প্রবাসী, ৫২শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৫৯

সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

স্নানে
তৃপ্তিদায়ক
প্রচুর মোলায়েম শুভ্র ফেনা
গাত্রত্বককে কোমল ও মসৃণ করে
বেঙ্গল কেমিক্যালের
স্বচ্ছ
গ্লিসারিন
সাবান
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা · বোম্বাই · কানপুর

"কালো মেয়ে"

শ্রীচারুরঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ম্যালভিনা হফম্যান-কৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবক্ষমূর্তি

নিউ ইয়র্ক

ম্যালভিনা হফম্যান-কৃত স্বামী বিবেকানন্দের ব্রোঞ্জ মূর্তি

নিউ ইয়র্ক

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫২শ ভাগ ১ম খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৫৯ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নববর্ষ

নববর্ষ আজ আমাদের দ্বারে। উহার আগমনে লোকের মনে স্বভাবতঃই আশার উদ্রেক হয়, সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও জাগে "কি জানি অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ-দহন আছে ?"

ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তাহা জানি না কিন্তু আমরা কিছুকালের মত দেশের ভাগ্য কংগ্রেসী সরকারের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। তাহার ফলাফলে আমাদেরও বুদ্ধি-বিবেচনার পরীক্ষা হইবে। শাসনদণ্ড যাঁহাদের আয়ত্তে গিয়াছে তাঁহারা এখনও বিজয়গর্ব্বে উন্মত্ত ও কাণ্ডজ্ঞানবিহীন। নির্ব্বাচনের প্রকৃত তথ্য বিচারের স্পৃহা বা ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। দেশের লোকের অর্দ্ধেকেরও অধিক যে আজ কংগ্রেসবিরোধী সে কথা তাঁহারা উড়াইয়া দিয়াছেন।

দেশব্যাপী নির্ব্বাচনের পালা ত অনেক দিন হইল শেষ হইয়াছে। উহার সমস্ত গোনাগুনতি এখন সাধারণের সামনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং পার্লামেণ্টে কোন্ পার্টির কত জোর তাহাও আমরা জানিয়াছি। প্রদেশের বিধানসভাগুলিতেও কোন্ পার্টির কত সভ্য তাহার হিসাবও আমরা পাইয়াছি।

নির্ব্বাচনে ভোটারদিগের সংখ্যা সবশুদ্ধ ১৭ কোটি ৬০ লক্ষ ছিল। ৭৫টি রাজনৈতিক দল হইতে ১৭০০০ (মোটামুটি) প্রার্থী নির্ব্বাচনে দাঁড়াইয়াছিলেন তন্মধ্যে পার্লামেণ্টের ৪৮৯ সভ্য লইয়া এবং ২২টি রাজ্যের বিধানসভার সভ্য লইয়া সবশুদ্ধ ৩২৭৮ সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ২২টি রাজ্যের মধ্যে ১৮টিতে কংগ্রেস প্রবল শক্তিলাভ করিয়াছে, অন্য চারিটিতেও কংগ্রেসই সংখ্যায় প্রবলতম একক দল। বিরোধী সভ্যগণ বহু দলে বিভক্ত হইয়াছেন। সেই কারণে কোথাও কোনও বিরোধীদল মন্ত্রিত্ব গঠনে সমর্থ হয় নাই।

উড়িষ্যায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রিত্ব গঠনে পূর্ব্বেই সক্ষম হইয়াছে। দুটি অন্য রাজ্যেও মন্ত্রিত্ব কংগ্রেসেরই হস্তে আসিতেছে। মাদ্রাজেও তো রাজাজীর যুক্তিকৌশলে মন্ত্রিত্ব কংগ্রেসেরই দখলে আসিল।

আসামে ১০৮ আসনের মধ্যে ৭৬টি, বিহারের ৩৩০ আসনের মধ্যে ২৪১টি, উত্তর প্রদেশের ৪৩০টি আসনের মধ্যে ৩৯০টি, বোম্বাইয়ের ৩১৫ আসনের মধ্যে ২৬৯টি, মধ্য-প্রদেশের ২৩২ আসনের মধ্যে ১৯৪টি, মাদ্রাজের ৩৭৫ আসনের মধ্যে ১৫২টি, উড়িষ্যার ১৪০ আসনের মধ্যে ৬৮টি, পঞ্জাবের ১২৬ আসনের মধ্যে ৯৮টি, পশ্চিম বাংলার ২৩৮ আসনের মধ্যে ১৫১টি, হায়দ্রাবাদের ১৭৫ আসনের মধ্যে ৯৩টি, মধ্য ভারতের ৯৯ আসনের মধ্যে ৭৫টি, মহীশূরের ৯৯ আসনের মধ্যে ৭৪টি, পেপস্থর ৬০ আসনের মধ্যে ৩৫টি, রাজস্থানের ১৬০ আসনের মধ্যে ৮১টি, সৌরাষ্ট্রের ৬০ আসনের মধ্যে ৫৫টি, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের ১০৮ আসনের মধ্যে ৪৪টি, আজমীরের ৩০ আসনের মধ্যে ২০টি, ভূপালের ৩০-র মধ্যে ২৫টি, বিন্ধ্য-প্রদেশের ৬০-র মধ্যে ৪০টি, কুর্গের ২৪-র মধ্যে ১৫টি, দিল্লীর ৪৮-র মধ্যে ৩৯টি এবং হিমাচল প্রদেশের ৩৬-র মধ্যে ২৪টি আসন কংগ্রেস-অধিকারে আসিয়াছে।

কিন্তু প্রার্থী সম্পর্কে ভোটদাতাদের যোগ্য-অযোগ্যের বিচার অন্যপ্রকার এক তথ্য উদ্ঘাটন করে; এ কথার বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। কংগ্রেস সমগ্র ভারতে ৩২৬৮ প্রার্থী নির্ব্বাচনে পাঠায় ইহার মধ্যে ২২৪৮ জন নির্ব্বাচনে সফলকাম হয়। কংগ্রেসের সপক্ষে ৪,৩৪,৭০,৯২৪ ভোট প্রদত্ত হয়। সোস্যালিষ্ট পার্টি ১৭৯৩ প্রার্থী নির্ব্বাচনে পাঠায়। উহার মধ্যে মাত্র ১২৬ জন নির্ব্বাচিত হয়, কিন্তু ঐ দলের পক্ষে ৯৯,৫৮,৮৪২ ভোট প্রদত্ত হয়। কম্যুনিষ্ট ও তাহাদের অনুগত দল ৫৮৭ প্রার্থী দাঁড় করায়। উহার মধ্যে ১৮১ জন সফলকাম হয়। ঐ সকল দলের পক্ষে ৬২,৫৯,৩৩৩ ভোট প্রদত্ত হয়। কৃষক-মজদুর-প্রজা দল ৯৪৫ জন প্রার্থী উপস্থিত করে। উহার মধ্যে ৭৮ জন সফলকাম হয়, এবং ঐ দলের সপক্ষে ৫০,৭৩,৩২৬ ভোট প্রদত্ত হয়। জনসঙ্ঘের ৭৩২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৫ জন কৃতকার্য্য হয় ও উহার সপক্ষে ২৮,১৮,৮৩৫ ভোট প্রদত্ত হয়। হিন্দু মহাসভার ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ২০ জন সফল হয় এবং ঐ দলের পক্ষে ৮,৫১,৪১০ ভোট পড়ে। রামরাজ্য পরিষদ ৩০৪ প্রার্থী মনোনীত করে, তার মধ্যে ৩২ জন পাস হয় এবং ঐ দলের পক্ষে ১২,১২,৪৬৮ ভোট আসে। অস্পৃশ্য ফেডারেশনের (আম্বেদকরের দল) ২১৩ জন প্রার্থীর

১২ জন মাত্র সফল হয়। ঐ দলের প্রার্থী ভোট পায় মোট ১৬,৯৬,৩৬০। কিষাণ-প্রজা পার্টি (মাদ্রাজের) ১২৭ জন প্রার্থী দাঁড় করায় যার মধ্যে ২১ জন পাস হয় এবং ঐ দল ১০,৮১,৫৬১ ভোট পায়।

স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিল সবশুদ্ধ ২৫৯৬ যার মধ্যে ২৮৩ জন সফলকাম হয় এবং স্বতন্ত্রপ্রার্থী সকলের পক্ষে ১,০৯,০১,৪৮১ ভোট প্রদত্ত হয়। অন্যান্য সকল ছোট বড় দল ১২৪৯ প্রার্থী দাঁড় করায় যার মধ্যে ২৩৭ জন সফল হয় এবং ঐ সকল প্রার্থীর পক্ষে ৯১,৩৩,৫৭৯ ভোট প্রদত্ত হয়।

এই সকল সংখ্যার বিচারে বুঝা যায় যে, কতকগুলি দল ভোট যাহা পাইয়াছে তাহার অনুপাতে আসন অনেক কমই পাইয়াছে। কংগ্রেসের পরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছে স্বতন্ত্র প্রার্থিগণ। তাহার পর সোস্তালিষ্ট পার্টির স্থান, যাহা প্রায় ১ কোটি ভোট পাইয়াছে, কিন্তু আসন পাইয়াছে মাত্র ১২৬টি। কিন্তু কম্যুনিষ্ট দল ও তাহাদের অনুগামীবর্গ ৬২ লক্ষ ভোটে ১৮১টি আসন দখল করিয়াছে। জনসঙ্ঘ ২৮ লক্ষ ভোটে মাত্র ৩৫টি আসন পাইয়াছে। উহার তুলনায় রামরাজ্য পরিষদ মাত্র ১২ লক্ষ ভোটে ৩২টি আসন পাইয়াছে। আম্বেদকারের দল ১৭ লক্ষ ভোট পাইয়াছে কিন্তু আসন পাইয়াছে মাত্র ১২টি।

এই সকল তথ্যের বিচারে নির্ব্বাচনে অদৃষ্টের পরিহাস যথেষ্টই দেখা যায়। সে যাহাই হউক, দেখা গেল যে, পুরাতন বা নবীন কংগ্রেসবিরোধী দল সবই নির্ব্বাচনে শুধু যে হটিয়া গিয়াছে তাহা নয়, পার্লামেণ্টে কংগ্রেসের পরেই প্রধান দল দাঁড়াইয়াছে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তাহার সহচরবৃন্দ, যদিও ভোট-সংখ্যায় তাহাদের স্থান বহু নিম্নে। অবশ্য স্বতন্ত্র প্রার্থিগণ সংখ্যায় তাহাদের অপেক্ষা গরিষ্ঠ কিন্তু তাঁহারা দলবদ্ধ নহেন।

কোনও বিচারবুদ্ধিযুক্ত লোক কখনও ভাবে নাই যে, এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেস হারিবে। বরং ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও মাদ্রাজে কংগ্রেসের পরাজয় সকলের মনে বিস্ময় আনে। কিন্তু কেহ একথাও ভাবেন নাই যে, নির্ব্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধীদল এরূপ ভাবে ঝড়ের মুখে খড়ের কুটার মত উড়িয়া যাইবে।

একমাত্র জনসঙ্ঘের প্রধান নেতা ভিন্ন অন্য সকল দলের নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের হাতে পরাজিত হইয়াছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতে যাঁহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি আছে ঐরূপ বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে পরাজিত হইয়াছেন। যে সকল নেতা সদলে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া নূতন দল গঠন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই পরাজিত।

এ সকল কথায় দুঃখ বা পরিতাপের কিছুই নাই। তবে দেশের কল্যাণকামনায় এ কথাই শুধু মনে হয় যে, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বিরোধী দল গঠিত হইলে দেশের শাসন ও গঠন কার্য্যে বহু দুর্নীতির বহিষ্কার সম্ভব হইত।

যে পার্লামেণ্টের মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে তাহাতে এরূপ লোক অল্পই ছিলেন যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত মতের ধারক ও রক্ষক ছিলেন। অন্যায় ও দুর্নীতির মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করার বা প্রবল বাধা দিবার চেষ্টা করার যোগ্যতা অতি অল্পলোকেরই ছিল। অধিকাংশ সভ্যই ছিলেন অবিবেচক ভাগ্যান্বেষী। কেহবা চাটুকাররূপে, কেহবা আত্মীয় বা দলপতির পলগ্রহরূপে দিনগত পাপক্ষয় করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিতেন। দেশে দুর্নীতি ও অনাচারের স্রোত বহাইবার প্রধান সহায়ক ছিলেন ঐ সকল অপদার্থ লোক।

এবারকার পার্লামেণ্টে ঐরূপ জীবেরই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বের পার্লামেণ্টে যে কয়েকজন নির্ভীক সমালোচক ছিলেন তাঁহারা এবার সকলেই পরাজিত। সুতরাং কংগ্রেসের পথ এখন নিষ্কণ্টক। কংগ্রেস-বিরোধী দলের মধ্যে হয়ত দুই-চার জন আছেন যাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে কংগ্রেসের রাষ্ট্রপরিচালন ও শাসনের সমালোচনা করিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহাদের সংহতি নাই, সমষ্টিগত ভাবে বিচার বা তর্কের ক্ষমতাও তাঁহারা এ যাবৎ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাষ্ট্রধ্বংসের কার্য্যে উৎসাহী তাঁহাদের সমালোচনার ত কোন মূল্যই নাই, কেননা তাঁহাদের হিসাবে বিপক্ষের সকল প্রস্তাব ও ব্যবস্থাই সমভাবে বিষবৎ বর্জ্জনীয়। তাহার মধ্যে ভালমন্দ বিচারের কোনও অবকাশ নাই, কোন প্রশ্নই নাই, আছে শুধু বিরোধিতার আয়োজন এবং সেই বিরোধ কংগ্রেস অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে কেননা ঐরূপ অযৌক্তিক বিরোধ জনমত টানিতে পারিবে না।

পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে যে কথা লিখিলাম তাহা প্রাদেশিক বিধান সভাগুলির ক্ষেত্রে আরও সত্য। তবে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসকে একটু সাবধানে চলিতে হইবে, কেননা যথেচ্ছাচারের ফলে সকল ভিন্ন পক্ষীয় লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিরোধিতা করিতে পারে, যাহার দরুন কংগ্রেসী শাসকবর্গ বিপদগ্রস্ত হইতে পারেন।

স্বতন্ত্রপ্রার্থীরূপে যাঁহারা নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচারের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে। এবারকার নির্ব্বাচনের ফলে দেশের শাসনতন্ত্রে স্বৈরাচার বা যথেচ্ছাচারের পথ মুক্ত হইয়া গিয়াছে। দেশের লোক বিভ্রান্ত হইয়া অনেক ভুল করিয়াছে। সে ভুলের পরিণাম ভয়াবহ হওয়া আশ্চর্য্য নয়, যদি কেহ অন্যায়ের প্রতিবাদ ও অনাচারের প্রতিরোধ করিবার জন্য সময়মত নিরপেক্ষভাবে ও স্থিরবুদ্ধিতে না থাকে।

সম্প্রতি কলিকাতায় তো কংগ্রেসের দিগ্বিজয়ের পালাগান হইয়া গেল। অধিকারীবর্গ মদগর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হইয়া এক অবাস্তব নাটকের অভিনয় করিয়া গেলেন। নানা বাক্যবাগীশ বক্তৃতার স্রোতে সভা প্লাবিত করিয়া নিজেদের গুণগান করিয়া গেলেন। বহু তথ্যের ভুল বিশ্লেষণ করা হইল, অনেক অলীক ও অবাস্তব বিষয়ের অবতারণাও হইল। মহাত্মা গান্ধীর শ্রাদ্ধও হইল অকারণে ও অকালে। সংকাজের মধ্যে মাত্র

উল্লেখ করা যায় "বর্দ্ধমান বনফর", অর্থাৎ কিনা কংগ্রেসের সহায়ক চোরাবাজারীর কিঞ্চিৎ অর্থনাশ।

সেখানে কংগ্রেসের সংস্কার বা কংগ্রেস হইতে দুর্নীতি-পরায়ণ লোকের বিতাড়ণ সম্পর্কে যে একটি শব্দও উচ্চারিত হয় নাই উহা বলাই বাহুল্য। কেননা দেশের লোককে বোকা বুঝাইবার প্রয়োজন তো আর নাই; অন্ততঃপক্ষে পাঁচ বৎসরের মত সেকাজ হইয়া গিয়াছে।

এই "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার" বিষয়ে আর বিশেষ কিছু লিখিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। ইহার উল্লেখ করিলাম, কেননা যে বৃথা আস্ফালন, ভুয়াকথার বিলাস ও ভণ্ডতপস্বীর অভিনয় আমরা কলিকাতায় দেখিলাম তাহাতে মনে অস্বস্তির সঞ্চার বিশেষভাবেই হইয়াছে।

আরও অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে দেশের শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গের যথেচ্ছাচারের আভাসে। এই বিজয়মদোন্মত্ত অন্ধের দল দেশকে কোন্ পথে লইয়া যাইবে তাহাই ভাবিবার বিষয়।

"নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি"র ঐ পালা সাঙ্গ করিবার সময় উচ্চতম অধিকারী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মনেও বোধ হয় কিছু সংশয় জাগে। তিনি বলেন:

"আমি এই সম্মেলনের সভাপতিরূপে বিগত দুই দিন বসিয়া থাকা কালে কেবল ভাবিতেছিলাম যে, আমাদের এই সকল কার্য্যক্রম ও প্রস্তাবমালার ভিত্তি কোনও কিছু বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত, না এ সবই নিছক অলীক অনুষ্ঠান। সময় ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী মাত্রই এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবে।"

পণ্ডিত নেহরুর মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হয় কেন? ইহার উত্তরে আমাদের মনে পড়ে এক বিখ্যাত হিন্দী লেখকের মন্তব্যের কথা। ইনি নির্ব্বাচনের ফলাফল বিচারে সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে পণ্ডিতজীর ঘোষণায় যে "কেবলমাত্র নির্ম্মল চরিত্র ও নিষ্কলঙ্ক খ্যাতিযুক্ত সজ্জনদিগকে কংগ্রেসের সমর্থন" দিবার কথা ছিল, সে কথা কি পণ্ডিতজীর আজও মনে আছে? নির্ব্বাচনের পরে পণ্ডিতজীর অবস্থা যেন পরম বৈষ্ণব এক শেঠজীর মত। ঐ শেঠজীর পাহাড়ী পাচক ঘোর মাংসাশী ছিল। সে চাকুরী যাইবার ভয়ে প্রকাশ্যে মাংস খাইত না, লুকাইয়া মাংস পিষিয়া 'মসলা'র মিশাইয়া ডালের সঙ্গে পাক করিয়া খাইত। এক দিন ভুলক্রমে সেই ডাল শেঠজীর পাতে পড়ে এবং শেঠজী ডালে নূতন মুখরোচক আস্বাদ পাইয়া, খুশী হইয়া, পাচককে বলেন তাঁহার জন্য নিত্য ঐরূপ ডাল রাঁধিতে। পাচক ভয়ে ভয়ে বলে, "আজ্ঞে ও মসলা আপনার ডালে দেওয়া চলে না উহাতে—"

শেঠজী বুঝিতে পারিয়া বাধা দিয়া বলেন, "আহা, তুমি ডালে কি মসলা দিবে তাহা আমি জানিতে চাই না। আমি শুধু চাই ঐমত ডাল।"

রেলের পুনর্গঠন

ভারতীয় রেলপথগুলি ব্রিটিশ বণিকস্বার্থ ও তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল। কোন প্রকার বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর আমাদের রেল-লাইন গঠিত হয় নাই। বহু ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক জলনিকাশের পথ প্রয়োজনানুসারে রাখা হয় নাই। কালভার্টগুলি অত্যন্ত ছোট করার ফলে প্রবল বন্যার সময় লাইন তো ভাঙিয়াছেই, মাইলের পর মাইল ভাসিয়া গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়া লোকেরও দুর্দশার একশেষ হইয়াছে। এই সকল অব্যবস্থার অপসারণ করিয়া বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে রেলপথকে পুনর্গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করিবার পর উহাদের রেলের সঠিক বিলিব্যবস্থাও ভারত-সরকারের হাতে আসিয়াছে। সুতরাং ইহাদের পুনর্গঠন নিতান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমানে লাইনগুলি যে অবস্থায় আছে, তাহাতে খরচ বেশী এবং গাড়ী চলাচলের অসুবিধাও অনেক। কলিকাতা হইতে ডিব্রুগড়ে জরুরী প্রয়োজনে কোন ট্রেন পাঠাইতে হইলে কলিকাতা, গোরক্ষপুর এবং পাণ্ডু এই তিন আপিসের কণ্ট্রোল মারফত যাইতে হইবে। কলিকাতায় ই. আই. রেল, গোরক্ষপুরে ও.টি. রেল এবং পাণ্ডুতে আসাম রেলের হেড কোয়ার্টার এই তিন দফার হেড আপিস না রাখিয়া একটি মাত্র হেড কোয়ার্টার রাখিলে তাহাতে খরচ কম হইবে। বিভিন্ন কোম্পানীর বিভিন্ন লাইনের পরিবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল লইয়া রেল গড়িয়া উঠিলে কাজের সুবিধা অনেক হইবে। এই সকল বিষয় আলোচনার জন্য ১৯৫০ সালে রেলওয়ে বোর্ড একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কমিটি রেলের পরিচালন ব্যয় হ্রাস এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় রেলপথকে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। ইহারা অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া পরস্পর নির্ভরশীল হইবে এবং তাহাতে দেশের মঙ্গল হইবে। কমিটি বলেন যে, ইহাতে 'ওভারহেড চার্জ্জ' কম পড়িবে। পাশাপাশি রেলের সঙ্গে অনাবশ্যক চিঠিপত্র আদানপ্রদানের প্রয়োজন হইবে না। লোক কম লাগিবে, কাজ সহজ ও দ্রুত হইবে। দুই রেলের সঙ্গমস্থলে দুই কণ্ট্রোলের অসুবিধা দূর হইবে। ১৬টি রেলের ১৩টি কণ্ট্রোল ভাঙিয়া ৬টি কণ্ট্রোল হইবে। মালগাড়ী চলাচলের পক্ষে ইহা অত্যন্ত সুবিধাজনক হইবে। ওয়ার্কশপগুলির কাজ অনেক সহজ হইবে এবং উহাদের মধ্যে 'rationalisation', অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। মাল ক্রয় ও ব্যবহারের আদেশ দেওয়ার কর্ত্তার সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে বলিয়া অপচয়ের একটি বৃহৎ রাস্তা বন্ধ হইবে। ইহাতে কাজেরও উন্নতি হইবে, টাকাও অনেক বাঁচিবে।

রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির এই সুপারিশ ভারত-

সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ; ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ তারিখে বাজেট বক্তৃতার আবেদার তাহা জানাইয়াছেন।

ইহার পর ১৪ই এপ্রিল ১৯৫১ তারিখে এম-এস্-এম, এস-আই এবং মহীশূর রেল লইয়া সাদার্ণ রেলওয়ে গঠিত হয়। সাদার্ণ রেলওয়ে গঠনের পর এবং মাদ্রাজে তাহার হেড কোয়ার্টার স্থাপন করার পর ওয়েষ্টার্ণ এবং সেণ্ট্রাল রেলওয়ে গঠনে হস্তক্ষেপ করা হয় ; শেষোক্ত দুইটির হেড কোয়ার্টার হয় বোম্বাই।

অতঃপর বাকী তিনটি এলাকায়—নর্দার্ণ, ইষ্টার্ণ এবং নর্থ-ইষ্টার্ণ—রেল পুনর্গঠন শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে। শেষের দুইটির হেড কোয়ার্টার কলিকাতায় হইবে বলিয়াই ঠিক ছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারী আয়েঙ্গারের এই বক্তৃতার পর ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ সহকারী রেলমন্ত্রী শাওনওয়াজ পার্লামেণ্টে বলেন যে, নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলের হেড কোয়ার্টার কলিকাতা হইবেই, তাহা না হইলে কলিকাতা হইতে গোরক্ষপুরে চার গুণ লোক বদলী করিতে হইবে।

সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় একটি ব্যাপার ঘটে। গোরক্ষপুরে ও. টি. রেলের হেড আপিস ছিল, উহা নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলের অন্তর্ভুক্ত হইলে গোরক্ষপুরের হেড কোয়ার্টার কলিকাতায় চলিয়া আসিবে। গোরক্ষপুর হিন্দু মহাসভা ও জনসঙ্ঘের একটি ঘাঁটি। তাহারা প্রাদেশিক কারণে গোরক্ষপুরে যাহাতে নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলের হেড কোয়ার্টার হয় তাহার জন্য দাবি করিয়া গোবিন্দবল্লভ পন্থকে বিপদগ্রস্ত করে। পণ্ডিত জবাহরলাল প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে ইহাদের রীতিমত ভয় করিতে থাকেন। হিন্দু মহাসভার এই চালকে বেচাল করার জন্যই গোরক্ষপুরের এই দাবি গোবিন্দবল্লভ তাঁহার নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে মানিয়া লইলেন। ওদিকে পাণ্ডুতে হেড কোয়ার্টার রাখিবার জন্য আসাম চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী রেলওয়ে সেণ্ট্রাল এডভাইসরি কমিটির বৈঠক বসে এবং উহাতে এসব বিষয় সমালোচনা করা হয়। এডভাইসরি বোর্ড এবার তাঁহাদের পূর্ব্বমতের পরিবর্ত্তনের পথ খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। চাপে পড়িয়া এডভাইসরি কমিটি বলিলেন যে, এখন বাকী তিনটি এলাকায় পুনর্গঠন প্রস্তাব চাপা থাকুক, নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে তাঁহারা ইহা করিবেন। কিন্তু গোপাল-স্বামীর ইহা ভাল লাগিল না কেননা ইহাতে তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপনে দেরী হয়. সুতরাং তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেই মতামত পেশ করার জন্য কমিটির উপর এক ফতোয়া জারী করিলেন।

৬ই মার্চ আবার কমিটি ডাকা হইল। ১৫ জনের মধ্যে ১২ জন উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, মৌলবী নাজিরুদ্দীন আহম্মদ এবং শ্রীগোকুলভাই ভাট কলিকাতা হেড কোয়ার্টারের পক্ষে ভোট দিলেন। বাকী নয়জনে গোরক্ষপুরে নর্থ-ইষ্টার্ণের হেড কোয়ার্টার করার প্রস্তাব মানিয়া লইলেন।

এইখানে আর এক কথা বলিয়া রাখা দরকার। প্রথম যখন সমস্ত রেলওয়ে ছয়টি কণ্ট্রোল এলাকায় ভাগ করার কথা হয়, তখন দিল্লীতে কোনও হেড কোয়ার্টার বসাইবার প্রস্তাবই হয় নাই। মূল প্রস্তাবে ছিল বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা ও লক্ষ্ণৌ এই চার কেন্দ্রের কথা। তারও আগে নাগপুরে সেণ্ট্রাল এলাকার কেন্দ্রের কথা হয়, কিন্তু বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মত ইহার বিরুদ্ধে যাওয়ায় উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দিল্লী বা গোরক্ষপুরের নামগন্ধও মূল প্রস্তাবে ছিল না। বদলের সময় নাগপুরের স্থলে বোম্বাইয়ে ওয়েষ্টার্ণ ও সেণ্ট্রাল, মাদ্রাজে সাদার্ণ, কলিকাতায় ইষ্টার্ণ ও নর্থ-ইষ্টার্ণ এবং লক্ষ্ণৌতে নর্দার্ণ কেন্দ্রের প্রস্তাবই হয়। ঐ প্রস্তাবই সমস্ত প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষ এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়।

তারপর পঞ্জাবের দল ধরিয়া বসিল যে, তাহাদের একটা কেন্দ্র চাই। দিল্লীতে পঞ্জাবী ও মাদ্রাজীর দল বড়ের চাল চালিয়া, লক্ষ্ণৌকে বেমালুম বাদ দিয়া নর্দার্ণ কেন্দ্র দিল্লীতে টানিয়া লইল। বলা বাহুল্য, রেলওয়ে কেন্দ্র হিসাবে দিল্লী অপেক্ষা লক্ষ্ণৌ শতগুণে অধিক উপযুক্ত। দিল্লীতে স্থানের অভাব ভীষণ এবং অন্যান্য দিক দিয়াও লক্ষ্ণৌ অপেক্ষা দিল্লীর যোগ্যতা অনেক কম। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, গোপালস্বামী একদিকে শক্তের ভক্ত অন্যদিকে রেলওয়ে সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত। শুধু রেলওয়ে নয় অন্য সকল বিষয়েও প্রায় তাই, কেবলমাত্র সুযোগ্য ঘটিরাম ডেপুটির মত হুজুর মেহেরুর তুষ্টিসাধনে অসীম জ্ঞানী।

উত্তর প্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপে একদিকে কেন্দ্র হিসাবে লক্ষ্ণৌকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারায় খেলো হয়, অন্যদিকে হিন্দু মহাসভার মাথা, গোরক্ষপুরের মোহন্ত দিগ্বিজয়নাথের চাপে অতিষ্ঠ হওয়ায় নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলকেন্দ্র লইয়া বায়না ধরিয়া বসিল। গোপালস্বামী ভাবিলেন উত্তর প্রদেশ তো তাঁহার মনিবের মুল্লুক, সুতরাং এ প্রস্তাব অন্যদিকে যতই খারাপ হউক ইহা প্রভুর তুষ্টিবিধায়ক হইতে পারে। সুতরাং ব্যবস্থা পাল্টাইবার চাল চলিল ও ফলিল। গোরক্ষপুরে হেড কোয়ার্টার হইলে কলিকাতায় কমার্সিয়াল অপারেশনাল, ষ্টোর এবং একাউণ্ট বিভাগ রাখিতে হইবে। ইহাতে দ্বিগুণ খরচ হইবে বাণিজ্যের এবং আসামে খাদ্য ও মিলিটারী স্পেশালের দ্রুত যাতায়াতের অসুবিধাও ঘটিবে। গোরক্ষ-পুরে নূতন করিয়া কণ্ট্রোল বসাইতে গেলে অতিরিক্ত ১৫।১৬ কোটি টাকা খরচ হইবে এবং দশ বৎসর সময় লাগিবে। কলিকাতায় সবই আছে, সুতরাং নূতন খরচ

লাগিবে না, সময়ও নষ্ট হইবে না। গোরক্ষপুরে হেড কোয়ার্টার হইলে কর্মচারীদের ও আপিসের জন্য বাড়ী করিতে কমপক্ষে ৬ কোটি টাকা খরচ হইবে। কলিকাতার তিনটা রেলের হেড আপিস ছিল, উহাদের বাড়ী আপিসের জন্য পাওয়া যাইবে। কলিকাতার কর্মচারীদের জন্য নূতন বাড়ী করার দরকার নাই। আয়েঙ্গার এখন বলিতেছেন বটে যে, কলিকাতার কর্মচারীরা গোরক্ষপুর যাইতে না চাহিলে তাঁহাদিগকে জোর করিয়া পাঠানো হইবে না। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতির ভরসা কি? নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলের হেড কোয়ার্টার গোরক্ষপুরে সরাইবার ফলে আসামের ইংরেজ চা-করেরা অধিকতর পরিমাণে চা চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া রপ্তানীর চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবে। ইহাতে কলিকাতার গুরুত্ব কমিবে। পাণ্ডু হেড কোয়ার্টার্স রাখিয়াই অসুবিধা হইতেছিল, গোরক্ষপুর হইতে চা-এর রপ্তানী চালানো একপ্রকার অসম্ভব হইবে।

ইষ্টার্ণ রেল হইতে এলাহাবাদ ডিভিসন সরাইয়া লইলে ইষ্টার্ণ রেল অল্পদিনের মধ্যেই অচল হইবার উপক্রম হইবে। রেলের মালগাড়ী চলাচলের পক্ষে এলাহাবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইষ্টার্ণ রেলে প্রত্যহ প্রতি দশ মাইলে ২৪টি করিয়া মালগাড়ী চলাচল হইবে। সাদার্ণ, ওয়েষ্টার্ণ এবং নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলে প্রত্যহ প্রতি দশ মাইলে ১০টির বেশী লাগিবে না, নর্দার্ণ রেলে লাগিবে মাত্র ৫টি। সুতরাং ইষ্টার্ণ রেলওয়ের উপর মাল চলাচলের চাপ সবচেয়ে বেশী পড়িবে। নর্দার্ণ রেল যদি সময় মত বোঝাই মালগাড়ী লইতে এবং খালি গাড়ী দিতে না পারে তাহা হইলেই কয়লা এবং অন্যান্য দ্রব্য চালানে বিঘ্ন ঘটিবে। মোগলসরাই ইয়ার্ডে এত গাড়ী জমিয়া যাইবে যে, সমস্ত চলাচল ব্যবস্থা নষ্ট হইবার উপক্রম হইবে।

তাহার পর এই ইষ্টার্ণ রেলে যুক্ত হইবে বি, এন, রেলওয়ে যাহা বিপুল খনিজবাহী রেলপথ। উহা যুক্ত হইলে এক ইষ্টার্ণ ক্ষেত্রের অধীন রেলপথে প্রতি বৎসর যত কোটি টন মাইল মাল চলাচল হইবে অন্য পাঁচটি ক্ষেত্রের মোট যোগফলেও তত টন মাইল হইবে কিনা সন্দেহ। অথচ সে ভাবে তাহার গাড়ী ও ইঞ্জিনের ব্যবস্থা একেবারেই হয় নাই।

প্রাদেশিকতা রেলের ব্যাপারে কতটা প্রবেশ করিয়াছে তার আর এক প্রমাণ গঙ্গার পুল। ফরকা গঙ্গার ব্রিজ ও বাঁধ তৈয়রির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান, কিন্তু ব্রিজ নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে পাটনায়। মুর্শিদাবাদ জেলায় ফরকায় গঙ্গার ব্রিজ তৈরি হইলে এবং সেই সঙ্গে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত ব্রডগেজ লাইন বসাইলে দার্জ্জিলিং যাইতে আগে যে সময় লাগিত এখন তদপেক্ষা কম সময় লাগিবে। গঙ্গার এপারে ব্রডগেজ লাইনের মাঝখানে একটা মিটারগেজ মাপের লাইন পাতিয়া দিলে আমিনগাঁও হইতে চায়ের মালগাড়ী সোজা কলিকাতা আসিতে পারিবে। ঐ সঙ্গে গঙ্গায় বাঁধ নির্ম্মিত হইয়া কলিকাতার বন্দর রক্ষা পাইতে পারিবে। গঙ্গার জল ভাগীরথীতে আগে যেমন আসিত এখন তেমন আসিতেছে না, ফলে চড়া পড়িয়া যাইতেছে এবং কলিকাতায় জাহাজ আসা বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে। ফরকায় পুল এবং বাঁধ একসঙ্গে নির্ম্মিত হইলে দুইটির জন্য পৃথক লোকর খরচ হইবে না এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দিক দিয়াও উহাই প্রশস্ত হইবে। কিন্তু উত্তর প্রদেশের প্রাদেশিকতাবাদীরা যেমন গোরক্ষপুর লইয়া টানাটানি সুরু করিয়াছে, বিহারের প্রাদেশিকতাবাদীরা তেমনি গঙ্গার পুল পাটনা অথবা মোকামার লইয়া যাইবার আন্দোলন করিতেছে। এইভাবে রেল পুনর্গঠনের নামে কলিকাতাকে ধ্বংস করিবার এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সুখের বিষয় যে, সমস্ত বামপন্থী দল এবং জনসাধারণ ইহার প্রতিবাদে সাড়া দিয়াছে। ইহার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হওয়া দরকার।

বাস্তব পক্ষে এই রেলের পুনর্গঠনের বিষয়টি সম্পূর্ণ নূতন ভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। প্রথমে যে ভাবে প্রস্তাবগুলি করা হয় তাহাতে আমাদের ধারণা ছিল যে সম্যক বিচার ও পরীক্ষা করার পরে রেলওয়ে পরামর্শদাতা কমিটি ঐরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। পার্লামেণ্টে সে বিষয়ে বিশেষ বিতর্ক না হওয়ায় আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, এই পুনর্গঠনের সকল সমস্যার পূর্ণ বিচার করা হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে, কেবলমাত্র লাইনের দৈর্ঘ্য মাপিয়া মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করিয়াই কাজ শেষ করা হইয়াছে। এইরূপ ছেলেখেলায় শেষ করা হইয়াছে এত বড় ব্যাপার, যাহাতে ভারতের ৮০০ কোটি টাকার মূলধন ন্যস্ত রহিয়াছে। ইহা বিশ্বাস করাও কঠিন, কিন্তু বটিয়ামের ব্যবস্থায় সবই সম্ভব। হয়ত এইভাবে রেল চলাচল বানচাল করিয়া তস্করের পথ সুগম করা হইতেছে। কে বুঝিবে তাহা? বিচারক ত কংগ্রেসী পণ্ডিতগণ।

রেলের পুনর্বিন্যাস

শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গারের বুজরুকির প্রতিবাদে কলিকাতায় রেলওয়ে এবং জনসাধারণের "সংযুক্ত সংগ্রাম-পরিষদে" দুই দিন ব্যাপী আলোচনার পর এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :

ই. আই., বি. এন. এবং আসাম রেলওয়ের কর্মচারীদের যুক্ত সংগ্রাম-পরিষদের আহ্বানে, দল ও মত নির্ব্বিশেষে কলিকাতার নাগরিক ও রেলকর্ম্মীদের এই সম্মেলন রেলদপ্তর কর্তৃক জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া নর্দার্ণ ও ইষ্টার্ণ রেলওয়ে ব্যবস্থার তাড়াহুড়া করিয়া পুনর্বিভাসের যে চেষ্টা চলিয়াছে তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে। এই প্রস্তাবিত পুনর্বিভাসে কলিকাতা, দিল্লী ও গোরক্ষপুরে তিনটি সদর কার্য্যালয় স্থাপনের যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহাতে ই. আই. রেলওয়েকে তিন ভাগে বিভক্ত

করা হইবে। উহা সর্ব্বত্র বিশেষজ্ঞের প্রস্তাব ও অভিমতের পরিপন্থী। বর্ত্তমানে রূপান্তরিত প্রস্তাব সরকারের পূর্ব্বেকার ঘোষণার বিরোধী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল যে, রেল-চলাচল ব্যবস্থায় বিশেষ গোলযোগ না ঘটাইয়া এবং আঞ্চলিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রেলের পুনর্বিভাস করা হইবে।

জানুয়ারী মাসে প্রচারিত রেলওয়ে বোর্ডের প্রস্তাবে কলিকাতায় নর্থ-ইষ্টার্ণ ও ইষ্টার্ণ জোনের হেডকোয়ার্টার্স রাখায় ও ইষ্টার্ণ জোনে এলাহাবাদ ডিভিসন অন্তর্ভুক্ত রাখার যে সিদ্ধান্ত ছিল তাহার হঠাৎ পরিবর্ত্তন ও উহার ফলে অপর একটি প্রস্তাবের কথা ঘোষণা করায় সম্মেলন উহার নিন্দা করিতেছে এবং এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, নূতন প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সঙ্কীর্ণ স্বার্থের তোষণ ও পোষণ করা। এই প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, এই সম্মেলন পরিবর্ত্তিত পুনর্বিভাসের প্রস্তাবে বিশেষ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে। এই পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব কার্য্যকরী করা হইলে শুধু যে পনের হাজার রেলকর্ম্মচারী ও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের উপর আঘাত আসিবে তাহা নহে, পরন্তু ইহার ফলে ভারতের উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলের আর্থিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুতর বিপর্য্যয় ঘটিবে। এই নূতন প্রস্তাবের ফলে (১) চলাচল ব্যবস্থায়—বিশেষতঃ কয়লা, পাট, চা, কাঠ প্রভৃতির চলাচলে গোলযোগ দেখা দিবে; (২) কলিকাতা বন্দরের বিরাট ক্ষতি হইবে; (৩) গাড়ী চলাচলে অত্যন্ত অসুবিধা সৃষ্টি হইবে—বিশেষতঃ ওয়াগন সরবরাহ চালু রাখা এবং কয়লা, খনিজ, লোহা-সিমেণ্ট, কাগজ, চিনি, খাদ্যশস্য প্রভৃতির জন্য নিত্য-প্রয়োজনীয় গাড়ীর ব্যবস্থা করা কঠিন হইয়া পড়িবে; (৪) ক্রেনের ব্যবস্থা, সরবরাহ চালু রাখা এবং ভাণ্ডারের সংগ্রহ করার ব্যাপারে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে; (৫) কলিকাতার শহরতলীর বিপুল সংখ্যক যাত্রীর চলাচল ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষ ঔদাসীন্য এই প্রস্তাবে দেখা যায়; (৬) মণিহারিঘাট, মোকামা, ভাগলপুর এবং কাশীতে গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়া রেল চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে; (৭) উত্তর প্রদেশসহ সমস্ত উত্তর ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে ভীষণ আঘাত পড়িবে; (৮) দেশের চলাচল ব্যবস্থায় প্রাদেশিকতা দেখা দিবে; (৯) নূতন আপিস স্থাপন, বাসভবন নির্ম্মাণ, অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য বহু অর্থ ব্যয় হইবে; (১০) প্রায় সমস্ত গ্রেডের কর্ম্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষের কারণ হইবে; (১১) ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে গাড়ী চলাচল ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় অসুবিধা দেখা দিবে।

সম্মেলন ভারত-সরকারকে জানুয়ারী মাসে ঘোষিত মূল প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। যদি তাহা না করা হয় তবে প্রস্তাবিত প্রস্তাব কার্য্যকরী করা স্থগিত রাখিতে এবং প্রশ্নটি সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির অভিমত গ্রহণ সম্পর্কে রেল-দপ্তরের নিকট আহ্বান জানাইতেছে।

সম্মেলন এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আহ্বান জানাইতেছে।

সম্মেলন রেল-পুনর্বিভাস সম্পর্কিত পরিবর্ত্তিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইতেছে এবং এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রেলকর্ম্মীরা যে ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে সম্মেলন অভিনন্দিত করিতেছে।

সম্মেলন এই সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, প্রাদেশিক সংকীর্ণতার দিক হইতে নহে, জাতীয় স্বার্থের দিক হইতেও রেলের পুনর্বিভাস সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিভিন্ন বিষয় বিচার বিবেচনা করিয়াই উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

এই অবৈজ্ঞানিক ক্ষতিকারক রেলওয়ে পুনর্বিভাসের প্রস্তাব তাড়াহুড়া করিয়া প্রযুক্ত করার চেষ্টায় প্রতিরোধ এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা স্থির করার জন্য সম্মেলন ২০ জনের একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন।

পণ্যমূল্য

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভারতের আর্থিক জগতে যে মন্দার সূচনা দৃষ্ট হয় তাহা যে আন্তর্জাতিক ঘটনা পরিক্রমার প্রতিক্রিয়া সে কথা আমরা পূর্ব্ব-সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি আমেরিকার "নিউজ উইক" নামক পত্রিকায় এই মর্ম্মে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমাদের মতেরই অনুকূলে সাক্ষ্য দিতেছে।

উক্ত পত্রিকায় এই আর্থিক বিশৃঙ্খলার জন্য ব্রিটেনকেই মূলতঃ দায়ী করা হইয়াছে। ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াই ১,৪০,০০,০০,০০০ ডলারের আমদানী বন্ধ করিয়াছে। বাজেটেও অনুরূপ 'deflationary' পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ফলে আভ্যন্তরীণ কেনাবেচায় ভাটা পড়িয়াছে। লোকে খরচ কমাইয়া সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। দেশের চাহিদা কমিয়া যাওয়ার ফলে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে, বিশেষতঃ ষ্টার্লিং এলাকার সঙ্গে বাণিজ্যে বিপর্য্যয় আশঙ্কা করা যাইতেছে। এই সকল অঞ্চলেই ব্রিটেনের রপ্তানী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং ইহা যে অমূলক নহে তাহা বিভিন্ন দেশের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তনেই প্রমাণিত হইতেছে। উত্তর আমেরিকার বাজার রুদ্ধ হওয়ার পর অষ্ট্রেলিয়াই ছিল ব্রিটেনের প্রধান বিক্রয়-কেন্দ্র। আন্তর্জাতিক লেন-দেন ব্যাপারে অষ্ট্রেলিয়া বিরাট ঘাটতির সম্মুখীন হইয়াছে। প্রচুর আমদানীর জন্য তাহাদের সঞ্চিত ষ্টার্লিঙের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। অপর পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য তাহাদের আছে পশম ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং তাহারও মূল্য দ্রুত পড়িতেছে। সুতরাং অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী

আমদানী কমাইবার আদেশ দিয়াছেন। ফলে ব্রিটেনের বস্ত্র-শিল্পে, মোটর-গাড়ী শিল্পে ঘাটতির সূচনা হইয়াছে। ইহার পরিণাম বেকার সংখ্যার আরও বৃদ্ধি। ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটেনে বেকারের-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩১৩,৫০০তে। যদি এভাবে চলিতে থাকে তবে বৎসরের শেষে বেকারের সংখ্যা ১০,০০,০০০ দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

কিন্তু ব্রিটেনে যে মন্দার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা আজ আর কেবলমাত্র ব্রিটেনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নাই। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের পথে তাহা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মালয় ও ইন্দোনেশিয়াতে ইহার প্রথম আঘাত লাগিয়াছে রবার শিল্পের উপর। রবারই এই দুইটি দেশের প্রধান সম্বল। রবারের দাম ১৯৫১ সালে ছিল ৭৮ সেণ্ট, আজ তাহা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৩৫ সেণ্টে। রবার উৎপাদনও পৃথিবীর মোট প্রয়োজন অপেক্ষা প্রায় ৩,৫০,০০০ হইতে ৪,০০,০০০ টন বেশী হইবে। আর এই রবারই ষ্টার্লিং এলাকার ডলার রোজগারের অন্যতম উপায়। সুতরাং এখানেও মন্দার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাতে এই দুই রাষ্ট্রের মজদুরের কমিউনিষ্টদের দলে ভিড়িয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে।

ভারত এবং পাকিস্থানেও শেয়ার মার্কেট ও বাজার দর নামিতে সুরু করিয়াছে। যদিও ইহা সাময়িক কাটকাবাজের কীর্ত্তি তথাপি অন্তরালবর্ত্তী কারণ স্বরূপে পাট ও তুলার মূল্য হ্রাসকেই মূলতঃ দায়ী করা যাইতে পারে। সিংহলেও রবার রপ্তানীতে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় আমদানীর উপর কড়াকড়ি সুরু হইয়াছে। কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে জাপানে উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পায়। ইদানীং তাহাতে মন্দা দেখা দিয়াছে এবং গত মাসে বস্ত্রশিল্পে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ উৎপাদন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আরজেণ্টাইনাতে পশমের বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ায় তাহারাও অনুরূপ আমদানী কমাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। ফরাসী দেশেও বর্ত্তমান শতকের ভীষণতম মুদ্রাস্ফীতি বাণিজ্য হ্রাসের দিকে ক্রমশঃ গড়াইতেছে।

এভাবে আন্তর্জাতিক আর্থিক বক্তব্য সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অংশে ও আফ্রিকাতে অবস্থায় এখনও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে ইহাদের মধ্যেও অনেকে নানাপ্রকার নিষেধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্ত প্রস্তুতি চালাইতেছে।

যাহা হউক, অর্থনীতিবিদ্‌গণ ইহাকে "স্থায়িত্ব অর্জনের সমস্যা" (stabilization crisis) অথিত "বাজার-ঘাটী" (slump) বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা কোরিয়ার যুদ্ধে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতির নিতান্তই স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু বিপদের বিষয় হইয়াছে, যে সকল বিধিনিষেধ সৃষ্টি হইতেছে সে সব নিষেধাত্মক নিয়ম-কানুন এই মন্দাকে পুনরায় দাম্ভীর বাজারে পর্য্যবসিত করিতে পারে। আবার দ্রুতগতিতে পুনরায় মন্দারও টানিতে পারে। অবশ্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, সেরূপ অনিশ্চয়তা বর্ত্তমান শতকে সম্ভব নয়। কারণ বর্ত্তমানে সকল রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার যথেষ্ট অধিকার আছে এবং মন্দা চরম রূপ পরিগ্রহ করার পূর্ব্বেই তাহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে এবং বাজার আবার চড়িবে।

উক্ত পত্রিকার মতে বহির্বাণিজ্যে এই মন্দা কমিউনিষ্টদের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কনফারেন্স-এর বনিয়াদ বেশ সুদৃঢ়-ভাবে গড়িতে সাহায্য করিবে। রাশিয়া ইহার সুযোগ পরিপূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং মনে হয় বিভিন্ন দেশের সহিত, বিশেষতঃ পূর্ব্ব-পশ্চিমের সহিত যে বাণিজ্য এতদিন বন্ধ ছিল, তাহা পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্ত সর্ব্বপ্রকারে সচেষ্ট হইবে। এইজন্ত রাশিয়া বিভিন্ন দেশের সম্মিলিত প্রতিনিধিদের নিজস্ব সকল কলকারখানা পরিভ্রমণ করিয়া দেখাইবে এবং সুবিধামত তাহাদের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি করিবে।

সুন্দরবনে সরকারী সাহায্য

১৩ই চৈত্রের "আনন্দবাজার পত্রিকা"র এই পত্রটি প্রকাশিত হয় :

"বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবন অঞ্চলে মাননীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আপাততঃ ৬০,০০০৲ টাকা খয়রাতি সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।...সন্দেশখালী থানার বেড়মজুর ইউনিয়নের ভাদা তুষখালী গ্রামের লোক কেন উপরোক্ত সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল বুঝিতে পারিতেছি না। তুষখালী ইউনিয়নেরও কেহই এইরূপ সাহায্যের বিষয় কিছু জানে না।

সুন্দরবন-কৃষক-দরদী ভূতপূর্ব্ব সুন্দরবন অফিসার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মজুমদার গত ভাদ্র মাসে উক্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রিপোর্ট দিয়াছিলেন—

People are idle. They have no work to do. Immidiately some amount requires to be granted for test relief work in Kumirmari, Tushkhali of P. S. Sandeskhali and Jogesgonj of Hasnabad P. S. and modified rationing requires to be increased in each of them.

Unless this is done the people half-fed and starved will pass on Aswin somehow and from Kartic death by indirect or immediate cause of starvation will begin and the situation will go out of control. The stock of Government Pr. Golowns at Atapur and Tushkhali—although it is very small—should not be exported anywhere if Government want to save the lives of cultivators.

ইহাতে মেম্বরদ্বয় ইউনিয়নের কথা নাই। ইহারই উপর কালেক্টর সাহেব বাহাদুর আদেশ দিয়া সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

এই রিপোর্টের পরই আতাপুর গবর্মেণ্ট গুদামের খাদ্য দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল।"

তাহার পর পত্রলেখক খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থায় স্থানীয় ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট ইত্যাদির সম্পর্কে বক্রোক্তি করিয়াছিলেন। আমরা দেখি যে, জনহিতকর সকল কাজেই এইরূপ দাঁড়ায়।

বেতার বিভাগের দুর্নীতি

কেন্দ্রীয় বেতার বিভাগের কর্তা মিঃ লক্ষণনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে। কারণ এখনও অজ্ঞাত, যদিও এ সম্বন্ধে দিল্লী নগরীতে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। কয়েকটি নমুনা দিতেছি। কলিকাতায় "লাইফ" পত্রিকার ২০শে চৈত্রের সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ টি. ডি. চট্টোপাধ্যায় একজন সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, তাঁহাকে ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার করিয়া বাধা বাজে কাজে নিযুক্ত করা হইতেছে। যথা, পায়খানা কত উঁচু হইবে তাহার মাপ, জলনিকাশের ব্যবস্থা ও রাস্তা সারান। একটি মহিলা কেরাণী পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন ও মাহিনা পাইতেন ৬০-৫-১২০৲ টাকা। এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন ডিরেক্টররূপে তাঁহার মাহিনা হইয়াছে ৪৮০-৩০-৭৫০। অন্য একটি মহিলা ৬০-৫-১২০ পাইতেন। এখন ৩৫০-৩০-৬০০ টাকা পাইতেছেন। শুনিয়াছি, মিঃ লক্ষণন "পণ্ডিত" লোককে ভয় করিয়া থাকেন। তাহার ফলে অ-পণ্ডিতের সঙ্গে পড়িয়া তাঁহার অধঃপতন হইয়াছে।

রাজাজীর "অধঃপতন"

রাজাজী স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার "অধঃপতন" হইয়াছে। বিধান সভার সভ্যবৃন্দের নিকট বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। বেতার বক্তৃতায় (২৬শে চৈত্র) যে অবস্থায় পড়িয়া মুখ্যমন্ত্রী পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাহা বর্ণনা করেন।

শ্রীরাজাগোপালাচারী বলেন, আইন সভায় কংগ্রেসী সদস্যরা একবাক্যে দাবি করায় এবং প্রবীণ সদস্যরা ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করিতে থাকায় হঠাৎ এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহা নিস্পৃহভাবে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। উপেক্ষা করিলে আমি আজীবন যে নীতি প্রচার করিয়া আসিতেছি, তাহাই অস্বীকার করা হইবে। কারণ আমার মতে দেশ বা সম্প্রদায়ের জন্য সকল কাজই সমান মহৎ।

এই কথাগুলির মধ্যে রস আছে, কুরুকুল-পিতামহ ভীষ্মদেবের ন্যায় "অর-গুণের" স্বীকৃতি আছে, বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় আছে ততোধিক। ভীষ্মদেবের ইচ্ছামৃত্যুর অধিকার ছিল। রাজাজী সেই অধিকার লাভ করিয়াছেন জানিলে সুখী হইতাম। তাহা হইলে তিনি শতায়ু বা সহস্রায়ু হইয়া লোকসেবা করিতে পারিতেন।

মালান সরকারের অপচেষ্টা

নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গত ৮ই চৈত্র এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, আপীল আদালত কর্তৃক পৃথক প্রতিনিধিত্ব আইন অবৈধ ঘোষিত হওয়ায় পদত্যাগ করাই এখন ডাঃ মালানের দলের মুখরক্ষার একমাত্র উপায়।

আরও বলা হইয়াছে যে, আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে গণতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায়দের দৃষ্টিতে সমভাবে এদেশের সর্ব্বোচ্চ ন্যায়াধিকরণের খ্যাতি ও সুনাম অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। একথা গবর্মেণ্টকে বেশ কড়াভাবেই সমঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, লোকের মনোভাব গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া বদ্ধহস্তভাবে বর্ণবৈষম্যমূলক আইন প্রয়োগের ক্ষমতা তাহার নাই।

পৃথক প্রতিনিধিত্ব আইনের বিরোধিতার জন্য গঠিত ভোটাধিকার কর্ম্মপরিষদ অনুরূপ এক বিবৃতিতে কৃষ্ণাঙ্গ ও অশ্বেত জাতিগুলি আদালতের এই জয়ে নিশ্চিন্ত না হওয়ার জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যত দিন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যমূলক আইনের অস্তিত্ব থাকিবে এবং অশ্বেতকায় জাতিগুলিকে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে, তত দিন "দক্ষিণ আফ্রিকা রক্ষা কর" ধ্বনি তাহাদের নিকট মূল্যহীনই থাকিবে।

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, সুপ্রীম কোর্ট সর্ব্বসম্মতিক্রমে পৃথক প্রতিনিধিত্ব আইন অবৈধ ঘোষণা করায় ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় গুরুতর শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কেপটাউন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আদালতের এই সিদ্ধান্তে জনসাধারণের মধ্যে গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়াছেন এবং অবিলম্বে গবর্মেণ্টের পদত্যাগের দাবি ক্রমশঃ জোরালো হইয়া উঠিতেছে। প্রধানমন্ত্রী মালান এখন চেষ্টায় আছেন আদালতের ক্ষমতা ব্যাহত করার জন্য এবং এই দুষ্কার্য্যে তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আইন-অধ্যাপক।

মালানের এই অপচেষ্টায় তীব্র প্রতিবাদ ব্রিটেনে, কানাডায় এবং অন্যান্য বহু দেশে হইয়াছে। মার্কিন কাগজেও কড়া সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু মালান ও তাহার দল এখন বর্ণবৈষম্যরূপ ভূতগ্রস্ত। তাহারা এখন দেশের ও বিদেশের জনমত অগ্রাহ্য করিতে বদ্ধপরিকর।

টিউনিসিয়া

টিউনিসিয়ার নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শালেহ-দীন-বাকুচে ৩১শে চৈত্র নূতন শাসনতন্ত্র বিধি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন।

ফরাসী রেসিডেণ্ট-জেনারেলের সম্মতি পাওয়া গেলে শীঘ্রই মন্ত্রিসভা গঠন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

প্রস্তাবগুলি সংযুক্ত ফ্রাঙ্কো-টিউনিসিয়ান কমিশন কর্তৃক বিবেচিত হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হওয়া রেসিডেণ্ট-জেনারেল এতদিন পছন্দ করেন নাই।

প্রস্তাবিত সংস্কার সাধনের মূল বিষয়গুলি হইতেছে এই-রূপ:—(১) ভবিষ্যতে সরকারী কর্ম্মচারীদের আদেশ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ফরাসী রেসিডেণ্ট-জেনারেল সেগুলি অনুমোদন করিবেন না। বাজেট ও অন্যান্য আর্থিক ব্যাপারে বে' যে-সকল আদেশ জারী করিবেন, সেগুলি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রেসিডেণ্ট-জেনারেল দেখিয়া দিবেন—কিন্তু তিনি সেগুলি বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন না। জনৈক ফরাসী চেয়ারম্যানের অধীনে ফরাসী ও টিউনিসিয়ানগণকে লইয়া যে এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে, উহার নিকট তিনি আপীল করিতে পারিবেন। বে'র নির্দ্দেশ বাতিল করিবার ক্ষমতা এই ট্রাইব্যুনালেরই থাকিবে। ট্রাইব্যুনালের অভিমত না জানা পর্য্যন্ত বে'র নির্দ্দেশ কার্য্যকরী হইবে না।

(২) সমগ্র টিউনিসিয়ার জন্য যে আইন-পরিষদ গঠিত হইবে, উহাতে সর্ব্বাধিক ৩০ জন সদস্য থাকিবেন। উক্ত পরিষদ বে'কে নির্দ্দেশ রচনার কার্য্যে সাহায্য করিবেন। (এতদিন বে' এই কাজটি একাই করিতেন।)

(৩) অর্দ্ধেক সংখ্যক ফরাসী ও অর্দ্ধেক সংখ্যক টিউ-নিসিয়ান সদস্য লইয়া একটি নূতন অর্থনৈতিক পরিষদ গঠিত হইবে।

বাজেট ও অন্যান্য অর্থনৈতিক নির্দ্দেশ জারী হইবার পূর্ব্বে পরিষদ সেগুলি আলোচনা করিয়া ফেলিবেন।

(বর্ত্তমানে ৭ জন ফরাসী ও ৭ জন টিউনিসিয়ানকে লইয়া যে গ্রাণ্ড কাউন্সিল গঠিত রহিয়াছে, উহার কাজও অনেকটা এইরূপ)।

(৪) এত দিন কেবলমাত্র টিউনিসে স্থানীয় পরিষদ ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ সকল শহরেরই স্থানীয় পরিষদ গঠিত হইবে। বৃহৎ শহরে অর্দ্ধেক ফরাসী ও অর্দ্ধেক টিউ-নিসিয়ান সদস্য লইয়া পরিষদ গঠিত হইবে।

(৫) অসামরিক সরকারী চাকুরীতে আরও অধিক সংখ্যক পদে টিউনিসিয়ান নিযুক্ত করা হইবে। (এত দিন তাহারা নিম্নপদস্থ ও মধ্যবর্ত্তী চাকুরীর এক-তৃতীয়াংশ ও উচ্চ-পদস্থ চাকুরীর অর্দ্ধেক পাইত)।

(৬) এই সকল শাসন সংস্কার যাহাতে স্থায়ী হইবার সুযোগ পায়, তজ্জন্য আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে আর কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ

নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শালেহ-দীন-বাকুচে মন্ত্রিসভা গঠনে সফল হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

যদি তাঁহার চেষ্টা সফল হয়, তবে বে' হয়ত আনুষ্ঠানিক ভাবে নূতন মন্ত্রিসভার হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিবেন।

টিউনিসিয়ার জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রীকে নির্ব্বাসিত করার প্রতিবাদে গতকল্য সাধারণ ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। অদ্য পুনরায় সাধারণ কাজকর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে। সকল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রই অবস্থাকে তিক্ত না করিয়া কোন সংস্কার সাধন করিতে চায় না। ব্রিটিশ শাসনের সময় ইহাই ছিল ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা। তার ফলে যতটা ত্যাগ করিলে চলিত তার অনেক বেশী ব্রিটেনকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ফরাসী সাধারণতন্ত্রকেও আফ্রিকা ও এশিয়ায় তাহা করিতে হইবে। কেবল কেন্দ্রীয় বিধান সভায় দু'জন প্রতিনিধি উপস্থিত হইবার ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না।

ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে বিরোধ

মিঃ জাফরুল্লা খান ৮ই চৈত্র করাচী পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন, "আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীর সহিত কোন কোন বিষয়ে আমাদের মনোমালিন্য চলিতেছে এবং আমরা আলাপ-আলোচনা দ্বারা ইহার মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি।" নিকট-তম প্রতিবেশী বলিতে তিনি ভারতকেই বুঝাইতেছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরের সময় তিনি এই মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, "একমাত্র আফগানিস্থান ছাড়া সাধারণ-ভাবে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত এবং বিশেষভাবে মুসলমান রাষ্ট্রগুলির সহিত আমাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ।"

আফগানিস্থান সংক্রান্ত স্বতন্ত্র একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া জাফরুল্লা খান বলেন, "আফগানিস্থান সাধারণভাবে পাকিস্থানীদের এবং বিশেষভাবে পাকিস্থানী ব্যবসায়ীদের নানাবিধ অসুবিধায় ফেলিতেছে এবং তাঁহাদের উপর কতক-গুলি বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছে। ইহাদের আফগানিস্থানে প্রবেশ, পুনঃপ্রবেশ এবং অবস্থানের অনুমতিপত্র দানের ব্যবস্থা এমনই দুরূহ করা হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থানীদের পক্ষে অনুমতি পাওয়াই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

সাধারণভাবে এই বিবৃতি সত্য। কিন্তু গোড়ার কথা পাকিস্থানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এড়াইয়া গিয়াছেন। যে ধর্মোন্মাদনার জন্য মুসলমান হইয়াও তাঁহার আহম্মদী সম্প্রদায়কে ভুগিতে হইতেছে, তাহার জন্য ভারত-পাকিস্থানের সৃষ্টি ও বিরোধ, লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণক্ষয়, ধনক্ষয়, সম্মানের হানি। ইহা বন্ধ না হইলে কাহারও মঙ্গল হইতে পারে না।

সোনারপুর-আড়াপাঁচ পরিকল্পনা

সোনারপুর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্যানিং পর্য্যন্ত রেল-লাইনের দুই পার্শ্বে বিশাল জমি গত ১৪।১৫ বৎসর বদ্ধ জলের জন্য অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই জমির পরিমাণ ১০৫ বর্গমাইল। এই অঞ্চল সোনারপুর, বারুইপুর এবং ক্যানিং থানার অন্তর্গত। দীর্ঘকাল চেষ্টার পর এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত-সরকারের সাহায্যে এই বিশাল জমি হইতে জল অপসারণের জন্য একটি সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হইলে শুধু এই অঞ্চলের নয় সমগ্র কলিকাতার খাদ্যের অভাব কথঞ্চিৎ লাঘব হইবে।

সেচ পরিকল্পনাটিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্য্যায়ে পিয়ালী নদীর পশ্চিমাংশে জল অপসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই অংশের পরিধি ৫৭ বর্গমাইল। বিদ্যাধরী নদী মজিয়া যাওয়ায় এই অঞ্চলের জল নিষ্কাষণের পথ একেবারেই রুদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পিয়ালী নদীর পূর্ব্বাংশের জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহার পরিধি ৪৮ বর্গমাইল। বর্ত্তমান বৎসরে প্রথম অংশের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্ত্তমান মূল পরিকল্পনাটি এইরূপ :

সোনারপুরের জলা হইতে একটি খাল কাটা হইবে। ইহা সোজা গিয়া আউলীপুরের জলার সহিত যুক্ত হইবে। আউলী-পুরের জলা হইতে আরম্ভ করিয়া আর একটি খাল সোজা উত্তর ভাগের পাম্পিং ষ্টেশনের সহিত যুক্ত হইবে। জমি জরীপ করিয়া দেখা গিয়াছে, এই দুইটি অঞ্চল সর্ব্বনিম্ন অঞ্চল। এই মূল খালটির সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোট ছোট খালের সংযোগ থাকিবে। পাম্পিং ষ্টেশনে ৪টি বিরাট বৈদ্যুতিক পাম্প (Heavy duty Electrically operated pump) কাজ করিবে। পাম্প বসাইবার জন্য প্রাথমিক কাজ শেষ হইয়াছে। আশা করা যায় বর্ত্তমান বৎসরের শেষভাগ হইতে পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী হইবে। কলিকাতায় ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করিবে। এই পরি-কল্পনাটিকে কার্য্যকরী করিবার জন্য ভারত-সরকার ৪৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ৩৩ লক্ষ টাকা ঋণ। মোট ৫৭ বর্গমাইলের মধ্যে ৩৬.৫ বর্গ মাইল ধানের জমি। সরকারী হিসাব মতে এই জমিতে বার্ষিক ১৭,৮০০ টন ধান হইবে। ইহার মূল্য প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে, ৪৪ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা হইতে বাৎসরিক ৪৪ লক্ষ টাকার শস্য পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সমগ্র পরিকল্পনাটি শেষ হইলে ৭২.৫ বর্গমাইল জমি জল-মুক্ত হইবে, ইহা হইতে বার্ষিক ২৯,১০০ টন শস্য পাওয়া যাইবে, যাহার মূল্য আনুমানিক ৭০ লক্ষ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ জনশিক্ষা সমিতি

আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫০-৫১ সালের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। যে আয় দেখান হইয়াছে তদপেক্ষা ব্যয় প্রায় ৬ হাজার টাকা বেশী। সম্পাদকদ্বয় শ্রীবিলাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, সরকারী সাহায্য ৩১শে মার্চ্চে না পাওয়ায় তাঁহাদের এরূপ করিতে হইয়াছে।

সমিতির অধীনে প্রায় ৩৪টি স্কুল পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে অদ্যাপি বিদ্যমান। পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহের পূর্ব্বতন জেলা জজ মিঃ বিভারের উৎসাহে তাহা সম্ভব হইতেছে। প্রায় ১৫ বৎসর কার্য্য করিয়া সমিতি আশানুরূপ সাহায্য পাইতেছে না এবং নিজের কাজের বিস্তার করিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি আমাদের এক বন্ধু বাটানগর গিয়াছিলেন। দীপমালা 'পরিয়া'ও, চারদিকের গ্রামাঞ্চল যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই থাকিয়া যাইতেছে।

কেন এরূপ হয়, তাহার অনুসন্ধান করা কঠিন নয়। আমরা তাহার ফল দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিলাম। সমিতির সম্পাদকদ্বয়ও তদন্ত করিলে ভাল হয়। বিলাসবাবু ব্যাপটিষ্ট মিশনের একজন কর্ত্তাব্যক্তি; ললিতবাবুর উপর উত্তর কলিকাতায় দুই-তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভার আছে। তিনি বিজ্ঞান-ভিক্ষু এই ছদ্মনামে অনেক পুস্তকের লেখক। তবুও এরূপ ব্যস্ত লোকেই বেশী কাজ করে ও করিতে পারে। আমরা সমিতির সাফল্য কামনা করি।

"এই শান্তি আন্দোলন"

উপরোক্ত শিরোনামাযুক্ত তের পৃষ্ঠায় একখানি পুস্তিকা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কয়োযার্ড ব্লক বিতরণ করিতেছেন। লেখক ৺অনিল রায়। ইহার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই। বর্ত্তমান শান্তি আন্দোলনের যে ইতিহাস আমরা দেখিতে পাই তাহা লেখকের মতে মাত্র চারি বৎসর কালের।

"মস্কো রেডিও মারফত ষ্টালিন ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৯-এ এক রুশ-আমেরিকা যুক্ত যুদ্ধবিরোধী ঘোষণার প্রস্তাব করেন। ষ্টালিনের এটা করবার কারণ হ'ল এই যে তখন রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উত্তর-অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-হয়।

৪ঠা এপ্রিল (১৯৪৯) চুক্তি স্বাক্ষর হ'ল এবং রাশিয়া-গোষ্ঠীকে ঘিরে এক আমেরিকা-তাঁবেদার গোষ্ঠীর চক্র রচনা হয়ে গেল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে এটা আমেরিকার একটা প্রকাণ্ড দাও। রাশিয়া যেমন বিশ্বময় একটা আমেরিকাবিদ্বেষী প্রচারের ঝড় না তুলতে পারলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং পৃথিবীতে মিত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। রাশিয়া সমাজবাদী রাষ্ট্র, স্বভাবতই বর্ত্তমান দুনিয়ায় তার প্রতি ও তার আদর্শের প্রতি বহু মানুষের ও রাষ্ট্রের সহানুভূতি রয়েছে। সেই সহানুভূতিকে ধরে আমেরিকা-বিদ্বেষের বীজ ছড়াতে ও সর্ব্বত্র রুষ-সমর্থনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। আমেরিকা এটম বোমার কথা জাহির করেছে, তাকে যুদ্ধবাজ দানব বলে জনমত গঠন সোজা হবে। শুরু হ'ল শান্তি আন্দোলন, রাশিয়া শান্তি চায়, ষ্টালিন শান্তিদূত, আর আমেরিকা যুদ্ধবাজ।

এপ্রিল মাসে (১৯৪৯) প্যারী শহরে শান্তি কংগ্রেস ডাকা হ'ল। সেখানে পৃথিবীর নানাস্থান থেকে কম্যুনিষ্ট দলগুলি প্রতিনিধি ও নিরপেক্ষ চিন্তানায়কদের জড় করবে এবং আমেরিকা-বিরোধী প্রচারের আওয়াজ তুলবে; ফরাসী সরকার এটা বুঝে কয়েক জন কম্যুনিষ্ট নেতাকে ছাড়পত্র না দেওয়ায় প্রাগ শহরে একটি বিকল্প শান্তি-কংগ্রেসও করা হ'ল। প্যারী শান্তি কংগ্রেস এক স্থায়ী বিশ্বশান্তি সংসদ গঠন করল যার প্রকাশ্য অধিবেশন হ'ল ১৯৫০ সনের মার্চ মাসে ষ্টকহলম্ শহরে। এই অধিবেশনে একটি বিশ্বশান্তির আবেদন হয় যা এখন ষ্টকহলম আবেদন নামে বিখ্যাত হয়েছে।...এর পর গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫১) প্রাভদার প্রতিনিধির কাছে ষ্টালিন এক বিবৃতিতে বিশ্বশান্তির আবেদনের সঙ্গে ইউনোকে আমেরিকার স্বার্থবাহী যন্ত্র বলে নিন্দা করেন।

এর পর হয় বিশ্বশান্তি-সংসদের বিখ্যাত বার্লিন অধিবেশন (২১-২৫ ফেব্রুয়ারী), আটাত্তরটি দেশের কম্যুনিষ্ট সমর্থকেরা এখানে দাবী ওঠায়—(১) পাঁচ বড় রাষ্ট্রের (আমেরিকা-ব্রিটেন-রুষ-ফ্রান্স-চীনের)—মধ্যে একটা পঞ্চশক্তি চুক্তি চাই। এরা বলুক, 'আমরা যুদ্ধ চাই নে', (২) কোরিয়া-চীন-জার্ম্মানী ও জাপ-সন্ধির ব্যাপারে ইউনো ও আমেরিকার নিন্দা করে এবং প্রকারান্তরে রুষ পররাষ্ট্র নীতিকে সমর্থন করে প্রস্তাব নেওয়া হয়। চৌদ্দ জন সদস্য সহ এক প্রতিনিধি দল এই সব প্রস্তাব ও শান্তি দাবী নিয়ে ইউনোতে পেশ করবে বলেও স্থির হ'ল। তার পরে এই শান্তি প্রস্তাবের সমর্থন জানায় রাশিয়ার উচ্চতম সোভিয়েট (৬-১২ মার্চ, ১৯৫১) ক্রেমলিন বৈঠকে। বার্লিন পঞ্চশক্তি চুক্তি এবং ষ্টকহলম আবেদন, এই দুটি অবলম্বন করে শান্তি আন্দোলন পৃথিবীর সব দেশেই চলেছে কম্যুনিষ্ট দলের নেতৃত্বে। ভারতেও বহু শান্তি সম্মেলন হচ্ছে ও হবে। কম্যুনিষ্ট পার্টির এটাই এখন মুখ্য প্রোগ্রাম।..."

এই কথাগুলি পাঠ করিলে প্রথম মনে হয় যে, আমেরিকা ও "রাশিয়া" ছাড়া আর কোন রাষ্ট্র শান্তির জন্য ব্যগ্র নয়। তার পর রাশিয়ার ইতিহাসেই টলষ্টয় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ প্রায় ১২৫ বৎসর ঐ দেশের লোকে কত দুঃখকষ্ট বরণ করিয়াছে। ষ্টালিন বরং "বিপ্লব চিরজীবী হউক" ধ্বনির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। "শান্তি'' কম্যুনিষ্টগণের ইতিহাস-জ্ঞান আর একটু একদেশদর্শিতাদুষ্ট না হইলে জগতের অনেক কল্যাণ হইবে।

চিনির কথা

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শর্করা-শিল্পের জন্ম হইলেও ইহা ভারতের দ্বিতীয় প্রধান শিল্পে পরিণত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। আজ ভারত একক দেশ হিসাবে বিশ্বের প্রধান চিনি-উৎপাদক দেশ।

ভারতে ৪০ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু মোট উৎপন্ন ইক্ষুর শতকরা মাত্র ২২ ভাগ মাড়াইয়ের জন্য চিনিকলে চালান দেওয়া হয়; শতকরা ৫৫ ভাগ গুড় প্রস্তুত করিতে লাগে, বাকী ২৩ ভাগ খান্দসার চিনি প্রস্তুত করিতে এবং মুখে চিবাইয়া খাইতেই ব্যয় হইয়া যায়।

ইক্ষুর সরবরাহ যথেষ্ট না পাওয়ায় ভারতের অনেকগুলি চিনিকলই উৎপাদন-ক্ষমতার চেয়ে অনেক কম উৎপাদন করিয়া থাকে। ভারতের চিনিশিল্প উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনেক সাহায্য করিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশকে যদি চিনির চাহিদা পূরণে স্বাবলম্বী হইতে হয় তবে ইক্ষুচাষের পদ্ধতি এবং উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে ইক্ষু উৎপাদনের হার একর প্রতি মাত্র ১৪ টন।

তবে মাদ্রাজে ৩০ হইতে ৩৫ টন এবং বোম্বাইয়ে কোন কোন স্থানে ৪০ হইতে ৪৫ টন ইক্ষুও উৎপন্ন হইয়া থাকে। খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উত্তর ভারতে অধিকাংশ চিনিকল স্থাপিত হইলেও উত্তর ভারতে ইক্ষু উৎপাদনের হার একর প্রতি মাত্র ১৪ টন। চিনিকলগুলি ক্ষুদ্র উৎপাদকের সহিত চুক্তি করিয়া ইক্ষু সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। শর্করা-শিল্পের দুর্ব্বলতম দিক হইতেছে কৃষি অর্থাৎ ইক্ষু উৎপাদনের হার।

কোয়েম্বাটোরে উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু জন্মান গিয়াছে। অপর কয়েকটি ক্ষেত্রেও ইক্ষু উৎপাদনের গবেষণায় বিপ্লব আনিয়াছে, কিন্তু এখনও অনেক কিছু করিতে হইবে।

কোয়েম্বাটোরে গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া গবেষণা চালাইয়া তবে উন্নত ধরণের ইক্ষু জন্মান সম্ভব হইয়াছে। আজকাল শতকরা ৯০ হইতে ৯৫ ভাগ জমিতে এই জাতের ইক্ষু আবাদ করা হইতেছে। ১৯৩১ সালে ভারত-সরকার কানপুরের হারকোর্ট বাটলার টেকনোলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের ভার

গ্রহণ করেন এবং উহা সম্প্রসারণ করিয়া বর্তমানের ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব সুগার টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করেন।

চিনি উৎপাদন ও চিনির রাসায়নিক গুণাগুণ পরীক্ষা করা ছাড়াও এখানে চিনিশিল্প-জাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে গবেষণা পরিচালিত হয়। এখানে চিনিশিল্পের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। চিনিকল এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করা হইয়া থাকে।

১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটি গঠিত হইবার পর ইন্‌ষ্টিটিউট অব সুগার টেকনলজির ভার ঐ কমিটির উপর অর্পণ করা হয়। ইক্ষু কমিটির কাজ হইতেছে ইক্ষু উৎপাদন, চালান এবং ইক্ষুজাত দ্রব্যাদির উন্নয়ন সাধন করা।

চিনি উৎপাদন শুল্ক তহবিলই ইক্ষু কমিটির আয়ের প্রধান সূত্র। ভারতে উৎপন্ন সাদা চিনির হন্দর প্রতি এক আনা হারে এই তহবিলে জমা হয়।

এই শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইক্ষু উন্নয়নের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ভারত-সরকার পৃথক ভাবে ৭৫ লক্ষ টাকা এবং লক্ষ্ণৌয়ে একটি আধুনিক শর্করাশিল্প ও ইক্ষু-গবেষণা মন্দির স্থাপনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ভারতে কেন্দ্রীয় শর্করা গবেষণা-মন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা এই প্রথম করা হইল, এমন নয়। প্রথম ভারতীয় ইক্ষু কমিটি ১৯২০ সালে এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা-মন্দির স্থাপনের সুপারিশ করেন।

লক্ষ্ণৌ ক্যান্টনমেন্টের অঞ্চলে যে সামরিক খাসের খামার রহিয়াছে সেখানে গবেষণা-মন্দির স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; এখানে জমির পরিমাণ ৫৫৫ একর এবং উহার দাম ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।

খামারটির অবস্থান খুবই সুন্দর। সর্দা খালটি ইহার ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। এখানকার মাটিও ইক্ষু উৎপাদনের উপযোগী। ইক্ষুর আবাদ উঠিয়া গেলেও ধান, গম, ডাল ও তৈলবীজ আবাদ করা চলে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতের খাদ্য ও কৃষি সচিব শ্রী কে. এম. মুন্সী তথায় শর্করাশিল্প ও ইক্ষু গবেষণা-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আজ এই শিল্পের কল্যাণে লক্ষ লক্ষ রাসায়নিক ও শ্রমিক জীবিকা উপার্জন করিতেছেন। কুটীর-শিল্পরূপে ছোট ছোট কারবার প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের লোকের চিনির প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে, এই কথা অনেকে বলেন। এই বিষয়ে অন্যান্য কথাও জানা প্রয়োজন। গত ১৮।১৯ বৎসর কলের চিনি দেশের লোকের নানাভাবে কি সাহায্য পাইয়াছে তার সম্বন্ধে নূতন করিয়া অনুসন্ধান আবশ্যক। ইংরেজ আমলের একজন অর্থসচিব গ্রেগ সাহেব প্রায়ই বলিতেন যে, ১৯৩২-৩৩ হইতে বস্ত্রশিল্প ও চিনিশিল্প ২৭।২৮ কোটি টাকা পাইয়াছে। যখন জাভার চিনির মূল্য ছিল দু'তিন আনা তখন আমরা দিয়াছি পাঁচ আনা। তারপর যুদ্ধ বাধিলে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। ১৯৪৮-৪৯ সালের শরৎকালে, পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল, তারপর এই শিল্পের জন্য কাহারও দরদ থাকিতে পারে না। যুদ্ধের সময়ে, ইংরেজের আমলে, ইংরেজ শিল্পপতিগণের শোষণের সময়ে আমরা আট আনা মূল্যে চিনি কিনিয়াছি। আজ কিনিতেছি গবর্মেণ্টের দোকানে চৌদ্দ আনা নয় পাই-এ, বাজারে এক টাকা বা সতর আনায়। যাহাই হউক, নূতন প্রথায় ইক্ষুচাষের ফলে চিনি যদি সস্তা হয় তবে উত্তম কথা।

বাঙালী ভৌগোলিকের সাফল্য

১১শে চৈত্র কালিম্পং হইতে নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে :

"পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্টের উদ্যোগে তিন বৎসর গবেষণা চালাইবার পরে জনৈক ভারতীয় ভূগোলতত্ত্ববিদ্ হিমালয়ের পূর্ব্বাঞ্চলে বরফ-যুগের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এক কোটি বৎসর পূর্ব্বে এই যুগ বর্ত্তমান ছিল। এই সময়ে উদ্ভিদ-জীবন বা মানব-জীবনের অস্তিত্ব ছিল না।

আগামী বৎসরে এই গবেষণা সমাপ্ত হইবে। তিস্তা নদীর পূর্ব্বদিকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব সিকিমে, ভূটানে কিয়দংশে এবং তিব্বত সীমান্তস্থিত কালিম্পঙের পার্ব্বত্য অঞ্চল এই গবেষণার কেন্দ্রস্থল।

ইউরোপ, আমেরিকা এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থান হইতে এই বরফ-যুগের নিদর্শন বহু পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু হিমালয়ের এই অঞ্চল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। জার্মান ও ব্রিটিশ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কাশ্মীরস্থ হিমালয় অঞ্চলে কিছু নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূগোল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রী এস্‌. আর. দত্ত এই অঞ্চলে বরফ-যুগের বহু নিদর্শন পাইয়াছেন।

এইরূপ গবেষণার ধারা চলিলে আমরা সুখী হইব। অনুসন্ধান ও গবেষণা সকল বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। উহা ব্যতীত বিজ্ঞানের চর্চ্চাই বৃথা। এতদিনে এই সত্যের উপলব্ধি আমাদের হইতেছে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও নৈশ-বিদ্যালয়

প্রথম দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি ২।২এ, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটে ও দ্বিতীয়টি উক্ত ষ্ট্রীটে ৫নং ভবনে প্রতিষ্ঠিত। উভয়েই বড়বাজার অঞ্চলের বস্তির অধিবাসিগণের শারীরিক ব্যাধি দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং মানসিক স্বাস্থ্য আনয়নেরও চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতার ত্রিশ লক্ষ নাগরিকের মধ্যে এক

বিরাট অংশ বস্তির অধিবাসী। সুতরাং পৌর-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গুরুভার হইয়া পড়িতেছে। মানব-প্রীতিসম্পন্ন নাগরিকই এই ভার বহনে সমর্থ।

মাত্র ১৮৫০৲ টাকার তহবিল লইয়া সেবা-কার্য্য চালান সহজ নয়। তবুও পরিচালকবর্গ অসাধ্য-সাধনের চেষ্টায় আছেন। সমিতির ৫ম বর্ষের (১৩৫১ বঙ্গাব্দের) কার্য্য-বিবরণী হইতে এই তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রথম সভাপতি ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণি। ১৩৫১ সনের সভাপতি ছিলেন ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য, বি-এল। এ বৎসরের সভাপতি শ্রীগণেশচন্দ্র দাশ ঐ অঞ্চলের এক জন সমাজপতি। স্থানীয় চিকিৎসকগণ বিনা পারিশ্রমিকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। এরূপ সেবা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্দ্ধিত হউক।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দলিল ও নন্দকুমার

"হিমাদ্রি" পত্রিকার ১ম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় নিম্নোক্ত বিবরণটি পাঠ করিয়া অতীত যুগের দুঃখময় স্মৃতি মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। হেষ্টিংসের শোষণের ফলে পলাশীর যুদ্ধের দশ বৎসরের মধ্যে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে", বাংলা-বিহারের তদানীন্তন জনসংখ্যা প্রায় তিন কোটি নরনারী এক কোটিতে দাঁড়াইল। ১৯৪২-৪৩ সালের ছয় কোটি নরনারীর মধ্যে পঁয়ত্রিশ লক্ষের মৃত্যু সেই তুলনায় নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। হেষ্টিংসের নয় বৎসরব্যাপী বিচার—বিলাতী বাগ্মিতা ও সহজ মানব-প্রীতির পরিচয়ে পরিপূর্ণ। বার্ক, শেরিডন, ফক্স-এর বক্তৃতা ইংরেজী সাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ।

এই দুইটি দুষ্প্রাপ্য দলিল হইতে জানা যায়, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে মহারাজা নন্দকুমার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন সহ্য করিতে পারেন নাই। এই দেশপ্রেমিক তেজস্বী ব্রাহ্মণ ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। পরিণামে, ওয়ারেন হেষ্টিংসের চক্রান্তে তাঁহাকে ফাঁসিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল।

[CALCUTTA COUNCIL. At a Select Committee held on the 24th July 1759. Fort William]

২৪শে জুলাই ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়মের সিলেক্ট কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব। উমরা রবার্ট ক্লাইভ সভাপতি। মেজর কেয়েলড এবং হলওয়েল সাহেবদ্বয়ের উপস্থিতিতে কলিকাতা কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটির অধিবেশনে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল:

নবাব মিরজাফর আমাদিগের সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমাদের বাণিজ্যকুঠির সাহেব এবং বাঙালী গোমস্তাগণের কাজকর্ম সম্বন্ধে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করিবেন না, এবং বাণিজ্যকুঠির সাহেব ও গোমস্তাগণ আমাদিগের এই কর্ম্মানুমোদিত ও ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় নেটিভদের উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন। কিন্তু নন্দকুমার নামক একজন ধূর্ত ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই অত্যন্ত গোলোযোগ উপস্থিত করিতেছে। নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও সে গোলযোগ করে। রেশমকুঠিতে যে সকল তন্তুবায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে দাদন গ্রহণ করে তাহাদিগের ঘরবাড়ী লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ শাসন করিতে আরম্ভ করিলেই এই ধূর্ত ব্রাহ্মণ নন্দকুমার কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে বাধা দিতে আরম্ভ করে। এই ব্যক্তি সর্ব্বদাই চীৎকার করিতেছে যে, আমাদের বাণিজ্যকুঠির সাহেব কর্ম্মচারিগণ ও বাঙালী গোমস্তাগণ তন্তুবায়দিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার ও নিষ্ঠুরাচরণ করে। ইহার চীৎকার নিবন্ধন আমাদের ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে। এই ব্যক্তি সত্য সত্যই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরম শত্রু।

At a Select Committee held at Fort William, the 10th September 1763.

১০ই সেপ্টেম্বর ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম সিলেক্ট কমিটির অধিবেশন। সভাপতি: মেজর বান্সিটার্ট। উপস্থিত সভ্যগণ: জন কার্ণাক, উইলিয়ম বিলারস, মেজর ওয়ারেন হেষ্টিংস, রামফুলক বেরিয়ট, হিটওয়াটস্।

আমরা অপরিজ্ঞাত নহি যে বৃদ্ধ নবাব মীরজাফর বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত, এখন আর রাজকার্য্য শাসনের একেবারেই ক্ষমতা নাই। কিন্তু তাঁহাকে সুবেদারের পদ প্রদান করিলে অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় হইবেক, এইরূপ অর্থসঞ্চয়ের সুযোগ ন্যায়সঙ্গতরূপে কখনও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহাকে সুবেদারের পদ প্রদান করিলে রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত এক জন উপযুক্ত লোককে ইহার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করা উচিত। আমাদিগের কাশিমবাজার রেশমকুঠির] প্রধান গোমস্তা অর্থাৎ দেওয়ান বাবু হিরামচন্দ্র বিশ্বাস ভিন্ন বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় লোক নাই যে, তাহাকে বঙ্গের সুবেদারের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। বাবু হিরামচন্দ্র বিশ্বাসকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের যে ক্রমে উন্নতি হইতে থাকিবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। দেশীয় লোকদের ইনি যম স্বরূপ এবং কোম্পানীর ন্যায্য পাওনা আদায় করিতে ইঁহার যোগ্য আর কেহ নাই। হিরাম বাবু সংস্কৃতে এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। পারস্য ভাষা বিলক্ষণ জানেন। তিনি বঙ্গদেশের একটি প্রসিদ্ধ এবং অতি সম্ভ্রান্ত অভিজাত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই মহাত্মার হস্তেই আমরা বিশ্বাস করিয়া নবাবের রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ করিতে পারি। অন্ত কোন

লোকের উপর এরূপ অসঙ্কুচিত চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না।

কিন্তু বৃদ্ধ মীরজাফর নন্দকুমার নামক এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এত ভালবাসেন যে তিনি নন্দকুমারের নিমিত্ত পাগল হইয়াছেন। নবাবের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে নন্দকুমারকেই স্বীয় দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি অতিশয় অবিশ্বাসী এবং ধূর্ত্ত। সে সর্ব্বদাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্যে ক্রমাগত ব্যাঘাত প্রদান করিতেছে। এই ব্যক্তি ইংরেজদিগের পরম শত্রু কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয়ে আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। ইহাকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলে নবাব মীরজাফর আমাদের আরও তিন লক্ষ টাকা অধিক দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই টাকা দুই চার পাঁচ টাকা নহে, তিন লক্ষ টাকা। সুতরাং আমরা কৌন্সিলের সভ্যগণ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও নবাবের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম। এবং নগদ দত্ত বদত্ত তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্তি নিবন্ধন নন্দকুমারকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিতে বৃদ্ধ নবাব মীরজাফরকে আমাদের পবিত্র অনুমতি প্রদান করিতেছি।

কিন্তু এই বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত যে ধূর্ত্ত নন্দকুমারের কাজকর্ম্মের উপর কৌন্সিলের মেম্বরদিগের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবং এই দেশের মঙ্গলার্থে এবং ন্যায়ের অনুরোধে আমরা ইহাই অবধারণ করিয়া রাখিলাম যে ভবিষ্যতে দেওয়ানের পদ শূন্য হইলে বাবু হিদামচন্দ্র বিশ্বাসকে এই পদে নিযুক্ত করা যাইবে।

বাংলার অন্যতম জাতীয় খেলা

স্থানীয় "সাধারণীতে" (পাক্ষিক পত্রিকা) পশ্চিমবঙ্গ কপাটি ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই খেলা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ দিয়াছেন। তাহার মধ্যে সকল ভারতীয় নাগরিকের নিকট একটি আবেদনও আছে।

"সর্ব্ব-ভারতীয় নিয়মে আমাদের রাজ্যে যাতে কপাটি খেলা চালু হয়, তার জন্ত আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলাদেশে কপাটি খেলার বিশেষ প্রচলন ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কপাটি দলের অভাবে প্রতি-যোগিতা চালান এখন প্রায় অসম্ভব হয়েছে। এই খেলা অতি অল্প জায়গায় অতি কম খরচে চলতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতিও এই খেলায় যথেষ্ট হয়।

মাদ্রাজ, বম্বে ও রাজপুতানা এই খেলার প্রচার ও প্রসারের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ সব প্রদেশে এই খেলা বেশ উন্নতি লাভ করেছে।

এ-বৎসর অন্যান্য রাজ্যের কপাটি দলপতির সহিত ও অল-ইণ্ডিয়া সম্পাদকের সহিত এই খেলা ভবিষ্যতে কি উপায়ে 'এশিয়ান গেমসে'র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, সেই সম্বন্ধে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আশা করি উক্ত খেলা কয়েক বৎসরের মধ্যেই 'এশিয়ান গেমসে'র অন্তর্ভুক্ত হবে।"

স্থানীয় "নৌকা-বাচ" প্রতিযোগিতার এক সময় প্রসিদ্ধি ছিল; এখনও তাহা নিঃশেষ হয় নাই। আমরা এই "বোট রেসের" পুনরুজ্জীবনের চেষ্টার অপেক্ষায় আছি।

সংস্কৃতির সমন্বয়

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "ভারতের দারিদ্র্যের মধ্যে এত অধিক সংখ্যায় মুসলমান কেন? তরবারী বলে তাহারা ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছে, একথা বলা মূর্খতা। জমিদার ও পুরোহিতের দাসত্ব হইতে মুক্তির জন্যই তাহারা ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।" পণ্ডিতপ্রবর হ্যাভেল '*Aryan Rule in India*' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।"

মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হ'ল। প্রথম প্রথম তাদের ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য থাকায় আভিজাত্য-দান সম্ভব হয়ে উঠল না। তখনকার মুসলমানদের যোগসূত্র আরব, পারস্ত প্রভৃতি মুসলমান সভ্যতার সঙ্গে ছিন্ন হয় নি, তারা সর্ব্বদাই মনে রেখেছে ভারত তাদের স্বদেশ নয়—আরব, পারস্তই তাদের জন্মভূমি, তাদের প্রাণভূমি। ক্রমে যখন তারা বুঝতে পারল যে, হিন্দুদের আনুকূল্য ও সাহায্য ব্যতীত রাজ্য-শাসন অসম্ভব, আর জাতিভেদে প্রপীড়িত হিন্দুসমাজের এক বিরাট অংশ যখন মুসলমান হয়ে গেল, তখন তারাও অজ্ঞাত-সারে ভারতীয় হতে বাধ্য হ'ল। যতই তারা দিল্লী, জৌনপুর ছেড়ে অগ্রসর হতে লাগল, ততই সেখানকার লৌকিক আচার-বিচারের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। এইভাবে তুর্ক-আফগান যুগ হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান সমন্বয় ও পুনর্গঠনের যুগ। ধর্ম্ম, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, সামাজিক রীতি-নীতিতে, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে এই সমন্বয়সাধন প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। কালক্রমে আকবরের সমকালে পৌঁছে মুসলমানরা সত্যি সত্যিই ভারতীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়ল। কোন দেশে ইসলাম রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিজয়ী হয়ে সমাজক্ষেত্রে এমনভাবে পরাজিত হয় নি...

উপরের উক্তি মৌলানা আক্রাম খাঁ তাঁহার এক অভি-ভাষণে সমর্থন করিয়াছিলেন। মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের এক অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি রূপে তিনি তাঁহার মত এই বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া আমাদের অনেকের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় ৭ শত বৎসরের মুসলিম রাজত্বের সময়ে রাজদণ্ড ব্যবহার করিয়া বাঙালী সমাজের সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয় নাই। জনাব আজহারউদ্দিন খাঁ "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় চৈত্র (১৩৫৮) সংখ্যায় তাহা সমর্থন করিলেন মাত্র। তবুও প্রশ্ন রহিয়া গেল যে ভারতবর্ষকে এরূপে বিভক্ত করিয়া দুই মুসলিম রাষ্ট্রের সৃষ্টি কেন হইল। "সোনার বাংলা"

পত্রিকার গত ২৬শে মাঘ সংখ্যায় "আল্লামা ইকবাল ও পাকিস্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলিম সমাজের নবজাগরণ প্রসঙ্গে লেখক জনাব মতিয়ার রহমান বলিয়াছেন :

"... ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আত্ম-বিস্মৃত ও অবসাদগ্রস্ত, দিশেহারা, রাজ্যমান-প্রভাবহারা অধঃপতিত ভারতীয় মুসলিম জাতির সুপ্তি ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে আলোর ও পথের সন্ধান দিতে হালী, ইকবাল, নজরুল প্রভৃতির লেখনীর যাদুস্পর্শ অনেকখানি কাজ করিয়াছিল। সাহিত্যিকের মসী বীরের অসি অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী। সাহিত্যিক জাতির জাগরণ ও উত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন এবং সুযোগ্য কুশলী নেতা সেখানে ফসল উৎপাদন করেন। আমাদের এই পাকিস্তান অর্জনের ইতিহাসের পুরোভাগে যে সব মনীষী শক্তিশালী সাহিত্যশিল্পীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে এবং যাঁহাদের লেখনীর যাদুস্পর্শ ব্যতীত জাতির ঘুম ভাঙিত না, তাহাদের মধ্যে মহাকবি স্যার মোহাম্মদ ইকবাল অন্যতম।

ভারতের মধ্যে মুসলিম ভারত সৃষ্টির দাবী জাগাইয়া তিনি বলিলেন ভারতের ও ইসলামের সর্ব্বোত্তম স্বার্থের জন্যই এক নিরবিচ্ছিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন প্রয়োজন।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

"ইতিহাস" নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকার ২য় বৎসরের ১ম সংখ্যা (ভাদ্র, ১৩৫৮) আমরা পাইয়াছি। তাহার মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। প্রবন্ধের ৮ পৃষ্ঠার মধ্যে রাজেন্দ্রলালের জীবনীর মোটামুটি সব কথা আছে। "যুগান্তর" পত্রিকার "রবিবাসরীয়" সংখ্যায় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৪টি প্রবন্ধেই অনেক তথ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলালের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে হেমেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধাবলী জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পণ্ডিত বলিয়া রাজেন্দ্রলালের খ্যাতির কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি বাংলা, তথা ভারতের, নব-জাতীয়তার অন্যতম স্রষ্টা বলিয়াই শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কতিপয় প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে রাজেন্দ্রলাল বলেন যে, ভারতের নানা জাতি, নানা পরিচয়ের লোক একত্রিত হইয়া এক মহাভারতের সৃষ্টি করিবে ইহাই তাঁর অন্তরের স্বপ্ন।

রমেশবাবু দুঃখ করিয়াছেন যে, "বিবিধার্থ সংগ্রহ", "রহস্য সন্দর্ভ", নামক মাসিক পত্রিকা আজ প্রায় দুষ্প্রাপ্য। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের পল্লীগ্রামেও আমাদের কেহ কেহ তাহা দেখিয়াছেন। সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহার কিরূপ আগ্রহ ছিল, এই নমুনার গ্রন্থ হইতে তাহা বুঝা যাইবে। এই উদ্দেশ্যে "গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তক সংগ্রহ" নামে একটি সিরিজ বাহির হইত। বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকাশিত শিল্প বিষয়ক তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ 'শিল্পিক দর্শন' নামে গ্রন্থাকারে এই সিরিজে প্রকাশিত হয়।

রমেশবাবু তাঁহার প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন এইরূপে—"জীবিতকালে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিলেও মৃত্যুর পর অদ্যাবধি তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখান হয় নাই। দেশের এই ত্রুটি সংশোধন করার সময় আসিয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া আবশ্যক।

মণিপুরবাসীর আশা ও দাবি

"ওসি" নামক মণিপুরী ভাষায় প্রকাশিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা আমরা মাঝে-মাঝে পাইয়া থাকি। উহার একটি সংখ্যায় (৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১) মণিপুরবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে একটি আলোচনা আছে। নমুনাস্বরূপ আমরা উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :

"মণিপুরদদি হৌজিক চেঙ অসী মমল থোইনা তাঙত্রি—আসামদা সরকারনা ককলিবা কণ্ট্রোল রেট লুপা ৪৫ নি (গৌহাটিদা) মাহুসি ভাংথাই থোনা মণিপুরদা তাঙত্রি, অহুমু করিমনো প্রজাশিংনা লৈবা ওমসি পাজদি আসামসি অভাঙবা মকমগী অহোঙবা মণিপুরসিগী খেন্নবা থোইনা লৈতে। মাদী মুমা থহুমবদি মণিপুর সরকারসি শাসন্দা হৈশিংবা থাংপনা প্রজাগি অবস্থা হেন্না কংতবতনি।" অক্ষর বাংলা—অনেকটা অসমীয়ার মত।

আসাম রাজ্যে মণিপুরবাসীর ভাষ্য অধিকার বজায় থাকিবে কিনা, তৎসম্বন্ধে প্রায় ৮ মাস পরেও একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় নাই। নাগা, লুসাই, মণিপুরী খাসিয়া জাতির ও বাঙালীর এই সব স্বার্থের সমন্বয় বিধান সহজ হইতে পারে না। তবুও মানুষ চেষ্টা করিবে, এবং সমগ্র আসামেও তাহা চলিতেছে। আসাম ভারতরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তরক্ষী। সুতরাং সেই রাজ্যের শান্তি বজায় রাখিতে হইবে।

শৈব সম্প্রদায়

গত মাঘ সংখ্যায় "প্রণব" (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র) এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ দিয়াছেন :

"রুদ্র অথবা শিবের উপাসনা বৈদিক কাল হইতে এদেশে প্রচলিত। শৈবতন্ত্র ইহার ইতিহাস ও সাহিত্য স্বরূপ। মাহেশ্বর সম্প্রদায় প্রধানতঃ (১) পাশুপত (২) শৈব (৩) কালামুখ (৪) কাপালিক, এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মাহেশ্বর-তন্ত্র (ক) শিবতন্ত্র (খ) রুদ্রতন্ত্র (গ) ভৈরবতন্ত্র—এই তিন ভাগে বিভক্ত। পাশুপত সম্প্রদায়ের মূলগ্রন্থ পাশুপত সূত্র বা মহেশ্বর চরিত। দাক্ষিণাত্যের শৈবরা প্রায়ই শৈব সিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থ-মতাবলম্বী। এদের মতে ভগবান

পঞ্চাননের পঞ্চমুখ-নিঃসৃত আগমের নিম্নলিখিত এই ২৮ প্রকার তন্ত্রই জীবের মহামুক্তির পথনির্দ্দেষ্টা :—(১) কামিক (২) যোগজ (৩) চিন্ত্য (৪) কারণ (৫) অজিত (৬) দীপ্ত (৭) সূক্ষ্ম (৮) সহস্র (৯) অংশুমান (১০) সুপ্রভেদ (১১) বিজয় (১২) নিঃশ্বাস (১৩) স্বায়ম্ভুব (১৪) অনল (১৫) বীর (১৬) রৌরব (১৭) মুকুট (১৮) বিমল (১৯) চন্দ্রজ্ঞান (২০) বিম্ব (২১) প্রোদ্গীত (২২) ললিত (২৩) সিদ্ধ (২৪) সন্তান (২৫) সর্ব্বোত্তর (২৬) পরমেশ্বর (২৭) কিরণ (২৮) বাতুল। এই সব তন্ত্র ছাড়া পরম শিব-কথিত মুক্তিমার্গ দর্শনাবলী অমূল্য সংহিতা পৃথক পৃথক ৮ ভাগে বিভক্ত, যাহা প্রধান প্রধান শৈবাচার্য্যগণের মতে অষ্ট-প্রকরণ নামে অমূল্য গ্রন্থ শৈব সিদ্ধান্তের দিগদর্শক স্বরূপ। হরদত্ত শিবাচার্য্যের "চতুর্ব্বেদ তাৎপর্য্য সংগ্রহ"ও একখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বস্তুতঃ তন্ত্র সম্বন্ধীয় বিশাল সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়।

বীর শৈব মত

বর্ত্তমানে কর্ণাটক দেশে এই বীর শৈব মতাবলম্বীরা অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। "সিদ্ধান্ত শিখামণি" ইহাদের সর্ব্বমান্য গ্রন্থ। বীর শৈবেরা (লিঙ্গায়েৎ) সর্ব্বক্ষণের জন্য নিজেদের শরীরে ক্ষুদ্রাকার শিবলিঙ্গ ধারণ করিয়া থাকেন। বাসবদেব এই মতের আদি প্রবর্ত্তক। সোমেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, রামনাথ, মল্লিকার্জ্জুন এবং বিশ্বেশ্বর নামক পাঁচ শিবলিঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া পাঁচ জন মহাপুরুষ এই ধর্ম্মমত প্রচার করেন।

কাশ্মীর দেশে প্রচলিত শৈব আগমের নাম প্রত্যভিজ্ঞা তন্ত্র। এই অদ্বৈতবাদী "ত্রিক দর্শন" এক অতি বিশাল গ্রন্থ-মালা, যাহা এখনও এদেশে কিছু প্রচলিত আছে। মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই মতের আদি আচার্য্য ও আচার্য্য বসুগুপ্ত ত্রিক দর্শনের মূল প্রবর্ত্তক। আচার্য্য অভিনব গুপ্তের "অভিনব ভারতী", "ধ্বন্যালোক লোচন", "ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা বিমর্শিনী", "তন্ত্রালোক", "তন্ত্রসার", "মালিনীবিজয় বার্ত্তিক", "পরমার্থ-সার", "পরাত্রিংশিকা বিবৃতি" প্রভৃতি গ্রন্থনিচয়কে তন্ত্রশাস্ত্রের বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে। মৎস্যেন্দ্র নাথ সম্প্রদায়ের ক্ষেম-রাজ নামক একজন পণ্ডিত প্রণীত (১) শিবসূত্র বিমর্শিনী (২) স্বচ্ছন্দ তন্ত্র (৩) বিজ্ঞান ভৈরব (৪) নেত্রতন্ত্র (৫) প্রত্যভিজ্ঞা হৃদয় (৬) স্পন্দ সন্দোহ (৭) শিবস্তোত্রাবলীর টীকা; গোরক্ষনাথের (মহেশ্বরানন্দ) পরিমল (৯) মহার্থ মঞ্জরী প্রভৃতি এই মতের বিখ্যাত গ্রন্থনিচয় এখনও বিদ্যমান।

শাক্ত তন্ত্র

শাক্ত সম্প্রদায়ের পূজা-উপাসনা পদ্ধতি সমস্তই একান্ত গোপনীয় ও গুরুপরম্পরায় প্রাপ্তব্য। তাই শাক্ত তন্ত্র অসংখ্য হইলেও বর্ত্তমানে ইহার বহুল প্রচার নাই। দেশ, কাল ও গুণ বিভাগে শাক্ত আগম তিন ভাগে বিভক্ত :—

তন্ত্র (সাত্ত্বিক আগম), যামল (রাজসিক), ডামর (তামসিক আগম) বলা হয়। প্রাচীন কালে এই মত সমগ্র ভারত ছাড়াও তিব্বত, চীন ও এসিয়া মহাদেশের অনেক প্রান্তে এবং পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও বিস্তৃত ছিল। যজুর্বেদের তান্ত্রিক উপনিষদ এই মতের পরিপোষক। শাক্ত-তন্ত্রের প্রধান উপনিষদ :—(১) কৌল (২) ত্রিপুরা মহোপনিষদ (৩) ভাবনা (৪) বহ্বৃচ (৫) অরুণোপনিষদ (৬) অদ্বৈত ভাবনা (৭) কালিকা (৮) তারা উপনিষদ। মিশ্র মার্গেরও তন্ত্র আট প্রকারের :—(১) চন্দ্রকলা (২) জ্যোৎস্নাবতী (৩) কলা-নিধি (৪) কুলার্ণব (৫) কুলেশ্বরী (৬) ভুবনেশ্বরী (৭) বার্হস্পত্য ও (৮) দুর্ব্বাসা মত। সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্র প্রায় এক হাজারেরও অধিক হইবে। মাত্র কয়েকখানা বিশেষ গ্রন্থের নাম দেওয়া হইল। শ্রীবিদ্যার আচার্য্য 'দত্তাত্রেয়' যে অষ্টাদশ সহস্র দত্ত সংহিতা রচনা করেন একণে উহার সংক্ষিপ্ত প্রকরণ "পরশুরাম কল্পসূত্র" হারিতায়ন সুমেধা দ্বারা সঙ্কলিত হয়। আচার্য্য গৌড়পাদ সুভগোদয় ও শ্রীবিদ্যা-রত্ন সূত্র নামক দুই খানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। শাক্ত দার্শনিক ভাস্কর রায় "বরিভারহস্য", "সৌভাগ্য ভাস্কর", "সেতু", "গুপ্তবতী" ও "কৌল" নামক অনেক মহান্ শাক্ত দর্শন প্রণয়ন করেন। স্বামী পূর্ণানন্দের ষট্‌চক্র নিরূপণ ও তার ব্যাখ্যা পুস্তক "তত্ত্ব চিন্তামণি" বঙ্গভাষায় রচিত হয়।"

এই অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় কি করিয়া দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে তাহা মানব-মনের এক রহস্য।

চন্দ্রলোক ভ্রমণ

গত ১৬ই চৈত্র লণ্ডন হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রেরিত হইয়াছিল। বিজ্ঞানের রাজ্য ও কল্পনার রাজ্যের মধ্যে প্রভেদ ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। নিম্নোক্ত সংবাদটিতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই সংবাদের পিছনে এখনও বাস্তব অপেক্ষা কল্পনাই অধিকমাত্রায় বিদ্যমান।

ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতির চান্দ্র-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এইচ পারসী উইলকিন্স বলেন, মনুষ্য যদি বাস্তবিকই বিমানযোগে চন্দ্রলোকে যাইতে চায়, আগামী ১০ বা ২০ বৎসরের মধ্যেই যাইতে পারিবে।

ব্রিটিশ আন্তঃগ্রহ সমিতির পত্রিকার এক পত্রে মিঃ উইল-কিন্স লিখিয়াছেন, বিভিন্ন গ্রহে ভ্রমণ কল্পনার বিষয় নয় ইহা সুনিশ্চিত।

অবশ্য এ কার্য্যে এত অর্থ ও সাহায্য প্রয়োজন হইবে যে, সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতীত ইহা সম্ভব হইবে না।

মানুষ যদি ইচ্ছা করে এবং একত্র সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে তবে ১০ বা ২০ বৎসরের মধ্যে এরূপ রকেট নির্ম্মাণ করিতে পারিবে যাহা বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় আরও কিছু অধিক সময় প্রয়োজন হইতে পারে।

জীবনযাত্রা

শ্রীরাজশেখর বসু

সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা, plain living and high thinking—এই বাক্যটি এককালে খুব শোনা যেত। এখন তার বদলে শোনা যায়—জীবনযাত্রার মান বা standard of living বাড়াতে হবে। এই দুই আপাতবিরোধী বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি? উচ্চ চিন্তার ব্যাঘাত না করেও জীবনযাত্রা কতটা সরল করা যায়? তার নিম্নতম মান কি?

গ্রীক সন্ন্যাসী ডায়োজিনিস একটা পিপের মধ্যে রাত্রিযাপন করতেন, দিনের বেলা বাইরে এসে রোদ পোয়াতেন। বোধ হয় তাঁর পরিধেয় কিছু ছিল না এবং লোকে দয়া বা ভক্তি করে যা দিত তাতেই তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'ত। এই রিক্ত জীবনযাত্রায় তাঁর উচ্চ চিন্তার বাধা হয় নি। বাংলায় 'উঞ্ছ' শব্দ হীন নীচ বা তুচ্ছ অর্থে চলে। কিন্তু এর মূল অর্থ—ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি খুঁটে নেওয়া, অর্থাৎ অত্যল্প উপকরণে জীবিকানির্বাহ। মহাভারতে উঞ্ছবৃত্তিব্রতধারীর অনেক প্রশংসা পাওয়া যায়। শান্তিপর্বে আছে—এক উঞ্ছব্রতী সমাধিনিষ্ঠ অনাসক্ত ব্রাহ্মণ ফলমূল জীর্ণপত্র ও বায়ু ভক্ষণ করে সর্বভূতের হিতসাধনে রত থাকতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'প্রবল নৈয়ায়িক' বুনো রামনাথের কথা লিখেছেন, যিনি বনের ভিতর ছাত্র পড়াতেন এবং সস্ত্রীক শুধু ভাত আর তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়ে প্রাণধারণ করতেন। মহারাজ শিবচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ইনি জানিয়েছিলেন যে, তাঁর কোনও অনুপপত্তি (অভাব) নেই।

যাঁরা নিস্পৃহ সন্ন্যাসী এবং যাঁদের পোষ্য কেউ নেই, অথবা যাঁদের পোষ্যবর্গ অত্যল্পে তুষ্ট, তাঁদেরও জীবনযাত্রার জন্য কয়েকটি বিষয় আবশ্যক। সর্বাগ্রে চাই সুস্থ সবল শরীর যা ধর্মের আদ্য সাধন, যা না হলে উচ্চ চিন্তা, জ্ঞানচর্চা বা সৎকর্ম কিছুই চলে না। আবার স্বাস্থ্যের জন্য যথোচিত খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয় চাই। যে স্বভাবত স্বাস্থ্যবান ও সবল সে যত অল্প উপকরণে জীবনধারণ করতে পারে, রুগ্ন বা দুর্বল লোকে তা পারে না।

উচ্চ চিন্তা বা জ্ঞানচর্চা এবং সর্বভূতের হিতসাধন বা লোকসেবা—এই দুইএর অর্থ সেকালে যা ছিল এখন ঠিক তা নেই। একালের আদর্শ অনুসরণের জন্য যে অল্পতম জীবনোপায় বা necessaries of life আবশ্যক তাও বদলে গেছে, সেকালের উঞ্ছব্রত এখন অসাধ্য। যথোচিত খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয় ছাড়াও কতকগুলি বিষয়ের ব্যবস্থা না হলে জীবনযাত্রা চলে না।

অত্যল্পে তুষ্ট লোকের সংখ্যা চিরকালই কম, সাধারণ মানুষ ভোগবিলাস চায়। অনেক বিলাসী লোকেও জ্ঞানচর্চা ও লোকসেবা করে, অনেক অবিলাসী লোকেরও উচ্চ চিন্তা ও সৎকর্মের প্রবৃত্তি থাকে না। তথাপি দেখা যায়, ভোগী অপেক্ষা ত্যাগী লোকেই অধিকতর লোকহিতৈষী হয়। এই কারণে সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা সর্ব দেশে সর্ব কালে মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গণ্য হয়েছে।

অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবনোপায় পর্যাপ্ত নয়। আদর্শের অনুসরণ দূরের কথা, বেঁচে থাকাই অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য, অন্নচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তার অবসর নেই। কোনও লোক জ্ঞানচর্চা ও লোকসেবা করুক বা না করুক, সে রাজপুরুষ ব্যবসায়ী বিজ্ঞানী শিক্ষক কলাবিৎ কৃষক বা মজুর যাই হোক, মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রার জন্য কতকগুলি বিষয় তার অবশ্যই চাই, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। কিন্তু মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রার নিম্নতম মান কি? দেশভেদে শীতাতপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে জীবনোপায়ের ভেদ হবে। বৃত্তিভেদেও কিছু কিছু পরিবর্তন হবে, শ্রমিকের আহার অশ্রমিকের সমান হলে চলবে না। এই রকম বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেনে নিয়েও সর্বসাধারণের জন্য জীবনযাত্রার নিম্নতম মান নির্ধারণ করা যেতে পারে কি? ফর্দ করে বা অঙ্কপাত করে দেখানো বোধ হয় অসম্ভব, কিন্তু জীবনযাত্রার যা প্রধান মাপকাঠি—স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ, তার দ্বারা একটা স্থূল ধারণা করা যেতে পারে।

যে ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের বা ধনী-দরিদ্রের মাঝামাঝি লোকের (যাদের আধুনিক নাম বুর্জোআ) স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ কোনও রকমে বজায় থাকে তাকেই আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার নিম্নতম মান ধরা যেতে পারে। আমার জন্ম মধ্যবিত্ত সমাজে। বিগত বাট-সত্তর বৎসরে এই সমাজে জীবনযাত্রার এবং তার সঙ্গে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধের যে পরিবর্তন দেখেছি তা বিচার করলে হয়তো মান নির্ধারণের সূত্র পাওয়া যাবে। এই দীর্ঘকালের গোড়ার দিকে উত্তর বিহারের একটা মাঝারি শহরে ছিলাম। বিহারীর তুলনায় সমশ্রেণীর বাঙালীর জীবনযাত্রায় আড়ম্বর বেশী ছিল। যে ভদ্র বাঙালী মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকা রোজগার করতেন তাঁরও অন্নবস্ত্র আর

বাসস্থানের অভাব হ'ত না। আমাদের বাড়িতে আধুনিক আসবাব ছিল না, শুধু অনেকগুলো তক্তাপোশ আর গোটা-কতক বেঢপ টেবিল চেয়ার আলমারি ছিল। জলের কল বিজলী বাতি ছিল না। পায়খানা অনেক দূরে, বর্ষায় ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে হ'ত। লোকে কদাচিৎ ঔষধার্থে চা খেত। সিগারেট তখন নূতন উঠেছে, গুটিকতক বড়-লোকের ছেলে লুকিয়ে খেত, বয়স্করা প্রায় সকলেই তামাক খেত। সুগন্ধ মাথার তেল দাঁতের মাজন প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যের চলন ছিল না। বাইসিকেল ফাউণ্টেন পেন হাতঘড়ি ছিল না, যারা ভাল চাকরি করত কেবল তাদেরই পকেট-ঘড়ি থাকত। ফুটবল আর ক্রিকেট শুধু নামেই জানা ছিল। আমোদের ব্যবস্থা—কালীপুজোর সময় শখের থিয়েটার, কালে ভদ্রে যাত্রা, আর কয়েকটি বাড়িতে গান গল্প তাস পাশা দাবার আড্ডা। সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীতে দেশবিদেশের যে খবর থাকত তাতেই সাধারণ ভদ্রলোকের কৌতূহল নিবৃত্ত হ'ত। বাংলা গল্প প্রবন্ধ আর কবিতার বই খুব কম ছিল, পাওয়া গেলে নিকৃষ্ট বইও লোকে সাগ্রহে পড়ত। তখনকার প্রধান বিলাসিতা ছিল ভাল জিনিস খাওয়া।

এই মধ্যবিত্ত সমাজের যাঁরা আজকাল কলকাতায় বা অন্য শহরে বাস করেন তাঁদের জীবনযাত্রা অনেক বদলে গেছে। এঁরা সেকালের তুলনায় বেশী রোজগার করেন, কিন্তু এঁদের অভাববোধ বেড়েছে। তার কারণ, টাকার মূল্য কমেছে, গ্রাসাচ্ছাদন দুর্মূল্য হয়েছে, এবং এঁরা অনেক বিষয়ে জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে ফেলেছেন। আহার নিকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু সজ্জা নেশা শখ আর আমোদের মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এখনকার যুবক আর কিশোর ধুতি পঞ্জাবিতে তুষ্ট নয়, দামী প্যাণ্ট আর নানা রকম শৌখিন জামা চাই। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই প্রসাধন-দ্রব্য দরকার। মেয়েদের যেমন অন্তত এক গাছা চুড়ি পরতে হয় ছেলেদের তেমনি হাতঘড়ি আর ফাউণ্টেন পেন পরতে হয়। যুবা বৃদ্ধ সকলেরই দিনের মধ্যে অনেকবার চা চাই। সস্তা গুড়ুক তামাক প্রায় উঠে গেছে, এখন অনেকে দিনে ত্রিশ-চল্লিশটা বা অবিরাম সিগারেট খায়। ঘন ঘন সিনেমা আর ফুটবল ক্রিকেট ম্যাচ না দেখলে চলে না। গ্রামোফোন আর রেডিও না থাকলে বাড়িতে সময় কাটে না। মনের খোরাক হিসাবে গল্পের বই কিনতে হয়, অনেক বই ছ-সাত টাকার কমে পাওয়া যায় না। জগতের হালচাল জানবার জন্য রোজ একাধিক খবরের কাগজ পড়তে হয়।

নিজের এবং সমকালীন আত্মীয়-বন্ধুদের অনুভূতি থেকে বলতে পারি—একালের তুলনায় সেকালে মধ্যবিত্তের স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ কিছুমাত্র কম ছিল না। তার কারণ—যে ভোগ অজ্ঞাত বা অনভ্যস্ত তার জন্য অভাব বোধ হয় না। ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর বাপের কাছে তপোবনে বেশ সুখে ছিলেন। কিন্তু যেমন তিনি লোমপাদ রাজার দূতীদের দেখলেন এবং তাদের দেওয়া ভাল ভাল লড্ডু আর পানীয় খেলেন, অমনি তাঁর মনে হ'ল যে এত দিন বৃথাই কেটেছে।

সেকালের কোনও মধ্যবিত্ত লোককে যদি মন্ত্রবলে হঠাৎ একালের কলকাতায় আনা হয় তবে তিনি কি রকম বোধ করবেন? খাওয়া-পরা, বাড়িভাড়া আর চাকর রাখার খরচ দেখে তিনি আঁতকে উঠবেন, ছেলেমেয়েদের চালচলন দেখে খুব চটবেন, কিন্তু নানা রকম আধুনিক সুবিধা ও আরাম ভোগ করে খুশীও হবেন। একালের কোনও লোককে যদি কলকাতা থেকে সেকালের মফস্বলে এনে ফেলা হয় তবে তিনি বোধ হয় খুশী হবেন না। ভাল ভাল জিনিস খেয়ে বাঁচবেন তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু কলের জল, ড্রেন-পায়খানা, বিজলী আলো আর পাখা, দৈনিক পত্রিকা, সেফ্‌টি ক্ষুর, কামাবার সাবান, অজস্র চা এবং ট্রাম বাস প্রভৃতির অভাবে তিনি কষ্ট পাবেন। যদি তাঁর বয়স কম হয়, তবে সিনেমা, রেডিও, রেস্তোরাঁর খাবার, ফুটবল ক্রিকেট ম্যাচ, নাচ-গানের জলসা, দেবী সরস্বতীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, সর্বজনীন হুল্লোড়, আর টাটকা রাজনীতিক খবরের অভাবে ছটফট করবেন।

পঞ্চাশ বৎসর আগে কলকাতায় মোটরকার দু-একটি দেখা যেত, সাধারণের জন্য টেলিফোন ছিল না। তাতে বড় কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার বা ব্যবসাদার কোনও অসুবিধা বোধ করতেন না। কিন্তু প্রচলন হবার পর কিছু কালের মধ্যেই মোটর আর টেলিফোন অপরিহার্য হয়ে পড়ল। অমুক অমুক রেখেছে অতএব অপরকেও রাখতে হবে, নতুবা কর্মক্ষেত্রে পরাভব অবশ্যম্ভাবী। যেমন, রাশিয়া বিস্তর সামরিক বিমান করেছে অতএব আমেরিকাকেও করতে হবে। আমেরিকা অ্যাটম বোমা করেছে অতএব রাশিয়া ব্রিটেনকেও করতে হবে। রেলগাড়িতে গেলেই সেকালের লোকের কাজ চলত, এখন এয়ারোপ্লেনে না গেলে অনেকের চলে না। আজ যদি জনকতক ধনী হেলি-কোপ্টার রেখে এক বাড়ির ছাত থেকে অন্য বাড়ির ছাতে যাতায়াত আরম্ভ করে তবে আরও অনেককে তা করতে হবে।

শুধু কাজের সুবিধা, আরাম বা বিলাসিতার জন্য অথবা ব্যবসায়ের প্রতিযোগের জন্যই যে নূতন নূতন জিনিস অপরিহার্য হয়েছে এমন নয়, অনুকরণ বা ফ্যাশনের জন্যও

হয়েছে। সরকার আইন করে ভূরিভোজ নিষিদ্ধ করেছেন। আইন মানলে চক্ষুলজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, খরচ বাঁচে, একটা সামাজিক কুপ্রথা দূর হয়। কিন্তু যেহেতু অমুক অমুক আত্মীয় বা বন্ধু আইন না মেনে হাজার লোক খাইয়েছে অতএব আমাকেও তা করতে হবে নতুবা মান থাকবে না। সরকার মদ বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন, মদের দামও খুব বেড়ে গেছে, কিন্তু উচ্চ সমাজের পার্টিতে বা আড্ড'য় স্ত্রীপুরুষের অত্যধিক মদ খাওয়া এখন প্রগতির লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে পয়সা খরচ করে বলনাচ শিখছে। ভারতবাসী যখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছিল তখন বিদেশী জিনিস ব্যবহারে যে সংকোচ এবং বিলাসিতায় যে সংযম ছিল তা এখন একেবারে লোপ পেয়েছে। পূর্বে যা ছিল না বা থাকলেও যা আবশ্যক গণ্য হত না এখন তা অনেকের কাছে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। দেশের লোক কুইট ইণ্ডিয়া বলে বিদেশী সরকারকে বিদায় করেছে, কিন্তু বিদেশী বিলাস আর ব্যসন সাদরে বরণ করে নিয়েছে।

আধুনিক সমস্ত কৃত্রিম অভ্যাস (বা ব্যসন) যদি অনাবশ্যক গণ্য করা হয় তবে জীবনযাত্রার ন্যূনতম উপকরণ বা জীবনোপায় দাঁড়ায়—যথোচিত (অর্থাৎ বাহুল্যবর্জিত) খাদ্য বস্ত্র আবাস, এবং পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা চিকিৎসা ব্যায়াম আর পরিমিত মাত্রায় চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা—

> অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
> চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
> সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।...

আমেরিকায় এবং ইওরোপের অনেক দেশে জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু। এদেশের জনসাধারণের দৃষ্টিতে এখনও যা বড়মানুষি বা বাড়াবাড়ি, পাশ্চাত্ত্য দেশে তা necessary, যেমন, মোটরকার, রিফ্রিজারেটার, বিজলী-উনন, ধুলো-ঝাড়া কল, কাপড়-কাচা কল, মদ, টিনে রাখা খাবার, নানা রকম পোশাক, মুখ আর ঠোঁটের রং, নাচঘর, নাইট ক্লাব, ইত্যাদি। জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হবে—এই উপদেশ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা আমাদের দিয়ে থাকেন। তাঁরা বোধ হয় নিজেদের সমৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের দুর্দশার তুলনা করে কৃপাবশে এই কথা বলেন। জীবনযাত্রার মান বাড়লে বিলাসিতা বাড়বে, বিদেশী পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হবে, এদেশের শ্রমিক অল্প বেতনে কাজ করে বিদেশী শ্রমিকের সঙ্গে প্রতিযোগ করবে না—এই স্বার্থবুদ্ধিও উপদেশের পিছনে থাকতে পারে।

ভোগ-বিলাসের প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তা যদি পরিমিত হয়, জনসাধারণের সামর্থ্যের অনধিক হয়, সমাজের হানিকর না হয়, তবে আপত্তির কারণ নেই। ইওরোপের অনেক দেশের এবং উত্তর আমেরিকার তুলনায় এদেশের ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বেশী, দরিদ্রের সংখ্যাও বেশী। ব্রিটেনে নানা রকম করের ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশ কমছে, ধনীর জীবনযাত্রার মান নামছে। এদেশের সরকারও আয়কর ইত্যাদির দ্বারা এবং বিদেশী বিলাস-সামগ্রীর উপর শুল্ক বাড়িয়ে কতকটা সেই চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোন্ বস্তু বিলাসের উপকরণ এবং কোন্ বস্তু জীবনযাত্রার জন্য একান্ত আবশ্যক তার যথোচিত বিচার হয় নি, এবং তদনুসারে দেশবাসীকে সংযম শেখাবার চেষ্টাও হয় নি।

সম্প্রতি এদেশে ধনীর সংখ্যা কিছু বেড়েছে, অনেকে সৎ বা অসৎ উপায়ে প্রচুর উপার্জন করে অত্যন্ত বিলাসী হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখনও ধনীর সংখ্যা দরিদ্রের তুলনায় মুষ্টিমেয়। বলা যেতে পারে, ধনীরা বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থেকে অধঃপাতে যাক না, তাতে কার কি ক্ষতি। তাদের ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়ে সমস্ত প্রজায় মধ্যে ভাগ করে দিলেও দরিদ্রের বিশেষ কিছু উপকার হবে না। কিন্তু দুর্নীতি যেমন সংক্রামক, বিলাসিতাও সেই রকম, সে কারণে উপেক্ষণীয় নয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চুরি আর ঘুষের যে দেশব্যাপী প্রসার হয়েছে তার একটি প্রধান কারণ বিলাসিতার লোভ। এদেশের ভদ্র-সন্তান শ্রমসাধ্য জীবিকা চায় না সেজন্য তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী। তাদের বিলাস-বাসনা আছে কিন্তু সদুপায়ে তা তৃপ্ত করতে পারে না, সেজন্য তাদের অসন্তোষ বেড়ে যাচ্ছে। কমিউনিস্ট ডিক্‌টেটারী রাষ্ট্রে জীবিকা বেছে নেবার বিশেষ সুবিধা নেই, ইতরভদ্র নির্বিশেষে প্রায় সকলকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। লৌহযবনিকার একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, দরিদ্র সোভিয়েট প্রজা বিদেশী ধনী রাষ্ট্রের বিলাসিতা জানতে পেরে যেন নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট না হয়।

পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতি বলে—want more, work more, earn more, অর্থাৎ আরও কামনা কর, আরও পরিশ্রম কর, আরও রোজগার কর; কামনার তাড়নায় খেটে খাও, আয় বাড়াও, তা হলে নব নব কামনা পূর্ণ হবে, ক্রমশঃ জীবনযাত্রার উৎকর্ষ হবে। ভারতের শাস্ত্র উলটো কথা বলে—ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়ে যায় তেমনি কাম্য-বস্তুর উপভোগে কামনা কেবলই বাড়তে থাকে, শান্তি আসে না; পৃথিবীতে যত ভোগ্য বিষয় আছে তা একজনের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়। কামনা সংযত না করলে মানুষের মঙ্গল নেই—এই সত্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা এখনও বোঝেন

নি। এ-কারণে সর্বত্র লোভ অসন্তোষ আর প্রতিযোগ বাড়ছে, যার পরিণাম পরদেশলিপ্সা ও যুদ্ধ।

অমুক দেশে শতকরা পঁচিশ জনের মোটর গাড়ি আছে, প্রতি পাঁচ হাজার জনের জন্য একটা সিনেমা আছে, সকলেরই রেডিও আছে, লোক পিছু বৎসরে এত মাত্রা তড়িৎ, এত পাউণ্ড মাখন, এত পাউণ্ড সাবান, এত গ্যালন পেট্রোলিয়ম খরচ হয়, প্রত্যেক লোকের অন্তত এত ঘন ফুট শোবার জায়গা আছে, অতএব এদেশের আদর্শও তাই হওয়া উচিত—এই প্রকার অন্ধ আকাঙ্ক্ষায় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। রাষ্ট্রের আয় আর উৎপাদন-সামর্থ্য বুঝেই জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যা অত্যাবশ্যক তার সংস্থানের জন্য অনেক বিলাস অনেক সুবিধা এখন স্থগিত রাখতে হবে।

শ্রমিককে তুষ্ট রাখা দরকার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধনিকের লাভ বজায় রেখে যদি মজুরি বাড়ানো হয় তবে অনেক অত্যাবশ্যক বস্তুর (যেমন বস্ত্রের) দাম বেড়ে যায়, তার ফলে সকলেরই খরচ বাড়ে, অন্যান্য পণ্যও দুর্মূল্য হয়, সুতরাং আবার মজুরি বাড়াবার দরকার হয়। এই দুষ্টচক্রের ফল দেশবাসী হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে।

আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি, ইহসর্বস্ব নই, জনক-কৃষ্ণ-বুদ্ধাদির শিক্ষা আমরা হৃদয়ংগম করেছি—এইসব কথা আত্মপ্রতারণা মাত্র। জাতীয় চরিত্রের সংশোধন না হলে আমাদের নিস্তার নেই। সরকার বিস্তর খরচ করে অনেক রকম পরিকল্পনা করছেন যার সুফল পেতে বিলম্ব হবে। মাটির জমি আবাদের চেয়ে মানব-জমি আবাদ কম দরকারী নয়। এখন যারা অল্পবয়স্ক ভবিষ্যতে তারাই রাষ্ট্র চালাবে, তাদের শিক্ষা আর চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে আবশ্যক। তার জন্য এমন শিক্ষক চাই যাঁর যোগ্যতা আছে এবং যিনি নিজের অবস্থায় তুষ্ট। শুধু বিদ্যা নয়, ছাত্রকে বাল্যকাল থেকে তিনি আচার ও বিনয় শেখাবেন, মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় সদভ্যাস ও সৎকর্মের প্রেরণা দেবেন। আমাদের সরকার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শ্রমিকের অনেক আবদার মঞ্জুর করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে শিক্ষকের চেয়ে শ্রমিকের মর্যাদা বেশী, কারণ তাদের কাজের ফল প্রত্যক্ষ। শিক্ষক যদি উপযুক্ত হন তবে তাঁর কাজের ফল পেতে বিলম্ব হলেও তার গুরুত্ব কত বেশী তা বোঝবার মতন দূরদৃষ্টি সরকার বা জনসাধারণের হয় নি, তাই শিক্ষকশ্রেণী সর্বাপেক্ষা অবজ্ঞাত হয়ে আছেন।

রজনী ভরিয়া স্বপ্নে

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী

চাঁদের আলোয় কামিনী হাসিছে
সবুজ পাতার কোলে,—
নিশীথ মলয়ে গন্ধ বিলায়ে
দোলে সে দোদুল দোলে।

মধুপ-বঁধু গন্ধে পাগল,
বাঁধিল তাহারে দাঁধায়-আগল ;
চাঁদিনী বাসিল কামিনীরে ভালো
তাই সে বেদনা তোলে।
চাঁদের আলোকে কামিনী হাসিছে
সবুজ পাতার কোলে।

মিলন-বেদনা তবু হিয়াতলে,
সতত দোঁহার ঝিকি ঝিকি জ্বলে ;
রবির পরশে লভিল ধরা সে
রজনী ভরিয়া স্বপ্নে'।

অনামিকা

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

তোমারে দেখেছি বন্ধু দিনান্তের গোধূলি আকাশে,
ত্রিযামার মাঝে যেথা আভাসিত সুষুপ্তি-অঞ্চল ;
উষসীর আলো-ছায়ে অস্ফুট আলোক বিকাশে,
অম্বুধির ঊর্মিমাঝে তরঙ্গিত সফেন চঞ্চল।

রজনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে শুনি যেন তব আহ্বান,
নক্ষত্রের দৃষ্টি-মাঝে হেরি যেন তব হাতছানি ;
মহত্ত্বের গুণকক্ষে তুমি আছ চির-দীপ্যমান,
মহাকাল দুঃখবক্ষে আছে তব পুঞ্জীভূত বাণী।

দিবস-শর্ব্বরী মাঝে তুমি রও চির-প্রহেলিকা,
তুমি স্থির ধ্রুবতারা অজ্ঞাত ভবিষ্যের মাঝে ;
শাশ্বত জীবনমাঝে অচঞ্চল চির-অনামিকা,
অতন্দ্র চেতনাশেষে তব শিঞ্জিনী শুনি বাজে।

সেকালের স্মৃতি

আদি ব্রাহ্মসমাজ

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

আমার দীর্ঘ জীবনের স্মৃতি যতদূরেই পিছিয়ে যাক না কেন, ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের গোড়া পর্য্যন্ত যায় না—বলাই বাহুল্য। শ্রুতি তার চেয়ে কিছু বেশীদূরে পৌঁছায় অবশ্য, তবে মেয়েদের শ্রুতি স্মৃতি অধিকাংশ পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ।

তারই জোরে বলতে পারি যে, মহর্ষির এই নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের নবীন উৎসাহে তাঁর গুণবান সন্তানগণ প্রায় সকলেই মেতে উঠেছিলেন, এবং কেউ তাঁর ব্যাখ্যা লিখে নিয়ে, কেউ গান রচনা করে, কেউ গান গেয়ে ধর্ম্মপ্রচারে তাঁকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। আমার মায়ের কাছে গল্প শুনেছি যে, তাঁর গৌরীদানের ফলে আট বৎসর বয়সে শ্বশুরবাড়ী আসবার পর—সে আজ একশ' বছরের উপর—তাঁরা সকলে ভোরে উঠে স্নান করে দালানে গিয়ে বসতেন; এক দিকে ছেলেরা, এক দিকে মেয়েরা ও মাঝখানে মহর্ষি। ঐটুকু মেয়ের পক্ষে ভারি ভারি সংস্কৃত শ্লোক বোঝা সম্ভব ছিল না, তাই সেই দীর্ঘ-হ্রস্ব ছন্দের শব্দবিন্যাস তিনি গ্রহণ করেছিলেন—'ই মা নিভৃতা নিজা খণ্ডে'—এই হাস্যকর রূপে। কিন্তু নাই বা সেই বাক্যের অর্থ তাঁর বোধগম্য হ'ল, তবু "দিনের প্রথম ক্ষণে" সেই যে এক অনির্দ্দেশ্য সত্তার প্রতি সকলে মিলে একটি পবিত্র শ্রদ্ধার ভাব নিবেদন করতে বসতেন, তার মূল্য কি অর্থ দিয়ে নির্ণয় করা যায়? সেই সৌম্যদর্শন পুণ্যাত্মা নিজের অন্তরে লব্ধ দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে সপরিবারে তাঁর প্রাণের আরামকে আনন্দে স্মরণ করছেন।—এ দৃশ্য যে আমরা চর্ম্মচক্ষে না দেখে কেবল কল্পনাচক্ষে দেখতে বাধ্য হয়েছি, সে আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলব।

আমার ব্রাহ্মসমাজের স্মৃতি যদি বেশীর ভাগ গানেই পর্য্যবসিত হয় ত আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ ক্ষমা করবেন। আমি পূর্ব্বে অন্যত্র যা বলেছি, এখানেও অকুণ্ঠিত চিত্তে তার পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে, ব্রাহ্মসমাজ যদি কালক্রমে বিলুপ্তও হয় (ভগবান না করুন) তা হলেও তার ভাণ্ডারে যে অমূল্য গানের রত্নরাজি সঞ্চিত আছে তারই দৌলতে এটি অন্ততঃ বাংলাদেশে চির সমাদর এবং অমরতা লাভ করবে। তার কথার সম্পদ বাদ দিলেও, শুধু সুর আলোচনা করলে আমাদের সঙ্গীতের অনেক ইতিহাস জানা যাবে; এবং আমাদের ব্রহ্ম-সঙ্গীত পুস্তকখানি মনোযোগপূর্ব্বক দেখলে বাংলার সামাজিক তথ্যও কিছু কিছু পাওয়া যাবে, যথা ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত-রচয়িতাদের কালক্রম, ধারা ইত্যাদি। "আমাদের" সঙ্গীত পুস্তক বিশেষ করে' উল্লেখ করছি এইজন্য যে, সেই পুস্তকেই কেবল রচনার কালানুসারে ভাল ভাল সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। হতে পারে আমার আবাল্য সংস্কার বশতঃ, কিন্তু এইরূপ ভাগে ভাগে বিভক্ত ভিন্ন অন্য সঙ্গীতপুস্তক তত ভাল লাগে না। তৃতীয় ভাগ থেকেই বোধ হয় ব্রহ্ম-সঙ্গীতের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের আরম্ভ; কিন্তু স্বরলিপির গুণে বা কানে শুনে ১ম ও ২য় ভাগের দু-চারটি ভাল গানও যে না জানি এমন নয়। বহুকাল আগে আমার একবার ইচ্ছে হয়েছিল পুরনো (অর্থাৎ প্রথম দুই ভাগের) ভাল ভাল গান বেছে নিয়ে শিখতে। তখন পূজ্যপাদ সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দু'জনেই জীবিত ছিলেন এবং দুই ভাইয়ে রাঁচির শান্তিধামে বাস করতেন; আমরাও প্রতি বৎসর পূজার ছুটিতে নিয়মিত সেখানে যেতুম। সুতরাং এ সদিচ্ছা পূর্ণ করবার কোন বাধাই ছিল না। প্রত্যেক ভাগের শিক্ষণীয় গান বোধ হয় নির্ব্বাচন করেছিলুম, এমন কি শিখতেও আরম্ভও করেছিলুম, যথা:

"তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে আপন,
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন"—

এ দুটি চরণের ছন্দোবন্ধ এখনো এত ভাল লাগে। কিন্তু কি জানি কেন এ শিক্ষা নিয়মিত ভাবে আর অগ্রসর হ'ল না; সম্ভবতঃ আমাদের মজ্জাগত অধ্যবসায়ের অভাব-দোষে। সুযোগ একবার হারালে আর পাওয়া যায় না। এখন চারিদিকে চেয়ে দেখি, সব অন্ধকার। এমন একটি প্রবীণ মানুষ বেঁচে নেই, যাঁর কাছ থেকে সেকালের শুধু গান কেন, কোন বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন বা জ্ঞানলাভ করতে পারি। নিজের অসম্পূর্ণ স্মৃতিদ্বারা বরং আমাকেই অপরের সন্দেহ ভঞ্জন করতে হয়।

আদি ব্রাহ্মসমাজের আদি সঙ্গীতের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের "কি স্বদেশে কি বিদেশে"র সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল; সম্ভবতঃ তাঁর বার্ষিকী রক্ষা-সূত্রে। সম্প্রতি ঐ একই উপলক্ষ্যে তাঁর রচিত "কেন ভোল, মনে কর" নামে আর একটি গান স্বরলিপি দেখে শিখলুম ও শেখালুম, যেটি সুরে কথায় ভাবে বেশ এ কালের রুচিসম্মত। নইলে স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর"-এর মত দেহতাত্ত্বিক গান

আজকাল আমাদের মনে ধর্ম্মভাব দূরে থাক, কৌতুকমিশ্রিত ভীতিরই উদ্রেক করে। শুনেছি নাকি স্বনামধন্য ৺শ্যামসুন্দর মিশ্র কোন ব্রাহ্ম বিবাহের পাকা দেখা অনুষ্ঠানে উক্ত গানটি গেয়েছিলেন; কিন্তু এই কিংবদন্তীটি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। মহর্ষি-প্রণীত "পরিপূর্ণমানন্দং", "দেহ জ্ঞান" আজ পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে খুবই চলিত। বিশেষতঃ শেষোক্তটি সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন প্রার্থনা হিসেবে অনবদ্য, এবং আমাদের কালে প্রত্যেক প্রাতঃকালীন উপাসনার প্রথমেই গাওয়া হ'ত। তাঁর বার্ষিকীতে "ভাব সেই একে", "ভাব তাঁরে" প্রভৃতি তাঁর অপেক্ষাকৃত সেকেলে ভাবের গানও পাওয়া হয়। এ নিয়মটি খুব ভাল, নইলে পরবর্ত্তী কালের প্রবল রচনা-বন্যায় সেকালের মুষ্টিমেয় গান কয়টি এতদিন কোথায় ভেসে তলিয়ে যেত তার ঠিক নেই। মনে আছে কয়েক বছর আগে আদি ব্রাহ্মসমাজের শেষ সম্পাদক ৺প্রেমানন্দ সিংহ মহাশয় আমার দাদা ৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বালিগঞ্জস্থ লালবাংলার বাড়ীতে এসে আমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করেন মহর্ষির তিরোধান বার্ষিকীতে সমাজগৃহে গিয়ে উপাসনায় সঙ্গীতের ভার নিতে। তাঁর এই অনুরোধ রক্ষার্থে আমরা পরিবারস্থ সব গায়ক-গায়িকা একত্র হয়ে সেই পুরনো আদি সমাজে কতকাল পরে গেলুম এবং মহর্ষির স্বরচিত কয়েকটি গানের সঙ্গে অন্যান্য উপযোগী দু' একটি গান মিলিয়ে কার্য্য সুসম্পন্ন করলুম। যতদূর মনে আছে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এই উপলক্ষ্যে তাঁর একটি রচনাও পাঠ করেন। এতকালের সমাজগৃহে সেই আমাদের শেষ পারিবারিক উপাসনা। কারণ "ছিল প্রাণ সে গিয়াছে, দেহে কি আর কেহ আছে;" দেহও বোধ হয় আর বেশী দিন খাড়া থাকবে না। যিনি এই ইটকাঠের দেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁরই নামে এখানে এক প্রকার "শেষ আরতি সাজ" করা হ'ল, সেকথা ভাবলে এই ঘটনাটির মধ্যে একটি বিষণ্ণ সার্থকতা উপলব্ধি হয়।

মহর্ষির প্রায় প্রত্যেক সন্তানেরই রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত আছে তা হয়ত সকলে জানেন না। খ্যাতনামা পুত্রগণ এবং স্বনামধন্যা কন্যা স্বর্ণকুমারীকে বাদ দিলেও তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীর অন্ততঃ একটি গান আছে জানি —"প্রভু পূজিব তোমারে আজি" এবং যাঁর কাছে নানা কারণে আশা করা যায় না, সেই সোমেন্দ্রনাথও নাকি একটি গান রচনা করেছেন—"দেখিতে তরঙ্গময় ভব-পারাবার"। তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথের দুটি গান সেকালে খুব জনপ্রিয় ছিল—"গাও হে তাঁহার নাম" এবং "দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে"। যত দূর জানি গানের সুর এঁরা নিজেরা দিতেন না, বেশীর ভাগ সেকালের উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান থেকে ভাঙ্গা হ'ত; বিশেষ ধ্রুপদাঙ্গের গান। সেইজন্য এমন সব সুন্দর সুরের দুর্লভ ধ্রুপদ ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু যেগুলির স্বরলিপি কাঙালীচরণ-কৃত ব্রহ্মসঙ্গীত ছয় খণ্ডের মধ্যে নেই, সেই সব গানের সুর বোধ হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল।

শান্তিনিকেতনে গত ১৯৪১ সনের শেষে আসি। এই দশ বৎসরে রবীন্দ্রেতর কতকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত এখানে চালাবার চেষ্টায় কৃতকার্য্য হয়েছি, যথা—দ্বিজেন্দ্রনাথের "অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি", "জাগো সকলে", "জয় জয় পরব্রহ্ম" ইত্যাদি। তাঁর "কর তাঁর নাম গান" পূর্ব্বেই চলিত ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের "কে রচে এমন সুন্দর", "কেন ভোল ভোল"; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "তুমি হে ভরসা মম", "জানি তুমি মঙ্গলময়", "শুভদিনক্ষণ", "প্রণমামি" তাঁর "বিমল প্রভাতে" আগেই চলিত ছিল, কিন্তু লোকে ভুলে মনে করত সেটি কবিগুরুর রচিত।

ব্রহ্মসঙ্গীতের ১ম ও ২য় ভাগের অধিকাংশ গানই যদি মহাত্মা রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হয়, তবে ৩য়, ৪র্থ ভাগের গান বেশীর ভাগ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহর্ষিদেবের বড় ছেলেদের রচিত বলে অনুমান করা অন্যায় হবে মনে হয় না। কেন যে তাঁরা সেকালের অন্যান্য প্রথার সঙ্গে শেষ চরণে নিজের নাম দেওয়া বা ভণিতার প্রথা অবলম্বন করলেন না তাই ভাবি—তা হলে আর আমাদের প্রকৃত রচয়িতার সন্ধানে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হ'ত না এবং 'উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে' চাপাতেও হ'ত না। কাঙালীচরণ সেন শুধু বহু ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি করে নয়, তাদের রচয়িতার উল্লেখ করেও আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আরও কিছু দিন বেঁচে থাকলে কত উপকারই না হ'ত। কর্ম্মের বহরের তুলনায় কর্ম্মীর বহর কত কম ভাবলে দুঃখ হয়।

সঙ্গীত-পুস্তকের ষষ্ঠ ভাগ থেকে যে রবীন্দ্র-যুগ আরম্ভ হ'ল, সেই যুগ দ্বাদশ ভাগ ছাপিয়ে গিয়ে, শান্তিনিকেতন ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সমানে চলেছিল বলা যেতে পারে; যদিও শান্তিনিকেতন বাসকালে তিনি খুব বেশী তথাকথিত ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। তবে তাঁরই নির্দ্দিষ্ট বিভাগানুযায়ী পূজা, প্রেম ও প্রকৃতির গানে সব রকম ভাব এত ওতপ্রোতরূপে জড়িত যে, দৈবী ও মানবীয় ভাবকে আলাদা করে ছাড়িয়ে নেওয়া শক্ত। তাঁর পরবর্ত্তী বংশধরগণও এই সঙ্গীতের মহাসিন্ধুতে নিজেদের ছিটে-ফোঁটা ঢালতে ত্রুটি করেন নি। ষষ্ঠ ভাগের

অন্তর্গত "তুমি কি গো পিতা আমাদের," "মহাসিংহাসনে বসি," "কোথা আছ প্রভু," "আমরা যে শিশু অতি" প্রভৃতি গানগুলি আমরা ছেলেবেলায় খুব শুনতুম ও গাইতুম—মনে আছে। তবে কোন্‌টি রবীন্দ্র-রচিত প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত তা হলপ করে বলতে পারব না; সে গবেষণার ভার তাঁর অন্যান্য নানা বিষয়ের গবেষকদের উপরেই রইল। এক সময় মাসিক সমাজ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় আমি সমাজে গিয়ে তাঁর গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজাতুম এবং তাঁর তখনকার নব নব রচিত সকালের গান—"তবে ঝিঁঝিঁরিব", "ভব কোলাহল ছাড়িয়ে", "ভোরের বেলায় কখন এসে" প্রভৃতি খুব ভাল লাগত—বিশেষতঃ শেষেরটি। অন্যগুলি হয়ত একালের কেউ জানে না, কিন্তু এটি এখনও লোক-রঞ্জন করে বলে আমার বিশ্বাস। গানের ভিতরেও বোধ হয় যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের নিয়ম কাজ করে।

তখন একটি কি সুন্দর হারমোনিয়ম বা অর্গ্যান সমাজে ছিল, তার চাবি দোতলা। নীচেরগুলিতে হারমোনিয়মের আওয়াজ এবং উপরেরগুলিতে পিয়ানোর মত টুং-টাং আওয়াজ পাওয়া যেত। এত বড় যন্ত্রটাও কি কালের স্রোতে বেমালুম তলিয়ে মিলিয়ে অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল? আশ্চর্য্য! এই সেদিনও ত মাঘোৎসবে বাজিয়েছি মনে হয়। তবে আমার সেদিন মানে অবশ্য অন্যদের বহুদিন। তখন হারমোনিয়মে দু'একটা গৎ বা গান বাজাতে পারে না, এমন ছেলেমেয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ছিল না বললেই হয়। অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেতার এস্‌রাজও বাজাতেন। শেষোক্ত দু'জন ত নাড়া বেঁধে বাংলার বিখ্যাত চেঁড়িজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মাঝে মাঝে আমাদের ঘরোয়া ঐকতানও হ'ত—হয়ত এক রাগিণীর বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ের গান পর পর বাজিয়ে। এখনকার মত হারমোনিয়মের উপর এতটা বিষদৃষ্টি তখনও পড়ে নি এবং আমার মনে ঐ যন্ত্রটির প্রতি সেই ছেলেবেলার টান তাই কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে। আমি এখনও বলব যে ভাল যন্ত্র ভাল বাজিয়ের হাতে পড়লে হারমোনিয়ম আমাদের গানের সঙ্গত হিসেবে কিছুমাত্র অনুপযোগী নয়; তার অনেক সুবিধেও আছে। তবে নিকৃষ্ট যন্ত্র ও বাদকের ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দ কানে অসহ্য লাগে এবং তারের যন্ত্র বাজালে দেখতে ও শুনতে সুন্দর হয় তা স্বীকার করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথ কখনো কোন বাদ্যযন্ত্রে হাত লাগান নি, কেন জানিনে। গানের তানও তিনি একপ্রকার বর্জ্জন করেছেন বলতে হয়। তার দুটি কারণ আছে মনে হয়—এক, তাঁদের ছেলেবেলা থেকে বড় বড় 'গাওয়াইয়ার' কাছে ভারি ভারি ধ্রুপদ শোনার অভ্যাস; দুই, তাঁর গানে কথার এমন প্রাধান্য যে, এক জায়গায় থেমে অনর্থক সুরবিস্তার করতে গেলে ভাবের রস-গ্রহণে বাধা হতে বাধ্য। কেবল যেখানে তিনি হিন্দী টপ্পার সুরে কথা বসিয়েছেন (যাকে চলতি ভাষায় বলে গান "ভাঙা") সেই ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দিতে আপত্তি করেন নি। তাঁর এই গান-ভাঙার অপরূপ কারিগরী, বা মধ্য জীবনে তাঁর সুরের ক্ষেত্রে বাউল সঙ্গীতের প্রবল প্রভাব সম্বন্ধে আজকাল এত সোদাহরণ আলোচনা প্রচলিত হয়েছে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত-ভক্তের নিকট তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

মাঘোৎসবের গানের সঙ্গে মাঘোৎসবের সভাসজ্জা এবং আলোকমালায়ও কত পরিবর্ত্তন আমাদের চোখের উপর দিয়ে হয়ে গেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের সেজ ছেলে নীতীন্দ্রনাথকে বাইরের লোকে জানুক বা না জানুক, আমরা ঘরের লোকে তাঁর সভাপ্রাঙ্গণ সাজাবার রুচি ও নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির জন্য অন্ততঃ চিরকাল তাঁর গুণ-কীর্ত্তন করব। সেই ছ' ফুটের উপর লম্বা সুপুরুষের মধ্যে বাস করত যে ছেলে-মানুষ, সে উঠানে দাঁড়িয়ে উপর-দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবত এবার সেই পুরনো গাঁদাফুল ও দেবদারু পাতার মালা দিয়ে থামগুলোকে কি নতুন ছাঁদের পোশাক পরানো যেতে পারে; লম্বালম্বি ঝুলিয়ে বা বরফির মত চক্ কেটে, বা আরো কত রকমে মাথা খেলত তা পরদিন বাহার দেখলে তবে বোঝা যেত।

আলোকসজ্জার সর্ব্বপ্রথম অবস্থা মনে পড়ে থাম পোঁতা। অর্থাৎ উঠোনের ধারে ধারে হাত দশেক অন্তর গর্ত্ত খুঁড়ে তাতে বেঁটে মানুষসমান ছোট ছোট কাঠের থাম পোঁতা ও এক থাম থেকে অন্য থামে খাসগেলাস বা রেড়ির তেলের আলোকমালা ঝুলিয়ে দেওয়া। ১০ই মাঘে থাম পোঁতা থেকেই আমাদের উৎসবানন্দ আরম্ভ হ'ত, যেমন হিন্দু-বাড়ীতে প্রতিমার কাঠামো তৈরি থেকে ছেলেদের হয়। একটা কিছু চোখের সামনে গড়ে উঠছে, কাজ এগোচ্ছে দেখতেই ত ছেলেরা ভালবাসে; নিরাকার সৃষ্টিকর্ত্তার ধ্যান-ধারণা অপেক্ষা তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৃষ্টি দেখা ও তাতে যোগ দেওয়াতেই তাদের আনন্দ বেশী। তারপর এল উঠানের দোতলার কার্ণিস বরাবর টিনের ফুলের সারে গ্যাসের আলো; তারপর ক্রমশঃ আধুনিক বৈদ্যুতিক আলো, যা এখনো সকলের চোখ ঝল্‌সিয়ে বিরাজমান। আমার কিন্তু ধর্ম্ম-মন্দিরে অত চোখ ধাঁধানো আলোর চেয়ে হয় মোমবাতি কিংবা প্রদীপের নরম আলো অধিকতর সুন্দর এবং মানানসই ঠেকে। মনে

আছে, বছর দুই আগে যখন শান্তিনিকেতনের মন্দিরে প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর চল হয়, তখন চোখে বড় বিসদৃশ লেগেছিল; বিশেষতঃ আলোতে কোনরকম অবগুণ্ঠন না থাকায়। পরে অবশ্য তলায় পাথরের থালা দেওয়া হ'ল।

ছেলেবেলায় বাড়ীর ছেলেমেয়েরাই মাঘোৎসবে গান করত মনে হয়। মাঝে ওস্তাদ দ্বারা গান শেখানো ও গাওয়ানোর রেওয়াজ হ'ল। তাঁরা সেজন্য বেশ মোটা পারিতোষিকও পেতেন। শুনেছিলুম একবার কোন্ ওস্তাদের বাড়ীতে মহড়ার সময় এত চীৎকার হ'ল যে সেজের আলো নিভে গেল। সেই সময় পুরুষ-মানুষের দরাজ-গলায় খুব কালোয়াতী কাওয়ালীধ্রুপদ শোনা যেত এবং সেই সংস্কার থেকেই আমার মনে ধ্রুপদের প্রতি একটা পক্ষপাত রয়ে গেছে, বিশেষতঃ পাখোয়াজের গুরু-গম্ভীর জলদমন্দ্রের সঙ্গে। যদিও পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে বলতেন যে, সেকালের অতিকায় জানোয়ারের মত ধ্রুপদগুলিরও লুপ্ত হবার সময় এসেছে। কবিগুরুর শান্তি-নিকেতনে স্থায়ী হবার কিছুকাল পরে আবার নিয়ম হ'ল যে, দিনেন্দ্রনাথ এখানকার ছেলেমেয়েদের গান শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে একেবারে মাঘোৎসবের সভায় নিয়ে গিয়ে গাওয়াবেন। পরে শুনেছি আমাদের বাড়ীর মেয়েদের একেবারে বাদ দেওয়া হ'ল বলে কেউ কেউ দুঃখিত হয়েছিলেন। কিন্তু তখন বিবাহাদিসূত্রে অনেক ঘরের মেয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল; তা ছাড়া আসল কথা হচ্ছে গান শেখাবার ভার নেবার মত জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তেমন কেউ ছিল না। এখনো মনে পড়ে দিনেন্দ্রনাথ একটি মাত্র ছোট হারমোনিয়মে বা এস্রাজে সুর দিয়ে তাঁর অত বড় দলকে কি সুশৃঙ্খলায় পরিচালনা করতেন। আর "প্রিয়তম হে জাগো জাগো" প্রভৃতি নতুন গানগুলি শুনে কি ভাল লাগত! তখন একক গান অপেক্ষা সমবেত গানেরই রেওয়াজ ছিল বেশী।

আমি যেমন শান্তিনিকেতনে এসে দেখেছি "সোলো" গাইবার জন্য আঁকুবাঁকু ও মান-অভিমান চলেছে, তখন বোধ হয় সে দুরাশা ছিল না। একবার মনে আছে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ একই গান কলকাতার ও শান্তিনিকেতনের গানের দলকে শেখান; গান দুটি হ'ল—"নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে" এবং "প্রাণ ভরিয়ে।" আমরা এক দল দালানের দিকে এবং আর এক দল গানের মণ্ডপে বসে বেশ উত্তর-প্রত্যুত্তরের মত পালাক্রমে গান গাইতে গিয়ে দেখি—হে হরি! দু'দলকে দু'রকম সুর শিখিয়ে বসেছেন। এ সঙ্কট-মোচন কি ভাবে হ'ল ঠিক মনে করতে পারছি নে। কিছু একটা রফা হয়েছিল নিশ্চয়ই। আর একবার কলকাতার পিয়ানোয় বসে আমাকে "কে গো অন্তরতর সে" শেখাতে গিয়ে অনুযোগ করলেন—"তোর শিখতে বড় দেরি লাগে।" বলা বাহুল্য, তখন আমার বয়স মাঝামাঝি ছিল এবং কথাটা শুনে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। কিন্তু পরে যখন শুনলুম ও দেখলুম দিনু এবং খুকু (৺অমিতা সেন) কি রকম অল্প সময়ের মধ্যে ওঁর চার-পাঁচটা নতুন গান একাদিক্রমে শিখে নেয়, তখন বুঝলাম তারা তাঁর অভ্যাস খারাপ করে' দিয়েছে, এবং আমাদের কোনকালে কোন বয়সেই ভিন্ন ভিন্ন সুরের অতগুলি নতুন গান একটানা বসে শিখে নেওয়া ও মনে রাখা অসম্ভব ছিল।

দিনুর অবর্তমানে আমার উপরেই মাঘোৎসবের গান শেখানোর ভার পড়ল—কি কলকাতায়, কি শান্তি-নিকেতনে। এখনো এখানে তাই রয়েছে। তবে কলকাতায় উৎসব চালনা আবার বাড়ীর ছেলেদের হাতে গিয়ে পড়েছে, সেটা সুখের বিষয়; কারণ তাদেরই ত কাজ। এখানে উপাসনা-পরিচালনার ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হয়। কারণ ক্ষিতিমোহন বাবু বলেন, গুরুদেব বলতেন—মাঘোৎসবই মহর্ষির বাড়ীর একমাত্র উৎসব। আপনি তাই গিয়ে সেখানকার উপাসনা পরিচালনা করবেন। পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী থাকতে তাঁর বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে আমাদের মন্দিরের বেদমন্ত্রপাঠে অনেক সাহায্য করতেন। তিনি আমাদের ত্যাগ করবার পর শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ স্বয়ং বেদীতে বসতে সম্মত হওয়ায় আমার খুব আনন্দ হয়েছে। অনেকেই জানেন যে, বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে বেদপাঠ শেখবার জন্য মহর্ষি তিন-চার জন ব্রাহ্মণকে কাশী পাঠিয়েছিলেন। আমরা সেই বিশেষ উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরে মন্ত্রপাঠ শোনায় আবাল্য অভ্যস্ত বলে অন্য কোন সুরে মন্ত্রপাঠ শুনতে ভাল লাগে না। তিন আচার্য্য বেদীতে বসে এক সুরে মন্ত্রপাঠ করলে যেমন সুন্দর গম্‌গমে শোনায়, সেই ঐক্য-সুরের ব্যতিক্রম হলে তেমনি কানে কর্কশ লাগে। এখন কথায় কথায় ছোট ঘরেও প্রতি গায়কের সামনে মাইক ধরে দেওয়া হয়; কিন্তু তখন ত মাইকের অস্তিত্বও জানতাম না। অথচ ঐ প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের শেষ, এমন কি দালানের ভিতর পর্য্যন্ত ত প্রত্যেক বক্তার গলা পরিষ্কার শোনা যেত। বড় বড় নাট্যশালায় গীতি-নাট্য অভিনয়কালীনও মেয়েদের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকণ্ঠের কোন যান্ত্রিক স্ফীতির সাহায্য নেওয়া কখনো আবশ্যক মনে হয় নি। কিন্তু অনেক বিষয়েই 'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ।'

আমি একটু বৈচিত্র্যভক্ত বলে ঘরে বাইরে যেখানে ভাল গলার সন্ধান পেতুম, একক গানের জন্য সংগ্রহের চেষ্টা

করতুম, তার মধ্যে শ্রীমতী মালতী ঘোষাল, সুষমা ও সুভাষা সেন, এবং আমাদের ঘরের বউ অমিয়া ও মেনকা দেবীকেই বেশী মনে পড়ে; যদিও মেয়েদের মধ্যে আরও অনেকে সাহায্য করেছেন। ছেলেদের মধ্যে হরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মুরারিমোহন মিশ্র উভয়েই সুগায়ক ছিলেন, এবং উভয়েই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সঙ্গীত-জগতের খুব ক্ষতি হয়েছে। এ স্থলে সুকণ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নামও উল্লেখযোগ্য। আর গোপাল সেনগুপ্ত নামক একটি অন্ধ গায়কের মধুর কণ্ঠে যখন শুনতুম "মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে," তখন কি রকম কষ্ট হ'ত। যাঁদের নাম করা হ'ল না তাঁরা যেন না মনে করেন তাঁদের ভুলে গেছি। ছেলেমেয়েদের সমবেত সঙ্গীত নানা প্রকার ভাগেযোগে গাইয়ে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করা হ'ত এবং এখনো হয়। তা ছাড়া ছোট ছেলেমেয়েদের একটা আলাদা দল করে তাদের দিয়ে উপযুক্ত গান গাওয়ানোর রেওয়াজও আমি নতুন করে প্রবর্ত্তন করি; সে নিয়ম এখনো এখানে রেখেছি। কারণ ব্রাহ্মসমাজে ছোট ছোট গায়কের অভাব নেই, এবং ওরাই ত আমাদের ভবিষ্যতের আশাভরসা স্থল। ইউরোপে শুনেছি গির্জ্জায় যখন কিশোর-কণ্ঠে সমবেত ধর্ম্মসঙ্গীত গাওয়া হয় তখন সে যেন সাধারণ স্ত্রী পুরুষের কণ্ঠের অতীত মাধুর্য্যে দেবদূতের কল্পনা মনে আনে।

সুমধুর সঙ্গীতের সঙ্গে যখন রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্য সম্মিলিত হ'ত, তখন জোড়াসাঁকোর উঠানে সে কি ভিড়, এবং উপরের বারান্দাগুলিশুদ্ধ কিরকম লোকের ঠাসে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হ'ত, তা না দেখলেও সহজেই অনুমেয়। আমার কোন স্নেহাস্পদ আত্মীয়ের কাছে যখন এই ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাকালীন ব্যাখ্যান বা উপদেশ পাঠে আমার অক্ষমতা এবং অযোগ্যতার অজুহাত জানাই তখন তিনি বলেছিলেন—তোমার কাছে আমরা মামুলি উপদেশ শুনতে চাই নি; কিন্তু তুমি দুই যুগই দেখেছ, তখনকার উৎসাহ এবং ধর্ম্মের অভ্যুত্থান এখনই বা কমে গেল কেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের এমন অধোগতিই বা হ'ল কেন এবং পুনরভ্যুদয়ই বা কিসে হতে পারে, এই সব কথা শুনতে চাই। তাই সে বিষয় আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা মনে হয় সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ না হয়েও এটুকু বোঝা যায় যে, কোন বাহ্যিক আঘাত লাগলে বা আলোড়ন হলে সমাজের মনেও একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়। এই রকম আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র ও বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠার ফলে। বিশেষতঃ, সমাজের উচ্চ স্তরে বিলেতী শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভাবে পূর্ব্বতন সমস্ত বিশ্বাস এবং সংস্কারের ওলটপালট হতে লাগল; ওদের সভ্যতার সবই ভাল এবং আমাদের সবই মন্দ—ক্রমশঃ এইরূপ সিদ্ধান্ত হ'ল। যে বিষয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল, সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে যে আরো বেশী কুরুক্ষেত্র বাধে নি, তার একটা কারণ—যেমন এদেশের লোকের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অবিচলিত আস্থা তেমনি আর একটা প্রধান কারণ রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ মহামনীষিগণ দ্বারা বেদবেদান্তের নির্ম্মল স্রোত ভগীরথের মত আবার বাংলাদেশে বহানো।

তাঁদের স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস দেওয়া বাহুল্য, এবং স্থাপনের অনতিবিলম্বেই আমাদের জাতীয় মজ্জাগত স্বভাবদোষে একখানা ভেঙে তিনখানা হয়ে গেল, তাও কারো অবিদিত নেই। আমার এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আদিসমাজ ও নববিধান সমাজ বলতে গেলে এক একটি পরিবারেই সীমাবদ্ধ রইল, যথাক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে। মহর্ষির জীবিতকালে মোটের উপর ব্রাহ্মসমাজে ও বাড়ীতে তাঁর প্রবর্ত্তিত নিয়মই বহাল রইল; ঘরে বাইরে নিয়মিত উপাসনাদি ও মাঘোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হ'ত। কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, বেহালা প্রভৃতি স্থানে শাখা-সমাজও বোধ হয় স্থাপিত হয়েছিল। বোম্বাইয়ের প্রার্থনা-সমাজ স্থাপনের সঙ্গে পিতৃদেবের কিছু যোগ ছিল কি না তা বলতে পারি নে; তবে তিনি তাঁর প্রবাসের কর্ম্মস্থল থেকেও নতুন নতুন ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করে পাঠাতেন তা জানি, এবং ওদিককার গুজরাটী ভজনাদিও ভাঙতেন। তার মধ্যে "জয় দেব" "জয় দেব" ভজনটি আমাদের কালে খুব গাওয়া হ'ত; বিশেষ, প্রাক্ত-বাসরে। "নমামি মহিষাসুর মর্দ্দিনী" নামক প্রসিদ্ধ দক্ষিণী ভজন ভাঙা পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের "ভজোরে ভজোরে ভবখণ্ডনে"রও বেশ চল ছিল। পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "অনুপম মহিমপূর্ণ" "অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে," "আদিনাথ", "আজি বিশ্বজন গাইছে," প্রভৃতি গানের সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িত, তাঁর "জয় পরম শুভ সদন"ও ছেলেদের শেখানো হ'ত। কিন্তু গানের স্মৃতির আর অন্ত নেই।

মহর্ষির তিরোধানের পরেও পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ যত দিন ছিলেন, বোলপুর থেকে সঙ্গীতাদি পরিচালনা করতেন, কখনো কখনো নিজেও বেদীতে বসতেন, তা আগেই লিখেছি। অন্যথা তাঁর নাতিরা বসতেন। ৺ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত অনেকদিন আদিসমাজের সম্পাদক ছিলেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও পরিচালনা করেছেন। তার আগে বেচারাম বাবু ও চিন্তামণি বাবুর আচার্য্য-পদ গ্রহণের কথা মনে পড়ে। শেষোক্তের পুত্রগণ বোধ হয় এখনো

নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বেহালার ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা করে চলেছেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজও তথৈবচ। অন্য শাখার কথা জানি নে।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে, সত্যের দিকে চেয়ে বলতেই হবে যে, তাঁর নিজ বাসভূমি কলকাতায় মহর্ষির সেই প্রাণপ্রিয় ব্রাহ্মসমাজের এখন মুমূর্ষু অবস্থা; তাঁর বাড়ীর একমাত্র সাম্বৎসরিক উৎসব মাঘোৎসবও কোন রকমে কায়ক্লেশে সমাধা হয়। এই অধোগতির কারণ কি?

বৈষয়িক অবস্থার হেরফের একটা কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। আমার মনে হয়, তাঁর উপযুক্ত চার পুত্র যে কলকাতার বাস ও পৈতৃক বাসভবন ত্যাগ করে, দুই ভাই রাঁচিতে এবং দুই ভাই শান্তিনিকেতনে বাস করতে চলে গেলেন তাতে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর, তথা আদি সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। পরামর্শপূর্ব্বক ভক্তিভরে যে পৈতৃক অনুষ্ঠান রক্ষা করবেন, সে সুযোগ তাঁদেরও রইল না, নাতিদেরও রইল না; বাইরের লোকদেরও এখানে সম্মিলিত হবার আকর্ষণ চলে গেল।

তা ছাড়া কালের গতিও ক্রমশঃ বদলে গেল। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মপালন অপেক্ষা সামাজিক কর্ম্মসাধনের প্রতিই আধুনিক শিক্ষিত লোকের মন বেশী আকৃষ্ট হ'ল। ভক্তিযোগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই এই দুঃখময় পৃথিবীর উন্নতির উৎকৃষ্টতর পন্থা বলে সাব্যস্ত হ'ল। যদিও দুটিই একসঙ্গে না চলবার কোন সঙ্গত কারণ দেখতে পাওয়া যায় না; বরং ধর্ম্মের প্রেরণা না থাকলে কর্ম্মের প্ররোচনা যথেষ্ট থাকে না, অন্যান্য সমাজে ত দেখা যায়। তবে?—

আদি সমাজের প্রকৃত দুর্ব্বলতা, আমার মনে হয়, অন্যত্র খুঁজতে হবে। 'সমাজ' বললেই ঐক্যবদ্ধ একটি গোষ্ঠী বোঝায়। শুধু নিজের আত্মার মুক্তি যদি কাম্য হয়, কেবল ভগবানের সঙ্গে আমার আত্মার মিলনই যদি জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে সংসারাশ্রম ছেড়ে বনে গিয়ে সাধনা করাই ত ভাল, যেমন আগেকার ঋষিমুনিরা করতেন শোনা যায়। কিন্তু ধর্ম্মের একটা সামাজিক অংশ আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজ তাঁদের নিজ সম্প্রদায়কে ধর্ম্মবিশ্বাস ছাড়া কতকগুলি সামাজিক অনুশাসনে আবদ্ধ রাখেন, কতকগুলি অনুষ্ঠান মেনে চলেন বলে' তাঁদের একতা ও বল থাকে।

কিন্তু মহর্ষি করলেন কি?—ধর্ম্মের দিক থেকে তিনি হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র গোমুখীতে গিয়ে বেদ উপনিষদের সুন্দর মহান্ শ্লোক আহরণ করে একটি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচলন করলেন, তার দুই খণ্ডে ধর্ম্ম এবং নীতির উপদেশ সন্নিবিষ্ট হ'ল। তাঁর একান্ত আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ ছিল, পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তিপূজা ও সাম্প্রদায়িক নানাপ্রকার আচার অনুষ্ঠানে ভারাক্রান্ত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং নিরাকার পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ উপাসনা ভারতবর্ষে প্রচার করা। "সবে মিলি তব সত্যধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।" সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত বেদমন্ত্র পাঠ, উচ্চাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত গান, ভগবদ্ভক্তি প্রণোদিত সাহিত্য-রসাত্মক ব্যাখ্যান প্রদান, আলোচনা-সভা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যত রকম সদুপায় সম্ভব তা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক দিক থেকে তাঁর তেমনি গভীর ও একাগ্র কামনা ছিল যে, এই ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটি শাখা বলে গণ্য হবে; স্বতন্ত্র একটি ধর্ম্ম বলে নয়। যে জন্য কেবল ব্রাহ্মণকে বেদীতে বসানো নিয়ে কেশববাবুর সঙ্গে গোল বাধল; যে জন্য 'Civil Marriage Act'-কে তিনি কিছুতেই Brahmo Marriage Act বলতে রাজী হলেন না; যে জন্য তাঁর সঙ্কলিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে তিনি হিন্দুসমাজের দশ সংস্কারের আসল বিচার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করলেন, এক মূর্তিপূজা এবং হোম ছাড়া। হিন্দুধর্ম্মের যে প্রধান ভিত্তি জাতিভেদ, তাও তিনি সংস্কার বশতঃই হোক্ বা হিন্দুত্বের খাতিরেই হোক সম্পূর্ণ বজায় রাখলেন। কিন্তু 'যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর।' হিন্দুধর্ম্মকে এত প্রশ্রয় দিয়েও তিনি তার মন পেলেন না। কারণ ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে যাই হোক, বাংলাদেশে শালগ্রাম শিলা নইলে চলে না, সংস্কারের কথা বাদ দিলেও বোধ হয় আইনসিদ্ধ হয় না। হোম সম্বন্ধেও তাই শুনেছি।

ফলে দাঁড়াল এই যে, এক দিকে আদি ব্রাহ্মসমাজকে যেমন হিন্দুসমাজও দলে নিল না, অপর দিকে অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজও, অন্ততঃ সামাজিক ক্ষেত্রে, তার সঙ্গে পুরোপুরি মিশ খেতে পারল না, ঐ অত্যধিক হিন্দুয়ানি-ঘেঁষা বলে। একে ত পিরালী বলে, ব্রাহ্ম হবার আগে থেকেই আমরা হিন্দুসমাজে ঠেকা হয়ে ছিলুম; তবু পিরালী দলটা ত ছিল। তার উপর ব্রাহ্ম হওয়ার পরে সে দল থেকেও ভ্রষ্ট হয়ে সত্যই একঘরে হয়ে পড়লুম। অথচ ছেলেমেয়ের বিয়ে ত দিতে হবে?—যতদিন মহর্ষি ছিলেন, তাঁর অর্থবল এবং চারিত্রবলে তিনি ঘরজামাই রেখে, কুলীনের ঘর ভাঙিয়ে নিজ পরিবারে নিজ মত সমর্থন করেছেন। যে দুই একটি ক্ষেত্রে তিনি থাকতেই তাঁর পরিবারে সে নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে সেখানে তাঁর অমোঘ দণ্ড কি কঠিন ভাবে অপরাধীর উপর পড়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেবার স্থান এ না হলেও পূর্ব্বেই বলেছি, আদি সমাজের সামাজিক ইতিবৃত্তের সঙ্গে মহর্ষির পরিবার অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। এও বলব যে,

যে-স্থলে তাঁর বোঝাপড়িতে কোন স্বার্থের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল না, সেখানেও তাঁর প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-ভক্তি বশতঃ তাঁর সন্তানগণ তাঁর অমতে কাজ করতে বিরত হতেন। মজা এই যে, যেখানে কোন বিশিষ্ট হিন্দুসমাজের বংশধরকে এঁরা স্বপরিবারভুক্ত করে সমাজচ্যুত করতেন, সেখানে তাঁদের কর্তৃপক্ষ অভিশাপ দিয়েছেন তাও যেমন শুনেছি; আবার মহর্ষির পরিবারের কেউ তাঁর নিয়মভঙ্গ করলে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন তাও শুনেছি। কোন্ দিকে মানুষ যায়?

এ রকম করে বেশী দিন চলতে পারে না বলা বাহুল্য। শাস্ত্রে বলে—ধর্মের পথ ক্ষুরধারের ন্যায় নিশিত, তার উপর সংসারের সঙ্কট-পথে যদি অতি সন্তর্পণে দুই দিক বাঁচিয়ে লহমন ঝোলার ওপর দিয়ে চলতে হয় ত বেশী দিন বেশী লোকে পারে না। বিশেষতঃ এখন আগের মত সমাজ-চ্যুতির শাস্তি যখন প্রায় কিছুই ভোগ করতে হয় না, পরকালে নরক-ভোগের ভয়টাও নেই বললেই হয়। ফলে মহর্ষির অবর্তমানে তাঁর বংশের কেউ কেউ বিবাহাদিসূত্রে হিন্দুসমাজভুক্ত হয়ে পড়লেন। অপর কেউ কেউ অপেক্ষাকৃত যুক্তিবাদী, উদার কালোপযোগী ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেন। আমার মনে আছে একবার স্বনামধন্য সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, বোধ হয় এঁদের বংশের সঙ্গে স্বীয় বংশানুগত সৌহার্দ্য-বশতঃ আদি ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষিত হতে চেয়েছিলেন; কিন্তু যখন বিবাহ সম্বন্ধে জাতিভেদরক্ষাদি কড়াক্কড় নিয়মের কথা শুনলেন, তখন নাকি ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন না এই ভয়ে পিছিয়ে গেলেন। এই একটি ঘটনা থেকেই আমার প্রতিপাদ্য বিষয় পরিস্ফুট হবে।

আর একটি দিকে ভয়ে ভয়ে ইঙ্গিত মাত্র করেই সামাজিক অভিযোগের পালা শেষ করব। আদি-ব্রাহ্মধর্ম জ্ঞানের ধর্ম। তার সংস্কৃত শ্লোকের গাম্ভীর্য্য স্বীকার্য্য হলেও, তার অর্থবোধে সৌকর্য্যের অভাব, দুঃখে-শোকে সান্ত্বনার অভাব, পূজার আয়োজনে ব্যাপৃত থাকার ব্যবস্থার অভাব। আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি নে, কারণ এই ধর্মেই আমরা মানুষ। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষ থেকে অনুমানে বলছি যে মানুষে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে একটা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, একটা কিছু ধরবার ছোঁবার মত চায়; সেবা করবার মত, নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দেবার মত একজন কাউকে পেলে ত কথাই নেই। যে জন্য গুরুবাদ শত দোষ সত্ত্বেও এদেশে এত প্রচলিত। হিমালয়ের উচ্চ গিরিশিখরে সকলে স্বস্তিপূর্ব্বক নিঃশ্বাস নিতে পারে না।

আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের কতকটা সগোত্র হলেও কেন আরও ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করল না, এবং মহর্ষির নিজের পরিবারেও কেন ১০০ বৎসর যেতে না যেতে শিথিলমূল হয়ে পড়ল, তার কারণ সাধ্যমত দেখাবার চেষ্টা করেছি। লোকে বলতে পারে, কতকগুলি অনুরূপ কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও নববিধান সমাজ ত আজও সুসম্বদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ কথার সত্যতা যাচাই করবার সুবিধা আপাততঃ না থাকলেও, মেনে নিয়ে বলছি যে, সত্যই মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের মেয়েরা পিতৃভক্তির চূড়ান্ত দেখিয়েছেন, এবং আমাদের বাড়ীর মেয়েরা তাঁদের তুলনায় আদি সমাজের জন্য কিছুই করেন নি। কারণ বা অজুহাত দেখাতে গেলে বলা যেতে পারে অবশ্য যে, তাঁদের মধ্যে একাধিক মহারাণী বিদ্যমান ছিলেন এবং অনেকগুলি সহোদর ভাইবোন একত্র থাকায় লোকবল, অর্থবল, ঐক্যবল তাঁদের মধ্যে স্বভাবতঃই সহজপ্রাপ্য ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত জাতিভেদাদির বাধাও ছিল না। কিন্তু কারণ যাই থাকুক নিজেদের অক্ষমতা ও ত্রুটি অকপটে স্বীকার করাই ভাল।

পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের কথা এখানে তুললুম না। যেমন তিনি একাই একশ' বা ততোধিক ছিলেন, তেমনি তিনি নিজেই বলতেন শুনেছি যে, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ে তিনি নিজেকে আবদ্ধ মনে করেন না। বলতে গেলে তিনি একাই একটি সমাজ ছিলেন, এবং তাঁর প্রকৃত ধর্মমত কি ছিল তা নিয়ে এখনো বাদানুবাদ চলছে। শান্তিনিকেতনে তিনি মূলতঃ আদি ব্রাহ্মসমাজেরই উপাসনা-পদ্ধতি বহাল রেখেছেন, তবে অনেকদিন থেকেই কাজে দেখিয়েছেন যে, যোগ্য ব্যক্তি হলে ব্রাহ্মণেতর আচার্য্যও বেদীতে অবশ্যই বসবেন। এমন কি ভিন্ন জাতির বরকন্যার বিবাহে আদি সমাজ-পদ্ধতিতে নিজে পৌরোহিত্য করে তার হিন্দুত্বের (তথা আইনের?) মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। অতএব তাঁর কথা থাক। অতঃপর শেষ কথা ওঠে এই যে, মহর্ষির মুষ্টিমেয় বংশধরদের মধ্যে এখনো যাঁদের—হয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কিংবা নিজেদের পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ—আদি সমাজের মতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবার ইচ্ছে বা অভিপ্রায় আছে, তাঁদের সেই সমাজের প্রতি কিছু কর্ত্তব্য আছে কি না, এবং কিংকর্ত্তব্য?*

---

* ভবানীপুর, ব্রাহ্মসমাজের নব-নবতিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত।

সালতামামি

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অধ গরীবের ঘরে। এক পয়সার মুড়ি মুড়কি খেয়ে এক বেলা কাটিয়ে দিয়েছে অনায়াসে। জ্ঞান হওয়া মাত্র দারিদ্র্য কি বড় হৃদয়ঙ্গম করেছে। খিদের চোটে সারারাত্রি ঘুম হয় নি—অথচ মুখ ফুটে বলে নি সে কথা। বড় হয়ে চাকরি পেয়েও সেকথা ভোলে নি। ভোলে নি প্রতিবেশীদের দয়ার অবহেলা, অর্থ না থাকার অসম্মান।

চাকরি পাওয়ার বছরখানেক বাদে বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। অশৌচ পালন এবং শ্রাদ্ধ-শান্তির আয়োজন করতেই হ'ল।

মা বললেন, তুই একমাত্র ছেলে—উপার্জ্জন করছিস, একটা ঘোড়শ কর।

না, তিল-কাঞ্চন শ্রাদ্ধ করব। গম্ভীর ভাবে অটল উত্তর দিলে।

সে কি রে—নিজের পক্ষে অন্ন-জল-বস্ত্র না করলে—

নিন্দে হবে? হোক। পরের দুয়োরে হাত পেতে ধর্ম্ম বজায় রাখা—সে আমার দ্বারা হবে না।

হ'লও তাই। পড়শীরা বললে, অটল টাকা চিনেছে খুব।

অটল মনে মনে হেসে বললে, আর তোমাদেরও চিনেছি। টাকা না থাকলে তোমরা ত দিশায় বপন।

সামাজিক ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য না করে ও লক্ষ্মীকে অকুণ্ঠ আহ্বান জানালে। লক্ষ্মী তাঁর সোনার ঝাঁপি নিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন হিসাবের খাতায়—ব্যাঙ্কের খাতায়। সে ঐশ্বর্য্য দিন দিন সঞ্চিত হতে লাগল। ব্যাঙ্কের খাতাখানি যত্ন করে তুলে রাখলে ক্যাশ বাক্সে। প্রত্যহ শোবার আগে বাক্স খুলে খাতাখানি বার করে তার পাতা ওল্টায় অটল—সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব করে। দুই থেকে তিন, তার থেকে চার-পাঁচ সংখ্যায় রূপান্তর হতে থাকে। প্রতিবেশীদের কার কত ঐশ্বর্য্য সেই সঙ্গে হিসাব করতে থাকে অটল। পৃথিবীতে প্রতিযোগিতা না থাকলে জীবন ধারণের কোন অর্থই বুঝি পরিস্ফুট হ'ত না, জীবন স্বাদে গন্ধে অপরূপ হয়ে উঠত না।

কিন্তু শুধু লক্ষ্মীর ধ্যান করে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেওয়া চলে না। পৃথিবীতে সকল যেমন আনন্দের—তা ছাড়া আনন্দ সঞ্চয়েরও বহু পন্থা রয়েছে। মনের ক্ষুধাকে এক পাশে ঠেলে ফেলাও দুষ্কর। মনের ক্ষুধাকে সর্ব্বক্ষণ অর্থসঞ্চয়ের নেশায় আচ্ছন্ন করে রাখা যায় না। প্রকৃতি তার প্রাপ্য পাওনা আদায় না করে ছাড়বে কেন?

মা অনেক দিন থেকে অনুযোগ করছেন, আর কত দিন সংসার ঠেলব?

তখনও চায়ের অঙ্ক পাঁচে ওঠে নি—তাঁর অনুযোগের গুরুত্ব অনুভব করে নি অটল। তার পর এক দিন বুঝলে—বাইরের লোক দিয়ে সংসার চালালেও—সংসার ত ভাল ভাবে চলেই না—অর্থের ক্ষয় অথবা অপব্যয়। টাকা দিয়ে সম্পর্ক পাতালে টাকার মতই তা শুকনো খস্ খসে হবে—যদিও ওর ঝঙ্কারটা মধুর—এবং ব্যাঙ্কের খাতায় অঙ্ক বৃদ্ধি করলে হয় মধুরতর। তা ছাড়া নিজের দিক দিয়েও কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। আপিস থেকে এসে আর ময়লা বিশৃঙ্খল বিছানায় বসে শ্রান্তি দূর করতে কেমন বিরক্তি বোধ হয়। আলো জ্বালা, চা তৈরী করা, কুঁজোর জল ভরা—এটা ওটা আরও অনেক কাজ—বুড়ো মা একা আর কতই বা করবেন।

অটল মাকে বললে, তা তোমাদের যা খুশী করগে বাপু—আমি কিন্তু বেশী খরচ-টরচ করতে পারব না।

শোন কথা! মা পুলকিত হয়ে বললেন, খরচ—আমরা করব কেন—যাদের কন্যাদায় সে ভার তাদের।

সম্বন্ধ আসতে লাগল। চলতে লাগল মেয়ে দেখা। কিন্তু কোন মেয়ে আর পছন্দ হয় না অটলের। রূপোর সুরে মন বাঁধা থাকলেও রূপের জলুস ওর কল্পনাকে কতকটা রঙীন করে রেখেছে বইকি। দৃষ্টির দর্পণে যে সব প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে—তাহা কল্পনার সঙ্গে মেলে না, সম্বন্ধ ভেঙে যায়।

মা ভেবেছিলেন—অর্থ অন্ত প্রাণ ছেলের—পাওনার পাল্লাটা ঝুঁকলেই কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে যাবে—কিন্তু ব্যাপার দেখে বুঝলেন—তা হবার নয়। বুঝে হতাশ হয়ে একদিন বললেন, বুঝেছি—আমার কপালে বৌয়ের সেবা খাওয়া নেই। আমি আর সংসারে থাকব না—আমায় তীর্থে দিয়ে চ।

প্রথমটা মায়ের অভিমান বলে ধরে নিয়েছিল অটল। ক্রমে বুঝলে—তার সঙ্গে সঙ্কল্পের বেশ যোগ আছে। মা জিদ ধরেছেন—তীর্থে যাবেনই। তাঁর অভিমান ভাঙাবার মত সম্বল থাকলেও ইচ্ছা নাই অটলের। এখনও মেয়ের বাপেরা দু'বেলা ধর্ণা দিচ্ছেন বাড়ীতে। কত অনুনয়—প্রলোভন—ক্ষোভ—কাকুতি—ধর্ম্মনীতি আর মনুষ্যত্বের দোহাই যে চলছে তার ইয়ত্তা নাই। ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পরিবেশ—অশান্ত হয়ে উঠছে মন। অটলও এক দিন বললে মাকে, সেই ভাল—চল দু'জনে তীর্থে বেরিয়ে পড়ি।

মা বললেন, আমি আর ফিরব না। হয় কাশী—না হয় বৃন্দাবন—যেখানে ভাল লাগবে সেইখানে থাকব।

অটল বললে, চল ত—আগে বেরিয়ে পড়ি—তারপর যা খুশী তোমায় করবে।

একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের জিম্মায় মালপত্র রেখে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল বাইরে।

মন্দ কি বাইরেটা! ঘরের বাঁধন পথের মাঝে রইল না, তবু পথকে ভাল লাগছে। রেল-লাইনের দু'ধারে মাঠের প্রসার যেমন অদ্ভুত—ট্রেনের গতিবেগে প্রকৃতিও তেমনি প্রাণময়ী হয়ে উঠছে। দু'ধারের গাছপালা ছোটে—আকাশের তারা ছোটে—চন্দ্র সূর্য্য ঘুরে ঘুরে যায়—নদী দ্রুত সরে যায় পায়ের তলা দিয়ে—বিদীর্ণ হয় পাহাড়ের প্রাচীর—ছোট ষ্টেশনগুলো গাড়ী চলার বেগে কাঁপতে থাকে—বড় ষ্টেশনগুলো বহু আলোর আঙুল বাড়িয়ে নিকটে আসার সঙ্কেত করে। একঘেয়ে জীবনে গতি এনে দিল বৈচিত্র্য—ট্রেনের দু'পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল যে প্রকৃতির টুকরো—তা সত্যই অদ্ভুত। তাজা মন নিয়ে ওরা কাশীধামে পৌছল।

মা বললেন, অনেক দিন আগে একবার এসেছিলাম কাশী—কাকীমা যেন দেবনাথপুরায় থাকতেন। বাড়ীটা দেখলে চিনতে পারি।

বাড়ীটা বার করা কঠিন হ'ল না—কিন্তু কাকীমা নেই। বছর কয়েক আগে তিনি কাশীলাভ করেছেন। যে বর্ষীয়সী তাঁর ঘরখানি দখল করে ছিলেন—তিনি সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, থাকুন মা এইখানে—ওই পাশের ঘরটা ত খালিই রয়েছে। আপনি যখন জানা চেনা লোক—আপনার কাছে কি আর বেশী ভাড়া নেওয়া ভাল দেখায়, হ'ত যদি বেগানা ষ'ণ্ডা ত কথা ছিল।

হাঁ—কল জলের একটু অসুবিধা। আরও অসুবিধে কিছু হবে হয়ত—এক বাড়ীতে পরের ঘর ত। কিন্তু তাও বলি—বাবা বিশ্বনাথের ছিচরণে একটু কষ্ট করে পড়ে থাকবার ক্ষ্যামতা যদি না জোগায় ত পরকালের গতি কি হবে। স্নান ত গঙ্গায়—পূজো-আহ্নিক সব সেইখানে। বাবার মাথায় ফুল জল ঢেলে কতটুকুই বা বাড়ীতে থাকা। রাঁধা আর খাওয়া—আর রাত্তিরে একটু চোখ বুজে শোওয়া। তা না হলে ষ'ণ্ডা বল, কথকতা বল, কেত্তন বল—কি না হচ্ছে দশাশ্বমেধ ঘাটে। অমন জুড়োবার জায়গা আর আছে দুনিয়াতে? যতক্ষণ বসে থাকবে, মনে হবে—কৈলাসে রয়েছি।

কাশীর মাহাত্ম্য যতই থাক—নীচের তলাটা ভারি স্যাঁত-সেঁতে আর অন্ধকার। এমন অন্ধকার যে দিনের বেলায় কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়ে রাখলে তবে কার সঙ্গে কথা কইছি বুঝতে পারা যায়। গ্রীষ্মকালে এই নীচের তলাটায় প্রাণ-জুড়োন ঠাণ্ডা।

কথাটা মিথ্যা নয়। দুপুরে দোতলা তিন তলার বাসিন্দারা নেমে আসেন, ঘরের কোলে চওড়া বারান্দায় বসে মজলিস। হেন কথা নেই পৃথিবীতে যা সে মজলিসে আলোচিত না হয়। যে বিষয়েই আলোচনা হোক—একটি মূল বস্তুতে সেটি ঘুরে ফিরে আসে।

ওমা, এখনও বিয়ে হয় নি মেয়ের। সম্বন্ধ টম্বন্ধ দেখছ ত ভাল করে? পুরুষদের ওই রকম এলোকাড়ি কাজ! তা ভাই—টাকার খাঁই আর কার কম বল? মেয়ে সুন্দরী হলে—তবু ওরই মধ্যে একটু—

না দিদি, মেয়ের রূপ গুণ কোনটাই কেউ দেখে না—টাকাটাই আসল। না হলে দেখ না—আমাদের অমিতার আজও আইবুড়ো নাম ঘুচল না।

তা ভাই—সত্যি কথা বলতে কি—কাশীতে ক'টি বাঙালী আছে! বিয়ে থাওয়া দিতে হলে—মেয়েকে বাংলাদেশে মাসী পিসির বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল।

কোন্ মেয়েটি গো? অটলের মা শুধোলেন।

ওই যে কোণে বসে পান সাজছে। অন্ধকার ঘর—তবু ঘর আলো করে আছে। কিন্তু কথায় বলে না—অতি বড় সুন্দরী না পায় বর—এও হয়েছে তাই।

এ দিকে এসো ত মেয়ে।

আয় না লো অমিতা—সরে আয়। প্রণাম কর দিদিকে। মাসী হন ইনি। পান খান ত দিদি? দে একটা পান দে। দোক্তা?

এমনি করে আলাপ জমল এবং দু'পক্ষের কুল-পরিচয় দু'পক্ষ সংগ্রহ করলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

অমিতার মা খপ করে অটলের মায়ের হাতখানি ধরে বললে, তুমি দিদি—আমার কত দায় থেকে উদ্ধার কর না কেন? বাবা বিশ্বনাথই তোমায় পাঠিয়েছেন।

অটলের মা সখেদে বললেন, অনেক দিন থেকে মনে ত ইচ্ছে অমনি কচিকে টুকটুকে বউ একটি ঘরে আনি। কিন্তু ছেলের যে ধনুকভাঙা পণ!

ধনুক-ভাঙা পণের বৃত্তান্ত শুনে অমিতার মা বললেন, একবার দেখুক না মেয়েটাকে। পছন্দ না হয়—বুঝব মেয়ের অদৃষ্ট!

আচ্ছা—কাল দশাশ্বমেধে বেড়াতে যাব বিকেলে—মেয়েকে যদি নিয়ে যাও—

তার আগেই সুযোগ ঘটল। সেই রাত্রিতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন অটলের মা। সকালে ডাক্তার ডাকতে হ'ল। ডাক্তার বললে, ঘরটা বড় ড্যাম্প—পারেন ত রোগীকে ভাল ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। আর শুশ্রূষাও দরকার।

দুটি জিনিসেরই অভাব। অটল স্থির করলে মাকে হাসপাতালে দেবে।

অমিতার মা বললেন, সেকি বাবা—আমরা থাকতে দিদি

কেন হাসপাতালে যাবেন ? ঘর বদলাবার ব্যবস্থা করছি—সেবার ভারও আমাদের।

অমিয়াদের দোতলার ঘরে উঠে আসতে হ'ল। সেবার ভারও ছেড়ে দিতে হ'ল ওঁদের উপর। না দিয়েই বা করবে কি অটল। সে বড় জোর ছুটোছুটি করে ডাক্তার ডাকতে পারে—ওষুধ পথ্য যোগাড় করতে পারে। ওষুধ খাওয়ান—ফলের রস তৈরী করে দেওয়া সেটাও যদি বা সম্ভব হয়—প্রহরে প্রহরে হাওয়া করা—গা হাত টিপে দেওয়া—বিছানা বদলান—দু'বেলা রান্না—এ সব করে কে।

সব ভার নিলে অমিয়া, বললে, সকুন আপনি—আমরা করছি সব। করলেও পরিপাটি করে। বাইরের অনাত্মীয় মানুষকে এমন মমতা ঢেলে শুশ্রূষা করতে কখনও দেখেনি অটল। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। শুধু কি সেবাই দেখলে ? সেবার পিছনে ফুটে উঠল যে রূপ—তা যেন দেহের বৃন্তে কোমল কামিনী ফুলের মতই শোভা সৌরভে অতুলনীয়। এই রূপই কি এতদিন কল্পনার আকাশে সপ্তবর্ণ বিস্তার করে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল ক্রমশ: ?

আপনি শুয়ে পড়ুন—আমি দেখছি।

এর উপর অগাধ বিশ্বাস আর নির্ভরতা রাখা চলে।

আসুন—খাবেন।

সেবাতেও অতুলনীয়া।

ভয় কি—সেরে উঠবেন না।

আশ্বাসদায়িনী—অভয়া।

কল্পনা বাস্তবে মিশে গেল।

মা সুস্থ হয়ে উঠলেন। মেয়েটিকে যথারীতি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে দেশে ফিরল অটল।

তার পর ? তার পর বাস্তব অবশ্য কল্পনাতে ফিরে যায় নি। ফিরে যাবও না তা। সংসারে রৌদ্র যখন চড়ে—তীক্ষ্ণ মধুর তাপে দিক হয় দুর্নিবার, দৃষ্টির প্রসার যায় কমে। অমিয়া আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। কল্পনাকে মুছে দিয়ে ও হয়ে উঠল প্রখর।

বললে, জানালাতে একটিও পর্দা নেই কেন ? এতদিন যা করেছ—করেছ—এখন এ বাড়ীর আব্রু রাখতে হবে।

কথার সুরটা কেমন কেমন—তবু অটল দ্বিধা বোধ করলে না ওর অনুরোধ রাখতে।

আর এক দিন অমিয়া বললে, বৈঠকখানা ঘরটি অমন খা-খা হয়ে পড়ে আছে কেন ? পাঁচ জন বাইরের লোক আসেন কি মনে করেন বল ত ?

অটল অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে অমিয়া হেসে বললে, আচ্ছা—ব্যবস্থা যা করবার আমি করছি—একটা ফর্দ তৈরী করে দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে খাতা পেনসিল নিয়ে বসলে অমিয়া। একটা গোলমত টেবিল—আর চারখানা চেয়ার, বইয়ের র‍্যাক, একটা আলমারী, খান আষ্টেক মাঝারি গোছের ছবি। এই রবীন্দ্রনাথ—বিবেকানন্দ প্রভৃতির। একটা ভাল দেওয়াল-আয়না—জানালার দু'পাশে দুটো ব্র্যাকেট—আর জামাকাপড় টাঙাবার জন্য একটা দেওয়াল-আলনা। ইচ্ছে হলে একখানি ইজি চেয়ারও রাখতে পারা যায়। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বসে যাদের পিঠ টন্ টন্ করলে—খানিকটা গড়িয়ে পড় তাতে।

অটল ফর্দের উপর চোখ বুলিয়ে গম্ভীর হ'ল।

কি, কথা কইছ না যে ?

চার পাঁচশোর ধাক্কা—দু'মাসের মাইনেতেও কুলোবে না। নীরস কণ্ঠে জবাব দিলে অটল।

সবই কি মাইনের টাকা থেকে করাতে বলছি ?

তা ছাড়া ত পরের দুয়োরে হাত পাততে হয়। তেমনি নীরস কণ্ঠের উত্তর।

মামই বা করবে কেন ? বলতে বলতে অমিয়াও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। অভিমানও হ'ল। ধার ছাড়াও যে উপায় আছে—সেটি মনে মনে জানে অমিয়া—কিন্তু মুখে বলা কত না কঠিন। সামান্য দিনই হ'ল সে এ বাড়ীতে এসেছে। এ বাড়ীর ব্যয়কুণ্ঠ মানুষের পরিচয়ও সামান্য পেয়েছে। সেই সঙ্গে তার কেমন ধারণা হয়েছে—অভাবের কষ্ট এখানে থাকতেই পারে না। এখানে লক্ষ্মীর আসনখানি পাতা আছে। কোথায় পাতা আছে সেটুকু শুধু বুঝতে পারে নি।

ওর কুণ্ঠা বুঝলে অটল। গলার স্বর যথাসম্ভব কোমল করে বললে, বৈঠকখানা নিয়ে মাথা ঘামিও না—আমার বন্ধু-বান্ধবরা ছেলেবেলা থেকেই জানে আমাকে—এ বাড়ীর প্রত্যেকটি জায়গা বা জিনিষ ওদের নখদর্পণে।

অমিয়া আর কথা কইলে না।

ওর সহসা নীরব হয়ে যাওয়ার ব্যথাটা ঠিক বুঝলে না অটল, তবু মনে হ'ল সুর যেন কোথায় কেটে গেল। মনকে প্রবোধ দিলে—দু'দিন যাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু গম্ভীর হয়েই রইল অমিয়া—আর কোন নূতন অনুরোধ নিয়ে অশান্তি বাড়ালে না।

রাত্রিতে অমিয়া তখন খেতে বসেছে—শোবার ঘরে দুয়োর বন্ধ করে ব্যাঙ্কের খাতাখানি খুললে অটল। খাতা খুলেই চমকে উঠল। ইস্—দুটি মাসে মোটেই অঙ্কপাত হয় নি তাতে। যা উপার্জন করেছে—ব্যয় হয়েছে সেই পরিমাণে। এ ভাবে যদি মাসের পর মাস চলতে থাকে—চঞ্চলাকে রাখা যাবে কি অচঞ্চলা করে ? না, আরও শক্ত হতে হবে।

এবার অনুরোধ এল অন্য দিক থেকে। মা বললেন, হাঁ রে অটল, বৌমাকে কি একখানা ক্যাটকেটে লাল পাড়

শাড়ী কিনে দিয়েছিস? মেয়েমানুষ বউ—কোথায় রঙীন মেয়াদায় বাপড় কিনে দিবি—তা না—

ওই শাড়ীই ত তোমার বউ পছন্দ করলে।

আর তোর পছন্দ নেই বুঝি? আ আমার কপাল!

অগত্যা আজকালকার সিনেমা-পন্থী একখানা রঙীন শাড়ী কিনে আনতে হ'ল। রাত্রিতে প্যাকেটটা অমিয়ার হাতে দিয়ে বললে, দেখ দেখি—পছন্দ হয়?

শাড়ীখানা লোভনীয় বটে—খুসীতে অমিয়ার দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তবু সে তাব যথাসাধ্য দমন করে ও বললে, মন্দ কি!

তা হলে তোমার ভাল পছন্দ হয় নি বল?

পছন্দ হবে না কেন। তবে ওবাড়ীর মামাদির পরণে যে শাড়ীখানা দেখলাম পরশু, সেটা লেটেষ্ট ডিজাইনের। ফরসা মানুষ কিনা—মানিয়েছে খাসা।

অটল চুপ করে রইল। ফরসা মানুষকে যে শাড়ী চমৎকার মানায়—তা নিয়ে বেশী আলোচনা করা নিরাপদ নয়। অমিয়ার গায়ের রঙ একটু ময়লা হলেও বা ও প্রসঙ্গে আলোচনা দীর্ঘ করা সম্ভব হ'ত। অমিয়ার বুদ্ধিটা যদি আর একটু প্রখর হ'ত!

কিন্তু অমিয়া একেবারে নির্ব্বোধ নয়—তা শাড়ীখানা খাটের উপরে রাখার ধরণে অটল বুঝলে। একখানি রঙীন শাড়ী এনে যে বউকে কৃতজ্ঞ করে দেবে—সে বুঝি দুরাশাই—এ যুগে! একখানা শাড়ী যদি নিজের পছন্দে আনা যায়—আর দুখানা বউয়ের পছন্দে—এনে দিলে ক্ষতি কি! বরং এইটিই ত চিরকালের রীতি। প্রিয়কে ভালবাসা জানাবার এমন সহজ ও সুষ্ঠু প্রথা যে সর্ব্ব যুগেরই।

যাই হোক—এ ক্ষেত্রেও সুর কেটে গেল—মনে মনে আহত হ'ল দু'জনেই।

মাসের শেষে অমিয়ার হঠাৎ জ্বর হ'ল। উপবাস ও ঘরের হোমিওতে রোগ কমল না—বাইরে থেকে ডাক্তার আনাতে হ'ল। ডাক্তারে আর পথ্যে যা ব্যয় হ'ল—তা অটলের প্রায় এক মাসের মাইনে। এতে আর কার মেজাজ কোমল থাকে?

তাই মা যখন বললেন, ডাক্তারবাবু বলেছেন—বউমার দিনকতক হাওয়া বদলান দরকার—অটল তখন রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিলে, আমরা যদি হাওয়া খেয়ে কাটাতে পারি—তবেই ওকে পেট ভরে হাওয়া খাওয়ান চলবে। কোথায় যেতে হবে শুনি? বাঙ্গালোর—না কাশ্মীর?

তোর বাপু সবেতেই ভিতি বিরক্ত ভাব। কেন, কাশীতে বউমার বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া যায় না?

তাই দিয়ো।

তোকেই ত রেখে আসতে হয়।

আমি পারব না—তুই রেখে না আসিলে।

ছুটি কিন্তু নিতেই হ'ল। ক্রমাগত ডাক্তার ডাকা—মোটা রকম কীন আর পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা—এখানে থাকলেও নিস্তার নাই। তার চেয়ে কিছু খরচ করে যদি রেখেই আসা যায়।

চল তোমায় রেখেই আসি।

না, আমি এখানেই থাকব।

ঠ্যালা সামলাবে কে শুনি? ওসব মতলব ছাড়।

না—আমি যাব না। অমিয়া ঈষৎ ঝাঁজের সঙ্গে জবাব দিলে। কোন্ মুখে মার কাছে গিয়ে দাঁড়াব! বিয়ে হয়ে অবধি একখানা দশি দিয়ে মা'র মান রাখতে পেরেছি? পূজোতে একখানা শুধু বস্ত্র দিয়ে প্রণাম করার সৌভাগ্য হ'ল না— কোন মুখে যাব তাঁর সেবা নিতে?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল অমিয়া। রোগা শরীরে এত কান্না ভাল নয়। কালই হয় ত জ্বর উঠবে—ডাক্তার ডাকতে হবে।

অমিয়ার মাথায় হাত রেখে কোমল স্বরে বললে অটল, ছিঃ—আবার কাঁদে! নাও উঠে বস—কালই একখানা নটকার ধুতি কিনে আনব—সত্যি বলছি···

মাসের শেষে ব্যাঙ্কের খাতাখানি বার করলে অটল। না—আর কোন আশা নাই। লক্ষ্মী যে পথে প্রবেশ করেন সেই পরিচিত পথটি চিরদিনের জন্যই বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।

তার পর কাশী থেকে স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে ফিরে এল অমিয়া। ওর নিটোল গলায় নূতন ধরণের হার উঠল—ওর কর-প্রকোষ্ঠ অলঙ্কৃত হ'ল রুকচুড়া আর্মলেটে। শাড়ী এল কয়েকখানা। অলঙ্কার ও শাড়ীতে সুপ্রসাধিতা হয়ে অমিয়া যেন প্রফুল্ল সরোবরে পদ্মের মত ফুটে উঠল।

অটল চেয়ে চেয়ে দেখে—কথা বলে না। মনটা হু—হু করে ওঠে। কি যেন হাতের মুঠো থেকে খসে গেল—কারা যেন চক্রান্ত করে ওকে কতুর করে দিচ্ছে। নিরুপায় ক্রোধে ও জ্বলতে থাকে এবং অত্যন্ত ভালমানুষের মতই সব সহ্য করে যায়।

এক দিন শরীরটা খারাপ হওয়ায় বাড়ী ফিরে এল সে। ট্রাম থেকে নেমে মোড় ঘুরতে যায় দেখা পেলে···দেখা না পেলেই ও সুখী হ'ত। কিন্তু দৈব বিড়ম্বনা!

পথের মাঝে কোন কথাই হ'ল না—ঔপাকে একটি অলস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অটল গম্ভীর মুখে বাড়ী ফিরল।

অমিয়া আসতেই জিজ্ঞাসা করলে, বইখানা কেমন লাগল?

বই! চমকে উঠল অমিয়া।

অটল মনে মনে বললে—এইবার ন্যাকা-ন্যাকা সুরে অমিয়া বলবে, কিসের বই বলছ—বুঝতে পারছি না ত?

হাঁগো—যেখানা শ্রীবাণীতে চলছে। ভাল বই ত ?

অমিয়া বুঝলে যেমন করেই হোক, ওর বিপ্রাহরিক সিনেমা-প্রীতির রহস্য জেনে ফেলেছে অটল। কিন্তু এতে দোষ করবার কি আছে ?

অমিয়ার মুখও তার হয়ে উঠল। নিজেকে যথাসাধ্য সামলে নিয়ে বললে, আজ গিয়েছিলাম—মাসে ওবাড়ীর ন'দি টেনে নিয়ে গেলেন। সত্যি কি সুন্দর হয়েছে বইখানা। মন্দা দেবী এমন চমৎকার পার্ট করলেন—

মন্দা দেবীকেও চেন তা হলে ! গম্ভীর থমথমে গলায় ব্যঙ্গ করে উঠল অটল।

কেন চিনব না ! আজকালকার দিনে ছবির মানুষদের কে না চেনে ! এক মুহূর্তে অমিয়ার স্বরেও দম্ভের সুর বেজে উঠল।

আমাদের মত ঘরের লোকেদের ওসব নেশা ভাল নয়।

অমিয়া উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, আমাদের মত ঘরের মেয়েরাই সিনেমা দেখে বেশী। না দেখে তাদের উপায় কি ! তারা দিনরাত দাসীবৃত্তি করবে সংসারে—দুটো মিষ্টি কথাও কেউ বলবে না—আদর যত্ন ত দূরের কথা ! মানুষের শরীর মন বলেও একটা জিনিষ আছে—সিনেমায় গিয়ে তবু তারা দু'দণ্ড জুড়োতে পায়, না হলে···আর বলতে পারলে না অমিয়া। অশ্রুবাষ্পে ওর স্বর রুদ্ধ হয়ে এল—তাড়াতাড়ি চলে গেল ও ঘর থেকে।

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল অটল ; যেন ফুল তুলতে গিয়ে তার মধ্যে দেখেছে কালসাপ। এ ত কোনকালেই কল্পনা করে নি সে ! গরীবের কন্যাদায় উদ্ধার করে ভেবেছে—কৃতজ্ঞতার মূল্যে এই ঋণ পরিশোধ হবে। এমন একটি আশ্রয় পাওয়ার সৌভাগ্য কোন দিন কি কল্পনা করেছিল অমিয়া ? কিন্তু হায়—অভাবের সংসারে বাস করেও মেয়েদের মন বহু দুরাশা পোষণ করে। একটা কথা আছে—খেতে পেলে শুতে চায়। সে-ও কিছু প্রশ্রয় দিয়েছে বটে, সেটা ঠিক প্রশ্রয় নয়, খানিকটা মমতা আর ভালবাসাও হয় ত—তারই জাগিয়ে খুশী করার চেষ্টা—কিন্তু সে হয়েছে আগুনে ঘি ঢালার তুল্য। শাস্ত্রকারেরা উপমাটা ঠিকই দিয়েছেন—ঘিয়ের ছিটে দিলে আগুন উজ্জ্বল হয়—সেটা পরিতৃপ্তিজনিত উল্লাস নয়—আরও পাওয়ার লালসা। এই চিরন্তনী লালসা বুঝি মেয়েদের মনে সৃষ্টি-প্রত্যূষ থেকে বাসা বেঁধে আছে !

সংস্কারকে শক্ত বনিয়াদে দাঁড় করাতে না পারলে দুঃখ-কষ্ট ঠেকানো যাবে না কোনমতেই। সংসারকে শক্ত বনিয়াদে দাঁড় করানো মানে মনকে যতদূর সম্ভব কঠিন করা—কোমল বৃত্তিগুলিকে বিনা মমতায় নির্মূল করে ফেলা।

কাজটা সহজ হ'ল—পরের দিন অভিমানের জের তুলে অমিয়া বললে, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দেবে—না আপত্তি তুলবে অনেক খরচ হবে বলে ?

আপত্তি তোলাটাই স্বাভাবিক। এই ত দু'মাসও হয় নি হাওয়া বদলে এল অমিয়া।

অটল কিন্তু আপত্তি তুললে না। স্বাভাবিক স্বরে বললে, বেশ ত—আমি রেখে আসব।

অমিয়া মিনিটখানেক স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে রইল অটলের পানে। না, পরিহাসে লঘু নয় ওর মুখমণ্ডল, অভিমানে বিকৃত হয়ে উঠল না রেখাগুলি। অত্যন্ত সহজ মানুষের মতই মুখের রং—গলার সুর। অমিয়ার চোখে জল উপচে পড়ল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে সামনে থেকে সরে গেল সে।

মা অবশ্য আপত্তি তুললেন। অটল হেসে বললে, যেতে চাইছে—থাক না দিন কতকের জন্য। শরীর মন ভাল না থাকলে মানুষ কখনও সুস্থ থাকে না।

সেই শরীর মনের খোঁটা ! অন্তরালে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছল অমিয়া। অত্যন্ত শক্ত হয়ে কি যেন শপথও করলে একটা। তার পর প্রণাম সেরে ধীর পায়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠল।

গাড়ী বদল করতে হ'ল—দু'একবার। দু'জনে পাশা-পাশি বসে—গাড়ী ছুটছে জোরে। দু'জনেরই মনে হচ্ছে—সেই গতিবেগে পরস্পর ছিটকে পড়ছে বিপরীত দিকে। দীর্ঘ একটি দিন কথা কি কয় নি ওরা ? হাঁ কথা বলেছে বইকি, কিন্তু অজানা মানুষের সঙ্গে আলাপে এর চেয়ে ঢের বেশী জড়তা থাকে।

অমিয়াকে রেখে ফিরে এল অটল। রাত্রিতে খরচের খাতা আর ব্যাঙ্কের পাশ বই নিয়ে বসল। এত দিনে জমা-খরচে সামঞ্জস্য হবে হয়ত। বনিয়াদ শক্ত না হলে···

সংসারের ঘটনাগুলি মানুষকে মাঝে মাঝে পরিহাস করে। সে পরিহাস কখনো বা মর্মান্তিক হয়। জমা-খরচের খাতার অঙ্ক পড়তে লাগল ঘন ঘন। বাঁয়ের অঙ্ক যতটা স্থিতিশীল—ডাইনের অঙ্ক সেই পরিমাণে গতিবান। মা বাতের বেদনায় শয্যা নিলেন—তাঁকে দেখবার জন্য দূর সম্পর্কীয় পিসিমাকে আনাতে হ'ল। আনতে হ'ল কবিরাজ। দর্শনী—ব্যবস্থাপত্র—অনুপান—ওষুধ আর পথ্যের বহর দেখলে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়ে। পিসিমা বিধবা শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষ—তাঁর খাওয়ার বাছবিচার যেমন—তেমনি উপবাস-পারণের ঘটাও কম নয়। অমিয়া শুনলে—'যেমন কর্ম তেমনি ফল' বলে মুখ টিপে টিপে হাসবে নিশ্চয়। সুতরাং অমিয়াকে না জানিয়ে খরচের খাতার অঙ্কপাত করে চলল অটল।

অটল বললে মনে মনে, সংসারের পাক যেমন শক্ত দড়ির মত—পাঁকও তেমনি তলে তলে গভীর। পাক যদি বা খোলে পাঁক জড়িয়ে ধরে পায়ে। এ থেকে কেউ বুঝি কোন কালে পরিত্রাণ পায় নি !

মা তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি। পিসি বললেন, নিজের সংসার ফেলে আর কতকাল এখানে পড়ে থাকব বাবা—তুই বরং বৌমাকে আন।

মা—প্রাণ থাকতে তাকে পত্র দিতে পারবে না অটল। দীর্ঘ দুটি মাসে একবারও খবর নিয়েছে কি? তাকে যেচে নিয়ে আসা মানে—তার হাজার রকমের মান-আহ্লাদকে প্রশ্রয় দেওয়া। বৈঠকখানা ঘরের আসবাব, শাড়ী, সিনেমা, গহনা, বন্ধুসমাগম—নানান রকমের উৎপাতকে সাদরে আহ্বান জানানো। অমিয়া এলে সেই বসবে ঘরে—লক্ষীর আসনখানি টেনে ফেলতে হবে পথে। লক্ষীর সঙ্গে আজকের বিবাদ বুঝি অনিবার।

পিসি বললেন মাকে, এদের রীত ব্যাভার বুঝি না বাপু! ঝগড়া কি হয় না স্বামী-স্ত্রীতে? সকালে হয়—সন্ধ্যের মেটে। দুটো দিন বাপের বাড়ী থাকলে মনে হয়—দুখানা পাখা যদি দিত ভগবান! এ কালের কি সবই সৃষ্টিছাড়া বাপু! তা তোমরা রাগই কর আর যাই কর—আমি পরশু চলে যাব।

চলে গেলেনও তিনি।

মা অসহায় স্বরে বললেন, মরণ ত হবে না—আমাকেও না হয় টেনে টুনে গঙ্গায় ফেলে দে, চুকে যাক।

অগত্যা অটল মায়ের জবানীতে চিঠি লিখলে শাশুড়ীকে।

তাই বেয়ান—আজ মাসখানেক হ'ল আমি বাতের বেদনায় শয্যাগত আছি। আমাকে দেখাশোনা—সেবা-শুশ্রূষা করার লোকের অভাব, সংসারও অচল। অটল আপিস কামাই করে আমাকে দেখাশোনা করছে—তার ত একদণ্ডও অন্যত্র যাবার অবসর নেই। অতএব যদি পত্র পাঠ বউমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন...

পত্রের উত্তর এল:

পূজনীয়া বিয়ান ঠাকুরাণী—আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আপনার অসুখের সংবাদে যার পর নাই দুঃখিত ও চিন্তিত রহিলাম। অমিয়া ত আপনার অসুখের খবর শুনিয়া অবধি যাইবার জন্য জিদ ধরিয়াছে। কিন্তু আমার জানা-চেনা এমন কোন লোক নাই যাহার সঙ্গে ওকে পাঠাইয়া দিই। আর লোক মারফত মেয়ে পাঠানো বা আনা আমাদের হিন্দু ঘরের রীতি নহে। মা যে সন্তান-সম্ভবা—এই সংবাদ নিশ্চয় জানেন। এই কারণে লিখিতেছি যে, অটল বাবাজীবন যদি নিজে আসিয়া মাকে লইয়া যান ত...

সস্মিত মুখে ছেলের পানে চেয়ে মা বললেন, বউমাকে আনতে যাবি ত তুই? তুই না গেলে—

অটল হিসাব করতে বসল—অমিয়াকে আনা মানে তার হাজার রকমের মান-আহ্লাদকেও বরে আনা। পুরাতন যে সব মান-অহ্লাদের বার্ত্তা একে একে অটলের গোচরে এসে-ছিল—তা ছাড়াও নূতন অতিথির জন্য কত নূতন রকমের বায়না যে জমা হচ্ছে...

তবু আপনার ঘরে এসে অটল এক বার দু'বার তিন বার আদ্যোপান্ত পড়লে চিঠিখানা। পড়তে পড়তে তার মনে হ'ল—মানুষকে এক সম্পদ থেকে নামিয়ে আর এক সম্পদে প্রতিষ্ঠিত করতে সারা দুনিয়াটাই বুঝি ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে অহরহ। সে জাল ছিঁড়ে বেরুবার সাধ্য বা সাধ দুর্ব্বল মানুষের নেই।

অটল চিঠিখানি সযত্নে ভাঁজ করে বাক্সের মধ্যে রেখে দিলে এবং হিসাবের খাতাখানি বার করলে টেনে। তারপর জানালার ধারে এসে সেখানা জানালা গলিয়ে ফেলে দিলে বাইরে।

বৈকালের আহ্বান

শ্রীকালিদাস রায়

এস বধূ এস গাগরী ভরিতে শীতল জলে,
দীঘি ডাকে তোমা কূলে ছলছলি কি কথা বলে।
না মুদিতে তার নয়ন-কমল
এস তার হৃদি হয়েছে অমল,
নিবিড় পরশ চায় তব তার গভীর তলে।

এস বধূ এসো তরুশাখা'পরে পাখীরা ডাকে,
আর দেরি কেন এস ত্বরা করি কলসী কাঁখে।
হয়ে এল বধূ দিবা অবসান
তোমারে তাহারা না শুনায়ে গান,
কুলায়ে পশিবে কেমনে, তোমার আশায় থাকে।

ডাকে রাঙা রবি ঘাটপথে বধূ তোমা না হেরি;
অস্তে নামিতে অযথা তাহার হয় যে দেরি।
গোধূলি ধূলার আবিরে ভরিয়া
রেখেছে ও পথ ঘোরালো করিয়া,
সে ধূলার ফাগ রঙিন করিবে ও তনু ঘেরি।

ডাকে তব সই বসি জলে ঐ ডুবায়ে গলা,
কত কথা শোনা হয় নি কত যে হয় নি বলা।
ঘরে ঘটভরা থাকে যদি জল,
ঢালি আঙিনায় এস করি ছল,
ফিরিবার পথে হেরিবে গগনে চন্দ্রকলা।

বরাহক্ষেত্রে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বরাহক্ষেত্র বিশাখাপত্তন। বরাহ নদী বিশাখাপত্তন জেলার মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত। অসংখ্য দেবস্থান অন্ধ্রদেশের এই সমুদ্রমেখলা, শৈলকিরীটিনী পুণ্যভূমিকে বিরাট মহিমায় মণ্ডিত করে রেখেছে। তন্মধ্যে ওয়ালটেয়ার থেকে নয় মাইল দূরবর্তী "সীমাচলম্" (সিংহাচলম) পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত বরাহনরসিংহ মন্দিরের খ্যাতি সমগ্র ভারতে প্রচারিত। কথিত আছে, পুরাকালে হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ এই পর্ব্বতে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়ে নরসিংহাবতারের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু পুণ্যকামী নরনারী এই তীর্থ-স্থানে এসে সমবেত হয়।

সমুদ্রবক্ষ থেকে বিশাখাপত্তন বন্দরের মুখ

প্রাচীন ভারতের যে সকল দেশের গৌরবময় কীর্ত্তিকাহিনী সংস্কৃত কাব্য নাটক তাম্রশাসন, বৈদেশিক পর্য্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনী ইত্যাদিতে পরিকীর্ত্তিত, কলিঙ্গ সেগুলির অন্যতম। এই দেশের পূর্ব্বদিকে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে সুদূরপ্রসারী মহাবন, দক্ষিণে বিপুলসলিলা গোদাবরী, উত্তরে মনোরম চিল্কা হ্রদ। এই তিন শত বর্গমাইল পরিমিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল তিনটি অংশে বিভক্ত। উত্তর অংশের নাম বলরামক্ষেত্র, দক্ষিণ-ভাগ গৌতমক্ষেত্র আর মধ্যভাগ হচ্ছে বরাহক্ষেত্র—এই বরাহ-ক্ষেত্রই বর্ত্তমান বিশাখাপত্তন জেলা।

সমুদ্রোপকূলস্থ বিশাখাপত্তন শহরটি অতি প্রাচীন। এখানকার সঙ্কীর্ণ সরু গলিগুলি কাশীর গলির কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রাচীন আমলের কোন কোন সৌধে ভারতীয় স্থাপত্যরীতির ছাপ সুপরিস্ফুট। আধুনিক সভ্যতার যাবতীয় উপকরণই এখানে আছে বটে, কিন্তু তবুও যেন এই নগরের দেহে প্রাচীনত্বের স্পর্শটুকু এখনও লেগে রয়েছে।

সন্ধ্যার পরে বিশাখাপত্তনের সাগর-সৈকতের দৃশ্যটি পরম উপভোগ্য। তীরের একেবারে কাছটিতে ছয়-সাত হাত উঁচু পোস্তার উপর প্রস্তর-নির্ম্মিত সৌধসমূহে বৈদ্যুতিক আলোক-মালা জ্বলে ওঠে, সুমুখে সাগরের বুকে ভাসমান বয়াগুলির উপর আলোকরশ্মি দৃশ্যমান হয়, ওধারে লাইট হাউস থেকে নিক্ষিপ্ত, ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ আলোকচ্ছটায় সমুদ্রবক্ষ মাঝে মাঝে হয়ে ওঠে শুভ্র রেখাঙ্কিত।

সমুদ্রতীর থেকে হোটেলে ফিরে আসছিলাম। গলি ছাড়িয়ে সবে বড় রাস্তায় পা দিয়েছি হঠাৎ অনতিদূরস্থ এক সৌধ থেকে মাইকের মাধ্যমে বিকীর্ণ গানের আওয়াজ কানে ভেসে এল। দক্ষিণী ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের সুরে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে গেলাম। সদর রাস্তার ঠিক পাশেই পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু ভিতের উপর তৈরি এক সুরম্য প্রাসাদের নিম্নতলায়, বৈদ্যুতিক আলোকমালায় উদ্ভাসিত একটি কক্ষে উৎসবের বিপুল সমারোহ।

কিসের উৎসব দেখবার জন্যে মনে জাগল প্রবল কৌতূহল। সামনের দিকে দ্বার আগলে আছে দ্বারীরা, চলছে আদর আপ্যায়ন অভ্যর্থনার পালা। বুঝলাম এদিকে অনাহূত আগ-ন্তুকের প্রবেশ নিষেধ। পাশের দিকে আর একটি দরজার নিকটে গিয়ে দেখি সেখানে আমারই মত কৌতূহলী দর্শকদের ভিড়। অনেকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ভেতরকার উৎসব-সমারোহ অবলোকন করছে।

গট গট করে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে ঊর্দ্ধে আরোহণ করলাম এবং যা থাকে কপালে বলে মুক্ত দ্বারপথে সরাসরি ভেতরে ঢুকে ভিড়ের মধ্যে গ্যাঁট হয়ে বসলাম। দু' এক জনের কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টি আমার 'পরে নিক্ষিপ্ত হ'ল, কিন্তু কেউ কিছু বললে না।

ভেতরে প্রকাণ্ড ভিড়—লোক একেবারে গিস গিস করছে, তিল ধারণের জায়গাটুকু পর্য্যন্ত নেই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ আর খিলানসমূহ উপরের ছাদকে ধারণ করে রেখেছে। ভাল করে চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলাম, বিরাট ভবনটির বহিঃপ্রকোষ্ঠে বিবাহ-উৎসবের অনুষ্ঠান সুরু হয়েছে। অন্দরমহলের প্রবেশপথের সামনে, পাশাপাশি বর-কনে উপবিষ্ট। বরের মাথায় নানাপুষ্পগুচ্ছে শোভিত সাদা পাগড়ি, কপালে শ্বেত চন্দনের তিলক, গলায় স্বর্ণহার, হাতে সোনার চুড়ি। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ চেহারা—সাজোয়ান পুরুষ। গায়ে একটা সিল্কের চাদর আছে বটে, তবে দেহের উদ্ধার্দ্ধের প্রায় সবটুকুই অনাবৃত। বুকে ইয়া প্রকাণ্ড এক জোড়া ভ্যান

কেয়ার গোঁফ—চেহারায় বেশ একটা বেপরোয়া ভাব।

বরের বাম পার্শ্বে বসে আছে কনে—রূপলাবণ্যবতী তন্বী তরুণী। মাথায় সাদা ফিতে জড়ানো—কবরীতে চাঁপা ফুলের

সীমাচলমের সোপান-পথ

মালা—এক গা গহনা, গলায় কয়েক নর স্বর্ণ-হার। বর যেমন বেপরোয়া, কনে তেমনি ব্রীড়াবনতা। মুখখানি আনত, দৃষ্টি মেঝের নিবদ্ধ—লজ্জায় মেয়েটি যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বিশালবপু বরের পাশে তন্বী বধূটিকে যে কিরূপ বেমানান দেখাচ্ছিল তা আর বলবার নয়।

বরকনে যেখানে বসে আছে তার নিকটেই বিচিত্রবেশা অবগুণ্ঠিতা পুরমহিলাদের ভিড়। তাদের নিরাবরণ মস্তকের কৃষ্ণ কেশদাম পুষ্পাভরণে ভূষিত। স্বর্ণ-নির্ম্মিত নীবিবন্ধে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক প্রতিফলিত হয়ে ঝকমক করছে। বরের ঠিক পেছনেই বসে আছেন এক বর্ষীয়সী বিপুলাঙ্গী মহিলা—মাথা একদম ন্যাড়া, পরনে থানধুতি—আধখানা মাথা ঘোমটায় ঢাকা। মস্তকের অবগুণ্ঠন অন্ধ্র এবং মাদ্রাজী স্ত্রীলোকদের বৈধব্যের নিদর্শন। এই বিধবা মহিলাটির সর্ব্বাঙ্গে কিন্তু অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য—গলায় স্বর্ণহার, হাতভরা সোনার চুড়ি—জুয়েলারির দোকানের শো-কেসকে হার মানিয়ে এই মেদ-বিপুলা বিধবাটি বিবাহ-বাসরে বিরাজিতা।

বরকনের উত্তরপার্শ্বে বসে আছেন পুরোহিতকুল। তাঁদের মাথার চার পাশ ক্ষুর দিয়ে চেঁচে কামানো—মাঝখানের দীর্ঘ কেশগুচ্ছ টিকে-খুঁটির আকারে গ্রন্থিবদ্ধ।

কিছুক্ষণ পরে অন্তঃপুর থেকে এলেন কয়েক জন এয়োস্ত্রী। তাঁদের মধ্যে এক জন কনের গায়ের উপর চাপিয়ে দিলেন একটা ফিনফিনে ওড়না। এর পর যে ব্যাপারটি সুরু হ'ল তা সম্ভবতঃ স্ত্রী-আচারের অন্যতম অঙ্গ। মেঝের উপর একটা বিশাল রূপোর থালা ছিল একপ্রকার সাদা গুঁড়োয় ভর্ত্তি। দূরের থেকে ঠিক বুঝতে পারি নি—সম্ভবতঃ চালের গুঁড়ো হবে। হঠাৎ কয়েক জন তরুণী এই থালার কাছে এসে বসলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে মুঠো মুঠো সাদা গুঁড়ো বর-কনের গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। এ ব্যাপারে সুন্দরীদের ক্লান্তি নেই। মাঝে মাঝে তাদের কলহাস্যে বিবাহ-মণ্ডপ মুখরিত হয়ে উঠতে লাগল। এদিকে আপাদমস্তক সাদা গুঁড়োয় আবৃত হয়ে কনে বেচারির অবস্থা কিন্তু কাহিল। তখন বর এগিয়ে এল তাকে এই স্ত্রী-আচার বা অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে। বর শুধু যে নিজের গায়ের সাদা গুঁড়োগুলোই ঝেড়ে দিলে তা নয়, একেবারে আহুত-পা হয়ে, নিজের চাদর দিয়ে কনের দেহেও ঝাড়পোঁছ সুরু করে দিলে। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে চার দিকে এক বার চক্ষু আবর্ত্তন করে তাকালে—মুখের ভাব এমনি যেন কোরিয়ার লড়াই জিতেছে। বিবাহ-বাসরে বাঙালী বরের সলজ্জভাবের সঙ্গে অন্ধ্র বরের এই বীরভাবের তুলনামূলক সমালোচনা স্বতঃই মনে উদিত হ'ল।

সীমাচলম্ পাহাড়ের একটি দৃশ্য।
বাঁ দিকে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে

কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তি একটা রূপোর বালতিতে পান ভর্ত্তি করে নিয়ে এসে বিতরণ করতে লাগল—বলা বাহুল্য, আমিও বঞ্চিত হলাম না। অন্ধ্রদেশের "তাম্বুলম্" বড়ই মুখরোচক, পানবিলাসীদের বিশেষ আদরের বস্তু। হঠাৎ একটা স্নিগ্ধ গন্ধে কক্ষ আমোদিত হয়ে উঠল। এক জন একটা স্বর্ণপাত্র থেকে সবাইকে গোলাপী রঙের সুতো আর সোনালী জরিতে মোড়া এক একটি সরু কাঠি বিতরণ সুরু করলে, কাঠিটির অগ্রভাগে সুরভিত তুলো জড়ানো। এদের বিবাহ-অনুষ্ঠানের এই অঙ্গটি বড় ভাল লাগল। হাত বাড়িয়ে এই প্রীতি-উপহার গ্রহণ করে সযত্নে পকেটে রেখে দিলাম। আলোকে হাস্যে, সৌগন্ধ্যে এবং সুন্দরীদের কলগুঞ্জনে আর অলঙ্কারশিঞ্জনে এমনি একটা বিচিত্রমধুর পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছিল যে, ইচ্ছে হ'ল অনুষ্ঠানের শেষ পর্য্যন্ত দেখে যাই,

কিন্তু এদিকে রাত বেড়ে যাচ্ছে, বেশী দেরি করলে হোটেলের দরজাই হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে, অগত্যা বিবাহ-মণ্ডপ পরিত্যাগ করে হোটেলের পথ ধরলাম।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে সীমাচলম্‌গামী বাস ধরবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সদর রাস্তায় পা দিতেই একজন অন্ধ্র ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা—মুখে তাঁর শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, সীমাচলম্‌গামী বাস ভিন্ন পথে কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে, তবে চৌরাস্তা থেকে আর একটা বাস সীমাচলমের পথে কিছু দূর পর্যন্ত যাবে, তিনি ঐ বাসে ফিরবেন নিজের গাঁয়ে। ভদ্রলোক আমাকে তাঁর সঙ্গে ঐ বাসে চাপতে বললেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, আমার সীমাচলম্‌ পৌঁছানোর ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন।

নৃসিংহদেবের মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার

দু'জনে বাসে আরোহণ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস ছেড়ে দিলে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ বেশ জমে উঠল। শুরুতেই আমাদের আলোচনা রাজনৈতিক প্রসঙ্গের পথে মোড় নিলে।

আমি যেদিন বিশাখাপত্তনে পৌঁছি সেই-দিনই কিষাণ মজদুর প্রজা-পার্টির নেতা শ্রী টি. প্রকাশম বিশাখাপত্তনে এসে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে আমার সহযাত্রী বললেন, "প্রকাশম হচ্ছেন অন্ধ্রের লোক, তিনি তেলুগুদের গৌরব। দেশের জনসাধারণের উপর তাঁর প্রভাবের পরিসীমা নেই, আপনি অন্ধ্রদেশের দূরতম গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত পরিভ্রমণ করলে দেখবেন গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে তাঁর আসন কিরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত, কিরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা উচ্চারণ করে তাঁর নাম। তেলুগুদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে—তিনি অন্ধ্রের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ লোকনায়ক—"গ্রিণ্ড ওল্ড ম্যান" বললে যা বুঝায় প্রকাশম হচ্ছেন তাই।"

তেলুগু সংস্কৃতির প্রসঙ্গ উঠলে ভদ্রলোক বললেন, "তেলুগু ও তামিল দুটি বিভিন্ন জাতি—এই উভয় জাতির ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা। কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে দীর্ঘকাল ধরে তামিল-প্রাধান্য আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে। জোর করে তামিল সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের ঘাড়ে। কিন্তু আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে—'র দ্বারা যদিও তিনি জাতিতে তেলুগু—তাঁর পূর্বপুরুষেরা অন্ধ্রদেশ থেকেই মাদ্রাজে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন।"

ক্ষণকাল গভীর চিন্তামগ্ন থেকে ভদ্রলোক অনেকটা যেন স্বগতোক্তির মত বললেন, "আমরা তেলুগু জাতি এক বিরাট সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। তামিল সংস্কৃতির আওতায় পড়ে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারছে না—কাজেই আমাদের আত্মবিকাশের জন্যে ভাষার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হওয়া একান্ত এবং আশু প্রয়োজন।"

একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "আমাদের এ আন্দোলন আজকের নয় ভদ্রজী। দেশভক্ত কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া পন্টুলু ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অন্ধ্রের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। কয়েক বছর পরে অন্ধ্র মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারী রূপে স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশের দাবি করে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে তিনি একটি স্মারকলিপি উপস্থাপিত করেন। ১৯৩৭-এ তিনি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং তার পরের বছর পরিষদে, ভাষার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। পরিষদের অনেক সদস্য গোড়া থেকেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে থাকেন, এই আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখবার জন্যে চেষ্টারও ত্রুটি হয় নি, কিন্তু সকল বাধা অগ্রাহ্য করে আন্দোলনের শক্তি উত্তরোত্তর বর্ধমান হবে, স্বাধীন ভারতে আজ তা সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ার তেলুগুদের মন আশায় ভরে উঠেছে।"

সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছিল টের পাই নি। চমক ভাঙল যখন এক জায়গায় বাস থামলে পরে আমার সহযাত্রী বললেন, "ভদ্রজী, এখানে আপনাকে নামতে হবে।" আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বাস থেকে অবতরণ করলেন এবং বারো আনা ভাড়ায় সীমাচলম্‌ পর্যন্ত একটা রিক্সা ঠিক করে দিয়ে আমার নিকট বিদায় নিয়ে বাসে গিয়ে উঠলেন।

রিক্সা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল সীমাচলমের পথে। শীঘ্রই শহর, বাজার, দোকানপাট ছাড়িয়ে এসে পড়লাম প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে। লাল মাটির রাস্তার উপর দিয়ে রিক্সা চলেছে ধীরমন্থর গতিতে। চারদিকে সবুজ শস্যাবৃত উচ্চাবচ

সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর। দূরে মেঘমালাসন্নিভ পূর্ব্ব-ঘাট পর্ব্বতমালা নয়নাভিরাম দৃশ্যপট প্রসারিত। বাঁদিকে রাস্তার অনতিদূরে আম্রকানন। সুপরিপক্ক স্বর্ণকান্তি ফলভারাবনত শাখাসমূহের শোভা অপূর্ব্ব।" "ছন্নোপান্তঃ পরিণত ফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ..." মেঘদূতে, দক্ষিণ-ভারতের পর্ব্বতের প্রান্তভূমিতে আম্রকাননের যে বর্ণনা পাঠ করেছি তা স্মৃতিপথে সমুদিত হ'ল। সম্মুখে আকাশের পটে বিলীন পাহাড়ের নীলিমায় যেন সুদূরের হাতছানি। মনের মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে বলেই বুঝি প্রতীতি হচ্ছে—দিগন্তলীন পর্ব্বতমালা উড়ে চলেছে কোন্ অনন্তের উদ্দেশে। "পর্ব্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ"—কবিগুরুর এই উক্তির গূঢ়ার্থ যেন উপলব্ধি করতে পারছি। সকালবেলার সোনালী আলো এসে পড়েছে সবুজ তৃণাস্তীর্ণ প্রান্তর আর লাল মাটির পথের 'পরে। বিশ্বশিল্পী যেন, লাল ও সবুজ রঙে আঁকা চিত্রপটখানির উপর সোনা মাখিয়ে 'ফিনিশিং টাচ্' দিয়ে তাকে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছেন। জনবিরল পথ। শীকরসিক্ত শীতল বাতাস শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে—নির্জ্জনতার মোহ সমস্ত অন্তরকে কেমন যেন করে ফেলেছে আচ্ছন্ন। চোখ বাইরের রূপ দেখছে বটে, কিন্তু মন যেন ডুব দিয়েছে একেবারে নিজের অন্তরতম সত্তার গহনতলে। সমস্ত চৈতন্য দিয়ে উপলব্ধি করছি—বাতাসে মধুর প্রবাহ, সিন্ধু ক্ষরণ করছে মধু, ধরণীর ধূলি হয়ে উঠেছে মধুময়।

মন্দিরগাত্রের একাংশ

মন্দিরগাত্রে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য

কয়েক মাইল এগোবার পর সীমাচলম্ পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে রিক্সা থামল। এবার সুরু হ'ল পর্ব্বতারোহণের পালা। তৈরব কটকের পর থেকে প্রস্তরনির্ম্মিত সুদৃঢ় সোপান-পথ ধাপে ধাপে আট শ' ফুট উঁচুতে পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত মন্দির পর্য্যন্ত উঠে গেছে। বারো শত সোপান অতিক্রম করে মন্দিরে পৌঁছুতে হয়। এই সোপান-পথ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন পুণ্যবতী রাণী অহল্যাবাঈ। কতিকতক সোপান অতিক্রম করবার পর পাওয়া যায় এক একটি প্রশস্ত চাতাল, শ্রান্ত পথিকেরা তাতে বিশ্রাম করে ক্লান্তি অপনোদন করে।
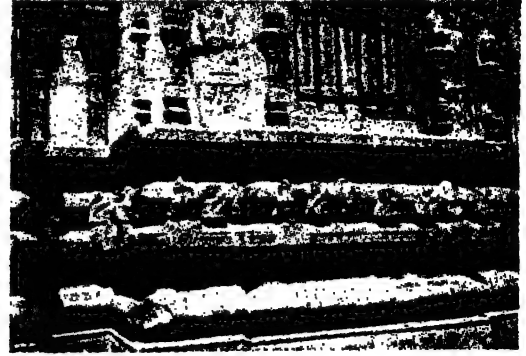
রাস্তার উভয়পার্শ্বে ঘনসবুজ তরুরাজি আর লতাগুল্মের নিবিড় জঙ্গল। স্থানে স্থানে পুষ্পরাজির প্রাচুর্য্য দেখে মনে হয় বনভূমিতে সুরু হয়েছে হোলি-উৎসবের সমারোহ, আর রঙের খেলায় বনলক্ষ্মীর সবুজ বসনখানি হয়ে উঠেছে বিচিত্রবর্ণে অনুরঞ্জিত। মাঝে মাঝে কলাবন আর আতাবন আরণ্য দৃশ্যের মধ্যে বেশ একটুখানি অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছে। পাহাড়ের পাষাণবক্ষ বিদীর্ণ করে একটি ঝরণাধারা নেমে এসে কলাবাগানের ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার কুলু কুলু ধ্বনি যেন নৃত্যপরা বনদেবীর নূপুর-নিক্কণের মত শ্রবণের পরিতৃপ্তিসাধন করছে।

রাস্তার উপরেও দৃশ্যবৈচিত্র্যের অভাব নেই। সেদিন নৃসিংহদেবের মন্দিরে কিসের একটা উৎসব। দলে দলে পুণ্যার্থীরা চলেছে দেব-দেউলের অভিমুখে। মহিলার সংখ্যাই বেশী—অনেকেরই পরনে সবুজ সাড়ী, গায়ে লাল জামা। নিবিড় অরণ্যের শ্যামলিমা আর মাটির রং বুঝি এই পার্ব্বত্য প্রদেশের জনপদ-বধূদের মনে লাল-সবুজের নেশা ধরিয়ে দেয়, তাই এখানকার বৃত্তিতা এবং প্রকৃতির বর্ণবৈভবের সঙ্গে তাদের বসনের বর্ণ-সুষমার এমন সুসঙ্গতি। প্রায় ছয় শত সোপান অতিক্রম করবার পর দেখি সম্মুখে পাহাড়ের উচ্চ স্থানে কারুকার্য্যখচিত এক বিরাট তোরণ, তার দু'পাশে দুটি ঝরণাধারা সবেগে সগর্জ্জনে নিচে গড়িয়ে পড়ছে—একটির নাম আকাশধারা, অপরটির নাম পিচিকা। ঝরণা দুটি যেন তোরণের দুই পার্শ্বে দুইটি প্রশস্ত রূপার পাতের মত প্রলম্বিত। বাঁদিকের জলধারা গোমুখের মত আকৃতিবিশিষ্ট প্রস্তরনির্ম্মিত একটি ছিদ্রপথে নিম্নাবতরণ করছে। এই ঝরণার পাশে পাহাড়ের পাষাণ-গাত্রে কয়েকটি প্রকোষ্ঠে পঞ্চদেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কটকের ভেতরে হনুমানজীর মন্দির।

আরো কতকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করে আর একটি

তোরণের সামনে এসে, দাঁড়ালাম। তোরণের নীচে কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্ম্মিত একটি গণেশমূর্ত্তি সুঠাম ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। এই তোরণের পার্শ্ববর্ত্তী জলনিঃসরণের ছিদ্রপথটি হাতীর মুখের মত আকৃতিবিশিষ্ট—ভিতরে মন্দির-প্রাঙ্গণে শাদা বিন্দুচিহ্ন

মন্দিরগাত্রে বিষ্ণুমূর্ত্তি
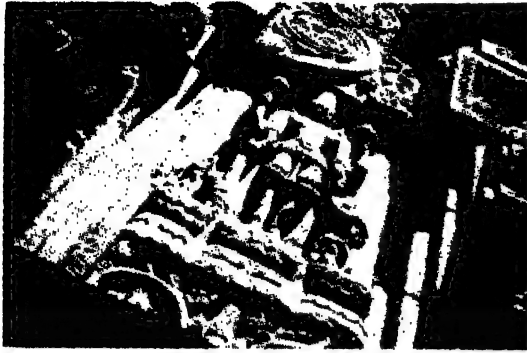
দিয়ে আলপনা আঁকা। অনেকগুলি সোপান (প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি হবে) অতিক্রম করবার পর পর্ব্বত-গাত্রস্থ সমতল স্থানে অবস্থিত এক গ্রামে পৌঁছানো গেল। পার্ব্বত্য পরিবেশের মধ্যে এই ক্ষুদ্র পল্লীটি দেখতে বড় ভাল লাগল।

এই গ্রামটি ছাড়িয়ে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর সম্মুখের পানে তাকিয়ে দেখি, অদূরে শ্যাম বনানীর পটভূমিকায় নৃসিংহদেবের মন্দিরের স্বর্ণচূড়া রৌদ্রকিরণে ঝক্‌ঝক্ করছে। বনলক্ষ্মীর শ্যামল অঙ্গে শোভা পাচ্ছে যেন একখানি দ্যুতি-মণ্ডিত স্বর্ণভূষণ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সবগুলি সোপান অতিক্রম করে বরাহ-নরসিংহদেবের মন্দিরের নিকটে এসে পৌঁছলাম। মন্দির-প্রাচীরের বাইরে এক বৃদ্ধার জিম্মায় জুতো রেখে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ-তোরণের নিকটে অত্যুচ্চ গরুড়-স্তম্ভ প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত বিরাট মন্দিরের স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য প্রথম দৃষ্টিতেই মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে দিলে। কোন্ মহান শিল্পীর পরি-কল্পনায় এ বিশাল মন্দিরের সৃষ্টি তা জানি না, কিন্তু এক পরম-পুরুষের বিরাট রূপকে যে তিনি ধ্যানযোগে উপলব্ধি করে-ছিলেন তাতে সন্দেহ রইল না। মন্দিরটি যেন সেই ভূমার উদ্দেশে প্রস্তরে রচিত স্তবগান। চেয়ে দেখি মন্দিরদ্বার রুদ্ধ। শুনলাম বেলা এগারোটার সময় ভোগারতির পরে দেব-দর্শনার্থীদের জন্যে দ্বার উন্মুক্ত হবে। অগত্যা বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মন্দিরের এক প্রান্ত থেকে নহবতের মধুর আওয়াজ কানে ভেসে আসতে লাগল। এদিকে মন্দিরের প্রশস্ত চত্বরে তালপাতার ছাউনির নীচে যাত্রীদের ভিড় ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। মেয়েদের প্রায় সকলেরই মুখে হলুদের গুঁড়ো মাখানো। এটা অন্ধ্রদেশে একটি বিশেষ পুণ্যকৃত্য বলে মনে করা হয়। অনেক পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষও এসে মন্দির-প্রাঙ্গণে ভিড় জমিয়েছে। একপাশে বসে আছে কয়েক জন বিবাহিতা পাহাড়ী রমণী। প্রত্যেকেরই ক্রোড়ে সন্তান—মাথা একদম ন্যাড়া, পায়ে মোটা মোটা রূপার খাড়ু—কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের ফোঁটা, হাত-ভর্ত্তি সবুজ কাচের চুড়ি। কয়েক জন ফুলওয়ালী ঘুরে ঘুরে ফুলের মালা বিক্রী করছে—তাদের কর্ণভূষণ এবং নাসিকার গহনার বহর দেখবার জিনিষ। কানের উপরিভাগে, মাঝখানে, নীচে সর্ব্বত্র পিতলের আংটি, নাকের দু'পাশে ছুটো করে রিং তো আছেই, তার উপরে আছে একটি করে দুল। কয়েক জন নেংটিপরা প্রায় দিগম্বর পুরুষ নির্ব্বিকারভাবে একপার্শ্বে উপবিষ্ট। মাথায় তাদের লম্বা চুল, কপালে চন্দনের ফোঁটা।

মন্দিরের বারান্দায় বসে আছেন, গলায় যজ্ঞোপবীত, সিন্দুর-লিপ্তললাট কয়েকজন পূজারী ব্রাহ্মণ। ওদিকে জমকালো শাড়ী পরিহিতা কয়েক জন অন্ধ্র পুরমহিলা বিচিত্রপক্ষ প্রজা-পতির মত মন্দির-প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই তীর্থমন্দিরের দেবতা আর্য্য অনার্য্য সকল শ্রেণীর নরনারীকে টেনে এনে-ছেন নিজের চরণোপান্তে। মানুষে মানুষে ভেদবৈষম্য এখানে ঘুচে গেছে। বিভেদের মধ্যে মিলন-প্রতিষ্ঠা যে ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তা এই তীর্থক্ষেত্রে এসে নূতন করে উপলব্ধি করলাম।

যথাসময়ে মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হ'ল। অন্যান্য যাত্রীদের দলে ভিড়ে গিয়ে শুরু করলাম মন্দির-প্রদক্ষিণ। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সীমাচলম্ মন্দির। মন্দিরের বহিঃপ্রাচীর-গাত্রে উৎকীর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মনিচয়ের শোভা অপূর্ব্ব। মন্দিরগাত্রে চতুর্ভুজ নারায়ণ, বামন অবতার এবং অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তিসমূহের গঠন-কৌশল এমনি অনিন্দ্য যে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। প্রাচীর-গাত্রে সংস্থাপিত প্রস্তরনির্ম্মিত একটি নারীমূর্ত্তি দেখে মূক বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। নারীদেহের লাবণ্য সৌকুমার্য্য এবং লীলায়িত রেখাসমূহকে প্রাচীন ভারতের যে রূপদক্ষ শিল্পী পাষাণে এমন অমর ভাবে রূপায়িত করে গেছেন, মনে মনে তাঁর স্বজনী-প্রতিভার উদ্দেশে প্রণতি জানালাম।

মন্দিরের ভিতরে বাইরে অলিন্দে মণ্ডপে সর্ব্বত্রই বিচিত্র ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন—এতটুকু জায়গায়ও ফাঁক পড়ে নেই। কোথাও দেবদেবীর লীলাদ্যোতক বিভিন্ন মূর্ত্তি, কোথাও-বা স্তম্ভগাত্রে মণ্ডনশিল্পের অপূর্ব্ব সুষমা। কত বড় রূপস্রষ্টা ছিলেন সেই সকল শিল্পী যাঁরা নীরস পাষাণে এই রূপ ও রেখার অপরূপ রূপকথা রচনা করে গেছেন। সার্থক হ'ল

তীর্থদর্শন—দৃষ্টির সামনে উদ্ঘাটিত হ'ল যেন এক নিরুপম রূপ-লোকের রহস্য-কক্ষ।

মন্দিরের এক কোণে আছে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত অশ্বযুগল-বাহিত একটি রথ। এই রথের চক্রসমূহের গঠন-কৌশল

মন্দিরগাত্রে ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন

যেমন অনিন্দ্য তেমনি অনুপম তাদের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। এই রথে উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যের প্রভাবের পরিচয় পরিস্ফুট। স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, কোনারকের সপ্তাশ্ববাহিত রথের আদর্শে সীমাচলমের এই অশ্বদ্বয়বাহিত রথও পরিকল্পিত হয়েছিল।

এই সমস্ত দেখে দেবমূর্ত্তির দর্শনলাভের জন্যে নাটমন্দিরে প্রবেশ করলাম। সেখানে মৃদঙ্গবাদনরতা কতকগুলি নৃত্যপরা নারীমূর্ত্তি দেখে চোখ আর ফেরাতে পারি না। কোন কোন মূর্ত্তির ঈষৎ উত্তোলিত এক পা মৃত্তিকা স্পর্শ করতে উদ্যত। মনে হয় এই ছন্দায়িত পদপাতে ভিত্তিগাত্রে সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জ বিকশিত হয়ে উঠবে। গর্ভগৃহে দেবতার আসন—ভিড় এত প্রচণ্ড যে, এক রকম যুদ্ধে যুদ্ধেই এগুতে লাগলাম—মাঝ পথ পর্য্যন্ত যাবার পর মনে হ'ল, মোক্ষলাভের আর বেশী দেরী নেই। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত ধাক্কার চোটে দেবমূর্ত্তির পাদপীঠের কাছে এসে ছিটকে পড়লাম—ঘনসংস্থাপিত অগণিত ঘৃতপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে গর্ভগৃহের অন্ধকার অপগত। সে আলোকে চোখ-ধাঁধানো তীব্রতা নেই, আছে রমণীয় স্নিগ্ধতা। এত ধকল সহ্য করে এলেও কিন্তু আসল দেবমূর্ত্তির দর্শনলাভ অদৃষ্টে ঘটল না। যা দেখলাম তাকে বলে চন্দনলিঙ্গম—ঠিক যেন শ্বেত বর্ণাচ্ছাদিত শিবলিঙ্গের মত আকৃতিবিশিষ্ট। এটি আসল দেববিগ্রহের আবরণী। প্রতিদিন পূজার সময় এই আবরণীটিকে চন্দনানুলিপ্ত করা হয়—ফলে এটির গায়ে শ্বেতচন্দন হয়ে উঠে স্তূপাকার। সর্ব্বসাধারণে এই আবরণীর অভ্যন্তরস্থ আসল দেববিগ্রহের দর্শনলাভ করতে পারে বৎসরে মাত্র একদিন—সে বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে। কথিত আছে, নৃসিংহাবতার যে মূর্ত্তিতে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন, সেই মূর্ত্তিতেই তিনি সিংহাচলম্ পর্ব্বতে বিরাজ করছেন। কিন্তু স্কন্দ পুরাণে এই মূর্ত্তির যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে বিগ্রহটির আকৃতিগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। বরং বরাহমূর্ত্তির সঙ্গেই ইহার অধিকতর মিল দেখা যায়, তবে মূর্ত্তিটি সিংহের মত

সীমাচলম্ মন্দিরে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত রথ

লেজযুক্ত এবং বরাহের মত মস্তকবিশিষ্ট। মূর্ত্তিটি কি বরাহ এবং নৃসিংহ এই দুই অবতারের একীভূত রূপ? স্কন্দপুরাণে অবশ্য এক জায়গায় আছে—"বরাহ নরসিংহশ্চ সিংহশৈল-নিকেতনঃ"। বরাহক্ষেত্রস্থ সিংহাচলম্ পর্ব্বতের অধিদেবতা বলেই কি ইনি বরাহ-নরসিংহস্বামী। এ বিষয়ে পৌরাণিক এবং মূর্ত্তিতাত্ত্বিক—আলোচনার অবকাশ আছে।

শ্রীচৈতন্যের পদরেণুকণাপূত এই সীমাচলম্ মন্দিরের সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক রামানুজাচার্য্যের পুণ্য স্মৃতি-বিজড়িত। এই মহাপুরুষ একবার সীমাচলমে আগমন করেন। তখন সকলে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করতে থাকে। মন্দিরে থাকতেন কৃষ্ণমাচারী নামে এক ভক্ত। তিনি নৃত্য-গীত দ্বারা প্রতি রাত্রে প্রভু নরসিংহদেবের তুষ্টি-বিধান করতেন। অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত হয়ে কৃষ্ণমাচারী রামানুজের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাইলেন না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। ভগবান নরসিংহদেব তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন যে, যদি তিনি রামানুজের কৃপালাভ করতে সক্ষম না হন, তা হলে তাঁর মুক্তির কোনও আশা নেই। এই কথা শুনে কৃষ্ণমাচারীর যেন দিব্য জ্ঞান লাভ হ'ল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, অহঙ্কার বর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত জীবের মুক্তির আশা সুদূরপরাহত।

সীমাচলম্ মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি কক্ষে শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের মূর্ত্তিটি দেখে কোনও কোনও ভক্তের হয়ত উপরি-উক্ত কাহিনীটি মনে পড়ে, অনতচিত্ত হয়ে ভগবানে আত্মসমর্পণ ব্যতীত শান্তিলাভের যে অন্য কোনও উপায় নেই এই বিশ্বাস স্থানমাহাত্ম্যে হয়তো তাঁদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়।

এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত তাম্রশাসনাদি থেকে জানা যায় যে, পূর্ব্ব-চালুক্যদের রাজত্বের প্রাক্‌কাল থেকেই (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী) সীমাচলমে নৃসিংহদেবের মন্দির বিদ্যমান ছিল। একাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার নৃপতি লাংগালা গজপতি মন্দির-চত্বরে একটি নবগৃহ নির্ম্মাণ করিয়ে দেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সীমাচলম্ বিজয়নগরের রাজবংশের অধীনে আসে, বর্ত্তমানে এই মন্দির তাঁদের দেবোত্তর সম্পত্তি।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে এক জন গাইডকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়নগরমের রাজকীয় পুষ্পোদ্যান দেখতে গেলাম। কি রমণীয় স্থান! বিচিত্রবর্ণের পুষ্পরাজি ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটার মত দৃষ্টিকে করছে বিমুগ্ধ—কতকগুলি ফোয়ারার মুখ দিয়ে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত জলকণাসমূহে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয়ে অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করেছে। মাথার উপর উদার অনন্ত আকাশ। নিম্নে এক দিকে পার্ব্বত্য প্রান্তরের বুকে ঘর-বাড়ী, যেন ছেলেদের খেলাঘরের মত দৃশ্যমান। অন্য দিকে সীমাচলম-প্রসারিত সমুদ্রের সুনীল বক্ষে সফেন তরঙ্গমালার নৃত্য চলছে অবিরাম, অবিশ্রান্ত। দূর দিকচক্রবালের কাছে আকাশ নত হয়ে পড়েছে গভীর স্নেহে সমুদ্রের বুকে। সমুদ্র দুধার, বিরাটের উদ্দেশে প্রদান করছে মুঠো মুঠো শুভ্র ফেনপুষ্পের অর্ঘ্য।

আকাশ এবং সমুদ্রের মহামিলনের দৃশ্য দেখতে দেখতে মগ্ন হয়েছিল বিরাটের অনুধ্যানে অন্তর, ভাবছিলাম এই মহা জগতের মধ্যে আমার ব্যক্তি-সত্তার অস্তিত্ব কতই না অকিঞ্চিৎকর! কেমন একটা বৈরাগ্যের ভাব যেন আচ্ছন্ন করেছিল সমস্ত অন্তরকে—উৎসাহ উদ্যমকে করে দিয়েছিল মন্দীভূত।

চমক ভাঙল গাইডের তাড়ায়। তাড়াতাড়ি না গেলে নাকি বাস ধরা যাবে না। তার কথায় যেন আবার আত্ম-সচেতন হয়ে উঠলাম। অনন্তপ্রসারিত সমুদ্রের উপর মহাকাশের নিঃসীম শূন্যতা ভিক্ষুকদের মত মনকে উদাস বিবাগী এবং নির্ব্বেদগ্রস্ত করে দিয়েছিল বটে, কিন্তু আবার পায়ের নীচে অনুভব করলাম রূঢ় বাস্তবের অনুভূতি—কঠিন মৃত্তিকার স্পর্শ। ধরণীর ধূলিধূসর সঙ্কট-সঙ্কুল দুর্গম পথেই তো আমার এ জীবনের তীর্থযাত্রা। সম্মুখে অনন্ত পথ—এগিয়ে যেতে হবে আরও আরও দূরে, নব নব আলোক-তীর্থের সন্ধানে—সুখ-দুঃখের অমৃত ও গরলে জীবনের পাত্র হয়ে উঠবে কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

শ্রান্ত চরণে আবার নূতন করে গতিবেগ সঞ্চারিত হ'ল—দ্রুত পদক্ষেপে সোপান-পথ বেয়ে নিচে অবতরণ করতে লাগলাম।*

* এই প্রবন্ধের ছবিগুলি শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত।

মানবের অধিকার

শ্রীঅমলেন্দু সেন

নানা রকম অর্থে আমরা 'অধিকার' কথাটিকে প্রয়োগ করে থাকি। বিনা বাধায় যা-কিছু আমরা করতে পারি অথবা আমাদের পাওয়া উচিত, সে সবেই আমাদের অধিকার। কিন্তু রবিবার বেলা ন'টা পর্য্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকবার অধিকার, টিকিট কেটে ট্রাম গাড়ীতে চড়বার অধিকার, আর স্বাধীন থাকবার অধিকার, ঠিক এক জাতের জিনিষ নয়। সেকথা বোঝা যাবে আইনের সঙ্গে এদের সম্বন্ধের বিষয় বিবেচনা করলে।

প্রথমটিকে নিয়ে আইন অথবা রাষ্ট্র মাথা ঘামায় না, ঘামাতেও কেউ বলে না। দ্বিতীয়টির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সবই নির্ভর করে আইনের উপর, এবং সে আইনও সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ কতকগুলি অবস্থার ফলে এবং স্থানবিশেষে। দেশ-কালপাত্রভেদে এ ধরণের অধিকারেরও বিভিন্নতা হয়ে থাকে, এর প্রয়োজন সমগ্র মানবজাতির পক্ষে সমান নয়। যেখানে এ সব অধিকারের ব্যবস্থা আছে, সেখানেই এরা আছে, নইলে নেই।

কিন্তু তৃতীয়টির বিষয়ে সেকথা খাটে না। এ জাতের অধিকার মানুষ মাত্রেরই জন্মস্বত্ব, কর্ণের কবচকুণ্ডলের মত সহজাত। মানব-পরিবারের প্রতি ব্যক্তির এ অধিকার আছে। আইন তাকে সৃষ্টি করে না, মেনে নেয়। অনেক সময়ই আইন অথবা রাষ্ট্র তা করতে চায় নি, জোর করে তাদের দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে হয়েছে। এইজন্য যে, স্বীকৃতি না পেলে অধিকারের মূল্য থাকে না। গাঁয়ে না মানলেও আপনি মোড়ল হওয়ার মধ্যে আর যা-ই থাকুক না কেন, নিশ্চয়তা নেই।

অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা যত দিন ব্যক্তিবিশেষ অথবা সম্প্রদায়-বিশেষের হাতে থেকে এসেছে, তত দিন তারা জনসাধারণের এই মূলগত অধিকারগুলি মেনে নিতে চায় নি। বঞ্চনার বিক্ষুব্ধ হয়ে এর প্রতিবাদে গণ-বাসুকী বারবার মাথা নাড়া দিয়েছে, রাষ্ট্রের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলমল করে উঠেছে তার ফলে। উষ্ণ নরশোণিতে প্লাবিত হয়ে গিয়েছে মেদিনী। তা ছাড়া, এই বঞ্চনার ফলে সমগ্র মানবজাতিরই উন্নতি ব্যাহত হয়েছে,

কেননা 'যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে'।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জ গঠনের সময় একথা উঠল। তার ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের সাত জায়গায় মানুষের সহজাত অধিকারগুলি রক্ষা করবার কথা বলা হয়েছে। সনদের ৫৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সকলেই চেষ্টা করবেন যাতে প্রত্যেকটি মানুষ এই অধিকারসমূহ ভোগ করতে পায়।

কিন্তু এই অধিকারগুলি যে কি কি, তা সনদে বিস্তারিত ভাবে বলা সম্ভব হয় নি। এর চার বৎসর আগে আটলান্টিক চার্টারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী চার্চিল মোটামুটি ভাবে বলেছিলেন যে, মানুষের চার রকম স্বাধীনতা থাকা দরকার—বাক্যের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, অভাব থেকে মুক্তি, আর ভয় থেকে মুক্তি। সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের সনদে সে কথাগুলি স্পষ্টতর হ'ল। তার পর সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জ গঠিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষৎ এই অধিকার এবং স্বাধীনতাগুলি কি কি, তা নির্ণয় করে লিপিবদ্ধ করবার ভার পেলেন।

এই কাজটিকে তিন ভাগ করে নেওয়া হ'ল। প্রথমতঃ, মানবের অধিকারগুলি কি কি, তা নির্ধারণ ও ঘোষণা করা; দ্বিতীয়তঃ, ঐগুলি সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র সম্পাদন করা; তৃতীয়তঃ, ঐ ঘোষণা আর চুক্তিপত্র অনুযায়ী কাজ সুরু করা।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষৎ এ কাজের জন্যে ১৮টি রাষ্ট্রের সদস্য নিয়ে এক সভা গঠন করলেন, তার নাম হ'ল 'হিউম্যান রাইট্‌স্ কমিশন' বা মানবাধিকার-আয়োগ। এই আঠারটি রাষ্ট্রের মধ্যে ভারত একটি। সভাপতি হলেন আমেরিকার মিসেস্ রুজভেল্ট। ফ্রান্সের অধ্যাপক রেনে ক্যাসাঁ হলেন অন্যতম সহ-সভাপতি। পৃথিবীর সমুদয় দেশের শাসনতন্ত্র সংগ্রহ করে কাজ আরম্ভ হ'ল। তা থেকে জানা গেল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষ কি অধিকার পেয়েছে, আর আজও কি অধিকার পায় নি।

এ বিষয়ে দেশে দেশে পার্থক্য আছে বিস্তর। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে অস্পৃশ্যতা বর্জন একটা বড় কথা বলে গণ্য হয়েছে, কিন্তু অস্ত্র-ধারণের অধিকারকে আমল দেওয়া হয় নি। অথচ আমেরিকার শাসনতন্ত্রের বিধান এর বিপরীত। অর্থাৎ সমাজভেদে অধিকারেরও প্রয়োজনভেদ হয়।

কিন্তু এমন কতকগুলি অধিকার আছে যা দেশজাতিনির্বিশেষে মানুষমাত্রেই চেয়ে এসেছে। কোথাও পেয়েছে, অনেক জায়গায়ই পায় নি। সমগ্র মানবজাতির জন্য সাধারণ ভাবে একটা অধিকার-ঘোষণা-পত্র রচনা করতে হলে এই অধিকারগুলিই যথাযথভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন।

তার প্রথম খসড়া লিখলেন অধ্যাপক ক্যাসাঁ। তাঁর এই লেখায় ৪৪টি প্রকরণ নিয়ে অনেক আলোচনার পর ২৮টি খাড়া করান হ'ল। তার পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের মহাসভার (জেনারেল অ্যাসেম্বলি) যে অধিবেশন হয়, সেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের পক্ষ থেকে এই পাণ্ডুলিপিটি দাখিল করা হয়। এর আলোচনা হয় ৮৫টি অধিবেশনে—সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের ইতিহাসে দীর্ঘকাল-স্থায়ী আলোচনা এইটিই।

শেষে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে মহাসভা এই পাণ্ডুলিপি সংশোধিত আকারে অনুমোদন করেন। তখন এর নাম হয় "সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা" (ইউনিভার্সাল ডিক্লেয়ারেশন অফ হিউম্যান রাইট্‌স্)। আর বলে দেওয়া হয় যে, প্রতি বৎসর ১০ই ডিসেম্বর তারিখটি 'মানবাধিকার দিবস' বলে গণ্য করা হবে:

ঘোষণাটি কি, তা এবার দেখা যাক। এর প্রথমেই আছে একটি প্রস্তাবনা। তাতে যা বলা হয়েছে তা মোটামুটি এই—

"যেহেতু মানব-পরিবারের প্রতি ব্যক্তির সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারগুলির এবং সহজাত মর্য্যাদার উপর প্রত্যাই পৃথিবীতে স্বাধীনতা, ন্যায় ও শান্তির ভিত্তিস্বরূপ,

"যেহেতু মানবসাধারণের কামনায় ধন এমন একটি জগৎ যেখানে প্রত্যেক মানুষ বাক্যে এবং মনে স্বাধীনতা এবং ভীতি ও অভাব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাস করিতে পারে,

"যেহেতু এই অধিকারগুলি বিধিমতে রক্ষিত না হওয়াতে জগতে বারংবার শোণিতক্ষয়ী বিপ্লবের উৎপত্তি হইয়াছে,

"যেহেতু সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত জাতিসমূহ তাঁহাদের সনদে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মানবের মৌলিক অধিকারগুলিতে, এবং ব্যক্তিগত মর্য্যাদায় ও নরনারীনির্বিশেষে সমানাধিকারের উপর তাঁহারা শ্রদ্ধাশীল, এবং মহত্তর স্বাধীনতার মধ্যে মানব-সমাজের উন্নতি ও জীবনযাপনের মান উন্নয়ন করিতে তাঁহারা কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন,

"যেহেতু এই অঙ্গীকার পূর্ণভাবে পালন করিতে হইলে মানবের এই স্বাধীনতা ও অধিকারগুলি কি, তাহার সম্যক উপলব্ধি আবশ্যক,

"অতএব মহা-সভা মানবাধিকারস্বীকৃতির এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ব্যক্তি এই আদর্শগুলি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান্ হউন।"

এর থেকে দেখা যায় যে, মানুষের ব্যক্তিগত মর্যাদা দেশ-পাত্রনিরপেক্ষভাবে এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তি। এর ত্রিশটি প্রকরণ আছে।

প্রথম দুটিতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তিগত মর্য্যাদার স্বীকৃতির উপরে যে সব অধিকার এবং স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, সেগুলি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল নরনারীর সমানভাবে প্রাপ্য।

সভ্য-সমাজে বহুকাল থেকে যে সব প্রাথমিক অধিকার স্বীকৃত হয়ে এসেছে, সেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তৃতীয় থেকে পঞ্চদশ প্রকরণে। বেঁচে থাকবার, স্বাধীন থাকবার, নিরাপদে বাস করবার, আইনের চক্ষে সমান বলে গণ্য হবার এবং ন্যায়বিচার পাবার অধিকার,—এগুলির উল্লেখ হয়েছে সকলের আগে। তার পর বলা হয়েছে যে দাসপ্রথা থাকবে না, কোনও অপরাধেই নির্যাতন করা কিংবা অমানুষিক বা অপমানকর শাস্তি দেওয়া চলবে না, এবং কাউকে বেআইনী-ভাবে গ্রেপ্তার করা হবে না। পারিবারিক জীবনে, বাসগৃহে এবং চিঠিপত্র আদানপ্রদানের ব্যাপারে খামখেয়ালীভাবে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। অবাধে চলাফেরা করবার, উৎপীড়ন এড়াবার জন্য দেশান্তরে গিয়ে আশ্রয় পাবার এবং কোনও না কোনও রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভ করবার সুযোগ সকলকেই দেওয়া হবে।

এর পর ষোড়শ প্রকরণ। তাতে বলা হয়েছে যে, বিবাহ ব্যাপারে নরনারীমাত্রেরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। সপ্তদশ প্রকরণে মানুষমাত্রেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখবার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ প্রকরণের বিষয় হ'ল ধর্ম্ম, মত ও বাক্যের স্বাধীনতা। বিংশ ও একবিংশ প্রকরণে নরনারীনির্বিশেষে সকলেরই শান্তিপূর্ণ সভায় যোগদান করবার এবং স্বদেশের শাসনব্যাপারে কিছু-না-কিছু ক্ষমতা পাবার অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে।

আধুনিক কালের প্রয়োজনে যে সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার মানুষমাত্রেরই থাকা উচিত বলে মনে করা হয়, সেগুলির কথা বলা হয়েছে দ্বাবিংশ থেকে ষড়্‌বিংশ প্রকরণে। তার মধ্যে প্রথম হ'ল কাজ করবার অধিকার। তার পর ক্রমে এসেছে ছুটি এবং ছুটির মাইনে পাবার, নিজের মনোমত কাজে লাগবার, ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেবার এবং সমান কাজের জন্য সমান মাইনে পাবার অধিকারের কথা। তা ছাড়া, কর্ম্মীরা যাতে মানুষের মত হয়ে বাঁচতে পায়, তার উপযোগী আয়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি পাবার অধিকার এতে স্বীকার করা হয়েছে।

সপ্তবিংশ প্রকরণে বলা হয়েছে যে, সমাজ-জীবনে কাউকে এক পাশে ঠেলে রাখা চলবে না। এ ছাড়া, বিজ্ঞানের সমস্ত দান সমানভাবে ভোগ করতে পারে সকল মানুষই।

মূলগত অধিকারগুলির কথা এইখানেই শেষ।

অতঃপর অষ্টাবিংশ প্রকরণে বলা হয়েছে সকল দেশের সহযোগিতা হলেই এই অধিকারগুলি পূর্ণভাবে লাভ করা সম্ভব। আর একথাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অধিকার পেলেই সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য মেনে নিতে হয়। সর্ব্বসাধারণের নীতিবোধ, শৃঙ্খলা এবং মঙ্গলের পরিপন্থী যাতে না হয়, শুধু এমন ভাবেই স্বাধীনতা বা অধিকার ভোগ করা যেতে পারে।

সার্ব্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার শেষ অর্থাৎ ত্রিংশ প্রকরণে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল বিভিন্ন রকমের অধিকার প্রচলিত আছে, তার কোনটি ক্ষুন্ন হতে পারে এমন ভাবে যেন এই ঘোষণার কোনও অর্থ করা না হয়।

যে যে অধিকারের কথা এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত হয়েছে তা শুনলে হয়তো মনে হতে পারে যে, এ তো নিতান্তই মামুলি কথা। কিন্তু তা নয়। হয়তো কতকগুলি দেশে বহুকাল থেকে এর অনেকগুলিই মেনে নেওয়া হয়ে আসছে, কিন্তু প্রত্যেক দেশেই এই প্রতিটি অধিকারলাভের পিছনে আছে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। আর আজও এ সকল অধিকারে বঞ্চিত হয়ে আছে, এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে নিতান্ত কম নয়।

এর থেকেই বোঝা যাবে যে, এই ঘোষণার গুরুত্ব মানব-সভ্যতার ইতিহাসে উপেক্ষণীয় নয়। পৃথিবীর ৫৮টি (এখন ৬০টি) রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের মহাসভা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের কতক-গুলি জন্মগত অধিকার আছে, এবং তাঁরা সমস্ত মানবসমাজকে সেই অধিকারগুলিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান—এ এক অদ্ভুত-পূর্ব্ব ব্যাপার।

শুধু ঘোষণাই নয়। ঘোষণানুযায়ী কাজ কি ভাবে হবে, মানবাধিকার-আয়োগ সে বিষয়েও একটি আন্তর্জ্জাতিক চুক্তিপত্র (ইণ্টারন্যাশনাল কভনাণ্ট অব হিউম্যান রাইটস্) রচনা করেছেন। এটা মানবাধিকার সম্পর্কিত আয়োজনের দ্বিতীয় ধাপ।

একথা অবশ্য ঠিক যে, সার্ব্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রটি কোনও মানুষ কিংবা রাষ্ট্রের উপর বাধ্যতামূলক নয়। সমগ্র মানবজাতির সামনে একটি আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে, এবং তদনুযায়ী কাজ করবার চেষ্টা হচ্ছে—এটুকু মাত্র। সব আদর্শের মত এরও সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সেই বিরাট মানবসমাজের উপর, যাদের জন্য এটি রচিত হয়েছে। বাধা অনেক, কিন্তু ভরসা এই যে, মানব-পরিবারের একটা বৃহৎ অংশ, সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি এ ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছেন।

আদিগঙ্গা নদী

শ্রীকালিদাস দত্ত

বর্ত্তমানে কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণে, খিদিরপুরের উপর দিয়া প্রবাহিত হুগলী নদীর আকার দেখিলে উহা কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী গঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর নিম্নাংশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ভাগীরথী নদীর নিম্নাংশ নহে।

বঙ্গোপসাগর হইতে হাওড়া জেলার দক্ষিণে, অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর মোহানা পর্য্যন্ত উহার যে অংশ তাহা হলদী, রূপনারায়ণ, দামোদর ও সরস্বতী এই তিনটি নদীর নিম্ন ভাগ এবং সরস্বতীর মোহানা হইতে কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে অংশ তাহা একটি কৃত্রিম প্রবাহ। প্রবাদ, জলপথে সমুদ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রাচীন কালে, বর্ত্তমান কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণে, ভাগীরথী হইতে একটি খাল খনন করিয়া সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত করা হয় এবং উক্ত খালই কালক্রমে প্রবল হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করে। এইজন্য হিন্দুগণ আজিও হুগলী নদীর ঐ অংশে, উহা কৃত্রিম বলিয়া গঙ্গাস্নান বা উহার তীরে শবদাহ করেন না। তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে কালীঘাটের উপর অধুনা টালীর নালা বা আদিগঙ্গা নামে খালের আকারে ভাগীরথীর শাখা রূপে যে প্রবাহ বিদ্যমান আছে তাহাতেই গঙ্গাস্নানাদি করেন। দক্ষিণ কলিকাতার হিন্দু শবদাহ ক্ষেত্রও সে কারণ সাহানগর বা কেওড়াতলা শ্মশান নামে উহার উপরই অবস্থিত।

উহাই প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদীর নিম্নাংশ ছিল এবং কালীঘাটের দক্ষিণ হইতে রসা, বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, মাহিনগর, বারুইপুর, নাচনগাছা (বর্ত্তমান সূর্য্যপুর), মূলটী, দক্ষিণ-বারাসাত, বড়ু, গঙ্গাঘাটা, জয়নগর-মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, ফুটিগোদা, সাতঘরা, জলঘাটা, ছত্রভোগ, বড়াশী ও খাড়ি প্রভৃতি গ্রামগুলির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সুন্দরবন অতিক্রমকরতঃ বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইত।

কালীঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত উক্ত গ্রামগুলির উপর আদিগঙ্গা নদীর ঐ অংশের মজাগর্ত্ত মথুরাপুর থানার অধীন বড়াশী পর্য্যন্ত এখনও স্থানে স্থানে কোথাও খালের আকারে আবার কোথাও গঙ্গার বাদা বা মজাগঙ্গা নামে ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া বর্ত্তমান আছে। এ অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীরা আজিও ঐ সমস্ত নিম্নভূমিতে শবদাহ করে ও ঐ সকল স্থানে খনিত পুষ্করিণীসমূহের জল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের গঙ্গামাহাত্ম্যে প্রদত্ত ব্যবস্থানুসারে গঙ্গাজল রূপে ব্যবহার করে।[১] ঐ সকল পুষ্করিণীও তজ্জন্য উহাদের স্বত্বাধিকারিগণের বংশের পদবী মত ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। ঐ সমস্ত কারণে কালীঘাটের দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর ঐ প্রাচীন পথ এখনও সঠিক নির্দ্ধারণ করা যায়।
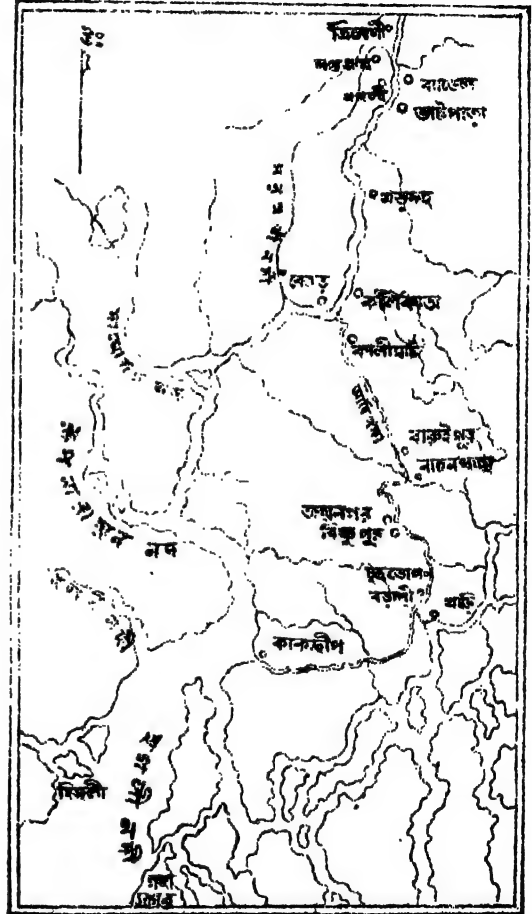
আদিগঙ্গা নদী
প্রাচীন মানচিত্র অবলম্বনে

কালীঘাটের পার্শ্ববর্ত্তী গঙ্গার প্রাচীন খাদ মজিয়া আসিলে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল টলী নামক জনৈক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার খনন করান। তৎপূর্ব্বে উহা একটি নালার

---

১ "প্রবাহ মধ্যে যচ্ছেদহেতু অত্র সলিল প্রবাহিতত্বাম দোষঃ। অতথা ইদানীং গঙ্গায়া সাগর গামিত্বানুপপত্তেঃ। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, গঙ্গামাহাত্ম্য। শ্রীরামপুর সংস্করণ (১৮৩৪), পৃঃ ২৯১

আকারে বর্ত্তমান কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণ হইতে প্রাচীন গোবিন্দপুর২ গ্রামের উপর দিয়া কালীঘাট পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল এবং ইংরেজগণ ঐ নালাটিকে গোবিন্দপুর ক্রীক বলিত।৩

বর্ত্তমান খিদিরপুর পুলের পশ্চিমে উক্ত আদিগঙ্গা নদীর যে অংশটি হুগলী নদীর সহিত সংযুক্ত আছে উহাও টলী সাহেবের দ্বারা খনিত নূতন প্রবাহ। গঙ্গার পুরাতন পথ, উক্ত গোবিন্দপুর ক্রীকের উর্দ্ধাংশ, আরও উত্তরে ছিল। এখন উহার আর কোন চিহ্ন নাই।

ফনডেন ব্রুক, থরনটন প্রভৃতি ইউরোপীয়গণের দ্বারা প্রস্তুত খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের মানচিত্রগুলিতে কালীঘাটের উপর দিয়া প্রবাহিত আদিগঙ্গা নদীর উক্ত প্রাচীন প্রবাহের চিত্র আছে। ঐ সকল মানচিত্রে উহা বেশ প্রশস্ত দেখা যায়। কিন্তু ঐ মানচিত্রগুলি প্রকৃত জরিপ কার্য্যের দ্বারা প্রস্তুত নহে বলিয়া ঐগুলিতে উহার আকার ও অবস্থান সর্ব্বত্র যথাযথ রূপে প্রদর্শিত হয় নাই। ইউরোপীয়গণের পুরাতন মানচিত্রগুলির মধ্যে রেণেলের অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের মানচিত্রখানিই প্রকৃত জরিপ কার্য্যদ্বারা প্রস্তুত।৪ সে কারণ উহাতেই ঐ প্রবাহের পথ সঠিক অঙ্কিত আছে। কিন্তু উহা তখন মজিয়া আসায় রেণেল উহাকে একটি বিচ্ছিন্ন ও সংকীর্ণ খালের আকারে বর্ত্তমান কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ হইতে কালীঘাট ও পূর্ব্বোক্ত বারুইপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি জনপদের উপর দিয়া ইদানীন্তন সুন্দরবন প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত নালুয়া গাঙ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।৫

সে কারণ ঐ সময় নালুয়ার দক্ষিণে ছত্রভোগ, বড়াশী ও খাড়ি প্রভৃতি স্থানে উহার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা ঠিক জানা যায় না। ঐ সকল স্থানে ভাগীরথী নদী ঐ সময়ের কত দিন পূর্ব্বে মজিয়া গিয়া উহার উত্তর ও দক্ষিণাংশের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহাও অজ্ঞাত। প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত, বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত নিমতা গ্রাম-নিবাসী, কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যে ছত্রভোগ দিয়া উক্ত নদীপথে যাতায়াতের বিবরণ আছে।৬ ঐ অঞ্চলে তৎকালে গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ থাকিলেও উহা সম্ভবতঃ খুব সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কারণ ঐ জলপথ প্রবল থাকিলে উক্ত গ্রন্থখানি রচনার কিছু পরে প্রস্তুত রেণেলের পূর্ব্বোক্ত মানচিত্রে উহা নিশ্চিত প্রদর্শিত হইত। যেহেতু রেণেলের বঙ্গদেশীয় নদীসমূহের জরিপ কার্য্যের আদেশপত্রে তৎকালীন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট সাহেব তাঁহাকে ৩০০ মণ পর্য্যন্ত দ্রব্যবাহী নৌকা যাতায়াতের পক্ষে সুগম এরূপ নদীগুলিও তাঁহার উক্ত মানচিত্রে প্রদর্শন করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।৭

রেণেলের মানচিত্রে ছত্রভোগে কোন নদী প্রদর্শিত না থাকায় বুঝা যায় যে, ঐ সময় হয় সেখানে বড় জলযান যাতায়াতের পক্ষে গঙ্গা সুগম ছিল না অথবা উহা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। গঙ্গার প্রাচীন পথ কলিকাতার দক্ষিণে ঐ সময়ের পূর্ব্বকাল হইতেই স্থানে স্থানে রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সে কারণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর মনসার ভাসান ও মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্যে দেখা যায় যে, তৎকালে কালীঘাট দিয়া আদিগঙ্গা পথে ছত্রভোগে আসিতে হইলে স্থানে স্থানে গঙ্গার প্রাচীন খাদ ত্যাগ করিয়া হলীয়ার গাঙ ও হাঁসুড়ি প্রভৃতি স্থানের পাশ দিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইত।৮

---

২ বর্ত্তমান কলিকাতা দুর্গ (ফোর্ট উইলিয়াম) ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী ময়দান প্রভৃতি স্থান প্রাচীন গোবিন্দপুর গ্রামের অন্তর্গত ছিল। যে কয়টি পুরাতন গ্রাম লইয়া প্রথমে কলিকাতা মহানগরীর পত্তন হয় গোবিন্দপুর তন্মধ্যে একটি।

3. "To the north of Alipur flows Tolly's Nullah, called after Colonel Tolly. . . . This Nullah was formerly called Govindapur Creek. Colonel Tolly excavated a portion of this creek in 1775. . . . It is supposed that Ganges once flowed on the site of the Tolly's Nullah."—*Good Old Days of John Company.* By W. H. Carrey. Vol. II, page 157.

4. *The Survey of Bengal* by Major James Rennel, F.R.S. (1764—1777). By Major F. C. Hirst, Director of Surveys, Bengal.

5. *Rennel's Atlas,* Plate 5, Parts 1 & 2.

৬ "পাটের পাথর যত, বাহিতে বড়ই ব্রত, ছাড়াইল
দুর্জ্জয় মগরা।
পোজাগা বাহিয়া চলে, কর্ণধার কুতূহলে, থানাই
বেতাই কৈল পাছে।
সারি সারি ভূমি ভূমি, কাক দ্বীপ গঙ্গারতি, ছাড়াইল
বণিকের রাজে।
টাবাখোল পাছু আর, গঙ্গা যাবার করি স্নান
উপনীত হইল ছত্রভোগ।
অম্বুলিঙ্গ মহাস্থান, সাধি যায় উপবাস, তথায়
বন্দিল বিশ্বনাথ।
বাদ্য বাজে সুমধুর বহিয়া যাত্রা বিষ্ণুপুর,
জয়নগর করিল পশ্চাৎ।" (রায়মঙ্গল)

7. *The Surveys of Bengal* by Major James Rennel. Major F. C. Hirst, page 11.

8. *Monographs of the Varendra Research Society,* No. 4, pages 16 and 17.

ঐ সকল গ্রন্থে চাঁদ, ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি বণিকগণের ভাগীরথী নদীর ঐ অংশ দিয়া বাণিজ্যের জন্ম পুনঃপুনঃ সিংহলে যাতায়াতের বৃত্তান্তগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে উহা নিম্নবঙ্গের সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি প্রধান পথ ছিল। সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে উহার উভয় তীরবর্ত্তী ভূভাগে প্রাচীন মনুষ্যাবাসের যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় দেখিলে বুঝা যায় যে, উহার উভয় কূলে গঙ্গাসাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত সুদূর অতীতকাল হইতে বহু সমৃদ্ধ লোকালয় থাকায় বণিক ও যাত্রিগণের যাতায়াতের পক্ষে ঐ পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ছিল।৯ ভাগীরথীর ঐ অংশের শুষ্ক গর্ভে স্থানে স্থানে ভূগর্ভ খননকালে অনেক প্রাচীন জাহাজের ভগ্নাবশেষ, যথা ভগ্নমাস্তুল, তক্তা ও লৌহ নির্ম্মিত শিকল, নঙ্গর প্রভৃতি দ্রব্যাদিও পাওয়া গিয়াছে। ছত্রভোগ ও খাড়ি প্রভৃতি স্থানে খোঁজ করিলে এখনও ঐরূপ অনেক প্রাচীন দ্রব্য সংগ্রহ করা যায়।

কালীঘাটের দক্ষিণে ভাগীরথীর ঐ অংশ কালক্রমে মজিয়া সংকীর্ণ হইলে ঐ পথে সমুদ্রে যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। তখন হুগলী নদীর বর্ত্তমান নিম্নাংশ দিয়া সরস্বতী নদী অবলম্বনে সমস্ত সমুদ্রগামী পোতাদি সপ্তগ্রাম বন্দরে যাতায়াত করিত। সে কারণ ঐ সময় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দররূপে সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি খুবই বর্দ্ধিত হয়। পরে সরস্বতী নদী সেখানেও মজিতে আরম্ভ করিলে বাণিজ্যের সুবিধার জন্ম পর্ত্তুগীজদের দ্বারা হুগলীর বন্দর স্থাপিত হয়।

ইটালীয় পর্য্যটক সিজার ফেডারিকের ১৫৬৩ হইতে ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতভ্রমণ বিষয়ক পুস্তকে দেখা যায় যে, তৎকালে সমুদ্রগামী জাহাজ বর্ত্তমান হুগলী নদীর নিম্নাংশ দিয়া বেতড়ের সন্নিকট পর্য্যন্ত আসিতে পারিত এবং লোকে তথা হইতে নৌকা বা বজরায় সপ্তগ্রামে যাইত।১০ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুরাতন কার্য্য-বিবরণীতেও উল্লিখিত আছে যে, তখন পর্ত্তুগীজগণ বড় বড় মালবাহী জাহাজ কলিকাতার দক্ষিণে গার্ডেনরিচে রাখিতেন এবং গার্ডেনরিচের উত্তরে যাইবার জলপথ প্রশস্ত না থাকায় সেখানে পণ্যদ্রব্যাদি নামাইয়া ঐস্থানের বিপরীত দিকে অবস্থিত বেতড়ে বিক্রয় করিতেন। সে কারণ বেতড়ে একটি বিখ্যাত গঞ্জ বসিত।১১

প্রবাদ, বাণিজ্যপোতের গার্ডেনরিচের উত্তর দিকে যাইবার অসুবিধা দূর করিবার জন্ম পর্ত্তুগীজগণ, আবার কাহারও কাহারও মতে মোগলেরা আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে গার্ডেনরিচ হইতে কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত খাল খনন করান১২ এবং তাহার ফলে ভাগীরথীর জলরাশি প্রবল বেগে দক্ষিণে প্রবাহিত হওয়ায় আদিগঙ্গা নদী, যাহা স্থানে স্থানে মজিয়া তখনও সংকীর্ণ আকারে বর্ত্তমান ছিল, ইহার পর হইতে সত্বর লুপ্ত হইয়া যায় ও কলিকাতার দক্ষিণ হইতে গার্ডেনরিচ পর্য্যন্ত হুগলী নদীর উক্ত কৃত্রিম অংশ প্রবল আকার প্রাপ্ত হয়। কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণে ঐ খাল প্রথমে কোন্ সময় কাহার দ্বারা খনিত হয় তাহা সঠিক জানা না গেলেও উহা যে কৃত্রিম এই প্রবাদ বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও জনৈক ইংরেজ উহা তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :

"To the south, a branch of the Hoogly flows into the Sundarbans. It is called by the Europeans, Tolly's Nullah, but the natives regard it as true Ganga, the wide stream being as they pretend, the work of human and impious hands, at some early period of their history. In consequence no person worships the river between Kidderpur and the sea, while the insignificant ditch enjoys all the same divine honours which the Ganges and the Hoogly river enjoys at the earlier parts of their course." 3

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কালীঘাট হইতে বর্ত্তমান মথুরাপুর থানার অন্তর্গত বড়াশী গ্রাম পর্য্যন্ত ভাগীরথীর মজাগর্ভ স্থানে স্থানে বিদ্যমান থাকায় উহার প্রাচীন পথ এখনও উক্ত বড়াশী গ্রামের দক্ষিণে কিছুদূর নাগাদ সঠিক জানিতে

9. *Monographs of the Varendra Research Society*, Nos. 3, 4 and 5.

১০ সমসাময়িক ভারত, ঊনবিংশ খণ্ড—যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার। পৃষ্ঠা ১১।

11. "Garden Reach a little to the south, had in bygone days been the great anchoring place of the stately Portuguese ships, and at Betor on the opposite side each year was built afresh the temporary markets in which they exposed their imports for sale. Higher up ships could go at extreme peril."
Fifth Report on the Affairs of the East Indian Company. Edited by Ferminger (R. Cambray & Co., 1917), p. lxiv.

১২ বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ।—রায় নারায়ণ বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, পৃষ্ঠা ১০

13. *Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India from Calcutta to Bombay*, (1824—1825). By Bishop Reginal Herber. Vol. I, page 31.

পাওয়া যায়। কিন্তু তৎপরে উহা কোন্ পথে সুন্দরবনের মধ্য দিয়া সাগরে পড়িত তাহা এত দিন নির্দ্ধারিত হয় নাই। সুন্দরবনের মধ্যে এখন যে সমস্ত নদী প্রবাহিত আছে সেগুলির অধিকাংশের প্রাচীন নাম বহুকাল ঐ অঞ্চল জনশূন্য হইয়া দুর্গম বনমধ্যে থাকায় অজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে। সে কারণ উহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনকালে গঙ্গা বা ভাগীরথী নামে অভিহিত হইত তাহা জানা যায় না। সুন্দরবনের নদীসমূহ সংখ্যায় বহু ও গঙ্গাসম্ভূত বলিয়া পূর্ব্বে শতমুখী গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পুরাতন বাংলা গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও চৈতন্যভাগবতে উহাদের ঐ নামে উল্লেখ আছে। চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচল যাইবার জন্য গঙ্গাতীর অবলম্বনে ছত্রভোগে আসেন তখনও ছত্রভোগের দক্ষিণে প্রবাহিত নদীগুলিকে লোকে শতমুখী গঙ্গা বলিত। যথা :

"এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহাকুতূহলে॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হইয়া শতমুখী।
বহিতে আছয়ে সর্ব্বলোকে করে সুখী॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি বলে সর্ব্বজনে॥"১৪

চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত উক্ত অম্বুলিঙ্গ ঘাটের অবস্থান এখনও সঠিক জানা যায় নাই।

বর্ত্তমান ছত্রভোগ গ্রামের দক্ষিণে বড়াশী গ্রামে উক্ত অম্বুলিঙ্গ নামে শিবের একটি প্রাচীন লিঙ্গমূর্ত্তি মজাগঙ্গার পশ্চিম তীরে দেখা যায়।১৫ ঐ ঘাটে সম্ভবতঃ ঐ দেবালয়ের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে কোন স্থানে ছিল। অম্বুলিঙ্গের বর্ত্তমান মন্দিরের অনতিদূরে ভাগীরথীর মজাগর্ভের উপর চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ একটি তীর্থক্ষেত্র আছে।১৬ প্রবাদ ভগীরথ গঙ্গাকে ঐস্থানে চিনিতে না পারায় গঙ্গা তাঁহাকে সেখানে তাঁহার হস্তস্থিত চক্র দেখাইয়া নিজ স্থান নির্দ্দেশ করেন। ঐ স্থানটি হইতে ভাগীরথী প্রাচীনকালে বহু শাখায় বিভক্ত থাকায় উহার মূল প্রবাহ নির্ণয় করা কঠিন হইত বলিয়া সম্ভবতঃ উক্ত রূপ প্রবাদের সৃষ্টি হয়।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানকালে পশ্চিম সুন্দরবনে প্রবাহিত উক্ত শতমুখী গঙ্গা নামে গঙ্গার বহু শাখা নদীর মধ্যে প্রাচীন ছত্রভোগের দক্ষিণে কোন্‌টি গঙ্গার মূল প্রবাহ ছিল তাহা সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। কারণ সুন্দরবনের প্রাচীন লোকালয়সমূহ ধ্বংস হইয়া ঐ অঞ্চল বহু দিন দুর্গম বনময় অবস্থায় থাকায় উহা অজ্ঞাত হইয়া যায়। এইজন্যই সম্ভবতঃ গঙ্গানদীর ঐ অংশ রেনেলের অষ্টাদশ শতাব্দীর মানচিত্রে সুন্দরবনে প্রদর্শিত হয় নাই। উহাতে উহার কালীঘাটের দক্ষিণে প্রবাহিত অংশ ছত্রভোগের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত নালুয়া গ্রামের সান্নিধ্য পর্য্যন্ত প্রদর্শিত আছে।১৭ ঐ সময়ের পূর্ব্বে নালুয়ার দক্ষিণে ছত্রভোগ ও বড়াশী প্রভৃতি স্থানে উহার কিয়দংশ বোধ হয় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ও তৎপরে সুন্দরবনে উহার যে অবশিষ্ট অংশ সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল তাহা অজ্ঞাত হইয়া বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল।

পুরাতন মানচিত্র, বাংলা পুথি ও প্রবাদাদির সাহায্যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি সর্ব্বপ্রথম সুন্দরবন মধ্যে গঙ্গার মূল প্রবাহের পথ নির্দ্ধারণ করি ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ সরকারের সাহায্যে একটি মানচিত্রে উহা প্রদর্শিত হইয়া উক্ত সমিতির মনোগ্রাফে আমার সুন্দরবনবিষয়ক একটি প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হয়।১৮ তৎপরে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট বিভাগ কর্ত্তৃক উক্ত মানচিত্রে প্রদর্শিত গঙ্গার ঐ পথ নির্ভুল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।১৯

বড়াশীর দক্ষিণে বর্ত্তমান ২২ নম্বর লটের পশ্চিম পার্শ্ব হইতে যে মজা নদীটি একটি খালের আকারে চড়াগঙ্গা নামে প্রবাহিত হইয়া প্রাচীন ছত্রভোগ (বর্ত্তমান ছুতরভোগ) নদীতে মিলিত হইয়া গোবাদীয়া গাঙ্গে পড়িয়াছে ও পরে গোবাদীয়া গাঙ নামে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে গিয়া ঘিবাটি নদীতে মিশিয়াছে, উহাই প্রাচীনকালে আদিগঙ্গার মূল

১৪। চৈতন্যভাগবত, অন্ত খণ্ড, ২য় অধ্যায়

১৫। চৈতন্যভাগবত পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, প্রাচীন কালে ছত্রভোগ গ্রাম আকারে অনেক বড় ছিল এবং বর্ত্তমান বড়াশী গ্রাম উহার অন্তর্গত ছিল। উহার ঐ নাম খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পরে হইয়াছে।

১৬। গঙ্গাতীরস্থ এই চক্রতীর্থটি বহু প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে রচিত শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে ও বরাহ পুরাণে উহার উল্লেখ আছে। ইদানীং এই তীর্থে স্নান উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে নন্দার মেলা নামে একটি বড় মেলা হয়। উক্ত স্নানও প্রাচীন কালে প্রসিদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে লিখিত রায়মঙ্গল কাব্যে উহার উল্লেখ দেখা যায়।

17. *Rennel's Atlas*, Plate 52, Parts 1 & 2.

18. *Monographs of the Varendra Research Society*, No. 3.

19. *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of 24-Parganas for the Period of 1924-33*, pages 14 and 15. Map No. 4.

প্রবাহ ছিল। কারণ উহার কিয়দংশের উক্ত চড়াগঙ্গা নাম ব্যতীত উহার দক্ষিণাংশে, বর্ত্তমান গোবাদীয়া গাঙের অনতিদূরে গঙ্গাধারা নামে একটি প্রাচীন স্থান ছিল এবং পূর্ব্বে লোকে সেখানে গঙ্গাস্নান করিত। ১৮৪৭-১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত মেজর স্মিথের সুন্দরবনের মানচিত্রে গঙ্গাধারা নামক ঐ স্থানটি প্রদর্শিত আছে। পুরাতন গ্রন্থাদির মধ্যেও খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রচিত পূর্ব্বোক্ত রায়মঙ্গল কাব্যে কাকদ্বীপ ও চীয়াখোল নামক স্থান দুইটির পরে জনৈক বণিকের ভাগীরথী পথে স্বদেশ প্রত্যাগমনের বিবরণে তাঁহার উক্ত গঙ্গাধারা নামক স্থানে আগমনের ও তথায় গঙ্গাস্নানের উল্লেখ আছে।২০

গোবাদীয়া গাঙ দক্ষিণে গিয়া বর্ত্তমান ১১।১২।১৪ ও ১৪ নম্বর লটের দক্ষিণে পূর্ব্বোক্ত ঘিবাটী গাঙে পড়িয়াছে। প্রবাদানুসারে ঐ ঘিবাটী গাঙও আদিগঙ্গার পরবর্ত্তী অংশ। লোকে আজিও তজ্জন্য উহার উপর কাকদ্বীপের পার্শ্বে গঙ্গাস্নান ও শবদাহ করে। প্রাচীনকালে উহাই কাকদ্বীপের উপর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে সাগরদ্বীপে প্রবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ দিকে গমন করতঃ ধবলাট ও মনসার দ্বীপের মধ্য দিয়া সাগরে পড়িত।২১ এইজন্য উক্ত ধবলাটের পার্শ্বস্থ খালের মোহানায় প্রতি বৎসর পৌষ মাসে, মকর সংক্রান্তিতে ভারতবিখ্যাত গঙ্গাসাগর মেলার অনুষ্ঠান হয়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রস্তুত রেণেল ও এলিসনের সুন্দরবন প্রদেশের মানচিত্র দুইখানি দেখিলে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান সময় সাগরদ্বীপের পূর্ব্বদিকে মড়িগঙ্গা বা বারাতলা নদী নামে যে নদী আছে প্রাচীনকালে উহার উত্তরাংশ এই আদিগঙ্গা প্রবাহের অঙ্গীভূত ছিল এবং উহার দক্ষিণে গঙ্গার একটি শাখা খাড়ির আকারে প্রবাহিত ছিল। সে কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈদেশিকগণ উহাকে চ্যানেল ক্রীক বলিত।২২ তখন উহার বোধ হয় বারাতলা বা মড়িগঙ্গা নাম ছিল না। প্রাকৃতিক বিপ্লবে সাগরদ্বীপের ভূখণ্ডের রূপান্তর ঘটিলে সাগরদ্বীপস্থ গঙ্গার শেষাংশের সহিত উহার যোগ ছিন্ন হইয়া যায় এবং উহা দক্ষিণে প্রবাহিত শাখার সহিত মিলিত হইয়া হুগলীর জলরাশির চাপে প্রবল আকার ধারণ করে। প্রবাদ, সাগরসঙ্গমস্থ গঙ্গার সহিত উহার যোগ ছিন্ন হইলে উহা মড়ি বা মৃতাগঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ হয়।

সাগরদ্বীপের দক্ষিণে বর্ত্তমান সময় গঙ্গাসাগর খাল নামে যে খাল আছে উহাই সাগরদ্বীপে গঙ্গার পরবর্ত্তী অংশ। উহা দক্ষিণে মগরা নামক স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্ত সওদাগরের আদিগঙ্গা পথে সিংহল যাত্রার বিবরণে হাতীয়াঘরের পর মগরায় ঝড়বৃষ্টির বর্ণনা আছে।২৩ উক্ত মগরা যে সাগরদ্বীপের ঐ স্থানটি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ উহা হাতীয়াঘর পরগণার পরে ভাগীরথীর উপর অবস্থিত২৪ এবং উহার পরই গঙ্গার সাগর-সঙ্গম। চণ্ডীকাব্যে কবিকঙ্কণের বর্ণনার সহিত ঐ স্থানের অবস্থানের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়।

পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানের গঙ্গাকে লোকে তারগঙ্গ বলিত। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে রচিত দক্ষিণ বারাসাত নিবাসী অযোধ্যারাম পাঠকের সত্যনারায়ণের পুথিতে হাতীয়াঘরের পর সাগরসঙ্গমে উক্ত তারগঙ্গার উল্লেখ আছে।২৫

২০। "নাহি পাহি ছুটি ছুটি কাক দ্বীপ গঙ্গবতী ছাড়াইল
বণিকের সাথে।
চিয়াখোল পাছুয়াম গঙ্গা ধারায় করি স্নান উপনীত
হইল ছত্রভোগ।"
(রায়মঙ্গল)

21. "The present channel of Hoogly is very different from that which the Ganges formerly followed. The original channel was identical with Tolly's Nullah from Kidderpur to Garia (8 miles south of Calcutta), from which point it ran to the sea in the south-easterly direction. Tradition has it that it emerged out of the Sundarban at Kakdwip and then passed along the present Muriganga or Baratala river, after which it found a passage along the creek between Dhoblat and Mansardwip and proceeded first in a westerly and then in a southerly direction until it fell into the Bay of Bengal at Gangasagar."

২২ রেণেলের ও এলিসনের মানচিত্রে ঐ নদীর Channel Creek নাম আছে। রেণেল উহাকে কেবলমাত্র ঐ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু রেণেলের পরে (১৮৭৩) খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত এলিসনের মানচিত্রে উহার Channel Creek নামের সহিত বারাতলা ও মড়িগঙ্গা এই দুইটি নামও দেখা যায়।

২৩ কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার বিবরণ দ্রষ্টব্য

২৪ বর্ত্তমান সময় ঘিবাটি নদীর উত্তরাংশ প্রদেশ হাতীয়াঘর পরগণার অন্তর্গত। ব্লকম্যান সাহেব আইন-ই-আকবরীতে উহার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই:

"Hatiagarh Pargana, the most southerly Mahal of the Sarkar Satgaon; a large Pargana extending from Diamond Harbour towards Sagar Island."

২৫ "অপূর্ব্ব হাতীয়াঘর এড়াইল বড় বড় গাছের গাবর ঝিঝি সব
তার পর পরশিতে কপিলেরে প্রণমিয়ে পূজে গঙ্গা

তাহারা অসুর

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আকাশ, বাতাস, জল, সৌরালোক আর
কে বলিবে এ সকলে আছে শুধু মোর অধিকার ?
কে বলিবে দরিয়ার জল
আমারই মাঠের শুধু ফলাবে ফসল ?
নদী ব'য়ে যায়—
জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবারে সে আনন্দ বিলায়।
বহিছে বাতাস—
নিমেষে নিমেষে মোরা তাহা হ'তে নিতেছি নিশ্বাস।
সে জন পাগল
যে বলে বাতাসে শুধু আমারই দখল,
আর কারও তার 'পরে অধিকার নাই,
সে শুধু আমারই ঘরে বহিবে সদাই।
আমারই প্রাঙ্গণে সূর্য্য ঢালিবে আলোক—
হেন কথা বলিবে যে-লোক—
পাগল বলিয়া মোরা ব্যঙ্গ করি তারে।
জ্যোতির মুকুট পরি দিগন্তের পারে
দেখা দেয় দিনমণি,
অরণ্যে অমনি
পাখীদের কণ্ঠে কণ্ঠে জাগে কলরব।
সুরু হয় প্রাণের উৎসব
দিক হ'তে দিগন্তরে, জয়ধ্বনি ওঠে সবিতার।
সূর্য্য—সে তো কারও নহে একান্ত একার।
আকাশের মেলা
আমরা বলি না সে তো আমারই একেলা;
বলি না আকাশ মোর প্রাসাদের ছাদ,
তারে নিয়ে কারও সাথে করি না বিবাদ।
ঈশ্বরের সৃষ্টি—সে তো নহে কভু একা কারও তরে,
সকলেরই অধিকার আছে সৌরকরে,
আছে জলে, আকাশে সমীরে।
তাই জানি যাহারা ভূমিরে
ভোগ্যবস্তু করিয়াছে হ'য়ে লোভাতুর—
তাহারা অসুর।
সবারে বঞ্চিত করি হোলো যারা ভূম্যধিকারী—
খোদার উপরে তারা করিছে খোদ্‌কারি।
বেদে বলে, ভূমিলক্ষ্মী জননী সবার।
সব তার যে করিবে একা অধিকার,
পড়শীরে দিবে নাকো ভাগ,—
বাহিরে মানুষ বটে—আসলে সে রক্তশোষী বাঘ।
বৈষম্যের বাঁধ
জাগায়ে রেখেছে যারা তারা তো উন্মাদ।
তাহাদেরই পাপ
পৃথিবীর শিরে ডেকে যুগে যুগে আনে অভিশাপ,
ডেকে আনে রক্তের প্লাবন,
ডেকে আনে ইতিহাসে দুর্য্যোগের দারুণ শ্রাবণ।

অভিনন্দন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

হে প্রিয় দরদী, প্রীতি-স্নেহ-ডোরে করিয়াছ সবে বন্ধন,
তাইতো বন্ধু, আমাদের এই হৃদয়ের অভিনন্দন।
দিগন্ত বুঝি রঞ্জিত হ'ল, এসেছে—আসুক সন্ধ্যা,
আকাশে উঠেছে চন্দ্র, এখনি ফুটিবে রজনীগন্ধা।
সমুখে এখনো প্রসারিত পথ, এই তো মাত্র সত্তর,
কিসেরি বা ত্বরা, পূর্ণা যে ধরা, কেন হবে তবে সত্বর ?
ভাণ্ডার আজো ভরা আছে তব, নিঃশেষ নহে বিত্ত,
কল্পনা আর কৌতুক-রসে টলমল করে চিত্ত।
গানের আসরে উৎসারি' ওঠে কণ্ঠে সুরের ঝর্ণা,
কাহিনী-কথায় নব নব ছবি ফোটে বিচিত্র-বর্ণা।
শুনেছি অনেক, এখনো অনেক শুনিব তোমার গল্প,
আমরা তোমার অনুরাগী, জেনো শ্রোতা নহে তব স্বল্প।
সেদিন দিলে যা সে-ভোজে আমরা মিলেছি সকলে হর্ষে,
'বিচিত্রা' পেলে বিচিত্র রূপ তোমারি যাদুর স্পর্শে।
কথাসাহিত্যে কত চরিত্র, আঁকা হ'ল কত চিত্র,
সহানুভূতিতে ভরা অন্তর, তাই সকলের মিত্র।
প্রবীণ, তোমার নবীন হৃদয়, লেখায় আলোর দীপ্তি,
তাই উজ্জ্বল-বরণী ধরণী দেয় সে এমন তৃপ্তি।
সমাজ-জীবনে জটিলতা যত এড়ায় নি তব দৃষ্টি,
সেই সমস্যা-উপাদানে হ'ল উপন্যাসের সৃষ্টি।
কবি-হৃদয়ের সঙ্গে মিলেছে কিছু উকিলের বুদ্ধি,
অভিজ্ঞতার স্পর্শ—করেছে ভাবের আবেগে শুদ্ধি।
প্রীতি আনন্দ তোমার জীবন-পথের নিত্য-সঙ্গী,
এমন সরস স্মৃতি-কথা, তাই এমন নূতন ভঙ্গী।
রবিবাসরের আসরে আমরা পেয়েছি তোমার সঙ্গ,
তুমি শ্রদ্ধেয়, তুমি সুরসিক, হে প্রিয় উপেন গঙ্গো।
দুঃখ-সুখের কথা সে চলুক, থাকুক হিসাব-পত্তর,
বর্ষ-শতের বাকি বহুদিন, এই হ'ল সবে সত্তর।
প্রীতির মাল্য পরাব কণ্ঠে, ললাটে প্রীতির চন্দন,
গ্রহণ করিও বন্ধু, মোদের হৃদয়ের অভিনন্দন।*

---

* শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সপ্ততি-বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে

রাষ্ট্রের শিক্ষা সচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

সৌরাষ্ট্র ভ্রমণকালে মিসেস এলিনোর রুজভেল্ট কর্তৃক জামনগর আয়ুর্বেদ কলেজ মিউজিয়ম পরিদর্শন

ইয়র্কের উর্সিয়ার একাডেমির একটি ক্লাসে একজন নেপালী ছাত্রী পাঠ্যাংশ ইংরেজী হইতে হিন্দীতে অনুবাদ করিতেছেন

কোরিয়াস্থ ৬০-তম ভারতীয় এম্বুলেন্স কোরের সভ্য সার্জেণ্ট মুথু কৃষ্ণনকে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র ব্রোঞ্জ মেডেলে ভূষিত করিতেছেন

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

এন্টি-সারকুলার সোসাইটির সভা ডাকা হইয়াছিল বিলাতী বর্জন কার্যকরী করিবার উপায় ও বৌবাজারে ছাত্রদের উপর পুলিশের আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য।

শ্যামবাজার, বাগবাজার, ভবানীপুর, কালীঘাট হইতে বহু সভ্য আসিয়াছিল। সভ্যেরা বেশীর ভাগ স্কুল ও কলেজের ছাত্র। বয়স্ক সভ্যদের অনেকে অনুপস্থিত, নেতারাও আসেন নাই। ছাত্র-সভ্যেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিল।

ভবেশ ও মহেন্দ্র যেখানে বসিয়া কথা বলিতেছিল সেখানে আরও কয়েক জন যুবক আসিয়া বসিল। তাহাদের মধ্যে আরম্ভ হইল নেতাদের সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনা। দেশের সব জায়গায় ছেলেরা মার খাইতেছে, নেতারা মিটিঙে আসিয়া গরম গরম বক্তৃতা দিয়া চলিয়া যান, আর তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। আজকের সভায় কয়েক জনের আসিবার কথা ছিল, কেহ আসিলেন না। তাঁহারা আজকাল ছেলে-দের এড়াইতে চাহেন মনে হয়। কারণ তাহারা আর শুধু বক্তৃতায় মুগ্ধ হয় না, তাহারা কাজ চাহে।

একজন বলিল—ছেলেরা পুলিসের হাতে মার খেয়ে জেলে যাক আর তাঁরা ঘরে বসে চোস্ত ইংরাজীতে খবরের কাগজ লিখে ইংরেজকে ভয় দেখানো, কান্নাকাটি করে বিলেতে দরখাস্ত পাঠানো—এই বন্দোবস্ত চালাতে চান। যে পাড়ায় দোকানে পিকেটিং হচ্ছে সে পাড়া দিয়ে হাঁটেন না পুলিসে ধরে জেলে দেবে ভয়ে।

ভবেশ বলিল—এসব কথা থাক্। লড়াইয়ের সময় সৈনিক ও সেনাপতিকে একই কাজ করতে হলে লড়াই চলতে পারে না। নেতাদের ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু আমরাই বা কি কাজ করছি?

মহেন্দ্র—এটা অন্যায় কথা হ'ল। যেটুকু কাজ হচ্ছে ছাত্ররাই সেটুকু করছে। আমাদের কথা এই যে, আন্দোলন যাতে দানা বাঁধে এমন কোন ব্যবস্থা চাই।

ভবেশ—বেশ, সকলে বসুন। এ বিষয়ে কার কি প্রস্তাব আছে শোনা যাক।

যাহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া আলোচনা করিতে-ছিল তাহারা আসিয়া বসিল। মহেন্দ্র প্রস্তাব করিল—বড়-বাজারে বিলাতী কাপড় বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য পিকেটিং চালাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল।

বাঙালীপাড়ার দোকানদারেরা ছেলেদের আসিতে দেখিলে বিলাতী কাপড় লুকাইয়া ফেলিত। বড়বাজারের কথা স্বতন্ত্র। মাড়োয়ারী বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা স্বদেশী আন্দোলন জাঁকিয়া উঠিলে বাংলাদেশের কাপড়ের বাজার হারাইবার ভয়ে যত শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ইতিমধ্যে সব ভুলিয়া গিয়াছিল। বিহারী পুলিস ও গোরা সার্জেন্টরা যখন ছোকরা স্বদেশীওয়ালাদের পিটিয়া প্রায় ঠাণ্ডা করিয়া আনিতেছিল, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা তখন নূতন কন্ট্রাক্ট করিয়া হাজার হাজার গাঁট বিলাতী কাপড় আনিয়া বড়বাজার ছাইয়া ফেলিল। কন্ট্রাক্টের একটা সর্ত ছিল—কাপড়ে বিলাতী ছাপ থাকিবে না। তাহারা নূতন নূতন খুচরা দোকান খুলিল বড়বাজারে বিলাতী কাপড় বেচিবার জন্য।

'মছলিখোর' বাঙালীরা স্বদেশীর নাম করিয়া তাহাদের ভাত মারিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে বলিয়া বাঙালী-বিরোধী আন্দোলন চলিল মাড়োয়ারী মহলে। স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী মুসলমানদের সঙ্গে তাহারা মিতালি পাতাইল। তাহাদের দরখাস্তের উত্তরে পুলিস কমিশনার বেশী করিয়া বিহারী পুলিস পাঠাইলেন বড়বাজারে পাহারা দিবার জন্য।

শুধু বড়বাজারী মাড়োয়ারী কেন বাংলার পার্শ্ববর্তী বিহার ও উড়িষ্যার অনেকের রাজভক্ত চিত্ত বাঙালী স্বদেশীওয়ালাদের কাণ্ডে ক্ষুব্ধ হইল। অর্থহীন একটা স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়া তাঁহাদের প্রতিবেশী বাঙালীরা বিদেশী সরকারের হাতে মার খাইতেছে—এই বোকামি দেখিয়া বিহারী ও উড়িয়া কাগজগুলি স্ব স্ব প্রদেশবাসীদের সাবধান করিতে অগ্রসর হইল। বিহার টাইমস বলিল—"বিহারী ভাই সব, বাঙালীরা বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। তোমরা যেন নির্বোধের মত তাহাদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিও না।" উৎকল দর্পণ বলিল—"ওড়িয়া ভাই সব, বাঙালীদের আন্দোলনে যোগ দিও না। তাহাদের স্বদেশী আন্দোলনের মূলে আছে প্রতিহিংসার ভাব। কর্তৃপক্ষ এ জিনিস কখনও সহ্য করিবেন না। তোমরা সাবধান! ওড়িয়া ভাই সব, বাঙালীরা কংগ্রেস চালাইতেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে তোমরা সংস্রব রাখিও না।"

সেদিন বড়বাজারে মহেন্দ্রের দলের রুট মার্চ করিবার কথা। স্কুলের কয়েক জন ছোট ছোট ছেলে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে বড়বাজারে প্রবেশ করিল, তাহাদের পিছনে মহেন্দ্র। বন্দেমাতরম্ শুনিয়া কয়েকজন দোকানী চীৎকার করিয়া বলিল—"বন্দেমাতরংবালা আ গিয়া।"

গুটিকয়েক দশ-এগার বছরের ছেলের সঙ্গে মহেন্দ্রকে দেখিয়া মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত

হইল। ভাড়া-করা গুণ্ডা ও দোকানীরা মিলিয়া ছেলেগুলিকে ও মহেন্দ্রকে ঘিরিয়া ফেলিয়া অশ্রাব্য গালাগালি করিতে ও মারিতে লাগিল। দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া বিহারী কনেষ্টবলরা লাঠি হাতে আসিয়া পৌঁছিল। দাঙ্গা করিবার অভিযোগে মহেন্দ্রকে ধরিয়া কোমরে দড়ি বাঁধিয়া থানায় লইয়া চলিল। ছোট ছোট ছেলেদেরও তাহারা ধরিল। থানায় কয়েক ঘা করিয়া বেত মারিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইল, মহেন্দ্রকে হাজতে পাঠান হইল।

এই হাঙ্গামার খবর শহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। "মাড়োয়ারীরা বন্দেমাতরম্ বিরোধী" এই শিরোনামা দিয়া হিন্দী বঙ্গবাসী, হিতবার্ত্তা, সঞ্জীবনী প্রভৃতি কাগজ ঘটনার বিবরণ ছাপিয়া মন্তব্য করিল—পুলিসকে ঘুষ দিয়া মাড়োয়ারীরা এই কাজ করিয়াছে।

এন্টি-সারকুলার সোসাইটির পক্ষ হইতে উকিল দিয়া মহেন্দ্রকে জামিনে খালাস করা হইল। ভবেশ বলিল, সে ডক্টর চক্রবর্ত্তীকে মহেন্দ্রের পক্ষসমর্থনের জন্য অনুরোধ করিবে। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ভবেশ দেবানন্দকে বলিল—তুই কি যাবি আমার সঙ্গে ?

দেবানন্দ বলিল—আপনার আপত্তি থাকলে নাই বা গেলাম।

ভবেশ—আমার আপত্তি নেই, তোর থাকতে পারে।

দেবানন্দ ভবেশের কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—আমার আপত্তি হবে কেন ?

একটু চিন্তা করিয়া ভবেশ বলিল—ডক্টর চক্রবর্ত্তীর ব্যক্তিগত জীবনের কথা ভেবে আপত্তির কথা বলছি। আমি যতটুকু জানি তোমাকে খুলে বলাই ভাল। আই-সি-এস পড়তে গিয়ে বিলাতে থাকবার সময়ে ডক্টর চক্রবর্ত্তী নাকি এক আইরিশ মেয়ের প্রেমে পড়েন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের বাধাতেই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক তাকে পেলেন না। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে অনেক দিন তিনি ইউরোপের নানা দেশে ঘুরে বেড়ালেন। তার পর ব্যারিষ্টারী পাশ করে ও ইতিহাসের গবেষণা করে ডক্টরেট নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। এত বিদ্যা ও বুদ্ধি ভদ্রলোকের কিন্তু কোন কাজে আসছে না। একটু মন দিয়ে কাজ করলে ও খাটলে তিনি সেরা ব্যারিষ্টারদের মধ্যে একজন হতে পারতেন, সকলেই একথা বলে। কিন্তু কিছু পৈতৃক বিত্ত আর তার উপর অল্প আয়াসে যা পান হাইকোর্টে, তাইতে সন্তুষ্ট হয়ে দুটি নেশায় ডুবিয়ে দিলেন নিজেকে। একটি মদের নেশা, অন্যটি বইয়ের নেশা।...

এমনি চলছিল হঠাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'ল। বন্ধুমহলে কানাকানি হতে লাগল অবিবাহিত ডাঃ চক্রবর্ত্তীর গৃহে কে একটি মেয়ে এসে জুটেছে। কোন জাত, কি তার ধর্ম্ম কেউ সঠিক জানে না। কেউ বলে জার্ম্মান, কেউ বলে ইহুদী, কেউ বলে সেই আইরিশ মেয়েটিই নাকি না থেতে পেয়ে এসে জুটেছে।

কিছু দিন যেতে শোনা গেল ডাঃ চক্রবর্ত্তী বিলেত যাবার আগে একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা হয়েছিল। মেয়েটি সুন্দরী ও একম্প্লিশ্‌ড্। কি কারণে বিয়ে ভেঙে গেল কেউ জানে না। সম্ভবতঃ মেয়ের পক্ষ থেকে কোন কথা উঠেছিল। ডক্টর চক্রবর্ত্তী বিলেত চলে গেলে এক ডাক্তারের সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়, কেউ বলে বিয়ে হয়ে যায়। সে যা হোক, মেয়েটি এর পর চাকরিতে ঢোকে। বছরখানেক আগে সেই ডাক্তারটি মারা গেছে। তার পর থেকে মেয়েটি এসে ডক্টর চক্রবর্ত্তীর কাছে রয়েছে। লোকে বলে ওঁদের নাকি বিয়ে হয় নি।

একটু থামিয়া ভবেশ বলিল—শুনি ডাঃ চক্রবর্ত্তীর পসার বাড়ছে হাইকোর্টে, মদ খাওয়া কমে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর বাড়ীতে কোন বন্ধুবান্ধব যান না।

দেবানন্দ বলিল—আমরা ত বন্ধুবান্ধব নই, আমরা কাজের জন্য যাচ্ছি। চলুন।

৪

ভবেশ ও দেবানন্দ যখন ডাঃ চক্রবর্ত্তীর গৃহে পৌঁছিয়া বেয়ারাকে জানাইল তাহারা সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চাহে, বেয়ারা তখন একবার ছোকরা বাবু দুইটির দিকে ভাল করিয়া চাহিল। তারপর পেন্সিল ও কাগজের স্লিপ ধরিল তাহাদের সম্মুখে। ভবেশ তাহাদের দুই জনের নাম লিখিয়া স্লিপটি তাহার হাতে দিলে তাহাদের বসাইয়া স্লিপ লইয়া সে ভিতরে ঢুকিল এবং তখনই বাহিরে আসিয়া তাহাদের ভিতরে যাইতে বলিল।

ভবেশ ও দেবানন্দ ঘরে ঢুকিতে দেখিল বিপরীত দিকের দরজার পরদা সরাইয়া একজন মহিলা বাহির হইয়া গেলেন। তিনি সরিয়া যাইবার আগে একবার ঘাড় ফিরাইয়া চাহিলেন, দুই বন্ধু তাঁহার মুখ দেখিতে পাইল। গৌরবর্ণ, অতি সুশ্রী সে মুখ, একটু যেন গম্ভীর ভাব।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী দুই বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন। ভবেশ ও দেবানন্দ ঘরের চারদিকে চাহিয়া দেখিল। তিন দিকের দেওয়াল জুড়িয়া দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা মেহগনি পালিশের র‍্যাক। র‍্যাকের থাকে থাকে সাজানো বই। টেবিলের উপর বই, সর্ব্বত্র ঠাসা বই। একটা বড় কাঁচের পুষ্পাধারে এক গোছা রজনীগন্ধা, টেবিলের পাশে একটা স্তেপায়ার উপর রহিয়াছে। ঘরের জানালায় ফিকা নীল রঙের সিল্কের পরদা।

দেবানন্দ মুগ্ধ হইল ঘরের সজ্জা দেখিয়া। ঘরের হাওয়ায় ফিনের একটু মিষ্ট গন্ধ লাগিয়া রহিয়াছে।

ডাঃ চক্রবর্তী দেবানন্দের মুখের ভাব লক্ষ্য করিলেন। মৃদু হাসিয়া বলিলেন—ওয়েল মাই ফ্রেণ্ডস, কোন খবর আছে ?

ভবেশ বড়বাজারের ব্যাপার, মহেন্দ্রের গ্রেপ্তার ও তাহাকে জামিনে খালাস করিবার কথা আগাগোড়া বর্ণনা করিয়া বলিল—পুলিসে দাঙ্গা করবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। এই অভিযোগে তাকে চালান দেবে। একটু ভালমত ডিফেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে। এই জন্ত আপনার কাছে এসেছি আমরা।

ডাঃ চক্রবর্তী দুই-চারিটা প্রশ্ন করিবার পর বলিলেন—ডিফেন্স যত ভাল দাও—পুলিসের কেস, আর আসামী যখন ছাত্র কন্ভিক্শন ইজ সারটেন (কারাদণ্ড নিশ্চিত)।

ভবেশ—যারা ছোট ছোট ছেলেদের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা পায় নি তাদের একটু শিক্ষা দেবার উপায় নেই ?

ডাঃ চক্রবর্তী একটু হাসিলেন। বলিলেন—মাই ফ্রেণ্ড, সে শিক্ষা দেবার এজেন্সী পুলিস কোর্ট নয়। উপায়ের কথা বলছ ? উপায় নেই কিসের ? তোমরা মাইটি (ক্ষমতাশালী) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে শিক্ষা দিতে চাইছ, কাণ্ট ইউ টিচ এ লেসন্ টু দি পেটি এনিমিজ অব ইওর কজ ? (আন্দোলনের ক্ষুদে শত্রুদের টিট্ করার ব্যবস্থা করা যায় না ?)

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন—এ সব কথা থাক্। তোমাদের বন্ধুর কথা বলছি। আমি ডিফেন্সের ব্যবস্থা করে দেব পুলিস কোর্টের ভাল উকিল দিয়ে। যদি না জানতাম যে ছাত্রদের মোকদ্দমায় পুলিস কোর্ট বল আর হাইকোর্ট বল ডিফেন্স ইজ ইউজলেস (পক্ষসমর্থন করে বাঁচানোর চেষ্টা বৃথা) ত আমি নিজে দাঁড়াতাম। যে কাজে নেমেছ দু'চার মাস জেলের ভাবনায় ঘাবড়ালে চলবে কেন ?

দুই বন্ধুর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন—একটা মজার কথা সেদিন একখানা কাগজে পড়ছিলাম, তোমাদের বলি শোন। পার্টিশন রদ করবার জন্ত আমাদের এত বক্তৃতা রেজলুশন (প্রস্তাব পাস) কান্নাকাটি ইংরেজ কানে তুলছে না দেখে কাগজখানা প্রস্তাব করেছে আমেরিকা ও জাপানের কাছে দরখাস্ত পাঠানো হোক, তারা হস্তক্ষেপ করে পার্টিশনটা রদ করে দিক। নো জোক ফ্রেণ্ডস (তামাশা নয় বন্ধুগণ), সত্যিই এই প্রস্তাব করেছে। ভাবলাম আমার ডায়াগনোসিস (রোগ-পরীক্ষা) কেউ কানে তোলে না—বাট আই এম রাইট (কিন্তু আমার ভুল হয় নি)।

ভবেশ—কিসের ডায়াগনোসিস ?

ডাঃ চক্রবর্তী—দ্য লা মালাদি বেঙ্গালেজ (de la maladie bengalaiso) অর্থাৎ ডায়াগনোসিস অব দি ন্যাশনাল ম্যালাডি অব দি বেঙ্গলীজ (বাঙালীর জাতীয় ব্যাধি নির্ণয়)। এত বড় ভারত সাম্রাজ্যের একটা ক্ষুদ্র প্রদেশ ইংরেজ পার্টিশন করেছে তার এডমিনিষ্ট্রেশনের (শাসনের) সুবিধার জন্ত, তাতে হস্তক্ষেপ করবে জাপান ও আমেরিকা আমাদের কাতর আবেদনে ?

দেবানন্দ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আমি ভাল বুঝতে পারছি না স্যার।

ডাঃ চক্রবর্তী—আই এম সরী। (আমি দুঃখিত)

দেবানন্দ—সংক্ষেপে একটু বুঝিয়ে দিন স্যার।

ডাঃ চক্রবর্তী হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—সব কথা কি সংক্ষেপে বোঝানো চলে ? এমন জিনিস আছে, ভয়ানক ভাইটাল (প্রয়োজনীয়) জিনিস হয়ত, যা একটু চোখ মিট মিট করে বোঝানো যায়। কিন্তু যে জিনিস বুঝতে চাইছ সেটা এই ক্লাসের নয়। এক কথায় বলা যায়—অল্প উত্তেজনায় ব্যালান্স (মনের ভারসাম্য) হারিয়ে ফেলা, বাস্তব জ্ঞানের, মাত্রাজ্ঞানের অভাব এগুলো হচ্ছে লা মালাদি বেঙ্গালেজের কয়েকটা লক্ষণ।

দেবানন্দের দিকে চাহিয়া ডাঃ চক্রবর্তী হাসিলেন।

দেবানন্দের মুখের ভাব একটু গম্ভীর দেখাইল। সে বলিল—আপনি বাঙালীর চরিত্রের দুর্বল দিকটার কথাই বললেন।

ডাঃ চক্রবর্তী—তুমি ঠিক বলেছ। সবল দিকটার সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা অনাবশ্যক। আচ্ছা, পরে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল তোমাদের সঙ্গে।

ভবেশ ও দেবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডাঃ চক্রবর্তী—মহেন্দ্রের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করছি। তবে ধরে নিতে পার তাকে মাস দু'তিন জেলে থাকতে হবে। পরশু সন্ধ্যায় রায়ের ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করো।

দুই বন্ধু নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

ভবেশ ও দেবানন্দ বাহির হইয়া গেলে যে মহিলাটিকে তাহারা ঘর হইতে ভিতরে চলিয়া যাইবার সময় দেখিয়াছিল তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

বয়স বোধ হয় বছর পঁচিশেক হইবে। বাস্তবিক সুন্দরী। মুখের গড়নটি অতি সুন্দর। বয়সের অনুপাতে মুখের ভাব গম্ভীর। তাঁহার অতখানি রূপের প্রখরতা গাম্ভীর্য্যের ছায়ায় কোমল দেখায়।

ঘরে ঢুকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ছেলে দুটি কে ? বেশ ভাল লাগল ওদের দেখে।

ডাঃ চক্রবর্তী কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিলেন—প্লিজ এক্সপ্লেন (দয়া করে বুঝিয়ে বল) ছেলে বলে ভাল লাগল, না কোন.বিশেষত্ব দেখে আনন্দ হ'ল।

ডাঃ চক্রবর্তীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া তিনি মৃদু হাসিলেন। বলিলেন—যেটির বয়েস কম তাকে দেখে মনে হয় ছাই চাপা আগুন।

ডাঃ চক্রবর্তী ধীরে ধীরে কথাটি আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—ছাই চাপা আগুন? ছোকরার মুখে একটা কনসেনট্রেটেড আরমেষ্টমেন্সের (একাগ্র চিন্তার) ছাপ আছে। তাই দেখে বোধ হয় কথাটা সত্য, মৃণাল। ঐ টাইপের ছেলেরা বেঘোরে মারা পড়ে সাধারণতঃ।

তার পর হাসিয়া বলিলেন, তবে বেঁচে যাবার উপায়ও আছে। কৌপীনবস্ত হয়ে কেটে পড়তেও পারে?

মৃণাল—অর্থাৎ?

ডাঃ চক্রবর্তী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, অর্থাৎ এই অখিল বিশ্বকে, মানে কামিনী ও কাঞ্চনকে মানে তোমার আঁচলের ঐ চাবির গোছা এবং তোমাকে—

মৃণাল হাসিতে হাসিতে বাধা দিয়া বলিল—থাক, আর কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে না।

ডাঃ চক্রবর্তী—হবে না? ব্যাখ্যা না করতেই বুঝে নিয়েছ? হোয়াট এ ক্লেভার গার্ল (কি চালাক মেয়ে)?

প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের আদালতে দাঙ্গা করিবার অভিযোগে মহেন্দ্রের বিচার হইয়া চার মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। আসামী-পক্ষে পুলিস কোর্টের নামকরা প্রবীণ উকিল দাঁড়াইয়াছিলেন। দাঙ্গার অপর পক্ষ মাড়োয়ারীদের চালান দেওয়া হয় নাই বলিয়া তিনি বিচার সম্পর্কে আপত্তি তুলিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ধমকাইয়া বলিলেন—তাহারা নিরীহ, অনেষ্ট (সাধু) ব্যবসায়ী, র‍্যাকিয়াস ষ্টুডেন্টরা (গুণ্ডা ছাত্ররা) তাহাদের উপর বুনো মহিষের মত পড়িয়া তাহাদের মারধোর করিয়াছে। তিনি পুলিসকে ধমকাইলেন অন্য আসামীদের চালান দেয় নাই বলিয়া। পাব্লিক প্রসিকিউটর বিনীতভাবে তাহাদের বয়সের উল্লেখ করিতে গিয়া প্রচণ্ড ধমক খাইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, ভাইপার (কালসাপ) ছোট হউক আর বড় হউক সমান বিপজ্জনক।

ভবেশ আদালতে গিয়াছিল। পরদিন সন্ধ্যায় দেবানন্দকে লইয়া সে চক্রবেড়ের মিঃ রায়ের গৃহের উদ্দেশে রওনা হইল।

মিঃ রায়ের গৃহে পৌঁছিয়া ভবেশ দেখিল ডাঃ চক্রবর্তী আসেন নাই তখনও। মিঃ ডাটা, মিঃ সেন, মিঃ গাঙ্গুলী প্রভৃতি মিঃ রায়ের কয়েক জন ব্যারিষ্টার বন্ধু বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিতেছেন। তাহারা দুই জন ঘরে গিয়া বসিল।

রায় বলিলেন, গেলিক আমেরিকান কাগজের লাষ্ট ইস্যুখানা দেখেছ? গোটা ইস্যু ভারতবর্ষের ব্যাপার সম্বন্ধে। কারলাইল ও লায়ন সারকুলার ছেপে দিয়েছে। কতকগুলো আর্টিকেল কার্জন ও মার্লী দুজনকে ছেপেছে দেখলাম। স্বদেশী ও বয়কট সম্বন্ধে কাগজখানার টোন খুব সিমপ্যাথেটিক (খুব সহানুভূতিপূর্ণ)।

কিছুক্ষণ পরে সিগার হাতে ডাঃ চক্রবর্তী ঘরে ঢুকিলেন। ভবেশ ও দেবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। ভবেশ বলিল, আপনার কথাই ঠিক হ'ল। মহেন্দ্রের জেল ঠেকানো গেল না।

ডাঃ চক্রবর্তী—ডোন্ট বি আপসেট (মুষড়ে পড়ো না)। বসো তোমরা।

চার দিকে চাহিয়া ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন, অনেষ্ট জন মর্লের মুণ্ডপাত করছিলে বোধ হয় সবাই। মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে। কিছু দুখিতে হবে না। মর্লে লিবারেল (উদারনৈতিক) হলেও তার পায়ের চামড়া গোঁড়া রক্ষণশীল দলের লোকের চেয়ে কম পুরু নয়। বরং আমার কাছে একটা নূতন খবর শোন। আমি একটা নূতন ধূমকেতুর সন্ধান পেয়েছি।

সকলে একটু বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। ডাঃ চক্রবর্তী হঠাৎ আবার কোন্ ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়া বসিলেন! মিঃ গাঙ্গুলী বলিলেন, মিঃ চক্রবর্তী ইজ ইন এ পোয়েটিক্যাল মুড (মিঃ চক্রবর্তীকে কাব্যতে পেয়েছে)।

ডাঃ চক্রবর্তী—ইয়েস্।

তার পর মিঃ রায়ের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—তুমি ত মাঝে মাঝে কাগজে লেখ। মফস্বলের কাগজগুলো কি কখনও দেখ না, না ভার্ণাকুলার র‍্যাগ বলে ছোঁও না? একখানা অত্যন্ত আপত্তিজনক লিফলেট আমাকে এক জন দেখতে দিয়েছে। কুমিল্লার এক মুসলমানের লেখা। সলিমুল্লার ভাড়াটে লেখক। তার বক্তব্য ইংরাজদের পাদশাহ পূর্ব্ববঙ্গের রাজ্যপাট নবাব সলিমুল্লাকে দিয়েছেন। পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট, জজ, মেজিষ্ট্রের, পুলুশ সাহেবরা এখন নবাবের চাকর। তার পর লিখেছে, নবাবের হুকুমে মোছলমান ভাই সব কাফের হিন্দুদের জমি আবাদ করবে না, তাদের খাজনা দেবে না, কাফের মহাজনদের টাকা দেবে না।—এই লিফলেট ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহে মুসলমানদের মধ্যে বিলি হচ্ছে।

মিঃ সেন—সিলি এজিটেশনস অব এ র‍্যাবিড ফেলো। উই মাষ্ট নট ডিসেণ্ড সো লো এণ্ড টু টেক নোটিশ অব সাচ ট্রাশ (পাগলের প্রলাপ। এ সব জিনিস নজরে আনবার মত নীচ মন কেন হবে আমাদের?)

মিঃ গাঙ্গুলী—এ সব আমাদের ইগনোর (উপেক্ষা) করা উচিত।

ডাঃ চক্রবর্তী এই সকল মন্তব্যের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, তার পর শোন। মাস দুই আগের এক কাগজের কথা বলছি। লিখেছে, "হিন্দুদের উৎপীড়ন করবার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের প্রশ্রয় দেবার নীতি আমরা সমর্থন করি না। অনেক জায়গায় গভর্ণমেণ্টের এই আচরণের ফলে মুসলমানদের ধারণা হয়েছে, তারা যা খুশি করুক কর্তৃপক্ষ তাদের সাহায্য

করবেন। এই ধারণার ফলে মৈমনসিংহের অপরাধপ্রবণ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মুসলমান চাষীদের ধারণা হয়েছে হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে গেলে গবর্ণমেণ্ট তাদের সাহায্য করবেন।"

মি: গাঙ্গুলী—গবর্ণমেণ্টস পার্সিকিউশান ইজ কোয়িং ন্যাশনাল ইউনিটি ইন দি কান্ট্রি (নির্যাতনের ফলে আমাদের জাতীয় একতা গড়ে উঠছে)। হিন্দু মুসলিম মিলে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গড়ে তুলছি আমরা। এ সব কমিউন্যাল মেণ্টালিটির (সাম্প্রদায়িক মনোভাবের) প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

মি: সেন বলিলেন, তবে তোমার মত কমিউন্যাল নিউজ এজেন্সীকে আমিও একটা খবর দিতে পারি। কুষ্টিয়ার হিন্দু মুসলমান মিলে যে সভা করেছে সেটার খবর পৌছেছে তোমার কানে? এই সভায় কয়েক জন হিন্দু কি বক্তৃতা দিয়েছেন জানো? এক জন বলেন—"মুসলমান ভাই সব, আবার তোমরা ভারতবর্ষের শাসনভার হাতে নাও, আমরা আগে যেমন ছিলাম তেমনি তোমাদের অধীনে থাকব। তোমরা আমাদের আন্দোলনে যোগ দাও।" আর এক জন বলেন—"ইংরেজরা অন্যায়ভাবে সিরাজদ্দৌলাকে ও শাহ আলমের ছেলেদের মেরে ফেলেছে। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাদের আন্দোলনে যোগ দাও।"

ডা: চক্রবর্ত্তী হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এ খোশামোদিতে তরী ভোলবার নয়। পরের খবরটুকু শোনাও।

মি: সেন সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

ডা: চক্রবর্ত্তী বলিলেন—উপসংহারটি শোন। এই সব মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা শেষ হলে সভায় উপস্থিত মুসলমানদের অনুরোধ করা হ'ল স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য শপথ করতে। এক জন মুসলমানও শপথ করল না। ইজ ইট নট এ ফ্যাক্ট, সেন (এটা কি প্রকৃত তথ্য নয়)?

মি: রায়—তোমার ধূমকেতুর কি হ'ল চক্রবর্ত্তী?

ডা: চক্রবর্ত্তী—এতক্ষণ এই কমেটের কথাই হচ্ছিল, অবশ্য পরোক্ষভাবে। আমার মনে হচ্ছে পূর্ব্ববঙ্গের রাজনৈতিক আকাশে যে নূতন ধূমকেতু দেখা দিয়েছে এর পর তার পুচ্ছ ছেয়ে ফেলবে সারা ভারতবর্ষের আকাশ। ধূমকেতু বলবার অর্থ—ইট স্পেলস ওয়াইডস্প্রেড এণ্ড কেটাল কনসিকোয়েন্সেস (দেশময় ঘোর অনর্থ বাধবে)। হিন্দুদের ও তাদের পোলিটি-কাল (রাজনৈতিক) আন্দোলন দমন করবার জন্য ক্যাটস্‌প (যন্ত্র) হিসাবে মুসলমানদের ব্যবহার করবার আইডিয়া একটা প্রাণ্ড আইডিয়া। কেউ কেউ বলবে মেকিয়েভেলিয়ান (শঠতাদের) আইডিয়া। ব্যাট ইট ইজ দি মোষ্ট ন্যেচরাল থিং ফর দি ইংলিশ টু পার্সু দিস আইডিয়া (ইংরেজের মাথায় স্বাভাবিক ভাবেই একথা উদয় হয়েছে), আমাদের স্পিরিচুয়াল মগজে কথাটা ঢুকতে পারে নি এ পর্য্যন্ত। পূর্ব্ববঙ্গে এই আইডিয়া অনুসারে কাজ করা আরম্ভ হয়েছে।

একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন—আমার কি মনে হয় জানো রায়? ১৮৮৫-তে কংগ্রেসের জন্ম; এত দিন বাদে এদেশে এই বার রিয়াল পলিটিক্স (আসল রাজনীতি) আরম্ভ হবে।

মি: সেন হাসিয়া বলিলেন—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা আগে ছিল, এখনও আছে। চক্রবর্ত্তী ইজ ট্রাইং টু রিড এ নিউ মিনিং ইনটু দেম (চক্রবর্ত্তী এর নূতন ভাষ্য উপস্থিত করতে চান)।

কিছুক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। মৃদুস্বরে ভবেশ বলিল—এক্সকিউজ মি (আমাকে মাপ করুন), মুসলমানদের মধ্যে মি: রসুলের মত লীডার (নেতা) রয়েছেন। লিয়াকত ভাই আব্দুল্লা স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে। আরও অনেকে আছেন। এঁরা এ জিনিসটা বন্ধ করতে পারবেন না?

ডা: চক্রবর্ত্তী হাসিলেন। বলিলেন—মাই ইয়াং ফ্রেণ্ড, মি: রসুল ইজ এ মোস্লেম লীডার অব দি হিন্দুস (মি: রসুল হিন্দুদের মুসলমান নেতা)। তিনি মুসলমানদের লীডার নন।

একটু পরে ভবেশ ও দেবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল। নমস্কার করিয়া তাহারা বিদায় লইল।

৫

পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। দেবানন্দ রাজনগরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পিতাকে চিঠি লিখিল।

পিতার উত্তর আসিল। তিনি লিখিয়াছেন—তাহার এখন রাজনগরে যাইবার প্রয়োজন নাই, ইচ্ছা হইলে কয়েক দিনের জন্য পুরী বা অন্য কোথাও বেড়াইয়া আসিতে পারে, তারপর হোষ্টেলে ফিরিয়া মন দিয়া পড়াশুনা করিতে হইবে। পরীক্ষার পরে বাড়ী যাইবে।

পিতার এই উত্তরে দেবানন্দ হতাশ ও একটু বিস্মিত হইল। সে জানিত না ইন্দ্রের সহিত তাহার দেখা-সাক্ষাতের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি এখনও নিঃশঙ্ক হইতে পারেন নাই।

দেবানন্দ বাড়ী যাইবে না জানিয়া ভবেশ তাহার নিকট তাহার স্বগ্রামে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিল। দেবানন্দ বলিল—বাবা যখন লিখেছেন তখন পুরীতেই যাই। সমুদ্র দেখি নি এ পর্য্যন্ত, দেখে আসি।

ভবেশ দেশে চলিয়া গেল। দেবানন্দ পুরীতে গিয়া এক পাণ্ডার বাড়ীতে উঠিল। দিন দুই পরে এক হোটেলে চলিয়া আসিল। প্রথম কয়েক দিন মন্দির প্রভৃতি দেখিয়া কাটাইল। তারপর প্রতিদিন সমুদ্রতীরে ঘুরিয়া বেড়াইত বা

বসিয়া কাটাইত। প্রথম সমুদ্র-দর্শনের উত্তেজনা শান্ত হইয়াছিল, এখন কেমন একটু একঘেয়ে মনে হইত তাহার। মনে হইত কঠিন বেলা-বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া সমুদ্র যেন অশ্রান্ত কাঁদিয়া চলিয়াছে। তবু সমুদ্রের আকর্ষণে সকালে বিকালে সে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইত।

এক দিন হোটেলের কয়েক জন মিলিয়া দল বাঁধিয়া গরুর গাড়ীতে চাপিয়া কোনারক বেড়াইতে গেল। কোনারক পৌঁছিয়া দেখিল তাহাদের আগে আর একটি দল সেখানে পৌঁছিয়াছে। বেড়াইতে বেড়াইতে কোনারকের সূর্য্য-মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে বিস্মিতভাবে ভাবিতেছিল যে সকল শিল্পী এই আশ্চর্য্য মন্দিরের পরিকল্পনা করিয়াছিল, যাহাদের অক্লান্ত সাধনায় এই অপূর্ব্ব মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদের বংশধর কি এখনকার ওড়িয়া ভ্রাতারা। সে একমনে এই সব ভাবিতেছে—একটি বছর সতেরোর ছেলে বেড়াইতে বেড়াইতে সেদিকে আসিল। তন্ময় চিত্তে দেবানন্দকে সূর্য্যমন্দিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সে সেখানে দাঁড়াইল। দেবানন্দকে দেখিয়া তাহার মনে হইল ইহার মুখ তাহার পরিচিত। কাছে গিয়া সে বলিল—আপনার নাম দেবানন্দ নয়?

চমকিয়া দেবানন্দ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল একটি অপরিচিত ছেলে তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে। সে বলিল—হাঁ, আপনাকে ত চিনতে পারলাম না।

ছেলেটি হাসিয়া বলিল—আমার নাম নারায়ণ। আমি এন্টি-সারকুলারের সভায় আপনাকে দেখেছি, আপনার বক্তৃতাও শুনেছি।

দুই জনের মধ্যে আলাপ জমিয়া উঠিল। স্থির হইল পরদিন বিকালে সমুদ্রতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবে।

পরদিন সমুদ্রতীরে আসিয়া দেবানন্দ দেখিল আগেই আসিয়া নারায়ণ তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া নারায়ণ পকেট হইতে একখানি বই বাহির করিয়া বলিল—কাল আপনি পড়বার জন্য বইয়ের কথা বলেছিলেন, বই এনেছি।

দেবানন্দ বইখানি হাতে লইয়া দেখিল "The Temple of Bhowani" (ভবানীর মন্দির)। বইখানির নাম শুনিয়াছে সে, পড়ে নাই।

দুই বেলা তাহাদের নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ ও আলোচনা আরম্ভ হইল। দিন দুই পরে নারায়ণ বলিল—আমি আপনার চাইতে বয়সে বোধ হয় কিছু ছোট। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করছি, দোষ ধরবেন না। আচ্ছা, এখন দেশে এই যে স্বদেশী আন্দোলন চলছে তার লক্ষ্য কি, আপনার মনে হয়?

—কেন, লক্ষ্য ভাঙা বাংলা জোড়া দেওয়া।

—অর্থাৎ ইংরেজকে দেশের লোকের মত বা দাবি মানতে বলা। ইংরেজ রাজী হবে এতে?

—রাজী হয় নি বলেই ত চাপ দেওয়া হচ্ছে।

—এই চাপে কাজ হবে মনে হয়?

—যদি ঠিকমত চাপ দেওয়া হয় তা হলে হবে। আমার নিজের মত যে ভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে তাতে কাজ হবে না।

—তবে কিসে কাজ হবে মনে করেন?

—এখানে কাজ হওয়া কথাটা সম্বন্ধে অনেক রকম মত থাকতে পারে।

—আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।

—পার্টিশন স্বদেশী আন্দোলনের উপলক্ষ্য। এই আন্দোলনের মধ্যে এমন সব জিনিস এসে পড়েছে যে শুধু পার্টিশন রদ তার লক্ষ্য বললে ভুল বলা হবে, যদিও লোকের চোখের সামনে এই লক্ষ্যটাই স্পষ্ট। আসল লক্ষ্য দেশের শাসন-পরিচালনা সম্বন্ধে দেশের লোকের অধিকার মানতে ইংরেজকে বাধ্য করা। ভাঙা বাংলা হয়ত আবার কোন দিন জোড়া লাগতে পারে। কিন্তু দেশের লোকের এই দাবি ইংরেজ মানবে না।

নারায়ণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল। তারপর বলিল—আর একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। দেশের লোকের দাবি বলতে আপনি কি বোঝেন?

দেবানন্দ একটু হাসিল। বলিল—দেশের লোক কি সমস্বরে কোন দাবি করছে? না তাদের সত্যিকারের দাবি কি পরিষ্কার করে কেউ বলছে? তারা চাইছে অনুগ্রহ। হিন্দুরা বলছে ভাঙা বাংলা জোড়া দাও, বেশীর ভাগ মুসলমানের মত ভাঙা বাংলা ভাঙাই থাক। তবু একটা বিষয়ে সকলে এক মত—আরও চাই। আরও চাকুরি চাই, কাউন্সিলের মেম্বর হতে চাই, মেম্বরদের হাতে আরও ক্ষমতা চাই।

—আপনার কি মত?

—তোমার কি মত আগে বল শুনি।

নারায়ণ যেন একটু চমকিয়া উঠিল। তারপর বলিল—আমার কোন মত নেই দেবুদা। আমি যাঁদের সঙ্গে আছি তাঁদের বিশ্বাসই আমার বিশ্বাস। তাঁদের কথা এই যে, পার্টিশন একটা সুযোগ এনে দিয়েছে লোককে জেগে ওঠবার, যাতে ইংরেজের স্বরূপ চেনবার। ভাঙা বাংলা জোড়া দেওয়া বা স্বদেশীশিল্পের পুনরুজ্জীবন আসল কাজ নয়, ইংরেজকে এ-দেশ থেকে দূর করা আসল কাজ। স্বদেশী আন্দোলন যারা করছে তারা করুক, আসল কাজ করবার জন্য আলাদা লোক চাই।

দেবানন্দের মনে হইল নারায়ণের কথায় যেন একটা

নূতন পথের ইঙ্গিত আছে। সে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিল—কি উপায়ে এই আসল কাজ করা হবে?

নারায়ণ তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না। নিজের মনে চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—আমাকে মাপ করবেন দেবুদা, যা জিজ্ঞেস করলেন তার উত্তর অন্য লোকের মুখ থেকে শুনবেন। যদি আপনি রাজী থাকেন কলকাতায় ফিরে আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। তবে একটা কথা আছে। যেখানে যাবেন, যা কথাবার্তা হবে সব গোপন রাখা হবে, কারও কাছে গল্প করবেন না। যাবেন?

—যাব।

নারায়ণ উচ্ছ্বসিতভাবে দেবানন্দকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—আপনাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি আমাদের দলের একজন হবার মত লোক আপনি।

—তোমাদের কিসের দল নারায়ণ?

—সব শুনবেন পরে।

পর দিন সকালে সমুদ্রতীরে পৌঁছিয়া দেবানন্দ দেখিল নারায়ণ ঠিক জায়গাটিতে বসিয়া আছে। সে কাছে আসিতে নারায়ণ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—আপনাকে আরও কতকগুলি জিনিস পড়তে দেব। এদিকটাতে লোকজন যাতায়াত করছে, চলুন চক্রতীর্থের দিকে একটু ফাঁকা জায়গাতে যাই।

তাহারা হাঁটিতে লাগিল। নারায়ণ বলিল—আপনি ত কলকাতায় থাকেন। যুগান্তর পড়েছেন?

দেবানন্দ বলিল—যুগান্তর, সন্ধ্যা, নিউ ইণ্ডিয়া—যা হাতে পাই পড়ি। যুগান্তর পড়েছি, তবে নিয়মিত ভাবে পড়বার সুযোগ হয় নি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যারা এই কাগজ চালায়—তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলে অনেক কাজের কথা জানতে পারব। এ পর্য্যন্ত সুযোগ হয় নি।

নারায়ণ—ইচ্ছা থাকলে সুযোগ হতে কতক্ষণ? আসুন ঐ জায়গাটাতে বালির উপর বসা যাক।

দুই জনে বসিলে নারায়ণ পকেট হইতে এক বাণ্ডিল কাগজ বাহির করিল। দেবানন্দ হাতে লইয়া দেখিল যুগান্তর, সন্ধ্যা ও নিউ ইণ্ডিয়া কাগজ। বলিল—আমাকে এগুলো দাও। আমি পড়ে তোমাকে ফেরত দেব।

নারায়ণ হাসিয়া বলিল—হাঁ, ফেরত দেবেন। এগুলো আমার কাজের সহায় কিনা।

দেবানন্দ—কি কাজের সহায়?

নারায়ণ—কাগজগুলো আগে পড়ুন, তার পর বলব।

ইহার পরদিন কলিকাতা হইতে হঠাৎ কি খবর পাইয়া নারায়ণ চলিয়া গেল। যাইবার আগে দেবানন্দের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল—বই ও কাগজগুলো আপনার কাছে থাক। আপনি কলকাতা ফিরে আমাকে চিঠি দেবেন। আমি আপনার হোটেলে গিয়ে ওগুলো নিয়ে আসব আর যুগান্তরের পেছনে যারা আছে তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দেব।

দেবানন্দ কাগজগুলি পড়িয়া শেষ করিল। কিন্তু নূতন বিষয় শুধু পড়িয়াই তাহার কাজ শেষ হইত না, সতীশের প্রভাবে আসিবার পর হইতে সে ডায়েরী লিখিত। জেল হইতে বাহিরে আসিবার পর এই অভ্যাস চলিয়া গিয়াছিল। তবে কোন কাগজে বা বইয়ে নূতন কথা, তাহার মনোমত কথা পাইলে তাহা গুছাইয়া নিজের ভাষায় লিখিয়া রাখিত। এই কাজ ও নিয়মিত করিত না, মাঝে মাঝে করিত। এই লেখার মধ্যে তাহার নিজের মনের সন্দেহ, বিশ্বাস, আকুলতা প্রকাশ পাইত। পুরীতে লিখিত ডায়েরী হইতে তাহার এই সময়ের মনের ভাব কিছু জানিতে পারা যায়। যেমন:—

"যুগান্তর রুশিয়ার ডুমা ভাঙিয়া দিবার এবং অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ও অরাজকতার কথা লিখিয়াছে, বিপ্লবের ফল যদি অনেকের পক্ষে এই রকম দুঃখজনক হয় তাহা হইলে বিপ্লবের সমর্থন করা কি সম্ভব? এই প্রসঙ্গে প্রথম প্রশ্ন এই যে, মনুষ্য-সমাজের ক্রমবিকাশের যে বিধান আছে বিপ্লব কি সেই বিধানের অঙ্গ? এই প্রশ্নের উত্তর—সমাজের ব্যাধি যদি স্বাভাবিক কারণে হয়, সেই ব্যাধির প্রতিষেধক বিপ্লবও স্বাভাবিক কারণে হয়। পরাধীনতার অভিশাপগ্রস্ত সমাজে আর্থিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটে। এই অভিশাপগ্রস্ত সমাজের মুক্তির দুইটি উপায় আছে—যথা, বিপ্লব ও স্বেচ্ছাচারী শাসকের প্রদত্ত মুক্তি। এই দ্বিতীয় উপায়ে অর্জ্জিত মুক্তি সম্বন্ধে একটা আশঙ্কার কারণ আছে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম জাতিকে সাহস, দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগে অভ্যস্ত করে। স্বাধীনতা অপরের হাত হইতে দান হিসাবে আসিলে এই সকল গুণের অভাবে জাতি স্বাধীনতা-ধন রক্ষা করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে কিনা সন্দেহ। পরাধীনতার অভিশাপগ্রস্ত সমাজের একমাত্র মুক্তির উপায় বিপ্লব।"

যুগান্তর "ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ" এই শিরোনামায় বড় সুন্দর লিখিয়াছে। লিখিয়াছে, "আমাদের বর্ত্তমান সুনিয়ন্ত্রিত, সুব্যবস্থিত দাসত্বের চাইতে এনার্কি অনেক বেশী কাম্য। ইংরাজ হঠাৎ চলিয়া গেলে দেশে যদি এনার্কি দেখা দেয় সে এনার্কিও ভাল—এ বিষয়ে কি সন্দেহ আছে?"

নিউ ইণ্ডিয়া এই মর্ম্মে লিখিয়াছে—"দেশ বিপ্লবের মুখে দাঁড়াইয়া আছে। এই বিপ্লব নৈতিক শক্তির দ্বারা আনিতে হইবে, দৈহিক শক্তির দ্বারা নয়। ময়্যাল ফোর্স যদি বিপ্লব আনিতে পারে তাহা হইলে অস্ত্র আইন লঙ্ঘন করিবার জন্য বড় গলায় উপদেশ দাও কেন? ময়্যাল ফোর্স ও আত্মিক শক্তির কথা শুনিতে শুনিতে কান ঝালা-পালা হইল। ইংরেজ কি ময়্যাল ফোর্সের বলে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে? তাহার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথায় রয়্যাল কোর্সের কথা এত বার বলিবার উদ্দেশ্য কি? যে রোগের যে ঔষধ তাহার ব্যবস্থা না করিয়া শুধু আবোলতাবোল কথার মারপ্যাঁচ।"

দেবানন্দের মনোজগৎ যে বিচিত্র ভাবপ্রবাহে আন্দোলিত হইতেছে তাহারই পরিচয় ডায়েরিখানির প্রতিটি পৃষ্ঠায়।

ভবানীর মন্দির বইখানি পড়িয়া দেবানন্দ দেখিল আনন্দমঠ পড়িয়া দুর্গম অরণ্যের মধ্যে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া হাজার হাজার সন্তানবাহিনী গঠনের যে স্বপ্ন তাহার মনে জাগিয়াছিল এককালে, সেই স্বপ্ন উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে বইখানিতে। কিন্তু এই বইখানির চেয়ে তাহার আরও ভাল লাগিল যুগান্তরের অগ্নিগর্ভ রচনাসমূহ। তাহার কেমন যেন মনে হইল প্রকৃত পথের সন্ধান এই বার বোধ হয় সে পাইবে। সে স্থির করিল কলিকাতায় ফিরিয়া যতশীঘ্র সম্ভব সে নারায়ণের সঙ্গে দেখা করিবে।

কলেজ খুলিবার কয়েক দিন আগে সে ফিরিয়া আসিল। হোষ্টেল তখন একরকম খালি। যাহাদের পরীক্ষা আছে এই রকম জনকয়েক ছেলে তাহার মত ছুটির মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

ভবেশ পূজার কয়দিন বাড়ীতে থাকিয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল। কলেজ খুলিবার দিন দুই আগে সে হোষ্টেলে ফিরিল। সে আসিবার পরের দিন সকালে মিঃ রায়ের বাড়ীর এক পিয়ন দেবানন্দের নামে এক চিঠি আনিল। কিটি চিঠি লিখিয়াছে দেবানন্দকে আমন্ত্রণ জানাইয়া। সে লিখিয়াছে তাহার এক মাসী আসিয়াছেন, তাহার জন্য নূতন ঠাকুর রাখা হইয়াছে। সুতরাং বাবুর্চির হাতে খাইয়া জাত যাইবার ভয় নাই। দেবানন্দ চিঠিখানা ভবেশকে দেখাইল। পিয়ন জবাবের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ভবেশ বলিল, লিখে দাও আমরা দু'জন যাব।

পিয়ন চলিয়া গেলে ভবেশ বলিল, কিটি কি করে জানল কলেজ খোলবার আগে তুই এসেছিস? ওখানে গিয়েছিলি?

দেবানন্দ—হষ্টেলে বড় একা একা লাগ তে আপনার খোঁজ নিতে ওখানে একদিন গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি লক্ষ্ণৌ গিয়েছেন। মিসেস রায় খুব আদর করলেন।

ভবেশ মনে মনে হাসিল। ডি. এস. পি. ও রায় বাহাদুরের ছেলে, পড়াশুনায় ভাল, দেখিতে ভাল। একবার বিলাত ঘুরাইয়া আনিয়া জাতে তুলিতে পারিলে—

দেবানন্দের সঙ্গে ভবেশকে দেখিয়া মিসেস রায় বলিলেন, তুমি লক্ষ্ণৌ থেকে কবে এলে ভবেশ? ভবেশ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—আমি কাল ফিরেছি। কিটি কোথায়? দেবুর আজ নিমন্ত্রণ কিসের?

মিসেস রায়—এমনি খেতে বলেছে। কিটি বলছিল ও একা একা হোষ্টেলে আছে তাই।

কিটি আসিল। সে স্নান করিয়া একখানি চওড়া কালোপাড় মিলের ধুতি পরিয়াছে। দুই হাতে দুইখানি নূতন কেনা শাঁখা। তাহাকে এই বেশে দেখিয়া দেবানন্দের মনে হইল হঠাৎ কিটির বয়স দুই বছর বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার দিকে চাহিয়া ভবেশ হাসিয়া বলিল—এই যে কিটি লক্ষ্মী, কেমন আছ?

কিটি—ভবেশ-দা, তোমাকে বিজয়ার প্রণাম করা হয় নি।

দেবানন্দ ভবেশের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। কিটি ভবেশকে প্রণাম করিবার জন্য আগাইলে সে একটু সরিয়া গেল। প্রণাম সারা হইলে ভবেশ হাসিতে হাসিতে বলিল—হ্যাঁরে, ছেলেমানুষ বলে ওকে একটা প্রণাম করলি না?

দেবানন্দ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—ভবেশ-দা কি যে বলেন! আমাকে কেন প্রণাম করবে? কিটি ভবেশের মুখের দিকে চাহিল। বলিল, পালিয়ে গেলে কি করে প্রণাম করবো? তার পর নিজেই কয়েক পা আগাইয়া গিয়া গম্ভীরভাবে দেবানন্দকে আদেশ করিল—এদিকে এসো।

দেবানন্দ আসিল না। তাহার মুখের ভাবে মনে হইল সে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতেছে। কিটি আগাইয়া আসিয়া দেবানন্দকে প্রণাম করিল।

মিসেস রায় এই প্রণামের ব্যাপারটা বিশেষ পছন্দ করিলেন না। ভবেশের ব্যবহারে তাঁহার একটু বিরক্তি হইল। কিটির অদ্ভুত বেশভূষাও তাঁহার অপছন্দ। সবভাতেই বাড়াবাড়ি করা মেয়েটার স্বভাব দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কি করিবেন তিনি? স্বদেশীতে দেশসুদ্ধ লোককে এমন পাইয়া বসিয়াছে যে মেয়েকে শাসন করিতে পারেন না। শাসন করিতে গেলে সে এমন পাকা পাকা কথা বলিতে সুরু করে যে তাঁহাকে চুপ করিয়া যাইতে হয়।

সকলে বসিবার ঘরে গিয়া আসন গ্রহণ করিল। একটু পরে মিঃ রায় আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

কিটির দিকে চাহিয়া মিঃ রায় বলিলেন—তোমার মা বলছিলেন তুমি একটা নূতন দেশী গান শিখেছ? গাঙ্গুলীর ওখানে একটা গান শুনলাম তার মেয়ের মুখে। গানটা নাকি অতুলপ্রসাদ সেনের লেখা। তুমি কি গান শিখেছ শোনাও ত।

মিসেস রায়—তাঁর একটি গানের খুব চল হয়েছে। বোধ হয় একই গান তুমি মিঃ গাঙ্গুলীর ওখানে শুনেছ।

কিটি খালি গলায় গাহিল—

উঠগো ভারতলক্ষ্মী উঠ আজি জগতজন-পূজ্যা
দুঃখ দৈন্য নাশি কর দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড় গো ছাড় শোকশয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল কনক ধনধান্যে।

জননী গো, লহ তুলে বকে
সান্ত্বনা-বাস দেহ তুলি বকে
কাঁদিছে তব চরণ তলে
ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো।...

কিটির গলা খুব মিষ্ট, তবেশ কিটির গলা ও গানের খুব প্রশংসা করিল। দেবানন্দ কোন কথা বলিল না, সে লাজুক প্রকৃতির ছেলে। মিসেস রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কেমন লাগল গান?

কিটির মুখে এই গান শুনিয়া মনে যে ভাব হইল দেবানন্দ তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না, লজ্জায় বাধিল। একটু হাসিয়া সে বলিল, খুব ভাল।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তবেশ ও দেবানন্দ হষ্টেলে ফিরিল। মিঃ রায় সিটিতে গিয়াছিলেন। তাহারা যখন বাহির হইল তখনও তিনি ফিরেন নাই।

ক্রমশঃ

দরদী দরিদ্র

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

তুমিই ধন্য, সদয় হৃদয়, দরদী দরিদ্র,
দীন বট তুমি, শুচিসুন্দর তোমার চরিত্র।
কাঠুরিয়া তুমি, ডাকি নিজ আঙিনায়,
দিলে আশ্রয় 'শ্রীবৎস চিন্তায়',
কাষ্ঠের ভার বহে দিতে তাঁর—দুঃস্থের মিত্র।

২

রাজ্যভ্রষ্ট 'নলে' দংশিল যবে কর্কট নাগে,
তাঁহার ডাকেতে ছুটে এলে বুঝি তুমিই সবার আগে?
ভিষক ডাকিলে, ঔষধ দিলে বাঁটি,
কত উদ্বেগ, কতবার হাঁটাহাঁটি,
পরের লাগিয়া যুগে যুগে যাপ রজনী বিনিদ্র।

৩

'হরিশ্চন্দ্র' ভিখারী যখন, 'শৈব্যা'ও ভিখারিণী,
রোহিতাশ্বকে ডাকিয়া খাওয়ালে নাহি জানি, নাহি চিনি।
পাণ্ডবদের সাথে ছিল সারা রাতি,
জতুগৃহের নির্গম পথে সাথী,
দুখ-সাগরের বলিষ্ঠ ভেলা-না হও বহিত্র।

৪

ফুটিত যখন খর-কণ্টক শ্রীরামের পদে বনে,
তুমি বনচর ছুটিয়া আসিয়া তুলে দিতে সযতনে।
কোলে তুলে নিতে তাঁর দুটি রাঙা পদ,
কালো জলে যেন প্রস্ফুট কোকনদ,
তুমি কত ভাবে দেশ ও জাতিকে করেছ সমৃদ্ধ।

৫

শ্রীহরিরে দিতে তুমিই 'বিদুরে' দিয়াছিলে খুদ আনি,
সেদিন তোমারও ছিল না কিছুই বেদনা কত তা জানি।
ভাণ্ডার ক্ষীণ, সামর্থ্য তব কম,
শ্রদ্ধায় হয় সবই তব মনোরম,
অকুণ্ঠ তব সাত্ত্বিক দান অকপট হৃদ্য।

৬

লোমশ মুনির সঙ্গে রচেছ তাঁহার পর্ণবাস,
ইন্দ্রের হয়ে তুমি রাবণের কেটেছ ঘোড়ার ঘাস।
যশোদার ঘরে না থাকিলে ক্ষীর ননী,
তুমি এনে দিতে, ভুলাইতে নীলমণি,
কানুর বাঁশরী নিজে গড়ে দিতে, করে দিতে ছিদ্র।

৭

নিভানো প্রদীপ জ্বালিয়া নিত্য উল্লাসে তুমি নাচো,
বেদনা-বিধুরে সান্ত্বনা দিতে অমর হইয়া আছ।
দেবতা-ধর্মী তুমি নর ধরণীর,
কাঁদিয়া মুছাও পরের নেত্রনীর,
পতিত তাপিত পাপীর সঙ্গী হে অপাপবিদ্ধ।

৮

তুমি দুর্ব্বল বিপন্নদের যাচি হও রক্ষী,
পরের লাগিয়া প্রাণ দাও তুমি হে জটায়ু পক্ষী।
হে মরূদ্যান, সহনীয় কর মরু,
পান্থপাদপ, সমাজের ক্ষীর তরু,
মাটির মানুষ—পল্লামাটির মানুষ পবিত্র।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার নূতন ভবন

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

স্বনামধন্য স্বর্গত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, এম-ডি, ডি-এল, সি-আই-ই প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা' (Indian Association for the Cultivation of Science) কলিকাতার মধ্যস্থলে স্থিত ২১০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটের পুরাতন ভবন হইতে দক্ষিণ শহরতলী যাদবপুরে, নূতন বিরাট ভবনে

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

স্থানান্তরিত হইয়াছে। কলিকাতায় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় গত ২রা জানুয়ারী তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু উক্ত ভবন পরিদর্শন করেন। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে আগত এবং ভারতীয় খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণও এক দিন নূতন ভবনে প্রীতি-সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতের গৌরববর্দ্ধিকর এই প্রথম জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটির অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

প্রথম পরিকল্পনার সময় হইতে সাত বৎসর কাল ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কয়েক জন বদান্য স্বদেশবাসী ও জনসাধারণের সহায়তায় ডাঃ সরকার ১৮৭৬ সালে 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা' স্থাপনে সফলকাম হন। ১৯০৪ সালে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান-সভাকে ভারতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত করিতে সক্ষম হন।

ডাঃ সরকারের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পরলোকগত ডাঃ অমৃতলাল সরকার, এল-এম-এস, এফ-সি-এস্ বিজ্ঞান-

স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন

সভার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইঁহারই সময়ে ১৯০৭ সালের মধ্যভাগে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র, কলিকাতার সরকারী হিসাব বিভাগের কর্ম্মে উচ্চপদে নিযুক্ত, তরুণ বিজ্ঞানবিৎ শ্রীচন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন্ প্রথম বিজ্ঞান-সভার সংস্রবে আসেন এবং অবসর-সময়ে, প্রাতে ও অপরাহ্নে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। কিছুকাল পরে কিন্তু তাঁহাকে কর্ম্মসূত্রে প্রথমে রেঙ্গুন ও তৎপরে নাগপুরে যাইতে হয় এবং গবেষণাও বন্ধ থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রশেখর ১৯১১ সালের শেষভাগে আবার কলিকাতায় বদলী হইয়া আসেন এবং পূর্ব্বের মত বিজ্ঞান-সভার গবেষণা-কার্য্যে রত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার গবেষণার ফলাফল 'বুলেটিন' আকারে সভা-

কর্তৃক প্রকাশিত হইতে থাকে এবং এই তরুণ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রতি বিদগ্ধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

কয়েক বৎসর পরে ১৯১৭ সালের মধ্যভাগে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে চন্দ্রশেখর সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বিজ্ঞান-সভারও তাঁহার গবেষণা-কার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিতে থাকে।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা, যাদবপুর

ডাঃ অমৃতলাল সরকারের মৃত্যুর পর, ১৯১৯ সালে অধ্যাপক রামন্ 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা'র সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ভারতের নানা স্থান হইতে গবেষক ছাত্রবৃন্দ আসিয়া বিজ্ঞান-সভায় তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অধ্যাপক রামন্ শব্দ-বিজ্ঞান, আলোক-বিজ্ঞান, রঞ্জন-রশ্মি ও চুম্বক-বিজ্ঞানের গবেষণায় কৃতিত্ব লাভ করিয়া ১৯২৪ সালে বিলাতের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্ব্বাচিত হন। আলোক-বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত গবেষণায় এক সম্পূর্ণ নূতন তথ্য (Raman Effect) আবিষ্কার করিয়া অধ্যাপক রামন্ ১৯৩০ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেন। সমগ্র বিশ্বে তাঁহার খ্যাতি ব্যাপ্ত হয়। এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞান-বিদ্ রামন্ এই অতুল সম্মানের অধিকারী হন। ইতিপূর্ব্বে মাত্র একজন এশিয়াবাসী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হইয়া ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।
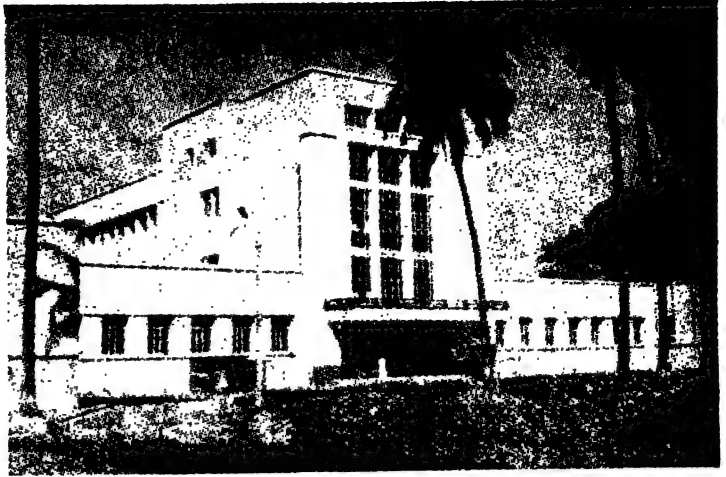
বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের এই প্রতিষ্ঠানকে শুধু শিক্ষাদান-কেন্দ্র নহে, অন্যতম গবেষণা-কেন্দ্রে পরিণত করার যে একান্ত বাসনা ছিল, তাহা এত দিনে সফলতা লাভ করে। ১৯৩৩ সালে অধ্যাপক রামন্ (তখন সভাপতি) বিজ্ঞান-সভা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালোরে চলিয়া যান এবং তাঁহার প্রিয় ছাত্র ডক্টর কে. এস্. কৃষ্ণান্ সভার গবেষণা বিভাগের ভার প্রাপ্ত হন। গবেষণা-কার্য্যে কৃতিত্বের জন্য ডক্টর কৃষ্ণান্ও বিলাতের রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি 'ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী'র ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রি ল্যাবরেটরী

বিজ্ঞান-জগতে 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা'র নাম আজ সুপরিজ্ঞাত। যুদ্ধোত্তর কালে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে উন্নতি পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার সহিত সমতালে অগ্রসর হইতে হইলে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণকেও উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, বিজ্ঞান-সভার সভাপতি বৈজ্ঞানিক-প্রবর অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা, ডি-এস্-সি, এফ-আর-এস্ এবং অন্যান্য পরিচালকগণ প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণে চেষ্টিত হন।

স্বাধীনতা-লাভের পর ১৯৪৭ সালে

ভারত গবর্ণমেণ্ট 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা'র নূতন পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার জন্য, বার্ষিক বরাদ্দ হিসাবে দুই লক্ষ সেবটি হাজার সাত শত টাকা দান মঞ্জুর করেন। বিগত চার বৎসরের মধ্যে সভা ক্রমে ক্রমে ছয়টি গবেষণা বিভাগ (X-Rays and Magnetism, Optics, Physical Chemistry, Organic Chemistry, Theoretical Physics and Inorganic Chemistry) স্থাপিত করিয়াছেন। বিভিন্ন অধ্যাপকের উপর এক একটি বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে। সভার গ্রন্থাগার বিশেষ ভাবে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহাকে পদার্থবিদ্যা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক মাসিক ও সাময়িক পত্রাদি পূর্ণ ভারতের একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থাগার বলা যাইতে পারে।

এক্স-রে ল্যাবরেটরী
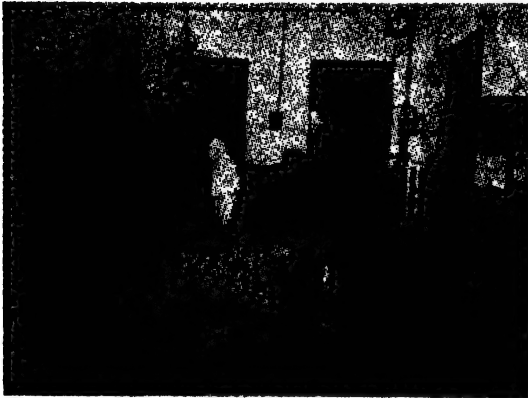
ভারত গবর্ণমেণ্টের ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের ৭ লক্ষ টাকা দানে এবং তদ্ব্যতীত ভারত গবর্ণমেণ্ট বিনা সুদে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়ায় বিজ্ঞান-সভার এই নূতন ভবন নির্ম্মাণ সম্ভবপর হইয়াছে। ভবনের জন্য এ যাবৎ মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় সোয়া পনর লক্ষ টাকা। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ এবং সেণ্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনিষ্টিটিউটের নিকট প্রায় ২৯ বিঘা জমির মধ্যে ইহা অবস্থিত। ১৯৪৯ সালের প্রারম্ভে সুরু করিয়া, ১৯৫০ সাল সমাপ্তির মধ্যেই ভবনের একতলা, সভাকক্ষ, গ্রন্থাগার, কারখানা ও ক্যাটালেটিক লেবরেটরী ইত্যাদির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসর কাল ধরিয়া 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা'র কার্য্য যে স্থানে পরিচালিত হইয়াছে, ১৯৫১ সালের প্রথম দিকেই বহুবাজারের সেই পুরাতন ভবন হইতে তাহার বিভিন্ন গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, কারখানা ও কার্য্যালয় নূতন ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজ্ঞান-সভার উন্নয়নের এই পরিকল্পনা যে প্রধানতঃ সভার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীমেঘ-নাদ সাহার অপরিসীম উৎসাহ ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধ্যাপক সাহা ১৯৪৬ হইতে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অধ্যাপক ডক্টর মেঘনাদ সাহা
(ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার সভাপতি, ১৯৪৬-৫১)

এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের বর্ত্তমান কর্ম্মসচিব ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন, এম-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়ের চেষ্টা ও উদ্যম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডক্টর সেন পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের পরামর্শদাতা ও পরে সেক্রেটারী ছিলেন এবং সে সময়ে তিনিই দিল্লী হইতে দানপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। কলিকাতায় বদলী হইয়া আসিলে, তাঁহারই সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দানপ্রাপ্তির সুবিধা হয়।

ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আগত বহু কৃতী ছাত্র বিজ্ঞান-সভার বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা-কার্য্যে রত আছেন। বর্ত্তমানে ডক্টর শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি-এসসি, এফ-এন-আই 'এক্স-রে ও ম্যাগনেটিজম' বিভাগের, ডক্টর শ্রীসুকুমার সরকার ডি-এস-সি, এফ-এন্-আই অপটিকস বিভাগের, ডক্টর শ্রীশান্তিরঞ্জন পালিত 'ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রি' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং ডক্টর শ্রীদেবীদাস বসু, পিএচ-ডি,'থিওরিটিক্যাল

ফিজিক্স' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রীডার। ইঁহারা সকলেই বৈজ্ঞানিক মহলে সুপরিচিত।

বিজ্ঞান-সভা হইতে 'ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্স' নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। সভার বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণী ব্যতীত, এখানকার কোচবিহার ও রিপন অধ্যাপকদ্বয় এবং 'জয়কিষণ মুখার্জ্জি লেক্চারার'রা যে সকল বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার সারাংশও ইহাতে প্রকাশ করা হয়।

পৃথিবীর যে সকল বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক মূল্যবান আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, এরূপ গুণীদেরই 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা'র 'ডঃ বিমলাচরণ লাহা সুবর্ণপদক' ও 'জয়কিষণ মুখার্জ্জী সুবর্ণপদক' প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। অধ্যাপক এ. আইনষ্টাইন, স্যার হেন্‌রি ডেল, স্যার রবার্ট রবিনসন্, স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং, অধ্যাপক রবার্ট মিলিকান, স্যার ই. জে. রাসেল, স্যার জেম্‌স জিন্‌স, ম্যাডাম আইরিণ কুরী, ডক্টর এস্. এস্. ভাটনগর প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ উক্ত পদক লাভ করিয়াছেন।

'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা'র সকল কার্য্য ২৪ জন সদস্যের একটি কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহার মধ্যে ভারত-গবর্ণমেণ্টের, পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের, 'ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট অফ সায়ান্স অফ ইণ্ডিয়া'র ট্রাষ্টিদের, টাক কমিটির এবং সভার আজীবন ও সাধারণ সদস্যদের প্রতিনিধিরা রহিয়াছেন। বিজ্ঞান-সভার আজীবন ও সাধারণ সদস্যদের সংখ্যা প্রায় আড়াই শত। বর্ত্তমানে স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডি-এস্‌সি, এফ-এন্-আই ইহার সভাপতি, অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়, এম-এ, এফ-এন্-আই ডিরেক্টর এবং শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এস্‌সি রেজিষ্ট্রার।

বর্ত্তমান লেখক দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার আজীবন সদস্যরূপে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় ইহার ক্রমোন্নতির সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত আছেন। তবে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটি যে বাংলাদেশের গৌরবস্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ভারতও যে নিজেকে অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য জাতির সমকক্ষ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, ইহা আনন্দের বিষয়। ভারতরাষ্ট্র সরকার আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ এই বিশাল দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকারের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করিতেছেন। 'দার্শনিক' ভারত যে অদূর ভবিষ্যতে 'বৈজ্ঞানিক' ভারত রূপেও জগদ্‌বাসীর নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকা : প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

চির-চঞ্চল ঘটনাপ্রবাহই ইতিহাসের প্রাণ। তাই যুগে যুগে ইতিহাসের পট-পরিবর্ত্তন হয়। ইহাই সনাতন নিয়ম। কালচক্রের আবর্ত্তনে জাতি এবং রাজ্য ও সাম্রাজ্যের পতন-অভ্যুদয় ঘটিয়া থাকে।

বিস্মৃতপ্রায় অতীতে একদা ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি স্বদেশের কূল ছাপাইয়া দূরদূরান্তে প্রসারিত হইয়াছিল। ইহারই ধারক এবং বাহক রূপে ভারতীয়গণ সে যুগে সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সম্মানিত হইতেন। কিন্ত আজ এই অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীর হইতে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও প্রায় ৪৫,০০,০০০ প্রবাসী ভারতীয়[১] বসবাস করিয়া থাকে। সুতরাং প্রতি শতে এক জন ভারতীয় এখনও প্রবাসী। ভারতীয়গণ যে ঘরমুখো নহে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ন্যূনাধিক ৪৫,০০,০০০ জন প্রবাসী ভারতীয়ের মধ্যে প্রায় ২৫,০০,০০০ জনই 'কমনওয়েলথ অব নেশনস্' এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীই 'কমন-ওয়েলথ'-এর কর্ণধার। ভারতবর্ষ এই 'কমনওয়েলথ'-এর অন্যতম সদস্য। অথচ এই 'কমনওয়েলথ' ও সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে প্রবাসী ভারতীয়দিগের উপর নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া তাহাদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিবার চেষ্টার আর বিরাম নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ন্যূনাধিক ৩,০০,০০০ ভারতীয়ের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা সর্ব্বজনবিদিত। ঘরের কোণে সিংহলও—ইহাকে ভারতবর্ষেরই অংশরূপে গণ্য করা যাইতে পারে—প্রায় ৭,৫০,০০০ প্রবাসী ভারতীয় সম্বন্ধে উদারতার পরিচয় দিতে পারে নাই। মালয়-প্রবাসী ছয়-সাত লক্ষ ভারতীয়ও সুখে নাই। ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়গণ সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

টাঙ্গানিকা, উগাণ্ডা এবং কেনিয়া এই তিনটি প্রদেশ লইয়া

---

১ বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় বলিতে ভারতীয় এবং পাকিস্থানী এই উভয়কেই বুঝাইবে।—লেখক

ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকা গঠিত। ১৯৪৩ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ভারত হইতে আগত অধিবাসীর সংখ্যা ১,৬১,০০০। দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী স্ব-জাতীয়গণের তুলনায় ইহারা অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিলেও জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ইহাদিগকে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদিগের সমকক্ষ জ্ঞান করা হয় না। ইহাদের সম্বন্ধে অনুসৃত সরকারী নীতি পক্ষপাতদুষ্ট। জাতি-বিদ্বেষের কৃষ্ণছায়া ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকায় দিনের পর দিন দীর্ঘতর হইয়া উঠিতেছে। আশঙ্কা হয় যে, এক দিন হয়ত এখানেও দক্ষিণ-আফ্রিকার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। বিবিধ কারণে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক সম্প্রদায় প্রবাসী ভারতীয়গণের উপর খড়্গহস্ত। প্রথমতঃ বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সাফল্য শ্বেতাঙ্গগণের চক্ষুঃশূল। দ্বিতীয়তঃ, ইহারা মনে করে যে, ভারতীয়দের দেখাদেখি স্থানীয় অধিবাসিগণও এক দিন-না-এক দিন শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের সহিত সমকক্ষতা দাবি করিয়া বসিবে।

সুদীর্ঘ পাঁচ শত বৎসর বা তাহারও অধিককাল পূর্ব্বে পূর্ব্ব-আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে, মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে ১৮৯৫ সালের পর হইতে ভারতীয়গণ অসভ্যজাতি অধ্যুষিত, শ্বাপদসঙ্কুল কৃষ্ণমহাদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ১৮৯৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্রিটিশ ঈষ্ট আফ্রিকা কোম্পানী কেনিয়া উগাণ্ডা রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য তদানীন্তন ভারত-সরকারের নিকট শ্রমিক আমদানি করিবার অনুমতি প্রার্থনা করে। ভারত-সরকার কোম্পানীকে প্রার্থিত অনুমতি প্রদান করিলেন। প্রধানতঃ পঞ্জাববাসী শ্রমিকগণের প্রাণপাত পরিশ্রমেই কেনিয়া উগাণ্ডা রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব-আফ্রিকার সমৃদ্ধির মূলে ভারতীয়গণের দানের পরিমাণ যে উপেক্ষণীয় নহে মিঃ চার্চিল পর্য্যন্ত তাহা স্বীকার করিয়াছেন।২

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় টাঙ্গানিকা জার্ম্মানীর শাসনাধীন ছিল। যুদ্ধান্তে ভার্সাই সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী জার্ম্মানীর সমস্ত উপনিবেশ কাড়িয়া লওয়া হয়। এই সময় টাঙ্গানিকার শাসনভার ইংলণ্ডের উপর অর্পিত হইল।

১৯৪৪ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী মোট ৪৪,২০০ ভারতীয় টাঙ্গানিকাতে বাস করিত। জার্ম্মান-শাসনে ইহারা বেশ সুখেই ছিল। ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যও ভালই চলিতেছিল। কিন্তু ইংরেজ-শাসনে ইহাদের অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি ঘটিয়াছে। ১৯৩২ সাল হইতে আইনের পর আইন প্রণয়ন করিয়া ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অধিকার বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। দেশের এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে তাহাদের অবাধে যাতায়াতের অধিকার হরণ করা হইয়াছে। ইংরেজ-পূর্ব্ব যুগে এই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের নব-দশমাংশই ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। ইহার যত একটা অংশই আজ ইহাদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে।

টাঙ্গানিকার মোট আয়তন ৩,৪০,০০০ বর্গ মাইল। অথচ ইহার রেলপথের আয়তন ২,০০০ মাইলও নহে। বলাই বাহুল্য যে, প্রয়োজনের তুলনায় ইহা একান্তই অপ্রচুর। যে সমস্ত অঞ্চলে রেলপথ নাই, পূর্ব্বে সে সমস্ত অঞ্চলে ভারতীয় মালিকের মোটর বাস এবং মোটর লরীই যাত্রী ও মাল বহনের প্রধান উপায় ছিল। সুতরাং সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনে ভারতীয় মোটর-ব্যবসায়ীরা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহাদের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ফলেই টাঙ্গানিকার অনগ্রসর দুর্গম এবং দুরধিগম্য অঞ্চলসমূহে যান-বাহন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং ইহারা অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অঞ্চলসমূহের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছে। এই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের চেষ্টাতেই যে টাঙ্গানিকার সর্ব্বত্র বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সহজসাধ্য হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ১৯৩১ সালে সরকার সর্ব্বপ্রথম মোটর বাস এবং লরীর চালকদিগের উপর উচ্চহারে লাইসেন্স ফি ধার্য্য করেন। দুই বৎসর পর ১৯৩৩ সালে আইন করা হইল যে, রেলপথের সমান্তরাল কোন রাস্তায় ভারতীয়দিগকে মোটরের ব্যবসায় চালাইতে দেওয়া হইবে না। তবে যে সমস্ত শাখা-পথ এই সকল রাস্তা হইতে বাহির হইয়াছে সেই সমস্ত রাস্তায় ভারতীয়গণের অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল। ১৯৩৭ সালে টাঙ্গানিকার ভারতীয় ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের অধিকার আরও সঙ্কুচিত করা হইল। কিন্তু এইখানেই শেষ নহে। ১৯৪০ সালে সরকার আইন করিলেন যে, টাঙ্গানিকা মালভূমির দক্ষিণাঞ্চলে কোন ভারতীয় মোটর-ব্যবসায়ী মোটর চালাইতে পারিবে না। কৃষি-সম্পদে সমৃদ্ধ টাঙ্গানিকার এই অঞ্চলে চা, কফি, গম এবং ধান প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

উল্লিখিত বিধি-নিষেধগুলি সুপরিকল্পিত নীতির একটি দিক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিবিধ ব্যবসায় হইতে ভারতীয়দিগের উৎসাদনই এই নীতির লক্ষ্য।

সরকারের অনুমোদিত একচেটিয়া অধিকারসম্পন্ন ব্যবসায়ী ব্যতীত আর কেহই টাঙ্গানিকার কতকগুলি বিশেষ অঞ্চলের

(2) "It was the Sikh soldier who bore an honourable part in the conquest and pacification of their East Africa territories. It is the Indian trader, who penetrating and maintaining him in all sorts of places to which no white man would go or in which no white man could earn a living, has more than any one else developed the early beginnings of trade and opened up the first slender means of communication. It was by Indian labour that one vital railway on which everything else depends, was constructed."—*African Journey* by Winston Churchill.

উৎপন্ন পণ্য ক্রয় করিবার অধিকারী নহে। এই ব্যবসায়িগণ সকলেই প্রায় ইউরোপীয়। অধিকাংশক্ষেত্রেই ইহারা ইংরেজ-জাতীয়। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে নিযুক্ত ভারতীয় কর্ম্মচারিগণের বেতনের হার শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদের তুলনায় অনেক কম। প্রথমোক্তদের পদোন্নতির সম্ভাবনাও একান্তই সীমাবদ্ধ।

টাঙ্গানিকার আইন-পরিষদ এবং বিভিন্ন 'পরামর্শদাতা কমিটি'তে ভারতীয় সদস্য থাকিলেও ইঁহাদিগের সংখ্যা প্রবাসী ভারতীয়গণের সংখ্যানুযায়ী নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আইন-পরিষদের ১৩ জন সরকারী এবং ১০ জন বে-সরকারী মনোনীত সদস্যের মধ্যে ৩ জন মাত্র ভারতীয়। ভারতীয়গণের তুলনায় ইউরোপীয় সদস্য-সংখ্যা অত্যধিক।

সরকারী পক্ষপাতিত্ব এবং বৈষম্যমূলক নীতি সত্ত্বেও টাঙ্গানিকার অর্থনৈতিক জীবনে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের গুরুত্ব উপেক্ষা করিবার মত নহে।৩

ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকার অন্যতম প্রদেশ উগাণ্ডা একটি আশ্রিত রাষ্ট্র (Protectorate)। উগাণ্ডা-প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা ৩৩,৯০০। ইহাদের আনুপাতিক সংখ্যা সমগ্র উগাণ্ডার জনসংখ্যার শতকরা একজনেরও কম। অন্যান্য বহু দেশের প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের তুলনায় উগাণ্ডার ভারতীয়গণ সুখে আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া এদেশে ভারতীয়গণের উন্নতির পথ বিঘ্নসঙ্কুল করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

তারপর কেনিয়া। কেনিয়া একটি উপনিবেশ (Crown Colony)। ইহার আয়তন ২,২০,০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৪০,৫৩,২৮৫। কেনিয়া-প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা ৯০,৯০০—আইনতঃ ইহাদের প্রতি বিশেষ বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা না হইলেও সামাজিক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণ অপ্রতিহত প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। এই শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক-সম্প্রদায়ই প্রকৃতপক্ষে কেনিয়ার ভাগ্যবিধাতা। ইহারা এতই ক্ষমতাশালী যে, বিলাতের উপনিবেশ দপ্তর (Colonial office) অতীতে একাধিকবার ইহাদের নিকট মাথা নোয়াইতে বাধ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইহারা খোলাখুলি ভাবে বিদ্রোহের হুমকি দিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। এই সময় কেনিয়ার মালভূমিতে শ্বেতাঙ্গ ব্যতীত অপর সকল জাতির সম্পত্তি অর্জ্জনের অধিকার লোপ করিবার কথা চলিতেছিল। ভারতীয়গণ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলে উপনিবেশ দপ্তর তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাই শ্বেতাঙ্গ-সমাজের উষ্মার কারণ। কেনিয়ার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণ স্থির করিয়াছিল যে, উপনিবেশ দপ্তর তাহাদের দাবি অগ্রাহ্য করিলে তাহারা স্থানীয় গবর্ণরকে অপহরণ করিবে।৩ এই সময় ইহারা ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে ঘোর প্রচার আরম্ভ করিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণকে যাহাতে উভয় দেশের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের সমান মর্য্যাদা এবং অধিকার প্রদান করা না হয় তদুদ্দেশ্যে ঐ দুই দেশে কেনিয়া হইতে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হইয়াছিল।

কেনিয়ার স্বেচ্ছাগত প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ব্যবসায়ী এবং নিপুণ শ্রমিক (Skilled workers)। কেনিয়ার পৌর-প্রতিষ্ঠান, আইন-পরিষদ এবং গবর্ণরের শাসন-পরিষদে ভারতীয়গণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার আছে। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ইউরোপীয় সদস্য অপেক্ষা ভারতীয় সদস্যগণের আনুপাতিক হার অনেক কম, ভারতীয়গণের সরকারী চাকুরিলাভের পথে আইনতঃ কোন বাধা নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়-সম্প্রদায়ের তুলনায় ইহাদের সাংস্কৃতিক এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত। কেনিয়ার দুইখানি দ্বিভাষিক দৈনিক সংবাদপত্র৪ প্রবাসী ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের পরিচালিত কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকাও আছে।

আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত না হইলেও জাতি-বিদ্বেষ এবং জাতি-বৈষম্যের বিষ বহুদিন হইতেই কেনিয়ার সমাজ-দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এই বিদ্বেষ এবং বৈষম্যের স্রোত দিনের পর দিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে।

১৯০৯ সালের কেনিয়ার গবর্ণর প্রবাসী ভারতীয়গণের একটি প্রতিনিধি-দলকে পরিষ্কার জানাইয়া দেন যে, কেনিয়া উপনিবেশে ভারতীয়-সম্প্রদায়ের স্বার্থ উপেক্ষিত না হইলেও শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণের স্বার্থ রক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইবে।৫

উত্তর কেনিয়ার ভূমি বন্ধ্যা। রাজধানী নাইরোবি হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ পূর্ব্বাঞ্চল সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা। সমগ্র কেনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪,০০০ ফুটের কম। এই অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ অঞ্চল ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ কর্ত্তৃক বাসের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত। প্রাকৃতিক সুষমা-সমৃদ্ধ অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ অতিশয় উর্ব্বর। কেনিয়া মালভূমি নামে পরিচিত এই

(3) ". . . the Indians control more than 25 per cent of the country's production of 'Sisal.' Most of coconut plantations and the majority of cotton-ginning factories belong to them. They own a number of rice and flour mills and several reefs are owned and operated by them."—*Indians Outside India* by Dr. N. V. Rajkumar, p. 19.

৪ *The Daily Mail* এবং *The Colonial times.*

(5) "The principle has been accepted that this country is primarily for European development and that whereas the interests of Indians will not be lost sight of, in all respects the interests of Europeans must predominate."

অঞ্চলে প্রচুর কফি, চা, গম এবং ভুট্টা উৎপন্ন হয়। যুগরাজের জন্যেও কেনিয়া মালভূমির আকর্ষণ উপেক্ষণীয় নহে। ১৯০৮ সালে সর্ব্বপ্রথম এই মালভূমি কেবলমাত্র শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকদিগের বসবাসের জন্য সংরক্ষিত করিবার প্রস্তাব করা হয়। কেনিয়া-প্রবাসী ভারতীয়গণ এতকাল সুখে-শান্তিতেই বসবাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছিল। ১৯০৪ সালে উপনিবেশ-সরকার তাহাদিগকে আশ্বাস দেন যে, তাহাদের বৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার লোপ করা হইবে না। কিন্তু ইহার পর চার বৎসরের মধ্যেই ১৯০৮ সালে বিলাতের তদানীন্তন উপনিবেশ-সচিব লর্ড এলগিন কেনিয়া মালভূমি ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদিগের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার নীতি ঘোষণা করেন। কেনিয়া এবং ভারতবর্ষে এই নীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠিল। ফলে উপনিবেশ-দপ্তর কিছুদিনের জন্য এই বৈষম্যমূলক নীতির প্রয়োগ স্থগিত রাখিল। ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল বহু বাদ-বিতণ্ডার পর অবশেষে ১৯৩৯ সালে রাজকীয় আদেশের বলে কেনিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অঞ্চল কেনিয়া মালভূমি শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইল।

বেশী দিনের কথা নহে, মহামান্য আগা খাঁ এই শ্বেতাঙ্গ স্বর্গে জমি ক্রয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়। পরে তাঁহার শ্বেতাঙ্গিনী বেগমের বেনামীতে তাঁহাকে প্রার্থিত অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। ইংরেজের একান্ত অনুগত মুসলমান-সম্প্রদায়ের এই ধর্ম্মগুরুর মনে উক্ত অভিজ্ঞতা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল জানি না।

১৯২০ সালে কেনিয়া সরকার প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়কে আশ্বাস দেন যে, ভারতীয়গণ যেন ভুলিয়া না যান—ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জন এবং খনিজ-সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সরকার ইউরোপীয় এবং ভারতীয় উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি একই নীতি অনুসরণ করিবেন।৬ উল্লিখিত ১৯০৯ সালের রাজকীয় আদেশ এই ঘোষণার সম্পূর্ণ বিরোধী।

কেনিয়ার সৈন্যদলে (কেনিয়া ডিফেন্স কোর্স) ভারতীয়গণকে গ্রহণ করা হয় না। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় খাদ্য এবং বাস-গৃহের অভাবের অজুহাতে কেনিয়ায় ভারতীয়গণের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধাবসানে বিধিবদ্ধ "ইমিগ্রেশন রেজিষ্ট্রেশন এক্ট" দ্বারা কেনিয়ায় ভারতীয়গণের প্রবেশাধিকার সঙ্কুচিত হইয়াছে। এই আইনে বলা হইয়াছে যে, কেনিয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা বেকার তাহারা যে সমস্ত কার্য্যের উপযুক্ত সে সমস্ত কার্য্যের জন্য বাহির হইতে কাহাকেও সে-দেশে যাইতে দেওয়া হইবে না। আইন-পরিষদে এই আইনের প্রস্তাবের আলোচনা-প্রসঙ্গে নির্ব্বাচিত ইউরোপীয় সদস্যবৃন্দের নেতা স্যর এলফ্রেড ভিনসেণ্ট মন্তব্য করেন—ভারতীয়গণের সহিত তাহাদের দুঃখ, দারিদ্র্য এবং জাতিগত তিক্ততা আমদানীর ফলে কেনিয়ার সমস্যা জটিলতর হইবে এবং ইহারই ফলে আফ্রিকাবাসী প্রাচ্য-সভ্যতা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।৭ ভারত-সরকার এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলে বিলাতের উপনিবেশ-দপ্তর আশ্বাস দেয় যে, এই আইন ভারতীয়দিগের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না। বিভিন্ন শ্বেতকায় জাতির অ-শ্বেতকায় জাতিসমূহকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের যে সমস্ত নজির রহিয়াছে তাহা হইতে উপনিবেশ-দপ্তরের আশ্বাসে বিশেষ আশ্বস্ত হওয়ার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া না।

এদিকে শ্বেতাঙ্গগণ প্রবাসী ভারতীয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিদ্বেষমূলক অপপ্রচারের ত্রুটি হইতেছে না। এই কার্য্যে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারই যেন সর্ব্বাধিক আগ্রহশীল। পূর্ব্ব আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদিগের জন্য চিন্তায় দক্ষিণ আফ্রিকার অবসরপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ‘ড. এফ. মালানের চোখে আর ঘুম নাই। পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার কাল্পনিক আশঙ্কায় মালান বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের প্রচার বিভাগ দিনের পর দিন রটনা করিয়া চলিয়াছে যে, ভারতীয়গণ পূর্ব্ব আফ্রিকায় একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর এবং আজ হউক, কাল হউক, ভারতবর্ষ পূর্ব্ব আফ্রিকা গ্রাস করিবে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের লণ্ডনস্থ হাই-কমিশনার ডাঃ এ. এল. গেয়ার বলেন যে, বৎসরের পর বৎসর দলে দলে জনবহুল এশিয়া মহাদেশ হইতে আগন্তুকের দল পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভিড় জমাইতেছে এবং ইহারই ফলে স্থানীয় অধিবাসীদিগের স্বার্থ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জোহান্সেবার্গের (ট্রান্সভাল, দক্ষিণ আফ্রিকা) ‘ষ্টার’ পত্রিকার নাইরোবিস্থ সংবাদদাতা ১৪।৫।৪৭ তারিখে প্রেরিত সংবাদে মন্তব্য করেন যে, প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতীয় নেতৃত্বের প্রতি আফ্রিকাবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমুৎসুক। বহু শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকের

(6) "They, *i.e.*, the Indians were in error in supposing that the Government had any intention of drawing any distinction between Europeans and Indians so far as rights of mining, settling and acquiring of lands are concerned."

(7) "The problems (of Kenya) will be aggravated by the importation of poverty, distress and racial bitterness that characterises the lives of so many of the peoples of India, which ultimately means the superimposition of Eastern civilization on the indigenous peoples of the country."

বিশ্বাস যে, প্রবাসী ভারতীয়গণ কেনিয়াকে ভারতবর্ষের অধীন করিতে চাহে।[৮]

এদিকে কেনিয়া-প্রবাসী ইউরোপীয়গণও নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। ইহারা ভারতীয় এবং আফ্রিকাবাসীর মধ্যে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ইহারা প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে কেনিয়ার আইন-পরিষদ কর্ত্তৃক উক্ত পরিষদে ভারতীয় মুসলমানদিগের জন্য পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে দুইটি আসন সংরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিষদের হিন্দু সদস্যগণ আপত্তি তুলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মের ভিত্তিতে মুসলমানদিগকে হিন্দু সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিবার এই ব্যবস্থা প্রবাসী ভারতীয়-সম্প্রদায় তথা সমগ্র কেনিয়ার স্বার্থের পরিপন্থী। পরিষদের হিন্দুদলের নেতা শ্রীপটেলের বক্তৃতায় প্রকাশ যে, ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত ইউরোপীয় সদস্যগণ মুসলমানদিগের জন্য পৃথক নির্ব্বাচন এবং আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু সদস্যগণ তাঁহাদিগের রাজনৈতিক দাবি সমর্থন করিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহারা মুসলমানদিগের সহিত একজোট হইয়া পৃথক নির্ব্বাচন এবং আসন-সংরক্ষণের দাবি সমর্থন করিয়াছেন। পরিষদের মুসলমান সদস্যগণ বলেন যে, আনুপাতিক হারে সদস্য-নির্ব্বাচন সম্ভব নহে এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ, ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার দিক হইতে হিন্দু এবং মুসলমানগণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা আরও বলেন যে, তাঁহারা হিন্দুগণের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিতে পারেন না। এই ধরণের যুক্তি আমাদের নিকট নূতন নহে। পরিষ্কার বুঝা যায়, শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা নিজেদের তাঁবেদার মুসলমানদিগের জবানিতে কথা বলিতেছেন। দেশ বিভাগের পূর্ব্বে ইংরেজ শাসকসম্প্রদায় ভারতবর্ষেও একই খেলা খেলিয়াছেন। পৃথক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার ফলে কেনিয়া-প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত এবং পঙ্গু হইয়া পড়িবে। পরিষদের হিন্দু, আরবদেশীয় এবং আফ্রিকাবাসী প্রতিনিধিবৃন্দ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথা এবং আসন-সংরক্ষণের বিরোধিতা করিলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারী ও বেসরকারী ইউরোপীয় এবং মুসলমান সদস্যদিগের নিকট তাঁহারা পরাস্ত হন।

১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কার ভারতবর্ষে স্বতন্ত্র প্রথারূপ যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিল, অনধিক অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে তাহাই মহামহীরুহে পরিণত হইয়া ভারতবর্ষের অখণ্ডতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাহার মুক্তিসাধনার আদর্শকে খণ্ডিত করিয়াছে। আশার কথা এই যে, মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনপ্রথার অন্তর্নিহিত অশুভ সম্ভাবনা সম্বন্ধে কেনিয়াবাসী অনবহিত নহে। তাহাদের আশঙ্কা, ইহারই ফলে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের মাতৃভূমিকে দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত করিবার কথা উঠিতে পারে। এইজন্যই 'কেনিয়া আফ্রিকান পলিটিক্যাল বডি' এবং 'ইষ্ট আফ্রিকান ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেস' মুসলমানদিগের দাবির বিরোধিতা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছে যে, ধর্ম্মের ভিত্তিতে মুসলমানদিগকে পৃথক নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইলে কালে আফ্রিকাবাসীদিগকেও ধর্ম্ম এবং জাতির ভিত্তিতে পরস্পর হইতে পৃথক করিবার চেষ্টা হইবে।[৯] এই উভয় প্রতিষ্ঠানই উপরোক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সচিবের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। উপনিবেশ-সচিব এই প্রতিবাদের কি জবাব দিয়াছেন অথবা আদৌ কোন জবাব দিয়াছেন কি না তাহা আমাদের জানা নাই। ভারত-সরকারও প্রবাসী ভারতীয়দিগের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শতকরা প্রায় ৯৫ জন কেনিয়াবাসী এবং ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী বহু দল ও ব্যক্তি এই ব্যবস্থার প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন। কেনিয়া সরকারের বক্তব্য এই যে, ভেদনীতির সাহায্যে কেনিয়া শাসনের অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই। সরকার বাস্তব অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কেনিয়ার সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের সন্দেহ যে, এই তথাকথিত বাস্তব অবস্থা মুখ্যতঃ স্বার্থান্বেষীদের সৃষ্ট।

(8) "They (*i.e.*, Indians) hope to turn African eyes towards Indian universities and Indian leadership. Many Europeans believe that the final political aim of the Indian community is to turn Kenya into an appendage of the Dominion of India or an Indian Empire."

(9) ". . . if the Muslims succeed in obtaining separate representation on religious grounds, the government and others will seek also to divide African representation on a religious and tribal basis."

প্রাকৃত না জানিলে সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা হয় না

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইলে প্রাকৃত জ্ঞানের আবশ্যকতা কিছুতেই অপলাপ করিতে পারা যায় না। স্থানান্তরে আমি বলিয়াছি যে, কিঞ্চিন্মাত্রও প্রাকৃত না জানিলে কেহ পরম বৈদান্তিক বা মীমাংসক, বা এইরূপ অন্য কিছু হইতে পারেন, কিন্তু কেহ কেহ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, প্রাকৃত না জানিলে কোন সংস্কৃতবিদ্ বস্তুত সংস্কৃতবিদ্ নহেন। কেন না এইরূপ ব্যক্তি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রযুক্ত ভূরি-ভূরি শব্দের সম্পূর্ণ বা যথাযথ অর্থ ব্যাখ্যা তো করিতে পারেনই না, বরং ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

বিদ্বানেরা জানেন যে, বেদ-ব্রাহ্মণেরও ভাষায় বহু-বহু প্রাকৃতভাব ও বৈভাষিক[1] মিশ্রণ আছে, পুরাণ,[2] তন্ত্র প্রভৃতির ভাষায় তো কথাই নাই। ইহারই সমর্থনে নিম্নলিখিত কয় পঙক্তি লিখিতে পারা যায়। ইহাতে বুঝা যাইবে সংস্কৃতের উপর প্রাকৃতের কি গুরুতর প্রভাব আছে।

প্রথমত শত শত শব্দের মধ্যে উদাহরণ রূপে আমরা 'গৃহ' অর্থে গেহ শব্দটিকে গ্রহণ করি। ইহা খুবই সোজা সকলেরই জানা, বিদ্যাপতিও লিখিয়াছেন "আজু মঝু গেহ গেহ করি মানহু।" এই গেহ শব্দটিকে প্রথমে বোধ হয় আমরা বাজসনেয়ি-সংহিতায় (৩০-৯) দেখিতে পাই, তাহার পর পাণিনিতে (৩.১.১৪৪, ইত্যাদি)। কিন্তু বস্তুত ইহা সংস্কৃত নহে, প্রাকৃত। ইহা গৃহ হইতে প্রাকৃত-প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে।

'ক্ষুদ্র' অর্থে সংস্কৃতে এই তিনটি শব্দের প্রয়োগ আছে, এবং উপনিষদের সাধারণ পাঠকেরাও ইহা জানেন। যথা দভ্র (ঋগ্বেদ, ১.১১৩.৫; কেনোপনিষদ্ ৯), দহ্র (তৈত্তিরীয়-সংহিতা ইত্যাদি, মহানারায়ণোপনিষদ্, ১০) এবং দহর (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮.১.১)। এখানে প্রথম শব্দটি, দভ্র, প্রথমে ভকার স্থানে হকার হওয়ায় দহ্র হয়, তাহার পর বিপ্রকর্ষ-বশত দহর হইয়াছে। সংস্কৃতে 'ভালুক' অর্থে ঋক্ষ শব্দ প্রসিদ্ধ। ইহার প্রাকৃত রূপ অচ্ছ। কিন্তু কখন-কখন প্রাকৃতে তাহার দুইটি আকার হইয়া থাকে যথা রিক্থ ও অচ্ছ। তথাপি অচ্ছ পদটি সংস্কৃতে সাধারণত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপেই নদী প্রভৃতির 'তট' অর্থে সংস্কৃতে কচ্ছ শব্দ প্রযুক্ত হয়, যেমন "যমুনাকচ্ছমবতীর্ণঃ", পঞ্চতন্ত্র। কিন্তু বস্তুতঃ এই শব্দটি সংস্কৃত নহে, কিন্তু প্রাকৃত, এবং কক্ষ হইতে প্রাকৃত নিয়মে উৎপন্ন। প্রাকৃত ধর্মেই বিকৃত হইয়াছে বিকট, আর বৃষভ হইয়াছে ঋষভ; এবং এই কারণেই একই √বৃধ্ ধাতু অপর আর দুইটি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, √ঋধ্ ও √এধ্, যদিও ইহাদের অর্থে একটুমাত্র ভেদ আছে। এই প্রকারেই 'আচ্ছাদন করিতেছে' অর্থে সংস্কৃতে বৃণোতি (√বৃ 'আবরণ' অর্থে) ও উর্ণোতি (√ঊর্ণু 'আচ্ছাদনে') একই।

সংস্কৃতে প্রিয়শাল নামে এক রকম গাছ আছে। প্রাকৃত প্রভাবে ইহা হইতে হয় প্রিয়াল, আবার ঐ কারণেই এই প্রিয়াল হইতে হয় পিয়াল। কালিদাস কুমারসম্ভবে (৩,৩১) এই পিয়াল শব্দটিকে প্রয়োগ করিয়াছেন—"মৃগাঃ পিয়াল দ্রুম মঞ্জরীণাম্।" ইহা ভাগবতেও (৮-৩-১১) আছে।

'গাল' অর্থে প্রাকৃতে গল্ল শব্দ আছে। ইহা গণ্ড হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ভবভূতিও ইহা সংস্কৃত রচনায় প্রয়োগ করিয়াছেন (মালতী মাধব, ৫-২২)—"পাতাল-প্রতিমল্লগল্লবিবরপ্রক্ষিপ্তসপ্তার্ণবম্।" এখানে মম্মটের কাব্যপ্রকাশ (৮ম পরিচ্ছেদে) ও বামনের কাব্যসূত্রালঙ্কার (২-১-৭) দ্রষ্টব্য।

'চন্দ্র' অর্থে মৃগলাঞ্ছন শব্দ সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ। এখানে লাঞ্ছন 'চিহ্ন, দাগ' স্পষ্টতই একটি প্রাকৃত শব্দ, ইহা লক্ষণ হইতে উৎপন্ন। তথাপি আমাদের সংস্কৃত মহাকাব্যে প্রযুক্ত হয়। দ্রষ্টব্য শিশুপালবধ (১,৫৩)। এইরূপ

---

১ প্রাকৃত ব্যাকরণে বিভাষা বলিতে কোন ভাষার অবান্তর ভেদ (dialect) বুঝায়। যাহা তৎসম্বন্ধ তাহা বৈভাষিক।

২ সত্য কথা বলিতে গেলে পুরাণ শব্দটিও খাঁটি সংস্কৃত নহে, বস্তুত ইহা মূল পুরাতন (> পুরাঅণ < পুরাণ) হইতে প্রাকৃতপ্রভাবে হইয়াছে। এইরূপেই নূতন হইয়াছে নবতন হইতে। দ্রষ্টব্য "নবস্য নূ" অর্থাৎ নব স্থানে নূ আদেশ হয় (পাণিনির, বার্তিক, ৫-৪-২৫)। আবার এই নূতন হইতে পরে মধ্য বর্ণের লোপে নূন। এই প্রকারেই প্রতন হইতে প্রত্ন 'প্রাচীন'। এইরূপ অনেক।

'লেজ' অর্থে মূল সংস্কৃত প শ্চ' 'পেছনে স্থিত' হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত পু চ্ছ শব্দ বৈদিক ভাষাতেও (অথর্ববেদ ৯.৪.১৩, ইত্যাদি) প্রচুর দেখা যায়। পরে ইহা ভবভূতিও উত্তররামচরিতে (৪-২৭) প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য পাণিনি, ৪-১ ৫৫ বার্তিক। 'ময়ূরাদির পাখনা' অর্থে পি চ্ছ শব্দ সংস্কৃত প ক্ষ হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত। মহাভারতে ইহা আছে, এবং মাঘ (শিশুপালবধ, ৪·৫০) প্রভৃতিও ইহা লিখিয়া গিয়াছেন। বাণের গোড়ার দিকে যে পাখীর পালক থাকে তাহা বুঝাইবার জন্য পু ঙ্খ শব্দ সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ আছে (যেমন রঘু, ২,৩১), কিন্তু বস্তুত ইহা সংস্কৃত প ক্ষ হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত, সংস্কৃত নহে। আমাদের সুপরিচিত পু ঙ্খা নু পু ঙ্খ শব্দ ভাগবতেও (৬.১০.২৪) আছে।

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ প্রাকৃত শব্দ ভূরি-ভূরি রহিয়াছে, তাই বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত না করিয়া অন্য কিছু একটু আলোচনা করা যাউক যাহাতে সংস্কৃতের উপর প্রাকৃতের কিরূপ গুরুতর প্রভাব তাহা জানা যাইবে।

প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রযুক্ত হয় না। তদনুসারে সংস্কৃত ম ন স্ হইবে প্রাকৃতে ম ন অথবা ম ণ। কিন্তু সংস্কৃতেও এইরূপ প্রচুর দেখা যায়। যেমন অ ধা স ন-স্থা য়ি ন্ অর্থাৎ 'যে নিম্ন আসনে থাকে (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ১-১·২·২১)।' এখানে অ ধ স্ আ স ন স্থানে সকারের লোপে অ ধ আ স ন করিয়া পরে সন্ধি করা হইয়াছে। টীকাকার হরদত্ত এখানে বলিতেছেন আলোচ্য পাঠটি বৈদিক অথবা ভুল পাঠ ("ছান্দসঃ অপপাঠো বা")। ঐ গ্রন্থেরই অন্যত্র (১-৬-১৯-৮) আছে স র্ব তো পে ত 'সবদিকে যুক্ত'; এখানে স র্ব ত স্ স্থানে স র্ব ত করিয়া উ পে ত শব্দের সহিত সন্ধি করা হইয়াছে। টীকাকার এখানেও পূর্বোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। মহাভারতে (১,৯১,৫) আছে অ নো ক শা য়ি ন্ 'যে গৃহে শয়ন করে না।' বস্তুত ক্রমে-ক্রমে আমাদের নিকটে 'গৃহ' অর্থে দুইটি শব্দ হইয়াছে, ও ক স্ এবং ও ক। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা প্রাচীন, কারণ তাহা বৈদিক ভাষাতেও (ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদেও) পাওয়া যায়। আ চা র্ য ব চ স্ 'আচার্যের কথা' স্থানে শতপথব্রাহ্মণে (১১.২.৬.৬) পাঠ করা হইয়াছে আ চা র্ য ব চ স। তুলনীয় ব্র হ্ম ব র্চ স্ 'ব্রহ্মতেজ' আর ব্র হ্ম ব র্চ স। এইরূপেই বি ন্দু স র স্ স্থানে ভাগবতে (৩,২৫,৫) বি ন্দু স র লিখিত হইয়াছে। আবার জ টা য়ু স্ আর জ টা য়ু উভয়ই রামায়ণে (৩,৪৯ ৩৮; ৫০, ১) পাওয়া যায়। এই রূপ বহু-বহু পদ উদ্ধৃত করিতে পারা যায়, কিন্তু আর আবশ্যক নহে। ইহাই দেখিয়া পরবর্তীকালে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, যে সকল শব্দের শেষে অ-স্ থাকে বিকল্পে তাহাদিগকে অকারান্ত বলিয়া গণ্য করা হয়।

এখানে আমরা কয়েকটি সন্ধির কথা আলোচনা করিয়া দেখি। যেমন, মে+আস্যং হইতে মে স্যং (মহাভারত শান্তি, ৩১৮'৭); কা+ইতি হইতে কা তি (শতপথ-ব্রাহ্মণ, ১১-৪-৪·৩); মে+আ য়ুঃ হইতে মে য়ুঃ (গো প থ ব্রাহ্মণ, পূর্ব, ২'৬); পা দ+উ ন হইতে পা দো ন না হইয়া পা দূ ন (আপস্তম্ব. ধর্মসূত্র, ১.১.২-১৩); ততঃ+ উ বা চ হইতে ত তো বা চ (রামায়ণ, ৩,১৩,১২; ৬,৭৫, ৯); তৃ ণা+অ স্য হইতে তৃ ণা স্য (রামায়ণ, ৬.৫১.২০) ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক।

আবার নিম্নলিখিত কয় পঙক্তি দ্রষ্টব্য—বি দ্যু জ্জি হ্ব[১] 'যাহার জিহ্বা বিদ্যুতের ন্যায়। ত ড়ি ৎ স্থানে ভাগবতে (২.৬.১৫) আছে ত ড়ি ত। রামায়ণে (১০.৪.৬৩) দেখা যায় উৎ সে ক 'উৎসেচন' (উৎ√সিচ্) স্থানে আছে উ চ্ছে ক, যেমন প্রাকৃতে ব ৎ স হয় ব চ্ছ। এইরূপই গু গ্‌ গু লু 'একরূপ ধূপজাতীয় প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য' হইয়াছে গু ল্‌ গু লু (ক্যাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র, ৫.৪.১৭) হইতে, যেমন প্রাকৃতে ফ গ্‌ গু হয় ফ ল্গু 'নিঃসার' হইতে।

মা তা হইতে প্রাকৃতে হয় মা আ, এবং ইহাই আবার সংশ্লিষ্ট হইয়া হয় মা। তথাপি ইহা সংস্কৃতে 'লক্ষ্মী' বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়, কেননা ইনি সমস্ত লোককে মাতার ন্যায় লালন করেন, এই জন্য লক্ষ্মীর অন্য একটি নাম লো ক-মা তা সুপ্রসিদ্ধ।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি হইতেও জানা যাইবে যে, প্রাকৃত সংস্কৃতের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যথা, হা স্য সি (√হা 'ত্যাগ করা') স্থানে জ হি ষ্য সি (রামায়ণ ৬.১০৬.২৭); ত র্জা প য় তি ও ভ ৎ র্সা প য় তি হইয়াছে (যথাক্রমে √তর্জ 'ভয় দেখান' ও √ভ ৎ র্স্ 'ভ ৎ র্স না'

১। সাধারণত প শ্চা ৎ শব্দকে আমরা অব্যয় বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। ইহা প শ্চ শব্দের পঞ্চমীর এক বচনের রূপ। প শ্চা র্ধ (পশ্চ-অর্ধ) শব্দে ইহা সুস্পষ্ট। কিন্তু ভ্রান্ত ধারণায়, এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি দেখাইতে গিয়া বলা হয় যে, অর্দ্ধ শব্দ পরে থাকিলে পশ্চাৎ স্থানে পশ্চ আদেশ হইয়া থাকে। প শ্চা নু তা প প্রভৃতি শব্দেও প শ্চ শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইবে। আবার বলা হয়, অ প র শব্দ স্থানে প শ্চ হয়, ইহা নিপাতনে হয় পাণিনি ৫-৩. ৩২-৩৩)।

১। এখানে বিদ্যুজ্জি হ্ব পাঠ করিলে ছন্দোভঙ্গ হয়।

করা') (রামায়ণ, ৬.৩৪.৯)। এইরূপ শব্দ আমাদের বিভিন্ন কালের সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যাইবে।

কালিদাস (মেঘদূত, ১.৫০), মাঘ (শিশুপালবধ, ১০.২৯) প্রভৃতির ন্যায় মহাকবিও সংস্কৃতে হা লা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ একপ্রকার মদ্য। কিন্তু এই শব্দটি সংস্কৃত নহে ;[১] প্রাকৃত, অর্থাৎ দেশী বা দেশ্য। এ বিষয়ে বামনের মন্তব্য দ্রষ্টব্য (কাব্যালঙ্কারসূত্র, ৫.১.১৩)। ইনি বলেন যে, অতিপ্রচলিত দেশী পদও সংস্কৃতে চলিতে পারে। এইরূপে পরবর্তী সাহিত্যে[২] নিম্নলিখিত ও তৎসদৃশ শব্দসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়—

হে বা ক 'আগ্রহ' (ভাষাদমঞ্জরী ৬ ; বিক্রমাঙ্কদেবচরিত ৮.৬); ল ট ভ 'সুন্দর' (বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, ৮.৬ ; ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতক, ৬২)। প্রাকৃতে ইহার রূপ ল ড় ভ, ইত্যাদি।[৩] 'খিড়কী দরজা' অর্থে খ ড় ক্কি কা।[৪] ইহা কখনই সংস্কৃত নহে, কিন্তু দেশী। ইহা হইতে আমাদের খি ড় কী। সংস্কৃত দং ষ্ট্রা 'বড় দাঁত', পালিতে দা ঠা আর প্রাকৃতে দা ঢ়া ; তথাপি হেমচন্দ্র নিজের সংস্কৃত কোশ অভিধান চিন্তামণিতে লিখিতেছেন "দা ঢি কা দংষ্ট্রিকা দা ঢ়া।" হেমচন্দ্র নিজের যোগশাস্ত্রে (১, পৃ. ১৫১) ,খাটাইবে' এই অর্থে খ ট্ট য়ে ৎ[৫] লিখিয়াছেন। এই ক্রিয়াপদটি হইয়াছে √খ ট্ট হইতে। ইহা নিশ্চয়ই সংস্কৃত নহে, কিন্তু দেশী। এইরূপ অনেক।

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্রষ্টব্য। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইহাদের এক অংশে প্রাকৃতের প্রভাব থাকিলেও অন্য অংশে তাহা নাই। যথা, ক্ষু ল্ল ক (নিঘণ্টু, ৩.২১)। ইহা হইয়াছে মূল ক্ষু দ্র ক হইতে। বৈদিক ভাষায় ইহার প্রচুর প্রয়োগ আছে। ভ ল্লা ক্ষ 'যাহার চোখ ভাল' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৪.১.২)। ইহার প্রথম শব্দ ভ ল্ল প্রাকৃত, সংস্কৃত ভ দ্র হইতে হইয়াছে।

১। তথাপি শব্দকল্পদ্রুমে ইহার এইরূপ অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি লেখা হইয়াছে—"হল্যতে কৃষ্যত ইব চিত্তমনেনেতি হল্ -বঞ্চ্ টাপ্।

২। যেমন হেমচন্দ্র প্রভৃতির রচিত ভাষাদমঞ্জরী প্রভৃতি। পরে দ্রষ্টব্য।

৩। আপ্‌টে স্বকীয় সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানে হেবাক শব্দে লিখিতেছেন—

"Such words as *lalabha* is used only by later writers like Kalhana and Bilhana, and is probably derived from Persian and Arabic."

৪। অভিধান চিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে "পক্ষদ্বারে খড়ক্কিকা।"

৫। "পাদমারাম্নিবিং কুর্য্যাৎ পাদং বিতার খট্টয়েৎ।"

√দ্যু ৎ (প্রকাশ পাওয়া) হইতে প্রাকৃত-প্রভাবে হইয়াছে √জ্যু ৎ এবং নিঘণ্টুতে (১. ১৬) ইহারা উভয়েই একত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে √জ্যুৎ হইতে উৎপন্ন বহু পদের প্রয়োগ দেখা যায়। আমাদের সকলের সুপরিচিত জ্যোতি শব্দটি মূলত দ্যো তি (স্) হইতে হইয়াছে।

যেমন নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে সেইরূপ বহু-বহু ধাতু-যুগ্মক সুস্পষ্টভাবে দেখাইবে যে, প্রাকৃতপ্রভাব কীরূপে একটি ধাতুকে বিভিন্ন আকারে পরিবর্তন করিয়াছে ; যেমন, 'গতি' অর্থে √অ ৎ ও √অ ট্, (ঋগ্বেদ্ প্রভৃতির বহু বহু স্থানে)। বলাই বাহুল্য, প্রাকৃতেরই প্রভাবে এই সকল স্থলে তকার টকার হইয়াছে। এই প্রকার 'গতি' বা 'খেলা' অর্থে √ক্রীড় (ঋগ্বেদ), √কেল্ ও √খে ল্ ; 'গতি' অর্থে √পে ল্[১] (নিঘণ্টু, ২.১৪) ও √পেল্ (ধাতুপাঠ, ১৫.৩৫) ; 'সেচন' অর্থে √ঘৃ ঋগ্বেদ) ও √গৃ (ধাতুপাঠ, ২২.৩৯) ; ইত্যাদি অনেক।

এইরূপ দেখিয়াই বামন নিজের কাব্যালঙ্কারসূত্রে (৫.২.২) বলিয়াছেন যে, ধাতুগণ বাড়িয়াই চলিয়াছে— "বর্ধন্ত এব ধাতুগণঃ।"

আবার প্রাকৃতে ইহা একটি প্রসিদ্ধ নিয়ম যে মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী প্রাকৃতে সাধারণত সর্বত্র দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয় (প্রাকৃতপ্রকাশ, ২.৪২ ; হেমচন্দ্র, ৮.১.২২৮), কিন্তু পৈশাচী প্রাকৃতে সর্বত্র দন্ত্য ন হইয়া থাকে (হেমচন্দ্র, ৮. ৪. ৩০৬)। অপরপক্ষে সংস্কৃতে দন্ত্য ন স্থানে মূর্ধন্য হইবার বিশেষ নিয়ম আছে ; যেমন, আস্তীর্ণ শব্দে মূল দন্ত্য ন রকারের পরে থাকায় মূর্দ্ধন্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এরূপ বহু-বহু শব্দ আছে যাহাতে কোন নিয়মের মধ্যে না পড়িলেও মূর্দ্ধন্য ণকারের প্রয়োগ দেখা যায়। এই সমস্ত স্থলে ণকারকে স্বাভাবিক বলা হয় ; যেমন, বে ণু, বী ণা ইত্যাদি শব্দে। কিন্তু সংস্কৃতের মধ্যে কোন-কোন স্থানে মনে হয় যে, প্রাকৃতপ্রভাবেই দন্ত্য ন মূর্ধন্য হইয়াছে। যেমন, না ম স্থানে ণা ম (আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র, ১০-১৪.১) এ ন ম্ স্থানে এ ণ ম্ (ঐ, ১৫.২৭.৭) স্থানে ; 'বেদির পশ্চাদ্ভাগ অর্থে' অ নূ ক শব্দ স্থানে অ ণূ ক (ঐ ১৬. ১৩. ৬)। এইরূপ অ নু লে প ন স্থানে অ নু লে প ণ (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ১. ৩. ১১. ১৩ ; ১৩. ৩২. ৫)।

শকার ও সকার সম্বন্ধে প্রশ্নও এই প্রকার। সাধারণত প্রাকৃতে কেবল স আছে, কিন্তু মাগধী প্রাকৃতে সাধারণত কেবল শ। আমরা বৈদিক সাহিত্যে স্ত্রীর ভাইকে বুঝাইতে

১। ইহা প্র-√ঈর্ ধাতুর সহিত সম্বদ্ধ।

২। "জাল আলয়ঃ সংযোগেনেতি বৈজালাঃ ; জাম্বাজামা-বপতীতে"—নিরুক্ত, ৬.২.৬।

দেখিতে পাই স্তাল (ঋগ্বেদ ১. ১০৭. ২)[১]। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে সাধারণত ইহা হইয়াছে শ্যাল। প্রাচীন সাহিত্যে 'কুলা' অর্থে শূর্প শব্দ দেখা যায়, কিন্তু পরে তাহার স্থানে শূর্প হইয়াছে। বৈদিক সংস্কৃতে বসিষ্ঠ ছিল, পরে প্রধানত বশিষ্ঠ দেখা যায়। বৈদিক সংস্কৃতে সূকর দেখা যাইত, পরবর্তী সাহিত্যে শূকর হইয়াছে। অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দ্বিরূপ ও ত্রিরূপ কোশসমূহ (অর্থাৎ যে সমস্ত কোশে এক-একটি শব্দের দুইটি বা তিনটি করিয়া রূপ দেখান হইয়াছে) উল্লেখ করিতে পারা যায়, ইহাতে সংগৃহীত শব্দসমূহের অধিকাংশই প্রাকৃত প্রভাবে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। ইহার কোন কোন শব্দে কেবল মাত্রা বা বর্ণের ভেদ দেখা যায়।[২] যথা: 'গৃহ' অর্থে অগার ও আগার; আপগা ও অপগা 'নদী'; ইত্যাদি, ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে এমন কি নিম্নলিখিত ও তৎসদৃশ বহু শব্দও সংস্কৃতে চলিয়া গিয়াছে; যেমন দুহিতৃ স্থানে দুহিতা।[৩] মাতৃ স্থানে মাতা।[৪]।

মূল আলোচ্য বিষয়ে আরো বহু বক্তব্য থাকিলেও বাহুল্য ভয়ে আজ এইখানেই শেষ করা যাউক।

১। অথর্ববেদ, ১.৬.১৬; শতপথ ব্রাহ্মণ, ১,১.১.১২।

২। "কচিন্মাত্রা কৃতো ভেদঃ কচিদ্বর্ণকৃতোহপি চ" দ্রষ্টব্য।

৩। A Manuscript in the Catalogue of Mss. of the Madras University (pp. 1112, 1204)

৪। "বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাম্", শব্দকল্পদ্রুমে ধৃত শিবরহস্য।

রবীন্দ্র সংলাপ কণিকা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

৬ই পৌষ, ১৩৪৪। ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষ্যে কয়েক দিন শান্তিনিকেতনে থাকিব বলিয়া চলিয়াছি। হাওড়া ষ্টেশনেই এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি অন্য কামড়ায় ছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি আমারই কাছে আসিলেন। আমরা একত্র আসিলাম। সঙ্গে অনেক ভুতপূর্ব ছাত্র।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গুরুদেবের কাছে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি তখন অন্য দুইটি ভদ্রলোকের সহিত কথা বলিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া আনন্দের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি ঘরের ভিতরে ছিলেন, আমার প্রস্তাবে বারাণ্ডায় আসিলেন। ওখানেই কয়েকখানি আসনের ব্যবস্থা হইল।

নূতন ঘর

গুরুদেব এক স্থানে এক ঘরে অনেক দিন থাকিতে ভালবাসিতেন না। তাঁহার ঘর কত বদলাইয়াছে। একবার বলিতেছিলেন 'দেখুন, পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া আমি পশ্চিমে আসিয়া পড়িয়াছি।' ইহার তাৎপর্য এই যে, তিনি যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম আসিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বাসা ছিল পূর্বদিকে দেহলীর কাছে। তারপর নূতন ঘর করিতে করিতে এখন পশ্চিম দিকে আর এক ঘরে বাস করিতেছেন। গুরুদেবের ঘরের পরিকল্পনার শেষ নাই। কোন একটা ঘরের ভিতের জন্য মাটি কাটা আরম্ভ হইলে তখনই আবার তাহা অন্য রকম করা হয়, ইহাও দেখা গিয়াছে। কোন্ ঘর কেমন হইবে স্থির করিয়া প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা হইল, কিন্তু যখন তাহা সম্পূর্ণ হইল তখন দেখা গেল উহা একটা সম্পূর্ণ নূতন হইয়া গিয়াছে। তাহার পরেও এত যোগ-বিয়োগ হয় যে বলিবার নহে। একবার এই পরিবর্তন সম্বন্ধে গুরুদেব বৌমাকে (অর্থাৎ রথীন্দ্রনাথের ধর্মপত্নী শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে) বলিতেছিলেন, "বৌমা, এখনি কি হয়েছে? অনেক বাকি।"

গুরুদেব বড় ঘরে থাকিতে ভালবাসিতেন না। খুব ছোট ছোট ঘরই তাঁহাকে ভাল লাগিত। উত্তরায়ণের কোণার্কে প্রথমে একখানি ছোট মেটে ঘর ছিল। তারপর একটি পাকা স্নানাগার হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবর্তনে-পরিবর্তনে তাহার বর্তমান আকার হইয়াছে। পরে তিনি ইহাতে নিজের জন্য এমন একটি ছোট কুঠরী করাইয়াছিলেন যে, তিনি নিজেই সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না, মাথা ছাদে লাগিত। ইহাতে বলিতেন, 'মাথাটা উঁচু হইয়া থাকে, ইহাকে নীচু করিয়া রাখাই ভাল।' তা ছাড়া এই কুঠরীটির সম্বন্ধে বলিতেছিলেন, 'আমি এমন জায়গায় থাকিব যে, আপনারা আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইবেন না।' আমি বলিয়াছিলাম, 'রবির প্রকাশ ঢাকিয়া রাখিবে কে?'

গুরুদেব এবার উদয়নের দক্ষিণে যে মনোরম উদ্যান তাহারই পশ্চিমে ছোট্ট একখানি দোতলার উপরে ছিলেন। ইহার আগাগোড়া সবই শিল্পকলার কল্পনার প্রকাশে পরিপূর্ণ। ইহা বৌমার (শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর) সৃষ্টি। অতি চমৎকার ও কবিজনোচিত।

একদিকে স্বয়ং কবি গুরুদেব, অন্যদিকে নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ, অপরদিকে রথীন্দ্রনাথ ও বৌমা। ইহাদের সমবায়ে শান্তিনিকেতনের এই সব বৈচিত্র্য বিশেষভাবে রূপ পরিগ্রহ করিবার সুবিধা পাইয়াছে। অনেকের মনে কল্পনা জাগে, কিন্তু তাহা প্রকাশ পায় না, কিন্তু এখানে সে অসুবিধা নাই। কল্পনার উন্মেষ, তা তাহা গুরুদেবের মধ্যে বা নন্দলাল বা সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে হউক, তাহাকে রূপ দিবার জন্য যে অর্থব্যয়, রথীন্দ্র তাহা করিতে কাতর নহেন।

দণ্ডকারণ্য

গুরুদেব পূর্বোল্লিখিত বাড়ীখানি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এ আমার দণ্ডকারণ্য!' ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, তাঁহার বয়স বেশী হইয়াছে, শরীর দুর্বল, বেশী ওঠা-নামা করিতে বা বেড়াইতে পারেন না। একবার দোতালায় উঠিলে নীচে নামা শক্ত। এই হিসাবে বাড়ীখানি দণ্ড বা দণ্ডক। অপরদিকে বৃদ্ধ বয়সে অরণ্যে যাইতে হয়, ইহা তাহারই মত। তাই উহা হইল দণ্ডকারণ্য!

জাপানের ঘুষদান

জাপান হইতে সম্প্রতি তাঁহাকে ফুলদানীর মত একটা সুন্দর জিনিস উপহার দেওয়া হইয়াছে। ঘরের এক পাশে উহা ছিল। গুরুদেব বলিলেন, 'এটি জাপান হইতে আসিয়াছে। তাহারা ঘুষ দিয়াছে! তাহারা ভাবিতেছে, এই সব দিয়া এই যুদ্ধের সময়ে আমাকে তাহাদের অনুকূল করিয়া রাখিবে। আরো কত কাগজপত্র পাঠাইতেছে। ইহাদের মধ্যে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মূলে চীনেরই যে দোষ তাহাই বর্ণনা করা হইতেছে। তাহারা মনে করিতেছে, আমি ইহাতেই ভুলিব!'

নূতন ফ্লীট

দেখিলাম মশার উপদ্রবের জন্য একটি চাকর (নীলমণি)[1] পিচকারী দিয়া চারিদিকে মশারি প্রভৃতিতে একটা তরল জিনিস প্রচুরভাবে ছড়াইতেছে। আমি বলিলাম, 'এ বুঝি ফ্লীট (fleet)'? গুরুদেব বলিলেন, 'উহা তাঁহার তৈরী ফ্লীট, খুব শস্তা।' আমি বলিলাম, 'বলিয়া দিন, আমিও করিব।' চাকরটি কাছে ছিল। সেই বলিল যে, এক টিন কেরোসিন তেলে ১/২॥ সের নেপথলিন, আর ।/॥ সের পেট্রোল তাহাতে মিশাইলেই হয়। গুরুদেব বলিলেন, 'পেট্রোল না দিলেও হয়। ইহা ছড়াইলে মশা সঙ্গে-সঙ্গে যায়। কেরোসিনের গন্ধ বেশীক্ষণ থাকে না।' আমি ভাবিলাম আমার বইগুলি রক্ষার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিব। পোকা ও আরসুলা ইহাতে যাইবে।

ব্রহ্মবিহার

কথাপ্রসঙ্গে গুরুদেব আমার কলিকাতার বাড়ীর কথা তুলিলেন। বলিলেন, তিনি তাহা দূর হইতে দেখিয়াছেন। বীরেন[2] তাহা তাঁহাকে দেখাইয়াছিল। আমার সঙ্গে প্রমদাবাবু[3] ছিলেন। ইনি বলিলেন, আমি বাড়ীখানির নাম রাখিয়াছি 'ব্রহ্মবিহার'। গুরুদেব বলিলেন, 'আপনার ছেলের নামে?' আমার ছেলের নাম 'ব্রহ্মব্রত'। আমি বলিলাম, 'অনেকেই ইহা মনে করেন, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। ব্রহ্মবিহার বলিতে বৌদ্ধ-শাস্ত্রে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটিকে এক সঙ্গে বুঝায়। এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, আর বিহার বলিতে অবস্থা। ইহাই মনে করিয়া আমি বাড়ীখানির ঐ নাম দিয়াছি।'

শব্দটা গুরুদেবের মনে পড়িল। আমি বলিলাম, আপনি সাধনায় (ইংরেজী) ইহার যে অর্থ (অর্থাৎ ব্রহ্মে বিহার) দিয়াছেন Mrs. Rhys Davids ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। গুরুদেব বলিলেন, 'তিনি যাই বলুন, আমি এই অর্থেই উহা লইয়াছি।' তিনি তখন উপনিষদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার কথা বলিলেন। "সপর্যগাচ্ছুক্রম্" ইত্যাদি ঈশোপনিষদের (৮) বাক্যটির ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিলেন, 'ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। সত্যর বিভিন্ন প্রকাশ আছে, সকলের কাছে সবটা প্রকাশ পায় না।'

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

---

১ ঠাট্টা করিয়া কখনও কখনও ইহাকে নীলমণি বলিয়া গুরুদেব উল্লেখ করিতেন।

২ শ্রীমান্ বীরেন্দ্রমোহন সেন।

৩ শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন ঘোষ।

শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

বিংশ শতকের প্রথম দশকে ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে চারি জন তরুণ সৈনিক সর্ব্বপ্রথম বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করিয়া নিজেরা কৃতার্থ হইয়াছেন এবং দেশ ও জাতিকে ধন্য করিয়াছেন, তাঁহারা যুগান্তর বিপ্লবী-দলের মৃত্যু-মন্ত্রে দীক্ষিত সন্তান। প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু হইলেন সেই বরেণ্য বীর-চতুষ্টয়। ইঁহাদের বীরোচিত মৃত্যুবরণ মুমূর্ষু জাতির মধ্যে আনিয়াছে প্রাণ-শক্তি—উত্তর কালের মুক্তি-সাধককে দিয়াছে আত্ম-বলিদানের প্রেরণা। দেশমাতার এই বীর সন্তানেরাই বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবযজ্ঞে প্রথম আহুতি।

অত্যাচারী ইংরেজ বিচারক, বহু স্বদেশী মামলার দণ্ডদাতা কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের হত্যা করিবার ব্যর্থ অভিযান এবং বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী নরেন্দ্র গোস্বামীকে নিধন করার সত্যেন-কানাইয়ের সফল প্রচেষ্টা—এই দুইটি স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।

মজঃফরপুর শহরে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল (১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ) রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় ইউরোপিয়ান ক্লাবের প্রবেশ-দ্বারে একখানা চলন্ত ফিটন গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। সেই গাড়ীতে কিংসফোর্ড ছিলেন না। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে বোমা বিস্ফোরিত হয়। গাড়ীর একাংশ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। আরোহিণী মিসেস্ কেনেডি ও মিস কেনেডি নিহত হইলেন।

এই বোমা নিক্ষেপের ঘটনা হইতেই মাণিকতলার বোমার মামলার উৎপত্তি হয়। আলিপুর দায়রা জজের আদালতে বিচার হইয়াছিল বলিয়া ইহা আলিপুর বোমার মামলা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ২রা মে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং কলিকাতার বাহিরে কয়েকটি শহরে ও গ্রামে ব্যাপক খানাতল্লাসী হয়। মাণিকতলা অঞ্চলে ৩২নং মুরারিপুকুর রোডে অরবিন্দ-বারীন্দ্র প্রমুখ ভ্রাতৃগণের বাগানবাড়ীতে বোমা নির্ম্মাণের কারখানা এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীউল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইলেন বাগানবাড়ীতে, হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) গ্রেপ্তার হইলেন ৩৮।৪নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে, অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ), শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শৈলেন বসু গ্রেপ্তার হইলেন ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীটে এবং কানাইলাল দত্ত ও নিরাপদকে (ওরফে নির্ম্মল রায়) গ্রেপ্তার করা হইল ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেনে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ধৃত হন তাঁহাদের মেদিনীপুর শহরের বাড়ীতে। পূর্ব্বোক্ত ধরপাকড়ের কয়েক দিন পরে শ্রীরামপুর (হুগলী) হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হয় তথাকার জমিদার দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামীর পুত্র নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

নরেন্দ্র কিছুকাল কারাবাসের পর পুলিসের নিকট স্বীকারোক্তি করে এবং পুলিসের প্ররোচনায় মিথ্যা উক্তি করিয়াও বিপন্ন সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে আনীত মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অভিযোগ-প্রমাণে সাহায্য করিতে থাকে। সে রাজসাক্ষী হইয়া নিম্ন আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট 'প্রাথমিক তদন্ত'-কালে সাক্ষ্য দেয়। সেশন জজের আদালতে বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করার কথাবার্ত্তা বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতাদের মধ্যে চলিতে থাকে। অরবিন্দকে এই সম্পর্কে কিছুই জানানো হয় নাই। জেলের মধ্যে নরেন গোসাঁই নিহত হইলে অরবিন্দ

নর-হত্যার মামলায় জড়িত হইয়া পড়িবেন—প্রধানতঃ এই যুক্তিতে বারীন্দ্রকুমার নরেন্দ্র-নিধন-প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁহার বিরোধিতার আর একটি কারণও ছিল। বাহির হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিয়া জেল ভাঙিয়া সদলবলে পলাইবার চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্কে কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই বাসা বাঁধিয়াছিল। তদনুত একটা পরিকল্পনাও রচিত হয়।

সত্যেন বসু ধৃত হইবার পর মেদিনীপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মেলসনের আদালতে অস্ত্র আইনের বিধান ভঙ্গের জন্য অভিযুক্ত হন। খানাতল্লাসী কালে, তাঁহাদের বাড়ীতে বিনা লাইসেন্সের অস্ত্রশস্ত্র কিম্বা বে-আইনী কাগজপত্র কিছুই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞানেন্দ্রনাথের একটি লাইসেন্স করা বন্দুক ছিল। সত্যেন সেই বন্দুক ব্যবহার করিতেন বলিয়া অভিযোগ আনা হয়। বিচারে তিনি দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। দণ্ডদানের পর তাঁহাকে বোমার মামলায় আসামী-শ্রেণীভুক্ত করিয়া আলিপুর জেলে পাঠানো হইল।

ইহার পরের কাহিনী বর্ণনা করার পূর্ব্বে সত্যেনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠ সহোদর অভয়চরণ সত্যেনের পিতা। তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই (১২৮৯ বঙ্গাব্দের ১৫ই শ্রাবণ) রাত্রি ৯টা ৪৫ মিনিটে রাখী-পূর্ণিমা তিথিতে মেদিনীপুরের বাড়ীতে বাংলার এই বীর শিশু ভূমিষ্ঠ হন। ছয় বৎসর বয়সে তাঁহাকে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। বাল্যকালেই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মরণশক্তির পরিচয় মিলে। লেখাপড়ায় তিনি ভালই ছিলেন। প্রতি বৎসর প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া তিনি পুরস্কার পাইতেন। তাঁহার পিতামহ, পিতৃব্য ও পিতা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ধার্ম্মিক বলিয়া শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বাংলার প্রগতিশীল বিদগ্ধ-সমাজে বসু-পরিবারের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। সরলতা, চরিত্র-বল, অমায়িক ব্যবহার, সত্যানুরাগ ইত্যাদি সদ্‌গুণ তিনি যেন উত্তরাধিকারসূত্রেই পাইয়াছিলেন। ছাত্র-জীবনেই তাঁহার মধ্যে এই সমুদয় গুণ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অতি অল্প সময়ের মেলামেশায় পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অতুলনীয়। এই কারণে সত্যেন্দ্রনাথ পরবর্ত্তীকালে বহু যুবককে বিপ্লবের অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

১৮৯৭ সালে পনর বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মেদিনীপুর কলেজে ভর্ত্তি হন। ইহার পরের বৎসর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৯৯ সালে তিনি এফ-এ পরীক্ষা পাস করিয়া কলিকাতায় আসিয়া সিটি কলেজে বি-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। বি-এ পরীক্ষার পূর্ব্বে তাঁহার স্বাস্থ্য এমন ভাঙিয়া পড়ে যে, তিনি পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। প্রথমে চিকিৎসকরা তাঁহার রোগনির্ণয় করিতে পারেন নাই। পরে তাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, সত্যেনের রাজযক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চিকিৎসকদের উপদেশে তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া ওয়াল-টেয়ার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করেন। তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি হইল এবং ঐ মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণের আশঙ্কাও লোপ পাইল; কিন্তু পূর্ব্বস্বাস্থ্য তিনি আর ফিরিয়া পাইলেন না।

সত্যেনের জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার স্বদেশ-সেবার কর্ম্মক্ষেত্রের পথ-প্রদর্শক।

সত্যেনের বৈপ্লবিক জীবন আরম্ভ হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে—স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার তিন বৎসর পূর্ব্বে। বিপ্লবী-নেতা অরবিন্দ ঘোষের সহায়তায় বাংলাদেশে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্বামী নিরালম্ব) গুপ্ত-সমিতির গোড়াপত্তন করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) প্রভৃতিও সেই সময় বিপ্লবের অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই গুপ্ত সমিতির মেদিনীপুর শাখাটি পরিচালিত হইতে থাকে প্রধানতঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্রের নেতৃত্বে। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পরে হেমচন্দ্র যখন বোমা তৈরি শিখার জন্য ফ্রান্সে চলিয়া যান, তখন সত্যেন্দ্রনাথের উপরই মেদিনীপুর শাখা পরিচালনার সমস্ত ভার পড়ে। তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম, চরিত্র-বল, কর্ম্ম-নিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব, সাহস, তেজস্বিতা ইত্যাদি গুণাবলী তাঁহাকে ছাত্র ও যুব-সমাজের প্রিয়পাত্র এবং শ্রদ্ধাভাজন করিয়া তুলিল। বয়োজ্যেষ্ঠ দেশ-সেবকেরাও তাঁহাকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন।

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির প্রতি দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও তরুণ-সমাজের তেমন কিছু আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু বাংলার সেই নবজাগৃতির যুগে—বিশেষতঃ স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব্বে যখন বৈদেশিক রাজশক্তির অনুসৃত দণ্ডনীতির নিষ্ঠুর প্রয়োগ চলিতেছিল—তখন তাঁহাদের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। লোকপ্রিয় তরুণ বিপ্লবী-নায়ক সত্যেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ছাত্র ও যুবকগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার ব্যায়ামশালায় এবং পাঠাগারে যোগদান করিতে লাগিল। যুগান্তর বিপ্লবী দলের হইল। মেদিনীপুর শাখা একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত শহীদ ক্ষুদিরাম বসু সত্যেন্দ্রনাথের হাতেগড়া, এই প্রতিষ্ঠানেরই কর্ম্মী। তিনিই ক্ষুদিরামকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

তরুণ কর্ম্মীদের দৈনন্দিন ব্যায়াম-চর্চ্চা, লাঠি-ছোরা-অসি খেলা, সংবাদপত্রাদি পাঠে জ্ঞানার্জ্জন এবং সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠে চরিত্রগঠন ইত্যাদি কার্য্য সত্যেন্দ্রনাথের পরিচালনায় সম্পন্ন হইত। আর্ত্ত-ত্রাণ এবং রুগ্নের সেবাও তাঁহার কার্য্যক্রমের

PRISONER'S LETTER.
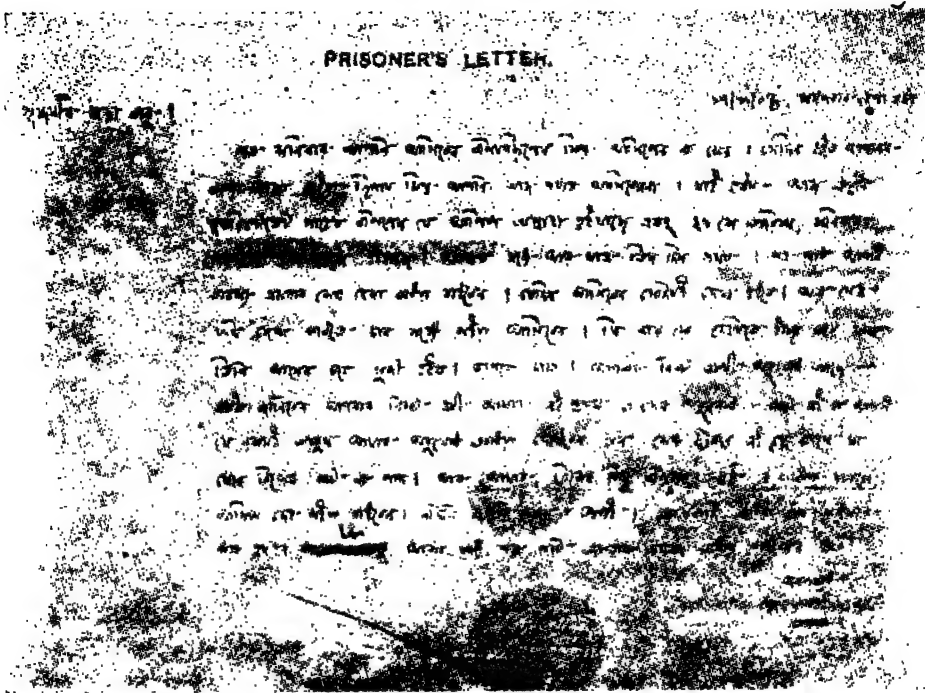
আলীপুর জেল হইতে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রের প্রতিলিপি

অন্তর্ভুক্ত ছিল। "ছাত্র ভাণ্ডার" নামে একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তিনি মেদিনীপুরে স্বদেশীদ্রব্য প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কর্মব্যস্ত জীবনের দুর্লভ অবসরটুকু তিনি জ্ঞান-ভারতীর ধ্যানে কাটাইতেন। খড়গপুরে কেল্‌নার কোম্পানীতে তিনি কিছুকাল কাজ করেন। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি সেই কাজ ছাড়িয়া দেন এবং মেদিনীপুর কালেক্টারীতে কেরাণীর কাজ যোগাড় করিয়া লন। কিন্তু এই কাজে তিনি বেশীদিন থাকিতে পারেন নাই। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর শহরে একটি কৃষিশিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। সেই মেলায় প্রকাশ্য ভাবে তিনি ক্ষুদিরাম বসুকে দিয়া "সোনার বাংলা" নামক একখানি রাজদ্রোহাত্মক পুস্তিকা বিতরণের ব্যবস্থা করেন। সেই উপলক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথের চাকরি-জীবনের সমাপ্তি ঘটে। আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম প্রধান আসামী, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত ও সত্যেন্দ্রনাথের সতীর্থ হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন :

"ঐ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুরে কৃষিশিল্প প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। এই সময় ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ ও গালাগালিপূর্ণ 'সোনার বাংলা' নামক বেনামী বাংলা পাম্ফ্‌লেট একটা প্রচারিত হয়েছিল। তার ইংরেজী অনুবাদ 'পাইওনিয়ার' পত্রে প্রকাশিত হলে ইংরেজ মহলে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। সত্যেন তার আবার বাংলা অনুবাদ করে হাজারখানেক ছাপিয়েছিল। উক্ত প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারের কাছে ক্ষুদিরাম নির্ব্বিচারে সকলকে ঐ পাম্ফ লেটগুলি বিলি করছিল; এমন সময় একজন হেড কনেষ্টবল এসে তাকে গ্রেপ্তার করাতে সে বক্সিং-এর খুব কেরামতি দেখিয়েছিল। ইত্যবসরে সত্যেন সেখানে এসে পড়ে বলে উঠল, "উও ডীপটিকা লেড়কা হ্যায়, উস্‌কো কেঁও পাকড়ায়া।" সত্যেন ছিল প্রদর্শনীর সহকারী সম্পাদক এবং তখন কালেক্টরীতে একজন ডেপুটি বাবুর এজলাসে কেরাণীর কাজ করত। জমাদার সত্যেনকে চিনত, সে ডেপুটি বাবুর নাম শুনে, নাকে রক্তপাত সত্ত্বেও ক্ষুদিরামকে ছেড়ে দিয়েছিল। পরক্ষণে যখন তার ভুল ভাঙল, তখন আর ক্ষুদিরামকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

"পুলিসকে ধোঁকা দেবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে সত্যেনকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। তাতে বোধ হয়, তাকে দোষী সাব্যস্ত করবার মত কিছু খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে সে বেপরোয়া ভাবে হেসে হেসে জবাব দিয়েছিল", তাই সঙ্গে সঙ্গে কেরাণীগিরি হতে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা রুজু করা

হ'ল। বাংলাদেশে বিপ্লববাদীর বিরুদ্ধে বোধ হয় এই প্রথম রাজদ্রোহের অভিযোগ।

"ফেরারী অবস্থায় কিছুকাল থাকার পর ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর এসে ধরা দিল। মোকদ্দমা দায়রায় গেল। অনেক উকীল ব্যারিষ্টার দয়া করে আদালতে ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সরকার বাহাদুর কি জানি কি মনে করে মোকদ্দমা তুলে নিয়েছিলেন।"

১৯০৭, ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে মেদিনীপুর শহরে জেলা কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার তরুণ কর্ম্মীদলকে লইয়া যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কলিকাতা হইতে আগত উভয় দলের নেতারাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। 'নরম পন্থী' ও 'গরম পন্থী' দলের মতানৈক্য দূর না হওয়ায় সম্মেলন ভাঙিয়া যায় এবং দুইটি পৃথক অধিবেশন হয়। প্রকাশ্য অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বেই তরুণ কর্ম্মীদল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত জননায়কের বিরোধিতা করিতে সাহসী হইয়াছিল—যাহার ফলে সম্মেলন পণ্ড হইয়া যায়। তৎকালে তাঁহার মত লোকপ্রিয় নেতার বিরুদ্ধে মফঃস্বল শহরে এইরূপ আচরণ অভাবনীয় ব্যাপার বলিতে হইবে। সত্যেন্দ্রনাথের কল্যাণেই সুরেন্দ্রনাথকে প্রতিকূল প্রবল জনমতের সম্মুখীন হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা মেদিনীপুরেই সর্ব্বপ্রথম অর্জ্জন করিতে হয়। ইহার পর সুরাট কংগ্রেসেও সত্যেন্দ্রনাথ গরমপন্থী দলের পক্ষে কার্য্য করিয়াছিলেন।

এখন আসল কথায় আসিতেছি। বিশ্বাসহন্তা নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর নিধন-ব্যাপার সমাধা হইয়াছিল অনেকটা নাটকীয় ধরণেই। সত্যেন বোমার মামলায় বিচারার্থ আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হইয়া বিচারাধীন অন্যান্য আসামীর সহিত বাস করিবার সুযোগ পান নাই—যেহেতু তখন তিনি ছিলেন এক জন দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী। নরেন গোসাঁইয়ের কাণ্ড শুনিয়া তিনি তাহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প নিজ হইতেই করেন। কি উপায়ে তাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহাই ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার সমমতাবলম্বী হেমচন্দ্র দাসের সঙ্গে এই সম্পর্কে পত্রালাপ চলিল। সত্যেন জানিতে চাহিলেন যে, নরেনের মত বিশ্বাসঘাতক তাঁহাদের মধ্যে আর কেহ আছে কিনা এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় এমন কে কে আছে। হেমচন্দ্র জানাইলেন যে, নরেনের মত আর কোন বিশ্বাসঘাতক তাঁহাদের দলে নাই, এবং "সম্পূর্ণ বিশ্বাসী বলে যে কয়জনকে মনে হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেছোকরা, আর বাকী নেহাৎ ভাল মানুষ বললে যা বোঝায় তাই।"

অবশেষে নরেনের হত্যার একটা পন্থা উদ্ভাবিত হইল। পরিকল্পনা অনুযায়ী সত্যেন অসুখের ভান করিয়া জেলখানার হাসপাতালে ভর্ত্তি হইলেন এবং সেখানে থাকার ব্যবস্থাটা পাকা করিয়া লইলেন। সেখান হইতে তিনি নরেন গোসাঁইকে এই বলিয়া সংবাদ পাঠান যে, রুগ্ন দুর্ব্বল শরীরে আর জেলের কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছেন না এবং তিনিও রাজসাক্ষী হইতে প্রস্তুত। গোসাঁই পুলিস কর্ত্তৃপক্ষকে সেই প্রস্তাবের কথা তাঁহারা জানাইলে তদন্ত করিয়া উহা অকৃত্রিম বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং গোসাঁইকে শিখাইয়া পড়াইয়া প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য বলেন। হাসপাতালে দিনের পর দিন সত্যেনের রাজসাক্ষী তৈয়ার হওয়ার মহড়া নরেনের তত্ত্বাবধানে চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একটা রিভলবার ও কার্ত্তুজ সত্যেনের হস্তগত হয়, কিন্তু উহা বড় এবং ট্রিগারটা বেশী শক্ত থাকায় তাহার ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে উহা ব্যবহার করা কঠিন হইতে পারে মনে করিয়া তিনি দ্বিতীয় রিভলবার হাতে না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকেন। দ্বিতীয় রিভলবার জেলের ভিতরে আসিলে হেমবাবু কাপড়ে জড়াইয়া উহা কানাইলালকে দিয়া হাসপাতালে পাঠান। কানাই অসুখের ভান করিয়া হাসপাতালে গিয়া উহা সত্যেনের হাতে দেন। তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে উহা রিভলভার। সত্যেন যখন আগের বড় রিভলভারটা কানাইয়ের মারফত হেমবাবুকে ফেরত দিতে যান, তখন কানাইলাল টের পাইলেন যে, উহা রিভলভার। ব্যাপার কি জানিবার জন্য কানাই তাঁহাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া ধরিলেন। তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া সত্যেন সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। তখন কানাইলাল তাঁহাকে এই ব্যাপারে সহকারী করিয়া লইবার জন্য খুব কাকুতি-মিনতি করেন। সত্যেন এই সম্পর্কে হেমবাবুর মতামত জানিতে চাহিলে তিনি (হেমবাবু) কানাইলালকে সহকারী করিয়া লইতে সম্মতি দেন। ইহার পর সত্যেন ও কানাইয়ের মধ্যে স্থির হইল যে, প্রথমে সত্যেনই গুলী চালাইবে, তারপর যদি তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে কানাই গুলী চালাইবেন। পরে দেখা গেল যে, সত্যেন কানাইকে সহকারী করিয়া না লইলে নরেন গোঁসাই রক্ষা পাইত।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট, সকাল সাড়ে সাতটা হইতে আটটার মধ্যে বিপ্লবী বীর-যুগল সত্যেন-কানাইয়ের হাতে নরেন্দ্র গোস্বামী নিহত হয়। সেই দিন ঘটনার পূর্ব্বে নরেন্দ্র ইউরোপিয়ান কয়েদী-ওয়ার্ডার হিগিন্‌সকে সঙ্গে লইয়া হাসপাতালে যায় এবং সত্যেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু করে। হিগিন্‌স পাশের একটা ঘরে চলিয়া যায়। গুলী-ভরা রিভলভারটি কেহ কাড়িয়া লইতে না পারে, সেইজন্য সত্যেন পূর্ব্বেই উহা কোমরের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। সামান্য কথাবার্ত্তার পরেই তিনি জামার পকেটে হাত রাখিয়াই গুলী ছুঁড়িলেন। গুলী নরেনের উরুদেশে লাগে। সে তখন

প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইতে থাকে। হিগিন্‌স্ ছুটিয়া আসিয়া রিভলভার ছিনাইয়া লইবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। অবতাৎক্ষণিতে একটা গুলী ছুটিয়া হিগিন্‌স্-এর মণিবন্ধে বিদ্ধ হয়। সত্যেন তাহার হাত হইতে ছুটিয়া নরেনের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকেন। গুলীর শব্দ শুনিয়া কানাই দৌড়াইয়া আসিয়া দেখেন শিকার পলাইয়াছে।

দুই জনেই হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়া বিদ্যুদ্গতিতে নীচে নামিয়া গেলেন। উভয়েই নরেনের নিকটবর্ত্তী হইয়া গুলী চালাইতে লাগিলেন। জেলখানার কর্ম্মচারী, ওয়ার্ডার এবং কয়েদীরা বাধা দিতে আসিলে ইঁহারা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া রিভলভার উঁচাইয়া ধরেন; সকলেই প্রাণভয়ে সরিয়া পড়ে। গুলীবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহে নরেন্দ্র পার্শ্ববর্ত্তী নর্দ্দমায় পড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মৃত্যু হয়।

তারপর জেলখানার নিয়মানুসারে পাগলা ঘণ্টি আর ভোঁপা (Whistle) বাজিয়া উঠিল। বন্দুকধারী পুলিস দলে দলে আসিয়া জেলখানায় হাজির হইল। হৈ-হৈ রৈ-রৈ পড়িয়া গেল। একটা বুড়া কয়েদী ছুটিয়া আসিয়া বারীনবাবুদের চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, "বাবুজী, গোসাঁই ঠাণ্ডা হো গিয়া।" এই সুসংবাদ পাইয়া বোমার মামলার আসামীরা বেআইনী দ্রব্যাদি ও কাগজপত্র নষ্ট করিয়া এবং ফেলিয়া দিয়া গোবেচারা সাজিয়া খানাতল্লাসীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে ঘোর খানাতল্লাসী আরম্ভ হয়; কিন্তু আপত্তিজনক বা বেআইনী কিছুই পাওয়া গেল না।

একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট দ্রুত সাক্ষ্যপ্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাথমিক তদন্ত শেষ করেন এবং নরহত্যার অভিযোগে সত্যেন-কানাইকে আলিপুরের সেসন আদালতে বিচারার্থ সোপর্দ্দ করেন। সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রকাশ, দুইটি রিভলভার হইতে মোট নয়টি গুলী ছোঁড়া হইয়াছিল এবং পাঁচটি নরেনের দেহে বিদ্ধ হয়। ছোট রিভলভারটি ব্যবহার করেন সত্যেন, আর বড়টি কানাই। ছোটটি হইতে চারিটা গুলী এবং বড়টি হইতে পাঁচটা গুলী ছোড়া হইয়াছিল। বিচারকালে সত্যেন আত্মপক্ষ সমর্থন করেন, কিন্তু কানাইলাল তাহা করেন নাই। সত্যেন বরাবরই স্বীকারোক্তি করিয়া অভিযোগ স্বীকার করার বিরোধী ছিলেন। বারীন্দ্র ধৃত হইবার পর যে ভাবে স্বীকারোক্তি করিয়া নিজেকে জড়াইয়াছেন এবং সহকর্ম্মীদেরও জড়িত করিয়াছেন, তাহাতে জেলে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। হেমবাবুর লেখায় প্রকাশ, বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির সভ্যদের পক্ষে স্বীকারোক্তি উচিত কি অনুচিত তাহা লইয়া জেলে তাঁহাদের মধ্যে ঝগড়ার ফলে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। এক দলের মোড়ল বারীন, অন্য দলের সত্যেন। বারীনকে দোষারোপ করিত সত্যেনের দল। বারীন্দ্র ঋষি রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র এবং সত্যেন্দ্র তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। সম্পর্কে সত্যেন্দ্র বারীন্দ্রের মাতুল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে গুপ্ত-সমিতির গোড়াপত্তনের সময় (১৯০২ খ্রীঃ) হইতেই মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। হেমচন্দ্রের লেখা হইতে প্রকাশ যে, সেই বিবাদের মিটমাট কোন দিনই হয় নাই, যদিও উভয়ে এক সঙ্গে কাজ করিয়া আসিয়াছেন।

সেসন আদালতের বিচারে পাঁচ জন জুরী একমত হইয়া কানাইকে নরহত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন; তিন জন জুরীর মতে সত্যেন নির্দ্দোষ ও দুই জনের মতে দোষী। দায়রা জজ ৯ই সেপ্টেম্বর কানাইকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং তিন জন জুরীর মতের সহিত একমত হইতে না পারিয়া মামলা শেষ সিদ্ধান্তের জন্য হাইকোর্টে পাঠান। হাইকোর্টে জষ্টিস সমসুদ্দিন ও ককসের এজলাসে মামলার শুনানি হয়। ২১শে অক্টোবর বিচারপতিদ্বয় রায় দিলেন। কানাইলালের মৃত্যুদণ্ড বহাল রহিল এবং সত্যেন্দ্রনাথকেও দোষী সাব্যস্ত করিয়া মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। ১০ই নবেম্বর কানাইর এবং ২১ নবেম্বর সত্যেনের ফাঁসি হয়। দুই জনেই বীরের ন্যায় শঙ্কাহীন চিত্তে ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যু বরণ করিয়া অমর হইয়া রহিলেন।

কয়েকটি কারণে তৎকালে এক শ্রেণীর লোকের মনে এরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মে যে, মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার পর সত্যেনের মধ্যে দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল। এই স্থলে সেই কারণ সমূহের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ কানাই আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই, কিন্তু সত্যেন করিয়াছিলেন। সত্যেন যে স্বীকারোক্তি করার বরাবরই বিরোধী, তাহা হেমচন্দ্রের লেখা হইতেই জানা যায়। স্বীকারোক্তির ব্যাপার লইয়া জেলের ভিতরে দলাদলি হয় এবং বারীনবাবুর বিরোধী দলের নেতা ছিলেন সত্যেন। দ্বিতীয়তঃ গোসাঁইয়ের হত্যার পরে কানাইয়ের ফাঁসির মঞ্চে ফাঁস গলায় পরা পর্য্যন্ত যে আচরণ তাহা অসাধারণ ও বিস্ময়কর। ইহার তুলনা হইতে পারে শুধু কোন রোমাঞ্চকর নাটকের বীর নায়কের আচরণের সঙ্গেই। কানাইয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত রাজসিক ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়—অধিকন্তু কানাই বয়সে সত্যেন অপেক্ষা ছয় বৎসরের ছোট, সুতরাং তাঁহার মধ্যে উন্মাদনা ও ভাবোচ্ছ্বাস সত্যেনের অপেক্ষা বেশী থাকাই স্বাভাবিক। স্বদেশের শৃঙ্খল-মোচনের জন্য সত্যেন সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বাছিয়া লইলেও তাঁহার প্রকৃতি ছিল সত্ত্বগুণে প্রভাবিত।

তৃতীয়তঃ কানাইয়ের অসাধারণ ও অভাবনীয় আচরণে দেশবাসীর মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তাহা নষ্ট করিবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারী ও এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলির ষড়যন্ত্র ও সত্যেন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার। কতি-

কাতার তৎকালীন এংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক পত্র 'এম্পায়ারে' সত্যেন সম্পর্কে যে একটা বিকৃত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন সত্যেনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও স্বনাম-বন্ধু বর্ণিত এ. সি. রায়—অবিনাশচন্দ্র রায়। এই সম্পর্কে হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহার সুযোগ্য সতীর্থ সত্যেনের উপর আরোপিত মিথ্যা কলঙ্ক ক্ষালন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাপ্রচারে ইন্ধন যোগাইয়াছে এবং সহায়তা করিয়াছে সত্যেনের বিরোধী অর্থাৎ বারীনবাবুর সমর্থক দল।

হেমবাবুর লেখায় সত্যেনের যে বন্ধুর উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই বন্ধু হইলেন হেমবাবু নিজেই।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার পরে সত্যেনের মধ্যে দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল কিনা তৎসম্পর্কে প্রথমে হেমচন্দ্র দাসের লেখা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :

..."সত্যেনের বিপক্ষ দল এই সুযোগে সত্যেনের সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার ক'রে তার উপর সাধ মিটিয়ে শোধ নিয়েছিল। তার মাত্রা এত দূর বেড়েছিল যে, অনেক পরে শুনেছিলাম, সত্যেনকে নাকি মূর্চ্ছিত বা মৃত অবস্থায় ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তাই সত্যেনের ফাঁসির সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, পরে তাঁদের অনেকের নিকট প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য অনুসন্ধান করেছিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বিখ্যাত সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়; আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সত্যেনের ফাঁসির দিন তিনিও জেলখানায় গেছলেন। নিতান্ত হৃদয়হীন বলে ফাঁসির ব্যাপারটা নিজে দেখেন নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গীদের ও জেল-কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁদের মুখে সত্যেনের ভূয়সী প্রশংসাই শুনেছিলেন। অথচ পরে কোন সংবাদপত্রে তার বিরুদ্ধে অত রকম মত প্রকাশিত হয়েছিল দেখে বিশেষ অনুসন্ধান করেছিলেন, আর জেনেছিলেন, আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রকমের দলাদলি ছিল—তার ফলেই সত্যেনের বিপক্ষ দলের দ্বারা এই রকম মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।" ("বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা ")

হাইকোর্টে আপীল করার ইচ্ছা যে সত্যেনের ছিল না, তাহা হেমবাবুর লেখা হইতেই জানা যায়। গোঁসাইকে হত্যা করার পর সত্যেনের মনে কি ভাব জাগিয়াছিল, তাহা হেমবাবুকে গোপনে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রেও প্রকাশ পাইয়াছে। এই সম্পর্কে হেমবাবুর লেখা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :

"সত্যেনও জানত, আপীলের ফল কিছুই হবে না; তার মা বিশেষ করে বলা সত্ত্বেও প্রথমে রাজী হয় নি। তার পর আমি তাকে তার মায়ের ইচ্ছার দোহাই দিয়ে রাজী করিয়েছিলাম। সেজন্য যে সত্যেনকে লোকমতে নিন্দিত হতে হবে তা ভাবতে পারিনি। বরং তখন মনে করেছিলাম, দেশে সত্যকার জনমতি কখনও হলে তারা সত্যেনকে বুঝতে পারবে। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। নরেনকে হত্যার দিন পাঁচ ছয় পরে আমরাও, সত্যেন কানাই যেখানে আবদ্ধ ছিল, সেই ৪৪ ডিগ্রী নামক জেলখানার মধ্যকার ক্ষুদ্রতর জেলে অর্থাৎ অন্দর মহলে রক্ষিত হয়েছিলাম। বিশেষ কড়াকড়ি পাহারা সত্ত্বেও 'কোডে' মেথরকে দিয়ে চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলত। প্রথমে চেয়ে সেই মেথরের হাতে একটু জল খেয়েছিলাম তাই তার শ্রদ্ধাও অর্জ্জন করেছিলাম।

'গোঁসাইয়ের' মৃত্যুতে সত্যেন কত আশাই করেছিল, কত কথাই সে বলে ছিল। কাব্যবিশারদের একটি গানের ভাব নিয়ে লিখেছিল,* অচিরে ভারতের নিশ্চয় 'বন্ধন মোচন' হবে, এই বন্ধন মোচনের কাজে সে 'নিজ দেহ প্রাণ বিসর্জ্জন' করে 'মাতৃঋণ প্রতিদান' করবে, এই তার অনন্ত তৃপ্তি।"

সত্যেনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বর্ণিত অবিনাশচন্দ্র রায় (এ. সি. রায়) তাঁহার মাতার অনুরোধে শবদাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কারণ তখন সত্যেনের জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞানবাবু জ্বরে শয্যাগত। সত্যেনের মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এবং তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে জেলে সাক্ষাৎও করিয়াছিলেন। হেমবাবুকে তিনি সত্যেন সম্পর্কে ১৯২৪ সনের ২রা জুলাই যে পত্র লেখেন, তাহার কিয়দাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"...ফাঁসির দিন আমি অতি প্রত্যূষে জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম। আমরা ঐ নির্দ্দয় ব্যাপার দেখিতে প্রস্তুত ছিলাম না। উহা সমাপ্ত হইলে একজন চর্ম্মবর্ম্মপরিহিত শ্বেত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,

"You can go now. The thing is over, Satyendra died bravely."

তৎক্ষণাৎ একজন সার্জ্জেণ্ট বলিতে লাগিল,

"When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake; when I said 'Satyendra be ready,' he answered, 'Well, I am quite ready' and smiled. He walked steadily to the gallows. He mounted it bravely and bore it all cheerfully. A brave lad."

"মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি ও আমার পত্নী দুই দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। খুব সহাস্য বদনে দুই দিনই সে আমাদের সহিত প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া স্বদেশী কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল। তাহার কিছু কিছু উক্তি আমার মনে আছে। সে বলিয়াছিল, 'আমার বা কানাইয়ের মৃত্যু কি হায়। আমা-

---

* "প্রকৃত সন্তান হবে সেই জন
নিজ দেহ-প্রাণ করি বিসর্জ্জন,
যে করিবে মা'র বন্ধন-মোচন
দুবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।"

দের মত সহস্র সহস্র মরিলে তবে দেশ উদ্ধার হইবে, তবে দেশে জাগরণ আসিবে।'

"আমিই তাকে ফাঁসির বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিবার প্রবৃত্তি দিই। সে কিছুতেই রাজী হয় নাই। তাহার মাতার ইচ্ছা বারংবার বুঝাইলে তখন সে বলে, 'ভাবিয়া দেখিব',—পরে জেল হইতে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করে।

"মাতার সাক্ষাতের ইচ্ছা জানাইলে বলিয়াছিল, 'যদি তিনি এখানে আসিয়া না কাঁদেন, তবেই আমি সাক্ষাৎ করিতে পারি, নচেৎ নয়।' তাহাই হইয়াছিল। তাহার বৃদ্ধা জননী এক ফোঁটা অশ্রু পরিত্যাগ করেন নাই। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রার্থনা করিবার জন্য আমিই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে ঠিক করিয়া দিই।...

"তখনকার বালক বালিকারা নানা স্থানে কানাই ও সত্যেনের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিয়াছিল। এই সংবাদ আমি কারাগারে সত্যেনকে দিয়াছিলাম। শুনিয়া তাহার মুখ খুব উৎফুল্ল হইয়াছিল।"

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত তৎকালের বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক *The Bengalee* পত্রের প্রতিনিধি সত্যেন্দ্রনাথের যে সকল আত্মীয়-স্বজন কারাগারে ফাঁসির দুই তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া সত্যেনের মানসিক অবস্থা অবগত হইয়াছিলেন। 'বেঙ্গলী' পত্রিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"So far as we are concerned," he continued, "I mean so far as the relations and friends are concerned, we could gather from his appearance and conversation that Satyendra Nath is never the least nervous or discomforted.

"His last conversation with us on Thursday was quite bright and cheerful. He said he was fully prepared for the worst. He asked his relations not to be making themselves uncomfortable and troubling about appeals and motions."—*The Bengalee*, dated Saturday, November 21, 1908.

সত্যেন জেল হইতে তাঁহার অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ফাঁসির দিনকয়েক পূর্ব্বে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার মনোবল কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হওয়ারি পরিচয় মিলে। পত্রখানি এই :

১৭।১১।০৮ মঙ্গলবার
বেলা ৪টা

পূজনীয় দাদা বাবু,

গত শনিবার আপনি আসিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু আসিলেন না কেন? সেদিন হইতে আপনার জন্য আশা করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি আজ পর্য্যন্ত আসিলেন না। যাই হউক—আজ এক্ষুনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলিলেন যে আপিল অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং ২১শে তারিখ শনিবার সকালে দিন স্থির হইয়াছে। অতএব মধ্যে আর মাত্র তিন দিন সময়, পত্র পাঠ আপনি অবশ্য একবার শেষ দেখা করিয়া যাইবেন। যেদিন আসিবেন সেই দিন দেখা হইবে। অন্য কেহ যদি দেখা করিতে চান সঙ্গে লইয়া আসিবেন। মিঃ রায়কে দেখিতে ইচ্ছা করে যদি তিনি আসেন তবে সুখী হইব। তৎপরে দাদা, আপনার নিকট একটি অনুরোধ আছে—জানিবেন আপনার নিকট এটি আমার এই প্রথম ও শেষ অনুরোধ—সেটি এই যে আপনি যে রকমই ভাবুন আমার অনুরোধ ভাবিয়া দেখিবেন যেন শেষ জীবনে কষ্ট না পান আর আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শনিবার সকালে আসিয়া দেহ লইয়া যাইবেন। ন'দিদি প্রভৃতি আসে ত ভালই। প্রার্থনাদি করিয়া যেন সংকার করা হয়। আশা করি পত্রপাঠ একবার দেখা করিয়া যাইবেন।

ইতি আপনার
স্নেহের ভাই সত্যেন

ঠানদিদি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গিয়ে দাঁড়াতেই গোবিন্দমাসি বললেন—"এই যে এসে গেছিস, জানি মা একটা ব্যবস্থা করবেনই।"

প্রশ্ন করলাম—"কিসের ব্যবস্থা মাসি ?"

"মনসা পুজোটা করে দিবি…"

বললাম—"সে কি মাসি, আমি যে মন্তর-টন্তর কিছু জানি না !"

পুজোর যোগাড়ই করছিলেন, হাত বন্ধ করে আমার মুখের পানে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন, তারপর যেন কথা কইবার মত অবস্থা হলে বললেন—"কি হ'ল রে শৈল ! বামুনের ঘরের ছেলে, মুখ দিয়ে বের করতে পারলি কথাটা ! তোদের কি ঠাকুরদেবতার ভয় নেই ?"

বললাম—"মন্তর জানি বললেই বেশী ভয়ের কথা নয় কি মাসি ? ইনি আবার যেমন কাঁচা-খেকো দেবতা !"

"আচ্ছা, হয়েছে ; আর এসেই ধূলো-পায়ে অমূলুলে কথাগুলো তোমার মুখ দিয়ে বের করতে হবে না, খুব নিকিয়ে হয়েছ, খুব বলিয়ে-কইয়ে হয়েছ।…নে, জামা জুতো ছেড়ে হাত পা ধুয়ে নে, আমি ততক্ষণ পিটুলি দিয়ে সাপ ক'টা এঁকে ফেলি…"

"না মাসি, আবার মার পেয়াদাদের সামনে বসে !… অত অনাচার সইবে না।"

গোবিন্দমাসি হেসে ফেলতে গিয়ে আরও গম্ভীর হয়ে আমার মুখের দিকে ঠায় চেয়ে রইলেন, তারপর উঠে পড়ে বললেন—"আচ্ছা, তার ব্যবস্থাও আছে, মনের খুঁতখুঁতুনি যেতে না চায়, গঙ্গা থেকে একটা ডুব দিয়ে আয়, যা তা কথা মুখে আনবার দোষটাও যাবে কেটে। জানি না বাপু, কি যে তোরা হয়ে উঠছিস দিন দিন !"

তেল মেখে গামছা কাপড় নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছি, দরজার কাছ থেকে ডাকলেন—"ওরে শোন শৈল, পেছু ডাকলাম, তা মা-মাসির ডাকে দোষ নেই, এইটে নে, নেয়ে উঠে গায়ে দিয়ে আসবি।"

এগিয়ে এসেছেন, হাতে একটা নামাবলি।

একটু বিমূঢ় ভাবেই বললাম—"ও কি হবে মাসি ! অনাচারের শরীর, যা তা খাওয়া অব্যেস…"

"তুই নে দিকিন, দেহটা শুদ্ধু থাকবে। আর যা মুখে আসে তাই বলিস নি অমন করে ; এখুনি পুজোয় বসতে হবে।" তা হলে যখন যাচ্ছিসই একটু দাঁড়া, কমণ্ডলুটাও এসে দিই ; জলটুকু খরচ করে ফেললাম।"

এর পরে যা হ'ল সেটাকে মতিচ্ছন্নই বলতে হয়। কিন্তু হ'ল বোধ হয় স্বাভাবিক নিয়মেই। কথাটা হচ্ছে, নেশা করলে যদি বিভুল বকবার ঝোঁক হয় তো মাসির যা ব্যবস্থা তাতে ধর্ম্মভাবই বা ক্রমে মনটা অধিকার করে বসবে না কেন ? হ'লও তাই ; ফেরবার সময় একটা অস্বস্তি ঠেলে উঠতে লাগল মনে—একটা লোক—ব্রাহ্মণই —গঙ্গাস্নান করে গায়ে নামাবলি জড়িয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, অথচ মনে যাই থাক, মুখে সংস্কৃতের একটু অনুস্বর-বিসর্গ নেই—কেমন যেন নেড়া নেড়া, বেমানান বোধ হতে লাগল। অথচ নেয়ে নামাবলি গায়ে তুলেছি বলেই যে সরস্বতী এসে কণ্ঠে অধিষ্ঠান করবেন এমনও তো হয় না। তবুও এক রকম করে বোধ হয় কাটিয়েই উঠতাম অস্বস্তিটা—পুঁজি নেই একেবারে, করা যায় কি ? কিন্তু এই সময় পরিস্থিতিটা একটু বদলে গেল।

গ্রামের পথ, বেলাও হয়েছে, লোক চলাচল খুব কম, অল্প যা যাওয়া-আসা করছে তাও নিম্নশ্রেণীর মানুষ, একটা মোড় ঘুরেই কিন্তু দেখি সামনে হাত পঞ্চাশেক দূরে তিন জন ভদ্রঘরের মেয়েছেলে, আমি যেদিকে যাচ্ছি সেইদিকেই এগিয়ে চলেছে। একজন বেশ বুড়ী চওড়া রাঙাপেড়ে কাপড় পরা ; তার পাশেরটি যুবতী, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে, পায়ে হালফ্যাশানের জুতো, হাতে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ, পরনের শাড়ি, ব্লাউস দূর থেকে যতটুকু দেখা যায়—সব ঐ মেলেরই, পরাও হালফ্যাশানে ; তার পাশের মেয়েটি নেহাত ছেলেমানুষ, বছর দশেকের হবে, ফ্রক-পরা, পায়ে ষ্ট্রাপ সু। বুড়ীর দেহটা সামনে একটু ঝুঁকে গেছে, বাঁ-হাতে একটি লাঠি ; চলেছে কিন্তু বেশ খর খর করে, মেয়ে দুটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। গল্পও হচ্ছে, একটু হাসিও ভেসে এল।

বিনা সংস্কৃততেই দিচ্ছিলাম চালিয়ে, কিন্তু এই নূতন সমাবেশের সামনাসামনি হয়ে সেই অস্বস্তিটা আরও বেড়ে গেল। গ্রামের প্রাচীনা, সে কত পুজো দেখেছে, কত পুরোহিত কত পণ্ডিত দেখেছে ; তার পাশ দিয়ে ঘটা করে জলভরা কমণ্ডলু নিয়ে নামাবলি গায়ে একজন গঙ্গাস্নাত ব্রাহ্মণ চলে গেল, মুখে একটিমাত্র মন্ত্র নেই, কি রকম হবে এটা ?…যেন মনশ্চক্ষে দেখছি আমি এগিয়ে গেছি, বুড়ী লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আছে চেয়ে…যেন মন্ত্রহীন কলির ব্রাহ্মণ নিয়ে অতিআধুনিকা নাতবৌকে সুদ্ধ জড়িয়ে কি একটা টিপ্পনী কাটলে।

নাতবৌয়ের কথা ভেবেই কি স্বস্তি পাচ্ছি? ছোট মেয়েটিকে না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু ঐ যে নব্যা, পায়ের হীল-তোলা জুতো থেকে মাথার এলো খোঁপা পর্য্যন্ত যার সমস্তটুকুই যা পুরাতন, যা বিগতপ্রায় তার উপর বিদ্রূপে ঠাসা, তার সামনে দিয়ে এ অবস্থায় আসল যা জিনিষ, অর্থাৎ মন্ত্র, সেটাকেই বাদ দিয়ে চলে গেলে তার বিজয়-স্পর্দ্ধাটাকেই কি বাড়িয়ে দেওয়া হবে না?

এখন অবশ্য ধীরে সুস্থে অবস্থাটা বিশ্লেষণ করে বুঝছি, সমস্তটাই ছিল আমার মনের দুর্ব্বলতা—ঐ যে জানি না মন্ত্র—ঐটেই বড় হয়ে প্রাচীনা নব্যা উভয়ের কাছেই সমান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কি করে, নইলে ব্রাহ্মণও নিয়ত গঙ্গাস্নান করে যাচ্ছে, সব গঙ্গার রাস্তাও কিছু সংস্কৃত টোল হয়ে ওঠেনি; তখন কিন্তু সত্যই দ্বিধা-সঙ্কোচে আমার যেন পা উঠতে চাইছিল না।

এদিকে বেশি দেরী করাও চলে না; আরও একটা চিত্র মনশ্চক্ষে স্পষ্ট হয়ে উঠছে—গোবিন্দমাসির পূজার জোগাড় শেষ হয়েছে, নেড়া মাথায় ভিজা গামছা পাট করে বসিয়ে বাইরের দুটো চৌকাঠে হাত দিয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। ঘণ্টাকয়েকের জন্য দেখা করতে এসেছি, কিছু বলবেন না নিশ্চয়, কিন্তু সেই কিছু না বলতে পারার জন্যই পাড়ার ভালোখাকী শতেক খোয়াড়ীদের উপর ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছেন, কি তুমুল হট্টগোলের মধ্যে গিয়ে যে পড়ব ভেবে পাচ্ছি না।

অবশ্য দাঁড়িয়ে পড়ি নি, কিন্তু গতি শ্লথ হয়ে গেছে।... ভগবান, ভুলে একটা শ্লোকও কি জীবনে মুখস্থ করি নি? তা হলে সেই পুণ্যে তার সিকিটুকুও মনে পাড়িয়ে এটুকু পার করিয়ে মান বাঁচাও।

একটি অক্ষরও মনে পড়ল না, এত উদ্বেগ চঞ্চলতার মধ্যে পড়ে না, তবে নিতান্ত শ্লোক মনে না পড়ুক খানিকটা কাজ চালানো সংস্কৃত হাতড়ে পাওয়া গেল। সামনের এইটুকু পথ কোন রকমে কাটিয়ে দেওয়া—বিদ্যাসাগর মশাইয়ের "উপক্রমণিকা" থেকে একটা শব্দরূপের অনুস্বার বিসর্গগুলো বেশ ঘটা করে জাগিয়ে, কমণ্ডলুটা শক্ত করে ধরে পা চালিয়ে দিলাম। "গট্ গট্ করে এগিয়েও গেলাম। ...তারপর পাপের প্রায়শ্চিত্তও হ'ল।—

ওদের ছাড়িয়ে প্রায় আরও হাত-পঞ্চাশেক গেছি, কানে গেল—"ঐ যে! শুনচ? বলি ও!..."

ঘুরে দেখি সেই বুড়ী! একাই রয়েছে। রাস্তা থেকে একটু নেমে একটা বাগানের এদিকে নূতনে-পুরনোয় একটা বড় দোতলা বাড়ী, রাস্তাতে পায়ল্যাম মেয়ে দুটি সেই দিকেই চলে গেছে।

বুড়ী আসছিলই, আমিও দু'পা এগিয়ে সামনাসামনি হতে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখে সোনার ফ্রেমের মোটা কাঁচের চশমা, তার মধ্যে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু যেন চটুল হাসি ঠোঁটে টেনে প্রশ্ন করলে, "বলি, চিনতে পারলে?"

বেশ ভাল করে দেখলাম—সত্তর-পঁচাত্তর বছর বয়স হয়েছে, চেহারাটি কিন্তু সরস—পরনে চওড়া রাঙা-পেড়ে শাড়ি, তার মধ্যে রুটির লেচির মত পাকা চুলের ছোট্ট খোঁপাটি ঢাকা, মুখে টানা-দেওয়া নথ, বাঁধানো দাঁত শুকনো গাল দুটিকে ঠেলে রেখেছে, গায়ে গয়নারও বেশ বাহুল্যই।

আমি বিমূঢ়ভাবে চেয়ে আছি দেখে বেশ বড় করেই হাসলে এবার, বললে, "আমাকে নয়; ঠানদিদিকে অত শীগ্‌গির ভুলবে না, জানি। আমি বলছিলাম, ঐ ওঁকে—রূপের ঢেউ তুলে পাউডারে, এসেন্সে গন্ধগোকুল হয়ে আসছিলেন না রাস্তা দিয়ে?—আমার সঙ্গেই গো!...ঐ ওঁর কথা বলছি।"

বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। কি বলা ঠিক হবে তাড়াতাড়ির মধ্যে ভেবে না পেয়ে উত্তর করলাম, "কে, চিনলাম না তো।"

ঠোঁটের একটা দিক গুটিয়ে নিয়ে একটু হাসলে, তারপর চোখ দুটো একটু টিপে বললে, "আমাদের নতুন চৌধুরী-গিন্নি, সনতের দ্বিতীয়পক্ষ গো!...চিনবে আর কোত্থেকে? —বিয়ের পর তো দু' বছর পাহাড়ে পাহাড়েই ঘুরে বেড়ালেন রাণী; দোজবরে—চালসে বর, মুখের কথাটুকু খসাতে দেরি, তক্ষণি তামিল হয়ে যাচ্ছে তো।...পাড়া-গাঁ—এখানে কি মানুষে থাকতে পারে?—বন, জঙ্গল, ডোবা, ম্যালেরিয়া!...বিয়ের কনের মুখের কথা বলছি তোমায়—সেই কোন্ দু'বছর আগেকার কথা, কিন্তু প্রত্যেকটি মনে আছে তো আমার।...আমি হচ্ছি ক্ষেমী বামনী, নাত-বৌয়ের সম্বন্ধ ধরে বসিয়ে বসিয়ে সব পেটের কথা বের করেছিলুম তো?—সে কি ঠ্যাকার! কি দেমাক! কি নাকসিটকুনি!...বলি তোর শহুরে মেয়ের ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার বাবা!...তা বছর দুই এ-পাহাড় ও-পাহাড়ের জল খেয়ে এখন আবার সেই অজ পাড়া-গাঁ, সেই এঁদো পুকুর, সেই ম্যালেরিয়াই গতি তো?...আমি বলি, পথে এসো বাছা।...হ্যাগা, ঐ মেম-সায়েবী খরচ কত দিন যোগাবে আর? জমিদার!...ন্যাও, ক্ষেমী বামনীর আর জানতে বাকি নেই বাছা; নামেই তালপুকুর, এদিকে ঘটি ডোবে না।...এখন আবার এই বামুনপাড়ের ওপর কত টান। ...মেয়েদের স্কুল বসাব, জঙ্গল পরিষ্কার করাব, ওপরে লেখাপড়া করে রাস্তাঘাট তোয়ের করাতে হবে...সব শুনতে শুনতে আসছিলাম—হাসিতে পেট গুড়-গুড় করছে,

কিন্তু বলি কাকে ?"...চাপা হাসিটাকে বেশ প্রাণ খুলেই মুক্তি দিলে।

আমি এমন অপ্রতিভ আর বিমূঢ় হয়ে গেছি যে কি বলব, কি করব যেন ভেবে উঠতে পারছি না। আমায় হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে ধরে এসব কাহিনী বলে কেন ? একটা যে ঝগড়াটে ধোঁট-পাকানে পাড়া-গেঁয়ে বুড়ী এটা তো বেশ বুঝা যায়, কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে, এ যেন একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া।...পাগল কি ?... কিন্তু তারও লক্ষণ তো কোন দেখা যাচ্ছে না...

আমার অবস্থাটা দেখে হাসিটা আরও বেড়ে গেল বুড়ীর। বেশ জমে এসেছে, মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, "তুমি যে একেবারে অবাক হয়ে গেলে গো ! তবে আরও শোন—অবাক হবার এখনও অনেক বাকি আছে। ক্ষেমী বামনীর তো জানতে কিছু বাকি নেই—বলি, মেমসায়েব পাহাড় থেকে নামতেন নাকি এক্ষুণি !—সনৎ এইসা এক মোচড় দিয়েছে যে !...ঝাঁটা পড়ুক, তবু জমিদারই তো ? —রটিয়ে দিয়েছে আবার একটা বিয়ে করবে—এই তখন এসেছে সাত-তাড়াতাড়ি নেমে। এখন এই রাধানগরই সগ্‌গ, ঐ সোয়ামীই ইন্দির-চন্দো?—দেখছ না ঠাটবাটের ঘটা ?...সাধে কি বাবা বলে ?—গুঁতোর চোটে বাবা বলায় ; এখন ঐ দোজবরেরই মন জোগাতে..."

আমিও কুটুস্ করে দিয়েছি কামড়।...ছাড়ব ! আমার নাম ক্ষেমী বামনী বাপু !—বলা মুখ, বাদশাকেও রেহাই দিই না। বললাম, "নাতির আমার বয়েস হয়েছে, তার ওপর নাতবৌকে ঘর আলো-করা রূপও দিয়েছেন ভগবান, এর ওপর যদি আবার নাতবৌ আমার সাজে-পোশাকে, হাবে-ভাবে..."

এই সময় একটা ব্যাপার হ'ল ; আমার পেছনে খানিকটা দূরে একটা আওয়াজ উঠল—"ঠানদিদি যে ! পথে দাঁড়িয়ে করছ কি ? একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে জোগাড়-যন্ত্র করে রাখো তো পূজার, আমি চৌধুরীদের বাড়ীটা সেরে এই এলাম বলে।—আজকেও যেন গাড়ী ফেল করিয়ে দিও না, দোহাই।...ইনি কে ? নতুন দেখছি যে..."

ফর্সা, একটু রোগা-রোগা, গায়ে নামাবলি, বয়সও প্রায় আমারই মতো। গ্রামের ডেলী-প্যাসেঞ্জার পুরোহিত, কথাগুলো বলতে বলতেই হন্-হন্ করে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বড় রাস্তা থেকে নেমে চৌধুরী-বাড়ীর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। "ইনি কে ?"—বলে একবার আমার দিকে চকিতে আড়ে চেয়ে নিলেন, কিন্তু উত্তর শুনবার ফুরসত কোথায় ?

—দিচ্ছেই বা কে ?

বুড়ী মোটা চশমার ওদিকে চোখ দুটো কুঁচকে পিট্ পিট্ করে একটু আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর নাক-মুখ সিটকে আমার পাশ কাটিয়েই ঠক্-ঠক্ করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে গেল বেরিয়ে।

ক্ষেমী-বামনী, বলা মুখ, সে বাদশাকেও রেহাই দেয় না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ স্পষ্ট-স্পষ্টই কানে গেল—

"কি রকম গো ! পোড়ারমুখো মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরের বৌয়ের কেচ্ছাটা আগাগোড়া শুনলে, একবার-বললে না যে আমি অমুক, পুরুত নই !"

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসাহানা দেবী

স্বর্ণকমল হাতে,
আসিলে যখন রাতের গগনে শুকতারা ছিল সাথে।
তখন মগ্ন সবে,
নিশীথ স্বপনজড়িত ভুবন সুপ্তি অতলে যবে—
যুগের প্রভাত সম,
চারিদিক করি' উজ্জ্বল মনোরম ;
ধরণীর শির চুমি',
যাত্রার পথে নামিয়া হেথায় এলে বল কোন্ পথের পথিক তুমি।
কণ্ঠে ভরিয়া গান,
—যেন কোন আহ্বান—
গাহিয়া জাগালে জীবনের নব প্রাণ,
রাত হোল অবসান।

ভোরের আলোতে দিয়ে গেল কারে ডাক :
—এলো সেইদিন,—সে পঁচিশে বৈশাখ।—

তুলে নিলে বীণাখানি,
আপনার সুরে সুর দিলে যবে আনি'—
আনন্দে কোন মধু-উৎসবে মাতি'—
প্রকৃতি সাজায় বরণের ডালা তুলিয়া দিবসরাতি।
ঋতুরা কাহার আসন বিছায় আনি',
কুঞ্জে কুঞ্জে কাননে কাননে গুঞ্জনে কানাকানি।
গাঁথে মালা তারি তরে,
তাহারি চরণে পড়িতে ঝরিয়া ফুল ফোটে থরে থরে।
বিশ্বভুবন বিস্ময়ে রহে চাহি'
তব পানে, ওগো বাণীর অগ্রবাহী,

তারি বিচিত্র রূপরসসুধা পান করে অবগাহি',
অন্ত নাহি যে নাহি।

হে কবি, অমরকবি,
হে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের ছবি,
রেখে গেছ এঁকে বিশ্বের হিয়াপটে,
তোমার প্রাণের ঢেউগুলি সব লেগেছিল কোন্ তটে।
অতুলন তব সৃষ্টির এই অবর্ণ্য ফুলগুলি,
চিরবসন্ত-মালঞ্চ ভরি' র'বে চিরকাল ফুটিয়া আনন তুলি'।

হে কালদর্শী, হে শিল্পীসম্রাট্,
বিরাট প্রতিভা কিরণোজ্জ্বল তোমার রাজ্যপাট।
কত অগণন দুর্লভ ধনরতনে পূর্ণ তব রাজভাণ্ডার,
রাশি রাশি ভরা কত রূপসম্ভার।
প্রতি কথা তব কি যে অপূর্ব বাণী,
কণ্ঠেতে যেন কথা কয় বীণাপাণি
অপরূপ সঙ্গীতে,—
ছন্দ তোমার কল্লোলি' চলে তটিনীর ভঙ্গীতে :
কুলু কুলু কুলু কল কল কূলে কূলে,
বহি চলে কোথা কোন্ গিরিপাদমূলে,—
বনানীর তরুছায়ে,—
দিকে দিকে কভু রাঙাপথে কভু শ্যামলের গায়ে গায়ে।—

—কবে কোন্ পর্বতে,
রাজার দুলাল চলেছিল কোন্ মেঘের শুভ্র রথে,
আনিতে জিনিয়া পাষাণপুরীর পর্বতদুহিতারে
নাশিয়া দৈত্য—ছিল যে জাগিয়া দ্বারে।—

—কোথায় মেঘের পার,
মরালীর ওই সুন্দর পাখা মেলিয়া গগনে কোন্ পথে ভেসে যায়।
—কোন্ শৃঙ্গের ধবল তুষার 'পরে
কে নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ করে।—
গিরিগুহা গহ্বরে,
কোন্ মুনি ধ্যান ধরে।—

—কোথা নীল সরোবরে,
করেছিল কারা জলকেলি কবে কমল তুলিয়া করে।
কবে কোথা কোন্ অপ্সরা সে রূপসী,
গেয়েছিল কার প্রাণের রাগিণী কোন্ প্রাঙ্গণে বসি'।—
রাজার কন্যা, যৌবন-ডাক শুনি এক দিন কবে,
ছাড়ি' আপনার বীরের সজ্জা চেয়েছিল কোন্ বীরশ্রেষ্ঠরে
ছিল বনবাসে যবে।—

কত কথা, ছবি, কত কাহিনীর সুমধুর ঝঙ্কার
তুলিয়া চলে যে ছন্দ তোমার স্রোতসঙ্গীতে তার।

ওগো মহীয়ান্, ওগো মহারূপকার,
হে সৌরভের গৌরবমণিহার,
নিখিলের অন্তর,
পূর্ণ করিয়া দিয়েছ ভরিয়া ওগো ধ্যানী সুন্দর।
তব গৌরবে গৌরবী আজ সবে,
জগৎ জীবন তোমার কাহিনী কবে,
মর্মে মর্মে মুরতি তোমার র'বে
চিরকাল চিরদিন।
শিল্পীর ধ্যান-অন্তরে র'বে তোমার প্রেরণা চিরঅন্তর্লীন।

এই ধরণীরে বেসেছিলে কত ভালো,
নয়নে তাহার মেলে দিয়ে গেছ আলো।
দিতে ভাষা, দিতে গান,
দিতে রূপ, রস, বৈচিত্র্য মহান্
এসেছিলে তুমি, কবি,
মেখে যেতে তারি ছবি।

শারদ পূর্ণিমায়,
সুরের জ্যোৎস্না দিয়েছ বিছায়ে বিশ্বের আঙিনায়।
ভরা শ্রাবণের ঘনবরিষণ সাথে,
কণ্ঠ ছাড়িয়া গেয়েছ গান সে বরষামুখর রাতে
বসন্ত উৎসবে,
চিরসুন্দরে দিয়ে গেলে ডাক সুন্দর সব যবে।
জীবনের সাজি ভ'রে
দিয়েছ সাজায়ে পূজার কুসুম কাহার পূজার তরে।

আমার কুসুম আনি',—
এসেছি চরণে নিবেদিতে আজ প্রাণের প্রণামখানি।
আজ নাই, তুমি নাই,
আমার কণ্ঠ খুঁজে ফেরে তব সে-পরশ মাঝে ঠাঁই।
শৈশব হ'তে তব গীতসুধা পানে,
শুনেছি গানের মর্মের কথা কানে,
শিখেছি তাহার গভীর প্রাণের ভাষা,
চিনেছি সুরের সুষমার মাঝে কি তার নিভৃত আশা।
তোমার কাব্যে নিখিলের সনে হোল পরিচয়, হোল মন
জানাজানি,
তোমার কাব্যে ভারত-গাথায় শুনি কতভাবে ভারতের মহাবাণী।

আমি আজ মেখে যাই—
আমার কাব্যে তোমারি লিখন—"তুমি নাই, তুমি নাই"।—

কীর্তিরে দিল মহিমার এই উচ্চশিখর যেই শিল্পীর তুলি,
মরণের মাঝে অমরণ দিল তাহারে দুয়ার খুলি'।

শুভারম্ভ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

নূতন নাটক বা সিনেমার বইয়ের শুভারম্ভের বিজ্ঞাপন অহরহ আমাদের চোখে পড়ে। আমরা পরমাগ্রহে নূতন নাটকাভিনয়ের রসাস্বাদন করি—যাঁহাদের অভিনয় নৈপুণ্য অভিনেতৃসমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে সগৌরবে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের আচরণ ও কথাবার্তায় যে একদল লোক বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করেন ভাবাতিশয্যে আমরা তাহা লক্ষ্য করি না। অথচ একটু অবহিত হইলেই আমরা নিজেদের ত্রুটিতে নিজেরা বিস্মিত হইব—ভাষাপ্রয়োগে আমাদের শৈথিল্য আমাদিগকে অপ্রস্তুত করিবে।

হেঁয়ালি ছাড়িয়া কথাটা স্পষ্ট করিয়াই বলা যাক। বাক্য মধ্যে শব্দসন্নিবেশের ক্রম এবং একই শব্দের উচ্চারণের আংশিক উচ্চতা বা নীচতা অর্থের যথেষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে। পাশাপাশি দুইটি শব্দ বিচ্ছিন্ন ভাবে যে অর্থ প্রকাশ করে সংযুক্ত বা সমাসবদ্ধ সন্ধিযুক্ত অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই তাহার পরিবর্তন হইয়া থাকে। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় বিশেষণ শব্দের উচ্চারণে যে জোর পড়ে বিশেষণ শব্দটিকে বিশেষ্যের সহিত জুড়িয়া সমাসবদ্ধ করিয়া দিলে সে জোর নষ্ট হইয়া যায়—বিশেষণের সার্থকতা কমিয়া যায়। তাই বৈয়াকরণ বলেন—বিশেষণের সহিত বিশেষ্য জুড়িয়া কর্মধারয় সমাস করিলে বিশেষণের অর্থ গৌণ হইয়া পড়ে এবং বিশেষ্যের অর্থ প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায় শুভারম্ভ, পরমাগ্রহ, পরমাত্মীয়, ঘনান্ধকার প্রভৃতি শব্দগুলি ভাঙ্গিয়া শুভ আরম্ভ, পরম আগ্রহ, পরম আত্মীয়, ঘন অন্ধকার ব্যবহার করাই সঙ্গত। তাহাতে যথাস্থানে জোর পড়ে—অভীষ্ট অর্থ প্রকাশে কোন বাধা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের লেখায়ও এই জাতীয় একাধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু এক্ষেত্রে সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইবে বলা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত কয়েকটি প্রয়োগ এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সেই মুক্ত দ্বার পথে, ক্ষীণালোকে, এক ছায়াতুল্য মূর্তি দেখিলেন। —বিষবৃক্ষ (৪৪শ পরিচ্ছেদ)

পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছে।

—প্রাচীন সাহিত্য, রামায়ণ, পৃ. ৫

শকুন্তলাকেও করুণাচ্ছাদনে আবরিত করিতেছে।

—প্রাচীন সাহিত্য শকুন্তলা, পৃ. ৩৪

মেদস্ফীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্ব্বদা চলাফেরার জন্য সে হয় নাই।

—প্রাচীন সাহিত্য—কাদম্বরী চিত্র, পৃ. ৫৬

সন্ধ্যার সমস্ত শান্তি এবং শ্রান্তি এবং ধূসরচ্ছায়া কবি মুহূর্ত্তেই মনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিয়াছেন।

—প্রাচীন সাহিত্য—কাদম্বরী চিত্র, পৃ. ৬০

দীর্ঘায়ু বিরল হইয়া আসিয়াছে।

—আত্মপরিচয়, পৃষ্ঠা ২১

কেবল পূর্ববর্তী বিশেষণের সঙ্গে পরবর্তী বিশেষ্য জুড়িয়া দিয়াই অসুবিধায় পড়িতে হয় এমন নহে। বিশেষ্যকে অপর পদের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া বিশেষণটিকে বিচ্ছিন্ন রাখাও সঙ্গত নয়। তাই গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন না বলিয়া 'গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন' বলা উচিত। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে এরূপ না করিলে বিশেষণটি বড়ই দুর্বল হইয়া পড়ে।

বাংলায় অনেক স্থলে ক্রিয়া দুইটি পদের সমবায়ে গঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে একটিকে অপর পদের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ার একটা রীতি মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেও সমর্থন করা চলে না। 'নামোল্লেখ করা' 'রসাস্বাদন করা 'মুখোজ্জ্বল করা' 'দ্বারোদ্ঘাটিত হওয়া' 'কার্য্যারম্ভ' 'ভারার্পণ করা' প্রভৃতি স্থলে সংযুক্ত শব্দগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা অন্বয়ের অসুবিধা হয়—কর্মপদগুলি যথাযোগ্য মূল্যলাভে বঞ্চিত হয়। বাংলায় অনেকক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সমাসবদ্ধ-পদের মধ্যেও সন্ধি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রথাই প্রচলিত হইতেছে দেখা যায়। প্রয়োজনানুসারে না বলিয়া এখন আমরা প্রয়োজন অনুসারে বলিতে দ্বিধা বোধ করি না—বিবাহ-উৎসব, মাতৃ-আজ্ঞা, ন্যায়-অন্যায়, প্রীতি-উপহার, ঈশ্বর-ইচ্ছায়, উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভৃতি প্রয়োগে কেহ আপত্তি করেন না। বরং সন্ধি করিলে তাহা বিসদৃশ বলিয়া মনে হইবে। সুতরাং এখন আর নূতন করিয়া সন্নিহিত দুই পদের মধ্যে সন্ধি করিবার চেষ্টা বাংলার প্রকৃতি-বিরোধী। ইহা দ্বারা ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি বা শক্তি সঞ্চারের সম্ভাবনাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে ক্রমবর্ধমান আর এক জাতীয় প্রয়োগের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। আজকাল স্থানে অস্থানে 'অনস্বীকার্য' ও 'অবিস্মরণীয়' এই দুইটি কথার ছড়া-

ছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। কথা দুইটির মধ্যে কোন দোষ নাই সত্য তবে কোন বাক্যে বিধেয় রূপে ইহাদের ব্যবহারে অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশিত হয় কিনা ধীরভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। বস্তুতঃ সেরূপ স্থলে নিষেধের অর্থ গৌণ হইয়া পড়ায় প্রকৃত অর্থের প্রতীতি হয় না। 'এ কথা অনস্বীকার্য' আর 'এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই'—এই দুইটি প্রয়োগের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য আছে। প্রথম বাক্যে 'না'-এর উপর আদৌ জোর পড়ে না অথচ বক্তা অবশ্যই সেই জোর দিতে চান। একখানি বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে একজন লিখিতেছেন—'হায় হায়, আহা-উহু, খেদ, দীর্ঘশ্বাস, অভিসম্পাৎ প্রভৃতি সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত গুণাবলী এখানে অনুপস্থিত।' স্পষ্টতই ইংরেজী অ্যাব্‌সেন্টের প্রতিশব্দ রূপেই অনুপস্থিত কথাটি এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজী না জানা পাঠক ইহার তাৎপর্য কতটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলা শক্ত। যে সকল পাঠক নির্বিচারে সকল কথা মানিয়া লইতে চান না এখানে নিষেধের অপ্রাধান্য তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইবে না। 'অনন্ত', 'অনবদ্য' প্রভৃতি শব্দও আজ অনেকে বিধেয়রূপে ব্যবহার করিতেছেন—ইহাদের প্রকৃত তাৎপর্যের দিকে লেখক বা পাঠক কাহারও তেমন লক্ষ্য আছে মনে হয় না।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে যেখানে প্রতিষেধের প্রাধান্য বিবক্ষিত সেখানে নঞ্‌-তৎপুরুষ সমাসই হইতে পারে না। অবশ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে বাংলায় মানিতে হইবে এমন দাবি করা চলে না। তবে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হইলেও একটা যুক্তি ও শৃঙ্খলা থাকা চাই। সর্বাপেক্ষা বেশী দরকার অর্থের সুস্পষ্টতা। যে কোন শব্দ ব্যবহার করিবার সময়ই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে তাহা দ্বারা অভীষ্ট অর্থ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইতে পারে কিনা—সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর তাহা বুঝিবার পক্ষে কোন বিশেষ বাধা আছে কিনা। বাধা থাকিলে এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও বাঞ্ছনীয় নহে। তাই সাধারণের জন্য লিখিত গল্পের মধ্যে যখন নিশীথ রাত্রে হ্যারিকেনটি অনুজ্জ্বল করিয়া দেওয়ার কথা বা 'অনুদিত প্রাতে সেতার লইয়া' বসার কথা শুনি তখন লেখকের উদ্দেশ্য ও পাঠকের অবস্থা চিন্তা করিয়া বিচলিত হই।

বস্তুতঃ ধ্বনিমাধুর্যের প্রলোভনে এবং শব্দাড়ম্বরের আকর্ষণে বাংলা ভাষায় নিত্য যে সব নূতন নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে বা প্রাচীন শব্দ নূতন ভাবে নূতন অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে তাহাতে সাধারণ পাঠকের পদে পদে বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু সাধারণতঃ পাঠক-সমাজ এ বিষয়ে উদাসীন—ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা পরিতৃপ্ত—রহস্য অনুসন্ধানের আগ্রহ বা সুযোগ অনেকের নাই। লেখকও এ বিষয়ে সর্বত্র যথোচিত অবহিত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এ অবস্থা কখনই কাম্য হইতে পারে না। ভাষার সারল্য, সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধির প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের আন্তরিক অনুরাগ ও সজাগ দৃষ্টি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের প্রধান অবলম্বন। তাই প্রত্যেকটি নূতন শব্দ বা নূতন প্রয়োগের ভাল-মন্দ বিচারের জন্য সকলকে যথা-সাধ্য যত্নবান্ হইতে হইবে। খোলা মনে বিচার করিলে অনেক ত্রুটি ধরা পড়িবে এবং অল্প আয়াসেই সেগুলির সংশোধন সম্ভবপর হইবে—ভাষা জড়তামুক্ত হইয়া সকলের সহজবোধ্য হইবে।

সর্বোদয়ের দৃষ্টি

দাদা ধর্মাধিকারী

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

এশিয়া সাবধান—বর্তমান সময়ে দুনিয়ায় দুইটি সম্প্রদায়-পীঠস্থান, একটি মস্কো, আর অপরটি ওয়াশিংটন। দুই গীর্জা। এক ক্রেমলিন, আর অপর ক্যাপিটল। একটির পুরোহিত জোসেফ ষ্টালিন, আর অপরটির হেরিস ট্রুম্যান। কিছুদিন যাবৎ এই দুই পীঠস্থান হইতে মানব-জাতির উদ্ধারের জন্য নূতন নূতন ঘোষণা ও নূতন নূতন আয়োজন বিজ্ঞাপিত হইতেছে। এদিকে ভেরী বাজে ত ওদিকে শঙ্খনিনাদ হয়। আর খানিকক্ষণ ধরিয়া নূতন নূতন ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হইতে থাকে।

এশিয়ার জন্য ব্যবস্থাপত্র: এদিকে কিছু দিন হইতে ট্রুম্যান নিজ তূর্য বেশ একটু জোরে বাজাইতেছেন। কিছু দিন আগে আমেরিকাবাসীদের তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাদের বন্দুক চাই, উপকরণ চাই, আর চাই মাখন। উপকরণ, হাতিয়ার আর মাখন! বড়ই বিচিত্র এই

সমাবেশ! উপকরণ এবং হাতিয়ারেরও স্নেহ-পদার্থ আবশ্যক হয়, কিন্তু যাহারা উপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র চালাইবে তাহাদের শরীরে যদি 'তাকত' না থাকে, তাহা হইলে দুই-ই ত বৃথা; তাই টু্ম্যান সাহেব বলিয়াছেন, মাখনও চাই। আমেরিকার জন্য ত তাঁহার ব্যবস্থাপত্র বা প্রেস্‌ক্রিপসন্‌ হইতেছে অস্ত্র, উপকরণ আর মাখন; কিন্তু প্রাচ্যের জন্য ব্যবস্থা একেবারেই আলাদা। এখানকার কথায় তিনি বলেন যে, এখানে লাঙ্গল চালান দরকার। কারণ প্রাচ্যের মুখ্য ব্যাধি হইতেছে বুভুক্ষা। তাই মহান্‌ উদারতার সহিত তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—প্রাচ্যে অন্নোৎপাদন বৃদ্ধি করার নিমিত্ত আমেরিকার উচিত হইবে টাকা-কড়ি বিজ্ঞান, এমন কি প্রতিষ্ঠা দিয়াও সহায়তা করা!

খুব সুন্দর চিত্তাকর্ষক কথা। কিন্তু প্রশ্ন এই, বস্তুতঃ ইহা কি কেবল নিরপেক্ষ উদারতাই? আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক স্রেফ পুণ্য ও আশীর্বাদ অর্জনের নিমিত্তই কি প্রাচ্যদেশসমূহের সহিত এই শুভ ব্যবহার করিতে চাহেন? অথবা এটা এমন একটা দানবীরতা যার পশ্চাতে কোন সম্প্রদায়গত অভিসন্ধি নিহিত রহিয়াছে?

বলদেবের নব অবতার: কথিত আছে, অতি প্রাচীন কালে, এই সৃষ্টি যখন বাল্যাবস্থায় ছিল, তখন টুয়ুবল কেন্‌ নামে এক কারিগর কেবল তলোয়ার আর তলোয়ার তৈয়ারি করিত। যখন সে দেখিল যে ঐ তরবারি দ্বারা লোকে মুলা-কাঁকুড়ের মত একে অন্যকে কাটিতেছে তখন তাহার অনুতাপ হইল, আর সে সর্বপ্রথম হল বানাইল। তদবধি মানুষ একে অন্যকে মারার পরিবর্তে জমি চাষ-আবাদ করিয়া পরস্পরকে খাওয়াইতে ও পোষণ করিতে লাগিল। কিন্তু টুয়ুবল কেন্‌ যে হল বানাইল—উহার এবংবিধ ব্যবহার তো সর্বত্র হইল না। শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই বলদেবের আয়ুধ হলই ছিল, কিন্তু সে হল দ্বারা তিনি ক্ষেত চাষ করিতেন না, মানুষের কলিজা চিরিতেন। আমাদের আশঙ্কা এই যে, ওয়াশিংটনের পুরোহিত এশিয়ার দেশগুলিতে যে হল চালাইতে চাহেন, তাহার পশ্চাতে বলদেবের মনোবৃত্তি লুকায়িত রহিয়াছে। তিনি তরবারিকে হলে রূপান্তরিত করিতে চাহেন না, বরং হলে তরবারির ভাবনা ভরিয়া দিতে চাহেন। আমেরিকায় সিপাহীদের মাখন খাওয়াইয়া তিনি বন্দুক চালাইবার জন্য পুষ্ট করিতে আর উপকরণ হইতে অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিতে চাহেন। প্রাচ্য দেশসমূহে জঠরাগ্নি ধক্‌ ধক্‌ করিতেছে। এখন তথায় হাতিয়ার ও সরঞ্জামে কাজ হইবে না। সেখানে আবশ্যক জঠরাগ্নিকে অন্নের আহুতি প্রদান/ অতএব টু্ম্যান এখানে বৈশ্বানরের হোম করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এশিয়াবাসীদের মধ্যে তিনি মস্কৌ-বিরোধী উন্মাদনা সৃষ্টি করিতে চাহেন। তিনি চাহেন যে, এখানে যে অন্ন উৎপাদন হইবে তাহা কম্যুনিজম বিরোধী ভাবনা দ্বারা অভিমন্ত্রিত হউক, তাহাতে ঐরূপ মাদকতা বৃদ্ধির শক্তি থাকুক।

পরশুরামের প্রক্রিয়া: মস্কৌতে গীর্জা রহিয়াছে, উহার প্রধান পুরোহিতও দুনিয়াকে কাস্তে ও হাতুড়ির প্রতীক দিয়াছিলেন, কিন্তু পরশুরামের পরশু যেমন গাছ কাটার পরিবর্তে ক্ষত্রিয় কাটিতে সুরু করে, এই কাস্তে এবং হাতুড়িতেও তেমনি লোকের গলা কাটার ও মাথা ভাঙ্গার ভাবনা ভরিয়া দেওয়া হইল। লোকে বলে ঔষধে যত বেশী ভাবনা ভরিয়া দেওয়া যায়, ততই তাহার গুণ—পোটেন্সী অথবা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। লোকে মনে করে কোদাল মাটি খুঁড়িবার হাতিয়ার, কৃষির একটি সাধারণ উপকরণ; কিন্তু সেই বেলচা-ই খাকসারদের হাতে পড়িয়া শস্ত্র বনিয়া যায়! আহুতিরূপে মনুষ্যের ব্যবহার চাই না!

কম্যুনিজমের গীর্জায় যে পুরোহিত ধূপ জ্বাল'ন, তিনি কৃষির ও শিল্পের যাবতীয় উপকরণকে অস্ত্রের কাজে লাগাইতে চাহেন, আর জনতন্ত্রের গীর্জায় জনতার মাঝে ধূপ দীপ নৈবেদ্যের আড়ম্বর প্রদর্শনকারী পুরোহিতও উৎপাদন এবং কারিগরী যাবতীয় উপকরণকে অস্ত্রশক্তির বিকাশ-রূপে ব্যবহার করিতে চাহেন। নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক সোমযজ্ঞের নিমিত্ত দুই সম্প্রদায়ের এই পুরোহিতেরা মাখনে আহুতির সঙ্গে মানুষের চর্বি আর মানুষকেও আহুতি দিবেন।

করজোড়ে আমাদের প্রার্থনা এই যে, সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া সংসারের গীর্জাদ্বয়ের এই প্রধান পুরোহিতেরা প্রাচ্যের মানুষদের যেন নিজ নিজ পরীক্ষাগারের খরগোস বা আপন আপন হোমশালার অজাপুত্র মনে না করেন। আমাদের নিবেদন এই যে, আমরা কাহারও আশ্রিত বা মুখাপেক্ষী হইয়া কুকুরের মত মরিতে চাই না, আর কুকুরের জীবন যাপন করিতে চাই না। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী—কিন্তু স্বয়ংতৃপ্ত নহে—মানব হিসাবে আমরা জগতের সাংস্কৃতিক প্রগতি ও সভ্যতার রক্ষাকার্য্যে পৌরুষের সহিত যোগদান করিতে চাই।

বাজারের মরপুরী: পুঁজিবাদী সভ্যতার সর্বাপেক্ষা বড় সংস্থা বাজার। বাজারে রহিয়াছে ছায়ার চঞ্চলতা ও মায়ার মাদকতা। মায়ার স্বরূপ বড় বড় বুদ্ধিবাদীরাও

নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পরাজিত হইয়া অন্তে তাঁহাদের এই কথাই বলিতে হইয়াছে যে মায়া অনির্বচনীয়। অর্থাৎ কেহই বলিতে পারে না যে উহা কি? মায়ার অপর লক্ষণ হইতেছে ধোঁকাবাজি, ছল-প্রপঞ্চ। মায়াসুরের অদ্ভুত ময়-সভায় দুর্যোধনের ন্যায় চতুর ব্যক্তিও জল এবং স্থলের পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। সংসারের সম্পত্তিবাদী ব্যবসায়ীরা বাজার নামধেয় যে পরম অদ্ভুত ধাঁধাগৃহ নির্মাণ করিয়াছে, তাহাতে ময়-সভার বিশেষত্বের সহিত চক্রব্যূহের দুর্গমতাও বিদ্যমান।

উপযোগিতা ও বিনিময়: বাজারে যে সকল জিনিষ আসে তাহাদের উপযোগিতার প্রশ্ন গৌণ হইয়া যায়। উপযোগিতার আগে বিনিময়ের কথা ভাবা হয়। বিনিময়ের অর্থ জিনিষের অদল-বদল। যে জিনিষের বদলে অপর জিনিষ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, বাজারে তাহার কদর হইয়া থাকে। অথবা অন্য কথায় বলিলে, যে বস্তুর জন্য অধিক হইতে অধিকতর মূল্য পাওয়া যায়, তাহার গুরুত্ব হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বাজারে উপযোগিতার মূল্য নহে, মূল্য বিনিময়ের।

আবশ্যকতা ও চাহিদা: অতএব বাজারে চাহিদার যতটা গুরুত্ব, বাস্তবিক আবশ্যকতার ততটা গুরুত্ব নাই। আবশ্যকতা এক জিনিষ, আর চাহিদা আর এক জিনিষ। কৃত্রিম উপায়ে আবশ্যকতা বাড়ান বা কমান যায় না, কিন্তু চাহিদার যোগাযোগ যুক্তি-কৌশলে করা যাইতে পারে। চাহিদার নিয়মন করিতে যে সকল লোক সিদ্ধহস্ত, তাহাদের মুদ্রা বাজারে চলিয়া থাকে।

ঘরে আর বাজারে: পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দ্রব্যের মূল্য স্রেফ্ বাজারেই নিরূপিত হইয়া থাকে। তাই বেচারী লক্ষ্মীতে পর্যন্ত চঞ্চলতার কলঙ্ক লাগিয়াছে। ঘরে যে সব বস্তু হয় তাহাদের নির্ধারিত উপযোগিতা থাকে, তাই তাহাদের মূল্যও নিশ্চিত এবং স্থায়ী হইয়া থাকে। ভাত, ডাল, দুধ, তরকারি, জামা, জুতা, লেপ, খাট-পালঙ্ক, বাসন-কোসন, লণ্ঠন ইত্যাদির উপযোগ ব্যবহার নিশ্চিত, আর তাহাদের উপযোগই তাহাদের মূল্য। তদ্রূপ সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, শিল্পকলা, সেলাই-ফোঁড়াই, জরির-কাজ এই সবেরই ব্যবহার ঘরে। বস্তু, কলা, বিদ্যা ও গুণ যতক্ষণ ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহাদের কুলীনতা, আর কুলীনতা হেতু তাহাদের মূল্য সুপ্রতিষ্ঠিত। বাজারে গেলেই চাহিদা অনুসারে রূপ, গুণ, কলা ও বিদ্যার মূল্যভেদ হইয়া থাকে।

দুই বিরোধী নীতি: আজ ত বাজারের কৃত্রিমতা চরম-সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাই বাজারের উঠ্‌তি-পড়্‌তি বুঝা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অতীত। দুইটি কথা বুঝা যায়। এক, যে জিনিষ যত বেশী আবশ্যক, সে জিনিষের উৎপাদন যদি কম হইয়া যায় ত তাহার দর চড়িয়া যায়। দ্বিতীয়, এই কথাও বুঝা যায় যে, যে জিনিষের আবশ্যকতা যত বেশী হইবে সে জিনিষ লোকের পক্ষে তত অনায়াসে সুলভ করা যায়। প্রথমোক্ত অবস্থাটি হইতেছে পুঁজিবাদী সংগঠনের দ্যোতক, যেখানে আবশ্যক বস্তুসমূহের মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে ও লোকের কষ্ট বাড়িতে থাকে। দ্বিতীয়টি মানবতার অর্থনীতি। এই নীতি অনুসারে যে জিনিষ যত বেশী দরকারী তাহা তত সুলভ হইয়া থাকে। বিধাতার ইহাই বিধান। জীবনরক্ষার জন্য বাতাস ও জল সর্বাধিক প্রয়োজন, অতএব এই দুই পদার্থ সর্বাপেক্ষা সুলভ এবং সস্তাও। হাওয়া ও জলের পরে অন্ন-বস্ত্রের স্থান। সুতরাং অন্ন-বস্ত্রও সুলভ এবং সস্তা হওয়া চাই। পরন্তু, আজ বাজারে দ্রব্যের ভাও যেভাবে বাড়ে ও কমে তাহাতে কোন নিয়মের ব্যবস্থা খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। আজিকার তেজিমন্দি কোনরূপ ব্যবস্থা-জনিত নহে, ব্যবস্থার অভাব-জনিত।

চাহিদা ও পূর্তির যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রণ: ব্যক্তি ও ব্যাপারীদের সঙ্ঘ নিজেদের ইচ্ছামত অথবা লাভের জন্য জিনিষের চাহিদার যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

কৃত্রিম উপায়ে চাহিদার যেরূপ নিয়ন্ত্রণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ পূর্তিরও নিয়ন্ত্রণ হইয়া থাকে। প্রয়োজনের সঙ্কোচন একটা সীমা পর্যন্ত করা যায়, কিন্তু তাহার যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নহে। চাহিদা ও পূর্তির যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে।

পরিস্থিতিগত বিরোধ: শহরে লোকে জিজ্ঞাসা করিত, "প্রয়োজনীয় জিনিষ কবে সস্তা হইবে? চাল, ডাল, কবে হইতে সস্তা দামে পাওয়া যাইবে?" প্রশ্নে তাহাদের উদ্বেগ ও বেদনা ফুটিয়া উঠিত। নেতাদের অনেকে তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "আমরা কি করিব? আমাদের হাতে শাসনভার আসিলে টাকায় পাঁচ-সের করিয়া চাল দিব।" এই সব নেতাই যখন গ্রামে যাইতেন, চাষীদের বলিতেন, "দেখিব, তোমাদের চাষ-আবাদে লাভ কেমন না হয়? চাল-গম, কার্পাস, আখ, চীনাবাদাম সব-কিছুর দাম বাড়িবে। কিষাণদের আমরা মরিতে দিতে পারি কি!" খরিদ্দারদের বলিতেন, "জিনিসপত্র তোমরা সস্তায় পাইবে।" এই অসঙ্গতির প্রতি কেহ যদি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত তো তাঁহারা বলিতেন, "ইহা তো সরকারের কাজ। আবশ্যক বস্তু বেশী দামে কিনিয়া কম দামে বিক্রয় করা সরকারের কর্তব্য।" ইহা দ্বারা সঙ্কট এড়ান যায়, কিন্তু সঙ্কটের কারণ দূর হয় না।

আট-দশ দিন পূর্বেও মজুর বলিত, "পয়সায় আমরা মজুরি চাই না। চালে-গমে চাই।" আজ তাহারা বলে, "চাল চাই না, পয়সা দাও।" ইহার অর্থ আদৌ এই নয় যে, চাল-গমের আবশ্যকতা কমিয়া গিয়াছে, আর পয়সার আবশ্যকতা বাড়িয়াছে।

বাজারেরই অন্ত হওয়া চাই : এই সব পরিস্থিতির পরিবর্তনের একটিই উপায় আছে, আর তাহা এই যে, ধীরে ধীরে বাজার নামক সংস্থার অন্ত হওয়া চাই। জিনিসের বিশেষ ডিপো থাকিবে ; প্রয়োজনমত জিনিস তথায় পাওয়া যাইবে। এখনও এবংবিধ ডিপো রহিয়াছে। ডাকঘরে টিকিট পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে কেহ দোকান বলে না। আজ গুরুত্ব বস্তুকে দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় পয়সাকে।

পয়সা মানদণ্ড, সম্পত্তি নহে : ওজনের বাটখারার মত, গজের মত, এবং থার্মোমিটরের মত, পয়সা যে মাপিবার উপায় মাত্র, নিজে সম্পত্তি নহে—ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। থার্মোমিটর আমাদের স্বাস্থ্য নহে, গজ কাপড় নহে, সেইরূপ পয়সা সম্পত্তি নহে।

আপনি আজ কোন মজুরকে সোনা লইতে বলুন, সে অস্বীকার করিবে। কিন্তু পয়সা দেন ত আগ্রহে লইবে, যদিও তাহাতে না আছে সোনা, আর না আছে বিস্তর চাঁদি। পয়সার নামে কাগজের টুকরা সে আগ্রহে লইবে। পয়সা নিজে উৎপাদনের উপকরণ নহে, আর ব্যবহারের উপকরণও নহে, তাই উহার উপযোগিতা কমে ও বাড়ে।

বস্তুর শাশ্বত মূল্য : বস্তুর আসল মান এইরূপ নহে। লবণ সব সময়েই নোন্তা, শর্করা সব সময়েই মিঠা। পাকা কলা এক আনায় যখন একটি তখনও মিঠা, আর আধলায় যখন একটি তখনও মিঠা। যেখানে আধ-পয়সায় একটি কলা মিলে, সস্তা বলিয়া সেখানকার কলা পান্‌সে লাগে না ; আর যেখানে পচা কলা আনায় বিক্রয় হয়, মাগ্‌গি বলিয়াই তাহা সেখানে ভাল নয়। কলা মিষ্টি লাগে, উপকারী, ইহাতেই তাহার মূল্য। দাম কমিলে বাড়িলে উহার গুণে পার্থক্য হয় না।

বিনোবার ইঙ্গিতের সারাংশ এই যে, মুদ্রা অপেক্ষা বস্তুর প্রতিষ্ঠা যখন বাড়িবে তখনই আর্থিক স্বাস্থ্য, আর্থিক ন্যায় ও আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। সোনা-রূপা, মণি-মাণিক্যের মূল্য কমাইয়া মাটির দাম বাড়াইবার যে অভিনব প্রক্রিয়া বিনোবা লোক-সমক্ষে ধরিয়াছেন, আর্থিক 'বিমোক্ষে'র দিক হইতে তাহা নির্ভুল সংকেত ও অমোঘ উপায়।

আমেরিকার অনুকম্পা-রাজ

মূলীভূত অভিযোগ : শ্রীমতী এলিনর রুজভেল্ট বলেন যে, কম্যুনিজমের প্রতিকার কেবল তলোয়ারেই নহে, পেটের অন্নেও হইতে পারে। ঠিক কথা বলিয়াছেন। তরবারি দ্বারা ত কেবল তরবারিরই সম্মুখীন হওয়া যায়। কোন মতবাদ বা বিচারকে তরবারি দিয়া বুঝা যায় না। প্রাচীনেরা কথায় কথায় বলিত যে, দৌলত, জমি, আর স্ত্রী, এই তিনটি পৃথিবীর যত ঝগড়ার মূলে। কথাটা বিলকুল ঠিক, কিন্তু অন্নের জন্য যত ঝগড়া-ফেসাদ, পাপ, গালাগালি, টানা-হেঁচড়া হয়, অন্য কিছুর জন্য তেমন হয় না। তার কারণ অন্ন, জীবনের প্রথম প্রয়োজন। প্রাথমিক আবশ্যকতার মধ্যেও উহার ক্রম ঠিক বাতাস ও জলের পরে। গিরিধর কবিরায়ের মতে রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধ স্ত্রীর জন্য হইয়াছিল, আর হোমারের মতে ট্রয়ের যুদ্ধও স্ত্রীর জন্যই ঘটিয়াছিল। কিন্তু সংসারে কম্যুনিজমের প্রাদুর্ভাব ত অন্নের প্রশ্ন লইয়াই হইয়াছে। অল্পসংখ্যক লোকে এত অন্ন পায় যে তাহাদের উদর মশকের মত ফুলিয়া উঠে আর উহাতে ঠাসিয়া ঠাসিয়া ভরার পরেও উদ্বৃত্ত থাকেই। পরন্তু সংসারে এমন লোকের সংখ্যাই অধিক, সারা দিন মেহনত করা সত্ত্বেও পেটের এক কোণ ভরাও যাহাদের পক্ষে কঠিন। বাসি ভাতও তাহাদের মিলে না। ইহাই মূলীভূত অভিযোগ।

মূল কথা : রুশের তরবারি হইতে আমেরিকার তরবারি যদি বড় হয়, এবং আমেরিকার সিপাহীরা রুশিয়ার সিপাহীদের অপেক্ষা অধিক মালাই-মাখন খাইতে পাইয়া থাকে ত আমেরিকার তরবারি রুশের তরবারিকে পরাস্ত করিয়া দিবে ; কিন্তু তাহাতে কম্যুনিজমের অবসান হইবে না। তাই আমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেন্টের পত্নী বলেন যে, পেটের ভাত দিয়া কম্যুনিজমের সম্মুখীন হইতে হইবে, আর বর্তমান প্রেসিডেন্ট বলেন যে, লাঙ্গল-মইয়ের দ্বারা তাহা রুখিতে হইবে। দুইয়ের একই অভিপ্রায়, উভয়েই মূলীভূত কথা বলিয়াছেন।

লোক-সংখ্যার প্রশ্নই আসল কথা : দুনিয়াতে এখন দুইটি প্রভুত্বপ্রয়াসী দল। উভয়েই যেন-তেন-প্রকারেণ সমগ্র পৃথিবীর উপর নিজ বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। রুশ হইতে আরম্ভ করিয়া জাপান পর্যন্ত ভূখণ্ডকে পূর্বজগৎ বলা হয়, আর রুশিয়া বাদে সমস্ত ইউরোপ ও আমেরিকা যে ভাগে পড়ে তাহাকে পশ্চিম গোলার্ধ বলা হয়। এই পশ্চিম গোলার্ধে বিজ্ঞানের প্রগতি হইয়াছে এবং জীবনধারণের এক বিশিষ্ট ঢং বা স্তর তথায় স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। দৈহিক সুখের এক পর্যাপ্ত উচ্চ আদর্শে সেখানকার লোকে পৌঁছিয়াছে। ঐ আদর্শ সংরক্ষণার্থে তাহারা নিয়বচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক উপায় দ্বারা লোক-

সংখ্যার বৃদ্ধি অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তাই তাহাদের মধ্যে এই বিশ্বাস দানা বাঁধিতেছে যে, আমরা যদি নিজেদের লোকসংখ্যা বেহিসাবে বাড়িতে না দিই ত আমরা বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিব।

কিন্তু রুশিয়া ও রুশিয়ার পূর্ব দিকের দেশগুলিতে লোক বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকসংখ্যা যদি এইরূপে বাড়িতে থাকে তবে পূর্ব গোলার্ধের লোকের হাতে অন্নোৎপাদনের জন্য পর্যন্ত পর্যাপ্ত ভূমি থাকিবে না। অন্নাভাব ত আজই অনুভূত হইতেছে। পৃথিবী দিন দিন সঙ্কুচিত হইতেছে। কোন দেশ একলা আলাদা থাকিতে পারিতেছে না। আমেরিকার মতই মানবজাতিকে বাঁচাইবার আগ্রহে আগ্রহান্বিত রাষ্ট্র পাশে থাকিয়া নিশ্চয়ই তামাশা দেখিতে পারে না।

বিপদের চিকিৎসা : পরিণাম এই হইবে যে, প্রাচ্যে অন্নহীনের সংখ্যা বাড়িয়া চলিবে, আর পাশ্চাত্ত্যকে, বিশেষতঃ আমেরিকাকে, তাহাদের পেটের খোরাকের কথা ভাবিতে হইবে। ইহা সুস্পষ্ট যে, আজ ইউরোপ ও আমেরিকা যেরূপ ঠাটেবাটে থাকিতে পারিতেছে, তাহাতে কাটছাট করিতে হইবে।

এ বিপত্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার দুইটি উপায় আছে। এক, লোকসংখ্যা এখন যাতে না বাড়ে, আর দুই, অন্ন সম্বন্ধে এশিয়ার লোক পুরাপুরি আত্মনির্ভরশীল হইয়া যায়। ইতিমধ্যেই আমেরিকা এই দুই দিকে চেষ্টা সুরু করিয়াছে। ভারতে পরিবার-নিয়ন্ত্রণ ও সন্ততি-নিরোধকে তাহারা যথাসাধ্য উৎসাহ দিতেছে, এবং ভারতে অন্নোৎপাদন যাহাতে বাড়ে সেদিকে প্রাণপণ সাহায্য করিতে চাহিতেছে।

ক্ষমতাবাদী রাজনীতির পরিণাম : এই উভয় উপায় সর্বথা বাঞ্ছনীয় আর আবশ্যকও। কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে যে, আমাদের উৎপাদন ও পরিবার-নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম যেন—জাগতিক প্রভুত্বের নিমিত্ত এই সময়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাদের কাহারও চালের অঙ্গ না হইয়া যায়। ক্ষমতাবাদকে ইংরেজীতে 'পাওয়ার পলিটিক্স' বলা হয়। 'পাওয়ার' শব্দের এক অর্থ 'ক্ষমতা', আর অপর অর্থ 'শক্তি'। এই অর্থে আমরা উহার ব্যবহার হর্স-পাওয়ার (অশ্বশক্তি) রূপ শব্দে করিয়া থাকি। ক্ষমতার রাজনীতিতে মনুষ্যের ব্যক্তিত্বের, তাহার সংস্কৃতির এবং তাহার চরিত্রের কোন মর্যাদা নাই। উহাতে তাহার বিচার কেবল 'ম্যান-পাওয়ারে'র এক 'ইউনিট'—মনুষ্যশক্তির এক একক—হিসাবেই হইয়া থাকে। যুদ্ধে শস্ত্র আর সাধারণ সৈনিকের মধ্যে বড় বিশেষ পার্থক্য করা হয় না। পুঁজিবাদী অর্থ-বিধানে অকুশল মানুষে আর উপকরণে বিশেষ বিচার-ব্যবধান করার প্রয়োজনীতা উপলব্ধ হয় না। তদ্রূপ ক্ষমতাবাদী রাজনীতিতে মনুষ্যকে ব্যক্তি হিসাবে কোন মর্যাদা দেওয়া হয় না। তাহাকে কেবল শক্তির এক একক মনে করা হয়।

প্রভুত্ববাদ আর চলিবে না : আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা ও অন্নে দ্রুত স্বাবলম্বী হওয়া এখন ভারতের পক্ষে অনিবার্য—প্রয়োজন। দুনিয়াতে আমাদের নিজ শক্তিতেই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কিন্তু সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ও অপর সকলকে নিজেদের সুখের ভাগী করিয়া। অতএব আমরা সংশয়াত্মার ভূমিকা গ্রহণ করিব না। সকলকে অবিশ্বাস ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিব না। নিরপেক্ষ ভাবে সহায়তা যে করিবে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিব। কিন্তু আমরা এই আশা ও প্রার্থনা করিব যে, পুরাতন সাম্প্রদায়িক প্রচারকদের ন্যায় কেহ যেন এখন মুষ্টি মুষ্টি ভাত ছড়াইয়া মানুষকে প্রভুত্ববাদের উপকরণে পরিণত করার আসুরী লালসা না পোষণ করেন।

আমাদের পক্ষে আত্মমর্যাদার ও আত্মোদ্ধারের একটিই মাত্র পন্থা। নিজেদের সমস্ত সৃজনমূলক প্রতিভার ও সংগঠনী কৌশলের সমাবেশ করিয়া অধিক উৎপাদন ও নির্মাণকার্যে একান্ত অভিনিবেশে আমাদের প্রবৃত্ত হইতে হইবে।*

* 'সর্বোদয়ে'র সৌজন্যে।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কি ক্ষণেই বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা ক'টি উচ্চারণ করেছিলেন, 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি'। যতই আমরা নিজেদের কথা আলোচনা করি ততই এর যাথার্থ্য আমাদের উপলব্ধি হয়। গত এক শ' বছরের ভিতর বাংলায় যে-সব মনীষী কবি সাহিত্যিক যশের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁদের ক'জনের খবর আমরা রাখি? অথচ আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মে তাঁরা কতই না রসদ জুগিয়েছেন। এইরূপ এক জনের কথা এখানে আলোচনা করা যাক।

কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ১৩৫৫ সনের ২২শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী ১৯৪৯) ইহধাম থেকে চলে গেছেন। তখন তাঁর পরিণত বয়স। জ্ঞানে গুণেও তিনি পরিণতিলাভ করেছিলেন। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল সাহিত্য-সেবা করে তিনি বাংলা ও বাঙালীর কতই না হিতসাধন করেছেন! এ যুগের অনেকে তাঁকে হয়ত জানে না—পরিণত বয়সে তিনি অবসর জীবনই যাপন করছিলেন। কিন্তু এমন এক দিন ছিল যখন প্রমথনাথের বৈঠকখানায় সাহিত্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, দেবকুমার, সুরেশ সমাজপতি, জলধর সেন প্রায়ই যোগ দিতেন। আরও কত খ্যাত-অখ্যাত লোক আনাগোনা করতেন তার কি ইয়ত্তা আছে? জলধর সেন লিখেছেন:

"বড় ভাই প্রমথবাবু কবি ও সাহিত্যিক, ; ভাই মন্মথবাবু তখন সাহিত্যিক এবং রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের উপযুক্ত শিষ্য।...

"তাদের বীডন স্ট্রীটের বাড়ীতে এক বৈঠকখানায় সাহিত্যিকদের বৈঠক বসত—সেখানে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমার প্রমুখ বড় বড় কবি ও সাহিত্যিক প্রতিদি. আড্ডা দিতেন—নানা বিষয়ের আলোচনা হ'ত। আর সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার আর এক প্রান্তে মন্মথবাবুর মজলিস্ বসত।...

"আমার এই দুই মজলিশে নিশবারই হাতপত্র ছিল।..."*

ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইলের অন্তর্গত সন্তোষ এক বিখ্যাত জমিদার-পরিবারের বাসভূমি। এই পরিবারে প্রমথনাথ ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দ্বারকানাথ, মাতা বিন্দুবাসিনী। প্রমথনাথের শৈশবেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁর এবং তাঁর অনুজের প্রতিপালনের ভার পড়ল বিন্দুবাসিনীর উপর। বিন্দুবাসিনীর নাম সে যুগে কে না জানত? জমিদারী পরিচালনে সে সময়ে যে ক'জন বুদ্ধিমতী বঙ্গমহিলা খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিন্দুবাসিনী অন্যতমা। দানশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা রূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর। তিনি টাঙ্গাইলে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, দেব-মন্দির, অতিথি-শালা প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িত্রী। বাংলার উন্নতি শুধু একটি কি দুটি শহর বা গ্রামের উন্নতির মধ্যেই নিবদ্ধ রাখলে চলবে না; বাংলার উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম দূর-দূরান্তের সকল অঞ্চলের উন্নতি হলেই তবে তাকে বাংলার যথার্থ উন্নয়ন বলা চলে। তাই দেখি সে যুগে কলকাতায় ভিড় না করে, সত্যকার স্বদেশহিতৈষী নরনারী নিজ নিজ অঞ্চলে থেকেই স্বদেশবাসীর হিতকর্ম্মে রত থাকতেন। বিন্দুবাসিনীও এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিন্দুবাসিনীর সার্থক শিক্ষায় প্রমথনাথও পল্লীর মধ্যেই বঙ্গজননীর প্রাণসত্তার স্পর্শ পেয়েছিলেন। তাই তিনি শুধু জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণেই নয়, চিন্তা ও কর্ম্মের ভিতর দিয়েও দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষা পল্লীমায়ের কোলে বসেই তাঁর হয়েছিল। সাহিত্যানুরাগী গৃহশিক্ষকের সংস্পর্শে এসে তাঁর মধ্যে সাহিত্যপ্রীতির সূচনা হয়। গণিতে তিনি ছিলেন খুবই কাঁচা। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তিনি বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। কিন্তু তাতে তাঁর সাহিত্যসেবায় এতটুকু ব্যাঘাত হওয়া তো দূরের কথা, এ বিষয়ে তিনি যেন আরও বেশী করে তৎপর হয়েছিলেন। প্রমথনাথ লিখেছেন:

"কৈশোরে বঙ্কিমের আদর্শগুলি আমার কল্পনাজগতে ছবির পর ছবি আঁকিয়া আমাকে এক লোকাতীত মায়ারাজ্যে লইয়া যাইত...। আমার স্মরণ আছে, বঙ্কিম পড়িয়াই আমার মনে স্বজাতি ও স্বদে..ের প্রতি অনুরাগ জাগিয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় বিলাসিতা ও আচার-পদ্ধতির উপর বিরাগ জন্মে।"

বস্তুতঃ স্বদেশী যুগে যাঁরা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। প্রমথনাথ আসলে কবি, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনকালে তিনি বিপুল উৎসাহ নিয়ে এর মধ্যেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কবি-মন এর ভিতরে

---

* 'স্মৃতি-তর্পণ'—ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৫৩

যেন আকৈশোর-পোষিত বঙ্গজননীর একটি সুষ্ঠু রূপ প্রত্যক্ষ করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনকালে তাঁর রচিত গানগুলি দেশবাসী আপামর সাধারণের কতই না আশা-উদ্দীপনা জাগরিত করিত। এই গানগুলি আমাদের জাতীয় সাহিত্যে কি উচ্চ স্থানই না অধিকার করেছে। দু'একটির থেকে দু'এক স্তবক মাত্র এখানে উদ্ধৃত করি। 'বঙ্গ-বন্দনা'য়—

'নমঃ বঙ্গভূমি, শ্যামাঙ্গিনী,
জননী, যুগে যুগে পতিত-পালিনী।
দূর নীলাম্বর-প্রান্ত সনে নীলিমা তব, মা, মিশিছে রঙ্গে,
রূপসী প্রেয়সী চিত্ত-হারিণী।"

আর একটি গানে:

'তুই মা মোদের জগত-আলো।
সুখে দুখে হাসিমুখে
আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো।
মা ব'লে, মা, ডাকলে তোরে,
সারাটি প্রাণ ওঠে ভ'রে,
বেসেছি, মা তোরেই ভাল,
তোরেই যেন বাসি ভালো।

আবার, আর একটি সঙ্গীতে:

"শুভ দিনে শুভ ক্ষণে গাহ আজি জয়,
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয়।
জয় জয় জয়, মাতৃভূমির জয়।
পুণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয়।
লক্ষ মুখে ঐক্য গাথা রটাও জগৎ ময়।"

বঙ্গ-সন্তানদের প্রাণে দেশভক্তি উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে কতই না বল সঞ্চার করত এই গানগুলি। এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গীত রচনার কথাও কিছু বলা যাক। প্রমথনাথ গান রচনা করতেন, গানে সুর দিতেন; একথা হয়ত অনেকে জানেন না যে, তিনি সুগায়কও ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতে সুরসম্রাট রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হয়ে যেতেন। প্রমথনাথের 'আগমনী'—'এসেছ তুমি এসেছ, কমলার বেশে আজি'; আবার, 'পল্লীলক্ষ্মী'র 'রূপসী পল্লীবাসিনী, শূন্য ঘাটে কেন একাকিনী সুহাসিনী' তাঁর অগোচরে রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে সুর শিখে নিয়ে তবে ছাড়লেন। 'গান' পুস্তকের প্রত্যেক গানটিতেই প্রমথনাথ নিজে স্বরলিপি জুড়ে দিয়ে ছাপিয়েছিলেন।

প্রমথনাথের সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধেও এখন কিছু বলা যাক। প্রমথনাথ ছিলেন খাঁটি বাঙালী কবি; তাঁর কবিতায় বাংলার অতি তুচ্ছ জিনিসটুকুও—ধূলিকণা পর্য্যন্ত সুন্দর সৌষ্ঠবপূর্ণ হয়ে উঠত। তিনি দীর্ঘকাল কাব্য-লক্ষ্মীর আরাধনায় লিপ্ত থেকে বহু কবিতা ও কাব্য এবং নাটক রচনা করেছিলেন। এর কাব্য অংশ জলধর সেনের সম্পাদনায় ১৩২২ ও '২৩ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে রয়েছে প্রমথনাথের পদ্মা, যমুনা, গীতি ও গীতিকা; দ্বিতীয় খণ্ডে—গৌরাঙ্গ, গল্প, গাথা, আখ্যায়িকা, চিত্র ও

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

চরিত্র; আর তৃতীয় খণ্ডে—কবিতা, পাথেয়, পাষাণ, পাথার, গৈরিক, গান (স্বরলিপি সমেত)। তিন খণ্ডের ভূমিকাতেই সুযোগ্য সম্পাদক প্রমথনাথের কাব্য আলোচনা করে এর ভিতরকার মূল সুরটি ধরিয়ে দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন:

"সব বড় কবির মত প্রমথনাথের একটা 'মিশন' আছে। তাঁহার সমস্ত কাব্য, নাটক ও অন্যান্য রচনা পাঠ করিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে, তিনি মানবপূজার কবি। তিনি নরে নারায়ণ দেখেন, লোক-সেবাই তাঁর কাছে দেব-পূজা। তাঁহার কল্পিত মানব

'দিবে বিশ্বহিতে হোমে আত্ম বলিদান',
(নবগান,—'গীতিকা')

'বড় হয় মানবের মানব জীবন
আগে সবে বিশ্ব মধ্য মাঝে।'

আবার বলিতেছেন:

'অনন্ত কল্যাণময় লোকহিত ব্রত
মহা গর্ব্বে বহি চলে শিরে।'
(জীবন মাধুরী—'গীতিকা')

তাঁহার আধুনিক কাব্য ও নাটকে এই লোকপ্রীতি উজ্জ্বলতর হইয়া নানাভাবে আকার লাভ করিয়াছে।"

দ্বিতীয় খণ্ডে, "গৌরাঙ্গ" মহাকাব্য সম্বন্ধে জলধর বলেছেন যে, এর 'key-note' বা মূল ভাব হ'ল "ভক্তি যার ভরভিত্তি প্রেম যার প্রাণ।" কবি দ্বিজেন্দ্রলাল খানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তিনি 'নব-প্রভা' নামক মাসিকে (ভাদ্র-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ১৩১০) 'গৌরাঙ্গ' মহাকাব্যের বিস্তৃত আলোচনা আরম্ভ করেন। ইহার প্রথম সর্গের শেষ কয়েক চরণ এই :

"হায় শচী, হায় মাতা পুত্র গরবিণী,
সে দিন অলক্ষ্যে বসি' ঘুরাইল কাল
যে ভাবে নিয়তি চক্র, তাহার হাবায়
তোমার স্নেহের শশী হ'ল অস্তমিত ;
জগতের ভাগ্য-রবি উদিল নীরবে।" (১ম সর্গ, পৃ. ৩৫)

প্রমথনাথ নাটক-রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বঙ্কিম চন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'রাজসিংহ'কে তিনি নাট্যরূপ দেন। এ ছাড়া তাঁর মৌলিক রচনা—'ভারতচন্দ্র', 'জয়-পরাজয়', 'চিতোরোদ্ধার', 'দিল্লী-অধিকার' নাটক এবং 'আক্কেল সেলামী' প্রহসন থিয়েটারে অভিনীত হয়ে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করে। তাঁর মতে "নাটকের প্রকৃত মর্মকথা মানবপ্রকৃতি উদ্ঘাটন করিয়া মানবপ্রকৃতিতে অজ্ঞাতে সরস সম্ভাবরাশি সঞ্চারিত করা।"

শেষে তাঁর কবিতা থেকে এই চরণ ক'টি উদ্ধৃত করে আজকার স্মৃতি-তর্পণ সাঙ্গ করব—

"ও বাঙালী আমি তোদের ভাই,
বাংলা আমার জনম মরণ ঠাঁই,
হয় যদি মোর এই দণ্ডে মরণ,
নিয়ে যাব জাতির কীর্ত্তি স্মরণ,
তোদের পায়ের ধূলা অঙ্গে মেখে
সুখে মরব তোদের বাঁচতে দেখে।"*

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিও—কলিকাতা কেন্দ্রে কথিত ও রেডিও-কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

চৌধুরী মশাই

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

চিন্তাহরণবাবুর সহিত চায়ের দোকানেই আলাপ। আমাদের নিয়মিত আড্ডাস্থল আমার এক বন্ধুর চায়ের দোকানটিতে। সকাল সাতটা হইতে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত দোকানে, শেষের একখানি বেঞ্চি ও একটি টেবিলকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের আড্ডা চলিতে থাকে। আড্ডায় পৃথিবীর যাবতীয় জটিল ও সহজ তত্ত্বের আলোচনা হয়। সাময়িক ঘটনা হইতে সুরু করিয়া পৃথিবীর রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা চলিতে চলিতে প্রায় বেলা বারটার সময় প্রাতঃকালীন আড্ডা মুলতুবি রাখিয়া স্নান-আহারের জন্য নিজ নিজ বাড়ী গিয়া পিতামাতাকে ধন্য করি। তার পর সুদীর্ঘ দিবানিদ্রা। বৈকালে ফুটবলের মাঠ ও সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কোন বন্ধুর বাড়ীতে তাসের আড্ডায় মাতিয়া থাকি। ঠিক জলস্রোতের মত সময় চলিতে থাকে। ইহাতে আমরা বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত নই। সময় তো যাইবেই, কদাচ বসিয়া থাকিবে না। অতএব উপস্থিত যখন আমাদের খাওয়া-পরার কোন অসুবিধা নাই, তখন স্রেফ্ আড্ডা দিয়া জীবনটা পুরোপুরি সার্থক করিয়া লই না কেন? এইরূপ আড্ডার মাঝেই চিন্তাহরণবাবুকে আবিষ্কার করা গেল। প্রায়ই দেখিতাম, এক জন সুবেশ ভদ্রলোক সম্মুখে এক কাপ চা রাখিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে একমনে আমাদের আলোচনা শুনিতেছেন; কখনও বা তাঁহার মুখে হাসির সামান্য রেখা বা আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার কখনও বেশ নির্লিপ্তভাবেই আলোচনা শুনিয়া যাইতেছেন। কিন্তু বেশী দিন নয়—হঠাৎ এক দিন ভদ্রলোক নিজ হইতেই ধরা দিলেন। আমাদের আড্ডা জমিতেই তিনি উঠিয়া আমাদের কাছে আসিয়া পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া বলিলেন—আমায় আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন। আপনাদের সঙ্গে একটু আলাপ না করে থাকতে পারলাম না। আপনাদের আলোচনা আমি রোজই শুনে থাকি, আমি নিজে একটু আড্ডাবাজ গাল্পিক লোক। আড্ডা দিতে পেলে বর্তে যাই। নিন্ সিগারেট ধরান্—।

এইদিন আড্ডাটি বেশ জমিয়া উঠিল। যাতা দুই ঘণ্টা, চৌধুরী মশাই নানা বিষয়ে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ঘটনাগুলোকে যেরূপ মুখরোচকভাবে আমাদের সম্মুখে হাজির করিলেন তাহাতে আমরা পরম বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কথার ভিতর এমন যাদু ও মধু থাকিতে পারে, তাহা কখনই কল্পনা করি নাই। কিন্তু একটা সন্দেহ বার বার মনে উঁকি মারিতে লাগিল। লোকটির এই গায়ে-পড়া ভাবটার আসল উদ্দেশ্য কি? সম্ভবতঃ কোন বীমা-কোম্পানীর দালাল। তা হোক উহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমাদের মধ্যে কেহই

মোটা খাঁয়া করিবার মত নয়েন মকেল নহি। কিন্তু আর একটি সন্দেহ মনে জাগিল। লোকটা কোন গোয়েন্দা নয় ত? তাহা হইলেই কিন্তু সর্ব্বনাশ। মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম। মাসকয়েক পূর্ব্বে আমাদের পাড়াতেই একটি ছেলেকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই ছেলেটি পাড়ার লাইব্রেরীতে যাতায়াত করিত, পড়িবার জন্য বইপত্র আনিত। তাহার সহিত কালেভদ্রে দুই-একটি কথা হইত এই পর্য্যন্ত। কিন্তু কোনরূপ অন্তরঙ্গতা আমাদের সহিত ছিল না। লাইব্রেরীতে অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে কিছু কিছু জাতীয় সাহিত্য ছিল। কিন্তু আমরা কোনদিনই সেই সব পুস্তক স্পর্শও করি নাই। লাইব্রেরীতে যে ক'খানি মোহন-সিরিজ, রহস্যলহরী সিরিজের বই ছিল, তাহাই পড়িতাম। 'স্বদেশী' পুস্তকের ধার দিয়াও যাইতাম না। কিন্তু কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। হইলও তাহাই। পুলিস তাহাকে ধরিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরীর যাবতীয় বই ঘাঁটিয়া তছনছ করিয়া কয়খানি পুস্তক বগলদাবা করিয়া চলিয়া গেল। শুনিলাম বইগুলি নাকি ভারি সাংঘাতিক—বোমা, বন্দুকের তুল্য ভীষণতম। মনে মনে ভাবিলাম, পুলিস লইয়া গিয়াছে, বেশ সৎকার্য্যই করিয়াছে। নতুবা দৈবাৎ লাইব্রেরীর মধ্যে পুস্তকগুলির বিস্ফোরণ হইলে নিশ্চয়ই সাংঘাতিক ঘটনাই ঘটিত। শুধু পুস্তকগুলি লইয়াই পুলিস ক্ষান্ত হইল না, লাইব্রেরীর যাবতীয় সভ্য, লাইব্রেরিয়ান সকলকেই টানিল। কয়দিন কি হয়রানি না হইতে হইল। অবশেষে বহু কষ্টে ফাঁড়া কাটিল। সেই হইতে কোন দিন আর লাইব্রেরী-মুখো হই না। আমরা আড্ডাস্থলে রাজা-উজীর মারিতে মারিতে বে-মক্কা বহু কথাই বলিয়া ফেলি। মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, আজ আড্ডায় কি পরিমাণ গুল ছাড়িয়াছি—কিন্তু না সবই বৃথা। একটা কথাও স্মরণে আসিল না। ঘুঁচুকে আমার সন্দেহের কথা বলিলাম

ঘুঁচু একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া, ধোঁয়ার রিং করিতে করিতে বলিল, পাগল—ও গোয়েন্দা না হাতি—। তবে বলিলাম ঐ দালাল-টালাল হবে বা—

বলিলাম—নাঃ কাজের কথা নয়। সন্দেহটা ঘুচিয়ে নিতে হবে। বাব্বাঃ যে হয়রানি হতে হয়েছিল। রাতে ঘুম নেই; খেয়ে, শুয়ে, বসে কিছুতেই সুখ ছিল না। এর মধ্যে সব ভুলে মেরে দিলি—ঘুঁচু নিবিষ্টচিত্তে সিগারেট টানিতে বলিল, তুই বড্ড ভয়তরাসে- সে তবে খোঁজই নে—। আমার সন্দেহের কথাটা চাপা রহিল না। আড্ডার সকলেই জানিতে পারিল এবং আমরা সকলেই খোঁজখবর লইতে লাগিলাম। খোঁজ লইয়া জানিলাম—নাঃ সন্দেহের কোন কারণ নাই। তবে ভদ্রলোক ঐ রকম কোন দালালী-টালালী করিয়া থাকেন। অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চা লইয়া স্টেশনের ধারে ভাড়া-বাড়ীতে বাস করেন। আমাদের দেহে ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল।

আমাদের আড্ডা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। চিত্তহরণ বাবুকে সংক্ষেপে আমরা চৌধুরী মশাই বলিয়া থাকি। এখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, সকাল-সন্ধ্যা চৌধুরী মশাই আড্ডায় না আসিলে আড্ডা জমিতে চায় না। আড্ডাতে চা ও সিগারেটের খরচ আমাদেরই। সেই যে প্রথম দিন চৌধুরী মশাই এক প্যাকেট সিগারেট বাহির করিয়াছিলেন, তার পর আর কোন দিনই তার পকেট হইতে একটাও সিগারেট বাহির হয় নাই। শুধু সিগারেট কেন, চা, পান, বিড়ি এমন কি মদ পর্য্যন্ত ওঁর দিব্যি সমানে চলিয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত সবই পরের পকেট হইতে। বিড়ি, মদ প্রভৃতি কিছুতেই ওঁর অনিচ্ছা বা অরুচি দেখি না। সমানভাবে গল্প করিতে করিতে আমাদের যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়া দেন। আমরা ওঁর বিস্তৃত বিদ্যাবুদ্ধিতে এবং ওঁর মুখে জগতের বহু তত্ত্বের সংবাদ জানিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া যাই। ভদ্রলোকের সব কিছু যেন নখদর্পণে। মনে হয় জীবনে উনি বহু দেশ দেখিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের নর-নারীর বহু বিচিত্র জীবন-যাত্রার প্রণালী, আচার-ব্যবহার সবই যেন ওঁর পরিচিত। রাঙ্গালু ও ভাঙা তাস! দৃষ্টিতে যেন উনি কিছুই দেখেন না। সমস্ত-কিছুকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সত্যাসত্য ভালরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। সেদিন আড্ডাতে সঙ্গীত সম্বন্ধে কথা উঠিল। আধুনিক গান ও গায়কদের কথা হইতে হইতে সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হইল। কিন্তু এই আলোচনাকে সঙ্গীত সম্বন্ধে নিখুঁত ঐতিহাসিক আলোচনা বলিলে বাড়াইয়া বলা হয়, কেননা সঙ্গীত বিদ্যায় যেমন আমরা ওস্তাদ, সঙ্গীতের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

ঘুঁচু বলিল, তোরা জানিস খালি সিনেমার গান। ও গানগুলো শুনে শুনে, কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ওসব গান আবার গান নাকি। জানিস মিয়া তানসেনের গানে বৃষ্টি নামত, আগুন জ্বলত—পাথর পর্য্যন্ত গলে যেত—

বলিলাম—হাঁ, 'তানসেন' বইয়ে তাই দেখেছি বটে। হবেও বা—

চৌধুরী মশাই, আমাদের এই অবিশ্বাসের সুরটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, জানেন, আমি তানসেনকে দেখেছি। মিথ্যে নয়—সঙ্গীত জগতে সবই সম্ভব। আমরা একযোগে সবিস্ময়ে বলিলাম, বলেন কি চৌধুরী মশাই। আকবর বাদশার সভাগায়ক মিয়া তানসেনকে দেখেছেন। এ যে তাজ্জব বাৎ—

—না। তাঁকে ঠিক নয়। ইনি দ্বিতীয় তানসেন। এক-বার ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়েছিলাম মাণ্ডুতে। মাণ্ডুটা হচ্ছে

কোথায় জানেন? জানেন না—আজকে যাকে আমরা ধার-রাজ্য বলি—এককালে যার নাম ছিল মালব। সেখানে কেন গিয়েছিলাম, তা আর নাই বললাম। ধরে নিন দেশ-ভ্রমণের জন্যেই ওখানে দৈবাৎ গিয়ে পড়েছিলাম। দ্বিতীয় তানসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, যে স্থানে সেটা মাণ্ডু শহর থেকে দশ ক্রোশ দূরে। পথ ভুলে এক নিবিড় বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আর বেরুতে পারিনে, এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে গেল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে সমস্ত শরীর অবসন্ন। বার বার মনে হতে লাগল, এই বুঝি ভিরমি লেগে মাটিতে পড়ে যাই। কিন্তু অতদূর আর হ'ল না। কিন্তু আর চলতে না পেরে, একটা গাছের তলায় বসে পড়লাম। রাত তখন অনেকটা হয়েছে। ভাবছি বনের ভেতর এই তলায় থাকলে নির্ঘাৎ বাঘের পেটে যেতে হবে। তাই সঙ্কল্প করলাম, প্রাণটা বাঁচাবার জন্যে একবার চেষ্টা চরিত্তির করে কোন মতে এই গাছটার ওপর উঠে রাত কাটাব। কিন্তু শরীর তখন এত অবসন্ন যে, গাছে উঠবার আর কোন শক্তিই নেই।

ভেবে দেখুন ব্যাপারখানা। অপরিচিত জায়গা—সমস্ত দিন হেঁটে হেঁটে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, তার ওপর এই ভীষণ নির্জ্জন বন। শীতে শরীর তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। হাত পা ক্রমশ: যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল। ভাবলাম, এই বুঝি সব শেষ হয়ে যায়। হঠাৎ আমার কান দুটোকে বিশ্বাস করতে না পেরে, আরও অবাক হয়ে গেলাম। মনে হ'ল কে যেন কোথায়, তারের বাজনা বাজাচ্ছে। তারের বাজনার সে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার, সেই শীতের নিস্তব্ধ রাত্রে, ঐ ভয়াবহ জঙ্গলে, কি ভাবে আমাকে মোহাবিষ্ট করেছিল তা এই দিনের আলোয়, শহরের চায়ের দোকানে বসে বর্ণনা করা খুব কঠিন। যাই হোক, আমি সবকিছুকে ঠেলে ঠুলে উঠে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি? কোথা হতে এই অপূর্ব্ব বাজনার ঝঙ্কার ভেসে আসছে, এ আমার দেখতেই হবে। মনে মনে ভাবলাম, এই গভীর জঙ্গলে, মানুষ ত কখ্খনো নয়—নিশ্চয়ই কোন পরীটরী এই নির্জ্জন রাতে, গানের আসর বসিয়েছে। যাই হোক, মরি আর বাঁচি এই বাজনার স্থান দেখে আসতেই হবে। আমি উঠে দাঁড়ালাম, অন্ধকার আর কাঁটা ঝোপঝাড় ঠেলে চলতে সুরু করলাম। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই মনে হতে লাগল, এই বুঝি কোন বাঘ, ভালুক কিংবা দাঁতাল হাতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। ক্রমশ: বাজনার শব্দ যেন আরও স্পষ্ট শুনতে পেলাম। এতক্ষণে চাঁদ উঠেছে, সমস্ত গাছপালার ওপর চাঁদের কিরণ পড়েছে, তাতে মনে হচ্ছে একখানা সাদা পাতলা চাদরে যেন গাছপালাকে কে মুড়ে দিয়েছে। গাছের পাতা থেকে টুপ টুপ করে কোঁটা কোঁটা শিশির ঝরে পড়ছে। হঠাৎ একটা মোড় ঘুরতেই, আমি অবাক হয়ে গেলাম। তাজ্জব ব্যাপার—এ নিজের চোখে না দেখলে, বিশ্বাস করতেই পারতাম না। অপরের কাছে, কথাটা শুনলে ভাবতাম, লোকটা গল্প করছে। কিন্তু নিজের চোখে দেখেও, নিজ দুটো চোখকে বিশ্বাস করতে পর্য্যন্ত পারলাম না। ভাবলাম, চোখের ভুল নাকি?

এইবার চৌধুরী থামিলেন। আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। চায়ে চুমুক দিয়া, ধীরে সুস্থে সিগারেটে টান দিয়া, চৌধুরী নিমীলিত চক্ষে চুপ করিয়া রহিলেন। আমরা বলিলাম—তার পর—

চৌধুরী মশায় আরম্ভ করিলেন, দেখলাম, অনেকখানি ফরসা জায়গা—আর প্রকাণ্ড একটা গাছের তলায় একজন সন্ন্যাসী, তারের একটা যন্ত্র বাজাচ্ছেন—আর গান করছেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে ঘিরে শুয়ে রয়েছে বাঘ, হরিণ, দাঁতাল কাল রঙের শুয়োর, প্রকাণ্ড ভালুক। গোটাকয়েক হাতী চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুঁড় দোলাচ্ছে। সন্ন্যাসী চোখ বুজে গান করছেন। সেই তারের যন্ত্রটা এক অদ্ভুত আকৃতির। সেটা এসরাজ—বীণ—তানপুরো—সেতার এ সবের মত আকৃতি-বিশিষ্ট নয়—আর যে গান করছেন, তার ভাষাও ভারি অদ্ভুত। ইংরেজী, বাংলা, ফারসী, উর্দ্দু, হিন্দী, তামিল, তেলুগু এ কোন ভাষাই নয়। আমি বুঝলাম—কারণ ঐ সব ভাষা সবই আমি জানি কিনা। হতে পারে প্রাচীন আর্য্য ভাষা—যা সংস্কৃত নয়। জানেন ত ভারতবর্ষের সুদূরতম অতীতের পাঁচশো বছরের ইতিহাস জানা যায় না। মনে হয়, সেই ভাষা সেই যুগের। ভাষা—সুর কোনটাই বোধগম্য হ'ল না। কিন্তু আশ্চর্য্য সুরেলা কণ্ঠ—ও গান আর সুর শুনলে মানুষ সব ভুলে যায়—নিজেকে পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে। আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে ঠিক মোহগ্রস্তের মত এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়ালাম। বাঘ, হরিণ, ভালুক, দাঁতাল শুয়োর একবার মাত্র আমার দিকে তাকিয়ে, মাথা গুঁজে শুয়ে রইল। হাতীগুলো শুধু একজায়গায় দাঁড়িয়ে শুঁড় দোলাতে লাগল। বাজনার সুরে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ। এর রাগিণীর আলাপে বৃষ্টি হয় কিনা, বা আগুন জ্বলে কিনা তা দেখি নি বটে। কিন্তু যে লোক, শুধু গান গেয়ে বনের হিংস্র পশুকে হিংসা ভুলিয়ে একত্র করতে পারেন, তিনি সবই পারেন। তবেই বুঝুন আমি তানসেনকে দেখেছি কিনা?

তার পর?

চৌধুরী মশাই মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তার পরের ঘটনা গুহ্য। আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না বন্ধুগণ, জবাব মিলবে না—

আমরা চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, না তার পরের ব্যাপারটা খুলে বলুন।

—বলব। কিন্তু সে আজ নয়।—চৌধুরী মশাই আর একটি সিগারেট ধরাইলেন। আড্ডা ভাঙিবার মুখে, চৌধুরী মশাই আমায় একান্তে ডাকিয়া লইয়া যাইয়া বলিলেন, হঠাৎ ভারি ঠেকে গেছি। গোটা কুড়ি টাকার বিশেষ

প্রয়োজন। দিন দেখি। দু'চার দিনের মধ্যেই দিয়ে দেব। বাড়ী ভাড়ার টাকাটা পেলাম না। বাদা অঞ্চলে সামান্য জমিদারী আছে, নায়েব মশাই আজ দু' সপ্তাহের ওপর হয়ে গেল, কোন চিঠিপত্র দিলেন না। মনে হয়, আমারে ব্যস্ত— কই দিন দেখি।—আমার পকেটে টাকা ছিল। মণিব্যাগ বাহির করিয়া দুইখানি দশ টাকার নোট দিলাম। চৌধুরী মশাই আর একটি সিগারেট ধরাইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার মুখে বলিলেন, এ টাকা নেওয়ার কথাটা যেন ফাঁস করবেন না। তবে ভারি লজ্জাতেই পড়ব।

দিন কয়েক হইয়া গেল, কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যে চৌধুরী মশাইকে আর আড্ডায় দেখি না। লোকটি আমাদের আড্ডায় ঠিক ধূমকেতুর মতই উদয় হইয়াছিলেন। এই কয়-দিনে আমরা সকলেই চৌধুরী মশায়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আজ কয়দিন তাঁহার অনুপস্থিতিতে আড্ডার আনন্দটুকু যেন ম্লান মনে হইতেছে। আড্ডার সমস্ত জমজমাট ভাবটা যেন ভাঙিয়া চুরিয়া শতখান হইয়া গিয়াছে। আমরা যেন প্রাণহীন পুতুলের মত, কলের যন্ত্রের মত আড্ডা দিতেছি। কোন পুরাতন গানের রেকর্ডের উপর পিন চাপাইলে, যেমন বহুশ্রুত পুরাতন গান শোনা যায়, তেমনি আমাদের মুখ দিয়া সেই পুরাতন কথাগুলিই বাহির হইতেছে। কোন নূতনত্ব নাই—কোন বৈচিত্র্য নাই। সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন চৌধুরী মশাই কোথায় ডুব মারিলেন। শহরে থাকিলে নিশ্চয়ই দেখা হইত। ভাবিলাম, হয়ত ভদ্রলোকের অসুখ-বিসুখ করিয়াছে। একবার খোঁজখবর লইলে হইত। কিন্তু অসুবিধা এই—তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা ভালভাবে চিনি না। যাই হোক, একটু খোঁজ খবর লইয়া বাড়ী ঠিক বাহির করিব।…

সকালবেলায় বাহির হইয়াছি। ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। হঠাৎ দেখি বাজারের থলে হাতে করিয়া, চৌধুরী মশাই একটি গলি হইতে বাহির হইতেছেন। সবিস্ময়ে বিশেষ পুলকিত হইয়া ডাকিলাম, বাঃ চৌধুরী মশাই যে—

একমুখ হাসিয়া চৌধুরী মশাই বলিলেন, আর বলেন কেন—শুধু হয়রানের একশেষ। এই কয়দিন খালি কলকাতা আর বাদা অঞ্চল চষে ফেললাম। খালি পয়সার শ্রাদ্ধ হ'ল আর শরীর নষ্ট—

—তাই ত দেখছি। শরীর যে খুব খারাপ হয়ে গেছে। এই কয়দিনে, আপনার কি বিশ্রী চেহারাই না হয়েছে—

—তাই তো বললাম। খালি অযথা হয়রানি, এক পয়সা আদায় হয় নি। আচ্ছা করে ধমকে দিয়ে এলাম নায়েব গোমস্তাকে। বলে এলাম, এই হপ্তাহ'র মধ্যে আমার তিন হাজার টাকা চাই-ই। খাজনাপত্র উঠতে এখনও দেরি, তার ওপর নানা মামলা-মোকদ্দমা। নাঃ, জমিদারি করা ঝকমারী ব্যাপার। কলকাতার বাড়ীর ভাড়াও আদায় হ'ল না। দেখছি, নালিশ করিয়ে না করলে ওরা বাড়ী ছাড়বে না। কিন্তু যাই হোক, বাদার জমিদারী-কাছারীতে এ কয়দিন খাঁটি দুধ, আর ডিম, মাংস, ঘি খুব খাওয়া গেল। সবই প্রজারা ভেট দিত, আমি একা মানুষ কতই আর খাব। কিন্তু এত খেয়েদেয়েও শরীরের এই হাল, কাজেই বুঝুন কি খাটুনিটাই না গেছে। তবে সবই বেকায়দা। আমার বড্ড ভুল হয়ে গেছে খুব, ভেবেছিলাম সঙ্গে করে কিছু নিয়ে আসব। নানা কাজে, আর নানান ঝামেলায়, ওসব আমার কথা আর মনে নেই। এদিকে বাসায় এসে দেখি, ঝি বেটির অসুখ—কাজে আসে না। চাকর বেটাও সময় বুঝে ছুটি নিয়ে সরেছে। এখন কি যে করি—সন্ধানে ভাল বেশ বিশ্বাসী লোক আছে?

বলিলাম—কই আর সে রকম। ততক্ষণ চৌধুরী মশাই আমায় টানিতে টানিতে চায়ের দোকানে উঠাইয়াছেন। টোস্ট ও চা অর্ডার দিয়া সিগারেট বাহির করিলাম। চৌধুরী মশাই সযত্নে কোঁচাটি কোলের উপর রাখিয়া সন্তর্পণে বসিলেন। পাছে পরিষ্কার ধবধবে জামা কাপড়ে ধুলা-বালি লাগে। জুতা জোড়াটি এত সুন্দর বার্ণিশ করা যে, আয়নার মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। চোখের চশমা—হাতের ঘড়ি, আঙুলের সোনার আংটি সমস্তই যথাস্থানে যথানিয়মে শোভা পাইতেছে। সযত্ন-রচিত কুঞ্চিত একরাশ কাল চুলের সিঁথির মাঝে, রূপার তারের মত দুই একগাছি পাকা চুল চক্ চক্ করিতেছে শুধু। সন্তর্পণে চায়ের কাপটি ঠোঁটের আগায় তুলিয়া চৌধুরী মশাই বলিলেন, ভাল কথা—আমি আপনার কাছেই যে যাচ্ছিলাম। সব খরচপত্র করে, হাত খালি। কুড়িটি টাকা দিতে হবে। আগের কুড়ি, আর আজকের কুড়ি। এই চল্লিশ টাকা দু' একদিনের মধ্যেই দিয়ে দেব। ব্যাঙ্কের টাকায় এখন আর হাত দিচ্ছি না—দিন চটপট উঠুন। আবার বাজার করতে হবে—যত সব ঝুইসেন্স ব্যাপার। এই সব বাজার করা কি ভদ্রলোকের পোষায় মশাই! দরদস্তুর করে কেনাকাটা এ আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি। তাই হরদম ঠকতে হয়—চলুন এখন।—অগত্যা আমাকে উঠিতে হইল। চৌধুরী মশায়ের মুখের উপর 'না' বলিতে পারিলাম না। চৌধুরী মশাই আরও কুড়িটি টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন।

দিনকয়েক আবার চৌধুরী মশাইয়ের দেখা নাই। ভাবিলাম বোধ হয় উনি কলকাতা অথবা বাদা অঞ্চলে গিয়াছেন। দু'একদিন পর খুঁদু আমায় জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছে, চৌধুরী মশায়ের খবর কি?

—জানি না তো। ক'দিন থেকে তো দেখছি নে। কিন্তু কেন?

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া খুঁদু বলিল, কদিন হ'ল,

আমার কাছে গ্রামোফোন আর অনেকগুলো রেকর্ড রেখে দিয়ে গেলেন, আর তা ছাড়া পঞ্চাশটি টাকাও নিয়েছেন। বাবা অফিসে যাবেন বললেন। এখন গ্রামোফোন ফেরত না পেলে ভারি গোলমাল হবে। দাদার ভারি সখের জিনিস, তিনি কাল পরশুর মধ্যে বহরমপুর থেকে ফিরবেন। এসে গ্রামোফোন দেখতে না পেলে কুরুক্ষেত্র বাধাইবেন। আমি আমার টাকা কয়টির কথা চিন্তা করিলাম। বলিলাম, তবে খোঁজ নিতে হয়। চল, ওবেলা ওর বাড়ীটা ঘুরে আসি।

ঘুঁচু বলিল, আমাকে যেতেই হবে। বাড়ীও যে আমি চিনি নে—তা হোক লোকজনকে শুধিয়ে জেনে নেব।

দুই জনে বিকালবেলা চৌধুরী মশাইয়ের বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইলাম। সদর রাস্তা ছাড়িয়া, এক বিশ্রী গলির ভিতর ছোট্ট একটি একতলা বাড়ীর সম্মুখে আসিলাম। যে লোক সন্ধান দিয়াছিল, সেই বলিল, এই বাড়ীই বটে—

ছোট্ট সরু গলি। নর্দমার বিশ্রী গন্ধে চতুর্দিকের বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। এঁটো পাতা, মাছের আঁশ, ইত্যাদি নানা আবর্জনায় রাস্তা চলা ভার। ঐটুকু সরু রাস্তার উপর, চারিদিকের ময়লা আবর্জনা পচিয়া ভট্ ভট্ করিতেছে। মনে হয় না যে, কোনদিনও এখানে মিউনিসিপালিটির নজর পড়িয়াছে। মনটা বিরূপ হইয়া উঠিল। ভাবিলাম যে লোক জমিদার, যাহার কলিকাতায় বাড়ী আছে, সেই রকম লোকের পক্ষে এই জায়গায় বাস করাটা নেহাতই বেমানান। আমি দরজার কড়া নাড়িয়া ডাকিলাম, চৌধুরী মশাই—ও চৌধুরী মশাই—

হঠাৎ দেখি গলির ভিতর হইতে আর একটি লোক আসিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, ও মশায় শালাকে পেয়েছেন নাকি?

আমরা অবাক হইয়া বলিলাম—কার কথা বলছেন আপনি। লোকটি একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল, আবার কার কথা, এই শালা জুয়োচোরের কথাই বলছি। আপনারা চিন্তাহরণ চৌধুরীকে খুঁজছেন তো?

আমরা প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, এক জন ভদ্রলোককে যা-তা গালাগালি দিচ্ছেন।

—দেব না? শালার কাছে তিন মাসের বাড়ীভাড়া বাকী রয়েছে, তার ওপর দোকানের জিনিষপত্র খেয়েছে অনেক টাকার। ধাপ্পা দিয়ে মোটা টাকা মেরে এখন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে—

ঘুঁচু বলিল, আরে উনি যে জমিদার, কলকাতায় ওঁর বাড়ী আছে—

লোকটি হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, বাড়ী? ছাই আছে—কোথাকার জমিদার উনি?…কচুপুরের জমিদার! ও বেটা আবার জমিদার!

আমরা ডাকিতে লাগিলাম। ভিতর হইতে মেয়েলী গলার সাড়া আসিল—বাবা বাড়ী নেই।

বলিলাম, বাড়ী নেই? কোথায় গিয়েছেন? কবে আসবেন?

জবাব আসিল এখানে নেই। কবে আসবেন জানি নে। লোকটি বলিল, জুয়োচোর কোথাকার। বাড়ী নেই—ব্যাটা রাস্তায় পেলে গলায় গামছা দিয়ে টানব। খালি পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ক'দিন পালিয়ে বেড়াবে। যে দিন ধরব বাছাধনের সব চালাকি বের করব।

কয়দিন ঘুরিয়াও ঘুঁচু চৌধুরী মশাইয়ের দেখা পায় নাই। আমি টাকা পাই নাই, ঘুঁচুর দুর্দশা হইয়াছে যথেষ্ট। দাদার বকুনিতে বেচারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। আমি আরও কয়দিন চৌধুরী মশাইয়ের খোঁজে গিয়াছিলাম, রোজই দেখিলাম, সেই বাড়ীওয়ালা লোকটি অতি কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করিতেছে। না—চৌধুরী মশায়ের সহিত দেখা বুঝি আর হইবে না। যে শ্রদ্ধায়, যে ভালবাসায় আমরা চৌধুরী মশাইকে দেখিতেছিলাম, এখন এই সকল ঘটনায় সবই ধূলিসাৎ হইয়া গেল। লোকটির উপর অসীম ঘৃণা আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করিল। আচ্ছা ধাপ্পাবাজ লোক—যা হোক। কেমন দিব্যি আলাপ জমাইয়া আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া নিঃশব্দে অন্তর্ধান করিল। এখন অবস্থা হইয়াছে এমন যে, নিজের কান নিজেই মলিতে ইচ্ছা করে। একে একে জানিতে পারিলাম আমাদের বন্ধুবান্ধব প্রত্যেকের কাছেই গোপনে কিছু কিছু টাকা ধার লইয়াছেন। প্রত্যেককেই একই কথা বলিয়াছেন। বুঝিলাম, লোকটির ঐ পেশা। কিন্তু এই ভাবে কতদিন চলিবে?

দুই-চার দিন পর শুনিলাম, চৌধুরী মশাই এখানেই আছেন এবং শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করিবার তোড়জোড় করিতেছেন।

সেদিন ভোরবেলায় আমি একাই চৌধুরী মশাইয়ের বাসার সম্মুখে গিয়া হাজির হইলাম। দরজা খোলা রহিয়াছে। খোলা দরজার ভিতর দিয়া দেখিলাম, বাড়ীর ক্ষুদ্র অপরিসর ভিজে উঠানে দুই-তিনটি ছেলেমেয়ে গড়াগড়ি দিয়া তারস্বরে কাঁদিতেছে। এই তীব্র শীতে তাহাদের গায়ে জামা নাই। ঘরের ভিতর হইতে ক্ষীণস্বরে একটি মেয়েলি কণ্ঠের কথা শুনিলাম, কাঁদলে আমি কি করব বাবা। ঘরে কি ছাই এক মুঠো মুড়ি পর্য্যন্ত আছে যে দেবো। কাল থেকে খাস নি তা কি আমি জানি নে। ভগবান, এ কষ্ট আর সহ্য হয় না। আমায় নাও—

এক মুহূর্তে সমস্ত রহস্যের সমাধান হইয়া গেল। আমি নিঃশব্দে চলিয়া আসিতেছিলাম, ভিতরে ছেলে ক'টির কান্না

ঠিক তেমনি সমানভাবে চলিতেছে। একটি দশ-বারো বৎসরের মেয়ে বালতি লইয়া বাহিরের রাস্তার কলে জল লইতে যাইতেছিল। দারুণ শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে—গায়ে যে জামাটি রহিয়াছে তাহা শতছিন্ন আর তেমনি অপরিচ্ছন্ন। আমাকে দেখিয়া মেয়েটির মুখ শুকাইয়া গেল, আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বলিলাম, খুকী তোমার বাবা কোথায় ?

—বাবা— ? জানিনে কোথায় গেছেন—

জিজ্ঞাসা করিলাম, ওরা যে কাঁদছে, ওরা তোমার ভাই না ? বোধ হয় ওদের খিদে লেগেছে—খেতে দাও গে।

মেয়েটি অবাক হইয়া বলিল, খেতে দিতে বলছেন ! কি দেব খেতে ? কাল থেকে আমরা সবাই এক মুঠো মুড়ি খেয়ে আছি। সারা দিন সারা রাত কিছু খাই নি।

বলিলাম, বল কি ? তা চৌধুরী মশাই কিছু উপায় করে যান নি ?

—বাবা ? বাবা কোথায় পাবেন ? বাবা যে বড় গরীব ! ধার করে যা এনেছিলেন সব ফুরিয়ে গেছে। মার যে খুব অসুখ। জানেন, মা বোধ হয় বাঁচবে না—খুব কঠিন অসুখ করেছে। বাবা বলছিলেন কিনা—

নিমেষের মধ্যে চৌধুরী মশায়ের উপর হইতে সমস্ত ঘৃণা দূরে চলিয়া গেল। আমার চোখের সামনে অভাব অনশন-ক্লিষ্ট পরিবারের ছবিটি ভাসিয়া উঠিল, কচি ক্ষুধাতুর শিশুর কান্না আর সহ্য করিতে পারিলাম না। বেকার ভদ্র-সন্তান—ঘরে রুগ্না স্ত্রী—ক্ষুধাতুর শিশুপুত্রকন্যা—গৃহহীন, অন্নহীন বেচারী চৌধুরী মশাইয়ের কথা ভাবিয়া মন বিষাদে ভরিয়া গেল। ভাবিলাম, সমাজের এইরূপ লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার ভদ্রলোক দিন দিন ধ্বংসের পথে নামিয়া যাইতেছে। এইবার আমি এক কাণ্ড করিলাম। পকেট হইতে একখানি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া মেয়েটিকে দিয়া বলিলাম, তোমার মাকে দাও গে। বল গে, তোমার বাবা আমার কাছে টাকা পেতেন। যাও দাও গে—

নোটখানি হাতে লইয়া মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তার পর তীরবেগে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিল—মা !—আমি আর দাঁড়াইলাম না, চলিয়া আসিলাম।

•

দু'দিন পর ঠিক এমনি ভোরবেলায় হঠাৎ চৌধুরী মশাইয়ের সহিত আমার দেখা হইয়া গেল। শতছিন্ন একখানি ময়লা কাপড় কোঁচা করিয়া পরিয়া বালতি লইয়া রাস্তার কল হইতে জল লইতেছেন। আমায় দেখিয়া দাঁড়াইলেন। এ কি চেহারা হইয়াছে ভদ্রলোকের ! সমস্ত মুখে গোঁফদাড়ি, মাথার চুল আরও পাকিয়া গিয়াছে, সারা দেহে ব্যাধি জরা যেন দ্রুতগতিতে আসিয়া কায়েম হইয়া বসিতেছে।

চৌধুরী মশাই আমার পানে বিদ্রূপের মত তাকাইয়া বলিলেন, আমার অপরাধ অনেক। আমার অপমান করতে পারেন, দু'ঘা মারতেও পারেন।

বলিলাম, চৌধুরী মশাই আমি অপমান করবার জন্যে আসি নি।

—কেন ? করাই তো উচিত। ওটাই তো আমার পাওনা। অপমান আর গলাধাক্কা খেতে খেতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছি। আমি দাগাবাজ জুয়োচোর ঠিকই। ইনিয়ে-বিনিয়ে নিজের দুঃখের কথা আর বলব না। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আমরা মধ্যবিত্তেরা কোন পথে পা বাড়ালে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোটে বলতে পারেন ?

আমি কি বলিব ? শুধু চুপ করিয়া রহিলাম।

চৌধুরী মশাই পুনরায় বলিলেন, আপনারা অনেক দিয়েছেন। সে ঋণ শোধ করার সামর্থ্য নেই। এই পিঠ পেতে দিলাম, দু'ঘা মারুন অথবা অপমান করে শোধ নিন—

আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—ছিঃ, কি যে বলেন। আমি চলিয়া আসিলাম। ইহার পর চৌধুরী মশাইয়ের সহিত আর দেখা হয় নাই।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ

৭

পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্মৃতিরক্ষা ব্যাপারে উৎসাহীদের মঠ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া প্রকৃত জনহিতকর কার্য্যে ঐ সমস্ত অর্থ নিয়োজিত করিবার জন্য আমি আবেদন করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু এ বিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন:—"সম্প্রতি আমরা বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ও মেম্বারদিগকে একটি আপিল করিয়াছি। এই আপিলে স্বামিজীর ভ্রাতা ডঃ ভূপেন দত্ত, বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন বসু, ডঃ কালিদাস নাগ, বিচারপতি গোপেন দাস, বি. কে. গুহ এবং ব্যবহারজীবী শ্রীঅতুল গুপ্ত প্রভৃতি সই করিয়াছেন এবং কলিকাতার বহু পুরুষ ও নারী এই আপিলে সই করতঃ তাঁহাদের সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। আপিলের মূল উদ্দেশ্য হইল বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিবেকানন্দ স্কলারশিপ প্রবর্ত্তন করা। স্বামিজীর নামে নূতন করিয়া মন্দির হলঘর নির্ম্মাণের কোনও সার্থকতা নাই ঐ আপিলে ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে।" তাঁহার মতে, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাবিত "কৃষ্যাণ ব্যাঙ্ক" গঠন করা সময়সাপেক্ষ। সেইজন্য ঐ সমস্ত স্মৃতি-তহবিলের সংগৃহীত অর্থের দ্বারা "আপাততঃ বৃত্তি বা স্কলারশিপ স্থাপন" করা উচিত। তাঁহাদের এই সুচিন্তিত প্রস্তাব যে খুবই সমীচীন তাহাতে সন্দেহ নাই।

গত ৩রা মার্চ্চ কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকে. এম. মুন্সী বোম্বাই শহরে কেন্দ্রীয় তুলা উৎপাদন কমিটির সভায় উদ্বোধন-বক্তৃতায় এই মর্ম্মে বলিয়াছেন :

'ভারত চিরকাল খাদ্যশস্যের পরিবর্ত্তে অর্থকরী ফসল (পাট, তুলা ইত্যাদি) উৎপাদনে উৎসাহ দান করিতে পারে না।'

সমগ্র ভারতের পক্ষে যাহা সত্য, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তাহা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

গত ১৯৪৭ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গে ক্রমান্বয়ে ধান্যের চাষ কমাইয়া পাটের চাষ বাড়াইবার দরুন এই প্রদেশের খাদ্যসমস্যা যে কিরূপ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হিসাব হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক পাটচাষের পরিমাণ :

	একর
১৯৪৭	২,২৯,১৭৫
১৯৪৮	৩,১৪,৯২০
১৯৪৯	৪,৫৭,৫০০
১৯৫০	৬,৫০,৯০৯
১৯৫১	৮,৭৬,১০০

এই পাটের চাষ বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশ-সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ধান্যের জমিতে পাট উৎপাদন করিবার কারণে যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের ঘাটতি হইবে সেই অনুপাতে চাউল—কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশ-সরকারকে বিদেশ অথবা অপর প্রদেশ হইতে সরবরাহ করিয়া তাহা পূরণ করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশ-সরকারকে যে চাউল সরবরাহ করেন তাহার মূল্য নানা কারণে অনেক বেশী পড়ে। অধিকন্তু কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কোনও প্রদেশকে অধিক মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের হেতু ঘাটতি টাকা পূরণ করিবার জন্য আর অর্থ দিবেন না।

পাটের চাষ প্রদেশবাসীর পক্ষে যে কিরূপ অনিষ্টকর সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। উপরি-লিখিত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭ সাল অপেক্ষা ১৯৫১ সালে ৬,৪৬,৯২৫ একর বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। যদিও সঠিক জানা যায় না, ইহার মধ্যে কত ধান্যচাষের জমি ছিল, তাহা হইলেও মোটামুটি ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, ইহার শতকরা অন্ততঃ ৮০ ভাগ জমিতে ধান্যের চাষ হইত। আরও জানিতে পারা যায় যে, ১৯৫১ সালে প্রদেশ-সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা এক লক্ষ একর ধান্যচাষের জমিতে (বেশীর ভাগ আউস ধান্যের জমি) পাটের চাষ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি পড়ে। প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা যে আউস ধান্য উৎপন্ন হয় তাহাতে প্রায় ৯·২ মণ চাউল পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রতি তিন একর জমিতে কমপক্ষে এক টন চাউল পাওয়া যাইতে পারে। সেই হিসাবে ১৯৫১ সালে ৬,৪৬,৯২৫ একর বেশী জমিতে যে পাটের চাষ করা হইয়াছিল তাহাতে আউস ধান্য রোপণ করিলে আরও অন্ততঃ ২,১৫,৬৪১ টন চাউল পাওয়া যাইত, অর্থাৎ এই প্রদেশের খাদ্যশস্যের ঘাটতির প্রায় অর্দ্ধেক অংশ একমাত্র

বর্দ্ধিত পাট চাষের জমি হইতে পূরণ করিতে পারা যাইত। বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, পাটের চাষই বাংলা ও বাঙালীর আর্থিক ও রাজনৈতিক দুর্গতির একটি মূলীভূত কারণ। ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী জাতির স্বাস্থ্যহানির জন্যও পাটের চাষ যে অনেকটা দায়ী তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে, পাটের চাষ হইতে প্রদেশবাসীরা যথেষ্ট লাভবান হয়, কিন্তু উহা আদৌ ঠিক নহে। ম্যালেরিয়া ও খাদ্যাভাবের জন্য এই প্রদেশে যে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যতদূর অবগত হওয়া যায়, পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলিতে উপস্থিত ৩,০৭,৩৫০ জন শ্রমিক কার্য্য করে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী উহার শতকরা ৮৫ ভাগ অপর প্রদেশবাসী, বাকি শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গবাসী। পাটের মহাজন, দালাল ও পাটকলের অংশীদারদের মধ্যেও এই প্রদেশবাসীর সংখ্যা ঐ অনুপাতিক হার অপেক্ষা বেশী হইবে না, বরং কম হওয়াই সম্ভব।

আমার ধারণা—যদি এই প্রদেশে কমসংখ্যক পাটকল থাকিত তাহা হইলে প্রদেশবাসীর বিশেষ কিছুই ক্ষতি হইত না। পাটের চাষ হইতে চাষীরা সকল সময় লাভবান হয় না, কারণ পাটকলের মালিকরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তাঁহাদের সুবিধা-মত পাটের দাম কমাইতে ও বাড়াইতে পারেন। অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, প্রতি বৎসর পাটের চাষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পাটের দাম হঠাৎ বাড়িয়া যায়, ফলে ঐ চড়া দামের জন্য পাটচাষীরা বেশী পরিমাণ পাট উৎপাদন করিতে উৎসাহিত হয়। আবার পাট উৎপাদনের পরেই, অধিক পাট উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি নানা অজুহাতে পাটের দাম প্রতি বৎসরই কমিয়া যায়। যদি এই সমস্ত পাটকলের বেশীর ভাগ পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে স্থানান্তরিত করা হয় তাহা হইলে অপর প্রদেশবাসী শ্রমিকের সংখ্যাও অনেক কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই এবং ঐ সমস্ত শ্রমিকের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্বও সেই অনুপাতে আমাদের প্রদেশ-সরকারের লাঘব হইবে ও সেই সঙ্গে কম পাট উৎপাদনের জন্য পল্লী-অঞ্চলের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং প্রদেশে অধিক খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হইতে পারিবে।

রাজনৈতিক দিক হইতেও ইহার উপকারিতা পশ্চিম-বঙ্গবাসীদের কম নহে। পাট উৎপাদন যদি অন্ততঃ ১৯৪৭ সালের অনুপাতে (২,২৯,১৭৫ একর জমি) কমাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে প্রায় দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার অপর প্রদেশ-বাসী শ্রমিক এই প্রদেশের বিধান সভার সভ্য নির্ব্বাচনে এখনকার মত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। আপা-ততঃ যখন পশ্চিমবঙ্গের আয়তনবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না তখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে পাটের চাষ যতদূর সম্ভব কমাইয়া দিয়া ঐ সমস্ত জমিতে ধান্যচাষের ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। নচেৎ এই প্রদেশের অধিবাসীদের নিজেদের খাদ্যাভাব পূরণ করিবার জন্য নয়াদিল্লীর দিকে চিরকাল তাকাইয়া থাকিতে হইবে। আমি পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণকামী প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির, বিশেষ করিয়া তরুণদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। এই উদ্দেশ্যে এখন হইতেই গ্রামে গ্রামে ও পল্লীতে পল্লীতে রীতিমত প্রচারকার্য্য আরম্ভ করা উচিত। আশঙ্কা হয়—স্বার্থান্বেষীর দল এই প্রস্তাবকে "প্রাদেশিকতা-পূর্ণ মনোবৃত্তির পরিচায়ক" বলিয়া অভিহিত করিয়া নানা ভাবে এই "অধিক ধান্য ফলাও" আন্দোলনকে বাধা দিবার চেষ্টা করিবেন। পাট ও পাটজাত দ্রব্য যে-কোনও প্রদেশে উৎপন্ন হউক না কেন, উহার বেশীর ভাগই কলিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানি করিতে হইবে। সে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকার হইতে পাট-করের অংশ পাইবেন না এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশের কল্যাণকল্পে এই আন্দোলনকে বাধা না দিয়া সহানুভূতিসূচক মনোভাব দেখাইবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যবিভাগ "অধিক খাদ্য-উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ" আখ্যাযুক্ত একখানি পুস্তিকা সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে, "পশ্চিমবাংলায় প্রায় ১৪ লক্ষ একর পতিত জমি আছে। এই রাজ্যে বিভিন্ন কারণে এই পতিত জমি পুনরুদ্ধার করিয়া চাষের অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত ও সম্ভব নহে। প্রত্যেক রাজ্যেই জলবায়ু ও অন্যান্য বিষয়ের সহায়ক রূপে মোট জমির শতকরা ২৫ ভাগ অরণ্যভূমি রাখা প্রয়োজন। ভূমিসংরক্ষণ ও পর্য্যাপ্ত বারিপাতের সুবিধার জন্য অরণ্য-ভূমির অত্যাবশ্যকতা অনস্বীকার্য্য। পশ্চিম বাংলায় প্রয়ো-জনীয় বনভূমির যথেষ্ট অভাব। বর্ত্তমানে এই রাজ্যের পতিত জমির বেশীর ভাগ অংশই চাষে না আনিয়া অরণ্য-ভূমির জন্য সংরক্ষণ করা দরকার। তদুপরি চারণভূমি ও খাদ্যের অভাবে পশ্চিম বাংলার গবাদি পশু একেই যথেষ্ট হীনবল এবং ইহাদের দুগ্ধ উৎপাদনের ক্ষমতাও ভারতের অনেক অঞ্চলের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশের অধিক নহে।" অর্থাৎ, পতিত জমি উদ্ধার করিয়া উহাতে খাদ্যশস্য-উৎপাদন-বৃদ্ধির কোনরূপ আশা নাই এবং সেইরূপ ব্যবস্থা করাও উচিত হইবে না। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন খুবই কমিয়া গিয়াছে। জমির অভাবে গৃহস্থ যেমন তাঁহার বাসভবন ইচ্ছামত শূন্যের দিকে উঠাইয়া নির্ম্মাণ করিতে

পারেন না, সেইরূপ বনভূমির আয়তন বৃদ্ধি দ্বারাও ফসল উৎপাদনের জমির অভাব পূরণ করা যায় না। সাধারণে বুঝিতে পারিতেছে না যে কি করিয়া পশ্চিমবঙ্গে "বন-মহোৎসব", "অধিক খাদ্য ফলাও", "অধিক পাট উৎপাদন করো" এই তিনটি আন্দোলন একই সঙ্গে চলিতে পারে; এবং তাহাদের ধারণা যে ইহা কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র।

জলসেচন ও নানাপ্রকার সার প্রয়োগ দ্বারা জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার বিষয় উক্ত পুস্তিকাতে যাহা লেখা আছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা এই প্রদেশে উপস্থিত কার্য্যকরী করা সম্ভব কিনা তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। প্রথমতঃ, আবশ্যকমত কম্পোষ্ট অর্থাৎ পচা সার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে না; দ্বিতীয়তঃ পোড়া কয়লার অভাব হেতু লক্ষ লক্ষ মণ গোবর-সার জ্বালানি-কার্য্যে লাগিয়া যাইতেছে, কারণ ভারত সরকার পোড়া কয়লার জন্য রেলগাড়ী সরবরাহ একেবারে নিম্নতম ধাপে স্থির করিয়া দিয়াছেন। যদিও সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধাই ভারত-সরকারের প্রথম ও চরম উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা কমিশনও স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, ফসল-উৎপাদনকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে হইবে; তৃতীয়তঃ, সমস্ত পল্লী-অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসার সময়সাপেক্ষ এবং উহা না হওয়া পর্য্যন্ত জলসেচন-ব্যবস্থার বিশেষ কোনরূপ সুবিধা হইতে পারে না। ঐ পুস্তিকাতে কৃষিক্ষেত্রে এমোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাও শোনা গিয়াছে যে, টেনিসি ভ্যালির সুবিখ্যাত কৃষিক্ষেত্রে এই রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া বহু সহস্র একর জমি একেবারে চাষের অনুপযোগী হইয়াছে। ইহা ব্যবহার করিলে প্রথম দুই-তিন বৎসর অবশ্য অধিক পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরে সেই জমি নাকি চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে একেই চাষের জমির অভাব, তার উপর এই মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা হওয়া মারাত্মক। সেই জন্য এই সার ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার যে, সত্যই টেনিসি-ভ্যালিতে এইরূপ ঘটিয়াছে কিনা।

ঐ পুস্তিকা পড়িয়া মনে হয়—একমাত্র খাদ্যশস্য উৎপাদন করিয়া পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া খাদ্যবিভাগ মনে করেন না। শস্য-রক্ষা ও শস্য-অপচয়ের বিষয় উহাতে যাহা লিখিয়াছেন তাহারও কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। —"পশ্চিম বাংলায় বরাহ, হনুমান ও বাঁদরের অত্যাচারে প্রতি বৎসর বহু শস্য নষ্ট হইয়া থাকে। দেশের অনেক লোকই সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া এই শস্য-অনিষ্টকারী বাঁদর ও হনুমান নিধনে বিরত হন। জীবনধারণের প্রতিযোগিতায় বাঁচিতে হইলে এই শস্যহানি নিবারণকল্পে বন্যবরাহ, বাঁদর, হনুমান প্রভৃতি ফসল-অনিষ্টকারী জন্তুর নিধন অত্যাবশ্যক। দেশের জনসাধারণকে এই কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকার প্রতি নিহত বন্যবরাহ বাবদ চার টাকা এবং প্রতি নিহত হনুমান বা বাঁদর বাবদ তিন টাকা পুরস্কার দিয়া থাকেন। ১৯৪৯-৫০ সালে হাওড়ার শ্রী............... একক প্রচেষ্টায় ৬১৩টি হনুমান নিধন করিয়া ১,৮৩৯ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।"

খাদ্যবিভাগ এই অভিনব উপায়ে প্রদেশে একই সঙ্গে শস্যরক্ষা ও বেকার-সমস্যার সমাধানের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সমস্ত নিহত হনুমান, বাঁদর, বন্যবরাহ ইত্যাদি পশুদের মাংসের দ্বারা প্রদেশের খাদ্যসমস্যারও কথঞ্চিৎ সমাধান হইয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধে উক্ত পুস্তিকায় কিছুই উল্লেখ নাই। শুনিলাম কোন কোন মহকুমায় হনুমান ও বাঁদরের লেজটি মাত্র কাটিয়া আনিয়া দেখাইলেই তিন টাকা করিয়া পুরস্কার পাওয়া যায়।

পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে হনুমান ও বাঁদরের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশী তাহা সকলেই জানেন। যদি এই প্রদেশের উৎসাহী বেকারের দল নিজেদের প্রদেশ হইতে হনুমান ও বাঁদরের লেজ কাটিয়া আনিয়া উক্ত হারে পুরস্কার দাবি করেন তাহা হইলে তাহা উপেক্ষা করা শক্ত হইবে, কারণ কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে ঐরূপ আপত্তি "প্রাদেশিকতার পরিচায়ক।"

খাদ্যবিভাগ "শস্যহানি নিবারণকল্পে" "অনিষ্টকারী জন্তুর নিধন অত্যাবশ্যক" বলিয়া মনে করে। কিন্তু উক্ত বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বোধ হয় অবগত নহেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি বিভাগ বহু উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদনকারী চাষের জমি, মধ্যবিত্ত অ-চাষী বাস্তুহারাদের গৃহনির্ম্মাণের জন্য "অনাবাদী ও পতিত জমি" বলিয়া ঘোষণা করিয়া সরকার কর্ত্তৃক গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সমস্ত জমি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগের নিকট অনুসন্ধান করেন নাই যে, প্রস্তাবিত জমিগুলি সত্য-সত্যই অনাবাদী ও পতিত কিনা। সম্প্রতি সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি বিভাগ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কেন্দ্রীয় ও প্রদেশ-সরকারের কৃষিবিভাগের পরামর্শে পরিচালিত একটি উচ্চ ধরণের মিশ্র কৃষি-প্রতিষ্ঠানের জমিগুলিকে অনাবাদী ও পতিত জমি বলিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন—এই

সংবাদ পাইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কলেক্টর মহোদয়কে জানাইয়াছিলেন। পরে শুনিলাম কলেক্টর মহোদয়ও এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তীব্র মন্তব্যসহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রিপোর্ট দিয়াছেন। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় শস্যহানি নিবারণকল্পে হনুমান ও বাঁদর নিধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশা করি সরকারী কোনও কর্মচারী শস্য উৎপাদনে যাহাতে বাধা না দিতে পারেন তাহার সুব্যবস্থাও তিনি করিবেন।

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী "পশ্চিম বাংলার খাদ্যসমস্যা" শীর্ষক পুস্তিকায় নিজেই লিখিয়াছেন, "আমাদের বর্ত্তমান খাদ্যসমস্যা জাতির অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের একটি মৌলিক সমস্যা। একে মাত্র একটি সাময়িক বা আকস্মিক সমস্যা বলে উপেক্ষা করে বহুদিন আমরা ভুল করেছি।"

য়িহুদী শব্দের উৎপত্তি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

বর্ত্তমান প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত য়ুডিয়া (Judaea) নামক অঞ্চলের নাম খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে পরবর্ত্তী পাঁচ শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত ছিল—(হিব্রু) Yehudah, য়েহুদা (Judah)। এই হিব্রু শব্দ yehudah হইতে প্রথমে গ্রীক ও তৎপরে লাতীন অনুবাদের মধ্য দিয়া 'য়ুডা',* ও উহা হইতে ইংরেজী Judah শব্দের উৎপত্তি হয়। উক্ত য়ুডারাজ্যবাসী ইস্রায়েল বংশের লোক বুঝাইতে হিব্রু শব্দ yehudah হইতে উদ্ভূত 'yehudai' (য়েহুদাই) বা y'hudi (য়েহুদী) শব্দ ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে গ্রীক ও গ্রীক হইতে লাতীন অনুবাদে Judaeus (য়ুদাইউস), তৎপরে ফরাসী ভাষায় giu ও তাহা হতে ইংরেজী Jew শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত বাংলা 'য়িহুদী' শব্দ মূল হিব্রু 'য়েহুদাই' শব্দের নিকটতর। হিব্রু yehudai শব্দ (ইংরেজী অনুবাদে Jew) Old Testament-এর 2 king's নামক পুস্তকের ষোড়শ অধ্যায়ে প্রথম পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তক সম্ভবতঃ য়ুডাবাসিগণের ব্যাবিলন দেশে তথাকার রাজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হওয়ার পর খ্রী: পূ: ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিব্রুভাষায় লিখিত হয়, পণ্ডিতেরা এইরূপ অনুমান করেন। এই সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত য়িহুদী জাতির পূর্ব্ব-পুরুষগণকে বুঝাইতে ইস্রায়েল শব্দই O. T. গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হিব্রু, ইস্রায়েল ও য়িহুদী—য়িহুদী জাতির ঊর্দ্ধতম পিতৃপুরুষ আব্রাহাম্ 'হিব্রু' (Hebrew মূল হিব্রুভাষায় 'ইব্রাই') এই নামে অভিহিত হন, হিব্রু ইব্রাই (গ্রীক Hebraios) শব্দের অর্থ,—'সুদূরস্থিত অপরপার হইতে আগত';—যেহেতু আব্রাহাম সুদূর ইউফ্রেতীস্ নদীর পার হইতে আসিয়া পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বোপকূলস্থ কানাআন্ প্রদেশে (বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইনের পশ্চিমাংশ) বসবাস করেন। বর্ত্তমানে 'হিব্রু', 'ইস্রায়েল' ও 'য়িহুদী' এই শব্দগুলি একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও 'হিব্রু' শব্দ প্রথমে আব্রাহাম্ ও তদীয় বংশধরগণকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত। তৎপরে আব্রাহামের পৌত্র য়াকোব্ (Jacob) ইস্রাএল্ নাম গ্রহণ করিলে য়াকোব ও তদীয় বংশধরগণকে বুঝাইতে ইস্রায়েল নাম প্রচলিত হয়; এজন্য 'হিব্রু' নাম ব্যাপক অর্থে আব্রাহাম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ইস্রায়েল জাতিকে বুঝাইতে পারে। আর ইস্রায়েল রাজ্য ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কানাআন্-এর আদিম অধিবাসিগণের সংমিশ্রণে পরবর্ত্তীকালে উদ্ভূত যে মিশ্রিত জাতি yehudah বা য়ুডায় বাস করিতে থাকে তাহাদিগকে য়ুডাবাসী এই অর্থে yehudai বা y'hudi (য়িহুদী Jew) নাম দেওয়া হয়।*

* লাতীন ভাষায় আদ্য 'J' উচ্চারণ ছিল 'য়' (সংস্কৃত 'য'এর মত)।

* এই নিবন্ধের প্রথমাংশে লিখিত য়িহুদী শব্দের উৎপত্তি-নির্দ্ধারণ সম্পর্কে আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু, ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বাগ্‌দাদে ভারতীয় চারুকলা শিল্পের উদ্বোধন

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) ইরাক সরকারের শিক্ষা-সচিব মিঃ খলিল কেন্না বাগদাদের 'ফাইন আর্টস্' ইনষ্টিটিউটে একটি ভারতীয় চারুকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ভারত-সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ভারতের চারুকলা ও হস্ত-শিল্প সমিতি ঐ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। উদ্বোধন-কালে মিঃ কেন্না বলেন—ইরাকের যুব-সমাজের মধ্যে শিল্পানুরাগ প্রসারে এই প্রদর্শনী বিশেষ সহায়ক হইবে এবং ভারতের সহিত আমাদের মধ্যে সংস্কৃতির বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া তুলিবে। ঐ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন—আমাদের আনন্দের বিষয় এই যে, ভারত-সরকার ও ভারতীয় শিল্পিগণ তাঁহাদের উদ্দীপনাময় চারুকলার নমুনা দর্শনের সুযোগ দিয়াছেন। মহান্ মানবিক ধর্মের প্রেরণা বরাবর ভারত হইতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতালাভের জন্য কিরূপে সংগ্রাম করিতে হয় তাহা ভারত আমাদিগকে শিখাইয়াছে। দেশের সম্পদসৃষ্টির জন্য সরকার ও জনসাধারণ কি ভাবে পরস্পরকে সহযোগিতা করিতে পারে তাহা ভারত বর্তমানে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে।

ইরাকের প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ, বিভিন্ন মিশনের প্রধানগণ, প্রধান প্রধান শিল্পিগণ, কয়েক জন শিক্ষাব্রতী এবং পাঁচ শত গণ্যমান্য অতিথি ঐ উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ইরাকের প্রধান মন্ত্রী বলেন—ইরাকের শিল্পীদেরও ভারতে অনুরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন করা উচিত।

ঐ প্রদর্শনীতে সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পীদের প্রায় দুই শত চিত্র প্রদর্শিত হয়। তাহা ছাড়া ভারতের ভূমিভাগ ও জন-সাধারণ, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যবিদ্যার নিদর্শন এবং হস্ত-শিল্পের বিশিষ্ট আলোকচিত্রও সেখানে রাখা হয়। ঐ প্রদর্শনীতে পূর্ব্বযুগের চিত্রের এক শতখানি মুদ্রিত কপিও রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কায়রো, ইস্তাম্বুল এবং আঙ্কারাতেও অনুরূপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

"কর্ম্মের আহ্বান"— শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

নালন্দা-বিহারের সাধারণ দৃশ্য

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম-এ, বি-টি

বৈদিক যুগে তপোবনের শান্ত পরিবেশের মধ্যে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে যে শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন করিয়াছিলেন, বৌদ্ধসঙ্ঘের পরিচালনাধীন হইয়া সেই শিক্ষা-পদ্ধতি উত্তরকালে যেন আরও উন্নততর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। নালন্দা-পদ্ধতিতে তাহার পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হইয়াছিল। সঙ্ঘ-পরিচালিত শিক্ষাতেও বৈদিক যুগের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

সঙ্ঘ-পরিচালিত শিক্ষার গৌরবময় যুগেও হিউয়েন-সাঙ্ ভারতবর্ষকে পো-লো-মেন-কিউ অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণের দেশ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তখনও শিক্ষা-দীক্ষায় সমাজের শীর্ষস্থানে সমারূঢ় ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা তখনও দেবভাষা বলিয়া সমাদৃত ছিল।[১] 'সিদ্ধিরস্ত' নামক যে পুস্তকের উল্লেখ হিউয়েন-সাঙ্ ও ইৎসিং উভয়েই করিয়াছেন সেই পুস্তকের প্রারম্ভে "নমঃ সর্ব্বজ্ঞায়" এই স্তোত্র বুদ্ধ বা পরম পুরুষ ভগবান যাঁহার উদ্দেশ্যেই রচিত হউক না কেন, এই পুস্তকের বিষয়বস্তু শুধু আধ্যাত্মিক তত্ত্বাদিতেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহাতে বর্ণিত পাঁচটি বিদ্যার মধ্যে যুগোপযোগী শিল্পবিদ্যা, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতিরও যেমন উল্লেখ রহিয়াছে তেমনি উপনিষদের অধ্যাত্মবিদ্যা, পাণিনির ব্যাকরণ প্রভৃতিও উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবাসীর রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক জীবনে বহু বিপ্লব সংঘটিত হইলেও ভারতের শিক্ষাধারা তার মূলপ্রবাহ পরিবর্ত্তন করে নাই। স্মরণাতীত-কালে যে শিক্ষাধারা তপোবন-উৎস হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল, কালের পরিবর্ত্তনে কখনও তাহা ক্ষীণ-স্রোতা হইয়াছে এবং কখনও দু'কূল প্লাবিত করিয়া ভারতের সভ্যতাকে অমৃত-রসে সিঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহা মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। এই মূল সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়াই নালন্দার ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান পাটনা জেলার বিহার মহকুমার বড়গাঁও (বিহার গ্রাম)-এর নিকট প্রাচীন নালন্দা অবস্থিত ছিল। 'নাল', 'নালক', 'নলেন্দ্র' প্রভৃতি বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত স্থানসমূহ নালন্দার অংশবিশেষ ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। প্রাচীন রাজগৃহ হইতে নালন্দা মাত্র সাত মাইল উত্তরে অবস্থিত, ফলে রাজগৃহের এই উভয় স্থানের সংস্কৃতিগত যোগাযোগ ছিল গভীর। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার সহিত নালন্দাও প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। শৈলশ্রী-মণ্ডিত প্রকৃতির স্নেহক্রোড়ে অবস্থিত এই গ্রামটি বহু প্রাচীনকাল হইতেই জ্ঞানানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণী নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। চীনদেশের সহিত ভারতে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সূচনা খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক হইতে। পরবর্ত্তীকালে ভারত-চীন সাংস্কৃতিক যোগসূত্র আরও

১ *On Yuan Chwang's Travels in India*—walters—vol. I, pp. 140 ; 153.

নালন্দার প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির

দৃঢ় হইয়াছিল। চীন পরিব্রাজকদের মধ্যে ফাহিয়ান, হিউয়েন-সাঙ্, ইৎসিং ও সেংচি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 'সদ্ধর্ম্ম' গ্রহণ করার পরেই চৈনিক বৌদ্ধশ্রমণগণ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত ও ধর্ম্মসমস্যা সমাধানের জন্য ভারতবর্ষে আসিতে লাগিলেন, নালন্দা বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র হওয়ায় তাহার সহিত চৈনিক ছাত্রদের সম্বন্ধ আরও গভীর হইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমবিবর্ত্তনের তথ্যাদি তিব্বতীয় গ্রন্থাদি হইতেও বহুল পরিমাণে উদ্ধার করা হইয়াছে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের বিবরণ, তিব্বতীয় 'ত্যাঙ্গুরে' নালন্দা ও বিক্রমশীলার পণ্ডিতদের লেখা গ্রন্থসমূহের তালিকা, সুম্‌পা প্রণীত পাগ-সাম-জোন-জাং প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নালন্দার ইতিহাস সম্পর্কে ভারতীয় উপকরণসমূহের মধ্যে সমসাময়িক রাজাদের শিলালিপি, শীলমোহরে উৎকীর্ণ 'শ্রী নালন্দা মহা-বিহারীয়ার্য-ভিক্ষু সঙ্ঘস্য' লিপি, হিন্দু ও বৌদ্ধ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।

প্রাচীন পালি-সাহিত্যে 'বিহার' কথাটি—এক একজন ভিক্ষুর বাসের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র-কক্ষ এই অর্থে প্রযুক্ত হইত। —পরে 'বিহার' বলিতে সাধারণতঃ বুঝাইত এরূপ নিকেতন বা মঠ। যেখানে কতকগুলি বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুর চেষ্টায় বিহারগুলি ক্রমে বিদ্যায়তনে পরিণত হইল। রাজা, মহারাজ এবং শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বা বিহার নির্ম্মাণে অর্থসাহায্য করিয়া পুণ্যার্জ্জনের প্রয়াস পাইতেন। বুদ্ধ-শিষ্য সারিপুত্ত মদ্‌গৌল্যায়নের সহিত নালন্দার স্মৃতি জড়িত থাকায় পুণ্যকামীদের দৃষ্টি নালন্দার উপরে পড়িল।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা-পাঠে জানা যায় যে, নালন্দার বালাদিত্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিহারের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে যে স্তূপটি বিদ্যমান ছিল সেই স্থানে বসিয়া বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।[১] তারনাথ বলেন, অশোক সারিপুত্তের চৈত্যে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।[২] খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান মতের কেন্দ্র হিসাবে নালন্দা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। গুপ্ত-সম্রাট কুমার গুপ্ত ও তাঁহার বংশধরগণ, এবং পরবর্ত্তীকালের বহু রাজগণ নালন্দা মহাবিহারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা গৌরবের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যায় পর্য্যন্ত পাল-সম্রাটদের দানে নালন্দা পুষ্ট হইয়াছিল।

বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পরে রাজগৃহ এবং তৎসঙ্গে নালন্দাও সম্ভবতঃ স্থবিরবাদীদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সম্রাট অশোকের অধিনায়কত্বে এবং মোগ্‌গলী পুত্র তিস্‌সের পৌরোহিত্যে যে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল তাহাতে বুদ্ধদেবের কথোপকথন ও উপদেশাবলী সঙ্কলিত হইয়া 'ত্রিপিটক' রচিত হয়। স্থবিরবাদীদের ধর্ম্মমত তাহার উপরেই

---

১ On *Yuan Chwang's Travels in India*—Walters—Vol. II, p. 171

২ রাজগৃহ ও নালন্দা—ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন, পৃ. ৮০

প্রতিষ্ঠিত। তিব্বতীয় কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, সম্রাট অশোকের সময় হইতে সম্রাট কণিষ্কের সময় পর্যন্ত স্থবিরবাদ উত্তর-ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বা মহিন্দ এই মতবাদ সিংহলেও প্রচার করিয়াছিলেন।৩ সম্রাট অশোককর্তৃক নালন্দাতে সারিপুত্তের চৈত্যে পূজাদান এবং স্তূপ নির্ম্মাণের বিবরণী পাঠে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত স্থবিরবাদের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দাতেও ছিল।

নালন্দার প্রধান স্তূপের সহিত সংশ্লিষ্ট তোরণ ও অন্যান্য স্তূপ

স্থবিরবাদীদের কল্যাণে বৌদ্ধধর্ম্মেও কঠোর নিয়ম ও অনুশাসনের প্রভাব দেখা দিল। ব্যক্তিগত অর্হতত্ব লাভই ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য হইল ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম জনপ্রিয়তা হারাইতে লাগিল। দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির ফলে যে মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায় সৃষ্ট হইল সেই সম্প্রদায় অর্হতত্ব লাভ হইতে বোধিসত্ত্ব লাভের উপরেই বেশি জোর দিয়াছিল। বুদ্ধ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বোধিসত্ত্বরূপে আবির্ভূত হইয়া জীবজগতের অশেষ কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব লাভ কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের অনুশাসনাধীন নহে। সকলেই পারমিতা বা গুণ বিশেষের (দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, উপায়, কৌশল, প্রণিধান, বল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা) চর্যা করিয়া বোধিসত্ব অবস্থা লাভ করিতে পারে।
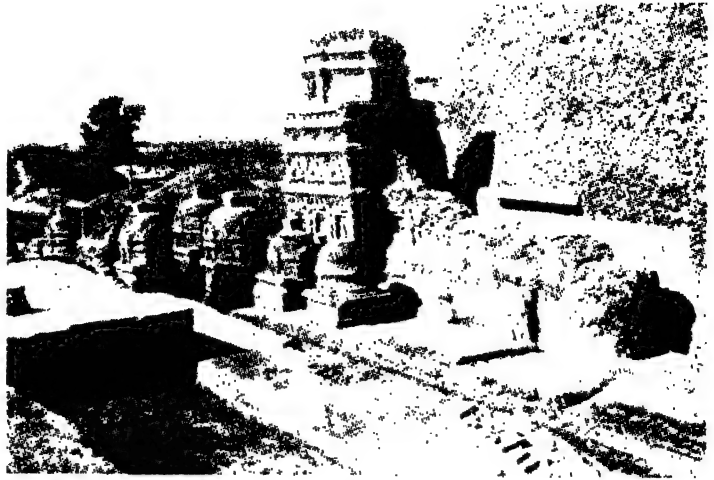
মহাসাঙ্ঘিক মতবাদ এবং এই মতবাদ হইতে সৃষ্ট লোকোত্তরবাদ উত্তর-ভারতে জনপ্রিয়তা লাভ করিতে লাগিল এবং ক্রমে দক্ষিণাপথে অন্ধ্রদেশের অমরাবতী ও নাগার্জ্জুনীকোণ্ডা এই মতবাদসমূহের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। অনেকেরই ধারণা যে সম্রাট কণিষ্ক কর্তৃক আহূত চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতির ফলেই মহাযান মতের সৃষ্টি। অবশ্য চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি উপলক্ষ্য মাত্র। এই সঙ্গীতিতে যে সকল সভ্য যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্থবিরবাদীদের প্রতিনিধি অতি অল্পই ছিলেন, অধিকাংশই ছিলেন মহাসাঙ্ঘিক।৪ চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতির পরে মহাসাঙ্ঘিকদের প্রচারের ফলেই মহাযান মতবাদ জনপ্রিয় হইতে লাগিল। তারানাথের বিবরণ হইতে জানা যায়, মহাযান মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক নাগার্জ্জুন নালন্দা সঙ্ঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে হীনযান মতের প্রধান কেন্দ্র 'বজ্রাসন' বা বুদ্ধগয়ার প্রাধান্য নষ্ট হইল এবং নালন্দাই মহাযান মতের প্রধান কেন্দ্র হইল।৫

নালন্দা মহাবিহারের ইতিহাসের অধ্যায়কে দ্বিতীয় মহাযান মতের অধ্যায় বলা যাইতে পারে। শিক্ষা ব্যাপারে সমসাময়িক রাজাদের এবং পুণ্যার্থীদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই নালন্দার উন্নতি। নাগার্জ্জুনের সমসাময়িক সুবিষ্ণু নামক একজন ব্রাহ্মণ অতিধর্ম্ম রক্ষাকল্পে নালন্দায় একশত আটটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।৬ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষের দিকে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বর্ণনায় বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্তিতে দ্বাবিংশটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের উল্লেখ থাকিলেও নালন্দার বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তি ও পাটলিপুত্র ব্যতীত অন্য কোন স্থানে এমনকি বৌদ্ধতীর্থ সারনাথেও গিয়াছেন বলিয়া কোন উল্লেখ তাঁহার বিবরণীতে পাওয়া যায় না।৭ সম্ভবতঃ নালন্দা বিহার তখন ছোট ছিল বলিয়া ফা-হিয়েন ঐ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বর্ণনা করেন নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্যের রাজত্বকালে (আঃ ৪১৫-৫৫ খ্রীঃ অঃ) সম্ভবতঃ মহাবিহারের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তী গুপ্তসম্রাটদের

৩ *Age of Imperial Unity*—edited by Dr. R. C. Mazumder and A. D. Pusalkor, p. 380
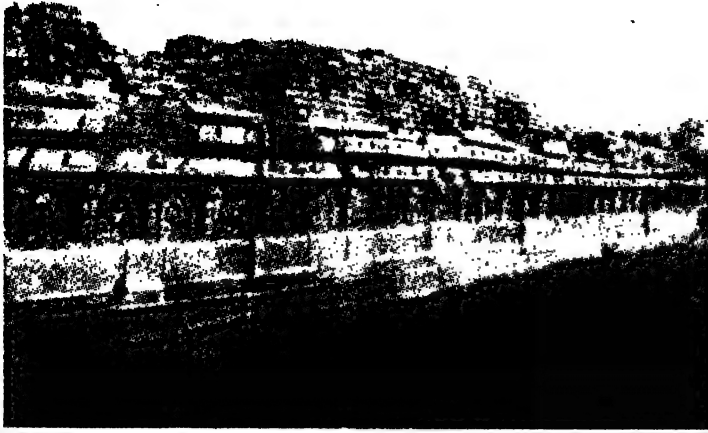
৪ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৯

৫ *Age of Imperial Unity*—Edited by Dr. R. C. Majumder and A. D. Pushalkar, p. 388

৬ *Ancient India Education*—Dr. R. K. Mukherjee, p. 558

৭ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃ. ৪৪

১২নং চৈত্য ও স্তূপসমূহ

প্রথম কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত, বালাদিত্য, বৈন্যগুপ্ত, বজ্র প্রভৃতি রাজগণের দানে নালন্দা মহাবিহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হিন্দু দেবদেবীর ন্যায় বৌদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ এবং তাহাতে অর্ঘ্যদান মহাযান মতের প্রচারের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের অনতিকাল পরেই স্তূপপূজা এবং বোধিবৃক্ষরূপে চৈত্যবৃক্ষের পূজা আরম্ভ হয়—ভারহুতের এবং সাঁচিস্তূপের বেদিকার লিপিমালা তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করে।৮

রাজসাহী জিলার বিহারৈল গ্রামে যে বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, এবং বগুড়া মহাস্থানে বলাইধাপ স্তূপের নিকটে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর ব্রোঞ্জধাতু নির্ম্মিত যে মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বৌদ্ধ মহাযানীর মূর্ত্তি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।৯ খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বৌদ্ধধর্ম্মে যে মহাযান মতবাদের সৃষ্টি হইল, অষ্টম শতাব্দীতে তাহা প্রবল আকার ধারণ করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্মদান করিল। মহাযান মতের কল্যাণেই বুদ্ধ হইয়া গেলেন দেবতা এবং বোধিসত্ত্বগণও বিভিন্ন দেবরূপ পরিগ্রহ করিলেন।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মান্দাসোররাজ যশোধর্ম্মদেবের মন্ত্রী মালদা নালন্দা মহাবিহারে প্রভূত অর্থদান করিয়াছিলেন। হিউয়েনসাঙের বর্ণনায় জানা যায় যে, দেশের রাজা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য একশতটি গ্রামের রাজস্ব দান করিয়াছিলেন।১০ এই রাজা নিশ্চয়ই পুষ্যভূতি বংশীয় হর্ষবর্দ্ধন। কনৌজরাজ যশোবর্ম্মণও (আ: ৭২৫-৭৫২ খ্রী: অ:) নালন্দায় অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। বাংলার পালসম্রাটগণের মধ্যে ধর্ম্মপাল, দেবপাল এবং তাঁহাদের বংশধরগণ নালন্দার প্রতি যথেষ্ট আনুকূল্য প্রদর্শন করিতেন। এই প্রকারে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ নরপতিদের দানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল।

নালন্দার ন্যায় বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার আর্থিক দায়িত্বভার সমসাময়িক রাজগণ এবং সম্পৎশালী ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নালন্দা ছিল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। বিরাট ছাত্রাবাস পরিচালনা, অধ্যাপনার ব্যবস্থা এবং বিদেশীয় ছাত্রগণের অধ্যয়নাদির যাবতীয় ব্যবস্থা ভিক্ষুসঙ্ঘের অধ্যাপকমণ্ডলীর উপরেই ন্যস্ত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারকে বলা হইত 'সর্ব্বাধ্যক্ষ' বা প্রধানাচার্য্য। বিভাগীয় কর্ম্মপরিচালনা ও নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা অধ্যাপকগণই করিতেন। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে, সুদীর্ঘ সাত শত বৎসরের মধ্যেও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম ভঙ্গের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই।

আহার, বাসস্থান, অধ্যয়নাদির জন্য ছাত্রদের কোন অর্থ ব্যয় হইত না, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষই ব্যয়ভার বহন করিতেন। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় নালন্দায় অবস্থান কালে তাঁহার দৈনন্দিন খাদ্যের একটি তালিকা পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এইজন্য তাঁহাকে কোন অর্থব্যয় করিতে হইত না। তৎকালে মগধে উৎপন্ন মহাশালি চাউল 'রাজা', মহারাজা এবং সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাধারণের ভাগ্যে জুটিত না। দৈনিক এক পেক্ (১৪ আউন্স বা ৭ ছটাক) মহাশালি চাউল হিউয়েন সাঙ আহারের জন্য পাইতেন। ইহা ব্যতীত বিশটি বাদাম জাতীয় ফল, এক শত বিশটি বাতাবি লেবু (বর্ত্তমান সময়ে মৌসম্বী জাতীয় ফল?) এক আউন্স কর্পূর এবং দুগ্ধ ও মাখন প্রয়োজনাতিরিক্ত পাইতেন।১১ হিউয়েন সাঙের সময়ে নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজার, ইৎসিঙের সময়ে ছিল তিন হাজারের অধিক।

প্রবেশাধিকার

চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং তখনকার কালের প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন পর্য্যন্ত একটি পাঠক্রম বর্ণনা করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে ছয় বৎসর বয়সেই "সিদ্ধিরস্তু"

৮ মূর্ত্তি ও মন্দির—রমাপ্রসাদ চন্দ, পৃ. ৩

৯ বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম্ম—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬

১০ *Harsha*—Dr. R. K. Mukherjee, p. 130

১১ *Ancient India Education*—Dr. R. K. Mukherjee, p. 571

(সিদ্ধিলাভ হউক) নামক তিন শত শ্লোক সম্বলিত একখানি পুস্তক পাঠ আরম্ভ করা হইত। আট বৎসর বয়সে পাণিনির ব্যাকরণ পাঠ সুরু হইত। ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিতে বারদ বর্ষ অতিবাহিত হইত। ব্যাকরণের পরে হেতু বিদ্যা ও অভিধর্ম কোষ পাঠ আরম্ভ হইত এবং সর্বশেষে নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া পাঠ সমাপ্ত করা হইত।১২ ইৎসিঙের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, ছাত্রদের বিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হইত না। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকেই প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত, কিন্তু প্রবেশ লাভের যোগ্যতালাভ দেশ-দেশান্তর হইতে আগত ছাত্রগণ, দ্বারপণ্ডিতদের নিকট নিজেদের উচ্চ-শিক্ষা লাভের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিত। এই পরীক্ষা এত কঠিন ছিল যে, প্রতি দশ জন প্রবেশপ্রার্থী ছাত্রদের মধ্যে সাত-আট জনকেই ব্যর্থতার দুঃখে ভারাক্রান্ত চিত্তে ফিরিয়া যাইতে হইত।১৩ চীন, তিব্বত, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্রগণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন।

নালন্দার পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ ও ইৎসিঙের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য। ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতের সমগ্র জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা নালন্দার পাঠ্য সূচীতে দেখা যায়। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পাঠ্য সূচীতে স্থান লাভ করিয়াছিল : ১। চতুর্ব্বেদ, ২। বৌদ্ধহীনযান ধর্ম্ম পুস্তক- ৩। মহাযান ও অষ্টাদশ শাখার (মহাসাঙ্ঘিক ৭, থেরবাদী ১১) তত্ত্বনিচয়, ৪। হেতুবিদ্যা বা ন্যায় শাস্ত্র, ৫। শব্দবিদ্যা বা ব্যাকরণ, ৬। রসায়নশাস্ত্র, ৭। চিকিৎসা বিদ্যা, ৮। যাদুবিদ্যা, ৯। যোগশাস্ত্র, ১০। জ্যোতিষ বিদ্যা, ১১। ব্যবহারিক শাস্ত্র, ১২। শিল্প স্থান বিদ্যা, ১৩। ধাতু-বিদ্যা, ১৪। তান্ত্রিক বৌদ্ধ শাস্ত্র।১৪

হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন যে, নালন্দার শিক্ষক ও ছাত্রের নিকট প্রশ্নোত্তর জিজ্ঞাসা ও আলোচনার পক্ষে গোটা দিনটিও যথেষ্ট ছিল না। বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানে আলোচনা ও বিতর্কের বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষণীয় বিষয়ের তাৎপর্য্য উপলব্ধির উপরেই বেশি জোর দেওয়া হইত বলিয়া মনে হয়। আবৃত্তির উপরে তক্ষশিলার ন্যায় নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিত। মৌলিক প্রবন্ধাদি রচনায় নালন্দা-পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল। বক্তৃতা অভ্যাসের উপরে বেশী জোর দেওয়া হইত। তপোবন-প্রবর্তিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা এইস্থলে সমষ্টিগত বা শ্রেণী শিক্ষায় পর্য্যবসিত হওয়ায় বক্তৃতা পদ্ধতির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। হিউয়েন সাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৈনিক এক শতটি বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল এ কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপনার জন্য আটটি বড় হলঘর এবং তিন শত প্রকোষ্ঠের বর্ণনা ইউসিঙেএর লেখায় পাওয়া যায়।

নালন্দা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত পরীক্ষার পরে উপাধি দানের ব্যবস্থা ছিল। তক্ষশীলায় ন্যায় মৌলিক পরীক্ষা গ্রহণের রীতি এখানেও প্রচলিত ছিল—তবে পরীক্ষণীয় বিষয়-সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দশ হাজার ছাত্রের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারীকে 'কুলপতি' আখ্যা দেওয়া হইত, কুলপতির নীচেকার স্তরের উপাধি ছিল 'পণ্ডিত'।

তিব্বতীয় লেখকের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, নালন্দা মহাবিহারে 'ধর্মগঞ্জ' নামক স্থানে, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক ও রত্ন-দধি নামক সুরম্য প্রাসাদে তিনটি উন্নত ধরণের পাঠাগার ছিল। 'রত্নসাগর' নামক একটি নয়তলা প্রাসাদে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পাঠাগারটি অবস্থিত ছিল। অগ্নিকাণ্ড এবং মুসলমানদের আক্রমণের ফলে এই পাঠাগার কয়টির মূল্যবান পুস্তক সকল নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তিব্বতীয় তালিকায় কেবলমাত্র তাহাদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে নালন্দার শিক্ষা-পদ্ধতিই ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক। এই যুগের ভারতীয় ঐতিহ্যে নালন্দার পণ্ডিতদের দান সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। হিউয়েন সাঙ এই সকল অধ্যাপকের নিকটে পাঠ গ্রহণ করায় ধন্য হইয়াছিলেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বত এই সকল জ্ঞানী শিক্ষককে, তাহাদের দেশে গিয়া জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করিবার অনুরোধ জানাইয়া সাদরে আমন্ত্রণ করিয়াছিল।

শীলভদ্রের পূর্ব্বে নালন্দার সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন কাঞ্চিদেশের ধর্মপাল। সমতট-নিবাসী ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজবংশের সন্তান নালন্দার সর্ব্বাধ্যক্ষ শীলভদ্রের খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি 'সদ্ধর্মনিধি' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে তিব্বতীয় 'ত্যঙ্গুরে' 'আর্য্যভূমি-ব্যাখ্যান' নামক একখানি গ্রন্থের অনুবাদ এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র নামক নালন্দার পণ্ডিতদের কথাও হিউয়েন সাঙ লিখিয়া গিয়াছেন। ইৎসিঙের বর্ণনাতেও ধর্ম্মপাল, শীলভদ্র এবং গুণ-মতির উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমির অধি-

---

১২ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—ডা: প্রফুল্ল ঘোষ পৃ. ১৫৮

১৩ *On Yuan Chwang's Travels in India*—Walters, vol. II, p. 168

১৪ 'নালন্দা খননের ফলে অনুমান হয় যে, ৬নং বিহারের উপরতলার প্রাঙ্গণে যে উনানগুলি দেখা যায় তাহাতে ছাত্রদের কিছু রাসায়নিক বিদ্যা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। ১৩ নং চৈত্যের উত্তরে যে উনানগুলি দেখা যায় তাহা ধাতু গলাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমান করা যায়।

বাগ্মী বলিয়া কথিত চন্দ্রগোমী নালন্দার অন্যতম খ্যাতিমান অধ্যাপক ছিলেন। নালন্দার অপর একজন শিক্ষক চন্দ্রকীর্তির ছাত্র বলিয়াও অনেকে চন্দ্রগোমীকে মনে করেন। চন্দ্রগোমী কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায় ও তান্ত্রিক শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

নালন্দার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শান্তরক্ষিতের নাম তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সহিত যুক্ত। এই সম্পর্কে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তিব্বতীয় উপদেবতাদের অত্যাচারের কোন প্রতিকার করিতে না পারায়, শান্তরক্ষিতের অনুরোধে তিব্বতরাজ নালন্দা হইতে যোগাদতন্ত্র শাস্ত্রে পণ্ডিত পদ্মসম্ভব (শান্তরক্ষিতের ভগ্নীপতিকে) তিব্বতে আমন্ত্রণ করেন। তিনি তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে ক্রিয়াকলাপাদি করিয়া উপদেবতার কোপ হইতে তিব্বতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কমলাশীল নামক নালন্দার আর একজন পণ্ডিত তিব্বতে শান্তরক্ষিতের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কমলাশীল প্রমুখ পণ্ডিতদের সময়ে নালন্দা পাল-সম্রাট ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল।

প্রাচীন নালন্দা ছিল এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধভিক্ষু মৌদগলীপুত্র তিষ্যের অনুপ্রেরণায় সম্রাট অশোক যে ধর্মবিজয়ের সূচনা করিয়াছিলেন, কয়েক শতাব্দী পরে নালন্দায় তাহার বিজয়ভেরী পুনরায় নিনাদিত হইল। ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ইৎসিং, সেংচি প্রভৃতির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙের পূর্বে হিউয়েন চাও নামক একজন চৈনিক শ্রমণ জীনপ্রভ ও রত্নসিংহ নামক দু'জন পণ্ডিতের নিকট নালন্দায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইৎসিংয়ের বর্ণনায় উহিং নামক আর একজন চীনদেশীয় শ্রমণের নালন্দায় পাঠের কথা জানিতে পারি। মঙ্গোলীয়া হইতেও শিক্ষার্থীরা এই সময়ে নালন্দায় অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। আওভিং, লুই-তা, তাও-হি, হুই-লা, তাও, তাও-সিং, তাও-লিপ প্রভৃতি চীনদেশীয় শ্রমণগণ, তিব্বত রাজমন্ত্রী থাও-মি এবং কোরিয়া হইতে আগত আর্যবর্মার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মুসলমান উদ্বাস্তু সম্বন্ধে কিছু তথ্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

ইংরেজ আমলে রাজ্য-শাসনের সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার বিবিধ তথ্য সংগ্রহ ও সঙ্কলন করিতেন, কিন্তু তাহার বহুলাংশ সরকারী দপ্তরখানায় ফাইল চাপা পড়িয়া থাকিত। দেশ স্বাধীন হইবার পর দেশের নানা সমস্যার সমাধানকল্পে আমাদের দেশের মন্ত্রীরা বহু তথ্য সংগ্রহ ও সঙ্কলন করিতেছেন। সেগুলি ছাপাও হইতেছে; কিন্তু সাধারণ্যে সেইগুলি প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে না। ১৯৫০ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে অনেক মুসলমান উদ্বাস্তু হইয়াছেন। কেহ কেহ পাকিস্থানবাসী হইয়াছেন; কেহ কেহ বা পাকিস্থানে গিয়া আবার ভারতরাষ্ট্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫১ সালের মে-জুন মাসে বাড়ী বাড়ী লোক পাঠাইয়া ইহাদের সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। এইগুলি পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বইখানির নাম *Report on the Survey of Non-migrant displaced Muslims in West Bengal*।

যে সকল মুসলমান ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর পর উদ্বাস্তু হইয়াছেন, কিন্তু পাকিস্থানে যান নাই তাঁহাদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল:

১নং কোষ্ঠা

কোথায় বর্তমানে আছেন	পরিবারের সংখ্যা	লোকের সংখ্যা	প্রতি পরিবারে জনসংখ্যা
কলিকাতা ও হাওড়া	৪,০৮৬	১৬,৫০২	৪.০
অপরাপর শহর অঞ্চল	৩,৭৭০	১১,৪০০	৩.০
পল্লী অঞ্চল	৪,৭৩৬	২০,৯১৩	৪.৪
মোট	১২,৫৯২	৪৮,৮১৫	৩.৮

২নং কোষ্ঠা

যে সকল মুসলমান-পরিবার ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর পর পাকিস্থানে গিয়াছিলেন এবং ইদানীং ভারতরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন:

বর্ত্তমান অবস্থান	পরিবারবর্গের সংখ্যা
কলিকাতা ও হাওড়া	৫৬২
অপরাপর শহরসমূহ	২,৩৫১
পল্লী-অঞ্চল	১৮,৭৬১
মোট	২১,৬৭৪

এইবার উদ্বাস্তু মুসলমান-পরিবারে গড়পড়তা লোক-সংখ্যার হিসাব দেওয়া যাইতেছে। সাধারণের ধারণা যে, প্রায় প্রত্যেক মুসলমানই চারটি করিয়া 'নিকাহ' করে; ফলে প্রতিটি মুসলমান-পরিবারের পোষ্যের সংখ্যা অত্যধিক হইয়া থাকে। এই ধারণা যে কিরূপ ভ্রমাত্মক তাহা নিম্নে প্রদত্ত পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যাইবে:

৩নং কোষ্ঠা

উদ্বাস্তু মুসলমান-পরিবারের জনসংখ্যা:

জনসংখ্যা	কোথায় বাস করিতেছেন: কলিকাতা ও হাওড়া	অন্যান্য অঞ্চল	মোট পরিবারের সংখ্যা
১	৫৭৩	১,৭১৫	২,২৮৮
২	৫৬৮	১,৪০৭	১,৯৭৫
৩	৭৬০	১,২০১	১,৯৬১
৪	৭০৩	১,২৭৪	১,৯৭৭
৫	৫৩১	১,১৩৫	১,৬৬৬
৬	৩৮৭	৬৪১	১,০২৮
৭	২২৮	৩৩৭	৫৬৫
৮	১৩৫	৩১২	৪৪৭
৯	৮৯	২৯০	৩৭৯
১০ বা ততোধিক	১১২	১৯৪	৩০৬
মোট	৪,০৮৬	৮,৫০৬	১২,৫৯২

উপরের কোষ্ঠা হইতে দেখা যায় যে, অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান-পরিবারে জনসংখ্যা চারের কম। পরিবারের মধ্যে মাত্র একজন লোক দিনমজুরি করিয়া খায় বা কলকারখানায় চাকুরি করে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে এইরূপ লোকের অনুপাত প্রায় শতকরা সতের জন।

২৪ পরগণা, কলিকাতা ও হাওড়া জেলায় মুসলমান-উদ্বাস্তুর সংখ্যা বেশী। শতকরা হিসাবে যথাক্রমে ৩৯, ২২ ও ১৬ জন। কিন্তু ইহারা উদ্বাস্তু হইলেও জেলা ছাড়িয়া বাহিরে যান নাই।

হাওড়া জেলার ২০০৬টি উদ্বাস্তু-পরিবারের মধ্যে ১৫৫৮টি পরিবার হাওড়াতেই বাস করিতেছেন। ২৪ পরগণা জেলার ৪৯০৪টি পরিবারের মধ্যে ৪৪৫৭টি ২৪ পরগণায় অবস্থান করিতেছেন। আর কলিকাতায় এইরূপ ২৭৪০টি পরিবারের মধ্যে ২৩৮৩টি পরিবারই কলিকাতার বাসিন্দা। সরকারী রিপোর্টে একটি বিষয়ের উল্লেখ নাই. কিন্তু উদ্বাস্তু মুসলমানদের সম্বন্ধে যাঁহারা ওয়াকিবহাল তাঁহারা জানেন যে, বাস্তুহারা মুসলমানেরা মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে বাস করিতেছেন। ফলে মুসলমানদের সংহতি বৃদ্ধি পাইতেছে।

এক্ষণে মুসলমান উদ্বাস্তুদের বসবাসের বর্ত্তমান ব্যবস্থা কিরূপ, বাস্তুহারা হইবার আগেকার সময়ের তুলনায় তাহাদের সুবিধা না অসুবিধা হইয়াছে তাহা নিম্নের কোষ্ঠাটি হইতে পরিস্ফুট হইবে।

বাস্তুহারা হইবার পূর্ব্বে মুসলমান পরিবারসমূহের বাসস্থানের কিরূপ স্বত্ব বা অধিকার ছিল এবং উদ্বাস্তু হওয়ার পরে কিরূপ হইয়াছে তাহা ইহা হইতে বোধগম্য হইবে:

৪নং কোষ্ঠা

উদ্বাস্তু হইবার পরে	উদ্বাস্তু হইবার পূর্ব্বে: ভাড়াটিয়া	নিজস্ব	অন্যান্য	মোট
ভাড়াটিয়া	৪,৩৩৮	২,৭৭৪	১১৪	৭,২২৬
নিজস্ব	৯৯	৮৩৮	৩৪	৯৭১
অন্যান্য	১,০৭৮	৩,১৫৬	১৬১	৪,৩৯৫
মোট	৫,৫১৫	৬,৭৬৮	৩০৯	১২,৫৯২

(উপর হইতে নীচে পড়িলে পূর্ব্বেকার অবস্থা; আর বাম দিক হইতে ডান দিকে পড়িলে উদ্বাস্তু হইবার পরের অবস্থা বুঝা যাইবে।)

উদ্বাস্তুদের মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর অর্থাৎ ১২,৫৯২টির মধ্যে ৬,৭৬৮টি পরিবার স্বগৃহ বা বাস্তুচ্যুত হইয়াছেন। যাঁহারা স্বগৃহচ্যুত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ৮৩৮টি পরিবার ইতিমধ্যেই (দেড় বৎসরের ভিতরে) পুনরায় নিজেদের বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ভাড়াটিয়া গৃহে বাস করিতেন তাঁহাদের অনুপাত ছিল শতকরা ৪৪ জন। উদ্বাস্তুদের মধ্যে এই অনুপাত বাড়িয়া হইয়াছে শতকরা ৫৭ জন, অর্থাৎ ভাড়াটিয়া গৃহে বাসিন্দার সংখ্যা এখন শতকরা ১৩ জন বেশী।

মুসলমান উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে যে পরিমাণ চাষের জমি বাস্তুহারা হইবার পূর্ব্বে ছিল ও পরে হইয়াছে তাহা নিম্নের কোষ্ঠা হইতে বুঝা যাইবে:

৫নং কোঠা

চাষের জমির পরিমাণ	উদ্বাস্তু হইবার পূর্ব্বে পরিবারের সংখ্যা	ও পরে পরিবারের সংখ্যা
১ একর পর্য্যন্ত	৮৪২	১৭৭
১—২ "	৩৬২	৮২
২—৩ "	৩৩৫	৭১
৩—৪ "	২০৩	৪০
৪—৫ "	১১৮	১১
৫—৬ "	৮০	২
৬—৮ "	১৩৮	৪০
৮—১০ "	১৩৮	৩০
১০—১৫ "	১৬৩	৪০
১৫—২০ "	৪১	২১
২০—৩০ "	৩১	—
৩০—৪০ "	৪	—
মোট	২,৪৫৫	৫১৪

উদ্বাস্তু মুসলমান পরিবারসমূহের মধ্যে ২,৪৫৫টির চাষের জমি ছিল। অর্থাৎ মোটামুটি প্রতি পাঁচটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবারের চাষের জমি ছিল। গড়ে এই জমির পরিমাণ ছিল সাড়ে এগার বিঘা। এই তথ্য হইতে ইহাও অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, চাষী মুসলমানরা তত সহজে উদ্বাস্তু হয় নাই, যত সহজে বাস্তুহারা হইয়াছে শহরের কারখানার কুলি-মজুররা। ইহার হেতু এই যে, পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের মধ্যে মুসলমান চাষীরা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। তাহা এই—যাহারা ভূমি লাভ করিয়াছে তাহাদেরও গড়পড়তা জমির পরিমাণ সাড়ে এগার বিঘা।

এইবার বাস্তুহারা হইবার পূর্ব্বে উদ্বাস্তু মুসলমানদের আয় কি পরিমাণ ছিল এবং উদ্বাস্তু হওয়ার পরে কিরূপ হইয়াছে তাহার একটি হিসাব নিম্নের কোঠায় পাওয়া যাইবে। যাহারা পরমুখাপেক্ষী বা ভিক্ষা করিয়া জীবন-ধারণ করিত তাহাদের মাসিক আয় ০ বলিয়া দেখান হইয়াছে। যে-সকল পরিবারের গড়পড়তা মাসিক আয় ৫১ টাকা হইতে ১০০ টাকা সেগুলির মধ্যেই উদ্বাস্তুদের সংখ্যা খুব বেশী।

হিসাবটিতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ঐ পরিমাণ অর্থ-উপার্জ্জনকারীর সংখ্যা বাস্তুহারা হইবার পূর্ব্বে যত ছিল, উদ্বাস্তু হইবার পর তাহার তুলনায় খুব বেশী হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই, কমিয়াছে মাত্র কয়েক শত। ফিরিওয়ালা, ছোট-খাটো ব্যবসাদার, কল-কারখানার মজুর প্রভৃতি এই শ্রেণী-ভুক্ত। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উদ্বাস্তু হইবার পর গড়ে উদ্বাস্তুদের আয় কমিয়াছে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ১৯৮ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭৪০ হইয়াছে।

৬নং কোঠা

আয়ের পরিমাণ মাসিক	উদ্বাস্তু হইবার পূর্ব্বে	ও পরে
০	১৯৮	৭৪০
১—৫০ টাকা	১,৭৭৭	৪,২৮৯
৫১—১০০ "	৫,৭৪২	৫,১৩০
১০১—২০০ "	১,১৯৪	৫৬৯
২০১—৩৫০ "	১,১০৭	৪৪০
৩৫১—৫০০ "	২৫৩	৪৯
৫০১—৭৫০ "	৮৬	১৪
৭৫১—১০০০"	২৩	৫
১০০০ টাকার উপর	২১	২
মোট	১২,৫৯২	১২,৫৯২

এই প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্যগুলি মুসলমান উদ্বাস্তুদের নিকট হইতে সংগৃহীত। তাঁহারা কতখানি বানাইয়া বা বাড়াইয়া বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধেও সরকার কিছু কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অবগত হওয়া যায়।

শতকরা ৪৮·৮টি পরিবারের লোকেদের উক্তিতে বড় রকমের গরমিল (major discrepancy) ধরা পড়িয়াছে। শতকরা ২·১টি পরিবার—যাঁহারা ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে উদ্বাস্তু হইয়াছেন, তাঁহারা ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরে বাস্তুত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন। খোঁজ লইয়া জানা গিয়াছে যে, শতকরা ৩·৫টি পরিবার পূর্ব্বে যেখানে থাকিতেন বলিয়াছেন আসলে সেখানকার বাসিন্দা তাঁহারা ছিলেন না। শতকরা ১৩·৩টি পরিবারকে পূর্ব্বের ঠিকানায় কেহই জানিত না। সম্পত্তি সম্বন্ধে অত্যুক্তি করিয়াছেন শতকরা ৬·৬টি পরিবারের লোকেরা। শতকরা ২·১টি পরিবারের সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন-রূপ তদন্ত সম্ভব হয় নাই। শতকরা ২৩·৬টি পরিবার সঠিক ভাবে পূর্ব্বের ঠিকানা বলিতে পারেন নাই।

অচিরেই এই সব তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করা পশ্চিম-বঙ্গ সরকার তথা ভারত-সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য।

কি ছিল, কি হ'ল ?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

১

উদ্বাস্তু ! কথাটা যেন গালাগালি। কিন্তু, কেন ? কার প্রয়োজনে—কে আমাকে উদ্বাস্তু করেছে ? তোমাদের বাস্তু আছে—আমার নেই। জিজ্ঞাসা করি—কেন নেই ?

একদিন তো ছিল ? আমার ঘর ছিল, বাড়ী ছিল। দুধোলো গরু, চাষের জমি, একজোড়া লাঙল—কি না ছিল আমার ? 'কি ছিল, আর হ'ল !' সেকথা যখন ভাবি তখন যেন একেবারে পাগল হয়ে যাই। আমার বাহুতেও ছিল বল, বুকেও ছিল সাহস। আর আজ ? আজ আমি যেন নিরুদ্দেশের যাত্রী ! সর্বহারা উদ্বাস্তু ! কিন্তু কেন ?

এই কেনর সঠিক জবাব নিবারণ তার মনের ভিতর খুঁজে পাচ্ছে না। নিষ্প্রভ চোখ দুটি জলে ভরে উঠছে। বিশীর্ণ গণ্ডে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

শীতের সকাল। নগ্ন গাত্রে রোদে বসে নিবারণ ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। কাঁধের উপর আছে একখানা অতি মলিন ছিন্ন গামছা—

আজ দু'দিন নিবারণ এখানে এসে পৌঁছেছে। বহু বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়ে, ছেলে ও মেয়ে সঙ্গে নিয়ে পূর্ব্ব পাকিস্থান-সীমান্ত পার হয়েছে।

এক মাস আগে সে এসেছিল খুলনায়। সেখানে তার স্ত্রী কলেরা-রোগে মারা গেছেন। মরবার আগে, কন্যা মাধবীর হাতখানা স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে, সতীলক্ষ্মী অনুরোধ জানিয়ে গেছেন—'সর্ব্বস্ব হারিয়েও আমার মায়ের সম্ভ্রম যাতে রক্ষা পায় সে চেষ্টা করো !' মাধবীর বয়স মাত্র তের বৎসর।

নিবারণের একমাত্র ছেলে দুলালের বয়স আট বছর। সর্ব্বস্বান্ত ও পথশ্রমে ক্লান্ত এই বালকটিও আজ দু'দিন উপবাসী। মেয়েটির চেয়েও অবুঝ ছেলেটা বেশী কাতর হয়ে পড়েছে খিদের জ্বালায়।

কাঁদো-কাঁদো সুরে দুলাল ডাকল—বাবা !

—কি বাবা ? নিবারণ দুলালকে কোলের ভিতর টেনে নিলে।

—আজও কি কিছু খেতে পাব না ?

মাধবী শুনেছিল—নিকটেই কোথায় নাকি চাল ডাল বিতরণ হচ্ছে। খুঁজে খুঁজে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার 'রিফিউজি কার্ড' আছে ?

ইংরেজী কথাটার মানে সে বুঝল না। অবাক হয়ে চেয়ে রইল মুখের দিকে। দেখল অনেকেই এক-একখানা কাগজ দেখিয়ে চাল ডাল নিয়ে যাচ্ছে। কাগজখানা যে কোথায় পাওয়া যায়, তাও সে জানে না। বহুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হতাশভাবে ফিরে এল গাছতলায়।

সেই গাছতলায় অন্য দিকে বসেছিলেন—পূর্ব্ববঙ্গের কোন অখ্যাত-পল্লীর ক্ষুদে জমিদার দীনেশবাবু। বয়স তাঁর ষাটের কোঠায়। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল—সৌম্য ও সুদর্শন চেহারা। স্বাস্থ্যের প্রতি বেশ যত্ন আছে। বয়সে ভাঁটা পড়লেও যৌবনশ্রী এখনও উবে যায় নি। গাছতলায় বসেও গোঁফদাড়ি কামিয়ে মুখখানি পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টা করছেন।

দীনেশবাবুর চেয়ে বয়সে প্রায় দশ বছরের ছোট হলেও, তাঁর গৃহিণী পদ্মাবতীকে বৃদ্ধা বলা চলে। দাঁত তাঁর একটিও নেই—সব বাঁধানো। চুলে পাক ধরেছে, দীনেশবাবুর চেয়েও ঢের বেশী।

একটা ষ্টীল ট্রাঙ্কের উপর বসে—দীনেশবাবু নির্নিমেষ চোখে চেয়ে ছিলেন নিবারণের দিকে। চারদিকে ছড়ান রয়েছে—তিন চারটে সুটকেস্ ও গোটা দুই বিছানা, কয়েকটা বড় বাল্তি ও বস্তা ভর্ত্তি গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় বহুবিধ জিনিষপত্র। একটা ছোট বাল্তিতে হুঁকো-কল্‌কে ও তামাকের সরঞ্জাম।

দীনেশবাবুর বিশ্বাসী চাকর বেঁটে ধনঞ্জয় সঙ্গেই আছে। তাকে ডেকে বললেন, দে রে ধনা, একটু তামাক দে…

পদ্মাবতী রান্না চাপিয়েছেন। ইট পেতে উনুন তৈরি করে, চালে-ডালে খিচুড়ি পাকানো হচ্ছে। প্রায় আধ-ডজন ছেলে-মেয়ে যথেচ্ছ ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক ও কলহাস্যে বৃক্ষতল মুখরিত করে তুলছে। বাবার মুখে শুনেছে—তারা নাকি পেয়েছে—'ভিটেছাড়া-স্বরাজ !' তাই তাদের নামকরণ হয়েছে—উদ্বাস্তু।

বেশ মজাটি ! সম্পূর্ণ অপরিচিত আবহাওয়ায়, মুক্ত আলো-বাতাসে—এমন বনভোজনের নির্ম্মল আনন্দই কি উদ্বাস্তুদের স্বরাজ বা স্বাধীনতা ? স্কুলে যাওয়ার তাগিদ নেই—মাষ্টারের রাঙা চোখের ভয় নেই—এমন কি কোনও বিষয়েই কোনও নিয়ম-নিষ্ঠার উৎপীড়ন নেই। সত্যিই আজ তারা বন্ধনমুক্ত স্বরাট্ বা স্বাধীন ! তারা প্রার্থনা করছে—হে ভগবান ! আমাদের চির দিনের জন্যে 'উদ্বাস্তু' কর।

দীনেশবাবুর বড় ছেলে—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও মফস্বল-শহরের ডেপুটি। তাকে 'তার' করা হয়েছে—সে

আসবে ট্যাক্সি নিয়ে। বাপ-মা আর ছোট ভাই-বোনদের কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে।

ডেপুটির পিতা দীনেশবাবুর এ দুর্গতি সাময়িক। কলকাতা পৌঁছাতে পারলেই যা-হোক একটা সুরাহা হবে। কিন্তু নিবারণের উপায় কি? ছেলেমেয়ে নিয়ে সে কোথায় যাবে?

পদ্মাবতীর মুখের দিকে চেয়ে দীনেশবাবু ভাবছেন নিবারণের কথা। নিবারণরা বাঁচবে কি করে? তাদের হাত ধরে ডাঙায় তুলবার শক্তি ও সামর্থ্য কি কারো নেই? থাকলেও তারা কি এগিয়ে আসবে? মানুষের স্বার্থপরতা ও নীচতা দিন দিন যেরূপ বেড়ে উঠছে, তাতে এই উদ্বাস্তু-সমস্যার কোনও সুষ্ঠু সমাধান যে হবে সে ভরসা দীনেশবাবু করেন না। তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস—ওই সব হতভাগ্য নিবারণরা সাঁতার-না-জানা মানুষের মত অতলে তলিয়ে যাবে—কেউ তাদের জন্যে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না।

কাঁদতে কাঁদতে দুলাল বলল, দিদি আজও কি ভাত জুটবে না?

সেই মা-হারা ছেলেটির গায়ে হাত বুলিয়ে মাতৃস্নেহেরই ষোল-আনা অভিব্যক্তি দেখিয়ে কুমারী মাধবী বললে, লক্ষীটি আমার, কাঁদিসনে—সহ্য কর্...

সে নিজেও কি সহ্য করতে পারছে? চোখ বুজে, আকাশের দিকে চেয়ে অদৃশ্য দেবতার কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানাল—ঠাকুর! আমি মরি, তাতে দুঃখ নেই—আমার এই ভাইটিকে রক্ষে কর...

ক্ষুধার কাতর এই দুটি অসহায় বালক-বালিকার করুণ মুখচ্ছবি দীনেশবাবুর অন্তরে যে আলোড়ন জাগিয়েছিল, রন্ধনরত পদ্মাবতী তা লক্ষ্য করেন নি। উনুনের উপর থেকে হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে দীনেশবাবুকে তিনি বললেন, থালা মাত্র একখানা আছে। তুমিই আগে গরম গরম খেয়ে নাও, তারপর ওরা খাবে তোমার পাতে...

দীনেশবাবু অন্যমনস্ক। পদ্মাবতীর কথা তাঁর কানে ঢুকেছে—মনে পৌঁছয় নি। পদ্মাবতী আবার বললেন, ওগো, শুনছ...?

—হ্যাঁ, দাও...বলেই দীনেশবাবু মাটির উপর থেকে থালাখানা তুলে দিলেন পদ্মাবতীর সুটকেসের উপর।

—ওমা! সুটকেসটা এঁটো হয়ে যাবে যে...

দীনেশবাবু হাসলেন। উচ্ছিষ্টের বিচার আর কর না পদ্মা! কোথায় যে যাচ্ছি আমরা, তা কি এখনও বুঝতে পারছ না?

—না না, ওর ভেতর আমার গীতাখানা আছে...

—তাই নাকি? তা হলে ত গীতাকে বাঁচাতেই হবে। আমরা মরি তাতে ক্ষতি নেই—আমাদের গীতা বেঁচে থাক। গীতার মর্য্যাদা বাড়িয়ে, গীতার ভগবানকে মাটিতে আছড়ানোই ত আমাদের নীতি...

দীনেশবাবু মাটিতে নেমে বসলেন। শীতের দিনে, খেজুরের কুণ্ডলী-পাকানো গরম ধোঁয়া ক্ষুধিত দুলালের নাকে পৌঁছেছিল। পদ্মাবতী একটা বোতলের মুখ খুলে খানিকটা টাট্‌কা ঘি ঢেলে দিলেন। দেশ থেকে আনা সেই খাঁটি গব্যঘৃতের সুঘ্রাণ কি চমৎকার! ঢোক গিলতে গিলতে দুলাল একটু এগিয়ে এসে দাঁড়াল। ছুটে এসে তার হাতখানা চেপে ধরে, খুব নীচু সুরে মাধবী বলল, ছিঃ! বাবু খেতে বসেছেন। ওই খাবারের দিকে নজর দিলে, ওঁর অসুখ করবে যে—এদিকে ঘুরে দাঁড়া...

নীচু গলায় বললেও মাধবীর কথাগুলি দীনেশবাবুর কান এড়াল না। গৃহিণীর দিকে কাতরভাবে চেয়ে দৃঢ়-কণ্ঠে বললেন, নাঃ, পদ্মা! খেতে পারব না...

—কেন?

—তোমার কি চোখ-কান নেই?

—যে দিনকাল পড়েছে—চোখ কান বুজে না খেলে তো অনাহারেই থাকতে হবে...

—তাই থাকব...চোখে মুখে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা জানিয়ে দীনেশবাবু হাত ধুয়ে সরে বসলেন। ধনাকে ডেকে বললেন—তামাক দিতে। আর, পদ্মাবতীকে বললেন—থালাখানা ধরে ওই ছেলেটাকে দিয়ে এস...

—আঃ, বাড়াবাড়ি করো না। খেয়ে নাও...

—কি বলছ তুমি? আর কত নীচের নামাতে চাও? শুনেছ—মেয়েটা কি বলেছে? 'বাবুর অসুখ করবে!' কি ভয়ানক কথা বল ত? আমার অসুখের ভয়ে ওরা মুখ ফেরাল? কুকুরের মত কেউ খেতে এলে হয় ত দূর্ দূর্ করে তাড়িয়ে দিতে পারতাম। এখন ওগুলো গিলব কি করে?

—শেষে ওদের দুমুঠো দেওয়া যাবে...

—না। আগে ওদের পেট ভরে খাওয়াও, তার পর আমরা খাব। আজ দু'দিন ওরা উপবাসী।

গাছের একটা ডাল ধরে দীনেশবাবু চেয়ে রইলেন দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের দিকে। তাঁর মনে পড়তে লাগ্‌ল—ছেড়ে-আসা পল্লীসমাজের কত সুখ-দুঃখের কথা। তিনি যে বাড়ী-ঘর ও বিষয়-সম্পত্তি ফেলে এসেছেন তার জন্যে একটুও দুঃখ নেই তাঁর। বৈষয়িক উত্থান-পতনের বহু ইতিহাস তিনি জানেন। কাল যে ধনী ছিল, আজ সে দরিদ্র হোক্, কাল যে দরিদ্র ছিল, আজ সে ধনী হোক্—এ ভাঙাগড়ার নিয়মকে তিনি অস্বীকার করতে চান না। কিন্তু জাতি হিসাবে বাঙালী যে অমানুষ হয়ে যাবে, তার শিক্ষা ও সংস্কারের বৈশিষ্ট্যকে আর

থাকতে থাকতে পারবে না, ষোল আনা আত্মসুখপরায়ণ হয়ে উঠবে—একজন বাঙালী হয়েও তিনি তা সহ্য করবেন কি করে? প্রাণের প্রাচুর্য্য হারালে বাঙালীর আর কি থাকবে?

দীনেশবাবুর মনে পড়ল—তাঁর বাবা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে লোক পাঠিয়ে খবর নিতেন—গাঁয়ের কোন লোক অভুক্ত আছে কিনা, তবে নিজে আহারে বসতেন। ততখানি কৃচ্ছ্রসাধন না করলেও, দীনেশবাবু কখনও কোন অতিথি বা অভ্যাগতকে অভুক্ত রেখে আহার করেন নি। আর আজ?

হাতখানা ধরে পদ্মাবতী বললেন—পাগলামি কর না। মানুষ যখন যে অবস্থায় পড়ে ব্যবস্থাও করে সেইরূপ…

—তাই নাকি? নিবারণের দিকে চেয়ে দীনেশবাবু বললেন—ওহে, এদিকে এস ত? তোমার নাম কি?

সসঙ্কোচে এগিয়ে এসে নিবারণ বলল—আজ্ঞে, নিবারণ পরামাণিক…

কঠোর আদেশের সুরে গম্ভীর ভাবে দীনেশবাবু বললেন—আমার সুমুখ থেকে ভাতের থালা কেড়ে নিয়ে, তোমার ছেলেমেয়ে দুটোকে খাওয়াতে পার?

—কি যে বলেন বাবু? যেন কোন গোপন-অন্যায়-ধরা-পড়া অপরাধীর মত নিবারণ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। মনে মনে ভাবল, বোধ হয় তার ক্ষুধিত ছেলেমেয়েদের লোলুপ দৃষ্টি ভদ্রলোকের আহারে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। তাই তিনি ভয়ানক চটে গেছেন। লজ্জিত ভাবে বলল—না না, আপনি সেবা করুন, ওদের আমি দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ওরে, চল চল—ওদিকে চল—বাবুর অসুবিধে হচ্ছে…

দীনেশবাবু বুঝলেন—এ কাড়াকাড়ির যুগে ওদের মত ভালমানুষেরা বাঁচতেই পারে না। যাদের ধর্ম্ম-শিক্ষা আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যে সমৃদ্ধ, পর-পীড়নের পাপ যাদের মনে নরকের বিভীষিকা সৃষ্টি করে—তারা ত এ যুগে মরে ভূত হয়ে আছে!

পদ্মাবতী এগিয়ে গেলেন। স্বামীর হাত ছাড়িয়ে দুলালকে আর মাধবীকে নিজের কাছে টেনে আনলেন। দীনেশবাবুর গাম্ভীর্য্য দেখে তারা যতখানি ভয় পেয়েছিল, মাতৃত্বের স্নেহ-শীতল করস্পর্শে তারা ঠিক ততখানি অভিভূত হয়ে পড়ল। একটা মেটে-পাত্র ধুয়ে মুছে তাতেই ঢেলে দিলেন খানিকটা খিচুড়ি।

চোখ মুছে মাধবী তার ভাইটির মুখে খিচুড়ি তুলে দিতে লাগল। পদ্মাবতীর অনুরোধ সত্ত্বেও নিজে এক গ্রাস খেল না। মাধবীর আচরণ দেখে দীনেশবাবু বললেন, তুমি খাচ্ছ না কেন?

মাধবী একটু হেসে বলল, আমি তো ভাইটির মত অবুঝ নই? আগে আপনাদের সেবা হোক্। তার পর যদি পাতে কিছু থাকে, আমি আর বাবা প্রসাদ পাব।

ডেপুটি নরেশবাবু টুরে বেরিয়েছিলেন। বাবার প্রেরিত তারবার্ত্তা তাঁর আপিসের টেবিলেই চাপা থাকল।…

সামনে শীতের রাত্রি। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন ট্যাক্সি এল না। ফাঁকা মাঠে গাছতলায় রাত্রিবাস! কি ভয়ানক কথা! পদ্মাবতীর চোখমুখ শুকিয়ে গেল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি উপায় হবে?

একটু হেসে দীনেশবাবু বললেন, নিজের কথাটাই ভাবছ? ওই নিবারণের কি উপায় হবে—তাও একটু ভাব। আমাদের জামাকাপড় আছে—বেডিং আছে—ওদের কিছু নেই! খানসামাকে বললেন বেডিং দুটো খুলে ফেলতে।

পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করলেন, নিকটে কি কোন লোকালয় নেই?

—না। দীনেশবাবু বললেন, আবার সীমান্ত পার হয়ে পাকিস্থানে যেতে হবে। যাবে? আমি কিন্তু রাজী আছি।

—রক্ষে কর…

—তা হলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে লেপ-তোষক চাপা দিয়ে শুয়ে পড়। তার পর আমরা দেখি কি করতে পারি…

নিবারণ বলল, ভাববেন না বাবু! রাতের ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি…

—কি করেছ?

—ওই বাগান থেকে দুটো শুকনো কাঠের গুঁড়ি আর ডালপালা এনে রেখেছি। সারা রাত জ্বলবে।

দীনেশবাবু সাগ্রহে বললেন, তা হলে আর দেরি কর না, জালিয়ে দাও। জানই তো, গায়ে জামাকাপড় থাকলেও—বাবুরা শীতে বড্ড কাবু…

—আজ্ঞে হ্যাঁ তা জানি বই কি। সুখের শরীর আপনাদের। আমাদের মত রোদেও পোড়েন নি, জলেও ভেজেন নি। নরোত্তম ঘোড়লের নাম শুনেছেন?

—না তো…

—শোনেন নি? নিবারণ বিস্মিতভাবে চেয়ে রইল মুখের দিকে। তার ভাব দেখে মনে হ'ল—'নরোত্তম' বোধ হয় দেশবন্ধু বা নেতাজীর মতই কোন বিখ্যাত ব্যক্তি, যার নাম না-শুনেছে এমন বাঙালীর সন্ধান নিবারণ আজ প্রথম পেয়েছে! সে বলতে লাগল—নরোত্তম লেঠেল মানুষ, এক-খানা লাঠিহাতে পাঁচ শ' পুলিসকে ঠেঙিয়ে, তিন দিন তিন রাত্তির লুকিয়ে ছিল একটা পানা-পুকুরের ভিতর। নরোত্তম বলে সবই অভ্যাস!

নরোত্তমকে না চিনলেও উপস্থিত নিবারণকে চিনতে পেরে দীনেশবাবু বেশ কৌতুক বোধ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পুলিসের হাতে বন্দুক ছিল না বোধ হয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিল। অনেক বন্দুক ছিল। নরোত্তম

এমনভাবে লাঠি ঘুরিয়ে ছিল যে, বন্দুকের গুলি লাঠিতে লাগে আর ছিঁটকে পড়ে যায়…হাত ঘুরিয়ে নরোত্তমের লাঠি ঘোরানোর কসরৎটিও একটু দেখিয়ে দিলে।

দীনেশবাবু বললেন, তা হলে আগুন জ্বালো নিবারণ। নরোত্তমের লাঠির গল্প শুনেই রাত্তিরটা কাটানো যাক্।

অতিরঞ্জন যদি আর্ট হয়—তা হলে এই নিবারণ যে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট সে বিষয়ে দীনেশবাবুর মনে কোন সন্দেহ রইল না।

নিবারণ আগুন জ্বালল।

সেই আগুন দেখে আরও কয়েকজন শীতার্ত উদ্বাস্তু এসে হাজির হ'ল সেখানে। তাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট আগন্তুককে দেখে নিবারণ লাফিয়ে উঠল।

—আরে, আরে—মোড়লের পো! তুমিও এসেছ দেখছি। তোমার কথাই বাবুকে বলছিলাম। অনেক দিন বাঁচবে…

—আরও অনেক দিন? ম্লানমুখে বৃদ্ধ নরোত্তম একটু হাসল।

নরোত্তম মোড়লের বয়স বাহাত্তর ছাড়িয়ে গেছে। বাচের নৌকায় অগ্রভাগে বসে যে কালো-বাবরিটা ঝেঁকে ঝেঁকে সে তার নিজের নৌকা সকলের আগে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিতে পারত—আজ তা একেবারেই দুধের মত সাদা। অযত্নবর্দ্ধিত সাদা গোঁফদাড়িতে ঢাকা মুখখানা দেখে এখন আর বুঝবার উপায় নেই যে, তার ওই দন্তহীন চোয়ালে একদিন কতখানি দৃঢ়তার অভিব্যক্তি ছিল। লোল চর্ম্মের নীচের পাকান-পাকান মাংসপেশীগুলি এখনও অতীত সামর্থ্যের সাক্ষী হয়ে আছে বটে, কিন্তু তাও নরোত্তম ঢেকে রেখেছে একখানা জীর্ণ গৈরিক চাদরে। লাঠিয়ালীতে ইস্তফা দেওয়ার সাক্ষী তার গলার তুলসীর মালাটা।

খুব নিবিষ্টভাবে দীনেশবাবু লক্ষ্য করলেন নরোত্তমকে। তারপর সুরু হ'ল সকলের সঙ্গে সকলের আলাপ-পরিচয়। দীনেশবাবু একে একে সবাইকে প্রশ্ন করতে লাগলেন—কার কোথায় বাড়ী? কে কি অবস্থায় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছে? কত সুখের সংসার ভেঙে এসে পথের ভিখারী হয়েছে?

সবার মুখেই একটি মাত্র প্রশ্ন—কার প্রয়োজনে হিন্দু মুসলমানের এ বিরোধ বেধে উঠল? সাত পুরুষ যারা একই মাঠে চাষ করেছে, একই মাঠের ধান ঘরে তুলেছে, একই বিলের মাছ খেয়েছে—একই আলোবাতাসে পরস্পরের সুখদুঃখের ভাগী হয়ে, পরম শান্তিতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেছে—তাদের মধ্যে এ আত্মঘাতী বিদ্বেষবুদ্ধি জাগিয়ে তুলল কে?

দীনেশবাবুর কাছে একটু এগিয়ে বসে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা বাবু আমরা তো মুখ্যু চাষা। আপনি কি একটু বুঝিয়ে দিতে পারেন—কেন এমন হ'ল?

দীনেশবাবু বললেন—এখন আর বুঝে লাভ কি? প্রতিকারের তো কোন উপায় নেই। তবে নিজের সান্ত্বনার জন্যে একটা কথা জেনে রাখতে পার—এ আমাদের পাপের শাস্তি—

—'পাপের শাস্তি'? নরোত্তম গর্জ্জে উঠল। 'কি পাপ আমরা করেছি বাবু? ব্রাহ্মণের পাদোদক খেয়েছি—তেত্রিশ কোটি ঠাকুরদেবতার কাছে মাথা খুঁড়েছি। পঞ্জিকার শুভাশুভ বিচার মেনে, দিন-ক্ষণ-নক্ষত্র গণনা করে যে কোনও কাজে পা বাড়িয়েছি—তবু আমাদের পাপ?

একটু থতমত খেয়ে দীনেশবাবু বললেন, না না, পাপটা তোমাদের নয়, আমাদের। আমরা যারা শিক্ষা ও সভ্যতার অহঙ্কার নিয়ে—সমাজের বুকে নেতৃত্বের দাবি করি তাদের। আমাদের প্রথম পাপ হচ্ছে—তোমাদের কিছু জানতে দিই নি বা বুঝতে দিই নি। সামাজিক সুযোগ ও সুবিধা ভোগের লোভে—তোমাদের রেখেছি অশিক্ষিত করে, অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে…

আরও অনেক উদ্বাস্তু এসে ঘিরে বসল সেই অগ্নিকুণ্ডকে। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল—তারপর? দ্বিতীয় পাপটার কথাও বলুন…

দীনেশবাবু বলতে লাগলেন—পৃথিবীর এই গণমুক্তির আন্দোলনের দিনে, আমরা বড্ড বেশী অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিলাম। তাই হঠাৎ রাজনৈতিক দাবার চালে হেরে গেছি। দিশেহারা হয়ে ঘরে-বাইরে বেসামাল হয়ে পড়েছি…

দীনেশবাবুর এ সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত অনেকেই বুঝল না। তিনিও আর বেশী আলোচনা করতে রাজী হলেন না। মনে মনে ভাবতে লাগলেন—আমাদের অহিংস-রক্তব্যূহের কোথায় ছিল একটা ফাটল, স্বার্থান্বেষী ব্রিটিশ তা জানত। তাই যাবার সময় আমাদের দুর্ব্বল-স্থানটিতে এমন আঘাত দিয়ে গেল যার ফলে আমাদের মেরুদণ্ড গেল ভেঙে। রক্তপাতহীন অহিংস-সংগ্রামের যত গৌরবই করি—একথা সত্যি যে, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর তাজা রক্ত আজ বাষ্পাকারে শুকিয়ে যাবে।

নরোত্তম ভাবছিল—অতীত জীবনের কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি। কায়িক শ্রমের বিনিময়ে পল্লীর বুকে গড়ে তোলা কত সমৃদ্ধির ইতিহাস।

নিস্তব্ধতা ভেঙে নিবারণ জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা বাবু আমরা কি বেঁচে থাকতে পারব?

দীনেশবাবু সংক্ষেপে বললেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে… কে যেন একজন বলে উঠল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শতকরা পাঁচ জনও তোমরা বাঁচবে না। কোন সরকারী তহবিলের সাধ্য নেই যে, এই বিরাট সমস্যার আংশিক সমাধানও করতে পারে। দেশের ধনীরা যদি এগিয়ে আসতেন—পাথরের সোমনাথের চেয়েও মানুষ সোমনাথের প্রতি

যদি তাঁদের বয়স বেশী থাকত তা হলে তোমাদের বাঁচিয়ে রাখা খুব কঠিন হ'ত না।

নরোত্তমের কোটরগত চোখ দুটি যেন আগুনের ফুলকির মত জ্বলে উঠল। হতাশার বাণী শুনতে শুনতে হঠাৎ একটু সোজা হয়ে উঠে বসল। পাকা বাবরিটা একটু ঝেঁকে বলল—না না, আমরা সে ভাবে মরব না। এখানে যদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখার কোন ব্যবস্থাই না হয় তা হলে আবার ফিরে যাব আমাদের বাপ-ঠাকুরদার ভিটের। সেখানে গিয়ে নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে লড়াই করে মরব তবু ভিক্ষের অন্নে বেঁচে থাকার লাঞ্ছনা সহ্য করব না।

এই সপ্ততিপর বৃদ্ধের সামাজিক সম্মানবোধ ও আত্ম-নির্ভরতার দাবি নিয়ে লড়াই করে বেঁচে থাকার উৎসাহ দেখে দীনেশবাবু বিস্মিত হলেন।

যিনি হতাশার বক্তৃতা শোনাচ্ছিলেন তিনি একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। দীনেশবাবু তাকে চিনতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, ওই বুড়োকে চেনেন ?

—খুব চিনি। স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করলে ওই বুড়ো হতে পারত একজন বিখ্যাত বীর—আদর্শ জননেতা। ওই বুড়োর মত চরিত্রবান্ ও সাহসী পুরুষসিংহের নেতৃত্বাভাব বাংলা আজ হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে। কিন্তু ওই বুড়ো তো বয়সের নাগাল পাবে না। শুনবেন ওর বিচিত্র জীবন-কাহিনী ?

—বলুন…

ঔপন্যাসিক বলতে আরম্ভ করলেন—

৩

আজ তুলসীর মালা গলায় বেঁধে পরম বৈষ্ণব সাজলেও, এক দিন নরোত্তম ছিল শক্তি-সাধক বীর-যোদ্ধা। যেখানেই দাঙ্গা সেখানেই নরোত্তম। কিন্তু সর্ব্বত্রই সে দাঁড়াত নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিকায়। কখনও কোন অত্যাচারী বা অত্যা-চারীর পক্ষ সমর্থন করে নি সে।

কালী-মন্দিরে গিয়ে মাকে একটা প্রণাম না করে বা তাঁর নির্ম্মাল্য মাথায় না নিয়ে নরোত্তম কখনও কোন দাঙ্গায় অবতীর্ণ হ'ত না।

গাঁয়ের কালী-বাড়ীটা ছিল যোতদারের তত্ত্বাবধানে, যদিও তার মালিক ছিলেন জমিদার। সেবায়েত-ঠাকুর এক দিন নরোত্তমের কাছে গিয়ে বললেন, নরোত্তম! দেবীর ভোগ-সেবা কি বন্ধ হয়ে যাবে ?

—কেন ঠাকুর ? বিস্মিতভাবে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল।

জমিদার তাঁর পূর্ব্বপুরুষের দত্ত জমিগুলো দখল করে নিয়েছেন…

সে কি ? নরোত্তমের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল।

তখনই সে ছুটে গেল জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে। জমিদারের মুখের উপর স্পষ্ট ভাষায় বলে এল—আপনার কোন লোক যদি মায়ের কোন জমির 'আইলে' গিয়ে দাঁড়ায়, তা হলে কাঁধে মাথা নিয়ে ফিরে আসবে না আর…

জমিদার অপমানিত হলেন। শুধু মাঠের জমি নয়, সেবায়েতকেও তাড়িয়ে মূল কালী-বাড়ীটা দখলের চেষ্টা আরম্ভ করলেন। গোপন ব্যবস্থা চলতে লাগল।

হঠাৎ এক দিন খবর এল—অজস্র লোক আসছে, কালী-বাড়ী দখল করতে। কি সর্ব্বনাশ! নরোত্তমের ধারণা ছিল—শুধু মাঠের জমিগুলির উপরেই জমিদারের লোভ। কালী-বাড়ী দখলের দুর্ব্বুদ্ধি যে তার মাথায় গজিয়ে উঠতে পারে সে কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

এইরূপ অতর্কিত আক্রমণের ফলে নরোত্তম ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়ল বটে, কিন্তু একটুও দমল না। বাড়ী বাড়ী ঘুরে নরোত্তম যোগাড় করল কয়েক ধামা পাকা লঙ্কা!

সেবায়েত-ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—এত পাকা লঙ্কা দিয়ে কি হবে নরোত্তম ?

নরোত্তম সে প্রশ্নের কোন জবাব দিলে না; পায়ের তলা থেকে এক মুঠো দূর্ব্বা ছিঁড়ে নিয়ে শূন্যে ছেড়ে দিয়ে দেখল বাতাসের গতি কোন্ দিকে! তার পর ভাইদের হুকুম দিল, কালী-বাড়ীর দক্ষিণ দিকে সাতটা ভিজে-খড়ের পালা সাজাতে।

কেউ বুঝতেই পারছে না—জমিদারের লোক-লস্করের বিরুদ্ধে মাত্র নিজের তিনটি ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নরোত্তম কি ভাবে লড়বে ? ভিজে-খড়ের পালার মধ্যে পাকা লঙ্কাগুলি ঢুকিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

ছোটভাই মনোহর এসে খবর দিল—বড়দা! জমিদারের লোকেরা দক্ষিণ ডাঙ্গার পথে আসছে!

—তাই তো আসবে। কতদূর এসেছে ?

—মাঠের প্রায় মাঝামাঝি…

—তা হলে আমি পালাগুলো ধরিয়ে দি'—তোরা কুলো এনে বাতাস কর।

সাতটা ভিজে খড়ের পালা অনর্গল ধূম উদ্গীরণ করতে লাগল। মাঠের দিক থেকে শোনা গেল—শুধু হাঁচি আর কাশির শব্দ! চোখের জ্বলুনি নিয়ে হতভম্ব হয়ে জমিদারের লোকেরা যে যেদিকে পারে, পালাতে আরম্ভ করল। ধূম্র-জালের আড়ালে দাঁড়িয়ে মা-কালীর দিকে চেয়ে—'জয় মা ধূমাবতী!' বলে নরোত্তম একটা প্রণাম করল।

নরোত্তম জানত—সেবায়েতের পক্ষে দাঁড়িয়ে জমিদারের সঙ্গে তার এই শক্তি পরীক্ষা এখানেই শেষ হবে না। জমিদারের আক্রমণ যে আরও সুপরিকল্পিত, আরও তীব্র হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্থানীয় দশখানা গাঁয়ের

লোক নরোত্তমের বিরুদ্ধে লাঠি ধরবে না, একথা সে জানে এবং লুকিয়ে দু-দশ জন সাহায্যও করতে পারে। তাই তো জমিদার আনছেন বহু অর্থব্যয়ে নদীর ওপার থেকে ভাড়াটে লেঠেল। তাদের এবার নরোত্তম এমন জব্দ করবে যে, জীবনে আর কখনও জমিদারের ডাকে সাড়া দেবে না।

নরোত্তমের তিনটি ভাই তারাচরণ, শশিচরণ ও মনোহর চিরদিনই জ্যেষ্ঠের অত্যন্ত অনুগত ও আদেশানুবর্তী। তাদের ডেকে নরোত্তম বলল—তিনখানা দা নিয়ে তিন জন আয়—কয় গাড়ী 'চ্যাঙা' কাটতে হবে।

তারাচরণ জিজ্ঞাসা করল—কেন? চ্যাঙা দিয়ে কি হবে?

নরোত্তম বলল—দু-এক দিনের মধ্যেই জমিদারের লোক আবার আসবে। সংখ্যায় তারা হবে আমাদের চেয়ে ঢের বেশী। লাঠি চালিয়ে আমরা ক'জনে এঁটে উঠতে পারব না। তোরা ক'জন তিন গাড়ী চ্যাঙা নিয়ে তিন দিকে ঘাঁটি করবি। আমি একলা থাকব কালী-বাড়ীর সিং-দরজায়। গেটের উপরকার সিংহ মূর্তিটার আড়ালে আমি দাঁড়াব এক বোঝা শড়কী নিয়ে—দেখব কোন শালা কালিবাড়ীতে ঢুকতে পারে।

নরোত্তমের অনুমান সত্যি হ'ল। তিন-চার দিনের মধ্যেই পঙ্গপালের মত সুসংবদ্ধ জনতা অগ্রসর হতে লাগল কালী-বাড়ীর দিকে। ঘোড়ার চড়ে একটা বন্দুক হাতে জমিদার নিজেই তাদের পুরোভাগে। তাঁর লক্ষ্য নরোত্তম। দৃষ্টিপথে পড়লেই গুলি করবেন। দুর্দ্ধর্ষ নরোত্তম এবার শেষ হবেই। কিন্তু কোথায় সে?

জমিদার ভাবতেন—দশখানা গাঁয়ের বিদ্রোহী প্রজারা সকলেই নরোত্তমের সমর্থনকারী। ঘেঁটো দাদার নরোত্তম এবার লাঠির কসরৎ দেখাবে, সে বিষয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এবার তারা দক্ষিণ-ভাদা দিয়ে আসছে না, অতএব ধূম্রজালের আড়ালে লুকানো আর চলবে না। কিন্তু কোথায় নরোত্তম? কোথায় তার লোকজন? কালী-মন্দিরের একশো গজের মধ্যে এসে পৌঁছানোর পরেও জমিদার কোন প্রতিবাদ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষণ দেখলেন না। ব্যাপার কি? এত সহজে কালী-বাড়ী দখল করা সম্ভব হবে, তা তো তিনি ভাবতেই পারছেন না?

হঠাৎ চারদিক থেকে—বোঁ বোঁ সন্ সন্ শব্দে ঝড়বেগে 'চ্যাঙা' আসছে। কোথা থেকে, কি ভাবে আসছে—কেউ তা বুঝতে পারছে না। কারও মাথা, কারও হাত-পা ভয়ানক-ভাবে জখম হতে লাগল। জমিদার 'ব্লাঙ্ক-ফায়ার' করলেন— তাতেও নিবৃত্তি নেই। হঠাৎ একটা শড়কী এসে জমিদারের উরু আর ঘোড়ার পেট একসঙ্গে গেঁথে ফেলল। ঘোড়া ছুটল ঘর-মুখো। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। কেউ আর কালী-বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে সাহসী হ'ল না।

নরোত্তমের শৌর্য্য ও বীর্য্যের গল্পকথা নানাভাবে পল্লবিত হয়ে দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই বিশ্বাস করল শক্তিসাধক নরোত্তম মা-কালীর বরপুত্র। গাঁয়ের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দীনবন্ধু সিদ্ধান্তরত্ন ও সদরের উকিল দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের মধ্যস্থতায় নরোত্তমের সঙ্গে একটা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে জমিদার বাধ্য হলেন। কিন্তু মনে মনে নরোত্তমকে এক বার 'দেখে-নেবা'র প্রবৃত্তি ত্যাগ করলেন না।

ক্রমশঃ

একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট

অধ্যাপক শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম-এ

কোন প্রকৃত গণতন্ত্র রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যাপারেই গণভোট গ্রহণ করিয়া তদনুসারে শাসনকার্য্য পরিচালনা করা অসম্ভব। প্রাচীন গ্রীসের "নগররাষ্ট্র"গুলিতে হয়ত উহা সম্ভব ছিল, কিন্তু আধুনিক বিস্তৃত রাষ্ট্রগুলিতে উহা কোনমতেই সম্ভব নহে। অথচ নিজ দেশের রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা ব্যাপারে প্রত্যেক দেশবাসী, তা সে যে দলভুক্তই হউক না কেন, নিজ নিজ মত জানাইবার অধিকারী। এইজন্য দেশের বা রাষ্ট্রের ব্যবস্থা-পরিষদ বা বিধান-পরিষদ সেই রাষ্ট্রের জনগণের সমস্ত দলের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হওয়া উচিত। সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিবার অধিকারী অবশ্যই সংখ্যাগুরু দল, কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারী সকলেই। কিন্তু সচরাচর প্রচলিত ভোটপ্রথায় এইরূপ সকল দলের প্রতিনিধি ব্যবস্থা-পরিষদে নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। সংখ্যাগুরু দলই অধিকাংশ "সীট" দখল করে। "একক হস্তান্তর যোগ্য" ভোটপ্রথা দ্বারা সদস্য নির্ব্বাচন করা হইলে কিন্তু এরূপ বেমানান সংখ্যাধিক্যের সম্ভাবনা থাকে না, গণতন্ত্রও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না, সংখ্যাগুরু দলের সংখ্যার অনুপাতে কর্ত্তৃত্ব বজায় থাকে এবং সংখ্যালঘু দলগুলিরও যথোচিত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হইতে পারে।

সাধারণ ভোট, যাহাকে 'Ballot voting' বা 'Block

voting' বলা হইয়া থাকে, তাহাতে অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অনুচিত প্রাধান্য স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট পদ্ধতিতে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যেক দল বা মতের প্রতিনিধি সংখ্যানুপাতে গ্রহণ করিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠিত হয়। যেমন ধরা যাক—একটি নির্ব্বাচনকেন্দ্রে ৯০০ ভোটার, তাহাদের মধ্যে ৫ জনকে নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ভোটারদের মধ্যে ৩০০ জন কংগ্রেস দলীয়, ২৪০ জন কম্যুনিষ্ট, ১৮০ জন সোস্যালিষ্ট এবং ১০০ জন হিন্দুমহাসভাভুক্ত। Ballot ভোট পদ্ধতিতে ঐ ৩০০ জন কংগ্রেসী ইচ্ছা করিলে ৫ জনই তাহাদের দলভুক্ত প্রার্থীকে নির্ব্বাচিত করিতে পারেন। অথচ মোট ভোটারের সংখ্যার তাঁহারা এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। বাকি দুই-তৃতীয়াংশের কোন প্রার্থীই আইনসভায় সদস্য হইতে পারিল না এবং দেশের বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর কোন সমস্যায় তাহাদের মত প্রকাশ করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত পাইল না। আবার ঐরূপ Ballot ভোট পদ্ধতিতে এরূপ অঘটনও ঘটিতে পারে যে, উক্ত একক সংখ্যাগুরু দল হইতে একজন সদস্যও নির্ব্বাচিত হইতে পারিল না। অপর তিন দল নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাহাদের মধ্য হইতেই ৫ জন সদস্য নির্ব্বাচিত করিল। ফলে সংখ্যাগুরু দল হইয়াও উক্ত দলের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব রহিল না।

এই দুই প্রকার ব্যাপারই প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিপন্থী। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে কিন্তু কখনও এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। এজন্য জন ষ্টুয়ার্ট মিল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেসিডেণ্ট উইলসন এবং স্যর্ জন সাইমন প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের মতে পার্লামেণ্টে বা বিধানসভাগুলিতে এই সকল কারণে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট পদ্ধতিই প্রচলিত করা উচিত, কারণ উহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গণতন্ত্রসম্মত।

"একক" ভোটের সুবিধা

যদি ৫ জন সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে হয় এবং যদি প্রতি ভোটারের ৫টি করিয়া ভোট থাকে তাহা হইলে সংখ্যাগুরু দল ৫টি সীটই দখল করিতে পারে। কিন্তু ৫টি বা ৭টি বা ততোধিক সীট থাকিলেও যদি প্রতি ভোটারের মাত্র একটি বা "একক" ভোটের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে সে যাহাকে সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি মনে করিবে তাহাকেই ভোট দিবে। ৫ জনকেই দিতে পারিবে না। ফলে সংখ্যাগুরু দল ৫টি সীটই দখল করিতে পারিবে না। যুক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, একজন ভোটার যে স্বয়ং বিধানসভায় গিয়া দেশের কার্য্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না সে নিজের proxy বা প্রতিনিধি হিসাবে মাত্র একজনকেই সেই ক্ষমতা দিতে পারে, অর্থাৎ মাত্র একজনকেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারে। একাধিক লোক একজনের প্রতিনিধি হইতে পারে না।

"হস্তান্তরযোগ্য" হইবার সুবিধা

কিন্তু শুধু "একক" ভোটের দ্বারা সংখ্যালঘু দলগুলির যথাসম্ভব প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবার সুযোগ থাকিলেও উহা দ্বারা সংখ্যাগুরু দলের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কারণ সংখ্যাগুরুরা হয়ত একজন প্রার্থীকে সকলে ভোট দিবে। তাহাতে তাহাদের বহু ভোটের অপচয় হইবে এবং প্রতিনিধিমণ্ডলীতে সংখ্যাগুরুত্ব বজায় থাকিবে না। আবার এমনও হইতে পারে যে, তাহারা তাহাদের দলীয় একাধিক প্রার্থীকে ভোট বিভাগ করিয়া দিল এবং হয়ত কেহই নির্ব্বাচিত হইতে পারিল না।

ভোট "হস্তান্তরযোগ্য" হইলে এইরূপ ভোট অপচয়ের আশঙ্কা থাকে না, কারণ একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা (quota) পূর্ণ হইলেও এক ব্যক্তির ভোট অন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর অর্পণ করা যাইবে। এই ভাবে সংখ্যাগুরু দল নিজ সংখ্যার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া অধিকতর সংখ্যায় প্রার্থী নির্ব্বাচিত করিতে পারিবে।

এই ভোটপ্রথার আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে ভোট অপচয় হয় না। প্রত্যেক ভোটার তাহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এই ভাবে স্বীয় মনোনয়ন জ্ঞাপন করে। যে কয়েকটি ভোটের দ্বারা প্রথম মনোনীত ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন, তাঁহার নামে অতিরিক্ত ভোটগুলি সেই সেই ভোটারের দ্বিতীয় মনোনীত ব্যক্তির উপর অর্শায়। আবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়া গেলে তাঁহার নামের অতিরিক্ত ভোটগুলি তৃতীয় মনোনীত ব্যক্তির উপর অর্পণ করা হয়।

আবার যদি এরূপ হয় যে, কিছু সংখ্যক ভোটার এমন একজন প্রার্থীকে তাহাদের প্রথম মনোনয়ন হিসাবে ভোট দিয়াছে যাহার নির্ব্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় নিম্ন-সংখ্যক ভোটও মিলে নাই, তাহা হইলে সেই প্রার্থীর নামীয় ভোটগুলি তাহার নাম হইতে অপসারণ করিয়া তৎসমুদয় দ্বিতীয় মনোনীত প্রার্থীর নামে অর্পণ করা হইবে। এইভাবে একটিও ভোট নষ্ট হইতে পারিবে না। সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি ৩০০ ভোট পাইল এবং সর্ব্বনিম্ন ব্যক্তি মাত্র ৪০ ভোট পাইল এরূপ হইয়া ভোটের অপচয় হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

কোটা (Quota) নির্ব্বাচিত হইবার ন্যূনতম ভোটসংখ্যা

এখন ন্যূনতম কয়টি ভোট পাইলে একজন প্রার্থী নির্ব্বাচিত বলিয়া গৃহীত হইবে এবং তাহার নামের উদ্বৃত্ত

ভোটগুলি অন্যের নামে অর্পণ করা চলিবে তাহার আলোচনায় আসা যাক। ধরা যাক, একটি নির্ব্বাচনে একটি আসনের জন্য ১০০ জন ভোটার ৫ জন প্রার্থীকে ভোট দান করিয়াছে। এখন গণনাকালে যদি কোন প্রার্থীর নামে ৫১ জনের মতদান পাওয়া যায় তাহা হইলে বাকি ৪৯ জন আর যাহাকেই ভোট দিক না কেন তাহা গণনা না করিয়াও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবেই। আবার যদি দুইটি আসনের জন্য ১০০ জন মতদাতা মতপ্রকাশ করে তাহা হইলে যদি কোন প্রার্থী ৩৪ জনের ভোট পায়, তাহা হইলে সে নির্ব্বাচিত হইবেই, কারণ বাকি ৬৬ জনের ভোট যদি একজনের উপরও প্রদত্ত হয় তাহা হইলেও উক্ত ৩৪ ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তি দুই জন নির্ব্বাচিতের মধ্যে একজন হইবেই।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ৫১ বা ৩৪ সংখ্যাটি কিভাবে পাওয়া গেল? উহা নিম্নলিখিত ভাবে পাইতে হইবে—
১০০÷(১+১)+১=৫১ এবং ১০০÷(২+১)+১=৩৪
অর্থাৎ মতদাতার সংখ্যাকে আসনসংখ্যার সহিত ১ যোগ করিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত ১ যোগ করিলে ঐ ন্যূনসংখ্যা বা Quota পাওয়া যাইবে।

দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যাপারটি আরও পরিস্ফুট হইবে। ধরা যাক ৫টি আসনের জন্য ১০ জন প্রার্থী ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হইল এবং ১২০০৪ জন ভোটার নিম্নলিখিত ভাবে তাহাদের ভোট প্রদান করিল—

প্রার্থী			
	ক	প্রথম মনোনয়ন	১৮৭৮
	খ	,,	২০২৮
	গ	,,	৪০১৮
	ঘ	,,	১৪৯৬
	ঙ	,,	৯৮৬
	চ	,,	৬৪২
	ছ	,,	৩১৪
	জ	,,	৩০৪
	ঝ	,,	২৩৬
	ঞ	..	১০২

এখন নির্ব্বাচিত হইতে হইলে প্রত্যেক প্রার্থীকে অন্ততঃ ১২০০৪÷(৫+১)+১ অর্থাৎ ২০০১ ভোট পাইতে হইবে। তদনুসারে খ এবং গ নির্ব্বাচিত বলিয়া গণ্য হইল।

গ সর্ব্বাধিক ভোট পাইয়াছে, এজন্য প্রথমে তাহার অতিরিক্ত ভোটগুলি (অর্থাৎ ৪০১৮−২০০১=২০১৭) সেই সেই ভোটদাতার দ্বিতীয় মনোনীত প্রার্থীর প্রাপ্য। তাহাদের ভোটপত্রগুলি হইতে নিম্নলিখিত রূপ দ্বিতীয় মনোনয়ন পাওয়া গেল—

ঘ— ৫০৬
ঙ— ১৪
চ— ২০
ছ— ৩৪৭৮

যেহেতু মাত্র ২০১৭টি ভোট হস্তান্তর করা চলিতে পারে সেইজন্য উল্লিখিত দ্বিতীয় মনোনীত প্রার্থীরা নিম্ন হিসাবমত ভোট পাইবে।

ঘ— $\frac{২০১৭}{৪০১৮}$ × ৫০৬ = ২৫৪
ঙ— $\frac{২০১৭}{৪০১৮}$ × ১৪ = ৭
ছ— $\frac{২০১৭}{৪০১৮}$ × ৩৪৭৬ = ১৭৪৪
চ— $\frac{২০১৭}{৪০১৮}$ × ২০ = ১০

ঘ, ঙ এবং ছ এইভাবে হস্তান্তরিত ভোটগুলি পাইবার ফলে তাহাদের নিম্নরূপ মোট ভোট হইল—

ঘ— ১৪৯৬ + ২৫৪ = ১৭৫০
ঙ— ৯৮৬ + ১৪ = ১০০০
চ— ৬৪২ + ২০ = ৬৬২
ছ— ৩১৪ + ১৭৪৪ = ২০৫৮

দেখা যাইতেছে যে, ছ কোটা অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছে। অতএব ছ নির্ব্বাচিত বলিয়া গণ্য হইল এবং তাহার উদ্বৃত্ত ভোটগুলি অর্থাৎ ৫৭ এবং খ-এর উদ্বৃত্ত ভোটগুলি অর্থাৎ ২৭ পুনরায় হস্তান্তরিত করিতে হইবে।

এইখানে আর একটা উল্লেখযোগ্য নিয়ম এই যে, উল্লিখিত ৫৭ এবং ২৭-এর যোগফল ৮৪টি ভোটও যদি সর্ব্বনিম্নস্থ প্রার্থী ঞকে দেওয়া যায় তাহা হইলেও তাঁহার ভোটসংখ্যা ঝ-এর ভোটসংখ্যার সমানও হইবে না। অতএব তাঁহার নির্ব্বাচিত হইবার কোন সম্ভবনা নাই। সেজন্য তাঁহার নামীয় ভোটপত্রগুলিতে যে যে প্রার্থীকে দ্বিতীয় মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে, সেই সেই প্রার্থীর নামে ঐ ভোটগুলি হস্তান্তরিত করিয়া ঞকে প্রতিযোগিতা হইতে "বহিষ্কার" করিতে হইবে।

এইভাবে বহিষ্কার এবং ভোট হস্তান্তর করিতে করিতে ৫ জন প্রার্থী নির্ব্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবে। ফলে দেখা যাইবে যে, সংখ্যাগুরু দলের সংখ্যানুপাতে গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে অথচ সংখ্যালঘু দলগুলির সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচিত হইবে। এই বিশেষ গুণের জন্যই এইচ. জি. ওয়েলস্, পোঁয়েকারে, অ্যাস্কুইথ প্রভৃতি মনীষী ও রাজনীতিজ্ঞগণ এইরূপ ভোটপ্রথা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

যান্ত্রিক সভ্যতার পরিণতি

আলফা অব্ দি প্লাউ

অনুবাদক—শ্রীতন্ময় বাগচী

দিনের বেলায় চিন্তাগুলো কাল রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্নে দেখলাম :

অজানাকে জানবার, বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাববার আগ্রহ আমাদের অনেকেরই প্রবল। অনেকে অনেক কিছু অনুমান করেও একটা কাজে লাগাতে পারে নি। বর্তমানের কালো মুখোসের অবগুণ্ঠনের তলে যদি ভবিষ্যতের দেখা পাওয়া যেত...। দশ...কুড়ি...তিরিশ...পঞ্চাশ...একশ' বছর পরের পৃথিবীর রূপ যদি আমরা দেখতে পেতাম...। এখনকার হিংসায় উন্মত্ত ধরণী তখনি বা কি রূপ নিত...। চারি দিকের অব্যবস্থা আর অনাসৃষ্টির কথা আমরা যেন ভাবতেই পারি না। মহাকাল গোপনে আর নীরবে অনেক কথাই নিজের খেয়ালে লিখে চলেছে—কিন্তু তার একটি কথাও বুঝবার বা আগে থেকে অনুমানের ক্ষমতা আমাদের কোথায় ?

আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন—'দিনরাত যত সব অদ্ভুত কথা ভাববে, তাই রাতে উদ্ভট স্বপ্ন দেখবে না কেন ?'

ঘুমের মধ্যে যখন জাগলাম তখন মনে হ'ল আমি যেন অদ্ভুত সৃষ্টির কোন্ সুদূর শতাব্দীর প্রতিনিধি। অনেক... অনেক বছর আগে জন্মেও এখনও যেন বেঁচে আছি।

এ পৃথিবীতে তাই আমি একা নিঃসঙ্গ। আশপাশ, সুদূর দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গা—যেখানে না আছে কোন বসতির চিহ্ন, না উঠেছে কোলাহল আর প্রাণের স্পন্দন। তবু সেই নিস্তব্ধতার মাঝে আমার যাত্রা সুরু হ'ল। নদী পথ ঘাট বন জঙ্গল পার হয়ে এগিয়ে চলতে চলতে থেমে পড়লাম বড় বড় শহরের ধ্বংসস্তূপের মাঝে। কোথাও চোখে পড়ল বিরাট বাঁধ আর তার উপরে নির্জীবের মত পড়ে আছে রেলের লাইন। কোথাও বা ভাঙা ভাঙা বিলাস—এককালে ব্রিজ ছিল বোধ হয়। সমুদ্রের ধারে কোথাও বা জাহাজ মেরামতি কারখানা—তারই ছোট ছোট কঙ্কালের গায়ে জমে উঠেছে পুরু শেওলা। সেগুলো আবার ইতস্ততঃ ছড়ান।

সেইখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীকে একবার ভাল করে দেখতে চেষ্টা করলাম। সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা ম্যাপের মত আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। তারি এক রেখা ধরে আবার পথ-চলা সুরু করলাম। চারদিকে বয়ে চলেছে পরিবর্তনের স্রোত। একটা উদ্দাম আবেগ আর প্রচণ্ড শক্তি চতুর্দিক ভেঙেচুরে একেবারে গুঁড়িয়ে ছারখার করে ফেলেছে। কোথাও সাড়া নেই, কোথাও ওঠে না শব্দ; চতুষ্পার্শ্বেই কেমন যেন একটা ভয়াবহতা আর নীরবতা। এই নিস্তব্ধতা সহ্য করতে না পেরে চীৎকার করে উঠলাম। কিন্তু চীৎকার শূন্যে মিলিয়ে গেল—অত বড় নীরবতাকে ভেঙে খান্ খান্ করবার শক্তি কোথায় তার ? তা ছাড়া এখানে সময়ের প্রয়োজন কিসের ? অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি ত আসি নি। আমার আবির্ভাব হয়েছে অনেক শতাব্দী...বহু যুগ আগে।

পাহাড় আর মরুভূমি দেখে আমার মনে পড়ে যায় অনেক ...অনেক দিন আগের পৃথিবীকে। কিনচার জোচের বরফ-ঢাকা চূড়ায় উঠতেই দেখলাম, ভোরের গোলাপী আলোর প্রথম পরশ এসে লেগেছে আল্প্সের উপর। পাহাড়ের গায়ের সাদা বরফখণ্ডগুলো সেই আলোয় ঝক্মক্ করছে। আসতে আসতে পাহাড় আর মরুভূমি পার হয়ে পৌঁছলাম পিরামিড আর স্ফিংসের রাজ্যে।

স্ফিংসের শিখরে যে লোকটির দেখা পেলাম, অগুনতি বছর ধরে সে বোধ হয় ওখানে ঐ ভাবে পড়ে আছে। তার দাঁত-গুলো পড়ে গেছে, দু'চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঘোলাটে আর নিষ্প্রভ। সমস্ত শরীরটাকে কুঁকড়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে শুয়ে আছে। মনে হ'ল একটা তরোয়ালকে সে যেন আদর করছে আর তারি উচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরটা তার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম।

ভ্রূ দুটো কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত স্থির ভাবে আমাকে দেখে নিয়ে সে উত্তর দিলে—"হেঁ...হেঁ আমি শুভিন। সারা পৃথিবীর মালিক আমি তা জান। আমার...আমারই দখলে রয়েছে এই তরোয়াল...জান না আমরাই সারা দুনিয়ার রাজা...হ্যাঁ ...হ্যাঁ...এই স্ফিংসও আমাদের দলেরই...তরোয়ালকে জড়িয়ে আদর সুরু হ'ল তার।

"আর কাউকে দেখছি না ত ? বাকী সবাই গেল কোথায় ?"—রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠি আমি।

"স...ব...ব চলে গেছে। কেউ নেই...। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ তাড়িয়ে তবে আজ আর একটি প্রাণও নেই। মানুষ সভ্য বলেই ত এত তাড়াতাড়ি আমরা জয়ী হয়েছি। অনেক বছর ধরে তীর ধনুক বর্শা ছোরা দিয়ে মারামারি করেও শেষ হতে পারে নি। তার পর মানুষ তৈরি করল বারুদ। কিন্তু তাতেও তার জয় হ'ল না। শেষকালে সভ্যতার সিঁড়ির অনেকগুলো ধাপ যখন সে টপকে গেল আর বিজ্ঞান তার পিছু নিলে—তখন থেকেই আমাদের জয়ের সূত্রপাত। সে তখন বাতাসে উড়তে পারে—জলেও ভাসতে

পারে তেমনি ভাবেই। পাহাড়ের চূড়ায় সে ঝির্ঝিরে ছুটো-ছুটি করতে আরম্ভ করল। আকাশ থেকে হাতের মুঠোয় পুরল বিদ্যুৎকে। লোহার বিরাট পাহাড় ভেঙে তৈরি করল জাহাজ; মাটির তলা থেকে খুঁড়ে বের করল কয়লা, তারপর থেকে সব সময়েই সে আপন মনে বলে চলে—"কি সুন্দর পৃথিবীর জন্ম দিলাম আমরা।…হি…হি…কি সুন্দর সব যন্ত্র-পাতি তৈরি করলাম—এই যন্ত্রই করবে শান্ত আর শোনাবে শান্তি-বাণী।…হিঃ…হিঃ…কারণ ছাড়া আর কিছু মানতে রাজী নই। বিশ্বপ্রেমে মানব বিশ্বভ্রাতৃত্বকে…অনেক বছর ধরে ভগবানকে খুঁজে খুঁজে আজ তবে তার দেখা পেয়েছি। সেই সঙ্গে আপন বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে করে নিয়েছি নিজের। এতদিনের পরিশ্রান্ত দেহ তাঁকে খুঁজে বের করেছে এই ল্যাবরেটরীতে। পৃথিবীর সব শক্তি জড়ো করে তাঁকে সৃষ্টি করেছি। আমাদের যন্ত্র-ভগবান বিরাট…বিপুল…অনন্ত। সম্মান, আশীর্বাদ গৌরব—এই যন্ত্র-ভগবানের কাছে ম্লান হয়ে যাবে। তার চেয়ে ঢের বেশী শক্তিমান…"

তার সেই জীর্ণশীর্ণ দেহ যেন বজ্রকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—'কেবল আমারই জন্য হ্যাঁ…হ্যাঁ…এই ওডিনের জন্য সে সব কিছু তৈরি করে চলল। বড় বড় স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী রাজা তো আমার ভৃত্য আর মানুষের শত্রু। আমি তখন হেসে বলেছিলাম মানুষের যন্ত্রই তার কাল হ'ল। ক্রমেই সে হয়ে পড়ল যন্ত্রের দাস। যন্ত্রের প্রচণ্ড গর্জন আর বিকট চীৎকারের তলে পড়ে মাছির মত পিষে মরল তারা। তবু সে বলে বিশ্বের এই বিরাট শ্রেষ্ঠ শক্তি আমার ভৃত্য…আমার বন্ধু। কি অপূর্ব জিনিসই না আমাদের মাথা থেকে বের হয়েছে। এসব ব্যাপার কিন্তু আমার…হেঁ…হেঁ…যন্ত্র তৈরি সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভৃত্যদের হাতে তুলে দিলাম। আর সেই মঙ্গলময় যন্ত্র তখন হয়ে উঠল প্রলয়ঙ্কর। প্রথমে এক অত্যাচারী চেষ্টা করে বিফল হ'ল, তার পর চেষ্টা করল আর এক জন। কিন্তু সেও সফল হতে পারল না। প্রথমে যে বেতাদ জাতি জয় পেয়েছিল তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে আর এক শীতাত জাতি, কিন্তু এই অভিযানই ধ্বংস করল যন্ত্রকে, ফলে মানুষ তখন হ'ল শেষ। আমার জয়ের প্রতিটি ধাপ যন্ত্রকে করে তুলল ভীষণ আর তার চাহিদা মেটাতে গিয়ে পৃথিবী হারাল সব কিছু শ্রেয়ঃ। ধীরে ধীরে গোটা মানুষ-জাতি তার উদরে তলিয়ে গেল। হাজার হাজার…লক্ষ লক্ষ…একটা জাতির পর একটা জাতিকে সে নিশ্চিহ্ন করে দিলে। যন্ত্রই করলে মানুষকে খুন, খাওয়ালে বিষ, রাখল উপবাসে। দীর্ঘ দিনের চেষ্টার পর পৃথিবী যখন আমার আর এই তলোয়ারের করতলগত হ'ল তখন শ্মশান হয়ে গেছে।…'

প্রবল উত্তেজনায় এতক্ষণ সে চীৎকার করে চলেছিল, কিন্তু শেষের দিকে তার গলা ধরে এল।

'কিন্তু এসবের মূল্য আছে কিছু? পৃথিবী জয় করে তোমার কতটুকু লাভ হবে?'

'মূল্য।…তা তো জানি না। সেকথা জানবার জন্যই তো এই স্ফিংক্সের কাছে এসেছি। বহু শতাব্দী ধরে তারি প্রতীক্ষায় আছি, কিন্তু সে শুধু তার শান্ত চোখ দুটো দিয়ে স্থিরভাবে মরুভূমির দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখমুখ দেখে মনে হয়, সে জানে সব কিছু, কিন্তু তবু নিরুত্তর থাকবে, একটি কথাও বলবে না। তার মধ্যেও আমার মাঝে মাঝে মনে হয় সে যেন কিছু বলতে চাচ্ছে—ঐ দেখ…ঐ দেখ…'

প্রবল উত্তেজনায় লোকটি আবার চীৎকার করে উঠতেই দু' হাতের তলোয়ারটা কেঁপে উঠল বারকয়েক। তার ঘোলাটে চোখ দুটো স্থিরভাবে আটকে রয়েছে স্ফিংক্সের মুখের দিকে।

আমিও মুখ ফেরালাম। হ্যাঁ…হ্যাঁ…সত্যি তো স্ফিংক্সের ঠোঁট দুটো নড়ছে—এখুনি হয়ত খুলে যাবে। মানুষ কি অদ্ভুত প্রাণী। তার ভগবান সে নিজেই সৃষ্টি করল তবু আঘাত এল কিনা নিজের ভগবানের কাছ থেকে। এ যেন এক বিরাট হেঁয়ালী। কিন্তু তার উত্তর আজ আমি শুনতে পাব। ধীরে ধীরে স্ফিংক্সের ঠোঁট দুটো খুলে গেল, কিন্তু বার কয়েক ঘর্ঘর শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হ'ল না।

স্ফিংক্সের ঘর্ঘর শব্দ কতক্ষণ শুনছিলাম জানি না, হঠাৎ এক ঝড়ো হাওয়ায় চারদিকের ধুলোবালি আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিলে। চারদিক গরম হয়ে উঠেছে; ঝড় যেন আকাশের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে সূর্য্যের অস্তিত্ব। স্ফিংক্সও ঝড়ের হাওয়ায় কোথাও ছিটকে পড়েছে; বুড়ো ওডিনও কোন্ শূন্যে মিলিয়ে গেছে তার হদিস পাওয়া ভার।

তাই নিবিড় ঘন অন্ধকারের মাঝে ডুবে গেল সমস্ত পৃথিবী।

সেই বিরাট আঁধার-ভরা শূন্যের মাঝে কেবল আমি একা শুধু বসে রইলাম।*

---

* "Odin Grown Old" অবলম্বনে।

পুস্তক পরিচয়

ব্রহ্মসঙ্গীত—স্বরলিপি (নূতন সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধনাশ্রম—২১০।৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আদি সমাজের একনিষ্ঠ কর্ম্মী শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন ছয় খণ্ডে "ব্রাহ্ম সঙ্গীত স্বরলিপি" প্রকাশ করেছিলেন—তারই একটি সপ্তম ভাগ—অধুনা দুষ্প্রাপ্য গানগুলি সংগ্রহ করে ছাপাবার অনুরোধ জানিয়েছেন নিজে শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। ব্রাহ্মসমাজের তরুণ দল তাঁর আদেশ পালন করবেন বলে আশা করি। ইতিমধ্যে সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রবীণ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কুড়িটি ব্রহ্মসঙ্গীতের সঠিক স্বরলিপি প্রকাশ করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। রাজা রামমোহন রায়ের রচিত গান ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের শ্লোক সুরে সন্নিবেশিত হয়েছে, তার সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ও তাঁর মনীষী পুত্রগণের কতকগুলি প্রসিদ্ধ গান পেলাম। তার পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতি ভক্তগণের গানগুলিও শিখবার সুযোগ রমেশবাবু করে দিয়েছেন। আশা করি তিনি এই ভাবে সাধন সঙ্গীতের উত্তরোত্তর প্রসার করে যাবেন। তাঁর স্বরলিপি গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বরবিতান—অষ্টম ও বিংশ খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনবার ও শেখবার আগ্রহ রবীন্দ্র-যুগেও প্রবল ছিল, এখন যেন প্রবলতর হয়েছে, কিন্তু ভাবে, ভাষায় এবং সুরে তিনি যে কত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, সে বিষয়ে বেশী মানুষ এখনও সজাগ হয় নি। তাঁর গানগুলির অনেক স্থলে পাঠভেদ যেমন আছে, তেমনি সুরভেদও আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। এক এক গান একটু আধটু অদলবদল করে তিনি নিজেই নানারূপে পরিবেশন করতেন। বহুক্ষেত্রে আমরা তা দেখেছি এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে যাঁকে সবাই আমরা শ্রদ্ধা করি, সেই ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীও তা স্বীকার করেছেন এবং তাঁর স্বরলিপিতে প্রকাশ করে গেছেন।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনায় নেমে আমি তাঁর প্রথম গীতসংগ্রহ "রবিচ্ছায়া" পুনরালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি এবং বিভিন্ন পত্রিকায় আমার মন্তব্য প্রকাশ করেছি। ধারাবাহিকভাবে গান ছাপা যত সহজ তাদের স্বরলিপি ছাপা তত সহজ নয়, কারণ সঠিক সুর নিখুঁতভাবে লেখবার মত গুণী মেলা ভার—তবু অষ্টম খণ্ড স্বরবিতানে ৩০টি প্রাচীন ধর্ম্মসঙ্গীত, 'রবিচ্ছায়া' ও 'গানের বহি' প্রভৃতি বই থেকে নিয়ে স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে দেখে আমরা খুশি হলাম। বিংশ খণ্ডে আরও ৩০টি গানের স্বরলিপি ছাপা হয়েছে এবং "গ্রন্থ পরিচয়ে" রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আদি সঙ্কলন-গ্রন্থ রবিচ্ছায়ার প্রতি সুবিচার করা হয়েছে দেখে আনন্দ পেলাম। কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের কত বিচিত্র গানের পদে, কত রকমের সুর তিনি নিজে বা তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন সে বিষয়ে আলোচনা করবার
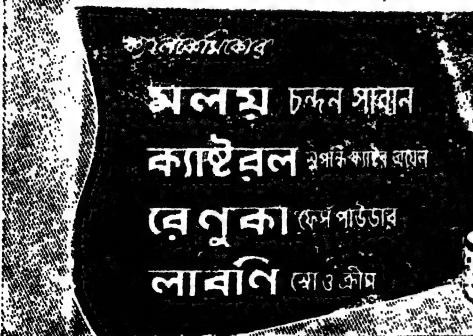
সুযোগ এখন পাওয়া গেল। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আরও অনেক অধুনা-বিস্মৃত রবীন্দ্র-সঙ্গীত-স্বরলিপি প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীকালিদাস নাগ

অনামী—শ্রীদীনেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা চারি আনা।

অনামীর লেখক 'সাহিত্য-জগতে নবাগত এবং বয়সেও তিনি তরুণ। এই রচনাটি তাঁহার কিশোরকালের। কাঁচা মনের ভাবাতিশয্যে সাধারণতঃ কাঁচা বয়সের লেখা ফাঁপিয়া উঠে এবং পাঠকের রসগ্রহণ-ক্ষমতাকে বহু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করে। বস্তুর চেয়ে ভাবের প্রাধান্য বেশী থাকে বলিয়াই এমনটি হয়। সুখের বিষয়, এই কিশোর-লেখকের রচনাতে ভাবোচ্ছ্বাস কম। দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও মনের বিচার-বোধ বস্তু ও ভাবকে পরিমিতভাবে মিলাইয়া সত্যকার একটি ভাল গল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। গল্পের বিষয়বস্তু অভিনব না হইলেও দেশের মাটি ও মানুষগুলির পরিচয়ে কৃত্রিমতা নাই। হিন্দু-মুসলমান এই দুই জাতি বাংলার জল মাটিকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আত্মসাৎ করিয়াও যে পরস্পরের আপন হইতে পারে নাই—তাহার মূলে আচারধর্ম্মের বিভিন্নতা অথবা দীর্ঘ দিনের পরাধীনতা—কোনটি প্রধান এই প্রশ্ন লেখকের মনে জাগিয়াছে এবং গল্পের মধ্য দিয়া তিনি এই সত্যটিকে প্রকাশ করিয়াছেন। লেখার ঢঙ ও চরিত্র-চিত্রণের কুশলতা—দু'টি সম্পদই লেখকের আছে।

কেদার-বদরিকা ভ্রমণ-রহস্য—শ্রীগৌরহরি ঘোষ। ৩, নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা।

স্মরণাতীতকাল হইতে দুর্গম পথ মানুষের মনকে আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাহাকে নিষ্ক্রিয় জীবনযাত্রার গণ্ডী হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে। প্রকৃতির-রূপদর্শনের নেশা কিংবা পুণ্যসঞ্চয়ের বাসনা অথবা অজানাকে জানিবার ও তাহার রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস যে নামই দেওয়া যাক—দুর্গম পথ কোন দিন মানুষকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় নাই—জীবনের প্রকৃত অর্থ, আরাম-বিরামকে তুচ্ছ করিয়া ওই পথচলার মধ্যেই যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের মুকুটমণি দেবতাত্মা হিমালয়: সর্ব্বোচ্চ বলিয়া নহে—দেবতা-যক্ষ-সিদ্ধ-চারণ-বিহারভূমি বলিয়াই হিন্দুর মনে ইহার প্রভাব আশ্চর্য্য রকমের। এই হিমালয়ের বুকে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ কেদার-বদরী, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী প্রভৃতি পঞ্চাশোর্দ্ধের তীর্থ—শাস্ত্র ইহাকে মহাপ্রস্থানের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। মহাভারতকার পঞ্চ-পাণ্ডবের শেষযাত্রাকে চিহ্নিত করিয়া 'এই পথের মহিমাকে হিন্দুর মনে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন এবং অগণ্য তীর্থকামী পুণ্যাভিলাষী এই দুর্গম পথে দুঃখ ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া পরমপুরুষের কৃপাবিন্দুলাভের জন্য তীর্থ-পরিক্রমা করিতেছেন। এই তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া যুক্তিবাদী মনও নাকি সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যকে নূতন করিয়া বিচার করিতে বসে। এই তীর্থ-পথকে লইয়া বাংলা সাহিত্যও কম সমৃদ্ধ হয় নাই।

আলোচ্য কেদার-বদরী ভ্রমণ-রহস্যে লেখক সহজ সরলভাবে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সাহিত্য-সৃষ্টির পর্য্যায়ে হয়তো উন্নীত হয় নাই—কিন্তু তীর্থরাজের মহিমাকে নিঃসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছে। ভ্রমণকে উপলক্ষ্য করিয়া সাহিত্য যদি সৃষ্ট হয় সেটি পরম লাভেরই কথা। তা ছাড়া ভ্রমণ-কাহিনীর আর একটি দিক আছে। সেটি হইতেছে পথকে ঠিকমত জানাইয়া দেওয়া ও পথচলার আনন্দকে যথাযথভাবে মনের মধ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়া। লেখক এই ক্ষেত্রে কৃতিত্বের দাবি করিতে পারেন।

যাত্রীসাধারণের সুবিধা-অসুবিধার খুঁটিনাটি বিবরণগুলি লেখক সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনেকগুলি সুন্দর ছবি এবং পথের নির্দ্দেশনামাটিও যাত্রীদের মনকে তীর্থভ্রমণে উন্মুখ ও তাঁহাদের পথের ক্লেশ নিরাকরণে সহায়তা করিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

তত্ত্বজিজ্ঞাসা—শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএচ-ডি। দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী লিঃ। ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে লিখিত কতকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধ বর্ত্তমান গ্রন্থে একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। 'আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের দার্শনিক মতবাদ' শীর্ষক দীর্ঘতম প্রবন্ধটি ছাড়া বাকী এগারটি প্রবন্ধের সকলগুলিই দর্শন, উদ্বোধন, বঙ্গশ্রী, বিশ্ববাণী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম তিনটি প্রবন্ধে দর্শনের স্বরূপ, ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ এবং দার্শনিক প্রমাণপদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতের আলোচনা করা হইয়াছে। কয়েকটি প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও

বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার *Fundamentals of Hinduism* নামক ইংরেজী গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বিস্তৃততর আলোচনা করিয়াছেন। 'বিশ্বসাহিত্য-সম্মেলনের সার্থকতা কোথায়' প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূলমন্ত্রগুলির ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। দুইটি প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষার সারমর্ম উদ্ঘাটিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসু পাঠক গ্রন্থখানির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান পাইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য। এ. মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৩৫৮। পৃষ্ঠা ৩৫৫। মূল্য ছয় টাকা।

ইংরেজী ভাষায় লেখা শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বহুসংখ্যক বই আছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় এ ধরণের বই কেবলমাত্র ট্রেনিং স্কুল কলেজের ছাত্রগণ বা শিক্ষক-সম্প্রদায়ই পড়েন না; সন্তানের কল্যাণকামী পিতামাতাও আগ্রহের সঙ্গে এই সকল পাঠ করেন এবং তদনুযায়ী সন্তানদের 'মানুষ' করিবার চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ গৃহ ও বিদ্যালয়ের মিলিত প্রযত্ন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর দিয়াই শিশুর মনের সার্থক বিকাশ সম্ভবপর। আমাদের দেশে শিশুর অভিভাবকদের মধ্যে এ সম্বন্ধে কোন সচেতনতার লক্ষণ দেখা যায় না; শিশুকে পালন করার দায়িত্ব সম্বন্ধেও অধিকাংশেরই কোন-সুস্পষ্ট ধারণা নাই। কাহাকেও দোষ দিয়া লাভ নাই, কেননা মাঝারি রকমের শিক্ষিত জনক-জননীর পক্ষে বোধগম্য এবং চিত্তাকর্ষক পুস্তকেরও একান্ত অভাব রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের বর্তমান পুস্তকখানি ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদের জন্য পরিকল্পিত। ইহাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ, শিক্ষার সংজ্ঞা, বিভিন্ন পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বহু জটিল তত্ত্ব ও তথ্য এবং শিক্ষার উন্নতির পরিমাপ-প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। এত অল্পপরিসরের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের সকল বিষয় বিস্তৃত ও বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। তবু সাধারণ পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করার বহু উপকরণ ইহাতে আছে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি—শ্রীনারায়ণচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত। বিদ্যার্থী জগৎ, ৯৩, হরচোল লেন, কলিকাতা-৫। পৃষ্ঠা ৪৪। মূল্য আট আনা।

উপদেশপূর্ণ পুস্তিকা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আর্ল অব চেষ্টারফিল্ড প্রভৃতি দেশবিদেশের নানা মনীষী ও পণ্ডিতদের রচনা হইতে মূল্যবান উক্তিসমূহ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সংযম, স্মরণশক্তি, অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ, চরিত্র, এবং নৈতিক জীবন ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান উপদেশাবলী ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ, মহাত্মা গান্ধী এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অমূল্য উপদেশ-বাণীও উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পুস্তিকার দ্বারা দেশের তরুণগণ উপকৃত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

সোস্যালিষ্ট পার্টি কি চায়—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস। সোস্যালিষ্ট পার্টি অফিস, পি-৩৫, গণেশ এভিনিউ, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৩৪। দাম চারি আনা।

সম্প্রতি ভারতের প্রথম গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচনে দল হিসাবে সোস্যালিষ্ট পার্টি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। আধুনিককালে সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব পৃথিবীর নানা দেশেই দেখা যাইতেছে। কিন্তু

ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা সর্ব্বসাধারণ তো দূরের কথা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও, খুব স্পষ্ট নহে। লেখক সংক্ষেপে এই পার্টির নীতি ও আদর্শ সরল সহজ ভাষায় বিবৃত করিয়া অনেকেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সাম্যবাদ বা কম্যুনিজমের সহিত সোশ্যালিজম বা সমাজ-তন্ত্রবাদের পার্থক্য কোথায় লেখক তাহা খুব খোলাখুলিভাবেই আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। লেখকের মতে—রাশিয়ার কম্যুনিজম হইতেছে 'স্বৈরাচারী' (Totalitarian) আর সোশ্যালিজম হইতেছে গণতান্ত্রিক (Democratic) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাশিয়ায় যাহা চলিয়াছে তাহা গণতন্ত্রবিরোধী—এজন্য উহা মূল মার্ক্সীয় নীতিরও বিরোধী। ষ্ট্যালিন এই রাজনীতির পথপ্রদর্শক। সুতরাং রাশিয়ার স্বৈরাচারী সাম্যবাদ সত্যকার সমাজতন্ত্র নহে। "সোশ্যালিজমের কাঠামোতে স্বাধীনতা-রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা ব্যক্তিগত যা হোক না কেন—সর্ব্বদা বিরাজমান।" সোশ্যালিষ্ট পার্টির মতে উৎপাদনের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে সঙ্ঘবদ্ধ ও সমবায়সূত্রে আবদ্ধ আত্মসচেতন শ্রমিকসম্প্রদায়ের হাতে। লেখক বলেন, "এই পার্টি এ দেশের ঐতিহ্য বজায় রেখে মার্ক্সবাদ গ্রহণ করেছে অথবা মার্ক্সবাদ গ্রহণ করে এদেশের আপনার সামগ্রী হয়েছে।" ইহা কিরূপে সম্ভব বা কতটা সকলতালাভ করিয়াছে ইহা অবশ্য বিতর্কের বিষয়। যাহা হউক, এই পুস্তিকখানি পাঠ করিলে পাঠক ভারতের সমাজতন্ত্রী দলের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থার স্বরূপ জানিতে পারিবেন এবং এ পথে দেশের নানা সমস্যার সমাধান কতটা সম্ভব সে সম্বন্ধে ভাবনার খোরাক পাইবেন। পুস্তিকার ভাষা সরল।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ভ্রমরী—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য। "সাহিত্য-কোণ", ৪৪-সি, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

উপন্যাস। ডাঃ বিন্দুপ্রকাশের সহিত তাঁহার রোগিণী মিসেস্ রঙ্গিণার অবৈধ প্রেম ও পরিণয়ের কাহিনী। পড়িতে বিরক্তির উদ্রেক হয়।

বিমুগ্ধা পৃথিবী—দেবাচারিয়া। সুমিত্রা প্রকাশক, ৪ বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন। কলিকাতা-৫। মূল্য দুই টাকা।

সমালোচ্য পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটি বড় গল্প। নায়ক—চিত্রকর অজয়—বিবর্ণ, সুকুমার মুখ ও চোখ দুটি উজ্জ্বল, দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী স্বপ্নময়। অজয় চিন্তাশীল—তার চিন্তাকে সে ভাষায় রূপদান করে। শাসককে দার্শনিক আর দার্শনিককে শাসকরূপে সে দেখিতে পায়—নহিলে জনসেবা নাকি সম্ভবপর নয়। পুরাতন পৃথিবীকে গতানুগতিকতা হইতে মুক্ত করিতে হইলে শাসককে দেখাইতে হইবে ত্যাগের আদর্শ, আর শ্রমিক করিবে ভোগ। শাসকশ্রেণীর প্রয়োজন ব্রহ্মচর্য্য, সাধুতা, পবিত্রতা। এক কথায় শাসকের দৃষ্টিভঙ্গী হইবে দার্শনিকের ও বৈজ্ঞানিকের। এমনি আরও বহু সম্ভব অসম্ভব কল্পনাকে অজয় মনে মনে পোষণ করে, এবং ভাষায় রূপ দেয়।

নায়িকা পূর্ণিমা সুন্দরী ও যুবতী, কিন্তু তাহাই তাহার সবটুকু পরিচয় নয়। তার ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি সব লইয়া সে এমন এক স্তরে বিচরণ করিত যেখানে কেহই তাহার সান্নিধ্যে পৌঁছিতে সাহস পাইত না। যে বেঁটে ছেলেটি অগ্রসর হইয়াছিল, পূর্ণিমা তাহাকে অধিক ব্যায়াম করিতে এবং পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া বিদায় করিয়াছে। অথচ এই মেয়েই ঘটনাচক্রে ভালবাসিল আত্মভোলা খামখেয়ালী দরিদ্র শিল্পী অজয়কে। এদিকে তিলডাঙ্গার কুমার বাহাদুরের সহিত তার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়া গিয়াছে। দেখা দিল ঝড়—যে ঝড়ের প্রচণ্ড দাপটে সব বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। অজয় পূর্ণিমার চলার পথ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া লইল, কিন্তু তাহাতেও তাণ্ডব রোধ করা গেল না।

তিলডাঙার জমিদারবাড়ীর প্রতিহিংসা ও ক্রোধ পূর্ণিমার বাবা অমলবাবুকে ধ্বংস করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হইল না, তার নামে জঘন্য অপবাদ রটনা করিতেও মুক্ত করিল। পূর্ণিমা সংসার ছাড়িল, অজয়ের বহু খোঁজ করিল, কিন্তু সবই হইল বিফল। অবশেষে একটি মেয়ে-স্কুলের শিক্ষকতার কাজ লইয়া সে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। তার পর একদিন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে অজয়ের সাক্ষাৎ মিলিল। সে তখন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। পূর্ণিমা এই উদ্ভট দার্শনিক ও তরুণ শিল্পীকে বাঁচাইয়া তুলিতে একে একে তার সমস্ত সঞ্চয় ও সম্বল নিঃশেষ করিল। গল্পটির আখ্যানভাগ মোটামুটি এইরূপ।

দেবাচারিয়া বাঙালী এবং আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার রচিত প্রথম বাংলা বই। কিন্তু রচনার কোথাও জড়তা প্রকাশ পায় নাই। দুই-এক স্থলে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও লেখকের অনবদ্য পরিবেশ সৃষ্টি, সাবলীল ভাষা, শাণিত সংলাপ ও চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্যে পুস্তকখানি অত্যন্ত সুখপাঠ্য হইয়াছে। নায়ক অজয়ের পুস্তক-রচনাকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর শাসকশ্রেণীকে যে ধরণের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ তিনি করিয়াছেন তাহা সুপ্রযুক্ত ত হইয়াছেই, সময়োপযোগীও হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

পূর্ব্বরঙ্গ—শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। সাধনা মন্দির, ৫৫, নারায়ণ রায় রোড, কলিকাতা ৮। মূল্য তিন টাকা।

'পূর্ব্বরঙ্গ' লেখকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "পূর্ব্বরঙ্গকে দু'ভাগে ভাগ করেছি—রঙ্গ ও সাধনা।...'রঙ্গ' পর্য্যায়ের রচনাবলীতে যে দুঃখ, যে নৈরাশ্য, যে সংশয় ও শ্লেষ ব্যক্তিত হয়েছে, বলাই বাহুল্য তা যুগগত সত্য।" শুধু নৈরাশ্য-সংশয় নয়, সকৌতুক আনন্দের সুরও কোথাও কোথাও শুনি, যেমন 'রিয়ালিটি'।

> "ভাদরের জলে ধুয়ে তকতকে হয়ে গেছে
> রায়েদের দালান ও রক—
> ভাখো ভাখো, আহা ভাখো, রকে শুয়ে সোনারোদ:
> সুখারামে করে আনচান।"

কবির সৌন্দর্য্যানুভূতি একান্ত সহজ ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহা তৃপ্তিকর।

কোথাও কোথাও অসঙ্গত প্রসাধনে কবিতার স্বভাবলাবণ্য ঢাকা পড়িয়াছে। আশা করি, এই ত্রুটিটুকু ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার কাব্যরস আরও প্রাণদীপ্তি লইয়া দেখা দিবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেদান্ত ও সূফীদর্শন—রমা চৌধুরী। শ্রীপ্রাচ্যবাণী মন্দির গ্রন্থমালা চতুর্থ পুষ্প। মূল্য দুই টাকা।

বেদান্ত ও সূফী মতের তুলনামূলক সমালোচনা-গ্রন্থ। বেদান্তশাস্ত্র যেরূপ বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত, সূফীদর্শনও তদ্রূপ বিভিন্ন মতবাদের সমষ্টি। গ্রন্থকর্ত্রী সূক্ষ্মবিচারপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, অনেক স্থলে উভয় দার্শনিক প্রস্থানে যেমন বহু সাদৃশ্য রহিয়াছে তেমনই বৈসাদৃশ্যেরও অভাব নাই। লেখিকার মতে 'বেদান্ত মতবিশেষের সহিত সূফী মতবিশেষের সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা বৃথা। সাধারণ সাদৃশ্যই গ্রহণীয়।' প্রাচ্য ভূখণ্ডের এই দুইটি মতবাদই অধ্যাত্মক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারত উভয় ধারার মিলনক্ষেত্র। গ্রন্থকর্ত্রীর পক্ষপাতশূন্য সমীক্ষা গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান, ধর্ম্মসাধনা ও নীতির পথে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর সাদৃশ্য বিশেষরূপে আলোচিত হইলে মিলনের প্রশস্ততর সেতুর সন্ধান পাওয়া যাইবে। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেদিকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিতেছে।

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

মহামানব শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথের মহানির্ব্বাণ—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২।১, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা-২৬ হইতে প্রকাশিত। ৪+২৯ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

নৃপেন্দ্রনাথ ছিলেন পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের অন্যতম ভক্ত। এবং "যার শেষ ভাল তার সব ভাল।"—এই প্রচলিত প্রবাদের সার্থকতা এই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অন্তিম সময়ের ঘটনায় প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি কত বড় পুণ্যাত্মা ছিলেন এবং কিরূপ আদর্শ অধ্যাত্মজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় সমালোচ্য পুস্তকখানিতে পাওয়া যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আঁটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী

আঁটপুর গ্রাম হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায় অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ২৫।২৬ মাইল, হাওড়া ময়দান ষ্টেশন হইতে মার্টিন কোম্পানীর রেলে আঁটপুর যাওয়া যায়। একদা আঁটপুর একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। ইহা বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্মস্থান। স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম ঘোষ) আঁটপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তাঁহারই বাটীর প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দ ধুনি জ্বালাইয়া অপর আট জন গুরুভ্রাতার সহিত প্রথম গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করেন; বাবুরামও তাঁহাদের সহিত ছিলেন। পরে

আঁটপুর কৃষিশিল্প-প্রদর্শনীতে কোদালি হস্তে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

শ্রীশ্রীমাও বাবুরামের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। বাবুরামের ভ্রাতা শ্রীশান্তিরাম ঘোষ মহাশয় অদ্যাপি জীবিত আছেন এবং তাঁহাদের পৈতৃক বাটীতে এখনও দুর্গাপূজা ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা অর্চনা যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হইতেছে। যে স্থানে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতারা ধুনি জ্বালাইয়া গৃহত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন এবং যে ঘরে শ্রীশ্রীমা অবস্থান করিয়াছিলেন সেই দুইটি স্থানে শান্তিরাম ঘোষ দুইটি প্রস্তরফলক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; স্বামী প্রেমানন্দেরও আলাদা একটি প্রস্তরফলক স্থাপিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে এবং আঁটপুরবাসী বর্ত্তমান লেখকের অক্লান্ত চেষ্টায় গত তিন বৎসর যাবৎ আঁটপুরের মিত্র-বাটীর প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর একটি পল্লীমঙ্গল প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইতেছে। এই প্রদর্শনীর নানা বৈশিষ্ট্য আছে। বর্ত্তমান বৎসরে গত ১৬ই মার্চ্চ এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হয় এবং ২৮শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত উহা খোলা থাকে। দ্বারোদ্ঘাটন করেন মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সভাপতি শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চন্দ। তিনি ছাত্র-সম্মেলনেও পৌরোহিত্য করেন। ২৮শে মার্চ্চ প্রদেশপাল ডঃ শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রদর্শনী পরিদর্শন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন; এই উপলক্ষে একটি শিশুপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিশুদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এতদুপলক্ষে "ভূমিসেনার সমাবেশ" হয় এবং বর্ত্তমান লেখক প্রদেশপালকে ভূমিসেনার 'ব্যাজ' ও কোদালি উপহার দেন। পুরস্কারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—আমেরিকার 'কেয়ার' লাঙ্গল এবং অন্যান্য 'কেয়ার' যন্ত্রাদি, 'কেয়ার' খাদ্য, 'কেয়ার' বস্ত্রাদি—এই সকল দ্রব্য 'কেয়ার' মিশন হইতে বিনামূল্যে প্রাপ্ত। উক্ত দিবসে হা-ডু-ডু খেলারও প্রতিযোগিতা হয়। রাজ্যপাল মহোদয় ভূমিসেনা সমাবেশ, হা ডু-ডু খেলা, পুরস্কারের আয়োজন, শিশু-প্রদর্শনী প্রভৃতি দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন।

রাজ্যপালের আগমনের সংবাদে দূরবর্তী পল্লীসমূহ হইতেও বহু লোক আঁটপুরে আসেন, পল্লী অঞ্চলে এক অভূতপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া যায়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান-পরিষদ

আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ও প্রসারকল্পে ২০ বৎসর পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান-পরিষদ নামক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম-এ। এই পরিষদের বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা-শাস্ত্র আবার পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বিগত ৩রা জুন পরিষদ কর্ত্তৃক মহর্ষি চরকের দুই হাজার বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে চরক প্রশস্তি দিবস উদ্‌যাপিত হয়। কলিকাতায় আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের একটি আদর্শ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও পরিষদের আছে। পরিষদের উদ্যোগে বিগত বৎসরে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে দুইটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার বিশিষ্ট আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। বর্ত্তমানে ৫২ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা, ৯—এই ঠিকানায় পরিষদের কার্য্যালয় অবস্থিত।

গত ৩রা ফাল্গুন কলিকাতায় মহাবোধি সোসাইটি হলে পরিষদের বিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন সুরু হয়। অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আয়ুর্ব্বেদের গবেষণা এবং উহার ফলাফল প্রবন্ধ ও পুস্তকাকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ষড়দর্শনতীর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সভার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা আয়ুর্ব্বেদের গবেষণা, গ্রন্থাগার স্থাপন ও আলোচনার মধ্য দিয়া উহার প্রচার ও প্রসারে আয়ুর্ব্বেদানুরাগী চিকিৎসকদের আত্মনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন: আয়ুর্ব্বেদের জীবন-মরণের এই যুগসন্ধিক্ষণে উহার পুনরুদ্ধার করিয়া অতীত গৌরবের উজ্জ্বল পাদপীঠের উপর পুনঃস্থাপিত করিবার গুরুদায়িত্ব মূলতঃ জাতীয় সরকারের উপর থাকিলেও উহার ভবিষ্যৎ রূপ নিরূপণ করিবার দায়িত্ব সমগ্রভাবে আয়ুর্ব্বেদসেবীদের উপর ন্যস্ত থাকা কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, আয়ুর্ব্বেদের নীতির সহিত

উহার অনুশীলন-রীতির সামঞ্জস্য বিধান, অসাধ্য রোগ নিরসন-কল্পে উহার অনুশীলন ও চিকিৎসার সংস্কার করিতে হইবে।

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, কবিরাজ শ্রীসুশীলকুমার সেন, কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ প্রভৃতিও বক্তৃতা করেন।

সোমবার ৫ই ফাল্গুন পরিষদের তৃতীয় ও শেষ দিবসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, আয়ুর্ব্বেদ এই দেশের বিজ্ঞান, সেই হেতু এই দেশের পক্ষে উপযোগী ও ফলপ্রদ। কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রলাল দাসগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন, পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ-সমাজকে একত্রিত করিয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যতে আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের উন্নতি ও অনুশীলনের ধারায় আলোকসম্পাত করিয়া ভাবী আয়ুর্ব্বেদের বনিয়াদ দৃঢ়ভাবে গড়িয়া তুলিবে। একটি গবেষণাগার স্থাপন করিবার জন্য পরিষদকে সকলের সাহায্য করা উচিত।

ঐ দিনের সভায় কবিরাজ শ্রীমনোরঞ্জন রায়চৌধুরী ও কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবিরাজ শ্রীহেরম্বনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা করেন।

'রবিবাসরে' শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংবর্দ্ধনা

গত ১০ই চৈত্র শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তের বাসভবনে 'রবিবাসরে'র এক বিশেষ অধিবেশনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সপ্ততি-বর্ষ-পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। ডক্টর শ্রীতারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। রবি-বাসরের সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু মূল অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। উপেন্দ্রনাথের প্রতি রবিবাসরের সভ্যদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগের নিদর্শন

এই স্বর্ণমণ্ডিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্যশোভিত এবং চিত্রিত মানপত্র-খানি ৭০টি তারকাখচিত সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো।

সভাপতি ডক্টর মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন—"আজ শরৎ চন্দ্রের কথা মনে পড়ে। তাঁহার ভিতরে যে শক্তি ছিল তাহার স্ফুরণ হয় উপেন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে। উপেন্দ্রনাথ যে সকল গল্প ও কাহিনী লিখিয়াছেন তাহাতে মানুষের অন্তরের ব্যথা ফুটিয়া উঠিয়াছে।...সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
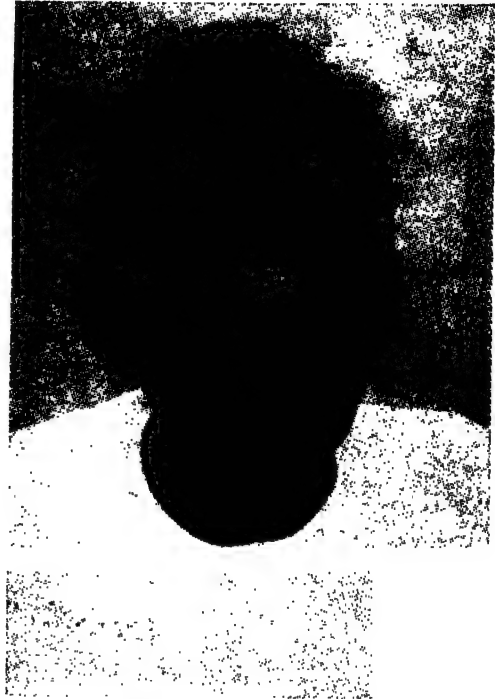
মানপত্রের উত্তরে উপেন্দ্রনাথ একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন :

"আপনাদের অভিনন্দনপত্র আমাকে বিহ্বল করেছে। আমার সংশয়পীড়িত মনে বারবার প্রশ্ন জাগছে দু'হাত ভরে আপনাদের কাছ থেকে যা নিলাম আমি তার যথার্থ অধিকারী কিনা। কেবলই মনে হচ্ছে, হায়, আমি যদি আপনাদের অভিনন্দনপত্রের যোগ্য হতে পারতাম। বিশ্বাস করুন, এ আমার কপট বিনয় নয়, এ আমার অন্তরের কথা। টাকা আনা পয়সার সদরগঞ্জে ছিল আমার কারবার। সে গঞ্জের অধিদেবতা কমলাসনা কমলা। তাঁর কৃপাদৃষ্টি যে একেবারে পাই নি তা নয় কিন্তু বেশি দিন থাকতে সইল না। সেখানকার কারবার বন্ধ করে এসে ছুটলাম দেবী বীণাপাণির দরবারে। এ দরবারের যা

যথার্থ স্বর্ণমুদ্রা তারই মাঝে আজ আপনারা আমাকে পুরস্কৃত করলেন, আজ আমি কৃতার্থ। আপনারা আজ আমাকে যত করেছেন, আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। রবিবাসর আমার সম্মুখে এক নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। তার মহিমা দিন দিন বর্দ্ধিত হোক।"

রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বৎসরের রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কারের ফল সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন। সাহিত্যে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুরস্কার লাভ করিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ সুদীর্ঘকাল নিরলস ভাবে বাংলা-সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দুই খণ্ড ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে। এই পুস্তকখানি উক্ত বিষয়ক আলোচনা-গবেষণায় যুগান্তর আনিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্রজেন্দ্রনাথ "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" এবং "বঙ্গীয় সাময়িকপত্রে"রও রচয়িতা। এ বই দুইখানি তাঁহার ঐকান্তিক তথ্যানুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। তিনি এক যুগ ধরিয়া নিষ্ঠার সহিত "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা"য় বাংলার বহু সাহিত্য-সাধকের জীবন-কথা ও রচনা-সংক্রান্ত মালমশলা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এই চরিতমালায় সংখ্যা প্রায় এক শতের কাছাকাছি। তন্মধ্যে পাঁচ-ছয়খানি ছাড়া বাকী সকল পুস্তকই ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত। দীর্ঘকালব্যাপী একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনার দরুন তিনি যে পুরস্কারলাভ করিলেন তাহাতে সাহিত্যিক মাত্রেই বিশেষ আনন্দিত হইবেন। আমরা তাঁহার শতায়ু কামনা করি।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশচন্দ্র নন্দী

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী গত ১ই ফাল্গুন শেষরাত্রে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩০৪) কলিকাতায় রাজবাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ স্কুল ও কৃষ্ণনাথ কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পিতা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আদর্শ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া শ্রীশচন্দ্র শিক্ষা সমাপ্তির পর হইতেই জনসেবায় কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১ সন হইতে একাদিক্রমে তিন বার তিনি বহরমপুর পৌরসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এ সময় তিনি কয়েক বৎসরকাল মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র প্রথম বঙ্গীয় আইন-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৫-এ ভারতশাসন আইন প্রবর্ত্তনের পর মিঃ এ. কে. ফজলুল হক প্রথম যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন, ন্যাশনালিষ্ট পার্টি হইতে মহারাজা অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে তাহাতে যোগদান করিয়া সেচ, বর্ত্ম ও পূর্ত্ত বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বকালেই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদী-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার চেষ্টা আরম্ভ হয় এবং তাহারই প্রাথমিক অঙ্গস্বরূপ বাংলার নদী অঞ্চলের জমির ঢালের জরীপ করা হয়। গত বৎসর হরিণঘাটাতে যে নদী-নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা উপরোক্ত নদী-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনারই ফল। ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। তিনি বর্ত্তমান বিদায়ী বিধান সভার সদস্য ছিলেন।
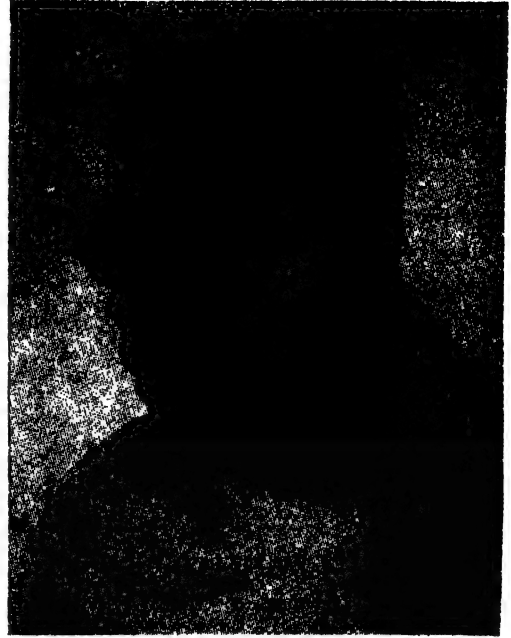
সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা ও ক্রীড়ানুরাগী ছিলেন শ্রীশচন্দ্র। মনস্যাধি, দস্যুদুহিতা, শান্তি কোন্ পথে, বন্যা ও তাহার প্রতিকার, বেঙ্গলস্ রিভার প্রবলেমস্, বেঙ্গল রিভার্স এণ্ড আওয়ার ইকনমিক ওয়েলফেয়ার ইত্যাদি গ্রন্থ তাঁহার সাহিত্যসেবা ও মননশীলতার পরিচায়ক। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট, নিখিল-ভারতীয় সঙ্গীত সভা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি; বিশ্বভারতী, ইণ্ডিয়ান সায়ান্স নিউজ এসোসিয়েশন ইত্যাদির আজীবন সদস্য এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, বেঙ্গল

অটোমোবাইল এসোসিয়েশন, বঙ্গীয় মহাজন সভা ইত্যাদির প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন।

ডাঃ পশুপতি মিত্র

গত ১৯শে চৈত্র খ্যাতনামা চিকিৎসক ও অস্ত্রোপচার-বিশারদ ডাক্তার পশুপতি মিত্র প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। পশুপতি-বাবু ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শারীরসংস্থানবিদ্ (Anatomist) রূপে বিখ্যাত ছিলেন। পশু-চিকিৎসায়ও তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

ডাঃ পশুপতি মিত্র

পশুপতিবাবু কলিকাতার "বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজে"র সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে শারীরসংস্থান বিভাগ সহকারী অধ্যাপক রূপে এবং ই. বি. রেলওয়ের "মেডিক্যাল অফিসার"রূপে প্রায় ষোল বৎসর কার্য্যে রত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই (১৯০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি কয়েক মাসের জন্য আলিপুর চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। পরে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে এনাটমির শিক্ষক হিসাবে দশ বৎসর কার্য্য করিয়া ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পরে আরও দশ বৎসর তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে এনাটমির অধ্যাপকরূপে কার্য্য করেন।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী

প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনাচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ ধর্ম্মক্ষেত্রের একটি অমূল্য রত্ন হারাইল। বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাণ্ডারকে মহাজন পদাবলীর সংগ্রহ দ্বারা সমৃদ্ধ করার তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ব্রজবাসী মহোদয়ের ৯২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ নিষ্কলঙ্ক, ভক্তিমাধুর্য্যপূর্ণ জীবন বাঙালী জাতির আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনে ব্যয়িত হইয়াছিল। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাধকগণের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি নিজে যেমন আধ্যাত্মিক সম্পদে ধনী হইয়াছেন তেমনি তাঁহার অতুলনীয় ভক্তিমাধুর্য্য দ্বারা তাঁহাদিগকেও প্রীতি দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গত ১৪ই চৈত্র তাঁহার দ্বি-নবতিতম বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল, ঠিক তাহার পূর্ব্বদিনেই মহাপ্রাণ ভক্তসাধকের আকস্মিক জীবনাবসান ঘটনাটিকে অধিকতর বিষাদময় করিয়া তুলিয়াছে। আমরা তাঁহার আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি এবং তাঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজনকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

একাধিক দৈনিক সংবাদপত্রে নবদ্বীপচন্দ্রের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। নবদ্বীপচন্দ্রের চরিত্রমাধুর্য্য সম্বন্ধে কোন তর্কের অবকাশ নাই, তাঁহাকে কলিকাতা সমাজে আরও সুপরিচিত করিবার কৃতিত্ব আর একজনেরও প্রাপ্য। তিনি ডাঃ সুন্দরী-মোহন দাস। তাঁহার দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে প্রাতে বা সন্ধ্যায় যাঁহারা নবদ্বীপচন্দ্রের কীর্ত্তন শুনিয়াছেন তাঁহারা এই কথা স্বীকার করিবেন। সুন্দরীমোহনের কীর্ত্তন ও খোলবাদন বা নবদ্বীপচন্দ্রের কীর্ত্তন ও খোলবাদন, এবং উভয়ের আদর দিবার মধ্যে যেন অলক্ষ্যে একটি আধ্যাত্মিক লোকের সৃষ্টি হইত। সুন্দরীমোহন ৯৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারও একটি "দিনপঞ্জী"তে স্থান পাইয়াছে। সে দিনপঞ্জী প্রকাশিত হইলে অনেক তথ্য আমরা পাইতাম। তাহা এখনও হয় নাই। সুন্দরীমোহনের 'দিনপঞ্জী' হইতে নবদ্বীপচন্দ্র সম্বন্ধেও আমরা অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিতাম। নবদ্বীপচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু লিখিবার আছে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

নিভৃতি

শ্রীসি. ডি. গোবিন্দরাজ

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(তেহেরাণ, ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৯)

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫২শ ভাগ
১ম খণ্ড
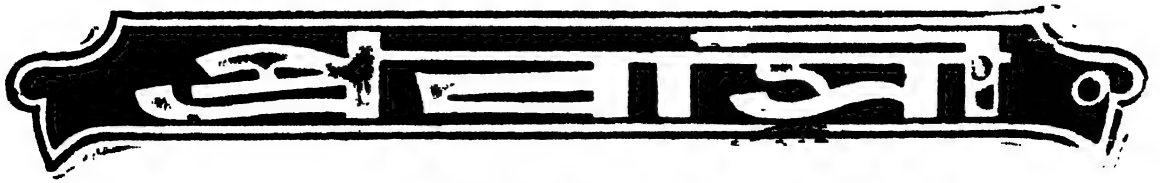
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতের ভবিষ্যৎ

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে "ভাবী ঘটনার ছায়া পূর্ব্বাহ্নেই পড়ে"। সেই ছায়াপাত আরম্ভ হইয়াছে।

১৩ই মে, নয়াদিল্লী, হইতে খবর আসে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ একুশ জন মন্ত্রী লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। এই মন্ত্রিসভায় আছেন পনর জন পূর্ণ মর্য্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রী, চারি জন মন্ত্রী এবং দুই জন সহকারী মন্ত্রী। রাষ্ট্রপতিভবন হইতে এক ইস্তাহারে এই ঘোষণা করা হইয়াছে :

প্রধানমন্ত্রীকে লইয়া মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। পূর্ব্বের মন্ত্রিসভার নয় জন এবং নূতন ছয় জনকে লইয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। শ্রী সি. সি. বিশ্বাস পূর্ব্বতন মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাকে পূর্ণ মর্য্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রিরূপে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইয়াছে।

মন্ত্রিসভায় যাঁহাদের নূতন লওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের নাম হইতেছে—মিঃ রফি আহ্‌মদ কিদওয়াই, শ্রী টি টি. কৃষ্ণমাচারী, শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, সর্দ্দার স্বরণ সিং, শ্রী ভি. ভি. গিরি এবং শ্রী কে. সি. রেড্ডী।

মন্ত্রী হিসাবে অদ্য যাঁহাদের নাম ঘোষিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে সর্দ্দার স্বরণ সিং এবং শ্রী কে. সি. রেড্ডী সংসদের নির্ব্বাচিত সদস্য নহেন।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ও তাঁহাদের দপ্তর :

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু—পররাষ্ট্র।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—শিক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

শ্রীনরসিংহ গোপালস্বামী আয়েঙ্গার—প্রতিরক্ষা।

রাজকুমারী অমৃতকুমারী—স্বাস্থ্য।

ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু—স্বরাষ্ট্র এবং রাজ্য।

শ্রীরফি আহ্‌মদ কিদওয়াই—খাদ্য এবং কৃষি।

শ্রীচিন্তামন দ্বারকানাথ দেশমুখ—অর্থ।

শ্রীজগজীবন রাম—যোগাযোগ।

শ্রীগুলজারীলাল নন্দ—জাতীয় পরিকল্পনা এবং নদী উপত্যকা পরিকল্পনা।

শ্রীতিরুভালুর থাত্তাই কৃষ্ণমাচারী—বাণিজ্য ও শিল্প।

শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস—আইন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সংক্রান্ত।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী—রেলওয়ে ও যানবাহন।

সর্দ্দার স্বরণ সিং—পূর্ত্ত, গৃহ ও সরবরাহ।

শ্রীবরাহগিরি বেঙ্কট গিরি—শ্রম।

শ্রীকিসণ্ণলী চেঙ্গলরায় রেড্ডী—উৎপাদন।

পূর্ণ-মর্য্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী (কিন্তু মন্ত্রিসভার সদস্য নহেন)—

শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন—পুনর্ব্বসতি।

শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ—সংসদ সংক্রান্ত।

শ্রীমহাবীর ত্যাগী—অর্থ-দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী।

ডাঃ বালকৃষ্ণ বিশ্বনাথ কেশকার—তথ্য ও বেতার।

সহকারী মন্ত্রী—শ্রীদত্তাত্রেয় পরশুরাম কারমারকার।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বড়গোহাইন।

আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় তাহাতে বলা চলে যে, এই যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইল উহা সাড়ে পনেরো আনা নেহেরু-মন্ত্রিসভা—অর্থাৎ এই যে পঁচিশ জন মহাশয় ব্যক্তি আমাদের এ অভাগা দেশের মন্ত্রিসভা অলঙ্কৃত করিলেন, যাঁহাদের হস্তে দেশের ও দশের ভাগ্য আগামী পাঁচ বৎসরের মত 'করতলগত আমলকবৎ' প্রদত্ত হইল। ইঁহারা প্রায় সকলেই নেহেরুরূপী হৃষীকেশের আরাধনায় ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। 'দুরাচার' প্যাটেলের অনুগামী কেহই নাই, গান্ধী বিসর্জ্জন তো বহু পূর্ব্বেই হইয়াছে। মন্ত্রিসভার হিসাবে ষোল আনার স্থলে দুই পয়সা কম ধরা হইয়াছে শ্রীবরাহগিরি বেঙ্কট গিরির দরুন। ইনি ত্রিশ বৎসর যাবৎ শ্রমিক আন্দোলনে আছেন

এবং প্রকৃতপক্ষে নেহেরু-চরণাশ্রিত নহেন। মিঞা রফি আহমেদ কিদওয়াই নূতনও বটেন, পুরাতনও বটেন। ইনি গোসা করিয়া মন্ত্রিসভায় ইস্তফা দিয়াছিলেন, তার পর সাত ঘাটের জল চাখিয়া ও ঘোলা করিয়া শেষে বড়ের চালে দাবা বসিয়াছেন।

তাহার পর মন্ত্রিসভার গুণ কীর্ত্তনের পালা। কোথায় আজ রায় গুণাকর, কোথায় বা "গৌড়ানন্দ কবি", সুতরাং কে ভণিবে আজ এই সব বিক্রমাদিত্যের প্রাচীন নবরত্নের ও অর্ব্বাচীন বত্ররত্নের মহিমা? তবে কবির ভাষার সুকান্ত মতনের খোঁজে "উড়াইয়া দেখ ছাই, যদি তার মধ্যে পাই" সে সন্ধান। দেশের অবস্থা যেরূপ হইয়া চলিতেছে তাহাতে ছাইয়ের অভাব দেশে ঘটিবে না, বরঞ্চ সোনার লঙ্কার মত সোনার ভারত দিগন্ত প্রসারিত ভস্মস্তূপে পরিণত হওয়ার লক্ষণ ক্রমেই দেখা দিতেছে, সেইজন্ত রাষ্ট্রপতিকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি সময়মত এই পঞ্চদশ মহারত্ন ও যত্ন-উপযুক্ত আহরণ করার জন্ত।

পণ্ডিত নেহেরুর বিষয় আর কি লিখিব? দেশের এই নিদারুণ দুরবস্থা দৃষ্টেও যাঁহার চৈতন্ত হয় না তাঁহার চিকিৎসা ধন্বন্তরীরও অতীত। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বাহ্ণে যে সকল প্রতিশ্রুতি তাঁহার মুখে দেশবাসী শুনিয়াছিল এবং যে স্তোকবাক্যে তাহারা ভুলিয়াছিল—সে সকলের পুনরাবৃত্তি এখানে অবান্তর। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে, হয়ত সেই ছলনার অনুশোচনার প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্রিসভা গঠনে দেখিতে পাইব। এখন দেখিতেছি তাও ছিল ভুল ধারণা। গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণের পর পাঁচ বৎসরও না যাইতে যে পণ্ডিত নেহেরুর এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা আমাদের দুঃস্বপ্নেরও অতীত ছিল।

মার্কিনদেশে প্রবাদ আছে, "প্রতি মিনিটে একজন নির্ব্বোধ জন্মায়।" আমাদের দেশে প্রতি মিনিটে উনষাট জন নির্ব্বোধ এবং একজন চাটুকার বা খল জন্মায়। প্রতি মিনিটে একজনও যদি স্থিরবুদ্ধি জন্মাইত—এমন কি প্রতি ঘণ্টায় বা প্রতি দিনে একজন—তাহা হইলেও ঐ চাটুকারদিগের এরূপ জন্ম সার্থক হওয়া সম্ভব হইত না। সে যাহাই হউক, এখন বৃথা আক্ষেপে সময় নষ্ট করার লাভ নাই। আমাদের এখন খুঁজিতে হইবে পথ, নিজের পরিত্রাণের এবং ভবিষ্যকালের সন্তান-সন্ততির পরিত্রাণের ও কল্যাণের।

পার্লামেণ্টে প্রবল বিপক্ষ দল গঠনের সম্ভাবনাও গিয়াছে। যদি বিরোধী দলের মধ্যে মুষ্টিমেয় দৃঢ়চিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞ লোক থাকিতেন, যদি তাঁহাদের চিত্ত প্রকৃতই স্বাধীন ও স্বার্থশূন্য হইত, যদি নেতৃত্বের কাম্য গুণরাজি তাঁহাদের মস্তিষ্কে ও মর্ম্মে বিরাজ করিত, তবে সংখ্যালঘু হইলেও তাঁহারা পণ্ডিত নেহেরু ও তাঁহার এই অপরূপ মন্ত্রণাসভাকে প্রকম্পিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহারও কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। সুতরাং আমাদের পথ খুঁজিতে হইবে সংসদ-পরিষদ ইত্যাদির বাহিরে; পথের লোকের মাঝে।

এই ত গেল পার্লামেণ্টের কথা। এখন দিল্লীর লাড্ডুর প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ঘরের হেঁসেলে যে "আস্কে পিঠে চাস্কে পিঠে ও খাস্কে পিঠে" প্রস্তুত হইয়াছে তাহার প্রসঙ্গ ধরি। এখানে তো মন্ত্রিসভার বিষয়ে না রাম না গঙ্গা কিছুই শুনা যায় না। যে তিন চারি জনের কথা লোকমুখে শুনিতেছি তাহা অদ্ভুত, তবে শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। কলিকাতা কর্পোরেশনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বহু পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে তাহার পুনরভিনয় অসম্ভব কিছুই নহে। তবে আশ্বাসের কথা এইটুকু যে, পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসে গৃহবিবাদ চলিতেছে। তাহার নিদর্শন বেশ কিছু পাওয়া যাইতেছে।

নিম্নের মন্তব্য "আনন্দবাজার পত্রিকা"র ২২শে বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। কুরুকুল ধ্বংস হইলেও পাণ্ডবকুল আরামে ছিলেন না। 'ধর্ম্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হইলেও বেশী দিন টেঁকে নাই।

আমাদের এই নূতন ইন্দ্রপ্রস্থের ধর্ম্মরাজ্যের কলির ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ত একাধিকবার "ইতি গজ" করিয়াছেন। সুতরাং নরকদর্শন নিশ্চিত। তবে ভয় হয় হয়ত সে নরক এই ভারতেরই পরিণাম এবং হয়ত আমাদেরও তাহা ভুগিতে হইবে। সে যাহা হউক মন্তব্য এইরূপ:

"পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের কর্ত্তাদের কার্য্য ও কীর্ত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রবৃত্তি আর আমাদের নাই। আপন গোষ্ঠির স্বার্থে গলবদ্ধরজ্জু জীবটির ন্যায় যাঁহারা খোলা চোখে জ্ঞানে সজ্ঞানে কংগ্রেস কেন্দ্রটিতে নিত্য আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলার কোন অর্থ আছে কি? বরং তাঁহাদের নিকট দেশবাসীকেই 'শ্রীভগবান উবাচ' মার্কা উচ্চাদের তত্ত্ব ও বাক্যাবলী নিত্য শ্রবণ করিতে হইবে। বাক্যের তাঁহাদের অনটন নাই, যুক্তিরও তাঁহাদের অভাব হইবে না এবং অর্থবল সম্বন্ধে ইঙ্গিত না করাই শোভন। যাহা তাঁহাদের নাই, তাহা হইল—চরিত্র। এই কথাটাই দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে ঐকান্তিক আবেদন লইয়া জানাইয়াছিলাম, 'তাঁহারা নিজেরা একটু মানুষ হউন।' ইহা কি আমাদের দাম্ভিকতা বা বেয়াদবী? আমরা তাহা মনে করি না। এমন উপদেশ দিবার অধিকার কি আমাদের আদৌ নাই? নিশ্চয় আছে এবং পূর্ণ অধিকারই আমাদের রহিয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া অগণিত বীরের প্রাণদানে, লক্ষ লক্ষ নরনারীর ত্যাগ ও সেবায় এবং জানা ও অজানা সংখ্যাতীত সাধকের সাধনার তিলে তিলে ভারতের বিরাট ও মহান্ কংগ্রেস জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ, ভারতের কংগ্রেস ভারতের সর্ব্বসাধারণের জাতীয় সম্পত্তি। বীরের প্রাণদান, কর্ম্মীর কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং সাধকের সিদ্ধির পুঞ্জী-

মৃত রূপ এই কংগ্রেস, তাহার উত্তরাধিকার আজ কোথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং ন্যস্ত হইয়াছে? যদি ক্রুদ্ধ অভিশাপ লইয়া আমরা এখন উচ্চারণ করি যে, যজ্ঞের পবিত্র হবি আজ লেহন করিতেছে সারমেয়ের দল তাহাও অমার্জ্জনীয় অপরাধ ও অন্যায় উক্তি বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। কংগ্রেসের বল্গা হস্তে তুলিয়া লইয়া পণ্ডিত নেহেরু যেদিন ঘোষণা করিয়াছিলেন—কংগ্রেস সমগ্র জাতির সর্ব্বসাধারণের সাধনার সিদ্ধি, সম্পত্তি ও শক্তি; ইহাকে কাহারও বা কোন গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইতে দেওয়া চলে না। কিন্তু তাহাই হইতে দেওয়া হইয়াছে, অন্ততঃ এই পশ্চিমবঙ্গে; কাজেই আমাদের দুঃখ এবং অভিশাপও অতিশয় স্বাভাবিক ও সঙ্গত।"

পূর্ণ সম্পাদকীয় আমরা দিলাম না, কেননা সারাংশ ঐটুকু মাত্র। তবে একথাও বলি যে, এই সকল কথা সময়মত যদি লেখা হইত তবে অনুযোগ অভিযোগ আক্ষেপাদির কারণ হয়ত এতটা থাকিত না। এই সকল কথা লিখিবার উপযুক্ত সময় ছিল নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ও নির্ব্বাচনের মধ্যে। তখন সে কাজ করা হয় নাই—আমরা কেহই করি নাই; সুতরাং সে ত্রুটি-বিচ্যুতির ফল আমাদের উপর বর্ত্তিবেই। সেইজন্য এখন এই সব লেখা সপত্নী-কলহের পর্য্যায়ে পড়িতেছে।

এই সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কোঁদলের বিষয়ে আমাদের কোনও বিশেষ আগ্রহ নাই, উৎসাহও নাই। সে কোঁদলের অন্তই হইবে না, কেননা কংগ্রেস এখন ভূতাবিষ্ট এবং রাষ্ট্রনীতির ওঝা যে সংবাদপত্র তাহাদের "সরিষা"ও ভূতগ্রস্ত।

যদি তাহা না হইত তবে দেশের রাজনীতি এরূপ বিকারগ্রস্ত হইল কি করিয়া? একদিকে দেখা গেল দেশের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইল শতকরা ৬২ জন সেইরূপ লোক যাহাদের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আজ "যজ্ঞের পবিত্র হবি-লেহনকারী সারমেয়" আখ্যা দিতেছেন।

আবার অন্যদিকে দেখি অপরিণতমস্তিষ্ক অর্ব্বাচীনের দল দেশের লোকের হাতে শতকরা ১২।১৪ জনকে পার করিল যাহাদের শির বিদেশীর ধ্বজার নীচে অবনত। বাকী অনেকে জোটনদী পার হইলেন কেহ বা ঘৃণিত কুৎসার জোরে, কেহ বা জাতিগত কুসংস্কারের প্রবাহে। বাস্তবিকই রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমরা অতি শিশু, নহিলে কি দক্ষিণহস্তে আবাহন করি নেকিচাঁদকে এবং বাম হস্তে উমিচাঁদকে?

আমরা গৌড়বাসী প্রকৃতই বুদ্ধিমান জাতি। ঘরে বসিয়া সর্ব্বথা খাঁটি সোনার চৌদ্দ আনা খাদনির্ণয়ে আমরা সিদ্ধহস্ত অথচ হাটে বেসাতির ব্যাপারে আমরাই আনি মেকি টাকার থলি ভরিয়া। এমন কোন উঁচু মাথা আছে যাহাকে লক্ষ্য করিয়া আমরা কর্দমনিক্ষেপ না করি। আবার এমন কোন ভাগ্যান্বেষী চতুরবাক্যবাগীশ আছে যে চাটুবাক্যে বা স্তোকবাক্যে আমাদের গলাইতে না পারিয়াছে?

আজ আমরা এই কাণ্ডজ্ঞানহীন আত্মপ্রতারণা ও ভাবপ্রবণতার ফলে কোথায় দাঁড়াইয়া আছি সেটা কি কাহারও জানিতে বাকী? তবে এখনও প্রতিকারের চেষ্টা হইতেছে না কেন? বাঙালী কি শক্তিহীন ক্লীব না বুদ্ধিহীন উদ্যোগবর্জ্জিত জরদ্গব?

আজ বাঙালী অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্র। বাংলার পথেঘাটে ভিন্নপ্রদেশীয়দের আধিপত্যই সর্ব্বত্র, সর্ব্বক্ষেত্রে বাংলার মেয়ে দুর্বৃত্তের কবলে ধর্ষিতা হইয়া ভিন্ন প্রদেশে নীতা হয়। বাংলার বিচারকের আদেশ তুচ্ছ করিয়া অন্য প্রদেশস্থ বিচারক সে মেয়ের উদ্ধারে বাধা দেয়। প্রতিকার নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙালীর স্বার্থ—যাহা তাহার জন্মগত অধিকার—অবহেলার সহিত উপেক্ষিত হয়, যেমন দেখিলাম আমরা রেলের পুনর্বিভাগে।

অথচ এমন একদিন ছিল—সুদূর অতীতে নয়, নিকট অতীতে—যখন এদেশ বারংবার দীক্ষা পাইয়াছে অগ্নিমন্ত্রে, এবং শত সহস্র বাংলার সন্তান আত্মাহুতি দিয়াছে সে পৌরুষ ও স্বাতন্ত্র্যের হোমানলে। আজ কি সে সকল আহুতিই বৃথা যাইবে মুষ্টিমেয় প্রতারকের প্ররোচনায়?

ছাড়পত্র

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যাতায়াতের জন্য পাকিস্থান সরকার ছাড়পত্র ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় উভয় ডোমিনিয়নের সম্পর্কে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

কয়েক মাস পূর্ব্বে উভয় বঙ্গের চীফ সেক্রেটারী সম্মেলনে লোক যাতায়াত লইয়া আলোচনার সময় পাকিস্থানের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পশ্চিমবঙ্গের জনৈক পদস্থ ব্যক্তির নিকট কথা-প্রসঙ্গে প্রকাশ করেন যে, পাকিস্থান সরকার অতি শীঘ্র উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ছাড়পত্র ব্যবস্থার প্রচলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবে। যথাসময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ বিষয় জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট প্রথমে অবিশ্বাস করিলেও শেষ পর্য্যন্ত ভারত-সরকারকে এ বিষয় অবগত করান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ব্যাপারে ভারত গবর্মেণ্ট যেরূপ নির্ব্বিকার ও অদ্ভুত মনোভাবের পরিচয় পূর্ব্বাপর দিয়া আসিতেছেন এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না, মিথ্যা গুজব বলিয়া প্রথমতঃ ব্যাপারটিকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ভারত-সরকার কিছুটা সচেতন হন এবং সংবাদের সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য পাক্-পররাষ্ট্র দপ্তরকে এক লিপি পাঠান।

পাকিস্থান সরকার প্রায় দুই সপ্তাহকাল একেবারে নিস্তব্ধ থাকিয়া গত ৯ই এপ্রিল এক পত্রযোগে ভারত-সরকারকে জানান যে, পাকিস্থান সরকার উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সত্বর ছাড়পত্র ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা ভারত ও পূর্ব্ব-পাকিস্থানের মধ্যে

যাতায়াত ব্যাপারেও প্রযুক্ত হইবে, কারণ-স্বরূপ বলা হয় যে, পাকিস্থান সরকার কিছুকাল যাবৎ অনুভব করিতেছেন যে ভারত ও পশ্চিম-পাকিস্থানের মধ্যে গমনাগমনের জন্য বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, উহা সন্তোষজনক নহে। উহা দ্বারা যাতায়াতের সুবিধা না হইয়া নানাপ্রকার বিঘ্নেরই সৃষ্টি হয়। সুতরাং উহার পরিবর্ত্তে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইবে।

প্রত্যুত্তরে ভারত-সরকার পাকিস্থান গবর্ন্মেন্টকে জানান যে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্ব্বে পাকিস্থান সরকার যেন স্থানীয় অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় ভাল-ভাবে বিবেচনা করেন, কারণ ভারত ও পশ্চিম-পাকিস্থানের মধ্যে লোক চলাচল কম বলিয়া অনুমতি পত্র ব্যবহার করা সম্ভব হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্থান ও তৎসংলগ্ন ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে লোক চলাচল খুব বেশী বলিয়া সেখানে গমনাগমনের অবাধ ব্যবস্থা আছে।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব-পাকিস্থান ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অবাধ ভ্রমণ গত ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে ভারত ও পাকিস্থান প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই বিধানের অস্তিত্ব ও প্রয়োগ উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা ও নিরাপত্তার ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছে। হাজার হাজার লোক দৈনিক এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে। তদুপরি পূর্ব্ব-পাকিস্থান ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্ক এত নিবিড় যে, গমনাগমনের উপর কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপিত হইলে উহার ফল উভয় দেশের অধিবাসীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পক্ষে অনিষ্টকর হইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত-সরকারের এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। পাকিস্থান সরকার ছাড়পত্রের ব্যবস্থা সত্বর প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত পুনরায় ব্যক্ত করিয়াছেন। পাক-সরকারের মতে বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে ১৯৫০ সালের চুক্তির কোন সর্ত্ত লঙ্ঘন করা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও পূর্ব্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে উদ্ভূত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্যই ঐ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। হাঙ্গামার জন্য যাহারা দেশত্যাগ করিয়াছিল তাহাদের গতিবিধির স্বাধীনতা ও পথে তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাই ঐ চুক্তিতে ছিল। যে কারণে ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহা আর নাই। সংখ্যালঘুদের পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ বন্ধ হইয়াছে। দেশত্যাগীদের মধ্যে অনেকে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। সুতরাং ১৯৫০ সালের চুক্তি কোন প্রকারেই ভঙ্গ করা হয় নাই। তবে তাঁহারা একথা জানাইয়াছে যে এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন ব্যবস্থা এখনও স্থির হয় নাই এবং সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহারা উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে সম্মিলিত আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। আগামী ১৫ই মে সম্মেলনের দিন ধার্য্য হইয়াছে।

পক্ষান্তরে ভারত-সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হইয়া তাঁহাদের সীমান্তদেশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

শোনা যায় তিন প্রকারে এই পাসপোর্ট ব্যবস্থা বহাল হইবে। প্রথমতঃ প্রকৃত পাসপোর্ট যেমন আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী হইয়া থাকে। ইহা পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে দেওয়া হইবে এবং ইহার জন্য visa দরকার হইবে। দ্বিতীয়তঃ এক রাষ্ট্রের অংশ হইতে অপর রাষ্ট্রের অংশে যাতায়াতের জন্য অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম ইত্যাদির মধ্যে চলাচল যেমন পশ্চিম-পঞ্জাব ও পূর্ব্ব-পঞ্জাবের মধ্যে আছে। ইহা স্থানীয় প্রাদেশিক সরকার করিতে পারিবেন। তৃতীয়তঃ এক জেলা হইতে অন্য জেলায় যাতায়াতের জন্য একরূপ ব্যবস্থা হইবে। ইহার জন্যও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করিবেন, কারণ অসংখ্য ব্যবসায়ী সবজী, দুধ, মাছ ইত্যাদি কাঁচামাল লইয়া দৈনিক অপর ডোমিনিয়নের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত করে। ইহা যাহাতে ব্যাহত না হয় সেইজন্য এরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু এই ছাড়পত্র কেবলমাত্র যে অঞ্চলের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে দেওয়া হইবে তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মধ্যে যাতা-য়াতের জন্য প্রাপ্ত ছাড়পত্র লইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ বা পশ্চিম পাকিস্থান ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে চলাচল করা নিষিদ্ধ থাকিবে। সেরূপ খুলনা ও বনগাঁও এর মধ্যে প্রচলিত ছাড়-পত্র লইয়া রাজসাহী ও পশ্চিম দিনাজপুরের মধ্যে যাতায়াত চলিবে না। প্রতিবার যাতায়াতের জন্য পৃথকভাবে ছাড়পত্র দেওয়া হইবে, ইহাতে কত লোক উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে যাতায়াত করে তাহারও সঠিক হিসাব পাওয়া যাইবে।

উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে বর্ত্তমানে যে অবস্থা চলিতেছে তাহাতে পাকিস্থান সরকার ভারত-সরকারের সহিত কোন প্রকার আলোচনা না করিয়া হঠাৎ কেন যে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন তাহা একান্তই দুর্ব্বোধ্য। তবে দেশবিভাগ স্বীকার করিয়া লওয়ার সময় একথা স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, এ পরিস্থিতির একদিন উদ্ভব হইবেই। কোন রাষ্ট্রই অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য তাহার সীমান্ত প্রদেশ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে পারে না। তাহাতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। পাকিস্থান রাষ্ট্রে খুন ডাকাতি করিয়া দুর্বৃত্তেরা ভারত ডোমিনিয়নে আশ্রয় লইলে পাকিস্থান সরকারের তাহাকে শাস্তি দিবার কোন সহজ উপায় নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও সীমান্ত রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। সে কারণে অবাঞ্ছিত লোককে দেশের

অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার না দেওয়া যাইতে পারে। পাকিস্থান সরকার যদি এই মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পাসপোর্ট ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন তবে অবশ্য তাহাকে দোষ দিবার কিছুই নাই। আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা প্রত্যেকের পক্ষেই স্বাভাবিক। প্রতিবেশী ভারত ডোমিনিয়ম তাহার সীমান্ত অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়াছে বলিয়া যে তাহারাও যে তাহাদের সীমান্ত অনুরূপ রাখিবে ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ভারত নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করিলে পাকিস্থানকেও করিতে হইবে ইহা আশা করা মূর্খতা। পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুর ইহাতে অসুবিধা হইবে। তাহারা উভয় ডোমিনিয়নেই কাজকর্ম্ম ব্যবসাদি চালাইয়া নিজেদের কার্য্য সিদ্ধি করিতেছিল। ইহারাই বর্ত্তমান ব্যবস্থা গৃহীত হইলে বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। কিন্তু ভারত-সরকারকে একথা পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল যে, এক দিন তাহাদের নিকট এ সমস্যা উপস্থিত হইবে যেদিন তাহাদের এই উভয়ের মধ্যে এক রাষ্ট্রকে আপনাদের দেশ বলিয়া স্থির করিয়া লইতে হইবে। দুই দেশে এককালীন রাষ্ট্রাধিকার ভোগ করা যায় না; পাকিস্থান সরকার পাসপোর্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহাদের সম্মুখে সেই সমস্যাই দেখা দিবে। সুতরাং এদিক হইতে ব্যাপারটির একটি চরম বোঝাপড়া হইয়া যাওয়া উভয় ডোমিনিয়নের পক্ষেই মঙ্গলের।

কিন্তু ছাড়পত্রের পশ্চাতে পরোক্ষ কারণ ইহা হইলেও বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোন প্রত্যক্ষ কারণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। পাকিস্থান সরকার বারম্বার একথাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন যে, ভাষা আন্দোলনের পশ্চাতে হিন্দুদের ও পশ্চিমবঙ্গের প্ররোচনা আছে, যদিচ পূর্ব্ব-পাকিস্থানের একাধিক নেতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনে হিন্দুদের কোন স্বার্থ থাকিলেও তাহাদের উস্কানিতে প্ররোচিত হইবার পাত্র তাঁহারা নহেন, এবং বস্তুতঃ পাকিস্থান সরকার অত্যন্ত ভালভাবেই তাহা জানেন। উর্দু পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া তাঁহারা যে অন্যায় করিয়াছেন, হিন্দু ও পশ্চিমবঙ্গের উপর দোষারোপ করিয়া তাহারা সেটা চাপিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব্ববঙ্গ সরকার গত হাঙ্গামার পর বুঝিয়াছেন—বিশেষতঃ যখন পাকিস্থান গবর্ন্মেণ্ট পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ রক্ষার দায়িত্ব তাঁহারা লইবেন না—পূর্ব্ব অনুষ্ঠিত পন্থায় হিন্দু বিতাড়ন করা আর সম্ভব হইবে না। তাহার পরিণাম এত বিষময় যে তাহাকে সামলাইতে পাকিস্থানকে নাজেহাল হইতে হয়। এই কারণেই তাহারা অন্য উপায় অবলম্বন করিতেছে। তাহারা নিশ্চিত যে ভারত-সরকার এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না যাহাতে মুসলমানদের এখানকার বাস চিরতরে তুলিতে হয়। তাহারা এখানে নাগরিক অধিকার ভোগ করিবে এবং অনেকে সেই সঙ্গে পাকিস্থানেও সেই অধিকার পাইবে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু হিন্দুরা কেবল একটি রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার পাইবে, এবং তাহা কোন্ রাষ্ট্রের হইবে তাহা এই ছাড়পত্র ব্যবস্থার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। ইহাতে অনেক হিন্দু রাষ্ট্রহীন হইবে।

স্বতন্ত্র দার্জ্জিলিং রাষ্ট্র

'ষ্টেটসম্যানে'র কালিম্পংস্থিত নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুর দার্জ্জিলিং ও সিকিম অঞ্চল পরিভ্রমণ কালে নিখিল-ভারত গুর্খালীগের প্রতিনিধিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গুর্খালীগের সভাপতি মিঃ গুরাং বলেন যে পণ্ডিতজীর দার্জ্জিলিং অবস্থানকালে লীগ তাঁহার নিকট চার পৃষ্ঠাব্যাপী এক স্মারকলিপি পেশ করে। তাহাতে গুর্খা দল দাবী করে যে, দার্জ্জিলিংকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শাসন কেন্দ্ররূপে গঠন করা হউক। দার্জ্জিলিং ও ডুয়ার্স লইয়া গঠিত এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র আসামের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। কারণ পার্ব্বত্য জনসাধারণ কখনই বাংলার সহিত থাকিতে ইচ্ছুক নহে। বাংলার সহিত তাহাদের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। মিঃ গুরাং বলেন যে, গুর্খাদলের এই দাবী অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং ইহা কোন প্রকার স্বার্থবুদ্ধি বা স্বাতন্ত্র্য-বোধ হইতে উদ্ভূত নহে। ইহার দ্বারা পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ শাসন কার্য্যে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিবার অধিকারই দাবী করিয়াছে।

প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন যে, গুর্খা-লীগের এই দাবী বাস্তবে প্রবর্ত্তন করিতে নানা প্রকার অসুবিধা আছে, বিশেষতঃ ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এরূপ পুনর্গঠন সম্ভব নহে। তবে স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে গুর্খাদের যে সকল অসন্তোষের কারণ আছে তাহা অচিরে দূর করার প্রতিশ্রুতি তিনি তাহাদের দিয়াছেন।

গুর্খালীগের এই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চীন, বিশেষতঃ তিব্বতে সাম্প্রতিক ঘটনার পরিবেশে ভারতের উত্তর সীমান্ত রূপে দার্জ্জিলিং ও সিকিম জেলার গুরুত্ব যথেষ্ট। সুতরাং সামরিক প্রয়োজনে দার্জ্জিলি-ঙের অধিবাসীদের দায়িত্ব অত্যন্ত প্রবল, এ অবস্থায় গুর্খালীগের এই মনোভাব বিশেষ আশাপ্রদ নহে, দার্জ্জিলিংকে বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে গুর্খালীগের বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না, এমন কি যে দার্জ্জিলিং ও ডুয়ার্স লইয়া তাহাদের এত আস্ফালন তাহাকে গুর্খাদল ভিত্তায় বলা ও

বর্ষার তাণ্ডব ইত্যাদির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। দার্জ্জিলিং শহর বাঙালীর অর্থে ও পরিশ্রমেই গড়িয়া উঠিয়াছে যদিও তাহার লাভ অন্য প্রদেশবাসী ভোগ করিতেছে। অল্পদিন পূর্ব্বে বর্ষার ধ্বসে ও তাণ্ডবে যখন দার্জ্জিলিং শহরের শ্রেষ্ঠ স্থানসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল তখন বাংলা সরকারই দ্রুত তাহার পুনর্গঠন করিয়াছিলেন। বাংলার গবর্ণর ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু তখন সেখানে ছিলেন এবং মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার প্রাণ হাতে করিয়া সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি-বিদ্‌দের আনয়ন করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে দার্জ্জিলিঙের সংস্কার সাধন করেন। এ সকল কথা ঐতিহাসিক নহে বলিয়া দার্জ্জিলিঙের অধিবাসিগণ এত শীঘ্র তাহা ভুলিবে না—ভুলিতে পারে গুর্খাগণ যাহারা তথাকার স্থায়ী অধিবাসী নহে; গুর্খাগণ পার্শ্ববর্ত্তী নেপাল রাজ্যের অধিবাসী। দার্জ্জিলিঙে তাহারা বসবাস করিতেছে যেমন বাঙালী করে, বিহারীরা করে, আসামীরা করে, এখানকার আদিম অধিবাসী লেপচাগণ। দার্জ্জিলিঙে বসবাস করে বলিয়াই দার্জ্জিলিঙের ভাগ্যনিয়ন্তা গুর্খারা নহে। তাহারা মোট জনসংখ্যার একটি সামান্য অংশমাত্র। দার্জ্জিলিং অঞ্চলের চা-বাগানের মালিকদের বরাবর বাঙালীদের প্রতি একটা বিদ্বেষ ছিল। কারণ বাঙালীর জন্যই চা-বাগানের কুলীদের তাহারা নির্য্যাতিত করিতে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং বাঙালীর বিরুদ্ধে স্থানীয় আদিবাসী-দের উস্কাইয়া দিতে তাহারা বরাবর চেষ্টা করিয়াছে, এবং তাহাদের প্ররোচনাতেই এই সকল অশিক্ষিত মুষ্টিমেয় লোক সময় সময় আন্দোলন করিয়াছে। তবে গুর্খা-লীগের বর্ত্তমান দাবীর পশ্চাতে তাহাদের কোন প্ররোচনা নাই বলিয়াই মনে হয়, গুর্খাগণ বাঙালীদের জন্যই লেপচা প্রভৃতি অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণের উপর আধিপত্য করিতে পারিতেছে না, সে কারণে এ প্রতিবন্ধক অপসারণ করা তাহাদের দরকার। এইজন্যই এই উদ্ভট পরিকল্পনা তাহাদের মস্তিষ্কে দানা বাঁধিয়াছে।

দুর্ভিক্ষ না খাদ্যাভাব

খাদ্য-পরিস্থিতি বর্ত্তমানে যে রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে তাহাতে ইহাকে দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কিছুই আখ্যা দেওয়া যায় না। যত দিন পর্য্যন্ত খাদ্যাভাব কেবলমাত্র দুইটি রাজ্যের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ছিল তত দিন বিষয়টি তত ভয়াবহ ছিল না, কিন্তু অবস্থা ইদানীং যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে দেশব্যাপী এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশের সকল অঞ্চল হইতেই খাদ্যাভাব, খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন জন-সাধারণের দুর্দশার সংবাদ আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গেও ইহার সুস্পষ্ট পূর্ব্বাভাষ আমরা লক্ষ্য করিতেছি। প্রায় সকল জেলা হইতেই চাউলের অস্বাভাবিক মূল্য-বৃদ্ধির সংবাদ আসিতেছে। বাঙালীর প্রধান খাদ্য চাউলের ব্যাপক মূল্য-বৃদ্ধিতে জনসাধারণের এক ক্ষুদ্রাংশকে ইতিমধ্যেই অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতে হইতেছে। ২৪ পরগণা জেলার এক সময় "বাংলার শস্যভাণ্ডার" বলিয়া অভিহিত সুন্দরবন অঞ্চলের কতিপয় ইউনিয়নে খাদ্যসঙ্কট বর্ত্তমানে চরম স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ২৪ পরগণার সন্দেশখালি, হাসনাবাদ ও হাড়োয়া থানাব্যাপী এই মন্বন্তরের পদধ্বনি শ্রুত হইয়াছে—বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বেই বিপদের আভাস ছিল, ইঙ্গিতও ছিল এবং সে সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষকে পূর্ব্ব হইতে সচেতন করিয়াও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় বর্ত্তমান অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

১৯৫০ সালের বন্যায় নোনাজলে সুন্দরবনের সমুদ্রকূলোপ-বর্ত্তী বাঁধ ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতি ও গ্রামবাসিগণ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে এবং বাঁধের অধিকারী জমিদারবর্গকে এই বাঁধ মেরামতের প্রয়োজনীয়তা জানান এবং দ্রুত তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু জমিদারদিগের কার্পণ্য ও কর্ত্তৃপক্ষের শৈথিল্যের জন্য সময়ে তাহা হয় না। ফলে বাঁধ ভাঙিয়া নোনা জল দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাইলের পর মাইল শস্যক্ষেত্র বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া যায়। পর বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য ব্যাপক শস্যহানি ঘটে। নোনা জলে বিধ্বস্ত অঞ্চল পুনরায় চাষের উপযুক্ত হইতে অন্ততঃ দুই বৎসর লাগিবে। সুতরাং চাষী-মজুরের বৃত্তি ধ্বংস হইয়াছে। সুন্দরবন এক-ফসলী অঞ্চল। কতিপয় বড় জমিদার ও জোতদার ব্যতীত অধিবাসীদের অধি-কাংশ ভাগচাষী, ছোটখাট চাষী এবং চাষী মজুর। চাষ ব্যতীত অন্য আয়ের পথ তাহাদের নাই। সুতরাং পর পর দুই বৎসর অজন্মার ফলে তাহারা আজ বেকার। তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমানে অগ্নিমূল্য দিয়া খাদ্যশস্য ক্রয় করা দুঃস্বপ্ন। সুতরাং সুন্দরবনের এই সর্ব্বহারা নিরন্নদের আজ ঘাসের মূল ও গাছের পাতা খাইয়া জীবনরক্ষার চেষ্টা করিতে হইতেছে। সম্মিলিত সাংবাদিক দলের বিবরণে প্রকাশ—বৃত্তির জন্য ও খাদ্য অন্বেষণে দলে দলে সাঁওতাল ও অন্যান্য চাষীরা পিতৃ-পুরুষের ভিটা পরিত্যাগ করিয়াছে—পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। সুন্দরবনের এই সব বৃত্তি-হীন উপায়হীন দরিদ্রতম জনসাধারণ তাহাদের বস্ত্রসমস্যা অনেকটা মিটাইয়াছে, কারণ অধিকাংশ শিশু ও কিশোরই নগ্নদেহ। দেখা যাইতেছে খাদ্যসমস্যাও তাহারা অনেক সহজ করিয়াছে—শাকপাতায়, মূল ও শিকড়ে। কিন্তু তাহাতেও যে অচিরেই কাড়াকাড়ি পড়িবে ইহাই ভাবনা।

সংবাদপত্রে দেশবাসীর দাবীর প্রত্যুত্তরে পশ্চিমবঙ্গের সমবায়, সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি বিভাগীয় মন্ত্রী ডাঃ আর আমেদ

গত ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল সন্দেশখালি ও হাসনাবাদ থানার দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিয়া সাংবাদিক বৈঠকে এক বিবৃতি দিয়াছেন।

তিনি বলেন, ঐ অঞ্চলের লোকের অত্যন্ত দুর্গতি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্গতি এমন নহে যে, উহাকে দুর্ভিক্ষের অবস্থা বলা যাইতে পারে। তাঁহার দৃঢ় ধারণা—এখানকার অবস্থা সম্পর্কে ইতিমধ্যে যে সব বিবরণী বা বিবৃতি বাহির হইয়াছে তাহা অতিরঞ্জিত। তিনি অনাহারে মৃত্যুর কোন প্রমাণ পান নাই। খাদ্য বা বস্ত্র যাহা আছে তাহা লোকের চাহিদা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু লোকের হাতে পয়সা নাই ইহাই বড় সমস্যা এবং ইহাই বর্ত্তমান দুর্গতির মূল। সরকারী রেশন দোকানে যদিও চাউলের পরিমাণ যথেষ্ট নহে, কিন্তু গম পর্য্যাপ্ত ভাবে মজুত আছে।

অতএব সরকারী মতে উক্ত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব নাই—অভাব হইয়াছে অর্থের। লোকের বৃত্তি নাই সুতরাং ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে এবং সেই কারণেই তাহারা অন্নাভাবে দিন কাটাইতেছে।

আমাদের প্রশ্ন এই যে, কাহারা এই মূল্যবৃদ্ধির পশ্চাতে আছে? ১৯৫১ সালের প্রাপ্ত শস্যের ও আমদানী শস্যের পরিমাণ হইতে মোট খাদ্যের যে ধারণা করা হয় তাহাতে এত শীঘ্র দেশে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব দেখা যাইবে বলিয়া মনে করার কোন কারণ ছিল না।

সাধারণতঃ বৈশাখ মাসে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা অভাব অনুভূত হয় না। শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্তই অভাব দেখা দেয়।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ করায় চোরাকারবারী মুনাফালোভী ব্যবসায়ী মহলে দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি হয় এবং মূল্য-মান উন্নত করিবার জন্য ভারত-সরকারের বড়কর্ত্তাদের নিকট আবেদন-নিবেদন চলিতে থাকে। তাহারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপে ভারত-সরকার খাদ্যমূল্য-হ্রাসে সরকারী সাহায্য দান বন্ধ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কারণ একমাত্র খাদ্যের মধ্য দিয়াই অতি দ্রুত তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব। এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেশন-বহির্ভূত এলাকার খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, বড় বড় মজুতদার ও আড়তদারগণ যদি প্রতিদিনই বিক্রয়ের সময় মণ প্রতি আট আনা, এক টাকা মূল্য বৃদ্ধি করিতে থাকে তবে মূল্য ২৭ টাকা হইতে ৪০।৪৫ টাকায় উঠিতে কতদিন লাগে? এবং ইহা তুলিতে তাহাদের কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না, ধনিক-তোষণকারী সরকারের সহায়তায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিনি কণ্ট্রোল করিয়া চোরাকারবারের আর একটি রাস্তা খুলিয়া দিল। এতদ্ভিন্ন পাট ও তুলার চাষ বৃদ্ধির দ্বারা খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমাইয়া সরকার তাহাদের মূল্য বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিতেছে। কৃষি-বিভাগ ফসল উৎপাদন কমাইয়া রাখিতেছে; বাণিজ্য-বিভাগ খাদ্য আমদানীতে বৈদেশিক মুদ্রা শেষ করিতেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের দোহাই দিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানী ঠেকাইতেছে, শিল্প-বিভাগ কলকারখানাকে কাজ বন্ধ করিয়া বা কমাইয়া উৎপাদন হ্রাস করিতেছে। সুতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে কোনই অসুবিধা নাই, এবং সকলের মিলিত প্রভাব খাদ্যের উপর পড়ায় খাদ্যের অবস্থা যে শোচনীয় হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। যে কৌশল ও যে উপায় অবলম্বনে '৪৩ সালে মন্বন্তর ঘটাইয়া ৫০ লক্ষের জীবন বলিদান করা সম্ভব হইয়াছিল আজও সেই সকল কৌশলেরই পুনরাবৃত্তি হইতেছে বলিয়া মনে হয় এবং ইহাতে যে কত জীবন হানি হইতে পারে তাহা অনুমান করা সহজ নহে। কর্ত্তৃপক্ষের ভরসা যে, এদেশের লোকে না খাইয়া মরে তবুও খাবারের দোকানে হানা দেয় না। কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, ১৯৪৩ সালে ও ১৯৫২ সালে প্রভেদ অনেক; অনেক পরিবর্ত্তন মানুষের দেহে-মনে ঘটিয়াছে। নির্ব্বিচারে সহ্য করিবার মত মানসিক অবস্থা আর দেশবাসীর নাই; এ সত্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সময় আসিয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। পুণায় সোশ্যালিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এক সঙ্ঘবদ্ধ সত্যাগ্রহ সুরু হইয়াছে। খাদ্য ফ্রন্টে তাহাদের এই সত্যাগ্রহ জনসাধারণের সম্পূর্ণ আন্তরিক সহানুভূতি ও সহায়তা যে পাইবে তাহাতে দ্বিমত নাই। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া অবস্থার বিচার করিতে হইবে।

বস্তুতঃ সরকারী মহল বর্ত্তমান পরিস্থিতিকে খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষ আখ্যা দিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। কারণ সুন্দরবন অঞ্চলে এক-আধজন লোক অনাহারে মারা গেলেও মৃত্যুহার ব্যাপক নহে। কিন্তু মৃত্যুসংখ্যা যাহাই হউক, একজন লোকও যদি খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে তাহা যে-কোন সভ্য রাষ্ট্রের পক্ষে কলঙ্কের কথা। আর এ মৃত্যু যদি ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে হয় তবে তাহা আরও পরিতাপের বিষয়। সুতরাং মৃত্যুর সংখ্যা কত বা মৃত্যুর কারণ কি তাহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক না করিয়া সমস্যার সমাধান করাই আশু কর্ত্তব্য। অবশ্য সুন্দরবন অঞ্চলে বাংলা-সরকার সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা আরও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। সাহায্য দান ব্যাপারে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা এখনই কর্ত্তব্য। সন্দেশখালি, হাসনাবাদ অঞ্চলের অবস্থা যে গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রদেশের অন্যান্য জেলা হইতেও দৈনিক যে সকল সংবাদ আসিতেছে তাহাতে মনে হয় সে সকল স্থানের অবস্থাও বিশেষ আশাপ্রদ নহে। বর্দ্ধমান জেলার কালনা অঞ্চলে, নদীয়ার কোন কোন অংশে

খাদ্যাবস্থা সুন্দরবন অঞ্চল অপেক্ষা কোন অংশেই ভাল নয়, একথা ডাঃ আমেদও সাংবাদিক বৈঠকে স্বীকার করিয়াছেন। এ সকল স্থানে যাহাতে খাদ্যমূল্য মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে নামিয়া আসে তাহার ব্যবস্থা যে কোন উপায়ে করা দরকার। এ বিষয়ে জনসাধারণের দায়িত্ব সরকারী কর্ত্তব্য হইতে কোন অংশে কম নহে। বিশেষতঃ যখন কতকগুলি মিথ্যা কুসংস্কার সমস্যা সমাধানের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন বেসরকারী দায়িত্ব অনেক বেশী। সংবাদে প্রকাশ, সরকারী গুদামে যদিও চাউল প্রয়োজন অনুযায়ী নাই তথাপি গম পর্য্যাপ্ত মজুত আছে। কিন্তু জনসাধারণ গম ব্যবহার করিতে নারাজ। অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে গম পাওয়া সত্ত্বেও তাহারা গম ক্রয় করিবে না। যাঁহাদের সঙ্গতি আছে তাঁহারাই "বাঙালীর পেটে আটা সয় না" এই কুসংস্কারে চড়া দামে চাউল ক্রয় করিয়া দাম চড়াইয়াছেন এবং দরিদ্রের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। এ ধরণের কুসংস্কার বাস্তবিকই নিন্দনীয়। এবং ইহা দূর করার দায়িত্ব সরকারী ও বেসরকারী উভয় স্তরেরই।

আর একটি বিষয় আমাদের খুবই অদ্ভুত লাগিতেছে। বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই বন্দরে দৈনিক গম ও মাইলো বোঝাই জাহাজ আসিতেছে। কিন্তু মাল খালাস করিয়া রাখিবার স্থান অভাবে মাল নামানো হইতেছে না। কারণ বোম্বাই বন্দরের গুদামে এত খাদ্য মজুত আছে যে, সেখানে তিলার্দ্ধ স্থান নাই। অনেক খাদ্য অরক্ষিত অবস্থায় বাহিরে ফেলিয়া রাখিতে হইতেছে, ভারত-সরকারও অনুরূপ অসুবিধায় পড়িয়াছেন। তাঁহাদের গুদামে এত খাদ্য জমা হইয়াছে যে, নূতন খাদ্য আনিবার সাধ্য তাঁহাদের নাই। উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশের সংবাদে প্রকাশ যে, ট্রান্সপোর্টের অভাবে তাহারা মাদ্রাজ ও পঞ্জাবের দুর্ভিক্ষাঞ্চলে খাদ্য পাঠাইতে পারিতেছে না।

সুতরাং দেশে খাদ্য আছে, এক ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে, দ্বিতীয়তঃ রেলের অসুবিধায় বিপন্ন অঞ্চলে খাদ্যাভাব মিটিতেছে না। এ বিষয়ে যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মে মাসে চাউল সম্পর্কে তিনটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন

"রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উদ্যোগে যবদ্বীপের বান্দুং নগরীতে তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। এই তিনটি বৈঠকেরই মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল চাউল উৎপাদন সম্পর্কে কিছু কার্য্যকরী সিদ্ধান্ত করা।

আন্তর্জাতিক চাউল কমিশনের তৃতীয় অধিবেশন হবে ১২ই মে তারিখে। চাউল উৎপাদন ও জমির সারের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দুটি বৈঠক হবে এর আগে। সংশ্লিষ্ট কর্মীরা তাদের আলোচনা আরম্ভ করবেন ৫ই মে থেকে।

চাউল কমিশনের সম্মেলনের অস্থায়ী আলোচ্য সূচী নিম্নরূপ :

(১) উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও ব্যবহার্য্য পণ্যের রূপান্তরকরণের মারফত ক্ষতির হার কমানো।

(২) জলসেচ প্রক্রিয়া।

(৩) বিভিন্ন দেশে চাউল উৎপাদন যে-সব সুনির্দিষ্ট কারণে ব্যাহত হয়।

(৪) চাউল উৎপাদনের সহায়ক আর্থিক ব্যবস্থাসমূহ।

(৫) ভাল চাউল উৎপাদনের ব্যবস্থা ও ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

কমিশন উক্ত দুই ধরণের কর্মীদেরই বিবরণ শুনবেন। ধান গাছ ও উৎপন্ন ফসল রক্ষার বৈজ্ঞানিক পন্থা কি এবং চারাগাছ পালনের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন—সে সম্পর্কে গবেষণা করবেন একদল কর্মী। বিদেশের কারিগরি সাহায্য নিয়ে এ ব্যাপারে কতদূর কি চেষ্টা করা সম্ভব তাঁরা এসব চিন্তা করে দেখবেন।

জমিতে সার দিয়ে তার উর্ব্বরা শক্তি বাড়ানোর উপায় কি তা অনুসন্ধান করবেন অপর একদল কর্মী। এই দল কমিশনের কাছে কতিপয় সুপারিশ করবেন। সংশ্লিষ্ট দেশগুলি নিজের শক্তিতে এবং অন্যের সহায়তায় ঐগুলি কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করবেন।

১৯৪৮ সালে ফিলিপাইনে যে আন্তর্জাতিক চাউল সম্মেলন হয় সেখানেই এই কমিশন গঠনের ব্যবস্থা হয় ; চাউল উৎপাদন সংরক্ষণ, বণ্টন ও ভোগ সম্পর্কে সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাকে সুকর করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই কমিশন গঠিত হয়েছিল।

বাইশটি দেশ এই কমিশনের সদস্য, প্রতি দুই বছর অন্তর এর সভা হয়। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেঙ্গুনে কমিশনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।"

পৃথিবীর লোকসংখ্যা যুদ্ধবিগ্রহ, অভাব-অনটন সত্ত্বেও বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকানাইলাল মুন্সীর মতে এই বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত না করিলে খাদ্যসঙ্কট মিটিবে না। এই সমস্যা কেবল ভারতবর্ষের নয় ; সারা জগতের। সেই জন্যই এত আয়োজন-উদ্যোগ, সম্মেলন ও পরিকল্পনার ছড়াছড়ি। ইহার মধ্যে নূতন কিছু নাই। জীবমাত্রেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হয়।

পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস চাষ

গবর্ণমেণ্ট পরিকল্পনানুযায়ী পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে ১৯৫১-৫২ সনের কার্পাস চাষের অবস্থা ও পর বৎসর ১৯৫২-৫৩ সনের কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্যে গত ২৪।৪।৫২ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ষ্টেট-কটন সাবকমিটির অধিবেশন হয়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ৫০০০ একর জমিতে চাষ হইবে

বলিয়া কার্য্য আরম্ভ হইলেও বৃষ্টির অভাবে সময়মত চাষ না হওয়াতে ৩৫০০ একর জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত দুর্ব্বৎসর ও সময়মত গবর্মেণ্ট হইতে সার ও অন্যান্য সাহায্য না পৌঁওয়ার মাত্র ১০০০ একর জমি হইতে ফসল সংগৃহীত হইয়াছিল। বঙ্গীয় মিল মালিক-সমিতি কার্পাস হইতে বীজ ছাড়াইবার জন্য কয়েকটি কল বসাইয়া বীজ সমেত তুলা খরিদ করিবে স্থির করে। কৃষিবিভাগ কর্তৃক প্রতি মণ কার্পাসের জন্য ৪০৲ মূল্যে চাষীদের নিকট হইতে কার্পাস খরিদ হইতেছে। একর প্রতি গড়ে তিন মণ কার্পাস পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ ১০০ একর পর্য্যন্ত চাষ করিলেও অধিকাংশই ক্ষুদ্র চাষী। ৩০০০ একর জমিতে উৎপাদক সংখ্যা ছিল ৮০০০। এ প্রকার ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে কেহ কেহ একরে ৮।৯ মণ কার্পাসও পাইয়াছে। উৎপাদন খরচ একর প্রতি ১৫০৲ হইতে ২৫০৲ পর্য্যন্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় খুব কমসংখ্যক উৎপাদকই ইহার চাষে লাভ করিতে পারিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয় লইয়া বিশদ আলোচনা করেন। শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করেন যে, আমেরিকার ক্ষুদ্র চাষীদের অনুকরণে বীজ পুঁতিবার পর এক মাস হাতে নিড়ান খোঁড়া না করিয়া হাত লাঙ্গল ও বিদে ব্যবহার করিলে (এবং তাহার পর ১ গরুচালিত লাঙ্গল ও বিদে ব্যবহার করিলে) চাষের খরচ অনেক কমিবে। এভাবে জমি আগাছামুক্ত ও মাটি আলগা থাকিবে বলিয়া কার্পাসেরও ফলন বাড়িবে। বাংলায় ইহার উপযোগিতা প্রমাণিত হইলে ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে সহজেই এই প্রণালীর চাষ প্রচলন করা সম্ভব হইবে। বর্ত্তমানে বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির কাজে—যাহাতে তাহারা সকলেই কার্পাস উৎপন্ন করিয়া চরখার সূতা কাটিয়া বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই ডাঃ রায় প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করেন। এবারে সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী বীজ, সার প্রভৃতি অল্প মূল্যে (subsidised rato) সরবরাহ ও চাষের জন্য যেভাবে ফসল হইতে মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা রাখিয়া সরকারী ট্রাক্টর দ্বারা জমি প্রস্তুত বিষয়ে সাহায্য করা হয়, তাহা করা হইবে। স্বল্পাবধানের সুবিধার জন্য ২৫ একরের অধিক জমিতে যাহারা চাষ করিবে তাহাদিগকে পরিকল্পনা ভুক্ত করিয়া উপরোক্ত সুবিধা দেওয়া হইবে। অন্যান্য চাষীরা যাহাতে সময়মত কার্পাস বীজ সার সরকারী কৃষিবিভাগে তাহার ব্যবস্থা থাকিবে এরূপ আশা দেওয়া হয়।

কার্পাস না হওয়াতে বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট তুলা প্রচুর আমদানী করিতে হয়। ইহাতে ভারতবর্ষের কোথাও মিহি সূতা তৈয়ির উপযোগী উৎকৃষ্ট ইজিপশিয়ান কার্পাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় উৎপাদন করিতেছেন এবং তাহা হইতে মোহিনী মিলসের মতে ৮০ নং আমার্থ সূতা প্রস্তুত হইতে পারে এবং কেশরাম কটন মিলসের মতে উহার আঁশ ১$\frac{5}{16}$″ দীর্ঘ করিতেছেন জানাইলে ডাঃ রায় মন্তব্য করেন যে, বর্ত্তমানে তিনি যেভাবে অল্প পরিমাণে ইহার চাষ করিতেছেন গবর্মেণ্ট সাহায্যে তাহাই চালান হইবে।

বাংলার কার্পাস চাষীগণ যাহাতে মাঝে মাঝে একত্র হইয়া কার্পাস চাষের সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে আলোচনা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইলে কার্পাস চাষের প্রভূত উন্নতি হইবে। আমেরিকা ও আফ্রিকাতে এম্পায়ার কটন গ্রোয়ার্স সমিতি সে সকল দেশে এই প্রণালীতে কার্পাস উৎপাদন বিষয়ে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে।

পশু-চিকিৎসা ও পশু-পালন

উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত মথুরার পশু-চিকিৎসা ও পশু-পালন মহাবিদ্যালয়টি ভারতে অদ্বিতীয়। ৭৮৪ একর জমির উপর ইহা অবস্থিত। একটি গৃহপালিত পশুগবেষণা-কেন্দ্র ইহার সঙ্গে যুক্ত আছে। এই মহাবিদ্যালয়ে পশু-পালন ও শস্য-বপন প্রভৃতি একযোগে শিক্ষা দেওয়া হয়।

১৯৪৭ সালে যখন ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এখানে মাত্র ৬০টি ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানে এখানে ১৭৫টি ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। এই মহাবিদ্যালয়ে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ভি এস-সি এণ্ড এ এইচ ডিগ্রীর জন্য ৪ বৎসরের পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয়। এই শিক্ষায়তনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে গৃহপালিত পশুসংক্রান্ত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। পশু-পালনের উপর এখানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এই শিক্ষায়তনে পশু-প্রজনন ও পশুর পুষ্টিসাধন সম্বন্ধে নানাপ্রকার গবেষণা করা হইয়া থাকে। কৃত্রিম উপায়ে পশু-প্রজনন জনপ্রিয় করা হইয়াছে। গরুর খাদ্যের তারতম্য করিয়া দুগ্ধোৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গবেষণাকার্য্যে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করা গিয়াছে।

উত্তর প্রদেশে কৃত্রিম উপায়ে পশু-প্রজননের দ্বাদশটি কেন্দ্র আছে। আরও চতুর্দ্দশটি নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে। হর্মোন চিকিৎসার ফলে গরু ও ঘোড়ার বন্ধ্যাত্ব দূর করাও গবেষণার ফলে সম্ভব হইয়াছে। গবেষণা সফল হইলে তাহা যথাসম্ভব জনসাধারণকে জানান হয়।

এখানে একটি গৃহপালিত পক্ষী-কেন্দ্রও আছে। তথায় প্রায় ১,০০০ পক্ষী পালন করা হয়। গ্রামবাসীরা এখান হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পক্ষী ও ডিম লইয়া যায়। এইভাবে প্রতি বৎসর প্রায় ১,৫০০ হইতে ২,০০০টি ডিম (এইগুলি হইতে বাচ্চা হইতে পারে) এবং ৫০০ হইতে ৬০০টি পক্ষী সরবরাহ করা হয়।

শস্যকণা, কপি প্রভৃতি নানা জাতীয় খাদ্য পক্ষীদিগকে খাওয়ান হয়। প্রাতে বেলা ১২টায়, বৈকাল ৩টায় এবং সন্ধ্যা ৬টায় এই চারি বার নিয়মিতভাবে পক্ষীকুলকে রুচিকর

খাবার দেওয়া হয়। প্রতিটি পক্ষীর জন্য মাসে ২৷৹ টাকা ব্যয় হয়। পক্ষীর খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় শাকসব্জী এখানকার ক্ষেতেই হয়।

এই মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি পশু-হাসপাতাল আছে। পশুর রোগ-নির্ণয়ের সুবিধার জন্য এখানে একটি এক্স-রে যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই হাসপাতালটির সুনাম দিন দিনই ছড়াইয়া পড়িতেছে। রাজ্যের দূরতম স্থান হইতেও চিকিৎসার্থ রুগ্ন পশু এখানে আনা হয়।

এখানে চার বৎসরের যে পাঠ্যসূচী অনুসৃত হয় তাহার মধ্যে শারীর-বিদ্যা, শারীর-স্থান, পশু-পরিচালন, পশু-পুষ্টি, দুগ্ধ-সংরক্ষণ, পশু-প্রজনন, পশুসংক্রান্ত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে ভর্ত্তি হইতে হইলে প্রার্থীদিগকে অন্ততঃ (জীববিদ্যাসহ) আই-এস্‌সি পাস হইতে হইবে।

গত ৬ই বৈশাখ নূতন দিল্লী হইতে উপরোক্ত বিবরণটি প্রচারিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটার তুলনায় মথুরার পশু-চিকিৎসালয় ও পশু-পালন প্রতিষ্ঠানটি বৃহৎ ব্যাপার। বৃহৎ ব্যাপারে নানারূপ গলদ থাকে, যেমন আছে হরিণঘাটার। কলিকাতা নগরীর বহুবাজারে হরিণঘাটার "টোন্‌ড মিল্ক" ও বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রাতে ২ ঘণ্টার মধ্যে কর্ম্মীরা কাজ সারিয়া চলিয়া যান। সুতরাং যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেক সময় দুধ না পাইয়া ফিরিয়া যান। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, কয়েকজন এম-এ, বি-এ পাসকরা মহিলা দু'ঘণ্টার জন্য এ কাজ করেন। রাষ্ট্র যখন ব্যবসায় চালাইতে অগ্রসর হন, তখন এরূপ অব্যবসায়ী পন্থা অবলম্বন করিলে, ক্ষতি স্বীকার ছাড়া গত্যন্তর নাই। সে ক্ষতি শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণের স্কন্ধে গিয়া পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের নদনদী

'আর্থিক প্রসঙ্গ' নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয় একটি প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক ও নদ-নদীর অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। নূতন কিছু না থাকিলেও, তাহা বলার ও জানার প্রয়োজন আছে। লেখক এই উপলক্ষে রাজা দিগম্বর মিত্রের নাম করিতে পারিতেন। তিনিই বাঙালীর মধ্যে বাংলাদেশে নদনদীর অবনতির কারণ ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন। তাহা আজ প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

লেখক বেণ্টলি সাহেবের পুস্তকের, সার উইলিয়ম উইলকক্‌সের উপর নির্ভর করিয়াছেন। আমরা উক্ত প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম:

"মুক্ত পলিপূর্ণ বন্যার জল জমির উৎপাদিকা শক্তির সহায় এবং জনস্বাস্থ্যের পক্ষেও বিশেষ কল্যাণকর। এ সম্বন্ধে ডাঃ বেণ্টলি তাঁহার ম্যালেরিয়া এবং কৃষি (Malaria and Agriculture) পুস্তকে লিখিয়াছেন, অতীত 'ব' দ্বীপের ন্যায় বাংলাদেশেও পরিপূর্ণ বন্যায় জলের দ্বারা সেচের উন্নতি ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপের অবনতি একই সঙ্গে জড়িত।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ হ্যামিলটন লিখিয়াছেন—"জমির আয়তনের অনুপাতে জমির উৎপাদন বিষয়ে সমগ্র হিন্দুস্থানে বর্দ্ধমান প্রথম ও তাঞ্জোর দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী।"

পরিবহন এবং বহির্ব্বাণিজ্যেও বাংলার প্রাচীন ব্যবস্থা প্রশংসনীয়। বাংলা নদীমাতৃক দেশ। জলপথে বাণিজ্যই ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল। পদ্মা, গঙ্গা, দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই, অজয়, ময়ূরাক্ষী, কপোতাক্ষী প্রভৃতি নদনদী ও ইহাদের সংশ্লিষ্ট খালগুলি যে বৃহত্তর বাংলার সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত দীর্ঘ জলপথ রচনা করিয়াছিল, আজিও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই জলপথের সহিত সমুদ্রোপকূলের যোগাযোগ ও বাণিজ্য-সম্পর্কও উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত বন্দর যে বাংলার জলপথের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিল এবং ইহাই বৃহত্তর বঙ্গের তথা সমগ্র উত্তর ভারতের প্রধান বন্দর ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বাংলার বিস্তৃত সমুদ্রোপকূল বহির্ব্বাণিজ্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। জলপথ ব্যতীত কটক রোড, অহল্যাবাঈ রোড প্রভৃতি আন্তঃপ্রাদেশিক রাজপথগুলি আজও প্রাচীন বাংলার উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার পরিচয় দেয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই কৃষি ও সেচব্যবস্থা সহযোগিতার সহিত কাজ করিয়াছিল। সার উইলিয়মের মতে, মোগলসাম্রাজ্যের অবসান, বর্গীর হাঙ্গামা ও ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাতের সময় দেশে যে অত্যাচার ও অরাজকতা চলিয়াছিল, তাহারই ফলে এই কৃষি ও সেচব্যবস্থার অবনতি ঘটিয়াছিল। মারাঠা-আফগান-যুদ্ধজনিত রাষ্ট্রবিপ্লবের গোলযোগে মধ্য-বাংলার রায়ত ও জমিদারগণ সেচের জন্য খালগুলি পরিষ্কার রাখা এবং খাল হইতে উদ্বৃত্ত পলিমাটি খালের তীরবর্ত্তী বাঁধ মেরামত করার কাজে অবহেলা করায় ১৮০৫ সালের পূর্ব্বেই গঙ্গার সেচব্যবস্থা একেবারে অচল হইয়া পড়িয়াছিল। তদানীন্তন ইংরেজ ব্যবসায়ীরা এই সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকায় সেচের জন্য প্রস্তুত খালগুলিকে নৌকা যাতায়াতের নদীপথ ভাবিয়া তাহার সংস্কারের কিছুই চেষ্টা করেন নাই। এই ভাবে একে একে সমস্ত সেচব্যবস্থাই অচল হইয়া যাওয়ায় কৃষির অবনতির মুখ্য কারণ ঘটিল।

"শুধু তাহাই নহে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বাংলার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশ একেবারে রূপান্তরিত হইল, তখন দেশে আসিল প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়। ১৭৬৭ সাল হইতে ১৭৭৬ সালের মধ্যে বাংলার ভৌগোলিক মানচিত্র একেবারে বদলাইয়া গেল—নদ-নদীর গতি পরিবর্ত্তন হেতু।

ভূমিকম্প ও কয় বৎসর ধরিয়া ভীষণ জলপ্লাবনের ফলে ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া উত্তরবঙ্গে নূতন স্রোতধারা যমুনা নদীর সৃষ্টি হইল (১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে)। দামোদর নদী কয়েক বৎসর প্লাবনের পর বর্দ্ধমান জেলা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-গামিনী হইল। পদ্মা নদীও পূর্ব্ব-গামিনী হইল। ইহার ফলে ক্রমে, ভাগীরথী, জলঙ্গী, ভৈরব ও মাথাভাঙ্গার অধোগতি আরম্ভ হইল। সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য-বাংলা হইল মৃত নদীর জীর্ণ-কঙ্কালে ভরা, বনজঙ্গলাকীর্ণ ম্যালেরিয়া-মহামারী নিপীড়িত কঙ্কু অঞ্চল।"

গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণ

গত ৫ই বৈশাখ গঙ্গা সেতু নির্ম্মাণ কমিটির পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে শ্রীবিশ্বেশ্বরায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদল তাঁহাকে বলেন যে, পাটনা মোকামা অঞ্চলে পাটনার যতদূর সম্ভব নিকটে সেতু নির্ম্মিত হওয়া উচিত।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন—বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীশ্যামনন্দন সহায়, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু, বিহার প্রেস এসো-সিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীনবলকিশোর সিংহ, শ্রীব্রজনন্দন আজাদ এবং শ্রীব্রজশঙ্কর বর্ম্মা। গঙ্গার উপরে কোন্ স্থানে সেতু নির্ম্মিত হইবে তাহা নির্ব্বাচনের ভার বিশ্বেশ্বরায়া কমিটির উপর অর্পিত হইয়াছে।

একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপির সারমর্ম্ম এই—উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণের স্থান নির্ব্বাচন সম্পর্কে আমরা আপনার বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পেশ করিতেছি :

(১) সেতু পাটনা মোকামা অঞ্চলে অবস্থিত হইলে এবং যতদূর সম্ভব পাটনার নিকটবর্ত্তী হইলে, ইহার দ্বারা উত্তর বিহারের দেড় কোটি অধিবাসী, উত্তর প্রদেশের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের ৪৫ লক্ষ অধিবাসী, নেপালের ৭৮ লক্ষ অধিবাসী এবং দক্ষিণ বিহারের ১ কোটি ১২ লক্ষ অধিবাসীর সুবিধা হইবে।

(২) ইহার ফলে উত্তর বিহারের অর্থনৈতিক স্থিতি সুদৃঢ় হইবে। ২১০০০ বর্গমাইল অঞ্চলের অধিবাসী ইহার সুবিধা ভোগ করিবে।

(৩) ইহার ফলে নদী উপত্যকা পরিকল্পনাসমূহের কার্য্য অপেক্ষাকৃত অধিকতর দ্রুত সম্পাদিত হইবে।

(৪) এই স্থানে সেতু নির্ম্মিত হইলে ইহার ফলে দুর্ভিক্ষ সাহায্য কার্য্যের সুবিধা হইবে এবং খাদ্যশস্যাদি অপেক্ষাকৃত সহজে প্রেরিত হইতে পারিবে।

(৫) ইহার ফলে উত্তর বিহারের উৎপন্ন মৎস্য, ফল, শাকসব্জী প্রভৃতির জন্য বাজার গড়িয়া উঠিবে।

(৬) ইহার ফলে নেপালের উন্নয়নে যে সুবিধা হইবে, সেতু অন্য কোন অঞ্চলে নির্ম্মিত হইলে তাহা হইবে না।

প্রতিনিধি দল বলেন, গঙ্গার উপরে বাঁধ রাজমহলে অথবা ফরাক্কাতে নির্ম্মিত হইবে এ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। এরূপ একটি পরিকল্পনার কার্য্যে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। সুতরাং এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে সময়ও যথেষ্ট লাগিবে। কিন্তু পাটনা, মোকামা অঞ্চলে সেতু নির্ম্মাণের কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ করা প্রয়োজন। বাঁধ নির্ম্মাণ পরিকল্পনা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সেতু নির্ম্মাণ স্থগিত রাখা উচিত হইবে না। সেতু নির্ম্মাণ ও বাঁধ নির্ম্মাণ দুইটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কার্য্য। গঙ্গার সেতু নির্ম্মাণের জন্য ১০.১৫ বৎসর অপেক্ষা করা বিহারের পক্ষে সম্ভব নয়।

কোন্ জায়গায় সেতুটি নির্ম্মিত হইবে, তাহা তর্ক-বিতর্কের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। গঙ্গার উপর অসংখ্য সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। তার মধ্যে কাশীর সেতু ও উইলিংডন সেতু প্রধান।

২৫ লক্ষ একর জমি বণ্টনের সঙ্কল্প

সেবাপুরীর চতুর্থ সর্ব্বোদয় সম্মেলনে গত ১লা বৈশাখ তারিখে গৃহীত এক প্রস্তাবে দেশের সমুদয় গঠনমূলক কর্ম্মীকে ভূ-দান যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করিতে এবং আগামী দুই বৎসরের মধ্যে ২৫ লক্ষ একর জমি বণ্টনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে বলা হয়। গঠনমূলক কার্য্যে রত কর্ম্মীরা যাতে কেন্দ্রীভূত শিল্পজাত দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া তৎস্থলে কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করেন, আলোচ্য প্রস্তাবে তাঁহাদের সেই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

"প্রস্তাবটিতে আরও বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারাই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব-পর। আজ কেন্দ্রীভূত শিল্প-ব্যবস্থার জন্যই দেশ খাদ্য ও বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারছে না। কেন্দ্রীভূত শিল্প-প্রয়াসকে সর্ব্বতোভাবে বন্ধ করে দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রীকৃত কুটীরশিল্প চালু করা দরকার। আরও বলা হয় যে, মাতার উপর যেমন শিশুর অধিকার আছে, মাটির উপরও তেমনি প্রতিটি মানবের অধিকার বর্ত্তমান। সুতরাং যাহাতে প্রতিটি পরিবারে পাঁচ একর সাধারণ জমি এবং এক একর করে জল জমি পেতে পারে, ভূ-দান যজ্ঞ এইভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার।

"বিতর্ককালে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রীযুক্ত পাতিল বলেন যে, ভূ-দান যজ্ঞ পরিকল্পনানুযায়ী কাজ হলে জমি অত্যন্ত ছোট ছোট টুকরায় ভাগ হয়ে যাবে, আর যৎসামান্য জমি হতে কোন কৃষক তার পরিবারের গ্রাসাচ্ছদনের সংস্থান করতে পারে না, উপরন্ত ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত হওয়ায় জমিতে ফসল উৎপাদনও বাড়ান যাবে না এবং শিল্পব্যবস্থাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শ্রীযুক্ত পাতিলের উক্তির বিরোধিতা করে ও ভূ-দান যজ্ঞ সমর্থন করে বহু গঠনকর্ম্মী নেতা বক্তৃতা দেন।

শ্রীপাতিলের বক্তৃতা ভারত গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের

পরিচয় প্রদান করে। নেহেরুজী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই গঠনমূলক কার্য্য ও শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ চান। কিন্তু তাঁহাদের সকল কথার মধ্যে 'কিন্তু' আছে। একথাও সত্য যে দেশের জমীর পরিমাণের সীমা আছে। তাহার শ্রেষ্ঠতম উপায়ে ব্যবহার ভিন্ন দেশের লোকের বাঁচিবার পথ নাই।

সাহিত্য ও বাংলা ভাষা

পূর্ব্ববঙ্গে উর্দু বনাম বাংলা রাজনীতির ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের প্রস্তাব অনুসারে বাংলা ভাষাকে পাকিস্থান রাষ্ট্রের বিকল্প রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দান করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

এই বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত শ্রেণী ও জনসাধারণ একমত। তাহার প্রমাণ পাই ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের মাহে-নও মাসিক পত্রিকায়। প্রথমেই প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর একটি বক্তৃতা প্রকাশিত করা হইয়াছে। ইহা কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ। এই ভাষণের নিম্নলিখিত অংশ প্রণিধানযোগ্য :

"আমাদের জীবনে ধর্ম্মকে রূপায়িত করতে চাইলে ধর্ম্মকে আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্য-সুষমায় মণ্ডিত করে পেশ করতে হবে। লা রাহবানিয়াতা ফিল-ইসলাম—ইসলামে বৈরাগ্য নাই। ইসলামের মূল ভাষাতেও বৈরাগ্য নাই। ইসলাম-ঘটিত আমাদের ভাষাতেও বৈরাগ্য থাকলে চলবে না। কোন দেশের কোন যুগের কোন ধর্ম্মের ভাষাতেই বেশী দিন চলে নাই।

বাংলা ভাষায় কোরআন ও হাদীসের অনুবাদ শুরু হয়েছে; ইসলাম সম্বন্ধে বই লিখতেও অনেকে আরম্ভ করেছেন। তাঁরা দেশের ধন্যবাদার্হ। তবে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—স্বয়ং আল্লা যেমন কোরআনের মহাবাণীকে অপূর্ব সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন, আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুরাও যেন সে বাণীকে সাহিত্যিক সুষমায় মণ্ডিত করে এ দেশের পাঠক সমাজের সামনে পেশ করেন। অন্যথায় মিলাদ খাঁ মুন্সী সাহেবের মতই আফশোস করে বলতে হবে—কিয়ামত নজদিক, নইলে ধর্ম্মের এমন ভাল ভাল কথা না পড়ে হতভাগারা নাটক নভেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে কেন?

একথা আমাদের কিছুতেই ভুললে চলবে না যে, জীবনে যেখানে কাব্য নাই, সেখানে জীবনের আনন্দের কোঠা অনেকখানি খালি পড়ে থাকে। আর আনন্দ যেখানে কম, সৃষ্টির স্রোত সেখানে স্তিমিত।

আমাদের নূতন রাষ্ট্র, আর সে রাষ্ট্রে আমরা নূতন বুনিয়াদের উপর আমাদের সামাজিক ও মানসিক জীবন গড়ে তুলতে চাই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে এ রাষ্ট্রে সকলে পাবে সমান অধিকার—আত্ম-বিকাশের সমান সুযোগ। বাংলা-সাহিত্যে এই মহান সাম্যের আদর্শ আজও যথেষ্ট রূপে রূপায়িত হয় নাই। কমিউনিষ্ট রাশিয়া হতে আমদানী এক রকম সাম্যের কথা আমরা মাঝে মাঝে শুনি। সাম্য মস্ত বড় জিনিষ, এর আদর্শগত আবেদনের শক্তিও বিরাট। কাজেই আমাদের তরুণেরা কেউ কেউ স্বভাবতঃই এই রুশীয় সাম্যের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। আমার মনে হয়, ইসলামের সাম্যের অন্তরে আছে যে দরদ, রুশীয় সাম্যের অন্তরে তা নাই। সেখানে আছে বিক্ষোভ। ইসলাম বলে—সকলে এক আদমের সন্তান, অতএব সকলে ভাই ভাই। রুশীয় সাম্য ছোটর প্রতি বড়র অতীতের লক্ষকোটি জুলুমের করুণ কাহিনী আওড়িয়ে আওড়িয়ে চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করতঃ বড়র বিরুদ্ধে প্রতিশোধে হুকার ছেড়ে ধ্বংসের জন্য শাবল হাতে অগ্রসর। সাম্যের পেছনে যদি প্রেম না থাকে তবে সে সাম্য বরণীয়ও হয় না, সহনীয়ও হয় না। কিন্তু রুশীয় সাম্যের বিরুদ্ধে কেবল কথার নালিশ করলে বা তার নিন্দাবাদ করলে চলবে না। আমাদের সাম্য যে তার চেয়ে বড়, তার চেয়ে বাস্তব এবং তার চেয়ে টেকসই, তা আমাদের কল্পনা, কথা ও কাজ দিয়ে সপ্রমাণ করতে হবে এবং এই কাজে আমাদের সাহিত্যের অবদান হতে পারে অপ্রমেয়। আমাদের তরুণ সাহিত্যিকদের নজর আমি এদিকে আকর্ষণ করছি…।"

এই আবেদনের সমর্থন করে সম্পাদকীয় মন্তব্য যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞজনোচিত।

"বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দানের প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্থানের কয়েকজন উর্দ্দুভাষী ও কয়েকটি পত্রিকা যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন তাতে আমরা বিস্মিতই হয়েছি। কোন শিক্ষিত সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক কোন ভাষাকে অনৈ-সলামিক ভাষা বলে অভিহিত করতে পারেন তাহা বাবায়ে উর্দ্দু নামে পরিচিত উর্দ্দু কবি ও সাহিত্যিক ডাক্তার আবদুল হক ও এককালের রাজনীতিজ্ঞ চৌধুরী খালিকুজ্জমানের উক্তি শোনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, আমরা কল্পনাও করতে পারি নাই। আমাদের মতে এতে শুধু তাঁদের নগ্ন প্রাদেশিকতা, ন্যায় বিচারবুদ্ধিহীনতা, গণতন্ত্রের প্রাথমিক আইন-কানুনে অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে।

"কোন মুসলমানের পক্ষে কোন ভাষাকে অনৈসলামিক ভাষা আখ্যা দিয়ে সে ভাষাকে ত্যাগ করতে বলাকে আমরা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য বলেই মনে করি। সার্ব্বজনীন বিশ্বধর্ম্ম বলে যে ধর্ম্মকে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন ও মানুষকে মেনে নিতে বলেছেন, সে ধর্ম্ম কোন একটি ভাষা বা হরফে প্রথম প্রবর্ত্তিত হলেও, তাকে তারই মধ্যে আটকে রাখার কল্পনা বা প্রচেষ্টা তার সার্ব্বজনীনতাকে বিনষ্ট করবার প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়।…

বলতে গেলে কোন ভাষাই ইসলামী ভাষা নয়। খোদ আরবী ভাষাকেও ইসলামী ভাষা বলা চলে না। যখন আরবী ভাষায় কোরান শরীফ নাজেল হয় তখন এ ছিল অজ্ঞ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিকদের ভাষা। ইসলাম প্রবর্ত্তনের পরেই এ গড়ে ওঠে ইসলামী ভাষা হিসাবে। উর্দ্দু ভাষার ত কথাই নেই।...”

আল্‌বারুণীর ভারত-ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়া লেখক তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছেন।

ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন বাণিজ্য চুক্তি

মস্কো ৮ই এপ্রিল—পূর্ব্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে বাণিজ্যের সম্ভাবনা ও সমাজের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতি আজ বিশদভাবে আলোচনা করেন।

আর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রিটিশ কমন্স সভার শ্রমিক সদস্য ও ব্রিটেনের জনৈক প্রতিনিধি মিঃ সিডনী সিলভারম্যান অদ্য রাত্রে ঘোষণা করেন যে, চীনা প্রতিনিধির সহিত উভয় দিক হইতে এক কোটি ষ্টার্লিং-এর বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁহাদের এক চুক্তি হইয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটেন চীনে যে মাল রপ্তানী করিবে তার শতকরা ৩৫ ভাগ বস্ত্র, ৩০ ভাগ রাসায়নিক দ্রব্য ও ৩৫ ভাগ ধাতবদ্রব্য হইবে। ইহার বিনিময়ে চীন শতকরা ২৫ ভাগ কয়লা, ২০ ভাগ ডিম ও ডিমজাতীয় দ্রব্য ও ৫৫ ভাগ সোয়াবিন, তৈলবীজ প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য ব্রিটেনে রপ্তানী করিবে।

ব্রিটিশ ও চীনাদের মধ্যে পত্রবিনিময়ের দ্বারা চুক্তি সমাপ্ত হয়। ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের পক্ষে বলা হয় যে, যে সকল দ্রব্য ক্রীত ও বিক্রীত হইবে উভয় দিক হইতেই তাহার মূল্য এক কোটি ষ্টার্লিং করিয়া হইবে এবং ১৯৫২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই বাণিজ্যিক লেনদেন শেষ করিতে হইবে। পত্রে এই মর্ম্মে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, প্রতিনিধিরা ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীগতভাবে পরিকল্পিত বাণিজ্য কার্য্যকরী করার জন্য ব্রিটিশ সরকার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সহিত আলোচনায় আন্তরিক চেষ্টা করিবেন। অবশ্য উভয় সরকারের বাণিজ্যের লাইসেন্স মঞ্জুরের উপরই উহা নির্ভর করিতেছে।

চীন প্রতিনিধিদের পক্ষে বলা হয় যে, ব্রিটেন ও চীনের জনসাধারণের পারস্পরিক সুবিধার জন্য ব্রিটিশ ও চীনা প্রতিনিধি দল পত্রে বর্ণিত সর্ত্তের ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের জন্য এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। ব্রিটেন ও চীনের মধ্যে কি কি দ্রব্য বিনিময় হইবে পত্রের সহিত গ্রথিত এক স্মারকলিপিতে তাহার বিবরণ দেওয়া হয়। ব্রিটেন চীনের নিকট যে বস্ত্র বিক্রয় করিবে তাহাতে পশম ও বিভিন্ন তুলাজাত দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে।

মিঃ সিলভারম্যান বলেন যে, ইতিমধ্যেই কয়েকটি আদান-প্রদান স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। অন্য প্রকার আদান-প্রদানের জন্য ব্রিটিশ ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল পিকিং অথবা লণ্ডনে চীনা বাণিজ্য দূতাবাস না থাকিলে বার্লিন যাইবেন।

রুশ ও ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি মিঃ কালেজি কোসনেক বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের কার্য্যকরী কমিটির সভাপতি লর্ড বয়েড ওরের সহিত সামাজিক সমস্যার সমাধান-কল্পে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয় আলোচনা করেন।

রাশিয়া ও পশ্চিমী গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রসারিত বাণিজ্যের জন্য রুশ প্রতিনিধি দলের সদস্য যে প্রস্তাব পেশ করেন মিঃ কোসনেক তাহা আরও সম্প্রসারিত করেন। তিনি বলেন যে, রাশিয়া পশ্চিমী গোষ্ঠীর নিকট হইতে জিনিষপত্র ক্রয়ের যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার ফলে তিন বৎসরের জন্য ফ্রান্স, পশ্চিম জার্ম্মানী, জাপান ও ইটালীর শ্রমিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ইটালীর নিকট রাশিয়া যে অর্ডার পেশ করিয়াছে তাহার ফলে ইটালীর জাহাজী শ্রমিকদের বেকারত্ব ঘুচিয়া যাইবে এবং পূর্ণ সময়ের জন্য তাঁহারা কার্য্য পাইবেন।

অনুন্নত দেশগুলির বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে রুশ বাণিজ্য সমিতির জনৈক মুখপাত্র দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির কাঁচা মালের বিনিময়ে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ দেন।

সকল প্রতিনিধি দলই বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পর্কে সোভিয়েট ও অন্যান্য প্রতিনিধি দলের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্য সিডনী সিলভারম্যান চীনের সহিত বেসরকারী বাণিজ্য চুক্তির যে সংবাদ ঘোষণা করেন ব্রিটিশ বাণিজ্য বোর্ড তৎসম্পর্কে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

বোর্ডের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, তাঁহারা চীনের সহিত বাণিজ্য পরিচালনার প্রয়াসী অবশ্য যে সকল দ্রব্য বিনিময়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে তাঁহারা কিছু বলিতে চাহেন না।

মিঃ সিলভারম্যান স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা বেসরকারী প্রতিনিধি দলের সদস্য এবং তাঁহাদের কোন সরকারী মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই। সেজন্য তাঁহারা যে চুক্তি করিবেন তাহা অবশ্যই আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য লাইসেন্সের আওতায় পড়িবে।

লণ্ডন ৮ই এপ্রিল—এশিয়ার দেশগুলির উন্নয়নের জন্য পাক-প্রতিনিধি যে ষ্টার্লিং পরিকল্পনার প্রস্তাব করিয়াছেন

তৎসম্পর্কে কোন প্রকার মন্তব্য করিতে ব্রিটিশ সরকারী মহল অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

বেসরকারী ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক মহল এশিয়ার দেশগুলিকে যন্ত্রপাতি সরবরাহে রাশিয়া ও কম্যুনিষ্ট দেশগুলির অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এশিয়ার দেশগুলির যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কম্যুনিষ্ট দেশগুলির নিজেদের শিল্পোন্নয়নের জন্য অনুরূপ প্রকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলিকে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা কতদূর সম্ভব হইবে তাঁহারা তাহা বলিতে পারেন না। বস্তুতঃ সোভিয়েট ইউনিয়নই চেকোস্লোভাকিয়ার নিকট হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতেছে।

লণ্ডন, ৯ই এপ্রিল—ব্রিটিশ বাণিজ্য বোর্ড আজ এ বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্রিটেন ও রাশিয়া অথবা চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের কোন বাধা নাই। অবশ্য রাশিয়া ও চীনের মনোভাবের উপর উহা নির্ভর করিতেছে।

ব্রিটিশ বাণিজ্য বোর্ডের সভাপতি মিঃ পিটার নিম্নোক্ত মর্ম্মে বিবৃতি দিয়াছেন: সভাপতি বলিতেছেন যে, চীনের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে ব্রিটেন বরাবরই সম্মত আছে এবং হংকং ও সাংহাইয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা ইহার চেষ্টা করিতেছেন।

চীনারা যদি বাণিজ্য করিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা উক্ত ব্যবসায়ীদের নিকট যাইতে পারেন, অন্যথায় সরকারীভাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট প্রস্তাব করিতে পারেন।

ব্রিটিশ বস্ত্র-শিল্পের ৭৫ হাজার শ্রমিক যে বেকার আছে তাঁহার উল্লেখ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ বাণিজ্য বোর্ডের বিবৃতিতে বলা হয় যে, ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বিশেষতঃ বস্ত্র ক্রয়ের জন্য লণ্ডনস্থ রুশ প্রতিনিধির নিকট তাঁহারা গত ছয় মাস ধরিয়া অনুনয়-বিনয় করিতেছেন। ইহার বিনিময়ে তাঁহারা রাশিয়ায় কিছু মাল কিনিবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন। এমন কি বাণিজ্য দূতাবাসে বিভিন্ন বস্ত্রের নমুনা প্রেরণ করা হইয়াছিল, এবং মূল্যও জানান হইয়াছিল, কিন্তু এই সম্পর্কে আর কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

জাপান রাশিয়া ও চীনের নিকট হইতে আশী লক্ষ টন উচ্চ কয়লা ক্রয় করিতে চাহে বলিয়া জনৈক জাপ মহিলা প্রতিনিধি আজ জানাইয়াছেন। ইহার বিনিময়ে জাপান রাশিয়া ও চীনকে কৃত্রিম রবার, রেশম ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করিবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে রিপোর্ট পেশ

বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা কমিটির সভাপতি ও পোল্যাণ্ডের সদস্য অধ্যাপক ওস্কার, লাঙ্গে মস্কো অর্থনৈতিক সম্মেলনের বিবরণ রাষ্ট্রসঙ্ঘে পেশ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন।

অধ্যাপক লাঙ্গে বলেন যে, সাধারণ পরিষদকে মস্কো সম্মেলনের রিপোর্ট শুনিতে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারদের এক সম্মেলনে আহ্বান করিতে বলা হউক।

পশ্চিমী গোষ্ঠীর সহিত আগামী দুই-তিন বৎসরে তাঁহারা ৫৩৫ কোটি হইতে ৬৭৮ কোটি ষ্টার্লিং-এর বাণিজ্য করিতে দিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া অধ্যাপক লাঙ্গে জানান।

আন্তর্বাণিজ্য শান্তি ও মৈত্রীর সহায়ক। সেই হিসাবে এই সকল চুক্তির গুরুত্ব অপরিমেয়। কিন্তু শান্তি ও মৈত্রী তখনই আসিবে যখন এইরূপ আদান-প্রদান মুক্ত ভাবে চলিবে এবং প্রত্যেক দেশই স্বাধীন ভাবে লেন দেন করিবে। সেই জন্য এই চুক্তি সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতে চাই। মস্কো নগরীতে চীনা প্রতিনিধির যথ যন উপস্থিত চীনের মর্য্যাদা হানি করে। ব্রিটেন মস্কোতে রাশিয়ার সঙ্গে ও পিকিং-এ চীনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করিলে এই সন্দেহ মনে জাগিত না।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি

গত ১৯শে বৈশাখ কলিকাতায় নিখিল-ভারত মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। ২১ দিন এই অধিবেশন চলে। মধ্যে মধ্যে অধিবেশন বন্ধ ছিল। জেনারেল মোহন সিং ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। নিখিল-ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের ইতিহাসে এই অধিবেশনটি দীর্ঘতম অধিবেশন। কমিটির সভায় ৭৫ হাজার শব্দসম্বলিত ফরোয়ার্ড ব্লকের খসড়া বিজ্ঞপ্তি-প্রবন্ধ গৃহীত হয়। সে সকল মুদ্রিত হওয়ার পর উহা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালে নিখিল-ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক বামপন্থীদের সকলের সম্মিলিত দল গঠনের জন্য সম্মিলিত সমাজতন্ত্রী প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের সমাজতন্ত্রী দল এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকট পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ জানান সত্ত্বেও তাহারা এই প্রতিষ্ঠানে যোগ না দিয়া বামপন্থী ঐক্য সম্পাদনের কার্য্যের অশেষ ক্ষতিসাধন করিয়াছে।

"কম্যুনিষ্ট পার্টি আরও একটু অগ্রসর হইয়া আঞ্চলিক গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠন করে। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে সম্মিলিতভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ঐকান্তিক ইচ্ছায় অনেকগুলি আসন ত্যাগ করিয়া আমরা কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত নির্ব্বাচনী মৈত্রী সম্পাদন করি।

"কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত সহযোগিতা করিয়া এই অভিজ্ঞতাই

হইয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ বামপন্থী ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহশীল নহে। তাহারা কেবল তাহাদের দলের সুবিধার জন্য বামপন্থী ঐক্য প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাইতেছে। বিভেদ এবং বিশ্বাসঘাতকতা যেন তাহাদের মজ্জাগত। তাহাদের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং কোন পরিবর্ত্তন হইবেও না।

"ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে তাহারা সকল সময়েই দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা, নেতাজী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরবজনক কার্য্যকে উপহাস, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দুরভিসন্ধিমূলক ধ্বনি তুলিয়া পাকিস্থান সৃষ্টিতে তাহাদের সমর্থন, সম্মিলিত সমাজতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধন, কাশ্মীর সম্পর্কে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সাম্প্রতিক ধ্বনি এবং দেশরক্ষা বাজেটের ৫০ ভাগ হ্রাস করা সম্পর্কে তাহারা যে নূতন ধ্বনি তুলিয়াছে, তাহা আকস্মিক ব্যাপার নহে।

"ফরোয়ার্ড ব্লক গভীর উদ্বেগের সহিত তাহাদের অতীত ও বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছে এবং দেশের স্বার্থের জন্য তাহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও ফরোয়ার্ড ব্লক অত্যন্ত সন্দিহান।

"কম্যুনিষ্ট পার্টি বর্ত্তমানে সংস্কারপন্থী হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধী এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের সহিত একযোগে সরকার গঠনের পরিকল্পনা করিতেছে। তাহাদের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কার্য্যকলাপে বুঝা যায় যে, শ্রেণী সহযোগিতার মতবাদকে তুষ্ট করার জন্য শ্রেণীসংগ্রামকে উপেক্ষা করা হইতেছে।

"কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ফরোয়ার্ড ব্লকের সহজাত কোন বিদ্বেষ ছিল না। আজ তাহাদের কার্য্যকলাপে দেশদ্রোহিতার পরিচয় পাইয়া সেই বিদ্বেষ জন্মিয়াছে।"

মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারিয়া গত ২৬শে বৈশাখ যে ঘোষণা করেন তাহা গুরুত্বপূর্ণ। হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানাও মাদ্রাজের প্রতিবেশী। তেলেঙ্গানায় কম্যুনিষ্টরা কি বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সুবিদিত। অনেক কথা আমরা জানি না, যাহা এই দুই রাজ্যের শাসকবর্গের নখাগ্রে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই রাজাজী ঘোষণা করিয়াছেন: "আমি কম্যুনিষ্ট পার্টিকে অন্য কোনও দেশ অপেক্ষা ভারতের পক্ষে অধিক বিপজ্জনক বলিয়া মনে করি। সেই কারণে আমি আপনাদিগকে (কম্যুনিষ্টগণকে) বলিতে চাই যে, আপনারা আমাকে আপনাদের এক নম্বর শত্রু বলিয়া ধরিয়া লইবেন।"

রাজাজীর এরূপ ঘোষণার আসল কারণ আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি। ভারতবর্ষের এই "বিভীষণ" দল যতদিন নির্মূল না হইবে, তত দিন দেশবাসী স্বস্তিতে থাকিতে পারিবে না। এই সময়ের রাজাজীর সুস্পষ্ট ঘোষণা আমরা সময়োচিত বলিয়া মনে করি।

গারো পার্ব্বত্য এলাকা

গত ১লা বৈশাখ গৌহাটি হইতে ১৯০ মাইল দূরে তুরা শহরে (পার্ব্বত্য গারো অঞ্চলের প্রধান শহর) শ্রীবিষ্ণুরাম মেধি এই এলাকার জন্য স্বাধীন জেলা পরিষদের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে প্যারেড গ্রাউণ্ডে উপজাতীয় জনগণের এক সমাবেশে বক্তৃতায় বলেন, "আপনারা যাহাতে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আপনাদের জেলা শাসনের কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন, তদুপযোগী একটা প্রতিষ্ঠানকে চালু করিয়া দিবার জন্যই আমি আজ এখানে আসিয়াছি।"

জেলা পরিষদের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, জেলা পরিষদের ক্ষমতা ব্যাপক রকমের, প্রকৃত পক্ষে দেওয়ানী ফৌজদারী বিচার ও শাসনকার্য্য পরিচালনের সমুদয় কর্ত্তৃত্বই উহার রহিয়াছে। জেলা পরিষদ জমি বণ্টন অধিকার ও ব্যবহার সম্পর্কে আইন প্রণয়ন, পল্লীর অরণ্যের তত্ত্বাবধান, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিধি-ব্যবস্থাদি করিতে পারিবে। উহা ভূমি-রাজস্ব নির্দ্ধারণ ও আদায় এবং কর নির্দ্ধারণও করিতে পারিবে।

এই জেলায় প্রাকৃতিক সম্পদ অপর্য্যাপ্ত। এই অঞ্চলে যে উচ্চ স্তরের কয়লা ও চুনা পাথর রহিয়াছে তাহা যখন আহরণ করা সম্ভব হইবে তখন জেলা যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে। গারো জাতীয় পরিষদের সভাপতি ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন সাংমা এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট গারো নেতা সভায় বক্তৃতা করেন।

আমরা আশা করি যে, স্বায়ত্তশাসনের প্রথম পদক্ষেপ শুভ হইবে, এবং এই সরল জাতি ভারতরাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ ও আশা মিলাইয়া দিতে সমর্থ হইবে। এখন পর্য্যন্ত আসামের ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্যান্ত প্রদেশের লোকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই প্রাধান্য সংযত করিয়া স্থানীয় লোকের মর্য্যাদাকে সম্ভব করিয়া দিতে হইবে।

আর্য্য সমিতি (বেহালা)

বেহালা আর্য্য সমিতির রজত-জয়ন্তী উৎসবের বিবরণ আমরা পাইয়াছি। প্রায় ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পূর্ব্বে "সারস্বত সমিতি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল; তারই ভগ্ন স্তূপের উপর এই নূতন গাছটি গজাইল। গান, বাজনা, তাসের আড্ডা হইতে এই প্রতিষ্ঠান আজ ঐ অঞ্চলের সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

কার্য্যবিবরণীতে বহু উৎসবের জলসা ও সাংস্কৃতিক

আলোচনার বিবরণ দেখিতে পাইলাম। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি :

"দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে এবং এদের ভবিষ্যৎ জীবন যাতে সহজ ও সুন্দর হয়ে ফুটতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের বেতন এবং পাঠ্য পুস্তক দান করে এদের শিক্ষালাভের পথ সুগম করে তুলতে সাহায্য করে আসছে। এখানে প্রদ্ধানতচিত্তে স্বীকার করছি যে অতুলকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীসরলা দেবী দুঃস্থ ছাত্রদের শিক্ষাকল্পে সাহায্যবাবদ এই সমিতিকে এককালীন এক সহস্র টাকা দান করে আরব্ধ কার্য্যে সহায়তা করেছেন। স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সম্পাদকদ্বয় সমিতির প্রেরিত কয়েকজন ছাত্রকে বিনা বেতনে বা অর্দ্ধবেতনে শিক্ষা-লাভের সুযোগ দান করে আমাদের শিক্ষাসেবাকে সুকর করে তুলেছেন। কেবলমাত্র আমাদের বেহালা ও সংলগ্ন গ্রামের মধ্যেই আমাদের এই শিক্ষাসেবা আবদ্ধ নয়—উপযুক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে মফঃস্বলের কয়েকটি ছাত্রকেও পুস্তকাদি দান করা হয়েছে। এই সব দরিদ্র ছাত্রের লেখাপড়া যাতে গৃহ-শিক্ষকের অভাবে ব্যাহত না হয়, সেজন্য কয়েকটি শিক্ষিত তরুণ কর্ম্মীর তত্ত্বাবধানে নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে।

"অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহে যারা অসমর্থ, রোগের সময় তাদের পক্ষে ঔষধ-পথ্য সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থার কথা দিবাস্বপ্ন মাত্র। সমিতির এই অভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে উপশম করবার আশায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীশচন্দ্র হালদার মহাশয়ের স্মৃতিপূত শ্রীশচন্দ্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়। গত চার বৎসরে মোট ৩১,০২৯ জন রোগী চিকিৎসা প্রাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া, রেড্ ক্রস্ সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হতে বিবিধ এলোপ্যাথিক ঔষধ ৩,২০০ জনকে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবস্থানুসারে রোগীর পথ্য এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থাও করতে হয়েছে। ডাঃ শ্রীশান্তিরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে নিয়মিত ভাবে অক্লান্ত সেবার দ্বারা এই কার্য্য সম্ভবপর করছেন।"

একটি মহিলা শিল্প-বিদ্যালয়ের কর্ম্মারম্ভের উল্লেখ দেখিলাম। তাহা বন্ধ হইয়া যাইবার কোন কারণ দেখান হয় নাই। উপযুক্ত কর্ম্মীর ও উৎসাহের অভাবই বোধ হয় কারণ। ইহার পরিচালক সমিতি আর একবার চেষ্টা করুন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক ও অধ্যাপক

গত ১ই চৈত্র পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক ও অধ্যাপক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি সভার বার্ষিক অধিবেশন উলুবেড়িয়া শহরে অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর মেঘনাদ সাহা সভাপতির কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার বক্তৃতায় এক শ্রেণীর শিক্ষকমণ্ডলীর মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, যাঁরা গালাগালি দিয়াই নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করেন। ডক্টর সাহা ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। গত কয়েক বৎসর হইতে তিনি হইয়া পড়িয়াছেন রাজনীতিক।

তাঁহার রাজনীতিক মতবাদ অনুযায়ী তিনি বলেন, "অথচ পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য অর্থব্যয়ের সীমা নাই।" দুষ্ট লোকে বলে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের নীতির জন্যই সকল দেশের সামরিক ব্যয় বাড়িয়া চলিতেছে।

অর্থব্যয় সম্বন্ধে ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বসু যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমর্থনযোগ্য। নিজের কর্ত্তব্য পালনের সহজ পথ তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে :

"অর্থের অভাবই শিক্ষা প্রসারের একমাত্র বাধা নহে।… নিষ্ঠা থাকিলে অর্থব্যবস্থা আপনিই হয়।…মাতৃভাষার মাধ্যমে অবিলম্বে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।…স্বাধীন ভারতকে সম্পৎশালী করিয়া তোলার যুগ আসিয়াছে। ইহার জন্য কর্ম্মীর প্রয়োজন। সেখানে বুলি কপচাইলে চলিবে না। শুধু বড় বড় বুলি আওড়ালেই চলিবে না। এই কার্য্যে শিক্ষা-ব্রতীদের গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে।"

এই কথার তুলনায় ডক্টর সাহার অভিভাষণ কত অকিঞ্চিৎকর।

ষ্টাফোর্ড ক্রিপস

বর্ত্তমান যুগের বিলাত নানাভাবে বিপন্ন। যুদ্ধে বিধ্বস্ত হওয়াই তাহার একমাত্র কারণ নয়। তাহার সাম্রাজ্যবাদের অবসান বা ভগ্নদশাও কারণ নয়। সমাজ-জীবনে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা সহজ নয়। একটা কথা বলিতে পারা যায় যে, বিলাতের বঞ্চিত শ্রেণী সজাগ হইয়াছে, সাম্রাজ্যের চাকচিক্যে আর ভুলিবে না।

লর্ড শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ক্রমে ক্রমে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছে। ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্স্ তাহার প্রমাণ। বিলাতের প্রাক্তন লর্ড-চান্সেলর লর্ড পারমুরের পুত্র, নিজে প্রসিদ্ধ আইনজীবী, নিরামিষাশী, সংযতজীবন এই ব্যক্তি শ্রেণীর স্বার্থে ভুলিলেন না। শ্রমিক দলে যোগদান করিয়া নিজের ত্যাগব্রতের পরিচয় দিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মে সাথী, সচিব ছিলেন।

গত ৮ই বৈশাখ সুইজারল্যাণ্ড রাষ্ট্রের জুরিক শহরে লেডী ক্রিপস্ সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তাঁহার স্বামী ঐ রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

ষ্টাফোর্ড ক্রিপসের জীবনকথা বর্ত্তমান ব্রিটেনের অঙ্গ। উইনষ্টন চার্চ্চিল যেমন তাঁহার দেশকে রক্ষা করিয়া অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, সেইরূপ ষ্টাফোর্ড ক্রিপস দেশের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও শোষণ-ক্রিয়া চূর্ণ করিয়া জাতির জীবনে যুগান্তর আনয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন।

কাজ ও অকাজ

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত

গীতায় জ্ঞানযোগের বিবৃতিপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলেছিলেন, কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম, আর অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম যে দেখতে পায় মানুষের মধ্যে সে-ই বুদ্ধিমান। দেশে তখন শস্ত্র আর শাস্ত্রের যুগ্ম আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত; বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা সমাজ তখন বিনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত। অনাগত কলির সেই আদিম উষায় বুদ্ধিমানের ঐ যে সংজ্ঞা, তার আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত বাদ দিলেও, ওটা শুধু মৌলিক এবং সময়োচিতই হয় নাই, সার্থকও হয়েছিল। আজ কিন্তু কলির দীপ্ত মধ্যাহ্নে, শ্রদ্ধাবিরহিত বুদ্ধির জৌলুসে সবাই আমরা অপরের কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম, আর নিজের অকর্ম্ম, এমন কি অপকর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্মের সন্ধান অহরহই পাচ্ছি। কাজেই বুদ্ধিমানেরও সংজ্ঞা এবং প্রশস্তি বর্ত্তমান যুগে বাতিল না হলেও নিতান্তই যে বাহুল্যের পর্য্যায়ে পড়ে গিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এ যুগে যদি মানবদেহ ধারণ করে ভগবান আবার এদেশে অবতীর্ণ হন, তবে মানব-বুদ্ধির অভাবনীয় অভিব্যক্তি দেখে অতিমাত্র বিস্মিত তাঁকে হতেই হবে; আর এই বহু বর্ণাকৃতি বুদ্ধির ইন্দ্রজাল থেকে মানবমনকে মুক্ত করার কাজটা যে তাঁর পক্ষেও সহজসাধ্য একটা ব্যাপার হবে না সেটাও স্বচ্ছন্দেই বলে দেওয়া যেতে পারে।

বুদ্ধির ইন্দ্রজাল আমাদের সহজ দৃষ্টিকে সম্মোহিত করেছে আজ জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য যেখানেই আমাদের আশু সমবেত চেষ্টার ঐকান্তিক প্রয়োজন সেখানেই নানা বুদ্ধি এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার সমারোহ আসন্ন সমস্যার সমাধি-রচনায় ব্যাপৃত রয়েছে। খাদ্যাভাব বছরের পর বছর স্বাধীন ভারতকে প্রপীড়িত করছে; আমাদের হাঁড়ির খবর বিদেশেও অজানা নাই। আমাদের দেশে কিন্তু এমন বুদ্ধিমানের অভাব নাই যাঁদের বিশ্বাস খাদ্যাভাব আছে বটে, কিন্তু শস্যের অভাব এদেশে আদৌ নাই, যথাস্থানে দক্ষিণা দিলেই যথেষ্ট খাদ্যশস্য পাওয়া যেতে পারে। তার পর উৎপাদনবৃদ্ধি?—কে করবে?—কৃষক?—জমি কই?—জমিদারী-প্রথার বিলোপ না করলে কৃষির উন্নতি অসম্ভব। জমিদারী-প্রথার বিলোপ?—সে ত মৌলিক নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ। তার পর জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াবে?—সার কই?—কমপোষ্ট?—এ যুগে অচল। রাসায়নিক সার, খনিজ সার?—ওসব জমিকে ক্রমশঃ উষর করবে, জমির পরকাল নষ্ট করবে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই যে সব বহু শাখাবিশিষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনা এর শেষ কোথায়? সেই যে ছেলে-ভুলানো ছড়া আছে, "সই লো সই, তোর পুত কই—হাটে গেছে—কি মাছ এনেছে..." শেষ কথা তার হচ্ছে, "সভা কই—ভেঙে গেছে"। আমাদেরও ও-সব বুদ্ধি-বিবেচনা, জল্পনা-কল্পনার উপসংহারে তেমনিধারা সভা ভেঙে যায়। দু'চার জন হয়ত আইন-সভায় বা বিজ্ঞান-মন্দিরে তার জের টানে; বাকী সবাই বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করে। স্বল্প কাজের সঙ্গে বিস্তর অকাজের ভেজাল দিয়ে জ্ঞানে-অজ্ঞানে আমরা ক্রমাগত আত্মপ্রতারণার জেরই টেনে চলেছি। লোকশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কুটিরশিল্প, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্ব বিভাগেই এমনিধারা কর্ম্মাকর্ম্মবাদের সাধনাই ও অপসাধনাই সমানে চলেছে। সিদ্ধিও সাধনার অনুরূপই হচ্ছে। এতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নাই, রাগ করবারও কারও অধিকার নাই।

স্বরাজ বুদ্ধিমানদের বিচার-বিবেচনার বাহনে চড়ে এ দেশে আসে নাই—এসেছে বহু বর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যা আর ত্যাগের মন্ত্রে প্রবুদ্ধ কোটি কোটি নরনারীর ঐকান্তিক আহ্বানে। স্বরাজসাধনায় বিচারবুদ্ধির স্থান ছিল না এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় মোটেই; আমি শুধু বলতে চাই সে স্থান গৌণ। ঘোড়ার সঙ্গে লাগামের যে সম্বন্ধ গণ-আন্দোলনের সঙ্গে বিচারবুদ্ধির ঠিক সেই সম্বন্ধ। ঘোড়ার অভাব লাগামের আস্ফালনে পূরণ হয় না; বরং অমনধারা অপব্যবহারে ও-বস্তুর কার্য্যকারিতা ক্রমশঃ কমেই যায়। স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনে আরও অনেক জিনিষের সঙ্গে এটাও নিঃশেষে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

গণদেবতার প্রসন্নতা যুক্তিতর্ক দিয়ে উদ্দীপিত হয় না। তার জন্যে চাই প্রত্যক্ষ অনুভূতির সোনার কাঠি। সে বস্তু গ্রোসের দরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বা হাটে-বাজারে বিক্রী হয় না। ওর যাঁরা ভাণ্ডারী, যাঁদেরকে বলে জাতির ভাগ্যবিধাতা, তাঁরা জন-গণ-মন-অধিনায়ক যিনি তাঁরই শুভ আশিস রূপে আসেন যুগে যুগে। আর তাঁদেরই প্রদর্শিত পথে পরবর্ত্তীকালে জনগণের অগ্রগতি হয় অব্যাহত। তাঁদেরই আদর্শ এবং প্রেরণাকে অবলম্বন করে জাতি হয় সঙ্ঘবদ্ধ। সেই সঙ্ঘশক্তির ভারে আর আদর্শের ধারে সর্ব্বপ্রকার অকল্যাণ আর অসুন্দরের মূলোচ্ছেদ তখনই হয়

সম্ভবপর। এমনি করেই বিভিন্ন জাতি মানব-সভ্যতার ভাণ্ডারে নিজ নিজ বিশিষ্ট অর্ঘ্য নিবেদন করে এসেছে চিরকাল। বিশাল ভারতের মহাজাতিও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।

২

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা যখন এক দিকে যাগ-যজ্ঞের রাজসিক আড়ম্বরে ক্লিন্ন, আর অপর দিকে কঠোর তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠানে পরিক্লিষ্ট হয়ে উঠেছিল; যখন জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন ধর্ম্মহীন আর আধ্যাত্মিক জীবন নিরালম্ব হয়ে পড়েছিল তখন বুদ্ধদেব এনেছিলেন এ দেশে সৎ সঙ্কল্প, সৎ জীবন, সৎ কর্ম্মের প্লাবন। এ প্লাবন শুধু ভারতের শুষ্কপ্রায় ধর্ম্ম-জীবনকেই পুনরুজ্জীবিত করে নাই, এর ঢেউ সমসাময়িক সভ্য জগতের প্রায় সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কেমন করে এটি সম্ভব হয়েছিল সেই সুদূর অতীতে—যখন রাস্তাঘাট ছিল অচল আর যানবাহন ছিল আদিম! যে বিশ্বাসে পর্ব্বত টলানো যায়, বুদ্ধদেবের উত্তরসাধকদের প্রাণে সে বিশ্বাস ছিল, আর ছিল তাদের সৌভ্রাত্র এবং সংহতি। 'বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি'র সঙ্গেই তাঁদের মূলমন্ত্র ছিল 'সঙ্ঘং শরণম্ গচ্ছামি'। এই আদর্শ-প্রীতি আর সঙ্ঘ-শক্তিই বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে বিশ্বের দিকে দিকে আলোর মত, বাতাসের মত সহজেই ছড়িয়ে দিয়েছিল; যাতে করে 'আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে তাঁর'।

তিন শতাব্দী আগে সর্ব্বগ্রাসী ধর্ম্মান্ধতার কবল থেকে ধর্ম্ম আর কর্ম্মের স্বাধীনতাকে প্রাণপণে বাঁচিয়ে যে কয়টি ইংরেজ ব্রতচারী মহাসিন্ধুর ওপারে গিয়ে নূতন জগতে নূতন স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন, তাঁরা সেই যে সেদিন পরস্পর মনে মন মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে দেশ-সেবা-ব্রতের সঙ্ঘ-পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, জাতি-বর্ণ-ভাষা-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমেরিকার প্রত্যেকটি নরনারীর মনে যুগ যুগ ধরে পুরুষপরম্পরাক্রমে তার প্রতিটি বাণীর অনুরণন চলেছে। নানা ভাষা, নানা সম্প্রদায় আর বহু বিচিত্র সভ্যতার সমাবেশ হয়েছে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রে। দু' শতাব্দী আগেকার অজানা দেশের বুকে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ছাড়া-ছাড়া, কাটা-কাটা কয়েকটা কৃষি-উপনিবেশ আজ আদর্শের মাহাত্ম্যে আর সঙ্ঘশক্তির প্রভাবে এক মহাজাতিতে পরিণত হয়ে সভ্যজগতের রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করছে।

আদর্শ-প্রীতি এবং সঙ্ঘ-শক্তির অপূর্ব্ব আর অমোঘ প্রকাশ ফুটে উঠেছে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্তিতে পৃথিবীর ভূ-ভাগের ষষ্ঠাংশ জুড়ে আজ সোভিয়েট রাশিয়াতে। মধ্যযুগে তাতার-মোগলের লুণ্ঠনে অত্যাচারে জর্জ্জরিত আর আধুনিক ঐতিহাসিক যুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজকীয় অরাজকতায় প্রপীড়িত ভীত, ত্রস্ত, মানুষের অধিকারে বঞ্চিত রাশিয়ার মূর্চ্ছাতুর 'দরিদ্রনারায়ণ' আজ সারা দেশে নূতন ধর্ম্মের সংস্থাপন করেছে।

স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজশক্তির সমূল উচ্ছেদ আর সোভিয়েট শাসনযন্ত্রের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা—এ দুয়ের মাঝখানে বছরের পর বছর—বারো বছর ধরে চলেছিল সে দেশে নানা অশান্তি, অনাচার, রক্তপাত, নির্ব্বাসন, আভ্যন্তরীণ দলাদলির নানা বিরোধ-সংঘাত আর আন্তর্জাতিক সন্ধিচুক্তির বিস্তর বাদ-বিতণ্ডা। সমস্ত ঝড়-ঝাপটা, আশা-আশঙ্কার মধ্যে রাশিয়ার গণতন্ত্র তার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে অবিচলিত, দৃপ্ত পদক্ষেপে। মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে সোভিয়েট রাশিয়া কায়মনোবাক্যে এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজনায় ব্যাপৃত আছে। তার আদর্শনিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস আর সংঘশক্তি বিগত মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সগৌরবে। আজ তার বিশাল দেশ থেকে অকর্ম্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আর ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের সমিধ তার জাতীয় মহাস্বার্থের হোমাগ্নিকে করেছে অনির্ব্বাণ।

আজ পাঁচ বছর হতে চলেছে ভারত রাজনৈতিক পরাধীনতার হীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যে বিরোধের সূচনা, ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়" আন্দোলনের সংগ্রামাত্মক দিকে তার পরিসমাপ্তি হয়েছে। এই যে সুদীর্ঘকালব্যাপী স্বাধীনতার সংগ্রাম, এ বিশেষ কোন এক বা একাধিক পলাশী বা পাণিপথের প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হয় নাই; সমস্ত ভারত জুড়েই ছিল এর কুরুক্ষেত্র। আর জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক সমস্ত ভারতবাসীই ছিল এই স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিক। নানা মতে দীক্ষিত, নানা পথের পথিক, ভারতের অগণিত জনগণ এক সুকৌশলী মণিকারের সুনিপুণ হাতের ইঙ্গিতে, একে একে এসে একত্রিত হয়েছিল স্বাধীনতা-যুদ্ধের পতাকা-মূলে, 'সূত্রে মণিগণাইব'। আদর্শের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, সঙ্ঘ-শক্তিতে বলীয়ান্ ভারতবাসী সেদিন 'সঙ্কটের কল্পনাতে ম্রিয়মাণ' না হয়ে 'দুরূহ কাজে নিজের কঠিন পরিচয়' দিয়ে সারা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। সত্যের 'পরে অটল থেকে ভারতবাসী শুধু স্বদেশে স্বরাজ আনে নি, সারা দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদে ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছে।

যে বিপুল জন-জাগরণের প্লাবন মাথায় করে এনেছিল স্বরাজ, সে কিন্তু বিজয়ের উল্লাসে অবলীলাক্রমে পায়ে ঠেলে দূর করে দিতে পারে নাই এদেশ থেকে বহু শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার নানা উপসর্গ। স্বরাজ-সংগ্রামের তীব্রতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শাসনের নগ্ন স্বরূপ যতই প্রকাশ পেতে লাগল, আমাদের উচ্ছ্বসিত স্বাধীনতাস্পৃহার তলায় ততই চাপা পড়ে যেতে লাগল আমাদের নিজস্ব স্বরূপ। বানের জল অপসৃত হয়ে গেলে যেমন আবার ভেসে ওঠে যার যার স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে খাল-বিল, ঝাড়-জঙ্গল, ঘাট-বাট; স্বরাজ-সংগ্রামের সমাপ্তির পরে আমরাও তেমনি দেখতে পাচ্ছি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা, সামাজিক কুসংস্কার, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য আর সর্ব্বোপরি অভাব আমাদের জাতীয় জীবনে রয়েই গেছে, ঠিক ব্যক্তির জীবনে ষড়রিপুর মতই স্থায়ী বাসা বেঁধে।

আমাদের দেশ আয়তনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্দ্ধেক আর সোভিয়েট রাশিয়ার সিকির চাইতেও অনেক কম। অধিবাসীদের মধ্যে ভাষাগত বিভিন্নতা, সংস্কৃতিগত পার্থক্য আর প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য ঐ দুই দেশেও আমাদের দেশের চাইতে কোন কালেই কম ছিল না। এ সব সত্ত্বেও কিন্তু উক্ত দুই দেশে আত্মকর্তৃত্ব লাভের অব্যবহিত পরেই সমষ্টিগত ভাবে জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে রকম সাড়া পড়ে গিয়েছিল আমাদের দেশে ঠিক তেমনটি পড়ে নি। দেশের নেতৃস্থানীয় যাঁরা তাঁদের অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ, এক কথায় তামসিকতাই এর জন্য দায়ী; খাদ্যসঙ্কট, পুনর্ব্বাসন-সমস্যা এ সবের অজুহাত আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩

চলতে গেলে মুখ সামনের দিকে রাখা আবশ্যক—এটা ত নিতান্তই আটপৌরে সত্যি কথা। আর দ্রুত চলতে হলে কাঁধের বোচকা যত হাল্‌কা হবে ততই যে সুবিধা, এটাও মোটেই আদর্শবাদ নয়। এ দেশের বুদ্ধিমানদের পক্ষে এই সোজা কথা দুটো বুঝা কিন্তু ক্রমশঃই দুরূহ হয়ে উঠছে। চলার প্রস্তাব মাত্রেই তাঁদের দৃষ্টি আশে-পাশে পিছনে হারিয়ে যায়; আর বোঁচকাও কোন্‌টা ফেলে যে কোন্‌টা নেবেন সঙ্গে সে সমস্যাও শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিতই থেকে যায়। বুদ্ধির আতিশয্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযম করে মনে মনে তাঁরা যে কর্ম্মসূচীর খসড়া গড়েন আর ভাঙেন, ভাঙেন আর গড়েন গীতার ভাষায় তাকেই বলে মিথ্যাচার।

এদেশে এমনটা কিন্তু চির দিন ছিল না। তা যদি থাকত তা হলে রাম-লক্ষ্মণকে খামকা বনে যেতে হ'ত না; আর ভীষ্ম-দ্রোণও বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধ করে মারা না পড়ে হয়ত আরও অনেক দিন বেঁচে থাকতেন। আসল কথা, পরাধীন হয়ে দিনের পর দিন ভারত অনেক কিছুই হারিয়েছে বহু শতাব্দী ধরে; হারায় নি শুধু তার বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। পালাজ্বরে দীর্ঘকাল ভুগলে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীর্ণ হয়ে রোগীর চোখ দুটো হয় অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, আর মাথাটি দেখায় বেমানান রকমের বড়,—এও কতকটা তেমনি।

পুরোনো পৃথিবীর গ্রীস, ইটালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি প্রাচীন দেশে সুদীর্ঘ দু'হাজার বছরের অবিরাম চেষ্টায় জ্ঞান, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদি মানব-সভ্যতার বিভিন্ন বিভাগে যতটা সংস্কৃতি, সমৃদ্ধি, উন্নতি সম্ভব হয়েছে, নতুন পৃথিবীতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র মাত্র দু'শ বছরে কোন কোন ক্ষেত্রে তা ছাড়িয়ে গেছে অনেক দূর। যাত্রার পথে মার্কিনের মুখ বরাবরই ছিল সামনের দিকে; আর বোঁচকা-বুঁচকির বালাইও তার ছিল না প্রায় কিছুই। সভ্যতার খোসাভূষি, ধর্ম্মের কচকচি, মতামতের রেষারেষি, রাজনীতির দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতার হানাহানি—এ সব পিছনে ফেলে রেখে শুধু সভ্যতার শাঁসটুকু সম্বল করে সে এসেছিল নূতন জগতে নূতন জীবনের সন্ধানে। ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, ইটালিয়ান—সবাই এসে এই নূতন রাষ্ট্রে হয়েছিল আমেরিকান। পুরাতন অতীতকে সেলাম ঠুকে তারা সবাই মিলে নূতন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির কাজে লেগে গিয়েছিল কায়-মনোবাক্যে। আজ পুরাতন তার দুয়ারে মাথা কুটছে নিতান্ত প্রাণের দায়ে। আমেরিকার লোকেদের বুদ্ধি নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে কম নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য সেখানে আছে মাত্র দুটি রাজনৈতিক দল।

আর সোভিয়েট রাশিয়াতে ত তাও নাই। সেখানে একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি। মাত্র একটি দল। নির্ম্মম হস্তে সমস্ত জঞ্জাল-জঙ্গল সাফ করে তারা জাতীয় জীবন নিজস্ব প্রণালীতে আবাদ করে সোনা ফলাচ্ছে। দৃষ্টি তাদের সামনের দিকে; পিছু ডাকবার তাদের কেউ নেই। অতীতকে তারা পেন্সন দেয় নি,—দিয়েছে বিদায়। কাজেই যাত্রাপথে বোঁচকা-বুঁচকির বালাই তাদেরও নেই মোটেই। ঐতিহ্যের ভারে বিব্রত আর আর দেশে শত-বর্ষে যা সম্ভব হয় নাই, সোভিয়েট রাশিয়াতে এক দশকে তা সুসম্পন্ন হয়েছে। মোঙ্গল, তাতার, কালমুক, কশাক ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ অশান্ত দুর্দ্দান্তের মনে আদর্শের আলো, সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মের উন্মাদনা আনবার জন্যে সেদেশে বিপ্লবের পরে কয়েক বছরের মধ্যেই কোটি কোটি

পুস্তক-পুস্তিকা প্রণীত ও প্রচারিত হয়েছে; হাজার হাজার বিদ্যালয়, কলাভবন, শিল্পায়তন গড়ে উঠেছে বিশাল দেশের সর্ব্বত্র। সে দেশের বুদ্ধিমানদের ঐকান্তিক প্রযত্ন হয়েছে আপামরসাধারণ সবারই মনে নব-উন্মেষিত মুক্তির চেতনাকে জাগ্রত রাখা; মুক্তির আলোক-শিখাকে প্রোজ্জ্বল করা, উদগ্র করা, উন্নতির পথে তাদের সমস্ত কর্ম্মশক্তিকে সঞ্চারিত করা।

কর্ম্মযজ্ঞের এই যে বিপুল সমারোহ, যাঁরা মনে করেন এর পিছনে রয়েছে শুধু "রেড টেরর" বা বলশেভিক জবরদস্তি; দৃষ্টি তাঁদের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, আগুনের অনুভূতি হতে তা বঞ্চিত। স্বরাজলাভের পরে জাতির গঠনমূলক কর্মক্ষেত্রে যে দৈন্য তার কৈফিয়ৎ হিসাবে যাঁরা খাদ্যসঙ্কট, পুনর্ব্বাসন সমস্যা ইত্যাদির অবতারণা করেন, আর যাঁরা তার প্রতিবাদকল্পে রামরাজ্য-কম্যুনিজম ইত্যাদির জিগীর তোলেন, সবাই তাঁরা আগুনের স্বল্পতাকে চাপা দিতে ধূম্রলোকেরই সৃষ্টি করেন। আসলে, আগুন জ্বালাতে হলে আর তা জীইয়ে রাখতে হলে বিস্তর কাঠ-খড়ের দরকার। যজ্ঞের আগুন সম্বন্ধেও ঐ কথা। ওতে চাই ত্যাগের সমিধ। দেশে ঐ বস্তুরই বর্ত্তমানে সমূহ অভাব হয়ে পড়েছে। ত্যাগের আর প্রয়োজনীয়তা নাই; বরং এই মনোবৃত্তি প্রকট হয়ে উঠেছে যে, দেশে ভোগের চাহিদা যতই বাড়বে, উন্নতিও ততই দ্রুত হবে। খুব সম্ভব স্বাধীন দেশের শ্রেষ্ঠ লোকেরা এই রকমই আজকাল ভাবছেন। অন্ততঃ তাঁদের আচরণ থেকে ইতরসাধারণ এই শিক্ষাই পাচ্ছে।

ফলে আমাদের কর্ম্মযজ্ঞ দক্ষযজ্ঞে রূপান্তরিত হতে চলেছে শনৈঃ শনৈঃ। যজ্ঞক্ষেত্রে বিভিন্ন বাহনে সমারূঢ় নানা প্রহরণধারী বহু দেবদেবীর সমাগমে শিব অদৃশ্যপ্রায় হয়ে গিয়েছেন। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে যাঁদের দেখা মেলে নি; অথবা কবির ভাষায় যাঁরা তখন 'চিত্রিত পুত্তলিপ্রায় দাঁড়াইয়া এক ধারে', 'রণ-পয়োধির ঊর্ম্মিমালা'-'গণ' ছিলেন, আজ তাঁরা প্রাণবন্ত হয়ে স্বাধীনতার পংক্তিভোজে আগের সারিতে বসবার দাবিতে মুখর হয়ে উঠেছেন। আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, এঁরাই আবার বলছেন—এখনও ভারতের সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হয় নাই; আর তৎপর হয়েছেন যথাসম্ভব সত্বর দেশে তা আনতে। ইতিমধ্যে কিন্তু এই 'ভূয়ো', 'তাঁবেদারি' স্বাধীনতার কাছেও এঁদের দাবির অন্ত নাই, আবদারের অবধি নাই।

এই যে 'গাছেরও খাই তলারও কুড়াই' মনোভাব, এটা সুস্থও নয় স্বাভাবিকও নয়। অথচ এই মনোভাবই ক্রমাগত দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করছে বছরের পর বছর। ত্যাগ আর নিষ্ঠায় পূত, সত্য আর অহিংসায় উদ্দীপ্ত কর্ম্মপ্রবাহের অভাবেই দেশে এই অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি সম্ভব হয়েছে। যাঁরা বুদ্ধির জোরে আজ অকর্ম্মকে কর্ম্ম আর কর্ম্মকে অকর্ম্ম প্রমাণিত করছেন, যাঁরা সহযোগিতার পরিশ্রমের বদলে সমালোচনার কসরৎ দিয়েই লোকসেবা করছেন, তাঁরা শুধু দেশের অগ্রগতিই ব্যাহত করছেন না, জনগণের মনকেও বিভ্রান্ত করছেন। আর যাঁরা আশা করছেন, দেশজোড়া এই অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির পরিণতি চরমে পর্য্যবসিত হবে কম্যুনিজমে—তাঁরা জানেন না কম্যুনিজম কোন্ ধাতুতে গড়া, তাঁরা চেনেন না তাঁদের স্বদেশকে।

এই সুজলা সুফলা দেশে ব্যাপক অকর্ম্ম আর অপকর্ম্মের যোগাযোগে যা আসবে, নাম তার যাই হোক বস্তুতঃ তা হবে পরাধীনতা। দুই আর দুইয়ে চার হওয়ার মতই এটা এ দেশের পক্ষে স্বাভাবিক। এ দেশের ইতিহাসে এর নজিরেরও অভাব নাই। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার হাতেগড়া উত্তরের উত্তুঙ্গ প্রাকার আর দক্ষিণের অসীম অতল পরিখাও এ দেশকে বিদেশীর লুব্ধ দৃষ্টি আর নির্ম্মম লুণ্ঠনের হাত থেকে বাঁচাতে পারে নাই সেকালে। একালেও পারবে না, যদি এ দেশের বুদ্ধিমানেরা দলাদলির অসংখ্য পাঁচিল তুলে আমাদের স্বাধীনতার ঝরণাধারাকে ক্রমাগত খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করার কাজেই তাঁদের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য বিনিয়োগ করতে থাকেন।

অতীতে এ দেশে শৌর্য্যবীর্য্য, বিদ্যাবুদ্ধির অভাব ছিল না—একান্ত অভাব ছিল জাতীয় ঐক্যবোধের। আত্মঘাতী অনৈক্যের ঐ ছিদ্রপথেই আমাদের স্বাধীনতার ভরাডুবি হয়েছে বারংবার। আর ঐ অনৈক্যের জয়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের আজকের এই স্বাধীনতা। এ কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যেতে পারে যে, আমাদের স্বাধীনতার সার্থকতা আর শক্তি একান্ত ভাবে নির্ভর করবে আমাদের সমবেত কর্ম্মপ্রচেষ্টার উপরে। আমাদের জাতীয় একতাবোধ যতই দৃঢ় হবে স্বাধীনতা আমাদের ততই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এ পথে যেতে হবে আমাদের এখনও বহু দূর।

আমাদের জাতীয় জীবনে বা সমাজদেহে মানবতার বিরোধী, উন্নতির পরিপন্থী যা-কিছু আর যত কিছু অনাচার অবিচার বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে, আর নির্ম্মূল করে তাদের উচ্ছেদসাধনের কাজে দেশের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে মতদ্বৈধের অবকাশ কোথায়? অশিক্ষা আর অস্বাস্থ্যের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণায় কার আপত্তি হতে পারে? কৃষি, পল্লীশিল্প, গ্রামোন্নয়নের কাজে কর্ম্মীদের মধ্যে দলাদলির স্থান কোথায়? এসব এবং আরও অনেক কাজ ছড়ানো রয়েছে এই বিশাল দেশের বুক জুড়ে সেবাব্রত কর্ম্মীর প্রতীক্ষায়।

পরাধীন ভারতে শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও বহু কর্ম্মী গড়ে তুলেছিল বহু প্রতিষ্ঠান, বহু আশ্রম, গুরুকুল ইত্যাদি। আজ স্বাধীন ভারতে তাদের সংখ্যা বাড়ে নাই, প্রসারও খুব সম্ভব দিন দিন কমেই আসছে। প্রতিকূল বাতাসে যারা জল-কাদা ভেঙে গুণ টেনেছিল প্রাণপণে, আজ বাতাসের অনুকূলে নৌকায় উঠে তারা পাল তুলে দেবার বেলায় ঠেলাঠেলি করছে পরস্পরে। এমনধারা নৈষ্কর্ম্ম্যের পথে জাতির কল্যাণ কখনও আসে না।

৪

পঞ্চালের স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যভেদ করেই অর্জ্জুন যাজ্ঞসেনীকে পান নি। 'অসম্ভব কর্ম্মে দ্বিজের প্রয়াস' দেখে লক্ষ্যভেদের আগে যারা হেসেছিলেন, পরে তাঁরা অবিশ্বাসভরে বললেন—'ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয়'। তার পরে যখন অপ্রত্যয়ের আর কোনই অবকাশ রইল না তখন 'যার যেবা অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ' শেষ পর্য্যন্ত স্বমূর্ত্তি ধারণ করেছিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্বাধীনতার স্বয়ম্বরেও চিরকাল ধরে এই প্রাচীন ধারাই চলে আসছে।

রাজা-রাণীর মাথা কেটেই ফরাসী বিপ্লব তার লক্ষ্য স্থানে পৌঁছয় নি, ছোট-বড় অনেক মাথাই তার যাত্রা-পথের ধূলায় লুটিয়েছে। ইংরেজের স্বাধীনতাও নর্ম্যান রাজার ম্যাগনা কার্টায় স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই সে দেশে আসে নাই—১২১৫ সালের শঙ্কাতুর রাজার অনিচ্ছুক হাতের পরিক্লিষ্ট দানে পুরা দখল পেয়েছে ইংরেজ বহু শতাব্দী পরে ১৬৮৮ সালে গর্ব্বিত ষ্টুয়ার্ট রাজবংশকে পরাভূত করে। আমেরিকা তার পরাধীনতা-পাশ ছিন্ন করেছিল জর্জ্জ ওয়াশিংটনের রণকৌশলে ১৭৮৩ সালে, আর সমগ্র রাষ্ট্র জুড়ে স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ সে দেশে সম্ভব হয়েছে তার অশীতি বর্ষ পরে আব্রাহাম লিঙ্কনের নেতৃত্বে ১৮৬৫ সালে। রাশিয়াতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

রুশ-রাজলক্ষ্মী বিপ্লবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ১৯১৭ সালে। নবরূপে তাঁর বিশাল রাজ্যে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বলশেভিক প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিসমাপ্তির সঙ্গে ১৯৩২ সালে। মাঝখানের এই পনেরটি বছরের ঘটনা-পরম্পরার বিবরণী রাশিয়ার ইতিহাসে লাল হরফে লেখা হয়েছে সে বিষয়ে দুই মত হবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বিরাট জাতির বহু শতাব্দীর অবরুদ্ধ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা, কর্ম্মের প্রবাহ বাধামুক্ত হয়ে সমস্ত দেশের বুকের 'পরে ছড়িয়ে পড়েছে উদ্দাম গতিতে। গতিমুখে কত ঐরাবত ভেসে গেছে, কত জহ্নু মুনির আশ্রম নিশ্চিহ্ন হয়েছে। অকর্ম্মের জড়তা আর আলস্যের তন্দ্রা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। অতি বুদ্ধির সতর্কতা আর অবিশ্বাসের দ্বিধা শুধু অবমানিত হয় নাই, নির্ম্মম ভাবে অপসারিত হয়েছে।

এই নির্ম্মমতার ফলেই রুশ সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট কেরেন্স্কি বিপ্লবের বছর না ঘুরতেই হলেন দেশ থেকে বিতাড়িত। হতভাগ্য রুশ সম্রাট নিকোলাস রাজ্যচ্যুতির পনর মাস পরে উরলের সুদূর প্রবাসে নিহত হলেন সপরিবারে। সেনানায়ক কর্নিলফ প্রথমে হলেন বিতাড়িত, পরে সহকারিগণসহ হলেন নিহত। দেশ জুড়ে শ্বেত আর লোহিত আতঙ্ক আবর্ত্তিত হতে লাগল চক্রবৎ। সৃষ্টির পূর্ব্বাহ্ণে এই যে শিবতাণ্ডব—এর নায়ক লেনিনকে থাকতে হ'ত অতিকায় লেট (Letts) আর বেতনভোগী চীনা দেহরক্ষীতে পরিবৃত হয়ে অষ্টপ্রহর। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর প্রধান সহকর্ম্মী ট্রট্স্কি হলেন দল থেকে বহিষ্কৃত এবং দেশ থেকে নির্ব্বাসিত ও পরে আততায়ীর হস্তে নিহত। অন্যতম নেতা জিনোভিয়েফের ভাগ্যেও প্রায় ঐ দশাই ঘটল।

এত যে অশান্তি, এত যে অনাচার এর মধ্যেও কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্‌যাপনের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া জগৎ-সভায় ঘোষণা করতে পেরেছে, "ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান সুখী"। তার কৃষক সংঘবদ্ধ হয়েছে, কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে, কৃষিপ্রণালী উন্নত হয়েছে; পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনাকে সে আকার দিয়েছে; খনিজ ও ধাতুশিল্পে অভাবনীয় উন্নতি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে সম্ভব করে তুলেছে। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সেদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বহির্ব্বাণিজ্যে আর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রসার-প্রতিপত্তির পথ আজ উন্মুক্ত, আর সে পথে সে অগ্রসর হচ্ছে অকুতোভয়ে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অভিধানে একেই ত বলে স্বাধীনতা।

ভারতে স্বাধীনতার সোনার মন্দিরের দুয়ার আজ খুলে গেছে—এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা বৃথা আত্ম-অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়। শাস্ত্রে বলে—নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ—সংশয়ীর না আছে ইহলোক, না

আছে পরলোক; না আছে সুখ। শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নয়, ব্যবহারিক জগতেও এ কথা সত্য। বিশ্বাসের জোরে দুর্বলেও শক্তির সঞ্চার হয়। নিরস্ত্র ভারতের স্বাধীনতা-সমরে এর প্রমাণ বার বার পাওয়া গেছে। আর বিশ্বাসের শিথিলতায়, সংশয়ের কুহেলিকায় পরশপাথরও যে চোখের সামনে ক্রমশঃ পাথরের নুড়িতে রূপান্তরিত হতে থাকে— স্বাধীন ভারতের গত পাঁচ বছরের ইতিহাসে তারও বহু প্রমাণ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে।

৫

জাতীয় বৈশিষ্ট্যই স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি। তাকে ঘিরেই প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। যে জাতির আত্মচেতনা যত জাগ্রত সে জাতির ঐক্যবোধ তত গভীর। আজ যে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব-বিভাগে এত অনৈক্য, এত দলাদলি এর মূলে সর্বত্র গণ-তান্ত্রিক চিন্তা এবং কর্মের স্বাধীনতাই আছে এমনটি মনে করলে ভুল করা হবে। আসলে এর মূলে অধিকাংশ স্থলেই রয়েছে ক্ষুদ্র স্বার্থের অহমিকা। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দাবি, তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রেরণা এখনও আমাদের মন এবং বুদ্ধিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করে নাই।

শুধুমাত্র বিদেশীর দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ অথবা তেল-নুন-লকড়ির প্রচুরতর সংস্থানের সুযোগকে লক্ষ্য করেই এই বিরাট দেশে স্বাধীনতা-যুদ্ধের আরম্ভ এবং পরিসমাপ্তি হয় নাই—একথা নিঃসংকোচেই বলা যেতে পারে। কবির ভাষায় "ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে"—এই আমাদের লক্ষ্য, এই আমাদের আদর্শ। ধর্মের পথে, কর্মের পথে আমরা স্বরাজলাভের পর কতটুকু অগ্রসর হয়েছি?

আর আর দেশে তারা নিজ নিজ রীতিনীতি দিয়ে বিপ্লবকে দীর্ঘজীবী করেছে; বিপ্লবের কামধেনু থেকে তারা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী অমৃত আহরণ করেছে। আমাদের দেশে আমরা বিদেশী-শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে হাত ধুয়ে স্বরাজের ভোজে বসে গিয়েছি। আর ভোজের থালায় যখন দেখেছি 'সবার প্রচুর অন্ন নাই' তখনই সুরু করেছি নানান্ সুরে বিসদৃশ কোলাহল। ফলে এ দেশে বিপ্লবের অপমৃত্যু না ঘটলেও তা যে বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষীণজীবী হয়ে পড়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। স্বাধীনতা আন্দোলনে পরাধীন ভারতের কোটি কোটি নরনারী যে মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিদেশী সরকারের দমন নীতির সর্বপ্রকার নৃশংসতা সহ্য করেও সংঘ-শক্তিতে অটল ছিল সে আদর্শ আজ স্বাধীন ভারতে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের কষ্টিপাথরের 'পরে জাতীয় মনের এই বিহ্বলতাই বিশেষ করে দাগ কেটেছে। যে সৎ সঙ্কল্প আর সাধু উপায়ের উদ্দীপনা আমাদের স্বরাজের পথ আলোকিত করেছিল তাকে জাতীয় জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করবার কোন সমবেত চেষ্টাই আমরা করি নাই। অনুশীলনের অভাবে আদর্শ আমাদের শুধু ম্রিয়মাণই হয় নাই, মলিনও হয়েছে।

অর্থের সঙ্গে অনর্থের মতই, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে রবাহূত হয়ে দেশে এল ভুল করবার স্বাধীনতা। প্রাপ্যের চাইতে উপরির আকর্ষণ চিরকাল এবং সর্বত্রই বেশী হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারের চাইতে তার অপব্যবহারের দৃষ্টান্তই আজ বেশী এ দেশে। শুধু ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই ব্যাপক ভাবে এটা আত্মপ্রকাশ করে নি, জাতির মনো-জগতেও এমনিধারা ভুলের ফসল বপনের কাজ অহরহ চলেছে অবাধ গতিতে।

কাশ্মীর সমস্যা? যুদ্ধ ছাড়া এর মীমাংসা হবে না। সাম্প্রদায়িক সমস্যা?—এর সমাধান ব্যাপক বাস্তু-বিনিময়ে। কোন পক্ষ যদি তাতে গররাজী হয়?—যুদ্ধ ছাড়া আর উপায় কি তা হলে? এই ধরণের যুদ্ধোন্মুখী মনোভাবের পিছনে ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি বা দাক্ষ্য কোনটাই নাই। আছে আমাদের নিজেদের কর্ম-বিমুখতা। গৃহদেবতার অর্চনা বেতনভোগী পূজারী দিয়ে চললেও চলতে পারে, কিন্তু বর্তমান যুগের যুদ্ধ পেশাদারী সিপাহী দিয়ে চলে না। জাতির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাইকেই মন এবং প্রাণ দিয়ে তার ইন্ধন জোগাতে হয়। আর যুদ্ধের পরে জয়ী হলেও জমার ঘরে যা আসে তাতে যে খরচা পোষায় না সে বিষয়ে দ্বাপরের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ব্যাসদেব, আর সেদিনকার বিশ্বযুদ্ধের পর মিষ্টার চার্চ্চিল উভয়েই একমত। তবু হিংসাত্মক যুদ্ধের নেশা মানুষের মেটে না। আমাদের মধ্যে যাঁরা না খেয়েই মাতাল, তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে সর্বপ্রকার মাদকতা বর্জনই ভারতের জাতীয় আদর্শ।

সাম্প্রদায়িকতা যে জাতির দেহে মাদকের মতই কাজ করে এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। আর এ বিষ থেকে জাতিকে যে মুক্ত করতে হবে সে বিষয়েও আমরা সবাই একমত। কিন্তু একমত হয়ে আমরা করেছি কি। পরাধীন দেশে তৃতীয় পক্ষের ভেদনীতির প্ররোচনা আমাদের সাম্প্র-

দায়িকতার খোরাক জুগিয়েছে ; স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার উগ্রতাও ঠিক তাই করছে। ভারত-পাকিস্তানে আছে কিনা জানি না, কিন্তু পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশেই মদ্যপান-নিবারিণী বহু সভা-সমিতি, বহু প্রচার-পত্রিকা রয়েছে। আমাদের কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধকল্পে তেমনধারা কোন কিছু ত নাই-ই, বরং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, সাম্প্রদায়িকতা প্রচারিণী পত্রিকাদি এখনও কোন কোন স্থলে রয়েছে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসনকল্পে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বাধ্যতামূলক অধিবাসী বিনিময়ের পরামর্শও মাঝে মাঝে আমাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দিয়ে থাকেন। সে যে কি বস্তু, তার স্বাভাবিক পরিণতি যে কোথায় সে সব বিষয়ে তাঁদের চিত্ত ভাবনাহীন। মদের বোতল ভেঙে ফেলার চাইতে পাকস্থলীর পুনর্গঠনই এঁদের মতে সহজসাধ্য। আসলে এমনধারা সব যুক্তি পরামর্শ আমাদের সনাতন সেই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির সাধনারই অন্যতম অঙ্গ। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করতে হলে যে অভয় আর সত্ত্ব-সংশুদ্ধির প্রয়োজন, জাতির মনে তার অনুশীলনের কোন ব্যবস্থাই আমরা করি নাই। জয়ের কোন চেষ্টা না করেই আমরা পরাজয়ের মনোভাব অনায়াসে আয়ত্ত করে নিয়েছি। আমাদের যুক্তি পরামর্শ, বিক্ষোভ সহানুভূতি সবই ঐ মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। এতে করে কল্যাণের চাইতে ঘরে-বাইরে আমাদের অকল্যাণই হচ্ছে বেশী। কেবলমাত্র ব্যাপক কর্ম্মের উদ্দীপনাই এই তামসিক মনোভাব থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে পারে। এ সম্বন্ধে জাতির জনকের নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট :

"...কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, এইবার তাহাকে সংগ্রামের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক মুক্তি অর্জন করিতে হইবে। রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রাম অপেক্ষা ভবিষ্যতের এই সংগ্রাম আরও কঠিন। তাহার এক কারণ, ইহার জন্য গঠনকর্ম্মের প্রয়োজন হয় এবং গঠনকর্ম্মে উত্তেজনা অথবা বাহিরের আড়ম্বর বা আকর্ষণের স্থান নাই। অথচ সর্ব্বতোমুখী গঠনকর্ম্মের দ্বারাই অগণিত জনসাধারণের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে শক্তির সম্যক্ উদ্দীপন ও বিকাশ হওয়া সম্ভব।..."*

* "কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ", মহাত্মাজী, ২৭-১-৪৮, বঙ্গানুবাদ 'হরিজন পত্রিকা', ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮।

জীবন-জিজ্ঞাসা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

যতবার দেখি চেয়ে এ অনন্ত, অদ্ভুত সংসার,—
শত প্রশ্ন, দ্বিধাদ্বন্দ্ব মনে মোর জাগে বারবার।
জানি নাকো এ ধরায় আসিয়াছি কোন্ প্রয়োজনে
কালস্রোতে ক্ষুদ্র তৃণ—কেন চলি ভেসে অকারণে?
জগতের ধাতা কোথা—কে সে জন—কিছু নাহি জানি,
আদিম পাপের বোঝা স্কন্ধপৃষ্ঠে চলিয়াছি টানি।
তাণ্ডব আসদতৃষা—আমি তার মূর্ত্তিমান কল,—
বুকে তবু দেবত্বের দুর্নিবার ক্ষুধা অবিরল।
জানি মৃত্যু ধ্রুব মোর—তবু করি অমৃতের আশা,
যাযাবর পথচিল—কত গাছে বাঁধি আমি বাসা।
সর্ব্বজ্ঞের ভাণ করি অভ্রভেদী অহমিকা নিয়া,
যাহা পাই দেখি তারে শির নাড়ি' চিরিয়া চিরিয়া
বিশ্বের রহস্য নিয়া দিবারাতি করি টানাটানি,
আমি শুধু আপনারে নাহি চিনি, নাহি কভু জানি।
প্রকৃতিরে করি' বশ ভাবি আমি সর্ব্বশক্তিমান,—
মোর চোখে একাকার ভূত, প্রেত আর ভগবান।
দুঃখতাপ হ'তে তবু কোনোমতে নাহিক নিস্তার,
ক্ষুদ্র এক বিস্ফোটক চূর্ণ করে মোর অহঙ্কার।
কোথা মিলে জীবনের নিঃশ্রেয়স্—কে কবে আমায়?
কেমনে কহিব মন্দ—ক্ষুধাতুর প্রাণ যাহা চায়।
একপ্রান্তে রমণীর সুকোমল উরস লোভন—
অন্যপ্রান্তে স্বর্গ, মুক্তি—রে নির্ব্বোধ কিবা আকিঞ্চন?
ওরে ভ্রান্ত, কেবা তোরে চিরতরে দিল অধিকার—
নীতির প্রাচীর গড়ি' জীবনপ্রবাহ রোধিবার?
কারে বলি মহাপুণ্য—এ ধরায় কারে বলি পাপ—
চিরন্তন মানদণ্ডে কিসে তার করি পরিমাপ?
ভাবি ব'সে—হয়তো এ জীবনের কোনো অর্থ নাই,
মনগড়া ভাষ্য তাঁর রচি মোরা বসি' সর্ব্বদাই।
অলক্ষ্যে ব্যঙ্গের হাসি হাসিছে রসিক ভগবান,
সত্য প্রহেলিকাসম তার গড়া বিশ্বের বিধান।
কোথা সৃষ্টি—কোথা স্রষ্টা! মাঝখানে অন্ধ যবনিকা,
চির আঁধারের জীব—তারি আলোকের অহমিকা!

সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতি

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

সংস্কৃতজ্ঞগণ জানেন সংস্কৃতশিক্ষার সম্প্রতি দুইটি পদ্ধতি আছে, প্রাচীন ও নবীন। ইহার কোনটাকেই আমরা একবারে অবজ্ঞা করিতে পারি না, উভয়কেই যথাযথ স্থান দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা দুঃখের বিষয় যে, কেবল টোলগুলিতে নহে, বিশ্ববিদ্যালয়েও সংস্কৃতশিক্ষায় নবীন পদ্ধতিকে একবারে অবজ্ঞা করা হইয়া থাকে। আজ নিম্নে সামান্য কয়েকটি পংক্তিতে ইহা কিছু দেখা যাইবে।

কয়েক দিন হইল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভাল ছাত্র আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সে তিন বিষয়ে এম-এ. সংস্কৃত, পালি ও বাঙলায়। কোন এক কলেজে বিশিষ্ট পদেও সে নিযুক্ত। কথাপ্রসঙ্গে দ ম্প তি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ লইয়া আমাদের আলোচনা উঠে। ছাত্রটি একবারে চুপ করিয়া থাকে। আমার মনে হয়, সম্ভবত আমাদের প্রাচীন পদ্ধতিসম্মত যে ব্যুৎপত্তি ও অর্থ আছে, সে তাহা জানিত, অর্থাৎ সে জানিত যে, জা য়া প তি শব্দের জা য়া স্থানে দ ম্ আদেশ হওয়ায় উহা হইতে দ ম্প তি হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে জা য়া দ ম্ আকারে পরিবর্তন প্রাপ্ত হইতে পারে ইহা ব্যাখ্যা করিতে না পারায় সে চুপ করিয়া থাকাই ভাল মনে করে।

ঠিক ইহার কিছু দিন পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি ছাত্র আমার কাছে আসে। এও তিন বিষয়ে এম-এ, দুইটি সংস্কৃত বর্গে ও প্রাকৃতে। এ কিছুকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও আংশিক সময়ে কিছু পড়াইত। আমি ইহাকেও ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ইহারও উত্তরে পূর্বোক্ত প্রাচীন পদ্ধতির উত্তর ভিন্ন নূতন কিছুই জানা যায় নি।

কিন্তু বস্তুত এই প্রশ্নটি খুব সহজ। বৈদিক ভাষায় 'গৃহ' অর্থে দুইটি শব্দ আছে, দ ম্ আর দ ম। দ্বিতীয়টিই প্রসিদ্ধতর। লক্ষ্য রাখিতে হইবে উভয় শব্দেরই প্রথম স্বরটি উদাত্ত। ইহার সহিত গ্রীক domos, লাতিন domus ও ইংরেজী dom. দ ম্ শব্দের সহিত প তি শব্দের যোগে দ ম্প তি হওয়ার কোন বাধাই নাই। দ ম শব্দেরও যোগে ও সহজেই হইতে পারে, কেননা দ ম প তি শব্দের আদ্যস্বর অর্থাৎ দকার স্থিত অকার উদাত্ত হওয়ায় তাহা প্রবল এবং সেইজন্য ঠিক থাকে, কিন্তু পরবর্তী মকারস্থিত অকার অনুদাত্ত বলিয়া দুর্বল হওয়ায় তাহার লোপ (syncope) হয়।[১]

দ ম শব্দের অর্থ 'গৃহ' হওয়ায় দ ম্প তি বলিতে মূলত 'গৃহপতি' বুঝায়। পালি ভাষাতেও ইহার অর্থ 'গৃহপতি' বা 'গহপতি'। বৈদিক ভাষায় দেখা যাইবে ইহা অগ্নি, ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়ের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়। সায়নাচার্য ঋগ্বেদভাষ্যে (২.১২৭.৮) ইহা অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন :

"দম্পতিং গার্হপত্যাদি রূপেণ গৃহস্য পালকম্ দম ইতি গৃহস্য নাম। অকার লোপশ্ছান্দসঃ।"

সংস্কৃত সাহিত্যে এক শ্রেণীর শব্দ আছে। ইহারা দ্বিবচনে প্রযুক্ত হইলে এক ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ দ্বন্দ্ব বা মিথুনকে বুঝাইয়া থাকে। যেমন পি ত রৌ বলিতে পিতা ও মাতা উভয়কেই বুঝায়। আমাদের ব্যাকরণের প্রাচীন পদ্ধতিতে সাধারণতঃ এখানে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয়, এবং ব্যাখ্যা করা হয় মাতা চ পিতা চ পি ত রৌ। এই অনুসারে আলোচ্য স্থলেও বলিতে পারা যায় দম্পতিশ্চ দম্পত্নী চ দ ম্প তী। কিন্তু বস্তুত এখানে কোন সমাস নাই।

এইরূপে দ ম্প তি শব্দের মুখ্য বা ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ 'গৃহপতি' বা 'গৃহস্বামী' আর দ্বিবচনে ("দম্পতী") গৌণ অর্থ 'স্বামী' ও 'স্ত্রী'।

এখানে আমরা এই প্রসঙ্গে জ ম্প তি শব্দেরও আলোচনা করিতে পারি। দ ম্প তি শব্দের ন্যায় ইহাও দ্বিবচনে 'স্বামী' ও 'স্ত্রী'কে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি কি? কিরূপে ইহা হইল? আমার মনে হয়, ইহা জ্মা প তি হইয়াছে। বৈদিক নিঘণ্টুতে (১.১) পৃথিবী বা ভূমি বুঝাইতে একুশটি শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি হইতেছে জ্মা, এবং বৈদিক ভাষায়

১। √অস্ ধাতু হইতে অস্তি, স্তঃ, সন্তি পদ হয়। এখানে প্রথম পদে ধাতুর অকারটি কেন আছে, এবং অপর পদ দুইটিতে তাহা কেন নাই অনুসন্ধান করিলে এই বিষয়টি কিঞ্চিৎ জানা যাইবে। সংস্কৃতে জগ্মুঃ (<জগমুঃ) প্রভৃতি পদে (পাণিনি, ৬. ৪. ৯৮) এইরূপ বর্ণলোপ বা মধ্য বর্ণলোপ (syncope) সকলেরই পরিচিত ও সমস্ত ভাষাতেই প্রসিদ্ধ।

ইহার বহু স্থলে প্রয়োগও আছে। যাস্ক স্বকীয় নিরুক্তে ইহা উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। এই জ্মা শব্দ বর্ণবিপর্যয়ে প্রথমতঃ জা ম্ হয়, পরে প্রাকৃতের প্রভাবে[২] তাহা জ ম্ হইয়া থাকে। এইরূপেই জ্মা প তি হইতে জ ম্প তি সহজেই হইতে পারে, কোন বাধা দেখা যায় না।

এখানে আমাদের প্রাচীন বৈয়াকরণগণ যে সূচনা দিয়াছেন,[৩] তাহা মনোরম। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, জা য়া প তি শব্দের জা য়া স্থানে জ ম্ ও দ ম্ নিপাতনে হইয়া থাকে। ইহার এরূপ অর্থ নহে বা তাৎপর্যও নহে যে, জা য়া শব্দ জ ম্ ও দ ম্ শব্দে পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়। না, ইহা কখনও হইতে পারে না। ইহার একমাত্র অভিপ্রায় এই যে জা য়া শব্দ স্থানে জ ম্ ও দ ম্ পাঠ করিতে হইবে।[৪]

আমরা দেখিলাম জ্মা প তি হইতে জ ম্প তি হইয়াছে। কিন্তু জ্মা শব্দের অর্থ 'পৃথিবী' বা 'ভূমি' হইলে তাহার সহিত প তি শব্দের যোগে 'জা য়া প তি' অর্থ কিরূপে হয়? ঠিক দ ম্প তি শব্দ স্থলে যেমন, এখানেও তেমনি, কোন ভেদ নাই। ঘরবাড়ী থাকিলে তাহার মালিক ও তাঁহার স্ত্রী এক কথায় যেমন দ ম্প তি তেমনি ভূমি বা জমি থাকিলে তাহার মালিক ও তাঁহার স্ত্রী এক কথায় জ ম্প তি।

মূল জ্মা শব্দটি যে, √জম্ (গমনার্থক) ধাতু হইতে হইয়াছে নিঘণ্টুর টীকায় দেবরাজযজ্বা তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। আবার √গম্ আর √জম্ ধাতু বস্তুত একই, কেবল আকারে ভিন্ন। √গম্ হইতে জ গা ম পদ আমাদের সকলেরই জানা। বৈদিক ভাষায় 'পৃথিবী' অর্থে গ্মা শব্দ সুপ্রসিদ্ধ। ইহা মূলত গ মা (√গম্) হইতে হইয়াছে, এবং এই গ্মা শব্দই পরে জ্মা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য নিরুক্ত, ১২, ৪২।

এখানে একটি কথা বলা উচিত। যদিও জ ম্প তি শব্দ আমাদের অনেকের জানা তথাপি প্রচলিত কোশসমূহ ও ব্যাকরণগুলির পূর্বসূচিত কথাটি (অর্থাৎ জা য়া স্থানে জ ম্ হয়) ভিন্ন অন্যত্র ইহার প্রয়োগ দেখা যায় না, অবশ্য যতটুকু আমার জানা আছে। কিন্তু মনে হয় নিশ্চয়ই ইহা ছিল, এবং কোনদিন হয় ত ইহা পাওয়াও যাইবে।

২। বৈদিক ভাষাতেও প্রাকৃতের কত প্রভাব পণ্ডিতেরা জানেন। একটু অনুসন্ধান করিলেই ইহা জানা যায়। পালি ও প্রাকৃতের একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, পরে অনুস্বার থাকিলে পূর্ববর্তী আ, ঈ, ও ঊ হ্রস্ব হইয়া যায়। এই অনুসারে সংস্কৃত মালাম্ পালি ও প্রাকৃতে মা লং হইয়া যায়।

৩। অর্থাৎ জা য়া শব্দের স্থানে জ ম্ ও দ ম্ হয়, "জায়া শব্দস্য জম্ভাবো দম্ভাবশ্চ নিপাত্যতে।"—কাশিকা, পাণিনি, ২, ২, ৩১।

৪। সংস্কৃত ব্যাকরণের পাঠকেরা জানেন যে, আ দে শ করিয়া অথবা নি পা ত নে ("যদলক্ষণেনানুৎপন্নং তৎসর্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধমিতি") বিবিধ পদ সাধন করা হয়। ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মে যে পদের ব্যুৎপত্তি পাওয়া শক্ত, সহজে তাহার অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে প্রাচীনেরা এইরূপ করিয়াছেন মনে হয়। ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে মূল তত্ত্ব প্রদর্শন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য এই বলিয়া প্রতিভাত হয় যে, সমগ্র শব্দশাস্ত্রখানিকে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করিয়া পাঠকগণকে সাহায্য করা। বৈয়াকরণগণ বলেন, ব্যাকরণসূত্রের অর্ধমাত্রাও কমাইতে পারিলে তাঁহারা পুত্রজন্মের আনন্দলাভ করেন।

আদেশ ও নিপাতনের দ্বারা এক পদের স্থানে অন্য পদের প্রয়োগ করার পদ্ধতি বিবিধ ভাষাতেই আছে। কেবল ব্যাকরণের নিয়মানুসারে নূতন নূতন পদ উদ্ভাবন করিলেই চলে না, প্রয়োগ অনুসরণ করাও আবশ্যক হয়। প্রয়োগ না থাকিলে ব্যাকরণ হয় না। এক একটি ভাষা এত বিপুল যে, তাহাকে সংযত করিয়া এইরূপ প্রয়োগ অনিবার্য।

ইংরেজীতে go ধাতু হইতে he goes, কিন্তু অতীতকালে he went। এই went পদ go হইতে নহে, wend হইতে। কিন্তু সাধারণত ঐ উভয় পদ একই ধাতুর বলিয়া প্রচলিত। আমরা be ধাতুর প্রয়োগে বলি I am, I was। কিন্তু এই am ও was কি be হইতে হইয়াছে? কখনই নহে। ফরাসীতে to be অর্থে ধাতুটি হইতেছে etre। ইহা হইতে I am বুঝাইতে বলা হয় je suis, আর I was হয় je fus; এই suis ও fus কি বস্তুত etre হইতে হইয়াছে? এই প্রকার জার্মান ভাষায় to be অর্থে ধাতুটি হইতেছে sein, ইহা হইতে I am হইতে ich bin, কিন্তু I was হয় ich war, এই ক্রিয়া পদ দুইটি কি sein হইতে হইয়াছে, না কেবল ঐরূপ ব্যবহার মাত্র হইয়া আসিতেছে? সাধারণ ব্যবহারের জন্য যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার তত্ত্ব কি অবশ্যই ভাবব্য।

আমাদের সংস্কৃতের মধ্যে ইহা এত বেশী যে, সংস্কৃতজ্ঞগণ ইহা কিছুতেই অবজ্ঞা করিতে পারেন না।

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

কয়েক দিন পরে মহেন্দ্র জেল হইতে ছাড়া পাইল।

মহেন্দ্র জেল হইতে ছাড়া পাইবার দিন সকালে ভবেশ, দেবানন্দ, এন্টি-সারকুলার সোসাইটির কয়েক জন সভ্য আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল স্কুল ও কলেজের কতকগুলি ছেলে আগেই সেখানে জড়ো হইয়াছে। কেহই জানে না কখন মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া দিবে তবু অন্ধকার থাকিতে ছেলেরা আসিয়াছে। নিজেদের মধ্যে তাহারা জটলা করিতেছে আর মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতেছে। মহেন্দ্রের সঙ্গে যাহারা বড়বাজারে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ আসিয়াছে। মাড়োয়ারী দোকানদার ও তাড়াকরা গুণ্ডাদের হাতে প্রহার ও পুলিসের হাতে বেত্রাঘাতের কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।

বেলা বাড়িয়া চলিতে তাহাদের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কেহ বন্দেমাতরম্ গান ধরিল, কেহ গাহিতে লাগিল কাব্যবিশারদের গান—

"ভেইয়া, দেশকা এ কেয়া হাল
খাক মিট্টি জৌহর হত্তি সব, জৌহর হোর জঞ্জাল
ধন দৌলত সব পরকো সেবে ভাইকো দেৎ ভগাই।
সাগর পার সব ধন গয়া ঔর ঘরমে লছমী নাই।
ঘরকা লছমী পরকো দেকর সব কোই রহে ভুখা।"

গান শুনিয়া ফটকের সিপাহীরা বার বার ছেলেদের দিকে চাহিতে লাগিল। কি তাহাদের মনের ভাব বুঝিবার উপায় ছিল না। হঠাৎ সিপাহীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ফটক খুলিয়া জেলার সাহেব কয়েক জন ষণ্ডামার্কা কয়েদী ওয়ার্ডার ও পুলিসসহ বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের পিছনে মহেন্দ্র। জেলারের আদেশে তাহারা ছেলেদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তখন বেশ বেলা হইয়াছে। ছেলেদের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইতে রাস্তায় ভিড় জমিতে লাগিল। কয়েদী, ওয়ার্ডার ও পুলিস লইয়া জেলার সাহেব জেলের ভিতর প্রবেশ করিল।

জেলার অদৃশ্য হইলে ফটকের সিপাহীদের এক জন আগাইয়া আসিয়া বলিল, আরে ভেইয়া, আবি ভাগ যা। তুম্ হল্লা করতা উসলিয়ে সাহাব গুস্সা হুয়া। আবি চলা যা।—পুলিসের প্রহার ও গালাগালি ভুলিয়া ছেলেরা বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে মহেন্দ্রকে লইয়া চলিল।...

এরকম ব্যাপার মাঝে মাঝে হইত। কয়েক দিন আগে মৈমনসিংহের জেল হইতে ছাড়া পাওয়া এক বন্দেমী পিকেটারকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য জেলের সম্মুখে অপেক্ষমাণ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগকে পুলিসবাহিনী লইয়া স্বয়ং পুলিস সাহেব এইভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল।

কাগজওয়ালারা দুই-চারি দিন তীব্র প্রতিবাদ করিয়েন, কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিবাদ কোন দিনই কানে তুলিতেন না।

মহেন্দ্র ছাড়া পাইবার দিন দুই পরে বিকালের দিকে গোলদীঘির পূর্ব্ব-কোণে রেলিং ধরিয়া দীঘির জলের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল দেবানন্দ। নারায়ণকে সে লিখিয়াছিল বিকালের দিকে এই জায়গায় সে অপেক্ষা করিবে।

গোলদীঘির দুই কোণে দুইটি সভা হইতেছিল। শ্রোতারা অধিকাংশ স্কুল-কলেজের ছাত্র। বায়ুসেবনকারী বৃদ্ধেরা কেহ কেহ দাঁড়াইয়া দুই-চারি মিনিট বক্তৃতা শুনিতেছেন, তার পর কেহ একটু হাসিয়া, কেহ নিজের মনে মাথা নাড়িয়া নীরবে বক্তার বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাইয়া আবার লাঠি হাতে হাঁটিতে আরম্ভ করিতেছেন।

পিঠে কে হাত দিতে দেবানন্দ ফিরিয়া—দেখিল নারায়ণ। দুই-একটা কথার পরে নারায়ণ বলিল, চলুন, আপনাকে যেখানে নিয়ে যাব বলেছিলাম সেখানে নিয়ে যাই।

দেবানন্দ উৎসাহিত হইয়া বলিল, চল।

চলিতে চলিতে দেবানন্দ বলিল, তোমাদের দলের কথা ত কিছু বললে না?

নারায়ণ বলিল, দলের কথা ত আমার বলবার নয়। আর আমি কতটুকু বা খবর রাখি যে আপনাকে বলব? কত জায়গায় কত দল আছে আমি কি সে সব খবর রাখি? আমার কাজ আপনাকে ঠিকমত জায়গায় পৌঁছে দেওয়া।

ট্রাম হাতিবাগানের মোড়ে পৌঁছিলে তাহারা নামিল। ষ্টার থিয়েটারের পিছনে একটা বাড়ীতে তাহারা প্রবেশ করিল।

বাহিরের ঘরটিতে মেঝে জুড়িয়া মাদুর পাতা। কয়েকটি যুবক মাদুরে বসিয়া বই বা খবরের কাগজ পড়িতেছে। কয়েক জন নিম্নস্বরে আলাপ করিতেছে। নারায়ণ ও দেবানন্দ ঘরে ঢুকিতে সকলে তাহাদের দিকে চাহিল। নারায়ণ এক জন যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিল, হারীতদা, ইনি দেবানন্দ বাবু, যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম।

দেবানন্দ দেখিল নারায়ণের হারীতদা এক জন লম্বা, রোগা যুবক, বড় বড় চোখ, মাথায় উস্কো-খুস্কো চুল। ভদ্র-লোক উঠিয়া দেবানন্দকে বলিলেন, তুমি এসো আমার সঙ্গে।

নারায়ণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমাকে যে কাজ বলেছি সেই কাজে যাও।

নারায়ণ চলিয়া গেল।

হারীতবাবু দেবানন্দকে সঙ্গে লইয়া ভিতরের একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন। সে ঘরটিতে মাদুরের উপর কয়েক জন যুবক বসিয়া আলোচনা করিতেছিল। ঘরের দেয়ালে বড় বড় কতকগুলি ম্যাপ ঝুলিতেছে। দেবানন্দ দেখিল এই ঘরের পরে একটি লম্বা দালান। দালানে বিশ-পঁচিশ জন যুবক বসিয়া কাহার বক্তৃতা শুনিতেছে। বক্তার চেহারা সে দেখিতে পাইল না, গলার স্বর শুনিতে পাইল।

হারীতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন সে রাজনীতি সম্বন্ধে কি কি বই পড়িয়াছে, ভবানীর মন্দির প'ড়িয়াছে কিনা, লাঠি-খেলা, বক্সিং, ঘোড়ায় চড়া জানে কিনা ইত্যাদি। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, তোমাকে কিছুদিন পণ্ডিতজীর ক্লাসে নিয়মিত লেকচার শুনতে হবে। চল, তোমাকে ভর্তি করে দিচ্ছি।

দেবানন্দকে সঙ্গে লইয়া হারীতবাবু দালানে যেখানে পড়ানো হইতেছিল সেখানে আসিলেন। দেবানন্দ দেখিল এক জন বয়স্ক ভদ্রলোক বোর্ডে অঙ্ক লিখিতেছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা দিতেছিলেন। ভদ্রলোকের চেহারা দেখিয়া অবাঙালী বলিয়া মনে হইল। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া হারীতবাবু বলিলেন—এক জন নূতন ভর্তি হচ্ছে। ক্লাস শেষ হলে একে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন।

তাহাকে বসাইয়া দিয়া হারীতবাবু চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বক্তৃতা শুনিয়া দেবানন্দ বুঝিতে পারিল উইলিয়ম ডিগবীর *Un-British Rule in British India* ও রমেশচন্দ্র দত্তের *Economic History of British India* পড়ানো হইতেছে। বক্তা বোর্ডে অঙ্ক লিখিয়া বুঝাইতেছিলেন পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে নানা অজুহাতে নির্মম শোষণ চালাইয়া কি বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংরেজ ভারতবর্ষ হইতে দেশে লইয়া গিয়াছে ও তাহার ফলে কি ভাবে আশ্চর্য্য সম্পৎশালী ভারতবর্ষ ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের কবলে পড়িয়াছে। উত্তেজিত হইয়া তিনি বলিলেন, সেদিনও এক ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট অন্নাভাবে কাতর, কঙ্কালসার দেশবাসীর অন্নের জন্য করুণ আবেদনের উত্তরে হাসিয়া বলিলেন,—কেন, এখনও গাছে পাতা আছে দেখিতেছি, এখনও তোমাদের ঘরের স্ত্রীলোকেরা দেহ বিক্রয় করিবার জন্য রাস্তায় আসিয়া দাঁড়ায় নাই, অন্নাভাবের কথা বলিতেছ কেন?

ক্লাস শেষ হইলে ছাত্রেরা উঠিয়া গেল। বক্তা দেবানন্দকে কাছে ডাকিলেন। হারীতবাবু আসিয়া সেখানে বসিলেন। বক্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি পড়? ইকনমিক্স, পলিটিক্স, হিষ্ট্রি পড়েছ কিছু?

দেবানন্দ—বিশেষ কিছু পড়ি নি। আমি সায়ান্সের ছাত্র।

বক্তা—তোমাকে খুব খাটতে হবে তা হলে। আগে ইকনমিক্স ক্লাস ও হিষ্ট্রি ক্লাস কর কিছুদিন। তার পরে পলিটিক্স পড়বে।

হারীতবাবুর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—একে কি কাজ দেবেন? রিক্রুটিং, ইনটেলিজেন্স, ফিনান্স না প্রোপাগাণ্ডা?

হারীতবাবু বলিলেন, পণ্ডিতজী, ও কিছুদিন ট্রেনিংএ থাক, তার পর ব্যবস্থা করা যাবে।

দেবানন্দকে বলিলেন, কিছুদিন নিয়মিত পণ্ডিতজীর ক্লাস ও ডাঃ চক্রবর্ত্তীর হিষ্ট্রির ক্লাস কর। কাল সন্ধ্যা ছয়টায় ডাঃ চক্রবর্ত্তীর ক্লাস আছে।

ডাঃ চক্রবর্ত্তীর নাম শুনিয়া দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল—কোন ডাঃ চক্রবর্ত্তী? ডাঃ এস. কে. চক্রবর্ত্তী বার-এট-ল? ল্যান্সডাউনে বাড়ী?

হারীতবাবু—হ্যাঁ, তুমি তাঁকে চেন?

দেবানন্দ—তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছে। খুব পণ্ডিত লোক। মিঃ রায়ের বাড়ীতে আলাপ হয়েছে।

হারীতবাবু—ব্যারিষ্টার মিঃ রায়ের বাড়ীতে? মিঃ রায় আমাদের সোসাইটির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। তাঁকে তুমি জান?—দেবানন্দ বিস্মিত হইল। মিঃ রায়ের সঙ্গে ইঁহাদের সংস্রব আছে একথা কি ভবেশ জানে না? কই তাহাকে ত কোন দিন কিছু বলে নাই সে। সে বলিল, মিঃ রায় আমার এক বন্ধুর আত্মীয়। দু-চার দিন তার সঙ্গে মিঃ রায়ের বাড়ীতে গিয়েছি।

হারীতবাবু—তুমি আমাদের দলে আসতে চাও কেন?

দেবানন্দ—সভা, প্রস্তাব পাস, স্বদেশী প্রচার, পিকেটিং অনেক করেছি। নূতন কোন কাজ পাবার আশায় আসতে চাই।

তাহার উত্তর শুনিয়া পণ্ডিতজী মৃদু হাসিলেন ও মাথা নাড়িলেন। হারীতবাবু একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—কি কাজ তোমাকে দেওয়া হবে সেটা তোমার সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করছে।

দেবানন্দ বলিল, আমার কয়েকটা কথা আছে। ইংরেজের কামানবন্দুক, সৈন্যসামন্ত আছে, কি করে আমরা তাদের দেশ থেকে তাড়াতে পারব? তারপর ইংরেজকে তাড়াতে পারলে দেশের রাজা হবে কে?

হারীতবাবু—তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। বাংলায় হবে সাধারণতন্ত্র। তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। মায়ের প্রেরণায় লক্ষ লক্ষ সন্তান এগিয়ে আসবে ইংরেজকে দেশ থেকে দূর করে দেবার জন্য। কতজন ইংরেজ সৈন্য আছে এদেশে? কত[illegible]দের অস্ত্রবল?

তারপর হারীত বাবু বলিলেন—তুমি কিছুদিন হিষ্ট্রি, ইকনমিক্স ও পলিটিক্সের ক্লাস কর। যথাসময়ে তোমাকে দীক্ষা দেওয়া হবে। দীক্ষার পরে উপযুক্ত কাজ দেওয়া যাবে।

হারীত বাবু ও পণ্ডিতজীর কাছে বিদায় লইয়া দেবানন্দ হোষ্টেলে ফিরিল। পথে সে ভাবিতে লাগিল, দলের নেতা কি হারীত বাবু? রংপুর কেন্দ্রের কথা উঁহারা বলিলেন। সতীশ-দা কবে এই দলে যোগ দিলেন? আর কোথায় কোথায় কেন্দ্র আছে? মিঃ রায় ও ডাঃ চক্রবর্তীর কথা তাহার মনে পড়িল। ইঁহাদের যে এই দলের সঙ্গে সংযোগ আছে সে কি ভাবিতে পারিত? ইঁহারাও কি ইংরেজ তাড়াইবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন? ভবেশদাও কি এই সমিতির কথা জানেন? জানাই ত সম্ভব। কিন্তু জানিলে তাহাকে কোন দিন কোন কথা বলেন নাই কেন?

পর দিন বেলা তিনটা নাগাদ সে যখন বাহিরে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে তখন ভবেশ বলিল—আজ এন্টি-সারকুলার সোসাইটির সভা আছে। সভায় যাবে, না হাতিবাগানে যাচ্ছ?

দেবানন্দ ফিরিল। ভবেশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া বলিল, হাতিবাগানের কথা কে আপনাকে বলল?

ভবেশ হাসিল। বলিল, কেউ বলে নি। তোমার টেবিলে "টেম্পল অব ভবানী" বইখানি দেখে আন্দাজ করছি।

দেবানন্দ ভবেশের বিছানায় আসিয়া বসিল। বলিল, হাতিবাগানের কথা না জানা থাকলে কি করে আন্দাজ করবেন? আপনি তা হলে এই সমিতির কথা জানেন? আমাকে ত সেকথা কোন দিন বলেন নি?

ভবেশ—আমি সমিতির বাইরের লোক। এ সম্বন্ধে আর এক জন বাইরের লোকের সঙ্গে কি আলোচনা করব? আর বাস্তবিক আমি ভেতরের কথা বিশেষ কিছু জানি নে।

দেবানন্দ—আপনি কিছু ভেবে কথাটা স্বীকার করছেন না। আপনার মামা মিঃ রায় যে সমিতির ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সমিতির সঙ্গে ডাঃ চক্রবর্তীর যে সংস্রব আছে সেটা ত জানেন?

ভবেশ হাসিয়া বলিল, তুমি ভাবছ আমি সত্য গোপন করছি। তা নয়। আমার মামা ও ডাঃ চক্রবর্তী সমিতির সিমপ্যাথাইজার, টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন, দরকার হলে উপদেশ, পরামর্শ দেন। সমিতির ভেতরের খবর, তার কাজের কথা ওঁরা কিছু জানেন বলে মনে হয় না। হাই-কোর্টের বারো আনা ব্যারিষ্টার, উকিল এই রকমের সিম-প্যাথাইজার। এঁদের টাকাতেই সমিতির কাজ অনেকটা চলে। ইংরেজ তাড়াবার কাজে এঁদের সহানুভূতি আছে বলে এঁরা নানা ভাবে সমিতিকে সাহায্য করেন। কিছু রাজা, জমিদার, বড়লোকেরাও সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁরা কেউ সমিতির সভ্য নন্।

দেবানন্দ—ব্যারিষ্টাররা সবাই আচার-ব্যবহারে ঘোর সাহেব। ইংরেজ তাড়াবার ব্যাপারে এঁদের আগ্রহ একটু অদ্ভুত মনে হয়।

ভবানন্দ হাসিয়া বলিল, বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক এটা কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়। কেন নয় বলছি তোমাকে। ইংরেজের দেশ থেকে ফিরে এসে এদেশে ইংরেজ-সমাজের সঙ্গে মিশতে গিয়ে তাদের তাচ্ছিল্য দেখে, লাথি, ঘুঁষি খেয়ে, নিগার, ব্লাডি সোয়াইন, বাষ্টার্ড, সন অব বিচ প্রভৃতি সুমিষ্ট সম্ভাষণ শুনে এঁদের অনেকের মনে বিকার জন্মে গেছে। শুধু কি ইংরেজ, পাঁচ আঁধলা ফিরিঙ্গী রেলের গার্ড পর্য্যন্ত লাথি মেরে গাড়ী থেকে আমাদের নামিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। মনে মনে অনেকেই ইংরেজকে এ দেশ থেকে অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া সম্ভব হলে খুশী হন। আর একটা কারণও আছে। দেশের বাইরে গিয়ে পাঁচটা স্বাধীন দেশের লোকের সঙ্গে মিশে পরাধীনতার অপমান কি জিনিষ এঁদের চেয়ে আর কে ভাল বুঝেছেন? আচার-ব্যবহারে সাহেব হলেও তাই এঁরা ইংরেজ-বিদ্বেষী। নিজেরা সাক্ষাৎ ভাবে কোন কাজ করতে পারেন না,—বয়সে, শিক্ষা-দীক্ষার বাধে, অর্থলালসার জন্য, বিপদের ভয়ে নিজেরা আড়ালে থাকতে বাধ্য হন, কিন্তু যারা কাজ করে তাদের সাহায্য করেন। এবার বুঝলে?

দেবানন্দ এত কথা কোথা হইতে জানিবে? মনোযোগ দিয়া সে ভবেশের কথা শুনিতেছিল। ভবেশের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, বুঝলাম ভবেশ-দা।

ভবেশ—এবার হাতিবাগানে যাও।

দেবানন্দ—যাই। আর একটা কথা জানতে চাই। আপনার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনার কাছে আমি কিছুই নয়। কিন্তু আপনি মুখ্য কাজ ছেড়ে গৌণ কাজ, এই যেমন এন্টি-সারকুলার সোসাইটি, স্বদেশী, সভা-সমিতি নিয়ে থাকেন কেন?

ভবেশ কথা না বলিয়া হাসিতে লাগিল। দেবানন্দ তাহার হাসিতে একটু অপ্রস্তুত বোধ করিল।

দিন তিনেক পরের কথা। মহেন্দ্র কয়েক দিনের জন্ত দেশে গিয়াছে, ঘরে ভবেশ ও দেবানন্দ থাকে। দেবানন্দ রাত্রে ভবেশকে বলিল, সেদিন আপনি আমাকে সব কথা বলেন নি, আজ সব কথা বলতে হবে।

ভবেশের কথাটা মনে পড়িল। তবু সে জিজ্ঞাসা করিল, কি কথা দেবু?

দেবানন্দ হাসিল। বলিল, আপনার ঠিক মনে আছে।

হাতিবাগান কেন্দ্রের কথা আপনি সব জানেন। এই রকম একটা আয়োজন চলছে জেনেও আপনি স্বদেশী ও বয়কট নিয়ে মেতে আছেন কেন? স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন চালিয়ে কি ইংরেজ তাড়ান যাবে?

ভবেশ—সর্ব্বনাশ! তুমি কি আমাকে রিক্রুট করতে চাইছ তোমার গুপ্ত সমিতিতে?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—আমাকে এখনও রিক্রুট করবার ভার দেয় নি। ট্রেনিং হচ্ছে। ভার পেলে আপনাকে পাকড়াও করবার জন্য চেষ্টা করব নিশ্চয়।

ভবেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর বলিল—দেখ, আমি হচ্ছি একজন ডাউটিং টমাস। সবকিছুতে সংশয় করা আমার স্বভাব। তাই কোন জিনিষ নেবার আগে নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখি। এদের দলের দু'চার জনের চরিত্র বিশ্লেষণ করে মনে হয়েছে, দিস ইজ নট এ রেভলুশনারী টাইপ (এটা ঠিক বৈপ্লবিক টাইপ নয়)।

দেবানন্দ কথাটা বুঝিল না। সে বলিল—আচ্ছা, ভবেশ-দা, আপনি আগে কি হাতিবাগান গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন?

ভবেশ—না, এই সমিতি কিছু দিন হ'ল হয়েছে। তোমাকে আগের কথা কিছু বলছি, তা হলে সব বুঝতে পারবে। ১৯০২ সনে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনের আদর্শে সতীশচন্দ্র বসু অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যারিষ্টার পি. মিত্র মহাশয় এবং আরও অনেকে এই সমিতিতে যোগ দেন। সভ্যদের অনেকের বেলুড় মঠের সঙ্গে সংযোগ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করবার আগে এঁরা তাঁর কাছে গিয়ে উপদেশ নিতেন। বোধ হয়, ১৯০২ সনেই বরোদা থেকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরোদা কলেজের এক অধ্যাপকের কাছ থেকে সরলা দেবীর নামে চিঠি নিয়ে এখানে আসেন। ইনি যুক্তপ্রদেশের ব্রাহ্মণ সেজে উপাধ্যায় নাম নিয়ে বরোদার সৈন্যদলে ঢুকেছিলেন যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার জন্য। বরোদা থেকে ফিরে ইনি সার্কুলার রোডে সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার কাছে এক বাড়ী নিয়ে গুপ্ত বিপ্লবী দলের প্রথম কেন্দ্র খুললেন। পি. মিত্রের পরামর্শে অনুশীলন সমিতি এই বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগ দিলে। সভাপতি হলেন পি. মিত্র, সহ-সভাপতি সি. আর. দাশ ও বরোদা কলেজের অরবিন্দ ঘোষ আর ট্রেজারার হলেন সুরেন্দ্র ঠাকুর। অনেক উকিল, ব্যারিষ্টার, লেখক, বক্তা সভ্য হলেন, তাঁরা নিয়মিত চাঁদা দিতেন। লাঠিখেলা, ঘোড়ায় চড়া, বক্সিং, সাইকেল চালানো, সাঁতার দেওয়া শেখান হ'ত সার্কুলার রোডের কেন্দ্রে। সিষ্টার নিবেদিতা তাঁর বিপ্লববাদ সম্পর্কিত পুস্তক-সংগ্রহ কেন্দ্রে দিলেন। তার মধ্যে ছিল আইরিশ বিপ্লবের ইতিহাস, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্রের কথা, ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনচরিত, কাভুরের জীবনচরিত, জাপানী কবি ওকাকুরার বই ইত্যাদি। অনুশীলন সমিতি ছাড়া আত্মোন্নতি সমিতি বলে আর একটা সমিতির সভ্যেরাও এসে এই কেন্দ্রে যোগ দিলেন।...

তোমার হাতিবাগানের হারীত বাবু সারকুলার কেন্দ্রে এসে যোগ দিলেন। মাঝে মাঝে সরকারী চাকুরীয় যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মশায়ের বাড়ীতে বিপ্লবী কেন্দ্রের সভ্যদের সভা বসত। আমি প্রথমে তাঁর বাড়ীতে দলের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচিত হই। তার পর দলের সভ্য হলাম।...

আমার বেশী আকর্ষণ ছিল রুশিয়ার গুপ্ত আন্দোলনের ওপর। ভাবতাম কবে রুশিয়ার বিপ্লবীদের মত আমাদের দেশের ছেলেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেশবাসীর রাজনৈতিক দৃষ্টি খুলে দেবে। একখানা বই এসেছিল সমিতির লাইব্রেরীতে। তাতে জারকে হত্যা করবার অনেকগুলো ষড়যন্ত্রের বিবরণ ছিল। মনোযোগ দিয়ে আমি এই বিবরণ পড়তাম।...

এ ছাড়া কেন্দ্রের বড় একটা কাজ ছিল দেশের নানা জায়গায় ঘুরে সভ্য সংগ্রহ করা ও শাখা সমিতি স্থাপন করা। খড়দা, চুঁচড়া, চন্দননগর, বর্দ্ধমান, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কটক, গৌহাটি, শিলং, রংপুর রাজসাহী, মালদহ, বরিশাল, মৈমনসিং, চাঁদপুর প্রভৃতি নানা জায়গায় শাখা সমিতি স্থাপন করা হ'ল।

এই সব সমিতির প্রধান কাজ ছিল শরীরচর্চ্চা ও রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা। প্রকৃত কাজ, মানে ইংরেজ তাড়ানো কি ভাবে হবে সে সম্বন্ধে কারো মনে স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভবেশ চুপ করিল, কি চিন্তা করিতে লাগিল নিজের মনে। দেবানন্দ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল—তারপর?

ভবেশ—তারপর? তারপর নিজেদের মধ্যে দলাদলি, ঈর্ষা, নেতৃত্বের লড়াই আরম্ভ হ'ল। সারকুলার রোডের কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত নেতার নামে তাঁর বিরোধীরা অপবাদ রটনা করতে সুরু করলেন। ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি অপমানিত ও নেতৃত্ব হতে অপসারিত হলেন। গারকোবাড় কলেজের অধ্যাপক এলেন দলাদলি মেটাতে; একটা মিলন হ'ল বটে কিন্তু স্থায়ী হ'ল না। কলকাতায় গুপ্ত সমিতির প্রধান কেন্দ্র ভেঙে যাবার মত হ'ল।

—হারীত বাবু তাঁর নিজস্ব দলবল নিয়ে মদন মিত্রের লেনে আলাদা বাড়ী ভাড়া করে নূতন করে কাজ আরম্ভ করলেন।

ভবেশ ও দেবানন্দ উভয়েই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চিন্তা-

মগ্ন হইয়া রহিল। অবশেষে ভবেশ বলিল, কেন্দ্রের এই অবস্থা হ'ল, কিন্তু দেশের অনেক জায়গায়, শহরে ও পল্লীতে, আগ্রহশীল, ভাবপ্রবণ ছেলে ও বয়স্ক অনেকের মধ্যে নূতন ভাবধারা জাগ্রত রইল। সমিতির কাজে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে আমার এই ধারণা হয়েছিল যে, মধ্যবিত্ত সমাজের লোকেরা একটা পরিবর্ত্তনের জন্য বিক্ষিপ্ত ভাবে তৈরি হচ্ছে। বড় একটা ধাক্কা বা আঘাত না এলে এই পরিবর্ত্তনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি কাজে লাগবে না, গুপ্ত সমিতি যে ব্যাপক অনুভূতি জাগাতে চায় সে অনুভূতির জাগরণ সম্ভব হবে না।…

সে ধাক্কা এল বঙ্গভঙ্গরূপে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ-আন্দোলন যে রূপ নিয়েছে, বঙ্গভঙ্গের কর্ত্তাদের তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আগে থেকে কোন ধারণা করা সম্ভব হলে তাঁরা বোধ হয় এ কাজ করতেন না। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন কংগ্রেসের মামুলি আবেদন নিবেদনের পথে আরও অনেক দিন সীমাবদ্ধ থাকত। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন দেশবাসীর উদাসীন, নির্ব্বিকার মনকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছে। দেশ-বাসীর এই চাঞ্চল্য কাজে লাগাবার জন্য গুপ্ত সমিতি চেষ্টা করছে। আগে মফস্বলে যে সকল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল সেগুলো হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন চালাবার কেন্দ্র।

নূতন গুপ্ত সমিতির মধ্যে অনেক নূতন জিনিস এসেছে। এগুলো এসেছে নাকি পশ্চিম ভারত থেকে। শুনেছি রাজ-পুতানায় না পুনায় এক ঠাকুর সাহেব এই নূতন দলের সর্ব্বময় নেতা। ইংরেজ তাড়ানো হলে তিনি নাকি হবেন হিন্দুস্থানের সম্রাট। সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে, গীতা হাতে নিয়ে দীক্ষা দেবার ব্যবস্থা এসেছে। ভবানীর মন্দির ও রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর দল গড়বার কল্পনা এসেছে। যোগাভ্যাস, ধ্যান-ধারণার চেষ্টা এসেছে।…

—জানিনে কি সূত্রে এই দলের নেতাদের মনে ধারণা হয়েছে ধর্ম্মের সাহায্যে অর্থাৎ মন্ত্র, তুকতাক ছাড়া দেশবাসীর মনে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ করা যাবে না। কেউ কেউ বলছেন যোগাভ্যাসের দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হলে আত্মিক চাপে ইংরেজ পালিয়ে যাবে এ দেশ ছেড়ে। কারো মতে প্রাচীন আর্য্যজাতির নিদ্রিত আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের মধ্যে জেগে উঠলে তার প্রভাবে ইংরেজ রাজসিকভাব ভুলে সাত্ত্বিক ভাবের সাধনা করবে।

—এদিকে দলের মূল সভাপতি মিঃ মিত্রের সঙ্গে নূতন গুপ্ত সমিতির অষ্ট নেতাদের গোলমাল চলছে। মিঃ মিত্রের লাঠিখেলা, শরীরচর্চ্চার দিকে ঝোঁক বেশী। যাঁরা যুগান্তর চালাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে নাকি ওঁর মতান্তর হয়েছে। ফলে অনুশীলন সমিতি থেকে যুগান্তর দল আলাদা হয়ে যাবার মত হয়েছে।

ভবেশ দেবানন্দের দিকে চাহিল। সে গভীর মনোযোগ সহকারে তাহার কথা শুনিতেছে। কথার মোড় ফিরাইয়া ভবেশ বলিল, ভেতরে ভেতরে গুপ্তসমিতিওয়ালারা কি কাজ করছেন আমি জানি নে। যতীন্দ্রনাথ অপসৃত হবার পরে আমি নূতন কেন্দ্রে আর যোগ দিই নি। আগেকার পরিচিত কয়েক জন নেতার সঙ্গে আলাপ করে আমার যে ধারণা হয়েছে তোমাকে বললাম। মোট কথা, তাঁদের এই এটি-চ্যুডের (মনোভাবের) দরুন তাঁদের দলের সঙ্গে যোগ দিতে উৎসাহ বোধ করি নি। তুমি যাকে গৌণ কাজ বল তাই নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভবেশ হাসিয়া বলিল—পুরোনো সম্পর্ক একেবারে মুছে যায় নি দেবু! আমি গুপ্ত সমিতিকে এখনও চাঁদা দিই। এন্টি-সারকুলার সোসাইটির খরচও কিছু বহন করতে হয়।

দেবানন্দ হাসিতে লাগিল। বলিল, গুপ্ত সমিতির কাজ যদি সমর্থন না করেন তবে চাঁদা দেন কেন?

দেবানন্দের হাসি দেখিয়া ভবেশও হাসিল। বলিল, চাঁদা দিই কারণ তাঁরা দেশের কাজ করছেন। এই হোষ্টেলের কত ছেলে—গুপ্ত সমিতি কাজ করছে, শুধু এইটুকু জেনে নিজেদের সামান্য খরচ থেকে পয়সা বাঁচিয়ে চাঁদা দেয় তুমি জানো না। আর এই চাঁদা সংগৃহীত হয়ে সমিতির লোকের হাতে যায় আমার হাত দিয়ে। কলকাতার কত হোষ্টেল, মেস বোর্ডিঙের ছেলেরা, আপিসের বাবুরা এই রকম চাঁদা দেয়। ভেতরের খবর তারা কিছু জানে না। একটা কিছু চেষ্টা হচ্ছে এইটুকু জেনেই তারা চাঁদা দেয়।

দেবানন্দ বিস্মিত হইয়া ভবেশের মুখের দিকে চাহিল। বলিল, আপনি ত কোন দিন একটা কথাও বলেন নি আমাকে।

ভবেশ—বলবার ত কিছুই নেই। এই হোষ্টেলের যারা চাঁদা দেয় তারা কেউ-আমার কাছে কোন খবর পায় নি। তারা এইটুকু জানে যে আমি পোষ্টাপিস। আমার হাতে টাকা দিলে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে এ খবরও তারা অন্য সূত্রে পেয়েছে। আমি এন্টি-সারকুলার সোসাইটির কাজ করছি, গোড়া থেকে তোমাকে নিয়ে এ কাজে নেমেছি।

একটু পরে দেবানন্দ বাহির হইয়া গেল।

বেলা হইয়াছে। দেবানন্দ হাতমুখ ধুইয়া বই খুলিয়া বসিয়াছিল। ভবেশ তখনও শুইয়া আছে। তাহার দেরিতে ঘুম ভাঙে, তাই দেবানন্দ মনে করিয়াছিল সে ঘুমাইতেছে। হঠাৎ সে বিস্মিত হইয়া শুনিল ভবেশ শুইয়া শুইয়া মহেন্দ্রের প্রিয় মীরা বাঈয়ের ভজনের একটি পদ গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দেবানন্দকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিতে দেখিয়া ভবেশ বলিল,

মহেন্দ্র নেই, তার প্রাতঃকালীন কর্তব্যের ভার আমার ওপর দিয়ে গেছে জানিস। আমার গলাটা মহেন্দ্রের গলার মত মিঠে না হলেও শ্রীশ্রী-কানাইরা তাঁর অত্যন্ত বর্ণিং সম্ভাষণ মিস্ করতে পারেন ভেবে আমি অস্থায়ীভাবে কাজটা চালিয়ে দিচ্ছি।

দেবানন্দ তাহার কথা শুনিয়া হাসিল। বলিল, শুয়ে শুয়ে এই রকমের ডাকে কানাই কি খুশী হবেন, ভবেশ-দা?

ভবেশ বলিল—তা হলে উঠে বসে ডাকি, কি বলিস?

ঘরের বাহির হইতে কে বলিল—বাবুজী আছেন?

দেবানন্দ দেখিল একজন তকমা আঁটা পিয়ন দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। সে অনুমান করিল ভবেশের মামাবাড়ীর লোক। ভবেশ ডাকিতে পিয়ন ঘরে ঢুকিয়া সেলাম করিয়া একখানি চিঠি তাহার হাতে দিল।

চিঠি লিখিয়াছেন মিসেস রায়। কিটির আজ জন্মদিন। বিকালের দিকে সে যেন আসে। তাহার বন্ধু দেবানন্দকেও যেন সঙ্গে আনে।

চিঠি পড়িয়া ভবেশের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। জন্মদিন মানে কেক, পুডিং, স্যাণ্ডউইচের স্লেচ্ছ ব্যবস্থা। ইহার মধ্যে নিষ্ঠাবান মানুষ দেবানন্দকে টানা কেন? এংলো-বেঙ্গলী হাই সার্কেলের সাহেব মেমসাহেব ও মিসিবাবার ভিড়ে মফস্বলের ডি-এস-পি'র ছেলে খই পাইবে না। অতি অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িবে বেচারা।

পিয়নকে বিদায় দিয়া সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। ইতিমধ্যে সে একটা উপায় স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। দেবানন্দকে বলিল, ওহে মনোযোগী ছাত্র, তোমার সম্মুখে কঠিন সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। এদিকে মুখ ফেরাও।

মিসেস রায়ের নিমন্ত্রণের কথা জানাইয়া বলিল, আমার আত্মীয় হলেও বলতে হচ্ছে যে এটা সাহেববাড়ীর কেতাদোরস্ত ব্যাপার হয় নি। তোমাকে যখন জানেন আলাদা চিঠি দেওয়া উচিত ছিল। তা দেন নি। আমি বলি কি নিমন্ত্রণ স্বীকার করলে জানিয়ে সামান্য কিছু একটা জিনিষ পাঠিয়ে দাও, নিজে যাবার দরকার নেই।

সে ভবেশের পরামর্শে সায় দিল। সে পড়াশুনা করে বটে, কিন্তু তাহার মন অন্য চিন্তায় পূর্ণ থাকে। তাহার মনে হয় প্রকাণ্ড একটা তরঙ্গ যেন আগাইয়া আসিতেছে, মিসেস রায়, কিটি, বিলির জগৎকে উহা কোন সুদূরে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

কি দেওয়া যাইতে পারে কথা হইল। ভবেশ বলিল, একটা বইটই কিনে দিস্।

দেবানন্দ রাজী হইল। দুপুরের পরে দোকানে গিয়া সে একখানি আনন্দমঠ কিনিয়া আনিল। ভবেশের পরামর্শে তাহাতে কিটির নাম লিখিয়া কাগজে মুড়িয়া তাহার হাতে দিল।

ভবেশ সে রাত্রে ফিরিল না। পরদিন সকালে সে ফিরিল দেবানন্দের দেওয়া বইখানি হাতে লইয়া। বলিল, আমায় প্ল্যানটা কাজে এল না দেবু। কিটি ভয়ানক রাগ করেছে। বলল, তুমি নিজে হাতে না দিলে প্রেজেণ্ট নেবে না। এ দিকে বইখানার ওপর খুব লোভ আছে দেখলাম। এ পর্য্যন্ত আনন্দমঠ তার হাতে পড়ে নি। তোকে একবার যেতে হচ্ছে। আজ যাবি?

দেবানন্দ কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—আপনার হাতে কোন কাজ না থাকলে আজ সন্ধ্যায় যেতে পারি।

সন্ধ্যাবেলা চক্রবেড়েতে মিঃ রায়ের বাড়ীতে ঢুকিবার সময় কটকে ডাঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা হইল। তাহাদের দুই জনকে দেখিয়া ডাঃ চক্রবর্ত্তী মুখের সিগার বাঁ হাতে লইয়া ডান হাত বাড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, গুড ইভনিং মাই ইয়ং ফ্রেণ্ডস। দেবানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আই মিসড ইউ ইয়েষ্টার-ডে—কাল কেন তোমাকে দেখতে পাই নি। চল, তোমাদের সঙ্গে একটু গল্পসল্প করি।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী তাহাদের ধরিয়া বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। মিঃ রায় বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিলেন, আর কেহ তখনও আসে নাই। সকলে বসিলে ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, হালো ভবেশ, তোমাদের এন্টি-সারকুলার সোসাইটির কাজ কেমন চলছে? আমার এক মরাঠি ফ্রেণ্ড, এডিটর অব এ জার্নাল, (একটি পত্রিকার সম্পাদক) জিজ্ঞেস করছিলেন সোসাইটির কথা। তিনি এর আগে তিলকের কেশরী কাগজে ছিলেন। বালকৃষ্ণ ও দামোদর চাপেকরের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁদের ধরা পড়বার পরে পুণা থেকে পালিয়ে যান একেবারে বিলেতে। সেখানে আইন পড়তে আরম্ভ করেন। কিছুদিন হ'ল ফিরেছেন। তাঁর মুখে শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা ও প্যারিস এস. এস. রাণার গল্প শুনলাম। বললেন, কৃষ্ণবর্ম্মা ইণ্ডিয়া হোমরুল সোসাইটির অনেক খবর শুনলাম। তিনি বিলাতের ভারতীয় ছাত্রদের অরগ্যানাইজ করবার চেষ্টা করছেন।

দেবানন্দ মহারাষ্ট্রের আন্দোলন সম্বন্ধে সতীশের মুখে কিছু শুনিয়াছিল। চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম শুনে নাই। সে ডাঃ চক্রবর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, বালকৃষ্ণ ও দামোদর চাপেকর কি করেছিলেন?

ডাঃ চক্রবর্ত্তী হাসিলেন। বলিলেন, করেছিলেন অনেক কিছু। ১৮৯৩ সনে বোম্বেতে হিন্দু-মুসলমান রায়টের পর বৎসর প্রথম সর্ব্বজনীন গণপতি উৎসব আরম্ভ হ'ল। দশ দিন ধরে মেলা, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, আর বক্তৃতা চলল। ছোট ছোট স্কুলের ছাত্রদের হাত দিয়ে লিফলেট ছড়ানো হ'ল।

"হে মারাঠী জাতি, শিবাজী মহারাজের মত তোমরাও বিদ্রোহ ঘোষণা কর"—এই হ'ল টিকলেটের বক্তব্য। চাপেকর ভ্রাতারা হিন্দুধর্মের বিঘ্ন অপসরণ নাম দিয়ে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর অভিষেক-উৎসব প্রথম আরম্ভ হ'ল। চাপেকররা উৎসব উপলক্ষ্যে কবিতা লিখে প্রচার করলেন: "জাতীয় সংগ্রামে যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা জীবন উৎসর্গ করব; যে সকল শত্রু আমাদের ধর্মে আঘাত করছে তাদের বুকের রক্তে মাটি সিক্ত করব। শত্রুকে হত্যা করে তবে আমরা মরব।" গণপতি উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁরা লিখলেন: "হায়, গোলাম হয়ে থাকতে এখনও তোমাদের লজ্জা হয় না? মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর, কিন্তু তার আগে ইংরেজকে মার, এদেশ হিন্দুস্থান, ইংরেজ কেন এদেশ শাসন করবে?"

ডাঃ চক্রবর্ত্তী চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, সিগার একবার মুখের কাছে উঠাইয়া আবার নামাইয়া লইলেন। ভবেশ ও দেবানন্দের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন—কথাটা প্রায় তিলকের কথার মত। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে উৎসবের সময় তিলক বক্তৃতা দিলেন—"ঈশ্বর ইংরেজকে হিন্দুস্থানের রাজত্ব দান করে তাম্রশাসন হাতে দিয়ে পাঠান নি। কূপমণ্ডুকের মত তোমাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ রেখো না, পিনাল কোডের গণ্ডী ভেদে বেরিয়ে পড়।" তারপর পোনা। বোম্বের প্লেগের হাঙ্গামায় কুখ্যাত প্লেগ কমিশনের র‍্যাণ্ড ও তার সঙ্গী লেফ্টেনাণ্ট আয়ার্ষ্ট বালকৃষ্ণ ও দামোদর চাপেকরের গুলিতে নিহত হ'ল। ধরা পড়ে দুই ভাইয়ের ফাঁসি হ'ল। চাপেকর সমিতির আরও কয়েকজনের ফাঁসি ও দ্বীপান্তর হ'ল।

ঘরের সকলে চুপ করিয়া রহিল কিছুক্ষণ। পরদা সরাইয়া মিঃ ডাটা প্রবেশ করিলেন। মিঃ রায় ও ডাঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া ভবেশ ও দেবানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, গুড ইভিনিং।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, মরাঠী ও বাঙালী ইংরেজের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে। লর্ড কার্জ্জন কাশ্মীরে যাবেন স্থির হ'ল। এক অসুস্থ বাঙালী ভদ্রলোক হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য জম্মুতে ছিলেন। হি ওয়াজ সার্ভড উইথ য়্যান অর্ডার টু কুইট (তাঁর উপর জম্মু ত্যাগ করবার আদেশ হ'ল)। শিয়ালকোটে পুলিস তাঁকে বলল, বড়লাট ফিরে গেলে আবার জম্মুতে যেও, এ-কয়েকটা দিন পঞ্জাবের কোথাও কাটিয়ে দাও। ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন, বড়লাট আসবেন, ভাল কথা। সেজন্য আমাকে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হ'ল কেন তার? তার বললেন, ইউ সি, ভাইসরয়ের দু'হাজার গজের মধ্যে কোন বাঙালী ও মরাঠীকে যেতে দেওয়া নিষেধ। বাঙালী ও মরাঠী সিডিশন করে।

মিঃ ডাটা বলিলেন, রায়, আজকের কাগজে দেখেছ দুনিয়া মিট করছে। টাইমস্ লিখেছে, উইদাউট ব্লডশেড শুধু ষ্ট্রাইকের চাপ দিয়ে ডেসপটিক শাসকের কাছ থেকে অধিকার আদায় করতে হয় কিভাবে রুশজাতি পৃথিবীকে দেখিয়েছে। বলেছে, নো-বডি এভার সাসপেক্টেড দাট পিপ্‌ল পজেসড্ সো পাওয়ারফুল এ ওয়েপন্ অব কোয়ারশন (জনসাধারণের হাতে যে এত বড় শক্তিশালী দাগ মারবার অস্ত্র আছে কেহ এ-কথা সন্দেহ করে নাই)। জারকে উপদেশ দিয়েছে, প্রজারা যা চাইছে দিয়ে দাও লক্ষ্মীছেলের মত।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিলেন—টাইমস্ কি লিখেছে? উইদাউট ব্লডশেড? দি গুড লায়ার।...

১৯০৪ সনে নিহিলিষ্টরা রাশিয়ান মিনিষ্টার M. de Pleve-কে হত্যা করলে পরাঞ্জপের কাগজ "কাল" লিখল,—ইউরোপের জাতিদের সঙ্গে সংস্রবের ফলে ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর অপরাধের আমদানী হলে বড় ভয়ের কথা। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া চিৎকার করে উঠল—"কাল" এদেশে নিহিলিজম্ আনতে চায়। বিনা রক্তপাতে বটে।

মিঃ ডাটা—ইণ্ডিয়ান মিররের পরশুর লীডরটা কে লিখেছে, রায়? লিখেছে, লর্ড ক্যানিং আসবার সময়ে দেশের অবস্থা যেমন দাঁড়িয়েছিল এখনকার অবস্থা তেমনি উদ্বেগজনক। ডিপ্রেশনের ফলে লোকের মন বিপ্লবমুখী হয়ে উঠছে। একখানা বাংলা কাগজে দেখলাম বর্ত্তমান অবস্থার ভাল এনালিসিস করেছে।

মিঃ রায়—কি লিখেছে?

—লিখেছে সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, কনসেণ্ট বিল সম্বন্ধে এজিটেশন (আন্দোলন) এডুকেটেড (শিক্ষিত) শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে সমাজের উঁচুনীচু সব স্তরের লোক যোগ দিয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে এ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। ঠিক—

মিঃ ডাটার কথা শেষ হইবার আগে মিঃ গাঙ্গুলী ও মিঃ মিটার এক সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভবেশ ও দেবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন—তোমরা উঠছ? আই সে ভবেশ, কম টু মাই প্লেস সাম ডে উইথ ইওর ফ্রেণ্ড (তোমার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে একদিন আমার বাড়ীতে এসো)। যেদিন তোমাদের কলেজ বন্ধ থাকে ও কোর্ট বন্ধ থাকে এই রকম একদিন সকালের দিকে এসো। গল্পসল্প হবে।

নমস্কার করিয়া তাহারা দুই জন বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়া ভবেশ বলিল—চল, ওপরে যাই।

কিটি খবর পাইয়াছিল ভবেশ ও দেবানন্দ আসিয়াছে। ডাঃ চক্রবর্ত্তী তাহাদের সঙ্গে লইয়া নীচে বসিবার ঘরে ঢুকিয়াছেন এ খবরও পাইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী সাহেবের হাতে পড়িলে শীঘ্র ছাড়া পাওয়া মুশকিল সে জানে। ভদ্রলোক এত বকবক করিতে পারেন। এত খ্রীষ্টাব্দে ইহা হইয়াছিল, এত

ষ্টাবে উহা হইয়াছিল, এত খ্রীষ্টাব্দে তাহা হইয়াছিল—শুনিলে মনে হয় যেন হিষ্ট্রির ক্লাসে পড়াইতেছেন। আর কত রকমের খবর যে তাঁহার পেটে রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেখিতে কাদার কুম্যানের মত গম্ভীর গোছের মানুষ কিন্তু যখন হাসির কথা আরম্ভ করেন তখন হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরিয়া যায়।

কিটি নিজের ঘরে গিয়া কাল যে সাড়ীখানা পরিয়াছিল সেখানা পরিল। আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর একবার সাজসজ্জা ঠিক আছে কিনা দেখিল। তারপর বসিবার ঘরে গিয়া একখানা ছবির বই দেখিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়াইয়া মুখখানাকে গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ভবেশ ও দেবানন্দ ঘরে ঢুকিতে মিসেস রায় একটু অনুযোগের স্বরে দেবানন্দকে বলিলেন—তোমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালাম কিটির জন্মদিনে, কাল এলে না কেন?

দেবানন্দ একবার ভবেশের দিকে চাহিয়া বলিল—কাল একটু কাজে আটকা পড়েছিলাম।

কিটি গম্ভীর মুখে বলিল—কি কাজ?

তাহার দিকে চাহিয়া দেবানন্দ হাসিল। হাত বাড়াইয়া বইখানি তাহার হাতে দিতে গেল। মিসেস রায়—ওটা কি বই?

দেবানন্দ—বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ।

মিসেস একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—বাংলা বই? ইংরেজী ভাল বই পেলে না? কিটির বাংলা বই পড়া বারণ। গভর্ণেস দেখতে পেলে বাংলা বই কেড়ে নেবে।

মায়ের কথা শুনিয়া চোখের পলকে গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া কিটি দেবানন্দের হাত হইতে বইখানি ছোঁ মারিয়া লইল। মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—গভর্ণেস আনন্দমঠ কেড়ে নেবে? দিলেই হ'ল?

এক মুখ হাসিয়া দেবানন্দকে বলিল—থ্যাঙ্ক ইউ। তোমার প্রেজেন্ট আমি যত্ন করে পড়ব, যত্ন করে রাখব। নাম লিখে দিয়েছ?

ভবেশ হাসিয়া বলিল—কিটি ইজ এ গুড গার্ল (কিটি লক্ষী মেয়ে) বা মুখের চেহারা করেছিলি—

কিটি হাসিয়া বলিল—মিস বাদলের মত, নয়? জানো ভবেশ-দা, আমার গভর্ণেস নিজের নাম বলে মিস বুদল, আমি বলি মিস বাদল আর বিলিটা আড়ালে বলে মিস কাদল।

বিলি কোথায় গিয়াছিল। লাফাইতে লাফাইতে ঘরে ঢুকিল। চারদিকে এক নজর দেখিয়া সে বলিল—তুই আজ আবার ও সাড়ীটা পরেছিস? আজও কি তোর জন্মদিন?

চোখ মিট মিট করিয়া দুষ্ট হাসি হাসিয়া বিলি বলিল—বুঝেছি।

কিটি—কি বুঝেছিস বিলি দি ডেভিল?

বিলি তারস্বরে প্রতিবাদ করিল সকলের সম্মুখে তাহাকে বিলি দি ডেভিল বলিবার। বলিল—ড্যাডি বলে তাই তুইও বলবি? দুষ্টু কিটি। ভবেশ-দা, ও আজ ও সাড়ীটা পরেছে তোমাদের দেখাবার জন্ম।

দেবানন্দের দিকে ইঙ্গিত করিয়া সে চোখ মিট মিট করিতে লাগিল। ভবেশ হাসিল।

কিটির মুখ একটু লাল হইল। সে বলিল—পরেছি বেশ করেছি। বিলি দি ডেভিল, যা এখান থেকে।

বিলি মার পাশে আঁটিয়া বসিল। বলিল—না যাব না। মামী, ও আমাকে বকছে দেখ না।

দেবানন্দের দিকে চাহিয়া বিলি বলিল—তুমি কাল এলে না, কত খাবার হয়েছিল। মামী, ওকে রসগোল্লা দেবে না?

বিলির মায়ের কাছে ঘেঁসিয়া বসিবার কারণ বুঝিতে পারিয়া ঘরের সকলে হাসিয়া উঠিল। মিসেস রায় বাহিরের লোকের সম্মুখে ছেলেমেয়ে ঝগড়া করায় বিরক্ত হইলেও সকলের সঙ্গে হাসিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মিষ্টিমুখ করিয়া দুই বন্ধু বিদায় লইল। কিটি ফটক পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে আসিল। দেবানন্দকে বলিল—তোমার বই পেয়ে আমি খুব খুশী হয়েছি, বুঝলে?

দেবানন্দ তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

ক্রমশঃ

শারদাবাস—সম্মুখের দৃশ্য
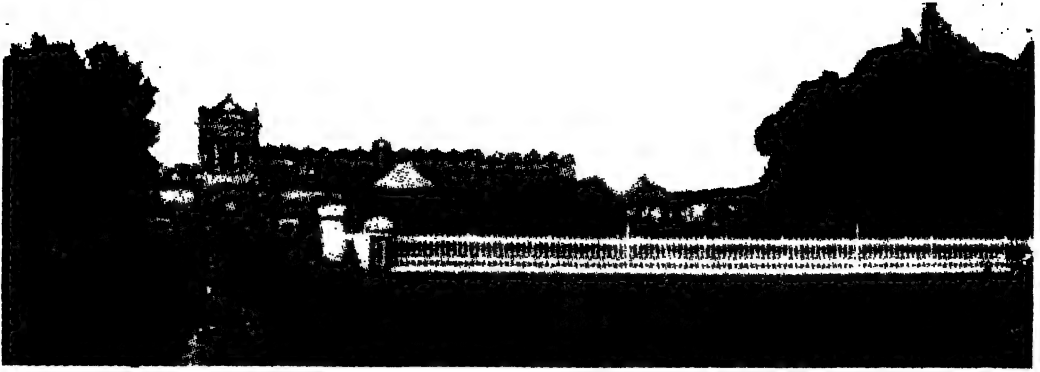
পূর্ব্ব পাকিস্থানের একটি আদর্শ পল্লীর অতীত চিত্র

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৩০ সালের পৌষ মাসের 'প্রবাসী'তে যে আদর্শ গ্রামের সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, দেশ-বিভাগের পর সেই আদর্শ পল্লীর অভাবনীয় পরিবর্ত্তন অতীতের স্মৃতিকে জাগ্রত করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীর আদর্শ সমাজ-জীবন কিরূপ ছিল এবং দেশ-বিভাগের ফলে তাহার কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই প্রবন্ধে দেওয়া যাইতেছে।

উত্তরবঙ্গের সিরাজগঞ্জ হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে "স্থল" গ্রামটিকে তখন একটি ক্ষুদ্র শহর বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। শহরের যাবতীয় সুবিধাই ঐ গ্রামে ছিল। প্রথমেই মনে পড়ে, গ্রামের সামাজিক জীবনের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের বিষয়, আর যাঁহারা এই আদর্শ সমাজের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই পাকড়াশী পরিবারের কৃতী সন্তানদের কথা। তাঁহাদের সমাজসেবার আদর্শে এই পল্লী-নিকেতনে একটি সজ্ঞবদ্ধ বিরাট হিন্দু সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেখানে প্রাচ্য আদর্শের সঙ্গে গণতন্ত্রের অপূর্ব্ব সমন্বয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় পরিস্ফুট হইত—যেখানে ধনী সমাজপতিগণের জনকল্যাণ-প্রচেষ্টার বহুমুখী অনুপ্রেরণার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছিল।

স্থল-সমাজের মাঝে পরিচয় দিত পার্শ্ববর্ত্তী দপখালা গ্রামের অধিবাসীরা। গোয়ালন্দ বাহাদুরাবাদ সার্ভিসের ষ্টীমার আজও অগ্রদূতের মত স্থলের বার্ত্তা বহির্জগতে বহন করিতেছে। স্বর্গত প্রাণচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে "স্থলচর" ষ্টীমার ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ষ্টীমার কোম্পানীর ফ্ল্যাট আজও পূর্ব্বের মতই আগন্তুকদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু ঘরের ছেলেরা আর ঘরে ফিরিয়া আসে না। পূজার ছুটিতে জন্মপল্লী-প্রত্যাগতদের ভিড় আর নাই।

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যেও গ্রাম ছিল সমৃদ্ধ। পূর্ব্ব ও দক্ষিণের সবুজ ঘাসের বিস্তৃত মাঠ গ্রামবাসীর নয়ন-মন মুগ্ধ করিত। এখানে খেলা হইত একসঙ্গে তিনটি ফুটবল টিমের এবং যুবক সঙ্ঘের টেনিস্ ক্লাবের। বর্ষায় জেলা বোর্ডের সড়কের পাশাপাশি প্রবাহিত খালের স্রোত ছিল হাট বাজারের নৌকা-চলাচলের পথ। সড়কের পশ্চিম প্রান্তে ছিল ইয়ং মেন্‌স্ এসোসিয়েসনের "গণেশচন্দ্র মেমোরিয়্যাল হল"। যুবক সঙ্ঘের কর্ম্মী গণেশচন্দ্রের স্মরণে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রতি বৎসর সৎকার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য স্বর্ণপদক পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় রাত্রিতে গ্রামের রাস্তায় মোড়ে মোড়ে আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখানেই ছিল সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন আইন অনুযায়ী রেজেষ্টারী করা "স্থল বাণীমন্দির" বা সাধারণের পত্রিকাপাঠের মিলনকেন্দ্র ও লাইব্রেরী। তার পর ছিল "হাতীঘর"। এক সময় এখানে তিনটি হাতী থাকিত। জমিদার ৺শারদাপ্রসাদ পাকড়াশী মহাশয় তাঁহার মায়ের "দানসাগর" শ্রাদ্ধে "মতিলাল" নামক হাতীটি দান করিয়াছিলেন। মতিলাল মধ্যে মধ্যে ক্ষিপ্ত হইয়া অনর্থ ঘটাইত। পাগলা মতিলালের অনেক কাহিনী উত্তরবঙ্গে রূপকথার মত প্রচলিত আছে।

সড়কের ধারেই ছিল "স্থল পাকড়াশী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়"। সম্মুখে "হরচন্দ্র হল" নামক বিরাট হলঘরটি স্কুলের

শোভা বর্দ্ধন করিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সুদূর গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত এই বিদ্যালয়টি পাকড়াশী-জমিদারগণের সংস্কৃতি ও বিদ্যানুরাগ, এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। রাস্তার পূর্ব্বপ্রান্তে টেলিগ্রাফ ও সব-পোষ্ট আপিস, "বিনোদলাল হল" নামাঙ্কিত দাতব্য চিকিৎসালয়, ঈশ্বরী জয়কালী মাতার সুন্দর পাকা মন্দির। আরও পূর্ব্ব দিকে ডাকবাংলো, সবৃরেজেষ্টারী আপিস, থানা, হাট বাজার চৌহালী গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জেলা বোর্ডের বাঁধান সড়কের দ্বারা সবগুলি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। সোমবার ও বৃহস্পতিবার হাটে হাজার হাজার লোকের সমাগম হইত।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সারা-সিরাজগঞ্জ রেলপথ চালু হওয়ার পূর্ব্বে, গোয়ালন্দের পথে ষ্টীমার যোগে কলকাতার ডাক বিকালে আসিয়া পৌঁছিত। বেলা ৪টা হইতে না হইতেই যুবকেরা খেলার মাঠে গিয়া হাজির হইত—প্রৌঢ় ব্যক্তিগণ পোষ্ট আপিসের দিকে রওনা হইতেন এবং বৃদ্ধেরা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সড়কে আসিয়া জমায়েত হইতেন। দৈনিক পত্রিকার খবরাদি লইয়া আলোচনার বৈকালিক আসর সরগরম হইয়া উঠিত। যে-কোন নবাগত ব্যক্তি বৈকালে সদর রাস্তায় উপস্থিত হইলেই গ্রামের অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ লাভ করিতেন। গ্রামের পুরুষেরা সকলেই সান্ধ্য সম্মিলনে একত্রিত হইতেন।

শারদাবাস চণ্ডীমণ্ডপ, শীর্ষদেশে ঘড়ি-ঘরের চূড়া

গ্রামের দক্ষিণের মাঠ হইতে উত্তর দিকে তাকাইলে সাত-খানি শ্রেণীবদ্ধ পাকা বাড়ী নজরে পড়িত। মধ্যস্থলে শারদা-বাসের ত্রিতল উচ্চ ঘড়ি-ঘরের চূড়া বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। গ্রামাঞ্চলে শারদাবাসের ন্যায় সুরম্য প্রাসাদ বিরল। সম্মুখে ঈশ্বরী দয়াময়ী কালীমন্দিরের দোতলা নহবতের সৌধ। ১২৬৪ সালে পরলোকগত হরচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় স্বীয় মাতার নামে এই সুঠাম দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেশ বিভাগের পর এই বিগ্রহ পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হইয়াছে। শূন্য পাকা মন্দিরটি এখনও অতীতের স্মৃতি বহন করিতেছে। মন্দিরে যাওয়ার পাকা রাস্তার দুই দিকে রেলিং-ঘেরা ফুলের বাগান, উত্তর দিকে লৌহতোরণ ও সেবায়েত-গণের সিংহদ্বারযুক্ত বাসভবন সবকিছু মিলিয়া এই স্থানের জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ দর্শক মাত্রকেই বিস্মিত করিত। এখন বাগানে ফুল ফোটে না। পরিত্যক্ত ঘরবাড়ীতে নিরুপায় নর-নারী আশ্রয় লইয়াছে।

গ্রামের অন্যতম দ্রষ্টব্য ছিল দুইটি দীর্ঘ জলাশয়। একটির নাম "বড়কুন", অপরটির নাম "ছোটকুন।" পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই উভয় জলাশয়ের চারিদিকে পাকড়াশী জমিদারগণ বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানকে ব্রহ্মোত্তর, বসতবাটি ও ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বড়কুন বার-মাস জলপূর্ণ থাকিত। বড়কুনের দক্ষিণ অংশে বট পাকুড় গাছের তলায় ছিল গ্রামের কিশোর ও যুবকদের দাড়িয়া, হাডুডু প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রীড়ার ময়দান। এই বটগাছের একধারে

জগদম্বাদেবীর সমাধির উপরে ছিল শিব-মন্দির। বিপরীত দিকে কেদারেশ্বর শিব-মন্দির। বর্ষার প্লাবনে যখন বড়কুম কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইত সে সময়ের দৃশ্য ছিল পরম উপভোগ্য।

এই অঞ্চলের খাঁটি দুধের প্রসিদ্ধি ছিল। ভিন্ন গ্রাম ও যমুনা নদীর চর থেকে প্রচুর দুধ স্থলের বাজারে প্রত্যহ আমদানী হইত। কাজেই খাঁটি ঘৃত, উৎকৃষ্ট দধি এবং ছানার প্রস্তুত যাবতীয় খাদ্যই সুলভ ছিল।

গ্রামের পূর্ব্বদিকে ছিল অধিকারীদের পল্লী। তাঁহাদের কৌলিক বিগ্রহ—গৌর ও নিত্যাইয়ের সুঠাম দারুমূর্ত্তি। আগেকার আমলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ৬৪ মোহান্তের অন্যতম কবিচন্দ্র ঠাকুর রাঢ়দেশে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কালক্রমে মুসলমানদের উৎপীড়নের আশঙ্কায় কবিচন্দ্রের বংশধরগণ উত্তরবঙ্গে আশ্রয় লন, অবশেষে তাঁহারা এই স্থলগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। গ্রামের বদান্য জমিদার শারদাপ্রসাদ পাকড়াশী মহাশয় এই বিগ্রহের একটি সুন্দর পাকা মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই বিগ্রহের অষ্টম দোল উপলক্ষে গ্রামে তিন দিন ব্যাপী বিরাট মেলা হইত। নাগর-দোলা, ম্যাজিক প্রভৃতির তাঁবু মাঠ ছাইয়া ফেলিত। বহুদূর হইতে হাজার হাজার যাত্রীর সমাগম হইত। বিগ্রহ এখন ২৪ পরগণার মদনপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। মেলার আনন্দোৎসব আজ স্মৃতিগর্ভে পর্য্যবসিত। ঠাকুরের মঙ্গলারতির কাঁসর ঘণ্টা আজ আর গ্রামবাসীদের নিদ্রাভঙ্গ করে না। গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে পাকড়াশী বাবুদের প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরী জয়কালী মন্দিরের চারিধারে ছিল মুসলমান-পল্লী। মুসলমানরাও এক সময় এই কালীবাড়ীতে মানত করিতে দ্বিধা করিত না। দেশ-বিভাগের পর ঈশ্বরী জয়কালীমাতাকে নবদ্বীপধামে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে. সেবায়েতগণের পরিত্যক্ত বসতবাটী এখন মনে বিষাদ-মাখা স্মৃতির উদ্রেক করে মন্দিরের পিছনে ছিল মৃধাদের বসতবাটী। এই মৃধাবংশের লোকেরা পুরুষানুক্রমে পাকড়াশী-জমিদারদের বিশ্বস্ত অনুচর ছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে গ্রামবাসীদের অবাধ গতি ছিল জমিদারদের বাড়ীতে। হিন্দু গৃহস্থদের কাজকর্ম্ম করিয়াই প্রতিবেশী মুসলমানগণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময় যুবকগণের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইত। এই উপলক্ষে সন্তরণ, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা প্রভৃতির আয়োজন হইত। সম্মিলনে গ্রামের অভাব-অভিযোগের কথা উত্থাপিত হইত এবং তাহার প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। এইরূপে গ্রামে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল।

৺দিনেশচন্দ্র পাকড়াশী এম্‌-এ, বি-এল্‌, মহাশয়ের উদ্যমে গ্রামে বয়নশিল্প প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারাও প্রচারিত হইয়াছিল। "স্থল-সমাজ" নামে হাতে লেখা একখানি ষাণ্মাসিক পত্রিকা বৈশাখ ও আশ্বিন মাসে তাঁহার চেষ্টায় প্রকাশিত হইত।

হরচন্দ্র 'হল'—স্থল পাকড়াশী উচ্চবিদ্যালয়

১৯১৯ সনে শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় "স্থল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্‌" নামে যে ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কয়েক বৎসর অংশীদিগকে লভ্যাংশ দান করিয়াছিল। গ্রামের জমিদার এবং তালুকদারদের ১০৷১২টি কাছারির কর্ম্মচারী, পাইক-বরকন্দাজ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতি বহু বিদেশী লোক গ্রামে অবস্থান করিত। গ্রামে সুতার-মিস্ত্রি, ভুঁইমালী, রজক প্রভৃতি বিভিন্ন লোকেরা জমিদারের কাজকর্ম্ম করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সেই হেতু গ্রামের জমিদারদের বাড়ী "সরকারী বাড়ী" নামে পরিচিত ছিল।

গীতবাদ্যানুশীলনেরও সুযোগ সুবিধা গ্রামে ছিল। ৺অখিলচন্দ্র পাকড়াশী মৃদঙ্গাচার্য্য মহাশয় পাখোয়াজ বাদনে যশবিক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ওস্তাদকে দীর্ঘকাল প্রতিপালন করিয়া নিজ গৃহে গীতবাদ্যানুশীলনের এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রামের অনেক যুবক বাঁয়া-তবলা বাজনায় এবং সঙ্গীতচর্চ্চায় পারদর্শী হইয়াছিল। প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় গান-বাজনার বৈঠক বা জলসার অনুষ্ঠান হইত। অনেক বিদেশী ওস্তাদও এখানকার সমঝদারদের গুণগ্রাহিতার কথা শুনিয়া এখানে আসিতেন এবং নিজেদের গুণপণার জন্য পুরস্কৃত হইতেন। "স্থল আদি আর্য্য রঙ্গভূমি" নামক নাট্য সমিতি ১২৮০ সনে স্থাপিত হয়। গ্রামবাসীদের উদ্যোগে প্রতি বৎসর নিয়মিত নাট্যাভিনয় হইত। পাকড়াশী-পরিবার ছিলেন এই নাট্য সমিতির পৃষ্ঠপোষক। তাঁহাদের অর্থানুকূল্যে রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ, দৃশ্যপট,

গ্যাসের ফুট-লাইট প্রভৃতির ব্যবস্থাও হইয়াছিল। অভিনয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক তিন-চার শত টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই অভিনয়কলায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ঈশ্বরী দয়াময়ী কালীমন্দিরের নহবৎযুক্ত তোরণ

জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। চিকিৎসার সর্ব্বপ্রকার সুবিধাই গ্রামে ছিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিয়া ৺হরকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুত নরেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় গরীব-দুঃখীদের দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিতেন।

গ্রামে বার মাসে তের পার্ব্বণে ভোজ-নিমন্ত্রণের ধুম পড়িয়া যাইত। ইহাতে মুসলমানরাও বাদ যাইত না। বৈশাখ মাসে প্রত্যহ ৺শোভারাম পাকড়াশী-প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেব বিগ্রহের অন্নুষ্ঠানে যোগদান করিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্মশানকালী পূজা বা আম্রকাম্য পূজা উপলক্ষে সারা রাত্রিব্যাপী উৎসব ও ভোজের বিপুল আয়োজন, আষাঢ়ে জমিদার ও তালুকদারদের বাড়ীর পুণ্যাহ, শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে মনসাপূজায় হিন্দু-মুসলমানের নৌকাবাচ-প্রতিযোগিতা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী নন্দোৎসবে গ্রামবাসীদের প্রীতিভোজ—এই সকল অনুষ্ঠান পল্লী-জীবনে বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিত। আশ্বিনে দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রবাসীদের নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে গ্রামে যেন আনন্দের হাট খুলিয়া যাইত। এক সময়ে গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ছাব্বিশ-খানি প্রতিমা নির্ম্মিত হইত। নবমী পূজায় বলিদানের সময় গ্রামবাসীরা সকলে একত্র সমবেত হইত। প্রত্যেক বাড়ীর কর্ত্তাব্যক্তি বলিদানের সময় উপস্থিত থাকিতেন এবং পর্য্যায়ক্রমে সবগুলি বাড়ীর বলিদান অনুষ্ঠান সমাধা হইলে ঈশ্বরী দয়াময়ী কালী-বাড়ীতে একত্রিত হইতেন। •পূজার সময়
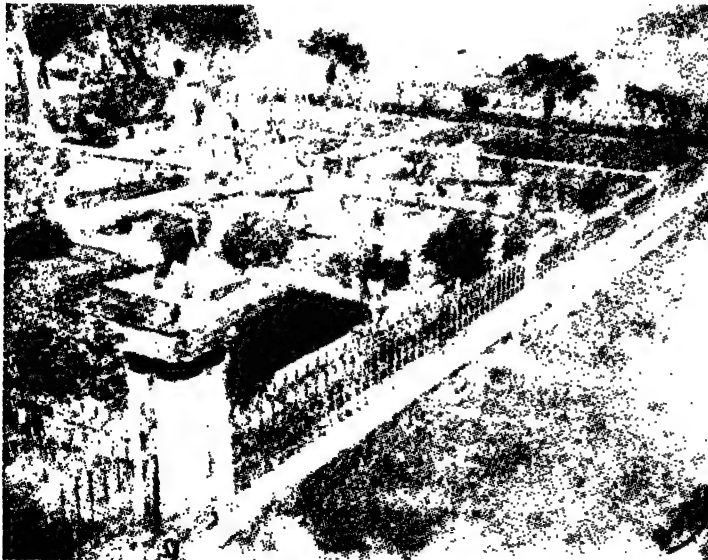
বাগানের ভিতরের দৃশ্য

শীতলী-ভোগ ও আরতি-কীর্ত্তন উপলক্ষে সমগ্র গ্রামবাসীর খাদ্য-ভোজের ব্যবস্থা সেবায়েতদের বাড়ীতে করা হইত। বৈশাখী সংক্রান্তিতে হরিসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক দিন অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন ও এক দিন পদ-কীর্ত্তন হইত। অনুবর্ত্তী হইয়া পাচিল গ্রামের এক দল মুসলমানও এই বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণের প্রথা ছিল না। ভোগ নিবেদিত হওয়ার সংবাদ দিলেই প্রত্যেক বাড়ীর অন্ততঃ দুই-তিন জন অত বাড়ী গিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিত। জমিদার ও তালুকদারদের বাড়ীতে কালিকা পুরাণোক্ত বিধি অনুযায়ী কালো রঙের দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও রাত্রিতে ভোগের ব্যবস্থা থাকায় দিবারাত্র

উৎসব এবং আনন্দের স্রোত চলিত। বিজয়ার দিন শোভাযাত্রাসহ প্রতিমা নিরঞ্জন হইত। এতদুপলক্ষে একে একে গ্রামের সবগুলি প্রতিমা নিরঞ্জনের শেষে সকলে একসঙ্গে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন এবং জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে গ্রামবাসীরা
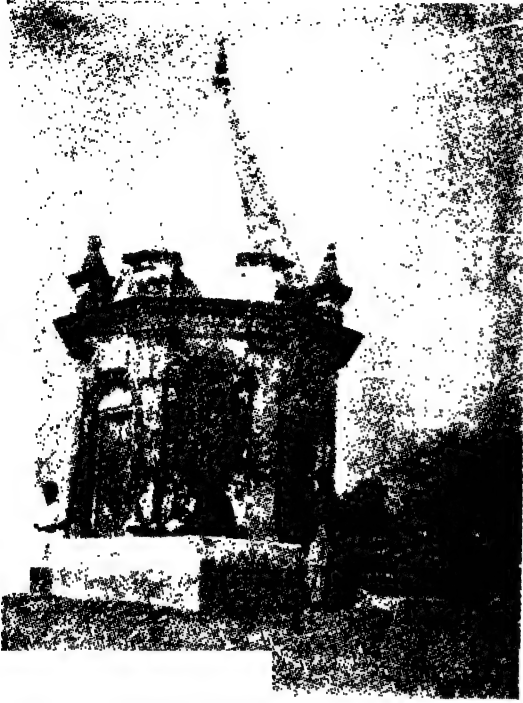
কেদারেশ্বর শিবমন্দির

পরস্পর পরস্পরকে বিজয়ার আলিঙ্গন করিতেন। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্ব্বেও ষোলখানি প্রতিমার পূজা হইত। ১৩৫৮ সনে মাত্র তিনটি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহা নিরানন্দ পুরীতে নিয়মরক্ষার প্রয়াসমাত্র।

কোজাগরী পূর্ণিমা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, দীপান্বিতা প্রভৃতি পার্ব্বণ উপলক্ষে প্রতিবেশীদের জন্য প্রতিটি গৃহের দ্বার ছিল অবারিত—সকলেই সাধ্যানুযায়ী আদর-আপ্যায়ন ও আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। অগ্রহায়ণ মাসে এখানে গৌরাঙ্গ মন্দিরের রাসপূর্ণিমার সমারোহ দেখিবার জন্য বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু লোকের সমাগম হইত। পৌষে "মুলা-মুড়ির ভোজ" একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব ছিল। পাকড়াশী মহাশয়দের বাড়ীতে পর পর সাত দিন ৺গোবিন্দদেবের বৈকালিক ভোগ উপলক্ষ্যে প্রচুর মোয়া মুড়কি চিঁড়া নাড়ু মুলা ও কলাদির দ্বারা প্রস্তুত প্রসাদ গ্রহণের জন্য ছেলে বুড়া সকলেই আমন্ত্রিত হইতেন। দোলের সময় আবির কুঙ্কুমে গ্রামের মাটি রাঙা হইয়া উঠিত। হোলির দিন জমিদার-বাড়ীর বিহারী দারোয়ান, সহিস প্রভৃতি দলবদ্ধ ভাবে মাদল বাজাইয়া গান করিতে করিতে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ফিরিত। চৈত্র মাসে হইত পাঠ, ঠাকুরের গাজন ও সন্ন্যাসীদের লোকনৃত্য। ঢাকের তালে তালে কত রকম নৃত্যের ছন্দে তাহারা ঠাকুর লইয়া গ্রাম পরিক্রমণ করিত। চৈত্রপূজার পরিসমাপ্তি হইত হর-গৌরী নৃত্য ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবার পর। চড়কপূজায় গ্রামে মেলা বসিত। কোন কোন বার বড়কুমে নৌকার মাস্তুলে চড়কগাছ জুড়িয়া দিয়া বাচখেলা হইত, কোন বার বা গরুর গাড়ীর উপর চড়কগাছ লাগাইয়া সড়কের উপর চলন্ত চড়কে সন্ন্যাসীরা ঘুরপাক খাইত। এইরূপে নানাবিধ আনন্দোৎসবের ভিতর দিয়া বারো মাস কাটিয়া যাইত।

জমিদারগণ হিন্দু হইলেও তাঁদের প্রজাবৃন্দ অধিকাংশই ছিল মুসলমান। নামাজের জন্য বাজারে জুম্মাঘর ছিল এবং পীরের দরগায় জমিদার-বাড়ী হইতেও সিন্নী পাঠানো হইত। স্কুলের মুসলমান ছাত্রেরা বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে মিলাদ সরিফ সভার অনুষ্ঠান করিত। মহরমে মুসলমান লাঠিয়ালরা লাঠিখেলা দেখাইয়া বখশিস লইয়া যাইত। বড় চৌহানীর আদাম মোল্লা, গোপীনাথপুরের করমান খাঁ, পাচিলের মেরু সর্দার, কেতাব সর্দার প্রভৃতি নামজাদা লাঠিয়ালরা হিন্দুদের আপদে বিপদে পূর্ণ বিক্রমে লাঠি হাতে লড়াই করিত। তখন সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ মনোভাবের লেশমাত্র লক্ষণও দৃষ্ট হইত না। আজ সেই সম্প্রীতি লোপ পাইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ আজ সমাজ-জীবনকে জর্জ্জরিত করিয়াছে।

এই গ্রামের স্বর্গত দুর্গানাথ পাকড়াশী মহাশয় ছিলেন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের ধারক ও শাস্ত্রীয় ধর্ম্মাচরণের পথপ্রদর্শক। তাঁহার অনুষ্ঠিত দানসাগর তোরণ, বৃষোৎসর্গ, নবরাত্রি ব্রত, দশমহাবিদ্যা পূজা ও ১০৮ কালীপূজার বিবরণ আজও প্রৌঢ়দের মুখে মুখে প্রচারিত হয়। ১৩০২ সনে দানবীর সারদাপ্রসাদ পাকড়াশী মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে অষ্টাদশ ষোড়শ, স্বর্ণসুখাসন, হাতী, ঘোড়ার গাড়ী, পাল্কী, নৌকা প্রভৃতির শাস্ত্রবিহিত দানসাগর অনুষ্ঠান বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল পৃষ্ঠা।

১২৮৩ সনে একবার ও ১২৯৪ সনে আর একবার ঘটক কুলীন সম্মিলন উপলক্ষে যেরূপ ঘটা হইয়াছিল এবং বলসমাজ যেরূপ অতিথি সংকার-পরায়ণতা ও সৌজন্যের পরিচয় দিয়াছিল সে কাহিনী এখন প্রাচীন ব্যক্তিগণের মুখে শুনিলে রূপকথার ন্যায় অলীক বলিয়া মনে হয়। এই সকল সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে সকল গ্রামবাসীর ঐকান্তিক সহযোগিতা ও জনশক্তির পরিচয় সর্ব্বদাই পাওয়া যাইত। বিবাহাদি উপলক্ষে বক্তি রায়, ভূষণ দাস, ভোলানাথ অপেরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ

গৌরাঙ্গদোলের মেলা

যাত্রা পার্টির অভিনয় বহুবার গ্রামবাসীদের আনন্দ পরিবেশন করিয়াছে।

১৩০৪ সনে যাত্রাভিনয়ে, সুপ্রসিদ্ধ মতি রায় মহাশয় এই গ্রামের সামাজিক জীবন বর্ণনা করিয়া যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহার উদ্ধৃতি হইতে পাঠক তদানীন্তন আদর্শ পল্লীসমাজের পরিচয় পাইবেন। সঙ্গীতের প্রারম্ভ এইরূপ—

"ধন্য হল-বসন্তপুর* আনন্দ ভবন।
নহে কভু দুঃখের আগমন,
মরি কি কান্তি, দেখি যেন
শান্তিদেবীর সিংহাসন।
গ্রামবাসী যত জন, সকলেই সুভাজন
দ্বিজগণ সবে বিজ্ঞ বিচক্ষণ।
আস্তিকের চূড়ামণি মুনি ঋষি মনে গণি,
ধর্ম্মে আবৃত দেখি সর্ব্বক্ষণ।
নাহি হিংসাদ্বেষ
সৎকর্ম্ম নির্দ্দেশ,
এঁদের দেখলে উপদেশ লাভ
করে সব মূঢ়গণ।
ধন্য হলবসন্তপুর আনন্দ ভবন।"

কালের কুটিল গতিতে, রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ফলে এই আদর্শ পল্লীর সমাজ-জীবন বিধ্বস্ত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে এখানকার আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত। আনন্দমুখর হলগ্রাম আজ স্তব্ধ নীরব। সকালে মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বাজে না, সন্ধ্যাসমাগমে গোবিন্দদেবের ধূপারতির বাদ্য শ্রুত হয় না। পল্লীর অধিকাংশ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইয়াছে। হিন্দুদের অধিকাংশ ঘরবাড়ী ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বেদখল করিয়া লইয়াছে। কীর্ত্তিমান সমাজপতিদের লীলাভূমিতে আজ নিরানন্দের ছায়াপাত হইয়াছে।

অতীতের সমৃদ্ধির সহিত বর্ত্তমান পরিবেশের তুলনা করিলে গভীর বিষাদে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

* 'হলবসন্তপুর' পরবর্তীকালে হল নামেই পরিচিত হয়।

বাস্তুত্যাগীদের সম্পর্কে দু'একটি কথা

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

নেহরু-লিয়াকত দিল্লী-চুক্তির ফলে ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তান, তথা পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দুসম্প্রদায় নিজ বাসভূমিতে নিরাপদে অবস্থানের ভরসা পাইলেও, বোধ হয়, বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারে নাই। তাই সরকারী বিজ্ঞাপন-সত্ত্বেও ইহাদের বাস্তুত্যাগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। রেলপথে উদ্বাস্তুদের যাতায়াতের যে সংখ্যা প্রত্যহ প্রকাশিত হয় তাহার নির্ভুলতায় সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে, এই যাতায়াতকারীদের মধ্যে সকলে উদ্বাস্তু নহে—অনেকেই ব্যবসাদার কেহ বা দিনে কারবার করে, কেহ বা রাত্রে মাল চালান দেয়। ইহাদের সংখ্যা ধরিলে উদ্বাস্তুদের আগমন-নির্গমনের সংখ্যা বাড়িয়া যায় সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিতে হইলে ইহাদিগকে বাদ দিতে হইবে। কার্য্যব্যপদেশে ইহারা উভয় বঙ্গে স্বল্পকালের জন্য যাতায়াত করে মাত্র। ইহাদের সংখ্যাও নগণ্য নহে। কেহ কেহ প্রকৃত কিংবা ভাবী উদ্বাস্তুদের মালপত্রাদি লইয়া আসে, কেহ পারিশ্রমিক পায়, কেহ বা পায় না। এই সকল চলমান সংখ্যা সরকারী স্থিতিশীল সংখ্যার হিসাবে গোলযোগ ঘটাইতেছে। রাষ্ট্র হিসাবে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ আজ সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও উভয় বঙ্গের সামাজিকতার নাড়ীর টান আজও নির্ম্মূল হইতে পারিতেছে না। তাই সরকারী পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সমীচীন হইবে না। মোট কথা, সরকারী ঘোষণাসত্ত্বেও বাস্তুত্যাগ আজও চলিতেছে এবং আশঙ্কা হয় ভবিষ্যতেও এইরূপ চলিতে থাকিবে।

ইহা সুপরিস্ফুট যে, সামাজিক দিক দিয়া এই বাস্তুত্যাগ গুরুতর ক্ষতি করিতেছে। সে তুলনায় আর্থিক দিকটা হয় তো লঘুতর করিয়া ভাবা যাইতেও পারে। অর্থের অপচয়কে সম্ভবতঃ এক দিন অন্য উপায়ে উপচয়ে আনা যাইতে পারে, কিন্তু সমাজে যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইল, তাহাতে অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের সামাজিক জীবনযাত্রার ও ঐতিহ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটিল, তাহার আর পূরণ বা পুনরুজ্জীবন হইবে কিনা সন্দেহ। জমিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ভবিষ্যতে এক দিন হইতেও পারে, কিন্তু সামাজিক জীবনধারা ও পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যকে আর ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে না।

ভাবীকালের সহিত এই অতীত ও বর্ত্তমানের বিচ্ছেদের যে সূচনা আজ দেখিতেছি তাহার পরিণাম ভাল হইবে কি মন্দ হইবে সে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই বিচ্ছেদটা যে সত্য, তাহা অস্বীকার করিব কি করিয়া?

এই বিচ্ছেদের ঐতিহাসিক সত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াই আমার আবেদন জানাইতেছি। আমরা যাহারা পাকিস্তানে এখনও আছি বা থাকিব বলিয়া আশা করি, তাহাদের পক্ষ হইতেও যেমন আমাদের আবেদন, তেমনি যাহারা পাকিস্তান ছাড়িয়া ভারতরাষ্ট্রে বসতি করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই আবেদনের যৌক্তিকতা এবং আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করি। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কালে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক জীবনের যোগসূত্র, সাংস্কৃতিক ঐক্যবন্ধন, প্রাণের টান একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা অনেকেরই মনে উদিত হইতেছে। এমতাবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীসমূহের গৌরব-ময় ঐতিহ্যকে বিনষ্টির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবিলম্বে মনোযোগী হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্রামের ইতিহাস-রচনার জন্য ব্যক্তিগত বা সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন আজ যে কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের সামাজিক জীবনে বাসগ্রামের একটা বিশিষ্ট মর্য্যাদা ছিল। শুধু বংশের নয়, গ্রামের নামের সঙ্গে যে প্রতিষ্ঠা বিজড়িত ছিল তাহার পরিচয় দিতেও আমরা গর্ব্ব অনুভব করিতাম। আজ পূর্ব্ববঙ্গের সেই সব গ্রাম হিন্দুরা একান্ত নিরুপায় হইয়া পরিত্যাগ করিতেছে। কিন্তু ভবিষ্যবংশীয়েরা যে পিতৃপিতামহের স্মৃতিবিজড়িত গ্রামের পরিচয় ভুলিয়া যাইবে সেকথা অনেকেই ভাবিয়া দেখিতেছেন না। যাঁহারা সক্ষম ও লিপিকুশল, তাঁহাদের নিকট অনুরোধ, তাঁহারা নিজ নিজ গ্রামের বিবরণ লিখিয়া এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হউন। ভবিষ্যৎ ইতিহাসকার এই সমস্ত রচনা হইতে বহু মালমশলা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন। এটাই হইবে সত্যকার জাতীয় ইতিহাস—রাজরাজড়ার ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা নয়, সমাজ-জীবনে ছোট বড় সকলের ইতিহাস।

আমরা দেখিয়াছি, হিন্দুসমাজে স্বজাতিদের মধ্যেও স্থান এবং পারিপার্শ্বিক ভেদে চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ভাষা ইত্যাদিতে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পূজা-পার্ব্বণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানে এই পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট। এই সকল বিষয়ের বর্ণনা লিপিবদ্ধ থাকিলে সামাজিক ইতিহাস-রচনায় প্রভূত সহায়তা হইতে পারে। বাস্তুত্যাগী প্রত্যেকটি বংশের বিস্তারিত বিবরণ লিখিত থাকাও প্রয়োজন। একই গ্রামের, একই সমাজের, একই বংশের বিভিন্ন পরিবার, আজ বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া স্থায়ী বাসস্থান

সংগ্রহ করিতেছেন। ইঁহাদের ভবিষ্যবংশীয়েরা যাহাতে বংশ-পরিচয় ও গ্রামের সহিত সম্পর্কের কথা ভুলিয়া না যায় সেজন্য "বংশাবলী" রচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এগুলি ভবিষ্যৎ বংশধর ও জীবনীকারদের কাজে আসিবে।

এই বিবরণাদির মধ্যে সবগুলিই যে সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইবেই তেমন আশা অবশ্য করা যায় না। বহু ক্ষেত্রে এই সকল রচনায় হয় ত লিপি-কুশলতার অভাব দেখা যাইবে, কিন্তু তাই বলিয়া কোন গ্রামের বা বংশের বিবরণই ফেলিয়া দিবার নহে। তাই আজও যতক্ষণ এক গ্রামবাসী বা একবংশীয় সকলে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হন নাই ততক্ষণ সকলের সমবেত চেষ্টায় এরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যাঁহাদের পক্ষে পুস্তকমুদ্রণ সম্ভব হইবে না, তাঁহারা তাঁহাদের হস্তলিখিত এই সব গ্রন্থ—হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ ও রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে দিলে সেগুলির সযত্ন-রক্ষণের ব্যবস্থা হইবে।

আমার এই আবেদনটির কথা সকলকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। এই সব বিবরণের মধ্য দিয়া কোন্ত বা উষ্মা প্রকাশ করা চলিবে না। এগুলি হইবে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক তথ্য।

রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু

শ্রীচিন্ময়ী পাঠক, এম-এ

রবীন্দ্রনাথ যে দেশে জন্ম নিয়েছেন সে দেশের আকাশে-বাতাসে সঞ্চিত হয়ে আছে যুগযুগান্তের অপার্থিব অনুভূতি—অপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-ঋষির ঐকান্তিক সাধনায় যে পরম সত্য প্রকাশিত হয়েছিল, কঠিন বস্তুতান্ত্রিক জগতের মলিন ছায়ায় তা প্রচ্ছন্ন হলেও বিলীন হয় নি। এখনও সাধকের গভীর চেতনার অন্তঃস্তলে অনুরণিত হচ্ছে সেই অনাদিকালের পরম সত্যের বাণী—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। কঠোপনিষৎ, ২অঃ

মানবাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। উৎপত্তিবিনাশ-রহিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে জন্মমরণাদি কল্পনা মূঢ়তার লক্ষণ। মৃত্যুতে মানবের পঞ্চভূতে গঠিত পার্থিব দেহের লয় হয়, কিন্তু অবিনশ্বর আত্মার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। এই কথাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। গীতা—২অঃ

বর্ত্তমান যুগের অবিশ্রাম কোলাহলের মধ্যেও ভারতবাসী ভুলতে পারে নি তার অতীত তপস্যার ধনকে। ক্লান্তদেহে বাড়ী ফিরবার পথে কৃষকের কণ্ঠে শুনি সেই যুগযুগান্তের গান, মেঠোলে মেঠোলে সাধকের কণ্ঠে শুনি সেই মন্ত্র, বাউলের এক-তারাতে বাজে সেই সুর।

এমনি দেশে কবিগুরু জন্মেছেন, পালিত হয়েছেন এরই আবহাওয়ায়। তাই এই দেশের দার্শনিক অনুভূতি তাঁর জীবনে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর কবিতার মাঝে ব্যক্ত হয়েছে আর্য্যঋষির সাধনা—তাঁর গানের মাঝে ধ্বনিত হয়েছে সেই শাশ্বত আনন্দের বাণী। তিনি উদাত্ত-কণ্ঠে গেয়েছেন—'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ', এই অন্তহীন আনন্দের উচ্ছ্বাসে তিনি মগ্ন, মৃত্যুকে তাঁর কি ভয়? দুরন্ত কালবৈশাখীর ঝড়ে তাঁর স্নেহের কুসুমগুলি একটি একটি করে ঝরে গেছে, তবু বিধাতার কাছে নাই তাঁর কোন নিরুদ্ধ অভিমান। বেদনার আঘাত যত তীব্র হয়েছে তত নিবিড়ভাবে অনুভব করেছেন :

"জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি।"

মৃত্যু ত নিষ্ঠুর ঘাতক নহে, সে যে পথিকৃৎ। তার উদার উন্মুক্ত পথে চলে ক্ষুদ্র মানবের অনন্ত জীবনের উদ্দেশে অভি-যান। তাই মৃত্যু আনে না ভীতি, বুকফাটা আর্ত্তনাদ, মর্ম্মস্পর্শী হাহাকার। অসম্পূর্ণ জীবনকে সম্পূর্ণ করে তার মোহন স্পর্শ। এ জীবনে যা বিফলতাময়, চঞ্চল, অনিত্য, তা মৃত্যুর আলোতে সফল হয়ে উঠে। তার একটি মাত্র ইঙ্গিতে জীবনের অবগুণ্ঠন খসে যায়, প্রকাশিত হয় অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় নূতন কান্তি। তাই নির্ম্মম আঘাতে জর্জরিত হয়েও কবি চেয়েছিলেন :

"মরণ আসুক চুপে পরম প্রকাশ রূপে
সব আবরণ হোক্ লয়, ঘুচুক সকল পরাজয়।"

কখনও কখনও ধুলার পৃথিবীর রূপ, রস ও বর্ণবৈচিত্র্যের সমারোহে ভ্রম হয়, 'বুঝি বা টুকরো টুকরো সুখে-দুঃখে ভরা, 'কান্না হাসির দোলদোলানো' এই ক্ষুদ্র পার্থিব জীবনটুকুই সুন্দর; তাই মৃত্যুর দ্বারে এসে মনে ব্যথা লাগে সেই অতিপরিচিত ছোট গণ্ডীটি ছেড়ে যেতে, আঁখি ছলছল করে। কিন্তু এই বেদনার অনুভূতি ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতামাত্র। মৃত্যুর মাঝে ত নেই বিরহের আভাস, সে যে আনে পরম মিলনের বার্তা,—

ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম মুহূর্ত্ত হ'তে তোমার অজ্ঞাতে
তোমার ইচ্ছার পূর্ব্বে। মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিব আবার
মুহূর্ত্তে চেনার মতো।

কবি জেনেছিলেন মৃত্যুর মাঝে আমার লয় হবে না। তার উদ্দাম স্রোতে ভেসে যাবে ধুলামাটির গড়া এই পুরাতন দেহখানি, চিরপুরাতন আমার 'আমি' নূতন উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হবে। তাই আমার কেন দুঃখ, কেন বেদনা?

"স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

যে বোঝা এই হাটে কিনেছিলাম তাকে শূন্য করে দিলাম, আমার 'আমি'র ত কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। তাই বুঝি ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছিলেন 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ' —আমি জন্মহীন নিত্য, আমি শাশ্বত, পরিবর্ত্তনহীন। যুগ যুগ ধরে নূতন নূতন রূপে পৃথিবীতে দেখা দেয় বার বার সেই চিরপুরাতন আমি।

"তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।"

সংসারের যে মলিনতা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যে জড়তা আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছে ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে, মৃত্যুর একটি ফুৎকারে সে জড়তা, সে মলিনতা যাবে দূরে। মৃত্যুর মাঝে আছে পরমা মুক্তির সন্ধান। তাই—

"জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুকে এমনি ভাল বাসিব নিশ্চয়।"

কি অপরূপ রূপে কবি দেখেছিলেন মৃত্যুকে। জীবনের গোধূলিক্ষণে সে এসেছিল তার দ্বারে প্রণয়ীর বেশে চোখে স্বপ্নের ঘোর বিছায়ে। তার পিঙ্গল জটাভার চূড়া করে বাঁধা, যেন ক্ষেপা মহেশ্বর চলেছেন উমাকে বিবাহ করতে। কবির অন্তরে জাগে চিরবিরহিণী নায়িকার আকুল মিনতি।

"তুমি উৎসব করো সারা রাত
তব বিজয় শঙ্খ বাজায়ে
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব রক্ত বসনে সাজায়ে।"

কখনও বা তার অলৌকিক প্রেমে আত্মহারা হয়ে কবি গেয়েছেন—

"মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান"

কবির অন্তরে কি পরম মুক্তির উল্লাস, কি অপূর্ব্ব আনন্দের অভ্যুদয়। যেন প্রেমবিহ্বলা রাধিকা বরণ করছেন তাঁর প্রিয়কে, এবার হ'ল তাঁর দীর্ঘ বিরহের অবসান, এবার এল তাঁর মিলনের লগ্ন—

"হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখণ
অতুলন তোঁহার লেহ।"

এই মিলনানন্দের শেষ নাই। রাধাও হারিয়েছিলেন তাঁর শ্রীকৃষ্ণকে, কিন্তু মরণরূপী তার দয়িতাকে কখনও ত্যাগ করেন না,—

"তুহুঁ নহি বিসরবি, তুহুঁ নহি ছোড়বি
রাধা হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি"

তাই যখন এল মিলনের আহ্বান, নির্ভরে কবি তরীখানি ভাসিয়ে দিলেন অনন্ত শান্তি-পারাবারে নীরব কর্ণধারের মুখ চেয়ে; সকল চিন্তার জড়তা থেকে মুক্ত করলেন আপনাকে —সঁপে দিলেন সেই পরম সত্যের চরণে:

"হে মহা জীবন, হে মহা মরণ।
লইনু শরণ, লইনু শরণ॥
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা—
করো হে আমার লজ্জা হরণ॥"

বাঙ্গলার সমাজ-জীবন—সম্পদ

শ্রীযদুনাথ সরকার

সব দেশেরই সম্পদ আসে তার মাটি হইতে এবং সেই জলবায়ুতে যুগ যুগ ধরিয়া বাস করার ফলে লোকদের যে চরিত্র ও শক্তি গড়ে ওঠে, তাহা থেকে। একেই বলে উপাদান ও জনশক্তি, natural resources and man-power.

বাঙ্গলা দেশ কৃষিজীবী এবং নদীমাতৃক, অর্থাৎ জমি চাষ করাই লোকদের প্রধান কাজ, এবং নদী নিজে থেকে যে জল এনে দেয় মানুষ তা দিয়ে ক্ষেতে গাছে ফল জন্মায়, নৌকা চালিয়ে মাল পাঠায়, আর দেশময় তরকারীর অভাব এই প্রচুর মাছ খেয়ে পূরণ করে।

আদি ও মধ্য যুগে অনেক বন জঙ্গল ছিল, চাষ করা জমি বড় কম, গাছের ফল এবং লতার শাক খুব প্রচুর। কারণ তখন লোকসংখ্যা এখনকার চেয়ে অনেক কম, এবং সেজন্য অতি অল্প জমি হতে তাঁদের আবশ্যক খাদ্য জুটিত। সেই সুদূর দু'তিন হাজার বছর আগেকার বাঙ্গালী গ্রাম্য-জীবনের দৃশ্য কল্পনা করিতে পারি যদি আমরা আসামে পাহাড়ের গায়ে বন্য জাতিদের জুম্ নামক চাষের প্রণালী দেখি। তাদের এক পরিবার আসিয়া জঙ্গলের মধ্যে গাছ কাটিয়া পুড়াইয়া একটু গোলাকার জমি সাফ করিয়া, তাহাতে ধান বা ভুট্টা জন্মায়। পাতার কুঁড়েঘর বাঁধিয়া থাকে, এবং এই প্রণালীর চাষ করার ফলে চার-পাঁচ বৎসর পরে যখন জমিটা একেবারে অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে, তখন তাহারা জঙ্গলের মধ্যে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরে অন্য এক জায়গায় গিয়া ঠিক এইরূপ গাছ ধ্বংস এবং নূতন চাষ আরম্ভ করে। এর ফলে বন ক্রমশঃ লোপ পায়, বর্ষার খর স্রোত বিনা বাধায় জমি ধুইয়া ঠেলিয়া লইয়া যায়, শুধু কঙ্কর বালি এবং নালা অবশিষ্ট থাকে।

কিন্তু বাঙ্গলাদেশের জীবন নদীজলের উপর নির্ভর করে, অথচ প্রতি বৎসর বর্ষার স্রোত জমির পলিমাটী ধুইয়া সাগরে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, আর বালি ও পরে ধুলা জমা হইয়া নদীগুলির উঁচু দিক মজিয়া যাইতেছে, পুকুরগুলি আর তত জল পায় না, নদীতে নৌকাচলা প্রতি বৎসরই জল কমার ফলে কঠিন হইতে কঠিনতর, এবং কম হইতে আরও কম দিন ধরিয়া সম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। উঁচু বাঙ্গলার ক্ষেতগুলি শুষ্ক ও অনুর্ব্বর হইতেছে। পুরাতন ম্যাপ হইতে প্রমাণ হয় যে আত্রেয়ী নদী কত বিস্তৃত ও প্রবল ছিল, যেন এখনকার পদ্মার সমান। আর ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পের আগে তিস্তা নদী আসামের দিকে তাহার জল ঢালিত না, সব জল পাবনা জেলা দিয়া বাহিয়া আত্রেয়ীতে পড়িত; তখন চলন বিল এক প্রকাণ্ড সমুদ্র ছিল, এখন তাহা শুষ্ক চাষের ক্ষেতে ভরা। আমাদের নদীগুলির ক্রমশঃ মৃত্যু বাঙ্গলাদেশের ভবিষ্যৎ বিপদ, ইহা হইতে কলিকাতাও বাঁচিবে না।

তার উপর ক্রমশঃ জমির উর্ব্বরতা হ্রাস হচ্ছে। আসল কথা প্রতি বিঘা থেকে খুব বেশী পরিমাণে শস্য পেতে হলে, গোবর ও গোচোনার মত উৎকৃষ্ট সার আর জগতে নাই, এরা হিউমাস্ সৃষ্টি করে যাহা শস্যের প্রধান প্রাণ অথচ জমির উর্ব্বরতা ধ্বংস করে না। এত দিনে বিজ্ঞান এই সত্য জানিয়াছে; জমিতে যতই ammonia sulphate আর phosphate ঢাল না কেন, দেখিবে যে, দশ বৎসরে ঐ জমি মরুভূমির মত বন্ধ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গাছের পাতা পচিয়াও সার হয়, কিন্তু গাছ কোথায় আছে? বাঙ্গলাদেশে জ্বালানী কাঠের যেমন অভাব তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোককে ঘুঁটে পোড়াইয়া রান্না করা হইতে নিবারণ করা যাইবে না; জমি চিরদিন গোবর অর্থাৎ humus হইতে বঞ্চিত থাকিবে, কম ফসল হইবে। এই বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন পথ দেখি না।

বাঙ্গলাদেশের জীবনযাত্রার কথা ইতিহাসে পড়িলে দেখা যায় যে পূর্ব্বে এই দেশ খাদ্য সম্বন্ধে স্বাধীন ছিল, অর্থাৎ অন্য দেশ হইতে ধান আনিতে হইত না, বরং জাহাজে চাউল রপ্তানী করিত (পলাশীর যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত)। কাপড় অতি কম প্রস্তুত হইত, কিন্তু এই গরম প্রদেশে অতি কম কাপড়েই চলিত, সৌখীন লোক ছাড়া ভদ্র-সম্প্রদায়ও এক জোড়া ধুতি ও এক জোড়া গামছা দিয়া গ্রামে সমস্ত বৎসর চালাইতেন। রপ্তানী-মধ্যে ছিল প্রধানতঃ চাউল ও শুকনো নোনা মাছ, যাহা সমুদ্রগামী জাহাজগুলি চাটগাঁ হুগলী প্রভৃতি বন্দর হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার কিনিত। সোনারূপা বড় কম ছিল, রাজকর অনেক স্থানে নগদ টাকায় দেওয়া অসম্ভব ছিল, ক্ষেতের চাউলের ভাগ মাত্র রাজা পাইতেন—হিন্দু যুগে ষষ্ঠাংশ, শের সার সময়ে চতুর্থাংশ এবং আকবরের সময় হইতে এক তৃতীয়াংশ, তেভাগা। লঙ্কা হলুদ ও পেঁয়াজ বেশ রপ্তানী হইত।

কিন্তু আকবরের বঙ্গবিজয় হইতে দেশের শাসন ইংরেজ নিজ হাতে লওয়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৫৭৫-১৭৭৫ এই দু'শ বছরে বঙ্গের অর্থনৈতিক জীবনে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন

হইল, অর্থাৎ আমাদের ক্রমবিকাশ আধুনিক সভ্যতার পথ ধরিল। বিদেশী সামুদ্রিক বাণিজ্য এদেশকে ছাইয়া ফেলিল, কিন্তু আমরা মিতব্যয়ী জাতি বড় কম বিদেশী আমদানী জিনিষ কিনিতাম, এবং তাহার ফলে আমরা রপ্তানীর জন্য যে জিনিষ বেচিতাম, ঐ বণিকেরা তাহা রূপা দিয়া কিনিত, জিনিষ বদলাইয়া নহে। পাঠান যুগে চীনা বণিকগণ রূপা আনিয়া বাঙলা হইতে জিনিষ কিনিয়া রপ্তানী করিত। আওরংজীবের সময়ে ডচ ও ইংরেজ বণিকেরা প্রতি বৎসর বহু লক্ষ তোলা রূপা আমদানী করিয়া বাদশাহী টাকশালে তাহা গলাইয়া সিক্কা টাকা করাইয়া, তাহা দিয়া নিজেদের রপ্তানী মাল কিনিত।

এক ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৬৮০-৮৩ সালে চার বৎসরে বঙ্গদেশে ১৬ লক্ষ টাকা আনিয়া ঢালিয়া দেয়, তখন টাকার ক্রয়শক্তি আজকার অপেক্ষা ত্রিশ গুণ ছিল।

এই বিদেশী জাহাজের বাণিজ্যই বঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রথম ধাপ। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে আমরা কি কি মাল রপ্তানী করিতাম? তার মধ্যে পাট, কয়লা ও চা ছিল না। দামী জিনিষ ছিল নীল, কিছু চিনি, সুতার কাপড় (মসলিন, মলমল, ছিট এবং মোটা গড়া), রেশমী কাপড় ও অনেক রেশমী সুতা, এবং বিহার হইতে আনীত সোরা—এই শেষটি যুদ্ধরত ইউরোপের বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক, ইহা আমাদের একচেটে ছিল।

কিন্তু ১৮০০ সালের পর হইতে ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হারিয়া গিয়া বঙ্গের হাতে বোনা কাপড় প্রায় লোপ পাইয়াছে। রাসায়নিক নীল, নূতন সাদা বারুদ, বীট হইতে চিনি আবিষ্কার হওয়ায় এই তিনটি মূল্যবান রপ্তানীর মাল আর বঙ্গদেশ বেচিতে পারে না, প্রস্তুত করা বৃথা। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত আমরা বিলাত বা জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দামে পাকা মাল প্রস্তুত করিতে না পারিব ততদিন আমরা শিল্পজগতের বাহিরে ভিক্ষুকের মত বেকার হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব। এই গুরুতর সমস্যার সম্মুখে কোম্পানীর শাসন শেষ হইল, সিপাহী বিদ্রোহের পর পার্লামেণ্ট ভারত-শাসন নিজ হাতে লইল, এবং ভারতরাষ্ট্রে নব্য যুগ প্রকৃতই আরম্ভ হইল। সেই দিন হইতে ৫০ বৎসরের চেষ্টার ফলে কতকগুলি কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে, কারিগর মিস্ত্রী শিক্ষিত হইতেছে, এবং পাকা মাল রপ্তানী করিয়া তাহার মূল্য হইতে দেশের খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করা হইতেছে বিদেশ হইতে শস্য আনিয়া।

এই আধুনিক কলকারখানা চালান সম্ভব হইয়াছে, ব্রিটিশ যুগে আমাদের মধ্যম শ্রেণীর অভাবনীয় সংখ্যাবৃদ্ধির ও শিক্ষা, দক্ষতা এবং রাজনৈতিক বললাভের ফলে। মানুষ নিজের ভাগ্য নিজের হাতে গড়িয়া তোলে, সুতরাং এই মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজই আমাদের ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা।

কিন্তু গত দুই বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবলীলার ফলে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ লোপ পাইতে চলিয়াছে। তাহারা যে ধ্বংস হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমাজ এবং বাহিরের জগৎ আজকাল যেদিকে মুখ ফিরাইয়াছে তাহা ভাবিয়া যদি বর্ত্তমানে বাঙালীরা নিজেদের জীবনযাত্রা, শিক্ষার প্রণালী, এবং সামাজিক ব্যবহারের রীতি সম্পূর্ণ না বদলায় তবে আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সেই সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর সকলে সত্যই লোপ পাইবে, লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ার মত নিম্ন শ্রেণীর হাতের-কর্ম্মী শ্রমিক মাত্র এ দেশে থাকিবে।

কিন্তু মুক্তি কোন্ পথে? আমার মনোভাব এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি—

একথা ভুলিলে চলিবে না যে বঙ্গদেশে পাথর নাই, ভাল কাঠের গাছ নাই, কাঁচা লোহা নাই, জলপ্রপাত না থাকায় সস্তায় প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় না, প্রথম শ্রেণীর তুলা জন্মে না, চাটগাঁ হিল্ ট্রাক্টস্-এ দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলা হইত কিন্তু তাহাও পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে; খাদ্যের মধ্যে ডাল সামান্য কয়েক রকম মাত্র প্রচুর জন্মে, ভাল ডাল এবং তিল সরিষার জন্য আমরা বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের মুখ চাহিয়া থাকি। এই সব দিক দিয়া প্রকৃতি-দেবী আমাদের প্রতি বিমুখ। কাজেই বাঙালীকে বাঁচিতে হইলে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইবে, আধপেটা খাইয়া ডবল মেহনৎ করিতে হইবে। ইংরেজ রাজ্যবিস্তারের দিনে একটু ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া বাঙালী মধ্যবিত্ত লোক যে ভারতময় চাকরি পাইত, সে দিন গিয়াছে।

আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য মিতব্যয়ী হইতে হইবে, সর্ব্বত্র, সব শ্রেণীতে যাকে ইংরেজীতে বলে tightening the belt, কম খাইয়া ভুঁড়ীটাকে ছোট করিতে হইবে। আর অপব্যয়, নবাবী ঢং একদিনও চলিবে না। বিবাহের সময় বাহ্য আড়ম্বর এবং জিনিষ ফেলাফেলিকে যেন অপরাধ বলিয়া সমস্ত সমাজ নিন্দা করেন। এই ব্যয়বাহুল্যের ভয়েই ছেলেরা বিবাহ করিতে চায় না; তবে তাহাদের এবং আমাদের কন্যাদের কি দশা হইবে ভাবিয়া দেখুন।

পুরাতন শুচিবাই এবং শাস্ত্রীয় শত শত বৃথা আচারও ছাড়িতে হইবে, কারণ এক বাড়ীতে একের অধিক চুলা রাখার অর্থ ও সময় নষ্ট সহ্য করিবে কে? মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মত সমবেত ভোজনালয় হইতে অনেক মাদ্রাজী

ও পঞ্জাবী হিন্দু প্রভৃতিদিনের খাদ্য আনেন এরূপ অনেক বড় শহরে দেখিয়াছি। অনিবার্য্য চাপে বাঙ্গালী হিন্দুও তাহাই করুক।

ছেলের শিক্ষা দিবার সময় তাহার ভবিষ্যৎ জীবন ভাবিয়া সেই ধরণের শিক্ষা দিতে হইবে। আগেকার দিনে পিতারা চোখ বুঁজিয়া ছেলেকে জেনেরাল এডুকেশন দিতেন পরে গ্রাজুয়েট হইবার পর সে নিজ পথ খুঁজিত, অধিকাংশ স্থলে হাবুডুবু খাইত। এখন আর এরূপ করা চলিবে না। তরুণ বালকের বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ১১ বৎসর বয়সেই ভিন্ন ভিন্ন কারিগরী বিদ্যালয়ের vocational training-এর জন্য ভর্ত্তি করিতে হইবে।

আর সবার উপর দেশময়, সকল শ্রেণীময় একত্বভাব, এক প্রণালী অবলম্বন করিবার অবাধ ইচ্ছা জাগাইতে হইবে, ব্যক্তিগত পরিবারগত, বর্ণগত, ভাষাগত পার্থক্য ত্যাগ করিতে হইবে, যাহাকে বলে standardise your social life। ইংলণ্ডের মত অভিমানী ও ধনী জাতি এই সামাজিক ঐক্য মানিয়া লইয়াছে। আর বাঙ্গালী; তাহাতে অবহেলা করিলে কতদিন বাঁচিবে?*

---

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে কথিত। রেডিও-কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে মুদ্রিত।

চা-বাগানের শ্রমিক জীবনের আর্থিক তথ্য

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

বাংলাদেশে চা-বাগান আছে দার্জ্জিলিং জেলার পাহাড়ে, পাহাড়ের পাদমূলে তরাই অঞ্চলে এবং জলপাইগুড়ি জেলার দুয়ারে (ভূটান দুয়ারে)। এই প্রবন্ধে আমরা এই তিন স্থানের চা-বাগানের শ্রমিকদিগের আর্থিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

চা-বাগানের শ্রমিক আসে সাধারণতঃ মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ হইতে। কিছু কিছু বিহার ও সাঁওতাল পরগণা হইতেও আসে। বাগানের সূচনার সময় ইহারা বাগান তৈয়ারী চা গাছ রোপণ করে। বাগান তৈয়ারী হইয়া গেলে তাহারা বাহিরে গাছের গোড়ায় বেদী তৈয়ারী, আগাছা পরিষ্কার, সার দেওয়া, গাছ ছাঁটা, গাছের পোকা নিবারণের জন্য ঔষধ জল নিক্ষেপ করা, পাতা তোলা, ফ্যাক্টরীর ভিতরে সকল প্রকার কাজ এবং ঘরবাড়ী, পথ-ঘাট নির্ম্মাণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ করিয়া থাকে।

মার্চ্চ হইতে চা তৈরির কাজ সুরু হয়। এপ্রিল মে এই দুই মাসে কাজের তেমন চাপ পড়ে না। জুন হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত কাজের মরসুম। আর নভেম্বরে কাজে ভাঁটা পড়ে। ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কাজ কতকটা কম থাকে।

শ্রমিকদিগের আর্থিক অবস্থা বুঝিবার জন্য প্রথমেই জানা দরকার তাহাদের পরিবারের গঠন, অর্থাৎ প্রতি পরিবারের জনসংখ্যা, উপার্জ্জনক্ষম লোকের ও পোষ্যের সংখ্যা ইত্যাদি।

	দুয়ার	তরাই	দার্জ্জিলিং
প্রতি পরিবারের গড় জনসংখ্যা	৪·৪৩৬	৪·১৪৪	৫·৩১০
এই জনসংখ্যার মধ্যে আছে—			
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	১·২৫১	১·২৫২	১·৩২১
ঐ নারী	১·১৬২	১·২২৩	১·৩১৭
১২ হইতে ১৮ বৎসরবয়স্ক বালক	০·৩২১	০·২০৬	০·৫১৬
ঐ বালিকা	০·৩৬২	০·২৮৮	০·৫০১
১২ বৎসরের কম বয়সের বালক	০·৬৮১	০·৫৭৮	০·৮৮১
ঐ বালিকা	০·৬৫১	০·৫১৭	৩·৭৭৪

প্রতি পরিবারে উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির গড় সংখ্যা দুয়ারে ২·৯২৬, তরাই অঞ্চলে ২·৫৪০, এবং দার্জ্জিলিং এ ২·৯৫০ জন ইহার মধ্যে

	দুয়ার	তরাই	দার্জ্জিলিং
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	১·১৫৩	১·১২২	১·১১০
ঐ নারী	০·৯৪৬	০·৯৭৪	০·৯৭৫
১২ হইতে ১৮ বৎসরবয়স্ক পুরুষ	০·২৭৮	০·১৫৮	০·৩৯৭
ঐ নারী	০·৩০৭	০·২৫২	০·৪২৫
১২ বৎসরের কম বয়সের বালক	০·১০৭	০·০১৫	০·০২২
ঐ বালিকা	০·১০৫	০·০১৯	০·০২১

চা-বাগানে ১২ বৎসরের কম বয়সের বালকবালিকাদিগকে এখন বাগানে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। কাজেই ইহাদিগকে পোষ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। বাহিরে গিয়া কাজ করিবার অনুপযুক্ত বৃদ্ধা এবং নারী প্রসবের পূর্ব্বে

ও পরে ঘরে বসিয়া চায়ের ডাঁটা বাছাই করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে। কাজেই চাবাগানের শ্রমিকের পরিবারে উপার্জ্জনহীন পোষ্যের সংখ্যা মধ্যবিত্ত ঘরের কর্ম্মচারীর পোষ্য-সংখ্যার চেয়ে কম। প্রতি পরিবারে উপার্জ্জনহীন পোষ্যের সংখ্যা সর্ব্বত্র একজনেরও কম।

চা-বাগানের শ্রমিক ও অপর কর্ম্মচারীদিগের ন্যূনতম বেতনের হার কি হওয়া উচিত তাহা স্থির করিবার জন্য ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের "মিনিমাম্ ওয়েজেস এক্ট ১১-এর ৫ (১) (এ) ধারানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কমিটি ১৯৫১ সনে নিম্নলিখিত বেতনের হার অনুমোদন করিয়াছেন :—

তরাই ও দুয়ারের চা বাগানে

	হাজিরা	ডবলি	মাগ্‌গিভাতা	মোট
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	।৵০	।৵০	।৵০	১৵০
ঐ নারী	।/০	।/০	।৵০	১/০
কাজের উপযুক্ত শিশু	৵০	৵০	।০	॥৵০

তরাই ও দুয়ারের চা ফ্যাক্টরীতে

	বেতন	মাগ্‌গিভাতা	মোট
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	৸০	।৵০	১৵০
ঐ নারী	॥৵০	।৵০	১/০
কাজের উপযুক্ত শিশু	।৵০	।০	॥৵০

উপরে বাগানের উপার্জ্জনের যে হার দেখান হইল তাহা ৫ হইতে ৮ ঘণ্টা কাজের জন্য। যদি কেহ 'ডবল' কাজ করিতে না চায়, তাহা হইলে সে শুধু 'হাজিরা' ও 'মাগ্‌গিভাতার' জন্য ।/০ আনা মাত্র পাইবে।

দার্জ্জিলিং জেলায় পাহাড়ের বাগানের জন্য পৃথক হার অনুমোদিত হইয়াছে, কারণ তথায় 'ডবলি' কাজ করিবার রেওয়াজ নাই।

দার্জ্জিলিঙের বাগানে

	বেতন	মাগ্‌গিভাতা	মোট
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	॥০	।৵০	৸৵০
ঐ নারী	।৵০	।৵০	৸৵০
কাজের উপযুক্ত শিশু	।০	।০	॥০

দার্জ্জিলিঙের ফ্যাক্টরীতে

	বেতন	মাগ্‌গিভাতা	মোট
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	॥/০	।৵০	১৲
ঐ নারী	॥০	।৵০	৸৵০
কাজের উপযুক্ত শিশু	।/০	।০	॥/০

এখন উপরে লিখিত উপার্জ্জনের হারই দুয়ার, তরাই ও দার্জ্জিলিঙে চলতি হইয়াছে।

ঐ কমিটি অনুমোদন করিয়াছেন যে, দৈনিক ৮ ঘণ্টার, অথবা সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশী কাজের সময় যেন না হয়। সপ্তাহে এক দিন বিনা উপার্জ্জনে ছুটি থাকিবে। কিন্তু ফ্যাক্টরীর বাহিরে বাগানে কি কি পরিমাণ কাজের জন্য উক্ত উপার্জন হইতে পারে তাহার কোনও নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ কোনও কোনও বাগানে দেখিতেছি, কাজের একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের রেওয়াজ আছে। যেমন, চা পাতা তুলিবার সময় ১২ সের পাতা তুলিলেই একজন 'হাজিরা' ও 'মাগ্‌গি ভাতা' পাইবার অধিকারী হয়। তাহার চেয়ে বেশী পাতা তুলিলে অতিরিক্ত পাতার জন্য সের প্রতি দেড় বা দুই পয়সা হারে পাইয়া থাকে। ইহাতে একজন শ্রমিক কম-সে-কম্ দৈনিক ১।/০-১।৵০ উপার্জ্জন করিতে পারে। অবশ্য কাজের এই মাপকাঠি সব বাগানেই যে একই প্রকার তাহা নহে।

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় প্রতি শ্রমিক পরিবারের সাপ্তাহিক আয় কমপক্ষে ১৬৷৷০ টাকা। দার্জ্জিলিং, তরাই ও দুয়ার হিসাবে সামান্য কয়েক আনার পার্থক্য আছে। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া আরও বেশী টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে।

নগদ টাকায় উপার্জ্জন ছাড়া চা-বাগানের কুলী পরিবারের অন্যপ্রকার উপার্জ্জনও আছে। তাহারা বাগান হইতে কম দামে খাদ্যসামগ্রী (চাল, আটা, তেল, গুড় ইত্যাদি) কাপড়, চা, কেরাসিন তৈল, ছাতা, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি পাইয়া থাকে। চিকিৎসা-ব্যয় লাগে না। শিক্ষা-ব্যয়ও কম। বিনা ভাড়ায় বাড়ী, জমি ইত্যাদিও ভোগ করে। গরু, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি রাখিয়াও কিছু কিছু উপার্জ্জন হয়। নারী প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে আট সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভাতা পাইয়া থাকে। কাজেই এই সব দফায় যে খরচ বাঁচে তাহাও উপার্জ্জনের অংশ বলিয়াই গণ্য হইবে। এই আয়ের পরিমাণ প্রতি পরিবারে সাপ্তাহিক প্রায় ৯ টাকা হইতে ১২ টাকা।

হয় কর্ম্মক্ষমতার অভাবে নয় অনুপস্থিতির জন্য প্রায় শতকরা ২৫ জন শ্রমিক ন্যূনতম আয় করিতে পারে না।

শ্রমিক যখন বাগানের কাজে অনুপস্থিত থাকে তখন সে যে অন্যত্র উপার্জ্জন করে তাহা নহে। সে আলস্যে সময় নষ্ট করে। পরিবারের ছয় দিনে যে উপার্জ্জন হয় উহা দ্বারাই সাতদিন চালাইতে হয়।

শ্রমিক পরিবারের সাপ্তাহিক আয়ের হিসাব দেওয়া গেল। এখন প্রতি পরিবারের সাপ্তাহিক ব্যয়ের হিসাব জানিতে পারিলে তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাইবে। প্রতি শ্রমিক পরিবারে সপ্তাহে ব্যয় করে—দুয়ারে প্রায় ১৮৷৷০, তরাইয়ে ২০৲ টাকা,

এবং দার্জ্জিলিঙে ২৫।০ টাকা। দফাওয়ারি ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ :

	ডুয়ার্স	তরাই	দার্জ্জিলিং
খাদ্য	১২·৬৫০ টাকা	১৩·১০৫ টাকা	১৭·১৮৭ টাকা
জ্বালানি কাঠ ও আলো	১·৮০৬ ,,	১·৬০০ ,,	২·৭১৪ ,,
জামা কাপড়	১·২৮৫ ,,	১·৩৪৩ ,,	১·৬১৮ ,,
গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি	০·১৭৩ ,,	০·১৮৪ ,,	০·১১০ ,,
বাড়ীভাড়া	০·৫৪৬ ,,	০·৬৬৪ ,,	০·৩৩৪ ,,
জীবন ধারণের জন্য নহে অথচ অভ্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি	১·০৫৭ ,,	১·২১২ ,,	১·৭২০ ,,
বিবিধ	১·০০২ ,,	১·৩১৭ ,,	১·২৪৯ ,,
মোট	১৮·৫১৯ ,,	২০·৩০৫ ,,	২৫·৮৯২ ,,

এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, ব্যয়ের প্রধান দফা খাদ্য। তাহারা খায় কি? খাদ্যসামগ্রী বাছিয়া দেখিতে পাই উহার মধ্যে আছে চাউল, ভুট্টা, আটা (শুধু দার্জ্জিলিঙে), চিঁড়া মুড়ি ইত্যাদি। ডালের মধ্যে খায় অড়হর, মুগ, মসুর, বুট, কলাই। আর, মাছ, শুকনা মাছ, ভেড়া ও পাঁঠার মাংস, শূকর ইত্যাদির মাংস, সরিষার তৈল, ঘি, মাখন যতটুকু ব্যবহার হয় তাহা দার্জ্জিলিং পাহাড়েই। খাদ্যের মধ্যে আরও পাই দুধ, দই, গুড়, চিনি। এই সব খাদ্যের মধ্যে ভাত ও ডালের পরিমাণই বেশী। অন্যান্য উপকরণ সামান্যমাত্র। কাজেই খাদ্য যে যথেষ্ট পুষ্টিকর হয় তাহা নহে। আদর্শ পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেও উহা অভ্যাসে আনিতে সময় লাগিবে।

পানীয়-তালিকার মধ্যে একটি জিনিস আছে তাহা 'হাড়িয়া' (দেশী মদ)। শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সামান্য পরিমাণ 'হাড়িয়া'র প্রয়োজন। কিন্তু সেই পরিমাণেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে না। অতিরিক্ত খাইয়া হয় মাতাল হয়, নয় কাজ কামাই করে। তাহাতে উপার্জ্জন কমিয়া যায়, কিন্তু ব্যয় ঠিক থাকে। ১৯৪৮ সনে বাংলার চা-বাগানের শ্রমিকদিগের উপার্জ্জন ৶১০ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার ফলে সেই পয়সায় 'হাড়িয়া' খাওয়াই বাড়িয়াছিল, অন্যবিধ স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত উহা ব্যয় হয় নাই।

ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুযায়ী চা-বাগানের শ্রমিকদিগের বাসের জন্য ঘরের উন্নতি শুরু হইয়াছে। পূর্ব্বেকার আবাসস্থলেরচেয়ে নূতন ঘর বাড়ী নিশ্চয়ই ভাল হইয়াছে। কিন্তু শ্রমিকেরা ঘরের পাকা মেঝে পছন্দ করে না, কারণ তাহাদের মাটির বাসনকোসন সহজে ভাঙিয়া যায়। শ্রমিক-জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে গেলে শ্রমিকের জীবনধারা, রুচি ও মতামত সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানা দরকার। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রুচি ও আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ব্যবস্থা করিলে কার্য্যতঃ বহুবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু নানা কারণে চা-বাগানের শ্রমিকের সামাজিক জীবনে পরিবর্ত্তনও আসিয়াছে। ব্যসনের জন্য ব্যয় বাড়িতেছে। বাড়তি আয় কি উপায়ে খরচ করিলে নিজেদের কল্যাণ হয় তাহা তাহারা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ছোটখাটো অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরের ঘরের অল্প-মূল্যের দ্রব্যাদিও ইহারা চুরি করে। অপরকে ঠকাইবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। এককালে যাহারা মিথ্যা কথা বলিত না আজ তাহারাই অযথা মিথ্যা বলিতে ইতস্ততঃ করে না।

স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে; কিন্তু স্ত্রী এখনও স্বামীকে প্রহার করিতে ইতস্ততঃ করে। নারী এখনও পুরণো আদর্শের মায়া ছাড়িতে পারে নাই। 'হাড়িয়া' খাওয়া যে লজ্জাজনক তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে এই জ্ঞান কিছু কিছু জাগিয়াছে।

পরস্ত্রী বা কন্যা হরণ, এবং লাম্পট্য সমাজে নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পঞ্চায়েতের বিচারে পূর্ব্বের মত কঠোর শাস্তির বিধান হয় না। জারজ সন্তান সমাজে নিন্দনীয় ছিল, এখনও আছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে সেও অলক্ষ্যে সমাজে স্থান করিয়া বসে।

চা-বাগানের শ্রমিকদিগের স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির জন্য প্রতি-বাগানেরই খরচ বাড়িয়াছে। যদি চায়ের বাজার পড়িয়া যায়, বা বাংলরে চায়ের দাম কোন কারণে কমিয়া যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে শ্রমিকের স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি বজায় থাকিবে কি না তাহাও বিচার করা দরকার। যে ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারিবে তাহাই বাঞ্ছনীয়।

ডুয়ার্সে চায়ের উৎপাদন-ব্যয় ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৭ সালে বাড়িয়াছে পাউণ্ড প্রতি ।৫ পাই। আর, প্রতি পাউণ্ড চা বিক্রয় করিয়া ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৭-এ বেশী পাওয়া গিয়াছে ।৶১ পাই। কাজেই ১৯৪৭ সালে চা এর দাম বাড়িলেও সেই অনুপাতে মুনাফা বাড়ে নাই। ছোট বাগানে লাভ আরও কম হইয়াছে।

তরাই ও দার্জ্জিলিঙের চায়ের বেলায়ও প্রায় এই অনুপাত রক্ষিত হইয়াছে।

লণ্ডনের চায়ের নীলাম-বাজার পুনরায় খুলিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট যে একটা নির্দিষ্ট দরে সব চা ক্রয় করিতেন

তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার চায়ের আবাদ যুদ্ধের পর আবার পুরাদমে সুরু হইয়াছে। প্রতি বৎসরই উৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বআফ্রিকার চায়ের উৎপাদনও বাড়িতেছে। ভবিষ্যতে এই সব দেশের সহিত টক্কর দিয়া বাংলার চায়ের কাটতি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেও পারে। এই অবস্থায় বাংলার চা-বাগানে চা উৎপাদনের খরচ যদি কমানো না যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বাংলার চা-বাগানের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির মূল উৎপাটন দুই ই হইতে পারে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের অগ্রগতির ব্যবস্থা হওয়া উচিত।*

* The Indian Tea Planters Association কর্ত্তৃক প্রকাশিত "*Reports of Minimum Wages (Tea Plantation) Committees, West Bengal, Behar*" হইতে তথ্য সম্পর্কিত সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

চা-বাগানের অভিজ্ঞ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।—লেখক

নিশীথে

শ্রীনির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যার সমাপ্তি-লগ্ন আরতিল সূর্য্য অস্ত গেলে,
মহোচ্চ তাম্রাভ নভ বিক্ষেপিল রৌদ্র-স্বর্ণকণা ;—
সুরম্য প্রাসাদরাজি রক্তস্নাত তুলি' লক্ষ ফণা
অস্তোন্মুখ আভা লয়ে চাহে এবে দীপ্ত নেত্র মেলে।

অন্ধকার দিশা মাঝে বিস্তৃত বিপুল পক্ষ লয়ে,
বিশাল পৃথ্বীরে ঢাকি' প্রান্তে প্রান্তে আপনা হারায়।
বিমূর্চ্ছিত বসুন্ধরা ঘনীভূত শোণিত-ধারায়।
গুমরি' গুমরি' কাঁদে মত্ত বায়ু লক্ষ্যহারা হয়ে।

চারিপাশে তমোরাজি ; দিশাহীন রক্তাক্ত আঁধার।
মৌন বিশ্ব অধোমুখে কাঁপিতেছে নিশ্বসি' নিশ্বসি',
ঊর্দ্ধমুখী ঘোরা রাত্রি মন্ত্র জপে রুদ্র নভে বসি',
লোহিত-অম্বুধি ঘিরি' ঢেউ উঠে বিরাট বাধার।

সারা ধরা কম্পমান, জর্জ্জরিত গূঢ়-অবসাদে,
দূরে-বিস্তৃত দৃষ্টি হয়ে আসে নিস্তেজ স্তিমিত ;
দূরাগত তারকার ম্লান দীপ্তি হতেছে দীপিত।
অসীমের মরীচিকা প্রসারিত তীব্র পিপাসার।

ধূলিময় দিগন্তের প্রান্তদেশে আচ্ছন্ন কানন
দীর্ঘরাজি যাপিতেছে মৃত্যুভয়ে মলিন পাণ্ডুর।
চতুর্দ্দিক বিমলিন, হত্যার গরলে পরিপূর।—
পৃথ্বী দেখে' অন্তরে অন্তরের ভয়াল স্বপন।

ওগো ঘোরা রাত্রি।—এই লোলজিহ্বা লকলক করি'
লেহন করিছ তুমি অন্তহীন বিপুল নিখিল।
হিংস্র-দংষ্ট্রারাজি বুঝি জিঘাংসায় হতেছে কুটিল,
ওষ্ঠাধর বাহি' তব লালারাশি পড়িতেছে ঝরি'।

রুধির-নিষিক্ত দেহ আত্মহারা আকণ্ঠ-মগন।
ক্রোড়ে শিশু-বিশ্ব পিয়ে রক্তধারা পীযূষের প্রায়,
আরক্ত বিকট নেত্র মেলি' সহো তুলে বক্ষে তায়,
নির্ম্মম-মর্দ্দনে সে যে আর্ত্তরবে ক্রন্দিবে ভীষণ।

নখরে বিদীর্ণ করি' শিশুবক্ষ, দুই হাতে চিরি'
ছিন্নভিন্ন হৃৎপিণ্ড—উন্মত্ত উল্লাসে ওঠো হাসি'।
তব চক্ষে উঠে ভাসি' নরকের ক্লেদ-পাপরাশি।
সে-পাপের উগ্র মদ্য পান করি' শূন্যে যাও ফিরি'।

হে ঘোরা রজনী। ওগো, তাকি তোমা' শান্তি বিবর্জ্জিতে,
এস হেথা। কর্ণে মম শোনাও সে কবিতা নূতন।
চিত্ত ভরি' দেখি তব রূপরাজি বিকট-ভীষণ।
রূপমুগ্ধ আসিয়াছি তব পাশে অকুণ্ঠিত চিতে।

পাপার্ত্ত পৃথিবী মাঝে জাগিয়াছে বিস্মৃতির সাধ,
তাই আজি দাঁড়ায়েছি তব পার্শ্বে অস্থির সঘনে,
এস, ওগো এস। লহো গ্রাসি' মোরে তৃষাযুক্তা হয়ে।
তোমা' তরে ওগো রাত্রি। হের, করিতেছি আর্ত্তনাদ।

এই দেহ হবে চূর্ণ। আস্বাদিব আনন্দ বিকট।
বিষাক্ত-আহ্লাদে যদি' পান তব অন্তরের দ্যুতি ?
রক্তাপ্লুত মর্ম্মে মম লঘু করে করিছ আহুতি।—
তোমার গরলে যাব তমোরাসে নরক-নিকট।

ওগো মম সহচরী। হে ঘোরা রজনী। কহো কথা।
তোমার সাফল্য ভেবে নিঃশেষে আমারে লয়ে গ্রাসি',
অধর-শোণিতে সিক্ত করি' মহাবেগে ওঠো হাসি'।
রক্তাক্ত-দেহের স্তূপে লাভ করি চির-নিস্তব্ধতা।

চিত্রা

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

বেশী দিনের কথা নয়; আমরা তখন গভীর 'শুক্‌না' জঙ্গলের মধ্যে রেললাইন পাতিবার জরিপের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। এক দিকে শিলিগুড়ি-দার্জ্জিলিং রাস্তা ও অন্য দিকে শিলিগুড়ি-কালিম্পং রাস্তা, ইহাদের মধ্যে যে বিশাল ও রহস্যময় বনভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে উহারই নাম 'শুক্‌না'। ঋজুদেহ ঘনসন্নিবিষ্ট শাল, বৃহৎ পত্রাচ্ছাদিত 'পানিশাস', লতা-বেষ্টিত 'লাম্পাতি', দীর্ঘকায় 'গামহরি' ও অন্যান্য বৃক্ষ, অশেষবিধ তৃণলতা ও গুল্ম, মহানদী, গুলমা চকলং সেভোক্‌ প্রভৃতি পার্ব্বত্য নদী, বিচিত্র আলোক-অন্ধকারের খেলা, শুক্‌নাকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, চিতা, শম্বর, বাইসন, বন্য বরাহ প্রভৃতি পশু এই বিরাট বনভূমিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। শুক্‌না ঋতুতে ঋতুতে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তরাই বর্ষার অবিরাম বারি-বর্ষণে বৃক্ষলতাগুল্ম সজীব হইয়া উঠে; পার্ব্বত্য নদীগুলি ক্ষুদ্র-বৃহৎ উপলখণ্ডে আহত ব্যাহত হইয়া গর্জ্জিয়া ছোটে; সমগ্র বনভূমি ক্লেদাক্ত আর্দ্রবাষ্পে বিষাক্ত হইয়া বনের পশু ও অসতর্ক পথিককে কণ্ঠরোধ করিয়া মারিতে চায়। আকাশে জল, বৃক্ষপত্রে জল, নদীতে জল, বনমৃত্তিকাতে জল। বর্ষাশেষে মাটি শুকাইয়া যায়, বৃক্ষতৃণলতা মঞ্জরিত ও পুষ্পিত হয়, বনমল্লিকার লঘুশুভ্র গন্ধ অরণ্যচারী পশু ও মানুষের ক্লান্তি অপহরণ করে; পরিষ্কার-পরিস্রুত নদী-জলধারা তাহাদের তৃষ্ণা দূর করে। রৌদ্রতাপ বাড়িতে থাকে; আকাশে, বনে, বৃক্ষে, বায়ুতে দাহ লাগে, নদীর জল শুকাইয়া যায়, 'শুক্‌না'—শুষ্ক, ধীরে ধীরে আপন মূর্ত্তি ধারণ করে। আকাশে জল নাই, নদীতে জল নাই, মাটির নীচে জল নাই, আট নয় মাইলের মধ্যে জল নাই। অসতর্ক অসাবধানী পথিক জল না লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলে রাক্ষসী শুক্‌নার তীব্র শোষণে মৃত্যু বরণ করে।

মহানদীর তীরে তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছিলাম। সমস্ত দিন গভীর জঙ্গলের উচ্চাবচ ভূমির উপর দিয়া একটা লাইন আবিষ্কারের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছি। অনেক গাছ কাটিয়া, কণ্টকবহুল লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র বহন করিয়া যেমনই কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি তখনই হয় উচ্চ ভূমি, গভীর গর্ত্ত কিংবা বিসর্পিল পার্ব্বত্য নদী গতি-রোধ করিয়াছে। সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরিতে মন ও দেহ দুই-ই কিছু অবসন্ন হইল। জরিপের সার্থকতা ও কৃত-কার্য্যতা পুনঃপুনঃ চেষ্টা ও অমানুষিক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। আজ না হয় দুই দিন পরে একটা ভাল লাইন নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হইবে। যথারীতি খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

তখন মাঘ মাসের শেষাশেষি, 'শুক্‌না' জঙ্গলে প্রচণ্ড শীত। বিশেষতঃ, দুই তীরে ঘনসন্নিবিষ্ট শালবনের মধ্যে মহানদীর যে উপলময় শুষ্ক উন্মুক্ত খাত পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা বাহিয়া যখন উত্তরের অনতিদূরবর্ত্তী হিমালয় হইতে হিমবায়ু আসিতে থাকে তখন শীত দুই পর্দ্দা তাঁবু, লেপ ইত্যাদি ভেদ করিয়া অস্থি মজ্জা জমাইয়া ফেলিতে চায়। শেষরাত্রিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল, অসময়ে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং কুল কুল শব্দে মহানদীতে ক্ষীণ জল-ধারা চলিতেছে। শীত এত দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল যে, খালাসিদের আগুন জ্বালাইতে বলিলাম। বৃষ্টিতে বনজঙ্গল ভিজিয়া গিয়াছিল, কিন্তু খালাসিদের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

যে মুহূর্ত্তে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা বনভূমির কিয়দংশ আলোকিত করিয়াছে ঠিক সেই সময়েই কিছু দূরবর্ত্তী এক খালাসির তাঁবু হইতে চীৎকার শোনা গেল—"শের হ্যায়, শের হ্যায়"। একটা চিতাবাঘিনী ও তাহার অতি ক্ষুদ্র বাচ্চা বহুদিন পরে শুষ্ক মহানদীতে জলধারার সন্ধান পাইয়া, বোধ হয়, তৃষ্ণা নিবারণ করিতে আসিয়াছিল। আগুনের আলোকে ও মানুষের চীৎকারে বাঘিনী ছুটিয়া পলাইল, বাচ্চাটি পড়িয়া রহিল। খালাসি ও বাবুরা বাচ্চাটিকে ঘেরিয়া ফেলিল। অতি ক্ষুদ্র ও অনাহারে শীর্ণ একটি চিতাশাবক, তাহাকে ধরিতে বেশী সময় লাগিল না। ক্রমে অন্ধকার দূর হইয়া রাত্রি প্রভাত হইল এবং শাবকটিকে আমার তাঁবুতে আনিয়া উপস্থিত করা হইল।

মনুষ্যশিশু পালন করিবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু জরিপের কাজের মধ্যে পনের দিনের এক ফুট লম্বা চিতাশিশু প্রতিপালনের ভার আমার উপর পড়িল। শাবকটি অতিশয় রুগ্ন; চক্ষু দুটি অত্যুজ্জ্বল হইলেও পিচুটিতে ভরা; গায়ে দুই-চারিটি কীট ও অনেকটা দুর্গন্ধ। ছোট ছোট দাঁত ও ছোট ছোট নখ। প্রথম দিনেই ঈষদুষ্ণ জল ও কার্ব্বলিক সাবান দিয়া তাহাকে স্নান করানো হইল। অনতিদূরবর্ত্তী শহর হইতে সরু চেন ও পাতলা কলার আনিয়া পরানো হইল। ইহার পরে কিছু মহিষের দুধ

একটি বাটিতে রাখিয়া পান করিতে দেওয়া হইল। গন্ধমাত্র গ্রহণ করিয়া সে পানীয় প্রত্যাখ্যান করিল।

কাজকর্ম চুলায় গেল; ক্ষুদ্র চিতাশাবকের আহার, নিদ্রা, স্নান ও স্বাস্থ্য লইয়া চিন্তার অবধি রহিল না। অনেক চেষ্টার পরে সে দুধরুটিতে অভ্যস্ত হইল, কিন্তু শুধু দুধ কিছুতেই সে পান করিতে চাহিত না।

জরিপের কাজ শেষ হইল। অনতিদূরবর্ত্তী শৈলশহরে স্ত্রী, একমাত্র পুত্র ও আড়াই মাসের চিতাশাবক লইয়া আবার ঘর পাতিলাম। শিশুপুত্র প্রায় সমস্ত দিন স্কুলে থাকিত, আর আমি থাকিতাম হয় আপিসে নয় মফস্বলে। স্ত্রীর যত স্নেহ, যত চিন্তা, যত যত্ন চিতাশাবকটির উপর পড়িল। তাহার নামকরণ হইল চিত্রা। বন্যশিশু চিত্রা অল্প কয়েক দিনেই এমন কতকগুলি অভ্যাস আয়ত্ত করিল যাহা বন্য ও মানবীয় প্রবৃত্তির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। ভোরে আমরা যখন চায়ের টেবিলে বসিতাম, তখন নিয়মিত ভাবে সে দুধসংযোগে দুইটি রুটির টুকরা ভক্ষণ করিত। ইহার কিছু পরে তাহার 'প্রকৃতির ডাকে'র প্রয়োজন হইত। অস্পষ্ট ও অস্ফুট শব্দে সে আপনার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিত এবং কখনও ঘর নোংরা করিত না। দ্বিপ্রহরে স্নানপর্ব্ব লইয়া একটা মহামারী ব্যাপার হইত। সপ্তাহে তিন দিন চিত্রাকে সাবান ও 'ডেটল' দিয়া স্নান করানো হইত। স্নান করিতে সে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল, আর তাহার পালয়িত্রী জননী সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতেন পাছে তাহার ঠাণ্ডা লাগে। স্নানের পর কাঁচা ছাগমাংস সে অতি তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করিত। বাস্তবিক পক্ষে নিক্ষিপ্ত ছাগমাংসের উপর চিত্রা যে ভাবে লাফাইয়া পড়িত তাহা দেখিলে মনে হইত সে বনের পশু, ঘরের জীব নয়। রাত্রিতেও সে আমমাংস ভক্ষণ করিত।

আদর-যত্ন ও উপযুক্ত আহারে চিত্রার অঙ্গসৌষ্ঠব বাড়িয়া চলিল। গায়ের গন্ধ দূর হইল, মসৃণ হরিদ্রাবর্ণের উপর কালো টিকাগুলি ঝকমক করিত। চক্ষু দুটি স্ফটিকস্বচ্ছ এবং সর্ব্বোপরি দীর্ঘ লাঙ্গুলের শোভা মনোরম। আমার স্ত্রীর সে অতিশয় ভক্ত হইয়া পড়িল এবং শিশুপুত্রের খেলার সঙ্গী হইল। শাড়ী, জুতা ও হাতব্যাগ লইয়া চিত্রা ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলা করিত; নখ দিয়া কিছু ধরিলে ছাড়ানো অসম্ভব হইত। সময় সময় আমার স্ত্রীর হাত কামড়াইয়া ধরিত। শরীরে কখনও নখও বসাইত না, দাঁতও না।

আমাকে সে দেখিতে পারিত না এবং আমিও তাহাকে একটু সন্দেহের চোখে দেখিতাম। চিত্রার কতকগুলি মনুষ্যোচিত ভাবভঙ্গী দেখিয়া অবাক হইতাম। আমাদের ছেলেটি বুকে হাত দিয়া শুইত, চিত্রাও ঠিক মনুষ্যশিশুর মত চিৎ হইয়া বুকের উপর হাত রাখিয়া শুইত। তাহার বুকের শুভ্র চিক্কণ রোমরাজি ক্রমশঃ হরিদ্রাভ হইয়া পৃষ্ঠের দিকে উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিয়াছে। আমাদের খাবার খাইতে দেখিলে সে বেশ বড় থাবা পাতিয়া খাবার চাহিত।

চিত্রা বড় হইতে লাগিল এবং অনেকেই বলিতে লাগিলেন যে, এখন আর তাহাকে ঘরে রাখা নিরাপদ নহে, আমিও মাঝে মাঝে ভাবিতাম যে চিড়িয়াখানায় পাঠাইয়া দিব। কথাটা উঠিলেই স্ত্রীর চোখে জল আসিত। তিনি শিকল ছাড়িয়া দিতেন, চিত্রা তাঁহার কোলে উঠিয়া মাথা লুকাইয়া বসিয়া থাকিত।

ক্রমে চিত্রার মধ্যে তাহার আদিম প্রবৃত্তি পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তড়িদ্বেগে সে গাছে চড়িত। বাগানে কোন পাখী বসিলে এ গাছের আড়ালে সে-ঝোপের কোণে আত্মগোপন করিয়া সে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইত এবং শেষে একেবারে শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত। শিকল টানিয়া তাহাকে রাখা দুঃসাধ্য হইত। নিজের শক্তি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। ছোট কুকুর ও ছাগল দেখিলে আক্রমণ করিত, কিন্তু ঘোড়া কিংবা গরু দেখিলে ভয় পাইত।

একবার কয়েক দিনের জন্য সস্ত্রীক বাহিরে গিয়াছিলাম। বাড়ীতে ফিরিয়া শুনিলাম চিত্রা শিকল ছিঁড়িয়া প্রতিবেশীর একটা মুরগী ভক্ষণ করিয়াছে এবং আর একটি ছাগলের গলা চিরিয়া হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। রাগে লাঠি দিয়া মারিলাম; সে দৌড়াইয়া স্ত্রীর কোলে আশ্রয় লইল এবং অনুতপ্ত অপরাধীর মত কোঁ কোঁ শব্দ করিতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবেরা পরামর্শ দিলেন চিতা যখন একবার রক্তের স্বাদ পাইয়াছে তখন আর তাহাকে বাড়ীতে রাখা উচিত নয়। যেরূপ দ্রুত গতিতে চিত্রা বাড়িয়া চলিয়াছিল তাহাতে এক এক সময় তাহাকে দেখিয়া ভয় করিত। তাহার রূপ দেখিয়া কিন্তু মুগ্ধ হইতাম। তাহার নাকের ডগায় একটি বড় কালো টিপ; জিহ্বা অমসৃণ হইলেও পরিষ্কার ও লাল; দাঁত উজ্জ্বল সাদা; চক্ষু দুটি যেন স্বচ্ছ কাচের কিন্তু মানুষী মায়ায় ভরা। আর গাত্রচর্ম্ম! এমন মসৃণ এমন উজ্জ্বল আর দেখি নাই। লেজটি মোটা হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। থাবাগুলি শরীর-অনুপাতে বেশ বড়, যখন রাগিত লুকানো নখ বাহির করিয়া গর্জ্জন করিত। সে ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্য অপরূপ!

মায়া বাড়াইয়া লাভ নাই। এক দিন চিত্রাকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। প্রতিদিন সে আমাদের সঙ্গে

রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়াইত, কিন্তু সেদিন সে কিছুতেই ষ্টেশনে যাইবে না। জোর করিয়া টানিতে চেষ্টা করিলাম; সে হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল এবং টানাটানিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল। কোলে করিয়া অতি কষ্টে চিত্রাকে ট্রেনে উঠাইলাম। মনিহারিঘাটে তেমনই কোলে করিয়া ষ্টীমারে তুলিলাম। ষ্টীমারে এঞ্জিনের শব্দে, কৌতূহলী বহু লোকের আলাপ-আলোচনায় সাহসী চিত্রা একেবারে চুপ করিয়া রহিল। যথাসময়ে তাহাকে কাঁচা মাংস দেওয়া হইল। অন্য দিন যে মাংসখণ্ডের উপর লাফাইয়া পড়িত আজ সে তাহা স্পর্শও করিল না। অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাহাকে মাংস বা দুধ কিছুই খাওয়ানো গেল না।

বড় লাইনের গাড়ীর 'ভ্যানবক্সে' চিত্রাকে পুরিয়া দেওয়া হইল; খাঁচার ভিতরে জল ও মাংস দেওয়া গেল। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে দেখা গেল সে খাদ্য বা পানীয় কিছুই স্পর্শ করে নাই, এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া সে যেন কাঁদিতেছে। চেন ধরিয়া তাহাকে প্ল্যাটফরমে নামানো হইল। নির্জ্জন শুক্না জঙ্গলের ক্ষুদ্র শিশু আমাদের ক্ষুদ্র সংসারে পাহাড়ে 'মানুষ' হইয়াছে, বর্দ্ধমান ষ্টেশনের লোকারণ্যে সে বিষম ভয় পাইল, এদিক-সেদিক ছুটিতে চাহিল। হঠাৎ যখন এঞ্জিনটা তীব্র চীৎকার করিল সে একেবারে ছুটিয়া নোংরা হাত-পা লইয়া তাহার মায়ের কোলে উঠিয়া বসিল।

রাত্রিটা শিয়ালদহ ষ্টেশনের বিশ্রামঘরে কাটাইলাম। ভোরে উঠিয়া দেখি টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ যেমন মলিন আমাদের মনও তেমন অপ্রসন্ন। সমস্ত রাত্রি চিত্রাকে খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। অনেকে পরামর্শ দিয়াছিল চিত্রাকে শুক্না জঙ্গলে ছাড়িয়া দিতে। বনের শিশুকে ঘরে আনিয়া কি ভাল করিয়াছি? সে কি আর জঙ্গলে বাস করিতে পারিবে? মানুষের সঙ্গে থাকিয়া সে বনের পশুর সাহস, শিকার ধরিবার কৌশল ভুলিয়াছে। মানুষের ভয় জন্মাইবার আকৃতি চিত্রার হইয়াছে, কিন্তু শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় বনে একাকী বিচরণ করিবার বয়স কি তাহার হইয়াছে?

চিড়িয়াখানা হইতে খাঁচা লইয়া লোক আসিল। চিত্রা কিন্তু কিছুতেই যাইবে না। যতই চেষ্টা হইতে লাগিল ততই সে খাটের নীচে লুকাইতে লাগিল। কখনও বা তাহার মাকে চার পায়ের নখ দিয়া জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। পশুরা কাঁদে কিনা জানি না, কিন্তু চিত্রার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

আবার দূর দেশে ডাক পড়িল; নূতন রেল-লাইন নির্ম্মাণ করিতে হইবে। নিজের পুত্রকে বন্ভেন্টে ও স্ত্রীকে পিত্রালয়ে রাখিয়া তাঁবুতে বাসা বাঁধিলাম।

কলিকাতা গেলে আমাদের অবশ্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে চিড়িয়াখানা অন্যতম। শিশু চিত্রা আজ তরুণী হইয়াছে। বনের মাকে তো সে অতি শৈশবেই হারাইয়াছে। আজ যখন লোহার গরাদ-দেওয়া প্রকাণ্ড খাঁচার বাহিরে তাহার মানুষ মা দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকে, চিত্রা তাঁহাকে চিনিতে পারে না; সে তাঁহার কাছে আসে না। তাহার মায়ের দুই চোখ ভরিয়া জল আসে।

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

ওগো নগ্ন ক্ষপণক, কোথা তুমি এ সঙ্কটকালে?
পশ্চিম সমুদ্রপারে আজো যে গো চিতা বহ্নিমান্।
আজো চলে কুরুক্ষেত্র, না জানি কি আছে বা কপালে,
হিংসুক শ্বাপদ দল ধরিয়াছে মিথ্যা সাম্য গান।

লোভাতুর দানবের রূঢ় অট্টহাসি যায় শোনা।
কাঁদিছে মানব-শিশু, কেঁপে ওঠে দিক চক্রবাল।
তিলে তিলে পলে পলে মরণের দিন হয় গোনা
রক্ত-রাঙা পৃথ্বীবুকে জেগে উঠে করোটি, কঙ্কাল।

দণ্ডধারী হে তাপস, নেমে এসো তেজঃমূর্ত্তি লয়ে,
আরবার গাহ তব অহিংসার সঞ্জীবনী গীতা।
দুঃশাসনে তুচ্ছ করি ক্লিষ্টা নারী ঘুমাক অভয়ে
প্রেম-মৈত্রী মন্ত্র শুনি রণচণ্ডী হউক মূর্চ্ছিতা।

পরম আশ্বাস লভি বহে যাক জীবন-জাহ্নবী।
অমৃত-বাণীতে তব দুঃখ কষ্ট দূর হোক সবি।

অর্থব্যবস্থা ও মনোব্যবস্থা

ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম-এ, পিএইচ-ডি

আজকাল এক সম্প্রদায়ের লোক প্রায় অন্ধভাবেই এই কথায় বিশ্বাসী যে, আমাদের সমাজব্যবস্থা আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরেই গড়িয়া উঠে। তাঁহারা শুধু সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা দেখিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, তাঁহারা আমাদের মনোব্যবস্থার ভিত্তিতেও দেখিয়াছেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই একাধিপত্য না হইলেও প্রধান আধিপত্য। তাঁহারা বলিবেন, সমাজের সূক্ষ্ম সুকুমার সম্বন্ধগু'লই যে শুধু মানুষের আর্থিক ব্যবস্থার উপরে গড়িয়া উঠে তাহা নহে, আমাদের মনের সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তিগুলিও অনেকাংশে এই আর্থিক ব্যবস্থার প্রভাবে গঠিত হয়। আর এক সম্প্রদায় আবার এই মতটির সম্পূর্ণ বিরোধী; শুধু বিরোধী বলিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেই চলে না, তাঁহাদের বিশ্বাস এই মতবাদটির ছিদ্র রন্ধ্রকে অবলম্বন করিয়াই বর্তমান মানুষের জীবনে দুরন্ত 'কলি'র প্রবেশ ঘটিয়াছে এবং মানুষের সকল প্রকারের মহৎ মূল্যবোধকে সে তছনছ করিয়া দিয়াছে। আর এক দল আছেন, যাঁহারা নৈষ্ঠিক ভাবে কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, 'ঘরেও নহে, পরেও নহে, যে-জন আছে মাঝখানে'—অনেকটা এই দলের। আমরা মোটামুটিভাবে নিজেদের এই শেষোক্ত দলের অনুগামী বলিয়াই অনুভব করিতেছি। অর্থাৎ মানুষের মনের সর্বপ্রকারের স্থূল সূক্ষ্ম বৃত্তির এবং মূল্যবোধের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ মানুষের উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং তজ্জনিত আর্থিক বণ্টন ব্যবস্থার উপরেই একান্ত ভাবে নির্ভরশীল এমনতর কথাকে স্বীকার করিয়া লইতে মন রাজী না হইলেও আমাদের মনোবৃত্তি ও বিবিধ মূল্যবোধের বিবর্তনে যে আর্থিক ব্যবস্থারও একটা বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে সে কথাকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

এ সকল বিষয়ে নিছক তর্কে তেমন লাভ হয় না, ইতিহাসের সাক্ষ্যই এ সব ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক। আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনের কিছু কিছু অংশ বিশ্লেষণ করিয়াই সত্য নির্ণয় করার চেষ্টা করা যাক।

কয়েক দিন আগে একজন বন্ধু রসিকতা করিয়া বলিতেছিলেন—'আমরা কলিকাতার লেক-অঞ্চলের লোক হওয়াতে আমাদের কতকগুলি সুবিধা আছে; নাটক দেখিতে আমাদিগকে সব সময় বাগবাজার বা শ্যামবাজারের দিকে দৌড়াইতে হয় না, সন্ধ্যায়-সকালে আমরা অনেক জীবন্ত নাটক বিনা পয়সাতেই অভিনীত হইতে দেখিতে পাই।'

কথাটা শুনিয়া সহজ ভাবেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। আমার জিজ্ঞাসা-বৃত্তি অপেক্ষা তাঁহার বিবক্ষা-বৃত্তি কিছুমাত্রায় অপ্রচুর ছিল না; সুতরাং নাট্যাভিনয়ের একটি সবিস্তার এবং সরস বর্ণনা পাইলাম। যাহা শুনিলাম তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে এই :

এক দিন সন্ধ্যায় তিনি বালিগঞ্জের ঢাকুরিয়া লেকের পারে বসিয়া আছেন। লেক আস্তে আস্তে নির্জন হইয়া উঠিয়াছে, সন্ধ্যার অন্ধকারও ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে, এমন সময় দেখা গেল, একটি যুবক এবং যুবতী ধীরপদবিক্ষেপে আসিয়া অদূরস্থ একটি আসনে উপবেশন করিল। তাহারা অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল; অদূর হইতে তাহাদের কথাবার্তা কিছু কিছু শোনা যাইতেছিল।

এরূপ স্থানে এই সময়ে ঈদৃশ যুবক-যুবতীর মনোভাব অনেক সময়ে অকথিত ভাবেই ব্যক্ত থাকে। প্রারম্ভিক কথাবার্তায়ই যাহা বোঝা গেল, তাহাতে আশ্বস্ত হইবার প্রচুর কারণ ছিল; ব্যাপারটি স্রেফ রোমান্স নহে, তাহারা পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে কৃতসঙ্কল্প। লেকের পারে বসিয়া তাহারা অদূর ভবিষ্যতের বিবাহিত জীবনেরই ব্যবস্থাদি সম্বন্ধেই একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতেছিল। প্রথম কথাই হইল বাসাবাড়ী লইয়া। ছেলেটি একটি মেসে থাকে, চাকুরি করে; বিবাহের পূর্বেই বাসা করা দরকার; কি রকম বাসা করা উচিত হইবে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা আরম্ভ হইল।

অনাস্বাদিতপূর্ব দাম্পত্য-জীবনের প্রথম রঙীন কল্পনা; সুতরাং উভয়তঃই উৎসাহের আবেগ। নিজেদের অজ্ঞাতেই তাহাদের কণ্ঠস্বর একটু একটু করিয়া উচ্চগ্রামে উঠিতেছে। কিন্তু তাহারা আশ্চর্যভাবে রিয়ালিষ্ট। প্রসঙ্গটি উঠিতেই মেয়েটি গার্হস্থ্য জীবনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মেয়েদের অভিজ্ঞতা-প্রাচুর্য এবং সহজাত বুদ্ধির দাবি লইয়া বলিয়া উঠিল, 'ভাড়া করিতে হইবে একটি ছোট্ট ফ্ল্যাট বাড়ী, সেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে সব দিক হইতেই, অথচ তাহাতে একটি রান্নাঘর এবং ছোট্ট দুইটি চমৎকার আলো-হাওয়াযুক্ত ঘর ছাড়া আর স্থান-বাহুল্য থাকিতে পারিবে না।' ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, 'দুইটি ঘরে চলিবে কি করিয়া?' মেয়েটি

বলিল, 'কেন, একটি হইবে আমাদের শোবার ঘর, আর একটি হইবে আমাদের বসিবার ঘর।' ছেলেটি বলিল, 'তা হয় কি করিয়া, মা থাকিবেন কোথায়?' মেয়েটি যেন একটু বিস্মিত এবং বিরক্ত হইয়া বলিল, 'মা? কেন, তুমি কি আরম্ভেই এই সব ঝঞ্ঝাট দিয়া ঘর বোঝাই করিতে চাও? তা কিন্তু হইবে না বলিয়া দিতেছি।' ছেলেটি বলিল, 'সে তোমার কি রকম কথা? আমি বিবাহ করিয়া বাসাবাড়ী করিব, মায়ের সেখানে স্থান হইবে না?' মেয়েটি এবারে একটু যেন চটিয়াই গেল; সে ভ্রূ কুঁচকাইল কিনা অন্ধকারে দেখা গেল না বটে, কিন্তু তাহার কণ্ঠে ছিল তাহার আভাস। সে বলিল, 'কেন, তুমি ত এখন মেসে আছ, তোমার মা এখন কোথায় থাকেন?' ছেলেটির কণ্ঠে কেমন একটা শুষ্ক গাম্ভীর্য দেখা দিল; সে বলিল, 'মা এখন থাকেন দাদাদের কাছে।' মেয়েটি বলিল, 'তবে আর দু'চার বছর তাঁহাদের কাছেই থাকিলে দোষ কি?' ছেলেটি উদাসীন ভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'সেখানে তাঁহার ভাল যত্ন হইতেছে না।' মেয়েটি বলিল, 'কেন, সেখানে তোমার বৌদিরা নাই?' ছেলেটি কেমন চুপ করিয়া গেল, খানিকক্ষণ পরে সে বলিল, 'বৌদিরা আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মায়ের তেমন যত্ন করেন না।' মেয়েটি একটু কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'তাহারা কেহ যত্ন করিতে পারিবে না, আমিই বা তবে প্রথমাবধি তাঁহার সব ভার লইতে যাইব কেন?' ছেলেটি বলিল, 'আমার বিবাহের পরে আমার সঙ্গেই থাকিবেন, অনেক দিন ধরিয়া মায়ের এই রকমই ইচ্ছা।' মেয়েটি দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, 'ও সব ইচ্ছা রাখিয়া দাও; প্রথম হইতেই এমন করিয়া ঘর বোঝাই করিতে হইলে তুমি অন্য 'লক্ষ্মী বউ' খুঁজিয়া লও, আমাকে দিয়া তাহা হইবে না। তোমার মা আসিলেই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া দিনে-রাত্রে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের রীতিমত ভিড় জমিয়া যাইবে, এত সব ঝামেলার মধ্যে আমি নাই।' বলিয়া মেয়েটি একটু মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া লেকের ওপারের দিকে চাহিয়া রহিল, ছেলেটির মুখেও আর কথা ফুটিল না। দাম্পত্য-জীবনের সিদ্ধান্তের প্রথম আলোচ্য বিষয়টিই যে এমন করিয়া তিক্ততা সৃষ্টি করিবে ইহার জন্য কোন পক্ষই প্রস্তুত ছিল না। কে জানিত লেকের পারের নির্জন সন্ধ্যার আবছায়া প্রদোষালোকের এমন স্বপ্নাবেশের ভিতরে তাহাদের নবীন প্রেম-নীড়ের বিচিত্র কল্পনা এমন করিয়া অকস্মাৎ উবিয়া যাইবে! কিন্তু যাহা হইবার ছিল না তাহাই হইল; যুবক-যুবতী-দ্বয়ের প্রেম-নাট্যের সেইখানেই সত্য সত্য একেবারে যবনিকা-পাত হইল কিনা তাহা বলা যায় না; কিন্তু দেখা গেল, তাহারা উপরি-উক্ত আলোচনার পর প্রায় দুই দিকে মুখ ফিরাইয়াই কতক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল এবং তাহার পর আবার আস্তে আস্তে আসন ছাড়িয়া নীরবেই একদিকে চলিয়া গেল।

গল্পটি বলিয়া আমার বন্ধুটি যে মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিক তাহাই সংক্ষেপে করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমাদের দেশের মেয়েদের এই সব 'হায় কি হইল!' কথাটি এই জাতীয় একটা সাক্ষেপ উক্তির মধ্যে ফুরাইয়া ফেলিতে পারিলেই এ সম্বন্ধে আবার এতগুলি কথা লিখিবার কোনও তাগিদ আসিত না। কথাটি গভীর ভাবে মনকে নাড়া দিয়াছিল বলিয়াই একটু আত্মবিশ্লেষণ এবং আনুষঙ্গিক ভাবনাও দেখা দিয়াছে।

উপরে একটি আধুনিকা যুবতীর যে মনোভাবের পরিচয় পাইলাম তাহাকে যদি একটি বিশেষ যুবতীর একটি বিশেষ মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি মাত্র বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিতাম তবে আর ভাবিবার মত কোনও সমস্যা দেখা দিত না; কিন্তু পারিপার্শ্বিক জীবন সম্বন্ধে একটু সচেতন হইবার চেষ্টা করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, ইহা একটি বিশেষ যুবতীর বিশিষ্ট মনোভাবেরই পরিচয় বহন করে না, শুধুমাত্র আধুনিকা যুবতীগণের মনোবৃত্তির পরিচয়ও প্রদান করে না; ইহা যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেরই সামাজিক মনের প্রবণতার দ্যোতক। সুতরাং ইহাকে আধুনিক যুগের বিকার বলিয়াই ধিক্কার দিই, আর ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়াই তারিফ করি, মোটামুটি একথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বর্তমান যুগে আমাদের সামাজিক জীবনে ইহা একটি বিশেষ সত্যরূপেই দেখা দিয়াছে।

আমরা আমাদের দেশ-গাঁয়ের পূর্বেকার সমাজ-জীবন সম্বন্ধে যাহা জানি তাহাতে মনে হয়, তখন বিবাহ অর্থই ছিল চারিদিক হইতে কেবল ঝামেলা বৃদ্ধি। ইহা বিবাহেচ্ছু যুবক-যুবতীও জানিত, কিন্তু তাহাতেই ছিল আনন্দ। বিবাহের পূর্বে পাত্রী যদি জানিত যে, তাহার যে বাড়ীতে বিবাহ হইবে সে বাড়ীতে কোনও রকমে ঠাসাঠাসি করিয়া থাকিবার মত মাত্র দুইখানি ঘর আছে, সেখানে শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, দেবর নাই, ভাসুর নাই, ননদ নাই, জা নাই, তবে সে মনে মনে খুব খুশী হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। ছেলেমেয়ের বিবাহ দিতে যাইয়াও দেখা গিয়াছে মা-বাপ বড়ঘর খুঁজিয়াছেন এবং বড়ঘরের লক্ষণই ছিল শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর-ভাসুর, ননদ-জা, আত্মীয়-স্বজন, ইত্যাদিতে সংসার চারিদিক হইতে ভরপুর। কিন্তু এখন যে এই দুইখানি মাত্র

'খোপে'র মধ্যে জীবনযাপনের মনোবৃত্তি তাহা যে কেবল আধুনিককালের যুবক-যুবতীগণের মধ্যেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, প্রাচীনপন্থী পিতামাতা, অভিভাবকগণও পর্য্যন্ত এ যুগে মেয়ের বিবাহ দিতে হইলে খোঁজেন এমন বর যাহার পোষ্য-পরিজন এবং অন্যান্য সাংসারিক দায়িত্ব অতি অল্প। আগে যেমন কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া মা, ঠাকুরমা, পিসিমা প্রভৃতিকে পাড়ায় গল্প করিতে দেখিতাম, যেখানে সম্বন্ধ করা গিয়াছে তাহাদের বাহির-বাড়ী ভিতর-বাড়ীতে কত ঘর-দরজা, কত পোষ্য-পরিজন, আত্মীয়-কুটুম্ব, অতিথি-অভ্যাগত—কত ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব-অনুষ্ঠান, পাল-পার্বণ! এখন আবার মা-ঠাকুরমাকে তেমনিধারা খুশী হইয়া বলিতে শুনি, ছেলেটি ভালই পাওয়া গিয়াছে, লেখাপড়া তেমন না জানিলেও চাকুরে ছেলে, বাপ নাই, মা থাকেন অন্য ভায়েদের সঙ্গে, একটি বোন তাহারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ভাইদের মধ্যে একজন বড়, সেও চাকুরি করে—ছোটটিও চাকুরি করে। ছেলে বিবাহ করিয়াই মেয়েকে লইয়া কর্মস্থলে গিয়া বাসা করিয়া থাকিবে, সুতরাং সব দিক বিচার করিয়া মেয়ের কপালই বলিতে হইবে!

আমি আলোচনাটা এতক্ষণ বিবাহকে অবলম্বন করিয়া করিতেছি বটে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা নিছক বিবাহ-সম্পর্কেই নহে, ইহা আমাদের সমাজ-জীবনের বিরাট একটা পরিবর্তনের এবং তৎসঙ্গে আমাদের মনোবৃত্তিরও একটি বৃহৎ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতেছে।

আমরা আমাদের প্রথম জীবনের কথা—অর্থাৎ যখন রীতিমত নাগরিক না হইয়া একান্তভাবে পল্লীবাসী ছিলাম,—সেই সময়ের কথা যখন স্মরণ করি তখন দেখি যে, আমাদের পারিবারিক পরিধির সীমা-রেখাটা যে ঠিক কোথায় ছিল তাহা আমরা তেমন বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। এখন যেমন আমার বাসস্থানের পরিধি—আমার পরিবারের লোকের সংখ্যা, আমাদের মাসিক ও দৈনিক কৃত্যসমূহ এবং তাহার জন্য আর্থিক রসদের পরিমাণ প্রত্যেকটা জিনিসকেই অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া জানি, এমনতর পূর্বে কোনও দিনই জানিতাম না—জানিবার কোনও সম্ভাবনাও ছিল না। আমরা যে খুব বনিয়াদী ধনী-পরিবারের লোক ছিলাম তাহা নহে, নেহাতই 'নেউগী চৌধুরী নাহি না করি, তালুক'—জাতীয় মধ্যবিত্ত ঘরের লোক। কিন্তু আমরা আমাদের পরিবার বলিয়া যে জিনিসটিকে জানিতাম তাহাকে বহু স্তরবিশিষ্ট একটি বিস্তীর্ণ সঙ্ঘ বলিলেই চলে। প্রথম স্তরেই আমরা একসঙ্গে নিত্য দু' বেলা পাত পাড়িতাম চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক, ইহা জ্যেঠা-খুড়া, জ্যেঠতুত-খুড়তুত ভাই এবং তাহাদের পুত্রকন্যার সমষ্টি। দ্বিতীয় স্তরে আমাদের বাড়ীর মানুষ, গ্রামের এবং আশ পাশের আত্মীয়-স্বজন। ইহারাও অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করিয়া এত আসিতেন, থাকিতেন, খাইতেন লইতেন এবং আমরাও অনুরূপ আচরণ এমন করিতাম যে, আমাদের ভিতরকার স্পষ্ট ভেদ-রেখা কাহারও নিকট তেমন অনুভব-গম্য ছিল না। ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব-অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া আবার মাথার উপরে গুরু-পুরোহিত ছিলেন (পুরোহিতের ভিতরেও আবার প্রকারভেদ ছিল, শালগ্রাম শিলার নিত্য পূজার জন্য একটি পুরোহিত-পরিবার, অন্যান্য পারিবারিক পূজানুষ্ঠানের জন্য অন্য পুরোহিত-পরিবার, আবার কালীপূজা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পূজার জন্য বিশেষ বিশেষ পুরোহিত), আর কিছু নিম্নস্তরে ধোপা-নাপিত, নট্ট মালাকর, কাহার-কুমার-ভুঁইমালী প্রভৃতি ত সমস্ত পরিবারটিকে জড়াইয়া ছিলই। আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন দুই ঘর 'রাইয়ত' ছিল, তাহাদের খাজনার পরিমাণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ছিল, তাহাও আইনতঃ দেয় হইলেও কোনও দিন দেওয়া হইত বলিয়া বড় একটা দেখি নাই। কিন্তু এই দুই ঘরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের সঙ্গে আমরা কাজে-কর্মে, আহারে বিহারে, রোগে-শোকে, সুখে-দুঃখে এমন করিয়াই এক হইয়াছিলাম যে, আজ বহু দিনের ছাড়াছাড়ির পরেও তাহাদের কাহাকেও দেখিলে পরম আপনার বলিয়া বোধ করি। ইহা ছাড়া আমাদের বাড়ীতে নিত্য পান দিয়া যাইত যে বারুই সে ছিল আমাদের একান্ত আপনার জন, আমাদের ভূমি চষিত যে চাষী, আমাদের খেজুর গাছ কাটিয়া রস, 'ভিড়' গুড়, পাটালি প্রভৃতি যোগাইত যে 'শিউলী' ইহারা সকলেই ছিল আমাদের আত্মীয়স্বরূপ। মাঝে মাঝে এক মুঠো চালের 'খুদ' বা ডালের 'খুদে'র বিনিময়ে লাউ-কুমড়োর শাক, পাট শাক, কলাই-মটর শাক দিয়া যাইত যে বুড়ী তাহাকেও ত আমাদের পরিবারের সুখ-দুঃখের ভাগী দেখিয়াছি, তাহাকেও ত কখনও একেবারে পর বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। এইরূপেই জাতিধর্মনিরপেক্ষ একটা বৃহৎ বন্ধন গড়িয়া উঠিত।

এই বৃহৎ বন্ধন আবার একটু একটু করিয়া শিথিল হইয়া স্তরে স্তরে ভাঙন ধরাইয়াছে। এখন সেই ভাঙন এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, সহোদর ভাই-ভাইয়েও বেশ ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইতেছে। পূর্বে যে বৃহৎ পারিবারিক বন্ধনের কথা বলিলাম, সেই বন্ধনের মূল শক্তি কোথায়? সে শক্তি অনেকখানিই নিহিত ছিল তৎকালীন

গ্রাম্য আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে। প্রাচীন যৌথপরিবার-প্রথা একটা পুরনো অর্থ-ব্যবস্থার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল; সেই আর্থিক প্রথা—এখন সম্পূর্ণভাবে বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার ফলেই দেখা দিয়াছে সমাজ-ব্যবস্থারও একটা আমূল পরিবর্তন। প্রাচীন গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেখানে 'অর্থ' শব্দের মানে বিশুদ্ধ ভাবে ধাতব মুদ্রা বা কারেন্সি নোট ছিল না; সেখানে অর্থ শব্দে ব্যাপকভাবে মানুষের সাধারণ সম্পদ বুঝাইত। সুতরাং গ্রাম্য আর্থিক ব্যবস্থার সহিত নগদ টাকার সম্পর্ক প্রত্যক্ষভাবে প্রধান ছিল না। মধ্যবিত্তগণের মধ্যে যে সকল বড় বড় যৌথ-পরিবার গড়িয়া উঠিত, তাহাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইত, পরিবারের কিছু যৌথ ভূমি-সম্পদ ছিল। এই যৌথ-সম্পদই ছিল যৌথ-পরিবারের বনিয়াদ-স্বরূপ। এই জাতীয় জমি-জমাতে বৎসরে যে ধান পাওয়া যাইত, মোটা ভাতের সংস্থান প্রায় তাহাতেই হইত। আমাদের পরিবারে দেখিয়াছি, নগদ টাকার অঙ্কটি সর্বদাই নগণ্য ছিল,—কিন্তু খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সচ্ছলতার অভাব আমরা কমই দেখিয়াছি। পাল-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠানাদির দ্বারা খুব ক্রিয়ান্বিত বাড়ী যেগুলি ছিল সে সব স্থলে একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে, এই সকল ক্রিয়া-কর্মের জন্যও অধিকাংশ স্থলেই পৃথক্ ভূসম্পত্তি ছিল। ইহা হইতে যে ধান-চাল পাওয়া যাইত তাহা বিক্রয় করিয়া মুদ্রা-সংগ্রহ করিয়া আমরা কাজ করিতে বেশী দেখি নাই; ধান-চালের এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময় দ্বারাই কাজ চলিতে দেখিয়াছি। যে পুরোহিত তিন দিন উপবাসী থাকিয়া মহা ধূমধামে দুর্গাপূজা করাইতেন তিনি নগদ কিছু পাইতেন শুধু নবমীর দিনে দক্ষিণার সময়ে—তাহাও যৎকিঞ্চিৎ 'কাঞ্চন-মূল্য' 'রজতখণ্ড'—তাম্রখণ্ডেও যে কাজ চলিত না এমন নহে। কিন্তু পূজার পরে দেখিতাম, তিনি নৈবেদ্যের চালে সবশুদ্ধ প্রায় মণখানেক চাল সংগ্রহ করিয়াছেন, সঙ্গে তিন-চারি মণ ধান পাইয়াছেন (তাহার ভিতরে কিছু আবার ফরমাস করা খইয়ের ধান, কিছু মুড়ির ধান, কিছু বা চিঁড়ার ধান), সঙ্গে কয়েক কাঁদি কাঁচকলা, কাঁদি কয়েক পাকা কলা, দুই কুড়ি মান কচু, চার কুড়ি নারিকেল, এক জালা ইক্ষু গুড়, কিছু শশা চালকুমড়া। ইহার বহু জিনিসই ছিল যজমানের বাগানে স্বচ্ছন্দজাত অথবা অনায়াসলব্ধ; সুতরাং যজমানেরও তেমন গায়ে লাগিত না, গুরু-পুরোহিতেরাও সন্তুষ্ট চিত্তে আশীর্বাদ বর্ষণে কার্পণ্য করিতেন না; এবং মোটের উপরে এতদুভয়ের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ যোগও তাই সহজ ভাবেই গড়িয়া উঠিত। কিন্তু আজিকার দিনে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অর্থ শব্দের একমাত্র তাৎপর্য হইয়া উঠিয়াছে মাসান্তে লব্ধ কিছু নগদ টাকা।

আজিকার বাজারদর যাচাই করিয়া পূর্বোক্ত পুরোহিত-দক্ষিণার একটা অঙ্ক ফেলিয়া দেখুন, দেখিবেন নয়নের বিস্ফারিত দৃষ্টি গুরুপুরোহিতকে কতখানি ব্যবধানে সরাইয়া দিয়াছে। ধোপা-নাপিত, নড়-ভুঁইমালী প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেকটা অনুরূপ ব্যবস্থারই প্রচলন ছিল; পুত্র-কন্যার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দোল-দুর্গোৎসব যাহা কিছু অনুষ্ঠান হোক, তাহাদের খাওয়া-দাওয়া ও পাওনা ছিল যখন-তখন; তদুপরি সর্বকার্যেই পাওনা ছিল 'সিধা' অর্থাৎ ধান-চাল, ডাল-তেল, নুন-লঙ্কা এবং আনুষঙ্গিক অনেক প্রকারের ইত্যাদি ইত্যাদি। নগদ পয়সার জন্য দাতাও তেমন দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হইতেন না, গ্রহীতারও নগদ পয়সার লালসা তেমন ভাবে দেখা যায় নাই। আসলে সংসার-যাত্রা নির্বাহের কিছু রসদ জুটিলেই চলিয়া যাইত। আমরা বহুদিন যাবৎ এমন ব্যবস্থাও দেখিয়াছি, দীর্ঘ তিন মাস বসিয়া বাড়ীতে মণ্ডপ-জোড়া দুর্গাপ্রতিমা গড়িয়া দিয়াছে যে কুমার তাহারাও নগদ টাকা কিছুই পাইত না—তিন মাস কাল ধরিয়া পাঁচ-ছয় কিস্তিতে চারি পাঁচ জন লোক প্রতিবারে তিন-চারি দিন পরম সন্তোষ সহকারে আহারাদি করিয়া যাইত এবং পূজার পরে প্রতিমা গড়ার বাবদে কয়েক মণ জমির ধান মাথায় করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইত। বাড়ীতে কোনও পাল-পার্বণ বা ক্রিয়ানুষ্ঠান হইলে গ্রাম্য চৌকিদারেরও কিছু 'ভেটে'র ভাগ ছিল; অল্প কিছু দিন পূর্ব পর্যন্তও আমাদের মুসলমান চৌকিদারের দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা এবং কালী-পূজার চাল-কলার নৈবেদ্য পাওনা ছিল। গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত যিনি মাসিক কোনও বেতন পাইতেন না, বৎসরান্তে কিছু ধান তাঁহার পাওনা হইত। গুরু-মহাশয়কে কোনও কোনও ছাত্রের নিকটে বেতন না পাইয়া অন্য প্রকারে দক্ষিণা লইতে দেখিয়াছি। কোনও গরীব ছাত্র হয়ত বেতন দিয়া পড়িতে পারে নাই,—গুরুমহাশয়ের জীর্ণ খড়ের ঘর সংস্কারের সময়ে নিজের 'ছাড়াভিটা'য় জাত বেত দিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছে। পাল-পার্বণ ও উৎসবাদি উপলক্ষে মাঝি-মাল্লারা চারি-ছ' আনা পয়সায় সানন্দে আট-দশ মাইল পথ পৌঁছাইয়া দিত; ইহা তাহারা পারিত এই জন্য যে, কোনও চুক্তি থাকুক কি না থাকুক, তাহারা যেখান হইতে রওনা হইবে সেখান হইতে এক বেলার 'খোরাক' এবং যেখানে গিয়া পৌঁছিবে সেখান হইতেও এক বেলার 'খোরাক' অনায়াসে আদায় করিয়া লইতে পারিত। এই 'খোরাক' শব্দটি কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা-

সাপেক্ষ; অর্থাৎ ইহার ভিতরে মাথাপ্রতি চাল, ডাল, তরি-তরকারী, মাছ, তেল-নুন, হলুদ-লঙ্কা, এমন কি জ্বালানি কাঠ, রাত্রিতে বাতি জ্বালাইবার কেরোসিন প্রভৃতি সকলই পরিমাণমত দেয় ছিল।

আমাদের পূর্বতন আর্থিক ব্যবস্থার পরিচয় লইতে হইলে এই সকলেরই খুঁটিনাটি সংবাদ রাখিতে হইবে। এখন ভাবিয়া দেখিতেছি, মুদ্রা ব্যবহারের রীতিই তখন পর্যন্ত খুব কম ছিল। একটু বনিয়াদি পরিবারের ইস্তক চণ্ডীপাঠ মায় জুতা সেলাই সব কাজের জন্য প্রায়ই জমি-জায়গীরের ব্যবস্থা ছিল। দেবতা-ব্রাহ্মণের জন্য দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ছিল, ধোপা-নাপিত, নট্ট-ভুঁইমালী প্রভৃতির জন্য 'চাকরাণ' জমি ছিল। সুতরাং পদে পদে নগদ হিসাবের মন-কষাকষি এবং তজ্জনিত অবশ্যম্ভাবী মনোমালিন্যের সম্ভাবনা ছিল না; আর টাকার হিসাব যেখানে যত গৌণ আত্মীয়তার বন্ধন সেখানে তত সহজ এবং দৃঢ়। কিন্তু আজ যে আপনি বাস করিবেন তাহার জন্য রন্ধ্রবিহীন আলমারির তাকের ন্যায় দুইখানি প্রকোষ্ঠ ত জানকবুল করিয়া একরূপ সংগ্রহ করিলেন এবং তাহার পরে চলিতে থাকিল প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে যে নগদ আদানপ্রদান তাহাকে সারা মাস ধরিয়া কত করিয়া ভুলিবার চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারিতেছেন না। প্রতি দিনের কৃত্য রূপে বাজারে একবার না গেলেই নয় এবং সেখান হইতে ফিরিবার সময়টুকুর মধ্যে নগদ মূল্যের আদান-প্রদানে পিত্ত কিছু তপ্ত না হইয়া যাইবে না। ধোপা আপনার কাপড় কাচিবে, তাহার নগদ-মূল্যের নিত্য নূতন রেট, নাপিত আপনার দাড়ি চাঁচিবে, তাহারও নিত্য নূতন কায়দা এবং তদনুরূপ নগদ মূল্যের উঠতি-পড়তি। রেল-ট্রাম-বাস—ইহাদের চালকদের সহিত আপনার কোনও দিন 'খোরাকি'র কোনও সম্বন্ধ থাকিবার কথা নহে; তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রম-বর্ধিত নগদ মুদ্রার আদান-প্রদানে। গুরু-পুরোহিতের বালাই তুলিয়া দিতে চাহিয়াও তুলিয়া দিতে পারিতেছেন না—বিবাহ আছে, শ্রাদ্ধ আছে, অগত্যা কালীক্ষেত্র কালীঘাট পীঠে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া নগদ পঁচিশটি টাকা কোনও পুরোহিতের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং একেবারে একোদ্দিষ্ট পিণ্ডদান হইতে ষোড়শ বৃষোৎসর্গ প্রায় ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই সারিয়া আসিলেন। সর্বত্রই শুধু নগদ মূল্য—আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে কাহার সঙ্গে? প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত আপনার পারিপার্শ্বিক জগৎ আপনাকে শুধু সচেতন করিয়া দিতেছে, নিছক বাঁচিয়া থাকিতে হইলেও নিরন্তর কি নগদ মূল্যের চাহিদা! সংসারটা যেন আর কিছুই নহে, আপনি সারাটি মাস গলদ্‌ঘর্ম হইয়া যে কয়েকটি ধাতব মুদ্রা বা যে কয়খানি কারেন্সি নোট সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই ছিনাইয়া ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার একটা বিরাট ষড়যন্ত্র!

গ্রাম্য আর্থিক ব্যবস্থায় এই সেদিন পর্যন্তও একটা বিনিময়প্রথা বর্তমান ছিল। গরীব যে, নগদ পয়সায় নলেন গুড়ের পাটালি কিনিয়া খাইতে পারে না, সে তাহার ভিটায় জাত 'ছনে'র দু' আঁটির বিনিময়ে কিছু গুড় সংগ্রহ করিতে পারে। দেশ-গাঁয়ে সর্বপ্রকারের শাকের ব্যবসা বাড়ীতে বাড়ীতে চলিত মুখ্যতঃ চালের বা ডালের 'খুদে'র বিনিময়ে। বেত-বাঁশের সহিত আহার্যদ্রব্যের বিনিময় আমরা অনেক দেখিয়াছি। সুপারির ঋতুতে সুপারিকে প্রায় মুদ্রাংশের ন্যায়ই ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি।

অর্থনীতির দিক হইতে হয়ত বলা হইবে বিনিময় সর্বত্রই বিনিময়, তাহা বস্তু বিনিময়ই হোক, অথবা মুদ্রার মাধ্যমেই হোক। কিন্তু পূর্ব-অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করিয়া আমরা ইহাকে একেবারে তুল্যমূল্য দিতে রাজী নই। বস্তু-বিনিময়ের ক্ষেত্রে সর্বত্র না হইলেও, অনেক ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা আদানপ্রদানের হৃদ্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছি। অর্থবিনিময়ের ক্ষেত্রে ইহার সম্ভাবনা স্বল্প। গ্রাম্য জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রার জন্য দ্রব্যবিনিময়ের একটি গভীর প্রভাব গ্রাম্য সমাজ-জীবনের উপরে লক্ষ্য করিয়াছি, ইহা আমাদের পল্লীর সমাজ-বন্ধনের ভিতরে একটা শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল।

মোটের উপরে আমাদের পূর্বতন আর্থিক ব্যবস্থা এবং বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য করিতে হইলে আমরা এই বলিতে পারি যে, পূর্বে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা নির্ভর করিত মুখ্যতঃ ভূমিজাত সম্পদের উপরে; আর বর্তমান অবস্থায় এই ভূমিজাত বা প্রাকৃতিক অন্য কোন প্রকারের সম্পদের সহিত আমরা সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক-বিহীন হইয়া উঠিয়াছি। আমাদের সম্পর্ক শুধু মাত্র ব্যাঙ্কের চেক বা কারেন্সি নোটের সঙ্গে। আমাদের বিশ্বাস অর্থনৈতিক জীবনের এই পরিবর্তনই আমাদের পূর্বতন পারিবারিক বন্ধন এবং সমাজ বন্ধনের ভিতরে ভাঙন ধরাইয়াছে। সেই ভাঙন-প্রক্রিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করিয়া আমাদিগকে যেখানে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়াছে তাহারই একটু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে পূর্ববর্ণিত লেকের পারের যুবতীটির মনোবৃত্তির ভিতরে।

আমি পুরাতনের প্রতি সহজাত অন্ধ-প্রীতির বশবর্তী হইয়াই এ কথা বলিতেছি না। পুরাতন প্রথা ভাঙবেই, সে ভাঙনের ভিতরে অবিমিশ্র অকল্যাণই রহিয়াছে এমন

কথাও শ্রদ্ধেয় নহে। কিন্তু আত্ম-বিশ্লেষণ করিয়া যে কথাটি মনে হয় তাহা এই যে, আমাদের পূর্বতন গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক—তথা সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরে চিত্তের যে ঔদার্য ছিল তাহা আমাদের আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরে গ্রথিত পারিবারিক তথা সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরে মারা পড়িতে বসিয়াছে। আমাদের গ্রামীণ সভ্যতার ভিতরে এই একটি চিত্তধর্ম লাভ করিতাম যে, সাংসারিক ছোটবড় কোনও সুখ-সম্পদকে একা একা ভোগ করিয়া আনন্দ লাভ করা যায় না; নানাভাবে বহুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া বাস, সুখ-সম্পদকে বণ্টন করিয়া লওয়াই ছিল আমাদের ধর্ম। পৌষ-সংক্রান্তির দিনে নিজের ঘরে দুয়ার আঁটিয়া পিঠা-পুলি খাইতে বা নবান্নের দিনে নিজের ঘরে বসিয়া একা একা ষোড়শ ব্যঞ্জনে আহার করিতে আমাদের কোনও আনন্দ ছিল না; দশ জনের সঙ্গে ভাগ করিয়া খাইবার একটা সহজ মনোবৃত্তি আমরা অনুভব করিতাম। ইহার পিছনকার অর্থনীতির উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, সে অর্থনীতি যে আমাদের একটি বিশেষ মনোবৃত্তিকে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নিতান্ত যে গরীব—সামান্য বরপণ বা কন্যার গায়ে না দিলেই নয় এমন দুই-একখানি গহনা জোগাড় করিতে যাহার ভদ্রাসন বাঁধা পড়িয়াছে বা তৈজসপত্র বিক্রি করিয়া দিতে হইয়াছে, তাহার পক্ষে চুপি চুপি বিবাহকার্য সমাধা করিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তিই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু যাহা যুক্তিসঙ্গত তাহাতে তাহার হৃদয় সায় দিত না; সুতরাং সেই যে সর্বস্ব খোয়াইবার যজ্ঞ তাহাতেও সে সকলকে না ডাকিয়া পারিত না। ইহা কোনও ঐশ্বর্য-প্রচারের লোভে নয়, কোনও ভবিষ্যৎ স্বার্থসিদ্ধির কামনায় নয়; আমার মনে হয়, ইহা পুরাতন গ্রামীণ মনোবৃত্তিরই একটা অভিব্যক্তি মাত্র।

অপর পক্ষে একবার আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। তাহার চারি দিক জুড়িয়া নিশিদিন কেবল একটি সুর—'চাচা, আপন বাঁচা'। এই নিরন্তর 'আপন বাঁচা'ইবার অভ্যাস্ত তাগিদে আমরা এমন করিয়াই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছি যে, তাহার পরিণামে এই 'আপন' কথাটি যে শেষ পর্যন্ত কি সংজ্ঞা লাভ করিয়া কয়টি লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইবে তাহা বুঝিতে পারি না। বর্তমান মাস-মাহিনার অর্থনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনে যাহারা থিতাইয়া পড়িয়াছি, তাহারা কন্যার বিবাহ দিতে হইলে যাহা কিছু খরচ করিব তাহা শুধুমাত্র মেয়ে-জামাইকে কি দিব এই একমাত্র দিকে নিবদ্ধ রাখিতে সুশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছি; আর তাহাদের অতিমাত্রায় সাহায্যকারী রূপে আসিয়া জুটিয়াছে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের যত নিয়ম-কানুন! যাঁহারা কালোবাজারের সর্ববিধ পাপাচরণের সহিতই নিজেদের সর্বদা যুক্ত রাখিতে এবং সেই উপায়ে প্রচুর অর্থাগম করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না, এই সময়ে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলীর প্রতি তাঁহাদের কঠোরতা এবং নিষ্ঠা দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়।

আমি পুরাতন গ্রাম্য অর্থনীতির পক্ষে কোনও ওকালতি করিতেছি না, কেহ করিলেও মহাকাল তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করিবেন কি না সন্দেহ। এই অর্থনীতির সপক্ষে যদি বলিবার কিছু থাকে, তবে বিপক্ষে বলিবারও অনেক কথা রহিয়াছে। আমি যে জিনিসটি সম্বন্ধে নিজেদের সচেতন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা হইল এই যে, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাপে আমরা আমাদের কতকগুলি সামাজিক গুণ হারাইয়া ফেলিতেছি—যে গুণগুলি আমাদের চিত্ত-ধর্মের ভিতরে একটা প্রসারতা দান করিত। ভূমিজ ও অন্যবিধ প্রকৃতিজ সর্বপ্রকারের সম্পদহারা হইয়া আমরা খালি ব্যাঙ্কসর্বস্ব বা মণিব্যাগসর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছি; ইহা সর্বদাই আমাদিগকে অতিমাত্রায় হিসাবী ও সাবধানী করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু সেই হিসাব ও সতর্কতার পরিণাম যদি হয় শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থবোধের প্রাচীর তুলিয়া তুলিয়া কেবলই বৃহৎ মানব-সমাজ হইতে নিজেকে বিচ্যুত এবং বঞ্চিত করিয়া রাখা, তবে সেই আত্মসঙ্কোচনের ভিতরে আমাদের অকল্যাণ এবং অপমানই নিহিত আছে। যে অর্থনীতি আমাদের এইজাতীয় মনোবৃত্তির জন্য দায়ী তাহাকে ইচ্ছা করিলেই আমরা এক দিনে পরিবর্তিত করিতে পারি না; কিন্তু সচেতন চেষ্টা দ্বারা মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিকের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এ বিশ্বাস আমরা এখনও রাখি।

সেবাগ্রাম

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুর শহর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল পশ্চিমে জি. আই. পি. রেলওয়ের মেন লাইনের উপর ওয়ার্ধা শহর। মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধা জেলার সদর এই শহরটি। এখান থেকে প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে গান্ধীজীর সাধনক্ষেত্র সেবাগ্রাম।

সেবাগ্রামের মূল নাম সেওগাঁও। বর্তমানে ওয়ার্ধা থেকে একটি মোটর চলাচলের উপযোগী রাস্তা সেবাগ্রাম পর্যন্ত এসেছে। গান্ধীজীর আশ্রম বা তাঁর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পার হয়ে তবে মূল গ্রামটিতে পৌছান যায়। আইন অমান্য আন্দোলনের পর ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে গান্ধীজী হরিজন উন্নয়ন উপলক্ষে সারা দেশ পরিভ্রমণ করেন। সেই সময় ভারতের গ্রামসমূহের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা ভাল করে তাঁর চোখে পড়ে এবং তখন থেকে তিনি "গ্রামে ফিরে যাবার" আন্দোলনের উপর বিশেষভাবে জোর দেন। এই সময় গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ শিষ্যেরাও গ্রাম-সংগঠনের জন্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন এবং মীরা বেন নিজের কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নেন মধ্যপ্রদেশে সর্ববিষয়ে অনগ্রসর এই সেওগাঁওকে। দাণ্ডিযাত্রা সুরু হবার প্রাক্কালে গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন যে, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আর সবরমতীতে ফিরবেন না। তাই হরিজন যাত্রা শেষে শেঠ যমুনালাল বাজাজের আমন্ত্রণে গান্ধীজী তখন ওয়ার্ধায় শেঠজীর বাগানবাড়ীতে (বর্তমানে নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের সদর কেন্দ্র মগনবাড়ী) ছিলেন এবং কোন্ গ্রামে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করা যায় এ সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন। মীরা বেন এই সময় তাঁর কাছে গিয়ে সেবাগ্রামে আশ্রম স্থাপন করতে অনুরোধ জানান এবং মীরা বেনের উদ্যোগেই সেবাগ্রাম গান্ধীজীর কর্মকেন্দ্র তথা প্রায় এক যুগ যাবৎ ভারতের প্রাণকেন্দ্র রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

গান্ধীজী ১৯৩৬ সালে সেবাগ্রামে আসার পর তাঁকে কেন্দ্র করে বাপু-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর ক্রমশঃ নিখিল-ভারত চরখা সংঘের প্রধান কার্যালয় এবং চরখা সংঘের খাদি বিদ্যালয়ের কাজও এখানে সুরু হয়। ১৯৩৭ সালে দেশে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারের জন্য হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ স্থাপিত হয়। নূতন শিক্ষাপদ্ধতি গান্ধীজীর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের অধীনে চালাবার জন্য তালিমী সংঘের প্রধান কার্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্র ও একটি করে প্রাক্-বুনিয়াদী, বুনিয়াদী ও উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও এখানে চলছে। খাস সেবাগ্রামে বর্তমানে চরখা সংঘ, তালিমী সংঘ এই দুটি প্রতিষ্ঠান এবং বাপুজীর আশ্রম ও কস্তুরবা হাসপাতাল বিদ্যমান।

গান্ধীজী বেঁচে থাকতে সেবাগ্রামের ক্ষুদ্র বাপু-কুটিরটি ছিল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর বাপু-কুটিরের শুধু ঐতিহাসিক মর্যাদাই আছে। প্রত্যহ বহু যাত্রী এই পুণ্যভূমি দর্শন করে যান। আশ্রমে ছয়-সাত জন কর্মী আছেন। এঁদের মধ্যে বল্লভস্বামী হচ্ছেন সর্ব সেবাসংঘের সহ-সম্পাদক। গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের "Confederation" বা সম্মেলন এই সর্ব সেবাসংঘ। সংঘের সদর কার্যালয়ও এইখানেই। এ ছাড়া আহারশাস্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্রজীও এখানে থাকেন এবং তিনিই হচ্ছেন বাপু-আশ্রমের বর্তমান পরিচালক। কৃষ্ণচন্দ্রজী উত্তর প্রদেশবাসী। এম-এ'তে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করা ছাড়া পরে ইনি একাধিক বিষয়ে এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতবর্ষে এঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা যায়। বাপুর কুটিরে প্রবেশের আগে ছোট ছোট নুড়িতে ভরা প্রার্থনা-ভূমি পার হতে হয়। কাঠের যে ছোট্ট মঞ্চটির উপর বসে গান্ধীজী প্রার্থনা করতেন এবং প্রার্থনান্তিক ভাষণ দিতেন, সেটি সেই অবস্থাতেই রাখা রয়েছে। গান্ধীজীর কুটিরের মেঝে সিমেন্টের এবং দেয়াল মাটি ও বাঁশের তৈরি। এই ছোট্ট এবং অতি সাদাসিধে ঘরে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব থাকতেন এ কথা ভাবতেই বিস্ময় বোধ হয়। কুটিরে ঢুকতেই প্রথমে ছোট্ট এক ফালি বারান্দা এবং তার পর গান্ধীজীর বসবার ঘর। ঘরের এককোণে গান্ধীজীর ভ্রমণসহায়ক লাঠিটি দাঁড় করান রয়েছে। তাঁর বসবার জায়গার সামনে তাঁর খড়ম দুটি সাজান। খদ্দরের একটি স্বল্পপরিসর তোষক পাতা রয়েছে এবং তার উপর সাদা খদ্দরের চাদর। তোষকের শেষপ্রান্তে দেওয়ালে ঠেস দেওয়া একটি বালিশ। গান্ধীজী এইখানে বসতেন। ডান পাশে খুলে রাখা রয়েছে তাঁর চরখা এবং তার পিছনে ছোট একটি বইয়ের সেলফ। গীতা প্রভৃতি যে অল্প কয়েকখানি বই গান্ধীজী সদা-সর্বদা পড়তেন, সেগুলো সেখানে রক্ষিত আছে। সেলফের নিচের তাকে সেই বিখ্যাত জাপানী তিন বাঁদরের মূর্তি। একটির মুখে হাত—কুকথা

বলব না। অন্যটি চোখ চাপা দিয়ে আছে—কুদৃশ্য দেখব না। তৃতীয়টি কান বন্ধ করে আছে—কুকথা শুনব না। এমন ভাবে সব জিনিস রাখা আছে যে, ঘরে ঢুকলেই মনে হয় গান্ধীজী কিছুক্ষণের জন্য বুঝি বাইরে গেছেন, এখনই আবার আসবেন। মহামানবের আসন্ন আগমনের সম্ভাবনায় শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠে এবং প্রতিটি পদবিক্ষেপ হয় সতর্ক। এক ধারের দেয়ালে একটি পিচবোর্ডের উপর কাগজ এঁটে তাতে লেখা আছে রাস্কিনের অমর বাণী :

"The essence of lying is in self deception, not in words: A lie may be told by silence, by equivocation, by the accent on a syllable, by a glance of the eye, attaching a peculiar significance to a sentence, and all these lies are worse and baser by many degrees than a lie plainly worded."

গান্ধীজীর আসনের ঠিক সামনের দিকের দেয়ালে পিচবোর্ডের উপর লেখা আছে :

"When you are not right, you can afford to keep your temper; but when you are right, you must keep your temper."

বসবার ঘরের ডান পাশে একটি বারান্দা এবং পিছনে আর একখানি ছোট কামরা। এই কামরাটিতে দুটি বাঁশের পেটি রয়েছে। এতে কস্তুরবা এবং বাপুর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকত। একটি সাদা চৌকীও রয়েছে এখানে। এটি ছিল মাতা কস্তুরবার শয়ন-কক্ষ। ডান পাশে বাপুর স্নানাগার ও পায়খানা। কয়েক বছর যাবৎ বাপু সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক ল্যাট্রিন ব্যবহার করছিলেন। কোন ভক্তের উপহার এটি। পায়খানার পাশে একটি ছোট খোপে সাময়িক পত্রিকা থাকত। পায়খানায় গিয়ে উনি ঐটুকু সময়ে কোন পত্রিকা পড়তেন। এর পিছনে তেল মাখবার একটি লম্বা বেঞ্চি রয়েছে। বাপু শরীরের খুবই যত্ন নিতেন। তৈল মর্দন ও স্নান ছিল তাঁর একটি বিলাস। ঐ বেঞ্চিতে তিনি শুয়ে থাকতেন ও কেউ তাঁকে তেল মাখাত। ঘরে রৌদ্র আসার জন্যে বাঁশের ঝাঁপ দেওয়া জানালা রয়েছে। তেল মাখার পর তিনি সূর্যস্নান করতেন এই বেঞ্চিতে শুয়েই। আশ্রমে অনেকটা জমি এবং ভাল বাগান আছে। সমবায় প্রথায় এখানে চাষ হয়। আশ্রমের কর্মীদের সঙ্গে যে সব শ্রমিক এখানে কাজ করেন, উৎপন্ন ফসলে তাঁদের ও আশ্রমবাসীদের সমান অধিকার। গান্ধীজী-লিখিত এবং গান্ধীবাদ-সম্পর্কিত ইংরেজী, হিন্দী এবং মরাঠী ভাষার একটি পুস্তক-ভাণ্ডারও এখানে আছে।

এর পর রয়েছে হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ। গান্ধীজী যে অহিংস শোষণবিহীন সমাজ স্থাপন করতে চান, তার বীজ হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষা। সর্বোদয় সমাজে সকলে শ্রমিক হবে বলে তাতে শোষণের সুযোগ থাকবে অতি কম। সুতরাং সর্বোদয় সমাজে উপনীত হবার মাধ্যমস্বরূপ বুনিয়াদী শিক্ষায় শারীর-শ্রমের স্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাশেষে ছাত্র যাতে নিজ পরিশ্রমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে, অর্থাৎ বাঁচবার জন্যে যাতে তাকে পরনির্ভরশীল না হতে হয়, সেইজন্য শারীর-শ্রমের মাধ্যমে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ছাড়া এর ফলে জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া বাস্তব জগতের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং শিক্ষক ও ছাত্রের শ্রমে বিদ্যালয়ের পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহ করার চেষ্টা হয় বলে ভারতের মত দরিদ্র দেশে দ্রুত সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির চেয়ে শ্রেয়স্কর অন্য কোন শিক্ষা-পদ্ধতি আছে কিনা সন্দেহ।

হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘের সভাপতি ছিলেন দিল্লীর জমিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়ার পরিচালক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ডঃ জাকির হোসেন। বর্তমানে তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করায় কাকা কালেলকর এখন তালিমী সংঘের সভাপতি। কাকা কালেলকর মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট জননায়ক এবং শান্তিনিকেতন ও গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমে তিনি অধ্যাপনা করতেন। বর্তমানে তিনি 'হিন্দুস্থানী প্রচার সভা'র সভাপতি এবং গান্ধী-সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ। তালিমী সংঘের যুগ্মসম্পাদক হচ্ছেন আর্যনায়কম্‌জী এবং তদীয় পত্নী আশা দেবী। আর্যনায়কম্‌জী সিংহল দেশবাসী খ্রীষ্টান। ইংলণ্ড, জার্মানী এবং আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ডিগ্রী আছে এঁর। অনেক দিন ইনি রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকও ছিলেন। আশা দেবী বঙ্গললনা। ইনিও শান্তিনিকেতনের অধ্যাপিকা ছিলেন। এঁর চেহারায় এবং আচরণে একটি স্নিগ্ধ মাতৃভাব প্রকাশ পায়। শুধু তালিমী সংঘের বাসিন্দাদেরই নয়, সেবাগ্রাম ও ওয়ার্ধার অনেকেরই ইনি মাতাজী। এঁদের দু'জনের অক্লান্ত পরিশ্রমই তালিমী সংঘের অভাবনীয় উন্নতির উৎস। এঁদের সঙ্গে আছেন শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষা ইংরেজ মহিলা মার্জোরী সাইক্‌স, উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পাণ্ডে গুরুজী, সেবাগ্রাম বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিচালিকা শ্রীমতী শান্তা নারুলকর এবং আরও অনেক শিক্ষাব্রতী। আগেই বলেছি যে, সেবাগ্রামের মূল জনপদটিতে তালিমী সংঘ একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় চালান। বস্তুতঃ সেবাগ্রাম এবং তার আশপাশের গ্রাম কয়টিতে গঠনমূলক কাজ করবার প্রত্যক্ষ ভার নিয়েছেন তালিমী সংঘ। সেবাগ্রামের বিদ্যালয় ছাড়া

তালিমী সংঘের এলাকার ভিতর আরও একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় তালিমী সংঘের দ্বারা পরিচালিত হয়। সারা ভারতবর্ষ থেকে প্রায় দেড় শত যুবক-যুবতী প্রতি বৎসর এখানে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী হবার শিক্ষা নেন; বিদ্যালয় চালাবার জন্যে কাতাই, বুনাই, কাঠের কাজ, কাগজ ও পিচবোর্ডের কাজ এবং বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র দ্বারা সুন্দর একটি গোশালাও চলে তালিমী সংঘের পরিচালনাধীনে। এখানকার সমস্ত কাজই অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা করেন।

তালিমী সংঘে শান্তিনিকেতনের ছাপ পড়েছে গভীর ভাবে। নায়কমজী এবং আশা দেবী তো রবীন্দ্রনাথেরই হাতে গড়া। এই দু'জন ছাড়া চিত্রকলা শিক্ষাদান কার্যে শান্তিনিকেতন ফেরত আরও কয়েকজন নিযুক্ত আছেন। গান্ধীজীর অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও কবিদৃষ্টির সমন্বয় হওয়ায় তালিমী সংঘ শিক্ষার এক আদর্শ কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছে। তালিমী সংঘ মারফত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ভাবী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী বর্তমান বিশ্বের এই দুই যুগ-মানবের সম্মিলিত আদর্শ গ্রহণ করছেন।

১৯৪৪ সালে শেষবার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গান্ধীজী চরখা সংঘের সামনে এক নূতন কার্যক্রম পেশ করলেন। এত দিন চরখা সংঘ এবং খাদি কর্মীরা শুধু দরিদ্রদের কথঞ্চিৎ আর্থিক সহায়তা দেবার জন্যে খাদির কাজ চালিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী এবার জানালেন যে, খাদির লক্ষ্য আরও উচ্চ। জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীর কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও বণ্টনের জন্য আমাদের সমাজে শোষণ চলছে। এই কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও বণ্টনের ফলে এক দল পরশ্রমজীবীর ভার বইতে হচ্ছে উৎপাদকশ্রেণী অর্থাৎ কৃষক ও মজদুরদের। এরই জন্য আবার রাষ্ট্রব্যবস্থাকেও কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছে এবং ফলে তার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চলে গেছে সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও আয়ত্তের বাইরে। ফলে আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন হয়ে গেছে মুষ্টিমেয় লোকের করায়ত্ত। উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্র-পরিচালিত হলেও এই ক্ষমতার একাধিপত্যের অবসান ঘটবে না। বরং উৎপাদন-যন্ত্রের সঙ্গে রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসনযন্ত্র একই কর্তৃপক্ষের হাতে যাওয়ায় ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিকতর পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হবে এবং এর ফলে ফ্যাসিজম বা কম্যুনিজম যে নামেই হোক না কেন, কোন-না-কোন প্রকারের একনায়কত্ব কায়েম হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ব্যক্তির যথাসম্ভব অধিক আত্মবিকাশের সুযোগ রাখার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় সংঘ-শক্তিকে যদি বজায় রাখতে হয়, তা হলে স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম্য সাধারণতন্ত্র কায়েম করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়। জীবনধারণের উপযোগী অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীর বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদনের প্রতীক চরখা এই লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়।

গান্ধীজী বেঁচে থাকতেই চরখা-সংঘের সমস্ত শক্তিকে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কর্মী তৈরি করা ও অহিংস বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রূপে তাদের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেবার কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হয়। তবে ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ কাজ তেমন ভাবে এগোয় নি। গান্ধীজীর তিরোধানের পর চরখা-সংঘের সভাপতি-পদের গুরু দায়িত্বভার যখন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের উপর পড়ে, তখন এই স্বল্পপরিচিত খাদিসেবকের যোগ্যতা সম্বন্ধে অনেকের মনেই দ্বিধার ভাব জেগেছিল। কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যেই ধীরেনভাই প্রমাণ করলেন যে, তিনি চরখা সংঘে গান্ধীজীর যোগ্য উত্তরাধিকারী। ধীরেনভাই উত্তরপ্রদেশ-প্রবাসী বাঙালী। ইনি বিখ্যাত নেত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর অগ্রজ। বেনারসে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সময় অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তখন থেকেই গান্ধীবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। উত্তরপ্রদেশে গান্ধী-আশ্রম মারফত এ যাবৎ তিনি গঠনমূলক কাজ চালিয়ে এসেছেন এবং সেখানে শত শত কর্মী তৈরি করে জনসেবার কাজে নিয়োগ করেছেন। বর্তমানে ধীরেনভাই সেবাগ্রামের খাদি বিদ্যালয়কে এই আদর্শের উপযুক্ত শিক্ষণকেন্দ্র রূপে গড়ে তুলছেন এবং সমগ্র চরখা-সংঘে ইনি নবজীবন এনে দিয়েছেন। তিনি ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে দেশবাসী ও শিক্ষিত-সমাজের মনে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং বহু বৎসর গঠনমূলক কাজে লিপ্ত থাকার কারণে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের দ্বারা গান্ধীবাদ এবং চরখার দর্শনকে তিনি অকাট্য যুক্তি বলে প্রমাণ করেছেন। মৌলিক চিন্তাশক্তি এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্য তিনি কর্মীমহলে সমাদৃত। ধীর মত অকস্মাৎ বর্জন করতে সংস্কারে বাধে বলে বিরোধীরাও ধীরেনভাইকে যথেষ্ট সমীহ করেন।

চরখা-সংঘে ধীরেনভাইয়ের পর নাম করতে হয় সংঘের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণদাস গান্ধীর। বাল্যকাল থেকে গান্ধীজীর কাছে মানুষ এই ক্ষীণকায় ব্যক্তিটির অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং অপূর্ব্ব সংগঠনীশক্তি দেখে বিস্মিত হতে হয়। খাদির 'টেকনিকে'র সর্বজনমান্য বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন নন্দলাল ভাই। চরখা ও তাঁতের উন্নতি করা

এবং খাদিকলার উপযোগী নূতন নূতন গবেষণা করবার ভার এঁর উপর। সদাহাস্যময় পণ্ডিতজী খাদি বিদ্যালয়ের মূর্তিমান অনুপ্রেরণা স্বরূপ। সন্তানবৎ স্নেহে ইনি খাদি বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে অহিংস বিপ্লবের হোতা হবার শিক্ষা দেন। ছাত্রছাত্রীদের সকল কর্মের সঙ্গী ভাইজী চন্দনসিংজীর সঙ্গে একবার পরিচিত হলে তাঁকে ভোলা শক্ত। সুমধুর ব্যবহারে সবাইকে তিনি বশ করে রেখেছেন। এ ছাড়া এখানে থাকেন ছাত্রাবাসের ব্যাপারে চন্দনসিংজীর সহকারী সৎ স্বভাববিশিষ্ট আত্রেজী এবং চরখা সংঘের কার্পাস-গবেষণা বিভাগের পরিচালক শ্রীযুক্ত পুণ্যব্রত ঘোষ—এঁরা দু'জনেই যুবক। শ্রীযুক্ত পুণ্যব্রত ঘোষ কলকাতার বাসিন্দা। ইনি নাকি বাংলার এক বিখ্যাত সাম্যবাদী দলের কর্মী ছিলেন। আত্মগোপন করে থাকার সময় শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালার সংস্পর্শে এসে গান্ধীবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং অতঃপর চরখা-সংঘে যোগদান করেন। খাদি বিদ্যালয়ের কাতাই, ধুনাই এবং বুনাই ক্লাস ছাড়া কৃষিক্ষেত্রও বেশ বড়। এখানকার সংগ্রহশালাটিতে খাদি এবং তার উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ক্রমবিবর্তনের ধারাটি সুন্দর ভাবে বুঝাবার ব্যবস্থা আছে।

এই তিনটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া সেবাগ্রামে কস্তুরবার নামে একটি হাসপাতালও আছে। ডাক্তারী করা গান্ধীজীর বহু দিনের নেশা। সেই উপলক্ষে তাঁর আশ্রমে ক্রমশঃ একটি ছোটখাটো ঔষধালয় স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ ডাঃ সুশীলা নায়ার ইহার ভার নেন। পরে এটি আরও বেড়ে যায়, এ কারণ আশ্রমে এর স্থান সংকুলান না হওয়ায় তালিমী সংঘ ও চরখা সংঘের মধ্যবর্তী মাঠে এর জন্য নূতন ঘর তৈরি হয়। বর্তমানে এখানে রোগীদের রেখেও চিকিৎসা করবার ব্যবস্থা আছে। শল্য চিকিৎসাসহ আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এই ছোট হাসপাতালে আছে। দূরের গ্রামের বহু রোগী এখানে এসে অতি অল্পব্যয়ে চিকিৎসা করিয়ে যান। কস্তুরবা ট্রাষ্টের তরফ থেকে প্রতি বৎসর কয়েক জন মহিলা এখানে ধাত্রীবিদ্যা এবং রোগী-পরিচর্যা শেখেন। এখানকার হাসপাতালের সেবিকাদের অধ্যক্ষা হচ্ছেন বাংলাদেশের মণিদি। কস্তুরবা ট্রাষ্টের বঙ্গীয় শাখা দ্বারা প্রেরিত দু'জন বাঙালী ছাত্রীও এখানে আছেন।

সর্বশেষে পরলোকগত শেঠ যমুনালাল বাজাজের দানের কথা উল্লেখ না করলে সেবাগ্রামের প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেবাগ্রামের এই গান্ধীগ্রাম স্থাপন করবার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টাও কম কার্যকরী হয়নি। গান্ধীজীকে ওয়ার্ধাতে তিনিই আনেন। বাপু আশ্রমের যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি তাঁরই দান। বাপু-আশ্রমের অন্যান্য খরচ, চরখা-সংঘ, তালিমী সংঘ এবং কস্তুরবা হাসপাতাল স্থাপনা ও পরিচালনার পিছনে রয়েছে তাঁর অজস্র অর্থানুকূল্য।

সুগতের উদ্দেশে

শ্রীকালিদাস রায়

বাল্যে জানিতাম প্রভু মৃত্যু হ'লে লোকে
যায় স্বর্গে অথবা নরকে।
তার পর জানিলাম বিজ্ঞানীরা কয়,
জীবনান্তে চিরতরে পাইব বিলয়।
হে সুগত, তুমি এলে নিয়ে এক নূতন বারতা,
বিষাদ আমার নাশে শকারিল শ্রীমুখের কথা।
আমারে বলিলে তুমি—"শেষ না হইলে কামনার,
জন্মপথে এজগতে আসিতে হইবে বার বার।
আশ্বস্ত হ'লাম শুনি—মৃত্যু নাই মোর,
ছিন্ন কভু হবে না না ধরণীর সাথে বাঁধা ডোর।
ভালবাসি এ ধরারে, বার বার আসিব ত ফিরে,
পশু হই, পক্ষী হই, হই ব্যাধ পাতার কুটীরে।

অশান্ত দুঃখালয় জানি এই ধরা,
পাপ তাপ জরা মৃত্যু ভরা,
তবু এরে ভালবাসি। নাই প্রভু আমার সাধনা
জানি মোর কোন দিন যাবে না কামনা।
তোমারি লভিতে যাহা কোটি জন্ম লাগিয়াছে প্রভু,
জানি তাহা এ পাপীর লভ্য নয় কভু।
নাই মোর নির্ব্বাণের ভয়
হে প্রভু, অমর আমি কোন দিন পাব না বিলয়।
জন্মজন্মান্তর পথে আমি মৃত্যুহীন,
সর্ব্ব জীবনের দ্বার আমার অধীন।
আশ্বস্ত করেছ তুমি, তোমার নির্ব্বাণ
তোমারি থাকুক প্রভু, চাহি নাকো শূন্যে অবসান,
চাই জীর্ণ দেহবাস ত্যজি নব বাস পরিধান।

মাকড়সার জাল

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

ঢেউয়ের ছন্দে নাচতে নাচতে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এল রমলা।

প্রথমেই মায়ের সঙ্গে দেখা। সুহাসিনী চালের কাঁকর বাছছিলেন। রমলার দিকে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার তিনি কাজে মন দিলেন। রমলার সঙ্গে কোন দিনই বনিবনাও হ'ত না সুহাসিনীর। এই বয়সে রমলার বিবিপনা নিয়ে প্রায়ই স্বামীর কাছে অনুযোগ করতেন সুহাসিনী। কিন্তু ফাকত পরিবেদনা। টাকার ধান্দায় রাধাকান্তবাবু এত ব্যস্ত যে মেয়েকে মৌখিক শাসন করবার পর্যন্ত তাঁর সময় নেই। এদিকে চোখ থাকতে এসব বসে বসে দেখতে পারেন না সুহাসিনী। সোমত্ত মেয়ে রাত আটটা অবধি বাইরে ঘুরে বেড়াবে—সুহাসিনী এ কিছুতেই সইতে পারেন না। ফলে সুরু হয় মা-মেয়েতে বাগ্‌যুদ্ধ। আর শেষকালে মেয়ের মুখের তোড়ে ভেসে যান সুহাসিনী—বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকতে হয়। তা ছাড়া আর উপায় কি। মেয়ে এখন রীতিমত বড় হয়েছে, তার স্বাধীন মতামত গড়ে উঠেছে—মা'র চোখরাঙানি আর গলা-কাঁপানো শাসন এখন মানতে চাইবে কেন রমলা? বি-এ পাস করিয়ে মেয়েকে স্বচ্ছন্দ চলাফেরার সুযোগ তো তাঁরাই করে দিয়েছেন—তাঁরাই রমলাকে সুযোগ দিয়েছেন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীর মতো আকাশে লঘু স্ফূর্তির পাখা মেলে দিয়ে উড়ে বেড়াবার। সুতরাং এখন রাশ টানলে দড়ি কাটা যাবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই জব্দ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন সুহাসিনী।

অন্য দিন হলে হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা মা'র চোখের সামনে দোলাতে দোলাতে গট গট করে সোজা চলে যেত রমলা। কিন্তু আজ মাকে নিজের আনন্দের ভাগটুকু না দিলে আর চলছে না।

"মা, আমার চাকরি হয়েছে।" হাউই বাজির মতো হুস্ করে খুশীতে যেন আকাশে বিচ্ছুরিত হ'ল রমলা।

"কোথায়? সিনেমা কোম্পানীতে? পর্দার আড়ালের গানের চাকরি?" প্লে-ব্যাক্ গানকে সুহাসিনী বলতেন পর্দার আড়ালের গান।

"বাঃ রে, সিনেমাতে আবার মাস মাইনের চাকরি হয় নাকি? এ আপিসের কাজ—রোজ দশটা পাঁচটা।"

"সরকারী আপিসে?" সুহাসিনী মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন।

"ঠিক সরকারী আপিসে নয়, তবে প্রায় আপিসের মতোই সব কায়দা-কানুন। নারকেলডাঙাতে মস্ত বড় পটারির কারখানা। মজুমদার সাহেব ঐ কারখানার ম্যানেজার—তাঁরই আপিসে কাজ..."

"কে মজুমদার সাহেব?" সুহাসিনীর সুরে সেই পুরনো শঙ্কা ও সন্দেহ।

"ও, তোমাকে বলি নি বুঝি?" আজ আর মাকে চটাবে না রমলা। একগাল হেসে বললে, "রেকর্ড কোম্পানীর অমরেশবাবুর বিশেষ বন্ধু হলেন মজুমদার সাহেব। অমরেশ-বাবুর সুপারিশেই কাজটা হয়েছে। কাল থেকেই যেতে হবে।" একটু থেমে আবার বললে রমলা "তোমাকে বলি নি মা—আজকালকার দিনে পাঁচটা লোকের সঙ্গে চেনাশোনা না থাকলে..." এই পর্যন্ত বলে ভঙ্গীতে একটা ঢেউ তুলে চঞ্চলকণ্ঠে বললে রমলা, "যাই বাবাকে বলে আসি। কাল সকালে উঠেই তো আপিসের তাড়া।"

রাধাকান্তবাবু পুলিসের চাকরি করে চুল পাকিয়েছেন। এক সময় বিস্তর টাকাও রোজগার করেছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। ব্রিটিশ আমলের দুরন্ত লাল ঘোড়ার অবাধগতি স্বাধীন ভারতের সদ্য প্রাকারে এসে রুদ্ধ হ'ল। হুমড়ি খেয়ে পড়লেন রাধাকান্ত। কি একটা ঘুষের ব্যাপারে ধরা পড়ে তাঁর চাকরি গেল। স্বাধীনতার সূত্রপাত করতে করতে কলকাতার অজস্র চোরাপথে লক্ষীর আরাধনায় মগ্ন হলেন এককালের জাঁদরেল পুলিস অফিসার রাধাকান্ত সিংহ রায়।

কিন্তু সৌভাগ্যরবি তখন তাঁর পশ্চিমে হেলে পড়েছে। রাধাকান্তের অবস্থা আর ফিরল না। এত বড় পরিবার নিয়ে তিনি বেশ একটুখানি বেকায়দায়ই পড়ে গেলেন। কাল শনিবার। 'রেসে' যাবেন কি না—তাই ভাবছিলেন রাধাকান্ত। এমন সময় দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকল রমলা। "বাবা, আমার চাকরি হয়েছে।" রমলা খুশীতে টলমল করছে।

চোখ থেকে চশমা টেনে নিয়ে প্রসন্ন মুখে তাকালেন রাধাকান্ত।

"কোন আপিসে?" রাধাকান্ত খুশি হয়ে উঠবার একটা দৃঢ় ভিত্তি খুঁজছেন—যেন হঠাৎ তার আশা আনন্দ মিথ্যে না হয়ে যায়—আবার যেন তাঁকে লাল ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আচম্‌কা মাটিতে গড়াগড়ি না খেতে হয়।

"সেই যে মজুমদার সাহেবের কথা তোমাকে বলেছিলাম—অমরেশবাবুর বন্ধু। নারকেলডাঙায় এক গ্লাস ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার। তাঁরই পার্সনাল এসিস্টান্ট..." উচ্ছ্বাসের

বাপে রমলার কথা জড়িয়ে আসছিল—যেন দিগ্বিজয় করে এসেছে রমলা।

রাধাকান্তবাবু জীবনে টাকাটাই বড় করে চিনেছেন—তাই কড়িয়ে হিসেব করে তবে তিনি খুশী হতে চান। নিশ্চিত ভরসা পাবার উদ্দেশ্যে রাধাকান্ত জিজ্ঞেস করলেন "কত করে দেবে?"

"তা আর কে জিজ্ঞেস করতে গেছে।"

বাবার এই অতিরিক্ত হিসেবিপনার মনে মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হ'ল রমলা। কোথায় বাবা খুশী হয়ে দুটো ভাল কথা বলবেন, না শুধু খুঁটিয়ে জেরা আর জেরা। রমলার আনন্দের উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস-তরঙ্গের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে পারছেন না রাধাকান্ত।

"যাক গে—এই বাজারে চাকরি হয়েছে তাই যথেষ্ট। কম করে হলেও অন্ততঃ শ'খানেক টাকা ত নিশ্চয়ই দেবে।" নিজের সঙ্গে সন্ধি করলেন রাধাকান্ত। চশমা জোড়া চোখে এঁটে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ডাকলেন ছোটকু—বাজারের থলিটা নিয়ে আয় তো মা।"

ছোটকু রাধাকান্তবাবুর ছোট মেয়ে। বাবাকে এই অসময়ে ব্যাগের জন্ত তাড়া দিতে দেখে রমলা জিজ্ঞেস করলে, "এখন তুমি আবার বাজারে যাবে নাকি বাবা?"

"তাই যাব ভাবছি। যা হউক কিছু নিয়ে আসি। সেই নারকেলডাঙায় আপিস। তোকে যে সকাল আটটার মধ্যেই খেয়ে দেয়ে আপিস বেরুতে হবে রমলা। এত সকালে বাজারের পর আর রান্না হয়ে উঠবে না।"

রাধাকান্তবাবু বাজারে যাবার জন্যে তৈরি হলেন।

ছোটকু ব্যাগ নিয়ে নাচতে নাচতে এলো। রমলাকে জড়িয়ে আবদারের সুরে বললে, "সেজদি তোর নাকি চাকরি হয়েছে। আমাকে দুটো পুতুল কিনে দিবি?"

পেছন থেকে ছোট ভাই বাবলু আবদার ধরলে, "সেজদি, আমার একটা হাওয়াই সার্ট।"

মেজভাই মন্টু অনেকদিন থেকেই একটা পুরনো ক্যামেরার জন্ত রমলার পেছনে লেগে আছে। রমলা কথা দিয়েছিল—তার আগামী গানের রেকর্ড হয়ে গেলে সেই টাকা দিয়ে মন্টুকে একটা পুরনো ক্যামেরা কিনে দেবে। এবার সুযোগ বুঝে মন্টু চেপে ধরলে। সেজদির চাকরি হয়েছে—চাই কি একটা নতুন ক্যামেরাও জুটে যেতে পারে। তবে ক্যামেরা কিনবার কথা শুনলে বাবা খাপ্পা হয়ে উঠবেন, তাই এদিন বক্তব্যটা সকলেই রমলাকে বলে এসেছে মন্টু। এবারও ইঙ্গিতে বললে, "সেজদি—সেই যে দেবে বলেছিলে। মনে আছে?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ,—খুব মনে আছে। যাকে যা দেব বলেছি—সবাইকে তা দেব। সবে তো কাল থেকে চাকরি। এক মাস সবুর কর—মাইনে পাই—তবে তো কেনাকাটা করব। এত ব্যস্ত কেন?"

তুলতুল সবে হাঁটতে শিখেছে। রমলার নতুন চাকরি পাওয়ার সংবাদ তার শিশুচেতনারও যেন বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সে রমলাকে বেষ্টন করে আধো আধো সুরে বললে, "সেজদি—আমার বিস্কুট কিনে দিবি?" রমলা তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে আদর করে বলে, "এই দেখ—তোর জন্যে কত কি কিনে নিয়ে এলাম।" কয়েকটা লজেন্স তুলতুলের হাতে গুঁজে দেয় রমলা।

রমলার চাকরির খবরে সারা বাড়ী জুড়ে খানিকক্ষণ এই চমক ও চাঞ্চল্যের আলোড়ন চলল। ছোট ভাইবোনেরা লঘু আনন্দের হাওয়ায় দুলতে শুরু করলে। এই কল্পনার ফেনোচ্ছ্বাস হয়ত আরও কিছুক্ষণ আবর্তিত হ'ত যদি না রান্নাঘর থেকে সুহাসিনী এসে এদের রঙীন নেশার ঘোর ভাঙিয়ে দিতেন।

এই ছেলেমেয়েরা—এত চেঁচামেচি, হট্টগোল কিসের? কি হয়েছে শুনি?

আকস্মিক যেন বজ্রনির্ঘোষ শুনতে পাওয়া গেল। মা'র রুদ্রমূর্তি দেখে বড়রা বুদ্ধিমানের মত গা-ঢাকা দিল। ছোটকু সবার আড়ালে। সে শুধু বলতে গেল, "মা, সেজদির চাকরি হয়েছে, আমায় পুতুল কিনে দেবে বলেছে।"

"তবে আর কি। এবার থেকে তুমি ধেই ধেই করে নাচতে শুরু কর।" সুহাসিনী ধমক দিয়ে উঠলেন।

মা'র কাছ থেকে এ ধরণের কটূক্তি কোনদিন শোনেনি ছোটকু। বেচারা লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে কেঁদে ফেলল। সুহাসিনী তবু নরম হলেন না। আরও কড়া সুরে বললেন, "থাক্—আর প্যান্ প্যান্ করে কাঁদতে হবে না। যাও—মুখ ধুয়ে পড়তে বস গে।"

মা'র এই অতিরিক্ত কঠোরতা রমলার মনে ছুঁচের মত বিঁধতে লাগল। মনে হ'ল—সুহাসিনী যেন ইচ্ছে করেই তাকে অপমান করবার জন্তে ভাইবোনদের কলোচ্ছ্বাস থামিয়ে দিলেন। রমলাও চুপ করে থাকবার মত মেয়ে নয়। মা'র সঙ্গে খিটিমিটি তার নিত্যই লেগে আছে। তার ঠোঁটটা জবাব দেবার জন্তে নড়ে উঠল। কিন্তু অনেক বিবেচনা করে সংযত হ'ল রমলা। প্রথম চাকরির মুখেই একটা কুৎসিত ঝগড়ার অবতারণা করা সঙ্গত হবে না ভেবে সে চুপ করে রইল। নিজে মনে মনে রাগের জালায় উত্তপ্ত হতে লাগল রমলা। থাক—আজকের দিন সে চুপ করেই থাকবে।

বাঁকা চোখে রমলার দিকে তাকিয়ে সুহাসিনী বললেন, "এতদিন ঘোরাঘুরি করে চাকরি যাও-বা একটা জুটল—তাও আবার মুলুক ছাড়িয়ে—একেবারে নারকেলডাঙায়—যেতে

আসতেই ত প্রাণান্ত। আমাদের বরাতই এমনি—চাকের বাদ্যেই মনসা বিদেয়।"

আর সহ্য হ'ল না রমলার। বাধা মানল না সংযমের শাসন। রমলার সারা দেহে কে যেন আগুনের হল্‌কা ছুঁড়ে মারছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রমলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "তোমার ঘুষিয়ে হবে বলে কেউ ত আর বাড়ীর পাশে আপিস বানিয়ে আমাকে চাকরিতে ডেকে দেবে না মা। চাকরি করতে হলে, যেখানে চাকরি খালি থাকে সেখানেই কাজ নিতে হবে। আর লোক যেখানে টালিগঞ্জ থেকে টালা পর্য্যন্ত টানাপোড়েন করতে পারছে, সেখানে ভবানীপুর থেকে নারকেলডাঙা কি আর এমন দ'শ নিরানব্বই মাইল দূর শুনি? ও, পরের চাকরি করতে গেলে অত বাছবিচার চলে না মা।"

এই বলে কথার ঝাপটা মেরে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রমলা।

বিছানায় শুয়ে চট্ করে ঘুম আসছিল না রমলার। কাল থেকে শুরু হবে দশটা-পাঁচটার জীবন—সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ। অচেনা লোক—কতখানি খাপ খাইয়ে চলতে পারবে তাই বা কে জানে। যে দিদিগিরির জন্ত আত্মীয়স্বজন, বিশেষ করে মা'র অজস্র বাঁকা কথা তাকে শুনতে হয়েছিল অহর্নিশ—আজ সেই কলঙ্কের দাগ জয়টিকা হয়ে উঠেছে তার জীবনে—তাকে জীবনে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি। মাসান্তে মাইনের টাকাটা যখন মা'র হাতে তুলে দেবে রমলা—মা'র তখনকার মনোভাব ও মুখের প্রসন্ন দীপ্তি কল্পনা করে একটা কৌতুকমিশ্রিত আমোদ অনুভব করলে রমলা। টাকার জৌলুসে সেদিন আপনা থেকেই চাপা পড়ে যাবে রমলার সব অপযশ। মধ্যবিত্ত পরিবারের অবস্থার মরুভূমিতে টাকার চেয়ে বড় বন্ধু, বড় সহায়ক, বড় আশীর্ব্বাদ আর কিছু নেই। রমলা তা জানত—আর জানত বলেই সকলের কানাঘুষা, প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ উপেক্ষা করে সকলের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে মেলামেশা করত রমলা। আর তারই ফলে নিজের জোরেই সে এই চাকরিটা জোটাতে পেরেছে—আজ তার বিরুদ্ধে সকল নিন্দা কটূক্তি মাথার ভূষণ হয়ে দেখা দিয়েছে সকলের কাছে।

কালকের রুটিনটা মনে মনে ঠিক করে নিল রমলা। সকালে ৮টার মধ্যেই তাকে আপিস বেরুতে হবে। সুতরাং আগের দিনের এন্‌গেজমেন্টগুলো সব ওলটপালট হয়ে যাবে। কোথায় কোথায় তার সব দেখা করবার কথা ছিল?…রমলা মনে মনে হাতড়াতে লাগল—আগামী কালের ছুটী! 'মুনলাইট পিকচার্সে'র একটি ছবিতে প্লে-ব্যাক গানের জন্ত তার পাওনা টাকা অনেক দিন ধরে পড়ে আছে। তাগিদ দিলে মোটাগোছের মালিক এক গাল হেসে বলেন, "অবস্থা ত নিজের চোখেই দেখছ দিদি; হাতে আমার মাইনের টাকা এক আনার বাড়তি একটি আধলাও নেই।…দেখ…দেখ…কাউকে নিরাশ করব না, ছবিটা একবার রিলিজ হোক…একদিনই যখন সবুর করলে তখন আর ক'টা দিন…।" অদ্ভুত লোক এই কানাইবাবু। কথায় যেন মধু ঝরে। কাল দুপুরে একবার আপিসে দেখা করবার জন্তে বলে দিয়েছিলেন কানাই বাবু। বোধ হয় কাল হাত উপুড় করবেন। কিন্তু রমলার ত আর কাল যাওয়া হবে না। অথচ বাবাকে এ কথা জানায় নি রমলা। এই সব সিনেমাওয়ালার উপর রাধা-কান্তবাবু হাড়ে চটা। শুধু কিছু বাড়তি রোজগার হবে বলে রমলার প্লে-ব্যাক গানের নেশাকে তিনি বরং প্রশ্রয়ই দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু রেকর্ড-সিনেমা লাইনে ক'বছর ঘোরাঘুরি করেও যখন আশানুরূপ টাকার মুখ দেখলে না রমলা তখন রাধাকান্তবাবুর উষ্মা প্রকাশ পেল। বিরক্তির সুরে বলেন, "তোকে তো আগেই বলেছিলাম রমু, ওসব সিনেমা-ফিল্মের কাছে আর যাবি নে। পাওনা টাকা দেবার নাম নেই, শুধু বাক্‌চাতুরী।" চুপ করে থাকে রমলা। বাবা সহজে তার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেন না। সব কিছুকেই টাকার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেন রাধাকান্তবাবু। আর্ট-কাল্চারের ধার ধারেন না তিনি। শিল্পীর গালভরা নামের চেয়ে অর্থের ঝুনঝুনির আকর্ষণ তাঁর কাছে অনেক বেশি।…হঠাৎ মনে পড়ল রমলার—কাল বিকেলে উৎপল আসবে। তাকে না পেয়ে খুবই মর্মাহত হবে উৎপল। হয়তো ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লিখবে, না হয় দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেবে অনেক দিনের জন্ত। শিল্পীরা সাধারণতঃ অভিমানী আর স্পর্শকাতর হয়েই থাকে। কিন্তু উৎপলের ভালবাসা যেন তাকে সর্ব্বক্ষণ সব দিক থেকেই ঘিরে রাখতে চায়, গণ্ডীবদ্ধ করতে চায়। তাই এক দিন সময়ে রমলার দেখা না পেলেই অন্তর-সমুদ্র আলোড়িত হয়ে উঠে।…মাকে লুকিয়ে কাল দুপুরে তাদের একটা বিলিতি ছবি দেখতে যাবার কথা ছিল, উৎপল টিকেট কিনে একেবারে যাবার জন্তে তৈরি হয়েই আসবে। কিন্তু সে তো আর আগেভাগেই চাকরির খবর জানত না। কিন্তু এবার যদি এ নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করে উৎপল তবে রমলা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেবে…এ ধরণের মিইয়ে পড়া, মেয়েলী পুরুষদের অন্তর থেকে ঘৃণা করে রমলা…

চোখ দুটো তার মধুর আবেশে জড়িয়ে আসছিল। রমলার মনে হ'ল—এক দিন তার মনের মুকুরে উৎপলের যে ছায়া পড়েছিল ক্রমশঃ তা যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। উৎপলের অনুরোধ এড়াতে না পেরে আজও তার সঙ্গে রমলা রেস্তোরাঁ আর সিনেমায় ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু দু'বছর আগের সে আবেগ ও উন্মাদনা, সে অন্তর-মাধুর্য্য—সব যেন আজ তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে রমলার কাছে…।

• • •

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম, মে ১৮৬৫ মৃত্যু, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩
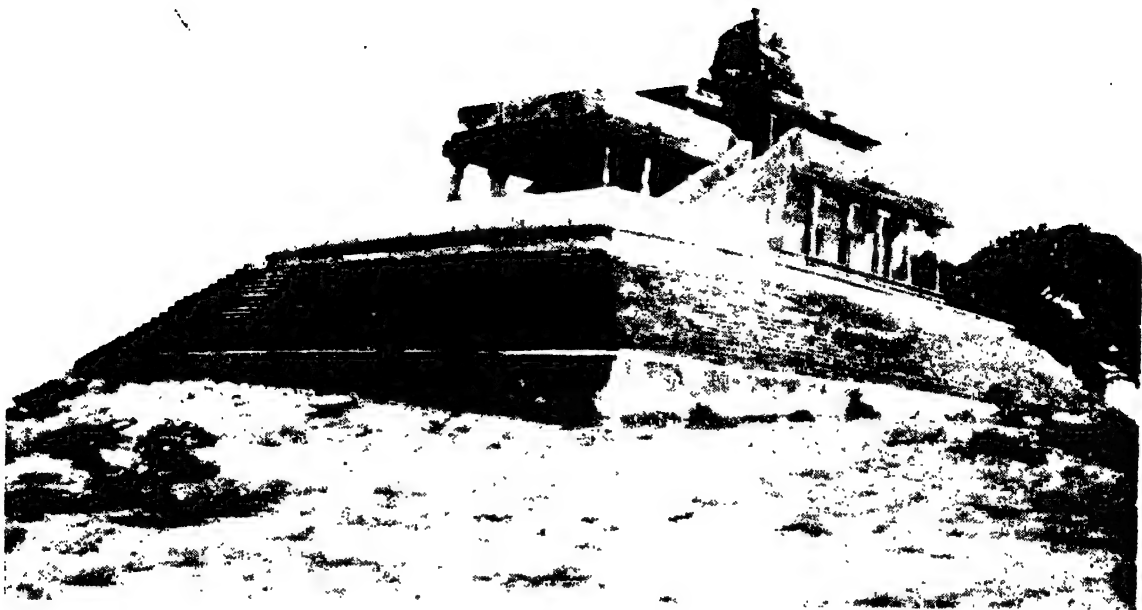
রামঝরকা—রামেশ্বর
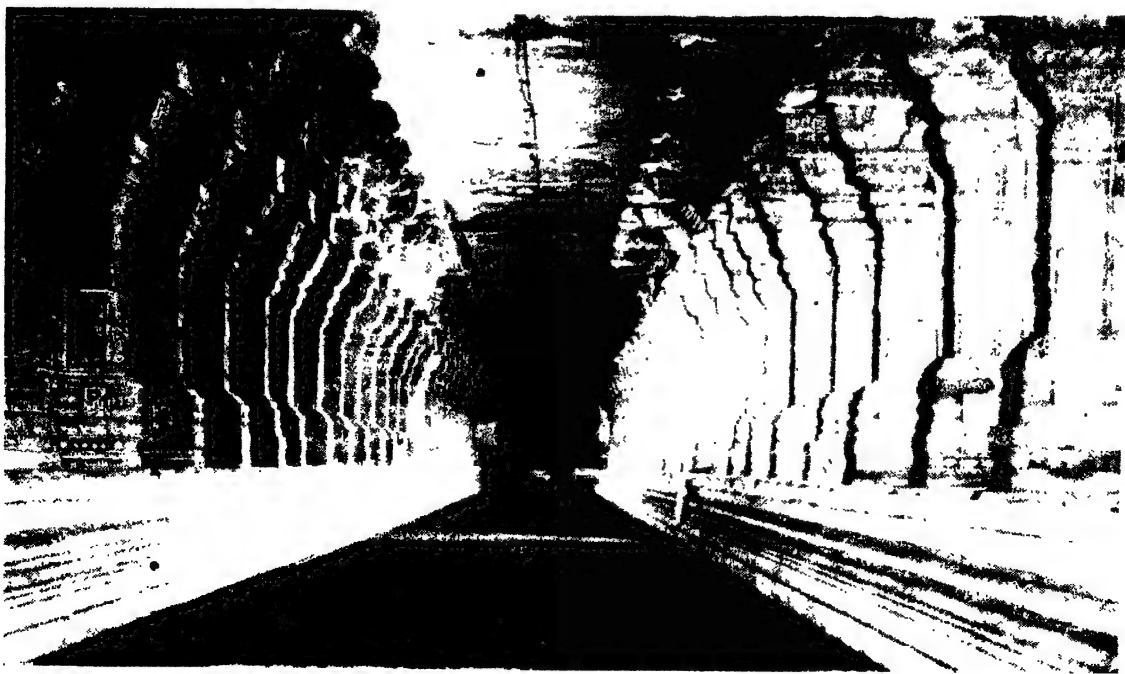
রামেশ্বর মন্দিরের অভ্যন্তরে কারুকার্য্যময় দালান

ঘটনা ও রটনা মিলিয়ে রমলাকে ঘিরে যে মুখরোচক কুৎসা-কল্পনার বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, রমলার এক আঘাতেই তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। শত্রুপক্ষ এবং বিরুদ্ধবাদী আত্মীয়দের মুখে ছাই দিয়ে রমলা সগৌরবে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে আপিসে বেরুতে আরম্ভ করলে। চাকুরিতে বহাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেড়'শ টাকা মাইনে—তা ছাড়া কাজ দেখাতে পারলে তর্ তর্ করে উপরে উঠে যাবার সিঁড়ি ত তার সামনে খোলাই রয়েছে। রূপ-যৌবন ও বিদ্যার অহঙ্কারে গরবিণী রমলা আর্থিক স্বীকৃতি লাভ করে বিজয়িনী হয়ে উঠল। এই সাফল্যে সবচেয়ে বেশী খুশী হলেন রমলার বাবা রাধাকান্ত বাবু। খুব চাপা লোক, তবু খুশীর উত্তেজনা তিনিও চেপে রাখতে পারলেন না। সুহাসিনী চা দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, রাধাকান্ত বাবু ডেকে বললেন, "শোন—এবার হ'ল তো। রমুর চলাফেরা নিয়ে রোজ যে চেঁচামেচি করতে... এবার। এবার মাইনের টাকাগুলো কার ঘরে আসবে শুনি ?"

সুহাসিনী শান্তকণ্ঠে জবাব দেন, "তা না হয় দু'চার দিন টাকাকড়ির সুবিধেই হ'ল। কিন্তু মেয়ে ত তোমার চিরকাল চাকরি করে কাটাবে না। আজ হোক—কাল হোক বিয়ে তোমাকে দিতেই হবে। তখন দেখো—কত কথা ওঠে মেয়ের চাল-চলন নিয়ে।"

রাধাকান্তবাবু বাঁকা হেসে বললেন, "রমুর জন্ত এখনও আমাদের পাত্র জোগাড় করে আনতে হবে ? এখনও পাত্রপক্ষ এসে দরকষাকষি করে, মেয়ের রঙ দেখে, চুল টেনে, হাঁটা পরখ করে তবে মেয়ে ঘরে নেবে ?" রাধাকান্তবাবু শব্দ করে হেসে উঠলেন।

"এটা আমাদের সেই পুরনো কাল নয়। রমুর বিয়ের জন্ত তোমাকে—আমাকে, কাউকে ভাবতে হবে না। রমু নিজের বর নিজেই জুটিয়ে নেবে—তুমি ঠিক দেখে নিও।"

মাস ছয়েকের মধ্যেই সারা আপিসে অতিশয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রমলা। মজুমদার সাহেবের নেকনজরে পড়েছে নূতন তরুণী টাইপিস্‌ট—এই নিয়ে কেরাণীমহলে চাপা কানাঘুষা, হাসি-ঠাট্টা আর রহস্যালাপের অন্ত নেই। তার দু'চারটে খুচরো মন্তব্য ছিটকে রমলার কানেও এসেছে—কিন্তু সে তা গ্রাহ্য করে নি। স্বভাবচরিত্র নিয়ে নিন্দা আর বক্রোক্তি তার গা-সওয়া হয়ে গেছে।

রামলোচন তরফদার এই আপিসের সব চাইতে প্রাচীন কেরাণী। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—কিন্তু মনটা কাঁচা—রসে ভুরভুর। সবাই তাকে বড়দা বলে ডাকে। সকলের সকল অসুবিধায় বড়দার পরামর্শ অপরিহার্য্য। আর সাহায্য কেউ না চাইলেও তিনি যেচে সাহায্য দিতে কোন দিন কুণ্ঠিত নন। সব সময়েই হাসিখুশী—হাতে পানের ডিবে। এক-রাশ করে পান খান, আর মন মন নস্ত নেন। আপিসের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁর জানা—তাই বড়দাকে কারো না কারো সব সময়েই প্রয়োজন।

সেদিন বড়দা নিজে থেকেই বললেন রমলাকে, "দিদি, তোমার বরাত খুব ভাল। দু'দিনেই মজুমদার সাহেবের চোখে পড়ে গেছ। তোমার কাজ দেখে ভারি খুশি। কাল তোমার কথাই আলাপ হচ্ছিল...।" এই বলে একগুচ্ছের পান নিজের মুখে ঠেসে দিলেন বড়দা।

রমলা চট্ করে কি জবাব দেবে ভেবে পেলে না। শুধু বললে, "ভুলচুক যদি কিছু হয় আপনি শুধ্‌রে দেবেন বড়দা।"

হা হা করে হেসে উঠলেন বড়দা, "বল কি দিদি—একি তোমার বলবার অপেক্ষায় আছি। যখনই যার কোন কিছুতে বাধা ঠেকবে, তোমাদের এই বড়দাকে ঠিক তখনই পাশে দেখতে পাবে দিদি।" এই বলে খুব জোরে এক টিপ্‌ নস্ত নিলেন বড়দা।

এমন সময় মজুমদার সাহেবের ঘর থেকে রমলার ডাক এল।

ছোকরা কেরাণী প্রিয়তোষ ক'দিন থেকেই রমলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পাত্তা না পেয়ে সে-ই রমলার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচক হয়ে দাঁড়িয়েছে ইদানীং। রমলা চলে যেতেই বড়দার দিকে ইশারা করে চাপা-গলায় বললে প্রিয়তোষ, "ব্যাপার কি বড়দা—সাহেবের ঘর থেকে যে খুব ঘন ঘন ডাক আসছে। জমে উঠতে আর দেরি নেই।"

পাশের চেয়ার থেকে আর একজন টিপ্পনি কাটল, "কতই ত দেখলাম দাদা। ও জমতেও দেরি হয় না, আবার গলে যেতেও বেশী সময় লাগে না।"

বড়দা কৃত্রিম শাসনের সুরে ধমকে উঠলেন, "বড়কর্ত্তা, ছোটকর্ত্তার কেচ্ছা নিয়ে তোমাদের কে মাথা ঘামাতে বলেছে অধিকারী। নিজের চরখায় তেল দাও গে—পঁচাত্তর টাকার কেরাণীকে আর স্বপন দেখতে হবে না।"

"বসুন"—গম্ভীরভাবে মজুমদারসাহেব রমলাকে বললেন।

এর আগে মজুমদারসাহেব কোন দিন তাকে খাতির করে বসতে বলেন নি। কাজের জন্ত ডেকেছেন—কাজ বুঝে নিয়ে সে চলে এসেছে। একটু ইতস্ততঃ করে, কুণ্ঠিতভাবে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল রমলা। বুকটা তার দুরু দুরু করছে। কি বলবেন মজুমদারসাহেব—হয়তো বলবেন তাকে দিয়ে কাজ ঠিকমত চলছে না। সুতরাং তাকে আর রাখতে পারলেন না বলে তিনি দুঃখিত।...কিন্তু আশ্চর্য্য, আপিসের কোন কথাই পাড়লেন না মজুমদারসাহেব।

"আজ আপিসের পর একবার আমাদের ওদিকে যেতে

পারবেন মিস্ সান্যাল ?" খুব তোষামোদের কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মজুমদারসাহেব।

প্রশ্নটার পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে রমলা।

মৃদু হাসি টেনে ব্যাখ্যার ভঙ্গীতে মজুমদারসাহেব বললেন, "আপনি রেকর্ডে গান-টান করেন—সে খবর কেমন করে জানি না বৌদির কানে উঠেছে। তাই আজ বলছিলেন, একদিন নিয়ে এসো না তোমাদের আপিসের সেই ভদ্র-মহিলাকে, চেনা-পরিচয়ও হবে, গানও শোনা হবে। বৌদি বেচারা চিররুগ্না, তাই দু'দণ্ড কারো সঙ্গে কথা কইতে পারলে যেন বর্তে যায়। তা যাবেন আজ ?"

এর পর 'না' বলতে পারে এমন কঠোর এখনও হতে পারে নি রমলা। বললে, "তা আপনার ওখানে যাব—তাতে আর অসুবিধে কি !"

"ঠিক আছে। আপনি আমার গাড়ীতেই যাবেন। নইলে একা গেলে আবার বাড়ী খোঁজার হাঙ্গামা পোয়াতে হবে। দূরও তো বড় কম নয়।"

রমলা উঠতে যাচ্ছিল, মজুমদারসাহেব বাধা দিয়ে বল-লেন, "বসুন না, বসুন।"

বেয়ারা এরই মধ্যে চা ও খাবার দিয়ে গেল। "তা আজ-কাল গান কি একেবারেই ছেড়ে দিলেন ?" এক মুখ কুণ্ডলী-কৃত ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলেন মজুমদার।

"রেকর্ডের দিকে লোকের আর তেমন ঝোঁক নেই আগের মত। তাই ওঁরা খুব নাম-করা গাইয়ে ছাড়া বড় একটা কারুর গান রেকর্ড করতে চান না।" কুণ্ঠিত ভাবে জবাব দিলে রমলা।

"কিন্তু সিনেমা"—লুফে নিলেন মজুমদার, "সিনেমা ত আজকাল ভাল টাকা দিচ্ছে মিস্ স্যান্যাল।"

"তা দিচ্ছে। দু' একটা কোম্পানীতে প্লে-ব্যাক গেয়েও ছিলাম। কিন্তু সব জায়গাতেই আজকাল ধরাধরির ব্যাপার।..."

"বলেন কি মিস্ স্যান্যাল"—উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসলেন মজুমদারসাহেব, "আপনার মত টেলেন্টকেও গান দেবার জন্যে কারো না কারো মাসতুতো কি পিসতুতো বোন হতে হবে ? নো-নেভার। হাঁতান—অমাকরেক মিউজিক ডিরেক্টরের সঙ্গে আমার বিশেষ জানাশোনা আছে। আমি তাঁদের বলে আপনার প্লে-ব্যাক্ গানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এমন গলা... অবশ্য গান সম্বন্ধে আমার মতামতের মূল্য কতটুকু আমি জানি —কিন্তু অমরেশের মুখে আপনার গান সম্পর্কে যা শুনেছি... এমন প্রতিভা শুধু সুযোগের অভাবে ছাইচাপা থাকবে—এটা খুবই স্যাড্ মিস্ সান্যাল...এত বড় অন্যায় আমি ঘটতে দেব না...।"

এর জবাবে রমলার সারা অন্তর কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হয়ে উঠল। টেলিফোন বাজছে। ফোন ধরে রমলাকে উদ্দেশ করে মজুমদারসাহেব বললেন, "আচ্ছা, তবে ঐ কথাই রইলো মিস্ সান্যাল।"

রমলার জীবনে নেমে এলো সমারোহের একটা নূতন জোয়ার—সে উত্তীর্ণ হ'ল অস্তিত্বের এক নব পর্য্যায়ে। আপিসে, পরিজন এবং সহকর্মীদের কাছে আজ রমলার কত কদর। এর মধ্যে দু'দুটো ছবিতে প্লে-ব্যাক গান করে এসেছে রমলা। প্রতিষ্ঠা এবং ঐশ্বর্য্যের দর্পবার উন্মুক্ত হয়েছে তার সামনে।

দামী ঘড়ি, কলম আর সিল্কের জামা কাপড়ের জৌলুসে আজকাল আর চেনাই যায় না রমলাকে। সুহাসিনী মেয়েদের 'ষ্টাইল' করা মোটেই পছন্দ করেন না, কিন্তু রমলার সঙ্গে কথা বলবার সাহস তাঁর আর নেই। রাধাকান্তবাবু এখন হিসেবী হয়েছেন অবস্থার চাপে পড়ে—কিন্তু মাসান্তে ঠিক দেড়শ' টাকাই তাঁর হাতে তুলে দেয় রমলা। সুতরাং মেয়ের বিলাস-ব্যসনের খরচ কে জোগাচ্ছে তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেন না।

আর বেচারা উৎপল ! রমলার বিকীর্ণ জীবন-সমারোহের মাঝে সে যে কোথায় হারিয়ে গেছে—কেই বা তার খোঁজ রাখে। উৎপলের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে প্রেমালাপ করবার সময় নেই রমলার।

তার জীবনে এসেছে নূতন বর্ণবৈচিত্র্য—জেগেছে নূতন প্রাণের স্ফূর্তি।

হঠাৎ সেদিন ট্রাঙ্কের তলা থেকে একখানা ফটো বেরিয়ে পড়ল। নিজের অজ্ঞাতসারেই ফটো দেখে চমকে উঠল রমলা। রমলা ও উৎপলের একত্রে তোলা ফটো—কোন এক ভাব-নিবিড়, দুর্ব্বল মুহূর্তের পাগলামি। অতীতের হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতি ভিড় করে এল তার মনের গহনে। কিন্তু স্মৃতির উৎসকে জোর করে চাপা দিলে রমলা। হাসির বঙ্কিম রেখা ফুটল তার মুখে। এককালে কি বোকাই না ছিল রমলা ! উৎপল তার হাতে হাত রেখে বলেছিল, "বলো, কোনদিন তুমি আমাকে ভুলবে না।"

রমলা মন্ত্রমুগ্ধের মত জবাব দিয়েছিল, "না, ভুলব না।"

"আর কোথাও যদি বিয়ে হয় তবুও না।"

"না—কোনদিনও না।"

অকস্মাৎ আপন মনেই খিল খিল করে হেসে উঠল রমলা। কি ছেলেমানুষের মতোই না উৎপলের কাছে নিজের মনকে বিলিয়ে দিয়েছিল সে। আজ সে সব পুরনো কথা মনে পড়লে অপরিসীম লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে আসে। ওমা—পাঁচটা

যাবে। আর দেরী নয়। মজুমদার হয়তো চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।...

রমলা তৈরি হয়েই ছিল। সে দ্রুত নীচে নামছে। দোতলার সিঁড়ির বাঁকেই উৎপলের সঙ্গে দেখা। কি আপদ!

"এই যে।" উৎপল অস্পষ্ট ভাবে বললে।

"চিনতে পারছ তো?" রহস্য করেই উৎপল বললে।

এর জবাবে রমলা শুধু হাসল। সে হাসির না আছে রূপ, না আছে রঙ।

বললে নিষ্প্রাণ গলায়, "অনেক দিন বাদে যে।"

"এলেই কি আর আজকাল সহজে তোমার দেখা মেলে রমু।" উৎপলের কণ্ঠে বেদনার সুর বেজে উঠল।

"এসো—যেতে যেতে কথা হবে।" দু'জনেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

"তোমার সঙ্গে অনেক কথা ছিল যে।" উৎপল জোর দিয়েই বললে "চলো না কাফি হাউসে বসেই আলাপ হবে।"

রমলার জরুরি তাড়া সত্ত্বেও মুখের উপর সে 'না' বলতে পারল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে উৎপলের অনুসরণ করতে হ'ল। উৎপলের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্য্যন্ত ট্যাক্সি করেই মজুমদারের ওখানে পৌঁছতে হবে রমলাকে।...

...কাফি হাউসে দু'জনে মুখোমুখি বসেছিল—রমলা ও উৎপল। রমলার চুলের গুচ্ছ হাওয়ায় উড়ছিল। পুরনো দিনের স্বপ্ন-জড়ানো কত কথাই না মনে পড়ল উৎপলের, রমলাকে নিয়ে কত আশ্চর্য্য দুপুর, কত মধুর সন্ধ্যা, কত আলো-ঝলমল রাত্রি কেটেছে কাফি হাউসে, রেস্তোরাঁয়, সিনেমায়। সেদিনও এমনি করেই হাওয়ায় দুলত রমলার চূর্ণ কুন্তল, হাওয়ায় এমনি ভেসে বেড়াত তার দেহ-সৌরভ।

প্রথম কথা কইলে উৎপল, "গান-টান কি একেবারেই ছেড়ে দিলে নাকি?"

রমলার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হ'ল। যেন এ ধরণের প্রশ্ন করা উৎপলের পক্ষে রীতিমত একটা স্পর্দ্ধার ব্যাপার। বাঁকা সুরে জবাব দিলে রমলা, "চাকরি বজায় রেখে যতটা পারা যায় তোমাদের ভাষায় যাকে বলে শিল্পচর্চ্চা—তা করছি বৈ কি। শীগ্‌গিরই আমার দুখানা রেকর্ড বেরুবে।"

রেকর্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে উৎপল আক্ষেপের সুরে বললে, "শেষ পর্য্যন্ত তুমিও চাকরিগতপ্রাণ হয়ে উঠলে রমু?"

"আমার তো বাবার জমিদারী নেই যে বসে বসে আরামে সঙ্গীতচর্চ্চা করব।" ঝঙ্কার দিয়ে উঠল রমলা।

"সে তো আমাদের কারুরই নেই রমু। কিন্তু তা নেই বলে জীবনের চেয়ে জীবিকাকে বড় হয়ে উঠতে দেব কেন? শিল্পীর কাছে শিল্প একটা তপস্যা। তুমি চাকরি করছ সেটা বড় কথা নয়, তুমি গায়িকা সেইটেই তোমার আসল পরিচয়।" বলতে বলতে ভাববিহ্বল হয়ে উঠল উৎপল।

"শিল্পীর তপস্যা!" শ্লেষের সুরে রমলা মুখ বাঁকাল, "সারাদিন তুলি আর রঙ্ নিয়ে মাতামাতি করে মাসে ক'টাকা রোজগার কর তুমি?" বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ তীর হানল রমলা, "বন্ধুরা ছবি দেখে শিল্পী বলে বাহবা দেয়, শুভানুধ্যায়ীরা উৎসাহ দেন, সমালোচকরা কাগজেকলমে শিল্প-সম্রাটের আসনে বসিয়ে দেন—কিন্তু ছবি বেচে যা রোজগার হয় তাতে যে আজকাল কোন ভদ্রলোকের জামা-জুতোর খরচাই কুলোয় না উৎপল।"

মসীবর্ণ হয়ে এল উৎপলের মুখ। রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "শিল্পের পক্ষে তার আর্থিক মূল্যটাই তো বড় কথা নয় রমু।"

"ঐ মিথ্যে সান্ত্বনাটুকু আছে বলেই তো এমন করে আমরা বেঁচে আছি। একে আর যাই বল—শিল্পীর গৌরব বলে জাহির করবার চেষ্টা করো না উৎপল।" এই বলে উঠে দাঁড়াল রমলা, কিন্তু আর কথা নয়—ছ'টা তিরিশে আমাদের গানের জলসা—এবার উঠতে হ'ল।

উৎপলের মনে কত কথাই না জমা হয়ে ছিল রমলাকে বলবার জন্যে, কিন্তু এর পর আর কথা চলে না।

রুগ্না ভদ্রমহিলাকে গান শোনাবার সূত্র ধরে মজুমদার-সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার যে নূতন অধ্যায় সুরু হয়েছিল রমলার জীবনে, তার পরিণতি যে এই হবে—প্রথমে সে তা বুঝতে পারে নি। নাম, যশ, অর্থ আর সম্মানের দুর্নিবার আকর্ষণে সে উল্কাগতিতে ছুটে চলেছিল প্রলোভনের বহ্নি-গর্ভে। তার পর যখন নিজের সত্যিকার অবস্থাটা বুঝতে পারলে রমলা—তখন পেছনে ফেরবার আর উপায় ছিল না।

মজুমদারসাহেবের সঙ্গে আপিসের সম্পর্ক ছাড়িয়ে রমলার ঘনিষ্ঠতা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল—প্রথমে সে তা বুঝতে পারে নি। কিন্তু রমলার চমক ভাঙল সে সম্পর্কের শোচনীয় পরিণতির আশঙ্কায়। কিন্তু তখন ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। গানের রাজ্যে প্রতিষ্ঠা পাবে রমলা—এই মোহই তাকে দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গভীর আবর্তে। মজুমদার তাকে বিয়ে করবে এমন ইঙ্গিতও সে পেয়েছিল। কিন্তু এদের স্বরূপ জানতে রমলার তখনও দেরি ছিল। যখন নিজের সত্যিকার অসহায় অবস্থার কথা বুঝতে পারলে, তখন তার আত্মগ্লানির সীমা রইল না।

দুর্ভাবনায় যৌবনের দীপ্তি নিভে গেছে রমলার, চোখের কাজলকে ছাপিয়ে উঠেছে কালির রেখা। দেখেই মনে হয় যেন তিল তিল করে অনুশোচনায় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে রমলা।

এই দুঃসময়ে মনে পড়ল উৎপলের কথা। কিন্তু বসন্ত-

বাহারের সোনালী দিনে যাকে সে অবহেলায় ফিরিয়ে দিয়েছে, আজ ঝরা-পাতার দিনে তাকে ডাকতে যাবে কোন্ লজ্জায়!...

প্রস্তুত হয়েই ছিল রমলা—এমন সময় ডাক এল মজুমদারসাহেবের ঘর থেকে।

"দেখুন মিস্ সান্যাল, আমি অনেক ভেবে দেখলাম।" কোন ভণিতা না করে স্পষ্ট ভাবেই বলতে সুরু করলেন মজুমদারসাহেব, "আমার মনে হয়, আপনার দিনকতক বাইরে চলে যাওয়াই উচিত। মুসৌরি, দার্জিলিং কিংবা রাঁচি। তাতে আপনার শরীরও সম্পূর্ণ সেরে উঠবে আর মনও ভাল থাকবে।"

রমলা বিবর্ণ হয়ে এল—যেন ফাঁসির হুকুম শুনছে।

মৃদু কণ্ঠে বলতে চেষ্টা করলে, "কিন্তু।" মজুমদার থামিয়ে দিয়ে বললেন, "সে আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি। এই পাঁচশ টাকা কোম্পানী আপনাকে চিকিৎসাবাবদ দিচ্ছে। তা ছাড়া সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে এলে আপনার মত মেয়ের পক্ষে কাজ একটা জুটিয়ে নেওয়া মোটেই শক্ত হবে না মিস্ সান্যাল।" টেবিলে চাপা দেওয়া ছিল পাঁচ শ টাকার নোট। মজুমদার টাকাগুলো রমলার হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, আপনি আসুন।"

রমলা নিষ্কৃতির জন্য ব্যাকুল—এখন সে শুধু অবাঞ্ছিতই নয়,—যে কোন সময় মজুমদারের মুখোস সে টান মেরে খুলে ফেলতে পারে, এইজন্য মজুমদার তাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচেন।

ছি: ছি:, ঘৃণায় লজ্জায় রমলার সারাদেহ রি রি করে উঠল। মজুমদারকে তার আগেই চিনতে পারা উচিত ছিল। তার আগেই বোঝা উচিত ছিল—এরা যাকে বিয়ে করে, তাকে ভালবাসে না। আর যার সঙ্গে ভালবাসার ভান করে, তাকে ঘরে নেয় না।

স্তিম্বিত, কুণ্ঠিত, ম্রিয়মাণ রমলা মজুমদারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু তার পর? চিরটা কাল যে তাকে লোকের টিটকারি-বিদ্রূপ শুনতে হবে!

...রমলার পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে। টলতে টলতে বেরিয়ে এল সে। পৃথিবীর বুকে এখন রাত্রির ছায়া নামছে—যেন তার জীবনের গ্লানিকে ঢেকে দেবার জন্য ছুটে আসছে ছায়াময়ী বিভীষিকা।

একটি দিনের স্মৃতি

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

১৯১৮ সাল। তখন আমি আদি ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে আহারাদি করি ও সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। ঐ বৎসরই আমার কবিতা প্রথম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাহির হয়। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া একটি কবিতা লিখিয়া প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গেলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশের গলির একটি বাটীর কক্ষে রচনার পাণ্ডুলিপি লইয়া তিনি তন্ময় ছিলেন; কিন্তু এই অপরিচিত বালকের প্রতি তাঁহার মনোযোগও কম হইল না। আগ্রহ সহকারেই কবিতাটি দেখিলেন, সস্নেহে দোষ-গুণ বিচার করিলেন ও 'সন্দেশ' কিংবা 'শিশু'তে পাঠাইতে উপদেশ দিলেন। আমার বিফলতার দুঃখও সহৃদয়তার আনন্দে ঢাকিয়া গেল।

সুদীর্ঘকাল প্রবাসীর নিয়মিত পাঠক হিসাবে উপলব্ধি করিয়াছি তাঁহার প্রজ্ঞা তাঁহাকে ভারতের প্রথম শ্রেণীর মনীষীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। শিক্ষাপীঠের সীমাবদ্ধ-ব্রত ও কর্তৃত্ব ছাড়িয়া তিনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাধারণ দেশবাসীর শিক্ষার ব্রতে উদ্যোগী হইয়া প্রবাসী, বিশাল ভারত ও মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকাত্রয় প্রবর্তন, সম্পাদন ও পরিচালনায় অসীম সাফল্যলাভ করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বাত্মক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই-গুলি ভারতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সমালোচনার দৃষ্টির সূক্ষ্মতা তাঁহার নির্ণীত বিষয় বিরোধী পক্ষকে মূক করিয়া দিত। অশিবকে বর্জন করিবার ক্ষমতা তাঁহার মত খুব কম লোকেরই ছিল। গুণীকে চিনিয়া কাজে লাগাইবার পটুতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। অনেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে এই স্থিতধীকে আদৌ বিচলিত করিতে না পারিয়া পরাস্ত হইয়াছিল। আধুনিক যুগের এই সত্যসন্ধ পুরুষকে প্রণাম করি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে পল্লীকর্ম্মীর স্মৃতিকথা

শ্রীসত্যভূষণ দত্ত

কয়েকটি বছর চলিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু যাঁর ঋষিসদৃশ সৌম্য মূর্ত্তি আজও মানসপটে সুস্পষ্ট রেখাপাত করিয়া রহিয়াছে—যাঁর সুমধুর স্নেহাপ্লুত বাক্যাবলী আজও কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে, সেই মহানুভব মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে প্রথমেই আমার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া তাঁহার সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ছেলেবেলা হইতেই দেখিতাম পিতৃদেব 'প্রবাসী'র গ্রাহক ছিলেন এবং মাঝে মাঝে উক্ত পত্রিকায় লেখাও পাঠাইতেন। তখনও স্কুলের পড়া শেষ হয় নাই। শহরে ছিলাম। মাঘ মাস। বাড়ী আসিয়া দেখিলাম পাড়ার মেয়েরা বেশ ঘটা করিয়া "সূর্য্যের ব্রত" করিতেছেন। ব্রত দেখিয়া খেয়াল চাপিল এই ব্রত সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইবে। ছোট একটি প্রবন্ধ লিখিয়া বরাবর প্রবাসী-সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তিন-চার মাস পরে প্রবন্ধটি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া মাঝে মাঝে ছোট ছোট লেখা 'প্রবাসী'তে পাঠাইতাম। কোনটা বা ছাপা হইত, কোনটা বা ফেরত আসিত।

এই সকল রচনার মাধ্যমে প্রবাসীর সহিত আমার যোগসূত্র স্থাপিত হইল এবং রামানন্দ বাবুর সহিত পত্রালাপেরও সূত্রপাত হইল। ১৯২১ সনে শ্রীহট্টের 'জনশক্তি' পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে কিছুকাল কাজ করিবার পর আমি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এবং ভক্তিভাজন রামানন্দের আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া পিতৃদেবের আদেশে কুশা শিল্পবিভালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করি। পিতৃদেব ৺শশীভূষণ দত্ত ১৯১৯ সালে কুশা শিল্পবিভালয়ের গোড়াপত্তন করেন।

কুশা শিল্পবিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করার পর চারিদিক হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি পাইতেছিলাম। ইহার দরুন নূতন উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলাম। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাজের বিবরণ বাহির হইতে লাগিল। এমন কি এই ক্ষুদ্র পল্লী-প্রতিষ্ঠানটির কর্ম্মপ্রচেষ্টার সচিত্র বিবরণ ১৩৩৪ সালের মাঘের প্রবাসীতে প্রকাশিত করিয়া সম্পাদক মহাশয় ইহার কর্ম্মীদের মনে একটা নূতন প্রেরণা জাগাইয়া দিলেন। যাহাতে সমগ্র বাংলা ও পার্শ্ববর্ত্তী সুরমা উপত্যকায় এই কুটীর-শিল্পের প্রচার ও প্রসার হয় আমাদের দৃষ্টি তৎপ্রতি নিবদ্ধ ছিল, সেইজন্য নানা স্থানের শিল্পপ্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া হাতে-কলমে কাজ দেখাইয়া লোক-চিত্তে কুটীরজাত শিল্পের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইলাম। ইহাতে যে বেকার-সমস্যার সমাধানের কতকটা সহায়তা হইতে পারে তাহাও দেখাইতে ত্রুটি করি নাই।

এই বৎসরই ফাল্গুন মাসে শিলচর শহরে সুরমা উপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। কর্ত্তৃপক্ষ ইহার সঙ্গে একটি বিরাট শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবার জন্য শিলচরে আসেন। সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে যথাসময়ে শিলচর শহরে উপস্থিত হইলাম। রামানন্দবাবুর দর্শনলাভ করিবার জন্য ভিতরে ভিতরে বিশেষ ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছিলাম। সভাস্থলে পৌঁছিয়া দেখি সভামণ্ডপ লোকে লোকারণ্য। মঞ্চোপরি শুভ্র কেশ, শুভ্র শ্মশ্রু-বিমণ্ডিত, শুভ্র বেশ পরিহিত সভাপতি রামানন্দ সমাসীন। তখনও সভার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। তাড়াতাড়ি মঞ্চোপরি উঠিয়া প্রণাম করা মাত্রই আমাকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া কি বলিতে যাইবেন, এমন সময় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় কামিনীকুমার চন্দ পরিচয় করাইয়া দিলেন। চন্দ মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই আমাকে বিশেষভাবে জানিতেন। আমি কর্ম্মিগণসহ উপস্থিত হইয়াছি জানিয়া রামানন্দবাবু অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি তাঁহার মহানুভবতা ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইলাম। আমার আসন প্রেস গেলারীতে নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেখানেই গিয়া বসিলাম।

সভার কাজ শেষ হইলে পর প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। রামানন্দবাবু ষ্টলগুলি ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে অবশেষে আমাদের ষ্টলে উপস্থিত হইলেন, এবং খুব মনোযোগ সহকারে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের হাতে তৈরি শিল্পদ্রব্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ষ্টল পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমাকে পরদিন প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলিয়া গেলেন। তিনি চন্দ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতে চা-পর্ব্ব শেষ করিয়াই চন্দ মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিলাম, সেই সকালবেলায়ই বেশ ভিড় জমিয়াছে, কয়েকজন মহিলাও আসিয়া হাজির হইয়াছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে পৌরোহিত্য, বক্তৃতা প্রদান ইত্যাদির অনুরোধ লইয়াই তাঁহারা আসিয়াছেন—খুব অল্প সময়ই আমার সঙ্গে আলাপ হইল। কিন্তু তাঁহার হিত এবং মনোহারী বাক্যাবলী আজও আমার কানে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। "হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ" কথাটার যাথার্থ্য আমি রামানন্দবাবুর সহিত

আলাপ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। পূর্ব্বে রামানন্দবাবুকে আমি কালে ভদ্রে পত্র লিখিতাম, কিন্তু সুরমা উপত্যকা সাহিত্য সম্মেলনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হওয়ার পর ঘন ঘন চিঠি লিখিতে লাগিলাম। আমার পরম সৌভাগ্য যে, কখনও তাঁহার নিকট হইতে পত্রের জবাব পাইতে বঞ্চিত হই নাই। শিলচর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি আমাকে যে পত্র লেখেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

২-১, টাউন্‌সেণ্ড রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা
১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ বাং
২-৬-২৮।

শ্রীতিভাজনেষু,

তোমার চিঠি ঠিক সময়ই পাইয়াছিলাম। উত্তর দিতে বড় বিলম্ব হইল, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবে।

তুমি যে আমার সম্বন্ধে কোন অসম্মানকর মন্তব্য করিবে, এ কল্পনাও আমার মনে কখন উদিত হয় নাই।

ত্রিপুরা গাইড্ রোজ হয় আমাদের আসে। কিন্তু আমি প্রায় কোন কাগজই পড়িবার অবকাশ পাই না। আমার মৌখিক বক্তৃতা তোমার ভাল লাগিয়াছিল জানিয়া সুখী হইলাম। সুরমা সাহিত্য সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষের এক অনুরোধ এখানে আসিয়া পাইয়াছিলাম মৌখিক বক্তৃতাগুলি লিখিয়া দিবার জন্য। কিন্তু তাহা ঠিক মনে না থাকায় এবং সময়ের অভাবে লিখিয়া দিতে পারি নাই।

তোমার পিতৃদেবের ব্লক ও তাঁহার জীবনীর cutting-টি পাঠাইতে পার। ব্যবহার করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু দেরী হইলে রাগ করিও না।

শুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—

তোমার সহিত শিলচরে দু'দণ্ড গল্প করিতে না পারায় মনে অতৃপ্তি বোধ করিয়াছি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

অতঃপর ১৯৩৪ সালের মার্চ্চ মাসে কলিকাতা নিখিল-ভারত শিল্প প্রদর্শনী ও বসিরহাট (২৪ পরগণা) প্রদর্শনী হইতে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান আসিল। বসিরহাট প্রদর্শনী কমিটি আমাদের ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি জানাইয়া বিশেষ অনুরোধ করিলেন যেন একজন কর্ম্মীসহ কলিকাতা যাই। সে সময় একদিন আমার আত্মীয়, মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকার তখনকার অন্যতম সহঃ সম্পাদক ৺নৃপেন্দ্রলাল দত্ত সহ রামানন্দবাবুর ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে যাই। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বাহিরে থাকায় সাক্ষাৎলাভ ঘটে নাই। কিন্তু 'প্রবাসী'তে সেবারও আমাদের প্রতিষ্ঠানের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশিত হয়।

কুণ্ডা শিল্প বিদ্যালয়টির প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ-দৃষ্টি সর্ব্বদাই সজাগ ছিল। বিদ্যালয়ের কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিবরণ তিনি বার বার সমাদরে প্রবাসীতে স্থান দিয়াছেন। এমন কি সময় সময় তিনি আমার লিখিত পত্রের অংশবিশেষ প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গে' মুদ্রিত করিয়া পত্রের গুরুত্ব বাড়াইয়া দিয়াছেন। গঠন-মূলক কর্ম্মের প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল ইহা তাহারই প্রমাণ এবং সুদূর মফস্বলের একটি ক্ষুদ্র গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের নগণ্য কর্ম্মী হইয়াও যে আমি তাঁহার স্নেহলাভ করিতে পারিয়াছিলাম সেটা আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।

প্রবাসীর দৌলতে কুণ্ডা শিল্পবিদ্যালয়ের কথা দেশের শিক্ষিত-মহলে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। একবার কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত নিখিল-বঙ্গ মহিলা সম্মিলনীতে শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবী ও ৺জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী আসেন। সেখানেও একটি বিরাট শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন হয়। তাঁহারা বলেন যে, কুণ্ডা শিল্পবিদ্যালয়ের বিবরণ প্রবাসীতে পড়িয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি রামানন্দবাবু ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনুরাগের কথা বিশেষ ভাবে বলেন।

আমাদের শিল্পবিদ্যালয়ের কাজে তিনি কিরূপ উৎসাহ দিতেন তাহার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার একখানা পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :

কল্যাণীয়েষু,

আপনার প্রেরিত পার্সেলটি কাল পাইয়াছি। জিনিষগুলি বেশ সুন্দর।

শিল্পবিদ্যালয়ের এক একটি বিভাগের এক একখানি ফোটো-গ্রাফ পাঠাইলেই হইবে। প্রক্রিয়া দেখাইবার দরকার নাই। কারিগররা যখন কাজ করে সেই সময়ে ফোটোগ্রাফ তুলিলেই হইবে। ফোটোগ্রাফগুলির সঙ্গে শিল্পবিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও দিবেন এবং কি কি জিনিষ তৈরি হয়, কাটতি কিরূপ, এবং কলিকাতায় বা অন্যত্র বিক্রয়ের বন্দোবস্ত আছে কি না, লিখিয়া দিবেন। জিনিষগুলির দামের একটা তালিকা দিলেও মন্দ হয় না।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রামানন্দবাবু নানা দিক দিয়াই বড় ছিলেন। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের যে দিকটির সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল আমি তাহারই আভাস দিবার চেষ্টা করিলাম। দেশের

যেখানেই গঠনমূলক কাজ হোক না কেন, তাহা তাঁহার সহানুভূতি লাভে সক্ষম হইত। মানুষই হোক, আর প্রতিষ্ঠানই হোক ছোটকে ছোট বলিয়া যে তিনি তুচ্ছ করিতেন না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি তাহার সাক্ষ্য দিতে পারি। স্বাধীন ভারতে আমরা যদি জাতিগঠনমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করি, কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবন করিয়া পল্লীর উন্নয়নে মনোযোগী হই তাহা হইলে রামানন্দের আত্মার পরিতৃপ্তি হইবে।

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সম্প্রতি দেশে গিয়েছিলাম। দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকেদের সঙ্গে অনেক বিষয় খোলাখুলিভাবে আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছি। সকলের মুখেই অভাব, অভিযোগ, নানারকমের অসুবিধার কথা শুনেছি; প্রত্যেকেরই কথা শুনে মনে হয়েছে কেউই সুখে শান্তিতে নেই—সকলেই যেন অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছে। যাদের অর্থ আছে তারা অন্যান্য অনেক রকমের অসুবিধার অশান্তিতে আছে, যাদের অর্থ নেই, তাদের ত কথাই নেই, বেঁচে মরে আছে। এদের সংখ্যাই বেশী।

বেশীর ভাগ লোক স্বাধীনতার 'স্ব'ও বোঝে না, উপলব্ধি করা ত দূরের কথা। তারা বরং স্বাধীনতাকে অভিসম্পাত দিচ্ছে। এত বড় একটা "নির্ব্বাচন পর্ব্ব" শেষ হ'ল; কত দল উপদল আসরে নামলেন, দেশের জনসাধারণ তাদের নামও বলতে পারে না—তারা কেবল 'কংগ্রেসে'র নামের সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু তা বলে তারা সকলেই কংগ্রেসের পক্ষে নয়; কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেকের অনেক রকমের অভিযোগ। প্রধানতঃ "মুরুব্বিদের" কথা অনুসারেই বেশীর ভাগ লোক ভোট দিয়েছে। দল উপদলের বা যাঁদের ভোট দিয়েছে তাঁদের বিষয় কিছুই জানে না। কংগ্রেস-কর্ম্মিগণকে এক জন কংগ্রেসপ্রার্থীর বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁরা বললেন প্রার্থীর যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই জানেন না—যেহেতু তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী, তাঁরা সেইজন্য তাঁর পক্ষে প্রচারকার্য্য করছেন। অন্য দলের প্রার্থী সম্বন্ধেও একই উত্তর পেয়েছিলাম।

কংগ্রেসের পক্ষে বিপক্ষে ভোট দেবার অনেক যুক্তি শুনেছি। কেউ কেউ বলেছিল কংগ্রেস পাটের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে সেইজন্য কংগ্রেসকে ভোট দেবে। আবার কেউ কেউ বলেছিল, 'কন্ট্রোলে'র দোকানে সমস্ত দিন অপেক্ষা করেও একখানা কাপড় পাওয়া যায় না—অথচ 'বাবু'রা পেছন দিক দিয়ে ঢুকে কাপড় নিয়ে যায়—এই কারণেই কংগ্রেসকে ভোট দেবে না। আবার কেউ কেউ বলেছিল—আমরা 'ছুটে' কংগ্রেসীদের কথা শুনব না, মন্ত্রীরা এসে যদি ভোট চান আমরা ভোট দেব। এই রকম অনেকের মুখে অনেক রকম কথা শুনেছিলাম। এখন নির্ব্বাচনের পরের কথা হচ্ছে—নির্ব্বাচনের জন্য কত লোক কত টাকা অকাতরে খরচ করলেন, কিন্তু পল্লীর উন্নতির জন্য কেউ এক কপর্দকও ব্যয় করলেন না। কেউ বা যদি কিছু করে থাকেন তা অন্য খরচের তুলনায় খুবই কম। জনসাধারণ জানে না কে নির্ব্বাচিত হ'ল, কে হ'ল না—কার কি গুণ।

গত বৎসর কৃষি ও খাদ্যসচিব যখন ঐ অঞ্চলে গিয়েছিলেন তখন পুরস্কারলাভের আশায় 'কম্পোষ্ট' তৈরি করবার 'হিড়িক' পড়ে গিয়েছিল; অনেকেই পুকুর, ডোবা, খাল ইত্যাদি থেকে কচুরিপানা তুলে পাড়ের ওপর জমা করেছিল, খাদ্যসচিব দেখে আনন্দপ্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেউ কম্পোষ্ট তৈরির দিকে তেমন মনোযোগ দিলে না—তবে অনেকেই পুরস্কার পেয়েছিল। এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে কত টাকার 'শ্রাদ্ধ' হয়েছে জানি না; তবে নিজের অঞ্চলের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে বিশেষ কোন স্থায়ী ফল হয় নি। এবারে কারও পুকুর বা ডোবার পাড়ে কচুরীপানার একটা গাদাও দেখি নি। অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সকলের কাছেই এক উত্তর পেয়েছি—সরকারকে বলুন আমাদের "জাওলা" গুলো কেটে দিক, আমাদের আর কিছু চাই না।

আজকাল পুরস্কারের হুড়াহুড়ি চলছে, কিন্তু তার কি ফল হয়েছে বা হচ্ছে? গত বৎসর কাছাকাছি অঞ্চলের এক জন আলুর ফলন দেখিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। এখন সে সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে। এ বৎসরও এই অঞ্চলের এক জন ফলন দেখিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দাবি করছেন। শুনছি তাঁর ওজনে কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন না; বিষয়টি কতদূর গড়াবে কে জানে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই রকম পুরস্কার দিয়ে স্থায়ী কিছু ফল পাওয়া যাচ্ছে কি? গত বৎসর যে এলাকায় পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল, এ বৎসর সে এলাকায় আলুর চাষ ৫ বেড়েছে

কি? সে এলাকায় আলুর গড় ফলন বেড়েছে কি? যিনি গত বৎসর পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি কি এই বৎসর আলুর চাষ বাড়িয়েছেন, তাঁর ফলনই বা কত হয়েছে? এই সকল প্রশ্নের উত্তরের উপরই পুরস্কার দেওয়ার সার্থকতা নির্ভর করে। দু'এক জন ফলন বাড়ালে দেশের কিছুই উপকার হবে না; দেশের গড় ফলন বাড়লেই দেশের উপকার হবে। গড় ফলন বাড়ানোর উপায় অন্ত রকম—যথা, উপযুক্ত সময়ে প্রত্যেক অঞ্চলের জন্ত উপযুক্ত শ্রেণীর উপযুক্ত পরিমাণ বীজ সরবরাহ, সার সরবরাহ, জল সেচনের ব্যবস্থা ইত্যাদি। বীজ ও সার সরবরাহ সম্বন্ধে কৃষকদের অভিযোগ যথেষ্ট আছে—কিন্তু সে অভিযোগ দূর করবার দিকে কর্তৃপক্ষের কোন মনোযোগ নেই। এবার যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ফলনের জন্ত পুরস্কার দাবি করছেন তিনিও বলছেন—আলুর চাষে তাঁর যথেষ্ট লোকসান হবে। তিনি পুরস্কারের জন্ত যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে আলুর চাষ করেছিলেন এবং সেই চাষের জন্ত যে পরিমাণ খরচ করেছেন সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির ফসল বিক্রয় করে তাঁর খরচ উশুল হবে না—লাভ ত দূরের কথা। এই রকম খরচ করে ফলন বাড়িয়ে লাভ কি? আর পুরস্কারের সার্থকতাই বা কোথায়?

কম্পোষ্ট সার ব্যবহার করলে ফলন বাড়ে। যাঁরা কম্পোষ্ট সার ব্যবহার করেছেন তাঁরা ফলন বেশী পেয়েছেন এবং ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হয়েছেন। কিন্তু তার দ্বারা দেশের মোট উপকারের পরিমাণ কতটুকু বেড়েছে? ফলন দেখে পুরস্কার দেওয়া হোক্ আপত্তি নেই; কিন্তু স্থায়ী ফল পাবার জন্ত অর্থাৎ ফসলের গড় ফলন বাড়াবার জন্ত অন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কৃষি ও খাদ্যসচিব বলেছেন—কৃষির উন্নতির জন্য জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক। কথাটা খুবই ঠিক; কিন্তু সর্বপ্রথমে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা দরকার, তাঁরা কিন্তু সেই আগের পথেই চলছেন। উপরিওয়ালাদের সংখ্যা এখন খুব বেশী। তা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই বিশেষজ্ঞ এখন আছেন। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নেই বললেই চলে। কৃষক সম্প্রদায়ের অভাব, অভিযোগ, অসুবিধার কথা তাঁরা জানেন না, জানবার চেষ্টা করেন না, বা জেনেও তার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন না। কৃষকদের মতামত তাঁরা গ্রহণ করেন না, জানবারও চেষ্টা করেন না। 'রাইটার্স বিল্ডিংসে' বসেই তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, পল্লী অঞ্চলের অবস্থা না জেনে নিম্নতম কর্মচারিগণের উপর আদেশ জারি করেন। কোন্ কোন্ উপরিওয়ালা, কোন্ কোন্ বিশেষজ্ঞ, কোন্ কোন্ পল্লী অঞ্চলে বৎসরে কত দিন অবস্থান করেছেন—এই প্রশ্নের উত্তর দাবি করা যেতে পারে না কি? বিধান পরিষদে কেউ এই প্রশ্ন করতে পারেন। পাশ্চাত্য দেশ থেকেও নানা কাজের জন্য অনেক বিশেষজ্ঞকে আনানো হয়েছে—তাঁরা না জানেন এ দেশের ভাষা, না জানেন এ দেশের অবস্থা, না জানেন জনসাধারণের মনের পরিচয়। এঁরা পল্লী অঞ্চলে না গিয়েই কলিকাতায় 'রাজার হালে' থেকে পল্লী অঞ্চলের উন্নতির নানা রকম পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন—এঁরা দেশের (পল্লী অঞ্চলের) লোকের মতামতও গ্রহণ করেন না—এঁদের সব আলোচনা হয় রাইটার্স বিল্ডিংসে—পল্লী অঞ্চলে নয়। পল্লী অঞ্চলের লোকেরা (কৃষক সম্প্রদায়) জানে না—কৃষি বিভাগের স্বরূপ কি? কোন্ বিষয়ের জন্ত কে বিশেষজ্ঞ আছেন—এ সম্বন্ধে পল্লী অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোকের কোন জ্ঞান নেই। উপরিওয়ালাদের সঙ্গে পল্লী অঞ্চলের লোকেদের কিরূপ যোগাযোগ আছে "যুগান্তরে" প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানি থেকেই তা স্পষ্ট বুঝা যাবে। পল্লী অঞ্চল যে তিমিরে ছিল, এখনও সেই তিমিরেই আছে, বরং তিমির ক্রমশঃ গাঢ়তর হচ্ছে। কর্মচারীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে "লাল ফিতার" (Red tapism) বহরও বেড়েছে। এখন উপর থেকে একটা নির্দেশ গ্রামে পৌঁছতে পাঁচ ছ'টা আপিস ঘুরে যেতে হয়। যখন পৌঁছয় তখন সে নির্দেশের আর কোন মূল্য থাকে না। এ কথা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। যুগান্তর থেকে উদ্ধৃত পত্রখানি এই:

"কৃষি-বিভাগের অব্যবস্থা

বঙ্গবিভাগের পর সাধারণ পল্লীর প্রতিটি অধিবাসীর সুবিধার্থে কৃষি বিভাগকে বহুলাংশে সম্প্রসারিত করা হয়, তখন হইতেই প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায় এবং প্রতি থানা ও ইউনিয়নে কৃষি কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় —হাওড়া ও হুগলী এই দুই জেলার জন্য একজন কৃষি-অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। উপরন্তু তাঁহার অফিস এই দুই জেলার বাহিরে—আলিপুর এণ্ডারসন হাউসে অবস্থিত। ইহাতে আমাদের যে কত অসুবিধা তাহা একবার কর্তৃপক্ষকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে দক্ষিণ কলিকাতায় যাইতে হইবে। হাওড়া-হুগলী জেলার কৃষি-অধ্যক্ষ মহাশয় আলিপুরে বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া আমাদের এই দুই জেলায় "অধিক খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনার" সাফল্য লাভে আমাদের যে কি ভাবে সহায়তা করিতেছেন ও করিবেন—ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তাঁহার অফিস শ্রীরামপুরে অথবা হাওড়া সদরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান ব্যবস্থা যেমন অসঙ্গত তেমনই অশোভনীয়।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দত্ত
পোঃ—হরিপাল, জেঃ—হুগলী"

রামেশ্বর দ্বীপ ও ভারতের মধ্যে সংযোগ-সেতু

ধনুষ্কোটি ও রামেশ্বর

শ্রীসাধনা চট্টোপাধ্যায়

ত্রিচিনপল্লী হইতে গাড়ী ছাড়িবার কথা রাত্রি সাড়ে নয়টায়, কিন্তু খবর লইয়া জানা গেল এগারটার পূর্ব্বে গাড়ী আসিবারই কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব প্ল্যাটফরমের চলচ্চিত্র দেখা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর রহিল না।

এ চিত্র আমার চিরদিনই ভাল লাগে। ইহাতে শুধু রূপ আর রস নহে, গন্ধ ও স্পর্শও আছে; আর অভিনেতা না হইয়া শুধু দর্শক হিসাবে দেখিলে এ চিত্র পরম কৌতুককর। প্রচুর লটবহর ও সন্তানসন্ততি লইয়া প্রৌঢ় গৃহস্বামীর ব্যতিব্যস্ত ভাব, সর্ব্বাগ্রে গাড়ীতে উঠিয়া আকাঙ্ক্ষিত স্থান গ্রহণ করিবার জন্ত বালক, যুবা ও বৃদ্ধের ঠেলাঠেলি, যাত্রীদলের উল্লাস বা দীর্ঘশ্বাস, মোটবাহীর কোলাহল ও যাত্রীর সহিত বচসা এ সমস্তই যেন বিশ্বজগতের ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। এই সব কোলাহল, অনিশ্চয়তা ও চঞ্চলতার অন্তরালে কোথাও বা মাতা ক্ষুদ্র শিশুকে বুকে করিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছেন, আবার কোথাও বা কোনও তরুণ ও তরুণী একান্তে বসিয়া কল্পনার ও স্বপ্নের আবেশে বিভোর হইয়া রহিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে আসিয়া ষ্টেশনে ষ্টেশনে বাঙালী যাত্রী খোঁজা মজ্জাগত অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সারা প্ল্যাটফরমে চোখ বুলাইয়াও কিন্তু এখানে একটি বঙ্গসন্তানকেও খুঁজিয়া পাইলাম না। কিন্তু যাহাকে পাইলাম সে পাণ্ডা—আর্য্যাবর্ত্তের যাত্রী খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। হিন্দীতে তাহার সহিত ভাবের আদানপ্রদান চলিতে পারে, আর দুই-একটা ভাঙা ভাঙা বাংলা কথা বলাও তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়।

পাণ্ডা রামেশ্বর যামের; ঠিক পাণ্ডা নয়, পাণ্ডার কর্ম্মচারী—বোধ হয় কমিশন হিসাবে কাজ করে। তাহার মতে ধনুষ্কোটি তীর্থ সারিয়া রামেশ্বর দর্শনই সমীচীন। আমরা অবশ্য সেইরূপ ব্যবস্থাই পূর্ব্ব হইতে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম।

রেলপথের কর্ম্মচারীদের আশঙ্কাকে কিঞ্চিৎ অমূলক প্রতিপন্ন করিয়া গাড়ী প্রায় পৌনে এগারটায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, প্রতীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভোগেরও শেষ হইল। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? কামরায় আলো ও জলের অভাব, পাখা চলে না আর আসনগুলিও ধূলিলিপ্ত। পরিদর্শকদিগের নিকট অনুরোধ বা অনুযোগে বিশেষ কোনও ফললাভ হইবার সম্ভাবনা দেখা গেল না; ভাগ্যকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইলাম। গাড়ী ছাড়িবার পর আবার আর এক উপসর্গ দেখা দিল। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্ত এই বিকলাঙ্গ বাষ্পীয় যান হইতে যে ঘর্ঘর ধ্বনি উঠিতে লাগিল তাহা মস্তিষ্কের পক্ষে তীব্র উত্তেজক। রাত্রে ঘুমাইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু তথাপি উত্তপ্ত মস্তিষ্ক যে কোন ফাঁকে নিস্তেজ হইয়া পড়িল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম রথ 'মণ্ডপম্' ষ্টেশনে থামিয়াছে আর যাত্রীর দল ষ্টেশনের জলের কল হইতে জলসংগ্রহ করিতেছে।

আমরাও হাত, মুখ ধুইয়া প্রাতরাশের বন্দোবস্ত করিলাম। ষ্টেশনে চা বা আহার্য্যের কোন ব্যবস্থা দেখিলাম না।

কিছু দূরে সমুদ্রের নীল আভাস দেখা যাইতেছিল।

পরিষ্কার প্রভাত কিন্তু সূর্য্যদেব তখনও উঠেন নাই। ডিসেম্বর মাস, তথাপি শৈত্যের লেশমাত্র নাই; প্রভাতবায়ুতে বসন্তের আমেজ।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সমুদ্র নিকটবর্তী হইতে লাগিল। কাছে, আরও কাছে—সহসা যেন সমস্ত গাড়ীটা সমুদ্রের উপর ভাসিতে লাগিল। সে এক অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি। চাহিয়া দেখি, যে সেতুর উপর দিয়া গাড়ী যাইতেছে তাহা সমুদ্রের জল হইতে অল্পমাত্র উঁচুতে—মনে হয়, গাড়ী যেন জল ছুঁইয়া যাইতেছে। গাড়ীর দুই দিকে সমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলোচ্ছ্বাস আর চঞ্চল বাতাস আরোহিগণকে অভিনন্দিত করিতেছে।
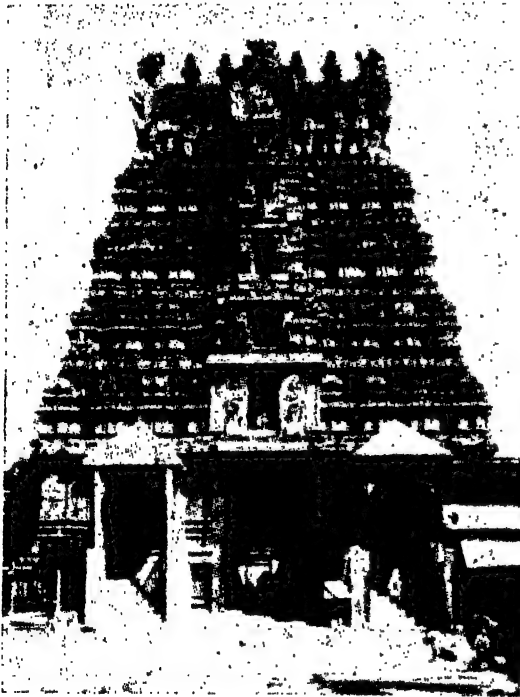
রামেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী তোরণ

সেতুটি বেশ দীর্ঘ, প্রায় দেড় মাইলের মত। ইহাই ভারতবর্ষের স্থলভাগের শেষ সীমার সহিত রামেশ্বর দ্বীপের সংযোগরক্ষা করিতেছে। কারিগরির কৌশলের জন্য এই সেতুর প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু ইহার দৌলতে যাত্রাপথের যে চিত্রটি মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায় তাহার মাধুর্য্য ও স্থায়িত্ব সে শিল্পনৈপুণ্য অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

রামেশ্বর দ্বীপের প্রথম ষ্টেশন 'পম্বনে' গাড়ী থামতেই স্থলপথে সমুদ্রযাত্রার এই অত্যাশ্চর্য্য অনুভূতি মিলাইয়া গেল। 'পম্বন' ক্ষুদ্র জংসন-ষ্টেশন। এক দিকে লাইন সোজা ধনুষ্কোটি চলিয়া গিয়াছে—অন্য দিকে রামেশ্বর। আমরা ধনুষ্কোটির দিকে অগ্রসর হইলাম।

রামেশ্বর দ্বীপ দৈর্ঘ্যে প্রায় দশ মাইল আর প্রস্থে তাহার অর্দ্ধেক। গাড়ী চলিতে লাগিল। চারিদিকে বালুকাস্তরণ, ভূমি অনুর্ব্বর, ফসলের বা কৃষিকার্য্যের চিহ্নমাত্র নাই। মানুষের আবাসস্থলের চিহ্ন কদাচিৎ চোখে পড়ে। ঐ রসহীন ভূমিকে অবলম্বন করিয়া স্থলে স্থলে যে তাল গোত্র-সত্তার জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে নারিকেলশ্রেণীর প্রাচুর্য্য দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে। কণ্টকাকীর্ণ আগাছাও কম নয়।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ধনুষ্কোটি ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। অদূরে ধনুষ্কোটি 'পায়ার'; সেখান হইতে সিংহলের জাহাজ ছাড়ে। গাড়ী সে পর্য্যন্ত যাইবে; কিন্তু আমাদের নামিতে হইবে ঐ ষ্টেশনেই।

ষ্টেশন হইতে ভারত সমুদ্রের তীরে স্নানের ঘাট প্রায় দুই মাইল। সমস্তটা পথ বালুর উপর দিয়া যাইতে হয়—অনেক কষ্ট। যানবাহনের মধ্যে একমাত্র ভরসা গরুর গাড়ী; তাহাও সব সময় জুটিয়া উঠে না। আমরাও হাঁটিয়াই চলিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র শিশুটিকে পাণ্ডার লোক কোলে করিয়া লইয়া চলিল; কিন্তু অপরিচিত লোকের কাছে থাকিতে তাহার বড় অনিচ্ছা। কাজেই তাহাকে লইয়া ঐ দুরতিক্রম্য পথে কিছু বিব্রত হইতে হইল।

ঘাট বলিতে যাহা মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠে, ধনুষ্কোটির ঘাটে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। স্নানের ঘাট বালুবেলাভূমি মাত্র; উত্তাল লবণাম্বুরাশি ক্ষণে ক্ষণে ইহাকে ধুইয়া মুছিয়া দিয়া যাইতেছে।

হাঁটু-জলে স্নানই বিধেয়। ইহা অপেক্ষা গভীর জলে বিপদের সম্ভাবনা। তাহার উপর আবার ক্রমাগত পায়ের নীচ হইতে বালু চলিয়া যাইতে থাকে। শতাধিক লোক আজ স্নান করিতে আসিয়াছে; স্নানের পরে শ্রীরামের উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ ও পূজা। তাহার জন্য পুরোহিত যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের তাপও বাড়িয়া উঠিয়াছে। বালুও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ষ্টেশনে ফিরিবার পথে কষ্ট আরও বেশী হইল।

ফিরিয়া দেখি, ষ্টেশনে রেল গাড়ী প্রস্তুত। গাড়ী 'পায়ার' ষ্টেশনে যাইবে অনতিবিলম্বে। তারপর সেখান হইতে সিংহলের যাত্রী লইয়া সোজা পম্বনে যাইবে—এ ষ্টেশনে আর দাঁড়াইবে না। আমরা আর দ্বিধা না করিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম। মোটবাহীরা বলিল, তাহারা আমাদের ষ্টেশনে রক্ষিত মালপত্র 'পায়ার' ষ্টেশনে লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিবে।

মোটবাহীরা তাহাদের কথা রাখিল বটে, কিন্তু ভাড়া আদায় করিল মাত্রাতিরিক্ত। আর কথা রাখিল ধনুষ্কোটির

হোটেলওয়ালা; সেও আমাদের খাবার টিফিনবাক্সে 'পামান' ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিল। কিন্তু খাদ্য দেখিয়া চক্ষুস্থির! বহু-বর্ষের বিচির মত ভাত, ঈষৎ পীতাভ জলের মত ডাল আর অজ্ঞাতনামা কোন শাক ও সব্জির ঘন্ট! এগুলি কিছুতেই আর গলাধঃকরণ করিতে পারা গেল না। স্নানের সঙ্গে উপ-বাস-পুণ্যের যোগ হইল।

যাত্রী বোঝাই সিংহলের জাহাজ আসিয়া পড়িল। এখানে 'কাষ্টম' পরীক্ষা হয়—কিন্তু পরীক্ষায় বেশীর ভাগই ভরাইয়া যায়। আমাদের গাড়ীতে যে কয়জন যাত্রী স্থান পাইল তাহা-দের অধিকাংশই নূতন নূতন সুটকেশ খুলিয়া কে কোন্ দ্রব্য 'কাষ্টম'কে ফাঁকি দিয়া লইয়া আসিতে পারিয়াছে তাহা একে অন্যকে দেখাইতে লাগিল। এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশই বিদেশে তৈরি কাপড় আর সজ্জাদ্রব্য। শুনিলাম, সিংহল আর ভারতের মধ্যে এইরূপ গোপন ব্যবসা প্রায় প্রকাশ্যেই বহুদিন যাবৎ চলিতেছে—মাঝে মাঝে ইহা প্রসারলাভ করে মাত্র।

আমরা যে কেবল এই গোপন কার-বারের দ্রব্য-সম্ভারের দৃশ্য অবলোকন করিলাম তাহা নহে, আমাদের রসনাও সে গোপন রসের আস্বাদন লাভ করিল। ঐ দলেরই এক ভদ্রলোক আমাদিগকে কিছু আঙুর উপহার দিলেন। আঙুরগুলি খুব বড়, রসাল ও তাজা। শুনিলাম, এপারে ওপারে দামের পার্থক্য বিস্ময়কর।

'পমবনে' গাড়ী বদল করিয়া আমরা অপরাহ্নে আসিয়া রামেশ্বরে পৌঁছিলাম। পাণ্ডার লোক সঙ্গে ছিল; টাঙ্গা করিয়া যাত্রীনিবাসে পৌঁছান গেল।

রামেশ্বর একটি গ্রামবিশেষ আর প্রখ্যাত মন্দিরটিই এই স্থানের শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র আকর্ষণ। গ্রানাইট পাথরে নির্ম্মিত এই বিরাট দেবালয় স্থাপত্যশিল্পে ও আয়তনে এক বিস্ময়ের বস্তু। মন্দিরের দুইটি তোরণ; একটি সমুদ্রের দিকে দক্ষিণমুখী, অন্যটি বাজারের দিকে উত্তরমুখী। তোরণ দুইটি উচ্চতায় এক শত ফুট; তাহাদের কক্ষে রামায়ণ ও অন্যান্য পৌরাণিক চিত্র-লেখার অজস্র সমাবেশ। চাহিয়া দেখিলে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু মন্দিরের সুপ্রশস্ত অভ্যন্তরভাগ, আর মূল মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে দালান তাহার পরিসর চারি হাজার বর্গফুট। সে দালানের স্থাপত্যশিল্প অতুলনীয়। দ্রাবিড়-জাতির ভাস্কর্য্যবিদ্যার এক মহা গৌরবময় নিদর্শন।

তোরণের মধ্যে প্রবেশ করিলেই মনে হয় যেন অন্য এক জগতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ভিতরে, প্রহরে প্রহরে মিছিল করিয়া দেবতার মূর্ত্তি এদিক হইতে ওদিকে লইয়া যাওয়া হইতেছে; মিছিলে হস্তী, অশ্ব, পদাতিক আর চতুর্দ্দোলা কিছুরই অভাব নাই। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য বাজিতেছে, শঙ্খ-ঘণ্টা-রবের অন্ত নাই আর মন্ত্রধ্বনির স্রোত বহিয়া চলিতেছে। এমন মহিমময় পরিবেশ স্বতঃই দর্শকের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবরসের সঞ্চার করে।

প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রামনাদের মহারাজা এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কিন্তু কি করিয়া যে এই দ্বীপের উপর এত বড় একটা সৌধ তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ভাবিতেও বিস্ময় বোধ হয়। এখন মন্দিরে আছেন বার জন মূল পূজারী আর তাঁহাদের সহকারী প্রায় দুই শত পঞ্চাশ জন। সেখানে দৈনন্দিন পূজাও যে কি বিরাট্ ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মন্দিরের বাৎসরিক আয় এখন প্রায় চারি লক্ষ টাকা। মন্দিরের কার্য্যপরিচালনার জন্য একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি আছে—মাঝে মাঝে সমিতির সভ্য অদল-বদল হয়। এই সমিতির কার্য্যকলাপের দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিও সজাগ।
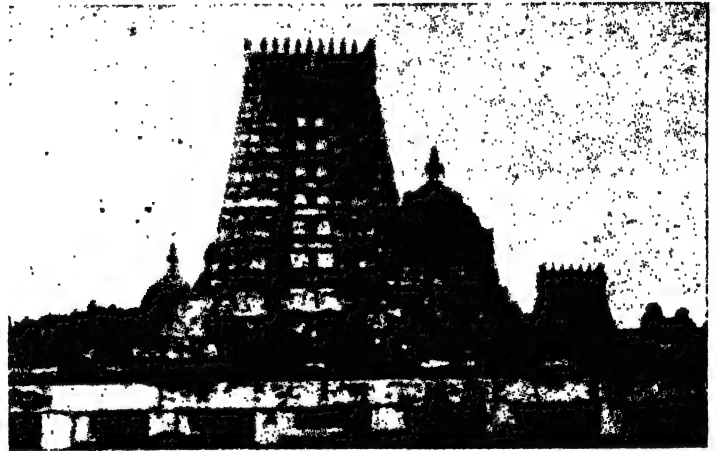
মন্দির ও তোরণ—দূর হইতে

দেবতার রত্নভাণ্ডারে দর্শনীয় জিনিষের ছড়াছড়ি। মহামূল্য প্রাচীন অলঙ্কার আর স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসপত্রের অন্ত নাই। কাঞ্চনমূল্যে দর্শনের অনুমতিপত্র মিলে।

শিবলিঙ্গ স্বর্ণবেদীতে রক্ষিত। লিঙ্গের মস্তকে স্বর্ণনির্ম্মিত সর্পের আচ্ছাদন। কিন্তু দেবাদিদেবকে দূর হইতেই দর্শন করিতে হয়; অন্যান্য মন্দিরের মত এখানে মহাদেবকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না।

রামেশ্বরের মন্দির হইতে মাইলখানেক দূরে তিনটি জলাশয় আছে। সেগুলি যথাক্রমে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতা-দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত। লক্ষ্মণের নামে উৎসর্গীকৃত জলাশয়টিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; আর পাণ্ডাদের মতে এই লক্ষ্মণ-

নহে স্নানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। জলের চেহারা দেখিলে অবশ্য স্নানের লিপ্সা কমিয়া আসে।

ওখান হইতে মাইল দুই দূরে একটি টিলার উপর একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি 'রাম ঝরুকা' নামে খ্যাত। মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন আছে; নিত্য তাহার পূজা হয়। মন্দিরটি কিন্তু পুরাতনও নহে আর ইহাতে স্থাপত্যশিল্পেরও কোন নিদর্শন নাই। বালুকাময় পথ। একমাত্র যান গরুর গাড়ী। পথে এবং মন্দিরের সান্নিধ্যে ভিক্ষুকের অজস্র সমাবেশ। তথাপি এই দ্রষ্টব্য স্থানটিতে না গেলে রামেশ্বর-ভ্রমণ অপূর্ণ থাকিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন্দিরটি একটি টিলার উপর অবস্থিত। সে টিলার উপর উঠিলে রামেশ্বর দ্বীপের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় আর সে পরিচয় মনের মধ্যে বহুদিন অঙ্কিত থাকে।

সামুদ্রিক ঝিনুক, শঙ্খ, কড়ি ইত্যাদির জন্য রামেশ্বর বিখ্যাত। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে এই সুদৃশ্য ও মনোরম দ্রব্যসম্ভারের দোকান অনেকগুলি—দামও অধিক নহে। যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সকলেই কিছু-না-কিছু সংগ্রহ না করিয়া পারে না। শুনিলাম, বেশীর ভাগ জিনিষই সিংহল হইতে আসে আর ওখান হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

রামেশ্বরে আহার্য্য সংগ্রহ এক বিরাট সমস্যা। প্রয়োজনীয় খাদ্য না লইয়া ওখানে যাওয়া সমীচীন নহে। সব্জীর মধ্যে সামান্য আলু পাওয়া যায়, ইহা ছাড়া আর যে সকল জিনিষের সমাবেশ দেখিলাম তাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অখাদ্য।

কিন্তু শারীরিক কষ্টকে দূর করিয়া রাখে মনের প্রফুল্লতা। ওই অপূর্ব্ব মন্দিরটিকে কেন্দ্র করিয়া মন স্বপ্নলোকে চলিয়া যায়।

আমরা যেদিন রামেশ্বর ছাড়িলাম সেদিন সত্যই মনে কষ্ট হইল। তখন রাত্রির তৃতীয় প্রহর; অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে মন্দিরটিকে একটি মায়াপুরী বলিয়া মনে হইতেছিল। নির্জ্জন পথ বাহিয়া আমাদের গরুর গাড়ী সশব্দে ধীরে ধীরে চলিল। আমরা যুক্তপাণি হইয়া আবার দেবাদিদেবকে প্রণাম করিলাম।

কাল হেথা ছিল যারা

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

কাল হেথা ছিল যারা, কোথা আজ গেল তারা।
মিশেছে নিশায় গিয়ে মহাশূন্যে হ'ল হারা ?
শূন্য পানে শূন্য মনে প্রশ্ন করি এই কথা,
জবাব মেলে না তার থাকে শুধু ব্যাকুলতা।

কাল যারা হেথা ছিল কুন্দ-শুভ্র কলিসম,
রূপে রসে ভরপুর দেবশিশু অনুপম;
মা'র কোলে কেন যায় ঘুমাইয়া চিরতরে
ফুটিবার বহু আগে শুকাইয়া শাখা 'পরে ?

স্বপন-কুসুম রচি' কুসুমিত যে কিশোর
হেসে খেলে গেয়ে গান মাতাইত এ আসর;
মঞ্জিত মদন সেই, অন্তহীন তমসায়,
না বাঁধিয়া বীণা-তার কেন ছাড়ি' চলে যায় ?

যৌবনের সপ্ত-অশ্বে ছুটেছিল যারা কাল,
অন্তরেতে এঁকেছিল সাত-রঙা মায়াজাল;
তাহাদের মাঝখানে বিচ্ছেদ-গোধূলি এসে
এক জনে নিয়ে যায় সঙ্গীহীন কোন্ দেশে ?

পূজনীয় ছিল যাঁরা, যাঁহাদের মহাপ্রাণ
বিস্তারিত ছিল হেথা অহর্নিশ অনির্ব্বাণ;
তাঁরাও গেছেন চ'লে দূরে দূরে বহুদূরে
হেথা হতে অন্ত কোন অজানা অচিন্‌পুরে।

অজানা অচিন্ দেশ কেহ নাহি জানে তার,
ফিরিয়া আসে নি কেহ লইয়াছে যে বিদায়;
হেথায় বেঁধেছি ঘর, একখানি ছোট নীড়
স্নেহ, প্রেম, প্রীতি-মাখা সুখে দুঃখে সুনিবিড়।

প্রাণের খেলায় হেথা অনির্দ্দেশ চলি পথ
মরণ-কুহেলি মাঝে চালায়ে জীবন-রথ,
ধেয়ে চলি তারাকালে ঘূর্ণবায়ু উড়াইয়া
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যাই মহাতীতে হারাইয়া।

হে অতীত! নিতি নিত্য নিতেছ হরণ করি'
স্নেহের প্রেমের নিধি যুগ যুগ কাল ধরি;
শুধাই তোমারে সব সুহৃৎ-সন্তান-হারা,
কোথাও কি আছে তারা চলিয়া গিয়াছে যারা ?

হিমাদ্রি সন্ধানে

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

হিমাদ্রি-সন্ধানে চলার পথে আর্য্যাবর্ত্তের যে সকল পুরাকীর্ত্তি আমার মনে বিস্ময়ের আলোড়ন এনেছিল, সেগুলো হচ্ছে প্রয়াগের সুপ্রাচীন যুগের দুর্গের নিম্নতলে পৌরাণিক দেব ও ঋষিগণের মূর্ত্তির সহিত সনাতন অক্ষয় বট, আর খসরুবাগের সমরৈখিক সমাধিশ্রেণী। এই ভবনগুলির কোন কোনটি ত্রিতল, লুপ্তপ্রায় রঙীন চিত্রাবলী ও ফারসী লিপিযুক্ত। আগ্রার তাজ-উদ্যানের সপ্ত সৌধ; প্রথমে চারিদিকে চারিটি দ্বার-মণ্ডপ, শেষাংশে দুই পাশে মসজিদ ও জমায়েতখানা—মধ্যে তাজ-মহল। মসজিদের সম্মুখের প্রথম সারির পাঁচটি প্রস্তরফলক, চারি পুত্রসহ বাদশাহ সাজাহানের উপাসনার আসন। এখানকার পরিখাযুক্ত বিরাট কেল্লার অমর সিংহফটক দিয়ে প্রবেশ করে বাদশাহী আমলের নানা মহল, প্রাসাদ, দেওয়ানী খাস ও আম, আর দুটি মসজিদ দেখা যায়।

হাথরাস হয়ে মথুরার পথে ময়ূর, উটের গাড়ী, মথুরায় কংস-কারাগার, ক্ষীণ যমুনা দেখে টাঙ্গায় ব্রজমণ্ডলে সাত মাইল গিয়ে বৃন্দাবন; এখানে সাড়ে পাঁচ হাজার দেবালয়, কোন কোনটি কেল্লার মত। মদন মোহনের মন্দির সর্ব্বপ্রাচীন—শেঠেদের মন্দিরে বিরাট স্বর্ণধ্বজা বা সোনার তালগাছ। এতে নাকি সাড়ে বার মণ সোনা আছে। ভিতরে চন্দন-কাঠের দণ্ড। বঙ্কিম মর্ম্মর স্তম্ভরাজি শোভিত শাহ কুন্দন-লালের মন্দির। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন এখান-কার প্রধান দেবতা। এঁদের প্রাচীন মন্দিরগুলি বিনষ্ট; নূতন মন্দির বাঙালী জমিদারদের কীর্ত্তি। শহর থেকে যমুনা এক মাইল সরে যাওয়ার ফলে, প্রাচীন ঘাটগুলি অকেজো হয়ে গেছে। এখানকার মরুভূমির মত প্রান্তরে বহু নীল গাই আর ময়ূর দেখা যায়। করিল নামক এক প্রকার কাঁটাগাছ এদেশে জন্মে।

এখান থেকে হাথরাসের অট্টালিকারণ্য, আলীগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, অনুপ সহরের বাঙালী জমিদারদের কাছারি, পুল, অগভীর গঙ্গা, প্রাচীন সৌধরাজি আর বুলন্দ শহরের জনাকীর্ণ পথ ছাড়িয়ে বাসে দিল্লী এলাম। বিড়লা-দের লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরসংলগ্ন ধর্ম্মশালায় থেকে শহর দেখলাম। চৌদ্দ মাইল দূরে মেহরৌলিতে দেড় হাজার বছরের পুরাতন লিপিযুক্ত চন্দ্ররাজার কলঙ্কহীন লৌহস্তম্ভ, কুতুবমিনার (৩৭৮টি সিঁড়ি), সের শাহের ভাঙা কেল্লা, হুমায়ুনের কবর, যন্তর মন্তর নামক মানমন্দির, বিশাল লাল-কেল্লা—এর ভেতরে দেওয়ানী আমের সিংহাসন, বেদীর গায়ে রঙীন পাথরে খচিত ফুল পাতা ও পাখীর অপরূপ ছবি, প্রাচীন কীর্ত্তিসকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান কালের রাষ্ট্রপতি-ভবন, লোকসভা-সৌধ দেখবার মত। লোকসভার দ্বারে কাঠের ফলকে বৈদিক বচন উৎকীর্ণ।

এর পর পূর্ব্ব পঞ্জাবের আম্বালা থেকে ফেরবার পথে কৃষ্ণসার মৃগের দল দেখলাম। হিন্দুর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারই এই জীবগুলির প্রশংসায় মুখর। হরিদ্বারে গঙ্গার উপরকার অস্থায়ী কাঠের পুলগুলি মনে বিস্ময় এনেছিল। এপারে পাহাড়ের চূড়ায় মনসা-মন্দির। ওপারের চণ্ডীপাহাড়-শিখরে চণ্ডী ও অঞ্জনার মন্দির। তীর্থরাজ ব্রহ্মকুণ্ড, কুম্ভমেলার বিরাট আস্তানা আর রেলপথের সুড়ঙ্গ দুটি দর্শনীয়।

হিমালয় যাত্রার পূর্ব্বে স্বগৃহে লেখক

হৃষীকেশ শহরে পৌঁছে তপোবন দেখার কল্পনা বিফল হ'ল। শিবালয়ে আশ্রয় পেয়ে ভরতজীর প্রাচীন মন্দির, ঋষি-কুণ্ড, গঙ্গা-চন্দ্রভাগা-সঙ্গম ঘুরে এলাম। মন্দির উৎকল রীতির আমলাশীর্ষক। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের মতই এখানকার সঙ্গমে মাছের খেলা।

১১ই বৈশাখ ভোরবেলা এখান থেকে শ্রীবদরীনাথের পথে এগিয়ে চললাম। সকালে বিকালে ছিল পথচলা। দুপুরে আর রাতে চটীতে আহার ও বিশ্রাম। তিন দিকে দেয়ালঘেরা

পাতা বা খড়ের ছাউনিওয়ালা ঘরই চটী। চটীওয়ালার কাছে জিনিষ কিনলে এখানে আশ্রয় মেলে, নচেৎ নয়। রাঁধবার উনান, থাকবার স্থান, বাসনকোসন, চাল, ডাল, আলু, লবণ, মশলা, জালানি, পাতবার চাটাই চটীতে পাওয়া যায়। উনান পাশাপাশি বা সামনাসামনি জোড়া জোড়া। ঝরণা কিংবা নদী, অথবা ঐ দুটির কাছেই চটী। নানা জাতি, আচার, আচরণ ও সংস্কারের মিশ্রণে এখানকার তীর্থযাত্রীদের মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। হরিদ্বার থেকে শ্রীবদরীনাথ একশ' তিরাশি মাইল। এক মাইল চিহ্নের পর এক ফার্লং চিহ্ন, সাত ফার্লং এর পর দুই মাইল চিহ্ন। এই ক্রম একশ'

নিউ দিল্লীর বিড়লা মন্দিরে

পঁয়ত্রিশ মাইল দূরস্থ চামোলি পর্য্যন্ত আছে। তার পর বদরী পর্য্যন্ত উল্টো ক্রম। ঐ অংশে মাইল-চিহ্ন হিন্দিতে লেখা। বাকী অংশে ইংরেজীতে। পাহাড়ের গায়ের পাথরেই মাইলের দাগ লেখা।

পাহাড়ের গা কেটে বেশ চওড়া পথ তৈরি হয়েছে। নদীর এপার দিয়ে লোকচলাচলের, ওপার দিয়ে বাস যাওয়ার পথ। পথে ডাইনে পর্ব্বত, বামে সুগভীর খদের নীচে বেগবতী নদী। পথ কোথাও সমতল, কোথাও চড়াই, কোথাও উৎরাই। বিজনী, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, ঘ্যাদ, ত্রিযুগী, কেদার, উখীমঠ, গোলিয়ারগড় প্রভৃতি স্থানের চড়াই বিখ্যাত। প্রাণান্তকর কষ্টের মধ্যেও যেন কিসের টানে বিভোর হয়ে যাত্রিগণ চলতে থাকে। কেদারের এক মাইল পথ বরফে পূর্ণ। কেদার শহর বরফে ঢাকা। বদরীপথে প্রায় দশ মাইল দূর থেকে মাঝে মাঝে বরফ প্রবাহাকারে জমাট। একটি জলধারা যেন হঠাৎ জমে গেছে। লবণের স্তূপের মত এই বরফরাশি। বরফ ধসে বিপদ ঘটতে পারে—এজন্য সাবধানতা প্রয়োজন।

পায়ে চলার যাত্রীই বেশী। ধনীরা ডাণ্ডী বা ঝাম্পানে চলেন। একটি নৌকার চেয়ার বসিয়ে ত্রিপলের ছাউনী দিলেই ঝাম্পান হয়। চারি জন বাহকে হৃষীকেশ থেকে যাতায়াতের ভাড়া সাড়ে পাঁচ শত টাকা আর ঝাম্পান-মূল্য পঞ্চাশ টাকা নয়। ওয়েষ্ট-পেপার বাস্কেটের মত ঝুড়ির নাম ডাণ্ডী। যাতায়াত খরচ এক শত টাকা। কেউ কেউ ঘোড়াতেও চলেন। ছাগলই বেশী মাল বহন করে। গোরু, ঘোড়া, খচ্চর আর চমরীর পিঠেও মাল যায়। সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য-পথে এই সকল পশু, মাল আর যাত্রীর চাপে ভ্রমণ দুষ্কর। পাহাড়ী আর ভিখারীরা পথে পয়সা ও ছুঁচ সুতা চায়। পুণ্যকামীরা তাদের প্রার্থনা পূরণ করেন।

প্রায়ই পথের ডাইনে ঝরণা আর বামে নদী, নদীতে নামবার ঘাট সব জায়গায় নেই, পাহাড়ের গা বেয়ে নামা বিপজ্জনক। পাহাড়ের সকল নদীর জলই বরফের মত শীতল, তাতে অবগাহন অসাধ্য। এই সকল নদীর প্রচণ্ড স্রোতেও মহাশোল মৎস্যকুলের অবিরাম ক্রীড়া চলেছে। কেদার হয়ে বদরীপথে গঙ্গা, হেমগঙ্গা, অলকানন্দা, বিষ্ণুগঙ্গা, মন্দাকিনী, শোণগঙ্গা ও গরুড়গঙ্গা নদীর তীর ধরে যেতে হয়। সমগ্র পথে অসংখ্য ছোটবড় ঝরণা গিরিরাজের গলিত স্নেহের মত যাত্রীকুলকে শান্তি দেবার জন্যই যেন বয়ে যাচ্ছে। হিমালয়ে হাতে চালানো তেলের ঘানিও দেখেছি।

নদী-পারাপারের জন্য বেশীর ভাগ স্থানেই ঝোলানো পুল আছে। কয়েকটি লোহার কাছির উপর ঐ সকল পুল ঝোলান। হৃষীকেশ থেকে তিন মাইল দূরে বিখ্যাত লছমন ঝোলা চারি শত পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ; উহা বারটি কাছি ও চারটি থামে লম্বিত। ইহার পর হেমগঙ্গা, কীর্ত্তিনগর, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, তীরি, শোণপ্রয়াগ, উখীমঠ, চামোলি, বিষ্ণুপ্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে বিখ্যাত ঝোলা পুল, আর কেদারে মন্দাকিনী ও বদরীনাথে অলকানন্দার উপর এবং আরও কয়েকটি স্থানে লোহার কড়িতে টানা পুল আছে। ঐ সকল পুলের উপর নির্ম্মাণকাল ও সেতুর দৈর্ঘ্য লেখা আছে। লছমন-ঝোলা ১৯৩০ সালে পুনর্নির্ম্মিত হয়। অগস্ত্যমুনি-পথে রামপুরের পর একটি সেকেলে দড়ির ঝোলা আছে।

কেদারনাথ ও বদরীর নিকটে কোন ক্ষেত বা বাগান নেই—এ ছাড়া সমগ্র পথে ডাইনে ও বামে পাহাড়ের গায়ে সোপানের মত থাকে থাকে ক্ষেত। স্থানে স্থানে আম, কলা,

বেল, লেবু প্রভৃতির বাগান। যোশীমঠ, গোপেশ্বর ও গুপ্তকাশীতে উত্তম গোলাপফুলের বাগান আছে। যব ও গমই প্রধান ফসল। কেদার-বদরীর কাছাকাছি শীতের আধিক্যে ফসল কাঁচা। বাকী পথের ফসল সোনালী রঙের। বিচালির গাদা গাছের উপরই দেখা যায়। কেদার ও বদরীর সান্নিধ্যে বরফযুক্ত পাহাড়ে একপ্রকার আগাছা ও বেগুনী রঙের ফুলগাছের বাহার।

কেদারনাথ ধাম, গুপ্তকাশী (গাড়োয়াল)

গ্রাম ও শহরের বাড়ীগুলি পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে সাজানো। গিরিরাজের অযাচিতলভ্য পাথর আর কাঠ দিয়েই ঐ সকল বাড়ী নির্ম্মিত। অনেক স্থলেই ঐ সকল কাঠে সুন্দর শিল্প-কার্য্যের নিদর্শন আছে। কার্ণিসের কাঠগুলিতে নানা পশুমূর্ত্তি উৎকীর্ণ। পাহাড়ের শিখরের কোন কোন গ্রামকে যেন অলকাপুরী বলেই মনে হয়।

হৃষীকেশ ছাড়বার পর বাকসের বন সুরু। পরে মনসা, ঝাউ, লাল রঙের রোডোডেনড্রন, শেওলাধরা একপ্রকার বিশাল বৃক্ষগাছ, সাদা বনগোলাপ, লাল ফেকাসে ও সাদা বোরাস ফুলের গাছ। বোরাসের পাতা ডালিমের মত, ফুল জবার মত—এক গুচ্ছে অনেক ফোটে। চাটনী ও আমাশয়ের ঔষধ এই ফুল থেকে হয়। গায়ে আঁশওয়ালা দেবদারু ও সরু এক জাতীয় বাঁশ পথের পাশে দেখা যায়। লিঙড়ি নামক শাক আর তরাপুষী ফুল পথে প্রচুর। সারি সারি দাঁড়ানো ঝাউয়ের বন দেখেই মনে হয় যেন এরা গিরিরাজের সেনাদল।

পথে বন্যপশু কমই দেখা যায়। একদিন মাত্র খাঁকর জাতীয় দুইটি হরিণ দেখি। বন্যপাখী সময়ে সময়ে নজরে পড়ে। ময়ূর দেখি নাই, কেকাধ্বনি শুনেছি মাত্র।

চৌত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী অগস্ত্যমুনি থেকে কেদারশৃঙ্গের বরফরাশি দেখা যায়। আর বদরীর বরফ নজরে পড়ে প্রায় কুড়ি মাইল দূর হতে। এ ছাড়া সমগ্র পথের পর্ব্বত বরফযুক্ত ও অনেক স্থানে বনাকীর্ণ। কোথাও পর্ব্বত পাষাণময়, কোথাও-বা পর্ব্বতগাত্রে মৃত্তিকারাশি। চামোলির নিকট শ্বেত পাথরের পর্ব্বত। পান্ডুকেশ্বরের কাছে অভ্ররাশি আর গৌরীর নিকট দস্তা। স্থানে স্থানে বৃহৎ গুহা। যোশীমঠের নিকট

কেদারনাথ ধামের মন্দির

একটি গুহামুখ হতে বায়ুপ্রবাহ বার হচ্ছে। কালিদাস যে "দরীমুখোত্থ সমীরণ" বলিয়াছেন, এ তাই। রাত্রিতে কোন কোন স্থানের পর্ব্বত-গাত্রের গর্ত্ত হতে জ্যোতি নির্গত হয়। এ কোন সরীসৃপের চোখ বা গায়ের আলো। পর্ব্বত-রাজ্যের রত্ন, ওষধি, বনস্পতিসম্পদের পরিমাপ করা অসাধ্য। কেদার হতে সাত মাইল নিয়ে গৌরীকুণ্ডে একটি গরম জলের প্রস্রবণ আছে। জল কুণ্ডে সঞ্চিত হয়। এই শীতের দেশে ঐ প্রস্রবণের জল যাত্রিগণের পক্ষে আশীর্ব্বাদস্বরূপ। শ্রীবদরীনাথেও সোপানরাজির নীচে এরূপ একটি প্রস্রবণ আছে।

প্রায়ই এক মাইল অন্তর চটি। অনেক চটিই ছোটখাটো তীর্থবিশেষ। পথে দুইটি গরুড় চটি। প্রথমটি লছমনঝোলার পর, দ্বিতীয়টি যোশীমঠের নিকট। উভয় স্থানের গরুড় দেবতার মূর্ত্তি। পথের অনেক স্থানে বাধাবিঘ্ন-নাশক গরুড়-স্মরণে পথক্লেশ-কমাবার উপদেশ দেয়। দেবপ্রয়াগে গঙ্গা ও অলকানন্দা সঙ্গমে বদরীনাথের পাণ্ডাগণের বাস। রঘুনাথ এখানকার দেবতা। শ্রীনগর গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী।

এখানে বৃহৎ জলপাত্র, ঢোলকের খোল প্রভৃতি স্থানীয় তৈজস মেলে। নিকটে কমলেশ্বরের প্রাচীন মঠ। পঞ্চমুখ শিব, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি এখানকার দেবতা। রুদ্রপ্রয়াগ অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল। অগস্ত্যমুনি উক্ত মহর্ষির তপস্যা-ক্ষেত্র। গুপ্তকাশীতে বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা দেবতা—মণিকর্ণিকাতীর্থ। মৈখণ্ডীতে মহিষমর্দ্দিনী, ত্রিযুগীর পথে শাকম্ভরী ও ত্রিযুগীতে নারায়ণ ধর্ম্মশিলায় শিবের বিবাহস্থান; মন্দিরের মণ্ডপে তিন যুগের ধুনী প্রজ্জলিত। গৌরীকুণ্ডে গৌরীদেবী, কেদারে অনাদিলিঙ্গেশ্বর, অন্নপূর্ণা। উখীমঠ কেদারের মহান্তের আস্তানা ও দেবস্থান। গোপেশ্বর শেষ শিবস্থান। হেলংগে কার্ত্তি-কেয়ের অবস্থান, যোশীমঠ বদরীর মহান্তের স্থান। এখানে বাসুদেব বদরীনাথ ও শঙ্করাচার্য্যের জ্যোতির্মঠ আছে। বিষ্ণু-প্রয়াগে অলকানন্দা বিষ্ণুগঙ্গা সঙ্গম। পাণ্ডুকেশ্বর পাণ্ডুর তপস্যাক্ষেত্র—এখানে বদরীনাথ দেবতা। হনুমান চটিতে হনুমান দেবতা।

বদরীনাথ শহরের উচ্চতম স্থানে শ্রীবদরীনাথের মন্দির। মন্দিরমধ্যে বদরীনাথ প্রভৃতি দেবতা—আমাদের ভাগ্যে দেবতার তাম্রমুখ দর্শনই ঘটল। হিমাচলে অনেক তীর্থেই এই তাম্রমুখ-আচ্ছাদন রীতি। বামে এক মন্দিরে লক্ষ্মীদেবী। উল্লিখিত প্রধান তীর্থগুলিতে ডাক ও তারঘর, সরকারী কার্য্যালয়, হাসপাতাল ও ধর্ম্মশালা আছে। প্রধান তীর্থস্থান-গুলির মন্দির উৎকলীয় রীতির চতুষ্কোণ, শীর্ষে আমলাশিলার উপর ছাউনি, সম্মুখে বিশাল মণ্ডপ।

কেদার ও বদরী হতে প্রায় দশ কোশ দূর থেকে শীতের বেশ প্রকোপ দেখা যায়। হৃষীকেশ থেকে ঐ স্থান পর্য্যন্ত পথে সকালের দিকে বেশী শীত বোধ হয়। রাত্রির কিয়দংশেও শীতের মাত্রা বাড়ে। বাকী সময় গরম। যাত্রি-গণ গরম-পোশাক, আমাশয় ও সর্দ্দির ঔষধ, সরিষার তৈল, সরবতের সরঞ্জাম নিয়ে ভ্রমণ করেন। পথে ঝড়, বৃষ্টি ও তুলার মত তুষারপাত প্রায়ই হয়। কোন একটি দলের সঙ্গে ভ্রমণই সমীচীন। পাহাড়ীরা সরল হলেও আজকাল এদিকে চোরের উপদ্রব বাড়ছে।

শ্রীবদরীনাথের দ্বার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন খোলে জানতাম। এবার অনেক পরে দ্বার খুলল।

পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য, জীবন্মুক্ত সাধুগণের সঙ্গ মানুষকে অন্তর্মুখী করে। দ্রব্যমূল্য এই রাজ্যে অধিক। মানুষের সংকীর্ণতা তীর্থের কল্যাণকেও ব্যাহত করে। ভক্ত ও ভগবানের চিরবাঞ্ছিত মিলনই পৃথিবীর সকল ক্লেশ দূর করে পরম শান্তি এনে দেয়। সেই শান্তির আশাতেই বরণীয় মানুষ এত দূর এসেও ক্লান্ত হয় না। হিমাদ্রি-সকাশে এসে এই অনাবিল অপার্থিব বিষয়ে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ

৮

নববর্ষ উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল প্রদেশবাসীদের সম্বোধন করিয়া তাঁহার বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন :

"আজ সকলকে নূতন উদ্যমে, নূতন আশায়, দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার সঙ্কল্প করতে হবে। বাঙালীর কর্ম্মশক্তিতে প্রেরণার অভাব যেন কোন দিন না আসে, আত্মদ্বন্দ্বে বাঙালী অযথা শক্তিক্ষয় না করে। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও অপরাজেয় কর্ম্মশক্তির পারস্পরিক সহযোগিতায় সাফল্যের পথে হোক আমাদের অগ্রগতি—আজকের দিনে এই কামনাই করি।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন :

"আমাদের প্রধান সমস্যা খাদ্যসমস্যা। গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় ফলেও আজ পর্য্যন্ত আমরা খাদ্য বিষয়ে আত্ম-নির্ভর হতে পারি নি। খাদ্যসমস্যা মেটাবার দায়িত্ব আমা-দের নিজেদেরই নিতে হবে।"

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনের জমির যে কতটা অভাব তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এইরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যপালের উপরি-উক্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা যে কি করিয়া পূরণ হইবে তাহা অনুমান করা শক্ত। ময়ূরাক্ষী ও দামোদর বাঁধ এবং অন্যান্য পরিকল্পনার দ্বারা সেচ-ব্যবস্থার কতকটা উন্নতি হইলেও পাট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রদেশের আয়তন বৃদ্ধি ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গ কখনও খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে কিনা তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে।

সংবাদপত্রে দেখিলাম আচার্য্য বিনোবা ভাবে তাঁহার "ভূদান যজ্ঞ" এই প্রদেশে শীঘ্রই আরম্ভ করিবেন। অনেকে ইহা একটা নিদারুণ পরিহাস বলিয়া মনে করেন, কারণ সমগ্র প্রদেশবাসীই যখন একরূপ ভূমিহীন তখন তিনি কোথা হইতে ভূমি পাইবেন? সমস্যা-প্রধান বাংলায়

ভূমির অভাবই প্রধান সমস্যা। যদি সত্য সত্যই তিনি বাংলায় তাঁহার "ভূদান যজ্ঞ" সফল করিতে চাহেন তাহা হইলে প্রথমে "প্রাদেশিক" স্তরে তাঁহার "ভূদান যজ্ঞ" আরম্ভ করা উচিত। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ও পার্শ্ববর্তী প্রাদেশিক সরকারগুলির নিকট হইতে অগ্রে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ভূমি ভিক্ষা করিয়া তাহার পর এই প্রদেশের ভূমিহীন কৃষক পর্য্যায়ে তাঁহার এই যজ্ঞ আরম্ভ করিলে তবেই বাস্তব ক্ষেত্রে উহা সফল হইতে পারে। তিনি হায়দ্রাবাদে প্রথমে যখন "ভূদান যজ্ঞ" আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন কৃষক ও মধ্যবিত্তদিগকে কমিউনিষ্টদের প্রভাব হইতে দূরে রাখাই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সর্ব্বসাধারণের ক্ষেত্রে যাহা সত্য প্রাদেশিক স্তরে তাহা অধিকতর সত্য। আশা করি, বাংলাদেশে এই "ভূদান যজ্ঞের" নবনির্ব্বাচিত কমিটির সভ্যেরা এ বিষয়ে আচার্য্য ভাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ভুলিবেন না। বাংলায় ভূমি সমস্যা যদি অচিরে সমাধান করিতে না পারা যায় তাহা হইলে আচার্য্য ভাবে "ভূদান যজ্ঞ" করিয়াও এই প্রদেশে তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবেন না।

পাটচাষের জমিতে ধান্য ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদনের কথা আমি পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, বহু পাঠক বন্ধু উহা বিশেষ ভাবে সমর্থন করিলেও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রস্তাবকে "প্রাদেশিকতা" বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে পশ্চিমবঙ্গ যখন ভারতরাষ্ট্রের একটি অংশ তখন প্রস্তাবটি প্রদেশের স্বার্থের দিক হইতে ন্যায়সঙ্গত হইলেও ইহা গ্রহণ করা উচিত হইবে না। আমি এই মতাবলম্বী কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, খাদ্যাভাবে, অর্থাভাবে বাঙালী জাতি ধ্বংসের পথে আগাইয়া গেলেও রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য কি তাহাকে আত্মবলি দিতে হইবে? "প্রাদেশিকতা" কি একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই বর্জ্জনীয়? বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা প্রদেশে এবং সম্প্রতি ভারতীয় রেল পুনর্বিন্যাস ক্ষেত্রে "প্রাদেশিকতা"র প্রকট মূর্ত্তি কি দেখা দেয় নাই? এত দিন ভারত-সরকার কেন ইহার প্রতিকার করেন নাই? পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বাংলার জীবনমরণ সমস্যা ক্ষেত্রে এইরূপ যুক্তিতর্ক সমীচীন কি? এই সব প্রশ্নের কোন সুস্পষ্ট উত্তর তাঁহাদের কেহই দিতে পারেন নাই।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের মতে এই প্রদেশে বনভূমির অভাব হেতু যে ১৪ লক্ষ একর অনাবাদী ও পতিত জমি আছে তাহা আবাদী জমিতে পরিণত করা প্রদেশের স্বার্থের অনুকূল হইবে না। যদিও বেশীর ভাগ পাট ও আউস ধান্যের জমিতে বৎসরে একাধিক ফসল উৎপন্ন করা খুবই সম্ভব তথাপি এই প্রদেশে মোট ১১৮ লক্ষ একর আবাদী জমি যাহা আছে উহার শতকরা ৯০ ভাগ জমিতে বৎসরে মাত্র একটি করিয়া ফসল উৎপন্ন করা হয়। তাহা ছাড়া আমাদের যৌথপরিবার প্রথা কৃষি ও খাদ্যোৎপাদনের পক্ষে একটি বিশেষ অন্তরায় হইয়াছে। অধিকাংশ চাষের জমি অংশীদারদের মধ্যে বংশানুক্রমে বণ্টনের ফলে ক্রমাগত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর আয়তনে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে। এই একই কারণে পল্লী অঞ্চলে ভাল ভাল ফলের বাগান ও পুষ্করিণী একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই সমস্ত চাষের জমি, ফলের বাগান ও পুষ্করিণী যাহাতে ঐ ভাবে আর নষ্ট না হয় আইনের দ্বারা তাহার ব্যবস্থা প্রদেশ সরকারের করা উচিত। যৌথপরিবার ভুক্ত ব্যক্তিরা যদি ঐ সমস্ত জমি ও পুষ্করিণীর পুনরুদ্ধার না করেন অথবা আর্থিক ও অন্যান্য কারণে তাঁহাদের দ্বারা উহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে আমার পূর্ব্ব প্রস্তাবিত জেলা ডেভলপমেণ্ট ট্রাষ্টগুলি ঐ সকলের উন্নতি সাধন করিয়া যাহাতে উহার সমুদয় ব্যয় মালিকদের নিকট হইতে আদায় করিতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা প্রদেশ সরকারকে করিতে হইবে।

চাষের জমিগুলিকে ন্যূনতম পক্ষে ২৫ বিঘা বা ততোধিক পরিমাণে একত্রীকরণ করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে মালিকদের দ্বারা ঐ সমস্ত একত্রিত জমি হইতে ফসল উৎপাদন করাইতেও আইনের দ্বারা বাধ্য করা উচিত। ইহা না করিলে জমিতে জলসেচন ও কলের লাঙল ব্যবহার করার সুবিধা হইবে না এবং খাদ্যশস্য ও ফসল উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে না। অনাবাদী পতিত জমিগুলিতে স্থান-বিশেষে ফলের বাগান, বাঁশের চাষ, সেগুন, মেহগনি, শাল ইত্যাদি বৃক্ষ রোপণেরও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা দরকার। ইহার দ্বারা একই সঙ্গে ভূমি সংরক্ষণ (Soil Conservation) এবং নানা প্রকার ফল ও অর্থকরী ফসল ও কাষ্ঠ ইত্যাদির উৎপাদন হইতে পারিবে। প্রতি বিঘা জমিতে কমপক্ষে অন্তত ১২টি করিয়া আম্র, কাঁঠাল ও ঐ জাতীয় ফলের বৃক্ষ রোপণ করিলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিঘা প্রতি খরচাদি বাদে অন্তত ২০০৲ টাকা হইতে ২৫০৲ টাকা আয় হওয়া খুবই সম্ভব। ঐরূপ প্রতি বিঘাতে ৭টি করিয়া বাঁশের ঝাড় বসান যাইতে পারে এবং বিঘা প্রতি ৩০০।৪০০ শত টাকা আয় হইতে পারে।

প্রদেশ সরকারের কৃষি বিভাগে সকল পর্য্যায়ে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকা সত্বেও কার্য্যতঃ উৎপাদনের দিক হইতে তাঁহারা "বিনামূল্যে ব্যবস্থা-পত্রের" ন্যায় কৃষকদের উপদেশ দেওয়া ভিন্ন বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। প্রথমতঃ সব রকমের ভাল বীজ তাঁহারা উপযুক্ত সময়ে ও

প্রয়োজনমত সরবরাহ করিতে একেবারেই অক্ষম। ইহা যদি অর্থাভাব হেতু হয় তাহা হইলে ঐ বিভাগে কর্ম্মচারীর সংখ্যা ক্রমাগত না বাড়াইয়া সেই অর্থে ভাল বীজ যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করা উচিত। আমার মিশ্র কৃষিক্ষেত্রের জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মাত্র দুই মণ আউস ধান্যের বীজ স্থানীয় কৃষি-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টরের নিকট চাহিতেছি, কিন্তু তিনি উহা দিতে পারিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতে পারিতেছেন না, কারণ উপস্থিত তাঁহাদের হাতে কোন আউস ধান্যের বীজ নাই এবং কবে উহা পাইবেন তাহারও কোন স্থিরতা নাই। স্থানীয় কৃষকেরাও আউস ধান্যের বীজের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছে। তাহাদের ধারণা যে, প্রদেশ সরকার পাটের চাষ লইয়াই বেশী ব্যস্ত; এজন্য ধান্য উৎপাদনের জন্য তাঁহারা বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন না। আশা করি, আমাদের কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মহোদয় সাধারণের এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা অবিলম্বে দূর করিতে চেষ্টা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ, কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য ছোট ছোট পেট্রোল অথবা তৈল চালিত পাম্প ভাড়া হিসাবে সরবরাহ করিবার কোন ব্যবস্থা কৃষি বিভাগে নাই। সাধারণে বেশী টাকা মূল্যের ঐ সমস্ত পাম্প উক্ত বিভাগ হইতে ক্রয় করিতে অক্ষম এ কথা তাঁহাদের জানা উচিত। তৃতীয়তঃ, পল্লীবাসীরা বাধ্য হইয়া বহুল পরিমাণ গোবর সার ও ভাল ভাল ফলের বৃক্ষ কাটিয়া কয়লার অভাবে জ্বালানীর জন্য ব্যবহার করিতেছে। ইহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারই সম্পূর্ণ দায়ী। তাঁহাদের খাদ্য-বিভাগ "অধিক খাদ্য ফলাও", "বন মহোৎসব করো" ইত্যাদি বলিতেছেন ও এই কারণে বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন, আর সেই সঙ্গেই কেন্দ্রীয় যানবাহন বিভাগ জনসাধারণের ব্যবহার্য্য পোড়া কয়লা চালান দিবার মালগাড়ী সরবরাহ করিবার জন্য সর্ব্বনিম্ন 'প্রায়রিটি' স্থির করিয়া দিয়াছেন, সে কারণ আবশ্যকমত নিয়মিত ভাবে খনি হইতে পোড়া কয়লার চালান হইতেছে না। ফলে রাষ্ট্রে খাদ্য উৎপাদন বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে। ইংরেজী ভাষায় একটা কথা আছে—"Consistency in Politics is the virtue of an ass", অর্থাৎ "রাজনীতি ক্ষেত্রে বরাবর একমত পোষণ করা একমাত্র গর্দ্দভের ধর্ম্ম।" কেন্দ্রীয় সরকার এই মতাবলম্বী কিনা তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

কৃষি আয়কর (Agricultural Income Tax) খাদ্যশস্য ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির যে আর একটি অন্তরায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেক ক্ষেত্রে যথার্থ আয় অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ নানা কারণে বেশী ধার্য্য হইবার দরুন খাদ্যশস্য ও ফসল বৃদ্ধি করিতে কৃষকদের সেইরূপ উৎসাহিত করে না। আমার মতে যত দিন বাংলা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে না পারে ততদিন পর্য্যন্ত কৃষি আয়কর আদায় স্থগিত রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। কম পরিমাণ জমিতে বেশী ফসল উৎপাদন করিবার পক্ষে পানের চাষ, রেশম পোকার চাষ ও লাক্ষার চাষের দিকে কৃষি-বিভাগের অধিক লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রদেশ সরকারের এ বিষয়ে যেরূপ প্রচার কার্য্য করা প্রয়োজন সেইরূপ হইতেছে না বলিয়া আমার ধারণা। অপর প্রদেশের তুলনায় বাঙালী শ্রমিকেরা শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু অধিক পরিশ্রম করিতে পারে না। এই কারণ রেশম পোকার চাষ, পানের চাষ ও লাক্ষার চাষ মধ্যবিত্ত যুবকদের ও স্বাস্থ্যহীন কৃষকদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমার একটি মিশ্র কৃষিক্ষেত্রে আউস ধান্যের ও পাটচাষের উপযুক্ত জমিগুলিতে প্রতি বৎসর একাধিক ফসল ও খাদ্যশস্য উৎপাদন করিয়া আসিতেছি। প্রথমে আউস ধান্যের ক্ষেতের ভিতর ১৬ হইতে ২০ হাত অন্তর কলার চারা রোপণ করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহাতে লাঙ্গল পরিচালনার কোনরূপ অসুবিধা হয় না এবং বিঘা প্রতি ফসলের পরিমাণও কম হয় না। ইহাতে একটি সুবিধা যে, বর্ষার সময় ক্ষেতের মাটি ধুইয়া পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্করিণীগুলি নষ্ট করে না। ক্ষেতের ধারে ধারে অড়হরের গাছ লাগাইয়াও দেখিয়াছি যে, উহার ফলন সাধারণ ফলন অপেক্ষা কম হয় না বরং বেশী হয় এবং অড়হর রোপণের জন্য আলাদা ভাবে জমির দরকার হয় না। আউস ধান্য ও পাট উৎপাদনের পরই সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব জমিতে লাঙ্গল দিয়া মুগ, মুশুরী, ছোলা, মটর, কলাই ইত্যাদি লাগাইয়া মন্দ ফল পাই নাই। তাহার পর ঐ সব ফসলের শেষে গ্রীষ্মকালের উপযোগী কুমড়া, ফুটি ইত্যাদির গাছ লাগাইয়া থাকি। বৎসরে এইরূপ একাধিক ফসল করিতে হইলে সকল সময় জলসেচনের ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার। এই কারণ আমার ২।৩টি পেট্রোল চালিত পাম্প আছে। মাত্র দুই গ্যালন পেট্রোলে প্রায় ২॥ ঘণ্টা চলে এবং উহার দ্বারা ৩।৪ বিঘা জমিতে ভালরূপে জলসেচন করিতে পারা যায়। প্রদেশ সরকারের কৃষি-বিভাগ যদি ঐরূপ কতকগুলি পাম্প ও পাম্পচালক প্রত্যেক মহকুমায় তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কৃষকদের আবশ্যকমত ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে সব রকম ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। প্রদেশবাসী ও প্রদেশ সরকার উভয়েই যদি এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ সচেতন হন তাহা হইলে প্রতি বৎসর অড়হর, মুগ, মুশুরী, ছোলা, মটর ইত্যাদি

ক্রয় করিবার জন্য বাংলার যে লক্ষ লক্ষ টাকা অপর প্রদেশে পাঠাইতে হয় তাহা বাংলাদেশেই থাকিয়া যাইবে।

পেঁপে ও কলার চাষ খুবই অর্থকরী। কলার চারা-গুলি ১০।১২ হাত অন্তর সারি করিয়া বসাইয়া প্রতি গাছের মধ্যে যদি একটি করিয়া ভাল পেঁপের চারা বসান যায় তাহা হইলে কোনই ক্ষতি হয় না। ভাল জাতীয় পেঁপের বীজ প্রথমে সংগ্রহ করা দরকার। আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে, খুব কমপক্ষে প্রতি পেঁপের গাছে বাৎসরিক ৮৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা মূল্যের পেঁপে পাওয়া যাইতে পারে। সীমানার ধারে ধারে ৬ হাত অন্তর সুপারি গাছ এবং ৪ হাত অন্তর কাগজি ও পাতি লেবুর চারা সারি করিয়া বসাইলে পরে ঐ সমস্ত গাছ বড় হইলে ভালরূপ বেড়ার কার্য্য করিবে। তাহা ছাড়া সীমানার ও পুষ্করিণীগুলির চারি ধারে ৫।৬ হাত দূরে সারি দিয়া নারিকেল চারা ৮।১০ হাত অন্তর বসাইলে জমি নষ্ট না করিয়া বহু নারিকেল, সুপারি ও লেবুর চারা বসান সম্ভব। যদি পল্লী অঞ্চলে উঁচু আবাদী জমিগুলির চারি ধারে সম্ভবমত ঐরূপ সুপারি, নারিকেল ও লেবুর চারা রোপণ করা যায় তাহা হইলে এই প্রদেশে ঐ সকল অর্থকরী ফসল উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইতে পারে।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রদেশ সরকারের কৃষি-বিভাগ স্বল্প মূল্যে আমাকে অনেকগুলি হাঁস (Khaki Campbell) ও মুরগী (Leghorn এবং R. I. Red) দিয়াছিলেন। গত কয়েক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত যুবকরা যদি ছোট ছোট Poulty Farm (হাঁস মুরগীর চাষ) করে এবং প্রদেশ সরকার যদি ঐগুলির তত্ত্বাবধান করিবার ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার হাঁস, মুরগী ও ডিম অপর প্রদেশ হইতে আমাদের আর ক্রয় করিবার আবশ্যক হইবে না। দুঃখের বিষয়, প্রদেশ সরকার প্রতি বৎসর যথেষ্ট পরিমাণ ঐ জাতীয় হাঁস ও মুরগী বিদেশ হইতে আমদানী করিতেছেন না, ফলে ভাল জাতীয় হাঁস ও মুরগীর সংখ্যাও দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। একমাত্র সংক্রামক রোগই হাঁস ও মুরগী পালনের অন্তরায়। যদি আমাদের কৃষি-বিভাগ নিয়মিত ভাবে ঐ সমস্ত হাঁস ও মুরগীর টিকা দানের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে ঐ সব সংক্রামক রোগের ভয় খুবই কমিয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি এ বিষয়ে ভালরূপ মনোযোগ দেন তাহা হইলে হাঁস ও মুরগী পালন এই প্রদেশের একটি বিশেষ অর্থকরী ব্যবসা হইবে এবং সেই সঙ্গে বেকার-সমস্যারও কতকটা সমাধান হইবে।

মৎস্য বাঙালীর একটি প্রধান ও অন্যতম খাদ্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ইহার প্রয়োজনের অর্দ্ধেক পরিমাণও জন্মায় না। এই প্রদেশের নদী, বিল, পুষ্করিণী ও অন্যান্য জলাশয়গুলির যদি ভালরূপ সংস্কার করা যায় তাহা হইলে মৎস্য উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রদেশ সরকারের মৎস্য-বিভাগ গভীর জলের মৎস্য সংগ্রহ (Deep Sea Fishing) লইয়াই বেশী ব্যস্ত। কলিকাতার বাজারে আমি বহুদিন গভীর জলের মৎস্য ক্রয় করিবার জন্য খুঁজিয়াছি, কিন্তু মাত্র একদিন ছাড়া আর সকল দিনই গভীর জলের খাদ্য-উপযোগী মৎস্যের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার সামুদ্রিক জীবজন্তুর মাংস বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি।

আমার মিশ্র কৃষিক্ষেত্রে ছোটবড় ৮।১০টি পুষ্করিণী আছে। উহাতে নিয়মিত ভাবে মৎস্যের চাষ করিবার জন্য আমি গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রদেশ সরকারের মৎস্য-বিভাগের সদর ও মহকুমা দপ্তরের কর্ম্মচারীদের সহিত বহু পত্র-বিনিময় করিয়াও বৎসরে একবারও ঐ কৃষিক্ষেত্রে তাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে পারি নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার মৎস্যচাষের জন্য প্রদেশ সরকারকে প্রতি বৎসর অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ঐ সমুদয় অর্থ বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদই খরচা হইয়া যায় কিনা তাহা জনসাধারণ জানিতে পারিলে সুখী হইবে।

প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় প্রদেশ সরকারের মৎস্য-দপ্তরের তত্ত্বাবধানে পুষ্করিণীর পুনরুদ্ধারের জন্য জল তুলিবার পাম্প, মাটি কাটার মজুর ইত্যাদি সরকারী মনোনীত ঠিকাদারদের মারফৎ আবশ্যকমত জনসাধারণ যাহাতে পায় তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে পল্লী অঞ্চলে পুষ্করিণীতে মৎস্য থাকা সত্ত্বেও সময়মত জাল ও জেলের অভাব হেতু সাধারণে মৎস্য ধরিতে পারে না। যদি মৎস্য-দপ্তর এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে নিয়মিত ভাবে পল্লী-অঞ্চল হইতে আরও অনেক বেশী পরিমাণ মৎস্য পাওয়া যাইতে পারে।

দেশবাসীদের দুগ্ধের অভাব মিটাইবার জন্য প্রদেশ সরকার নানারূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কয়েক বৎসর হইল হরিণঘাটাতে একটি সরকারী ডেয়ারী স্থাপন করা হইয়াছে। যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে হরিণঘাটা ডেয়ারী হইতে গো-দুগ্ধ অপেক্ষা বিদেশ হইতে আমদানী টিনের দুগ্ধই গো-দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া চালান হইয়া থাকে। ঐ চালানী দুগ্ধের শতকরা ৭৫ ভাগ নাকি টিনের দুগ্ধ এবং বাকী ২৫ ভাগ মাত্র সরকারের

নিজস্ব ডেয়ারী হইতে ও নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

সম্প্রতি প্রদেশ সরকার একজন ডেয়ারী ডেভেলপমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দুগ্ধবৃদ্ধির পরিকল্পনা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রদেশ সরকার এই পরিকল্পনার জন্য যে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবেন তাহারই উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

এই প্রদেশে যে সমস্ত দেশী গাভী আছে উহাদের দ্বারা দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। যদি প্রদেশ সরকার ভাল জাতীয় গাভী অপর প্রদেশ হইতে আমদানী করিয়া পল্লী-অঞ্চলে মধ্যবিত্ত যুবকদের দ্বারা সমবায় পদ্ধতিতে ডেয়ারী প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে স্বল্প মূল্যে অথবা বিনামূল্যে ঐ সমস্ত গাভী দিবার ব্যবস্থা করেন তবেই দুগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি কতকটা সম্ভব হইতে পারে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের মধ্যেও ঐ রূপ ব্যবস্থা করিলে তাঁহারা তাঁহাদের উদ্বৃত্ত দুগ্ধ সরকারী দুগ্ধ-সংগ্রহ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরবরাহ করিতে পারে। ঐ সমস্ত দুগ্ধ সংগ্রহ করিবার জন্য Cooling Plant যুক্ত মটর ভ্যান নিয়মিত সকালে ও বিকালে প্রধান প্রধান জেলা রাস্তাগুলির ধারে ধারে দুগ্ধ-সংগ্রহের ষ্টেশনগুলি হইতে দুগ্ধ লইয়া কলিকাতা অথবা স্থানীয় নিকটবর্ত্তী শহরগুলিতে সরবরাহ করিতে পারে। এই প্রদেশে গোচারণ ভূমিরও খুবই অভাব এবং পল্লীতে পল্লীতে সেই অভাব পূরণ করিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। সেই কারণ দুগ্ধবৃদ্ধি পরিকল্পনার মধ্যে দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ হইবার পর ঐ সমস্ত সরকারী বিতরিত গাভীগুলিকে জেলার সরকারী ডেয়ারী ফার্ম্মে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নচেৎ উহাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকিবে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, খাদ্যের জন্য প্রতিদিন অপর প্রদেশ হইতে দুই-একখানি ট্রেন বোঝাই বহু ছাগল ও ভেড়া কলিকাতায় আমদানী করা হয় এবং এই বাবদ প্রতি বৎসর বাংলাদেশকে কয়েক লক্ষ টাকা অপর প্রদেশে পাঠাইতে হয়। বাংলাদেশে সকল ঋতুতে নানারূপ ঘাস ও গাছের পাতার অভাব না থাকা সত্ত্বেও এই প্রদেশে ছাগল ও ভেড়া পালনের প্রথা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক কম। ইহাদের মূল্য ও মাসিক খরচা বেশী নহে। বাংলায় পল্লী ও গ্রামাঞ্চলে এমন কি শহরাঞ্চলেও সকল গৃহস্থই ছাগল ও ভেড়া পালন করিয়া অল্প খরচায় যথেষ্ট দুগ্ধ পাইতে পারেন। যদি পশ্চিমবঙ্গে ছাগল ও ভেড়া পালনের প্রসার লাভ করে তাহা হইলে একই সঙ্গে প্রদেশে দুগ্ধ উৎপাদন ও খাদ্য বৃদ্ধি হইবে।

সরকারী কৃষি-বিভাগ এ বিষয়ে সেরূপ মনযোগ দিতেছেন না এবং এইজন্য কোন প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন না কেন তাহা বুঝিতেছি না।

প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় মাটির গুণের প্রভেদ আছে। একই রকম ফসল ও খাদ্যশস্য এক জেলায় অথবা মহকুমায় যেরূপ উৎপন্ন হয় অপর জেলায় ও মহকুমায় শত চেষ্টা করিলেও সেইরূপ উৎপন্ন হয় না। তাহার উপর জলবায়ুর সমতাও সকল জেলায় একরূপ নহে। এ ক্ষেত্রে যদি ভাল ভাবে এই প্রদেশে কৃষির উন্নতি করিতে হয় তাহা হইলে প্রত্যেক জেলায় এবং সম্ভব হইলে প্রত্যেক মহকুমায় একটি করিয়া সরকারী কৃষিক্ষেত্র গোচারণ ভূমিসহ থাকা একান্ত আবশ্যক। ঐ সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে বীজ উৎপাদন এবং স্থানীয় মাটির গুণ ও জলবায়ু অনুসারে যে সমস্ত খাদ্যশস্য ও ফসল ভালরূপ উৎপন্ন হইতে পারে তাহা পরীক্ষা করিয়া স্থানীয় কৃষকদিগকে উপদেশ দিতে হইবে এবং সেই ভাবে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে।

সংবাদপত্রে দেখিলাম, পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য ও পুনর্বসতি মন্ত্রী (Relief & Rehabilitation Minister) ২৪ পরগণার কয়েকটি থানা পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থাভাবে স্থানীয় অধিবাসীরা তাহাদের নিজেদের আহার্য্য সংগ্রহ করিতে একেবারেই অক্ষম। তিনি বলিয়াছেন, —"ইহা খাদ্যের দুর্ভিক্ষ নহে—অর্থের দুর্ভিক্ষ।"

যদি এই ভাবে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা বাংলা হইতে অপর প্রদেশে চলিয়া যায় তাহা হইলে আজ হাসনাবাদ, সন্দেশখালি, হাড়োয়া, জয়নগর, ক্যানিং প্রভৃতি থানা অঞ্চলে অর্থের যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে তাহা যে এক দিন সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিতে পারে একথা লেখাই বাহুল্য।

অসভ্য সভ্যতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বন থেকে মোরা নগরেতে আসি,
নগর হইতে বনে,
সভ্যতা আর বর্ব্বরতার
ক্রমপরিবর্ত্তনে।
ক্রোধে, হিংসায়, আজও হই অন্ধ,
আনন্দে সেই আমিষের গন্ধ,
গুহার মানবই বাস করিতেছি
মর্ম্মর-নিকেতনে।

২

দেহে মনে মোরা পশু হতে কিছু
উর্দ্ধে উঠেছি বটে,
তবু ভালবাসি থাকিতে, যে বেশী
তাদের সন্নিকটে।
যতই আবরি' আবরণে আভরণে,
অধিক সখ্য সেই নগ্নতা সনে,
রক্তমাংস বড় হয়ে রাজে
এখনো মানস-পটে।

৩

স্বার্থ, অর্থ, প্রভুত্বকেই
শ্রেষ্ঠ কাম্য মানি',
ফুৎকারে ধরা ভস্ম-করার
শুনাই অভয় বাণী।
করি' উপেক্ষা মহার্ঘ মৃগনাভি—
মাংস, শৃঙ্গ, চর্ম্মেই করি দাবি,
বুকের বিশাল ঐশ্বর্য্যের
নিত্য হতেছে হানি।

সুদুর্লভ সে মনুষ্যত্ব
হারালো বিমূঢ় হিয়া।
মানব দানব হলো স্বেচ্ছায়
বিবেক বিসর্জ্জিয়া।
কোনো অন্যায় লাগে নাকো আর হেয়,
সব পাপ ধীরে হইতেছে পাংক্তেয়,
এর চেয়ে ভাল, বনে বনে ফেরা—
লাঙ্গুল ঝুলাইয়া।

৫

অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি
এখনো ধূমায়মান,
'পম্পীর' মত হবে কি ধরণী
ভস্মেই অবসান?
কবে নরমেধ যজ্ঞের হবেশেষ?
হবে কি দিব্য জীবনের উন্মেষ?
কোথায় সিদ্ধি? কোথায় শান্তি?
কোথায় সে কল্যাণ?

৬

রণ-দামামার শব্দে বধির
শ্রবণ ভাগ্যহারা,—
শুনিতে পায় না নূপুরের ধ্বনি,
মধু বংশীর সাড়া।
দেবতার আর হয় না অধিষ্ঠান।
নাই বিশ্বাস, স্থির-তপস্যা, ধ্যান—
তামা ওজনের 'মণ' লয়ে আছে
মানবের মন খাড়া।

৭

মঙ্গলময়ে টলাতে পারে না
হৃদয় অনির্ম্মল,
তাঁর তুষ্টির আলোক ব্যতীত
সকলি যে নিষ্ফল।
গর্ব্বিত নর। তোমার আবিষ্কার
কতটুকু বেশী সন্ধান দিলে তাঁর?
অমৃতের কোনো খবর পেলে কি
ক্ষুধিত ভূমণ্ডল?

এসো, পরিধিতে নিরঞ্জনের
'রঞ্জন' রশ্মির,
দেখ, তুমি সেই বন্য মানব
হস্তে ধনুক তীর।
কোথা সজ্জিত রঙ্গিন পটভূমি?
কুৎসিততর দেখিবে হয়েছ তুমি।
বিশ-শতকের সভ্যতা হবে
লজ্জায় নতশির।

কি ছিল, কি হ'ল?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

৪

দীনবন্ধু সিদ্ধান্তরত্ন ছিলেন জমিদারের সভাপণ্ডিত। পারিবারিক শুভাশুভ-গণনা ও মাঙ্গলিক নির্দেশদানের জন্যে প্রত্যহ তাঁকে জমিদার-বাড়ীতে পদধূলি দিতে হ'ত। সে কারণে তাঁর বৃত্তিভোগের ব্যবস্থাও ছিল প্রচুর।

বর্তমান যুবক-জমিদার সিদ্ধান্তরত্নঠাকুরকে সসম্মানে অপসারিত করেছেন। কালীবাড়ীর জমিজমার মত পণ্ডিতের বৃত্তি-ব্যবস্থাও অনাবশ্যক বাজে ব্যয় ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না তিনি। ব্যয়-সংক্ষেপের অজুহাতে এরূপ একটি হিতাকাঙ্ক্ষী পণ্ডিতের বৃত্তিলোপ জমিদার-গৃহিণী রমাদেবী সমর্থন করেন নি। মাঝে মাঝে দীনবন্ধু ঠাকুরকে তিনি ডেকে পাঠাতেন—যথারীতি প্রণামীও দিতেন। সেই সুযোগে অন্দর-মহলে থেকেও জমিদারের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্যে প্রজা-সাধারণের অসন্তোষবৃদ্ধির কারণটাও অবগত হতে পারতেন।

জনমত উপেক্ষা করে কালী-মন্দির দখলের অভিযান দেখে রমাদেবী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েও জমিদারকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেন নি।

একদিন তিনি গোপনে দীনবন্ধু ঠাকুরকে ডেকে পাঠালেন। উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কি উপায় হবে ঠাকুরমশাই?

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে দীনবন্ধু-ঠাকুর বললেন, আমি আর কি বলবো মা? মতপের উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে উঠেছে। এ জমিদারী বোধ হয় ধ্বংস হবে…

—শুনেছি নরোত্তম আপনার বিশেষ অনুগত। দয়া করে তাকে বলবেন…কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই চুপ করে রইলেন। কি যে বলবেন, ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। হঠাৎ নিজের একমাত্র পুত্র খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন।

রমাদেবীর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে দীনবন্ধু ঠাকুর তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বুঝিয়ে বললেন, নরোত্তম একটা নির্দয় ডাকাত, অতি দুর্দ্ধর্ষ লেঠেল—সেকথা সত্যি। কিন্তু সে অমানুষও নয়, অধার্মিকও নয়। নিতান্ত অশিক্ষিত চাষা হলেও তার মাতৃভক্তি অসাধারণ। কোনও মায়ের বুকে আঘাত দিতে সে কখনই পারবে না…

—কিন্তু মা-কালীর কোপ-দৃষ্টি! তাঁকে অবজ্ঞা করার শাস্তি? রমাদেবী শিউরে উঠলেন।

দীনবন্ধু ঠাকুর জানতেন যুবক-জমিদার ঘোর নাস্তিক—বিশেষ ভাবে পৌত্তলিকতা-বিরোধী। বাড়ীর সর্ব্বত্র বাবুজির গতিবিধি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যেমন দেব, তেমনি দেবী। কিন্তু একি! মা-কালীর কোপদৃষ্টির ভয়ে রমাদেবীর চোখ-মুখ পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে যে!

অতীতে এই জমিদার-বংশের খেতাব ছিল 'রাজা'। এখন-কার যুবক-জমিদার কুমারবাহাদুর নামেই পরিচিত। কুমার-বাহাদুর ছোটবেলা থেকেই উচ্ছৃঙ্খল ও অধ্যয়নে অমনো-যোগী। বৃদ্ধ জমিদারের বন্ধুকন্যা এই পিতৃ-মাতৃহীনা রমা দেবী আবাল্য জমিদার-বাড়ীতেই প্রতিপালিত। কুমারবাহাদুরের সমবয়সী, খেলার সাথী ও সহপাঠিনী। বৃদ্ধ জমিদার রমাকে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসতেন ও আদর-যত্ন করতেন। কুমারবাহাদুর উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের দোলায় পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। কিছুতেই তার দেয়াল ডিঙিয়ে কলেজে পৌঁছতে পারলেন না। রমাদেবী সসম্মানে বি-এ পাস করলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুমারবাহাদুরের পানাসক্তি ও আনু-ষঙ্গিক ব্যাপারাদির কথা যখন বৃদ্ধ জমিদারের কানে পৌঁছল, তখন তিনি কুমারকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণার সঙ্কল্প জানালেন। প্রতিবাদী হলেন—রমাদেবী।

গম্ভীরভাবে বৃদ্ধ জমিদার জিজ্ঞাসা করলেন, রমা! পারবে তুমি আমার এই জমিদারী রক্ষার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে?

প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে রমাদেবী বহুক্ষণ লজ্জিতভাবে ঘাড় হেঁট করে বসে রইলেন।

বৃদ্ধ জমিদার বলতে লাগলেন—ভেবে দেখ, বুঝে দেখ, একটা উচ্ছৃঙ্খল মাতালের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সারাজীবন চোখের জলে ভাসবে কিনা…?

রমাদেবী নিরুত্তর। কুমারবাহাদুরের সঙ্গে তার প্রকৃতিরও কোন সাদৃশ্য ছিল না, মতেরও মিল ছিল না। কুমারের প্রহারের দু'একটা চিহ্ন এখনও তার দেহে আছে। কতদিন পুকুরঘাটে গিয়ে কুমার তাকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিয়েছে—আবার পিঠে তুলেও সাঁতার শিখিয়েছে। পড়ার বই কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে, আবার দপ্তরীকে দিয়ে বাঁধিয়ে এনে সোনার জলে নাম খোদাই করেও দিয়েছে। স্নেহের এইরূপ বহু অত্যাচারের মধুর স্মৃতি রমার মনে ভেসে উঠতে লাগল। তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। সেই কুমার হবে ত্যাজ্য-পুত্র! একেবারেই বঞ্চিত ও ব্যর্থ হবে তার জীবন। রমা তা সহ্য করবে কি করে?

উচ্ছৃঙ্খল কুমারের প্রতি রমার এই দরদী মনের সহানুভূতির কথা বৃদ্ধ জমিদার জানতেন। তবু তাকে সতর্ক হতে বললেন।

কুমারের এই অধঃপতনের জন্যে তার লোকান্তরিতা স্নেহশীলা জননীকে দায়ী করে বলতে লাগলেন, মেয়েরা শুধু ভালবাসতেই জানে। নির্জ্জলা স্নেহ আর মমতা দিয়ে মানুষ তৈরি করা যায় না। শাসন নির্ম্মম না হলেও নিরপেক্ষ ও নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। তুমি পারবে না রমা! তোমার সহিষ্ণুতা ও কোমলতার খবরও আমি রাখি।

—না না, আমি পারব। কুমারের প্রতি এত বড় অবিচার আপনি করবেন না।—রমাদেবী অবুঝ বালিকার মত কেঁদে ফেললেন।

একটু হেসে দীনবন্ধু ঠাকুরের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ জমিদার বললেন, তবে আর ভাবনা কি সিদ্ধান্তরত্ন? পাঁজি খুলে দিন দেখ। লোকে কন্যা-সম্প্রদান করে, আমি পুত্র-সম্প্রদান করব—আমার ওই শিক্ষিতা-মা রমার হাতে···

ভালবাসা অন্ধ। নিমজ্জমান শৈশব-সাথীকে ডাঙায় তুলতে গিয়ে রমাদেবী নিজেও ডুবে মরতে রাজী হলেন। মহাসমারোহে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল।

আজ পর্য্যন্ত স্বামীর চরিত্র-সংশোধনের বহু চেষ্টা রমাদেবী করেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। শ্বশুরের মৃত্যুর পর কুমারকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ ঘুরে এসেছেন, বর্ত্তমান জগতের উদার মতবাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কুমারের নিজস্ব মতবাদের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নি।

কুমারবাহাদুরের ধারণা শুধু শাসন ও শোষণই জমিদারী রক্ষার একমাত্র উপায়। রমাদেবীর প্রজা-হিতৈষণা অতি অবাস্তব ভণ্ডামি। চাষার জন্ম জমি-চাষের জন্যে, আর জমিদারের জন্ম সেই চাষের উপস্বত্ব ভোগদখলের নিমিত্ত। নরোত্তমের মত একটা চাষীপ্রজা আজ তার প্রতিদ্বন্দ্বী—একথা ভাবলেও কুমারবাহাদুরের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

পাশ্চাত্য পরিবেশ থেকে কুমারবাহাদুর আহরণ করে এনেছেন অতি উৎকট মতবাদ আর নানাবিধ বিলাস-ব্যসনের প্রবৃত্তি। হঠাৎ জমিদারবাড়ীতে বিজলী-বাতির রোশনাই দেখে, প্রজাদের চোখ ঝল্‌সে গেল। তারা কুমারের নিউ-মডেলের মোটরখানাকে অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু রমাদেবীর ঐকান্তিক অনুরোধ সত্ত্বেও দু'চারটা টিউবওয়েল খুঁড়ে প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণের কোনও ব্যবস্থাই হ'ল না।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে মা-কালীর প্রতিবাদ-মূর্ত্তি! কালীবাড়ী সম্বন্ধে রমাদেবীর মনে যে কতখানি গোপন দুর্ব্বলতা আছে—সেকথা কুমারবাহাদুর জানেন না। দেব-দেবীর মধ্যে কালীকে তিনি অত্যন্ত ভয় করেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে তার খানিকটা মতৈক্য থাকলেও করালবদনীকে একেবারেই অস্বীকার করতে পারেন না তিনি। কালীকে মনে করেন—অনিশ্চিত অন্ধকারের বিভীষিকা! সেই রুধিরাক্ত লোলরসনা ভয়ঙ্করী দেবী যদি বিরূপ হয়ে উঠেন—মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করেন, তা হলে কুমারবাহাদুরের মত অত্যাচারীরাই যে হবে তার প্রথম বলি, এ বিষয়ে রমাদেবীর কোন সন্দেহ নেই।

রমাদেবী এক দিন কুমারবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, কালীবাড়ীটা দখলে নিয়ে তুমি কি করতে চাও, তোমার উদ্দেশ্য কি?

সদম্ভে কুমারবাহাদুর গর্জ্জে উঠলেন, ওখানেই হবে আমার বাগানবাড়ী। ঐ কুৎসিত পাথরের মূর্ত্তিটাকে আমি বিসর্জ্জন দেব মরগঙ্গার জলে···

রমাদেবীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে তার বলতে ইচ্ছা হ'ল—ওগো, না, না, আমার এত বড় সর্ব্বনাশ করো না। শুধু এ জমিদারী ধ্বংস হবে না, আমার খোকাও মরে যাবে।—মানুষের সংস্কার বা বিশ্বাসকে কোনও যুক্তিতর্কের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা যায় না।—একথা কুমারবাহাদুরের জানা নেই।

দীনবন্ধুঠাকুর বলেছেন, এ জমিদারী ধ্বংস হবে। কালীবাড়ী দখলের চেষ্টাই যে হবে সেই ধ্বংস-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সে বিষয়ে রমাদেবীর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু উপায় কি?

রমাদেবী দীনবন্ধু ঠাকুরকে মনের উদ্বেগ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কুমারবাহাদুরের মতিগতি পরিবর্ত্তনের কি কোনও উপায় নেই?

দীনবন্ধু ঠাকুর হতাশভাবে বললেন, তাই ত মনে হয় না! 'প্রকৃতি বুর্দ্ধিমি বর্ত্ততে···'

৫

নরোত্তমের সড়কীর আঘাতে কুমারবাহাদুরের উরুদেশ জখম হয়ে আছে। এক মাসের উপর তিনি শয্যাশায়ী। এ অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করা তাঁর পক্ষে মৃত্যুর চেয়েও বেশী মনে হচ্ছে। রমাদেবী কোনও কথা বলতে এলেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন—চিৎকার করে বন্দুকটা দেখিয়ে বলেন, পার ত নরোত্তমকে গুলি করে এস···

নরোত্তম কে? রমাদেবী মনে করেন উচ্ছৃঙ্খল জমিদারের

সহোদর তিনটি ভাইকে নিয়ে নরোত্তম যে সুখের সংসার গড়ে তুলেছিল—সেখানে কারও গায়ে কোনও দুঃখের আঁচ লাগত না, যদি বৌয়েরা একটু বুঝে-সুঝে চলত। বৌয়েদের মধ্যে কারও সঙ্গেই কারও বনিবনাও ছিল না। সে কারণে নরোত্তমের মনেও অশান্তি ছিল খুব।

সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ দীনবন্ধু ঠাকুরকে নরোত্তম বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। সন্ধ্যার পর তাঁর মুখে ধর্ম্মকথা শোনা

মনোত্তমের একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিজের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথা দীনবন্ধু ঠাকুরের কাছে নিবেদন করতে না পারলে তার মনে শান্তি হ'ত না।

বৌয়েদের ঝগড়া-ঝাঁটি ছিল মনোত্তমের সংসারে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কি ভাবে সামান্য একটা কথার ভুল বা ত্রুটি উপলক্ষ্য করে কলহের সৃষ্টি হ'ত তা দেখে মনোত্তমের স্নেহার্দ্র উদার মন ব্যথায় ভরে উঠত। কিন্তু প্রতিকারের কোনও উপায় খুঁজে পেত না। ঝগড়ার কারণ বিশ্লেষণ করে এক দিন সে দীনবন্ধু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করল—বল ত ঠাকুর-খুড়ো! কি উপায় করি।

দীনবন্ধুঠাকুর বললেন, মনোত্তম! শুধু উপেক্ষা। এ ছাড়া এদের শান্ত রাখবার কোনও উপায় নেই।

—আমার মনে হয়, বৌয়েরা হাঁড়ি আলাদা করতে চায়···

একটু চিন্তা করে দীনবন্ধু ঠাকুর বললেন, হাঁড়ি আলাদা করলে যদি শান্তি হয় করতে পার, কিন্তু বাড়ী আলাদা করো না। ঝাড়ের বাঁশ ঝড়ে পড়ে না। চারটি ভাই, এক ঠাঁইয়ে আছ বলেই লোকে তোমাদের সমীহ করে চলে। বুদ্ধিমান লোকও একা হলে বোকা হয়ে যায়···

—তা সত্যি···মনোত্তম একটু ভাবল। হাঁড়ি আলাদা করার কথা ভাবতেও তার বুকটা ফেটে যায়। একটু উত্তেজিত ভাবে হঠাৎ বলল, আমার তারাচরণ, আমার শশিচরণ, আমার মনোহর যে আমার পাঁজরার এক-একখানা হাড়—এ কথাটা বৌয়েরা কেন বুঝে না? বলতে পার ঠাকুরখুড়ো?

—তারা যে পরের মেয়ে!—এক টিপ্ নস্য টেনে দীনবন্ধু-ঠাকুর বললেন।

ব্যাখ্যা করে মানে বুঝিয়ে দেবার সময় দীনবন্ধু-ঠাকুর লক্ষ্য করলেন—মনোত্তমের দু'চোখ সজল। বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা মনোত্তম! তুমি লাঠিবাজী কর। সড়কীর খোঁচায় মানুষের বুকটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করতেও তোমার হাত কাঁপে না। তোমার চোখে জল কেন?

ঠিক এই সময়ে দীনবন্ধু গৃহিণী খানিকটা সরিষার তৈলে মাখা এক থালা মুড়ি আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা এনে রাখলেন মনোত্তমের সামনে।

—আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে তা তুমি কি করে জানলে খুড়িমাঠাকরুণ?—হাসতে হাসতে মুড়ির থালাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে মনোত্তম বলল, ছেলের চোখ-মুখ দেখলেই মায়েরা বুঝতে পারেন, সে না-খেয়ে আছে, বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। তাই নয় কি মা? মনোত্তম খুব হাসতে লাগল।

খুড়ো বলে ডাকলেও মনোত্তম প্রায় দশ বছরের বড়। এমন বুড়ো-ছেলের মা ডাক শুনে দীনবন্ধু-গৃহিণী ঘোমটায় মুখ ঢেকে এক ঘটি জল রেখে চলে গেলেন।

তার মাস। পল্লীর মাঠ-ঘাট কানায় কানায় ভরা। ধান আর পাট সেই জলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বেড়ে উঠছে। দিগন্ত-বিস্তৃত একটা সবুজ আস্তরণ যেন দূরে—বহু দূরে গিয়ে মিশেছে নীল আকাশের কোলে। যেখানে যেখানে আগাম পাট-কাটা সারা হয়ে গেছে, সেখানে ফুটে উঠেছে অসংখ্য শালুক ফুল। দূরে দূরে দু'একটা হিজল গাছ যেন বুক-জলে দাঁড়িয়ে আছে।

গাঁয়ের ঘাটে ঘাটে ডিঙি নৌকা আর লগি। বর্ষাকালে শস্য-শ্যামল পূর্ব্ববঙ্গের বিলাঞ্চলে এবাড়ী-ওবাড়ী যাতায়াত করতে হলেও জলযানের সাহায্য চাই। বাড়ীগুলি যেন পটে আঁকা ছবির মত জলের উপর বিক্ষিপ্তভাবে ভেসে আছে।

দীনবন্ধুঠাকুরের বাড়ী গাঁয়ের দক্ষিণপ্রান্তে। তার দাওয়ায় বসে মধুমতীর ঢেউ দেখা যায়। বহু দূর পর্য্যন্ত ফাঁকা। ধানের জমির ভিতর দিয়ে 'দাঁড়া' পড়ে গেছে। সেই দাঁড়াই হ'ল গ্রাম্য নৌকাগুলির গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াতের পথ। বাতাসের সুযোগ বুঝে কেউ-বা গায়ের চাদর উড়িয়ে পাল তুলেছে, কেউ-বা লগি ঠেলছে বাতাসের বিরুদ্ধে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও মাঠে নামে নি, গৃহস্থের আনাচে-কানাচে উঁকি দিচ্ছে। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ-রশ্মি গাছের আগায় ঝিক্‌মিক্ করছে। মনোত্তম তার দেশকে ভালবাসে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে মাঠের দিকে চেয়ে মুড়ি চিবুচ্ছে—তার মনের ভাব বোধ হয় এইরূপ—'এই দেশেতেই জন্ম যেন দেশেতেই মরি!'

এমন সময় একটা পুরো-পেটো ইলিশ মাছ হাতে নিয়ে বকা-জেলে এসে হাজির হ'ল। দীনবন্ধুঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে বকা—খবর কি?

—বড়ই মুশকিলে পড়েছি ঠাকমশা!

—কি মুশকিল?

—ওপাড়ার মধুঠাকুর এই মাছটা দর করলেন দু'আনা। আমি চেয়েছি দশ পয়সা। না, না, দু'আনাই দিচ্ছি বলে, একটা দু'আনি ফেলে দিলেন তিনি আমার নৌকোর ভিতর···

—তারপর?

—দু'আনিটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না—মাছের দাবিও তিনি ছাড়ছেন না। এখন কি উপায় করি বল ত···?

—দু'আনিটা তুই দেখেছিস?

—আজ্ঞে না। তবে নৌকোর ভিতর 'ঠক' করে একটা শব্দ হয়েছে—তা শুনেছি···

মনোত্তম বলল, একটা পয়সা ফেললেও ত 'ঠক্' করে শব্দ হতে পারে···

—উঁহুঃ! একটা ঠক্-শব্দ শোনাবার জন্যে একটি পয়সা ব্যয় করবেন—এত নির্ব্বোধ মধুঠাকুর নয়। তাহলে···ট্যাক

থেকে তিন আনার পয়সা বকার হাতে দিয়ে দীনবন্ধু ঠাকুর বললেন, এই নে দাম। মাছটা আমাকেই দিয়ে যা…

—বামুনের অভিশাপ লাগবে না ত?

—আরে, আমিও ত বামুন। আশীর্ব্বাদ করছি—'তুই একশো বছর বাঁচবি'। অভিশাপে আর আশীর্ব্বাদে কাটাকাটি হয়ে যাবে, তোর পরমায়ু ঠিকই থাকবে।

মাছটা দীনবন্ধু ঠাকুরের পায়ের কাছে রেখে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বকা চলে গেল পয়সা নিয়ে।

নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপারটা কি হ'ল ঠাকুর-খুড়ো? নৌকোর ভেতর মধু ঠাকুর কি ফেললেন?

—যা ফেললে ঠক্-শব্দ হয় তার বেশী কিছুই ফেলেন নি। মধু ঠাকুরের কাছে মাছের চেয়েও পয়সা বেশী মধুর। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে নরোত্তম…

—কি?

—যাবার পথে এই মাছটা পৌঁছে দিও মধু ঠাকুরের বাড়ীতে…

—কেন?

—আরে, তিনি যে আমার বেয়াই। মেয়ে মরে গেলেও সম্পর্কটা ত এখনও আছে? বিনা পয়সার মাছটা পেলে খুব খুশী হবেন তিনি…

মরা মেয়ের কথা মনে পড়ে দীনবন্ধু ঠাকুরের চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। মধু ঠাকুর অনেক নির্যাতন করেছিলেন মেয়েটিকে। নানা রোগে ভুগে মরেছিল সে। কখনও এক কৌটা ওষুধ বা পথ্যের জন্তে ব্যয় করেন নি। সেই অর্থ-পিশাচকে খুশী করবার আগ্রহ দেখে নরোত্তম অবাক হয়ে চেয়ে রইল দীনবন্ধু ঠাকুরের মুখের দিকে।

মাছটা হাতে তুলে নিয়ে নরোত্তম বলল, আমি কিন্তু দুটো শক্ত কথা শুনিয়ে দেব তোমার বেয়াইকে।

—না না, শক্ত কথা শোনানো মানেই মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে আরও বেশী করে জাগিয়ে তোলা। হ্যাঁ ভাল কথা, দাদার মোকদ্দমার তারিখটা কোন্ মাসে পড়েছে নরোত্তম?

—আশ্বিন মাসে, পূজোর পর…

—তাই নাকি? খুব হুঁসিয়ারীর সঙ্গে তদ্বির কর, ভাল উকিল লাগাও। জমিদার-গৃহিণী কি বলেছেন জান?

—কি?

—যত টাকা লাগবে তিনি দেবেন। তোমার যেন জেল না হয়। তবে, কথাটা খুব গোপন রাখা চাই। কুমার-বাহাদুর জানতে না পারেন…

নরোত্তমের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। যত টাকা লাগবে জমিদার-গিন্নী দেবেন—এ কথার মানে কি? এও কি সম্ভব? নরোত্তম উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার বসে পড়ল। সবিস্ময়ে বলল, কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না ঠাকুর-খুড়ো! বুঝিয়ে দাও তুমি কি বলছ…?

দীনবন্ধু ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন—রমাদেবী অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন তাঁর একমাত্র পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়। নরোত্তম যে মা-কালীর অনুগৃহীত সে বিষয়ে তাঁর মনেও কোনও সন্দেহ নেই। শাবনের অমাবস্যা তিথিতে দীনবন্ধু ঠাকুর নিজেই দেবীকে বিশেষভাবে অর্চনা করবেন খোকার দীর্ঘায়ু কামনার জন্তে। নরোত্তম অবাক হয়ে শুনল সেই অবিশ্বাস্য অদ্ভূত কাহিনী।

৬

যুদ্ধের বাজারে ধানের দাম চড়ে গেছে—বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত। সারা বছরের খোরাকী ধান ধরে তুলেও নরোত্তম অনেক ধান বেচল। টাকাও পেলে অনেক। চারটে পিতলের ঘটি কেনা হ'ল। মোটভর্ত্তি ঘটিগুলি পুঁতে রাখা হ'ল চার ভাইয়ের ঘরের মেঝের বিছানার নীচে।

কিছু টাকা হাতে রেখে শ্যামাচরণ বলল, এবার চার বৌকে চার ছড়া হার গড়িয়ে দিতেই হবে। কি বল বড়দা?

সখিচরণ বলল, উঁহুঃ! মেয়েদের গলায় হার ত প্রায় ঢাকাই থাকে। লোকের চোখে পড়ে না। তার চেয়ে ভাল—চারটে নথ গড়িয়ে দাও। দিনরাত যারা মুখ নেড়ে নেড়ে ঝগড়া করে, তাদের মুখে নথের বাহারই খুলবে ভাল।

নরোত্তম হো হো করে হেসে বলল, ঠিক বলেছিস…

মনোহর প্রতিবাদ জানাল—এখন কোনও গয়না গড়াবার দরকার নেই। টাকা জমাও। সামনের বছর ইট কাটা হবে। চার-ভাইয়ের চারটে কুঠুরি আগে দরকার। এ টিনের ঘরগুলো বড্ড গরম। চোত-বোশেখ মাসে যেন আগুনের মালসা মাথায় নিয়ে বসে থাকতে হয়…

নরোত্তম বলল, সেই কথাই ভাল। এবার খুব জোরে লাঙল চালিয়ে জমিগুলো সব চষে ফেল্। সামনের বছর দ্বিগুণ ফসল ফলানো চাই। দোতলাই তুলব…

সোৎসাহে চার ভাই মাঠে যায় ও লাঙল চালায়। বৌয়েরাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর ঝগড়া-ঝাঁটি করবে না। কিন্তু ক'দিন? পাঁচ-সাত দিন পরেই হঠাৎ আবার এক দিন বেধে গেল।

তাদের একমাত্র বোন কাদম্বিনী হাঁকাতে হাঁকাতে গিয়ে হাজির হ'ল মাঠে—বড়দা! বৌরা দেদার ঝগড়া বাধিয়েছে…

—তাই নাকি? আচ্ছা চল—আজ তাদের ঝগড়ার চূড়ান্ত ফয়সালা করব। লাঙল ছেড়ে দিয়ে গরু-তাড়ানো লাঠিটা হাতে নিয়ে নরোত্তম রওনা হ'ল। যাবার সময় ভাইদের বলে গেল—তোরা তোদের কাজ কর…

বাড়ীতে পৌঁছেই চোরের মত পা টিপে টিপে নরোত্তম

গিয়ে দাঁড়াল বড় বৌয়ের পিছনে। সে তা জানতেও পারল না।

তর্জনী নেড়ে ও চোখমুখ ঘুরিয়ে বড়বৌ তখন বৌয়ের শাসাচ্ছিল—আসুক সে আজ বাড়ীতে। তোদের সবাইকে ঝেঁটিয়ে তাড়াব তবে আমার নাম চন্দ্রকলা!

হঠাৎ সামনে একটু ঝুঁকে, মুখের কাছে মুখটা নিয়ে বিদ্রূপের সুরে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা চন্দ্রকলা! তুমি কি একাই এ বাড়ীতে থাকতে চাও?

চন্দ্রকলা নিঃসন্তান। মেজভাই শ্যামাচরণের একটা বোবা ছেলেকে সে আঁতুড় থেকে মানুষ করেছে। ছেলেমেয়েরা কেউ তাকে মা বলে ডাকে না, বোবার মুখেও কথা ফুটবে না—এই দুঃখই চন্দ্রকলাকে অন্য বৌদের উপর ঈর্ষান্বিত করে তুলেছে।

আজ সকালে একজন গণৎকার এসেছিলেন। একটা টাকা দক্ষিণা নিয়ে বলে গেছেন—'শীগ্‌গিরই ভুতো কথা বলবে।' ভুতো সেই বোবা ছেলেটার নাম। বয়স প্রায় সাত বছর।

ভুতো কথা বলবে—এই আনন্দ-সংবাদ সবাইকে শুনিয়ে চন্দ্রকলা পাঁঠা মানত করেছেন মা-কালীর কাছে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়েছে মুখে কথা ফুটলে ভুতো কাকে মা বলে ডাকবে?

ঝগড়া বাধাবার কৌশলটা খুব ভাল জানে সেজবৌ—সখিচরণের স্ত্রী সুহাসিনী। বাধিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায়, খোঁচা দিয়ে ঝগড়া বাড়ায়, কিন্তু নিজে বেশী ঝগড়া করে না। ছোটবৌ মনোহরের স্ত্রী—নীহারিকার টিপ্পনীগুলি ছুধারী করাত—মাতৃত্ব নিয়ে বিবদমানা বড়বৌ ও মেজবৌ দু'জনকেই কাবেল করছে।

তুমুল ঝগড়া বেধে গেল। অনেক অতীত সুখ-দুঃখের কথা, অভাব-অভিযোগ, অন্যায়-অবিচারের কথা ফাঁস হয়ে গেল। পিছন থেকে নরোত্তমের কণ্ঠস্বর শুনে চন্দ্রকলার চমক ভাঙল। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল—ওগো, কি কলঙ্কের কথা! আমি নাকি কবে তাজের ভিতর লুকিয়ে তোমাকে দিয়েছি পাঁচখানা ভাজা মাছ?

নরোত্তম বলল—পাঁচখানা না দাও—সবার চেয়ে দু'চার খানা বেশী ত রোজই দাও আমাকে। আমি কি তা পছন্দ করি? তুমি হচ্ছ সকলের বড়। তোমার যদি বুদ্ধি-বিবেচনা না থাকে—এ সংসার টিকবে কি করে?

চন্দ্রকলা চিৎকার করে কেঁদে উঠল—ওগো তুমিও? তুমিও আমাকে অপবাদ দিচ্ছ?

—আঃ, চেঁচিও না। অপবাদের কথাটা কি হ'ল? আমিও মধু ঠাকুর নই, তুমিও শিবুর বৌ নও। এই নরোত্তম মোড়লের বৌ তুমি···সে কথাটা ভুলে যাও কেন?

জলভরা আরক্ত চোখে নরোত্তমের দিকে চেয়ে চন্দ্রকলা বলে উঠল—আমি যদি এতই মন্দ, আমাকে আলাদা করে দাও···

আড়ালে দাঁড়িয়ে সেজবৌকে লক্ষ্য করে মেজবৌ বলল—সেই কথাই ভাল। কি বলিস ভাই? যার যা জোটে, সে তাই খাবে। আমাদের ছেলেমেয়ে আছে, ওঁর ত সে বালাই নেই? কেন মিছিমিছি আমার ভুতোকে টেনে নিয়ে মা সাজতে চান?

ধমক দিয়ে নরোত্তম বলল—চুপ কর মেজবৌমা! আমি তোমাদের সবার মতলবই বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আজ থেকে সেই ব্যবস্থাই হবে···

সেখান থেকে একটু সরে এসে নরোত্তম তার বোনকে ডাকল—ওরে কাদু! বাইরের ঘরে আমাদের চার ভাইয়ের আর তোর রান্না চড়িয়ে দে। এক মায়ের পেটের ভাইবোন আমরা। আমরা কেন পরের মেয়েদের ছোটলোকমির জন্যে আলাদা হতে যাব?

কতকগুলো বাঁশের খুঁটি কেটে এনে, উঠানের মাঝখান দিয়ে নরোত্তম বেঁধে ফেলল একটা শক্ত বেড়া। তারপর চিৎকার করে বৌদের বলল—খবরদার! তোমরা কেউ কখনও এই বেড়া ডিঙিয়ে বাইরের দিকে এস না কিন্তু···

বৌয়েরা যে যার ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে নির্ব্বাক ভাবে দেখতে লাগল।

বেড়ার বাঁধন শেষ করে, হাতের দা'খানা উঁচু করে ধরে নরোত্তম আর একবার বৌদের শাসিয়ে বলল—সাবধান!···

কাদম্বিনী জিজ্ঞাসা করল—ছেলেমেয়েগুলো কোন্ দিকে থাকবে বড়দা?

—ছেলেরা আমাদের দিকে আর মেয়েরা বৌদের দিকে। বলেই নরোত্তম গিয়ে উঠে বসল বাইরের ঘরের দাওয়ার উপর। ঘর্মাক্ত দেহটা মুছে, গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগল।···

দুপুরে বাড়ীতে ফিরে এসে শ্যামাচরণ, সখিচরণ ও মনোহর বিনা প্রতিবাদে দাদার এ ব্যবস্থা মেনে নিলে। সত্যিই ত বৌয়েরা পরের মেয়ে। তারা মোড়লদের কে? নরোত্তমের এ যুক্তি অকাট্য।

শ্যামাচরণ একটু স্ত্রৈণ। মেনে নিতে বাধ্য হলেও তার মনটা খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল। সখিচরণ নির্ব্বিকার। সারা-দিনের ক্লান্তির পর গোপী-যন্ত্রটা বাগিয়ে নিয়ে দু'চারটে ভজন গাইতে পারলেই তার তৃপ্তি। বেসুরো গানের পরেই আরম্ভ হয় তার সুরেলা নাসিকা গর্জ্জন! মনোহর সেদিন বিয়ে করেছে—এখনও বয়স জোরে নি। দাদার এ আদেশ তার কাছে কাঁসির হুকুমের মতই নির্মম মনে হ'ল।

বাইরের ঘরটা খুব বড়। তার এক দিকে চালা কয়াম্

পেতে চার ভাইয়ের শোবার ব্যবস্থা হ'ল। আর এক দিকে কাদম্বিনী রইল বাচ্চা ছেলেদের নিয়ে। কারও ঘুম আসছে না। সবাই পড়ে আছে ঘুমের ভান করে। সবাই মনে করছে—সে ছাড়া আর কেউ জেগে নেই।

কালীবাড়ীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। মনোহর উঠে বসল। দাদারা যে ঘুমিয়ে আছে সে বিষয়ে তার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। অন্ধকার ঘর। চারদিকে তাকাতে তাকাতে চোরের মত পা টিপে-টিপে সে গেল দরজার ধারে। তার পর নিঃশব্দে দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। পিছন ফিরে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে অতি সন্তর্পণে।

ফাল্গুন মাস। শুক্লপক্ষ। আধখানা চাঁদ তখনও আকাশের এককোণ থেকে ম্লান জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছেন। বসন্তের হাওয়ায় গাছের পাতাগুলিও কেঁপে কেঁপে নবজীবনের সাড়া অনুভব করছে। সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে মনোহর গিয়ে দাঁড়াল ছোটবৌ নীহারিকার জানলার কাছে। খোলা জানলা-পথে উঁকি মেরে দেখল—এলোচুলে নীহারিকা ঘুমিয়ে আছে অকাতরে। কি আশ্চর্য্য! মনোহরের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। যার জন্যে তার চোখে ঘুম নেই, সে কি করে এমন নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল? মুখে ত বলে খুব ভালবাসি। এই কি ভালবাসা? ভালবাসাকে ছাপিয়ে ঘুম আসে কি করে? নিশ্চয়ই তার ভালবাসায় একটুও গভীরতা নেই। মনোহর ভেবেছিল, সে এসে দেখবে—নীহারিকা জানালা-পথে চাঁদের দিকে চেয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। মনোহরকে দেখেই ছুটে এসে দরজা খুলবে। কিন্তু এ কি?

খুব নীচু স্বরে মনোহর তিন চারবার ডাকল—নীহার… নীহার…তবু নীহারিকার ঘুম ভাঙল না। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে জানালা-পথে হাত বাড়িয়ে এক গোছা চুল ধরে টান দিতেই নীহারিকা হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

চুপ চুপ—আমি—চেঁচিও না…

কে তার আমি? নীহারিকার ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নি। তখনও সে চেঁচাচ্ছিল—চো—চো—চো…

ছোটবৌয়ের ঘরের পাশেই মেজবৌ সুহাসিনীর ঘর। সে বাইরে ছুটে এল দরজা খুলে। মনোহরকে দেখেই বুঝল —ব্যাপারটা কি? নীচু স্বরে ধমক দিয়ে ছোটবৌকে বলল —মর্ বাঁদরী? দরজাটা খুলেই দেখ না—কে?

মনোহর দাঁড়িয়ে রইল লজ্জায় মাথা হেঁট করে।

বাইরের ঘরে তখন তারাচরণও উঠে বসেছে। মনোহরের পদাঙ্কানুসরণের প্রবৃত্তি তার মনেও জেগেছে। নরোত্তম আর নধিচরণ ত ঘুমিয়েই আছে—ভয় কি?

বৈৎ তারাচরণের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। ছেলেটিকে কাদম্বিনী নিয়ে এসেছে। তারাচরণের দুর্ভাবনা কোলের মেয়েটির জন্যে। সে বড্ড রোগা। সারারাত সাধু খায়। মেজবৌ সৌরভিণীর কত কষ্ট হয় তাকে নিয়ে। তারাচরণ যদি একটু সাহায্য না করে, বেচারা পারবে কেন? নিজে সে সারাদিন মেঠো-রোদে লাঙল চষে। তার চেয়েও ঢের বেশী কষ্ট হয় সেজবৌয়ের—ছেলেদের উত্তাপে।

নাঃ, মনোহর কোন অন্যায় করে নি। তারাচরণের সহানুভূতি জেগে উঠল। বড়দার এই নির্যাতন সহ্য করতে পারে—একমাত্র ঐ কুম্ভকর্ণটা। নধিচরণের দিকে একবার কটমট করে তাকাল, তার পর মনোহরের মতই বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।

নীচু স্বরে নধিচরণ বলল—বড়দা! এবার মেজদাও গেল কিন্তু…

বিরক্তির সঙ্গে নরোত্তম বলল—তুইও যা…

নধিচরণ পাশ ফিরল। সদম্ভে বলল—আমি মেজদার মত 'মেধো' নই…

নরোত্তম বলতে লাগল—দেখ ন'খে! তোদের জন্যেই পারছি নে বৌগুলোকে ঢিট্ করতে।

বা রে আমাকে বকছ কেন? আমি ত চুপটি করে শুয়েই আছি।

এখনও ঘুমোস নি কেন?

তুমিও ত ঘুমোও নি…

আমার কি দুশ্চিন্তার সীমা আছে? মাথার উপর ঝুলছে দুটো খুন আর দশটা জখমের মামলা। জামিনে খালাস আছি। জেল খাটলে আমিই খাটব। তোরা কেন ঘুমিয়ে শরীরটা সুস্থ রাখতে পারিস্ না?

পাশ ফিরে শুতে শুতে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নরোত্তম বলল—যা, যা, তুইও যা।

নধিচরণ একটু উত্তেজিত ভাবে বলল—আমি যদি যাই, ওদের দুটোকেই মারতে মারতে এ ঘরে টেনে আনব কিন্তু…

না না, মারামারি করতে হবে না। তোরা কি ভেবেছিস—উঠানের বেড়াটা বেশী দিন রাখব? মিছিমিছি আর কেলেঙ্কারী করিস নে। সুরটা একটু নামিয়ে নরোত্তম বলল —চুপ করে শুয়ে থাক্। ওরা জানে, আমরা ঘুমিয়ে আছি। কিছুই জানি নে। আরও দু'চার দিন এই ভাবে চলুক। দেখি ওদের বেহায়াপনার দৌড় কত দূর।

বেশ, তাই থাক…অতি নির্লিপ্ত ভাবে কথাটা বলে নধিচরণ আবার পাশ ফিরল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার নাক-ডাকা সুরু হ'ল।

(ক্রমশঃ)

কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের জন্মকথা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

শিল্প-কলার উপরে জাতীয় জীবনের ছাপ কিরূপ পড়ে, আবার জাতীয় জীবনও ইহা দ্বারা কতখানি প্রভাবান্বিত হয় তাহা কলিকাতার কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। আগামী বর্ষে ইহার শতবর্ষ পূর্ত্তি হইবে। তখন হয়ত ইহার বিস্তারিত ইতিহাস রচনারও আয়োজন হইবে। এখানে এই বিদ্যালয়টির মাত্র জন্মকথা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই। এবিষয়ে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার উপরেই আমাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে।

১৮৫৪ সনের প্রথম দিকে, ২রা মার্চ্চ তারিখে কর্ণেল ই. গুডউইন বেথুন সোসাইটিতে "Union of Science, Industry and Arts" শীর্ষক একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। ইহার পর হইতে এই উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আলাপ-আলোচনা সুরু হয়। এ নিমিত্ত অচিরে প্রথমে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার নাম হইল 'শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা' (ইংরেজী নাম—'Society for the Promotion of Industrial Art')। এই সভার সভাপতি—কর্ণেল ই. গুডউইন স্বয়ং; সম্পাদক—হজসন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ইহার কমিটিতে সদস্য ছিলেন পনর জন, যথা—সি. এলেন, সি. বীডন, ডাঃ জি. বেডফোর্ড, পাদরি জে. এম. বিপু, জে. এ. ক্রফোর্ড, ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী, রামগোপাল ঘোষ, ডবলিউ. এন্. লীস্, পাদরি জে. লঙ, রামচন্দ্র মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ক্যাপটেন এইচ. খুলিয়র, হেনরি উড্রো, ডবলিউ. জে. ইয়ং। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তখন পর্য্যন্ত এখানকার শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী বিদগ্ধজনেরা একত্র হইয়া লোক হিতকর কার্য্যে লিপ্ত হইতেছিলেন।

শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা একটি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। সভার পক্ষে সম্পাদক হজসন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের এক-খানা অনুষ্ঠানপত্র রচনা করেন। ইহার তারিখ ৬ই এপ্রিল ১৮৫৪। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে এখানি প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা 'বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশিত হয় ১৮৫৪, ২৪শে এপ্রিল দিবসে। পরবর্ত্তী ২৫ মে 'সম্বাদ ভাস্কর' এখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ এখানে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্যক্ জানা যাইবে। অনুবাদটি এই :

"শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উৎসাহার্থে এতন্নগরে এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তৎকর্তৃক আদেশিত হইয়া আমরা সাধারণের শিক্ষোপযুক্ত একটি প্রকাণ্ড বিদ্যালয় সংস্থাপনের নিমিত্ত মহাশয়দিগের সাহায্য যাচ্ঞা করিতেছি। উক্ত বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা, কাষ্ঠ, ধাতু প্রস্তরাদির তক্ষণবিদ্যা ও মৃৎপাত্র পুত্তলিকাদির গঠনোপযোগি বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

দেশীয় শিল্পসাধ্য ব্যবসায়ের উৎসাহ ও তদুন্নতি চেষ্টা, এতদ্দেশে চিত্রকর ও তক্ষকের অভাব নিরাকরণ করা, এবং হিন্দু মোসলমান ও ইংরাজ সন্তান যাহারা কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরে উপজীবিকা প্রাপ্তির ক্লেশ পাইতেছে, তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যবসায় প্রস্তুত করা প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য, এবং তৎকার্য্যসকল করণাভিপ্রায়ে এই সাহায্য প্রত্যাশা করা যাইতেছে।

যে সকল মহাশয়েরা এতদ্দেশের ঐহিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা অনায়াসেই জানিতে পারিবেন যে প্রস্তাবিত কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত লাভ অপেক্ষাও অধিক উপকারের সম্ভাবনা আছে, ইহা দ্বারা প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর এক অভাব নিরাকরণ হইবার উপায় হইবে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মহোপকারি শিক্ষা কি তদ্বিষয়ে সকলের ঐক্য না হইলে হইতে পারে, পরন্তু ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, যে সকল ব্যক্তি উপজীবিকা অনুষ্ঠান করিয়া নিম্নপান্ত হয়ে অথচ নিকৃষ্ট প্রয়োগজীবী হইতে অস্রাবস্থায় স্থিত, তাহাদিগের পক্ষে এক বিদ্যার উৎকৃষ্টতা অপেক্ষা বিবিধ বিদ্যার আলোচনা শ্রেয়স্কর, অর্থাৎ ঈদৃশ নানা বিদ্যার শিক্ষা পাওয়া উচিত, যাহাতে প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে লাভজনক ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের ব্যক্তিব্যূহকে তদ্দেশের ঐহিক মঙ্গলসাধনের উপায় করণার্থে, তথা সকল ব্যবসায়ে নিযুক্ত করণার্থে একান্তত: তাহাদের অধিকাংশকে কায়িক ও মানসিক উভয় প্রকারে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই উভয় প্রকারে শিক্ষার প্রতি অপর এক কারণ আছে। এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গের মনকে স্বাধীন করণার্থে সকল মনোবৃত্তির চালনা করা অত্যন্ত আবশ্যক। যাবৎ শিক্ষা প্রণালী এমত অসম্পূর্ণ থাকে যাহাতে কেবল কয়েকটি মনোবৃত্তির চালনা হয়, বিশেষত: যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের ব্যবহারাদি বিদ্যার প্রয়োগ করিবার উপায় নিরূপিত না হয়, যদ্দ্বারা উৎসাহ স্ফূর্ত্তি সাধন প্রভৃতি মনোবৃত্তির চালনা হইতে পারে, তাবৎ কদাপি এতদ্দেশের যথার্থ উন্নতি সম্ভব না।

আমারদিগের এমত অভিমান নাই যে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী বিষয়ের যে সকল দোষ প্রদর্শিত হইল, শিল্প বিষয়ক একটি বিত্তালয় সংস্থাপনে তত্তাবতের নিরাকরণ হইবে, পরন্তু ইহা অভিষ্ট সাধনের সাহায্যকর বটে। মনুষ্য ব্যবহারে বিদ্যার প্রয়োগ করণার্থে কায়িক শ্রমসাধ্য শিল্প এক শ্রেষ্ঠ উপায়, এবং কোন সভা কর্ত্তৃক তাহার সাধন চেষ্টা অনায়াসেই হইতে পারে। বোধ হয় অন্যান্য বিষয় শিক্ষার উপায় রাজপুরুষেরা স্বয়ং করিবেন।

প্রাচীন রীত্যনুসারে কায়িক শ্রমসাধ্য শিল্প অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হস্তে সমর্পণ করাতে তদুন্নতির প্রতি যে হানি হইয়াছে এই বিত্তালয় সংস্থাপন তাহার দূরীকরণের প্রতি এক প্রধান কারণ হইবে।

প্রস্তাবিত ব্যাপারে সভার অভিপ্রায় এই যে বুদ্ধি ও হস্ত এককালে এই উভয়ের শিক্ষা হইতে পারে, এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে শ্রমসাধ্য শিল্প শিক্ষা করাইয়া এতদ্দেশীয় ধনী, মানী ও বিজ্ঞগণের নিকট তাহার গরিমা সংস্থাপিত হয়।

মান্দ্রাজ নগরে এই প্রকার প্রযত্নের যথোচিত ফল হওয়াতে প্রস্তাবিত সভা নির্ভয়ে সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। উক্ত নগরে ডাক্তর হন্টর সাহেব যে সকল বিত্তালয় সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে যে২ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা ক্রয় করিতে ও যে সকল ছাত্র সুশিক্ষিত হয় তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে লোকে এতাদৃশ ব্যগ্র হইয়াছেন যে ডাক্তর সাহেব সকল প্রার্থীদিগের মানস সফল করিতে পারেন নাই।

মনস্থ করা গিয়াছে যে উপরে যে সকল বিদ্যার উল্লেখ হইল তদ্বিষয়ের শিক্ষাপ্রদান জন্য মান্দ্রাজ হইতে সুশিক্ষক আনান যাইবেক, অথবা এই নগরস্থই কোন সুশিক্ষক নিযুক্ত করা যাইবেক। হিন্দু পল্লীর মধ্যভাগে বিদ্যালয়ের নিমিত্ত এক বাটী ভাড়া লওয়া যাইবেক, এবং এ প্রকারে শিক্ষার সময় নিরূপিত করা যাইবে যাহাতে অন্যান্য বিত্তালয়ের ছাত্রেরা তৎ পরিত্যাগ না করিয়াও প্রস্তাবিত বিত্তালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারে। সাধ্যমত আপন আয়ে এই বিত্তালয় অবস্থান করিতে পারে এই অভিপ্রায়ে ছাত্রদিগের নিকট হইতে বিত্তাহরণ কিঞ্চিৎ২ বেতন লওয়া যাইবেক। পরন্তু কোন মতে সেই বেতন মাসিক এক টাকার অধিক হইবেক না।

সভার অভিপ্রায় যে এক্ষণতঃ এই বিদ্যালয় এক বৎসরকাল বর্ত্তমান রাখেন, তদর্থে ও গৃহসজ্জা, চিত্রপট প্রভৃতি দ্রব্য ক্রয় করিতে বোধ হয় সপ্ত সহস্র টাকা সংগ্রহ করিতে হইবেক, তন্মধ্যে শিক্ষিকার মাসিক বেতনে প্রাপ্তব্য।

সভা বোধ করেন বহু সংখ্যক মনুষ্যকে লাভজনক ব্যবসায় প্রাপ্তির উপায় প্রদান করা ফলতঃ আপনা আপনি সাহায্য করিতে লোককে সাহায্য করা অপেক্ষায় মহৎকার্য্যে দয়া প্রকাশ হইতে পারে না।

মাসিক ব্যয়ের নিমিত্ত মাসিক দান, ও কর্ম্মারম্ভের উপযুক্ত পুস্তক, চিত্র পুত্তলিকাদি দান বা তৎক্রয় নিমিত্ত এককালিক অর্থদান সভার প্রার্থনা শেষোক্ত বিষয়ের নিমিত্ত বোধ হয় দুই সহস্র টাকা প্রয়োজন হইবেক। ইতি কলিকাতা। ইং ৬ আপ্রেল। ১৮৫৪ অব্দ

শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদকস্য।
শ্রীহাজ্‌সন্‌ প্রাট্‌ নাম্নঃ।
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য চ।"

২৪ মে ১৮৫৪ দিবসে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রস্তাবিত শিল্পবিদ্যালয় সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় লেখেন। ইংরেজ ও বাঙালী চাঁদাদাতাদের একটি তালিকাও প্রভাকরে দেওয়া হয়। ইহা হইতে দেখা যায়—ইংরেজদের নিকট এককালীন দান পাওয়া যায় দুই হাজার টাকা ও মাসিক দান একশত তেত্রিশ টাকা। বাঙালীদের দানের ফিরিস্তি আলাদা করিয়া দিলাম। 'সম্বাদ ভাস্কর'—২৫ মে ১৮৫৪ সংখ্যায় হিসাবটি এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :

দাতা	দান	
	এককালীন	মাসিক
প্রতাপচন্দ্র সিংহ	৫০০৲	৮৲
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	১০০৲	১০৲
রমানাথ ঠাকুর	০	৫৲
রামলোচন ঘোষ	১০০৲	৫৲
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲	০
নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲	০
রামপ্রসাদ রায়	৫০৲	০
গোবিন্দচন্দ্র সেন	১০০৲	০
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১০০৲	৫৲
রাজেন্দ্র দত্ত	১০০৲	০
সত্যচরণ ঘোষাল	১০০৲	৩৲

দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনান্তর ৪ মে ১৮৫৪ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখেন :

"What is now absolutely necessary to ensure the progress of our nation is to disturb the optimism into which they complacently take refuge whenever an improvement is suggested, and the school design will according to the measure of its ability effectually contribute towards that end.

Col. Goodwyn and Mr. Hodgson Pratt with whom the new scheme originates, have placed us under much obligation by their active labour in promoting it and carrying into its execution . . ."

এই প্রসঙ্গে একজন বাঙালীপ্রধানের নামও উল্লেখযোগ্য। রাজেন্দ্রলাল মিত্র শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের জন্মনা হইতেই ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার অন্যতর সম্পাদকরূপে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁহার তৎপরতা বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি সুদীর্ঘকাল ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া ইহার পরিচালনায় যে নানারূপে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে।

শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত হইবার পর হইতেই শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় চলিতেছিল। বিদ্যালয়-গৃহের জন্য নূতন বাজারের সন্নিকট চিৎপুর রাস্তার ধারে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের একটি বাড়ী বিনাভাড়ায় পাওয়া গেল। কে কে শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন তাহাও নিরূপিত হয়। ৯ মে ১৮৫৪ 'সংবাদ প্রভাকর' এই সকল সংবাদ দিয়া লিখিলেন :

"পারিশ্রমিক ও শিল্পাদি বিদ্যাশিক্ষার বিদ্যালয় এক মাসের মধ্যে খোলা হইবেক, পরম বদান্যবর শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ঐ বিদ্যালয়ের নিমিত্ত চিৎপুরের রাস্তার ধারে এক উত্তম বাটী প্রদান করিয়াছেন তাহার মাসিক ভাড়া ১৫০ টাকা নিরূপিত ছিল, মেং রিগউড সাহেব কাষ্ঠ প্রস্তুত ও তদ্দ্বারা দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করণ বিষয়ের উপদেশক এবং মেং আর্শিয়ার সাহেব চিত্রবিষয়ক শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইবেন, এমত জনরব আছে যে মেং হেণ্ডরি সাহেব কাষ্ঠের উপর প্রতিমূর্ত্তি খুদিবার বিষয়ে ছাত্রদিগকে উপদেশ দিবেন, মেং সি, গ্রাণ্ট নামক একজন অতি উপযুক্ত ব্যক্তি শীঘ্র বিলাত হইতে আসিবেন, এবং তিনি তাঁহার প্লেটের উপর অক্ষর ও প্রতিমূর্ত্তি খুদিবার শিক্ষা প্রদান করিবেন, এই বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইলে সাধারণের সামান্য উপকার দর্শিবেক না অনেক উত্তম দ্রব্য এদেশে হইতে পারিবেক।"

কিন্তু শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য্য নানা কারণে বিলম্বিত হইতে লাগিল। মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর' এক দীর্ঘ প্রস্তাবে এরূপ বিদ্যালয় আশু প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সম্বন্ধে পুনরায় লিখিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টেরও যে এরূপ একটি শুভকর বিদ্যালয়ের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য সে বিষয়েও তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

যাহা হউক, প্রারম্ভিক আয়োজনাদি সম্পূর্ণ করিয়া সভার সম্পাদকদ্বয় ইংরেজী বাংলা সংবাদপত্রে বিদ্যালয় স্থাপনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' ১১ আগষ্ট ১৮৫৪ তারিখে এই বিজ্ঞাপনটি এরূপ বাহির হয় :

"শিল্পবিদ্যালয় বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, ৺লালাবাবুর নূতন বাজারের বাটীতে আগামি ৩১শে শ্রাবণ সোমবার বেলা ৪ ঘণ্টা সময়ে উপরোক্ত বিদ্যালয়ের সংস্থাপন হইবেক। তাহাতে অধুনা চিত্রকরণ এবং পুত্তলিকাদি গঠনোপযোগি বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার দিবসে চিত্রকর শ্রেণীর শিক্ষা হইবেক, এবং মূর্ত্তি নির্ম্মাতৃ শ্রেণীর শিক্ষা মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার হইবেক।

এক শ্রেণীতে উপদেশ প্রাপ্তির মাসিক বৃত্তি ১ টাকা।

উভয় শ্রেণীতে উপদেশ প্রাপ্তির মাসিক বৃত্তি ১৷০ টাকা।

উক্ত বৃত্তি প্রতি মাসের শেষ দিবসে দিতে হইবেক।

বিদ্যার্থিরা বিদ্যালয়ের ছাত্র নির্দ্দেশ পুস্তকে আপন আপন নাম নির্দ্দিষ্ট করাইলে এক একখানি ছাত্রীয় পত্র (টিকিট) প্রাপ্ত হইবেন, ঐ পত্র বিদ্যার্থি কর্ত্তৃক প্রত্যহ শিক্ষকদিগকে দেখাইতে হইবেক। উক্ত পত্র ছাত্রেরা এক মাসের নিমিত্ত প্রাপ্ত হইবেন। মাস পূর্ণ দিবসে ছাত্রীয় বৃত্তি আদায় হইলে আগামি মাসের নিমিত্ত পুনঃ নূতন পত্র প্রদত্ত হইবেক।

বৃত্তিগ্রহণ ও বিদ্যার্থিদিগের নাম নির্দ্দেশকরণার্থে এক ব্যক্তি প্রত্যহ বিদ্যালয়ে অপরাহ্নে দুই ঘণ্টা অবধি চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবে। অদ্যাবধি এক সপ্তাহ সে ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে সাত ঘণ্টা অবধি দশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তদর্থে তথায় উপস্থিত থাকিবেক।

চিত্র শিক্ষার্থিদিগকে এক একখানি প্রস্তরফলক লেখনী স্লেট ও পেন্‌সিল আনিতে হইবেক।

চিত্রকর শ্রেণীস্থ বালকেরা চিত্রকরণে কিঞ্চিৎ সক্ষম হইলেই তখন বিদ্যোপদেশার্থে অপর এক শ্রেণীতে সংস্থাপিত হইবেক। হজ্‌সন্ প্রাট্, শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র। শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক। কলিকাতা, ইং ৯ আগষ্ট ১৮৫৪ সাল।"

পর দিবস ১২ই আগষ্ট তারিখেও এই বিজ্ঞাপনটি 'সংবাদ প্রভাকরে' হুবহু পুনর্মুদ্রিত হয়। এই দিন 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক মূল সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন :

"আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে নবজাত শিল্পবিদ্যালয় আগামি সোমবারাবধি [১৪ই আগষ্ট] খোলা হইবেক, তাহার নিয়ম সকল পাঠকবর্গ বিজ্ঞাপনস্থলে দৃষ্টিগোচর করিবেন, ঐ বিদ্যালয় দ্বারা যেরূপ উপকার সম্ভাবনা আমরা তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এতদ্দেশীয় লোকেরা অন্যান্য বিদ্যায় যেরূপ পারদর্শি হইতেছেন, শিল্প বিদ্যায়ও তদ্রূপ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই, প্রথমতঃ ঐ বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা ও পুত্তলিকাদি গঠনোপযোগি বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক, পরে তক্ষণাদি অন্যান্য বিষয়ে ছাত্রগণ উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, শিল্প বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন শাখা সাধারণের পক্ষে যদ্রূপ প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থিগণের পক্ষে তদ্রূপ আনন্দজনক, বিশেষতঃ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব বিশিষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু প্রস্তুত করিয়া

তদ্দ্বারা নানা প্রকার মনোহর ও শোভাকর দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করণে পারগ হইলে বিলাতীয় লোকদিগের ন্যায় এতদ্দেশীয় সাধারণ ব্যক্তিদিগের গৃহাদি সজ্জীভূত হইতে পারিবেক, আত্মীয় বন্ধুগণের চিত্র প্রতিমূর্ত্তি সকল অনায়াসে অথচ অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত হইলে সামান্য উপকার দর্শিবেক না, অতএব যে সকল মহাশয়েরা এই বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমরা তাঁহারদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ করিলাম, বিশেষতঃ পরম ধার্ম্মিকবর সুবিখ্যাত ৺লালাবাবুর কুলতিলক শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ নূতন বাজারের বাটি প্রদান করাতে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার-দিগের যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ হইয়াছে, অধুনা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা শিল্প বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া স্বাধীনরূপে সৌভাগ্য সঞ্চয়পূর্ব্বক স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করণের বাসনা করেন, তাঁহারা আগামি সোমবার অপরাহ্ণ বেলা চার ঘটিকা সময়ে বিদ্যালয়ের বাটিতে উপস্থিত হইবেন।"

'সংবাদ প্রভাকর'-নির্দ্দেশিত তারিখে কিন্তু শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার প্রতিষ্ঠা হয় দুই দিন পরে, ১৬ই আগষ্ট বুধবার দিবসে। এই দিন 'বেঙ্গল হরকরা' বিদ্যালয়টিকে অভিনন্দিত করিয়া ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। ইহার কোন কোন অংশ মাত্র এখানে দিলাম:

"The opening of the Industrial School of Art is an event in native improvement well deserving attention . . . The Industrial School is one of those Institutions originated as the best of such are by private enterprise and philanthropy. It addresses itself to a want which must have long been felt in Calcutta; but for which no provision has ever yet been made. And yet this seems marvellous, when we consider the peculiar mechanical designs either of Nature or of Art. Block-cutting—that sort of block which is used in Calico Printing—has for a long time been familiar to the natives, and these instruments of their handicraft we believe have often been used in England to print those very Calico's which are produced in our Exchange here. The talent has, however, been allowed to lie fallow up to the present day . . . To draw forth the mechanical and artistic abilities of the people of Bengal, the Industrial School has been established. Today it opens to the public . . . The names of Col. Goodwyn and Mr. Hodgson Pratt must ever be associated with this school, if it becomes an established member of the Calcutta Institutions, as we foresee it will. The design has been Col. Goodwyn's, the execution Mr. Pratt's . . .

"As the school opens to the public this afternoon, we hope that all interested in the progress of Art and Science will be present on the occasion."—
(*The Bengal Hurkaru and the India Gazette*, August 16, 1854.)

বেঙ্গল হরকরা নিজ মন্তব্যে একথা স্বীকার করেন যে, ব্লক তৈরির কাজ বহু পূর্ব্ব হইতেই এদেশীয়দের জানা ছিল। কিন্তু অনুশীলনের অভাবে তাহাদের জ্ঞান প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। 'বেঙ্গল হরকরা' ইঞ্জিনীয়ার কর্ণেল গুডউইন এবং হজসন প্রাটের কথাই এখানে মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙালী-প্রধানেরা যে এই প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পনা হইতে ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং দেশীয় সম্পাদকগণও যে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেন তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। 'সম্বাদ ভাস্কর' ২২ আগষ্ট ১৮৫৪ তারিখে "শিল্পবিদ্যা শিক্ষালয়" শিরোনামায় বিদ্যালয়টিকে অভিনন্দিত করিয়া যাহা লেখেন তাহার কিয়দংশ এই:

"পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করুন এই বিদ্যালয় সংস্থাপন সম্ভাবনায় আমরা পূর্ব্বে বিস্তারিত প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম এবং শিল্পবিদ্যা শিক্ষায় যেং উপকার তাহা প্রদর্শন করাইয়াছি একণে আনন্দিত হইয়া বলিতেছি শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরদিগের গরাণহাটার প্রশস্ত বাটিতে বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, প্রতিদিন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে... ।"

শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী এবং ছাত্রসংখ্যা সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকর' পরবর্ত্তী ২৪শে আগষ্ট আরও বিশদ ভাবে লিখিলেন:

"শিল্পবিদ্যালয়ের কার্য্য অতি সুনিয়মে নির্ব্বাহ হইতেছে, তথাকার সেক্রেটারী শ্রীযুত হজসন প্রাট সাহেব ও অন্যান্য অধ্যক্ষেরা এরূপ স্থির করিয়াছেন যে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার শ্রেণীতে ৫০ জন ও মৃৎ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করণ বিদ্যা শিক্ষার শ্রেণী ৪৫ জন আপাতত গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ঐ সংখ্যা প্রথম দিবসেই পরিপূর্ণ হওয়াতে প্রতি দিবস বহু ব্যক্তি তথায় গমন করতঃ হতাশ হইয়া প্রত্যাগত হইতেছে, কর্ম্মাধ্যক্ষেরা যদপি নূতন ছাত্র নিয়োগ করেন তবে ৪।৫ দিবসের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা ৫০০ হইতে পারে, অধুনা অধিক শিক্ষক নাই, একারণ অধ্যক্ষেরা তাহাতে বিরত হইয়া অতি সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন।"...

বিদ্যালয়ের ভাবী শিক্ষকদের নামের বিবৃতি পূর্ব্বে পাইয়াছি। প্রতিষ্ঠার সময়ে মৃৎ-পুত্তলি নির্ম্মাণ শ্রেণীতে এন্. রিগউড শিক্ষক-পদে বৃত হন। চিত্র-বিভাগের শিক্ষকের নাম প্রতিষ্ঠাকালীন বিবরণাদিতে পাই নাই। মনে হয়, পূর্ব্বোক্ত আগিয়ার সাহেবই এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে সরকারী কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হইল।

রোগবিস্তারের জন্য আপনিই দায়ী

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

যে কাজ আপনি করেন নাই, অন্ততঃ জ্ঞাতসারে করেন নাই তাহার জন্য কেহ যদি সরাসরি আপনাকে দায়ী করিয়া বসে তাহা হইলে সেটা আপনার পক্ষে অসঙ্গত মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যে সকল ক্ষতিকর কাজের জন্য অন্য কোন বিষয় বা অন্য কোনো ব্যক্তির উপর দোষারোপ করা অযৌক্তিক নহে, সেগুলির জন্য আপনি নিশ্চয়ই নিন্দাভাজন হইতে চাহেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা সত্য যে অপরের স্বাস্থ্যহানির জন্য আপনিই দায়ী।

আপনি অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"কিন্তু কেন, আমার কি দোষ?" আচ্ছা, হয়ত চেষ্টা করিলে আপনি মনে করিতে পারিবেন যে, শেষবার যখন আপনি সর্দি কাশি অথবা গলগ্রন্থির প্রদাহে আক্রান্ত হন, কিংবা যখন আপনার টাইফয়েড, যক্ষ্মা-পীড়া বা উদরাময় হয় তখন কোন্ ফাঁকে যে এই রোগ আপনার দেহে আসিয়া প্রবেশ করিল তাহা ভাবিয়া আপনি অবাক হইয়াছিলেন। আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য অপর কাহাকেও দায়ী করিবার কথা হয় ত আপনার মনেও উদিত হয় নাই। যখন আপনি মাছ ধরিতে, পিকনিক করিতে অথবা জমি চষিতে গেলেন, এমতাবস্থায় যদি বাদল নামে তাহা হইলে আপনি যেমন এই দুর্ঘটনার জন্য আপনার শত্রু মিত্র কাহারও উপরেই দোষারোপ করেন না (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে খুব বাড়াবাড়ি করিয়া থাকেন)—ইহাও তদ্রূপ। প্রায়শঃই বলা হইয়া থাকে যে, এই সমস্ত দুর্বিপাক ঘটে—হয় দৈবাৎই দৈবক্রমে, নতুবা ভগবান কিংবা আমাদের বোধশক্তির অতীত কোনো অজ্ঞাত কারণে।

ব্যাধি সেইজন্য অনেকের নিকট এমন একটি অনতিক্রম্য অশুভ বলিয়া প্রতীয়মান হয় যাহাকে—পছন্দই হোক আর না-পছন্দই হোক, যাহার প্রকৃতি বোঝা যাক অথবা দুর্বোধ্যই থাকুক—মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং কেহ যদি আপনাকে একথা বলে যে, অন্যান্য লোকেদের মধ্যে রোগের প্রসারের জন্য আপনিই দায়ী তো তাহা আপনার নিকট পুরাপুরি আজগুবি, অপ্রীতিকর এবং অশোভন উক্তি বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

অসুস্থতাকালে আরামহীনতা, অক্ষমতা, রোগের প্রতিক্রিয়া, এবং ইহার প্রতিকারকল্পে অর্থব্যয় ইত্যাদির জন্য হয়তো আপনার মন এরূপ উদ্বেগে পরিপূর্ণ থাকিত যে, যে-ব্যাধিতে আপনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহার আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভাব্য ছিল কিনা নিজেকে সে প্রশ্ন করার সুযোগও বোধ করি আপনার হয় নাই। কিন্তু আরোগ্যলাভের পরে ব্যাধির পুনরাক্রমণে কাবু হইয়া পড়িলে হয়তো আপনার মনে এই ইচ্ছা জাগিতেও পারিত যে, যদি চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী অথবা গবর্ণমেন্ট ভবিষ্যতে আপনাকে ইহার কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য কিছু করিতে সমর্থ হইতেন।

সম্ভবতঃ আপনার মনে থাকিতে পারে কেমন করিয়া এক দিন ঘুম হইতে উঠিয়া নির্মল আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া আপনি অনুভব করিলেন, আপনি অসুস্থ। যেহেতু আগের দিনও মনে হইয়াছিল যে, আপনার স্বাস্থ্য ভাল, কাজেই এই ব্যাধি পোষণ করিবার জন্য আপনার দেহের উপর দোষারোপ করার কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া আপনার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। হয়তো আপনি মনে মনে বলিতে পারেন যে, সম্ভবতঃ বাহির হইতে "কোনো-কিছু" আপনার সুস্থ দেহে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত আকস্মিক-ভাবে এই রোগ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু আপনার অলক্ষিতে কি করিয়াই বা এরূপ "কোন-কিছু"—আপনার শরীরে ঢুকিল?

ইহার সকল রহস্যই কিন্তু অত্যন্ত সহজ এবং যা আপনি সন্দেহ করিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত। ব্যাধি, অথবা অধিকাংশ ব্যাধিরই সৃষ্টি হয় বাহির হইতে যে সকল 'এজেন্ট' বা রোগবীজাণুবাহক দেহে প্রবেশ করে তাহাদের দ্বারা। এই সমস্ত বাহিরের এজেন্ট আকারে এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। 'ম্যাগনিফাইং লেন্স' বা বহু ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহারা দৃষ্টিগোচর হয়। বাহিরের একটা বিশেষ পারিপার্শ্বিক হইতে ইহারা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং পরে দেহ ছাড়িয়া পুনরায় বাহিরের পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করে। চুপিসারে মানুষের দেহে প্রবেশ করিয়া এই সমস্ত জীবাণু ইহাকে ব্যাধিগ্রস্ত করে এবং পুনরায় তেমনি নিঃশব্দে উহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা অন্য ব্যক্তির দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে—ফলে শেষোক্ত ব্যক্তিও রোগাক্রান্ত হয়।

অন্য কথায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, আপনি যদি পিতা হন ত যে ছেলে আপনার সঙ্গে একই গৃহে বাস করে তাহার দেহে আপনার সর্দি-কাশি সংক্রামিত হওয়ার জন্য আপনিই দায়ী। আর আপনি যদি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত মাতা হন ত আপনার শিশুকন্যার দেহে ঐ ব্যাধির বীজাণু যে সংক্রামিত হইল সে আপনারই দোষে। অথবা আপনি যদি খাদ্যবস্তুর ব্যবসায়ী হন তবে যে সকল লোক আপনার সরবরাহ-করা খাবার আহার করে তাহাদের মধ্যে টাইফয়েড

রোগের প্রসারের জন্য আপনাকেই দায়ী করিতে হয়। এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য ব্যাধির কথা বলা যাইতে পারে যেগুলি এমন সব বীজাণুদ্বারা সংক্রামিত হয় যাহারা আমাদের শরীরে অলক্ষিতে আসা-যাওয়া করিয়া থাকে।

উপরের কথাগুলি ভাল করিয়া অনুধাবন করিলে এখন আপনি মনে মনে বলিতে পারেন—"আচ্ছা, আমার প্রতিবেশী যদি অজ্ঞাতসারে নিজের দেহ হইতে টাইফয়েডের বীজাণু আমার পুত্রের দেহে সংক্রামিত করিয়া দিতে পারেন (তাহার অসুখের পরে আমার পুত্র রোগাক্রান্ত হইয়াছিল), তাহা হইলে তাহার পুত্রের চোখের ক্ষতের জন্য আমিও ত দায়ী হইতে পারি (প্রথমে ত আমারই চোখে ঘা হয়, তার পরেই না ছেলেটির ঐ অসুখের সূত্রপাত)। অন্য কথায়—বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনামা যখন 'দোষী' বলিয়া আপনার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে, অথবা আপনার দেহে 'রোগ বিস্তারকারী' এই লেবেল আঁটিয়া দেয় তখন আপনাকে একজন দুরভিসন্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রতিপন্ন করা নিশ্চয়ই ইহার উদ্দেশ্য নয়, অথবা উক্ত শিরোনামা যে কেবল একলা আপনাকেই দায়ী করে তাহাও নহে। ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে যেমন আপনার প্রতিবেশীকে তেমনি আপনাকেও বুঝায়। শুধু তাহাই নয়—ইহা বৃদ্ধ অথবা যুবক, চিকিৎসক কিংবা অব্যবসায়ী, পুরুষ অথবা স্ত্রী, শিক্ষিত অথবা অজ্ঞ, ধনী এবং দরিদ্র—সমাজের অপর প্রত্যেককেই সমভাবে দায়ী করে। বস্তুতঃ সমাজের প্রত্যেকেই—অবশ্য অনিচ্ছাসত্ত্বে—রোগবিস্তারের জন্য দায়ী।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, সকল প্রকার ব্যাধির প্রসারের জন্য আপনি দায়ী নহেন। একথা হয়ত আপনার জানা থাকিতে পারে যে, ক্যান্সার, বহুমূত্র, হৃদ্‌রোগ, পাকস্থলীর ক্ষত প্রভৃতি এমন অনেকগুলি ব্যাধি আছে যাহা এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইতে পারে না। এগুলিকে বলা হয় অ-সংক্রমণীয় (Non-Communicable) ব্যাধি। পক্ষান্তরে অন্য সব তথাকথিত সংক্রমণীয় (Communicable) ব্যাধিসমূহ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত অথবা পীড়িত ব্যক্তির দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, সিফিলিস (উপদংশ) ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধির দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত ব্যাধির সৃষ্টি হয় পূর্বোল্লিখিত, বাহিরের এজেন্ট—তথাকথিত জীবাণুসমূহের দ্বারা। এই জীবাণুগুলিই এ সকল রোগের সংক্রামকতার কারণ।

এই সমস্ত বীজাণু এক দেহ হইতে অন্য দেহে গিয়া আশ্রয় লইবার ক্ষমতাবিশিষ্ট। কিন্তু অন্যান্য ব্যাধিসমূহ কোনও বাহিরের এজেন্টের দ্বারা উৎপন্ন হয় না বলিয়া সেগুলিকে বলা হয় অ-সংক্রমণীয়।

এখন আপনি বলিতে পারেন যে, রোগের বীজাণু যে কেমন করিয়া আপনার দেহে প্রথম প্রবেশ করিল তাহা যখন আপনি বুঝাইয়াও ঠাঁর পান নাই, তখন আপনার শরীর হইতে অন্যান্য লোকের মধ্যে তাহার সংক্রমণের জন্য আপনাকে দায়ী করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

আপনার কথাটা যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। এই ধরণের প্রশ্ন যে আপনার মনে জাগিতে পারে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে কিভাবে আপনার শরীর হইতে অপরের দেহে রোগ সংক্রামিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে তাহা আমরা অত্যন্ত সহজ সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এই রোগসংক্রমণ হইতে পারে তিনটি বিভিন্ন প্রণালীতে বা খাতে।

খাত নং ১—শ্বাসনালীর মাধ্যমে

যখন আপনি থুথু ফেলেন, কাসেন বা হাঁচেন তখন প্রশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে চতুষ্পার্শ্বের বায়ুস্তরে আপনি আপনার শরীরে যে-কোনও ব্যাধির বীজাণু আছে তাহা নিক্ষেপ করেন। যক্ষ্মা; ডিপথিরিয়া, টনসিল, হাম প্রভৃতি নানা রোগের বীজাণুই এগুলি হইতে পারে। এই সকল বীজাণু বায়ুতে পৌঁছিবার পর, অপর কাহারও নিঃশ্বাসবায়ুর সঙ্গে তাহার দেহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ঐ ব্যাধিতে আক্রান্ত করিতে পারে।

খাত নং ২—মলমূত্র-খাত

এই খাতের দ্বারাও বিবিধ রোগ সংক্রমণের সহায়তা হয়। আপনার দেহে যদি টাইফয়েড, আমাশয়, কলেরা, উদরাময় ইত্যাদি রোগ থাকে তাহা হইলে চতুষ্পার্শ্বের জমিতে এবং জলে আপনার মলমূত্র ত্যাগের ফলে ঐ সকল রোগের বীজ নিঃসৃত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। এই সমস্ত জীবাণু মাটিতে অথবা নদী এবং হ্রদের জলে পৌঁছিবার পর অপর কাহারও কাঁচা খাদ্য বা পানীয় জলের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইতে এবং তাহার দেহে ঢুকিয়া তাহাকে ঐ সকল ব্যাধির কবলিত করিতে পারে।

খাত নং ৩—হস্ত-খাত

এই খাতের মাধ্যমে আপনার দেহের যাবতীয় বীজাণুই অপরের দেহে সংক্রামিত হইতে পারে। কেননা হাত নাসিকা এবং মুখ (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের খাত) এই দুটিকে যেমন ছোঁয় তেমনি মলমূত্র নিঃসরণের খাতকেও স্পর্শ করে। সেই জন্য প্রথম দুইটি খাতের সাহায্যে যে সকল রোগের বীজাণু বিস্তার-লাভ করে তৎসমুদয়ই ঐ সকল ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকের হাতের মাধ্যমে প্রথমে অন্যান্য লোকের হাতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে; তারপর ক্রমে ক্রমে উক্ত ব্যাধিসমূহ তাহার দেহে সংক্রামিত হয়। ধরুন, আপনার হাতের মাধ্যমে যদি আপনার টাইফয়েডের বা গলক্ষতের বীজাণু অন্য কাহারও হাতে পৌঁছে তাহা হইলে নিশ্চয়ই বীজাণুগুলি শেষোক্ত ব্যক্তির নিজের হাত হইতে তাহার নাক এবং মুখের ভিতরে গিয়া ঢুকিবে এবং তাহাকে ঐরূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত করিবে।

সুতরাং যদি আপনি আপনার দেহ হইতে বাহিরে ব্যাধি-বীজাণুর বিস্তার বন্ধ করিতে চাহেন ত আপনাকে নীচের তিনটি নীতি মানিয়া চলিতে হইবে।

নীতি—১

কাশিবার, হাঁচিবার অথবা থুথু ফেলিবার সময় আপনি আপনার নাকের উপর একটি রুমাল ব্যবহার করিবেন। রুমাল খাসনালী-পথে রোগবীজাণুর বিস্তার বন্ধ করিবার পক্ষে সহায়ক হয়।

নীতি—২

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে নির্ম্মিত পায়খানায় মলমূত্র ত্যাগ এবং স্যানিটারী টয়লেট ব্যবহার করিবেন। ইহা ছাড়া অন্তত্র মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস বর্জ্জন করিবেন। স্যানিটারী টয়লেট এবং পায়খানা মল-মূত্র খাতে রোগ বিস্তার প্রতিরোধের সহায়তা করে।

নীতি—৩

প্রতিবার মলমূত্র ত্যাগের পর এবং আহারের পূর্ব্বে সাবান-জল ব্যবহার করিবেন। সাবান হস্ত-খাতে রোগ-বিস্তার প্রতিরোধের সহায়ক হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা বলিলাম তাহার সারাংশ হইতেছে এই :

একথা নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে যে, যে সকল বীজাণু ব্যাধি সৃষ্টি করে সেগুলি তিনটি খাতের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে : (১) খাস-খাত, (২) মলমূত্র খাত (৩) হস্ত-খাত। তিনটি নীতি পালন করিয়া আপনি রোগ-বিস্তার বন্ধ করিতে পারেন—(১) রুমাল ব্যবহারের নীতি, (২) টয়লেট ও পায়খানা ব্যবহারের নীতি এবং (৩) সাবান ব্যবহারের নীতি—প্রত্যেকটি খাতে রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত এক একটি নীতি প্রতিপাদ্য।

যে পর্য্যন্ত সংক্রমণীয় রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আপনি অসুস্থ হইতে থাকিবেন, অর্থাৎ—যে পর্য্যন্ত অপরে তাহাদের রোগের বীজাণু আপনার দেহে ছড়াইতে থাকিবে সেই পর্য্যন্ত অপরের মধ্যে রোগ-বিস্তারের জন্ত আপনিও দায়ী থাকিবেন। কাজে কাজেই আপনি যদি অপরের মধ্যে রোগ ছড়ানো বন্ধ করেন তাহা হইলে অপরেও আপনার মধ্যে ব্যাধির বীজাণু বিস্তারে বিরত হইবে।

এই বিষয়টি অনুধাবন করিয়া যাঁহারা কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিলেন তাঁহারা প্রত্যেকে কি অন্ততঃ আর দুই জনকে এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিবার চেষ্টা করিবেন না? অতীতে যদি আপনি রোগ বিস্তারের জন্ত অনিচ্ছাক্রমে দায়ী হইয়া থাকেন তাহা হইলে এই "তিন খাত এবং তিন নীতির" নূতন 'বেদ' প্রচার করিয়া আপনি স্বেচ্ছায় ইহার সংক্রমণের পথ বন্ধ করিয়া কৃতিত্বের ভাগী হইতে সক্ষম হইবেন।*

* 'ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গেনাইজেশনে'র সৌজন্যে।

ফেলে আসা দিনগুলি মোর

শ্রীনীলিমা দত্ত

ফেলে আসা দিনগুলি মোর—
মনোমাঝে এলো ধীরে ভেসে
ঘনাইয়া স্বপনের ঘোর
সুমধুর স্মৃতির আবেশে;
ফেলে আসা দিনগুলি মোর—
একদিন তোমাদের সনে
করেছি যে খেলা আনমনে;
সুখ-দুখ পরশ বিভোর
র'চেছি যে স্নেহমায়া-ডোর
জীবনের নব নব পথে
দূরে যদি যাই তোমা হ'তে
ক্ষতি নাই;
তোমাদের কথা
রবে হৃদে স্মৃতি-কল্পলতা,
রচি স্বপনের মায়াডোর
ফেলে আসা দিনগুলি মোর।

২

দিনান্তের স্বর্ণ যবে তাপদগ্ধ দিবসের শেষে,
ম্লান হ'য়ে নিবে যাবে, দিগন্তরে অস্তাচলে এসে,
আঁধারে বিরামক্ষণে নাম ধ'রে ডাকিও আমারে
নিশীথ-স্বপ্নের মাঝে জেগে ওঠা স্মরণীর পারে।

সাধারণ মানুষ

শ্রীতপতী গোস্বামী

কলকাতার বাইরে কমই যাওয়া ঘটে, তবু একদিন সুযোগ পেয়েছিলাম। হাতে একটি ক্যামেরা ছিল। ক্যামেরা নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। পথে বাজার পার হতে হ'ল। এরকম জনতার মধ্যে মেয়েদের পক্ষে ছবি তোলা সহজ নয়। সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা গোস্বামী। জায়গাটা তাঁদের পরিচিত এবং আমার অপরিচিত। সাহস করে বাজারের মধ্যেই ক্যামেরা খুললাম।

হাটের পথে

চলার পথে নজরে পড়ল রাস্তার ধারে বসে আপন মনে ঝুলুরি ভাজছে একটি স্ত্রীলোক। আপন কাজে কি নিষ্ঠা! আমরা ক্যামেরা নিয়ে গেলাম তার সামনে, সে একটু অবাক হয়ে তাকাল। কি ভাবল কে জানে। ওর যে একখানা ছবি তুলতে পারি তা অবশ্যই ভাবে নি। তাই সে নিজের কাজে মন দিলে। কিন্তু যখন সত্যই তার সামনে ক্যামেরা ধরলাম তখন খুশি ও গর্ব্বে ফুলে উঠল। আমরাও উৎসাহিত হয়ে বাজারের মধ্যে গিয়ে অনেক ছবি তুললাম। ভাল লাগল এই সব মানুষকে। মনে হচ্ছিল যেন ওরা আমাদের কাছে যে আনন্দ পেল, ক্যামেরায় ছবি তোলাতে যে গর্ব্ব অনুভব করল, তার নিমিত্ত তো আমরাই। আমাদেরও আনন্দ হচ্ছিল খুব দেখতে।

ডালমুট ভাজায় রত

মাটির হুঁকো, গামলা

ফেরবার পথে দেখি তিনটি ছোট ছোট ভাইবোন জিনের পুঁটুলি নিয়ে হন্ হন্ করে ছুটে চলেছে বাজারের দিকে। তাদের দাঁড়াতে বললাম। তারা বিস্মিত হ'ল এবং মনে

হ'ল একটু যেন বিব্রত বোধ করছে। বলা হ'ল তোমাদের তস্‌বির দেওয়া হবে। তারা ভাবতেও পারল না যে, তাদের জানে। তাই কোন ভদ্রশ্রেণীর লোক তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে কথা বললে বিস্মিত হয়।

ফলের বাজার

জমাদারণী

তস্‌বিরের কি প্রয়োজন থাকতে পারে। ঝুমুরি তাবার মত বস্তি, রাস্তায় চলা ভাইবোন তিনটি, হরিজন-বৌয়েরা, কুঁজো-পায়রা বিক্রেতা, ফলবিক্রেতা, এদের দিকে কে বা তাকায়। এরা অতি সাধারণ মানুষ। এরা যেন নিজেদের ছোট বলেই

এ রকম একটা অনুভূতি আমার এই প্রথম। ছবি যেমনই উঠুক, ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ মিশে আমরা যে আনন্দ পেয়েছিলাম তার চেয়েও হয় তো বেশী ওরা আনন্দ পেয়েছে। তা হয়ত বা সামান্য কিছু ফুটেছে ছবিতে।

অবিস্মরণীয়

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

বৈশাখীর আমন্ত্রণে প্রকৃতির রম্য পাদপীঠে,
নৃত্য করে নটরাজ রুদ্র ঝঞ্ঝা তালে।
অরণ্য-সঙ্গীতে আর ঝটিকার মৃদঙ্গ বাদনে,
অভিনবে উল্লসিত তৃণ-পত্র লতা-গুল্মজালে।
নেপথ্য হইতে হয় বৃষ্টিরূপে পুষ্প বরিষণ।
বসুন্ধরা পর্জ্জন্যের প্রণতিকা পাঠে,
ব্যক্ত হয় বৈশাখীর স্মরণীয় দুটি লক্ষণ॥
অবিস্মরণীয় দুটি জন্মের মুহূর্ত ;
প্রেম আর প্রজ্ঞারূপে মিশে হয়েছিল সমাগত
বৈশাখের রৌদ্রদীপ্ত গৈরিক ললাটে ;
ভাবী দিক ভারতের মূর্ত্ত সমাগত।
শ্রীহস্তে-চিহ্নিয়া গেছে আপনার জন্মের স্বাক্ষর,
প্রেম-প্রীতি-বৈরাগ্যের চন্দন তিলকে।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড দুই তৃষার্ত্ত ভূলোকে।
আকুল অজস্র ধারে স্নিগ্ধ বারিধার,
কুণ্ঠিত হিংসার তীক্ষ্ণ তরবার
অহিংসার ক্ষমাময় প্রেমময় পাঠে।

আত্মভোলা সন্ন্যাসীর বিশ্বসাথী সর্ব্বব্যাপী প্রেমে ;
বিধাতার আশীর্ব্বাদ প্রজ্ঞারূপে মর্ত্ত্যে এল নেমে।
স্মরণীয় আরও এক জন্ম-মহোৎসব ;
অর্ঘ্যে সিঞ্চিত আজি বৈশাখীর কৃষ্ণচূড়া বন।
আনন্দে পুষ্পপুঞ্জে নিত্য ব্যক্ত হয়,
"এস কবি, ধরা মাঝে সৃষ্টি কর শান্তিনিকেতন"।
ভারতীর পদতলে সুন্দরের সার্থক পূজারী ;
সহস্র কুটিল পন্থা দ্বিধাহীন নিঃশঙ্ক দিশারী
দীপ্তিমান বিবস্বান। বৈশাখের অমর অধ্যায়,
স্বাক্ষর রাখিয়া গেছে অবিনাশী সৃষ্টি-প্রতিভায়।
ঘন ঘোর মেঘাচ্ছন্ন বৈশাখীর আবৃত আননে,
বিদ্যুৎ চমকে আর ইন্দ্রনীল জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে
যে সৌন্দর্য্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত অহর্নিশ পলকে পলকে ;
সেই ত রবীন্দ্র-আত্মা, বিধাতার আশিস ধরায়।
শাশ্বত জীবন-মন্ত্র, নিত্য প্রেম জাহ্নবীধারায়।

আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব-প্রসঙ্গে শিক্ষার কথা

শ্রীহরিহর শেঠ

ভারত-সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের উদ্যোগে তেইশটি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ভারতে যে আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব মহাসমারোহের সহিত প্রথমে বোম্বাই এবং পর পর মাদ্রাজ, দিল্লী ও পরিশেষে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইল, মনে হয়, এত বড় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম। আমেরিকার শিকাগো নগরে ১৮৯৩ সনে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের কথা ছাড়িয়া দিলে, জগতের ইতিহাসে আর কোথাও এত বড় আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলন ইতিপূর্ব্বে হইয়াছিল কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। ভারতে বড় বড় সাংস্কৃতিক সম্মিলন হয়ত অনেক হইয়া থাকিবে, কিন্তু এমন আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন সত্যই ইহার পূর্ব্বে হয় নাই। এত ব্যয়ে এই যে আড়ম্বরপূর্ণ সম্মেলন হইয়া গেল ইহার যথার্থ জন-কল্যাণমূলক সার্থকতা সম্বন্ধে স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে।

কি উদ্দেশ্য লইয়া কর্ত্তৃপক্ষ এই উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা জানা না থাকিলেও, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এবং বিদেশাগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের ও বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি মহাশয়ের ভাষণাদি হইতে ইহার সার্থকতা সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁহাদের অনেকেরই মতে ইহার সুফল পাওয়া যাইবে, এই উৎসব নিরর্থক হয় নাই। ইহা যেমন অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক পরিচালকের নিকট, তেমনই দর্শকদের কাছেও নূতন চিন্তা, নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দিবারও সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। বিদেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ আশা করিয়াছেন যে, এই উৎসবের মাধ্যমে তাঁহাদের দেশ ও ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্পের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হইবে। কেহ বলিয়াছেন, ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প বিশ্ববাসীর মন ও সংস্কৃতির খোরাক যোগাইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, ভারতীয় চিত্রগুলি বিশ্বের সর্ব্বত্র শান্তির দূত হিসাবে কার্য্য করিতেছে। আমেরিকার প্রতিনিধি আশা প্রকাশ করিয়াছেন, অদূরভবিষ্যতে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক ভারতীয় চিত্র আমেরিকাবাসীদের প্রিয় হইয়া উঠিবে। তাঁহারা এইরূপ ভাসা ভাসা মন্তব্য এবং বাঙালীর ভদ্র ব্যবহার, তাহাদের আতিথেয়তার প্রশংসা অথবা চলচ্চিত্র-শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন এ ধরণের কথা কেহ কেহ কিছু বলিয়াছেন বটে, কিন্তু বৈদেশিকদের মধ্যে একমাত্র ফ্রান্সের প্রতিনিধি এই শিল্পের যথেষ্ট প্রগতি স্বীকার করিয়াও বলিয়াছেন উহার আরও কিছু করিবার আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার যথেষ্ট কাজ আছে।

আমি নিজে একদিনও এ উৎসবে যাই নাই বা এই সম্পর্কে প্রদর্শিত কোন ছবিও দেখি নাই। ইহাতে যোগ দিলেও এই মত বুঝিতাম কিনা সন্দেহ। ভারতীয় ছবিগুলি কিভাবে বিশ্বের সর্ব্বত্র শান্তির দূত হিসাবে কাজ করিতেছে তাহা বুঝিবার সৌভাগ্যও আমার হয় নাই। সংবাদপত্র হইতে যাহা পাইয়াছি মাত্র তাহা অবলম্বন করিয়া সেই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রী ও যুবকদের চলচ্চিত্র ও বেতারের মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্পর্কে আমি যেভাবে চিন্তা করিয়া থাকি তাহাই একটু আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য।

এই শিল্পের ভাল দিক ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জবানিতে ব্যক্ত হইলেও, ইহার যে একটা অন্ত দিকও আছে তাহা তাঁহারা বিশেষ করিয়া বলেন নাই। প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ইহার শিল্প ও সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগ্রত করিবার উপর গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও ইহার অন্ধকার দিকটা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, এই অপরিসীম শক্তির অধিকারী শিল্পটিকে সর্ব্বদা উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন, অন্যথা বিপদ অবশ্যম্ভাবী। ইহার দ্বারা মানুষের নিম্নাভিমুখী হওয়ার আশঙ্কা তাঁহার বক্তৃতায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে এবং সেজন্য চলচ্চিত্র নির্ম্মাণে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সচেতন থাকিতে বিনীত ভাবে অনুরোধ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার উৎসবের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, মানুষকে আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞানদান চলচ্চিত্রের প্রধান কর্ত্তব্য। তিনি শিক্ষা-প্রসারে চলচ্চিত্রের প্রভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কথা—এ বিষয়ে আমাদের দেশ বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। শিশু-শ্রেণী হইতে উচ্চস্তরের শিক্ষা-ব্যাপারে যাহাতে ইহাকে নিয়োজিত করা যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করা দরকার বলিয়া তিনি সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই শিল্পের দ্বারা কলা ও সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত করার আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করিলেও ইহা যাহাতে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত হয় তাহা করা উচিত বলিয়াছেন। এই শিল্পকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে কত কাজ হইতে পারে এবং তৎপরিবর্ত্তে অনেক স্থলে ইহা দ্বারা কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে বিবিধ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যেও তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে।

ইঁহারা সকলেই যাহাতে এই শিল্পকে শিক্ষার বাহন করিয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন দ্বারা মানুষের হিতসাধন হয়, তাহাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে—চলচ্চিত্র বিলাসের বস্তু নহে; সাধারণ মানুষের জীবনে ইহা অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং এই শিল্পের যে একটা শিক্ষার দিক আছে—এই সব

স্বীকার করিলেও, চলচ্চিত্র আজ কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবে এবং কি হওয়া উচিত ইহার উত্তরে তিনি জোরগলায় বলিয়াছেন, জনগণের চিত্ত-বিনোদনই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত তথ্যাদি হইতে জানা যায়, একমাত্র আমেরিকার কথা ছাড়িয়া দিলে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এই শিল্পে ভারতের স্থান সর্ব্বোচ্চে এবং ভারতে চিত্রগৃহের সংখ্যা মোট তিন সহস্রের অধিক। আর ফিল্ম ডিভিশন নামক যে সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ভারতীয় চারুকলা, সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্প, জনস্বাস্থ্য সমাজ-সভ্যতা প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষামূলক চিত্র প্রস্তুত করা এবং ভারত ও ভারতের বাহিরে সেগুলি প্রচারের ব্যবস্থা করা। রাজ্যপালের বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রের মন্তব্য হইতে জানা যায়, তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। এক দিকে যেমন শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ব্রত সার্থকতা লাভ করিয়াছে, অপর দিকে তেমনই তাহার কলা-নৈপুণ্য ও রুচিবোধ বিশ্বজনের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

কিন্তু ডিভিশনের সহিত চলচ্চিত্র সমিতির কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। কিন্তু বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্প বিষয়ে এই সমিতির যে কিছু হাত আছে ইহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। তাহার সভাপতি মহাশয় যদি মনে করেন, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য জনগণের চিত্ত-বিনোদন, তাহা হইলে অন্য সকল বিষয় গৌণ উদ্দেশ্যের মধ্যেই পড়ে—চলচ্চিত্রের পক্ষে শিক্ষার বাহন হওয়াও তাহারই অন্যতম। আজ যখন অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে চোরাকারবার প্রভৃতি দুর্নীতি-মূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় দেশের সাধারণ জনমণ্ডলী তিলে তিলে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে, সেই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর বিনীত নিবেদনে, রাজ্যপাল অথবা মুখ্যমন্ত্রীর শিক্ষামূলক চিত্র প্রস্তুতির আহ্বান বা উপদেশে, অথবা সম্পাদকদের যুক্তিপূর্ণ লেখায় নিজ নিজ ব্যবসায়গত আর্থিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া দেশের কল্যাণের কথা ভাবিবেন এ প্রত্যাশা কতকটা অমূলক বলিয়াই মনে হয়। যদি সত্যই এই শিল্পের সাহায্যে শিক্ষাবিষয়ক সুবিধা বা উন্নতি সম্ভবপর বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকারকেই সে বিষয়ে চেষ্টিত হইতে হইবে। গণ-আন্দোলনে, সংবাদপত্রের সমালোচনায়, সাধারণের চাপে যে কাজ না হয় তেমন নহে এবং কতকটা তাহারই দরুন 'বিদ্যাসাগর', 'যুগদেবতা', 'স্বামিজী', 'মাইকেল মধুসূদন' প্রভৃতি কয়েকখানি সুন্দর চিত্রের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে মনে হয়। বোধ হয় ভারতে বাংলাই এ বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অগ্রগণ্য। ইহা দ্বারা সেই সকল শিল্পের কর্তৃপক্ষেরা সকলেই লাভবান হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

চিন্তাশীল মনীষিগণ মনে করেন এতাদৃশ জনপ্রিয় ক্ষমতা-শালী শিল্পকে যেদিকে পরিচালনা করা যায় সেই দিকেই সাফল্য সুনিশ্চিত। আমাদের দেশে—যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা অত্যধিক—যদি কেবলমাত্র প্রমোদ-পরিবেশনের কাজে ইহাকে নিয়োজিত করা যায় ত তাহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? শিক্ষার ক্ষেত্রে টেলিভিশনের কার্য্যকারিতার কথা সম্যক্ অবগত নহি। তাহা বাদ দিলে বোধ হয়, সবাক-চলচ্চিত্রের উপযোগিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাসে শিক্ষকের অধ্যাপনার ফলে যাহা না লাভ হয়, শিক্ষামূলক একখানি ছবিতে সহজেই সে ফললাভ হইয়া থাকে। আর শিক্ষার্থীরা আনন্দের সহিতই তাহা গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে সর্ব্ব-সাধারণকে আনন্দ-পরিবেশন, তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করা ইত্যাদির সঙ্গে শিক্ষা-মূলক ও গঠনাত্মক ছবি নির্ম্মাণের দিকেও সমান দৃষ্টি দেওয়া হয়। এদেশে সেরূপ ছবির একান্ত অভাব ত আছেই, এমন কি আমাদের বর্ত্তমান দুঃখদৈন্যপূর্ণ বিপর্য্যস্ত জীবনের রূপায়ণের সহিত যাহাতে ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত থাকে এ ধরণের ছবিও দেখা যায় না।

চলচ্চিত্রের দ্বারা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে। ইতিহাস, জীবনী, রোমাঞ্চকর অভিযান প্রভৃতিও যেমন দেখান যাইতে পারে, তেমনি স্কুল কলেজের উপযোগী এবং মাত্র সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শিক্ষাব্রতীদের সহযোগিতায় বিজ্ঞান, ভূগোলাদি ভালরূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। স্কুল কলেজে শিক্ষামূলক ছবি প্রস্তুতের জন্য বহু রোমাঞ্চকর ঘটনা-বলী, নানা দেশের দৃশ্যাবলী সম্বলিত ছবি অপেক্ষা ব্যয় অধিক নয়, বরং কমই হওয়ার কথা। তবে ইহা স্বীকার্য্য, এখানে সাধারণ স্কুল বা কলেজে ইহা নিয়মিত দেখানোর জন্য যে ব্যয়, তাহা সংকুলান করা কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত সম্ভব না হইতে পারে। তবে কলেজে বা স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে এই প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে অধ্যাপকের বেতনের ব্যয়ভার লাঘব হইতে পারে। আমাদের চিন্তানায়কদের কথায় চলচ্চিত্র সাহায্যে দুর্নীতি নিবারণ, তাহার গুণগত উৎকর্ষ সাধন শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক ও গঠনমূলক এবং জনগণের রুচি মার্জ্জিত ও উন্নততর করিবার উপযোগী চিত্র নির্ম্মাণের আবশ্যকতা ব্যক্ত হইলেও যাঁহারা এই শিল্পে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাঁহাদেরই যেন এ বিষয়ে একমাত্র দায়িত্ব এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। দায়িত্ব তাঁহাদের আছে সত্য, কিন্তু দায়িত্ব দেশবাসী মাত্রেরই আছে। এ সম্পর্কে দৈনিক বসুমতীতে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় একটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, এ বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব শতকরা আশী ভাগ। নির্ম্মাতা যাঁহারা তাঁহাদের একটা স্বতন্ত্র স্বার্থ আছে। ব্যক্তিগতভাবে সরকারের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আমাদের শক্তি কতটুকু। সুতরাং গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে আশু কোন উপায় বিধান হইবে না।

একটি করুণ মুহূর্ত

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বামী স্ত্রীতে কথা হচ্ছিল।

আক্ষেপের সুরে তিনকড়ি বলল, 'তোমার দিকে ফিরে তাকাবার এক দণ্ডও যদি অবসর পাই! সংসার পেতে অবধি তোমাকে কেবল দুঃখই দিলাম, নীলুর মা।'

সাদরে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে স্বামীর একখানি হাত টেনে নিয়ে থাকমণি বলল, 'না তো, আমি কেন দুঃখ পেতে যাব! স্বামী-পুত্রের এমন সোনার সংসারে আমার মত সুখী ক'জন? আমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক, তাতেই আমার শান্তি।'

—'চিরকাল তো এমনি করেই তুমি বললে, তাই বলে মানুষ কি কখনও অমর হয়!' হৃদয়াবেগে কথাগুলো এক বার কেঁপে উঠল তিনকড়ির কণ্ঠে। 'দেহ ছেড়ে আত্মা একদিন-না-একদিন মুক্তি পায়। সেদিন নীলু-ওদের হাত ধরে তোমাকে পথে দাঁড়াতে না হয় তাই তো এমন করে দিন রাত গাধার খাটুনি খাটছি। তবু তো সামান্য এক জোড়া শাঁখা এনেও তোমাকে হাতে তুলে দিতে পারি না। এ কি আমার কম দুঃখ, নীলুর মা?' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিল তিনকড়ি।

বাঁ-হাতের কব্জিতে তখনও এক ফালি লাল সুতো বাঁধা রয়েছে থাকমণির, তার পাশে দীর্ঘকালের ক্ষয়ে যাওয়া এক খণ্ড বলয়িত 'নোয়া' নরম মাংসের উপর ঢল্ ঢল্ করছে। অলঙ্কার বলতে ডান-হাতে একটি মাত্র শাঁখা। ক'দিন আগে হেঁসেলের কাজে বাঁ-হাতেরটি খোয়াতে হয়েছে; তিনকড়িকে জানতে দেয় নি থাকমণি, নিজেই এয়োতির চিহ্ন-স্বরূপ শাঁখার স্থানকে কাঁথা সেলাইয়ের লাল সুতো দিয়ে পূর্ণ করে নিয়েছে। বড় মেয়ে চিত্রা এক বার বাবার কানে দিতে চেয়েছিল কথাটা, কিন্তু মায়ের বকুনি খেয়ে নিজে থেকেই আবার নিবৃত্ত হয়েছে।

বেহালার তারের উপর দিয়ে ছড়ি বুলিয়ে নেবার মত স্বামীর হাতের উপর দিয়ে নিজের নরম আঙুলগুলো বুলিয়ে দিতে দিতে থাকমণি বলল, 'এমনি করে বলে বলে দুঃখ দিও না গো। বিষয়-আশয় আর গয়নাগাঁটি আর নেই কি সুখ, আমার এ সুখের কাছে তা কি দাঁড়াতে পারে? তুমি ঘুমোও, আবার তো সেই ভোরে উঠেই কাজের তাড়া।'

কাজ কি একটা তিনকড়ির, সারা দিনে তার মরবার অবধি ফুরসত নেই। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই গোয়াল পরিষ্কার করে বুধি আর তার বাচ্চাটাকে জাবনা দিতে হয়, ছেলেমেয়ে-গুলোর পড়াশুনো থেকে সুরু করে তাদের প্রাতরাশ পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করতে হয়, তার পর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে হয় জমিদারী সেরেস্তায়। মাসিক মাত্র পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি, খাজনা আদায়ের কাজ। সারাদিন এ মহল্লা থেকে সে মহল্লায় টহল দিয়ে বেড়াতে হয়। আগে আগে মাঝে মধ্যে তাতে কিছু উপরিও এসে যেত হাতে। ধরাবাঁধা রোজগার নয়, তা না হলেও আয় তো বটেই। ইদানীং তাতেও বাদ সেধেছে প্রজারা; সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেয়। তম্বি করে উঠে মুখের উপর, জমিদারের তিন পুরুষ উদ্ধার করে বিদায় করে দেয় দুয়ার থেকে। সেই সঙ্গে জমিদারের লোক হিসেবে তার নিজের বিরুদ্ধেও তাদের বিক্ষোভ কিছু কম প্রকাশ পায় না। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়, মনের আশা মেটে না তার। বিকেলে এসে আবার লেগে যেতে হয় তাকে জমি-জিরেত নিয়ে। বিঘাখানেক জমিতে লাউ কুমড়ো তরিতরকারী ফলিয়ে তিন ভাগ বাজারে বেচে তবে সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় এটা-ওটা সংগ্রহ করতে হয়। পাড়ার রামলোচনের দাওয়ায় গিয়ে একহাত দাবা পর্য্যন্ত খেলে আসার সময় হয় না। রজনীর সন্ধ্যাগুলো কাটে তার থাকমণি থেকে সুরু করে সংসারের ক্ষুদ্রতম প্রাণী নীলুর অবধি স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণে। কারুর স্বাস্থ্যই ভাল নয়। থাকমণি সুস্থ থাকলে গোয়ালঘরটাকে নিজের শোবার ঘরের মত একাই ঠিক রাখতে পারত। মেজ ছেলে হারাণ পেটে আসার পর থেকেই শরীর কেমন হঠাৎ ভেঙে পড়ল থাকমণির। এই স্বাস্থ্য নিয়েই সে আরও তিনটি ছেলেমেয়ের মা হয়েছে, রক্ষা করে চলেছে সংসারটাকে। সেজ মেয়ে টুনির আজ সাত দিন ধরে ঘুষঘুষে জ্বর আর আমাশা চলেছে, নীলুর যে কি হয়েছে—তা বোঝা মুশকিল, যখন যা খায় অমনি বমি হয়ে যায়। গাঁয়ের ভিষগ্রত্নের কাছ থেকে বারকয়েক ওষুধ এনে দিয়েছে তিনকড়ি, কিন্তু কাজ হয় নি। হারাণকে চেষ্টা করে কিছু কিছু লেখাপড়া শেখাচ্ছিল সে, তবু যদি হারাণ মানুষ হয়ে এক দিন সংসারের অবস্থা ফেরাতে পারে! কিন্তু আশা করলে কি হবে, মাঝে মাঝে রোগে ভুগে ভুগেই ছেলেটা অস্থিচর্ম্মসার হ'ল। মানুষের আকৃতি নিয়ে জন্মেও কেউ মানুষ হ'ল না সংসারে। এ দুঃখ কোথায় রাখবে তিনকড়ি! নিজের শরীরেও তার ভাঁটা পড়ে এসেছে, এই ফাল্গুনে আটচল্লিশ পেরিয়ে গেল। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখে তিনকড়ি।

থাকমণি তাকে ঘুমোতে বললে কি হবে, ঘুম কি আছে ছাই পোড়া দু'চোখে! থেমে জিজ্ঞেস করল, 'টুনির আজ

পায়খানা হয়েছে ক'বার, রং কি রকম, আমের পরিমাণ কি ? কাল কাজে বেরোবার মুখে আর একবার ভিষগ্‌রত্ন কবিরাজের কাছ হয়ে যেতে হবে। নীলুকে ভাল করে লেবুর রস মিশিয়ে ঘোল দিচ্ছ তো ? অসুখ তো ওদের নয়, অসুখ হয়েছে আমার। কি যে করি, কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে নীলুর মা।'

—'এ সব ভাবনা মাথার উপর থেকে দিয়ে তুমি আপাতত নিশ্চিন্ত হও দিকি। এর পর বায়ু চড়ে গিয়ে আর যে ঘুম আসবে না তোমার।' কথা দিয়ে স্বামীকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করে থাকমণি।

কিন্তু তাতেই কি স্বস্তি আছে তিনকড়ির। বলল, 'সব ঝঞ্ঝাটের বোঝা তুমিই যদি বইতে পারবে, তবে যে নিশ্চিন্তেই আমি চুপ করে বসে থাকতে পারতাম। ওদিকে যে আর এক বিপদ মাথার উপর খাড়া হয়ে আছে, কিছু জান ?'

থাকমণি এবারে আরও খানিকটা কাছ ঘেঁষে এল তিনকড়ির। 'কি গো, কি এমন বিপদ শুনি।'

কথাটা বলতে গিয়ে একবার থামল তিনকড়ি। থাকমণির কাছে এসব কথার উল্লেখ না করলেই ভাল ছিল। কিন্তু পারল না; পাষাণের মত ভারী হয়ে আছে বুকের ভিতরটা, খুলে বলতে না পারলে যেন মুক্তি পাচ্ছে না সে।

—'কি গো, চুপ করে রইলে কেন, বিপদটা কি, বল ?' খানিকটা উৎকণ্ঠায় দৃষ্টি ফেটে পড়ল এবারে থাকমণির চোখ থেকে।

লুকাতে পারল না তিনকড়ি, বলল, 'জমিদারের নুন খাই বলে অনেকেরই আমি শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছি। বার্ষিক পাঁচ টাকা সেলামীতে এই বাড়ীতে আছি, এক খণ্ড জমিতে কিছু করে খাই, এও অনেকের সহ্য হচ্ছে না। পূব-পাড়ের সহদেব চেষ্টা করেছিল কর্তাদের সেরেস্তায় ঢুকে আমার এই কাজটা হাত করবার, পারে নি বলে আমাকে মনে করে তার বড় শত্রু। সে-ই প্রজামহলে ঘুরে ঘুরে আমার বিরুদ্ধে ইদানীং ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে সবাইকে। প্রজাদের বাড়ীতে খাজনা আদায় করতে গেলে আজকাল আর মুখ পাই না। লোভ যে মানুষকে কত নীচে নামাতে পারে, তাই এক এক বার ভাবি নীলুর মা। এর পর হয়ত কর্তাদের সেরেস্তাতেও আমাকে আর প্রয়োজন হবে না। ঐ সহদেব হারামজাদা তখন মুখ টিপে হাসবে।' নিজের অলক্ষ্যেই বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে দিলে তিনকড়ি।

কিন্তু সহদেব লোকটি সত্যি সত্যিই হাসবে না কাঁদবে, তা নিয়ে আপাতত চিন্তা নেই থাকমণির, মনে মনে তার নিষ্কৃতি করে সে চুপ করে থেকেই। বলল, কেন গো, ও-কথা বললে কেন, কর্তাদের সেরেস্তায় তোমাকে প্রয়োজন হবে না কেন ?

—খাজনা আদায় করে যদি মালিকের হাতে এনে তুলে দিতেই না পারলাম, তবে প্রয়োজন কি আমাকে দিয়ে। তিনকড়ি বলল, 'দিনকালের গতিক ভাল নয় নীলুর মা, জমিদারেরাও হয়ত আর বেশীদিন টিকবেন না।'

—তবে তো ভালই, সব এক হয়ে যাবে; প্রজা-মালিক সম্বন্ধ থাকবে না, আমরাও কিছু মানী লোক হয়ে তাদের কাছে সম্মান পাব।—মনে মনে খানিকটা যেন খুশী হয়েই উঠল থাকমণি।

কিন্তু কথাটা ঠিক হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারল না তিনকড়ি। বলল, সম্মান না ছাই পাবে। এখন তবু টায়টোয় সংসার চলছে, তখন একেবারে তালমুট হয়ে যাবে।

আঘাত পেলে এবারে থাকমণি। সম্মানের পরিবর্তে ছাই: একি বলছে তিনকড়ি! আর দ্বিরুক্তি করল না সে। রাত তখন কম নয়, কিছুক্ষণ থেকে ছাই উঠে চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল থাকমণির। এবারে তার চোখ দুটো ঘুমে ভেঙে এল। ধীরে ধীরে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

কিন্তু তিনকড়ি সত্যি সত্যিই কিছু একটা পাল্টা জবাব আশা করেছিল স্ত্রীর কাছ থেকে, না পেয়ে বুঝল—অভিমানে কথা বন্ধ করেছে সে। বড় অভিমান থাকমণির। মৃদুকণ্ঠে ডাকল একবার তিনকড়ি: 'নীলুর মা ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?'

উত্তর নেই।

মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল তিনকড়ি—সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে থাকমণি। চোখের পাতা দুটো কেমন অদ্ভুতভাবে বুঁজে আছে তার; নীচের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে কালি পড়েছে। সহসা একবার কেমন শিউরে উঠল তিনকড়ি। খেটে খেটেআর ভুগে ভুগে আজ তার যৌবনের শরীরে কিছু নেই। এক দিন এই চোখ দুটো ছিল তার প্রধান আকর্ষণ। অসামান্য লাবণ্যময়ী করে তুলেছিল তাকে এই চোখ দুটি, আজ সেই চোখের পাতা দুটো শুকিয়ে নীচে কালি জমে উঠেছে। একটা দিনের জন্যও তাকে সুখী করতে পারল না তিনকড়ি। তার দাম্পত্যের মর্য্যাদা ভেঙে ক্রমেই চুরমার হয়ে গেছে। তবু কি প্রশান্ত মূর্তি থাকমণির, একটি দিনের জন্যও নিজের কষ্টের কথা মুখ ফুটে জানাল না। অভিমান হলে হয় নীরবে অন্য কোথাও উঠে গেছে, নয় ত নির্বিবাদে দু'চোখ বুজে এক সময় একনিশ্বাসে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পাশ ফিরে শুয়ে এবারে নিজেও ঘুমাতে চেষ্টা করল তিনকড়ি; কিন্তু দু'চোখের কোথাও তার ঘুমের লেশমাত্র নেই। বায়ু চড়ে গিয়েই থাকবে। এমনি সব নিদ্রাহীন রাত্রিতে মন তার বিষিয়ে ওঠে, ইচ্ছে হয় আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা! কথাটা মনে পড়তেই হঠাৎ চমকে উঠল তিনকড়ি। আত্মহত্যা করলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কার দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াবে থাকমণি ? আত্মহত্যা না করে বলতে

হয় আত্মদ্রোহ, ঘুমের সঙ্গে বিদ্রোহ করে জয়ী হতে চায় সে।

হঠাৎ ওপাশের মেঝে থেকে ঘুমের মধ্যেই টুনি কেঁদে উঠল। খাকমণিকে ডেকে মিথ্যে আর বিরক্ত করতে চাইল না তিনকড়ি, সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু ঘুমিয়েছে, বসতে ত সময় পায় না একদণ্ডও। তিনকড়ি নিজেই উঠে এসে টুনির শিয়রে বসল: 'মা, সোনা মা আমার কষ্ট হচ্ছে, পেট কামড়াচ্ছে, তাই না?'

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল টুনির, কেঁদে কঁকিয়ে উঠল সে: 'উঃ, ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে পেট।' আমাশার কামড়ানি সহ্য করতে পারে না টুনি।

আলগোছে দুই হাতের উপর তাকে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে আনল তিনকড়ি। এতক্ষণে ব্যথাটা কিছু কমল।

কিন্তু নিজের চোখের মণি দুটো ব্যথায় ফেটে পড়ছে তিনকড়ির; বিনিদ্র রাত্রির দিশেহারা দৃষ্টি যে কি সাংঘাতিক, তা নিদ্রাসুখী ব্যক্তিরা কি বুঝবে! আবার বিছানায় এসে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল সে।

ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে অনেক বেলা হয়ে গেল। শেষরাত্রির দিকে অকস্মাৎ গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে। যখন ঘুম ভাঙল—প্রভাতসূর্য্য তখন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। গোয়ালঘর থেকে বুধি আর তার বাচ্চাটা কেমন দুর্ব্বল কণ্ঠে মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে, প্রতিদিন এতক্ষণে ভোরের জাবনা তাদের উদরস্থ হয়ে যায়, ঘর থেকে বাইরের নরম ঘাসের উপর এসে সূর্য্যের মুখ দেখে। চিৎকার করবার কারণ আছে বৈকি তাদের আজ!

চোখেমুখে খানিকটা জল ছিটিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের জাবনা কেটে দিতে বসল তিনকড়ি। দেখল—কেমন যেন নিরুৎসাহ আর নিস্তেজ হয়ে পড়েছে বুধি আর তার বাচ্চাটা! শরীর খারাপ করল নাকি তবে বুধির? চোখে কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি, ঘাড় তুলে ভাল করে তাকাতে পারছে না। এ আবার কোন্ বিপদে পড়তে হ'ল তিনকড়িকে? নীলু নবে দেবার হ'ল। মাস দু'য়েকের বেশী খাকমণির বুকে দুধ রইল না, নীলুকে বাঁচানো মুশকিল দেখে গাইয়ের সন্ধান নিলে তিনকড়ি। বিল মামুদপুরের হাটে পাওয়া গেল বুধিকে; কুড়ি টাকা দিয়ে তাকে কিনে এনে বাড়ীতে গোয়াল বাঁধল সে। অল্পদিনেই বাচ্চাটা পেটে এল। দুধ এল বুধির 'বাটে।' দুধ না যেন ক্ষীর! এতদিন ধরে সেই ক্ষীরই পরিবেশন করে এসেছে বুধি। আজ এ তার কি হ'ল?—কিছুক্ষণ ধরে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিল সে বুধি আর তার বাচ্চাটার মাথার উপর। তারপর আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে সোজা রওনা হ'ল সে ভিষগ্রত্নের বাড়ীর দিকে। এর পর তাঁকে গিয়ে আর ধরা যাবে না। টুনি আর নীলুর দিকে তাকাতে গিয়ে দুঃখে বুক ফেটে যায়।

রোগী দেখতেই সম্ভবতঃ বেরুচ্ছিলেন ভিষগ্রত্ন, চৌকাঠে পা দিতেই তিনকড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, বাড়ীর অবস্থা কি তোমার?'

যথাযথ অবস্থা বর্ণনা ক'রে কাতর কণ্ঠে তিনকড়ি বলল, 'এমন কিছু ধন্বন্তরী ওষুধ দিন কবরেজ মশাই—যাতে এ দুর্ভোগ আর আমাকে না পোয়াতে হয়! বাপ হয়ে নিজের চোখে ছেলেমেয়ে দুটোর কষ্ট আর দেখতে পারি নে।'

—দেখতে পারি না কি হে, না পারলে চলবে কেন, ধৈর্য্য ধরতে হবে।' তিনকড়ির স্বেদসিক্ত ললাটের দিকে তাকিয়ে যেন কি একবার লক্ষ্য করলেন ভিষগ্রত্ন। শুধুই কবরেজ নন তিনি, জ্যোতিষীও বটে; মানুষের অদৃষ্টের লেখা বলে দিতে পারেন তিনি রাশিচক্র মিলিয়ে। বললেন, 'সময় খারাপ পড়লে মানুষের এমনিই হয়। এখন তোমার রাহুর দশা চলেছে; অল্পস্বল্প অর্থনাশ, রোগভোগ আর মানসিক ক্ষতির সঙ্গে এ সময়টা ধৈর্য্য ধরে চলতে হবে রোগের প্রতি-ষেধক হিসেবে ওষুধ সেবে বটে, কিন্তু ভোগান্তি তাতে দূর হবে না। তবে শীঘ্রই শুভদিন আসবে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে থাকবে, একথা নিশ্চিত।"

ওষুধের কথা ভুলে গেল তিনকড়ি। কিছুক্ষণ অভিভূতের মত ভিষগ্রত্নের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কবে তেমন শুভদিন আসবে কবরেজ মশাই?'

কিছুমাত্র দ্বিধা না করে ভিষগ্রত্ন বললেন, 'একটা নবগ্রহ কবচ ধারণ করে গ্রহশান্তির জন্য তুমি কিছু ব্যয় কর দেখবে —নিশ্চিত ফললাভ হবে।'

নবগ্রহ কবচ, গ্রহশান্তির জন্য ব্যয়, নিশ্চিত ফললাভ: মনে মনে বারকয়েক কথা কয়টি উচ্চারণ করল তিনকড়ি। তারপর থেমে বলল, 'সংসার ত আর আমার একার ভাগ্যে চলে না, তাতে আমার স্ত্রীরও ভাগ্যের যোগও আছে, একবার আলোচনা ক'রে নিই তার সঙ্গে। আপনি বরং আপাতত কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করুন কবরেজ মশাই।'

—'বেশ, অপেক্ষা কর।' বলে ওষুধের বাক্স নিয়ে বসলেন ভিষগ্রত্ন।

জমিদারী সেরেস্তায় যখন এসে সে পৌঁছল, সূর্য্য তখন মাথার ঠিক উপরে উঠেছে। বুড়ো নায়েবের সঙ্গে দেখা হতেই দাঁতমুখ খিঁচুনি খেতে হ'ল তিনকড়িকে। 'এমন খুশীমত কাজে বেরুলে শ্বশুরবাড়ীর বাজার করা চলে, জমিদারের কাজ চলে না।'

লজ্জায় মাথা নীচু করে নিলে তিনকড়ি, তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'আজ্ঞে ছেলেমেয়ে দুটো অসুখে ভুগছে, ওষুধের

ব্যবস্থা করে আসতেই যা একটু দেরি হয়ে গেল। বিশ্বাস না করেন ত তিনগ্রহস্থ মশাইকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

তর্ক করবার মানুষ নয় নায়েব, সরাসরি বলল, 'কথা না বাড়িয়ে পার ত এবারে একবার তাগিদে বের হও। দত্তপাড়ার হারু দত্ত যদি খাজনা না দেয় ত তার জমি নীলামে তুলবার ব্যবস্থা করবে।

নীলামে তুলবার ব্যবস্থা তিনকড়ি কেন করতে যাবে, খাজনা আদায়ের ব্যাপার পর্য্যন্তই তার সম্পর্ক, তারপর যা করবার নায়েব নিজেই করবেন। কিন্তু মুখ ফুটে সেটুকু বলতে পারল না তিনকড়ি। নীরবে ঘাড় কাৎ করে সোজা সে কাজে বেরিয়ে পড়ল।

না পড়ল মাথায় একটু তেল জল, না পড়ল পেটে দু'দানা ভাত। সারাটা দিন আজ অভুক্তই থাকতে হ'ল তিনকড়িকে। সূর্য্যের প্রখর তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ব্রহ্মতালু, এক একটা মুহূর্ত কাটছে আর ক্ষুধার পাক দিয়ে উঠছে পেটের নাড়ী। মাথা গুঁজবার মত একখানি ঘর, বিঘাখানেক জিরেৎ জমি আর মাসান্তে নগদ বিদায় পঁচিশ টাকা—হুকুমের গোলাম হয়ে আছে এর কাছে তিনকড়ি। সেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই নেই, গ্রীষ্ম বর্ষা নেই, সেখানে জমিদারের খাজনা আদায়কারী নির্ম্মম কর্ম্মচারী সে।

যখন ঘরে ফিরল তিনকড়ি—সূর্য্য তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। দেখল—সারাদিন তার জন্য অপেক্ষা করে করে থাকমণিও অভুক্ত থেকে বসে বসে বাড়াভাত আগলাচ্ছে। দুঃখে একবার চোখে জল এল তার। বলল, গোলামি করে মান-ইজ্জৎ আর শরীর বলে কিছু রইল না, নীলুর মা।

কেন যেন উত্তরে কিছু একটাও বলতে পারল না থাকমণি। স্বামীর মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ দুটি একবার ছল ছল করে উঠল তার। কিন্তু ধারা বর্ষিত হ'ল না। অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে নিলে থাকমণি।

তিনকড়ি জিজ্ঞেস করল, টুনি আজ সারাদিনে ক'বার পায়খানায় গেছে, ওষুধ খেয়ে ব্যথা কিছু কমেছে ত? নীলু আর বমি করে নি ত একবারও?

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে থাকমণি পাল্টা জিজ্ঞেস করল, তুমি আবার কোথাও বেরোবে নাকি এক্ষুনি?

—না, বেরুব আর কোথায়? তিনকড়ি বলল, জমিতে লাউয়ের কচি চারা দুটো বেশ লতিয়ে উঠেছে, পাটখড়ির ঘেরাও করে মাচান বেঁধে দেব, নইলে গরু ছাগলে খেয়ে ফেলতে পারে।

'আজ আর জিরেতে গিয়ে হাত না লাগালেই কি চলে না?' থাকমণি বলল, 'এই ত সারাদিন খালি পেটে কত পরিশ্রম করে এলে, কিছু খেয়ে বিশ্রাম না নিলে যে শরীর টিকবে না।

'না গো না, তা নয়। ব্যস্ত হয়ে তিনকড়ি বলল, দু'দিন বাদে চিত্তার বিয়ে দিতে হবে, কারাণের ভবিষ্যৎ আছে, আমি অস্থির হলে কি চলে? এক আধ বেলায় উপোসে শরীর বরং ভালই থাকে। জমি থেকে ফিরে এসে গরম গরম দুটি খেয়েই বরং শুয়ে পড়ব।

আর বাধা দিতে গেল না থাকমণি। দুঃখে অভিমানে ভেঙে পড়ল সে। সারাদিন সে যে স্বামীর আশাপথ চেয়ে নিজেও অভুক্ত রইল, সেটুকু বুঝল না তিনকড়ি। চোখ ফেটে আর একবার জল এল থাকমণির, হয়ত এখনই কিছু একটা অনর্থ ঘটে যাবে, ত্রস্তে উঠে তাই অন্যত্র কোথায় একদিকে চলে গেল সে।...

ইতিমধ্যে কোথা থেকে চিত্তা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে খুতনিটা ভীষণ ভাবে ছড়ে গেছে। চলাফেরায় এখনও সতর্ক হতে পারে নি চিত্তা, বয়স চৌদ্দ পেরিয়ে পনেরয় পড়েছে।

ধমক দিয়ে তিনকড়ি বলল, বুড়োধাড়ী মেয়ে হলি, দু'দিন বাদে পরের ঘর করতে যাবি, এখনও ভাল করে পা ফেলে হাঁটতে শিখলি নে। আমার হয়েছে জ্বালা, এখন বসে বসে ঘষো আবার ওষুধ।

সশব্দে কেঁদে উঠল এবারে চিত্তা। অপরাধ করে নি সে, ঘাট থেকে কলসীতে জল ভরে আনতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে যেতেই এই দুর্ঘটনা। কিন্তু সেটুকু খুলে বলতে পারল না সে বাবার কাছে।

মেয়ের কান্নায় রাগ ক্রমে জল হয়ে এল তিনকড়ির। প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সে ছেলেমেয়েদের। বলল, লক্ষ্মী মা, খুব চোট পেয়েছিস, তাই না? কাঁদিস নে, চোখ মোছ, এক্ষুণি ভাল হয়ে যাবে; জল দিয়ে ডলে দিচ্ছি, একটুও আর ব্যথা থাকবে না।

জিরেতের কাজে আর বেরুনো হ'ল না তিনকড়ির। চিত্তাকে নিয়েই সে আপাতত ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আড়ালে থেকে মনে মনে থাকমণি বলল: এই যদি আমার মাথার দিব্যি দিয়েও বলতাম, তবু বেরুতে হত ওঁকে; এখন থাক বসে মেয়েকে নিয়ে।—আসলে মনে মনে কতকটা খুশীই হ'ল থাকমণি। স্বামী-অন্ত-প্রাণ তার, স্বামীকে কাছে পেয়েই তার সুখ।

ছেলেমেয়েদের খাইয়ে, টুনি আর নীলুর পথ্যের ব্যবস্থা করে আজ একসঙ্গেই খেতে বসল দু'জনে। অনন্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও এ এক অদ্ভুত আনন্দ। তিনগ্রহের কথাটা উল্লেখ করে তিনকড়ি বলল, গ্রহশান্তির জন্যে কত ব্যয় হতে পারে, কিছু জান? এল না, দু'জনেই দুটো গ্রহশান্তি কবচ ধারণ করি। কথাটা মন্দ বলেন নি কবরেজ মশাই, কত বড় জ্যোতিষী তিনি!

শুনে কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিল থাকমণি। বলল, তুমিও যেমন, যে যা বলে অমনি বিশ্বাস করে বস। গ্রহশান্তি কবচ ধারণ করলেই যদি অদৃষ্ট ফিরবে, তবে কবরেজ মশাই-বা এমন বড়ি টিপে খাচ্ছেন কেন, তাঁরও ত মনে শান্তি নেই; ক' মাস আগে কব্‌রেজ-গিন্নী কালাজ্বরে ভুগে মরল, গ্রহশান্তি দিয়ে আরাম করলেই ত পারতেন!

কথা কাটতে পারল না তিনকড়ি। সংসারের জন্য খেটে মরে বটে সে, কিন্তু থাকমণির সাংসারিক বুদ্ধিকে কখনও কোন ক্ষেত্রেই সে উড়িয়ে দিতে পারে নি। এখনও পারল না। বলল, তবে থাক্‌। ভগবানের বিধানকে কি কেউ খণ্ডাতে পারে সংসারে! অদৃষ্টে থাক্‌লে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না আমাদের সুখ।

খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল দু'জনে।

টুনি আর নীলু আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছে বলেই মনে হ'ল; ঘুম আছে চোখে, আজ আর রাত্রে উঠবে বলে অন্ততঃ মনে হয় না।

তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়ল তিনকড়ি। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে এল। খুব ভোরে উঠেই জমিতে গিয়ে জল দিতে হবে গাছগুলোর গোড়ায়, পাটখড়ি দিয়ে ঘেরাও করে দিতে হবে লাউয়ের কচি চারা দুটোকে, তার পর গোয়ালের কাজ। একটা মুহূর্ত্তও কি বিশ্রাম আছে তার? আগামী প্রভাতের কর্ম্মসূচীর কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল তিনকড়ি।...

উঠল সে ভোরে কাকডাকার আগেই। তখনও ভাল করে ফর্সা হয় নি। পূর্ব্বদিগন্তে ঈষৎ আলোর আভাস দেখা দিয়েছে মাত্র। দেখল—তখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে সবাই। নরম হাতে একবার থাকমণিকে ঠেলে দিয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ল তিনকড়ি। তার পর চোখে মুখে খানিকটা জলের ছিটে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে জমির দিকে। সামনের ছোট গলিটা পার হয়ে একটু বাঁক ঘুরেই বাঁ-হাতি জমি।

এসে পৌঁছুতেই দু'চোখ তার কপালে উঠে গেল। দুঃখে রাগে হঠাৎ হু হু করে উঠল বুকখানা। কাদের নির্ম্মম অত্যাচারে সমস্ত জিরেত তার নষ্ট হয়ে গেছে। কুমড়োর মাচানটা ভেঙে গুঁড়িয়ে আছে; অসংখ্য ফুল আর গুটি দেখা দিয়েছিল, আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। পুঁইয়ের কচি ডগাগুলোকে পিষে রেখে গেছে, লাউয়ের কচি চারা দুটোর কোথাও আর অস্তিত্ব নেই; নধরকান্তি ডাঁটা, লঙ্কা, বেগুন আর ঢেঁড়সের চারাগুলো ধূলিসাৎ হয়ে আছে। সজনে-গাছটা শুধু ছিন্নপত্রে সাক্ষীগোপালের মত দাঁড়িয়ে আছে। মনে হ'ল—তার বুকের পাঁজরাগুলোই যেন ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে সারা জমিতে। তিনকড়ির গোটা পরিবারের ভবিষ্যৎ, দরিদ্র-জীবনের ভবিষ্যতের সংস্থান—তার মূলে কার অদৃশ্য হস্ত এমন করে শ্মশান রচনা করে দিয়ে গেল একটা রাত্রির অবকাশে?

নির্ম্মম হয়ে উঠল সে। বুঝতে তার কিছুই বাকী রইল না। মুহূর্ত্তে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে সব কিছু। এক দিকে ক্ষমতার অটুট সিংহাসন, আর এক দিকে ক্ষমতাহীনের জীবন-সংগ্রাম: মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলছে তিনকড়ি। এক দিকে অবিশ্বাস, আর এক দিকে বিদ্বেষ। না পারছে সে ক্ষমতার সিংহাসন স্পর্শ করতে, না পারছে ক্ষমতাহীনের জীবন-সংগ্রামে গিয়ে হাত মিলিয়ে দাঁড়াতে। খাস-কাবারী বিদায় তার পঁচিশ টাকা। হায়রে অর্থ! তার চাইতে কি কম মূল্য কিছু বুকের এই পাঁজরা ক'খানার? পারে নাকি এই পাঁজরাগুলো গেঁথে গেঁথে জীবনের একখানি অমূল্য সিংহাসন গড়ে তুলতে তিনকড়ি—যেখান থেকে থাকমণিকে একটা মুহূর্ত্তের জন্যও সরে দাঁড়াতে হবে না নীলুদের নিয়ে! কিন্তু ভাঙা হাড়ে সত্যিই যে জোড়া লাগে? জিরেতগুলোর দিকে আর একবার তাকাতে গিয়ে দু'চোখ ছাপিয়ে হু হু করে জল এসে গেল তিনকড়ির।

প্রভাতের তরুণ সূর্য্যের কোমল আলোয় তখন চারদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
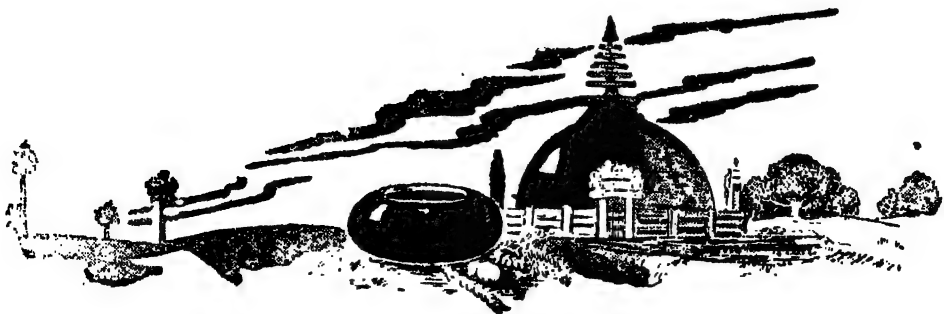
অবলা বসু

শ্রীশোভনা নন্দী

বাংলা তথা ভারতের সর্ব্বজনবরেণ্যা পরম শ্রদ্ধেয়া লেডী অবলা বসুর মহাপ্রয়াণের আজ প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী দিবস। সেই পুণ্যবতীর আত্মার পবিত্র স্মৃতিপাদমূলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। তাঁর চরণোদ্দেশে নিবেদিত ভক্তি-অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করুন, তাঁকে বার বার প্রণাম জানাই।

জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে লেডী বসুকে পরম আত্মীয়া রূপে পাবার সৌভাগ্য আমার জীবনে ঘটেছে; এ দীর্ঘজীবনে তাঁর যে স্নেহ উপভোগ করেছি তার তুলনা হয় না। মাতৃহীনা আমরা, মাতৃস্নেহের অভাব তিনি আমাদের পূর্ণ করেছিলেন—তাঁর কাছে আমার ঋণ-অপরিশোধ্য। লেডী বসু সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য আমার আদেশ করা হয়েছে। জানি না এ সম্বন্ধে যোগ্যতা আমার কতটুকু, তবে শুনেছি পিতৃমাতৃ তর্পণে সকল সন্তানেরই অধিকার; সেখানে যোগ্যতা-অযোগ্যতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না; আমিও আজ সেই সন্তানের দাবিতে এ গুরু ভার বহন করতে সাহসী হয়েছি, আশা করি আমার ভুলত্রুটি আপনারা দয়া করে মার্জ্জনা করবেন।

মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জন্ম ও তিরোধান তিথিতে তাঁদের গুণাবলী স্মরণে, স্মৃতিতর্পণে ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, চিত্ত পবিত্র হয়। তাঁদের জীবনাদর্শ চির উজ্জ্বল থেকে পথের নির্দ্দেশ দেবে, যাত্রাপথের সহায় হবে—এ উদ্দেশ্যেই স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। মহাত্মাদের স্মৃতি-পূজা জাতীয় জীবন গঠনের অন্যতম সোপান। আজ আমরা সেই বরণীয়া মহিলার অপূর্ব্ব জীবন-কথা আলোচনা করে ধন্য হই, নারী-কল্যাণে তাঁর অতুলনীয় দানের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞচিত্তে সেই বিদেহী আত্মার চরণে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। তাঁর আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে সত্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করুক এই প্রার্থনা।

এক পরম শুভ মুহূর্ত্তে বঙ্গমাতার ক্রোড়ে লেডী বসুর আবির্ভাব হয়েছিল। জননী জন্মভূমির দুর্গতিমোচনে বদ্ধ-পরিকর হয়ে যেদিন তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা হন সেদিন বুঝি আকাশ বাতাস মুখরিত করে ঘোষিত হয়েছিল "কুলং পবিত্রম্, জননী কৃতার্থা"।

লেডী বসু আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পত্নী। কিন্তু এইটেই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়, জনসাধারণের কাছে তাঁর আরও পরিচয় আছে—তিনি ছিলেন বাংলার মেয়েদের জননীস্বরূপা, হিতৈষিণী বন্ধু, শুভার্থিনী অভিভাবিকা ও নারী-সমাজের পথ-প্রদর্শিকা জননেত্রী।

কবি বলেছেন, "জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে, চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে?" বিধাতার অমোঘ বিধানে মানব-জীবনের ইহাই অনিবার্য্য পরিণতি। পৃথিবীতে প্রতিদিন সহস্রে সহস্রে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। কে তার সংবাদ রাখে, আত্মীয় বন্ধু ছাড়া কয়জনই বা তার জন্য অশ্রুমোচন করে? কিন্তু সেদিন দেখেছি লেডী বসুর মহা-প্রয়াণে ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠেছিল, সারা বাংলা শোকে মুহ্যমান হয়েছিল। আজ নিঃসন্তানা লেডী বসুর শত শত কন্যা চোখের জলে মাতৃতর্পণ করছে। সেদিন মনে হয়েছিল মৃত্যু ত সকলেরই হয়, কিন্তু নরজীবনের এমন গৌরব-ময় পরিসমাপ্তি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে।

নারী-কল্যাণে লেডী বসুর যে অমর অবদান তার বুঝি তুলনা নেই। ভারতের নারীসমাজে আজ যে যুগান্তর উপস্থিত হয়েছে, শিক্ষায় দীক্ষায়, রাষ্ট্রে ও সমাজে—জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ এদেশের নারীদের জীবনে আজ সহজলভ্য হয়েছে, তার মূলে যে কয়জন মনীষী এবং মনস্বিনীর সম্মিলিত সংগ্রাম ও সাধনা রয়েছে, লেডী বসু ছিলেন তাঁদেরই অন্যতমা।

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা লেডী বসু আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে প্রায় সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন। দেশ-বিদেশের বিদ্বমণ্ডলী ও অভিজাত পরিবারসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার প্রচুর সুযোগ তাঁর জীবনে এসেছিল, কিন্তু পাশ্চাত্যের কোনও প্রভাব তাঁর জীবনে বা আচরণে ছায়াপাত করতে পারে নি। ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত লেডী বসু জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত মনেপ্রাণে ছিলেন আদর্শ ভারতনারী। তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রীতি, জাতীয় আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ আমাদের কতই না মুগ্ধ করেছে। এই দেশপ্রীতিই তাঁকে দুর্গতদের সেবায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর ছিল উদার দৃষ্টি-ভঙ্গি—যেখান থেকেই পাওয়া যাক না কেন যা ভাল তা সর্ব্বদাই সাদরে গ্রহণীয় এ ছিল তাঁর আদর্শ। হাঁস যাকি জল মিশ্রিত দুগ্ধ থেকে নীর পরিত্যাগ করে ক্ষীর বা দুধের সারাংশ গ্রহণ করে। অবলা বসুও তেমনি পাশ্চাত্য নারী-সমাজে যখন যা ভাল দেখেছেন দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী করে নিজের প্রতিষ্ঠানগুলিতে তা প্রবর্ত্তিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, পূর্ব্ব-পশ্চিমের অপূর্ব্ব সমাবেশ।

বাংলার মেয়েরা শিশুকাল থেকে ভারতীয় ভাবধারায় শিক্ষালাভ করে যেদিন "শ্রদ্ধা, তপস্যা, সেবায়" এ মন্ত্র নিজ

নিজ জীবনে প্রতিফলিত করে তুলতে পারবে সেদিনই ভারতে নারীদের মর্য্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। লক্ষ্য স্থির রেখে অগ্রসর হব, এক দিন সিদ্ধিলাভ হবেই হবে এ ছিল লেডী বসুর জীবনের সাধনা। বিশ্বের দরবারে ভারত-নারীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। এই স্বপ্নকে রূপায়িত করে তোলার ঐকান্তিক আগ্রহই বুঝি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদিকার গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সেদিন তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। এই বিদ্যায়তনটিকে তিনি সুদীর্ঘকাল কন্যাস্নেহে লালন করে এসেছেন, এর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। আজন্ম শিক্ষাব্রতী অবলা বসু শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন চিন্তাধারা, নূতন আদর্শের পথ খুলে দিলেন। বিদেশে থাকা কালেও স্কুল সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার বিরাম ছিল না। শিক্ষালয়ের কাজে তাঁর ক্লান্তি ছিল না, নিত্য নূতন পরিকল্পনা নিয়ে সর্ব্বদা তাঁকে ব্যাপৃত থাকতে দেখেছি। সর্ব্বদা আমায় বলতেন, "শিক্ষার্থীর মনে স্বদেশ-প্রীতি জাগিয়ে তুলে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ-স্পৃহা জন্মানোর চেষ্টাই শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ, শিক্ষার মূলগত নীতি।" তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা যত্ন ও ঐকান্তিক সাধনার ফলেই আজ এই শিক্ষায়তনটি ফল-পুষ্প-সুশোভিত বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ইহার আজিকার এই সফলতা ও প্রতিষ্ঠার-মূলে লেডী বসুর অতুলনীয় দানের কথা কারও অবিদিত নেই। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের ইতিহাসে তাঁর এই অমূল্য দানের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। প্রাক্তন ছাত্রীর দাবিতে তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশে আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সহস্র প্রণতি জানাই।

লেডী বসুর ছিল অদ্ভুত কর্ম্ম-প্রতিভা। এই শিক্ষালয়টি তাঁর একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র নয়। নারী শিক্ষা-সমিতি, বিদ্যাসাগর বাণীভবন তাঁর আর দুটি অমর কীর্ত্তি। এ ছাড়া মহিলা শিল্প-ভবন, মহিলা কো-অপারেটিভ হোম ও কামারহাটি শিল্পাশ্রম, ট্রেনিং স্কুল তাঁরই পরিকল্পনায়, তাঁরই পরিশ্রমের ফলে গড়ে উঠেছে, তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাণস্বরূপ। তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও ঐকান্তিক সাধনার ফলে কত দুঃস্থ অব-হেলিত কন্যা আজ বাঁচবার পথের সন্ধান পেয়েছে; সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে পরমুখাপেক্ষিণী নারীর একদা ব্যর্থ জীবন আজ সার্থক হবার, বড় হবার। এই সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করে আজ শত শত বিধবা ও অসহায়া নারী অর্থোপার্জ্জন দ্বারা নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণে সক্ষম হয়েছে।

দেশ-সেবার পথ কোন দিনই কুসুমাস্তীর্ণ নয়, লেডী বসুর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। কত ঝড়ঝঞ্ঝা, কত নিন্দা প্রতিবাদ, কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাঁকে এই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলতে হয়েছে, কিন্তু কোনও দিন তিনি নিরুদ্যম হন নি—কত বড় শক্তি থাকলে এটা সম্ভব হয় তা ভেবে দেখা উচিত। সাধু সঙ্কল্প ও নিঃস্বার্থ সেবা কি কখনও বিফল হতে পারে! সকল প্রচেষ্টার মূলে ছিল তাঁর ঈশ্বরের প্রতি গভীর নির্ভরতা ও বিশ্বাস। আজ সে সব কথা মনে পড়ে হৃদয় শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে ওঠে। উপরে যেগুলোর কথা বলা হ'ল তা ছাড়া আরও বহু নারী-কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

একটা জীবনে এতগুলি কর্ম্মপ্রচেষ্টার সফলতালাভ খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। শরীর যখন জীর্ণ, শক্তি যখন ক্ষীণ তখনও তাঁর মনে কত নূতন নূতন কল্পনা। মৃত্যুর অল্প কিছু দিন আগেও আমায় বলেছিলেন, "মেয়েদের জন্ত আরও কত কি করার আছে, কিন্তু আমার ত আর সময় নেই—"কাজের যেন অন্ত নেই, তখনও জনসেবার কি অদম্য স্পৃহা! দেহে ছিল না শক্তি, কিন্তু মনে ছিল যৌবনের উৎসাহ, অপূর্ব্ব কর্ম্ম-প্রেরণা!

লেডী বসু ছিলেন ধনীর কন্যা, সম্পন্ন ঘরের বধূ, ধন মান, যশ প্রতিপত্তি জীবনে কিছুরই অভাব ছিল না; অথচ এই প্রাচুর্য্যের মধ্যে তাঁর ছিল সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিচিত্র কর্ম্মসাধিকা দেশের নেত্রীস্থানীয়া, আবার পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে দেখেছি তাঁকে ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী সহধর্ম্মিণী ও আদর্শ-গৃহিণী। স্বামী ও পরিবার-পরিজনের সেবায় কি একাগ্র নিষ্ঠা! তাঁর সেই শান্তস্নিগ্ধ মমতাময়ী মাতৃমূর্ত্তির স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় আমরণ উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। অবলা বসু ছিলেন অতীত ভারতের মহিমময়ী নারীদের প্রতীক।

পিতা ও স্বামীগৃহের ঐশ্বর্য্য তাঁর হৃদয়কে সঙ্কুচিত করেনি, দিয়েছিল বিস্তৃত পরিসর, শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির স্নিগ্ধ পরিবেশ এনে দিয়েছিল চরিত্রের শালীনতা, মহানুভবতা, সৌজন্য, উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও ধর্ম্ম-প্রবণতা। এই দুই পরিবারের কন্যা ও বধূরূপে যে অতুল শিক্ষা সম্পদের অধিকারিণী হয়েছিলেন, নিঃশেষে তিনি তা সমাজসেবায় দান করে গেছেন। সমাজ-সংস্কারক পিতা দুর্গামোহন একদিন স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও স্ত্রী-স্বাধীনতা-সংগ্রামে আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। সেই মহানুভব পিতার কাছে কন্যা সেদিন যে কল্যাণব্রতে দীক্ষাগ্রহণ করেন, কঠোর সংগ্রাম ও সাধনায়, দেশমাতৃকার সেবার মধ্য দিয়ে সে ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করে গেছেন।

লেডী বসু ছিলেন নীরব কর্ম্মী, নামযশ বা পদগৌরবের অহমিকা তাঁর মনে কোনও দিন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ভগবদ্ভক্তিতে অনুপ্রাণিত এই পুণ্যশ্লোকা নারীর ত্যাগ, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-মাধুর্য্য সকলকে মুগ্ধ ও তাঁর প্রতি একান্ত ভাবে আকৃষ্ট করবে এ আর বিচিত্র কি?

আজ এক বৎসর হ'ল লেডী বসুকে আমরা হারিয়েছি। কিন্তু আজও তাঁর অভাবের তীব্রতাবোধ আমাদের কমে নি,

তাঁর তিরোধানে বঙ্গমাতা এক বিশিষ্ট কন্যাকে হারিয়েছেন কিন্তু তাঁর অমর কীর্ত্তি বাংলার নারী-জাগরণের ইতিহাসে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

সেই অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী বাংলার মেয়েদের কাছে 'অমৃত সমান' হউক, তাঁর শিক্ষা, তাঁর আদর্শ স্বাধীন ভারতের ভাবী কালকে পথের নির্দ্দেশ দিক—এই প্রার্থনা।

মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিদেশ থেকে লিখিত লেডী বসুর একটি পত্রের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করছি। আশা করি এই শিক্ষালয়ের তরুণী কন্যারা এর দ্বারা উপকৃত হবেন, তাঁর আদর্শকে সার্থক করে তুলবেন :

"আমি চাই দেশপ্রীতি বজায় রেখে দেশসেবার জন্য মেয়েদের Efficient করা। আমাদের মটো "শ্রদ্ধয়া তপসা সেবয়া" সেই অনুসারে মেয়েদের গড়িয়া তুলিতে যেন পারি। সেই Distinctive stamp দিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

* * * আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা সমুদায় দেশীয় ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া করিতে হইবে। আমাদের নিজের দেশের শাস্ত্র ও চিন্তার ধারা ছাড়িয়া দিলে দেশের মঙ্গল নাই।"

ইহার ছত্রে ছত্রে কি উচ্চ আদর্শের অভিব্যক্তি!

আজ এই শ্রাদ্ধ বাসরে শিক্ষালয়-কর্ত্তৃপক্ষ লেডী বসু ও তদীয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্গীয়া সরলাবালা রায়ের তৈলচিত্র দুখানি বিভালয়কক্ষে প্রতিষ্ঠার আয়োজন করে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। লেডী বসুর ন্যায় তাঁর ভগিনীও শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। লোকান্তরিতা সরলাবালা এই বিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা কর্ম্মসচিব।

বালিকাদের শিক্ষা ও তাদের চরিত্রগঠনে নারীরই অধিকার, অতএব মেয়েদের শিক্ষার ভার পুরুষদের হাতে না রেখে মেয়েদের নিতে হবে এ ছিল সরলাবালা রায়ের অভিমত। তাই তিনি শিক্ষালয়ে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করে শিক্ষা-জগতে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করলেন। তখন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ছেলে-মেয়েদের শিক্ষণ-ভার পুরুষদের হাতেই ছিল। বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী-নিয়োগ-প্রথা প্রবর্ত্তনের তিনি অন্যতম পথ-প্রদর্শিকা। শিক্ষালয়ের আভ্যন্তরীন কার্য্য পরিচালনোদ্দেশে তিনি একটি মহিলা কমিটিও গঠন করেন। স্কুলের আর্থিক অবস্থা তখন অতি শোচনীয়, বুঝি বা স্কুল উঠে যায় এই ভাবনায় কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। চারদিকে নানা বিশৃঙ্খলা, কিন্তু সরলাবালার দক্ষ পরিচালনায় সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে বিদ্যালয় দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হ'ল। শিক্ষালয়টিকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করবার যে পরিকল্পনা সেদিন স্বর্গীয়া রায় করেছিলেন পরবর্ত্তী কালে তা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল তাঁরই কনিষ্ঠার সাধনায়: এই শিক্ষালয় এঁদের উভয়ের নিকটই অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ।

পরলোকগত প্রিয়জনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও তাঁদের স্মৃতিকে নিজেদের মধ্যে সঞ্জীবিত করে রাখার উদ্দেশ্যেই আমরা মৃত আত্মীয়ের আলেখ্য নিজ-গৃহে স্থাপন করি। এই ভগিনীদ্বয় বাংলার মেয়েদের একান্ত আপন জন, পরম আত্মীয়। তাঁদের স্মৃতির এবং তাঁদের মহৎ কার্য্যাবলীর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের জন্যই আজিকার এ অনুষ্ঠান, কিন্তু এ যেন মাত্র এক দিনের চিত্র প্রতিষ্ঠারই পর্য্যবসিত না হয়। সেই লোকান্তরিতা ভগিনীদ্বয়ের পদচিহ্ন অনুসরণ করে, তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলে, সেই পুণ্যাদর্শ নিজেদের জীবনে প্রতি-ফলিত করতে যদি পারি তবেই এ অনুষ্ঠান সার্থক হবে, তাঁদের আত্মাও তৃপ্ত হবে।*

* লেডী অবলা বসুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে অনুষ্ঠিত স্মৃতি-সভায় পঠিত।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বঙ্গীয় বিধান-সভার ২৩৮ জন সদস্য বঙ্গীয় বিধান পরিষদের জন্য ১১ জনকে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট (Single Transferable Vote) দ্বারা "আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব" করিবার জন্য পাঠাইবেন। এই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিব।

'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব সোশ্যাল সায়ান্সেস'-এর ১২শ খণ্ডে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :

"The term proportional representation is used to designate the various electoral devices which aim to secure a legislative body reflecting with more or less mathematical exactness the strength of the groups in the electorals."

ইহার বহু প্রকার-ভেদ আছে ; সকল 'প্রকারে'রই উদ্দেশ্য হইতেছে সংখ্যালঘুরা যাহাতে উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারে। নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে নানা প্রকারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা মতবাদী থাকিতে পারে, কিন্তু এই প্রথায় তাঁহারা আইন-সভায় নিজ নিজ সংখ্যানুযায়ী প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন।

গত ১৯৪৫-৪৬-এর নির্ব্বাচনে কংগ্রেস শতকরা ৮০টি ভোট পাইয়া শতকরা ৯৭টি আসন দখল করে ; আর হিন্দু-মহাসভা শতকরা ৭টি ভোট পাইয়া একটি আসন মাত্র পায়। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকিলে হিন্দুমহাসভা শতকরা ৭টি আসন পাইত। যাক্ পুরাতন কথা।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দুইটি প্রধান রূপ আছে—একটি হইতেছে "হস্তান্তর-অযোগ্য ভোটসহ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব" (proportional representation with non-transferable vote) ; অপরটি একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটসহ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (proportional representation with the single transferable vote)।

হস্তান্তর-অযোগ্য ভোট (Non-Transferable Vote)

আমরা এখন পূর্ব্বোক্ত প্রথম রূপটির আলোচনা করিব। ইহার আবার তিনটি প্রধান রকম আছে যথা : (১) পরিমিত-সংখ্যক ভোট (limited vote) ; (২) একক হস্তান্তর-অযোগ্য ভোট (single non-transferable vote) ও (৩) সামগ্রিক ভোট (cumulative vote)। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একই নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে বহু ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করা একান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে ইহার কার্য্যকারিতা থাকিবে না।

পরিমিতসংখ্যক ভোটের স্বরূপ বুঝাইবার সুবিধার জন্য আমরা ধরিয়া লইলাম যে, একটি নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে ৩ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। আর এই তিনটি সদস্য-পদের জন্য "রক্ষণশীল" ও "উদারনৈতিক" দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আরও ধরা গেল, এই ক্ষেত্রে রক্ষণশীলরা সংখ্যাগুরু। তাঁহারা তিনটি পদের জন্য তিন জনকে মনোনয়ন করিলেন। আর "উদারনৈতিক" দল একজনকে মনোনীত করিলেন। প্রত্যেক নির্ব্বাচকের যদি তিনটি করিয়া ভোট থাকে তাহা হইলে ৩টি পদই রক্ষণশীলরা দখল করিবেন। এইজন্য সদস্য-সংখ্যার পরিমিতসংখ্যক ভোট (limited vote), যেমন প্রত্যেক নির্ব্বাচকের দুটি ভোট আছে। ইহার ফলে রক্ষণশীলরা যদি সংখ্যায় শতকরা ৮০।৯০ জন হন ত তাঁহারা তিনটি সদস্যপদই অধিকার করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহারা যদি সংখ্যায় ৭০।৭৫ জন হন তবে একটি পদ "উদারনৈতিক"দের হইবেই। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের একেবারে হটাইয়া দিতে পারিবেন না। এই প্রথার গলদও আছে, তবে ইহার গলদ আলোচনা করিবার স্থান এখানে নহে।

একক হস্তান্তর-অযোগ্য ভোট

(Single Non-Transferable Vote)

এই প্রথায় প্রত্যেক নির্ব্বাচকের একটি করিয়া ভোট, এবং ঐ ভোট তিনি যে-কোন প্রার্থীকে দিতে পারেন। যে যে প্রার্থী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোট পাইবেন, তিনিই নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। উপরি-উক্ত উদাহরণে দুই জন "রক্ষণশীল" ও ১ জন "উদারনৈতিক" নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা বেশী।

সামগ্রিক ভোট (Cumulative Vote)

এই প্রথায় যত জন সদস্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে, প্রত্যেক নির্ব্বাচকের ততটি ভোট আছে। উক্ত উদাহরণ অনুসারে প্রত্যেক ভোটারের তিনটি ভোট আছে। এই তিনটি ভোট ইচ্ছা করিলে তিনি একজনকে দিতে পারেন, বা একজনকে দুটি অপর একজনকে একটি বা তিন জনকে তিনটি ভোট দিতে পারেন।

উপরোক্ত দুইটি প্রথার ত্রুটিও আছে। পরাজিত প্রার্থীকে যে ভোট দেওয়া হইয়াছে সেগুলি একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে। সংখ্যালঘুরা কিছু প্রাপ্য অংশ পাইলেও সবটা পাইল না। একক হস্তান্তর-অযোগ্য ভোটের কার্য্যকারিতা বুঝা সহজ।

১৯৩৭ সালে ভারত-শাসন আইন অনুসারে যে নির্ব্বাচন হইয়াছিল, তাহা হইতে সামগ্রিক ভোট-দান (cumulative voting) ও নির্ব্বাচকমণ্ডলী সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস কি করিয়াছিল তাহার কিছু উদাহরণ দেওয়া যা'ক।

বোম্বাই শহর হইতে বোম্বাই বিধান-সভায় চার জন প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে স্থির হইয়াছিল। আট জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন—কংগ্রেস চারটি আসনের মধ্যে দুটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল ও দুইটিই জিতিয়াছিল। যদি কংগ্রেস একটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত, তাহা হইলে আরও একটি আসন স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিত। যদি তাঁহারা তিনটি বা চারটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাইত, তাহা হইলে সব কয়টি আসনই তাহাদের হস্তচ্যুত হইত। ভোটের ফলাফল দিয়ে দেওয়া গেল :

প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা
করন্ধিয়া*	স্বতন্ত্র	১৫৫২
মিসেস হংস মেহতা*	কংগ্রেস	১২২৭
রতিলাল গান্ধী*	কংগ্রেস	১১০৫
ডাভার*	স্বতন্ত্র	৮৮৩
ভেঙ্কটরাও	ঐ	৭২৮
ডাঃ জাওলে	ঐ	৫০১
দেশাই	ঐ	৪১৬
আগবালে	তপশীলী	১৯৫

মধ্যপ্রদেশে ভাণ্ডারা-সাকোলি গ্রাম্যকেন্দ্রে দুটি আসন, একটি তপশীলী সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত। কংগ্রেস দুটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও দুইটিই হারান। ভোটের ফলাফল দিয়ে দেওয়া হইল :

সাধারণ আসন		
গণপৎরাও যাদবরাও পাণ্ডে*	স্বতন্ত্র	১৬,৭১১
পালাচলে	কংগ্রেস	১৬,৫৩০
সংরক্ষিত আসন		
মাধব গাম্ভীরা*	আম্বেদকরী দল	৭,১১৬
সুরজ উকর-হুণ্ডা	কংগ্রেস	৪১৬
গঙ্গারাম মাভাজী	স্বতন্ত্র	৩,২৬২
পাণ্ডুরং পাঙ্কোজী	স্বতন্ত্র	১১০১

যদি কংগ্রেস একটি মাত্র আসনের জন্য, তা সাধারণ আসনই হউক কিংবা সংরক্ষিত আসনই হউক, নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইত তাহা হইলে ইহা সেই আসনটি লাভ করিত।

মধ্যপ্রদেশের হিঙ্গনঘাট নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে দুটি আসন। একটি সাধারণ ও একটি সংরক্ষিত। কংগ্রেস দুটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও একটি আসন পান। কিন্তু তাঁহারা অতি সহজেই দুটি আসনই দখল করিতে পারিতেন, যদি উপযুক্ত ভাবে ভোট বিভাগ করিয়া দিতেন।

সাধারণ আসন		
শেঠ গোকরাজ কোচার*	কংগ্রেস	১৪,০০৪
কোটাম্বকার	অ-ব্রাহ্মণ	৮,৬১৬
দেশপাণ্ডে	স্বতন্ত্র	২৫৭
সংরক্ষিত আসন		
দশরথ পাতিল*	স্বতন্ত্র	৩,২২৬
কেশব নারায়ণ	ঐ	১,৬৫১
বিশ্বনাথ	কংগ্রেস	১০৬৮
দৌলত মদনজী	স্বতন্ত্র	৩১৬

সাধারণ আসনে শেঠ গোকরাজ তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা ৫,৩৮৭ ভোট বেশী পাইয়াছেন। তিনি ৩০০০ হাজার কম ভোট পাইলেও প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষা তাঁহার যথেষ্ট বেশী ভোট থাকিত। আর বিশ্বনাথ যদি এই ৩০০০ ভোট পাইতেন তাহা হইলে পাতিলকে অনায়াসে পরাজিত করিতে পারিতেন।

এইবার আমরা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। যদিও বিধান পরিষদে বহু প্রতিনিধি থাকেন; এবং একটি নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন তথাপি কোনও ভোটার বা নির্ব্বাচক তাঁহাদের সকলকে তাঁহার প্রতিনিধি বলিয়া দাবি করিতে পারেন না। তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজনকে তাঁহার প্রতিনিধি বলিয়া দাবি করিতে পারেন। সুতরাং একই নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবার বিধান থাকিলেও নির্ব্বাচকের একের অধিক ভোট থাকিবে না।

কিন্তু দেখিতে হইবে তিনি যাঁহাকে ভোট দিলেন তিনি যেন নির্ব্বাচিত হন। অন্যথায় শাসন-পরিষদে তাঁহার প্রতিনিধি রহিল না। তিনি যাঁহাকে ভোট দিলেন, তিনি যদি পরাজিত হন তাহা হইলে তাঁহার ভোটটি নষ্ট হইল। পক্ষান্তরে তিনি যাঁহাকে ভোট দিলেন তিনি যদি বহু ভোটে বিজয়ী হন তাহা হইলেও তাঁহার ভোটটি নষ্ট হইল এইজন্য যে, এই ভোট বিশেষভাবে তাঁহার মনোনীত প্রার্থীর কাজে আসিল না। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট-পদ্ধতিতে এই ভাবে যাহাতে ভোট নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক ভোটারের একটি ভোট; কিন্তু তাঁহার ভোট যদি পূর্ব্বোক্ত দুইটি কারণের মধ্যে একটি কারণেও নষ্ট হয় তাহা হইলে তাঁহারা ভোট অপর প্রার্থীর প্রতি হস্তান্তরিত হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাচিত হইতে সাহায্য করিবে। এই ভাবে নষ্ট ভোটের সংখ্যা খুব কম রাখা যায়।

একজন প্রার্থী হইতে অপর একজন প্রার্থীর প্রতি ভোট

* নির্ব্বাচিত

হস্তান্তরিত হয় দুই রকমে। এক রকমে ভোটার প্রত্যেক প্রার্থীকে সরাসরি ও ব্যক্তিগত ভাবে ভোট দেন। কাহাকে কাহাকে তিনি চাহেন তাহা তিনি তাঁহাদের নামের পার্শ্বে ১,২,৩,...ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা ইঙ্গিত করিবেন। এই প্রথা 'হেয়ার পদ্ধতি' বলিয়া পরিচিত। এই প্রথার সমস্ত ভোটপত্র একত্র করিয়া গণনা করা হয়। প্রথমে 'কোটা' (Quota) নির্দ্ধারণ করা হয়—অর্থাৎ কত ভোট পাইলে একজন প্রার্থী নির্ব্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবেন। এই 'কোটা' নির্দ্ধারণেরও আবার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, যথা—'সিম্পল কোটা', 'ড্রুপ কোটা', 'চেঞ্জিং কোটা', 'ডেসিমেল কোটা'।

তাহার পর যে যে প্রার্থী ১ পাইয়া অর্থাৎ 'first preference' পাইয়া নির্ব্বাচিত হইলেন বা নির্ব্বাচনের দিকে অগ্রসর হইলেন তাঁহাদের তালিকা প্রস্তুত করা হইল। যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইলেন তাঁহাদের 'surplus vote' বা বাড়তি ভোট অপর প্রার্থীদের মধ্যে 'second preference' অনুসারে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে যদি কাহারও ভোট 'কোটা'র উপর যায় ত তিনিও নির্ব্বাচিত হইলেন। যদি ইহাতেও সমস্ত আসন পূর্ণ না হয় তাহা হইলে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছেন তাঁহাকে বাদ দিয়া তাঁহার "২য়" ভোটগুলি অপর প্রার্থীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেখা যায় কাহারও পূর্ণ হইয়াছে কিনা। 'কোটা' পূর্ণ হইলে তাঁহাকে নির্ব্বাচিত বলিয়া গণ্য করা হয়।

বাড়তি ভোট হস্তান্তর করিবার দুইটি পদ্ধতি আছে—একটি 'chance method, অপরটি 'exact method, লিষ্ট পদ্ধতি (List system) সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে হেয়ার পদ্ধতি—যাহা সাধারণতঃ একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট বলিয়া জনসাধারণের নিকট পরিচিত—বিভিন্ন প্রকারের 'কোটা' কি করিয়া নির্দ্ধারিত হয় তৎসম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা যাক।

'কোটা' নির্দ্ধারণের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সদস্য-নির্ব্বাচনের জন্য এমন উপযুক্ত ভোট-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা যাহাতে ভোট নষ্ট না হয়। বঙ্গীয় বিধান সভার ২৩৮ জন সদস্য বঙ্গীয় বিধান পরিষদের ১৭ জন সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন। ২৩৮-কে ১৭ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ১৪ হয়। 'Simple quota' হইতেছে ১৪। যিনি ১৪টি "১" (বা first preference) পাইবেন তিনিই নির্ব্বাচিত হইবেন। কিন্তু নির্ব্বাচনী কমিশন যে নিয়ম বার্ধা করিয়াছেন তাহা হইতেছে এই :

Rule 97. Ascertainment of Quota—The Returning Officer shall then divide the total number of valid papers by a number exceeding by one the number of vacancies to be filled, and this result increased by one, disregarding any fractional remainder shall be the number of votes sufficient to secure the return of a candidate (in this chapter referred to as the "quota").

সুতরাং উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে 'কোটা' আমাদের হইতেছে $\{২৩৮\div(১৭+১)\}+১$ অর্থাৎ $১৩\frac{২}{৯}+১=১৪$। এই পদ্ধতিতে যে 'কোটা' নির্দ্ধারিত হয় তাহাকে 'ড্রুপ কোটা' বলে। এই পদ্ধতিতে কম ভোট নষ্ট হয়।

আর একটি পদ্ধতি হইতেছে 'Changing quota', যেখানে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা কম সেখানে এই পদ্ধতি অনুসারে ভোট গণনা হইলে সংখ্যালঘুদের ভোট আরও কম নষ্ট হয়। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার অনুগতদের দিয়া "single voting" (একক ভোটদান) করান, তাহার কুফল অপরকে ভুগিতে হয় না।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে, ধরুন রামবাবু তাঁহার অনুগত ব্যক্তিদের দিয়া কেবলমাত্র তাঁহার নামে ভোট দেওয়াইলেন, তাহাদের দ্বারা অপর কাহাকেও ভোট এমন কি দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ 'প্রেফারেন্স' দেওয়াইলেন না। রামবাবু পাইলেন ৩৮টি ভোট। তিনি ত নির্ব্বাচিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পরে যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদের বেলায় ১৪ এই 'কোটা' রাখিলে অন্যায় করা হয়। ২৩৮এর মধ্যে রামবাবু পাইয়াছেন ৩৮টি। বাকী ২০০ ভোটের মধ্যে যিনি ১৪ পাইবেন, তিনি ত নির্ব্বাচিত হইবেনই; কিন্তু যিনি ১৪ অপেক্ষা কম পাইবেন তিনিও নির্ব্বাচিত হইবেন। এই 'কম' নির্দ্ধারণ এই প্রকারে হয় :—রামবাবুর নির্ব্বাচনের পর ১৬ জন নির্ব্বাচিত হইবেন। পূর্ব্বোক্ত 'ড্রুপ কোটা' হিসাবে এইবারকার 'কোটা' হইতেছে $২০০\div\{(১৬+১)\}+১=১২$। এই পদ্ধতিতে যিনি ১২ ভোট পাইবেন তিনিও নির্ব্বাচিত হইবেন। এই 'কোটা' পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া ইহার নাম 'changing quota system'—এই পদ্ধতিতে ভোট নষ্ট সবচেয়ে কম হয়।

আর একটি পদ্ধতি হইতেছে 'ডেসিম্যাল' বা 'দশমিক কোটা'। এই পদ্ধতিতে পূর্ব্বে যেমন লেজিসলেটিভ এসেম্বলির সাহেবরা মেম্বর নির্ব্বাচন করিতেন।

বাড়তি ভোট কি করিয়া হস্তান্তর করা হয় তৎসম্বন্ধে দুইটি নিয়মের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। একটি 'চান্স মেথড' (chance method)। রামবাবুর ৩৮টি ভোটপত্র গণনা হইবার পর প্রথম ১৪টি আলাদা করিয়া রাখা গেল। এই প্রথম ১৪টি গণনাকারীর হাতে প্রথম যে ১৪টি উঠিয়াছে সেই ১৪টি। বাকী ২৪টির মধ্যে জোড়া নম্বর বা বেজোড় নম্বর তুলিয়া লওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রেফারেন্স কাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখা হইল। এই পদ্ধতিতে গণনাকারীর সুবিধা হইলেও খানিকটা লটারির ভাব ভোট-গণনার মধ্যে প্রবেশ করে। সেজন্য যেখানে ভোট-সংখ্যা হাজারের কম সেখানে 'Exact Method' অনুসরণ করা

হয়। 'Exact Method' দুই রকমে প্রযুক্ত হয়। এক রকম হইতেছে—রামবাবুর ৩৮টি ভোট-পত্র পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, যাঁহারা রামবাবুকে ভোট দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ২০ জন হরিবাবুকে আর ১৮ জন কৃষ্ণবাবুকে দ্বিতীয় প্রেফারেন্স দিয়াছেন। রামবাবুর নিজের ১৪টি ভোট বাদে বাকী ২৪টি দ্বিতীয় প্রেফারেন্স হরিবাবু ও কৃষ্ণবাবুর মধ্যে বাঁটিয়া দিতে হইবে। হরিবাবুকে ১৩টি ও কৃষ্ণবাবুকে ১১টি ভোট দেওয়া হইল—অনুপাত অনুসারে। কিন্তু এই অনুপাত সূক্ষ্ম হিসাবে হইল না। সেজন্য অপর পদ্ধতি হইতেছে হরিবাবু পাইবেন $\frac{২৪}{৩৮}$ × ২০ ভোট, আর কৃষ্ণবাবু পাইবেন $\frac{২৪}{৩৮}$ × ১৮ ভোট এই সূক্ষ্ম হিসাবই বঙ্গীয় বিধান সভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সমস্ত নির্ব্বাচনের ব্যাপারে প্রযুক্ত হইবে। যেখানে নির্ব্বাচকের সংখ্যা অল্প সেখানে এই শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করাই সমীচীন।

আলোচনা

নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা

শ্রীকোহিনূরকান্তি করণ

নিম্নবঙ্গের দুইটি লৌকিক দেবতা সম্পর্কে কিছু নূতন কথা জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত লিখিয়াছেন—"বারা বা জাতাল শব্দের অর্থ কি তাহা অজ্ঞাত" (প্রবাসী আষাঢ়, ১৩৫৮)। অক্ষয়বাবু প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য হইতে 'বারা' শব্দের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন এবং উহার অর্থনির্দ্দেশ করিয়াছেন (ঐ ভাদ্র ১৩৫৮), কিন্তু 'জাতাল' শব্দের কোন উল্লেখ করেন নাই। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় জাতাল শব্দ প্রচলিত আছে; উহার অর্থ—অতি উত্তম। সম্ভবতঃ জাঁক-জমকপূর্ণ পূজাকে জাতাল পূজা বলা হইয়া থাকে।

দক্ষিণরায় সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতের আলোচনা শ্রীযুক্তা নীলিমা মণ্ডল করিয়াছেন (ঐ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮)। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত ডঃ শ্রীসুকুমার সেনের 'ইসলামি বাংলা-সাহিত্যে'র নিম্নলিখিত বাক্যটি উল্লেখযোগ্য: "অষ্ট্রিক-মোঙ্গল জাতির অন্যতম উপাস্য ব্যাঘ্রবাহন অপদেবতা কালক্রমে দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গল-অনুপ প্রান্তে দক্ষিণরায় ঠাকুরে পরিণত হলেন।"

পঞ্চাননের যে ধ্যানমন্ত্রটি পঞ্চানন রায় মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন (ঐ মাঘ, ১৩৫৮), তাহা কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত 'পুরোহিত দর্পণ' প্রভৃতি পুস্তকে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও তাঁহার আরও বিভিন্ন ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র আছে। আমরা নিম্নে নূতন একটি ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র দিতেছি। ইহা হইতে পঞ্চাননের পরিচয়ও কিছু স্পষ্ট হইবে।

ধ্যান:

পঞ্চাননং মহাদেবং রক্তবর্ণং দিগম্বরং
জাড্যং (?) গলিতশ্মশ্রুং পট্টবস্ত্রোপবীতকং
শিরঃ পিঙ্গল জটাধর শিতগ্রীব
বামহস্তে দক্ষিণধারা দক্ষিণহস্তে ত্রিশূলকং
গোমুখ দ্বারপালক বেষ্টিত নাগভূষণং
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালাদি ভূষিত রক্তচন্দনং
উগ্রতেজোময়ং উগ্রং বলিদস্যু তপস্বিনি
ধ্যায়েৎ পঞ্চাননং দেবং ভক্তানুগ্রহকারকং॥

(শ্রীমোহিনীমোহন চক্রবর্তীর নিকট প্রাপ্ত)

প্রণাম:

পঞ্চানন্দ জটাধারী শূদ ডমরুবাদনঃ।
ভূতনাথ জরাসুর পঞ্চানন্দ নমোহস্তুতে॥

(শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্ত)

বস্তুতঃ, বিভিন্ন লেখক ইচ্ছামত এই লৌকিক দেবতাটির ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র রচনা করিয়াছেন।

অক্ষয়বাবু পঞ্চাননের বিভিন্ন বাহনের উল্লেখ করিলেও একটি বিশিষ্ট বাহন তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। উহা 'গোমুখ'—সম্মুখার্দ্ধ গোরু, পশ্চাদর্দ্ধ নর। চেতলা, বেহালা প্রভৃতি অঞ্চলে এই বাহন প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। চব্বিশ পরগণার পাইকানে পঞ্চাননকে নরপৃষ্ঠেও আরূঢ় দেখিয়াছি। পঞ্চানন বা শীতলা দেবীর পাশেই জরাসুর নামে আর একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাই। উহার তিন পা, তিন মুখ ও ছয় হাত।

পঞ্চানন মঙ্গলের কাহিনী হইতে জানা যায় যে, ইনি রক্ষাধিষ্ঠাতা ভৈরব বা ক্ষেত্রপাল।

সমাধি-সৈকত

শ্রীবিমলানন্দ শাসমল

নিথর সাগর-শিখরে চলেছে পালপক্ষীর দল,
পাইনের ফাঁকে, কবরের ফাঁকে ছবি তার চঞ্চল ;
মধ্যদিবস যেথা নিতি রচে অগ্নিপুঞ্জমালা
সে যে সাগর, ফিরে ফিরে দেয় যাত্রার পথে পাড়ি,
চিন্তাজালের যোজনাতার মহামাধুরীতে লয় কাড়ি
দেবলোকে-রচা সেই সুষমীতে এক পলকের পালা।

দিবা আলোর সূক্ষ্ম কিরণে লীলায়িত আল্‌পনা
গেঁথে দিয়ে চলে ফেন-বাষ্পের লক্ষ হীরার কণা,
কি মহাশান্তি আপন গহনে ধ'রে থাকে তারি কায়া ;
অন্তবিহীন গতিচক্রের শাশ্বত ব্যথা-বেগে,
একটি সূর্য অসীমের বুকে বুকে যবে থাকে জেগে
কালের মরমে লহরী নাচিছে, ভাবের চক্ষে মায়া।

এক নিশ্বাসে ধরা দাও তুমি, মহাকাল-মন্দির,
তোমার ভূমির যোগ্য হবারে আমি তুলিতেছি শির.
বিশালের মহা-প্রেরণা-দৃষ্টি সাথে ল'য়ে চারিপাশে ;
দেবতার পদে অর্ঘ্য যেমন দান করি নীচ থেকে,
তব তরঙ্গবহ্নি-লহরী রাজগৌরবে ঢেকে
তেমনি তোমার ঘৃণা-ভ্রূকুটিরে ছুঁড়িতেছ মহাকাশে।

রসনা-বিবরে যেমনে ফলের অপরূপ লীলা চলে,
নিজ কায়াটারে সে বিলায়ে দেয় দাতের চর্বণ-তলে,
হারিয়ে যাবার ব্যথা দিয়ে দেয় পুলকের অবদান,—
তেমনি বিলীন ধূমে মোর মম ভবিষ্য ছায়াময় ,
আর মত হ'তে মোহিত প্রাণের সাথে করে পরিচয়
একূল-ওকূলের কল-চঞ্চল ভাঙা ও গড়ার গান।

যে আমি রেখেছি এত অহমিকা, নিঃশংক অলসতা,
মধুর গগন, শাশ্বত তুমি, হেরো তারি ক্ষণিকতা !
তবু আছে মোর গভীর প্রাণের বীর্যের সম্বল ;
তাই দিয়ে ওই দীপ্ত অসীমে করি মোরে নিবেদন,
ছায়াখানি মোর পার হ'য়ে চলে মৃত্যুর নিকেতন,
মন্থর তারি গতি মোরে দিয়ে বেড়িতেছে শৃঙ্খল।

অনাগত আজি হয়েছে অলস তোমার দুয়ারে ব'সে ;
ঔজ্জ্বল্যের আঁচড়ে যতেক শুষ্কতা যায় খ'সে।
সকলি হেথায় পবনে মিশিছে লঘু হ'য়ে দাহ-শেষে
অজানিত কোন্ নিদারুণ মহা-দহনের নির্যাসে ;…
জীবন হয়েছে বিশাল মাতিয়া শূন্যের আশ্বাসে,
আশা হেথা আলোময়, তিক্ততা কোমলের মাঝে মেশে।

এই ভূমিতলে লভিছে আরাম প্রোথিত মৃতের দল,
তাপের পরশ তারা পায়, হয় মহতে নিষ্ফল।
অভ্রংলিহ মধ্যদিবস কম্পবিহীন সাজে
নিজের চরণে নত হ'য়ে পুনঃ ফিরে আসে নিজ 'পরে,
আপন প্রভায় জীর্ণ মুকুট শোভায়ে সে শিরে ধরে,
গোপন বিবর্তনের সে-ছায়া হেরি গো তোমারি মাঝে।

স্পর্শ-শিহরে মত্ত মেয়ের উচ্ছল কলরোল,
নয়ন তাহার, দশন তাহার, ভেজা পল্লব-কোল,
মোহিনী তাহার যে-বক্ষ করে বহ্নিরে নিয়ে খেলা,
নিবেদিত তার অধরে অধরে যে-শোণিত জ্যোতি জ্বলে,
শেষের যে-ছোঁয়া, যে আঙুল তারে চেপে রাখে ভূমিতলে,
সবি এসে মেশে এই ভূমিতলে, পুনঃ সুরু করে মেলা।

নবীন বর্ণ রচিতে চাও কি, ওগো তুমি মহাপ্রাণ ?
যেথা থাকিবে না মিথ্যার এত রঙিল উপাদান
চর্ম-চোখেতে সোনা-তরঙ্গ এখানে যেমন আঁকে ?
গীতিকা তোমার শুনাবে কি যবে বাষ্পেতে পাবে লয় ?
যাও, যদি সবি যাবে, মম স্থিতিও নহে গো অব্যয়,
সৃষ্টির পূত বেদন-জ্বালাও মৃত্যুর মেঘে ঢাকে।

কালোতে সোনাতে মেশানো, হে তুমি অমর অমরতা,
ভয়াল শোভাতে সেজে শুনাতেছ চির-প্রবোধের কথা ;
মৃত্যু-আঁধারে প'ড়ে তোলো তুমি মাতৃত্বের কোল ;
চোখ-ঝলসানো অসত্য আর মমতা-মাখানো ফাঁকি
জানোনা তো তুমি, তবু তাহাদের দাবিতে রাখো নি বাকি
তব অসীমের গৌরব-ছায়া, সনাতন কল্লোল।*

---

* Haul velery-র একটি কবিতার ভাবানুবাদ

মহামানব রবীন্দ্রনাথ

শ্রীআশুতোষ বাগচি

মানুষের ইতিহাসে পঁচিশে বৈশাখ একটি বিশেষ স্মরণীয় আনন্দোল্লাসের দিন। ১২৬৮ সালের এই দিনে এক জ্যোতির্ময় মহামানবের আবির্ভাব হয়। মাতা বসুন্ধরা মানব-সূর্য রবীন্দ্রনাথকে কোলে পাবার পর আজ এক নবতিতম বার আকাশের রবি-প্রদক্ষিণ শেষ করলেন। রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সার্থক সাধনায় সকল মানুষের আনন্দময় জীবন-বিকাশের সম্ভাবনার আশা উদ্দীপ্ত করে গেছেন। মহাভারতের মত সুবিশাল তাঁর রচনাবলী, তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি বিশ্বভারতী এবং তাঁর দীর্ঘ জীবনের বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তাঁর যে অভূতপূর্ব অনিন্দ্যসুন্দর জীবনালেখ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাকে একটি "পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত" বলা যেতে পারে। এটি ভক্তহৃদয়ের অতিশয়োক্তি নয়।

কবি ঋষি সুরকার রূপকার ভাস্কর প্রভৃতি জীবনশিল্পিগণের কল্পনায় ধ্যানে ও অনুভাবে যেসব বিচিত্র ভাবরাজির উদ্ভব হয়, যেসব স্বর্গীয় সত্য মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হয় তার অতি অল্পই মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা ভাষায় সুরে রেখায় রঙে ও গতি-ছন্দে এবং অনেকখানি ব্যঞ্জনার সাহায্যে। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন,

"* * * প্রত্যক্ষ প্রকাশ
কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত আভাস
কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সঙ্গীত উচ্ছ্বাস
আত্মবিদারণকারী মর্মান্তিক মহান নিশ্বাস।

* * *

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে
ঘুরে মানুষের চতুর্দ্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্দ্ধমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।"

কিশোর রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি জীবনের প্রভাতকালেই অনুভব করেছিলেন,

"না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে,
মাগিছে তেমনি সুর।"

এবং দেবী সরস্বতীর নিকট এই প্রার্থনা জানালেন;

কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দুচারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।"

তাঁর সেই সুরসাধনায় তিনি যে কল্পনাতীত সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তা সমস্ত জগতের বিমুগ্ধ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। ইংরেজী ভাষায় তাঁর অধিকার কত গভীর আমরা হয়ত ঠিকমত বুঝতে পারি না। ইংরেজ সাহিত্যিক টম্‌সন্ তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবনীর একস্থানে লিখেছেন,

"It is one of the most surprising things in the world's literature that such a mastery over an alien tongue ever came to any man."

রবীন্দ্রনাথের দিব্য প্রতিভার স্পর্শে আমাদের বাংলা-ভাষা-সরসীতে যে অজস্র কাব্য-শতদল প্রস্ফুটিত হয়েছে তার বর্ণ-স্বাদ-সৌরভ এবং সরস্বতীর সহস্র তন্ত্রীতে তাঁর এই বরপুত্রের যে বিচিত্র সুর-ঝঙ্কার বেজে উঠেছে তা নিত্যনিয়ত আমাদের প্রাণ মনকে আলোকে পুলকে পূর্ণ; আনন্দে বেদনায় আপ্লুত করে ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে তুলে ধরছে। কিন্তু আমাদের চরিত্রবলের দৈন্যে আমরা বারবার নেমে পড়ছি।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তাঁর প্রতিকৃতি পুষ্পপল্লবে সজ্জিত করে ধূপ-ধুনার গন্ধে আমোদিত করে নৃত্য গীত-আবৃত্তি-বক্তৃতার সমারোহে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ সবের যথেষ্ট মর্যাদা মূল্য ও প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কারণ এই রকম উৎসবের মধ্যে খুব স্পষ্ট করে, তাঁর স্পর্শ ও সান্নিধ্য অনুভব করা যায় এবং এই রকম সৌন্দর্যময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লোক-সাধারণের, বিশেষ করে শিশুদের পরিচয় করে দেওয়া সহজে সম্ভব হয়। কিন্তু মহামানব রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবন-যাত্রার যে পথনির্দেশ করে গেছেন সেদিকে আমাদের চোখ পড়েছে বলে মনে হয় না। অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ অভিজাত জমিদার, স্বপ্নবিলাসী মাত্র ছিলেন। নিভৃত কবিকুঞ্জে বসে নিশ্চিন্ত মনে কেবল আকাশ-কুসুমই চয়ন করে গেছেন। সংসারের রোগশোক অভাব-অভিযোগ দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর কোনই পরিচয় ছিল না, কিংবা ঐসব নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা মোটেই ছিল না। আমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যই তাঁর সম্বন্ধে এই ভুল,

বিপরীত ধারণা অবিলম্বে দূর হওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রথমেই জানা দরকার তিনি কত শুদ্ধস্বভাব, কলুষহীন-চরিত্র, সংযতবাক্, মিতাহারী, মিতাচারী, কঠোর শ্রমশীল মানুষ ছিলেন। কি গভীর মানবপ্রেমিক ছিলেন তিনি!

রবীন্দ্রনাথের লোকান্তরপ্রাপ্তির পর বিনয়কুমার সরকার একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে "The greatest man of the world ever born"—'জগতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ' বলেছিলেন; তার এগারো বৎসর পূর্বে জার্মান মনীষী কাউন্টী কাইজারলিং লিখেছিলেন,

"There has been no one like him anywhere on our globe for many and many centuries. . . . He is the most universal, the most encompassing, the most complete human being I have known."

এই দুটি উক্তি অন্ধ স্তাবকের স্তুতিবাদ ও অত্যুক্তি কিংবা অর্থহীন প্রলাপ নয়। এই দু'জন দেশী ও বিদেশী মনীষীর ঐ উক্তির যাথার্থ্য যাচাই করে নিতে হলে রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত জীবনচরিত, এবং তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে কাজ করবার ও তাঁর খুব নিকটে বসবাস করে তাঁর প্রতিদিনের জীবনযাপনের ঘনিষ্ঠতম, পরিচয়লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন যেসব ভাগ্যবান তাঁদের প্রকাশিত 'মানুষ' রবীন্দ্রনাথের সামান্য ছোট-ছোট কথা ও কাজ সম্পর্কীয় বিবিধ লেখার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। বাইরে যিনি যত বড় বলেই পরিচিত হোন, অত্যন্ত কাছের মানুষের চোখে তাঁর কোন ক্ষুদ্রতাই গোপন থাকে না। ঐ সব লেখা, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র যা পুস্তকাকারে ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর রচনাবলী যদি একত্রে মিলিয়ে পড়া যায় তবেই তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে তাঁর কীর্তির চেয়ে কত মহৎ ছিলেন সেটা তখনই আমরা উপলব্ধি করতে পারব।

তিনি সাধারণ মানুষের মতই জীবন-চর্চা করেছেন; কিন্তু চারদিকের নিম্নাভিমুখী পরিবেশের মধ্যেও স্বকীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ও চরিত্রের আভিজাত্য সর্বদা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের চিন্তা তাঁর মনে সব সময়ে জাগ্রত ছিল। দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের মনে মনুষ্যত্বের মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে তিনি চিরজীবন প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তিনি বড় জমিদারীর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন; কিন্তু সেই জমিদারী সম্বন্ধে তাঁর মনে কি ভাব ছিল তার একটুখানি ব্যক্ত হয়েছে তাঁর আপন-জনকে লেখা একখানি পত্রে। তিনি লিখছেন,

"* * আমাদের যা-কিছু আছে তা যে আমাদের নিজের নয় এবং যা কিছুকে আমাদের নিজের ব'লে গ্রহণ করি তা যে চুরি ক'রে করি এটা আমাদের খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝতে হবে। * *"

এই পত্রখানি ১৩১৯ সালের (১৯১২ খ্রীঃ) ১লা পৌষ তারিখে লেখা। কবি তখনও নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন নি এবং আনুষঙ্গিক অর্থলাভ করেন নি। মার্কস্-লেনিনের বাণী এ দেশের শিক্ষিত-সাধারণেরও তখন অজ্ঞাত। দেখতে পাই, ঐ সময় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অর্থাভাবে তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় আছেন; এবং অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন ক্লান্ত পীড়িত প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ! এর থেকে তাঁর অন্তরের মানুষটির যে পরিচয় পাই সেটা নিবিড় ও উজ্জ্বল হয়ে উঠে যদি তাঁকে ঠিক ভাবে জানতে যথার্থই যত্নপর হই।

রবীন্দ্রনাথের স্মরণে আমাদের উৎসব তখন সফল ও সার্থক হবে, তাঁর গৌরবে আমরা তখন সত্য গৌরবের মহিমা অর্জন করব যখন কঠিন আয়াসলব্ধ চরিত্রবলে তাঁর প্রতি আমাদের ঋণশোধে সচেষ্ট হব। যেদিন আমাদের প্রতিদিনের ছোট বড় সকল কথায় ও কাজে সংযম, সুরুচি, শ্রী, হ্রী ও ত্যাগের শুভ্র বিনম্র শুচিতা সর্বদা সর্বত্র প্রকাশ পাবে। বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একদা ব্যথিত হৃদয়ে লিখেছিলেন,

"আমরা কোনোদিন এমনতরো হাটের মানুষ ছিলাম না। আজ আমরা হাটের মধ্যে বাহির হইয়া ঠেলাঠেলি ও চীৎকার করিতেছি—ইতর হইয়া উঠিয়াছি, কলহে মাতিয়াছি, পদ ও পদবী লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছি, বড়ো অক্ষরের ও উচ্চ কণ্ঠের বিজ্ঞাপনের দ্বারা নিজেকে আর পাঁচ জনের চেয়ে অগ্রসর করিয়া ঘোষণা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অথচ ইহা একটা নকল। ইহার মধ্যে সত্য অতি অল্পই আছে। ইহার মধ্যে শান্তি নাই, গাম্ভীর্য্য নাই, শিষ্টতা শীলতার সংযম নাই, শ্রী নাই।"

তাঁর জন্মদিনের আনন্দোৎসবে সবচেয়ে বেশি করে মনে হচ্ছে যে, যাঁর আবির্ভাবে বাঙালী জাতি ধন্য হয়েছে, যাঁর নাম নিয়ে বাঙালী গৌরব ও গর্ব করে সেই সুরলোক-বাসীর নিকট যে অপরিশোধ্য ঋণে আমরা আবদ্ধ তা শোধ দেবার কথা একেবারে বিস্মৃত হয়েছি। এ বিষয়েও তিনি আমাদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে গেছেন তাঁর শারদোৎসব নাটকের যেখানে সম্রাট-সন্ন্যাসী বিজয়াদিত্য অনাথ বালক উপনন্দকে তার প্রভু সদ্য পরলোকগত বীণাচার্য সুরসেনের ঋণশোধের জন্য তার সঙ্গী বালকদলের উৎসবের ডাকে সাড়া না দিয়ে পুঁথি নকলে নিযুক্ত দেখে বলছেন,

"এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে। ঐ ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল ক'রে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা আজ এই বালকের ঋণ-শোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো তো। দেখো, দেখো বাবা, তুমি দেখো, আমি দেখি। তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ— তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না। • • •"

আমরা যেন আজ এই আনন্দোৎসবের মধ্যেও আমাদের এই ঋণশোধের কথা ভুলে না থাকি। মহামানব রবীন্দ্রনাথ যে বাণীমূর্তিতে ও সুরের রূপে আমাদের মধ্যে অনুক্ষণ বিরাজ করছেন এই অনুভূতি যেন আমাদের অন্তরে বহন করি এবং আমাদের আচরণের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতিতে তাঁর অসম্মান না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকি।

পুস্তক পরিচয়

চড়াই উৎরাই—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

এই সংগ্রহে আছে—রস, অবতরণিকা, জৈব, হেড মাষ্টার, হেড মিষ্ট্রেস, চড়াই-উৎরাই প্রভৃতি গল্প।

বাংলা কথা-সাহিত্যের আসরে লেখক খুব বেশী দিন আসেন নাই—কিন্তু ভাল গল্প-লেখক বলিয়া ইতিমধ্যেই রসিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ছোট গল্প রচনায় শ্রীযুত মিত্র যে নূতন কোন রীতি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নহে—তবু তাঁহার গল্পগুলি জমিয়াছে। গল্পকে গুছাইয়া বলা ও মানুষের মনের কথা টানিয়া বলার মুন্সিয়ানাই যে ছোট গল্পের প্রাণ এটি তিনি জানেন। গল্পের মধ্যেকার জীবন-সত্যের মহিমাকে কল্পনার গাঁথুনি দিয়া প্রত্যক্ষগোচর করাইতে না পারিলে সমস্ত জিনিসটাই অবয়বহীন বস্তুতে পরিণত হয়, সে বস্তু মনের রস-পিপাসাকে কোনমতেই পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। বাস্তব-চিত্রণে—চোখের দেখার সঙ্গে মনের রং খানিকটা না লাগিলে ছবিটা চোখেও ধরে না, মনেও লাগে না। তাই বলিয়া গল্পের কাঁধে বাস্তববোধবর্জ্জিত কল্পনাকে চাপাইয়া দিয়া বয়স্ক পাঠককে ভুলানো চলে না। বৎসরের হিসাবে যে বয়সের পরিমাপ তাহার কথা বলিতেছি না; মনের হিসাবে বয়সটা কখনো কমে, কখনো বাড়ে। কোন কোন যুবক তো রীতিমত শিশু। যে-কোন চিত্ত-উত্তেজক গল্প পাইলেই ইঁহারা তৃপ্ত—পাঠক-সমাজে ইঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠও বটে। অবাস্তব উদ্ভট রহস্য সিরিজের স্বাদ গ্রহণ করিয়া ইঁহারা পুলকিত না হইলে অধিকাংশ পাঠাগারে এই জাতীয় গল্পের জঞ্জাল জমে কেন?

সে যাহা হউক, ভাল কাহিনীকার বাহিরের ঘটনার পিছনে মানসিক বিপর্য্যয়ের ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাহিনী রচনা করেন। মনুষ্য চরিত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা অকিঞ্চিৎকর হইলে এই কার্য্য সম্ভবপর হয় না। শ্রীযুত মিত্র মানুষকে জানেন, তার মনের খবর রাখেন এবং চারিপাশের বস্তুপুঞ্জও তাঁর দৃষ্টিতে অস্পষ্ট নহে। আর এই কারণেই তাঁহার কল্পনায় যে ছবি ফুটিয়া উঠে পাঠকের কল্পনাকেও তাহা উদ্দীপ্ত করে—রস-উপভোগের ক্ষেত্রটিকে করে প্রশস্ত।

পৌত্রান্ত—বিধুভূষণ বসু। ৩।১-বি, গর্চ্চা ফার্ষ্ট লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এই উপন্যাসের লেখক অশীতিপর বৃদ্ধ। তাঁহার 'লক্ষ্মী বউ', 'লক্ষ্মী মা' ইত্যাদি প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘকাল পূর্ব্বে। আমাদের বাল্যকালে বই দুখানি হয়তো পড়িয়া থাকিব, কিন্তু বহুকাল তাঁহার কোন রচনা আত্মপ্রকাশ না করায় লেখকও আমাদের স্মৃতি হইতে প্রায় মুছিয়া গিয়াছিলেন—পৌত্রান্তের মধ্যে তাঁহাকে ফিরিয়া পাইতেছি।

ইতিমধ্যে বাংলার ভাগ্যে বহু দুর্ব্বিপাক ঘটিয়াছে। জন্মভূমি ও স্বজনচ্যুত বহু মানুষ দেহে ও মনে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। লেখকের ভাগ্যেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শোকদগ্ধ, বাস্তুচ্যুত, ক্ষীণদৃষ্টি অন্ন-আশ্রয় সমস্যাজালে জড়িত অশীতিপর বৃদ্ধের লেখনী যে স্তব্ধ হইয়া যায় নাই—ইহাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। এত বিপর্য্যয়ের মধ্যে তাঁহার গ্রাম ও প্রতিবেশীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। গল্পের আসরে অতি আপনার জনের মত লেখক তাহাদের টানিয়া আনিয়াছেন। জড় এবং চেতন দুইয়েতেই প্রাণসঞ্চার হইয়াছে।
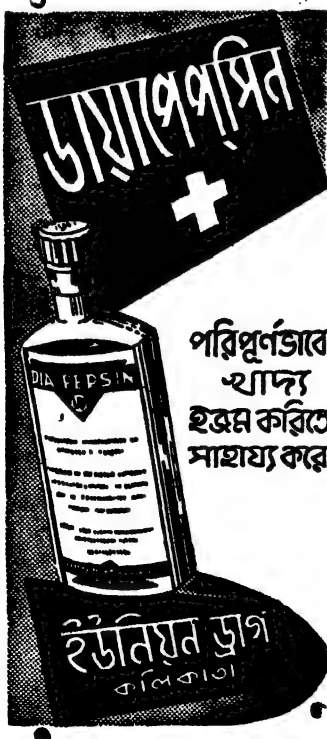
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য-প্রবাহ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এ. মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সুকবি এবং সুসাহিত্যিক। "সাহিত্য-প্রবাহে"র অধিকাংশ প্রবন্ধই কবি এবং কাব্যের আলোচনা। কাব্যকথা, জীবন, জাপানী কবিতা, জীবনের জয়মুকুট, সাংহাইয়ে ঝড়, আণ্টন চেখভ, কবি হালি, কবি ইকবাল, আধুনিক বাংলা কবিতা, বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি, গোবিন্দচন্দ্র দাস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ছোট গল্প, 'খাপছাড়া'র কবি, মানসী, সোনার তরী, খেয়া, রক্তকরবী এই আঠারটি প্রবন্ধ আছে। 'কাব্যকথা'র প্রবন্ধকার বলিতেছেন, "এই রহস্যদৃষ্টি শিল্পসৃষ্টির মূল।...মানুষের বিস্ময় কতদিন পরে ভাষা পেয়েছিল কে জানে। কিন্তু ঐ বিস্ময়কে ভাষা দিতে গিয়েই শিল্পের জন্ম।" প্রসঙ্গান্তরে তিনি বলিতেছেন, "জাপানী কবিতায় কথার অত্যাচার নেই। তাতে আছে শুধু ইঙ্গিত।...আর একটি বৈশিষ্ট্য প্রতিদিনকার জীবনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ।" গোবিন্দচন্দ্র দাসের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "তাঁর কবিতা কোথাও পরের অনুকরণ বা কাল্পনিক সুখ-দুঃখের অস্পষ্ট চিত্র নয়...তাঁর অলঙ্কারের প্রয়োগেও দেখতে পাই, তা পুঁথির পাতা থেকে ধার করা নয়, স্বভাব থেকে চয়ন করা। হৃদয়াবেগে যেন তা আপনিই এসে পড়েছে।" সবচেয়ে লেখক আনন্দ পাইয়াছেন শেষ কয়টি প্রবন্ধ রচনায়, রবীন্দ্রনাথের কয়খানি কাব্য ও নাটকের আলোচনায়। তিনি বলিতেছেন, "প্রকৃতি, প্রেম আর দেশ—এই তিন উপচারে 'মানসী'র অর্ঘ্যরচনা। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কবির দৃষ্টি অন্তর্মুখী।" "অপ্রত্যক্ষ শক্তির কল্পনা 'সোনার তরী'তে রোমান্টিক-স্বপ্নমণ্ডিত।" লেখক বলিতেছেন, "রক্তকরবী রচনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার 'বিজয়ী' কবিতায় ওর ভাবাভাস ফুটে উঠেছে।...শক্তিমত্ত পাশ্চাত্ত্য মানবগণ ছুটে চলেছে 'দৃপ্তবেগের বিজয়রথে'। মশালের আলোয় অন্ধকার দূর করবে ভেবেছে তারা, 'বন্দিদলের রক্তকমল ফুটল প্রবল দম্ভভরে'। 'আপনাকে হায় দেখছিল কোন স্বপ্নাবেশে—যক্ষপুরীর সিংহাসনে লক্ষ মণির রাজার বেশে।' মনে পড়ে যায় নাটকের প্রথম নাম 'যক্ষপুরী'।" "সন্ধ্যাকার ধ্বনি বেজে ওঠে সার্থক সাঙ্কেতিক নাটকে, মানবীয় সুখদুঃখের তরঙ্গকল্লোলে ভেসে আসে হৃদয়ের দ্বারে।" ধীরেন্দ্রনাথের রচনায় কোথাও অস্পষ্টতা নাই। তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা সরল এবং প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। "সাহিত্য-প্রবাহ" সাহিত্যামোদী পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জীবন-জলতরঙ্গ—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। কমলা পাবলিশিং হাউস, ৮।১ এ, হরিপাল লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য চার টাকা।

বাংলাদেশের একটি পল্লীগ্রাম এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল। গ্রামখানি সম্বন্ধে বইয়ের গোড়ার দিকে লেখক বলেন, "এর মাটিতে সাড়ে চারশো বছর আগে জ্বলেছিল যে বিদ্রোহ-বহ্নি—সারা ভারত তা আত্মসাৎ করে ভিন্নরূপে ঐক্য এনে দিয়েছে জাতির জীবনে—অথচ এ মাটি রইলো পবিত্র হয়ে—পাষাণবিগ্রহে যে পবিত্রতা আরোপ করে গ্রামবাসী নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। জীবন এর নিঃশেষিত। নিঃশেষিত বলেই কি পবিত্র।"

শ্রীচৈতন্যদেবকে বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ এই গ্রাম সুদীর্ঘকাল ছিল মোহাচ্ছন্ন, সাত্ত্বিকতার নামে তামসিকতাকে আশ্রয় করিয়া জড়তাগ্রস্ত। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া সারা দেশের বুকের উপর দিয়া বিভিন্ন সময়ে মুক্তি-আন্দোলনের স্রোত কত বিচিত্র পথে আবর্ত্তিত হইয়া চলিল, কিন্তু এই গ্রাম রহিয়া গেল যে তিমিরে সেই তিমিরেই—মহাজাগরণের তরঙ্গোচ্ছ্বাস ইহার প্রান্ত-সীমাকে মাঝে মাঝে ছুঁইয়া গেল মাত্র, কিন্তু পল্লীর শান্ত পল্বলে কলকল্লোলধ্বনি শ্রুত হইল না।

মালী পরিবারের পুরন্দর এই গ্রামেরই সন্তান—মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার আদর্শে অনুপ্রাণিত সে—দেশের মুক্তিই তাহার একমাত্র ভাবনা ও জীবনের সাধনা। তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল গণজাগরণের উদাত্ত আহ্বান। কৈবর্ত্ত গোয়ালা প্রভৃতি গ্রামের তথাকথিত নীচশ্রেণীর লোকেরা নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার চারিপাশে আসিয়া সমবেত হইল—তখন গ্রামের প্রাচীনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দলের নেতা শ্রীধর ভূপেন সেন প্রভৃতির স্বার্থবুদ্ধির সহিত বাধিল পুরন্দরের প্রচারিত আদর্শের সঙ্ঘাত। এই সঙ্ঘাত ও সংঘর্ষের ফলে পল্লীর সমাজ-জীবনে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হইল। ইহাতে অমৃত উঠিল যতটুকু, হলাহল উত্থিত হইল তার চেয়ে ঢের বেশী—শেষ পর্য্যন্ত পুরন্দরের অদৃষ্টে জুটিল দেশ ও মানবসেবার চরম পুরস্কার—লাঞ্ছনা অপবাদ আর অপমান।

ওদিকে অভিজাত মিত্রপরিবারের সন্তান মার্ক্‌সপন্থী অপূর্ব্ব গ্রামের অজ্ঞ, পদদলিত, অত্যাচারিত নর-নারীর কানে দিল সাম্যবাদের নবমন্ত্র। নিম্নশ্রেণীর অনেকে তাঁহার শিক্ষায় ধ্বংসাত্মক কার্য্যে মাতিয়া উঠিল। শেষ পর্য্যন্ত চোরাকারবারী এবং মুনাফাখোরদের ষড়যন্ত্রে অপূর্ব্বর যখন ধরা পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিল তখন একদিন গভীর রাত্রিতে পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া সে গ্রাম পরিত্যাগ করিল।

পুরন্দর এবং অপূর্ব্ব যেন জাতির মুক্তিসাধনায় পরস্পরবিরোধী দুইটি আদর্শের প্রতীক: এক জন জাতির মুক্তি চায় অহিংসার শান্তিপূর্ণ পথে,

আর একজন জনগণকে পুঁজিবাদের ধ্বংস-সাধনের কথা শুনাইয়া হিংসার রক্তাক্ত পথে মুক্তি-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে উদ্বুদ্ধ করে। পুরন্দর ও অপূর্ব্বর সংলাপে এই দুই আদর্শের বিশ্লেষণে লেখক মননশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি কোন্ পথে—তাহার মীমাংসা তিনি করেন নাই—মহাকালের বুকে একটি বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছেন মাত্র।

"মহৎ জীবন মাত্রেই ব্যর্থ হইতে বাধ্য"— এই উক্তির সত্যতা আমরা পুরন্দরের জীবনের পরিণতিতে লক্ষ্য করি। তাহার জীবনের ট্র্যাজেডি মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে সত্য, কিন্তু তাহার প্রচারিত আদর্শ ও শিক্ষা যে ভিতরে ভিতরে গ্রাম-জীবনের একেবারে মর্ম্মস্থলে শিকড় বিস্তার করিতেছিল তাহার পরিচয় পাই এই উপন্যাসের উপসংহারে ক্ষেত্র তৈরি হইয়াই ছিল, ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মতিথিকে উপলক্ষ্য করিয়া গ্রামে দেখা দিল অপূর্ব্ব জাগরণ। মহাজীবনের জল-তরঙ্গ পল্লীর পবন উদ্বেলিত করিয়া আকুল আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—কিন্তু এমনি অদৃষ্টের পরিহাস যে, পুরন্দর রহিল সেই উৎসবে অপাংক্তেয় হইয়া। পুরন্দরকে লেখক আঁকিয়াছেন সহনশীলতা ও তিতিক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক-রূপে। পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে মেজবাবুর চরিত্রটি বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং অভ্রভেদী আভিজাত্য লইয়া অপূর্ব্ব মহিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অন্তিম রোগশয্যার বর্ণনাটি এমনি করুণ মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ যে, মনে হয় যেন পশ্চিম আকাশে শেষ রশ্মিচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বাংলার পল্লীর অভিজাত-সমাজের গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত হইতেছেন। তাঁহার মৃত্যু যেন কোন ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু নয়, এ যেন নূতন আদর্শের অভ্যাগমে বঙ্গপল্লীর জমিদারীপ্রথা-আশ্রয়ী সনাতন আভিজাত্যের চিরবিলুপ্তির পূর্ব্ব-সূচনা।

এই উপন্যাসের আর একটি প্রধান আকর্ষণ লেখকের অনুভূতির রসে সিক্ত নিসর্গচিত্রগুলি। এগুলি স্থানে স্থানে (যেমন পৃ. ১৫৩, ১৫৪) এমনি মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে হৃদয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—মনে কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য আকুতির সঞ্চার হয়।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

প্রিয়তমের চিঠি—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

গল্প-সঙ্কলন। এগারটি গল্প পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। লেখক ইতি-পূর্ব্বে অনুবাদ-সাহিত্যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, মৌলিক রচনায়ও তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। ছোট গল্প রচনায়ও যে তিনি সিদ্ধহস্ত তাহার প্রমাণও সমালোচ্য পুস্তকখানিতে পাইলাম। গল্প বলার কৌশলটি আয়ত্ত করিয়াছেন বলিয়াই সাধারণ বিষয়বস্তুও তাঁহার লেখনীতে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া প্রিয়তমের চিঠি, জগমোহনের বিবাহ, মিনতি, বিকল্প, আদিম ও ঘরে-ফেরা প্রভৃতি গল্প সূক্ষ্ম রসানু-ভূতির প্রকাশে সমুজ্জ্বল। শেষ করিবার পরেও মনে যেন রেশ থাকিয়া যায়।

যুগ-ঝঙ্কার—শ্রীহরিচন্দন মুখোপাধ্যায়। দি নিউ ওরিয়েন্টাল প্রেস, ঝরিয়া। মূল্য আড়াই টাকা।

বর্ত্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনের অলিতে গলিতে যে অগণিত সমস্যা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। লেখক আশাবাদী, তিনি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছেন এবং সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সৌরেন, দীপক, বন্যা, চিত্রা প্রভৃতির জীবনালেখ্যের মাধ্যমে। কিন্তু ঘটনা-সংস্থানের

কাহিনীতে উপন্যাসের গতি পদে পদে ব্যাহত হইয়াছে। লেখকের ভাষা ভাল, কিন্তু সংলাপ দীর্ঘ ও বক্তৃতাপন্থী।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

জনগণের উপনিষৎ—শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-টি। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯২। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে ঈশ, কেন, কঠ ও মুণ্ডক—এই চারিটি প্রধান উপনিষদের সরল বাংলা পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে 'উপনিষদের কিঞ্চিৎ' শীর্ষক অধ্যায়ে উপনিষদের ঐতিহাসিক বিবরণ এবং এই সম্বন্ধে শোপেনহাওয়ার, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি দেশ-বিদেশের মনীষিগণের সুচিন্তিত অভিমত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক উপনিষদের প্রারম্ভে উহার সংক্ষিপ্ত নির্গলিতার্থ আছে। পাদটীকায় কঠিন শব্দসমূহের সরলার্থ এবং নানা বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও উক্তি স্থানলাভ করিয়াছে। স্থানবিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুগন্ধর মহাপুরুষগণের আধুনিক ব্যাখ্যা, বিবিধ ছন্দের সমবায় এবং কতিপয় রেখা-চিত্রের সন্নিবেশ প্রভৃতি ইহার বৈশিষ্ট্য। উপনিষদ্‌কে এইভাবে রূপদান বাংলা-সাহিত্যে অভিনব। বাঙালী হিন্দু "জনগণের" মধ্যে এই "উপনিষৎ" ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"প্রসাদ", "গণেশের কাহিনী" এবং "আমিতত্ত্ব"—শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথ। ১২।১, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা-২৬ হইতে প্রকাশিত। ১ম গ্রন্থ ১৯১ পৃ., মূল্য আড়াই টাকা, ২য় গ্রন্থ ১৩৯ পৃ, মূল্য দুই টাকা চার আনা এবং ৩য় গ্রন্থ (।০+৩৬) পৃ, মূল্য পাঁচ সিকা।

প্রথম গ্রন্থে "শ্রীশ্রীগুরুধ্যান" হইতে "উপদেশামৃত" পর্য্যন্ত নানা ছন্দে রচিত ছোট বড় আকারের পঁয়ত্রিশটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতা হিসাবে এইগুলি খুব উচ্চাঙ্গের না হইলেও ইহাদের ভাব ও তত্ত্ব সাধক-হৃদয় হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থে গণেশ নামক এক রাখাল বালকের মাতৃসাধনার রূপক-চিত্রে মাতৃশরণাগতির মহিমা নিপুণভাবে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। গ্রন্থের শেষাংশে গণেশের মুখ দিয়া যে বাদশ আদেশ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা শ্রেয়স্কামী নরনারী মাত্রেরই অনুধাবনযোগ্য।

তৃতীয় গ্রন্থে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানী 'আমি কে'?—এই প্রশ্নের আলোচনা পাইবেন। ৩২ পৃষ্ঠায় আছে: প্রকৃত 'আমি' চিৎ মহাসমুদ্রের ত্রিগুণ-শূন্য ও ত্রিগুণযুক্ত পুরুষপ্রকৃতিভাবাপন্ন একজোড়া যুগল বা যুগ্ম জ্যোতিকণা।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাংলা সাময়িক-পত্র, ২য় খণ্ড;
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, অষ্টম খণ্ড।

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩.১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য যথাক্রমে আড়াই টাকা ও ছয় টাকা।

প্রথিতযশা সাহিত্যিক, সম্প্রতি রবীন্দ্র-পুরস্কার-প্রাপ্ত অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইখানি পুস্তক সমালোচনার্থ আমরা পাইয়াছি। বাংলা সাময়িক-পত্র, প্রথম খণ্ড ইতিপূর্ব্বে সুধীসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। আলোচ্য খণ্ডে ১৮৩৮ হইতে ১৮৬৮ সন পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক-পত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বৎসরানুক্রমিকভাবে ব্রজেন্দ্রবাবু দিয়াছেন। শুধু কলিকাতা বা ঢাকা নহে, দূরতম নগণ্য মফস্বল শহর হইতেও যে কত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা এই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ একান্ত নিষ্ঠা ও অপরিসীম আয়াসে এগুলির তালিকা—কখনও মূল পত্রিকা দৃষ্টে, কখনও বা সরকারী রিপোর্ট ও সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত নূতন পত্র-পত্রিকার সমালোচনার উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য, ইহাদের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতিরও পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বাংলা সাময়িক-পত্রের এরূপ নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক বিবরণ এই আমরা প্রথম পাইলাম।

আলোচ্য দ্বিতীয় পুস্তক, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা অষ্টম খণ্ডে চন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শিশিরকুমার ঘোষ, অধরলাল সেন, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জেম্‌স ষ্টুয়ার্ট, ফেলিক্‌স্ কেরী, হটী বিদ্যালঙ্কার, হটু বিদ্যালঙ্কার, দ্রবময়ী, কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার, দীনেশচন্দ্র সেন ও সখারাম গণেশ দেউস্কর—এই কুড়ি জন সাহিত্য-সাধকের জীবনী ও কীর্ত্তিকথা লিপিবদ্ধ আছে। ইঁহাদের মধ্যে 'জেম্‌স ষ্টুয়ার্ট', ফেলিক্‌স্ কেরী—শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও

সজনীকান্ত দাসের যুগ্মরচনা। এতদ্ব্যতীত সমুদয়ই একা ব্রজেন্দ্রনাথের। এই সকল সাধক বাংলা সাহিত্যে কত বিচিত্র কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা ক্রমশঃ ভুলিতে বসিয়াছি। বঙ্গ-সাহিত্য-সৌধ গঠনে তাঁহারা কি পরিমাণ মালমশলা জোগাইয়াছিলেন তাহা এতদিন আমাদের জানা ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ বহু পরিশ্রমে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তৎসমুদয় সংগ্রহ করতঃ আমাদের গোচরে আনিয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কার বাঙ্গলার শিক্ষিত-সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে।

নেহরু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর কথা বিশ্ববাসী আজ নানাভাবে জানিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনুকূল এবং প্রতিকূল মতবাদও অনেকে পোষণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি বা আলোচনা করি? আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখক মূলতঃ নেহরু-রচিত গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার ব্যক্তিত্বকে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যক্তিরূপ, ব্যক্তিত্বের উপাদান, আত্মচরিত, ভারত-আবিষ্কার, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, নেহরু-আবিষ্কার, দুই জীবন—এই কয়টি অনুচ্ছেদে লেখক এই বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। নেহরুর আত্মচরিত জীবনী-সাহিত্যে একটি অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে নেহরু-জীবনকে বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হয়। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর বিভিন্ন বিষয়ে কোথায় মিল ও কোথায় অমিল রহিয়াছে তাহা আলোচ্য বইখানিতে লেখক ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নেহরু একাধারে ভাবুক ও কর্ম্মী। 'দুই জীবন' অনুচ্ছেদে এই বিষয়টির সুন্দর আলোচনা আছে।

এই পুস্তকখানিতে স্বল্পপরিসরে নেহরুর জীবনের বিভিন্ন দিক সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। লেখক তাঁহার কোন কোন মতবাদ সম্বন্ধে সমালোচনাও করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে সাধারণ পাঠকও নেহরুর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দুইখানি এবং নেহরুর নিজের একখানি চিত্র ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ—নীরদবরণ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। পৃষ্ঠা ৩২। মূল্য এক টাকা।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে পুস্তক-পুস্তিকা বর্ত্তমানে কয়েকখানি লেখা হইয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তিকাখানি "তাঁর জীবন-রহস্যের ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনা, ছোটখাট কথা" সম্বন্ধে লেখক আলোচনা করিয়াছেন। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বেও শ্রীঅরবিন্দ কিরূপ কর্ম্মরত ছিলেন, বিখ্যাত "সাবিত্রী" কাব্য সমাপ্ত করিতে তাঁহার কিরূপ আগ্রহ, উৎকণ্ঠা ও পরিশ্রম—ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। লেখক এসব কথাও পুস্তিকাখানিতে মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

সামাজিক ও নাগরিক জ্ঞান—শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। প্রাচী পুস্তক প্রতিষ্ঠান, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৪৮। মূল্য দশ আনা।

শৈশব হইতেই ছেলেমেয়েদের সামাজিক রীতিনীতি, আদবকায়দা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আর নাগরিক জীবনে আমাদের দায়িত্ব, পরস্পরের প্রতি আচরণ প্রভৃতি বিষয় এই বইখানিতে লেখক আলোচনা করিয়াছেন। পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। লেখকের সঙ্গে আমরাও বলি "শিক্ষা, সামাজিকতা শিক্ষার স্থান কেবল বিদ্যালয় নহে, গৃহও।" পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
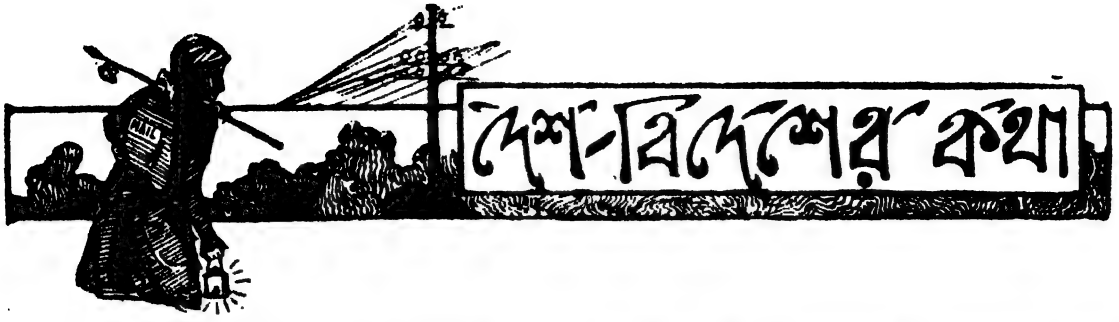
অন্ধ্র, শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার সম্পাদক শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্ম্মার ভাষণ

সম্প্রতি কাশীতে অনুষ্ঠিত সর্ব্বোদয় সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করিয়া অন্ধ্র, শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার সম্পাদক শ্রীমান্ মণ্ডেশ্বর শর্ম্মা উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত অখিল ভারত বৈজ্ঞানিক পরিষদের সম্পাদক শ্রীসর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা এম-এ সহ কলিকাতায় আসেন। গত ২৭শে এপ্রিল ৬বি ব্রড ষ্ট্রীটস্থ সেবায়তনে শ্রীনলিনীমোহন মজুমদারের উদ্যোগে এক সভার আয়োজন হয়। শর্ম্মাজীর পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীনলিনী-কুমার ভদ্র বলেন যে, গত বৎসর অন্ধ্র শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার আমন্ত্রণে পশ্চিম গোদাবরী জেলার কব্বূর নামক স্থানে গিয়া তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগ লাভ করেন। শ্রীযুক্ত মণ্ডেশ্বর শর্ম্মা শুধু যে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা তাহাই নয়, তিনি ইহার প্রাণস্বরূপ। প্রথম যৌবনে শর্ম্মাজী ছিলেন লোকমান্য তিলকের সহকর্ম্মী। অবশেষে তিনি গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন এবং দেশের সেবা করিতে গিয়া বহুবার কারাবরণ এবং বহুবিধ নির্য্যাতন ভোগ করেন। সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শর্ম্মাজী অবশেষে গঠনমূলক কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ্রদেশের চুনি নামক স্থানে 'শ্রমিক ধর্ম্মসাধক সঙ্ঘ' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর তিনি গোদাবরী নদীর পশ্চিমতীরস্থ কব্বূর নামক স্থানে আসিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে থাকেন এবং তখন হইতে তৎপ্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি 'শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভা' এই নূতন নাম পরিগ্রহ করে। কিছুকাল পরে অন্ধ্রের দেশপ্রেমিক বীর শহীদদের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে গোদাবরী নদীর তীরে বীরমন্দির নামক ভবনটি নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে উহা শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র। শর্ম্মাজীর নেতৃত্বাধীনে এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা যে-ভাবে অন্ধ্রদেশের সমতলের শ্রমিক এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে কল্যাণকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছেন তাহা আমাদের দেশে সেবা-ধর্ম্মের ক্ষেত্রে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। সেবার ভিতর দিয়া গণসংযোগ স্থাপনই শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার আদর্শ।

শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্ম্মা দেড়ঘণ্টাব্যাপী এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরস ও চিন্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথমেই বাংলার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—বাংলা একদা সমগ্র ভারত-বর্ষকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা সমগ্র বিশ্বের নিকট বাংলা তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন রাজা রামমোহন রায়, আবার বাঙালী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দই প্রথম পাশ্চাত্যে ভারতের বাণী প্রচার করেন।

নিজের রাজনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গে শর্ম্মাজী বলেন যে, প্রথম যৌবনে চারিটি জিনিষ তাঁহাকে স্বাদেশিকতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লোকমান্য তিলকের অনুগামী হইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। প্রথমতঃ বাংলার স্বদেশী আন্দোলন, দ্বিতীয়তঃ বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত, তৃতীয়তঃ বাঙালী বীর-বালক ক্ষুদিরামের ফাঁসি এবং চতুর্থতঃ বিপিনচন্দ্র পালের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা।

শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার আদর্শ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শর্ম্মাজী ভারতীয় শঙ্কর দর্শনের সঙ্গে মার্ক্সবাদের তুলনামূলক সমা-লোচনা করেন। তিনি বলেন, যদিও শঙ্করদর্শন এবং মার্ক্সবাদ এ দুটির ক্ষেত্র বিভিন্ন—প্রথমোক্তটি অধ্যাত্মবাদী এবং দ্বিতীয়টি জড়বাদী, তথাপি উভয়ের টেক্‌নিকের মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য-ব্যাখ্যাত ভারতীয় অদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্ব এই যে, অনাদিকাল হইতে যে চৈতন্য-শক্তি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজিত তাহা এক এবং অদ্বিতীয়, আমরা যাহাকে সংসার বলিয়া জানি তাহা ঐ একের বহুধাবিচিত্র বিকাশ বা 'বিকার' মাত্র। আসলে ইহা মায়া—ঐ মায়াকে মিথ্যা জানিয়া সেই একমেবাদ্বিতীয়মের প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধিই অদ্বৈতবাদী সাধকের চরম লক্ষ্য।

মার্ক্স যে আদিম সাম্যবাদের hypothesis-এর উপর তাঁহার জড়বাদী দর্শনের গোড়াপত্তন করেন তাহাকেও বলা যাইতে পারে অবৈদিক অদ্বৈতবাদ। সেই সাম্যমূলক অর্থ-ব্যবস্থাবিশিষ্ট সমাজে শ্রেণীবিভাগ বা শোষক-শোষিতের বালাই ছিল না। তার পর ক্রমে ক্রমে সেই অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈতের সৃষ্টি হইল—পর পর আসিল বিনিময় প্রথাযুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা, দাসতন্ত্র, ফিউডালতন্ত্র, রাজতন্ত্র, বুর্জ্জোয়া গণ-

তত্ত্ব। অবশেষে আবার সমাজের ভেদ-বৈষম্য ঘুচাইয়া যৌথিক সাম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার—অবশ্য উন্নততর আকারে—স্বীকৃতি প্রচার করিয়াছে মার্ক্সীয় দর্শন। শ্রেণীহীন সমাজ ও অর্থনৈতিক 'একত্ব' প্রতিষ্ঠাই মার্ক্সবাদীর লক্ষ্য।

ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র, এবং হেগেল ও মার্ক্সের দার্শনিক মতবাদ আলোচনা করিয়া আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ভারতীয় অদ্বৈতবাদ মার্ক্সীয় দর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। মার্ক্স যে হেগেলের দর্শনশাস্ত্র অধিগত করিয়াছিলেন তাঁহার নিজের উক্তিতেই তাহার প্রমাণ আছে। তিনি বলিয়াছেন—'আমি হেগেলের দার্শনিক মতবাদকে ওলট-পালট করিয়া দিয়াছি' ("I have turned Hegel upside down")। সুতরাং ইহা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, হেগেলের নৈতিক 'একত্ব'ই (moral oneness) শেষ পর্য্যন্ত মার্ক্সের জড় 'একত্বে' (material oneness) পরিণত হইয়াছে। ইহা জানা কথা যে, হেগেল এবং সপ্তদশ শতাব্দীর আরও কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক ভারতীয় বেদান্ত-দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য অষ্টম শতাব্দীর এবং মার্ক্স ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক। কিন্তু নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া উভয়ে যে 'টেকনিক' অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা হুবহু একই রূপ। উভয়ের দার্শনিক রচনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে ইঁহাদের পরস্পরের দার্শনিক সিদ্ধান্তের টেকনিকের মধ্যে একটা গভীর ঐক্যসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে একটিমাত্র মিল দেখাইতেছি। শঙ্করাচার্য্যের মতে নিত্য অনিত্য বস্তু বিচারের পর অদ্বৈতবাদী সাধক সংসারকে অসার মনে করেন এবং সাংসারিক ভোগসুখের উপর বীতরাগ হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। তেমনি মার্ক্সবাদীও ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সমাজে শ্রেণীবৈষম্যকে অসার বলিয়া উপলব্ধি করেন এবং পুঁজিবাদের উচ্ছেদ-সাধনে সচেষ্ট হন।

উপসংহারে শর্ম্মাজী বলেন, মোটামুটি আমার বক্তব্য হইল এই যে, মার্ক্সীয় চিন্তাধারা ভারতের নিকট সম্পূর্ণ অভিনব বা অপরিচিত নহে এবং হঠাৎ একদিন মাটি ফুঁড়িয়া ইহা ইউরোপে গজায় নাই। সুতরাং যথোচিত সমালোচনা এবং বিচার-বিতর্ক না করিয়া ইহাকে আমরা যেন অভ্রান্ত 'বেদ' বলিয়া গ্রহণ না করি।

দুঃখের বিষয়, যারা আজ নিজেদের কম্যুনিষ্ট বলিয়া সগর্ব্বে জাহির করিয়া নানাপ্রকার অমানুষিক এবং নিষ্ঠুরতাপূর্ণ আচরণ করিয়া থাকে তাহারা মার্ক্সকে তাঁহার সিংহাসন হইতে ধুলায় টানিয়া নামাইয়াছে। আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আজিকার পৃথিবীতে তাঁহার এই সকল তথাকথিত চেলা-চামুণ্ডার দ্বারা অনুষ্ঠিত হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ দেখিয়া নিদারুণ মর্ম্ম-পীড়া অনুভব করিতেন।

উপসংহারে শর্ম্মাজী বলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখি ভারতবর্ষ যুগে যুগে নূতন আদর্শকে আত্মসাৎ করিয়া নবরূপ দিয়াছে—সুতরাং মার্ক্সবাদও যে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে নিজের চিরন্তন আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবে না এ বিশ্বাস আমার আছে। জড়বাদ নহে, আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই যে ভাবী বিশ্বের কল্যাণ নিহিত ভারতের সাধনা বর্ত্তমান যুগেও আবার নূতন করিয়া তাহা প্রমাণিত করিবে।

শর্ম্মাজীর বক্তৃতার পর সভায় মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীরণজিৎ সেনগুপ্ত প্রভৃতি আলোচনায় যোগদান করেন।

শর্ম্মাজীকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল বলেন, বক্তা মার্ক্সবাদের যে ব্যাখ্যা করিলেন তাহা যেমন মৌলিক তেমনি অভিনব—ইহা অনেকের চোখ খুলিয়া দিবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দেশ-বিদেশে সংস্কৃতের অনুশীলন বিশেষভাবে আরম্ভ হয়। হেগেল, কান্ট প্রমুখ জার্ম্মান দার্শনিকগণ হিন্দুদর্শন ও তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে অধিগত করেন। মার্ক্স উহা দ্বারা খুবই প্রভাবান্বিত হন। ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি যে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার মূলেও রহিয়াছে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। মার্ক্সের *Letters of India* ইহার প্রমাণ।

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন

জেলা ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রাম রাজনারায়ণ বসুর জন্মস্থান। কালক্রমে তাঁহার পৈতৃক বসতবাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে সভাপতি ও বোড়ালনিবাসী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্রকে সম্পাদক করিয়া—রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিরক্ষা সঙ্ঘ নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উক্ত সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষক। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য রাজনারায়ণের জন্মভিটায় একটি স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করা, শিক্ষা ও সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা এবং তাঁহার পুস্তকাবলী পুনর্মুদ্রণ করা।

সঙ্ঘ ইতিমধ্যেই স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছেন। গত ২রা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে গ্রামবাসিগণের বিশেষ আগ্রহ পরি-

বোড়াল গ্রামে নব-নির্ম্মিত 'ঋষি রাজনারায়ণ স্মৃতি মন্দিরে'র উদ্বোধন অনুষ্ঠান

উপবিষ্ট (বামদিক হইতে)—শ্রীদাশরথি ভট্টাচার্য্য, শ্রীহীরেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ সুবোধকুমার বসু, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীআলামোহন দাস, রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী, রাজ্যপাল-পত্নী শ্রীমতী বনবালা মুখার্জী, শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী, ডঃ প্রশান্তকুমার বসু, শ্রীসুকুমার মিত্র, শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

লক্ষিত হয়। প্রায় এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহকারে রাজ্যপালকে স্মৃতিমন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়।

বিভালয় ও গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করিতে গিয়া রাজনারায়ণের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া রাজ্যপাল বলেন—"শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক ও দেশনায়ক হিসাবে রাজনারায়ণ ভারতবাসীর হৃদয়ে এক নব-জাগরণের স্পন্দন তুলিয়াছিলেন। আজ দেশবাসী যে সেই মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষায় যত্নশীল হইয়াছেন ইহা এক পরম শুভ লক্ষণ।"

রাজনারায়ণ স্মৃতিরক্ষা সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র বলেন—"এই স্মৃতিমন্দির আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পরিপূরক।" তিনি আরও বলেন যে, স্মৃতিমন্দির প্রভৃতির নির্ম্মাণকার্য্যে এ যাবৎ ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১৩০০০, টাকা এবং উহা সম্পূর্ণ করিতে আজ আরও অন্ততঃ ৬০০০, টাকার প্রয়োজন। এই টাকার জন্য তিনি জনসাধারণের নিকট আবেদন করেন।

শ্রীআলামোহন দাস মহাশয় স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণকার্য্যের জন্য ২৫০০, টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

রাজনারায়ণের দৌহিত্র শ্রীসুকুমার মিত্র রাজনারায়ণের ব্যবহৃত প্রায় ৯০ বৎসর আগেকার একটি পুরাতন চশমা, তাঁহার নিজস্বলিখিত বাণী সম্বলিত দুইটি তৈলচিত্র এবং রাজনারায়ণের পিতা নন্দকিশোর বসুর একখানি সংক্ষিপ্ত ডায়েরী রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিরক্ষা সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের পত্নী শ্রীমতী বনবালা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ সুবোধকুমার বসু, ডাঃ প্রশান্তকুমার বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব, শ্রীহীরেন্দ্রলাল সরকার, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম হইতে "শ্রীমা" একটি আশীর্ব্বাণী প্রেরণ করেন।

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবর্দ্ধনা

ভারতপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৬ই এপ্রিল কলিকাতায় আসেন। ১৭ই এপ্রিল কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি সংবর্দ্ধিত হন এবং রাত্রি সাড়ে আটটার সময় তাঁহার মধুর ধ্রুপদ সঙ্গীত প্রচারিত হয়। বহুদিন পরে তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পরিতৃপ্ত হন।

১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যায় ১৫৫ রসা রোডস্থিত 'গীত বিতান শিক্ষায়তনে' গীত বিতান সম্মিলনীর এক বিশেষ অধিবেশনে সঙ্গীতনায়ককে সংবর্দ্ধিত করা হয়। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ সঙ্গীতের উন্নতি, প্রচার ও শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া তিনি সমগ্র ভারতের সঙ্গীতজ্ঞগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গোপেশ্বরবাবুর গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'বঙ্গ-সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেন। এখনও তিনি বিষ্ণুপুর সঙ্গীত কলেজের অধ্যক্ষের পদে আসীন থাকিয়া সঙ্গীতের উন্নতি ও নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়নে রত আছেন।

১১শে এপ্রিল ২।২বি বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে "ভবতারিণী নাট-মন্দিরে" গোপেশ্বরবাবুর আর একটি বিরাট সংবর্দ্ধনা-সভার আয়োজন হয়। অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সকল বিভিন্ন সভায় অধিবেশনে গোপেশ্বর বাবু তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া তাঁহার ভক্তমণ্ডলী ও শিষ্যবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করেন। সঙ্গীত-নায়ক সুহৃদেহে দীর্ঘজীবী হইয়া ভারতীয় সঙ্গীতকে আরও গৌরবান্বিত ও উন্নত করুন, ইহাই আমাদের বাসনা।

হাজারিবাগে প্রবাসী বাঙালীদের বসন্তোৎসব

গত ২২শে মার্চ্চ পরলোকগত অধ্যাপক যজ্ঞসিংহ ঘোষের "নির্ম্মাল্য" ভবনে হাজারিবাগের কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি ও মহিলাদের সম্মিলিত চেষ্টায় "বসন্তোৎসব" অনুষ্ঠিত হয়। কবিগুরুর "নবীন" নাটিকাটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। শ্রীমতী অলকা নিয়োগীর নেতৃত্বে স্থানীয় "গীতালি" স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ ইহাতে যোগদান করেন। অধ্যাপক মাণিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। শ্রীতপতী রায়, ছায়া আয়কট্ট, কমলা পুরকায়স্থ, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কণপ্রভা সেন, তড়িৎ চক্রবর্ত্তী, অমিয় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি একক, দ্বৈত ও সমবেত ভাবে গান করেন। নৃত্য, গীত, আবৃত্তি ইত্যাদির সমবায়ে অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। প্রবাসী বাঙালী ছাড়া আরও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ডক্টর শ্রীঅমরেশ দত্তের পুরস্কার লাভ

সম্প্রতি 'ইন্টার-ন্যেশন্যাল এসোসিয়েশন অব পোয়েট্রি, রোম' নামক সংস্থার কবিতা-নির্ব্বাচকমণ্ডলী কর্ত্তৃক মধ্য-প্রদেশের সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীঅমরেশ দত্ত, এম-এ, পিএইচ-ডি'র "ক্যাপটিভ মোমেন্টস" নামক কাব্যগ্রন্থখানি পুরস্কারপ্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

ইটালীস্থ ভারতীয় দূতাবাস হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, এই উপলক্ষে ইটালীয় গবর্ণমেন্টের মধ্যবর্ত্তিতায় ডক্টর দত্তকে যে ডিপ্লোমা ও পদক পুরস্কার দিবার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা শীঘ্রই তাঁহার নিকট প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ৯ই ডিসেম্বর রোমের Siracusa নামক স্থানে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য ডক্টর দত্ত আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

ডক্টর দত্তের কাব্যগ্রন্থখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করিয়াই নির্ব্বাচকমণ্ডলী তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

নলিনীমোহন রায়চৌধুরী

গত ১২ই চৈত্র উত্তরবঙ্গের জমিদার-পরিবারের নলিনীমোহন দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা অন্নদাচরণ রায়চৌধুরী শিক্ষার উন্নতিকল্পে লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের এই জমিদারশ্রেণী সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী হইয়া নানাভাবে দেশের নব-জাগরণকে সাহায্য করিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের জমিদারী অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার জমিদারীর কার্য্যপরিচালনা করিতে হইয়াছিল। কাশিমবাজারের রাজপরিবারের বাহারবন্দ পরগণার আয়েই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের দান-যজ্ঞের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। পূর্ব্ববঙ্গের সূর্য্যকান্ত, ব্রজেন্দ্রকিশোর, রাণী দিনমণির দান বিখ্যাত।

নলিনীমোহন বাংলার সেই ঐতিহ্যের ধারক ছিলেন। তার উপরে তিনি ছিলেন রাজনীতিক। রংপুর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে এবং পরে নেতাজীর সহকর্মীরূপে তাঁহার চিন্তা ও কর্ম্ম স্মরণীয়। নানাবিধ ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ে সাহায্য করিতে গিয়া তিনি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং তজ্জনিত দুশ্চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্যহানি হয়। ফলে তাঁহার অকালমৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র ও পত্নীর উদ্দেশে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

কান্তিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

লব্ধপ্রতিষ্ঠ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক কান্তিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বালীগঞ্জস্থ ভবনে গত ১৬ই বৈশাখ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বিজ্ঞান ও শিক্ষাজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও চারিত্রিক নিষ্ঠার জন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। তিনি বিপত্নীক ছিলেন।

ফণীন্দ্রনাথ মিত্র

প্রবীণ সাংবাদিক ও পাটনার ইউনাইটেড প্রেসের সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মিত্র গত ২২শে বৈশাখ ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক-

গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত কাজ করিতেছিলেন। দীর্ঘ ৫০ বৎসর যাবৎ তিনি সাংবাদিকতা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন পুরাতন যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক এবং সে যুগে ১৯০৭ সালে যুগান্তরের সম্পাদকরূপে রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনি ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবার উপলক্ষে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

জনসাধারণের সহিত তাঁহার যোগ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। পাটনায় কেন, বিহারের সর্ব্বত্র বাঙালী-অবাঙালী-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক পরিচিত ব্যক্তিই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তাঁহার গুরুতর অসুস্থতার খবর পাইয়া বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহ সহ চারজন মন্ত্রী, বিধানসভার স্পীকার ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়াছিলেন এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শোকযাত্রার অনুগমন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির আপিস ও বিহার বিদ্যাপীঠ বন্ধ রাখা হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে সাংবাদিকশ্রেণীর ও বিহার-প্রবাসী বাঙালীদিগের যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ হওয়ার আশা সুদূরপরাহত। সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ও অজাতশত্রু এরূপ ব্যক্তির বিয়োগে মন স্বভাবতঃই ব্যথিত হয়। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমরা সহানুভূতি জানাইতেছি।

মেরিয়া মণ্টেসোরি

গত ২৩শে বৈশাখ শিশুশিক্ষার নূতন ভাব ও কর্ম্মনীতি প্রবর্ত্তনকারিণী মাদাম মণ্টেসোরি সন্ন্যাসরোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল। ইটালীর এই কন্যা হল্যাণ্ড দেশে দেহত্যাগ করিলেন।

শিশুর স্বাভাবিক প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করিয়া মণ্টেসোরি তাঁহার শিক্ষা-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। শিশুশিক্ষা প্রসঙ্গে "শিক্ষক" নামক মাসিক পত্রিকার গত ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস লিখিত একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে উক্ত প্রবন্ধের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম। মণ্টেসোরি শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে কি ভাবে চিন্তা করিতেছেন তাহা নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইবে :

"মনস্তাত্ত্বিকরা বলেছেন যে, কর্ম্মচাপল্যটা শুধু শিশুর প্রকৃতি নয়, তার আদিম প্রবৃত্তিও বটে। কাজেই [illegible]-শীলতার সঙ্গে কর্ম্মতৎপরতার নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। শিশুর কাছে জ্ঞানমুখী শিক্ষার চেয়ে কর্ম্মমুখী শিক্ষার মূল্য অনেক বেশী। কারণ শিশুদের যে-কোন অনুভূতিই তার কাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশের সুযোগ খোঁজে। শিশুর ধ্যান-ধারণা মূর্ত্ত হয়ে উঠতে চায় তার প্রকাশভঙ্গিমায়; অর্থাৎ child's impression must be followed by expression. এই জন্যেই শিশুর হাতে রং তুলি, খেলার সরঞ্জাম, কাঁচি কাগজ দিলেই, শিশু সেগুলি দিয়ে কাজ আরম্ভ করে। প্রথমে উদ্দেশ্যহীনভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে শিশুর মাথায় কাজের প্রেরণা আসে, অমনি উন্মুখ হয়ে উঠে শিশুর অন্তরস্থ কল্পনা,—সৃজনাত্মক কাজের আনন্দে মশগুল হয়ে উঠে শিশুরা। শুধু কি তাই? তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে জাগে কাজ করার দুর্নিবার পিপাসা। কাজের চাকায় তার অন্তরস্থ ইচ্ছা যেন ঘুরপাক খেতে থাকে, কাজের জন্য অস্থির হয়ে উঠে শিশু। তাই একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন যে, 'For the young motion education is cardinal.' কাজেই এই সুযোগ থেকে শিশুরা বঞ্চিত হলে তাদের মনে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হবে, তার ফলে শিশুর মানসিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। এই জন্যে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে শিশুর অনুরাগের ছাঁচে ঢালাই করার প্রচেষ্টা হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন পাঠ্যসূচীতে। প্রত্যেক প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই যতদূর সম্ভব শিশুদের সুযোগ দেওয়া হয়: 'to think through the muscles'।

এই কারণে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত বলে মেনে নিয়েছেন। শিক্ষার আয়োজনে কাজের প্রয়োজন যে কত তা তাঁরা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁরা জোরগলায় বলেছেন যে, কাজটাই শিক্ষার উপলক্ষ মাত্র, স্বাভাবিক উপায়ে জ্ঞান পরিবেশন করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই জন্যে কাজের ভালমন্দ নিয়ে অকারণ মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নাই, লক্ষ্য ঠিক থাকলেই হ'ল। কাজ যাই হোক না কেন, লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রতিটি কাজকর্ম্মের মধ্যে দিয়ে শিশুর আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ, কার্য্যক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণশক্তি, শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহল এবং মনঃসংযোগ বাড়ছে কিনা, অথবা সাগ্রহে সে তার কাজ করছে কিনা।

শিক্ষার এই বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে গান্ধীজী সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তিনি তার স্বাবলম্বিতার কথাও চিন্তা করেছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে শিক্ষাসমস্যাকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারেন নি। তাই তিনি বৈজ্ঞানিক [illegible] সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন অর্থনৈতিক সমতাকে।"

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

ঝড়

শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

চেতুয়া চিত্ররীতির ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতের পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন—আয়ুধসহ দশাবতারের চিত্র

শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ জ্যোতির্বিনোদ প্রদত্ত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫২শ ভাগ
১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৫৯ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ডাক্তার রায়ের স্বপ্নমঙ্গল

পশ্চিম বাংলা এখন যাঁহাদের হাতে আছে তাঁহারা মোটামুটি ত্রিশ বৎসর আগেকার অবিভক্ত বাংলার কংগ্রেসের অধিকারীবর্গের উত্তরাধিকারী। ঐ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার অধঃপতন আরম্ভ হয়। অধঃপতনের মুখে বাংলার রাষ্ট্রনীতি কূটনীতিতে পরিবর্ত্তিত হয় এবং সেই সময়েই রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্র হইতে নীতি ও সত্য—ইংরেজীতে যাহাকে বলে moral values—বহিষ্কৃত হয়। সেই সময় বলা হয় নীতিজ্ঞান, ন্যায়-বিচার, ধর্ম্মভীরুতা ইত্যাদি পৌরুষের পরিপন্থী এবং রাষ্ট্র-নীতিতে উহার স্থান নাই। ছলে-বলে-কৌশলেই রাষ্ট্রাধিকার লাভ ও রক্ষা করিতে হয় এবং বিবেক ও ধর্ম্মজ্ঞান বিসর্জ্জন না দিলে রাষ্ট্রচালনা অসম্ভব। যিনি বাংলার এই কূটনীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহার ইতিহাস-জ্ঞান একেবারেই ছিল না এবং অচিরেই তিনি বুঝিতে পারেন যে, দেশের কি সর্ব্বনাশের পথ তিনি উন্মুক্ত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, অকালমৃত্যুর ফলে তিনি কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই, যদিও প্রতিকারের সঙ্কল্পের কথা তিনি অনেককেই আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন, যাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি, শ্রদ্ধেয় শ্রীযদুনাথ সরকার, জীবিত আছেন।

শ্রীবিধানচন্দ্র রায় তাঁহারই প্রধান শিষ্য, কিন্তু গুরুর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তিনি হয় ভুলিয়াছেন নয় মনে করেন যে উহা ভুল। সুতরাং আজও সেই ১৯২১-২৪ সালের কূটনীতিই তিনি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে তাঁহার রাজত্বের শেষ পরিচ্ছেদের কথাও ভুলিয়াছেন।

ডাঃ রায় ৭০ বৎসর পার হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নীতি-জ্ঞান বা ধর্ম্মজ্ঞানের কথা বলা অন্যের পক্ষে অশোভন। তবে দেশ যে কোন্ জাহান্নমের পথে চলিয়াছে সে কথা সকলেরই চিন্তার বিষয়।

পুরাতন মন্ত্রিসভা গিয়াছে এবং নূতন বসিয়াছে। পুরাতনের

মজুমদার কংগ্রেসী চক্রান্তে এবং ডাঃ রায়ের যুক্তির অভাবে মন্ত্রিত্ব হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীহরেন্দ্র রায়চৌধুরীর বিদায়ও অনুরূপ। নূতন দলের মধ্যে ইঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণের যোগ্যতা কাহারও আছে কিনা তাহা অদূরভবিষ্যতেই বুঝা যাইবে। পশ্চিম বাংলা তো সর্ব্বস্বহারা, 'গতগৌরব হৃত আসন' অবস্থায় ডুবিতে চলিয়াছে। কেন্দ্রের পদলেহনই তাহার একমাত্র সম্বল। এই অবস্থায় আজ এই অপরূপ লোকহাস্যকর মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ পত্র পেশ করিবার প্রাক্কালে ডাঃ বি. সি. রায় নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। এই বিবৃতি সুপাঠ্য হইয়াছে, কিন্তু ইহা কতটা সুসার তাহা অল্প বিচারেই বুঝা যাইবে। পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন, এ বিষয়ে কাহারও বিশেষ সন্দেহ নাই। একমাত্র ডাঃ রায় প্রমুখ কয়েকজন, যাঁহারা পশ্চিম বাংলা বলিতে বুঝেন কলিকাতা এবং দেশবাসী বলিতে বুঝেন সংবাদপত্রের ছুয়া কথায় পসারী, তাঁহাদের স্বপ্নজগতের পশ্চিম বাংলা স্বর্গ-রাজ্যের নন্দনকানন। যাহা হউক, আমরা পাঠকের ধৈর্য্য-চ্যুতির ভয় থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বিবৃতি পরিবেশন করিলাম :

"প্রায় সাড়ে চার বৎসর পূর্ব্বে আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করি। তখন রাজনৈতিক আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। জাতির জনক গান্ধীজীর অপঘাত মৃত্যু, পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের আগমন ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার—এই সব বিভ্রান্তিকর পরিবেশে আমাদিগকে কাজ আরম্ভ করিতে হয়। ইহা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রীয় তরণী দুস্তর ও বিপৎসঙ্কুল জাতীয় সমুদ্রে পাড়ি জমায়। ১৯৫০ সালের প্রথম কয়-মাসের ঘটনাবলী ও পরবর্ত্তী দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং সাম্প্রতিক সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানকালে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে আমাদের কার্য্যক্ষমতার দুঃসহ পরীক্ষা চলে। এই সময় মন্ত্রিসভায় আমার সহকর্ম্মিগণ একাত্মবোধে অনুপ্রাণিত ছিল এবং

এই "শ্রদ্ধা ও আনুগত্য" যে কতটা ছিল তাহার প্রমাণ নির্ব্বাচনেই দেখা গিয়াছে। পূর্ব্বেও অনেক কিছু ঘটিয়াছে। ডাঃ রায়ের কথার অর্থ, সকলেই তাঁহার অনুগত ছিল।

অতঃপর তিনি বলেন, "এ স্থলে আমার ভবিষ্যৎ মন্ত্রিসভার গঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে প্রতি বৎসর অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। এই হেতু মন্ত্রিসংখ্যা, বিশেষ করিয়া তরুণবয়স্ক মন্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করিয়াছি।"

অর্থাৎ কিনা পশ্চিমবঙ্গবাসী পৌরীসেনবর্গ কড়ি যোগাইবে এবং ডাঃ রায় পাত্র মিত্র চাটুকারবর্গ লইয়া মন্ত্রিত্বের ইস্কুল চালাইবেন। পড়ুয়া অর্ব্বাচীনের দল যদি দেশ উচ্ছন্নে দেয় তো ভালই, পশ্চিম বাংলার লোক মরিয়া বাস্তুঘুঘুদের স্থানের সংকুলান করিবে। প্রকৃত বাস্তুহারাদের কোনও ঠাঁই কোথায়ও নাই, সে পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাই হউক বা পশ্চিমবঙ্গেরই হউক। বাংলার মন্ত্রিসভা বাস্তুহারা বলিতে বুঝে বাস্তুঘুঘু।

ডাঃ রায় বলেন, "সাড়ে চার বৎসর পূর্ব্বে মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার সময় আমাকে আমার সহকর্ম্মীদের বাছাই করিতে হয়। কার্য্যভার গ্রহণের দিন আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, আমার সহকর্ম্মিবৃন্দ 'সুখী-পরিবারে'র লোক। বিগত ৫২ মাসে আমাদের মন্ত্রিসভার ২৩৮ বার বৈঠক হয়। ইহার মধ্যে একবার ছাড়া আর কখনও আমাদের মধ্যে মতভেদ হয় নাই। সেইবারের বৈঠকে শাসন-ঘটিত কোন আলোচনা হয় নাই; আমাদের সামাজিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি নীতিঘটিত প্রশ্ন উহাতে আলোচিত হয়। মন্ত্রীদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু মতভেদ যতবারই উপস্থিত হইয়াছে, ততবারই আলাপ-আলোচনার ও আপোষে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। ইহাতেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মন্ত্রিসভা কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও একটি সুগঠিত দল হিসাবে কাজ করিয়াছে।

"মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরই গান্ধীজী নিহত হন এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির উদ্ভব হয়। পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণ দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে থাকে; খাদ্যশস্য ও বস্ত্রের নিয়ন্ত্রিত দর বহাল ছিল; জনসাধারণের ভয় হয় যে, 'অহিংসার ঋষি'র তিরোধানে দেশে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইবে। সাম্প্রদায়িকতা শক্তি সঞ্চয় করিয়া গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত নীতির ধ্বংস করিয়া ফেলিবে বলিয়া মনে হয়। এহেন বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে আমাদিগকে কাজ আরম্ভ করিতে হয়। ইহা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রীয় তরণী অবিচল গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে।"

কিবা 'অবিচল গতি' এবং অহো, কিবা 'অগ্রগতি'!

"একণে আমাদিগকে নূতন পথে যাত্রা সুরু করিতে হইবে। শীঘ্রই নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। কাজেই আমরা বলিতে পারি যে, মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; তবে মন্ত্রিসভা দীর্ঘজীবী হউক।

"এই সুযোগে আমি আমার মন্ত্রিসভার সহকর্ম্মীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহাদের সহযোগিতা ও আনুগত্যের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার তুলনা নাই। আমার বিশ্বাস প্রয়োজনমত তাঁহারা ভবিষ্যতেও যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।"

কর্ত্তব্য নিষ্ঠার প্রতিদান বলিতে ডাঃ রায় কি বুঝেন ও তাঁহার শ্রদ্ধার মূল্য কি তাহা শ্রীভূপতি মজুমদার জানেন এবং জানেন আরও অনেকে। সে যাহাই হউক, ভণিতা এই পর্য্যন্ত। ইহার পর স্বপ্নমঙ্গলের কথা।

"আমি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য নূতন মন্ত্রীদের একটি তালিকা পেশ করিয়াছি। এ বিষয়ে প্রথমে আমার বক্তব্য এই যে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সত্ত্বেও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রতিবৎসর বেশী পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে আমরা এই খাতে কিঞ্চিদধিক দশ কোটি টাকা এবং পর বৎসর বার কোটি টাকা ব্যয় করি। ইহার মধ্যে নদী উপত্যকা পরিকল্পনা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয় নাই। একণে পরিকল্পনা, বিন্যাস সম্পূর্ণ হইয়াছে। উহাদের প্রত্যক্ষ ও যথাযোগ্য তত্ত্বাবধান করা অত্যাবশ্যক। এই হেতু মন্ত্রিসংখ্যা বিশেষ করিয়া তরুণ মন্ত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাঁহারা ঘটনাস্থলে স্বচক্ষে সমস্ত বিষয় দেখিয়া মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য নির্ভুল সংবাদ পরিবেশন করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ, যেসব যুবক বিধানসভার সদস্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককে ভবিষ্যৎ কাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই হেতু আমাদের মধ্যে যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ আছেন, তাঁহারা লোকান্তরিত হইলে যাহাতে এই সব তরুণ সদস্য তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অধিক সুযোগ দেওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ, আমার মনে হইয়াছে যে, শাসন বিভাগের প্রত্যেকটি দপ্তরের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যাহাতে অধিক মাত্রায় ব্যক্তিগত নজর দেওয়া সম্ভবপর হয়, এমনভাবে সবকয়টি বিভাগকে একত্র গ্রথিত রাখা উচিত। তাহা ছাড়া, এমন কয়েকটি বিষয় আছে, যথা খণ্ডজাতি সম্পর্কিত ব্যাপার এবং কুটিরশিল্প—যাহা রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার পটভূমিকায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ অবস্থায় আমি উপরোক্ত বিষয়ে অবহিত হইয়া মন্ত্রিসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছি।"

২২ কোটি টাকা দুই বৎসরে 'উন্নয়ন' কার্য্যের খাতে ব্যয়

করা হইয়াছে। কিন্তু দিব্যনয়ন ব্যতিরেকে তাহার চিহ্নমাত্র দর্শন করার উপায় নাই। খাদ্যে, বিত্তে, বাসে, শিক্ষায়, সম্মানে, বাঙালীর, বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার বাঙালীর, স্থান সর্ব্বোচ্চে—অন্ততঃপক্ষে ডাঃ রায়ের স্বপ্নজগতে!

স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান
মুখ্যমন্ত্রী ভণে তথা শুনে পুণ্যবান ॥

নূতন মন্ত্রিসভা

স্বপ্নরাজ্য বিহারের পর ডাঃ রায় বাস্তব জগতে নামিয়াছেন। চৌদ্দ জন মন্ত্রী ও ষোল জন উপমন্ত্রীর নাম শুনাইয়া আমাদের ধন্য করিয়াছেন। বাকী আছে ৩০ বা ৩৬ জন পরিষদ-সচিবের নামগান। অবশিষ্ট ১০ জনেরও ব্যবস্থা হইবে ছলে-বলে-কৌশলে। তাহা হইলেই মন্ত্রিসভা "সুখী-একান্নবর্ত্তী পরিবার" হইয়া পরিচারক লইয়া ঘর করিতে পারিবে। এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুখই তো দেশের কাম্য। দুঃস্থ, বুভুক্ষু, বেকার ইত্যাদি দুষ্ট লোকে নানা কথা বলিতেছে। সে কথা কর্ত্তব্যের মধ্যে না হইলেও মুখ্যমন্ত্রী তাহা শুনিয়াছেন।

ডাঃ রায় বলেন, "বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, আমি স্বয়ং অনেকগুলি দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছি এবং এইগুলি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর; দ্বিতীয়তঃ, আমি অনেকগুলি মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছি। আমি মনে করি, আমার এই উভয় কার্য্যই যে সঙ্গত হইয়াছে তাহা প্রতিপাদন করিতে হইবে।"

প্রতিপাদন ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু বর্ত্তমানে মুখ্যমন্ত্রী যাহা বলিতেছেন তাহাও শুনা প্রয়োজন। অতএব 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—

"যাঁহারা বলিতেছেন যে, আমি অনেকগুলি দপ্তরের ভার লইয়াছি তাঁহারা সম্ভবতঃ জানেন না যে, গত কয়েক মাস হইল এই সমস্ত দপ্তরেরই কার্য্যাবলী আমি তত্ত্বাবধান করিতেছি। ইহার সহিত গুরুদায়িত্বসম্পন্ন সাহায্য ও পুনর্বসতি দপ্তরও আমার তত্ত্বাবধানে ছিল। যদিও শ্রীনলিনী-রঞ্জন সরকার তাঁহার পরামর্শ এবং পরিচালনা দ্বারা আমাকে কৃতিত্বের সহিত সাহায্য করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শারীরিক অবস্থা এরূপ ছিল যে, চিকিৎসক হিসাবে তাঁহাকে আমি অনর্থক উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ হইতে রক্ষা করিতে চাহি। এই রাজ্যের আর্থিক অবস্থার জন্য আমি কোনরূপ কৃতিত্ব দাবি করিতেছি না। শ্রীযুক্ত সরকারের উদ্যম ও প্রেরণার ফলেই অর্থনৈতিক অবস্থা এইরূপ হইতে পারিয়াছে। আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি বরাবরই রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সম্পর্কিত ব্যবস্থার সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। যে সমস্ত বিষয়ের ভার আমি নিজে গ্রহণ করিয়াছি ঐগুলির জন্য আমি ছয় জন উপমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছি। যদিও তাঁহারা আপাততঃ প্রধান দপ্তরের কোনও একটি দপ্তরের ভার লইবেন, তথাপি তাঁহারা যখনই অনুভব করিবেন যে, তাঁহারা আরও গুরুদায়িত্ব গ্রহণে সমর্থ তখনই আমি যথাসম্ভব দ্রুত দায়িত্বভার ত্যাগ করিব। এইরূপ মানবিকতাবোধ আমার আছে। ইহাতে আমি শ্রম ও উদ্বেগ হইতে অব্যাহতি পাইব। শাসনকার্য্য পরিচালন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে আমি এই সমস্ত উপমন্ত্রীকে পরিচালনা করিতে পারিব বলিয়া গর্ববোধ করিতেছি।

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার সম্বন্ধে কিছুই বলার প্রয়োজন নাই। তবে ডাঃ রায় এই রাজ্যের আর্থিক অবস্থার জন্য "কৃতিত্ব" দাবি না করিয়া ভালই করিয়াছেন। "উভো খই গোবিন্দায় নমঃ" ইহাই উত্তম ব্যবস্থা। এখন একা রামে যাহা করিয়াছেন তাহার উপর সুগ্রীব, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, জাম্ববান সংযুক্ত হইলে কি হইবে তাহাই বিচার্য্য। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা দৈবজ্ঞ আমরা নহি, ডাঃ রায়ের উপদেষ্টারা সে বিষয়ে পটু। তবে গর্ব্বের পরিণতি সম্পর্কে ইংরেজী প্রবাদবাক্য কি একটা আছে যেন মনে হয়, Pride cometh before…

"আমি ব্যক্তি-বিশেষকে বা কয়েক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি—সম্ভবতঃ এই ধারণা হইতেই এরূপ সমালোচনা করা হইতেছে যে, আমি বেশী উপমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছি। আমি দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছি যে, এইরূপ ধারণার মূলে কোনও সত্য নাই। একজন মানুষের পক্ষে যেরূপ অভিনিবেশ প্রদর্শন সম্ভবপর গত সাড়ে চারি বৎসর সেইরূপ অভিনিবেশসহ রাজ্যের প্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। সহকর্ম্মীদের সাহায্যে আমি রাজ্যের উন্নতির জন্য সতর্কতার সহিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছি। দুই দিন পূর্ব্বে আমি যে লিপিটি প্রচার করিয়াছি তাহাতেই আমি ইতোমধ্যে আভাস দিয়াছি যে, আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও এই রাজ্য গত দুই বৎসর যাবৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ প্রতি বৎসর ১০ হইতে ১২ কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্রুততর উন্নতি সাধিত হইবে এবং আরও বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা সম্ভবপর হইবে। পরিকল্পনাগুলি সযত্নে প্রণয়ন করা হইলেও আমি ইহা অনুভব করিয়াছি যে, ঐগুলি কার্য্যে পরিণত করার জন্য যথাযোগ্য সংস্থা গঠন করিতে হইবে। যদি উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় পর্য্যবেক্ষণ এবং সে সম্পর্কে তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলে অর্থের অপচয় নিবারণ করা যাইতে পারে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়নে অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। বাণিজ্য এবং নানারূপ ব্যবসায়ের চেষ্টায় রত উন্নতিশীল একটি রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে রাজ্যের শাসন-বিভাগের অধিকাংশ বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তৃবৃন্দের—মুখ্য আধিকারিকদের—জ্ঞান নাই। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, যত

সময়েই বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হউক না কেন তাঁহারা কোনও ঝুঁকি লইতে বা কোনরূপ সাহসিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টায় রত হইতে দ্বিধা বোধ করিবেন। ইহা ছাড়া কয়েকটি উপলক্ষ্য ব্যতীত এই সমস্ত কর্মচারীকে জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রতিষ্ঠা হইতে সযত্নে দূরে রাখা হইয়াছিল।"

মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর সংখ্যা সম্পর্কে ডাঃ রায় যদিও বলিয়াছেন 'আমি দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছি' ইত্যাদি, তথাপি তাঁহার যুক্তি শুনিয়া আমাদের ঐ ধারণা দৃঢ়তর হইয়াছে।

"সুতরাং রাষ্ট্রের উন্নয়নে যাঁহাদের উৎসাহ ও সামর্থ্য আছে এবং যাঁহারা এই কার্য্যের জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতে পারেন, তেমন একদল লোককে একত্র করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েকটি কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের উক্ত কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন কার্য্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা এবং পরামর্শের সঙ্গেও তাঁহাদের পরিচয় আছে। এইরূপে জনসাধারণের সঙ্গে শাসন বিভাগ যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিবে। মন্ত্রিসভার বড় সংখ্যক সদস্য আমি গ্রহণ করিয়াছি, তাহার জন্য আমি কোন কৈফিয়ৎ দিতে চাই না। শাসনকার্য্যের বিভিন্ন বিভাগে উন্নতিসাধনের জন্য আমি বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ করিয়াছি এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমি ইহা অনুভব করি যে, আমি সঠিক কার্য্যই করিয়াছি। আমি যাহা করি, তাহার পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করি। এই নূতন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্বও আমার। আমি বিশেষ ভাবে আশা করি যে, এই মন্ত্রিসভা বর্ত্তমানে এই প্রদেশ যে অবস্থায় আছে, তাহা অপেক্ষা ইহাকে অধিকতর বাসযোগ্য করিয়া তুলিবেন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আমরা সকলেই সুখী হইব।

"আমাদের দেশবাসীর নিকট আমি বলি যে, আপনারা আমাদের উপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। কর্ত্তব্য পালনে আপনারা আমাদিগকে শক্তি দিন। আমরা চেষ্টার ত্রুটির জন্য ব্যর্থ হইব না। আমরা কেবল আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টাই করিতে পারি। আগামী পাঁচ বৎসরে প্রত্যেকের নিকট হইতে আমরা পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করিব এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমরা সফল হইব।"

পালা সাঙ্গ হইল। মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদিগের গুণপণার কথা ভবিষ্যতের শিকায় তুলিয়া রাখিলাম।

৴ বাঙালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

প্রায় ১৫ মাস পূর্ব্বে মাসিক "উত্তরা" পত্রিকায় শ্রীবিমল ঘোষ ও শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখিত দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তখন ডাঃ রায়ের 'সুখী-পরিবার' মন্ত্রিত্ব চলিতেছে। ডাঃ রায়ের বিবৃতির উপর আমাদের মন্তব্যের সমর্থনে উহা উদ্ধৃত করিলাম। স্বদেশের ঘটনাবলী দর্শকের চক্ষে দেখানো ছিল এই প্রবন্ধ দুইটির উদ্দেশ্য। বাংলার অবনতি বা অগ্রগতি হইয়াছে কিনা উহাতেই বুঝা যায়, কেননা দর্শকেই খেলার গতি বুঝে ভাল। প্রবাসী বাঙালীর পক্ষপাতহীন চোখে তখনকার বাংলার চিত্র এইরূপ :

"তবু যদি আজ বারাণসী-প্রয়াগে ব'সে কোন বাঙালী মনের আনন্দে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা পড়েন—

কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !

আর মনে মনে বাংলার কথা ও বাঙালীদের কথা ভেবে পুলকবোধ করেন অথবা দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, তা হলে সেটা ওদের স্বর্গলোকে বিচরণের মত ভুল হবে, মিথ্যা হবে। চণ্ডীদাস আর রামপ্রসাদের কণ্ঠ 'কোথায় বাজে রে' ব'লে দূরে ব'সে আনন্দ ক'রে আজ লাভ নেই ; কারণ একদিকে আজ হনুমানপ্রসাদ এবং আর একদিকে হিন্দুস্থানী দাদার বাঙালী ভাইদের কণ্ঠে মোসাহেবের সুর বাজেরে। যে বাংলা দেশে বাঘের গর্জ্জন চিরকাল শোনা গেছে, আজ সেখানে এলে শেয়াল-কুকুরের চীৎকার শুনতে পাবেন, গাছে গাছে ফিঙের নাচের বদলে দেখতে পাবেন মাটিতে ডুগডুগি বাজিয়ে বাঁদরের নাচ। নেতাবুনেরা যে কি চমৎকার "কীর্ত্তনিয়া" হয়েছে যদি দেখতে চান, তা হলে বাংলার বর্ত্তমান রাজনৈতিক হরিসংকীর্ত্তনাসরে একবার এসে যোগদান করুন। সেকালে ব্রাহ্মণরা বংশপরম্পরায় গুরুগিরি ও পুরোহিতগিরি ক'রে এসেছেন, একালে আমরা বংশানুক্রমে রাজনীতির নেতাগিরি করছি। বাংলার বনগাঁয়ে এইভাবে অনেক 'শেয়াল রাজা' গজিয়ে উঠছেন এবং তাঁদের "কাহুয়া" আহ্বানে আমরা সকলে "হুকা হুয়া, হুকা হুয়া" বলে সাড়া দিচ্ছি।"

রাজনীতি ছেড়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আসুন। সেখানেও এই শারদীয় পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে দুঃস্বপ্ন দেখবেন। 'মাঠে মাঠে ধান আর ধারে না' চলছে না, গ্রাম পথে পথে তার গন্ধও ভ'রে উঠছে না। 'হে মাতঃ পশ্চিমবঙ্গের' কোন 'মধুর মুরতি' শারদ প্রভাতে দেখতে পাবেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বদলে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'শরতে বঙ্গভূমি' স্মরণ করতে হবে—

জননী, তোমার ভিক্ষার থালা
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।
রোগে বন্যায় 'ভাতে ভবানী',
তোমার ভবনে বনে !
অবসর আর নাহিক তোমার
দলে দলে ছুটে অন্নদুটিয়ার,
লবণ ফুরায় আনিতে পান্ত,
পান্ত—আনিতে লবণে।

জননী, তোমার চির-টানা খাতা
খুলিয়া রেখেছ ভুবনে !

একথা শুধু যে লক্ষ লক্ষ ভিটেমাটিহীন উদ্বাস্তু বাঙালী পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়, সাধারণভাবে সমস্ত বাঙালীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ...

"পৌনে দুশো বছর ধরে এই চলতে চলতে, এমন অবস্থা হয়েছে যে কলকাতা সারা দেশের বিদ্যা, বিত্ত ও সামর্থ্য শুষে নিয়ে বিষম রকম কেঁপে উঠেছে—আর গ্রামগুলি হয়েছে রিক্ত, সর্ব্বস্বান্ত। অথচ ক্রমবর্দ্ধমান জনতার অনুপাতে কলকাতার জীবিকার পথ উন্মুক্ত হয় নি, বসবাস ও শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থাপনা হয় নি—দেখা দিয়েছে ব্যাপক দারিদ্র্য, বেকার দশা, দুর্নীতি ও অধঃপতন।...

"আজ একদিক থেকে পাকিস্থানের রাহু, অন্য দিক থেকে সর্ব্বভারতীয়তার বিষম জ্বর তাকে একই সঙ্গে চেপে ধরেছে। এর মধ্যে আত্মরক্ষা করে তার ভাষা ও সংস্কৃতির, সভ্যতা ও জীবন-নীতির নিজস্ব ঐতিহ্য সে কি আর বাঁচাতে পারবে? সন্দেহ করার সত্যিই কারণ আছে। কিন্তু কেউ কি ভাবছেন তা?"

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট

অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ ১৯৫২-৫৩ সালের যে চূড়ান্ত কেন্দ্রীয় বাজেট লোকসভার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, পূর্ব্বেকার অন্তর্বর্ত্তী বাজেটের মতই তাহা বৈচিত্র্যবিহীন। শ্রীদেশমুখ বলেন, সংশোধিত হিসাবে রাজস্বখাতে মোট আয় হইবে ৪০৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা; পক্ষান্তরে এই খাতে মোট ব্যয় হইবে ৪০১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। কাজেই ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা রাজস্বখাতে উদ্বৃত্ত হইবে। পক্ষান্তরে অন্তর্বর্ত্তী বাজেটে রাজস্বখাতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১৮ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে। এই ঘাটতির কারণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, বহির্বাণিজ্যের শুল্ক খাতে ২৫ কোটি টাকা আয় হ্রাস পাইবে।

দ্রব্যমূল্য হ্রাসের বিষয় আলোচনা করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন যে, কতকটা আন্তর্জাতিক কারণে এবং কতকটা ভারত-সরকারের মুদ্রা ও অর্থনীতি ব্যবস্থার জন্য উহা হ্রাস পাইয়াছে। ইহাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যবসায়ী মহলে কিছু অসুবিধা হইলেও দ্রব্যমূল্য হ্রাস দেশের অর্থনীতির পক্ষে মঙ্গলকরই হইয়াছে, অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রব্যমূল্য হ্রাস সুরু হওয়ায় এবং দেশের রপ্তানী শুল্কের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া সুরু হওয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহার প্রতিকারার্থ ভারত-সরকার যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন শ্রীদেশমুখ তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। রপ্তানী শুল্কের পরিবর্ত্তন, পাট-জাতদ্রব্য ও কার্পাসজাত দ্রব্যের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কড়াকড়ি হ্রাস, বিদেশী তুলা ক্রয়ের জন্য বস্ত্রশিল্পকে বিশেষ সাহায্যদান এবং কাঁচা তুলার মূল্য হ্রাস বন্ধ করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তিনি সেগুলির উল্লেখ করেন।

শিল্পোৎপাদন হার মোটামুটিভাবে অব্যাহত আছে। কৃষি উৎপাদনের হারও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক মূল্য হ্রাস মন্দার সূচনা নহে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ পরিদর্শকের মতে এই মূল্য হ্রাসে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, বিশ্বের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির বল নিঃশেষিত হইয়াছে। সরকার যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেও মুদ্রাস্ফীতির কুফল হ্রাস পাইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, মূল্য হ্রাস এখনও এমন স্তরে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই যে তাহার জন্য অবিলম্বে কোন জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তবে ভারত-সরকার এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন আছেন এবং দ্রব্যমূল্য-বিশৃঙ্খলার ফলে উৎপাদন হ্রাস ও কর্ম্মহীনের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তাহার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

ইহার পর অর্থমন্ত্রী মহাশয় বহির্বাণিজ্যের অবস্থা বিবৃত করেন। ১৯৫১ সালে বহির্বাণিজ্য ১৯৫০ সালের মত সুবিধাজনক হয় নাই। এই অবস্থা একেবারে অভাবনীয় ছিল না। মুদ্রামূল্য হ্রাস ও কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ায় ১৯৫০ সালে ও ১৯৫১ সালের প্রথম ভাগে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে। সরবরাহ পাওয়ায় অসুবিধা থাকায় আমদানীও এই সময়ে কম হইয়াছে। গত সালের শেষ পর্য্যন্ত সঞ্চিত উদ্বৃত্ত হইতেই বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি মিটানো হইয়াছে। পাওনা ষ্টার্লিং হইতে টাকা লওয়ার প্রয়োজন হয় নাই।

অতঃপর অর্থমন্ত্রী ভারত ও সমগ্র ষ্টার্লিং অঞ্চলের ডলার অবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কেন্দ্রীয় সঞ্চয় দ্রুত গতিতে হ্রাস হওয়া বন্ধ করিবার জন্য কমনওয়েলথ সরকারগুলি যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহাতে অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। গম ও কাঁচা তুলা মজুত যথেষ্ট থাকায় ১৯৫২ সালের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভারতকে কম পরিমাণ অর্থ লইতে হইয়াছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। এই ঋণ পাওয়া গেলে দেশের ডলার সঞ্চয় অবস্থার উন্নতি হইবে।

তারপর অর্থসচিব খাদ্য ব্যাপারে সরকারী সাহায্যদান ব্যবস্থার হ্রাসের উল্লেখ করেন। খাইলোর ব্যাপারে সরকারী সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও যদি শিল্পাঞ্চল ও অন্যান্য এলাকায় খাদ্যশস্যের মূল্য ১৯৫১ সালের হারেই রাখিতে হয় তবে আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী তহবিলে ব্যয় প্রায় ৬০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। শ্রীদেশমুখ

বলেন যে, আমাদের আর্থিক সম্পদের অধিকতর স্থায়ী লাভজনক উন্নয়নের জন্য অধিকতর প্রতিযোগিতা হইতে থাকিলে, খাদ্যের ব্যাপারে সরকারী সাহায্যদান করিয়া এত বেশী অর্থ ব্যয় করা নিরর্থক হইবে।

সাধারণ মূল্যহার হ্রাসের পটভূমিকায় খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি পর্য্যালোচনা করিতে হইয়াছিল। শহর অঞ্চলের শ্রমিকদের জীবনধারণের ব্যয়ের মান হইতে জানা যায় যে, খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের মোট মূল্য হ্রাস যথেষ্ট হইয়াছে। সেজন্য প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়; সরকার মাইলোর ব্যাপারে সাহায্যদান করিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকেদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন। কোন প্রকার সরকারী সাহায্য দিয়া কষ্ট লাঘবের আশা তিনি দিতে পারেন না।

অর্থসচিব ঘোষণা করেন যে, তিনি করের হারের কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। করভার লাঘবের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীদেশমুখ বলেন, বাড়তি টাকা কি ভাবে বিলাইয়া দিব ইহা আমাদের সমস্যা নহে। পরন্তু আমি যে সকল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছি তাহাদের দ্বারা যে নীট লোকসান হইবে তাহার ক্ষতিপূরণ কি ভাবে করা যায় তাহাই সমস্যা। উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন এত কাজ করিবার আছে তখন কেহই বোধ হয় সত্য সত্যই করভার লাঘবের কথা প্রস্তাব করিতে পারেন না। গত দুই বৎসর নানা কারণে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি বাবদ ব্যয় ক্রমেই বাড়িতে থাকে। বর্ত্তমান অবস্থায় ভারত-সরকারের রাজস্ব পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনসাধন বিপজ্জনক হইবে।

সরকারী ব্যয় হ্রাসের কথা আলোচনা করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে এখন অর্থনীতি ক্ষেত্রের যে সম্প্রসারণ চলিতেছে তাহাতে শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত বিভাগগুলির ব্যয় হ্রাসের ফলে যে অর্থের সাশ্রয় হইবে উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি রূপায়ন বাবদ তাহা ব্যয় করা যাইবে। ব্যয় হ্রাসের ফলে এত অর্থ বাঁচিয়া যাইতে পারে যে, তাহাতে করের হার বিশেষ ভাবে হ্রাস করা সম্ভব হইবে এ কথা ঠিক নহে।

বাজেট বৎসরের শেষে সরকারের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ ৮৩ কোটিতে দাঁড়াইবে। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে ইহা অপেক্ষা দুই শত কোটি টাকা বেশী ছিল। ইহা হইতে মোটা টাকা অত্যাবশ্যক কারণে ও উন্নয়ন কার্য্যে ব্যয় করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে সঞ্চিত ও উদ্বৃত্ত আকারে টাকা মজুত রাখা হইবে না। দেশকে রাষ্ট্রকার্য্যে ব্যয় ও উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ব্যয়ের টাকা সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়া লইতে হইবে।

পরিশেষে অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রাণ-শক্তি কিছুমাত্র ভারগ্রস্ত না করিয়া শুধু মাত্র বিদেশের সাহায্যের ভিত্তির উপরে দেশের সমৃদ্ধি গড়িয়া তোলা যায় না। আমাদের জনগণের প্রচেষ্টায়ই আমাদের দেশের সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

অর্থসচিব শ্রীদেশমুখের মতে আন্তর্জাতিক মন্দার জন্য পাট, চট, তুলার রপ্তানী শুল্ক অসম্ভব কমিয়া যাওয়ায় ১৯৫২-৫৩ সালের রাজস্বের উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। ঐ সকল দ্রব্য হইতে আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ—

রপ্তানী শুল্ক (কোটি টাকার হিসাব)

	১৯৫০-৫১ প্রকৃত আয়	১৯৫১-৫২ বাজেট	১৯৫১-৫২ সংশোধিত বাজেট	১৯৫২-৫৩ বাজেট
পাট ও চট	২৬.১২	৩৬.০০	৫৭.০০	৪০.০০
তুলা	১.২০	৪.৫০	৭.৭০	৫.৫০
কাপড় ও সূতা	৩১	২.৫০	২.৩৫	২.৫০
চা	১১.২৪	১০.০০	১০.০০	১০.০০
গোলমরিচ	৪.২৬	৩.২৫	৪.০০	৩.০০
অন্যান্য কৃষিপণ্য	৪০	২৪	৫০	৪০
লোহা ও ইস্পাত	২১	১৮	১৫	১০
অভ্র	২৯	২১	৪০	২৫
তৈল ও তৈলবীজ	২	১.৫২	১.৫০	১.০০
পশম	১.৯৯	২.৮৫	১.২৫	৭৫
	৪৭.৩৬	৬২.২৫	৮৭.৭৫	৬৫.০০

সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা বর্ত্তমান বাজেটে পাট ও চটের রপ্তানী শুল্ক বাবদ ১৭ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে এবং তুলার দরুন মোট ২.২০ কোটি টাকা আয় কমিয়াছে। কিন্তু বহির্বাণিজ্যে মোট শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়াছে। আবগারী শুল্কও গত সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। নিম্নের হিসাব হইতে ইহা বুঝা যাইবে :

আবগারী শুল্ক

১৯৫০-৫১ (প্রকৃত আয়)	৬৭ কোটি	৫৪ লক্ষ টাকা
১৯৫১-৫২ (বাজেট)	৭৯ „	৬০ „ „
১৯৫১-৫২ (সংশোধিত বাজেট)	৮৪ „	৩০ „ „
১৯৫২-৫৩ (বাজেট)	৮৬ „	„ „ „

আয়কর হইতে ১৯৫২-৫৩ সালে রাজস্ব আদায় হইবে ১১৯ কোটি টাকা। পর পর দুই বৎসর আয়কর ১৩২ কোটি টাকা ধার্য্য করিয়া হঠাৎ এ বৎসর তাহা কমানো হইয়াছে এবং অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের মতে দেশ বর্ত্তমানে যেরূপ আর্থিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে আয়কর আরও হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা আছে।

বাজেটে মোট রাজস্ব ২০ কোটি টাকা সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা কম হইবে। কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা অনেক বাড়ানো হইয়াছে। এই খরচের খাতায়

গরমিলই দেশমুখের বড় কৃতিত্ব। যে সামরিক বিভাগ ইংরেজ রাজত্বকালে এত সমালোচনার বিষয় ছিল সেই সামরিক খাতে এখনও প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে। বস্তুতঃ দেশের মোট রাজস্বের মোটা অংশ এই একটি মাত্র বিভাগেই খরচ হইবে।

এই খরচ কমাইবার পথে অশেষ বাধা আছে সত্য, কিন্তু এখন সময় আসিয়াছে সে বিষয়ে চিন্তা করার। দেশরক্ষার ব্যাপারে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্র-নির্ম্মাণ শিক্ষা এখন নিতান্ত প্রয়োজন।

সমগ্র বাজেটের কোথাও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কোন আলোচনা নাই। অথচ ইহারই দোহাই দিয়া অনেক কিছু পাস করাইয়া লওয়া হইতেছে। পাঁচসালা বন্দোবস্তের কাজ এক বৎসরে কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহারও কোন বিবরণ নাই। পরিকল্পনায় স্থির হয় যে, ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক সরকার ব্যয় সঙ্কোচের দ্বারা অর্থ উদ্বৃত্ত করিয়া তাহার দ্বারা কমিশন-নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করিবেন। কিন্তু ব্যয়-সঙ্কোচের কোন আভাসই শ্রীদেশমুখের বক্তৃতায় পাওয়া গেল না। হীরাকুণ্ড, দামোদর ভ্যালি প্রভৃতি বিভিন্ন পরিকল্পনা ক্ষেত্রে অমিতব্যয়িতার চূড়ান্ত চলিতেছে। এ সকল ব্যাপারে যে পরিমাণ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন ছিল তাহা হয় নাই। ব্যয়-সঙ্কোচের কোন চেষ্টাও সেখানে করা হয় নাই, কারণ সরকার হইতে কোন প্রকার বাধা পাওয়ার আশঙ্কা তাহাদের ছিল না এবং বারংবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও কোন প্রকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই।

শ্রীদেশমুখ বলেন, দেশের আর্থিক সমতা রক্ষা করাই সরকারের একমাত্র কাম্য এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ভারত-সরকার তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এই ব্যাপারে বাজেট পলিসির উপর তাঁহারা যথেষ্ট নির্ভর করেন। কিন্তু বাজেটের রদবদল করিয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের পক্ষে সহজ হইলেও ভারতবর্ষের পক্ষে সহজ নহে। আমাদের দেশে ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান এখনও তেমন সুগঠিত নহে এবং তাহাদের প্রভাব ব্যবসা বাণিজ্যের উপর এখনও অতি সামান্য। মহাজনদের প্রভাবই অত্যন্ত বেশী এবং তাহাদের আইনের কবলে আনয়ন করার কোন ক্ষমতা ভারত-সরকারের ব্যাঙ্কের নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য নীতি এদেশে চলিতে পারে না। আমাদের এখানে সম্পূর্ণ অন্য ব্যবস্থাই গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্য সরকার যতই নিয়ন্ত্রণ ও অধিক ট্যাক্সের দ্বারা সমতা আনয়নের চেষ্টা করিতেছেন ততই তাহা বিফল হইতেছে। ইংলণ্ডের সোসা-লিষ্ট গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতে সক্ষম হইল না ভারত-সরকার তাহা কি ভাবে করিবেন? সর্ব্বপ্রকার কণ্ট্রোল ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া করভার হ্রাস করিয়া ব্যবসায়ে টাকা খাটাই-বার সুযোগ করিয়া দিলে দ্রুত কাজ পাওয়া যাইত বলিয়াই মনে হয়। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জোড়াতালি নিখুঁত করিতে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় দুইটিরই অভাব।

ভারত-সরকারের বৎসর শেষে নগদ তহবিলের যে শোচনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে ডাঃ মুখোপাধ্যায় তাহাই সংসদের সম্মুখে উত্থাপন করিয়াছেন। দেশ বিভাগের পর প্রথম সম্পূর্ণ বাজেটের সময় ভারত-সরকারের হাতে ২৭৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ছিল। এই মোট অর্থ হইতে ১৯৫০-৫১ সালের মধ্যে প্রায় ১৬০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়া মাত্র ৭৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট ছিল। ১৯৫২-৫৩ সালে বৎসর শেষে নগদ তহবিলে মাত্র ৮৩·০৮ কোটি টাকা থাকিবে। ইহার মধ্যে আবার বিদেশ হইতে ভারত-সরকার যে সকল সাহায্য পাইতেছেন তাহার বাবদ ৪০ কোটি টাকা আছে। অথাৎ ইংরেজ এ দেশ ত্যাগ করার সময় আমাদের প্রায় পৌনে তিন শত কোটি টাকার মত দিয়া গিয়াছিল এবং ১৯৫২-৫৩ সালে তাহার মধ্যে মাত্র ৪৭ কোটি টাকার মত অবশিষ্ট আছে। দেশ-মুখ বলিতেছেন যে, টাকাটা 'essential purpose'-এ ব্যয় করা হইয়াছে। কিন্তু এমন কোন কাজ দেখা যায় না যেখানে এ টাকাটার সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। খাদ্য উৎপাদন সেরূপ বাড়ে নাই, কৃষির উন্নতি হয় নাই, শিল্পের প্রসার হয় নাই, তবে কিসে এই অর্থ খরচ হইল? ইহার হিসাব-নিকাশ কাম্য।

ভারত-সরকারের বাজেটের একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, রেভেনিউ ও ক্যাপিটাল বাজেট এক সঙ্গে ধরা হয়। বিদেশে মূলধনের টাকা ব্যয়ের পরিমাণ ইদানীং যথেষ্ট বাড়িয়াছে। চলতি বৎসরে ভারত-সরকার মোট ২১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বিদেশে পাঠাইবেন। এতদ্ব্যতীত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যে টাকা বাহিরে যাইবে তাহার কোন হিসাব নাই। এই টাকার ৩০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে সাধারণ রাজস্ব হইতে, ১১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মূলধন বাবদ, ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ঋণ শোধ বাবদ এবং বাকী টাকা ঋণ ও ডিপোজিট একাউণ্ট হইতে দেওয়া হইবে। বিদেশ হইতে আমাদের রোজগার হইবে দুই কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। সুতরাং বিদেশে মোট ২১৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পাঠানো হইবে। ১৯৫২-৫৩ সালে রাজস্ব ও মূলধনে সম্মিলিত ভাবে আয় হইবে ৫৩৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইবে ৫৯৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ২১৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা সরকারের হাত দিয়াই বিদেশে যাইবে। ইংরেজ আমলে হোম চার্জ্জ রূপে যাহা দেওয়া হইত তাহা লইয়া কংগ্রেসীদের আন্দো-লনের সীমা ছিল না। আর আজ অন্য খাতে নিঃশব্দে এত টাকা বিদেশে যাইতেছে।

রেলের পূর্ণাঙ্গ বাজেট

গত ফেব্রুয়ারী মাসে তদানীন্তন রেলমন্ত্রী শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার যে বাজেট পেশ করিয়াছিলেন, নূতন মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে তাহার কোন বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নাই, শ্রীআয়েঙ্গারের উত্তরাধিকারী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী রেল শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত এক কোটি টাকা ব্যয়বৃদ্ধির উল্লেখ এবং মোট আয়-ব্যয়ে আনুষঙ্গিক পরিবর্তন সাধন করিয়া পুরাতন বাজেট নূতন লোকসভায় পাস করাইয়া লইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় রেলের পুনর্বিভাগ লইয়া বক্তৃতায় দীর্ঘ সময়ক্ষেপ করিয়াছেন। রেলওয়ের উত্তর, পূর্ব্ব-উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চল গঠন সম্পর্কে যে সকল সমালোচনা করা হইয়াছে সেগুলি বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করিয়া তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন রেলওয়ে ব্যবস্থাকে একত্রিত করিয়া উহাকে ছয়টি এলাকায় বিভক্ত এক সুসংহত রেল-ব্যবস্থা হিসাবে গঠন করার জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছিল, তাহা দেশবাসী সমর্থন করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার, ব্যবসায়, শিল্প, শ্রম প্রতিষ্ঠানসমূহ দক্ষিণ, পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় রেলওয়ে গঠন অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাকী তিনটি অঞ্চল গঠন লইয়া কোন কোন স্থানে তীব্র ও বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে।

রেলমন্ত্রী বলেন যে, গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫২) যখন রেলওয়ে দপ্তরের সাময়িক পরিকল্পনাটি প্রচার করা হইয়াছিল, তখন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগণ নিজেদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন এবং ঐ সকল রাজ্যের ব্যবসায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সম্পর্কে কতকগুলি সুপারিশ করেন। ঐ সুপারিশগুলি ছিল পরস্পরবিরোধী এবং উহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সঙ্গতিস্থাপন সম্ভবপর ছিল না। যাহাতে ঐ সুপারিশগুলি বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখা হয় এবং একটি সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা হিসাবে সমগ্র রেলওয়ের কর্মকুশলতা রক্ষা ও উন্নয়ন করা যায় এমন একটি পরিকল্পনা রচনা করা তখন সরকারের চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেন, এই মধ্য পর্যন্ত আশা করা যায় যে, দেশবাসী জাতির ঐক্য ও সমৃদ্ধির জন্য সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোবৃত্তি পরিহার করিতে পারিবে।

পূর্ব্ব-উত্তর রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার্স সম্পর্কে তিনি বলেন, ও. টি. এবং আসাম রেলওয়ে একত্র করিয়া এই রেলওয়ে গঠন করা হইয়াছে, এই রেলওয়েটি সম্পূর্ণ ভাবে মিটার গেজ রেলওয়ে। মিটার গেজ রেলওয়ে ছাড়া অন্যত্র উহার হেড কোয়ার্টার্স স্থাপনের প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

এলাহাবাদ ডিভিসনের উত্তরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি লইয়া মতভেদ দেখা দিয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহে এই বিষয় লইয়া সংবাদপত্রে অনেক লেখালেখি হইয়াছে। উহার ভিত্তি হইল ওয়েজ উড্ ও কুঞ্জরু কমিটির অভিমত। সরকার ঐ সকল অভিমত অতি যত্নসহকারে বিচার-বিবেচনা করিয়া, এলাহাবাদ ডিভিসন উত্তর রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কারণ কমিটির সুপারিশের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যাহা সম্ভব তাহাই করা হইয়াছে।

শ্রীলালবাহাদুর বলেন, প্রধানতঃ কয়লাখনি অঞ্চলে পর্য্যাপ্তসংখ্যক ওয়াগন সরবরাহের জন্যই কেহ কেহ এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ ডিভিসন দুইটিকে এবং সম্ভবতঃ মোরাদাবাদ ডিভিসনকেও পূর্ব্ব রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত রাখার জিদ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল যে, ঐ দুইটি বা তিনটি ডিভিসন পূর্ব্ব রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত হইলে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধন সহজ হইবে। ইঁহারা স্বীকার করেন যে, ঐ তিনটি ডিভিসনের ওয়াগনের সংখ্যা একত্রে ৪০০০-এর অধিক হইবে না। অথচ মোগলসরাইতে প্রত্যহ এক হাজার ওয়াগনের প্রয়োজন হয়, এবং তাহাও আবার ঐ তিনটি ডিভিসনের অন্যান্য পণ্যবোঝাই নিয়ন্ত্রিত করিয়া। ভারতের সম্মিলিত রেলওয়ে এইরূপ সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী হইয়া কাজ করিবে, না এই তিনটি ডিভিসনের বরাবর ক্ষতি সাধনের দ্বারা এই অবস্থা স্থায়ী করিয়া রাখিবে, তাহা বিবেচনা করা দরকার। রেলওয়ে মন্ত্রী বলেন, সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে রেলওয়েসমূহের সংহতি বিধান হইলে এবং সকল অঞ্চল নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইলে দেশের কয়লা চলাচল ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত হইবে। এজন্য রেলওয়ে বোর্ডের একজন ডেপুটি ডিরেক্টরকে মোগলসরাইতে নিযুক্ত করা হইয়াছে। যাহাতে কয়লাখনি অঞ্চলে যথেষ্টসংখ্যক ওয়াগন ফিরিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি সকল অঞ্চলের রেলওয়ে ও রেলওয়ে বোর্ডের সহিত সর্ব্বদা যোগাযোগ রাখিবেন।

শিয়ালদহ বিভাগ সম্পর্কে যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, পূর্ব্বোত্তর রেলওয়েকে কলিকাতায় প্রবেশের একটা রাস্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অস্থায়ী পরিকল্পনায় এই বিভাগটি উক্ত রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব হয়। বাংলা-সরকার ও ব্যবসায়ী মহল ইহার প্রতিবাদ করেন। বাংলার ব্রড গেজ রেল ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে এই বিভাগটি পূর্ব্ব রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত রাখা হউক বলিয়া বাংলা যে দাবি করিয়াছে বিশেষ বিবেচনার পর ভারত-সরকার তাহা মানিয়া লইয়াছেন। কলিকাতা বন্দরে মাল চলাচল ও যাত্রী যাতায়াত অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে রেলওয়ে বোর্ডের একজন অফিসার কলিকাতায় রেল চলাচলের অধিকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এই অঞ্চলের যাত্রী ও মাল চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

লোকসভায় সদস্য ও জনসাধারণকে এই বিষয়টি নিরপেক্ষ

দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণপূর্ব্বক দেখিবার আবেদন করিয়া তিনি বলেন, সকলেই দেখিতে পাইবেন যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য এই সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আরও বলেন যে, যাঁহারা রেলের পুনর্বিন্যাসের বিরোধিতা করিতেছেন তাঁহারা ক্ষুদ্র প্রাদেশিক স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াই সেরূপ করিতেছেন—দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি তাঁহারা দৃষ্টি দিতে পারিতেছেন না।

অপরকে দোষারোপ করিয়া নিজের অপরাধ কালন করার মত নির্লজ্জতা আর কিছু হইতে পারে না। ২৭শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণার পর রাতারাতি একটি বিশেষ প্রদেশের স্বার্থের জন্য যেভাবে সমগ্র পরিকল্পনাটির পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই ভাল বলিতে পারিবেন প্রাদেশিকতা কোথায় কি ভাবে কাজ করিতেছে।

সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে মাত্র তিনটি বিষয়েই বিরোধিতার উদ্ভব হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব্ব রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার্স কলিকাতায় না হইয়া গোরক্ষপুর করায়, শিয়ালদহ ডিভিসনকে নবগঠিত পূর্ব্ব-ভারতীয় রেলওয়ের সহিত যুক্ত করায় এবং এলাহাবাদকে উত্তর বিভাগের সহিত জুড়িয়া দেওয়ায় বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রথম অভিযোগের উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, এই রেলওয়েটি সম্পূর্ণ ভাবে মিটার গেজের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মিটার গেজের রেলওয়ে ছাড়া অন্যত্র উহার হেড কোয়ার্টার্স স্থাপনের প্রশ্ন উঠে না। এইরূপ অদ্ভুত যুক্তি আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার দ্বারা রেলওয়ে বোর্ডের নিজের কাজেরই কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। নবগঠিত দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথটিতে মিটার, ব্রড ও ন্যারো গেজ এই তিন প্রকার লাইনই আছে। কিন্তু তথাপি সেখানে একটি মাত্র হেডকোয়ার্টার্স করা হইয়াছে। যদি তাঁহাদের গঠিত এক রেলওয়েতে ইহা কার্য্যক্ষম হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন তবে অন্য বিভাগেই বা কেন তাহা হইতে পারে না? এতদ্ব্যতীত আসাম রেলওয়ে সম্পূর্ণ একটি মিটার গেজ পথ। কিন্তু পুনর্গঠনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার ব্রড গেজ ষ্টেশনের হেডকোয়ার্টার্স কলিকাতায় ছিল এবং তাঁহাদের রেল পরিচালনা ত্রুটিপূর্ণ ছিল বলিয়া কোনও অভিযোগ হয় নাই।

এলাহাবাদ ডিভিসনকে উত্তর রেলপথের সহিত যুক্ত করা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার পটভূমিকাতে যতদূর সম্ভব ওয়েজউড ও কুঞ্জরু কমিটির সুপারিশ অনুসারেই তাঁহারা নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মাত্র দুই বৎসর হইল কুঞ্জরু কমিটি তাঁহাদের সুপারিশ পেশ করেন। এত অল্প দিনের মধ্যেই যদি ইহাদের প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে বিশেষ চিন্তার কথা। যে কোন পরিকল্পনাই কার্য্যে পরিণত হইতে কিছু সময়ের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া আশা করা যায় না, সুতরাং এত অল্পদিনের মধ্যে কুঞ্জরু কমিটির রিপোর্টকে বাতিল করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য সহজেই বোধগম্য হয়। অথচ কুঞ্জরু কমিটিকে সরকারই নিযুক্ত করেন। এই ভাবে যদি বিশেষজ্ঞদের অভিমতকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয় তাহা হইলে বিভিন্ন প্ল্যানিং কমিশনের পশ্চাতে দেশের লোকের রক্ত-শোষিত অর্থ বিসর্জ্জন দেওয়ার সার্থকতা কোথায়? দেশবাসী সরকারের কথারই বা কি করিয়া আস্থা রাখিতে পারে?

এলাহাবাদ ডিভিসন উত্তর রেলপথের সহিত যুক্ত হইলে কয়লা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চলাচলে বিঘ্ন ঘটিবে এই অভিযোগের উত্তরে শ্রীশাস্ত্রী বলেন যে, সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে রেলওয়েসমূহের সংহতি বিধান হইলে এবং সকল অঞ্চল নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইলে দেশে কয়লা চলাচল ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত হইবে। কিন্তু এলাহাবাদ ডিভিসন উত্তর বিভাগের সহিত যুক্ত না হইয়া পূর্ব্ব অঞ্চলের সহিত থাকিলে তাহাতে কোন বাধা হইত কি, না আরও অল্প খরচে সুষ্ঠু ভাবে কাজ হইত তাহাই প্রশ্ন। সমগ্র মাল চলাচলের শতকরা ৪৫ ভাগ একমাত্র পূর্ব্ব রেলপথে হয়। সুতরাং এখানে চাপ অত্যন্ত বেশী হইবে। যদি উত্তর রেলওয়ে সময়মত খালি ওয়াগন পাঠাইবার ও সরাইবার ব্যবস্থা না করিতে পারে তবে মাল চলাচলের যথেষ্ট অসুবিধা হইবে। মোগলসরাই টার্মিনাস ষ্টেশনরূপে এত খালি ওয়াগনের স্থান দিতে পারিবে না। সুতরাং উত্তর রেলপথের সামান্ত গাফিলতির জন্য সমগ্র দেশের আর্থিক দুর্দশার সৃষ্টি হইবে। ইতিমধ্যেই পূর্ব্ব রেলওয়ে অঞ্চলে কয়লা চলাচলে যে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

রেলসচিব মহাশয় বলেন যে, পুনর্গঠন ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্ব্বে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের সরকার, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তিনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, এই অনুমোদন দেওয়া হইয়াছিল মূল পরিকল্পনাটিতে—আয়েঙ্গার-রচিত প্ল্যানে নহে। কলিকাতার প্রায় সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, বেতনভোগী কর্মচারী, জনসাধারণ সকলেই এই নূতন ব্যবস্থার বিরোধিতা করিতেছেন এবং তাঁহারা সকলেই একটি নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ কমিটির নিকট বিষয়টি পুনরালোচনার জন্য পাঠাইবার আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ নিছক প্রাদেশিকতার বশে, ভোটের জোরে, সমস্ত তর্ক-বিতর্ক উপেক্ষা করিয়া রেল-বাজেট পাস করিয়া লইলেন।

বাংলার দাবি মানিয়া করকায় রেল ব্রীজ তৈয়ারী স্বীকার

করা হইয়াছে। বিহারের দাবি মানিয়া মোকামায় আর একটি ব্রীজ তৈয়ারী হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। যাহা হউক, গঙ্গায় যত বেশী ব্রীজ হয় ততই ভাল—এইরূপ ব্রীজের দরকারও যথেষ্ট আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রাধান্য দিতে হইবে ফরক্কায়, কারণ এই পথ ব্যতীত আসামের সহিত যোগাযোগের অন্য পথ নাই এবং ফরক্কায় বাঁধ ও সংযুক্ত খাল দিলে গঙ্গায় মোগলসরাই পর্য্যন্ত ষ্টীমার চলিবে। তাহা হইলে দেশবাসী লালবাহাদুর ও গোপালস্বামীর চরম অদূরদর্শিতার অভিশাপ হইতে অংশতঃ মুক্তি পাইবে।

খাদ্য সমস্যা

গত ৬ই জুন এক বেতার বক্তৃতায় মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালাচারী ঘোষণা করেন যে, মাদ্রাজ রাজ্যের সর্ব্বত্র খাদ্যশস্যের সরকারী রেশন-ব্যবস্থা অবিলম্বে রহিত হইবে। তিনি বলেন, "বিশেষরূপে বিবেচনার পর আমরা একটি বিনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বিন্যাস করি; কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর সহিত এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা হয়। এক্ষণে ভারত-সরকার এই পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা সঙ্গে সঙ্গে বলবৎ হইবে।"

তিনি বলেন যে, মাদ্রাজ রাজ্য ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত হইবে। প্রত্যেকটি অঞ্চলের সহিত এক বা দুইটি উদ্বৃত্ত জেলা জুড়িয়া দেওয়া হইবে। উদ্বৃত্ত জেলাগুলি প্রকাশ্য বাজার মারফত সংলগ্ন ঘাটতি জেলাসমূহের প্রয়োজন মিটাইবে। এই সব অঞ্চলের মধ্যে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য ও খাদ্যশস্যের আমদানী-রপ্তানী চলিবে।

তিনি স্পষ্টভাবে জানান যে, প্রকাশ্য বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য অথবা কোন ক্রেতার বা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয়যোগ্য চাউলের পরিমাণ সম্পর্কে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল থাকিবে না। তবে যাহাতে জনসাধারণকে আকস্মিক অসুবিধা ও দুর্গতি ভোগ না করিতে হয় তদুদ্দেশ্যে—প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে—গবর্ণমেণ্ট ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের দোকান মারফত খাদ্যমূল্য ও বিক্রেয় খাদ্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সাড়ে চারি লক্ষ টন চাউল মজুত আছে, তাহা জরুরী অবস্থার জন্য সংরক্ষিত হইবে। আগামী বৎসরে উদ্বৃত্ত জেলাগুলিতে সহজ পদ্ধতিতে দেড় লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হইবে। কয়েকটি রেশনের দোকান খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ন্যায্য দরে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের দোকান হিসাবে চালু থাকিবে। তাহা ছাড়া আমদানী গম এবং চিনিও অবাধে বিক্রয় করা হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সব সরবরাহ করিবেন এবং পাইকারী সমবায় সমিতিসমূহের মারফত তাহা বিক্রয় করা হইবে।

তিনি বলেন যে, এক একটি অঞ্চলের মধ্যে খাদ্যশস্য অবাধে আনা-নেওয়া চলিবে; কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পূর্ব্ব প্রদত্ত অনুমতি ছাড়া খাদ্যশস্য আনা-নেওয়া যাইবে না।

তিনি অতঃপর বলেন যে, জনসাধারণ যদি সতর্ক হয় এবং অপচয় না করে তাহা হইলে কুলাইয়া যাইবার মত প্রচুর খাদ্য দেশে আছে। তিনি সকলকে সংযত হইতে, লোভ পরিহার করিতে এবং সৎ, ধর্ম্মভীরু ও স্বদেশপ্রেমিক হইতে অনুরোধ করেন।

শ্রীরাজাগোপালাচারীর এই প্রচেষ্টা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ মনের পরিচায়ক। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত জনসাধারণের মনে যে স্বস্তির ভাব ফিরাইয়া দিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা রাজাজীর সহিত একমত যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে দেশে খাদ্যের ঘাটতি হইতে পারে না। রাজাজীর প্রচেষ্টা অচিরেই ফলপ্রদ হউক ইহাই বাঞ্ছনীয়। সংবাদে প্রকাশ যে, ইতিমধ্যেই মাদ্রাজে খাদ্যশস্যের মূল্য কমিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মাদ্রাজে খাদ্যাবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেও খাদ্যাভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাস দেখা দেয়। অবস্থা মাদ্রাজের মত তত সাংঘাতিক না হইলেও অচিরে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে অদূরভবিষ্যতে যে ঐরূপ হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। মাদ্রাজ সরকার অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেন। বাংলার খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত-সরকারের খাদ্যমন্ত্রী মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই পশ্চিমবঙ্গের দুর্গত অঞ্চল সফরে আসেন। তাঁহার সফরের উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাজের ব্যবস্থা এখানে প্রবর্ত্তন সম্ভবপর কিনা তাহা লক্ষ্য করা। তিনি পশ্চিমবঙ্গের দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন ও বাংলা-সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। গত বৃহস্পতিবার কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব কিদোয়াই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যনীতির গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী শিল্পাঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের জন্য খাদ্যশস্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলগুলিকে এইজন্য বেষ্টনীদ্বারা (কর্ডন) রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতে পৃথক করা হইবে। তিনি আরও বলেন যে, কলিকাতার রেশন-ব্যবস্থার মারফত সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক লক্ষ টন চাউল দিবেন। তাহা ছাড়া বৃহত্তর কলিকাতার অধিবাসীদের জন্য সরকার মনোনীত দোকান মারফত তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী চাউল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে

কেন্দ্রীয় সরকার আমদানীকৃত চাউল হইতে আরও এক লক্ষ টন চাউল সরবরাহ করিবেন। ঐ চাউল মণপ্রতি ত্রিশ টাকা হইতে বত্রিশ টাকা দরে বিক্রয় করা হইবে।

দ্বিতীয়তঃ জনাব কিদোয়াই বলেন যে, খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে রাজ্য সরকার এমন একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন যাহার ফলে বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্টাংশে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে বিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই বলবৎ হইবে। দুর্গত অঞ্চলে দুঃস্থ অধিবাসীদের কষ্ট লাঘবের জন্য সরকারী মজুত চাউল সরকার-মনোনীত দোকান হইতে ১৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হইবে। প্রোকিউরমেণ্টের জন্য সরকার হইতে লেভি প্রথার প্রবর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার ফলে যে কৃষক পনর একর জমি চাষ করিবে তাহার নিকট হইতে বাধ্যতা-মূলকভাবে উৎপন্ন শস্যের একাংশ সংগৃহীত হইবে। অবশেষে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বিভিন্ন জেলার মধ্যে কর্ডন ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইবে।

মাদ্রাজে রাজাজীর ন্যায় আমরাও মনে করি যে, বাংলা-দেশে খাদ্যের ঘাটতি নাই। কতকগুলি মুনাফাখোর জোতদার ও আড়তদারের পাল্লায় পড়িয়া, দেশে এক কৃত্রিম খাদ্যা-ভাবের সৃষ্টি করিয়া মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে মাত্র। সরকারের প্রোকিউরমেণ্ট ব্যবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ কর্ডন ব্যবস্থা ও কতকগুলি দুষ্ট লোকের লোভের ফলেই বাংলাদেশে খাদ্যের আজ এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

খাদ্য সমস্যার কোন প্রকার প্রতিকার করিতে হইলে এই প্রোকিউরমেণ্ট ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। বিভিন্ন জেলা-গুলিকে বাড়তি ও ঘাটতি অঞ্চল বলিয়া যে ভাবে ভাগ করা হইয়াছে তাহার পরিবর্তন হওয়া দরকার। এভাবে পরিবর্তন করিয়া আমাদের এখানেও মাদ্রাজের মত সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করিয়া ফেলা দরকার। তারপর সেখানে সরকারের অনুমোদিত ব্যবস্থা মত 'কেয়ার প্রাইস' দোকান করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই দোকান মারফত সস্তায় খাদ্য বিলি করা যাইবে। গরীবেরা এই দোকানের সুবিধা পাইবে। চাউলের বরাদ্দ সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধ্যতা না থাকিলে এবং ইচ্ছাকৃত ক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে রেশনের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। অপর পক্ষে প্রাদেশিক কর্ডন রক্ষা করিয়া অন্য সকল কর্ডন তুলিয়া দিলে প্রদেশের সর্বত্র চাউলের স্বাভাবিক বেচাকেনা আরম্ভ হইবে। তাহাতে চাউলের দর কোথাও উঁচু কোথাও নীচু না থাকিয়া সর্বত্র একটি অঙ্কে আসিয়া স্থির হইবে।

শিক্ষার্থীর কর্তব্য

সম্প্রতি হাওড়া যুব-ছাত্র-কংগ্রেস-সভার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা সমস্যার ঠিক মর্মস্থানটিতে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। অধ্যাপক মহাশয় বলেন :

"শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া মানুষ এক ভীষণ অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। মানুষের কর্তব্য কি, কি ভাবে জীবনে সুখ-শান্তি ফিরিয়া আসে, সে বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ এখন আমাদের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিতেছে। পৃথিবীর শক্তিশালী জাতির মানুষেরা এখন একাধিক দল বা গোষ্ঠিতে বিভক্ত। আমাদের দেশের মধ্যেও নানা রাজনীতিক, অর্থনীতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দল বিদ্যমান। এই সকল দলের লোকেরা দেশের যুব-শক্তিকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছাত্র ও যুবকগণ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। সকলের মনের মধ্যে এই প্রশ্ন—পথ কোথায়? কোন্ পথ?

"ছাত্র ও যুবকগণই দেশের আশাস্থল। কারণ, ভবিষ্যৎ তাহাদের লইয়াই। আজ তাহারা যে ভাবের ভাবুক এবং যে কর্মধারার ধারক, কাল সেই ভাব আর কর্মধারার ভিত্তিতেই জাতি এবং তাহার কার্য্যকারিতা ও শক্তি অথবা তাহাদের বিপরীত গড়িয়া উঠিবে।

"দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন কেহই থাকিতে পারে না। দেশের অর্থাৎ দেশের জনগণের কল্যাণ চিন্তা করা, মঙ্গলসাধন করা সকলেরই প্রধান কর্তব্য। কোন্ পথে এই কল্যাণ আসিতে পারে, যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। বিশেষ ভাবে তাহা জ্ঞান ও দর্শন, বিচার ও চিন্তাসাপেক্ষ। অভিজ্ঞতাও ইহাতে বিশেষভাবে অপেক্ষিত।

"ছাত্রজীবনের ও যুবজীবনের আদর্শ কি? আমাদের দেশের মনীষীরা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, পাপ আর কিছুই নয়, পাপ হইতেছে অজ্ঞান। 'অজ্ঞানং পাতকং মহৎ।' মানুষ অন্যায় করে, সত্যকার জ্ঞান তাহার নাই, এই জন্যই।

"ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাই ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য হইতেছে—জ্ঞানার্জন করা। 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।' অতন্দ্র হইয়া ছাত্র-জীবনে জ্ঞানের সাধনা করাই ছাত্রের কর্তব্যসাধন। এই জ্ঞানকে সর্বতোমুখী করিতে হইবে। ছাত্রজীবনের পরিপূর্ণতার জন্য দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, এই তিনটি সদ্‌গুণ বা বৃত্তি অপরিহার্য্য। এই ভীষণ প্রমাদ-কালে যেন অপ্রমাদ বজায় থাকে।

"মানুষের জগতের সব জিনিষ নিজ অধিকারের জ্ঞান বিচার করিয়া, তাহার মধ্যে যাহা শাশ্বত, যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাকে আত্মসাৎ করিবার প্রবৃত্তিই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির প্রকাশ হয়—মানুষে মানুষে পরস্পরের মধ্যে কি ভাবে ব্যবহার করিবে, তাহাতে। ছাত্রদের চরিত্রনীতি হিসাবে কতকগুলি কথা বলিতে চাহি—সব ব্যাপারে যুক্তি, বিচার,

নিবেক খাটাও, নিজেকে জান, পরকে আপন কর, পরিশ্রম হইতে বিরত হইও না, অপরের শ্রমের মূল্য না দিয়া নিজের সুবিধা করিও না।

"আর একটা কথা—ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া নিজের সত্তা হারাইও না।

"মানুষের মধ্যে মানব-সাধারণও আছে, আবার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও আছে; দুইটিই মূল্যবান্। একটিকে হারাইলে, জীবনে খোঁড়াইয়া চলিতে হয়।

"জাতীয়তাবাদ মানুষকে আত্মত্যাগে ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে, দেশরক্ষায় প্রণোদিত করে। এই জাতীয়তাবাদ যদি অন্ধ অহঙ্কার বা আত্মম্ভরিতা-প্রসূত হয়, অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞা যদি ইহার মূল হয়, তাহা জগতের পক্ষে বিপজ্জনক হয়।

"আমি ৩৮ বৎসর ধরিয়া শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছি। আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার গভীরতম আন্তরিক প্রার্থনা, আমাদের যুবশক্তি প্রাণবন্ত হউক, কল্যাণের উৎস হউক।"

সুনীতিবাবুর প্রার্থনা দেশের যুব-শ্রেণীকে অকল্যাণের পথ হইতে সৎপথে পরিচালিত করুক।

বালুরঘাট কলেজ

নিম্নোক্ত মন্তব্যটি "আত্রেয়ী" মাসিক পত্রিকার ১৩৫৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সম্পাদকীয় মন্তব্যটির সারবত্তা স্বীকার করি।

"নব-প্রতিষ্ঠিত বালুরঘাট কলেজ বালুরঘাট জনসাধারণের একনিষ্ঠ কর্ম, সাধনা ও আত্মত্যাগে গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৪২-এর আগষ্ট বিপ্লবে বালুরঘাটের জনসাধারণের নিকট হইতে যে পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়, তাহার একটি বৃহৎ অংশ বালুরঘাট কলেজ লাভ করিয়াছে। কলেজটি গঠনের মুখে শহরের বিদ্যোৎসাহী কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি অবৈতনিক অধ্যাপনার কার্য্য এবং অধ্যক্ষের কার্য্য পরিচালনা করিয়া অকুণ্ঠভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন। কলেজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কলেজের উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। ইঁহাদের ত্যাগের ইতিহাস বালুরঘাটনিবাসী চিরকাল কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে।

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলেজটিকে তিনসালা পরিকল্পনার মধ্যে গ্রহণ করায় কলেজের বিজ্ঞান বিভাগেরও আশাতীত উন্নতি হইয়াছে।

"আমরা কলেজটির প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। তবে ইহার পরিচালনায় কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হইলে তাহা সংশোধনের নিমিত্ত ও জনস্বার্থের খাতিরে আলোচনা করা কর্ত্তব্য মনে করি।

"গণস্বার্থের প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণকল্পে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং কলেজ পরিচালন ব্যাপারে নিয়মতন্ত্রের সামান্যতম শৈথিল্য ও ব্যতিক্রম যে কোন মুহূর্ত্তে মহা অনর্থ ঘটাইতে পারে এবং ছোটখাটো নিয়মভঙ্গের উৎসাহ ও শক্তির পরিশেষে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে।

"বালুরঘাট কলেজে যাহাতে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হয়, সেই উদ্দেশ্যে কলেজের একটি সাম্প্রতিক ঘটনা জনসাধারণের গোচরীভূত করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। ঘটনাটি বালুরঘাট কলেজে ঘটিতে দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইয়াছি। বালুরঘাট কলেজের গঠনতন্ত্র এমনভাবেই বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, জনপ্রতিনিধি মারফত জনসাধারণের বক্তব্য পেশ করিবার কোন ব্যবস্থাই রাখা হয় নাই। তবে মন্দের ভাল, জনসাধারণের মধ্য হইতে মাত্র দুই জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকে কার্য্যকরী সমিতির অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণের ভোট দ্বারা সদস্য নির্ব্বাচিত (co-opt) করিবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম, কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহাশয় কার্য্যকরী সমিতির সভায় সদস্য নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্তের (co-opt-এর) অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্বেই দুই ভদ্রলোককে গ্রহণ করিয়া 'কনফারমেশন' লইবার জন্য কার্য্যকরী সমিতির সভায় উপস্থিত করাইয়াছেন।..."

লোকশিক্ষা

"গণভারতী"র গত বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার উপরোক্ত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

সত্যেন মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধে আক্ষেপ আছে; সোভিয়েট ইউনিয়নের গণশিক্ষার উন্নতির বর্ণনা আছে; স্বামী বিবেকানন্দের কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। স্বামিজীর দিগ্‌দর্শন যে এই বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়াছিল, তাহা অজানা নয়। তবুও ৫০ বৎসরের মধ্যে আমরা বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই তাহাও সত্য। সত্যেন-বাবু যাহা বলিয়াছেন, তদপেক্ষা কঠিন ভাষায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ে আমাদের নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি আপনি মাষ্টার সাজিয়া সকলকে শিক্ষাব্রতে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, কবি, সংগঠক, সাংবাদিক। আমরা কেবল সাংবাদিকতা লইয়াই পড়িয়া আছি। অবশ্য সংবাদপত্রসেবীও পরোক্ষে গণশিক্ষক। কিন্তু একাধারে শিক্ষা ও কূটরাষ্ট্রনীতি চলে না। সে অভিজ্ঞতা উনিশ ও তাহার পরবর্ত্তী বেশ শতাব্দীর ভারত-ভাগ্যনিয়ন্তা, দেশী ও বিদেশী ভাগ্যান্বেষীবর্গ, আমাদের দিয়া গিয়াছে। 'বিলাতী সাহেব' সাজিয়া আমরা ভারতভূমিকে রিক্ত করিয়াছিলাম, রুশীয় "টৌভারিস" সাজিতে গিয়া কোথায় চলিয়াছি?

ডাক ও তার বিভাগের পুনর্বিন্যাস

ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ কলিকাতায়

পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপ কলিকাতা হইতে তুলিয়া জব্বলপুর ও বাঙ্গালোরে স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে আলীপুর ওয়ার্কশপের পাঁচ সহস্র কর্ম্মচারীর চাকুরী লইয়া টানাটানি সুরু হইবে।

আলীপুরের ডাক ও তার বিভাগীয় কারখানা সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ ঐ জাতীয় কারখানা। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের যাবতীয় 'কলকব্জা' এখানে প্রস্তুত হয়। সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে এশিয়ার সর্ব্ববৃহৎ কারখানাটি একটি মামুলী কারখানায় পরিণত হইবে।

দক্ষিণ কলিকাতার আলীপুর অঞ্চলে ২৪৮নং লোয়ার সার্কুলার রোডে এই বিরাট কারখানাটি অবস্থিত। এই কারখানাটির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপ। প্রায় আড়াই হাজার ব্যক্তি এখানে কাজ করে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের ছোট-বড় যন্ত্রাদি এখানে প্রস্তুত হয়।

তৈরী যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হয় ষ্টোর্স হইতে। এই ষ্টোর্সেও দেড় হাজার ব্যক্তি কাজ করে।

ইহার পর আছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চীফের অফিস—এখানকার কর্ম্মচারীর সংখ্যা দেড় শত। এখানে তৈরী যন্ত্রাদি পরীক্ষা করা হয়।

টেলিগ্রাফ ষ্টোর্সের চীফ কন্ট্রোলারের অফিসের কর্ম্মচারী-সংখ্যা দুই শত। আগ্রা, জব্বলপুর, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের ষ্টোর্সের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এই অফিস হইতে। ভারতের সকল ডাক ও তার বিভাগীয় ষ্টোর্সের ইহাই হইল হেড কোয়ার্টার।

পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপসমূহের জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের কর্ম্মচারী সংখ্যা দুই শতাধিক। এই অফিস সকল ডাক ও তার বিভাগীয় কারখানার রক্ষণাবেক্ষণ করে। একাউণ্টস অফিসের কর্ম্মচারীর সংখ্যাও শতাধিক।

সরকার যে নতুন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে এই সুবৃহৎ কারখানাটিকে শুধুমাত্র কলিকাতার উপযোগী যন্ত্রাদি সরবরাহ করিতে হইবে। এই নূতন ব্যবস্থানুসারে কারখানার নির্ম্মাণ বিভাগ (কনস্ট্রাকশন ব্রাঞ্চ) সম্পূর্ণ উঠিয়া যাইবে এবং যন্ত্র বিভাগ (ইনস্ট্রুমেণ্ট ব্রাঞ্চকে) আরও ছোট করিয়া বাকীটাকে বাঙ্গালোরে পাঠান হইবে। বাঙ্গালোরে ইংরেজ মালিকের অর্থে পুষ্ট ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফ ইণ্ডাস্ট্রিজ খোলা হইয়াছে। অতঃপর যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের দায়িত্ব ইহার উপর দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত সরকার আলীপুরস্থ ষ্টোর্সটি যথাসম্ভব ছোট করিয়া আসাম ও উত্তর বাংলার কার্য্যের জন্য কাটিহার (বিহার) এবং দক্ষিণাঞ্চলের জন্য বাঙ্গালোরে দুইটি ডিপো স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কারখানা এবং ষ্টোর্স উঠিয়া যাওয়ার ফলে অন্যান্য অফিসগুলিও ক্রমশঃ উঠিয়া যাইবে। ফলে রেলওয়ে পুনর্গঠন প্রস্তাবের দরুন যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হইবে। আলীপুরের শ্রমিকমহলে ইতিমধ্যেই রীতিমত বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। এই বিবরণটি পাঠ করিয়া একটা কথা মনে হয়। 'নাই কাজ তো খই ভাজ'। এই পরিবর্ত্তনের পক্ষে ও বিপক্ষে কি যুক্তি আছে, তৎসম্বন্ধে একটা সরকারী বিবৃতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। জব্বলপুর ও উজ্জয়িনী নগরীর সন্নিকটস্থ অঞ্চলে ভারতরাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত করা হউক, এরূপ প্রস্তাবও বিধান পরিষদে করা হইয়াছে। কংগ্রেসের চাই ও তাহাদের চেলা ও চাটুকারবর্গের পোষণের জন্য চাকরী ও কাজ তো প্রয়োজন।

কৃষক-মজুর

সেদিন কলেজ স্কোয়ার ষ্টুডেণ্টস হলে কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় কৃষক-মজুর শ্রেণীর দুঃখে কবিজনোচিত ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, আমরা সকলেই তাহাদের শোষণ করিতেছি। কবিরা বা চারণেরা তাহাদের শোষণ করেন কিনা, সেই প্রশ্ন তাঁহাকে সেই সময়ে কেহই করেন নাই।

আজকাল কৃষক-চাষীর জন্য ক্রন্দন ও কুম্ভীরাশ্রুপাত এক শ্রেণীর লোকের বাঁধাবোল দাঁড়াইয়াছে। অথচ বর্ত্তমানে জমির মালিক-চাষী এবং দক্ষ মজুর তাহাদের জীবনযাত্রা অনেক সুগম করিয়াছে ও জীবিকার মান ঊর্দ্ধমুখী হইয়াছে। মরিতেছে সেই মধ্যবিত্ত, যে সারা জগতে সমাজের উন্নয়ন করিয়াছে। মানবজগতের সকল উন্নয়ন, সকল স্বাতন্ত্র্যমুখী প্রয়াসের মূলে রহিয়াছে এই মধ্যবিত্ত সমাজের চিন্তার ধারা, শোণিত তর্পণ। আজ শোষিত নিষ্পেষিত সেই-ই।

কবি বিজয়লাল রমাঁ রলাঁর ভক্ত। সেই জন্য তাঁহাকে ক্লেরাম্বো বোর্ট-এ বর্ণিত কৃষক-প্রকৃতির স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। "যখন কৃষক কোন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে তখন সে কেবলই অভিযোগ করিয়া থাকে; ইহা তাহাদের অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। এই অভ্যাসের একমাত্র কারণ মনে হয় যে, সে ভয় করে যে হয়ত তাহার নিকট কোন সৎকার্য্যে দেয় টাকার জন্য হাত পাতা হইবে।"

এই মনোভাবের কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করা যায়। তাহার পক্ষে যুক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু এখানে সে চেষ্টা করিব না। কৃষকের প্রকৃতি সম্বন্ধে একজন বিদেশী সাহিত্য-রথী ও চিন্তানায়ক কি বলেন, তাহা সাধারণ পাঠকগণকে জানাইয়া দিলাম, যাহাতে তাঁহারা যথাযথ বিচারে সমর্থ হইতে পারেন।

জাপানের পূর্ণ সার্ব্বভৌমত্ব লাভ

যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সহিত আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধ অবসান করিয়া শান্তি স্থাপন করিয়াছে।

স্বল্পকালস্থায়ী একটি অনুষ্ঠানের পর ২০শে বৈশাখ জাপ-শান্তিচুক্তি কার্য্যকরী করা হয়। ইহার ফলে জাপানে মিত্রপক্ষীয় দখল শেষ হইল ও জাপান পূর্ণ সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী হইল।

চুক্তি বলবৎ হওয়ায় দ্বিতীয় মহাসমরের অবসান ঘোষণা করা হইল।

জাপান এবং জাপ-শান্তিচুক্তি অনুমোদনকারী ৩৮টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ভবনের দ্বাদশ তলে অবস্থিত সম্মেলন-কক্ষে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মিঃ একিসন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের স্বাক্ষরযুক্ত চুক্তিপত্রের একটি কপি অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত করেন। এই অনুষ্ঠানে জাপ-মার্কিন দেশরক্ষা চুক্তিটিও কার্য্যকরী বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

অপর যে আটটি রাষ্ট্র জাপ-শান্তিচুক্তি অনুমোদন করিয়াছে, সেগুলি হইল পাকিস্থান, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, মেক্সিকো নিউজিলণ্ড, সিংহল এবং যুক্তরাষ্ট্র।

সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে চুক্তিতে স্বাক্ষরদানকারী আরও ৩৮টি রাষ্ট্র তাহাদের অনুমোদন ব্যবস্থা শেষ করিলে ঐ রাষ্ট্রগুলির ব্যাপারে এই চুক্তি কার্য্যকরী হইবে।

জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাপানে অবস্থিত থাইল্যাণ্ডের প্রতিনিধির সহিত একটি নোট বিনিময় করেন। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনই ইহার উদ্দেশ্য।

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, প্রাক্তন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ হার্ব্বার্ট মরিসন বলেন যে, উদারনীতির ভিত্তিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ইহার ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে জাপান মর্য্যাদা লাভ করিবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

টোকিওর খবরে প্রকাশ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম দিনেই জাপানে ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে বিনা ভাড়ায় ট্রেনে ভ্রমণের সুবিধা দিতে অস্বীকার করা হয়। কারণ বলা হয় যে, কমনওয়েলথ বাহিনীকে এ যাবৎ জাপানে যে সকল সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মেয়াদ বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। রেল-কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, ভবিষ্যতে কি ব্যবস্থা করা হইবে তাহা অজ্ঞাত থাকায় তাঁহারা সৈন্যদিগকে আর বিনা পয়সায় টিকেট দিবেন না।

জাপান স্বাধীন হইলেও জাপ-মার্কিন দেশরক্ষা চুক্তি অনুসারে মার্কিন সৈন্য অবস্থান করিবে। কিন্তু বিশ্বস্ত খবরে প্রকাশ ইন্দ-জাপান চুক্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী শিগেরু যোশিদা জাপানের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বলেন যে, এখন হইতে সম্ভাব্য কম্যুনিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে জাপানকে তাহার নিজ জাতীয় সৈন্য মোতায়েন রাখিতে হইবে।

বিশেষ এক সরকারী বিবৃতি প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন: "নিরাপত্তা চুক্তিবলে এ বিষয়ে আমেরিকাকে অনুরোধ জানাইয়াছি। কিন্তু এই নিরাপত্তা চুক্তিও অনির্দিষ্ট কালের জন্য নহে।"

"অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সহিত সম্মিলিতভাবে যাহাতে আমরা বিশ্বে শান্তি স্থাপন করিতে পারি, তাহার জন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে আমাদের শক্তি ও দেশরক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইব।"

জাতির প্রতি এক আবেদন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন: "আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি, এখন আমরা মুক্ত। কিন্তু এখন আমাদিগকে এমন ভাবে কাজ করিয়া যাইতে হইবে, যাহাতে আমরা একটি উন্নতিশীল নব্য জাপানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গর্ব্ববোধ করিতে পারি।"

জাপানের স্বাধীনতা এশিয়ার কাম্য। কম্যুনিজমের প্রসার দমন করিতে জাপান যেমন সক্ষম, এশিয়ার কোন রাষ্ট্র তত নয়।

ডন-ভল্গা নদীর সংযোগ

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরাট পরিকল্পনাসমূহ অপূর্ব্ব সাফল্য-লাভ করিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাই এবং খাদ্যের উৎপাদন ও শিল্পকলার বিস্তার সম্বন্ধে যে-সব হিসাবের কথা বলা হয়, তাহার মধ্যে, অত্যুক্তির স্থান থাকিলেও, বাদসাদ দিয়া যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাও বিস্ময়কর। এই সব পরিকল্পনার মধ্যে ডন-ভল্গা নদীর সংযোগসাধন অন্যতম।

কলিকাতা কম্যুনিষ্ট দৈনিক "স্বাধীনতা"র লণ্ডন নগরীস্থ সংবাদদাতা গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

"সোবিয়েৎ ইউনিয়নে যুদ্ধোত্তর যুগে যে পাঁচটি বিশাল গঠনকার্য্যের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, আজ তাহার একটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ডন ও ভলগা, এই দুইটি বিরাট নদীর মধ্যে সংযোগ সাধিত হওয়ায় বাল্টিক হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত এক বিশাল জলপথ উন্মুক্ত হইল। এই জলপথ উন্মুক্ত হওয়ায় ফলে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে পঞ্চ-সমুদ্রের সংযোগ সাধিত হইল। এখন হইতে বাল্টিক সাগর, শ্বেতসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, আজভ সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ অনায়াসে চলাচল করিতে পারিবে।

যে খালের মারফত ডন ও ভল্গা যুক্ত হইয়াছে সেই খালের খননকার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ১৯৫৭ সালে এই খাল আরল সমুদ্রের সহিত যুক্ত হইবে। সারা জগতের মধ্যে দীর্ঘতম এই খাল আরল ও আমুদরিয়ার জলরাশিকে কাস্পিয়ান সাগরের নিকটবর্ত্তী করিবে। মূল খাল হইতে ছোট ছোট যে সমস্ত খাল কাটা হইয়াছে সেগুলির দ্বারাই ১৯৫২ সালে ১ লক্ষ হেক্টর তৃণ-ভূমিতে সেচকার্য্য চলিবে। আগামী আরও ৪ বছরের মধ্যে এই সকল খালের জল বর্দ্ধনের

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে মোট সাড়ে সাত লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।"

আজ দুই বৎসর হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত স্টীমার চলাচলের সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিবার পরিকল্পনা সরকারের দপ্তরে চাপা আছে। অপেক্ষারও একটা সীমা আছে।

সমাজে মুসলিম রমণীর স্থান

এই বিষয় লইয়া সংবাদপত্রে নানারূপ আলোচনা চলিতেছে। এই তর্ক-বিতর্ক শেষ হইবে না, যত দিন না মুসলিম-সমাজ, মৌলানা মৌলবী বর্ত্তমান যুগের চিন্তার গতি বুঝিতে পারিবেন ও তদনুযায়ী সমাজ-বিকাশের সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিবেন। এই বিষয়ে প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার একটি ইংরেজী দৈনিকের স্তম্ভে যে পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল তার আভাস এখানে দিতেছি:

যুক্তপ্রদেশের সভ্য জনাব কাজমি বিবাহবন্ধন ছিন্ন করা সম্বন্ধে একটি আইন প্রবর্ত্তন করেন। তদুপলক্ষে 'এক জন মুসলিম মহিলা' এই ছদ্মনামে পত্রখানি প্রকাশিত হয়।

"জনাব কাজমি বহু বিবাহ সম্বন্ধে কোন বিধানের উল্লেখ করেন নাই। অন্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করা সম্বন্ধে একটি বিধান ছিল। মুসলিম মহিলা এই বিধানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।" জনাব কাজমি বর্ত্তমান লোকসভার সভ্য। তাঁহার রক্ষণশীল মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কিনা জানি না। তবে তিনি যে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাজি-প্রথানুযায়ী কাজিশ্রেণী মুসলিম বিবাহের নিয়ন্তা ছিলেন—নিজস্ব অধিকার হরণ করার ফলে মুসলিম সমাজ ভারতবর্ষকে দার-উল-হারব (শত্রুপুরী) বলিয়া মনে করিত, তাহা নিঃসঙ্কোচে কিছু পূর্ব্বে তিনি ব্যক্ত করেন। দার-উল্-হারব, দার-উল্-আমন্ (বন্ধুর বাসস্থান) প্রভৃতি তত্ত্ব মুসলিম সমাজের মজ্জাগত সংস্কার।"

"একতাবোধই জাতীয়তাবাদের আসল বুনিয়াদ"

পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় অর্থসচিব মোহাম্মদ আলী গত ২১শে বৈশাখ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে পাকিস্থানের সমৃদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, "পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর যাঁহারা দেশের সেবা করার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, সেই কর্ম্মচারীদের উপর বিশেষ দায়িত্ব আছে। কারণ তাঁহারা এখন যে পথ প্রদর্শন করিবেন তাঁহাদের বংশধরগণ কার্য্যতঃ তাহাই অনুসরণ করিবে।

"ঐক্যের মনোভাব গড়িয়া তোলা সরকারী কর্ম্মচারীদেরই একান্ত কর্ত্তব্য। যত প্রকার উপাদান লইয়া জাতি গঠিত হউক না কেন, একতাবোধই জাতীয়তার মূল আদর্শ। তিনি আরও বলেন যে, সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ যে অঞ্চলেরই হউক না কেন, উভয় পাকিস্থানে তাঁহাদের সমান অধিকার রহিয়াছে। তাঁহাদের কেহই বিশেষ সুবিধা দাবী করিতে পারেন না।

পাকিস্থানের উন্নতির জন্য যোগ্যতার সহিত অবিরাম কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং সেখানে ব্যক্তিগত উন্নতিকে প্রাধান্য দিলে চলিবে না। কারণ সরকারী কর্ম্মচারীদের মোটামুটিভাবে উন্নত জীবনযাপনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহা দরিদ্র কৃষকদের নিকট হইতেই আদায় করা হয়। সুতরাং আপনাদের নিকট অবিরাম কাজ আশা করিবার অধিকার জনসাধারণের আছে।"

এই নীতিকথার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু মুসলিম সমাজ 'অবিভক্ত' নয়। তার প্রমাণ দিয়াছেন পশ্চিম পাকিস্থানের কয়েকজন মৌলবী মৌলানা। তাঁরা ফতোয়া জারী করিয়াছেন যে 'কাদিয়ানীরা'—পাকিস্থানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব জাফরউল্লা খাঁর স্বধর্মীরা—'মুসলিম' নয়; তাঁদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত করা হউক।

বাংলার কাঁথা শিল্প

২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের "লোকসেবক" (দৈনিক) পত্রিকার স্তম্ভে শ্রীপরেশ সিংহ রায় একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম:

"আজ সত্যই দুঃখ হয় যে, আমাদের আগের দিদিমা বা ঠাকুরমাদের থলিতে থলিতে কত বীরত্বপূর্ণ গল্প বা কত রহস্যময় ছড়া ছিল, তার বদলে আজকাল দিদিমা বা ঠাকুরমাদের থলিতে আছে শুধু ভ্যানিটি ব্যাগ বা পাউডার ও লিপষ্টিক। এর চেয়ে আর কি দুঃখের হতে পারে!

"আজ অপব্যবহারের জন্য দেশে কত মহৎ শিল্প চলেছে মৃত্যুর পথে। বাংলার মা-বোনেরা সামান্য কয়েক খণ্ড ছেঁড়া ন্যেকড়া দিয়ে তার গায়ে কত বিচিত্র রঙের সুতা দিয়ে কত কি কথা, ছবি, ছড়া, ধর্ম্মের কাহিনী সামান্য সুতা দিয়ে হাজার টাকার শাল বা চাদরকে হার মানিয়ে দিতে পারত। হায় আজ আমাদের সেই কুটিরশিল্প কোথায় চলেছে?

"এই বিংশ শতাব্দীতে যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানব, তিনি আরম্ভ করেছিলেন দেশের কুটিরশিল্পকে রক্ষা করতে। মহাত্মা গান্ধী প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন দেশে কুটিরশিল্পকে বাঁচাবার জন্য। দেশের কুটিরশিল্প ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে চলছিল, তিনি দেখেছিলেন যদি আমার দেশে জাতীয় শিল্প মরে যায় তবে আমাদের জাতীয় কৃষ্টি মরে যাবে।

"প্রাচীন কালে এত সুন্দর কাঁথা তৈরি করে গেছে আমাদের মা-বোনেরা তা যদি আমরা অনুগ্রহ করে যাদুঘরে গিয়ে দেখি তবে আশ্চর্য্য হয়ে যাব, যার কাছে কাশ্মীরী শাল হার মানে। কাশ্মীরী শাল হ'ল ভাল ভাল পশমের কাপড়ের উপর আর আমার কাঁথা হ'ল আমাদের ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া অল্প দামের সুতার কাপড়। তার উপর এই সামান্য ঘরের বা ফেলে দেওয়া পাড়ের সুতার কত সুন্দর নক্সা করে দেশে একটা নূতন জাতীয় শিল্পের সৃষ্টি করে গেছেন।"

নীলপুর ও সদগোপ সমাজ

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত "আর্য্য" (সাপ্তাহিক) পত্রিকার ১লা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় নিম্নোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। রাঢ়-ভূমি প্রাচীন বঙ্গের অন্যতম পীঠস্থান। প্রতি জেলা ও মহকুমার সংবাদপত্র যদি "আর্য্য" পত্রিকার উদাহরণ অনুসরণ করেন, তবে বাঙালীর ইতিহাসের অনেক মালমশলা সংগৃহীত হইতে পারে :

"নীলপুরের বিস্মৃত কাহিনীর বিবরণ দিতে গিয়ে মনে পড়ে যায় গোপ-সাম্রাজ্যের কীর্ত্তিকথা।

"এখনকার মুসলমান ও উদ্বাস্তু অধ্যুষিত নীলপুর একদা রাজা কালী ঘোষের সাম্রাজ্যভূমি ছিল। কালী ঘোষ জাতিতে ছিলেন সদ্গোপ। এ সম্পর্কে আবার একদলের মত ভিন্ন। তাঁরা বলেন : কানু ঘোষ নীলপুরের রাজা ছিলেন। তিনি জাতিতে গোয়ালা। কিন্তু এ মত তাঁরা টিকিয়ে রাখতে পারেন নি। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান নগরী ছিল কালী ঘোষের আবাসভূমি, আর নীলপুর ছিল এঁর রাজধানী। আর এক মতে জানা যায়, নীলপুরে কালী ঘোষের দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ ছিল। কালী ঘোষের বহু পরে বর্দ্ধমান রাজ বংশের উদ্ভব।

"১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'ধর্ম্মমঙ্গলের' মাণিক গাঙ্গুলী লিখেছেন :

কালিদাস রাজা বর্দ্ধমানে ঘর

*   *   *

মৃগয়া করিয়া যায় কালিদাস নৃপতি।

"'ধর্ম্মমঙ্গল' চারশো বছর পূর্ব্বের। সমগ্র বর্দ্ধমান একদিন গোপ জাতির শাসনাধিকারে ছিল। মুসলমান রাজত্বের পর বর্দ্ধমান রাজবংশ বর্দ্ধমানের শাসক হন। নীলপুর যে শৌর্য্য-বীর্য্য ও পরাক্রমের কেন্দ্রভূমি ছিল, তার নিদর্শন কালি ঘোষের স্মৃতি। বিক্ষিপ্ত ও ভাঙা ইটের স্তূপ দেখে অনুমান করা যেতে পারে : একদিন হিন্দু শাসন ঘুচে গিয়ে বর্দ্ধমানে মুসলমান শক্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আর কালিদাস ঘোষ যে মুসলমান শক্তির অনেক আগেই নীলপুরের অধীশ্বর ছিলেন এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নাই।

রাজা কালি ঘোষ তাঁর দুবল ও বিমলা—দু'মেয়ের বিয়ে দেন ময়নার রাজা লাউসেন কোঙারের সঙ্গে। লাউসেন, ইছাই ঘোষ, ভদ্রপদ ও ধর্ম্মপাল কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন।

"নীলপুরের ঘোষ বংশ সদগোপ সমাজের বিখ্যাত বংশ। আইন-ই-আকবরী ও কিরিস্তায় নীলপুরের উল্লেখ রয়েছে। অনেকের ধারণা : বর্ত্তমান কালী রাজার পল্লী রাজা কালিদাসের স্মৃতিচিহ্ন। কিম্বদন্তী আছে, নীলপুরে নীলানন্দ নামে এক সদ্গোপ ছিলেন। ইনি কালীভক্ত হওয়ায় কালিদাস নামে খ্যাত হন।

মেদিনীপুরের কর্ণগড় রাজবংশের আদিরাজ লক্ষণ সিং-এর আদি বাসভূমি নীলপুর। মাণিক গাঙ্গুলীর সময় অর্থাৎ ৪০০ বছর আগে নীলপুরবংশ স্বগৌরবে ছিল কিন্তু বর্দ্ধমানের সময়ে এ বংশের ঐতিহাসিক গৌরব ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ে।

নীলপুর এখন জঙ্গলাকীর্ণ—ভাঙা শিব মন্দির, দেবস্থান আর নীলানন্দের প্রাসাদ আজ লোকচক্ষুর অগোচরে রয়েছে। শিবমন্দিরগুলো রাজা কালিদাসের শিব উপাসনার নিদর্শন। এরূপ জনপ্রবাদ যে, কালিদাসের সময় বাংলায় ধর্ম্মঠাকুরের পুজো ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সূত্রপাত হয় নি।"

মার্কিনগণতন্ত্র ও জাতীয়তার মূলমন্ত্র

"আমরা বিশ্বাস করি : সকল মানুষ সমান, সকল মানুষেরই স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জীবনযাপনের কতকগুলি জন্মগত অধিকার রয়েছে, আর এই সকল অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যেই মানব-সমাজে সরকারের প্রতিষ্ঠা। শাসনাধীন মানুষের সম্মতির উপরই সরকারের ক্ষমতা নির্ভরশীল।"

"জেফার্সন বলিতেন, 'মানুষের মনের উপর সকলের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে চির-শত্রুতার শপথই আমি গ্রহণ করেছি।' কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ থেকে মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তিনি এ কথার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করেছেন। স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে আজীবন সংগ্রাম করে জেফার্সন গণ-তন্ত্রের ভিৎ গড়ে গিয়েছেন। বস্তুতঃ জেফার্সনই আধুনিক গণ-তন্ত্রের প্রধান স্থাপয়িতা। এর আগেও যে মানুষের গণতন্ত্র সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না, তা নয়। তবে সে ধারণা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট।"

এই বিবরণ সত্য। তবে এই সঙ্গে আর একজনের নাম সংযোগ করা উচিত। তাহা টমাস পেনের। তিনিই বর্ত্তমান মার্কিন গণতন্ত্রের প্রথম উদ্‌গাতা।

চিত্র-পরিচয়

প্রায় তিন শত পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এই দশাবতার চিত্রটি চেতুয়া অঙ্কন-রীতির একটি পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন। শ্রীজগন্নাথ সম্পর্কে চেতুয়া সমাজের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতবাদটি ইহাতে প্রকটিত। বহু মন্দিরের কবাটের খোপেও এইরূপ জগন্নাথ সমেত দশাবতারের দারুমূর্ত্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। নারী-রূপিণী বরাহদন্তোদ্ধৃতা ধরণী, বামনের নাভিনির্গত চরণ, তীর ধনুকধারী পরশুরাম, শিঙ্গাধারী বলরাম এই চিত্রে লক্ষণীয়। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত পোঃ শঙ্করপুরের অধীন চেতুয়া বাসুদেবপুরের ভারভূষণ পাড়ার আদিকবি কৃত্তি-বাস ও মহাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জ্ঞাতিবংশীয় মহা-মহাধ্যাপক উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের পুঁথিঘরে রক্ষিত ১০১৩ সালের একটি ভাগবতের পাটার রঙীন চিত্র হইতে এই চিত্র-গুলির অনুলিপি গৃহীত হইয়াছে। ন্যায়ভূষণ মহাশয় গত শতকে মেদিনীপুরের একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। ইং ১৮৯২ সালে মঃ মঃ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত টোলের তালিকায় তাঁহার নাম আছে। তাঁহার প্রপৌত্র শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ জ্যোতির্বিনোদ কর্ত্তৃক চিত্রটি প্রদত্ত।

শৃঙ্গেরী

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত কডুর জেলায় তুঙ্গভদ্রা নদীর বাম তটে শৃঙ্গেরী নামক শহরটি অবস্থিত। প্রাচীন যুগের রাজন্যবর্গ শৃঙ্গেরী জায়গীরটি তদানীন্তন মঠাধীশগণকে দান করিয়াছিলেন। উক্ত জায়গীর কোপ্পা তালুকের অন্তর্গত এবং প্রায় ৪৪ বর্গমাইল পরিব্যাপ্ত। উহার অন্তর্গত প্রায় ২০৭টি গ্রাম আছে, লোকসংখ্যা আনুমানিক বিশ হাজার হইবে। শৃঙ্গেরী শহরটি প্রায় এক বর্গ-মাইল। শহরে বৈদ্যুতিক আলো বা জলের কল নাই। শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশগণ কেবলমাত্র মঠের মধ্যে ডায়নামো বসাইয়া আলোর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। শৃঙ্গেরী শহরের লোকসংখ্যা প্রায় চারি সহস্র হইবে। স্থানীয় লোকদের মাতৃভাষা কানাড়া। শৃঙ্গেরীতে তুঙ্গা নদী পূর্বোত্তরবাহিনী—"যত্র পূর্বোত্তরবাহিনী তুঙ্গা তত্রৈব শৃঙ্গগিরি।" শৃঙ্গেরীর চতুর্দিক্ নীল শৈলমালায় বেষ্টিত ও উহাদের সুগভীর উপত্যকাগুলি পার্বত্য শ্যামল বনরাজিতে ভূষিত হইয়া এক অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক সুষমার সৃষ্টি করিয়াছে। কথিত আছে, আদি শঙ্করাচার্য যখন পরিব্রাজক রূপে বিভিন্ন স্থান পর্যটন করিতে করিতে বর্তমান শৃঙ্গেরী মঠের নিম্নস্থ তুঙ্গা নদীতে আসিয়া এক নিদাঘকালীন মধ্যাহ্নের সময় স্নান করিতে-ছিলেন, তখন উহার নিকটেই একটি শৈলখণ্ডের উপরে প্রখর সূর্যোত্তাপের মধ্যে প্রসব-বেদনায় অত্যন্ত কাতরা একটি গর্ভবতী ভেকের উপর একটি বিষধর সর্পকে ফণা বিস্তার করিয়া রৌদ্রতাপ নিবারণে সচেষ্ট দেখিতে পান। ইহা দেখিয়া শঙ্করাচার্য বিস্মিত হন এবং মনে মনে বিচার করেন যে, যে স্থানে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধবিশিষ্ট প্রাণিদ্বয়ের মধ্যে এরূপ প্রীতির ভাব স্বভাবতঃই বিরাজিত রহিয়াছে, সেই স্থানই ব্রহ্মচিন্তার উপযুক্ত স্থান। এইরূপ বিচার করিয়া শঙ্করাচার্য এই স্থানেই তাঁহার পীঠস্থান, প্রধান মঠ ও বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনার্থ সঙ্কল্প করিলেন এবং এই স্থানে সারদা দেবীর যন্ত্র (মতান্তরে চন্দনদারুময়ী সারদা-মূর্তি) প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি এই স্থানে স্নানঘাটের উপর মণ্ডুক-শঙ্কর-লিঙ্গ নামক একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে, যে স্থানে শ্রীশঙ্করাচার্য সারদা-দেবীর যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বহস্তে পূজা করিয়াছিলেন, তাহাই শৃঙ্গেরীর আদিস্থান। ইহার পরে আদি শঙ্করাচার্য ভারতের চতুর্দিকে চারিটি মঠ স্থাপন করেন।

এই স্থানের প্রকৃত নাম ঋষ্যশৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গগিরি। কথিত আছে, এই স্থানে কশ্যপাত্মজ বিভাণ্ডক মুনির পুত্র

শৃঙ্গেরীর অধিষ্ঠাত্রী শ্রীসারদা দেবী (বিদ্যারণ্য প্রতিষ্ঠিত)

ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৃঙ্গেরী হইতে পাঁচ মাইল দূরে ঋষ্যশৃঙ্গপুর নামক একটি গ্রাম অদ্যাপি ঋষ্য-শৃঙ্গের আবির্ভাব-স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। তথায় একটি মন্দিরে লিঙ্গরূপী ঋষ্যশৃঙ্গ ও তাঁহার পত্নী শান্তা দেবীর মূর্তি অধিষ্ঠিত আছে। বাল্মীকি-রামায়ণে* উক্ত হইয়াছে যে, কাশ্যপ ঋষির পুত্র বিভাণ্ডক, তৎপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। ইনি কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন ও পিতার শুশ্রূষা করিয়া এই স্থানে (শৃঙ্গেরীতে) বাস করিতেছিলেন। সেই সময় অঙ্গদেশে রোমপাদ নামক এক সুবিখ্যাত রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণগণ উক্ত রাজাকে পরামর্শ দেন যে, যে কোন উপায়ে উক্ত ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গদেশে আনয়ন করিয়া শান্তা নাম্নী রাজকুমারীকে ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত বিবাহ প্রদান ও উক্ত রাজ্যে স্থায়ী ভাবে বসবাস করাইতে পারিলে রাজ্যে প্রচুর

* শ্রীমদ্বাল্মীকি রামায়ণম্ (বালকাণ্ড ৯ম হইতে ১৮শ সর্গ)। প্রকাশক—আর. নারায়ণস্বামী আয়ার, মাদ্রাজ। ১৯৩৩।

বৃষ্টি ও শস্যাদির উদ্গম হইবে। তদনুসারে রাজা অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ও বীর্যবান ঋষ্যশৃঙ্গকে বারবনিতাগণের দ্বারা ভুলাইয়া অঙ্গদেশে আনয়ন করেন। ঐরূপ কার্যের জন্য রোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার শান্তা নাম্নী কন্যাকে সম্প্রদান করেন।

বিদ্যাশঙ্কর মন্দির—শৃঙ্গেরী
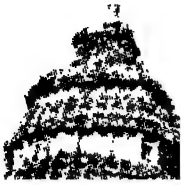
ইক্ষাকুবংশীয় সুধার্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথের সহিত অঙ্গরাজ রোমপাদের বন্ধুত্ব ছিল। অপুত্রক রাজা দশরথ সুমন্ত্রের মন্ত্রণায় বশিষ্ঠ ঋষির অনুমতি লইয়া যে স্থানে রাজা রোমপাদ ও ঋষ্যশৃঙ্গ বাস করিতেন তথায় গমন করেন। দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞসাধনার্থ ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করেন। ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রণী করিয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত পায়স কৌশল্যাদি দশরথের মহিষীগণ ভোজন করিয়া যে গর্ভধারণ করেন, তাহাতেই শ্রীবিষ্ণু চারি অংশে—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন রূপে আবির্ভূত হন।

শৃঙ্গেরী যাইবার পথ: এম্. এস্. এম্. রেলপথের বাঙ্গালোর সিটি—হরিহর শাখা লাইনে বীরুর জংসন। বাঙ্গালোর সিটি হইতে বীরুর ১৩১ মাইল। বীরুর জংসন হইতে শৃঙ্গেরীতে সরাসরি মোটর-বাস চলে। বাসভাড়া জনপ্রতি তিন টাকা মাত্র। বীরুর হইতে শৃঙ্গেরী মোটর-বাসে ৭৪ মাইল। মোটর-বাস পার্বত্যপথ দিয়া গমনাগমন করে। বীরুর জংসন হইতে টেরিকেরী ১৪ মাইল; টেরিকেরী হইতে কোপ্পা ৪২ মাইল; কোপ্পা হইতে হরিহরপুর ৬ মাইল; হরিহরপুর হইতে শৃঙ্গেরী ১২ মাইল। ঐ সকল স্থানে বাস দাঁড়াইবার জায়গা আছে।

সীমোগা ও টেরিকেরী—এই দুইটি রেলওয়ে ষ্টেশন হইতেও শৃঙ্গেরী পর্যন্ত বাস চলাচল করে। উভয়েরই দূরত্ব প্রায় ৬০ মাইল।

উড়ুপী হইতে শৃঙ্গেরী মোটর-বাসে ৬৪ মাইল। উড়ুপী হইতে পুত্তিগে ১২ মাইল। তথায় বাস পরিবর্তন করিয়া ও পুত্তিগে নদী পার হইয়া পেরেড়ুর হইতে অন্য বাসে সোমেশ্বর ১৫ মাইল; সোমেশ্বরে বাস বদল করিয়া সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথ দিয়া ট্যাক্সিতে আগুয়ে পর্বত প্রায় ৯ মাইল অতিক্রম করিতে হয়। তথায় পুনরায় ট্যাক্সি পরিবর্তন করিয়া মোটর-বাসে হরিহরপুর ১৬ মাইল। হরিহরপুর হইতে শৃঙ্গেরী ১২ মাইল।

শৃঙ্গেরী মঠ: তুঙ্গা নদীর উত্তর-পশ্চিম তটে শৃঙ্গেরী মঠ অবস্থিত। খরস্রোতা স্বচ্ছসলিলা তুঙ্গা শৃঙ্গেরীর উত্তুঙ্গ প্রাচীন বিদ্যাশঙ্কর-মর্মর মন্দিরের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত। তুঙ্গার পূর্ব তীরে ও শৃঙ্গেরী মঠের চতুর্দিকে শ্যামলবনরাজি-মণ্ডিত উপত্যকা-বিভূষিত নীল গিরিমালা সারদা মন্দিরের বেষ্টনী রূপে শোভা পাইতেছে। বিদ্যাশঙ্কর মন্দিরের পাদদেশে মর্মর সোপানাবলী শোভিত একটি স্নানঘাট আছে। স্নানঘাটের সোপানাবলীর উপরে আদি শঙ্করাচার্যের পাদপীঠ ও মণ্ডুক-শঙ্করলিঙ্গের মন্দির বিরাজিত। শৃঙ্গেরীস্থ নদীর নাম তুঙ্গা হইলেও স্থানীয় লোকেরা ইহাকে তুঙ্গভদ্রা বলেন। বস্তুত তুঙ্গা ও ভদ্রা দুইটি পৃথক্ নদী কড়ুর জেলার প্রান্তস্থ পশ্চিমঘাট নামক পর্বত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তুঙ্গা শৃঙ্গেরী, তির্থল্লী ও সিমোগা দিয়া প্রবাহিত এবং ভদ্রা বাবাবুদন গিরিশ্রেণীর পূর্ব উপত্যকা হইতে পশ্চিম উপত্যকা দিয়া এবং তৎপরে উত্তর দিকে বেঁকিপুর দিয়া প্রবাহিত। ইহারা উভয়ে সিমোগা জেলার উত্তরে কুড়লীতে মিলিত হইয়াছে। মিলিত তুঙ্গা ও ভদ্রা মহীশূর এবং মান্দ্রাজের মধ্যে এবং তৎপরে মুম্বাই ও মান্দ্রাজের মধ্যে সীমারেখা রচনা করিয়াছে। কথিত আছে, একটি অসুর এই ভূলোককে নিম্নলোকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে শ্রীবিষ্ণু বরাহমূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহাকে পুনরায় উদ্ধার করেন। ইহাতে বিষ্ণু লীলা প্রকট করিয়া যে পর্বতোপরি বিশ্রাম করেন, তাহা কোল-পর্বত বা বরাহপর্বত নামে খ্যাত হয়। উক্ত বরাহদেবের বাম ও দক্ষিণের

দংষ্ট্রা হইতে যে ধর্ম নির্গত হয়, তাহাই যথাক্রমে তুঙ্গা ও ভদ্রা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তুঙ্গা নদীর উত্তর-তটে ও ও শৃঙ্গেরী মঠের প্রাকারের মধ্যে বিদ্যাশঙ্করের সমাধি-মন্দির। তুঙ্গভদ্রার তীরস্থ শৃঙ্গেরী মঠের স্নানঘাটের নাম অম্বাতীর্থ।

মায়নের ঔরসে ও শ্রীমতীর গর্ভে মাধব (বিদ্যারণ্য), সায়ন ও ভোগনাথ নামক তিন পুত্র জন্মে; মাধবের সন্ন্যাস-আশ্রমের নামই বিদ্যারণ্য। তিনি যজুঃ শাখা, বোধায়ন-সূত্র ও ভরদ্বাজ গোত্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রায় ১২৬৮ (মতান্তরে ১২৯৬) খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি বিদ্যাশঙ্কর তীর্থের (নামান্তর বিদ্যাতীর্থের) শিষ্য। বিদ্যারণ্য শৃঙ্গেরী মঠের গুরুপরম্পরায় দ্বাদশ গুরু। এই বিদ্যারণ্যই আনুমানিক ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের প্রথম নৃপতি রূপে হরিহর নামক রাজাকে রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছিলেন। উক্ত ভূপতির উপর বিদ্যারণ্যের বিশেস প্রভাব ছিল। এই রাজা শৃঙ্গেরী মঠের জন্য বহু গ্রাম, ধান্যক্ষেত্র ও অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন বলিয়া ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত একটি শিলালিপি হইতে জানা যায়। প্রথম হরিহরের ভ্রাতা বুক্কান্না রাজা হইবার পর আনুমানিক ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শৃঙ্গেরীতে আগমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, বিদ্যারণ্যই প্রসিদ্ধ বিদ্যানগরের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বেদের ভাষ্য ও কেবলাদ্বৈত মতবাদের বহু গ্রন্থ রচনা করেন। প্রায় ১১৯ বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া তিনি ১৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হাম্পিতে পরলোকগত হন।*

বিদ্যাশঙ্কর সমাধিমন্দির: বিদ্যারণ্য তাঁহার গুরু বিদ্যাশঙ্করের স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ রাজা প্রথম হরিহরের অর্থানুকূল্যে উক্ত সমাধি-মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দির তুঙ্গভদ্রার উত্তর-পশ্চিম তটে একটি উচ্চ স্থানে শৃঙ্গেরী মঠের প্রাকারের অভ্যন্তরে অপূর্ব কারুকার্য-খচিত উত্তুঙ্গ মর্মরমন্দির রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দর্শক-মাত্রেরই বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এই মন্দিরে চালুক্য ও দ্রাবিড় শিল্পকলার অপূর্ব্ব সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ভারত সরকার কর্তৃক এই মন্দিরটি প্রাচীন স্মৃতিরক্ষার আইনানু-সারে রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরটি মেরুচক্রের আকারের অনুকরণে নির্মিত। ইহা মঠের প্রাঙ্গণ হইতে প্রায় পাঁচ ফুট উচ্চ মর্মরবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের বিভিন্ন অবতারের মূর্তি মন্দিরের গাত্রে খোদিত রহিয়াছে। মন্দিরের ছয়টি দ্বার; প্রধান দ্বারটি পূর্বাভিমুখী, একটি পাষাণময় কূর্মের উপর মন্দিরটি নির্মিত। কূর্মের চারিটি পা, মুখ ও পুচ্ছ উক্ত ছয়টি দ্বারের প্রতীক। মন্দিরের নিম্নভাগে সপ্তলোক ও উর্ধ্বভাগে সপ্তলোক প্রস্তরগাত্রে খোদিত রহিয়াছে। অভ্যন্তরস্থ নাট্যমন্দির দ্বাদশটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। স্তম্ভগুলি এরূপ সুসজ্জিত ভাবে নির্মিত হইয়াছে যে, দ্বাদশ মাসের (সম্বৎসরের) এক-একটি বিশেষ মাসে সূর্য-রশ্মি এক-একটি বিশেষ স্তম্ভের উপর পতিত হয়। মন্দিরে বিদ্যারণ্য-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শনৈশ্চর বিগ্রহ আছেন। গর্ভ-

তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে প্রাচীন বিদ্যাশঙ্কর মন্দির ও শৃঙ্গেরী মঠ

গৃহে রৌপ্যকবচাবৃত শিবলিঙ্গ একটি উচ্চ বেদীর উপর অধিষ্ঠিত। এখানে বিদ্যাশঙ্কর "লম্বিকা যোগ" অবলম্বন করিয়া তপস্যায় বসিয়াছিলেন। তপস্যায় বসিবার পূর্বে তিনি তাঁহার কুটিরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাহা দ্বাদশ বর্ষ পূর্বে কাহাকেও খুলিতে নিষেধ করিয়া যান। কিন্তু প্রায় তিন বৎসর অতীত হইবার পর কেহ কেহ কৌতূহল-বশতঃ তাঁহার তপঃকুটিরের দ্বার ভাঙিয়া খুলিয়া দেখিতে পান যে, বিদ্যাশঙ্কর শিবলিঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। সেই লিঙ্গরূপী বিদ্যাশঙ্করের মূর্তির উপর তাঁহার প্রধান শিষ্য বিদ্যারণ্য এই সমাধিমন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন সেই লিঙ্গের উপর বিদ্যাশঙ্করের একটি রৌপ্যমূর্তির কবচ স্থাপিত হইয়াছে। সেই গর্ভগৃহের চতুর্দিকে প্রাকার ও তপঃকুটিরটি আছে। তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দেবীর মূর্তি বিরাজিত। উত্তর ও দক্ষিণ কোণে দুইটি গুহা আছে। প্রবাদ, উক্ত গুহা সুড়ঙ্গের মত তুঙ্গভদ্রার অপর তীর পর্যন্ত গিয়াছে।

অন্য বিবরণানুসারে বিদ্যাশঙ্কর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী লম্বিকা-যোগ অবলম্বনে শিবলিঙ্গে পরিণত হইবেন—এইরূপ কথা তাঁহার শিষ্য ভারতী কৃষ্ণতীর্থ ও বিদ্যারণ্যকে বলিয়া নিজের তপঃকুটিরে যোগাসনে বসেন এবং বার বৎসর পূর্ণ না

* Vide "Vijayanagara and Vidyaranya" by S. Shrikantaya, B.A., B.L., Secretary, Mythic Society, Bangalore. Published in *Vijayanagara Sexcentenary Commemoration Volume*, Dharwar, 1936, pp. 163-165.

হওয়া পর্যন্ত যেন উক্ত কুটিরের দ্বার উন্মুক্ত করা না হয় এই আদেশ করিয়া যান। কিন্তু প্রায় তিন বৎসর পরে কুটিরের দ্বার খুলিয়া তথায় বিদ্যাশঙ্করকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই রাত্রিতে বিদ্যাশঙ্কর শিষ্য ভারতী কৃষ্ণতীর্থকে স্বপ্নে দর্শন দান করেন এবং তিনি যে স্থানে যোগাবলম্বন করিয়া বসিয়াছিলেন, তথায় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে বলেন। তদনুসারে আনুমানিক ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তথায় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই শিবলিঙ্গই বিদ্যাশঙ্করের সমাধিমন্দিরের গর্ভালয়ে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে কৃষ্ণদেব রায়ের শিলালেখ আছে। শৃঙ্গেরী মঠে যত স্বর্ণরত্নালঙ্কার আছে, সমস্তই বিদ্যাশঙ্করের নামে লিখিত আছে।

শৃঙ্গেরীর নিকট তুঙ্গভদ্রা নদী

বিদ্যাশঙ্করের নামান্তর সর্বজ্ঞ বিষ্ণু; তাঁহার পিতার নাম শার্ঙ্গপাণি। ইনি বিলারণ্য নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। বিদ্যাশঙ্কর পনর বৎসর কাল হিমালয়ের পাদদেশে লম্বিকা যোগাভ্যাস করেন। তিনি ৭৩ বৎসরকাল শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আটটি মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার আট জন সন্ন্যাসী-শিষ্যকে সেই সকল মঠের রক্ষক রূপে স্থাপন করেন। ভারতী কৃষ্ণতীর্থ ও বিত্তারণ্য তাঁহার প্রসিদ্ধ এবং প্রধান শিষ্য।*

শঙ্করাচার্য তাঁহার চারি জন শিষ্যদ্বারা ভারতের উত্তরে বদরিকায়—জ্যোতির্মঠ, পুরুষোত্তমে—ভোগবর্ধন বা গোবর্ধন মঠ, দ্বারকায়—সারদামঠ ও দাক্ষিণাত্যে—শৃঙ্গেরীমঠ স্থাপন করান। শৃঙ্গেরী মঠে 'সরস্বতী', 'ভারতী' ও 'পুরী'—এই ত্রিবিধ নামের সহিত একদণ্ড সন্ন্যাস গৃহীত হয়। "চতুর্থো দক্ষিণাম্নায়ঃ শৃঙ্গের্যাং বর্ততে মঠঃ। সম্প্রদায়ো ভূরিবারঃ ভূভুর্বঃ গোত্র উচ্যতে॥ পদানি ত্রীণি খ্যাতানি সরস্বতী ভারতী পুরী। বরাহো দেবতা যত্র ক্ষেত্রং রামেশ্বরং বদেৎ॥ তীর্থঞ্চ তুঙ্গভদ্রাখ্যং শক্তিঃ কামাক্ষিকা স্মৃতা। চৈতন্য-ব্রহ্মচারীতি হস্তামলকদেশিকঃ॥ আন্ধ্র-দ্রাবিড়-কর্ণাট-কেরলাদি প্রভেদতঃ। শৃঙ্গের্যধীনা দেশাস্তে হ্যবাচীদিগবস্থিতাঃ॥ স্বর জ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ। সংসারসাগরাসারহন্তাসৌ হি সরস্বতী॥ বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্বভারং পরিত্যজন্। দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্ততে॥ জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্ব পদে স্থিতঃ। পরব্রহ্মরতো নিত্যং 'পুরী' নামা স উচ্যতে॥"—(মঠাম্নায়)

অর্থাৎ মঠনাম—শৃঙ্গেরী, দিক—দক্ষিণ, দেশ—আন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও কেরলাদি, সম্প্রদায়—ভূরিবার, গোত্র—ভূভুর্বঃ, ক্ষেত্র—রামেশ্বর, মহাবাক্য বা বোধ—"অহং ব্রহ্মাস্মি", দেব—বরাহ, শক্তি—কামাক্ষী, আচার্য—হস্তামলক, সন্ন্যাসপদবী—'সরস্বতী', 'ভারতী' ও 'পুরী', ব্রহ্মচারী—চৈতন্য, তীর্থ—তুঙ্গভদ্রা, বেদ—যজুঃ।

শৃঙ্গেরী মঠের গুরু ও সন্ন্যাসগ্রহণ কাল-পরম্পরা—যথা, ১। শঙ্করাচার্য—২২ শক, ২। সুরেশ্বরাচার্য—৩০ শক, ৩। বোধনাচার্য—৬৮০ শক, ৪। জ্ঞানধনাচার্য—৭৬৮ শক, ৫। জ্ঞানোত্তম শিবাচার্য—৮২৭ শক, ৬। জ্ঞানগিরি আচার্য ৮৭১ শক, ৭। সিংহগিরি আচার্য—৯৫৮ শক, ৮। ঈশ্বরতীর্থ ১০১৯ শক, ৯। নরসিংহতীর্থ—১০৬৭ শক, ১০। বিদ্যাতীর্থ বিদ্যাশঙ্কর—১১৫০ শক, ১১। ভারতী কৃষ্ণতীর্থ—১২৫০ শক, ১২। বিদ্যারণ্য ভারতী—১২৫৩ শক, ১৩। চন্দ্রশেখর ভারতী—১২৯০ শক, ১৪। নরসিংহ ভারতী—১৩০৯ শক, ১৫। পুরুষোত্তম ভারতী—১৩২৮ শক, ১৬। শঙ্করানন্দ—১৩৫০ শক, ১৭। চন্দ্রশেখর ভারতী—১৩৭১ শক, ১৮। নরসিংহ ভারতী—১৩৮৬ শক, ১৯। পুরুষোত্তম ভারতী—১৩৯৪ শক, ২০। রামচন্দ্র ভারতী—১৪৩০ শক, ২১। নরসিংহ ভারতী—১৪৭৯ শক, ২২। নরসিংহ ভারতী—১৪৮৫ শক, ২৩। ধনমড়ি নরসিংহ ভারতী—১৪৯৮ শক, ২৪। অভিনব নরসিংহ ভারতী—১৫২১ শক, ২৫। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৫৪৪ শক, ২৬। নরসিংহ ভারতী—১৫৮৫ শক, ২৭। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬২৭ শক, ২৮। অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬৬৩ শক, ২৯। নৃসিংহ ভারতী—১৬৮৯ শক, ৩০। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬৯২ শক, ৩১। অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৭৩০ শক, ৩২। নরসিংহ ভারতী—১৭৩৯ শক। ইঁহাদের সমাধি সম্বন্ধে জানিতে হইলে "বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি" (৪র্থ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য। ৩৩। সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব নরসিংহ ভারতী—১৭৮৮ শক, ৩৪। শ্রীচন্দ্রশেখর ভারতী (বর্তমান প্রধান মঠাধীশ), ৩৫। শ্রীঅভিনব বিদ্যাতীর্থ (ভাবী মঠাধীশ)।

* Vide *Vijayanagara Sexcentenary Commemoration Volume*, 1936. p. 163 and p. 296.

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শৃঙ্গেরী মঠে পদার্পণ করিয়া মৎস্যতীর্থ দর্শন ও তুঙ্গভদ্রায় স্নানলীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

শৃঙ্গেরি মঠে আইলা শঙ্করাচার্য-স্থানে।
মৎস্য-তীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে॥*

শৃঙ্গেরী মঠস্থ অন্যান্য মন্দির: বিদ্যাশঙ্কর-সমাধি-মন্দিরের উত্তরে আদি শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত জনার্দন-বিষ্ণুর মন্দির; মন্দিরটি খুব প্রাচীন। শ্রীজনার্দন এক অখণ্ড শিলায় শ্রী ও ভূদেবীর সহিত প্রকাশিত চতুর্ভুজ-মূর্তি। শ্রীজনার্দন-মন্দিরের দ্বারের দক্ষিণ দিকে বীর হনুমান ও উত্তর দিকে যুক্তকর গরুড়। এই উভয় মূর্তিই আদি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এখানে উক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীজনার্দন মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে বিদ্যারণ্যের সমাধিমন্দির; তৎপার্শ্বে অর্থাৎ শ্রীজনার্দন মন্দিরের উত্তর ভাগে সুরেশ্বরাচার্যের সমাধি। উক্ত সমাধির উপর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত এবং তদুপরি ছত্রাকার একটি ক্ষুদ্র মন্দির। ইনি আদি শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য ও শৃঙ্গেরী মঠের আদি-গুরু। 'শঙ্কর বিজয়ে'র মতানুসারে সুরেশ্বরাচার্য কুমারিল ভট্টের ছাত্র ছিলেন। ইঁহার পূর্বাশ্রম মাহিষ্মতী পুরীতে ছিল। সুরেশ্বরাচার্যের পূর্বাশ্রমের নাম মণ্ডন মিশ্র। যখন প্রয়াগে কর্মবাদি-মীমাংসক কুমারিল ভট্ট মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন, সেই সময় শঙ্করাচার্য কুমারিলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কুমারিল মুমূর্ষু অবস্থায় শঙ্করের সহিত নিজে বিচার না করিয়া তাঁহার প্রধান শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের নিকট মাহিষ্মতী নগরীতে পাঠাইয়া দেন। মণ্ডনের সহিত শঙ্করের যে বিচার হয়, তাহার মধ্যস্থ ছিলেন মণ্ডনের পত্নী সরস্বতী বা উভয়ভারতী। মণ্ডন বিচারে পরাজিত হইয়া শঙ্করাচার্যের শিষ্যত্ব ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুর সহিত পর্যটন করেন। আচার্য শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় সুরেশ্বরাচার্যকে মঠাধীশ রূপে স্থাপন করেন।

প্রবাদ, মণ্ডন মিশ্রের (সুরেশ্বরের) সহধর্মিণী সরস্বতী (নামান্তর উভয়ভারতী) শঙ্করের সহিত কামশাস্ত্র বিষয়ে বিচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আজীবন ব্রহ্মচারী শঙ্কর উভয়ভারতীর নিকট হইতে এক মাস কাল সময় লইয়া যোগবলে একটি সদ্যমৃত রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং উভয়ভারতীর সহিত বিচারার্থ প্রস্তুত হন। উভয়ভারতী আর বিচার না করিয়া শঙ্করাচার্যের প্রার্থনানুসারে তাঁহার শৃঙ্গেরী মঠে অচলা থাকিবেন এই বর দিয়া অন্তর্হিত হন।

* চৈ, চ, ম, ৯।২৪৪, শৃঙ্গেরীতে বহু অনুসন্ধান করিয়াও মৎস্যতীর্থের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।—লেখক

সুরেশ্বরাচার্য নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, ব্রহ্মসিদ্ধি ও ইষ্টসিদ্ধি নামক তিনটি প্রকরণগ্রন্থ, 'বিধিবিবেক' নামক একটি নিবন্ধগ্রন্থ এবং তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন।

শৃঙ্গেরীতে দুর্গাম্বার রথোৎসব

বিদ্যাশঙ্কর মন্দিরের পশ্চিম দিকে শৃঙ্গেরী মঠের দশ জন পূর্বগুরুর সমাধিমন্দিরসমূহ বিরাজিত। সুরেশ্বরাচার্যের সমাধির উত্তরে শিলাময় প্রাকারবেষ্টিত সারদাদেবীর মন্দির।

শ্রীসারদা মন্দির: স্থানীয় বিবরণানুসারে আদি শঙ্করাচার্য সর্বপ্রথমে সারদাদেবীর যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যারণ্য উক্ত যন্ত্রের উপর পঞ্চ ধাতুময়ী সারদামূর্তি স্থাপন করেন। বর্তমান শিলামন্দিরটি সচ্চিদানন্দ শিবাভিনববিদ্যা নরসিংহ ভারতী (১৭৮৮ শক) নির্মাণ করেন। সারদা দেবী চতুর্ভুজা ও স্বর্ণকবচধারিণী। দেবীর দক্ষিণোর্ধ হস্তে শুকপক্ষী ও জপমালা; দক্ষিণ নিম্ন-হস্তে অভয় মুদ্রা, বামোর্ধে অমৃত-কলস ও বাম নিম্নহস্তে বেদ। অচল মূর্তি ব্যতীত একটি উৎসবমূর্তিও এখানে অধিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে, আদি শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত সারদাদেবীর শ্রীমূর্তি চন্দন-দারুময়ী ছিল। কোন কোন মতে আদি শঙ্করাচার্য সারদাদেবীর যন্ত্রমাত্র প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কোন শঙ্করাচার্য উক্ত যন্ত্রের উপর চন্দন-দারুময়ী সারদামূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিধর্মীর আক্রমণে শৃঙ্গেরী মঠ ও মন্দিরের কিছু ক্ষতি হয়। ইহার পরে সারদাদেবীর মন্দির পুনর্নির্মিত এবং পঞ্চধাতুময়ী সারদাদেবীর মূর্তি প্রকাশিত হয়।

সারদা-মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে সর্বজ্ঞ পীঠ ব্যাখ্যান সিংহাসন। এই স্থানে নূতন আচার্যের পট্টাভিষেক ও গুরু-মন্ত্রের উপদেশ হয়।

সারদাদেবীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আদি শঙ্করাচার্য-

প্রতিষ্ঠিত শক্তি গণপতি, তৎসংলগ্ন পশ্চিমে বহু শালগ্রাম ও বহু দেবমূর্তি রহিয়াছে। সারদামাতার পিছনে ও পশ্চিম দিকে বিদ্যারণ্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী মূর্তি।

প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় রৌপ্যরথে সারদামাতার উৎসব-মূর্তিকে মন্দিরের ভিতর বাদ্যভাণ্ডাদি সহযোগে তিনবার প্রদক্ষিণ করানো হয়।

সারদা-মন্দিরের উত্তরে আদি শঙ্করাচার্যের মন্দির। ইহার চতুর্দিকে বেদ-সংস্কৃত-সদ্বিদ্যা-সঞ্জীবনী মহাপাঠশালা। ইহাতে বেদ, বেদান্ত, তর্ক, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও আগম-শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়। শুনিলাম, এই স্থানে প্রত্যহ প্রায় এক শত বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করেন। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবটুগণই এখানে অধ্যয়ন করিবার অধিকারী। তাঁহাদের বাসস্থান, ভোজ্য, বস্ত্র, ঔষধ, উপচার সমস্তই মঠ হইতে প্রদত্ত হয়।

একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে আদি শঙ্করাচার্যের একটি প্রস্তরময় মূর্তি। সেই মূর্তির পাদপীঠে সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, হস্তামলক ও ত্রোটক—এই প্রধান শিষ্যচতুষ্টয়ের খোদিত মূর্তি এবং তৎসম্মুখে কালাডি হইতে আনীত ধাতুময় উৎসব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত মূর্তিদ্বয় বিদ্যারণ্যের দ্বারা এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। চন্দ্রশেখর ভারতী (১২৯০ শক ?, ১৩৭১ শক ?) শঙ্করাচার্যের এই মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই স্থানে 'সরস্বতী ভাণ্ডার পুস্তকালয়' নামক একটি প্রাচীন পুথিশালা ও পুস্তকাগার আছে।

বিদ্যাশঙ্কর মন্দিরের দক্ষিণদিকে এবং তুঙ্গা নদীর তীরের সন্নিকটে মঠের পাকশালা। ইহাতে মঠসেবকগণের এবং বিদ্যার্থিগণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দুই ভাগে রন্ধন হয়। ঐ দুই শ্রেণীর মঠবাসীগণের জন্য পাকশালারই সংলগ্ন পৃথক্ পৃথক্ ভোজনশালাও আছে।

শৃঙ্গেরী মঠের প্রবেশদ্বারের পূর্বদিকের 'শৃঙ্গেরী ব্রহ্মা' নামক শৃঙ্গেরী মঠরক্ষকের একটি শিলামূর্তি রহিয়াছে। আদি শঙ্করাচার্য নাকি কোন এক ব্রহ্মরাক্ষসকে মুক্তি-দান করিয়া উক্ত মূর্তি শৃঙ্গেরী মঠের দ্বারপাল রূপে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে কোদণ্ডরামস্বামীর মন্দির। সারদাদেবীর মন্দিরের সামনে অখণ্ড প্রস্তরে নির্মিত প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভ দৃষ্ট হয়, ইহা ধ্বজস্তম্ভ নহে; জৈন রাজগণের প্রাচীন কীর্তিবিশেষ। শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়ের পূর্বে এই স্থান জৈন রাজগণের শাসনাধীন ছিল।

বর্তমান মঠাধীশগণের আশ্রম: তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ-তটে প্রায় এক বর্গমাইল একটি ভূখণ্ডে শৃঙ্গেরী মঠের বর্তমান প্রধান মঠাধীশের গুরু সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব নৃসিংহ ভারতী স্বামীর একটি সুরম্য মর্মরমন্দির ও উহারই সম্মুখে বর্তমান আচার্যদ্বয়ের বাসস্থান। তুঙ্গভদ্রার তটে চতুর্দিকে শ্যামল উপত্যকা-শোভিত নীল শৈলমালা ও শান্ত পরিবেশের মধ্যে এই স্থানটি বর্তমান মঠাধীশগণের ব্রহ্ম-চিন্তার স্থান রূপে নির্বাচিত হইয়াছে। এই স্থান 'নৃসিংহ-বন' নামে খ্যাত। একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান এই স্থানের বিশেষ শোভা বর্ধন করিয়াছে। শুনা যায়, এই স্থানে পূর্বে মঠাধীশগণের গ্রীষ্মাবাস ছিল। বর্তমান প্রধান মঠাধীশ শ্রীচন্দ্রশেখর ভারতী ও দ্বিতীয় মঠাধীশ শ্রীঅভিনব বিদ্যাতীর্থ স্বামিদ্বয় এই স্থানে সকল সময়ই বাস করেন।

নৃসিংহবনে সন্ন্যাসী ব্যতীত কোন গৃহস্থের থাকিবার অধিকার নাই। এখানে একটি গোশালা আছে। যে অট্টালিকার মধ্যে স্বামীদ্বয় বাস করেন, তথায় আদি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত ও তৎপ্রদত্ত কয়েকটি বিগ্রহ ও অন্যান্য দ্রব্য আমাদিগকে দেখানো হইল। আদি শঙ্করাচার্য যে চন্দ্রমৌলীশ্বর নামক শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন তাহা তথায় প্রতিষ্ঠিত আছে। অদ্যাপি প্রতি রাত্রিতে মঠাধীশগণ স্বহস্তে উক্ত শিবলিঙ্গের অর্চনা ও অভিষেক করেন। ঐ লিঙ্গের উপর একটি চন্দ্ররেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত চামুণ্ডেশ্বরী শালগ্রাম নামক একটি সুবৃহৎ শালগ্রামশিলাও দর্শনীয়। শালগ্রামের মধ্যে চামুণ্ডেশ্বরীর মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। নবরত্নগর্ভ-গজানন, সুবর্ণ শ্রীচক্র, স্ফটিক মেরু শ্রীচক্র তথায় রৌপ্যসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। এই সকল বস্তু শঙ্করাচার্য সুরেশ্বরাচার্যকে প্রদান করিয়াছিলেন।

স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ আমাদিগকে বিশেষ আগ্রহের সহিত উক্ত নৃসিংহবনে লইয়া যান। স্বামীজী তখন তুঙ্গভদ্রায় স্নানার্থ গমন করিতেছিলেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিলেন। স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের পিতার নাম সুব্রহ্মণ্য নামান্তর গোপী শাস্ত্রী এবং মাতার নাম লক্ষাম্মা গারু। তাঁহার পূর্বাশ্রমের পিতার ষোলটি সন্তানের মধ্যে তিনি চতুর্দশ, একমাত্র স্বামীজী ব্যতীত তাঁহার পূর্বাশ্রমের ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে আর কেহই জীবিত নাই। ইনি সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব নরসিংহ ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

উৎসব: বৈশাখ মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে শুক্লা পঞ্চমী পর্যন্ত পাঁচ দিবসব্যাপী আদি শঙ্করাচার্যের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, এতদ্ব্যতীত বৈশাখ মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে গিরিজা-কল্যাণোৎসব ও প্রতিপদ দিবসে সারদাদেবীর মহাভিষেকোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে

চাতুর্মাস্য সঙ্কল্পোৎসব হয়, ভাদ্রী অমাবস্যায় আবার শ্রীসারদা-দেবীর মহাভিষেক উৎসব হয়, আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে পনর দিবসকাল বিবিধ উৎসব হইয়া থাকে; ইহার মধ্যে পঞ্চমীতে চণ্ডীশালা-প্রবেশ, নবমীতে চণ্ডীহোম, একাদশীতে সারদাদেবীর রথোৎসব ও পূর্ণিমাতে নৌকা-বিহার উৎসব হয়। কার্তিকী শুক্লা তৃতীয়ায় ধ্বজারোহণোৎসব, শুক্লাষ্টমীতে রথোৎসব ও নবমীতে ভাসানোৎসব হইয়া থাকে। শিবরাত্রির সময় মল্লিকার্জুনের রথোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মল্লিকার্জুন: শৃঙ্গেরী মঠের অনতিদূরে ও উত্তরাভিমুখে একটি শৈলোপরি মল্লিকার্জুন-শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন। উক্ত শৈলে আরোহণ করিবার জন্য ১৬০টি সোপান আছে। মল্লিকার্জুন মন্দিরের সম্মুখে এক পার্শ্বে একটি শিলালেখ দৃষ্ট হয়। মন্দিরটি পূর্বাভিমুখী—পর্বত হইতে চতুর্দিকে অত্যুচ্চ নীল শৈলমালা ও হরিদ্বর্ণ বনরাজি-শোভিত উপত্যকাসমূহ দৃষ্ট হয়। মল্লিকার্জুন মন্দিরের প্রাকারের মধ্যে দক্ষিণ দিকেও একটি শিলালেখ আছে। উহা দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।

মল্লিকার্জুন মহাদেবের পরিক্রমার পথে পূর্বদ্বারের উত্তর পার্শ্বে স্বয়ম্ভূ-গণপতি একটি স্তম্ভগাত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই স্তম্ভটি দেখিতে শৃঙ্গেরী মঠের প্রাঙ্গণস্থ সারদাদেবীর মন্দিরের সম্মুখস্থ এবং উড়ুপীর বড়ভণ্ডেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখস্থ জৈন স্তম্ভের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহা সম্ভবতঃ জৈন স্তম্ভই হইবে।

মল্লিকার্জুন বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রমস্থ অর্চন লিঙ্গ বলিয়া খ্যাত। স্থানীয় অর্চকগণ বলেন, এই লিঙ্গ হইতে মহাদেব প্রকটিত হইয়া বিভাণ্ডক ঋষিকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং বিভাণ্ডক এই লিঙ্গের সহিত ঐক্য লাভ করেন।

মহাদেবের 'মল্লিকার্জুন' নাম হইবার একটি বিশেষ কারণ আছে। মহাদেব অর্জুনের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বীরত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য কিরাতবেশে অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অর্জুন ব্যাধরূপী সেই মহাদেবের উপর বাণ বৃষ্টি করিতে থাকিলে ব্যাধরূপী মহাদেব তাহা অতিশয় প্রসন্নচিত্তে স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিয়া অক্ষত শরীরে পর্বতের ন্যায় অচল ছিলেন।* শিব অর্জুনের বাণ মল্লিকাপুষ্পের ন্যায় সুকোমল বস্তু রূপে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া শিবের নাম মল্লিকার্জুন হয়। অর্জুনের বীরত্ব দেখিয়া শিব তাঁহাকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন। উক্ত পর্বতের উপর মল্লিকার্জুন মহাদেব স্থাপিত হওয়ায় পর্বতের নামও 'মল্লিকার্জুন' হইয়াছে। শৃঙ্গেরী মঠের দ্বারাই মল্লিকার্জুন মন্দির পরিচালিত হয়।

সশিষ্য আদি শঙ্করাচার্যের প্রতিমূর্তি

শৃঙ্গেরী মঠের আয়: শঙ্করাচার্যের অলৌকিক প্রতিভা ও যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে তদানীন্তন বহু ধর্মপ্রাণ রাজন্যবৃন্দ শৃঙ্গেরী মঠের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হন। কিন্তু ঐ সকল দানের স্মারক কোনও প্রমাণ রক্ষিত হইতে পারে নাই। ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম হরিহর শৃঙ্গেরী মঠের জন্য রাজস্ব, ভূমি ও গ্রামাদি দান করিয়া তাহা শিলালেখের মধ্যে উল্লেখ করিয়া যান। তাহা হইতেই শৃঙ্গেরী মঠের দানভাণ্ডারের প্রথম রক্ষিত প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন বিজয়নগরের রাজা শৃঙ্গেরী মঠের বিশেষ পৃষ্ঠ-পোষক হইলেন, তখন রাজমুদ্রাঙ্কিত বহু প্রকার উপঢৌকন শৃঙ্গেরী মঠের ধনকোষকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। বিদ্যাশঙ্কর ও বিদ্যারণ্যের প্রচার এবং রাজা প্রথম হরিহরের পৃষ্ঠপোষকতা দর্শনে অন্যান্য রাজন্যবর্গ ক্রমশঃ শৃঙ্গেরী মঠের সহায়ক হইতে থাকিলেন। এই ভাবে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শৃঙ্গেরী মঠ নির্ব্যূঢ় ও স্থায়ী ভাবে রাজস্ব, ভূমি, গ্রাম এবং নানাপ্রকার অধিকার ভোগ করিতে লাগিলেন। শৃঙ্গেরী একটি দুর্গম পার্বত্য কান্তারে অবস্থিত। সুতরাং সেই বিপুল ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রজাদের সহিত ভূসম্পত্তির মালিক মঠাধীশগণের

---

* মহাভারত বনপর্ব ৩৫ অঃ (মঃ মঃ শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ) ও শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা ৩৭ অধ্যায় (বঙ্গবাসী সং ১৩১৪ বঙ্গাব্দ দ্রষ্টব্য)

তথা দাতৃগণের সহিত মঠাধীশগণের পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের অভাবে তাহাদের স্ব স্ব অধিকারগত নানা প্রকার বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়। শিবাপ্পানায়েক নামক একজন কর্মকুশল ব্যক্তির প্রয়াসে প্রজা, জমিদার ও মঠাধীশগণের যথাযথ অধিকার নির্ণীত হইয়া বিবাদ মীমাংসিত হইয়া যায়।

যখন হায়দার আলি ও টিপু সুলতান মহীশূর রাজ্যের অধিকারী হইলেন, তখন তাঁহারাও শৃঙ্গেরী মঠ সম্বন্ধে বিজয়নগরের পূর্বতন রাজন্যবর্গের আদর্শের সম্মান করেন। তাঁহারা শৃঙ্গেরী মঠে সম্পত্তি প্রভৃতি দান করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের ধর্মসংক্রান্ত অধিকারসমূহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টায় ত্রুটি করেন নাই। এমন কি, তাঁহারা মঠের উৎসবাদির ব্যাপারেও আনুকূল্য করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, তাঁহারা তদানীন্তন মঠাধীশগণের সহিত পত্রাদি ব্যবহারও করিতেন।

মহীশূরের কোনও রাজা শৃঙ্গেরীর মঠাধীশকে মাসিক এক সহস্র টাকা করিয়া প্রণামী দিতেন। বর্তমানে শৃঙ্গেরী জায়গীরের আয় বাৎসরিক প্রায় তিন লক্ষ টাকা। এখনও গবর্ণমেণ্ট নাকি মঠের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

কল্যাণী

শ্রীগোপাললাল দে

একদা শঙ্খের নাদে, বাঁশী-সুরে তুমি এস গেহে,
নত আঁখি, শুচিস্মিতা শান্ত পদে দুরু দুরু হিয়া,
সীমন্তে সিন্দূরলেখা 'লজ্জাবাসে' আবরিত দেহে,
মোদের স্বাগত স্নেহ সেই ক্ষণে রহিল ঘিরিয়া।

দিনে দিনে ধীরে ধীরে বিথারিলে তোমার মহিমা,
আপনে করিয়া পর, বাড়াইলে আপনার সীমা ;
শাখা মেলি ফুলে ফলে প্রাণময়ী কুঞ্জবীথি খানি,
সেবায় সার্থক করি নিরলস সাজাইলে রাণি !

তোমারে হেরিনু রোগে শয্যাপার্শ্বে জাগিছ যামিনী,
উৎসবে উল্লাসময়ী উদাসিনী নিজসুখ পানে,
জননী আত্মীয়া জায়া নর্ম-সখী মুখে হাসি আনি,
ব্যস্ত আছ অবিরত গৃহস্থের মঙ্গল-বিধানে ;

দীর্ঘ জীবনের পথে সুখে দুঃখে সুচির সঙ্গিনী,
ফাল্গুনের শ্যাম শোভা মিলাইছ শ্রাবণের দানে।

রোমন্থন

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

আমারে রেখেছ তুমি যৌবনের উপাসক করি,
লীলায়িত দেহ-পাত্র পূর্ণ প্রেমে করে টলমল,
অতনুর দাহ সে কি চলিয়াছে যুগ যুগ ধরি ?
সম্মুখে গভীর সিন্ধু, তবু যেন নাই বিন্দু জল।

বিহ্বল নয়নে জাগে অতন্দ্রিত মধু পৌর্ণমাসী,
পরশ রভসে কাঁপে সারা অঙ্গ মুগ্ধ শিহরণে,
ইন্দ্রধনু রচা মন ক্ষণে ক্ষণে হয় যে উদাসী।
চুম্বন-মদিরা আজো থেকে থেকে পড়ে যে স্মরণে।

কি রহস্য নাহি জানি উছলিছে স্নিগ্ধ দুটি চোখে,
আলুলিত কেশপাশ স্বপ্নাতুর করে যে গো মোরে,
মর্মের গোপন কথা ফিরে পড়ি প্রেমের আলোকে।
হাস্যে, লাস্যে, মমতায় বাঁধিয়াছ দুটি বাহুডোরে।

স্মরণের কুঞ্জে মন আজো ফেরে করে মাধুকরী,
প্রৌঢ়ত্বের দ্বারদেশে শুনি যেন যৌবন-বাঁশরী।
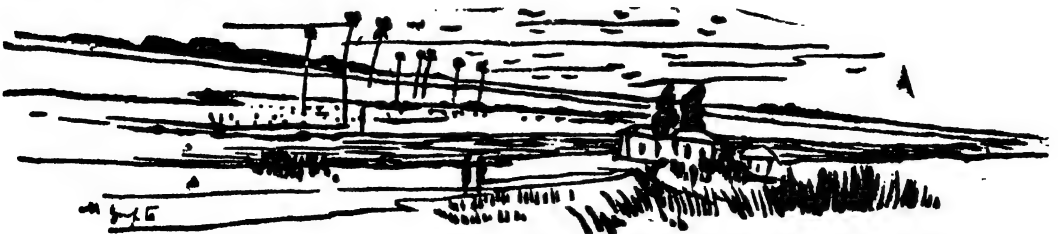
ভারতের সামাজিক সমস্যার এক দিক

শ্রীবিষ্ণুব্রত ভট্টাচার্য, এম-এ

ভারতবাসী আজ চরম সঙ্কটে কাল যাপন করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের পরও দেখা যায় সমাজের কোন উন্নতিই হয় নাই। সমাজের অগ্রগতির বাধা অনেক। লোকসংখ্যা যে হারে বাড়িয়া চলিয়াছে তদনুপাতে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর। রাষ্ট্রবিপ্লবের পর দেশে যে সকল অভিনব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সমাধান করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। দেশে আজ অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বাসস্থান নাই, জীবিকার সংস্থান নাই, ভারতীয় নাগরিকের সামাজিক চেতনা নাই। জাতীয় জীবনের এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমারজনীতে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলোক-বর্তিকা বহন করিয়া পথ নির্দেশ করিবে কে? পথ কোথায়?

কেবলমাত্র রাষ্ট্রনায়কদের প্রচেষ্টায় জাতি এই সংকট হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। যাহাদের লইয়া এই সমাজ গঠিত, সেই নাগরিকবৃন্দের প্রত্যেকে যদি অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী হয় তবেই রাষ্ট্রনায়কদের সাধু প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে নাগরিকদের স্বভাব নির্ভর করে সমাজের অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলির গঠন ও প্রকৃতির উপর। পরিবার ও সমাজের সম্বন্ধ, বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থানের মধ্যে ভিন্ন-প্রকৃতির পরিবারের উদ্ভব ও সেই পরিবারের স্বরূপ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকগণের কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের দেশীয় পরিবার-গুলির প্রকৃতি নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। দেশে প্রত্যেক নাগরিকের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও কেন জনসাধারণের উন্নতি হইতেছে না? সাধারণের উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রাণশক্তির কেন এত দৈন্য? ইহার সহিত আমাদের পরিবারের গঠন ও প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা চিন্তা করার আজ প্রয়োজন আসিয়াছে।

প্রখ্যাতনামা সমাজতাত্ত্বিক ল্য প্লে ও তাঁহার অনুবর্তীদের মতে পরিবারগুলিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়—কর্তৃপ্রধান পরিবার, অস্থায়ী পরিবার ও ব্যক্তিপ্রধান পরিবার।

কর্তৃপ্রধান পরিবারে পিতা অথবা গোষ্ঠীর প্রধান সর্বময় কর্তা। বিবাহিতা কন্যা ছাড়া সকল পুত্রকন্যাই এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাস করে। নিতান্ত নগণ্য দ্রব্য ভিন্ন এই পরিবারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিছু থাকে না, সবই পরিবারের সাধারণ সম্পদ। ব্যক্তি সমাজদেহের একটি অঙ্গ মাত্র। তাহার নিজস্ব কোন সত্তা থাকে না। এইরূপ পরিবার শিশুদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এখানে শিশুরা নিজের উপর নির্ভর না করিয়া পরিবারের উপর এবং চিরাচরিত সামাজিক রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা পায়। ফলে এই প্রকার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ রক্ষণশীল হইয়া পড়ে এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অতীতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের উপর পরিবারের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। যে সমস্ত স্থানে জীবিকার জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না, সেই সকল স্থানেই কর্তৃপ্রধান পরিবারের অস্তিত্ব দেখা যায়। পরিবারের খাদ্য, পরিচ্ছদ, আবাস প্রভৃতির উৎকর্ষ যে কি পরিমাণে ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল দেমোলিঁ সাহেব ষ্টেপস্ অঞ্চলের পরিবারের স্বরূপ-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় দেখা যায়, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত দুগ্ধ ও মাংস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, কারণ ঐ অঞ্চলে তৃণভোজী পশুর অভাব নাই। ঐ খাদ্য সংগ্রহ করিতে অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না; এক-একটি পরিবার সহজেই নিজ খাদ্যের সংস্থান করিতে পারে। যাযাবর জীবন যাপন করিতে হয় বলিয়া প্রত্যেক পরিবার পশুচর্মনির্মিত তাঁবুতে বাস করে। গোচারণ ঐ অঞ্চলের অধিবাসীর জীবনধারণের উপায়। তাই এক স্থানে তাহারা অধিক দিন একত্র বাস করিতে পারে না। সমগ্র দেশ তাই সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব থাকে না। পরিবারের মধ্যেও ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সেই ব্যক্তিত্ব কর্তার প্রতি আনুগত্যে পরিণতি লাভ করে।

মধ্য আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম অরণ্যে অস্থায়ী পরিবারের অস্তিত্ব দেখা যায়। বন্য জীবজন্তু শিকার দ্বারা এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকার সংস্থান হয়। এই শিকার এতই অনিশ্চিত যে, ইহার উপর নির্ভর

করিয়া একত্র অনেক প্রাণীর চলিতে পারে না। তাই মাত্র স্বামী ও স্ত্রী লইয়া এখানকার এক-একটি পরিবার গঠিত। শিশুগণকে শৈশব অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করা মাত্রই নিজেদের আহার্য সংগ্রহের জন্য পরিবারের বাহির হইয়া পড়িতে হয়। কাজেই এখানে স্থায়ী কোন বৃহৎ পরিবার গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই প্রকার পরিবারে জ্যেষ্ঠদের প্রতি কনিষ্ঠদের কোনরূপ আনুগত্য স্বীকার করিতে হয় না।

ব্যক্তিপ্রধান পরিবারের উৎপত্তি, তাহার কারণ ও বিকাশ সম্বন্ধে আঁরি দ্য তুরভিল্ (Henri de Tourville) বিশেষ ভাবে গবেষণা করেন। তাঁহার মতে নরওয়ের ফিয়র্ড অঞ্চলে, অপ্রচুর উর্বর ভূমিতে এই প্রকার পরিবারের উদ্ভব। মৎস্য শিকার এই অঞ্চলের অধিবাসীর প্রধান উপজীবিকা। উপরন্তু কৃষিকার্যের সাহায্যে স্বামী, স্ত্রী ও পরিবারের কতিপয় শিশুর ভরণ-পোষণ কোনক্রমে সম্পন্ন হয়। কৃষিযোগ্য ভূমি উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় এইরূপ অঞ্চলে বৃহৎ পরিবার গড়িয়া উঠিতে পারে না। প্রাপ্তবয়স্ক যুবকদিগকে তাই পরিবার ত্যাগ করিয়া অন্যত্র জীবিকার সন্ধানে যাইতে হয়। ভৌগোলিক অবস্থান অনুরূপ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে এইরূপে উদ্যমশীল, আত্মবিশ্বাসী ও স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলে। ভূমিকর্ষণের দ্বারা জীবিকা অর্জনের ফলে ভূমিখণ্ডের উপর এক-একটি পরিবারের অধিকার স্থাপিত হয়। প্রত্যেকটি পরিবার আত্মনির্ভরশীল বলিয়া প্রয়োজনবোধে তাহারা সমাজবন্ধনসূত্রে আবদ্ধ হইলে তখনই গণতন্ত্রের সূচনা দেখা দেয়।

প্রত্যেক প্রকার পরিবার নিজ প্রকৃতি অনুসারে শিশুদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। কর্তৃপ্রধান পরিবারে শিশুরা পরিবার বা গোষ্ঠীর প্রধানের আশ্রয়ে পরম শান্তিতে বসবাস করে। তাহাদিগকে সমগ্র পরিবারের জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সমস্তই উৎসর্গ করিতে হয়। তাহারা পরিবারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সমাজের জন্য তাহারা নিজ ব্যক্তিগত সত্তা হারাইয়া ফেলে। অন্নসংস্থানের জন্যও তাহাদিগকে কোন চিন্তা করিতে হয় না, পরিবারের কর্তা তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিবেন। কোন কারণে কোন ব্যক্তি যদি সমাজ হইতে বাহির হইয়া পড়ে তবে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসিলেও পরিবার তাহাকে নিজ ক্রোড়ে আশ্রয় দেয়। এই প্রকৃতির পরিবারে শিশুদিগকে বিশেষ শিক্ষাদানের কোন প্রয়োজন হয় না। সামান্যতম শিক্ষার ব্যবস্থাও যদি করা হয় তবে পরিবারেরই কেহ অথবা ধর্মযাজক বা পুরোহিতগণই তাহা করেন। এই প্রকার পরিবার লইয়া যে সমাজ গঠিত তাহা নিঃসন্দেহে রক্ষণশীল হইয়া পড়ে। জড় স্থাণুবৎ সেই সমাজ; প্রগতির কোন সম্ভাবনাই সেই সমাজে থাকে না।

অস্থায়ী পরিবারে শিশুদের শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা থাকে না। কর্তৃপ্রধান পরিবারের ন্যায় এই পরিবারের শিশুদিগকে কর্তৃত্ব বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না, আবার কোন নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিতও করা হয় না। এই পরিবারে কাহারও আনুগত্যের প্রত্যাশা করা হয় না অথচ তাহাকে নিজের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকে না। কোন বিশেষ শিক্ষা না পাওয়ায় শিশুরা কোন কাজ করিতে শিখে না, সুতরাং জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাহারা রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে।

ব্যক্তিপ্রধান পরিবারে শিশুরা যাহাতে নিজ জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা হয়। শিশুর অন্তঃপ্রকৃতির বৃত্তিগুলি এই পরিবারে পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে। নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত চলিতে পারে। সমাজবন্ধনে জড়িত হইলেও নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য যাহাতে বিলুপ্ত না হয় ব্যক্তি তাহার দিকে লক্ষ্য রাখে। কোন লোক নিজেদের কোন বিষয়ে পরিবার, গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্রের দিকে তাকাইয়া নিশ্চেষ্ট থাকে না। এই পরিবারে ব্যক্তিকে প্রধানত নিজ শক্তিসামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাস্তব জীবনে সাফল্য লাভ করিতে হইলে যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, এই পরিবারে সেইরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই করা হয়। শিশুগণ পরিবারের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় না, শৈশব হইতেই তাহাদিগকে প্রাপ্তবয়স্কদের অধিকাংশ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। এই প্রকার ব্যবহারের ফলে পরিণত বয়সে তাহারা আত্মনির্ভরশীল, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। শিশুদের মধ্যে উৎসাহ, প্রাণপ্রাচুর্য, উদ্দীপনা, জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার প্রেরণা ও সাহস প্রভৃতি গুণের সঞ্চার হয়। শৈশবকাল হইতেই বাস্তব জীবন সম্পর্কে তাহাদের পরিচয় হওয়ার ফলে তাহারা সাহসের সহিত সর্ববিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। জীবিকার সন্ধানে পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িতে ইহারা বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করে না। জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া ভিন্ন প্রকৃতির কোন পরিবারের সহিত সংঘাত উপস্থিত হইলে পরিণামে ইহারাই জয়লাভ করে। ইংলণ্ডের সমাজ এই ব্যক্তিপ্রধান পরিবার লইয়াই গঠিত। তাই ইংরেজগণ সমগ্র পৃথিবীতে এতকাল আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ

হইয়াছিল। যদিও অন্যান্য সমাজের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে খর্ব হইয়াছে, তবু সমগ্র পৃথিবীতে আজ ইংরেজ-মার্কিন সমাজের প্রতিপত্তি অপরিসীম।

এইবার ভারতীয় সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, এই সমাজ কর্তৃপ্রধান পরিবার লইয়া গঠিত। ভারতভূমি সুজলা সুফলা বলিয়া এখানে জীবিকার সংস্থান করা খুব কষ্টসাধ্য ছিল না। তাই ধীরে ধীরে এখানে এই প্রকৃতির পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছে; এখানে পরিবারের সকলেই পরিবার বা গোষ্ঠীর প্রধানের আশ্রয়ে থাকিয়া বসবাস করে। বাংলায় সাধারণতঃ সুবৃহৎ পরিবারের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও উত্তর-ভারতে এইরূপ অনেক পরিবার রহিয়াছে। প্রবাদ আছে, যুক্তপ্রদেশের কোন একটি পরিবারের জন্য প্রস্তুত একটি ডালের পাত্রে কয়েকটি বালক ডুবিয়া মারা যায়। এই প্রবাদের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট থাকিলেও সেই পরিবারের আকারটি কল্পনা করিয়া দেখিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের এই সমস্ত পরিবারে শিশুদের কোন পৃথক সত্তা থাকিতে পারে না। সর্ববিধ ব্যাপারে পরিবারের প্রধানের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া শিশুরা আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে শিখে না। তাহাদের অধিকাংশ সময় বিনা কাজে অথবা পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট কোন কাজে কাটিয়া যায়। শিশুদের জন্য আদৌ কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। সামান্য কয়জনের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহাও প্রায়ই তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতির বৃত্তিনিচয়ের সুষম বিকাশের অনুকূল হয় না। এই শিক্ষালাভের পর জীবন-সংগ্রামে রত হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে ব্যর্থ হইতে হয়। কিছু দিন পূর্বেও ভারতবর্ষে অন্নসমস্যা এত ভয়ঙ্কর আকারে দেখা দেয় নাই। বর্তমানে পরিবারের প্রত্যেকের অন্নের সংস্থান করা দুঃসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। উপার্জনক্ষম একটিমাত্র প্রাণীর উপর নির্ভর করে বহু লোকে। এমন পরিবারের সংখ্যা এদেশে নিতান্ত কম নয়। আবার শিশুগণও এমন কোন শিক্ষা পায় না যাহাতে পরিণত বয়সে তাহারা সাফল্যের সহিত বর্তমানের কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইতে পারে। ফলে দেশে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে।

পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে আজ নবজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। ভারতও আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। আইনের দৃষ্টিতে ভারত আজ সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। কিন্তু দেশের যে সমাজ-ব্যবস্থা তাহাতে কেবলমাত্র রাষ্ট্রনায়কদের প্রচেষ্টায় দেশ দ্রুত প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। আজ দেশের উন্নতিকল্পে সমাজ-নায়কদেরও দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া আগাইয়া আসিতে হইবে। তাঁহাদিগকে বর্তমান সমাজ এমন ভাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তিপ্রধান পরিবারের শিশুদের মত আমাদেরও শিশুরা স্বাধীনচিত্ত, আত্মনির্ভরশীল, কর্মনিষ্ঠ এবং অফুরন্ত প্রেরণা ও দুর্দম প্রাণশক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তবেই তাহা দেশকে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে। নচেৎ দুর্বলচিত্ত উদ্যমবিহীন, পরভৃৎ শিশুরা দেশ ও সমাজের অগ্রগতিতে প্রতি পদক্ষেপে বাধার সৃষ্টি করিবে।

বাল্মীকি-রামায়ণে রামচরিত্র

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়
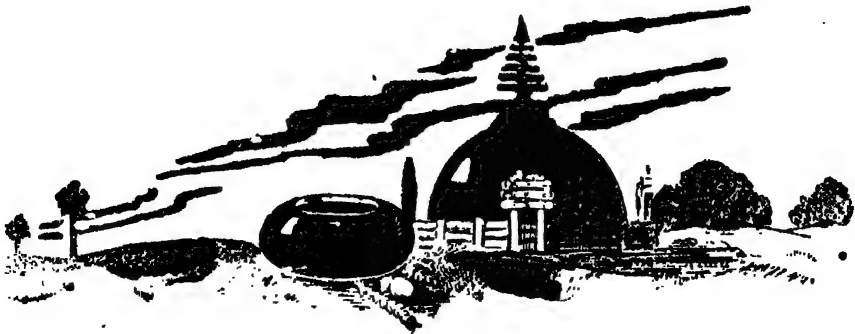
রামচন্দ্রকে অনেকেই ভগবান বলিয়া মানেন এবং তিনি ভগবানের দশ অবতারের এক অবতার বলিয়া গণ্য। মহাত্মাজীর রামধুনে তিনি স্বয়ং ভগবান। হিন্দুর ক্ষাত্র-শক্তির পূর্ণ বিড়ম্বনার যুগে রচিত 'রামচরিতমানসে' গোস্বামী তুলসীদাস বলিতেছেন:

> কলিযুগে ন করম ভগতি বিবেকু,
> রাম নাম অবলম্বন এঁকু।

কৃত্তিবাসের অবস্থা তথৈবচ।

বাল্মীকি-রামায়ণ পড়িলে আসলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম বলিয়া মনে হয়। সেখানে আমরা দেখি জিগীষু আর্য্য-সভ্যতা ও সেই সভ্যতার প্রধান পুরুষ রামচন্দ্রকে অন্য মূর্ত্তিতে। উত্তর-ভারতের অনেকখানির উপর আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া আর্য্যগণ তখন ক্রমে দক্ষিণাপথের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আর্য্যগণের প্রধান রাজ্য কোশল এবং রাজ্যের নগরীর নাম অযোধ্যা—যুদ্ধে অজেয় বলিয়াই অযোধ্যা নাম। মহারাষ্ট্র-বিবর্দ্ধন দশরথ অযোধ্যার রাজা। অযোধ্যা নগরী কপাট-তোরণ-সমন্বিতা সুবিভক্ত-ক্ষুদ্র-পথ-শোভিতা, শত শত শতঘ্নী প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিতা এবং গভীর জলে পূর্ণ পরিখা দ্বারা সুরক্ষিতা। ইহার পরে আছে অযোধ্যার সৌন্দর্য্য, সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা।

অযোধ্যার দক্ষিণে গাঙ্গেয় অঞ্চল তখন জলস্থলময় এবং অনার্য্য নিষাদপতি গুহকের রাজ্য। কৈবর্ত্ত-চালিত পঞ্চ শত নৌকা তাঁহার নৌবল; মৎস্য মাংস ও মধু তাঁহার উপঢৌকন দ্রব্য। গঙ্গার দক্ষিণে চিত্রকূট; তাহার কিছু দক্ষিণ হইতেই গভীর দণ্ডকবনের আরম্ভ। দণ্ডকবন আসলে অনার্য্য রাক্ষসজাতির রাজ্য এবং ইহার উত্তরাংশ জনস্থানে রাবণের আধিপত্য তখনও বিদ্যমান। খর প্রভৃতি রাবণের আত্মীয়গণ সসৈন্যে ঐ সব অঞ্চলে বিরাজমান। কিন্তু আর্য্য সংস্কৃতির অগ্রদূত ঋষি তপস্বীরা ইতিমধ্যে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণে বহু দূর পর্য্যন্ত আপনাদের আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। মনে হয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্রের সহিত শস্ত্রেরও কারবার করিতেন। ফলে অনার্য্য রাক্ষসদের সহিত তাঁহাদের ঠোকাঠুকি হইতেছে এবং পশ্চাতে আসিতেছেন ক্ষত্রিয় রাজারা সসৈন্যে অশ্ব-যোজিত রথে চড়িয়া, লৌহ-বর্ম্মাবৃত দেহে ধনুকে লৌহ-মুখ তীর জুড়িয়া। তাঁহাদের সৈন্যদলও অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত এবং উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। ফলে অনার্য্যেরা পিছু হটিতেছে এবং আর্য্যেরা রক্তাক্ত ভূমির উপর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন।

সংক্ষেপতঃ ইহাই বাল্মীকি-রামায়ণের পটভূমিকা এবং সেই পটভূমির পুরোভাগে আমরা পাই একান্ত মানবীয় ও নানা লৌকিক সদ্‌গুণসম্পন্ন, স্বধর্ম্ম ও স্বজনগণের রক্ষক শত্রু-নিসূদন রামচন্দ্রকে। কতকগুলি অবাস্তব ও অসংলগ্ন অংশ ছাড়া আদি রামায়ণে আখ্যানভাগে কোথাও রামচন্দ্রের উপর দেবত্বের আরোপ করা হয় নাই। আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বারটি শ্লোকে রামের যা বর্ণনা আছে তাহাতে অতি-মানবত্ব কোথাও নাই:

> স চ সর্ব্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ
> সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে ধৈর্য্যেন হিমবানিব।
> বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ
> কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
> ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম্ম ইবাপরঃ

ইহাই সংক্ষেপতঃ তাঁহার পরিচয়। নরশার্দ্দুল, মহাবাহু, রাজীবলোচন, লক্ষ্মণাগ্রজ, কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন ইত্যাদি রামের সাধারণ বিশেষণ। আদি রামায়ণে রামের অনুভূতি 'প্রক্ষোভ' (emotion), কল্পনা, বাসনা, ব্যবহার ও চেষ্টা সব কিছুই লৌকিক ও মনুষ্যোচিত। রণক্ষেত্রে আহত লক্ষ্মণের জন্য তাঁহাকে একাধিক স্থানে সাধারণ মানুষের মত শোক প্রকাশ করিতে দেখা যায়।

> দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ
> তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতাসহোদরঃ।

রামায়ণের এই শ্লোক আজ অনেকেরই পরিচিত। সীতা-হরণের পর তাঁহার তীব্র শোক ও অস্থিরতার বর্ণনা একাধিক স্থানে আছে। অধিকাংশ স্থলে এই সব বর্ণনার পশ্চাতে আছে প্রাকৃতিক পটভূমিকা। এই সব স্থলে রামের শোক ও আচরণ নিতান্ত মানবোচিত এবং অপূর্ব্ব কাব্যসুষমায় মণ্ডিত:

> "বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ
> ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টি-সমাগমঃ।"

সীতা-হনুমান-সংবাদে হনুমান বলিতেছেন, "রাম আপনার বিরহে মধু ও মাংসাহার ত্যাগ করিয়াছেন, নিত্য আপনার ধ্যান করিতেছেন, সর্ব্বদা এত অন্যমনস্ক থাকেন যে গাত্রে মশক ও মক্ষিকা বসিলেও অনেক সময়ে সাড় হয় না।" সূর্পনখার সহিত কথোপকথন এবং লঙ্কা হইতে

উদ্ধারের পর সীতার সমক্ষে তাঁহার মনোভাবের প্রকাশ সকলই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মানবোচিত। সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা পালনে বিলম্ব দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ; সমুদ্রকূলে আসিয়া সমুদ্রের অগাধত্ব ও দুস্তরত্ব অনুভব করিয়া তিনি হতাশায় মুহ্যমান। কাব্য রচনা করিতে গেলে ইহাই চাই; কাঠের পুতুল লইয়া কাব্য হয় না। তবে সব-কিছুর উপরেই আছে তাঁহার মহামানবোচিত ধৈর্য্য, দৃঢ়তা ও শৌর্য্য যাহা পরিণামে সমস্ত আলোড়ন ও চঞ্চলতার মধ্য দিয়া তাঁহাকে মহাজনোচিত কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত করিতেছে।

কিন্তু শুধু ন্যায়ধর্ম্মপরায়ণ হইলেই হয় না। ব্যবহারিক জীবনে দক্ষতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। মহাকাব্যের নায়ক শুধু উদাত্ত নহেন, তিনি চতুর অর্থাৎ কর্ম্ম-কৌশল-সম্পন্ন। তাই দেখি 'সত্যে ধর্ম ইবাপর' রামচন্দ্র কর্ম্ম-কুশল, রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ। বালী ও সুগ্রীবের বিবাদের সুযোগ লইয়া তিনি সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিজেকে সহায়-সম্পন্ন ও সৈন্যবলে বলীয়ান করিলেন। বালী-বধের সমর্থনের জন্য তিনি—ভরত পৃথিবীর রাজা সুতরাং ভরতের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি বালীকে অগম্যাগমনের জন্য শাস্তি দিতেছেন ইত্যাকার সাফাই গাহিলেন। অধিকন্তু বলিলেন, বানরের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধের প্রয়োজন নাই এবং শেষটায় বুঝাইলেন রাজাকে হিংসা, নিন্দা বা অপমান করা, কিংবা অপ্রিয় বলা উচিত নয়; কেননা 'দেবা মনুষ্যরূপেণ চরন্ত্যেতে মহীতলে।' 'ভেদ চতুরঙ্গ রাজনীতির অঙ্গ; সুতরাং এইসব যুক্তি প্রয়োগ করিয়া শাস্ত্রমতে রামচন্দ্র বোধ হয় ধর্ম্মভ্রষ্ট হন নাই। অথচ সমস্ত রামায়ণ পড়িলে বেশ বুঝা যায়—দাক্ষিণাত্যে তখন আর্য্য-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; বিভিন্ন অনার্য্যেরাই ছিলেন সেখানকার রাজা। দাক্ষিণাত্যের ভূগোল সম্বন্ধে রাম-চন্দ্রের পরিচয় ছিল নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও অস্পষ্ট। এমন কি রাবণ বা লঙ্কার সংবাদও তিনি রাখিতেন না। রামের সৈনাপত্যের পরিচয়ও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। লঙ্কা হইতে প্রত্যাগত হনুমানের নিকট তিনি রাবণের দুর্গ ও বলাবল সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ লইতেছেন। পরে লঙ্কা অবরোধ করিয়া তিনি শত্রুপক্ষের সেনা-সংস্থানের উপর লক্ষ্য রাখিয়া যথোপযুক্ত যুদ্ধ-পরিচালনা করিতেছেন এবং তাহাদের আক্রমণের গতি ও প্রকৃতি অনুমান করিয়া বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ রণকৌশল নির্দ্ধারিত করিতেছেন। পর্ব্বতের উপর অবস্থিত এবং প্রাচীর ও পরিখা-বেষ্টিত লঙ্কা জয় করা সহজসাধ্য ছিল না। অস্ত্রবলে নিকৃষ্ট হইলেও রামচন্দ্রের সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক। রাক্ষসেরা প্রাচীরের উপর হইতে মুক্ত অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিত এবং মাঝে মাঝে বাহির হইয়া অতর্কিতে আক্রমণ করিত। সুদীর্ঘ অবরোধের পর অবশেষে রামচন্দ্র লঙ্কা-নগরীকে করতলগত করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যময়ী মহানগরীকে লুণ্ঠন করিবার লোভে বানরসৈন্য দীর্ঘকাল সংহত থাকিয়া যুদ্ধ চালাইয়াছিল।

আসলে রামচন্দ্র সে যুগের আর্য্য-আধিপত্য-বিস্তারের অগ্রণী। নিজের আর্য্য দ্বিজসম্প্রদায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের তিনি পৃষ্ঠপোষক এবং তাহাদের সঙ্গে আচরণে তিনি ন্যায়ধর্ম্মপরায়ণ—'রক্ষিতা স্বস্য ধর্ম্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।' সমাজ উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট না হয় এজন্য তিনি লঙ্কা-জয়ের পর সীতার অগ্নিপরীক্ষা করাই-লেন এবং দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষার দাবি করিয়া তাঁহাকে মর্ত্ত্যধাম ছাড়িয়া পাতাল প্রবেশ করিতে একরূপ বাধ্য করিলেন। অনধিকারচর্চ্চা করিবার জন্য তিনি শূদ্রককে দিলেন চরম দণ্ড। অনেক মিষ্ট কথার প্রয়োগ থাকিলেও দেখা যায়, সে যুগে স্ত্রীলোক সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হইত এবং শূদ্রজাতির অধিকার ছিল সঙ্কীর্ণ।

সে যুগের এই সব কতকগুলি অসম ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া বলা যাইতে পারে যে, রাম ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, প্রজা-হিতৈষী ও প্রজা-রক্ষণে সমর্থ মহান্ রাজচক্রবর্ত্তী। পারিবারিক জীবনে নানা দিক দিয়া তিনি এখনও আমাদের আদর্শস্থানীয়। তাঁহার দীর্ঘ সুশাসনে দেশে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং সাধারণ লোকের জীবন অভাব ও উৎপীড়নের হাত হইতে অনেকখানি রক্ষা পাইয়াছিল। আজ তাই আমাদের দেশে 'রামরাজ্য' শব্দের অর্থ জনসাধারণের মধ্যে একটা শান্তি ও প্রাচুর্য্যের অবস্থা।

বাল্মীকি-রামায়ণ আসলে 'সেকুলার' কাব্য এবং মানব-মনের রতি-শোক-উৎসাহ আদি বাসনা-ব্যাপার লইয়াই ইহার কারবার। এই মহাগ্রন্থ বিবিধ চরিত্রের সমাবেশে পূর্ণ এবং প্রত্যেক চরিত্রই মানবীয় এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। অধিকাংশ স্থলেই চরিত্রগুলির একটা নিত্যকালীন সত্তা আছে। পাঠকালে তাহাদের কাছে পাওয়া যায়, তাহাদের সত্তা অনুভব করা যায় এবং নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় বোধ হয়। তাহারা সকলেই প্রাণবান রক্তমাংসের মানুষ। গ্রন্থের নায়ক রামচন্দ্র সর্ব্বপ্রকার অলৌকিকত্ব ও দেবত্ববর্জ্জিত মানবচরিত্র। রামকে মহামানব বলা যাইতে পারে, কেহ আদর্শ মানবও বলিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাতে

দেবত্বের আরোপ করা যায় না। মানবচরিত্র বলিয়াই কাব্যে সে চরিত্র এত উচ্চ অঙ্গের সৃষ্টি এবং এত কাল ধরিয়া লোকের মনে শ্রেয় ও প্রেয় বস্তু রূপে বিরাজ করিতেছে। এ চরিত্র মনে আশা জাগায়, ভরসা জাগায়, মানুষের অধ্যবসায়কে উদ্রিক্ত করে ও মহত্ত্বে মহীয়ান্ করে। আদি রামায়ণের রামচন্দ্রকে আমরা পাই একান্ত ভাবে নিজেদের মধ্যে। তাঁহার সুখে দুঃখে আমাদেরও চিত্ত আন্দোলিত হয়।

ইদন্তু মম দীনস্য মনো ভূয়ঃ প্রকর্ষতি
যদিহাস্য প্রিয়াখ্যাতুর্ন কুর্মি সদৃশং প্রিয়ম্।
এষ সর্বস্বভূতস্তু পরিষ্বঙ্গো হনুমতঃ।
ময়া কালমিমং প্রাপ্য দত্তস্তস্য মহাত্মনঃ।

এ সকল কথা মানুষেই বলিতে পারে, এগুলি দেবতার উক্তি নহে।

পশ্চিমবঙ্গ বন্দনা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বন্দি মা পশ্চিমবঙ্গ,
গঙ্গায় ধৌত মা পুণ্য শ্রীঅঙ্গ।
বাস্তার পর্বতে ঘেরা তব মন্দির দূর্বায় স্নিগ্ধ মা প্রাঙ্গণ,
পদ্মায় যৌবনছন্দের নৃত্যে ঝঙ্কৃত সৃষ্টি ও ভাঙন।
আম-জাম-নারিকেল-খর্জ্জুর তাল-বেল-কুঞ্জেরি রসভরা কান্তি,
ঊর্দ্ধেতে ওঙ্কার-ঝঙ্কৃত অম্বর নিয়েতে মাঠঘেরা শান্তি
ভৈরব দামোদর তিস্তা চপলকলছন্দা,
অজয় জলঙ্গী ও রূপনারায়ণ মহানন্দা,
চূর্ণি কংসাবতী দ্বারকা কোপাই ময়ূরাক্ষী,
ছোট্ট বালিকাসম হাস্যেতে চঞ্চল তব স্নেহ-বক্ষেরি সাক্ষী।
সঙ্গেতে ষড়ঋতু নর্ত্তনরঙ্গ,
বন্দি মা পশ্চিমবঙ্গ!

রঙীন প্রত্যুষে লক্ষ বিহঙ্গম-সঙ্গীতে বেজে ওঠে পল্লী,
মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা আরত্রিকে নেচে ওঠে অন্তর-বল্লী।
গোলাপ পদ্ম যুঁই মল্লিকা বেলফুল করবী গন্ধরাজ চম্পা,
টগর হাস্নুহানা রজনীগন্ধা বুকে গন্ধে বিতর অনুকম্পা।
শেফালি রক্তজবা কুন্দ কেতকী-মকরন্দ,
কন্ঠে মালতীফুল হাস্যে ঢালিছে রসে ছন্দ।
মত্ত হরষে কালবৈশাখী বুকে তোর গর্জে,
হর্ষের হিল্লোলে লক্ষ বর্ষা এসে শীর্ষেতে ঢেলে যায় বরষে।
শ্রীগৌরাঙ্গপদচুম্বিত অঙ্গ,
বন্দি মা পশ্চিমবঙ্গ!

মালদহ বীরভূম বাঁকুড়া বর্দ্ধমানে গৈরিকরূপধ্যানমগ্না,
হাওড়া মেদিনীপুর হুগলী নবদ্বীপে শিল্পকল্পলোকলগ্না।
জলপাইগুড়ি কোচ দিনাজ দার্জিলিঙে পুলকি ঝলকে রূপ ইন্দু,
চব্বিশ পরগণা সুন্দরবনতলে পদযুগ চুম্বিছে সিন্ধু।
মুর্শিদাবাদ তোর গজমোতি মুক্তার মাল্য,
নিত্যনামামৃত কীর্ত্তনে ঢালে নির্মাল্য।
সর্বভারতহৃদিকৃষ্টিতীর্থ তুমি ধন্যা,
জন্মিল তোরি বুকে ধরার শ্রেষ্ঠ কবি, গৌরবময়ী কত কন্যা।
গঙ্গার নন্দিনী নন্দন অঙ্গ,
বন্দি মা পশ্চিমবঙ্গ!

কুঞ্জবনেতে তোর ভৃঙ্গের ঝঙ্কার মেঘে বাজে বজ্রের ডঙ্কা,
লক্ষ্মীর মূর্ত্তিতে গোধূম ধান্য হাতে কালিকার বেশে নাশো শঙ্কা।
পিক শুক চন্দনা দোয়েল ফটিকজল বৌকথাকও ঘুঘু গায় গান,
বিদ্যুৎ চকমকি বৃষ্টির ঝমঝম্ আনন্দে প্রাণ করে আহ্বান্।
ভক্তের মাটি তুমি রক্তের তর্পণে ধন্যা,
বক্ষে বহিল তব যুগ যুগ ধর্ম্মেরি বন্যা।
অগ্নির শিখা তুমি মূর্ত্ত তোমাতে হরিহর গো,
জন্মভূমির মহামুক্তির রক্তের হে আদিম মৃন্ময়ী স্বর্গ!
লক্ষ আশীর্বাদে ভরা তব অঙ্গ,
বন্দি মা পশ্চিমবঙ্গ!

পম্‌পম্

শ্রীশিশিরচন্দ্র বসু

এক

মেয়েটি সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। আগ্রহভরে চেয়ে দেখে।

—এই যে, এসেছেন। নমস্কার।

সন্ধ্যার আঁধারে পার্ক তখন প্রায় নির্জ্জন হয়ে এসেছে। একটু আগে যাঁরা বেড়াচ্ছিলেন, একে একে ফিরে যেতে সুরু করেছেন।

—আপনিই বুঝি লিখেছেন চিঠিখানা? আমি জিজ্ঞেস করি।

মেয়েটি স্বচ্ছন্দে বেঞ্চিতে এসে বসে। বলে—হাঁ, আমিই লিখেছি। আশ্চর্য্য হচ্ছেন?

—আশ্চর্য্য যদি বা হই, তাতে কি দোষ দিতে পারেন?

আশ্চর্য্য ব্যাপারই বটে। কিছুদিন হ'ল চাকরি নিয়ে জেনিভাতে এসেছি। নিতান্ত বিদেশী আমি। আলাপ-পরিচয় কারও সঙ্গে এখনও বিশেষ হয় নি। আপিস যাই—বাড়ী ফিরি। অনুরোধে পড়ে কখনও কখনও স্থানীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিই। ঐ পর্য্যন্ত। হঠাৎ সেদিন ভোরের ডাকে একখানা চিঠি আসে—আপনি আজ সন্ধ্যায় যদি একবার পার্ক দে জোভিভে (Parc des Eaux-Vives) আসেন, তা হলে বাধিত হই। না এলে কিন্তু হতাশ হব। ইতি জি. এম্।

জি. এম্ নামধারী কাউকে আমার পরিচিত বলে মনে হয় না। ভাবতে থাকি যাব কিনা। কৌতূহল জয়ী হয় শেষ পর্য্যন্ত। আপিসের ছুটির পরে পার্ক দ্যে জোভিভে যাই। একটা খালি বেঞ্চি দখল করে বসে অপেক্ষা করি। ক্রমশঃ সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে আসে।

মেয়েটি বলে—আপনার কথা শুনে মনে হয়, আপনি চিঠিটা পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছেন?

—না, ঠিক তা' নয়। তবে ব্যাপারটা একটু অসাধারণ মনে হয়েছে।

পার্কের আলো জ্বলে ওঠে। এতক্ষণে তাকে ভাল করে দেখার সুযোগ হয়। সুন্দরী তরুণী। বয়স আন্দাজ কুড়ি একুশ। তনু দেহ যৌবনের পূর্ণ জোয়ারে নিটোল। সুডোল মাথার কেশরাশি যেন সোনালী রেশমের স্তবক। মুখখানি ঢলঢলে। ডাগর দুটি চোখের নীলাভ দৃষ্টিতে সাগরদোলার শিহরণ—মেয়েটি রঙ। নদী রঙের ব্লাউজ এবং লাল টকটকে মেরিনো-স্কার্টে তাকে মানিয়েছে চমৎকার।

চাঁপার কলি আঙুলের আদুরে চাপে কানের পাশে এলিয়ে পড়া চুল সরিয়ে মেয়েটি বলে—যাক, বাঁচলুম যে অসন্তুষ্ট হন নি।

—না, কিন্তু কেন লিখেছেন, জানতে পারি কি?

—নিশ্চয়। শুনুন। গত শনিবার আপনি আন্তর্জাতিক ছাত্রপরিষদে বক্তৃতা দিয়েছেন, মনে আছে? আমি সেখানে ছিলাম। কেমন যেন খেয়াল হ'ল আপনার সঙ্গে আলাপ করি। আপনার ঠিকানা যোগাড় করতে অসুবিধা হয় নি—পরিষদের কর্ম্মসচিব আপনার সম্বন্ধে সবই জানেন।

জিজ্ঞেস করি—কেমন লাগল আমার বক্তৃতা?

মেয়েটি হাসে—আমি কি ছাই শুনেছি কিছু। কি করে আপনার সঙ্গে আলাপ করা যায়, তাই কেবল ভেবেছি যে।

ক্ষুণ্ণ হয়ে বলি—আপনি আমায় চেনেন না, বক্তৃতা পর্য্যন্ত শুনলেন না, অথচ আলাপ করতে ইচ্ছে হ'ল?

মেয়েটি কথার সুরে আব্‌দার মিশিয়ে বলে—কিন্তু আপনাকে কেমন যেন খুব ভাল লাগল।

বিস্মিত হয়ে বলি—আমার সঙ্গে তামাশা করছেন?

সে অপ্রস্তুত বোধ করে—না, মঁসিয়ে, তামাশা নয়, সত্যিই ভাল লেগেছে…না হলে…বিশ্বাস করুন আমাকে।

গম্ভীর হয়ে বলি—কিন্তু ভাল করেন নি।

মেয়েটির মুখ আঁধার হয়ে যায়। বলে—কেন? আপনি কি আমার বন্ধু হতে পারেন না?

চোখ দুটি তার ছল্ ছল্ করে।

সুর নরম করে বলি—বন্ধু হলেই যদি আপনি খুশী হন, বেশ ত। কিন্তু আপনার পরিচয় ত কিছু পেলাম না?

—পরিচয় পাবেন বৈকি।

মেয়েটি একটু চুপ করে থাকে। তার পর বলতে সুরু করে—আমি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। জাতিতে আমরা ফরাসী। আত্মীয়স্বজন একরকম নেই বললেই হয়। ছোটবেলায়ই মাকে হারিয়েছি। বাবা ছিলেন—প্যারিসে মোটরগাড়ীর কারবার করতেন। দু' বছর হ'ল তিনিও নেই। থাকার মধ্যে আছেন এক বুড়ী পিসি। তা শহরের আবহাওয়া তাঁর সহ্য হয় না, তিনি বেশীর ভাগ সময়ই নীস্-এ সমুদ্রতীরে থাকেন। তাই প্যারিসের বাস তুলে আমি এখানে চলে এসেছি। বাবা সামান্য কিছু রেখে গেছেন, সুতরাং অর্থ-কষ্ট তেমন নেই। পড়াশুনো নিয়েই সময় কাটে; কিন্তু বড় একা মনে হয়।

চোখ থেকে তার দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। কেমন যেন সহানুভূতি জাগে তার প্রতি। বলি—কৈ, আপনার নাম ত বললেন না?

—জেনীভিভ। জেনীভিভ দ্য মিরাবেল। বাবা কিন্তু ডাকতেন পম্‌পম্ বলে। বেশী বক্ বক্ করি কিনা, তাই

তা আপনিও পম্‌পম্‌ বলেই ডাকবেন, কেমন? ঐ নামটাই আমার বেশী ভাল লাগে। এবার আপনার পরিচয় দিন।

—আমার পরিচয় ত আপনি সবই সংগ্রহ করেছেন, পরিমল থেকে। নয় কি?

—তা সত্যি।

সে একটু ইতস্তত: করে বলে—তা হলে, আমরা বন্ধু, কেমন?

—আপনার যখন এত ইচ্ছে, তাই হোক।

সে কাছে সরে আসে। হাতখানি বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। হাতে হাত রেখে বসে থাকি। আঁধারের ঘেরাটোপে রাত্রি ক্রমশ: এগিয়ে আসে। আকাশে তার পথ জুড়ে ফুটে ওঠে সহস্র তারার রোশনাই। বিরাট পার্ক, বিজন-নিস্তব্ধ। বিজলীবাতির ছায়াগুলো দুলে দুলে প্রশস্ত তৃণভূমিতে আলো-আঁধারের আলপনা আঁকে।

হাত ছেড়ে মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়—রাত হ'ল, আজ তবে যাই।

এক পা দু' পা করে সে এগিয়ে যায়। আবার সে ফেরে—

আপনি কি বাসায় ফিরবেন এখন? সঙ্গে গাড়ী আছে, চলুন নামিয়ে দিয়ে যাই তা হলে।

গাড়ীতে ওঠার সময় সে বলে—ঐ যা, আপনাকে বলতে ভুলেছি, আমার বাসার ঠিকানাটা। আমি থাকি—নং অ্যাভেনিউ সাঁপেলে। ঐ যে ট্রামের ডিপো, ঠিক তার উল্টোদিকে যে একখানা ছোট্ট দোতলা বাড়ী, তাতে। মনে থাকবে ত?

গাড়ী ছুটে চলে। আমরা নীরবে পাশাপাশি বসে। তার হাতে ষ্টিয়ারিং। হঠাৎ থেমে আসে গাড়ীর গতি। ক্যাঁচ করে ব্রেকের শব্দ হয়।

—এসে গেছি, নামুন এবার।

এক রকম ঠেলেই আমাকে নামিয়ে দেয় গাড়ী থেকে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে মাথাটি হেলিয়ে বলে—আচ্ছা, আবার দেখা হবে।

পলকের তর সয় না, গাড়ী আবার চলতে থাকে। তার পিছনের লাল আলো রাস্তার বাঁকে চোখের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ে।

২

মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয় না। প্রথম দিন দুয়েক তার কথা মনে হয়েছে। তারপর নানা কাজে ব্যস্ত থেকে তার কথা ভাববার অবসর হয় নি।

দিন দশেক কেটে গেছে। সেদিন রবিবার। আপিসে বেরুতে হয় নি। সারাদিন আলসেমি করে কাটিয়েছি। বিকালবেলাটা যেন আর কাটিতে চায় না। বেড়াতে যাওয়ারও উৎসাহ নেই। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ। ঠাণ্ডা পড়তে সুরু করেছে। এ সময়ে সান্ধ্য ভ্রমণ আরামদায়ক ত নয়ই বরং রাস্তায় চলার সময়ে বিশেষ মনোযোগী না হলে পা পিছলে হাড়গোড় ভাঙার সম্ভাবনাই বেশী। এ সময়টাতে রাস্তায় জল থাকলে তা পাতলা সরের মত জমে পথ পিছল করে রাখে; তাই খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। সুতরাং বায়ুসেবনের আকর্ষণও নেই।

একখানা বই টেনে নিয়ে মন বসাতে চেষ্টা করি। বাইরে কে যেন দরজা ঠেলছে। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলি। দেখি মেয়েটি দাঁড়িয়ে।

হেসে বলে—নমস্কার, আসতে পারি?

—নমস্কার, এই যে, আসুন আসুন।

লঘু চরণক্ষেপে সে ঘরের ভিতর আসে। একখানা চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিই। সে বলে—"মেরার সি (ধন্যবাদ) মন্ আমিঁ (বন্ধু), কিন্তু তুমি আমাকে আপনি করে কথা বলছ কেন? আমাকে ত পম্‌পম্‌ বলে ডাকলে না"—এই বুঝি বন্ধুর মত কাজ?

এমন ভঙ্গী করে সে বলে, যেন কতদিনের জানাশোনা।

আমি হেসে বলি, আচ্ছা, এবার থেকে বন্ধুর মতই তোমাকে ডাকব। আজ যে, হঠাৎ আমার মনে পড়ল—ব্যাপার কি?

অভিমানের ঝাঁঝে সে বলে—তা ত বলবেই। নিজে ত গেলে না একদিন। বাড়ীর ঠিকানা ত দিয়েছিলাম।

—কিন্তু যেতে ত আমাকে বল নি।

চোখ দুটি বড় করে সে বলে—ও লালা, যেতে বলতে হবে বুঝি। বড্ড ফরম্যাল তুমি কিন্তু।

উপযুক্ত জবাব খুঁজে পাই নি। আশ্চর্য্য লাগে মেয়েটিকে। কিই বা বলি।—

—চা খাবে পম্‌পম্‌?

সে খুশী হয়ে ওঠে।

—খেতে পারি। কিন্তু চা করবে কে? তুমি? চায়ের কোনও ব্যবস্থা আছে নাকি?

—হাঁ আছে। তুমি একটু অপেক্ষা কর তা হলে। বেশী দেরী হবে না।

রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যাই, সেও উঠে সঙ্গে আসে। আমার হাত থেকে কেটলি কেড়ে নিয়ে বিজলী-উনানের উপর চড়িয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করে—লেবু আছে ত? চায়ে দুধ আমার ভাল লাগে না।

—আছে বৈকি। তা হলে লেবু কাটো তুমি। পাশের ঐ ছোট আলমারীতে রয়েছে।

আলমারী খুলে লেবু ও ছুরি নিয়ে সে কাটতে বসে যায়।

ট্রের উপর চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে বসবার ঘরে

ফিরে আসি। এক পেয়ালা চা ঢেলে সে আমার দিকে এগিয়ে দেয়—নিজেও এক পেয়ালা চা নেয়, তাতে পাতলা একটুকরো লেবু ডুবিয়ে সেটা চামচ দিয়ে টিপে বলে—এমন অসময়ে এসে তোমাকে বিরক্ত করলাম না ত ?

চায়ে চুমুক দিয়ে বলি—সত্যি কথা বলব ?

—নিশ্চয়।

গাম্ভীর্য্যের ভাণ করে বলি—দরজায় শব্দ শুনে মনে হয়েছিল, এমন সময়ে আবার কোন্ আপদ এসে জুটল !

মুখখানা তার ফ্যাকাসে হয়ে যায়—তাই নাকি। ভারি অন্যায় হয়েছে ত তা হলে ! আমায় মাপ করুন।

কৌতুকে হেসে উঠি—না না, মোটেই অন্যায় হয় নি তোমার। তুমি যে এসেছ, খুব ভাল লাগছে আমার। আজ সারাদিন চুপচাপ বসে। বিকেলবেলাটা যেন আর কাটে না, এমনি বোধ হচ্ছিল !

উৎসুক হয়ে সে কথাগুলো শোনে। তার মুখের প্রশান্তি আবার ফিরে আসে। সে নিশ্চিন্তভাবে চায়ে চুমুক দেয়।

তার পেয়ালাতে আরও খানিক চা ঢেলে স্যাণ্ডউইচের প্লেটখানা এগিয়ে দিই। দুটি আঙুল দিয়ে আলগোছে সে একখানা স্যাণ্ডউইচ তুলে নেয়, একটু ইতস্তত করে বলে, একটা কথা বলব ? কিছু মনে কর না কিন্তু।

—বল।

—মনে হয় তুমি নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে এর আগে একা কোথাও থাক নি কোনও দিন !

—কিসে বুঝলে ?

—তোমার ঘর-দোরের চেহারা দেখে। গৃহস্থালির তদারক করার অভ্যাস তোমার নেই।

হেসে বলি, তাই নাকি ! বেশ ত, অগোছালো যদি তুমি মনে কর—গুছিয়ে দাও না তবে ! দেখে !

সে চুপ করে থাকে, যেন কি ভাবে।

হঠাৎ বলে, দু'দিনের যদিও পরিচয়, কিন্তু আমাকে কি তুমি বিশ্বাস করতে পার না ?

—একথা মনে এল কেন ?

—না, এমনিই।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে সে নামিয়ে রাখে। তার পর ট্রে নিয়ে রান্নাঘরে চলে যায়। অল্পক্ষণ পরেই সে ঘর থেকে পেয়ালা পীরিচ ধোয়ার শব্দ আসে।

চায়ের সরঞ্জাম আলমারীতে গুছিয়ে রেখে, হাসিমুখে সে সামনে এসে দাঁড়ায়।

—মেরসি বকু (অনেক ধন্যবাদ), আজ তবে আসি বন্ধু। দরজা পেরিয়ে সে চলে যায়। আবার ফিরে আসে।

—তোমার দরজায় ডুপ্লি-চাবি আছে ত। একটা দাও আমাকে। আমার সুবিধামত যাব আসব। যারে যারে দরজা ঠেলতে হবে না।

আমি নিরুত্তর হয়ে থাকি। সে মুখ তুলে আমার দিকে তাকায়, ধাঁধালো সুরে বলে, ভাবছ কি এত ? ওগো, ভয় নেই কিছু চুরি করে নেব না ! বন্ধু বলে যখন স্বীকার করেছ, বিশ্বাস কর আমাকে।

টেবিলের টানা থেকে ডুপ্লি-চাবিটা বার করে তাকে দিই। চাবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সে বলে, ভারি খুশী হলাম বন্ধু আজ তবে যাই, কেমন ?

নাচের ভঙ্গীতে সে বাইরে চলে যায়। সিঁড়ির কাছ বরাবর গিয়ে ফিরে তাকায়। হাত নেড়ে বলে, আবার দেখা হবে !

তার পর সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। আমার মুগ্ধ দৃষ্টি তার সাবলীল গতিভঙ্গীকে অনুসরণ করে।

পরদিন আপিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে দিশেহারা হয়ে পড়ি। সমস্ত ঘরখানা জুড়ে আশ্চর্য্য পরিবর্তন ! আমার আসবাবপত্র যা কিছু ছিল সবই অন্তর্হিত হয়েছে। তাদের স্থানে পরিপাটি করে সাজানো হাল-ফ্যাশানের সব দামী আসবাব। খাট-বিছানা থেকে নায় জানালায় পর্দাগুলো পর্য্যন্ত গেছে বদলে ! অবাক হয়ে বারে বারে দেখি। দরজার বাইরে গিয়ে দেখি, ভুল করে অন্য কারও আস্তানায় ঢুকি নি ত। পিছু থেকে হাসির শব্দ কানে আসে। চমকে ফিরে দাঁড়াই।

—কেমন, সব পছন্দ হয়েছে ত ?

পম্‌পম্‌ হাসতে থাকে।

—এ সব তুমি কি করেছ পম্‌পম্‌ ? এযে রাজারাজড়ার ব্যাপার। এর দাম আমি দেব কেমন করে ?

—না গো না, এর দাম তোমাকে দিতে হবে না।

সে খিলখিল করে হাসে।

—তার মানে ?

—মানে, খুবই সহজ। এসব জিনিস আমার। না না, আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আমার বাবার বেজায় সখ ছিল আসবাবপত্রের। ঐ সব জিনিস যোগাড়ও করেছিলেন প্রচুর। প্যারিস থেকে বাসা উঠিয়ে এখানে আসবার সময় কিছু কিছু আসবাব আমি নিয়ে আসি। তা থেকে কয়েকটা মাত্র তোমাকে দিয়েছি।...

বাধা দিয়ে বলি, ভারি অন্যায় করেছ তুমি। না, এ সব আমি কিছুতেই নিতে পারব না।...কিছুতেই না !

সে দু'পা সামনে এগিয়ে আসে। দুধের মত শাদা কপোল দুটি তার রক্ত-রাঙা হয়ে ওঠে। কোমরে হাত দুখানি রেখে সে দৃপ্তস্বরে বলে, এমন করে বন্ধুদের অমর্যাদা করতে পার তুমি ! বেশ, না নাও এগুলো আমি পুড়িয়ে

দেব। তোমার জিনিসপত্র একতলার খুপরিতে বন্ধ করা আছে, সেগুলো তা হলে আনিয়ে নাও তুমি।

সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। থামতে চায় না সে কান্না!

ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে যাই। তার কাঁধে হাত রেখে বলি, পদ্মগন্ধ, কেঁদ না লক্ষীটি, আমি এগুলো নিলেই যদি তুমি খুশী হও বেশ, নিলাম।

মুহূর্তে হাসির ঝিলিকে তার মুখে রোদ-বৃষ্টির খেলা সুরু হয়। মধুর স্বরে সে বলে, নিলে তুমি? সত্যি বলছ? বন্ধু, তুমি মহৎ, তুমি আমার সম্মান রেখেছ!

ম্যান্টল পিসের উপর ছোট্ট এনামেলের ঘড়িটায় টুং টুাং শব্দ হয়। সে বলে, ঐ যা, রাত্তির আটটা বাজল যে, এবার তবে উঠি! তোমারও ত খাওয়ার সময় হ'ল, কিন্তু বাড়ীতে ত দেখি তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা কিছু নেই।

—ঠিক বলেছ, বাড়ীতে ওসব হাঙ্গামা আমি রাখি নি। এখান থেকে খুবই কাছে রু ড ইতালীতে যে চীনে রেস্তোরাঁ আছে, সেখানেই রাত্রিতে আমি খাই। আজ তুমিও চল না, দু'জনে একসঙ্গে খাওয়া যাবে।

—আজ থাক, আর এক দিন যাব।

আমি অনুযোগ করে বলি, আজ যাবে না ত? বেশ!

সে কাছে ঘেঁষে আসে, কানের কাছে মুখ এনে বলে, রাগ করো না লক্ষীটি, শীগ্‌গিরই এক দিন যাব।

ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি পর্য্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

৩

পদ্মগন্ধের সঙ্গে দেখা হয় না; কিন্তু তার অদ্ভুত খেয়াল আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে। আমার অনুপস্থিতিতে সে প্রায়ই যে আমার বাসায় আসে, ঘর-দোর গুছিয়ে রেখে তা আমি টের পাই। যেদিন সে আসে, ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারি। অগোছালো জিনিষগুলি সেদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে মনোরম দেখায়। এক এক দিন টেবিলের উপরে বড় কাগজে গোটা-গোটা অক্ষরে তার অনুযোগ লিপিবদ্ধ থাকে।

—বড় অগোছালো তুমি বন্ধু! আশা করি এবার থেকে একটু সাবধানে চলবে!

কোন দিন বা লেখা থাকে, পোড়া সিগ্রেটগুলি ঘরময় ছড়িয়ে কি আনন্দ পাও তুমি বল ত? ছাইদানীগুলো তবে রয়েছে কি জন্যে!

এক-এক দিন অনুযোগ হয়—না, তোমাকে নিয়ে পারা যায় না! যা খুশি কর বাপু, আর আমি আসব না।

কিন্তু তবুও সে আসে। তার এই ব্যবহার দুর্বোধ্য লাগে—ভালও লাগে।...

সেদিন নৈশ-ভোজনে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি। পোশাক পরা হয়ে গেছে। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে চুলে ব্রুশ ঘষ্‌ছি।

দরজায় টোকা পড়ে—আসতে পারি?

—এসো—এসো।

দরজা খুলে যায়, সুসজ্জিতা পদ্মগন্ধের অনবদ্য রূপ-রেখা ফুটে ওঠে আরশির বুকে।

—বাঃ ঠিক সময়েই এসেছি তা হলে! খেতে যাচ্ছ ত?

—এতদিনে বুঝি তোমার সময় হ'ল?

—নিশ্চয়, তাই ত তৈরি হয়েই এসেছি। ঠিক আজকের দিনটিতে যাব বলেই ত সেদিন যাই নি তোমার সঙ্গে। বল ত কেন? আজ আমার জন্মদিন—তেইশ বছর পূর্ণ হ'ল আজ।

হেসে বলি, তুমি দীর্ঘজীবী হও, পদ্মগন্ধ। মধুময় হোক তোমার জীবন। সুখী হও তুমি!

—তোমার শুভেচ্ছার জন্যে ধন্যবাদ, বন্ধু। কিন্তু আমার দীর্ঘ-জীবন কামনা করো না তুমি। বুড়ী হয়ে বেঁচে থাকা আমি সইতে পারব না।

কাছ ঘেঁষে সে এগিয়ে আসে—খাওয়ার পোশাকে কি চমৎকার দেখায় তোমাকে!

—আরশিতে আগে নিজের চেহারা দেখে, তারপর বল, শুনব।

—রেবেইয়াবুস্‌ মুঁসিয়ে (মশায় বড়ই বিনয়ী)! তোমাকে কথায় এঁটে উঠতে পারা যায় না।

তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলে, আমি যে এলাম তাতে তুমি খুশী হয়েছ?

—খুব।

—সত্যি?

—সত্যি।

সে আরও কাছে সরে আসে। আমার দিকে চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েক মিনিট এমনি করে কাটে। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলে, কোথায় খেতে যাবে, কিছু ঠিক করেছ কি?

—না, তুমিই বল, যেখানে তোমার ইচ্ছে।

—তা হলে পেয়ারল্‌ ডু লাকেই চল। ওখানে খাবার খুব ভাল, আর জায়গাটাও নিরালা।

পেয়ারল্‌ ডু লাকের মনোরম পরিবেশে পদ্মগন্ধ যেন উচ্ছল হয়ে ওঠে! তার আনন্দ যেন ভিয়েনীজ্‌ ভাল্‌জের সুর-তরঙ্গ। ছলে-ছলে, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে প্রাণবন্ত হতে চায়। মুখের কথা তার থামতে চায় না। আমি অবাক হয়ে শুনি।

হঠাৎ সে থেমে যায়, সুরে মধু ঝরিয়ে বলে, কই, তুমি কিছু খাচ্ছ না!

—তোমার কথা শুনছি। ভারি ভাল লাগছে।

—বা—ও !

তৃপ্তির আবেশ ফুটে ওঠে তার মুখে।

ওয়েট্রেস্ পুডিং নিয়ে আসে। পম্‌পম্‌ বলে, ও, লালা ষ্ট্রবেরী আন্ডেক ক্রেইম্! খাও পেট ভরে।

বড় চামচে দিয়ে অনেকখানি সে আমার প্লেটে ঢেলে দেয়। নিজের জন্ত একটুখানি নেয়। আমি অনুযোগ করি। সে হাসে।

ভোজনাগারের বারান্দার গায়েই লাগোয়া একটা পার্ক। কফি শেষ করে দু'জনে পার্কে নেমে আসি। পূবদিকের রেলিং ঘেঁষে সুবিস্তৃত জেনীভা-হ্রদ। তার ধারে এসে দাঁড়াই। নিথর রাত্রি। তারা-বিচ্ছুরিত আকাশের ছায়া হ্রদের বুকে চুমকির মালা গাঁথে। অল্প অল্প হিম পড়ছে।

ধীরে ধীরে বলি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, পম্‌পম্‌?

—বল।

—একি তোমার অদ্ভুত খেয়াল!

—কি বললে?

—আমার জন্তে তুমি এত কর কেন?

—তোমার জন্তে এত করি? তার মানে?

—এই যেমন, আমার ঘর-দোর গোছানো। কত কষ্ট হয় তোমার! তা ছাড়া, ঐ আসবাবপত্র কেন দিলে আমাকে?

বাধা দিয়ে সে বলে—থাক্‌, আজ আর ওসব কথা নয়। দেখছ না কি চমৎকার রাত্রি! আজকের এই যে আনন্দ তা আমাকে উপভোগ করতে দাও। আজ কিছু বলো না, লক্ষীটি!

আকাশ থেকে তারা খসে পড়ে। সে উত্তেজিত হয়ে বলে—ঐ তারার দিকে চেয়ে নিজের মনের ইচ্ছা জানাও, শীগগির। যা ইচ্ছা জানাবে তাই পূর্ণ হবে!...

তার পর জিজ্ঞেস করে—কি ইচ্ছা জানালে, বল।

—ইচ্ছে জানিয়েছি, তুমি সুখী হও পম্‌পম্‌!

—আমি প্রার্থনা করেছি, এদেশে তোমার অবস্থান সুদীর্ঘ হোক বন্ধু!

অদূরে গীর্জা থেকে মাঝরাতের ঘড়ি বাজে। সে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে। বলে—ফিরে যাওয়ার সময় যে হ'ল, চল!

৪

পম্‌পম্‌কে আর হেঁয়ালি বলে মনে হয় না। অনেকখানি সহজ হয়ে এসেছে তার ব্যবহার। দরদী বন্ধুর মতই সে আসে—যায়। আমার মনের দ্বিধা-সঙ্কোচ কেটে গেছে, আমি নিশ্চিন্ত। নির্ব্বান্ধব বিদেশে তার অকৃপণ মমতা পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হয়।

প্রতি সন্ধ্যায় সে আসে। গল্পে, আলোচনায় কাটে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত। আমি নৈশ-ভোজনে যাওয়ার জন্ত তৈরি হই। সে বাড়ী ফিরে যায়। কোনও দিন বা আমার সঙ্গে খেতেও যায়।

তার সঙ্গে কথা বলে প্রচুর আনন্দ পাই। সে যে শুধু বুদ্ধিমতী তা নয়, বিভিন্ন বিষয়ে তার পড়াশোনা এবং জ্ঞানও যথেষ্ট। সারা সন্ধ্যা ধরে চলে আমাদের তর্ক-আলোচনা। দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে সুরু করে দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি সমস্তা—কিছুই বাদ যায় না। বড় ভাল লাগে এই সন্ধ্যার আসর।

সেদিন বিভিন্ন দেশে প্রচলিত নর-নারীর বিয়ের বয়স সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। বহুক্ষণ একটানা তর্কের পর গম্ভীর পরিবেশকে কিছু হাল্কা করার জন্ত আমি জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা, পম্‌পম্‌, তুমি বিয়ে করছ, কবে বল ত?

চমকে সে তাকায় আমার দিকে। কিছু বলে না।

হেসে বলি—কি? এর বেলায় যে উত্তর নেই?

ধীরে ধীরে সে বলে—কি, উত্তর দেব আমি!

—কেন? নিজের বেলায় কোনও উত্তর নেই বুঝি?

মাথা নুইয়ে সে বলে—এর উত্তর আমি কি দেব? সে-ত তুমি জান।

—আমি জানি?

বিস্মিত উপলব্ধিতে অন্তর ভরে ওঠে। অধীর হয়ে বলি —তুমি মস্ত ভুল করেছ, পম্‌পম্‌। তুমি হয়ত সব জান না, তাই বুঝতে পার নি। শোন, আমার অনেক কথা বলার আছে তোমাকে!...

সে বাধা দিয়ে বলে—দোহাই তোমার, আর কিছু বল না আমাকে। আমি শুনতে চাইনে। এত দিনেও যদি তুমি... না না, তুমি হৃদয়হীন—অমানুষ তুমি!

চাপা কান্নায় তার সারা দেহ কাঁপতে থাকে। তার পাশে গিয়ে বসি। হাত দুখানি ধরে বলি—ভুল বুঝ না পম্‌-পম্‌, বলবার অবকাশ দাও আমাকে।

সজোরে হাত ছিনিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়—বলতে হবে না আর কিছু। শুনতে চাইনে আমি!

ঠোঁট দুটি তার কাঁপতে থাকে। ডাগর চোখে জল ঝরে। শুভ্র কপোল বেয়ে মুক্তোর দানা গড়িয়ে পড়ে। ঘর থেকে ছুটে সে বেরিয়ে যায়। সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ। আমার বুকে তার প্রতিধ্বনি বাজতে থাকে।

৫

পম্‌পম্‌ আর আসে না।...আমি কিন্তু সোয়াস্তি পাইনে। নিজেকে ঘোর অপরাধী মনে হয়। সর্ব্বদাই মন্‌ খচখচ করে। এক একবার ভাবি, যাই তার বাড়ীতে—বুঝিয়ে বলি তাকে সব কথা। আবার ভাবি, না কাজ নেই। এতদিনে সে হয় ত নিজের মনকে সংযত করতে পেরেছে—গেলে, সে যদি নূতন করে ব্যথা পায়!

ক্রমশঃ শীত এসে পড়ে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। দুই-

আয়র্ল্যাণ্ডের শীত। ক'দিন তুষারপাত হচ্ছে অবিরত। রাশি রাশি পেঁজা তুলার মত নরম—ঠাণ্ডায় যেন ক্ষুরধার। তুষারবর্ষণ আজ চরমে পৌঁছেছে। তাপমাত্রা শূন্যের নীচেও আরও আঠার ডিগ্রী নেমে গেছে। সন্ধ্যা নাগাদ ঝড়ের আশঙ্কা করে সিগন্যাল পড়েছে। তাই আজ সকাল সকাল আপিস ছুটি হয়েছে।

বাড়ী ফিরতে কিন্তু বেশ দেরি হ'ল। রাস্তা ঘাটে তুষাররাশি স্তূপে স্তূপে জমেছে। তবুও বর্ষণের বিরাম নেই। ট্রাম-বাস চলাচল বন্ধ। অতি কষ্টে হেঁটে বাড়ী ফিরি।

বসবার ঘরে ঢুকে দেখি, সোফায় আধ-শোয়া ভাবে এক নারীমূর্ত্তি। মুখ দেখতে পাই না—কুশনে তার মাথাটি গোঁজা। আমার পায়ের শব্দে সে মাথা তোলে, সোজা হয়ে বসে। তার সুনীল চোখ দুটি কান্নায় আরক্ত। আমাকে দেখে আরও উচ্ছ্বাসে নামে তার চোখের জল।

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বলি—পম্‌পম্‌!…এ কি তুমি কাঁদছ?

আমার কথায় সে ফুঁকিয়ে ওঠে—ওগো, কে ঐ মণিকা? বল?

আঙুল দিয়ে সে দেখায়, দেয়ালের গা-ঘেঁষে তেপায়া টেবিলের উপর বসানো একখানা ফটোগ্রাফের দিকে। ছবিখানা আজকের ডাকেই পেয়েছি, দেশ থেকে। হাস্যময়ী নারীমূর্ত্তি। নীচে টানা ইংরেজীতে লেখা তোমারই মণিকা।

আমাকে নিরুত্তর দেখে, সে অধীর হয়ে পড়ে।

—কি চুপ করে রইলে কেন? বল না গো ও কে? বলবে না!

ধীরে ধীরে বলি—আমি ত তোমাকে বলতেই চেয়েছিলাম পম্‌পম্‌, কিন্তু…

—আমি ত শুন্‌তে চাই নি! কেন, জান? আমার মন তা মেনে নিতে চায় নি। আমি সহ্য করতে পারব না বলে! আজ ক'দিন হ'ল মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি—তাই ছুটে এসেছি আবার। কি করব আমি বলে দাও!

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি। সান্ত্বনার কথা খুঁজে পাইনে। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়ের প্রলয়-হুঙ্কার—দরজা-জানালাগুলো ঝড়ের ঝাপ্টায় ঝন্‌ ঝন্‌ করে।…

ক্রমে সে শান্ত হয়ে আসে। মাথা তুলে বলে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস। না, না, ওখানে—অত দূরে নয়, আমার পাশটিতে বস। মণিকার কথা বল আমাকে।

তার পাশে এসে বসি। সে তার হাতখানা বাড়িয়ে দেয় আমার হাতে। ঠাণ্ডায় নিঃসাড় সে হাত।

তাকে বলি মণিকার কথা। আমাদের বিয়ের দিনের কথা। আমাদের সংসারের কথা। জীবনের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষার কথা—কিছুই বাদ দিই না।—

কথা শেষ হলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলে—মণিকাকে তুমি খুব ভালবাস, নয়? সেও তোমাকে খুব ভালবাসে, তাই—ছবিতেও সে হাসে!

তারপর সে যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়। চোখের পলক পড়ে না। সারা দেহ যেন পাথর। বাইরে ঝড়ের দাপাদাপি প্রচণ্ডতর হয়ে আসে। হঠাৎ সে চমকে কেঁপে ওঠে।

বলি—তোমার শীত করছে। এক পেয়ালা গরম চা কিম্বা কফি এনে দিই, কেমন!

স্প্রিঙের পুতুলের মত সে ছিট্‌কে উঠে দাঁড়ায়।

—না না, কিছু দরকার নেই। এবার আমি যাই।

বাধা দিই—এ কি বলছ তুমি! এই দুর্য্যোগে যাবে কেমন করে। বস, বরং গরম কিছু খাও। দুর্য্যোগ থামুক, তখন যেও—আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।

যন্ত্রণাকাতর সুরে সে বলে—না, গো, না। আমি আর থাকতে পারছিনে। বাধা দিও না তুমি—আমাকে যেতে দাও…যেতেই যে হবে। পথ ছাড়।

ধাক্কায় আমাকে সরিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে যায়। তরতর করে নামতে থাকে সিঁড়ি দিয়ে।

আমিও ছুটি পিছু পিছু—পম্‌পম্‌, শোন, যেও না তুমি। কের। একি পাগলামি করছ?

কোনও ফল হয় না। দুর্দান্ত ঝড়ের মধ্যে সে পথে বেরিয়ে পড়ে। তুষারের নিবিড় যবনিকা নিমেষে তাকে চোখের আড়াল করে দেয়।

শীতে বুকের রক্ত যেন জমে আসে। ছুটে ঘরে ফিরি। ওভারকোটটা টেনে নিয়ে নেমে যাই—পথে বেরিয়ে পড়ি তার খোঁজে। কি ভীষণ তুষারপাত! কি নিদারুণ ঠাণ্ডা!

মানুষের সমান উঁচু হয়ে তুষার জমেছে পথের উপর। হাতে পায়ে মাথায় যেন ছুঁচ কোটায়। কন্‌কনে বাতাস যেন হাড়ের ভিতর করাত চালাতে থাকে। চোখে নজর চলে না—আন্দাজে পথ করে নিই। তাকে খুঁজে ফিরি, এ রাস্তা সে রাস্তা। ক্রমশঃ দেহ অবশ হয়ে আসে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হয়। পা দুটো নিঃসাড়, অচল হয়ে ভেঙে পড়তে চায়।…মরিয়া হয়ে তবু চলি। খুঁজে পাইনে তাকে। নিরুপায় হয়ে বাসায় ফিরে আসি। হতাশায় মন আচ্ছন্ন, অবসন্ন শরীর। ওভারকোট খুলতে হাতের শক্তি নেই—অর্দ্ধচেতন অবস্থায় সোফায় এলিয়ে পড়ি।…

টেলিফোনের গোঙানিতে তন্দ্রা ছুটে যায়। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, রাত্রি তিনটে পেরিয়ে গেছে। ঝড়ের শব্দ আর কানে আসে না। নিশুতি রাত, চারদিক থম্‌ থম্‌ করে। টেলিফোন বেজে যায়।…

রিসিভার তুলে জিজ্ঞেস করি,—হালো, কাকে চান আপনি?

উত্তর আসে, গ্লাস্ বেই-এয়ার হাসপাতাল থেকে বলছি, আপনি কি যূঁথিরে—?

—হাঁ, বলুন।

—এত রাত্তিরে বিরক্ত করছি, মাপ করবেন।

—আচ্ছা, কি বলতে চান বলুন।

—আজ রাতে ঝড়ের সময় একটি মহিলাকে অচৈতন্য অবস্থায় পথ থেকে তুলে আনা হয়েছে।

বুকখানা ছাঁৎ করে ওঠে। হায় ভগবান! টেলিফোনের রিসিভার শক্ত করে ধরে শুনতে থাকি।

—এই মাত্র তার চেতনা একটু ফিরেছে। তিনি আপনাকে খবর দিতে বলেছেন, বলেছেন, এখানে আপনিই তাঁর একমাত্র নিকটতম বন্ধু। মহিলাটি তাঁর নাম বলেছেন, কুমারী মিরাবেল—জেমীভিত্‌ ত মিরাবেল।

অস্থির চিত্তে জিজ্ঞেস করি, এখন কেমন আছেন তিনি? জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই ত!

উত্তর পাই, শীঘ্র চলে আসুন আপনি।

টেলিফোন রেখে দৌড়ে বেরিয়ে পড়ি।

তুষারস্তূপের মধ্যে পথ করে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছুতে প্রায় কুড়ি মিনিট লাগে। নার্স রোগিণীর ঘর দেখিয়ে দেয়। সেখানে ঢুকে দেখি, শয্যায় শায়িত পদ্মগন্ধ। দুখানা নরম পুরু কম্বলে তার দেহ আচ্ছাদিত, শুধু মুখখানি বেরিয়ে আছে। চোখ দুটি মুদ্রিত। পেলব মুখের শুভ্র রক্তিম গোলাপ কোন্ সে নিষ্ঠুর যাদুকরের দণ্ডস্পর্শে নীল অপরাজিতার রূপান্তরিত হয়েছে! বালিসে বিক্ষিপ্ত সোনালী চুলের রাশি তার রূপকে করুণ ও বেদনাতুর করে তুলেছে।

নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমি চেয়ে থাকি। তার দেহে জীবনের সাড়া খুঁজি।

হঠাৎ কাঁধে কার স্পর্শ অনুভব করে চমকে উঠি। ফিরে দেখি এক বেঁটেখাটো মানুষ। মাথার চুল সব সাদা ধবধবে। সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ।

স্নিগ্ধস্বরে তিনি বলেন, আপনি কি যূঁথিরে—? আমি এই হাসপাতালের ডাক্তার। নমস্কার!

ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করি, রোগিণী এখন কেমন? কোনও ভয় নেই ত?

মাথা নেড়ে তিনি বলেন, উহুঁ! ভাল নয় মোটেই ভাল নয়, তবে জ্ঞান ফিরেছে, একটু আগে। ডাকুন, হয়ত সাড়া পাবেন।

মেঝের হাঁটু রেখে বসি। তার দিকে ঝুঁকে ডাকি।

—পদ্মগন্ধ, আমি এসেছি।

কোনও সাড়া নেই। ডাক্তার নীচু হয়ে নাড়ি দেখেন।

—জোরে ডাকুন, আপনি।

এবারে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলি, পদ্মগন্ধ, আমি এসেছি। একটি বার চেয়ে দেখ লক্ষ্মীটি!

গায়ের কম্বলখানা কেঁপে ওঠে। সে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকায়। অতি কষ্টে সে তার হাতখানি বের করে এগিয়ে দেয় আমার হাতের দিকে। সস্নেহে আমি নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরি। তার মুখে মৃদু হাসি ফোটে। আমার দিকে চেয়ে থাকে। সে দৃষ্টিতে প্রীতি উপ্‌চে পড়ে।

তার ঠোঁট দুখানি কাঁপে, যেন বলতে চায়—বন্ধু আমি যাই…আয়ত চোখের নীল তারা দুটি ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসতে থাকে, তার পর চোখ দুটি তার মুদিত হয়ে যায়। আমার মুঠোর মধ্যে তার হাতের আঙুলগুলি মৃদুভাবে কাঁপতে থাকে।

বৃদ্ধ ডাক্তার আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, ধরে রাখতে পারা যাবে কিনা সন্দেহ। চেষ্টার তো ত্রুটি হচ্ছে না। চমৎকার সুন্দরী মেয়েটি!…কি ভীষণ ঝড়! কি সাংঘাতিক…সাংঘাতিক…

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। যন্ত্রণায় বুকখানা ছিঁড়ে পড়তে চায়!

বাংলা বানান ও উচ্চারণ

অধ্যাপক শ্রীপ্রকৃতিরঞ্জন বড়ুয়া

বাংলা বানানের উচ্ছৃংখলতা নিয়ে আজকাল আবার আলোচনা সুরু হয়েছে। অতএব এ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা সময়োপযোগী বলে মনে হয়।

বাংলা ভাষার বানানের উচ্ছৃংখলতা দু'রকমের আছে—একটা অজ্ঞতাপ্রসূত, অপরটি স্বেচ্ছাচার-জনিত। প্রথমোক্তটির কথাই আগে আলোচনা করা যাক।

বাঙালীর ছেলেমেয়েরা বাংলা ভাষা লিখতে গিয়ে কি রকম মারাত্মক বর্ণাশুদ্ধির কবলে পড়ে তা বাঙালী অভিভাবক, শিক্ষক এবং পরীক্ষক মাত্রেই অবগত আছেন। ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশের তরুণ শিক্ষার্থীরা বোধ হয় নিজ নিজ মাতৃভাষায় এমন কঠিন বানান-সমস্যার সম্মুখীন হয় না। অনেকে হয় তো শুনে বিস্মিত হবেন যে, মারাঠীভাষী অঞ্চলে ছোটদের পাঠশালায় বানান শেখাবার রেওয়াজ নেই, কারণ তাদের উচ্চারণ এমন বিশুদ্ধ যে একই শব্দ একাধিকরূপে লিখিত হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্ত কম। বিশুদ্ধ হিন্দীভাষী অঞ্চলেও বানান শেখাবার জন্য অতিরিক্ত কোনও চেষ্টা দেখা যায় না, যদিও 'হিজ্জে' (বানান) বলে একটা বস্তু তাদের অপরিচিত নয়। কিন্তু বাঙালীর ছেলেমেয়েদের বেলায় বর্ণশিক্ষার স্তর ছেড়ে শব্দশিক্ষার স্তরে উঠতেই সুরু হয় বানানের পাথর-ভাঙা। হ্রস্ব-দীর্ঘ, অন্তস্থ-বর্গীয়, দন্ত্য-মূর্দ্ধন্য-তালব্য ইত্যাদি সমস্যার ভিড় তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। এক অন্ধ ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে যে শুদ্ধ বানান করবার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তির ইতিহাস আয়ত্ত করতে হবে এবং ব্যাকরণের যাবতীয় বিধিবিধান একেবারে নখদর্পণে রাখতে হবে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে এটা যে কি অসাধ্য ব্যাপার তা আমরা এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করে দেখি না। কেবল ব্যাকরণ-বিশারদগণই এসব নীরস চুলচেরা সূক্ষাতি-সূক্ষ্ম নিয়মকানুন নিয়ে মশগুল হয়ে থাকতে পারেন। সাধারণের পক্ষে ব্যাপারটা যতই সহজ ও স্বাভাবিক করে তোলা যায় ততই ভাষা এবং ভাষা-ভাষীদের মঙ্গল হয়। আমাদের বানান-সমস্যার গোড়ার কারণ হচ্ছে উচ্চারণ-বিকৃতি। এই গোড়ার গলদ শোধরাবার দিকে নজর দিলে বানান-সমস্যার সমাধান অনেকটা সহজ হয়ে আসবে। বানান উচ্চারণকে অনুসরণ করবে, কি উচ্চারণ বানানকে অনুসরণ করবে সে প্রশ্ন অতি জটিল। আমার মনে হয় অবস্থাবিশেষে বিচার করে কোথাও বা বহু-প্রচলিত উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়ে, আবার কোথাও বা বহু-প্রচলিত বানানকে প্রাধান্য দিয়ে ভাষার সংস্কার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুধু এই উদ্দেশ্যটি মনে রাখা চাই যে, প্রত্যেক শব্দ যেভাবে লিখিত হবে যথাযথ সেভাবেই যেন তার বর্ণানুগ উচ্চারণ হয়। যে-কোনও ভাষার এক একটা বর্ণ মানুষের উচ্চারিত এক একটা ধ্বনির সঙ্কেত। একই ধ্বনিকে বিভিন্ন বর্ণপ্রয়োগে প্রকাশ করতে গেলে ভাষার উচ্ছৃংখলতা বৃদ্ধি পাবেই ; তেমনি আবার কোনও বিশেষ ভাষায় কোনও ধ্বনিবিশেষের অস্তিত্ব না থাকলে সেই ভাষায় উক্ত ধ্বনির প্রতীকরূপে কোনও বর্ণ রাখবার মানে হয় না। এ রকম বর্ণের উদ্দেশ্যহীন উপস্থিতি এবং অকারণ প্রয়োগে ভাষার উচ্ছৃংখলতা বাড়তে পারে। অতএব বর্ণমালায় কোনও বর্ণ যদি অনুচ্চারিত থাকে, অথবা ভাষা-ভাষীদের স্বাভাবিক উচ্চারণশক্তির পক্ষে অতি কঠিন হয়, তবে সেই বর্ণকে চিরনির্বাসন দিতে আপত্তি কি ? অনেক ভাষারই বিবর্ত্তনের ইতিহাসে এরকম দু'একটা বর্ণ-বিলুপ্তির নজির পাওয়া যায়। বাংলা ভাষাতেও তার নজির রয়েছে। কিন্তু এ আলোচনা পরে হবে, এখন আমাদের বিকৃত বর্ণোচ্চারণ নিয়ে দু'কথা বলা যাক।

প্রত্যেক ভাষাতেই উচ্চারণ এবং কণ্ঠধ্বনির (intonation) কিছু কিছু আঞ্চলিক তারতম্য দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য ভাষার মধ্যে বাহ্য পার্থক্যের একটা মুখ্য কারণ বিসদৃশ উচ্চারণ এবং ধ্বনি। ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন কাউন্টিতে উচ্চারণ এবং ধ্বনির কি রকম বৈসাদৃশ্য তা জানতে হলে বিলাত-যাত্রারও দরকার নেই, Phonetics-এর বিশেষ চর্চ্চাও নিষ্প্রয়োজন—বার্ণার্ড শ'-এর পিগমেলিয়ন নাটক পড়লেই এর মজাটা উপভোগ করা যায়। কিন্তু নিজের দেশের কথাই ধরা যাক না কেন ? বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলার কথ্য ভাষারই বৈশিষ্ট্য আছে—সকলেই তা জানেন। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গে 'স'র একচ্ছত্র আধিপত্য দেখা যায়। পূর্ব্ব-বঙ্গের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গীয়দের ঠাট্টা করে বলে থাকেন—'সামবাজারের সসীবাবু সসা নিয়ে সহুরবাড়ী যায়।' পূর্ববঙ্গে তেমনি 'শ'র প্রাধান্য। পূর্ববঙ্গের অনেক অঞ্চলে চ, ছ, জ-এর উচ্চারণ কিছু শিথিল, এবং তা পশ্চিমবঙ্গীয়দের কৌতুক উদ্রিক্ত করে। "জানতে পার না" কথাটা পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও অঞ্চলে "Zানতি পার না" হয়ে যায় (পরশুরামের গল্প দ্রষ্টব্য)। 'দেব'—'দেবো'—'দোব', 'করল'—'করলো', 'করছেন'—'কোর্চ্ছেন'—'কর্চেন', 'গেল'—'গেলো'—'গ্যালো' ইত্যাদি জাতীয় নানা বৈকল্পিক বানানের গোড়াতেও রয়েছে ঐ উচ্চা-রণ-বৈসাদৃশ্য। কিন্তু কথ্য ভাষার যতই কেননা বিভিন্নতা

থাকুক, লিখিত ভাষার একটি প্রামাণ্য রূপ থাকাই উচিত, নইলে ভাষায় অরাজকতার সৃষ্টি হয় এবং তাই বাংলা ভাষায় হচ্ছে।

এই সব আঞ্চলিক পার্থক্য ছাড়াও আমাদের ভাষায় কতকগুলি সাধারণ উচ্চারণ-সম্পর্কিত ত্রুটি রয়েছে। "বেটার ষত্ব-ণত্ব জ্ঞান নেই"—কথাটা একটা গালিতে পরিণত হয়েছে। এটা হচ্ছে কারো বুদ্ধিহীনতা বা মূর্খতার জন্য তিরস্কার। কিন্তু আমার মনে হয় ষত্ব-ণত্ব জ্ঞান যতটা সহজ বলে ধরে নেওয়া হয় ততটা সহজ নয়। তার আগে ভেবে দেখা উচিত আমাদের হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান সহজ এবং স্বাভাবিক কি না। এ দুটির মধ্যে আমরা প্রায়ই গোল পাকাই। চিঠিপত্রে অনেকেই আমাদের "শারিরীক কুশল" জান্‌তে চান। আরও সহজ এবং সাধারণ একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্—"রীতিনীতি।" আমাদের অভ্যস্ত উচ্চারণ অনুযায়ী শব্দটার বানান হওয়া উচিত "রিতিনিতি"। কিন্তু আমরা জানি "রীতি" এবং "নীতি" উভয় শব্দেই একটা হ্রস্ব এবং একটা দীর্ঘ স্বর রয়েছে। জ্ঞান ও অভ্যাসের মধ্যে মিল না থাকাতে ঠিক কোন্‌টা হ্রস্ব আর কোন্‌টা দীর্ঘ তাই নিয়ে আমরা মুশকিলে পড়ে যাই। ফলতঃ সবরকম উলট-পালট ঐ শব্দটার বানানে হতে পারে, এবং হয়েও থাকে। রীতি, রিতী, আর নীতি, নিতী এই চারটেতে মিলে আমাদের মাথা গুলিয়ে দেয়। শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবু "সুনিতীকুমারের" নামে কোনও চিঠিপত্র পেয়ে থাকেন কি না জানিনে, কিন্তু আমি "প্রফুতীরঞ্জনের" নামে মাঝে মাঝে চিঠি পেয়েছি। উ-ঊকারের বেলাতেও একই সঙ্কট। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ লাভের দুটো উপায় আছে; হয় হ্রস্ব-দীর্ঘ দুটির একটিকে উচ্ছিন্ন করা, নতুবা শৈশব হতেই হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ অভ্যাস করা। কোন্ উপায় গ্রহণযোগ্য সে বিচার সুধীজন করবেন।

এখন বিচার করে দেখা যাক্ 'অন্তস্থ' আর 'বর্গীয়' সমস্যা। আমাদের বর্ণমালায় বর্গীয় 'জ' আর অন্তস্থ 'য' এবং বর্গীয় 'ব' আর অন্তস্থ 'ব' নিয়ে কি ভয়ানক কেলেঙ্কারি! বস্তুতঃ এই বর্ণযুগলের মধ্যে গোল বাধবার কোনও কারণই নেই। 'য' ও 'জ' আর 'ব' (অন্তস্থ) ও 'ব' (বর্গীয়) সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ। দেবনাগরী 'य' ও 'ज' এবং 'व' ও 'ब'তে কিছু-মাত্র ঘেঁষাঘেঁষি নেই, বাংলায় কেন তা হয়? প্রথম ক্ষেত্রে এর একমাত্র কারণ আমাদের উচ্চারণ-দোষ; এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই দোষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুই বিভিন্ন বর্ণকে একই রূপে লিখবার রীতি। এমন নয় যে বাঙালী এই পৃথক পৃথক বর্ণগুলির উচ্চারণে অসমর্থ। 'य' এবং 'व' আসলে দুটো অর্ধ-স্বর বর্ণ বা semi-vowel, ইংরেজী y এবং w-র মতো। বাঙালীরা কি ইংরেজী y এবং w উচ্চারণ করতে পারে না যদি পারে, তবে সেই একই উচ্চারণ নিজের ভাষায় করতে পারবে না এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিজের ভাষায়ও যে বাঙালী এই বর্ণদ্বয় উচ্চারণ করে থাকে তার প্রমাণ অতি সহজেই দেওয়া যায়। দেবনাগরী 'य' আর বাংলা 'য' একই বর্ণ, এবং তাদের উচ্চারণ একই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাঙালীরা 'য'র জন্য একটি অতিরিক্ত বর্ণ সৃষ্টি করেছে—'য়'। অর্থাৎ উচ্চারণটা বাঙালীর মুখে ঠিকই আছে, কিন্তু বর্ণটির ঠিকমত উচ্চারণ না করে অনাবশ্যক একটা নতুন বর্ণের উদ্ভাবন করা হয়েছে। 'য' যথারীতি উচ্চারিত হলে 'য়' র কোনও দরকার থাকে না। বাঙালী 'য'কে 'য়'র মত উচ্চারণ করলেই লেঠা চুকে যায়। আমরা যে 'य' সহজেই উচ্চারণ করতে পারি তার আর একটা প্রমাণ 'য' ফলার বহুধা প্রয়োগ এবং তার যথাযথ উচ্চারণ। এই চিহ্নটিকে আমরা বলি বটে "য-ফলা", কিন্তু উচ্চারণ 'य'-ফলাই করি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'য' 'জ'-এর সমস্যা বাঙালীর জিভের জড়তাহেতু উৎপন্ন হয় নি, খেয়ালের দোষেই হয়েছে। বর্ণমালা থেকে কালক্রমে 'য়'টাকে অপসারিত করে 'য'কে 'য়'র মত উচ্চারণ করতে সুরু করলে বোধ হয় সহজেই সমস্যার মীমাংসা হয়।

দেবনাগরী 'ब' এবং 'व' একই রূপে বাংলা বর্ণমালার দুই জায়গায় বিরাজ করছে,—প-বর্গের 'ব' (বর্গীয়), আর অন্তস্থ বর্ণের 'ব' (অন্তস্থ)। কিন্তু যেহেতু এই দুই বর্ণের চেহারার মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নেই, সেহেতু তাদের সনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, এবং এইজন্যই সর্বত্র বর্গীয় উচ্চারণই হয়ে থাকে। সংযুক্ত 'ব'-এর কথা পরে আলোচিত হবে। এখন শুধু এ কথাটা বলতে চাই যে কোমল 'ব' (व) উচ্চারণেও বাঙালীর সহজাত অক্ষমতা নেই, 'व'কেও যে বাঙালী 'ब' উচ্চারণ করে তাও খামখেয়ালীর দোষ, এবং দুই বর্ণের লিখিত রূপের অভিন্নতা এই খামখেয়ালীকে প্রশ্রয় দিয়েছে। বাঙালী যে দুই 'ব'-এর উচ্চারণ কেবল করতে পারে তা নয়, হামেশাই করে থাকে। একটা পরিচিত ইংরেজী নাম উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক—Wordsworth। নামটা ইংরেজরা যেরূপ উচ্চারণ করে, আমরা বাঙালীরাও তা করি এবং হিন্দীভাষীরাও তাই করে। কিন্তু লিখবার বেলায় যত গণ্ডগোল। দেবনাগরীতে এ নামটা লিখা হবে—'वार्ड्स्वार्थ', আমরা বাংলায় লিখি—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। বাংলায় 'বার্ডবার্থ' লিখলে তা কিভাবে উচ্চারিত হবে আমরা সবাই জানি। অর্থাৎ, নামটির শুদ্ধ উচ্চারণ বাঙালী মাত্রেই করতে পারে, কিন্তু বর্ণ আর উচ্চারণে সঙ্গতি নেই বলে লিখবার সময় নামটাকে বেশ লম্বা এবং জটিল করে আমাদের লিখতে হয়—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। 'व'র স্থলে 'য়'র মত এখানেও আমরা 'व'র স্থলে 'ওয়' উদ্ভাবন করেছি। কিন্তু এই উদ্ভাবনে গলদ আরও আছে। নামটা যেভাবে বাংলায় লেখা হয় ঠিক উচ্চারণ করতে

লেখে তা হবে ইংরেজী "Oyardsoyarth"-এর শামিল। দেবনাগরীতে বাংলার মত বানান করে লিখলেও নামটা এই ভাবেই পড়া হবে। আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু বাংলা অক্ষর চেনেন, কোথাও তিনি বাংলায় লিখিত 'ফরওয়ার্ড' শব্দটা দেখেন, এবং তার অর্থোদ্ধারে অসমর্থ হন। আমি তাঁকে বলে দিলে পর তিনি ঠাট্টার স্বরে আমায় জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা, ইংরেজীর অধ্যাপক মশায়, শব্দটা Forward না foroyard? সেরূপ West End-এর জন্য আমরা লিখি 'ওয়েষ্ট এণ্ড'। উপরোক্ত শব্দগুলি দেবনাগরীতে এইভাবেই লেখা হবে—ৱার্ডস্ৱার্থ, ফৱার্ড, ৱেষ্টএণ্ড। 'ৱ' বর্ণ টির উচ্চারণ 'ওয়' নয়, 'ওঅ'; কিন্তু এটা স্বচ্ছন্দে লেখা যায় না, তাই 'ওয়' লেখা হয়। আমাদের বর্ণমালায় ব ও ৱ রয়েছে সমাক্ত-চিহ্নহীন দুই যমজ ভাইয়ের মত। উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ দুটি যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণ, এবং কোনটাই যদি আমাদের সহজ উচ্চারণ-শক্তির বহির্ভূত নয়, তবে লিখবার সময় তাদের কিছু পৃথকত্ব দিলে কি ক্ষতি হয় বুঝতে পারি নে। একটার পেটে দাগ কেটে দেওয়ার কথা ভেবে দেখা উচিত; বর্তমান যুগে অস্ত্রোপচারে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। এ প্রস্তাবের সমর্থনে আরও যুক্তি আছে, কিন্তু এখন ওসব যুক্তির অবতারণা করে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। কেবল যুক্তাক্ষরের প্রসঙ্গে আরো দু'একটি কথা বলব।

অন্তস্থ-বর্ণীয় সমস্যার সমাধান তো হ'ল। এবার দন্ত-মূর্ধন্ত-তালব্য সমস্যা সংক্ষেপে বিচার করে দেখা যাক। ন এবং ণ-এর বেলায় দন্ত্য-মূর্ধন্ত সঠিক উচ্চারণ করা বাঙালীর পক্ষে সত্যি কঠিন। কেবল বানানের উদ্দেশ্যে এই দুটোই রাখা উচিত, কি একটাকে চিরবিদায় দেওয়াই বাঞ্ছনীয় তা বিশেষজ্ঞগণ বলবেন। শ, ষ, স-এর বেলাতেও অনেকে কেবল একটাকে রেখে বাকী দুটাকে বর্জন করার পক্ষপাতী। কিন্তু এ প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ বাঙালীর দুটো ভিন্ন উচ্চারণ আছে—স (s) এবং শ (sh)। কেবল 'ষ'ই আমরা উচ্চারণ করতে অপারগ। অর্থাৎ এখানে সমস্যাটা দন্ত্য-মূর্ধন্ত বা দন্ত্য-তালব্য নয়, এটা তালব্য-মূর্ধন্ত সমস্যা। অতএব শ, ষ, স-এর মধ্যে কাউকে বাদ দিতে হলে কেবল 'ষ'কেই বাদ দিতে হয়। দুটাকে বাদ দেওয়ার পক্ষে প্রবল যুক্তি নেই, দুটাকেই রাখতে হয়। তৃতীয়টাকেও সম্পূর্ণ লোপ করে দেওয়া যায় কিনা সন্দেহের বিষয়, কেননা তাতে বানানের ক্ষেত্রে অনেক মুশকিল এসে পড়তে পারে। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত অভিমত দেওয়া দরকার।

এখন আসা যাক্ যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে। অনেক যুক্তাক্ষরের স্পষ্ট বিশুদ্ধ উচ্চারণ আমরা করি না। 'অক্ষর' শব্দটাই দেওয়া যাক্ না কেন? বানানমতে শব্দটা 'অক্‌ষর', কিন্তু উচ্চারণমতে 'অক্‌খর'। 'ক্ষ' কদাপি আমরা শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করি না। শব্দের আদিতে এর উচ্চারণ পরিষ্কার নির্জলা 'খ', যথা—ক্ষেত্র (খেত্র), ক্ষতি (খতি), ক্ষমা (খমা) ইত্যাদি। অন্যত্র উহা 'ক্‌খ', যেমন—অক্ষর (অক্‌খর), সাক্ষর (সাক্‌খর), ভক্ষণ (ভক্‌খন), পরীক্ষা (পরীক্‌খা) ইত্যাদি। অথচ মজা এই যে, কেউ যদি 'খতি' 'খমা' 'ভক্‌খণ' লিখে বসেন তবে তাঁকে 'গণ্ডমূর্খ' প্রভৃতি উপাধিদানে আমরা একটুকুও দ্বিধা করব না। আর ঐরূপ বিদ্যা জাহির করলে 'পরীক্‌খার্থীর' তো 'পরীক্‌খায়' অশ্বডিম্বই জুটবে। আমার ধারণা 'ক্ষ' যথাযথ উচ্চারণ করা বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব তো নয়ই, উপরন্তু 'ক্‌খ'-এর চেয়ে 'ক্‌ষ'ই কবিত্বধর্মী বাঙালীর বেশী প্রিয় হওয়া উচিত। অক্‌খর, ভক্‌খণ, পরীক্‌খা বড় কাঠখোট্টা; পক্ষান্তরে অক্‌ষর, ভক্‌ষণ, পরীক্‌ষা অনেক মার্জিত এবং শ্রুতিমধুর। 'ক্ষ' সম্বলিত শব্দকে যথাযথ উচ্চারণ করে দেখলেই এটা সবাই বুঝতে পারবেন।

সংযুক্ত 'ম'ও আমাদের উচ্চারণে এভাবে উপেক্ষিত হয়, এবং ঐ উপেক্ষার প্রতিশোধ গ্রহণে নিরত উদ্যত থাকে। বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে প্রায়ই 'স্মরণ' ও 'শরণ' শব্দদ্বয় দেওয়া হয় তাদের বিভিন্ন অর্থ প্রকট করবার জন্য, যেন এ দুটো শব্দের অর্থ নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। কিন্তু উচ্চারণের ত্রুটি হেতু বাংলাভাষায় এ গোলযোগ সম্ভব হয়েছে। আর একটা সাধারণ উদাহরণ 'শ্মশান' শব্দ; কারও হাতে এসে পড়ে 'শশ্মান', কারও হাতে বা 'শ্মশ্মান'। আমাদের মুখে এবং কাজেকাজেই আমাদের অনেকের লেখাতেও 'রামে'র সঙ্গে 'লক্ষণে'র যতটা অভিন্ন-হৃদয় সম্পর্ক দেখা যায় বোধ করি সুমিত্রানন্দন 'লক্ষ্মণে'র কোনকালেই ততটা ছিল না।

কোমল 'ব' (অন্তস্থ) সম্বন্ধে কিছু আলোচনা তো আগেই হয়েছে। এটা যখন অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত হয় তখন আমাদের উচ্চারণে তার আভাসমাত্র থাকে না। ফলতঃ সাধারণ শব্দের বানান নিয়েও অনেকে সমস্যায় পড়েন। চিঠিপত্রে অনেকের হাত থেকেই আমরা "স্বভক্তি প্রণতি" গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। স্বয়ং বাণীবিদ্যাদায়িনী মাঝে মাঝে আমাদের সম্মুখে "স্বরস্বতী"রূপে আবির্ভূতা হন, বিশেষতঃ তাঁর পূজার আমন্ত্রণপত্রে। 'দ্বন্দ্ব' শব্দ নিয়ে কত লোক যে 'দন্দে' পতিত হয় তার হিসাব কে রাখে? ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেক "দ্বস্তখত"-এর সাক্ষাৎও আমরা পেয়ে থাকি; তাঁদের জন্য সত্যি দুঃখ হয়।

সংযুক্ত ঙ, ঞ, ন, ম এবং ণ সম্বন্ধে "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয়ের প্রস্তাব মোটামুটি সমর্থনযোগ্য বলে আমি মনে করি। তবে সামান্য একটু সংশোধনের প্রস্তাব করতে চাই। অনুস্বারকে বাংলার মত না লিখে দেবনাগরীর মত লিখলেই ভাল হয়। আমাদের

দীর্ঘকালের সংস্কারবশতঃ বাংলায় 'পংডিত' লিখলে সেটাকে 'পণ্ডিত' উচ্চারণ আমরা করব না। কিন্তু 'পঁডিত' লিখলে 'ং' উচ্চারণ করতে দীর্ঘকাল লাগবে না।

বাংলাদেশের সর্বত্র না হোক, অধিকাংশ অঞ্চলে শিশুদের যেভাবে বর্ণশিক্ষা দেওয়া হয় তা অত্যন্ত হাস্যকর। 'য' এবং 'জ'-এ যদিও 'আসমান্-জমীন্ ফারাক্', তবুও উচ্চারণদ্বারা তাদের পার্থক্য শিশুদের বোধগম্য করানো হয় না। একই 'জ'-ধ্বনির পূর্বে 'অন্তস্থ' বা 'বর্গীয়' বিশেষণ যোগ দিয়ে তা শিখানো হয়। হ্রস্ব-দীর্ঘ, তালব্য-মূর্ধণ্য-দন্ত্য সকল বর্ণের বেলাতেই ঐ এক শিক্ষাপদ্ধতি। বলে দিচ্ছি দীর্ঘ, অথচ উচ্চারণ করছি হ্রস্ব।

সংক্ষেপে আমার মূল বক্তব্য এই—বাংলাভাষার উচ্চারণ এবং বানানের সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করা উচিত কিনা? যদি উচিত হয় তবে কোন্‌টার কতদূর সংস্কার করা সম্ভবপর? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার শক্তি এবং সর্বজনস্বীকৃত অধিকার যাঁদের আছে, সমস্যার দিকে তাদের মনোযোগ দেওয়া আশু প্রয়োজন। এই পথে ভাষা প্রয়োজন সংস্কারের প্রস্তাব নূতনও নয়, অলীকও নয়। ইংরেজী ভাষাতেও এই চেষ্টা হয়েছে, আমেরিকানদের দ্বারাও এই চেষ্টা হয়েছে। আমাদের ভাষারও যথাসম্ভব Phonetic spelling (ধ্বনিসম্মত বানান) গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

নামের অসম্মান

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

শ্যামলী যদি গো নামটি তোমার
চাঁপার বরণ রংটি কেন?
গৌরী তোমার "পাউডার"-মাখা
মুখের বর্ণ নীলাভ যেন!
ভিখারিণী ওই মেয়েটির নাম
অন্নপূর্ণা—অন্ন চেয়ে
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মাগিয়া
শ্যামাসঙ্গীত বেড়ায় গেয়ে।
সুনয়না নামে মেয়েটির ভাখো
অন্ধ নয়ন জনমাবধি;
তাহার বোনের লীনা নাম কেন
হাতীর মতন চেহারা যদি?
'টিচারি' করেন হাসিরাশি-দিদি
মুখটি যদিও পেচক সম
হাসিতে তাহারে দেখে নি কো কেউ
যদিও হলেন ভগ্নী মম!
অবলা তাহারে কে দিয়েছে নাম
সার্কাসে বাঘ খেলান যিনি
সরলার মনে জিলাপীর প্যাঁচ,
বিপুলার দেহ বেজায় ক্ষীণই!
রঙ্গিণী হায় কলহ করেন
চপলতাময়ী কুমারী ধীরা,
গলাখানি ছেঁড়ে গানের কিসসু
জানেন না হায় শ্রীমতী মীরা।
করুণাময়ীর নিঠুর হৃদয়
করেন না কভু কাউকে ক্ষমা,
উজ্জ্বলা আর হিমানী মাসীমা
—টিপিটিপি বলি—কাজল সমা!
অপরাজিতারা পরাজিতা হন
দজ্জাল স্বামী শাশুড়ী হ'লে
বিষ্ণুপ্রিয়া পতি-সোহাগিনী
পুত্রকন্যা পেয়েছে কোলে।
বীণাপাণি, বাণী, সরস্বতীর
অক্ষর-জ্ঞান হয় নি মোটে
বালিকা-বয়সে হয়েছে বিবাহ
বরের আদর তাই না জোটে!
ছেঁড়া শাড়ী আর ময়লা সেমিজ
পরেন পাড়ার বিলাসিনী-দি
কুৎসিত ওই মেয়েটির নাম
সুন্দরী কেন দিলেন বিধি?
সত্যবালার সকল কথাই
অকারণে শুধু মিথ্যা-ভরা
নমিতা বিনীতা দুইটি বোনেই
দেমাকে দেখেন ধরাকে সরা!
লজ্জাবতীরা পর-পুরুষেরে
অধুনা থোড়াই 'কেয়ার' করে,
সীতাসাবিত্রী স্বামীত্যাগ করি
যাচ্ছে কতই পরের ঘরে।

* * *

কত আর কব? নাম-সম্মান
এ জগতে হায় কেহ না রাখে,
আমারই ভাখো না মহাদেব নাম
সাহেবী পেশাক টুপীটি টাকে!

রামানন্দ-পরিচয়

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জীবনের পথে চলতে চলতে যে কয়েক জন দুর্লভ পুরুষের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য হয়েছে, পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁদের অন্যতম। তাঁকে নানা অবস্থার মধ্যে দেখবার সুযোগ জীবনে ঘটেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের নব নব পরিচয় আমাকে তাঁর প্রতি বেশী করে আকৃষ্ট করেছে। বজ্রের মত তিনি কঠোর ছিলেন; কিন্তু সেই কঠোরতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল পুষ্পের কোমলতা। তাঁর গাম্ভীর্য্যের বর্মকেই সাধারণ লোক বড় করে দেখত। কিন্তু সেই গাম্ভীর্য্যের তলে তলে রসের যে ফল্গুধারা বইত তা ছিল তাঁর চরিত্রের একটি অত্যন্ত সত্য পরিচয়। মাথা তিনি কারও কাছে নত করতেন না। তাঁর সাধুতা ছিল সকল সংশয়ের ঊর্দ্ধে। কিন্তু সেই ভালমানুষির মধ্যে ছিল পুরুষ-সিংহের তেজস্বিতা। কেবল খাঁটি মানুষই তিনি ছিলেন না; শক্ত মানুষও তিনি ছিলেন। দশের সুরে সুর মেলানো তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি ছিলেন সত্যের পূজারী। তাঁর সংবাদপত্রসেবা ছিল সত্যেরই সেবা। সত্যকে অনুসরণ করতে গিয়ে বিস্তর বাধা, বিস্তর বিদ্রূপ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে।

তবু বলব— মাথা উঁচু করে যিনি চলতেন চিত্তে অপরিমেয় নির্ভীকতা নিয়ে, তাঁর মধ্যে নম্রতারও সীমা ছিল না। মানুষের মধ্যে যাঁরা যথার্থ বরণীয় তাঁদের কাছে কত সহজে তিনি মাথা নোয়াতে পারতেন!

একটি ঘটনার স্মৃতি আজও হৃদয়-আকাশে জল জল করছে সন্ধ্যাতারার মত। অনেক দিনের কথা। কলিকাতা থেকে চলেছি ফুলিয়ার মহাকবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। একই ট্রেনে রামানন্দবাবুরও যাবার কথা। শিয়ালদহ ষ্টেশনে এসে তাঁকে খুঁজছি। প্রথম শ্রেণীর কামরায় তিনি নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতেও তাঁর দেখা মিলল না। তবে কি তিনি আসেন নি? ট্রেন ছাড়ার তখন আর বেশী বিলম্ব ছিল না। এমন সময় একজন বললেন, রামানন্দ-বাবু থার্ড ক্লাসে। সত্যই তাই। আমি গিয়ে দেখি সেই ঋষিপ্রতিম সৌম্যদর্শন মানুষটি প্রশান্তচিত্তে বসে আছেন ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরার একটি প্রান্তে। আমি যেতেই তিনি বললেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে: 'তীর্থে চলেছি। তীর্থ করতে হলে কষ্ট স্বীকার করতে হয়।' বিনয় যে যথার্থ প্রতিভার লক্ষণ—এ সত্য সেদিনের ঘটনার মর্ম্মের গভীরে উপলব্ধি করেছিলাম। যারা শুধুই পণ্ডিত, কেবল বুদ্ধির কসরত করেছে তাদের ঔদ্ধত্যই চিরকাল প্রবল। ঐশী প্রতিভায় যাঁরা প্রতিভাবান তাঁরা কিন্তু চিরদিনই নম্র ও নিরভিমান। রামানন্দ উন্নত হয়েও নিরভিমান ছিলেন।

আর এক দিনের একটি ঘটনা মনে পড়ে। সেবার তাঁকে কৃষ্ণনগর নিয়ে চলেছি কি একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে। তিনি চলছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়। আমি সস্ত্রীক থার্ড ক্লাসের যাত্রী। রাণাঘাট ষ্টেশনে তিনি এসে আমাদের কামরায় উঠলেন। এক বন্ধু আমার ক্ষুদ্র কন্যার হাতে খাবার দিলেন। সে এক হাতে খাবার নিয়ে আর এক হাত বাড়াল। ইচ্ছা আরও নেবে। রামানন্দবাবু সকৌতুকে এই দৃশ্য দেখছিলেন। স্মিতহাস্যে বললেন, 'তোমার কন্যাটি দ্বিভুজা না হয়ে যদি দশভুজা হ'ত!

তিনি সমালোচনা করবেন বলে আমার একখানি পুস্তকের দুই কপি তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিছু দিন পরে দেখি এক কপি তিনি ফেরত পাঠিয়েছেন। যাদের তিনি স্নেহ করতেন তারা জানত—সেই স্নেহ নিঃশব্দে প্রকাশ পেত কত খুঁটিনাটি জিনিষের ভিতর দিয়ে। কত রকমের সমস্যা নিয়ে তাঁকে ভাবতে হ'ত, লিখতে হ'ত। কত দেশ দেশান্তরে যাবার জন্য তাঁর কাছে ডাক আসত। সমুদ্রের এ পারের এবং ও পারের কত মনীষীদের চিঠির জবাব দিতে হ'ত তাঁকে। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও তিনি মনে করে বইখানি পাঠিয়েছিলেন। তাঁর চেতনার আলো ছিল দিগন্ত-বিস্তারী। তাঁর খ্যাতি ছিল জগৎ-জোড়া। তবু যারা ছিল আমাদের মত নগণ্য তাদেরও জীবনের সুখদুঃখের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল অতন্দ্র। তাঁর বিশ্ব ছিল বৃহৎ। মানবতার তিনি ছিলেন উপাসক। কিন্তু সেই বৃহৎ বিশ্বের বিস্তারের মধ্যে তাঁর কাছের মানুষগুলি কখনও হারিয়ে যায় নি। নিকটের মানুষগুলির সুখ-দুঃখকে বাদ দিয়ে যে একরকমের ভাসা-ভাসা মানবতার জয়গান আজকাল একটা ফ্যাশানের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে সেই মানবতাকে তিনি সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর মানবতার ভিত্তি ছিল রক্তমাংসের প্রত্যেকটি ব্যক্তির কল্যাণ।

যুক্তিতে তিনি ছিলেন বৃহস্পতি। তাঁর যুক্তির বাঁধুনি সক্রেটিসের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। 'প্রবাসী'র এবং 'মডার্ণ রিভিউ'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির প্রধান আকর্ষণ ছিল তাদের অকাট্য যুক্তির সারবত্তা। গ্রীসের মাতব্বরেরা সক্রেটিসকে বিষ খাইয়েছিল। তরুণ গ্রীকদের তিনি শিখিয়েছিলেন যুক্তিবাদী অনাসক্ত মন নিয়ে কেমন করে সত্যের অন্বেষণ করতে হয়। যারা দেশের তরুণচিত্তকে

তর্ক করতে, বিচার করতে শেখায় তারা অতীতের শাসনের ভিত্তিমূলে দেয় কাটল ধরিয়ে, মিথ্যার আধিপত্যে হানে দারুণ আঘাত। রামানন্দবাবুর সমালোচনার পদ্ধতি তরুণ-বাংলাকে শিখিয়ে গেছে যুক্তির সুতীব্র সন্ধানী আলোয় সত্যকে কি করে আবিষ্কার করতে হয়। ক্ষমতা ছিল যাদের হাতের মুঠোয় মধ্যে তাদের কাছে তাই তিনি ছিলেন এত ভীতিপ্রদ। বাংলা তথা ভারতকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে রামানন্দবাবুর সতেজ লেখনী কতখানি সাহায্য করেছে, বিশ্লেষণ করে তার পরিমাপ করা যায় না। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। স্বাধীন ভারতবর্ষের তিনি নিশ্চয়ই অন্যতম স্রষ্টা।

তবু বলব—তাঁকে যুক্তিবাদী নিছক পণ্ডিত বললে তাঁর সম্পর্কে সবখানি বলা হয় না। ভাবাবেগও তাঁর মধ্যে ছিল প্রচুর যদিও সেই ভাবাবেগের অভিব্যক্তির মধ্যে কোনরকমের নাটুকেপনা ছিল না। এক দিনের কথা আজও ভুলতে পারি নি। শান্তিপুরে তিনি গিয়েছেন এক সাহিত্য-সভায় সভাপতি হয়ে। আমি তাঁর সঙ্গে আছি। সকালে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে উপাসনা হচ্ছে। আচার্য্যের আসনে রামানন্দবাবু। তিনি উপাসনা করছেন। তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে দরদর ধারায় বিগলিত হচ্ছে প্রেমাশ্রু। ভক্তের সে কি মর্ম্মস্পর্শী কান্না! সেদিনের সেই স্নিগ্ধ প্রভাতের একটি ঘটনা বিদ্যুদ্দীপ্তিতে আমাকে যা দেখাল তার পরিচয় আগে আমি কখনও পাই নি। সম্পাদক রামানন্দকে দিনের পর দিন দেখেছি তাঁর টেবিলে। কত রকমের কাগজে ভর্ত্তি সেই টেবিল। প্রাচীন তপোবন থেকে আর্য্য ঋষি যেন আবির্ভূত হয়েছেন বিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে। মুখচ্ছবিতে কি অতলস্পর্শী প্রশান্তি! চলায়, বলায়, ভাবে, ভঙ্গীতে কোন রকমের চাঞ্চল্য নেই। আপনা থেকে মাথা বার বার নুয়ে পড়েছে তাঁর পদপ্রান্তে। বক্তা রামানন্দকে দেখেছি। সেই বক্তৃতায় উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যুক্তির পর যু'ক্তর দ্বারা বক্তব্য বিষয়টিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে থাকে থাকে বসিয়ে দেবার কৌশল ছিল তাঁর বাগ্মিতার বৈশিষ্ট্য। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতাও শুনেছি। সেই বক্তৃতার মধ্যে ছিল নায়েগ্রা জলপ্রপাতের গর্জ্জন। তা শ্রোতাদের মনকে নিমেষে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত। বিপিনচন্দ্র বক্তৃতা করতেন আর সেই বক্তৃতার ভাষা শ্রোতৃবর্গের মনের গভীরে সৃষ্টি করত একটা বিপুল আলোড়ন। যারা তাঁর বাগ্মিতার পরিচয় পায় নি তাদের বোঝানো যাবে না বাংলা ভাষায় বক্তৃতা কতখানি জোরালো হতে পারে। কিন্তু রামানন্দবাবুর বক্তৃতার ধরণ ছিল স্বতন্ত্র।

আমাদের নিতান্ত আপনার জন হয়ে যিনি প্রাণ খুলে গল্প করতেন সেই সহজ মানুষ রামানন্দকেও আমরা কতদিন কত বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে পেয়েছি। সে সময়ে তিনি কোন আড়াল রাখতেন না। দেশ-বিদেশের মনীষীদের কথা বলতে তিনি ভালবাসতেন। ভগিনী নিবেদিতার ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের অনেক কাহিনী তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। রবীন্দ্রনাথ এসেছেন তাঁর বাড়ীতে। তাঁর শিশু নাতনীর হাত কবির হাতে। হাসতে হাসতে পরিহাসপ্রিয় কবি তাঁকে বলেছেন" রামানন্দবাবু, আপনার নাতনীর পাণিগ্রহণ করলাম।" মজলিসী রামানন্দের পরিচয় যারা পায় নি তাদের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের অতি সামান্য অংশই উদ্ঘাটিত হয়েছে। তাঁর চোখ দিয়ে আমি ইউরোপের ছবি দেখেছি। ইউরোপ থেকে স্বদেশে ফিরছেন। ওদেশের এক ভদ্রলোক কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন : "আমাদের দেশের রান্না আপনার কেমন লাগল?" অপ্রিয় সত্য বললে পাছে বিদেশী ভদ্রলোক দুঃখ পান তাই অননুকরণীয় ভঙ্গিতে রামানন্দবাবু জবাব দিলেন, "ভালই লেগেছে, তবে আপনাদের দেশের রান্না বেশী খাওয়া যায় না।" তাঁর মুখ থেকে এই রকমের গল্প শুনতে শুনতে আমরা কত হাসিই না হেসেছি!

তখন তিনি ইউরোপে। কানের পীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন। চিকিৎসকের বাড়ীতে গিয়েছেন কান দেখাতে। ডাক্তার হিসাবে তাঁর ইউরোপে খুব নাম। চেয়ারে বসে প্রবীণ সম্পাদক রামানন্দবাবু। ডাক্তার সামনে দাঁড়িয়ে। রামানন্দবাবুকে তিনি হাঁ করতে বললেন। হাঁ করতেই ডাক্তার তাঁর মুখের মধ্যে একটা লজেন্স ফেলে দিলেন। তার পর খুব যত্ন নিয়ে তাঁকে দেখে ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন। রামানন্দবাবু যখন বাড়ী ফিরে এলেন লজেন্সের ব্যাপারটা তখনও তাঁর মনের মধ্যে ছোট কাঁটার মত খচ্ খচ্ করছে। একই বাড়ীতে তখন রবীন্দ্রনাথ সদলবলে অবস্থান করছেন। একই চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথকেও দেখেছেন ইতিপূর্ব্বে এবং যথারীতি তাঁর মুখের মধ্যেও লজেন্স ফেলেছিলেন। ব্যাপারটা কবির কাছেও খুব প্রীতিকর বলে মনে হয় নি। কিন্তু ঘটনাটা চেপে গেছেন তিনি। ডাক্তারের ওখান থেকে ফিরে রামানন্দবাবু বসেছেন কবির কাছে। আর কেউ নেই। দু'এক কথা হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশাই, ডাক্তার কি আপনাকেও লজেন্স খাইয়েছে?' রামানন্দবাবুর ভারাক্রান্ত মন থেকে সঙ্গে সঙ্গে আহত অভিমানের বোঝা নেমে গেল। লজেন্স খাওয়া সম্পর্কে দু'জনেরই অভিজ্ঞতা এক। কারও মনে আর ক্ষোভ রইল না। গল্পের মজলিসে এই ধরণের কাহিনী যখন তিনি পরিবেশন করতেন, আমরা প্রচুর হাসির সঙ্গে তাদের নির্ম্মল রস আস্বাদন করতাম।

সম্পাদক রামানন্দকে দেখেছি, বক্তা রামানন্দকে দেখেছি, মজলিসী রসিক রামানন্দকে দেখেছি, তাঁকে বিভিন্ন রূপে

দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। দেখেছি তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞানের পিপাসা, ক্ষত্রিয়ের নির্ভীক চিত্তের অপরিসীম দৃঢ়তা, দেখেছি বুদ্ধির এবং চরিত্রের আভিজাত্য। কিন্তু শান্তিপুরের ব্রাহ্মসমাজে তাঁর অশ্রুপ্লাবিত মুখমণ্ডলে যে ছবিখানি সেদিন দেখেছিলাম তারই মধ্যে বোধ হয়, ফুটে উঠেছিল তাঁর পরম পরিচয়। আসলে রামানন্দ ছিলেন ভগবদ্ভক্ত। তাঁর হৃদয়-আকাশে যে কামনা সর্ব্বসময়ের জন্ত জ্বলন্ত ধ্রুবতারকার মত সে হচ্ছে ভগবানকে পাওয়ার ব্যাকুল কামনা। কিন্তু মর্ম্মের গভীরতম প্রদেশের এই নিবিড় আকাঙ্ক্ষাকে বাহিরে প্রকাশ করতে তাঁর কুণ্ঠার অবধি ছিল না। আমার সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁকে ভগবানের কথা বলতে কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তবু তাঁর হৃদয়কে জুড়ে ছিল সেই পরম পুরুষকে উপলব্ধি করবার সর্ব্বগ্রাসী কামনা। আর মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে তিনি ভালবেসেছিলেন বলেই নরদেবতার অসম্মানকে তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না, বরদাস্ত করতে পারতেন না অত্যাচারীর স্পর্দ্ধাকে।

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

৮

কলিকাতার শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে বাল গঙ্গাধর তিলক আসিতেছেন, সঙ্গে আসিতেছেন খাপার্দে ও ডাঃ মুঞ্জে। ছাত্রমহলে মহা উৎসাহ। বরিশালে ফুলারী লাঠিবাজির পরে দেশময় যে উত্তেজনার ঢেউ উঠিয়াছিল ধীরে ধীরে তাহা মিলাইয়া যাইতেছিল। দমননীতির নিষ্পেষণে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের গতি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। ব্রিটিশ "ফেয়ার প্লে" বিশ্বাসী নরমপন্থী মডারেট নেতাদের অধিকৃত কংগ্রেস, বিলাতী পার্লামেণ্টে লিবারেল পার্টির প্রভাবের উপর অনেকখানি আশা রাখিয়াছিল। এই নেতারা তখনও বিলাতে ডেপুটেশন পাঠাইবার কথা ছাড়া আর কোন উপায় দেখিতেছিলেন না। গোপালকৃষ্ণ গোখলে বিলাতে গিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের জবরদস্ত নীতিকে একটু উদার করিবার জন্ত বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন। ছাত্রমহল ও যুবক-সম্প্রদায় প্রাচীন নেতৃত্বের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। নূতন নেতৃত্ব তখনও রাজনৈতিক মহলকে হাত করিয়া লইতে পারে নাই। এই অনিশ্চিত অবস্থা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া ছাত্রসমাজ খানিকটা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল, কথায় কথায় দেশের প্রাচীন, অভিজ্ঞ নেতাদের অসম্মান করিতেছিল। ইণ্ডিয়ান মিরর এই অশিষ্ট আচরণের নিন্দা করিয়া বলিল, ছুঁইফোঁড় নেতারাই এজন্ত দায়ী।

শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে চরমপন্থী নেতারা যখন তিলককে নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন কলিকাতার মডারেট নেতারা মনে মনে শঙ্কিত হইলেও একটু মিষ্ট নেতাদের সঙ্গে হাত মিলাইলেন মহারাষ্ট্রের নেতাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্ত। তাঁহারা ভাবিলেন তিলকের আগমনে স্বদেশী আন্দোলনে যদি নূতন উৎসাহ আসে তাহাতে মঙ্গল হইবে।

প্রকাশ্ত রাজনীতির আড়ালে যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অন্ত প্রকার আন্দোলনের চেষ্টা বিচ্ছিন্নভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, প্রবীণ নেতারা অনেকে তাহার ব্যাপকতা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ খবর রাখিতেন না। কিন্তু দূর মহারাষ্ট্রে সে খবর পৌঁছিয়াছিল। নব জাগরণের প্রথম হইতে দুই দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান আরম্ভ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রের গণপতি ও শিবাজী উৎসবের পরে পঞ্জাব হইতে আসিল গুরুগোবিন্দ উৎসব। বাংলার নিজের বীর সন্তানদের কথাও মনে পড়িল—ফলে প্রতাপাদিত্য উৎসব, সিরকাশেম উৎসব আরম্ভ হইল।

দেশের বীর সন্তানদের পুণ্যস্মৃতি স্মরণে জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্ত বাঙালী হিন্দুরা এই সব উৎসব আরম্ভ করিলে দুই শ্রেণীর লোকের ইহা ভাল লাগিল না। তাহারা প্রতিবাদ ও পাল্টা উৎসবের প্রস্তাব করিল। ইংরেজ সম্প্রদায়ের মনে হইল, স্মরণ করিবার মত তাহাদের অনেক কীর্ত্তিকলাপ ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা আছে, তাহারাই বা কেন সেগুলি স্মরণ করিয়া উৎসব করিবে না? পলাশী মেমোরিয়াল, মিউটিনি মেমোরিয়াল, ক্লাইভ মেমোরিয়ালের প্রস্তাব উঠিল তাহাদের পক্ষ হইতে। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিবাদকারী বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমান-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আহম্মদ শা দুরানীর পাণিপথের যুদ্ধের স্মরণ করিয়া উৎসব করিবার প্রস্তাব করিলেন শিবাজী উৎসবের প্রতিবাদে।

মহা উৎসাহে শিবাজী উৎসব হইল। উৎসবের বিবরণ দিয়া যুগান্তর এই মর্ম্মে লিখিল—শিবাজী মহারাজের কাছে তাঁহার তরবারি ছিল-ব্রাহ্মণদের চাইতে বেশী আদরের বস্তু। তরবারির জন্যই তিনি ভবানীর প্রিয় হইয়াছিলেন। হে ভারতবাসী, আজ যদি তোমরা তরবারি দূরে ফেলিয়া দিয়া তরবারিহীন শিবাজীকে হৃদয়ে স্থান দিতে অগ্রসর হও, নিশ্চয় জানিও তোমাদের ঐ হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইবে। তিলক বক্তৃতা করিলেন, "ইংরেজ আমাদিগকে চণ্ডালের মত ঘৃণা অপমান করে। যাহারা এই ব্যাপারের প্রতিবাদ করে না তাহারা মনুষ্যনামের যোগ্য নহে। বিদেশী জিনিসের বিরুদ্ধে সকলের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যত অত্যাচার হউক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আমাদের স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিতে হইবে।" সমবেত শ্রোতাদের সম্বোধন করিয়া তিনি আরও বলিলেন—"স্বদেশীর শত্রু আমাদের স্বদেশবাসী যাঁরা বিদেশী সরকারের গোলামী করেন। মনিবের কাছে তাঁরা আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, সত্য বলিবার সাহস কই তাঁদের। শিবাজী ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। তাঁর পিতা সরকারের চাকুরি করিতেন, শিবাজী তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন।"

একদিকে প্রকাশ্য সভা সমিতিতে বক্তৃতা চলিতে লাগিল আবার তাঁহার দুই জন মরাঠি সহকারীকে সঙ্গে লইয়া তিলক মহারাজ অনুশীলন সমিতির অধিনায়ক মি: মিত্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বাংলার গুপ্ত সমিতি গঠন সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল।

বাংলার বিপ্লবী দলের নেতাদের কাছে মহারাষ্ট্র হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, মরাঠা নেতারা তিন শত যুবককে আমেরিকা হইতে যুদ্ধ-পরিচালনা-বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়াছেন এবং বোম্বাই প্রদেশে প্রায় দেড় লক্ষ স্বেচ্ছা-সৈনিক সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া বাংলায় এক লক্ষ স্বেচ্ছাসৈনিক সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ঢাকার কেন্দ্র হইতে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের সর্ব্বত্র অনুশীলন সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। কলিকাতা, মেদিনীপুর ও চন্দননগরের কেন্দ্র হইতেও স্বেচ্ছাসৈনিক সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হইল। রুদ্ধদ্বার কক্ষে মহারাষ্ট্রের নেতাদের সঙ্গে বাংলার নেতাদের আলোচনা হইল, দ্বাররক্ষা করিতেছিলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির পুলিনবিহারী দাস ও আনন্দ চক্রবর্ত্তী।

হ্যারিসন রোডের কেন্দ্র উঠিয়া যুগান্তর আপিসে গিয়াছিল। তরুণ-সমাজের মন বিপ্লবমুখী করিবার জন্য যুগান্তর জোর প্রচারকার্য্য চালাইতে লাগিল। যুগান্তরের গ্রাহকসংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিল। নূতন সভ্য সংগ্রহ, সভ্যদের শিক্ষার ব্যবস্থা চলিতেছিল। জায়গায় জায়গায় স্থানীয় নেতাদের অধীনে পৃথক সমিতি স্থাপিত হইতেছিল।

বিপ্লবপন্থী যুগান্তর, অরবিন্দের বন্দেমাতরম্, বিপিনচন্দ্র পালের নিউ ইণ্ডিয়া ও ব্রহ্মবান্ধবের সন্ধ্যা যুগপৎ সরকার ও মডারেট নেতাদের আক্রমণ করিতে লাগিল। লোকে নূতন ভাব ও চিন্তার এই সকল সাহসী প্রচারককে বন্দে-মাতরম্ পার্টি নাম দিল। এই দলের প্রধান পুরুষ বন্দে-মাতরমের পরিচালক। সমাজের অনেক পদস্থ ব্যক্তি এই দলের প্রত্যক্ষ ও গোপন সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষক হইলেন। নিউ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাংলার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া নূতন ভাব ও চিন্তা প্রচার করিতে লাগিলেন।...

মি: রায়ের এক জরুরী পত্র পাইয়া ভবেশকে চক্রবেড়ের যাইতে হইল। সে যাইবার জন্য জামা কাপড় পরিতেছে, দেখিল বগলে কতকগুলি কাগজ লইয়া দেবানন্দ বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সে বলিল, আজও যুগান্তর বিক্রী করতে বেরুচ্ছিস না কি ?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল, হাঁ, এই কাজের ভার পড়েছে আমার উপর।

ভবেশ বলিল, আমার কথা শোন্। আমি চক্রবেড়ের যাচ্ছি, আমার সঙ্গে আজ চল। এর পর আর তোকে কর্ত্তব্যচ্যুত করবার জন্য ডাকব না।

দেবানন্দ—কাগজ বিক্রি করে পয়সা জমা দিতে হবে।

ভবেশ—কাগজগুলো হস্টেলের ছেলেদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া যাবে। দাম আমার কাছ থেকে নিয়ে জমা দিয়ে আসিস। আজ চল ভাই আমার সঙ্গে। মামা লিখেছেন, বাবা তাঁকে নাকি এক চিঠি লিখেছেন আমার বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে। জরুরি পরামর্শ আছে।

দেবানন্দ—আপনার সঙ্গে জরুরি পরামর্শ, আমি গিয়ে কি করব ?

ভবেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, তুই কিটির সঙ্গে গল্প করবি।

দেবানন্দ লক্ষ্য করিয়াছে আজকাল ভবেশদা মাঝে মাঝে কিটির কথা তুলিয়া তাহাকে ঠাট্টা করেন। কিটি যেন গবর্ণেসের কাছে পড়ে, সাহেবী চালে থাকে, কিন্তু দেবানন্দ দেখিয়াছে তাহার নিজের একটা আলাদা চেহারা আছে। সেটা যেন অনেকখানি শান্ত, আর একটু মিষ্ট। সেদিনকার কথা তাহার মনে পড়িল। কি একটা ছেলেমানুষি করিতে করিতে কিটি হঠাৎ ঘাড় কাৎ করিয়া তাহার দিকে চাহিল। মনে হইল যেন দৃষ্টি দিয়া বলিতেছে, দেখ আমি কেমন দুষ্টুমি করছি। মনে হইল চাহনি দিয়া সে যেন বলিতে চাহিতেছে, তোমার সঙ্গে আমার ত বোঝাপড়া হয়ে গেছে, নয় কি ? এই বোঝাপড়াটা যে কি সে বহু চেষ্টা করিয়াও ধরিতে পারে

না। তাহা না পারুক, কিটিকে বেশ লাগে তাহার। আর বোধ হয় কিটির জন্যই সে চক্রবেড়ে যায়।

ভবেশের কথা শুনিয়া তাহার একটু লজ্জা হইল। সে ভাবটুকু ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে বলিল, আজ থাক।

ভবেশ মুচকি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা।

একটু পরে সে আবার বলিল, বি-এ পাস করে বিলাত যাবার কথা। হঠাৎ বাবা এখন এ কথা তুললেন কেন, আর আমাকে কিছু না লিখে মামাকে লিখলেন কেন বুঝতে পারছি নি।

ভবেশের পিতার ও তাঁহার এই পত্রের কথা একটু বলা হইতেছে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ে ভাবের বন্যা বহিয়াছিল দেশে। মহারাজা, রাজা, জমিদার হইতে আরম্ভ করিয়া মুটে, মজুর, চাষী, গাড়োয়ান, দোকানদার, সবাই যেন একটা যাদু-মন্ত্রে নবজাগ্রত দেশপ্রেমের প্রেরণায় আলাদা মানুষ হইয়া উঠিল। ভবেশের পিতা চিরকালের রাজভক্ত জমিদার। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর সনে তাঁহার যে মেয়ে জন্মিল তাহার নাম রাখিলেন ভিক্টোরিয়া। তার পরের বছর তিনি রায়বাহাদুর খেতাব পাইলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হইলে রায়বাহাদুর গ্রামের সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে মিলিয়া খালি পায়ে রাখীবন্ধনের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া গান করিলেন—

ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।

বন্দেমাতরম্ সারকুলার জারি হইলে যে সব ছেলে স্কুল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল তাহাদের জন্য তিনি গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় খুলিলেন। দেশী কাপড় বিক্রয়ের জন্য হাটে তিনি দোকান খুলিলেন।

তারপর আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল মুলারী অভিযানে। রেগুলেশন লাঠির আবির্ভাব হইল। আরম্ভ হইল হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের, জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের উস্কানি দেওয়া, বন্দেমাতরম্ ও স্বদেশীর বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান। ইংরেজ রাজপুরুষগণ ও ইংরেজ কাগজওয়ালারা ঘোষণা করিল—এডুকেটেড বেঙ্গলীজ আর সিরিয়াসলি ডিসলয়াল (শিক্ষিত বাঙালীরা একেবারে রাজভক্তিহীন)। দেশের অনেক জমিদারের মত রায়বাহাদুর ঘাবড়াইয়া গেলেন। দেশের সর্ব্বত্র সমাজের পদস্থ, অর্থশালী ব্যক্তিদের পশ্চাদপসরণ আরম্ভ হইল। রায়বাহাদুর হাত গুটাইলেন।

অর্থাভাবে জাতীয় বিদ্যালয় উঠিয়া গেল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্বদেশী দোকান হইতে যাহারা ধারে কাপড় কিনিতেন তাঁহারা বাকী টাকা শোধ করিতে ভুলিয়া গেলেন। শেষে হইল দোকানের কাপড় চুরি। অনেক লোকসান খাওয়াইয়া দোকান উঠিয়া গেল। হাটে বিলাতী লবণ বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য ছেলেরা পিকেটিং আরম্ভ করিলে তিনি দারোয়ান পাঠাইয়া তাহাদের ধরিয়া আনিয়া খুব ধমকাইয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন তাঁহার হাটে ফের গোলমাল করিলে তিনি তাহাদের ধরিয়া থানায় পাঠাইয়া দিবেন। এখন স্বদেশী আন্দোলন, বয়কট তাঁহার চোখে রাজদ্রোহ, তাঁহাদের পারিবারিক রাজভক্তির সুনাম নষ্ট হইবার ভয়ে তিনি সর্ব্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

শ্যালক-পত্নীর এক পত্রে পুত্রের কার্য্যকলাপের সংবাদ পাইয়া তিনি সন্ত্রস্ত হইলেন। ব্যারিষ্টার শ্যালককে লিখিলেন —আর দেরী না করিয়া ভবেশকে বিলাতে পাঠাইয়া দাও।

মিসেস রায়ের ভবেশকে তাড়াতাড়ি বিলাতে পাঠাইবার আগ্রহ জন্মিবার একটা কারণ ঘটিয়াছিল। ভবেশ এই কারণের কথা কিছু জানিত না। কিন্তু এই কারণ বশতঃই মিসেস রায় ভবেশের পিতাকে ভয় দেখাইয়া তাঁহার সম্মতি আদায় করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের উত্তর আসিলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য মিঃ রায় ভবেশকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

মিঃ রায়ের গৃহে পৌঁছিয়া নীচে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া ভবেশ উপরে উঠিল।

বসিবার ঘরে মিসেস্ রায় একজন অপরিচিত ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। একটু দূরে কিটি, একটি মেয়ে ও একজন যুবক বসিয়া নিজেদের মধ্যে আলাপ করিতেছিল। ভবেশ ঘরে ঢুকিবে কিনা ইতস্ততঃ করিতেছে, ইতিমধ্যে বিজি সিঁড়ি দিয়া লাফাইতে লাফাইতে উঠিয়া আসিল। ভবেশকে দেখিয়া সে চিৎকার করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, ভবেশ তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল স্পর্শ করিয়া তাহাকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল। তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া সে পাশের একটি ঘরে লইয়া গেল।

ভবেশ জিজ্ঞাসা করিল, কারা এসেছেরে বিজি? ওদের ত চিনি না।

বিজি উত্তর না দিয়া হাসিতে লাগিল। ভবেশ বলিল, কি হ'ল তোমার মাষ্টার বিজু? এত হাসি কেন?

হাসিতে হাসিতে বিজি বলিল, ইয়া আল্লা! ওরা কারা তুমি জান না ভবেশ দা?

'ইয়া আল্লা' কথাটা বিজি শিখিয়াছে মিঞামুন্না বাবুর্চ্চির কাছে। বাজারে চুরি করিবার জন্য মিসেস রায়ের কাছে বকুনি খাইয়া সে প্রথমেই বলে—ইয়া আল্লা!

ভবেশ বলিল, না, ত।

বিজি—চুপে চুপে বলছি তোমাকে। কিটিটাকে যেন বলে দিও না। কিটির কাছে ঐ যে জাপানী পুতুলের মত গালফোলা মেয়েটাকে দেখছ ওর নাম আইভি মুকসি বা মাকসি। ও ইংরেজী বলে কিটির গভর্ণেসের মত সুর ক'রে।

ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। ম্যামী সেদিন বলছিল ড্যাডীকে, আমি লুকিয়ে শুনেছি। আর ওর কাছে খুব কর্ণ্টা, পিংপং খেলবার ব্যাটের মত নাকওয়ালা যে বসে আছে ও হচ্ছে আইভি বুকসির ভাই। কিটির সঙ্গে ওর বিয়ে হবে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিলি খুব হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, পিংপং ব্যাটের কথা কে বলেছে জান ভবেশ দা? কিটি বলেছে। কিটি ইজ নটি। সে বলে চীনাম্যান চ্যাং চুং।

হাসি সংক্রামক। খবর শুনিয়া বিস্মিত হইলেও ভবেশ বিলির সঙ্গে হাসিতে লাগিল। বিলি বলিল, কিটি বলে ঐ চীনাম্যানকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে। জান ভবেশদা, ও কিন্তু সত্যি চীনাম্যান নয়, ও একজন ম্যাজিষ্ট্রেট। বিলেতে পাশ করেছে, ম্যামী বলেছে।

তারপর সে বলিল, আমি ম্যামীকে বলছি তুমি এসেছ। পালিও না যেন। বিলি চলিয়া গেল।

বিলির মুখে যাহা সে শুনিল তাহাতে ভবেশ বুঝিল পিতার হঠাৎ মত পরিবর্ত্তনের পিছনে মিসেস রায়ের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র আছে। তাহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। আর অপেক্ষা না করিয়া তখনই সে নীচে নামিয়া গেল।

বিলির সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিয়া মিসেস রায় ভবেশকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

৯

ভবেশ লক্ষ্য করিতেছিল দেবানন্দ যেন দূরে সরিয়া যাইতেছে। সে প্রায়ই বাহিরে যায় ও দিনের অধিকাংশ সময় হষ্টেলে অনুপস্থিত থাকে। পরীক্ষা দিবে বলিয়া মাঝে মাঝে বই খুলিয়া বসে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। খাওয়া ও থাকা ছাড়া হষ্টেল-জীবনের সঙ্গে তাহার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইবার মত। ভবেশ নিজের মনে চিন্তা করে, দুঃখ করে দেবানন্দের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, কিন্তু জানে তাহাকে ঠেকাইবার চেষ্টা করা বৃথা।

তাহার নিজের ভবিষ্যৎও একটু অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কয়েকদিন হইল তাহার পিতার আর একখানি পত্র আসিয়াছে। পিতা লিখিয়াছেন—তাহার মামা প্রস্তাব করিয়াছেন বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ বিলাত অতিশয় প্রলোভনের স্থান। তিনি এই প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। তাহার মামা একটি সুপাত্রীর সন্ধানও দিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন এই কার্য্য সর্ব্বথা করণীয়। ভবেশ অবিলম্বে এই পাত্রীটিকে দেখিয়া তাহার মত তাহার মাতাঠাকুরাণীকে যেন জানায়।

ভবেশ বুঝিতে পারিল তাহার মামীর পরামর্শে মামাবাবু বিলাত যাইবার আগে মিস বক্সীর সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাবে তাহার পিতার সম্মতি আদায় করিয়াছেন। সে মিস বক্সীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার নিজের মেয়ের আই-সি-এস পাত্রের সঙ্গে বিবাহের সুবিধা করিয়া দিবে তিনি এই প্রত্যাশা করেন। ভবেশ জানে তাহার পিতাকে ভিতরের চক্রান্ত বুঝাইবার চেষ্টা করা নিরর্থক, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ব্যারিষ্টার শ্যালকের প্রভাবাধীন। সেই দিনই সে পিতাকে লিখিল বিবাহ করিয়া বিলাত যাওয়া তাহার মতের বিরোধী, তিনি মত পরিবর্ত্তন না করিলে সে বিলাত যাইবে না।

দেবানন্দ বাহিরে গিয়াছিল। বোঝাপড়া করিবার অভিপ্রায় লইয়া ভবেশ সন্ধ্যাবেলা একাই চক্রবেড়ে রওনা হইল।

নীচে বসিবার ঘরে আড্ডা জমিয়াছে, বেয়ারার কাছে খবর পাইয়া সে সোজা বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। ডাঃ চক্রবর্ত্তী, মিঃ গোহো, মিঃ মিটার ও মিঃ গাঙ্গুলী উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ চক্রবর্ত্তী ভবেশের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া চোখের একটু ইঙ্গিত করিয়া হাসিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, হ্যালো মাই ফ্রেণ্ড, উই হেভণ্ট সীন ইউ ফর এজেস (এক যুগ তোমার সঙ্গে দেখা নেই।)

ভবেশ শুনিল আলোচনা হইতেছে পার্লামেণ্টে স্যার হেনরী কটনের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ মর্লের উক্তি "পার্টিশান ইজ এ সেটলড ফ্যাক্ট" লইয়া।

মিঃ গাঙ্গুলী উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, ইংরেজের ইতিহাসে কতবার সেটলড ফ্যাক্টকে আনসেটল করতে হয়েছে মিঃ মর্লে কি খবর রাখেন না?

ডাঃ চক্রবর্ত্তী—তোমাদের ডেলিকেট মডারেট ষ্ট্যমাক আপসেট (পেটের গোলমাল) না হয় এজন্য মিঃ মর্লে একটু মোলায়েম করে বলেছেন। সেদিনকার পায়োনিয়ার দেখেছ?

মিঃ গাঙ্গুলী—কবেকার? যে ইস্যুতে "গোল্ডেন বেঙ্গল লিকলেট হোপস্" বেরিয়েছে?

ডাঃ চক্রবর্ত্তী—না, যে ইস্যুতে বাঙালীদের এই বলে ভয় দেখিয়েছে "দি ইংলিস উইল ডিসেণ্ড আপন দেম উইথ ফায়ার এণ্ড সোর্ড এণ্ড শুট এণ্ড হ্যাং এজ রিমোর্সলেশলি এজ ইন এইটিন ফিফটি সেভন্" (ইংরেজ আগুন এবং তরবারি নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যেমন বেপরোয়া গুলি ও তরবারি চালিয়েছিল আবার সেইরূপ চালাবে।)

ভবেশের মনে পড়িল পায়োনিয়ারের এই ভীতি প্রদর্শন সম্বন্ধে বেঙ্গলী কি ভাবে তাহার মন্তব্য শেষ করিয়াছিল। তাহার মামা মিঃ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জির বিশেষ ভক্ত। মামার উপর পরোক্ষে একটু কটাক্ষ করিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল, প্লিজ একসকিউজ, পায়োনিয়ার অকারণে ভয় দেখিয়েছে। বেঙ্গলী এ সম্বন্ধে কমেণ্ট করে

লিখেছে, "The educated Indians will never agree to England withdrawing from India as such an event will atuomatically result in anarchy" (শিক্ষিত ভারতবাসীরা ভারত হইতে ইংরেজদের চলিয়া যাইবার প্রস্তাবে কখনও রাজী হইবে না, কারণ তাহার ফলে দেশে সঙ্গে সঙ্গে অরাজকতা দেখা দিবে।) সুতরাং প্যারোনিয়ার অপায়ে ভয় দেখিয়েছে।

ডাঃ চক্রবর্তী উচ্চ হাস্য করিলেন। বলিলেন, ভেরি ক্লেভার অব ইউ টু সে দ্যাট (বেশ বলেছ)। কিন্তু যাই বল টাইমসের "ইণ্ডিয়া ওয়াজ কঙ্কার্ড বাই দি সোর্ড এণ্ড ইজ হেল্ড বাই দি সোর্ড" এই কথার চাইতে প্যারোনিয়ারের লেখা বেশী জোরালো।

মিঃ গোহো—ইংলিশম্যান কি বল যায় ভেবেছ? টমি এটকিন্স নামে একটা লোক লিখেছে ঈষ্ট বেঙ্গলের "বাডিং ওয়ারিয়রদের (স্ফুটনোন্মুখ যোদ্ধা) ঠাণ্ডা করবার জন্ত ঈষ্ট বেঙ্গলে টমিদের একটা রুট মার্চই যথেষ্ট।

ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন, এতদিন গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলনকে দমাবার জন্ত রেগুলেশন লাঠির সদ্ব্যবহার করছিলেন, এবার এখানকার সব ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ানের মাথা খারাপ হয়েছে ভয়ে। আসানসোলের রেলের এংলো-ইণ্ডিয়ানরা মিঃ সুরেন্দ্র ব্যানার্জির একিজি পুড়িয়েছে, সো টু হেভ বেরিড দি একিজি উড হেভ বীন মোর এপ্রোপ্রিয়েট (যদিও কবর দেওয়া বেশী সঙ্গত হ'ত) মিঃ গাঙ্গুলী—দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভাস কি বলেছে, শুনেছ? এক বক্তৃতায় সে বলেছে সুরেন্দ্র ব্যানার্জি দিনাজপুরে এলে তার গলায় আমি জুতোর মালা পরিয়ে দিয়ে এখান থেকে বিদেয় করব।

এদেশের সব এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো এক সঙ্গে চীৎকার করছে—আরও রিপ্রেশন চালাও, আর বিলাতী কাগজগুলোর করেসপণ্ডেন্টরা এখানকার অবস্থা সম্বন্ধে ক্রমাগত এলার্মিষ্ট রিপোর্ট পাঠাচ্ছে।

মিঃ মিটার—মেদিনীপুরে জায়গায় জায়গায় গ্রেন রায়টস্‌ হয়েছে। ঈষ্ট বেঙ্গলে কয়েকটা জায়গায় স্কারসিটি (অন্নাভাব) দেখা দিয়েছে। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি এই খাত্তাভাব সম্বন্ধে কি বলছে জান?

মিঃ গাঙ্গুলী—এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজের কথা বলছ কেন? ফুলার নিজে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সকে চিঠি লিখেছে স্বদেশীওয়ালাদের কাজের ফলে চাউল ও অন্যান্ত জিনিসের দাম বেড়েছে, লোকের কষ্ট হয়েছে। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো সঙ্গে সঙ্গে বলতে আরম্ভ করেছে স্বদেশী আন্দোলন খাত্তাভাবের জন্য দায়ী।

মিঃ গোহো—আচ্ছা, সোনার বাংলা লিফলেট নিয়ে পায়োনিয়ার, ইংলিশম্যান যে হৈ চৈ করছে ব্যাপারটা কি? সত্যি এই নামে কোন সোসাইটি আছে?

কিছুক্ষণ কেহ কোন উত্তর দিলেন না। শেষে মিঃ রায় বলিলেন, যাদের খবর রাখবার কথা তারা জিনিসটাকে উড়িয়ে দিচ্ছে। বন্দেমাতরম্‌ বলছে, সোনার বাংলা লিফলেটের পেছনে কোন গুপ্ত সমিতি নেই। টেলিগ্রাফ বলছে, চুঁচুড়ার কোন টেররিষ্ট বা অর্গিনি বোমাওয়ালা সমিতি নেই। রক্তপাত করা বাঙালীর স্বভাবের বিরোধী। কোন লিফলেট যদি সত্যি বেরিয়ে থাকে সেটা কোন অপ্রকৃতিস্থ লোকের কাজ। কোন কোন কাগজ ঠাট্টা করেছে। সন্ধ্যা বলছে, "ডাক, ডাক, যত নীলকর, চা-কর, কাগজের সম্পাদক, কুলি, ব্যারিষ্টার, জবুরে আর ব্যাঙ্ক বাজনাদার আছে সবাইকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তৈরী হতে বল, দেশে ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত।"

ডাঃ চক্রবর্তী মিঃ রায়ের কথা শুনিয়া মুচকিয়া হাসিলেন। তিনি জানিতেন যুগান্তর দলের লোকেরা মাঝে মাঝে এই সোনার বাংলা ইস্তাহার ছাপাইয়া বিলি করে। মিঃ রা[illegible] দলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছেন।

মিঃ রায় উঠিয়া ভবেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভবেশ আমার সঙ্গে একটু এস। প্লিজ এক্সকিউজ মি ফর এ কি[illegible] মিনিটস (দু'চার মিনিটের মধ্যে আসছি)।

তিনি ঘর হইতে বাহিরে গেলেন। ভবেশ ডাঃ চক্রবর্তী[illegible] দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বাহিরে গেল।

মিঃ গাঙ্গুলী—চক্রবর্তী, মৈমনসিংহের ব্যাপারটা কি ব[illegible] দেখি? মৈমনসিং ও ঢাকায় ললেসনেস ক্রনিক ডিজিজে[illegible] দাঁড়িয়েছে। খবর পেলাম ঢাকায় ফের ট্রাবল সুরু হয়েছে এ দিকে যশোরেও নাকি কমিউন্যাল ইল-ফিলিং (সাম্প্রদায়ি[illegible] মনোমালিন্য) দেখা দিয়েছে।

ডাঃ চক্রবর্তী—আই এম এফ্রেড উই আর গোইং টু হে[illegible] মোর দিউজ ফ্রম মৈমনসিং, ঢাকা এণ্ড কুমিল্লা, হট-বেডস অ[illegible] অ্যান্টি হিন্দু একটিভিটিজ ইন ঈষ্ট বেঙ্গল (হিন্দু-বিদ্বে[illegible] আন্দোলনের কেন্দ্র মৈমনসিং, ঢাকা ও কুমিল্লা থেকে আর[illegible] সংবাদ আসবে)। মৈমনসিংহে মুসলমানরা বলে বেড়াচ্ছে[illegible] ইমাম মেহেদীর আবির্ভাব হবে এদেশে তার শাসন কায়ে[illegible] করতে। মৌলবীরা প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে কাফেরের সম্পত্তি[illegible] লুঠ করা, তাকে ইসলামে দীক্ষিত করা কোরাণের মতে মেরি[illegible] টোরিয়াস কাজ। মৈমনসিংহের কাগজে এই সব একটিভিটি[illegible] বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে আর কমপ্লেন করেছে পুলিশ চুপচা[illegible] বসে আছে।

মিঃ গোহো—মৈমনসিং ঈশ্বরগঞ্জ রায়টের মোকদ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেটের জাজমেন্ট দেখেছ? তার মত এই যে স্বদে[illegible] আন্দোলন এই সব রায়টের জন্য দায়ী।

স্বাক্ষরিত ভারত-মার্কিন শিল্প সহযোগিতা চুক্তি সম্পর্কিত কাগজপত্র পরিদর্শনরত পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

নিউ দিল্লীস্থ রাষ্ট্রপতি-ভবনে, চীনে ভারতীয় সংস্কৃতি মিশনের নেত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও অন্যান্য সভ্যগণসহ ডক্টর শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ
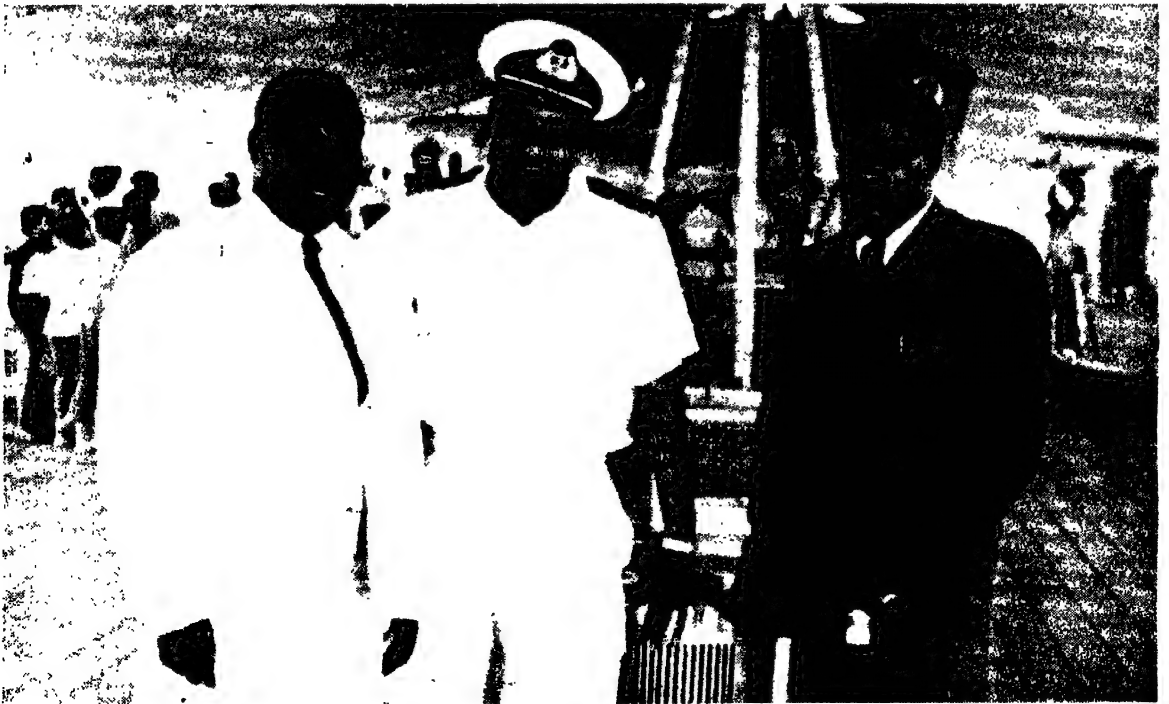
ডা: চক্রবর্তী—কোয়াইট সো। সেই জন্যই ত ঢাকার আবার কতকগুলি বাজার লুঠ হয়েছে। আর সেই জন্যই টাঙ্গাইলের বাটাইল হাটের স্বদেশী কাপড় আর দেশী লবণের কতকগুলি দোকান মুসলমানরা লুঠ করেছে। স্বদেশী জিনিসের দোকান যখন লুঠ হয়েছে তখন স্বদেশী আন্দোলনকেই ত এজন্য দায়ী করতে হবে।

মি: গোহো—বারে একজন ফ্রেণ্ড বলছিল বৈমনসিংহে "স্বজাতি আন্দোলন ও জাতীয় বিজ্ঞাপন" নামে এক প্যামফ্লেট মুসলমানদের মধ্যে বিলি হচ্ছে। প্যামফ্লেটের বক্তব্য, "হিন্দুদের সঙ্গে সব সংস্রব বর্জ্জন কর, তাদের অধীনে চাকুরি করো না, তাদের স্কুলে ছেলেদের পড়তে দিও না, তাদের তৈরি জিনিস কেনো না, তাদের চাকরি দিও না,—হিন্দুদের জাহান্নমে পাঠাও।"

ডা: চক্রবর্তী—এর ফলে লুঠপাট, গৃহদাহ ইত্যাদি ঘটলে ম্যাজিষ্ট্রেট বলবে স্বদেশী মুভমেণ্ট এর জন্য দায়ী। এণ্ড দি ষ্টেটমেণ্ট উইল বি সুপ্ল্যাণ্ড্ বাই অল দি হোম পেপারস (বিলাতের কাগজে এই সংবাদ ফলাও করে ছাপা হবে)।

মি: রায় ভবেশকে লইয়া উপরে ড্রইংরুমে গেলেন। মিসেস রায় তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিটি গভর্ণেসের কাছে পড়িতেছিল। ঘরে আর কেহ ছিল না। মিসেস রায় বলিলেন, এই যে ভবেশ এস। আজকাল তুমি এদিকে আসা ছেড়ে দিয়েছ। নিজের মামা-মামী পর হয়ে গেছে। তোমার সেই ডি. এস. পি-র ছেলে বন্ধুটিকে আর দেখি না। সে কোথায়?

ভবেশ—সে পড়াশোনায় ব্যস্ত আছে।

মি: রায়—তোমার বাবার চিঠি পড়েছ? হি ফুললি এগ্রিজ উইথ মি (আমার মত তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন করেন)। তোমার বিয়ে করে বিলেত যাওয়া উচিত। রিসেণ্টলি কয়েকটা কেসে দেখা গিয়েছে ব্রিলিয়াণ্ট সং ছেলে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আই ডোণ্ট ব্লেম দেম মাচ (আমি তাদের দোষ দিই না)। টেম্পটেশন ও অপারচুনিটিজ এত বেশী যে এ ইয়ংম্যান ইজ ইজিলি ক্যারেড অফ্ হিজ ফিট আনলেস দেয়ার ইজ সামথিং টু পুল হিম ব্যাক্ (পিছনের কোন আকর্ষণ না থাকলে ছোকরারা সহজে বিপথে যায়)। তাদের বিয়ে দিয়ে বিলেতে পাঠালে এ রকমটা হ'ত না। তুমি বাপের বড় ছেলে, হি হ্যাজ গ্রেট হোপস অব ইউ (তোমার সম্বন্ধে তিনি অনেক আশা রাখেন)। আমার মত এই যে নো রিস্ক শুড্ বি টেকন (কোন বিপদের ঝুঁকি নেওয়া উচিত নহে)।

মিসেস রায়—তোমার জন্য যে মেয়েটি আমরা দেখেছি তেমন মেয়ে আমাদের সমাজে পাওয়া যায় না। যেমন একমপ্লিসড তেমন দেখতে।

মি: রায়—কথা দেবার আগে তুমি যদি দেখতে চাও ইট মে বি এরেঞ্জড (সে বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।)

মিসেস রায়—ও রকম রং বাঙালীর ঘরে দেখতে পাবে না সহজে।

মি: রায়—সি ইজ ভেরি হাইলি কানেক্টেড (তার আত্মীয়-স্বজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের)

মিসেস রায়—মেয়েটির ভাই আই-সি-এস, বাপ বিহারের একটা বড় এষ্টেটের দেওয়ান, কাকা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, জ্যেঠা ষ্ট্যাটুটরি সিবিলিয়ান ছিলেন।

মি: রায়—সি স্পিকস ইংলিশ লাইক ন্যাচারাটিং। (মাতৃভাষার মত ইংরেজী বলে)

মিসেস রায়—বরাবর ইংরেজী স্কুলে পড়েছে। সবে বাংলা কথা বলতে শিখছে।

* মি: রায়—সি উড লাভ দি আইডিয়া অব একমপ্যানিং ইউ টু ইংল্যাণ্ড আফটার ম্যারেজ। আই ক্যান এরেঞ্জ দি ম্যাটার উইথ ইওর ফাদার। আই ডেয়ার সে হি ওণ্ট গ্রাজ দিস এক্সট্রা একপেন্স ফর ইওর সেক। (বিয়ের পরে তোমার সঙ্গে বিলেত যাওয়ার প্রস্তাবে খুশী হবে। তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলে এ বন্দোবস্ত করে দিতে পারি, তোমার জন্য এ বাড়তি খরচে তিনি আপত্তি করবেন না)।

মামা মামীর কথাবার্তার মধ্যে এতক্ষণ ভবেশ কোন কথা বলিবার অবকাশ পায় নাই। তাঁহারা একটু থামিতে সে বলিল, বাবাকে আমি লিখে দিয়েছি আমি বিলেত যাব না।

মি: ও মিসেস রায় আকাশ হইতে পড়িলেন। কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে। প্রথমে মি: রায় কথা বলিলেন। তাঁহার গলার স্বর তেমন মোলায়েম শুনাইল না। ভবেশের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, হোয়াট ইজ দি আইডিয়া? (তোমার মনের ভাব কি?) তোমার এই মত পরিবর্ত্তনের কারণ?

ভবেশ—পাস করলে আমি এখানে বি-এল ক্লাসে ভর্ত্তি হব।

মি: রায়—উকিল হবে? বাট ইওর ফাদার ওয়াণ্টস ইউ টু গো টু ইংল্যাণ্ড। (তোমার বাবা চান তুমি বিলেত যাও)।

তা হয়ত চান। তবে আমার ইচ্ছে না থাকলে তিনি জোর করবেন না লিখেছেন।

মিসেস রায়ের মুখে কথা আসিতেছিল না। তাঁহার এত দিনের প্ল্যানটি ভবেশ এক কথায় চূর্ণ করিয়া দিল। কিটির মত কালো মেয়েকে আই-সি-এস ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া কি সহজ কথা? মেয়েটার মনের গতিকও সুবিধার নয়। স্বদেশী লইয়া মাতিয়াছে। মাঝে মাঝে বলে মিস জাদলকে

ছাড়িয়ে দাও, ও আমাদের দেশের সম্বন্ধে অসম্মানের কথা বলে, স্বদেশী নিয়ে বিদ্রূপ করে। বলে, ইউ এপ আস ইন এভ্রিথিং (তোমরা আমাদের প্রত্যেক ব্যাপার নকল কর)। তোমাদের আবার 'সোয়াদেশী' কি? বাবুদের সোয়াদেশী একটা fraud (ধাপ্পা)—একটা মেকি জিনিস; রাগ করিয়া মাঝে কয়দিন গবর্ণেসের কাছে পড়িতে বসে নাই। আই-সি-এস-এর হাতে পড়িলে এই স্বদেশীয়ানা দুই দিনে ছুটিয়া যাইত। তিনিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতেন। সব গুছাইয়া আনিয়াছিলেন, ভবেশটা ঘাটে আসিয়া ভরাডুবি করিল।

মিসেস রায় ভাবিয়া পাইলেন না কেন ভবেশ বিলাত যাইবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত কাঁচিয়া দিল। বোধ হয় হষ্টেলে বাজে ছেলেদের সঙ্গে থাকিয়া তাহার নৈতিক ও মানসিক অধঃপতন হইয়াছে। স্বামীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, আমি গোড়াতে তোমাকে বলেছিলাম ভবেশকে হষ্টেলে বাজে ছেলেদের সঙ্গে থাকতে দিও না, এখানে রাখো। তখন কথাটা শুনলে না।

মিঃ রায় একটু চটিয়া বলিলেন, আমি কি জোর করে ধরে আনব? তোমাকে কি বলি নি ভবেশ হষ্টেলে থাকতে চায়?

শান্ত হইয়া মিঃ রায় ভবেশকে বলিলেন, ইওর ডিসিশন হ্যাজ বিন এ সারপ্রাইজ টু আস (তোমার সিদ্ধান্তে আমরা বিস্মিত হয়েছি), ধীর ভাবে কথাটা ভেবে দেখ। তোমার বাবাকে আমি চিঠি লিখছি।

মিঃ রায় অপেক্ষা না করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। মিসেস রায় ভবেশের সঙ্গে আর কথা বলিলেন না। সে নীচে নামিতে লাগিল।

বিলি লাফাইতে লাফাইতে উপরে উঠিতেছিল। ভবেশকে দেখিয়া সে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, তুমি কখন এলে ভবেশদা?

ভবেশ বিলির গালে হাত বুলাইয়া একটু আদর করিল, বলিল, হাউ ডু-ডু মাষ্টার বিলু? কিটি বুঝি এখনও পড়ছে?

বিলি—ওপরে চল না ভবেশদা। কিটি আর আমি একটা গান শিখেছি, শুনবে।

ভবেশ—আমি এই উপর থেকে আসছি। আজ কাজ আছে। কাল পরশু এসে তোমার গান শুনব। কিটিকে বলবে আমি এসেছিলাম।

বিলি তখনও ভবেশকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে। সে বলিল জান ভবেশদা কিটি আর মিস জাদলের কাছে পড়বে না। সেদিন দু'জনে দারুণ ঝগড়া। মিস জাদল নাকি বলেছিল গবর্ণমেণ্ট গুড গ্যাং বাবু এজিটেটরস। কিটি তেড়েমেড়ে বলেছিল—

কথা শেষ না করিয়া বিলি হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভবেশ—কি হ'ল তোমার বিলু? কিটি কি বলেছিল?

হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বিলি বলিল, কিটি কি বলেছিল জান ভবেশদা? কিটি মিস জাদলকে বলেছিল, হি হি—

ভবেশ—এত হাসি কেন বিলু? কিটি কি বলেছিল?

বিলি হাসিতে হাসিতে বলিল, হোয়াইট মানে জান ভবেশদা? হোয়াইট মানে সাদা। আর মঙ্কি মানে জান? জান না? মঙ্কি মানে বাঁদর। ভু'লে গিয়েছ ভবেশদা? ভু'লে যে লেজওয়ালা বাঁদর আছে সেই বাঁদর। কিটি বলেছিল, উই গ্যাং হোয়াইট মঙ্কিজ হি—হি—: গ্যাং মানে জান?

বিলির হাসি দেখিয়া ও ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ভবেশও হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে সে বলিল, গ্যাং নয় বিলু দি গ্রেট, কথাটা হ'ল হ্যাং, মানে ফাঁসি দেওয়া।

বিলি সোল্লাসে বলিল, ঠিক বলেছ, গ্যাং, হ্যাং, হ্যাং।

কিটি বলেছিল সাদা বাঁদরকে ফাঁসি দেব। মিস জাদল সাদা বাঁদর—হি, হি।

বিলির হাসির শব্দ মিসেস রায়ের কানে পৌঁছিয়াছিল। ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া গম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন—বিলি কি হচ্ছে ওখানে দাঁড়িয়ে? মাষ্টার আসে নি আজ?

বিলির হাসি বন্ধ হইল। সে বলিল, নো মমী, আজ ছুটি।

মিসেস রায়—তাই অসভ্যের মত চেঁচাচ্ছ? উঠে এস।

বিলি আস্তে ভবেশকে বলিল, তুমি ঠিক আসবে পরশু ভবেশদা?

ভবেশ—তুমি এখন ওপরে যাও বিলু, ইওর মমী ইজ ক্রস (তোমার মা রাগ করেছেন)।

ভবেশ নীচে নামিয়া পর্দার আড়াল হইতে উঁকি দিয়া দেখিল আলোচনা তখনও চলিতেছে। সে ঘরে ঢুকিবে কি না ভাবিতেছে, দেখিল, ডাঃ চক্রবর্ত্তী সিগার ধরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভবেশ আর ঘরে গেল না। দুই দিকে লনের মধ্যের পথ ধরিয়া সে ফটকের বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

একটু পরে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাঃ চক্রবর্ত্তী বাহিরে আসিলেন। ভবেশকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, হ্যালো ভবেশ, ইউ আর ওয়েটিং ফর সমবডি? (কারও জন্য অপেক্ষা করছ?)

ভবেশ হাসিয়া বলিল—যাঁর জন্য অপেক্ষা করছি তিনি আমার সামনে।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী উচ্চহাস্য করিলেন। বলিলেন—রাস্তায় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তোমাদের যোষ্ঠম কবিদের কি একটা মনে-পড়ছে-পড়ছে পড়েছে না কবিতা আছে এই ধরণের

অপেক্ষা করা সম্বন্ধে। বাট সিরিয়াসলি, হোয়াট ইজ আপ ? (বাস্তবিক, ব্যাপারটা কি ?) তোমার মামাবাবুর মুখের ভাব কেমন-কেমন মনে হ'ল, আর এদিকে তুমি অপেক্ষা করছ রাস্তায়। কি ব্যাপার বল দেখি ? চল হাঁটা যাক্।

দুই জন ল্যান্সডাউন রোডে পড়িয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন। ভবেশ বলিল, আই হ্যাভ ডান উইথ দ্যাট বিজনেস (ও ব্যাপার আমি শেষ করেছি, অর্থাৎ বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে)।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী—তার মানে কি ভবেশ ? আর ইউ গোইং অর নট ?

ভবেশ—নো।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করিলেন। বলিলেন—ইট টিকলস মি (কৌতূহল বাড়ছে)। চল দেখি আমার বাড়ীর দিকে। আই উড লাইক টু হিয়ার দি ফুল ষ্টোরি। (সমস্ত ব্যাপারটা শুনতে চাই)।

সেদিন হষ্টেলে ফিরিতে ভবেশের বেশ একটু রাত হইল। তাহার মুখ দেখিয়া দেবানন্দ অনুমান করিল একটা কোন বিরক্তিকর ব্যাপার হইয়াছে। তখনই সে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। খাওয়া শেষ হইবার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, ভবেশদা, আপনার বিলেত যাবার কথা ঠিক হ'ল ?

ভবেশ হাসিয়া বলিল, মা-বাবার কথা ঠিক হ'ল ; মিস বকসির কথা তোমাকে সেদিন বলেছি। মামা মামীর কথা, মিস বকসিকে বিয়ে করে বিলেত যেতে হবে। আমি স্পষ্ট জবাব দিয়েছি বিয়ে করে বিলাত যাওয়া আমার প্রিন্সিপলের বিরোধী, বিশেষ যখন আমি বাপের পয়সায় যাচ্ছি। এঁদের এই বিরক্তিকর জেদের একটা কারণ আছে জানতে পেরেছি। সেকথা পরে তোকে বলব। আমি স্থির করেছি বি-এ পরীক্ষার ফলটা বেরুলেই একটা যে-কোন কাজ নিয়ে আমি কলকাতা থেকে পালাব যদি এঁরা আমার বিরুদ্ধে এই আন-হোলি ক্রুসেড চালাতে থাকেন। না হয় এক বেটা ফিরিঙ্গীকে ঠেঙিয়ে দেব। দয়ালু কিংসফোর্ড আছেন, ছয় মাসের জন্য শ্বশুরালয়ে পাঠাবেন এক কথায়। সেদিন ভবানীপুরের ট্রামে জনতিনেক ফিরিঙ্গী ছোকরার সঙ্গে লেগে গিয়েছিল প্রায়। বেটারা এই লাইনের ট্রামে নিরীহ আপিসের বাবুদের ওপর বেশ জুলুম করে। একে ধাক্কা দেয়, ওর পা মাড়িয়ে দেয়, তাকে "ব্লাডি নেটিভ" বলে গালাগালি করে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, লোক উঠতে দেবে না। অনেক দিন ধরে এই কাণ্ড করছে এরা। সম্প্রতি এটা নিয়ে বাঙালী ছেলেদের খুব খানিকটা গালাগালি করবার পর থেকে তিন চার বার মারামারি হয়েছে। ফলে এই ন্যুইসান্স একটু কমেছে। (ক্রমশঃ)

বাংলার প্রতি রাজপুতানা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

আমি মরু
তৃষ্ণার্ত্ত উত্তপ্ত রুক্ষ ; মোর বক্ষে তরু
তৃণ গুল্ম শ্যামলের ক্ষীণ স্নিগ্ধ রেখা
ঊর্দ্ধমুখ ঘূর্ণিমাঝে নাহি যায় দেখা,
নাচাইয়া মায়ামরীচিকা
নির্বাপিত আলোকের দগ্ধপ্রায় শিখা
টেনে আনি নিতি নিষ্করুণ
প্রভাতের আশার অরুণ-
রেখা হেথা গোধূলি ধূসর
উদাস উষর
সায়াহ্নের উদার পূরবী
হেথা আঁকে শুধু বন্ধ্যা বালুকার ছবি
বাঁচে শুধু কণ্টকিত ঝোপ
নিরাশার নিষ্ঠুর প্রকোপ।

তবু তুমি একদিন, দূর পূর্ব মেদুর শ্যামল,
পেয়েছিলে মোর মাঝে বীর্য্য ঝলমল
মরুপ্রান্তে অঙ্কুরিত বাঁচিবার অনন্ত প্রয়াস
অমৃতের গৌরব নিঃশ্বাস,
ছন্নছাড়া তৃষিত সাহারা
মাঝে কান্ত দেশপ্রেমধারা,
বক্ষে লৌহ আর চক্ষে সোনার স্বপন
চারণের নিত্য কাব্য কুসুমবপন
চির-মর্ম্মরিত প্রাণ। আমারে ত তুমিই জাগালে
গিরিগাত্রে মরুপ্রান্তে সুপ্ত মহাকালে।
দিলে নব পরিচয়
বিস্ময়ে অক্ষয় ;
তাই তুমি বাঁচ ওগো, বাঁচ লয়ে তব তৃণ তরু,
তব প্রাণে প্রাণ পাব, আমি, আমি প্রাণহীন মরু।

শিক্ষা-নীতি ও জনগণ

শ্রীনীলরতন দাশ

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে এবং সেই মুষ্টিমেয়ের জন্যও শিক্ষা অপরিহার্য্য ছিল না। জনৈক শিক্ষাবিদের ভাষায় "রাজা বাদশার পক্ষে শিক্ষা ছিল মার্জ্জিত বিলাস, উজির-নাজির প্রভৃতি রাষ্ট্রচালকদের পক্ষে ছিল ক্ষমতা হাতে রাখিবার যন্ত্র, পাদ্রী-পুরোহিতের পক্ষে ছিল মোক্ষলাভের সহায়ক। আর দেশের অগণিত জনগণ হাজার হাজার বৎসর অশিক্ষা ও অজ্ঞতার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়া, নিজেরা অনশনে অর্দ্ধাশনে জীবনযাপন করিয়া dumb driven cattle-এর মত উচ্চসমাজের ভৃত্যরূপে আজ্ঞাবহ বিলাস-উপকরণ জোগাইত মাত্র।"

প্রাচীন যুগে শিক্ষার সমস্যাও খুব জটিল ছিল না; কারণ তখনকার দিনে জীবনযাত্রা ছিল সহজ ও সরল। তখন মানুষের মনোজগতের বিস্তার-সাধন করাই ছিল শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষকও সাধারণতঃ নিজের ইচ্ছামত এবং স্বীয় আদর্শ অনুসারে শিক্ষার ক্ষেত্র এবং বিষয় নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে জগতের রাষ্ট্র-নৈতিক মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তন ও নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। অধুনা রাষ্ট্র-নায়কগণ রাষ্ট্র-পরিচালনা, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্বের জন্য জনগণের অনুকূল মত গঠন করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে শিক্ষার লক্ষ্য এবং নীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইউরোপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টই সর্ব্বপ্রথমে 'এডুকেশন কোড' রচনা করিয়া শিক্ষাকে রাষ্ট্রের অঙ্গস্বরূপ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। জার্ম্মানগণ ১৮৭০ সালে আল্‌সাস্ লোরেইন জয় করিবার পর ফরাসী চিন্তাধারাকে পঙ্গু করিবার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনমত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে। পোলাণ্ড বিজয়ের পর রাশিয়া কর্ত্তৃক পোলাণ্ডের শিক্ষাবিধি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করা হয়। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন একদা সাম্রাজ্যবাদী-সুলভ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা বিদ্যালয় স্থাপন করছি সত্যিকার লোকশিক্ষার জন্যে নয়, শুধু জগৎকে জানাব যে আমরা প্রজাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করছি। প্রজাবর্গ যে শিক্ষা দাবি করে, সেই শিক্ষা যদি আমরা জনগণকে দিই, তবে আমাদের রাষ্ট্রের ভিৎ ধ্বসে পড়বে।" বস্তুতঃ, সাম্রাজ্যবাদিগণের নিয়ত আশঙ্কা এই যে, জনসাধারণ যদি প্রকৃত শিক্ষা-লাভে সত্যকার মানুষ হইয়া উঠে তবে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি শিথিল হইয়া যাইবে। টলষ্টয় রাশিয়ার তদানীন্তন শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে কঠোর মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান যুগে অল্প-বিস্তর সকল দেশের শিক্ষাবিধি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তিনি বলিয়াছিলেন,

"The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment. It is time we realised that fact. And it is most undesirable to let the Government, while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightenment of the people. It is doing this now by means of all sorts of pseudo-educational establishment which it controls, schools, high schools, universities, academies and all kinds of committees and congresses."

বহুদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাম্রাজ্যবাদ এখনও সকল দেশে ছদ্মবেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। কবি ইকবাল সত্যই বলিয়াছেন:

"The tyranny of imperialism struts abroad in the masks of Democracy, Nationalism, Communism and Fascism. Under these masks, in every corner of the earth, the spirit of freedom and the dignity of man are being trampled under foot."

বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুগে অনেক ক্ষেত্রে মনোবিস্তার অপেক্ষা মনোবিকারের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা-নীতি নির্দ্ধারিত এবং শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে সকল দেশ একনায়কত্বপ্রধান, সে সমস্ত দেশে রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়ার শিক্ষাই দেওয়া হইয়া থাকে। স্বাধীনভাবে মনোবৃত্তিবিকাশের চেষ্টা প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন জার্ম্মানী, জাপান ও ইটালীতে করা হয় নাই; ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে বিনা দ্বিধায় তরুণেরা যেন রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ অনুসারে যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে। এই সকল রাষ্ট্রে একটা বিশিষ্ট মতবাদের পরিপোষক ভ্রান্ত ও বিকৃত শিক্ষা-নীতির সাহায্যে সমগ্র জাতিকে বিদ্বেষ-প্রসূত আক্রমণাত্মক মনোভাবাপন্ন করিয়া তোলা হইয়াছিল। এবম্প্রকার শিক্ষাব্যবস্থায় সমস্ত জাতির স্বাধীন চিন্তাশক্তি যেন লোপ পাইয়াছিল এবং নেতা বা নায়ক অথবা দলবিশেষের উপর দেশের ইষ্টানিষ্ট বিচারের ভার দিয়া সমগ্র জাতিটাই যেন মোহাচ্ছন্নের মত

তাহাদের অনুসরণ করিয়াই তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু একটা বিশিষ্ট মতবাদকে অন্ধের মত প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা প্রকৃত জীবনধর্ম্মের বিপরীত লক্ষণ। ইহার শোচনীয় পরিণামের কথা আজ সর্ব্বজনবিদিত। রাশিয়ার ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন,

"অপরিসীম উৎসাহে রাশিয়া নিরক্ষরতা ও অস্বাস্থ্য দূর করে এই বিরাট মহাদেশ থেকে অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য মুছে দিয়েছে।...আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা ছিল মূক, তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়েছিল আজ তারা সমাজের অন্ধকুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী।"

অবশ্য, জার-শাসিত রাশিয়া ছিল একটি বিশাল কারাগারস্বরূপ, লেনিনের কথায়—'A prisonhouse of nationalities'। শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার এবং উন্নয়নের জন্য জার সরকার কোনই চেষ্টা করিতেন না। পক্ষান্তরে, জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত রাখার প্রয়াসের বিরাম ছিল না। লেনিন বলিয়াছিলেন, "রাশিয়া গবর্ণমেণ্টের ন্যায় রাশিয়ার জনসাধারণের শিক্ষালাভের বিরুদ্ধে এত বড় শত্রু আর একটিও নেই।" সোভিয়েট রাশিয়ায় লেনিনের আমলে স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইত বটে, কিন্তু ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ষ্টালিনের নির্দ্দেশে উক্ত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেকে বলেন যে, তথাকার বর্ত্তমান শিক্ষাবিধি একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালা,—রাষ্ট্রানুগত্যের ভাবধারার ভিতর দিয়া শিক্ষার্থীরা যাহাতে বর্দ্ধিত হইতে পারে সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন সেই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে।

মানুষকে তাহার প্রকৃতি অনুসারে বিকশিত করিয়া তোলাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিক্ষাব্যাপারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিলে শিক্ষারও যেমন অবনতি ঘটে, রাষ্ট্রেরও তেমনি ক্ষতি হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত—

"শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি আর কোনও অবান্তর উদ্দেশ্য ভিতরে ভিতরে থাকিয়া যায়, তবে তাহাতে বিকার জন্মায়। আইরিশকে স্যাক্সন্ করিবার চেষ্টায় তাহার শিক্ষাকেই মাটি করা হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ আজকাল আমাদের শিক্ষার মধ্যে পোলিটিক্যাল মতলবকে সাঁধ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বুঝা কঠিন নহে। সেইজন্য তাঁহারা শিক্ষা ব্যাপারে দেশীয় লোকের স্বাধীনতা নানা দিক দিয়া খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইয়াছেন।"

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—

"নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতর মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। আমরা স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই জন্যই শিক্ষার আদর্শ লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে স্বদেশভক্তদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এদেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তি পত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।"

ইংরেজ আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই—একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষের চিন্তাধারাকে ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির অনুকূল পথে চালিত করিবার জন্য শিক্ষাবিভাগের কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট মিঃ সামনার ওয়েলস্ ইংরেজদের এই শিক্ষা-নীতির আসল উদ্দেশ্য ও পরিণাম সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন :

"Higher education of a purely literary character was given to a certain class of people to provide English-knowing clerks and assistants for their masters though nobody doubts that it has produced results undreamt of in the philosophy of those who wanted only quill-drivers."

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"কোচিন-চায়নার শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে শুনেছি কোনও ফরাসী পাণ্ডিত্য-ব্যবসায়ী বলেছেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ দেশী লোককে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে ভুল করেছেন ফ্রান্স যেন সে ভুল না করেন। একথা মানতে হবে যে, ইংরেজের চরিত্রে এমন একটা মহত্ত্ব আছে যে জন্যে বিদেশী শাসননীতিতে তাঁরা কিছু কিছু ভুল করে বসেন, শাসনের ঠাসবুনানিতে কিছু কিছু খেই হারায়, নইলে আমাদের মুখ ফুটতে আরও এক-আধ শতাব্দী দেরী হ'ত।"

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে এদেশের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা প্রতীচ্য-ভাবস্রোতে গা ভাসাইয়া দিল, আর জনগণ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া প্রগতিশীল শিক্ষিত-সমাজ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িল। "ভারতের মুষ্টিমেয়

শিক্ষিত সম্প্রদায় গর্ব্বভরে আপনাদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়া চলিল—মানবত্ব কত বিকৃত শিক্ষার অন্তরালে গুমরিয়া মরিতে লাগিল।" বাস্তবিক একই যুগে একই দেশে শিক্ষাগত ব্যবধানই ভারতে জাতীয় শিক্ষাকে এত দিন পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষাকে মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত করিয়া রাখিলে দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। দেশের বৃহত্তম অংশ জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া রাখিলে শিক্ষা যেমন প্রাণহীন হইয়া পড়ে, অপর দিকে জনগণ শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত হইয়া অন্ধকারে ডুবিতে থাকে। ফলে দেশের অগ্রগতি হয় ব্যাহত। সুবিখ্যাত Filtration theory দ্বারা ইংরেজ এদেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার যে আশা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ শিক্ষাবিদের অভিমতের মর্ম্ম এই :

"হিমালয়ের শীর্ষ হইতে বিদ্যাধারা বিন্দু বিন্দু করিয়া নীচে পতিত হইয়া তৃষিত মরুভূমিকে সিক্ত করিতে থাকিবে, এবং এই অভিসিঞ্চিত মরুভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে মানামুখী স্রোতধারা। এই স্রোতধারায় অবগাহন করিয়া জনগণ হৃষ্ট, পুষ্ট ও পুলকিত হইবে।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে স্রোতধারা গঠিত হইতে পারিল না। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারা বিদ্যারস বিন্দু বিন্দু পান করিয়া হইয়া উঠিলেন মসীজীবী, ভুলিতে বসিলেন নিজেদের সংস্কৃতি, শ্রদ্ধা করিতে শিখিলেন নগরের বিলাস ও আরামদায়িনী সভ্যতাকে। যাহাদের জন্য এই ভাগ্যবান্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, তাহাদিগকেই ইঁহারা ঘৃণা করিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেল-কামরার দীপের মত। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ী চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়ীটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনার পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।...সেই জন্যে ইংরেজী শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন, তাঁদের মনের মিল হয় না সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড় জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।"

দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে, এবং স্বাধীনতার চরম উদ্দেশ্য হইতেছে দেশে এক সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন। কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি হইল শিক্ষিত জনসাধারণ। নিরক্ষর বা অশিক্ষিত লোকের আধিক্য থাকিলে কখনই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এরূপ তন্ত্রে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ধনী ও শক্তিশালী ব্যক্তি দেশের সমস্ত রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন; সেরূপ ব্যবস্থা অধিকাংশ লোকের উন্নতি বিধায়ক বা কল্যাণপ্রসূ হয় না, উহা ডিক্টেটরী শাসন বা স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর। এই অজ্ঞতার অচলায়তন সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে এক বিরাট অন্তরায়। দেশের বিশাল জনসমষ্টি যদি অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া যায়, তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং মানবজীবনের জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের দ্বারা দেশের জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য। এই শিক্ষাপদ্ধতি এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে সমাজের সর্ব্বস্তরের লোক সমভাবে উপকৃত হইতে পারে। জনৈক শিক্ষাবিদ্ বলেন, "স্বাধীন গণতন্ত্রের যুগে মানবের সমান অধিকার এবং মানবত্বের দাবি আজ সমাজদেহকে বিশেষ ভাবে আন্দোলিত করিয়া শিক্ষাজগতেও বিপুল তরঙ্গ তুলিয়াছে। ফলে অতীতের সেই শ্রেণীশিক্ষার আয়োজন আজ ধ্বসিয়া পড়িতেছে এবং তৎপরিবর্ত্তে দেখা দিতেছে সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বপ্রকারের মানুষের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন।" কিন্তু ঠিক পথে সুপরিচালিত না হইলে এই সার্ব্বজনীন শিক্ষাও বিকৃত হইয়া জাতিকে বিভ্রান্ত করিয়া সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যায়। সুতরাং যাঁহারা গণশিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করিবেন, তাঁহাদের লক্ষ্য হইবে কি উপায়ে শিক্ষাকে বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়া মানবগঠনের ও সমাজকল্যাণের পথে পরিচালিত করা যায়। এ সম্পর্কে স্যর রিচার্ড লিভিংষ্টোনের মন্তব্য স্মরণীয় :

"What is most important is to get the people mentally and emotionally roused. They must learn to hear, to see, to think and to use their own powers."

জাতিকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী চাহিয়াছিলেন "শিক্ষামে অহিংসকক্রান্তি," অর্থাৎ শিক্ষায় অহিংস বিপ্লব। তাঁহার পরিকল্পিত ওয়ার্দ্ধা-পদ্ধতি শিক্ষাজগতে যুগান্তকারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সহযোগিতা ও ফলপ্রসূ কর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতির বুনিয়াদ গঠিত। ভারতের সুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় গ্রামগুলিকে সর্ব্বপ্রকারের দুর্নীতি এবং কুসংস্কারের হাত হইতে মুক্ত করিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রচার ও প্রসার করিতে না পারিলে প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয় এবং স্বরাজ বা স্বাধীনতা নিরর্থক একথা মহাত্মাজী মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ভারতের গ্রামগুলিই ভারতের হৃৎপিণ্ড; অতএব গ্রাম-উন্নয়ন ব্যতীত দেশের উন্নতি অসম্ভব। তিনি

আরও বুঝিয়াছিলেন যে, অর্থের অভাব বশতঃ গ্রামবাসিগণ শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে চায় না। যাহারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে না, তাহাদের মনে কখনও শিক্ষালাভের অনুপ্রেরণা জাগা সম্ভব নয়। তাই গান্ধীজী মনে করিতেন যে, দরিদ্র পল্লী-বাসীদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিই দেশের পক্ষে একান্ত উপযোগী। বস্তুতঃ তাঁহার শিক্ষাপরিকল্পনা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিতে চাহিয়াছেন এবং গ্রামাঞ্চলকেই দেশের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র-রূপে গঠন করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, "আমাদের দেশের গ্রামগুলি শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্‌বৃত্তভোজী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক আমি এই কামনা করি।"

স্বাধীনতার মত শিক্ষাও মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষকে সেই অধিকার দিতে কার্পণ্য বা বিলম্ব করিলে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করাই হইবে। তাই আজ প্রজা-তন্ত্রী ভারতে নব নব শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। স্বাধীন ভারতের জননায়কগণ সেই সকল শিক্ষা-পরিকল্পনায় যেন কোন রকম মারাত্মক ভুল না করেন, দেশবাসিগণ একান্তভাবে সেই কামনা করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"এদেশের শিক্ষা-ইমারতের সিঁড়ির লম্বা গোড়া থেকেই আমাদের রাজমিস্ত্রীর প্ল্যানে ওঠে নি। নীচের তলাটা উপরের তলাকে নিঃস্বার্থ ধৈর্য্যে শিরোধার্য্য করে নিয়েছে; আর তার ভার বহন করেছে, কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করে নি; দাম জুগিয়েছে, মাল আদায় করে নি।"

যাঁহারা জনশিক্ষা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন এবং যাঁহাদের উপর গণশিক্ষা প্রসারের উপায় নির্দ্ধারণের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহাদের পক্ষে বিবেকানন্দের অমর উক্তি স্মরণীয় এবং অনুসরণীয়:

"ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতন জীবনযাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা। আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি আর দু'পা দিয়ে দলেছি। যদি কতকগুলো নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, ম্যাপ, ক্যামেরা, গ্লোব ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করে, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে।...এদেশে আগে 'প্রাউণ্ড' তৈয়ারী করতে হবে, তবে বীজ ফেললে গাছ হবে।"

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে "পাড়াগাঁয়ের কথা" শীর্ষক আমার একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল; উক্ত প্রবন্ধে প্রধানতঃ আমার নিজের এলাকার কথাই অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। অনেকে এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার নিকট পত্র লিখিয়াছেন; সকলের পত্রের সারাংশ মোটামুটি একই রকমের, অর্থাৎ সকল পল্লী অঞ্চলের অবস্থা উক্ত প্রবন্ধে লিখিত অবস্থার অনুরূপ। দুই একটি নূতন সংবাদও পাইয়াছি। হুগলী জেলার জনাইয়ের জমিদার শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"পশ্চিম বাংলা সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ফসল রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই, বাঁদর, হনুমান প্রভৃতির উৎপাতে হাওড়া ও হুগলী জেলার লোকেদের ক্ষেতের ফসল, বাগানের ফল, ঘরের চাল ইত্যাদির কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে এ সম্বন্ধে তাঁহারা কোন খোঁজ রাখেন কি? সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন বাঁদরের উৎপাত নিবারণ করিবার তাঁহাদের কোন ব্যবস্থা নাই; স্থানীয় লোকেরা যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন—তাঁহাদের চিঠিখানির নকল এই—

Sri Bhutnath Mukherjee.
Zemindar, Janai,
P.S. Chanditola (Hooghly)

Dear Sir,

I beg to inform you that there is no monkey-killing squad for the district of Hooghly. In these circumstances you are requested to adopt other local suitable arrangements for coping with the problem.

Yours faithfully,
S. C. Ray,
Deputy Director of Agriculture,
E. Range.

শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—"কৃষিবিভাগের নিকট হইতে হালের ভাল গরু চাহিলে উচ্চ-

পরন্তু কর্মচারিগণ সরকারী গো-প্রজনন কেন্দ্রের কথা বলেন এবং কত বৎসর পর ভাল গরু পাওয়া যাইবে তাহার হিসাব দেন।...তিনি আরও বলেন জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্য সরকার মাঝে মাঝে আবেদন করেন কিন্তু জনসাধারণের নিবেদন তাঁহারা মোটেই গ্রাহ্য করেন না।"

শুনিতে পাই পল্লী অঞ্চলে প্রায় সকল বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারী আছেন, কিন্তু তাঁহারা কোথায় থাকেন, কি করেন, কি ভাবে পল্লীবাসিগণের উপকার করিতেছেন তাহা জনসাধারণ জানে না; সরকারী এমন বহু পরিকল্পনা আছে যাহা কার্য্যকরী করিতে পারিলে নানা দিকেই পল্লীর জনসাধারণ উপকৃত হয়; কিন্তু উপযুক্ত প্রচারকার্য্যের অভাবে সেই সকল পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনসাধারণের কোন জ্ঞান নাই। আবার দুই-এক জন যদি কোন পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন ত কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাদের হয়রাণির সীমা থাকে না; শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন ফল পান না; অথচ ইহার জন্য তাঁহাদের যথেষ্ট সময় ও অর্থ নষ্ট হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে একটি উদাহরণ দিতেছি। আমার একটি অতি পুরাতন পুকুর আছে। পুকুরটির আয়তন প্রায় চারি বিঘা; চতুর্দ্দিকের পাড়ের আয়তন প্রায় ১২ বিঘা। আশৈশব পুকুরটিকে হাজা মজা অবস্থায় দেখিতেছি; পঙ্ক, শালুক এবং নানাবিধ জলজ উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে উহাতে জন্মায়, পাড়টিও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। শুনিতে পাইলাম এইরূপ পুকুর সংস্কারের জন্য সরকারের একটি পরিকল্পনা আছে; এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে, নানাবিধ সর্ত্তে পুকুর-সংস্কারের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ঋণ পাওয়া যায়; অতি কষ্টে এই পরিকল্পনার একটি নকল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম; তাহার পরের পালা হইল—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুকুর পরিদর্শন ও মন্তব্য পেশ। ইহা করাইতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে ১৯৫০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার মৎস্য-কর্ম্মচারী (District Fishery Officer) পুকুরটি পরিদর্শন করেন এবং তাঁহার মন্তব্য উপরিওয়ালার নিকট পেশ করেন। পেশ করিবার তারিখ ছিল—১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ইহার পর আমাকে বহু নির্দ্দেশ পালন করিতে হয়; বহু চিঠিপত্র লিখিতে হয়; হুগলী জেলার সরকারী উকীল মহাশয়ের নিকট পুকুরের দলিলপত্র পাঠাইতে হয়। আমাকে জানান হয় যে, হুগলী জেলার সরকারী উকীল মহাশয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজখবর লইয়া যদি বলেন যে, পুকুর আমার নিজস্ব, দলিলপত্রাদিতে কোন গোলমাল নাই, এবং পুকুর বন্ধক নাই, তবেই আমাকে অন্যান্য সর্ত্ত অনুযায়ী সরকারী ঋণ দেওয়া হইবে। সরকারী উকীল মহাশয় দলিলাদিতে কোন গোলমাল দেখিতে পান নাই, এবং পুকুর আমার নিজস্ব, উহা বন্ধক নাই—এই মন্তব্য করেন। তিনি খোঁজখবর করিয়া এই মন্তব্য দিবার জন্য দীর্ঘ সময় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে ১৬৲ টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে দিতে হইয়াছিল। ইহার পর আমার দলিলপত্রাদি লিগ্যাল রিমেমব্রেন্সারের নিকট পাঠাইতে হইয়াছিল। তিনিও সরকারী উকীল মহাশয়ের মন্তব্য সমর্থন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে হুগলী জেলার মৎস্য-কর্ম্মচারী মহাশয় নির্দ্ধারিত ফর্ম্মে সরকারী ঋণের জন্য আবেদন করিতে বারবার তাগিদ দিতে লাগিলেন। ফর্ম্ম পূরণ করা এতই জটিল ছিল যে, আমি এই বিষয়ে তাঁহাদের উপদেশ ও সাহায্য চাহিয়াছিলাম। ১৯৫১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর 'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ ফিশারিজ' আমাকে লেখেন—

I have taken up your case with interest. The District Fishery Officer, Hooghly, is to assist you in drawing up the scheme and he has been intimated to contact you immediately in this connection. Before he meets you, I will give him necessary instructions to expedite the matter without the least possible delay.

এইরূপ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে কাহার না আনন্দ হয়, এবং সরকারী কর্ম্মচারীগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা বর্দ্ধিত না হয়? আমি তৎক্ষণাৎ আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম।

ইহার পর ১৯৫২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে হুগলী জেলার মৎস্য-কর্ম্মচারী আমাকে যাহা লেখেন তাহার নকল এই—

"As it has been decided to discontinue the scheme for the improvement of tank fisheries in the dry districts of West Bengal and the fund alloted to this office under this scheme for the current financial year has been totally exhausted, I regret to inform your loan application for pisciculture is hereby treated as cancelled.

Thanking you for the trouble you have undertaken."

দেড় বৎসর ব্যাপী চেষ্টা, পত্রাদি লেখালেখির পর আমাকে জানান হইল, "পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছে, আপনার ঋণের আবেদন 'ক্যানসেল' (বাতিল) করা হইল।" চিঠি লেখালেখিতে যে খরচ হইয়াছে তাহা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, যে সময় নষ্ট হইয়াছে তাহাও ধরিলাম না, কিন্তু সরকারী উকীল মহাশয়কে যে ১৬৲ টাকা দিতে হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী কে? সরকারের এইরূপ অব্যবস্থার কথা পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণ শুনিলে কি সরকারী পরিকল্পনার উপর তাঁহারা কোন আস্থা রাখিতে পারিবেন? বিভিন্ন বিভাগের এইরূপ অব্যবস্থার অনেক উদাহরণ দিতে পারি।

চশমা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

অশোককে আজ অত্যন্ত চিন্তিত মনে হ'ল। কিন্তু নীলিমা সংবাদটা কিছুতেই সত্য বলে মেনে নিতে পারে নি। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়ে সে অশোককে বললে, আমার মন বলছে, এ কখনও হতে পারে না—নিশ্চয়ই কোথাও কোন গোলমাল বেঁধেছে।

অশোক বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে চোখ তুলে তাকাতেই সে পুনশ্চ বললে, যার পিতৃমাতৃকুলে আজ পর্য্যন্ত কেউ চশমা ব্যবহার করেন নি তাঁদেরই বংশের ছেলের এত অল্প বয়েসে···

স্ত্রীকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিলে অশোক। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, তুমি চুপ কর নীলিমা—

'চুপ করব কিসের জন্ত ?' তার কণ্ঠে বিস্ময়,'কথাটা মিথ্যে বলেছি নাকি ? তোমার বাবা পঁচাত্তর বছর বয়েসেও চশমা ছাড়া লেখাপড়া করে গেছেন—আমার বাবা আজও···'

অশোক অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। যত সব অপ্রাসঙ্গিক কথা··· তা ছাড়া তোমার কথা অস্বীকার করছে কে ?

নীলিমা বলে, বার বার বাধা দিচ্ছ···তবুও বলবে অস্বীকার করছ না ?

অশোক জবাব দেয়, তুলনাটা ঠিক হয় নি বলেই বাধা দিয়েছি। সেকাল আর একালের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ···এই মোদ্দা কথাটাই আমি তোমায় বলতে চাইছি।

নীলিমা বললে, ঠিক বুঝলাম না···

অশোক বললে, বলতে পার নীলিমা আজকের দিনে দেহ-পুষ্টির জন্তে আমাদের ছেলেরা কতটুকু পাচ্ছে ? পয়সা দিয়ে জিনিষ মেলে না। খাঁটির নামে ভেজালকেই হাসিমুখে মাথায় তুলে নিতে হচ্ছে। না নিয়ে উপায় নেই। ওরা উঠেছে জাতে, আর খাঁটি হয়েছে জাতিচ্যুত। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। উপরন্তু মন খারাপ হয়ে যায়। তাই বলছিলাম যে, বাসুর ব্যাপারটাকে পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিয়ে আমাদের অবজ্ঞা করা উচিত হবে না।

নীলিমা রাগ করে জবাব দিলে, তোমার ছেলে আমার ত আর কেউ নয় তাই তোমায় চুপ করে থাকতে বলছি! কথা শুনলেও গা জ্বলে যায়।—সে আর একমুহূর্ত দাঁড়াল না; দ্রুত প্রস্থান করলে।

নীলিমা চলে যেতেই অশোক অন্তমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগল। নীলিমার ভাল লাগে নি তার কথা। না লাগবারই কথা। আজীবন সহরে লালিত পালিত সে—কতটুকু সে জানে পূর্ব্বপুরুষদের জীবনধারার কথা। শুধু কানে শুনেছে—চোখে দেখেনি—ভেবেও দেখেনি! কিন্তু অশোকের আছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা! তাই আজ আর কোনকিছুতেই সে আশ্চর্য্য হয় না বরং বিস্মিত হয় এই ভেবে যে, আজও তারা বেঁচে আছে কেমন করে!

স্ত্রী রাগ করে চলে গেলেন। তাকে দোষ দেওয়া চলে না। অভাব আর অনটনের পাকে পাকে তারা এমনি জড়িয়ে পড়েছে যে, মন অতিরিক্ত হিসেবী হয়ে উঠেছে। কোনকিছুকেই সহজ ভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। ভয় হয় যে, অনটনের ফাঁসটা হয় ত আরও দৃঢ়ভাবে গলায় চেপে বসে যাবে। কথাটা অশোক সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করে এবং কতকটা যেন বিহ্বল হয়েও পড়ে। কিন্তু নীলিমার মত পূর্ব্বপুরুষের নজির দেখিয়ে নিজের মনকে চোখ ঠারতে পারে না।

অশোক অন্তমনস্ক হয়ে পড়ে। তার মনে অতীত স্মৃতির রোমন্থন চলতে থাকে। কোথায় ছিল তখন স্ত্রী আর কোথায় ছিল তার পুত্র। তার স্পষ্ট মনে আছে তখনকার দিনগুলোর কথা। প্রথম মহাযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। যুদ্ধের যে সামান্যতম পরোক্ষ প্রভাব এখানে এসে পৌঁছেছিল তারই আঘাতে অশোকের বাপঠাকুর্দার অভ্যস্ত জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছিল। তাঁরা চমকে উঠেছিলেন—আর্ত্তনাদ করে উঠেছিলেন, বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন দিন চলবে কেমন করে এই কথা ভেবে। অথচ আজকের সঙ্গে সেদিনের কোন দিক দিয়েই তুলনা করা চলে না। তবুও তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে। অশোক সহসা আপন মনে হেসে উঠল। এই সহজ কথাটা তার বোঝা উচিত ছিল এতক্ষণ। ভবিষ্যৎ···তাদের আবার ভবিষ্যৎ কোথায় ? যেদিকে চোখ ফেরানো যায় সবই অন্ধকার···কিন্তু তবুও মানুষকে ভাবতে হয়—অশোকও তার হাত থেকে রেহাই পায় না। পুনরায় সে তার অতীতের মধ্যে ডুবে যায়। তার বাবা তার ঠাকুর্দাদা এসে সব চিন্তার মধ্যে আসন পেতে বসেন।···অশোক যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তাঁদের ব্যাকুলতা···অথচ সেদিনের দুর্মূল্যতা আজকের তুলনায় ধর্ত্তব্যই নয়। কাপড়ের জোড়া পাঁচ টাকা শুনে তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু অশোক ভাবছে আজকার দিনে কোনকিছুতে বিস্মিত হওয়াই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। তাই বলে অতীতের কথা চিন্তা করে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে থাকা চলে না। অশোকের চিন্তাধারায় বাধা পড়ল—বাসুর উপস্থিতিতে।···অত্যন্ত সঙ্গোপনে একটি নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে অশোক বাসুকে কাছে ডাকলে। তার পিঠে মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে অশোক তাকে নানা প্রশ্ন করে। বাসু কোন জবাব দিতে পারে না। কেবল একপ্রকার অপরাধীর মত মুখ করে নীরবে চেয়ে থাকে। চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। মনটা তার

হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে ওঠে পাশের বাড়ীর গোপার দাদার উপর।...নইলে...

পুত্রের বিমর্ষ মুখের পানে খানিক নিঃশব্দে চেয়ে থাকে অশোক। সে দৃষ্টির কাছে বাসু এতটুকু হয়ে যায়। সে মাথা নীচু করে।

অশোক মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, চোখে কি বড্ড ঝাপসা দেখিস বাসু?

সহসা বাসু কেঁদে ফেলে—মাথা খেয়ে আমার, মা...সে আর দাঁড়ায় না। কতকটা পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে সরে পড়ল। কিন্তু অশোকের তখন কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। ছেলের বিমর্ষ মুখ, চোখের জল তার সারা মন আচ্ছন্ন করে আছে। অশোক ভাবছিল যে, নীলিমা যাই বলুক না কেন সে কোন ক্রমেই নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারে না। অবিলম্বে একটা কিছু ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে।

পরদিন আপিস-ফেরত অশোককে তার বাল্যবন্ধু রাজেনের শরণাপন্ন হতে দেখা গেল। রাজেনের ভগ্নীপতি খ্যাতিমান চোখের ডাক্তার। অতীতের সখ্যকে জাগিয়ে দিয়ে সে তার নিজের কথা তুলে আর দশটা সাংসারিক সুখ-দুঃখের প্রসঙ্গে। একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে সে বললে, আমার এ উপকারটুকু তোমাকে করতেই হবে রাজেন। না না, একেবারে খালি হাতে তাঁর কাছে আমি যেতে চাই না—সাধ্যমত দেব বৈকি। বাসু আমার একমাত্র সন্তান—তা ছাড়া ডাক্তারিটা তোমার ভগ্নীপতির পেশা একথা ভুলে গেলে চলবে কেন!

রাজেন মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

অশোক বলে, তুমি হাসছ কেন রাজেন?

রাজেন বলে, আমায় ভগ্নীপতিও ঠিক এই কথাই বলেন। আর একতে বাজারে তার বদনামও আছে। তিনি তাঁর আত্মীয়বন্ধুকেও খাতির করেন না। বলেন, ডাক্তারিটা তাঁর ব্যবসা এবং কোন বুদ্ধিমান লোকেই ব্যবসায়ে লোকসান হতে দিতে পারে না।

অশোক বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এতটা সে আশা করে নি। সুতরাং নিরাশ হয়েই তাকে ফিরে আসতে হয়। প্রয়োজনের তুলনায় সঙ্গতি কম। মনটা দমে যায়। নিজেকে দেয় ধিক্কার।

বাড়ী ফিরতে নীলিমা হাসি-মুখে কাছে এসে দাঁড়াল। স্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু ব্যবস্থা হ'ল?

একটি নিঃশ্বাস মোচন করে অশোক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দেয়, না—রাজেনের ভগ্নীপতি ব্যবসায়ে বিন্দুমাত্র লোকসান করতেও রাজী নন্। আর তুমি ত জান—

নীলিমা তাকে থামিয়ে দেয়। অদূরে বাসু পড়তে বসেছে। এ সব আলোচনা ওর সামনে না হওয়াই ভাল। কথাটা সে অশোককে জানিয়ে দেয়। কিন্তু যতটুকু বাসুর কানে গেছে তাইতেই সে শঙ্কিত হয়ে উঠল। তারই চশমার বিষয় আলোচনা হচ্ছে একথা বুঝে নিতে তার বেগ পেতে হ'ল না। সে একটু অন্যমনস্ক হতেই গোপার দাদার চশমা-পরা মুখখানা তার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল। চশমা পরলে বেশ দেখায় কিন্তু তাকে। চোখে তার ধুলোবালি ঢুকতে পারে না—চশমায় ঢাকা থাকে তার চোখ। সহসা তার বাবার পানে চোখ পড়তেই বাসুর তন্ময়তার ঘোর কেটে যায়। বুকের মধ্যে হয়ত নিতান্ত অকারণেই আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

দিনকয়েকের মধ্যেই তার জন্যে চশমা আসবে একথা সে শুনেছে, কিন্তু চশমা-প্রাপ্তির আনন্দের চেয়ে একটা অজানা আশঙ্কা তার মনের উপর বোঝার মত চেপে আছে। একটা তীব্র অস্বস্তি তাকে ক্ষণে ক্ষণে আনমনা করে তুলছে। কি জানি যদি...বাসু সহসা চমকে উঠল—যেন সে মস্ত বড় একটা অন্যায় কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়েছে।

নীলিমা যথাসম্ভব স্নিগ্ধ স্বরে পুনশ্চ বললে, এমনিতেই ক'দিন ধরে মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার উপর ওর সামনে আর এসব কথা তোলো না তুমি।

অশোক মৃদু কণ্ঠে বলে, অক্ষমতার লজ্জা যে কি তা আজকের মত এমন করে আর কোন দিন অনুভব করি নি। রাজেন আমায় শেষ পর্য্যন্ত কি উপদেশ দিলে জান নীলিমা? বলে, হাসপাতালে নিয়ে যাও নিখরচায় হবে।

নীলিমার একটি নিঃশ্বাস পড়ল—কোন জবাব দিলে না। কিন্তু অশোক থামতে পারলে না, বলে ফেলল, আমিও মুখের মত জবাব দিয়েছি।

নীলিমা একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, এ তোমার অন্যায় রাগ করা। রাজেন বাবু ত মিথ্যে বলেন নি—ওখানে পৌঁছবার ক্ষমতা কি সকলের থাকে?

অকস্মাৎ অশোক উগ্র হয়ে উঠল, তোমার মত অতটা চুলচেরা হিসেব অবশ্য আমি করে দেখি নি। কিন্তু মানুষের স্পর্দ্ধারও একটা সীমা আছে।

নীলিমা শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে, তুমি অকারণে রাগ করছ। বেশ ত ওরই কাছে ছেলেকে দেখিয়ে এসে না হয় মুখের মত জবাব দিয়ে এস।

অশোক দমে গেল, বললে, তুমিও কি আমায় ঠাট্টা করছ!

নীলিমা বললে, না সত্যি কথাই বলেছি, কিন্তু আর নয়—অনেক বাজে কথা বলা হয়েছে, আর দেরি না করে কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে এস। ততক্ষণে চা হয়ে যাবে। নীলিমা চলে গেল।

এরই কিছুক্ষণ পরে অশোককে দেখা গেল রান্নাঘরে বসে চা পান করতে। পেয়ালায় বারকয়েক চুমুক দিয়ে পূর্ব্ব-কথার সূত্র ধরে সে পুনরায় সুরু করলে, ঠাট্টা ত তুমি কম নি

কিন্তু একে ঠাট্টা ছাড়া আর কি ভাবা যায় বল দেখি। আমি যে নিরুপায় একথা তোমার চেয়ে আর বেশী কে জানে!

এ কথার কোন সোজা জবাব না দিয়ে নীলিমা বড় মধুর একটুখানি হাসল। এ হাসির সঙ্গে অশোকের পরিচয় আছে, সে মাথা নত করলে।

তার মনের কথা অনায়াসে নীলিমা পড়ে ফেললে। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, এ তোমার অন্যায় বাপু। আচ্ছা তোমরা আমাদের কি মনে কর বল ত? কাঠের পুতুল?

বারকয়েক ঢোক গিলে অশোক বলে, তা ভাবতে পারি না বলেই যে এত দুঃখ পাই···

গ্রীবা বাঁকিয়ে নীলিমা উত্তর দিলে, এ তোমাদের অহঙ্কারের কথা। প্রয়োজনে তোমাদের সেবা করতে বাঁধে না, কিন্তু স্ত্রীর গয়না নেবার কথায় তোমরা কুণ্ঠিত হয়ে ওঠ। এই তুচ্ছ জিনিষকে যে কেন এত বড় করে দেখ তা কি আমরা বুঝি না মনে কর?···

এই তুচ্ছ বস্তুটি শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য বড় বলে গণ্য করতে অশোক পারে নি। বাচ্চুর চোখের চিকিৎসা রাজেনের ভগ্নীপতিকে দিয়ে করাতেও তারা পারে নি। একটা তীব্র অভিমান—যা হয়ত মোটেই সঙ্গত নয়—তাই অত্যন্ত বড় হয়ে উঠেছিল তাদের কাছে। আর হাসপাতাল? সেখানেও তারা যেতে পারে নি। রাজেনের অযাচিত উপদেশ পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল।

বাচ্চুকে অবশ্য তার মা বাবা কোন কথাই জানতে দিতে চান নি, কিন্তু বাচ্চু সব খবরই রাখে। ফলে তার ভয় এবং সঙ্কোচ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। অথচ অবস্থাটা এমনি দাঁড়িয়েছে যে তার একখানি কান এবং একটি চোখ মা বাবার প্রহরায় নিযুক্ত না রেখেও স্বস্তি পাচ্ছে না।···আঃ এই সময় সে একবার যদি গোপার দাদার সাক্ষাৎ পেত···এমন জানলে কে তার কথায়···কথাটা সে পুরোপুরি ভাববারও অবসর পেলে না, হঠাৎ তার বাবা এসে দেখা দিলেন। বাচ্চু একটু নড়ে-চড়ে স্থির হয়ে বসল, কিন্তু মনের মধ্যে তার রাশি রাশি চিন্তা পাক খেতে লাগল।···গোপার দাদা···তার চশমাপরা একখানি মুখ, তার উপদেশ···স্কুল—সেখানকার ব্যাপার, তার মা বাবার দুশ্চিন্তা···সবকিছু এক সঙ্গে চিন্তা করতে গিয়ে বাচ্চু দিশাহারা হয়ে পড়ে।

অবশেষে বাচ্চুর চোখের ঔষধ এল। কিন্তু এরই নাম কি ঔষধ—চোখে দেবার পর থেকেই সে ঝাপসা দেখতে সুরু করেছে। শেষ পর্য্যন্ত একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে না ত। বাচ্চু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে—গোপার দাদাকে মনে মনে অভিসম্পাত করে। নিজের বুদ্ধিকে দেয় ধিক্কার, কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথা বলতে সে সাহস পায় না। মার কাছে একটা অতি গোপনীয় কথা প্রকাশ করবার জন্য ক'দিন থেকেই বাচ্চু ছটফট করছে। বহুবার বলতে গিয়েও কি অজ্ঞাত কারণে পিছিয়ে এসেছে।···আর তারই চরম শাস্তি সে হাতে হাতে পেয়েছে।

মাকে ডেকে করুণ কণ্ঠে বলে, চোখে যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না মা? নীলিমা তাকে আশ্বাস দিয়ে চলে যায়।··· কিন্তু বাচ্চুর দুশ্চিন্তার তাতে বিন্দুমাত্র লাঘব হয় না।

দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা একটা তীব্র অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়ে বাচ্চু পুনরায় তার স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। তার দুর্ভাবনা কেটে গেছে। চোখে মুখে দেখা দিয়েছে হাসি। গোপার দাদাকেও সে ক্ষমা করে ফেলেছে।···

আজ তার চশমা আসবে। গত রাত্রে ঘুমের ভান করে শুয়ে থেকে বাচ্চু তার মা-বাবার সব কথা শুনেছে। তার পরে বহুক্ষণ সে ঘুমুতে পারে নি। একটা মধুর উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসেছিল। চোখের সম্মুখে ভেসে বেড়াচ্ছিল একখানি চশমা-পরা সুন্দর মুখ—সে মুখ বাচ্চুর নিজেরই।

বাচ্চু একবার খোলা জানালা-পথে গোপাদের সুবৃহৎ অট্টালিকার পানে চেয়ে দেখে। আজ এই মুহূর্তে তার মনে আর কোন ক্ষোভ নাই। ওদের মত অমন সুন্দর বাড়ী আর গাড়ী না থাকার দুঃখটাও যেন ফিকে হয়ে গেছে।

চশমা কিন্তু সেই দিনই বাচ্চু পেলে না। শুধু তার বাবা ওকে নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থাটা পাকা করে এলেন। তাই কি কম ঝামেলা। নানা 'পাওয়ারে'র লেন্স দিয়ে বাচ্চুর উপর চলল পরীক্ষা। পরীক্ষা না ছাই। যত সব ঝাপসা কাঁচ বাচ্চুর চোখের সামনে ধরে বলে কিনা কেমন দেখছ? ওর ভিতর দিয়ে আবার মানুষ কখনও দেখতে পায় নাকি। বাচ্চু মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে তার রা নেই। আজ এই মুহূর্তে এই লোকটির হাতেই তাকে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে শেষ পর্য্যন্ত একখানি কম পাওয়ারের কাঁচের মধ্য দিয়ে বাচ্চু অনায়াসে দূরের লেখাগুলি পড়ে ফেলল। ডাক্তার খুশী হলেন। মুখে তাঁর হাসি ফুটল।

ডাক্তার তাঁর কাজ শেষ করে দিয়েছেন। দিন তিনেকের মধ্যেই তিনি চশমা করে দিয়েছেন কিন্তু বাচ্চুর আর ইদানীং চশমা সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নাই বরং চশমা চোখে পরতেই সে ভয় পায়। অথচ বাবা হুকুম দিয়েছেন চব্বিশ ঘণ্টা চশমা চোখে দিয়ে থাকতে হবে। এমন জানলে সে কখনই গোপার দাদার কথায় কান দিত না, আর এমন ভয়ে ভয়ে তাকে দিন কাটাতে হ'ত না।

মা বলেন, কিছুদিন নিয়মিত চশমা ব্যবহার করলে নাকি চোখ ভাল হয়ে যাবে ডাক্তারবাবু এই কথা বলে দিয়েছেন। মা ত আর বোঝেন না যে ঐ ডাক্তারবাবুটি কিছুই জানেন না। কিন্তু এসব কথা আজ আর বলবার নয়।···

দিনকয়েক ধরেই নীলিমা ছেলের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে আসছে, কিন্তু এর সঠিক কোন কারণ সে খুঁজে পায় নি। বান্নুর সর্ব্বদা বাপ-মাকে এড়িয়ে চলার প্রাণপণ চেষ্টা, তার সদা-শঙ্কিত চোখ মুখের ভাব তাকে আবার নূতন করে ভাবিয়ে তুলেছে। কোথাও যে একটা গোল বেধেছে একথা সে নিঃসংশয়ে টের পেয়েছে। তা ছাড়া এমন ত বান্নু কোন দিন ছিল না। গোপা ডাকতে এসে ফিরে যায়। তার দাদার মাম করতে ঘুমিয়ে উঠে...বিকেল হলেই মাথা ধরার নাম করে শুয়ে পড়ে...এসব নীলিমার মোটেই ভাল ঠেকছে না। অশোককে সে কোন কথা বলে না...ছেলেকে কাছে ডেকেও কোন প্রশ্ন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে কেমন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায়, কিন্তু এমন চুপ করেই কত দিন থাকা যায়! এই একটু আগেও গোপা ডাকতে এসে অকারণে কতকগুলি কটু কথা শুনে গেল বান্নুর কাছ থেকে। অন্তরাল থেকে নীলিমা সবই লক্ষ্য করেছে। গোপা মুখ কালো করে চলে গেল। নীলিমা ছেলেকে কাছে ডেকে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলে, আজও কি তোর মাথা ধরেছে বান্নু? ওমা চশমা চোখে নেই কেন তোর? আর গোপাকেই বা ফিরিয়ে দিলি কেন?

এত দিনের লুকিয়ে রাখা কথাটা অকস্মাৎ বান্নু তার মার কাছে অকপটে স্বীকার করলে। চোখের অসুখ তার কোন দিনই ছিল না—এখনও নেই। ঐ গোপার দাদার পরামর্শেই সে এত কাণ্ড করেছে।

দেখতে দেখতে নীলিমার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। মায়ের এমনি মুখের ভাব বান্নু কোন দিন দেখে নি। তার অন্তর কেঁপে উঠল। কিন্তু একটি শক্ত কথাও নীলিমা তাকে বললে না, শুধু দুঃখিত কণ্ঠে জানালে, তুমি এখন নিতান্ত ছেলে মানুষটি নও, এই তোমার তের বছর বয়েস হ'ল বান্নু। কত বড় অন্যায় তুমি করেছ তা একবার বুঝবার চেষ্টা কর।...

অশোকের আপিস থেকে ফিরে আসবার সময় হয়েছে। খানিক আগে নীলিমা বান্নুকে জোর করে খেলতে পাঠিয়েছে।

বহু দিন পরে পুনরায় সে তার ভুলে যাওয়া অভ্যাসকে জাগিয়ে দিতে প্রবৃত্ত হয়েছে। সযত্নে রচনা করেছে কবরী—কপালে দিলে কুঙ্কুমের টিপ...পায়ে আলতা। ট্রাঙ্ক খুলে বের করলে সাবেক দিনের একখানি শাড়ী। বিয়ের অব্যবহিত পরেই এই কাপড়খানি অশোক তাকে লুকিয়ে উপহার দিয়েছিল। বিশেষ কোন উপলক্ষ্য ছাড়া এখানি সে কোনদিন ব্যবহার করে নি। বিগত দিনে নিভৃত কক্ষে এই কাপড়খানি পরে কতদিন সে অশোকের সামনে সহাস্য মুখে দাঁড়িয়েছে। অশোক খুশী হয়ে উঠেছে...আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তার মন।

অতীতের সে দিনগুলি ফুরিয়ে গেছে...মনের সে ঐশ্বর্য্যও আজ আর নেই...রংও ফিকে হয়ে গেছে...নীলিমা আয়নায় নিজেকে দেখে...আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে বসে...কোথায় ঘটেছে পরিবর্তন তার খোঁজ করতে থাকে। পরিবর্তনটা দেহের চেয়ে মনকেই বার্দ্ধক্যের সাজ পরিয়েছে...নইলে...নীলিমা চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াল। অশোক নিঃশব্দে এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। বড় মধুর করে সে একটুখানি হাসল, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, এমন চোরের মত এসে ঘরে ঢুকেছ যে একটু হলেই আমি চিৎকার করে উঠতাম। অমন হাঁ করে দেখছ কি তুমি? আজ নতুন দেখছ নাকি?

অশোক সত্যই বিস্মিত হয়েছে। বিস্মৃতির অতলগর্ভ থেকে হারানো দিনের কতকগুলি মধুর স্মৃতি জীবন্ত হয়ে তাকে যেন তার বর্তমান জীবনের দুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট বৈচিত্র্যহীন পরিবেশ থেকে কিছুক্ষণের জন্য এক নূতন জগতে নিয়ে এল। এ জগতের সঙ্গে তার পরিচয় থাকলেও পারিপার্শ্বিকের চাপে তা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তার আসল সত্তার যেন মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তার মনে হ'ল—সে মরে নি, শুধু ঘুমিয়ে ছিল। সামান্য স্পর্শেই আবার জেগে উঠেছে। তার ধমনীতে রক্তধারা আবার যেন নৃত্য শুরু করেছে।

অশোকের মুখের পানে খানিক নিঃশব্দে চেয়ে থেকে নীলিমা হেসে বললে, অমন করে চেয়ে আছ কি...জামা কাপড় ছাড়বে না?

অশোকের স্বপ্ন টুটে গেল। একটি নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে বললে, এই যে যাচ্ছি, কিন্তু ব্যাপার কি বল ত নীলিমা? বড্ড যেন খুশী হয়েছ মনে হচ্ছে।

নীলিমা বললে, তুমি ঠিকই ধরেছ। আজ আমার আনন্দ রাখবার ঠাঁই নেই কিন্তু তুমি হয়ত খুশী হতে পারবে না।

ধোঁয়া কথাটা কি বলত নীলিমা, অশোক বললে, তুমি যে ক্রমেই দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়ছ।

স্বামীর কাছ থেকে প্রথমে নীলিমা একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলে। তারপর একে একে বান্নুর চশমা সংক্রান্ত সকল কথা জানিয়ে দিলে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল অশোক। নীলিমা পুনশ্চ বললে, তুমি বিশ্বাস কর পয়সার জন্য আজ আর আমার একবিন্দু ক্ষোভ নেই। তবে যদি বান্নুর কথা বল ত আমাকে বলতেই হবে যে, ও ছেলেমানুষ পরের বুদ্ধিতে একটা অন্যায় করেছে বৈত নয়।

অশোক যেন আপন মনেই কথা কয়ে উঠল, কিন্তু ডাক্তার...

নীলিমা বললে, কেন তুমিই ত বলে থাক যে, আজকের দিনে কোন কিছুতে বিস্মিত হওয়াই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার—

এ কথার কোন জবাব অশোক দিতে পারলে না, শুধু তার কণ্ঠ থেকে একটি মাত্র শব্দ বেরিয়ে এল...হুঁ...

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তরুণ ছাত্রদের "আলোচনী"

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আজ যারা ছাত্র ভবিষ্যতে তারাই হবে দেশের নেতা। তাদের আদর্শবাদ, বিশ্বাস, আশা-আশঙ্কা এ সকলের মধ্যেই নিহিত রয়েছে অনাগতকালে উন্নততর বিশ্ববোধের জাগৃতি এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিপুল সম্ভাবনা।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যাতে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে সচেতন হয় সেই উদ্দেশ্যে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র, নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের উদ্যোগে ১৯৪৬ সালে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের জন্য বার্ষিক আলোচনীর (forum) সূচনা হয়। "যে পৃথিবী আমরা চাই"—এইটাই ছিল এই আলোচনীর মূল বিষয়বস্তু।

১৯৪৮ সালে এই আলোচনীর পরিধি সম্প্রসারিত হয় এবং যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় অঞ্চল, এমন কি বৈদেশিক ছাত্রেরাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হয়। বিগত চার বৎসরের মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার ৬২টি দেশ থেকে প্রায় পাঁচ শ ছাত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে এই আলোচনীতে অংশ গ্রহণ করেছে। এই সকল বৈদেশিক ছাত্র যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে অবস্থান করে তাদের কাজকর্ম খেলাধুলা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে এবং এই মেলামেশার দরুন তারা আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

বর্তমান বৎসরে এই প্রোগ্রাম অনুসারে এশিয়া এবং মধ্য-প্রাচ্যের ১৬টি দেশের ২৪ জন ছাত্র-প্রতিনিধি জানুয়ারী মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে হাজির হয় এবং মার্চের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। ২২শে মার্চ তারিখে নিউ-ইয়র্কের একটি সেরা হোটেলের বলরুমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের ২০০০ ছাত্রের যে আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান হয় তাতে তারাও যোগদান করে।

এই অনুষ্ঠানে, মাদ্রাজের ট্রেনা ম্যারিস কলেজের মার্টল তোরাই রাজ এবং আসামের গৌহাটি, কটন কলেজের রাজেন্দ্র-নাথ বেরা এই দু'জন তরুণ ছাত্র ভারতীয় ছাত্র-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারত-সরকারের শিক্ষা-পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক নিখিলভারত রচনা-প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য এই ছাত্রদ্বয় ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। আমেরিকায় উপস্থিতির পর অন্যান্য বিদেশী ছাত্রদের ন্যায়

ওয়াশিংটন, কানেক্‌টিকাটের গানারি স্কুলের কয়েকজন ছাত্রসহ শ্রীবেরা (বাঁ-দিক হইতে দ্বিতীয়)

ভারতের এই দু'জন ছাত্রও মার্কিন-পরিবারের অন্তরঙ্গ হিসাবে অবস্থান করতে থাকেন। ফলে তাঁরা তাঁদের তরুণ আমেরিকান বন্ধুদের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টায় যোগদান করবার সুযোগ লাভ করেন। তাঁরা মার্কিন উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে হাজিরা দেন এবং গ্রন্থাগার, সংবাদপত্রের আপিস, বেতার ষ্টেশন, বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, আদালত ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। ওয়াশিংটনে গিয়ে তাঁরা মাউণ্ট ভার্ণনস্থ জর্জ-ওয়াশিংটন হোম, লিঙ্কন এবং জেফারসন স্মৃতি-সৌধ ও 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে'র মত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান-সমূহ পরিদর্শন করেন।

ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিকে প্রতিনিধিরা দুই দিন ব্যাপী

একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৫ই মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকারও একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়।

আমেরিকায় জ্যাক ক্রুয়ং-এর গৃহে আসামের ছাত্র-প্রতিনিধি শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বেরা

'ফোরামে' প্রতিনিধিরা উদ্যোক্তাদের নির্দেশিত বিষয়ে প্রবন্ধাদি পাঠ এবং আলোচনায় যোগদান করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী, বিশিষ্ট মার্কিন গুণী এবং জ্ঞানীরাও আলোচনীর মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নিকট ভাষণ প্রদান করেন।

এমনিভাবে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ফলে আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের ছাত্রেরা উভয়তঃই লাভবান হয়েছে। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যেমন আমেরিকানদের কাছ থেকে বিদেশের ছাত্রদের অনেককিছু শেখবার আছে তেমনি মার্কিন ছাত্রেরাও বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও জীবন-যাপন-প্রণালী থেকে বহুবিধ শিক্ষালাভ করে উপকৃত হতে পারে। সময় সময় তর্ক-বিতর্কে আসর সরগরম হয়ে উঠেছিল সত্য, কিন্তু অন্যেরা কি চিন্তা করছে তা জানবার জন্যে সকলের ঔৎসুক্য থাকায় অপ্রীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয় নি—পরিণামে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ছাত্রেরা নিজ নিজ দেশে ফেরবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যালয় এবং নাগরিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে এমন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সুস্পষ্ট ধারণা যা শুধু বইপুঁথি পড়ে বা চলচ্চিত্র দেখে সঞ্চয় করা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। মার্কিন রীতিনীতি, রূপকথা, এবং জীবনধারার স্বরূপ সম্বন্ধে এখন তারা অধিকতর ওয়াকিবহাল।

অন্যদিকে, এর দরুন হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী দেশগুলির অধিবাসীদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তাবোধ মার্কিন ছাত্রদের মনে জাগ্রত হয়েছে; তাদের হৃদয়ে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য-স্থাপনের যে আগ্রহ জেগেছে তাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক মৈত্রীর মূল ভিত্তি। তাদের দৃষ্টি প্রসারিত হ'ল—তাদের চিন্তার নূতন খোরাক জুটেছে এবং একদা যে সকল দেশ তাদের নিকট ছিল মানচিত্রের উপরকার কতকগুলি স্থান মাত্র, আজ সেই সকল দেশের সমস্যাসমূহকে স্পষ্টতররূপে বুঝবার ক্ষমতা তাদের হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা সম্বন্ধে একজন পরিদর্শক-ছাত্রের নিম্নোক্ত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"আন্তর্জাতিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার পক্ষে মন্ত্রীদের লম্বা-চওড়া আলোচনার চেয়ে এধরণের অনুষ্ঠান যে ঢের বেশী সহায়ক হবে তাতে সন্দেহ নেই।"

এশিয়ার পুনর্গঠন : নূতন জাপানের বিস্ময়কর উন্নতি

শ্রীঅন্নাসাহেব সহস্রবুদ্ধে

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

[বিনোবাজীর ভূ-দান যজ্ঞের প্রশ্নে সরকার-পক্ষ হইতে শ্রীআর. কে. পাটিল আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "কাজটা ভাল, আমরা উহাকে অভিনন্দিতও করি; তবে মুশকিল এই যে, জমি টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে, আর তার ফলে উৎপাদন কমিবে।" এই আশঙ্কা যে সর্ব্বৈব অমূলক তাহা 'সর্ব্বোদয়ের' অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত উক্ত শীর্ষক লেখা হইতে স্পষ্ট সপ্রমাণ হইবে। কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীঅন্নাসাহেব সহস্রবুদ্ধে জাপানের কুটির-শিল্প ও কৃষির সবিশেষ অধ্যয়নের নিমিত্ত তথায় গিয়াছিলেন। তিন মাস কাল ব্যাপী নিরন্তর নিরীক্ষণ ও অধ্যয়নের সার তিনি তিনটি লেখায় 'সর্ব্বোদয়ে'র পাঠকদের কাছে ধরিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ লেখাটি ঐ লেখমালার প্রথমটির অনুবাদ।

প্রসঙ্গক্রমে এডওয়ার্ড বিংহাম্ কৃত *Rice* পুস্তকের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। বিংহাম্ জাপানের কৃষিকে 'hoe-farming' বলিয়াছেন। লাঙল-বলদ পর্য্যন্ত নয়, যন্ত্রের ব্যবহার ত দূরের কথা। যন্ত্র ব্যবহারের অবসরও

সেখানে প্রায় নাই। পর্ব্বতময় দেশ। পর্ব্বতগাত্র স্তরে স্তরে কাটিয়া (terracnig) ক্ষেত তৈরি করা হয়। অথচ জাপানের একর-প্রতি উৎপাদন আমাদের উৎপাদনের তিন গুণ। একথা প্ল্যানিং কমিশনের শ্রীযুক্ত পাটিলের না জানার কথা নয়। তবুও তিনি এই ধাঁধাকথা তুলিয়াছেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয়।]

১

যে দেশের সহিত আমাদের সমস্যাসমূহের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় : আজ সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায় যে, উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য লোকে পাশ্চাত্য দেশের দিকে যায়। এই প্রবণতা এতটা বাড়িয়া গিয়াছে যে, কৃষিশিল্প শিক্ষার নিমিত্ত পর্য্যন্ত লোকে আমেরিকা যাইয়া থাকে। বস্তুত পক্ষে আমাদের কৃষি-সমস্যা এক স্বতন্ত্র প্রকারের এবং দেশের অবস্থাও অন্যরূপ। আমাদের সমস্যাসমূহের সহিত যে দেশের সমস্যার মিল আছে এবং তাহা সত্ত্বেও যে দেশ প্রগতিশীল এরূপ দেশ হইতে আমাদের অবশ্যই কিছু শেখার আছে। চীন, জাপান ও ভারতের কৃষি-সমস্যা কতক পরিমাণে একই রূপ। ভারতের লোকসংখ্যা ৩৬ কোটি। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের এখানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ এক-চতুর্থাংশ একর। আমেরিকায় ইহা অপেক্ষা বেশী। যন্ত্রের দিক হইতে আমরা পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এখানকার প্রায় ষোল আনা চাষ-আবাদ মনুষ্য ও পশুশক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। পাশ্চাত্য দেশের কৃষিতে যন্ত্রের সহায়তা লওয়া হয়। চীন ও জাপানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ আমাদের মতই হইবে।

জাপানে 'ঋষি-কৃষি !' : প্রাচ্যের এই সব দেশে কৃষি-ব্যবসায় পূর্ণ ব্যবসায় নহে। কৃষির সহিত অপর কোন শিল্পের সংযোগ না করিলে চলে না। ভারতেও কৃষি পূর্ণ ব্যবসায় নহে। জাপানে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ এক-পঞ্চমাংশ একর। তথাকার সমগ্র জমির আশীভাগ জমির আবাদ কেবল মনুষ্য দ্বারা হইয়া থাকে। জাপানে ট্রাক্টর বা অন্য যন্ত্রের ব্যবহার সাধারণতঃ করা হয় না। আজও তথাকার কৃষক ছোট ছোট কৃষি-যন্ত্র দিয়া চাষ-আবাদের কাজ করে।

আমাদের এখানকার মত জাপানেও পূর্ব্বে এক প্রকারের জমিদারী-প্রথা ছিল। কিন্তু কম্যুনিজমের কবল হইতে দেশকে বাঁচাইবার নিমিত্ত জেনারেল ম্যাক্‌আর্থার একটি বড় বিপ্লবী সংস্কার সাধন করিয়াছেন—জমি পুনর্বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। আজ জাপানের কোন এক ব্যক্তির তিন একরের বেশী জমি নাই। কিন্তু জমি এত কম হইলেও জাপানী কৃষকের জীবনযাত্রার মান আমাদের কৃষকদের অপেক্ষা বেশ খানিকটা উঁচু। বিনোবাজী পওনারে হস্ত সাহায্যে চাষ-আবাদ করার পরীক্ষা চালাইতেছেন। এই পদ্ধতিকে তিনি 'ঋষি-খেতি' নাম দিয়াছেন। জাপানের খেতিও এই প্রকারের ঋষি-খেতি। কিন্তু জমি এত কম হইলেও উহা হইতেই সেখানকার কৃষক নিজ পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রায় আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা আয় করে। সাধারণতঃ আমাদের এখানকার কৃষকদের অপেক্ষা জাপানী কৃষক অনেক বেশী শ্রম করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কৃষির এবংবিধ সুব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের পুরাপুরি সহায়তা সকল কৃষকই পায়। কৃষক পরিশ্রমী ও অভিজ্ঞ, ইহাই তাহার খ্যাতির মূল কারণ।

যেখানে কেবল আজিকার বিচার মাত্রই সম্ভব : জাপানে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ জন। খেতি কম বলিয়া লোকে খেতির সহিত অপর শিল্পের সংযোগ করিয়া পুরা কর্ম (full employment) সৃষ্টি করিয়া লয়। এক দিক হইতে জাপানের প্রকৃতি তথাকার লোকদের পক্ষে কতকটা অনুকূল, আর এক দিক হইতে দেখিলে মনে হইবে যে প্রকৃতি তথাকার লোকের বাঁচিয়া থাকার অভিলাষকে প্রতি মুহূর্তে 'চ্যালেঞ্জ' (চুনৌতি) দিতেছে। আমাদের দেশের তুলনায় জাপান ঠাণ্ডা দেশ। আবহাওয়া ভাল, আর লোকের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। লোকে দীর্ঘ সময় পরিশ্রম করিতে পারে, ক্লান্তি বোধ হয় না। জাপান শিল্পের ক্ষেত্রে পর্যান্ত ইংলণ্ড-আমেরিকার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম, অথচ না আছে তথায় কাঁচামাল, না আছে জীবনের কোন নিশ্চিত স্থায়িত্ব। ভূমিকম্পের ভয় ত অনুক্ষণ রহিয়াছেই। ফলে তথাকার লোকেদের সংস্কৃতির উপর উহার ছাপ পড়িয়াছে। কোন জিনিষ দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে ইহা ভাবিয়া তাহারা কোন কাজই করে না। তাহারা শুধু বর্ত্তমান কালের জীব, একথা বলা চলে। শিক্ষার দিক হইতে জাপানের স্থান সর্ব্বোচ্চে। সেখানে এক শতকে এক শ' জনই লেখাপড়া জানে। নবম বর্ষ পর্য্যন্ত বালক-বালিকার শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শেষের তিন বৎসর তাহাদিগকে কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবক বিচার-বিবেচনা করিয়া কারিগরি পাঠ্যের বিষয় নির্ণয় করিয়া থাকেন। কোন কাজই ওখানে হিসাব না করিয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে করা হয় না। অভিভাবক হিসাব করিয়া দেখিয়া লন, নিজ সন্তানদের মধ্যে কয়জনের কৃষিতে, আর কয়জনের গৃহ-ফ্যাক্টরীতে পুরা কাজ মিলিবে। সেই সব সন্তানকে সেই সেই শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশিষ্টদের জন্য অভিভাবক ও শিক্ষক কোন-না-কোন ব্যবসায় খুঁজিয়া বাহির করেন। স্থানীয় ফসলের কথা বিবেচনা করিয়াও শিক্ষার যথোচিত পরিবর্ত্তন করা হইয়া থাকে। এক স্থানে আমি গিয়াছিলাম। সেখানে স্কুলে 'ক্যানিং' শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। টিনের কৌটার ফল ভরিয়া রাখাকে ক্যানিং কহে। ঐ সম্বন্ধে স্কুলের শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "এখন এখানে কমলালেবুর বাগান শুরু হইয়াছে। এখন কোনরূপ

প্রতিযোগিতা নাই, মালের দাম বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু ফলন যখন বাড়িবে তখন এতটা চাহিদা এখানে থাকিবে না। অতএব প্রতিযোগিতায় দর কমিয়া যাইবে, চাষীর লোকসান হইবে। তাই এখন হইতেই বালকবালিকাদের ক্যানিং-এর শিক্ষা দিতেছি, যাহাতে কৃষকদের ঘরে ঘরে ইহা একটি বড় শিল্পরূপে গড়িয়া উঠে এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে অধিক ফল বাহিরে রপ্তানি করা যায়। এই প্রকার দূরদৃষ্টির সঙ্গে জাপানীদের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। স্থানিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা না করিয়া ওদেশে উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত আমাদের এখানকার মত একই ছাঁচে শিক্ষা দেওয়া হয় না। গান্ধীজী বলিতেন যে, যে শিক্ষা প্রয়োজন পূরণে সক্ষম তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জাপানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

আবর্জ্জনা-জঞ্জাল হইতেও রত্ন: জাপানে যেমন অনুক্ষণ ভূ-কম্পের ভয়, তেমনি অন্য এক দিক হইতেও প্রকৃতি তাহার উপর বিরূপ। শিল্পের জন্য তাহার যে কাঁচামাল আবশ্যক তাহা সেখানে উৎপন্ন হয় না বলিলেই চলে। ধাতুর খনি সেখানে নাই, কাঁচামাল উৎপাদনের মত আবশ্যক জমিও নাই। জাপানের প্রায় সব শিল্পের জন্যই বাহির হইতে কাঁচামাল আমদানী করিতে হয়। তাহাদের মনোবৃত্তি উহা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। অন্যদেশ হইতে অধিক মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে হয়, আর পণ্য অন্য সকল দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় বিদেশে বিক্রয় করিতে হয়। তাই ভাল জিনিষ সস্তা দামে দিতে হয়। ফলে সব জিনিষেরই উৎপাদনে তাহারা দক্ষ বনিয়া গিয়াছে। আরও ভাল কিভাবে করা যায়, সকল ক্ষেত্রে সেদিকেই তাহাদের দৃষ্টি। প্রত্যেকেরই ভাবনা, আমার কাজ এই নির্দ্দিষ্ট স্তরের হওয়া চাই। সেই স্তর পর্য্যন্ত যদি কেহ পৌঁছিতে না পারে ত তাহার দুঃখের সীমা থাকে না। প্রাণপণ করিয়া সে নৈপুণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করে। তাহাতে সাফল্য না মিলিলে সে অপর কোন হাতের কাজে নৈপুণ্য লাভ করিতে লাগিয়া যায়। নিরন্তর যত্ন করা সত্ত্বেও কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট স্তরে পৌঁছিতে না পারিলে লোকে স্বেচ্ছায় হারিকিরি করিয়া বসে এইরূপ উদাহরণও আছে। এই হেতু পৃথিবীর যে-কোন দেশের কারিগরদের অপেক্ষা জাপানের কারিগরেরা সমধিক নিপুণ। দ্বিতীয় পরিণাম এই হইয়াছে যে, লোকে কোন জিনিষকেই নিরর্থক যাইতে দেয় না; প্রত্যেক জিনিষের পুরাপুরি সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে।

এখানে আমরা হাতে-তৈরি কাগজ প্রস্তুত করিতে নেকড়ার ব্যবহার করিয়া থাকি, একথা শুনিয়া তাহাদের বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। তাহারা নেকড়াকে ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান মনে করে। নেকড়া পরিষ্কার করিয়া, বুনিয়া শতরঞ্চি তৈয়ার করা হয়। জাপান অন্য দেশ হইতে সস্তায় নেকড়া কিনিয়া থাকে। কার্পাস জাপানে মোটেই হয় না। কিন্তু কাপড়ের উৎপাদনে জাপান পৃথিবীর সকল দেশের অগ্রণী। আমদানী কার্পাস হইতে প্রথম এক কারখানায় যতদূর সম্ভব সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিয়া কাপড় বোনা হয়। ঐ প্রক্রিয়াতে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা অপর এক কারখানায় চলিয়া যায় এবং উহা হইতে সাধারণ কাপড় তৈরি হয়। এই ভাবে তিন-চার কারখানায় ব্যবহারের পরে যাহা বাঁচে তাহা কাগজের কলে গিয়া পৌঁছে। ভাল কাগজ তৈরির পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা দ্বিতীয় এক কারখানায় খেলো কাগজ তৈরির কাজে লাগে। দ্বিতীয় কারখানায় অবশিষ্ট পদার্থ দিয়া তৃতীয় এক কারখানায় খেলনা প্রস্তুত হয়। এইরূপে প্রত্যেক জিনিষের পূর্ণ সদ্ব্যবহার তথায় করা হয়।

আবর্জ্জনা জমা করায়ও একটা বিশেষ রীতি আছে। বড় বড় শহরের আবর্জ্জনা এক জায়গায় স্তূপীকৃত করার পরে শ্রেণী বিভাগ করা হয়। হাজার হাজার লোক উহা হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া পয়সা রোজগার করে। জাপানীরা খুব সজাগ, সতর্ক। আমাদের এখানে লোকে আবর্জ্জনা আঁস্তাকুড়ে যেমন-তেমন ভাবে ফেলিয়া থাকে। জাপানে লোকে নিজ-গৃহের জঞ্জালগুলিকে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া গর্ত্তে ফেলে— লোহার টুকরা এক জায়গায়, কাঁচ-ভাঙা আর এক স্থানে। আর কম্পোষ্ট তৈরির উপযোগী প্রাণীজ অবশেষ তৃতীয় কোন স্থানে। আবর্জ্জনাও তাহারা এইরূপ ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া থাকে। রাস্তায় বিড়ির উচ্ছিষ্ট যে সব অংশ পড়িয়া থাকে, তাহা একত্র করিয়া, তাহা হইতে তামাক বাহির করিয়া পুনরায় বিড়ি তৈরি হয়। হরেক রকম জিনিষ হইতে ষোল আনা লাভ ওয়াসিল করার প্রবৃত্তি জাপানের সর্ব্বত্র আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। প্রকৃতির 'চ্যালেঞ্জে' বিবশ না হইয়া, তাহারা উল্টা উহাকে পুরুষার্থের সাধন করিয়া লইয়াছে। জাপানের মত দক্ষ, উদ্যমশীল, নিপুণ জাতি জগতে আর আছে কিনা সন্দেহ।

পশ্চিম সুন্দরবনে আবিষ্কৃত কয়েকটি শৈবমূর্ত্তি

শ্রীকালিদাস দত্ত

বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দরবন প্রদেশের বনমধ্য হইতে এবং বনহাসিলের পর উহার বিভিন্ন অংশে পুষ্করিণী প্রভৃতি খননকালে ভূগর্ভ হইতে এনাগাৎ বহুসংখ্যক পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল নিদর্শনের মধ্যে অনেক প্রস্তরনির্ম্মিত হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্রিকায় আমি উহাদের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি।

এখনও সময় সময় এই প্রদেশের নানাস্থানে ঐরূপ প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাপ্ত ঐপ্রকার কয়েকটি মূর্ত্তির মধ্যে একটি শিবের অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধনারী (Androgynous) মূর্ত্তি ও দুইটি শিবের বাহন বৃষভ বা নন্দী মূর্ত্তির পরিচয় আমি এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিতেছি।

উক্ত অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিটি জয়নগর থানার অন্তর্গত বাটরা গ্রামে শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্তের কাছারি-বাটির সন্নিকটে একটি পুষ্করিণী খননকালে পাওয়া যায়। উহা এক খণ্ড কাল প্রস্তরের উপর খোদিত এবং উচ্চে প্রায় দুই ফুট। উহাতে দক্ষিণে শিবমূর্ত্তির অর্দ্ধাংশ ও বামে পার্ব্বতী মূর্ত্তির অর্দ্ধাংশ দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রদর্শিত আছে। শিবের মস্তকে জটামুকুট ও তাঁহার দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে ত্রিশূল ও দক্ষিণাধঃ হস্তে অক্ষমালা এবং পার্ব্বতীর মস্তকে ঐরূপ মুকুট ও তাঁহার বামোর্দ্ধ হস্তে শূল ও বামাধঃ হস্তে ঘট আছে।

শিবের দক্ষিণপার্শ্বে গণেশ ও পার্ব্বতীর বাম পার্শ্বে কার্ত্তিক পার্শ্বদেবতা রূপে দণ্ডায়মান। পাদপীঠের উপর পদ্মাসনের নীচে শিব ও পার্ব্বতীর বাহন বৃষ, সিংহ ও শিবের অনুচর ভৃঙ্গি প্রভৃতি উপবিষ্ট। যে প্রস্তর খণ্ডটির উপর ঐ সমস্ত মূর্ত্তি খোদিত তাহার উপরিভাগে কীর্ত্তিমুখ ও তন্নিম্নে দুই পার্শ্বে মালাহস্তে উড্ডীয়মান দুইটি গন্ধর্ব্বমূর্ত্তি এবং তাহারও নিম্নে দুইটি গজসিংহ মূর্ত্তি আছে।

গঠনভঙ্গী ও সাজসজ্জার ধরণ হইতে ঐ মূর্ত্তিটি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যের নিদর্শন বলিয়া জানা যায়।

শিবের এই জাতীয় মূর্ত্তি দক্ষিণভারতে অনেক পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উত্তর ভারতে উহাদের সংখ্যা কম। এই প্রবন্ধে বর্ণিত মূর্ত্তিটি ব্যতীত বাংলাদেশে আর একটিমাত্র ঐরূপ মূর্ত্তি কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকা জেলায় আবিষ্কৃত হয়। উহা এখন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।[1] উহা কিন্তু একটি হাত-পা ছাড়া মূর্ত্তি (sculpture in the round) এবং এই প্রবন্ধে বর্ণিত মূর্ত্তিটির

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি (বাঁটরা)

মত প্রস্তরগাত্রে উদ্গত (in relief) নহে। ইহা

(1) Iconography of the Buddhist and Brahmanical sculptures in the Dacca Museum, Bhattasali, Plate LII.

অপেক্ষা আকারেও উহা অনেক বড় ও অধিকতর সুষমামণ্ডিত।

পুরাণমতে প্রজাসৃষ্টির জন্য আদিতে ব্রহ্মার মুখ হইতে এই প্রকার অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধনারী (Hermaphrodite রূপেই শিব আবির্ভূত হন এবং ব্রহ্মার বাক্যে পুরুষ ও নারীর আকারে দ্বিধা বিভক্ত হন। কূর্ম্ম পুরাণে উহা যেরূপে বিবৃত আছে তাহা এই :

> "এবং সৃষ্ট্বা মরীচ্যাদীন্ দেবদেবঃ পিতামহঃ।
> সহৈব মানসৈঃ পুত্রৈস্তুতাপ পরমং তপঃ।
> তস্যৈবং তপতো বক্ত্রাদ্রুদ্রঃ কালাগ্নিসম্ভবঃ
> ত্রিশূলপাণিরীশানঃ প্রাদুরাসীৎ ত্রিলোচনঃ।
> অর্দ্ধনারীনরবপুর্দুষ্প্রেক্ষ্যোঽতি ভয়ঙ্করঃ।
> বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা ব্রহ্মা চান্তর্দধে ভয়াৎ।
> তথোক্তোঽসৌ দ্বিধা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোৎ।" (১)

শিবপুরাণেও উক্ত মূর্ত্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐরূপ একটি
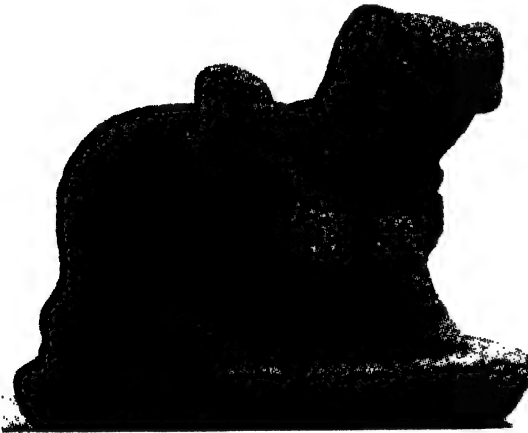
নন্দীমূর্ত্তি (নলগোড়া)

কাহিনী আছে। এই প্রকার দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে মৎস্যপুরাণকার বলিতেছেন :

> "অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি অর্দ্ধনারীশ্বরং পরম্।
> অর্দ্ধেন দেবদেবস্য নারীরূপং সুশোভিতম্।
> ঈশার্দ্ধে তু জটাভাগো বালেন্দুকলয়া যুতঃ।
> উমার্দ্ধে চাপি দাতব্যৌ সীমন্ততিলকাবুভৌ।
> বাসুকিং দক্ষিণে কর্ণে বামে কুণ্ডলমাদিশেৎ।
> বালিকা চোপরিষ্টাত্তু কপালং দক্ষিণে করে।
> ত্রিশূলং বাপি কর্ত্তব্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ।
> বামতো দর্পণং দদ্যাদুৎপলন্তু বিশেষতঃ।
> বামবাহুশ্চ কর্ত্তব্যঃ কেয়ূর বলয়ান্বিতঃ।
> উপবীতঞ্চ কর্ত্তব্যং মণিমুক্তাময়ং তথা।
> স্তনভারং তথার্দ্ধেতু বামে পীনং প্রকল্পয়েৎ।
> পরমার্দ্ধমুজ্জ্বলং কুর্য্যাচ্ছ্রোণ্যর্দ্ধে তু তথৈব চ।
> লিঙ্গার্দ্ধমূর্দ্ধগং কুর্য্যাদ্ব্যালাজিনকৃতাম্বরম্।
> বামে লম্বপরীধানং কটিসূত্রত্রয়ান্বিতম্।
> নানারত্নসমোপেতং দক্ষিণে ভুজগান্বিতম্।
> দেবস্য দক্ষিণং পাদং পদ্মোপরি সুসংস্থিতম্।
> কিঞ্চিদূর্দ্ধে তথা বামং ভূষিতং নূপুরেণতু।
> রত্নৈর্বিভূষিতান্ কুর্য্যাদঙ্গুলীষঙ্গুলীয়কান্।
> সালক্তকং তথা পাদং পার্ব্বত্যা দর্শয়েৎ সদা।
> অর্দ্ধনারীশ্বরস্যেদং রূপমাস্যন্ন দারুণম্।"১

এই বর্ণনার সহিত উল্লিখিত মূর্ত্তিটির সুক্ষ্মরূপে মিল না হইলেও মোটামুটি মিল আছে। প্রাচীন স্থপতিরা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণের সময় শাস্ত্র বচন সম্মুখে ধরিয়া রাখিতেন না। তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে তৎকালে প্রচলিত দেবমূর্ত্তি বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান অনুসারেই দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন। এই জন্যই বোধ হয় সর্ব্বত্র শাস্ত্র বচনের সহিত প্রাচীন মূর্ত্তিগুলির সুক্ষ্মরূপে মিল দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বোক্ত নন্দী বা বৃষের মূর্ত্তি দুইটির মধ্যে একটি জয়নগর থানার অধীন ২৯ নম্বর লটের অন্তর্গত শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চকে ভূগর্ত্ত খননকালে পাওয়া যায়। ঐ মূর্ত্তিটিও কাল পাথরের এবং উচ্চে প্রায় ১ ফুট। গঠন-পদ্ধতি হইতে উহাও খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।

অন্য বৃষভ মূর্ত্তিটি উহা অপেক্ষা আকারে ছোট। ঐ মূর্ত্তিটি কুলপী থানার অধীন কাঁটাবেনিয়া গ্রামের সন্নিকটে একটি শিবের লিঙ্গমূর্ত্তির সহিত আবিষ্কৃত হয়। প্রথম মূর্ত্তিটি মজিলপুরে শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটিতে ও দ্বিতীয়টি কাঁটাবেনিয়া গ্রামের অনতিদূরে একটি বৃক্ষতলে রক্ষিত হইয়া পূজিত হইতেছে।

মৎস্য পুরাণমতে "ধর্ম্মোঽয়ং বৃষরূপেন নন্দী নাম গণাধিপঃ"২। অর্থাৎ ধর্ম্মই বৃষরূপে নন্দী নামে শিবের গণাধিপ হন। শাস্ত্রে শিবের মন্দিরে ঐরূপ বৃষ, শক্তির গৃহে সিংহ ও বিষ্ণুর আলয়ে গরুড়মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উহা এইরূপ :

> "দেব্যাগারে মহাসিংহং বৃষভ শঙ্করালয়ে।
> গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্তমঃ।"৩

এই প্রবন্ধে বর্ণিত অর্দ্ধনারীশ্বর ও বৃষভমূর্ত্তি দুইটি ভিন্ন পশ্চিম সুন্দরবনের নানা স্থানে আরও অনেক শিবের

১ কূর্ম্ম পুরাণ, ১১ অধ্যায়

১ মৎস্য পুরাণ, ২৬০ অধ্যায়
২ মৎস্য পুরাণ, ৯৫ অধ্যায়
৩ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ১৩।১২

লিঙ্গমূর্তি ও অন্যান্যরূপ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি প্রস্তরের নটরাজমূর্তি, একটি ধাতব চন্দ্রশেখর মূর্তি ও কয়েকটি প্রস্তরের ও ধাতব উমামহেশ্বর বা আলীঙ্গনমূর্তি উল্লেখযোগ্য। উহাদের সচিত্র পরিচয় আমি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি।৩

দক্ষিণবঙ্গের সাগরতীরবর্ত্তী ভূখণ্ডে যে অতীত যুগে শৈবসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল তাহা এই সকল প্রাচীন মূর্ত্তির আবিষ্কার হইতে জানিতে পারা যায়। এখানে গঙ্গাসাগর সঙ্গমেও প্রাচীনকালে চক্রাকারামেশ্বর নামে একটি শিবের প্রসিদ্ধ লিঙ্গমূর্ত্তি ছিল। স্কন্দপুরাণে কাশীর বিশ্বেশ্বর, প্রয়াগের ললিতেশ্বর, সৌরাষ্ট্রের সোমেশ্বর (সোমনাথ) প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত লিঙ্গমূর্ত্তিগুলির সহিত উহার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা এই :

"কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরং দেব প্রয়াগে ললিতেশ্বরং।
ত্রিয়ম্বকাং ব্রহ্মশিরৌ কল্পৌ ভদ্রেশ্বরং তথা।
চক্রাকারামেশ্বরং লিঙ্গং গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।
সৌরাষ্ট্রে চ তথা লিঙ্গং সোমেশ্বরমিতিস্মৃতম্।"৪

পূর্ব্বে সাগর দ্বীপে মগরা নামক স্থানের পরে সঙ্কেত-মাধব নামে একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। দুই একটি প্রাচীন বাংলা পুঁথিতেও সেখানে একটি সোনার মহেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন ঐ স্থানটির পরেই গঙ্গার সাগরসঙ্গম ক্ষেত্র অবস্থিত ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত তাঁহার বিখ্যাত চণ্ডীকাব্যে, সওদাগরের ভাগীরথী পথে সিংহলে বাণিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে ঐ সোনার মহেশের এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

"বড় বৃষ্টি দূর হইল চণ্ডীর কৃপায়।
তরী মেলি সদাগর শীঘ্র গতি যায়।
ডানি বামে ছাড়ি যায় কত কত দেশ।
সঙ্কেত মাধবে দেখে সোনার মহেশ।
সাগর সঙ্গম দেখি কাণ্ডারের রঙ্গ।
কহে সাধু শ্রিপতি সাগর প্রসঙ্গ।"১

এই প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন যে লিঙ্গমূর্ত্তিটি আছে তাহা একটি গুপ্তযুগের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে

শিবলিঙ্গ ও নন্দী (কাঁটাবেনিয়া)

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১১৪ নম্বর লাটে, গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। উহা এখন সেখানেই পূজিত হইতেছে। ঐ মূর্ত্তিটি বালি পাথরের, আকারে ছোট এবং গৌরীপট্ট বিহীন। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে গুপ্তরাজত্বকালের যে সকল লিঙ্গমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলির সহিত উহার আকারের খুব বেশী সাদৃশ্য আছে।

(৩) Varendra Research Society's Monographs No. 3 and 5. *Journal of the Indian Society of Oriental Art*, Vol. IX, 1941, pages 147-148.

৪ স্কন্দপুরাণ, মহেশ্বর খণ্ডে কেদার খণ্ড, ৭ অধ্যায়।

১ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী সংস্করণ, শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার বিবরণ।

রবীন্দ্রকাব্যে ছন্দোমুক্তি

শ্রীত্রিযুগ বাগচী

আগে কাব্য বিনা গীত ছিল না, আর গীত বিনা ছিল না ছন্দ। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গলের মত বড় বড় কাব্য আসরে গান করা হ'ত, আর সুর করে পড়াও হ'ত। কিন্তু ছন্দকে সুরে ফেলার একটা মস্ত অসুবিধা এই যে, শব্দের নিজস্ব ওজন তাতে অনেক সময় হারিয়ে যায়।

ভাষা, ভাব আর ছন্দ—এই তিনের সমন্বয়ে কাব্য গড়ে ওঠে। কাব্যের জন্মবৃত্তান্ত খোঁজ নিলে দেখা যায়, আবেগের সঙ্গে ছন্দের সংমিশ্রণেই কাব্যের সৃষ্টি। ভাষা তার প্রকাশভঙ্গীর অঙ্গমাত্র। এদের মধ্যে অগ্রজের আসন দাবি করে ছন্দ। এখানে একটা সমস্যা এসে দাঁড়ায়। সমস্যাটা হচ্ছে, আবেগ আর ছন্দের সম্বন্ধে। আবেগ আর বেগ বিষমার্থবাচক—আবেগের মধ্যে বেগের চেয়ে বিরামই বেশী; অর্থাৎ মুখর আবেগ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়য় না, চলে বিরতিবহুল গতিতে। ধ্বনি ও যতির সুব্যবস্থিত নক্সাই হচ্ছে ছন্দ। এখন ছন্দের এই সংজ্ঞাই যদি সমীচীন বলে ধরে নেওয়া হয়, তা হলে গদ্য-পদ্যের সীমারেখা সুস্পষ্টতর হয়ে আসবে। শেষে হয়ত হার্বার্ট স্পেন্সরের মতে মত দিয়ে বলতে হবে—মুদ্রাকরের মর্জির উপরই নির্ভর করে গদ্য-পদ্য রচনারীতির তারতম্য।

স্পেন্সরের এই মত আপাতদৃষ্টিতে অতিরঞ্জিত মনে হলেও সমর্থনযোগ্য। সাহিত্য-রসিকদের এ অভিজ্ঞতা হয়তো আছে—এমন অনেক গদ্য-রচনার সাক্ষাৎ মেলে, যা বুদ্ধিবিবেচনার পাহারা এড়িয়ে একেবারে তাঁদের অন্তরের দ্বারে ঘা দেয়, তখন কাব্য থেকে আলাদা করে তাদের যেন আর চেনাই যায় না। আবার কবিতার ক্ষেত্রেও, এমন কবিতাও প্রায়ই দেখা যায়—ছন্দ-মিল-উপমা-অনুপ্রাসের প্রাচুর্য সত্ত্বেও যাকে রূঢ় গদ্যের প্রতিভূ বলেই মনে হয়।

যা হোক এই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে ধরে নিলাম, ছন্দ আর আবেগ যমজ—তাদের টান নাড়ীর টান। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, ছন্দ আর মিল এক জিনিষ নয়। মিল কাব্যের অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের অলঙ্কার, ছন্দ অনাদি। আর আধুনিক কালে মিলকে বলা যায় অনেকটা পাণিতিক ছন্দ। আলঙ্কারিকের প্রশ্রয় পেয়েই আজও সে গদি আঁকড়ে বসে আছে। সংস্কৃত-কবিরা এই বিদ্যাটাকে খুব ভাল ভাবে আয়ত্তে এনেছিলেন।

> "প্রণয়িং যদি জীবিতাপহা
> হৃদয়ে কিং নিহিতা ন হন্তি মাম্,
> বিষমপ্যমৃতং কচিদ্ ভবেৎ
> অমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।"

অজবিলাপের এই শ্লোকটি শোকের সঙ্গে কোন সংস্রব না রেখেও পাঠক-মনে বিষাদের একটা করুণ মূর্তি ফুটিয়ে তোলে; কিন্তু ছন্দের সুর মিলিয়ে গেলেই বোঝা যায়, আবেগের স্বসমুখ ধারা শুকিয়ে এসেছিল বলেই কালিদাস সুন্দরীর শরণ নিয়েছিলেন। কাব্যের ভাষা যেমন অকৃত্রিমতার কণ্ঠস্বর, কাব্যের ছন্দ তেমনি অকৃত্রিমতার পদধ্বনি।

তাই বলব আবেগ আর ছন্দের মিতালি অনাবশ্যক। আসলে আবেগকে আপনার ছন্দ খুঁজে নিতে দেওয়াই উচিত। ছন্দমাত্রেই যেকালে আবেগের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে, তখন অতিমাত্রিক আবেগের চলনে ছন্দ বাঁধন ছিঁড়তে পারে। আবেগও আবার উপযুক্ত আধারের অন্বেষণে এমন ছন্দে পৌঁছতে পারে যার সঙ্গে ছান্দসিকের কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি কাব্যের মূল শক্তিই হ'ল ছন্দ। এখানে গদ্য-পদ্যের স্বাধিকারের তর্ক উঠলেও বোধ করি, ধীমান ব্যক্তি উভয়ের অভিন্নতা স্বীকার করবেন। কারণ গদ্য-পদ্যের স্বকীয় মূলধন একত্র করে যে যৌথ ব্যবসায়ের উৎপত্তি তাকেই আমরা কাব্য বলি। আর আমাদের কাছে এই কাব্যই হচ্ছে সকল বস্তুর অতি নিশ্চিত উপলব্ধির উৎস। কাব্যের মূল লক্ষ্য রস-সৃষ্টি, এবং এর সাফল্যেই তার সার্থকতা বিচার্য। এই রস-সৃষ্টিও হবে জীবননিষ্ঠ। গদ্য ও পদ্যের স্বভাব যদি সত্যই বিভিন্নধর্মী হয়, তবে বিশুদ্ধ গদ্য অথবা বিশুদ্ধ পদ্য দিয়ে কোনমতেই জীবননিষ্ঠ কাব্য গড়া যেতে পারে না। গদ্য-পদ্যের এই ধাতুসঙ্করকেই বলা হয় ছন্দোমুক্তি বা 'free verse'।

ছন্দের সার্থকতা কোথায়, তার উপযোগী স্থানই বা কোথায়—রবীন্দ্রনাথ সেকথা পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের রত্নাকরে এই ছন্দের জৌলুস সর্বপ্রথমেই চোখে এসে লাগে—সে কি গানে, কি কবিতায়, কি নাটকে, কি গদ্য-প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"কাব্যের মূল শক্তিই হ'ল ছন্দ। ছন্দ তার সেই শক্তি, শতাব্দীর পর শতাব্দীর ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষ থেকে তাকে বাঁচায়। ছন্দে বেঁধে

দিলে তাই কবির কথাটি ফুরিয়েও ফুরোয় না; যে-কথা অতি সাধারণ একটা খবরমাত্র, তা হয়ে ওঠে বাণী। ছন্দ জিনিষটা মূলত হচ্ছে গতি, এইটেই বিশেষ ভাবে ভেবে দেখবার। বাক্য তার অর্থের দ্বারা বাইরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।"

তারপর উদাহরণ দেখিয়ে বলেছেন :

"শ্যামের নাম রাধা শুনেছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে একটা অদৃশ্য বেগ জন্মাল তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটা হ'ল তাই। সেইজন্য কবি ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে এই কথাটাকে দুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে, ততক্ষণ এই দোলা থামবে না। 'সই, কে-বা শুনাইল শ্যাম নাম।' কেবলি ঢেউ উঠতে লাগল।...ওদের অন্তরের স্পন্দন আর কোনদিনই শান্ত হবার নয়।"

রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন হ'ল; সাম্রাজ্য ভাঙল, গড়ল—যুদ্ধের অন্ধকারে পৃথিবীর শ্যামল মুখশ্রী ঢাকা পড়ল। এল দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব, কত নব নব চিন্তা, কত যুগান্তকারী দর্শন-বিজ্ঞান—কিন্তু এত সব তোলপাড় ওলট-পালট করেও, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও 'সই, কে-বা শুনাইল শ্যাম নাম' এই ঢেউ ওঠাটুকু থামল না।

ছন্দের আসল কৃতিত্ব এইখানেই। এই কারণেই 'হ্যামলেট', 'কিং লিয়র' আজও 'লুক্রেশিয়া' 'প্যাশনেট পিলগ্রিম'-এর সঙ্গেই এক আসনে আসীন। এলিজাবেথীয় যুগের বিলুপ্তির পরও তারা অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়ে নি। প্রথমোক্তগুলি নাটক, শেষোক্তগুলি কবিতা—কিন্তু ছন্দোবদ্ধ বলে উভয়ই কালাতীত।

রবীন্দ্রকাব্যে এই ছন্দের পরিক্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাব ও বস্তুর সহযোগিতায় তাঁর কাব্যে ছন্দ এক স্তর থেকে আর এক স্তর ভেদ করে পাখা মেলে দেয়। পাঠক-মনে তার গতায়াত স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ।

এক বিশিষ্ট মর্যাদায় ছন্দকে প্রতিষ্ঠিত করলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন যে, প্রত্যেক শব্দকে তার স্বাভাবিক মূল্য দিলে বাংলা ছন্দ অসংখ্য বিস্ময়কর নূতন সম্ভাবনায় ভরে ওঠে। নিজের সুদীর্ঘ কবি-জীবনে রবীন্দ্রনাথ এ সম্ভাবনাকে যে কত দিকে, কত ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন, রবীন্দ্রকাব্যের যার আংশিক পরিচয়ও আছে সেই তা জানে।

প্রাক্-বৈদিক যুগে ছন্দ ছিল প্রায় নিয়মের অন্ধকূপে বন্দী। 'আট-ছয়-আট-ছয়' এই ছিল পয়ারের চাল। পর্বাংশের মধ্যে যেটুকু স্বাধীনতা ছিল, সেইটুকুই ছিল পয়ারের সর্বস্ব। মাইকেল এসে তার বাঁধন আলগা করে দিলেন, যেখানে সেখানে যতি ফেলে পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের পংক্তিকে তিন টুকরা করে দিলেন। পদ্যের সমস্ত পংক্তিতে ন্যূনতম পর্বাংশগুলির মধ্যেও যে কত বৈচিত্র্য আনা যায়, সেদিকে মাইকেল নজর দিলেন না। ফলে বাংলা কবিতায় চালের নূতনত্ব এল, কিন্তু চলন বদলাল না।

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছন্দ নূতন চালে চলতে শিখল। সে আর আগেকার ঢিমে তেতালা চলনই আঁকড়ে রইল না। বাংলা ছন্দে এল দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়-সাত মাত্রার চলন। রবীন্দ্রনাথ লঘু-গুরু স্বরের ভেদে ছন্দে এক নূতন পথ দেখিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ নাকি প্রমথ চৌধুরীকে বলেছিলেন, পৃথিবীর যে কোন ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করা যায়। এ যে কত বড় সত্য তা তিনি নিজে এলিয়ট বদেলেয়ারের কবিতা অনুবাদ করে দেখিয়ে গেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ কালিদাসের মন্দাক্রান্তা ছন্দকে অবিকৃত রেখে বাংলায় অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন :

> পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও;
> সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্রমন্থর বচন কও।
> সূর্যের পিঙ্গল নয়নে তুমি মেঘ, দাও হে কজ্জল, পাড়াও ঘুম
> বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চ'লে যাও, অঙ্গে হর্ষের পড় ক ধূম।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে সর্বদাই এগিয়ে চলেছেন—ছন্দের দিক থেকেও তাঁর দান তাই অভিনব। তিনি আমাদের দিয়েছেন সোনার তরী, চিত্রা, ক্ষণিকা; দিয়েছেন বলাকা, যেখানে পংক্তির নির্দিষ্টতার শাসন ভেঙে ছন্দ ভাবস্রোতের সঙ্গে ছুটে চলেছে। আর দিয়েছেন পলাতকা যেখানে সেই অসম পংক্তির কাহিনীর ছন্দ কখনও দ্রুতগতির তালে কখনও ঢিলে হয়ে একাত্ম হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি ছড়ার ছন্দের নূতন রূপ, পেয়েছি 'লিপিকা' 'পুনশ্চ'।

হারজিৎ

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

খুকুর কনেবৌ-পুতুলটি সম্প্রতি অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। অবশ্য দোষটা সম্পূর্ণ পুতুলটার নয়। তার এই অকর্মণ্যতার পিছনে বার্দ্ধক্যোচিত জড়তা বা রোগব্যাধিবশতঃ অক্ষমতা নেই, আছে নিতান্ত একটা আকস্মিক ঘটনা। খুকু এক দিন বর-কনে পুতুলদ্বয়ের বিয়ের দিনে কনেকে বিশেষ মনের মত ধরণে সাজাতে গিয়ে এই বিপর্যয় ঘটিয়েছে। তার দিদিরা যে ধরণে শাড়ী পরে, খুকুর ইচ্ছা জেগেছিল প্রতিদিনকার একঘেয়েমি বাদ দিয়ে ঠিক সেই ভাবে পুতুলকে শাড়ী পরায়। কিন্তু হাজার রকম করে পরীক্ষা করেও, যথা—কনেকে পাশ ফিরিয়ে, চিৎ করিয়ে, পা উপুড় করে ইত্যাদি কোন প্রকারেই শাড়ীটা ঠিক দিদির মত জুতসই মানাল না। বরঞ্চ এক অসতর্ক মুহূর্তে এই জিমন্যাষ্টিকসদৃশ কনেটি তার হাত ফসকে পড়ে গিয়ে বাঁ পা'টা হারিয়ে বসে। মাকে অবশ্য খুকু সেই রকমই কৈফিয়ত দিয়েছে, কিন্তু আমাদের খুবই সন্দেহ হয় যে মাত্র এক হাত উপর থেকে পড়ে গিয়ে ভাঙবার মত নরম পা পুতুলটির ছিল না, এ নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধা খুকুর নিজের অকৃতকার্য্যতার প্রতিশোধ পুতুলটির উপর তোলা।

যাই হোক খুকু এখন বিশেষ অনুতপ্ত ও দুঃখিত। তার বিপত্নীক বর-পুতুলটির শোচনীয় দুরবস্থার কথা নিজস্ব শোকোদ্দীপক ভাষায় ও ভঙ্গিতে বর্ণনা করে খুকু ইতিমধ্যে বাড়ীর প্রায় সকলের কাছ থেকেই কিছু না কিছু আদায় করেছে—বরের জন্য নূতন কনে আমদানী করতে হবে। বাবা এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী দিয়েছেন, আট আনা—বোধ হয় তিনি বিপত্নীকদের দুর্দ্দশা কতকটা অনুভব করতে পারেন। মা দিয়েছেন মোটে দুই আনা—বর-পুতুলটার কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে হয়তো বেশী দিতেন। অবশিষ্ট দাদা দিদিরাও দিয়েছে দু' পয়সা এক পয়সা করে। এই রকম করে তার মোট টিনের বাক্সে অর্থাৎ খুকুর নিজস্ব তহবিলে জমা হ'ল প্রায় সাড়ে বারো আনা। পয়সাগুলো টিনের বাক্সে বাজাতে বাজাতে খুকুর মনে আমোদ জাগে। কেমন জিতে গেছি! বোকা পুতুলটাকে দিয়েছি আছড়ে ভেঙে। কেউ বকল না ত, বরঞ্চ কাল সকালেই নতুন পুতুল আনব, নতুন শাড়ী পরাব—ইত্যাদি খুকুজনোচিত কত দুর্লভ কল্পনা ও ছবি তার মনে ভেসে আসে।

রবিবার সকালে সে দাদার সঙ্গে বাজারে গিয়ে নিজের পছন্দমত রঙচঙে—সম্পূর্ণ নূতন প্যাটার্ণের একটা পুতুল কিনে আনল—মাটির নয় সেলুলয়েডের। সে অবশ্য মাটিরই কিনতে চেয়েছিল, কিন্তু তার দাদা সমীর মত প্রকাশ করেছিল যে, মাটির পুতুল নাকি 'ভাটি', সেলুলয়েড অনেক ভাল। খুকু ক্ষীণ প্রতিবাদ করাতে সমীর তাড়াতাড়ি তাকে একটা বড় পুতুলের দোকানে নিয়ে গেল। খুকুর চোখ ত ঝলসে যাবার জোগাড়। এত পুতুল! এত রকমারি! এ যেন সম্পূর্ণ নূতন জগৎ। খুকুর ধারণা এক মুহূর্তে বদলে গেল। সে দেখল তার নিজস্ব পুতুলের মত খারাপ পুতুল দোকানে একটিও নেই। সব ঝকঝকে তকতকে ফিটফাট। খুকু প্রলুব্ধ আগ্রহে নিজের তহবিলের ওজন আন্দাজ না করেই একটা ভাল সেলুলয়েডের পুতুল তুলে নিলে, বললে—"এইটে নিই দাদা?" দাম একটু বেশী পড়ল। খুকু নিজের সমস্ত সঞ্চয়টা সমর্পণ করে দিলে। বাকীটা সমীর নিজের টিফিন-সঞ্চিত পয়সা থেকে পূরণ করে দিয়ে দাদার পদোচিত মর্য্যাদা বজায় রাখল।

খুকু নাচাতে নাচাতে বাড়ী ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে তার জিনিষ দেখিয়ে বেড়াতে লাগল এবং সদ্য-ক্রীত পুতুলটির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করতে লাগল। "মাটির নয় জেনে রেখো, এ হ'ল খাঁটি 'সেলুড়ের'। মাটির পুতুলগুলো কেমন বোকা-বোকা লাগে দেখ নি। আর এটা দেখ কেমন সুন্দর ফ্রকসুদ্ধ পরা রয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে, না?"—এই বলেই মতামতের জন্য অপেক্ষা মাত্র না করে আর একজনের কাছে ছুটে যাচ্ছে। যেখানে নিজের বিশ্বাস একেবারে নিশ্চিত সেখানে পরের মতামত সম্বন্ধে আগ্রহ থাকে কৈ?

এইভাবে বাড়ীর সবার দেখা হলে সে সারাদিন ধরে পুতুলটাকে পাড়ার পরিচিত অপরিচিত সবাইকে দেখিয়ে শুনিয়ে যেন 'প্রসেশন' সেরে বিজয়িনীর মত বাড়ী ঢুকল। নূতন পুতুল তার নাম রেখেছে। শিশুমহলে সবাই তার অপরিমিত প্রশংসা করেছে। বড়রা অবশ্য বিশেষ মতামতের ধার দিয়েই যায় নি। তবে পুতুলের তারা বোঝেই বা কি? তাদের ঔদাসীন্যে খুকু একটুকুও ঘাবড়ায় না। যারা সত্যিকার রসিক, খুকু তাদের সবার উপর টেক্কা দিয়েছে। এমন পুতুল হুঁ হুঁ ইত্যাদি।

রবিবার সন্ধ্যেবেলা। সুতরাং পড়াশোনার বালাই নেই। খুকু বেশ হৃষ্টচিত্তে বসে গেছে পুতুল সাজাতে। সে নূতন পুতুলটাকে প্রথমে যথাস্থানে অর্থাৎ পুরোনোটির স্থানে অভিষিক্ত করলে। পুরনো পুতুলটির শাড়ী, জামা, পুঁতির মালা, আংটি, চুড়ি ইত্যাদি সমস্ত একে একে আত্মসাৎ করে

সে সযত্নে তার অঙ্গে জড়াতে লাগল। চোখে মুখে তার স্ফূর্তি উছলে পড়ছে। যেন কত বড় রাজ্য জয় করে ফিরেছে—এই ভাব।

হঠাৎ এই সাজসজ্জার মাঝখানে কি একটা খুঁজতে গিয়ে তার হাত ঠেকল একখানা ভাঙা মাটির পায়ে। খুকু সেটা তুলে দেখল সেটা তার পুরনো পুতুলটির ভাঙা পা-খানি। তার কিরণ্ডরেই নিতান্ত মুমূর্ষু ভাবে শায়িতা সেই বোকা কনে-পুতুলটি—জিমন্যাষ্টিক করিয়েও যাকে শাড়ী পরাতে পারা যায় নি। এমন কত পুতুল ত ভেঙেই থাকে—অতি সামান্য ঘটনা। কিন্তু এত দিনের সঙ্গিনী, খুকুর কত সুখে দুঃখে সমব্যথী সেই অতিপরিচিত পুতুলটিকে আজ খুকুর এই চরম বিজয়-মুহূর্তে এমন অসহায়ভাবে পরাজয়ের প্রতিমূর্ত্তির মত পড়ে থাকতে দেখে খুকুর সহসা অস্ফুট বেদনাবোধ জেগে উঠল। বেদনাবোধ থেকেই হয়তো মনের গহনে সুরু হয় অতীত স্মৃতির আনাগোনা। খুকুরও অতীত আছে, স্মৃতির উপর অধিকার তারও আছে। স্মৃতি নিয়ে কারবার কিন্তু তার এই প্রথম। এর আগে বেদনা সে অনেকই হয়তো পেয়েছে, কিন্তু যে ধরণের গভীর বেদনায় স্মৃতির তলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে তা বুঝি এই প্রথম ঘটল। আজ সে পরিপূর্ণ ভাবে বিজয়িনী। বাড়ীর সকলে, পাড়ার সকলে তার পছন্দের তারিফ করেছে। তার পুতুলের সৌন্দর্য্য নিঃসংশয়ে সকলের দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু তার সবচেয়ে পরিচিত বন্ধুটি ত আজ তার জয়ের সমারোহে যোগদান করতে পারল না। খুকুর এই ছোট্ট জীবনে দুর্গতি কম ঘটে নি। নানা কারণে দাদার কানমলা, মা'র বকুনি, বাবার বহু বিচিত্র শাস্তি সহ্য করে যখন এই পুতুল দুটি নিয়ে বসত তখন কোথায় যেত ওই সব শাস্তিলাভের বেদনা ও গ্লানি। পুতুলের জগতে প্রবেশ করে মনে জাগত অনাবিল আনন্দ, পুতুল দুটি যেন পরমাত্মীয়ের মত সব তিক্ততা ও বেদনা মুছিয়ে নিয়ে যেত। ছুটির দিনে, উল্লাসের দিনেও আবার সে এই পুতুলের সাহচর্য্যেই সবচেয়ে নিবিড় আনন্দলাভ করেছে। বিশেষ করে এই কনে-পুতুলটির প্রতিই তার আসক্তি ছিল সমধিক, কারণ তাকে সাজানো গুছানোর মধ্যে দিয়ে খুকুর নিজস্ব চিন্তাধারা ও জন্মগত সংস্কারগুলো যেন রূপায়িত হ'ত। বর-পুতুলকে সে সাজাত তার জানাশোনা অভিজ্ঞতার সাহায্যে, কিন্তু কনেকে সাজাত তার সহজাত অপরিণত প্রবৃত্তির বর্ণপ্রলেপ দিয়ে। সেই প্রিয় সঙ্গিনীকে সে আজ তাড়িয়েছে পা ভেঙে দিয়ে, অকর্ম্মণ্যতার মিথ্যা অপবাদ তার ঘাড়ে চাপিয়ে। কারণ দোষ ত খুকুর, পা ত সে-ই ভেঙেছে। তার ভাঙা পা নিয়ে সে আজ তাই পিছনেই পড়ে রইল, খুকুর বিজয়-অভিযানে এই প্রথম সে অভিনন্দন জানাতে আসতে পারল না। খুকু এতক্ষণে যেন তার ভাঙা পুতুলের এই না-পাওয়ার মর্ম্মবেদনা অনুভব করতে পারল। তার উৎসুক্যচঞ্চল হাত পা ও মনের গতি যেন কিসের মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে রইল, বিজয়িনীর ইন্দ্রিয়গুলি যেন পরাজিতা সঙ্গিনীর মূক ব্যথায় স্পর্শে নিজস্ব গতিবেগ হারিয়ে ফেলল। খুকু লেগেছে পুতুল ও তার ভাঙা পা'টি টিপে নিলে। নবাগতার অপরূপ সাজসজ্জা অসমাপ্তই রইল। একমনে খুকু ভাঙা পা'টি যথাস্থানে স্থাপন করে পরীক্ষা করতে লাগল সত্যিই আবার জোড়া লাগানো যায় কি না। একখানা মাটির পা স্বীয় স্থানচ্যুত হয়ে আজ তার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জয়ের সমস্ত উন্মাদনাকে ব্যর্থ করে দিল।

"কিরে কতদূর সাজানো হ'ল দেখি?" পাশের বাড়ীর টুনু দৌড়ে এসে প্রায় তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নূতন পুতুলটি তখনও অর্দ্ধসজ্জিত খাপছাড়া অবস্থায় একধারে পড়ে আছে। খুকুর দুই হাতে পুরানো পুতুলটির দুটি অংশ।

টুনুর প্রচণ্ড বিস্ময়। এমন কে মেয়ে আছে যে আজকারই কেনা নূতন পুতুলকে হাতছাড়া করতে পারে! সঙ্গে সঙ্গে নূতনের এই অভূতপূর্ব্ব অনাদরে তার রাগও হ'ল, শাসনের ভঙ্গীতে বললে—

"তুই কি মেয়ে বল দেখি? নূতন সুন্দর পুতুলটাকে ফেলে রেখেছিস যেন কার না কার জিনিষ, আর কি একটা বাজে জিনিষ নিয়ে সময় কাটাচ্ছিস!"—'বাজে' জিনিষটা যে কি সে লক্ষ্যই করলে না।

খুকু যেন তার কথা শুনতেই পায় নি এমনি ভাবেই চুপি চুপি টুনুকে প্রশ্ন করলে—"হ্যাঁ রে মাটি কিসে জোড়া লাগে জানিস?

টুনু একেবারে আকাশ থেকে পড়ে—"এর মধ্যে আবার মাটি কোথায় এল রে। মাটি দিয়ে করবি কি শুনি?"

খুকুর চোখে অপ্রস্তুত চাহনি। সে ভাঙা পা সমেত নিজের ডানহাতখানাকে এই উদ্যত প্রশ্নের আঘাত হতে বাঁচবার ভঙ্গিতে আলোর আড়াল করে ফেলল।

টুনু বেশ আরাম করে বসে নূতন পুতুলটাকে নিয়ে সাজাতে লাগল। তার চোখে মুখে লুব্ধ প্রশংসার চাহনি। নূতনের পরিচর্য্যায় সে সম্পূর্ণ ব্যস্ত, শুধু মাঝখানে অন্যমনস্ক ভাবে একবার বললে—"তুই যে মাটি মাটি করে কেন মাথা ঘামাচ্ছিস বুঝি না। এ তো খাঁটি 'সেলুডে'র দেখতে পাস না? এর সঙ্গে আর মাটির কারবারই রইল না, বুঝলি?"

আশ্চর্য্য! এই সেলুলয়েড-তত্ত্ব খুকু নিজেই আজ সমস্ত পাড়ায় তার মূঢ় সঙ্গিনীদের কাছে প্রচার করে বেড়িয়েছে, যেন সেই একমাত্র এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কেউ একটা কথা বলতে এলে শিক্ষাদাত্রীর ভঙ্গিতে খুকু তাকে দশ কথা শুনিয়ে বুঝিয়ে শিখিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে এক টুকরো ভাঙা

বিবর্ণ মাটির তালের মধ্যে তার সমস্ত মনকল্প জান কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল। সেলুলয়েড যে মাটি নয় সে জানে, কিন্তু এইটুকু আমার জোরেই পুরাতন সুখদুঃখের সঙ্গিনীকে নূতনের অবমাননায় মথের চাকার তলায় ছড়িয়ে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারা যায় কি না সে বিষয়ে খুকুর মনে সন্দেহ-বেদনায় আলোড়ন-প্রাচুর্য্য।

টুনুর সাজানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সে পূর্বসজ্জিত পুতুলটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মনের মত ভাল করে দেখে নিলে। তারপরে খুকুর দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—কিরে এমন চুপচাপ বসে আছিস কেন? দ্যাখ দেখি পুতুলটাকে কেমন সাজিয়েছে। এ'কেই বলে ঘর-আলো-করা পুতুল, জানিস?

খুকু নিরুত্তরে বাঁ হাতের অপরাংশটিও অতি সন্তর্পণে আলোর আড়ালে লুকিয়ে ফেলল।

সিদ্ধা জালন্দরনাথ ও রাজা গোপীচাঁদ

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার

খাঁটি বাঙালী রাজা গোপীচাঁদকে বাঙালীরা বড় একটা চেনে না, একথা শুনিলে ভারতের অন্যান্য স্থানের অনেকেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়েন। তাঁহার বৈরাগ্যের কাহিনী বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় সঙ্গীত কাব্য ও উপন্যাসের উপাদান যোগাইয়াছে, ভারতের বিভিন্ন স্থানের রঙ্গালয়ে তাঁহার রাজ্য-ত্যাগের অপূর্ব্ব আদর্শ অবলম্বনে রচিত দৃশ্যকাব্যের অভিনয় দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছে। রাজা গোপীচাঁদের পিতার নাম মাণিকচাঁদ এবং মাতার নাম ময়নামতী। ইঁহারা কল্পনার সৃষ্টি নহেন, তিন জনই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মাণিক-চন্দ্র রাজার গান শিবের গীত নামে প্রসিদ্ধ। এই গীতে গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র গোপীচন্দ্র ও গোবিন্দ (৪৭৩ শ্লোক) নামে বিখ্যাত। গ্রিয়ার্সন সাহেব বলিয়াছেন—রঙ্গপুর জেলার সদর মহকুমার নয় দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ধর্ম্ম-পালের নগর। এই নগরের দুই মাইল পশ্চিমে মাণিকচন্দ্র রাজার নগর ছিল। ঐ স্থানটি বর্ত্তমানে মাণিকচন্দ্রের মহিষী ময়নামতীর নামানুসারে ময়নামতীর কোর্ট বলিয়া কথিত হইতেছে। গোবিন্দচন্দ্রের গীত হইতে জানা যায় যে, ময়নামতী বাল্যকালে নাথসিদ্ধা গোরক্ষনাথের নিকট যোগবিষয়ক জ্ঞান লাভ করেন। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনেক প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, কুমিল্লার ময়নামতীর পাহাড়ে গোপীচাঁদের রাজধানী ছিল। তিনি বলেন—"নাথ-সাহিত্যে" হাড়িপার (জালন্দর) শিষ্য মেহেরকুল বা মেহেরকুল বা মেহের কুলের রাজা সর্ব্বভারতগীতকীর্ত্তি গোপীচাঁদ এবং বঙ্গাল খ্যাত গোবিন্দচন্দ্রের অভিন্নতা সম্বন্ধে আর বড় সন্দেহ থাকা উচিত নহে।...গোপীচাঁদের রাজ্য যে মূলতঃ মেহেরকুল পাটিকায় ছিল এই বিষয়ে আর সন্দেহ থাকা উচিত নহে। কুমিল্লার পাঁচ মাইল পশ্চিমে লালমাই পাহাড়, তাহার উত্তরাংশের নাম ময়নামতীর টিলা।...ময়না-মতীর পশ্চিম দিকস্থ পরগণার নাম পাটিকারা, সমস্ত পূর্ব্বদিক জুড়িয়া মেহেরকুল পরগণা"। (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস ৭০ পৃ.)। গোপীচাঁদের মাতার নামানুসারে পাহাড়ের নাম ময়নামতীর টিলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর রঙ্গপুর হইতে ময়নামতীর টিলায় রাজধানী স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

গোপীচাঁদ ১১শ ১২শ খ্রীষ্টাব্দের লোক। সে সময় পরমার্থ-লাভের জন্য রাজ্য ধনসম্পদ ছাড়িয়া অরণ্যাশ্রমে যাইবার খুব রেওয়াজ ছিল। অবিশ্বাসীর দল ইহাকে জাতীয় জীবনের অবনতির নিদর্শন বলিতে পারেন, কিন্তু অধ্যাত্ম-সম্পদের জন্য বিষয়সুখ বিসর্জ্জন দেওয়া ভারতের মাটিতে অভিনব কিছু নহে। গোপীচাঁদের জন্মের পর যোগবলে ময়নামতী জানিতে পারিলেন অষ্টাদশ বৎসরে তাঁহার পুত্র গোপীচাঁদ, গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যু হইবে। তাহাতে তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে গোপীচাঁদ অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করি-লেন। মাতা বুঝিলেন যোগবিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন পুত্রের বাঁচোয়া নাই। তিনি পুত্রের সুখের জন্য লালায়িত, কিন্তু তাঁহাকে বিলাসিতার বেদীমূলে বলি দিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য আকুল, কিন্তু স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাস ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। ময়নামতীর কার্য্য স্বাধীনতাব্যঞ্জক, বাক্য তেজস্বিতাপূর্ণ এবং তিনি স্বয়ং তেজস্বিনী রমণী। তাহা না হইলে তাঁহার পক্ষে একমাত্র পুত্র গোপীচাঁদকে ধর্ম্মাচরণের উদ্দেশ্যে দ্বাদশ বৎসরের জন্য অরণ্যাশ্রমে প্রেরণ সম্ভব হইত কি? রাজ্য সুখ রাজসম্মান প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া নাথযোগী-জালন্দর বা হাড়িপা সিদ্ধার সঙ্গে বনাশ্রমে যাইবার জন্য তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

> "মায়াজাল বিষম জাল জন্ম রাজার থানা
> গ্রিহেতে[১] থাকিলে বাছা জমে দিবে হানা।
> * * *

১। গৃহেতে

হাত বাহা রাজ্য পাট দুখে যাব ছাই[২]।
মা'এ পুতে[৩] যুগি হৈয়া চারিযুগ বেড়াই ॥"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৩১ পৃ.)।[৪]

"শুন পুত্র গোপীচন্দ্র যুগে কর মন।
বরাক্ষণ গ্যান[৫] সাদ[৬] যুগী হইবার ॥
বরাক্ষণ গ্যান সাদিলে নাহিক মরণ।
জিয়া থাক[৭] গোবিচাঁদ মাথে দেউক বর।"
(ভবানীদাসের ময়নামতীর গান)[৮]

পরমার্থের জন্ত বিষয় সুখবর্জ্জন করার উপদেশ শুনিয়া রাজা গোপীচাঁদ মাতা ময়নামতীকে বলিতেছেন—

"আরের মা'এ বাটা[৯] চাহে রাখিবারে ঘর[১০]।
তুমি মা'এ কহ মোরে যুগী হইবার ॥
আর মা'এ পুত দেখি দুধভাত খাওাএ[১১]।
নাতিপতি লইয়া ঘরে আনন্দে গোঞাএ ॥
তুদ্ধি মা'এ হিয়াখানি[১২] পাতারে[১৩] বন্দিয়া।
নিত্য প্রতি কহ মোরে যাইতে যুগী হইয়া ॥
নিত্য প্রতি কহ মোরে যুগী হইবার।
কোন দুগীর সহিত মা'ও কহ যাইবার ॥
হেন গ্যান পাইলে আন্ধি যুগী হইয়া যাই।"
(ময়নামতীর গান—ভবানীদাস)।

"এতেক শুনিয়া রাজা কহে মা'এর ঠাঞি।
নিশ্চয়এ হইব যুগি মোনে[১৪] কিছু নাঞি[১৫] ॥
চারি রাশির আগে আমি বিদাএ হৈয়া আশি।
কালিকা বেহানে[১৬] আমি হইব শন্যাসি[১৭] ॥"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৩১ পৃ.)

রাজা গোপীচাঁদ সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বনাশ্রমে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন জানিয়া রাণীরা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্ত সুফল ফলিল না। মাতার আদেশে তিনি নাথযোগী হাড়িপা বা জালন্ধর-নাথের নিকট সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাণীদিগকে বলিতেছেন—

"রারা দূর কর রাণি না বৈশ[১৮] মোর কাছে।
নিশ্চএ হইব যুগী যাইব শন্যাশে ॥

এযুক[১৯] সম্পদ মোর মোনে নাহি ভাএ।
চিত্যবার্ত্তা আছে মোর হাড়িপার পাএ[২০]।
হাড়িপার চরণে আমার মোন আছে বার্ত্তা।
রাজ্যপাট নারি পুত্রি সব মিথ্যাবাত্তা।"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪২ পৃ.)

রাণীদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। রাজমাতা ময়নামতী—

"পুত্র যুগি করিবেন মএনামতি রাই।
নাপিত আনিঞা রাজার মস্তক মুড়িল।
গলে কেথা দিয়া মুখে ভূষণ চড়াইল ॥
বগলে বগলি[২১] দিল শিঙনাদ গলে।
রক্তচন্দনের ফোঁটা পরাইল কপালে ॥
চকমকি পাথর দিল বটুয়া[২২] আর্দ্ধারি[২৩]।
যোর মেখিলি[২৪] আর যোজনের খাপুরী[২৫] ॥
গলাএ পরাইতে দিল উদ্রাক্ষের[২৬] মালা।
কটিতে পরাইতে দিল যোগবস্ত্র ছাল[২৭] ॥
কমুচ বিপ্রশন দিল যাদণ দিল হাতে।"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪৮ পৃঃ)।

হাজার হাজার লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা রাজা গোপীচাঁদকে এভাবে যোগীবেশে সাজাইয়া রাজমাতা ময়নামতী বিমল আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। যোগীরূপে রাজা গোপীচাঁদ—

"গুরু শেবিতে জাএ রাজা মত্তে মুনির[২৮] সাথে ॥
আগে জাএ মএনামতি পাছে জাএ রাজা
দেখিয়া হাহাক্যার করে ত্রিভুলের প্রজা।"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪৮ পৃ.)।

এ ভাবে

"যেখানে হাড়িপা সির্দ্ধা আছিল বশিয়া।
শেহিখানে গেলো মুনি পুত্র সঙ্গে লৈঞা ॥"
গুরুকে দেখিয়া রাজা চরণ বন্দিল।
গলে বসন দিয়া নাথের সাক্ষাতে রহিল ॥
হাড়িফা দেখিল যদি রাজার বদন।
যুগিরূপ দেখি বোলে না হবে মরণ ॥
মুনি[২৯] বোলে শুন গুরু হাড়িফা জলন্দর[৩০]।
আজ হৈতে পুত্র হইল তোমার কিঙ্কর ॥
তোমার চরণ বিনে অন্ত নাহি জানি।
এতেক বলিয়া হস্তে[৩১] সম্পিল[৩২] মাওমুনি ॥

---

২ ভস্ম। ৩ মাতাপুত্রে। ৪ গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৫ জ্ঞান। ৬ সাধনা কর। ৭ দীর্ঘজীবী হও। ৮ ময়নামতীর গান—ডক্টর নলিনী ভট্টশালী সম্পাদিত। ৯ ছেলে। ১০ সংসার। ১১ খাইতে দেয়। ১২ হৃদয়খানি। ১৩ পাষাণে। ১৪ মনে। ১৫ নাই। ১৬ আগামীকল্য সকালে। ১৭ সন্ন্যাসী। ১৮ বস।

১৯ সুখ। ২০ পদে। ২১ কাপড়ের ছোট থলি। ২২ ঝুলি বা থলি। ২৩ পাত্রবিশেষ। ২৪ কালবর্ণের কটি-সূত্র। ২৫ লাউয়ের খোলের ভিক্ষাপাত্র। ২৬ রুদ্রাক্ষের। ২৭ চর্ম। ২৮ ময়নামতীর। ২৯ ময়নামতী ময়নামতীকে অনেক স্থানে মুনি বলা হইয়াছে। ৩০ জলন্দর। ৩১ হস্তে। ৩২ সমর্পণ করিলেন।

হাড়িফা বোলেন যুমি থাক বার মাস।
ওপিচন্দ্রক লৈঞা আমি করিগা শন্তাস ॥
একেক বলিয়া শিঙ্গা৩৩ আশোম ভুলিল।
শিঙ্গনাদ পুরিয়া হাড়ি জাত্রা করিল ॥
মা'এর চরণে রাজা হুইয়া বিদাএ।
শন্তাস হইতে রাজা গুরুর শঙ্গে জাএ ॥
রাজ্য ছাড়িয়া রাজা জাএ বোন পথে।"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪৮ পৃঃ)।

নানাবিধ সুখসম্পদের অধিকারী বঙ্গালরাজ গোপীচাঁদ প্রজাসাধারণকে বিষাদসলিলে নিমগ্ন করিয়া স্বীয় গুরু হাড়িপানাথের সহিত ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া যোগাভ্যাস করার জন্ত রাজ্য পরিত্যাগকরতঃ বনে গমন করেন এবং অবর্ণনীয় ক্লেশ সহ্য করিয়া গুরু কৃপায়—

"জোগ আসন করি রাজা যোহাজন হৈল ॥
জোগাস্ত বেদাস্ত বেদ সরির৩৪ বিচার।
যুযুমুনা৩৫ ভেদিয়া রাজা কায়া কৈল সার ॥
সষ্টচক্র ভেদে আর সব চক্র * * *।
চৌর্দ্দভুবন৩৬ ভেটে আর খিড়কি দুয়ার ॥
চাকি কুণ্ডল ভেটে আর অধ৩৭ ভুড়ে বন্দ।
তিনি তিহুড়ি৩৮ ভেটিয়া যোমের তাকে বন্দ ॥
আদ্য উভি দিয়া বন্দ দর্শনিত৩৯ দিল তালি।
গগন মন্দিরে যুবা৪০ করে গাত্তুরালি ॥
তোমর কোঠা৪১ ভেটিয়া তথা শ্রীকলার হাট৪২।
পূর্ব্ব পশ্চিম৪৩ ভেটিয়া তথা নাগাইল কপাট ॥
উত্তরদক্ষিণ ভেটে হেমন্ত বসন্ত।
বারো কাল৪৪ ভেটিয়া যোমের তাকে বন্দ ॥
শোলাকাল ভেটিল আর কায়া শরবর।
তিনকালা ভেটিয়া যোম কৈল একাশুভর ॥
আদ্য নাম ভেটিয়া তিবেধ্য কৈল থানা।
একে একে ভেদিল রাজা অঙ্গের পঞ্চজনা৪৫ ॥
পিতার মেদ রসবিন্দু জননির শন্দ।
ভেদিল সকল তৎপ্রিথিবির রন্দ ॥
উজানি বাহিয়া জাএ কামারশালাঠারে৪৬।
তাদদিল জরা মিত্তু দুই কাল ভবে ॥
নিজ নাম পাবিল রাজা গুরুর শাক্ষাতে।
অঘোর৪৭ পড়িল রাজার মরণের পথে।
নিকটে আছিল জতো মরণের ভএ।
মির্ত্ত৪৮ পথ দূরে গেলো রিপু হৈল খএ।"৪৯

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৫৫-৫৬ পৃ.)।

যোগশক্তি-বলে মৃত্যুভয় দূর হয়। রাজা গোপীচাঁদ যোগাভ্যাস করিয়া অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে রাজা গোবিন্দচন্দ্র—

"জোড় হাতে কহে রাজা করিয়া মিনতি।
হইব তোমার চেলা যুন ভুহীবর
ভুহীর চরণে রাজা কাপে থর থর।
* * *
কিছু জ্ঞান দেহ আমি কলিঙ্গ ভূপতি ॥৬০৬
জ্ঞান দিয়া কয় ভুহী জগতে অমর।
পড়িল ভুহীর পায় বঙ্গের ঈশ্বর।"

(গোবিন্দচন্দ্র গীত)।

সিদ্ধা জালন্দনাথ যে ভাবে গোপীচাঁদকে যোগধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন গোবিন্দচন্দ্র গীতে তাহার বর্ণনা আছে—

"মস্তক মুড়্যায়া, কর্ণে মুদ্রা দিয়া,
ধরিব জোগির বেশে।
কহে জলন্দরি, সব সঙ্গে করি,
আজি জাহ নিজ বাসে ॥"৫১৪

(গোবিন্দচন্দ্র গীত)।

রাজা গোপীচাঁদের গুরু সিদ্ধা জালন্দরনাথ বা হাড়িপানাথের সম্বন্ধে ডাঃ বুকানন বলেন—Haripa a religious mendicant (yogi) of remarkable sanctity (*J. A. S. B.* 1838, page 5)। গোবিন্দচন্দ্র গীতে আছে—

"হাড়িপা হাড়ের সিদ্ধা কুলে হাড়ি নয়।১৬৯
সর্ব্বঘটে আছে হাড় হাড়ি একজন ॥
হাড়িপা মনুষ্য নহে হাড়ের সৃজন।"

(গোবিন্দচন্দ্র গীত)।

হাড়ি নহে হাড়িপা বাউল ব্রহ্মজ্ঞানী।৫৭

(গোবিন্দচন্দ্র গীত)।

সংস্কৃত অস্থিবাচক প্রাকৃত শব্দ হড্ড, হিন্দীতে হাড্ডী, তৎপরে পা (পাদ) ইহার প্রাচীন বাংলা হাড়িপা। অথবা পা=পাট=কাটা। (অসমীয়া ভাষায়) হাড্ডির অর্থাৎ হাড়ের কাটী মালা যার গলায় সে হাড়িপাট বা হাড়িপা। দিল্লীর পশ্চিমের অভোর গ্রামের যোগীদের নাম হরপা যোগী। হাড়িপা হরপা শব্দের রূপান্তর হওয়াও

---

৩৩ সিদ্ধা। ৩৪ শরীর। ৩৫ সুযুম্না। ৩৬ দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশ ভুবন। ৩৭ 'অ' হইতে 'ক' পর্য্যন্ত অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত ষটচক্রের কমলগুলির দলসমূহ। ৩৮ ত্রিপুরী। ৩৯ দেহ নবদ্বার। ৪০ কুণ্ডলিনী শক্তি। ৪১ ব্রহ্মপুরী। ৪২ মীনচেতনে শ্রীগোলার হাট বলা হইয়াছে। ৪৩ দেহের মধ্যে পূর্ব্বাদি দিক এবং ষড় ঋতু আছে। ৪৪ কলা। ৪৫ পঞ্চতত্ত্ব। ৪৬ সহস্রার।

৪৭ আগড়, অর্গল। ৪৮ মৃত্যু। ৪৯ ক্ষয়।

অসম্ভব নহে। হাড়িপা সর্ব্বত্র জালন্ধর নামে খ্যাত। পঞ্জাবের জলন্ধর নামক স্থানটি প্রসিদ্ধ। অনেকে মনে করেন, সিদ্ধা জালন্ধরের নামানুসারে ঐ স্থানের নামকরণ করা হইয়াছে। জলন্ধর অর্থে মেঘ এবং সমুদ্রও বুঝায়। কণ্ঠ-সঙ্কোচ করিয়া প্রাণবায়ুর গতি রোধ করাকেও জলন্ধর মুদ্রা বলা হয়। হয়ত এই মুদ্রা সাধন করার জন্য অথবা জলন্ধরে তাঁহার আসন ছিল বলিয়া তাঁহার নাম জালন্ধর হইয়াছে।

ময়নামতীর টিলায় (কুমিল্লার নিকটে) বসিয়া হাড়িপা বা জালন্ধরনাথ যোগসাধনা করিতেন। জলপানের ইচ্ছা হইলে তিনি মন্ত্র আওড়াইতেন। মন্ত্রবলে গাছের কচি নারিকেল তাঁহার মুখে জল ঢালিয়া দিত। একবার অবন্তী-দেশে দেবতার নিকট বলি দিবার জন্য আনীত কয়েক হাজার ছাগলকে নাকি তিনি মন্ত্রবলে নেকড়ে বাঘে পরিণত করিয়া ছিলেন (*J. R. A. S. B.* pt 1, 1898 page 20)।

কি ছিল, কি হ'ল ?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

৭

দাঙ্গার মামলায় বহু সাক্ষী। গত ছ'সাত মাসের উপর উভয় পক্ষ আদালতে ছুটোছুটি করছে। দিনের পর দিন মোকদ্দমার তারিখ পড়ছে। কুমারবাহাদুর অর্থব্যয় করছেন জলের মত। দীনবন্ধু ঠাকুরের মারফত রমাদেবী অর্থ সাহায্য পাঠাচ্ছেন নরোত্তমকে, কুমারবাহাদুর তা জানতেও পারছেন না।

হঠাৎ আজ তিনি জেনে ফেলেছেন—রমাদেবী মাঝে মাঝে খোকাকে নিয়ে কালীবাড়ীতে গিয়ে থাকেন। আজও যাচ্ছেন।

কুমারবাহাদুর রমাদেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় যাচ্ছ ?

—কালীবাড়ীতে···

—খোকাকে রেখে যাও···

—কেন ?

—সে জমিদারের ছেলে। তার আত্মসম্মান-বোধটা নষ্ট করো না।

—সে ত বন্দুক নিয়ে কালীবাড়ী দখল করতে যাচ্ছে না ? বাগানবাড়ী তৈরির পরিকল্পনাও তার নেই। সে কেন আত্ম-সম্মান হারাবে ?

—তুমি যেতে চাও—যাও। আমার অনুরোধ—খোকাকে নিয়ে যেও না।

—খোকার জন্যেই ত যাচ্ছি···

—তার মানে ?

—আমার ভয় হচ্ছে তোমার পাপে খোকার অকল্যাণ হবে। আমার সর্ব্বনাশ হবে···

রমাদেবী মা-কালীকে কত ভক্তি এবং ভয় করেন, সেকথা জানতে পেরে কুমারবাহাদুর পরিহাসের ছলে কালী-সম্বন্ধে নানা অশ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য করতে লাগলেন।

উত্তেজিত ভাবে রমাদেবী বললেন—ওই নরোত্তম কে তা জান ?

—কে ?

—মা-কালীর অনুগৃহীত ভক্ত।

হো হো করে হেসে উঠে কুমার বাহাদুর বললেন—আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ পাই নি, সেজন্যে আমার মনে আজ আর কোন ক্ষোভ রইল না। একথা বুঝতে পারছি যে, বি-এ পাস করলেও মেয়েরা মেয়েই থাকে।

—তারা বাগানবাড়ীতে গিয়ে মদ খেতেও চায় না···

—ঠাকুরের চরণামৃত পান করে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতে চায়।

—হ্যাঁ, তাই চায়। ইহকালের মাতলামোটাই জীবনের লক্ষ্য নয়।

কুমারবাহাদুর ব্যঙ্গ করে বললেন—শোন রমা। তোমার মা-কালীর বরপুত্রটি শীগগিরই জেলে ঢুকবেন, সে ব্যবস্থা আমি করছি, দেখি তখন মা কালী কি করে তাকে রক্ষা করেন ?

তার এ কথার কোন জবাব না দিয়ে খোকাকে বুকে নিয়ে রমাদেবী চলে গেলেন সেখান থেকে।

দীনবন্ধু ঠাকুরের ব্যবস্থায় কালীবাড়ীতেই নরোত্তমের সঙ্গে রমাদেবীর প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল। নরোত্তম তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

বিস্মিতভাবে রমাদেবী লক্ষ্য করলেন—নরোত্তমের চোখে মুখে আর পেশীবহুল দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গে যেন মাতৃদর্শনের আনন্দ-স্পন্দন জেগে উঠেছে। এ কি অদ্ভুত ভাবাবেশ ? এই নরোত্তমই দাঙ্গার মাঠে দুর্জ্জয় হয়ে ওঠে ?

রমাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা নরোত্তম। মা-কালী

নাকি তোমার দেখা দেন ? তুমি নাকি তাঁর সঙ্গে কথা বল ? একথা কি সত্যি ?

নরোত্তম বলল—এই ত মা এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গেই ত আমি কথা বলছি…

—আমিই তোমার সেই-মা ?

—সেই-মা আর এই-মা, দুটো মা আমার নেই। আমার এক-মা। আমার মা কি ওই মন্দিরের পাঁচিলের মধ্যে আটক থাকতে পারে ? পথে ঘাটে কোথায় সে নেই ? যেখানে যাই সেখানেই তাকে দেখতে পাই। দাঙ্গার মাঠে সে এসে দাঁড়ায় আমার সামনে। আমি কি লড়াই করি ? সেই ত করে। আমাকে আড়াল করে দাঁড়ায় বলেই, আমার গায়ে আঁচড়টিও লাগে না।

রমাদেবী দীনবন্ধু ঠাকুরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—এই নরোত্তমকে আপনি বলেন অশিক্ষিত চাষা ?

নরোত্তম বলল—মা ? তোমার খোকাকে একবারটি দেবে আমার কোলে ?

রমাদেবী বললেন—না। জমিদারের সঙ্গে তোমার মামলা চলছে। তোমার সঙ্গে আমি দেখা করেছি জানলেও তিনি ক্ষেপে উঠবেন। তুমি এখন যাও…

মাঠের পথে যেতে যেতে নরোত্তম ভায়েদের বলে গেল—আজ তোরা দুপুরের আগেই লাঙল ছেড়ে বাড়ীতে ফিরিস্…

গত রাত্রের নির্লজ্জ ব্যবহারের জন্যে মাঠে এসেই লখিচরণ অতি নির্দয় ভাবে তিরস্কার করেছে বেচারা মনোহর ও মেজুর শ্যামাচরণকে।

বিশেষ ভাবে শ্যামাচরণকে বলেছে—আচ্ছা মেজদা ! তুমি কি কামরূপ-কামিখ্যের মেয়ে বিয়ে করেছ ? নতুবা, এমন 'ভেড়াকান্ত' হ'য়ে গেলে কেন ? মনোহর ছেলেমানুষ। নতুন বিয়ে করেছে। তার সাত খুন মাপ। কিন্তু বুড়ো তুমি। চুলে তোমার পাক ধরেছে। লজ্জা-ঘেন্নার মাথা খেয়ে একটা রাত্তিরও কি মেজ বৌকে ছেড়ে থাকতে পারলে না ? একটা কলসী আর দড়ি নিয়ে মধুমতীতে যাও।

বাড়ীতে ফিরে নরোত্তম শুনল শুভোকে বড়বৌ চন্দ্রকলা নিয়ে গেছে তার কাছে।

—না না, তা হতে পারে না। যত দিন বৌদের আলাদা হবার সাধ না মিটবে—ততদিন এ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। নরোত্তমের আদেশে কাদম্বিনী গিয়ে শুভোকে কেড়ে আনল বড়বৌয়ের কোল থেকে।

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও নরোত্তমকে যমের মত ভয় করে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভাইবোনরা ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে। বড় বোন্ ছোট ভাইটিকে দিচ্ছে একটা বাঁশী। বড় ভাই ছোট বোনকে দিচ্ছে একটা পুতুল। তবে সবাই নজর রাখছে জ্যেঠা না জানতে পারে।

পাড়াপ্রতিবেশীরা ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেছে। ঝগড়া-ঝাটির ভয়ে যে মোড়লবাড়ীর চালের উপরেও কাক বসতে সাহস পেত না, সেখানে আজ টুঁ-শব্দটি নেই। সবাই ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে আর ইসারায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সেদিন রাত্রে ভাইরা কেউ আর বিছানা ছেড়ে উঠল না।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে লখিচরণকে একান্তে ডেকে নরোত্তম বলল—দেখলি ত কাল আর কেউ ঘর থেকে বেরয় নি। একটু ভাববার বা বুঝবার সময় ও সুযোগ দিলে সবাই শোধরায়। এই ব্যবস্থা আর দুটো দিন রাখতে পারলে—বৌরাও শোধরাবে।

—হেঁঃ শোধরাবে। এই লখিচরণের মধুর বাক্যি না শুনলে কেউ শোধরাবে না…

চোখ দুটো বিস্ফারিত করে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল—তাদের কিছু বলেছিস্ নাকি ?

—বলব না ? সে ভেড়াকান্তের কি কোন আক্কেল-পছন্দ আছে ? তোমার মত দাদাকে যে অগ্রাহ্য করতে পারে, সে কি মানুষ ? মাঠে গিয়ে এমন বাক্যি ছেড়েছি যে পেটের ভাত চাল হয়ে গেছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে বৌদেরও আজ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

—কি বলেছিস্ ?

—বলেছি, যদি মঙ্গল চাও, সবাই মিলে বড়দার পায়ের উপর গিয়ে পড়। নইলে চাল-ডালের যোগানও বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের ভাত গিলতে লজ্জা করে না তোমাদের…?

—ছি ছি, তুই বড্ড মুর্খ।

—যেমন কুকুর, তেমন মুগুর না হলে কি চলে বড়দা ? তুমি বেশী কথা কও না, তাই ওরা তোমাকে বুঝতে পারে না। কখনও হও কাদার মত নরম, আবার কখনও হও লোহার মত শক্ত। বাক্যি ছাড় বড়দা। বাক্যি ছাড়। বাক্যির জোরেই ত মধুঠাকুর শিবুর বৌটার মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

—তা সত্যি।

এমন সময় পাশের বাড়ীর একটি প্রাচীনা এসে বললেন—ওরে ও নরোত্তম। কাল রাত বারোটার পর থেকে তোদের বড়বৌয়ের কোন খোঁজখবর নেই। সেকথা জানিস ? বৌটা কোথায় গেল খুঁজে দেখ…

নরোত্তম চমকে উঠল।

লখিচরণ জিজ্ঞাসা করল—কি বলছ তুমি ? এ কথার মানে কি ?

প্রাচীনা বললেন—মানে আমরা কি জানি ? শিবুর বৌয়ের মত সেও দীনবন্ধু ঠাকুরের বাড়ীতে উঠল কিনা, তাই বা কে জানে ?

নখিচরণ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল—বৌদি যদি আবার দাদার মুখে চুণকালি দিয়ে থাকে, তা হলে আমি তাকে কেটে দু'খণ্ড করব।

৮

চন্দ্রকলা যে নিবুর বৌয়ের মত আত্মসম্মান হারাতে পারে না, নরোত্তম তা জানত। একথাও জানত যে চন্দ্রকলা অত্যন্ত অভিমানিনী। গুণোকে তার কোল থেকে কেড়ে আনার পর সে চুপটি করে বসে বহুক্ষণ কেঁদেছে। কাদম্বিনীর কাছে সেকথা শুনে একটা দুর্ঘটনার আশঙ্কাও নরোত্তমের মনে এল।

চার ভাই চার দিকে ছুটে বেরিয়ে পড়ল। মনোহর গেল দীনবন্ধু ঠাকুরের বাড়ীতে। ছাতি চাদর নিয়ে তারাচরণ ছুটল চন্দ্রকলার বাপের বাড়ীমুখো। নখিচরণ ভাবল সে নিশ্চয়ই জলে ডুবে মরেছে। ব্যস্তভাবে নদীর ঘাটে গিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল।

নরোত্তম যেন ভূতাবিষ্ট। চারি দিকে বিহ্বলভাবে তাকাতে তাকাতে সে গিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ীর উত্তরে একটা বাগানের মধ্যে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—ওই যে, ওই যে!

চন্দ্রকলা একটা আম গাছের ডালে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলছে। সে ঝুলেছে গভীর রাত্রে। এখন হয়ে পড়েছে—কাঠের মতই শক্ত। চোখে মুখে মৃত্যু-যন্ত্রণার শেষ চিহ্নগুলি পরিস্ফুট হয়ে আছে।

নরোত্তমের চিৎকার শুনে সবাই ছুটে এল। একখানা দা হাতে নিয়ে নরোত্তম উঠল গাছে। তার পর তাকে নিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল। লাশটা বাইরের ঘরের দাওয়ার নামিয়ে বহুক্ষণ চেয়ে রইল সে চন্দ্রকলার মুখের দিকে।

চন্দ্রকলাকে নরোত্তম বাস্তবিকই ভালবাসে। সে চেয়েছিল তার প্রকৃতির সংশোধন, দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধির জাগরণ, প্রাণাধিকা চন্দ্রকলার সঙ্গে চির-বিচ্ছেদ ত সে কামনা করে নি? নরোত্তমের মনে পড়ল, চন্দ্রকলা তার সংসারে এসেছিল শাশুড়ীর কোলে উঠে। বয়স তখন মাত্র তিন বছর। এই তিন বছরের বালিকা বধূটির জন্ত মেয়ের বাপকে তিনশ' টাকা পণ দিতে হয়েছিল।

বিবাহের সময় নরোত্তমের বয়স ছিল কুড়ি। চন্দ্রকলাকে পরিপূর্ণ ভাবে বধূ হিসাবে পাবার জন্তে, তার চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক স্ফূর্তির জন্তে, নরোত্তমকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রায় পনর বছর। অবুঝ বালিকা বধূর কত অসঙ্গত আবদার ও কত অন্তায় অত্যাচার তাকে সহ্য করতে হয়েছে। কবে নরোত্তম তার একটা পুতুল ভেঙে ফেলেছিল, সে কারণে চন্দ্রকলা একটা ঘটি ছুঁড়ে মেরেছিল তার কপালে। সে ক্ষতচিহ্নটা আজও মোছে নি।

তিন বছরের বালিকার শৈশব-স্মৃতি সুস্পষ্ট মনে থাকা সম্ভব নয়। বয়োবৃদ্ধির পর নরোত্তমের গলাটা জড়িয়ে ধরে, অনুরাগভরে চন্দ্রকলা এক দিন জিজ্ঞাসা করেছিল—আমি যে ঘটি ছুঁড়ে কপালটা কেটে দিয়েছিলাম—তাতে রক্ত পড়েছিল? ব্যথা লেগেছিল?

নরোত্তম হাসল। আদর করে বলেছিল—দাগটা দেখেও কি বুঝতে পারছ না?

—সেজন্তে তুমি আমাকে কিছু বল নি? একটা চড়ও মার নি?

তেমনি হাসতে হাসতেই নরোত্তম বলল—তুমি তখন পাঁচ-ছ' বছরের খুকীটি, আর আমি একটা ডবা বয়সের জোয়ান। আমার একটা চড় খেলে তুমি ত মরেই যেতে। বিয়ের সময় মন্তরের মানে বুঝি নি, তা সত্যি, কিন্তু বাসরে খেলার ছলে শালী-শালাজেরা যে একবার আদায় করে নিয়েছিলেন—'তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করব।' তা কি এ জীবনে ভুলতে পারি?

চন্দ্রকলার চোখ দুটি ছলছল করতে লাগল। তার ইচ্ছে করে, নিজে না-খেয়ে, বা আর কাকেও না-খাইয়ে, ভাল ভাল খাদ্যগুলি একমাত্র নরোত্তমকেই খাওয়ায়। ভ্রাতৃগতপ্রাণ নরোত্তম তা পছন্দ করে না। নরোত্তম ও চন্দ্রকলার মধ্যে দাম্পত্য-কলহের মূল ত সেইখানে। বধ্যার সন্তান-বাৎসল্য যে স্বামীকে ঘিরেই তৃপ্ত হতে চায়, নরোত্তম তা বুঝতে পারে না, গোপনে দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করে এনে চন্দ্রকলা যখন নরোত্তমের মুখের কাছে ধরে—নরোত্তম ভাবে—ছি, ছি, এ কি স্বার্থপরতা?

সব বৌকে পৃথক করে দিয়ে, যে নিরপেক্ষতার দাবি নিয়ে নরোত্তম তাদের পারিবারিক কলহ-নিবৃত্তির অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছিল, তা আর কোন বৌয়ের পক্ষে ততটা পীড়াদায়ক হয় নি, যতটা হয়েছিল চন্দ্রকলার পক্ষে।

চন্দ্রকলার দিকে চেয়ে চেয়ে নরোত্তমের চোখের জল শুকিয়ে গেল। মেজার বাবা অস্বীকার করে মেজবৌ, সেজ-বৌ, আর ছোটবৌও এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। নিত্য-কলহের পরিণাম যে এমন ভয়াবহ হতে পারে, তা তারা কল্পনাও করেনি। সবাই মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বড়বৌয়ের অপমৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তারাচরণ রাস্তা থেকেই কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছে। নরোত্তম তাকে ডেকে বলল—ওরে তারা! মেজাটা তুলে দে…

এমন সময় দীনবন্ধু ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে মনোহর এসে হাজির হল।

—ব্যাপার কি নরোত্তম? উদ্বিগ্ন ভাবে দীনবন্ধু ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন।

—দেখতেই ত পাচ্ছ ঠাকুর-খুড়ো! বড়বৌ আমাদের সংসারের সব অশান্তি আঁচলে বেঁধে নিয়ে সরে পড়েছে···

—কি সর্ব্বনাশ! দীনবন্ধু ঠাকুর বহুক্ষণ মাথাটা চেপে ধরে একটা চৌকির উপর বসে রইলেন। তার পর উৎকণ্ঠিত ভাবে বললেন—একটা সমস্যা যে বড্ডই জটিল হয়ে উঠল নরোত্তম?

—কি সমিস্তে?

—এ লাস ত পুড়িয়ে ফেলতে পারবে না···

—কেন?

—আত্মঘাতী আগুন পাবে না। শাস্ত্রের নিষেধ। ওকে জলে ভাসিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তাতেও বিপদ আছে···

—কি বিপদ?

—থানায় না জানিয়ে কোন লাস জলে ভাসাতে পার না তুমি। ভয়ানক বে-আইনী···

থানার কথা শুনে নরোত্তম চমকে উঠল। তাকে জব্দ করার জন্যে জমিদারের সঙ্গে থানার আঁতাতের খবর সে রাখে। কালীবাড়ীর দাঙ্গাটা প্রমাণাভাবে ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা আছে। এখন চন্দ্রকলার গলার দড়িটা অন্য ভাবে প্রমাণের চেষ্টা দারোগা ত না করেই ছাড়বে না?

নরোত্তমও কিছুক্ষণ মাথাটা ঝুঁকিয়ে বসে রইল। হঠাৎ দীনবন্ধুঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করল—পুড়িয়ে ফেললে ওর সদ্‌গতি হবে না?

—না। শাস্ত্রে সে ব্যবস্থা নেই। আত্মহত্যা মহাপাপ। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত জলজ প্রাণীর ভক্ষ্য হওয়া···

—মনোহর! শুনে যা—নরোত্তম মনোহরকে ডেকে বলল—শীগগীর একটা বড় বস্তা নিয়ে আয়···

—বস্তা দিয়ে কি হবে? দীনবন্ধু ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন।

—বস্তায় ভর্ত্তি করে ইট বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দেব, তবু থানায় খবর দেব না। দারোগা এসে যদি জিজ্ঞাসা করে, বলব বাপের বাড়ী গিয়েছিল। তার পর কোথায় গেছে, কি হয়েছে, জানি না।

—তোমার পাড়াপ্রতিবেশীরা যদি সাক্ষী দেয়···

—আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে এমন পাড়াপ্রতিবেশী আমার একটিও নেই। তবে তোমাদের পাড়ায় কেউ যদি বলে, বলুক। তারা ত দূরের লোক। তাদের সাক্ষীতে কি আসে যায়?

শেষ পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থাই ঠিক হ'ল। চার ভাই মিলে চন্দ্রকলাকে বস্তাবন্দী করে নবগঙ্গায় ডুবিয়ে দিলে। থানায় সে খবর গোপন রইল না—তিন দিন পরে চন্দ্রকলার মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ হ'ল। কুমারবাহাদুর মহাদেবীকে বললেন—এইবার তোমার মা-কালীর বরপুত্রটিকে দেখে নেব। খুনী আসামী সে।

৯

চন্দ্রকলার গলায় দড়ি সম্বন্ধে নানা লোকে নানা মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগল। হাটুরে লোকরা কেউ বলল, বৌটা নিজেই ঝুলেছে। কেউ বলল, মোড়লের পো মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে।

নরোত্তমকে সবাই চেনে। অনেকেই দ্বিতীয় অনুমানের প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, না না, তা হতেই পারে না। মোড়ল যদি তেমন কাজ করত, তা হলে নিজেই থানায় গিয়ে ধরা দিত। কোন মিথ্যে কারবারের ভিতর সে নেই।

জনমত চিরদিনই সন্দেহের দোলায় দোলে। জনমতের বিচারে বহু নিরপরাধ শাস্তি পেয়েছে, আবার বহু অপরাধী ফুলের মালা পরেছে। সেজন্যে দায়ী মানুষের অসংযত রসনা আর কল্পিত প্রচার। দায়িত্বহীন মন্তব্য ও মিথ্যা-প্রচারের ফলে কত নিরপরাধের প্রাণহানি যে ঘটেছে, তার সাক্ষী হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা।

তিন-চার দিন পরে নবগঙ্গার কোনও বাঁকে ভেসে উঠল একটি স্ত্রীলোকের বিকৃত লাস। চারদিকে হৈ চৈ! প্রচার-বিশারদরা মুখর হয়ে উঠল। থানায় গেল খবর। নরোত্তমের ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করে দারোগার সঙ্গে কুমারবাহাদুরের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল। মদের গ্লাস ঠোকাঠুকি করে দু'জনাই সানন্দে মন্তব্য করলেন—নিশ্চয়ই এ লাস চন্দ্রকলার।

লাস সনাক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নরোত্তমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড়ানোও চলছে না। পূতিগন্ধময় লাসটাকে ডাঙায় তুলবার উপায় কি? চৌকিদাররা রাজী হ'ল না। জমিদার সদরে লোক পাঠালেন—পাঁচ জন মুদ্দফরাস আনবার জন্যে।

উপস্থিত লাসটাকে থানার ঘাটে ভাসিয়ে এনে একটা খোঁটায় বেঁধে রাখা হ'ল। সাত জন চৌকিদার নিযুক্ত হ'ল সাতখানা ডিঙি নৌকো দিয়ে ঘিরে সারারাত লাসটা পাহারা দেবার জন্যে। কালই মুদ্দফরাস আসবে।

সন্ধ্যার পর দীনবন্ধু ঠাকুর এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন উপায় কি নরোত্তম?

লাসটা যে চন্দ্রকলার সে বিষয়ে নরোত্তমের মনে কোনও সন্দেহ নেই।

—তাই ত ঠাকুরখুড়ো! কি করা যায় বল ত? নরোত্তম মাথায় হাত রেখে ভাবতে লাগল।

বহুক্ষণ পরে হঠাৎ সে রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করে উঠে দাঁড়াল। মাথার বাবরিটা ঝেঁকে দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, না, না, এত বড় মিথ্যে, এত বড় অন্যায়, এত বড় দুরভিসন্ধির প্রশ্রয় সে কখনও দেবে না। চন্দ্রকলাকে খুন করেছে

নরোত্তম ? এত বড় একটা মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা নরোত্তমের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ জমিদার কখনও পাবে না।

—কি করবে ? অনুসন্ধিৎসু ভাবে দীনবন্ধুঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন।

চারদিকে একবার চেয়ে খুব নীচু সুরে নরোত্তম বলল, আজ রাত্রেই লাসটা সরিয়ে ফেলব···

—তা কি করে সম্ভব হবে ? পাহারার খুব কড়া ব্যবস্থা হয়েছে। সাত জন চৌকিদার নিযুক্ত আছে সাতখানা ডিঙি নিয়ে···

—সাতশ' ফৌজ এসে পাহারা দিক না, তবুও ও লাস থানার ঘাট থেকে আজ রাত্রেই সরে যাবে···

—মাথা খারাপ ? একটু ম্লান হাসি হেসে দীনবন্ধুঠাকুর বললেন, কোনও মন্তর থাড়বে নাকি ?

—হ্যাঁ, আমার এক মাত্তর মন্তর—'জয় মা-কালী !' তা ছাড়া আর কোনও মন্তর আমি জানি না ঠাকুর-খুড়ো ! যেন এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিতে নরোত্তমের মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সদম্ভে বলল, আমার বুকটা চিরে দেখ, সেখানে মার মূর্ত্তি আঁকা আছে ! মার কৃপায় আমি অসাধ্য সাধন করব, কেউ আমার কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না।

বিস্মিতভাবে দীনবন্ধুঠাকুর চেয়ে রইলেন নরোত্তমের মুখের দিকে, মনে মনে স্বীকার করলেন—এত বড় মাতৃভক্তের বিনাশ নেই। কিন্তু থানার ঘাট থেকে লাস সরানো সম্ভব হবে কি করে ?

নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল, বলতে পার ঠাকুরখুড়ো ! থানার ঘাটে নবগঙ্গা কতখানি চওড়া ?

—তা প্রায় দু'শ-আড়াই'শ গজ হবে বৈকি !

—তা হলে যাও, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও গে। কাল সকালে শুনতে পাবে—লাসটা থানার ঘাটে নেই···

এত বড় একটা অসাধ্য-সাধন করা মানুষের পক্ষে কিভাবে সম্ভব হবে, দীনবন্ধুঠাকুর তা ভাবতেই পারলেন না। তবে মাতৃভক্ত নরোত্তমের অদম্য শক্তি ও সামর্থ্যের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস আছে; তাই দুশ্চিন্তার মধ্যেও খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

উঠানের বেড়া উঠে গেছে। বৌদের বগড়া-ঝাঁটিও থেমে গেছে। নরোত্তম ছেলেদের নিয়ে বাইরের ঘরে পড়ে থাকে। তার সেবাযত্ন করে কাদম্বিনী। খাওয়া-দাওয়া সেরে শ্যামাচরণ আর মনোহর গিয়ে ঢোকে তাদের বৌদের ঘরে। সখিচরণ বারান্দায় শুয়ে ভজন গায় আর নাক ডাকায়।

সন্ধ্যার পর সখিচরণকে ডেকে নরোত্তম বলল, দুখানা দায়ে ধার দে। আর আমার শিওরে রেখে যা দুটো বস্তা। হ্যাঁ ভাল কথা—ক'গাছা নৌকোর গুণ ঘরে আছে রে ?

—কেন ?

—দরকার আছে। গুণ ক'গাছাও গুছিয়ে রাখিস। আর একটু সজাগ থাকিস। রাত দুটো আড়াইটার সময় এক জায়গায় যেতে হবে আমার সঙ্গে···

সখিচরণ বালি-কাঁচায় দা ঘষতে ঘষতে গান ধরল—

এই মানব-জীবন জোয়ার-ভাঁটা !
ভাঁটার টানে পড়লে রে মন—
ওরে—মিছেই হবে তোর সাঁতার-কাটা।
স্মরণ রাখিস মায়ের চরণ
হবে না তোর অকাল মরণ।
জোয়ার-ভাঁটা আসবে যাবে—
তবু, ভাঙবে কে তোর বুকের পাটা ?

দা দুখানা বালিশের নীচে রেখে সখিচরণ কান্ত হয়েও সুর ভাঁজতে লাগল। ক্রমে গানের সুর মিশে গেল নাসিকা-গর্জ্জনের সঙ্গে।

কালী-বাড়ীর পেটা-ঘড়িতে দুটো বাজার সঙ্গে সঙ্গেই নরোত্তম এসে সখিচরণকে ধাক্কা দিল। উঠে বসে চোখ রগড়ে সে জিজ্ঞাসা করল—কি বড়দা ?

—চল আমার সঙ্গে···

কোথায় যাচ্ছে, কি করতে যাচ্ছে, সে সব কথা সখিচরণ কিছুই জানে না। তাই তিনটি শুধু দাঁড় টানতেই জানে। বড়দা যদি হালে থাকে, তা হলে তাদের নৌকো কখনই বানচাল হবে না, এ বিশ্বাস তাদের আছে। তাই তারা কোনও বিষয়েই মাথা ঘামায় না। নরোত্তমকে মাথায় রেখেই তারা নিশ্চিন্ত।

অন্ধকারে থানার অপর পারে নদীর কূলে বসে নরোত্তম ফিস্ ফিস্ করে সখিচরণকে বুঝিয়ে দিল—কি করতে হবে। গুণের দড়ির একটা দিক সখিচরণের হাতে রেখে, আর একটা দিক গুছিয়ে নিল নিজের হাতে। তারপর দা'টা কোমরে গুঁজে 'জয় মা-কালী' বলে নেমে পড়ল জলে। একটা কাল হাঁড়ি দিয়ে মাথাটা ঢেকে ভাসতে ভাসতে চলল থানা-মুখো।

জলের মৃদু ঢেউয়ের উপর দিয়ে হাঁড়িটা ভেসে চলেছে অতি ধীর ও মন্থরগতিতে। দেখলে কারো মনে সন্দেহমাত্র জাগে না যে ওই হাঁড়ির নীচে কোনও মানুষ আছে। মাঝে মাঝে হাঁড়িটা একটু উঁচু করে নরোত্তম দেখে নিচ্ছে—থানার ঘাট কতদূর।

কূলে বসে সখিচরণ ভাবছে—হৈ হৈ করে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটতে সবাই পারে। কিন্তু এমন শান্ত ও সংযত ভাবে অতি মন্থর সাঁতার-কাটা একমাত্র তার বড়দার মত কৌশলী-সাঁতারু ছাড়া আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

লাসটা যেখানে খোঁটায় বাঁধা ছিল—দুই নৌকোর ফাঁক দিয়ে হাঁড়িটা গিয়ে থামল সেখানে। রাত্রি তখন প্রায় তিনটে হাঁড়িটা সরিয়ে চারদিকে চেয়ে নরোত্তম বিশেষ ভাবে লক্ষ্য

করতে লাগল—কেউ কোথায়ও জেগে আছে কিনা। কি ভয়ানক দুঃসাহসের কাজ সে করছে! দারোগা টের পেলে, এখুনি দুম্ করে বন্দুকের একটা আওয়াজ হবে—আর নরোত্তমের মাথাটা যাবে চৌচির হয়ে ফেটে।

নিশুতি রাত। কেউ কোথায়ও জেগে নেই। নরোত্তম নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে গেল লাসটার কাছে।

নরোত্তমের মনে পড়ল সেই নবনীতকান্তি তিন বছরের ছোট্ট মেয়েটিকে, তার পরে একদিন এল তার যৌবন! দেহের লাবণ্য সর্ব্বাঙ্গে উছলে উঠল। আর আজ তার এই পরিণাম! বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে ইচ্ছা হ'ল তার। এই দেহটাকেই মানুষ কেন এত ভালবাসে? সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করে নরোত্তমের হাত-পা শিথিল হয়ে আসছিল। হঠাৎ সে আবার শক্ত হয়ে উঠল।

না না, তা হতে পারে না। সংসার যতই অনিত্য হোক—যত দিন প্রাণ আছে কর্ত্তব্য মানুষকে করতেই হবে। মা যে পথে চালাবেন—সে পথে চলতেই হবে। ফাঁসি-কাঠকে নরোত্তম ভয় করে না। কিন্তু জমিদারের মিথ্যা ষড়যন্ত্র জয়ী হবে—লোকে জানবে নরোত্তম স্ত্রী-হন্তা! এত-খানি কাপুরুষতার গ্লানি তার পক্ষে অসহ্য।

মায়ের নাম স্মরণ করে আবার সে কর্ত্তব্যে কঠোর হয়ে উঠল। দু'একটা চোঁতাকে লেজ ধরে টেনে সরিয়ে দিল। শণের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল চন্দ্রকলার পা-দুখানা। তারপর খোঁটার সঙ্গে যে দড়ি দিয়ে লাসটা বাঁধা ছিল, তা দিল কেটে। হাঁড়ি মাথায় দিয়ে যে ভাবে এসেছিল, ঠিক সেই ভাবেই আবার ফিরে গেল, নদীর অপর পারে নখিচরণের কাছে। ডাঙায় উঠে তাকে বলল—গুণটা খুব আস্তে আস্তে টান—দু'নৌকোর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসবে লাসটা।

(ক্রমশঃ)

স্বাপ্নিক

শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন তোমার আজও কি হয়নি শেষ
স্বাপ্নিক তুমি ঘুম হতে আজ জাগো,
আঁধার ঘনায়, চারিদিক হতে উঠেছে ঝড়
অন্তর দিয়ে আজিকে তুমি ধৈর্য্যের বর মাগো।
সারাটি জীবন গেয়ে গেলে তুমি স্বপ্নের জয়গান,
রঙীন নয়নে রাঙালে এ পৃথিবীরে,
ধূ ধূ মাঠে তুমি দেখে গেলে শুধু সবুজ ধানের শীষ
ঝিনুক কাঁচেরে বলে গেলে তুমি হীরে।
স্বপ্ন দেখার নেশায় তুমি কি আজিও রবে বিভোর
কল্পনা-রথে উধাও হবে কি চাঁদের দেশে?
মত্ত সাগর বুকে সাঁতারিয়া কূল পেতে চাবে তুমি
নীলাকাশে বুঝি উড়ে যাবে এক ছোট্ট পাখীর বেশে।
যদি একবার নয়ন মেলিয়া চেয়ে দেখ পৃথিবীরে
লজ্জায় তুমি ফেরাবে তোমার মুখ;
এতদিন ধরে কোন্ পৃথিবীর গান গেয়ে গেলে তুমি
কোন্ পৃথিবীর মাঝে ফিরে যেতে অন্তর উৎসুক।
হেথায় কি তুমি দেখনি কখন কারা কেঁদে যায় পথে
কাদের নয়ন-জলে হ'ল আজ পথ পিছিল,
প্রেতের মত পথে পথে চলে কারা আজ দিশাহারা
দেখনিক তুমি নরকঙ্কালে স্তূপ মিছিল।
হেথায় কি তুমি দেখেছ কখন ডাষ্টবিন খুঁটে কারা বাঁচে,
আঁস্তাকুড়ের অন্নের লাগি মানুষে কুকুরে হানাহানি
স্বাপ্নিক তুমি দেখনি কখন হাজারে হাজারে কারা মরে
কাদের কান্না আকাশে বাতাসে আজিও করিছে কানাকানি।
স্বাপ্নিক তুমি দেখ চেয়ে দেখ মুদিত নয়ন মেলিয়া চাও
স্বপ্ন দেখার ভ্রান্তি হোক আজ শেষ।
জীবনে জীবনে যত যন্ত্রণা অনুভব কর মনে মনে
দেখ চেয়ে দেখ আলোর নাহিক লেশ।
স্বাপ্নিক তব আহ্বানে আজ পথহারাদের জাগায়ে দাও
যারা কেঁদে যায় এক ফোঁটা আলো লাগি,
অন্তবিহীন বেদনায় যদি পার তবে দাও সান্ত্বনা
তব সঙ্গীতে উঠুক তাহারা জাগি।

দেওয়ান-ই-খাস ও জাসমিন টাওয়ার—আগ্রা দুর্গ

আগ্রায় তিন দিন

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

একদা শরৎকালের বেলাশেষে আমরা এসে দাঁড়ালাম তাজমহল স্মৃতি-সৌধের সম্মুখে। মনে ছিল বিস্ময়, ছিল ব্যাকুলতা; মৃত্যুকে অমৃতরূপে, প্রেমকে ক্ষেমরূপে, দুঃখকে কীর্তিরূপে, স্বপ্নকে সৌন্দর্য্যরূপে অবলোকন করবার প্রবল আগ্রহ। তাজমহল দেখে সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলাম এক অপার্থিব প্রেমের সত্তাকে—যে প্রেম অবিনশ্বর হয় বিচ্ছেদের দহনে। শ্যামল তরুরাজি ও উদ্যান-বাটিকা-সমাচ্ছন্ন, এবং চতুর্দিকে সুবৃহৎ রক্তবর্ণের তোরণদ্বারবেষ্টিত শুভ্র মর্ম্মর-সৌধে বন্দী হয়ে রয়েছে সম্রাট শাজাহানের স্বপ্ন—অমর কীর্তি তাজমহল। আমরা এই পবিত্র সমাধি-মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। সম্রাট ও বেগমের আসল সমাধি আছে একেবারে নীচের তলায় একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। একদা যে স্থান মণিমাণিক্যের উজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত ছিল, আজ সেখানে অন্ধকার বিদূরণের জন্য মিটমিট করে জ্বলছে একটি কেরোসিনের প্রদীপ। নানাবর্ণের বিচিত্র কারুকার্য্যমণ্ডিত শ্বেত প্রস্তরের দুটি পাষাণ-বেদিকার অন্তরালে পাশাপাশি চিরনিদ্রাভিভূত রয়েছেন সম্রাট শাজাহান ও তাঁর প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ। সমাধিগাত্রে কোরাণের শ্লোক উৎকীর্ণ—সেই সমাধিতে আমরা পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে উপরে এলাম। এখানে সাধারণের দর্শনার্থে বাদশাহী সমারোহের নিদর্শনস্বরূপ নকল সমাধি রক্ষিত রয়েছে। এই সমাধিযুগল ঠিক আসলেরই অনুরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, শুধু আয়তনে কিছু বৃহৎ হবে। এই সমাধির চতুষ্পার্শ্বে যে শ্বেতপ্রস্তরের জালির পর্দাটি বিলম্বিত তার কারুকার্য্য অতি চমৎকার। তাজমহল যে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য নামে খ্যাত তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এই জালির পর্দাটির শিল্পনৈপুণ্য। এই বৃহৎ মর্ম্মর-প্রাসাদের সমস্ত প্রাচীরগাত্রে আঙুর ফল, ফুল, লতা আর পাতা খোদিত। প্রত্যেকটি লতা-পুষ্পের নির্ম্মাণকৌশল বিভিন্ন প্রকারের। স্থানে স্থানে প্রাচীরগাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ছিদ্র বিদ্যমান—সেই ছিদ্রগুলি স্ফটিকখণ্ড দ্বারা আবৃত এবং সেই স্ফটিকাবরণের মাধ্যমেই বাইরে থেকে সমাধিকক্ষে আলোক প্রবেশ করে। এই সমাধি-মন্দির নাকি একদা সূর্য্যকান্ত মণি, চন্দ্রকান্ত মণি, নীলকান্ত মণি, পদ্মরাগ মণি এবং আরও নানা মূল্যবান রত্ন দ্বারা পরিশোভিত ছিল। মনে হ'ল প্রাচীরের ঐ স্ফটিকদ্বারা আবৃত ছিদ্রগুলিতে একদা ঐ সকল মণিমাণিক্য গ্রথিত ছিল এবং সেই রত্নরাজির প্রভায়ই সমাধিভবন উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে থাকত।

সমাধিভবনের বাহিরে প্রশস্ত চত্বরের প্রাচীর-গাত্রেও বিচিত্র ভাস্কর্য্যশিল্পের নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়। কোনও কোনও স্থানে মর্ম্মর-গাত্রে উৎকীর্ণ বৃহৎ পুষ্পের অভ্যন্তরভাগ ভগ্ন এবং কৃষ্ণবর্ণ দেখে গাইডকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললে, "অগ্নির সাহায্যে এই সকল স্থান হতে

আগ্রা-দুর্গ

সিংহদ্বার দিয়ে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। ১৮৫৭ সালের সিপাহী-যুদ্ধের সময় থেকে এই প্রবেশ-পথের নাম হয়েছে অমরসিং দ্বার। অতীতে এই প্রাকারাভ্যন্তরে পাঁচ শত মহল ছিল, কিন্তু এখন তার বেশীর ভাগই কালের স্থূল হস্তাবলেপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তথাপি আজও যাহা বিদ্যমান আছে, তাহা দর্শকের চিত্তকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। এই দুর্গে যথাক্রমে আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাজাহান এই তিন জন শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাটের কীর্ত্তিচিহ্নের নিদর্শন বিদ্যমান। একদা যেখানে দলে দলে প্রহরী প্রহরায় নিযুক্ত থাকত আজ সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখী
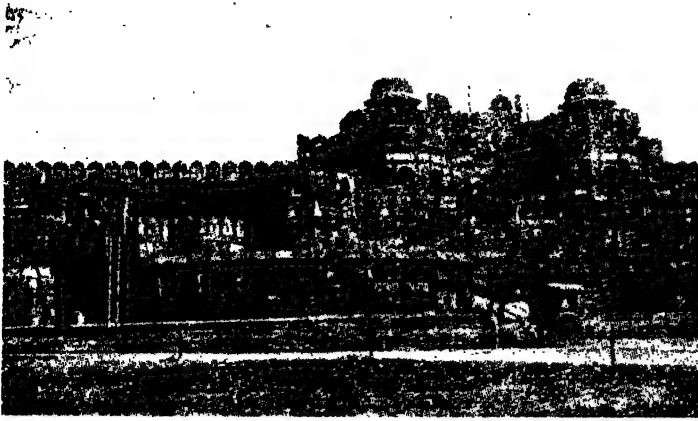
হীরক অপহরণ করা হয়েছে।" এই সুবৃহৎ স্মৃতি-সৌধের সর্বত্র সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের দ্যোতক ভাস্কর্য্যশিল্পের বিচিত্র সব নিদর্শন তিন শত বৎসরের কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে মুক্ত আকাশের তলায় সগর্ব্বে উচ্চ শিরে দণ্ডায়মান আছে। বৃহৎ চত্বরের চারদিকে অনেকক্ষণ ঘুরে বেরিয়ে অবশেষে আমরা যমুনার ধারে একটি প্রস্তর-বেদিকায় গিয়ে বসলাম। এ যমুনার প্রাণও নেই, গানও নেই; শুধু অতীতের স্মৃতি নিয়ে সে নির্জীবের মত পড়ে আছে। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল, অবশেষে অন্ধকার কেটে গিয়ে দূরে যমুনার পারে দেবদারু বনের শীর্ষে আকাশে উঠল দেবীপক্ষের চাঁদ। সেই অনতিস্ফুট জ্যোৎস্নায় দেখলাম তাজের আর এক স্বপ্নময় রূপ—যে রূপের মাধুরী শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করা যায়, কিন্তু ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। নির্জ্জন বনস্থলী, নির্ব্বাক যমুনা—জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে তাজ মৃদু মৃদু হাসছে। এদিকে রাত বাড়ছে—আর দেরি করা চলে না, কাজেই আমরা উঠে পড়লাম। হুলা পাপ্‌ড়ি বিরাট চত্বরের অন্ধকার কোণে অপদেবতা আছে কিনা তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল আমাদের ডাকে তারা ফিরে এল। জ্যোৎস্নার আল্পনা-আঁকা তরুবীথিকার ছায়াপথ অতিক্রম করে নীরবে তাজের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা মুসাফিরখানা পিছনে ফেলে রাজপথে এসে দাঁড়ালাম। পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করতে দেখলাম বহুদূরে আকাশের পটে আঁকা তাজের শুভ্র গম্বুজ—যেন মহাকালের ললাটে শ্বেত-চন্দন-তিলক, এক মহাশিল্পীর নিপুণ হস্তের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

আগ্রা হোটেল থেকে কোর্ট খুব কাছে। পরের দিন ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লাম আমরা কোর্ট দেখবার উদ্দেশ্যে। এই বিরাট দুর্গ এক বেলায় দেখে শেষ করা অসম্ভব। এর সামরিক বিভাগটি এখন বন্ধ আছে। আমরা অমরসিং

কলরব করে বেড়াচ্ছে। প্রাকারাভ্যন্তরে কি অদ্ভুত নীরবতা, কি গভীর প্রশান্তি! আমরা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে জাহাঙ্গীর মহলে প্রবেশ করলাম। এখানে লাল বেলে পাথরে নির্ম্মিত যোধাবাঈ মহলের কারুশিল্প অতি চমৎকার। সমস্ত কক্ষের প্রাচীর-গাত্রে সোনালী ও নানা বর্ণে মিশ্রিত চিত্রাবলী লক্ষ্য করা যায়। যোধাবাঈ মহলে মোগলযুগের এই স্থাপত্য-শিল্পের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতিরও কিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়—যদিও বর্ত্তমানে সে শিল্পসম্পদ বহুল পরিমাণে বিনষ্টপ্রায়।

এই প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে একটি প্রকাণ্ড জলাধার আছে। এর উচ্চতা পাঁচ ফুট, ব্যাস আট ফুট এবং পরিধি আটাশ ফুট। এই আশ্চর্য্য জলাধারটি একখানি কষ্টিপাথর কেটে নির্ম্মিত হয় ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে। প্রবাদ—এটা সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং তাঁর আমলে সুরাধার রূপে ব্যবহৃত হ'ত। তারপর ভগ্নপ্রায় আকবরী মহল ও রমণীর খাসমহল দেখে আমরা গেলাম শাজাহানের স্মৃতিজড়িত ভবন মুসাম্মন বুরুজে। এই বিরাট দুর্গের বহুসংখ্যক মহলের মধ্যে আমার এই মহলটিই সবচেয়ে ভাল লাগল। এইখানেই পুত্রহস্তে বন্দী সম্রাট জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন, এবং এই মর্ম্মরনির্ম্মিত কক্ষেই ঠিক তাজমহলের মুখোমুখি পেতেছিলেন তাঁর শেষশয্যা। এখানকার এই যমুনার শীকরসিক্ত বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস। এই ভবনটি এমন সুপরিকল্পিত ভাবে নির্ম্মিত যে, এর চতুর্দ্দিক থেকে তাজমহলকে স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। এই ভবন এবং অলিন্দ শুভ্র মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত। এখানকার প্রাচীর-গাত্রেও সূক্ষ্ম জালির কার্য্যের শিল্পনৈপুণ্য বিস্ময়কর। সমগ্র ভবনটির পাষাণগাত্র বহু মূল্যবান নানাবর্ণের রত্নরাজি দ্বারা শোভিত। এর বহু স্থান হতে বহু রত্ন অপহৃত

হয়েছে, শূন্য ছিদ্রগুলি দেখলে সেকথা বুঝতে বিলম্ব হয় না। এই ভবন-সংলগ্ন অলিন্দের রত্নশোভিত কারুকার্য্য গৃহেরই অনুরূপ। এই অলিন্দে বসে বন্দী সম্রাট তাজমহল দেখতেন। দেখতে দেখতে হয়তো অশ্রুজলে তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যেত তবুও তিনি চোখ ফেরাতে পারতেন না। অলিন্দের প্রাচীর-গাত্রের একটি অতি ক্ষুদ্র স্ফটিক-খণ্ডের মধ্য দিয়ে আমরা তাজমহলের পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখতে পেলাম। গাইড বললে, সম্রাট কখনও কখনও এই স্ফটিক-খণ্ডের মধ্য দিয়ে তাজমহলকে দেখতেন। মনে হ'ল বাদশাহী আমলে নিশ্চয়ই এখানে কোনও মূল্যবান প্রস্তর গাঁথা ছিল, তা অপহৃত হওয়ায় এখন সে স্থানে কাচ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মহলটি মোগলের গৌরবযুগের শেষ অধ্যায়ের স্বাক্ষর বক্ষে নিয়ে আজও বিদ্যমান।

মমতাজের সমাধি

দেওয়ানী খাসের দরবারী-মহল যেন দূর থেকে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। প্রকাণ্ড দরবারী মহলের আনাচে কানাচে আমরা ঘুরে বেড়ালাম। একদিন এ স্থান কত না

তাজমহলের জালির পর্দ্দার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য
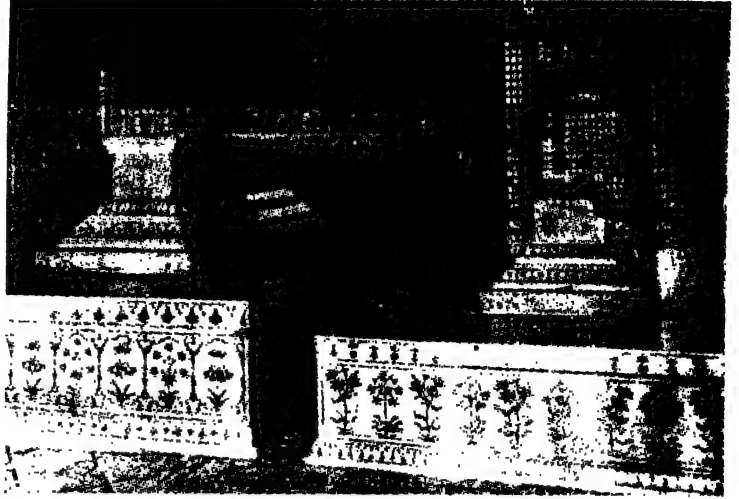
আমীর-ওমরাহদের আলাপ-আলোচনায় মুখর ছিল। আর আজ সেই স্থান মহাশূন্যতা বক্ষে নিয়ে নির্জীবের মত পড়ে রয়েছে; মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান চামচিকাগুলো এই নীরবতা ভঙ্গ করছে। এই ভবনটি দুগ্ধধবল শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। এখানেও প্রাচীর-গাত্রে মহার্ঘ্য রত্নরাজি ঝলমল করছে—কত বিচিত্র বর্ণ ও গঠনের সে সব মণি-মাণিক্য। দরবার-সংলগ্ন উদ্যানের মর্ম্মরাসনে আমরা কিছুক্ষণের জন্য উপবেশন করলাম। কি রমণীয় স্থান! চতুর্দ্দিকের তরু-বীথিকা থেকে ভেসে আসছে স্নিগ্ধ বায়ুবাহিত পাখীর কূজন; মাথার উপর মুক্ত নীলাকাশ, পায়ের নীচে পাথরে বাঁধানো শীতল বেদী, চতুষ্পার্শ্বে গভীর প্রশান্তি। একান্ত নির্জ্জনতায় জায়গাটি থমথম করছে। অতীতে গ্রীষ্ম-কালের সায়াহ্নবেলায়, বেগম সহ বাদশাজাদারা এই স্থানে বসে বিশ্রাম করতেন। কোথায় হারিয়ে গেছে সে সকল দিন। আজ আমরা কয়েক জন ভ্রমণ-বিলাসী সেই শূন্য আসনে বসে তিন শত বৎসরের অতীত ইতি-হাসের পানে দৃষ্টিপাত করছি; বিগত দিনের মহিমাকে প্রত্যক্ষ করছি মনশ্চক্ষে।

মতি মসজিদের ঐশ্বর্য্য সত্যই বিস্ময়কর। এই সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে প্রাচীর-বেষ্টিত বৃহৎ ভজনালয়টি আগাগোড়া শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত। এর গঠনে শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার নিদর্শন পরিলক্ষিত না হলেও এই বিরাট পরিবেশের মধ্যে এমন একটি শান্ত গাম্ভীর্য্য ও মুক্ত ঔদার্য্য বিরাজ করছে যা মনকে স্বতঃই আকৃষ্ট করে, চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত প্রশান্তি চঞ্চল চিত্তে স্থৈর্য্য দান করে। মতি মসজিদ ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাজাহান কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। এর নির্ম্মাণ-কার্য্যে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয় এবং এতে সাত বৎসর সময় লেগেছিল। উন্মুক্ত উদ্যানে শ্বেত প্রস্তরাসনে এক সঙ্গে ৫৭০ জন পুরুষ ও

১০ জন নারীর প্রার্থনায় যোগদানের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেব পিতাকে বন্দী করার পর আর তাঁকে উপাসনা করবার জন্য এখানে আসতে দেন নি, তাঁর জন্য মীনা মসজিদ নামে একটি ছোট মসজিদ নির্ম্মাণ করে দিয়েছিলেন। নগিনা নামে এখানে আর একটি মসজিদ আছে। এর শীর্ষদেশে পিতলের গম্বুজগুলি দেখতে ভারি সুন্দর। মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে যখন এই গম্বুজের শীর্ষগুলি ঝকঝক করে জলে তখন এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়। দুর্গ পরিক্রমা করে বহুক্ষণ কাটল। আর সময় নেই, এবার আমাদের ফিরতে হবে। মহলের পর মহল পার হয়ে আমরা এসে দাঁড়ালাম মুক্ত প্রাঙ্গণে। সম্মুখে বিরাট পাষাণ-সৌধ, পদতলে শ্যামল তৃণভূমি। এক দিকে পার্থিব ঐশ্বর্য্য, অপর দিকে প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা—এই দুইয়ের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছিল সম্রাট শাজাহানের জীবনে। মনে হ'ল এই মাটির গভীরে, এখনও হয়ত শুকিয়ে আছে তাঁর শেষ জীবনের কয়েক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু।

শিক্ষা-বিষয়ে বেতারের কার্য্যকারিতা

শ্রীহরিহর শেঠ

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিশুশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্র পর্য্যন্তও যে ভাল ভাবে শিক্ষা দিতে পারা যায় একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত এ মন্তব্যও ব্যক্ত হইতে দেখা যায়, কিন্তু এতাবৎ সে বিষয়ে কোন প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আর বেতারের মাধ্যমে শিক্ষা-প্রবর্ত্তন সম্পর্কে তেমন কিছু শুনা না গেলেও প্রকারান্তরে যে তাহা হইতেছে তাহা গান-শিক্ষা, সীবন-শিক্ষা, হিন্দীশিক্ষা, রন্ধনশিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইতে বেতারের নিয়মিত শ্রোতা মাত্রেই অবগত আছেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বেতার যে সঙ্গীত-শিক্ষার পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক মাধ্যম একথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিত-সমাজ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়াস নাই।

বেতারযন্ত্রকে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ব্যাপারের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করিলে কত সহজে স্বল্পব্যয়ে সুষ্ঠু ভাবে নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন দ্বারা শিক্ষা-জগতে যে যুগান্তর আনয়ন করা সম্ভব তাহা সামান্য চিন্তা করিলেই উপলব্ধ হইতে পারে। এই বিষয়টির প্রতি যাহাতে দেশের শিক্ষা-নুরাগীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেই আশায় আমার এই সামান্য প্রয়াস। এ সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারা যে ভুলভ্রান্তিশূন্য তাহা আমি মনে করি না। তবে যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ-যোগ্য বিবেচিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ ইহার সাফল্যের জন্য তৎপর হন, তাহা হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অনেক সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমার মনে হয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্কুল-কলেজের কতিপয় শ্রেণীতে শিক্ষকের বিনা সহায়তায় বেতার-যন্ত্র সহযোগে বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত প্রভৃতি সাহিত্য, ইতিহাস, স্বাস্থ্যনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি এবং যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে যে যে শ্রেণীতে যতটুকু বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা এবং হয়ত বা লজিক্, দর্শন, অর্থ-নীতি প্রভৃতিও বেশ শিক্ষা দিতে পারা যায়। এই ভাবে অভিনব শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা আবশ্যক।

(১) কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে: এ সম্পর্কে আমার মত পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। এ বিষয়টি মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ্ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা স্থির করিবেন।

(২) কোন্ কোন্ শ্রেণীতে এই ভাবে শিক্ষা দিতে পারা যায়: আমার মনে হয়, স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীতে এবং কলেজের নিম্ন শ্রেণীতেও হয়ত বেতার-মাধ্যমে শিক্ষা-দান করা চলিতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে সাহায্যের জন্য, বিশেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে অমনোযোগী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার এবং বাল-সুলভ চাপল্যবশতঃ তাহারা নিয়ম ও শৃঙ্খলাবিরোধী আচরণ না করিতে পারে তাহা পর্য্যবেক্ষণের জন্য একজন শিক্ষকের উপস্থিতি ও সহায়তা প্রয়োজন। সুতরাং সে ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থায় ব্যয়ভার লাঘবের কথা আসে না।

(৩) কি উপায়ে স্কুল-কলেজসমূহে শিক্ষা দেওয়া হইবে: এজন্য প্রথমে প্রয়োজন যে যে শ্রেণীতে যে যে বিষয় বেতারে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার নিমিত্ত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ্ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বেতার ক্লাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত এবং বিজ্ঞাপিত করা। যেমন, নবম

শ্রেণীর ইতিহাস ৪র্থ পিরিয়ড, ১২৷টা হইতে ১টা। ইংরেজী ৫ম পিরিয়ড ১৷৷টা হইতে ২.টা। এইখানে বলা দরকার যাবতীয় বিদ্যালয়ে একই পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। অবশ্য স্কুল ফাইনাল, আই-এ, বি-এ—এ সকলের জন্য প্রায় একই পাঠ্য পুস্তক স্থির করা থাকে।

(৪) বিদ্যালয়ে বেতার-সাহায্যে শিক্ষাদানের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক: প্রথমেই দরকার একটি বা দুইটি করিয়া বেতারযন্ত্র সংগ্রহ করা এবং রেডিও ক্লাসের জন্য একটি করিয়া স্বতন্ত্র বা অন্ততঃ পক্ষে পার্শ্বের কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা।

(৫) মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয়: বেতারে শিক্ষাদান সম্পর্কিত সকল বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিবার দায়িত্ব মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ্ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের। বেতার বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া সুনিপুণ, বেতারে শিক্ষা দিবার যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তা ছাড়া একই সময়ে বিভিন্ন 'ওয়েভে' কি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া চলিতে পারে তাহা জানিয়া সুচিন্তিত রুটিন প্রস্তুত করা, এই কার্য্যের উপযোগী বেতারযন্ত্র যাহাতে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিদ্যালয়সমূহ পাইতে পারে কোন কোম্পানীর সহিত তাহার ব্যবস্থা করা, যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নাই সেখানকার জন্য যেরূপ যন্ত্র আবশ্যক তাহা পাইবার ব্যবস্থা করা। এ সকল বিষয় তাঁহাদের কর্ম্মতালিকার অন্তর্গত।

(৬) যিনি রেডিও ষ্টেশন হইতে শিক্ষা দিবেন তাঁহার কর্ত্তব্য: এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা। তিনি যে বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতেছেন এ বিষয়ে সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া ধীরে ধীরে বারংবার এক কথা বলায় ধৈর্য্য থাকা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং দরকারমত বলার মাঝে মাঝে ছাত্রদিগকে লিখিয়া লইবার মত সময় দেওয়াও তাঁহার কর্ত্তব্য। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দ্দেশে পাঠ্যপুস্তক সম্মুখে খুলিয়া পাঠ গ্রহণ করিতেও পারিবে। বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকগুলি সচিত্র হইলে এবং চিত্রগুলিতে যদি ক্রমিক সংখ্যা থাকে তবে বুঝাইয়া দিবার সুবিধা হয়।

বেতারের সাহায্যে অতি সহজে নীতিবিষয়ক শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ ভাবে উপদেশাদি দেওয়া যাইতে পারে এবং একসঙ্গে সমগ্র শিক্ষালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাহা গ্রহণ করিতে পারে। এমন কি শিক্ষার্থীদের সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট মানচিত্র বা অন্যান্য চার্ট টাঙ্গাইয়া ভূগোল, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়াও চলিতে পারে। যদি বেতারের সাহায্যে কলেজের শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলেও এ বিষয়ে সহজসাধ্য এবং নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে।

ইহার প্রবর্ত্তনে মনে হয়, শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ অপেক্ষাকৃত প্রীতিকরই হইবে, সুতরাং তাহাদের মনোযোগ অধিকতর আকৃষ্ট হইতে পারে। আর ব্যয়লাঘব হইবে এই অর্থে যে, যে সময়টা বিনা শিক্ষকে বেতারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে, সে সময়ের জন্য শিক্ষকের পারিশ্রমিক দেওয়া বাঁচিয়া যাইবে। মোটামুটি বাংলায় যদি কম-বেশী দুই হাজার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থাকে, সেগুলিতে দুই বা তিন ঘণ্টা বিনা শিক্ষকে কাজ চালাইলে সমষ্টিগত হিসাবে যে ব্যয়ভার লাঘব হইবে তাহা নিতান্ত অল্প নহে। এখানে বেতারের সাহায্যে শিক্ষাদাতার পারিশ্রমিকের কথা মনে হইতে পারে। তাঁহাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক অবশ্যই দিতে হইবে। এক দিকে তাহা যেমন দিতে হইবে অন্য দিকে তেমনি সে সময়টার জন্য অন্যকে যাহা দিতে হইত সেই খরচটা বাঁচিয়া যাইবে। আর যদিই দিতে হয়, তাহা হইলে বেতার পরিচালনা ও পারিশ্রমিক বাবদে বোধ হয় প্রত্যেক স্কুলের মাসিক দুই টাকার অধিক ব্যয়বৃদ্ধি হইবে না।

কি শিক্ষানীতি, কি বেতারযন্ত্র এতদুভয়ের কোন বিষয়েই আমি বিশেষজ্ঞ নই। তবে শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করিতে করিতে ইহার সৌকর্য্যবিধান সম্বন্ধে যে সকল কথা মনে হইয়াছে তাহা বলিবার চেষ্টা করিলাম। আজিও আমাদের দেশে বেতারে শিক্ষাদান সম্পর্কে কোন প্রচেষ্টার কথা শুনা যায় নাই, কিন্তু যদি বাস্তবিকই ইহা দেশ ও জাতির পক্ষে কল্যাণকর বিবেচিত হয় তবে শিক্ষানুরাগীদের এ বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

গান

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

সাহানা—কাওয়ালী

অন্তরবাসি, জাগো তুমি জাগো—
আঘাত দিয়ে মোরে জাগাও
অন্তরে বল কাছে আছো
তুমি জাগো !

একা আমি নই ক্ষণতরে
তুমি আছ তনু মন ভরে
প্রতি কায়া-মন্দির পূর্ণ করে
সুন্দর দেবতা বিরাজো !
তুমি জাগো !

বাহিরে বাহিরে ঘুরে মরি
মাথা ঠুকি 'সুখ' 'সুখ' করি,
তুমি বলি' দাও মোরে নেই সুখ,
সুখ শুধু ধেয়ানে তোমারি !

কবে হবে জাগরণ মম
ফুটিব সে শতদল সম
ভক্তি-প্রেমে নম্র হয়ে
চরণে প্রণাম হয়ে রব
তুমি জাগো ॥

II সা -া সা সা | রা -া রা -সা I রা -পা মা -জ্ঞা | -া -া -া -া I
অ ন্ ত র বা ০ সি ০ জা ০ গো ০ ০ ০ ০ ০

II
মা মা রা -া | সা -া -া -া I সা ণা -া ধা | ণা -া ধা পা I
তু মি জা ০ গো ০ ০ ০ আ ঘা ত্ দি য়ে ০ মো রে

ধা -মা পা -া | -া -া -া -া I সা -া সা সা | রা রা রা সা I
জা ০ গা ০ ০ ০ ও ০ অ ন্ ত রে ব ল কা ছে

রা -পা মা -জ্ঞা | -া -া -া -া I মা মা রা -া | সা -া -া -া II
আ ০ ছো ০ ০ ০ ০ ০ তু মি জ্ঞা ০ গো ০ ০ ০

[না না] [র্সা নর্সা -র্রা]
II {মা পা না না | না -া না না I না -র্সা র্সা -া | -া -া -া -া I
কা আ মি ন ই ক্ষ ণ ত ০ রে ০ ০ ০ ০

পা পর্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা I নর্সা -র্রা র্রা -া |
তু মি আ ছ ত নু ম ন ভ ০ ০ রে ০

া -া (জ্ঞর্রা -জ্ঞর্রা) } I -া -া I র্সা র্রা র্সা র্সা | র্সণা -া ণা ণা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ প্র তি কা য়া ম ন্ দি র

ধা -র্সা ণা ধা | পা -া -া -া I সা -া সা সা | রা রা রা সা I
পূ ০ র্ণ ক রে ০ ০ ০ সু ন্ দ র দে ব তা বি

রা -পা মা -জ্ঞা | -া -া -া -া I মা মা রা -া | সা -া -া -া II
রা ০ জো ০ ০ ০ ০ ০ তু মি জ্ঞা ০ গো ০ ০ ০

II {ণ্া ণ্া পা পা | ন্া ন্া ন্া ন্া I ন্া -সা সা া | -া -া -া -া I
{বা হি রে বা হি রে ঘু রে ম ০ রি ০ ০ ০ ০ ০

প্া সা সা সা | সা -া সা -া I ন্সা -রা রা -া | -া -া -া -া I
মা থা ঠু কি সু খ্ সু খ্ ক০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০

গমা মা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা -মা মা মা I মা -পা পা -া | -া -া -া -া I
তু মি ব লি' দা ও মো রে নে ই সু খ্ ০ ০ ০ ০

মা -জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা মা মা মা I রা -া সা -া | -া -া -া -া} II
সু খ্ শু ধু ধে য়া নে তো মা ০ রি ০ ০ ০ ০ ০}

[না না] [র্সা নর্সা -র্রা]
II {মা পা না না | না না না না I না -র্সা র্সা -া | -া -া -া -া I
{ক বে হ বে জা গ র ণ ম ০ ম ০ ০ ০ ০ ০

পা পর্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা I নর্সা -র্রা র্রা -া

ফু টি ব সে শ ত দ ল স০ ০ ম ০

-া -া (-জ্ঞর্রা -জ্ঞর্রা) } I -া -া I র্সা -র্রা র্সা র্সা | র্সণা -া -া -া

০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ভ ক্ তি প্রে মে ০ ০ ০

ধা -র্সা ণা ধা পা -া া -া I সা সা সা সা | রা -া রা সা I

ন ০ ম্র হ য়ে ০ ০ ০ চ র ণে প্র ণা ম্ হ য়ে

রা -পা মা -জ্ঞা | -া -া -া -া I মা মা রা -া | সা -া -া -া

র ০ বো ০ ০ ০ ০ ০ তু মি জা ০ গো ০ ০ ০

একা

শ্রী"কুড়রাম" ভট্টাচার্য্য

চৈতি দিনের বেলাশেষে জীর্ণ দেহখানি
এসেছি আজ শীর্ণা নদীকূলে,
চেয়ে আছি ঘাটের ধারে, পারের তরী যত
একে একে চলছে হেলে দুলে।

ক্লান্ত রবি দিগন্তের ঐ পারে
হাতছানিতে ডাকুছে বারে বারে,—
বেলা যে নাই, নাইক সময় আর,
নাম্‌লো ছায়া শ্যামধরণীর 'পরে ;
ভাবছি বসে নদীর কূলে একা
কেমন করে ফিরবো আপন ঘরে।

গোধূলিতে ধূসর মলিন দেহ
রাখালেরা ফিরছে ঘরের টানে,
উদাস প্রাণে বাজিয়ে বাঁশের বাঁশী
মেঠো হাওয়া মাতিয়ে বাউল-গানে।

চলার পথে সঙ্গে এলো যারা
অবেলাতে কেউ দিল না সাড়া ;
সবাই শুধু মত্ত আপন কাজে,
আমার পানে চোখ মেলে না কেহ,
একলা আমি নদীর বালুচরে
ভাবছি বসে লয়ে মলিন দেহ।

অশথ তরুর শীর্ণশাখা হ'তে
শেষ পাতাটি ঐ যে বিদায় মাগে,
আকাশভরা লক্ষ তারার মাঝে
একটি তারা আপন মনে জাগে।

নিবিড় হলো সাঁঝের কালো ছায়া,
ডাকছে শিবা লুকিয়ে আপন কায়া ;
আঁধার হেরি' উড়ন্ত ঐ পাখী
ফিরছে কুলায় কাঁপিয়ে কালোপাখা,
নদীর জলে ছড়িয়ে রূপের আলো
চাঁদের ছায়া ডুবছে আঁকা-বাঁকা।

বারেক দেখি পিছন ফিরে চাহি'
তিমির ঢাকা পথের রেখাপাশে।
"ফেরার পথে কে আছে মোর সাথী ?"
আকুল হয়ে ডাক্‌ছি কাতর প্রাণে।

সে ডাক আমার ফিরেই শুধু আসে,
দুরু দুরু, প্রাণ যে কাঁপে ত্রাসে ;—
এই পারেতে সন্ধ্যা হয়ে এলো
পারের তরী ফিরবে কখন ঘাটে ?
একলা বসে সারা সকাল-সাঁঝে
আপন মনে দিনগুলি মোর কাটে।

চিরবিলুপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রূপকথায় পথিভ্রষ্ট রাজপুত্র কর্ত্তৃক অরণ্যমধ্যে অট্টালিকা ও তদধিষ্ঠাত্রী কোন রাজকন্যার আবিষ্কারবার্ত্তা বালক-বালিকাদের চিত্ত যেমন আকৃষ্ট করে, তেমনই সময়ে সময়ে বিশাল অরণ্যসদৃশ সংস্কৃত গ্রন্থরাশির মধ্যে অশ্রুতপূর্ব্ব গ্রন্থের আবিষ্কার গবেষকের শ্রমকাতর চিত্তে অমৃত-সিঞ্চনের কাজ করে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এইরূপ একটি অপূর্ব্ব আবিষ্কারের কথা সংক্ষেপে লিখিত হইল। ছয় বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত এক সুবিখ্যাত পণ্ডিত-প্রবরের অনুরোধে তাঞ্জোরের 'সরস্বতী মহাল' পুথিশালা হইতে "প্রেমরসায়ন" নামক একটি গ্রন্থের অনুলিপি আমরা আনাইয়াছিলাম।১ আমাদের ধারণা ছিল, ইহা বোধ হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অর্থাৎ মহাপ্রভুর মতাবলম্বী কোন গোস্বামি-রচিত গ্রন্থ। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, গ্রন্থকার 'বিশ্বনাথ পণ্ডিত' চৈতন্যমতাবলম্বী ছিলেন না—তিনি সম্পূর্ণ পৃথক্ এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক এবং এই চিরলুপ্ত সম্প্রদায়ের গ্রন্থরাশির মধ্যে বোধ হয়, এই একটি মাত্র নিবন্ধই আবিষ্কৃত হইল। ইহা গদ্যপদ্যাত্মক একটি 'প্রকরণ' (৫০ পত্রে সম্পূর্ণ) মোট ২১২ কারিকা ও তাহাদের গদ্যাত্মক ব্যাখ্যা। মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ব্যাজস্তুতিরূপে রচনা করিয়া গ্রন্থকার কবিত্ব দেখাইয়াছেন :

> কীর্ত্তিপ্রতাপ-বিধুতাম্বুসমুজ্জ্বলানি
> বীরৈঃ কৃতানি বদনানি দিশাং প্রযত্নং।
> সুব্যক্ত-গোপবনিতানয়নান্তপাত-
> পাত্রৈকরূপতিমিরাণি ময়া তু তানি ॥

(অর্থাৎ, পণ্ডিতেরা যে দিগ্‌বধূদের বদন কীর্ত্তিচন্দ্র ও প্রতাপসূর্য্যের আভায় সমুজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন আমি প্রযত্নপূর্ব্বক তাহা তিমিরাবৃত করিয়া দিলাম, গোপিনী-গণের দৃষ্টিপাতের একমাত্র পাত্রটির শ্যামরূপদ্বারা)। ব্যাখ্যাটি অতি সংক্ষিপ্ত :

"ইহ কশ্চিদ্‌গ্রন্থারম্ভে প্রেম নিরূপয়িতুং প্রেমাতিশয়াভি-ব্যঞ্জকবর্ণনেন শ্রীকৃষ্ণং নির্দিশতি কীর্ত্তীতি। অত্র ব্যাজস্তুতির-লংকারঃ। যদপি মাদৃং কবিমদোৎকর্ষমাবেদয়ন্ গ্রন্থারম্ভে নিবধ্নমর্হঃ তথাপ্যেতদুপস্কার্য্যত্ব শ্রীকৃষ্ণৈকতানমতারূপস্য প্রকৃত-গ্রন্থপ্রতিপাদ্যপ্রেমনিরূপণোপযোগিত্বাৎ সোঽয়ং এব নিবদ্ধম্।"

গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনা দ্বিতীয় শ্লোকে আছে :

> উচ্ছলদ্ভাবকল্লোল-শৃঙ্গারাদিরসাকরঃ।
> জয়ত্যপারো গম্ভীরশ্চিরং প্রেমমহার্ণবঃ ॥

ব্যাখ্যা—উচ্ছলন্তোঽহমহমিকয়া ইব ব্যক্তীভবন্তো ভাব-লক্ষণাঃ কল্লোলা বৃহত্তরঙ্গা যেষু শৃঙ্গারাদিরসেষু তেষামাকরঃ, প্রেমমূলেষ্বসাধারণাবির্ভাবাৎ। অত্র ভাবাঃ কল্লোলপদনামা-ধিকরণ্যাদ্ ব্যভিচারিণোঽনুভাবাশ্চ গৃহ্যন্তে। অপারঃ ইতর-চেতোবৃত্তিবৎ কালয়োগানাস্পদত্বাৎ। গম্ভীরঃ বিয়োগিনস্তৎসময়ে-ঽনুভবাৎ কথঞ্চিদনুভবেঽপি তেষামনভিজ্ঞত্বাৎ।...অতএব জয়তি, মুক্তিহেতুজ্ঞানে এবাস্ত বিশ্রান্তেঃ)।

লক্ষ্য করা আবশ্যক, গ্রন্থকার 'কশ্চিৎ' বলিয়া স্বকীয় নাম এ স্থলে গোপন করিয়াছেন। গোপীপ্রেমের বিশ্রান্তি মুক্তিহেতু জ্ঞানে—একথা চৈতন্যসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত-বিরোধী। গ্রন্থশেষে চারিশ্লোকে গ্রন্থকার মূল্যবান্ তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

> চিরন্তনগ্রন্থসমুদ্ভবোঽসৌ যত্নোঽপি সন্তাবনকারবদ্ভিঃ।
> নানামতব্যাকৃতিকল্পিতো নির্দিষ্টবিশ্বমূলমাত্রযোনিঃ ॥১

অর্থাৎ, এই নিবন্ধে নানা মতের ব্যাখ্যা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

> বহূক্তং বহুভির্গ্রন্থৈঃ "সূত্র-তন্ত্রামৃতাদিভিঃ"।
> তদেবানূদিতং কিঞ্চিন্ময়া সমুদ্ধৃতম্ ॥২

অর্থাৎ—সূত্র, তন্ত্রামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে যাহা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে তাহারই কিয়দংশ মৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে, নিজের কথা ইহাতে নাই।

> স্খলনং যত্র শক্তানামপি সুস্নেহপিচ্ছিলে।
> পথি তত্র মমাশক্তবতঃ সত্যেহ কা কথা ॥৩
> চিত্তবংশেন সংযোজ্য দোষা যদি বিলিপ্যতি।
> তর্হি গৌরচ্যুতপ্রেমচন্দ্রমেষা প্রদাস্যতি ॥৪

পুষ্পিকা যথা :

ইতি শ্রীবিশ্বনাথপণ্ডিত-বিরচিতং তন্ত্রামৃতমতানুসারি প্রেমরসায়নং নাম প্রকরণং সমাপ্তম্।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য প্রধানতঃ দুইটি—প্রেমশব্দের বিস্তৃত লক্ষণ বিচার ও দ্বাদশবিধ প্রেমভেদের উদাহরণসহ বর্ণনা। এই পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রের 'সূত্রকার' ছিলেন শাণ্ডিল্য। যথা :

---

১ তাঞ্জোরের পুথিশালা হইতে পুথি ধার দেওয়া হয় না, কিন্তু অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে পুথির নির্ভরযোগ্য অনুলিপি পাওয়া যায়। বাংলাদেশে পুথিশালাগুলিতে এইরূপ সুবিধা কুত্রাপি নাই। বাঙালী জাতি সর্ব্ববিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া যাইতেছে।

সংযোগেপি পদার্থস্য যদ্বিয়োগোপলালনং।
শাণ্ডিল্যঃ স্বরূপং প্রাহ তদেব প্রেমলক্ষণম্। (১১ কারিকা)

ব্যাখ্যাস্থলে মূল সূত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে,"যোগে বিযোগবৃত্তিঃ প্রেমে"তি। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, শাণ্ডিল্যের 'ভক্তিসূত্র' এই সূত্রাত্মক গ্রন্থ হইতে পৃথক্—ভক্তিসূত্রে এই সূত্র নাই। বোধ হয়, 'প্রেমসূত্র' নামে শাণ্ডিল্যরচিত গ্রন্থ ছিল, যাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। "তন্ত্রামৃত" গ্রন্থ এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব শাণ্ডিল্যসূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যাস্বরূপ। উদ্ধৃত সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে পাওয়া যায়: 'বৃত্তির্বর্ত্তনং, বিয়োগে বর্ত্তনমর্থাজ্জনস্য, বিয়োগস্য বর্ত্তনমবস্থিতির্বা বিয়োগবৃত্তিরিতি তন্ত্রামৃতকারোত্র ব্যাচখ্যৌ'। যে সকল প্রেমলক্ষণ খণ্ডিত হইয়াছে তন্মধ্যে একটি হইল ভরতকৃত:

দ্রবাবস্থৈব চিত্তস্য প্রেমেতি ভরতোঽব্রবীৎ। (১৪ কারিকা)

এই দ্রবত্ববোধের উপায়ই হইল স্বেদাদি অষ্টবিধ সাত্ত্বিক ভাব (১৯-২০ কারিকা)। প্রেমের সিদ্ধান্তলক্ষণ যথা, ইচ্ছাবিশেষঃ প্রেমেতি গুপ্তপাদার্য্যসংমতম্ (৩৮ কারিকা)। এই গুপ্তপাদাচার্য্যই তন্ত্রামৃতকার এবং এই সম্প্রদায়ের পরম প্রামাণিক পুরুষ। তাঁহার বহুতর সন্দর্ভ এই প্রকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে। দুইটি প্রদত্ত হইল:

"চিরকালাবস্থায়িস্বরূপা গাঢ়তা তু ন বাচ্যেতি "গুপ্তপাদাচার্য্যৈরেব তন্ত্রামৃতে অভিহিতম্।" (৩৫।১ পত্র)

"অত্র বহূনি প্রেমমূলবচনানি তন্ত্রামৃতগ্রন্থাদ্ জ্ঞেয়ানি, বিস্তরভয়ান্ন লিখ্যন্তে।" (৪০।২ পত্র)

এই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যের পরিচয়াদি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বলা বাহুল্য, তিনি কাশ্মীর-নিবাসী বিখ্যাত আলঙ্কারিক ও শৈবাগমরচয়িতা অভিনবগুপ্তাচার্য্য নহেন। কিন্তু লক্ষ্য করা আবশ্যক, আনন্দাশ্রম-প্রকাশিত 'শঙ্করদিগ্‌বিজয়' গ্রন্থানুসারে শাক্তভাষ্যকার অভিনবগুপ্তের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিচার হইয়াছিল কামরূপে, কাশ্মীরে নহে (১৫ সর্গ ১৫৮ শ্লোক) এবং গৌড়নিবাসী মুরারিমিশ্র ও উদয়ন ভিন্ন এক "ধর্ম্মগুপ্তমিশ্র"কেও শঙ্করাচার্য্য বাদে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণবিরুদ্ধ উক্তির কোনই মূল্য নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্বাকলে গুপ্তনামক এক প্রধান আচার্য্যের ক্ষীণস্মৃতি এইরূপ বিকৃতাকারে বাঁচিয়া ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। কাব্যপ্রকাশের বহু প্রামাণিক টীকাকার অভিনবগুপ্তকে বিখ্যাত গৌড়ীয় গ্রন্থকার ভবদেব ভট্টের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছিলেন (সা. প. প. ৫২, পৃ. ১০০-২; I. H. Q., xxii, p. 135)—এই আশ্চর্য্য কথাও এ সম্পর্কে স্মরণীয়। গুপ্তনামক এক তান্ত্রিকের নাম প্রামাণিকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে নৈষধকার শ্রীহর্ষের 'স্থৈর্য্য-বিচার' প্রকরণে—তিনি ছিলেন শ্রীহর্ষের গুরু চিদ্বিলাসের প্রতিদ্বন্দ্বী, অর্থাৎ প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক (I. H. Q. xxii, p. 148)। কিন্তু তাঁহাকে তন্ত্রামৃতকারের সহিত অভিন্ন ধরার কোন প্রমাণসূত্র আবিষ্কৃত হয় নাই।

প্রেমের বিভাগ দুইটি আর্য্যাচ্ছন্দের কারিকায় উল্লিখিত হইয়াছে:

উদ্বং বদ্ধং ললিতং দলিতং মিলিতং তথা কলিতং।
হলিতং চলিতং ক্রান্তং বিদ্রুতং গলিতং চ সংভূপ্তম্।
এতদ্বাদশভেদং প্রেম নিরুক্তং "রসামৃত"-গ্রন্থে।
যদ্যমপি লক্ষণতোত্র ব্যাখ্যাস্যেতস্য সংভ্রমঃ।

(৭৯-৮০ কারিকা)

এই বিভাগ অশ্রুতপূর্ব্ব এবং যে প্রমাণগ্রন্থের নামোল্লেখ রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি চৈতন্যসম্প্রদায়ের কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নহে। এই সকল বিভাগের বিস্তীর্ণ আলোচনার পর গ্রন্থশেষে (৪৪-৫০ পত্রে) দার্শনিক যুক্তিবিচার ও তার্কিক-বেদান্তাদিমতের খণ্ডনপূর্ব্বক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত লিখিত হইয়াছে—এই অংশ বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। স্থানে স্থানে গ্রন্থকারের যুক্তি যে ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা বুঝা যায় তিনি নব্যন্যায়ে কৃতবিদ্য ছিলেন—"স্বসমানাধিকরণদুঃখাসমানকালিকত্বস্যাত্যন্তিকত্বস্য দুঃখসামগ্র্যভাবনিবন্ধনতয়া নাত্যন্তিকত্বাংশেপি তত্ত্বজ্ঞানোপযোগঃ" (৪৬।২ পত্র), "বাচ্যতাবচ্ছেদকে লাঘবাদিতি ভাবঃ" (৪৭।২ পত্র) প্রভৃতি সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়, গ্রন্থকার "বিশ্বনাথ পণ্ডিত" খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন এবং বেশী পরবর্ত্তীও নহেন। কারণ "পণ্ডিত" উপাধি বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীর পরে আর প্রচলিত ছিল না—কৃত্তিবাস পণ্ডিত, শ্রীকান্ত পণ্ডিত, কামদেব পণ্ডিত প্রভৃতি অনেকেই ১৫শ শতাব্দীর লোক। বলা বাহুল্য, এই উপাধি একমাত্র বাংলাদেশেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, মিথিলায় নহে এবং নব্যন্যায়ে প্রবীণতা গৌড় মিথিলার বাহিরে তাঁহার অবস্থিতি সূচনা করে না। এই প্রকরণে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের বর্ণানুক্রমিক সূচি ও কতিপয় সন্দর্ভ প্রদত্ত হইল:

কৃষ্ণকল্পদ্রুম (১৪।১, ১৮।২, ১৯।২, ৪২।১)—একটি প্রধান প্রমাণ গ্রন্থ। যথা:

তত্তদ্ভূর্যা গদিতঃ কৃষ্ণকল্পদ্রুমাদিষু। (৬০ কারিকা)

তৎপর 'কৃষ্ণকল্পদ্রুমস্থাঃ কারিকা আহঃ—(৬১-৬৬ কারিকা)

নিত্যং প্রেমপরীতাত্মা কদাচিৎ প্রেমমোহিতঃ।
কৃত্রিমপ্রেমযুক্তশ্চ প্রেমোদারশ্চতুর্থকঃ॥
চত্বারঃ প্রেমভক্তাঃ স্যুস্তত্রাদ্যো গোপিকাগণঃ।
নৈবত্র বিপ্রলম্ভোস্তি কৃষ্ণপ্রেমসমাধিনা॥
দ্বিতীয়ঃ শুকদেবাদিঃ সমাধিচ্ছেদদর্শনাৎ।
ঈষৎপ্রেম্নি হঠাচ্ছিত্তং চিরং যেন নিবেশ্যতে॥
সঃ তার্ত্তীয়ঃ সোপি তাদ্বিবিধস্তত্র চাদিমঃ।
বিষয়স্ত বিয়োবেনাবিয়োবেনোপি চেতরঃ॥
প্রহ্লাদাদিমুখস্ত্বাস্ত অর্জুনাদিস্তথাপরঃ।
গোপীমুখানামুক্তানাং মধ্যে নৈকতমোপ্যহং॥
ইতি শোচতি যো নিত্যং প্রেমোদারঃ স উচ্যতে।
যথা যুধিষ্ঠিরো রাজেন্দ্রোবং ভক্তচতুষ্টয়ম্॥

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভক্তিমার্গের নানা সম্প্রদায় বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিল—আলোকবর্ত্তিকার ন্যায় এই সকল নবাবিষ্কৃত কারিকা সেই অন্ধকার যুগের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

কৃষ্ণচৈতন্যগোস্বামী (১৭.২)—"কৃষ্ণচৈতন্যগোস্বামিনস্তু ভক্তিরত্নে, অধীরসত্ত্বোধীরসত্ত্বো ধীরাধীরসত্ত্বশ্চেতি প্রেমাধারস্য ত্রেধা ভেদমাদর্শয়ন্তঃ প্রেমবিষয়বিশ্লেষে প্রাগুক্ত পক্ষত্রয়ং ব্যবস্থিতমস্তীতি বিশেষমূচিরে।" মহাপ্রভুর পূর্ব্বে অবিকল তন্নামধারী একজন "গোস্বামী" ছিলেন এবং তৎ-রচিত ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থ ছিল ইহা আশ্চর্য্য আবিষ্কার সন্দেহ নাই। 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম যে তৎকালে প্রচলিত ছিল, কুলপঞ্জী হইতে তাহার একটি মূল্যবান্ নিদর্শন আমরা উল্লেখ করিতেছি। নবদ্বীপাধিপতি ভবানন্দ মজুমদারের পিতামহ কাশীনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল বাণীনাথ। বাণীনাথের পাঁচ পুত্র "ভবানন্দ-জগদানন্দ রায়-গন্ধর্বনারায়ণ রায়-পদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য-কৃষ্ণচৈতন্যাঃ"। ভবানন্দ মজুমদারের পিতৃব্য এই কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রায় সমকালীন ছিলেন।

গুণাকর (৯।২, ৪৭।২)—"ভাবচন্দ্রিকা"কার। যথা, "এতন্মতানুসারিণা গুণাকরেণাপি ভাবচন্দ্রিকায়াং হার্দ-সৌহার্দয়োর্লক্ষণমুক্তম্" (৯।২)।

গুপ্তপাদাচার্য্য (৮।১, ৩৫।১)—তন্ত্রামৃতকার।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী (১২।২)—"গোবিন্দচক্রবর্ত্তিনস্তু প্রেম-কলিকায়ামিদমাহুঃ

বাচব্যসনসাহস্রসংপাতেপি নিরন্তরং।
ন হীয়তে বর্দ্ধতেইতি সাধু তৎ প্রেমলক্ষণম্। ইতি

তন্ত্রান্তর (২২।২)—তন্ত্রান্তরোক্তমেযামুত্তরোত্তর ভূমি-কাত্বং বিশদয়তি।

তন্ত্রামৃত (৪।১, ১৮।১-২, ২০।২, ৩৪।১, ৩৫।১, ৩৭।২, ৪০।২, ৪২।২, ৪৫।২, ৪৯)।

নামকৌমুদী (৩৪।২)।
"দৃঢ়প্রেমা তত্র ইত্যাদৌ তু প্রেমপর্য্যোয়রাগনামাভাসয়ঃ।
পুরা ন জায়তে প্রেম জাতং চেন্ন বিনশ্যতি।
যদি নশ্যতি চেত্তৎ প্রেম রাগো হি কেবলম্॥
ইতি নামকৌমুদ্যাং কূর্ম্মোক্তেঃ।"

নারদপঞ্চরাত্র (৪৭।২)—
"গুণাকরস্ত...'প্রেম যত্র হরৌ নীনং স মুক্তপদবীং গত'
ইতি নারদপঞ্চরাত্রাদিত্যাহ।"

পরমানন্দ ঠক্কুর (১৩।১)—
"পরমানন্দঠক্কুরাস্ত প্রেমচন্দ্রিকায়ামন্তথা প্রেমলক্ষণমুদাহরণং চ সংজগদিরে। তদ্যথা,
বস্তুব্যাপারবিষয়া সমীহা হার্দশব্দভাক্।
বস্তুমাত্রাবলম্বা তু প্রেমেতি পদবীং গতা॥

পাতঞ্জল (৪৩।১)—
"আনন্দাকারতাবৃত্তিং বিনা স্বাভাবিকী হৃদঃ।
অসংপ্রজ্ঞাতনামায়ং ব্যক্তঃ পাতঞ্জলোক্তিযু। ১৮৭ কারিকা

প্রেমকলিকা (১২।২)—গোবিন্দকৃত।

প্রেমচন্দ্রিকা (১৩।১)—পরমানন্দকৃত

বিষ্ণুরহস্য (৪০।২, ৪২।১)—
"ইহ তন্ত্রামৃতকারধৃতং বিষ্ণুরহস্যস্থং শ্লোকং প্রমাণয়েন দর্শয়তি,
অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ সংভৃপ্তহৃদয়ঃ সুধীঃ।
জীবন্মুক্তদশোপেতো নাস্ত কর্ত্তব্যমিষ্যতে॥"
ইতি (১৭৩ কারিকা)
"কৃষ্ণকর্ণামৃতধৃতং বিষ্ণুরহস্যস্থং শ্লোকমত্র দর্শয়তি,
কৃষ্ণস্য প্রেম যৎপ্রেমবিষয়েস্ত মদাত্মনি।
আনন্দরূপে যত্রাস্তে ন বিয়োগো মনাগপি।" ১৮২ কারিকা

ভক্তিচিন্তামণি (৮।২)—
"ভক্তিচিন্তামণৌতু বিয়োগবৃত্তিরিতি সূত্রস্য বিয়োগোপ-লালনহেতুভূতচিত্তবৃত্তিরিত্যর্থং বিধায় প্রাগুক্তোহ্য স্বার্থ এব ইতি বিবৃতম্।"

ভক্তিরত্ন (১৭।২)—কৃষ্ণচৈতন্যকৃত।

ভক্তিরত্নাকর (৪।১, ৪৮।১-২—হরিদাসকৃত।

ভরত (৪।২)।

ভাবচন্দ্রিকা (৯।২)—গুণাকরকৃত।

রসামৃত (১৯।১)—পূর্ব্বোক্ত কারিকা দ্রষ্টব্য।

শাণ্ডিল্য (৩।২)—সূত্রকার।

হরিদাস (৪।১, ৩৫।২, ৩৭।১, ৪১।২, ৪৫।২)—ভক্তি-রত্নাকরকার, সম্প্রদায়ের একজন প্রধান গ্রন্থকার। "ভক্তি-রত্নাকরে হরিদাসঃ" (৪।১)। তিনি তন্ত্রামৃতকারের পরবর্ত্তী ছিলেন—

"গুণানুবন্ধিনী হেতুঃ সাধ্যাগুণ্যানুবন্ধিনী।

ভক্তিরেষা বিধেত্যাহ 'ভক্তামৃত'কবিঃ স্বয়ম্। ১১৮ কারিকা "এতস্মিন্ন আয়াৎ পূর্বভাবিনি সংস্তুপ্তে যথা স কলরূপতা-পতিতথা সুধীভিঃ পরিচিন্তনীয়মিত্যাহ হরিদাস ইতি দিক্।" (৪৫।২)

উপসংহারে আমরা দুইটি বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। গ্রন্থকার গৌড়দেশীয় ছিলেন, ইহা গ্রন্থমধ্যে কোথাও স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু গ্রন্থকারের "পণ্ডিত" উপাধি ব্যতীত তাঁহার প্রমাণভূত ব্যক্তিদের গোস্বামী, চক্রবর্ত্তী ও ঠক্কুর উপাধি দেখিলে এ বিষয়ে সকল সংশয় দূর হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থকার মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত কোন গ্রন্থকারের বচনাদি খণ্ডন-মণ্ডনের জন্য উদ্ধৃত করেন নাই। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বেই এই গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। মহাপ্রভুর অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রভাবের ফলে যে এই বিরাট্ সাহিত্যপুষ্ট সম্প্রদায় লোপ পাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ

১

ব্যবসা ও বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙালী কেন এত পিছাইয়া রহিয়াছে তাহার মূলগত কারণ ও উহার প্রতিকারের উপায় কি ইহা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ইংরেজ রাজত্বের প্রাক্কাল হইতে বাঙালী অপর প্রদেশ-বাসীর অপেক্ষা ইংরেজী শিক্ষালাভের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পাইয়াছিল। ইহার ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে তৎকালীন বাঙালী যুবকেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার পর ব্যারিষ্টার, উকিল, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হইত এবং সিভিল সার্বিস ও গবর্ণ-মেন্টের উচ্চপদ লাভ করিবার জন্যই বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিল। ঐ সময় অনেক বাঙালী তাঁহাদের স্বাভাবিক দক্ষতার গুণে বাংলার বাহিরে পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, বিহার এবং অন্যান্য প্রদেশেও ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়াটা শিক্ষিত ও উর্দ্ধতন বাঙালী সমাজ একরূপ আত্মমর্য্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করিতেন। আজ যে ব্যবসা ও বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান অপর প্রদেশবাসীর অপেক্ষা অনেক পিছনে ইহা তাহার অন্যতম কারণ। বাংলায় চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথাও ইহার আর একটা অন্তরায় ছিল। তৎকালীন অর্থশালী ও অর্থোপার্জ্জন-কারী ব্যক্তিরা তাঁহাদের অর্থ ব্যবসায়ে নিয়োজিত না করিয়া জমিদারী ক্রয় করিতে ও লগ্নিতে টাকা খাটাইতে এবং কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিতে বেশী উৎসাহী ছিলেন, কারণ তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা আবদ্ধ করা নিরাপদ নহে।

ইহার পর দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই প্রদেশের জমিদার ও মহাজন অর্থাৎ সুদীকারবারীদের এবং অর্থ-শালী ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ যৌথ কোম্পানীর অংশ ক্রয় অথবা নিজেরাই গঠন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে আরম্ভ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ হইলেও নিজেরাই ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের জমিদারী অভ্যাস, মহাজনী মনোবৃত্তি, আত্মাভিমান ও শ্রমবিমুখতা ঐ সমস্ত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত হওয়ার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইয়াছে। তাঁহারা অপর অভিজ্ঞ সংখ্যালঘু ডাইরেক্টরদের উপদেশ গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং কাহারও কোন প্রকার স্বাধীন সমালোচনা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, জমিদারীতে নিজে উপস্থিত না থাকিলেও নায়েব মহাশয়দের দ্বারা যেরূপ ভাবে জমিদারী পরিচালনা করা সম্ভব হয় সেইরূপ ভাবে ব্যবসা-ও-শিল্প-প্রতিষ্ঠানেও নিজেরা উপস্থিত না থাকিয়া অপর ব্যক্তিদের দ্বারা এগুলি সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারে।

সকলেই অবগত আছেন যে, এই প্রদেশে বহু কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী নিজেরা লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে নানারূপ অসদুপায় অবলম্বন করিয়া অংশীদারদের বঞ্চিত করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক হইতে কোম্পানীর কার্য্যের জন্য টাকা কর্জ্জ করিয়া উহার অপব্যবহার করিবার দৃষ্টান্তও যথেষ্ট পাওয়া যায়। ফলে যাঁহারা ঐ সমস্ত কোম্পানীর অংশ খরিদ করিয়াছিলেন তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছেন। ভবিষ্যতে যে সমস্ত কোম্পানীতে

ঐরূপ অনভিজ্ঞ ও অবাঞ্ছনীয় পরিচালকমণ্ডলী থাকিবে, উহার অংশ খরিদ করিবার পূর্ব্বে জনসাধারণের বিশেষ ভাবে তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতা ও সততার বিষয় অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ইহার প্রতিকারকল্পে ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধনের ব্যবস্থা করিতেছেন তথাপি আমি মনে করি, কেবলমাত্র আইনের দ্বারা ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকার হওয়া সম্ভবপর নয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের যৌথ কোম্পানী-সমূহের বেশীর ভাগ অংশীদারগণ সেরূপ সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ নহেন। এই কারণ এই প্রদেশের যৌথ কোম্পানীর অংশীদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

যে সমস্ত খ্যাতনামা বাঙালী নিজেদের অধ্যবসায় ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ধনীর সন্তান খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, অধিকাংশ অর্থশালী ব্যক্তিদের বংশধরেরা অন্নাভাব না থাকায় অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা মনে করেন না ও আলস্য এবং গল্পগুজব করিয়া দিন কাটাইতে ভালবাসেন।

ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষমতা সকল ক্ষেত্রে বংশগত ভাবে থাকা সম্ভব নয় ইহা লেখাই বাহুল্য। অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরই বহু প্রসিদ্ধ ব্যবসা-ও-শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে নানা প্রকার মতবিরোধিতার জন্য বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে অথবা একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। আরও দেখা যায় যে, যৌথ পরিবারভুক্ত কোনও ব্যক্তি যদি নিজের কর্ম্মকুশলতার দ্বারা কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান লাভজনক ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন তাহা হইলে উক্ত যৌথ পরিবারের সকলেই ঐ ব্যবসায়ে তাহাদের অংশ দাবি করিয়া নানারূপ মামলা মোকদ্দমা সুরু করিয়া দেন। যৌথ পরিবারভুক্ত সকল ব্যবসায়ীর প্রথম হইতেই আইনগতভাবে এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। এই সকল অন্তরায়ের প্রতিকার করিতে হইলে সমস্ত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হইতে হিন্দু-আইনের প্রভাব কমাইতে হইবে অর্থাৎ উহার পরিচালনার ভার কেবলমাত্র বংশধরগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, আবশ্যক হইলে লভ্যের অংশ দিয়া অপর কোন সুদক্ষ পরিচালক নিযুক্ত করা সমীচীন। স্বনামধন্য বাঙালী ব্যবসায়ী স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম্ম-পদ্ধতি প্রত্যেক বাঙালী ব্যবসায়ীর আদর্শ হওয়া উচিত। তিনি কখনও তাঁহার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে অনভিজ্ঞ আত্মীয়-স্বজনদের নিযুক্ত করিতেন না এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বিভাগের পরিচালনার জন্য কেবলমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকেই নিযুক্ত করিতেন। এমন কি তাঁহার পুত্রদিগকেও পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে শিক্ষা না দিয়া কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার দিতেন না।

প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে আমার ব্যবসা-জীবনের প্রারম্ভে আমি একদিন নূতন বৎসরের ক্যালেণ্ডার সংগ্রহের জন্য মার্টিন কোম্পানীর আপিসে গিয়াছিলাম। দেখিলাম যে, তাঁহার প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ বিভাগই অভিজ্ঞ ইংরেজ ও অন্যান্য প্রদেশবাসীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। আমার উপস্থিতি-কালে রাজেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীদিগের বসিবার হলঘরের মধ্য দিয়া নিজ কক্ষে যাইতেছিলেন তখন ঐ সকল উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী দণ্ডায়-মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। এই দৃশ্যটি সেই সময় আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশের ব্যবসায়ীরাও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতন দিয়া কেবলমাত্র সুদক্ষ ব্যক্তিদেরই পরিচালকরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে নিজেদের শিক্ষিত পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে ব্যবসা সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। বাঙালী ব্যবসায়ীদেরও ঐরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

আমার মতে অনুপযুক্ত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন উত্তরাধি-কারী অথবা আত্মীয়-স্বজনের হস্তে কাহারও কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠান অর্পণ করিয়া একেবারে নষ্ট করা অপেক্ষা উহা কোনও সুদক্ষ ব্যবসায়ীকে হস্তান্তর করা শ্রেয়। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ব্যবসা-শিক্ষাভিলাষী অধিকাংশ বাঙালী যুবকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, উচ্চশিক্ষিতদের পক্ষে ব্যবসা-শিক্ষা খুবই সহজসাধ্য এবং অল্পদিনের মধ্যেই ও সামান্য পরিশ্রমে উহা আয়ত্ত করিতে পারা যায়। তাঁহাদের ধারণা নাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করিতে হইলে যেরূপ বহু বৎসর ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় এবং তাহাও অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যবসা-শিক্ষাও তদনুরূপ। কয়েক ক্ষেত্রে আমি দেখিয়াছি যে, কিছুদিন চেষ্টা করিবার পরই তাঁহারা ধৈর্য্য হারাইয়া ব্যবসা-শিক্ষা পরিত্যাগ করেন।

আমাদের আর একটি ত্রুটির বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় যে, নবীন ব্যবসায়ীদের মধ্যে কাহারও কাহারও শেয়ার ও ফাটকা বাজারে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে এবং রাত্রিকালে বড় বড় হোটেলে ও ক্লাবে বহু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যাতায়াতের অভ্যাস অতিমাত্রায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার

বিষময় ফল ও শোচনীয় পরিণাম যে কিরূপ হইতেছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

সকল ক্ষেত্রেই যে এইরূপ হইয়া থাকে এরূপ ধারণা করিলে ভুল করা হইবে। একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, আজকাল কেবলমাত্র বাংলাদেশেই নহে, অপরাপর প্রদেশেও বাঙালীর ব্যবসা পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন প্রসার-লাভ করিতেছে। তবে আমাদের নিজেদের দোষ ও ত্রুটিগুলি অকপটে স্বীকার না করিলে উহার প্রতিকারের কোনও ব্যবস্থা হইবে না এই বিশ্বাসেই আমি এই সমস্ত অপ্রিয় সত্যের আলোচনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছি না।

প্রদেশে শক্তিশালী বণিকসভা ও শিল্প-সমিতির একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। কিন্তু ঐগুলি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাহাতে উহা কতিপয় অর্থশালী উচ্চাভিলাষী এবং স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির কুক্ষিগত না হয় এ দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। ঐ সমস্ত সভা ও সমিতির পরিচালকমণ্ডলী দলগতভাবে অথবা অনুগত বন্ধুদের দ্বারা গঠিত না হইয়া একমাত্র বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই গঠিত হওয়া আবশ্যক এবং সভ্যদের কর্ম্মতৎপরতা কেবলমাত্র নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া প্রদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ও প্রদেশবাসীর উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বণিকসভা ও শিল্প-সমিতিগুলি সকলেই দেশের ও দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন কিংবা কেবলমাত্র নিজেদের সভ্যদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত আছেন তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। কারণ উচ্চ পর্য্যায়ের অনেক ব্যবসায়ী যাঁহারা ঐ সকল সভা ও সমিতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কালোবাজারে বিশেষ সুপরিচিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি শিল্প-সমিতির বিষয় উল্লেখ করিতেছি। কিছু দিন পূর্ব্বে ঐরূপ একটি সমিতির একজন বহু পুরাতন সভ্য কোনও এক অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার জন্য পরিচালকমণ্ডলীতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত পরিচালকমণ্ডলীর অধিকাংশ সভ্যই এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, সমিতির বেশীর ভাগ সভ্যই (majority) যখন ঐরূপ অন্যায়ের সুযোগ লইতেছেন তখন উহার বিরুদ্ধাচরণ করা একেবারেই undemocratic হইবে অর্থাৎ মাইনরিটির উহা মানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য এবং উহার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন চালানো উচিত হইবে না। গণতন্ত্রের এইরূপ অভিনব ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে অক্ষম হওয়ায় ঐ সভ্যটি পরিচালকমণ্ডলীর এবং সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করেন। পরে শুনিয়াছি যে, তাঁহার পদত্যাগে অপর সভ্যেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রদেশ সরকার নানারূপ নির্ম্মাণকার্য্যে বৎসরে বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ঠিকাদারী কার্য্যে বাঙালী নিজ প্রদেশেও অনেক পিছাইয়া রহিয়াছে। ইহার একটি কারণ এই যে, অনেক ক্ষেত্রে ঠিকা বণ্টনের সময় বাঙালী ঠিকাদারেরা সমান সুযোগ পান না। অনেকেই জানেন যে, অপর প্রদেশবাসী বহু শিল্পপতি প্রথমে সরকারী ও বেসরকারী ঠিকাদারী কার্য্য করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার দ্বারাই পরে তাঁহারা বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষিত হওয়া উচিত। প্রদেশ-সরকারের উচিত যে, প্রদেশের অভ্যন্তরে তাঁহাদের ও কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত নির্ম্মাণকার্য্য হইয়া থাকে, উহার ঠিকা বণ্টনের সময় যাহাতে বাঙালী ঠিকাদারেরা সমান সুযোগ পায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা। সকলেই জানেন যে, মার্টিন কোম্পানীর খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাতা রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথমে ঠিকাদারী কার্য্য আরম্ভ করেন এবং উহা হইতে লাভবান হইয়া পরে তাঁহার কোম্পানীতে নানা বিভাগ খুলিয়াছিলেন।

শিল্পপতিদের ও শ্রমিকদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে সকল সময়ে সমন্বয় করা সম্ভব নয়। সেইরূপ ক্ষেত্রে বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়া অনিবার্য্য ; ইহা ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ ভূমির এবং স্বাস্থ্যবান শ্রমিকের অভাব হেতু ও অন্যান্য কারণে ভবিষ্যতে আর কোনও বৃহত্তর শিল্প অথবা কলকারখানা প্রতিষ্ঠা প্রদেশবাসীর স্বার্থের অনুকূল হইবে না এ বিষয় পূর্ব্বেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং কুটীর-শিল্পের প্রসারণের উপরই যতটা সম্ভব আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইবে। ইহার দ্বারা শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা ও মূলধন অভাবে মহাজনদের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন অনেক কমিয়া যাইবে।

বাংলার আর্থিক পরিস্থিতি উপস্থিত যেরূপ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার সমাধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন করা দরকার। বৎসরের পর বৎসর যে কোটি কোটি টাকা নানাভাবে বাংলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে তাহারই ফলে আজ ২৪ পরগণা, নদীয়া ও অন্যান্য জেলায় দারুণ অর্থাভাব হেতু অন্নাভাব দেখা দিয়াছে। ইহা যে ক্রমে ক্রমে সকল জেলাতেই ও সকল স্তরের প্রদেশবাসীর

মধ্যেও শীঘ্রই বিস্তার লাভ করিতে পারে তাহা অনুমান করা অন্যায় হইবে না। গত কয়েক বৎসর হইতে "অধিক পাট উৎপাদন কর" অভিযানের জন্যই আজ শস্যশ্যামলা বাংলাতে তাহার প্রয়োজনানুরূপ ধান্য ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদন হইতেছে না। ধান্য ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা অগ্রে করিয়া কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত জমিতে পাট ও ঐ জাতীয় ফসল করিতে দেওয়া প্রদেশ সরকারের উচিত ছিল। সম্প্রতি খাদ্য বিভাগের পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি শ্রীনিশাপতি মাঝি মহাশয় ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর ও অনান্য কয়েকটি স্থান সফর করিয়া সংবাদপত্র মারফত একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফল ও শাক-সব্জী কলিকাতার বাজারে না পাঠাইয়া স্থানীয় অধিবাসীরা উহার দ্বারা খাদ্যের অভাব অনেকটা পূরণ করিতে পারেন। মাঝি মহাশয় যে পথ দেখাইয়াছেন তাহা সমীচীন কি না জানি না, কারণ অভাবক্লিষ্ট জনসাধারণের নিজেদের ফলের গাছ এবং তরিতরকারী উৎপাদনের জমি আছে কি না সন্দেহ। ঐ সমস্ত জিনিষ ক্রয় করিতে তাহারা অর্থ কোথায় পাইবে তাহা তিনি বলেন নাই। এইরূপ অবস্থায় মাঝি মহাশয়ের উপদেশানুসারে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিদের অন্নাভাব দূর করিতে হইলে তাহাদের তস্করের বৃত্তি অবলম্বন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মাঝি মহাশয়ের স্মরণ আছে কি না জানি না যে গত মহাযুদ্ধের সময় খাদ্যাভাব পূরণ করিবার জন্য জনৈক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, দূর্ব্বা ঘাসের তৈরি নানারূপ খাদ্য মানুষের পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর। মাঝি মহাশয়কে বাংলাদেশে মৎস্য ও মাংসের অভাব পূরণ করিবার জন্য নানা জাতীয় ফড়িং-এর মধ্যে কি পরিমাণ প্রোটিন আছে তাহাও গবেষণা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি কি? বাংলার সরকারী অন্নদাতারা সত্যই কি এইরূপ বিবৃতি দিয়া প্রদেশের অন্ন-সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন?

বাংলার পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামো নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে একমাত্র কুটীর-শিল্পের প্রসারের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। যেমন কোন বৃহদাকার বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে হইলে কেবলমাত্র উহার উপরের শাখা-প্রশাখাগুলি কাটিয়া দিলে কিছুই ফল হয় না, মাটির নীচে উহার সহস্র সহস্র শিকড়কে অগ্রে নষ্ট করা দরকার, সেইরূপ আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অর্থের শোষণের শিকড়গুলি কাটিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব গ্রামের টাকা গ্রামে, পল্লীর টাকা পল্লীতে এবং জেলার টাকা জেলাতে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে—যাহাতে উহা প্রদেশের বাহিরে চলিয়া না যায়। এই উদ্দেশ্যে প্রতি গ্রামে ও পল্লীতে "দেশকল্যাণ সমিতি" গঠন করিয়া "অধিক ধান্য ফলাও", "বাংলার টাকা বাংলায় রাখ", "পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি করো" ইত্যাদি অত্যাবশ্যক অভিযান সুরু করিয়া অর্থের বহির্গমনস্রোত বন্ধ করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে, ইদানীং যুবকদের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে সেরূপ লক্ষ্য নাই। এমন কি গুরুজনদিগের প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য অনেক স্থলে তাহা তাঁহারা করেন না। এই সমস্ত বিষয়ে প্রস্তাবিত সমিতির প্রত্যেক সভ্যের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, অন্যথায় দেশের কল্যাণের পরিবর্ত্তে তাঁহারা একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবেন, ফলে অভিযানগুলি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে এবং এই বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। প্রত্যেক জেলার পরিস্থিতি একরূপ নহে। সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কৃষিক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রত্যেক স্তরে স্থানীয় অধিবাসীদের অর্থ কি ভাবে ক্ষয় হইতেছে এবং উহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার পর সমিতিগুলি তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যসূচী স্থির করিবেন। এই সমস্ত সমিতিতে সর্ব্বভারতীয় রাজনৈতিক দলভুক্ত ব্যক্তিদিগকে যোগ দিতে দেওয়া আদৌ উচিত হইবে না, কারণ তাঁহারা ঐগুলিকে কুক্ষিগত করিয়া ভবিষ্যৎ নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জনসাধারণকে নিজ নিজ দলের সপক্ষে প্রভাবান্বিত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। উল্লিখিত দেশকল্যাণ সমিতি গঠনের প্রস্তাবে সম্ভবতঃ রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিতেরা প্রাদেশিকতা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বাংলার নবীনেরা এ বিষয়ে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইবেন।

মহারাজ পৃথ্বীরাজের মহিষীকুল

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ইহার ঠিক ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে তরাইনের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর হস্তে ভারতের শেষ স্বাধীন হিন্দু সম্রাট্ পৃথ্বীরাজ বন্দী হন, নৃশংসভাবে তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করা হয় এবং আঘাতের পর আঘাত হানিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। সেই দিন হইতে ভারতবর্ষ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়।

সম্রাট্ পৃথ্বীরাজের পরাক্রমের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী সংযুক্তার কথাও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়া আছে। এই সংযুক্তাকে লইয়াই আরম্ভ হইয়াছিল হিন্দু রাজ্য, তথা ভারতবর্ষের ও ইতিহাসের উলটপালট। কিন্তু মহিষী সংযুক্তা মহারাজ পৃথ্বীরাজের একমাত্র রাণী ছিলেন না; শুধু ইহাই নহে, তিনি পৃথ্বীরাজের পাটরাণীও ছিলেন না। রাণী হিসাবে তিনি ছিলেন একাদশ স্থানীয়া ছোট রাণী। রাণী সংযুক্তা ভিন্ন মহারাজ পৃথ্বীরাজের আরও দশ জন রাণী ছিলেন।

কোন কোন পুস্তকে মহারাজ পৃথ্বীরাজের এগার-জন রাণীর নাম বা পরিচয় পাওয়া যায়। আবার কোন পুস্তকে দেখিতে পাই যে, যখন তিনি শেষ বার মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যাত্রা করেন তখন তিনি তাঁহার দশ জন রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। এই হিসাবে দেখা যায় যে, তাঁহার মহিষী ছিলেন দশ জন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার মহিষী এগার জনই ছিলেন; তবে যুদ্ধযাত্রাকালে দশ জন মহিষী জীবিত ছিলেন এবং এক জন সেই সময় স্বর্গারোহণ করিয়া-ছিলেন। কোন কোন পুস্তকে দেখা যায় যে, পৃথ্বীরাজ প্রথম বিবাহ করেন মণ্ডেবরের পরিহার রাজা নাহর রায়ের কন্যাকে। নিয়ম অনুসারে তাঁহারই হওয়া উচিত পাটরাণী। কিন্তু পৃথ্বীরাজের সভাকবি চন্দ "পৃথ্বীরাজ রাসো" নামক পুস্তকে মহারাণী ইচ্ছনীকে পাটরাণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাণী ইচ্ছনী ছিলেন পৃথ্বীরাজের দ্বিতীয় রাণী। তিনি পাটরাণী হইতে পারেন না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনিই ছিলেন পাটরাণী। তাই আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, অল্প বয়সেই পৃথ্বীরাজের প্রথমা মহিষী স্বর্গারোহণ করিয়া-ছিলেন এবং এইজন্যই দ্বিতীয় রাণী ইচ্ছনী হইয়াছিলেন পাট-রাণী। আর এইজন্যই পৃথ্বীরাজের যুদ্ধযাত্রার সময় আমরা দশ রাণীর নিকট হইতে তাঁহার বিদায় গ্রহণের উল্লেখ দেখিতে পাই। নানা পুস্তকে পৃথ্বীরাজ মহিষীদের পরিচয় পাওয়া যায়; বিশেষ করিয়া কবি চন্দ লিখিত "পৃথ্বীরাজ রাসো" নামক মহাকাব্যে পৃথ্বীরাজ-মহিষীদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার উপর নির্ভর করিয়া মহারাজ পৃথ্বীরাজের রাণীদের সামান্য সামান্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

পরিহার রাজা নাহর রায়ের কন্যা

দিল্লীর মহারাজ অনঙ্গপালের দ্বিতীয়া কন্যা কমলার বিবাহ হয় আজমীরের রাজা সোমেশ্বরের সহিত। এই কমলার গর্ভে পৃথ্বীরাজের জন্ম। পৃথ্বীরাজের জন্মের পর হইতেই দিল্লীর অপুত্রক মহারাজ অনঙ্গপাল পৃথ্বীরাজকে খুব ভাল-বাসিতেন এবং মনে মনে তাঁহাকেই দিল্লীর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। মাতামহের স্নেহের টানে পৃথ্বীরাজ অনেক সময়ই দিল্লীতে কাটাইতেন। পৃথ্বীরাজের বয়স যখন আট বৎসর তখন তিনি তাঁর মাতামহের নিকট দিল্লীতে ছিলেন। এই সময় কোন কার্য্যোপলক্ষে মণ্ডেবরের পরিহার রাজা নাহর রায় দিল্লীতে আসেন। দিল্লীতে মহারাজ অনঙ্গপালের দরবারে অষ্ট বর্ষীয় বালক পৃথ্বীরাজকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। মহারাজ অনঙ্গপাল সাদরে এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। ফলে রাজা নাহর রায় তাঁহার কন্যাকে দিল্লীতেই পৃথ্বীরাজকে বাগদত্তা করিয়া রাখেন।

রাজা নাহর রায় কন্যাকে বাগদত্তা করিয়া দেশে চলিয়া গেলে দিল্লীতে, আজমীরে এবং মণ্ডেবরে সমারোহ চলিতে থাকে। তিনটি রাজ-পরিবার আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কিন্তু কালের কুটিল গতি কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। কিছু দিন যাইবার পর রাজা নাহর রায়ের মত বদলাইয়া যায় এবং তিনি স্থির করেন যে, পৃথীরাজের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কনৌজের রাজা বিজয়পালের পরামর্শে নাহর রায় পৃথীরাজের সহিত তাঁহার কন্যাকে বিবাহ দিতে অসম্মত হন। বিজয়পালের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার পুত্র, অর্থাৎ অনঙ্গপালের প্রথমা কন্যা সুরসুন্দরীর গর্ভজাত পুত্র জয়চন্দ্রের সহিত এই বিবাহ হয়।

আজমীরের রাজা সোমেশ্বর যখন জানিতে পারিলেন যে, রাজা নাহর রায় তাঁহার বাগদত্তা কন্যাকে তাঁহার পুত্র পৃথী-রাজের সহিত বিবাহ দিবেন না, তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি ইহাতে মহা অপমান বোধ করিলেন। এই অপমানের জ্বালায় তাঁহার রক্ত টগবগ করিয়া

টিয়া উঠিল। তিনি রাজা নাহর রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে নাহর রায় পরাজিত হইলেন। অবশেষে সন্ধি স্থাপন করিয়া পৃথ্বীরাজের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। এই সময় পৃথ্বীরাজের বয়স ছিল মাত্র এগার বৎসর।

এই নাহর রায়ের কন্যাই হইলেন পাটরাণী। কিন্তু পাটরাণী বলিয়া যে তাঁহার উল্লেখ দেখা যায় না একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মহারাণী ইচ্ছনী

মহারাণী ইচ্ছনী ছিলেন পৃথ্বীরাজের দ্বিতীয়া মহিষী। ইচ্ছনী ছিলেন আবু রাজ্যের পরমার রাজার দ্বিতীয়া কন্যা। এই পরমার রাজাদের কীর্ত্তি—শিল্পকলা ও স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ আজও আবু পাহাড়ের নানা স্থানে বর্ত্তমান। ইচ্ছনী ছিলেন পরমা সুন্দরী, রূপবতী ও গুণবতী। বহু রাজা মহারাজা ইচ্ছনীর রূপেগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাণিপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা পরমার পৃথ্বীরাজের সহিত ইচ্ছনীর বিবাহ দিবেন বলিয়া বাগ্‌দত্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই অন্য কোন রাজা মহারাজা ইচ্ছনীর পাণিপ্রার্থনা করিলে রাজা পরমার তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেন।

ইচ্ছনীর বড় ভগিনীর নাম ছিল মন্দোদরী। গুজরাটের রাজা ভোলাভীমের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; কিন্তু ভোলা-ভীম ইচ্ছনীর অসাধারণ রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইচ্ছনী বা তাঁর পিতা কেহই ইহাতে রাজী হন নাই। এই কারণে ভোলাভীম তাঁহার শ্বশুর সলখ পরমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে পরমার রাজাকে পরাজিত করিয়া ইচ্ছনীকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবেন—ইহাই ছিল তাঁর মনোগত ভাব। এই সময় পৃথীরাজ যৌবনে উপনীত হইয়াছেন। তিনি আবুর রাজার নিকট হইতে ভোলাভীমের যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ পাইলেন। তাহার নিকট বাগ্‌দত্তা ইচ্ছনীকে ভোলাভীম বিবাহ করিবেন, তাহাও আবার পরমার রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, ভোলাভীমের এই সঙ্কল্পের কথা অবগত হইয়া পৃথী-রাজ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং বাছা বাছা সৈন্য লইয়া আবুতে গিয়া হাজির হইলেন। ভোলাভীম আবু পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পৃথীরাজ তাঁহার রাস্তা অবরোধ করিয়া রহিলেন। পৃথীরাজের হাতে পরাজিত হইয়া ভোলাভীম গুজরাটে চলিয়া যান। পরমার রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইচ্ছনীকে বিবাহ করিয়া আজমীরে ফিরিয়া আসেন।

পৃথ্বীরাজের সহিত ভোলাভীমের যে যুদ্ধ হইয়াছিল ইতি-হাসে তাহা নাগর যুদ্ধ নামে খ্যাত। আবুর নিকটে নাগর নামক স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। এই নাগর যুদ্ধে ইচ্ছনীর ভাই জৈতরাও পরমার পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ইনি পৃথ্বীরাজের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

ভোলাভীম যুদ্ধে পরাজিত ও অপমানিত হইয়া গুজরাটে ফিরিয়া গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন না। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভোলাভীম পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিবার নিমিত্ত মহম্মদ ঘোরীকে এক অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করিলেন। সর্দ্দার ও প্রধানগণের প্রতিকূল মত সত্বেও ভোলাভীম মকবানা নামক একজন সর্দ্দারকে ঘোরীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্র পাইয়া মহম্মদ ঘোরী তখন তখনই পৃথ্বীরাজের পিতা সোমেশ্বরের রাজ্য আক্রমণ করেন নাই। পরে যখন মহম্মদ ঘোরী হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, তখন ভোলাভীমের পত্র অনেকখানি প্রেরণা যোগাইয়াছিল এবং আক্রমণ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। অবশ্য এই প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়া-ছিলেন। হিন্দুস্থান আর আক্রমণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে করুণাপরবশ হইয়া পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ইচ্ছনী তাঁহার বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, আচরণ ও দায়িত্ব বোধের জন্য রাণীদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন এবং পাটরাণী হন। যেমন তিনি তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন তেমনি চারিত্রিক সৌন্দর্য্যে ছিলেন মাধুর্য্যময়ী। অন্যায় আচরণকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এমত পৃথ্বীরাজের বাল্যসখা ও প্রধানমন্ত্রী কৈমাসকে পর্য্যন্ত তিনি কৌশলে হত্যা করাইয়াছিলেন।

ব্যাপারটি এইরূপ। কৈমাস পৃথ্বীরাজের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এক সময় কর্ণাটরাজ পৃথ্বীরাজের সভায় এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী নর্ত্তকীকে ভেট পাঠাইয়া-ছিলেন। ইতিহাসে এই নর্ত্তকী "কর্ণাটকী" নামে পরিচিতা। পৃথ্বীরাজ এই কর্ণাটকীকে খুব সমাদর করিতেন এবং রাজ-সভায় শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকীর সম্মান দিয়াছিলেন। কর্ণাটকী দরবারে আসিবার পর হইতেই কৈমাস ইহার প্রতি আসক্ত হন, কিন্তু ইহার সহিত মিলনের কোন সুযোগ তাঁহার হয় নাই। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগ আসিল।

একবার পৃথ্বীরাজ রাজ্যের ভার কৈমাসের উপর রাখিয়া মৃগয়ার জন্য পাণিপথ চলিয়া যান। সুযোগ পাইয়া কৈমাস কর্ণাটকীর সহিত প্রণয়লীলায় লিপ্ত করিলেন। এই প্রেমের জন্য কৈমাস রাজকার্য্যে অবহেলা করিতে লাগিলেন। রাজ-কার্য্যে কৈমাসের অবহেলা বুদ্ধিমতী ইচ্ছনীর নিকট ধরা পড়িল। তিনি জানিতে পারিলেন যে, কৈমাস কর্ণাটকীর সহিত প্রণয়াসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিতেছেন। কৈমাসের এই ব্যবহারে রাণী ইচ্ছনী অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার এক দাসীকে গোপনে পৃথ্বীরাজের

নিকট এক পত্রসহ পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে এই মাত্র লেখা ছিল, "কাক কর্পূর খাইতেছে।"

অনেক রাত্রিতে এই খবর পাইয়া পৃথ্বীরাজ জ্বলিয়া উঠিলেন। বর্ষাকাল, অন্ধকার রাত্রি, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছিল। পৃথ্বীরাজ দুর্য্যোগের কথা না ভাবিয়া তখনই অশ্বারোহণে একাকী দিল্লী রওনা হইলেন। দিল্লী আসিয়া ইচ্ছনীর সহিত দেখা করিলে ইচ্ছনী সব খুলিয়া বলিলেন এবং কর্ণাটকীর মহলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সেই দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। মহারাজ ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ করিয়া কর্ণাটকীর মহলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন কর্ণাটকীর ঘরে আলো জ্বলিতেছে আর তাঁহার বাল্যসখা কৈমাস সেই ঘরের গবাক্ষে বসিয়া কর্ণাটকীর সহিত মধুর আলাপ করিতেছেন। পৃথ্বীরাজ অধিকক্ষণ এই দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না; ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বাণ চালাইলেন। বাণ কৈমাসের বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে কৈমাসের মৃতদেহ গবাক্ষপথে নীচে পড়িয়া গেল।

সংযুক্তাকে বিবাহ করিবার পর মহারাজ পৃথ্বীরাজ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সংযুক্তাকে লইয়া প্রমোদে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। কোন পুরুষের রাজপ্রাসাদে প্রবেশাধিকার রহিল না। কাহারও পৃথ্বীরাজের সহিত দেখা করিবার ক্ষমতা রহিল না। রাজকার্য্যে ও রাজ্য-পরিচালন ব্যবস্থায় আসিয়া পড়িল শিথিলতা ও অনিয়ম। মহম্মদ ঘোরী তাঁর পূর্ব্বপরাজয় ও অপমানের কথা ভুলেন নাই। তিনি গুপ্তচর পাঠাইয়া পৃথ্বীরাজের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা জানিতে পারিলেন। এদিকে জয়চন্দ্র পূর্ব্বেই মহম্মদ ঘোরীকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। ঘোরী সিন্ধুনদ পার হইয়া অনেকটা অগ্রসর হইলেন। ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, এই সংবাদ দিল্লীতে সকলেই জানিতে পারিল কিন্তু পৃথ্বীরাজ জানিতে পারিলেন না। তিনি সংযুক্তাকে লইয়া প্রমোদে মত্ত। কেহই এ সংবাদ তাঁহাকে দিতে সাহস করিল না। মহম্মদ ঘোরী কোরান স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আর হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবেন না; তাই কোন দিনই পৃথ্বীরাজের মনে মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের আশঙ্কার কথা জাগে নাই। তিনি সংযুক্তাকে লইয়া প্রমোদে মগ্ন।

এদিকে পৃথ্বীরাজের ভগ্নীপতি রাণা সমর সিংহ মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী আক্রমণের কথা শুনিয়া দিল্লী আসিয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি পর্য্যন্ত পৃথ্বীরাজের সহিত দেখা করিতে পারিলেন না এবং তাঁর কথাও পৃথ্বীরাজের নিকট পৌঁছিল না। অথচ এই রাণার মত বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী পৃথ্বীরাজের আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। অবশেষে সঙ্কট বুঝিয়া রাজ্যের কুলপুরোহিত মহারাণী ইচ্ছনীর সহিত পরামর্শ করিলেন। তখন ইচ্ছনী কর্তব্যের খাতিরে সমস্ত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও পৃথ্বীরাজকে ঘোরীর আক্রমণের সংবাদ জানাইলেন। প্রমোদে বাধা পড়িল। ঘোরীর বিশ্বাসভঙ্গে ক্রোধে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন; কিন্তু বড় অসময় ও অসজ্জিত অবস্থায়। অনেকে মনে করেন পৃথ্বীরাজ বীর হইলেও অতিমাত্রায় ভোগাসক্ত ছিলেন। ইহা ছিল ঘোরীর নিকট তাঁহার পরাজিত এবং বন্দী হওয়ার অন্যতম কারণ।

মহম্মদ ঘোরীর হস্তে পৃথ্বীরাজের বন্দী হওয়ার সংবাদ শুনিয়া অন্যান্য রাণীদের সহিত ইচ্ছনীও জহরব্রত করিয়া মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

রাণী চন্দ্রাবতী

চন্দ্রাবতী ছিলেন পৃথ্বীরাজের তৃতীয়া রাণী। পিতৃকুলের দিকে ইনি ছিলেন দাহিমা রাজা চামুণ্ড রায়ের ভগিনী। রাণী চন্দ্রাবতীর গর্ভে রাজকুমার রেনসীর (রণসিংহ) জন্ম হয়। রাণী চন্দ্রাবতীর ভ্রাতা অর্থাৎ রাজকুমার রেনসীর মাতুল প্রবলপরাক্রান্ত বীর ছিলেন। পৃথ্বীরাজের এক শত বাছাই-করা প্রধান যোদ্ধার মধ্যে রাজা চামুণ্ড রায়ের স্থান যথেষ্ট উচ্চে ছিল।

এক দিন রাজা চামুণ্ড রায় দিল্লীর এক গলির মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন; এমন সময় পৃথ্বীরাজের অতি প্রিয় হস্তী "শৃঙ্গার হার" মাহুতের হস্তচ্যুত হইয়া পাগলামি আরম্ভ করে এবং গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া চামুণ্ড রায়কে আক্রমণ করে। চামুণ্ড রায় প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কোন উপায় না পাইয়া তাঁহার হস্তস্থিত অসি দ্বারা "শৃঙ্গার হার"কে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলেন। এই "শৃঙ্গার হার" রাজা পৃথ্বীরাজের খুব প্রিয় ছিল। প্রথম বার যখন ঘোরীর সহিত পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের কাকা, কাকা কহ্ন ঘোরীকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন। তখন মহম্মদ ঘোরী কোরান মাথায় লইয়া কসম খাইয়া বলিয়াছিলেন যে, পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে তিনি আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না। কসম খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীরাজকে খুশী করিবার জন্য মহম্মদ ঘোরী তাঁহাকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ হস্তী "শৃঙ্গার হার" উপহার দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কথা রক্ষা করেন নাই।

পৃথ্বীরাজ শেষবার যখন ঘোরীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তরাইনের সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হন, তখন রাজ্যের ভার চন্দ্রাবতীর গর্ভজাত পুত্র রেনসীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ঘোরী পৃথ্বীরাজকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। পৃথ্বীরাজের সভাকবি চন্দ লিখিত 'রাসো'তে দেখা যায় যে, পৃথ্বীরাজকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া কিছুদিন পর নৃশংসভাবে তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করানো হয়। অন্ধ অবস্থায় রাজা পৃথ্বীরাজ কারাগারে পড়িতে থাকেন। পরে কৌশলে শব্দভেদী বাণ দ্বারা ঘোরীকে

হত্যা করিয়া নিজে আত্মহত্যা করেন। অবশ্য এই কথা ইতিহাস সমর্থন করে না। যাহাই হউক, মহম্মদ ঘোরী চলিয়া যাইবার পর রেনসী যথারীতি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ঘোরীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকেন। এই সময় রাজকুমার রেনসীর বয়স আঠার বৎসর ছিল।

রেনসীর যুদ্ধায়োজনের কথা জানিতে পারিয়া ঘোরী কুতুবউদ্দিন এবেককে দিল্লী অধিকার করিতে আদেশ দেন। সাত মাস পর্য্যন্ত এবেক দিল্লী বেষ্টন করিয়া রাখেন। তার পর যথাসাধ্য লড়াই হয়। লড়াইয়ে রেনসী মারা যান। দিল্লী এবেকের দখলে আসে এবং লুণ্ঠিত হয়। রাণী চন্দ্রাবতী ইহার পূর্ব্বেই 'সতী' হইয়াছিলেন।

হাহুলি হমীরের দুহিতা

পৃথ্বীরাজের চতুর্থ রাণী ছিলেন হাহুলীর কন্যা। ইহা ভিন্ন ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

বড় গুর্জ্জরের রাজকুমারী

পৃথ্বীরাজের পঞ্চম রাণী ছিলেন বড় গুর্জ্জরের রাজা রাম রায়ের কন্যা।

রাণী পদ্মাবতী

পৃথ্বীরাজের পিতা সোমেশ্বর যখন আজমীরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন দেবগিরিতে যাদব বংশের এক রাজা রাজত্ব করিতেন। এই যাদব রাজার কন্যাই ছিলেন রাণী পদ্মাবতী। ইনি অতিশয় রূপবতী ছিলেন। এই সময় যোদ্ধা ও বীর হিসাবে পৃথ্বীরাজের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পদ্মাবতী মনে মনে পৃথ্বীরাজকে পতিত্বে বরণ করেন। এদিকে জয়চন্দের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (লঘু-ভ্রাতা) বীরচন্দ্র কমধ্বজের সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ হওয়া ঠিক হয়। রাজকুমারী পদ্মাবতী গোপনে পৃথ্বীরাজকে জানাইয়া দেন যে তিনি তাঁহার বিশেষ অনুরাগিণী। পৃথ্বীরাজ একথা শুনিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিতে পারেন। তিনি বহু সৈন্ত লইয়া দেবগিরির দিকে রওনা হন। এদিকে পৃথ্বীরাজ দেবগিরি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কমধ্বজ বহু রাঠোর সৈন্তসহ দেবগিরিতে পৌঁছেন। পৃথ্বীরাজ হটিবার পাত্র ছিলেন না। দেবগিরিতে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই কমধ্বজের রাঠোর সৈন্তের সহিত তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং কমধ্বজকে পরাজিত করিয়া মহাসমারোহে পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া আজমীরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পৃথ্বীরাজের প্রতি জয়চন্দের শত্রুতার ইহাও একটি কারণ ছিল।

পুজ্জন রায় কচ্ছ বাহারের ভগিনী

পুজ্জন রায় পৃথ্বীরাজের এক জন অতি পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন। মোহবার যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। একবার তিনি মহম্মদ ঘোরীকে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন। তুমুল যুদ্ধের মধ্যে এক বার তিনি গুজরাটের রাজা ভোলাভীমের মুকুট ছিনাইয়া আনিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ যখন বাছা বাছা যোদ্ধা লইয়া সংযুক্তাকে আনিতে গিয়াছিলেন তখন এই বীর পুজ্জন রায়ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই উপলক্ষে জয়চন্দের হাজার হাজার সৈন্তের সহিত পৃথ্বীরাজের বাছাই-করা শত সৈন্যের যে লড়াই হয়, তাহাতে পুজ্জন রায় অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। অবশেষে প্রাণত্যাগ করেন। পৃথ্বীরাজ এই বীর পুজ্জন রায়ের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহার রূপগুণের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ইহা সত্য যে, ইনি কোন রাজপরিবারের দুহিতা ছিলেন না। পৃথ্বীরাজের খেয়ালের জন্যই এই বিবাহ হইয়াছিল।

চন্দ পুণ্ডীরের কন্যা

পুজ্জন রায়ের ভগিনীর ন্যায় চন্দ পুণ্ডীরের কন্যাও কোন বিশেষ রাজপরিবারের কন্যা ছিলেন না। চন্দ পুণ্ডীর পৃথ্বীরাজের প্রতিনিধি হিসাবে লাহোরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। চন্দ পুণ্ডীরের কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াই পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইনি ছিলেন পৃথ্বীরাজের অষ্টম রাণী।

রাণী শশিব্রতা

পৃথ্বীরাজের নবম রাণী ছিলেন দেবাসের রাজার কন্যা রাজকুমারী শশিব্রতা।

রাণী হংসাবতী

রাণী হংসাবতী ছিলেন রণথম্বরের রাজা ভানু রায়ের কন্যা। রাজকুমারী হংসাবতী ছিলেন অতিশয় সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী। হংসাবতীর গুণ গরিমা ও সৌন্দর্য্যের মহিমার কথা সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য অনেক রাজা মহারাজা হংসাবতীকে রাণীরূপে পাইবার জন্য রাজা ভানু রায়ের নিকট অনুরোধ-পত্র পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল রাজার মধ্যে চান্দেরীর হিন্দু রাজা পঞ্চাইন অন্যতম ছিলেন। রাজা ভানু রায় রাজা পঞ্চাইনের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই; কারণ রাজকুমারী হংসাবতী মহারাজ পৃথ্বীরাজের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বাগ্দত্তাও ছিলেন। রাজা পঞ্চাইনের অনুরোধ রক্ষা না হওয়ার জন্য তিনি ভানু রায়ের উপর ক্রোধান্বিত হন এবং এক বিরাট সেনাবাহিনী লইয়া রণথম্বর আক্রমণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, ভানু রায়কে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজকুমারী হংসাবতীকে বিবাহ করিবেন। রাজা পঞ্চাইন জোর করিয়া হংসাবতীকে বিবাহ করিবার জন্য রণথম্বর আক্রমণ

করিয়াছেন জানিতে পারিয়া রাজা পৃথীরাজ এক বিরাট সৈন্য-বাহিনী লইয়া গিয়া রণথম্বরে উপস্থিত হন এবং ভানু রায়ের সৈন্যদের সহিত যোগ দেন। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। অবশেষে জয়-পরাজয়ের মধ্যে রাজা পঙ্কাইন পৃথীরাজের হস্তে নিহত হন।

কথিত আছে, রাজা ভানু রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য রাজা পঙ্কাইন মহম্মদ ঘোরীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। চান্দেরীর রাজা পঙ্কাইন, গুজরাটের রাজা ভোলা-ভীম এবং কনৌজের রাজা জয়চন্দ মুহম্মদ ঘোরীর নিকট তাঁহাদের দেশের হিন্দুরাজদিগকে দমন ও পরাস্ত করিবার মানসে সাহায্য প্রার্থনার জন্য ইতিহাসে কলঙ্কিত হইয়া আছেন।

পৃথীরাজ যখন রাজা পঙ্কাইনের বিরুদ্ধে রাজা ভানু রায়কে সাহায্য করিবার জন্য রণথম্বরের যুদ্ধ-শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে, এক চন্দ্রবদনা রমণী তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিতেছেন। পৃথীরাজের ঘুম ভাঙিয়া যায়, কিন্তু ঐ স্বপ্ন-সুন্দরীকে পাশে না পাইয়া অস্থির হইয়া উঠেন। ঐ রাত্রিতে পৃথীরাজের এই অস্থিরতার কথা জানিতে পারিয়া কবি চন্দ তাঁহার নিকট গমন করেন এবং তাঁহার স্বপ্নের মূল কথার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, ঐ স্বপ্ন-সুন্দরী আর কেহই নহেন, যিনি দু'দিন পরে তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইবেন, সেই অনিন্দ্যসুন্দরী হংসা-বতী। এই বলিয়া হংসাবতীর রূপ, গুণ ও যৌবনের সুষমা বর্ণনা করিয়া পৃথীরাজের মনোরঞ্জন করেন।

কিছুদিন পর এই অনিন্দ্যসুন্দরী হংসাবতীকে বিবাহ করিয়া পৃথীরাজ রাজধানী দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন।

সন্ধান

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

মেয়ে নয়, যেন সাক্ষাৎ প্রতিমা। নূতন বউ দেখবার জন্যে যারা কৌতূহলে ভিড় করেছিল, সবাই অবাক হয়ে তাকাল। টকটক করছে গায়ের রং, বড় বড় কাজল-কালো দুটো চোখ। নাঃ, পছন্দ আছে হরিপদর। বোউমার রূপ সম্বন্ধে কারও কিছু বলবার নেই। নানা মুখে প্রশংসা গুন্‌গুনিয়ে উঠল গুঞ্জনের সুরে।

জেঠায় মা বলল, আহা, বউ নয় যেন সাক্ষাৎ মা দুর্গা।

বিন্দী পিসী মন্তব্য করলে, ভাগ্য ভাল আমাদের অমরের। আর হবেই না কেন, অমর আমাদের যে-সে ছেলে তো নয়।

'তা যাই বল', কামিনী আলোচনায় যোগ দিলে, 'পছন্দ বলতে হবে আমাদের হরিপদর।'

তা তো নিশ্চয়ই। সে কথা একশো বার। জেঠায় মা মুখে একটা পান পুরে সায় দিলে।

অবশ্য সবচেয়ে বেশী আনন্দ হবার কথা অমরের বাবা হরিপদর। কেমন ভাজা গোলাপ খুঁজে পেতে বার করেছেন। খুশীতে হরিপদ তামাক টানতে লাগলেন ঘন ঘন।

কল্যাণী বউয়ের মুখ দেখে স্বামীর পছন্দের তারিফ করলেন বার বার। বরাবরই ভয় ছিল, শেষে কি জানি একটা নিয়ে আসবে। যাক, সেই দুর্ভাবনা থেকে রেহাই পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু এই আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। বউয়ের সঙ্গে যে সমস্ত জিনিষপত্র এসেছে তা পরীক্ষা করতে গিয়েই চক্ষু চড়কগাছ। মেজাজ মুহূর্তে গেল বিগড়ে। কনের তরফ থেকে যা জিনিষ দেবার কথা ছিল তার অর্দ্ধেকই যে নেই! কল্যাণী তৎক্ষণাৎ ছুটলেন স্বামীর কাছে। একি সর্ব্বনেশে কাণ্ড!

হরিপদ তামাক টানছিলেন। এমন ভঙ্গিতে সহ-ধর্ম্মিণীর গম্ভীর মুখে আবির্ভাবে ভয়ের আভাস পেলেন।

কি হয়েছে? নলটা ছিটকে গেল মুখ থেকে।

সর্ব্বনাশ হয়েছে। তোমার হাতে যখন ভার দিয়েছি তখন জানি এমনি একটা হবেই গণ্ডগোল।

'মানে? হয়েছেটা কি?' হরিপদ স্ত্রীর কথায় আরও ঘাবড়ে গেলেন। নূতন বউয়ের হঠাৎ কিছু অসুখবিসুখ হ'ল নাকি?

তাই হলে তো বাঁচতাম। আমরা মহা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছি। তাহা ঠকিয়েছে ব্যাটা।

কে? কার কথা বলছ? হরিপদ উঠে দাঁড়ান।

থাক্ আর ন্যাকামি করতে হবে না। মেয়ের রূপেই মেয়ের বাপ তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। বলি দেনাপাওনার সর্ত্তমত কনের তরফ থেকে যা দেবার কথা ছিল দিয়েছে কিনা দেখে নিয়েছিলে?

অবশ্য খুঁটিনাটি সব দেখে নি হরিপদ। বিয়ের ব্যবস্থাতেই ব্যস্ত ছিল সারারাত। অত দেখবার ফুরসত কই? আর দেনাপাওনার কথা যখন অনেক আগে থেকেই পাকা হয়ে গেছে, দেখবারও তত প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় নি। বললেন, কেন দেয় নি?

যৌতুক দিন দিয়েছে। যা যা দেবে বলেছিল তার অর্ধেকেরও পাত্তা নেই।

বল কি? চমকে উঠলেন হরিপদ।

বলব আর কি? নিজেই দেখ না গিয়ে।

দেখলেন হরিপদ। তাই বটে।

কল্যাণী রাগে ফুলতে লাগলেন। লোকজনের ভিড় কমতে, বউকে একা পেয়ে বললেন আচ্ছামত।

বলি বৌমা, তোমার বাপ ব্যাটার আক্কেলটা কি শুনি?

শোভনা প্রশ্নটার ধরনে একটু অবাকই হ'ল। বলল, কেন মা, কি হয়েছে বাবার?

'মা, তুমি যেন কিছু জান না। কচি খুকি কিনা একেবারে!' কল্যাণী বিচিত্র ভঙ্গীতে মুখ বিকৃত করে উঠলেন। 'থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না তোমার।'

সত্যি সে কিছুই জানে না। তাই অকারণ এই ধমকে শোভনা আহত হ'ল। বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বললে, আপনি কিসের কথা বলছেন, সত্যিই কিছু জানি না আমি।

তা কেন জানবে? যেমন বাপ আর তার তেমনি মেয়ে। দুই-ই চোর।

নূতন বউ হিসেবে শোভনা যতটা সম্ভব সংযত হয়েছিল। কিন্তু আর ধৈর্য্য রাখা সম্ভব হ'ল না।

আমার বাবাকে আপনি চোর বলবেন না।

ওর রাগে কল্যাণী গর্জ্জনের আরও খোরাক পেলেন। চোরকে চোর বলব না? একশ' বার বলব। হাজার বার বলব।

কি চুরি করেছে আমার বাবা?

শুধু চুরি? জোচ্চোর, বদমায়েস। ঠকিয়েছে আমাদের। দেব বলে অর্দ্ধেক জিনিষ দেয় নি সে।

যে দেয় নি তাকে বলুন না। তার সঙ্গে বোঝাপড়া করুন। আমায় বলতে এসেছেন কেন?

তাকে ত বলবই। কাছে পাই সেই হারামজাদাকে একবার। তুমি সেই বাপেরই গুণধর মেয়ে কিনা, তোমাকেও তাই বলতে এলুম।

খবরদার বাবাকে গালাগাল দেবেন না বলছি।

ইস্, বাপের উপর যে দরদ একেবারে উথলে উঠল। একশ' বার গালাগাল দেব, হাজার বার দেব। কি করবে? মারবে নাকি?

প্রয়োজন হলে তাই করতে হবে।

ব্যস্। নূতন বউয়ের এই জবাবের সঙ্গে সঙ্গেই কল্যাণী চীৎকারে বাড়ী মাথায় করে তুললেন। ওগো শুনছ একবার। ওরে ও অমর, একবার শুনে যা।

যাদের ডাকা হ'ল, তারা ত এলই; ছুটে এল আরও অনেকে। তাদের বাড়ীতে লোকজনের ত অভাব নেই।

কি হয়েছে মামীমা? অমর শুধাল।

হবার আর কি বাকি আছে বল? বউয়ের এত বড় আস্পর্দ্ধা, বলে দরকার পড়লে আমার গায়ে হাত ওঠাবে। তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, কি মেয়েই পছন্দ করে এনেছ! মেয়ে নয় ত, দজ্জাল মাগী! রূপ দিয়ে কি হবে? অমন রূপের মুখে ঝ্যাঁটা মারি।

অমর নূতন বউয়ের দিকে তাকাল। মামীমাকে তুমি এই সব বলেছ?

হ্যাঁ। গম্ভীর কণ্ঠ শোভনার।

কেন?

উনি আমার বাবাকে চোর বলেছেন।

বেশ করেছেন, বলেছেন। তাই বলে তুমি এমন ছোট-লোকের মত ঝগড়া করবে নাকি! আর চোর ত সত্যিই তোমার বাবা।

না। শোভনা বললে।

চুপ, তর্ক করো না। অমর গম্ভীর।

তর্ক করছি না। আর ঝগড়াও আমি আরম্ভ করি নি। তোমার মামীমাই ছোটলোকের মত ঝগড়া আরম্ভ করেছেন।

কল্যাণী ফেটে পড়লেন। শুনছিস্ ছোটলোকের মেয়ের কথা? শোন্। আমায় বলে কিনা ছোটলোক। জোচ্চোরের গুষ্টি সব।

আমরা জোচ্চোর হতে পারি, কিন্তু আপনারাও চামার।

এর পর অমরের গলা বজ্রের মত গর্জ্জে উঠল, ফের যদি কোন দিন ঐকথা তোমার মুখে শুনি, গলা টিপে মাটিতে পুঁতে ফেলব। যাও এখান থেকে, শিগ্গীর যাও। যাও।

এই আদেশ অমান্য করবার মত দুঃসাহস পেলে না শোভনা। ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিলে। বিছানায় এসে বসল। চোখ ফেটে তার কান্না আসছে। কি করেছে সে? কিছুই নয়। অপরাধের লেশমাত্রও নেই তার। অন্যায় যদি কিছু হয়ে থাকে ত সে তার বাবার। এদের কাছ থেকে চোর, জুয়াচোর এই ধরণের অপবাদ বিনা প্রতিবাদে বাবাকেই সহ্য করতে হবে। কিন্তু এই অপরাধ বাবা করেছেন তারই জন্তে। নইলে বিয়ে তার হ'তই না। তাই ত শোভনা অপবাদের সব বোঝা বাবার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে নিজে বেইমানের মত এক পাশে সরে দাঁড়াতে পারছে না। কেমন করে পারবে? কোনও মেয়েই কি পারে?

অপরাধ শোভনার, সে ওই বাপের মেয়ে। আরও অপরাধ, সে প্রতিবাদ করেছে। হয়ত প্রতিবাদ করত না। কিন্তু এদের অভিযোগের ভাষা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রতিবাদ না করে তাই ত পারল না শোভনা। ওরা ত জানে না তার 'জোচ্চোর' বাপ সর্ব্বস্ব বেচেই সাধ্যমত দিয়েছে। প্রতিবাদ সে করেছিল এই ভেবে যে, স্বামীর কাছে

ভরসা পাবে, প্রতিবিধানের আশ্বাস পাবে। তাই ত সেও ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে এক ধাপ নীচে নেমেছিল।

না, তার ভুল। এখানে কেউ নেই তার পাশে। সে একা। স্বামীও তাকে ভুল বুঝল। বিয়ের শুভ লগ্ন থেকেই তার সুরু হ'ল দুঃখের পৃথিবী। তার কুমারী-জীবনে নীড় বাঁধার সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল।

কাজলকালো চোখের স্বপ্নসুরভিত নীল তারা ফুলের বাসরে কিছুই পেলে না খুঁজে, পেলে শুধু নোনা জলের বন্যা।

রমানাথ এলেন মেয়েকে দিতে।

ওকে দেখে কল্যাণী তুবড়ির মত ফেটে পড়লেন, মেয়ে দিতে এসেছ? সাহস ত কম নয় দেখছি।

আজ্ঞে। হাত কচলালেন রমানাথ।

জোচ্চোর, বদমায়েস, চামার।

হাসলেন রমানাথ। যেন কালা হয়ে গেছেন।

আজ্ঞে, ক্ষমা করুন। দোহাই, বিশ্বাস করুন, এর চেয়ে বেশী আর দিতে পারলাম না।

হরিপদ এবার কথা কইলেন। মহা ধড়িবাজ তুমি। এখন ক্ষমা চেয়ে আর কি হবে? তখন তো বড় খাড় নেড়েছিলে যা চেয়েছিলাম তাতেই। যাও এখন।

আজ্ঞে দয়া করুন।

দয়া? এর চেয়ে বেশী আর কেউ করতে পারে না। আমাদের হাতে পড়েছ, তাই খুব বেঁচে গেলে। অন্য কারও পাল্লায় পড়লে টেরটি পেতে। যাও, মেয়ে পাবে না।

আজ্ঞে...

যাও বলছি।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনতে শুনতে শোভনার দেহের রক্ত টগবগ করে ফুটছিল দুঃসহ জ্বালায়। কেন বাবা দাঁড়িয়ে এভাবে অপমানিত হচ্ছেন তখন থেকে? যান না চলে। যাই-বা গেল শোভনা। তাকে তো বিসর্জ্জন দিয়েছেনই এদের হাতে। ক'দিনের জন্যে কাছে পেয়ে কি হবে? তাতে দুঃখই বাড়বে শুধু।

রমানাথ মেয়ের কাছে দাঁড়ালেন একটুখানি।

চললাম মা।

আমি বেশ ভালই আছি বাবা। তোমার কোন ভয় নেই। শোভনা কান্না চেপে বহুকষ্টে জানাল।

আশীর্ব্বাদ করি তাই থাক মা, তাই থাক।

কিন্তু রমানাথ চলে যেতেই শোভনা নিজের ঘরে ঢুকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ছিঃ বউ, অত কাঁদে না। শরীর খারাপ হবে, চোখ খারাপ হবে। যখনই উঁকি মারি, দেখি বউ আমার কাঁদছে।

কে? কে এত ভাল কথা বলে? কে এমন আছে এ বাড়ীতে! বিছানা ছেড়ে ধড়ফড় করে উঠে বসল শোভনা। জলভরা চোখে তাকাল।

কে ভাই তুমি?

আমায় তুমি চিনবে না বউ। আমি নেত্যর মা। আমি বাসন মাজি।

ওঃ, তুমি ভাল, খুব ভাল।

না বউ, না। ভাল আমি নই। ভাল হলে কি তোমার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে হ'ত। আহা, এই ক'দিনেই আমার সোনার পিতিমের কি ছিরি হয়েছে গা! যেমন চামার মাগী, তেমনি হতভাগা মনসেটা।

আস্তে বল নেত্যর মা, আস্তে।

কেন? নেত্যর মা কাউকে ডরায় না। তা সে যেই হোক। সত্যি কথা বলতে ভয় কিসের! তোমায় ওরা মেরে ফেলবে বউ।

শোভনা হাসল। ম্লান হাসি।

ভয় নেই, এত তাড়াতাড়ি আমি মরব না।

সে তোমার পেরমাই মা। তবে ও মাগীর বড় সোনা। ও সহজে মরবে না। জ্বলে পুড়ে মরবে।

ছিঃ, অমন কথা বল না।

সাধে কি বলি মা। তোমার চোখে রাতদিন জল দেখে বুকটা যে ফেটে যায় বউ।

মূক ধরিত্রীর মতই সর্ব্বংসহা হয়ে শোভনা কাটিয়ে চলে তার নূতন জীবন। কথা বলে না, কথা শোনায় না। জানে প্রতিবাদে কোন সুফল হবে না, বরং দুঃখই টেনে আনবে আরও। শুধু গোপনে ফেলে চোখের জল। এই বাড়ীতে এত মানুষের মাঝে তার আপন কেউ নেই। কেউ তাকে বাসে না ভাল। এই সঙ্গীহীন জীবন হয়ত দুঃসহ হয়ে উঠত, নেত্যর মাকে না পেলে। সত্যিই সে ভাল।

ওর সঙ্গে কথা বলে শোভনা—সুখদুঃখের কথা।

কেউ আমায় ভালবাসে না, কেউ চায় না আমায়। বল আমার কি দোষ?

দোষ তোমার নয় বউ, এই হ'ল সংসারের নিয়ম। যে ভাল, যে নির্দ্দোষ তার ভাগ্যেই তো জোটে অপবাদ।

নেত্যর মার কথাগুলো ভারি ভাল লাগে শোভনার। বলে, তবে তুমি কেন কাছে আমার আস? কেন আমায় ভালবাস?

আমি তো আর ওদের মত বুকটা পাথর করতে পারি নি।

এই নির্দ্দয় পৃথিবীতে নেত্যর মা-ই শুধু তার আশ্রয়। ওকে ভালবাসে নেত্যর মা।

ক'দিন থেকে শরীরটা খারাপ লাগছে শোভনার। মাথার দারুণ যন্ত্রণা—চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে

থাকলে সারাটা শরীর টলমল করে ওঠে। প্রথমে তেমন নজর দেয় নি শোভনা। অমন একটু-আধটু শরীর খারাপ কারই বা না হয়। ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু না। মাথার ব্যথা যেন দিন দিন আরও চেপে বসতে লাগল। চোখের তারায় ম্লান হয়ে আসে জ্যোতি। যেন কুয়াশা নেমেছে পৃথিবীতে।

তাই শেষে এক দিন অমরের কাছে এল।

ওগো শুনছ?

কি? অমর আপিসের কাজ করছিল। বিরক্ত হয়েই সাড়া দিলে।

এক বার ডাক্তারবাবুকে ডেকে দেবে?

কেন? ডাক্তার কি হবে?

অমরের কথার ধরণ দেখে আর জবাব দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল না শোভনার। তবু বলল, মাথাটা আমার ক'দিন থেকে এত ব্যথা করছে কি বলব।

মাথা থাকলেই ব্যথা করবে। মাথাব্যথা কি এমন রোগ যে তার জন্যে একেবারে ডাক্তার ডাকতে হবে। পয়সা আমাদের অত সস্তা নয়।

জবাব শুনে শোভনা চলে গেল। আর একটা মুহূর্তও দাঁড়াল না।

মামীমা খাবার নিয়ে এলেন।

বউকে যেন এখানে দেখলাম?

হ্যাঁ।

কি ফিসফাস করছিল রে?

কিছু নয়। বলল, মাথা ধরেছে, ডাক্তার ডাক।

'ইস্, নবাবনন্দিনী এসেছেন। ডাক্তার ডাক।' মামীমা মুখের বিচিত্র ভঙ্গী করলেন। 'মাথা ধরেছে তো শুয়ে থাক্, কপালে মালিশ কর। মাথা যেন আর দুনিয়ার কারও কোন দিন ধরে নি।'...

দিনের পর দিন চোখ দুটোর দীপ্তি নিভে আসছে, বুঝতে পারে শোভনা। আর সেই সঙ্গে মাথার অসহ্য যন্ত্রণা। আর কিন্তু কাউকে সে কিছু বলে না। ভাল হওয়া যদি অদৃষ্টে থাকে আপনিই হবে।

বলে শুধু নেত্যর মাকে। না বলে পারে না।

চিকিৎসে করাও।

ডাক্তার ডেকে লাভ নেই। টাকাই নষ্ট। এমনিই ভাল হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, ভাল হবে না ঘোড়ার ডিম। এমনি করে থাকলে চোখ দুটো যে খোয়াবে বউ।

হাসল শোভনা। এ চোখ যাওয়াই ভাল।

শোন কথা। দাঁড়াও, এখুনি আমি মামীর কাছে যাচ্ছি।

না।

না কেন?

আমি বলেছিলাম।

তা কি জবাব দিলে সে?

শোভনা ম্লান হাসল শুধু।

দরজার চৌকাঠে পা আটকে শোভনা কেটলিটা ভাঙল। কল্যাণী চীৎকার করে উঠলেন, ভাঙ সব, ভাঙ। কি আছুটে বউই এসেছে রে বাবা। বলি হ্যাঁ বউমা, কি আক্কেল তোমার শুনি? দেখে চলতে পার না? চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?

শোভনা লজ্জায় মৃদু কণ্ঠে বললে, চোখ দুটো আমার—

অমন চোখের যাওয়াই ভাল।...

শেষ পর্য্যন্ত সত্যিই চোখ দুটো গেল শোভনার।

'যাবে না? চিকিৎসে না করলে যাবে না?' নেত্যর মা না বলে পারল না। 'যেমন পিশেচের বাড়ীতে এসেছে।'

শোভনা চাপা গলায় বললে, চুপ। কেউ শুনে ফেলবে।

কেন, ভয়টা কিসের? সত্যি কথা বলতে নেত্যর মা কাউকে ডরায় না।

কিন্তু কথা কানে ঠিকই গেল। ভৈরবী মূর্ত্তিতে কল্যাণী ছুটে এলেন।

কি, আমারই খেয়ে পরে আমারই গায়ে বিষ তোলা। বেরো এ বাড়ী থেকে, আজই বেরো। এখুনি।

যাচ্ছি। এই চামারের বাড়ীতে এক মুহূর্ত আর থাকা যায়? হন্ হন্ করে চলে গেল নেত্যর মা।

চোখ গেছে, আরও কত কি যাবে। এখন হয়েছে কি। আমাদের ঠকানো, গুরুজনকে গালমন্দ দেওয়া। পাপের ফল ফলবে না? মাথার উপর কি ভগবান নেই?

নেত্যর মা চলে গেল। এ বাড়ীতে যাও একজন সত্যি-কারের দরদী ছিল, সেও চলে গেল। তাকে ফেলে গেল না, তাকে ভালবাসত বলেই চলে গেল। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে গেল। ওর জন্যে দুঃখ হয় শোভনার। কেন তাকে ভাল সে বাসল? শোভনার জন্যেই ত তার চাকরিটা গেল।

ওই বউ মাগীই যত নষ্টের গোড়া। তাই ত ভাবি, রাত-দিন ওদের কি এত ফিসফিসানি। কই আগে ত নেত্যর মা এমন ছিল না। ওই বউটাই ওর কানে বিষ ঢুকিয়েছে।

এমনি নানা ধরণের মন্তব্য কানে আসে শোভনার। সত্যি কথাই, নেত্যর মার এই স্বভাবের জন্যে সে-ই দায়ী। কেন সে পৃথিবীর দুর্ভাগ্যের বোঝা সঙ্গে নিয়ে এ বাড়ীতে পা দিলে?

অমর রাত করে বাড়ী ফিরে দেখে, শোভনা তার অপেক্ষায় বসে'। পায়ের সাড়া পেতে খাবার এগিয়ে দিলে।

আঃ, তুমি আবার কেন? ওসব আমি নিয়ে নিচ্ছি। চোখে দেখতে পাও না। আবার কিছু একটা ভাঙবে।

না গো না, কিছু ভাঙব না। হাসল সে অমরের কথায়।

না, ভাঙবে না আবার? আর ভাঙলে তোমার আর কি, ক্ষতি ত আমাদেরই হবে। সর এখান থেকে, যাও।

এর পর আর কিছু বলতে পারে না শোভনা। আস্তে চলে যায়।

বেলফুলের গাছটা সাদা ফুলে ভরে গেছে। দেখতে না পেলেও, আকুল গন্ধে ফুলের অজস্রতা সে বুঝতে পারে।

চাকর ফুল এনে দেয় সাজি ভরে। মালা গাঁথে শোভনা। মালা হাতে অমরের কাছে যায়।

শোন।

কি আবার?

দেখ কি সুন্দর বেল ফুলের মালা গেঁথেছি। এস না, পরিয়ে দিই।

আঃ, বিরক্ত করো না এখন। যাও।

ক্ষুণ্ণ হয় শোভনা। বলে, পরবে না?

আচ্ছা দাও। চোখে ত দেখতে পাও না, এদিকে মালা গাঁথবার সখ দেখছি ষোল আনা। থাক থাক, আমাকেই দাও, তোমাকে আর ওস্তাদি করে পরাতে হবে না। পড়বে শেষে আমার গায়ে হুমড়ি খেয়ে।

মালাটা হাতে নিয়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দেয় অমর।

সত্যি বল, ভাল মানায় নি তোমায়?

চমৎকার মানিয়েছে। অমর ব্যঙ্গ করে বলল।

তুমি ফেলে দিয়েছ? হঠাৎ বলে উঠল শোভনা।

কে বললে? চমকে উঠল অমর। কি করে জানলে? চোখে ত দেখতে পাও না।

কিন্তু নাকে ত গন্ধ পাই। অত গন্ধ বেল ফুলের, কোথায় গেল? কেন তুমি ফেলে দিলে? কেন?

বেশ করেছি। যাও এখন বিরক্ত কর না।

এই নিঃসঙ্গ, অবজ্ঞাত, জীবনের বেদনায় যেন এক দিন শেষ হ'ল—যেদিন টের পেল শোভনা, একজনের আগমনের। বিয়ের পর এই দীর্ঘ দিনগুলোর ভেতর দিয়ে যা কিছু অবজ্ঞা, অত্যাচার ও অনাদর সে পেয়েছে, আজ সে সব মনে হ'ল তুচ্ছ। বহু দিনের পর সত্যিকারের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ শোভনার দেহে জোয়ার বইয়ে দিয়ে গেল। মা হবে সে, মা। আনন্দেরই খবর। এর চেয়ে বড় আনন্দ তার কাছে আর কিছু নেই। সব আঘাত ভুলে গেছে শোভনা। মাতৃত্বের অমৃতে অভিষিক্ত দেহের শিরায় শিরায় এক আশ্চর্য্য পুলকানুভূতি। আর সে একা নয়। তার একা থাকার দিন শেষ হতে চলেছে। আসছে একজন তার একান্ত আপনার জন। ও ত তাকে ঘৃণা করতে পারবে না, পারবে না অবজ্ঞা করতে। সেই শিশু ত তারই, তারই রক্তের—তারই একাগ্র কামনার। তাকে সে কেমন করে দূরে রাখতে পারবে? ভাল যে তাকে বাসতেই হবে। ওর উপর দাবি আছে শোভনার। মায়ের দাবি। সবচেয়ে বড় দাবি।

নবাগত একজনের আগমনের সাড়া জাগে বাড়ীতে। সকলের ব্যবহারে শোভনা আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে। সে মা হতে চলেছে, তাই কি?

শোভনা যেন এতক্ষণ সুন্দর এক আলোর পৃথিবীতে বেড়িয়ে এল। স্বপ্নের মতই অপরূপ।

'জানি, এমন বউ যখন ঘরে এনেছি তখনই কপাল পুড়েছে। নাতির মুখ দেখব, সে ভাগ্য কি আর এই অলুক্ষুণে বউ থাকতে হবে!'

কল্যাণীর এই কথাগুলো কানে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল শোভনার। পাশে হাত দিয়ে কাকে যেন খুঁজল। কই সে? কই?

দুর্ব্বল দেহে ও আর্ত্ত কণ্ঠে বললে, খোকা? আমার খোকা কই?

থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না। থাম।

সত্যি বল না, কোথায় সে। তোমাদের পায়ে পড়ি।

মরি মরি, ঢং দেখে আর বাঁচি না! সে নেই।

নেই? কে নিলে? কোথায় গেল? শোভনার মাতৃহৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠে এই নির্ম্মম ঘোষণায়।

যাবে আবার কোথায়? শোন কথা! নিজের ছেলেকে নিজেই খেয়েছ। তা মনে নেই? ঢং দেখে আর বাঁচি না।...

সে নেই? তবে কোথায় গেল? এই তো সে ছিল। খানিক আগেই সে যে ছিল। শোভনা স্পর্শ করেছিল সেই আলোর শিশুর চোখ, মুখ, নাক। মাথার নরম চুলে সে যে বুলিয়েছিল হাত। কানে বেজেছিল তার প্রথম ডাক। এই তো ছিল। একটু আগেই ছিল। কোথায় গেল?

হ্যাঁ, ঠিক। এরাই লুকিয়ে রেখেছে। এরা শোভনার সুখ যে দু'চোখে দেখতে পারে না। এরা খুব হিংসুটে। তার শত্রু এ বাড়ীর মানুষেরা। হ্যাঁ, এরাই লুকিয়ে রেখেছে। এরাই।

কিন্তু কোথায় লুকিয়ে রাখবে? কত দিন? এক দিন শোভনা ওকে খুঁজে বের করবেই।

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, রোজ রাতের অন্ধকারে সকলের অগোচরে এ বাড়ীর অন্ধ বউ কি যেন হাতড়ে বেড়ায়।

শিল্পবিদ্যালয়ের প্রথম বৎসর

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

"কলা ও শিল্প-মহাবিদ্যালয়ের জন্মকথা" শীর্ষক পূর্ব্ব প্রবন্ধে শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। উহাতে এই সময়কার পত্র-পত্রিকা হইতে বিদ্যালয়টির শিক্ষক, ছাত্রসংখ্যা ও শিক্ষণীয় বিষয়াদি সম্বন্ধেও কিছু তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। শিল্পবিদ্যালয় ১৮৫৪, ১৬ই আগষ্ট* প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পরে 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' ১৮৫৪, ২৪শে আগষ্ট সংখ্যায় ইহার উপরে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে বিদ্যালয়ের সমর্থন করিতে গিয়া 'ফ্রেণ্ড' বাঙালীদের দানশীলতা এবং নব নব বিদ্যার্জ্জন-স্পৃহার প্রশংসা করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। বিদ্যালয়ের উন্নতির পক্ষে ছোট ছোট বাধা—যেমন উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অপ্রতুল প্রভৃতির প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে আরও জানা যাইতেছে যে, এম. আগিয়ার এক শত কুড়ি টাকা মাসিক বেতনে চিত্র-বিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। মৃৎ-পুত্তলি-নির্ম্মাণশ্রেণীর অধ্যাপক এম্. রিগউড বিনাবেতনেই শিক্ষকতাকার্য্য করিতে থাকেন। তবে তাঁহার একজন দক্ষ বাঙালী সহকারী ছিলেন। এই সহকারীটির নাম এখনও পাই নাই। 'ফ্রেণ্ড' বলেন, বিদ্যালয়টিতে ব্যবহারিক শিল্পাদি শিক্ষারও আয়োজন হইয়াছে। ইষ্টক ও মৃৎ-শিল্পের রকমারি দ্রব্য তৈরি পরীক্ষামূলক ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্রগণও হাতের কাজ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না। যেসব ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে তাহাদের মধ্যে আটাশ জন এংলো-ইণ্ডিয়ান, বাকী সকলই হিন্দু। শেষোক্তদের মধ্যে আবার এগার জন ব্রাহ্মণ। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই জানিতে পারিয়াছি যে, চিত্রবিদ্যা শিক্ষার শ্রেণীতে পঞ্চাশ জন এবং মৃৎ-শিল্পাদি শিক্ষার শ্রেণীতে পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্র ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। স্থানাভাবে ইহার অধিক আপাতত ভর্ত্তি করা হইবে না—কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ স্থির করিয়াছিলেন।

শিল্পবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সম্বন্ধেও প্রথমে আমাদের একটু স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার সভাপতি ছিলেন কর্ণেল এইচ. গুড্উইন। তিনি সে যুগের একজন বিখ্যাত সরকারী ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। ইহার সম্পাদক ছিলেন দুই জন—বাংলা-সরকারের আণ্ডার-সেক্রেটারী হজসন প্রাট ও এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিয়ান, পরবর্ত্তীকালে সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও রাজনীতিজ্ঞ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার কার্য্য শিল্পবিদ্যালয় পরিচালনা ও উন্নতি-চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার যে কয়েকটি অধিবেশনের বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভার অন্যতর সম্পাদক হইলেও, প্রথম বৎসরে বিদ্যালয় সম্পর্কে পত্রিকাদিতে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হয় প্রথম বিজ্ঞপ্তি-পত্র ব্যতীত সমুদয়ই অবৈতনিক সম্পাদকরূপে প্রাটের একক স্বাক্ষরযুক্ত দেখিতেছি। তবে ১৮৫৫ সনের জুলাই মাসের শেষে দ্বিতীয় বৎসরের জন্য যে অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয় তাহাতে হজসন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র দুই জনই পুনরায় অবৈতনিক সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। বর্ত্তমান বৎসরে সভার বিভিন্ন অধিবেশন সম্পর্কে শিল্পবিদ্যালয়-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হইবে। শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও শিল্পবিদ্যালয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কি ছিল, প্রথম হইতেই আমাদের সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এজন্য এখানে এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখিলাম।

২

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রদত্ত চিৎপুরের বাড়ী হইতে শিল্পবিদ্যালয় ১৮৫৪ সনের নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি ৺মতিলাল শীলের কলুটোলাস্থ একটি ত্রিতল ভবনে উঠিয়া আসে।* এই ভবনটি ছিল তখনকার নিউ ফিভার হস্‌পিটালের (বর্ত্তমান মেডিক্যাল কলেজ জেনারেল হাসপাতাল) উত্তর দিকে কলেজ ষ্ট্রীটের উপরে। তখন উক্ত হাসপাতাল ও এই বাড়ীর ভিতরে একটি গলি ছিল—এরূপ উল্লেখ পাইতেছি। তখন মতিলাল শীল গতায়ু হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ—হীরালাল শীল ও তদীয় ভ্রাতারা এক বৎসরের জন্য এই বাড়ীটি বিনা ভাড়ায় শিল্পবিদ্যালয়ের জন্য ইহার কর্ত্তৃপক্ষ শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভাকে অর্পণ করেন। এই বাড়ীতেই পূর্ব্বে মতিলাল

---

* ১৬ আগষ্ট বুধবার ১৮৫৪ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'র সম্পাদকীয় নিবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, এই তারিখেই শিল্পবিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল। উক্ত নিবন্ধে এই কথা কয়টিও আছে :

"It opens today with a modelling class, and a drawing class. . . ."

* The family of the late Mutty Loll Seal, have offered the building formerly known as Seal's College, rent free, to the Industrial School of Art, and the offer has been greatfully accepted . . ."—*The Friend of India*, November 23, 1854: Weekly Epitome of News—Friday, November 17.

শীলের 'শীল্‌স কলেজ' প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে বিদ্যালয়টি উঠিয়া আসায় বাঙালী-অবাঙালী উভয় অঞ্চলের ছাত্রদেরই যাতায়াতের সুবিধা হইল। ছাত্রেরাও অধিক সংখ্যায় ভর্ত্তি হইতে লাগিল।

শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার অন্যতর সম্পাদক হজসন প্রাট বিদ্যালয়ের আবাসস্থল পরিবর্ত্তন ও ছাত্রদের শিক্ষা-প্রণালী সম্পর্কে একখানি দীর্ঘ-পত্র ১৮৫৪, ২০শে নবেম্বর 'বেঙ্গল হরকরা'য় লিখিয়া পাঠান। এখানি পরবর্ত্তী ২৭শে নবেম্বরের 'হরকরা'য় প্রকাশিত হয়। তিনি লেখেন, ছাত্রেরা মডেলিং বা মৃৎ-পুত্তলি নির্ম্মাণ এবং শিল্পকার্য্যে প্যারিস-প্লাষ্টারের ব্যবহারে বেশ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার দরুন ছাত্রাবস্থায়ই তাহারা কিছু কিছু রোজগার করিতে সক্ষম হইবে। বাহির হইতে যেসব মাটির বা প্যারিস-প্লাষ্টারের দ্রব্য অথবা মূর্ত্তি নির্ম্মাণের অর্ডার আসিবে তাহার লাভের অংশ অথবা কমিশন আনুপাতিক ভাবে প্রত্যেক ছাত্রের হিসাবে জমা পড়িবে। শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কোন ছাত্র বিদ্যালয় ছাড়িয়া গেলে তাহার প্রাপ্য বাজেয়াপ্ত হইবে। আর, প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট-সহ শিক্ষাকাল অন্তে বাহির হইলে প্রত্যেক ছাত্রই তাহার মজুত টাকা পাইবার অধিকারী থাকিবে। ইহা দ্বারা তাহার পক্ষে নূতন কার্য্য বা ব্যবসায় আরম্ভ করা কতকটা সহজ হইবে। পত্রে তিনি আরও বলেন যে, যে-কেহ বিদ্যালয়ে আসিয়া ছাত্রদের শিল্পকর্ম্মে উৎসাহদান করিলে কর্তৃপক্ষ সুখী হইবেন। তাঁহাদের মন্তব্যাদি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একখানি 'পরিদর্শক-বহি'ও রাখা হইয়াছে। ইহার পর উক্ত পত্রে তিনি এমন একটি শুভকর প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ দান করিতে সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন।

৩

বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মৃৎ-পুত্তলি-আদি নির্ম্মাণে অল্পকালের মধ্যেই কতকটা পারদর্শী হইল। চিত্রবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করা সময়সাপেক্ষ। ইহাতে তখনই তাহারা তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। তথাপি শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে সভাপতি গুডউইন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিল্পকার্য্যাদি সাধারণের গোচরে আনিবার জন্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি ১লা নবেম্বর (১৮৫৪) তারিখযুক্ত একখানি বিজ্ঞপ্তি-পত্র কলিকাতার দেশী-বিদেশী শিল্পরসিক ও বিদগ্ধমণ্ডলীর নিকট প্রেরণ করেন।* পত্রখানির শিরোনামা ছিল—"To the Patrons and Lovers of Art, Industry and Science"। তিনি বিজ্ঞপ্তি-পত্রে লেখেন যে, ছাত্রেরা ইতিমধ্যেই চিত্রবিদ্যা এবং মৃৎ-পুত্তলি নির্ম্মাণে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখাইয়াছে। লিথোগ্রাফি, কাঠ-খোদাই এবং কারুকার্য্যখচিত মৃৎ-পাত্রাদি নির্ম্মাণেও যে তাহারা দ্রুত উন্নতিলাভ করিবে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। কিন্তু শিল্পকর্ম্মের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, ছাত্রেরা যাহাতে উৎসাহ পায় সেজন্য সাধারণের নিকট হইতে সহানুভূতি এবং অর্থলাভ একান্ত আবশ্যক। প্রদর্শনীর মারফতই ইহা সম্ভব। তিনি প্রস্তাব করেন, পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসে টাউন হলে একটি চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে, ছাত্রদের শিল্পকার্য্যের সঙ্গে বাহিরের শিল্পীদের চিত্রাদি এবং এদেশীয়দের গৃহে সংরক্ষিত শিল্প-দ্রব্যাদিও প্রদর্শিত হইবে। এ সকল কারু ও চারু শিল্পের নিদর্শন লইয়া ভবিষ্যতে কলিকাতায় যে সাধারণগম্য একটি 'পাবলিক আর্ট গ্যালারি' স্থাপিত হইতে পারিবে তাহারও আভাস গুডউইন উক্ত পত্রে দিলেন। সাহায্যকারী ব্যতিরেকে আর সকলের নিকট হইতেই প্রবেশ-মূল্য গ্রহণের প্রস্তাব হয়।

শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজনও চলিতে লাগিল। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এই প্রথম সাধারণ শিল্পপ্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা সবিশেষ তৎপর হইলেন। ১লা জানুয়ারী ১৮৫৫ তারিখের একটি বিজ্ঞাপনে* জানা যায়, শিল্পপ্রদর্শনী টাউন হলে ২২শে জানুয়ারী হইতে ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকিবে। ইহা যে শিল্পবিদ্যালয়ের সাহায্য ও উন্নতিকল্পে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, একথাও স্পষ্টই উল্লিখিত হয়। ঐ তারিখের মধ্যেই বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে অন্ততঃ দেড় হাজার চিত্র সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।†

৪

প্রদর্শনী যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রদর্শিত চিত্রাদি সম্বন্ধে ঐ সময়ের বিভিন্ন পত্রিকায় সাধারণভাবে আলোচনা বাহির হয়। দর্শকগণ কেহ কেহ সংবাদপত্রে পত্র লিখিয়া নিজস্ব অভিমতও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ সমুদয়েই শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রদের এত অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পকর্ম্মে নৈপুণ্য প্রদর্শনের উল্লেখ আমরা পাই। ছাত্রদের শিল্পকর্ম্ম এবং বিদ্যালয়ে তাহাদের কার্য্যপদ্ধতি সাধারণের গোচরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে টাউন হলের একটি অংশ নির্দ্দিষ্ট ছিল। 'বেঙ্গল

* এই বিজ্ঞপ্তি-পত্রখানি ১৮৫৪, ২৭শে নবেম্বর তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় বাহির হয়।

* *The Bengal Hurkaru and the India Gazette*, January 1, 1855.

† ঐ, সম্পাদকীয়

হরকরা' ২৪শে জানুয়ারী ১৮৫৫ সংখ্যায় প্রদর্শনী সম্পর্কে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে ছাত্রদের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে লেখেন:

"At the East end of the Hall is a compartment appropriated to the Industrial School of Art; which is intended to exhibit the manner in which the pupils of the school are employed while under instruction. In this place they are seen working at the clay models by which they are instructed."

ছাত্রদের চিত্র ও মৃৎশিল্পকার্য্যাদি সম্বন্ধে জনৈক দর্শকের সমালোচনা উক্ত সংবাদপত্রে পরবর্ত্তী ৩১শে জানুয়ারী (১৮৫৫) তারিখে তাহারই একখানি পত্রমধ্যে প্রকাশিত হয়। ছাত্রেরা শিল্পবিদ্যা শিক্ষায় কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, ইহা হইতে তাহারও কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি লেখেন:

"To begin with the students of the Industrial Art. The modellers shew an ability for their work which is very encouraging, but the subjects chosen as copies are injudicious, to say the least of them, a bust of Napoleon or a Wellington requires real talent and the study of years to copy well, and is immeasurably beyond their present powers; the same may be said of a spirited sketch in clay of a Boar and Dogs, by a French Artist. The models of leaves, and some of the smaller animals in relievo, and the studies of hands and feet are much better done, and will be more useful to the pupils . The drawing it is unnecessary to mention. By the way how is it that the students do not draw from the books published by the London school of design, and why is the whole Exhibition under the superintendence of a French Artist?"

দর্শক এখানে ছাত্রদের মৃৎ-শিল্পকার্য্য ও অঙ্কনাদির দোষত্রুটি দেখাইলেও, কোন কোন বিষয়ে যে তাহারা উৎকর্ষলাভ করিয়াছে তাহা বলিতেও ভুলেন নাই। যাহা হউক, প্রদর্শনীতে টিকেট বিক্রয়ে বেশ অর্থাগম হয় এবং তাহা যথারীতি শিল্পবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ জমা থাকে।

৫

শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমিতি—শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার একটি সাধারণ অধিবেশন কর্ণেল গুড্‌উইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইল ১৮৫৫, ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। পূর্ব্বেই কথা ছিল, সভা বিলাত হইতে তক্ষণশিল্পের (কাঠাদি খোদাই) অধ্যাপক আনয়ন করিবেন। লণ্ডনের মিঃ হুইটলি নামক এক তক্ষণশিল্পবিদ্ শিক্ষাপদ্ধতি ও বেতনাদি সম্বন্ধে সভাকে পত্র লেখেন। কিন্তু সভা তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণে এই বলিয়া অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন যে, ইহার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় সরকারের নিকট হইতে সাহায্য না পাওয়া পর্য্যন্ত এরূপ প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করা সম্ভব নয়। ভ্যান গেল্ডার শিল্পবিদ্যালয়ে একটি সঙ্গীত বিভাগ খুলিবার জন্য গুড্‌উইনকে পত্র লিখিয়াছিলেন। একটি প্রস্তাবে এ বিষয়ের বিবেচনাও স্থগিত রাখা হয়। এবারকার কার্য্যবিবরণে জে. আর. বেডফোর্ড—অস্থায়ী সম্পাদক বলিয়া সহি আছে। মূল সম্পাদক গ্রাট এ সময় কলিকাতার বাহিরে ছিলেন।* 'বেঙ্গল হরকরা' শিল্পবিদ্যালয়ের যাহাতে দ্রুত উন্নতি হয়, সে বিষয়ে বরাবর লেখনী চালনা করিতেছিলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫ সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'হরকরা' বলেন যে, অন্ততঃ মাদ্রাজের শিল্পবিদ্যালয়ে সেখানকার গবর্ণমেণ্ট যেরূপ অর্থসাহায্য করিতেছেন, বাংলা-সরকারেরও উচিত এই বিদ্যালয়টিকে অন্ততঃ সেইরূপ সাহায্য করা—বিশেষতঃ যখন দেখি এরূপ একটি বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার দ্বারা সমাজের অত্যধিক স্থায়ী উপকারের সম্ভাবনা।

শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার পরবর্ত্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১২ই মার্চ্চ (১৮৫৫) তারিখে। বাঙালী সভ্যেরা সভার কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এদিনকার সভায় বাঙালীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামচন্দ্র মিত্র, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সভায় ধার্য্য হইল, মৃৎ-কার্য্যাদি শিক্ষাদানের অধ্যাপক এম্. রিগউড প্রত্যহ ছয় ঘণ্টা করিয়া কাজ করিবেন, ইহার জন্য তাঁহার মাসিক বেতন হইবে তিন শত টাকা। চিত্রবিদ্যার শিক্ষক এম. আগিয়ার ইতিপূর্ব্বে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রতীতি হইতেছে। কারণ ইঁহার পরেই দেখিতেছি, রিগউড ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিখাইবার ভারও গ্রহণ করিয়াছেন। এই সভায় আরও স্থির হইল যে, প্রত্যেক সভ্যের পক্ষে মাসিক চাঁদা তিন টাকা অথবা এককালীন আড়াই শত টাকা দেয়। এ অধিবেশনে ডবলিউ. টেলর ও রাধানাথ সিকদার নূতন সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন। ইউরোপীয় ও দেশীয়দের নিকট সাহায্য প্রার্থনাকল্পে একখানি আবেদন-পত্র রচনার বিষয় স্থির করিয়া সভা একটি সাব্-কমিটির উপর তাহার ভার দেন। নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়: এইচ. গুড্‌উইন, জি. স্মালো, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, হরিমোহন সেন ও হজসন প্রাট।

৬

ইহার পরেই মনে হয়, মিঃ ফাউলার নামক একজন শিল্পী বিলাত হইতে শিল্পবিদ্যালয়ের তক্ষণশিল্পের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার বেতন হয় তিন শত

---

* *The Bengal Hurkaru and the India Gazette,* February 19, 1855.

টাকা। ১৬ই মে, ১৮৫৫ তারিখে লিখিত একখানি পত্র* হইতে এ বিষয় আমরা সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারি। পত্রলেখক এক দিন অকস্মাৎ শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ছাত্রদের শিল্পশিক্ষা সম্পর্কে যাহা যাহা দেখেন ও শুনেন তাহা এই পত্রে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, দ্বিতলে একটি হল-ঘরে প্রায় এক শত ছাত্র তিনটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া শিল্প-বিদ্যাদি শিক্ষায় রত ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা রেখাচিত্রাদি অঙ্কন করিতেছিল। দ্বিতীয় বিভাগে গাছ, ফুল, ফল ও পাতা আঁকায় ছেলেরা লিপ্ত, প্রথম বিভাগে প্রতিমূর্ত্তি ও পরিপ্রেক্ষিত (perspective) আঁকা হইতেছিল। এ সমুদয় এম্. রিগউড শিক্ষা দেন। মৃৎ-শিল্প, ছাঁচে-ঢালাই, ভাস্কর্য, এবং স্থাপত্য শিল্পের অঙ্কনাদি তাঁহাকে শিখাইতে হইত। এসব কর্ম্মে তাঁহার একজন মাত্র বাঙালী সহকারী। পত্রলেখক আর একটি প্রকোষ্ঠে ত্রিশ জন ছাত্রকে তক্ষণশিল্প—কাঠ খোদাই প্রভৃতি কার্য্যে নিরত দেখিতে পান। অধ্যাপক ফাউলারের তত্ত্বাবধানে তাহারা এ বিষয়টি শিক্ষা করে। ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ যেরূপ অভিনিবেশ সহকারে নিজ নিজ কর্ম্ম করিতেছিলেন, তাহাতে বিদ্যালয়ের দ্রুত উন্নতি সম্বন্ধে পত্রলেখকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। ছাত্রেরা সত্য সত্যই যে কোন কোন বিভাগে দ্রুত উন্নতি করিতেছিল তাহার প্রমাণও শীঘ্রই পাওয়া গেল। 'সিটিজেন' নামক দৈনিক জুলাই মাসের আরম্ভেই লিখিলেন:

"We are happy to state that the school of Industrial Art is now getting on well. The financial state of the Institution has been somewhat reclaimed. The encouragement of Mr. Fowler has done eminent benefit to it. Several of his pupils have so improved that the woodcuts that will adorn the pages of the work of Capt. D. L. Richardson "On flowers and flower gardens" have for the most part been prepared by them. From our knowledge of the performance we are able to say that they have been neatly executed, and reflect much credit both on pupils and instructors."†

পত্রিকাখানি এখানে এই মর্ম্মে বলেন যে, ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের 'অন ফ্লাওয়ার্স এণ্ড ফ্লাওয়ার গার্ডেন্‌স' পুস্তকের কাঠখোদাই চিত্রগুলি অধিকাংশই এই বিভাগের ছাত্রগণ তৈরি করিয়াছে। ইহাতে অধ্যাপক ফাউলার ও তাঁহার ছাত্রদল—দুইয়েরই কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। কাঠখোদাই ছবিগুলি খুবই পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করিয়া করা হইয়াছে।

৭

জুলাই মাসের শেষে শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার আর একটি অধিবেশন হইল।* এই অধিবেশনে পরবর্ত্তী বৎসরে শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর কি কি সংস্কার সাধিত হইবে তাহা স্থির হয়। এখানে বৎসরে চারিটি প্রাথমিক শিক্ষা-শ্রেণী ও তিনটি উচ্চ শ্রেণী খুলিতে সভা মনস্থ করেন। প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে নানারূপ অঙ্কন-পদ্ধতি শিখানো হইবে। এ সকল শ্রেণীতে পারদর্শিতা দেখাইবার পর উচ্চতর বিভাগে ছাত্রেরা প্রবেশ করিতে পারিবে। তিনটি উচ্চ শ্রেণীতে যথাক্রমে শিক্ষা দেওয়া হইবে—১ মৃৎ-পুত্তলি আদি নির্ম্মাণ ও ছাঁচে-ঢালাই, ২ তক্ষণশিল্প ও লিথোগ্রাফী, এবং ৩ উচ্চতর চিত্রবিদ্যা। প্রথম দুই শ্রেণীতেও চিত্রবিদ্যা শেখানো হইবে। ইহাদের প্রত্যেকটিতে ছাত্র-বেতন মাসে আড়াই টাকা, তৃতীয় শ্রেণীতে দুই টাকা দেয়। ইহা ছাড়া সভা বয়স্কদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ শ্রেণী খুলিবারও সিদ্ধান্ত করেন। এরূপ প্রত্যেক ছাত্রের বেতন ধার্য্য হয় মাসে পাঁচ টাকা। সপ্তাহে একদিন করিয়া তাঁহারা শিক্ষালাভ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত সাব-কমিটি কর্ত্তৃক সাধারণের নিকট সাহায্য চাহিয়া যে আবেদন-পত্র রচিত হইয়াছিল তাহাও এখানে গৃহীত হইল। প্রতিষ্ঠাকালীন বিজ্ঞপ্তি-পত্রসহ ইহা সংবাদপত্রে প্রকাশের প্রস্তাবও সভা গ্রহণ করিলেন। নব-রচিত আবেদন-পত্র হইতে জানা যায়, শিল্পবিদ্যালয়ের তখনকার ব্যয় ছিল মাসিক ৭২০৲ টাকা। ইহা দফাওয়ারী ভাবে এইরূপ দেখানো হয়—

মৃৎ-শিল্পকার্য্য, ছাঁচে-ঢালাই ও চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক (বাহির হইতে যেসব অর্ডার আসে তাহার আয় ও কমিশন বাদে)	মাসিক বেতন—৩০০৲
তক্ষণশিল্প ও চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক	„ —৩০০৲
ভৃত্য ও অন্যান্য ব্যয়	প্রতি মাসে —১২০৲
মোট	৭২০৲

সভ্যদের মাসিক চাঁদা ২৫০৲ টাকা, ছাত্র বেতন ১২০৲ টাকা, একুনে ৩৭০৲ টাকা মাত্র শিল্পবিদ্যালয়ের মাসিক আয়। নূতন শিক্ষাবিষয়ক সরকারী ডেস্‌পাচে বিদ্যালয়-সমূহে সরকারী অর্থসাহায্য প্রদানের যে নিয়ম হইয়াছিল তাহাতে বিদ্যালয়ের মাসিক চাঁদার সমপরিমাণ সাহায্য সরকারের নিকট হইতে তাঁহারা পাইতে পারিতেন।

* *The Bengal Hurkaru and the India Gazette*, May 17, 1855.

† Quoted in *The Bengal Hurkaru and the India Gazette*, July 5, 1855.

* *The Bengal Hurkaru* etc., Aug. 9, 1855.

সুতরাং তখনও এক শত টাকার মত সভার আর বাড়ানো দরকার ছিল। প্রয়োজনীয় ব্যয় তখন পর্য্যন্ত প্রতি মাসে স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে মিটানো হইতেছিল। আবেদন-পত্রে সর্ব্বশেষে সাধারণের নিকট এই পরিমাণ অর্থসাহায্যের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়।

এই দিনের অধিবেশনে পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধ্যক্ষ-সমিতিও গঠিত হয়। সভাপতি কর্ণেল গুড্‌উইন এবং সম্পাদকদ্বয় হজসন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্ব্ববৎই রহিলেন। কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ডাঃ এ. সি. ম্যাক্রি। ইহা ছাড়া সদস্যদের মধ্যে ছিলেন একুশ জন ইউরোপীয় ও দশ জন বাঙালী। শেষোক্তদের নাম এই: ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী, রামগোপাল ঘোষ, বিশ্বেশ্বর দত্ত, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামচন্দ্র মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, হরিমোহন সেন, হরমোহন চট্টোপাধ্যায় ও রাধানাথ সিকদার।

উক্ত অধিবেশনে আরও সাব্যস্ত হয় যে, পরবর্ত্তী ১লা সেপ্টেম্বর শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করা হইবে, ঐ সময়ে তাহাদের শিল্পকার্য্যের একটি প্রদর্শনীরও তাঁহারা আয়োজন করিবেন। সভার পরবর্ত্তী সাধারণ অধিবেশনে (২৯ আগষ্ট ১৮৫৫) অধ্যাপক ব্রিগউডের অসুস্থতানিবন্ধন উহা কিছুকালের জন্য পিছাইয়া দেওয়া হইল।* এদিনকার অধিবেশনের আলোচনা হইতে কয়েকটি নূতন বিষয় জানা গেল। লাইসিয়াম হইতে চিত্রবিদ্যার পুস্তক ও তদুপযোগী দ্রব্যাদি বিদ্যালয়ের জন্য পাওয়া যায়। সম্পাদক প্রাট নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য প্যারিস হইতে অনেকগুলি রেখাচিত্র এবং প্যারিস-প্লাষ্টার আনয়ন করিয়াছেন। সরকার হইতে অর্থসাহায্য পাওয়া গেলে, তিনি সানন্দে এগুলি বিদ্যালয়কে দান করিবেন, বলেন। একটি প্রস্তাবে সরকারকে এই বলিয়া অনুরোধ জানানো হয় যে, এখানকার শিল্পী ছাত্রগণকে শিক্ষান্তে যেন সরকারী জেলা ও অন্যান্য স্কুলে চিত্রাঙ্কনের শিক্ষকরূপে গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘকাল পরে, সম্প্রতি কিছুকাল হইতে এই অনুযায়ী কার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আর একটি প্রস্তাবে সম্পাদক হজসন প্রাটের কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে আমেরিকান একেশ্বরবাদী পাদ্রী সি. এইচ্. এ. ড্যালকে অন্যতর সম্পাদকপদে নিয়োগ করা হয়।

৮

অবশেষে ১৮৫৫ সনের ১০ই অক্টোবর শিল্পবিদ্যালয়ের বর্ষপূর্ত্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এই দিন ছেলেদের শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উৎকর্ষের নিরিখে যথারীতি পারিতোষিকও প্রদান করা হয়। এ উৎসবে সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স পীল। সভাপতির ভাষণে তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রদের শিল্পবিদ্যায় উৎকর্ষ দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এরূপ একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান—যেখানে শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণ স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের সুযোগ পাইতেছে তাহার সাহায্যার্থে সরকারকে অগ্রসর হইতেও বিশেষ জোরের সহিত দাবি জানান। এই উপলক্ষে ছেলেদের চিত্রাদির একটি প্রদর্শনীও ১০ই ও ১১ই অক্টোবর বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খোলা হইল। ঐ সময়কার সংবাদপত্র সম্পাদকগণ শিল্পবিদ্যালয়ের ভাবী সুফল-সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া নিজ নিজ পত্রে বিশেষ প্রশংসা করেন। আমরা এখানে ডি. এল. রিচার্ডসন সম্পাদিত 'ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

". . . For our own part we were perfectly astonished at the progress made by the students in so short a time; and we can hardly speak in terms of sufficiently high praise of all concerned in the establishment of this well-meant and well-judged attempt to instruct the mind and hand simultaneously of the youthful Hindoo, so that he may become at once an enlightened and a practically useful member of society. A man so educated, conscious that he has the means, will insensibly acquire the habit and the pride of self-support and independence. If this Institution be continued, as we earnestly hope it may, the most generous-spirited amongst the middle classes of natives will soon scorn the work of mere copying clerks. Because they will learn to trust and respect their own powers for something infinitely better." (Quoted in *The Bengal Hurkaru and the India Gazette*, October 15, 1855, (Supplement).

শিল্পবিদ্যালয়ে ছাত্রগণ যেরূপ অল্পকালের মধ্যে শিল্পবিদ্যায় উন্নতিলাভ করিয়াছে, 'গেজেটে'র মতে তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। হিন্দু ছেলেরা নকলনবিশ কেরাণীগিরির জন্য ধরনা না দিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে। তাহারা আত্মশক্তিতে আস্থা ফিরিয়া পাইবে, নিশ্চয়। 'গেজেট' অন্যত্র সরকারী সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ১১ই অক্টোবর শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যগণ ছোটলাট হেলিডের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য সাক্ষাৎ ভাবে একখানি আবেদন-পত্র পেশ করিয়াছেন। সরকারী সাহায্যলাভে আরও কিছু বিলম্ব হয়। যাহা হউক, ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণ উৎসব ও শিল্প-প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ উদ্‌যাপিত হইল।

* ঐ, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫

আন্তর্জাতিক সন্ধির বাধ্যবাধকতা

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

স্বাধীন ভারতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমস্যা ও প্রকৃতির আলোচনা অবান্তর নহে, বরং প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। আজ কোনও রাষ্ট্র অন্য এক রাষ্ট্রের সহিত যে চুক্তি করিল, কিছুদিন পর সে চুক্তি ভঙ্গ করিবার যথেচ্ছ অধিকার তাহার আছে কি না; যদি থাকে তবে সে কিরূপ ক্ষেত্রে? চুক্তিভঙ্গ যদি অপর রাষ্ট্রের অসম্মতিক্রমে হয় এবং সেই রাষ্ট্র যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে শেষোক্ত রাষ্ট্রের প্রতিকার কি?

আমরা চারিদিকে এমন কতকগুলি দৃষ্টান্ত অধুনা দেখিতে পাইতেছি যাহাতে এই বিষয়টির আলোচনা সময়োচিত মনে হয়। বিগত বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটেন মিশরের সঙ্গে এক চুক্তি করে যাহার দরুন ইংরেজ প্রতিশ্রুতি দেয় যে যুদ্ধান্তে মিশর ও সুয়েজখাল হইতে সে তাহার সৈনিক ও ডেরাডাণ্ডা তুলিয়া লইবে, সুদান অঞ্চলও মিশরের কর্তৃত্বাধীনে ছাড়িয়া দিবার অঙ্গীকার করে। আজ ইংরেজ এই সব সর্ত্ত পালনে অস্বীকার করিতেছে।

মাস দুই পূর্ব্বে যখন ইরাণ রাষ্ট্র পারস্যদেশে প্রায় বার-তেরটি ইংরেজ বাণিজ্য দূতাবাস বা কনস্যুলেট বন্ধ করিবার আদেশ দেন, তখন ইংরেজ পক্ষ হইতে পৃথিবীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে ১৮৫৭ সালের সন্ধি অনুসারে ইরাণের এ কার্য্য গর্হিত। ইরাণ সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াছে।

কোনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ সেই রাষ্ট্রের আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। ইহা বিধিবদ্ধ অর্থাৎ ব্যবস্থা-পরিষদে গৃহীত লিপিবদ্ধ আইনও হইতে পারে বা চিরাচরিত প্রথা বা 'কমন ল'ও হইতে পারে। কোনও ব্যক্তি আইন ভঙ্গ করিলে, অপর ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিচার-বিভাগের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারে এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত পালিত হয় কি না ইহা দেখিবার ভার থাকে রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগের উপর। সুতরাং সমাজজীবনে ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিবার, বিরোধ মিটাইবার ও অন্যায়কারীকে শাস্তি দিবার জন্য রাষ্ট্রশক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেহেতু এই রাষ্ট্রশক্তি জনসাধারণের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সেই কারণে ইহাকে দোষী ব্যক্তি অমান্য করিতে পারে না।

আন্তর্জাতিক সমাজে বিভিন্ন রাষ্ট্র একত্র হইয়া এমন কোনও শক্তিকেন্দ্র রচনা করে নাই যাহার আন্তঃরাষ্ট্রিক বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন বিধিবদ্ধ আইন নাই এবং সেই আইন প্রয়োগ করিবার কোন পদ্ধতিও নাই। যদিও আমরা 'ইণ্টারন্যাশনাল ল' বা আন্তর্জাতিক আইনের উল্লেখ সর্ব্বদাই পাই, উহা একটি ভুয়া পদার্থ। রাজনীতির অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণ তত্ত্ব-বিচারে সুবিধার জন্য "আইন" শব্দটি ব্যবহার করিলেও উহার "আইন"রূপে কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নাই।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ইউরোপ ও এসিয়া জুড়িয়া দুইবার যে মহাসমর হইয়া গেল—তাহার অবসানে দুই বারই বিজিত রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রসঙ্ঘ নামে প্রতিষ্ঠান খাড়া করিয়া দুনিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের জালের মধ্যে গুটাইয়া তুলিয়া প্রভুত্বের বাঁটোয়ারার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু শক্তিমানদের পরস্পর হিংসা ও নিজের কোলে ঝোল টানার প্রচেষ্টায় ধাপ্পা ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

আইন (রাষ্ট্রের) ব্যক্তি-অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায়। আন্তর্জাতিক সমাজের কল্পনা সত্য হইলে একক-রাষ্ট্রের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োজন। এখন তাহা নাই—শীঘ্র যে হইবে তাহার আশাও দেখিতেছি না। কেন না, ডেমোক্রাটিক রাজ-চক্রবর্ত্তিত্বের সূত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধরূপেই দুইটি রাষ্ট্রের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং এতাবৎকাল (অন্ততঃ গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) বিশেষজ্ঞেরা সন্ধি-পত্রকে আন্তর্জাতিক আইনের অংশরূপে উল্লেখ করিতেন। অধ্যাপক ছাত্রদের এবং রাজনৈতিক নেতারা ভোটদাতাগণকে শিখাইয়া আসিয়াছেন যে, সন্ধির সর্ত্ত শাস্ত্রের অনুশাসনের মতই অলঙ্ঘনীয়। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতিকে ইঁহারা জড়াইয়া জট পাকাইয়া ফেলিয়াছেন।

অনেকেরই মনে থাকিতে পারে যে, ১৯১৪ সালে যখন জার্ম্মানী বেলজিয়াম আক্রমণ করিল, তখন ইংলণ্ডের শাসক-সম্প্রদায় তারস্বরে চীৎকার জুড়িয়া দিলেন যে, জার্ম্মানী একটা আস্ত পাষণ্ড—রাবণ কিংবা মহিষাসুর। সে সন্ধিপত্র "চোথা কাগজের" মত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। বেলজিয়ামের নিরাপত্তামূলক সন্ধি-সর্ত্ত অবহেলা করিয়াছে, ইংলণ্ডের জনগণকে এই ধাপ্পাবাজি দ্বারা উত্তেজিত করিয়া ইংরেজ যুবক, বালক, প্রৌঢ়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ নাগরিককে কচুকাটা হইতে পাঠাইয়াছে।

অথচ ইংলণ্ড, আমেরিকা বা অন্য যে-কোনও স্বাধীন দেশে যাঁহারা রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেন, তাঁহারা জানিতেন যে, সন্ধির সর্ত্ত অবশ্যপালনীয় হইতে পারে না। সন্ধির সর্ত্ত আন্তর্জাতিক আইনের অংশরূপে অলঙ্ঘনীয় বলিয়া যত জোরগলায় প্রচারিত হউক না কেন, অবস্থা-

বিশেষে উহা পালন করা রাষ্ট্র-স্বার্থের পরিপন্থী হইলে কাল-বিলম্ব না করিয়া সে সন্ধি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে সে রাষ্ট্র বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না। অবশ্য এরূপ বাতিল করিবার আগে নিজ শক্তিসামর্থ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। কেননা, যদি অপর রাষ্ট্র গায়ের জোরে সন্ধিসর্ত্ত পালন করাইতে অগ্রসর হয় তবে তাকে পরাজিত করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। সে ক্ষমতার অভাবে অবশ্য কোনও রাষ্ট্র চুক্তিভঙ্গে সাহসী হয় না। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ঘোষণা করিয়াছিল—"১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিগুলি ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের দ্বারা স্বীকার্য্য নহে।" ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসানে পরাজিত রাশিয়ার উপর বসফোরাস প্রণালী ও বাল্টিক-সাগরের প্রণালীর মধ্য দিয়া জাহাজ চালানো নিষিদ্ধ করিয়া কতকগুলি সর্ত্ত আরোপিত হয়। ১৮৭১ সালে রাশিয়া এই সন্ধিসর্ত্তগুলি মানিয়া চলিতে অস্বীকার করে।

এই সব ঘটনার পর আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞগণ রাষ্ট্রনীতির এক নূতন সূত্র বা ফরমুলা আবিষ্কার করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে কোনও সন্ধি ততক্ষণই পালনীয় যতক্ষণ যে অবস্থায় ও যে পরিবেশে উক্ত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, সেই অবস্থা ও সেই পরিবেশ বর্ত্তমান থাকে—অন্যথায় নহে। ইহার নির্গলিতার্থ এই যে, সামরিক শক্তির দাঁড়িপাল্লার হেরফের হইলেই সন্ধিপত্রের অনুশাসন-ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। তখন প্রবলতর রাষ্ট্রের চোখে উহা "চোথা কাগজ"। বিসমার্কের একটা বিখ্যাত উক্তি এই—"ইউরোপের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট পরিস্থিতির স্থায়িত্বের দ্বারা সন্ধির বাধ্যবাধকতার নীতি নিরূপিত হয়।" থিয়োডোর রুজভেল্ট বলিয়াছেন—"কোনও সন্ধি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করার অধিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই আছে। ইহা তাহার স্বাভাবিক ও মৌলিক অধিকার। এরূপ আচরণের সঙ্গতি ও অসঙ্গতি বিচার করিবার মালিকও রাষ্ট্র স্বয়ং—যেমন যুদ্ধ ঘোষণা করার বা অন্য কোনও পররাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার অপর রাষ্ট্রের বিচার বা নির্দ্দেশ-নিরপেক্ষ।" (প্রিঙ্গল লিখিত "থিওডোর রুজভেল্টের জীবনী", ৩০৯ পৃঃ)। প্যারিস শহরে ১৯১৯-২০ সালে যখন শান্তিবৈঠক চলিতেছিল, তখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উডরো উইলসন ঘরোয়া আলাপে একবার বলেন—"আমি যখন কলেজে আন্তর্জাতিক আইন পড়াইতাম তখন ছাত্রগণকে বলিতাম—আমার বিশ্বাস প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই যে-কোনও সন্ধি নাকচ করিবার অধিকার আছে।" (মিলারের "ড্রাফটিং অফ দি কভেন্যান্ট, ১ম অঃ, ২৯৩ পৃঃ)

এখন এ সম্বন্ধে ইংরেজের আচরণ আলোচনা করা যাক। এক সময়ে ব্রিটেন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাষ্ট্র ছিল। কূটনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের ইচ্ছায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সন্ধির সর্ত্তগুলি নির্দ্দিষ্ট হইত। নিজ স্বার্থ বিচার করিয়াই ব্রিটেন যে সব সর্ত্ত আন্তর্জাতিক সন্ধিপত্রে চাপাইয়া দিত, সেগুলি সম্বন্ধে তাহার নীতি ছিল "পরের বেলা আঁটিসাঁটি, নিজের বেলা দাঁতকপাটি।" পূর্ব্বে বেলজিয়মের নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে সন্ধির উল্লেখ করিয়াছি তাহা ১৮৩৯ সালে সম্পাদিত হয়। কোনও প্রবল শত্রু বেলজিয়ম অধিকার করিলে শুধু যে ইংলণ্ডের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তেমন নয়, অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। সুতরাং এরূপ চুক্তি বেলজিয়মের জনগণের মঙ্গল চিন্তা করিয়া কেহ করেন নাই, ব্রিটেনের নিজ গরজেই ইহা প্রণীত হয়। কিন্তু গরজ বড় বালাই। ১৮৭০ সনে ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর লড়াইয়ের সময়, ইংলণ্ডের আত্মরক্ষার সাময়িক প্রয়োজনে, জার্ম্মানীকে আক্রমণ করার প্রয়োজন হইলে বেলজিয়মে সৈন্যসমাবেশ অপরিহার্য্য বলিয়া সামরিক কর্ত্তারা মত প্রকাশ করেন। তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন কমন্স সভায় বলেন—"যাঁহারা বলেন যে সকল ক্ষেত্রে সকল অবস্থাতেই, যতই গুরুতর প্রয়োজন হউক না কেন, চুক্তির সর্ত্ত অবশ্যপালনীয়, তাঁহাদের সহিত একমত হইতে আমি অক্ষম।" গ্লাডষ্টোনের মতে এরূপ মনোভাব কঠিন (রিজিড) ও অবাস্তব (ইমপ্র্যাকটিকেবল)। (ভাইকাউণ্ট গ্রের "স্পীচেস্ অন ফরেন এফেয়ার্স" পুস্তকের ৩০৭ পৃঃ)। প্রথম মহাযুদ্ধের আগের দিন, ১৯১৪ সালের ৩রা আগষ্ট, গ্লাডষ্টোনের এই উক্তিটি গ্রে পার্লামেণ্টে উল্লেখ করেন। কিন্তু ১৯১৪ সালের অনেক পূর্ব্বেও আমরা ব্রিটেনের মনোভাব সম্বন্ধে নজির পাইতেছি। ১৯০৮ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র দপ্তরের স্থায়ী উপমন্ত্রী ছিলেন (ইনি পরে ভারতের বড়লাট হন)। ইনি বিশেষ একটি গোপনীয় দলিলে মন্তব্য করেন—"আমাদের দায়িত্ব অবশ্য অস্বীকার্য্য (বেলজিয়মের নিরাপত্তাচুক্তি সম্পর্কে)...কিন্তু বেলজিয়মের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটিলে বিঘ্নকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সে দায়িত্ব ইংলণ্ড পালন করিবে কিনা তাহা নির্ভর করে সেই সময়ে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ধারা ও তাৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর। ধরুন, জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধে ফ্রান্স বেলজিয়মের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাইতেছে, তাহা হইলে ব্রিটেন ও রাশিয়া বিঘ্নকারী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অঙ্গুলিহেলনও করিবে কিনা সন্দেহ। অথচ আজ যদি জার্ম্মানী অনুরূপ কারণে বেলজিয়ম আক্রমণ করে, তাহা হইলে ইংলণ্ড বিপরীত পন্থাই গ্রহণ করিবে।" (গুচ ও টেম্পার্লি সম্পাদিত,

"বৃটিশ ডকুমেন্টস অন দি অরিজিন অফ দি ওয়ার" পুস্তকের ৮ম অধ্যায়, ৩৭৭-৮ পৃঃ)

সন্ধির নির্লজ্জ চুক্তিভঙ্গের আর একটা যুক্তি কূটনৈতিকেরা অনুমোদন করেন। "প্রয়োজন" বা "বৃহত্তর স্বার্থের" খাতিরে উহা সমর্থিত হয়। আইনের ছাত্রদের ইহা সুবিদিত যে, আইন কাহাকেও কোনও অসম্ভব কার্য্যে চুক্তিবদ্ধ হইতে সমর্থন করে না। পর-রাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিভঙ্গীতে, যাহা কিছু আমার রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী তাহাই উহার পক্ষে অসম্ভব। কোন কোনও পণ্ডিতের মতে রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার তাগিদে ভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত চুক্তিভঙ্গ করার অধিকার আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই সিদ্ধ। এরূপ ব্যাখ্যা অবশ্য যুদ্ধের সময় সব রাষ্ট্রই সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১৯১৪ সালে ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ড যখন ইউরোপের উপকূল অবরোধ (ব্লকেড) করিয়া জার্ম্মানীতে মালসরবরাহে বাধা দিতেছিল তখন নিরপেক্ষ আমেরিকার স্বার্থহানি হওয়ায়, ইংলণ্ডের নিকট সে এক প্রতিবাদ পাঠায়। কিন্তু প্রতিবাদ করিয়াও একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক নীতি অনস্বীকার্য্য বলিয়া উল্লেখ করে। তাহা এই—"আন্তর্জাতিক আইনমতে যুযুধান রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অবাধ বাণিজ্য-অধিকারে বাধাদান আইনবিরুদ্ধ বটে; তবে যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এরূপ বাধাদান একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা গর্হিত নহে। তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত বাধা সৃষ্টি করা সঙ্গত নহে।" মার্কিন নোটের এই মন্তব্যটুকুর সম্পূর্ণ সুযোগ ব্রিটেন গ্রহণ করিল এবং "দেশের নিরাপত্তার" "একান্ত আবশ্যকতার" অজুহাতে অবরোধ তুলিয়া লইতে আপত্তি করিল। যখন "জেমসন রেইড" নামে কুখ্যাত ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় তখন অনেক ইংরেজ ইহাকে অন্যায় বলিয়াছিলেন। এই ডাকাতি বুয়র যুদ্ধের সূচনা বলা চলে। তখন ইংলণ্ডের রাজ সভাকবি লর্ড টেনিসনের একটি কবিতা লণ্ডনের "টাইম্‌স্" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়:

"লেট ল-ইয়ার্স অ্যাণ্ড ষ্টেটসমেন অ্যাড্‌ল্
"দেয়ার পেট্‌স্ ওভার পয়েন্টস্ অফ ল';
"ইফ্ সাউণ্ড বি আওয়ার সোর্ড অ্যাণ্ড হ্যাড্‌ল্
"অ্যাণ্ড গান-গিয়ার, হু কেয়ার্স ওয়ান ষ্ট্র?"

অর্থাৎ—নিছক ডাণ্ডার যুক্তিই পররাষ্ট্রনীতিতে একমাত্র যুক্তি, ইহাই ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি ও সংবাদপত্র উভয়েরই মত। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জাপান যখন চীন আক্রমণ করে তখন জাপানী রণতরী চীনের উপকূল পাহারা দিত ও চীনগামী বিদেশী জাহাজ খানাতল্লাসী করিত। ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হইলে জাপানী নৌবিভাগের একজন কূটনৈতিক বক্তা বলেন, "এ ব্যাপারে আমাদের অধিকার আছে কিনা ইহা বিচার্য্য নহে। আমাদের প্রয়োজন আছে এবং আমরা তাহা করিতেছি।" ("টাইম্‌স্" পত্রিকা, ২৬শে মে ১৯৩৯)। এ সম্বন্ধে হিটলারের উক্তি—"জাতি যখন বিনাশ বা অত্যাচারের সম্মুখীন, তখন নীতি আইন-সম্মত কিনা এ প্রশ্ন নিতান্তই গৌণ।" (মীন কেম্‌ফ—১০৪ পৃ.)।

দেখা যাইতেছে যে, যখন কোনও রাষ্ট্র সন্ধির সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যে সব কৈফিয়ৎ সে দেয় তাহা হইতে বুঝা দায় হইয়া পড়ে যে, সে আইন-নিষ্ঠা বা ধর্ম্ম-নিষ্ঠা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ঐরূপ করিতেছে। ১৯৩৫ সনে জার্ম্মানী যখন ভের্সাই সন্ধির সামরিক সর্ত্তগুলি মানিয়া চলিতে অস্বীকার করে তখন সে বলে যে সন্ধিপত্রের অন্যান্য স্বাক্ষরকারিগণ, অস্ত্র-হ্রাসের সর্ত্তগুলি পালন করিতেছে না। পরবর্ত্তী বৎসরে যখন জার্ম্মানী লোকার্ণো চুক্তি বাতিল করে, সে কারণ দেখায় যে, ফরাসী-সোভিয়েট সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকার্ণো সন্ধি ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এগুলি আইন-ঘটিত যুক্তি। রাইনল্যাণ্ড অধিকার করিয়া হিটলার বলিয়াছিলেন—"সমস্ত বিশ্ব সন্ধির বাক্যার্থ লইয়া কচকচি করুক; আমি রাষ্ট্রধর্ম্ম আঁকড়াইয়া থাকিব।"

পরাজিত রাষ্ট্রকে যখন বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহ সন্ধির চুক্তিতে আবদ্ধ করেন, তখন প্রভূত অন্যায় সঙ্ঘটিত হয়। ভের্সাই সন্ধি ও ব্রেষ্ট-লিট্‌ভস্ক্ সন্ধি—এই দুইটাই ছিল অত্যাচারমূলক। এগুলি অস্বীকার করিয়া জার্ম্মানী অধর্ম্ম করে নাই এ মত এখন অনেকেই পোষণ করেন। এ ধরণের সন্ধি যে-কোনও রাষ্ট্রকে মানিতে বাধ্য করাই অধর্ম্ম।

সুতরাং সামরিক সামর্থ্যই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সন্ধিব্যাপারে আসল দিক-দর্শক। প্রবল রাষ্ট্র দুর্ব্বলের সঙ্গে সন্ধি করিয়া মনে করে অপর পক্ষকে সন্ধির সর্ত্তপালনে সে বাধ্য করিবে, কিন্তু বলসাম্যের পরিবর্ত্তন হওয়ামাত্র ঐ দুর্ব্বল রাষ্ট্র সন্ধি উপেক্ষা করিবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে সব দুর্ব্বল রাষ্ট্র প্রবলতর রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিল তাহারা জার্ম্মানী, জাপান ও ইটালী। এই তিন রাষ্ট্রই পরবর্ত্তীকালে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি হওয়া মাত্র পূর্ব্বের সব সন্ধি বাতিল করিয়াছিল। ১৯১৮ সনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার অপেক্ষা প্রবলতর কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যে চুক্তি সে পোদা ও ইয়ালটাতে করিয়াছিল, তাহা এখন নড়বড় করিতেছে। সুতরাং কে প্রবলতর তাহার পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী।

যত দিন পাকিস্থান নিশ্চিন্ত যে ভারত-রাষ্ট্র অস্ত্রের যুক্তি প্রয়োগ করিবে না, তত দিন সে খোশ-মেজাজে সব চুক্তি নস্যাৎ করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। পাসপোর্ট-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে আমরা যতই চীৎকার করি, সে তাহা অনাবশ্যক চীৎকার মনে করিয়া নিজের গোঁ বজায় রাখিয়া চলিবে।

দরবেশ কবি আলীরাজা

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের কোন জেলার এক রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে কোন প্রসিদ্ধ বাঙালী মুসলমান বলিয়াছিলেন—"আমি ধর্ম্মে মুসলমান কিন্তু জাতিতে বাঙালী।" বাঙালীত্বে বিশ্বাসের যে পরিচয় উদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, পাকিস্থানের আন্দোলনের বন্যায় তাহা একেবারে ধুইয়া-মুছিয়া ফেলিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে চেষ্টা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ফলবতী হইতে পারে নাই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য যে অভিযান পাকিস্থানের উর্দ্দু ভাষাভাষী কর্ত্তাদের দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান ভ্রাতাদের মন হইতে বাঙালীত্বের অনুভূতি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নাই।

বাঙালীত্ব অর্থাৎ বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাস ছিল বঙ্গদেশের মুসলমানগণের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ব্রিটিশ শাসনের যুগে পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিক ও পর্য্যবেক্ষকেরা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে ঐ কারণেই অনেকটা পৃথক রকমের ছিল।

বাঙালী মুসলমান ভ্রাতাগণের এই বাঙালীত্ব বোধের কথা আলোচনা করিতে গিয়া যদি আমরা এ দেশের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাই, তবে দেখিতে পাই যে এককালে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক অতিশয় নিবিড় হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও ইহা সত্য যে এই সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় বঙ্গদেশের তুর্কী-আরব বংশীয় মুসলমান ধর্ম্মবিশ্বাসী শাসনকর্ত্তাদের সময়ে। বিজেতা শাসনকর্ত্তাদের সমধর্ম্মাবলম্বী হওয়ার জন্য বিজেতৃসুলভ গর্ব্বে স্ফীত হওয়া তো দূরের কথা, বাংলার মুসলমানসমাজের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা যে স্বদেশবাসী হিন্দুদিগের সহিত ধর্ম্মব্যতীত অন্য প্রায় সকল বিষয়েই একাত্মতা বোধ করিতেন, আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারায় হিন্দুর সহগামী ছিলেন, বিখ্যাত লেখকগণের রচনা পড়িয়া এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমানসমাজ কেবল যে আচার-ব্যবহারেই হিন্দুঘেঁসা হইয়াছিল তাহা নহে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র এবং হিন্দুর আধ্যাত্মিক সাধনা-পদ্ধতি বাঙালী মুসলমানসমাজের অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির চিন্তাধারাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল। ডাঃ এনামুল হক "আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থে এই বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান-সমাজের বর্ণনায় তিনি দেখাইয়াছেন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচার-ব্যবহারের প্রভাব ঐ সমাজে কত বেশী লক্ষিত হইত। হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুর সাধনাপদ্ধতির প্রভাবের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হইতেছে মুসলমান-সমাজে প্রচলিত পীরপূজার প্রথা। এই পীরপূজা হিন্দু-গুরুবাদেরই নামান্তর মাত্র। ডঃ এনামুল হকের নিজের কথায়—"বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে এই সময় পীরপূজার বহুল প্রচলন হয়। এই পীরপূজা ও হিন্দুর গুরুবাদে কোন প্রকারের প্রভেদ ছিল না। পীরদের হাতে দীক্ষা গ্রহণ করাকে মুসলমানগণ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বিশ্বাসে পরিণত করে। পীরগণ 'মুর্শিদ' বা পরমার্থ পথদ্রষ্টা নামে সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন। তাঁহাদের ভক্ত শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে ভগবানের জাগতিক প্রতিনিধি ও 'মা-রফত' অথবা তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন মুর্শিদ বা পীরকে পূজা করিলে হৃদয়ের যাবতীয় অজ্ঞানতা-অন্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, পরলোকে মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়া যায় এবং শরীর পবিত্রীকৃত ও বিশুদ্ধ হয়:

> কায়া শুদ্ধ হয় জান মুর্শিদ ভজিলে।
> নাটি দৈন্যে চলে যেন আজ্ঞিয়ান সকলে॥
> মুর্শিদ প্রসাদে হয় আঁখির প্রকাশ।
> মিহির কিরণে যেন উজ্জ্বল আকাশ।"

(জনৈক মধ্যযুগীয় মুসলমান কবির রচনা)

উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে হিন্দুশাস্ত্রের "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া" প্রভৃতি গুরুমাহাত্ম্যব্যঞ্জক কথাগুলির অবিকল প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে। সেকালের মুসলমান-সমাজে হিন্দুদিগের মতই অন্নপ্রাশন, বিবাহের পূর্ব্বে অধিবাস, মঙ্গলঘট, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম প্রভৃতি প্রথার প্রচলন ছিল, একথা কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন কি? অথচ বর্ত্তমান যুগের একজন সুপণ্ডিত ও বিখ্যাত মুসলমান লেখক মধ্যযুগীয় মুসলমানদিগের রচিত বহু বাংলা পুথি ও মুদ্রিত পুস্তক হইতে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হইতেছে এই যে, হিন্দুঘেঁসা আচার-ব্যবহার সেকালে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানসমাজ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান-সমাজেই অধিকতর প্রচলিত ছিল।

হিন্দুশাস্ত্রে নরজ্ঞান এবং হিন্দুর আধ্যাত্মিক ভাবধারার অনুরাগী বলিয়া পরিচিত বহু মুসলমান লেখকের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকের সম্বন্ধে "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" এই আখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ হিন্দু-শাস্ত্রাদিতে গভীরতর জ্ঞানলাভের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের দু'এক জনের জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা না করিলে আমরা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিব না যে জ্ঞানমার্গের পথিক এই বাঙালী মুসলমান ভ্রাতারা হিন্দুর আধ্যাত্মিক ভাবসাগরে কতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন। কবি আলাওয়াল প্রভৃতি এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু এই প্রবন্ধে যে দরবেশ কবির কথা আলোচিত হইতেছে, তিনি হিন্দুর আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সহিত অধিকতর পরিচিত ছিলেন।

আলীরাজার অপর নাম কালু ফকির। প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী ও সঙ্গীতগুলি হইতে মনে হয় তিনি একজন ভক্ত সাধক ছিলেন এবং হিন্দুর সাধনা-পদ্ধতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দুর শাস্ত্র, বিশেষতঃ যোগশাস্ত্র ও অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার রচনা হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। আলীরাজার প্রধান গ্রন্থ হইতেছে "জ্ঞানসাগর"। ইহা গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। রচনাপদ্ধতি, ভাবধারা সমস্তই হিন্দুর মত। "মোহাম্মদ," "পয়গাম্বর", "রছুল", "হুর" প্রভৃতি কথাগুলি না থাকিলে কেহ মনে করিতে পারিবে না যে গ্রন্থখানির রচয়িতা অ-হিন্দু। আলীরাজা অনুরূপ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ ও কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সাধারণ পারমার্থিক সঙ্গীতের সঙ্গে আলীরাজার রচনার মধ্যে কতকগুলি বৈষ্ণবপদ এবং দুইটি শ্যামাসঙ্গীতও আছে বলিয়া কথিত হয়।

বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক আলীরাজার "জ্ঞানসাগর" গ্রন্থখানির যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল. মুন্সী শ্রীআব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক লিখিত উহার ভূমিকায় আলীরাজার "জ্ঞানসাগর" ও অন্যান্য রচনার নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায় :

"ইহা (জ্ঞানসাগর) একখানি দরবেশী গ্রন্থ। ইহার প্রায় আদ্যোপান্ত নিগূঢ় আধ্যাত্মিক কথায় পূর্ণ। সে আধ্যাত্মিকতায় আবার হিন্দু-মুসলমানী ভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়... এই 'জ্ঞানসাগর' ব্যতীত আলীরাজার রচিত 'সিরাজ কুলুপ' ও 'ধ্যানমালা' নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ 'যোগ কালন্দর' নামক যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থকেও তাঁহার লেখনী প্রসূত বলিয়া মনে করেন...এই সকল ভিন্ন তাঁহার রচিত 'ষট্‌চক্র ভেদ' গ্রন্থের কথাও শুনা যায়।"

আলীরাজার বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে মুন্সী আব্দুল করিম বলেন :

"তাঁহার সে সমস্ত গীতে রাধাকৃষ্ণের লীলার বর্ণনা আছে। ...তাঁহার ন্যায় একজন স্বধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান এরূপ করিলেন কেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। কেহ কেহ বলেন, মুসলমান ফকিরদের মতে মানবদেহই রাধা ও মনই শ্রীকৃষ্ণ। যদি এই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে আলীরাজা প্রভৃতি কবিগণকে 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' নামে অভিহিত করা সঙ্গত হয় না।...দেখা যায় বহু পদেই তিনি আপনাকে 'জন্মে জন্মে ভক্ত রাধা হরির চরণে' বলিয়া পরিচিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই... (তাঁহার রচিত শ্যামাসঙ্গীতে) দেখা যায়, তিনি 'শিত আলী রাজা ভণে তার কালিকা দাস' বলিয়া ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। এক দিকে তাঁহার এই হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ভক্তি, অন্য দিকে 'জ্ঞানসাগর' প্রভৃতি হইতে তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগের পরিচয়—এই পরস্পর বিরোধী ভাব দুইটি মিলিয়া সমস্যাটিকে বড়ই জটিল করিয়া তুলিয়াছে।"

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মুসলমানী বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। আলীরাজার গ্রন্থ ও সঙ্গীতাদি হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আলীরাজা একদিকে হিন্দু দেবদেবীতে ভক্তিমান, অপর দিকে তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগও সন্দেহাতীত। এবং এই জন্য আলী রাজা যে স্ব-সম্প্রদায়ের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এমন কথাও শুনা যায় নাই। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর উদারচেতা ও সুপণ্ডিত বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুধর্ম, বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের মৌলিক আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ও যোগশাস্ত্রের চর্চ্চা যথেষ্ট প্রসারলাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ আলীরাজা ভিন্ন আরও অনেক বাঙালী মুসলমানের লিখিত এই সম্বন্ধীয় পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লেখকের সহিত ডাঃ মুহম্মদ এনামুল হকের সাক্ষাৎকালে ডাঃ হক বলিয়াছিলেন যে, বাঙালী মুসলমানগণের দ্বারা বাংলা ভাষায় লিখিত যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু পুথি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকখানি হস্তলিখিত পুথি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থমুদ্রণের পরিকল্পনাও ডাঃ হক স্থির করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, আলীরাজাকে আমরা সেই হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম-সমন্বয়ের যুগের এক জন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি এবং তাঁহার রচিত "জ্ঞান-

সাগর" গ্রন্থ এই সমন্বয় প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই সমন্বয় প্রচেষ্টা যে পক্ষ প্রথম আরম্ভ করে তাহারা হিন্দু কি মুসলমান, সে প্রশ্ন অবান্তর। এই প্রচেষ্টা উভয় সমাজের বেশীর ভাগ নরনারী দ্বারা আন্তরিকতার সহিত গৃহীত না হওয়ায় কথাও আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি না। মুসলমান পণ্ডিতগণের কেহ কেহ এই সমন্বয়ের পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, "জ্ঞানসাগর" গ্রন্থ হইতে রচনা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাহারই একটি সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে পারিব।

"জ্ঞানসাগর" গ্রন্থের প্রারম্ভেই গুরুবাদের পরিচয় পাওয়া যায়:

নবী বোলে শুন আলি অপরূপ বাণী।
প্রভুর আগমতত্ত্ব সুরস কাহিনী॥
অপরূপ কথন শুন আলি তুমি।
প্রভুর গোপন রত্ন তত্ত্ব সে কাহিনী॥
এই সব বৃথা নহে জ্ঞান শুদ্ধ সার।
মোর পাছে পয়গাম্বর না জন্মিব আর॥
মোর পরে হইবেক কবি ঋষিগণ।
প্রভুর গোপন রত্নে বান্ধিবেক মন॥
শাস্ত্র সব ত্যাগ করি ভাবে ডুব দিয়া।
প্রভু প্রেমে প্রেম করি রহিবে জড়িয়া॥
মোর পাছে হইব শুদ্ধ ফকির প্রধান।
গুরুর পাইবে দেখা প্রভু নিজ স্থান॥

উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে দেখা যাইতেছে যে আলীরাজা "মহম্মদের পরে আর পয়গম্বর নাই" ইস্‌লামের এই গোড়ার কথায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু পয়গম্বরের পরে "গুরুর শরণ লইতে হইবে" এই মতবাদও মানিতেছেন।

অতঃপর সাধনার পথ নির্ণয় হইতেছে। প্রেম সাধনাই প্রধান সাধনা:

যথা রস তথা বশ সমস্ত ভুবন।
সকল রসের মূল পীরীতি ভজন॥
...　　...　　...
এ বুঝিআ যত কৈল প্রেম পন্থ সার।
মোহাম্মদ রূপে ভক্ত জগতে প্রচার॥
জন্মে জন্মে ভক্ত হৈলো নারায়ণ হরি।
ক্রিয়া কৈল রাধার সঙ্গে নব রূপ ধরি॥
মন্দোদরী সঙ্গে ভক্ত হইল দশানন।
জানকীর রূপে ভক্ত রাম নারায়ণ॥
শচী সঙ্গে ভক্ত হইল দেবকুল রায়।
সন্ধ্যা নারীর প্রেমে ভক্ত হইল ব্রহ্মাএ॥　ইত্যাদি

কেবল হিন্দু দেবগণের প্রেমসাধনাই কবির আদর্শ নহে, মুসলমানগণের নবী প্রভৃতিরাও তাঁহার মতে প্রেম-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন:

জোলেখা হইল ভক্ত ইছুপ দেখিয়া।
আমীর হোছন ভক্ত জয়নব পাইয়া॥
উরিয়ার নারী ছিল অধিক সুন্দর।
ভক্ত হৈল সেই রূপে দাউদ পয়গাম্বর॥
হালওয়াসী সুত ছিল মোবারক সুন্দর।
ভক্ত হৈল সেই রূপে বুআলী কালন্দর॥
পরম সুন্দরী ছিল কৈবর্ত্ত কুমারী।
নবী ছোলেমান ভক্ত পাই সেই নারী॥

রূপের ধ্যান ও প্রেমের সাধনায় বহু মহামানব এইরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন:

এই মতে বহুত তপস্বী ভক্ত হইয়া।
যথা রূপ তথা ভাবে রহিল মজিয়া॥
রূপ ভিন্ন প্রেম নাহি ভাব বিনু ভক্তি।
ভাব বিনু লক্ষ্য নাই সিদ্ধি বিনা মুক্তি॥
নবী কুলে প্রথমে আদম ভক্ত হইল।
হাবা দেবী সঙ্গে রসকূপে ডুবি ছিল॥
দেব কুলে অতি ভক্ত হইল মহেশ্বর।
গৌরী দেবী সম্মুখে থাকিত দিগম্বর॥
...　　...　　...
গঙ্গা গৌরী যুগ্মনারী রাখি দিগম্বর।
তন্ত্র যোগে সাধি সিদ্ধা হইল মহেশ্বর॥
আছিল আয়েসা বিবি পরম সুন্দর।
সেই রূপে মোহাম্মদ ভক্ত পয়গাম্বর॥

কেবল যে হিন্দু-দেবতারা এবং মুসলমানের নবী-পয়গম্বরেরাই প্রেমসাধনকে সিদ্ধির পথ বলিয়া জানিয়াছেন তাহা নহে। কীট-পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষকুলের মুক্তি লাভেরও সেই একই পথ:

নর নারী পশু পক্ষী কীট তরুবর।
প্রেম রস বিনু কার নাই মুক্তি বর॥

প্রেম হইতেই পৃথিবীর উৎপত্তি:

প্রথমে বহ্নির সঙ্গে বায়ির পিরীতি।
হইল মাটির প্রেম জলের সংহতি॥
এ সব প্রেমে যদি মন না ডুবিত।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আদি কিছু না জন্মিত।
গগনের সঙ্গে হইল স্বর্গের পিরীতি।
স্বর্গ সঙ্গে মর্ত্ত্যের পিরীতি আছে অতি।
ত্রিভুবনে প্রভু প্রেম আছএ জড়িত।
নরক পাতাল সঙ্গে আছএ পিরীত।　ইত্যাদি।

সুতরাং আলীরাজার "প্রেম" সাধারণ লোকে উহাকে

যে অর্থে বুঝে তাহা নহে। এই প্রেম বিশ্বপ্রেম, ঐশ্বরিক প্রেম; জাতি, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের পরিধি দ্বারা ইহা সীমাবদ্ধ নহে। অতএব গোঁড়া মুসলমানগণের প্রচলিত মতের সঙ্গে আলীরাজার এইখানে যে প্রকাণ্ড প্রভেদ তাহা ত দেখাই যাইতেছে। প্রেমের এই উদার আধ্যাত্মিক অর্থ কোন কোন হিন্দু (বৈষ্ণব) সম্প্রদায়ের মতবাদেরই যে প্রতিধ্বনি, ইহাতে সন্দেহ নাই। আলীরাজা যে হিন্দুদের যোগ-সাধনা পদ্ধতিও আয়ত্ত করিয়াছিলেন, "জ্ঞান-সাগর" গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়:

শুন সাহা আলি তুমি জ্ঞান-পঞ্চানন।
কহিমু যোগের কথা এমাল বরণ।

যোগিগণকে আহার, নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে সংযত হইতে হইবে এবং ক্রোধাদি রিপুদমন করিতে হইবে:

অতি নিদ্রা ভোজন করিতে না জুয়াএ।
বহু নিদ্রা মহাকাল কহে জ্ঞান যার॥
... ...
মৎস্য মাংস যোগী ভুলে না করে ভক্ষণ।
দোষ নাহি অল্প অল্প করিলে ভোজন॥
... ...
ক্রোধ হন্তে সিদ্ধি পন্থ সমূলে বিনাশে।
সে কারণে সকল ফকির ক্রোধ গরাসে॥
... ...
হিংসা ক্রোধ তেজিলে নির্ম্মল হএ মন।
চিত্ত শুদ্ধ হৈলে পুরে সকল বাঞ্ছিত॥

সর্ব্বোপরি গুরুর আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিবে না:

পালিবে মস্তকে করি গুরুর আদেশ।
লংঘিলে অখণ্ড পাপ জন্মিবে বিশেষ॥

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে সংসার-বৈরাগ্যের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মে সেরূপ কিছু আছে বলিয়া শুনা যায় না। বরং বিবাহাদি করিয়া সংসারী না হওয়াই মুসলমান ধর্ম্মানুসারে অবাঞ্ছিত কার্য্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যে সকল মুসলমান সুফী ও দরবেশ শ্রেণীর মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সংসার-বৈরাগ্য সিদ্ধি-লাভের একটি বিশিষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। "জ্ঞানসাগর" গ্রন্থে আলীরাজা সংসারত্যাগী "সন্ন্যাসী"-(ফকির) দিগের আদর্শকে অনুকরণীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন:

রাজ্য পাট তেজি কত কত নরপতি।
অন্তে তার ইছিল ফকিরী হালগতি।
রাজ্য পাট ধন জন সকল আনিত।
মাতা পিতা ইষ্ট মিত্র কেহ নহে হিত।
স্ত্রী পুত্র সমস্ত সংসার নরকুল।
কেহ মিত্র নাহি এক প্রভু নবতুল।
সংসার অসার জব নৃপতি জানিল।
এক চিত্তে হত-ভাবে ফকিরী ইছিল।

সংসার অসার জানিয়া অনেক মহাপুরুষ ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়াছেন:

আমা সবে জানিল সংসার মহে সার।
অল্প দিনে বল গর্ব্ব হয় ছারখার॥
সংসার অসার সার নিশ্চয় জানিল।
সকলে রসুলী হাল কবুল করিল।
তেজিল ধনের আশা আলী কতেআএ।
তেজিল ধনের আশা আছবা সবার। ইত্যাদি।

অবশ্য, কবির এই আধ্যাত্মিক কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে তিনি নিজে "সংসার অসার" মতবাদে কতখানি বিশ্বাস করিতেন, তাহা উদ্ধৃত কথাগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। এই মতবাদ হিন্দুদের নিকট হইতেই গৃহীত।

শাস্ত্র পাঠ করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান সঞ্চয় হওয়ার পরেই ঈশ্বরকে চেনা যায়। তখন সাধক জানিতে পারে:

লা এলাহা ইল্লাল্লাহ তিন লোক সার।
তিন লোকে বেয়াপিত সেই করতার।
ঈশ্বরের এক কায়া এ তিন ভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্র কোরানে কহিছে নিরঞ্জন॥
কলেমার অর্থ বুঝি চাও মীরগণ।
ঈশ্বরের অষ্ট অঙ্গ এ তিন ভুবন।

এই জ্ঞানলাভ হইলেই লোকে প্রকৃত "ফকির" হইতে পারে:

ঈশ্বরের লীলা আর ঈশ্বর সেবা চিনে।
চলিতে রসুলী হালে পারে সেই জনে।
যে চিনিল তিন লোক আর করতার।
সে সবে ফকিরী পন্থ পারে চলিবার। ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, পংক্তিগুলি পড়িতে পড়িতে বাঙালী পাঠকের মনে হইবে যে "রসুল","ফকির" প্রভৃতি কথাগুলি সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম্মেরই কোন আলোচনা পড়িতেছেন। কৌতূহলী পাঠককে "জ্ঞানসাগর" গ্রন্থ হইতে আর একটি বিষয় উপহার না দিয়া পারিতেছি না। আলীরাজা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই হউক অথবা কোন কারণ-বশতঃ "চাকুরীর" প্রতি বীতরাগ ছিলেন। বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা যেন কখনও চাকুরী না করেন, এই উপদেশ তিনি দিয়াছেন:

কায় মনে প্রভু সেবা করিবে পণ্ডিতে।
নরের চাকরী যুক্ত না হয় করিতে।

মনের চাকরী যদি করে বীরগণ।
সে সব আলিম শুদ্ধ নহে কদাচন।
মনুষ্যের সেবা করে যে সব পণ্ডিত।
শাস্ত্র পড়ি হইল কবি পশুর চরিত।

আলীরাজার মত উদারমনা মুসলমান বিদ্বানগণের যুগ চলিয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম-সমন্বয়, নিজের ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখিয়াও পরধর্ম্মে শ্রদ্ধা, অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ—এ সমস্ত মনোবৃত্তি বঙ্গের মুসলমান সমাজ হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার যে ব্যাপক প্রচেষ্টা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের দ্বারা অবলম্বিত হইতেছে তাহা পুরাপুরি সাফল্যমণ্ডিত হইবে কিনা, উপযুক্ত সময়েই বুঝা যাইবে। আলীরাজা ও তাঁহার মত অনেক বাঙালী মুসলমান লেখকের জন্মস্থান ছিল সেই পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে তাঁহাদের প্রিয় মাতৃভাষার মর্য্যাদা-হানি করিবার অপপ্রয়াস চলিতেছে। মাতৃভাষার মর্য্যাদা এমন কি অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে দেখিয়া উহার রক্ষার চেষ্টায় পূর্ব্ববঙ্গের যে তরুণ ও প্রবীণ মুসলমান ভ্রাতারা বীরের মত মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছেন, আলীরাজা প্রভৃতির লোকান্তরিত স্বর্গীয় আত্মা নিশ্চয়ই সেই বাঙালী মুসলমানদের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন।

"পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস"

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির অন্যতম বলে পরিগণিত হবার মর্য্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু যাকে বলে রসসাহিত্য সেই দিকে বিশেষ রকম পরিপুষ্ট হয়ে থাকলেও বাংলা সাহিত্যে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক রচনার অত্যন্ত অভাব। কিন্তু এমন হলে ত সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, এবং বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তার মর্য্যাদারও হানি ঘটে। বাংলা সাহিত্যের এই ত্রুটি দূর করা বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই কারণেই বাঙালী দার্শনিক বা বাঙালী বৈজ্ঞানিকের কর্ত্তব্য বাংলা ভাষায় তাঁদের সাধনার ফল লিপিবদ্ধ করা।

শ্রীতারকচন্দ্র রায় লিখিত পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)* পড়ে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, তিনি এই কর্ত্তব্য সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একটি মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ বলে পরিগণিত হবার যোগ্য। এই বিরাট ও জটিল গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তা সার্থক হয়েছে।

দর্শনের বিষয়বস্তু অত্যন্ত জটিল। বস্তুর জটিলতা বশতঃই প্রধানতঃ দর্শনশাস্ত্র নীরস। তা কোন ব্যবহারিক কাজে লাগে না, তাই সাধারণ মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। অথচ সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে এবং দুঃখকষ্টবিমিশ্র জীবনে মানুষের মনের একটা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন হিসাবে তার যে প্রয়োজনীয়তা নাই তাও নয়। সেই কারণে তাকে যত সরল ও চিত্তাকর্ষক করে উপস্থাপিত করা যায় ততই ভাল।

সমালোচ্য গ্রন্থে এই উদ্দেশ্যটিকে সফল করবার বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ দার্শনিকের দর্শনবিষয়ক মতগুলি তাদের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের সহিত সংযুক্ত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যে ভাবধারার সহিত তা সংযুক্ত তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিশেষ বিশেষ মতটি সন্নিবেশিত হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ সক্রেটিসের কথা ধরা যাক। সক্রেটিসের মত বিচ্ছিন্ন আকারে উপস্থাপিত হয় নি। তিনি কোন্ দেশের লোক, সেই দেশের সামাজিক অবস্থা তখন কিরূপ ছিল, তার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক মতবাদের কি বৈশিষ্ট্য ছিল, তার সহিত সক্রেটিসের প্রচারিত বাণী কি ভাবে সংযুক্ত হয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে, এই সকল আনুষঙ্গিক বিষয়-

* পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড। শ্রীতারকচন্দ্র রায় প্রণীত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এর নিকট প্রাপ্তব্য: মূল্য ৮৲

গুলিও বর্ণিত হয়েছে। এইরূপে পরিবেশের অঙ্গীভূত করে তাঁর মতটি স্থাপিত হওয়ায় তা এক দিকে যেমন চিত্তাকর্ষক অপর দিকে তেমনি সহজবোধ্যও হয়েছে। সক্রেটিসের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলিও সেই সঙ্গে সন্নিবেশিত করায় তা সরসও হয়েছে। এই ঘটনাগুলির মাধ্যমে সক্রেটিস নামক ব্যক্তিটির সহিতও আমরা পরিচিত হই। ফলে শুধু তাঁর বাণীকে জানি না, ব্যক্তি হিসাবে তাঁর স্পর্শও পাই।

এই জটিল বিষয় আলোচনা করতে লেখক যে রচনাভঙ্গি অবলম্বন করেছেন, তা সরল ও সহজবোধ্য। তাতে বাগাড়ম্বর নাই, কঠিন বিষয়কে সরল ভাষায় প্রকাশ করবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা হয়েছে। ফলে আলোচনাগুলি বেশ স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল হয়েছে। দার্শনিক মতগুলির সমালোচনা বা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এ বিষয়ে লিখিত প্রধান প্রধান দর্শনের ইতিহাসের গ্রন্থগুলি হতে নানা মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এই সম্পর্কে আমরা তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই। কোথাও কোথাও এই সম্পর্কে নিজ মতও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

পাইথাগোরাসের দর্শনে সংখ্যাই বিশ্বের মূল তত্ত্ব। তার ব্যাখ্যা বার্ট্রাণ্ড রাসেল কি দিয়েছেন তা বর্ণনা করে, তিনি পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। তা জড়জগৎকে ব্যাখ্যা করেছে কতকগুলি গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে। তার উপাদান সর্ব্বত্রই সংখ্যা। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "জগৎ বিশ্বকর্ম্মার মানসসৃষ্টি'; সে সৃষ্টি সংখ্যার নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গুহ্যতত্ত্ববিদ্ পাইথা-গোরাসের মনে জগৎ-রহস্য এইভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা কে জানে।"

এই সম্পর্কে গ্রীক দর্শনের উপর ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাবের আলোচনায় তাঁর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। জন্মান্তর-বাদ, জ্ঞান ও তপস্যার সাহায্যে মুক্তিলাভ, সমাধি অবস্থায় জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ প্রভৃতি কয়েকটি প্রকটরূপে ভারতীয় তত্ত্বের সহিত তুলনীয়। এই সকল সম্পর্কিত দার্শনিক মতের উল্লেখ তিনি অত্যন্ত সঙ্গত ভাবে করেছেন। এ ছাড়া তিনি প্লেটোর 'সামান্য প্রত্যয়' (Universals)-এর সহিত বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লিখিত যাজ্ঞবল্ক্যের মতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।

এখানে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল—আত্মার জ্ঞান হলে সবই জ্ঞাত হওয়া যায়। 'আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্"। (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫।) এই মন্তব্য প্রতিপাদনের জন্য তিনি নানা উপমার দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, বিশ্বের কোন অংশ সম্পর্কে বিশেষের জ্ঞান তার মূলকে জানা হলে আয়ত্ত হয়ে যায়। যেমন দুন্দুভির শব্দগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান তার উৎপাদক দুন্দুভির সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করলে লাভ করা যায়, যেমন সকল আঘ্রাণের বস্তুর জ্ঞান তার উৎপত্তিস্থল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞান হলে আয়ত্ত হয়। এইরূপে স্থিতিশীল এক মৌলিক সত্তার সাহায্যে পরিবর্ত্তনশীল বহু বিশেষের যে জ্ঞান হয়, তার সঙ্গে তিনি প্লেটোর 'সামান্য প্রত্যয়ে'র ও বিশেষের ভিত্তিতে যে দ্বৈতবাদ স্থাপিত করেছেন, তার তুলনা করেছেন। মতটি তাঁর নিজস্ব বলেই মনে হয়। এখানে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও আলোচনাটি প্রণিধানযোগ্য।

এই সম্পর্কে ঋগ্বেদের পরিকল্পনায় 'বরুণের' বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। তাঁকে 'ধৃতব্রত' বলা হয়েছে এবং 'ঋত' বা যে শাশ্বত নীতি দৃশ্যমান জগৎকে পরিচালিত করে তার সংরক্ষণ-কার্য্য তাঁর কর্ত্তব্য বলে নির্দ্ধারিত হয়েছে। তাই তিনি 'ঋতস্য গোপা'। (ঋগ্বেদ ।১।২৪।৮।) প্লেটোর দর্শনে যে দৃশ্যমান পরিবর্ত্তনশীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হতে স্বতন্ত্র 'সার্ব্বিক প্রত্যয়'-এর জগৎ 'শ্রেয়' দ্বারা অধিষ্ঠিত বলে পরি-কল্পনা করা হয়েছে তার সঙ্গে এই 'ঋতে'র যেন মিল পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণন্ এই মত সমর্থন করেন। এই সম্পর্কে তাঁর ভারতীয় দর্শন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাশ্চাত্য ভাষাগুলিতে পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনায় উপযোগী দার্শনিক পরিভাষার অভাব নাই। আমাদের দেশের ভাষায় ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যায় উপযুক্ত পরিভাষা পাওয়া দুষ্কর নয়। সংস্কৃত ভাষা হতে তা প্রধানতঃ আহৃত হতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের বিকাশের ধারা এবং আলোচনা-পদ্ধতি এমন পৃথক যে তার উপযুক্ত ভারতীয় পরি-ভাষা পাওয়া কঠিন। কাজেই যিনি ভারতীয় ভাষায় পাশ্চাত্য দর্শন আলোচনা করেন, তাঁর নিজেকে পরিভাষা সৃষ্টি করে নিতে হয়। প্রত্যেক লেখকের পরিভাষা একেত্রে ভিন্ন হতে পারে এবং একই তত্ত্ব নির্দেশ করতে বিভিন্ন পরিভাষা সৃষ্ট হয়ে পাঠকের বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। সে সম্ভাবনাকে পরাহত করবার একটি মাত্র উপায় আছে। তা হ'ল বিদেশী পরি-ভাষাকে সেই সম্পর্কে যুগপৎ উল্লেখ করা। গ্রন্থকার প্রতি পৃষ্ঠায় নিয়ে যে সকল বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তার পাশ্চাত্য প্রতিশব্দ লিপিবদ্ধ করে এই অনিশ্চয়তা থেকে পাঠকের মনকে নিরাপদ করেছেন।

বিশেষ বিশেষ দার্শনিকের মত আলোচনা সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে মূল রচনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। দু'এক জায়গায় মূল রচনাটি কবিতায় লিখিত। সেখানে গ্রন্থকার—কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতায় অনুবাদ উদ্ধৃত করে মূলের রূপটিকে অনুবাদে অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছেন।

"পূজাপার্বণ"

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

নানা বিষয়ে নানা মনীষীর বহু মূল্যবান তথ্যপূর্ণ লেখা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৈনিক সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোন্ পত্রিকায় কখন কি প্রকাশিত হইতেছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষেও সব সময়ে তাহার সংবাদ রাখা দুঃসাধ্য। সংবাদ পাইলেও অনেক সময় দরকারমত পত্রিকা সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিপুল সাহিত্যিক অপচয় ঘটিয়া থাকে—পূর্বসংগৃহীত উপকরণ ও তথ্য অজ্ঞাত ও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে—এদিকে সেই সব জিনিষ নূতন করিয়া সংগ্রহ করিবার জন্য নবীন কর্মীকে অযথা পরিশ্রম করিতে হয়। এ অবস্থায় এ জাতীয় লেখা যথাসম্ভব স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে পারিলে লেখকের পরিশ্রম সার্থক হয়—পাঠক ও সাহিত্যিক সমাজ বিশেষ উপকৃত হন। সুখের বিষয়, এদিকে সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাই দেখিতেছি একই লেখকের বা একই বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত, লুপ্তপ্রায় রচনা একত্র সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়ের সম্পাদকতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'সমালোচনা সংগ্রহ' ও 'বাঙালীর পূজাপার্বণ' এবং শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পালের সম্পাদকতায় প্রকাশিত 'সমালোচনা সাহিত্য' প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগও মাঝে মাঝে এ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালায় প্রকাশিত স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অনতিপরিচিত ও অসুলভ কার্যবিবরণের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া ইহা প্রকাশ করা হয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশ্বভারতীর এই জাতীয় প্রচেষ্টার নূতনতম নিদর্শন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় আমাদের দেশে প্রচলিত প্রধান প্রধান পূজাপার্বণের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে সমস্ত সুন্দর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন সেইগুলি একত্র করিয়া 'পূজাপার্বণ' নামে
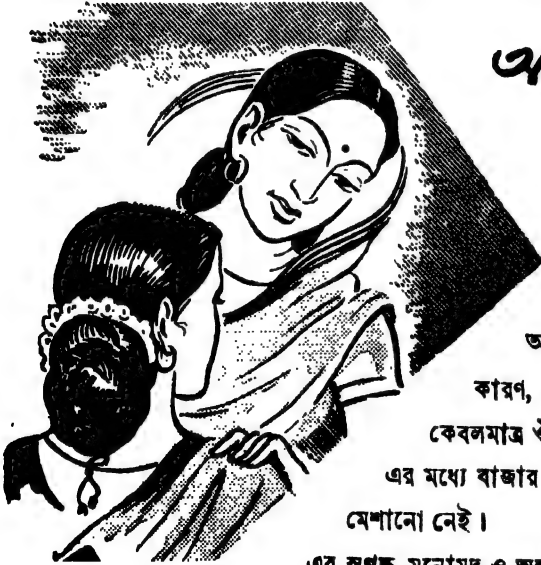
এই স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।* প্রবন্ধগুলি দুই খণ্ডে ভাগ করা হইয়াছে। 'আমাদের পূজা ও পার্বণ' নামক প্রথম খণ্ডে আছে দোলযাত্রা, শারদোৎসব, রাসযাত্রা, শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা ও বারমাসে তের পার্বণ এই পাঁচটি প্রবন্ধ। দ্বিতীয় খণ্ডে দুর্গোৎসব বিষয়ক সাতটি প্রবন্ধ (দুর্গোৎসব প্রশ্ন, শ্রীশ্রীদুর্গা, মহিষমর্দিনী, দুর্গার প্রতিমা, দুর্গাপূজা শরৎকালীন যজ্ঞ, দুর্গোৎসব নববর্ষোৎসব এবং দুর্গোৎসবের পুরাণের দেশ ও কাল) স্থান পাইয়াছে। পরিশিষ্টে অয়ন, বিষুব, রাশি, নক্ষত্র, তিথি, মাহেশ্বরযুগ, বৎসর, যুগ, মনু প্রভৃতি বিষয়গুলির ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

প্রবন্ধকারের মূল প্রতিপাদ্য মোটামুটি এইরূপ : আমাদের প্রধান প্রধান উৎসবগুলি অতি প্রাচীনকালের—অনেক ক্ষেত্রে ইহারা হাজার হাজার বৎসর পূর্বের স্মৃতি বহন করিতেছে। বিষুব দিনদ্বয়, অয়নাদি দিনদ্বয় ও ঋতুর আরম্ভ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জ্যোতিষিক যোগ উপলক্ষ্যে স্মরণাতীত কালে কোন না কোনরূপে এই সব উৎসবের সূত্রপাত হয়। কালক্রমে সেই সমস্ত যোগের সময় পরিবর্তিত হইলেও উৎসবের দিন ঠিকই আছে। গ্রন্থকারের মতে দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, দুর্গোৎসব মূলতঃ নববর্ষোৎসব। এক এক যুগে এক এক সময় বর্ষ আরম্ভ হইত—উৎসবগুলি তাহারই স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজমান। বর্ষার আরম্ভসূচক অম্বুবাচী বা তৎসদৃশ উৎসব বিভিন্ন যুগে নির্দিষ্ট বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হইত—আষাঢ়ের শেষ দিন, শ্রাবণ-পূর্ণিমা, ভাদ্র-পূর্ণিমা, আশ্বিন-পূর্ণিমা, শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী, শ্রাবণ-সংক্রান্তি, ভাদ্র-সংক্রান্তি (পৃ. ২১, ২২, ৬০, ৬৪, ৬১)। এখন বর্ষার সূচনা এই দিনগুলিতে না হইলেও আজও আমরা এই সমস্ত দিনে কোন না কোন উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

এই ভাবে আলোচনা করিলে উৎসবগুলির প্রাচীনতা অনুধাবন করিয়া মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত হয়। শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও যখন ধর্মীয় বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অশ্রদ্ধা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে তখন বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে লেখা, আচার্য রায়ের এই রচনাগুলির প্রচার সময়োপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয়। আগ্রহ-সহকারে এগুলি পাঠ করিলে পাঠকের দৃষ্টি প্রসারিত হইবে—মন তৃপ্তিলাভ করিবে। লেখাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে গণিত-জ্যোতিষের হিসাব-নিকাশের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যিক রস ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা এই পুস্তকের একটি বৈশিষ্ট্য। অবশ্য অনেক স্থলে হিসাব-নিকাশের প্রাচুর্য সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে। তবে একটু ধৈর্য ধরিয়া পড়িয়া গেলে ইহাদের সারমর্ম উপলব্ধি করা কঠিন হইবে না।

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকার জন্য লিখিত হওয়ার দরুন স্থানে স্থানে কিছু কিছু পুনরুক্তি ও স্ববিরোধী উক্তি রহিয়া গিয়াছে। প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত শারদোৎসব প্রবন্ধের সহিত দুর্গোৎসব বিষয়ক দ্বিতীয় খণ্ডের কোন কোন অংশের যথেষ্ট মিল আছে। এ সম্পর্কে প্রকাশকদের পক্ষ হইতে একটা কৈফিয়ত দিলে ভাল হইত। কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি চোখে পড়িল। এগুলির জন্যও প্রকাশকের দায়িত্ব অস্বীকার করা চলে না। তবে এই সকল সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁহারা আচার্য যোগেশচন্দ্রের মূল্যবান প্রবন্ধগুলি মনোজ্ঞ আকারে উপস্থাপিত করিয়া বাঙালী পাঠক-সমাজের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

* পূজাপার্বণ। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

শরৎ-পরিচয়—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃ. ২২৭, সাড়ে তিন টাকা।

রামায়ণে এবং মহাভারতে মামাদের ভিন্ন প্রসিদ্ধি আছে, ভাগিনেয়ের জীবনী-লেখক মাতুল এই প্রথম। তবে এই জীবনীতেও লঙ্কাভাগের আভাস আছে। শরৎ-চন্দ্রের "মন্দির" গল্প নিজের নামে ছাপাইয়া সুরেন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক-খ্যাতির সূত্রপাত, 'শরৎ-পরিচয়' সেই খ্যাতিরই সমাপ্তি, উপন্যাস সুখপাঠ্য হইয়াছে। সত্য ভাল, নিছক মিথ্যাও ভাল, কিন্তু সত্যের সঙ্গে মিথ্যার পাক করিয়া যে বস্তু প্রস্তুত হয় তাহা মারাত্মক। সুরেন্দ্রবাবুর গল্পাংশ সম্বন্ধে আমাদের কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু সত্যাংশে অর্থাৎ তথ্যাংশে তিনি বহু গলদ ঘটাইয়াছেন। কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি :—

পৃ. ১। "(ইং) ১৮৭০-৭২ সালে ভাগলপুর থেকে এনট্রান্স পাশ করে মতিলাল পাটনা কলেজে পড়তে যান।"—এই সালটির জন্য পাঠকের কোনও মাথাব্যথা ছিল না, না দিলেও পারিতেন। কিন্তু দিলেনই যখন, একটু দেখিয়া শুনিয়া দিলে ভগিনীপতিকে এনট্রান্স পাস করাইতে সুরেন্দ্রবাবুর তিন বৎসর লাগিত না। ক্যালেণ্ডার খুঁজিলেই দেখিতে পাইতেন, মতিলাল ১৮৭৩ সনে তৃতীয় বিভাগে এনট্রান্স পাস করেন।

পৃ. ৫। "কনিষ্ঠ বিপ্রদাস...বর্ত্তমানে পাটনায় আছেন। বর্ত্তমানে তিনিও গত হয়েছেন।" অতীত অর্থে বর্ত্তমানের প্রয়োগ এই প্রথম।

পৃ. ৪২। "১৮৮৩ সালে তাঁদের আবার [ডিহিরি থেকে] ভাগলপুরে ফিরতে হল।" ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় হিসাবে দেখান হইয়াছে, শরৎ-চন্দ্র ১৮৯০ পর্য্যন্ত ডিহিরিতে ছিলেন। নিখুঁত হিসাব সন্দেহ নাই।

পৃ. ১৫৩। "ভারতীতে নামহীন 'বড়দিদি' লেখা।" ১৩১৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা অর্থাৎ শেষ কিস্তিতে শরৎ-চন্দ্রের নাম বাহির হয়।

পৃ. ১৫৪। "সেই সময়ে ৺প্রমথ ভট্টাচার্য্য মশাই-এর মাথায় ভারতবর্ষ বার করার প্ল্যান এসে উপস্থিত হোল।" "সেই সময়" অর্থাৎ ১৩১৪ সাল, 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের প্ল্যান হয় ছয় সাত বৎসর পরে ১৩২০ সালে (পৃ. ১৫৫ দ্র.)।

পৃ. ১৬০। ব্রজেন্দ্রবাবু 'শরৎ-পরিচয়ে' শরৎ-চন্দ্র ভাগলপুরে "বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলে" পড়িয়াছিলেন এইরূপ উক্তি কুত্রাপি করেন নাই, অথচ এই কারণেই এই পৃষ্ঠায় সুরেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রতি বহু বক্রোক্তি করিয়াছেন। মিথ্যা দোষারোপ করিয়া কটু ভাষণ তাঁহার মত প্রবীণের সাজে না।

আরও আছে। উপন্যাসের সমালোচনায় তথ্যের এই সকল ভুল প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল না, তবে তিনি স্বয়ং যখন ১৫৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন —"[জীবনীতে] ভুল থাকা উচিত হয় না" তখন তাঁহার "ভুল-ভ্রান্তি হবার বয়স বর্ত্তমানে এসেছে, সে কথা" (পৃ ১৫৮) তাঁহাকেও সবিনয়ে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ব্রজেন্দ্রবাবুর 'শরৎ-পরিচয়ে' বিভূতিভূষণ ভট্টের চিঠি নাই, সুরেন্দ্রবাবুর মাত্র একখানি আছে, ইহার কারণ যে ব্রজেন্দ্রবাবুর অবহেলা নয় তাহা সুরেন্দ্রবাবুই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জানেন। বিভূতিবাবু সমস্ত চিঠিপত্র হারাইয়া ফেলিয়াছেন (দ্র. 'ভারতবর্ষ' চৈত্র ১৩৪৪, পৃ. ৫৯২-৯৩), সুরেন্দ্রবাবু অনুরুদ্ধ হইয়াও চিঠি দেন নাই। মোটের উপর, সুরেন্দ্রবাবুর 'শরৎ-পরিচয়ে' অনেক কৌতুকের খোরাক আছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রবেশিকা—শ্রীহিমাংশু চৌধুরী, এম-এ, বি-এল। জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে মহাশয় পুস্তকখানির "পরিচিতি" লিখিয়া ইহার মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহার দীর্ঘকালের সঞ্চয়নের ফল আজ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। কেন বৈষ্ণব পদাবলীকে "মহাজন পদাবলী" বলিয়া বাংলাদেশে পরিচয় দেওয়া হয়, এই পুস্তকের পরিশিষ্টে তাহার ইতিহাস আছে। "মহাজন" বলিতে বহুল-প্রচলিত অর্থে সুদখোর বুঝায়। আমাদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে "মহাজন" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারী, পুঁজিদার—যাঁর ভাণ্ডারের ভাগ লইতে পারে সকল পিপাসু বা ক্ষুধিত—এই অর্থে।

জয়দেবের পর হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত গীত রচনা হইয়াছে তাহা "পদ" নামে পরিচিত। পদের সাহায্যে জীবমাত্রেই চলে। এই সব গানের সাহায্যেও জীবনপথে অগ্রসর হওয়া যায়। বাংলাদেশে চৈতন্য মহাপ্রভুর পর হইতে যে আধ্যাত্মিক ভাবধারা বহিয়া চলিয়াছে, তাহা লইয়া আমরা গর্ব্ব করি। গ্রন্থকার জানেন যে, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের মতে নারদের শ্বেতদ্বীপে ভ্রমণের ফলে পৃথিবীতে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। এই বিষয়ে ডক্টর সুশীলকুমার দে একটু আলোচনা করিলে আমরা উপকৃত হইতাম। পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস আছে, তাহা পাঠ করিয়া এই আধ্যাত্মিক সম্পদের বহু সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যুক্তিবাদী এবং প্রায় নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে বর্ত্তমান বৈষ্ণব ধর্ম্মের যোগ সুস্পষ্ট। ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম্মে সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তির প্রাধান্য দেখা যায়। সুফী-সম্প্রদায়ের মতে সম্পূর্ণ শরণাগতিই জীবনকে সার্থকতা দান করে। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ত এ কথা বলে যে, যীশুর আশ্রয় ভিন্ন পাপ-তাপ-দগ্ধ পৃথিবীতে শান্তির অন্ত কোন উপায় নাই।

আমাদের বিশ্বাস যে, এই পুস্তক পাঠকমহলে সমাদৃত হইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

সোভিয়েট-মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০ টাকা। পৃষ্ঠা ১৩৬।

বর্ত্তমান জগতের অন্যতম ভাগ্যনিয়ন্তা হইলেও মার্কিন রাষ্ট্র অপেক্ষা-কৃত আধুনিক। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ইহার স্বাধীনতা ঘোষণা হয়, আর ১৮৬১-৬৫ পর্য্যন্ত চলে ইহার গৃহযুদ্ধ। বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির ছোঁয়াচ এড়াইয়া চলিয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াও ইহা জাতি-সঙ্ঘে (লীগ অব নেশনস্) যোগদান করে নাই। কারণ ইঙ্গ-ফরাসী কূটনীতির নিকট মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সঙ্গে আমেরিকা ওতপ্রোতভাবে নিজেকে জড়াইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, দুনিয়ার রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ক্রমে ক্রমে এতটা জড়িত হইয়াছে যে, প্রগতিশীল পৃথিবী আজ দুইটি বিরোধী শিবিরে পরিণত হইয়াছে। অথচ রুজভেল্ট-চার্চ্চিল-ষ্টালিনের সম্মিলিত নেতৃত্ব পৃথিবী হইতে ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিশক্তির উচ্ছেদসাধনে মহাযুদ্ধের কয়েকটি বৎসর কিরূপ গভীর সৌহার্দ্যসূত্রেই না আবদ্ধ হইয়াছিল। এই পরমাশ্চর্য্য ঘটনার তাৎপর্য্য বুঝাইতে গিয়া লেখক বহু তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। রুজভেল্টের সহিত ট্রুম্যানের পার্থক্য কোথায় তাহা বুঝাইতেও চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানি পড়িলে পাঠকের ধারণা হইবে ইঙ্গ-মার্কিন কূট-নীতিই বর্ত্তমান বিশ্বের অশান্তির জন্ত দায়ী। সোভিয়েট প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বাক্যে এবং আচরণে শান্তিকামী রহিয়াছে। সোভিয়েট মতবাদের প্রসারজনিত ভীতি মার্কিন জাতিকে পাইয়া বসিয়াছে। যুদ্ধ-কালীন মৈত্রী ও সহযোগিতা যেন একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র আজ ইহাই হয়ত অনেকের মনে হয়, কিন্তু রুজভেল্ট-ষ্টালিনের পুরাতন কথা ও ঘোষণা-গুলি উদ্ধৃত করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের সময়েই বিশ্বশান্তির ও বিশ্বমৈত্রীর পরিকল্পনার বীজ উপ্ত হইয়াছিল যাহা আজ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামে (ইউনাইটেড নেশনস্) রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধও চলি-তেছে না, অথচ শান্তিরও অভাব দেখা যায়— যাহার নাম 'ঠাণ্ডা লড়াই' ইহা খুবই অবাস্তব অবস্থা। লেখক বলিতে চাহেন, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে সামরিক প্রভাবই এরূপ অবস্থার জন্ত দায়ী। এই উৎকট অবস্থার কতকটা অবসান ঘটাইবার জন্ত ট্রুম্যান জেনারেল ম্যাক্ আর্থারকে কোরিয়া রণা-ঙ্গন হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। সমষ্টিগত নিরাপত্তা রক্ষা দ্বারা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। বর্ত্তমানে কোরিয়ার 'ঠাণ্ডা'র বদলে 'গরম লড়াই' চলিতেছে। অথচ কেহই যুদ্ধ চাহে, মুখে একথা বলে না। যে জিনিষ কোন পক্ষই চাহে না তাহা কেন হয় তাহার হদিস কেবল পর-রাষ্ট্র নীতির মধ্যে পাওয়া যায় না, ধনিকতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় গঠনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়; ইঙ্গ-মার্কিনের এশিয়া-নীতি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলে ইহার সন্ধান মেলে। অবশ্য মার্কিন ও রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত ব্যবধান সুস্পষ্ট, কিন্তু ইহাই বিরোধ বা বিপ্লবের শেষ কিংবা একমাত্র কথা নহে। অপর দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাই সে দেশকে বিপ্লবের মধ্যে টানিয়া লয়। বিপ্লব কিছু চালানি মাল নহে যে অপর এক দেশ হইতে আমদানী করা চলে। ষ্টালিনের ভাষায় "The export of revolution is nonsense."

সাম্যবাদ বা সাম্যবাদী আদর্শে পরিকল্পিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যেরূপ আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা সোভিয়েটের স্বপ্ন, সমগ্র পৃথিবীতে পুঁজি-বাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও তেমনি মার্কিনের কাম্য। কিন্তু ইহার কোনটাই মার্কিন বা রাশিয়ার পক্ষে অপর জাতির উপরে চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে, যদি না অপর জাতিগুলি ইহাতে রাজী হয়। এই জন্তই যত

প্রচার ও কূটনৈতিক চাপের প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই যে নানা রাষ্ট্রকে দলে টানিবার চেষ্টা ইহাই বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখকের মতে এই প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি সহজ ও সরল, কিন্তু পুঁজিবাদী মার্কিনের পররাষ্ট্র-নীতি কুটিল পথে চলিয়াছে। এজন্যই আজিকার বিশ্বে শান্তি ব্যাহত হইবার যে আশঙ্কা বিদ্যমান, তাহার জন্য মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিশেষ ভাবে দায়ী। গ্রন্থকার রাশিয়ার পক্ষে রায় দিলেও, রাষ্ট্রনীতির পাঠকগণ অল্প পরিসরের মধ্যে এই পুস্তকে অনেক তথ্য জানিয়া লাভবান হইবেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ঋগ্বেদীয় মন্ত্র-সঙ্কলন—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। ৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ টাকা।

পৃথিবীর প্রাচীনতম পুস্তক ঋগ্বেদই হিন্দুদের আদি ধর্ম্মগ্রন্থ। বর্ত্তমান যুগে এই লুপ্তপ্রায় পুস্তকের পুনরুদ্ধার করেন জার্ম্মান মনীষী ম্যাক্সমুলার। তিনি অক্সফোর্ড হইতে ভাষ্যসহ ঋগ্বেদের পুনঃপ্রকাশ না করিলে পাশ্চাত্ত্য জগতে ইহার প্রচার হইত কিনা সন্দেহ। পরিতাপের বিষয় এই যে, ঋগ্বেদ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। আলোচ্য পুস্তিকা বাঙালী পাঠকসাধারণের এই অজ্ঞতা দুরীকরণে কতকটা সহায়ক হইবে বলিয়া মনে হয়।

ইহাতে ঋগ্বেদের ২২৮টি মন্ত্র অনুবাদসহ প্রদত্ত হইয়াছে। মন্ত্রগুলি ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা, সূর্য্য, পর্জ্জন্য, রুদ্র, বরুণাদি দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত এবং অধ্যাত্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ। সঙ্কলয়িতা পনের পৃষ্ঠাব্যাপী তথ্যপূর্ণ ও সুলিখিত ভূমিকায় ঋগ্বেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে বৈদিক ভাষা, দেবতা, ধর্ম্ম, সমাজ, খাদ্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের জন্মকাল সম্বন্ধে সঙ্কলয়িতা কেবলমাত্র মার্টিন, কোলব্রুক, ম্যাক্স-মুলার ও বালগঙ্গাধর তিলকের মত উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস পান নাই। ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এই পুস্তিকায় যে সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা লিখিয়া দিয়াছেন তাহাতে বলেন, ঋগ্বেদ একাধারে ইতিহাস, দর্শন ও কাব্যগ্রন্থ। এই পুস্তিকা পাঠে মূল বেদ অধ্যয়নের আকাঙ্ক্ষা পাঠকদের মনে জাগিতে পারে। ঋগ্বেদের সংস্কৃত দুর্ব্বোধ্য। সুতরাং অনুবাদের সহিত অন্বয়-মুখে শব্দার্থ থাকিলে মন্ত্রগুলির মর্ম্মার্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম হইত।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভজহরি—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ (ভাস্কর)। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২।০ টাকা।

রসিক বলিয়া বাঙালীর খ্যাতি আছে—সেই হেতু বাংলা-সাহিত্যে রসের অবদানে সমৃদ্ধ। প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত—এই সাহিত্যের রসপ্রবাহধারা অব্যাহত আছে। সম্প্রতি অন্ন, বস্ত্র ও জীবিকা প্রভৃতি কতকগুলি স্থূল সমস্যার আঘাতে আমরা বিশেষভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি এবং বাস্তববাদ আমাদের অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে—আর তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আমাদের সাহিত্যরসধারাও কিছু পরিমাণে ক্ষীণ হইয়াছে। ক্ষীণ হইয়াছে বটে, কিন্তু সে রসধারা একেবারে

শুকাইয়া যায় নাই। জানি, যুগের পরিবর্ত্তনে চিন্তার ধারাও বদলাইয়া যায়—রসোপভোগের ক্ষেত্রও হয় ভিন্নতর। এক কালের রস-রসিকতা বহুক্ষেত্রে অন্য কালের মানুষকে তেমন ভাবে মাতাইতে পারে না—তাহার আবেদন কেমন স্থূল বলিয়া বোধ হয়। যুগের অগ্রগমনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতেছেন যে সব রস-রচয়িতা—তাঁহাদের সংখ্যাও আজকাল অঙ্গুলির পর্ব্বে গোণা যায়। ইহাও বুঝিতেছি। তবু বাংলা সাহিত্যের হাস্য-কৌতুকের ধারাটি এই সংখ্যাল্প রস-রচয়িতারা যে দক্ষতার সঙ্গে প্রবহমাণ রাখিয়াছেন—ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ এই সার্থক রস-রচয়িতাদের অন্যতম। আলোচ্য গল্প-সংগ্রহখানিতে তাঁহার কয়েকটি রস-রচনা স্থান পাইয়াছে। ভজহরি এই একটি নামের সূত্রে গল্পগুলি গাঁথা হইলেও বিষয়বস্তুতে এগুলি বিভিন্ন এবং প্রত্যেকটি গল্পের প্রকাশভঙ্গীতে বৈচিত্র্যও বিদ্যমান। বেকার-জীবনের আলেখ্য হইতে সাংসারিক জীবনের নানা সমস্যাকে (উৎপাত বলাই বাঞ্ছনীয়) কেন্দ্র করিয়া এক একটি গল্পের উৎপত্তি। গল্পগুলিতে স্থূল রসের আবেদন কম, রসের আবিলতাও চোখে পড়ে না। শুচিশুভ্র হাস্যরসে ঝলমলে এই কাহিনীগুলি পড়িয়া আমরা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। যাঁহারা হাসিতে ভালবাসেন এই সব গল্প যে তাঁহাদের চিত্ত হরণ করিবে এই কথা অসঙ্কোচে বলা যায়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-সঙ্গীত-প্রসঙ্গ—শ্রীশেফালিকা শেঠ। প্রকাশক: শ্রীবারীন্দ্রনাথ শেঠ। ২১৫, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৭। দামের উল্লেখ নাই।

তিনটি প্রবন্ধের সমষ্টি:- (১) সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ: শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, (২) ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্থান: শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীত: শ্রীশেফালিকা শেঠ।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুরাগী পুস্তিকাখানিতে জানিবার ও ভাবিবার অনেক খোরাক পাইবেন। বিশেষ করিয়া, রবীন্দ্রনাথের নব নব সুর-রচনার পশ্চাতে যে এদেশীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের জ্ঞান ও সযত্ন সাধনা বর্ত্তমান, একথা আমাদের উপলব্ধি করা আবশ্যক।

দেশপ্রীতি ও চট্টলার বীরস্মৃতি—শ্রীমতী কুন্দপ্রভা সেন। প্রকাশক: শ্রীজগবন্ধু সেন। সদর ঘাট রোড, চট্টগ্রাম। মূল্য ১।০

বিপ্লবী বীরগণের স্মৃতি অবলম্বনে রচিত পদ্যগ্রন্থ। বিষয় মহৎ রচনা গতানুগতিক।

রূপলোক—শ্রীকরুণাসিন্ধু পালিত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।০।

বড় গল্প—ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। রচনা সাবলীল, কখনও কবিত্বপন্থী, কখনও কৌতুকে উজ্জ্বল। নৈমিত্তিক অবকাশ-বহুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ছাত্রজীবনকে কেন্দ্র করিয়া লেখক একটি রোমান্টিক প্রেমকাহিনী রচনা করিয়াছেন। 'লাগে নে,' 'আসে নে', 'সত্বা', 'উৎসুক' প্রভৃতি ভাষা ও বানানের ত্রুটি মারাত্মক।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সীমাহীন—শ্রীসত্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রিমিয়ার বুক কোম্পানী। ৩৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১|০ টাকা।

এই উপন্যাসের নায়ক সুবোধ দত্ত বিলাতফেরত এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। বিলাতে অধ্যয়নকালে লতিকা নাম্নী একটি মেয়ের সঙ্গে তাহার প্রণয় হয়। দেশে ফিরিবার পর ঘটনাচক্রে লতিকার অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেল—তাহার স্বামী মদ্যপ ও চরিত্রহীন। সুবোধের বৌদির বৈমাত্রেয় বোন তাহাদের বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। তাহার সঙ্গে সুবোধের আসন্ন বিবাহের আয়োজনে বাড়ী যখন সরগরম তখন সে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে গৃহত্যাগ করিল। তার পর লেখক তার সন্ন্যাসগ্রহণ, মানবসেবায় আত্মনিয়োগ, বরিশাল জেলায় গিয়া মৃত্যুপথযাত্রিণী লতিকার শয্যাপার্শ্বে তাহার উপস্থিতি, লতিকার মৃতদেহ স্কন্ধে তাহার শ্মশানঘাটে গমন, লতিকার পুনর্জ্জীবনলাভ ইত্যাদি নানা চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত রাত্রির অন্ধকারে নৌকাযোগে সুবোধ ও লতিকাকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করাইয়া উপন্যাসের উপসংহার করিয়াছেন।

কাহিনীটি মামুলি এবং স্থানে স্থানে আজগুবি হইলেও লেখকের যে লিখিবার হাত আছে সে পরিচয় এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে বর্ণনা মন্দ নয়, কিন্তু উচ্ছ্বাসের আধিক্যবশতঃ এবং মাত্রাজ্ঞানের অভাবে কাহিনীটি দানা বাঁধিতে পারে নাই। রচনার সংযম এবং মাত্রাবোধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার হাত দিয়া ভাল জিনিষ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

"সিদ্ধান্তসার", "শ্রীশ্রীভাগবত", "শ্রীকৃষ্ণ"—শ্রীবিহারীলাল সরকার। ১২-২এ, মনোহর পুকুর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬ হইতে প্রকাশিত। ১ম গ্রন্থ ৪৩৩ পৃ., মূল্য দুই টাকা; ২য় গ্রন্থ ৪৫৬ পৃ., মূল্য দুই টাকা এবং ৩য় গ্রন্থ ১৪৬ পৃ., মূল্য দশ আনা।

প্রথম গ্রন্থে কর্ম্মশক্তি, বেদান্তমত, তন্ত্রমত, পুরাণমত, অবতারের আশ্রয় এবং সিদ্ধপুরুষের ধর্ম্মজীবন এই বিষয়গুলি ছয়টি অধ্যায়ে সহজ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অসংখ্য মূল শাস্ত্রগ্রন্থাদি মন্থন করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সার উদ্ধার পণ্ডিতদের পক্ষেও দুঃসাধ্য, সাধারণের ত কথাই নাই। গ্রন্থকার সাধারণ নরনারীর জন্য দুরূহ দর্শন, উপনিষৎ, তন্ত্র, পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে প্রধান প্রধান বহু বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুকূল, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষের বহু অমূল্য উক্তি স্থানে স্থানে পরিবেশন করিয়া শাস্ত্র-মর্ম্ম অতীব সরল ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের "বাণীরূপ" শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা কীর্ত্তন এবং দ্বাদশ স্কন্ধে বিবৃত বৈচিত্র্যময় ভাগবতী লীলাকথার সারসঙ্কলন অতীব সরল মধুর ভাষায় করা হইয়াছে। পরিশেষে চতুঃশ্লোকী ভাগবত এবং সপ্তশ্লোকী গীতা সানুবাদ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থের সম্পদ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

তৃতীয় গ্রন্থে মহাভারত, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং বহু মহাজন পদ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের অনুপম লীলাকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। গীতা ও ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ অমূল্য উপদেশাবলী পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়
সুবর্ণ জয়ন্তী

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগিনী নিবেদিতা ভারতের নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এই বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন এবং ১৮৯৮ সনের নবেম্বর মাসে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদামণি দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যবৃন্দের উপস্থিতিতে এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর মার্কিন শিষ্যা ভগিনী ক্রীষ্টিন এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালন-ভার রামকৃষ্ণ মিশনের উপর অর্পিত হয়। এই শিক্ষামন্দিরে অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ বহুসংখ্যক বালিকা বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছে। ১৯৪৭ সাল হইতে মাত্র মাধ্যমিক বিভাগে বেতন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বহু অন্তঃপুরচারিণী মহিলাও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত শিল্প-মন্দিরে বহু দরিদ্রা মহিলা শিল্পবিদ্যা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ভগিনী নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইহার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

১৯৫২ সনের ডিসেম্বর মাসে সপ্তাহব্যাপী জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। জয়ন্তী উৎসব সমিতি এতদুপলক্ষে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভগিনী নিবেদিতার প্রামাণিক ও বিস্তৃত জীবনী প্রকাশ, বিদ্যালয়ের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন, প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষার ইতিহাস রচনা, ছাত্রীদের জন্য ভগিনী নিবেদিতার জীবনী সম্বন্ধে রচনা-প্রতিযোগিতা, শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী সম্মেলন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতি বৎসর উপযুক্ত ছাত্রীদের স্বর্ণপদক প্রদানের ব্যবস্থা, শিল্পবিভাগের সম্প্রসারণের জন্য অনুমানিক ২৫০০০ টাকায় এক খণ্ড জমি ক্রয় ইত্যাদি বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। যাবতীয় পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে অন্ততঃ পক্ষে ১০০,০০০ টাকার প্রয়োজন হইবে। সহৃদয় দেশবাসীর কর্তব্য যথাশক্তি দান করিয়া জয়ন্তী উৎসব এবং উৎসব কমিটি কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করা। টাকাকড়ি নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরিতব্য :

১। নিবেদিতা সুবর্ণ জয়ন্তী ফণ্ড।
রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়
৫নং নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

২। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৫১ সালের কার্য্যবিবরণী

আলোচ্য বর্ষে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগেই সবিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আশ্রমের অধীনে এই বৎসর (১) একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়,

—

(২) একটি দাতব্য প্রাথমিক চিকিৎসা ও আরোগ্যচার বিভাগ, (৩) একটি অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, (৪) ষ্টুডেণ্টস হোম এবং (৫) একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ও রিডিং-রুমের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়াছে।

চিকিৎসা বিভাগ—(ক) ভুবনেশ্বর দাতব্য চিকিৎসালয়ের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিভাগে এবার ৩৮,৮৫৪ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে—গত বৎসর রোগীর সংখ্যা ছিল ৫৪ ৫১৯ জন। (খ) প্রাথমিক সাহায্য বিভাগটি মূলতঃ ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির বিহার শাখার ৩,৫৫০৲ অর্থসাহায্যে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। আলোচ্যবর্ষে এই বিভাগের চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯,২২৭ জন। ডাঃ এস. সি. ভট্টাচার্য্য নামক সরকারী চিকিৎসাবিভাগের এক জন অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত।

দুর্গতদের সেবাকার্য্য—আলোচ্য বর্ষে মিশনের উদ্যোগে বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবনীতে একটি সেবাকেন্দ্র খোলা হয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামসমূহে চাল বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষাদান-প্রচেষ্টা—কুড়ি বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী অদ্ভুতানন্দের (লাটু মহারাজের) স্মৃতিরকার্থে স্বামী অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বিহার প্রদেশের লোক ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ১৫১ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং এই বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ষ্টুডেণ্টস হোমে অবস্থানকারী ছাত্রদের মধ্যে একজন আই-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়ের স্বামী তুরীয়ানন্দ লাইব্রেরী রিডিং রুমের পুস্তকসংখ্যা বর্ত্তমান বর্ষে ১০৯১ খানি। ইহাতে নিয়মিত ভাবে দুইখানি দৈনিক ও বারখানি মাসিক পত্রিকা রাখা হয়।

বর্ত্তমান বৎসরে আশ্রমে আধ্যাত্মিক বিষয়ে ৩৬৮টি ক্লাস, ৯টি বক্তৃতা ও ২৭টি আলোচনা-সভা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মহাসমারোহে ঠাকুর ও স্বামিজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বহু দরিদ্রনারায়ণকে ভোজন করানো হয়।
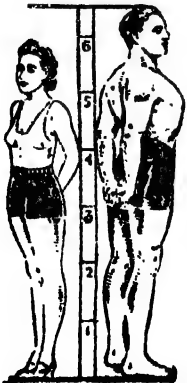
আশ্রমের সকল বিভাগের উন্নয়নের জন্য অন্ততঃপক্ষে বার হাজার টাকার প্রয়োজন। এই সদনুষ্ঠানে যাঁহারা অর্থসাহায্য করিবেন তাঁহাদের দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। টাকাকড়ি—সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বা পোঃ বাঁকিপুর, পাটনা, এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ

নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার সেবাগ্রাম ওয়ার্দ্ধা হইতে দেশের যুবসম্প্রদায়ের নিকট নিম্নোক্ত আবেদনপত্রটি প্রচার করিয়াছেন :

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আজ পাঁচ বৎসর হইতে চলিল দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসান হওয়া ত দূরের কথা, ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এইজন্য যুবসম্প্রদায় হয় আজ নৈরাশ্যবাদী হইয়া পড়িয়াছে আর নচেৎ বর্ত্তমান অবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্ত্রাসবাদের পথ ধরিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যেও পরস্পরের উপর দোষারোপের মনোভাব দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোনই ফল হইবে না। এ অবস্থায় সৃষ্টির কারণ আমাদের গভীর ভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। সমস্যার সমাধান কি উপায়ে হইবে তাহা আবিষ্কারান্তে জীবন পণ করিয়া সেই কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিতে হইবে।

গান্ধীজী বলিতেন, সত্যকার স্বরাজ ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা বা রাশিয়া কোথাও নাই। গণপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা এ সকল দেশে থাকিতে পারে ; কিন্তু শাসন-ক্ষমতার অপব্যবহার হইলে তাহার বিরুদ্ধে সাফল্য সহকারে বিদ্রোহ পরিচালনা করিবার শক্তি যখন প্রতিটি ব্যক্তির ভিতর জাগিবে তখনই শুধু তাহাকে সত্যকার স্বরাজ আখ্যা দেওয়া সম্ভব হইবে (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-১-২৫)। জনসাধারণ যখন নিজেদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের জন্য কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হইবে না, তখনই শুধু এরকম অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ জনসাধারণের মরণ-বাঁচন যে সব দ্রব্যসামগ্রীর উপর নির্ভরশীল, সেগুলির ব্যাপারে অন্ততঃ তাহাদের স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। এ আদর্শে পৌঁছিবার জন্য বর্ত্তমান আর্থিক কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে।

পুঁজিবাদের ব্যাপক সংগঠনের জন্য দেশ দ্রুতবেগে একাধিনায়কত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অনেক যুবকযুবতী মনে করেন যে, পুঁজিপতিদের ধ্বংসসাধন করিলেই পুঁজিবাদের অবসান ঘটিবে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, জনসাধারণের জীবন যত দিন পুঁজির উপর নির্ভরশীল, তত দিন

তাহাদের পুঁজির পরিচালক ব্যক্তি বা দলের পদানত হইয়া থাকিতেই হইবে।

অতএব ভারতের লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীকে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়া অন্নবস্ত্রাদি জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সমূহের জন্য শ্রমের ভিত্তিতে স্বাবলম্বী হইয়া আর্থিক অবস্থা কায়েম করার বিপ্লবে যোগদান করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রেও বিপ্লবসাধন করিতে হইবে।

শ্রেণীবৈষম্যের ফলসম্ভূত শোষণ ও উৎপীড়নের নিরাকরণ করিয়া বিশ্বে সত্য ও শান্তির রাজত্ব স্থাপন করিতে হইবে। বর্ত্তমানের মজুর ও হুজুরের পার্থক্য দূর করিয়া এক শ্রেণীহীন সমাজ রচনা করিতে হইবে।

নব বিপ্লবের পদ্ধতি সম্বন্ধে হিংসাত্মক ও অহিংসাত্মক এই দুই উপায়ের কথা লোকে চিন্তা করে। গান্ধীজী অহিংসা-ত্মক রাজনৈতিক বিপ্লব সফল করিয়া দেখাইয়াছেন।

আমাদের এইভাবে এখন আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব-সাধন করিতে হইবে। যুবক-যুবতীদের এখন গ্রামে গ্রামে গিয়া কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে হইবে। কৃষক ও শ্রমিক সমাজের সঙ্গে একাত্ম হইয়া তাহারা গঠনমূলক কার্য্য দ্বারা তাহাদের মধ্যে স্বাবলম্বনের শক্তি সৃষ্টি করিবে। বয়োবৃদ্ধ বিনোবাজী শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আজ বিপ্লবের পথে স্থির পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। এ অবস্থায় ভারতের যুব সম্প্রদায় কি আলস্যে কালাতিপাত করিবে?

যুবক-যুবতীরা অনেক সময় বলে যে তাহারা ত প্রস্তুত। তাহাদের মধ্যে উদ্দীপনা ও ত্যাগের জন্য আগ্রহ ও শক্তি সকলই বর্ত্তমান। কিন্তু তাহাদের পথপ্রদর্শক হইবে কে এবং কেই বা তাহাদের পরিচালনার দায়িত্ব লইবে? নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ এই উদ্দেশ্যে সারা দেশে গ্রামসেবা কেন্দ্র স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে নূতন বিপ্লবের জন্য সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। দেশব্যাপী কাতাই মণ্ডল স্থাপনার দ্বারা এই লক্ষ্যাভিমুখে চলিবার কাজও সুরু হইয়া গিয়াছে।
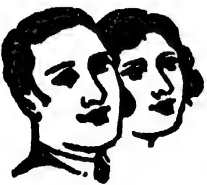
নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘের পক্ষ হইতে আমি দেশের প্রত্যেকটি যুবক-যুবতীর নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, দেশকে বাঁচাইবার জন্য তাহারা যেন হাজারে হাজারে আমা-দের এই কার্য্যে যোগদান করে। এই কার্য্যে যোগদানকারী যুবক-যুবতীদের আমরা এই কাজের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানান্তর ভারতের গ্রামে গ্রামে পাঠাইব। সেখানে তাহারা কাতাই মণ্ডল স্থাপন এবং গ্রাম-সেবা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া জন-সাধারণের ভিতর স্বাবলম্বন ও আত্মশক্তি জাগ্রত করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। এই কার্য্যে যোগদানকারী যুবক-যুবতীদের বর্ত্তমান বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদ ও 'সর্ব্বোদয়' বিচার দ্বারা বুঝিবার মত বুদ্ধি এবং সর্ব্বোদয়ের পথে চলিবার মত শারীরিক শক্তি ও মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। আবেদনপত্রের সঙ্গে তাহারা যেন সবিস্তারে নিজ নিজ যোগ্যতা সম্বন্ধে লেখে এবং এ সম্বন্ধে অধিক তথ্যের প্রয়োজন হইলে আমার সহিত পত্রব্যবহার করে।

শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

নিউ ইয়র্কে আন্তর্জ্জাতিক কাউন্‌ড্রি কংগ্রেসের যে অধি-বেশন হইবে, বোম্বাই প্রবাসী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী তাহাতে ভারতের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য শৈলেন্দ্রবাবু ২০শে এপ্রিল তারিখে বিমানযোগে নিউ ইয়র্ক যাত্রা করিয়াছেন।

পাটনায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যসম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব

বার্ণপুর হইতে শ্রীকালীপদ সিংহ জানাইয়াছেন যে, গত ডিসেম্বর মাসে পাটনায় অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশনে সবসুদ্ধ চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে সিংহ মহাশয়েরই একটি প্রস্তাব অনুসারে উক্ত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাবধি দরদী পৃষ্ঠপোষক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে স্থির হয়।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর (মহারাজ) সম্বর্দ্ধনা

গত ২০শে বৈশাখ ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত কাপাসাটিয়া পল্লীগঠন কেন্দ্রে কাপাসাটিয়া ও তৎসংলগ্ন গ্রামের অধিবাসীরা বিপ্লবী নেতা শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর (মহারাজ) ৬৪তম জন্মতিথি পালন করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর যতীন্দ্রমোহন রায়ের সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মানপত্রাদি পাঠ, কবিতা আবৃত্তি ও ডাঃ সতীশচন্দ্র রায়ের বক্তৃতার পর ছোট বালিকাদের চরকা-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এই প্রতিযোগিতায় শক্তি দে প্রথম পুরস্কার এবং ইন্দু চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

মানপত্রের উত্তরে মহারাজ বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর গঠন-মূলক কাজের মধ্য দিয়া জাতিকে সবল করিয়া গড়িয়া তোলা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। তিনি সকলকে স্বাবলম্বী এবং সংযত হইতে উপদেশ দেন।

বীরেন্দ্রকুমার সাহা

গত ১৮ই মে জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠনে অগ্রণী পরলোক-গত বীরেন্দ্রকুমার সাহার সপ্তম বার্ষিক মৃত্যু দিবস উপলক্ষে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বীরেন্দ্রকুমারের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

বীরেন্দ্রবাবু বাংলা ১৩০০ সনের ১৫ই আশ্বিন কলিকাতায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়স হইতে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা, উত্তম, উৎসাহ, অধ্যবসায় এবং উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা দেশের ঐশ্বর্য্য ও শিল্পসম্পদ বৃদ্ধির যে দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গেলেন তাহার তুলনা নাই। কাঁচ ও ম্যান্টল শিল্পের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বীরেন্দ্রকুমার স্বদেশীযুগের লোক ছিলেন এবং সেই অগ্নি-যুগের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দেশসেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। এদেশের কাঁচ ও ম্যান্টল শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "সোদপুর গ্লাস ওয়ার্কস" বাঙালী জাতির সার্থক শিল্পপ্রচেষ্টার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ভারতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম যন্ত্র-সাহায্যে শিশি, বোতল, শিট গ্লাস, এবং অন্যান্য কাঁচের দ্রব্যাদি তৈরি করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই কারখানাই কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁচ বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের "হাতে কলমে" কাজ শিক্ষা দিবার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তিনি শেফিল্ডের সোসাইটি অব গ্লাস টেকনোলজির ভারতীয় বিভাগের এবং ইণ্ডিয়ান সিরামিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন।

গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"শ্রীরামকৃষ্ণ" পত্রিকার প্রকাশক শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা এবং বেহালা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৮ বৎসর বয়সে গত ১২ই বৈশাখ শুক্রবার বেহালায় তাঁহার নিজ বাসভবনে লোকা-ন্তরিত হন। তাঁহার ন্যায় ছাত্রকল্যাণকামী, বিচক্ষণ এবং আদর্শ শিক্ষক, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অথচ জনপ্রিয় নাগরিক বিরল। প্রথম জীবনের অতি সাধারণ এবং সামান্য অবস্থা হইতে উত্তরকালে তিনি যে সর্ব্বজনপ্রিয়তা, সম্মান ও সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তার মূলে ছিল তাঁহার কর্ম্মশক্তি, আত্ম-নির্ভরতা ও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা। বহু ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান ও জন-হিতকর সঙ্ঘের সহিতও তিনি সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

বঙ্কুবিহারী মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ও শ্রম দপ্তরের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী বঙ্কুবিহারী মণ্ডল গত ৩১শে বৈশাখ ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি গত নির্ব্বাচনে রাণীগঞ্জ কেন্দ্র হইতে তপশীলী আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। লীগ আমলেও তিনি পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ছিলেন এবং ১৯৩৭ সাল হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই রাজনৈতিক জীবন আরম্ভের পূর্ব্বে তিনি আসানসোল কোর্টে ওকালতী করিতেন।

তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং পরোপকার-প্রবৃত্তির জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তিনি স্ব-শ্রেণীর উন্নতি ও উপকারের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিতেন। যখনই আসান-সোল মহকুমার কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট কোন কার্য্যের জন্য গিয়াছেন, বঙ্কুবাবু তাঁহার সেই কার্য্য সমাধা করিয়া দিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অন্ধবধূ
শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরের প্রধান তোরণ

সহস্র স্তম্ভনির্মিত কক্ষগাত্রে প্রস্তরের মধ্যে বিচিত্র কারুকার্য

শ্রীরঙ্গমের সাধারণ দৃশ্য (পশ্চিম দিক হইতে)

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"
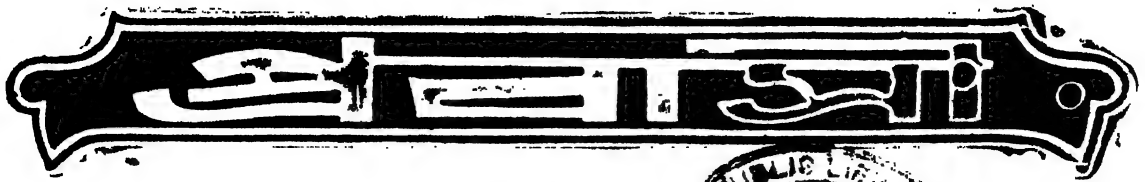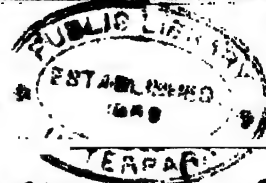
৫২শ ভাগ ১ম খণ্ড } শ্রাবণ, ১৩৫৯ { ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতায় "আইন অমান্য" আন্দোলন

বিগত মঙ্গলবার ৩১শে আষাঢ় কলিকাতায় এক "জন বিক্ষোভের" সৃষ্টি হয়। "আইন অমান্য", "জনবিক্ষোভ" ইত্যাদি শব্দ কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদিগের কর্ণের অগোচর ছিল। কিন্তু প্রাদেশিক বিধান পরিষদে সরকারী ও সরকার-বিরোধী দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাতের ফলে উহার পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই ব্যাপারের সূত্রপাত সম্বন্ধে সরকারী বিবৃতি এইরূপ :

"পরিষদ ভবন এলাকায় এখনও ১৪৪ ধারা আদেশ বলবৎ রহিয়াছে। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা ১৫ই জুলাই ঐ আদেশ অমান্য করিবেন। গবর্মেণ্টকে তাহাদের খাদ্য পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে বাধ্য করাই তাঁহাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ছিল। ১৪ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, গবর্মেণ্ট খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন আছেন তবে আগামী বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহাদের পক্ষে কিদোয়াই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে না, কারণ কলিকাতা ও শিল্প এলাকার জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ গম ও চাউল যে ভারত-সরকার সরবরাহ করিতে পারিবেন এরূপ 'গ্যারাণ্টি' তাঁহারা দিতে পারিতেছেন না। এই বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, ভারত গবর্মেণ্ট কিদোয়াই পরিকল্পনা বর্ত্তমান বৎসরেই কার্য্যকরী করিতে রাজী আছেন কি না তাহা জানাইবার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর নিকট একটি তার প্রেরণ করিয়াছেন। সরাসরি ব্যবস্থা অবলম্বন হইতে বিরত থাকার জন্য তিনি সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যগণকে অনুরোধ করেন। তিনি তাঁহাদিগকে আরও অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা যেন বিধানসভায় খাদ্যেট সম্পর্কিত আলোচনা শান্তিপূর্ণভাবে চলিতে দেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জি ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি অবশ্য এই যুক্তি দেখান যে, তাঁহাদের এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে রাজ্য সরকারের পক্ষে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ গম ও চাউল সংগ্রহের সুবিধা হইবে। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৩টার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রায় বার শত লোক সমবেত হয়। এখানে কয়েকজনের বক্তৃতার পর ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জি, শ্রীহেমন্তকুমার বসু প্রভৃতির নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। নিষিদ্ধ এলাকার প্রবেশ-পথের মুখে পুলিস শোভাযাত্রা আটক করে এবং তাহারা শোভাযাত্রিগণকে ১৪৪ ধারা অমান্য না করিতে বলে। শোভাযাত্রাকারীরা তখন পুলিস-বেষ্টনী ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। শোভাযাত্রাকারীদের মধ্য হইতে কয়েকজন নেতাসহ ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। শোভাযাত্রিগণ তখন রাস্তার মাঝখানে বসিয়া পড়ে। ইহার পর তথায় ঘটনাস্থলে বিরাট জনতা সমবেত হয় এবং তাহারা পুলিসের উপর ইট-পাটকেল ছুড়িতে আরম্ভ করে। জনতাকে সরাইয়া দিবার জন্য পুলিসকে মৃদু লাঠি চালনা করিতে হয় কিন্তু চারিদিক হইতে আরও লোক আসিয়া তথায় জমিতে থাকে এবং তাহারা পুলিসের উপর প্রবলভাবে ইট-পাটকেল ছুড়িতে থাকে। একজন পুলিস গুরুতররূপে আহত হয় এবং তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কয়েকজন পুলিস অফিসার এবং জন-সাধারণের মধ্যেও অনেকে আহত হয়। গ্রেপ্তারের সময় জনতা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। পুলিস তখন ১৬ রাউণ্ড কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য অশ্বারোহী পুলিসও আগাইয়া আসে। এই সময়ে এসপ্ল্যানেড রো ঈষ্টে কিছু লোক একত্র হয়। কার্জ্জন পার্কের ভিতর হইতেও জনতা প্রস্তর ছুড়িতে থাকে। এই সময় আরও সাত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাত্রি প্রায় আটটার সময় জনতা ছত্রভঙ্গ হয়। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আট জন সামান্য আঘাত পাইয়াছে।"

অন্য দিকে বিরোধী দলের বর্ত্তমান মুখপত্র "আনন্দবাজার

পত্রিকা" ঐ একই ব্যাপার সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য—বুধবার ৩২শে আষাঢ়—এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন :

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার লাঠির যুক্তির প্রয়োগে অতিমাত্রায় উৎসাহী হইয়া উঠিতেছেন, দেখিতেছি। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে বিধানসভার দ্বারদেশে সমবেত দুর্ভিক্ষপীড়িত জনতার উপর লাঠি চালনা হইয়াছে। পুনরায় গত মঙ্গলবার সরকারী খাদ্যনীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য যে জনতা বিধানসভার দিকে যাইতেছিল, তাহার উপর লাঠি চালনা করা হইয়াছে। কেবল লাঠি চালনা হইয়াছে বলিলে ভুল বলা হইবে ; লাঠি চালনা, ঘোড়াচালনা, কাঁদুনে গ্যাসচালনা—সবরকম পরীক্ষাই হইয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত সংবাদ, শতাধিক সংখ্যক ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন এবং অভিযানকারীদের নেতৃস্থানীয় বত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই অভিযানের বিজ্ঞপ্তি যখন প্রথমে প্রকাশিত হয়, তখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় শাসনের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শাসন যে নিরস্ত্র ও শান্ত জনতার উপর সরকারী বলপ্রয়োগের এই নগ্ন রূপের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইবে, তাহা কেহ ভাবে নাই।"

'প্রবাসী' বাহির হইবার সময়ের অবস্থা এইরূপ। পরে উহা কোন্ দিকে চলিবে বুঝা যাইতেছে না। তবে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেরূপ নগ্ন ও বীভৎস রূপে দেখা দিয়াছে তাহা এপ্রদেশবাসীর পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইবে না নিশ্চয়। এ প্রদেশের সংবাদপত্র—বলিতে কি সমস্ত ভারতের সংবাদপত্র—আজ "সারকুলেশন" নামক দেবতার পূজারী, সুতরাং সেদিক হইতে পথ নির্দ্দেশের আশা বৃথা। দেশে প্রকৃত নেতৃত্বের যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রবীণ দেশসেবী আজ কেহই নাই যিনি এই আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে পারেন। নাগরিকবর্গ স্থির ও নিরপেক্ষ থাকুন ইহাই আমাদের নিবেদন।

কলিকাতার উচ্চতম "ন্যায়াধিকরণ"

আমাদের দেশে হাইকোর্ট অর্থে "উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণ" শব্দ পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। ধর্ম্মাধিকরণ বলিতে কি বুঝায় তাহা আজিকার দিনের অধিকাংশ লোকেরই হয় ধারণা নাই, নয় স্মৃতির অতীত। "High Courts of Judicature" শব্দের দিল্লী কি অনুবাদ করিয়াছেন তাহা অল্প লোকেই জানেন এবং ব্যবহার করেন আরও অল্প লোকে, কিন্তু ঐ অধিকরণে আমাদের নূতন ব্যবস্থায় কি ভার অর্পিত হইয়াছে সে বিষয়ে দিল্লীর দরবার জনসাধারণকে বিশেষ জানান নাই। জানাইলে দেখা যাইত যে, হাইকোর্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি অশেষ ভাবে করা হইয়াছে, কিন্তু সেখানকার অধিকারীবর্গের দায়িত্বজ্ঞান সরল ও সজাগ রাখিবার ব্যবস্থা কিছুই করা হয় নাই। অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে ধর্ম্মবিচার ও ন্যায়বিচার যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিচারকবর্গের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বিচারকের কর্ত্তব্যচ্যুতি হইলে তাহার শোধন অতিশয় কঠিন ও দুঃসাধ্য পূর্ব্বেই ছিল, বর্ত্তমানে তাহা আরও দুরূহ করা হইয়াছে। ফলে বিচারকের কাজ সহজ হইয়াছে, বিচারপ্রার্থীর অবস্থা সঙ্গীন হইতে সঙ্গীনতর হইয়াছে।

এই ব্যবস্থার ফলে আমরা বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ "ধর্ম্মাধিকরণে" যথেচ্ছাচারের সুস্পষ্ট লক্ষণ কয়েকবার দেখিয়াছি এবং আমাদের আশঙ্কার কারণ আছে যে, পরে অধর্ম্ম ও অনাচারও ঐপথেই প্রবেশ করিতে পারে। কেননা যেখানে বিদ্যার অভিমানে বা পরোক্ষ প্রভাবের ফলে বিচার ধর্ম্মচ্যুত হইতে পারে সেখানে অনাচার প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হইয়া যাওয়া অসম্ভব কোনমতেই নয়। ভিন্ন কয়টি প্রদেশে উহা ইতিপূর্ব্বেই অল্পবিস্তর ঘটিয়াছে, সুতরাং এখানে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, না হইলে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারের উচ্চ আদর্শ ম্লান হইয়া ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যাইবে।

আমরা অনেক চিন্তা ও আলোচনার পর এই বিষয়ে লিখিতেছি, কেননা আমরা আইন-কানুনে পটু নহি এবং "প্রবাসী" ন্যায়-মীমাংসার ক্ষেত্রও নহে। কিন্তু অন্য সাধারণ জনের ন্যায় আমাদেরও এ বিষয়ে আলোচনা করার অধিকার আছে এবং সে অধিকার প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকের জন্মগত স্বত্ব।

প্রশ্ন হইতে পারে, হাইকোর্টের বিচার সম্বন্ধে আলোচনা করার অধিকার জনসাধারণের কেমন করিয়া হইতে পারে, কেননা সেরূপ জ্ঞান কয়জনের আছে ? তাহার সহজ উত্তর যে, সে জ্ঞান বিশেষজ্ঞ ভিন্ন কাহারও নাই, কিন্তু বিচারের ফলাফল যদি সাধারণের সম্মুখে প্রত্যক্ষভাবে সমীচীন না হয় তবে সে বিচার ব্যর্থ, সে আইনজ্ঞান ব্যর্থ এবং ধর্ম্মাধিকরণের যে মূল উদ্দেশ্য—সুবিচার—তাহাও ব্যর্থ। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু—বিচার, আইন-কানুনের কূটতর্ক নহে।

কালোবাজারের উৎপীড়নে দেশবাসী হৃতসর্ব্বস্ব ও অশেষ ভাবে ক্লিষ্ট, কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে কেহ শাস্তি পায় নাই। অনাচারের প্লাবনে দেশ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে, কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে কচিৎ এক আধজন সামান্য শাস্তি পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। প্রবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল বা অসমর্থ লোক জর্জ্জরিত, হাইকোর্টে তাহার প্রতিকার দুরূহ হইতে দুরূহতর হইতেছে। এ সকল কথা সর্ব্বজনবিদিত এবং সকলের মনেই প্রশ্ন এই যে, কেন এমন হয় ? তবে প্রত্যক্ষ সুবিচার কোথায় ?

বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তদুপলক্ষে পরদিনের সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সমাচার প্রকাশিত হয় :

"শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর বার লাইব্রেরীর পক্ষে এড্‌ভোকেট জেনারেল শ্রী এস. এম. বসু, বার-এসোসিয়েশনের পক্ষে ডঃ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং ইনকরপোরেটেড ল' সোসাইটির পক্ষে শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

অভিনন্দনের উত্তরে প্রধান বিচারপতি বলেন যে, এই দেশের ন্যায়াধিকরণের মর্য্যাদা ও ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষার গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে সচেতন আছেন এবং সংবিধানে ন্যায়াধিকরণকে যে মর্য্যাদা ও ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই আদালত ও অন্যান্য আদালতে যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

বিচারপতি আরও বলেন, আমরা—জনসাধারণ ও বিচারক উভয়েই সমানভাবে এখন পরীক্ষার সম্মুখীন। বিচারকগণ যতই চেষ্টা করুন না কেন, আইনজীবিগণও যতই পরিশ্রম করুন না কেন, জনসাধারণ ও শাসনতান্ত্রিক অন্যান্য বিভাগের মধ্যে আদালতের কর্তৃত্ব স্বীকৃতি এবং আদালতের চতুর্দ্দিকে আদালতের নির্দ্দেশ হৃষ্টচিত্তে মানিয়া লওয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টি না হইলে ন্যায়াধিকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না।

বিচারপতি বলেন যে, হাইকোর্টের ঐতিহ্য মাত্র বিচারকগণের স্বাধীনতা অথবা বিচার-বিভাগের দক্ষতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। আইনজীবীদের ন্যায়নিষ্ঠা ও স্বাধীনতা এবং আদালতের কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার উপরই উহা নির্ভরশীল। তাহাদের সহযোগিতারই বিচার বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালন সম্ভবপর।"

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তীর খ্যাতি আছে জ্ঞানলিপ্সার কারণে এবং দার্শনিক দৃষ্টিকোণের জন্য। সুতরাং তিনি যে ন্যায়াধিকরণের সংবিধান প্রদত্ত মর্য্যাদা ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টিত থাকিবেন তাহা বলা বাহুল্য এবং আমাদের বিশ্বাস আছে যে, তিনি জ্ঞাতসারে সে ক্ষমতার অপব্যবহার নিজে করিবেন না। সে কারণে তাঁহার বিবৃতি পূর্ণভাবে গ্রাহ্য, কিন্তু তিনি যেখানে জনসাধারণের স্বীকৃতি ও হৃষ্টচিত্তে নির্দ্দেশ পালনের কথা তুলিয়াছেন সেখানেই আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। জনসাধারণের হৃদয়ে হাইকোর্টের স্থান আজ কোথায় সেটা হয়তো প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টের উচ্চাসনে আসীন বলিয়াই ঠিক দেখিতে পাইতেছেন না।

আমাদের বক্তব্য এই মাত্র যে, আজ জনসাধারণ হাইকোর্টকে "ন্যায়াধিকরণ" বলিয়া মানিয়া লইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাকে "ধর্ম্মাধিকরণ" বলিয়া স্বীকার কেহই করে না এবং সেই কারণেই উহার নির্দ্দেশ হৃষ্টচিত্তে মানিতেছে কেবল যে-কজন খালাস হইবার জন্য দুরাচার লোকে। কচিৎ কেহ যদি ন্যায়বিচারের সঙ্গে ধর্ম্মবিচার পায় তবে সেও এতই বিলম্বে এবং এরূপ দুরূহ-দুর্বিপাক অতিক্রম করিয়া যে, তাহারও মনে প্রসন্নতার স্থান থাকে না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় চিন্তাশীল ব্যক্তি, তিনি হাইকোর্টের আড়ম্বর ও তোষামোদের পরিবেশ হইতে দূরে বসিয়া যদি এ বিষয়ে চিন্তা করেন তবে আমাদের বক্তব্যের সত্যাসত্য নির্ণয় ও প্রতিকারের পথের নির্দ্দেশ, দুই-ই তিনি করিতে পারিবেন ইহাই আমাদের আশা।

পশ্চিমবঙ্গে "কম্যুনিটি" পরিকল্পনা

বিগত ৫ই জানুয়ারী দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের স্বাক্ষরে এক চুক্তি সংস্থাপিত হয়। তাহার বহু পূর্ব্বে, ১৯৫০ সনের ২৮শে ডিসেম্বরে যে "টেকনিক্যাল এড", অর্থাৎ কার্য্যকৌশল সহায়ক ব্যবস্থাসম্পর্কিত চুক্তি হয়, বর্ত্তমান চুক্তি তাহারই ধারাবাহিক বিকাশ। এই চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ২৫ কোটি টাকা ও ভারত-সরকার সমপরিমাণ টাকা দিয়া একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করিবেন। ঐ পঞ্চাশ কোটি মুদ্রা ভারতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ব্যয়িত হইবে।

বলা হইয়াছিল, "যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে সমবায় প্রচেষ্টা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন—অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ক উন্নতি—পরিকল্পনাগুলি উৎসাহ পায় সে বিষয়ে এই তহবিল পরিচালকদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।" আরও বলা হয় যে, যে সব পরিকল্পনায় কৃষি ও দেশের খাদ্যাবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা আছে, এই তহবিলের একটি মোটা অঙ্ক সেই বাবদে ব্যয় করা হইবে। পরিকল্পনার সাধারণ বিবরণ এই ভাবে দেওয়া হয়:

সার্ব্বজনীন উন্নয়ন কার্য্যসূচী

এই ভাণ্ডার হইতে যে সকল সার্ব্বজনীন উন্নয়ন কার্য্যসূচীর জন্য অর্থ সাহায্য করা হইবে, তাহাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫০টি গ্রাম্য-শহরাঞ্চল উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। ইহার জন্য প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রায় ৩০০টি করিয়া গ্রাম এবং ২,০০,০০০ করিয়া লোক থাকা প্রয়োজন। এটোয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং নিলোখেরী ও ফরিদাবাদের নূতন নগর পত্তনে উত্তর প্রদেশ সরকার যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নূতন উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হইবে। এটোয়াতে ৩ বৎসর সময়ের মধ্যে ১০২টি গ্রামের ৭৯,০০০ জন অধিবাসী ১০০ বর্গ মাইল ক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদন বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি করিয়া সমবায়মূলক সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছে। তাহারা উদ্ভিদ্-রোগ বিনাশ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্য্যেও বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছে। নিলোখেরী ও ফরিদাবাদে তিন বৎসরের মধ্যে সুপরিকল্পনা এবং জনগণের সমবায়মূলক সহযোগিতার ফলে সর্ব্বপ্রকার আধুনিক ব্যবস্থা সমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি

এই চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে, একটি ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করিতে হইবে এবং এই কমিটিই পরিকল্পনাগুলির

নীতি নির্দ্ধারণ করিবেন এবং ঐগুলির তদারকের ব্যবস্থা করিবেন। ভারত-সরকার এই কমিটি নিয়োগ করিবেন। ভারতে মার্কিন টেকনিক্যাল সহযোগিতা পরিচালনা ব্যবস্থার অধ্যক্ষ মিঃ ক্লিফোর্ড উইলসন এই কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

চুক্তির মূল উদ্দেশ্য দুই দফায় সংক্ষেপে বলা হয় এইরূপ :

১। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ নির্দ্দেশ ও তাহার গতিবেগ বৃদ্ধি।

২। জগতের সর্ব্বজাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সম্যক্ পরিচয় স্থাপনা, জগদ্‌ব্যাপী শান্তি স্থাপনা এবং (চুক্তিকারী) দুই সরকার কর্ত্তৃক এরূপ কার্য্যসূচনা যাহাতে আন্তর্জ্জাতিক সংঘর্ষের কারণ দূরীভূত হয়।

বলা হইয়াছিল যে, ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির প্রধান অন্তরায় তাহার খাদ্যশস্যের ঘাটতি। প্রতি বৎসর গড়পড়তায় প্রায় ২৫০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য ভারতকে আমদানী করিতে হয়। ঐ ২৫০ কোটি টাকার কেনা পঞ্চাশ লক্ষ টন শস্য যদি এদেশে উৎপাদন করা যায় তবে ঐ টাকায় বহু প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতিবিধান এবং বহু অত্যাবশ্যক কার্য্যসূচীর গতিবৃদ্ধি সম্ভব হইবে।

এই চুক্তি সম্পর্কে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা এত দিন চলিতেছিল। অধিকাংশ লোক এ বিষয়ে কোনও সবিশেষ সংবাদ অবগত নহেন। তাহার কারণ উহার কার্য্যক্রমের পূর্ণ বিবরণ এখনও রচিত ও প্রকাশিত হয় নাই। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে আলোচনাও অল্পই হইয়াছে, ইহার প্রধান কারণ এই চুক্তি নির্ব্বাচন-পর্ব্বের ঝড়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। তবে মোটামুটি বলা যায় যে, ভারতীয় সংবাদপত্রের অধিকাংশ এই চুক্তিকে ভারত-মার্কিন সম্প্রীতির স্মারকস্তম্ভ বলিয়া অভিনন্দিত করে। বামপন্থীদিগের এক অংশ স্বভাবতঃই ইহাকে "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের" প্রতিষ্ঠান বলিয়াছিলেন এবং গান্ধীবাদী এক দলও ইহাকে ভাল চোখে দেখেন নাই।

আমরা এই চুক্তি সম্পর্কে "কলেন পরিচীয়তে" বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। কারণ প্রথমতঃ দেশের দুর্দ্দশাবৃদ্ধি যে ভাবে চলিতেছে এবং দেশের শাসনযন্ত্র যেরূপ অযোগ্য অধিকারীবর্গের হস্তে গিয়াছে, তাহাতে দেশের ভিতরের শক্তি-সামর্থ্য ও আর্থিক সম্বলের দ্বারা কোনও উন্নয়ন কার্য্যের প্রগতি যথাসময়ে হইবে কিনা সন্দেহ। বিদেশের ও বিদেশীর সাহায্য লওয়া আমাদের বিশেষ পছন্দ নয়, কেননা এক দিন মোগল-পাঠান ও তার পর ইংরেজও এদেশে আসিয়াছিল বন্ধুর বেশে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা দেখিতেছি এক দিকে বিদেশীর সাহায্যে উন্নয়নের আশার ক্ষীণ আলোক, অন্য দিকে নিরবচ্ছিন্ন দুর্দ্দশা, তৎপরে অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায় এবং সর্ব্বশেষে অবশ্যম্ভাবী বিদেশীর দাসত্ব।

সর্ব্বশেষে বিদেশীর দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী বলিতেছি এই কারণে যে, একদিন এদেশের সমাজের এক উচ্চশিক্ষিত স্তর—যে স্তরকে এখন 'বুর্জোয়া' আখ্যা দেওয়া হইতেছে—ইংরেজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান "বুনিয়াদি ঘরানা"—অর্থাৎ বনেদী অভিজাতবর্গ—ইংরেজের দালালী করিয়াই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ঠিক সেই বুর্জোয়া স্তরেরই এক অংশ অন্য এক বিদেশী জাতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং তাহাদের সাম্রাজ্যবাদ এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিদেশী পতাকা লইয়া দালালী করিতেছেন। সুতরাং বিদেশীর সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা দুই দিকেই রহিয়াছে, এক দিকে কিছু কম, অন্য দিকে কিছু বেশী।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখিয়াছি সম্পূর্ণ এদেশের টাকায় যে সকল উন্নয়ন-কার্য্যের সূচনা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই বহু অযোগ্য লোক অধিকারী বা ছোট বড় ঠিকাদার বা সরবরাহকারী রূপে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার কারণ দেশের শাসনতন্ত্র ও ব্যবস্থাতন্ত্রের উচ্চ অধিকারীবর্গের আত্মীয় ও চাটুকার পোষণের স্পৃহা এবং ন্যায়নীতি ও কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। এই দোষ শুধু কংগ্রেসের একচেটিয়া নহে বলা বাহুল্য, ইহা আমাদের জাতিগত দুর্ব্বলতা। বিদেশী বিশেষজ্ঞের মধ্যে সেরূপ অযোগ্য লোকের নিয়োগ কিছু কম হওয়াই সম্ভব।

চুক্তি অনুযায়ী মূল পরিকল্পনার ছিল সমগ্র ভারতে ৩০০টি গ্রাম লইয়া এক একটি সামগ্রিক উন্নয়ন কেন্দ্র গঠিত হইবে এবং এইরূপ ৫০টি কেন্দ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হইবে। এখন শুনিতেছি, পশ্চিমবঙ্গে ঐরূপ ৮টি কেন্দ্র স্থাপিত হইবে কিন্তু সেগুলির প্রত্যেকটিতে ১০০টি গ্রামের স্থান থাকিবে।

উন্নয়নের সমস্যা নানারূপ, অন্তরায়ও বহু। কিন্তু প্রধান অন্তরায় হইবে আত্মীয়-চাটুকার ও দলীয়-পদাতিক তোষণ ও পোষণ। বাস্তুহারার জন্য প্রদত্ত অন্ন ও অর্থ যে ভাবে বাস্তুঘুঘুতে লুটিতেছে, গ্রাম উন্নয়নের ধনভাণ্ডারও লুণ্ঠিত হইবে সেইরূপেই অযোগ্য লোকের দ্বারা এবং দলগত স্বার্থের ধ্বজাধারীদিগের দ্বারা, যদি না প্রথম হইতেই তাহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়।

দ্বিতীয় সমস্যা অভিজ্ঞতার অভাব। পশ্চিমবঙ্গের সকল গ্রামাঞ্চলই প্রায় পঞ্চাশ বৎসর উপেক্ষিত ও অবহেলিত অবস্থায় আছে। উপরন্তু সেখানে কৃষিযোগ্য পতিত জমিও অল্প। সুতরাং জমির উপর লোকসংখ্যার চাপ লাঘব করা কঠিন সমস্যা। তবে কুটীর-শিল্পের অবশিষ্ট এখনও সর্ব্বত্রই অতি হীন অবস্থায় আছে। যদি সে সকলকে জাগ্রত ও সচল করা হয়, তবে সমবায় সংগঠনের সাহায্যে তাহাতে জনসংখ্যার এক বিশেষ অংশ নিয়োজিত ও উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারিবে। কিন্তু এই সমবায় সংগঠনে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পরিবেশের মধ্যে তাহা সহজে ও যথাযথ ভাবে

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সেই কারণে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োজন কৃষি, পশুপালন, দক্ষ শিল্পী ও কুটীরশিল্প সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ। আমরা জানি, ঐরূপ তথ্যের একান্ত অভাব রহিয়াছে, যাহা আছে তাহা প্রকৃত নহে, আনুমানিক এবং অনেক ক্ষেত্রে ভয়ানক ভ্রমপ্রমাদযুক্ত।

তৃতীয় ও সর্ব্বপ্রধান সমস্যা জনসাধারণের ঔদাসীন্য ও কর্ম্মবিমুখতা। দেশের শ্রমিক নানা কারণে অলস ও শ্রমকাতর হইয়া পড়িয়াছে। উপরন্তু এক দল চতুর খল প্রকৃতির লোক উহাদের ক্রমাগতই পরামর্শ দেয় কাজ না করিতে। শ্রমবিমুখ লোককে যদি কেহ বুঝাইয়া বলে যে,"আমি একজন শিক্ষিত নেতা, আমি বলছি তোরা এ কাজে হাত দিস্‌নে, আমার কথা শোন্ আমি সরকারের হাত ধরে অন্য লোককে দিয়ে তোদের জন্যে এ কাজ করিয়ে দিচ্ছি", তবে তাহার কি ফল হয় তাহা সহজেই বিবেচ্য। উক্ত কথাগুলি আমাদের কল্পিত নহে। যাহা আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি তাহাই অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ভাষায় লিখিলাম। ঐ শ্রেণীর কুপরামর্শদাতার কবল হইতে নিরক্ষর গ্রামবাসীদিগকে উদ্ধার করাই এক প্রধান সমস্যা। ঐরূপ লোক এদেশের প্রত্যেক রাজনৈতিক দলে অজস্র রহিয়াছে।

সমস্যার কথা ত অনেক হইল, সমস্যা পূরণের কি আছে? সমস্যা পূরণ তখনই হইবে যখন এই উন্নয়নের পরিকল্পনা দলগত স্বার্থের বাহিরে যাইবে। যদি প্রাদেশিক সরকার কার্য্যত: দেখাইতে পারেন যে, এই কার্য্যে একমাত্র প্রাদেশিক গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নই তাহার কাম্য তবেই দলনির্ব্বিশেষে সকল সৎ এবং দেশের ও দশের প্রগতিকামী লোকের সাহায্য ও সহানুভূতি সে পাইবে, নচেৎ নয়, এবং গ্রামের লোককে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবে শুধু ঐ প্রকৃতির লোক।

সেই কারণে এই উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল কার্য্যসূচীই সাধারণের গোচরে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন এবং সেই কার্য্য কাহাদের হাতে অর্পিত হইতেছে তাহাও সেই ভাবে জানানো প্রয়োজন।

বঙ্গের ছোটখাট জলসেচ-পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ১৯৫১-৫২ সনে ছোটখাট জলসেচ-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এই পরিকল্পনা-সংখ্যা মোট ৮৬৪। বর্ত্তমান বৎসরে আরও ৫৭১টি ছোট ছোট পরিকল্পনা চালু হইবে। কোন্ কোন্ জেলায় আরব্ধ পরিকল্পনার সংখ্যা কত, একটি বিবৃতিতে তাহা এইরূপ বলা হইয়াছে—বর্দ্ধমান ২১৯, মেদিনীপুর ১৭৯, হুগলী ৮৬, বীরভূম ৮০, চব্বিশ-পরগণা ৭০, হাওড়া ৫০, জলপাইগুড়ি ৩৮, মালদহ ৫১, বাঁকুড়া ৪৩, মুর্শিদাবাদ ৩৮, নদীয়া ৫ ও পশ্চিম দিনাজপুর ৫। এই প্রকার জলসেচ ব্যবস্থায় ২,৮২,৮৯৮ একর জমি জল পাইবে। যে সকল পরিকল্পনা এ বৎসর বিভিন্ন জেলায় চালু হইতে বাকি আছে তাহা এই—বাঁকুড়া ৮২, মালদহ ৫৮, হুগলী ৫০, হাওড়া ৪৯, বর্দ্ধমান ৪৯, চব্বিশ-পরগণা ৩২, মুর্শিদাবাদ ২৫, বীরভূম ২০, দার্জিলিং ১২, জলপাইগুড়ি ৮ এবং নদীয়া ৩।

জলনিকাশের বিরাট পরিকল্পনা

কলিকাতা ও ইহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের জলনিকাশের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকল্পে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল, সেই কমিটি সোনারপুর-আরাপাঁচ ও বাগজোলার জলনিকাশের বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের জলনিকাশের ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিয়াছে।

সমগ্র পরিকল্পনাটির জন্য ১০৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। টালির নালা এবং সোনারপুর, বারুইপুর ও ক্যানিং থানার মধ্যে বিভাধরী নদীর দক্ষিণাংশে ১০৫ বর্গমাইল অঞ্চল এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই অঞ্চলের মধ্যে 'পিয়ালী' নদীর পশ্চিমাংশের ৫৭ বর্গমাইল স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল।

কুড়ি বৎসর আগে এই অঞ্চল অত্যন্ত উর্ব্বর স্থান ছিল। কিন্তু বিভাধরী নদী ক্রমশ: শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় এবং পিয়ালী নদীর উপরের অংশ স্রোতহীন হইয়া পড়ায় এই অঞ্চল সর্ব্বদা জলপ্লাবিত থাকে।

এই পরিকল্পনার জন্য উক্ত অঞ্চলকে দুই ভাগ করা হইয়াছে। মোট ১০৫ বর্গমাইল অঞ্চলের মধ্যে ৩২'৫ বর্গমাইল উঁচু বসতিযোগ্য স্থান আছে। কাজেই মোট ৭২'৫ বর্গমাইল স্থানই এই পরিকল্পনা হইতে উপকৃত হইবে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে ২৯,১০০ টন খরিফ ও রবিশস্য উৎপন্ন হইবে এবং ইহার আনুমানিক মূল্য হইবে ৭০ লক্ষ টাকা।

বর্ত্তমানে রাজ্য সরকারের পক্ষে অবিলম্বে এত টাকা দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থসাহায্য চাওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সীমাবদ্ধ পরিকল্পনার ভিত্তিতে ইহাতে সম্মত হন এবং এই বৃহৎ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় ১০৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪৪ লক্ষ টাকা দিবার সিদ্ধান্ত করেন। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। বাকী ৩৩ লক্ষ টাকা ঋণস্বরূপ দেওয়া হইবে। উক্ত ঋণ ১৫টি কিস্তিতে শোধ করিতে হইবে। ভারত-সরকারের পাঁচশালা পরিকল্পনার মধ্যে ইহাকে ধরা হইয়াছে। কিন্তু বাকী ৬১ লক্ষ টাকার এখনও কোন সংস্থান হয় নাই।

এই সীমাবদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে পিয়ালী নদীর পশ্চিমাংশের

আরপাঁচ অঞ্চলের ৫৭ বর্গমাইল জায়গা জুড়িয়া বর্তমান কাজ সুরু হইবে। এই অঞ্চলটি কলিকাতার খুব নিকটবর্তী ও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা।

এই সীমাবদ্ধ পরিকল্পনায় একটি প্রধান ক্যানাল, কয়েকটি শাখা ক্যানাল খনন, চারিটি বেশী শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক 'পাম্পিং সেট' প্রভৃতি স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। সোনারপুরের জলাভূমির উত্তর ও সোনারপুর-ক্যানিং রেল লাইনের দক্ষিণদিকস্থ আদিপুরের জলাভূমি এই জলনিকাশ ব্যবস্থার গ্রহীতা রূপে কাজ করিবে। প্রধান ক্যানালটি উত্তরদিকের জলাভূমি হইতে রেলওয়ে লাইন পার হইয়া দক্ষিণ দিকের জলাভূমির সহিত সংযুক্ত হইবে এবং 'উত্তরভাগ' পাম্পিং ষ্টেশনের দিকে চলিয়া যাইবে, এই সঙ্গে কয়েকটি ছোট ছোট শাখা ক্যানালও ইহার সহিত পথিমধ্যে সংযুক্ত হইবে। উক্ত পরিকল্পনায় আরও কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের গড়িয়া কেন্দ্র হইতে পাম্পিং ষ্টেশন পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক তার স্থাপন করার এবং পিয়ালী নদীর বাঁধকে উচ্চ ও দৃঢ় করার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

১৯৫২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাম্পিং সেট স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ হইবে। ইহার পর পরিকল্পনার কাজ দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিবে।

ধাপা

ধাপার সব্‌জী চাষ কলিকাতা ও তাহার বাহিরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রতি বৎসর শীতের সময় বহুল পরিমাণে ফুলকপি, বেগুন, লাউ, কুমড়া এই ধাপাতেই উৎপন্ন হয়। বর্ষার সময়ও নানা প্রকার শাক, ভুট্টা ইত্যাদির চাষ হয়। বাস্তবিক কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত ধাপা সব্‌জী-চাষে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

ধাপা খাস কর্পোরেশনের অধীন কলিকাতা শহরের আবর্জ্জনা নিকাশের স্থান। বাগবাজারের সেন-পরিবারের ইহা একটা চাকরাণ ভূমি। ধাপার মাঠের পরিমাণ প্রায় দুই বর্গ মাইল। পূর্ব্বে বাণতলাহাট, উত্তরে তাদর থানা, পশ্চিমে ট্যাংরা মৌজা, দক্ষিণে চৌবগা মৌজা ধাপাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছে।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ডাঁটা, চাপানটে প্রভৃতি শাক বহুল পরিমাণে জন্মে। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ভুট্টা ও ঝিঙা উৎপন্ন হয়। শীতের সময় ফুলকপি, বেগুন, লাউ, কুমড়া প্রভৃতির চাষ হয়। ধাপার অধিকাংশ চাষী উড়িষ্যা, বিহার ও মেদিনীপুর হইতে আগত। ইহাদের সংখ্যা প্রায় পনর শত।

কলিকাতা শহরের যে আবর্জ্জনা ধাপায় সংরক্ষিত হয়, তাহা প্রথম দুই তিন বৎসর সব্‌জী-চাষের পক্ষে একান্ত উপযোগী বলিয়া মনে হয়। ইহার পর আবর্জ্জনার মধ্যে সারের অস্তিত্ব থাকে না; তখন কৃত্রিম সার প্রয়োগ না করিয়া উপায় নাই। গত দুই বৎসর যাবৎ চাষীরা কৃষি বিভাগের নিকট হইতে প্রায় ১০০০ মণ এমোনিয়া সল্‌ফেট সংগ্রহ করিয়া শীতের ফসল প্রচুর পরিমাণে ফলাইয়াছে। দেখা গিয়াছে, প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় ৬০০০ ফুলকপির চাষ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বেগুন ও লাউ কুমড়ার গাছ লাগানো হয়। এ ছাড়া, মূলা ও পুঁই শাকের চাষ হয়। এই সকল সব্‌জী-চাষের জন্য জলসেচেরও বড়ই প্রয়োজন। অনেক কৃষকই পাম্পিং মেসিনের সাহায্যে নিকটস্থ বিল হইতে জমিতে সেচ দিয়া থাকে। প্রত্যেক বিঘা জমিতে প্রায় ১৬ বার সেচ দিতে হয়।

ধাপার মাঠে শা' ওয়ালেস কোম্পানীর সারের কারখানা আছে। মৃত পশুর কঙ্কাল হইতে হাড়ের গুঁড়া প্রস্তুত হয় এই কারখানায়। এ ছাড়া পশুর শিং ও খুর হইতে আঠা প্রস্তুত হয়। ধাপার মাঠে পরিত্যক্ত ছিন্ন বস্ত্রও যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাহা কুড়াইয়া এক শ্রেণীর লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহা ছাড়া পুরাতন লোহার টুকরা, ভাঙা কাচ, কয়লাও প্রচুর পরিমাণ ধাপার মাঠ হইতে সংগৃহীত হয়। ধাপার পরিত্যক্ত আমের আঁটি হইতে যে চারা জন্মায়, তাহা বহু কলমের ব্যবসায়ী নামমাত্র পারিশ্রমিকে সংগ্রহ করে।

ধাপায় পশুখাদ্যও যথেষ্ট জন্মে। কর্পোরেশনের ময়লা জল যে খাল দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহার স্থানে স্থানে পলি পড়িয়া উঁচু হইয়া গিয়াছে। তথায় দল জাতীয় এক প্রকার ঘাস জন্মে। এই ঘাস কলিকাতায় রপ্তানী করিয়া অনেকে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ধাপায় মৎস্য উৎপাদনও প্রচুর পরিমাণে হয়। মৎস্য উৎপাদনের জন্য যে সকল "ভেড়ি" আছে তাহাদের পরিমাণ প্রায় ৮০০ বিঘা।

ধাপায় চাষ করিয়া বহু চাষী উদরান্নের সংস্থান করিতেছে, তবুও বলিতে হয় তাহারা নিতান্ত দুঃখী। তাহারা যে সকল গৃহে থাকে সেগুলি অস্বাস্থ্যকর। বস্তি জীবনের দুঃখ হইতে তাহারা রেহাই পায় নাই। পানীয় জলের জন্য সুব্যবস্থা নাই। শোনা যায়, প্রতি বিঘা জমির খাজানা ২৫০৲ হইতে ৫০০৲ টাকা। চাষীর পক্ষে খাজনা অত্যধিক স্বীকার করিতে হয়।

ধাপার এই উর্ব্বর ভূমির বর্ণনা "খাদ্য উৎপাদন" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক শ্রীঅবনীমোহন গোপ, কৃষি সহকারী। অবনীবাবু বর্ণনার শেষ অনুচ্ছেদে কৃষক পরিবারের দুঃখের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই দুরবস্থা দূর করার কোন উপায় নির্দ্দেশ করেন নাই। কেবল অত্যধিক খাজানাই এক মাত্র কারণ নয়। তাড়ি খাওয়ার অভ্যাসও

একটা কারণ। সে পাপ কি রাষ্ট্র দূর করিতে পারে? খাজনা যথাযথ হওয়া উচিত সন্দেহ নাই। কিন্তু খাজনা কমিলেই কি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত?

জয়নগর থানায় খাদ্যসঙ্কট

আমরা আজ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ "বন্ধু" নামীয় একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পাইতেছি। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীকালিদাস দত্ত। জয়নগর-মজিলপুর গ্রামে অবস্থিত তাঁহার পুস্তকাগার ও যাদুঘর দর্শনীয়।

গত ১১ই ও ১৮ই জ্যৈষ্ঠের পত্রিকায় ঐ অঞ্চলের খাদ্য-সঙ্কটের আলোচনা আছে ও তাহা সমাধানের উপায়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ১৮ই আষাঢ়ের পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে সমাধানের একটি সন্ধান দেওয়া হইয়াছে:

"জয়নগর থানার খাদ্যসঙ্কটের কথা আজ সর্ব্বজনস্বীকৃত। সরকারী তরফ থেকে ঘাটতি এলাকা ঘোষণা না করা হলেও এই অঞ্চলের দুর্গত অধিবাসিগণের যে সাহায্যের প্রয়োজন প্রকারান্তরে তা স্বীকৃত হয়েছে। পশ্চিম-বাংলার খাদ্য-মন্ত্রীর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী শ্রীনিশাপতি মাঝি এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, ধান চালের অবস্থা খুব খারাপ না হলেও অধিকাংশ লোকের কেনার ক্ষমতা অসম্ভব রকমে কমে গেছে কিন্তু তিনি বেশ স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, সরকারের হাতে যথেষ্ট চাল না থাকায়, সরকারী সাহায্যের পরিমাণ অত্যল্প হতে বাধ্য। তবে সরকারী ভাবে অনুসন্ধানের ফলে কোন জায়গা থেকে মজুত ধান চাল পাওয়া গেলে তা সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফত সেই এলাকার দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা করা হবে।

একথা খুবই সত্য যে, জনসাধারণের কেনার ক্ষমতা অসম্ভব রকমে কমে গেছে। তবে মাঝি মশাইয়ের মতে ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করার কাজে অনেকের আয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। আর শাক-সব্জী চালান দেওয়া বন্ধ করা গেলেই খাদ্যের অভাব অনেকটা মিটবে।

কিন্তু মাঝি মশাই নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন যে, এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই ক্ষেতমজুর যাদের এক পয়সাও সংস্থান নেই। এই সব সহায়-সম্পদহীন লোকের পক্ষে ব্যাপক ভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করার কাজে লেগে যাওয়া কল্পনা করা সম্ভব হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তা মোটেই কার্য্যকরী হতে পারে না। তবে সরকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলে যদিও খানিকটা সম্ভব হয়, তাও সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী করে তুলতে অনেক সময় লাগতে বাধ্য। সুতরাং এখনই সাধারণের আয় বাড়ানোর কোন ব্যবস্থাই এ থেকে হতে পারে না, এবং অদূর ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না।

শাক-সব্জী চালান দেওয়া বন্ধ করলে স্থানীয় বাজারে তাদের তীব্র অসম্ভব কমে যাবে। একেই ত লোকের কেনার ক্ষমতা কমে গেছে, এত জিনিষ তখন কিনবে কে? চালান দিলে যদিও বিক্রি করে কিছু লাভ করার সম্ভাবনা থাকে, চালান বন্ধ করলে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। তবে অমনি দিলে যারা পাবে তাদের কিছু সুবিধা হতে পারে বটে; কিন্তু খাদ্যসমস্যা সমাধান হবে না নিশ্চয়ই।

মাঝি মশাই আরও নজির দেখিয়ে বলেছেন যে, কর্ডন প্রথায় কড়াকড়ি করার ফলে অনেক জায়গায় চালের দর ১৭৲।২০৲ টাকায় বেশী উঠতে পারে নি। এই প্রথায় যতই কড়াকড়ি করা যাক না কেন, ঘাটতি এলাকা থেকে সরকারী প্রয়োজনে চাল কেনা চলতে থাকলে চালের দাম ত কমতেই পারে না বরং বাড়তে বাধ্য। অতএব কর্ডন প্রথায় কড়াকড়ি নয়—একে উঠিয়ে দিয়ে আংশিক রেশন প্রথা চালু করা একান্ত দরকার। কিন্তু আংশিক রেশন মানে এ নয় যে, "এ" এবং "বি" পাবে আর "সি" পাবে না। কোনও 'এ', 'বি', 'সি' ভাগাভাগি না করে সকল শ্রেণীর লোককেই চাল, আটা রেশনের মারফত বিলি করতে হবে।"

মুর্শিদাবাদে খাদ্যশস্যের অবস্থা

মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীজিতেশচন্দ্র তালুকদার জেলার সংবাদপত্রগুলির সম্পাদক ও শহরের সংবাদদাতাদের খাস-কামরায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আহ্বান করেন এবং জেলার খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

জেলার অভাবগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে, বিশেষ করিয়া কান্দী মহকুমার বিভিন্ন ইউনিয়নে, আংশিক রেশনিং ব্যবস্থার গম ও চাউল দেওয়ার ব্যবস্থার কথা জেলা-শাসক উল্লেখ করেন। জেলার খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে সকল প্রকার সুবিধা-অসুবিধার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, গত ১৯৫০-৫১ সনে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় ২,২৫,০০০ মণ ধান্য ও চাউল সংগ্রহ করা হয়, তাহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ৬ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য প্রেরণ করেন। কিন্তু বর্ত্তমান ১৯৫১-৫২ সনে মুর্শিদাবাদ জেলায় এ পর্য্যন্ত মাত্র ৪০,০০০ মণ ধান্য ও চাউল সংগৃহীত হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় সংগৃহীত ধান্য ও চাউল হইতে জেলা-কর্ত্তৃপক্ষ এক মণ খাদ্যশস্যও এই দুই বৎসর জেলার বাহিরে প্রেরণ করেন নাই। কান্দী মহকুমায় গত বৎসর অর্দ্ধেক ধান্য ফসল পাওয়ায় ফলে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ভাল হয় নাই। তথাচ তিনি জেলার খাদ্যাভাব দূরীকরণার্থে সকল প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না।

প্রাদেশিক সরকার এই জেলার জন্য প্রচুর পরিমাণে গম বরাদ্দ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে এই জেলায় বিভিন্ন সরকারী গুদামে প্রায় দুই লক্ষ মণ গম আছে। জেলাবাসী ময়দা

খাইতে অভ্যাস করিলে খাদ্য-সঙ্কট অনায়াসেই দূরীভূত করা যায়।

গ্রামাঞ্চলের লোক গম লইতে রাজি না হওয়ায় সাংবাদিকদের তরফ হইতে বলা হয় যে, গ্রামাঞ্চলে গম ভাঙাইয়া ময়দা করার ব্যবস্থা সহজ না হওয়ার জন্য গ্রামবাসীরা গম লইতে চায় না। সরকার হইতে গম ভাঙাইয়া ময়দা করিয়া তাহা আংশিক রেশনিং প্রথায় দিলে গ্রামবাসীদের মধ্যে গম খাওয়া চালু করা সহজ হইবে। তাহা ছাড়া সরকারী গম ও বাজারের গমের দরের কথাও উল্লেখ করা হয়। জেলা-শাসক বলেন যে, বাজারের গমের দরের উঠা-নামা আছে, কিন্তু সরকারী গমের দর সারা বৎসরেই এক থাকে। তথাপি তিনি গমের দর কমানো সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

বর্ত্তমান বৎসরে বাগড়ী অঞ্চলে আউস ধান্য ভাল হইবার সম্ভাবনা থাকায় কর্তৃপক্ষ আউস প্রকিওরমেণ্ট সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। এইভাবে যদি অন্ততঃ ১০,০০০ মণ আউস ধান্য সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে জেলায় ধান্যের মজুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এ যাবৎ কান্দী অঞ্চলের আমন ধান্য বাগড়ী অঞ্চলকে বাঁচাইয়াছে, বর্ত্তমান বৎসরে বাগড়ী অঞ্চলের আউস ধান্য কান্দী অঞ্চলকে যাহাতে রক্ষা করে, সে বিষয়ে সকলের সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য। সরকার মনস্থ করিয়াছেন যে, খামার হইতে যে পরিমাণ আউস ধান্য সংগৃহীত হইবে তার তিন ভাগের এক ভাগ সেই খামার জন্যই বরাদ্দ করা হইবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি জেলাবাসীর সর্ব্ববিধ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। সমালোচনা ও আন্দোলন অপেক্ষা সহযোগিতার ভিত্তিতেই সঙ্কট মোচনের ব্যবস্থা সহজ হয়।

সকল জেলায়—মাত্র ১৪টি জেলার অবস্থা জানিলে খাদ্যের অনটন বলিয়া যে হৈ-চৈ উঠিয়াছে তাহা বন্ধ হইতে পারে। খাদ্যশস্যের অনটন যত বলিয়া সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তাহা সত্য নয়। আমাদের রুচির একটু অদল-বদল করিলে খাদ্য সম্বন্ধে এত ভাবিতে হইবে না।

এখন গত বিশ্বযুদ্ধ হইতে খাদ্যের প্রশ্ন সকল দেশের নরনারীকে বিভ্রান্ত করিতেছে। রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছেন এবং বড় বড় পরিকল্পনা করিয়া নাগরিককে ধৈর্য্য ধরিতে উপদেশ দিতেছেন।

হরিণঘাটার বাড়ীঘর

"লোকসেবক" পত্রিকার ১১শে আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার কিয়দংশ আমরা তুলিয়া দিলাম :

"হরিণঘাটার বাড়ীঘর, কায়দা-কানুনই এমন যে, সাধারণ মানুষ সভয়ে উহাকে পরিহার করিতে চাহে। উহার কাছে মাথা গলাইতে ভরসা পায় না।" সিমেণ্ট করা পাকা গো-শালা, মুর্গীর জন্য পাকা বাড়ী, সুটকী মাছ ইত্যাদিতে মিশাইয়া মুর্গীর আড়ম্বরপূর্ণ খাদ্য-ব্যবস্থা প্রভৃতি দেখিয়া সাধারণ মানুষ উৎসাহ বা প্রেরণা পাইবে কিরূপে, ইহাই তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন।

'এইরূপ ব্যয়বহুল ব্যবস্থার দ্বারা প্রকৃত উন্নতি কখনই সম্ভব নহে। ২৫,৩০ বিঘা জমির উপর মাটির ঘর প্রস্তুত করিয়া চতুর্দ্দিকে মাটির দেওয়ালযুক্ত গোশালা ও মুর্গী পালনের ব্যবস্থা করিয়া অধিক পরিমাণে দুধ, ডিম উৎপন্ন করিতে পারিলে তাহাই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিত ও অনুসরণের উপযোগী হইত।'

"চৌধুরী মহাশয়ের বক্তৃতার উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য এইরূপ : 'কিন্তু কৃত্রিমতা আর কূটনীতিই যাঁহাদের সম্বল, তাঁহারা এই সহজ সরল গ্রামীণ পন্থা গ্রহণ করিবেন কিরূপে? প্রকৃত জনকল্যাণ-রাষ্ট্রে সরকার এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণ জনসেবক মাত্র—তাই জনসাধারণ তাঁহাদের বন্ধুরূপেই সর্ব্বক্ষেত্রে গ্রহণ করে। আর, এতদ্দেশে আজও সরকারী কর্ম্মচারীদের বাহ্যিক আড়ম্বর হেতু গ্রামবাসী তাঁহাদের দেখিয়া ভয়ে বা সন্দেহে পলাইতেই চাহে। এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের মধ্যেই যে দেশের কল্যাণের বীজ নিহিত আছে, তাহা কি সরকার বুঝিবেন?"

এই মন্তব্যের মধ্যে মৌলিকতা কিছু নাই। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—তিনি যখন অর্থসচিব ছিলেন তার পূর্ব্বে হরিণঘাটার পরিকল্পনায় লাট কেসি প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পরে সেখানকার কাজ বন্ধ হয় নাই। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রীমণ্ডলী তাহা করিতে পারেন নাই। সেই অকৃতকার্য্যতার জন্য চৌধুরী মহাশয় যত দায়ী সরকার মহাশয় তার বেশী নয়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্বন্ধে বলিতে চাই—কৃত্রিমতার প্রশ্ন বর্ত্তমান যুগে অবান্তর। রোটারি মুদ্রাযন্ত্রে পত্রিকা ছাপানও কৃত্রিম। পূর্ব্বের দিনের সহজ, সরল জীবনে ফিরিয়া যাইতে হইলে "লোকসেবক" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে হইতে হইবে কথক। চৌধুরী মহাশয়কে বিধান সভায় যাইতে হইবে পায়ে হাঁটিয়া বা গরুর গাড়ীতে। অন্নদাবরণ রায় বা মণীন্দ্রভূষণ সিংহের মত তিনি কৌপীনবন্ত হইতেও পারেন নাই।

শর্করাজাতীয় খাদ্যের গুণাগুণ

"জ্ঞান-বিজ্ঞান" মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য্য উপরোক্ত শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :

"শর্করাজাতীয় খাদ্য—মিছরি, চিনি ও গুড় এই তিন-প্রকার খাদ্যের নামের মধ্যে একমাত্র গুড় কথাটি আমাদের

নিয়ম। গৌড় দেশম্ (বাংলাদেশের পূর্ব নাম) গৌড় হইতে গুড় কথাটির উৎপত্তি।

"আখি গুড়ে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের (mono saccharides) পরিমাণের আধিক্য হেতু ইহা অন্যান্য গুড় অপেক্ষা দ্রুত ও সহজপাচ্য। ফস্‌ফরাস এবং তাম্রের পরিমাণও আখি গুড়ে অধিক। প্রতি এক শত গ্র্যাম আখি গুড়ে ৭৫ মিঃগ্র্যাম ক্যালসিয়াম, ৩৮ মিঃগ্র্যাম ফস্‌ফরাস, ১১ মিঃগ্র্যাম লৌহ, ৫৬ মিঃগ্র্যাম তাম্র ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ রহিয়াছে। তাম্রের পরিমাণ অধিক থাকা হেতু আখি গুড় রক্তশূন্যতা রোগে অধিক প্রযোজ্য। কারণ তাম্র সহযোগে লৌহ এই রোগে বেশী কার্য্যকরী। উপরন্তু খাদ্যপ্রাণ বি ১ ও বি ২ যাহা পাওয়া যায় তাহা প্রায় সমস্ত প্রকার গুড়েই থাকা সম্ভব।

"বর্ত্তমানে কতক রাজ্যে নারিকেল গুড় প্রস্তুত করিয়া অত্যাবশ্যক ডাবের ফলন নষ্ট করা হইতেছে। ইহা ঠিক নহে। কারণ ডাবের জলের বিশিষ্ট গুণাগুণ পরিলক্ষিত হয়। প্রতি ১০০ সি, সি, ডাবের জলে প্রায় ৩ মিঃগ্র্যাম ক্যালসিয়াম, ১৩০ মিঃগ্র্যাম ক্লোরিন, ৭ মিঃগ্র্যাম ফস্‌ফরাস ও ১৫০ মিঃগ্র্যাম পটাসিয়াম পাওয়া যায়। প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্ব্বোহাইড্রেট ব্যতীত ইহাতে অ্যামিনো অ্যাসিড এবং বি১ ও বি২ খাদ্য-প্রাণ রহিয়াছে।"

আমাদের খাদ্যে গুড় ও পানীয়ে ডাবের জল পূর্ব্বে খুবই প্রচলিত ছিল। লোকের রুচি বদলাইয়াছে, সুতরাং ঐ দুই-ই এখন প্রায় অচল। সেই সঙ্গে শরীরের অবস্থাও কাহিল।

"প্রাচীনকালে আমাদের দেশে যে চিনি প্রস্তুত হইত তাহা দুই প্রকার ছিল—খণ্ডঃ এবং শর্করা। শ্বেতবর্ণ বালুকাকার খণ্ডকেই উৎকৃষ্ট শর্করা বা সিতা বলা হইত। "খণ্ডস্ত সিকতারূপঃ সুশ্বেতঃ শর্করা সিতা।" খণ্ডঃ যাহা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে তাহা খাঁড়গুড় বা দুরা।

"খণ্ডস্তু মধুরো বৃষ্যো চক্ষুষ্যো বৃংহণো হিমঃ।
বাতপিত্তহরঃ স্নিগ্ধো বল্যো বান্তিহরঃ পরঃ॥"

খণ্ড (দুরা)—শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, শরীরের উপচায়ক, শীতবীর্য্য, বায়ু ও পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, বলকারক এবং বমননাশক।

অনুরূপভাবে উক্ত শাস্ত্রে চিনি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

"সিতা সুমধুরা রুচ্যা বাতপিত্তাস্রদাহহৃৎ।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দিজ্বরান্ হন্তি সুশীতা শুক্রকারিণী॥"

সিতা—অতিশয় মধুররস, রুচিকারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি এবং জ্বরনাশক। ঔষধি শাস্ত্র, ঔষধি গুণধর্ম্ম প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে মিছরির বিশেষ গুণাগুণ বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সিতোপলাদি, চন্দনাদিবটী এবং অন্যান্য বহু গুণসম্পন্ন ঔষধ প্রায় অর্দ্ধ পরিমাণ মিছরি সহযোগে সেবনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। উপরন্তু বৎ-পিত্তের দুক্‌দুকি, অত্যধিক ক্লান্তিবোধ, শুষ্ক কাশ, উষ্ণ-শীত চক্ষু-ক্ষত প্রভৃতি নির্দিষ্ট পীড়ায় মিছরির আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। সিতোপলা—সারক, লঘু শীতবীর্য্য এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

"সিতোপলা সরালঘ্বী বাতপিত্তহরী হিমা॥"

আসাম রেল লিঙ্কে দ্রুততর রেল চলাচল

"১৪০ মাইল দীর্ঘ আসাম রেল লিঙ্ক পথে বর্ত্তমানে দ্রুতগতিতে রেল চলাচল আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে যোগাযোগকারী এই পথটিকে ক্রমে ক্রমে সহনশীল করে তোলার ফলেই মালবাহী এবং যাত্রীবাহী গাড়ীগুলি এখন দ্রুতগতিতে চলাচল করতে সক্ষম হচ্ছে।

"এই গুরুত্বপূর্ণ পথে যখন প্রথমে যাত্রীবাহী গাড়ী চলাচল আরম্ভ হয় তখন ঘণ্টায় মাত্র ১৫ মাইল বেগে গাড়ীগুলি চলতে পারত, কারণ লাইন এবং পথ তখনও শক্ত ও মজবুত হয়নি। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে যে পথ গাড়ীতে ৩১ ঘণ্টায় অতিক্রম হওয়ার কথা তাহা তখন অনেক বেশী সময়ে অতিক্রান্ত হত। ট্রেন বর্ত্তমানে ঐ পথ মাত্র ২২ ঘণ্টায় অতিক্রম করে। এখন গাড়ীগুলি ঐ রাস্তা ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে অতিক্রম করে। পথের আরও উন্নতি হলে গাড়ী তখন ঘণ্টায় ৪৫ মাইল বেগে চলতে পারবে বলে আশা করা যায়।

"আসাম রেল লিঙ্ক পথে প্রথম মাল চলাচল আরম্ভ হয় ১৯৪৯ সনের ৯ই ডিসেম্বর। প্রথম কয়েক মাস কাটিহার এবং শিলিগুড়ির মধ্যে ১২০ মাইল পথ অতিক্রম করতে মালগাড়ীর ২০ ঘণ্টা সময় লাগত। বর্ত্তমানে মাত্র ১১ ঘণ্টায় মালগাড়ী ঐ পথ অতিক্রম করে।

"তখন ঐ পথে মালগাড়ীর সংখ্যাও খুব কম ছিল। বর্ত্তমানে ঐ পথে ২০০ মালগাড়ী চলাচল করে। রেল-কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঐ পথে ৪০০ মালগাড়ী চালান সম্ভব হবে।

"বর্ত্তমানে উত্তর-পূর্ব্ব রেলের অন্তর্গত আসাম রেলপথ কেবলমাত্র পাট এবং চা'ই বহন করে না, উপরন্ত আলু, আনারস, কমলা লেবু এবং রাস্তা নির্মাণের জন্য পাথরও বহন করে।

"পাট চালান ব্যাপারেই অসুবিধার সৃষ্টি হয় বেশী। রেল-কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, পুনরায় পাট উঠবার পূর্ব্বেই একবারের পাট তাঁরা বিদেশে পাঠাতে সক্ষম হন, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে রপ্তানী দ্রুততর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

"পাট সাধারণতঃ মধ্যস্থ লোকের মারফত উৎপাদকের নিকট হতে কেনা হয়। সে প্রধানতঃ ক্রীত পাট মজুত করে রাখে এবং পাটের দাম যখন বেশ বেড়ে যায় তখন কলকাতায়

পাঠিয়ে দেয়। সুতরাং কলকাতা বাজারের পরিবর্তন আসামেরেই পাটের জন্য মালগাড়ীর চাহিদা বাড়ে বলে। পাট বুকিং করবার জন্য দৈনিক ১০০ হতে ২৫০০ মালগাড়ীর প্রয়োজন হয়। রেল-কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে, আগামী ৬ মাসের মধ্যেই আসাম হতে পাট বহন করে আনা সম্ভব হবে।

"১৪০ মাইলের অধিক দীর্ঘ এই যোগসূত্র চারিটি পৃথক পৃথক যোগসূত্রের সমন্বয়ে গঠিত এবং ইহাদিগকে পূর্ব্ব হতে অবস্থিত মিটার গেজ লাইনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ইহারা যথাক্রমে কিষণগঞ্জ হতে শিলিগুড়ি (৬৬ মাইল), শিলিগুড়ি হতে বাগরাকোট (২২ মাইল), মাদারিহাট হতে হাসিমারা (৮। মাইল) এবং আলিপুরদুয়ার হতে কতিয়া গ্রাম (৪৫ মাইল) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

"এই যোগসূত্রের নির্ম্মাণ কাজ আরম্ভ হয় ১৯৪৮ সনের ২৮শে জানুয়ারী এবং নির্ম্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৪৯ সনে।

"আমাদের রেলপথ ভারতের সুন্দর সুন্দর স্থানের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। এই সকল পথের মধ্যে আছে চা-বাগান, ঘন বাঁশের বন, নারিকেল, সুপারি এবং কলার ক্ষেত। এই অঞ্চল ঘন বসতিপূর্ণ কিন্তু শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম। আসাম রেল লিংকে ছোট ও বড় অনেক সেতু আছে।

"এই যোগাযোগ যন্ত্র নির্ম্মাণ করতে ৮ কোটি টাকার অধিক ব্যয় হয়েছে।

"রেলওয়ে ষ্টেশন, যাত্রিগণের অপেক্ষা করবার ঘর এবং কর্ম্মীদের জন্য কলোনির নির্ম্মাণ কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। এই নূতন রেল-কলোনিতে আধুনিক ধরণের জলসরবরাহ যন্ত্র এবং নূতন জলনির্গমন প্রণালী থাকবে।"

"যোগাযোগ" পত্রিকার উপরোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। তারপর বন্যায় ঐ যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার সংবাদ আসিয়াছে। এইরূপে বন্যা ও ভূমিকম্পের অধীন থাকিলে ঐ রেলওয়ের কার্য্যকরী ক্ষমতা ব্যাহত হইতে বাধ্য। ইহার কি কোনও প্রতিকার নাই?

উদ্বাস্তু কাহারা?

ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য "সংগঠন" পত্রিকার চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যায় নিম্নোক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন:

'যাহারা আকস্মিক উৎপাতের ফলে বাসস্থান হারাইয়া অন্যত্র চলিয়া যায় তাহারা প্রকৃত উদ্বাস্তু। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, দেশ বিভাগের পর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত এই শ্রেণীর লোক বহুসংখ্যক বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত উদ্বাস্তুর সংখ্যা কত তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যক্তি মাত্রই উদ্বাস্তু হইতে পারে না। যাহারা যুক্ত অবস্থায় পুরুষানুক্রমে দুই বঙ্গেই বাস করিত এবং আজ দেশ ভেদের পর পশ্চিমবঙ্গেই রহিয়া গেল, তাহারা উদ্বাস্তু কি না? যাহারা পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী হইয়াও যুক্তবঙ্গের উপার্জ্জনে থাকায় একাকী বা সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে বাস করিত এবং যাহাদের জীবনযাত্রা যেমন পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ব্যক্তির উপার্জ্জনেই চলিত তেমনই আজও চলিতেছে তাহারা উদ্বাস্তু কি না? আর যাহারা দেশের শান্ত অবস্থায় পরিবার পূর্ব্ববঙ্গে রাখিয়া বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করিত এবং অবসরমত দেশে যাইত, কিন্তু বিদেশলব্ধ অর্থেই পরিবার প্রতিপালন করিত, তাহারা বর্ত্তমানে সেইভাবেই অর্থোপার্জ্জন করিতেছে এবং পরিবারবর্গকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত করিয়া প্রতিপালন করিতেছে তাহারা উদ্বাস্তু কি না? এই প্রশ্নেরও সুমীমাংসা মানুষের সমাজে, বিশেষতঃ এদেশের আত্মপরায়ণ মানুষের সমাজে, যাহারা কেমন করিয়া নিজের যাহা পাইবার নয় তাহাও অতিরিক্ত মাত্রায় পাইতে চায়, তাহাদের মধ্যে কোন দিনই সম্ভাবনা নাই, তথাপি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব ফল মানুষকে পাইতেই হইবে। অতএব উদ্বাস্তুর শুভবুদ্ধির উপর সবটুকু ছাড়িয়া না দিয়া এই দেশের জনসাধারণ যদি এই উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হয় তাহা হইলে কাজ অনেকটা হইবে বলিয়া মনে হয়।"

উক্ত প্রশ্ন মানুষের সহজ বুদ্ধির উপরে ছাড়িয়া দেওয়া চলে না। কারণ তাহা প্রায়ই অশুভ। সেইজন্য আইনের প্রয়োজন।

এই সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার লিখিয়াছি। আজ পশ্চিমবঙ্গবাসী শুধু নয়, পূর্ব্ববঙ্গের অসংখ্য সৎলোকও তথাকথিত উদ্বাস্তুর কার্য্যকলাপে বিব্রত ও বিরক্ত। তাই "সংগঠন" পত্রিকায় এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছে। দেশের জনসাধারণ সচেতন হইলে উহার পূরণ হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবিষয়ে অর্থ ঢালিয়াছেন অজস্র, কিন্তু তাহার অপব্যয়ই হইয়াছে প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে। বাস্তুঘুঘু তোষণ, দুরাচার সরকারী কর্ম্মচারীর অনাচারের সমর্থন, সাময়িক উৎসাহী শতদিগের কার্য্যে বাধা না দেওয়া—এসবই হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম অধিকারী মহাশয়ের বুদ্ধি-বিবেচনার অভাবে। জুয়াচুরীর পথ যেমন সবদিকে সরল করা হইতেছে সেইভাবে এখানেও কাজ চলিতেছে।

প্রকৃত বাস্তুহারার দুর্দ্দশার সীমা নাই। তাহার সহায়ক কেহ নাই। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া দলগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, এমন কি পাশবপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি, সবই হইতেছে।

রাশিয়ায় ভারতের নূতন রাষ্ট্রদূত

গত ২৫শে আষাঢ় তারিখের সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত-সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী কে. পি. এস. মেনন, আই-সি-এস, সোভিয়েট রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে ছুটি লইয়া ব্রিটেনে

রহিয়াছেন। তিনি জুলাই মাসের শেষভাগে দিল্লীতে তাঁহার নিজ পদে প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে তাঁহার নূতন কার্য্যভার গ্রহণের জন্য মস্কো যাত্রা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীমেনন ১৯২২ সালে ভারতীয় সিবিল সার্বিসে প্রবেশ করেন। ১৯২৫ সালে তিনি ভারত-সরকারের পররাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগে যোগদান করেন। ঐ বিভাগে তিনিই প্রথম ভারতীয় অফিসার নিযুক্ত হন। ঐ বিভাগের চাকুরিতে অবস্থানকালে হায়দরাবাদ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থানে বিভিন্ন পদে কাজ করেন। ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত তিনি সিংহলে ভারত-সরকারের এজেণ্ট ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারত-সরকারের প্রতিনিধিরূপে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে জাঞ্জিবার, কেনিয়া ও উগাণ্ডা গমন করেন। পরে তিনি ভারত-সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিভাগের এবং বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগের সহকারী কর্ম্মসচিব নিযুক্ত হন। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত শ্রীমেনন রাজপুতানার ভরতপুর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এবং পশ্চিম রাজপুতানা রাজ্যসমূহের রাজনৈতিক এজেণ্টরূপে কাজ করেন। ১৯৪৩ সালে আগষ্ট মাসে তিনি চীনে ভারত-সরকারের এজেণ্ট-জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সালে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো সম্মেলনে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর তিনি প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন এবং ১৯৪৬ সালে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৪৭ সালে শ্রীমেনন চীনে প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর তিনি কোরিয়া সম্পর্কে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১৬ই এপ্রিল হইতে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্ম্মসচিবের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি 'দিল্লী-চুংকিং ডায়ারি' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

এইরূপ মনোনয়ন আমরা সাধারণতঃ সমর্থন করি না। বেসরকারী রাজনীতিবিদেরা কি কেবল রাজ্যসমূহের গবর্ণররূপে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর নৈবেদ্যের মাথায় বাতাসার মত বিরাজ করিবেন? কে. পি. এস. মেননের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কোন কিছু বলিবার নাই, তাঁহার যোগ্যতা আছে অন্য দিকে। আমরা নীতির কথা বলিতেছি।

মার্কসীয় মতবাদ

মানুষ বা তাহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদ সম্বন্ধ সমাজ-সংগঠনের একমাত্র নিয়ামক, ইহাই বর্ত্তমান যুগের ষ্টালিনপন্থী কম্যুনিষ্টদের প্রচারের মূলমন্ত্র। কিন্তু কার্ল মার্কসের নিম্নলিখিত উক্তি তাহা সমর্থন করে না :

"মানুষ নিজের ইতিহাসের নির্মাতা, কিন্তু তারা একে যেমন খুশী তেমন করে নির্ম্মাণ করতে পারে না; তাদের নিজেদের দ্বারা নির্ব্বাচিত পারিবেশিক অবস্থার মধ্যে নয়, পরন্তু অতীতের কাছ থেকে পাওয়া, প্রদত্ত, এবং সংক্রমিত (transmitted) পারিবেশিক অবস্থার অধীনে তাহারা ইহাকে তৈয়ারী করে। সমস্ত মৃত 'পুরুষের' (generations) ঐতিহ্য জীবিত 'পুরুষে'র মস্তিকে 'নিশি'র (nightmare) মত চেপে থাকে এবং ঠিক যখন লোকেরা নিজেদের এবং (অন্যান্য) ব্যাপারের আমূল পরিবর্ত্তনের কাজে সম্পূর্ণ নূতন কিছু সৃষ্টি করার কাজে ব্যাপৃত বলে মনে হয়, বৈপ্লবিক সঙ্কটের সেই সব যুগেই তারা তাদের কাজে সাগ্রহে অতীতের ভূতগুলিকে ডেকে আনে এবং বিশ্ব ইতিহাসের নূতন দৃশ্যকে এই বহুকাল সম্মানিত ছদ্মবেশে এবং এই ধার-করা ভাষায় উপস্থাপিত করবার জন্য তাদের কাছ থেকে নাম, সংগ্রাম-'ধ্বনি' (slogans) এবং পরিচ্ছদ ধার করে।" (Eighteenth Brumaire).

গ্রাম্য জাগরণ ও কম্যুনিষ্ট

গত ১৫ই চৈত্র তারিখের 'হরিজন' (বাংলা) পত্রিকায় আচার্য্য বিনোবা ভাবের তেলেঙ্গানা পরিক্রমার নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার লেখক শ্রীদামোদর দাস মুংদড়া :

বিনোবা শ্রোতাদের শহর সম্বন্ধে সাবধান হইতে বলিলেন এবং পাছে ঐ সকল চতুর লোক তাঁহাকেও কাজে লাগায় সেই ভয়ে তিনি ভীত ছিলেন। কম্যুনিষ্টরা সেখানে থাকার দরুন যদিও মাঝে মাঝে গ্রাম্য জাগরণ ভুল পথে পরিচালিত হইতেছে তথাপি এইরূপ গ্রাম্য জাগরণ সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক। কম্যুনিষ্টদের উপস্থিতি জাগরণের সূচনা করিতেছে কিন্তু যে পন্থা তাহারা গ্রহণ করিয়াছে তাহা ক্ষতিকর। জাগ্রত কিন্তু ভুল পথে পরিচালিত এই সকল ভাইকে ঠিক পথে আনয়ন করা তাহাদের সংস্থার জ্ঞানী লোকদের কর্ত্তব্য।

প্রার্থনা-সভায় কোরাণের যে পদটি গীত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া বিনোবা এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করিলেন। ইহার অর্থ—"ভগবান তুমি আমাদের ঠিক পথে পরিচালিত কর।" কোরাণের "ঠিকপথ" হইতে কম্যুনিষ্টদের পথ ভিন্ন। যাহা হউক, লোকেরা জাগ্রত হইয়াছে, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও ঘুমাইয়া নাই দেখিয়া তিনি সুখী হইয়াছেন। কারণ লোকেরা জাগ্রত হইলে তাহাদের ঠিক পথ দেখাইতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না।

গ্রাম্য জাগরণ ভগবানের ইচ্ছার একটি প্রকাশ; শহর ইহা লক্ষ্য করিয়া সৎ উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহার সহিত নিজেদের ঠিকরূপ মানাইয়া লইবে। বিনোবা বলিলেন যে, শহর গ্রামের পরিশ্রমের ফল প্রচুর লাভ করিয়াছে। এখন তাহাদের গ্রামকে কিছু ফিরাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে। ভগবান এখন ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত

অশিক্ষিত সকলকে প্রেমের গ্রন্থির দ্বারা একসূত্রে গাঁথিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই কার্য্যে বিনোবা তাঁহার হৃদের একটি যন্ত্র মাত্র। তিনিই এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য বিনোবাকে এই ভূমিদান যজ্ঞের পথ দেখাইয়াছেন। যদি শহরের লোকেরা ইহার জন্য তাহাদের দান দেয় তবে কম্যুনিষ্টরা সত্বর পলায়ন করিবে এবং প্রেমের জয় হইবে। একটি অবিশ্র দোষ বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। কম্যুনিষ্টদের প্রভুত্ব বর্দ্ধিত হইতেছে ইহার কারণ তাহাদের মধ্যেও কিছু মঙ্গল নিহিত আছে। গরীবদের উন্নতি সাধন করিবার শুভ ইচ্ছা তাহাদের আছে। তাহাদের নিকট হইতে লোকের এই শিক্ষা লওয়া উচিত। যদি একবার তাহারা ইহা করিত তবে কম্যুনিষ্টরা ঐ কার্য্যে বিরত হইত।

বর্ত্তমান অসমতা যাহা সমাজকে কতকগুলি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছে তাহা হইতে শ্রোতাদের বিরত থাকিবার আদেশ দিয়া বিনোবা বলিলেন যে, জল যেমন সর্ব্বত্র সমতা রক্ষা করে সেইরূপ সমাজকেও সর্ব্বত্র সমতা রক্ষা করিতে হইবে। ইহা গর্ত্তকেও তাহার সমতাকে নষ্ট করিতে দিবে না। সমাজেরও সেইরূপ দেওয়া উচিত নহে। কবীর বলিয়াছেন, "জল যখন নৌকায় অথবা অর্থ যখন গৃহে জমা হয় তখন দুই হাত দিয়া তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।" নৌকাকে ভাসমান রাখিতে ও চালাইতে নীচে ও আশেপাশে জলের প্রয়োজন, কিন্তু ভিতরে নহে। একজনের বাড়ী সম্বন্ধেও ইহা সত্য। আমাদের অর্থের প্রয়োজন আছে কিন্তু বাড়ীর বাহিরে অর্থাৎ সমাজের জন্য ইহার প্রয়োজন।

তাঁহার ভাষণের শেষে বিনোবা কম্যুনিষ্টদের এই বলিয়া সাবধান করিলেন যে, যদি তাহারা হিংসার আশ্রয় লয় তবে ভারতবর্ষ বেশী দিনের জন্য তাহা সহ্য করিবে না। কারণ তাহার স্বভাবের কাছে হিংসার মোহ অপরিচিত। তিনি বলিলেন যে, তিনি নিজেকে গরীবদের একজন প্রতিনিধি বলিয়া মনে করেন। তিনি তেলেঙ্গানায় আসিয়াছেন এবং লোকেদের দুঃখ দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের প্রেমের পথ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছেন এবং লোকেরা তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেছে। কম্যুনিষ্টদেরও শিক্ষা লওয়া উচিত এবং কাজের জন্য তাহাকে অনুসরণ করা উচিত। তাহারা যদি এইরূপ করিত তবে তাহাদের কাজ ফলপ্রসূ হইত এবং ভারতের সর্ব্বত্র তাহা ছড়াইয়া পড়িত এই আশ্বাস তিনি তাহাদের দিতে পারেন।

এই ভাষণের পর ছাত্রদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য একজন তাঁহাকে একটি চিরকুট পাঠাইল। বিনোবা বলিলেন, ছাত্রদের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাহারা সমাজের নিকট হইতে শিক্ষার দান পায়। সুতরাং তাহারা অবশ্য সমাজের জন্য কাজ করিবে এবং ঋণ পরিশোধ করিবে।

প্রশ্ন ও উত্তর

মেদেরকোতায় বন্ধুরা ও কর্ম্মীরা বিনোবার সহিত যাহা আলোচনা করিয়াছিল তাহা হইতে কতকগুলি প্রধান প্রধান প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে দেওয়া হইল—

আইনের স্থান

প্রশ্ন : ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য কেন আপনি প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের কথা উত্থাপন করেন না ?

উত্তর : আমি আইনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। কিন্তু আইনে জনসাধারণের মত থাকা দরকার। অস্পৃশ্যতার পক্ষে জনসাধারণের মত থাকায় ইহার বিরুদ্ধে আইন-প্রণয়ন করা অসাধ্য হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আইন সর্ব্বত্র কাজ করিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, জাতিভেদ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ আইন দ্বারা বন্ধ করা যায় না।

কম্যুনিষ্টদের লক্ষ্য

প্রশ্ন : অর্থনৈতিক কারণ হইতে এখানে কম্যুনিষ্টদের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছে। ঐ সকল কারণ দূর করিলে আপনা হইতে এই আন্দোলন বন্ধ হইবে। এই ব্যাপারে কেবলমাত্র বক্তৃতা কি সাহায্য করিতে পারে ?

উত্তর : আমি তোমাদের মত সমর্থন করি না। আমি বিশ্বাস করি না যে, ভারতের কম্যুনিষ্টরা লোকদের দারিদ্র্যে অতি কাতর। সরকারের ধ্বংস সাধনই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি শস্য পুড়িয়া যায় তবে তাহারা অত্যন্ত প্রীত হয়, কারণ ইহাতে তাহারা সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইবার আরও একটি সুযোগ পায়। যদি লোকেদের সেবা করিবার ইচ্ছা তাহাদের থাকিত তবে তাহারা অন্যান্য অসংখ্য কার্য্যক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইতে পারিত। তেলেঙ্গানার লোকেরা অধিক পরিমাণে দেশী মদ্য "সিন্ধি"তে আসক্ত, এই কু-অভ্যাস দূর করিবার জন্য তাহারা কি কিছু করিতেছে ? আমি তাহাদের ভালরূপে চিনি। তাহারা এই স্থানে মাত্র আবদ্ধ নাই, ভারতের সর্ব্বত্র তাহারা ছড়াইয়া আছে। আমার বন্ধুদের মধ্যে আমি অনেককে কম্যুনিষ্ট বলি। তাহাদের প্রথম লক্ষ্য রাজনীতি এবং তাহার পরের লক্ষ্য অর্থনীতি। তাহাদের আন্দোলনের সমস্ত গাঁথুনি রাজনীতির ভিত্তিতে দণ্ডায়মান। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর তাহারা অর্থনৈতিক কাঠামোকে ঠিক করিতে চায়।

মিশর ও সুদানের বাদশাহ

গত ২১শে কার্ত্তিক মিশরের রাজা বা নবাব ফারুক উপরোক্ত উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। এই ঘোষণার মূল্য সাত মাসের মধ্যেও নিরূপিত হইল না।

এই ঘোষণার পরের দিন প্যারিস নগরীতে মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সালেহ্-উদ্দীন পাশা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে

গতানুগতিকতা ছাড়া কিছু নাই। ভবিষ্যতের নজির হিসাবে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :

"জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিশরের পররাষ্ট্র সচিব সালেহ্-উদ্দীন পাশা বলেন যে, সুদানে অবাধ গণভোট গ্রহণ সম্ভবপর করিয়া তোলার জন্য ব্রিটেনকে সুদান হইতে অফিসার ও সৈন্যদল অপসারণ করিতে হইবে।

সুদান হইতে ব্রিটিশ সৈন্য ও অফিসারদের অপসারণ করা হইলে মিশরও তথা হইতে স্বীয় সৈন্যদল ও অফিসারদের অপসারণ করিবে। অতঃপর জাতিসঙ্ঘের সহযোগিতায় গণ-ভোট গ্রহণের দ্বারা সুদানবাসীকে অবাধে মত প্রকাশের সুযোগ দান করিতে হইবে।

ব্রিটেন এই ধরণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে সাহসী হইবে না।

তিনি এই মর্ম্মে অভিযোগ করেন যে, মিত্রতার সম্পর্ক বজায় থাকার সময়ে ব্রিটিশ প্রকৃতপক্ষে মিশরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ব্রিটেন সুয়েজ খাল এলাকা সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিয়াছে। তথায় সামরিক আইন জারি করিয়াছে এবং এই এলাকাকে কার্য্যত: দেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।"

মিশরের ভিতরের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একটা অন্তর্বিপ্লবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "মুসলিম ব্রাদারহুড" যে "মুক্তি কৌজের" নেতৃত্ব করিতেছে তাহাদের সন্ত্রাসবাদী কার্য্য-কলাপে মিশরের গবর্ণমেণ্টও বিব্রত বোধ করিতেছেন। ২৯শে কার্ত্তিক আলেকজান্দ্রিয়ার স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিনায়ক "জেনারেল" আলি-অল্-মুরতাব গবর্ণমেণ্টের এই ফৌজের নিয়ন্ত্রণ-ভার গ্রহণ করিবার ঘোষণায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া এই মন্তব্য করেন—

"সরকারের এই নীতির তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারি না। যে ব্রিটিশ সৈন্যদল বেআইনী ভাবে আমাদের দেশকে দখল করিয়া রহিয়াছে তাহাদের বিতাড়িত করাই মুক্তি ফৌজের উদ্দেশ্য, সরকার কি তাহাদের কার্য্যকলাপ দমন করিতে চাহেন ?

জাতীয় মুক্তির জন্য গণ-আন্দোলনের পরিচালন ভার জন-সাধারণের উপরই ছাড়িয়া দিতে হইবে। জনসাধারণের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত 'গেরিলা' সংগ্রামের দ্বারাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, আয়ার্ল্যণ্ড এবং সম্প্রতি ফ্রান্স আজাদী লাভ করিয়াছে। সরকার যে সময়ে সৈন্যবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবেন, সেই সময়ে জন-সাধারণকে রক্তবিন্দু বিসর্জ্জন করিয়া আজাদী সংগ্রামে কর্ত্তব্য পালনের সুযোগ দান করা উচিত।

কোন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে বিষয়টি সম্পর্কে সরকার পুনর্ব্বিবেচনা করিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন। কারণ সরকারের উক্ত সঙ্কল্প অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

মিশরের সমস্যা লইয়া পাকিস্থানেরও ঘুম হয় না। সেই জন্য পাকিস্থানের রাজধানী করাচী নগরীতে মিশরীয় দূত আব্দুল ওয়াহাব আজম বে ২৪শে কার্ত্তিক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন। পাকিস্থান সম্পাদক-পরিষদের "পাঠচক্রে" বক্তৃতা প্রদান উপলক্ষে এই মন্তব্যগুলি করা হয় :

সুয়েজখাল বিরোধ হইতে মধ্যপ্রাচ্যে বিপ্লবের সূচনা হইতে পারে। পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের সাম্রাজ্যবাদী অভি-সন্ধির বিরুদ্ধে মোসলেম জাহান মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। মিশর এক্ষণে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য চুক্তি করিতেছে।

মিশরের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মিশর সরকার সাধ্যপক্ষে জনগণকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ইংরেজদের আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপের ফলে পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে।

মিশরের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে, মিশরীয়রা সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন কামনা করে। ব্রিটনরা যে মিশর হইতে বিতাড়িত হইবে এবং সুদান যে মিশরের সহিত মিলিত হইবে, ইহা এক্ষণে অবধারিত।

রুশ সমর্থন সম্পর্কে তিনি বলেন, গত মহাসমরে আমেরিকা ও রাশিয়া দুই দিক হইতে যেমন করিয়া জার্ম্মাণীকে আক্রমণ করিয়াছিল, তদ্রূপ দুইটি বিভিন্ন শিবিরও তাহাদের সাধারণ শত্রুকে আঘাতের পর আঘাত হানিতেছে। রাশিয়া মিশরের জীবনধারা গ্রহণ করে নাই, মিশরীয়রাও রাশিয়ার জীবনধারা গ্রহণে সম্মত হয় নাই। মিশরীয়রা তাদের জীবনধারা সম্পর্কে গর্ব্ববোধ করে। তথাপি মিশর কম্যুনিষ্ট বনিয়া যাইতে পারে।

সুদান নীল উপত্যকা একত্রীকরণের পক্ষে ভোট প্রদান করিবে। সুদানীরা মিশর ও সুদানের ঐক্য কামনা করে। সেই ভোট-যুদ্ধ এখনও দূরে আছে।

মালয় উপদ্বীপ

এই উপদ্বীপের আকার একখানি খড়্গের মতন। ১৯৪১ সনের পর তাহা ব্রিটিশের হাত হইতে জাপানীদের হাতে যায়—তার পর জাপানের পরাজয়ের পরে ব্রিটিশের হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তদবধি সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয়তা-বাদ, কম্যুনিজম বনাম জাতীয়তাবাদ, চীনা বনাম মালয়ী, মালয়ী বনাম ভারতবাসী—এই চতুঃশক্তির রণাঙ্গন হইয়াছে।

লোকসমষ্টির হিসাবে মালয়ীদের সংখ্যা ২৫ লক্ষ, চীনাদের সংখ্যা ২৫ লক্ষ; ভারতীয়দের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ হাজার, ইউরোপীয়ান ৩০ হাজার ও ইউরেশিয়ান ২০ হাজার। এই হিসাব ১৯৪৫ সনের। গত ৭ বৎসরে চীনা, মালয়ী, ভারত-

বাসীর সংখ্যা বাড়িয়াছে ; অশান্তি ও অরাজকতার জন্য শেষোক্ত দুই শ্রেণীর সংখ্যা কমিয়াছে।

এগনও হেইক নামক একজন লেখক বলিতেছেন, যে নূতন মালয় প্রস্তুত হইতেছে তাহা এই চারি জাতির সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিবে। এ আশা সার্থক হইবে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। চীনা ও ভারতীয়েরা সহজে কাহারও সঙ্গে মিশিয়া যায় না। ভারতীয়দের জাতিভেদ এক কারণ ; চীনাদের পারিবারিক ও গোষ্ঠীর বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। তার উপরে বর্তমানে মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে যে চীন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তার ফলে চীনাদের মেল বন্ধন আরও দৃঢ় হইবে। মালয় উপদ্বীপের ৩০ লক্ষ আদিম অধিবাসী এই অবস্থা বেশী দিন সহ্য করিবে না। সুতরাং ইংরেজের রবার বাগান, টিনের খনির কর্তৃত্ব ক্রমশঃই তাহাদের আয়ত্তে চলিয়া যাইবে। তখন এগনও হেইকের "ধর্মরাজ্য" স্থাপিত হইবে। তৎপূর্ব্বে কি আর এক ছোট কুরুক্ষেত্রের সূচনা দেখা যাইতেছে না ?

জাফরুল্লা খাঁকে বরখাস্তের দাবী

গত ২৪শে আষাঢ় রাত্রিতে অনুষ্ঠিত প্রায় ২৫ হাজার লোকের এক জনসভায় পাকিস্থানের পররাষ্ট্রসচিব মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁর 'বরখাস্ত' এবং কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে একটি "পৃথক অমুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ" সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণার দাবি করা হয়।

পূর্ব্ব পাকিস্থান জমাইৎ-উল-উলেমার সভাপতি মৌলানা আবদুল হামিদ বদাউনী সহ কয়েক জন উলেমা এই সভায় বক্তৃতা করেন। অন্যান্য সকলের সহিত পাকিস্থান পঞ্জাবের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মামদোতের খানও এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন।

কাদিয়ানি সম্প্রদায় একটি ছোট মুসলিম সম্প্রদায় এবং পাকিস্থানের পররাষ্ট্রসচিব মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ এই সম্প্রদায়েরই লোক। সম্প্রতি কাদিয়ানিদের বার্ষিক সম্মেলনে পাক-পররাষ্ট্রসচিবের বক্তৃতার সময় করাচীতে কাদিয়ানি ও অকাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছিল। মৌলানা আবদুল হামিদ বদাউনী সাহেব বাঙালী নন, তবুও তিনি পূর্ব্ববঙ্গের আলেম সম্প্রদায়ের নেতা। উপরোক্ত প্রস্তাবে ইসলামের "সাম্যবাদের" ভড়ং ফুটা হইয়া গিয়াছে।

শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য-সংসদ

শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য-সংসদের চতুর্দ্দশ বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা এই প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দন জানাইতেছি। এই সাহিত্য-সংসদে, তের বৎসর পূর্ব্বে দরিদ্রতার পরিবেশের মধ্যে জনাব নুরুল হক সাহেব তাঁহার জনকতক সাহিত্য-রসিককে লইয়া নীরবে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। তিনি রাজনৈতিক কলকোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া সংসদের পুস্তকাগারটি সংগঠিত ও 'আল ইস-লাহ' নামক মাসিক সাহিত্য-পত্রিকাখানি ধীর স্থিরভাবে সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিতে থাকেন এবং বিভিন্ন সময়ে এই সংসদের সাহিত্যসাধনালব্ধ কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। স্বর্গগত কবি রজাকের 'পথ-সন্ধানী', 'জীবন গাঙের মাইয়া' প্রভৃতি উহাদের অন্যতম। এই পুস্তকাগারটি এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান পুস্তকাগারের গৌরব দাবি করিতে পারে। "আল ইস-লাহ" এখনও চলিতেছে। ইহার সম্পাদক শ্রীহট্ট সুনামগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক আকতার আলী।

সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খাঁ

এই মহাপুরুষ আজ পাঁচ বৎসর হইতে পাকিস্থানের শাসকবর্গ দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হইতেছেন। দুই-তিন মাস পূর্ব্বে কারাবাসের অত্যাচারে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। এখনও বিপদ কাটে নাই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পূর্ব্বের সহকর্ম্মীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া পাকিস্থানীদের প্রীতি অর্জ্জন করেন নাই এবং ভারতব্যাপী "খোদাই খেদমৎ" দিবস বা সপ্তাহ পালন করিয়া ব্যাপার আরও জটিল করা হইতেছে।

ভারতরাষ্ট্রের কর্ত্তব্য কি তৎসম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। পাকিস্থানের সঙ্গে কখনও যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইবে, সেই ভরসা ক্রমশঃ তিমিত হইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ভারতরাষ্ট্রের আইন বিভাগীয় মন্ত্রী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষক শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস গত ৫ই আষাঢ় যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাও আশাপ্রদ নয়। পাকিস্থান কখনও তাহার চুক্তি পালন করিবে না—ইহাই তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্মার্থ। এই বাগ্‌বিতণ্ডার শেষ আমরা দেখিতে পাইব না।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মিঃ উইলিয়ম বার্টন তাঁহার "নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, গফুর খাঁর অহিংসাবাদ তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তিনি গান্ধীজীর নিকট হইতে ধার করেন নাই। কোরাণের নির্দ্দেশ তাঁহাকে এই বিশ্বাসে উপনীত হইতে সাহায্য করিয়াছে। শ্রীসুকুমার রায় প্রণীত "সীমান্ত গান্ধী ও খোদাই খেদমৎগার আন্দোলনের ইতিহাসে" এই উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে :

অহিংসাবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের পিছনে পাঠান সমাজের প্রয়োজনের একটা তাগিদ ছিল। বংশানুক্রমিক যুদ্ধ, পরস্পরের মধ্যে খুনোখুনি দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। কত পরিবার ইহার ফলে ধ্বংস হইয়াছিল তাহার হিসাব নাই। এই দোষের সুযোগ বিদেশী শাসকবর্গ পূর্ণভাবে লইয়াছেন। পাঠানের বীরত্বের প্রশংসায় তাঁহারা পঞ্চমুখ ছিলেন এবং "খাসাদার" প্রভৃতি কর্ম্মে নিয়োগে তাঁহারা পাঠানদের একাংশকে হাত করিয়াছিলেন। বৎসরে প্রায় দুই কোটি টাকা এতদর্থে ব্যয় হইত। এখন পাঠানদের দমন করিবার জন্য পাকিস্থান সরকারও রীতিমত সৈন্যবাহিনী পুষিতেছেন।

ইংরেজের নীতি তাহারা পালন করিতেছে। ব্রিটিশ মেমোরেন অফিসলেক ও শ্রেণি ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে বা কার্পেট প্রভৃতির ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। ক্লাইভের সময়ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহা করিত। তারপর বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হইল।

বোম্বাইয়ে বিকলাঙ্গ শিশুদের চিকিৎসালয়

"বিকলাঙ্গ শিশুদের চিকিৎসার জন্যে বোম্বাই নগরীর হাজি আলি পার্কে একটি সুন্দর হাসপাতাল আছে। পোলিয়ো-মাইলিটিস, অষ্টিওমাইলিটিস, সাময়িক পক্ষাঘাত অথবা অস্থিতে যক্ষারোগে যে সব শিশু ভুগছে, যে সব শিশু জন্মগত বিকলাঙ্গ কিংবা কোনও রকম দুর্ঘটনার ফলে যাদের অঙ্গ হানি ঘটেছে এই রকম শিশুরোগীদের জন্যেই এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শিশু চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরাই এই হাসপাতালের রোগীদের পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করে থাকেন। বিজ্ঞানসম্মত শরীর-মর্দন-প্রক্রিয়া এই জাতীয় রোগ নিরাময়ে বিশেষ সহায়ক বলে এই প্রক্রিয়ার বিশেষজ্ঞ লোকদেরও রাখা হয়েছে হাস-পাতালে; এঁরা যুদ্ধের সময়ে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন। হাসপাতালে একটি সুসজ্জিত অস্ত্রাগার আছে এবং হাসপাতালে নিযুক্ত ডাক্তার ও নার্সদের থাকবার ব্যবস্থাও হয়েছে সংলগ্ন আর একটি বাড়ীতে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই জাতীয় শিশুরোগের চিকিৎসার যে রকম ব্যবস্থাদি দেখতে পাওয়া যায়, সে সবই এই হাস-পাতালটিতে আছে। বিকলাঙ্গ শিশুদের ব্যবহারের জন্যে যে সব যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়ে থাকে সে সবই তৈরি করা হয় স্থানীয় কারিগরদের দিয়ে এবং তুলনায় সেগুলি কোনও দেশের থেকে নিকৃষ্ট নয়। বিকলাঙ্গ শিশুদের আধুনিকতম চিকিৎসাপদ্ধতি অর্থাৎ জল-চিকিৎসা, আলো-চিকিৎসা, অঙ্গমর্দন এবং নানারকম পদ্ধতিতে শরীর সঞ্চালন ইত্যাদি সবই এখানে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

শরীরের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মনের দিকে লক্ষ্য রাখাও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার একটি অঙ্গ। এই হাসপাতালটিতে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সুন্দর সুন্দর রঙীন ছবি আর চার্ট দিয়ে সাজান একটি স্কুলঘর এখানে আছে এবং সুশিক্ষিত শিক্ষকও একজন সেখানে আছেন। মাঝে মাঝে শিশুরোগীদের জন্যে পার্টি, সিনেমা-শো এবং এখানে-সেখানে বেড়ানর ব্যবস্থাও করা হয়, যাতে মনমরা না হয়ে আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিশুরোগীরা সহজে সেরে উঠতে পারে।

এই হাসপাতালে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই চিকিৎসার জন্যে গ্রহণ করা হয়। প্রধানতঃ দুঃস্থ ও মধ্যবিত্তদের শিশুদের জন্যে স্থাপিত হলেও ধনীদের সন্তানদেরও এখানে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। অভিভাবকের সঙ্গতি অনুযায়ীই শিশুদের চিকিৎসার খরচ দিতে হয়।

বোম্বাইয়ের এই বিকলাঙ্গ শিশু চিকিৎসালয় ও হাস-পাতালটির প্রতিষ্ঠাত্রী হলেন মিসেস কমো ইসমাইল। সমাজ সেবিকারূপে বোম্বাই এবং অন্যত্রও তাঁর প্রসিদ্ধি যথেষ্ট। বোম্বাই শহরেই তাঁর জন্ম এবং সেখানে শিক্ষালাভের পর তিনি ভিয়েনাতে যান চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করতে।

বিকলাঙ্গ শিশু বা ব্যক্তি যে কোন রাষ্ট্রের পরিচালক পর্য্যন্ত হতে পারেন, তার প্রমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের কল্যাণে এরূপ আরোগ্য সহজ হইয়া পড়িয়াছে। সকল দেশেই এরূপ চিকিৎসার আয়োজন আছে এবং তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।"

নারী-চক্রের প্রতিষ্ঠা দিবস-উৎসব

ইটালী নারী-চক্রের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ কুমারী বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। নারী-চক্রের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া রেণুরেণু দাস একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ক্যাপ্টেন নরেন দত্তের সহধর্মিণীর উদ্যোগে অল্প কয়জন মহিলাকে লইয়া এই সমিতিটি প্রথম স্থাপিত হয়। বর্তমানে ইহার কর্মক্ষেত্র ইটালী ছাড়াইয়াও বিস্তৃত হইয়াছে। মহিলাদের শিল্পকার্য্যে শিক্ষা দেওয়া, পড়াশুনায় সাহায্য করা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক চর্চ্চা করার কাজে সমিতি লিপ্ত আছে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে নারীদের এই অগ্রগতির প্রশংসা করিয়াও অতীতকে না ভুলিবার পরামর্শই দেন। আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতিও শ্রদ্ধা পোষণ করিতে—রামায়ণ ও মহাভারত প্রত্যেককেই পাঠ করিতে অনুরোধ জানান।

আজ পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত নারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিস্তৃত হইয়াছে। তাহাদের প্রয়োজন আছে বলিয়াই যুগের তাগিদে এগুলি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই জাগরণের পিছনে কয়েকজন বাঙালী নারীর সক্রিয় যোগ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা নাই তুলিলাম। বিংশতাব্দীর প্রথম দশক হইতে উচ্চ শিক্ষার রাজ্যে ৺সরলা রায় (মিসেস পি. কে. রায়) যাহা করিয়াছেন "গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজ" তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার সহোদরা অবলা বসু (আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী) ও সরোজনলিনী দত্তের নাম শিল্পশিক্ষার জন্য স্মরণীয়।

এইরূপ প্রচেষ্টার সাফল্য আমরা কামনা করি।

সমাজ-সংস্কার

"বাঁকুড়া জিলি সমাজ উন্নয়ন সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমহা-দেব দে এক পত্রে জানাচ্ছেন, বাঁকুড়া মেদিনীপুর জিলি সমাজের যুবগণপ্রমুখ গত চৈত্র মাসে এক সভায় মিলিত হয়ে তাঁদের সমাজের পণ-প্রথা সমূলে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত করেন।

একজন্মবাসী এই অঞ্চলের তিলি সমাজে যে সমস্ত বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হয়েছে, কোথাও কেহই বরপণ গ্রহণ করেন নাই। বিবাহগুলিতে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই ৫০০৲ টাকার মধ্যে সর্ব্ববিধ ব্যয় নিষ্পন্ন হয়েছে। তিলি সমাজের এই প্রচেষ্টার জন্ত আমরা এই সমাজের মুখপাত্রদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। হিন্দু সমাজে পণপ্রথা যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তাতে পণপ্রথা সমূলে উচ্ছেদ করা না হলে হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো অদূর ভবিষ্যতেই ভেঙে পড়বে। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের তিলি সমাজ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, হিন্দু জাতির অন্যান্য সমাজগুলির পক্ষে তা অনুকরণীয়। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক সমাজের মুখপাত্রগণ চেষ্টা করলে নিজ নিজ সমাজের ভিতর অনায়াসে পণপ্রথা উচ্ছেদ করতে পারেন।"

বাঁকুড়ার "হিন্দুবাণী" পত্রিকার ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় উপরোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা উচিত। পণপ্রথাই হিন্দু সমাজদেহে একমাত্র ক্ষত নয়। শত শত শ্রেণীতে বিভক্ত হিন্দু সমাজকে সংহত করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে চেষ্টা চলিতেছে। তাহা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই।

নিরক্ষর শিক্ষা

গত অগ্রহায়ণ মাসের "শিক্ষা" (মাসিক) পত্রিকায় শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ উপরোক্ত শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের শিরোনামা কি বাংলা ব্যাকরণসম্মত? প্রবন্ধ-লেখক আক্ষরিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব অর্পণ করেন নাই; করিয়াছেন আচরণ শিক্ষার উপর।

এই শিক্ষা দান কে করিবেন? "এ ত ঘরের ব্যাপার। শিক্ষক ত আক্ষরিক শিক্ষার বণিক। এ কাজ জননীর, গৃহকর্ত্রীর।"

"মায়েরা যেমন সন্তানের প্রসূতি, মায়েরা তেমন সমাজেরও ধাত্রী। সমাজের ভালমন্দ রূপ দেওয়া তাহাদের হাতে। শাবকের হানিভয়ে শঙ্কিত সিংহিনী যেমন শাবক রক্ষাকল্পে ব্যাকুল হয়, হিংস্রমূর্ত্তি ধারণ করে, প্রয়োজন হইলে গৃহকর্তার বিরুদ্ধে গৃহকর্ত্রীকে সন্তান ও সমাজের হিতকল্পে সিংহিনীর মত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে। মাতারা যদি এই দিকে মন দেন, এই দায় বহন করেন, তবে দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের সন্তানেরা শতে সহস্রে অনক্ষর শিক্ষার জনম শিক্ষক-রূপে পথে-ঘাটে বিচরণ করিবেন আর অচিরে জাতি ত্রুটিমুক্ত হইয়া জগতের কাছে সম্মানলাভ করিবে। এই মহান দায় ও গৌরব মাতাদেরই।"

চিন্তার দৈন্য

গত [১৭ই] আষাঢ় তারিখের "বঙ্গবাণী" (আসানসোল) পত্রিকায় আমাদের সমাজ-জীবনে চিন্তার দৈন্য সম্বন্ধে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে:

"আমাদিগের জীবনে দৈন্য আজ নানা দিকে। চিন্তার দৈন্যের জন্য কেহ কেহ উদরকেই দায়ী করেন। পেট পুরিয়া খাইতে পরিতে পাই না, চিন্তা আসিবে কোথা হইতে? কথাটা হয়ত আংশিক সত্য হইতে পারে। কিন্তু তেঁতুল পাতার ঝোল খাওয়া বাংলার রামনাথকে দেখিয়া একথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ঊনবিংশ শতক চিন্তার দিক দিয়া বাংলার স্বর্ণযুগ। বাংলার বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাবীরগণ এই যুগেই জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু "রূপার ঝিনুক" মুখে করিয়া আসিয়াছিলেন কয় জন? কথা উহা নহে; এই চিন্তার দৈন্যও হইতেছে আমাদিগের চারিত্রিক অধঃপতনের আর একটা দিক। আজ আমরা অত্যন্ত বহির্মুখী; অন্তর্মুখী হইয়া দুই দণ্ড সুসংবদ্ধ প্রণালীতে চিন্তা করিব এমন শক্তি এবং ধৈর্য্যও যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি। সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, সভাসমিতি, স্লোগান এবং সংবাদপত্র সকল সময়েই আমাদিগকে বাহিরে টানিতেছে। তাহারাই রেডিমেড (Ready made) চিন্তা ও সিদ্ধান্ত (Conclusion) আমাদিগের সম্মুখে ধরিতেছে। আমরা নির্ব্বিচারে তাহাই গ্রহণ করিতেছি। ফলে গভীরভাবে চিন্তা করা আমাদিগের অভ্যাসের বাহিরে দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থা সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। নহিলে দেশের যুবশক্তির নিকট বড় কিছু আমরা প্রত্যাশা করিতে পারিব না।"

উপরোক্ত বাক্যগুলি সত্য। কিন্তু চিন্তার দৈন্য আমাদের এখনও একেবারে দেউলিয়া করিতে পারে নাই। "আমরা নিষ্প্রাণ না হইবার দৃঢ় পণ করিলাম"—ইহাই বাংলা তথা ভারতের জপমন্ত্র হওয়া উচিত।

উড়িষ্যার বাহ্য পরিচয়

উড়িষ্যা গবর্মেণ্ট প্রচার বিভাগ 'নব-কলেবর স্মরণী ও উড়িষ্যা পরিচিতি" নামক একখানি ৪৫ পৃষ্ঠার পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। পুরীবাসী এক জন বন্ধুর নিকট তাহা পাইয়াছি।

উড়িষ্যার আয়তন ৫৯,৩১৮ বর্গমাইল। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিগুণ; লোকসংখ্যা ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬৮ হাজার (১৯৪১ আদমসুমারী)। পশ্চিমবঙ্গের অর্দ্ধেকের কিঞ্চিদধিক। শহরের সংখ্যা মাত্র ৩০টি। রাজধানী কটক জেলার লোকসংখ্যা ২৪ লক্ষ ৪৯ হাজার। পুরী জেলার লোকসংখ্যা ১৪ লক্ষ ৫৬ হাজার। বালেশ্বর জেলার ১১ লক্ষ ১৬ হাজার; সম্বলপুর জেলার ১২ লক্ষ ২৫ হাজার; গঞ্জাম জেলার (ব্রহ্মপুর) ১৫ লক্ষ ৬১ হাজার; কোরাপুট জেলার ১১ লক্ষ ২৮ হাজার; ময়ূরভঞ্জ ৮ লক্ষ ৫৫ হাজার। ২৩ পৃষ্ঠা হইতে ৩৩ পৃষ্ঠায় উড়িষ্যার "প্রাচীন" গৌরবের বিবরণ আছে। ২৭ পৃষ্ঠায় একটা তর্কের বিষয় দেওয়া হইয়াছে। "রাজা প্রতাপ-রুদ্র ও তাঁহার সুদক্ষ মন্ত্রী রামানন্দ রায় উড়িষ্যার বৈষ্ণব ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠধর্ম্মে পরিণত করেন, এবং এই গজপতি রাজাদের সুপ্রতিষ্ঠিত উৎকল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেন।" "সুদক্ষ মন্ত্রী" কি বুঝিয়া ও ভাবিয়া এই ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া জাতীয় ধ্বংসের পথ সুপ্রশস্ত করিয়াছিলেন জানি না।

শাহজাদা দারাশুকো

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

ভ্রাতৃ-বিরোধের পূর্ব্বাভাস

চতুর্থ অধ্যায়*

১

১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৮শে মে। আগ্রা দুর্গের পাদচুম্বিনী ক্ষীণতোয়া যমুনার প্রশস্ত বালুকা-সৈকতে নগরীর উৎসুক জনতার বিপুল সমাবেশ ও অস্ফুট উল্লাসগুঞ্জন। অশ্বপৃষ্ঠে স্বয়ং সম্রাট শাহজাহান কুমার দারা, শুজা, আওরঙ্গজেব, কচ্ছবাহপতি মীর্জা রাজা জয়সিংহ প্রমুখ সেনানীমণ্ডল পরিবেষ্টিত হইয়া দুর্গপ্রাচীরের ছায়ায় স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। দলিল না থাকিলেও অনুমান হয়, বাদশাহের অনুপস্থিতিতে অন্তঃপুরচারিণীগণ অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া অন্তরালে ছিলেন না; শাহীমহলের পূর্ব্ব দিকের অলিন্দ হইতে মর্মর জালমার্গ-বিচ্ছুরিত কান্তা-মুখশ্রী নিম্নস্থ রঙ্গভূমিকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

যথাসময়ে চলমান পর্ব্বতসদৃশ সুধাকর এবং সুরতসুন্দর নামক হস্তিযুগল শাহী দর্শনঝরোকার নীচে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিছুক্ষণ শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি করিয়া মত্ত মাতঙ্গদ্বয় কিঞ্চিৎ পিছনে হটিয়া গেল, জনসমুদ্র চঞ্চল তরঙ্গায়িত, সর্ব্বত্র প্রবল উত্তেজনা। অজাতশ্মশ্রু কুমার আওরঙ্গজেব যুদ্ধের দ্বিতীয় দফা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ঘোড়া দাবাইয়া সুধাকর হাতীর খুব নিকটে আসিলেন। ক্রোধান্ধ সুধাকর সুরতসুন্দরকে সামনে না পাইয়া শাহজাদার উপর হামলা করিল, চারিদিকে হায় হায় পড়িয়া গেল। সোরগোল চীৎকার ও আতসবাজীর আগুন উপেক্ষা করিয়া সুধাকর আওরঙ্গজেবের ঘোড়াকে ধরিবার উপক্রম করিল। ষোল বৎসর বয়সেই কুমার পাকা সওয়ার; ঘোড়া সামলাইয়া তিনি হাতীকে বর্শা ছুঁড়িয়া মারিলেন। হাতী হার না মানিয়া ঘোড়াকে শুঁড়ে জড়াইয়া ধরিতেই কুমার ভূমিতে লাফাইয়া পড়িয়া খোলা তলোয়ার হাতে রুখিয়া দাঁড়াইলেন। পলায়মান ছত্রভঙ্গ জনতার ভিড় ঠেলিয়া সম্রাট কিংবা অন্য কেহ সহসা সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই সময় কুমার শুজা এবং মীর্জা রাজা জয়সিংহ দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া সুধাকরের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে সৌভাগ্যক্রমে সুরতসুন্দর পুনরায় যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। মানুষ ও প্রতিস্পর্দ্ধী সুরতসুন্দরের সহিত একাকী যুদ্ধে ভরসা না পাইয়া সুধাকর শুঁড় তুলিয়া ছুটিয়া পলাইল। শাহজাদা রক্ষা পাইলেন;—গরীবের খবর ইতিহাসে নাই।

এই বাহাদুরীর জন্য সম্রাট ঐদিন আওরঙ্গজেবকে "বাহাদুর" উপাধি ও বহুমূল্য উপহার প্রদান করিলেন; সারাদিন তাঁহাকে কাছছাড়া করেন নাই। আওরঙ্গজেবের অসীম সৌভাগ্যে ভ্রাতাদের মন সেদিন ঈর্ষায় ব্যথিত হইয়াছিল, কিংবা পিতার প্রিয়তম পুত্র দারার মুখে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছিল—এমন কথা ইতিহাসে লেখা নাই; তবুও আওরঙ্গজেব সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বাপকে শুনাইয়া দিলেন—খোদাতালার হাতে মানুষের জান্; আমি শুধু ভাইসাহেবদের আচরণে ব্যথিত ও লজ্জিত। তাঁহার শ্লেষের একমাত্র লক্ষ্য দারা; ইহা দারার প্রতি তাঁহার জন্মগত বিদ্বেষ ও ঈর্ষার ভাবী অমঙ্গলসূচক ঝাঁজ, সর্পশিশুর প্রথম বিষোদ্গার, শাহজাহানের আশঙ্কা আওরঙ্গজেবের পরবর্ত্তী আচরণে আরও ঘনাইয়া উঠিল।

২

জাহানারা বেগমের ঠিক বার মাস পরে কুমার দারা এবং কন্যা রোশনারার জন্মের চৌদ্দ মাস পরে (২৪শে আগষ্ট ১৬১৭) আওরঙ্গজেব ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে জাহানারা-দারা এবং রোশনারা-আওরঙ্গজেবের ন্যায় পাল্টা জুড়ি ইতিহাসে বড় বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। লোকের ধারণা ছিল শাহজাহান জাহানারা-দারাকে এক মাপে এবং রোশনারা-আওরঙ্গজেবকে অন্য মাপে ভালবাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন। শাহী পরিবারে এই "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" ব্যাপার গতানুগতিক কিংবা অস্বাভাবিক নহে; কারণ জাহানারা এবং দারার স্বভাব ও জীবনাদর্শের যে রকম মিল দেখা যায়, রোশনারা এবং আওরঙ্গজেবের স্বার্থবুদ্ধি ও চরিত্রে তদ্রূপ সামঞ্জস্য ছিল। দারা এবং আওরঙ্গজেব শাহজাহান-চরিত্রের এপিঠ ওপিঠ; •এইজন্য তিনি পুত্রদ্বয়কে লইয়া টোটানা স্রোতে পড়িয়াছিলেন। শাহজাহানের সংসারে এই সন্তান চতুষ্টয়কে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধি এবং লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর যুগপৎ সমাবেশ যেন একটি সুপরিকল্পিত বিয়োগান্ত নাটকের ভূমিকা।

মাতা মমতাজমহলের মৃত্যুর পর জাহানারা বেগম

---

* প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ—১৩৫৩ সংখ্যায় পূর্ব্ব তিনটি অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সমস্ত ভ্রাতা-ভগিনীগণকে স্নেহের সমান অংশই দিয়াছিলেন, চরিত্রগুণে এবং নিত্য সাহচর্য্যের জন্য হয়ত দারার প্রতি টান একটু বেশী ছিল। তিনি দারার ইষ্ট কামনা করিলেও অন্য কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিতেন না; সকলের নালিশ এবং পিতার কাছে সুপারিশ করিবার তাগিদ তাঁহার নিকটেই আসিত। আওরঙ্গজেব ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে একমাত্র জাহানারাকে শ্রদ্ধা করিতেন, কিঞ্চিৎ বিশ্বাসও করিতেন।

জাহানারা সাম্রাজ্যের সর্ব্বপুজ্যা "বেগম সাহেবা"। অন্দরমহলে এবং দরবারের আড়ালে শাহী তক্তের ছায়ায়, পুত্রী হইয়াও তিনি সম্রাটের মাতার মর্য্যাদা ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। গোলকুণ্ডা-বিজাপুরের রাজদূত, অর্থী-প্রত্যর্থী ও অভিজাতবর্গ 'বেগম সাহেবা'র দরবারে কুর্ণিশ করিতে আসিতেন, অভাব-অভিযোগ জানাইতেন। সেকালেও ঘুষ, নজর, তদ্বির এবং সুপারিশ ব্যতীত কাজ হাসিল হইত না। লোকে মনে করিত, বাদশাহের মন্জির চাবিকাঠি উজীর সাদুল্লার হাতে নয়, দারা ও জাহানারার হেফাজতে। রোশনারা বেগম জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সৌভাগ্যে হিংসায় জ্বলিয়া উঠিলেন; কিন্তু পিতা ও শাহজাদা দারা বাঁচিয়া থাকিতে জাহানারাকে স্থানচ্যুত করা দুঃসাধ্য, এইজন্যই আওরঙ্গজেব ও তাঁহার ভাগ্য একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িল।

আওরঙ্গজেব, শুজা, মোরাদ—কেহই জাহানারার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না; তাঁহারা অভিমান করিতেন, অনিষ্ট কিংবা প্রতিহিংসার চেষ্টা করেন নাই। ইহার কারণ, জাহানারা কাহারও ন্যায্য দাবি এবং অধিকারের বিরোধিতা করেন নাই। দারার প্রতি তাঁহার অন্তরের টান কোন ইহলৌকিক স্বার্থদুষ্ট ছিল না। রোশনারা জাহানারাকে ঈর্ষা নয়, দস্তুরমত হিংসা করিতেন। নারীর দুর্দ্দমনীয় ক্ষমতাস্পৃহা অতি প্রলয়ঙ্করী, ক্ষমতার নেশা শরাবের নেশা হইতে শত গুণ মারাত্মক। মুসলমান ইতিহাসে নারী-চরিত্রের উল্টা পিঠ দেখিতে গেলে রক্ত জমাট হইয়া যায়,—যেমন আবু সুফিয়ানের পত্নী এবং মাবিয়ার মাতা "হিন্দা" প্রথম যৌবনে প্রেম প্রত্যাখ্যানের প্রতিহিংসা পূর্ণ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে শাহিদ হজরত মহম্মদের খুল্লতাত বৃদ্ধ হামজার কলিজা চর্ব্বণ করিয়াছিলেন। হারুণ-অল-রশিদের মাতা খাইজুরান্ স্বামীকে ভেড়া বানাইয়া সাম্রাজ্য শাসন করিতেন; পুত্র হাদি খলিফা হইয়া মাতাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছিলেন—এই দোষে হাদিকে তিনি দাসীগণের দ্বারা হত্যা করাইয়া হারুণকে খলিফা করিয়াছিলেন। শাহজাহানের কন্যা রোশনারা এই জাতীয় স্ত্রী-চরিত্র, মূর্ত্তিমতী অসূয়া ও লালসা-জড়িত বিজীগিষা।

৩

পুণ্যশীলা জাহানারা বেগম মহিমময়ী নারী,—সম্রাট পরিবারের পারিজাত-প্রসূন। রোশনারা অশিব শ্মশান-কুসুম, পঙ্কিল সরোবরে নলিনী নহেন; জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী ধর্ম্ম ও জ্ঞান চর্চ্চায়, ত্যাগ ও সেবায় জীবন-মরুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন। রোশনারার ভোগমুখী চিত্তবৃত্তি অনীপ্সিত কৌমার্য্যে ব্যাহত হইয়া বিপ্লব ও ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে তৃপ্তি খুঁজিতেছিল। তত্ত্ববাদিনী হইয়াও জাহানারা দারার মত শরিয়তের অনুশাসন লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি রোজা-নমাজে নিষ্ঠাবতী ছিলেন, অবসর সময়ে ধ্যানধারণা করিতেন, কিংবা গ্রন্থ রচনা করিতেন। যথা খাজা মুইনুদ্দীন চিশতীর ফারসি জীবন-চরিত *Munis-ul Aruwah* (comforter of souls) দ্রষ্টব্য। এইরূপ খেয়ালে সময় নষ্ট করিবার ফুরসত চঞ্চলা রোশনারার ছিল না। দারা সম্রাট হইলে পিতার অবর্ত্তমানেও জাহানারা কর্ত্তৃত্ব করিবেন—এই দুশ্চিন্তা রোশনারাকে নিরন্তর দগ্ধ করিত। বিধাতার তথা পিতার সঙ্কল্প বিফল করিবেন,—ইহাই যেন তাঁহার দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা। এইজন্য সমস্বার্থে আবদ্ধ সমানধর্মী ভ্রাতা আওরঙ্গজেব রোশনারার নির্ব্বাচিত ভাবী দিল্লীশ্বর। রোশনারা শাহীমহলের সংবাদ নিয়মিত ভাবে গুপ্তচরের মারফত বাহিরে প্রেরণ করিতেন, ষড়যন্ত্রের জাল বুনিতেন।

ইতিহাসে রোশনারা দুই বার ছিন্নমস্তা রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন; প্রথম বার বন্দী ভ্রাতা দারার বিচার-প্রহসনের সময়, দ্বিতীয় বার আওরঙ্গজেবের রোগশয্যায়। সম্রাট একবার ৪৪ দিন শয্যাশায়ী ছিলেন (১২ই মে হইতে ২৪শে জুন ১৬৬২)। রোগের সঙ্কট-সময়ে তাঁহার জীবনের আশা সকলেই ত্যাগ করিয়াছিল, তখন সম্রাটের প্রকোষ্ঠে নূতন "বেগম সাহেবা" রোশনারার কড়া পাহারা, স্ত্রীপুত্রগণের পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। এক দিন সম্রাটের অন্যতমা পত্নী নবাববাঈ মরিয়া হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া মুমূর্ষু স্বামীর বিছানার উপর আলুথালু বেশে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; রোশনারা চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হতভাগিনীকে চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে ঘরের বাহির করিয়া দিলেন।

আরোগ্যের পর চতুর আওরঙ্গজেবের বুঝিতে বিলম্ব হইল না ভগ্নী তাঁহার পরেও নিজের ভবিষ্যৎ রচনা করিতেছেন। রোশনারার স্বপ্ন টুটিয়া গেল; সম্রাটের কন্যা

জেবউন্নিসা অন্দরমহলে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। নিজের জন্য উদ্যান-পরিবেষ্টিত সুরম্য সমাধি (বর্ত্তমান রোশনারাবাগ) প্রস্তুত ব্যতীত রোশনারার অন্য প্রয়োজন ফুরাইয়া গেল।

৪

শাহজাহান দুঃখ করিতেন, পুত্র আওরঙ্গজেব বুদ্ধিমান ও বাহাদুর বটে, তবে বড় রোগা ; কিন্তু পুত্রের রোগের কারণ তিনি বুঝিয়াও বুঝিলেন না। পেটে কুবুদ্ধির ভুট-ভাট, মগজে কূটনীতির দাবাখেলা অষ্টপ্রহর চলিতে থাকিলে হেকেমী চূরণে শুকয়াও হজম হয় না। কোনকালে আওরঙ্গজেবের প্রাণে শান্তি ও তৃপ্তি এবং চিত্তে প্রফুল্লতা ছিল না। কৃতকার্য্যতার প্রশংসায় তাঁহার মুখ কঠোর ও গম্ভীর হইয়া উঠিত, কেহ তাঁহার নিন্দা করিয়াছে শুনিলে কিংবা পরের অনিষ্ট-সংবাদ পাইলে কদাচিৎ মুচকি হাসিতেন। শাহজাহান তাঁহার প্রিয়তম পুত্র দারাকে অনেককিছু দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন কিছু না পাইলেও এই পুত্র তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না ; কিন্তু আওরঙ্গজেব ? দারাকে বঞ্চিত করিয়া শাহজাহান যদি স্বহস্তে রাজমুকুট আওরঙ্গজেবের মাথায় পরাইয়া দিতেন তবুও তাঁহার দুশ্চিন্তার অবসান হইত না ; বিনা দ্বিধায় হয়ত পিতাকে বলিতেন, "বাপজান্! আপনি এখন মক্কা শরীফে বাস করিলে সুবিধা হয় ; জাহানারা বেগম আগ্রায় থাকিয়া যাইতে পারেন।"

শাহজাদাগণের মধ্যে শুজা সর্ব্বপ্রথমে মনসব পাইয়াছিলেন এবং আওরঙ্গজেব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে কর্ত্তৃত্ব ও সুবাদারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব বুন্দেলা বিদ্রোহ দমন করেন। ইহার পর তিনি আট বৎসর দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া (১৬৩৬—১৬৪৪ খ্রীঃ) বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের সহিত যুদ্ধে অসীম কৃতিত্ব দেখান। ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ রাত্রিতে সিঁড়ির উপর মোমবাতির শিখায় অনবধানতাবশতঃ জাহানারা বেগমের কাপড়ে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া তিনি মরণাপন্ন হইলেন। ভগ্নীকে দেখিবার জন্য আওরঙ্গজেব ২রা মে আগ্রা পৌঁছিলেন। ইহার তিন সপ্তাহ পরে এমন কিছু ঘটিয়াছিল যাহার জন্য তিনি হঠাৎ তাঁহার সুবাদারী হইতে বরখাস্ত হইলেন এবং মনসব পর্য্যন্ত হারাইলেন। মনের দুঃখে আওরঙ্গজেব ফকীর হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু শাহজাহানের কঠোর মনোভাব অনমনীয় রহিল। ইতিমধ্যে জাহানারা বেগম আরোগ্যলাভ করিলেন। তিনি সম্রাটের কাছে আওরঙ্গজেবের অপরাধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করেন। কন্যাকে অদেয় কিছু শাহজাহানের ছিল না, আওরঙ্গজেব গুজরাটের সুবাদারী এবং নিজের পূর্ব্ব মনসব ফিরিয়া পাইলেন।

দাক্ষিণাত্য হইতে একটা বড় রকমের মতলব আঁটিয়া আওরঙ্গজেব আগ্রায় আসিয়াছিলেন। পিতার সৌভাগ্যের পীঠস্থান দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইয়া বিজাপুর-গোলকুণ্ডাকে পদানত করিয়া তিনি হয়ত দিল্লীর সিংহাসনে বসিবার আশা প্রায় ফলপ্রসূ মনে করিয়াছিলেন, অন্ততঃ যোগ্যতার পুরস্কারস্বরূপ দারার উপরে একটা ত্রিশ হাজারী মনসব ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। দরবারে আসিয়া তিনি কেবল দারার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতেছিলেন ; শাহজাহান জাহাঙ্গীর নহেন, পুত্রের আসল মতলব বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। এইজন্যই তিনি পুত্রের ক্ষমতা ও দুরাকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছিলেন ; কিন্তু কন্যার সকরুণ প্রার্থনায় তিনি গলিয়া জল হইয়া গেলেন।

এই ঘটনার সম্ভবতঃ কিছুদিন পরে দারা তাঁহার নবনির্ম্মিত প্রাসাদে সম্রাট ও ভ্রাতাদের আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে সঙ্গে লইয়া দারার প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। যথারীতি অভ্যর্থনা এবং আপ্যায়নাদির পর দারা স্বয়ং পিতা ও নিমন্ত্রিতবর্গকে প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ দেখাইতে লইয়া গেলেন। সকল জায়গা ঘুরিয়া তাঁহারা তায়খানা, অর্থাৎ ভিত্তিনিম্নস্থ শীতল প্রকোষ্ঠ দেখিবার জন্য নীচে নামিয়া গেলেন, অন্যের অলক্ষ্যে উহার প্রবেশ-পথে একাকী কুমার আওরঙ্গজেব সশস্ত্র দাঁড়াইয়া রহিলেন। উপরে উঠিয়া পুত্রকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া সম্রাট অত্যন্ত বিস্মিত ও রুষ্ট হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া আওরঙ্গজেব নিবেদন করিলেন, কেহ যদি উপর হইতে সিঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া সম্রাটের জীবন বিপন্ন করে এই আশঙ্কায় আমি পাহারায় ছিলাম।

পুত্রের বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখিয়া সম্রাট প্রমাদ গণিলেন ; কোন্ খাতে আওরঙ্গজেবের সর্পিল চিন্তাধারা চলিয়াছে, বুঝিতে বাকি রহিল না। দারার পেটে এতখানি কুবুদ্ধি, এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার কৌশল জানা থাকিলে হিন্দুস্থানের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়া যাইত।

৫

বাপের 'আলালের ঘরের দুলাল', ভগ্নী জাহানারার নয়নমণি শাহজাদা দারা পিতার জীবদ্দশায় কোন কৃতিত্বের পরিচয় না দিয়াও অর্দ্ধেক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, ছয় সুবার অনুপস্থিত সুবাদার। তাঁহার মনসব অন্য তিন ভ্রাতার

মোট মনসবের প্রায় সমান। দরবারে সম্রাটের ময়ূর-সিংহাসনের পার্শ্বে সোনার চৌকি একমাত্র তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট ;—উভয়ের মধ্যে ব্যবধান পিতার পরমায়ু। সম্রাটের পৌত্রগণের মধ্যে দারার পুত্রদ্বয় তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ ও অনুগ্রহভাজন, এমন কি তাঁহার কর্মচারিগণও অনুরূপ সৌভাগ্যের পাত্র। কেন পিতার, ন্যায়নিষ্ঠ গুণগ্রাহী সম্রাটের এই দুর্ব্বলতা ও অবিচার ?

দারাকে শাহান্‌শাহ্‌ আদুরে বড় খোকাটির মত গায়ে আঁচড় লাগিবার ভয়ে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতেন, পারতপক্ষে যুদ্ধবিগ্রহে পাঠাইতেন না। যে বয়সে আওরঙ্গজেব বুন্দেলখণ্ড ও দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া গুজরাটের সুবাদারী করিতেছিলেন সে বয়সে দারা দূর হইতেও লড়াই দেখেন নাই। ২৪ বৎসর বয়সে দুই ছেলের বাপ হওয়ার পর দারা কান্দাহার সুবা রক্ষা করিবার জন্য প্রথম অভিযানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শাহজাদা ময়দানে দুশমন খুঁজিয়া পাইলেন না, ফাঁকা মাঠে খেলা জিতিয়া বাহবা লইলেন। তিন বৎসর পরে আবার গুজব শুনা গেল, ইরাণের শাহ্‌ সফী বিরাট ফৌজ লইয়া কান্দাহারের দিকে কুচ করিতেছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য দিল্লীশ্বর দারাকে দ্বিতীয় বার মোগলবাহিনীর অধিনায়ক করিয়া পাঠাইলেন। বুলন্দ্‌-ইকবাল শাহজাদার উঁচু কপাল ; শাহ্‌ সফী নিশাপুরের পথে বহুদূরে কাশান শহরেই কবরস্থ হইলেন। বিজয়-দামামা বাজাইয়া দারা লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন, এবং পিতা কর্তৃক এমন বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত ও পুরস্কৃত হইলেন যেন তিনি গোটা ইরাণ-তুরাণ ফতে করিয়া ফিরিয়াছেন। সবই বরাতের জোর !

পাকা মুসলমান ও কাজের লোকের নজরে দারা হইলেন কুঁড়ের বাদশা ; কোন ঝকমারি নাই ; দিল-খোলা হাসি লইয়া আনন্দসাগরে গা ভাসাইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার রোজা নাই ; শুক্রবার ব্যতীত অন্যদিনে নমাজ নাই, আছে কেবল কোরাণশরীফ লইয়া বেইমানী গবেষণা, 'নাপাক হিন্দুয়ানী'র সহিত পবিত্র ইসলামের তুলনামূলক উদ্ভট বিচার। সকাল-সন্ধ্যা শাহজাদার মজলিসে যত রাজ্যের পাগলের আনাগোনা, অর্দ্ধ উলঙ্গ কাফের যোগী সন্ন্যাসীর ভিড়। সেখানে মাঝে মাঝে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ সংস্কৃত প্রশস্তি পাঠ কিংবা কর্ণাটক ভাষায় গান শুনাইতেন ; নিভৃতে চলিত তাঁহার হিন্দুগুরু কবীন্দ্রাচার্য্য সরস্বতীর সহিত দর্শন উপনিষদ আলোচনা। কবি, গায়ক, গুণী, চিত্রকর, শিল্পী, গরীব ফকিরদের নিকট তাঁহার দ্বার ও ভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত ; যাহারা দশ দুয়ারে তাড়া খাইয়া ফিরে তাহাদের কটক পার হইতে আপত্তি নাই,—তাহাদের কাছে তিনি মাটির মানুষ। শাহী দরবারে বড় বড় মনসবদার এমন কি উজীর-ই-আজম সাদুল্লা খাঁর সহিত ব্যবহারে কিন্তু তিনি দ্বিতীয় ফরায়ুন (Pharoah)। ঈর্ষামূলক হইলেও এই চিত্র দারার চরিত্রের এক দিক সন্দেহ নাই।

৬

পিতা শাহজাহান আওরঙ্গজেবের মত পাকা নমাজী ; সুতরাং দারা হয়ত ভয়ে শুক্রবারের জুম্মা নমাজ খেলাফ করিতেন না। ঐদিন তিনি দরাজ হাতে ফকীর গরীবকে দানখয়রাত করিতেন ; তাঁহার সুফিয়ানা ব্যাখ্যায় দান এবং ক্ষমাই হইল খোদাতালার আসল ইবাদৎ। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শাহজাদা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন ; কেননা রাজ-জ্যোতিষী ভবানীপ্রসাদ কোষ্ঠী বিচার করিয়া বলিয়াছেন দারা নিশ্চয়ই বাদশাহ হইবেন ; তাঁহার অন্যতম গুরু সুফী সর্ম্মদ্‌ বলিয়াছিলেন দারা দুনিয়ার মালিক হইয়া জন্মিয়াছেন। জ্যোতিষী ভবানীপ্রসাদকে তাঁহার এক বন্ধু সাবধান করিয়া বলিয়াছিল দারা বাদশাহ্‌ না হইলে তোমার মাথাটাই আগে যাইবে। ধূর্ত্ত ভবানীপ্রসাদ বলিল, তোমার যেমন বুদ্ধি ! বাদশাহ্‌ না হইলে নিজের মাথা বাঁচাইতেই শাহজাদা ফাঁপরে পড়িবেন, আমার মাথা লওয়ার ফুরসত কোথায় ? আওরঙ্গজেবের হুকুমে শিরশ্ছেদ করিবার পূর্ব্বে এক মোল্লা সাধু সর্ম্মদকে টিটকারী দিয়া বলিয়াছিল, দারার বাদশাহী গেল কোথায় ? সর্ম্মদ নিতান্ত সপ্রতিভভাবে জবাব দিলেন, তিনি বেহেশ্‌তের বাদশাহ হইয়া গিয়াছেন !

সন্ধ্যাবেলা শাহীমহলে ডাক না পড়িলে দারা তত্ত্বজ্ঞানী সুফী সাধকগণের জীবনী সঙ্কলন, উপনিষদ্‌ এবং যোগবাশিষ্ট গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, কিংবা শাহমুহিবুল্লা এলাহাবাদী, সর্ম্মদ এবং অন্যান্য ছোট বড় সাধু ফকীরগণের কাছে বস্তা বস্তা চিঠি লিখিতেন, সৃষ্টিছাড়া প্রশ্ন করিতেন। নিশীথ রাত্রে তিনি কাদেরিয়া কীর্ত্তন পদ্ধতি অনুসারে দিলের উপর জেকের-ফেকেরের "জরব" [জপে "ধ্বনির" আঘাত] মারিতেন ; কখনও প্রাণায়াম করিতে করিতে "গায়েবী আওয়াজ" ["অনাহত" ধ্বনি] শুনিতেন। ঘুমাইয়া পড়িলেও তিনি রাজযোগ সম্বন্ধে পুস্তিকা (যথা স্বরচিত রিসালা-ই-হকনুমা) লিখিবার জন্য ফেরেশ্‌তার মারফত খোদার হুকুম পাইতেন। কোন কোন রাত্রিতে তাঁহার স্বপ্নপ্রয়াণ হইত, জঙ্গলে বশিষ্ঠ ঋষি ও রামচন্দ্রের সাক্ষাৎলাভ করিয়া জাগিয়া উঠিতেন।

এই সমস্ত ব্যাপারের উপর আরও ছিল শাহজাদার

কুণ্ডলিনী ভেদ প্রক্রিয়া। লাহোরের হজরত মিঞা মীরের মুরীদ্ হজরতশাহ বদক্শী দারার মন্ত্রগুরু। তাঁহার কৃপায় নিজের কুণ্ডলিনী ছাড়াইয়া তিনি পরের কুণ্ডলিনী ভেদ করাইবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মচর্চ্চায় তিনি সাধিকা জাহানারার গুরুতম গুরুস্থানীয়। কাশ্মীর সফরের সময় জাহানারা গুরু বদক্শীর কাছে বসিয়া তিন দিন এই সাধনা (untying the knot) করিয়া সফলতালাভ করিয়াছিলেন। দারা পরের মুখে স্তোকবাক্য শুনিতে শুনিতে নিজেও বিশ্বাস করিতেন তিনি বাস্তবিক একজন দৈবানুগৃহীত "ইন্‌সান-ই-কামিল বা "পূর্ণপুরুষ"।

দারা ও আওরঙ্গজেব পরোক্ষে পরস্পরের প্রতি বাছা বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করিতেন। দারা বলিতেন ভাই আওরঙ্গজেব নমাজী বকধার্ম্মিক; আওরঙ্গজেব বলিতেন কাফের শাহজাদা দরবারী মোসাহেব, মতলববাজ পাগল। আওরঙ্গজেবের অষ্টপ্রহর দুশ্চিন্তা ইসলাম ও মোগল সাম্রাজ্য; ইসলাম বিপন্ন করিয়া ভগ্নী জাহানারার সহায়তায় তৈমুরের শাহীতক্তে বসিবেন দারা ? আর আওরঙ্গজেব ?

৭

প্রথম বয়স হইতেই দারা দৈবে দারুণ বিশ্বাসী, সাংসারিক ব্যাপারে বাস্তবদৃষ্টি ও দৃঢ়তা শূন্য; উপায়-অপায় নির্ণয়ে অপারগ, লেখাপড়া ব্যতীত অন্য কার্য্যে পরমুখাপেক্ষী; পরের মুখে ঝাল খাওয়া তাঁহার স্বভাব। আওরঙ্গজেব ছিলেন ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং স্বভাব-চরিত্র, বুদ্ধি ও জীবনযাত্রায় দারার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাল্যকাল হইতে তিনি বাপের বাড়া পাকা সুন্নী, ইমাম্ আবুহানিফার মতানুগামী। লড়াইয়ের ময়দান কিংবা সফরেও তাঁহার রোজা নমাজ আমরণ বাদ পড়ে নাই। ইসলামীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, সর্ব্বদা হারাম হালাল জায়েজ-নাজায়েজ, বিধি-নিষেধ বিচার করিয়া চলিতেন। এই বিচারের ফাঁকিও তিনি জানিতেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেন। আওরঙ্গজেব শিকার ব্যতীত সর্ব্ববিধ ব্যসন বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে ছন্দ ও প্রাণে সঙ্গীত ছিল না, কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা ছিল। তাঁহার দাড়ির দৈর্ঘ্য, পায়জামার ঝুল, জামার সুতা ও রং শরিয়তের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল। বাদশাহ হইয়াও তিনি ফকীর, হিন্দুস্থানের জিন্দা-পীর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাজকোষের অর্থ তিনি হারাম মনে করিতেন। রুজী (উপার্জ্জন) হালাল করিবার জন্য তিনি নিজে কোরাণশরীফ লিখিয়া বিক্রয় করিতেন কফনের কাপড় ও দফনের খরচের জন্য ঐ টাকা জমাইয়া রাখিতেন। সারা জীবনে শরাবের পেয়ালা তিনি দুই বার স্পর্শ করিয়াছিলেন, গলাধঃকরণ করেন নাই— একবার সুন্দরী হীরাবাঈয়ের নিকট প্রেমের পরীক্ষায়, এবং দ্বিতীয় বার মথুরায় নৈশ-ভোজের পর পেয়ালার পর পেয়ালা ভাই মোরাদের মুখে তুলিয়া দিয়া অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহাকে বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে। বাদশাহ হইয়া তিনি শাহীমহল ও রাজধানী হইতে নৃত্যকলা ও সঙ্গীতকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, পাপ-ব্যবসায় দমন করিবার জন্য নাচওয়ালী ও রূপোপজীবিনীগণকে শরিয়ত মতে স্বামী-গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন।

৮

ইতিহাসে আওরঙ্গজেব মূর্ত্তিমান পুরুষকার। দারার সহায়কারী দৈব এবং মানবীয় শক্তিকে পরাজিত করিবার জন্য তিনি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন। জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্রের পক্ষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ডিঙ্গাইয়া সিংহাসন-লাভ যদি পাপকার্য্য না হয়, শাহজাহানের বীর্য্য ও বুদ্ধি-মত্তার অধিকারী তাঁহার তৃতীয় পুত্র কেন ঐ সিংহাসন হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন ?

মুখে সর্ব্বদা আল্লা ভরসা আওড়াইলেও আওরঙ্গজেব সম্পূর্ণ নিজের উপর ভরসা রাখিয়া চলিতেন। আল্লার উপর অটুট বিশ্বাস থাকিলেও আল্লার সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন প্রকার মমতা কিংবা বিশ্বাস তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। আওরঙ্গজেব মাটির পৃথিবীর উপর দিয়া চলিতেন। এক পা ফেলিয়া আগে কি আছে আর এক পা দিয়া দেখিতেন; দারার ন্যায় ভাবের ডানায় ভর করিয়া কল্পনা-পরীর রাজ্যে উড়িয়া বেড়াইতেন না। মানুষ হিসাবে দারার সদর-অন্দর প্রায় এক ছিল; কিন্তু আওরঙ্গজেব যেন দৌলতাবাদ দুর্গ। মনের দুয়ার মানুষ দূরের কথা খোদাতালার কাছে খুলিয়াছিলেন কিনা তিনিই জানেন। স্বার্থ, বিবেক ও ধর্ম্ম তাঁহার মধ্যে গোল পাকাইয়া এমন এক গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছিল যাহার মধ্যে ঐতিহাসিক খেই খুঁজিয়া পায় না।

ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখা যায় দারা এবং আওরঙ্গজেবের "আল্লা" বিপরীতধর্ম্মী, দুইটি বিভিন্ন সত্তা। আওরঙ্গজেবের আল্লা একমাত্র মুসলমানের আশ্রয় ও সহায়। মুসলমানের ভোগের জন্য আল্লা দুনিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কাফেরগুলি ইহকালে মুসলমানের গোলামী ও খোদার গজব বরদাস্ত করিয়া মরণের পর অনন্তকাল দোজখের আগুনে পুড়িবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। কাফেরগণকে আঁধার হইতে গলায় শিকল দিয়া আলোকে আনিবার ভার, এমন কি বেহেশতে

উঠাইবার অধিকার আল্লাতাল্লা ইমানদারকে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

অপর পক্ষে দারা আল্লাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, বাক্যমনের অগোচর পরব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করিবার দাবি করিতেন; চিঠিপত্রে শিরোনামার উপরে (যথা মীর্জা রাজা জয়সিংহের কাছে লিখিত পত্র) ফার্সী অক্ষরে "সচ্চিদানন্দ" লিখিতেন। সূফীভাবে বিভোর হইয়া দারা "মাশুক" অর্থাৎ অশরীরী আল্লার চেহারা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—জ্যোতিস্বরূপ আল্লার মুখমণ্ডলের শোভাবর্দ্ধন করিয়া দুইটি অলকগুচ্ছ বা জুলফি ঝুলিয়া রহিয়াছে: উহার একটি ইসলাম, অপরটি হিন্দুর ধর্ম—মূর্ত্তি ও বহু দেব উপাসনা।

মোট কথা, আওরঙ্গজেবের আল্লা তৌরীত (Old Testament) এবং উহার আরবীয় সংস্করণ কোরাণশরীফের "সেমেটিক" কুলপতিধর্ম্মী "আল্লা" (tribal god); দারার আল্লাকে আর্য্য বা হিন্দুস্থানী আল্লা বলা যাইতে পারে। ভ্রাতৃদ্বয়ের "আল্লা"র স্বরূপ এবং উহার কোন কোন "সিফৎ" বা গুণ আসল এবং কোনটি প্রক্ষিপ্ত—ইহা তর্ক অপেক্ষা তলোয়ারের ধারে পরীক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন আওরঙ্গজেব এবং যুযুৎসু মোল্লাসমাজ।

ইতিহাসে দেখা যায় শাহজাহান মনে প্রাণে, নীতি ও ধর্ম্মানুশাসনে, মন্দির মূর্ত্তি ধ্বংসসাধনে, হিন্দুকে মুসলমান করিবার উৎসাহে এবং আদর্শ মুসলমান হিসাবে কেবল আওরঙ্গজেব অপেক্ষা এক ধাপ নীচে ছিলেন। পনর বৎসর বয়স হইতে প্রৌঢ়ত্বের অবসান পর্য্যন্ত ইসলামের খেদমত করিয়া এহেন পিতার নিকট হইতে তাঁহার যোগ্যতম পুত্র আওরঙ্গজেব পুরস্কার তেমন কিছু পান নাই, অধিকন্তু পাইয়াছেন সকল কার্য্যে বাধা ও তিরস্কার।

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

আণবিক বিস্ফোরণে থরথর কাঁপে বসুমতী
লুপ্ত হ'ল হিরোশিমা, দানবের বিকট উল্লাস;
প্রেম-স্বপ্ন-আশা-গ্রাসী চিতাগ্নিতে প্রাণের আরতি,
মনুষ্যত্ব বিকৃতির প্রদর্শনী; রক্তাক্ত আকাশ।
ত্রস্ত মন সংশয়ে উত্তাল,
সভ্যতার মৃত্যু-ঘণ্টা তবে কি বাজায় মহাকাল?
অভিশপ্ত এ-শতাব্দী, ব্যর্থ শিক্ষা-দীক্ষা-ধর্ম্ম-ধ্যান,
বর্ব্বর গুহার যুগ এনে দিল গর্ব-অন্ধ উজ্জ্বল বিজ্ঞান?
ধূলি-ভস্ম ধূমে লুপ্ত সময়ের বর্ণ আলো-রেশ,
পলায়িত স্বপ্ন প্রেম; অমৃতের সন্ধান কি শেষ?

হঠাৎ তোমার কথা মনে হয়, বইগুলি পড়ি;
প্রভুত্বের আস্ফালন, হত্যার উল্লাস, কোলাহলে
তোমার উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখে দুরু দুরু বুকে পড়ি
কোন এক সুস্থ শ্যাম পৃথ্বী দীপ্ত নীলাকাশতলে।
শান্ত মন আশ্বাসে মুখর,
প্রেত-রাত্রে দেখি লেখা নভো গাত্রে তারার অক্ষর!
কঙ্কাল-আকীর্ণ মাঠে তৃণ সাড়া দেয়, ফুল হাসে;
দুর্য্যোগ অধ্যায় উড়ে যায় রাঙা ভোরের বাতাসে।
রূঢ় মৃত্যু-পদধ্বনি হ'য়ে ওঠে জীবনের স্তব,
পাখীর কাকলি বনে, নদী ডাকে, প্রাণের উৎসব।

সে সময় ভাবি—এই সভ্যতার ঋণ-ক্ষতি-ক্ষয়
অনেক শুধেছ তুমি; স্বপ্নে প্রেমে নয়, ব্যর্থ নয়
দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ এ শতাব্দী; সভ্যতার মন্থনের বিষ
পান করে নীলকণ্ঠ দিয়ে গেছ সৃষ্টির আশিস্।*

---

* আচার্য্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি ভবনে রবীন্দ্র-স্মৃতিবাসরে পঠিত।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি

শ্রীচিন্ময়ী পাঠক

এক অচ্ছেদ্য নিবিড় বন্ধনে মানুষ প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সভ্যতার অভিযানে মানুষ চায় প্রকৃতিকে বিসর্জন দিতে, কিন্তু পারে না; তাহার অন্তরের স্তরে স্তরে ছড়াইয়া রহিয়াছে প্রকৃতিপ্রেম। আকাশের রঙে, কুসুমের সৌরভে, বিহগের কাকলিতে আছে মাদকতা। প্রকৃতির অস্ফুট আহ্বান রক্তে জাগায় শিহরণ, প্রাণে সঞ্চারিত করে নবীন স্ফূর্ত্তি। দক্ষিণ পবনে আন্দোলিত কৃষ্ণচূড়ার রাঙা গুচ্ছ কঠিন বস্তুতান্ত্রিকের চোখেও ক্ষণিকের জন্য রঙীন আবেশ আনিয়া দেয়, আষাঢ়ের কালো কৃষ্ণমেঘপুঞ্জ দেখিয়া তাহার চিত্ত মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। মানুষ প্রকৃতিকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেও প্রকৃতি মানুষকে ভুলিতে দেয় না। রূপে, বর্ণে, আভাসে, ইঙ্গিতে মানুষের মনে জাগাইয়া রাখে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। তাই শহরের বুকেও দেখি সযত্নরচিত পুষ্পপল্লবে সজ্জিত রমণীয় উদ্যান। সাহিত্য-জগতেও মানুষ প্রকৃতিকে ভুলিতে পারে নাই। কাব্যে, নাট্যে প্রকৃতি বিস্তৃত অংশ অধিকার করিয়া আছে। শিল্পী আপনার কল্পনার মাধুরী দিয়া প্রকৃতির পুষ্পপল্লবের রঙীন ছবি আঁকিয়া দেয়, অন্তরের সুধা সিঞ্চন করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলে নূতন রূপে। অন্যান্য দেশের সাহিত্যের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যেও যুগে যুগে প্রকৃতি দেখা দিয়াছে নূতন নূতন রূপে।

ভারতীয় সভ্যতার আদিপর্ব্বে উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারিত যে বৈদিক মন্ত্র আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছিল তাহা প্রকৃতির স্তবগানে পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন—

The higher gods of the Rigveda are almost entirely personification of the natural phenomena such as Sun, Dawn, Fire, Wind.

"ঋগ্বেদের অধিকাংশ দেবতা, যথা সূর্য, উষা, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের মূর্ত্ত বিগ্রহ মাত্র।" বস্তুতঃ আর্য ঋষিগণ সূর্য, বায়ু প্রভৃতি দেবতার স্তবের মধ্য দিয়া প্রকৃতির স্তব করিয়াছেন।

আর্যগণ সিন্ধুনদের উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন চারিদিকে মুক্ত প্রকৃতি আপন লীলায় বিভোর। প্রভাতে ধীরে ধীরে আঁধারের যবনিকা সরাইয়া সোনার আলোয় দিগন্ত প্লাবিত করিয়া যখন সূর্য পূর্ব্ব গগনে আবির্ভূত হইতেন তখন অপরিসীম আনন্দে অভিভূত ঋষিগণ তরুণ অরুণের বন্দনা গান করিতেন:

> ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্যস্য
> চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ।
> নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ
> পরি দ্যাবা পৃথিবী যন্তি সদ্যঃ॥

কখনও বা যখন প্রচণ্ড রবে বজ্র আকাশ বিদীর্ণ করিত, রুদ্ধ আক্রোশে পৃথিবী দুলিয়া উঠিত, প্রবল বারিপাতে ধরাতল ভাসিয়া যাইত, কুটিরে কুটিরে জাগিত তীব্র আর্ত্তনাদ, তখন ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া ঋষিগণ বজ্রের দেবতা ইন্দ্রের স্তব-গান করিতেন:

> দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে
> শুষ্মাচ্চিদস্য পর্বতা ভয়ন্তে।
> যঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহু—
> র্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইন্দ্রঃ॥

এইরূপে প্রকৃতির বিভিন্ন লীলায় কখনও ভয়ে, কখনও বিস্ময়ে, কখনও বা আনন্দে অভিভূত হইয়া আর্য ঋষিগণ প্রকৃতিতে দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিতেন। সুতরাং প্রকৃতিই বৈদিক মন্ত্রে দেবতা রূপে আবির্ভূত হইল।

মহাকাব্যের যুগে প্রকৃতিকে দেখি অন্য রূপে। এখন আদিম যুগের ভয় বা বিস্ময় আর নাই। আর্যেরা তখন প্রকৃতির রূপ, রস ও বর্ণমাধুর্য্য আকণ্ঠ পান করিলেন।

মহাকবি বাল্মীকি প্রকৃতিকে দেখিয়াছিলেন তাহার নিজস্ব রূপে। তরুলতা, পুষ্পপল্লব আপন রূপেই তাঁহার চিত্ত মোহিত করিয়াছিল। তাই রামায়ণে পাই বহিঃ-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনা, মধুর ভাষায়, সুললিত ছন্দে। পঞ্চ-বটির বনে শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃতির রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন:

> অয়ং দেশঃ সমঃ শ্রীমান্ পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতঃ।
> ইদমাশ্রমপদং রম্যং কলবৎ কর্ত্তুমর্হসি।
>
> ... ...
>
> সৌবর্ণৈ রাজতৈস্তাম্রৈর্দেশে দেশেঃ তথা শুভৈঃ।
> গবাক্ষিতা ইবাভান্তি গজাঃ পরমভক্তিভিঃ।
> সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ খর্জ্জুরৈঃ পনসৈর্দ্রুমৈঃ।
> নীবারৈস্তিনিশৈশ্চৈব পুংনাগৈশ্চোপশোভিতা।
> চূতৈরশোকৈস্তিলকৈঃ কেতকৈরপি চম্পকৈঃ।
> পুষ্পগুল্মলতোপেতৈস্তৈস্তৈস্তরুভিরাবৃতৈঃ।

পম্পার তীরে প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব শোভা! কিন্তু

এ প্রকৃতি নিছক জড় প্রকৃতি, কোন অন্তর্লীন চেতন সত্তার বহিঃপ্রকাশ নহে। এ প্রকৃতি আপন রূপের বিচিত্র লীলায় কখনও চিত্তে জাগায় আনন্দ, কখনও বিস্ময়, কখনও বা হারানো প্রিয়ার স্মৃতি উদ্বেলিত করিয়া চিত্তে আনে নিবিড় বেদনা।

কালিদাসের কাব্যে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তর্লীন প্রাণবন্ত সত্তার মিলন দেখা যায়। তরু, লতা, নদী, পর্ব্বত সকলই যেন এক অনির্ব্বচনীয় চেতনার অধিকারী। স্নেহ, প্রেম, করুণা প্রভৃতি মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলি জড়প্রকৃতির অন্তরেও যেন বিরাজমান। 'মেঘদূত' কাব্যের ভূমিকায় পণ্ডিতপ্রবর এম. আর. কালে বলেন:

"He (Kalidasa) sets forth···that the oceans and the rivers, the mountains and the forests, the trees and the flowers, the beasts and the birds are as much conscious of a personal life as man;···All forms of Nature—from the sublimest mountains to the tiniest flower that blows—have for him as conscious an individuality as real a personal life as men or gods."

বস্তুতঃ, কালিদাসের প্রকৃতি ইংরেজকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতির মত ঈশ্বরের বহিঃপ্রকাশ মাত্র নহে। কালিদাসের প্রকৃতি মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গী। তাই আষাঢ়ের ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ বিরহী যক্ষের আকুল বার্ত্তা সুদূর অলকায় প্রিয়ার কাছে লইয়া যায়, বসুন্ধরার যৌবনশ্রী উপভোগ করে। পর্ব্বতরাজ হিমালয় স্নেহশীল পিতার মত কন্যা উমার ব্যথায় কাতর:

> সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্রসংরম্ভভীত্যা
> দুহিতরমনুকম্প্যামদ্রিরাদায় দোর্ভ্যাম্।
> সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং
> প্রতিপথগতিরাসীদ্ বেগদীর্ঘীকৃতাঙ্গঃ।

শকুন্তলা নাটকে প্রকৃতি 'আত্মভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয় ভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে।' শকুন্তলার চরিত্র অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত, পশুপক্ষীর সহিত অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ। তরুলতাগুলিতে শকুন্তলা জলসেচন করিয়া সোদর-স্নেহে অভিষিক্ত করে। সে নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আপনার কোমল হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছে। 'লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেরূপ সম্বন্ধ।' তাই শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রাকালে ঋষি কণ্ব প্রকৃতির কাছে শকুন্তলার বিদায়-প্রার্থনা করিতেছেন:

> পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
> নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাঽপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
> আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
> সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্।

'প্রাচীন সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

"অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোন নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্ত্তা বসাইয়া রূপক নাট্য রচিত হইতে পারে—কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া—এতো অন্যত্র দেখি নাই।"

আদিকবি বাল্মীকির মত ভবভূতিও বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নদীপর্ব্বত, পুষ্পপল্লব তাঁহাদের নিজস্ব রূপে তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, কোন নিগূঢ় সত্তার আভাস দেয় নাই। সীতা অরণ্যকে ভালবাসিয়াছিলেন তাহার বাহ্য রূপের মোহে, প্রাসাদে থাকিয়াও তাঁহার প্রাণ সেই অরণ্যের জন্য কাঁদিত:

> জানে পুনরপি প্রসন্নগম্ভীরাসু বনরাজিষু বিহৃত্য
> পবিত্রনির্ম্মলশিশিরসলিলাং ভগবতীং ভাগীরথীম্
> অবগাহিষ্যে ইতি।

শ্রীহর্ষ, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবি ও নাট্যকারগণও প্রকৃতির বাহিরের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, তাহার অন্তরের গোপন চৈতন্যের সন্ধান পান নাই। তাই তাঁহাদের রচনায় পাই কেবল বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যবর্ণনা, নানা ছন্দে, নানা ভঙ্গিতে। যথা:

> গলৎপরাগং ভ্রমিভঙ্গিভিঃ পতৎপ্রসক্তভৃঙ্গাবলি নাগকেশরম্।
> স মারনারাচনিঘর্ষশৈলসংজ্বলৎকণং শাণমিব ব্যলোকয়ৎ।
>
> (নৈষধঃ ১.)

এই কবিগণ মানুষের সহিত প্রকৃতির নিবিড় সৌহার্দ্দ্য-বন্ধন অনুভব করেন নাই। তাঁহাদের প্রকৃতিপ্রেম নিবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র প্রকৃতির বাহিরের রূপে; তাঁহারা গোপন অন্তর্লোকের চৈতন্যময় সত্তার আভাস পান নাই।

চিত্রচোর

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১

কাচের পেয়ালায় ডালিমের রস লইয়া সত্যবতী ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'নাও, এটুকু খেয়ে ফেল।'

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম বেলা ঠিক চারটে। সত্যবতীর সময়ের নড়চড় হয় না।

ব্যোমকেশ আরাম কেদারায় বসিয়া বই পড়িতেছিল, কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ চক্ষে পেয়ালার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'রোজ রোজ ডালিমের রস খাব কেন?'

সত্যবতী বলিল, 'ডাক্তারের হুকুম।'

ব্যোমকেশ ভ্রূকুটিকুটিল মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, 'ডাক্তারের নিকুচি করেছে। ও খেতে আমার ভাল লাগে না। কি হবে খেয়ে?'

সত্যবতী বলিল, 'গায়ে রক্ত হবে। লক্ষ্মীটি খেয়ে ফেল।'

ব্যোমকেশ চকিতে একবার সত্যবতীর মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিল, প্রশ্ন করিল, 'আজ রাত্তিরে কি খেতে দেবে?'

সত্যবতী বলিল, 'মুর্গীর সুরুয়া আর টোস্ট।'

ব্যোমকেশের ভ্রূকুটি গভীর হইল, 'হুঁ, সুরুয়া।—আর মুর্গীটা খাবে কে?'

সত্যবতী মুখ টিপিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো।'

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'শুধু ঠাকুরপো নয়, তোমার অর্ধাঙ্গিনীও ভাগ পাবেন।'

ব্যোমকেশ আমার পানে একবার চোখ পাকাইয়া তাকাইল, তারপর বিকৃত মুখে ডালিমের রসটুকু খাইয়া ফেলিল।

কয়েকদিন হইল ব্যোমকেশকে লইয়া সাঁওতাল পরগণার একটি শহরে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছি। কলিকাতায় ব্যোমকেশ হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিল; দুই মাস যমে-মানুষে টানাটানির পর তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছি। রোগীর সেবা করিয়া সত্যবতী কাঠির মত রোগা হইয়া গিয়াছিল, আমার অবস্থাও কাহিল হইয়াছিল। তাই ডাক্তারের পরামর্শে পৌষের গোড়ার দিকে সাঁওতাল পরগণার প্রাণপ্রদ জলহাওয়ার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখানে আসিয়া ফলও মন্ত্রের মত হইয়াছে। আমার ও সত্যবতীর শরীর তো চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছেই, ব্যোমকেশের শরীরেও দ্রুত রক্তসঞ্চার হইতেছে এবং অসম্ভব রকম ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়াছে। দীর্ঘ রোগভোগের পর তাহার স্বভাব অবুঝ বালকের মত হইয়া গিয়াছে; সে দিবারাত্র খাই-খাই করিতেছে। আমরা দু'জনে অতি কষ্টে তাহাকে সামলাইয়া রাখিয়াছি।

এখানে আসিয়া অবধি মাত্র দুই জন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছে: এক, অধ্যাপক আদিনাথ সোম, তাঁহার বাড়ীর নীচের তলাটা আমরা ভাড়া লইয়াছি। দ্বিতীয়, এখানকার স্থানীয় ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক। রোগী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, তাই সর্বাগ্রে ডাক্তারের সহিত পরিচয় করিয়া রাখা প্রয়োজন মনে হইয়াছে।

শহরে আরও অনেকগুলি বাঙালী আছেন, কিন্তু কাহারও সহিত এখনও আলাপের সুযোগ হয় নাই। এ কয়দিন বাড়ীর বাহির হইতে পারি নাই, নূতন স্থানে আসিয়া গোছ-গাছ করিয়া বসিতেই দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ প্রথম সুযোগ হইয়াছে; শহরের একজন গণ্যমান্য বাঙালীর বাড়ীতে চা-পানের নিমন্ত্রণ আছে। আমরা যদিও এখানে আসিয়া নিজেদের জাহির করিতে চাহি নাই, তবু কাঁঠালী চাঁপার সুগন্ধের মত ব্যোমকেশের আগমন-বার্তা শহরে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে চায়ের নিমন্ত্রণ আসিয়াছে।

ব্যোমকেশকে এত শীঘ্র চায়ের পার্টিতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না; কিন্তু দীর্ঘকাল ঘরে বদ্ধ থাকিয়া সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে; ডাক্তারও ছাড়পত্র দিয়াছেন। সুতরাং যাওয়াই স্থির হইয়াছে।

আরাম কেদারায় বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে ব্যোমকেশ উসখুস করিতেছিল এবং বারবার ঘড়ির পানে তাকাইতেছিল। আমি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া অলস ভাবে সিগারেট টানিতেছিলাম; সাঁওতাল পরগণার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। এখানে রুক্ষতার সহিত শ্যামলতার, প্রাচুর্যের সহিত রিক্ততার মিশিত মিলন ঘটিয়াছে; মানুষের সংস্পর্শ এখানকার কঙ্করময় মাটিকে পঙ্কিল পচ্ছিল করিয়া তুলিতে পারে নাই।

ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'রিক্‌শ কখন আসতে বলেছ?'

বলিলাম, 'সাড়ে চারটে।'

ব্যোমকেশ আর একবার ঘড়ির পানে তাকাইয়া পুস্তকের দিকে চোখ নামাইল। বুঝিলাম ঘড়ির কাঁটার মন্থর আবর্তন তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। হাসিয়া বলিলাম, 'রাই ধৈর্যং রহু ধৈর্যং—।'

ব্যোমকেশ খিঁচাইয়া উঠিল, 'লজ্জা করে না! আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট খাচ্ছ!'

অর্ধদগ্ধ সিগারেট জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। ব্যোমকেশ এখনও সিগারেট খাইবার অনুমতি পায় নাই; সত্যবতী কঠিন দিব্য দিয়াছে তাহার অনুমতি না পাইয়া সিগারেট খাইলে মাথা খাইবে, মরা মুখ দেখিবে। আমিও ব্যোমকেশের সম্মুখে সিগারেট খাইতাম না; প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নেশাখোরকে লোভ দেখানোর মত পাপ আর নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল হইয়া যাইত।

২

ঠিক সাড়ে চারিটার সময় বাড়ীর সদরে দুইটি সাইকেল রিক্সা আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা প্রস্তুত ছিলাম; সত্যবতীও ইতিমধ্যে সাজপোশাক করিয়া লইয়াছিল। আমরা বাহির হইলাম।

আমাদের বাড়ীর একতলার সহিত দোতলার কোনও যোগ ছিল না, সদরের খোলা বারান্দার ওপাশ হইতে উপরের সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছিল। বাড়ীর সম্মুখে খানিকটা মুক্ত স্থান, তারপর ফটক। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম আমাদের গৃহস্বামী অধ্যাপক সোম বিরসগম্ভীর মুখে ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন।

অধ্যাপক সোমের বয়স বোধ করি চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া ত্রিশের বেশী বয়স মনে হয় না; তাঁহার আচার-ব্যবহারেও প্রৌঢ়ত্বের ছাপ নাই। সব কাজেই চটপটে উৎসাহশীল। কিন্তু তাঁহার জীবনে একটি কাঁটা ছিল, সেটি তাঁর স্ত্রী। দাম্পত্য জীবনে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই।

প্রোফেসার সোম বাহিরে যাইবার উপযোগী সাজগোজ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আমাদের দেখিয়া করুণ হাসিলেন। তিনিও চায়ের নিমন্ত্রণে যাইবেন জানিতাম, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দাঁড়িয়ে যে! যাবেন না?'

প্রোফেসার সোম একবার নিজের বাড়ীর দ্বিতলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'যাব। কিন্তু গিন্নীর এখনও প্রসাধন শেষ হয় নি। আপনারা এগোন।'

আমরা রিক্স'তে চড়িয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ ও সত্যবতী একটাতে বসিল, অন্যটাতে আমি একা। ঘন্টি বাজাইয়া মনুষ্য-চালিত ত্রিচক্র-যান ছাড়িয়া দিল। ব্যোমকেশের মুখে হাসি ফুটিল। সত্যবতী সযত্নে তাহার গায়ে শাল জড়াইয়া দিল, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া না যায়।

কাঁকর-ঢাকা উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়া দুই দিক দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। রাস্তার দু'ধারে ঘরবাড়ীর ভিড় নাই, এখানে একটা ওখানে একটা। শহরটি যেন হাত-পা ছড়াইয়া অসমতল পাহাড়তলীর উপর অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে, গাদাগাদি ঠেসাঠেসি নাই। আয়তনে বিস্তৃত হইলেও নগরের জনসংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু সমৃদ্ধি আছে। আশেপাশে কয়েকটি অভ্রের খনি এখানকার সমৃদ্ধির প্রধান সূত্র। আদালত আছে, ব্যাঙ্ক আছে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা গণ্যমান্য তাঁরা প্রায় সকলেই বাঙালী।

যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাঁহার নাম মহীধর চৌধুরী। অধ্যাপক সোমের কাছে শুনিয়াছি ভদ্রলোক প্রচুর বিত্তশালী; বয়সে প্রবীণ হইলেও সর্বদাই নানাপ্রকার হুজুগ লইয়া আছেন; অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত। তাঁহার প্রযোজনায় চড়ুইভাতি, শিকার, খেলাধুলা লাগিয়াই আছে।

মিনিট দশ-পনরোর মধ্যে তাঁহার বাসভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রায় দশ বিঘা জমি পাথরের পাঁচিল দিয়া ঘেরা, হঠাৎ দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। ভিতরে রকমারি গাছপালা, মরসুমি ফুলের কেয়ারি, উঁচু-নীচু পাথুরে জমির উপর কোথাও লাল-মাছের বাঁধানো সরোবর; কোথাও নিভৃত বেতসকুঞ্জ, কোথাও বা কৃত্রিম ক্রীড়া-শৈল। সাজানো বাগান দেখিয়া সহসা বনানীর বিভ্রম উপস্থিত হয়। মহীধর বাবু যে ধনবান তাহা তাঁহার বাগান দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না।

বাড়ীর সম্মুখে ছাঁটা ঘাসের সমতল টেনিস্ কোর্ট, তাহার উপর টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সাজাইয়া নিমন্ত্রিতদের বসিবার স্থান হইয়াছে, শীতের বৈকালী রৌদ্র স্থানটিকে আতপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দর দোতলা বাড়ীটি যেন এই দৃশ্যের পশ্চাৎপট রচনা করিয়াছে। আমরা উপস্থিত হইলে মহীধর বাবু সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ভদ্রলোকের দেহায়তন বিপুল, গৌরবর্ণ দেহ, মাথার সাদা চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, দাড়িগোঁফ কামানো, গাল দুটি চালতার মত, মুখে ফুটি-ফাটা হাসি। দেখিলেই মনে হয় অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক।

তিনি তাঁহার মেয়ে রজনীর সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটির বয়স কুড়ি-একুশ, সুশ্রী গৌরাঙ্গী হাস্যমুখী; ডাগর-ডাগর চোখ দুটিতে বুদ্ধি ও কৌতুকের খেলা। মহীধর বাবু বিপত্নীক, এই মেয়েটি তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল এবং উত্তরাধিকারিণী।

রজনী মুহূর্তমধ্যে সত্যবতীর সহিত ভাব করিয়া ফেলিল এবং তাহাকে লইয়া দূরের একটা কোণে বসাইয়া গল্প জুড়িয়া দিল। আমরাও বসিলাম। অতিথিরা এখনও সকলে আসিয়া উপস্থিত হন নাই; কেবল ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক ও আর একটি ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ডাক্তার ঘটক আমাদের পরিচিত, পূর্বেই বলিয়াছি; অন্য ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ হইল। এঁর নাম নকুলেশ সরকার; শহরের একজন মধ্যম শ্রেণীর ব্যবসাদার, তা ছাড়া ফটোগ্রাফির দোকান আছে।

কটোগ্রাফি করেন শখের বশে, উপরন্তু এই থেকে কিছু-কিঞ্চিৎ উপার্জন হয়। শহরে অন্য ফটোগ্রাফার নাই।

সাধারণভাবে কথাবার্তা হইতে লাগিল। মহীধরবাবু এক সময় ডাক্তার ঘটককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ওহে ঘোটক, তুমি অ্যাকিমেও ব্যোমকেশবাবুকে চাদা করে তুলতে পারলে না। তুমি দেখছি নামেও ঘোটক কাজেও ঘোটক—একেবারে ঘোড়ার ডাক্তার।' বলিয়া নিজের রসিকতায় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নকুলেশবাবু ফোড়ন দিয়া বলিলেন, 'ঘোড়ার ডাক্তার না হয়ে উপায় আছে? একে অশ্বিনী তায় ঘোটক!'

ডাক্তার ইঁহাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, সে একটু হাসিয়া রসিকতা হজম করিল। ডাক্তারকে লইয়া অনেকেই রঙ্গ-রসিকতা করে দেখিলাম, কিন্তু তাহার চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে সকলেই শ্রদ্ধাশীল। শহরে আরও কয়েকজন প্রবীণ চিকিৎসক আছেন, কিন্তু এই তরুণ সংবতাব ডাক্তারটি মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে বেশ পসার জমাইয়া তুলিয়াছে।

ক্রমে অন্যান্য অতিথিরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে আসিলেন সস্ত্রীক সপুত্র উষানাথ ঘোষ। ইনি একজন ডেপুটি, এখানকার সরকারী খাসখামার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। লম্বা-চওড়া চেহারা, খস্‌খসে কালো রঙ, চোখে কালো কাঁচের চশমা। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, গম্ভীরভাবে থামিয়া থামিয়া কথা বলেন, গম্ভীরভাবে হাসেন। তাঁহার স্ত্রীর চেহারা রুগ্ন, মুখে উৎকণ্ঠার ভাব, থাকিয়া থাকিয়া স্বামীর মুখের পানে উদ্বিগ্ন চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন। ছেলেটি বছর পাঁচেকের; তাহাকে দেখিয়াও মনে হয় যেন সর্বদা শঙ্কিত সঙ্কুচিত হইয়া আছে। উষানাথবাবু সম্ভবত নিজের পরিবারবর্গকে কঠিন শাসনে রাখেন, তাঁহার সম্মুখে কেহ মাথা তুলিয়া কথা বলিতে পারে না।

মহীধরবাবু আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলে তিনি গম্ভীর মুখে গলার মধ্যে দুই-চারিটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন, বোধ হয় তাহা লৌকিক সম্ভাষণ, কিন্তু আমরা কিছু শুনিতে পাইলাম না। তাঁহার চক্ষু দুটিও কালো কাঁচের অন্তরালে আবৃত হইয়া রহিল। একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। যাহার চোখ দেখিতে পাইতেছি না এমন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া সুখ নাই।

তারপর আসিলেন পুলিসের ডি-এস্-পি পুরন্দর পাণ্ডে। ইনি বাঙালী নন, কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলেন; বাঙালীর সহিত মেলামেশা করিতেও ভালবাসেন। লোকটি সুপুরুষ, পুলিসের সাজ-পোশাকে দিব্য মানাইয়াছে। ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'আপনি এসেছেন, কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, একটা জটিল রহস্য দিয়ে যে আপনাকে সংবর্ধনা করব তার উপায় নেই। আমাদের এলাকায় রহস্য জিনিসটার একান্ত অভাব। সব খোলাখুলি। চুরি বাটপাড়ি যে হয় না তা নয়, কিন্তু তাতে বুদ্ধি খেলাবার অবকাশ নেই।'

ব্যোমকেশও হাসিয়া বলিল, 'সেটা আমার পক্ষে ভালই। জটিল রহস্য এবং আরও অনেক লোভনীয় বস্তু থেকে আমি উপস্থিত বঞ্চিত। ডাক্তারের বারণ।'

এই সময় আর একজন অতিথি দেখা দিলেন। ইনি স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা। কৃশ ব্যক্তিত্বহীন চেহারা, তাই বোধ করি মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখিয়া চেহারায় একটু বৈশিষ্ট্য দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বয়স যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি একটা অনির্দিষ্ট স্থানে।

মহীধরবাবু বলিলেন, 'অমরেশবাবু, আপনি ব্যোমকেশ-বাবুকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন—এই নিন।'

অমরেশবাবু নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'কীর্তিমান পুরুষকে দেখবার ইচ্ছে কার না হয়? আপনারাও কম ব্যস্ত হন নি, শুধু আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'কিন্তু আজ আপনি আসতে বড় দেরি করেছেন। সকলেই এসে গেছেন, কেবল প্রোফেসার সোম বাকি। তা তাঁর না হয় একটা ওজুহাত আছে। মেয়েদের সাজসজ্জা করতে একটু দেরি হয়। আপনার সে ওজুহাতও নেই। ব্যাঙ্ক তো সাড়ে তিনটের সময় বন্ধ হয়ে গেছে।'

অমরেশ রাহা বলিলেন, 'তাড়াতাড়ি আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু বড়দিন এসে পড়ল, এখন কাজের চাপ একটু বেশী। বছর ফুরিয়ে আসছে। নূতন বছর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ত আপনারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা টানতে আরম্ভ করবেন। তার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে ত।'

ইতিমধ্যে কয়েকজন ভৃত্য বাড়ীর ভিতর হইতে বড় বড় ট্রে'তে করিয়া নানাবিধ খাদ্য-পানীয় আনিয়া টেবিলগুলির উপর রাখিতেছিল; চা, কেক, সন্দেশ, পাঁপর-ভাজা, ডালমুট ইত্যাদি। রজনী উঠিয়া গিয়া খাবারের প্লেটগুলি পরিবেশন করিতে লাগিল। কেহ কেহ নিজেই গিয়া প্লেট তুলিয়া লইয়া আহার আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসি গল্প আলাপ আলোচনা চলিল।

রজনী মিষ্টান্নের একটি প্লেট লইয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে দাঁড়াইল, হাসিমুখে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, একটু জলযোগ।'

ব্যোমকেশ আড়চোখে একবার সত্যবতীর দিকে তাকাইল, দেখিল সত্যবতী দূর হইতে একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে। ব্যোমকেশ ঘাড় চুলকাইয়া বলিল, 'আমাকে মাপ করতে হবে। এসব আমার চলবে না।'

মহীধরবাবু ঘুরিয়া ফিরিয়া খাওয়া তদারক করিতেছিলেন, বলিলেন, 'সে কি কথা! একেবারেই চলবে না? একটু

কিছু—? ওহে ডাক্তার, তোমার রোগীর কি কিছুই খাবার হুকুম নেই?'

ডাক্তার টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া এক মুঠি ডালমুট মুখে ফেলিয়া চিবাইতেছিল, বলিল, 'না খেলেই ভাল।'

ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল, 'শুনলেন ত! আমাকে শুধু এক পেয়ালা চা দিন। ভাববেন না, আবার আমরা আসব; আজকের আসাটা মুখবন্ধ মাত্র।'

মহীধরবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, 'আমার বাড়ীতে রোজ সন্ধ্যেবেলা কেউ না কেউ পায়ের ধুলো দেন। আপনারাও যদি মাঝে মাঝে আসেন সান্ধ্য-বৈঠক জমবে ভাল।'

এতক্ষণে অধ্যাপক সোম সস্ত্রীক আসিয়া পৌঁছিলেন। সোমের একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব। বস্তুতঃ লজ্জা না হওয়াই আশ্চর্য। সোম-পত্নী মালতী দেবীর বর্ণনা আমরা এখনও দিই নাই, কিন্তু আর না দিলে নয়। বয়সে তিনি স্বামীর প্রায় সমকক্ষ; কালো মোটা শরীর, থলথলে গড়ন, তাঁহার মত চক্ষু দুটি সর্বদাই সন্দিগ্ধভাবে ঘুরিতেছে, মুখশ্রী দেখিয়া কেহ মুগ্ধ হইবে সে সম্ভাবনা নাই। উপরন্তু তিনি সাজ-পোশাক করিয়া থাকিতে ভালবাসেন। আজ যেরূপ সর্বালঙ্কার ভূষিতা হইয়া চায়ের জলসায় আসিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরাদেরও চমক লাগিবার কথা। পরিধানে ডগ্‌ডগে লাল মাদ্রাজী সিল্কের শাড়ী, তার উপর সর্বাঙ্গে হীরা-জহরতের গহনা। তাঁহার পাশে সোমের কুণ্ঠিত ম্রিয়মাণ মূর্তি দেখিয়া আমাদেরই লজ্জা করিতে লাগিল।

রজনী তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল, কিন্তু মালতী দেবীর মুখে হাসি ফুটিল না। তিনি বক্রচক্ষে রজনীর মুখ হইতে স্বামীর মুখ পর্যন্ত দৃষ্টির একটি কশাঘাত করিয়া চেয়ারে গিয়া বসিলেন।

খাওয়া এবং গল্প চলিতে লাগিল। ব্যোমকেশ মুখে শহীদের ন্যায় ভাবব্যঞ্জনা ফুটাইয়া চুমুক দিয়া দিয়া চা খাইতেছে; আমি নকুলেশবাবুর সহিত আলাপ করিতে করিতে পানাহার করিতেছি; ঊষানাথবাবু গম্ভীরমুখে পুরন্দর পাণ্ডের কথা শুনিতে শুনিতে ঘাড় নাড়িতেছেন; তাঁহার ছেলেটি লুব্ধভাবে খাবারের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইয়া শঙ্কিত-মুখে আবার ফিরিয়া আসিতেছে, তাহার মা খাবারের একটি প্লেট হাতে ধরিয়া পর্যায়ক্রমে ছেলে ও স্বামীর দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এই সময় বাক্যালাপের মিলিত কলস্বরের মধ্যে মহীধরবাবুর ঈষদুচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল, 'মিষ্টার পাণ্ডে খানিক আগে বলছিলেন যে আমাদের এলাকায় জটিল রহস্যের একান্ত অভাব। এ কথা কতদূর সত্য আপনারাই বিচার করুন। কাল রাত্রে আমার বাড়ীতে চোর ঢুকেছিল।'

ঘরশুদ্ধ নীরব হইল; সকলের দৃষ্টি গিয়া পড়িল মহীধরবাবুর উপর। তিনি হাস্যবিকশিত মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, যেন সংবাদটা ভারি কৌতুকপ্রদ।

অমরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিছু চুরি গেছে নাকি?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'সেইটেই জটিল রহস্য। ড্রয়িং-রুমের দেয়াল থেকে একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ চুরি গেছে। রাত্রে কিছু জানতে পারি নি, সকালবেলা দেখলাম ছবি নেই, আর একটা জানলা খোলা রয়েছে।'

পুরন্দর পাণ্ডে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'ছবি! কোন্ ছবি?'

'একটা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ। মাসখানেক আগে আমরা পিক্‌নিকে গিয়েছিলাম, সেই সময় নকুলেশ বাবু তুলেছিলেন।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'হুঁ। আর কিছু চুরি করে নি? ঘরে দামী জিনিষ কিছু ছিল?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'কয়েকটা রূপোর ফুলদানী ছিল; তা ছাড়া পাশের ঘরে অনেক রূপোর বাসন ছিল। চোর এসব কিছু না নিয়ে স্রেফ একটি ফটো নিয়ে পালাল। বলুন দেখি জটিল রহস্য কি না?'

পাণ্ডে তাচ্ছিল্যভরে হাসিয়া বলিলেন, 'জটিল রহস্য মনে করতে চান মনে করতে পারেন। আমার তো মনে হয় কোনও জংলী সাঁওতাল জানলা খোলা পেয়ে ঢুকেছিল, তারপর ছবির সোনালী ফ্রেমের লোভে ছবিটা নিয়ে গেছে।'

মহীধরবাবু ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার কি মনে হয়?'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ ইঁহাদের সওয়াল জবাব শুনিতেছিল বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষু অলসভাবে চারিদিকে ঘুরিতেছিল। সে এখন একটু সচেতন হইয়া বলিল, 'মিষ্টার পাণ্ডে ঠিকই ধরেছেন মনে হয়। নকুলেশবাবু, আপনি ছবি তুলেছিলেন?'

নকুলেশবাবু বলিলেন, 'হাঁ। ছবিখানা ভাল হয়েছিল। তিন কপি ছেপেছিলাম। তার মধ্যে এক কপি মহীধর বাবু নিয়েছিলেন—'

ঊষানাথবাবু গলা ঝাড়া দিয়া বলিলেন, 'আমিও একখানা কিনেছিলাম।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার ছবিখানা আছে তো?'

ঊষানাথবাবু বলিলেন, 'কি জানি। এল্‌বামে রেখেছিলাম, তারপর আর দেখি নি। আছে নিশ্চয়।'

'আর তৃতীয় ছবিটি কে নিয়েছিলেন, নকুলেশবাবু?'

'প্রোফেসর সোম।'

আমরা সকলে সোমের পানে তাকাইলাম। তিনি এতক্ষণ নির্জীব ভাবে স্ত্রীর পাশে বসিয়াছিলেন, নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। সোম-গৃহিণীর কিন্তু কোনও

প্রকার ভাবান্তর দেখা গেল না; তিনি কষ্টিপাথরের যক্ষিণী-মূর্তির ন্যায় অটল হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার ছবিটা নিশ্চয় আছে!'

সোম উত্তপ্তমুখে বলিলেন, 'হ্যাঁ—তা—বোধ হয়—ঠিক বলতে পারি না—'

তাঁহার ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয়, তিনি এমন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন কেন?

তাঁহাকে সঙ্কটাবস্থা হইতে উদ্ধার করিলেন অমরেশবাবু, হাসিয়া বলিলেন, 'তা গিয়ে থাকে যাক গে, আর একখানা নেবেন। নকুলেশবাবু, আমারও কিন্তু একখানা চাই। আমিও গ্রুপে ছিলাম।'

নকুলেশবাবু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, 'ও ছবিটা আর পাওয়া যাবে না। নেগেটিভ খুঁজে পাচ্ছি না।'

'সে কি! কোথায় গেল নেগেটিভ!'

দেখিলাম, ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নকুলেশ বাবুর পানে চাহিয়া আছে। তিনি বলিলেন, 'আমার ষ্টুডিওতে অন্যান্য নেগেটিভের সঙ্গে ছিল। আমি দিন দুয়েকের জন্যে কলকাতা গিয়েছিলাম, ষ্টুডিও বন্ধ ছিল; ফিরে এসে আর সেটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'ভাল করে খুঁজে দেখবেন। নিশ্চয় কোথাও আছে, যাবে কোথায়।'

এ প্রসঙ্গ লইয়া আর কোনও কথা হইল না। এদিকে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল। আমরা গাত্রোত্থানের উদ্যোগ করিলাম; কারণ সূর্যাস্তের পর ব্যোমকেশকে বাহিরে রাখা নিরাপদ নয়।

এই সময় দেখিলাম একটি প্রেতাকৃতি লোক কখন আসিয়া মহীধর বাবুর পাশে দাঁড়াইয়াছে এবং নিম্নস্বরে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। লোকটি যে নিমন্ত্রিত অতিথি নয় তাহা তাহার বেশবাস দেখিয়াই অনুমান করা যায়। দীর্ঘ কঙ্কালসার দেহে আধ ময়লা ধুতি ও সুতির কামিজ, চক্ষু এবং গণ্ডস্থল কোটরপ্রবিষ্ট, যেন মূর্তিমান দুর্ভিক্ষ। তবু লোকটি যে ভদ্রশ্রেণীর তাহা বোঝা যায়।

মহীধরবাবু আমার অনতিদূরে উপবিষ্ট ছিলেন, তাই তাঁহাদের কথাবার্তা কানে আসিল। মহীধরবাবু একটু অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, 'আবার কি চাই বাপু? এই তো পরশু তোমাকে টাকা দিয়েছি।'

লোকটি ব্যগ্র-বিহ্বল স্বরে বলিল, 'আজ্ঞে আমি টাকা চাই না। আপনার একটা ছবি এঁকেছি তাই দেখাতে এসেছিলাম।'

'আমার ছবি!'

লোকটির হাতে এক তা পাকানো কাগজ ছিল, সে তাহা খুলিয়া মহীধরবাবুর চোখের সামনে ধরিল।

মহীধরবাবু সবিস্ময়ে ছবির পানে চাহিয়া রহিলেন। আমারও কৌতূহল হইয়াছিল, উঠিয়া গিয়া মহীধরবাবুর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইলাম।

ছবি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সাদা কাগজের উপর ক্রেয়নের আঁকা ছবি, মহীধরবাবুর বুক পর্যন্ত প্রতিকৃতি; পাকা হাতের নিঃসংশয় কয়েকটি রেখায় মহীধরবাবুর অবিকল চেহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমার দেখাদেখি রজনীও আসিয়া পিতার পিছনে দাঁড়াইল এবং ছবি দেখিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল, 'বাঃ! কি সুন্দর ছবি!'

তখন আরও কয়েকজন আসিয়া জুটিলেন। ছবিখানা হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল এবং সকলের মুখেই প্রশংসা গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত চিত্রকর অদূরে দাঁড়াইয়া গদ্গদ মুখে দুই হাত ঘষিতে লাগিল।

মহীধরবাবু তাহাকে বলিলেন, 'তুমি তো খাসা ছবি আঁকতে পার! তোমার নাম কি?'

চিত্রকর বলিল, 'আজ্ঞে আমার নাম ফাল্গুনী পাল।'

মহীধরবাবু পকেট হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া প্রসন্ন স্বরে বলিলেন, 'বেশ বেশ। ছবিখানি আমি নিলাম। এই নাও তোমার পুরস্কার।'

ফাল্গুনী পাল কাঁকড়ার মত হাত বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ নোট পকেটস্থ করিল।

পুরন্দর পাণ্ডে ললাট কুঞ্চিত করিয়া ছবিখানা দেখিতেছিলেন, হঠাৎ মুখ তুলিয়া ফাল্গুনীকে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি ওঁর ছবি আঁকলে কি করে? কোত্থেকে?'

ফাল্গুনী বলিল, 'আজ্ঞে না। ওঁকে পরশুদিন একবার দেখেছিলাম—তাই—'

'একবার দেখেছিলে তাতেই ছবি এঁকে ফেললে?'

ফাল্গুনী আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে আমি পারি। আপনি যদি হুকুম দেন আপনার ছবি এঁকে দেব।'

পাণ্ডে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা বেশ। তুমি যদি আমার ছবি এঁকে আনতে পার, আমিও তোমাকে দশ টাকা বক্‌শিস্ দেব।'

ফাল্গুনী পাল সবিনয়ে সকলকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। পাণ্ডে ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'দেখা যাক। আমি ওঁদের পিক্‌নিক্ গ্রুপে ছিলাম না।'

ব্যোমকেশ অনুমোদনসূচক ঘাড় নাড়িল।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল। মহীধরবাবুর মোটর আমাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। সোম-দম্পতিও আমাদের সঙ্গে ফিরিলেন।

৩

রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় আমরা তিন জন বসিবার ঘরে দোরতাড়া বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম। নৈশ আহারের এখনও বিলম্ব আছে। ব্যোমকেশ আরাম কেদারায় বসিয়া বলবর্দ্ধক ডাক্তারি মত চুমুক দিয়া দিয়া পান করিতেছে; সত্যবতী তাহার পাশে একটা চেয়ারে র্যাপার মুড়ি দিয়া বসিয়াছে। আমি সম্মুখে বসিয়া মাঝে মাঝে পকেট হইতে সিগারেটের ডিবা বাহির করিতেছি, আবার রাখিয়া দিতেছি। ব্যোমকেশের গঞ্জনা খাইবার আর ইচ্ছা নাই। চায়ের জলসার আলোচনাই হইতেছে।

আমি বলিলাম, 'আমরা শিল্প-সাহিত্যের কত আদর করি ফাল্গুনী পাল তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। লোকটা সত্যিকার গুণী, অথচ পেটের দায়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।'

ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক ছিল, বলিল, 'পেটের দায়ে ভিক্ষে করছে তুমি জানলে কি করে?'

বলিলাম, 'ওর চেহারা আর কাপড়-চোপড় দেখে পেটের অবস্থা আন্দাজ করা শক্ত নয়।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, 'শক্ত নয় বলেই তুমি ভুল আন্দাজ করেছ। তুমি সাহিত্যিক, শিল্পীর প্রতি তোমার সহানুভূতি স্বাভাবিক। কিন্তু ফাল্গুনী পালের শারীরিক দুর্গতির কারণ অন্নাভাব নয়। আসলে খাদ্যের চেয়ে পানীয়ের প্রতি তার টান বেশী।'

'অর্থাৎ মাতাল? তুমি কি করে বুঝলে?'

'প্রথমত, তার ঠোঁট দেখে। মাতালের ঠোঁট যদি লক্ষ্য কর, দেখবে বৈশিষ্ট্য আছে; একটু ভিজে ভিজে, একটু শিথিল—ঠিক বুঝাতে পারব না, কিন্তু দেখলে বুঝতে পারি। দ্বিতীয়ত, ফাল্গুনী যদি ক্ষুধার্ত হ'ত তা হলে খাদ্যদ্রব্যগুলোর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করত, টেবিলের উপর তখনও প্রচুর খাবার ছিল। কিন্তু ফাল্গুনী সেদিকে একবার ফিরেও তাকাল না। তৃতীয়তঃ, আমার পাশ দিয়ে যখন চলে গেল তখন তার গায়ে মদের গন্ধ পেলাম। খুব স্পষ্ট নয়, তবু মদের গন্ধ।' বলিয়া ব্যোমকেশ নিজের বল-বর্দ্ধক ঔষধটি তুলিয়া লইয়া এক চুমুক পান করিল।

সত্যবতী বলিল, 'যাক গে, মাতালের কথা শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু ছবি চুরির এ কি ব্যাপার গা? আমি ত কিছু বুঝতেই পারলাম না। মিছিমিছি ছবি চুরি করবে কেন?'

ব্যোমকেশ কতকটা আপন মনেই বলিল, 'হয়তো পাণ্ডে-সাহেব ঠিকই বলেছেন। কিন্তু—। যদি তা না হয় তা হলে ভাববার কথা।...পিক্‌নিকে গ্রুপ-ছবি তোলা হয়েছিল। আজ চায়ের পার্টিতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই পিক্‌নিকে ছিলেন—পাণ্ডে ছাড়া।...ছবির তিনটে কপি ছাপা হয়েছিল; তার মধ্যে একটা চুরি গেছে, বাকি দুটো আছে কিনা জানা যায় নি—নেগেটিভটাও পাওয়া যাচ্ছে না।—' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ইনি ছবির কথায় এমন ঘাবড়ে গেলেন কেন বুঝা গেল না।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর আমি বলিলাম, 'কেউ যদি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ছবিটা সরিয়ে থাকে তবে সে উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উদ্দেশ্য কি একটা অদ্ভুত? কে কোন্ মতলবে ফিরছে তা কি অত সহজে ধরা যায়? গহনা কর্ম্মণো গতিঃ। সেদিন একটা মার্কিন পত্রিকায় দেখছিলাম, ওদের কোন্ একটা জু'তে এক বানর-দম্পতি আছে। পুরুষ বাঁদরটা এমনি হিংসুটে, কোনও পুরুষ-দর্শক খাঁচার কাছে এলেই বৌকে টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে।'

সত্যবতী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'তোমার যত সব আষাঢ়ে গল্প। বাঁদরের কখনও এত বুদ্ধি হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা বুদ্ধি নয়, হৃদয়াবেগ; সরল ভাষায় যৌন ঈর্ষা। মানুষের মধ্যেও যে ও-বস্তুটি আছে আশা করি তা অস্বীকার করবে না। পুরুষের মধ্যে ত আছেই, মেয়েদের মধ্যে আরও বেশী আছে। আমি যদি মহীধরবাবুর মেয়ে রজনীর সঙ্গে বেশী মাখামাখি করি তোমার ভাল লাগবে না।'

সত্যবতী র্যাপারের একটা প্রান্ত ঠোঁটের উপর ধরিয়া নত চক্ষে চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'কিন্তু এই ঈর্ষার সঙ্গে ছবি চুরির সম্বন্ধটা কি?'

'যেখানে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা আছে সেইখানেই এ ধরণের ঈর্ষা থাকতে পারে।' বলিয়া ব্যোমকেশ ঊর্দ্ধমুখে ছাদের পানে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম, 'মোটিভ্ খুব জোরালো মনে হচ্ছে না। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে না কি?'

'পারে। চিত্রকর ফাল্গুনী পাল চুরি করে থাকতে পারে। একটা মানুষকে একবার মাত্র দেখে সে ছবি আঁকতে পারে, তার এই দাবি সম্ভবত মিথ্যে। ফটো দেখে ছবি সহজেই আঁকা যায়। ফাল্গুনী সকলের চোখে চমক লাগিয়ে দিয়ে বেশী টাকা রোজগার করবার চেষ্টা করছে কিনা কে জানে!'

'হুঁ। আর কিছু?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'ফটোগ্রাফার নকুলেশবাবু স্বয়ং ছবি চুরি করে থাকতে পারেন।'

'নকুলেশবাবুর স্বার্থ কি?'

'তাঁর ছবি আরও বিক্রি হবে এই স্বার্থ।' বলিয়া ব্যোমকেশ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

'এটা সম্ভব বলে তোমার মনে হয়?'

'ব্যবসাদারের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। আমেরিকায় ফসলের দাম বাড়াবার জন্য ফসল পুড়িয়ে দেয়।'

'আচ্ছা। আর কেউ?'

'ঐ দলের মধ্যে হয়তো এমন কেউ আছে যে নিশ্চিহ্নভাবে নিজের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে চায়—'

'মানে—দাগী আসামী?'

এই সময় ঘরের বন্ধ দ্বারে মৃদু টোকা পড়িল। আমি গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। অধ্যাপক সোম গরম ড্রেসিং গাউন পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে স্বাগত করিলাম। আমরা আসা অবধি তিনি প্রায় প্রত্যহ এই সময় একবার নামিয়া আসেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজব হয়; তার পর আহারের সময় হইলে তিনি চলিয়া যান। তাঁহার গৃহিণী দিনের বেলা দু'একবার আসিয়াছেন বটে, কিন্তু সত্যবতীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিবার আগ্রহ তাঁহার দেখা যায় নাই। সত্যবতীও মহিলাটির প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে নাই।

সোম আসিয়া বসিলেন। তাঁহাকে একটি সিগারেট দিয়া নিজে একটি ধরাইলাম। ব্যোমকেশের সাক্ষাতে ধূমপান করিবার এই একটা সুযোগ; সে খিঁচাইতে পারিবে না।

সোম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ পার্টি কেমন লাগল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ লাগল। সকলেই বেশ কর্ষিত-চিত্ত ভদ্রলোক বলে মনে হ'ল।'

সোম সিগারেটে একটা টান দিয়া বলিলেন, 'বাইরে থেকে সাধারণতঃ তাই মনে হয়। কিন্তু সেকথা আপনার চেয়ে বেশী কে জানে? মিসেস্ বক্সী, আজ যাঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কাকে ভাল লাগল বলুন।'

সত্যবতী নিঃসংশয়ে বলিল, 'রজনীকে। ভারি সুন্দর স্বভাব, আমার বড্ড ভাল লেগেছে।'

সোমের মুখে একটু অরুণাভা ফুটিয়া উঠিল। সত্যবতী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া চলিল, 'যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি মিষ্টি কথা; আর ভারি বুদ্ধিমতী।—আচ্ছা, মহীধরবাবু এখনও মেয়ের বিয়ে কেন দিচ্ছেন না? ওঁর তো টাকার অভাব নেই।'

দ্বারের নিকট হইতে একটি তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিলাম—

'বিধবা! বিধবা! বিধবাকে কোন্ হিঁদুর ছেলে বিয়ে করবে?'

মালতী দেবী কখন দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন জানিতে পারি নাই। সংবাদটি যেমন অপ্রত্যাশিত, সংবাদ-দাত্রীর আবির্ভাবও তেমনি বিস্ময়কর। হতভম্ব হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। মালতী দেবী ঈর্ষাতিক্ত নয়নে আমাদের একে একে নিরীক্ষণ করিয়া আবার বলিলেন, 'বিশ্বাস হচ্ছে না? উনি জানেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন। এখানে সবাই জানে। অতি বড় বেহায়া না হলে বিধবা মেয়ে আইবুড়ো সেজে বেড়ায় না। কিন্তু দু'কান কাটার কি লজ্জা আছে? আর যে ছলা-কলা ওসব পুরুষ ধরবার ফাঁদ।'

মালতী দেবী যেমন আচম্বিতে আসিয়াছিলেন তেমনি অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন। সিঁড়িতে তাঁর দুম্ দুম্ পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অভিভূত হইয়াছিলেন অধ্যাপক সোম। তিনি লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিতেছিলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। শেষে তিনি বিড়ম্বিত মুখ তুলিয়া দীনকণ্ঠে বলিলেন, 'আমাকে আপনারা মাপ করুন। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় কোথাও পালিয়ে যাই—' তাঁর স্বর বুজিয়া গেল।

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে প্রশ্ন করিল, 'রজনী সত্যিই বিধবা?'

সোম ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হ্যাঁ। চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়। মহীধরবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কৃতী ছাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের দু'দিন পরে প্লেনে চড়ে সে বিলেত যাত্রা করে; মহীধরবাবুই জামাইকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে বিলেত পর্যন্ত পৌঁছুল না; পথেই বিমান-দুর্ঘটনা হয়ে মারা গেল। কাজেই রজনীকে কুমারী বলা চলে।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি সোমকে আর একটি সিগারেট দিলাম এবং দেশলাই জ্বালাইয়া ধরিলাম। সিগারেট ধরাইয়া সোম বলিলেন, 'আপনারা আমার পারিবারিক পরিস্থিতি বুঝতেই পেরেছেন। আমার জীবনের ইতিহাসও অনেকটা মহীধরবাবুর জামাইয়ের মত। গরীবের ছেলে ছিলাম এবং ভাল ছাত্র ছিলাম। বিয়ে করে শ্বশুরের টাকায় বিলেত যাই। কিন্তু উপসংহারটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের হ'ল। আমি বিদ্যালাভ করে ফিরে এলাম এবং এক কলেজের অধ্যাপক হলাম। কিন্তু বেশীদিন টিকতে পারলাম না। কাজ ছেড়ে দিয়ে আজ সাত বছর এখানে বাস করছি। অন্ন-বস্ত্রের অভাব নেই; আমার স্ত্রীর অনেক টাকা।'

কথাগুলিতে অন্তরের তিক্ততা ফুটিয়া উঠিল। আমি একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাজ ছেড়েছিলেন কেন?'

সোম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'লজ্জায়। স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে স্ত্রীকে ঘরে বন্ধ করে রাখা যায় না—অথচ—। মাঝে মাঝে ভাবি, বিমান-দুর্ঘটনাটা যদি রজনীর স্বামীর না হয়ে আমার হ'ত, সব দিক দিয়েই সুরাহা হ'ত।'

সোম দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। ব্যোমকেশ পিছন

হইতে বলিল, 'প্রোফেসার সোম, যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করি। যে গ্রুপ ছবিটা কিনেছিলেন সেটা কোথায়?'

সোম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'সেটা আমার স্ত্রী কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তাতে আমি আর রজনী পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম।'

সোম নীরবপদে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে আহারে বসিয়া বেশী কথাবার্তা হইল না। হঠাৎ এক সময় সত্যবতী বলিয়া উঠিল, 'যে যাই বলুক, রজনী ভারি ভাল মেয়ে। কম বয়সে বিধবা হয়েছে, বাপ যদি সাজিয়ে গুজিয়ে রাখতে চান তাতে দোষ কি?'

ব্যোমকেশ একবার সত্যবতীর পানে তাকাইল, তারপর নির্লিপ্ত স্বরে বলিল, 'আজ পার্টিতে একটা সামান্য ঘটনা লক্ষ্য করলাম, তোমাদের বোধ হয় চোখে পড়ে নি। মহীধরবাবু তখন ছবি চুরির গল্প আরম্ভ করেছেন, সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে। দেখলাম, ডাক্তার ঘটক একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, রজনী চুপি চুপি তার কাছে গিয়ে তার পকেটে একটা চিঠির মতন ভাঁজ করা কাগজ ফেলে দিলে। দু'জনের মধ্যে একটা চকিত চাউনি খেলে গেল। তারপর রজনী সেখান থেকে সরে এল। আমার বোধ হয় আমি ছাড়া এ দৃশ্য আর কেউ লক্ষ্য করে নি। মালতী দেবীও না।'

৪

দিন পাঁচ ছয় কাটিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশের শরীর এই কয়দিনে আরও সারিয়াছে। তাহার আহার্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি পাইয়াছে; সত্যবতী তাহাকে দিনে দুইটি সিগারেট খাইবার অনুমতি দিয়াছে। আমি নিত্য গুরুভোজনের ফলে দিন দিন খোদার খাসী হইয়া উঠিতেছি, সত্যবতীর গায়েও গত্তি লাগিয়াছে। এখন আমরা প্রত্যহ বৈকালে ব্যোমকেশকে লইয়া রাস্তায় রাস্তায় পাদচারণ করি, কারণ হাওয়া বদলের ইহা একটা অপরিহার্য অঙ্গ। সকলেই খুশী।

এক দিন আমরা পথ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছি, অধ্যাপক সোম আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, বলিলেন, 'চলুন, আজ আমিও আপনাদের সহযাত্রী।'

সত্যবতী একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল,—'মিসেস্ সোম কি—?'

সোম প্রফুল্ল স্বরে বলিলেন, তাঁর সর্দি হয়েছে। শুয়ে আছেন।

সোম মিশুক লোক, কেবল স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে একটু নির্জীব হইয়া পড়েন। আমরা নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

ছবি চুরির প্রসঙ্গ আপনা হইতেই উঠিয়া পড়িল। ব্যোমকেশ বলিল, আচ্ছা বলুন দেখি, ঐ ছবিখানা কাগজে বা পত্রিকায় ছাপাবার কোনও প্রস্তাব হয়েছিল কি?

সোম চকিতে একবার ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তার পর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, কৈ আমি ত কিছু জানি না। তবে নকুলেশ বাবু মাঝে কলকাতা গিয়েছিলেন বটে। কিন্তু আমাদের না জানিয়ে তিনি ছবি ছাপতে দেবেন কি? মনে হয় না। বিশেষত ডেপুটি উষানাথ বাবু জানতে পারলে ভারি অসন্তুষ্ট হবেন।

উষানাথ বাবু অসন্তুষ্ট হবেন কেন?

উনি একটু অদ্ভুত গোছের লোক। বাইরে বেশ প্রাস্তারি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীরু প্রকৃতি। বিশেষত ইংরেজ মনিবকে * যমের মত ভয় করেন। সাহেবেরা বোধ হয় চায় না যে এক জন হাকিম সাধারণ লোকের সঙ্গে ফটো তোলাবে, তাই উষানাথবাবুর ফটো তোলাতে ঘোর আপত্তি। মনে আছে, পিক্‌নিকের সময় তিনি প্রথমটা ফটোর দলে থাকতে চান নি, অনেক বলে-কয়ে রাজী করাতে হয়েছিল। এ ছবি যদি কাগজে ছাপা হয় নকুলেশ বাবুর কপালে দুঃখ আছে।

ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম সে মনে মনে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, উষানাথ বাবু কি সব সময়েই কালো চশমা পরে থাকেন?

সোম বলিলেন, হাঁ। উনি বছর দেড়েক হ'ল এখানে বদলি হয়ে এসেছেন, তার মধ্যে আমি ওঁকে কখনও বিনা চশমায় দেখি নি। হয় ত চোখের কোনও দুর্বলতা আছে, ভদ্রলোক আলো সহ্য করতে পারেন না।

ব্যোমকেশ উষানাথবাবু সম্বন্ধে আর কোনও প্রশ্ন করিল না। হঠাৎ বলিল, ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার লোকটি কেমন?

সোম বলিলেন, চতুর ব্যবসাদার, ঘটে বুদ্ধি আছে। মহীধরবাবুকে খোশামোদ করে চলেন, শুনেছি তাঁর কাছে টাকা ধার নিয়েছেন।

তাই নাকি! কত টাকা?

তা ঠিক জানি না। তবে মোটা টাকা।

এই সময় সামনে ফট্ ফট্ শব্দ শুনিয়া দেখিলাম একটি মোটর বাইক আসিতেছে। আরও কাছে আসিলে চেনা গেল, আরোহী ডি-এস্-পি পুরন্দর পাণ্ডে। তিনিও আমাদের চিনিয়াছিলেন, মোটর বাইক থামাইয়া সহাস্যমুখে অভিবাদন করিলেন।

কুশল প্রশ্ন আদান-প্রদানের পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, ফাল্গুনী পাল আপনার ছবি এঁকেছে?

* যে সময়ের গল্প তখনও ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয় নাই।

পাণ্ডে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, তাজ্জব ব্যাপার মশাই। পর দিনই ছবি নিয়ে হাজির। একেবারে হুবহু ছবি এঁকেছে। অথচ আমার ফটো তার হাতে যাবার কোনই সম্ভাবনা নেই। সত্যি গুণী লোক। দশ টাকা খসাতে হ'ল।

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, কোথায় থাকে সে?

পাণ্ডে বলিলেন, আর বলবেন না। অতবড় গুণী কিন্তু একেবারে হতভাগা। পাঁড় নেশাখোর—মদ গাঁজা গুলী কোকেন কিছুই বাদ যায় না। মাসখানেক এখানে এসেছে। এখানে এসে যেখানে সেখানে পড়ে থাকত, কোনও দিন কারুর বারান্দায়, কোনও দিন কারুর খড়ের গাদায় রাত কাটাত। মহীধরবাবু দয়া করে নিজের বাগানে থাকতে দিয়েছেন। ওঁর বাগানের কোণে একটা মেটে ঘর আছে, দু'দিন থেকে সেখানেই আছে।

হতভাগ্য এবং চরিত্রহীন শিল্পীর যে-দশা হয় ফাল্গুনীরও তাহাই হইয়াছে। তবু কিছুদিনের জন্যও সে একটা আশ্রয় পাইয়াছে জানিয়া মনটা আশ্বস্ত হইল।

পাণ্ডে আবার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিবার উপক্রম করিলে সোম বলিলেন, আপনি এদিকে চলেছেন কোথায়?

পাণ্ডে বলিলেন, মহীধরবাবুর বাড়ীর দিকেই যাচ্ছি। নকুলেশ বাবুর মুখে শুনলাম তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই বাড়ী যাবার পথে তাঁর খবর নিয়ে যাব।

কি অসুখ?

সামান্য সর্দিকাশি। কিন্তু ওঁর আবার হাঁপানির ধাত।

সোম বলিলেন, তাই ত, আমারও দেখতে যাওয়া উচিত। মহীধরবাবু আমাকে বড়ই স্নেহ করেন—

পাণ্ডে বলিলেন—বেশ ত, আমার গাড়ীর পিছনের সীটে উঠে বসুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক। ফেরবার সময় আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।

'তা হলে ত ভালই হয়', বলিয়া সোম মোটর বাইকের পিছনে গদি-আঁটা আসনটিতে বসিয়া পাণ্ডের কোমর জড়াইয়া লইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, আচ্ছা, মহীধরবাবুকে বলে দেবেন আমরা কাল বিকেলে যাব।

আচ্ছা। নমস্কার।

মোটর বাইক দুই জন আরোহী লইয়া চলিয়া গেল। আমরাও বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশ আপন মনে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে। বাড়ী ফিরিয়া চা পান করিতে বসিলাম। ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। দরজা খোলা ছিল; সিঁড়ির উপর ভারী পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ব্যোমকেশ চকিত হইয়া খাটো গলায় বলিল, অধ্যাপক সোম কোথায় গেছেন এ প্রশ্নের যদি জবাব দেবার দরকার হয়, ব'লো তিনি মিষ্টার পাণ্ডের বাড়ীতে গেছেন।

কথাটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। মালতী দেবী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সর্দিতে তাঁহার মুখখানা আরও ভারী হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু রক্তাভ; তিনি ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। সত্যবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আসুন মিসেস সোম।

মালতী দেবী ধরা ধরা গলায় বলিলেন, না, আমার শরীর ভাল নয়। উনি আপনাদের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন, কোথায় গেলেন?

ব্যোমকেশ দ্বারের কাছে আসিয়া সহজ সুরে বলিল, রাস্তায় পাণ্ডে সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি প্রোফেসর সোমকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

মালতী দেবী বিস্ময় ভরে বলিলেন, পুলিসের পাণ্ডে? ওঁর সঙ্গে তার কি দরকার?

ব্যোমকেশ সরলভাবে বলিল, তা তো কিছু শুনলাম না। পাণ্ডে বললেন, চলুন আমার বাড়ীতে চা খাবেন। হয় ত কোনও কাজের কথা আছে।

মালতী দেবী আমাদের তিন জনের মুখ ভাল করিয়া দেখিলেন, একটা গুরুভার নিশ্বাস ফেলিলেন, তার পর আর কোনও কথা না বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম।

ব্যোমকেশ আমাদের পানে চাহিয়া একটু লজ্জিত ভাবে হাসিল, বলিল, ডাঁহা মিথ্যে কথা বলতে হ'ল। কিন্তু উপায় কি? বাড়ীতে দাম্পত্য-দাঙ্গা হওয়াটা কি ভাল?

সত্যবতী বাঁকা সুরে বলিল, তোমাদের সহানুভূতি কেবল পুরুষের দিকে। মিসেস সোম যে সন্দেহ করেন সে নেহাত মিছে নয়।

ব্যোমকেশেরও স্বর গরম হইয়া উঠিল, আর তোমাদের সহানুভূতি কেবল মেয়েদের দিকে। স্বামীর ভালবাসা না পেলে তোমরা হিংসের চৌচির হয়ে যাও, কিন্তু স্বামীর ভালবাসা কি করে রাখতে হয় তা জান না।—যাক, অজিত, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই; বাইরের বারান্দায় পাহারা দিতে হবে। সোম ফিরলেই তাঁকে চেতিয়ে দেওয়া দরকার, নৈলে মিথ্যে কথা যদি ধরা পড়ে যায় তা হলে সোম ত যাবেই, সেই সঙ্গে আমাদেরও অশেষ দুর্গতি হবে।

আমার কোনই আপত্তি ছিল না। বাহিরের বারান্দায় একটা চেয়ার পড়িয়া থাকিত, তাহাতে বসিয়া মনের সুখে সিগারেট টানিতে লাগিলাম। বাহিরে একটু ঠাণ্ডা বেশী, কিন্তু আলোয়ান গায়ে থাকিলে কষ্ট হয় না।

সোম ফিরিলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। পাণ্ডের মোটর

ঘাইক কই কই শব্দে ফটকের বাহিরে দাঁড়াইল, সোমকে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তিনি বারান্দায় উঠিলে আমি বলিলাম, শুনে যান। কথা আছে।

বসিবার ঘরে ব্যোমকেশ একলা ছিল। সোমের মুখ দেখিলাম, গম্ভীর ও কঠিন। ব্যোমকেশ বলিল, মহীধরবাবু কেমন আছেন?

সোম সংক্ষেপে বলিলেন, ভালই।

ওখানে আর কেউ ছিল নাকি?

শুধু ডাক্তার ঘটক।

ব্যোমকেশ তখন মালতী-সংবাদ সোমকে শুনাইল। সোমের গম্ভীর মুখে একটু হাসি ফুটিল। তিনি বলিলেন, —'ধন্যবাদ।'

ক্রমশঃ

আগ্নেয় রজনী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অস্থির অশান্ত যুগে পথান্বেষী সমাজের ছায়া
পড়েছে কি আজ তব মুক্ত বাতায়নে!
ঐতিহ্যের উপকণ্ঠে উৎকণ্ঠিত মরণের মায়া
এ মরু বাস্তব ছুঁয়ে তন্দ্রা জাগরণে
প্রত্যক্ষ হ'ল কি তব?
বঞ্চিত পন্থায় যেথা পান্থ জনে দীর্ণতর হয়ে
এসে যেন মত্ত আশা আলস্য বিলাসে,
অন্ধ বন্ধ বধিরের প্রাত্যহিক আর্তনাদ লয়ে
জীবন-সাগর হ'তে বিশ্বচিন্তাকাশে
বিষবাষ্প ওঠে সব।
তুমি দূর মননের শিল্প এঁকে রাখিবে কোথায়?
দুর্য্যোগ উৎসবে হের বনবীথি শিহরে ব্যথায়।

আগ্নেয় রজনী এলো আঁধারের ব্যূহ ভেদ ক'রে
অশান্তির কোলাহল আর কলরবে
আদিগন্ত নীল নভে
লক্ষ তারা ঝরে!
গলিত উল্কা সব স্খলিত প্রহরে।
শ্মশানের বক্ষে জ্বলে চিতা: চাঁদ ডুবে গেছে কবে!
কালের রুধির যাত্রা চলে অবিরত,
তুমি তো জানিলে নাকো কত প্রাণ দুঃখে হ'ল গত!
কত যৌবনের আশা টুটে গেল নিমেষে সহসা,
নেমে এলো তাই ঘরে অবিশ্রান্ত দুঃখের বরষা।

ঘুরে ঘুরে যায় যেথা অবসন্ন পায়ে-চলা পথে
যাত্রীদল—কাঁদে ক্লান্ত তব মনোরথে:
হৃদয়ের ক্ষতে
সান্ত্বনা-প্রলেপ কেহ দিয়েছে কি?—প্রশ্ন জাগে মনে।
শক্তির মূঢ়তা লয়ে যুগবদ্ধ বর্ব্বরের সনে
চলে ইতিহাস।
ঔদ্ধত্যের অভিযানে শান্তি কোন বাণীর সঙ্গতি।
পরিহাস করে কারা? কোন অভিলাষ
পূরিল না প্রিয়তমে! নিখিলের সন্তানসন্ততি
করে উপবাস।
রাত্রির ললাটে কোন মাঙ্গল্যের ছলে আঁক' টিপ,
বারে বারে নিবে যায় সংসারের কল্যাণ-প্রদীপ।

শোণিতের স্রোতে হায়, ডুবে গেল মূক বনস্পতি
একে একে অরণ্যের মৃত মহীরুহ।
বিশাল বিটপীশ্রেণী ভেঙে পড়ে: অসংখ্য দুর্গতি
সমাজ-সংসারে হের রচিতেছে ব্যূহ।
ভয়াবহ অনাগত দিন।
মিথ্যার বিজয়ধ্বজা উড়িতেছে শঠতার শিরে
প্রান্তরে কান্তারে কত দস্যু যাযাবর।
সত্যের শাশ্বত শক্তি পঙ্গু হ'ল জীবনের তীরে
দলিত পত্রের মত মধ্যবিত্ত ঘর;
এ নিখিল আয়ুর্বীর্য্যহীন।
তুমি তো জানিলে নাকো ভালোবাসা—তাও দিশাহারা,
প্রেমের সমাধি-তীর্থে বিরহের কোথা অশ্রুধারা!

শ্রীরঙ্গম্

শ্রীসাধনা চট্টোপাধ্যায়

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। ইচ্ছা ছিল, 'বৈকুণ্ঠ' একাদশীর দিন শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের দরবারে হাজির থাকি। কিন্তু কার্য্যগতিকে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। চিঙ্গলপুট হইয়া ত্রিচিনপল্লীর দিকে রওনা হইলাম সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশীতে।

রাত্রি সাড়ে আটটায় ত্রিচিনপল্লীতে গাড়ী পৌঁছিবার কথা। কিন্তু গাড়ী আটকা পড়িল শ্রীরঙ্গম্ ষ্টেশনে—ত্রিচিনপল্লী হইতে তিন মাইল দূরে। ষ্টেশনের অনতিদূরেই মন্দির। গাড়ী হইতে মন্দিরটি একটি অত্যুচ্চ, কিন্তু বিশালকায়, মিনারের মত দেখায়—নানা রঙের বিজলী আলোর লতা উহার দেহ বাহিয়া শিখরদেশে উঠিয়া গিয়াছে। শিখর-শীর্ষে অত্যুজ্জ্বল আলো—বহুদূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'শ্রীরঙ্গনাথ জয়তু'! ষ্টেশনে সে কি কোলাহল! পিপীলিকাশ্রেণীর মত লোক সারি বাঁধিয়া আসিতেছে, যাইতেছে। তাহার আদি নাই অন্তও নাই। চারিদিকে ভক্তের উচ্ছ্বাসময় কলকণ্ঠের সঙ্গীত, স্তোত্রপাঠ ও বন্দনাগীতি। বেশীর ভাগই তামিল ভাষায়। বুঝিবার সাধ্য নাই অথচ সুরটুকু মর্ম্ম স্পর্শ করে।

'শ্রীরঙ্গনাথ জয়তু'! অবাক হইলাম। দক্ষিণাপথ শিবের দেশ। কৈলাসপতি নটরাজের বিভিন্ন রূপের উপাসনা চারিদিকে—জয় শিব, জয় শম্ভু, জয় শূলপাণি! যে দেশে মন্দির বলিতেই 'শিব'মন্দির বুঝায় সে দেশে এত বিষ্ণুভক্ত! শ্রীরঙ্গম্ বিষ্ণুমন্দির—সারা ভারতের বৈষ্ণবদের পরম তীর্থ।

তীর্থযাত্রীদের এখন ঘরে ফিরিবার পালা। মিনিট পনর পর পর কয়েকখানা স্পেশাল ট্রেন চলিয়া গেল। ষ্টেশনে যাত্রীদের সুবিধার জন্য রেলকর্ত্তৃপক্ষ 'লাউড স্পীকারে'র বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাহাতে সকল শ্রেণীর যাত্রীদেরই সুবিধা হইয়াছে। লাউড স্পীকারে প্রচারিত ভাষা তামিল, মালায়ালম্ ও ইংরেজী।

এদিকে আমাদের আটক থাকার মেয়াদ শেষ হইল। তীর্থ হইতে ফিরিয়া-আসা প্রচুর ভক্ত বোঝাই হইয়া আমাদের গাড়ী ধীরে ধীরে ত্রিচিনপল্লী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। যতদূর দেখা গেল, আমরা মন্দিরগাত্রের আলোকমালার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ত্রিচিনপল্লী দক্ষিণাপথের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। চালুক্যদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী চোলরাজবংশ প্রথমে তাঞ্জোরে ও পরে ত্রিচিনপল্লীতে রাজধানী স্থাপন করেন। চোলরাজবংশের প্রতিপত্তি-কালে তাঁহাদের রাজত্ব সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশে, এমন

মন্দিরের দক্ষিণ দিকের প্রথম তোরণ

কি মহীশূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিশাল ছিল তাঁহাদের নৌ-বাহিনী। সে বাহিনীর সাহায্যে সিংহল এবং ভারত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপও আসিয়াছিল তাঁহাদের অধিকারে। তারপর হইল চোলবংশের পতন। দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে চালুক্যদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহারা পরাজিত হইলেন। চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের পরাক্রমে চোলরাজ্য কর্পূরের মত উবিয়া গেল।

চোল-রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য ত্রিচিনপল্লীর ইতিহাস শেষ হয় নাই। কালচক্রের আবর্ত্তনে বহু রাজবংশের উত্থানপতন ঘটিয়াছে, কিন্তু ত্রিচিনপল্লীর নাম এবং গৌরব কখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

ত্রিচিনপল্লীতে থাকিবার ব্যবস্থা হইল রেল কোম্পানীর যাত্রী-নিবাসে। ষ্টেশনের উপরেই সেই যাত্রীনিবাস; ঘরগুলি আধুনিক হোটেলের ধরণে সাজানো। তোয়ালে, বিছানা ইত্যাদি সবই রেল কোম্পানী সরবরাহ করে। ভাড়া জনপ্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় চারি টাকা। আহারের ব্যবস্থা

নিজেদের করিতে হয়; যাত্রীনিবাসের সঙ্গেই রেল-কর্তৃপক্ষ পরিচালিত ভোজনালয়। আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্যেরই বন্দোবস্ত আছে—রন্ধন হয় ইউরোপীয় আর ভারতীয় উভয় পদ্ধতিতেই। তবে একথা বলিয়া রাখা ভাল যে, উত্তর-ভারতের লোকের পক্ষে সে খাদ্যের স্বাদ রুচিকর না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

শহরকে কর্তন ও বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। তাহার বুকের উপর আধুনিক ও সুদৃঢ় সেতু হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে বক্ষে না আসিয়াছে তার জড়তা, না থামিয়াছে তার পূর্ব্বতন গতি-ভঙ্গী।

বাস আমাদের শ্রীরঙ্গমের দরজায় নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে মন্দিরের যে কল্পনা করিয়াছিলাম,

মন্দিরের সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু তোরণ (পূর্ব্বে)

তোরণ (পশ্চিমে)

পরদিন সকালবেলা স্নান করিয়াই শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে বাহির হইয়া পড়িলাম। ষ্টেশনের প্রাঙ্গণ হইতে বাস যায়। কলিকাতার তুলনায় বাসের ব্যবস্থা ভাল। বাসের কণ্ডাক্টরেরা বাস কোম্পানীর নির্দ্দেশেই হউক বা পুলিসের ভয়েই হউক নির্দ্দিষ্টসংখ্যক যাত্রীর বেশী গ্রহণ করে না।

ত্রিচিনপল্লী নূতন পুরাতনে মিশ্রিত জগাখিচুড়ি শহর। চোলরাজদের অন্দরমহলের মধ্যে যেন আধুনিক সদর রাস্তা আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। শহরতলীর চারিদিকে নবযুগের জয়পতাকা—সেখানে সুপ্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার বা স্থাপত্যের নামগন্ধও নাই। পুরাতন শহরের মধ্যেও আধুনিক রুচির নিদর্শন দ্রুতগতিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চারিদিকে সামঞ্জস্যের অভাব। মনে হয়, চোল-চালুক্য-পল্লীর চিহ্ন বিলুপ্ত হইবার বড় বেশী দেরি নাই।

এক, অপেক্ষাকৃত স্থির আছে পুণ্যতোয়া কাবেরী। নদীটি

দিনের আলোকে বাস্তব সে কল্পনাকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। অপূর্ব্ব এ মন্দির, অদ্ভুত ইহার কারুকার্য্য ও স্থাপত্য-শিল্প, আর বিস্ময়কর এর বিশালতা।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদ। তখন ত্রিচিনপল্লীর প্রাসাদ-শীর্ষে চোলরাজের জয়পতাকা। কিন্তু দেশে সর্ব্বাঙ্গীণ শান্তি নাই। দস্যু, তস্করের ভয় ব্যাপক। দস্যুদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী তাহার নাম নীল। সে শস্ত্রবলে বলীয়ান আর লোকবলও তার অগণিত। রাজসৈন্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে সে পরাঙ্মুখ নহে, বরং রাজসৈন্যরাই সন্ধ্যক্রমে বিচার বিবেচনা না করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাকে সমীচীন মনে করে না। কারণ নীল এই চোলরাজেরই ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি। কিন্তু দুর্নিবার অর্থলোভ ও প্রাধান্য-লোভ তাহার রক্তে। তাহেই রাজানুগতি তাহার বেশী দিন ছিল না।

যোদ্ধবংশের যুবক; যুযুৎসা তাহার রক্তাগত কিন্তু আত্ম-প্রতিষ্ঠার মোহে সে উন্মত্ত। রাজার সমকক্ষতা তাহার কাম্য।

মূল মন্দিরের স্বর্ণচূড়া
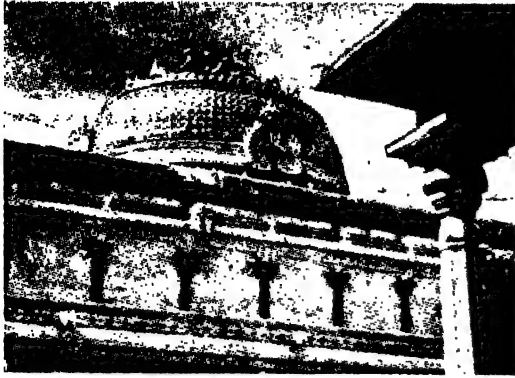
নীলের দমনকল্পে চোলরাজ সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। ফলে এক সন্ধি হইল। নীল দস্যুতা বর্জ্জন করিয়া চোলরাজার এক করদ রাজ্যের অধিপতি হইল। নীলের বিচিত্র জীবন-কাহিনীর ইহা প্রথম অংশ।

দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার অপরূপ প্রণয়-কাহিনী।

কুমুদবল্লী বৈষ্ণব পরিবারের মেয়ে। রূপে ও গুণে সে অনন্যসাধারণ। খ্যাতি তাহার দেশব্যাপী। বহু ধনী ও বিদ্বান যুবক তাহার পাণিপ্রার্থী। কিন্তু কাহাকেও তাহার পছন্দ হয় না।

নীলের কানেও তাহার খ্যাতি পৌঁছিয়াছে। কিন্তু এত দিন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় এদিকে সে পুরাপুরি নজর দিতে পারে নাই। কিন্তু এখন সে একাকী কুমুদবল্লী সকাশে যাত্রা করিল।

দর্শনমাত্রই প্রেম। নীলের মনে হইল, কুমুদবল্লী তাহার যুগ যুগ আকাঙ্ক্ষিতা প্রিয়া, কুমুদবল্লী তাহার জীবনের আনন্দের উৎস। সে তাহার পাণি-প্রার্থনা করিল।

এদিকে কুমুদবল্লীও নীলের প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু বৈষ্ণব-বংশের মেয়ে হইয়া কি করিয়া সে শৈববংশের ছেলেকে পতিত্বে বরণ করিবে? ধর্ম্মবিশ্বাস অপেক্ষা কি সাংসারিক জীবনের সুখ বড়? না, তাহা সে পারিবে না। নিজের জীবনের সুখকে জলাঞ্জলি দিয়া সে ধর্ম্মবিশ্বাসকে বড় করিয়া রাখিবে।

এদিকে নীল নাছোড়বান্দা। কুমুদবল্লীকে লাভ করিবার জন্ত সে জীবন-পণ করিয়াছে।

ফলে নীলকে জীবনমূল্য না দিয়া ধর্মমূল্য দিতে হইল। রফা হইল, যদি নীল প্রতিদিন জনকয়েক বৈষ্ণবের সাধ্যমত সেবা করে, তবে এক বৎসর পরে কুমুদবল্লী তাহাকে স্বামিত্বে বরণ করিবে। তথাস্ত।

এক বৎসর পরে নীল ও কুমুদবল্লীর বিবাহ হইল। আর দীর্ঘকাল বৈষ্ণব ভজনের ফলে নীল পুরাপুরি বিষ্ণুভক্ত হইয়া পড়িল। যথারীতি তাহার বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা হইল। দস্যু রত্নাকরের হইয়াছিল শ্রীরামনাম-সিদ্ধি আর দস্যু নীলের হইল শ্রীবিষ্ণু-সিদ্ধি।

শ্রীরঙ্গনাথের রথযাত্রা

তাহার পর আসিল নীলের বিচিত্র জীবনের তৃতীয় পর্য্যায়।

ধর্মে দীক্ষা হইল; কিন্তু ধর্মমন্দির কোথায়? দেশ শিবের আবাস—রাজাও শৈবধর্ম্মী। সারা দেশে বিষ্ণুর মন্দির একটিও নাই। এ অবস্থা কি নীল মানিয়া লইতে পারে? কিছুতেই না। মন্দিরের জন্ত ভিক্ষা? না, তাহা সে কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। অবিরত বৈষ্ণবসেবায় তাহার নিজের ধন সবই নিঃশেষিত হইয়াছে—এমন কি করদ রাজ্যটুকুও বোধ হয় থাকে না। কিন্তু তথাপি একটি বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। উপায়?

উপায়?—উপায় লুণ্ঠন। ফলে নেগাপট্টমের বিরাট বৌদ্ধ-মন্দির ধ্বংস হইল, আর সেই ঐশ্বর্য্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা হইল শ্রীরঙ্গমের।

চতুর্থ অধ্যায়ে নীল আর নীল নহে, পরম বৈষ্ণব তিরুমঙ্গই আলোয়ার। তিরুমঙ্গই এখন দক্ষিণাপথের বিখ্যাত আলোয়ার

'রঙ্গবিলাস' তোরণ

সম্প্রদায়ের কর্তা আর বহুসংখ্যক বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা। তামিল ভাষায় এই পদাবলীকে 'দেবারম্' বলে। 'দেবারম্' সুধাবর্ষী ও প্রাণবন্ত বলিয়া বিখ্যাত।

অষ্টম শতাব্দী হইতে বর্ত্তমানে ফিরিয়া আসিলাম। দস্যুই হউক, প্রেমিকই হউক আর তপস্বীই হউক, নীলের সাধনা অসাধারণ। বিশালতায় এ মন্দির ভারতে অদ্বিতীয়, হয়ত একমাত্র মাদুরায় মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের সহিত ইহার তুলনা চলে। কক্ষে কক্ষে ইহার স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন—চাহিয়া চাহিয়া চোখের তৃপ্তি আসে না। তোরণ-ঐশ্বর্য্যে দাক্ষিণাত্যের কোন মন্দির অপেক্ষা ইহা হীন নহে—বোধ হয় অভিনবত্বে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম।

আর সমগ্র দক্ষিণাপথের বৈষ্ণব-সমাজের ভিত্তিই এই শ্রীরঙ্গম্। সেদিক হইতে ইহার মূল্য কে নির্দ্ধারণ করিবে?

শ্রীরঙ্গম্ বৈষ্ণবপ্রধান আচার্য্য শ্রীরামানুজমের পদরেণু-রঞ্জিত। আচার্য্যদেব একাদশ শতাব্দীতে মাদ্রাজের চিঙ্গল-পুট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। আর এই শ্রীরঙ্গমই তাঁহার সাধনা ও প্রচারের পাদপীঠ।

মন্দিরের সমস্ত স্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে অনেক সময়ের দরকার। আর মাঝে মাঝে বিশ্রাম না করিলে চলে না।

যদিও 'বৈকুণ্ঠ' একাদশীর মেলা শেষ হইয়া গিয়াছে তথাপি জনস্রোতের বেগ মন্দীভূত হয় নাই। প্রায় সকলেই দক্ষিণাপথের লোক। কিছু কিছু উত্তর ভারতের লোকও চোখে পড়িল—চোখে পড়িল না কেবল কোন বঙ্গবাসীর মুখ।

মন্দির দর্শন করিয়া আমরা যখন আবার পথে বাহির হইলাম তখন বেলা আর বড় বেশী নাই।

শ্রাবণে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশে বাজিয়া উঠে মেঘের সারঙ,
হয়ত কিছুটা ফিরে ধরণীর রঙ।
আর্দ্র-বায়ু শ্বাসে কাঁদে ভবন-বসতি,
বনানী বিলায় যেন সোঁদালি-মূরতি।
বাহিরে বিদ্যুৎ-ছটা, ক্ষুব্ধ হাহাকার,
কিসের বেদনা তারে গুমরে অন্তর।
ঝাপটে ভিজিয়া গেল শয়ন-শিথান,
বেশ-বাস-কুন্তল হ'ল যে বিথান।

তুমি কাছে সরে এলে, আরো—আরো কাছে,
এমন মিলন ক্ষণ আর না কি আছে!
নিশীথের নীলাঞ্চলে বিরহের লেখা,
পড়ি কাঁদে অহরহ কত বন-কেকা।
শ্রাবণের আঁখি ঝুরে তমালের বনে,
কত রাধা ব্যাকুলিত শ্যাম-বাঁশী-স্বনে।

শিল্পবিদ্যালয়ের কথা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

কলিকাতার কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের জন্মকথা এবং প্রথম বৎসরের কার্য্যকলাপের বিষয় পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি প্রবন্ধে (প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৫৯) আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রস্তাবে ইহার পরের আরও দেড় বৎসরের কথা সমসাময়িক সংবাদপত্রসমূহে প্রাপ্ত তথ্যাদির নিরিখে এখানে বলিতে চাই। তবে প্রসঙ্গ আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ দুইটি প্রস্তাবের পরিপূরক হিসাবে কয়েকটি বিষয় এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিব :

(১) মাদ্রাজস্থ ডাঃ হাণ্টারের শিল্পবিদ্যালয়ের অনুরূপ কলিকাতায় একটি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা গঠিত হয় ১৮৫৪, ৩১শে মার্চ্চ দিবসে। এই দিনকার সভায় যাঁহারা যোগদান করেন তাঁহারাই শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রাথমিক সদস্যরূপে পরিগণিত হন। তাঁহারা যথাক্রমে চার্লস এলেন, সিসিল বীডন, ডাঃ বেডফোর্ড, পাদ্রী জে. এম্, বীলু,* ডাঃ সূর্য্য-কুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী, জে. এ. ক্রফোর্ড, রামগোপাল ঘোষ, কর্ণেল এইচ্. গুড্‌উইন, লেঃ ডব্‌লিউ. এন্. লীস্, পাদ্রী জেম্‌স লং, হজসন প্রাট, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ক্যাপ্‌টেন এইচ্. থুইলিয়র, হেনরি উড্রো এবং ডব্‌লিউ. জি. ইয়ং। অনুষ্ঠাতৃ সভার সভাপতি হন চার্লস এলেন। গুড্‌উইন ও প্রাট সভার উদ্দেশ্য তথা কলিকাতায় একটি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করেন। ইহার পর এখানেই স্থির হয় যে, কর্ণেল গুড্‌উইন প্রস্তাবিত সভার সভাপতি এবং হজসন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদক হইবেন। অর্থ সংগ্রহ, সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবৃতি রচনা এবং আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি পরিচালনার নিমিত্ত একটি সাব-কমিটি নিযুক্ত হইল। সভাপতি ও সম্পাদকদ্বয় বাদে ইহাতে এই সকল সদস্যও ছিলেন—চার্লস এলেন, ডাঃ বেডফোর্ড, জেম্‌স লং, ক্যাপ্‌টেন থুইলিয়র, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং চার্লস এলেন। চিত্রবিদ্যা, মৃৎ-কার্য্য ও তক্ষণশিল্প প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এ-দিনকার অধিবেশনেই তাহা স্থিরীকৃত হয়। স্কুল-কলেজ ছুটির পর বৈকালের দিকে এই সকল শিক্ষাদানের কথাও এই সভায় উঠিল।

২। শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তারিখ যে ১৪ই আগষ্ট নহে, পরন্তু ১৬ই আগষ্ট, 'বেঙ্গল হরকরা' বাদে, ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৫৪ তারিখের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সারে'ও "Chronological Table for the year 1854" শীর্ষক সালতামামিতে ইহার সমর্থক উক্তি এইরূপ পাওয়া যাইতেছে :

"August 16.—Opening of the School of Industry and Art in Calcutta."

তখনকার দিনে শিল্পবিদ্যালয় ইংরেজীতে এই নামেও পরিচিত ছিল।

৩। শিল্পবিদ্যালয়ে প্রধানতঃ তক্ষণশিল্প শিক্ষাদানের জন্য বিলাত হইতে টি. এফ্. ফাউলার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। ১৮৫৫ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী শিল্প বিদ্যোৎ-সাহিনী সভার অধিবেশনে ফাউলারকে সদস্যগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। এই সভায় একটি প্রস্তাবে স্থির হয় যে, ফাউলার মাসিক তিন শত টাকা বেতনে তিন বৎসরের জন্য অধ্যাপনা কার্য্য করিবেন। এচিং, লিথো ও তক্ষণশিল্প সম্বন্ধে প্রত্যহ তিন ঘণ্টা করিয়া তিনি ছাত্র-দিগকে শিক্ষা দিবেন।

২

এখন মূল বিষয়ের আলোচনায় আসা যাক্। ১৮৫৫, ১০ই অক্টোবর প্রথম বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভার অনুষ্ঠানের পরে শিল্পবিদ্যালয় কয়েকদিনের জন্য বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ একটি সংবাদে জানা যায়, '১লা নবেম্বর, ১৮৫৫ হইতে শিল্পবিদ্যালয়ের নববর্ষের কার্য্যারম্ভ হইবে। অধ্যাপক ব্রিগ্‌উড ও ফাউলারের অধীনে ছাত্র-গণ চিত্রবিদ্যা, মৃৎকার্য্য ও তক্ষণশিল্প শিক্ষালাভ করিবে। বিদ্যালয়ের স্থান যথাপূর্ব্ব মেডিক্যাল কলেজের সন্নিকট ভবন।'*

শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষার উৎকর্ষের প্রতি প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণ উৎসবের সময় হইতে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িল। ছাত্রদের শিল্পশিক্ষায় উৎসাহ-দানের নিমিত্ত কেহ কেহ পদকাদি দিবারও প্রস্তাব করিলেন। প্রথমেই, রামায়ণের কাহিনী লইয়া মৃৎ-পুত্তলী রচনায় কোন ছাত্র কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলে একটি

---

* প্রথম প্রবন্ধে ভ্রমক্রমে 'বীপু' লিখিত হইয়াছে।

* *The Bengal Hurkaru and the India Gazette,* October 26, 1855.

প্রশস্ত সুবর্ণ পদক পাইবে, এইরূপ প্রস্তাব সম্বলিত একটি সংবাদ পাইতেছি। সংবাদটি এই :

"... A broad gold medal will be given in October next, to the author of the best original design in clay from the Ramayuna. The group of figure is to be beautiful rather than grotesque, national rather than 'cosmopolitan.' Above all, it is as far as possible (to) bear proof that it is not a copy. . . . Lastly, should the best design be unmistakably and unmitigatingly bad, the medal will be reserved for another year. The judges will, we believe, be the managers of the School, assisted by Sir Arthur Buller and Mr. Macdonald Stephenson. . . . ."*

এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা হইল যে, মৃৎ-পুত্তলিটি সুন্দর ও 'জাতীয়' ভাবাপন্ন হওয়া চাই। পরীক্ষকদের বিবেচনায় মূর্তিটি মন্দ বিবেচিত হইলে, পর বৎসরের জন্য পদক প্রদান স্থগিত থাকিবে। শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ, বাহির হইতে দুইজন শিল্পরসিকের সাহায্যে, পুত্তলির গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিবেন বলিয়াও জানা গিয়াছিল।

শিল্পবিদ্যালয়ের চিত্রবিদ্যা, মৃৎ-কার্য্য, তক্ষণশিল্প প্রভৃতি শিক্ষাদান কিরূপ চলিতেছিল এবং ছাত্রগণই-বা এ সমুদয়ে কতখানি কৃতিত্ব দেখায় তাহা লইয়া শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনা চলিত। ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণেরও ব্যবস্থা হইত এখানে। উক্ত সভার একটি অধিবেশন হয় ১৮৫৬, ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। কর্ণেল গুডউইনের সরকারী বাসভবন ছিল ১৩নং কিড স্ট্রীটে। এই ভবনেই সাধারণতঃ সভার অধিবেশন হইত। উক্ত ২৮শে ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে অধ্যাপক রিগ্‌উড ও অধ্যাপক ফাউলার নিজ নিজ কার্য্যের এক একটি ফিরিস্তি দেন। মৃৎ-শিল্প বিভাগের কার্য্য অতিশয় সন্তোষজনক বলিয়া সভায় বিবেচিত হয়। এই বিভাগের অধ্যাপক রিগ্‌উড সদস্যগণকে জানান যে, প্যারিস প্লাষ্টারের অভাবে কার্য্য বিশেষ ব্যাহত হইবার উপক্রম, তবে যে কোন মুহূর্ত্তে জাহাজ আসিয়া পৌছিতে পারে। কিন্তু ইহার উপর ভরসা করিয়া বাহির হইতে নূতন অর্ডার বা কার্য্য গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না। ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলি অর্ডার তামিল করা হইয়াছে, এখনও কতকগুলি সম্পূর্ণ হইতে বাকি। রিগ্‌উড আরও জানান, বিভিন্ন পক্ষের নিকট মৃৎশিল্পাদি পৌছাইয়া দিলেও, ইহার মূল্য বাবদ অনেক টাকা অনাদায় রহিয়াছে। সভা অতঃপর একটি প্রস্তাবে অবিলম্বে এই সকল আদায়ের ব্যবস্থা করিতে কোষাধ্যক্ষকে নির্দ্দেশ দিলেন।

অধ্যাপক ফাউলারও তাঁহার বিভাগের কাজকর্ম্মের একটা বিবরণ পেশ করিলেন। তক্ষণশিল্পে—কাঠখোদাই প্রভৃতি কার্য্যে অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ব্যাপৃত ছিলেন। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর (বর্ত্তমান পরিভাষায় 'শিক্ষা অধিকর্ত্তা') কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই বিভাগ 'ঈসপ্‌স্ ফেব্‌লস'-এর কাঠখোদাই চিত্রগুলি করিয়াছেন। অন্য অর্ডারও তাঁহারা কিছু কিছু তামিল করিয়াছেন। কিন্তু ফাউলার বলেন, ইহার পর এ বিভাগের কাজ তেমন জোর চলে নাই। বাহির হইতে আর কোন অর্ডার না পাওয়ায় তিনি ছাত্রগণকে লিথোর কাজ শিক্ষা দিতেছেন, যাহাতে পরে ইহা দ্বারাও তাহারা কিছু কিছু রোজগার করিতে পারে। অধ্যাপক ফাউলারের নিকট হইতে এই বিবরণ শ্রবণান্তর সভা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কাঠখোদাই ও অন্যবিধ তক্ষণ কার্য্যের অর্ডার চাহিয়া বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে যেন দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

এই দিনের অধিবেশনের আর একটি বিষয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'-সম্পাদক মেরিডিথ টাউনসেণ্ডের মারফত তাঁহার জনৈক বন্ধু শিল্পবিদ্যালয়কে এক হাজার টাকা দান করেন। এই মর্ম্মে লিখিত টাউনসেণ্ডের পত্র সভায় পাঠ করা হইল। কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত দান ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করিলেন।*

৩

শিল্পবিদ্যালয়ের জন্য সরকারী সাহায্য চাহিয়া গত বৎসরই আবেদন করা হয়। হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স পীলও প্রথম পুরস্কার-বিতরণ উৎসবে এই উদ্দেশ্যে সরকারকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার কর্ত্তৃপক্ষও সাক্ষাৎভাবে ছোটলাট হেলিডেকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানান। কিন্তু ১৮৫৬ সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্তও যে খুব বেশী কিছু সরকারী সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল এমন তো মনে হয় না। কারণ 'বেঙ্গল হরকরা' ১৮৫৬, ১৭শে এপ্রিল তারিখে ডিরেক্টর-সভা কর্ত্তৃক মান্দ্রাজের শিল্পবিদ্যালয়ে মাসিক আড়াই শত টাকা বেতনে এ. কোল নামক একজন অধ্যাপক নিয়োগের প্রসঙ্গে লেখেন, 'আমাদের শিল্প-বিদ্যালয় সম্পর্কেও কোর্ট এইরূপ ব্যবস্থা করুক না কেন।'*

তবে সরকার ১৮৫৪ সনের ১৯শে জুলাইয়ের 'শিক্ষা-বিধান' অনুসারে প্রবর্ত্তিত সাহায্যদান (grant-in aid) পদ্ধতি অনুযায়ী যে শিল্পবিদ্যালয়কেও অর্থসাহায্য প্রদান সুরু করিয়া দেন সেরূপ ধারণা করিবারও সঙ্গত কারণ আছে।

---

* *The Friend of India*, November 8, 1855.

* *The Bengal Hurkaru and the India Gazette*, March 5, 1856.

* "We wish the Court of Directors extend its patronage to our School of Industrial Art."

একটু পরেই এ বিষয়ে বলিতেছি। শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনের একটি বিবরণ পাইতেছি। ইহার কথা এখন বলিব।

বার্ষিক সভার অধিবেশন হইল ১৮৫৬ সনের ৯ই মে। ইহার আর একটি স্থগিত অধিবেশন হয় পরবর্তী ১৪ই মে তারিখে। এই দুই অধিবেশনে সভার নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হয়। আগামী বৎসরের জন্য কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন: কর্ণেল গুড্উইন—সভাপতি; পাদ্রী লং, সি. ইং, কিশোরীচাঁদ মিত্র, জি. স্মালে, ডাঃ বোরবেল, ডাঃ বেডফোর্ড—সদস্য; রাজেন্দ্রলাল মিত্র—কোষাধ্যক্ষ এবং এফ. জে. বোবাং—সম্পাদক।

সরকার কি নাগাদ শিল্পবিদ্যালয়ে সাহায্যদান করিতে আরম্ভ করেন? ৩১শে জুলাই ১৮৫৬ দিবসীয় 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে সরকারী সাহায্য সম্পর্কে একটি তথ্যমূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে জানা যায়, বাংলা-সরকার পূর্ব্বোক্ত সাহায্যদান পদ্ধতি অনুসারে শিল্পবিদ্যালয়কে অর্থসাহায্য করিতে আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে উহার ব্যয়সঙ্কুলান হওয়া দুরূহ হইয়া উঠে। তখন তাঁহারা ভারত-সরকারের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, হয় বিদ্যালয়টিকে অতিরিক্ত অর্থ-সাহায্য করা হউক, নচেৎ সরকার পুরাপুরি ইহা হাতে নিন্।

বাংলা সরকারের প্রস্তাব শুনিয়া নবাগত বড়লাট লর্ড ক্যানিং স্বয়ং শিল্পবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন। তখন মাসিক চাঁদা হইতে বিদ্যালয়ের আয় ক্রমশঃ কমিয়া প্রতি মাসে এক শত নব্বই টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। ক্যানিং বিদ্যালয়টির কার্য্যকলাপে মুগ্ধ হইলেও ইহার আর্থিক দুরবস্থা দেখিয়া বিশেষ ব্যথিত হন। তিনি সকৌন্সিল বড়লাট রূপে আদেশ দিলেন যে, ১৮৫৬ সনের ১লা জুলাই হইতে শিল্পবিদ্যালয়ের মাসিক সরকারী সাহায্য বাড়াইয়া ছয় শত টাকা করা হইবে। তবে সর্ত্ত থাকিবে যে, শিক্ষা-অধিকর্ত্তাকে মাঝে মাঝে বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে সুযোগ দিতে হইবে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বভার শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার উপর থাকুক, তিনি এইরূপ ইচ্ছাই প্রকাশ করিলেন। সভা সরকারী ব্যয়ে একজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগেরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহার পর, বিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপের সংবাদ পরিবেশন সম্পর্কে ভারত-সরকার কর্তৃক ছোটলাট এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন:

"The Lieutenant-Governor has been requested to issue the necessary instructions to the Director of Public Instruction regarding the future inspection of this school, and to call upon him to report at the end of three months the form in which, if further aid be needed, it can be given. The Governor-General further added, that in the annual report on education, it should have been stated whether there is any demand for the productions of this school, whether the pupils have as yet been able to turn their knowledge to any account, or to dispose of any other work, either on their own behalf (or) on account of the school, and whether there is reason to believe that the public derive any degree of practical benefit from the operations of the school."

এখানে এই মর্ম্মে বলা হয় যে, শিক্ষা-অধিকর্ত্তাকে শিল্পবিদ্যালয় পরিদর্শন সম্পর্কে যেন আবশ্যক নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। তিন মাস পরে, সাহায্যদান যথেষ্ট কিনা, না ইহা আরও বাড়াইয়া দিতে হইবে, আর কিরূপেই বা ইহা বাড়ানো যাইতে পারে—এই সকল বিষয় যেন তিনি বাংলা-সরকার মারফত ভারত-সরকারকে জানান। শিল্পবিদ্যালয়ে প্রস্তুত দ্রব্যাদির চাহিদা কিরূপ, এখানে প্রাপ্ত শিক্ষায় ছাত্রদের জীবিকার্জ্জন সম্ভব কিনা, জনসাধারণই বা কি ভাবে ইহা দ্বারা উপকৃত হইতেছে এ সমুদয় তথ্যও শিক্ষা বিষয়ক বার্ষিক বিবরণে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল।

৪

প্রতি মাসে ছয় শত টাকা সরকারী সাহায্য লাভে শিল্প-বিদ্যালয়ের আর্থিক অসচ্ছলতা অনেকটা নিরাকৃত হইল। শিল্পবিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণে অধ্যক্ষ সভা লিখিলেন:

"The Committee are glad to have it in their power to congratulate the Society on the improvement which has taken place in their position and prospects."*

বিদ্যালয়ের সাফল্যে ইহার কর্তৃপক্ষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। প্রতি মাসে প্রাপ্ত সরকারী সাহায্যের কথাও উক্ত বিবরণে স্থান পাইল।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্যর লরেন্স পীল ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি কমিটি স্থাপিত হয় "পীল টেষ্টিমনিয়াল কমিটি" নামে। শিল্পবিদ্যা-লয়ের কার্য্যে পীল বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কমিটি আদায়ী মবলগ সাড়ে সাত হাজার টাকা শিল্পবিদ্যালয়কে এই সর্ত্তে দান করিলেন যে, উহার সুদ হইতে আট টাকা মূল্যের তিনটি মাসিক পীল-বৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী তিন জন ছাত্রকে প্রতি বৎসর দিতে হইবে। এই সংবাদ প্রদানান্তর ২৮শে আগষ্ট 'বেঙ্গল হরকরা' এই মর্ম্মে লেখেন, —শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভা এবং অধ্যাপকগণের মধ্যে

* *The Bengal Hurkaru and the India Gazette*, August 26, 1856.

মতানৈক্য হেতু যতখানি শিক্ষার উৎকর্ষ আশা করা গিয়াছিল ততখানি হইতে পারিতেছে না। অধ্যাপক ফাউলার সম্বন্ধে সভা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার বিভাগের কার্য্য ভালরূপ চলিতেছে না। কিন্তু মৃৎশিল্পের অধ্যাপক মসিঁয়ে রিগ্‌উড সম্পর্কেই যত গোলযোগ। অধ্যক্ষ-সভা তাঁহার পূর্ব্বেকার কার্য্যকলাপের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার সম্পর্কে সুব্যবস্থা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ তাঁহার অতিরিক্ত দাবি এবং উগ্র ব্যবহারে অধ্যক্ষ-সভা উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার এই অতিরিক্ত দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে পরে বলিতেছি।

ইতিমধ্যে অধ্যাপক ফাউলার অল্প কয়েক দিনের অসুখে ১৮৫৬, ৩০শে আগষ্ট দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'ইংলিশম্যান' লেখেন :

"Death of Professor Fowler of the Calcutta School of Industrial Art.—The above institution has met with a sudden loss in the death of Prof. Fowler, who had in charge one-half of the pupils as a co-ordinate teacher with M. Rigaud. He died after a brief illness on Saturday, the 30th of August. He was giving instruction in Drawing, Wood and Copper plate Engraving, Lithographic drawing and Printing, Water-coloured painting, etc. He was no mean chemist, and as a linguist was surpassed by few men of his years in this part of the world. At the age of 27 he has fallen a victim to over earnest study and unremitted application. . . . Latin, Greek, Hebrew, the French, the Italian and other European languages seem to have been familiar to him; and within his two years past he has acquainted himself with Bengalee, Hindusthanee and Persian. There were gift books in his library presented, by their authors, men well-known to the scientific world who seem to prove that the modest merit, which had reached so few in this neighbourhood, was not unappreciated. A wife and a widowed mother were expecting his return to them in England, in a few months. . . ."*

শিল্পবিদ্যালয়ের প্রায় অর্দ্ধেক ছাত্রের শিক্ষার ভার ছিল অধ্যাপক ফাউলারের উপর। ফাউলার চিত্রবিদ্যা, কাঠ-খোদাই, তামার পাতের উপর খোদাই, লিথো-চিত্র, মুদ্রণ ও জলরং-চিত্র বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র সাতাশ বৎসর। এই সময়ের মধ্যেই তিনি একজন রাসায়নিক ও বহু ভাষাবিদ্ রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। লাটিন, গ্রীক, হিব্রু, ফরাসী, ইটালিয়ান ও অন্যান্য বহু ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এখানে, দুই বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে অধ্যাপক ফাউলার বাংলা, হিন্দুস্থানী ও ফার্সী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

৫

ফাউলারের মৃত্যুর পর তৎস্থলে অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য সাময়িকভাবে একজন অধ্যাপক নিয়োগকল্পে শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেন।* কিন্তু তাহাতে ফল হইল না। ইহার পর অন্ততঃ দুই বৎসরের করারে বিলাত হইতে একজন অধ্যাপক আনাইবার কথা হয়। যতদিন না এরূপ একজন অধ্যাপক পাওয়া যায় তত দিন কর্তৃপক্ষ রিগ্‌উডকে মাসিক এক শত টাকা অতিরিক্ত বেতন দিয়া ফাউলারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অনুরোধ করিলেন।†

এখন, অধ্যাপক রিগ্‌উড সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবধি রিগ্‌উড ইহার সঙ্গে যুক্ত। প্রথমে অবেতনে, পরে তিন শত টাকা মাসিক বেতনে তিনি এখানে কার্য্য করিতে থাকেন। মৃৎশিল্পাদি নির্ম্মাণ হইতে যে আয় হইত তাহারও আংশিক লাভ বেতন বাদে তিনি পাইতেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু পরে তিনি দাবি করেন যে, লভ্যাংশ সমুদয়ই তাঁহাকে দিতে হইবে। ইহা লইয়া অধ্যক্ষ-সভার সঙ্গে তাঁহার মতান্তর ঘটে। অধ্যক্ষ-সভা পক্ষান্তরে রিগ্‌উডের স্বার্থত্যাগ ও কর্ম্মতৎপরতার কথা ভাবিয়া যতদূর সম্ভব তাঁহার দাবি মিটাইতে চেষ্টা করেন।

রিগ্‌উডের দাবি কিন্তু কিছুতেই কমিল না। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ তারিখে শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাধারণ অধিবেশনে রিগ্‌উডের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার উদ্দেশ্যে তিন জন সদস্য লইয়া একটি সাব-কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটিতে ছিলেন—চার্লস এলেন, আর. দ্য. বোরবেল এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র। সাব-কমিটির সদস্যগণও রিগ্‌উডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া তাঁহার দাবি কোনমতেই কমাইতে পারিলেন না। পরবর্ত্তী ২৪শে সেপ্টেম্বর শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার আর একটি সাধারণ অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে সাব-কমিটির অকৃতকার্য্যতার কথা যথারীতি বিজ্ঞাপিত হয়।

রিগ্‌উড শিল্পবিদ্যালয়ের একমাত্র অভিজ্ঞ পুরাতন অধ্যাপক। তাঁহার এইরূপ জিদে বিদ্যালয়ের কার্য্যে স্বভাবতঃই বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তবে চিত্রবিদ্যা ও মৃৎশিল্পের কাজ কতকটা আগের মতই চলিতে লাগিল। অধ্যাপক রিগ্‌উডের সঙ্গে পরে শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার

* *The Bengal Hurkaru*, etc., Tuesday Sept. 2. 1856: Selections.

* *The Bengal Hurkaru* etc., Sept. 13, 1856.

† *The Englishman*, October 30, 1856.

একটা আপোষ-রফা হইয়া থাকিবে। কারণ ইহার পরেও দুই বৎসরের অধিককাল তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ বিষয় পরে আমরা জানিতে পারিব।

এই সময় শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধ্যক্ষদের মধ্যেও কতকটা শৈথিল্য আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ চারিটি সভার দিন তারিখ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইলেও কোন অধিবেশনের বিবরণ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় পাইতেছি না। অধিবেশন হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ বা অন্ততঃপক্ষে তাহার সমালোচনাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত।

৬

শিল্পবিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভা এবং ছাত্রদের চিত্র ও শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৫ সনের ১০ই অক্টোবর। ইহার ঠিক এক বৎসর পাঁচ মাস পরে শিল্পবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পুরস্কার বিতরণী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। অধ্যাপক ফাউলারের মৃত্যু এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগই যে এইরূপ বিলম্বের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এ নিমিত্ত প্রথম বৎসরে ইহার যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইতেছিল দ্বিতীয় বৎসরে তদনুরূপ হইতে পারে নাই। তথাপি ইহা একেবারে ব্যাহত হইয়াছিল এমন কথাও বলা যায় না। যাহা হউক, শিল্পবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পুরস্কার বিতরণ উৎসব করা স্থির হইল ১৮৫৭ সনের ১২ই মার্চ্চ। এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া 'ইংলিশম্যান' (১২ মার্চ্চ, ১৮৫৭) লিখিলেন :

". . . and we take the opportunity of requesting all who interest themselves in the advancement of the people, to go and see for themselves the progress which the school has already made in spite of very restricted means. It is to be hoped that this very useful school will find more favour with the public than it has hitherto done, and that those who liberally support the institutions, the utility of some of which is questionable, will assist one which is intended to give the working classes new methods of self-support, without pressing upon the bounty of their superiors."

পুরস্কার-বিতরণ উৎসবের কথা ঘোষণা কালে 'ইংলিশ-ম্যান' দেশবাসীকে এমন একটি প্রয়োজনীয় ও হিতকর প্রতিষ্ঠানকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ১৮৫৭ সনের ১৯শে মার্চ্চ সংবাদ স্তম্ভে (শুক্রবার, ১৩ই মার্চ্চ) লেখেন :

"The distribution of prizes to the pupils of the School of Industry and Arts took place yesterday. The first prize, a scholarship valued eight rupees a month, from the Peel Testimonial Fund, was awarded to Tara-persaud Bannerjea for the composition of the 'Plague of Pompeii' executed on four tablets from the artist's own imagination aided by Bulwer's 'Last Days of Pompeii.'

শিল্পবিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় "প্লেগ অফ পম্পিয়াই" শীর্ষক চিত্রের জন্য মাসিক আট টাকা পীল-বৃত্তি লাভ করে। "লাষ্ট ডেজ অফ পম্পিয়াই"র নিরিখে নিজের কল্পনাশক্তি প্রভাবে চারখানি টেবলেটের উপর উহা খোদাই করা হয়।

এইখানেই শিল্পবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পর্ব্বের অবসান হইল।

লীলা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

বাহিরের মহা-বিশ্ব মনের ভিতরে
কি করিয়া ধীরে ধীরে ধ্যান-মূর্ত্তি ধরে,
গড়ে স্বপ্ন-তিলোত্তমা, ভরে চিত্ততল,
কোমলে কঠোর করে, কঠোরে কোমল,
অপরিচয়েতে ঘেরা সেই পরিচয়
জানিতে পেরেও নাহি পারে যে হৃদয়।
অনন্ত জিজ্ঞাসা তাই অন্তর-সাগরে
অনু-বিশ্ব সম শুধু ফোটে আর ঝরে।

অসীম অন্তর হ'তে কেন অহরহ
আবেগ-প্রেমার্ত্তি আর বিপুল বিরহ
বাহিরের মহাবিশ্বে অনন্ত সুষমা
কি ভাবে ফুটায়ে তোলে, চির অনুপমা
করে এই প্রকৃতিরে চিরদিন ধরি',
বুঝি না রহস্য তার, শুধু ভেবে মরি।
জড়ে জীবে এ কি লীলা, অন্তরে বাহিরে,
সীমায় অসীমে লীলা কেন ফিরে ফিরে!

কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

২

কলিকাতার একমাত্র বিশাল বা যোচালা মন্দিরটি উত্তরাংশে বাগবাজারের ২৬।১ দুর্গাচরণ মুখার্জ্জী ষ্ট্রীটে অবস্থিত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন ইহার বয়স অনূ্যন দুই শত বৎসর। ইহা দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্বশুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দিরে কোন প্রাচীন লিপি নাই। বর্ত্তমানে

কলিকাতার একমাত্র বিশাল বা যোচালা শিবমন্দির
(দুই শত বৎসরের প্রাচীন)
[ফটো—ডাঃ সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতার একমাত্র বিশাল মন্দির। অন্ত দিক হইতে
[ফটো—ডাঃ সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্দিরটি জীর্ণপ্রায়। মন্দিরমধ্যে তিনটি শিবলিঙ্গের মধ্যেরটি কালো পাথরে ও পাশের দুইটি সাদা পাথরে নির্ম্মিত। মন্দিরের পশ্চিমে ও দক্ষিণে তিনটি দ্বার; দক্ষিণ-পশ্চিমের দ্বারটি ক্ষুদ্র। ভিতরের উত্তর দিকের দেওয়ালে তিনটি বৃহৎ কলুঙ্গা ও পূর্ব্বের দেওয়ালে দুইটি ত্রিকোণ কলুঙ্গা আছে। ছাদটি খিলানে গঠিত, তদুপরি ত্রিশূল।

এই মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বিখ্যাত রূপচাঁদ পক্ষীর আড্ডা ছিল। এক শত আট ছিলিম গঞ্জিকা সেবনে সক্ষম ব্যক্তিরাই তাঁহার আড্ডায় বসিবার জন্য ইট পাইত, অন্য কেহ নহে। খাঁচার মত একটি গাড়ীতে করিয়া এই ধনী সন্তানটি বেড়াইতেন বলিয়া 'রূপচাঁদ পক্ষী' নাম পাইয়াছিলেন। বৃহৎ কলিকল্পত গঞ্জিকা স্তোত্রে ইহার সম্পর্কে আছে: "অভূৎ পক্ষী প্রসাদাত্তে রূপচাঁদো জরায়ুজ। ইতিতে মহতী কীর্ত্তিঃ শাস্ত্রেষু পরিবিশ্রুতা।"

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন কলিকাতার এক জন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন। বাইশ বিঘা জমির উপর তাঁহার বাস্ত ছিল। 'বঙ্গের রত্নমালা' পুস্তকে কিরূপে তিনি গুরুদেবকে নিজগৃহে আটকাইয়া ভাটপাড়ায় সাড়ম্বরে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন ও শ্রাদ্ধদিনে তাঁহাকে ঐ স্থানে লইয়া গিয়া বিস্মিত করেন, তাহার উপাদেয় গল্প আছে।

মন্দিরে মর্ম্মরফলকে একটি নূতন ভরাটলিপি আছে। উহা "৺জগতরাম হালদার কর্ত্তৃক স্থাপিত, তদীয় পৌত্র-কন্যা ৺হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী কর্ত্তৃক ১৯৭২ সংবৎসরে সংস্কারিত।" এই প্রতুল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপা-

চার্য্য (Vice Chancellor) ছিলেন। তাঁহার পত্নী বসন্তকুমারী স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুপুত্র ৺আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর দেবসেবার ভার দেন। মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ঐ ভার পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে নাট্যকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ২৭নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট-নিবাসী ডাঃ সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এস্‌সি, এম-বি. মহাশয় ঐ মন্দিরের দেবতাগণের সেবক।

রামলক্ষ্মণ দত্তের অষ্টশাল শিবমন্দির

[ফটো—অধ্যাপক শ্রীপুরুষোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্ব প্রবন্ধে (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৮) উল্লিখিত বাগবাজার-চিৎপুর রাস্তার তেমাথার দক্ষিণে অবস্থিত অন্নপূর্ণার মন্দির ও শিবের অষ্টশাল চারিটি পূর্ব্বোক্ত বিশাল মন্দিরের সমসাময়িক বলিয়া কথিত হয়। ঐ অষ্টশাল চারিটির মধ্যের দুইটির দ্বারের উপর, বাম ও দক্ষিণের চৌকাঠের সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত তিন সারির খোপগুলিতে প্রাচীন রেখাচিত্র আছে। ঐ রেখাচিত্রসমূহের প্রত্যেক দেবতা ও মানুষই যুদ্ধভঙ্গীতে বর্ত্তমান। উহাদের রং এখন চটিয়া গিয়াছে, কিন্তু চিত্রগুলি স্বাভাবিকতায় মনোরম। কলিকাতা বা বাংলার আর কোন মন্দিরে এরূপ রেখাচিত্র দেখা যায় না। ঐ মন্দির দুইটির উত্তরেরটিতে দ্বারশীর্ষে একটি কৃত্রিম ফলকে চারি সারি রেখালিপি আছে। উহার পাঠ উদ্ধার করিতে যেরূপ পারিয়াছি সেরূপই দিতেছি :

শাকে বিলেশয় বিলর্ত্তু বিধৌ বিবর্ষে
চিত্তে বিলাসকলদং গুরু পাদপদ্ম
রামাভকং শিভিতৃতো বিজবিষ্ণুরামোহ-
কার্ষীদি মন্দিরমিদং পরবৈরকাঙ্ক্ষী।
ছন্দটি বসন্ততিলক, বিলেশয় (সর্প—৮) বিল (ছিদ্র—০)

ঋতু—৬ বিধু—১—১৬০৮ শকাব্দে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুরাম মনে গুরুপাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে পরলোকের কল্যাণ কামনায় মহাদেবের এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরগুলি ত্রিচূড়; মধ্যের লিঙ্গ চারিটি উত্তম কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত। অন্নপূর্ণা ও শিবের মূর্ত্তি অষ্টধাতু গঠিত—দুইটি বৃহৎ শালগ্রামও আছেন।

মধ্য কলিকাতার মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটে রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের মর্ম্মর প্রাসাদের পশ্চিমভাগে অবস্থিত তাঁহার গৃহদেবতার মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় বা বিলাতী রীতির একটি নিখুঁত নিদর্শন। মন্দির-চূড়া ক্রমশ সূক্ষ্মাগ্র। চোর-

রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের শ্রীজগন্নাথ মন্দির

[কুমার শ্রীদীনেন্দ্রনাথ মল্লিকের সৌজন্যে

বাগান মল্লিক পরিবারের ৺নীলমণি মল্লিক মহাশয় তাঁহার মাতুলালয় হইতে শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহ পাইয়া ইং ১৭৭৫-১৮২১ মধ্যে এই মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন। মন্দিরের বর্ত্তমান রূপ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পরিকল্পনা।

রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত মহাদেবের অষ্টশালটি সন ১২১২ সালের ১লা বৈশাখ রামলক্ষ্মণ দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম ও বিরাট নবরত্ন মন্দিরটি টালিগঞ্জের আদিগঙ্গাতীরস্থ ১নং মণ্ডল টেম্পল লেনে অবস্থিত। উহার চারিদিকে উচ্চ রোয়াক ও থাম। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে দ্বার। নবরত্নের উচ্চতম চূড়া অবধি সোপান ও চূড়াগুলি খাঁজবিশিষ্ট। প্রত্যেকটি চূড়ার উপরে লৌহদণ্ডে বিষ্ণুচক্রশোভিত। মন্দির মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। রোয়াকের অগ্নিকোণের দেওয়ালে কৃষ্ণপ্রস্তর ফলকে নিম্নোক্ত উৎকীর্ণ লিপি আছে :

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ: শকাব্দা: ১৭১৮
শাকেষ্টাদশ বাধি চন্দ্র গণিতে কৃতহিতে তাকরে।
রাধাকান্ত যুতে ভত্তাশয়যুতে গঙ্গোপকণ্ঠস্থলে।

আরব্ধ নবরত্নমেতদমলং তস্যামনাথেনদা।
লেখাদ্রি ১৭২৯ মবতুম্নে চৈত্র বিদিতে পূর্ণত্বমাগাদহো।
ইতি পুনশ্চ ১৭৩১।৩ সংক্রাত্যাং সর্ব্ব পূর্ণত্বমগাৎ।

মর্ম্ম:—"শ্রীরামনাথদাস রাধাকান্তের প্রীতির নিমিত্ত গঙ্গাতীরে ১৭১৮ শকাব্দার ফাল্গুন মাসে শুভেচ্ছা পূর্ণ চিত্তে এই নব রত্ন মন্দির আরম্ভ করেন। ১৭২৯ শকাব্দার চৈত্র মাসে ইহা শেষ হয়। ১৭৩১ শকাব্দার আষাঢ় মাসের সংক্রান্তিতে ইহা সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ হয়।"

কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট ও উচ্চতম শ্রীরাধাকান্ত জীউর নবরত্ন মন্দির। ইহা হইতেই দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের আদর্শ গৃহীত হইয়াছিল। সাহানগর ১নং মণ্ডল টেম্পল লেনে ইহা অবস্থিত।
[শ্রীসরোজকুমার মণ্ডলের সৌজন্যে

আরম্ভ হইতে সমাপ্তি অবধি বর্ষাদিঘোষণায় লিপিটি অভিনব।

মন্দিরের সম্মুখে দুই সারি থামযুক্ত বিরাট নাটমন্দির; প্রাঙ্গণের চারিদিকে প্রাচীরের গাত্রে কক্ষরাজি বিরাজিত। প্রবাদ, এই মন্দির বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন। ইহার কারণ-স্বরূপ নিম্নোক্ত গল্পটি প্রচলিত আছে। এগার জন শ্রমিক প্রত্যহ মন্দির গঠনের কার্য্য করিত, কিন্তু মন্দির যখন ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে তখন নিম্ন হইতে দেখা যাইত যে বার জন শ্রমিক কাজ করিতেছে। ঐ সকল শ্রমিক যখন নীচে কাজ করিত তখন উপর হইতে মনে হইত যে, বার জনই কাজ করিতেছে। সুদীর্ঘ তের বৎসর পরে মন্দির ও ঠাকুর-বাড়ী নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হয়। বহিরঙ্গনে বিরাট রাসমঞ্চ। এই মন্দিরের আদর্শ হইতেই দক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। এই মহোন্নত নবরত্নের কোন নিখুঁত ছবিই নাকি পৃথিবীর কোন দেশের কোন চিত্রশিল্পী লইতে পারেন নাই।

২৪ পরগণা জেলার বাওয়ালী গ্রাম নিবাসী মণ্ডল-পরিবারের আদি বাস বর্দ্ধমান জেলায় ছিল। খড়ের ব্যবসায় করিয়া এই বংশ ধনী হন। লাটের সমুহ জমিই ইঁহারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ সকল লাটের মধ্যে খাড়ি ও জুড়ির আয়ই ছিল বার্ষিক প্রায় দুই লক্ষ টাকা। দিগম্বর মিত্র ঐ দুইটি লাট কিনিয়াই রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। কলিকাতা ডায়মণ্ড হারবার পথের বেহালা হইতে হারবার পর্য্যন্ত অংশের যাবতীয় হাট ও বিরাট জলাশয়গুলি এই বংশের প্রতিষ্ঠিত। ইহারা কুড়ি হাজার বিঘা নিষ্কর ভূমির মালিক ছিলেন। গঙ্গার পর-পারে অবস্থিত মন্দিরগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় এই মন্দিরটিই শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। ইহার পূর্ব্বদ্বারের দুইটি বিরাট চৌকাঠই কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত। কষ্টিপাথরের এরূপ প্রকাণ্ড খণ্ড অন্যত্র দেখা যায় না। হরানন্দ মণ্ডলের কনিষ্ঠ পুত্র রামনাথ দাস এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার চারি পুত্র—রামনারায়ণ, রাজনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র মদনমোহন (পত্নী প্রসন্নময়ী) তাঁহার পুত্রদ্বয় কমলকৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণ। শিব-কৃষ্ণের পুত্র শ্রীযতীন্দ্রনাথের চারি পুত্র। শ্রীসরোজকুমার, শ্রীসুশীলকুমার, শ্রীঅনিলকুমার, শ্রীঅজিতকুমার মন্দিরের বর্ত্তমান মালিক। ইঁহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষের নাবালক অবস্থার সুযোগে মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রায় ত্রিশ বিঘা জমি, যাহার বর্ত্তমান মূল্য দশ লক্ষ টাকা—মাত্র এক টাকা রোড সেস বাকীর দায়ে নিলাম হইয়া যায়।

রাস এখানকার প্রধান উৎসব। মন্দির হইতেই সম্মুখের পথটির নামকরণ হইয়াছে। বাওয়ালীর মণ্ডলগণ ধর্ম্ম ও শিল্পোন্নতিতেই নিজেদের অর্থব্যয় সার্থক করেন নাই; তাঁহারা বিদ্যোৎসাহিতারও পরিচয় দিয়াছেন। ভর্তৃহরি ব্যাকরণকে কাব্যের রূপ দিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ভারতে সুবিদিত। কিন্তু ব্যাকরণকে নাটকের রূপ দিয়া কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী নামক নদীয়া মহেশপুর নিবাসী যে বাঙালী মহাপণ্ডিত অদ্ভুত কীর্ত্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বিস্মৃতির অতল তলে মিলাইয়া যাইত, যদি না বাওয়ালীর শ্রীরাজকিশোর মণ্ডল সন ১৩০১ সালের ১২ই আষাঢ় সেই "অন্তর্ব্যাকরণনাট্য পরিশিষ্ট"কে মুদ্রা-যন্ত্রের মারফত প্রকাশ করিয়া বহুল প্রচারের সহায়তা

করিতেন। এই মহৎ কর্ম্মের জন্য তিনি বাঙালী জাতি তথা সংস্কৃতানুরাগী ভারতীয়গণের অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। এই মণ্ডলগণের-পূর্ব্বপুরুষের বিরাট শিল্পকীর্ত্তি বাঙালী-জাতির মহোজ্জ্বল অতীতের মহনীয় নিদর্শন। ইহা অনবদ্য জাতীয় গৌরব।

ফিরিবে না তাহার হর্ষবিষাদবিধুরস্মৃতি ক্ষণিকের শিহরণ আনিয়া দেয়—কৃতী রামনাথ, কুশলী শিল্পকার আর অঘটনঘটনপটু তাঁহার কালের করাল পরিণামকে সোনার কাঠির যাদুর স্পর্শে যেন ক্ষণিকের তরেও পরাহত করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়া অমর হইয়াছে।

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থলের ত্রিচূড় একক শিবমন্দির
[ফটো—অধ্যাপক শ্রীসুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাগবাজারের লিপিযুক্ত অষ্টশাল শিবমন্দিরের রেখাচিত্রযুক্ত খোপসকল

আমরা উড়িষ্যার সাগর-সৈকতের মরুপ্রান্তরে কোণারকের ভগ্ন-মন্দির দেখিতে ছুটিয়া যাই, আর বিস্মিত হইয়া শিল্পীর জয়গান করি কিন্তু আমাদের ঘরের কোণে এই যে বিরাট অট্টালিকা দেবতার আসনরূপে সার্দ্ধশত বৎসর কল্যাণ বাণী বিতরণ করিতেছে তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহি না। উড়িষ্যার বার বৎসরের রাজকরে রাজা নরসিংহ দেবের শাসনে, বার শত শিল্পী বার বৎসরের শ্রমে কোণারকের দেউল গড়িয়া তুলিয়াছিল, আর এই মহান্ দেবনিবাস মাত্র বার জন শ্রমিকের সাধনায়, এক জন অখ্যাত নাগরিকের কষ্টার্জ্জিত বিত্তের সার্থক পরিণতি-দান করিতে, তের বৎসরের যত্নে, আদি গঙ্গার পূতসৈকতে এক নূতন অমরাবতীতে রূপায়িত হইয়াছিল। গঙ্গাদেবী এখন আর এই খাতে নিজ জলধারা বহন করেন না, তাই নদীর পরিসর সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। যেটুকু প্রবাহ বর্ত্তমান তাহাও পঙ্কিল। বিরাট্ জলযান এদিকে যাতায়াত ছাড়িয়াছে। কাটিগঙ্গার কৃত্রিম পথে তাহাদের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু অতীতের এই ভূস্বর্গ এখনও মুষ্টিমেয় যাত্রীর প্রাণে, পবিত্র গাঙ্গের প্রণালীর যে সুদিন আর

উত্তর কলিকাতার দুইটি প্রাচীনতম চণ্ডীমণ্ডপের একটি নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটে হাটখোলার দত্তবাবুদের, অপরটি ১৫৮নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত। উহার বর্ত্তমান মালিক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। কলিকাতার এই অংশের কয়েকটি চকমিলান প্রাসাদের চণ্ডীমণ্ডপ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত! উহারা বাগবাজার ষ্ট্রীটের নন্দলাল বসুর বাটির মণ্ডপ, গোকুল মিত্র লেনের গোকুল মিত্রের মণ্ডপ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মণ্ডপ, তারক প্রামাণিক রোডে (১৫৪নং) প্রামাণিকদিগের মণ্ডপ। শেষোক্তটির বর্ত্তমান মালিক শ্রীরাখালদাস প্রামাণিক মহাশয়।

গোকুল মিত্রের মণ্ডপের সম্মুখে উচ্চ থামযুক্ত বিরাট আটচালা। তারক প্রামাণিক মহাশয়ের আটচালা মণ্ডপের পশ্চাতে অবস্থিত। ইহাতে পুরাণ পাঠকের একটি মর্ম্মর বেদী আছে। কয়েকটি মণ্ডপের কার্ণিসে কাঠের কাজ দেখা যায়। অক্রূর দত্ত লেনের অক্রূর দত্তের মণ্ডপের কার্ণিসের অবলম্বনগুলি কাঠের ও উহাতে সুন্দর কারুকার্য্য আছে। রামবাগানের মিত্রদের, জোড়াবাগান ও পাথুরিয়া-ঘাটার ঘোষেদের মণ্ডপের নিম্নে একটি তল আছে। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের মণ্ডপ (১নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট) একটি পৃথক আঙ্গিনায় অবস্থিত।

বাংলা শব্দের উচ্চারণ

শ্রীমনোজমোহন রায়, এম-এ

বাংলা শব্দের উচ্চারণ নিয়ে কয়েক বছর আগে "টিচার্স জার্নাল"-এ আলোচনা করেছিলাম। তারও আগে শ্রদ্ধেয় শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয়কে অনুরোধ জানিয়েছিলাম তিনি যেন পকেট অক্সফোর্ড ডিক্‌সনারির ধরণে তাঁর "চলন্তিকা"র উচ্চারণ দেন। কিন্তু তিনি জানান যে, ছোট অভিধানে উচ্চারণ দেওয়ার সময় তখনও আসে নি।

বর্তমানে বাংলা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা এবং পশ্চিম-বঙ্গ রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা। সুতরাং এখন আশা করা অন্যায় হবে না যে, এর একটা প্রমাণ (standard) উচ্চারণ থাকবে।

আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলা শব্দের বানান নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন একটি কমিটি করে ব্যবস্থা করেছিলেন, শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবু প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বিদগ্ধ ব্যক্তিকে নিয়ে তেমনি কমিটি করে বাংলা শব্দের বানান সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য ব্যবস্থা হউক।

আমাদের উচ্চারণ-বৈষম্য যে কত তা চিন্তাশীল ব্যক্তিই জানেন। কেবল বিদেশী শিক্ষার্থীর কাছেই নয়, বাঙালীদের নিজেদের মধ্যেও উচ্চারণের গোলযোগে শুধু হাস্যোদ্রেকই করে না, ভাল করে বুঝতেও বাধার সৃষ্টি করে।

আমরা কেউ বলি 'দেশ্‌লাই', কেউবা 'দেশলাই' বা 'দেশোলাই'। লক্ষণ ও লক্ষণ এর গোলমাল হয়। 'রক্ষা' শব্দকে "রোক্‌খ্যা" বা 'মশা'কে 'মোশা'র ন্যায় উচ্চারণ না করলে শ্রোতা হাসে। অর্থাৎ, 'অ'কারের উচ্চারণ-বিভ্রাট আছে—কোথাও হস্ হয়, কোথাও 'ও'কার হয়। এই সব ব্যাপারে কমিটি যদি একটা নির্দেশ দেন তা হলে ভাল হয়। সংস্কৃত শব্দও (তৎসম শব্দ) বাংলায় বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। এ সম্বন্ধেও নির্দেশ বাঞ্ছনীয়। 'পণ্ডিত্‌ জমি' না 'পতিত জমি', 'বিনায়ক্' না 'বিনায়ক'?

'য'ফলার উচ্চারণ নিয়েও গোলমাল বাধে: "ব্যথা"কে, ব্যাথা, ব্যক্তিকে বেক্তি বা বোক্তি, 'উদ্যোগ'কে উদ্‌যোগ বা উদ্‌দ্যোগ্ উচ্চারণ করা হয়। এ বৈষম্যেরও সমাধান প্রয়োজন।

'ব'ফলায় কোথাও 'ব' উচ্চারিত, কোথাও অনুচ্চারিত। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলতে পারেন না। 'পক্ব'কে কেউ পক্‌ব বলে না, কিন্তু 'উদ্বেগ'কে কেউ উদ্‌বেগ, কেউ বা উদ্‌দেগ উচ্চারণ করেন। হাতের কাছে ছোট অভিধান বা পাওয়া যায়, তাতে একটা বাঁধাধরা উচ্চারণবিধি দেওয়া থাকলে দশ-পনের বৎসরের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে মনে হয়।

এ-কার নিয়ে যে গণ্ডগোল, রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রকাশক তার একটা ব্যবস্থা করেছেন, তবু 'একাকী' অ্যাকাকী না এ-কাকী, এলাচ না অ্যালাচ, এ-কাদশী না অ্যাকাদশী, এ-কেলা না অ্যাকেলা এ গণ্ডগোল যায় নি। সুনীতিবাবুর ব্যাকরণ-জাতীয় বই আমাদের কাছে থাকে না, থাকে "চলন্তিকা" জাতীয় অভিধান। সুতরাং উচ্চারণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা হওয়া একান্ত দরকার। 'কেবল'কে 'ক্যাবল' বললে হাসি আসে কেন?

বিদেশী শব্দ উচ্চারণে আমরা "হরে-কর-কম-বা-দিও" ইত্যাদি করে ফেলি। 'ওয়াকিবহাল' কেউ উচ্চারণ করেন 'ওয়াকি-বহাল', কেউ বা 'ওয়াকিব-হাল'। এর ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

'মাতৃভূমি'কে কেউ বলেন "মাত্‌রিভূমি" কেউবা 'মাত্রী-ভূমি'। এই রকম বহু দেখান যায়।

কমিটি বসে যদি একটা নির্দিষ্ট উচ্চারণ-বিধি বাৎলে দেন, তা হলে অদূর ভবিষ্যতে একটি সামঞ্জস্য হবে বলে মনে হয়। বিভিন্ন জেলার উচ্চারণের টান থাকবে, তা দূর হয় না—ইংরেজী শব্দ উচ্চারণেও আছে, কিন্তু আবৃত্তি, গান, অভিনয় আদিতে যা ব্যবহৃত হবে তাতে একরকম বিধি হওয়া কাম্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ বা সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি বা বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অগ্রণী হলে সমস্যার সহজ সমাধান হবে মনে করি।

দর্শনের দিগ্‌দর্শন

শ্রীবিপিনবিহারী দাসগুপ্ত

ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আস্তিক ও নাস্তিক। যাঁহারা বেদ মানেন তাঁহারা আস্তিক। যাঁহারা বেদ মানেন না তাঁহারা নাস্তিক। আরও দুইটি শ্রেণী বিভাগ আছে। নিরীশ্বর এবং ঈশ্বরবাদী: যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না তাঁহারা নিরীশ্বর; কিন্তু নাস্তিক নহেন। একমাত্র বেদ না মানিলেই নাস্তিক বলা হয়। হিন্দু ষড়-দর্শন, কপিলের সাংখ্য, পাতঞ্জলের যোগ, গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা, বেদব্যাসের বেদান্ত—ইঁহারা সকলেই বেদ মানেন সুতরাং আস্তিক। কপিল ও জৈমিনি ঈশ্বর মানেন না, তথাপি আস্তিক এবং ষড়দর্শনের মধ্যে আসন পাইয়াছেন। এই ষড়দর্শন ভিন্ন আমাদের দেশে আরও তিনটি দর্শন আছে, তাঁহারা নাস্তিক এবং নিরীশ্বর—বেদও মানেন না এবং ঈশ্বরও মানেন না। এই তিনটির নাম চার্ব্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন এবং জৈনদর্শন।

চার্ব্বাক দর্শনের মধ্যে সাতটি বিভাগ:— ১। শরীরাত্ম-বাদী, অর্থাৎ শরীরই আত্মা। ২। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ই আত্মা। ৩। মনই আত্মা। ৪। বুদ্ধিই আত্মা। ৫। অহংকারই আত্মা। ৬। পুত্রই আত্মা। ৭। ধনই আত্মা।

বৌদ্ধ মতের চারিটি ধারা। বুদ্ধদেব একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। "সর্ব্বং দুঃখং দুঃখং শূন্যং শূন্যং বিজ্ঞানং বিজ্ঞানং ক্ষণিকং ক্ষণিকং।।" বুদ্ধদেবের চারি জন শিষ্য সূত্রের এক একটি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই অনুসারে তাঁহারা চারিটি ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা করিয়াছেন। যথা— ১। সৌত্রান্তিক। ২। বৈভাষিক ৩। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ। ৪। মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ। যিনি সূত্রের শেষ ধরিয়াছেন তিনি সৌত্রান্তিক বা ক্ষণিকবাদী—অর্থাৎ বহির্জগৎ ক্ষণিক, অন্তর্জগৎও ক্ষণিক।

বৈভাষিক বিরুদ্ধ ভাবার সামঞ্জস্য করিয়াছেন। শূন্যও বলিয়াছেন, বিজ্ঞানও বলিয়াছেন। শূন্য হইলে বিজ্ঞান কিরূপে হয়? বৈভাষিক সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছেন বাহির শূন্য, অন্তর বিজ্ঞানময়।

যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী বলিয়াছেন যে বাহির ও ভিতর উভয়ই বিজ্ঞানময়। অন্তর বিজ্ঞানময় বুঝা যায়, কিন্তু বহির্জগৎ কিরূপে বিজ্ঞানময় এই প্রশ্ন উঠিলে তাঁহারা উত্তর দিলেন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ জ্ঞানের আকার-মাত্র। পাশ্চাত্য দার্শনিক কাণ্ট এই মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের নিকট হইতে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অনেকেই জানেন না।

মাধ্যমিক সূত্রের মধ্যভাগ লইয়াছেন "শূন্যং শূন্যং"। তাঁহারা শূন্যবাদী। অন্তর বাহির উভয়ই শূন্য। সকলই শূন্যে মিলিয়া যাইবে। সুতরাং নির্ব্বাণপ্রাপ্তি সকলের লক্ষ্য। যাহাকে মায়া বলা হয় বৌদ্ধেরা তাহাকে বলেন সংবৃতি। সম্যক্ বৃণোতি আচ্ছাদয়তি। সম্যক্-রূপে আচ্ছাদন করে এইজন্য সংবৃতি। তাঁহাদের মতে প্রমাণ দুই প্রকার—অনুমান ও প্রত্যক্ষ। তাঁহারা 'শব্দ' প্রমাণ মানেন না।

ভারতবর্ষে এক সময় বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদর্শন এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, হিন্দুদর্শনের চর্চ্চা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বৌদ্ধমত প্রথম খণ্ডন করেন কুমারিল মিশ্র (ভট্ট)। কিন্তু কুমারিল মিশ্রকেও বৌদ্ধ দার্শনিকের নিকট শিক্ষার্থে যাইতে হইয়াছিল। কুমারিল নিজের ভাব লুক্কায়িত রাখিয়া বৌদ্ধ ছাত্রগণের সঙ্গে মিশিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধদের নিকট বেদ-নিন্দা শুনিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসাতে বৌদ্ধগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহাদের দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কুমারিল ভট্ট তাহার পর অদম্য উৎসাহে প্রকাশ্যে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যশ ও প্রতিভা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল। কিন্তু কুমারিল গুরুকে প্রতারণা করিয়াছেন এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুষানলে প্রাণত্যাগ করেন। কুমারিল পূর্ব্ব-মীমাংসার মতাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং তিনি নিরীশ্বর কিন্তু আস্তিক। সাধারণ আস্তিক নহে, বেদ-নিন্দা শুনিয়া চেষ্টা করিয়াও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। আচার্য্য শঙ্কর দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়া কুমারিল ভট্টের নিকট বিচারের জন্য উপস্থিত হন। তখন কুমারিল তুষানলে বসিয়াছেন। কুমারিল বলিলেন—আমি এখন তুষানলে প্রাণত্যাগ করিতেছি, তুমি আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের নিকট যাও, সে তোমার সঙ্গে বিচার করিতে সমর্থ। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন মধ্যস্থ কে হইবে? কুমারিল উত্তর করিলেন, মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতী। আচার্য্য শঙ্কর মণ্ডন মিশ্রের সহিত একুশ দিন বিচার করিয়াছিলেন।

উভয় ভারতী মধ্যস্থ হইয়া কৌশলে শঙ্করের পক্ষে জয় ঘোষণা করিলেন।

কুমারিলের পর শঙ্কর বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন। তার পর করেন উদয়নাচার্য্য। শঙ্করাচার্য্য উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তের ভাষ্য করেন। অন্যান্য দর্শনের মত খণ্ডন করিয়া বেদান্ত মত প্রতিষ্ঠা করেন। এই বেদান্তই হিন্দু-ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। অন্যান্য মতের উপযোগিতা যথেষ্ট আছে। কিন্তু বেদান্ত মতই ভারতবর্ষে ও বিদেশে বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের যেরূপ ক্রম-বিকাশ হইয়াছে আর কোন দর্শনের সেরূপ হয় নাই। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, শ্রীকণ্ঠ ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বিষ্ণু স্বামী ও বল্লভাচার্য্যের বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ, ভাস্করের ব্রহ্ম পরিণামবাদ, বিজ্ঞান ভিক্ষুর অনাদিসত্যমায়াবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ এ সকলই বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।

শঙ্করের মতকে অনেকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলেন। বাস্তবিক শঙ্করের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদের উপাদান পরোক্ষভাবে বৌদ্ধমতের মধ্যে নিহিত একথা বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন মতকে যদি কেহ বিশেষভাবে খণ্ডন করিতে চাহেন তো তিনি অজ্ঞাতসারে সেই মত কিছু পরিমাণে গ্রহণ করেন। আর বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিকট বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে গিয়া বৌদ্ধমত হইতে খুব বেশী দূরে সরিয়া যাইতে পারেন না। তিনি যে শূন্যবাদ হইতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এইজন্য সমস্ত হিন্দুসমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বৌদ্ধদর্শন হইতে হিন্দুদর্শনে পৌঁছাইবার সোপান শঙ্কর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

শঙ্করমতে—জীব অনাদি, সান্ত। ঈশ্বর অনাদি, সান্ত। একমাত্র বিশুদ্ধ ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত। এই তিনের সম্বন্ধও অনাদি সান্ত। অবিদ্যা—অনাদি, সান্ত। অবিদ্যার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ অনাদি সান্ত। অদ্বৈতবাদী কেহ জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলেন, কেহ জীবকে পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বলেন। এই দুইটি মতকে যথাক্রমে প্রতিবিম্ববাদ ও পরিচ্ছিন্নবাদ বলা হয়। ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব প্রত্যেক জীবে। ব্রহ্মের প্রতিবিম্বের যেরূপ নিজস্ব সত্তা নাই, জীবেরও সেইরূপ নিজস্ব সত্তা নাই। প্রতিবিম্বের সত্তা জ্যোতিষ্মান্ বস্তুর সত্তার উপর নির্ভর করে। সেইরূপ জীবের সত্তাও ব্রহ্মসত্তার উপর নির্ভরশীল।

জ্যোতিষ্মান্ বস্তু ও তাহার প্রতিবিম্ব পৃথক জিনিষ। সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে যে আধারে সেখানে সূর্য্য নাই। সূর্য্যের মধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে না। সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে জলে। জল সূর্য্য হইতে পৃথক বস্তু। জীব যদি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হয় তবে জীব ব্রহ্মেতর বস্তু। যেখানে ব্রহ্ম নাই সেখানে জীব আছে। ব্রহ্ম সর্ব্বগ সর্ব্বব্যাপী। এমন কোন স্থান নাই যেখানে ব্রহ্ম নাই। সুতরাং ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব হইতে পারে না। জীব যে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না তাহার আর একটি কারণ এই যে, ব্রহ্ম নিরাকার। যাঁহার আকার নাই তাঁহার প্রতিবিম্ব কিরূপে হইতে পারে? অপর একটি কারণ এই যে, প্রতিবিম্ব একটি আধারে পতিত হয়। যদি বলা যায়, অন্তঃকরণে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে—তাহা সম্ভবপর নহে। অন্তঃকরণ মায়াময় পদার্থ। মায়ার কোন অস্তিত্ব নাই। সুতরাং অস্তিত্বহীন পদার্থে কিরূপে প্রতিবিম্ব পড়িবে? এইরূপে প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করা হইয়াছে।

পরিচ্ছিন্নবাদ—এই মতে জীব পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বৈ কিছুই নহে। যেমন মহাকাশের মধ্যে ঘটাকাশ, পটাকাশ আছে, ঘট, পট ভাঙিয়া দিলে ঘটাকাশ, পটাকাশ মহাকাশে মিলিয়া যায় সেইরূপ জীবের মায়ার আবরণ দূর হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যায়।

এই মত স্বীকার করিলে ব্রহ্মে পরিচ্ছিন্নতা দোষ আসিয়া পড়ে। এক হইতে অপর পরিচ্ছিন্ন হয় আকার দ্বারা। সুতরাং পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে সাকার বলিতেই হইবে। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধি এই মতে টিকিতে পারে না। এই মতে দুইটি প্রধান দোষ। একটি এই যে, ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। তাহা অসম্ভব। অপর দোষ এই যে ব্রহ্ম সাকার হইয়া পড়েন। এইরূপে পরিচ্ছিন্নবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে। শঙ্কর জীবের সত্তা এবং জগতের সত্তা স্বীকার করেন না। শঙ্করের ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নির্বিকল্প, কূটস্থজ্ঞানস্বরূপ, যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান তিনের পার্থক্য নাই—তিন এক হইয়া গিয়াছে।

শঙ্কর-মতের প্রতিবাদ করেন শ্রীকণ্ঠ ও রামানুজস্বামী। দুই জনেরই বিশিষ্টাদ্বৈত মত। শ্রীকণ্ঠ শৈব, রামানুজ বৈষ্ণব। কিন্তু দুই জনেরই তত্ত্ববিচার একরূপ। বিশিষ্টা-দ্বৈতমতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহে, সবিশেষ। জগতের সত্তা আছে, জীবেরও সত্তা আছে। জীব এবং জগৎ ব্রহ্মের শরীর। ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার নহে। তিনি অপারকারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্যৌ, দার্য্য-ঐশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্যমহোদধি। তিনি শ্রীমন্ নারায়ণ বৈকুণ্ঠনাথ, প্রণতার্ত্তিহর, আশ্রিতবাৎসল্যৈক-জলধি, অশরণ্যশরণ্য, অনন্যশরণ।

বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভাচার্য্যের মত বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ। এই মতে জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম এক—জীবও ব্রহ্মস্বরূপ, জগৎও

ব্রহ্মস্বরূপ। জীবে আনন্দ আবৃত আছে। জগতে চিৎ ও আনন্দ আবৃত আছে। ব্রহ্ম অনাবৃত।

ভাস্করের মত ব্রহ্ম পরিণামবাদ। ব্রহ্ম জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পরিণামবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগতের সত্তা নির্ণয় করিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পরিণামবাদকে অনুমোদন করিয়াছেন। মহাপ্রভু শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করিয়া পরিণামবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মতে ব্রহ্ম জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন। বিরুদ্ধ তর্ক উঠিয়াছে যে, ব্রহ্ম জগৎ রূপে পরিণত হইলে ব্রহ্ম বিকারী হন। আর চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম কিরূপে জড়স্বরূপ জগতে পরিণত হইতে পারেন? তাহার মীমাংসা এইরূপ করা হইয়াছে। অবিচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবান ইচ্ছায় জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন। চিন্তামণির স্পর্শে লোহা সোনা হইয়া যায় অথচ চিন্তামণি অবিকৃত থাকে। প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি থাকে তো ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি থাকিবে তাহাতে আবার আশ্চর্য্য কি? বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে মায়া অনাদি এবং সত্য। মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ। ব্রহ্ম, জীব, জগৎ এই তিনের পৃথক পৃথক সত্তা মধ্বাচার্য্য স্বীকার করেন। তিনের ভেদ আছে এবং পরস্পর ভেদ আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মে জীবে ভেদ আছে, ব্রহ্মে জগতে ভেদ আছে, জীবে জগতে ভেদ আছে, জীবে জীবে ভেদ আছে, জগতের মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে।

শ্রীমন্ মধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ সত্যংজগৎ তত্ত্বতোভেদাঃ
জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতি রমলাভক্তিশ্চ তৎসাধনং
ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈক বেদ্য হরিঃ।

অর্থাৎ—শ্রীমন মধ্বমতে হরি পরতত্ত্ব, জগৎ সত্য, ভেদ সত্য, জীবগণ উচ্চনীচভাবাপন্ন হরিদাস, মুক্তি স্বকীয়-সুখানুভূতি, ভক্তি তাহার সাধন, প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ। অখিল শাস্ত্রের একমাত্র জ্ঞাতব্য শ্রীহরিঃ।

নিম্বার্কস্বামীর মত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। মধ্বাচার্য্য পাঁচ প্রকার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। নিম্বার্ক বলেন যে, সেই পাঁচ প্রকার ভেদের মধ্যে অভেদ আছে। জীবে ব্রহ্মে, ব্রহ্মে জগতে, জগতে জীবে, জীবে জীবে, জগতের মধ্যে পরস্পরে দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ। তিনি পূর্ব্বতন মতের সমন্বয় করিয়া তাহাকে নূতন আলোকে আলোকিত করিয়াছেন। তিনি মধ্বের ন্যায় জগতে ব্রহ্মে, জগতে জীবে, জীবের মধ্যে পরস্পর, জগতের মধ্যে পরস্পর ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কেবল জীবে ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ স্বীকার করিয়াছেন। এই "ভেদাভেদ" পূর্ব্বতন "ভেদাভেদ" নহে। ইহা "অচিন্ত্যভেদাভেদ"।

অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর "অচিন্ত্যভেদাভেদ" মত শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রচার করিয়াছেন।

জীব, জগৎ, ব্রহ্ম এই তিনের তত্ত্ব ও পারস্পরিক সম্বন্ধ দর্শনশাস্ত্রের বিষয়। বৌদ্ধ দার্শনিক শূন্যবাদী—কাহারও সত্তা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতে ভেদ বা অভেদ কিছুই নাই। আচার্য্য শঙ্কর এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ভেদ স্বীকার করেন নাই। তিনি অদ্বৈতবাদী। জগৎ মায়াময়; জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া এই দুইয়ের সত্তা উড়াইয়া দিয়াছেন।

রামানুজস্বামী জীব ও জগতের পৃথক সত্তা স্বীকার করেন নাই। তিনিও এক রকম ভেদাভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তাহা স্বগত ভেদ। ভেদ তিন প্রকার। স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত। এক জাতির মধ্যে যে ভেদ তাহাকে স্বজাতীয় ভেদ বলে। যেমন, জন্তুর মধ্যে গরু এবং কুকুরের ভেদ। দুই বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে ভেদ তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলে। যেমন বৃক্ষ এবং পাখীর মধ্যে ভেদ। একটি জিনিষের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যে ভেদ তাহাকে স্বগত ভেদ বলে। যেমন একটি বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পল্লবের মধ্যে ভেদ। তবে কাণ্ড—শাখা বা পল্লব নহে; শাখা পল্লব নহে; শাখা বৃক্ষ নহে; পল্লবও বৃক্ষ নহে। ইহা স্বগত ভেদ। আবার অভেদও বটে। কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পল্লব লইয়া বৃক্ষ। ইহাদের বাদ দিলে বৃক্ষ থাকে না। সুতরাং বৃক্ষের সঙ্গে কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা ও পল্লবের অভেদত্ব আছে। এই ভেদাভেদকে স্বগত ভেদাভেদ বলে। রামানুজস্বামী জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বলিয়াছেন। জীবজগৎ লইয়াই ব্রহ্মসত্তা, অথচ জীব এবং জগৎই ব্রহ্ম নয়। ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের স্বগত ভেদাভেদ সম্পর্ক।

মধ্বাচার্য্য জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিয়া এই তিনের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে পাঁচ রকম ভেদ স্বীকার করিয়া এবং অভেদকে অস্বীকার করিয়া যুক্তিতর্ক দেখাইয়াছেন।

মধ্বাচার্য্য যে পাঁচটি ভেদ দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়াছেন নিম্বার্কস্বামী সেই পাঁচটি ভেদের মধ্যে পাঁচটি অভেদও মানিয়াছেন। নিম্বার্কস্বামীর মতে এই পাঁচটি তত্ত্বই দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব।

একথা বলিলে দোষ হয় না যে, নিম্বার্কস্বামী মধ্বাচার্য্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য যেখানে যেখানে অভেদ খণ্ডন করিয়া ভেদ স্থাপন করিয়াছেন, নিম্বার্ক সেখানে সেখানে ভেদের সঙ্গে অভেদও মানিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত চারটি ভেদ-মানিয়াছেন, কিন্তু জীব ব্রহ্মে ভেদ মানেন নাই। জীব ও ব্রহ্মের "ভেদাভেদ" সম্বন্ধ মানিয়াছেন। কিন্তু সে ভেদাভেদ অচিন্ত্য। "ভেদাভেদ" সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহাকে "অচিন্ত্য" কেন বলা হইল তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। "অচিন্ত্য" অর্থ প্রমাণের অবিষয়। প্রমাণ প্রধানতঃ চারিটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ। অনুমান প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে; উপমানও প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবব্রহ্মের সম্বন্ধতত্ত্ব প্রমাণসাপেক্ষ নহে। তাহা হইলে একমাত্র 'শব্দ' দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু শব্দও ব্রহ্মতত্ত্ব এবং জীবব্রহ্মের সম্বন্ধতত্ত্ব প্রমাণ করিতে অক্ষম। শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—যাহাকে না পাইয়া যাহা হইতে বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আসে। শব্দ প্রমাণ হইতে না পারার কারণ এই যে, ইহা জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা এই চারিটি শব্দার্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু ব্রহ্মের জাতি নাই, তাহাকে কোন জাতিভুক্ত করা যায় না, তাহার কোন গুণ নাই। তিনি নির্গুণ, তাঁহার ক্রিয়া নাই—তিনি নিষ্ক্রিয়। তাঁহার কোন সংজ্ঞা নাই। সুতরাং শব্দ তাঁহাকে প্রমাণ করিতে পারে না। ব্রহ্ম অচিন্ত্য। ব্রহ্মের সহিত জীবের যে "ভেদাভেদ" সম্বন্ধ তাহাও অচিন্ত্য। এ সম্বন্ধে যুক্তিতর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। "অভেদ" এবং "ভেদ" এবং "ভেদাভেদ" প্রতিষ্ঠা করিতে যে সকল প্রমাণের সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা মনুষ্যের বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য মাত্র। কিন্তু কোন প্রমাণই টিকিতে পারে না। যথা শঙ্করের প্রতিবিম্ববাদ; পরিচ্ছিন্নবাদ আমাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর স্থাপন করা হইয়াছে। আবার বিরুদ্ধপক্ষও সেই প্রমাণ অবলম্বন করিয়াই শঙ্করের মত খণ্ডন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষও যেমন দোষী, উত্তর পক্ষও তেমনি দোষী।

আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের নিয়মদ্বারা অতীন্দ্রিয়, অচিন্ত্যতত্ত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। সুতরাং এই তর্কের শেষ নাই। এই তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। এই যুক্তি-তর্কের শেষ কথা হইতেছে—এই "ভেদাভেদ" অচিন্ত্য। সাধারণ বুদ্ধির গোচর করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়দ্বারা—অনুমান উপমান দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। "ভেদাভেদ" সম্বন্ধে একটি তর্ক উঠিয়াছে যে ভেদাভেদ একত্র থাকিতে পারে না। যেমন অন্ধকার ও আলোকের একত্র অবস্থান সম্ভব নহে। কিন্তু জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধ অংশাংশী সম্বন্ধ। যেমন সূর্য্য ও তাহার কিরণ। কিরণ সূর্য্যেরই অংশ। সূর্য্যের গুণ কিরণে আছে, কিন্তু কিরণ সূর্য্য নহে। সূর্য্যের সঙ্গে তাহার কিরণের ভেদাভেদ সম্পর্ক—ইহা আমাদের অনায়াস বোধগম্য। জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ অচিন্ত্য। বেদান্ত মতে এই শেষ সিদ্ধান্ত। সকল মতের সমন্বয় এই মতে। এইটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দান। যিনি বাল্যকালে নবদ্বীপের সমুদয় শাস্ত্রের সকল প্রধান পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের জ্ঞানচর্চ্চার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝাইয়াছিলেন, যিনি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িক বৈদান্তিকের মত অনায়াসে খণ্ডন করিয়াছিলেন। যিনি একবার মত খণ্ডন করিয়া আবার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আবার খণ্ডন করিয়া আবার স্থাপন করিয়াছেন, এইরূপে দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধির কৌশলে তিনি যে-কোন মতকে খণ্ডন করিতে এবং প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তিনি জ্ঞানসিন্ধু হইয়াও প্রেমভক্তিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া ভাবসিন্ধু, প্রেমসিন্ধু নাম ধারণ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা তত্ত্ব

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ

আমাদের জীবন-সাধনা যেন একটি নিরুদ্দেশ যাত্রা। সাধনার সোনার তরী বাহিয়া আমরা ভাসিয়া চলিতেছি। তরণীর চরম কর্তৃত্ব যাঁহার হাতে আছে, তাঁহাকে আমরা হয়ত মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করি, "আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী, বল কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী?"—কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। তাই আমাদের ভাসিয়া চলিতে হয়, কিন্তু কোথায়? তাহা আমরা জানি না।

বাস্তবিক আমাদের সাধনার চরম কথাটাও আমাদের জানা নাই, কর্তৃত্বও আমাদের নিজের হাতে নাই এবং প্রয়োজনটাও আমাদের নিজস্ব নহে। আমরা আমাদের জীবন-বিধাতা বা জীবন-দেবতার প্রয়োজনেই আমাদের জীবন-কুঞ্জ সাজাইয়া তুলি, বর্ণে গন্ধে রাগিণী ও ছন্দে তাঁহার বাসর-শয়ন গাঁথিয়া তুলি। হয়ত অনেক সময়ই আমাদের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয় না, হয়ত কর্মে শৈথিল্য আসে, হয়ত-বা বীণার তার নামিয়া নামিয়া যায়, অর্ঘ্যকুসুম বিজন-বিপিনে ঝরিয়া পড়ে।

কিন্তু আমাদের অন্তরের দেবতা তাহাতে ক্ষুব্ধ হন না, তিনি বার বার আমাদের আহ্বান করেন, আমাদের খণ্ডিত প্রচেষ্টার ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতাকে অনাগত পূর্ণতার "প্যাটার্নে"র মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া দেন, আমাদের বিভিন্ন কড়ি কোমল সুরগুলিকে একটা ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করেন, অসঙ্গতিগুলি ভাবী সঙ্গতির তাৎপর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তুলেন।

আমাদের ব্যর্থ-সাধনার অসঙ্গতিকে ভাবী সঙ্গতির তাৎপর্য্যে তিনি কিভাবে মণ্ডিত করিয়া তুলেন? তিনি শিল্পী, তাঁহার শিল্প-সাধনার সৌধটি গড়িয়া তুলিবার জন্য কোনও ইষ্টককে হয়ত ভাঙিয়া, কোনওটিকে হয়ত-বা অখণ্ড রাখিয়াই তিনি তাহার গঠন-কার্য্য চালাইয়া যান। সমগ্র সৌধটির "প্ল্যান" তাঁহার মাথায় আছে। সেই পূর্ণাবয়ব সৌধটির জন্যই তাঁহার মাথাব্যথা; কাজেই যে ইষ্টকটি অভগ্ন রহিল সমগ্র সৌধটির নির্ম্মাণে তাহার অবদানও যতটা সার্থক, যে ইষ্টকটি ভাঙিয়া গেল তাহারও অবদান ততটাই সার্থক।

আমরা আমাদের জীবন-সাধনা দিয়া আমাদের জীবন-বিধাতাকে যখন সেবা করি, তখন অনেক সময়েই আমাদের "স্খলন পতন ত্রুটি" হয়, তাঁহার কাননে "সেচিবারে গিয়া" হয়ত অনেক সময়েই আমরা ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়ি, তাঁহার রচিত রাগিণী বেসুরা হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই, আমাদের যে পূজা সারা হয় নাই তাহা তাঁহার কাছে ব্যর্থ হয় না; যে ফুল না ফুটিতে ফুটিতেই ধরণীতে ঝরিয়া পড়ে, যে নদী মরুপথে তাহার ধারাকে হারাইয়া ফেলে, তাহাও তাঁহার কাছে নিরর্থক নহে; কারণ তাঁহার বীণার তারে আমাদের অনাহত ভাবী রাগিণীও বাজিতে থাকে।

বর্তমান অনুভূতির সীমাবদ্ধ বুদ্ধি দিয়া আমরা এই অনাগত ভবিষ্যতের পূর্ণতাকেও যেমন চিনিতে পারি না, তেমনই অতীতের যে সমস্ত অদৃশ্য ঘটনা আমাদের বর্তমানকে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহাকেও জানিতে পারি না। আমরা শুধু বর্তমান প্রভাতের কুসুম-কলিকা, আমরা ফুল হইতে বীজে এবং বীজ হইতে ফুলে কতবার যে আবর্তন করিয়াছি তাহা আমরা জানি না, আবার কত অতীতের বর্ষা-বাদল "কত বাদলের স্পর্শ কোমল" আমাদের প্রাণের আলেখ্যটিকে বর্ণের পর বর্ণসম্পাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, সে সংবাদ রাখিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। সে সংবাদ আমরা জানি না, কিন্তু জানেন একজন, যিনি আমাদের জীবন-সাধনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাঁহার পাদপীঠ আমাদের সমস্ত অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে, অনুভূতি ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার মর্ম্মস্থলে।

এই অন্তরের দেবতাকেই রবীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতা আখ্যা দিয়াছেন। ইঁহাকে প্রথম হইতেই কবি ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেইজন্যই তিনি এই জীবন-দেবতাকে কখনও "কঠোর-স্বামিনী" রূপে, কখনও প্রেয়সী "মর্ত্যের গেহিনী রূপে", কখনও বা অন্তরতম জীবন-নাথ রূপে দেখিয়াছেন। এই জীবন-দেবতা কখনও বা বীণাপাণি, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী, যাঁহার মালঞ্চের মালাকর হইবার জন্য কবি প্রাণের আকুতি জানান, কখনও বা তিনি কবির "লীলা-সঙ্গিনী", যিনি কবির বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার "কাজের কক্ষ-কোণে" আসিয়া তাঁহাকে খেলায় আহ্বান করেন এবং—

> "লীলাঘরের তলে
> ঘর ছাড়া যত দিশেহারাদের দলে"

যোগ দিতে বলেন; কখনও তিনি হাতে বাঁশী লইয়া কবির নব-যৌবন সভাতে কাজ ভুলাইয়া দেন, কখনও বা

যন্ত্রের আঁধার সঙ্গে করিয়া লৌহ-বলয়ে লৌহদণ্ড বাজাইয়া তাপস মূর্ত্তি ধরিয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার এই বিচিত্র রূপ ও বিচিত্র লীলার জন্যই তাঁহাকে ঠিক চিনিতে পারা যায় না। এই জন্যই জীবন-দেবতার স্বরূপ লইয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়াছে। এই সমস্ত মতবাদের সংঘর্ষে আলোকেরও যেমন সৃষ্টি হইয়াছে তেমনই উত্তাপ ও ধূম্রজালেরও সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে আলোকটিও অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অনেক রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচকই "জীবন-দেবতা"কে "বিশ্ব-দেবতা" বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু মোহিতচন্দ্র সেন বলিয়াছেন জীবন-দেবতাকে বিশ্ব-দেবতা বলিলে কবির আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভোগের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝা যায় না।

এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :

"বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁহার আসন লোকে লোকে গ্রহচন্দ্র তারায়। জীবন-দেবতা বিশেষ ভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে যার পীঠস্থান, সকল অনুভূতির সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁহাকেই বলিয়াছে মনের মানুষ" (মানব সত্য ; প্রবাসী, ১৩৪০, জ্যৈষ্ঠ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "এই জীবন-দেবতাকে আগেকার কবিরা সরস্বতী নামে অভিহিত করিয়াছেন ; কবি কৃত্তিবাস ওঝা গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়া আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

'সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে
নানা শব্দ নানা ভাষা আপনা হইতে স্ফুরে।'

কবিকে যন্ত্র হিসাবে উপলক্ষ করিয়া যে যন্ত্রী কাব্যসঙ্গীত ফুটাইয়া তুলেন তিনিই জীবন-দেবতা।

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী জীবন-দেবতার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অনেক জটিল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

"ডারুইনের মতে প্রত্যেক জীবন-কোষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। সুতরাং একই মানুষের মধ্যে অগণ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটিয়াছে। কবি তাঁহার দৃষ্টিতে অনুভব করিলেন যে বিশ্ব-অভিব্যক্তির নানা ধারায় তাঁহার যুগযুগান্তরের জীবন প্রবাহিত হইয়াছে। সেই নানা জীবনের নানা ব্যক্তিত্ব তাঁহার মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে—একই অখণ্ড জীবন-দেবতা তাহাদের সকলকে আপনার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। ফেকনারের চৈতন্যময় বিশ্বপুরুষের আইডিয়ার সঙ্গে, গীতার বিশ্বরূপের সঙ্গে এবং উপনিষদীয় সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মার ভাবের সম্পূর্ণ মিল আছে—ইহাই জীবন-দেবতা"

ডঃ এডওয়ার্ড টমসন রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতাকে কবির কাব্য-বিবর্ত্তনের একটা স্তর হিসাবে দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

"Rabindranath proved his greatness both as a poet and as a man by rising completely above the 'Jiban debata' phase, so that the thought faded out from his work—faded out gradually, till it was lost in his strong religious experience and absorbed into his general system of thought."

কিন্তু জীবন-দেবতা কবির কাব্য বিবর্ত্তনের স্তর মাত্র নহে, জীবন-দেবতা হইতেছেন কবির কর্ম্ম-সাধনা ও জীবন-সাধনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তও জীবন-দেবতাকে জীবন-সাধনার প্রেরয়িত্রী ও অধিষ্ঠাত্রী রূপে কল্পনা না করিয়া যেন সাধারণ দেবতা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

"কোন্ কবিতা বাস্তবিক জীবন দেবতা বিষয়ক, ইহা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে কোন্ কাব্যের প্রেরণা আসিয়াছে দেবতার সহিত মিলন বা সেই মিলনের আকাঙ্ক্ষা হইতে। বাস্তবিক সেই সকল কবিতাই এই শ্রেণীর মধ্যে পড়িবে, যাহাদের মধ্যে কবি দেবতার সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা প্রকাশ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন—এই দেবতা প্রধানতঃ তাঁহার স্বীয় দেবতাই হউন, অথবা তিনি বিশ্বের দেবতাই হউন, আসল কথা এই, তিনি হইবেন দেবতা" (উদয়ন, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩৪১)।

ডঃ শচীন্দ্রনাথ সেন তাঁহার 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার সার্থক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার প্রবন্ধের শেষের দিকটিতে যেন রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতাবাদ ও তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাস এক হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু জীবন-দেবতা সম্বন্ধে বোধ হয় এত জটিল আলোচনার প্রয়োজন নাই। কারণ কবি নিজেই ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন,

"আজ জানিয়াছি যে সকল লেখা উপলক্ষ মাত্র—তাহারা যে অনাগতকে গ'ড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন রচনাকার আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য্য প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান। ফুৎকার বাঁশীর একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া এক একটা সুর জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং নিজের কর্ত্তৃত্ব উচ্চৈস্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিণীতে গাঁথিয়া তুলিয়াছে? ফু সুর জাগাইয়াছে বটে, কিন্তু ফু ত বাঁশী বাজাইতেছে না; কে সেই বাঁশী বাজাইতেছে, তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিণী বর্ত্তমান আছে, তাঁহার অগোচরে কিছুই নাই...এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, সমস্ত অনুকূল-প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা

করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবন-দেবতা' নাম দিয়াছি···আমি জানি অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন" (মানব সত্য, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০)

তবে এই জীবন-দেবতা সম্বন্ধে কবির ধারণাটা এক দিনেই হঠাৎ গড়িয়া উঠে নাই। কবির ৭।৮ বৎসর বয়স হইতেই তাঁহার কবিতা রচনা আরম্ভ হয়, ১৪ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার প্রথম কাব্য-কাহিনী "বনফুল" জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার জীবন-দেবতা সম্বন্ধে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় চিত্রা কাব্যের মধ্যে। প্রথমে তিনি ছিলেন কবির "অন্তর্যামী" (১৩০১), পরে কবি তাঁহাকে "জীবন-দেবতা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন (১৩০২)।

ইহা ছাড়া চিত্রার 'সাধনা', 'সিন্ধুপারে', 'আত্মোৎসর্গ', 'শেষ উপহার' প্রভৃতি কবিতায়, উৎসর্গ কাব্যের 'ছল', 'নববেশ', 'দুয়ারে তোমার ভিড় করে আছে যারা' প্রভৃতিতে কল্পনার 'অশেষ' কবিতায়, বলাকার 'শঙ্খ' কবিতায়, পূরবীর 'লীলাসঙ্গিনী','আহ্বান','পদধ্বনি', 'দোসর', 'অন্তর্হিতা' প্রভৃতি কবিতাতেও জীবন-দেবতার প্রসঙ্গ আছে। কবির কাব্যে জীবন-দেবতা-বাদ পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বেই কবি তাহার লীলা-রহস্য বুঝিতে আরম্ভ করেন। সোনার তরীর "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র মধ্যে তিনি জীবন-দেবতার অজ্ঞাত অভিযানের কথা অনুভব করিয়াছিলেন, "মানস সুন্দরী"তে তিনি জীবন-দেবতাকেই হয়ত সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী বা কাব্য-লক্ষ্মীরূপে অনুভব করিয়াছেন এবং "সোনার-তরী" কবিতাতে তিনি জীবন-দেবতার একটা দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান পান।

সে-তত্ত্বটি এইরূপ—

সোনার তরী বাহিয়া মহাকাল চলিতেছে। মানুষ তাহার জীবনের ছোট ক্ষেতটিতে সোনার ফসল ফলাইয়াছে। এই ক্ষেতটুকু ছোট একটি দ্বীপের মত, কারণ সেই দ্বীপের চারিদিকই সে অব্যক্তের দ্বারা বেষ্টিত। এইবার বর্ষা ঘনাইয়া আসিয়াছে, হয়ত ঐ অব্যক্তের মধ্যে তাঁহার ক্ষেতটুকুও ডুবিয়া যাইবে। কবি এতদিন জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনযাপন করিতেছিলেন। এখন কিন্তু তাঁহার মনটি পরপারে আঁকা "তরুছায়া মসীমাখা" গ্রামের দিকে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় তিনি দেখিলেন মহাকালের দেবতা কালস্রোতে তরী ভাসাইয়া চলিতেছেন। কবি তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার সোনার ফসল সমস্তই "ধরে-বিথরে" তুলিয়া দিলেন এবং তাহার পর তাঁহাকেও সেই সোনার তরীতে তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করিলেন। কিন্তু মহাকাল তাঁহার কর্ম্মের ফসলকেই গ্রহণ করিলেন, কবিকে গ্রহণ করিলেন না। কারণ মহাকালের ইতিহাসে আমাদের সাধনার সোনার ফসলই সঞ্চিত হইয়া থাকে, সাধকের স্মৃতি লইয়া তাঁহার কোনও মাথাব্যথা নাই।

এই সোনার তরী হইতেছে কবির তথা সমগ্র মানব জাতির সাধন-তরী। আমাদের সাধনার সোনার ফসল তাহাতে রক্ষিত ও বাহিত হয়, কিন্তু আমরা সেখানে স্থান পাই না। কোন্ দিন কোন্ অজ্ঞাত শিল্পী আদার সহিত মৌরী বাটিয়া বাংলার কলাই-এর ডালের সঙ্গে মুলতানের হিং মিশাইয়া রন্ধনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে খবর আমরা রাখি না, কিন্তু সে প্রক্রিয়াটি মনে রাখিয়াছি। জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রেই এই জিনিষটি দৃষ্ট হয়। কবে কোন্ বৈজ্ঞানিক প্রথম গাড়ীর চাকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কে আগুন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সমুদ্র হইতে মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, খনি হইতে লৌহের সন্ধান করিয়াছিলেন, মহাকালের খাতায় তাহা লিখিত হয় নাই, কিন্তু সেই সব সাধনার ফলগুলি মানব-সভ্যতার ইতিহাসে রহিয়া গিয়াছে।

এই কবিতাটির শেষের স্তবকে কবির জীবন-দেবতা-বাদের সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। মহাকাল কবির সোনার ধান গ্রহণ করিলেন কিন্তু কবিকে গ্রহণ করিলেন না। ফলে কবি সাধনার শেষে যে বিশ্রাম খুঁজিতেছিলেন তাহা তাঁহার ভাগ্যে জুটিল না। ইহাই তাঁহার জীবন-দেবতার অভিপ্রায়। কারণ আমরা কবির জীবন-দেবতা-বিষয়ক পরবর্ত্তী রচনা "অশেষ" ১৩০৬ (কল্পনা), "আহ্বান" (পূরবী), শঙ্খ ১৩২১ (বলাকা) প্রভৃতির মধ্যে দেখিতে পাই যে, সাধনার অর্জ্জিত সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে পূর্ব্বার্জ্জিত অর্থের সুদ খাটান মহাজনের মত বসিয়া থাকিবার অধিকার জীবন-দেবতা আমাদের দেন না। কারণ সেই কঠোর স্বামিনীর দাবির শেষ নাই, তাঁহাকে সেবা করিলে বিদায় পাওয়া যায় না, ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার আহ্বান ধ্বনিত হয়, তাঁহার কাছে আরাম চাহিলে শুধু লজ্জাই পাইতে হয়, কিছুতেই তাঁহার পূজা সারা হয় না, কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি বিধানও হয় না. "গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা" তাঁহার ক্ষণিক খেলার জন্য নূতন নূতন মূর্ত্তি রচনা করিতে হয়, "নিঠুর-পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম" তাঁহার পান-পাত্র ভরিয়া তুলিতে হয়; আবার এই জীবন দিয়া যখন তাঁহাকে নূতন কিছু সেবা করিবার সম্ভাবনা থাকে না, তখন তিনি মৃত্যুর

ভিতর দিয়া তাঁহার সেবককে নূতন জীবন দান করিয়া তাঁহার নিজের কাজ আদায় করিয়া লইতে চাহেন; তাই কবিকে প্রার্থনা করিতে হয়।

"নূতন করিয়া লহ আর বার চির পুরাতন মোরে
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন ডোরে।"

এই জীবন-দেবতার প্রেরণাতেই কবি বার বার তাঁহার কাব্য-সাধনার সমাপ্তি করিয়াও বার বার নূতন করিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। কবি তাঁহার সাধনার শেষ দান মনে করিয়া "চৈতালি" কাব্য (১৩০২-১৩০৩) রচনা করিলেন। কিন্তু এইখানে তাঁহার রচনার শেষ হইল না। ইহার পর "খেয়া" (১৩১৩), "পূরবী" (১৩২৯), "শেষের কবিতা" (১৩৩৬), "পরিশেষ" (১৩৩৭) প্রভৃতি পরিসমাপ্তি সূচক গ্রন্থ লিখিয়াও শেষ পর্য্যন্ত "পুনশ্চে"র (১৩৩৯) জের টানিয়া তাঁহাকে চলিতে হইল।

এই তত্ত্বটিই প্রকাশিত হইয়াছে "সোনার তরী"র শেষ স্তবকে। সেখানে দেখিতে পাই কবি যখন কাজের একটা পর্ব্ব শেষ করিয়া একটু বিশ্রামের জন্য সোনার তরীতে স্থান চাহিলেন, তখন তিনি সেই স্থানটুকু পাইলেন না। কারণ ইহাই যে জীবন-দেবতার অভিপ্রেত, তিনি যে ভাবে আমাদের দিয়া কাজ করাইয়া লন তাহার শেষ নাই, বিবর্ত্তনের পর বিবর্ত্তন, আবর্ত্তনের পর আবর্ত্তনের ভিতর দিয়া তাঁহার লীলা চলিতেছে। তাই দেখিতে পাওয়া যায় চৈতালী পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার সাধনার একটা পর্ব্ব শেষ করিলেন বলিয়া তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন:

"চৈতালী শীর্ষক কবিতাগুলি লেখকের পর্ব্ব শেষের লেখা। তাহার অধিকাংশই চৈত্র মাসে লিখিত বলিয়া বৎসরের শেষ উৎপন্ন শস্যের নামে তাহার নামকরণ করিলাম।"

কিন্তু এইখানেই ত কবির সাধনার শেষ হইল না, তাঁহার অঙ্গে ক্লান্তি নামিয়া আসিল, মন্দমন্থরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, তবুও তাঁহাকে বলিতে হইল "তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা"(১৩০৪)। ইহার পর "অশেষ" কবিতায় (১৩০৬) কবি নিষ্ঠুর স্বামিনী জীবন-দেবতার আহ্বান স্পষ্ট করিয়াই শুনিতে পাইলেন:

"মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ণ ম্লান হেসে
হ'ল অবসান,
পর পারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে
তবুও আহ্বান?"

কিন্তু এই আহ্বান যিনি করেন তিনি শুধু কঠোর স্বামিনীই নন তিনি "মোহিনী"ও বটে। সেইজন্যই তাঁহার সহিত কবির সম্পর্ক শুধু প্রভুর সহিত ভৃত্যের দীনতার সম্পর্ক নহে, স্বার্থের সম্পর্ক নহে। এই জীবন-দেবতা কবির জীবনের অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীও বটে। তাই তাঁহার সহিত কবির একটা মধুর রসের সম্পর্কও আছে। সেইজন্য কবি সেই সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর স্বেচ্ছাবন্দী সেবক হইয়া তাঁহার নিকুঞ্জের অনুচর হইতে চান। তিনি এই রাজরাজেশ্বরী মহারাণীর চরণপ্রান্তে যুদ্ধ অস্ত্র ধনুশর উষ্ণীষ রাজসাজ সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, গৌরব ও দম্ভের উচ্চ রাজকার্য্য প্রত্যাখ্যান করিয়া, রাজসিক দম্ভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পদ ফিরাইয়া দিয়া তাঁহার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর মধুর অঙ্গকে ফুলের কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে মধুরতর করিয়া সাজাইয়া তুলিবার অধিকারলাভ করিবার জন্য, তাঁহার মালঞ্চের মালাকর হইবার জন্য আবেদন করেন। ইহার মধ্যে প্রতিষ্ঠার প্রেরণা নাই, আছে শুধু শিল্পীর নিষ্ঠা, আত্মবিস্মৃত প্রেমিকসেবকের সন্ন্যাসীকৃত্য।

এই নিষ্ঠা, এই সন্ন্যাসীকৃত্য আমাদের জীবন-দেবতার নিকট কখনও অবহেলিত হয় না। জগতের সাধারণ লোক আমাদের কাজের মূল্য দেয় কাজের সফলতা দেখিয়া। কারণ স্থূল দৃষ্টিতে এই সফলতার চেয়ে ব্যবহারিক মাপকাঠি মানুষের হাতে নাই। কিন্তু জীবন-দেবতার পীঠস্থান মর্ম্মের মর্ম্মস্থলে, সমস্ত অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে, সেইজন্য আমাদের "যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না" সেই সমস্ত ব্যর্থ-সাধনাকেও তিনি অবহেলা করেন না। আমাদের সাধনার মধ্যে যদি আন্তরিকতা থাকে তাহা হইলে আমাদের কাজ করাটাই তাঁহার চোখে বড় হইয়া উঠে, কাজের ব্যর্থতাটা নহে। সংসারের স্বার্থ-সফল কৃতী লোকেরা হয়ত আমাদের ব্যর্থতা দেখিয়া হাসিতে পারে, কিন্তু আমাদের জীবন-দেবতা সেই ব্যর্থতাকে তিরস্কৃত করেন না, তাই তাঁহাকে বলা যায়:

"তুমি জান ওগো করি নাই হেলা
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা
শুধু সাধিয়াছি বসি সারা বেলা শতেক বার"—

এইটাই হইতেছে বড় কথা। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের:

"মনে যাহা ছিল হয়ে গেল আর
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বার বার;"

কিন্তু জীবন-দেবতা ত সেই ভাঙিয়া যাওয়াটাকেই বড় করিয়া দেখেন না, তিনি মনের আন্তরিক বাসনাকেই মূল্য দেন, স্থূল চক্ষে যাহা সকলের নিকট ধরা পড়ে, সেই সফলতার স্থূল মাপকাঠি দিয়াই তাঁহার বিচার নহে, কারণ আমাদের অন্তরের নিষ্ঠাটা তাঁর কাছে অজ্ঞাত নয়, তাই যে ব্যর্থতার জন্য লোকে আমাদের নিন্দা করে, সেই ব্যর্থপ্রচেষ্টার মূল্যও তিনি দিয়া থাকেন। কারণ:

"All I could never be
All men ignored in me
This I was worth to God whose wheel the pitcher
shaped."

কবির জীবন-দেবতা তাঁহার ব্যর্থ সাধনাকেও যেমন অবহেলা করেন না তেমনই সার্থক সাধনাকে লইয়াও মাতামাতি করেন না। কারণ পূর্ণতা ও সফলতা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অনেক উচ্চ। সেই জন্য আমাদের ত্রুটিগুলিকেও যেমন তিনি উদারভাবে ক্ষমা করিতে পারেন, তেমনই আমাদের লৌকিক সফলতাকেও খুব বড় করিয়া ভাবিতে পারেন না। সেই জন্যই কবি তাঁহার জীবন-দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন :

"বুঝেছি বুঝেছি তব ছলনা
সবার যাহে তৃপ্তি হলো তোমার তাহে হলো না।"
(উৎসর্গ, 'ছল')

এই জীবন দেবতা যেন রাজরাজেশ্বরী, আমাদের সাধনার তুচ্ছতম, এমন কি ব্যর্থ উপহারকেও তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করেন, আবার সফল-সাধনার উপহারে তিনি অভিভূত হন না। কারণ চরম সফলতার যে আদর্শ তাঁহার জানা আছে, তাহাকে আমরা কোনও দিনই পাইতে পারি না, কাজেই সবার যাতে তৃপ্তি হয় এমন সফলতাও তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারে না।

এই জন্যই আমাদের সাধনার শেষ নাই, সার্থকতার পার্বত্য যাত্রাপথের শেষ বিরামের অধিত্যকা নাই। সেই সার্থকতা আমাদের অজ্ঞাত, অথচ সেই অজ্ঞাত সাধনার সন্ধানেই "কস্তুরী মৃগসম" আপন গন্ধে পাগল হইয়াই আমরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করি, অন্তরের সৌন্দর্য্য-বোধ ও সৃষ্টির বহিঃপ্রকাশের জন্য এই ব্যাকুলতাই হইতেছে আমাদের অচিন প্রিয়ার বাঁশরীর আহ্বান, এই সুদূরের আহ্বানেই আমাদের "অবারণ চলা আরম্ভ হয়, কখনও তাহার শেষ হয় না, কারণ এই যাত্রা-পথ সরল রেখায় বিস্তৃত নহে, ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে আরম্ভ এবং নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে পরিসমাপ্তি নাই, ইহা আবর্ত্তনে আবর্ত্তনে চক্রগতিতে চলে, এই জন্যই সব সময়েই তাহার আরম্ভ, অথচ কোনও সময়েই তাহার শেষ নাই, কোনও সময়েই তাহা একেবারে অসম্পূর্ণ নয়, আবার কোনও সময়েই তাহা সম্পূর্ণও নহে—এ চলার "শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?" প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন :

"সাদ হলে মেঘের পালা সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা
বরফ জমা সারা হলে নদী হয়ে গলবে—"

মানুষের সাধনার ক্ষেত্রেও সেইরূপ, ইহাই মানুষের জীবন দেবতারও লীলা।

সমাধান

শ্রীশান্তশীল দাশ

হিসেব নিকেশ করি না'কো আর
এই আছি বেশ ভালো ;
অনেক কমেছে জীবনের জটিলতা ;
জীবনে মেনেছে কতটা আঁধার,
আর কতটুকু আলো,—
এ হিসাব মাঝে পাই সে সার্থকতা।
আঁধারের দাম হাসিমুখে দিই
করি নাকো বৃথতায় ;
দেখি সে আঁধার নহে তো চিরন্তন।

যেটুকু পাবার তার চেয়ে বেশী
থাকে নাকো সে তো আর,
কেন হতাশায় অকারণ ক্রন্দন।
জোছনা রজনী আসে দেখি চেয়ে,
হই নাকো বিহ্বল,
সাথে আছে তার অমাবস্যা সে তো জানি ;
চিরসাথী নয় বলে ব্যথাভরে
ফেলি নাকো আঁখিজল ;
সহজ হৃদয়ে হ'য়েছে নিয়েছি মানি।

এক রাত্রির স্মৃতি

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর, প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত দরখাস্ত ও 'ইণ্টারভিউ' দিয়া দিয়া যেমন হতাশ হইয়া পড়িলাম, তেমনি নিজের উপরও একটা প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মিয়া গেল। ভাবিলাম, বাস্তবিকই আমি একটা অকেজো অপদার্থ —নতুবা অন্ত সকলের কেমন চাকরি জুটিয়া যায়, আর আমারই বা হয় না কেন? আমার মনটা যে শুধু দুঃখেই ভরিয়া গেল তাহাই নয়, হতাশা ঘৃণা বিষাদ বিদ্বেষ ক্রোধ প্রভৃতি মিলাইয়া যে বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে, ঠিক সেইরূপ কোন এক ভীষণ নারকীয় বস্তুর সৃষ্টি হইয়া, আমার মনকে এমন এক অবস্থায় আনিয়া দিল যে, পৃথিবীর সবকিছুরই উপর অতিমাত্রায় বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া, অত্যন্ত অনাসক্ত হইয়া পড়িলাম। মনে হইল, এই জগৎ সত্যই অতি বিশ্রী স্থান, এখানে কোন আকর্ষণ নাই, মধুরতা নাই, সৌন্দর্য্য নাই। বোধ হয়, এইরূপ মনোবিকারের মধ্যেই মানুষ সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া যায়, অথবা আত্মহত্যা করিয়া বসে। কিন্তু আমার মন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাই ঐ দুই পন্থাকেই বেমালুম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, একদিন সকলের অগোচরে ট্রেনে চাপিয়া বসিলাম—উদ্দেশ্য কলিকাতায় যাওয়া।

মামা মামীর নিত্য দুই বেলা গঞ্জনা আর সহ্য হয় না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, আমি শৈশব হইতেই পিতৃ-মাতৃ-হীন। কলিকাতা রওনা হইবার পূর্ব্বে আমার কৃপণ মাতুলের বাক্স খুলিয়া, তাঁহার বহুদিনের সযত্নসঞ্চিত অর্থ সরাইয়া তাঁহার ভার লাঘব করিয়া দিলাম। জানি আমার এই যাওয়াই এখান হইতে শেষ যাত্রা, কারণ আর কখনই মাতুল তাঁহার গৃহে আমায় স্থান দিবেন না।...

ট্রেনে চাপিয়া বসিয়া, কৃপণ মাতুলের অর্থশোকের সেই মর্ম্মকাতর দৃশ্যটি ভাবিয়া, মনে মনে হাসিয়া, সম্ভ ক্রীত কাঁচি সিগারেটের তেলতেলে কাগজখানি ছিঁড়িয়া একটা সিগারেট ধরাইলাম। মাতুলের পয়সায় সিগারেট টানিতে বেশ লাগিতেছে। নবদ্বীপ ষ্টেশন আসিলে, এক গেলাস চা লইয়া সিগারেট টানিতে টানিতে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা ঠিক করিতে লাগিলাম। প্রথম সমস্যা দেখা দিল, কলিকাতায় কোথায় গিয়া উঠিব। ভাবিলাম, মল্লিকদের হরিপদ বড়বাজারে এক মশলার দোকানে কাজ করে। তাহার ঠিকানা ত জানি। উপস্থিত তাহার কাছেই উঠিয়া, যা হোক কোন একটা কাজকর্ম্মের সন্ধান করিব। ইহাই মনে মনে ঠিক করিয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ভবিষ্যতের সোনালী চিত্র আঁকিতেছি, আবার কখনও কখনও মাতুলের মুখখানি মনে পড়িতেছে। মনশ্চক্ষে দেখিলাম, মাতুল বাক্স খুলিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তারপর টাকভরা মাথায় অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় চুলগুলি টানিতে টানিতে মাথা চাপড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট ভাগনের সহিত সঞ্চিত অর্থগুলির উধাও হওয়ায় যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা তারস্বরে ঘোষণা করিতে করিতে উঠানময় একরূপ উদ্দাম নৃত্যই সুরু করিয়া দিলেন। কল্পনায় মামা-মামীর যুক্ত গালিগালাজ ও অভিসম্পাতের দৃশ্যটুকু যে বেশ চমৎকারই লাগিল, তা বলা বাহুল্য।

ভাবিতে ভাবিতে অথবা সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে বুদ্ধি খুলিয়া গেল। মনে হইল, এতদিন শুধু ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাইয়াছি, আর ইণ্টারভিউ দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু চাকরি পাইতে হইলে যে, তদ্বির ও চেষ্টা করিতে হয়, তাহা ত কোন দিনই করি নাই। উপস্থিত হাতে যখন অর্থ আছে, তখন একবার ভাল করিয়া তদ্বির করিয়াই দেখা যাক না। মনে পড়িল—শেষ দরখাস্তখানির কথা। বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার আপিস হইতে যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, ও যাহাতে আমি দরখাস্ত করিয়াছি সেইখানির কথা। এখনও ইণ্টারভিউ করিবার তারিখ আসে নাই। এখনই ত তদ্বির করিবার সময়। উহারা কতকগুলি লোক লইতেছেন —যাহাদের কাজ গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কাহার কত বিঘা জমি আছে—উহার মধ্যে কত আবাদী কত অনাবাদী, অথবা কোন্ জমিতে কি কি ফসল কত হারে হয় এইসব তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। চাকুরি যদিও অস্থায়ী এবং মাহিনা যদিও কম —মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা—তবুও সোলার টুপী মাথায় দিয়া অঙ্গে খাঁকি প্যাণ্ট সার্ট চড়াইয়া, জুতা মোজা আঁটিয়া কিছুকাল একজন মস্ত বড় অফিসার সাজিয়া বেড়াইব। গেঁয়ো চাষীরা ও সরল গ্রাম্য লোকেরা সভয়ে সেলাম ঠুকিবে—কেহ বা বিনা কারণে খোশামোদ করিবে। উহাই বা কম আনন্দ নাকি। এখন যো সো করিয়া, তদ্বির তদারকের জোরে চাকরিটা বাগাইয়া ফেলিতে পারিলে হয়। তাই ব্যাণ্ডেলে নামিয়া পড়িয়া বর্দ্ধমানের গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম। আমার জানা-শোনা একটি ছেলে বর্দ্ধমানের কোর্টে কাজ করিত। তাহারই আস্তানায় উঠিলাম। নাবেন তখন সবেমাত্র কোর্ট হইতে ফিরিয়া, ভাঙা তক্তপোষের উপর শুইয়া পাখা নাড়িয়া বাতাস খাইতেছে। আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, আরে দাদা যে—

মৃদু হাসিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িলাম।

নাবেন বলিল, তার পর হঠাৎ কি ব্যাপার। মামলা-মোকদ্দমা নাকি?

—না হে—ও সব কিছু না। তার চেয়েও বড়। সব বলছি দাঁড়াও একটু। হাত মুখ ধুয়ে, আগে একটু চা খেয়ে নিই। বাব্বাঃ, গাড়ীতে কি ভিড়। গরমে আর ঠেলাঠেলিতে প্রায় শেষ হয়ে গেছি। হাঁ, তোমার এখানে রাতটা ত কাটাবই, সম্ভবতঃ কালকেও থাকতে হবে।

রাজেন বলিল, তাতে কি? বসুন—ভাল হয়ে বসুন। না—না—ওদিকটায় বেশী চাপ দেবেন না। একটা পায়া ভাঙা, তাই খানকতক ইট দিয়ে কোন মতে খাটাকে খাড়া রেখেছি। কি জানি চাপ পেলে—ইনি কাৎ মারতে পারেন। —সভয়ে সরিয়া বসিয়া বলিলাম—ও বাবা। কাজ নেই—সরে বসি। বলি ছারপোকা আছে নাকি হে? কুট কুট করে কামড়াচ্ছে যে—

রাজেন বলিল—বাঃ থাকবে না মানে? রাতে ও বেটারা ঘুমুতে দেয় নাকি? সারা রাতই এক একটাকে ধরছি—আর মারছি। একে রেশনের চাল খেয়ে খেয়ে চামচিকেটি হয়ে গেলাম—তার ওপর এই রক্ত শোষকগুলোর অত্যাচারে শরীরে আর কিছু রইল না। রাতে প্রতিজ্ঞা করি—সকাল হলেই এই ভক্তপোষসুদ্ধ ওদের টান মেরে ফেলে দেব। কিন্তু সকাল হলে আর হয় না। দশ টাকা দিয়ে কিনেছি কিনা?

বলিলাম—তা বটে। দশ দশটা টাকাই লোকসান হবে।

রাজেন কোন কথা না বলিয়া, দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। এক সময় দুটি বিড়ি বাহির করিয়া বলিল, নিন টানুন। কিন্তু ব্যাপারটা কি—মানে কি দরকারটা তা ত বললেন না। সংক্ষেপে সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলিলাম, দেখ চাকরি আমার চাই-ই। যেমন করে হোক—তদ্বির তদারক খোশামোদ করে পায়ে তেল দিয়ে—মানে ওটা চাই। নতুবা আমার আর কোন আশা নেই। মাতুলাশ্রম বন্ধ—আর ওমুখো হবার উপায় নেই—

রাজেন বলিল, তা তো সবই বুঝলাম। কিন্তু চাকরি—। এই বলিয়া রাজেন মুখখানা বিকৃত করিল।

বলিলাম—কেন—আশা নেই নাকি? এখন কার হাত আছে—কাকে ধরতে হবে, কি ভাবে তদ্বির তদারক করতে হবে, এই সব সন্ধান আমায় বাৎলে দাও দেখি। তার পর আমি দেখে নেব।

রাজেন উঠিয়া বলিল, আচ্ছা সে হবে। এখন চলুন, হাত মুখ ধুইগে।

দিন পাঁচ-ছয় কি পরিশ্রমই না করিলাম! রাজেনের নিকট সন্ধান লইয়া ঠিক চাকরিবাজীর মত বোঁ বোঁ করিয়া এই কয়দিন ঘুরিয়া অবশেষে সত্য সত্যই চাকরি একটা বাগাইয়া ফেলিলাম। যেদিন চাকরিতে বহাল হইলাম, সেই দিন মনে হইল, করতলে স্বর্গরাজ্য নামিয়া আসিয়াছে। রাজেনকে একপেট সীতাভোগ মিহিদানা খাওয়াইয়া দিলাম। রাজেন না থাকিলে এই চাকরি-যুদ্ধে জয়ী হইতাম না। ও অঞ্চলে থাকিয়া, মোক্ষম মোক্ষম তীর ছুড়িয়া আমায় জয়ী করিয়া দিয়াছে। রাজেনের নিকট ঠিক ঠিক সন্ধান—ঠিক ঠিক খবর না পাইলে এই চাকরি আমার ভাগ্যে জুটিত না। শুধু ইণ্টারভিউ দেওয়াই সার হইত।

এক দিন আপিসের কাগজপত্রসহ সদরের উপদেশ ও আদেশ লইয়া আমার কর্ম্মস্থল সেনপাহাড়ীতে রওনা হই-লাম। সেনপাহাড়ী একটা পরগণা। লালমাটি আর কাঁকরে একটা রুক্ষতা যেন সারা অঞ্চল ছাইয়া রহিয়াছে। ধরিত্রীর স্পর্শে কোমলতা নাই—আছে তীক্ষ্ণতা। এখানে আসিয়া অতীতের বহু কথা মনে পড়িতে লাগিল।

ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম—এই সেনপাহাড়ী পরগণা অতীতে এককালে গোপভূমি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে মহারাজ চিত্রসেন এই রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার নামানুসারে এই পরগণার নাম হইল সেনপাহাড়ী। আমার মন চলিয়া গেল সেই সুদূর অতীত যুগে—তিন হাজার বৎসর আগেকার ইতিহাসের পৃষ্ঠায়—সেই সব তেজস্বী বীর বাঙালীর ছবি মনে ভাসিয়া উঠিল। মনে পড়িতে লাগিল, এক দিন বিজয় সিংহ তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে নীল সাগরের বুকে জাহাজ ভাসাইয়া লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন এই রাঢ়-দেশ বা সুহ্মজনপদের রাজা—রাজা সিংহবাহুর পুত্র। মনে পড়িল—দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডার বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। রাঢ়ের দুর্দ্ধর্ষ বাঙালী-বাহিনী গঙ্গা-রাঢ়ী সৈন্যের অসীম শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী শুনিয়া আর তিনি অগ্রসর হন নাই। এই মাটিতে—পুরাকালের এই গোপভূমির মাটিতে কত বীর কত যোদ্ধা জন্মিয়াছিলেন—কত যুদ্ধ-বিগ্রহই না এই ভূমির উপর ঘটিয়া গিয়াছিল। এই ভূমি—এই লাল মাটি—আর রুক্ষ কাঁকর, পুরাতন পৃথিবীর জীর্ণতায় আজ প্রাণ-হীন—রসহীন। কিন্তু বোধ হয় এক দিন ছিল—এই ভূমি সুজলা সুফলা। মনে পড়িতে লাগিল—এক দিন, এই স্থান ছিল সিংহবাহু, মহারাজ শশাঙ্ক, কর্ণ সেন, চিত্র সেন, ঈশ্বর ঘোষ, হেমন্ত সেন প্রভৃতি বীর পুরুষগণের লীলাস্থল।

অতীতের সেই গৌরবময় যুগে এই জনপদে সেদিন প্রতি সন্ধ্যায়, মন্দিরে মন্দিরে পূজার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত—ধূপ ধূনা গুগ্‌গুলের সুগন্ধে বাতাস সুরভিত হইত—অশ্বারোহী সৈন্যের জেহীনিনাদে—অশ্বের ক্ষুরাঘাতে রাজপথ সচকিত হইয়া উঠিত। তার পর কালস্রোতে সব ভাসিয়া গেল। বাঙালী সভ্যতার আদি তীর্থভূমি কালের কঠোর আঘাতে কোথায় ডুবিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এখন সেই স্থান শুধু শ্রীহীন

কাঁকর আর লাল মাটিতে পরিপূর্ণ। ছোট বড় নদীসমূহ আজ মৃত—কিংবা মৃতপ্রায়। গ্রামাঞ্চল—কোথাও বিরলবসতি—কোথাও ধূ ধূ করিতেছে প্রান্তর—কোথাও বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বড় বড় দীঘির চারি পাড়ে বন জঙ্গল—সাপ আর হিংস্র বন্যজন্তুর আস্তানা। মন্দিরে মন্দিরে—নরহন্তা ডাকাতদলের নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

আমি একখানি সাইকেল যোগাড় করিয়াছিলাম। আমার উপর আদেশ ছিল, এই দেশপাহাড়ীর আশপাশের দশ বারখানি গ্রামের আবাদী ও অনাবাদী জমির হিসাব লইতে হইবে। কোন্ জমিতে কি পরিমাণ ফসল হয়, কি কি ফসল ফলে, সেচের ব্যবস্থা আছে কিনা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখিলাম—অন্ততঃ পনের-ষোল দিনের কম এই সব ব্যাপার চুকিবে না। এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কৃপায় একটা আশ্রয়স্থল জুটিয়া গেল। আমি সাইকেলে চাপিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। প্রায়ই সমস্ত দিন আমার একরূপ খাওয়াই হয় না। ভগবানের দয়ায় অবশ্য কোন কোন দিন কোথাও বেশ ভাল আহারই জুটিয়া যায়। অনাহারে বিশেষ কষ্ট হয় না—যতটা কষ্ট হয় সময়মত চা না পাইলে। তাই সাইকেলের পিছনের কেরিয়ারে চা, চিনি, কেটলী, একটা কাপ ঝোলায় করিয়া বাঁধিয়া লইয়া কাজে বাহির হইয়া যাই। গ্রামের ভিতর দুধ জুটিয়া যায়। কোন দিন দুধ না জুটিলেও অসুবিধা হয় না। বিনা দুধে চা খাইবার অভ্যাস আছে।...

সাইকেল লইয়া গ্রামের পর গ্রাম পার হইতেছি—সমস্ত জমিই ধূ ধূ করিতেছে। কোথাও ফসলের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। এখানে ওখানে আগাছা লইয়া, জমিগুলি রিক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় না যে, এখানে কোন দিন চাষ আবাদ হইয়াছে।

আমার খাকী প্যান্ট ও সোলার টুপী দেখিয়া অজ্ঞ চাষীরা আমাকে একজন বিশেষ মান্যগণ্য সরকারী কর্ম্মচারী মনে করিল। উহারা দুই হাত জোড় করিয়া কত কাকুতিমিনতি করে—দুঃখের ফিরিস্তির, নালিশের শেষ নাই। গ্রামে জল নাই—খাদ্য নাই। গত দুই বৎসর অজন্মা গিয়াছে—এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয় নাই। পানীয় জলের দারুণ অভাব—এমন কি গরু বাছুরের তৃষ্ণার জল পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। লাল কাঁকর-মাটি ফাটিয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে ধরিত্রীর বিষ-নিঃশ্বাস ঐ সব পথ দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া সবকিছুকে ভস্ম করিয়া দিয়াছে। দেখিলাম, এই সব গ্রামের বহু দূর দিয়া ক্যানেল গিয়াছে। চাষের সময় একমাত্র আকাশের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয়। গত দুই বৎসর যে বৃষ্টি বা বর্ষা হয় নাই, তাহার মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখা যাইতেছে। সমস্ত মাঠ জমি খাঁ খাঁ করিতেছে, পুকুর দীঘি শুকাইয়া গিয়াছে, ছোট ছোট কুটীরগুলির চালে খড় নাই—কোনটা বা ভগ্ন অথবা অর্দ্ধভগ্ন। সমস্ত গ্রাম যেমন শ্রীহীন গ্রামবাসিগণের স্বাস্থ্যও তেমনি। খাদ্য নাই—পানীয় জল নাই—পরণের বস্ত্র নাই—রোগে ঔষধ নাই। এই সব মানুষ একান্ত অবহেলায় অসহায় ভাবে মরিতেছে।

ইহাদের লইয়া আমার নিজেরও খুব মুশকিল হইয়াছে। নাম বলিতে চাহে না—জমিতে ধান কি পরিমাণে পূর্ব্বে হইয়াছে- কি কি ফসল জন্মায়—এ সব সংবাদ কিছুই দিতে রাজী হয় না। ভয় পায়—বুঝি নূতন করিয়া কোন খাজনা ট্যাক্স পড়িবে। আমার সম্মুখে অগণিত চাষী নর-নারী হাত-জোড় করিয়া শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন করে, 'বাবু শুধু চালের ব্যবস্থা করে দাও। খেতে পাইনে—মরে গেলাম'। মেয়েরা কোলের শীর্ণ শিশুসন্তান লইয়া দেখায়। দেখি, মায়ের বুকের কাছে এক একটা কঙ্কাল। জীবনের স্পন্দন তবুও টিপ টিপ করিয়া চলিতেছে—ভয় হয় বুঝি-বা এখনই থামিয়া যাইবে।

সকলে সমস্বরে বলে—সরকারকে বলে চাল দাও বাবু। জলের ব্যবস্থা করে দাও।

কিন্তু আমি—আমি ব্যবস্থা করিবার কে? ইহাদের এই সব অন্তহীন অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করিবার সাধ্য কোথায় আমার। আমার সম্মুখে এই সব নিরন্ন বস্ত্রহীন নর-নারী—বালক, বৃদ্ধ, শিশু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উহাদের ক্ষুধার্ত্ত শুষ্ক মুখ--বস্ত্রহীন ব্যাধিগ্রস্ত শীর্ণ দেহ—উহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার কে করিবে। আমি নিজে একজন সামান্ত কর্ম্মচারী, আমার নিকট করজোড়ে উহারা কোন প্রতিকার চায়? আমার এই খাকী প্যান্ট আর সোলার টুপীটা ছাড়িয়া ফেলিয়া দিলেই, উহাদের সহিত আমার আর পার্থক্য কি?...

তখন আমিও উহাদের মতই, অমনি দুই শীর্ণ বাহু বাড়াইয়া, অমনি বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া, দুই কোটরগত চক্ষু মেলিয়া, শুধু চাহিব—দাও ভাত দাও—দাও একটু জল। উহাদের মতই রৌদ্রদগ্ধ পথের উপর নিঃসহায় ভাবে বুক ফাটাইয়া চীৎকার করিব—"ক্ষুধায় মরে যাই—দাও ভাত দাও—তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়—জল দাও।" কিন্তু সমস্তই বৃথা, কেহ শুনিবে না—কেহ কিছু দিবে না—কেহ ফিরিয়াও তাকাইবে না। এই রুক্ষ রিক্ত রাঙা কঙ্করময় প্রাণহীন মাটির মত আমারও জীবন অমনি শুকাইয়া প্রাণহীন হইয়া উঠিবে—তার পর এক দিন চক্ষের উপর হইতে সূর্য্যের সমস্ত আলো মুছিয়া দিয়া অন্তহীন ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার নামিয়া আসিয়া গ্রাস করিবে। তখনও প্রবলের করধৃত অসংখ্য নিয়মকানুনে আবদ্ধ এই সমাজচক্র ঠিক পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকিবে।

কাজ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। সাইকেলের

আলোতে পথ চিনিয়া, নিজের আস্তানায় ফিরিয়া আসি। সেদিন অনেক দূর গিয়াছি। গ্রামটির নাম কয়কণা। সমস্ত দুপুর, এ-মাঠ সে-মাঠ করিয়া সেদিন অনেকটা কাজ করিয়া ফেলিলাম। বেলা বোধ করি তিনটে বাজিয়া গিয়াছে। গাছতলায় বসিয়া শুকনো কাঠ, পাতা যোগাড় করিয়া, আগুন জ্বালাইয়া, একটু জল ফুটাইয়া, চা করিয়া লইলাম। সঙ্গে মুড়ি ও গুড় ছিল। মুড়ি গুড় সংযোগে দুগ্ধহীন এক পেয়ালা চা খাইয়া বেশ আরাম করিয়া সিগারেট টানিতেছি—হঠাৎ একটা গোলমালে সচকিত হইয়া দেখি, পশ্চিম আকাশে কালো হইয়া মেঘ করিয়াছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ—গাছপালা স্তব্ধ হইয়া কিসের যেন প্রতীক্ষা করিতেছে। মনে হইতেছে আসন্ন প্রলয় বুঝি সমুপস্থিত। আমি তাড়াতাড়ি সাইকেল লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু কোথায় যাইব। এক জন লোক বলিল, একটু জোরে জোরে আগিয়ে চলুন বাবু—কাছে রায় মশাইয়ের বাড়ী। সেখানেই নিয়ে যাই। লোকটির পিছন পিছন সাইকেল ঠেলিয়া চলিতে লাগিলাম। ততক্ষণে ঝড় সুরু হইয়া গিয়াছে। গুরু গুরু করিয়া মেঘ ডাকিতেছে—এক সময় কড়কড় করিয়া ভীমগর্জনে সমস্ত পৃথিবী কাঁপাইয়া বাজ পড়িল। শুধু একবার মাত্র, একটা লাল আলো সমস্ত চরাচর উদ্ভাসিত করিয়া আবার মেঘের মধ্যে মিলাইয়া গেল—তার পর একটা প্রচণ্ড শব্দ। সেই বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে দুই জনে রায় মশাইয়ের বাড়ীর দিকে চলিলাম। আমার সোলার টুপী, খাকী প্যাণ্ট, সার্ট, সমস্ত ভিজিয়া সপ্ সপ্ করিতেছে। ঝড়ের দাপটে সমস্ত শরীর হি হি করিয়া শীতে কাঁপিয়া উঠিল।

একটা ছোটখাট বাগান পার হইয়া রায় মশাইয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীর সম্মুখে রাশীকৃত গোবর। তার পাশেই গোয়াল। গোবরগুলি জলের সহিত মিশিয়া কল কল শব্দে বাহির হইয়া যাইতেছে। একটা বিশ্রী গন্ধে সমস্ত স্থান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গোয়ালের কিছু দূরে একখানি চালাঘর। এইটাই নাকি রায় মশাইয়ের বাইরের ঘর। সাইকেল ঠেলিয়া ঘরের বারান্দায় উঠিলাম। বৃষ্টির জলে ঘরের মেঝে কাদা হইয়া গিয়াছে। পুরাতন খড়ের চাল ভেদ করিয়া টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আমাদের দেখিয়া রায় মশাই আশ্চর্য্য ভাবে তাকাইয়া হাতের হুঁকাটি নামাইলেন। সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিতেই, রায় মশাই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, আগে জামা প্যাণ্ট ছাড়ুন। সমস্ত ভিজে সপ্ সপ্ করছে। এই বলিয়া উঠিয়া হাঁক দিলেন, 'ওরে অমি—ও অমি'। 'যাই—' ভিতর হইতে, মেয়েলী গলার শব্দ ভাসিয়া আসিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি মেয়ে আসিয়া ঘরে দাঁড়াইল।

রায় মশাই বলিলেন, 'যা ত মা, একখানা শুকনো কাপড় নিয়ে আয়। ভদ্রলোক ভিজে গেছেন।' মেয়েটি চকিতে আমার দিকে একবার তাকাইয়া চলিয়া গেল। আমি সোলার টুপীটিকে বারকয়েক ঝাঁকানি দিয়া জল ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সাইকেলটি ঘরের দেয়ালে ঠেসান দিয়া রাখিলাম। ততক্ষণ মেয়েটি কাপড় আনিয়াছে। তাহার হাত হইতে কাপড় লইবার সময় একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। বয়স তাহার বোধ করি ষোলর উপর—বুঝা গেল এখনও বিবাহ হয় নাই। গায়ের রং শ্যামবর্ণ—মুখখানি অতি সুকুমার আর কচি, দীর্ঘায়ত গভীর কালো দুটি চোখ। মাথার বেণী এক পাশে ঝুলিয়া রহিয়াছে। নধর-পুষ্ট হাত দুটিতে তিন-চার গাছি করিয়া কাঁচের চুড়ি। শরীরে কোথাও এতটুকু সোনার চিহ্নমাত্র নাই।

আমি প্যাণ্ট ও সার্ট ছাড়িয়া দিতেই, রায় মশাই মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'যাও ত মা। ওঁর জামা প্যাণ্ট ভাল করে নিংড়ে শুকোতে দাও। বাতাসে শুকিয়ে যাবে।' তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'বসুন ভাল হয়ে বসুন। আর বসতেই বা কোথায় দেব। সবই ভাঙাচোরা।' আমি একখানি জীর্ণ তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িলাম। বাহিরে তুমুল গর্জনে ঝড় বৃষ্টি সমানে চলিতেছে। হয়ত তখনও কিছু বেলা আছে, কিন্তু তাহা বুঝিবার উপায় নাই। দিনের আলোর একটুকু চিহ্ন আর দেখা যায় না। ঝড়ে, জলে আর মেঘে চারিদিক অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে।

রায় মশাই ঘরের বাহিরে গিয়া দরজার কাছ হইতে মেয়েকে বলিলেন, মা, একটু চা করতে পারিস। বাড়ীতে অতিথি। রাত্তেও থাকবেন। এখন দুটো মুড়িটুড়ি আর একটু চা যোগাড় করে দে।

আমার কানে সবই আসিতে লাগিল। পরক্ষণে শুনিতে পাইলাম, মেয়েটি বলিতেছে—চা ত সব ফুরিয়ে গেছে—

রায় মশাই বলিলেন—তবে? উপায় কি এখন—

উপেন কাকার বাড়ী থেকে নিয়ে আসি।

ভিজে ভিজে যাবসে। মাথায় একটা কিছু দিয়ে যা। হাঁরে, চাল আছে ত—

চুপি চুপি মেয়েটি কি যে বলিল শুনিতে পাইলাম না। বাতাসের ঝাপটায় অমির সমস্ত কথা ডুবিয়া গেল। শুধু কানে আসিল, রায় মশাইয়ের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস—আর একটা শব্দ—নারায়ণ। বুঝিলাম চা, চাল দুই-ই ধার করিতে এই বর্ষার মধ্যে মেয়েটি চলিয়া গেল। অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করিলাম। আমার জন্য ইঁহারা কি অসুবিধায় না পড়িয়াছেন! অভাবের সংসারে আর একজন অপরিচিত লোক আসিয়া আরও জটিলতা, আরও অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে।—আমার কাছেও চা ছিল। ভাবিলাম, সেকথা বলি। কিন্তু ইহাতে

হয় ত রায়মশাই ক্ষুণ্ণ হইতে বা অপমানবোধ করিতে পারেন। তাই চুপ করিয়া রহিলাম। রায় মশাই তামাক টানিতে টানিতে কাছে বসিয়া বলিলেন, বড় মেয়েই সংসার মাথায় করে রেখেছে। ওর মা আজ তিন মাস শয্যাশায়ী। ছেলেপুলে নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছি। ওই মেয়েই রান্নাবান্না করে, ঘর-সংসারের কাজ—গরুবাছুর দেখা—ছেলেপুলেদের খাওয়ান-দাওয়ান, রুগীর সেবা—সবই করছে। মুখে কথা নেই—নিজের দিকে কোন লক্ষ্য নেই। মা আমার বড় লক্ষ্মী। ভাবি কি করে যে ওকে সংপাত্রস্থ করব।—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রায় মশাই ক্ষণেকের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া যান।

আমি কি বলিব। অথচ চুপ করিয়াও থাকা চলে না। তাই কথার মোড় ঘুরাইবার জন্য বলিলাম, আজ বোধ হয় বৃষ্টি থামবে না—

নাঃ। রাতে ত নয়ই। ভাবছি ঝড়ে ঘরদুয়োর উড়িয়ে না নিয়ে যায়। সবই ভাঙা আর পুরোনো। তবে খুঁটিগুলো হালে বদলে দিয়েছি, তাই ভরসা। রাত্রে কোনক্রমে মাথা গুঁজে কষ্ট করে থাকতে হবে। কোন সামর্থ্য নেই যে আপনার ভালভাবে সেবাযত্ন করি। উপরি উপরি দু'বছর অজন্মা। বলতে গেলে দু'বছর পর বৃষ্টি নেমেছে। এবার যদি ভগবান মুখ তুলে চান।

ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। রায় মশাই নিজেই একটা লণ্ঠন জ্বালাইয়া দিলেন। মাটির ঘর—উপরে খড়ের চাল। ঘরের মেঝে বেশ সুন্দর করিয়া নিকানো। রায় মশাই তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, তামাক খান নাকি?

বলিলাম—না। তবে সিগারেট খাই—তা সঙ্গেই আছে।

—না-না? তার চেয়ে হুঁকোর তামাক খাওয়া ঢের ভাল। বিড়ি, সিগারেটে শরীরের বেশী ক্ষতি করে। রায় মশাই আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কি জাতি—বাবার নাম, দেশ কোথায়, কিসের চাকরি, কত মাহিনা—এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলাম। তবে মাহিনার বেলায় মিথ্যা কথা বলিলাম। আমি যে একজন গণ্যমান্য সরকারী চাকুরে, মাহিনা আমার দুই শতের উপর—এই সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। রায় মশাই বলিলেন, দেখছেন তো কি কষ্টেই আছি। পাঁচ-ছয় বিঘে জমি—তাও ভাগে চাষ করি। নিজে চাষ করবার মত পয়সা কোথায়? মাঠে গাঁয়ের পাশ দিয়ে ক্যানেল হয়, তার একটা বিধিব্যবস্থা করতেই হবে আপনাকে। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ত আর চাষ হয় না। আপনারা বড় চাকুরে, এক কলম লিখলেই এটা হয়ে যায়।

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "আচ্ছা চেষ্টা করব।" এইরূপ ভাব দেখাইলাম, যেন আমার সামান্য চেষ্টাতেই, এই সব গ্রামের সকল দুঃখকষ্টের লাঘব হয়ে যেতে পারে। রায় মশাই অনর্গলভাবে নিজের দুঃখের কাহিনী বলিয়া যাইতেছেন। অতীতের সুখের দিনগুলির কথা—তখনকার ঐশ্বর্য্য, তখনকার সচ্ছলতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বলিতে বলিতে তিনি তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। বাহিরে সূচিভেদ্য অন্ধকার—মাঝে মাঝে গুড় গুড় করিয়া মেঘ ডাকিতেছে—ঝম্ ঝম্ শব্দে অবিশ্রান্ত ভাবে বৃষ্টিপাত হইতেছে। হঠাৎ রায় মশাইয়ের মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া আমার সম্মুখে এক বাটি চা ও আর এক পাত্রে চারটি মুড়ি রাখিয়া বলিল, দিন চা খান। যা বৃষ্টিতে ভিজেছেন। চায়ে আদার রস দিয়েছি।

চায়ে চুমুক দিয়া বলিলাম, বাঃ, বেশ হয়েছে। রায় মশাই ধীরে ধীরে নিজের চায়ের কাপে চুমুক দিয়া বলিলেন, অমি মা, চা ভালই করে। শুধু চা কেন—ঘর-সংসারের কাজ—রান্নাবান্নার কাজ সবই জানে আর ভালই করে। সেলাই টেলাইও জানে। তবে কি খুব ভাল সেলাই জানে—না তা নয়। গরীবের ঘরের মেয়ে কে শেখাচ্ছে—আর কোথায় বা ভাল ভাল সেলাইয়ের কাজ শিখবে বলুন—। ওর জন্যে বড় ভাবনায় পড়েছি মজুমদার মশাই। কি করে এখন পাত্রস্থ করি, সেই ভাবনা হয়েছে—

আড়চোখে তাকাইয়া দেখিলাম, অমি তখন কলকেতে ফুঁ দিতেছে।

রায় মশাই বলিলেন, আপনার সন্ধানে তেমন কোন পাত্র আছে? কিন্তু আমি গরীব—টাকা পয়সা দিতে থুতে পারব না—

—পাত্র? আচ্ছা দেখব চেষ্টা করে। অমির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, কলকের আগুনের উত্তাপে তার গাল ঠোঁট লাল হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘায়ত দুইটি কাল চোখ, পুরন্ত গাল, সুন্দর দুইখানি ঠোঁট সবই অপরূপ লাগিতেছে। কালো চুলের রাশি হইতে দুই এক গাছি চূর্ণ কুন্তল কপাল ও গালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কচি কলাপাতা রঙের পুরাতন শাড়ীখানি এখানে ওখানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আমি তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। এই বর্ষণমুখর রাত্রে আমার চোখে অমিকে বড় ভাল লাগিল। আমার দুই চোখ যেন এক অপূর্ব্ব মায়ায় ভরিয়া গেল।

রায় মশাইয়ের হাতে কলকে দিয়া অমি বলিল, রান্নাঘরে যাই এখন আর কিছু দরকার নেই তো—

—'না মা। রান্নার দিকটা দেখগে। তোমার মাকে দুধ সাবু খাইয়ে দাও গে, এক পুরীয়া ওষুধ দিতে হবে যে—। ছেলেগুলো চেঁচামেচি করছে আবার।' অমি একবার আমার দিকে তাকাইয়া, নিঃশব্দে চলিয়া গেল। রায় মশাই তামাক টানিতে লাগিলেন।

এক সময় বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আর বর্ষার এই মনোরম সজল হাওয়ায় বড় মধুর ঘুম আসিয়াছিল। হঠাৎ কাহার ডাকে জাগিয়া

উঠিলাম, দেখি অমি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। ম্লান আলোকে, ও ঘুমভরা চোখে অমিকে বড় সুন্দর লাগিল। আমি সদ্য-ঘুম-ভাঙা, মুগ্ধ চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

অমি বলিল, 'বাব্বাঃ কি ঘুম আপনার। কতক্ষণ ডাকাডাকি করছি। উঠুন অনেক রাত হয়েছে। রান্না হয়ে গেছে।' আমি উঠিয়া বসিলাম। অমি আমার হাতে জল ঢালিয়া দিল—গামছা আগাইয়া দিল। ঘরের একপাশে জল ছিটাইয়া, আসন পাতিয়া আমার খাবার দিল। খিচুড়ী, একটা ভাজা আর আলু পটলের তরকারী। চটের আসনটি চমৎকার। নানা রং বেরঙের সুতা দিয়া, বেশ সুন্দর সুন্দর ফুল তুলিয়া আসন বুনিয়াছে। সম্ভবতঃ এটি অমিরই তৈয়ারি। আমি খাইতে বসিলাম, অমি পাখা দিয়া, গরম খিচুড়ীতে বাতাস দিতে লাগিল। রায় মশাই বলিলেন, যা হয় চারটি মুখে দিন। খাওয়ার খুব কষ্ট হ'ল, কিন্তু আর কি করব বলুন—

বলিলাম—না না। এই তো যথেষ্ট। এই যা পাচ্ছি—আজকের দিনে কে দেয় বলুন তো। আপনাদেরই কত কষ্ট দিলাম।

বাধা দিয়া রায় মশাই বলিলেন, 'না না ও কথা বলবেন না। আপনি অতিথি, নারায়ণ। আপনার পাতে না দিতে পারলাম মাছ—না দুধ…। এতে যে কত কষ্ট পাচ্ছি তা ভগবানই জানেন।' অমি একটা কাঁচের ডিশে করিয়া আচার আনিয়া দিয়া বলিল, আর একটু খিচুড়ী এনে দিই—

ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—না না। এই যথেষ্ট হয়েছে। তখন অতগুলো মুড়ি খেলাম, আর খিদে নেই।

অমি সলজ্জ ভাবে বলিল, কিছু ফেলবেন না—খেয়ে ফেলুন। না হয় একটু তরকারি এনে দিই—

অমির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলাম, সত্যি বলছি আর কিছু লাগবে না—ভাবিলাম, কে বলিবে ইহারা অপরিচিত অনাত্মীয়। যেন আমি কত দিনের পরিচিত। স্বল্পক্ষণের পরিচয়ে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা জড়তা নাই, দ্বিধা নাই। সহজ সরল মনে মুহূর্তের মধ্যে আমায় যেন আপন করিয়া লইয়াছে। খাওয়া শেষ হইলে অমি হাতের কাছে জল আগাইয়া দিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে যাইয়া পান লইয়া আসিল। বিছানা ঝাড়িয়া দিয়া বলিল, আপনি শুয়ে পড়ুন। ঐ কোণে খাবার জল ঢাকা দেওয়া রইল। যদি দরকার হয় বাবাকে ডাকবেন। বাবা পাশের ঘরে থাকেন—

বলিলাম, হাঁ, এবার শুয়ে পড়ব। রায় মশাইয়ের খাওয়া হয়েছে ত—

অমি বলিল, বাবা রাত্রে ভাত খান না। দুটো শুকনো মুড়ি খান। রাতে বাবার ভাত সহ্য হয় না—

আমি বলিলাম, তোমার ভাল নামটা ত শুনলাম না—

—আমার ভাল নাম? অন্নপূর্ণা।

আমি হাসিয়া বলিলাম, নামের সঙ্গে কাজেরও মিল আছে—

অমি মৃদু হাসিল, কোন জবাব দিল না।

—তোমার খাওয়া হয়েছে—

—না। এখনও রান্নাঘরের পাট শেষ হয় নি। সব সেরে-সুরে খেতে বসব।

আমি বলিলাম, তোমাদের অনেক কষ্ট দিলাম। মনে মনে ভাবছ কোথাকার কে এসে কত জ্বালাতন করলে। নয় কি?

অমি মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, 'ছিঃ কি যে বলেন। আপনি আমাদের অতিথি। বাবা বলেন, অতিথি নারায়ণ। অতিথির সেবা করাই মানুষের ধর্ম। আগে কত লোকজন আসত। তখন অবস্থাও ভাল ছিল—আর এখন'—হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া অমি বলিল, আপনি শুয়ে পড়ুন।—এই বলিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া অমি চলিয়া গেল।

আবার ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। সেই অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুইয়া চোখ বন্ধ করিলাম। সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে, মাঝে মাঝে এক-একবার কড়্ কড়্ করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে। আমি চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বার বার অমির মুখখানিই যেন চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে। সুন্দর মেয়েটি—দরিদ্র ঘরের মেয়ে, হয়ত এই আকালের বছরে কোন দিন খাইতে পায় না—কোন দিন বা একসন্ধ্যা জোটে। গায়ে কোন অলঙ্কার নাই—কৃত্রিম প্রসাধনের কোন চিহ্ন নাই। অজ্ঞাত অখ্যাত এই বন-জঙ্গল-ঘেরা গ্রামের মধ্যে হাসিয়া খেলিয়া বড় হইয়াছে। রান্না-বান্না করিয়া, ঘর নিকাইয়া, বাসন মাজিয়া, গোয়াল ও গরুর যত্ন করিয়া দিন চলিয়া যায়। এই ত বেশ। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে আজ আমার তরুণ-মনে দোলা লাগিল। ঐ রকম একটি মেয়ে—অমন আনন্দময়ী, স্বাস্থ্যবতী, সরলা মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে পাইলে বোধ করি জীবন হইয়া উঠে মধুময়। অমির সরল আনন্দময় মুখখানি তার দীর্ঘায়ত কৃষ্ণপক্ষ্মযুক্ত কালো চোখ দুটির কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল যেন আমি এক নূতন জগতের অজানা আলো দেখিতে পাইলাম। আজ রাত্রে বাহিরে দুরন্ত বাতাস হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে—আকাশ ভাঙিয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাসের অবিশ্রাম হা হা ধ্বনি আমার হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনাকে দোলাইয়া জাগাইয়া, এক সুমধুর চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিয়া নূতন ভাষাতে, নূতন সঙ্গীতে যেন ব্যক্ত করিতে লাগিল। গীত রচনা করিবার স্বপ্নে বিভোর হইয়া গেলাম। কিন্তু আমি ত জানি আমার সামর্থ্য কতটুকু। ইহাদের কাছে বড় বড় কথা বলিয়াছি, নিজের সম্মান বাড়াইবার জন্য, সব মিথ্যা কথাই বলি

না কেন, কিন্তু আমি ত একজন সামান্য অস্থায়ী কর্মচারী। আজ আছি কাল নাই। তবুও এই বর্ষণ-মুখর রাত্রে, আমি মনে মনে এক স্বপ্ন-রাজ্য গড়িয়া তুলিলাম। অমির সেবা-যত্ন—এইটুকু সময়ের মধ্যে পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা—সরল মুখের মধুর হাসি, সমস্তই বার বার ভাবিয়া দেখিলাম। এতক্ষণে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, শুধু ভেকের অশ্রান্ত কলরবে নিশীথের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। অত গৃহের অমি বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ভাবিলাম, অমি কি আমার মত কোন সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছে? আমি কল্পনা করিয়া লইলাম, নরম বালিশের উপর একখানি কোমল সুন্দর মুখ। চূর্ণ-কুন্তল শুভ্র ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, এবং দীর্ঘায়ত আঁখির কৃষ্ণপক্ষ কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে। বিছানার এক পাশে নীলবর্ণের কাঁচের চুড়ি-পরা কোমল পুষ্ট হাতখানি অলসভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। তারপর কোন সময় যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তা স্মরণ নাই। ঘুম যখন ভাঙিল তখন বেশ বেলা হইয়াছে। প্রচুর সূর্য্যালোকে মাঠঘাট ভরিয়া গিয়াছে। অত্যবর্ষণ প্রভাতে থাকিয়া থাকিয়া একটা জোলো হাওয়া বহিয়া যাইতেছে। হাত-মুখ ধুইয়া ফেলিলাম। ততক্ষণ অমি চা করিয়া লইয়া আসিয়াছে।

রায় মশাই বলিলেন, অনেক কষ্ট হ'ল। রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল ত।

চায়ে চুমুক দিয়া বলিলাম, খুব ঘুমিয়েছি। কাল আপনাদের আশ্রয় না পেলে কি যে কপালে ঘটত—তাই ভাবছি। অমি আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। উহার ছোট ভাই দুটি দিদির অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া আমায় সবিস্ময়ে দেখিতেছে। রাত্রে উহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাই দেখি নাই।

রায় মশাই বললেন, আমার কথাটা মনে রাখবেন। গাঁয়ে যাতে ক্যানেল আসে তার ব্যবস্থাটা করবেন। ক্যানেলটা হলে সময়মত চাষের জল পাওয়া যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। গাঁয়ের অবস্থা ত স্বচক্ষে দেখেই গেলেন। আর হাঁ ঐ যে পাত্রের কথাটা—

আমি বলিলাম, হাঁ, মনে আছে। সে রকম সন্ধান হলেই আপনাকে জানাব—

—ঠিকানাটা লিখে রেখেছেন ত? তা চিঠি আসতেও সাত দিন লাগে—কখনও পনের দিনও হয়ে যায়। গাঁয়ে ত পোষ্ট আপিস নেই। সপ্তাহে এক দিন পিওন এসে চিঠি বিলি করে যায়। যাই হোক চিঠি দিলে পাব—তা দু'চার দিন দেরি হতে পারে। তবে কথাটা মনে রাখবেন।

প্যাণ্ট শার্ট পরিয়া, মাথায় সোলার টুপিটা চাপাইয়া দিলাম। সাইকেল চালাইয়া অনেকটা পথ যাইতে হইবে। চিন্তা হইল, রাস্তায় যদি সে-রকম কাদা হয়, তবে ভাবনার কথা। সাইকেল তখন ঘাড়ে লইতে হইবে। মনে মনে ঠিক করিলাম, আজ আর অন্য কোথাও যাইব না। বরাবর নিজের আস্তানায় ফিরিয়া যাইব। বাহিরের আবহাওয়া ভালই লাগিল। আমি প্রস্তুত হইলাম। পকেট হইতে দুটি টাকা বাহির করিয়া, অমির ছোট দুটি ভাইয়ের হাতে দিলাম। উহারা আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল। রায় মশাইকে নমস্কার করিলাম। রায় মশাই বলিলেন, যদি কখনও এদিকে আসেন তবে গরীবের কুঁড়েকে ভুলবেন না।—আমি অমির দিকে চাহিয়া বললাম, খুব কষ্ট দিয়ে গেলাম—আচ্ছা আসি তবে। অমি হাসিল না, কোন কথা বলিল না। সাইকেল লইয়া রাস্তায় নামিয়া আসিলাম। মনে হইল, কি যেন হারাইয়াছি, কি যেন পিছনে ফেলিয়া আসিলাম। সাইকেলে উঠিবার আগে আর একবার পিছনে তাকাইলাম, দেখি অমি তাহার দুই দীর্ঘায়ত চক্ষু মেলিয়া নিস্তব্ধ ভাবে ঠিক একখানি ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মনে মনে ভাবিলাম, এই পৃথিবীর হাটে একদিন তুমিও হারাইয়া যাইবে, আমিও হারাইয়া যাইব। কিন্তু এক রাত্রির কথা একটি বর্ষণ-মুখর প্রীতিস্নিগ্ধ রাত্রির স্মৃতি—তোমার এই সুকোমল সুন্দর মুখখানি আমার মনে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

পাংশুপ্রদানাবদান

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

দুইটি সুকুমার বালক পথিপার্শ্বে ক্রীড়া করিতেছে। তাহারা নানারূপ পাংশুপিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে অন্নব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি নাম দিয়া সংসার পাতিয়াছে। এমন সময় ভিক্ষা-পাত্র হস্তে ভগবান বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হইলেন। বালক দুইটি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। একটি বালক ঐ কল্পিত অন্নাদি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া তথাগতের ভিক্ষাপাত্রে অর্পণ করিল। দ্বিতীয় বালক হাসিমুখে উহা অনুমোদন করিল।

ভগবান বলিলেন, "আনন্দ, তথাগতের পরিনির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে এই বালক জম্বুদ্বীপে সম্রাট্ অশোক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। এই সহচর হইবেন তাঁহার অমাত্য রাধাগুপ্ত। এই সদ্ধর্ম্ম সম্রাট্ অশোকের দ্বারা সমস্ত জগতে প্রচারিত হইবে।"

অবদানখানির এক স্থানে এই পাংশুপ্রদানের কথা এবং অধিকাংশ স্থানে পাংশুপ্রদান-পুণ্যের ফলভোক্তা সম্রাট্ অশোকের কথা আছে বলিয়া ইহাকে পাংশুপ্রদানাবদান বলা হইয়াছে।১

তথাগতের পরিনির্ব্বাণকাল আসন্ন। তিনি মথুরায় অবস্থান করিতেছেন। একদিন তিনি আনন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আনন্দ, এই মথুরাতে আমার পরিনির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে গুপ্তনামে এক গন্ধিক জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার উপগুপ্ত নামে এক পুত্র হইবেন। শতবর্ষ পরে তিনি বুদ্ধের ন্যায় ধর্ম্মপ্রচার করিবেন। তাঁহার প্রভাবে বহু ব্যক্তি সর্ব্ববাসনা হইতে মুক্ত হইয়া অর্হৎপদ লাভ করিবেন। সমস্ত শ্রাবকের সকল ধর্ম্মপ্রচারকের শ্রেষ্ঠ হইবেন এই উপগুপ্ত।

"আনন্দ দূরে বহুদূরে ঐ নীলনীলাম্বররাজি দর্শন কর। ঐ নীলনীলাম্বররাজি হইল রুরুমুণ্ড নামক শৈলশ্রেণী। শতবর্ষ পরে শাণকবাসী নামক এক ভিক্ষু ঐ পর্ব্বতে বিহার স্থাপন করিবেন। তিনি উপগুপ্তকে প্রব্রজ্যা দিবেন।"

আনন্দ ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য ভগবান! ইহা অতীব আশ্চর্য্য! আয়ুষ্মান্ উপগুপ্ত বুদ্ধের ন্যায় বহুজনের কল্যাণ করিবেন!"

ভগবান বলিলেন, "আনন্দ, আয়ুষ্মান্ উপগুপ্ত যে কেবল এই জন্মেই জনগণের এইরূপ হিতসাধন করিবেন তাহা নহে, তাঁহার পূর্ব্বজন্মেও তিনি ঐরূপ হিতসাধন করিয়া ঐখানেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

"ঐ রুরুমুণ্ড পর্ব্বতের তিনটি পার্শ্ব। এক পার্শ্বে পঞ্চশত "প্রত্যেক বুদ্ধ"২ এক পার্শ্বে পঞ্চশত ঋষি এবং আর এক পার্শ্বে পঞ্চ শত বানর বাস করিত।

"এই পঞ্চ শত বানরের যে দলপতি সে তাহার দল পরি-ত্যাগ করিয়া যেখানে পঞ্চ শত 'প্রত্যেক বুদ্ধের' বাস সেই পার্শ্বে উপস্থিত হইল। প্রত্যেক বুদ্ধগণকে দর্শন করিয়া তাহার অন্তর প্রসন্ন হইল।

"তখন হইতে সেই বানর সেইখানেই বাস করিতে থাকে। সে প্রতিদিন ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক বুদ্ধগণের সেবা এবং তাঁহাদেরই মত পর্য্যঙ্কবদ্ধ হইয়া উপাসনা করে।

"কিছুকাল পরে প্রত্যেক বুদ্ধগণ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। বানর পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদের জন্য ফলমূলাদি আহরণ করে। কিন্তু তাঁহারা আর আহার করেন না। বানর তাঁহাদের চীবর ধরিয়া আকর্ষণ করে, চরণে হাত দেয়; কিন্তু কোনও সাড়া পায় না। অবশেষে তাঁহাদের শরীরে জীবনের কোনও লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া সে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে পার্শ্বে পঞ্চ শত ঋষির বাস সেই পার্শ্বে উপস্থিত হয়।

"এই ঋষিদের কাহারও বা সর্ব্বশরীর কণ্টকাকীর্ণ, কাহারও বা ভস্মাচ্ছাদিত—কেহ বা ঊর্দ্ধহস্তে বিরাজমান, কেহ বা পঞ্চাগ্নির মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন।

"বানর তাঁহাদের এইরূপ সাধনায় বাধা দিতে লাগিল। সে কণ্টকবিদ্ধ-শরীরীদের কণ্টক-উদ্ধার; ভস্মাচ্ছাদিতদের ভস্ম-অপসারণ, ঊর্দ্ধহস্তদের হস্ত অবনমন এবং পঞ্চাগ্নিকদের অগ্নি অপসারণ করিতে লাগিল। অতঃপর সে তাহাদের সম্মুখে পর্য্যঙ্কবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিল।

"ঋষিগণ এই সমস্ত ঘটনা তাঁহাদের আচার্য্যের নিকট নিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন, 'তোমরা ঐরূপ পর্য্যঙ্ক-বদ্ধ হইয়াই উপবেশন কর।' এই ভাবে তাঁহারা ঐ বানর-নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে সাধনা করিয়া প্রত্যেক বুদ্ধ হইলেন।

"ঐ প্রত্যেক বুদ্ধগণের মনে হইল—'আমরা শ্রেয়োলাভ করিয়াছি, তাহা এই বানর হইতেই।' এই ভাবিয়া তাঁহারা ফলমূলের দ্বারা ঐ বানরকে পরিপালন করিতে লাগিলেন।

---

১ ইহা অবদানখানির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। অনুবাদ আক্ষরিক নহে। কিন্তু মূলভাব অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।

২ বুদ্ধের ন্যায় যিনি পূর্ণজ্ঞানলাভ করেন, কিন্তু তাহা জগতে প্রচার না করিয়াই দেহত্যাগ করেন, তিনিই "প্রত্যেক বুদ্ধ" (বা মৌনীবুদ্ধ)।

তাহার মৃত্যু হইলে সুগন্ধি কাষ্ঠের দ্বারা তাহার সংকার করিলেন।

"দেখ আনন্দ, ঐ বানরই উপগুপ্ত। সেইজন্য বলিতেছি কেবল ভবিষ্যতেই যে তিনি বহুজনের হিতসাধন করিবেন তাহা নহে, অতীতেও তিনি এইরূপ হিতসাধন করিয়াছেন।"

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে স্থবির শাণকবাসী রুরুমুণ্ড পর্ব্বতে বিহার স্থাপন করিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল তথাগতের পরিনির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে গুপ্ত নামক গন্ধিকের কথা। তিনি ধ্যানযোগে দেখিতে চাহিলেন গুপ্তের জন্ম হইয়াছে কিনা—দেখিলেন হইয়াছে। তাহার পর দেখিতে চাহিলেন—উপগুপ্তের আবির্ভাব হইয়াছে কিনা। দেখিলেন উপগুপ্ত তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

অতঃপর স্থবির শাণকবাসী নানা উপায়ে বুদ্ধধর্ম্মের প্রতি গুপ্তগন্ধিকের শ্রদ্ধা উৎপাদন করিলেন। গুপ্ত যখন বুদ্ধধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধালু হইয়া উঠিয়াছেন তখন একদিন তিনি তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। গুপ্ত তাঁহাকে একাকী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার সেবক কই?"

স্থবির বলিলেন, "জরাধর্ম্মী আমরা। কোথায় আমাদের সেবক? যদি কেহ শ্রদ্ধাসহকারে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করেন তাঁহাকে আমরা সেবক করি।"

গুপ্ত বলিলেন, "আর্য্য, আমি গৃহবাসে লুব্ধ। বিষয়াসক্ত আমার প্রব্রজ্যা-গ্রহণের শক্তি নাই। যদি আমার পুত্র জন্মে তাহাকে আপনার সেবক করিব।" স্থবির বলিলেন, "তথাস্ত। কিন্তু বৎস, প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিও।"

অতঃপর গন্ধিকের পুত্র হইল। তিনি তাঁহার নাম রাখিলেন অশ্বগুপ্ত। সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল তখন স্থবির শাণকবাসী গুপ্তগন্ধিকের নিকট গমন করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞার বিষয় স্মরণ করাইলেন।

গুপ্ত বলিলেন, "আর্য্য, এই আমাদের একমাত্র পুত্র, দ্বিতীয় পুত্রকে দান করিব।" স্থবির শাণকবাসী ধ্যানযোগে দেখিলেন—ইনি উপগুপ্ত নহেন। অতএব "তথাস্ত" বলিয়া বিদায় লইলেন।

ইহার পর গন্ধিকের দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম রাখা হইল ধনগুপ্ত। সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল তখন স্থবির শাণকবাসী গুপ্তগন্ধিককে তাঁহার প্রতিজ্ঞার বিষয় স্মরণ করাইলেন।

গুপ্ত বলিলেন, "আর্য্য, ক্ষমা করুন। আমার এক পুত্র বিদেশে গিয়া দ্রব্য আহরণ করিবে। অন্য পুত্র গৃহে থাকিয়া তাহা রক্ষা করিবে। আমার তৃতীয় পুত্র আপনাকে দান করিব।"

স্থবির শাণকবাসী ধ্যানযোগে দেখিলেন—ইনিও উপগুপ্ত নহেন। অতএব তথাস্ত বলিয়া বিদায় লইলেন।

অতঃপর গুপ্তের তৃতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। মনোরম তাঁহার রূপ, সুন্দর তাঁহার আকৃতি। তাঁহার নাম রাখা হইল উপগুপ্ত।

স্থবির শাণকবাসী বাল্যকাল হইতেই তাঁহার উপর লক্ষ্য রাখিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার চরিত্রগঠনে সাহায্য করিতেন।

উপগুপ্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতার বাণিজ্য-কর্ম্মে যোগ দিলেন। তিনি ন্যায় ও সততার সহিত ক্রয়-বিক্রয় করিতেন। তাঁহার ব্যবসা ছিল সুগন্ধিদ্রব্যের। নানারূপ সুগন্ধি সামগ্রী তিনি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেন।

মথুরায় তখন বাসবদত্তা নামক এক সুপ্রসিদ্ধা অপরূপ সুন্দরী গণিকা ছিল। সেই গণিকার দাসী উপগুপ্তের বিপণি হইতে বিলাসসামগ্রী ক্রয় করিত। একদিন বাসবদত্তা তাহার দাসীকে বলিল, দাসি, তুমি ঐ গন্ধিককে প্রবঞ্চিত করিতেছ। এই মূল্যে এই পরিমাণ গন্ধদ্রব্য লাভ সম্ভব নহে।"

দাসী তাহা শুনিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "মা, উপগুপ্ত অতি ধার্ম্মিক। যেমন তাঁহার রূপ, তেমনি তাঁহার ব্যবহার। রূপে গুণে চাতুর্য্যে মাধুর্য্যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয়।"

ইহা শ্রবণ করিয়া গণিকা বাসবদত্তা গন্ধিক উপগুপ্তের প্রতি অনুরক্ত হইল। সে উপগুপ্তকে নিজ প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানাইয়া দূতী পাঠাইল। উপগুপ্ত বলিলেন, "দূতি, আমার হইয়া তাঁহাকে বলো—ভগিনী, এখনও তোমার দর্শনের সময় হয় নি।"

সেই সময় বাসবদত্তার দর্শনী ছিল পঞ্চ শত সুবর্ণমুদ্রা। তাহার মনে হইল—নিশ্চয়ই এই বণিক পঞ্চ শত সুবর্ণমুদ্রা ব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহে। তাই তিনি দূতীর দ্বারা পুনরায় বলিয়া পাঠাইলেন—"প্রিয়তম, আপনার সুবর্ণমুদ্রা আমি চাই না। আমি আপনাকে ভালবাসি।" দূতী যখন উপগুপ্তকে সেই কথা নিবেদন করিল—উপগুপ্ত পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর দিলেন, "ভগিনী, এখনও তোমার দর্শনের সময় হয় নি।"

দিনের পর দিন যায়। বাসবদত্তার কোনও পরিবর্ত্তন নাই। সে পূর্ব্বের ন্যায় পঞ্চ শত কার্ষাপণ দর্শনী লইয়া জনপদের শ্রেষ্ঠ ধনিক বণিক ও রাজপুরুষগণের সহিত বিলাসলীলায় মগ্ন হইয়া থাকে।

এক দিন এক শ্রেষ্ঠিপুত্র বাসবদত্তার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে—এমন সময় জনৈক বিদেশী সার্থবাহ পঞ্চ শত কার্ষাপণ এবং বহু মূল্যবান উপঢৌকন লইয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইল।

বাসবদত্তা লোভাকৃষ্ট হইয়া শ্রেষ্ঠিপুত্রকে হত্যা করাইয়া

তাহার মৃতদেহ মলাধারে লুকাইয়া রাখিল। তাহার পর সেই বিদেশী সার্থবাহকে লইয়া বিলাসে মগ্ন হইল।

ইতিমধ্যে নিহত শ্রেষ্ঠিপুত্রের বন্ধুবর্গ তাহার মৃতদেহ উদ্ধার করিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিল। রাজাজ্ঞায় বাসবদত্তার হস্ত-পদ-কর্ণ-নাসিকা ছিন্ন হইল। বিকৃতদেহ বাসবদত্তা নগরের বহির্ভাগে শ্মশানে নির্বাসিতা হইল।

উপগুপ্ত যখন বাসবদত্তার এই দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিলেন তখন ভাবিলেন—'একদিন সে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল। তাহার সেই আমন্ত্রণগ্রহণের দিন আজ উপস্থিত।' তিনি শান্ত সংযত চিত্তে সেই শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পরমাসুন্দরী সুগঠিত-সুকুমারাকৃতি সর্ব্বকামিজনউপভোগ্যা বাসবদত্তা আজ ছিন্নাঙ্গী, কুৎসিতদর্শনা, সর্ব্বজনপরিত্যক্তা, শ্মশানে শকুনি-গৃধিনী শৃগাল কুকুরের উপভোগ্যা হইয়াছে। তাহার একটি মাত্র দাসী পূর্ব্বোপকার ভুলিতে না পারিয়া, সঙ্গে আসিয়া আজ তাহাকে শকুনি-গৃধিনীর নির্মম অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে।

উপগুপ্তকে আসিতে দেখিয়া সে বাসবদত্তাকে বলিল, "মা, যাঁহাকে তুমি পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ করিয়াছিলে, সেই উপগুপ্ত আসিতেছেন। নিশ্চয়ই ইনি কামার্ত্ত হইয়া আসিতেছেন।" শুনিয়া বাসবদত্তা বলিলেন—

রুধির-রঞ্জিত দেহ বিকৃত-বদন হতশোভা আমি হতভাগী,
এদেহের প্রতি হায় গৃধ্রগণ বিনা আর কেবা হবে অনুরাগী।

সে পরম উদ্বেগের সহিত দাসীকে বলিল, "দাসি, সত্বর আমার ছিন্ন অঙ্গসমূহ পট্টকের (bandage) দ্বারা সংযোজিত কর।" দাসী তাহাই করিল। উপগুপ্ত আসিয়া বাসবদত্তার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বাসবদত্তা বলিল—

শতদল সমশোভা সুকুমার-সুশোভিতা তনু মম ছিল অনুপম
মুনিমন-ভ্রান্তিকর ছিল যবে কান্তি মোর, তখন এলে না
প্রিয়তম !

রুধির-রঞ্জিতদেহ, বিকৃত-বদন, হতশোভা আমি হতভাগী
এ দেহের প্রতি আজি, ওগো প্রিয়তম ! কেমনে হইলে
অনুরাগী ?

উপগুপ্ত বলিলেন—

কাম হত হে ভগিনী ! নহি আমি কামী ! কামিজনও
ত্যজিবে যে কাম
হেরিবে সমুখে যবে এই বিভীষিকা ! কামনার এই পরিণাম !
আজি এ দুর্দিনে ভগি, কারুণিক সবুদ্ধেরে ভক্তিভরে
করহ স্মরণ !
আর্ত্তজন প্রতি যাঁর নাহি সীমা করুণার আজি তাঁর
লহগো শরণ !
দুঃখের এ পারাবার পার হতে সাধ্য কার করুণার
পারাবার তথাগত বিনা
বিপদ-তারণ নাথ কর তাঁরে প্রণিপাত, সঁপ তারে তনুমন,
অয়ি, ভাগ্যহীনা !

উপগুপ্তের অলৌকিক চরিত্রের প্রভাবে অন্তিম সময়ে বাসবদত্তার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

যথাসময়ে স্থবির, শাণকবাসী উপগুপ্তকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিলেন। উপগুপ্ত ভগবান বুদ্ধের ন্যায় মারবিজয়ী হইয়া দেশে দেশে জনপদে জনপদে বুদ্ধের ন্যায় পূজা পাইতে থাকেন। তাঁহার প্রভাবে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি বুদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং বহু সাধক অর্হৎপদ লাভ করেন।[৩]

এই সময় পাটলিপুত্রে নৃপতি বিন্দুসারের পুত্র অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত চণ্ড প্রকৃতির ছিলেন। সেইজন্য তিনি চণ্ডাশোক নামে পরিচিত হন।

তিনি তখন এমনি চণ্ড প্রকৃতির ছিলেন যে একদিন ক্রোধভরে স্বহস্তে পঞ্চ শত অমাত্যের শিরশ্ছেদন করেন। আর একবার অন্তঃপুরিকাগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চ শত পত্নীকে স্বহস্তে দগ্ধ করিতে উদ্যত হন।

ইহা দেখিয়া তাঁহার বাল্যবন্ধু অমাত্য রাধাগুপ্ত বলেন, "মহারাজ, স্বহস্তে এইরূপ হত্যাকার্য্যের কি প্রয়োজন ? ইহার জন্য ঘাতক নিযুক্ত করুন।"

তখন এতাদৃশ নৃশংস হত্যাকার্য্য করিতে পারে এরূপ ব্যক্তির অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

সেই সময় রাজধানীর অনতিদূরে পর্ব্বতপাদমূলে এক গ্রামে এক তন্তুবায় বাস করিত। তাহার এক পুত্র ছিল। তাহার নাম গিরিক। বাল্যকাল হইতেই সে অতীব নিষ্ঠুর ছিল। পিতামাতাকে অতি কদর্য্য ভাষায় গালি দিত। বালকবালিকাদের তাড়না করিত। পিপীলিকা, মক্ষিকা, মূষিক, পক্ষী যাহা পাইত, হত্যা করিত। এইরূপ চণ্ড বলিয়া লোকে তাহার নাম দিয়াছিল 'চণ্ডগিরিক'।

রাজপুরুষগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি সম্রাট অশোকের অধীনে ঘাতকের কাজ করিতে পারিবে কি ?" সে উত্তর দিল—"সমস্ত জম্বুদ্বীপবাসীর প্রত্যেকের হত্যাকার্য্য করিতেও আমি প্রস্তুত আছি।"

তাহার কথা সম্রাট অশোককে বলা হইল। তিনি তাহাকে তাঁহার নিকট আনিবার আদেশ দিলেন।

রাজপুরুষগণ তাহাকে বলিল, "এসো, রাজা তোমাকে

৩ উপগুপ্তের সহিত অশোকের সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ (অশোকাবদানের অন্তর্গত) "কুনালাবদানে" আছে।

আহ্বান করিয়াছেন।" সে বলিল, "পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া আসিতেছি।"

তাহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় রাজপুরুষগণ বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সে উত্তর দিল—"পিতামাতা আমাকে এই কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেছিলেন তাই তাহাদের হত্যা করিয়া আসিলাম। চল, অনর্থক বিলম্ব হইয়া গেল।"

সম্রাট অশোক তাহাকে ঘাতকপতির পদ প্রদান করিলেন। অনর্থক হত্যাক্রিয়ায় সে এতদূর অভ্যস্ত ছিল যে, অশোকের নিকট বর প্রার্থনা করিল—"আমার জন্ত এক অতি মনোরম গৃহ নির্ম্মাণ করুন। এই গৃহের বহির্ম্মুখ এমন চিত্তাকর্ষক হোক যে, যে দেখিবে সেই উহাতে প্রবেশ করিতে চাহিবে এবং যে প্রবেশ করিবে তাহাকেই আমি বধ করিব।"

চণ্ডাশোক তাঁহার সমধর্ম্মী চণ্ডগিরিকের এই প্রার্থনা পূরণ করিলেন। ঐ গৃহে যে কত নির্দ্দোষ, কত সাধু প্রাণ হারাইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

একবার এক বিদেশী বণিকপুত্র রাজধানীতে আসিলেন। তাঁহার পিতামাতা যখন বাণিজ্যের জন্ত সমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন অর্ণবপোতের মধ্যেই তাঁহার জন্ম হয়। সেইজন্ত তাঁহার নাম রাখা হয় সমুদ্র। দ্বাদশ বৎসর যাবৎ তাঁহারা সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন। সহসা এক দিন জলদস্যুগণ তাঁহাদের অর্ণবপোত আক্রমণ করিয়া সকলকে হত্যা করে। সমুদ্র কোনরূপে রক্ষা পান। পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

পাটলীপুত্রে উপস্থিত হইয়া প্রব্রাজক সমুদ্র ভিক্ষার্থে ঐ মনোরম গৃহে প্রবেশ করিলেন। বহির্ম্মুখ অতীব সুন্দর, কিন্তু অভ্যন্তর নরকসদৃশ ভয়াবহ দর্শন করিয়া যখন তিনি বাহির হইয়া আসিতেছেন তখন চণ্ডগিরিক তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "যাইবে কোথায়? এইখানেই তোমার মৃত্যু।"

ভিক্ষু তখন শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া চণ্ডগিরিক বলিল, "বালকের ন্যায় রোদন করিতেছ কেন?" ভিক্ষু বলিলেন—

মৃত্যুভয়ে ভীত নহি তথা
ভীত যথা সাধারণ লোক।
বাধা হবে ধর্ম্ম আচরণে
তাই আমি করিতেছি শোক।
দুর্লভ এ নরজন্ম লভিব কি পুনঃ হায়!
লভিব কি জন্ম পুনরায়
মহামায়াদেবী-সুত-প্রেমধর্ম্ম-বিভূষিত
ধরণীরা ধন্যা এ ধরায়।

ভিক্ষু সকরুণ বচনে চণ্ডগিরিকের নিকট এক মাস সময় ভিক্ষা করিলেন। চণ্ডগিরিক তাঁহাকে সাত দিন সময় দিল।

এই সাত দিন ধরিয়া অবিরত আসন্ন মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সেই ভিক্ষুর চিত্ত নির্ম্মল এবং দিব্যজ্ঞানের উপযোগী হইয়া উঠিল। এমন সময় সপ্তম দিবসে সম্রাট অশোকের অন্তঃপুরে এক মহা কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটিল। অন্তঃপুরে কোনও এক রাজ্ঞীর সহিত এক কুমারকে সংসক্ত দেখিয়া সম্রাট উভয়ের বধের আদেশ দিলেন। তাহাদিগকে চণ্ডগিরিকের কারাগারে পাঠানো হইল। সেখানে অমো-ক্রোশিতে মুষলের আঘাতে সুকুমার সেই যুবক-যুবতী উভয়েরই দেহ চূর্ণ করা হইল। ভিক্ষু চক্ষের সম্মুখে এই নৃশংস হত্যা-কাণ্ড ঘটিতে দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন—

কামিজন মনোলোভা অপরূপ রূপশোভা
আহা একি পরিণাম তার!
একি স্বপ্ন? একি ভ্রান্তি? কোথা সেই দেহকান্তি?
ফেনপিণ্ড-সমান সংসার!

সেই ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিয়া সমস্ত রূপ-জগতের উপর তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া উহাই ভাবনা করিতে করিতে সর্ব্বপ্রকার আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার অভীষ্ট অর্হৎপদলাভ করিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

দস্যুভূমি-মধ্যে থাকি লভিলাম দিব্য আঁখি
সম্বুদ্ধের করুণা অপার!
ধন্য এই কারাগার আজি ভব-পারাবার
হেথা বসি হইলাম পার।

সপ্তম দিবসে রজনী যখন প্রভাত হইল তখন চণ্ডগিরিক ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে ভিক্ষু! রাত্রির অবসান হইয়াছে। সূর্য্য-উদিত হইয়াছে।"

ভিক্ষু ধীরে ধীরে বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ বন্ধু, আমারও মোহরাত্রির অবসান হইয়াছে।—

আজি এ অন্তরে মম বিদূরিত ঘোর তম
প্রভাত হইল মোহরাত্রি।
চিদাকাশে রক্ত ছবি উদিল জ্ঞানের রবি
পশিল মোক্ষধামে যাত্রী।
আজি বড় শুভদিন মহাধনে ধনী দীন
কিছুই অদেয় নাই তার যে—
লহ বন্ধু দেহখান এ তো অতি তুচ্ছ দান
নিয়োজ ইহারে নিজ কার্য্যে।

নৃশংস চণ্ডগিরিক নরুরুধির-বসামূত্রপুরীষ ও জল পরিপূর্ণ বিরাট লৌহকটাহে ঐ অর্হতের দেহ নিক্ষেপ করিয়া অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক উহা উত্তপ্ত করিতে লাগিল।

কিন্তু যখন বহু ইন্ধন সংযোগেও ঐ কটাহের জল উত্তপ্ত করা সম্ভব হইল না, তখন চণ্ডগিরিক আশ্চর্য্য হইয়া কটাহের

মধ্যে দেখিল পর্য্যঙ্কবদ্ধ হইয়া নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় সাধু উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

সে তৎক্ষণাৎ এই বিষয় সম্রাট অশোককে নিবেদন করিল। সম্রাট সেখানে আসিলেন।

সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ সম্রাট অশোক করযোড়ে ঐ মহাত্মার স্তব করিতে লাগিলেন। অবশেষে কিভাবে তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিবেন তাহা জানিতে চাহিলেন।

সাধু বলিলেন, "মহারাজ, ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন—'তথাগতের পরিনির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে পাটলিপুত্রে অশোক নামে চক্রবর্ত্তী সম্রাট হইবেন। তিনি সমস্ত পৃথিবীতে এই মৈত্রীর ধর্ম্ম প্রচার করিবেন।' মহারাজ, ভগবানের কথা মিথ্যা হইবার নহে। তুমি এই নৃশংস অত্যাচার পরিত্যাগ কর। প্রাণিহত্যা তোমার কর্ত্তব্য নহে। প্রাণীর রক্ষার জন্যই তোমার জন্ম।"

"অতএব হে নরেন্দ্র, সমস্ত প্রাণিজগৎকে অভয় দান কর। তোমার ঐ বলিষ্ঠ বাহু সমস্ত জগৎকে রক্ষা করুক।"

সম্রাট কহিলেন, "তথাস্তু। আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য হোক। আজি হইতে আমি প্রাণিগণকে অভয় দান করিলাম। নরকসদৃশ এই বধ্যশালা, এই ভয়ঙ্কর কারাগার আজই ভাঙিয়া ফেলিব।"

সম্রাট অশোককে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া ভিক্ষু অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অতঃপর সম্রাট যখন সেই কারাগার হইতে বাহির হইতেছেন তখন চণ্ডগিরিক সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে বলিল, "দেব, আপনি বর দিয়াছেন, এই গৃহ হইতে কেহ বাহির হইতে পারিবে না।"

রাজা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তুমি কি আমাকেও হত্যা করিতে চাও?" সে উত্তর দিল—"হাঁ মহারাজ।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের মধ্যে কে প্রথমে ইহার ভিতর প্রবেশ করিল?" চণ্ডগিরিক বলিল, "আমি।"

তৎক্ষণাৎ রাজাদেশে চণ্ডগিরিক প্রাণ হারাইল। কারাগার ভাঙিয়া ফেলা হইল। রাজা সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করিলেন।

শুক্‌নো গোলাপ

শ্রীসুশীলকুমার লাহিড়ী

এই যে গোলাপ দেখ্‌ছ প্রিয়া শুক্‌নো সকল দলগুলি,
সুবাস ইহার লুকিয়ে গেছে রুদ্ধ বুকের দ্বার খুলি।
তোমার অধর পরশটুকু, বুকের তব নিশাস-বায়—
যেমন আমায় মাতিয়ে তোলে, তেম্‌নি ইহার সুবাস হায়—
ক'রত আমায় আকুল প্রিয়ে—রক্তবরণ গোলাপ সেই—
অতুল তাহার রূপের দ্যুতি—তুলনা তার কোথাও নেই।
চুমায় চুমায় কেবল যবে রাঙাই প্রিয়ে আনন তব,
শরম-রাঙা মুখখানি সেই—এর রূপেরি তুল্য কব'।
সেই রূপসী গোলাপ-বালার রিক্ত যে হায় রূপডালি,
শুক্‌নো পাতাপ জীবন-হীনা মরণ ছোঁয়ায় আজ কালি।
ব্যথায় বিবশ শূন্য বুকে রচেছি শেষ শয়ন তয়,
জীবন যুকে বাসর-যোগর মরণ যেন চুমায় মোর।
নিবিড় সুখে বাঁধা আমার বক্ষভরা উচ্ছাসে,
ছিলেন ইহার পরশখানি হায় কি নীরব পরিহাসে।
বারে বারেই ভাব্‌ছি যে হায় আশায় হলেই দুলে দুলে,
বুক ভরে এর নিশাস বায়ু উঠল বুঝি উঠল দুলে।
কিন্তু যে হায় মিথ্যে আশা, মিছেই রাখা এমন সাধ;
কাজল-দুখের মেঘের বারে ভাঙল শেষে চোখের বাঁধ।
ইহার মতই আমিও হায় মরণ-কোলে পড়ব ঢলে,
কণ্ঠ আমার নীরব হবে কঠোর বিধি-বিধান ফলে।*

---

* শেলির "Song on a faded Violet" কবিতার ভাবানুবাদ

ঝঞ্ঝা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ঝঞ্ঝা—প্রলয় ঝঞ্ঝা, দুর্নিবার
অঙ্গে অঙ্গে ঘুরিছে ঘূর্ণী তার।
করাল কুমেরু কুয়াশা কক্ষে ঘর,
সঙ্গে সাথে সদা মন্বন্তর,
অস্থি-মালার রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রণিয়া ঝনৎকার।

২

তাহার তীক্ষ্ণ "ম্যয় ভূঁখা হুঁই" ডাকে—
ভূতলে গগনে চকিত চমক লাগে।
সে করে শুম্ভ নিশুম্ভে চঞ্চল,
হয় উন্মাদ রক্ত-বীজের দল,
টলে সুখাসন ভুবনেশ্বরী
ষোড়শ মাতৃকার।

৩

গিরিদরী হতে শুনি সে নৃত্যতাল,
ছোটে অসংখ্য ক্ষুধিত পালপাল।
বিপুল তাদের নির্মম অভিযান,
দিগ্বিজয়ের করে যেন সন্ধান—
'জেরাক্সিসের' সৈন্য হতেছে
'হেলেস্পন্ত্র' পার।

৪

কে যেন বলিছে করি গর্জ্জন ঘোর—
'সাজাও সে চতুরঙ্গ বাহিনী মোর।
সুদূরবিস্তী সে কোটি শিরস্ত্রাণ—
রণবাদ্যের সাথে হোক আহ্বান,
সর্ব্বধ্বংসী অনলবর্ষী
গোলন্দাজের সার!

৫

আরব-উপন্যাসের দৈত্যদল—
করে একত্রে যেন ভীম কোলাহল।
উন্মাদনার বাজাইয়া ডঙ্কা,
চলে সমগ্র মরুর আকাঙ্ক্ষা,—
'সমরখন্দ' 'গজনী' ও 'ঘোর'
বোগদাদ বোখারার।

৬

এমনি ঝঞ্ঝা এসেছে বারম্বার,
হয়ে "খাইবার" গিরি-সঙ্কট পার।
দুর্জ্জয় চমূ এসেছে গিয়াছে ফের,
'ম্যাসিডোনিয়া'র বিজয়ী ফ্যালাংসের,
ত্রস্ত করিয়া পঞ্চনদ আর
দু'ধার বিতস্তার।

৭

ঝঞ্ঝায় আমি শুনে হই অস্থির,
ভাঙার শব্দ সোমনাথ মন্দির।
চিতোর জহর-ব্রতের গন্ধ পাই।
উড়ে ঝঞ্ঝায় দগ্ধ পুঁথির ছাই,
ভস্মীভূত সে পুস্তকাগার
"আলেকজেন্দ্রিয়ার"।

৮

হেন ঝঞ্ঝায় উড়িয়া গিয়াছে ঠিক্—
রোমান, কারথেজিয়ান পারসি গ্রীক।
হয়তো উহারি আবর্ত্তে হবে লীন,
অমনি 'প্যারিস' 'লণ্ডন' 'বার্লিন',
'স্টেলিন-গ্রাডের' রণ-আয়ুধের
অনন্ত ভাণ্ডার।

৯

স্ফীত আমেরিকা অভিনব গর্ব্বে,—
ধূলি হয়ে র'বে ঝঞ্ঝার গর্ভে।
হয়তো 'নুরেনবার্গের ঘূর্ণী
যাবে ইয়াঙ্কী জনপদ চূর্ণি'
দগ্ধ মাটির অভিশাপ আছে
'হিরোসিমা', 'কোরিয়ার'।

১০

ঝঞ্ঝা তোমায় ত্যজ এ বৈরীভাব,—
হউক পুণ্য নূতন জন্মলাভ।
আনো আনন্দ, অমৃত হিল্লোল,
ঝুলন ঝুলাও, দাও হিন্দোলে দোল,
ভাসাও উজানে প্রেমের প্রদীপ
কাল জলে যমুনার।

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

মাঘের সময় নিজের 'বাসভূমে' গিয়াছিলাম এবং সেখানে দুই দিনে মোট ৩৮ ঘণ্টা বাস করিয়াছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে কেবল ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনিয়াছিলাম। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি বর্ত্তমান মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীমণ্ডলী নিয়োগ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া যে তীব্র মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও শুনিতে হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে স্থানীয় কংগ্রেস দলভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যাই বেশী ছিল।

এই অঞ্চলে বর্ত্তমান বৎসরে আউশ ধানের চাষ হয় নাই বলিলেই চলে। প্রায় সর্ব্বত্রই পাটের চাষ হইয়াছে; পাটের অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। ইতিমধ্যেই পাটের গাছে ফুল ধরিয়াছে। আমন ধানের চাঁষের জন্য এখনও উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টি হয় নাই; তবে স্থানে স্থানে অতি অল্প পরিমাণ জমি 'ভাঙা' হইতেছে। স্থানীয় শ্রমিকগণের দৈনিক বেতন মাথাপিছু এক টাকা বার আনা। সাঁওতাল পরগণা, রাঁচি প্রভৃতি অঞ্চল হইতে যে সকল শ্রমিক আসিয়াছে তাহাদের মাথাপিছু দৈনিক বেতন দুই টাকা চার আনা।

রেশনের (সংশোধিত) দোকানে চাল নাই বলিলেই চলে। গম প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু গমের কাটতি কম। গম ভাঙাইবার পক্ষে অনেক অসুবিধাও আছে; ২।৩ মাইল দূরে গম ভাঙাইতে যাইতে হয়। যাওয়া-আসাতে এবং গম ভাঙাইতে এক জন লোকের আধ বেলা নষ্ট হয়। গমের মূল্য, ভাঙাইবার খরচ, এবং এই আধ বেলার পারি-শ্রমিক ধরিলে যে খরচ পড়ে তাহার তুলনায় "স্থানীয় বাজারে" চালের মূল্য কম। সুতরাং লোকে স্থানীয় বাজারেই চাল ক্রয় করা সহজতর মনে করে। আর একটা কথা, এক সের গমের দ্বারা যে কয় জন লোকের খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায়, এক সের চালের সাহায্যে তাহা অপেক্ষা বেশী লোকের খাদ্যের ব্যবস্থা হয়। এই দিক হইতেও যে অধিকতর মূল্যে চাল ক্রয় করা লোকে সুবিধাজনক মনে করে। দেশে চালের অভাব, সেই হেতু গম খাইতে হইবে, এই বোধ কয় জনের আছে? বর্ত্তমান সময়ে স্থানীয় বাজারে এক টাকায় এক সের আধ পোয়া চাল বিক্রীত হইতেছে—অর্থাৎ মণকরা সাড়ে পঁয়ত্রিশ টাকা।

সর্ব্বপ্রকার উপায়ে চালের চোরা চালান (smuggling) পুরাদস্তুর চলিতেছে। শুনিতে পাইলাম যাঁহারা 'লাইসেন্স-প্রাপ্ত ব্যবসায়ী' তাঁহাদের সাহায্যেও এই কারবার বেশ ভালভাবে পরিপুষ্ট হইতেছে। তাঁহাদের হিসাবপত্র দেখিবার তেমন সরকারী সুব্যবস্থা নাই।

উপমন্ত্রীবর্গের নিয়োগ সম্বন্ধে সাধারণের মত এই যে, এক এক জন উপমন্ত্রী যদি এক এক এলাকায় এক মাস বা দুই মাস একাদিক্রমে অবস্থান করেন এবং স্থানীয় জন-সাধারণের দুঃখ দুর্দশা, অসুবিধা প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখিয়া যথাসম্ভব প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে উপমন্ত্রী নিয়োগের সার্থকতা থাকে। ইহাতে চালের চোরাচালানও বন্ধ হইতে পারে।

এই অঞ্চলে কিসের অভাব নাই বলা কঠিন। কয়লার একান্ত অভাব চলিতেছে। কয়লা ব্যবসায়িগণ খনি হইতে কয়লা আনিবার "পারমিট" পাইয়াছেন, কিন্তু গাড়ী (ওয়াগন) পান নাই। গাড়ী পাইতে হইলে বহু 'জটিলতার' মধ্য দিয়া যাইতে হয়। কয়লার অভাবে "বৃক্ষবধ" উৎসব চলিতেছে। দুই-দশটা গাছ যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও জ্বালানির জন্য কর্ত্তিত হইতেছে। টিন, সিমেন্ট প্রভৃতির অভাবও যথেষ্ট আছে; আবেদনকারিগণ বৎসরের পর বৎসর উহাদের অপেক্ষায় দিন কাটাইতেছে। সরকারী সেচ-বিভাগ দুই একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু 'অনুসন্ধানের' জন্য এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতেছে যে লোকে ইহাদের "বাস্তব রূপ" সম্বন্ধে আশা ত্যাগ করিয়াছে। সবই যেন অতি মন্দ গতিতে চলিতেছে।

এই ত অবস্থা, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেশে দলাদলি, রেষা-রেষি প্রভৃতির অভাব নাই; স্থানীয় উন্নতির জন্য একতাবদ্ধ হইয়া সংগঠনমূলক ছোটখাটো কোন কাজ করিবার কাহারও অবকাশ নাই। সকলেই নেতার আসনে বসিয়া আছেন, কর্ম্মীর আসন শূন্য। এই অঞ্চলে কংগ্রেসেরও কোন সংগঠন-মূলক কাজ দেখিতে পাই নাই।

এশিয়ার পুনর্গঠন ঃ নূতন জাপানের বিস্ময়কর উন্নতি

শ্রীঅন্নাসাহেব সহস্রবুদ্ধে

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

২

পাঁচ জনে এক জনের অন্নাভাব

জাপানের লোকসংখ্যা প্রায় নয় কোটি। যুদ্ধের পূর্ব্বে অপর কতকগুলি দেশ ও অঞ্চল জাপানের অধিকারভুক্ত ছিল। জাপানের শতকরা কুড়ি জন লোক জাপানের বাহিরে থাকিত। জাপান যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় ঐ সব লোককে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। আজ জাপানের বাসিন্দা প্রতি পাঁচ জন লোকের এক জন বাহির হইতে প্রত্যাগত। তাহাদের শরণার্থী বলা যায়। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধে পরাজয়ের পরে জাপানে না ছিল অন্ন, না ছিল কর্ম্ম। প্রতি বৎসর আমেরিকা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে চা'উল ও গম আসিত। আর এখন পর্য্যন্তও এক-পঞ্চমাংশ খাদ্যশস্য বাহির হইতে আসিতেছে। এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত খাদ্যে পরিপূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ঐকান্তিক চেষ্টা তাহারা করিতেছে।

জমির ও জঙ্গলের গুরুত্ব সমান

বর্ত্তমানে জাপানের মোট জমির শতকরা ষোল ভাগ জমিতে চাষ-আবাদ হয়, আর এই পরিমাণ ভূমি পাওয়ার জন্যও গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তাহাদের অবিরাম চেষ্টা করিতে হইয়াছে। চাষের জমির অনুপাত বাড়িয়া যাহাতে অন্ততঃ বিশ-শতাংশ হয় সেদিকে তাহাদের প্রযত্নের ত্রুটি নাই। পাহাড় কাটিয়া তাহারা চাষের জমি তৈরি করিয়াছে; সমুদ্রকে পিছনে হটাইয়া জমি সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাপানের সমগ্র ভূমির ষাট ভাগ জঙ্গলাকীর্ণ। কিন্তু চাষের জমি বৃদ্ধি করার চেষ্টায় নিজেদের বনভূমির কোনরূপ হানি করিতে তাহারা নারাজ, কারণ বন হইতে তাহাদের বহুবিধ পল্লী-শিল্পের উপকরণ আহৃত হয়। তা ছাড়া একথাও তাহারা বিশেষভাবে জানে যে জঙ্গল কমিয়া গেলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিয়া যাইবে, এবং জমির উর্ব্বরতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে।

চাষ-আবাদ

এত কম জমিতে চাষ-আবাদ করিতে হয় বলিয়া ক্ষেতকে যেন তাহারা বাগিচার রূপ দিয়াছে। এখানে আমরা যেমন বাগিচার প্রত্যেকটি গাছের তদ্বির করি, তেমনি তাহারা ক্ষেতের প্রতিটি অঙ্কুরের উপর নজর রাখে। আমাদের এখানে ক্ষেতে যতটা ব্যবধানে গাছ রোয়া হয়, উহারা তাহার অপেক্ষা অধিক ব্যবধানে রোপণ করিয়া থাকে। তাই বীজও তাহাদের কম লাগে—আমাদের এখানকার এক-পঞ্চমাংশ। জাপানে প্রায় এক শত ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, আর তা হয় বার মাসই। তাহা হইলেও চাষীকে তথায় বৃষ্টির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। নব্বই ভাগ জমিতে, খাল পুষ্করিণী, বা কুয়া হইতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনমত তাহারা উহা হইতে সেচ দিয়া থাকে।

কম্পোষ্ট প্রস্তুত-প্রণালী

জাপানীরা ক্ষেতে প্রচুর সার ব্যবহার করে। প্রতি চাষীর বাড়ীর সামনে আছে একটি কুঁড়ে ঘর। ঐ কুঁড়ে ঘরে সারা বছর ধরিয়া কম্পোষ্ট সার তৈরি হয়। অবসর সময়ে চাষী বন হইতে ঘাসপাতা সংগ্রহ করিয়া আনে, এবং নিজ ক্ষেত বার বার নিড়াইয়াও সে কিছু ঘাস পায়। এই সব সে জমা করিয়া রাখে। জাপানের ৭০।৮০ ভাগ জমি পশুর সহায়তা বিনা চাষীরা নিজেরাই আবাদ করিয়া থাকে, কারণ সেখানে গবাদি পশু কম। সুতরাং কম্পোষ্টের জন্য ঘাস, গমের ভুষি, তুষ ইত্যাদির ব্যবহার হইয়া থাকে। কম্পোষ্ট-কুঁড়ের মেঝে সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো। মেঝেতে চাষী ঐ সব তৃণ-লতা, ঘাসপাতা, ভুষি-তুষ স্তূপীকৃত করিয়া প্রতি সপ্তাহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল ঢালিতে ও উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দিতে থাকে। উহা হইতে যে জল চোয়ায় তাহা এক গর্ত্তে গিয়া জমা হয়। ঐ জল পুনরায় ব্যবহার করা হয়। প্রায় ছয় মাস ধরিয়া এই প্রক্রিয়া চলে। তখন ঐ তৃণলতাদির স্তূপ মাখনের মত মোলায়েম সারে পরিণত হয়। ঐ প্রক্রিয়ায় ইহা অপেক্ষা অল্প সময়ে সার পাইতে হইলে, এতদ্ব্যতীত উহাতে দুই-তিন শতাংশ ক্যালসিয়ম নাইট্রেট সংযোগ করা হয়। তাহাতে দুই বা আড়াই মাসেই ভাল সার পাওয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে যে, তথায় প্রতি একর জমিতে প্রতি বৎসর পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ গাড়ী তথা পাঁচ হইতে দশ টন সার ব্যবহার করা হয়।

পায়খানা নির্ম্মাণ ও মলের সার

সারের জন্য মানুষের মলমূত্রের প্রচুর ব্যবহার করে বলিয়া জাপানী ও চীনাদের খ্যাতি আছে। জাপানের ছয়টি বড়

ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কির সাধারণ দৃশ্য
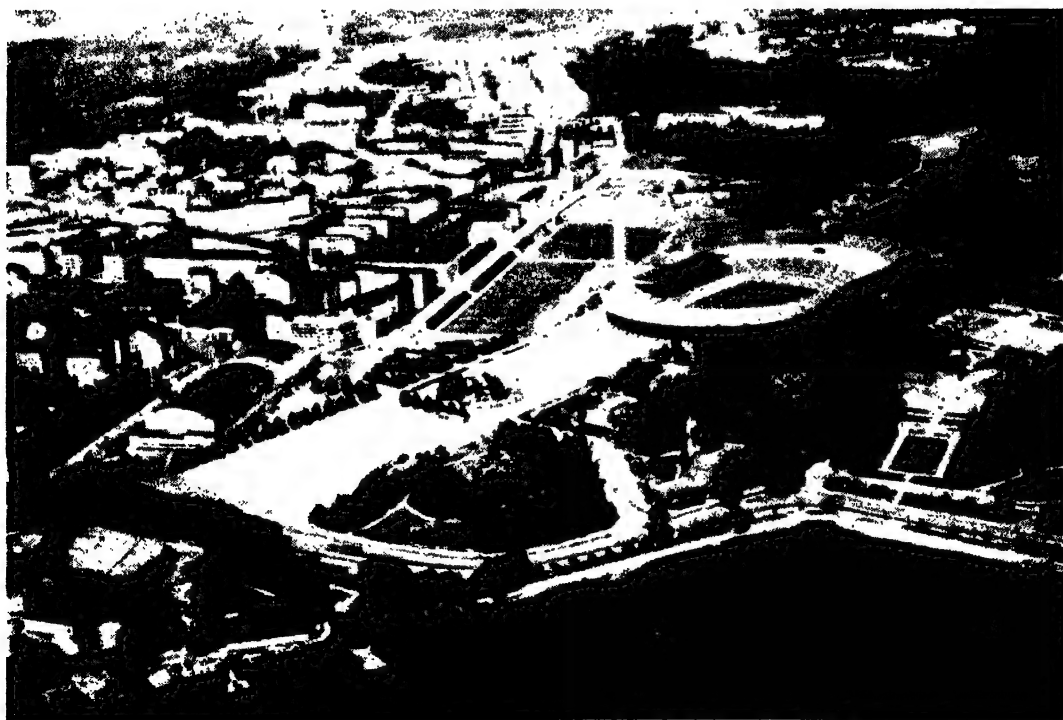
হেলসিঙ্কির ষ্টেডিয়াম। প্রধানতঃ এখানেই ১৯৫২ সনের অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইতেছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্ব্বাচন-

ভোট যন্ত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে সাধারণ নির্ব্বাচন চলিতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে নির্ব্বাচন কালে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা দ্বারা ভোট গণনায় অনেক সময় বাঁচে

ওহিওতে প্রাথমিক নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের একটি দৃশ্য

নগরে ফ্লাস পায়খানার ব্যবস্থা আছে। তদ্ব্যতিরেকে, অন্য সব জায়গায়—কি ক্ষুদ্র গ্রাম, কি বড় শহর সর্ব্বত্রই প্রতি বাড়ীতে পায়খানা রহিয়াছে। তথাকার পায়খানা এইরূপ :

চার ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া, চার ফুট গভীর একটি সিমেণ্টে তৈরী কূপ। তার উপর তক্তার ছাউনি। আর ঐ পাটাতনের উপর শৌচ-গৃহ নির্ম্মিত। কূপ হইতে মল-মূত্র অপসারণের সুবিধার জন্য বাহিরের দিকে একটি মুখ রাখা হয়। উহা ঢাকিয়া রাখার ব্যবস্থা থাকে। পাটাতনের মধ্যস্থলে এক ফুট লম্বা ও নয় ইঞ্চি চওড়া গোলাকৃতি একটি ফাঁক আর তাহাতে ফোকলা একটি চীনা মাটির বাসন বসানো। ময়লার বালতিগুলি বাঁকে ঝুলাইয়া বা গাড়ীতে চাপাইয়া ক্ষেতে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রত্যেক ক্ষেতে সিমেণ্ট বা পোড়া মাটিতে তৈরী চার ফুট গভীর ও চার ফুট পরিধিবিশিষ্ট দুইটি গোল কূপ থাকে। উহাতে ঐ মল-মূত্র ঢালিয়া তিন-চার বালতি জল মিশায়। পরে খুব ভাল করিয়া ঘাঁটিয়া পচাইবার জন্য ৮ হইতে ১৫ দিন রাখিয়া দেয়। যখন উহার উপরে মালাইয়ের মত সর পড়ে এবং উহার রঙ কালো বা গাঢ় সবুজ হয় তখন বুঝা যায় যে সার ঠিক পচিয়াছে। তখন কাঠের বড় চামচে দিয়া কাঠের বালতিতে তুলিয়া উহাতে আরও জল মিশান হয় এবং প্রত্যেক গাছের মূলে বড় চামচের এক এক চামচে জল দেওয়া হয়।

মেথরের সমস্যা নাই

বড় বড় শহরে এমন বহু লোক বাস করে যাহাদের ক্ষেত-খামার নাই। তাহাদের বাড়ীর মল অপসারণের কাজটা করে আশপাশের আট-দশ মাইলের কৃষকেরা। এক এক জন চাষী ২৫-৩০ ঘরের ভার লইয়া থাকে। ইহার জন্ম গৃহস্বামীকে তাহাদের কিছু দিতে হয় না, আর তাহারাও গৃহস্বামীকে কিছু দেয় না। ইচ্ছা হইলে কখন-কখন গৃহস্বামীকে কৃষক কিছু শাক-সব্জী দিয়া থাকে, কিন্তু বাধ্যবাধকতা কিছু নাই। ওখানে মিউনিসি-প্যালিটিগুলিকে মল অপসারণের জন্ম মেথর নিযুক্ত করিতে হয় না। অতএব মলমূত্র অপসারণের কোন খরচা নাই। বড় বড় সর্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠান, হোটেল, রেল-ষ্টেশন ইত্যাদির মল-মূত্রও চাষীরাই অপসারিত করিয়া থাকে।

বিজ্ঞানের সহায়তা ও খাদ্য সম্পর্কে স্বাবলম্বনের চেষ্টা

চাষীরা কম্পোষ্ট, মলমূত্র ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করে। তা ছাড়া, তথায় রাসায়নিক সারের ব্যবহারও খুব হয়, সারা ভারতে যে পরিমাণ হয় তার চাইতেও বেশী। প্রতি ফসলে আর প্রতি গাছে তাহার অল্প অল্প করিয়া সাত-আট বার সার দিয়া থাকে। উপযুক্ত পরিমাণ সার ও জলের ব্যবহার, কীট নিবারণের যাবতীয় উপায় অবলম্বন, বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় এবং অক্লান্ত পরিশ্রম হেতু জাপানের একরপ্রতি গড়পড়তা খাদ্যশস্যের ফলন ভারতের একরপ্রতি ফলনের চারি গুণ অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক। তাহাই নহে, উৎপাদন আরও অধিক বাড়াইবে এবং নিজেদের দেশকে খাদ্যবিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবে এই মহৎ আকাঙ্ক্ষাও তাহারা পোষণ করে।

সেবাগ্রাম পদ্ধতির দোষগুণ :—মলমূত্র অপসারণ ও উহার ব্যবহারবিষয়ক জাপানীদের এই পদ্ধতি* আমাদের কাছে বিশ্রী ও অতিশয় নোংরা মনে হইবে। ইহা অস্বাভাবিকও নহে। সেখানকার কতক শিক্ষিত লোক মনে করেন যে, ঐ পদ্ধতি অপেক্ষা ফ্লাশ পায়খানা ভাল। কিন্তু ফ্লাশ ব্যবস্থায় সার নষ্ট হয় বলিয়া জনসাধারণ উহার প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহে। সেবাগ্রামের পায়খানা সাফাই দেখিয়া কোন জাপানী ভদ্রলোক মন্তব্য করেন যে, জাপানী পদ্ধতি অপেক্ষা সেবাগ্রাম-পদ্ধতি উন্নততর। কিন্তু তৎসঙ্গে একথাও তিনি বলেন—কি পরিমাণ সারে কি পরিমাণ নাইট্রোজেন ইত্যাদি অত্যাবশ্যক উপকরণ আছে তাহা নির্ণয়ের নিমিত্ত সেবাগ্রাম-পদ্ধতিকে অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত করা দরকার। জাপানের পদ্ধতি কতকটা নোংরা হইলেও, আমাদের চাষীরা যেরূপ সহজ ভাবে গোবর ব্যবহার করে, জাপানীরা ঠিক সেরূপ সহজভাবে মলমূত্র অপসারণ ও ব্যবহার করে। এ কাজ সেখানে ঘৃণ্য বিবেচিত হয় না, বরং সমাজে অন্য সব কাজের যে মর্য্যাদা, এ কাজেরও সেই মর্য্যাদা। খাদ্যসম্পর্কে স্বাবলম্বী হইতে হইলে ভারতবর্ষকেও জমিতে পর্য্যাপ্ত সার ব্যবহার করিতে হইবে আর তাহার দরুন তাহাকেও সার তৈরীর জন্ম মলমূত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার অবশ্যই করিতে হইবে।

[এ বিষয়ে জাপানের পদাঙ্কানুসরণ করিলে ভারত খাদ্য-শস্যে স্বাবলম্বী হইবে। আর মেথরদের প্রতি যে সামাজিক অবিচার চলিয়া আসিতেছে সেই পাপ হইতে আমরা মুক্ত হইব। সমাজের পক্ষে অতি আবশ্যক একটি কাজ মেথর করে, কিন্তু তার বিনিময়ে সে সমাজ হইতে পায় অবিমিশ্র ঘৃণা। এদিকে গান্ধীজী আমাদের চেতনা কতকটা জাগ্রত

---

* এখানেও পল্লী অঞ্চলে কোথাও কোথাও এই ধরণের 'কূপ-পায়খানা' মফস্বলের স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের জন্য আছে। শৌচান্তে উহাতে মাটি, ঘাস-খড় ও আবর্জনাদি চাপা দেওয়া হয়। মল যখন সারে পরিণত হয় তখন তাহা তুলিয়া লওয়া হয়। উহা কূয়ার মত গভীর। ধাপার গর্ত্ত বলা যাইতে পারে। তেলেঙ্গানার গ্রামে কোথাও কোথাও এরূপ পায়খানা চোখে পড়ে।—

করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ আজ সমাজে ক্ষীণ। অতএব অদূর ভবিষ্যতে অন্ত কর্ষের মত মেথরের কর্মকে সমাজ যে মর্য্যাদা দিবে সে ভরসা কম। ব্রাহ্মণ আজ অর্থ-লোভে চামড়ার কাজ করিতেছে, কিন্তু অর্থলোভ থাকিলেও মেথরের কাজ সে করিত না। কারণ এ কাজটাকেই যে সমাজ হীন করিয়া রাখিয়াছে। বার্ণাড শ বলিয়াছেন যে, ডাক্তারদেরও মল-মূত্র-পুঁজ ঘাঁটার মত নোংরা কাজ করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও লোকে তাহাদের ঘৃণা না করিয়া সম্মান করে। তার কারণ তাহারা রোজগার করে বেশী। অতএব সমান আয় হইলে সমাজের দৃষ্টিতে মেথরে আর ডাক্তারে ব্যবধান থাকিবে না। এই অভিমত স্বীকার করা মুশকিল। কারণ শারীর-শ্রমকে, বুদ্ধি-শ্রম অপেক্ষা হেয় মনে করা রেওয়াজ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, মেথরের রোজগার ডাক্তারের রোজগারের সমান বর্ত্তমান ভারতে হইবার সম্ভাবনা কম। এ ভারত গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত নহে। অতএব এই কর্মটাকে উঠাইয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ। জাপানের কৃষক আমাদের দীক্ষাদাতা হউক।—অনুবাদক]

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ

১০

প্রদেশ ও প্রদেশবাসীদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে প্রদেশ সরকার কেবলমাত্র প্রদেশবাসীদের দ্বারাই গঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক—অপর প্রদেশবাসীদের দ্বারা ইহার গঠন প্রভাবান্বিত হওয়া আদৌ উচিত নহে। সকলেই জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে অপর প্রদেশবাসী ভোট-দাতার সংখ্যা অনেক বেশী। যত দিন পর্য্যন্ত ইহার পরিবর্ত্তন করিতে না পারা যাইবে, তত দিন পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের স্বার্থ রাজ্য-সরকার সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কারণ যাঁহাদের দ্বারা তাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন ও ভবিষ্যতে হইবেন তাঁহাদের সকলকার সমষ্টিগত স্বার্থ প্রদেশবাসীদের স্বার্থের প্রতিকূল হইলেও রাজ্য-সরকারকে উহা রক্ষা করিতেই হইবে। এই অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হইতেছে এই যে, পশ্চিমবঙ্গে যাঁহারা স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন তাঁহাদেরই নাম কেবলমাত্র ভোটার তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। গত নির্ব্বাচনে বহু লক্ষ অপর প্রদেশবাসী ব্যবসায়ী ও শ্রমিকের নাম এই প্রদেশের ভোটার-তালিকাভুক্ত করা হইয়াছিল। ঐ সমস্ত ব্যক্তি এই প্রদেশে ভোট না দিয়া নিজ প্রদেশের স্ব স্ব গ্রামে ও বিভিন্ন এলাকায় ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়া অনায়াসে ডাকযোগে তাঁহাদের ভোটগুলি প্রেরণ করিতে পারিতেন।

গত নির্ব্বাচনী দ্বন্দ্বের পর ডাঃ রায় নিজেই বলিয়াছিলেন যে, মুসলমান ও অপর প্রদেশবাসী ভোটদাতাদের সাহায্যেই এই প্রদেশে কংগ্রেস জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা হইতে দেখা যায় যে, অধিকসংখ্যক প্রদেশবাসী কংগ্রেসের বিপক্ষে ভোট দেওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস-প্রার্থিগণ নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, প্রায় প্রত্যেক ভোট-কেন্দ্রে এত অধিকসংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিলেন যাহার ফলে ভোটগুলি বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং বহু কেন্দ্রে অধিকসংখ্যক ভোটদাতার সমর্থন লাভ করিতে না পারিলেও অনেক প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন।

অনেকেই মনে করেন যে, হিন্দু মহাসভা, রামরাজ্য পরিষদ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক আখ্যাবিশিষ্ট দলগুলি যদি নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ না হইতেন তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান অধিবাসীরা বিচলিত না হইয়া কেবলমাত্র কংগ্রেস-প্রার্থীদেরই ভোট দিতেন না। একথা লেখা বাহুল্য যে, যতদিন পর্য্যন্ত প্রদেশের মুসলমান অধিবাসীদের মনে কংগ্রেসের স্তায় একাধিক ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল আছে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে না পারা যাইবে তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা একমাত্র কংগ্রেস-প্রার্থীদেরই ভোট দিতে থাকিবেন এবং কংগ্রেসও ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবেন। রাজ্য-বিধান সভায় কোনও দলভুক্ত না হইলে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কিছুই করিতে পারেন না ইহা জানা সত্ত্বেও গত নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ায় প্রদেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁহারা নিজেরাও মনোনীত হইতে পারেন নাই এবং অনেক সুযোগ্য প্রার্থীরও রাজ্য-বিধান সভায় এবং লোকসভায় মনোনীত হইবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কয়েক ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা রাজ্য-বিধান সভায় মনোনীত হইবার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে যোগ

দিয়াছেন। আশা করি, ভবিষ্যতে ভোটদাতারা এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ভারতের অপরাপর প্রদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ যে সকল ক্ষেত্রে এই প্রদেশের স্বার্থের অনুকূল নহে ইহা লেখাই বাহুল্য। এই প্রদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য লাভ করিবার জন্ম অপর প্রদেশবাসীরা এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে নানাভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই উদ্দেশ্যে অন্ত প্রদেশবাসী ধনীসম্প্রদায় অর্থসাহায্যের দ্বারা তাঁহাদের মনোনীত অনেক প্রার্থীকে প্রদেশের রাজ্য-বিধান সভায় নির্ব্বাচিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

যদিও ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেই ভোটাধিকার লাভ করিয়াছেন তথাপি লোকসভা, রাজ্য-বিধান সভা ইত্যাদিতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে চাহিলে একমাত্র ধনী ব্যক্তি অথবা অর্থশালী রাজনৈতিক দলের দ্বারা মনোনীত হইতে না পারিলে কাহারও পক্ষে কোনও নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। ইহার প্রতিকারের উপায় প্রচলিত ভোট-কেন্দ্রের নিয়মবিধি পরিবর্ত্তন করিয়া ভ্রাম্যমাণ ভোট কেন্দ্রের প্রবর্ত্তন করা। পোলিং অফিসারগণ সরকারী বাসে প্রত্যেক গ্রামে ও পল্লীতে গিয়া ভোট গ্রহণ করিবেন ইহাতে False personification-এর আদৌ সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ গ্রাম ও পল্লীর লোক সঙ্গে সঙ্গে উহা ধরিয়া ফেলিবেন এবং অধিকাংশ স্ত্রীলোক-ভোটদাত্রীরাও ভোট দিতে সক্ষম হইবেন। অবশ্য ইহার দ্বারা এক দিনে ভোট গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না, কয়েক দিন বেশী সময় লাগিবে। এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তন করিলে ভোট-প্রার্থীদের অর্থব্যয়ও খুব কম হইবে।

উপস্থিত লোকসভায় ও রাজ্য-বিধান সভাগুলিতে একমাত্র বামপন্থী দল ভিন্ন অপর কোনও শক্তিশালী বিরোধী দল নাই। এইরূপ অবস্থায় কংগ্রেস-গঠিত রাজ্য-সরকার জনমতকে উপেক্ষা করিলে কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারেন না। এই ক্ষুদ্রায়তন পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের প্রকট অর্থাভাব ও অন্নাভাব থাকা সত্ত্বেও ১৪ জন মন্ত্রী ও ১৬ জন উপমন্ত্রী লইয়া রাজ্য-সরকার গঠিত হইয়াছে। উপরন্তু ঐ সমস্ত মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহা ভারতরাষ্ট্রের অপর কোন রাজ্য-সরকার করেন নাই। প্রদেশবাসীদের সেবা করিবার আগ্রহ অপেক্ষা রাজ্য সভার নূতন কংগ্রেসী সভ্যেরা যে নিজেদের লভ্যের দিকে বেশী পরিমাণ নজর দিতেছেন ইহা বলাই বাহুল্য। আমাদের পরাধীন অবস্থায় কংগ্রেসের মূলনীতি ছিল "নিরুপদ্রব অসহযোগিতা"। অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন যে, আমাদের স্বাধীনতা লাভ করিবার পর কংগ্রেসের মূলনীতি ক্রমে ক্রমে "নিরুপদ্রব হিটলারবাদে" দাঁড়াইতেছে। মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের স্থান জনসাধারণ হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ইহা অনুভব করিয়া সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা একটি "ভারত সেবক সমাজ" গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। খুব সম্ভব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন যে, পাঁচ বৎসর পরে নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে উপস্থিত কংগ্রেসী দল আর সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। সেই কারণ এখন হইতেই তিনি আর একটি কংগ্রেসী উপদল গঠন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা একবার কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন অথবা কংগ্রেস-দলের সঙ্গে একমত নহেন তাঁহারা এই বেনামী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান—"ভারত সেবক সমাজে" যে যোগ দিবেন না ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ প্রত্যেক রাজ্যেই যখন কংগ্রেসী দল উক্ত "ভারতসেবক সমাজ"কে প্রভাবান্বিত করিতে থাকিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, বাঙালীকে জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে কংগ্রেস অথবা অপর কোনও সর্ব্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। কারণ বাংলার সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহার সমাধান করিতে হইলে স্বতন্ত্র ভাবে বাংলায় উচ্চ পর্য্যায়ের একটি অদলীয় "পশ্চিমবঙ্গ সেবক সমাজ" গঠন করা আবশ্যক। বাংলা ও বাঙালীর স্বার্থরক্ষাই হইবে ঐ সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য। যখন আমরা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিলাম তখন কলিকাতা হাইকোর্টের ও মফস্বলের জেলা কোর্ট-সমূহের শীর্ষস্থানীয় ব্যবহারজীবীরা সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন। বাংলার উপস্থিত জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান করিতে আবার যদি তাঁহারা অগ্রসর হন তবেই ইহা সম্ভব।

প্রস্তাবিত "পশ্চিমবঙ্গ সেবক সমাজ"কে কংগ্রেস অথবা অপর কোন সর্ব্বভারতীয় রাজনৈতিক দল যাহাতে কোন-রূপে প্রভাবান্বিত করিতে না পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, নচেৎ ইহার মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি দৈনিক সংবাদপত্র (ইংরেজি ও বাংলা) আছে সেগুলির দ্বারা বাঙালীর স্বার্থ রক্ষা হওয়া সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর নহে। এই সমস্ত দলগত সংবাদপত্রগুলি সকল সময় স্বাধীন

ভাবে প্রদেশ সরকারের কার্য্যের সমালোচনা করিতে অক্ষম। কারণ প্রথমতঃ প্রতি বৎসর বহু টাকা নিয়মিত ভাবে সরকারী বিজ্ঞাপন হইতে তাঁহারা পাইয়া থাকেন। উপরন্তু ঐ সমস্ত সংবাদপত্রের মালিকগণের কেহ কেহ রাজ্য-বিধান সভায় উপমন্ত্রিত্ব ও রাষ্ট্রসভায় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ হইতে মনোনীত হইয়াছেন।

বাঙালী যুবকদের বেকার-সমস্যা সমাধান করিবার জন্য যে মনীষী আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছিলেন সেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত আমরা করি নাই। যদি প্রস্তাবিত "পশ্চিমবঙ্গ সেবক সমাজ" স্বর্গীয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের একটি স্মৃতি তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন তাহা হইলে আমি মনে করি, পশ্চিম বঙ্গ হইতে দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা আদৌ অসম্ভব হইবে না। উক্ত স্মৃতি তহবিলের অর্থ হইতে একখানি উচ্চ পর্য্যায়ের বাংলা এবং একখানি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র বাংলা ও বাঙালীর স্বার্থরক্ষার্থে প্রকাশ করা যাইতে পারে। সংবাদপত্রগুলি পরিচালনা করিয়া যে অর্থ লাভ হইবে তাহার দ্বারা এবং স্মৃতি তহবিলের অন্যান্য আয় হইতে বাঙালী যুবকদের নানারূপ ব্যবসা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে দেশের বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে।

বাংলা ও বাঙালীর উপস্থিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিষয় গত কয়েক মাস যাবৎ "প্রবাসী" পত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট যতদূর সম্ভব নিবেদন করিয়াছি। আমি মনে করি যে, ইহার প্রতিকার যদি এখন হইতে না করা হয় তাহা হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের জন্মভূমি বাংলা—বাঙালীর বাংলা অচিরে ইতিহাসের কথা হইয়া দাঁড়াইবে।

সমাপ্ত

অন্তর্বর্ত্তীকালীন

শ্রীসত্যাদর্শ বসু

আর তো ওঠে না বলাকা-বলয় বোমারু বিমানবাহিনী,
ককিয়ে ওঠে না সাইরেন আর ভয়াতুর শিশু সম,
রোষভরে চেয়ে ধ্বংসী কামান গর্জায় নাকো আর—
যুদ্ধ গিয়েছে থেমে,
দুর্ভিক্ষ ও বন্যার।
মহামারী আর অভাব
শত কাহিনীতে ভরতি রয় না প্রভাতের দৈনিক ;
পীড়া দেয় নাকো সঙ্গীনপাণি বিদেশের সৈনিক ;
শত অভাবের গোলকধাঁধায় ঘুরে—
ঘোর-ঝলোমলো বিপুল আশায় সকাল বিকাল সন্ধ্যা
কেটে যায় নাকো তিল তিল করে নিষ্ফল হতাশায়।
তবু কেন আজ শান্তি নাইরে উদ্বেগহীন চিতে,
অসোয়াস্তি লাগে কেন, পায়ে কণ্টক বিঁধে নেই তো,
[illegible]তার কূলেতে ভিড়েছে ভাবনার খেয়া-তরী
তবু ভাবনায় চিহ্নিত কেন মুখ ?
উজ্জ্বল রোদে পিঠ পেতে শুয়ে পড়ে আছে খোলা-পথ—
তবে কেন আজ চলবার নেশা নেই ?
গতি কি হয়েছে হারা ?
আকাশের পটে বর্ণবাহার রবির রক্তরাগে,
সাগরের বুকে তরুমর্মরে বিহগের কলগানে,
আজিও চলেছে অনাদি কালের খেলা সে চিরন্তন,
আজিও রয়েছে মরসুমী আর রঙীন প্রজাপতি—
তবে কি গো আজ ধরিত্রী দীনা, হয়েছে কি মরু বন্ধ্যা ?
সৃষ্টি কি গেছে থেমে ?
তা তো নয়, তা তো নয় :
তটিনীর স্রোত জোয়ার ভাটায় সরিতে আছে থমকে,
মানুষের মন ভাবা না-ভাবার সীমানায় গেছে পৌঁছে।
শাস্ত্র বলছে, চলে কিছু কাল সংস্কারের চাকা,
বিজ্ঞানে কয়, তেজিত যত স্বাভাবিক হয়ে আসছে—
সময় কিছু নেবে তাই রে—হতাশার কিছু নেই রে,
সবেতে আসিয়া মিলিবে আবার গান,
সুপ্ত চম্পা জাগিবে আবার সোনার মাটির পরশে,
নীপ-কোরক জাগিবে বিপুল হরষে
সাত সমুদ্র পাড়ি দিতে পুনঃ জাগিবে মধুপথী,
পক্ষীরাজও ছুটিবে আবার সীমাহীন সেই অজানা তেপান্তর,
থেমেছে যে রথ আবার চলিবে
আশা উৎসাহ নিশান উড়িয়ে—
চির নবীনের বিজয়-যাত্রাপথে।

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

১০

ভবেশ বিলাত যাইবে না বলিয়া জবাব দিলেও মিঃ ও মিসেস রায় হাল ছাড়িতে পারিলেন না। মেয়ের জন্ত আই. সি. এস. পাত্র হাতছাড়া করা বড় কঠিন কাজ। ছেলের বাপ বড় ব্যারিষ্টারের কালো মেয়েকে মোটা চেকের সহায়তায় পরিবারস্থ করিতে রাজী ছিলেন এক সর্ত্তের বিনিময়ে। সর্ত্তটি এই যে, তাঁহার মেয়েটিকে হাই সোসাইটিতে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা মিঃ রায়কে করিতে হইবে। তিনি ধার করিয়া ছেলেকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। ছেলের বিয়েতে যে টাকা পাইবেন তাহা দিয়া ঋণমুক্ত হইবেন, সুতরাং মেয়ের বিয়েতে টাকা খরচ করিতে পারিবেন না। মিসেস রায় ভাবিয়াছিলেন ভবেশকে সহজে রাজী করাইতে পারিবেন ভবেশের পিতার সাহায্যে।

ভবেশেরও ছেলেবেলা হইতে বিলাত যাইবার কল্পনা ছিল। এ পর্য্যন্ত ভবেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্ত তাহাকে বিলাত পাঠাইবার প্ল্যান মিঃ ও মিসেস রায়ের মাথায় ছিল, তাহাকে বিবাহ দিয়া পাঠাইবার কথা তাঁহারা ভাবেন নাই। কিন্তু এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বক্সীর খবর পাইবার পরে পূর্ব্ব প্ল্যানের পরিবর্ত্তন হইল।

মিঃ রায় প্রথমটা স্ত্রীর প্রস্তাবে সায় দেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন মেয়ে বড় হউক, একটা ভাল ছেলে দেখিয়া নিজে খরচ দিয়া বিলাতে পাঠাইয়া মানুষ করিয়া আনিবেন, মানুষ হইয়া আসিলে তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবেন। দেবানন্দকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল এই ছেলেটিকে লইলে মন্দ হয় না। স্ত্রীকে সেকথা বলিয়াছিলেন, তিনি তেমন আপত্তি করেন নাই। বলিয়াছেলেন আরও কিছুদিন যাউক, ছেলেটি কি রকম পাস করে, কি রকম তাহার স্বভাব-চরিত্র দেখা যাক।

মিটি সম্ভবতঃ ইহার কিছু আভাস পাইয়াছিল। তাহার মনের কথা বলা কঠিন। সে সাহেবী ষ্টাইলে বরাবর মানুষ হইয়াছিল, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ তাহার কিশোর মনকে নাড়া দিলে তাহার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল: একটু একটু করিয়া সে তাহার সমাজের আইন-কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। মিঃ ও মিসেস রায় উভয়েই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ভবেশের সঙ্গে দেবানন্দ তাঁহাদের গৃহে আসিবার পর হইতে তাহার এই ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল।

মিঃ বক্সীর আবির্ভাবের পরে পূর্ব্ব প্ল্যানের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইল। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ভবেশকে হাতে আনা গেল না, মেয়ের জন্ত হাতের কাছে আই. সি. এস. পাত্র পাইয়াও মিঃ বক্সী সিনিয়রের সর্ত্তের জন্ত মিঃ রায় বিপদে পড়িলেন। তাঁহার রাগ হইল এই ভদ্রলোকের উপর। দুই চারি হাজার টাকা বেশী চাইলে তিনি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার নিজের ছেলে বড় হইলেও না হয় একটা ব্যবস্থা করা যাইত। অন্যায় আব্দার ধরিয়া ভদ্রলোক তাঁহাকে এক মহা সমস্যার মধ্যে ফেলিয়াছেন।

সেক্রেটারী অব ষ্টেট মিঃ মর্লের আদেশে বঙ্গেভঙ্গের সার্কুলার উঠাইয়া লওয়া হইল এবং স্বদেশী আন্দোলনের সংস্রবে যে সকল স্কুলের ছাত্র স্কুল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল তাহাদিগকে পুনরায় স্কুলে ভর্ত্তি করা আরম্ভ হইল। উপর-ওয়ালার এই আদেশে ফুলার সাহেব ও তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীরা মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। অনেক জায়গায় স্কুলের উপর অপ্রত্যক্ষ চাপ দিয়া তাঁহারা বিতাড়িত ছাত্র ভর্ত্তি করিবার ব্যাপারে বাধা দিতেছিলেন। সিরাজগঞ্জ স্কুলের সঙ্গে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের গোলযোগ বাধিল। ছোটলাট ফুলার নিজের হাতে বিষয়টি লইলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলিলেন, সিরাজগঞ্জ স্কুলকে 'ডিসএফিলিয়েট' করো। বিশ্ববিদ্যালয় ফুলারী অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। এই সামান্য ব্যাপার বড়লাটের হাতে গেল। তিনি ফুলারের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন না। সভা, শোভাযাত্রা বন্ধ করিয়া ফুলারী শাসনে যে সকল সারকুলার জারি হইয়াছিল সেক্রেটারী অব ষ্টেট সেগুলি বাতিল করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সেগুলি বাতিল হইল বটে, কিন্তু সেগুলির জায়গায় পূর্ব্ববঙ্গে নিত্যনূতন আদেশ জারি হইতে লাগিল। এ অবস্থা বর্ণনা করিয়া একখানি কাগজে লিখিল—"মিঃ মর্লের ভর্ৎসনা সত্ত্বেও স্তর ব্যামফিল্ড ফুলার আপনার কুঅভ্যাসগুলি সংশোধন করিতে পারেন নাই। ঢোলসহরতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পাঁচ জন বা তার বেশী লোক রাস্তায় যাইবার সময়ে জোরে কথা বলিলে বা জোরে হাসিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীরা কি রসিকতা করিতেছেন, না তাঁহারা 'সিরিয়াস'? সিরিয়াস হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহাদের মাথা বিগড়াইয়াছে এবং তাঁহারা আপনাদিগকে হাস্যাস্পদ করিতেছেন।"

দেশী কাগজগুলি অনবরত অভিযোগ করিতে লাগিল যে, ছোটলাট ফুলার সেক্রেটারী অব ষ্টেটের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া

যথেচ্ছ অত্যাচার চালাইতেছেন। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রস্তাব পাস করিয়া সেক্রেটারী অব ষ্টেটকে অনুরোধ করিল ফুলারকে ফিরাইয়া আন, "হিজ এক্টস্ হ্যাভ বিন আণ্ডারমাইনিং দি এম্পায়ার" (তাঁহার কার্য্যের ফলে সাম্রাজ্যের অনিষ্ট হইতেছে)।

ইহার পরে আসিল উদয় পাটনীর ফাঁসির ব্যাপার। শ্রীহট্টের উদয় পাটনীর ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল। সে বড়লাটের কাছে প্রাণ-ভিক্ষার দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল। দরখাস্ত শ্রীহট্ট হইতে সিমলায় বড়লাটের হাতে পৌঁছিবার আগেই উদয়-পাটনীর ফাঁসি হইয়া গেল। বড়লাট তাহার প্রাণ-ভিক্ষার দরখাস্ত পাইয়া তাহা মঞ্জুর করিয়া পাঠাইলেন। 'পায়োনিয়ার' লিখিল, উদয়-পাটনীর ফাঁসি "রিগ্রেটেবল ওভারসাইট।" এই কৈফিয়তে সেক্রেটারী অব ষ্টেট সন্তুষ্ট হইলেন না, বলিলেন, স্তর ব্যামফিল্ড ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহার পর হিতবাদী কাগজ লিখিল, "আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি ফুলার সাহেব পদত্যাগ পত্র দিয়াছেন এবং লর্ড মিণ্টো তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলা বোধ হয় রাহুমুক্ত হইল। কিন্তু সুসংবাদ আমরা এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

ফুলার সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন দেশের সর্ব্বত্র এই গুজব ছড়াইয়া পড়িল। সুরমা উপত্যকা জনকারেদের সভাপতি কলিকাতায় কাগজে তার পাঠাইলেন—শ্রীহট্টের অধিবাসীরা উল্লসিত। পাবনা হইতে তার আসিল—দেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। দলে দলে লোক জটলা করিতেছে—সংবাদ সত্য না মিথ্যা। বরিশাল হইতে অশ্বিনীকুমার দত্ত তার করিলেন—বন্দেমাতরম্! সন্ধ্যা লিখিল—"ফুলারের পদত্যাগে বাড়ীতে আলোকসজ্জা করিয়া নাচিয়া, কীর্ত্তন গাহিয়া আনন্দ করিবার হেতু নাই। ফুলারের শাসন-পদ্ধতি ফিরিঙ্গী রাজনীতির অনুকূল নহে, তাই পূর্ব্ববঙ্গে এক ফুলারকে সরাইয়া নূতন ফুলার আনা হইবে। ফুলার জবরদস্ত শাসন-পদ্ধতি চালাইয়া আমাদের জাতীয় চেতনা জাগাইয়াছে, লর্ড রিপন বা স্তর হেনরী কটন আমাদের এই উপকার করিতে পারিতেন না। ফুলার বিষকুম্ভ, কিন্তু মিঃ মর্লের মত পয়োমুখ বিষকুম্ভ নহে।"

ফুলারের পদত্যাগে বাংলার মুসলমান-সমাজের এক অংশের মধ্যে ক্ষোভ ও অভিমান প্রকাশ পাইল। তাহারা বলিল, "ইংলণ্ড ফুলারকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া আজ যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিল ভবিষ্যতে ইহার জন্য গভীর অনুতাপ করিতে হইবে। লর্ড কার্জ্জন হিন্দুদের ঠিক চিনিতেন এবং তাহাদিগকে শায়েস্তা করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মুসলমান শাসকদের মধ্যে শুধু সম্রাট আলমগীর হিন্দু-চরিত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাদের বিষদাঁত ভাঙিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হিন্দুরা তাহাদের মুসলমান প্রভুদের প্রতি কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করিয়া ইংরেজের হাতে দেশের শাসনভার তুলিয়া দিয়াছিল। নূতন প্রভুর প্রতি তাহারা অনুরক্ত থাকিবে একথা মনে করা ইংরেজের গুরুতর ভুল হইয়াছে।"

জব্বলপুর, মাদ্রাজ ও লাহোরে সভা করিয়া মুসলমানরা ফুলারের পদত্যাগে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিল। ইংরেজী কাগজ লিখিল, "হি ওয়াজ অফার্ড্ এজ এ হলোকাষ্ট টু র‍্যাম-প্যাণ্ট র‍্যাডিক্যালিজম্।" (চরমপন্থীদের কাছে তাঁকে বলি দেওয়া হইয়াছে।)

ফুলারের জায়গায় ল্যান্সিলট হেয়ার পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট নিযুক্ত হইলেন। কাগজে লিখিল, "ফুলারের দমননীতির ফলে পূর্ব্ববঙ্গে যে অসন্তোষের আগুন জ্বলিতেছে, নূতন ছোটলাট তাহা নিভাইতে পারিবেন সকলে এই আশা করিতেছে।"

কিটির ক্রমবর্দ্ধমান বেয়াড়াপনায় মিসেস রায় শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। মিস বাদলের কাছে পড়িতে বসিয়া কিটি প্রায়ই তাহার সঙ্গে ঝগড়া করে; মিঃ বক্সী জুনিয়রের আসিবার খবর পাইলে তাহার মাথা ধরে, ধমকাইলে মুখে মুখে জবাব দেয়। একদিন মিসেস রায় শুনিলেন সে বিনির কাছে পটলডাঙ্গার ভবেশদার হোষ্টেল কতদূর খবর লইতেছে। এই সব লক্ষণ দেখিয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরামর্শ হইল। মিঃ রায় স্থির করিলেন মিঃ বক্সী সিনিয়রকে জানাইবেন অবিলম্বে বিবাহ দিলে তিনি দুই-তিন হাজার টাকা কালহু দিতে প্রস্তুত আছেন। জানাইবার পূর্ব্বে ভবেশকে রাজী করাইবার একবার শেষ চেষ্টা করিবেন মনে করিয়া ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে কলিকাতা আসিবার জন্য লিখিলেন। চিঠি পাঠাইয়া মিঃ রায় ভবেশকে লিখিলেন, তাহার মামী একটা পার্টি দিবেন, এ সম্বন্ধে ভবেশের সঙ্গে পরামর্শ করিতে চাহেন। সে যেন দুই একদিনের মধ্যে আসে।

মামা মামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটির পরে আবার চক্রবেড়ে হইতে আহ্বান পাইয়া ভবেশ বিরক্ত হইল। তাহার সন্দেহ হইল এই পার্টি সম্বন্ধে পরামর্শ একটা ধাপ্পা, সম্ভবতঃ নূতন কোন ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হইতেছে।

বিরক্তি ছাড়া আর একটা জিনিস ভবেশের মনকে পীড়া দিতেছিল। ভবেশ কিটিকে স্নেহ করিত, আন্তরিক স্নেহ করিত। দেবানন্দ প্রথম হইতে ভবেশের মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমে সে তাহার অন্তরঙ্গ ও পরম স্নেহভাজন হইয়া উঠিল। কিটিকে দেবানন্দের হাতে দিবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে স্থির করিয়াছিল। প্রথম দিকে মামা মামীর ভাব দেখিয়া সে মনে করিয়াছিল তাহার প্রস্তাবে

তাঁহাদের বোধ হয় অমত হইবে না। তাহাকে কিছু না জানাইয়া কিটির বিবাহ স্থির করায় সে মনে আঘাত পাইল। দেবানন্দের প্রতি কিটির পক্ষপাতিত্বের দুই-একটি দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়িয়া তাহাঁর মন বিষণ্ণ হইল।

ভবেশ যখন চক্রবেড়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল তখন বেশ দেরি হইয়াছে, সান্ধ্য মজলিস জমিয়া উঠিয়াছে। ভবেশ বসিবার ঘরে ঢুকিল। সে ঘরে ঢুকিতে মিঃ রায় তাহার দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে পড়িল স্ত্রীর কথায় তিনি এই অবাধ্য ভাগিনেয়টিকে আসিতে লিখিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন—বস ভবেশ, তোমার মামীর সঙ্গে দেখা না করে পালিও না।

ভবেশ বসিল। সে শুনিল মিঃ ভাটা বলিতেছেন—বোম্বের মিলওয়ালারা বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগে দু'হাতে পয়সা লুটছে। ম্যাঞ্চেষ্টার আর সহ্য করতে পারছে না। এবার বোম্বেওয়ালাদের ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। মর্লে স্যর হ্যামিল্টন স্মিথকে পাঠাচ্ছেন বোম্বে কাপড়ের কলগুলিতে লেবর কন্‌ডিশন সম্বন্ধে রিপোর্ট করবার জন্য।

মিঃ রায়—মিলগুলো হাই প্রেশারে কাজ করছে। টাইমস অব ইণ্ডিয়া মজুরদের কষ্ট দেখে বড় বিচলিত হয়ে "বোম্বে স্লেভ" নাম দিয়ে একটার পর একটা প্রবন্ধ ছাড়তে থাকে। এই সব প্রবন্ধ পড়ে লণ্ডন টাইমস ও ম্যাঞ্চেষ্টারের চোখ থেকে জল পড়তে সুরু করে মজুরদের দুর্দশায়। এ অবস্থায় মর্লে কেমন করে স্থির থাকবেন? কাজেই হ্যামিল্টন স্মিথ আসছে। ইট ইজ দি ওল্ড গেম অব জন বুল (জন বুলের পুরাতন চাল)।

বাংলার রাজনীতিতে মডারেট ও একস্‌ট্রিমিষ্টদের দলাদলি ও কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া দুই দলের কলহের প্রসঙ্গ উঠিল। মিঃ ভাটা নূতন পার্টির লোক, বিপিনচন্দ্র পালের ভক্ত। তিনি বলিলেন—

বিপিনবাবু প্রস্তাব করেছেন দাদাভাই নৌরজীর জায়গায় তিলককে এবার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করা হোক। উই একস্‌ট্রিমিষ্টস হোলহার্টেডলি সার্পোর্ট দি প্রোপোজাল—সমর্থন করি আমরা একস্‌ট্রিমিষ্টরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাব। পিটিশন ও প্রেয়ার অনেক হয়েছে, নো মোর অব মেন্‌ডিক্যান্সী (ভিক্ষাবৃত্তি আর নয়)। ফুলারের রেজিগনেশন আর বরিশাল কেসে হাইকোর্টের রায়ের জোরে মডারেটরা লজ্জায় নুয়ে যাওয়া মাথা আবার ওঠাতে সাহস পেয়েছেন দেখছি। আবার তাঁরা কথা কইতে সুরু করেছেন।

মিঃ গাঙ্গুলী একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন—উই একস্‌ট্রিমিষ্ট মানে ত অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, রবি ঠাকুর আর সত্যার ম্যাডক্যাপ উপাধ্যায়? এঁদের ভরসায় ইউ হোপ টু রেষ্ট লীডরশিপ ফ্রম দি হ্যাণ্ডস অব দি ভেটের‍্যান্স, (অভিজ্ঞ নেতাদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চাও)—ফ্রম দি হ্যাণ্ডস অব মিঃ সুরেন্দ্র ব্যানার্জি দি হিরো অব হানড্রেড ব্যাটল্‌ফিল্ডস?

মিঃ রায় সংশোধন করিয়া বলিলেন—হানড্রেড প্ল্যাটফরম্‌স।

মিঃ গাঙ্গুলী—থ্যাঙ্ক ইউ। হিন্দু পেট্রিয়ট ইজ রাইট। বলেছে, এই "হোম রুলার" আর "সেলফ রিলায়েন্টের" দল হচ্ছে এ মিনেস টু দি এম্পায়ার (সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক); তাদের আইডিয়ালস "সিলি এণ্ড ডেঞ্জারাস" (নির্ব্বুদ্ধিতা প্রসূত ও বিপজ্জনক)।

মিঃ ভাটা—এণ্ড দি মডারেটস আর এ ক্যাম্পানী অব বেগারস (মডারেটরা ভিক্ষুকের গোষ্ঠী)।

মিঃ গাঙ্গুলী—বেগারস নয়, তারা লয়্যাল পেট্রিয়টস্। বন্দেমাতরম্ পার্টির ফ্যানাটিকরা দেশের অনিষ্ট করছে।

মিঃ রায়—হোমরুলের ফ্যানাটিক আইডিয়া নিউ পার্টির সভ্যদের মাথায় ঢুকেছে। আমরা আশা করছি—দে উইল সুন রিটার্ণ টু দি ফিল্ড অব প্র্যাকটিক্যাল পলিটিক্স। (শীঘ্রই তাঁহারা বাস্তব রাজনীতিতে ফিরে আসবেন)।

মিঃ ভাটা দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—এংলো ইণ্ডিয়ান ও মডারেটদের মধ্যে তফাৎ দেখছি না বিশেষ। ইংরেজদের কণ্ট্রোলের বাইরে অটোনমি চাই আমরা, এই কথা শুনে এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রেস হিষ্টিরিয়ার রোগীর মত করছে। মডারেটরা পোঁ ধরেছে। অটোনমি ফ্রি অব ব্রিটিশ কণ্ট্রোল—উঃ কথাটা ভাবতেই মডারেটদের মাথা ঘুরে যায়, পা কাঁপতে থাকে। তাই অমৃত বাজার লিখেছে: "বিপিন পাল বলছেন ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র অটোনোমাস, এবসোলিউটলি ফ্রি অব ব্রিটিশ কণ্ট্রোল হবে (ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবে), এর অর্থ ব্রিটিশ কণ্ট্রোলের অধীনে ভারতবর্ষকে অটোনমি দিতে হবে। তাঁর কথার অর্থ যদি এই না হয় তা হলে বলতে হবে হি টোক্‌ট ননসেন্স।" (বাজে কথা লিখেছেন)

মিঃ গাঙ্গুলী—ঠিক কথা।

মিঃ ভাটা—ঠিক কথা নয় গাঙ্গুলী, "মাইল্ড হিন্দুর" উপযুক্ত কথা, গত পঞ্চাশ বছর যারা রাইট অব পিটিশনিং ছাড়া আর কোন রাইট চায় নি ও পায় নি, এখনও যারা অন্য কোন রাইটের কথা ভাবতে পারে না তাদের উপযুক্ত কথা। বিলিতী কাগজে "টাইগার কোয়ালিটিজ অব দি ইম্পিরিয়াল রেস" বলতে সুরু করেছে, সঙ্গে সঙ্গে মডারেট বন্ধুদের পিলে চমকে গেছে, নয় কি?

মিঃ রায়—ঝগড়া থাক ভাটা। তিলক ভার্সাস নৌরজী কনটেষ্টে কে জেতে দেখে নিও। আর বুঝতে পারবে দেশের লোক বন্দেমাতরম্ পার্টির ফায়ার ইটারদের পক্ষে, না ট্রায়েড এণ্ড সোবার লীডারদের (অভিজ্ঞ ও স্থিরমতিক নেতাদের) পক্ষে

মিঃ ভাটা—দেশের লোকের কথা বলো না যায়। বড়া-মেটরা কংগ্রেসকে পকেটে পুরে রেখেছে। সত্যার কথায় দি কংগ্রেস ইজ আওয়ার্স, আমাদের কথা কংগ্রেসকে শুনতে হবে, নইলে—

মিঃ গাঙ্গুলী—নইলে ? কংগ্রেসকে তোমাদের পকেটে পুরবে ?

মিঃ ভাটা—এক্স্যাক্টলি (নিশ্চয়)। সত্যার রেজোল্যুশন দেখেছ ? উই আর সিরিয়স্, উই শাল বুক দি রেজোল্যুশন : "We the representatives of all the people of India assembled, vow that in all our activities and efforts the independence of our nativeland shall be our one aim" (আমরা ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের সমবেত প্রতিনিধিরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমাদের সকল কর্মে ও চেষ্টায় স্বদেশের স্বাধীনতা হইবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য)।

মিঃ গাঙ্গুলী ও মিঃ রায় হাসিয়া উঠিলেন। মিঃ গাঙ্গুলী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ইণ্ডিপেনডেন্স শ্যাল বি আওয়ার ওয়ান এম"—ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ছেলের হাতের মোয়া !

মিঃ মিটার এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। অবেশ মিঃ গাঙ্গুলীর কথায় উত্তেজিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, মিঃ মিটার তাহাকে হাত নাড়িয়া নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন—রায়, তুমি মৌলভী ভারসাম তিলকের কথা বলছিলে। কলকাতা কংগ্রেসে মৌলভী প্রেসিডেন্ট হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু নিউ পার্টির শক্তির পরিচয় তোমরা এই কংগ্রেসেই পাবে। আর মডারেট স্কুলের রাজত্ব এইবার শেষ হবে। মৌলভী ষ্ট্যাণ্ডস ফর দি পাষ্ট এণ্ড তিলক ষ্ট্যাণ্ডস ফর দি ফিউচার। যকেয়া আইডিয়াল ও ফিউটাইল মেথড আর চলবে না—তোমাদের দল খুব ভাল ইংরেজীতে চিৎকার কর না কেন, একটু মিষ্টের মত গাল দাও না কেন।

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া মিঃ রায় ডাকিলেন—বয় !

মিঃ মিটার কি বলিতেছিলেন। মিঃ গাঙ্গুলী বাধা দিয়া বলিলেন—আর নয় মিটার। আই এম রেডি টু ড্রিঙ্ক দি হেলথ অব ইওর গ্রেট তিলক।

বয় ট্রেতে পেগ সাজাইয়া ঘরে ঢুকিল। অবেশ উঠিয়া ঘরের বাহিরে গেল। মিঃ রায় অবেশকে যাইতে দেখিলেন, বিশেষ কাজের জন্য তিনি যে তাহাকে ডাকিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে যাইতে দেখিয়াও কিছু বলিলেন না।

অবেশ সিঁড়িতে উঠিতে গিয়া থামিল। তাহার মামীর সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি করিবার ইচ্ছা হইল না। একবার একটু কৌতূহল হইল মামীর এই পার্টির উপলক্ষ্য কি জিজ্ঞাসা করিবে, আবার ভাবিল, কি হইবে জানিয়া ? সে নিজের মন এক রকম স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। কলিকাতা হইতে কিছুদিন তাহাকে পালাইতে হইবে। দেবানন্দের রকম সকম ভাল নহে, সে ঘন ঘন হাতিবাগান অথবা চাপাতলায় যাইতেছে। নিজের রাজনৈতিক কাজকর্মের উপরও তাহার বিরক্তি আসিয়াছিল। এদিকে পড়াশুনা কিছুই হইতেছে না।

মিঃ রায়ের গৃহ হইতে বাহির হইয়া সে রাস্তায় আসিল চিন্তিতভাবে দক্ষিণ মুখে হাঁটিতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল, কলিকাতা হইতে দুই দিনের মধ্যে পালাইবে, কিন্তু তাহার আগে একবার ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করিবে।

১১

অনেক দিন পরে দেবানন্দ তাহার বরিশালের বন্ধু অতুলের এক চিঠি পাইল। অতুল লিখিয়াছে—"ভাই দেবু, কয়েক দিন হ'ল বাবা মারা গিয়েছেন। মা অনেক দিন আগেই গিয়েছেন। আজ আমি বন্ধনমুক্ত। আপাততঃ বাড়ীতেই আছি, প্রয়োজন হলেই বেরিয়ে পড়ব। স্বদেশ-বান্ধব সমিতির সব কাজের ভার আমার ওপর এসে পড়েছে। বাড়ী-ঘর, বাপ-মা ছেড়ে কয়েকটি ছেলে এসে জুটেছে সমিতিতে। তাদের থাকবার, খাবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এরা একেবারে শেকল-ছেঁড়া পাগল। 'কাজ দাও, কাজ দাও করে আমাকেও পাগল করে তুলেছে। দুটিকে ঢাকা ডাগদাল স্কুলে পাঠিয়েছি, দুটি গিয়েছে কলকাতায়। কাজের ভার নিয়ে দেখছি টাকার দরকার। চাঁদা তুলে কিছু যোগাড় হচ্ছে। দেখছি মুখে যাদের দেশপ্রেমের খৈ ফোটে, চাঁদা দেবার বেলায় তারা হাত গুটিয়ে নেয়। বলে কাজ কর, টাকার ভাবনা কি ? বোঝে না কাজ করতে হলে অর-গানাইজেশন চাই, আর অরগানাইজেশন মানে টাকার ব্যাপার। মুষ্টিভিক্ষা আর দু-চার টাকা চাঁদা দিয়ে এঁরা মনে করেন ইংরেজকে মেরে তাড়াবার জন্য আর বেশী কি চাই ? কিছু দিন আগের কথা বলছি। এক ভদ্রলোক পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়ে বললেন স্নুলারকে মারতে হবে। মারতে পারলে আরও পঞ্চাশ টাকা দেব। আমাদের টাকার বড় দরকার, তাই ওঁর টাকা নিলাম। মধ্যে মধ্যে তাড়া দিতেন, কই, কতদূর হ'ল ? স্নুলারের রেজিগনেশনের খবর বেরুতে তিনি এসে আমাদের গালাগালি করতে লাগলেন। বললেন, 'তোমরা সব বাজে বক্তিয়ারের দল, কোন কাজের মুরোদ নেই। দাও আমার টাকা ফিরিয়ে দাও। কেউ পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে বলেন—এমার্শন সেটার মাথা চাই। যিনি মুষ্টিভিক্ষা দেন তাঁরও দাবি, আগে বরিশাল থেকে ইংরেজ ফৌজদের তাড়াও

মোটকথা বহু সময় নষ্ট করে ও বেইজ্জত করে যে সাহায্য টাকা ওঠে তাতে যারা সব ছেড়েছুড়ে এসেছে সেই সব কর্মীর আহারের সংস্থান করাই কঠিন। দেশের লোক, যাদের অক্লেশে মোটা টাকা সাহায্য দেবার অবস্থা আছে, তারাও টাকা দেবে না, শুধু উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে ইংরেজ তাড়াবার সাহায্য করতে চায়। ধারে পরে পৈতৃক সম্পত্তিতে আমার নিজের অংশ বেচে দিতে হয়েছে। কিছু টাকা পেয়েছি এইভাবে। এই টাকায় মালমশলা সংগ্রহের চেষ্টা করছি। বোধ হয় আমাকে ঢাকা, কলকাতা ও চন্দননগর যেতে হবে কয়েক দিনের মধ্যে। ঢাকা ও কলকাতা থেকে টাকা সংগ্রহের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ পেয়েছি। দেবী চৌধুরাণীর আমলের ব্যবস্থা। আমি আশঙ্কা করছি এ পথে চললে দেশের লোকের মন আমাদের ওপর বিরূপ হতে পারে। ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝেছি এ পন্থা অনুসরণ করতে তারা ইতস্তত: করছে। তার পর এ পথে চলতে হলেও কিছু মালমশলা চাই।

কলকাতা গেলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আশা করি। আমি সম্ভবতঃ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের কোন্ও উঠব। হোষ্টেলের বন্ধুদের খবর কি? মহেন্দ্র কেমন আছে?"

অতুলের চিঠি পাইয়া দেবানন্দ আনন্দিত হইল। চিঠি পড়িয়া সে নিজের মনে চিন্তা করিতে লাগিল। অতুল তাহা হইলে কাজের সন্ধান পাইয়াছে? সে এখনও বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কর্তৃপক্ষ শীঘ্র তাহাকে দীক্ষা দিবেন শুনিয়াছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁহারা কোন কথা নির্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই। আর কত দিন তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে?

পাশের সিটে মহেন্দ্র বসিয়া গীতা পড়িতেছে। জেল হইতে ফিরিয়া তাহার ধর্মে বিশেষ ভক্তি হইয়াছে। সে হঠযোগ অভ্যাস করে, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ধ্যান ধারণায় ব্যস্ত থাকে। তাহার দিকে চাহিয়া দেবানন্দ বলিল—আমাদের বরিশাল কলেজের অতুল অনেক দিন পরে চিঠি লিখেছে। কলকাতায় আসবে জানিয়েছে।

মহেন্দ্র মুখ তুলিয়া বলিল, ওটা গোলযোগ সমিতির এক পাণ্ডা হয়েছে শুনেছি, পৈতৃক বিষয়আশয় সব শেষ করেছে।

ভবেশ হোষ্টেলে প্রচার করিয়াছিল সে শীঘ্রই দেশে যাইতেছে। তাহার জিনিসপত্র গোছান হইতেছিল। আজ ছুটি আছে, হাইকোর্ট বন্ধ। ডা: চক্রবর্তীর গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সে দেবানন্দকে বলিল, আমি ডা: চক্রবর্তীর বাড়ী যাচ্ছি। তুই কি যাবি?

দেবানন্দ ভাবিল ভবেশদা ত চলিয়া যাইতেছেন ডা: চক্রবর্তীর সঙ্গে আবার কবে দেখা হইবে কে জানে?

সে বলিল, চলুন যাই।

ডা: চক্রবর্তীর গৃহে পৌঁছিয়া স্লিপ পাঠাইলে তিনি বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। দুই বন্ধুকে লাইব্রেরী ঘরে বসাইয়া তিনি বলিলেন, এক মিনিট অপেক্ষা কর। আমি আসছি।

ডা: চক্রবর্তী ভিতরের ঘরে চলিয়া গেলেন। উভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া ঘরের সাজসজ্জা দেখিতে লাগিল। দেবানন্দ দেখিল প্রথম দিনের মত একগোছা রজনীগন্ধা ভ্যাসে রহিয়াছে। টেবিলের উপরে একখানা ছোট রূপার ডিসে এক মুঠা চাঁপা ফুল। সেদিন এটা ছিল না। ঘরময় চাঁপার ঈষৎ উগ্র গন্ধ। সে ভাবিল ডা: চক্রবর্তী খুব ফুল ভালবাসেন দেখিতেছি।

পরদা সরাইয়া ডা: চক্রবর্তী আসিলেন, তাঁহার পিছনে সেই ভদ্রমহিলা যাঁহার মুখের খানিকটা সেদিন ভবেশ ও দেবানন্দ দেখিতে পাইয়াছিল। তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। ডা: চক্রবর্তী বলিলেন, মৃণাল, আমার বন্ধু ভবেশ ও দেবানন্দ। ইনি হচ্ছেন মিসট্রেস অব দি হাউস।

তাহারা নমস্কার করিল। ভবেশ একটু বিস্মিত হইল ডা: চক্রবর্তী ইঁহার সঙ্গে তাহাদের পরিচয় করিয়া দেওয়াতে। সে আরও বিস্মিত হইল ভদ্রমহিলার আশ্চর্য্য, স্নিগ্ধ রূপ দেখিয়া। ইঁহার পরিচয় সম্বন্ধে যেটুকু সে শুনিয়াছে তাহাতে এমনটি দেখিতে পাইবে সে কখনও ভাবে নাই।

মৃণাল বলিল, আপনারা বসুন। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করবার বড় ইচ্ছে হয়েছিল। আজ এসেছেন ভাল হয়েছে। আজ ত ছুটি, আপনারা দুপুরে যদি এখানে খেয়ে যান বড় খুশী হব।

ভবেশ দেবানন্দের দিকে একবার চাহিয়া বলিল, আজ একটু কাজ আছে, এর পর এক দিন আসব।

মৃণাল—আপনি ত শীগগির বিলেত যাচ্ছেন শুনছি, তার আগে সময় হবে ত?

ভবেশ হাসিয়া বলিল, বিলেত যাওয়া আপাততঃ স্থগিত।

মৃণাল দেবানন্দকে তাহার বাড়ীঘর, আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। তার পর বলিল, আপনারা কথাবার্তা বলুন, আমি আসছি। সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

ডা: চক্রবর্তী একটি সিগার ধরাইয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া উভয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমরা এসেছ ভাল করেছ। আমি এক গভীর সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছি।

তাঁহার বলিবার ভঙ্গী হইতে দেবানন্দ মনে করিল তিনি রসিকতা করিতেছেন। হাসিয়া বলিল, কিসের সমস্যা স্যর?

ডা: চক্রবর্তী—এদেশের সেরা সমস্যা। মাই ফ্রেণ্ডস, আমি রসিকতা করছি না। আই এম ইন এ সিরিয়াস মুড। বেদীর ভাগ মজেলে যেমন দেখা যায় একটি মেয়ে ও তার দুটি সাতায় নিয়ে ইটারন্যাল ট্র্যাঙ্গল তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর

মাঝামাঝি থেকে এ দেশের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ট্র্যাজেডি দাঁড়িয়েছে মুসলমানরূপী মেয়ে ও তার হিন্দু ও ইংরেজ এই দুই নাতার নিয়ে। দুইটি নাতার মেয়েটির কানের কাছে অনবরত ফিসফাস করছে। এই ত্রয়ীর মধ্যে সম্পর্ক ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সন্দেহ, ভয়, ভয় দেখানো ও লোভ দেখানো হচ্ছে প্রধান কয়েকটি সেন্টিমেন্ট যা এই উপন্যাসের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এই ত্রয়ীর মধ্যে সাম্প্রতিক সম্পর্কের অধ্যায় নিয়ে আপাততঃ আমি ব্যস্ত রয়েছি।

পর্দা সরাইয়া বেয়ারা ঘরে আসিল, তাহার হাতে একটি ট্রে। সে ট্রেটি ভবেশ ও দেবানন্দের পাশে একটি তেপায়ার উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, রোমান্স ছেড়ে ইতিহাসের সাদা কথায় ব্যাপারটা বলছি। আগে হিন্দুদের কথা শোন। একখানা কাগজ বলছে—"এ দেশ থেকে কোন সময়ে ব্রিটিশরা চলে গেলে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দেবে বলে মনে হয় না। They will very probably try to make India part of an empire co-extensive with the Moslem world (খুব সম্ভব তারা ভারতবর্ষকে মুস্লিম জগদ্‌ব্যাপী সাম্রাজ্যের অংশরূপে পরিণত করবার চেষ্টা করবে)। অথবা মুসলমান রাজাদের সৈন্যসামন্তের সাহায্যে এ দেশে আবার মুসলমান-আধিপত্য স্থাপন করবার চেষ্টা করবে। ভারতবর্ষের মুসলমানরা ভারতবর্ষকে এখনও স্বদেশ বলে মনে করে না—তুর্কী, পারস্য কাবুলের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা বেশী বলে মনে করে। দেশে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে ক্রমাগত। হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংস কামনা করতে পারে না। হিন্দুদের রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্রিটিশের আশ্রয়ে জাতীয় উন্নতি করা। এই আশ্রয় সরে গেলে হিন্দুদের বহু বিপদ ঘটবে। নির্ব্বোধ ছাড়া আর কেউ হিন্দুদের ভিসলয়াল বলতে পারে না।

দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের মনে এদেশের মুসলমানদের মতিগতি সম্বন্ধে সন্দেহ ও ভয় দুই-ই আছে।

মুসলমানদের কথা শোন। আজ পাক মাসে মুসলমানদের কাগজখানা স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে বলছে, "হিন্দুরা যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, তারা বিদেশী জিনিস কিনবে না তো মুসলমানদের কর্ত্তব্য হবে বিদেশী জিনিস বেচবার জন্য এজেন্সী খোলা। হিন্দুরা কূট অভিসন্ধি নিয়ে মুসলমানদের তাদের আন্দোলনে যোগ দিতে বলছে। এই অভিসন্ধি হচ্ছে মুসলমানদের সর্ব্বনাশ করা।" মুসলমানদের সর্ব্বনাশ কি ভাবে হবে সেটা বলা হয় নাই। অনুমান করা যায় যে, হিন্দুরা পোলিটিক্যালি প্রাধান্য লাভ করবে ও মুসলমানদের তাদের তাঁবেদার হতে হবে এই ভয় রয়েছে মনে। পূর্ব্ববঙ্গের দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্বন্ধে কাগজখানা বলছে, "পূর্ব্ববঙ্গের সরকার মুসলমানদের বেশী সংখ্যায় নিয়োগ করা সম্বন্ধে যে সার্কুলার জারি করেছেন সেটা বাতিল করে দেবার জন্য হিন্দুরা মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে দাঙ্গা বাধিয়েছিল।"

—শুনেছ বোধ হয় লর্ড মিণ্টো আর্মীর হবিবুল্লাকে এদেশে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন। কাগজখানা এই উপলক্ষে লিখেছে বাঙালী সিডিশান ঠাণ্ডা করবার সবচেয়ে ভাল উপায় আহমদ শা দুরাণীর স্মৃতি স্মরণ রাখবার জন্য প্রতি বৎসর উরস অর্থাৎ উৎসবের ব্যবস্থা করা।

১৬ই অক্টোবর আমরা রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান করি বঙ্গভঙ্গের দুঃখ স্মরণ করে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এসোসিয়েশন এবার ঢাকায় বঙ্গভঙ্গের আনন্দোৎসব করেছে। এই উৎসবের পাণ্ডা ঢাকার নবাব সলিমুল্লা। এই উপলক্ষে নবাব সলিমুল্লা ছোটলাট হেয়ারের কাছে পূর্ব্ববঙ্গে সরকারী ছুটি ঘোষণা করবার জন্য দরবার করেছিলেন। হেয়ার সাহেব অতটা এগোন নি। ইংরেজ বড় চক্ষুলজ্জাশীল জাত।

—আলিগড়ের স্যর সৈয়দ আহমেদ খাঁ মারা গেলে তাঁর পাবলিক সার্ভিসেস স্মরণ করে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁর পরিবারকে মাসিক তিন শত টাকা পেনসন দিয়েছেন। ১৮৮৬ সনে কলকাতা কংগ্রেসে যোগ দিতে এসে কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত না হয়ে তিনি সরে পড়েছিলেন, তাঁর পাবলিক সার্ভিস আরম্ভ হয় এইভাবে। স্যর সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুর পরে শিক্ষিত মুসলমান নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ কংগ্রেসে যোগ দিতে লাগলেন। টাইম্‌স কাগজ লিখল—"সর্ব্বনাশ! শীঘ্র হিন্দুদের কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের সরিয়ে রাখবার ব্যবস্থা কর।" এই ব্যবস্থার পরিণতি হচ্ছে বিখ্যাত মোস্‌লেম ডেপুটেশন। এই ডেপুটেশন যে "কম্যাণ্ড পারফরম্যান্স" সেটা সকলে জেনে ফেলেছে। ডেপুটেশনের মেমোরিয়াল লিখে দিয়েছিলেন আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ আর্চবোল্ড ও লর্ড মিণ্টোর প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল ডানলপ স্মিথ। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। মুসলমানরা দাবি করেছে তাঁদের জন্য রিজার্ভেশন অব সিটস্ চাই, লোকাল বডিতে শতকরা পঞ্চাশটি আসন চাই।

—পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু-বিদ্বেষী ইংরেজ ও মুসলমান কর্ম্মচারীরা মিলে এই ডেপুটেশনের পরে মোস্‌লেম ভিজিলান্স কমিটি গড়ে তোলবার সাহায্য করেছেন। এই কমিটির উদ্দেশ্য হিন্দুদের অত্যাচার হতে মুসলমানদের রক্ষা করা। এই ভিজিলান্স কমিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বন্দেমাতরম্ কাগজের মন্তব্য শোন, "গবর্ণমেণ্ট আবিষ্কার করেছেন যে হিন্দুরা এদেশ থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবার জন্য ষড়যন্ত্র করছে; তাঁরা আবিষ্কার করেছেন যে, এই দুই সম্প্রদায়

বরাবর পরস্পরের শত্রু এবং ওয়ারলাইক (সংগ্রামপ্রিয়) মুসলমানরা পৌত্তলিক হিন্দুদের সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করে ইত্যাদি। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি এই সব কথা প্রচার করছে এবং গবর্ণমেণ্ট তাতে উৎসাহ দিচ্ছেন। এইভাবে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষ সৃষ্টি করবার পর গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদের সতর্ক করে বলেছেন তোমরা আত্মরক্ষার জন্য শীঘ্র ভিজিলান্স কমিটি গড়ে তোল।"

এই ভিজিলান্স কমিটির পত্তন একটা অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম এসোসিয়েশন বা কনফেডারেসী গড়ে উঠেছে। মুসলিম কাগজে খোলাখুলি বলেছে এই এসোসিয়েশনের কাজ হবে গবর্ণমেণ্টের সব কাজ আনকনডিশনালি সাপোর্ট করা আর মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব যাতে না বাড়ে তার ব্যবস্থা করা। এই এসোসিয়েশনের নাম হয়েছে মোসলেম লীগ। এবার দেখছ—

পরদা সরাইয়া মৃণাল ঘরে প্রবেশ করিল। একটু হাসিয়া বলিল, আপনাদের খাবার পাঠিয়েছি। হঠাৎ মনে হ'ল আপনারা বোধ হয় খাবার অবসর পান নি।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী—আই এম সরি। তোমরা খেয়ে নাও।

মৃণাল লেমনেডের বোতল খুলিয়া গ্লাসে লেমনেড ঢালিয়া দিল। ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, জান ভবেশ, কাল একটা কাগজে,—অফ কোর্স এ হিন্দু পেপার, আর হিন্দু ছাড়া এমন মানসিক সাইওপিয়া-গ্রস্ত জাত জগতের আর কোথাও পাবে না—পড়ছিলাম প্যান-ইসলাম আন্দোলনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বৈদান্তিক ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও ইসলাম—এই তিনের ট্রায়াল অব য়ুনিভার্সাল ফেথের কল্পনা চোখে ধাঁধা লাগিয়েছে লেখকের। একটা আন্দোলনের, বিশেষ করে ধর্ম্মের নামে পোলিটিক্যাল আন্দোলনের তাৎপর্য্য বোঝবার জন্ত তার ব্যাকগ্রাউণ্ডটা একটু ষ্টাডি করা যে দরকার—

মৃণাল বাধা দিয়া বলিল—আপনারা খেয়ে নিন।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিলেন—ওবে হার (ওঁর আদেশ পালন কর)।

ভবেশ ও দেবানন্দের খাওয়া হইলে মৃণাল ঘর হইতে চলিয়া গেল, বেয়ারা আসিয়া ট্রে উঠাইয়া লইল।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বিষয়ের পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, আমি ওয়াচ করছি হাওয়া কোন দিকে বইছে। আমাদের পোলিটিক্যাল ক্যাম্পে একটা ক্লিভেজ (বিচ্ছেদ) আসন্ন, লক্ষণ দেখে বুঝতে পারছি। এর কথা পরে হবে। আগে যে জিনিসটা সবচেয়ে ষ্ট্রাইকিং মনে হয় তার কথা বলছি। সন্ধ্যা কাগজখানা পড় বোধ হয়। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশে যে অর্থোডক্স রিভাইভ্যালিজম্ দেখা দিয়েছে তার স্পোকসম্যান হচ্ছে সন্ধ্যার এডিটর এই অদ্ভুত মানুষ উপাধ্যায়। গত ফেব্রুয়ারী মাসেও সন্ধ্যা ইংরেজের বিরুদ্ধে কটকোর্স ব্যবহারের নীতিকে নিন্দা করেছে বার বার। দেশের যে ক্ষুদ্র দলটি এই নীতিতে বিশ্বাসী তারা ভ্রান্ত বলে মন্তব্য করেছে। বলেছে, ইণ্টারনাল ষ্ট্রেংথকে জাগিয়ে তুলিতে হইবে, জিজিবীষা বর্দ্ধন করিতে হইবে মনে ও বাইরে। বরিশাল কনফারেন্সের পরে সন্ধ্যা কি বলছে শোন।—"আমাদের সামনে এই প্রশ্ন উঠেছে। আজ গরু ও ভেড়ার পালের মত চুপ করে মার খাওয়া ভাল না আত্মরক্ষার জন্ত লাঠির বদলে লাঠি চালান ভাল।" ইউ সি, রেগুলেশন লাঠির ঘায়ে আত্মিক শক্তির জাগরণের সমস্যা এক কথায় সমাধান হয়ে গিয়েছে।

ভবেশ বলিল, আপনি পোলিটিক্যাল ক্লিভেজের কথা কি বলছিলেন?

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, বরিশালের ঘটনার পরে যে এক্সাইটমেণ্ট দেশে দেখা গিয়েছিল সেটা কমে আসছে। কিন্তু এ এক্সাইটমেণ্টের স্থায়ী ফল এই হয়েছে যে, নূতন আইডিওলজি নিয়ে একদল লোক দেশের একমাত্র রাজনৈতিক অরগানিজেশন কংগ্রেসে ঢুকে পড়েছে। এতদিন তারা সুযোগ পাচ্ছিল না; বরিশালের অত্যাচার লোকের মনকে যে ধাক্কা দিয়েছে তার ফলে তারা সামনে আসবার সুযোগ পেয়েছে। এরা হচ্ছে কংগ্রেসের এক্সট্রিমিষ্ট দল।

ভবেশ বলিল, এটা ভাল বলতে হবে।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, ভাল কি মন্দ পরে দেখবে। আই হোপ দি সিচুয়েশন ইজ নাউ ক্লিয়ার টু ইউ (আশা করি অবস্থা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছ)। বরিশালে রেগুলেশন লাঠির ব্যবহার, অথবা একখানা কাগজের ভাষায়, "দি ডিসেণ্টেড ডেসপটিজম্ অব কুলার" দেশের লোকের মনে যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে, যাঁরা আড়াল থেকে কাজ করতে চান তাঁরা এটাকে কাজে লাগাচ্ছেন নিজের কাজের পরিধি বাড়াতে, আর যাঁরা প্রকাশ্যে কাজ করতে চান তাঁরা এটাকে কাজে লাগাচ্ছেন ওল্ড লীডারশিপকে সরিয়ে নিউ লীডারশিপ প্রতিষ্ঠা করতে।

কিছুক্ষণ পরে ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, বাই দি বাই, তোমার মামা সে দিন কমপ্লেন করছিলেন ভবেশ। বলছিলেন, তিনি তোমার বিলেত যাবার ব্যবস্থা করছেন আর তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ।

ভবেশ হাসিয়া বলিল, কই, আমি ত পালিয়ে বেড়াচ্ছি না। রওনা হবার দিন ঠিক করুন তিনি, দিনটা জানতে পারলে আমি বথে রওনা হব।

বিদায় লইবার আগে ভবেশ তাঁহাকে একান্তে বলিল, সেদিন আপনাকে সব কথা খুলে বলেছি। আমার কলকাতা ভাল লাগছে না। পড়াশুনোও কিছু হচ্ছে না। তাই ভাবছি কিছু দিন দেওঘরে পালাব। সেখানে একটা বাড়ী আছে আমাদের। চুপচাপ বসে পরীক্ষার জন্ত তৈরি হব। আপনাকে

কথাটা জানালাম, কিন্তু এটা গোপন রাখতে হবে আপনাকে।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিলেন, গোপন রাখব।

দেবানন্দ ও ভবেশ বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইলে ডাঃ চক্রবর্ত্তী মৃণালকে ডাকিলেন। উভয়কে নমস্কার করিয়া তাহারা বিদায় লইল।

দিন তিনেক পরে ভবেশ তাহার পিতার এক চিঠি পাইল। তিনি লিখিয়াছেন, "তোমার মামা আমাকে ও তোমার মাকে কলিকাতা যাইবার জন্য জরুরি টেলিগ্রাম করিয়াছেন। আমার এখন যাওয়া সম্ভব নহে। হিজ অনর স্তর লান্সিলট হেয়ার, এল-জি বাহাদুর শীঘ্র এখানে আসিতেছেন। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ডি. ও. চিঠি লিখিয়াছেন এল. জি-র রিসেপশন কমিটিতে আমি ভাইস-চেয়ারম্যান মনোনীত হইয়াছি, আমাকে অবিলম্বে সদরে উপস্থিত হইতে হইবে। তোমার মামাকে আমি একথা জানাইলাম।

আমার উপদেশ এই যে, তুমি কোন প্রকার আন্দোলনের মধ্যে থাকিবে না। নিজের মনে পড়াশুনা করিবে। বয়কট আন্দোলন এখন সরকারের চক্ষুশূল হইয়াছে। তুমি কদাচ এই আন্দোলনের সংস্রবে থাকিবে না। আমাদের বংশ রাজভক্ত বলিয়া পরিচিত। সরকারের অনভিপ্রেত কোন প্রকার আন্দোলনে যোগ দিয়া বংশের সুনামের হানি করিবে না। আমার ও তোমার মাতাঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদ জানিবে।"

পিতা কলিকাতা আসিবেন না জানিয়া ভবেশ নিশ্চিন্ত হইল। দিন দুই পরে দেশে যাইতেছে বলিয়া সকলের কাছে বিদায় লইয়া সে হোষ্টেল ত্যাগ করিল। ক্রমশঃ

মায়ের ব্যথা

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

তিন বছরের খোকারে রাখিয়া স্বর্গে গেলেন তিনি,
নাবালক নিয়ে রহিলাম পড়ে আমি হায় অভাগিনী।
পক্ষিণীসম বাছারে আমার লইয়া বক্ষপুটে,
চালায়েছি পেট বাড়ী বাড়ী নিতি ধান ভেনে চিঁড়েকুটে।
মনে ছিল সাধ বাছারে আমার গড়িব মানুষ করি,
মুটের মতন খেটে খেটে তাই হাঁপানীতে আজ মরি।
খোকন আমার হ'ল বিদ্বান মানুষ হ'ল না হায়,
না হ'ত বিদ্যা হইত মানুষ খুশী যে হতাম তায়।
ধনী শ্বশুরের পয়সা[illegible] যে হয়েছে ব্যারিষ্টার,
মস্ত পসার দেশজোড়া নাম সুখে ভরা সংসার।
সহরের বুকে করিয়াছে বাড়ী টাকা ঢেলে ঝুড়ি ঝুড়ি,
বিজলী আলোকে করে ঝলমল যেন সে ইন্দ্রপুরী।
কত আসবাব ফুলের বাগান চারটে মোটর গাড়ী,
কত দাসদাসী দারোয়ান মালি জম্ জম্ করে বাড়ী।
গিয়ে ছিল খোকা ছিলাম সেখানে কয়টি মাসের তরে,
কেন যে ফিরেছি বলিতে অশ্রু কণ্ঠ রুদ্ধ করে।
বৌমা আমার এম্. এ. পাসকরা সহরের মেয়ে খাঁটি,
মেমের মতন চলন বলন ফিট্‌ফাট্ পরিপাটি।
পাড়াগেঁয়ে মোর হাবভাব দেখে বৌমা গেলেন রেগে,
ঠিক করে দিল একখানা ঘর একপাশে মোর লেগে।
কয়েদীর মত থাকিতাম সেথা নিষেধ বাহির হওয়া,
সেথাই আমার রান্নাবান্না সেথা মোর খাওয়া-শোওয়া।
নিত্য আসিত বৌমার কত সাথী সঙ্গিনী দল,
আমারে দেখিলে কণ্ঠে তাদের নামিত হাসির ঢল।
শুনিনু একদা শুধায় তাহারা ওটি তোমাদের কি ?
উত্তর দিল বৌমা হাসিয়া 'দেশের পুরাণ ঝি'।
সেই শুনে আমি আসিলাম ফিরে গ্রামের ভিটার পরে,
দিবানিশি শুধু বাছার লাগিয়া আঁখি ঝর ঝর্ ঝরে।
গর্ব্বে ধরেছি মাসে মাসে খোকা দেয় সে অদায়ভাতা,
যে ক'দিন বাঁচি শ্বশুরের ভিটা আর নাহি হব ছাড়া।

রবীন্দ্রনাথের বর্ষাকাব্য

শ্রীগোপাললাল দে

রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসম্পর্কীয় সমস্ত কবিতার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং একটি ভাবসাধর্ম্ম্য দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তাহার একটি মৌলিক, স্থির রূপ আছে। এই ভাবসাধর্ম্ম্যটিও এতই স্পষ্ট ও নির্দ্দেশ্য যে কবির বর্ষা-সম্পর্কীয় কবিতাগুলিকে একটি বিশেষ:পর্য্যায়ের 'লিরিক' কাব্যরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে, যদিও কবিতাগুলি এক স্থানে বা একই কালে রচিত হয় নাই। কবির একই বয়সের অনুভূতিও ইহাতে নাই, পরন্তু 'মানসী' হইতে আরম্ভ করিয়া গীতাঞ্জলি পর্য্যন্ত, এমন কি কবি-জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ইহারা বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে রচিত হইয়াছে।

এই বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে বর্ষার প্রতি কবির নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁহার বর্ষাবিষয়ক কাব্যগুলির উপর ভারতীয় পূর্ব্বসূরীদের প্রভাব। প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিকের উপরেই পূর্ব্ববর্ত্তী কবি-সাহিত্যিকগণের প্রভাব পড়ে। অক্ষম লেখকদের পক্ষে সে প্রভাব হইয়া দাঁড়ায় অনুকরণ, কিন্তু স্রষ্টা কবির পক্ষে তাহা হইয়া উঠে নবসৃষ্টির উপকরণ। তাহা বর্ত্তমানের কবিকে গৌরবান্বিত করে এবং অতীতের কবি-কৃতিগুলিকে পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতা সম্পর্কে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'তিনি ··সমগ্র মেঘদূতের কাহিনীটির সঙ্গে সঙ্গে সেই কাব্যের অবস্থা, চিত্র, বর্ণনা ও এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত নিজের কবিতার অন্তর্গত করিয়া অবলীলাক্রমে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। পরের ঐশ্বর্য্যসম্ভার সঞ্চয়ন করিতে করিতে তাহাকে নিজের কবিত্বে পরিণত করিয়া তোলা অসাধারণ নিপুণতারই পরিচায়ক।' (রবিরশ্মি) এক কথায় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বর্ষা-কবিতা আদিযুগ হইতে আধুনিকপূর্ব্ব সমস্ত কবির, বাল্মীকি, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া জয়দেব, বিদ্যাপতি পর্য্যন্ত সকলের বর্ষাচিত্রের চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু এই প্রভাব যে সেই সেই কবির কাব্যপাঠের সাক্ষাৎ এবং সামান্য ফল, তাহা নহে; সে প্রভাবের মূল আরও গভীরে নিহিত।

প্রকৃতপক্ষে বর্ষার প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গিটিই সৃষ্ট হইয়াছে এই সকল কবির বর্ষা-প্রতীতি দ্বারা। মন যে ব্যাপারে নিবিষ্ট হইতে চায় পূর্ব্বে অধিগত কতকগুলি রূপরসশব্দগন্ধ-স্পর্শময় স্মৃতিখণ্ডের ভিতর দিয়াই তাহা হইয়া থাকে। মনোবিজ্ঞান-মতে সেগুলিকে বলা হয় ছায়াস্মৃতি—রূপময় রসময়, শব্দময়, গন্ধময় ও স্পর্শময় ছায়াস্মৃতি। চিন্তাশক্তি সেই ছায়াস্মৃতি বা স্মৃতিচিত্রগুলিকে বিবিধ কল্পনায় রূপায়িত করে। একই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বিবিধ স্মৃতি পৌনঃপুন্য অথবা তীব্রতা ও গভীরতার ফলে কতকটা স্থায়ী রূপ লাভ করে, তখন তাহাদিগকে বলা চলিবে কল্পপ্রতিমা। এই কল্পপ্রতিমাগুলি স্বকীয়তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার ফলে প্রতীতিতে পরিণত হয়। বিষয় উপলব্ধির মূলে আছে এই প্রতীতি। ইহাদের স্বকীয়তা, মৌলিকতা অবশ্যই থাকে, কিন্তু সেগুলি গঠিত হয় প্রচুর আহরণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দ্বারা। এই প্রতীতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যক্তি তথা জাতি বস্তু ও বিষয় সম্পর্কে নূতন দৃষ্টি লাভ করে।

আবার সামান্য মানুষের চক্ষে হয়ত একটি দৃশ্য নিতান্তই তুচ্ছ, স্বপ্নবৎ, অর্থহীন অলীক কল্পনামাত্র, কিন্তু দ্রষ্টা কবির চক্ষে তাহাই পরম মূল্যবান, অর্থপূর্ণ। তাই তো কবি বলিয়াছেন, 'মোর কিছু ধন আছে সংসারে, বাকী সব ধন স্বপনে।' লোকে ত বলে কালো, কিন্তু কবি? 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।' এই প্রসঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিও উল্লেখ করা যাইতে পারে :

> 'A primrose by a river's brim
> A yellow primrose was to him,
> And it was nothing more.'

কিন্তু কবির দৃষ্টিতে ··

> 'The meanest flower that blows can give
> Thoughts that do often lie too deep for tears.'

বর্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতীতির প্রাতমারূপগুলিকে লালন করিয়াছেন প্রাচীন কালের ভারতীয় কবিগণ। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বর্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন তখন তাঁহার চক্ষু দিয়া দেখিয়াছেন নিত্য নব বর্ষা-সমারোহকে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব, বিদ্যাপতি তাঁহাদের চির অতৃপ্ত চক্ষু দ্বারা। তাই বলিয়া কি কবির বর্ষাদর্শনের মধ্যে কোনও মৌলিকত্ব নাই? এই দৃষ্টি পুরাতন নহে, নূতন দৃষ্টি ও নূতন সৃষ্টি—দর্শনের উপায়নগুলি শুধু পুরাতন। পুরাতন উপায়নের সাহায্যে নূতন দৃষ্টিলাভে ও সৃষ্টিব্যাপারে কবির পথে বহিরাগত কোন বাধা কার্য্যকরী হয় না।

তাই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পুরাতন কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পার্থক্য। 'কালিদাস প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ

করেছেন ইন্দ্রিয়ের অনুভব দিয়ে, কালিদাসে পাই চিত্রের ও ভাস্কর্য্যের ধর্ম্ম ও রীতি, রবীন্দ্রনাথে চিত্রের ও সঙ্গীতের ধর্ম্ম ও রীতি।" (নলিনীকান্ত গুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ)

বৈদিক কাল হইতে বর্ষাঋতুর সহিত ভারতীয়দের চিত্ত গভীর ও বিচিত্রভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। মানুষের অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ ও তদুপযোগী হৃদয়াবেগ, রসানুভূতি কালক্রমে উপলক্ষ্যের সহিত একান্ত ও অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়া যায়।

বর্ষা-সমাগমে প্রাচীন ভারতে নগর জনপদ জুড়িয়া কি বিপুল আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। সেকালে বর্ষার আগমনে চারি মাস ব্যাপিয়া কত উৎসব, আনন্দ, গান, গল্প—কত দোলনা, কত ঝুলন!

রবীন্দ্রবর্ষাকাব্য একান্তভাবে ভারতীয়। কবির বর্ষা-সম্ভোগ রীতিটি সম্যক্ ফুটিয়া উঠিয়াছে 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায়। প্রবল বেগ, হর্ষ এবং ঔৎসুক্য সহকারে অকস্মাৎ বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে:

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘন-গৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর-সরসা।

সুদূর অতীত কাল হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত বর্ষা-সম্ভোগের অসংখ্য চিত্র বিচ্ছিন্নভাবে এই কবিতাটিকে দ্রুত লয়ে প্রকাশলাভের চেষ্টা করিয়া যেন একটা কোলাহল জাগাইয়া তুলিয়াছে। নববারিসিক্তা ধরণীর সুগন্ধ, শ্যাম-গম্ভীর বর্ষাদিবা, গুরুগর্জনে শিহরিত নীল অরণ্য, উতলা কলাপীর কেকারব সবকিছু মিলিয়া পাঠককে উতলা করিয়া তোলে। গৃহাভিমুখী প্রবাসী পথিক, গৃহে তাহাদের তরুণী বধূদের উৎকণ্ঠা, তড়িৎ চকিতনয়না নগর-বধূর বেশভূষা, মেঘান্ধকার পথে ঘননীলবসনা অভিসারিকা, প্রিয়সুখভাগিনী নব অনুরাগিণীদের মৃদঙ্গ-মুরলী-শব্দরবে বর্ষা সংবর্দ্ধনা, কুঞ্জকুটীর-দ্বারে ভাবাকুললোচনার প্রতীক্ষা, ভূর্জপাতায় মেঘমল্লার রাগিণীতে নব গীত রচনা, এমনি কত বিস্মৃত চিত্র কবিচিত্তে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

এই বর্ষা প্রবাসীকে গৃহে আনে, প্রিয়জনকে বাহির হইতে অন্তঃপুরে লইয়া আসে, দিবাকে রাত্রিবৎ করিয়া মিলনের উপযোগী করে। তাই কবি আধুনিকাদেরও উপদেশ দিয়াছেন, কেতকী কেশরে কেশপাশ সুরভিত করিতে, ক্ষীণ কটিতটে কবরীর মেখলা ধারণ করিতে, শয়নে কদম্বরেণু বিছাইয়া দিতে। তারপরে অঞ্জন-আঁকা নয়নে নায়িকা যখন কঙ্কণের রুণ রুণ শিঞ্জিতের তালে তালে ভবন-শিখীটিকে নাচাইবে, তখন তাহার মুখখানি স্মিত বিকশিত হইয়া উঠিবে। শূন্য শয়নে বিরহিণী পুরকামিনীকে কবি দেখিতে পান দীপ্ত-দামিনীর চমকে।

সজল সমীরে যূথীপরিমল ভাসিয়া আসে, তমালকুঞ্জ তিমিরে দাদুরী ডাকে, খণ্ডিতা মানিনীর মানের কাল এ নয়। নীপশাখায় ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনায় দুলিবার ছলে অধরে অধরে, অলকে অলকে ঘন ঘন দুর্লভ স্পর্শ লাভ করিবার এই ত প্রকৃষ্ট সময়। তাই কবি অনুরোধ করিয়াছেন, 'আজিকার নিশি ভুলো না।'

অতীতের সংখ্যাতীত অতৃপ্ত কবি রবীন্দ্রনাথের চিত্ত দিয়া আর একবার যেন বর্ষাসম্ভোগ করিয়াছেন। শেষ স্তবকে কবি বলিয়াছেন,

শতেক যুগের কবি দলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে,
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা।

এই আকাশ কবির চিত্তাকাশ। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যই বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষের সকল দেশের সকল কালের বর্ষার গানের মধ্যে যে মধুরিমা আছে, তাহারই যেন ঘনসার এই কবিতাটি।'

কিন্তু এহ বাহ্য। প্রাচীন কবিগণের এই বর্ষাসম্ভোগ—ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বর্ষা-উপভোগ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের সাহায্যে রসগ্রাহী মন বর্ষাকে সম্ভোগ করে। 'বর্ষামঙ্গলে' এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই 'অধরে অধরে' সক্রিয় হইয়াছে। সংস্কৃত কবিদের সীমা প্রায়শঃ এই পর্য্যন্তই। যখন কালিদাস 'ঋতুসংহার' কাব্যে লিখিয়াছেন:

প্রভিন্ন বৈদূর্য্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ, সমাচিতা প্রোত্থিতকন্দলীদলৈঃ।
বিভাতি শুক্লেতর-রত্নভূষিতা, বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ॥

'খণ্ডিত বৈদূর্য্যমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ তৃণাঙ্কুরসমূহ এবং নবজাতকন্দলী পত্রসমূহ ও লোহিতবর্ণ ইন্দ্রগোপকীটে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে ভূমি যেন শ্বেতাদি নানা বর্ণের মণিরত্নে বিমণ্ডিতা বরাঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতেছে।'

এবং 'বলাহকাশ্চাশনি শব্দমর্দ্দলাঃ, সুরেন্দ্র চাপং
দধতস্তড়িদ্গুণম্।
সুতীক্ষ্ণধারা পতনোগ্র সায়কৈঃ, সমাচিতা প্রোত্থিত
কন্দলীদলৈঃ॥'

'বজ্রধ্বনিরূপ বাদ্য বাদন করিয়া, সৌদামিনীরূপ ইন্দ্রধনু ধারণ করিয়া, মেঘজাল সুতীক্ষ্ণ বর্ষণধারারূপ কঠোর শরাঘাতে প্রবাসিগণের চিত্ত প্রমথিত করিয়া দিতেছে।'

অথবা মৃচ্ছকটিক নাটকে অভিসারিকা বসন্তসেনা যখন বিটকে বলিতেছেন,

'এহ্যেহীতি শিখণ্ডিনাং পটুতরং কেকাভিরাক্রন্দিতঃ।
প্রোড্ডীয়েব বলাকয়া সরভসং সোৎকণ্ঠমালিঙ্গিতঃ॥
হংসৈরুজ্ঝিত পুষ্করৈরতিতরাং সোদ্বেগমুদ্বীক্ষিতঃ।
কুর্ব্বন্নঞ্জন মেচকা ইব দিশো মেঘঃ সমুত্তিষ্ঠতি॥'

'এই আর একখানা মেঘ, ময়ূরগণের কেকারবে সুস্পষ্টভাবে 'এস, এস' বলিয়াই যেন আহূত হইয়া, বেগে উড্ডীন বকপঙ্ক্তিশ্রেণী কর্ত্তৃক উৎকণ্ঠার সহিতই যেন আলিঙ্গিত হইয়া এবং পদ্মবন-পরিত্যাগী হংসসমূহ কর্ত্তৃক উদ্বেগের সহিত দৃষ্ট হইয়া, দিকসকলকে কজ্জল দ্বারাই যেন শ্যামবর্ণ করতঃ আকাশে উঠিতেছে।'

উত্তরে বিট বসন্তসেনাকে বলিতেছেন,

নিষ্পন্দীকৃত-পদ্ম-ষণ্ড-নয়নং নষ্টক্ষপাবাসরম্
বিদ্যুদ্ভিঃ ক্ষণ-নষ্ট-দৃষ্ট তিমিরং প্রচ্ছাদিতাশামুখম্।
নিশ্চেষ্টং স্বপিতীব সম্প্রতি পয়োধারা-গৃহান্তর্গতম্
স্ফীতাম্ভোধর-ধাম-নৈক-জলদ-ছত্রাপিধানং জগৎ॥

'পদ্মবনরূপ নয়ন নিস্পন্দ হইয়াছে। দিন বা রাত্রির কিছু ঠিক নাই; বিদ্যুতের জন্য ক্ষণকাল অন্ধকার দূরীভূত হইতেছে, আবার দেখা যাইতেছে এবং সমস্ত দিঙ্‌মুখ আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় জলধারাগৃহের অন্তর্গত জগন্মণ্ডল, মেঘের বাটিতে (আকাশে) বহুতর মেঘরূপ ছত্রে আবৃত হইয়া, নিশ্চেষ্ট অবস্থায় এখন যেন নিদ্রা যাইতেছে।'—তখন বর্ষা ইন্দ্রিয়ভোগ্যরূপেই থাকিয়া যায়, সে ভোগ যত মধুরই হউক না কেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তরেই রাখেন নাই, তাহাকে প্রায়শঃই এক অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যে লইয়া গিয়াছেন। এইটি তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। 'বর্ষার দিনে' কবিতায় তিনি বলিয়াছেন:

যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়।

কি সে কথা? এবং কাহাকেই বা বলা যায়? তাহার কোনও স্পষ্ট উত্তর মিলে না। বস্তুতঃ সেই অকথিত বাণী এবং সেই অনামিকা নায়িকা ইন্দ্রিয়রাজ্যের নহে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় লোকের। 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতাতেও কবি 'জীবন-মরণময় সুগভীর কথা' শুনাইতে ব্যাকুল হইয়াছেন। মরণ-পরিব্যাপ্ত যে কথা, তাহা কি ইন্দ্রিয়লোকের? 'একাল ও সেকাল' নামক কবিতায় কবি অনুভব করিতেছেন দূর বৃন্দাবনের অভিসারিকা রাধিকার সময় হইতে 'আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।' এই চিরন্তনীর দার্শনিক উপলব্ধি (অনুমান নহে) কি কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলা যায়? বর্ষাকে এই চিরন্তনীর পটভূমিকায় সম্ভোগ ঠিক ইন্দ্রিয়সম্ভোগ বলা যায় না।

'নববর্ষা' কবিতায় কবি বলিতেছেন,

'শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে।'

এই অংশ এবং সমস্ত কবিতাটির মধ্যেই একটি অতীন্দ্রিয় অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়। আবার রূপের মধ্যে কবি বার বার রূপাতীতকে দেখিতেছেন:

'ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে, কবরী এলায়ে।'
'ওগো নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে বসে অমল বসনে, শ্যামল বসনে।'

বকুল-শাখায় সেই রূপাতীত দোলায় দুলে, 'বিকচ-কেতকী তটভূমি' 'পরে তরণী বাঁধিয়া রাশি রাশি শৈবাল তুলিয়া অঞ্চল ভরিয়া লয় এবং সজল নয়নে বাদল রাগিণী গায়। সমস্ত খণ্ডরূপকে বিধৃত করিয়া ইনি কি মূর্ত্ত-প্রতিমা বর্ষা? একেবারে চিন্ময় সত্তায় কবিকে দর্শন দিয়াছেন—ব্যক্তিত্বময়ী, অন্তরঙ্গরূপিণী প্রিয়-সুখভাগিনী।

গীতাঞ্জলির গানগুলিতে আবার দেখি বর্ষাকে কবি তুলিয়াছেন এক অতি উচ্চ দুনিরীক্ষ অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ক্ষেত্রে। ঝড়ের রাত তাঁহাকে 'পরাণ-সখা'র অভিসারে প্রতীক্ষা করায়। বাহিরে যতই তিনি দেখিতে পান না ততই তাঁহার পথ কোথায় তাহা ভাবিয়া আকুল হন। 'শ্রাবণ-ঘন-গহন মোহে' সবার দৃষ্টি এড়াইয়া কোন্ এক 'একা সখা, প্রিয়তম' কবির দ্বারদেশে উপস্থিত হন, কবি ব্যাকুল অনুরোধ জানান, 'সমুখ দিয়ে স্বপন সম, যেয়োনা মোরে হেলায় ঠেলে।'

কবির সমগ্র বর্ষা-কাব্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বর্ষা সম্পর্কে কবির একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তাহা প্রাচীন কবিদের দ্বারা লালিত; কবি বর্ষাকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য ভূমিতে উপভোগ করিয়াছেন, অতীন্দ্রিয় ভূমিতেও সম্ভোগ করিয়াছেন; বর্ষার দৃশ্য কবির অন্তরে শতবরণের ভাব-উচ্ছ্বাস জাগাইয়াছে, আবার কবিও নিজের মনের মাধুরী দিয়া বর্ষাকে নূতন রূপে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন:

'নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে,
নয়নে লেগেছে।'

আবার—'নবতৃণদলে ঘন বন ছায়ে, হরষ আমার
দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি, বিকশিত
প্রাণ জেগেছে।'

কবি বর্ষার রূপ দেখিয়াছেন, রূপাতীতকেও দেখিয়াছেন; কৌতূহল, হর্ষ, ভয় প্রেম, বিস্ময়ের সঙ্গে কবির মনে বর্ষা বাৎসল্য, সখ্যও জাগাইয়াছে। বর্ষার দৃশ্যের ভিতর দিয়া কবি বর্ত্তমানকে দেখিয়াছেন আবার অতীত এবং ভবিষ্যৎকেও দেখিয়াছেন; খণ্ড এবং অখণ্ড উভয়কেই দেখিয়াছেন—জগৎ ও জীবনকে যেমন তেমন জগৎ ও জীবনের অতীত সত্তাকেও দেখিয়াছেন। বর্ষাকে কবি নবাগত অপরিচিত রূপেও দেখিয়াছেন, আবার একান্ত অন্তরঙ্গ পরাণ-সখারূপেও পাইয়াছেন—কবির চিত্তে বর্ষার প্রভাব অপরিসীম।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

বর্ত্তমান বাংলা ও বিহারের সীমারেখা-নির্দ্দেশক অঞ্চলে এবং ভাগলপুরের (প্রাচীন চম্পা) নিকটবর্ত্তী স্থানে বিক্রমশীলা মহাবিহার অবস্থিত ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। তিব্বতী বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, গঙ্গাতীরে একটি তুঙ্গ শৈলের উপরে 'দেব-বিহার বিক্রমশীলা' অবস্থিত ছিল।[১] ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী রাজমহল গিরিশ্রেণীর কলগঙ্গ শাখার অন্তর্ভুক্ত পাথরঘাটা শৈলটি গঙ্গার দক্ষিণ-তীরে অবস্থিত। তিব্বতী বর্ণনায় বিক্রমশীল মহাবিহারের পরিচালনাধীন ছয়টি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, বিভিন্ন ছাত্রাবাস, ছাত্র, শিক্ষক ও বিশিষ্ট অতিথিদের সম্মিলনোপযোগী প্রশস্ত হল-ঘর ও বিভিন্ন মন্দির প্রভৃতির উল্লেখ রহিয়াছে। নন্দলাল দে[২] রাজমহল অঞ্চলে পাথরঘাটার তুঙ্গ-শৈলে বিক্রমশীলা মহাবিহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়া নূতন আলোক-সম্পাত না হওয়া পর্য্যন্ত বিক্রমশীলার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন।

বিক্রমশীলা মহাবিহারের বর্ণনায় তিব্বতী তথ্যাদির উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে। এই যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা তিব্বতে প্রবাহিত হইয়াছিল, বিক্রমশীলার পণ্ডিতদের প্রযত্নে। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথ বলিয়াছেন যে, বিক্রমশীলের অধ্যাপকগণ নালন্দা-পদ্ধতির উপরে লক্ষ্য রাখিতেন। বিক্রমশীলা এই সময়ে নালন্দার স্থান অধিকার করিয়াছিল। তিব্বতী পণ্ডিতগণ বাঙলা ও বিহারের পণ্ডিতদের সাহায্যে বিভিন্ন বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, অনূদিত গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা তিব্বতী লামা বু-তোন্ কর্ত্তৃক ত্রয়োদশ শতকে সঙ্কলিত হইয়াছিল। তালিকা গ্রন্থটির নাম 'তেঙ্গুর'। তারনাথের বিবরণী এবং সুম্পা রচিত পাগ্ সাম-জোন্ জান গ্রন্থখানি বিক্রমশীলার ইতিহাসে প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের বর্ণনায় জানিতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতেই রাজমহল অঞ্চলে বৌদ্ধ-শ্রমণদের প্রযত্নে সঙ্ঘারাম ও বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কজঙ্গল প্রদেশের ছয়-সাতটি বিহারে তিন শতের অধিক ভিক্ষু বাস করিতেন। কানিংহাম কজঙ্গলকে রাজমহল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৩] সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে ইৎসিঙের সমসাময়িক অপর একজন চৈনিক পরিব্রাজক সেংচির বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে, সমতটের খড়্গবংশীয় রাজা রাজভট বৌদ্ধ ছিলেন এবং বাংলায় এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেব সঙ্ঘ-শিক্ষার উন্নতিকল্পে নূতন বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন ওদন্তপুরীতে, নালন্দা হইতে আট মাইল উত্তরে। তারনাথের মতে গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেব সঙ্ঘ-শিক্ষার প্রসারকল্পে পঞ্চাশটি বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ধর্ম্মপালদেবই রাজমহল অঞ্চলের বৌদ্ধ বিহারগুলির আরও উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন এবং উচ্চ-শিক্ষার জন্য এই অঞ্চলে বিক্রমশীলা মহাবিহার স্থাপন করেন।

ঐতিহাসিক তারনাথ বিক্রমশীলা মহাবিহারকে মহারাজ ধর্ম্মপালের কীর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বিহারটি তিব্বতী বর্ণনায় 'দেব-বিহার' আখ্যা লাভ করিয়াছিল। কবি অভিনন্দের 'রামচরিত' নামক গ্রন্থানুসারে মহারাজ ধর্ম্মপালের দ্বিতীয় নাম 'বিক্রমশীলদেব'। পালবংশীয় অন্যতম নরপতি দ্বিতীয়

১ *Hindusthan Review*, March, 1906—S. C. Das, p. 190.
২ *The Glories of Magadha*—J. N. Somaddar, p. 158.
৩ *On Yuan Chwang's Travels in India*— Watters Vol. II, p. 183.

গোপালদেবের (আঃ ৯৪০ ৬০ খ্রীঃ অঃ) সময়ে লিখিত একখানি 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতাঃ' পুষ্পিকায় বিহারটিকে 'শ্রীমদ্বিক্রমশীলদেব-বিহার' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'তেঙ্গুর'-তালিকার 'রত্নকরণ্ডোদ্ঘাট' নামক অতীশ দীপঙ্করের একখানি গ্রন্থের পুষ্পিকায় বিক্রমশীলা বিহার মহারাজ দেবপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।[৪] ধর্মপালের বংশধরগণের চেষ্টায় মহাবিহারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইয়াছিল। পালরাজাদের দানে ত্রৈকূটক, সোমপুরী, বিক্রমপুরী, জগদ্দল প্রভৃতি বিহার প্রতিষ্ঠিত হইলেও মহারাজ রামপালের আমল পর্য্যন্ত বিক্রমশীলা মহাবিহার রাজানুগ্রহ লাভে কোন সময়েই বঞ্চিত হয় নাই।

বিক্রমশীলা মহাবিহারের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সমসাময়িক বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে হইবে। সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্য্যায়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক শিক্ষা নালন্দা-পদ্ধতিতে প্রবেশ করিয়াছিল, বিক্রমশীলা-পদ্ধতিতে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করিবার মত।

বৌদ্ধধর্ম্মকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মপ্রচারকগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন তাহারই ফলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম সম্ভব হইয়াছিল। তান্ত্রিকতা মূল বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত, এমন কি মহাযান মতবাদের সহিতও কোন মৌলিক সম্পর্কের দাবি করিতে পারে না।

পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে জন্মলাভ করিয়া চুরাশি জন সিদ্ধপুরুষের সাহায্যে উত্তর ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল।[৫] তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মতবাদই গ্রহণযোগ্য হউক না কেন, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রথমতঃ নালন্দায় এবং পরে বিক্রমশীলায় এই মতবাদের উত্তরোত্তর প্রাধান্যলাভ সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ নাই। বহু-প্রকার গুহ্যমন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী—মহাযান ধ্যান-ধারণায় প্রবেশ-লাভ করিল। মন্ত্রগুণে অলৌকিক কার্য্যাবলী সম্পাদিত হওয়ায় তান্ত্রিক মতবাদ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। মন্ত্র-তন্ত্রের সাধনাই বুদ্ধত্বলাভের সহজ উপায় বলিয়া এক শ্রেণীর বৌদ্ধাচার্য্যগণ প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক মতবাদসমূহ মন্ত্র-মাহাত্ম্যকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ করিল। মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল প্রভৃতি তান্ত্রিক পদ্ধতি বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্যান-ধারণায় স্থান পাইল। বিভিন্ন যানসমূহ গুহ্য সাধন-পদ্ধতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, অতএব গুরুর নিকট হইতে দীক্ষালাভ ব্যতীত এই সাধনা চলিতে পারে না। মন্ত্রের ধ্বনিতে বিভিন্ন দেব-দেবী রূপ পরিগ্রহ করিয়া মণ্ডলাকারে অবস্থান করেন। তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া, বিশেষ ভাবে বজ্রযান সাধনার এক বিরাট পূজাপদ্ধতি গড়িয়া উঠিল। বজ্রযানকে
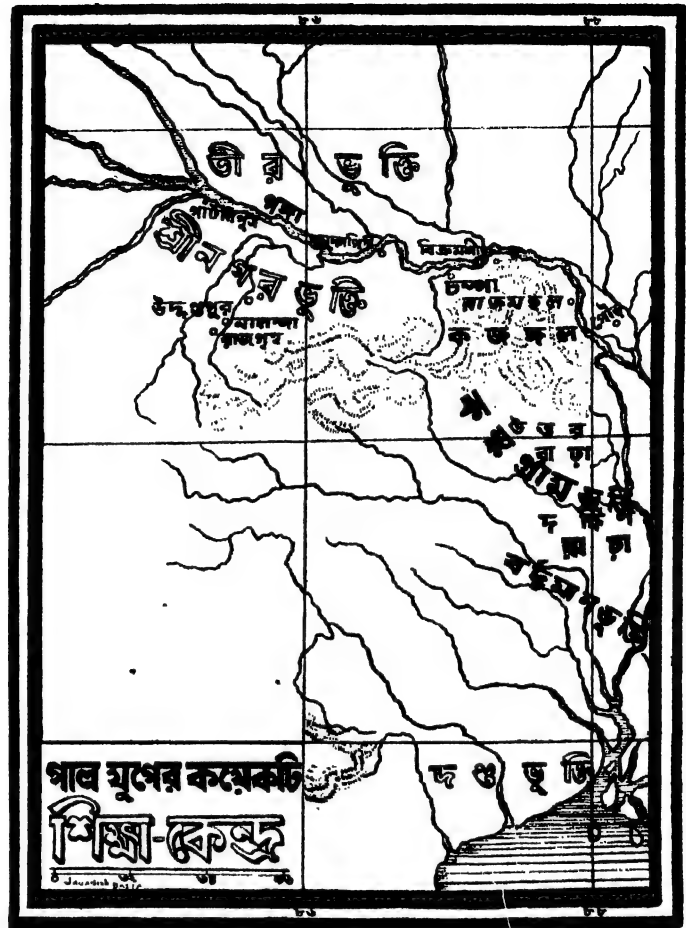
---

৪ বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৭২

৫ *History of Bengal*, Dacca University, Vol. I, Footnote—1. P. 3:7.

আশ্রয় করিয়া কালচক্রযানের সৃষ্টি। মহাসুখ বা বোধি-চিত্তত্ব-লাভের প্রধান অন্তরায় 'কাল', অতএব 'কাল' বা বার্দ্ধক্যকে গ্রাস করিয়া মহাসুখকে চিরস্থায়ী করা কাল-চক্রযানীয় সাধনার উদ্দেশ্য। ক্রমে 'মহাসুখবাদ' তত্ত্ব বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার প্রধান অঙ্গ হইল এবং মহাসুখবাদকে আশ্রয় করিয়া সহজযানের সৃষ্টি হইল। সহজযানে দেব-দেবীর পূজা অনুষ্ঠান এবং মন্ত্র, মুদ্রার কোন স্বীকৃতি ছিল না। শূন্যতা বা প্রকৃতি এবং করুণা বা পুরুষ, এই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের ফলেই বোধিচিত্ত পরমানন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হয়; ক্রমে 'দেহবাদ বা কায়াসাধন' ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে স্থানলাভ করিল।

বিক্রমশীলা মহাবিহারের পণ্ডিতগণের মধ্যে রত্নাকর শান্তি, নাড়োপা, অতীশ দীপঙ্কর, দিবাকরচন্দ্র, অভয়াকর গুপ্ত প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা তেঙ্গুরে রক্ষিত আছে। তান্ত্রিক মতবাদের অভিনবত্ব বিক্রমশীলার পণ্ডিতগণের ধ্যান ধারণাকে আবিষ্ট করিলেও, বিশুদ্ধ মহা-যান মতবাদ এবং বিজ্ঞানবাদের চর্চাও এই সময়ে অব্যাহত ছিল। বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের উপরে জেতারির গ্রন্থসমূহ, আচার্য্য বুদ্ধ শ্রীজ্ঞানের মহাযানীয় পুস্তকাবলী এবং নৈয়ায়িক রত্নকীর্ত্তির গ্রন্থরাজি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অতীশ দীপঙ্কর এবং তাঁহার পরবর্ত্তী যুগে অভয়াকর গুপ্ত মহাযান মতের উপরে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বিক্রমশীলার প্রথম ও মধ্য যুগে মহাবিহারের অধ্যাপক-গণ উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বাদির আলোচনাতেই নিমগ্ন থাকিতেন। মহাবিহারের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনমত তাঁহারা কঠোর হইতেন। ক্রমে সহজিয়া ধর্ম ও তান্ত্রিক সাধনা একাকার হইয়া ধর্মজগতে বীভৎসতা সৃষ্টি করিল। দেহ-বাদই হইল ধর্ম, এমন কি হিন্দু-তন্ত্রের শক্তি বা কালী-মাতার সহিত বুদ্ধের এক রহস্যময় সম্বন্ধও বৌদ্ধ তান্ত্রিক-গণ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। বৌদ্ধসঙ্ঘসমূহ অনাচার ও আবিলতায় পূর্ণ হইয়া দুরবস্থাপ্রাপ্ত হইল।

বিক্রমশীলা ছিল একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। মূল বিহারকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এক শত সাতটি ক্ষুদ্র মন্দির, ছয়টি বিদ্যালয়, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট উন্নত প্রণালীর গবেষণাগার, ছয়টি অবৈতনিক ছাত্রাবাস, বিদেশীয় ছাত্রদের জন্য পৃথক ছাত্রাবাস, বিরাট সম্মিলন-গৃহ—এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিল। এক শত চৌদ্দ জন অধ্যাপক বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ দান করিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালনায় আর্থিক ব্যবস্থা পালবংশীয় রাজগণই করিতেন। ভিক্ষু-সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ধনী-সম্প্রদায়ও 'বিহারে' আর্থিক সাহায্য দান করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিতেন।

মহাবিহারের প্রধান পরিচালক বা কর্ম্মসচিবকে বলা হইত সর্ব্বাধ্যক্ষ। ছয় জন সভ্য দ্বারা গঠিত একটি কর্ম্ম-পরিষদ কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনা হইত। সর্ব্বাধ্যক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কর্ম্মপরিষদ কোন সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। সর্ব্বাধ্যক্ষ ও কর্ম্ম-পরিষদ মহাবিহার এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় দেশের রাজার সহিত সর্ব্বদাই যোগরক্ষা করিতেন।

তিব্বতরাজ চানচুব্ অতীশ দীপঙ্করকে তিব্বতে আম-ন্ত্রণের জন্য নাগ্ছো নামক এক তিব্বতী ভিক্ষুকে বিক্রম-শীলায় পাঠাইয়াছিলেন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমাবর্ত্তন উৎসবের ন্যায় বিক্রমশীলায় অনুষ্ঠিত একটি বিরাট সম্মিলনে নাগ্ছো যোগদান করেন। স্থবিরের পরিচালনায় আট হাজার অধ্যাপক ও ছাত্র এই সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। স্থবিরশ্রেষ্ঠ 'বিদ্যাকোকিল' এই সম্মিলনে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর বীরবজ্র, অতীশ-দীপঙ্কর, বিক্রমশীলার মহারাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সম্মিলনে যোগদান করেন। নাগছো-বর্ণিত এই বিরাট সম্মিলনে বিক্রমশীলার মহারাজ অপেক্ষাও অধিকতর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন পণ্ডিতপ্রবর বীরবজ্র ও অতীশ দীপঙ্কর প্রমুখ পণ্ডিতবৃন্দ। অতীশ দীপঙ্কর বিহারের ছাত্রাবাস ও বিভাগীয় কার্য্য পরিচালনার দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নাগ্ছোর বর্ণনায় আরও জানা যায় যে, তিনি সন্ধ্যার পরে বিক্রমশীলায় পৌছিয়াছিলেন এবং বিহারের বহির্ভাগে ধর্ম্মশালায় এক রাত্রি যাপন করেন—কেননা সন্ধ্যা হইলেই বিহারের প্রধান প্রবেশদ্বার বন্ধ হইত।

তক্ষশীলা ও নালন্দার ন্যায় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিঙের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হইত না। নালন্দার ন্যায় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রদের প্রবেশাধিকার সহজ ছিল না। ছয় জন দ্বারপণ্ডিত ছাত্রদিগকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া তাহাদের উত্তরে সন্তুষ্ট হইলে বিশ্ববিদ্যা-লয়ে প্রবেশের অনুমতি দিতেন।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী নালন্দার ন্যায় ব্যাপক ছিল না। বৌদ্ধ হীনযান ও মহাযান ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ্যসূচীতে স্থানলাভ করিলেও, তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যয়ন এই সময়ে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শব্দবিদ্যা বা ব্যাকরণ এবং হেতুবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র পাঠ্যতালিকায় বিশিষ্ট স্থান

লাভ করিয়াছিল। বাস্তুবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত ছিল। গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই 'শিল্পস্থানবিদ্যা' বৌদ্ধসঙ্ঘের শিক্ষায় বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন পালি পুস্তকে 'অষ্টাদশটি শিল্পবিদ্যা'র উল্লেখ রহিয়াছে। 'মিলিন্দ-পহ্নো' পুস্তকে উনবিংশটি শিল্পবিদ্যার মধ্যে স্থাপত্য প্রধান শিল্প হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং বিহার ও অট্টালিকা নির্ম্মাণাদি কার্য্য ভিক্ষুর অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত আছে।৬ 'শিল্পবিদ্যা' বিক্রমশীলা-পদ্ধতিতেও স্থানলাভ করিয়াছিল।

তিব্বতী বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে, মহাবিহারের প্রধান তোরণের দক্ষিণ পার্শ্বে নাগার্জ্জুন এবং বামে অতীশের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ ছিল।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে সমষ্টি-গত ও ব্যক্তিগত উভয় পদ্ধতিই বিদ্যমান ছিল। তান্ত্রিক শিক্ষা প্রচলনের ফলে ব্যক্তিগত শিক্ষার চর্চা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তান্ত্রিক সাধনা গুরুর নিকট হইতে দীক্ষালাভ ব্যতীত চলিতে পারে না, বিভিন্ন প্রক্রিয়াদি গুরুর নিকটে সর্ব্বদাই শিক্ষা-সাপেক্ষ বলিয়া গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক আরও গভীরতর হইয়াছিল। শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনায় অধ্যাপক ও ছাত্রগণ তুল্য অংশ গ্রহণ করিতেন। শ্রেণী-কক্ষে আলোচনা ও বিতর্কাদি চলিত। শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল মনোবৃত্তি-বিকাশ ও চরিত্রগঠনের প্রধান সহায়ক। শিক্ষক, ছাত্র ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মেলন উপলক্ষে শিক্ষা-সমস্যাদির আলোচনা চলিত। ছাত্রদের পরীক্ষা-পদ্ধতি ছিল মৌখিক। শিক্ষাসমাপ্তির পরে যোগ্য ছাত্রগণ রাজার নিকট হইতে উপাধি লাভ করিতেন। বিক্রমশীলার জেতারি (প্রথমে ছাত্র, পরে অধ্যাপক) রাজা প্রথম মহীপাল কর্ত্তৃক 'পণ্ডিত' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। কাশ্মীরনিবাসী রত্নবজ্র 'পণ্ডিত' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক রত্নকীর্ত্তি ও উড়িষ্যার তথাগত রক্ষিত 'মহাপণ্ডিত' ও 'উপাধ্যায়' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাগ্‌ছোর বর্ণনায় স্থবিরশ্রেষ্ঠ 'বিদ্যা-কোকিলে'র উল্লেখে 'বিদ্যাকোকিল' পাণ্ডিত্যসূচক কোন সম্মানজনক উপাধি বলিয়াই মনে হয়।

নবম ও দশম শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিবাহী হইয়া ভারত ও ভারতের বাহিরে যাঁহারা অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিক্রমশীলার প্রথিতযশা কয়েক জন অধ্যাপকের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।

তিব্বতী জনশ্রুতি মতে মহারাজ ধর্ম্মপালের সময়ে আচার্য্য বুদ্ধশ্রীজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞানপদ বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। মহাযান মতের উপরে তিনি নাকি কয়েকখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়ে জিনমিত্র নামক আর একজন আচার্য্যের নামও তিব্বতী বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ, প্রথম মহী-পালের সময়ে বরেন্দ্রের জেতারি বিক্রমশীলার অন্যতম আচার্য্য ছিলেন। তিনি অতীশ দীপঙ্করের শিক্ষক এবং মহাবিহারের উত্তর দিকের দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। তারনাথের মতে 'তন্ত্র' ও 'সূত্রে'র উপরে তিনি শতাধিক পুস্তক রচনা করেন। দশম শতকের শেষাদ্ধে, সম্ভবতঃ মহারাজ প্রথম মহীপালের সময়ে রত্নাকরশান্তি, ভগীশ্বর-কীর্ত্তি, নাড়োপা, প্রজ্ঞাকরমতি, রত্নবজ্র, জ্ঞানশ্রী মিত্র নামে ভারত-বিখ্যাত ছয় জন বিদ্বান মহাবিহারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। তারনাথের মতে রত্নাকরশান্তি ছিলেন মগধের অধিবাসী। 'তেঙ্গুর' ঐতিহ্য অনুসারে তিনি অতীশের শিক্ষক এবং অতীশের তিব্বতযাত্রার সময়ে মহাবিহারের সর্ব্বাধ্যক্ষ। আচার্য্য ভগীশ্বরকীর্ত্তি এবং রত্নবজ্রের তান্ত্রিক-মতবাদসমূহ অতীশ তিব্বতে প্রচার করিয়াছিলেন। মহাবিহারের অন্যতম প্রসিদ্ধ দ্বারপণ্ডিত নাড়োপা 'মহা-চার্য্য', 'মহাযোগী' ও 'শ্রীমহামুদ্রাচার্য্য' নামে অভিহিত হইয়াছেন। নাড়োপা ছিলেন বরেন্দ্রের অধিবাসী এবং মহারাজ নয়পালের সমসাময়িক। তিব্বতী ঐতিহ্য অনুযায়ী চুরাশী জন সিদ্ধপুরুষের মধ্যে তিনি অন্যতম। আচার্য্য জেতারির পরে তিনি মহাবিহারের উত্তর দিকের দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ আগমে ছিল তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য। হেরুক, হেবজ্র এবং অন্যান্য বজ্রযানীয় দেব-দেবীর উপরে প্রায় দশখানি সাধন-গ্রন্থ, কালচক্রযানী দীক্ষা সম্বন্ধে (অন্ততঃ) একখানি গ্রন্থ, দুই-খানি 'বজ্রগীতি' ও 'বজ্রপদ সার-সংগ্রহ' গ্রন্থের উপরে একটি টীকা তিনি রচনা করিয়াছেন।৭ শরৎ চন্দ্র দাস মহাশয়ের বিবরণ পাঠে জানা যায়, জ্ঞানশ্রী মিত্র (গৌড়ের) এবং রত্নবজ্র ধর্ম্মতত্ত্বে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং মহা-বিহারের দুইটি প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন।

অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন বিক্রমশীলার 'শীলভদ্র'। বিক্রম-শীলা এই মহাপণ্ডিতকে আচার্য্যপদে বরণ করিয়া তাঁহার প্রতিভার যোগ্য সম্মান দিয়াছিল। বৌদ্ধজগৎ তাঁহার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল এবং তিব্বত তাঁহার উপস্থিতিতে ধন্য হইয়াছিল। দীপঙ্কর প্রথম মহীপাল কর্ত্তৃক বিক্রমশীলায় আহূত হন এবং মহারাজ নয়পালের

৬ *Ancient Education*—R. K. Mookherjee. Pp. 475-76.

৭ বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব্ব)—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৭২২

সময়ে মহাবিহারের আচার্য্য-পদ গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ১০৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে কিংবা ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতী আচার্য্য বিনয়ধর, তিব্বতী পণ্ডিত গ্যা ট্সন, বিক্রমশীলার পণ্ডিত বীর্য্যচন্দ্র, ভূমিগর্ভ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে তিব্বত যাত্রা করেন। জীবনের অবশিষ্টকাল (আঃ ১০৫৩ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত) তিনি তিব্বতে ধর্ম্মপ্রচারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পাগ-সাম-জোন্-জাং গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা ও সোমপুরী এই তিনটি বিহারের সহিতই অতীশের সম্পর্ক ছিল। 'তেঙ্গুর' ঐতিহ্য মতে তিনি বজ্রযানীয় সাধন ও মহাযানীয় সূত্রের উপরে মৌলিক রচনা ও অনুবাদে প্রায় দুই শত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

'অতীশ না থাকিলে ভারতবর্ষ অন্ধকার'—মহাবিহারের সর্ব্বাধ্যক্ষ রত্নাকরশান্তির এই উক্তির নিরিখে বিক্রমশীলার শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস আলোচনা করা যাইতে পারে। 'কিম্‌হুখ' নামক তান্ত্রিকসম্প্রদায় অতীশের সময় হইতেই মহাবিহারের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষায় বিঘ্ন ঘটাইতেছিল ৮

৮ *The Glories of Magadha* - J. N. Somadder, p. 152

সুম্‌পার মতে দিবাকরচন্দ্র নামক এক তান্ত্রিক শ্রমণকে অতীশ মহাবিহার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। দিবাকরচন্দ্র হয়ত 'কিম্‌হুখ' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সময় হইতেই চরমপন্থী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য মহাবিহারে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল।

অতীশ-পরবর্ত্তী যুগে মহাবিহারের অধ্যাপকদের মধ্যে রত্নকীর্ত্তি, অভয়াকর গুপ্ত ও শাক্যশ্রীভদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী অভয়াকর গুপ্ত মহারাজ রামপালের সমসাময়িক ছিলেন।

কালচক্রযান মতবাদ সম্পর্কে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিক্রমশীলা ধ্বংসের সময়ে কাশ্মীরবাসী পণ্ডিত শাক্যশ্রীভদ্রের বিহারে অবস্থানের উল্লেখ কোন কোন ঐতিহাসিক করিয়াছেন।

তবকাৎ-ই-নাসিরীর গ্রন্থকার মীনহাজুদ্দিনের বিবরণ পাঠে মনে হয় যে, ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিয়ার ওদন্তপুর বিহার ধ্বংস করিলেন এবং সম্ভবতঃ ঐ একই বৎসরে বিক্রমশীলা মহাবিহারও মুসলমান-আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, মহাবিহারে সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাজিও ভস্মীভূত করা হয়।

জীবন-বেদ

শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্ত্তী

সূর্য্যের মৃত্যুর সাথে পৃথিবীরও মৃত্যু হবে জানি।
সব রূপ রঙ রস উবে যাবে কর্পূরের মত,
থেমে যাবে চিরতরে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সব হাসি গানই,
অবশেষে প্রাণহীন হিমস্তূপে হবে পরিণত।

মানুষের এত কীর্ত্তি : জয়-পরাজয়, গর্ব্ব-গ্লানি,
হিংসা-প্রেম, দ্বেষ-প্রীতি, শান্তি বা অশান্তি অবিরত,
স্বার্থহীন মহত্ত্বের পাশে হীন ঘৃণ্য হানাহানি,
কিছুই রবে না আর—তারি সাথে সব হবে গত।

কেন তবে মিথ্যা এই আমরণ জীবন-সংগ্রাম?
কেন মাতি আকাঙ্ক্ষায় জীবনেরে জয় করিবার?
দিন যায়—রাত্রি যায়—ক্ষতি কি এ ভাবে চলে যেতে?

কিন্তু সে যে মরণেরি রূপান্তর। ক্লীবের বিশ্রাম
নয় তাই মোর লাগে। আমি চাই অনন্ত প্রসার
হৃদয়ের—চাই আমি জীবনেরে দুই হাতে পেতে।

ঝাড়খণ্ডের ঝর্ণাধারা

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের উৎস আমার ভ্রমণ-বিলাসী চেতনায় অনুরণন তুলেছিল। অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিলাম অজানা পথে বেরিয়ে পড়বার এক দুর্নিবার আকর্ষণ। এক দিন তুফান এক্সপ্রেসে হাজারীবাগ অভিমুখে রওনা হয়ে পড়লাম। আগে থেকে আশ্রয়ের কোনও ব্যবস্থা আমাদের করা হয়ে ওঠে নি। এ বিষয় আমরা নির্লিপ্ত ছিলাম হয় তো এই জন্যেই যে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-নিকেতনই আমাদের নিরন্তর হাতছানি দিয়ে ডাকছিল—আশা আর ভরসা দিচ্ছিল। সন্ধ্যা সাতটায় হাজারীবাগ ষ্টেশনে নেমে মোটরবাসে ৪২ মাইল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করে হাজারীবাগ শহর অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রি—চাঁদ উঠেছিল আকাশে। দুই ধারে কোথাও পর্ব্বত আবার কোথাও বা অরণ্য—মাঝে মাঝে ধূ ধূ করছে মাঠ। শাল মহুয়া বনের শ্যাম শোভায় সবুজ মসৃণ পথে যাত্রা আমার ভারি ভাল লেগেছিল। রাত্রি সাড়ে নয়টা বেজেছে, আরও এক মাইল দূরে রয়েছে শহর—জনমানবের চিহ্ন কোথাও নেই, কেবল প্রকৃতির

রাজরোপ্পা ফল্‌স

টাইগার ফল্‌স

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ অনুপম সৌন্দর্য্যে ঝলমল করছে। অবশেষে মোটর-বাস আমাদের একটা "ডাকবাংলো"র নিকটে নামিয়ে দিলে।

শহর রাস্তায় খানিকটা দূরে বাউণ্ডের আড়ালে ডাকবাংলো, সেখানে ঠাঁই পাবার আশা ছিল না। সিট্‌ নাকি রিজার্ভ হয়ে গিয়েছে সেখানকার খানসামা আমাদের জানাল। যাই হোক্‌, অনেক কষ্টে কয়েক জন শিক্ষক ও অধ্যাপক ভ্রমণকারীর চেষ্টায় ডাকবাংলোয় আমরা একখানা ঘর পেলাম।

হাজারীবাগ টাউনটি জি. টি. রোডের প্রান্তে অবস্থিত, এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য খুব বিস্তৃত—ব্যবসায়ীদেরই নিরন্তর আনাগোনা, কলরব কোলাহল। আশেপাশে অভ্র এবং কয়লার খনি আছে। স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবেই হাজারী-বাগের আসল পরিচয়। মিশনরীরা এই স্থানের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিল। খ্রীষ্টানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রুচিবোধ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিশনরীদের কলেজ ও স্কুলগুলি আধুনিক রুচিসম্মত। এখানকার অধিকাংশ সাঁওতাল খ্রীষ্টান। হাজারীবাগ মিলিটারীদের একটি প্রধান আস্তানা, এখানে পুলিশ ট্রেনিং কলেজও আছে।

টাউনের বাইরে গেলে হাজারীবাগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হতে হয়। সেখানে উঁচুনীচু পার্ব্বত্য প্রান্তর, কখনও মসৃণ, কখনও দুই ধারে শাল মহুয়া আর বাঁশ-বনের সবুজ সমারোহ। ক্যানারি, সীতাগড়, বিন্ধ্যাচল, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি পাহাড় যেন হাজারীবাগ শহরটিকে চারিদিকে ঘিরে রেখেছে। দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছু না থাকলেও এর অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য মনকে

স্পর্শ করে। প্রত্যেক পাহাড়ই পাঁচ-সাত মাইল দূরে অবস্থিত, সাইকেল-রিক্সাতে যেতে হয়। আসা-যাওয়ার রিক্সাভাড়া দুই-তিন টাকা। সীতাগড় খ্রীষ্টধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র। এখানে বিস্তৃত জমিতে কৃষি সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষণ হয়ে থাকে।

হুড্রু ফল্‌স

শহরের নানা দৃশ্য দেখে আমরা এখানকার প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের উৎস ঝর্ণার কলতান শুনতে, তার উচ্ছলিত প্রাণ-প্রবাহ সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করতে আঠারো মাইল দূরবর্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলের উদ্দেশে রওনা হলাম। গয়া অভিমুখী বাস আমাদের জি. টি. রোডের বনবিবিক্ত নির্জ্জন স্থানে নামিয়ে দিলে, ড্রাইভার বলে দিলে "কোয়ার্টার মাইল ঐ বাঁদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে যান, টাইগার ফল্‌স পাবেন।" দুই ধারে গভীর অরণ্যানী ঘন ফুলপাতার সমাচ্ছন্ন। বাতাসে অনুরণিত হয়ে ভেসে আসছে ঝর্ণার মৃদু কলগান—আমরা ঐ বনান্ত-রালের সঙ্গীতধারাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। দূরে মেঘে ঢাকা পাহাড় আর নিবিড় জঙ্গল ছাড়া কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। বন্য পশুর পায়ের চিহ্ন মাঝে মাঝে দেখতে পেলাম, কোথাও জনমানবের সাড়া নেই।

মহুয়ার বুকের মধ্যে ভয়ের কাঁপন জেগেছে, ও আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, "মা, তোমার ভয় করে না—"

ইতিমধ্যে আমরা টাইগার ঝর্ণার নিকট পৌঁছে গেলাম। টাইগার অশ্রান্ত গর্জ্জনমুখরিত নয়, কিন্তু রূপ তার অনবদ্য—উপলখণ্ডে-ঘেরা শান্ত নির্ঝর আপন প্রাণপ্রবাহের উৎস থেকে উৎসারিত। টাইগারের মূল উৎস কোথায় কে জানে? না জানি কোন্ দূর দূরান্তর থেকে পাহাড় পর্ব্বত ভেদ করে ঝর্ণাটি এগিয়ে এসেছে। এখানে এসে তার চাঞ্চল্য ও বেগের হয়েছে অবসান।

"আমি ভটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া গাহিয়া গাহিয়া গান।"

এই যেন তার মর্ম্মবাণী। যেন তপস্বিনী উমা শিবের তপস্যায় পার্ব্বত্য প্রান্তরে আত্মসমাহিত।

ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের ঝর্ণাধারার রূপে বৈচিত্র্যের আর এক নিদর্শন দেখলাম আর এক স্থানে। রাজরোপ্পা নিরিবিলি ও দুর্গম স্থানে অবস্থিত, সহজে এবং স্বল্প ব্যয়ে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়।

হাজারীবাগ শহর এবং রাঁচী থেকে রাজরোপ্পা ৫৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ট্যাক্সি ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই—সত্তর টাকা ভাড়া। সঙ্গী সংগ্রহ করতে পারলে, খরচ কিছু কম পড়ে। হাজারী-বাগে আমরা সঙ্গী পাই নি। এক দিন পাটনা থেকে রাঁচি অভিমুখী বাসে রাঁচি রওনা হয়ে পড়লাম। সুদীর্ঘ পার্ব্বত্য পথ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন সুন্দর তেমনি বিচিত্র—রামগড় পাহাড়ে গাড়ী একবার ঊর্দ্ধে আরোহণ করে, আবার নামে—দুর্গম পথে যাত্রা দেহমনে অজানা অনুভূতির শিহরণ জাগিয়ে তোলে। ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে রাঁচি হোটেল ইউনিয়নে পৌঁছলাম। হোটেলে আমরা রাজরোপ্পার সঙ্গী পেলাম। রাণাঘাট কলেজের প্রোফেসর চিত্রশিল্পী নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউসনের শিক্ষক বীরেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী শিল্পানুরাগী সঙ্গী খুঁজছিলেন, আমাদের পেয়ে খুশি হয়ে তাঁদের ষ্টেশন ওয়াগনে স্থান করে দিলেন। ষ্টেশন ওয়াগনের সত্তর টাকা ভাড়া—আমরা প্রত্যেকে দশ টাকা দিয়েছিলাম।

রাঁচি-রোড, রামগড় পাহাড় অতিক্রম করে এবড়ো-খেবড়ো গ্রাম্য পথ ছাড়িয়ে আমরা বনান্তরালস্থিত রাজরোপ্পার নিকটে এসে পৌঁছলাম। তীরে তীরে কত গাছ কত ফুল, কত পাতা, শালের কুঞ্জ; পলাশ শেফালী, আমলকী, ডালিম, তাল, বাঁশ-ঝাড়, আম, জাম বট বাদামের তাল গোছা—ডালে ডালে পাখীর কূজন সুমিষ্ট তান তুলেছে। সু-উচ্চ পার্ব্বত্য প্রান্তরে, শিলা আর উপলখণ্ডের অজস্র ছড়াছড়ি। পাহাড় কেটে, পাহাড় ডিঙিয়ে কোন দূরদূরান্তর থেকে দামোদর দুর্ব্বার গতিবেগে বেয়ে এসেছে, উচ্ছলপ্রবাহিণী ভেড়ানদী এসে মিশেছে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে। দামোদর আর ভেড়ানদীর সঙ্গমস্থলই রাজরোপ্পার বৈচিত্র্য আর বৈশিষ্ট্য।

ভাবমুগ্ধ মন নিয়ে আমরা রাজরোপ্পা ঝর্ণার ধারে ধারে ঘুরে বেড়ালাম। কখনও পর্ব্বতের চড়াই বেয়ে ঊর্দ্ধে আরোহণ

করি, কখনও উৎরাই পথে নেমে যাই; যেখানে রাজরৌপ্পা জলপ্রপাত দামোদরের শীর্ণ অববাহিকায় বয়ে গিয়েছে। চিকচিকে বালুচরে পা ফেলে নদী পার হয়ে অপর প্রান্তে যাই আমরা, সূর্যাস্তের বর্ণ-সমারোহে নদী-পর্ব্বত হয়ে উঠেছে অপরূপ। শিল্পী নরেশবাবু রাজরৌপ্পার অনবদ্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ঝর্ণার ধারে বালুচরে রঙ্ আর তুলিকার ধারা রূপসৃষ্টির মধ্যে ডুবে গেলেন।

আঁকা শেষ করে শিল্পী খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর আঁকা সুন্দর ছবিখানা দেখালেন। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে ঝর্ণাধারা—চিক্‌চিকে বালুচরের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে, সূর্যাস্তের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহে হয়ে উঠেছে অপরূপ। দূরে দূরে পাহাড়ের সারি—আকাশে রং-বেরঙের মেঘের খেলা। এক কথায় রাজরৌপ্পার একখানি জীবন্ত ছবি যেন ফুটে উঠেছে শিল্পীর নিপুণ তুলিকায়। ছিন্নমস্তার মন্দিরটি রাজরৌপ্পার বৈশিষ্ট্য।

যোনা ফল্‌স

রাঁচির বিখ্যাত জলপ্রপাত হুড্রু ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের আর একটি প্রধান ঝর্ণা। ট্যাক্সি ছাড়া আর কোনও যানবাহনের চলাচল নেই। হুড্রু ও যোনা ঝর্ণায় যেতে ট্যাক্সিভাড়া পঁচিশ থেকে চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত।

রাঁচি শহর থেকে পুরুলিয়া রোড ধরে আমাদের গাড়ী হুড্রুর দিকে যেতে লাগল। সুন্দর পিচঢালা মসৃণ রাস্তা—শান্ত ঝিরিঝিরি পরিবেশ, দূরে দূরে পাহাড় আর শালবন, প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত বিস্তৃত প্রাঙ্গণের বিচিত্র শোভা। চৌদ্দ মাইল পুরুলিয়া রোড অতিক্রম করে পার্ব্বত্য প্রান্তরে গাড়ী এবার বাঁক নিলে। ঝোপঝাড় জঙ্গল পেছনে রেখে এবড়ো-খেবড়ো পথে গাড়ী চলতে লাগল। তের মাইল চড়াই আর উৎরাই পথ অতিক্রম করে তিন শত ফুট পর্ব্বতের শীর্ষদেশে মোটর আরোহণ করল।

হুড্রুর নিকটে এসে আমরা পৌছলাম। ঝর্ণা এখানে মৃদু কলতানে ঝির্‌ঝির্ নয়, উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত। পর্ব্বতের গহ্বরের অন্তরাল থেকে আকুল আবেগ আর কলরোলে উৎসারিত হুড্রু উচ্ছল প্রবাহে নেমে আসে; উন্মত্ত গর্জ্জনে পর্ব্বত, বনবনান্ত থরথর করে কাঁপে। অশ্রান্ত গর্জ্জনশীল হুড্রুর বিরাট রূপে বিস্মিত অভিভূত হলাম। পর্ব্বতের পর পর্ব্বত অতিক্রম করে উদাম গতিতে ছুটে চলেছে তার উন্মত্ত জলপ্রবাহ। শেষে সমতল ভূমিতে এসে হুড্রু রূপান্তরিত হয়েছে সুবর্ণরেখা নদীতে।

পাহাড় ভেঙে তিন শত ফুট নীচে আমরা নামলাম। হুড্রু শিলা থেকে শিলান্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে সহস্র ধারায় নীচে নেমে এসেছে। বহুক্ষণ তন্ময় হয়ে তার প্রচণ্ড রূপরাশি দর্শন করে আমরা আবার তিন শত ফুট উপরে উঠে এসে যোনা অভিমুখে রওনা হলাম।

পার্ব্বত্য প্রান্তর অতিক্রম করে ফিরে এলাম আবার পুরুলিয়া রোডে, আরও এগার মাইল সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার সাড়ে তিন মাইল পাহাড়িয়া পথ অতিক্রম করে পর্ব্বতের শীর্ষদেশে আরোহণ করলাম। গভীর অরণ্যে সমাচ্ছন্ন এই পর্ব্বতের শীর্ষদেশ যোনা জলপ্রপাতের গুহা এবং উৎস দেখা যায় না। আমরা উৎরাই পথে অনেক নীচে নেমে গেলাম। যোনা শিলাখণ্ড অতিক্রম করে দুর্ব্বার বেগে বেয়ে আসছে অজস্র ধারায়—উন্মত্ত নয়, অশ্রান্ত নয়, যেন সাধনার সাফল্যে হিল্লোলিত, খুশীতে লীলায়িত।

ঝাড়খণ্ডের ঝর্ণাধারায় মধ্যে যোনা জলপ্রপাতের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে দেখলাম। ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের ঝর্ণাধারাগুলি যত দেখেছি—মুগ্ধ হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি, খুশীতে মন ভরে উঠেছে। স্মৃতির মণিকোঠায় ঝাড়খণ্ডের ঝর্ণাধারায় অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যের ছাপ অক্ষয় হয়ে রইল।*

* এই প্রবন্ধের ফটোগুলি লেখিকা কর্ত্তৃক গৃহীত।

কি ছিল, কি হ'ল ?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

১০

দীনেশবাবু বললেন, থামুন মশাই! এক গ্লাস জল খাব।

ঔপন্যাসিক বললেন, আমিও খাব…

দীনেশবাবু বেঁটে-ঘনশ্যামকে ডেকে বললেন, ওরে ঘনা! কুঁজোটা এদিকে নিয়ে আয়…

ঔপন্যাসিক জিজ্ঞাসা করলেন, নরোত্তমের কোন সাড়া পাচ্ছি না যে? সে কি নেই এখানে?

নিবারণ বলল, মোড়ল আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে…

এক ঘটি জল খেয়ে ঔপন্যাসিক আবার বলতে আরম্ভ করলেন—

চন্দ্রকলার লাসটা যখন এ কূলে এসে পৌছল তখন রাত্তির প্রায় চারটে। দু' ভায়ে সেটাকে ডাঙায় তুলে নিয়ে ঢুকল নিকটেই একটা গভীর জঙ্গলের ভেতর।

গাঁয়ের দু'দিকে দুটো নদী। মোড়লদের বাড়ী থেকে নবগঙ্গার দূরত্ব এক মাইল। আর মধুমতীর দূরত্ব দু'মাইলের কিছু বেশী। দু'ভাই বস্তা কাঁধে নিয়ে রওনা হ'ল মধুমতীর উদ্দেশে। আকাশে তখন প্রভাতী তারা জ্বল্ জ্বল্ করছিল। সে ছাড়া নরোত্তমের এই কাজের সাক্ষী আর কেউ রইল না।

ভোর হতেই থানায় সোরগোল পড়ে গেল—লাসটা গেল কোথায়? দারোগা চৌকিদারদের মারতে যান—বল্ ব্যাটারা! লাস কি করলি?

সদরে খবর গেল। পুলিশসাহেব নিজেই ছুটে এলেন। দারোগাকে ধমকাতে লাগলেন। থানার হেপাজত থেকে লাস উধাও, ব্যাপারটা ত সোজা নয়?

দশ-বার খানা ডিঙি নিয়ে কনেষ্টবল ও চৌকিদাররা বেরিয়ে পড়ল। নদীর বাঁকে বাঁকে সন্ধান করতে লাগল। উজানে বা ভাঁটিতে যত নৌকা যাতায়াত করছিল, তাদের সবাইকে প্রশ্ন করল—কেউ কোন লাস ভেসে যেতে দেখেছে কিনা?

ভয়ানক বিপদে পড়ল নদীর জেলেরা। তারা অত্যন্ত নিরীহ-প্রকৃতি—পুলিশ-জুজুর ভয়ে কাঁপে। পুলিশের লোক এসে কোনও প্রশ্ন করলেই জবাবের আগে দেয় দু'চারটে মাছ উপঢৌকন। তাকে খুশী করে এড়াতে পারলেই বাঁচে। নদীতে যে ঘটনা ঘটেছে—সেজন্যে জেলেদের দায়িত্ব যেন তারা স্বীকার করেই নিচ্ছে। নিজেকে যে অপরাধী মনে করে—সে ত নির্যাতিত হবেই।

সবাই বলল, আমরা ভোরে এসে জাল দিয়ে খোঁজো তাসিয়েছি। ধরা পড়ে গেল একটা জেলে। প্রমাণ হ'ল—সে প্রায় রাত দুটো-আড়াইটার সময় থানার বাঁকে 'খেপ্‌জা-জালে' মাছ ধরেছে। পুলিশ তার 'ডুপ্‌নো' কেড়ে নিয়ে বেদম প্রহার আরম্ভ করল—বল্ ব্যাটা, লাস কোথায়?

লোকটা পাথুরে-কালা, কিছুই শুনতে পায় না। অথচ বেশী কথা কয়। কানের অভাবটা জিভ চালিয়েই পূরণ করতে চেষ্টা করে। প্রশ্নের অসংলগ্ন জবাব শুনে বুদ্ধিমান দারোগা তাকে লাথি, চড়, ঘুসি প্রভৃতি উপহার দিয়ে হাজতে আটকে রাখলেন।

পুলিশসাহেব এসে তাকে বাইরে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, কাল রাত্রে তুই কোথায় ছিলি?

—আজ্ঞে হুজুর আমার নাম দৃষ্টিধর…

—নদীতে মাছ ধরতে এসেছিলি?

—আমার বাবা ভাগ্যধর সাধু, রোজ বামুনের পাদোদক খেতেন। খুড়ো গদাধর সাধু গত বছর গঙ্গাসাগরে গিয়ে দেহ রেখেছেন—আমাদের বংশে কেউ কখনও চোর ছিল না হুজুর!

তার সাফাইয়ে বাধা দিয়ে পুলিশসাহেব বললেন, যা জিজ্ঞেস করছি—তার জবাব দে…

—আজ্ঞে হুজুর! আজকাল খুব বড় কাতলা কি রুই পাচ্ছি না। পেলেই আপনাকে দিয়ে যাব…

পুলিশসাহেব দারোগার উপর চটে উঠলেন। কেন একটা গো-বেচারা বদ্ধকালাকে হাজতে আটকে রেখেছ? ছেড়ে দাও…

দু'দিন তিনি থানায় রইলেন। বহু চেষ্টা করেও লাসের কোনও সন্ধান পেলেন না। নরোত্তমকে ডাকিয়ে এনে বহু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে দিলে সোজা জবাব। লাস সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

—তোমার বৌ কোথায়? পুলিশসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ী গিয়েছিল। সেখান থেকে শ্রীবৃন্দাবন গেছে। মথুরায়ও যাবে—শুনতে পাচ্ছি…

দারোগা বললেন, লোকটা দাগাবাজ। লাঠি ও সড়কির ওস্তাদ!

—সেকথা সত্যি হুজুর! খুব গর্ব্বের সঙ্গে নরোত্তম বলল, সেজন্যে সরকার আমাকে পুরস্কার দিয়েছেন। জমিদারের দেওয়া দু'চারটে মেডেলও আছে আমার ঘরে…

উত্তেজিতভাবে দারোগা বললেন, শালা ! তুই একটা ডাকাত। তোর বৌকে তুই মেরে ফেলেছিস···

নরোত্তমও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে, একটু সামলে নিয়ে পুলিশসাহেবকে লক্ষ্য করে বলল, হুজুর আমরা চার ভাই, এক বোন। বোনটির এখনও বিয়ে হয় নি। দারোগাবাবু যদি রাজী থাকেন, আজই এসে সাতপাক ঘুরিয়ে দিতে পারি—আপত্তি নেই। ডাকাতি এখনও করি নি। দারোগাবাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা হলে নিশ্চয়ই করব।

—তুই চুরি-ডাকাতি করিস একথা কে না জানে ?

—'এই থানার এলেকার চুরি-ডাকাতি কে করে, তা এখুনি প্রমাণ হয়ে যেতে পারে। যদি একবার আপনি আমার তবু বোনাইয়ের বাসার ভিতর ঢোকেন। তার পর পুলিশ-সাহেবের পানে তাকিয়ে বললে—হুজুর। তা হলে সব বুঝতে পারবেন। জেলেদের কাছ থেকে উনি যে এক ঝাঁকা মাছ কেড়ে এনেছেন, তার দাম কি দিয়েছেন ? ছোকরা জমিদারের বাগান-বাড়ীর মজলিশে যাঁর আড্ডা, সকালে চা আর বিকেলে লালজল টেনে যিনি গরীবের ঝি-বৌদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন—তাকে উপযুক্ত শিক্ষা এই নরোত্তম একদিন দেবে। য'দি আর বেশী দিন উনি থাকেন এই থানায়···নরোত্তম বাবরিটা ঝেঁকে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আচ্ছা তুমি এখন এসো···পুলিশ সাহেব চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। নরোত্তমও নমস্কার জানিয়ে বিদায় হ'ল।···

এই লোকের সঙ্গে তুমি বিরোধ বাধিয়েছ ? জমিদারের পক্ষ-সমর্থন করছ ? ধমক দিয়ে পুলিশসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

আজ্ঞে না···

বুঝতে পেরেছি। জমিদারের সঙ্গে বড্ড বেশী মাখামাখি করে ফেলেছ। এ থানায় আর দারোগাগিরি করতে পারবে না তুমি। আচ্ছা, পুলিশ সাহেব তাঁর লঞ্চে উঠে রওনা হলেন।

সন্ধ্যার পর নরোত্তম গেল দীনবন্ধুঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। দূর থেকে তাকে দেখেই দীনবন্ধুঠাকুর ছুটে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—সাবাস্ ! মোড়লের পো ! সাবাস্ ! কি করে লাগটা উড়িয়ে দিলে, ভেবেই পাচ্ছিনে !

মায়ের দয়া, আর তোমাদের ছিরিচরণের আশীর্ব্বাদ। নরোত্তম তার পায়ের ধূলা মাথায় নিলে।

এমন সময় একখানা দা-হাতে শিবু এসে হাজির হ'ল সেখানে।

কি রে শিবু খবর কি ? দীনবন্ধুঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন।

ওই মোড়লকে খুঁজে বেড়াচ্ছি···

কেন রে ? নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল।

হাতের দা'খানা দেখিয়ে শিবু বলল—আমি কিন্তু মধু-ঠাকুরকে খুন করব। সে আমার সব্বনাশ করেছে। বলেই অবুঝ বালকের মত কেঁদে ফেলল।

নরোত্তম বলল—যে কাঁদে, সে খুন করতে পারে না। খুন করার সময় চোখে জ্বলবে আগুন। পরে দু'ফোঁটা জল ফেলতে চাস্ ফেলিস—এখন কাঁদিস নে।

মধুঠাকুরের বাড়ীর পাশেই শিবুর বাড়ী। নেহাত ভাল-মানুষ শিবচরণ—অত্যন্ত সহজ ও সরল তার বুদ্ধি। কোন কুটিলতার ধার সে ধারে না। পত্নী-বিয়োগের পর মধুঠাকুর শোকে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিবেশীর সেই আকস্মিক বিপদে শিবচরণের মনে সহানুভূতি জেগে উঠে-ছিল। বিপত্নীক মধুঠাকুরের সেবা ও শুশ্রূষার জন্যে শিবুই তার যুবতী ভার্য্যা নন্দরাণীকে নিযুক্ত করল। এখন আর বৌটা ঘরে ফিরতে চায় না।

নরোত্তম বিরক্ত ভাবে বলল—দেখ শিবু ! আমরা সবাই জানি। এ ঘটনার জন্যে দায়ী তুই। কেন এখন মিছিমিছি মধুঠাকুরের উপর চটছিস ?

দীনবন্ধুঠাকুর বিস্মিত ভাবে অস্ফুট স্বরে বললেন—কি লজ্জার কথা, কি ঘেন্নার কথা। শিবুর বৌ ত আমার মেয়েরই—মধুঠাকুরের নাতনীর বয়সী।

ভুরু কুঁচকে নরোত্তম বলল—আমার মনে হয়—আজকাল মায়ের মন্দিরে পাঁঠা বলি তুলে দিয়ে, মধুঠাকুরের মত মানুষ-দের বলির ব্যবস্থা করা উচিত। চল্ দেখি শুনে আসি—মধু-ঠাকুর কি বলে···?

শিবচরণকে সঙ্গে নিয়ে নরোত্তম এসে হাজির হ'ল মধু-ঠাকুরের কাছে। তাকে দেখেই মধুঠাকুর বুঝলেন—ব্যাপার খুব গুরুতর···

সাদরে নরোত্তমকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মধুঠাকুর বলতে লাগলেন—আরে এস, এস, মোড়লের পো। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। অনেক চেষ্টা করছি—কিন্তু কিছুতেই পারছি না শিবুর বৌটাকে ঘর ফিরতে রাজী করতে। সে নাকি জীবনে আর শিবুর মুখ দেখবে না।

কেন, শিবুর অপরাধ কি ?

শিবু নাকি তার চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করেছে। মেয়েটি যে অতি নির্ম্মলচরিত্রা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে প্রতিজ্ঞা করেছে—দাসীবৃত্তি করে পেট চালাবে তবু শিবুর সংসার আর করবে না···

থাম ঠাকুরমশাই ! হঠাৎ চোখ রাঙিয়ে চিৎকার করে উঠল নরোত্তম। পরের ঘর ভাঙবার ওস্তাদ তুমি—সেকথা জানি। শিবুর বৌকে একবার ডাক এখানে, আমি তার মুখেই সব কথা শুনব···

নরোত্তমকে মধুঠাকুর ভয় করেন। ধমকানি খাওয়া বালকের মত তাঁর চোখমুখ যেন শুকিয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন—আমি কারও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। দিনরাত জপতপ আর সন্ধ্যাহ্নিক নিয়ে পড়ে আছি। তবু আমার এ কলঙ্ক কেন? ওরে বাবা নন্দরাণী! মধুঠাকুর অন্দরে ঢুকলেন।

বহুক্ষণ নরোত্তম ও শিবচরণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। মধুঠাকুর বা নন্দরাণীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

অধৈর্য্য হয়ে শিবচরণ বললে—কই এল না ত?

ও বৌয়ের আশা তুই ছেড়ে দে শিবু! আর একটা বিয়ে কর। ওকে নিয়ে সংসার করতে পারবি নে···

শিবচরণ ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। বুক চাপড়ে বলল—নন্দকে ছেড়ে আমি বাঁচব না মোড়ল! যা হোক একটা উপায় কর···

মধুঠাকুর ফিরে এসে বললেন, নন্দরাণী আমার বাড়ীতে নেই। তোমরা এসেছ শুনেই পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে···

—কেন মিছে কথা বলছ ঠাকুর? তাকে আমার সামনে আসতে দেবে না, তাই বল···

—দেখ মোড়ল! তুমি একজন মাতব্বর লোক। দশখানা গাঁয়ের চাষাভূষোরা তোমার কথায় ওঠে বসে। ক্ষমতার অহঙ্কারে ব্রাহ্মণকে অসম্মান ক'র না। মধুঠাকুর জীবনে কখনও একটি মিছে কথা বলে নি। তেমন বাপের ঔরসে তার জন্ম হয় নি···বলতে বলতে গলার পৈতাটা মার্জ্জনা করতে লাগলেন।

নরোত্তম শিবুকে আদেশ করল—যা ত শিবু! বাড়ীটার পেছন ঘুরে উত্তর ডাঙ্গায় যা। সত্যিই যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে—নিশ্চয়ই বেশি দূর যেতে পারে নি। যেখানে পাবি চুলের মুঠো ধরে টেনে আনবি···

—শোন মোড়ল! মেজে ঘষে রূপ, আর ধরে বেঁধে পীরিত হয় না। তার চেয়ে একটা কাজ কর···

—কি?

—আমিই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শিবুর ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। শিবু আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করুক—তাকে কোন নির্যাতন করবে না বা তার চরিত্র সম্বন্ধে কোন কুৎসা রটাবে না।

উত্তেজিত ভাবে শিবু বলল, সে দিনরাত তোমার ঘরে গিয়ে বসে থাকবে আর এদিকে আমার ভাত পুড়বে, মাছে ঝাল হবে না। লাঙল ছেড়ে ঘরে ফিরে এসে যখন খেতে বসব—তখন আমার সামনে এনে ধরে দেবে এক থালা পোড়া ভাত। চাষা আমি। মেজাজ ঠিক রাখব কি করে?

হো হো করে হেসে মধুঠাকুর বললেন—ওরে শিবু! পরিবারের ওসব দোষ-ত্রুটি ধরতে নেই।

একটু থেমে মধুঠাকুর বলতে লাগলেন—মোড়ল নিজেই যখন এসেছে—যে ব্যবস্থা ভাল হয় করুক—আমার কোন আপত্তি নেই। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ···

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নরোত্তম বলল—কি আর করব মধুঠাকুর! করবার কিছু নেই। শিবু বোকা, তুমি বুদ্ধিমান। বোকাকে একটা বৌ দেওয়া যায়—কিন্তু বৌ ঘরে রাখবার বুদ্ধি দেওয়া যায় না। তোমার মত বুদ্ধিমান লোকের বাড়ীর পাশে বাস করে—বোকা-শিবুর বিয়ে করাটাই অন্যায় হয়ে গেছে।

—কি যে বল মোড়ল! মধুঠাকুর হাসলেন।

—শোন মধুঠাকুর! এ গাঁয়ে দু'জন শাস্তর জানা বামুন বাস করেন। এক জন তুমি আর এক জন তোমার বেয়াই দীননাথঠাকুর। তিনি দেবতা, আর তুমি শয়তান!

মধুঠাকুর উত্তেজিত ভাবে বললেন—কি বললে? আমি শয়তান?

—চোখ রাঙিও না ঠাকুর! শয়তানকে চিট্ করতে আমি জানি। কিন্তু আমরা যে বড্ড ধর্ম্মভীরু! টিকি-নামাবলী আর ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়ের আড়ালে যে সব শয়তান লুকিয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে পেরে উঠি নে। আমার কি মনে হচ্ছে জান?

কি? মলিন ভাবে মধুঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন।

নরোত্তম বলতে লাগল—পোশাকী শয়তানের সংখ্যা দিন দিন যেরূপ বেড়ে উঠছে—তাতে মনে হয়—দেশটা শীগগীরই ধ্বংস হয়ে যাবে। মা-রণচণ্ডী আর বেশী দিন সহ্য করবেন না।

১২

উদ্বাস্তরা যে স্তিমিত আগুনটা ঘিরে বসেছিল—তার আধ পোড়া কাঠগুলো একটু নেড়েচেড়ে দিতেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। সেই আলোকে সকলের চোখমুখ হঠাৎ অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হ'ল।

নিবারণের ধারণা ভুল। নরোত্তম তার কোলের উপর মাথাটা রেখেছিল বটে, কিন্তু ঘুমোয় নি। চন্দ্রকলার কথা মনে পড়ে—জলভরা কোটরগত ঝাপসা চোখে চেয়েছিল—অসংখ্য তারকাখচিত দূর আকাশের দিকে।

এক দিন নরোত্তম বলেছে—'এ দেশ শীগগীরই ধ্বংস হয়ে যাবে। মা-রণচণ্ডী আর বেশী দিন সহ্য করবেন না।' সে কথা শুনে, বিস্মিত ভাবে নরোত্তমের মুখের দিকে চেয়ে, দীনেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—বুড়ো! তুমি কি ত্রিকালজ্ঞ?

আজ্ঞে এ অধম আপনাদের দাসানুদাস! নরোত্তম উঠে বলল।

উদ্বাস্তদের এমন দুর্গতি হবে—তা কি তুমি অনেক আগেই জেনেছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মা জানিয়েছিলেন। জমিদারের অত্যাচার,

পোশাক-আশাক জামা-কাপড় আর টিকি-মালাধারীর অনাচার, যা কি সইতে পারেন ?

ঔপন্যাসিকের দিকে চেয়ে দীনেশবাবু বললেন—এ সময়ে রমা দেবী কি করছেন ? তাঁর কথাটা একটু বলুন—

ঔপন্যাসিক বলতে লাগলেন—

শান্ত ও কোমলস্বভাব রমা দেবী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। নরোত্তমকে এক দিন দেখে, আর তার মুখে মাতৃসম্বোধন শুনে, তিনি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। সঙ্কল্প করে-ছিলেন—কুমার বাহাদুর যতই চেষ্টা করুন, নরোত্তমকে তিনি রক্ষা করবেনই।

দাঙ্গার মামলায় নরোত্তমকে জড়ান জমিদারের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। কারণ যে সময়ে দাঙ্গাটা বেধেছিল, ঠিক সেই সময়ে রেজেষ্ট্রি আপিসে হয়েছিল একখানা সাধারণ দলিল রেজেষ্ট্রি। দেখা গেল—সাক্ষী হিসাবে সেই দলিলে আছে নরোত্তমের টিপসই।

ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে কুমারবাহাদুর বললেন—নিশ্চয়ই রেজিষ্ট্রার ঘুস খেয়েছে···

দীনবন্ধুঠাকুর মন্তব্য করলেন—নরোত্তম এত টাকা কোথায় পাবে যে রেজিষ্ট্রারকে ঘুস খাওয়াবে ?

হাসতে হাসতে রমাদেবী বললেন—মা-কালী যার সহায়, তাকে জেলে পুরতে কিছুতেই পারবে না তুমি। বৃথা চেষ্টা করছ···

আদালত নরোত্তমকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি বিশ্বাস ? কালীবাড়ীর পক্ষে দাঁড়িয়ে দাঙ্গা লড়েছিল কে ?

প্রশ্নের জবাব দেবার সময় নরোত্তমের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে সে বলল—নিশ্চয়ই মা-দশভুজা। পাঁচ হাতে চ্যাঙা ছুড়েছিলেন, আর পাঁচ হাতে লড়কি চালিয়েছিলেন। সে কথা কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। বিচারক প্রমাণাভাবে নরোত্তমকে বেকসুর খালাস দিলেন।

জমিদারের দ্বিতীয় চেষ্টা—চন্দ্রকলাকে খুন করার অভি-যোগ আদালত পর্য্যন্ত পৌঁছাল না। জমিদার-বন্ধু দারোগা বদলি হয়ে গেলেন। নূতন যিনি এলেন, কুমারবাহাদুরকে স্পষ্ট বললেন তিনি—নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ না পেলে কোন লোককে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না।

কিন্তু সফল হ'ল—জমিদারের তৃতীয় চেষ্টা। শিবুর বৌ নন্দরাণী গিয়ে হাজির হয়েছে কুমারবাহাদুরের কাছে। সঙ্গে তার মধুঠাকুর। নরোত্তম নাকি করেছে—নন্দরাণীর উপর পাশবিক অত্যাচার। সে কথা শুনে, কানে আঙুল গুঁজে, নরোত্তম চিৎকার করে উঠল—মা, মা বলে।

জমিদার-বাড়ীর ফুল-বারান্দায় একখানা কৌচ পেতে বসে রমাদেবী দেখলেন—অস্তগামী সূর্য্য যেন পশ্চিম আকাশে রক্ত ঢেলে দিয়েছেন। বাতাসের শ্বাসরোধ ঘটেছে—গাছের পাতাটিও নড়ছে না।

হাসতে হাসতে কুমারবাহাদুর এসে বললেন—এইবার ? এইবার তোমার মা-কালীর বরপুত্রটিকে কে রক্ষা করবে ?

শঙ্কিত ভাবে কাঁপতে কাঁপতে রমাদেবী বললেন—তুমি কি উন্মাদ হয়ে উঠলে ? আকাশের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিলে ? খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—চল খোকা ! আমরা এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই···

উদ্বিগ্ন ভাবে দীনবন্ধুঠাকুর ছুটে এলেন নরোত্তমের কাছে। লজ্জায় ও ঘৃণায় মাথা হেঁট করে বসে রইল সে। দীনবন্ধু ঠাকুরের মুখের দিকে চাইতে পারল না।

মধুঠাকুর এসে সাফাই সুরু করলেন—আমি ত আগেই তোমাকে বলেছিলাম মোড়ল ! শিবুর কথা শুনে মেয়েটাকে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত হচ্ছে না। এখন ঠেলা সামলাও

নরোত্তমের চোখে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। চিৎকার করে বলল—সরে যাও, সরে যাও মধুঠাকুর ! এখুনি আমি তোমার বুকটা চিরে ভীমের মত রক্ত খেতে পারি···

দীনবন্ধুঠাকুর ছুটে এসে মধুঠাকুরকে আড়াল করলেন। তাঁকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন—শীগগির সরে পড় বেয়াই ! নরোত্তমের মাথা খারাপ হয়ে গেছে···

নারায়ণ ! নারায়ণ ! জপ করতে করতে মধুঠাকুর ছুটে পালিয়ে গেলেন।

নারায়ণের মুখোস মধুঠাকুরের মুখে আর বেশীদিন রইল না। নরোত্তম হাজতে ভর্ত্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিয়মিত ভাবে যাতায়াত সুরু করলেন জমিদার-বাড়ীতে।

মধুঠাকুরের অপরূপ শাস্ত্রব্যাখ্যা আর অতি উচ্চাঙ্গের প্রেম তত্ত্ব শুনে শুনে নন্দরাণীর মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল—একমাত্র মধুঠাকুরের পদসেবা করেই তার পরমার্থ প্রাপ্তি ঘটবে। শিবু তার কে ? কেউ নয়।

কিন্তু এ কি ? কেন মধুঠাকুর তাকে জমিদারের বাগান-বাড়ীতে নিয়ে এসেছেন ? কেন সে তাঁর অনুরোধে বাধ্য হ'ল পুলিসের কাছে কেঁদে কেঁদে নরোত্তমের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করতে ? বাবার বয়সী নরোত্তম ! কি লজ্জার কথা, কি ঘেন্নার কথা, ছি ছি ছি—মধুঠাকুর আজ তাকে হাত ধরে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ? সন্দিগ্ধ নন্দরাণীর মনে প্রশ্নের অন্ত নেই।

এক দিন সন্ধ্যার পর মাতাল জমিদার তাকে স্পর্শ করতে উদ্যত দেখে নন্দরাণী চমকে উঠল। উৎকট ধর্ম্মবিশ্বাসের তলে তার যে মর্য্যাদাবোধ লুপ্ত হয়ে আসছিল, তা হঠাৎ জেগে উঠল। মধুঠাকুরের কাছে ছুটে গিয়ে কাতর ভাবে জিজ্ঞেস করল একি ঠাকুর ? কেন তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ ?

তোমার পদসেবা করেছি বলে কখনও কি আমার গায়ে হাত দেবে ?

বাগান-বাড়ীতে বসেই মধুঠাকুর আরম্ভ করলেন—বেদ-পুরাণের অপব্যাখ্যা ও শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের প্রয়োজনীয় দৃষ্ট-প্রয়োগ।

নন্দরাণীর শোণিতপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠল। সে যেন কি এক শক্তির উন্মাদনা অনুভব করল। সত্যিই ত নরোত্তম তার শত্রু।

হাসতে হাসতে মধুঠাকুর বললেন—এ জগতে কিছুই সত্য নয়, সবই মায়া। নির্ভয় ও নিরহঙ্কার ভাবে মায়ার খেলা খেলতে হবে। তুমি যদি কেঁদে কেঁদে তোমার মিথ্যা অভি-যোগগুলি বিচারকের কাছে পেশ করতে পার—তা হলেই নরোত্তমাসুর-বধ সুনিশ্চিত।

নন্দরাণীর মাথা গুলিয়ে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে তার কথা।...

এদিকে নরোত্তম হাজতে পচতে লাগল। সর্বচরণ একদিন তার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করল—পুড়িয়ে দেব মধুঠাকুরের বাড়ীঘর ? একেবারেই শেষ করে দেব তাকে ?

না দেখি মার কি ইচ্ছে...নরোত্তম গভীর ভাবে বললে।

নির্দিষ্ট দিনে মামলা আরম্ভ হ'ল। আদালত লোকে লোকারণ্য। একটা অশিক্ষিত দুর্দ্ধর্ষ লেঠেল হলেও, নরোত্তমকে লোকে ভালবাসে। তার মাতৃভক্তি ও বিপদোদ্ধার-প্রবৃত্ত সর্বজনবিদিত। কেউ বিশ্বাস করে না যে এমন হীন কাজ করা নরোত্তমের পক্ষে সম্ভব।

নন্দরাণীর পক্ষে তদ্বির চালাচ্ছেন মধুঠাকুর, অর্থব্যয় করছেন জমিদার। কলকাতা থেকে ব্যারিষ্টার এসেছে। রমাদেবী নিরুপায় হয়ে পড়েছেন। দীনবন্ধুঠাকুরের মারফত নরোত্তম তাঁকে জানিয়ে দিয়েছে—কোন উকিল ব্যারিষ্টারের সাহায্য সে গ্রহণ করবে না। সে শুধু দেখবে—মার কি ইচ্ছে ?

মধুঠাকুরের মনে আজ ভয়ানক উদ্বেগ ও অশান্তি। কাল থেকে নন্দরাণীর জিদ্ব হচ্ছে। তাকে সুস্থভাবে কাঠগড়ায় তুলবার জন্যে একজন ডাক্তার নিযুক্ত হয়েছেন। শিশিতে দাগ কেটে মাঝে মাঝে তাকে একটু লাল জল খাওয়ান হচ্ছে। দূরে দাঁড়িয়ে মধুঠাকুর জপ করছেন—নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ...

আসামীর খাঁচায় আবদ্ধ নরোত্তম। অতি শান্ত সৌম্য ও অচঞ্চল গভীর-মূর্তি। মাথার রুক্ষ বাব্‌রি আর মুখের ঈষদুন্নত গোঁপদাড়ি তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। উদাস ভাবে নরোত্তম চেয়ে আছে বিচারকের মুখের দিকে। বিচারকও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছেন আসামীর সেই নির্লিপ্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মুখের ভাব। বোধ হয় ফাঁসির হুকুম শুনলেও সে বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা প্রকাশ করবে না।

মধুঠাকুর ও নরোত্তমের মুখের ভাবাভিব্যক্তি তুলনা করলে স্পষ্টই মনে হয়—আজকের এই বিচারাভিনয়ের আসামী নরোত্তম নয়—মধুঠাকুর। তাঁর চোখে-মুখে উদ্বেগ, অশান্তি ও যন্ত্রণার কালো ছায়া বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নন্দরাণী এসে কাঠগড়ায় দাঁড়াল। বয়স তার সতের-আঠারোর বেশী নয়। পরিপূর্ণ যৌবনশ্রী সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে। অসাধারণ সুন্দরী না হলেও, অপূর্ব্ব স্বাস্থ্যবতী। নন্দরাণীর দিকে চেয়ে চোখভরা স্নেহ দিয়ে নরোত্তম একটু হাসল। সে অশ্রুসিক্ত সরল হাসি দেখে নন্দরাণীর বুকটা কেঁপে উঠল। মধুঠাকুরের চোখমুখ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেল।

ব্যারিষ্টার প্রশ্ন করতে লাগলেন। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মধুঠাকুরের শেখান জবাবগুলি ধীরে ধীরে উদ্গীরণ করতে লাগল নন্দরাণী। জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে মধুঠাকুর ছটফট করছিলেন—আর মনে মনে জপ করছিলেন নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ...

গুরুগম্ভীর স্বরে নরোত্তম বলে উঠল—ধর্ম্মাবতার ! মেয়েটিকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। অনু-মতি প্রার্থনা করি।

আদালত অনুমতি দিলেন।

নন্দরাণীর চোখের দিকে চেয়ে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল, মা ! তোমার একটি ছেলে হয়েছিল ?

—হ্যাঁ।

—গত বছর সে মারা গেছে ?

—হ্যাঁ।

—তার বয়স হয়েছিল কত ?

—দু'বছর তিন মাস।

—মুখে তার কথা ফুটেছিল ? তোমাকে মা বলে ডেকেছিল ?

—হ্যাঁ।

—তার মুখখানি তোমার মনে পড়ে ?

—হ্যাঁ, পড়ে...টপ্ টপ্ করে নন্দরাণীর চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

—আচ্ছা মা ! সেই ছেলেটি যদি এই আদালতে এসে এখন হাজির হয়—তুমি কি তার মাথায় হাত রেখে বলতে পারবে কখনও আমি তোমার মুখের দিকে কুভাবে তাকিয়েছি, বা তোমার অঙ্গ স্পর্শ করেছি ?

—না, না, না—নন্দরাণী ফুকরে কেঁদে উঠল। মিছে কথা। সব মিছে কথা। মধুঠাকুর আর জমিদার আমাকে বাধ্য করেছে এই সব মিছে কথা বলতে।

আদালতে কল-গুঞ্জন উঠল। ব্যারিষ্টার আপত্তি জানালেন—আসামীকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে বাদিনীকে

হিপনোটাইজড করবার জন্যে। সে এখন সত্য গোপন করে আদালতকে বিভ্রান্ত করছে।

নন্দরাণীকে ধমক দিয়ে ব্যারিষ্টার তার পূর্ব্ব বিবৃতি বহাল রাখবার বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। সে কিছুতেই স্বীকার করল না যে, নরোত্তম কখনও তার অঙ্গ স্পর্শ করেছে। তার পূর্ব্ব বিবৃতি মিথ্যে—শিখিয়ে-বলান কল্পিত কাহিনী মাত্র।

জনতার ভিতর থেকে একটু এগিয়ে এসে মধুঠাকুর চেষ্টা করছিলেন—নন্দরাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার। হঠাৎ তার দিকে নজর পড়তেই নন্দরাণী উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে উঠল—ওই যে—ওই যে সেই শয়তান-ঠাকুর। ও আমাকে পথে বসিয়েছে, আমার ভালমানুষ সোয়ামীকে পাগল করে দিয়েছে··

জনতার মধ্য থেকেই কে যেন বলে উঠল—মার শালাকে!

সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে মধুঠাকুর যে কোন্ দিকে গা-ঢাকা দিলেন তা ঠিক বোঝা গেল না। নন্দরাণী মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল। সেদিনের মত মামলা মুলতুবি রইল। নরোত্তম হ'ল জামিনে খালাস।

কিছু দিনের মধ্যে মধুঠাকুরকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। হঠাৎ এক দিন শিবচরণ ওরফে শিবু এসে হাজির হ'ল থানায়, হাতে একখানা রক্তমাখা দা নিয়ে। হাসতে হাসতে বলল, দারোগা সাহেব! মধুঠাকুরকে আমি কেটে ফেলেছি···

দারোগা তার হাতের দা'খানা কেড়ে নিয়ে বললেন—বেশ করেছ। অতি চমৎকার কাজটি করেছ। দয়া করে নিজেই এসে ধরা দিয়ে আমাদের পরিশ্রম অনেক লাঘব করে দিয়েছ। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন এস—হাজতের দরজা খোলাই আছে···

দারোগা শিবুকে হাজতে আটকালেন। ক্রমশঃ

গান্ধীগ্রাম সেবাশ্রমের গ্রামোন্নয়ন

(ঝালকাঠি, বরিশাল)

শ্রীরঞ্জনকুমার দত্ত

গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ সেবার আদর্শই আমাদের সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূলে। এই প্রচেষ্টার দুটো দিক আছে—একটা আত্মোন্নয়ন, অপরটা গ্রামোন্নয়ন। এই উন্নয়ন কেবল একাভিমুখীন নয়, সর্ব্বাভিমুখীন। অন্ন-বস্ত্র-আবাসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাধারণের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নৈতিক-জীবন গঠনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রেও তেমনি এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলার সদভিপ্রায় নিয়ে আমরা কাজ করে চলছি। কিন্তু কতটুকুই বা আমাদের শক্তি, আমাদের পৌরুষ। আমাদের সম্বল বলতে আছে সাধু সংকল্প, সাধু প্রচেষ্টা, আর আছে জনসাধারণের সহযোগিতা ও আশীর্ব্বচন। তবে এই চেষ্টা সার্থক হওয়া না-হওয়া ঈশ্বরেচ্ছা ও আমাদের কর্ম্মকুশলতা-সাপেক্ষ। আমরা যা কিছুই করি না কেন তা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় মহাত্মা গান্ধী-প্রদর্শিত আদর্শ পথে। দুঃখের বিষয়, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র পরিচালক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন, এম-এল-এ (পূর্ব্ব-পাকিস্থান), বর্ত্তমানে রংপুর জেলে রাজবন্দীরূপে আটক আছেন। তাঁকে গত ফেব্রুয়ারী মাসে এসেম্বলী অধিবেশনকালে অন্যান্যের সহিত ঢাকায় পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকার কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ সময় ঢাকায় পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে 'বাংলা ভাষা'র দাবিতে ছাত্র-আন্দোলন চলছিল। ২৪শে মার্চ্চ তারিখে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি মন্তব্য করেন যে, এই ভাষা-আন্দোলনের পশ্চাতে পাকিস্থানকে ধ্বংস করার একটা ষড়যন্ত্র চলছিল এবং সেই ষড়যন্ত্রের সহিত বরিশালের সর্ব্বজনপ্রিয় জননেতা, পূর্ব্ববঙ্গের একনিষ্ঠ ও অকপট দেশ-সেবক আমাদের এই গঠনকর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের একমাত্র পরিচালক শ্রদ্ধাস্পদ সতীন্দ্রবাবুও লিপ্ত আছেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করার কৈফিয়ৎ স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী সাহেব উল্লিখিত মন্তব্য করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

বস্তুতঃ পাকিস্থান সম্পর্কে সতীন্দ্রবাবুর বর্ত্তমান মনোভাব যাঁরা জানেন (আমার বিশ্বাস সরকারও জানেন) তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর এতাদৃশ মন্তব্যে ও তাঁকে আটক করার ব্যাপারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছেন। আমরা আশা করি রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর অকপট সেবাভাব ও একনিষ্ঠতার পরিচয় সম্পর্কে সরকারের গুপ্ত-তথ্য-উদ্ঘাটক পুলিশ বিভাগের বিশেষ ভাবেই জানা আছে। সে বিষয়ে আমাদের কিছু বলতে যাওয়া অনাবশ্যক মনে করি। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের কয়েক মাসের কার্য্য-বিবরণী এখানে উল্লেখ করছি। পরিচালক-অভাবে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম্ম আজ খুবই ব্যাহত হচ্ছে। সতীন্দ্রবাবুর স্বাস্থ্যও জেলে খারাপ চলছে বলে সংবাদ

পাওয়া গেছে। এই সব বিবেচনা করে সরকার সতীশবাবুর সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ধারণা পরিবর্ত্তন করতে পারেন।

আমাদের কর্ম্মবিভাগ :—১। কৃষি, ২। চিকিৎসা, ৩। মৌমাছি-পালন, ৪। হাঁস-মুরগী পালন, ৫। বিদ্যালয়, পাঠাগার ও সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠানাদি, ৬। হরিজন-উন্নয়ন ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা, ৭। সুতা কাটা, ৮। রাস্তা নির্ম্মাণ।

১। কৃষি—পূর্ব্ববঙ্গ কৃষি-প্রধান দেশ। একপ্রকার বিনা যত্নেই এদেশের কৃষকেরা ফসল ফলিয়ে আসছে। সারের ব্যবহার তারা করে না ; তার ব্যবহারও জানে না। সারের ব্যবহার যদি জানত আর ব্যবহার যদি করত, তা হলে পূর্ব্ববঙ্গে যেসব জমিতে কৃষিদ্রব্যের চাষ হয় তা দিয়ে কেবল পূর্ব্ববঙ্গের নয়, সারা পাকিস্থানের খাদ্যাভাব মিটানো যেতে পারত। কিন্তু কৃষকদের ভিতরে সে উদ্যম ও জ্ঞানের অভাব। গান্ধী-গ্রাম সেবাশ্রমের কর্ম্মীরা নিজেদের প্রত্যক্ষ কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে গ্রামবাসীর হৃদয়ে সেই শিক্ষা ও উদ্যম সঞ্চার করতে চেষ্টা করে আসছেন। মানুষের মলমূত্রকে উত্তম সারে পরিণত করার ও তা জমিতে ব্যবহার করার প্রক্রিয়া, হাড়ের সার ও অন্যান্য সারের ব্যবহার, কোন্ জমিতে কি ভাবে প্রয়োগ করা দিবের সে সবের পরিচয় গ্রামবাসীরা প্রত্যক্ষ ভাবে আশ্রম কৃষি-প্রদর্শনীতে পেয়ে থাকে।

বিভিন্ন শ্রেণীর সব্জী-বীজ ও চারা, ফুলের বীজ প্রভৃতি গ্রামবাসীর মধ্যে বিতরণ ও বিক্রয় করা হয়। গত শীতের সব্জী হিসাবে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, পালং, লেটুস, মূলা, গোল আলু, টমেটো, রসুন, বেগুন, মরিচ, লাউ, কুমড়া, পানিকচু, মানকচু প্রভৃতির চাষ করা হয়েছিল। তা ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর কলা, পেঁপে, শ্রীহট্টের আনারস, আক প্রভৃতির চাষ জমিতে ছিল। শীত-অন্তে গ্রীষ্ম-সব্জীর চাষের কাজ চলে। একই জমিতে একই সময়ে একাধিক ফসলের চাষ ও ফসলের হ্রাস-বৃদ্ধির পরীক্ষাদি কার্য্যও পরিচালিত হয়। জনৈকা প্রতিবেশিনীর একটি বাগান আশ্রমের রক্ষণাধীনে আছে।

এ ছাড়া আশ্রমের নিজ বাগানে আম, লিচু, কাঁঠাল ও নারিকেল প্রভৃতির কয়েকটি গাছ আছে যাদের ফলন বৃদ্ধির জন্য পরীক্ষামূলক নানাবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। গাছের কোনটাতে ফল হয় না, কোনটাতে হয়ে নষ্ট হয়, ফল পচে যায় বা ঝরে পড়ে যায়। কোনও কোনও গাছে নানা-প্রকারের কীট-পতঙ্গের উপদ্রব, পরগাছার উপদ্রব। এ সবের প্রতিকারমূলক ও প্রতিষেধাত্মক ব্যবস্থাদির পরীক্ষা-কার্য্যও পরিচালিত হয়। স্থানীয় লোকদের দৃষ্টি সর্ব্বদা এই সব পরীক্ষাকার্য্যের প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা সাগ্রহে কর্ম্মীদের সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনা করেন। বাখরগঞ্জ থানার সরকারী কৃষি আপিসের সহিত সর্ব্বদা যোগাযোগ রাখা হয়।

গ্রামের হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশিগণ আশ্রমকে কিছু বাঁশ ও সুপারি গাছ দিয়ে সাহায্য করেছেন। শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস তাঁর হাল-বলদও মধ্যে মধ্যে আশ্রমকে চাষের কাজের জন্যে দিয়েছেন।

২। চিকিৎসা-বিভাগ—দরিদ্র গ্রামবাসীদের চিকিৎসার্থ একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিভাগ খোলা হয়েছে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসার উপযোগী কার্ট এবং ঔষধপত্রও এখানে রাখা হয় এবং ১৩৫৪ সালে আশ্রমের প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় হতেই এই চিকিৎসা বিভাগ থেকে বিনামূল্যে এযাবৎ সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর রোগীকেই চিকিৎসা করা হয়েছে। আশ্রমের কোনও স্থায়ী ভাণ্ডার না থাকায় ও লোকের দানের উপরেই নির্ভর করতে হয় বলে সক্ষম ব্যক্তিদের নিকট থেকে বর্তমানে কিছু কিছু ঔষধমূল্য নেওয়া হয়। ঔষধমূল্যও বাজারের সাধারণ ব্যবসায়ী ডিস্‌পেন্সারীর ঔষধমূল্য অপেক্ষা অর্দ্ধেক কম ; কিন্তু এই মূল্যও গরীব কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের নিকট থেকে নেওয়া হয় না। ঢাকার জনৈক ডাক্তার বন্ধু আশ্রমকে কিছু ঔষধপত্র দিয়ে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

বাখরগঞ্জ থানার কতক এলাকায় কলেরা মহামারীর আকারে দেখা দেওয়ায় আশ্রম-সংলগ্ন গ্রামের জনসাধারণকে প্রতিষেধক ব্যবস্থাস্বরূপ সরকারের স্যানিটারী বিভাগের সহ-যোগিতায় আশ্রমের তরফে কর্ম্মীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে এন্টি-কলেরা ইন্‌জেকশন দিয়েছেন এবং সতর্কতামূলক ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয়ে জনসাধারণকে উপদেশ দান করেছেন। ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধও দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এজন্যে কর্ম্মীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে কাজ করতে অনেক সময় দিতে হয়েছে।

৩। মৌমাছি-পালন—আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশে মৌমাছি পালন কৃষক-গৃহস্থের একটি অবশ্যকরণীয় কাজ। মধু সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তারা এটা করে না, কৃষির ফসল উৎ-পাদন বৃদ্ধি অথবা ফুল ফলের পরাগ সংযোগের উৎকর্ষ সাধন হিসাবে সেদেশের এবং পাশ্চাত্যের আরও বহু অঞ্চলে কৃষক গৃহস্থেরা মৌমাছি পালনকে অপরিহার্য্য শিল্প হিসাবে অথবা কৃষির উপজাত শিল্প হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ভারত ডোমিনিয়ন ও পাকিস্থান কৃষিপ্রধান দেশ। কাজেই এ দেশে আরও বেশী করেই কৃষকদের পক্ষে মৌমাছি পালন আবশ্যক। গ্রামবাসীর মধ্যে মৌমাছি পালনের আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আশ্রমে কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছি পালনের কাজ সুরু করা হয়েছে। এই একটা নূতন বিষয়ে লোকের উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। মধু সংগ্রহের পদ্ধতি এদেশের সুন্দরবনের

প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়; আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কৃত্রিম মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করা হয়।

৪। হাঁস-মুরগী-কবুতর পালন—স্বাবলম্বনের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীগণের হাঁস, মুরগী ও কবুতর পালনের কাজ কিছুদিন হ'ল হাতে নেওয়া হয়েছে।

৫। বিদ্যালয়, পাঠাগার ও সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠানাদি—আশ্রম পরিচালনায় গান্ধীজী-পরিকল্পিত ওয়ার্ধা-পদ্ধতি অনুযায়ী একটি বিদ্যালয় চলছিল। বিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই শিক্ষা লাভ করত। কিন্তু পাকিস্থান সরকার এখনও বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তেমন আগ্রহশীল না হওয়ায় এবং অভিভাবকেরাও এর সমর্থক না থাকায় বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি সম্যকভাবে সুরু করায় অসুবিধা হচ্ছে। নানা দিক বিচার করে গত জানুয়ারী মাসে পূর্ব্ববঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পাঠ্যক্রমের সহিত সঙ্গতি রেখে কতক পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করা হয়, যাতে করে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে ভাবীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রম অনুসরণ করতে অসুবিধা বোধ না করে। সেই সঙ্গে সেলাই, কৃষি পরিচর্য্যা, সূতাকাটা, চরখা-সরঞ্জামের ব্যবহার ও গান্ধীজীর আদর্শে চরিত্র-গঠনের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষয়িত্রী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার নিয়েছেন।

বৎসরের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পর্ব্বদিনে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ ও কৃতী ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা উদ্যোগী হয়ে সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে। ঐ সব অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা চতুষ্পার্শ্বের গ্রামের হিন্দু-মুসলমান নরনারীকে যোগদানে আহ্বান করে। আবৃত্তি, প্রবন্ধাদি পাঠ, গান, শিক্ষাপ্রদ অভিনয়, প্রার্থনাসভা ও আলোচনাদির ভেতর দিয়ে তারা লোকশিক্ষা প্রচারে একটা বড় অংশ নিয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে একটি পাঠাগারও খোলা হয়েছে। বর্ষা ব্যতীত অন্যান্য ঋতুতে প্রতি শুক্রবারে ছেলেমেয়েরা সকালে প্রভাত ফেরী বের করে। প্রভাত ফেরী মানে গণ-সংযোগ। ছেলেমেয়েরা কতকটা সময় গ্রাম সাফ ও পথঘাট সংস্কারের কাজ করে। বিকালের দিকে বিশেষ প্রার্থনাসভা ও সূত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়।

কখনও কখনও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান বাড়ী থেকে প্রার্থনাসভা ও সূত্রযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ আসে এবং আশ্রমকর্মীরা ও বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা সকলে সোৎসাহে নিজ নিজ চরখা তকলী পাঁজ হাতে করে আহ্বায়কের বাড়ীতে উপস্থিত হন। সূত্রযজ্ঞ ও গ্রামের লোকের অর্থনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে বিস্তৃত আলাপ-আলোচনার পর প্রার্থনা সুরু হয়। আশ্রমের প্রার্থনা-পদ্ধতি গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত প্রার্থনারই অনুরূপ। সকল ধর্ম্মের প্রতিই সমান শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা গান্ধীগ্রাম সেবাশ্রমের আদর্শ।

৬। হরিজন উন্নয়ন—হরিজনদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিবিধান কর্ম্মসূচীর একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে জাগৃতির অভাব। যে দু-চার জন লোক এদের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে তাদের প্রায় সকলেই নিজেকে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হরিজনদের অনেকেরই আচার-ব্যবহার প্রায় অমার্জিত, নৈতিক ও আত্মিক জ্ঞানেও তারা অনেকেই প্রায় বঞ্চিত; আর সেই সব কারণেই সমান সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারীও তেমন হতে পারে না। তাই এদেরকে জাগ্রত ও শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। নিরন্তর সাহচর্য্য ও নৈতিক বুদ্ধি দান করে তাদেরকে সুশিক্ষিত করার চেষ্টা চলছে। তাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে একটা নৈশ বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে; ঘনিষ্ঠ ভাবে তাদের সঙ্গে মিশে তাদেরকে মর্য্যাদাসম্পন্ন নাগরিকের যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

হরিজন ছেলেমেয়েদের আশ্রম-বিদ্যালয়েই শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ণহিন্দু, হরিজন, মুসলমান ছেলেমেয়ে সকলেই এক সঙ্গে পড়াশুনা ও খেলা করে এবং এই সব ছেলেমেয়ের চরিত্রে বর্ণবিদ্বেষের-ভাব একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। আশা করা যায়, এরাই যখন সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে তখন হয়ত আজকার দুঃখকর মনোভাবের অবসান ঘটবে।

৭। সূতাকাটা—পূর্ব্ববঙ্গে বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বনের উপযোগী উপকরণের অপ্রতুল নেই। শিক্ষা ও আগ্রহের অভাবেই লোকে ঐ সব ব্যবস্থা কাজে লাগাতে অনিচ্ছুক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বস্ত্র বিষয়ে আরও বেশ বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতের মধ্যে গিয়ে আমরা পড়ছি। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, শিল্পপ্রধান নয়। কৃষক ব্যতীত বাকী লোকের কর্ম্ম চাই। সবাই কিছু ডাক্তার, মোক্তার, ব্যারিষ্টার হতে পারে না। কাজেই কুটীর-শিল্পের ব্যাপক প্রচলনে উদ্যোগী হলে আমাদের মধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের কর্ম্মসংস্থান হতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গ সরকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জোর চেষ্টা করছেন এদেশে সূতা ও কাপড়ের কল বসাবার জন্যে। আমরা বলি সূতা ও কাপড়ের কল না বসিয়ে অন্যান্য শিল্পের কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করা অনেক ভাল এবং সেটাই কাম্য। বস্ত্রশিল্পকে কেন্দ্রীভূত করার ভয়াবহতা সম্পর্কে গান্ধীজীর উক্তি আমাদের চোখের সামনে ভাসে। তিনি বলেছেন: "যন্ত্র-কলা ইউরোপকে ধ্বংস করতে আরম্ভ করেছে। ইংরেজদের দরজায় ধ্বংস করাঘাত করছে। আধুনিক সভ্যতার প্রধান প্রতীক যন্ত্র। যন্ত্র একটি মহাপাপস্বরূপ।

"বোম্বাইয়ের কলগুলোর কর্ম্মীরা গোলাম সেজেছে। কলে যে সব মেয়ে কাজ করে তাদের অবস্থা কি ভয়াবহ। যখন কোনও কল ছিল না তখন এই সব মেয়েকে অনাহারে থাকতে হয় নি। আমাদের দেশে যদি এই যান্ত্রিক উন্নততা বেড়ে চলে, তা হলে এই দেশ অসুখী দেশে পরিণত হবে।... কিন্তু আমি বলতে বাধ্য যে, ভারতবর্ষে মিলের সংখ্যা বাড়ানোর চাইতে ম্যানচেষ্টারে টাকা পাঠিয়ে কিনকিনে পাতলা ম্যানচেষ্টার-কাপড় এনে ব্যবহার করা অনেক ভাল। ম্যানচেষ্টার-কাপড় ব্যবহার করে আমরা কেবল পয়সাই নষ্ট করি, কিন্তু ভারতবর্ষে ম্যানচেষ্টার সৃষ্টি করে আমাদের রক্তের বিনিময়ে আমাদিগকে ধন রক্ষা করতে হবে। কেননা আমাদের নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি নষ্ট হবে...। নিঃস্ব ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে পারে, কিন্তু আবার ভারতবর্ষের পক্ষে এটা কঠিন হবে যে দুর্নীতির ভেতর দিয়ে ধনবান হয়ে সে তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবে।"

গান্ধীজীর এই সাবধানবাণী সম্মুখে রেখে গান্ধীগ্রাম সেবাশ্রম গ্রামের ভেতরে চরখা প্রবর্ত্তনের কাজ করে আসছেন। পূর্ব্ববঙ্গে তুলার অভাব নেই, এই কাজে কতকগুলি গঠনমূলক অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানও আছে। কিন্তু আবশ্যক অর্থ এবং লোকের নৈতিক শিক্ষা ও শ্রমশীলতার অভাবে আমাদের কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হচ্ছে না। সরকার আগ্রহশীল হলে এই সব প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য দান করে বস্ত্র-স্বাবলম্বনের তথা কুটির-শিল্প প্রবর্ত্তনের কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারেন।

এই উদ্দেশ্যে আশ্রম থেকে গ্রামের প্রতিটি হিন্দু মুসলমান বাড়ীতে কার্পাস তুলার বীজ বিতরণ করা হয়েছে। ১৬টি বাড়ীতে ১৪১৪টি বীজ দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে বাড়ী বাড়ী বসে বীজ হতে তুলা পৃথক করা থেকে আরম্ভ করে সুতাকাটা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করা হয়েছে। গ্রামের নরনারী বালকবালিকা সকলের মধ্যেই এ বিষয়ে একটা উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। চরখার অর্থনৈতিক দিকটা তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

গ্রামের কয়েকটি পরিবারে চরখায় সুতাকাটায় আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে এবং আশ্রম থেকে তাদের বহুম-তকলী করে দেওয়া হয়েছে। বাঁশের চরখা ও বহুম-তকলী গ্রামেই নিজেরা করে নিতে পারা যায়। অতি সহজ যন্ত্র। তৈরিতে বা ক্রয়ে বেশী কিছু ব্যয়ের প্রশ্ন নেই।

৮। রাস্তা নির্ম্মাণ—বেবাজ গ্রামে আশ্রমের চেষ্টায় এ বছর একটি নূতন রাস্তা তৈরি হয়েছে। রাস্তাটি দৈর্ঘ্যে ৩১১৪ হাত। তার মধ্যে ৮০০ হাতের কিছু অধিক স্বেচ্ছাশ্রমে ও ১৭০৩ হাত ক্রীতশ্রমে বাঁধা। এই রাস্তার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের নিকট থেকে ৮০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গেছে; গ্রামের জনাব হাতেমভাই হাওলাদার ও জনাব মহম্মদ হাওলাদার আট টাকা করে ষোল টাকা ও জনাব এছাহক হাওলাদার প্রতিশ্রুত নয় টাকার মধ্যে দুই টাকা সাহায্য করেছেন।

এই প্রসঙ্গে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে শ্রীগদাচরণ কাইতের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর উদ্যম ও সহযোগিতা না পেলে এই দীর্ঘ রাস্তাটি সম্পন্ন হওয়া খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার হ'ত।

এই রাস্তা ছাড়া বেবাজ-কলসকাটি জেলাবোর্ডের রাস্তাটি গত বছরে আশ্রম থেকে পৌনে তিন শত টাকা ব্যয়ে মেরামত করা হয়েছে। ঐ রাস্তায় বর্ষাকালে চলাফেরা করা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। নিতান্ত জরুরী ব্যাপার ছাড়া লোক পথে বেরুত না। ঐ রাস্তাটি এ বছরে আশ্রমকর্ম্মীরা গ্রামের ছোট ছেলেদের নিয়ে মেরামত করেছে। আশ্রম থেকে টাকা দিয়ে কিছু মাটিও এবার দেওয়া হয়েছে এবং কতকটা অংশ পাকা করা হয়েছে। সমগ্র অংশই পাকা করার ইচ্ছা আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষের আছে। কিন্তু আশ্রমের সম্বল বলতে একমাত্র ভিক্ষাবৃত্তি।

তবে এই অনিশ্চিত সম্বলের উপর নির্ভর করার অনেক অসুবিধা ও বিপদ আছে। এইজন্য আশ্রমকর্ম্মীরা চেষ্টা করছেন কেমন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে এই সব সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান বজায় রাখতে পারা যায়। পূর্ব্ববঙ্গ সরকার যদি কিছু আর্থিক সাহায্য করেন তবে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের মারফতে রাষ্ট্রের তথা জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধিমূলক আরও বহু কাজ করা সম্ভব হবে বলে আশা করি।

হেলসিঙ্কির প্রবেশ-মুখ। ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের দ্বীপাবলী নবাগতদের যেন অভিনন্দন জানাইতেছে

হেলসিঙ্কি

ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে এবারকার অলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই অনুষ্ঠান আগামী ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত চলিবে। এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতেও ফুটবল, হকি, ওয়াটারপোলো প্রভৃতি বিভিন্ন টিমের খেলোয়াড়দল এবং মুষ্টিযোদ্ধা, সাঁতারু ও কুস্তিগীরেরা হেলসিঙ্কিতে গিয়া পৌছিয়াছেন। এ ক্রীড়ানুষ্ঠানে যে দুইটি মেয়ে সন্তরণে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতে গিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের শ্রীমতী আরতি সাহা তাঁহাদের অন্যতমা। এতদুপলক্ষে হেলসিঙ্কিতে দুই লক্ষেরও অধিক দর্শক সমাগম হইবে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

অগণিত হ্রদ, সমুদ্রগর্ভস্থ অসংখ্য দ্বীপমালা ইত্যাদির সমাবেশে ফিনল্যাণ্ড প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন। এখানকার বল্গাহরিণ-চালিত স্লেজগাড়ী আর মেরুপ্রদেশের ভল্লুকের কথা আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে। প্রধানতঃ বিমানযোগে অথবা রেলপথে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহোম হইয়া ফিনল্যাণ্ডে যাইতে হয়। জলপথে ষ্টকহোম হইতে হেলসিঙ্কিতে যাইতে লাগে তেইশ ঘণ্টা। কোপেনহেগেন, হামবুর্গ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্যারিস এবং মস্কো হইতেও সরাসরি বিমানপথে হেলসিঙ্কি পৌছানো যায়।

উত্তর দিক হইতে আর একটি রাস্তা টৌর্নিওর হেপারাণ্ডা হইয়া হেলসিঙ্কিতে গিয়াছে। এই রাস্তায় গেলে ল্যাপল্যাণ্ড সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে। তুষারাবৃত প্রান্তর, ইতস্ততঃ বিচরণশীল বল্গা হরিণের পাল, স্যামোন মৎস্যে পরিপূর্ণ নদীসমূহ—এই সকল দৃশ্যবৈচিত্র্য ভ্রমণকারীর মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে।

হেলসিঙ্কির আয়তন ৬৪ বর্গমাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা চার লক্ষ। সুতরাং ইহা একটি বৃহৎ নগরী বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য মহানগরীর ন্যায় প্রকৃতির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। শহরটি প্রায় চারিদিকেই সাগরদ্বারা বেষ্টিত।

জুলাই ও আগষ্ট এই দুইটি মাস হেলসিঙ্কির গ্রীষ্মকাল। এই সময় এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নয়নমনমুগ্ধকর। গ্রীষ্মঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই শহরের পথিপার্শ্বস্থ এবং উদ্যানসমূহের অগণিত তরুরাজি প্রচুর শ্যামল পত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, নির্ম্মল বাতাস দেহে বুলাইয়া দেয় স্নিগ্ধ স্পর্শ। এখানকার আকাশ স্বচ্ছ সুনীল—কারখানার ধূমে কলঙ্কিত নহে এবং বায়ু বিশ্রী গন্ধে ভারাক্রান্ত নহে। শহরের যে-কোন উচ্চ অট্টালিকার ছাদে উঠিয়া নিম্নাভিমুখে তাকাইলে দীপমালায় খচিত সাগরসমূহের বারিরাশির অনন্ত বিস্তার এবং সুবিস্তীর্ণ স্থলভূমিতে দিগন্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত বনভূমির শ্যাম সমারোহে বিস্মিত বিমুগ্ধ হইতে হয়।

সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি পার্ক, খেলার মাঠ, ব্যায়াম-

প্রাঙ্গণ ইত্যাদি লইয়া হেলসিঙ্কি রীতিমত গৌরববোধ করিতে পারে। অলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রায় সবগুলিই ব্যবহৃত হইবে। শহরটি সুপরিকল্পিত ভাবে নির্মিত এবং গৃহাদি নির্মাণের সময় বাড়ী ও রাস্তার উপরকার গাছপালা যতদূর সম্ভব কম বিনষ্ট করা হইয়াছে।

বিবাহ-নাটকের একটি দৃশ্য। ক্রন্দনরতা বর্ষ-মাতা কন্যেকে ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। কন্যেও ক্রন্দন করিতে থাকে

যে ষ্টেডিয়ামে ক্রীড়াদি অনুষ্ঠিত হইবে তাহা শহরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ষ্টেডিয়ামের পরেই যে পার্কটির কথা উল্লেখযোগ্য তাহার নাম ইলাইনটাাী অথবা 'জু'। আসল চিড়িয়াখানাটি কিন্তু কোরকিয়াসারি (উচ্চ দ্বীপে) অবস্থিত।

শহরের উপকণ্ঠে বারিরাশির উপর যে অগণিত দ্বীপমালা বিদ্যমান কোরকিয়াসারি তাহাদেরই অন্যতম। শহরের ঠিক মাঝখানটিতে অবস্থিত একটি পোস্তা হইতে নৌকাযোগে দশ মিনিটে ঐ স্থানে পৌঁছিতে পারা যায়। সিউরাসারি (সোসাইটি আইল্যাণ্ড) দ্বীপের প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদিও দেশের সমুদয় অঞ্চলের অধিবাসীদের আকৃষ্ট করিয়া থাকে। শহরবাসীরা মাঝে মাঝে ছুটির দিনে নগরের বহিঃস্থ মিউজিয়মে গিয়া সেখানকার গোলাবাড়ী, কাঠের তৈরি কুটীর, তালুকদারের বাটী, নৌকার ছাউনি এবং কাঠের গীর্জা ইত্যাদি দেখিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করে। ফলে গ্রামাঞ্চলে না গেলেও পল্লীজীবনের বৈচিত্র্যের স্পর্শে তাহাদের কর্মক্লান্ত দেহমন চাঙ্গা হইয়া উঠে।

হেলসিঙ্কির চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান গ্রীষ্মকালে ভ্রমণ, পিকনিক ইত্যাদির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। নগর-প্রান্তের অনতিদূরে এমন সব চমৎকার বিস্তীর্ণ খোলা জায়গা আছে যেখানে ক্যাম্প করিয়া থাকা যায়। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ রাজধানীর বাহিরে গ্রামাঞ্চলে রাত্রিবাসের আশ্রয়স্থল নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া এইরূপ প্রমোদভ্রমণে উৎসাহ প্রদান করেন। সমুদ্রস্নান এবং গৃহের বাহিরে সাধারণ স্নানাগারে স্নানাদিরও যথোচিত ব্যবস্থা আছে।

জাতীয় ক্রীড়া স্কি-দৌড়ের জন্য প্রস্তুতি

নগরোপকণ্ঠে বহুসংখ্যক কুটিরসমন্বিত এমন সব উপনিবেশ আছে, যেখানে শহরবাসীরা রোজ অপরাহ্ণকাল এবং সপ্তাহান্তিক ছুটির দিন কাটাইতে পারে নিজেদের ক্ষুদ্রায়তন জমি চাষ করিয়া। তা ছাড়া হাজার হাজার নাগরিক সপ্তাহান্তিক ছুটি এবং অবসর-সময় যাপন করে সাগরের বুকে মাছ ধরিয়া, নৌকা বাহিয়া অথবা মনুষ্য-অনধ্যুষিত দ্বীপে ক্যাম্প নির্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া। টেনিস এবং অনুরূপ অন্যান্য জনপ্রিয় ক্রীড়াদিও হেলসিঙ্কির নাগরিকদের গ্রীষ্মকালীন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

শীতকালে ফিনল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য প্রান্তর তুষারাবৃত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। ফিনিস ছেলেরা তখন তুষারের উপর স্কি ক্রীড়ার জন্য এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে। শীতের শেষভাগে মেরুপ্রদেশের প্রকৃতি যখন শুভ্র বসনে নিজের দেহ আচ্ছাদিত করে তখন ফিনিস

স্কুলগুলিকে স্কি-ক্রীড়া উপলক্ষে ছুটি দেওয়া হয়। স্কুলের ছাত্র, বাড়ীর গৃহিণী, এমন কি আপিসের কর্ম্মচারীদের দ্বারা পর্য্যন্ত বোঝাই ট্রেনগুলি স্কি-ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের অভিমুখে রওনা হয়। কোনো কোনো সমিতি ল্যাপল্যাণ্ড অথবা মধ্য-ফিনল্যাণ্ডের এতদঞ্চলে ভ্রমণের ব্যবস্থা করে। হেলসিঙ্কির শহরতলীস্থ তুষার-প্রান্তরেও নিয়মিত ভাবে স্কি-ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। হেলসিঙ্কি হইতে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরবর্ত্তী এক স্থানে, একটি হ্রদের তীরে 'ফিনল্যাণ্ডিয়া পিক্টরিয়্যাল' নামক কাগজের স্বত্বাধিকারীদের একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ আছে। কোম্পানির জনৈক কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে, 'কোম্পানী বালকসঙ্ঘে'র সভ্যেরা স্কি-এর ছুটি উপলক্ষে ওখানে গিয়া সকলে মিলিয়া একত্রে ঐ গৃহে মনের আনন্দে অবস্থান করে এবং স্কি-প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

১৯৪৭ সনের উৎসব-ক্রীড়ায় যোগদানকারীদের মিছিল
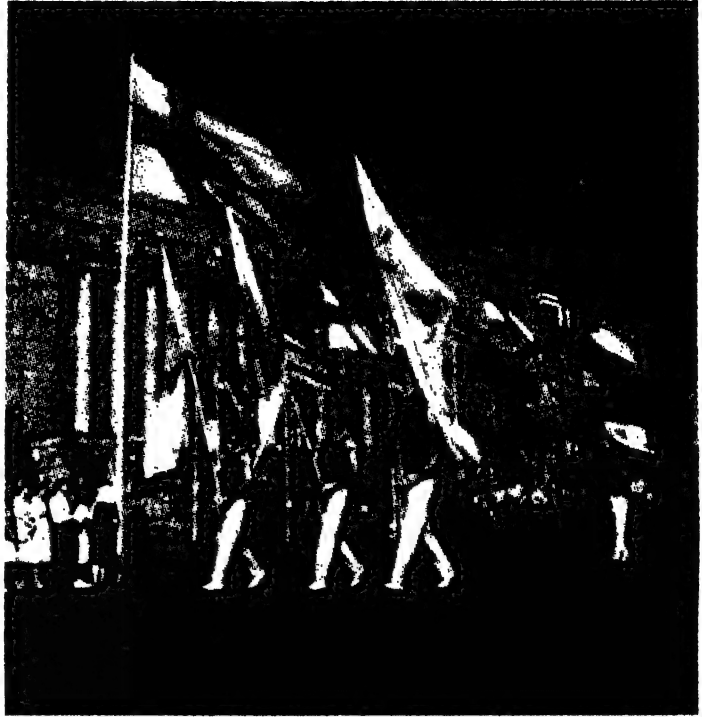
ফিনল্যাণ্ডের পূর্ব্বভাগের গ্রামাঞ্চলে গত শতাব্দীর শেষভাগে যে ধরণের বিবাহ-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইত তদনুরূপ অনুষ্ঠানের অভিনয় কিছুকাল আগে একদল কারেলিয়ান কর্ত্তৃক হেলসিঙ্কির এগজিবিশন হলে উৎসাহী দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। অনুষ্ঠানটি বড়ই চিত্তাকর্ষক।

বিবাহ-নাটকের যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-মাতার পাশাপাশি মন্থর পদক্ষেপে রঙ্গমঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইল কনে'। কিছুক্ষণ পরেই কনে'র ধর্ম্ম-মাতা একেবারে উচ্ছ্বসিতভাবে কান্না জুড়িয়া দিলে—কনেও পিতৃগৃহ হইতে চিরতরে বিদায় লইয়া যাইবার প্রাক্কালে আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। কনে' যদি এই উপলক্ষ্যে না কাঁদে তাহা হইলে নূতন গৃহে যাইয়া সে নাকি সুখী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য। স্থান কনে'র বাড়ী। বরপক্ষের লোকেরা সেখানে হাজির হইয়াছে, কন্যাপক্ষীয়েরা নানা ভেট দিয়া তাদের আপ্যায়িত করিতেছে। পাত্রপক্ষের মুখপাত্রকে একটি কোর্ত্তা উপহার দেওয়া হইল। তিনি উহা গায়ে দিলে পর কন্যাপক্ষের এক জন বর্ষীয়সী মহিলা প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী কোর্ত্তার উপর তাঁহার কোমরে একটি বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া দিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য। স্থান ভোজনাগার। ডিনার টেবিলের উপর ভোজনপাত্রে অনেকগুলি কেক সংস্থাপিত। অভ্যাগত যথারীতি স্বাগত করা হইল। তারপর বরের পিতা ও কনে'র পিতা করমর্দ্দন দ্বারা এই বিবাহে পারস্পরিক সম্মতি প্রদান করিলেন এবং এই মিলন যাহাতে স্থায়ী হয় সেজন্য একে অপরের কোর্ত্তার প্রান্ত হস্তদ্বারা ধারণপূর্ব্বক স্মিত হাস্যে পরস্পরের পানে তাকাইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই এই নাটকের উপর যবনিকাপাত হইল।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে হেলসিঙ্কিতে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্য যখন এই অনুষ্ঠান প্রত্যাহৃত হইল তখন এখানকার ক্রীড়ানুরাগী নাগরিকদের মন নৈরাশ্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তার পর হইতেই তাহারা কবে হেলসিঙ্কিতে বাস্তবিকই অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হইবে আকুল আগ্রহে সেই শুভদিনটির প্রতীক্ষা করিতেছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা অলিম্পিক ড্রেস রিহার্সেলের মত একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, তদুপলক্ষে

হেলসিঙ্কিতে বিবিধ ক্রীড়াকৌশলাদি প্রদর্শিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে বহু সহস্র মল্ল ও ব্যায়ামবীর—তন্মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই ছিল—যোগদান করে।

আজ হেলসিঙ্কিবাসীদের দীর্ঘকালপোষিত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে চলিয়াছে। হেলসিঙ্কি ১৯৫২ সালের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচিত হওয়ায় সেখানকার নাগরিকেরা নবীন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পথে যে সকল প্রতিবন্ধক বিদ্যমান তৎসমুদয় অপসারিত করিতে আজ তাহারা বদ্ধপরিকর। উৎসবসজ্জায় সজ্জিত পরিচ্ছন্ন হেলসিঙ্কি নগরী আজ অপরূপ শ্রীমণ্ডিত—অলিম্পিক অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার আয়োজন আজ সেখানে নিখুঁত এবং পূর্ণাঙ্গ।*

* শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র কর্তৃক সংকলিত।

অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-কৌশল

শ্রীগীতা মিত্র ও ক্যাপ্টেন শ্রী আর. ডি. মিত্র

বর্ত্তমানে রন্ধনপ্রণালী, খাদ্যের পুষ্টিকারিতা ও পুষ্টিহীনতা জনিত রোগ সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা আছে। রন্ধনক্রিয়ায় কি প্রকারে খাদ্যের পুষ্টিকারিতা, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় সেই সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু খাদ্যের পরিচ্ছন্নতা, রন্ধনগৃহের ও রন্ধনকারীর পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে রাখিতে হইবে এই সকল বিষয়ের উপরও আমাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

যদিও আমাদের দেশে বর্ত্তমানে জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার লাভ করিয়াছে, তথাপি এখনও দেশে মলমূত্রের দ্বারা বহুপ্রকার ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া থাকে। নিম্নবঙ্গে ও গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী প্রদেশসমূহে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব এখনও বর্ত্তমান। এই অবস্থার অন্যতম কারণ জনসাধারণের রন্ধনপ্রণালীর অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। এই সম্বন্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর রন্ধনগৃহের পরিচ্ছন্নতাবিষয়ক নির্দ্দেশে কিছু পরিমাণ আলোকপাত করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা সকলের পক্ষে সহজলভ্য নহে।

সৈন্যবাহিনীর বাহিরে এই সম্বন্ধীয় নির্দ্দেশ বিরল; গত মহাযুদ্ধে বহু নগরীর অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর হোটেলে ও রেস্তোরাঁয় সৈন্যদের খাদ্যগ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রন্ধনগৃহের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিতে হইলে বিশেষ ধরণের নির্দ্দেশ ও নিয়মাবলীর প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি সহজ, সরল ও প্রতিপাল্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, যাহাতে লোকে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নিয়মগুলি মানিয়া চলে। এই নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও সাধারণ হাসপাতালের রন্ধনপ্রণালী পরীক্ষা করা হয়। পুণা, কলিকাতা ও দিল্লী প্রভৃতি নগরীর প্রসিদ্ধ হোটেলসমূহে গিয়া তাহাদের রন্ধনব্যবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। এই অনাড়ম্বর, ব্যবহারিক নিয়মগুলিতে যে পন্থা আপাততঃ দেখিতে ভাল, অথচ সহজ প্রতিপাল্য নহে, তাহার উল্লেখ নাই।

রন্ধনশালা ও তাহার চারি ধার

(১) রন্ধনশালার চারি ধার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে প্রত্যহ রন্ধন-কক্ষ ও ভোজন-কক্ষ ঝাঁট দিতে হইবে। 'পাপোস' হইতে ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। প্রত্যেক বার আহারের শেষে ঝাঁট দিয়া ধূলা না উড়াইয়া ভিজা ঝাড়ন দিয়া রন্ধনশালা ও ভোজনকক্ষ মুছিয়া লইতে হইবে। মেঝে পাকা হইলে রাত্রে গরম জল ও সোডা দিয়া ধুইতে হইবে।

(২) রন্ধনশালায় বা উহার নিকট ধূমপান, থুথু ফেলা ও নাক পরিষ্কার করা নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) ভুক্তাবশেষ বা তরিতরকারির খোসা ফেলিবার পাত্র পরিষ্কার রাখিতে হইবে, অন্যথায় মাছি জন্মাইতে পারে।

(৪) নিয়োগের পূর্ব্বে রাঁধুনী ও রন্ধনশালার অন্যান্য লোকেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক নূতন লোকের পূর্ব্বরোগ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে। পেটের অসুখ বা যৌনব্যাধিগ্রস্ত লোককে কিংবা কেহ দুই বৎসরের মধ্যে টাইফয়েড, প্যারা-টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া থাকিলে তাহাকে ভোজনালয়-সংক্রান্ত কোনও কাজে নিয়োগ করা চলিবে না।

(৫) রন্ধনশালার লোকেদের একটি তালিকা রাখিতে হইবে, তাহাতে নাম-ধাম, নিয়োগের তারিখ, শেষ ডাক্তারী পরীক্ষার তারিখ, পরবর্ত্তী ডাক্তারী পরীক্ষার দিন, টিকা লওয়ার তারিখ এবং পরে আবার যে তারিখে টিকা লইতে হইবে, তাহা লিখিত থাকিবে। যে তারিখে পরবর্ত্তী ডাক্তারী পরীক্ষা হইবে অথবা টিকা লইতে হইবে, তাহা প্রথমে পেন্সিলে লিখিতে হইবে এবং পরে

পরীক্ষাদি হইয়া গেলে পেন্সিলের লেখার উপর কালি দিয়া লিখিতে হইবে। এই তালিকাখানি রন্ধনগৃহের প্রবেশ-পথের নিকটবর্ত্তী দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেকের নামে নামে কাজ ভাগ করিয়া দিতে হইবে—যেমন রান্না, শাকসব্জী কাটা, রান্নাঘরের 'ন্যাতা' ঝাড়নাদি পরিষ্কার করা ইত্যাদি।

খাদ্যদ্রব্য ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি

(৭) প্রত্যহ রান্নার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য রান্নাঘরে রাখা হইবে না। তাহা জাল-দেওয়া আলমারী বা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা উচিত।

(৮) যে শাকসব্জী কাঁচা খাওয়া হইবে তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে ধুইতে হইবে :—(ক) দ্রুত ধারায় পড়িতেছে এইরূপ জলে উত্তমরূপে ধুইতে হইবে, (খ) পরিষ্কার জলে প্রতি গ্যালনে এক চামচ বীজাণুমুক্ত করিবার পাউডার (water-sterilising powder) মিশাইয়া পাঁচ মিনিট ডুবাইয়া রাখিতে হইবে।

(৯) পুনরায় স্বচ্ছ জলধারায় ধুইতে হইবে। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে শাকসব্জীর ভিটামিন বা খনিজ পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়—এই ধারণা ভ্রমাত্মক। কলেরা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি ব্যাধির প্রতিষেধের নিমিত্ত উপরোক্ত পন্থা প্রত্যহ অবশ্য অবলম্বন করা উচিত। মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলেই যে এই নিয়ম পালন করিতে হইবে তাহা নহে।

(১০) কাষ্ঠখণ্ডের উপর মাংস কাটা উচিত। চপিং ব্লক গরম সোডার জলে বুরুশ দিয়া ধুইয়া, শুষ্কভাবে মুছিয়া, মিহি লবণের গুঁড়ার দ্বারা প্রত্যহ আবৃত করিয়া রাখা উচিত। রাঁধুনীদের হাত মোছা গামছা, পাক-করা খাদ্য ঢাকিবার ঝাড়ন সোডার জলে ফুটান উচিত। অন্য সকল ঝাড়ন ও ন্যাতা যাহা রান্নাঘরে ব্যবহার করা হয়, তাহা প্রত্যহ কলের জলে ধোয়া উচিত ও সপ্তাহে একটি নির্দ্ধারিত দিনে সোডার জলে ফুটান উচিত। ধোয়া কাপড়গুলি সম্পূর্ণ শুকান উচিত।

(১১) বাসনপত্র পরিষ্কার ভাবে ধুইয়া শুষ্ক কাপড়ের টুকরা দ্বারা মুছিয়া আলো-বাতাসময় ঘরের শেলফের উপর অথবা আলমারীতে উপুড় করিয়া রাখা উচিত। সকল বাসনের পরিচ্ছন্নতা সকালে ব্যবহারের পূর্ব্বে ও রাত্রে মাজিবার পর পরীক্ষা করিতে হইবে। রান্নাঘরের যাবতীয় তৈজসপত্র যথা কিমার যন্ত্র, চপিং ব্লক, টেবিল, ছুরি, চামচ ও রান্নার বাসন এবং বাসন ধুইবার স্থান সব সময় পরিষ্কার থাকিবে ও কাজের শেষে উত্তমরূপে মাজিয়া রাখিতে হইবে।

কিমা করিবার যন্ত্র ব্যবহার না করাই ভাল। ইহা ও বাসন ধুইবার স্থান গরম জল এবং সোডা দিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া, মুছিয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক করিতে হইবে। অন্য সব দ্রব্য সাবান ও গরম জলে ধুইলেই চলিবে।

(১২) তেল-ঘি ছাড়াইবার নিমিত্ত বাসন প্রথমে গরম জলে উত্তমরূপে ডুবানো উচিত ; সোডা, ছাই কিংবা পোড়ামাটি দিয়া মাজিয়া জলের ধারায় ধোওয়া উচিত। একটি বড় ড্রামে কিংবা অন্য পাত্রে অনবরত জল গরম করিতে হইবে, ফুটন্ত জলে ভাসমান তৈলাক্ত পদার্থ ঘন ঘন ছাঁকিয়া ফেলিতে হইবে। ছোট জিনিষ গরম জলে ডুবাইবার জন্য একপ্রকার জলের সাজি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ছাই পরিষ্কারভাবে নির্দ্দিষ্ট টিনে রাখা উচিত। তৈলাক্ত বাসন মাজিবার জন্য নয় ভাগ পোড়ামাটির সহিত এক ভাগ সোডা মিশ্রিত করা বাঞ্ছনীয়। চীনামাটির পাত্রের জন্য শুধু সোডা ব্যবহার করা উচিত।

(১৩) ইঁদুর, আরশুলা ও মাছি রান্নাঘরে থাকিবে না।

ইঁদুর যে শুধু প্লেগের বীজাণু বহন করে তাহাই নহে। ইহারা 'টাইফাস্' ও পালাজ্বরের বীজাণুও বহন করে। ইঁদুরের বিষ্ঠায় এক প্রকার কৃমির ডিম প্রচুর পরিমাণে থাকে ; খাদ্যদ্রব্যের সহিত এই বিষ্ঠা পেটে ঢুকিলে উপরোক্ত কৃমি মানুষকে রোগাক্রান্ত করে।

আরশুলা—অনেকে জানেন না যে, আরশুলা মলমূত্র দ্বারা সংক্রামিত রোগের একটি প্রধান বাহন। আরশুলা বিষ্ঠা ও বমির উপর বিচরণ করে। কলেরা ও আমাশয় রোগের বীজাণু উদরসাৎ করিয়া আরশুলা এই বীজাণু ত্যাগ করে। ইহা ছাড়াও এই রোগের কোটি কোটি বীজাণু ইহাদের গায়ে ও পায়ে লাগিয়া থাকার জন্য তাহা অনায়াসে খাদ্যদ্রব্যে সংক্রামিত হয়।

মাছি—মাছি টাইফয়েড্, কলেরা, যক্ষ্মা, আমাশয় ও উদরাময়ের বীজাণু খাদ্যে সংক্রামিত করে।

(১৪) রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত নিয়ম যত সামান্যভাবেই কেহ লঙ্ঘন করুক না কেন, নিয়মভঙ্গের জন্য কঠোর ব্যবস্থা রাখিলে নিয়মানুবর্ত্তিতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

তৃতীয় বিশ্বস্বাস্থ্য-সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ কে. ইভাং তাঁহার ভাষণে সত্যই বলিয়াছেন যে, আজকাল জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে অজ্ঞতা নহে, বরং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগের অভাবই বহুলপরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। রোগের প্রতিষেধ অথবা চিকিৎসা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যাহা কিছু জানা আছে, তাহার এক-দশমাংশও যদি জনসাধারণের মধ্যে সুচারুরূপে পরিবেশন করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে বিশ্বের জনসাধারণের জীবনধারা আজ ভিন্নপ্রকার হইত।

মা-স-য়িন্

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত

বার্মা সিন্ডিকেট কোম্পানীর বিরাট কারখানাটি ইরাবতী নদীর কোল-ঘেঁসে অবস্থিত। মান্দালয়-রেঙ্গুন যাতায়াতের পথে ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানীর বাষ্পীয় পোতগুলি যখন জলদ-গম্ভীর বংশীধ্বনি করিতে করিতে কারখানার ঘাটে আসিয়া ঠেকিত, মাউঙ্ পো-সিন্ তখন তাহার লাল রেশমী লোঙ্গী-খানা কোমরে আঁটিতে আঁটিতে বালির ঢালু চড়ার উপর দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিত। সিন্ডিকেটের ভারী ভারী বস্তাগুলো নম্বর মিলাইয়া গণিয়া জাহাজে তুলিয়া দিবার ভার তাহার উপর ছিল। দশ মিনিটের মধ্যে অসংখ্য বস্তা উঠাইয়া দেওয়া, হিসাব নির্ভুল রাখা, মাদ্রাজী সাহেবকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দেওয়া যতক্ষণ না শেষ হইত, ততক্ষণ হাজার ডাকেও পো-সিনের কেহ সাড়া পাইত না। মা-স-য়িন্ জাহাজ ঘাটের কাছে একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া বালির উপর নুড়ির সাহায্যে আপন মনে কত কি ছবি আঁকিয়া যাইত। দৃষ্টি তাহার দিগন্ত-প্রসারিত নদী ও আকাশের মিলন-নীলিমায়। নদী ও পাহাড়ের কোলেই তাহার জন্ম, এ পুরাতন দৃশ্য সে জন্ম হইতে নিয়তই দেখিতেছে, তবু প্রতিদিনই তার চোখে কি যে এক নূতন আবেশ আনিয়া দেয়, চাহিয়া চাহিয়া যেন তার আশ মেটে না, মনকে তার "সুদূরের পিয়াসী" করিয়া তোলে।

পো-সিন চমক ভাঙাইয়া দিয়া বলে, 'নয়ে, চল্ মা-স-য়িন্, এক পেয়ালা চা না পেলে আর গলা দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না।'

মা-স-য়িন্ আনমনে বলে 'পী-বি-লা?' অর্থাৎ 'শেষ হ'ল?'

দু'জনে গল্প করিতে করিতে বালি-সমুদ্র পার হইয়া চড়াই ভাঙিয়া উপরে উঠিতে থাকে। আশেপাশের লোক উহাদের শুনাইয়া বলে—

'ভাল যেন আর কেউ বাসে না! বাপরে বাপ, এই ঠেকো রোদ্দুরে স্বামী না হয় চাকরীর খাতিরে এতখানি পথ ছুটে আসে, বউটার কি পাগলামি, মেয়েমানুষ রোদে পুড়ে রোজ রোজ জাহাজঘাটার গরম বালিতে পা পুড়িয়ে মরবার দরকার কি বাপু? চোখে-চোখে না চললে যেন আর প্রাণ ভরে না।'

পো-সিন্ স্ত্রীকে ঠেলা দিয়া বলে, 'শুন্‌ছিস্ কি বলে সবাই?'

মা-স-য়িনের চোখে তখনও সুদূরের নেশা, কিছুই সে শোনে নাই। স্বামীর দিকে চাহিয়া বলে—জাহাজটার বাঁশী যেন আমার কানে লেগেই আছে, মনে হয় কোন্ সুদূর হতে আমায় ডাকছে, আমার মনটাও সাড়া দেয় যাই, যাই।

পো-সিন্ বিমর্ষ ভাবে বলে, 'আমি ভাবতুম তুই আমার সঙ্গ পাবার জন্য বুঝি রোজ রোজ এখানে আসিস্, এখন দেখছি জাহাজের বাঁশীর সুরই তোকে পাগল করে, কোন দিন আমাকে ফেলে চলে যাবি না ত?'

মা-স-য়িন্ পো-সিনের কাঁধে হাতখানা রাখিয়া বলে, 'না না, তোকে ফেলে আমি কোথাও গিয়ে সুখ পাব না, সে ভয় করিস না।'

টুন-ডাউঙ পাহাড়ের নীচে খানিকটা সমতল জায়গায় সারি সারি কাঠের ব্যারাক, তাহারই একটি অংশে দুইখানি ঘর ও এক ফালি বারান্দা লইয়া পো-সিন্-দম্পতির বাস। বারাণ্ডার রেলিঙের উপর কাঠের ব্র্যাকেটের সারি সারি কয়েকটি ফুল গাছের টব, লাল টালির ছাদের কিনারা হইতে তারে ঝোলান অর্কিডের গুচ্ছ। গৃহটি সঙ্কীর্ণ হইলেও সাজে, সজ্জায়, পরিচ্ছন্নতায় গৃহস্থের অন্তর্মাধুর্য্যের পরিচয় দেয়।

পো-সিনের ঘরের পশ্চাতে বিরাট একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ। লাল ফুলের স্তবক যখন সবুজ পাতাকে ঝরাইয়া দিয়া আগুনের ঝলকের মত চারিদিকের আকাশকেও রক্তবর্ণে রাঙাইয়া দেয়, মা-স-য়িনের মন তখন আর ঘরের কাজে বসে না, কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছুটিয়া বাহিরে আসে, আর ঝরা ফুলের একটি ছোট্ট গুচ্ছ কবরীর এক পাশে গুঁজিয়া দিয়া আনন্দে শিশুর মত করতালি দিয়া গান ধরে।

পো-সিন্ বলে, 'তুই কি পাগল হয়ে যাবি নাকি? সারা-দিন গাছতলায় গান গেয়ে বেড়ালে কি সংসারের কাজ চলে?'

মা-স-য়িন্ একদিন গম্ভীর স্বরে বলে, 'জান, কো-সিন্*, এই গাছটায় এক জন নাট্ (প্রেত দেবতা) আছে, সে আমায় ডাকে, কেবল ডাকে, তার ডাকে আমি ছুটে আসতে বাধ্য হই, আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যে এই গাছতলায় পূজো, নৈবেদ্য দিই, একে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে। আমার মা যখন বেঁচেছিলেন, আমাকে ছোট বেলায় বলেছিলেন, ঘরের কাছে যদি কোনও গাছে নাট্ এসে আশ্রয় নেয়, তবে তাকে খুশী রাখতে হয় নতুবা সে গৃহস্থের অকল্যাণ ঘটায়। এই বাড়ীতে আমার মা চিরদিন বাস করে গেছেন, তিনি জানতেন এই গাছে একটি প্রেত-দেবতার বাস, আমাকে তাই পূজো-অর্ঘ্য দিতে শিখিয়ে গেছেন, আমি যখন ঘরে একা কাজকর্ম করি, মনের ভিতর কে যেন কথা বলে, স্পষ্ট শুনতে পাই, এখন এ কাজ কর না, ওখানে

---

* কো অর্থ দাদা—বর্মীরা স্বামীকেও কো বলে।

যেয়ো না, এ রকম আদেশ করে, অনেক চেষ্টা করেও আমি তার কথা অমান্য করতে পারি না। মাউঙ্-পো-লিন্ গম্ভীর ভাবে সব শুনিয়া বলিল—"আচ্ছা, স-মিন্, এত দিন তুমি আমায় এ সব কথা বল নি ত? আমি এ সব ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না, তুমি এমন লেখাপড়া জানা মেয়ে, কুসংস্কারে বিশ্বাস করবে, তা ত জানতাম না। চল, আমরা এ বাড়ী ছেড়ে অন্য একটা বাড়ী নিই, তাতে তোমারও শান্তি, আমিও নিশ্চিন্ত হই। এই জন্যই বুঝি তুমি বাড়ীতে একা থাকতে চাও না?"

মা-সমিন্ স্বামীর গলা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—না, না, কো, তুমি এমন কথা মনেও স্থান দিও না। এত বছরের গৃহে-অধিষ্ঠিত প্রেত-দেবতাকে অমান্য করতে আমি পারব না, তাতে আমাদের নিশ্চয়ই অমঙ্গল হবে। এতকাল মা এ বাড়ীতে থেকে তার সেবা করেছেন, আমার ভাই, বোন্, মা সব এ বাড়ীতেই মরেছেন, আমিও যত দিন বেঁচে থাকব, এই দেবতাকে আমিই আহার-জল দেব। তুমি আমার কথা শোন, দু'পাতা ইংরেজী পড়ে আমাদের চিরন্তন সংস্কার, বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করলে ভাল হবে না কখনও, বুঝলে?"

পো-লিন্ একটি ছোট্ট "হুঁ" বলিয়া চলিয়া গেল।

সেদিন ছোট্ট শহরটিতে আশেপাশের গ্রাম হইতে অসংখ্য গরুর গাড়ী, একা গাড়ী, লাল মাটির পথে ধূলা উড়াইয়া যাত্রী বোঝাই করিয়া আসিতেছে। পায়ে-চলার সরু পথে মাঠের উপর দিয়া পিপীলিকার সারির মতন কাল মাথার স্রোত স্থানীয় আদালত-গৃহের অভিমুখে চলিয়াছে। সকলেরই মুখে এক কথা—"আশ্চর্য্য! মা-সমিন্ খুনী আসামী! এও বিশ্বাস করতে হবে!" বর্ম্মী তরুণের দল উত্তেজিত—"পো-লিন্ এমন দুঃসাহসের কাজ করল কেন? বাপ-পিতামহ যা বলে গেছেন, তা মেনে চলাই ত উচিত ছিল।" তরুণীরা বাধা দিয়া বলিতেছে—"তা বলে স্বামীকে হত্যা করবে স্ত্রী? এত বড় পাপ ধর্ম্মে সইবে না। কত অভিনয়ই করেছিল এই মা-সমিন্, মাউঙ্-লিন্‌কে যেন কতই ভালবাসত! নিশ্চয়ই সে অন্য কোন পুরুষের প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু অবাক কাণ্ড, নিজে হাতে কুড়ুলের কোপে কি করে মেয়েমানুষ স্বামীকে খুন করল, বল ত?"

কেউ বলছে—"নিশ্চয়ই মা-সমিন্ পাগল হয়ে গিয়েছিল।"

আদালত লোকে লোকারণ্য। বিচারের সময় উপস্থিত। পুলিসের প্রহরী যখন লোহার শিকলে হাত বাঁধা, শুষ্কমুখ ষোড়শী তরুণী আসামী মা-সমিন্‌কে উপস্থিত করিল, চারিদিক হইতে—"আহা, আহা, এই কোমল শিশুর মতন, সদ্য-ফোটা গোলাপের মতন মেয়েটিকে ফাঁসি দেবে? না, না, এমন যেন হয় না, হা ফায়া (ভগবান বুদ্ধ), দয়া কর। কখনও এ মেয়ে খুনী আসামী হতে পারে না", ইত্যাদি মন্তব্য শোনা যাইতে লাগিল।

জজসাহেব মা-সমিন্‌কে আদেশ করিলেন—"মা-সমিন্, তুমি তোমার স্বামী মাউঙ্-পো-লিন্‌কে হত্যা করেছ, তোমার নামে এই অভিযোগ কি সত্য? এ বিষয়ে তোমার কি বলবার আছে, নির্ভয়ে সত্য কথা বল।"

মা-সমিন্ এঞ্জির (গায়ের জামা) আস্তিনে চোখের জল মুছিয়া জজসাহেবের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সংযত নির্ভীক কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল—"ধর্ম্মাবতার, আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করে শপথ করে বলছি আমিই আমার প্রাণ-প্রিয় কো-লিন্‌কে আপন হাতে হত্যা করেছি। কো-লিনের চেয়ে প্রিয়তর আর কেউ নেই আমার এ সংসারে, তাকে ছেড়ে আমার জীবন দুর্ব্বহ হয়েছে—আমার কাতর অনুরোধ, আপনি যথাসম্ভব শীঘ্র আমার ফাঁসীর আদেশ দিন, আমি দেহ-মুক্ত হয়ে কো-লিনের সন্ধানে যাই।" অঝোর ধারায় দুই চোখ হইতে অশ্রুর প্লাবনে বক্ষ ভাসিয়া গেল, মা-সমিনের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। বিচারপতি নিজের স্বভাবগাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিলেন, "কেন তুমি এ অপরাধ করলে তা আমরা শুনতে চাই।"

মা-সমিন্ বলিতে লাগিল—"আমার গৃহের সংলগ্ন একটি বৃক্ষে একটি প্রেত-দেবতা বাস করে। আমার জন্মকাল হতে অর্থাৎ আমার জ্ঞান হবার পর থেকেই আমি মায়ের মুখে ইহার অস্তিত্বের বিষয় জানি। আমার মা তাঁর জীবিতকাল পর্য্যন্ত এই দেবতার সেবা করেছেন এবং আমাকেও সেবার ভার দিয়ে গেছেন। আমি সর্ব্বদাই এই দেবতার আদেশ পাই, সে আদেশ এমনই স্পষ্ট এবং কঠোর যে অমান্য করবার উপায় নেই। আমার স্বামী এসব বিশ্বাস করতেন না এবং সর্ব্বদাই আমাকে তিরস্কার করতেন, এ বাড়ী ছেড়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হতেন। আমি কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় তিনি আমাকে না জানিয়ে এক দিন কতকগুলি মজুর নিযুক্ত করে গাছটি কেটে ফেলে গাছের ডালগুলি জ্বালানি কাঠের ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করবার ব্যবস্থা করেন। গাছ যখন কাটা আরম্ভ হয়েছে, আমার মনে তখন কে যেন তীব্রস্বরে বলতে লাগল—"বাধা দাও, বাধা দাও, কাটতে দিও না।" আমি কো-লিনের পায়ে ধরে কত অনুনয়-বিনয় করলাম, কো-লিন শুনল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মড় মড় শব্দে গাছের গুঁড়িসুদ্ধ বিরাট গাছটি ভূ-শায়িত হ'ল। আর আমার সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে গেল, আমি অচেতন হয়ে পড়ে গেলাম।..."

গভীর রাত্রে আমার যখন চেতনা ফিরে এল, দেখি আমি আমার শয্যায় শায়িত, পাশের পালঙে স্বামী গভীর নিদ্রিত। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার মন যেন হিংস্র পশুর মত দুর্দম ক্রোধে ভরে উঠল, আমার সমস্ত শরীর-মন যেন অদৃশ্য এক পাশব-শক্তির প্রভাবে প্রচণ্ড হয়ে উঠল। আমি নিজের অস্তিত্ব যেন হারিয়ে ফেললাম, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কো-লিনের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, এ আমার পরম শত্রু, একে এখনি

নির্মূল করা চাই। নিমেষে ঘরের কোণ থেকে ধারালো কুঠারখানা তুলে নিয়ে এক কোপে কো-লিনের মাথা ও দেহ বিখণ্ডিত করে ফেললাম। গরম রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে আমাকে যেন স্নান করিয়ে দিল। পাগলের মত হা হা করে হেসে উঠলাম, কুঠার হাতে ঘরের বাইরে দৌড়ে গিয়ে সেই কাটা গাছতলায় আছাড় খেয়ে পড়লাম। তখন ভোরের আলো সবে ছড়িয়ে পড়েছে, আকাশে রাঙা-মেঘের খেলা, মৃদু মধুর বাতাস বইছে—আমি সে দৃশ্য উপভোগ করতে চিরদিনই ভালবাসতাম, ধুলোয় গড়িয়ে পড়ে আকাশের পানে তাকাতেই আমি যেন আবার আমার আমিত্বকে ফিরে পেলাম। রক্ত-মাখা লৌহি, এদিকে দিকে চেয়ে প্রাণ শিউরে উঠল। টলতে টলতে ঘরের দিকে ছুটলাম—আমার কো-লিন্‌, আমার প্রিয়তম কো-লিন্‌কে আমি কেন মারলাম। উঃ সে কি অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা, শোকে অনুতাপে মন জর্জ্জরিত। ঘরের সে বীভৎস দৃশ্য সইতে না পেরে ছুটে প্রতিবেশীদের ডেকে এনে সব বললাম। কেউ বিশ্বাস করে না আমার কথা, সকলে ভাবে আমার কোন প্রণয়ীর কাজ, আমি তাকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে অপরাধী করছি। শেষে উন্মত্তের মত ছুটে গেলাম পুলিসের থানায়, নিজে ধরা দিলাম। আর আমার কিছু বলবার নেই, ধর্ম্মরাজ বিচারপতি তুমি, তুমিই এ পাপীকে উচিত শাস্তি দিতে পার। তোমরা আমার দয়া কর না, এখনি একটা শাণিত তরবারি দিয়ে কি কেউ আমাকে কেটে ফেলতে পার না?" বলিতে বলিতে মেয়েটি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

আদালত নিস্তব্ধ, বিচারপতি স্তম্ভিত। জুরীরা একযোগে মেয়েটিকে নির্দ্দোষী বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

বিচারপতি বিস্ময়ে জুরীদের মতে রায় দিয়া বলিলেন—"এরকম ঘটনা একেবারেই অভূতপূর্ব্ব, সুতরাং আমি বাধ্য হইয়াই জুরীদের সহিত একমত হইলাম।"*

* সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

অহিংসা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

গান্ধীজীর প্রচারের ফলে অহিংসা ধর্ম্মের প্রতি জগতের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম বেদেই অহিংসা ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বেদ বলিয়াছেন, কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না—

ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা: ভূতানি।১

কিন্তু যজ্ঞে পশু বধের বিধান আছে, তাহা কি হিংসা নয়? বৈষ্ণব আচার্য্য রামানুজ বলিয়াছেন যে, ইহা হিংসা নহে। যাহারা যজ্ঞ করে তাহারা বিশ্বাস করে যে, যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গে যাইবে। চিকিৎসক রোগীর অঙ্গচ্ছেদ করে রোগীর কল্যাণের জন্য, তাহা যেমন হিংসা নয়, সেইরূপ যজ্ঞে পশুবধ হিংসা নয়। যজ্ঞের পশুকে সম্বোধন করিয়া বলা হয়, "তোমার মৃত্যু হইতেছে না, তোমাকে হিংসা করা হইতেছে না, তুমি সুগম পথে দেবতাদের নিকট যাইতেছ।"

ন বা উ এতন্ ম্রিয়সে ন রিষ্যসি
দেবান্ ইৎ এষি পথিভিঃ সুগেভিঃ
ঋগ্বেদ সংহিতা, ১-১৬২-২১

বলা বাহুল্য, শঙ্কর প্রভৃতি অন্য আচার্য্যেরও এই মত। ব্রহ্ম-সূত্রে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদ সম্বন্ধে নির্ভুল মত প্রচার করা হইয়াছে, ইহা সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন।

আধুনিক পণ্ডিত এই সকল আচার্য্যকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহারা যজ্ঞে পশুবধ করিত তাহারা পশুদের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা করিত না।

বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনুসংহিতা একটি প্রামাণিক গ্রন্থ।২ মনু সকল মনুষ্যের সাধারণ ধর্ম্মের মধ্যে অহিংসাকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দিয়াছেন।৩ তিনি বলিয়াছেন এক শত বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, মাংস-

১। "অশুদ্ধম্ ইতিচেৎ ন শব্দাৎ" ব্রহ্মসূত্র ৩।১.২৫। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই এই বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষ বাক্যে আদর্শ ধর্ম্মজীবনের বর্ণনায় এই বেদবাক্যের অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়, "অহিংসন্ সর্ব্ব ভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" অর্থাৎ যজ্ঞ ভিন্ন অন্যত্র সকল প্রাণিবধ হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

২। মনুর বিধানসকল বেদানুযায়ী।

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে— (মনুসংহিতা ২ ৭)

বেদে বলা হইয়াছে, "মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায়।"

যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজম্ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।২।১০।২)

৩। অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্মং সর্ব বর্ণেঽব্রবীন্মনুঃ। মনু ১০ ৬৩

"অহিংসা, সত্য, পরদ্রব্য গ্রহণ না করা, দেহ ও মনের শুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—সকল বর্ণের এই ধর্ম্মগুলি পালন করা উচিত—মনু ইহা বলিয়াছেন।"

ভক্ষণ হইতে বিরত থাকিলে তাহার সমান পুণ্য হয়।[৪] যে বধ করে তাহার যেমন পাপ হয়, যে বধ করিতে বলে, যে নিহত পশুর মাংস খণ্ড খণ্ড করে, যে বিক্রয় করে, যে ক্রয় করে, যে রন্ধন করে, যে পরিবেশন করে এবং যে ভোজন করে তাহাদেরও সেইরূপ পাপ হয়।[৫]

মনু বলিয়াছেন যে, ধর্ম বিপন্ন হইলে ব্রাহ্মণও অস্ত্রগ্রহণ করিবে। আত্মরক্ষার্থ, স্ত্রী ও ব্রাহ্মণ রক্ষার নিমিত্ত, ধন বা পশু হরণ নিমিত্ত যুদ্ধে বধ করিলে দোষ নাই।[৬] ঋষিগণ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, সংসারযাত্রাতে ইচ্ছা না করিলেও নানাবিধ ক্ষুদ্র প্রাণী বধ করা অপরিহার্য্য। গৃহস্থের নিম্নলিখিত স্থলে প্রত্যহ প্রাণী বধ হয়:—(ক) চুল্লী, (খ) শিলনোড়া, (গ) সম্মার্জ্জনী, (ঘ) উদূখল এবং (ঙ) জলের কলস।[৭] এই সকল স্থলে প্রাণিবধ অপরিহার্য্য হইলেও তাহাতে পাপ হয়। এই পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানগুলি প্রত্যহ করিতে বলা হইয়াছে: (ক) অধ্যাপন, (খ) পিতৃপুরুষদের তর্পণ, (গ) হোম, (ঘ) বলি, প্রাণীদিগকে অন্নদান, (ঙ) অতিথি পূজা।[৮]

ধর্মযুদ্ধে যে সৈন্যবধ করা হয় তাহাতেও হিংসা হয় না। এজন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অহিংসার উপদেশ[৯] দিয়াও অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন।

জৈনধর্ম্মে অহিংসা—জৈনধর্ম্মে অহিংসার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহাকে সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। জৈনধর্ম অনুসারে কোনও অবস্থায় কোনও প্রাণীকে বধ করা উচিত নহে। যুদ্ধ করা উচিত নয়। নরহন্তা দস্যুকেও বধ করা উচিত নয়। করিলে পাপ হইবে। ক্ষুদ্র প্রাণীকে যাহাতে বধ করা না হয় এজন্য খুব সাবধানে ভ্রমণ, উপবেশন ও ভোজন করিতে হইবে। সন্ধ্যার পর ভোজন নিষেধ। যে বধ করে তাহার পাপ হয়, যে বধ করিতে বলে তাহারও পাপ হয়। যে ভোজন করে তাহার যে পাপ হয় ইহার উল্লেখ নাই। যদিও জৈনগণ মাংস ভক্ষণ করেন না তথাপি অন্য লোক বধ করিলে এবং তাহাকে বধ করিতে আজ্ঞা না দিলে যে ভোজন করে তাহার পাপ হয় না ইহাই জৈনধর্ম্মের মত বলিয়া মনে হয়। কারণ দশবৈকালিক সূত্র নামক জৈনধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মাংসে বেশী অস্থি থাকিলে এবং মৎস্যে বেশী কাঁটা থাকিলে তাহা ভোজন করিবে না। ইহার ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হয় এখানে ফলবিশেষের সম্বন্ধে কথা বলা হইয়াছে, নয় ফলকেই মৎস্য মাংস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা বিশেষ সন্তোষজনক নহে। ইহা ছাড়া আর এক কারণেও মনে হয় যে, অন্য লোক প্রাণী বধ করিলে মাংসভোজনে পাপ হয় না। জৈনধর্ম অনুসারে জলেরও প্রাণ আছে, জল ফুটাইলে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। জৈন সাধুরা কাঁচা জল খান না, নিজেরাও জল গরম করেন না (তাহা হইলে জলের প্রাণ বধ করা হইবে), কিন্তু কোনও গৃহস্থ জল ফুটাইলে সাধু সেই জল পান করিতে পারেন।

জৈনধর্ম মতে উদ্ভিদেরও ত প্রাণ আছেই—মৃত্তিকা, জল, অগ্নি এবং বায়ুরও প্রাণ আছে। অস্ত্র দ্বারা ছেদন বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে তাহাদের প্রাণ থাকে না।

বৌদ্ধধর্ম্মে অহিংসা—বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসার প্রচার প্রধানতঃ যজ্ঞে পশুবধের বিরুদ্ধেই করা হইয়াছিল। বৌদ্ধমতে পশুবধ করিলে পাপ হয়, কিন্তু পশুমাংস ভোজন করিলে পাপ হয় না, যদি ঐ পশু ভোজনকারীর সম্মুখে নিহত না হয়, বা ঐ ব্যক্তির জন্যই নিহত না হয়। হিন্দুধর্ম অনুসারে মাংস ভোজনকারীর সকল অবস্থাতেই পাপ হয়, কেবল যজ্ঞে পশুবধ হইলে পাপ হয় না। হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে মাংসভোজন অনেক কম হয়—কারণ যজ্ঞ করিতে অনেক আয়োজন করিতে হয়, অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ফলে যদিও বুদ্ধদেব পশুবধের বিরুদ্ধে প্রচার করিলেন তথাপি যাহারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল তাহাদের মধ্যে পশুবধ বেশী হইল, হিন্দুদের মধ্যে পশুবধ কম হইল। ব্রহ্মদেশ, চীন, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশে সকলেই মাংস খায়, ভিক্ষুরাও (অর্থাৎ সন্ন্যাসী) মাংস খায়। এজন্য হিন্দুধর্মগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধদেবের কতকগুলি উপদেশ বিভ্রান্তিকারী।

খ্রীষ্টানধর্ম্মে অহিংসা—খ্রীষ্টান ধর্ম্মে ইহা বলা হয় নাই যে, পশুবধ করা পাপ, বা মাংসভোজন করা পাপ। দশবিধ আদেশ (Ten Commandments)-এর মধ্যে একটি আদেশ আছে 'হত্যা করিও না' (Thou shalt not kill)। ইহার অর্থ নরহত্যা করিও না। পশুবধের কোনও দোষ দেওয়া হয় নাই। যিশুখ্রীষ্ট মাংস ভোজন করিতেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মে পশুর জীবনের প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রম ভাব দেখান হয় নাই। অপর পক্ষে মনুষ্যের জীবনের প্রতি অতিরিক্ত করুণা দেখান হইয়াছে। বিশেষ 'Sermon on the Mount'-এর উপদেশ অনুসারে কোনও অবস্থায় কাহাকেও

৪। বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্‌যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমং। মনু ৫।৫৩

৫। অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ। মনু ৫।৫১

৬। আত্মনশ্চ পরিত্রাণে দক্ষিণানাং চ সঙ্গরে।
স্ত্রী বিপ্রাভ্যুপপত্তৌ চ ঘ্নন্‌ ধর্ম্মেণ ন দুষ্যতি। মনু ৮।৩৪৯

৭। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্‌। মনু ৩।৬৮

৮। তাসাং ক্রমেণ সর্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চ কৢপ্তাঃ মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাং। মনু ৩।৬৯

৯। অহিংসা সত্যমক্রোধঃ ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্‌।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্‌। গীতা ১৬।২

আঘাত করা উচিত নয়। নরহত্যাকারী দস্যুকেও বধ করা বা আঘাত করা পাপ। এই মত অনেকটা জৈনধর্মের অনুরূপ। বলা বাহুল্য, কোনও খ্রীষ্টান জাতি এই মত অনুসরণ করে নাই। টলষ্টয় শেষজীবনে এই মত অনুসারে চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমগ্র জাতির মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত করিবার চেষ্টা গান্ধীজী করিয়াছিলেন প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকায়, পরে ভারতবর্ষে। তিনি জিন্নার সকল অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন, প্রেম দ্বারা মুসলমান জাতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই।'

গান্ধীজীর অহিংসা খ্রীষ্টান ধর্মের অনুরূপ। এজন্য খ্রীষ্টান জগৎ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিল।

মুসলমান ধর্মে অহিংসা—পশুবধে পাপ নাই এ বিষয়ে মুসলমান ধর্মের মত খ্রীষ্টান ধর্মের অনুরূপ। যদিও মুসলমান ধর্মে যিশুকে ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি (prophet) বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তথাপি 'Sermon on the Mount'এর অহিংসা গ্রহণ করা হয় নাই। মহম্মদ নিজেই অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন, মদিনায় থাকাকালীন মক্কার বণিকদলকে (caravan) আক্রমণ করিয়াছেন।

সাধারণ মন্তব্য—বিভিন্ন ধর্মের অহিংসা সম্বন্ধে মতের আলোচনা করিলে হিন্দুধর্মের মত সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়ানুমোদিত, সূক্ষ্মবিচারশীল এবং করুণাপ্রণোদিত বলিয়া প্রতীত হইবে। পশুবধ যে অত্যন্ত পাপজনক এবং কেবল বধকর্ত্তা নহে, যে কেহ পশুবধ হইতে নিজের স্বার্থসাধন করে, মাংসভোজনকারী ত বটেই, ইহা হিন্দুধর্মে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে অন্য ধর্মে তাহা বলা হয় নাই।

টলষ্টয় কসাইখানার নির্ম্মম দৃশ্য বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘোর কলঙ্ক। যাহারা মাংস ভোজন করে তাহারা সাক্ষাৎভাবে কসাইখানার ব্যাপারে লিপ্ত হয় না বলিয়া অনেক সময় আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে, তাহারা বিশেষ কোনও অন্যায় কার্য্য করিতেছে না। হিন্দুধর্মে বলিয়া দিয়াছে যে, ঐ পাপের ফল মাংসভোজীকে ভোগ করিতে হইবে। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মে পশুবধ ও মাংসভোজনকে পাপ বলে নাই, ইহা ঐ দুই ধর্মের গুরুতর ত্রুটি। যে ব্যক্তি পশুর প্রতি নিষ্ঠুর হয়, সে মনুষ্যের প্রতিও নিষ্ঠুর হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের প্রাণের প্রতিও হিন্দুধর্ম যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছে। ঐ সকল ক্ষুদ্র প্রাণীরও আত্মা আছে, তাহাদের আত্মা ও আমাদের আত্মা এক বস্তু, এই সকল কথা হিন্দু-দর্শনের সিদ্ধান্ত। মনু বিবিধ জন্তু এবং ক্ষুদ্র প্রাণিবধের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন (মনু ১১।১৩১—১৪১)। নরহত্যাকারীকে বধ না করিলে দুষ্টের দমন হইবে না, সমাজে অকল্যাণ হইবে। খ্রীষ্টান ও জৈনধর্মে বলা হইয়াছে যে, কোনও অবস্থায় মনুষ্যকে বধ করিলে বা আঘাত করিলে পাপ হয়। এই ব্যবস্থা অনুসরণ করিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। খ্রীষ্টান ধর্মে অপরাধ করিলেও মনুষ্যকে দণ্ড দিতে নিষেধ করা হইয়াছে (Thou shalt not judge) অথচ মনুষ্যজাতির জন্য গাভী প্রভৃতি মনুষ্য জাতির বিশেষ কল্যাণ-কর প্রাণীকে বধ করিতে নিষেধ করা হয় নাই। ইহাতে ঘোরতর অসমবুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইহা সমাজের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। যুক্তির দ্বারা অহিংসা সম্বন্ধে হিন্দু-ধর্মগ্রন্থের সকল ব্যবস্থা সমর্থন করা যায়। যজ্ঞে পশুবধ হইলে ঐ মাংস খাইতে দোষ নাই, নচেৎ মাংসভোজন মহাপাপ এই বিধান হিন্দুদের মধ্যে মাংসভোজন অনেক কমাইয়া দিয়াছে, বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য প্রদেশে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মাংসভোজন হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিরত হইয়াছে। বাংলাদেশেও পূর্ব্বে দুর্গা বা কালীপূজার বলির মাংস ভিন্ন অন্য মাংস ব্যবহার হইত না, এক্ষণে ধর্মবিশ্বাস শিথিল হওয়ার অভাবে কসাইয়ের মাংস চলিতেছে এবং প্রাণিহিংসারূপ পাপ সমাজে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

ওন্দার মাঠ

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

বিষ্ণুপুরের রাজারা তাঁহাদের রাজ্যে ধান-আবাদ কেমন হইল জানিতে হইলে প্রথমেই ওন্দার মাঠের খবর লইতেন। ওন্দার মাঠে ধান আবাদ হইয়া গেলে তাঁহারা বুঝিতেন—রাজ্যের কোথাও আর আবাদ হইতে বাকি নাই, এবং সে বৎসর রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইবে।

বাঁকুড়া হইতে ট্রেনে বিষ্ণুপুর আসিতে হইলে উত্তর দিকে রামসাগর পর্য্যন্ত যে বিস্তীর্ণ সমতল ধানের ক্ষেত—উহাই ওন্দার মাঠ। এই মাঠের মাটি কঙ্করময় নয়, এবং ইহাতে কখনও জঙ্গল ছিল না।

বর্ত্তমানে ইহা যেরূপ শুষ্ক দেখায়, পূর্ব্বে ইহা সেরূপ শুষ্ক ছিল না। ইহা বাঁকুড়ার উচ্চ অথচ চাষের উপযোগী ভূমি। সুবৃষ্টি না হইলে ইহাতে এখন আর ভাল ধান জন্মায় না। পূর্ব্বে বাঁকুড়ায় প্রচুর বৃষ্টি হইত, ইহাতে ধানও প্রচুর পরিমাণে জন্মাইত। বাঁকুড়ার মাটি দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছে। ছেলেবেলায় গ্রীষ্মকালেও যেখানে হ্রদ দেখিয়াছি এখন সেখানে শুষ্কভূমি। ওন্দার মাঠে পূর্ব্বে রবিশস্যও প্রচুর উৎপন্ন হইত। এককালে ইহাতে ঘোর নীল চাষ চলিয়াছিল। নীল চাষের পর হইতেই সম্ভবতঃ এই মাঠের এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে। নীলচাষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা সুবর্ণ-প্রসূ ছিল।

ঐতিহাসিকেরা মনে করেন বাঁকুড়া পূর্ব্বে নিবিড় বনে আচ্ছন্ন ছিল। প্রস্তরময় শুষ্ক এই দেশ চাষের উপযোগী ছিল না। এখানে কেবল কোল, ভীল, সাঁওতালেরাই বাস করিত। ইহা কত বড় ভুল—ওন্দার মাঠই তাহার প্রমাণ। এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বুঝি ইতিহাসও নাম ওন্দার মাঠের একেশ্বরের মন্দির, সোনাতাপলের মন্দির, এবং বাহুলাড়ার মন্দিরগুলিকে অতি প্রাচীন স্বীকার করিয়াই নীরব হইয়া গিয়াছে।

কোল, ভীল, সাঁওতাল বাসের নিদর্শন এই ভূমিতে অল্পই পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত জাতিগণের বাসের নিদর্শনই এই ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে: গোপ, নাপিত, মোদক, তমুলী, বণিক, মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, চিত্রকর, স্বর্ণকার, অট্টালিকাকার, তৈলকার, চর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, ধীবর, শবাক, গণক, অগ্রদানী, পাঠক, ভট্ট ইত্যাদি। ইহারাই বাঁকুড়ার আদিম অধিবাসী। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই সব জাতির উল্লেখ আছে। ইহাদের একটা বিশেষ সভ্যতা ছিল। বিদেশ হইতে আসিয়া ইহারা এখানে বন কাটিয়া বাস করে নাই। শিল্পকলা ইত্যাদি জ্ঞানে ইহারা আর্য্যদের অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না।

ওন্দার মাঠের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে বাহুলাড়ার মন্দির, পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে লাপুড় শিবলিঙ্গ, উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সোনাতাপলের মন্দির এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে একেশ্বরের মন্দির। একেশ্বরের মন্দির এবং সোনাতাপলের মন্দিরের মধ্যস্থলে ভূদিসমতরীর গড়। বর্ত্তমান বাঁকুড়ার দেড় মাইল পূর্ব্বে এই ভূদিসমতরীর গড় হইতেই প্রকৃতপক্ষে ওন্দার মাঠের আরম্ভ।

বিষ্ণুপুরের রাজা আদিমল্লের (৮ম শতকের প্রথম) মল্লরাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও ওন্দার মাঠ ছিল। ওন্দার মাঠে একেশ্বরের মন্দির ছিল, ভূদিসমতরীর গড় ছিল, সোনাতাপলের মন্দির ছিল। শুশুনিয়া শিলালিপির চন্দ্রবর্ম্মার (৪র্থ শতক) কালেও ছিল। গয়াতীর্থ যত দিনের, কাশীতীর্থ যত দিনের, একেশ্বর তীর্থ তত দিনের। এখনও 'ভক্ত্যা'রা জয়ধ্বনি করিয়া থাকে—'গয়াতে গদাধর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর, বাঁকুড়াতে একেশ্বরনাথ-মুনিমহাদেব।' সিংহবর্ম্মা, চন্দ্রবর্ম্মা ভূদিসমতরীর গড়ের রাজা ছিলেন। পখন্নার-গড়ের ডাঙা, সিদাই ঘোড়, চান্দাই ঘোড়—একেশ্বরের মন্দির, ভূদিসমতরীর গড়, সোনাতাপলের মন্দির অপেক্ষা বৃহত্তর প্রমাণ নয়। শিলালিপির পুষ্কর শব্দ তীর্থ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ভূদিসমতরীর গড়ের পশ্চাতে হ্রদ ছিল।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ওন্দার মাঠ ছিল, ওন্দার মাঠে তীর্থ ছিল। সে তীর্থে বর্দ্ধমান মহাবীর আসিয়াছিলেন। তখন ওন্দার মাঠের নাম ছিল রাঢ়াপুর। রাঢ়াপুর হইতেই রামসাগরের লাপুড় শিবলিঙ্গ। ওন্দার মাঠ বনবেষ্টিত ছিল। এখনও ইহা বনবেষ্টিত। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বর্ম্মবংশীয় রাজা এখানে ছিলেন বলিয়া ইহার নাম বনবিষ্ণুপুর হইয়াছিল। জন-বর্দ্ধমান ছিল বলিয়া বৃহৎসংহিতার কালে ইহার নাম বর্দ্ধমান হইয়াছিল। ইহাই মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থের পুরোত্তরবর্দ্ধমান। এখনও ওন্দার মাঠে পুরোত্তমপুর রহিয়াছে। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের (একাদশ শতক) রাঢ়াপুরী এই ভূমেই ছিল। সে পুরী সোনাতাপলের নিকট বর্ত্তমান বীরসিংহপুর হইতে একেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ভূমিই হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি গ্রন্থের (দ্বাদশ শতক) বিষ্ণুগৃহ। এই তীর্থে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন পূজা দিতে আসিয়াছিলেন।

বর্ম্মবংশ রাঢ়ের অতি প্রাচীন রাজবংশ। টলেমির তাম্রলিপ্ত—তাম্রলিপ্ত প্রদেশ হইলে সিংহবর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষগণের রাজ্য বর্ত্তমান বাঁকুড়া হইতে ২৪ পরগণা খুলনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রবর্ম্মার কালে সে রাজ্য সমতট ও ডবাক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত সমতট ও ডবাক জয় করিয়া লইয়াছিলেন। বর্ম্মবংশীয়দিগের রাজ্যই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাহিত্যে

তাম্রশাসনে রাঢ়া, তাম্রলিপ্ত, বিষ্ণুপুর, রাঢ়, হরিকেলমণ্ডল ইত্যাদি নামে কথিত হইয়াছে। ইৎ-সিঙের বিবরণ অনুসারে (৬৭৩-৮৮) হরিকেলমণ্ডল পূর্ব্ববঙ্গের সহিত যুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়।

সমুদ্রগুপ্তের পরবর্তীকালের আর্য্যাবর্ত্ত-বহির্ভূত বাংলাদেশেই চন্দ্রবর্ম্মার রাজ্য। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে গোপচন্দ্র নামক একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন—ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম বাংলা বৃহৎ সংহিতায় তাম্রলিপ্ত ও বর্দ্ধমান জনপদ—বর্ত্তমান মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলা। চন্দ্রবর্ম্মার পরবর্ত্তী দুই শত বৎসরেই বর্ম্মবংশ অবশ্য লোপ পাইয়া যায় নাই। গোপচন্দ্র বর্ম্মবংশীয় ছিলেন মনে করা বোধ করি অসঙ্গত হইবে না।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ওন্দার মাঠে মেদিনীপুর, তাতন, চন্দ্রকোণা রহিয়াছে। দুবিনবতীর গড়ের নিকট সুবর্ণের মহাস্মৃতি—সুবর্ণনগর (স্বর্ণনগর), সুবর্ণকোড়, সুবর্ণতপন, সুবর্ণদীঘি ইত্যাদি। মহারাজ শশাঙ্কের কথা মনে পড়ে। তিনি রাঢ়ের রাজা ছিলেন। তাঁহার কিরণসুবর্ণ কোথায় ছিল আজিও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। তাঁহার আমল ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ। সেখানে রাঢ় পুরোত্তম বর্দ্ধমান—বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলা। বৃহদ্বিশ্বকোষ গ্রন্থে কামরূপের পরই পুরোত্তম বর্দ্ধমান। মহারাজ শশাঙ্ক শিবভক্ত ছিলেন। তাঁহার সহিত একেশ্বরের শিবের, রামসাগরের সাপুড় শিবলিঙ্গের সম্পর্ক ছিল না—হইতে পারে না। দুবিনবতীর গড় হইতে একেশ্বরের সন্নিকটে আরও রাজবাসের নিদর্শন রহিয়াছে। বাঁকেশ্বরের বাম-পার্শ্বে যেমন একেশ্বর হইতে দুবিনবতীর গড়, সোনাতপল, কোটালপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদ ছিল, বাঁকেশ্বরের দক্ষিণ-পার্শ্বেও তেমনি রাজাগ্রাম গড়াবাড়ী, ভাবড়া, লোদনা, চন্দ্রকোণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদ ছিল। গড়াবাড়ী অবশ্য গড়বাড়ী। তাবীর—তাবুয়া হইয়া তাবুয়া হইতে পারে। দক্ষিণ-মেদিনীপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন—শশাঙ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত দণ্ডভুক্তি নামক প্রদেশের তাবীর সংজ্ঞক স্থানের অধিকরণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। দণ্ডভুক্তি ওন্দার মাঠের দাঁতনও হইতে পারে। শশাঙ্কের দণ্ডভুক্তিই হয়ত পরবর্তীকালের বর্দ্ধমানভুক্তি। ভুক্তি—বিভাগ হইলে বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত আবার এক দণ্ডভুক্তি কেমন করিয়া হয় বুঝি না। বেত্রবতী এবং দ্বারকেশীর মধ্যবর্ত্তী ওন্দার মাঠেই হয়ত কামরূপরাজ ভাস্কর বর্ম্মার সহিত মহারাজ শশাঙ্কের যুদ্ধ হইয়াছিল।

ওন্দার মাঠের বাহুলাড়ার মন্দিরটি জৈনমন্দির বলিয়া খ্যাত। এরূপ মন্দির নির্ম্মাণ দিগম্বরদিগের কর্ম্ম নয়। ইহা কোনও রাজা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। জৈনধর্ম্মাবলম্বী কোনও রাজা এ অঞ্চলে কখনও ছিলেন, ইতিহাসে এরূপ দৃষ্ট হয় না। বরং এ অঞ্চলে দুই জন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী রাজার কথা ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। এক—হরিকেলমণ্ডলের কান্তিদেব (নবম শতক)। ইনি দামোদরের উত্তর ভাগে বর্দ্ধমান নগরী স্থাপন করেন। বৃহৎ সংহিতার বর্দ্ধমান জনপদই তখনকার হরিকেলমণ্ডল। এই হরিকেলমণ্ডলই আবার আচারাঙ্গ সূত্রের তখনকার বজ্রভূমি। ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মনে করেন, বজ্রভূমিই পরবর্তীকালের মদারণ সরকার। মদারণ সরকার আধুনিক বীরভূম, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার কোন কোন অংশ লইয়া গঠিত ছিল। চীনদেশীয় মানচিত্র অনুসারে হরিকেল তখন তাম্রলিপ্ত ও উৎকল এই দুই দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। আর এক বৌদ্ধরাজা চন্দ্রদেব (দশম শতাব্দীর শেষ)। ইনি কান্তিদেবের রাজ্য বিক্রম দ্বারা লাভ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ওন্দার মাঠেরই কোনও অংশে কান্তিদেবের পুর ছিল। সে পুর ওন্দার নিকট বর্ত্তমান পুরোত্তমপুর হইতে পারে। চন্দ্রদেবের পুর বাঁকুড়া তেহুয়া-পোলের নিকট বর্ত্তমান বিক্রমপুর হইতে পারে। বাহুলাড়ার মন্দির কান্তিদেব অথবা চন্দ্রদেবের কীর্ত্তি হইতে পারে। বাহুলাড়ার মন্দিরকে কেহ সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির বলেন। কেহ বলেন, ইহা সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির, কেহ বলেন জৈনমন্দির, কেহ-বা বলেন বৌদ্ধমন্দির। এই মন্দিরে প্রাপ্ত নাগমূর্ত্তি—পার্শ্বনাথ-মূর্ত্তি অথবা বামনমূর্ত্তি মূর্ত্তিবিশারদদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত। হয়ত এই অঞ্চলে কোনও কালে বামনের পূজা প্রচলিত ছিল। বর্দ্ধমান মহাবীরকে কুকুর লেলাইয়া দিবার পর রাঢ়ে এরূপ জৈনমন্দির নির্ম্মাণ সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। কান্তিদেব, চন্দ্রদেব পূর্ব্ববঙ্গের হইতে পারেন না। তখনও পূর্ব্ববঙ্গের সৃষ্টিই হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর বিজয়সেনের পর। বৃহৎ সংহিতার বর্দ্ধমানজনপদ, তাম্রলিপ্তজনপদ এবং উপবঙ্গ (ব'দ্বীপই) তখনকার বঙ্গদেশ। কান্তিদেব, চন্দ্রদেব বর্ম্মদিগেরই কোনও শাখার হইতে পারেন। বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনের পর হয় ত তাঁহারা বর্ম্ম উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুর রাজবংশের ইতিহাসে দেখা যায়—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত তিন শত বৎসরে মল্লরাজ্য দক্ষিণে বর্ত্তমান বজ্রপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে জগৎমল্ল ওন্দার মাঠের পূর্ব্ব সীমান্তে বর্ত্তমান বিষ্ণুপুরে রাজ রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। এই তিন শত বৎসর অবশ্য ওন্দার মাঠ জনশূন্য ছিল না। ওন্দার মাঠের মন্দিরগুলিও শূন্য পড়িয়াছিল না। বরং সে সময় এই স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক জনসমাকীর্ণ ছিল; এ স্থানের মন্দিরগুলিতে আরও অধিক জনসমাবেশ হইত এবং প্রতিটি মন্দিরে অহরহঃ মহাসমারোহে পূজাদি অনুষ্ঠিত হইত অনুমান করিতে পারা যায়। তখন এ স্থানে অবশ্য রাজা ছিলেন এবং সে রাজা বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণের অপেক্ষা অধিক

পরাক্রমশালী ছিলেন। সেই রাজা ভাস্কিদেব, চন্দ্রের রাজা আর কে হইতে পারেন?

এককালে ওন্দার মাঠে লুহিচন্দ্রের পূজা প্রচলিত ছিল। ওন্দার মাঠের গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন পুথির আবডে "লুহিচন্দ্রব্রতী" লেখা দেখিয়াছি। লুহিচন্দ্র—ধর্মমঙ্গল কাব্যের হরিচন্দ্র রাজার পুত্র। বিজয়সেনের সমসাময়িক রাঢ়ের রাজা হরিবর্মাই (একাদশ শতক) কাব্যের হরিচন্দ্র। হরিবর্মা জুদিনগরীর গড়ের রাজা ছিলেন। যে স্থানকে বাঁকুড়ার লোকে জুদিনগরীর গড় নির্দেশ করে—সে স্থানকে অনেকে মদনার ডাঙাও বলিয়া থাকে। হরিচন্দ্রের রাণীর নাম—মদনা। এক্তেশ্বরের নিকটবর্তী অঞ্চলে বহুকার বন, বহুকাজোড়, বহুকা গ্রামও আছে শুনিয়াছি (বর্তমান ভেলকুয়া)। এক্তেশ্বরের নিকট বারিকা গ্রামও রহিয়াছে (বর্তমান বায়্যা)। ইতিহাসে হরিবর্মার পুত্র—ভোজবর্মা। ভোজবর্মা ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের ভোজমহারাজা হইতে পারেন। আশ্চর্যের বিষয়, জুদিনগরীর গড়ের পশ্চাতে মাণিকহ্রদের মধ্যবর্তী স্থলে মাণিক দ্বীপও রহিয়াছে (বর্তমান মানক্যার ডাং), কিন্তু তাহাতে ধূপ দত্তের দেউলের চিহ্ন নাই।

এক্তেশ্বরের মন্দির এবং সোমাভাপলের মন্দিরের মধ্যবর্তী অঞ্চল পূর্বে জয়বেল্যা তরফ বলিয়া কথিত হইত। মনে হয় এই অঞ্চলে পূর্বে জয় নামক কোনও রাজা ছিলেন। মহারাজ শশাঙ্কের কাল হইতে রামপালের বরেন্দ্রী অভিযানের কাল পর্যন্ত ইতিহাসে জয় নামক দুই জন উল্লেখযোগ্য রাজার নাম পাওয়া যায়। এক কর্ণসুবর্ণের জয়নাগ, আর এক রামপালের বরেন্দ্রী অভিযানের সাহায্যকারী দণ্ডভুক্তির জয়সিংহ। জয়বেল্যা তরফের মধ্যেই সুবর্ণনগর, সুবর্ণজোড়, সুবর্ণতপন ইত্যাদি এবং ইহারই মধ্যে কর্ণ নামক নদী (বর্তমানে মজিয়া গিয়াছে)। জয়নাগের নাম অনুসারে জয়বেল্যা হইলে এই অঞ্চল মহারাজ শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ হইয়া পড়ে। আবার রামপালের সামন্তচক্রের কোটাটবি—বিষ্ণুপুরের কোটেশ্বর হইলে এবং অপর মন্দার—মদারণ সরকার হইলে ওন্দার মাঠ দণ্ডভুক্তি হইয়া পড়ে। কারণ মেদিনীপুরের দাঁতন তখন বিজয়সেনের রাজ্যের অন্তর্গত। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারাও তখন ওন্দার মাঠে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই এবং তখনও তাঁহাদের কেহ সিংহ উপাধি ধারণ করেন নাই। দণ্ডভুক্তির জয়সিংহের নামানুসারে জয়বেল্যা হইলেও হইতে পারে। সিংহবর্মার বংশীয় কোনও রাজা হয়ত সিংহ উপাধি ধারণ করিয়া থাকিবেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে দিল্লীরাজ সিকন্দর বহু সাধু-সন্ন্যাসীকে হত্যা করিয়া হিন্দুর তীর্থযাত্রা নিবারণ করেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে এক্তেশ্বর তীর্থে জনসমাগম] কমিতে আরম্ভ করে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ওন্দার মাঠে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

"হুগলী জেলার ইতিহাস"

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ আমলে হুগলী নামে জেলার সৃষ্টি হইয়া সুপ্রাচীন দক্ষিণ-রাঢ়ের একটি বিশিষ্ট অংশ পৃথক্ সত্তা লাভ করে। এই ভূভাগের প্রত্নসম্পৎ প্রায় অতুলনীয়—কারণ ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্ব-ভারতের বহু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান ইহার অন্তর্গত বটে। বহু মনীষী বাঙ্গলার প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপ এই জেলার বিবরণ বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহার সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করিতে পারেন নাই—বস্তুতঃ এক জনের পক্ষে তাহা অসাধ্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। চারি বৎসর পূর্ব্বে তরুণ সাহিত্যিক শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের শতাধিক চিত্রসম্বলিত সহস্র পৃষ্ঠার গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সাগ্রহে তাহা অধ্যয়ন করি। সমালোচনাচ্ছলে অযথা প্রশস্তি করার রীতি অবলম্বন না করিয়াও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, গ্রন্থকার এই অসাধ্যসাধনে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। জেলার প্রায় ২৫০০ গ্রামের পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক চিত্র কিংবা একমাত্র ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামে আবিষ্কৃত প্রত্নলিপ্যাদির বিজ্ঞানসম্মত বিশদ বিবরণ দেওয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নহে। প্রভূত পরিশ্রমে শতাবধি প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ সহ সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষার চিত্র বিপুল উপকরণ হইতে নির্ব্বাচন করিয়া তিনি যাহা পরিবেশন করিয়াছেন, ভাষার এবং ঘটনাবৈচিত্র্যে তাহা প্রায় উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে এবং গ্রন্থটির পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। নামে একটি জেলার ইতিহাস হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলার ইতিহাসেরই একটি প্রধান অংশ এবং বাঙ্গলার সমস্ত পাঠাগারে ইহা থাকা উচিত, নতুবা তাহাদের অঙ্গহানি ঘটিবে। উপকরণ সংগ্রহকালে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া গ্রন্থকার যেরূপ শ্রমশক্তি ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমরা ভরসা করি অদূর ভবিষ্যতে তিনি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন এবং প্রথম সংস্করণে জেলার ইতিহাসের যে সুদৃঢ় ভিত্তি তিনি গঠন করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি, তাহা মনোহর সৌধে পরিণত করিয়া কৃতার্থ ও কীর্ত্তিমান্ হইবেন।

এই গ্রন্থে* বহু নূতন তথ্য ও প্রমাণপত্র বিবৃত হইয়াছে—বাংলার প্রথম গত পুস্তক (পৃ. ৫৪৪-৫৫), নিমাইতীর্থঘাটের সূর্য্যমূর্ত্তি (পৃ. ৬২৭-২৮), মাহেশের জগন্নাথদেবের দেবোত্তর সম্পত্তির মূল দলিল (পৃ. ৬৮১-৮৩) প্রভৃতি। শেষোক্ত দলিলের তারিখ ১৬৫০ খ্রী. (১৬৪১ নহে) এবং অন্যতম স্বাক্ষরকারী "রাঘব দত্ত" বাঁশবাড়িয়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রাঘব মজুমদার (রাজত্বকাল ১৬৬১-৭৪ খ্রী.) বটেন—তৎকালে বোড়ো পরগণা 'নওয়াব খাঁন্নে আলি শাহ' নামক রাজপুরুষের 'জায়গীর' ছিল। জগন্নাথদেবের অপর একটি দেবোত্তর 'বালিয়া' পরগণায় "পূর্ব্বের জমিদার ভূপতি শর্ম্মন, বলরাম রায়দত্ত, মহেন্দ্র রায়, অনন্তরাম রায় ও প্রাণবল্লভ রায়" সেবাত শিবেশ্বর অধিকারীকে দান করেন—চণ্ডীগড়ি গ্রামে ২৫/২ পরিমাণ ভূমি। শিবেশ্বরের পৌত্রদ্বয় কালিচরণ ও রামচন্দ্র ১২১০ সনে লিখিয়াছেন "ভোগ একশত চৌত্রিশ বৎসর"—অর্থাৎ দানের তারিখ হয় ১০৭৬ সন (হুগলীর ৬৫২৪৫নং তায়দাদ)। মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা লীলায় একটি কৌতুকজনক ছড়া মুদ্রিত হইয়াছিল (নগেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত 'পুরীতীর্থ', ১৩২২, পৃ. ১৩১-৩৪)। প্রসঙ্গতঃ আমরা জেলার প্রধান তীর্থস্থান তারকেশ্বরের বিবরণে (পৃ ৮১৪-৩১) কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিতেছি। ১২৩১ সনে মোহন্ত গিরির 'জবাবে' পাওয়া যায়, ১২১৩ সালের ৩২ আষাঢ় ডাকাইতী হইয়া সমস্ত দলিলপত্র নষ্ট হয়—কেবল রক্ষা পায় "রায় তারামল্লর ১৮৫ সালের আচদৌত মহত্বত বন্দী এক কেতা সনন্দ"। এই সনন্দ (পৃ. ৮২৩ মুদ্রিত) নিশ্চিতই জাল—আকবরের পূর্ব্বে বঙ্গাব্দের প্রচলন ছিল না। সহদেব চক্রবর্ত্তী ১১৪১ (বা ১০৪১) সালে তারকেশ্বরের 'দয়া' লাভ করিয়াছিলেন—ঐ সাল তীর্থপ্রতিষ্ঠার তারিখ নহে। তারকেশ্বরের দেবোত্তর সম্পত্তির মোট পরিমাণ ১০২৫।১ (১১৩১ নং তায়দাদ) এবং দাতা যথাক্রমে তারামল্ল (আদি মোহন্ত ৺মায়াগিরি রঘুরাম উদাসীন গ্রহীতা), তৎপরে রাজা জগৎ রায়, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র (বলভদ্র গিরি গ্রহীতা), চিত্রসেন (শিবচন্দ্রগিরি গ্রহীতা), তিলকচাঁদ প্রভৃতি। ১১৯৮ সালে বর্দ্ধমানে পরশুরামগিরি বনাম কন্দর্প-গিরির মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় (৬।৫।১৭৯১ খ্রীঃ)। তাহাতে মোহন্তদের শিষ্যপরম্পরা এইরূপ পাওয়া যায়—সমুদ্রনাথগিরি, যমুনাগিরি, সহরগিরি, অরুণাচলগিরি, প্রসাদগিরি, পরশু-

* হুগলী জেলার ইতিহাস—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র। শিশির পাবলিশিং হাউস, ২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পনর টাকা।

নাম। তৎপর যথাক্রমে মোহন (১২০৫ সন হইতে), মধুচন্দ্র (১২৭২ সনে মৃত), মাধবচন্দ্র (১২৯১ সনে মৃত) ও সতীশচন্দ্র। মোহন্তদের অন্যত্র মুদ্রিত তালিকা (পৃ. ৮২৪, সতীশগিরি-কৃত তারকেশ্বর-শিবতত্ত্ব, ২য় সং, ১৩২৮, হুগলী-মালা প্রভৃতি) কল্পিত ও প্রমাণ বিরুদ্ধ। শ্রীমন্তগিরি মোহন্ত ছিলেন না। তীর্থ-প্রতিষ্ঠা খ্রী: ১৭শ শতাব্দীর পরে হয় নাই, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হইতে পারে। "জোতশম্ভু" গ্রামই অধুনা তারকেশ্বর নামে পরিচিত হইয়াছে। পরগণা বালিগড়ির আদি জমিদার রাজা বিষ্ণুদাস ১২০১ সনেই ১৮ পুরুষ বা 'আটদশ পুরুষ' পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন (৬৪৮৫ ও ২৬৫১১নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)—সুতরাং তিনি নিশ্চিতই ১৮শ শতাব্দীর লোক নহেন। জেলার অপর প্রসিদ্ধ তীর্থধাম গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র বিষয়েও বহু তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এই জেলার দেবমন্দিরের এবং বিশেষ করিয়া শিবমন্দিরের ইয়ত্তা করা যায় না—যতদূর সম্ভব প্রধান মন্দিরগুলির একটি নির্ভর-যোগ্য তালিকা সংগৃহীত হইলে বর্ত্তমান জনসাধারণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বুঝিতে পারিবে, ইংরেজ-শাসনের পূর্ব্বে বাঙালীর সভ্য-সভ্যতা অধ্যাত্মস্তরে কতটা উন্নত ছিল। আমরা সোমড়ার রায় রামশঙ্কর-স্থাপিত মহাবিদ্যা নামক জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির নবরত্ন মন্দিরের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করিতেছি—ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৮৭ শক (=১৭৬৫-৬ খ্রী:)। বৈদ্যবংশীয় এই রামশঙ্কর "সারাৎসারতন্ত্র সংগ্রহ" নামে এক বিশাল তান্ত্রিক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

সামাজিক ইতিহাসের উপকরণস্বরূপ এই গ্রন্থে বহু বিবাহ-কারীর তালিকা সাড়ম্বরে মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ১৯২-৯৮)—মোট সংখ্যা ১০২ (মুখবংশীয় ৬১, বন্দ্যবংশীয় ৫০, চট্টবংশীয় ১৬ ও গাঙ্গুলী ৫ জন) এবং গ্রামসংখ্যা ৭৪। তালিকাটি বহুলাংশে কৃত্রিম বলিয়া বিদ্যাসাগরের সময়েই প্রতিবাদ হইয়া-ছিল। বস্তুতঃ কৌলীন্যপ্রথার উৎপত্তি ও পরিণতি বিষয়ে এ যাবৎ যাহা লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে তাহা নিতান্তই ভ্রমপ্রমাদবহুল, কারণ যে সকল মূল কুলগ্রন্থে ইহার বিবৃতি আছে তাহা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে অদ্যাপি পরীক্ষিত হয় নাই। উক্ত তালিকার পরিবর্ত্তে এই জেলার গ্রামে গ্রামে যে সকল চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়া ৩০০।৪০০ বৎসর ধরিয়া শাস্ত্র ও ধর্ম্ম শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা দেশ-বিদেশে প্রচার করিয়াছিল তাহাদের তালিকা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ত্রিবেণী, বাঁশ-বেড়িয়া, কোন্নগর প্রমুখ গ্রামসমূহে আমরা সহস্রাবধি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদের নাম সংগ্রহ করিয়াছি এবং বহু স্থলে কাশী-কাঞ্চী-দ্রাবিড় হইতে ছাত্র আসিয়া পড়িয়াছে। বাঙালী জাতির এই গুরু-গৌরবের চিত্র ইতিহাসের অঙ্গরূপে গ্রহণীয়।
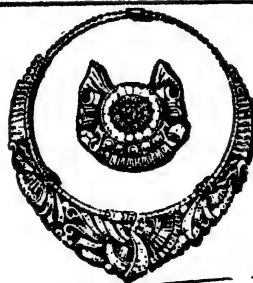
ঐতিহাসিক উপকরণের একটি প্রধান অংশ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বটে। বাংলার শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃত শিক্ষা বহুকাল বিলুপ্তপ্রায় হওয়ার ফলে সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থে অতি শোচনীয় ভ্রমপ্রমাদ স্থান লাভ করিয়াছে—আলোচ্য গ্রন্থও এ বিষয়ে বাদ পড়ে নাই। পবনদূতের শ্লোকে (পৃ. ১৪৭) লক্ষ্মণসেনের অভীষ্টদেব "মুরারি শর্ম্মা"র উল্লেখ নাই, আছে তৎস্থাপিত 'কমলাকেলিকারো মুরারিঃ' অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর প্রণয়ী বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা। এই গ্রন্থের বহু স্থলে (পৃ. ২২, ১৪, ৩২১, ৩৬৩, ৩৬৭, ৩১০, ৩১৩, ৪১৭, ৬৩৬, ৭৬১, ৮৩৩) দেশাবলী বিবৃতি ও দিগ্বিজয় প্রকাশ নামক দুইটি গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—উভয়ই বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত দুইটি জাল গ্রন্থ, যাহার একটি উক্তিও বিনা প্রমাণে গ্রহণ-যোগ্য নহে (*Journal, R. A. S. B.* XV, 1949. pp. 119-123)। শাস্ত্রী মহাশয় ও তাঁহার অনুগত নগেন বসু গ্রন্থদ্বয়ের কৃত্রিমতা ধরিতে না পারিয়া বিষম কাণ্ড ঘটাইয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থকারদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা ও গ্রন্থনাম একটি পরিশ্রমসাধ্য অপূর্ব্ব সঙ্কলন এবং যথাযথ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলে গ্রন্থের শ্রেষ্ঠাংশরূপে পরিণত হইতে পারে। সংস্কৃত গ্রন্থকারদের নাম পৃথক তালিকায় সাবধানে সঙ্কলিত হওয়া কর্ত্তব্য। বহু বিখ্যাত নাম বাদ পড়িয়াছে, যথা—ত্রিবেণীর চন্দ্রশেখর বাচস্পতি, বংশবাটীর জগদেব ন্যায়ালঙ্কার, দীর্ঘাঙ্গনিবাসী কবি, আলঙ্কারিক ও বৈদ্যক গ্রন্থকার কবিচন্দ্র দত্ত, সুগন্ধ্যার বসু-রায় বংশের বৈদ্যক গ্রন্থকার বৈদ্যরাজ প্রভৃতি। তালিকামধ্যে কয়েকটি প্রাচীন নাম দেখিয়া আমরা অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়াছি—তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ, নিদান টীকাকার বিজয় রক্ষিত, কাশিকাবৃত্তিকার বামন-জয়াদিত্য, বিবেককার শূলপাণি প্রভৃতি। হুগলী জেলার সহিত এই সকল ভারতবিশ্রুত মহাপণ্ডিতের অসম্ভব সম্বন্ধকল্পনা বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার শোচনীয় অবনতির ফলে সম্ভব হইয়াছে। আমরা দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ কামনা করিয়া গ্রন্থটির কিছু ত্রুটি প্রদর্শন করিলাম। স্থানীয় ইতিহাসের উপকরণ প্রায়শঃ এখনও গ্রামে গ্রামে লুক্কায়িত রহিয়াছে এবং তাহার অতি সামান্য অংশই এযাবৎ উদ্ঘাটিত ও পরীক্ষিত হইয়াছে—এ বিষয়ে যে সকল অন্তরায় বিদ্যমান তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল ধনী লোকের উদাসীনতা। স্থানীয় গবেষণায় যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা ভিন্ন কেহই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, তথাকথিত শিক্ষিত লোকের গৃহে পুরাতন প্রমাণপত্র পরীক্ষার্থ বাহির করা কি দুরূহ ব্যাপার এবং এ বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্য জগতের তুলনায় কতদূর পশ্চাৎপদ হইয়া আছি। দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতার প্রাসাদবাসী এক শ্রেণীর লেখক বিনা পরিশ্রমে ধনবলে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে বাঙালীকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিতেছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থকার এই সকল অন্তরায়ের সম্মুখীন হওয়ার সাহস ও অদম্য উৎসাহের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন এবং সাদরে তাঁহার বিপুল পরিশ্রমকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের সম্পর্কে ভক্তেরা নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বাংলা ভাষায় তাঁহার যে সকল জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দু'একখানি ছাড়া আর সব-গুলিতেই তাঁহাকে ভগবানের অবতার প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই সকল পুস্তকে তাঁহার জীবন ও অধ্যাত্ম-সাধনা সম্পর্কে এমন সব কথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহার প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

এমন অনেকে আছেন যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না বটে, তবে তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন। কিন্তু একথা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে, পরমহংসদেব ছিলেন কামকাঞ্চনে সম্পূর্ণ রূপে অনাসক্ত পূতচরিত্র, দিব্য জীবনের অধিকারী বিরাট পুরুষ। তাঁহার জীবনে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের যে আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। তাঁহার সাধনাপূত জীবনাদর্শ পাশ্চাত্ত্যের কোন কোন শ্রেষ্ঠ মনীষীকে পর্য্যন্ত গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাঁহার তিরোধানের দশ বৎসর পরে ম্যাক্সমূলার "A Real Mahatman" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। আধুনিককালে রমাঁ রলাঁ রামকৃষ্ণদেবের জীবনী লিখিয়া এই মহাপুরুষের আবির্ভাবের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

এই লোকোত্তরচরিত মহাপুরুষ সম্বন্ধে যে সকল গালগল্প, অতিরঞ্জন এবং অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে ভক্তের অনুরাগ বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু যাঁহারা সত্যান্বেষী, পরমহংসদেবের আসল স্বরূপটি কি ছিল, কোন্ গুণে আত্মপ্রতিষ্ঠায় বীতস্পৃহ হওয়া সত্ত্বেও—

> যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
> স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

—গীতার এই বাণী তাঁহার জীবনে উদাহৃত এবং সার্থক হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে লোকগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর যাঁহারা চান তাঁহাদের একমাত্র উপজীব্য সমসাময়িক সাক্ষ্য-প্রমাণ—প্রত্যক্ষ দর্শন এবং সত্যের ভিত্তির উপর যাহার প্রতিষ্ঠা। এত-কাল পরমহংসদেব সম্বন্ধে সমসাময়িক ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠাসমূহে ও অন্যত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, এবং সেগুলির প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে

বিলীন এই সমস্ত উপকরণ অক্লান্ত পরিশ্রমে সমাহরণপূর্ব্বক গ্রন্থকারদ্বয় পরমহংসদেবের জীবন ও চরিত্রমাহাত্ম্যকে প্রকৃত সত্যের আলোকে যাচাই করিয়া লইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ১৮৭৫ সনের ২৮শে মার্চ কেশবচন্দ্র-পরিচালিত ইণ্ডিয়ান মিরের প্রথম পরমহংসদেব সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়। তখন হইতে তিরোধানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাল (১৮৮৮ সালের শেষভাগ) পর্য্যন্ত এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রায় সমুদয় তথ্যই এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। তা ছাড়া ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি ব্রাহ্ম নেতাদের গ্রন্থে প্রদত্ত পরমহংস-প্রসঙ্গ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অশ্বিনীকুমার দত্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মূল্যবান তথ্যাদিকলিত স্মৃতিকথা ইত্যাদিও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকারদ্বয় সমসাময়িক সংবাদপত্রাদি হইতে সঙ্কলিত তথ্য কালানুক্রমিকভাবে পর পর সন্নিবেশিত করিয়াছেন মাত্র. এগুলির উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ বা মনগড়া ভাষ্য-রচনা করেন নাই—সূর্য্যকে মৃৎপ্রদীপ জ্বালাইয়া দেখাইবার ব্যর্থপ্রয়াস না করিয়া ভালই করিয়াছেন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত অভিনিবেশসহকারে অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাতে সঙ্কলিত তথ্যাদির মধ্যে পরমহংসদেবের অধ্যাত্ম ও ভাব-জীবনের মূল সূত্রটি বিধৃত রহিয়াছে এবং এগুলির মাধ্যমেই এক মহাজীবনের অভ্রভেদী বিরাট মহিমার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের চোখের সামনে পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

পরমহংসদেব আত্মপ্রচারে বিমুখ ছিলেন একথা যেমন সত্য, তেমনি কেশবচন্দ্র দ্বারা যে তাঁহার মাহাত্ম্য-কথা, এমন কি উক্তিসমূহ পর্য্যন্ত 'কথামৃতে'র বহপূর্ব্বে প্রথম শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হইয়া সমসাময়িক জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীবৃন্দকে তাঁহার চরণোপান্তে টানিয়া আনিয়াছিল ইহাও তেমনি ঐতিহাসিক সত্য। কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ এই দুই জন মহাপুরুষের তিরোধানের পর কে কাহার নিকট কতটা ঋণী তাহা লইয়া দলীয় মনোভাব উৎকট আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া ধর্মজগতের নির্ম্মল আবহাওয়াকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল। সাময়িক বুদ্ধিভ্রংশতা বশতঃ কেশবের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন-প্রয়াসী কেহ কেহ তখন পরমহংসদেবকে ব্যাধিগ্রস্ত এবং বিকৃতমস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু সমসাময়িক কেশব-শিষ্যেরা পরমহংসদেবকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাঁহাকে কিরূপ উচ্চাঙ্গের আত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ মনে করিতেন তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় এই পুস্তকে সঙ্কলিত তাঁহাদের স্মৃতি-কথাগুলি হইতে পাওয়া যাইবে। তন্মধ্যে *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen* প্রণেতা আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিকথাটি (*The Theistic Quarterly Review*, October-December 1879-এ প্রকাশিত) এমনি যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যসমর্থিত ও অকপট যে তাহা পরমহংসদেবের অধ্যাত্ম-জীবনের দিগ্‌দর্শনে ধর্ম্মসম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই সমভাবে সহায়ক হইবে। অন্ততঃ, ব্রাহ্ম-সমাজে মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপাসনা প্রবর্ত্তনের জন্য কেশবচন্দ্র যে পরমহংস-দেবের নিকট ঋণী, প্রতাপচন্দ্রের রচিত কেশব-জীবনীতে তাহার স্বীকৃতি আছে।

কিন্তু এহ বাহ্য। কে কাহার নিকট ঋণী তাহা লইয়া চুলচেরা বিচার—সার বস্তু ফেলিয়া খোসা লইয়া টানাটানি করিবার মত। আসলে পরমহংসদেব এবং কেশবচন্দ্রের মধ্যে যে কি মধুর আত্মিক সম্পর্ক ছিল, পরস্পরের দর্শনে তাঁহারা উভয়ে কিরূপ পুলকিত হইতেন, কেশবের বিরহ পরমহংসদেবের ভাবপ্রবণ অন্তরকে কিরূপ বিচলিত ও বেদনাতুর করিয়া তুলিত তাহার পরিচয় এই পুস্তকের বহু স্থানেই পাওয়া যাইবে।.

প্রতাপচন্দ্র ছাড়া সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের স্মৃতি-কথার মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী বা নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রবন্ধ বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। নগেন্দ্রনাথ তাঁহার নিপুণ তুলিকায় পরমহংসদেবের ভাবসমাধি এবং মহাসমাধি দুয়েরই যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব।

লোকচক্ষুর অন্তরালে পরমহংসদেবের অধ্যাত্ম এবং লৌকিক জীবন সম্পর্কিত যে সকল অমূল্য উপকরণ অনাদরে অবহেলায় আত্মগোপন করিয়াছিল সেগুলি আহরণ করিয়া গ্রন্থকারদ্বয় এক মহৎ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন—এই তথ্যাবলী পরমহংসদেবের জীবনের তথা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাসের উপর অভিনব আলোক-সম্পাত করিয়াছে। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে পুস্তকখানি আকর গ্রন্থের মর্য্যাদালাভ করিবে এবং ভবিষ্যতে যিনিই পরমহংসদেব সম্পর্কে সত্যাশ্রিত তথ্যমূলক জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন এখানি তাঁহার নিকট অপরি-হার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। পুস্তকের ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও অনবদ্য।

এশিয়ার নৃত্য-ছন্দ (নৃত্য নাটিকা)—স্বপন বুড়ো। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম পাঁচ সিকা মাত্র।

১৯২৭ সনের ২৩শে জানুয়ারী তারিখটি ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ দিন রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য নটীর পূজা অভিনীত হইয়া দর্শকদের সমক্ষে এক অভিনব রসলোকের দ্বার উদ্ঘাটিত করে—নটীর পূজায় রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী নৃত্যের সংযোজনা করিয়াছিলেন—তাঁহার সৃজনী প্রতিভার গুণে উক্ত নাটকে সাহিত্য এবং নৃত্যকলার এক অপূর্ব্ব মিলন সাধিত হয়—তার পর তিনি ঋতুরঙ্গ, শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা ইত্যাদি আরও অনেকগুলি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ক্ষেত্রে তাঁহার অনুগামীর সংখ্যা খুবই কম। নৃত্য আজ আমাদের বিবিধ সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানের অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ছোট ছোট বালক-বালিকারাও নৃত্যকলানৈপুণ্যে আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাহাদের উপযোগী নৃত্যনাট্য অভিনয়ের অভাব আছে।

খ্যাতিমান শিশু-সাহিত্যিক 'স্বপন বুড়ো' এই অভাবপূরণে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ জানাইতেছি। বিশেষ ভাবে বালিকাদের অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত এই নৃত্যনাট্যে তিনি যে মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়।

নাটকের কাহিনীটি শিশুদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিবে। মেঘগর্জ্জন-মুখরিত বিদ্যুৎ-চমকিত এক ঘনান্ধকার রাত্রে সুন্দরবনের বাঘের মুলুকে দৈবক্রমে সমাগত বর্ম্মা দেশের পারিয়া কুকুর, আসামের হরিণ, চীনের ড্রাগন, দক্ষিণ ভারতের বীর হনুমান, গুজরাটের হাতী এবং উত্তর ভারতের উট, জাপানের প্রজাপতি, সিংহলের সাপ ইত্যাদি নানা জন্তু জানোয়ারের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠিল। মারামারি হানাহানি করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইবার পর তাহারা বুঝিতে পারিল যে, বেতালা হইয়া বেচালে চলিয়া তাহারা ছন্দপতন করিয়া বসিয়াছে, তখন তারা 'অমিল আর আড়ি'কে ভুলিয়া ছন্দের আসর বসাইল—প্রথমে প্রদর্শিত হইল শিবদুর্গার গাজন নৃত্যের গান, সতীতাণ্ডব আর সাঁওতালী নৃত্য। শেষে প্রত্যেকটি জানোয়ার প্রদর্শন করিল নিজ নিজ দেশের নৃত্যকলা। মিষ্টি সংলাপ, নৃত্যের আনুষঙ্গিক সঙ্গীতগুলির সুন্দর ছন্দ ও কথার মধ্যে এরূপ যাদু রহিয়াছে যে তাহা এমনি পাঠ করিলেই শিশুচিত্ত নন্দিত হইবে—সুষ্ঠুভাবে অভিনীত হইলে এই সুন্দর নৃত্যনাট্যখানি যে কি অপরূপ রূপসৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই নাটকে সন্নিবিষ্ট গানগুলির সুর সংযোজনা করিয়াছেন শ্রীসুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য—পুস্তকে সবগুলি গানেরই স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে।

এশিয়ার অনেকগুলি প্রধান প্রধান নৃত্যকে চরণ ছন্দে রূপায়িত করিবার সুযোগ নাটকখানিতে আছে। তবে এই ছন্দের আসরে যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের দুইটি প্রাণীকে আনিয়া হাজির করিলে ভাল হইত—এশিয়ার নৃত্যকলার ক্ষেত্রে যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের নৃত্যকলা কি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে রবীন্দ্রনাথের "যাত্রী" পুস্তকে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে—যবদ্বীপের নৃত্যকলাকে রূপদান করিতে পারেন বাংলা দেশে এমন নৃত্যশিল্পীও আছেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দীনবন্ধু মিত্র—শ্রীসুশীলকুমার দে। এ. মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ১৸০ আনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-ভাষণে গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই ভাষণ মুদ্রিত হইয়া সুদৃশ্য গ্রন্থাকারে এইবার প্রকাশিত হইল। বঙ্গ-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রেই ইহাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিবেন। আমাদের নাট্যসাহিত্য বেশী সমৃদ্ধ নয়। যে দুই-এক জন অসাধারণ প্রতিভাবান্ লেখক প্রকৃত নাটক-রচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, দীনবন্ধু, নিঃসন্দেহ, তাঁহাদের অন্যতম। সম্প্রতি তাঁহার নাটক সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঔৎসুক্য দেখা যাইতেছে, ইহা সুলক্ষণ। তাঁহার নাটকের নীতি ও রুচিগত দুর্ব্বলতার অভিযোগ মধ্যে মধ্যে শোনা গিয়াছে। সে সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য: "যাঁহারা বলেন, শ্লীলতার চেয়ে অশ্লীলতার দিকেই দীনবন্ধুর ঝোঁক বেশী, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে দীনবন্ধুর মত নাট্যরসিকের সমগ্র জীবনদৃষ্টি শ্লীলও নয়, অশ্লীলও নয়,—নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ।" উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক ও সামাজিক পটভূমিতে দীনবন্ধুর নাট্যসৃষ্টি-প্রতিভার পরিচয় দেওয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য। পাণ্ডিত্য ও রসবোধের সমন্বয়ে গ্রন্থকার সে উদ্দেশ্যসাধনে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছেন।

সবিনয়ে সামান্য একটি ত্রুটির উল্লেখ করি। ৩২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' "১৮৫৩-৫৭" সালে রচিত। 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল ১৭৭৯ শক মুদ্রিত আছে; ইহা ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ ছাড়া অন্যরূপ হইতে পারে না। ১৩৩৮ সালের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, উহার প্রকাশকাল ইং ১৮৫৮।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বাধীন চিন্তা ও নয়াসমাজের গোড়াপত্তন—শ্রীপ্রমোদকুমার ঘোষ। লেখক কর্তৃক পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৭। মূল্য ১।০ আনা।

দেশের বর্ত্তমান দুঃখদৈন্য, খাদ্যসঙ্কট, রাজনীতি, দলাদলি, সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং নূতন পরিকল্পনায় পুনর্গঠন প্রভৃতি বহু বিষয় লেখক স্বল্পপরিসরের মধ্যে আলোচনা করিয়াছেন। লেখক আদর্শবাদী এবং তাঁহার মতে দেশের হিতকামী ব্যক্তিগণ যেভাবে দেশবাসীকে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান ভারতবর্ষে বাস্তবক্ষেত্রে কার্য্যকরী হওয়ার পক্ষে বহু বিঘ্ন আছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইতে গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ পর্য্যন্ত একই আদর্শ অনুসরণের দরকার কিন্তু ইহা কিরূপে

সম্ভব তাহাই সমস্যা। লেখকের আশাবাদ বাস্তবতাকে ছাড়িয়া অনেক ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে এবং স্থানে স্থানে অশ্বকে শকটের পশ্চাতে স্থাপন করিয়াছে। লেখক অনেক স্থানে ইংরেজী হরফে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ ইহার কোন আবশ্যকতা ছিল না। লেখক চিন্তাশীল, কিন্তু তাঁহার চিন্তা বাস্তবতার পথে সমস্যার সমাধানে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অধিক খাদ্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ।—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত আরও খাদ্য ফলাও সম্পর্কিত পুস্তিকা। ৫০ পৃষ্ঠার নানা ছবি সম্বলিত এই পুস্তকে আমাদের সরকারের ধান, আলু, পাট প্রভৃতির চাষ, সার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচেষ্টার অনেক তথ্য দেওয়া হইয়াছে। মডেল ফার্মের সাহায্যে জনমত গঠনের চেষ্টাও প্রশংসনীয়। আন্তর্জাতিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা দ্বারা আমাদের কৃষির শোচনীয় অবস্থা দেখান হইয়াছে। কৃষক ও কৃষি-অনুরাগীদের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার কাম্য।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মনপ্যাথি—শ্রীশচন্দ্র নন্দী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পরশুরামের বিখ্যাত হাসির গল্প 'চিকিৎসা-সঙ্কট' অবলম্বনে 'মনপ্যাথি' নাটকখানি রচিত হইয়াছে। মূল গল্প খুব ছোট। তাহা সত্ত্বেও গল্পের মূলভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাট্যকার আশ্চর্য নৈপুণ্য এবং মুন্সিয়ানার সঙ্গে ইহাকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসির নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। পরশুরামের প্রত্যেক গল্পেই অনাবিল হাস্যরসের যে ধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, মনপ্যাথি নাটকের সর্ব্বত্রই সে ধারাটি বজায় আছে, এক কথায় মনপ্যাথি 'চিকিৎসা-সঙ্কটে'র একটি সার্থক নাট্যরূপ। নাটকের চরম সার্থকতা অভিনয়ে। 'মনপ্যাথি' নাটকখানি বহুস্থানে—এমন কি সুদূর লণ্ডনে পর্য্যন্ত সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে। 'মনপ্যাথি'র হাসির তরঙ্গ যে পাঠক এবং দর্শকের মনকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে নাটকখানির দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ।

অভিসার রঙ্গনটি—রমাপদ চৌধুরী। ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ। ৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

'অভিসার রঙ্গনটি' একখানি ছোট গল্পের বই। বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের প্রাণান্তকর প্রয়াস সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট এবং এই নিদারুণ জীবনসংগ্রাম ও প্রতিকূল পরিবেশের জন্য আমাদের জীবনযাপনের প্রণালীও জটিল হইতে বাধ্য এবং স্বাভাবিকভাবেই যে আধুনিককালের মানুষের মানসলোকেও তাহার ছাপ পড়িবে তাহা বলাই বাহুল্য। 'অভিসার রঙ্গনটি'র গল্পগুলিতে লেখক আধুনিক জীবনের গ্লানি, প্রবঞ্চনা ও বেদনার ছবি আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু সমস্যার উপর আলোকপাত করিলেই সার্থক ছোটগল্প হয় না—রস-রূপ উজ্জ্বল হইয়া না উঠিলে তাহা সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে ব্যর্থ হয়। বাস্তবধর্মী সাহিত্য সকল যুগেই সমকালীন সমাজ-সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সমস্যা যেখানে নিছক বিশ্লেষণে পর্য্যবসিত হয়—সাহিত্য আর সেখানে সাহিত্য থাকে না—রসের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাহা বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় পরিণত হয়। 'অভিসার রঙ্গনটি'র গল্পগুলি পড়িয়াও বার বার এই কথাই মনকে পীড়িত করিয়া তোলে। ভাষার যাদু আছে, কথন কৌশল সুন্দর, কিন্তু নাই প্রাণের উত্তাপ। ভঙ্গীসর্ব্বস্ব সাহিত্যের ইহাই প্রধান ত্রুটি। প্রচ্ছদপটটি চমৎকার।

খোলা চিঠি—শ্রীকানাইলাল ঘোষ। দি প্রকাশনী, ২১, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য দেড় টাকা।

'খোলা চিঠি' বইখানিতে উপন্যাসের বিস্তৃতি থাকিলেও আসলে ইহা একটি বড় গল্প। সৈনিক হিসাবে লেখক মানুষের মহত্ব, উদারতা, দেশপ্রেমের যেমন পরিচয় পাইয়াছেন তেমনি মানুষের নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও কপটতাও তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সেই অভিজ্ঞতাই কাহিনীর আকারে এই বইয়ে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। লেখকের বলিবার ভঙ্গী এমনি সুন্দর যে তাহা পাঠকের মনকে বইখানির শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

প্রিয়া ও পরকীয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা। প্রাপ্তিস্থান—ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য—২৲।

অবিনাশ বাবুর কবি অথবা ঔপন্যাসিক পরিচিতি নিষ্প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি উপন্যাস। চিরন্তন একটি প্রেমের কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে, কিন্তু কাহিনী যাহাই হউক না কেন দরদ দিয়া নিষ্ঠার সহিত লিখিতে পারিলে অতি সাধারণ বিষয়বস্তুও অসাধারণ হইয়া উঠিতে পারে এবং পাঠকবর্গও অকুণ্ঠ চিত্তে তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে না। পুস্তকখানির ছয় মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এই উক্তি প্রমাণিত হইয়াছে।

সবার চেয়ে বড় কথা, লেখকের ভাষার এবং পরিবেশ সৃষ্টির উপর সংযম কোথাও ব্যাহত হয় নাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

মানভূমে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব

মানভূম জেলার কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদিগের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান—"মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথি"র উদ্যোগে বিশেষ সমারোহের সহিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পুরুলিয়া জেলা স্কুল হলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কুমারী গৌরী মজুমদারের উদ্বোধন-সঙ্গীতের দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভার মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির পক্ষ হইতে শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহুল প্রচারের জন্য অবিলম্বে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশের অনুরোধ জানানো হউক এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর রমা মজুমদার কর্ত্তৃক "তোমার আসন শূন্য আজি" সঙ্গীত গীত হইলে সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক শ্রীঅশোকনাথ চৌধুরী এক সুচিন্তিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গীত হইলে পর প্রধান অতিথি মানভূম জেলার ডেপুটি কমিশনার শ্রীমোহন চৌধুরী বক্তৃতা-প্রসঙ্গে দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইতে আবেদন জানান। সমবেত কণ্ঠে "জনগণমন অধিনায়ক" গীত হইবার পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

রূপনারায়ণ নদী সংস্কার পরিকল্পনা

আমরা নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইয়াছি :

"প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে বি-এন-আর রেলপুলের সাতটি পিলারের নিকট ৮।১০ ওয়াগন রেল-পাথর ঢালায় ঐ নদীর স্রোত মন্দীভূত হইয়া মজিয়া গিয়াছে। একমাত্র উক্ত কারণে দামোদর, দ্বারকেশ্বর, বরেল প্রভৃতি ছোট বড় বহু নদী-অঞ্চলে জলের অনটন দেখা দিয়াছে। ফলে নদী হইতে খাল কাটিয়া জলসেচন করতঃ একই জমিতে একাধিকবার ফসল ফলানোর যে সুবিধা ছিল তাহা বিশেষভাবে ব্যাহত হওয়ায় শস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটিতেছে। তাহা ছাড়া নদীর জলের সহিত প্রচুর পরিমাণ খাদ্যোপযোগী মৎস্য পাওয়ার যে সুবিধা ছিল তাহাও আশাতীত রকমে কমিয়া গিয়াছে। ইহা স্থানীয় অধিবাসিগণের আর্থিক সাচ্ছল্যের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কটের গুরুত্ব হ্রাস করিবার জন্য নদীর সংস্কার করিয়া প্রচুর জল-সরবরাহের নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বি-এন-আর রেল কোম্পানীর এই সরকার নথিপত্র হইতে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া বর্ত্তমানে নদীর অবস্থা ও ইহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল ইহার সাক্ষ্য দিবে। সুতরাং সরকারের সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ সহযোগিতা পাইলে উক্ত সংস্কার-কার্য্য অসম্ভব হইবে না।

স্থানীয় জনগণের পক্ষে
শ্রীহৃষীকেশ সরকার"
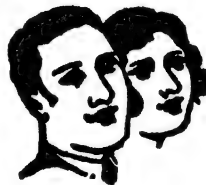
গ্রাম—সাহাপুর,
পোঃ—কোলাঘাট,
মেদিনীপুর।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

কর্ম্মবীর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার বরিশাল জেলার গাভা গ্রামে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। গাভা হাই স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া জ্ঞানচন্দ্র ১৯০৮ সনে বি-এ পাস করেন। তৎপরে তিনি আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৯১২ সনে বিখ্যাত দি সিটি অব গ্লাসগো ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্সি লইয়া কর্ম্মজীবন সুরু করেন। দুই বৎসর পর তিনি প্রভিন্সিয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হন। ইউনিভার্সাল

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

এসিওরেন্স কোম্পানী নামে আর একটি কোম্পানী প্রভিন্সিয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানী কর্ত্তৃক ক্রীত হইলে জ্ঞানচন্দ্র ইহার দায়-আদায় প্রভৃতির বন্দোবস্ত করেন। ভারতীয় বীমার ইতিহাসে এই প্রকার রদ-বদল ইহাই প্রথম এবং তিনি অতি সুষ্ঠুভাবে ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তারপর তিনি বোম্বে মিউচুয়াল বীমা কোম্পানীর চীফ এজেন্সী গ্রহণ করেন।

কলিকাতা শহরই ছিল তাঁহার প্রথম জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র। তারপর ক্রমে ক্রমে তিনি সমগ্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা ও আসামে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তার করেন। ১৯৫০ সালে অবসর গ্রহণের সময় তিনি বৎসরে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার কাজ দেখাইয়া গিয়াছেন। এদেশে বোম্বে মিউচুয়াল যে বীমা কোম্পানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাহার মূলে আছে জ্ঞানচন্দ্রের অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অমানুষিক কর্ম্মতৎপরতা। বাংলাদেশে যে ক'জন কর্ম্মবীর জীবনবীমার প্রতি বাঙালী জাতিকে অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছেন, জ্ঞানচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। তিনি অন্যান্য বহু ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

জ্ঞানচন্দ্র যেমন অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন তেমনি মুক্ত-হস্তে এই অর্থের সদ্ব্যয়ও করিয়াছেন। তাঁহার নিজের কোন বিলাসব্যসন ছিল না। বরিশাল সদর হাসপাতালে অস্ত্রোপচার বিভাগের একটি শাখা প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার তিনি বহন করিয়াছিলেন। জামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে তাঁহার দান অসামান্য। ভবানীপুর সামরিক হাসপাতালেও তিনি প্রভূত দান করিয়াছেন। গাভায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন।

ফুটবল খেলায় তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল। এক সময় তিনি ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁহাকে জেনারেল সেক্রেটারী পদে নির্ব্বাচন করিয়াছিল।

চিন্তাহরণ রায়

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের প্রাক্তন ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল চিন্তাহরণ রায় পরলোক গমন করিয়াছেন।

চিন্তাহরণ রায় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিত-শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৩ সালে দিল্লীর সেন্ট ষ্টিফেন কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ভাগলপুর টি. এন. জুবিলী কলেজে, মীরাট কলেজে ও গৌহাটি কলেজেও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৯১১ সালে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের আহ্বানে স্থায়ী ভাবে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে যোগদান করেন। মুখ্যত: তাঁহার ঐকান্তিক প্রয়াসে উত্তরকালে ব্রজমোহন কলেজ অবিভক্ত বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজে পরিণত হয়।

তিনি এই কলেজে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে যুক্ত ছিলেন। পরে কিছুদিন প্রিন্সিপ্যাল পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এস. কে. মিত্র

গত ২৬শে আষাঢ় এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির জল-সরবরাহ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার এস্. কে. মিত্র মিত্রের বাটীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৬৩ বৎসর। তিনি জল-সরবরাহ বিভাগের পুনর্গঠন করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ২০ বৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।
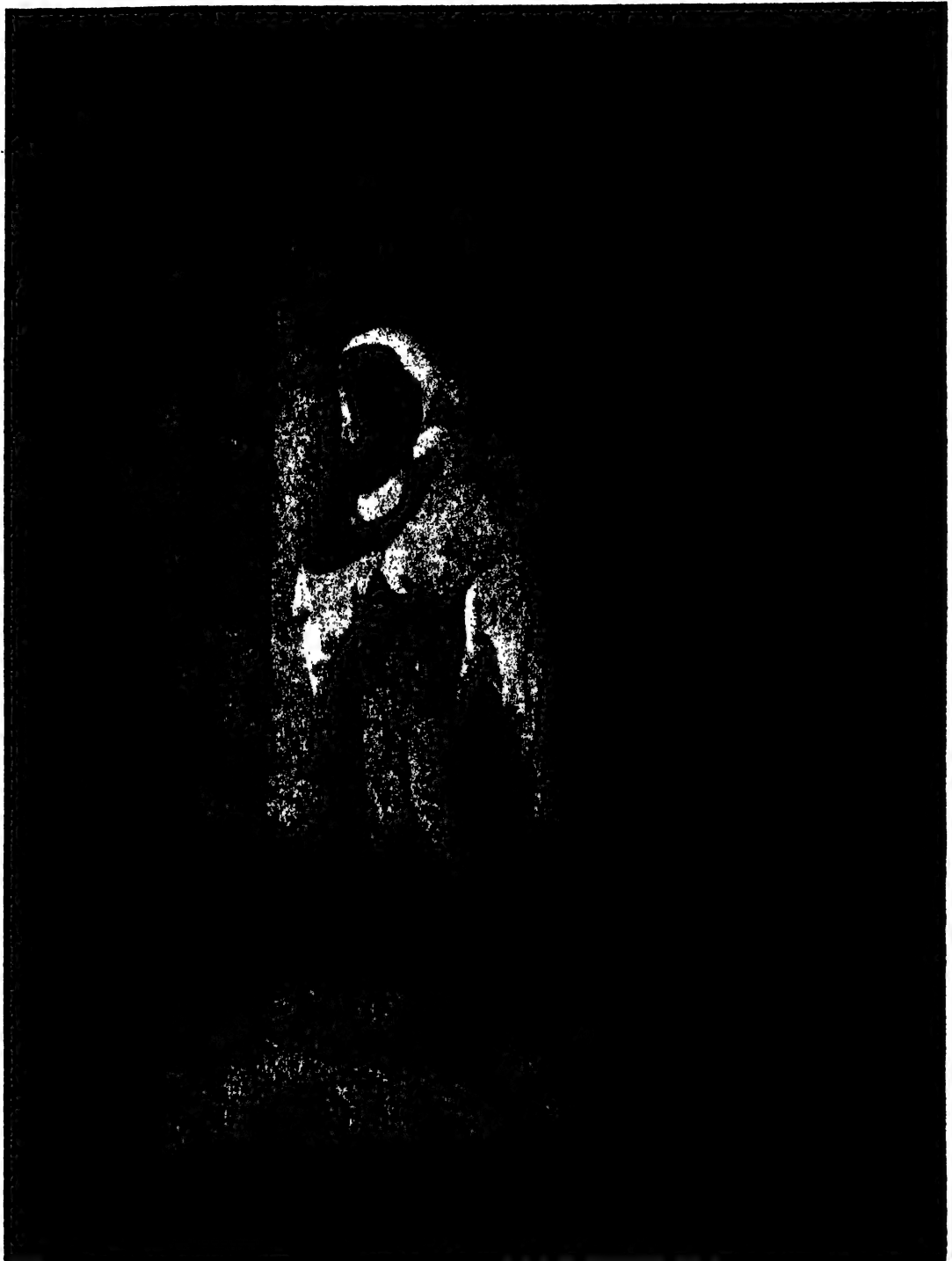
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

মা ও ছেলে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীসুখময় মিত্র

বুদ্ধ ও সুজাতা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিসার
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫২শ ভাগ
১ম খণ্ড } ভাদ্র, ১৩৫৯ ৫ম সংখ্যা
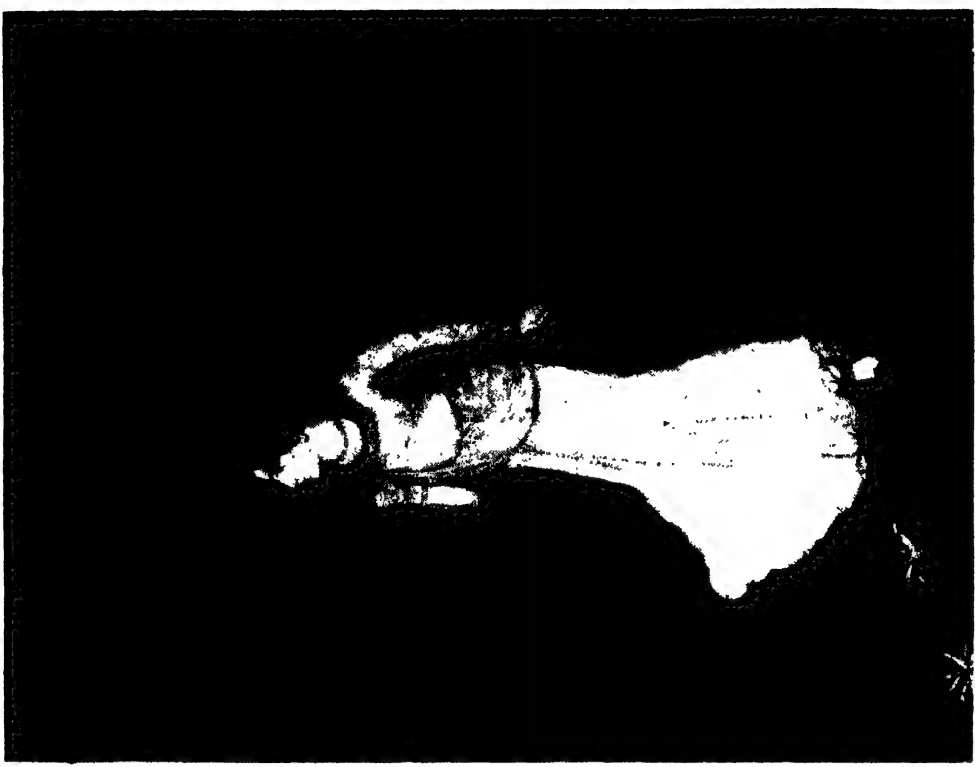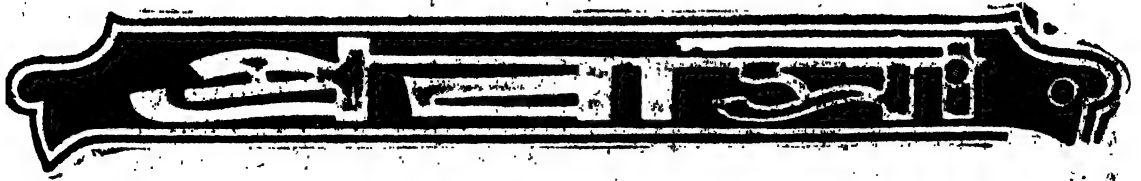
বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতার পাঁচ বৎসর অতীতের পর্য্যায়ে চলিয়া গেল। স্বাধীনতা দিবসে লোকের উচিত সেই সব মহামানবের কথা স্মরণ করা যাঁহাদের দৃষ্টি ও প্রয়াসে স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা মূর্ত্ত হইয়া উঠে। তাঁহাদের বাণী ও কীর্ত্তির কথা মনে জাগিলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসে যে, যে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন ধ্যান তাঁহারা করিয়াছিলেন, আজিকার স্বাধীন ভারত কি তাহাই?

সেই সঙ্গে প্রশ্নের উত্তরও আসে। স্বাধীনতা বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং যাহার মূল্য আমরা দিয়াছি তাহাই আমরা পাইয়াছি। মূল্য কি কেহই কিছু দেয় নাই? দিয়াছে নিশ্চয় দেশমাতৃকার সেই সুসন্তানগণ, যাহারা প্রত্যাশা কিছুই করে নাই, সর্ব্বস্ব রিক্ত করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে চরম আহুতি যাহারা দিয়া গিয়াছে এবং এখনও দিতে প্রস্তুত আছে। তাহারাই বা কি পাইয়াছে? পাইয়াছে নিশ্চয় তাহারা কিছু, কেননা কোনও অভিযোগ তাহাদের শোনা যায় না।

তবে পায় নাই কাহারা? যাহারা বিনামূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করিতে চাহে। স্বাধীনতার অর্থ তাহাদের নিকট বিনামূল্যে, বিনা প্রতিদানে স্বার্থসিদ্ধি ও লালসার তৃপ্তি। এই স্বাধীনতা চিরদিনই তাহাদের নিকট অলীক বস্তু হইয়াই থাকিবে—কেননা স্বার্থ ও লালসার শেষ নাই, ইহা অপূরণীয়।

এই স্বার্থ ও লালসার সঙ্গে যখন জ্ঞানের অভাব, শিক্ষার অভাব ও কর্ম্মবিমুখতা আসে তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাই আমরা আজ চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি। বাস্তব অভাব অনেক কিছু রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে অভাব কি শুধু গগনভেদী চীৎকারেই দূর হওয়া সম্ভব? পরের উপর দোষারোপ ত পরমুখাপেক্ষী স্বার্থসিদ্ধিরই রূপান্তর, উহাতে আত্মনির্ভর বা উদ্যোগময় পৌরুষের কোনও লক্ষণ নাই। দেশের লোক যত দিন কর্ম্মতৎপর এবং আত্মনির্ভরশীল না হয় তত দিন স্বাধীনতার অর্থই তাহারা বুঝিবে না এবং অভাব তাহাদের নিত্যসঙ্গী থাকিবেই। বাঙালী বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া আমাদের গর্ব্ব আছে—তাহা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, কিন্তু এই সহজ কথা তবে বাংলার সন্তান বুঝিয়াও বুঝে না কেন?

বাংলা আজ অভাবগ্রস্ত, সম্বিৎহীন, দুর্ব্বল ও সাহায্যের জন্য পরের দ্বারস্থ। কিন্তু ভিক্ষাপাত্রে যদি উচ্ছিষ্টের পরিমাণ যথেষ্ট না হয়, তবে ভিখারীর ক্রোধ ও ক্ষোভের অবসাদের জন্য চীৎকার ও গালিবর্ষণ ভিন্ন উপায় কি? আমরা পথে-ঘাটে দেখিতেছি সেই উপায়ের ব্যবহার—স্লোগানের চীৎকার এবং অনুযোগ ও অভিযোগের অবিরাম বর্ষণ। এই ভিক্ষাপথে বাংলার ও বাঙালীর দুঃখ কি কোন দিন ঘুচিবে?

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল, আজও কি আত্মপরীক্ষার সময় আমাদের হয় নাই, আত্ম-চেতনার মুহূর্ত্ত কি আসে নাই? আজও কি অর্ব্বাচীন অপোগণ্ডের চীৎকারই আমাদের একমাত্র অবলম্বন? নিস্তেজ, কর্ম্মশক্তিহীন, বিভ্রান্ত অবস্থায় আমরা কোন্ পথে চলিয়াছি তাহা কি বুঝাইবার কেহই নাই?

হইতে পারে অযোগ্য লোকে উচ্চ অধিকার পাইয়াছে, হইতে পারে আমাদের অর্জ্জিত ধন দস্যু-তস্করে, দুর্নীতি-পরায়ণ লোকে অপহরণ করিতেছে, হইতে পারে চোরাকারবারী, নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মহীন পাষণ্ডেই স্বাধীনতার সব সুখ ভোগ করিতেছে। ইহার প্রতিকারের পথ কি শুধু গলাভরা স্লোগান, মিথ্যার বদলে চতুর্গুণ মিথ্যা বা বিদেশীর দয়া ও শক্তির অর্চনা ও আবাহন?

বাংলার উদ্ধার নাই, ভারতেরও উদ্ধার নাই যদি আত্ম-পরীক্ষা ও আত্মনির্ভর আমাদের সকল ব্যবস্থার মধ্যে প্রথম স্থান না পায়।

"বাঙালী মরিলে বাঁচিবে কে" এ প্রশ্নের উত্তর 'বাঁচিবে সেই যাহার কর্ম্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতা আছে'। পৃথিবীর কত দেশ, কত জনপদ, কত জাতি এখন লোকস্মৃতির অতীত। কিন্তু কালের স্রোত ফিরে নাই, মানুষের প্রগতির পথও রুদ্ধ হয় নাই। বাঙালী অপেক্ষা তাহারা সকলেই কিছু কম ছিল না।

আমরা বুঝি শুধু সভা-আন্দোলনের পথ এবং বেকী-বিপ্লবের পন্থা। মাঠে-ময়দানে বা সভা-সমিতির গৃহে গরম বক্তৃতা চলিল, তাহার অতিরঞ্জিত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল, কিছুকালের মত দেশের কাজকর্ম্ম স্থগিত বা ব্যাহত হইল,

তাহার পর কিছু ভিক্ষা, কিছু সাময়িক দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিচয় ঘুচিল, তার পর সবই শান্ত, সবই ক্লান্ত। ভাগ্যচক্র ক্ষণিক থামিয়া আবার সেই পথেই চলিল। নিয়তির চক্রনেমী কি অত সহজে ফিরানো যায়?

বিহার আমাদের পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত বহু অঞ্চল অন্যায়-ভাবে অধিকারে রাখিয়াছে। তাহার উদ্ধারের জন্ত আমরা চেষ্টিত কতটুকু? অতীত গৌরব বা পুরাকালের পৌরুষ কাহিনী শুনাইলেই কি হারানিধির উদ্ধার হইবে? আজ বিহার জানে যে, বাংলা ও বাঙালীর গৃহস্থালী হইতে আরম্ভ করিয়া কল-কারখানা, পথঘাট নির্মাণ এ সবকিছুতেই বিহারী শ্রমিকের স্থান বাঙালী লইতে পারিবে না। বিহারী জানে যে, বাংলা এখন সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী, আত্মকলহে ব্যস্ত এবং সকল দিকেই কর্ম্মবিমুখ। তবে সে কেন তাহার অধিকার ছাড়িবে?

এই কলিকাতার বাঙালী শিশু বিহারী গোয়ালার উপর নির্ভর করিয়া দুধ পায়। বাংলার গোধন যাহা ছিল তাহা এখন কোথায়? গো-হত্যা নিবারণী সভার নাম শুনি, তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই, কিন্তু গো-সেবা বা গো-রক্ষার জন্ত তাঁহারা কতটুকু করিতে পারিয়াছেন? শহরে প্রকাশ্যে গো-মাংস বিক্রয়ে নিষ্ঠাবান হিন্দুর মনে আঘাত লাগা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু অস্থিচর্ম্মসার গরু তিলে তিলে মরিতেছে দেখিয়াও তাহাকে খাদ্য বা জল দিতে অগ্রসর হন কয়জন? এই অবহেলার ফলেই ত আজ বাংলার শিশু দুধের কাঙাল এবং ভিন্নপ্রদেশীয়ের দ্বারস্থ।

ভাষার ভিত্তিতে দেশগঠন কাম্য সন্দেহ নাই, কিন্তু যত দিন ছেঁড়া কাঁথা ও জীর্ণ কুটির লইয়াই কাড়াকাড়ি চলিবে, যত দিন আত্মকলহের কোনও চূড়ান্ত মীমাংসা না হইবে তত দিন ঐরূপ দাবী বিফল হইতে বাধ্য। দুর্ব্বলের সহায় স্বয়ং ভগবান আছেন, কিন্তু নিশ্চেষ্ট, অলস ও বাক্‌সর্ব্বস্বের সহায় একমাত্র যম। তবুও আমরা চলিব ঐ কর্ম্মহীন লক্ষ্যহীন উচ্ছ্বাসেরই পথে। স্বার্থলোভী নির্ব্বোধ নেতারা "বিপ্লব" করিতেছেন লোকের কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া, ছেলেদের লেখাপড়ায় ছাই দিয়া, অথচ বাহবা পাইতেছেন তাঁহারাই। "কংগ্রেস সরকার দেশ দুর্নীতিতে ছাইয়া দিয়াছে, জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে". সুতরাং দেশে আগুন লাগাও, দেশের কোটি কোটি লোক চরম দুর্দশাগ্রস্ত হউক, দুষ্টিমেয় অধিকারীবর্গ ত জব্দ হইবে। অতএব শ্রমিককে মুখ্যত পরিশ্রম গণতন্ত্রবিরোধী, ছাত্রকে মুখ্যত লিখন-পঠন মহাপাপ, তবেই দেশোদ্ধার হইবে। উদ্যোগ, পরিশ্রম, কর্ম্মতৎপরতা এই সব প্রাচীন শব্দ মরা বাংলায় অচল।

"হিয়ে আজাদী ঝুঠা হায়" একথা সত্য, কেননা আমরা স্বাধীনতা-যজ্ঞের পবিত্র হবি অবহেলা এবং আলস্যে কুকুরের মুখেই তুলিয়া দিতেছি।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধি ও সীমানার পরিবর্ত্তনের জন্ত ঐ প্রদেশের বিধান সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব আসে:

বিধান সভার অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার পূর্ব্বে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। একটি হইতেছে, শিশুক বাঁচার জন্ত বাংলার সংলগ্ন এলাকাগুলির জন্ত আবেদন, যাহাতে মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও জলপাইগুড়ি দার্জ্জিলিঙের মধ্যে সংযোগ সাধন হইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনে সাঁওতাল পরগণার কতকাংশের জন্তও আবেদন জানান হইয়াছে।

বিহারের প্রস্তাব সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায় উদ্বাস্তু ও অর্থনৈতিক সমস্যার চাপে পশ্চিমবঙ্গ যদি ভাঙিয়া পড়ে, তাহা হইলে বিহার এবং অন্যান্য রাজ্যের অবস্থা কি হইবে, সেই কথা ভাবিয়া দেখার জন্ত তিনি বিহারের নিকট আবেদন জানান। তিনি আরও বলেন যে, এক রাজ্যের সহিত অন্ত রাজ্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রহিয়াছে। এই কথা যত শীঘ্র আমরা বুঝিতে পারিব, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, ধানবাদ ও চাঁটাগরের ন্যায় অর্থকরী এলাকাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন এলাকার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। এই সকল এলাকার সহিত বিহার অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের অধিকতর মিল আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি সাঁওতাল পরগণার কথা বলেন।

ডাঃ রায়ের মানভূম ও সিংভূম সম্পর্কে এত সহজে ও অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ আমরা বুঝিলাম না। ঐ অঞ্চলগুলির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভাষার ও রক্তের যে যোগ আছে সে বিষয়ে অজ্ঞতা একটি কারণ বোধ হয়। যাহাই হউক, এইরূপ মৃদু ভাষার অনুরোধও বিহারী কর্ত্তাদিগের পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে:

বিহার কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্র বলেন যে, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ পরিষদে যে বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার ধরণ দেখিয়া মনে হয় যে, ডাঃ বিধান রায় ও তাঁহার বন্ধুগণ মৃত ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিতেছেন।

তিনি বলেন যে, বিহার কখনও এই দাবী মানিয়া লইবে না। তিনি আশা করেন যে, কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড ডাঃ রায় ও তাঁহার বাংলার বন্ধুদের প্রশ্রয় দিবেন না।

উহার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নায়ক শ্রীঅতুল্য ঘোষ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:

"শ্রী ঘোষ বলেন, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের মাথা গুঁজিবার ঠাঁইয়ের জন্ত পশ্চিমবঙ্গের কিছু স্থানের

অত্যন্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় সর্বসম্মত ভাবে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তৎসম্পর্কে বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রজাপতি মিশ্রের উৎকট্ভাবপ্রবণ বিবৃতির প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাড়াহুড়ো করিয়া সংবাদপত্রে বিবৃতিদানের পূর্ব্বে শ্রীযুত মিশ্র ঐ প্রস্তাবটি এবং মুখ্যমন্ত্রী বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গের [বক্তব্য সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন তাহা পাঠ করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই।

শ্রীযুত মিশ্রের ন্যায় একজন সংযত ও দায়িত্বশীল কংগ্রেস-নেতা কিরূপে এইরূপ মাত্রাহীন উক্তি করিতে পারেন, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। সম্ভবতঃ এখন বিহারের এই নেতার সুযোগমাফিক এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। আমরা সকল সময়ই সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছি যে, মানবতার দিক দিয়াই আমাদের দাবী উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা শ্রীযুত মিশ্রকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, উদ্বাস্তুদের জন্ত কিছু স্থান দাবীর পিছনে আমাদের কোন কুমতলব নাই।

বঙ্গ-বিভাগের ফলে আমরা প্রচণ্ড দুর্ভোগ ভোগ করিতেছি তাহা কে অস্বীকার করিবে? মাথা গুঁজিবার কিছুটা স্থানের জন্ত আমরা কি ভারতের সকল রাজ্য এবং কেন্দ্রের নিকট হইতে সহযোগিতা ও সহানুভূতি দাবী করিতে পারি না?"

শ্রী ঘোষের উত্তর তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনায় উপযুক্তই হইয়াছে। কেন, চোরাইমালের অধিকারীকে সোজা কথা বলার সাহস ও সত্যনিষ্ঠা দেখাইলে কি বাংলার কংগ্রেসের জাত যাইবে? মানভূম ও সিংভূমের বিরাট অংশ ভাষায়, সামাজিক প্রথায় ও রক্তের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গেরই অংশ একথা তো কংগ্রেসই বহু পূর্ব্বে মানিয়া লইয়াছে। এ বিষয়ে ইতিহাস, ভাষা ও দেশাচার অকাট্য সাক্ষ্য দিতেছে। বাংলাকে ও বাঙালীকে শাস্তি দিবার জন্ত বিদেশী দস্যু বাংলার যে ধন কাড়িয়া অন্তকে দিয়াছে তাহার উদ্ধারের জন্ত সোজা কথা বলারও যোগ্যতা যদি আমাদের না থাকে তবে তাহা কখনও ফিরিয়া আসিবে না। এই দাবীর পিছনে সমস্ত দেশের সকলের দাঁড়ানো প্রয়োজন, তবেই এই হারানো সন্তানদের আমরা ফিরিয়া পাইব।

"ভাষাগত রাজ্যগঠন"

ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের পুনর্গঠন সম্পর্কে অন্ত প্রদেশের নেতৃবর্গ কিরূপ স্পষ্ট ভাষায় দাবি জ্ঞাপন করেন তাহার উদাহরণরূপে নিম্নোক্ত সংবাদটি পঠনীয়।

অন্ধ্র রাজ্য হইতে নির্ব্বাচিত সংসদ সদস্য ডাঃ লঙ্কাসুন্দরম্ অমরাবতীতে নিখিল-ভারত ভাষাগত রাজ্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেন, "ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের এলাকার পুনর্বণ্টন ও পুনর্গঠনের দাবীর জন্য ভারতের ঐক্য কোনক্রমেই ব্যাহত হইবে না। পরন্তু ইহার ফলে প্রত্যেক নাগরিকই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হইয়া সর্ব্বের সহিত নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিবে।"

তিনি আরও বলেন, "ঐক্যবদ্ধ অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও কেরল রাজ্য ভারত সাধারণতন্ত্রের পরম সম্পদে পরিণত হইবে। পঞ্জাবী ভাষাভাষী রাজ্যগঠনও দেশের কল্যাণ ও শক্তি বৃদ্ধি করিবে।"

তিনি তাঁহার ভাষণে আরও বলেন যে, ভারত সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্তমান রাজ্যগুলির সীমানা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিবর্তনের ব্যবস্থা আছে৷ ক্ষমতা-মদমত্ত রাজনীতিবিদ্দের এই অনুচ্ছেদ অংশের ক্ষমতা যেন কোনক্রমেই না দেওয়া হয়। এই সকল রাজনীতিজ্ঞরা যদি আমাদের লক্ষ্যপথে বাধা দেন তাহা হইলে আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও বৈধভাবে লাভ-ক্ষতির কথা চিন্তা না করিয়া কঠোর সংগ্রামে ব্রতী হইব।

ডাঃ লঙ্কাসুন্দরম্ আরও বলেন, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যসমূহের পুনর্গঠন যে মুহূর্তে সুরু হইবে সেই মুহূর্তে রাজনৈতিক ও গঠনতান্ত্রিক সমস্যা এইরূপ প্রবল হইয়া উঠিবে যে, বর্তমানে যে সকল কংগ্রেসী সরকার কায়েম আছে তাহার মধ্যে বহু সরকারই হেলিয়া পড়িবে। সেইজন্যই বিভিন্ন রাজ্যে এই ক্ষমতা হাতে রাখিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হইতেছে না।

তিনি বলেন যে, আইনসম্মত সীমানা নির্দ্ধারণ জন্য প্রবল কমিশন গঠন করিতে হইবে। এই কমিশন প্রাক্তন লীগ অব নেশনসের ব্যবস্থানুযায়ী স্যাইলেশিয় কমিশনের অনুরূপ হইবে। এই কমিশন বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী গঠন করা যাইবে। দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের লইয়া এই কমিশন গঠন করিতে হইবে এবং উহার ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে হইবে।

তিনি দ্বি-ভাষাভাষী ও বহু-ভাষাভাষী শহরের সমস্যা আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই শহর এমন কি কলিকাতা শহরকেও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে পরিণত করিতে হইবে এবং ভারত সরকারের দপ্তর-সমূহ ঐ সকল শহরে পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরিশেষে তিনি বলেন যে, অলীক জগতে বাস ও বর্তমান সমস্যাগুলির প্রতি অবহেলার এই নীতি আত্মহত্যার তুল্য।"

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, বাংলার বিষয়ে কোনও সহানুভূতির চিহ্নও এই বিবৃতিতে নাই। বরং বাংলার প্রধান নগরকে কাটিয়া লওয়ার প্রস্তাব আছে। আমাদের "সত্যাগ্রহ ও কৃতাঞ্জলীপুট" গরুড় সদৃশ নেতৃবর্গ বাংলাকে ও বাঙালীকে ভিন্নপ্রদেশীয়ের চোখে এতই হীন করিয়াছেন যে, আমরা এই অবস্থার সম্মুখীন। এখন লঙ্কাসুন্দরম্ জাতীয় কাণ্ডেনিদ

দল ভাগ-বাটোয়ারায় বাংলাকে আরও খণ্ডিত করিবার কথা অনায়াসে বলে, কেহ তার প্রতিবাদও করে না।

বিহারে বাঙালীর অবস্থা

ব্রিটিশ শোষকের দল বাংলার যে সকল অঞ্চল বিহারের হাতে তুলিয়া দেয় তাহার মধ্যে মানভূম সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সেখানকার বাঙালীর কি দুর্দ্দশা তাহার পরিচয় আমরা পুরুলিয়ার বিখ্যাত পত্রিকা "মুক্তি"তে পাই। তাহার গত ১১শে শ্রাবণ সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশিত হয় :

"দামোদর নদীতে কয়েকটি বাঁধ বাঁধাইয়া অতিরিক্ত জল আটক করিয়া বর্দ্ধমান জেলাকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার এবং ঐ জলে বিহারের ও বাংলার বহু পরিমাণ জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করিবার জন্য, এবং শিল্পোন্নতি, কলকারখানার পরিচালনা, আলো সরবরাহ, জল সরবরাহ ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপাদন প্রভৃতি কাজের জন্য বহু কোটি টাকার পরিকল্পনা করিয়া ভারত-সরকার দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন নামে এক আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কর্পোরেশন কয়েক বৎসর যাবৎ ঐ পরিকল্পনা অনুসারে বাঁধ নির্ম্মাণ প্রভৃতির কাজ করিতেছেন। উক্ত কাজের খরচের তিন ভাগের এক অংশ বিহার সরকার, এবং বাকী দুই অংশ বাংলা-সরকার ও ভারত-সরকার বহন করিয়া আসিতেছেন। বিহার সরকারের এ বৎসরের দেয় অংশের টাকার মঞ্জুরির জন্য বিহার বিধান-সভায় এবং বিধান-পরিষদে জলসেচ মন্ত্রী বাজেট পেশ করিলে উক্ত সভা দুইটির বহু বিহারী সদস্য টাকা মঞ্জুরির প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া টাকা দিতে বিহার সরকারকে নিষেধ করেন। তাঁহারা ঐ সভায় বক্তৃতায় বলিয়াছেন—দামোদর পরিকল্পনা হইতে বাংলাদেশ যে পরিমাণে লাভবান হইবে বিহার সে পরিমাণে লাভবান হইবে না। তাঁহারা বলেন, এই পরিকল্পনার কাজে শতকরা ৩০ জনের উপর বিহারী চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিলেও উচ্চ বেতনের চাকুরিতে বিহারীদের সংখ্যা অনুপাতে কম এবং এই কাজে বিহারী ইঞ্জিনিয়ার গ্রহণ করা হয় নাই এবং বিহারী কণ্ট্রাক্টারদের কাজ দেওয়া হয় নাই। তাঁহারা আরও বলেন, কর্পোরেশনের প্রধান আপিস কলিকাতা হইতে বিহারে স্থানান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত টাকা দেওয়া যাইতে পারে না। অবশ্য সেচমন্ত্রী মহোদয় ও কয়েকজন বিহারী সদস্য এরূপ সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া সমগ্রভাবে ভারতের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দিতে বলেন। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এরূপ উগ্র প্রাদেশিকতা বিহারের বাহিরে অন্য কোনও প্রদেশে দেখা যায় না। এই সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাবই মানভূমের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা তথা বিবিধ অশান্তি, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ-বিদ্বেষ সৃষ্টি ও জনগণের অশেষ দুর্গতি ও উৎপীড়নের জন্য দায়ী।"

মানভূমে বাঙালী উৎপীড়ন ও বিহারী অধিকারীবর্গের স্বৈরাচার সম্পর্কে বহু লেখা "মুক্তি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। মানভূমে বাঙালীরা বিহারীর হাতে স্বাধীনতার যে আস্বাদন পাইয়াছে সে সম্পর্কে ঐ পত্রের ২৬শে শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীঅতুলচন্দ্র মাহাত এইরূপ লিখিয়াছেন :

"ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। ভারতবর্ষ আজ নিজেই নিজের ব্যবস্থা চালাইবার মহান্ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আজ আমরা দেখিতেছি দেশসেবার মহান্ দায়িত্ব যাহাদের হাতে, দেশকে পরিচালনা করিবার ক্ষমতা যাহাদের হাতে অর্পিত হইয়াছে তাঁহারাই আজ সারা দেশ ব্যাপী স্বৈরাচার, অব্যবস্থা অশান্তির অনল জ্বালিয়া চলিয়াছেন। জনগণকে নিত্য নূতন নূতন উপায়ে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, বৃথা হয়রাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত করাই সরকারের একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জঙ্গল ব্যাপারে দেশের বহু ভ্রাতা ও ভগ্নীর উপর অত্যাচার-অবিচার অবাধে চলিয়া আসিতেছে; জঙ্গল রক্ষার নামে জঙ্গল ধ্বংস হইতেছে। শিক্ষার নামে শিক্ষাকেন্দ্র উচ্ছেদ, রেকগ্‌নিশন কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। মাতৃভাষার উচ্ছেদ করিবার জন্য হীন প্রচেষ্টাসমূহ চলিতেছে। চতুর্দ্দিকে চোর, গুণ্ডা, জনস্বার্থ-বিরোধীদের অবাধ রাজত্ব সরকারী সমর্থনে চলিতেছে। অভিযোগ শুনিবার, তদন্ত করিবার কেহই নাই। অভিযোগ জানাইতে গেলেই অফিসারেরা লাঠি দিয়া তাড়াইয়া দিবার কাজ গ্রহণ করিয়াছে। তদন্ত ও আসামীদের অজ্ঞাতেই থানায় অথবা পুরুলিয়া কোর্টেই শেষ হইতেছে। গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ বান্দোয়ান হাটে দেখিলাম থানার নিকটেই জুয়া খেলা হইতেছে। থানা-পুলিস যে দেখেন নাই এমন নয়। আমরা দেখিলাম থানার জমাদার সিপাহী উহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ভাবিলাম এরূপ কেন হইল। বুঝিলাম ইহাই হইতেছে স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস-সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার প্রমাণ এবং কংগ্রেস-সরকারের আজ স্থান কোথায় নামিয়াছে তাহা বুঝিবার উপায়। বহুলোক আসিয়া আমাকে এ বিষয়ে অভিযোগ জানাইতে লাগিল, আমিও উহার উত্তর দিলাম। লোকে বলিতে লাগিল—আজ প্রায় ১৮।২০ বৎসর যাবৎ ৺যমাজী রোহিণী, ৺কিশোরী ও অন্যান্য একনিষ্ঠ ত্যাগী কর্ম্মীদল বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া হাটে ঐ খেলা বন্ধ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার ১ বৎসর পরে আবার উহা দেখা যাইতেছে। স্বাধীন ভারত মস্তক নত হইয়া গেল।"

ভারত সেবক-সমাজ

ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের পিছনে ছুটিয়া এবং আত্মীয় ও চাটুকারবর্গ পোষণ-নীতির ব্যাপক প্রচলনে কংগ্রেস আজ

ভারতকে এক শোচনীয় পরিস্থিতিতে আনিয়াছে। এ বিষয়ে শুধু কংগ্রেস কেন অন্য সকল রাষ্ট্রনৈতিক দলও প্রায় সকলেই কম বেশী দোষী। এখন ঐ অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টায় এই নূতন সেবক-সমাজ গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টার মধ্যে কতটা সততা ও প্রকৃত সেবার ইচ্ছা আছে তাহার উপরই উহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। এ বিষয়ে নিম্ন-লিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :

১৩ই আগষ্ট—জন-সহযোগিতা অর্জনের জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি শ্রীজবাহরলাল নেহরুকে ভারত সেবক-সমাজের সভাপতি পদ গ্রহণ করিবার এবং সমাজের গঠনতন্ত্র কার্য্যকরী না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। গত ১২ই আগষ্ট এই কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়াছে।

কমিটি সভাপতিকে সমাজের খসড়া গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অবিলম্বে একটি অস্থায়ী বোর্ড গঠনের অনুমতি দিয়াছেন এবং আশু জাতীয় কর্মসূচী সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করিয়াছেন। দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আটটি স্বতন্ত্র বিভাগ এই কর্মসূচীতে রহিয়াছে। কর্মসূচী এইরূপ :

১। আর্থিক উন্নয়ন

(ক) নির্মাণ—রাস্তাঘাট, সড়ক, কূপ, বাঁধ, বাসোপযোগী ঘর ইত্যাদি ;

(খ) সমবায় উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতের কাজে সাহায্য করা ;

(গ) সঞ্চয় ও স্বল্পসঞ্চয়ের আন্দোলন ;

(ঘ) শস্য সংরক্ষণ ;

(ঙ) গৃহপালিত পশু উন্নয়ন।

২। সমাজ শুদ্ধি

(ক) দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন :

(১) শপথ—আমি ঘুষ দিব না বা লইব না ;

(২) এই শপথ মানিয়া চলিতে যাহারা অসুবিধায় পড়িবে তাহাদিগকে সাহায্য করা।

(খ) ভেজাল বিরোধী আন্দোলন :

(১) শপথ—আমি খাদ্যে বা ঔষধে ভেজাল দিব না এবং ভেজাল খাদ্য বা ঔষধ বিক্রয় করিব না ;

(২) ভেজাল বন্ধ করিবার কাজে জনসাধারণকে সাহায্য করা।

৩। সামাজিক শিক্ষা

(ক) নাগরিক অধিকার ও স্বাস্থ্যরক্ষা শিক্ষাদান ;

(খ) অর্থনৈতিক অবস্থা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

৪। চিত্তবিনোদন ও জাতীয় ক্রীড়া

যুবক, নারী ও শিশুদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী।

৫। স্বাস্থ্য

(ক) ম্যালেরিয়া দমন কার্য্য ;

(খ) বস্তী পরিষ্কার ;

(গ) 'রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখুন' আন্দোলন।

৬। নিবারণ

(ক) দুর্নীতি ;

(খ) খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল ;

(গ) অপচয় ;

(ঘ) অপরাপর সামাজিক সমস্যা।

৭। ত্রাণ ও সাহায্য

৮। সম্পদ

স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইহার সংখ্যা কমান বা বাড়ান চলিবে।

অধিবেশনে আলোচনাকালে বিভিন্ন দলের নেতা অংশ গ্রহণ করেন। সকলেই সমাজগঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও বলেন যে, সর্ব্বপ্রকারে ইহার অ-রাজনৈতিক চরিত্র বজায় রাখিতে হইবে।

সরকারি দুর্নীতি ও অত্যাচার—যেমন রামভুয়ে চলিতেছে, তাহার প্রতিকার কিরূপে হইবে ?

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বলেন—ভারত সেবক-সমাজের কাজ-কর্মে লোকের প্রয়োজন। স্বরাধিত করিবার জন্য শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় শ্রীনেহরুর ব্যক্তিগত দায়িত্ব গ্রহণ করা দরকার। যদি কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেবা ও ত্যাগের মনোভাব লইয়া কার্য্যে ব্রত হওয়া যায় তাহা হইলে সাফল্য লাভের আশা থাকে।

ভারত সেবক-সমাজকে কোনও প্রকারে রাজনৈতিক হইলে চলিবে না বলিয়া কয়েকজন নেতা যে মত ব্যক্ত করেন তাহার উল্লেখ করিয়া পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ বলেন যে, এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে যাহারা গঠনমূলক কার্য্যে নিযুক্ত কেবলমাত্র তাহাদিগকেই সমাজের সদস্য করিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ যাহারা রাজনৈতিক দলে থাকিয়াও সমাজে যোগ দিবে তাহাদিগকে সমাজের কাজ করিবার সময় সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক বিভেদ মন হইতে দূরে রাখিতে হইবে।

কমিটি সভাপতিকে সমাজগঠন সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দিয়াছেন, যেমন—(১) রাজ্যে সমাজের শাখা খুলিবার জন্য আহ্বায়ক নিয়োগ করা, (২) সমাজের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য নিয়োগ, (৩) সাধারণ ও সহকারী সদস্য নিয়োগ এবং (৪) কেন্দ্রে ও রাজ্যে সদস্যদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা।

কংগ্রেসের নৈতিক ভিত্তি ধসিয়া পড়িয়াছে এবং সেবক-সমাজ সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তি ভিন্ন দাঁড়াইতে পারে না। তাহার কি ব্যবস্থা হইবে ?

দুর্নীতির নিবারণ

"ভারত সেবক-সমাজের" গঠন কেন অত্যাবশ্যক হইয়াছে তাহা উপরোক্ত শিরোনামায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বুঝা যায়। উহা পুরুলিয়ার "মুক্তি" পত্রিকায় ১১শে শ্রাবণ প্রকাশিত হয়। সরকারী অত্যাচার ও দুর্নীতির পরিচয় এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে :

"বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীকাটজু যিনি এই বিলটি পার্লামেণ্টে পেশ করেন—এই বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের জনসাধারণ সামাজিক বয়কট করুক। ভাল কথা। অত কথা ছাড়িয়া দিলেও ধরা যাক কোন স্থানে জনসাধারণ কোন থানার দারোগাকে তাহাই করিল। তাহার ফলে বয়কটকারীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এবং থানার জনসাধারণের উপর স্থানীয় সরকারী ক্ষমতা নানাভাবে অত্যাচার চালাইয়া যাইতে লাগিল। তখন প্রমাণসহ সেই অভিযোগ লইয়া শ্রীযুক্ত কাটজুর কাছে গেলে তিনি ভারতীয় বিধান (ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশন) খুলিয়া দেখাইয়া দিবেন যে—প্রভিনশিয়াল অটোনমি অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন—এ ক্ষেত্রে আমি কি করিতে পারি? না হয় বড় জোর তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট চাহিবেন; প্রাদেশিক মন্ত্রী জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট লইবেন। কাটজু সাহেবের নিকট হইতে অভিযোগকারীদের নিকট চিঠি আসিবে—সব মিথ্যা—অনুসন্ধানে জানা গেল। যাঁহারা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচিত আছেন তাঁহারা জানেন ইহা কত বড় সত্য।

"আসল কথা, আজ যদি দেশবাসীকে দুর্নীতির জন্য কাহাকেও বয়কট করিতে হয়, তবে তাহা শুধু সরকারী কর্মচারীদের নয়—সমস্ত কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট ও সমস্ত কংগ্রেসকে। দুর্নীতির এত বড় স্রষ্টা, ধারক, বাহক ও পোষক ভারতবর্ষের ইতিহাস খুঁজিলে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। বহু যুগের পরাধীনতার বোঝা ভারতবাসীর নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিয়াছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বাধীনতার বিচিত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া সেই দেশবাসীর ভগ্নপ্রায় নৈতিক মেরুদণ্ড শক্তিমান করিয়া খাড়া করিতেছিল। স্বাধীনতার পরে গত পাঁচ বৎসরের মধ্যেই কংগ্রেস ও কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা দেশবাসীর সেই নৈতিক মেরুদণ্ডকে ভাঙিয়া গুঁড়া করিয়া ছাড়িয়াছে। আজ ইহাদের নিকট হইতে নীতির বাক্য—যাহারা ইহাদের স্বরূপের সহিত পরিচিত তাহাদের নিকট উপহাসের মতই মনে হইবে। কারণ দেশে দেশবাসীর অকুণ্ঠ বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া ও তাহা ভঙ্গ করিয়া কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকারী নেতৃত্ব ও ক্ষমতা দেশে যে দুর্নীতির প্লাবন বহাইয়াছে তাহারই শক্তিতে আজ কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের পুনরস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে। বর্তমান নেতৃত্বের বাঁধা ও বোঁকার নাগপাশ হইতে দেশবাসী নিজেকে মুক্ত করিয়া যেদিন সে তাহার নৈতিক মেরুদণ্ড শক্ত করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, সেদিন কংগ্রেস অথবা কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এবং সত্যকারের দুর্নীতি নিবারণের কাজও সেই দিন হইতেই বাস্তবিক সুরু হইবে।"

রাষ্ট্রপতির আহ্বান

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, জাতি হিসাবে নিজেদেরই আমাদিগকে সমস্ত বাধাবিঘ্ন জয় করিতে হইবে এবং তাহা আমরা করিবই সে সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ সচেতনতা এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থাকা প্রয়োজন। ইহার জন্য চরিত্রবল চাই। যে চরিত্রবল লোভের নিকট সহজে এবং সহসা নতি স্বীকার করিবে না, যাহা ত্যাগের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে, সমস্ত বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া যাহা ন্যায়কে অবলম্বন করিয়া রহিবে, যাহা অন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দুঃখ দুর্ভোগকে আপন করিয়া লইবে, যাহা গ্রহণ অপেক্ষা দান করিবার জন্যই সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে—চরিত্রের সেই দৃঢ়তা আমাদের অর্জন করিতে হইবে। এইরূপ চরিত্রবল শুধু আমাদিগকেই সুখী ও সমৃদ্ধ করিবে না, অন্য সকলকেও সুখী ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে। এইরূপ একটি জাতিতে আমরা যাহাতে পরিণত হইতে পারি, আসুন তাহার জন্য আমরা চেষ্টা করি এবং অর্জিত স্বাধীনতাকে আমরা নিজেদের পক্ষে এবং সকলের পক্ষে এক শুভ আশীর্ব্বাদে পরিণত করিয়া তুলি।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভাষণের এই অংশ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমাদের অনুরোধ যে, তিনি বিহারী ভায়েরা যে ভাষা বুঝে তাহাতে তাঁহার এই আহ্বান তাঁহাদের বুঝাইয়া দিন।

ভারত ও কাশ্মীর

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী পাকা খেলোয়াড়। তিনি দাবার চাল ও বড়ের চাল দুই-ই সমানে বুঝেন। কিছুদিন পূর্ব্বে দাবার চালে কিছু ভুল করিয়া নিজেকে ও পণ্ডিত নেহরুকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিলেন। এখন বড়ের চালে সেটা শুধরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তবে যতদিন ভারতের ক্ষেত্রে তাঁহার পরম মিত্রবর্গ বিরাজ করিতেছেন ততদিন তাঁহার কোনও ভয় নাই এবং ভারতরাষ্ট্রের কোনও ভরসাও নাই। ভারতের টাকার স্রোত ও রক্তের স্রোত বহিয়া চলিতেছে, অথচ ভারতের স্থান নীচে। কিবা নীতি, কিবা ব্যবস্থা :

শ্রীনগর ১১ই আগষ্ট—অদ্য কাশ্মীর গণপরিষদে মুখ্যমন্ত্রী শেখ মহম্মদ আবদুল্লা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ভারত-সরকার ও কাশ্মীর-সরকারের মধ্যে যে মীমাংসা হইয়াছে, তাহা পেশ

করিয়া বলেন যে, আলোচনার ফলে এক সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইয়াছে এবং "এখন আমরা ভারতের সহিত আমাদের শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করিতে পারিব।"

মুখ্যমন্ত্রী আব্দুল্লা বলেন,"ভারতের এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ তাহাদের মুক্তি-সংগ্রামের কালে গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ভিত্তিতে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহাই হইল যথার্থ রক্ষাকবচ, অপর যে কোন শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচই উহার তুলনায় গৌণ হইয়া পড়ে।"

তিনি বলেন, "আমাদের পরস্পরের অভিমতকে সামঞ্জস্য করিবার জন্য আগ্রহের ত্রুটি ছিল না। ভারত-সরকারের প্রতিনিধি দল এবং কাশ্মীরের প্রতিনিধিরা অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তাকে দূর করিয়া বর্তমান সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া কাজ করিয়াছেন।"

শেখ আবদুল্লা বলেন, "আমাদের গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং আমাদের লক্ষ্যপথে পৌঁছিবার আগ্রহকে রূপদান করিবার জন্য ভারত-সরকার ও ভারতের জনগণের সমর্থন যে রহিয়াছে তাহা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। আমি আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে সুসংবদ্ধ করিব।"

অতঃপর শেখ আবদুল্লা বলেন, "ভারতের সহিত এই রাজ্য কি ভাবে কতটুকু যুক্ত থাকিবে তাহা অবশ্য গণপরিষদই নির্ধারণ করিবে। পরিষদ বর্তমান ভিত্তিতে সম্পর্ক বজায় রাখার সিদ্ধান্তও করিতে পারে, আবার প্রয়োজন বোধ করিলে উহার ক্ষেত্র প্রসারিত করিতে পারে। রাজ্যের সংবিধান রচনার সময় পরিষদের সদস্যগণ এই সকল সর্ত বিবেচনা করিয়া দেখিয়া এতৎসম্পর্কে তাঁহাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পাইবেন।"

মৃত্যু-কর

মৃত্যু-কর প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আয়ের এক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। তবে উহার পরিমাণ সম্পত্তির আয়তনের পার্থক্যের সহিত তারতম্য হওয়া প্রয়োজন। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদিগের ভবিষ্যৎ যাহাতে অনিশ্চিতের কোঠায় না যায় সেরূপ ব্যবস্থাও রাখা প্রয়োজন :

নয়াদিল্লী ১১ই আগষ্ট—অদ্য লোকসভায় অর্থদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগী কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর সম্পত্তি হস্তান্তরের কালে কর বসাইবার উদ্দেশ্যে মৃত্যু-কর বিল উপস্থাপিত করিয়াছেন।

এই বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "যুদ্ধের কাল হইতে উচ্চহারে আয়কর ধার্য্য ও সংগ্রহ করা হইতেছে এবং আয়কর তদন্ত কমিশন কর ফাঁকি দেওয়া সম্পর্কিত বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছেন। ইহার ফলে ধনীদের কাছে আরও ধন পুঞ্জীভূত হইতে কিছু বাধা সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ধনের বণ্টনবৈষম্য দূর করিবার জন্য এইগুলি কার্য্যকরী ব্যবস্থা নহে। এই মৃত্যু-কর ধার্য্য করা হইলে এই যে ধনবণ্টন-বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা অনেকটা সংশোধন হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে রাজ্যসমূহের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলিও অর্থ পাইবে।"

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে, "পরিকল্পনা কমিশন তাঁহাদের খসড়াতেও অনতিবিলম্বে ভারতে মৃত্যু-কর ধার্য্য করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিবার আবশ্যকতা সম্পর্কে বলিয়াছেন।

"ভারতে সংবিধান এবং প্রাক্তন ভারত-শাসন আইনে রাজ্যসমূহের তালিকাতে কৃষি-ভূমির উপর কর ধার্য্যের অধিকার আছে এবং অ-কৃষি সম্পত্তি পড়িয়াছে কেন্দ্রের তালিকায়। যাহা হউক, এই করধার্য্য যাহাতে একরূপ হয় তদুদ্দেশ্যে কয়েকটি রাজ্য—বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, হায়দরাবাদ এবং রাজস্থান সংবিধানের ২৫২ ধারানুযায়ী আবশ্যক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রকে তাঁহাদের পক্ষ হইতে কৃষি সম্পত্তি সম্পর্কে, আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়াছেন।

"এই বিল অনুযায়ী কৃষিভূমি সম্পর্কে যে কর আদায় করা হইবে, তাহা রাজ্য পাইবেন। অ-কৃষি সম্পত্তি সম্পর্কে সংবিধানের ২৬৯ ধারানুযায়ী যে বিধান আছে, তদনুযায়ী সংসদের অভিপ্রায় মত বণ্টন হইবে।

মৃত্যু-কর বিল নূতন ব্যবস্থা নহে। ১৯২৫ সালে কর তদন্ত কমিটি এই ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছিলেন। গত যুদ্ধের কালে বহু লোক বিপুল সম্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছিল, তখনও গ্রেট ব্রিটেনের অনুরূপ এই মৃত্যু-কর ধার্য্য করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনানুযায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। এই জন্য ১৯৪৪ সালে উক্ত আইনের সংশোধন করা হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় আইন সভায় মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর কর ধার্য্যের জন্য একটা বিল পেশ করা হয়। কিন্তু নানা কারণে তাহা গৃহীত হয় নাই। ১৯৪৮ সালে অস্থায়ী সংসদে এই মৃত্যু-কর বিল পেশ করা হইয়াছিল। সিলেক্ট কমিটির মধ্য দিয়া বিল আসিবার পরও তাহা গ্রহণ করা যায় নাই। তৎপর অস্থায়ী সংসদ শেষ হইয়া যায়, সুতরাং এই বিলও বাতিল হইয়া যায়।

১৯৪৮ সালে যে বিল সিলেক্ট কমিটির মধ্য দিয়া আসে, তাহাই অদ্য পেশ করা হয়। তবে ইহাতে সামান্য সামান্য পরিবর্তন আছে। সেগুলি নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) যখন বিলটি করা হইয়াছিল, তখন কৃষি-ভূমি সম্পর্কে কেন্দ্রের কোন এক্তিয়ার ছিল না, কিন্তু সংবিধানের ২৫২

ধারানুযায়ী কয়েকটি রাজ্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং এই বিল রাজ্যের কৃষি-ভূমির উপরও প্রযুক্ত হইবে। অবশিষ্ট রাজ্যগুলি যখন আবশ্যক প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন তখন কেন্দ্রীয় সরকার একটা বিজ্ঞপ্তির দ্বারা উক্ত রাজ্যকে আমলে আনিবেন।

(২) মৃতের অস্থাবর সম্পত্তির কর ধার্য্য হইবে যেখানে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিতেন। বিলে পরিবর্ত্ত বাসস্থান সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটি সংশোধন করিয়াছিলেন, তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) বার্ষিক অর্থ আইনানুযায়ী আয়কর আইন, করের হার ধার্য্য এবং কি পরিমাণ মকুব হইবে তাহা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৪) কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে মৃত্যু-কর কন্ট্রোলার থাকিবেন। তিনিই এই কর ধার্য্য করিবেন।

(৫) মৃত্যু-কর কন্ট্রোলারের আদেশের বিরুদ্ধে ১৯২২ সালের ভারতীয় আয়কর আইনের মত কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট আবেদন করা যাইবে। আইন সম্পর্কিত প্রশ্ন সম্পর্কে হাইকোর্টে আবেদন করা চলিবে।

নাগা পাহাড় ও চীন সীমান্ত

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অনেক কিছু লিখিয়াছেন। তাহার অধিকাংশই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি "উত্তরা" (কাশী) পত্রিকার ১৩৫৯ সালের আষাঢ় সংখ্যায় উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে লেখকের মনোবৃত্তির পরিচয় এবং কিছু সংবাদ পাওয়া যাইবে :

"নাগা পাহাড় হতে আরম্ভ করে চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত অশাসিত অঞ্চলের শাসনভার প্রকৃতপক্ষে বিদেশী মিশনারী এবং আসামের 'সাইমুন্না ক্লার্কের' হাতেই ছিল। বিদেশী খ্রীষ্টান মিশনরীদের উদ্দেশ্য ছিল অশাসিত অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করা এবং সেই স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে উত্তর-ব্রহ্ম এবং আসাম সরকার সাহায্য করবে। এতে এক দিকে ইণ্ডিয়া অন্য দিকে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশের পদানত হয়ে থাকবে, সেই সঙ্গে তিব্বত এবং সিকিয়াং (Sikang) প্রদেশেও ব্রিটিশের প্রাধান্য স্থাপন হবে। সিকিয়াং প্রদেশে মুসলিম চীনাদের সংখ্যা বেশি। আসামের দরং জেলাতে ইতিমধ্যেই পঞ্জাবী মুসলমানদের বসবাসের ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু তারা টিকতে পারে নি। পরে নরমনসিংহের মুসলমানদের বসবাস করানো হয়, তারা এখনও আছে এবং ভবিষ্যতে যদি থাকে তবে ভয়ের কোন কারণ নাই। চীন স্বাধীন হয়েছে। মাও-সে-তুঙের নূতন গণতন্ত্র মানেই হ'ল প্রলিটারিয়েট ডিক্টেটরদের অধ্যবসায় এবং পেয়ারাসাইট নষ্ট করা।

"ব্রিটিশের ইচ্ছা ছিল আসামের সদিয়া ফ্রন্টিয়ার জেলা, তিব্বত, সিকিয়াং এবং নাগা পাহাড় পর্য্যন্ত এলাকা নিয়ে ব্রিটিশ প্রাধান্যযুক্ত একটি দেশ গঠন করা। এই সংবাদ যাতে কেউ না পায় সেজন্যই কোনো উত্তম রাষ্ট্রজ্ঞানীকে সেদিকে পাহাড় অথবা সাইকেলে ভ্রমণ করবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। সাধারণ লোক এসব বিষয় চিন্তাও করত না এবং এখনও করে না।

"এখানে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি, ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সরকার বর্ত্তমানে ভুটান এবং উত্তর বাংলার উত্তর দিকে সেরূপ একটি চালবাজিতে নিযুক্ত আছেন কিন্তু সেই চালবাজিতে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সরকার কোনমতেই কৃতকার্য্য হবে না। মহাচীন ইতিমধ্যেই তিব্বতকে নেপালের করদ রাজ্যরূপে মেনে নিয়েছে এবং করও পাঠিয়ে দিয়েছে। এটা হ'ল সংবাদ। যদি তাই হয়, আপনা হতেই ভুটানের অভ্যন্তরে অথবা উত্তরবঙ্গের উত্তর দিকে ব্রিটিশ এবং আমেরিকার চালবাজি করার মত যদিও কিছু থাকে, তবুও কিছুই ফলবতী হবে না। বর্ত্তমান মহাচীন চীনা সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত নহে। গণতন্ত্রবাদী চীন অপরের দেশ অধিকার করে না অথবা ন্যায্য অধিকার ছেড়েও দেবে না, এই সত্যটি এংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের জেনে রাখা একান্ত দরকার—সেই সঙ্গে ভাঁবেদার সরকারদেরও জানা সমূহ কর্ত্তব্য।

"চীনের সিকিয়াং প্রদেশে মহামান্য আগা খাঁকে রাজা করার কথা হয়েছিল। আমোয়ার পাশাও সেই সুযোগ অন্বেষী ছিলেন। সকলের আশায় ছাই পড়েছে। সিংকিয়াং প্রদেশ বর্ত্তমানে চীনের একটি বিশিষ্ট প্রদেশ। ব্রিটিশ ত দূরের কথা ইণ্ডিয়া সরকারও কন্সাল সারভিস্ রাখতে সাহস করেন নি। কন্সাল সারভিস রেখেও লাভ হবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের মারফতে ভারতবাসী দ্বারা ব্রিটিশ চালাত গোয়েন্দাবৃত্তি। ইণ্ডিয়া সরকার গোয়েন্দাবৃত্তি অবলম্বন করতে ইচ্ছুক নয় বলেই, কন্সাল সারভিসেরও দরকার হচ্ছে না। এই কাজটি অন্য কোন সরকার করলেই ভাল হবে।..."

লেখক মহাশয় "ভাঁবেদার সরকার", "গোয়েন্দাবৃত্তি" ইত্যাদি গালভরা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি নিজে কাহার পক্ষ হইয়া লিখিয়াছেন এবং কি মহাজ্ঞানের বশে "মহাচীন"কে সুপারিশ ও আমেরিকার উপর দোষারোপ করিয়াছেন বুঝিলাম না। ভারতীয়ের লেখায়, "ইণ্ডিয়া সরকার" শব্দ ব্যবহার আশ্চর্য্য।

ব্রিটিশ ও আমেরিকান সরকার ভুটান ও উত্তর বাংলায় কি করিতেছে তাহা তিনি দৈববলে জানিয়াছেন কিন্তু "মহাচীন" ও তাহার কর্ণধার যে কালিম্পঙে কি চেষ্টায় আছেন তাহা ইনি জানেন না।

নেপালে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র

বিশ্বাস মহাশয়ের রূপকথার পর বাস্তবের ক্ষেত্রে আমরা আরও আশ্চর্য্য সংবাদ কিছু পাইতেছি। তাহা এইরূপ :

কাঠমাণ্ডু, ১২ই আগষ্ট—চীনা কম্যুনিষ্টগণের সহায়তায় নেপালে সশস্ত্র বিদ্রোহ করার জন্য কম্যুনিষ্টগণের ব্যর্থ ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, তাহারা সীমান্ত অঞ্চলের জুমলা ও ডোটি জেলাসমূহ দখল করিবার চেষ্টা করে। তাহাদের নিকট যে সকল কাগজপত্র পাওয়া যায়, তাহাতে প্রকাশ, এই সকল জেলা দখল করিয়া উহা তাহাদের কার্য্যপরিচালনার প্রধান ঘাটিতে পরিণত করার উদ্দেশ্য ছিল। জুমলা ও ডোটি অধিকারের পর তরাই অঞ্চলে ধনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা এবং নেপালের একটি বা দুইটি জেলা দখল করিয়া তাহাকে গেরিলা কার্য্যকলাপ পরিচালনার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করা তাহাদের লক্ষ্য ছিল। এখানকার পুলিসের প্রধান কার্য্যালয় হইতে বলা হয় যে, যে সকল তথ্য পুলিসের হস্তগত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়—আত্মগোপনকারী কম্যুনিষ্ট কর্ম্মিগণ তাহাদের পূর্ব প্রভাবসম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাটি প্রস্তুত করিতেছে এবং ঐ সকল ঘাটি হইতে রাজনৈতিক ডাকাতি এবং ধনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতেছে। তাঁহারা বলেন—তরাই অঞ্চলে সম্প্রতি যে অশান্তি দেখা যাইতেছে, তাহা বিদ্রোহিগণের কার্য্যকলাপেরই পরিণতি। নেপালে হাঙ্গামা ও আতঙ্কের অবস্থা সৃষ্টিই উহার উদ্দেশ্য।

এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শ্রী এম. পি. কৈরালা বলেন, এ যাবৎ নেপালের কম্যুনিষ্ট কর্ম্মিগণ বাংলার কম্যুনিষ্টগণের পরিচালনাধীনে কার্য্য করিতেছিল। কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বপ্রথম সংবাদ পাওয়া গেল যে, নেপালী কম্যুনিষ্টগণ উত্তরাঞ্চল হইতে চীনের ও তিব্বতের কম্যুনিষ্টগণের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীকৈরালা আরও বলেন, চীনাদের মানচিত্রে নেপালকে চীন সাম্রাজ্যের অংশরূপে দেখান হইয়াছে। তিনি এই ঘোষণা করেন যে, বিশ্বপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে বুঝা যায় যে, সম্ভবতঃ ভারতের মধ্য দিয়া পথ করিবার জন্য কম্যুনিষ্টগণ নেপাল দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে।

তিব্বতে ডাঃ কে. আই. সিং-এর উপস্থিতির সুযোগ লইয়া কম্যুনিষ্টগণ পশ্চিম নেপালের জনসাধারণের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করিতেছে। ডাঃ কে. আই. সিং পশ্চিম নেপালের অধিবাসী। তাঁহার গ্রেপ্তারের পরে এবং তিব্বতে পলায়নের পূর্ব্বে ঐ অঞ্চল তাঁহার কার্য্যকলাপের প্রধান কেন্দ্র ছিল। তিনি সেখানে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার নাম করিয়া ঐ এলাকায় অনেক কিছু করা যাইতে পারে।

নেপালী কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীবি. পি. কৈরালা নেপালে কম্যুনিষ্টদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলেন, তিনি মনে করেন, "শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, কম্যুনিষ্টগণ তাহাদের পরবর্ত্তী লক্ষ্যস্থল হিসাবে নেপাল আক্রমণ করিবে। কম্যুনিষ্টদের বিশ্বাস এই যে, ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত না হইলেও, ভারত নিশ্চয়ই কম্যুনিষ্ট-সমর্থক নহে, ভারত কম্যুনিষ্ট-বিরোধী এই পটভূমিকায় আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটকালে ভারতের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য কম্যুনিষ্টগণ নিশ্চয়ই নেপালে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইবে।"

বস্তুতঃপক্ষে ভারতের সীমান্তে যে কি চলিতেছে তাহা বুঝা কঠিন। কেবলমাত্র বন্ধুত্বের উপর ও অহিংসার উপর নির্ভর করিয়া আমরা শত শত বৎসরের দাসত্ব ভোগ করিয়াছি। এখনও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না?

"ব্রিটিশ গোর্খা"

নয়াদিল্লী ১১ই আগষ্ট—ভারত সরকার যুক্তরাজ্য ও নেপালের মধ্যে যে ত্রিদলীয় চুক্তির ফলে ব্রিটিশ গবর্ণেণ্ট ভারতীয় এলাকায় গোর্খা সৈন্য সংগ্রহকেন্দ্র খুলিবার অধিকার পাইয়াছেন অবিলম্বে তাহা বাতিল করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, ডঃ তারাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, শ্রীএ. কে. গোপালন, শ্রীত্রিদিব চৌধুরী ও শ্রীঘোষে—লোকসভায় এই পাঁচ জন সদস্য এক যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন।

বিবৃতিতে তাঁহারা বলিয়াছেন, "ভারতীয় এলাকায় ব্রিটিশের গোর্খা রিক্রুটিং কেন্দ্রের অস্তিত্ব একটি উদ্বেগজনক জাতীয় সমস্যা এবং কিছুদিন যাবৎ জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। এই কেন্দ্রের অস্তিত্বের কথা গত ৮ই আগষ্ট লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়া ছাড়াও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে এই অতিরিক্ত সুবিধাদান আমাদের জাতীয় সম্মানের হানিকর।

মালয়ে যুদ্ধ চালাইবার উদ্দেশ্যে গোর্খাসৈন্য সংগ্রহের কাজে ব্রিটিশবাহিনীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে বহু শহীদের পবিত্র রক্তে ধৌত আমাদের এই পবিত্র ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার অর্থ আমাদের স্বাধীনতাপ্রিয় জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবকে কঠোর আঘাত দেওয়া।

যুক্তরাজ্য ও নেপাল সরকারের সহিত শীঘ্র এই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করা হইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমাদের অনুরোধ যে, তিনি যেন অবিলম্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন।"

আমরা এই অনুরোধ সমর্থন করিতেছি। যতদিন দারিদ্র্য ও যুদ্ধ প্রবৃত্তি আছে ততদিন অপরের ধন সৈনিকবৃত্তি থাকিবেই। কিন্তু ভারতে বিদেশীর সৈন্য সংগ্রহের স্থান থাকা

আমাদের সমাজের হাকিমদের এ বিষয়ে দুই মত না থাকা উচিত।

অপরাধ-নিবারণ আটক বিল

আমরা অপরাধ নিবারণ জন্য আটক করার বিল কিছুতেই স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু রোগ নিবারণের জন্য তিক্ত ঔষধ গলাধঃকরণ করার মত উহা লইতে বাধ্য হইতেছি। তাহার কারণ এবং ঐ ঔষধের প্রয়োজন সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ দূর করিয়াছেন এক কম্যুনিষ্ট নেতা। নিম্নোক্ত সংবাদে তাহার বিবরণ আমরা পাই :

নয়াদিল্লী, ৯ই আগষ্ট—আজ রাষ্ট্রসভায় অপরাধ-নিবারণ আটক (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা স্বরাষ্ট্র সচিবের উত্তরদানের পর সমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর দফাওয়ারীভাবে বিলটির আলোচনা করা হইবে।

গতকল্য কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীসুন্দরায়া তাঁহার বক্তৃতায় কমিউনিষ্টদের নিকট যে সকল অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে, কয়েকটি সর্তে তাহা সরকারের নিকট সমর্পণের প্রস্তাব করেন। সাধারণ আলোচনার উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব ডঃ কাটজু আজ এই প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলেন—"আপনারা আপনাদের খুসীমত চলিতে পারেন, কিন্তু খুসীমত চলার সর্তে সরকার আপনাদের সহিত কোনও আপোষ রফায় উপনীত হইতে পারেন না।" তিনি বলেন যে, খুসীমত চলার অধিকারকে 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' বলিয়া মনে করা চলে না।

ডঃ কাটজু দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, এদেশেরই হউক কি অপর কোন দেশেরই হউক, কোনও সরকারের পক্ষেই ব্যক্তি বা দলবিশেষের হুমকির নিকট নতি স্বীকার অসম্ভব। ভারত-সরকারকে অবস্থার প্রতিবিধান করিতে হইবে এবং সরকার উহা করিতে কৃতসঙ্কল্প।

কমিউনিষ্টদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, "আপনারা অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের নিকট রাখিয়া দিতে পারেন এবং খুসীমত চলিতে পারেন, কিন্তু নিশ্চিত জানিয়া রাখুন যে, সরকার এই জাতীয় হুমকির নিকট নতি স্বীকার করিবে না।"

কমিউনিষ্টরা অপর যে-কোনও ব্যক্তির মতই দেশকে ভালবাসে বলিয়া কমিউনিষ্ট নেতা যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া স্বরাষ্ট্রসচিব বলেন যে, ভারতের প্রতি তাঁহাদের ভালবাসা যাহাই হউক না কেন, তাঁহারা যে চলার পথ বাছিয়া লইয়াছেন তাহা তাঁহাদিগকে ভারতে না রাখিয়া অন্য দেশেই লইয়া যাইতেছে।

বিদেশীর পতাকার নীচে বিদেশীর জয়গান যাঁহারা করেন তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম অপরূপ। ঐরূপ প্রেমিকের সন্ধান পাইয়াছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুর এবং উহারাই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান দালাল।

ট্রান্সজর্ডানে রাজা বদল

আম্মান, ১১ই আগষ্ট—"পার্লামেণ্টে রাজা তালালের শাসনের অবসান ঘটাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে প্রধানমন্ত্রী আবুল হুদা উভয় পরিষদের গোপন এক যুক্ত অধিবেশনে জানান যে, রাজা তালাল আর তাঁহার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগের উপযুক্ত নহেন। কাজেই তাঁহার রোগমুক্তির জন্য অপেক্ষা করা নিরর্থক। রাজার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সম্প্রতি চিকিৎসকগণ যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তিনি তাঁহার উক্তির সমর্থনে উহা পেশ করেন। প্রায় মাসখানেক আগে দুই জন মিশরীয় চিকিৎসক রাজার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আম্মানে আসিয়াছিলেন। অতঃপর নিম্নতন পরিষদের তিন জন এবং সেনেটের ছয় জন সদস্য লইয়া মেডিক্যাল রিপোর্টগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। দুই ঘণ্টা আলোচনার পর উক্ত কমিটি প্রধানমন্ত্রীর অভিমত সমর্থন করেন। কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিতর্কের পর রাজা তালালের শাসনের অবসান ঘটাইয়া রাজকুমার হুসেনকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করার প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

নূতন রাজা হুসেন সম্ভবতঃ শীঘ্রই সুইজারল্যাণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।"

উপরোক্ত সংবাদে আমরা এশিয়ার যে অঞ্চল নিকট-প্রাচ্য নামে অভিহিত তাহার আর এক নূতন অঙ্কের আরম্ভ দেখিতেছি। ট্রান্সজর্ডানের নৃপতি আবদুল্লা যে ষড়যন্ত্রে নিহত হন তাহার পূর্ণপ্রকাশ এখনও হয় নাই। তাহার পর তাঁহার পুত্র বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং নূতন রাজা এখন অপরিণতবয়স্ক। আরব রাজ্যসকলের মধ্যে ট্রান্সজর্ডান অতি সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল। এখন তাহার অবস্থা অনিশ্চিতের কোঠায় আসিতেছে।

রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে মিশর

মিশরের রাষ্ট্রবিপ্লব ক্রমে স্থিতিশীল অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এখন ঐ দেশের কর্ণধার যিনি তাঁহার চিন্তাধারার যেটুকু পরিচয় আমরা পাইতেছি তাহাতে মিশরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আশার আলোক দেখা যায়। যাহা তাঁহার মনের ধারণা তাহা যদি বাস্তবে পরিণত হয় তবে হয়ত আরব দেশগুলি পুনরায় প্রাচীন সংস্কৃতিমূলক গৌরবের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে :

কায়রো, ৮ই আগষ্ট—মিশর সামরিক বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক এবং সাম্প্রতিক সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক জেনারেল মহম্মদ নাগুইব এখানে বলেন যে, বর্ত্তমানে মিশরে একনায়ক শাসন-ব্যবস্থা ঘোষণার কোন কারণ নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অপসারণের কর্ম্মব্রতী

গ্রহণে মিশরের রাজনৈতিক দলগুলি যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে একনায়ক শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতে পারে। তিনি বলেন যে, গান্ধীজীর রাজনৈতিক আদর্শ প্রাচ্যদেশগুলির আদর্শ হওয়া উচিত।

মিঃ নাগুইব পি. টি. আই-এর প্রতিনিধিকে বলেন যে, দল হইতে দুর্নীতিপরায়ণ এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বিতাড়নের দাবী সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিকট হইতে যে ধরণের সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। মিশরে শুষ্ঠু সং গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের পক্ষে ইহাই প্রথম প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, এজন্য অসামরিক সরকারের মারফতে কঠোর সতর্কবাণী ঘোষণার প্রয়োজন হইতে পারে। সুখের বিষয় এই যে, সামরিক বাহিনীর সহিত আলি মাহের সরকারের সম্পর্ক খুবই ভাল।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতি সম্পর্কিত ইস্তাহার ও বিবৃতি এবং 'শুদ্ধি আন্দোলনের' ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া তিনি বলেন যে, এই সকল ব্যবস্থায় তিনি মোটেই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি বলেন যে, প্রত্যেকেই মনে করেন তিনি এক জন নিষ্পাপ দেবদূত। মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যসহ ওয়াফদ দল হইতে বিশিষ্ট চৌদ্দ জন নেতা বিতাড়নের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, দলের উপর হইতে তলা পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ অবাঞ্ছিত ব্যক্তিই এখন পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছেন। ওয়াফদ দল সম্পর্কে যে কথা সত্য, অন্যান্য দলের বেলায়ও তাহাই খাটে। জেনারেল নাগুইব যখন এই বিবৃতি দিতেছিলেন তখন ওয়াফদ দলের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল নাগুইবের সহিত সাক্ষাতের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী ক্যাম্পে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

ইঙ্গ-মিশর বিরোধ সম্পর্কে কোন আলোচনায় অনিচ্ছুক হইলেও জেনারেল নাগুইব বলেন যে, মিশরভূমি হইতে ব্রিটিশ সৈন্যের অপসারণের যে জাতীয় দাবী রহিয়াছে, সে সম্পর্কে মিশর কোনরূপ আপোষ করিবে না। মিশরে ব্রিটিশ বাহিনীর রাখার দাবী ব্রিটিশদেরই স্বার্থের প্রতিকূলে। তাঁহারা বৃটেন এবং অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছুক। মিশরের সহিত স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিজেদের স্বার্থের দিক হইতেই ব্রিটেনের আপোষ-মীমাংসা করা উচিত।

গান্ধীজীর নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের আদর্শের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রশংসা করিয়া তিনি নূতন শাসন-ব্যবস্থাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য মিশরীদের ঐ আদর্শ অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, গান্ধীজীর রাজনৈতিক আদর্শই প্রাচ্য-আদর্শের প্রতীক। মিশরের রাজনীতিবিদ্‌গণ, সেনাবাহিনী, সরকারী কর্মচারী এবং জনগণ গান্ধীজী-প্রচারিত নিঃস্বার্থপরতা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া নূতন রাজ্যগঠনে সার্থকতা লাভ করিতে পারেন।

কায়রোতে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, যে সমস্ত সামরিক অফিসার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া রাজা ফারুককে নির্ব্বাসিত করিয়াছে তাহাদের 'ঢিট' করিবার জন্য রাজা ফারুক একটি বিশ্বস্ত বাহিনী গঠনের ফন্দি আঁটিয়াছিলেন। এল আহরাম'র সংবাদে প্রকাশ, এই বিশ্বস্ত বাহিনী সম্পর্কিত এক রিপোর্ট শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হইবে। এল আহরাম'র সংবাদে আরও প্রকাশ, এই বিশ্বস্ত বাহিনী গঠন করিয়া রাজা ফারুক তাঁহার নিজস্ব বাহিনীকে পোক্ত করিতে এবং রাজকীয় বাহিনীর সংখ্যা তিন সহস্রে উন্নীত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

বর্ণবৈষম্যমূলক ভেদনীতির বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সত্যাগ্রহ চলিতেছে তাহা ক্রমে ব্যাপক রূপ গ্রহণ করিতেছে। আমরা এই সত্যাগ্রহের জয় কামনা করি:

জোহানেসবার্গ, ১১ই আগষ্ট—বিনানুমতিতে এখান হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী রুডপুর্ট অঞ্চলে প্রবেশ করার অভিযোগে অদ্য রাত্রিতে ৩৩ জন আফ্রিকানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে সাত জন নারী। ট্রান্সভালে বর্ণবৈষম্য-মূলক আইন লঙ্ঘনের অভিযানে এই প্রথম নারীরা স্বেচ্ছা-মূলকভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। আগামী কল্য তাঁহা-দিগকে রুডপুর্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এখন পর্য্যন্ত ২০৪০ জন অশ্বেত সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হইলেন।

উদ্বাস্তু সম্পত্তির সমস্যা

"যুগান্তর" পত্রিকায় ৩০শে শ্রাবণ সংখ্যায় নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে সমস্যাটার প্রকৃতি বুঝা যায়:

"কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের জয়েণ্ট সেক্রেটারী শ্রীভি. ডি. দন্তুত্যাগী বর্ত্তমান প্রবন্ধে উদ্বাস্তু সম্পত্তির সমস্যা সমাধানে বিলম্বের হেতু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাকিস্থান সরকার আন্তরিকতা সহকারে এই ব্যাপারে অগ্রসর হইতেছেন না বলিয়াই এমন একটি গুরুপূর্ণ সমস্যার আজও কোনও সমাধান হইতেছে না—ইহাই লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে দেশ বিভাগের পর যে সকল সমস্যা দেখা দেয় উদ্বাস্তু সম্পত্তি তাহাদের অন্যতম। উভয় দেশের অধিকাংশ উদ্বাস্তুর পক্ষেই তাহাদের একটি

সমাধানের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই।

উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে উভয় দেশের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবারের সুখ ও তাহাদের সন্তানদের সমৃদ্ধির প্রশ্ন জড়িত।

হিন্দু ও শিখগণ পশ্চিম পাকিস্থানে যে সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়াছেন এবং মুসলমানগণ ভারতে যে পরিমাণ সম্পত্তি ফেলিয়া গিয়াছেন তাহার একটা বিশ্বাসযোগ্য হিসাব এখন করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব-পঞ্জাব ও পশ্চিম-পঞ্জাব সরকারের মধ্যে যে সকল রাজস্ব সংক্রান্ত রেকর্ড বিনিময় করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পশ্চিম-পঞ্জাবের বাসিন্দা হিন্দু ও শিখগণ এবং পশ্চিম পাকিস্থানের অন্যান্ত প্রদেশে বসবাসকারী পঞ্জাবী সন্তানগণ মোট ৬৭,২২,০০০ একর জমি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্থানের অন্যান্ত অঞ্চল, যেমন—সিন্ধু, সীমান্ত-প্রদেশ প্রভৃতি হইতে আগত অ-পঞ্জাবী হিন্দু ও শিখগণ পরিত্যক্ত জমির যে সকল দাবি পেশ করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে, ঐ সকল জমির পরিমাণ ৩০,০০,০০০ একর অর্থাৎ হিন্দু ও শিখগণ পশ্চিম পাকিস্থানে যে পরিমাণ জমি ফেলিয়া আসিয়াছেন তাহার পরিমাণ ৯০ হইতে ১০০ লক্ষ একর। পক্ষান্তরে পাকিস্থানাগত মুসলমানগণ ভারতে ফেলিয়া গিয়াছেন প্রায় ৫০ লক্ষ একর জমি। একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, হিন্দু ও শিখগণ যে সকল জমি ফেলিয়া আসিয়াছেন সেইগুলি খুব মূল্যবান ও উর্ব্বর এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেচব্যবস্থা ঐ সকল অঞ্চলে বর্ত্তমান। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত জমিগুলি উৎকর্ষের দিক দিয়া অনেক খারাপ।

হিন্দু ও শিখগণ পাকিস্থানের বিভিন্ন শহরে যে সব সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়াছেন, উহার মধ্যে আছে ৪,৩৬,০০০টি বাড়ী, ২২,০০০ খণ্ড জমি এবং ১১,০০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান। আর ভারতে মুসলমানগণ ফেলিয়া গিয়াছেন শহরের ২,৮৭,০০০টি বাড়ী, ৯,৬০০ খণ্ড জমি এবং ১,৭৮৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান। পশ্চিম পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বাড়ীগুলি যে ভারতে মুসলমান পরিত্যক্ত বাড়ীগুলি হইতে অনেক বেশী মজবুত ও মূল্যবান একথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

পাঁচ বৎসর হইয়া গেল, এখনও ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে এই উদ্বাস্তু সম্পত্তির সমস্যার মীমাংসা হইতেছে না কেন? আমরা এখানে কেবল প্রকৃত তথ্যগুলি দিয়া বিচারের ভার পাঠকের উপর ছাড়িয়া দিব।

ভারত পুনঃ পুনঃ এই প্রস্তাব করিয়াছে যে, উভয় সরকার নিজ নিজ এলাকায় সম্পত্তিগুলির দখল লইবেন, পরে ঐগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করাইবেন। হয় একটি যুক্ত ভারত-পাকিস্থান সংস্থা অথবা কোনও নিরপেক্ষ সংস্থা কর্ত্তৃক এই মূল্য নির্দ্ধারণ করাইতে হইবে। মূল্যের যে তারতম্য হইবে, তাহা ঋণী দেশ পাওনাদার দেশকে স্বীকৃত ব্যবস্থানুযায়ী শোধ করিয়া দিবে। পরে প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট নিজদেশে আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ দিবেন এবং অন্য দেশের দায় বা দায়িত্ব আর থাকিবে না। এই ব্যবস্থাকে আমরা সরকারী স্তরে বিনিময় বলিয়া অভিহিত করিব।

কৃষি জমি সম্পর্কে পাকিস্থান নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলে নাই। এক সময়ে পাকিস্থান সরকারের অফিসারগণ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, দুই পঞ্জাবের মধ্যে সম্পত্তিগুলি সরকারী স্তরে বিনিময় করা হইবে। কিন্তু পাকিস্থানের রাজনৈতিক নেতারা এই সমাধানে রাজী হইলেন না। প্রথমে তাঁহারা অজুহাত দেখাইলেন যে, রাজস্ব রেকর্ডগুলি এখনও বিনিময় করা হয় নাই, পরে তাঁহারা আবার এই সমস্যাকে খালের জল লইয়া যে বিতর্ক সুরু হইয়াছে তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দিলেন। শহরস্থ সম্পত্তির বেলায় পাকিস্থান এখনও ব্যক্তিগত বিক্রয় ও বিনিময়ই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান বলিয়া মনে করে।

কৃষি জমি সম্বন্ধে তাঁহারা কি করিতে চান সেই সম্বন্ধে পাকিস্থানী মুখপাত্রগণ কিছুই বলেন না। তাঁহারা কি কৃষি জমি বিক্রয়ের অথবা বিনিময়ের অনুমতি দিতে চান? যদি না চান তবে কি ইহা বাঞ্ছনীয় নয় যে, অন্ততঃ জমিগুলি সম্বন্ধে অবিলম্বে একটা মীমাংসা হউক? পাকিস্থান হইতে এই বিষয়ে কোনও উত্তর আসিতেছে না। তাঁহারা বলেন যে, খালের জলের উপর জমির দর নির্ভর করে, আর ভারত এই জলের প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিবে কি না তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই যুক্তি বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। কারণ যে সকল জমি সম্পর্কে মীমাংসার কথা চলিতেছে তাহার মাত্র ২০ শতাংশ বিতর্কমূলক খালের জলের সেচের অধীন। হিন্দু ও শিখগণ যে এক কোটি একর জমি পশ্চিম পাকিস্থানে ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাহার অবশিষ্ট ৮০ শতাংশের মূল্যও ভারতে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত জমির মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। খালের জলের বিষয়টিও পৃথকভাবে আলোচনাধীন আছে। পরে আমরা এই বিষয়ে আরও আলোচনা করিব।

ব্যক্তিগতভাবে জমি বিক্রয় ও বিনিময় করিতে দিলে নানা প্রকার অসুবিধা ঘটিবে। উভয় দেশের নূতন কৃষি আইনগুলিতে চাষীকেই জমির মালিক করার চেষ্টা হইতেছে অথচ উদ্বাস্তু মালিকদের অধিকাংশই কৃষক ছিলেন না। তদুপরি উভয় দেশের আগতকদিগকে ইতিমধ্যেই জমি বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি কোনও মালিক এখন ঐ জমি বিক্রয় বা বিনিময় করিতে চান, তবে তিনি ক্রেতা পাইবেন কি না সন্দেহ, কারণ বর্ত্তমান দখলকারীদিগকে আর একবার উচ্ছেদ করা যাইবে না। পাকিস্থান যে ইহা না বুঝে তাহা নহে; কিন্তু একথাও সে বুঝে যে, জমির মূল্য প্রভেদের

দরুন যে টাকাটা ভারতকে দিতে হইবে তাহা অল্প নহে। এইজন্যই হয়ত তাঁহারা বিষয়টি এড়াইয়া যাইতে চান।

শহরস্থ স্থাবর সম্পত্তির সমস্যা পাকিস্থান সমাধান করিতে চায় ব্যক্তিগতভাবে ঐগুলি বিক্রয় ও বিনিময় করিবার অনুমতি দিয়া। পক্ষান্তরে ভারত-সরকার মনে করেন যে, ইহা সম্ভাব্য সমাধান নহে। প্রকৃত ব্যাপার কি ?

উভয় দেশের উদ্বাস্তুদিগের মোটামুটি এক হিসাবে দেখা যায় যে, ইহাদের শতকরা ৭০ জন ১০,০০০ টাকারও নিম্ন মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিক। ৫,০০০ টাকার কম মূল্যের সম্পত্তির মালিকের সংখ্যাও কম নহে।

এই সকল সরল ও নির্ব্বিরোধী ব্যক্তিদের পক্ষে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বারংবার উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াত করা সম্ভবপর নয়। মনে করা যাউক, একজন গরীব শিখ জব্বলপুরে বসতি স্থাপন করিয়াছে; তাহার পক্ষে কি পশ্চিম পাকিস্থানের শিকারপুরে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য একাধিকবার যাওয়া সম্ভবপর ? জব্বলপুরের যে গরীব মুসলমান শিকারপুরে ঘর বাঁধিয়াছে, তাহার পক্ষেও অনুরূপ অসুবিধাই দেখা দিবে।

স্বাভাবিক সময়েও গরীবদের পক্ষে দূরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াত দুঃসাধ্য। বর্ত্তমানে যাতায়াত ও অর্থ প্রেরণ ক্ষেত্রে যে সকল বাধা-নিষেধ আরোপিত হইয়াছে, উহার ফলে উক্ত দুঃসাধ্য কার্য্য অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া, ভারত হইতে যে সকল হিন্দু ও শিখ পাকিস্থানে যাইবেন তাঁহারা সেখানে কোন বন্ধুবান্ধবের সাহায্য দূরের কথা, তাঁহাদের দেখাই পাইবেন না। পাকিস্থান হইতে আগত মুসলমানদের অবস্থা এ বিষয়ে খুবই অনুকূল।

সম্পত্তি বিক্রয়ে একটি অন্তর্নিহিত অসুবিধাও আছে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী একমাত্র মালিকই সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন; উক্ত ব্যবস্থার আর কোনও বিকল্প নাই।

পৃথক বিক্রয় পরিকল্পনার ফলাফল জানিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৯ সালে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দেখা গিয়াছে যে, ন্যায্য দামে পশ্চিম পাকিস্থানে পরিত্যক্ত উদ্বাস্তু-সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ক্রেতা সংগ্রহ করা খুবই কষ্টকর। কার্য্যতঃ ১৯৪৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্থানে মাত্র একটি উদ্বাস্তু সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে এবং তাহাও খুব সস্তা দরে। তাহা সত্ত্বেও বিক্রেতাকে অত্যধিক হারে বিক্রয়-কর দিতে হইয়াছে। অপর দিকে, ভারতে পর্য্যাপ্ত সংখ্যক মুসলমান থাকা সত্ত্বেও ৫০টির বেশী উদ্বাস্তু সম্পত্তি ছয় মাসের মধ্যে বিক্রয় হয় নাই।

সরকারী পর্য্যায়ে উদ্বাস্তু সম্পত্তি বিনিময়ে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট গররাজী কেন ? তাহাদের একমাত্র যুক্তি এই যে, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর সম্পত্তির মূল্য নির্ণয় কার্য্যতঃ অসম্ভব। কিন্তু নানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে ঐ কার্য্য অবিলম্বে শেষ করার জন্য তৎপর হইয়াছেন। মনে হয়, এ বিষয়ে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইলে কাজটি আরও দ্রুত শেষ করা যাইত। বস্তুতঃপক্ষে কাজটি মোটেই অসম্ভব নয়।"

এই উদ্বাস্তু সম্পত্তি এবং ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ এ সকলের মূলে আছে ভারত-সরকারের—বিশেষতঃ নেহরু মন্ত্রিসভার নিদারুণ শিথিল মনোভাব। সেই প্রথম ভারত বিভাগের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা দেখি আমাদের সরকারের নিষ্ক্রিয়তা, পৌরুষ ও দৃঢ়তার অভাব।

পাকিস্থানের সমস্যা অশেষ। উহার সম্বিৎ কম, লোকবল কম, ধরাপৃষ্ঠের বা ভূগর্ভের ঐশ্বর্য্যের একান্ত অভাব। এই অভাবজনিত লোভ এখন ঐ রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক হইতে উচ্চতম অধিকারী পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু পাকিস্থান তাহার সমস্যাপূরণে অদম্য মনোবলের পরিচয় দিতে পারিতেছে। ইহার দুই কারণ, প্রথম—তাহার কর্ম্মচারীবর্গ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রচালনা করিতেছে, দ্বিতীয় কারণ—ভারত নামক কামধেনুর বেতুবৎ মনোবৃত্তি। চোখ রাঙাইলেই বা লম্ফঝম্ফ করিলেই যদি কার্য্যসিদ্ধি হয় তবে তাহা করে না কে ?

অনধীন ভারতরাষ্ট্র

বর্দ্ধমানের প্রাচীনপন্থী "আর্য্য" পত্রিকার গত শ্রাবণ মাসের ৮ই তারিখে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন : লোকযাত্রা ও যজ্ঞ অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অন্নদানের তুল্য দান আর নাই।

* * *

ছিলাম রাষ্ট্র-পরাধীন, হইয়াছি : অনধীন—ইন্‌ডিপেন্‌ডেণ্ট—not dependent on others। এখনও প্রকৃত স্বাধীন হই নাই। উপনিষদের ভাষায় স্বাধীনতার অর্থ : স্বে-মহিম্নি রাজতে, আত্ম-মহিমায় বিরাজ করা। স্বকীয় নীতি-ধর্ম্ম, তপস্যা-কর্ম্ম, চারিত্র্যবত্তা, পরম্পরাগত সদাচার, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি। জাতীয় চরিত্র আজও পর-ভাব-ভাবুক রহিয়াছে বলিয়াই নিত্য এই মারামারি, কাটাকাটি, এই আত্মঘাত, আত্মদ্রোহ। একদিকে অবিমৃষ্য উপদ্রব, উৎপাত, অন্যদিকে স্বাধিকারপ্রমত্ততা। এই অবস্থাকে বলে অঘোরপন্থা।"

লেখক যে তথ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা সকল নরনারীর কাম্য। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের পুষ্করিণীতে দুধ না ঢালিয়া কর্দ্দমাক্ত জল ঢালিতেছি, সেইজন্য পুষ্করিণীটি

না জল না হবে পূর্ণ হইতেছে। হয়ত কোন বার্ষিক নাগরিক তাঁর দের দুধ চাহিয়াছিলেন তাই দুধরক্ষা হইয়াছে।

কৃষিঋণ

"বাঁকুড়া-দর্পণ" পত্রিকার ১৬ই শ্রাবণ সংখ্যায় সেই পত্রিকার ১৯৪৬ খ্রী: ১৬ই মে সংখ্যা হইতে 'দুর্ভিক্ষের সময় সরকারের কর্ত্তব্য কি' প্রকাশিত করিয়া একটি সময়োপযোগী কর্ত্তব্য করিয়াছেন :

"বাংলা-সরকার প্রায় ছয় লক্ষ টাকা সদর মহকুমার জন্য মঞ্জুর করেছেন।...গত ১৫ই মে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় সদরে সমস্ত রিলিফ অফিসারকে আহ্বান করে একটি অধিবেশনে কিভাবে এই ঋণ দেওয়া হইবে বুঝাইয়া দেন।

আমরা কমিশনার মহোদয়কে জানাইতেছি যে, '৪৩-এর মন্বন্তরে বহু ছোটখাট জমির মালিক বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য জমি বিক্রয় করে এখন ভাগচাষীতে পরিণত হয়েছে। এই সব দুঃস্থ দুর্ভাগা চাষীদের সঙ্গে যদি কোন জমির মালিক যোগ দিতে না চায় তা হলে কি তারা চাষের জন্য কৃষিঋণ পাবে না ? কিন্তু *Famine Manual*-এর ২৩ ধারায় রয়েছে :

"* * If the better off villagers decline to sign joint Bond with poor Landless villagers, it is permissible to advance loans under Rule 6(3) to bodies of 5 or more co-villagers on their Personal Security."

এ ধারা প্রয়োগ না করার কি তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। আমরা এ জেলার দুঃস্থ চাষীদের নিঃসহায় অবস্থা বিবেচনা করে উক্ত ধারা পুনর্ব্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।"

পশ্চিম বঙ্গে লিখন-পঠনক্ষম লোকের হার

১৯৩১ সন	শতকরা	১১'৪
১৯৪১ সন	,,	১৬'৫
১৯৫১ সন	,,	২৪'৮

প্রতি জেলার হিসাব

১।	কলিকাতা	শতকরা	৫৩'১২
২।	হাওড়া	,,	২৮'৩৭
৩।	২৪-পরগণা	,,	২৭'৩০
৪।	হুগলী	,,	২৪'৬৬
৫।	মেদিনীপুর	,,	২৩'১৭
৬।	দারজিলিং	,,	২১'১২
৭।	নদীয়া	,,	২১'৩৯
৮।	বর্দ্ধমান	,,	২০'৬৫
৯।	বীরভূম	,,	১৭'৬৬
১০।	বাঁকুড়া	,,	১৭'২১
১১।	কুচবিহার	,,	১৫'০৯
১২।	পশ্চিমদিনাজপুর	,,	১৪'৭৩
১৩।	জলপাইগুড়ি	,,	১৪'৪৬
১৪।	মুর্শিদাবাদ	,,	১৩'০৬
১৫।	মালদহ	,,	৯'৫৭

পশ্চিম বাংলা সরকারের জনশিক্ষা বিভাগের মুখপত্র জনশিক্ষার গত শ্রাবণ সংখ্যায় উপরোক্ত হিসাবটি প্রকাশিত হইয়াছে। জগতে সভ্যজাতি বলিয়া যাহারা পরিচয় দেয় তাহাদের মধ্যে আমাদের স্থান কোথায় তাহা এই হিসাবেই বুঝা যায়। মরুময় আরবদেশ বা তিমিরাচ্ছন্ন আফ্রিকা ভিন্ন অন্য কোথায়ও নিরক্ষরতার অন্ধকার প্রগাঢ় নয়। ভারতেও আমাদের স্থান সর্ব্বোচ্চে নয়। ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, বরোদা অনেক উচ্চে। মাদ্রাজও বোধ হয় উপরেই আছে।

সুতরাং বাঙালীর গর্ব্বের কারণ আর যাহাতেই থাকুক এই বিষয়ে নয়।

বিজ্ঞানচর্চ্চায় প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

"ডা: মহেন্দ্রলাল সরকারের দেহত্যাগের (১৯০৪, ২৩শে ফেব্রুয়ারী) পর তদীয় একমাত্র পুত্র ডা: অমৃতলাল সরকার ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার অবৈতনিক সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯১৯ অব্দ পর্য্যন্ত বিশেষ যোগ্যতার সহিত তিনি সভার কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ইনিই তরুণ সরকারী কর্ম্মচারী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনকে চাকুরী বজায় রাখিয়াও বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্য্যে সুযোগ দানের জন্য সভার পরীক্ষাগার সকল সময় খুলিয়া রাখার ব্যবস্থা করেন। বিজ্ঞান-সভা স্থাপনার (১৮৭৬) পর গোড়ার দিকে ডা: মহেন্দ্রলাল সরকার নিজেই পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যে ফাদার লাফোঁ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন। পরে ডা: তারাপ্রসন্ন রায় রসায়ন বিজ্ঞান বিষয়ে ঐরূপ বক্তৃতা প্রদান করিতে থাকেন। এই সকল বক্তৃতা সাধারণের বোধগম্যভাবে এবং যন্ত্রাদি সহযোগে পরীক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রদত্ত হইত। বিজ্ঞান-সভার বক্তৃতা শুনিবার জন্য জনসমাগম ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৮৮৬ সালে শ্রোতার সংখ্যা ৩০০ পর্য্যন্ত হয়। কয়েকজন মহিলাও বক্তৃতায় যোগদান করিতেন। এই সময় আরও কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের সহযোগিতালাভের সুযোগ ঘটে, ফলে অবৈতনিক বক্তৃতাদাতার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাঁহাদের সহায়তায় কেবল পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নেই নয়, ভূ-তত্ত্ব, ফলিত গণিত, জীব-বিজ্ঞান এবং উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়েও বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। এই সকল অবৈতনিক বক্তৃতাদাতা যাঁহারা সভার মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে নিজেদের অমূল্য সময় ব্যয় করেন তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং স্যার নীলরতন সরকারও ছিলেন। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ডা: চুনীলাল বসু (বাংলা গবর্ণমেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষক), ডা: রজনীকান্ত সেন, শ্রীরামচন্দ্র দত্ত রসায়ন-

বিজ্ঞানে, শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় ফলিত গণিতে, শ্রীপ্রমথনাথ বসু (টাটা লৌহ প্রতিষ্ঠানখ্যাত) ভূ-তত্ত্ব বিভাগ, শ্রী বি. এল. চৌধুরী জীববিজ্ঞানে, ডাঃ অমৃতলাল সরকার পদার্থ-বিজ্ঞানে এবং শ্রীগিরীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ে বক্তৃতাদান করিতেন। কয়েক বৎসর পরে বিজ্ঞান-সভা ইণ্টারমিডিয়েট ছাত্রদের জন্য উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্র নিয়মিতভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।"

প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রতিষ্ঠান কার্য্য আরম্ভ করে। "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান-সভা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

বীরভূম জেলায় ভূদান-যজ্ঞ

শ্রীলালবিহারী সিংহ "হরিজন" পত্রিকায় ৩রা শ্রাবণ সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠাইয়াছেন: "আমাদের এই যজ্ঞের আয়োজন চলিতেছে। বোধ হয়, আগামী পৌষ-মাঘ মাসে আচার্য্য বিনোবা ভাবে এই রাজ্যে পদার্পণ করিবেন।"

বীরভূম জেলার ভূদান-যজ্ঞ সমিতির আহ্বায়ক শ্রীলালবিহারী সিংহ গত ২৩-৬-৫২ পর্য্যন্ত মুরারই থানার আমডোল ইউনিয়নের ভিমপুর, আমডোল, কলহপুর, অমৃতপুর, নরোত্তমপুর ও কণকপুর এবং নন্দীগ্রাম ইউনিয়নের ভোগারপাড়া ও নন্দীগ্রাম গ্রামে যাইয়া ভূদান-যজ্ঞ ও সর্ব্বোদয় আন্দোলন বিষয়ে ব্যক্তিগত বৈঠক করিয়া ও প্রতিনিধি স্থানীয় লোকদের সভায় আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া বলেন। গ্রাম শান্তি স্থাপন ও উন্নয়ন বিষয়েও গ্রামবাসীদের তিনি পরামর্শ দেন। আমডোল গ্রামে ২৯-৬-৫২ তারিখে সভায় আলোচনা করিয়া ইউনিয়নের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযতীন্দ্রমোহন মণ্ডল ও জনাব মহম্মদ কোরবান হোসেন মহাশয়দ্বয়ের উপর ইউনিয়নের সকল বিষয়ের মীমাংসা, উন্নয়ন ও ভূদান-যজ্ঞের (ইউনিয়নের অংশ ৭ হাজার লোকের পক্ষ হইতে ৭০ একর ভূদান-সংগ্রহ) কাজ করিবার ভার অর্পণ করেন। বিভিন্ন পক্ষ মধ্যে বহুদিন যাবৎ যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহার অবসান হয়। নন্দীগ্রাম ইউনিয়নে ভূদান-যজ্ঞের কাজ করিবার ভার গ্রহণ করেন জনাব রহিম বক্স, শ্রীআশুতোষ সেন ও শ্রীসুবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই ইউনিয়নে শান্তি স্থাপন ও উন্নয়ন-বিষয়েও কাজ হয়।

আমডোল ইউনিয়নে দাতারা ৬·২১ শতক ভূমি দান করেন।

বীরভূম জেলায় এ যাবৎ ১৭ জন দাতা ২২·৩৩ ভূমিদান করিয়াছেন এবং বহু স্থান হইতে ভূমিদান দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লেখকের নিকট পত্র দিয়াছেন।

৩০-৬-৫২ লাইকর গ্রামে বীরভূম জেলা ভূদান-যজ্ঞ সমিতির সভা হয়। এই সভায় আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৩টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। জেলা সমিতির সিদ্ধান্ত মত সাঁইথিয়ায় বীরভূম জেলা ভূদান সমিতির কার্য্যালয় খোলা হইয়াছে। শ্রীনিরঞ্জন সরকার কার্য্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীলালবিহারী সিংহ ১-৭-৫২ হইতে ৮-৭-৫২ পর্য্যন্ত লাইকর, মুরারই, সাঁইথিয়া, সিউড়ি, তাঁতীপাড়া, রামপুরহাট, বোলপুর ও কলিকাতা গিয়া ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধিকল্পে কর্ম্মীগণের সহিত আলোচনা করেন। শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, শ্রীপঞ্চানন বসু, শ্রীরত্নমণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমল বিষ্ণু, শ্রীগোপিকাবিলাস সেন, শ্রীকামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবসন্তলাল মুরারকার সহিত তিনি এই বিষয়ে পরামর্শ করেন।

কাজি নজরুল ইসলামের বৃত্তি

"নিশান" পত্র ২৬শে শ্রাবণ সংখ্যায় নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন:

"১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫২ সালের জুন মাস অবধি কাজি নজরুল ইসলামকে দেয় মাসিক ১০০৲ টাকা হিসাবে ৬২৫৬।০ আনা জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী ডেপুটি হাই-কমিশনার এককালীন শোধ করিয়াছেন। দান বটে! কিন্তু ১ বৎসর ৯ মাসে অর্থাৎ ২১ মাসে ১০০৲ হারে প্রাপ্য হয় ২১০০৲ টাকা—৬২৫৬।০ হয় কেমনে? পাক টাকায় ৯২৪৲ টাকা বেশী হয়—তাহাতে হয় ৩০২৪৲। তারপর হইল ১০০৲ টাকার বৃত্তি যদি ৬২৫৬।০ টাকায় শেষ করা হয় তবে কি বৃত্তিপ্রাপক সে টাকার ফল উপভোগ করিতে পারে—রুগ্ন কবি এতকাল ভবধামে না-ও থাকিতে পারিত। দান করিয়া ঢক্কানিনাদে প্রকাশ না করিলেই শোভন হইত—এত দিন দিতে শক্তি হয় নাই—আজ দিলাম এই ত কথা।"

ঐ সংখ্যায়ই "বরিশাল হিতৈষী"র উপর পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে। তৎসম্পর্কে দুর্গামোহন বাবু অনেক হা-হুতাশ করিয়াছেন। আমরা মনে করি যে, পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের নিষেধাজ্ঞা যুক্তিসঙ্গত। কোন রাষ্ট্রই এরূপ দ্বৈত আনুগত্য সহ্য করিতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গের নেতৃস্থানীয় অনেকে এরূপ দু' নৌকায় পা রাখিয়া চলিতেছেন। শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে পরিবার-পরিজনকে আনিয়াছেন। শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন গুহ, সকলেই সেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ ব্যবস্থার সঙ্গে করাচীর কেন্দ্রীয়-পরিষদে ও পূর্ব্ববঙ্গের পরিষদে গরম গরম বক্তৃতার কোন সঙ্গতি নাই। এই কথাটা মনে রাখিলে, দুর্গামোহন বাবুর ক্ষোভ অন্য ভাবে প্রকাশ পাইত।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের নূতন সাহিত্য

হাওড়ার "সত্যভারত" (২৪শে শ্রাবণ) নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :

"শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় সাহিত্যিক ও কবি বটে, তবে ইদানীং তিনি আণ্টনী ফিরিঙ্গী ও ভোলা ময়রা কবির মত লড়ায়ে কবির পাঁয়তাড়া কষছেন। তাই তাঁহার লড়ায়ে কাব্যটা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই লেখা হইয়াছে।...অক্ষমতার দুর্ব্বলতাকে নবীন সাহিত্যিকরা কবিতা লিখিয়াই চাপা দিয়া থাকেন।"

উড়িষ্যার অবস্থা

"যুগান্তর" পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন :

চক্রনেমির পরিবর্ত্তনে উড়িষ্যার নবযুগ আরম্ভ হয়েছিল ১৫ বৎসর পূর্ব্বে নয়া প্রদেশ সংগঠনের সঙ্গে ১৯৩৬-৩৭ সনে; ১৯৩৭ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের অপূর্ব্ব জয়লাভ, ১৯৩৮-৩৯ সনে কংগ্রেসী শাসনের প্রথম পর্ব্বে ও তার পর সম্মিলিত মন্ত্রিত্বকালে এবং বিশেষ করে ১৯৪৬ সন থেকে মহতাব মন্ত্রিত্বের আমলে এ রাজ্যের বিভিন্নমুখী উন্নয়ন দ্বারা ১৯৪৮-৪৯ সনে দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তির ফলে উড়িষ্যার বহুল সম্প্রসারণে প্রবল বেগে বৃহত্তর দিকে এগিয়ে যাবে আশা করা গিয়েছিল। যে রাজ্য পূর্ব্বতন সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির, বহু শতাব্দীর ঐশ্বর্য্য কারুকলায়, শৌর্য্যবীর্য্যে ভারতে সর্ব্বশেষ (১৮০০ ইং) ব্রিটিশ শক্তির অধীনে স্বাধীনতা হারিয়েছিল, তার নব অভ্যুদয়ের গৌরচন্দ্রিকায় ভবিষ্যতের পুনর্গঠনের দিকে যে অতি উচ্চ আশা-ভরসা উদ্রিক্ত হয়েছিল, তা কি জানি যেন কেমন, গত দুই-তিন বছরের রাষ্ট্রীয় বা শাসন সম্পর্কীয় অব্যবস্থার এবং সাধারণ্যে নৈতিক পঙ্কিলতায় মলিন হতে চলেছে দিনের পর দিন। এ বিপর্য্যয়ের গতিরোধ করার মত নিষ্ঠাবান ও কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃত্বের আবির্ভাব না হলে একটা বিরাট জাতির বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যাবার আশঙ্কাই হচ্ছে।"

এই অবস্থার বা দুরবস্থার জন্য মানুষই দায়ী এবং মানুষই তার প্রতিকার করিতে পারে। উড়িষ্যার মত ভাগ্যবান প্রায় কোন রাজ্যই নয়। তার আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকমত সন্তুষ্ট; শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী রাজ্যের কর্ণধার। শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাবের আত্মচরিতের কয়েকটি অংশ "যুগান্তরে" প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকলের পুনরুত্থান সম্বন্ধে মধুসূদন দাশ ও গোপবন্ধু দাশ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার আত্মচরিতে "পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের উড়িষ্যা" নামক অংশে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

পৃথিবীর কোনও দেশ, কোনও রাজ্য বা কোনও জাতি একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই, এমন কি মার্কিন দেশ বা সোভিয়েট রুশও নয়। ভারতের যে সকল রাজ্য ভারতরাষ্ট্রের অংশ তাঁহারা যদি এই সার কথা বুঝেন এবং এক রাজ্য অন্য রাজ্যের সহিত পূর্ণ সৌহার্দ্য ও সহযোগ রাখিয়া চলেন তবেই তাঁহারা প্রগতির পথে চলিতে পারিবেন নতুবা নহে। আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

শ্ল্যাভ শব্দের অর্থ

"শ্ল্যাভ" শব্দ আজ ষ্টালিনের মাহাত্ম্যে নূতন করিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "সবাক জাতি" (the articulate people)। তারা অন্যান্য অসভ্য জাতি (barbarians) হইতে পৃথক। এই জাতিগত, বর্ণগত অহমিকার উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় পাতায় পড়া যায়।

কম্যুনিষ্ট শাসকবর্গের পূর্ব্বজ জার (Tsar) রাজা-রাণীগণ এই জাতিবাচক অহমিকাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। কতবার যে তারা য়িহুদী ধর্মাবলম্বীদের নিঃশেষ করিবার জন্য জনগণকে ক্ষেপাইয়াছিলেন, তার সংখ্যা অগণিত এবং ষ্টালিনের নেতৃত্বে সেইরূপ "সবাক" রুশগণ অরুশীয় জাতিসমূহকে পদানত করিতেছে।

এই শ্ল্যাভ আদর্শের প্রবর্ত্তক কিন্তু কোন রুশ-জাতিসম্ভূত ব্যক্তি নন্। চেকোশ্লাভিয়া দেশবাসী জোসেফ সেফারিস (Josef Sefaris) সর্ব্বপ্রথমে বিজ্ঞানসম্মত শ্ল্যাভ-ভাষাসমূহের ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন। আর এক জন চেকোশ্লাভিয়াবাসী জ্যান কলার (Jan Kollar) চেকোশ্ল্যাভ ভাষায় প্রথম স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন। তার শিরোনামা—শ্ল্যাভ দুহিতা (The Daughter of the Slavs)। প্রাগ্ নগরীতে ১৮৪৮ খ্রীঃ নিখিল-শ্ল্যাভ সম্মেলন সংগঠিত হয়। তাহার সভাপতি ছিলেন প্যালেকি ড্রন (Palacky Drawn)। সকল শ্ল্যাভ দেশের প্রতিনিধি তাহাতে সমবেত হন। আর এক কথা, এক জন জার্ম্মান এই জাগরণের পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার নাম জোহান গটফ্রেড হার্ডার। শ্ল্যাভ-কৃষকের সহজ জীবনযাত্রার প্রশংসা করিয়া তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই তত্ত্বের একটা প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। তাহা এই যে, টিউটন ও ল্যাটিন জাতিসমূহই ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়িতেছে। শ্ল্যাভ রক্ত প্রবাহিত করাইয়া তাহাদের পুনরায় সতেজ করা যাইতে পারে। নৃতত্ত্ববিদের এই চেষ্টা সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত। তাহার সঙ্গে যখন ভাষাবিদ্ যোগদান করেন তখন সোনায় সোহাগা মেশানো হয়।

ইতিহাসের এই বিবরণ বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক সমস্যাবলী বুঝিবার পক্ষে সাহায্য করে বলিয়া দিলাম।

শাহজাদা দারাশুকো

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

পঞ্চম অধ্যায়

দোটানা স্রোতে দিল্লীশ্বর তথা মোগল সাম্রাজ্য

১

সম্রাট শাহজাহান শুধু পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া নয়, মোগল সাম্রাজ্যের শাসননীতি নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া প্রবল দোটানা স্রোতের মুখে পড়িয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন পিতামহ হইতে তাঁহার কৃতিত্ব কোন অংশে কম নহে; আবুল ফজলের মত একজন ঐতিহাসিক পাওয়া গেলে তাঁহার কীর্ত্তিগাথা পিতামহের গৌরবকে ম্লান করিয়া দিত। রাজ্যবিস্তার, গুণীর সমাদর, সাম্রাজ্যের রূপসজ্জা, শাসনকার্য্যে পরিশ্রম ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে পিতামহের সহিত প্রশংসনীয় প্রতিস্পর্দ্ধা-ভাব শাহজাহানকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগাইয়াছে সন্দেহ নাই। এই প্রতিযোগিতায় তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে আকবরকে হার মানাইয়াছেন বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আকবর বাদ্‌শা হুমায়ূ-শেরশাহের ভাঙা দিল্লীতেই পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সামিয়ানা খাটাইয়া দরবার-ই-আমে হিন্দুর দেবতার খাটের মত লাল পাথরের চতুর্দ্দোলের মধ্যে মসনদের উপর গালিচা পাতিয়া বসিয়াছেন, সহজলভ্য লাল পাথর দিয়া রাজধানী ফতেপুর সিক্রী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মর্ম্মর পাথরের নামগন্ধ নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে শাহজাহানের হাতে আগ্রার চেহারা ফিরিয়া গেল, যমুনাতীরে দিল্লী-শাহজাহানাবাদ নির্ম্মিত হইল, গৌরবদৃপ্তা সাম্রাজ্যলক্ষ্মীর অভিনব রূপসজ্জায় মর্ম্মর-প্রস্তর শিল্পীর বিচিত্র বর্ণসম্ভার-সমৃদ্ধ রত্ন-আলিপনার নীচে যেন আমাদের মাটির প্রলেপ। আকবরের চিত্রশিল্পী সিক্রীর মহলে তুর্কী-হামামের গায়ে যে রূপরেখা রাখিয়া গিয়াছিল, শাহজাহানের শিল্পীও সাজ-সাজ (খোদাইকর) বাটালি ও এক ঝুড়ি দেশী-বিদেশী নানা রঙের দামী পাথর লইয়া মর্ম্মরের চত্বরে-প্রাচীরে, সম্রাটের ইন্দ্রপুরীর অলকানন্দা নহর-ই-বেহেশতে, সেই ছবির খেলা এবং রঙের বাহু দেখাইয়াছে। তাজমহলের ইরাণী শান্-এ ও মুখর লাস্যে হিন্দুস্থানে মুসলমান স্থাপত্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টির পরিসমাপ্তি হইল। হিন্দু ললিতকলাখচিত রক্তাম্বর-পরিহিতা সিক্রী পূর্ব্বেই অরণ্যবাসিনী হইয়াছিলেন। শাহজাহান মনে করিতেন যে, হিন্দুস্থাপত্য, শিল্পকলাকে মুসলমানরা উত্তর ভারতে তিন শতাব্দী ধরিয়া কবরস্থ করিয়াছিল, আকবর ফতেপুর সিক্রীতে ঐগুলির পুনঃ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া ইসলামের অবমাননা করিয়াছিলেন।

লোকপ্রসিদ্ধ ফতেপুর সিক্রীর নবরত্নের মধ্যমণি আকবর ছিলেন বহুশ্রুত নিরক্ষর বিক্রমাদিত্য; তাঁহার পৌত্র প্রকৃত বিদ্বান্, আরবী-ফার্সিতে আলিম, হিন্দী লেখাপড়ায় পাকা কায়স্থ। শাহজাহানের দরবারে পুরুষরত্নের অভাব ছিল না। উঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রত্ন উজীর-ই-আজম সাদুল্লা খাঁ, মুসলমানের চোখে "দজ্জাল" (Anti-Christ) আকবর বাদশার "নওরতন", নয়টি দুর্গ্রহ। মোল্লা বদায়ুনী দরবারী হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সবগুলিকে বলিয়াছেন "লুচ্চা";—যাহাদের কথা লিখিলে কলম নাপাক হইয়া যায়।* সাদুল্লা খাঁকে আওরঙ্গজেব বিশেষ হিতৈষী জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন; দারার সহিত উজীরের প্রায়ই টক্কর লাগিত, সম্রাট্ এইজন্য দারাকে শাসাইতেন, শাহজাদার উপর বিরক্তি প্রকাশ করিতেন।

মোগল সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় টোডরমল কিংবা দ্বিতীয় সাদুল্লা জন্মগ্রহণ করেন নাই। রাজা মানসিংহের পৌত্র মীর্জ্জারাজা জয়সিংহ মোগল-দরবারে পিতামহের স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। মিঞা তানসেনের নাতি লাল খাঁ দাদা-সাহেবের নাম বজায় রাখিয়াছিলেন। শাহজাহান কিঞ্চিৎ হিন্দুবিদ্বেষী হইলেও সংস্কৃত এবং হিন্দীর উপর সদয় ছিলেন; দরবারী খেতাব, নাম ইত্যাদি নির্ব্বাচনে তিনি পণ্ডিতী সংস্কৃত পছন্দ করিতেন। দরবারের "গুণী"শ্রেষ্ঠ লাল-খাঁকে তিনি "গুণসমুদ্র" উপাধি দিয়াছিলেন। ফার্সী কবি মোল্লা কুদ্‌সী শাহজাহানের দরবারে—আকবরশাহী দরবারে সেখ ফৈজীর স্থান পূর্ণ করিয়া "কবিসম্রাট" (মালিক্-উশ-শোয়া) উপাধি পাইয়াছিলেন, ময়ূরতক্তের তক্তায় তাঁহার রচিত মসনবী খোদাই করা হইয়াছিল। ফৈজী এবং কুদ্‌সীর মধ্যে আশমান-জমীন তফাৎ। সম্রাট্ কবিতা ভাল-বাসিতেন, কিন্তু ভালমন্দ বুঝিতেন না, কাজের কথা, পদের মিল থাকিলেই হইত। তাঁহার কাছে ভাল কবিতাপাঠ "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্"—অনেক সময় বিপদ ডাকিয়া লওয়ার মত। দারা একবার তাঁহার বন্ধু প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি ও সাহসী যোদ্ধা চন্দ্রভান "ব্রাহ্মণ"কে পুরস্কৃত করিবার জন্য পিতার কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। সম্রাটের অনুমতি

---

* Muntekhab-ut-tawarikh, Eng. trans. Vol. III, p. 1.

পাইয়া কবি স্বরচিত একটি সুফিয়ানী কবিতা আবৃত্তি করিলেন—ইহার স্থূলার্থ :

'আমি বহুদিন "কাবা" এবং বুতখানার (দেবমন্দির) মধ্যে সংশয়াকুল ভাবে আনাগোনা করিতে করিতে অবশেষে বুতখানায় ঢুকিয়া পড়িলাম।'

কবিতা শুনিয়াই শাহানশাহ চটিয়া আগুন হইলেন,—এমন বেইমানকে তাঁহার পুত্র হাজির করিয়াছে; এই কবিতায় ইসলামের অপমান করা হইয়াছে, এই কাফের কাবা শরীফ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বুতখানায় ঢুকিয়া পড়িল?—এই কবিতায় আসলে চন্দ্রভানের মৌলিকতা ছিল না, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান সুফীগণের ভাব লইয়া রচিত। এই কথা পিতাকে বুঝাইতে দারা এবং বিশিষ্ট বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ গলদঘর্ম্ম হইলেন। আর একজন কবি শাহজাহানকে কবিতা শুনাইতে গিয়া গুরুতর বিপদে পড়িয়াছিলেন। এই কবি সেলিম চিশতীর বংশধর ফতেপুর সিক্রীর শেখজাদা পাগলা সৈইদা, খাঁটি সুফী ও ভাবের পাগল। তিনি আবৃত্তি করিয়াছিলেন :

Chi-st dani bada-i-gulgun musaffa-i-Jauhri :
Husn-ra parawar-digar wa ishq-ra Paigambari.

অর্থাৎ, গোলাপের মত রক্তিমাভ পদ্মরাগ মণির নির্ম্মল রক্তিমচ্ছটার ন্যায় সমুজ্জল সুরা কি বস্তু জানা আছে কি? এই সুরা সৌন্দর্য্যের পরবর-দিগর (প্রতিপোষক) এবং ইশ্‌কের (প্রেমের) বার্ত্তাবাহক পয়গম্বর।

হারাম শরাবের সহিত পবিত্র পরবর-দিগর আল্লা এবং আল্লার রসুল হজরত পয়গম্বরের নাম-সংযোগ শুনিয়া শাহজাহানের ভিতরের আসল মানুষটি বাহির হইয়া পড়িল—যাহার প্রতিচ্ছবি তাঁহার পুত্র আওরঙ্গজেব। কবি গোস্তাকী মাপ চাহিয়া অনেক কষ্টে তাঁহাকে বুঝাইলেন এই শরাব সাধারণ নেশা নয়, দিলের পেয়ালায় ইশ্‌ক-ই-হকিকি অর্থাৎ ভগবৎ প্রেম।

২

শাহজাহান স্বয়ং "দ্বিতীয়" তৈমুর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, বুন্দেলা-বিদ্রোহের সময় নৃশংস ধর্ম্মান্ধতা ও রক্তস্নাত বর্ব্বরতায় তাঁহার তৈমুরত্ব প্রকট হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ মোল্লাগণ তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া প্রচার করিলেন শাহানশাহ এই জমানার ইমাম মেহ্‌দী, ইসলামকে রক্ষা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। আকবর-প্রবর্ত্তিত ইলাহী সাল বাতিল করিয়া শাহজাহান শাহী দপ্তরে ইসলামী হিজরী সাল পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের অন্তর্গত ভিম্বরের জমিদার নিজের জমিদারীর মধ্যে ধর্ম্মত্যাগ না করিয়া হিন্দুনারীর মুসলমান পতিগ্রহণ এবং মুসলমান স্ত্রীলোকের হিন্দুর সহিত বিবাহপ্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের পথে মোল্লার এই বিষয় তাঁহার কানে পৌঁছাইল। তিনি হুকুম দিলেন, যে সমস্ত হিন্দু মুসলমান স্ত্রী লইয়াছে তাহাদিগকে স্ত্রী কিংবা ধর্ম্ম দুইটার একটা ত্যাগ করিতে হইবে। বেচারা ঘোগুভয়ে মুসলমান হইয়া গেল, প্রজাদেরও ঐ অবস্থা। মুসলমানের দেওয়ানখানায় হিন্দু পদস্থ কর্ম্মচারিগণকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়—এই অভিযোগে তিনি দেওয়ান-ই-তন দপ্তর হইতে রাজা মণিদাসকে অন্যত্র সরাইয়াছিলেন। সুদক্ষ রাজস্ব-কর্ম্মচারী রাজা রঘুনাথ আজীবন উজীর সাদুল্লার "পেশদস্ত" বা হেড এসিষ্টাণ্ট রহিয়া গেলেন, টোডরমলের ভাগ্য কোন হিন্দুর হয় নাই। হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সর্ব্ববিধ সুবিধা জায়গীর ও নগদ পুরস্কার পাইত; বাগলানার হিন্দু রাজার পুত্র প্রেমজী মুসলমান হওয়ায় কুমার আওরঙ্গজেবের সুপারিশে সম্রাটের নিকট হইতে দেড় হাজারী মনসব পাইয়াছিল; রাজা বখতাবর কচ্ছবাহ ধর্ম্মত্যাগের জন্য ইনাম পাইলেন নগদ দুই হাজার টাকা।

হিন্দুর মন্দির ধ্বংসকার্য্যে পুণ্য অর্জ্জনের বাতিক জাহাঙ্গীরের সময় হইতে কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর বাদশাহ খেয়ালী মানুষ, ধর্ম্মোন্মাদনা বিষমাশ্রিত জ্বরের মত সময় সময় তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ করিত। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তিনি হিন্দুদিগকে মন্দির নির্ম্মাণে বাধা দিতেন না। শেষ বয়সে ধর্ম্মের রোগ প্রবল হওয়ায় তিনি হুকুম দিলেন নূতন মন্দির যেগুলি সম্পূর্ণ হয় নাই ঐগুলি ঐ অবস্থায় থাকিবে। কাশীতে হিন্দুরা নূতন বাদশাহের কাছে ঐ সমস্ত মন্দির সম্পূর্ণ করিবার আর্জ্জি পেশ করিল। শাহজাহান আদেশ করিলেন, যে অংশ পূর্ব্বে তৈয়ার হইয়া গিয়াছে উহাও ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। দরবারী ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরীর বাদশাহনামায় কাশী হইতে ছিয়াত্তরটা হিন্দুমন্দির ধ্বংসের খবর কোন দিন দরবারে পৌঁছিল—সন তারিখসহ লেখা আছে। বিদ্রোহী পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গীগণের হুগলীর গীর্জ্জা ধ্বংস করিয়া উহার মূর্ত্তি (Icon)গুলি দরবারে প্রেরিত হইয়াছিল। শাহজাহান ঐগুলি চুরমার করিয়া কেবল দুইটি মাত্র যমুনার জলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

৩

জাহাঙ্গীর বাদশাহ হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা করিতেন, মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসী চিৎরূপের (অশুদ্ধ পাঠ 'যদরূপ') সহিত দুই বার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন—একবার রাওয়ালপিণ্ডির

নিকটবর্ত্তী বালনাথ যোগীর টিলায় সাধুদিগের বাৎসরিক মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। আকবরের ন্যায় তিনিও পণ্ডিতগণের সঙ্গে বাদানুবাদ করিতেন; অবশ্য হিন্দুধর্ম্ম বুঝিবার মতলবে নয়, উহার মুণ্ডপাত করিবার জন্য। দীন-ই-ইলাহীর গুরু হিসাবে তিনি শিষ্যগণকে দীক্ষা দান করিয়া তাহাদিগকে ধ্যানের প্রতীক শাশ্ত প্রদান করিতেন। আকবরশাহী আমলের এই ধারা শাহজাহান লোপ করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান পীর ফকিরগণের (যথা লাহোরের মিঞা মীর) সঙ্গ করিতেন; দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া সুফীর কেরামতি দেখিতেন। ১৬৫২ সনের পূর্ব্বে কোন এক দিন শেখ নাজীর নামক নামজাদা সুফীর হঠাৎ শাহী দরবারে বৈষ্ণবী "দশা" হইয়া গেল। ঐ অবস্থায় তিনি এক গেলাস জল চাহিলেন; এক চুমুক পান করিবার পর তিনি উহা উপস্থিত ব্যক্তিগণকে চাখিয়া দেখিতে বলিলেন, সকলেই অবাক হইয়া বলিতে লাগিল মধু! টাটকা খালিস মধু! নাজীরের এই বেনজীর কেরামতির পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য ঐখানে উপস্থিত ছিলেন শাহজাদা দারা, সত্যবাদী কাজী মহম্মদ আসলম এবং রাজা বিক্রমজিৎ (বিলোচপুরের যুদ্ধে নিহত বীর বিক্রমজিৎ নহেন)। শাহজাদা ও কাজী বাদশাহকে নিবেদন করিলেন তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন পীর সাহেব একবার একটি বদ্‌না এবং আর একবার একখানা রুমালকে কবুতর করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। রাজা বিক্রমজিৎ বলিলেন, একবার শেখ নাজীর নমাজ করিবার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখিলেন নমাজের অবস্থায় শেখজীর কাঁচা গালপাট্টা সাদা হইয়া গেল এবং এক দিকে মাথা ও অন্য দিকে ধড় পড়িয়া রহিল! কিছুক্ষণ পরেই আবার দুইটা জোড়া লাগিয়া গেল।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলিবেন শাহী দরবার লক্ষ্ণৌয়ের গুলিখোরের আড্ডা; কিন্তু বিক্রমজিৎ কাফের হইলেও মিথ্যাবাদী ছিলেন না—এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন সমসাময়িক দরবারী ঐতিহাসিক লাহোরী। এই রকম ব্যাপারে শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের বিশ্বাসের কিছু মাত্রা ছিল; কিন্তু বিশ্বাসপ্রবণ দারার মাত্রাজ্ঞান ছিল না।

৪

আকবর ও জাহাঙ্গীর হিন্দু প্রজার উৎসবের আনন্দে অংশ গ্রহণ করিতেন। বিজয়া দশমী, রাখীবন্ধন মানাইতেন, দীপালীর রাত্রিতে শাহী মহলে আলোকসজ্জা হইত। শাহজাহান হিন্দুয়ানীর প্রশ্রয় পাপকার্য্য জ্ঞানে এই সমস্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। দীপালীর পরিবর্ত্তে "শবে বরাত", মুসলমানের গণ্ডীর মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃভাব সৃষ্টি এবং পুণ্য অর্জ্জনের জন্য বাৎসরিক "মিলাদ শরীফ"কে সম্রাট্ জাতীয় উৎসবের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। লাহোরে শবে বরাত রাত্রির (১১ই শাবান ১০৪৯ হিঃ) বর্ণনা বাদশাহনামায় লিখিত আছে। আলীমর্দ্দান খাঁ দরবার-ই-আমের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অপূর্ব্ব আলোকসজ্জা করিয়াছিলেন। ঐখানে এবং বাহিরে দর্শনঝরোকার নীচে আতসবাজী পোড়ান হইয়াছিল। ঐ রাত্রিতে শাহানশাহ্ মোল্লা ফাজিল এবং শিয়ালকোটবাসী মোল্লা আবদুল হাকিমকে জন্মতিথির তুলাদানের সোনা হইতে দুই শত আসরফী প্রত্যেককে দান করিয়াছিলেন এবং দশ হাজার টাকা গরীব ফকীরদিগকে দান-খয়রাতে খরচ করিয়াছিলেন।

মহা ধুমধামের সঙ্গে আগ্রা দুর্গে একবার মিলাদ শরীফের উৎসব হইয়াছিল (১২ই রবিয়ুল আউয়াল ১০৪৩ হিঃ)। মিলাদের মজলিসে অনেক বিদ্বান্, কোরাণ-পাঠক এবং ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। হজরত মহম্মদের জন্মতিথির এই অনুষ্ঠানে স্বয়ং সম্রাট্ সিংহাসন ছাড়িয়া সাধারণ ভাবে মজলিসের গালিচায় বসিলেন। হজরত রসুলাল্লার পবিত্র জীবনী এবং গুণাবলীর আলোচনার সময়ে গোলাপজল বর্ষণ এবং আতর বিতরণ করা হইল, ইহার পরে বড় বড় থালায় ভোজনসামগ্রী মিঠাই এবং হালুয়া সকলকে পরিবেশন। এই রাত্রির উৎসবে ফকিরদিগকে শাল ও ফরুজী দান করা হইয়াছিল; গরীব-দুঃখীদিগকে খয়রাতের খরচ হইয়াছিল মোট বিশ হাজার টাকা।

আকবরশাহী আমলের "তুলাদান" হিন্দু অনুষ্ঠান হইলেও অমঙ্গলের আশঙ্কায় সম্রাট্ শাহজাহান বৎসরে দুই বার সৌর ও চান্দ্র জন্মতিথিতে যথারীতি "তুলাদান" করিতেন। যে সমস্ত দ্রব্যের সহিত সম্রাটের ওজন হইত ঐগুলি আকবর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের পণ্ডিত এবং আলেমগণকে দান করিতেন। কখনও কখনও বা তুলাদানের দ্রব্য একটি ভাণ্ডারে জমা রাখিতেন এবং মুসলমান পর্ব্ব উপলক্ষ্যে সুফী-মোল্লা ইত্যাদিকে দান করিতেন।

৫

শাহজাহানের রাজত্বকালে আকবরের উদারনীতি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিলেও বাহ্যদৃষ্টিতে উহা ধরা পড়ে নাই। দরবারে সংস্কৃত ও হিন্দী কবিগণ যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেন; হিন্দুদর্শন ও জ্যোতিষচর্চ্চা হইত, সংস্কৃত পুস্তকের ফার্সী অনুবাদও হইত।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ শাহী দরবারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হিন্দু পণ্ডিত ছিলেন। আবদুল হামিদ লাহোরী লিখিয়া-

ছেন, জগন্নাথ ঐ যুগের "গ্রন্থকারগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়" (সরামদ্-ই মুসন্নিফান্) এবং শ্রেষ্ঠ গায়ক; কিন্তু তিনি কর্ণাটক ভাষায় গান করেন। লাহোরী কোন গ্রন্থের নাম না করিলেও সংস্কৃত কাব্যরসিকগণের নিকট জগন্নাথ-রচিত "রসগঙ্গাধর", মল্লিনাথের টীকা, "মনোরমা"র "মনোরমা-কুচমর্দন", "ভামিনী-বিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থ সুপরিচিত। টলেমীর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থের আরবী অনুবাদ "অল-মাজিষ্ট" নামক পুস্তক অবলম্বনে জগন্নাথ "সিদ্ধান্তসার-কৌস্তুভ" এবং আর একখানা জ্যোতিষগ্রন্থ "সম্রাট্-সিদ্ধান্ত" লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রশস্তিরচনা জগন্নাথ পণ্ডিতের আয়ের প্রশস্ত পথ ছিল, শাহজাহানের শ্বশুর এবং প্রধানমন্ত্রী আসফ খাঁর নামে "আসফ-লহরী" লিখিয়াছেন, আরও অনেক "লহরী" হয়ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এমন এক "লহরী" উপহার লইয়াই জগন্নাথ "কলাবন্ত" ১০৪৪ হিজরীর ২২শে রবিউস্-সানী তারিখে কাশ্মীরের পথে ভীম্বর নামক স্থানে সম্রাটের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হইয়া বাদশা সমান ওজনের টাকা বকশিশ দিলেন। জগন্নাথ পণ্ডিতের ওজন হইয়াছিল ৪৫০০ সিক্কা টাকা অর্থাৎ এক মণ সওয়া ষোল সের; তাঁহার সৌভাগ্যের প্রতিস্পর্দ্ধী মোল্লা কবি কুদসী ওজনে এক হাজার তোলা বেশী। জগন্নাথকৃত এই লুপ্ত লহরীর একটি মাত্র শ্লোক মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে:

> দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মনোরথান্ পূরয়িতুং সমর্থঃ।
> অন্যৈর্নৃপালৈঃ পরিদীয়মানং শাকায় বা স্যাৎ লবণায় বা স্যাৎ॥

দরবারী ইতিহাসে জগন্নাথ পণ্ডিতকে পণ্ডিত বা কবি না বলিয়া কলাবন্ত বলা হইয়াছে। জগন্নাথ শাহান্শার নামে গান রচনা করিয়াছিলেন, "লেকিন্ কর্ণাটক" ভাষায় (লাহোরী)। পাকা মুসলমান হইলেও শাহজাহান গান-বাজনার আওয়াজ শুনিলে কানে আঙুল দিতেন না। সঙ্গীতে তাঁহার অনুরাগ আকবর হইতে ন্যূন ছিল না। দরবারে লাল খাঁ এবং তাঁহার দুই পুত্র খুশহাল এবং বিশ্রাম খাঁ ব্যতীত আর একজন গুণী ছিলেন দরাজ খাঁ। দরাজ খাঁ পুরস্কারস্বরূপ সমান ওজনে ৪৫০০ টাকা পাইয়াছিলেন (লাহোরী)।

শাহজাহান জগন্নাথকে প্রথমে কবি রায় এবং পরে মহাকবি রায় খেতাব দিয়াছিলেন। জগন্নাথ শাহজাদা দারার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি দারার জীবনী-মূলক এক মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন, নাম 'জগদাভরণম্'। আওরঙ্গজেবের রাজ্যারোহণের পর জগন্নাথ কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের আশ্রয়প্রার্থী হন। ঐখানে তিনি উক্ত মহাকাব্যে দারার নামের স্থানে রাজার নাম বসাইয়া প্রাণাভরণম্ খাড়া করিয়াছিলেন। শেষবয়সে ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া কবি রাজশেখরের ন্যায় পাপের বোঝা নামাইবার জন্য তিনিও বারাণসী "অন্বেষণ" করিয়াছিলেন।

শাহজাদা দারার সন্ন্যাসীগুরু কবীন্দ্রাচার্য্য সরস্বতী ভারতের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মুখপাত্র রূপে তীর্থকর রহিত করিবার আবেদন লইয়া সম্রাটের দরবারে গিয়াছিলেন। আকবরের পর দ্বিতীয় বার সম্রাটের কৃপায় তীর্থকর হইতে হিন্দুগণ রক্ষা পাইল। কবীন্দ্রাচার্য্য এই কৃতিত্বের জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের নিকট হইতেও অভিনন্দন লাভ করিয়াছিলেন। কবীন্দ্রাচার্য্য স্বরচিত "কবীন্দ্রকল্পলতা" নামক হিন্দী কবিতায় শাহজাহানের স্তুতিগান করিয়াছেন। লাহোরী লিখিয়াছেন—১০৬২ হিজরীর ২রা জিলকাদ তারিখে কবিন্দর সম্রাটের সহিত (লাহোরে) দেখা করিয়া ১৫০০ টাকা ইনাম পান। উজীর-আজম আসফ খাঁর প্রচ্ছন্ন হিন্দুবিদ্বেষ থাকিলেও উহা সাময়িক এবং রাজনীতির গণ্ডী ছাড়াইয়া যায় নাই। তিনি এক দিন (১৪ই সেপ্টেম্বর ১৬২৯) সম্রাটের দরবারে ত্রিহুতবাসী (দারবঙ্গ ও মুজাফর-পুর) দুই জন ব্রাহ্মণকে শ্রুতিধর এবং কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া নিবেদন করিলেন। সভাস্থ পণ্ডিত-গণ ইঁহাদের পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া দশ জন পণ্ডিত ক্রমানুসারে মুখে মুখে রচিত এক একটি শ্লোক একবার মাত্র আবৃত্তি করিয়া গেলেন। উক্ত ব্রাহ্মণ দুই জন ঠিক ঐ ক্রম অনুসারে প্রত্যেক শ্লোক পুনরাবৃত্তি করিলেন, অধিকন্তু উঁহারা প্রত্যেকেই পণ্ডিতগণের দশটি শ্লোকের বিষয়বস্তুর উপর ঠিক ঐ সমস্ত শ্লোকের ছন্দে আরও দশটি পাল্টা শ্লোক শুনাইয়া দেন। সম্রাট্ এই দুই জনকে খেলাত এবং নগদ এক হাজার টাকা করিয়া পুরস্কার দিলেন।*

সুলতান মামুদের মজলিশে নবাগত কবি ফিরদৌসীকে সভাকবিগণ ইহা অপেক্ষা অল্পেই বেহাই দিয়াছিলেন।

৬

সম্রাট্ শাহজাহানের ত্রিশ বর্ষব্যাপী রাজত্বকালে মধ্য-যুগের ইতিহাসে ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলা, হিন্দুর প্রতিপত্তি এবং হিন্দী সাহিত্যের জোয়ার কানায় কানায় ভরিয়াছে—ভাটার বিলম্ব নাই।

আকবর বাদশাহ মুখে মুখে হিন্দী দোহা রচনা করিয়াছেন; শাহজাহান হাতেকলমে আওরঙ্গজেবের অবোধ্য

* বাদশাহনামা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬৮-৬৯।

হিন্দী ভাষায় চিঠিপত্র লিখিতেন, কায়েতী হিসাব পরীক্ষা করিতেন। উদারচিত্ত শাহজাদা দারা আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন, হাতের আংটিতে পবিত্র আরবী হরফে "আল্লাহ্" খোদাই না করিয়া মোল্লাটা মুসলমানের চক্ষুঃশূল দেবনাগরী অক্ষরে "প্রভু" খোদাই করাইয়া ভাবী অমঙ্গল ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন আল্লা অক্ষরাতীত; হিব্রু, আরবী, দেবনাগরী প্রভৃতি মানুষের সৃষ্ট বর্ণমালা সবই তাঁহার অশরীরী দৃষ্টিতে এক সমান, ইতরবিশেষ নাই। একমাত্র আরবী খোদাতালার ভাষা, আদমসন্তানকে কোন ভাষা না শিখাইলে আল্লার প্রিয়তম জবান আরবী আপনা হইতেই তাহার নিষ্পাপ জিহ্বায় আসিয়া পড়িবে—মোল্লাদের এই দাবি তাঁহার প্রপিতামহ আকবর বুংগা-মহলের নৃশংস পরীক্ষার দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং আরবী অল-রৌব্ এবং হিন্দী প্রভুর মধ্যে ধার্ম্মিকের দৃষ্টিতে কোন প্রভেদ নাই; যিনি স্বয়ং নামরূপবর্জ্জিত তাঁহাকে যে-কোন নামে ডাকিলেই তিনি সাড়া দিয়া থাকেন। শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব ইসলামে সনাতনপন্থী, তাঁহারা আল্লা ব্যতীত God, প্রভু কিংবা পরব্রহ্মকে আমল দেওয়ার পাত্র নহেন। স্নেহের দৌর্ব্বল্যবশতঃ হাল ছাড়িয়া শাহজাহান পুত্র দারার শরিয়ৎ-বিরুদ্ধ ভাবের পাগলামি, শুজার শিয়া-প্রীতি, মোরাদের জাহেলী (ধর্ম্মবিমুখতা) সবই সহ্য করিতেন। আওরঙ্গজেব "আল্লা-অ'ল্লা" করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, পাইলেই খোদাতালার নামে প্রথমেই বেইমান দারার মাথা হাতে লইবেন।

সম্রাট শাহজাহানের দরবারে অনেক হিন্দী কবি রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তখন সুরদাস, তুলসীদাস ও কেশবদাসের যুগ অতীত হইয়াছে। বিহারীলালের প্রতিভা স্ফুটনোন্মুখ, হিন্দী সাহিত্যের অগ্রগতির স্রোতে ভাটা পড়ে নাই। সে যুগের হিন্দী সাহিত্যাচার্য্যগণ ঈর্ষা করিয়াই যেন দরবারী হিন্দী কবিদিগকে বিশেষ আমল দেন নাই; দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন:

> সুর সুর তুলসী সসী, উড়ুগণ কেশবদাস।
> অব্ কে কবি খদ্যোৎ সম, জঁহ তঁহ করে প্রকাশ।

অর্থাৎ, সুরদাস (কাব্যগগনের) সূর্য্য, তুলসীদাস চন্দ্রমা-তুল্য, এবং কেশবদাস (সপ্তর্ষিমণ্ডল); আজকালকার কবি জোনাকি পোকা, যেখানে-সেখানে ঝিকমিক করেন।

দরবারী ইতিহাসে দুই জন হিন্দী কবির নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে [illegible] রসাত্মক সুন্দর-শৃঙ্গার কাব্য-প্রণেতা কবি সুন্দর সম্রাটের নিকট হইতে প্রথমে "কবি-রায়" এবং পরে শ্রেষ্ঠ সম্মান "মহাকবি-রায়" উপাধি পাইয়াছিলেন। আকবরী দরবারের হিন্দীকবি নরহরি মহাপাত্রের বংশজগণ মোগল দরবারে বংশানুক্রমে রাজ-কবি ছিলেন। নরহরি-পুত্র* কিংবা পৌত্র হরিনাথ ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি সম্রাটের নিকট হইতে একটি ঘোড়া, একটা হাতী এবং নগদ এক লক্ষ দাম (২৫০০ টাকা) পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য কিংবা রাজা ভোজের দরবারেও হাতী-ঘোড়া ইনাম কোন কবি পাইয়াছিলেন কিনা জনশ্রুতিতেও জানা যায় না। সম্রাট শাহজাহান সুপাত্রেই দান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, হরিনাথ মহাপাত্র যখন ভারী ইনাম লইয়া দরবার হইতে ফিরিতেছিলেন, তখন এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভিক্ষাপ্রার্থনা করিয়া একটি দোহা মহাপাত্রকে শুনাইয়াছিল; তিনি এক লক্ষ দাম পথিমধ্যে দান করিয়া শূন্য হাতে ফিরিলেন, বাদশাহী হাতী ও ঘোড়ার কি গতি হইল জানা নাই।

শাহজাদা দারা হিন্দী ভাষার সমাদর করিতেন, স্বয়ং চর্চ্চাও করিতেন। তাঁহার লিখিত দুইখানি হিন্দী পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির নাম দোহান্তর সংগ্রহ এবং সারসংগ্রহ। দরবারের বাহিরে সামন্ত নৃপতি এবং মনসবদারগণ হিন্দী কবিগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, কয়েকজন মুসলমান হিন্দী কবিতা লিখিয়াছেন। মীর্জ্জা-রাজা জয়সিংহ, মহারাজা যশোবন্ত সিংহ রাঠোর, যশোবন্তের নির্ব্বাসিত জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভীমকর্ম্মা অমর্ষপরায়ণ রাও অমরসিংহ রাঠোর† কাব্যরসিক এবং হিন্দী কবি-গণের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ এবং চারণ ভাটের মুখে মুখে প্রচলিত পৃথীরাজ-রাসো মহাকাব্য সংগ্রহ এবং সঙ্কলিত করিয়াছিলেন (নাগরী প্রচারিণী সভা সংস্করণ)।

কবিতার গুণাগুণ অপেক্ষা কাব্যে স্তুতি প্রশংসা এবং

---

* হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণের সমসাময়িক ইতিহাসের সহিত পরিচয় আছে কিনা বলা যায় না। "মিশ্রবন্ধুবিনোদ" অনুসারে হরিনাথ নরহরির পুত্র; দুই পুরুষে প্রায় এক শত বৎসর পার হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। "কবিতা-কৌমুদী সঙ্কলয়িতা শ্রীরামনরেশ ত্রিপাঠী দোহা উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, লাখ টাকাটা কবি রাজা মান-সিংহের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর হিন্দীপ্রেমীগণের কাছে দোহা, কিংবদন্তী আবদুল হামিদ লাহোরী অপেক্ষা অধিক নির্ভর-যোগ্য।

† অমরসিংহ নাগোরের রাও এবং উচ্চ মনসবদার ছিলেন। আগ্রা শহরে দারার প্রাসাদে সম্রাটের সম্মুখে প্রকাশ্য দরবারে মীর বক্সী সলাবৎ খাঁকে একটি অর্দ্ধ উচ্চারিত শব্দের জন্য জমচাড়ের এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে এই রাঠোরশার্দ্দূল বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অমরসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রী এবং মীর্জ্জারাজা জয়সিংহের ভাগিনেয়ীর সহিত দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার সুলেমান শুকোর বিবাহ হইয়াছিল।

নামপ্রচারের আশা সম্রাটের বদান্যতার পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিত। ইহাই সেকালে এবং একালেও বড়লোকদের দানের রীতি, মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাও বটে। নিজের এবং পূর্ব্বপুরুষের সত্যমিথ্যা যশোগান নিত্য চারণের মুখে শুনিবার জন্যই রাজপুত আধপেটা খাইয়া চারণকে আধা রুটি দিত। ইউনানী ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ জুলকর্‌নাইন ফিরিঙ্গী (আর্ম্মানী খ্রীষ্টান) সম্রাটের নামে এমন কিছু লিখিয়াছিলেন যাহার জন্য তিনি পাঁচ শতী মনসব পাইয়াছিলেন (লাহোরী)।

এইরূপ দানে এবং গুণগ্রাহিতায় সম্রাট্ জাতি ধর্ম্ম কিংবা দেশ বিচার করিতেন না। ইহা আকবরশাহী আমলের ধারা।

৭

দুনিয়া যেমন আজকাল একটা পোশাকী pose বা ঢঙে আসলকে চাপা দিয়া সোয়াস্তি লাভ, মতলব হাসিল কিংবা মেজাক জাহির করিয়া চলিয়াছে পূর্ব্বে বিশেষতঃ মোগলাই আমলে খোদ বাদশাহ হইতে ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত কেহই লোক-চক্ষুর সম্মুখে একটা পোজ বা চেহারা না করিয়া চলিত না। দরবারী ইতিহাসে এইজন্যই সে যুগের সহজ মানুষ বিচক্ষণ ঐতিহাসিকের নজরেও সহজে ধরা পড়ে না। আত্মজীবনী (তুজুক) মধ্যে তবুও একটা পোজ; কিন্তু যে সমস্ত ইতিহাসের (যথা, আকবরনামা এবং বাদশাহনামা) প্রত্যেক পৃষ্ঠা আকবর কানে শুনিতেন কিংবা শাহজাহান নিজে পড়িয়া উহার উপর কলম চালাইতেন সেখানে আমরা উক্ত সম্রাটদ্বয়কে উভয় 'পোজে'ই দেখিতে পাই,—একটি ঐতিহাসিকের মনোবৃত্তির পোজ, অন্যটি মানব কিংবা মুসলমানসুলভ সম্রাটের অহমিকার পোজ। শাহ-জাহানের দরবারী পোজ আরও জটিল; ইহার মধ্যে "আসল" তিনি আছেন এবং তদুপরি একটা গতানু-গতিক ইমাম মেহদী বা 'কল্কি অবতারে'র পোজও রহি-য়াছে।

বাদশাহনামা পড়িয়া মনে হয়, সম্রাট শাহজাহান ছিলেন প্রতাপে সোলেমান বাদশা, বুদ্ধিতে বুর্জুর্গ মেহের, ন্যায় বিচার ও ইসলামের প্রতি অখণ্ড নিষ্ঠায় হজরত ওমর এবং কাফের নিধন ও মূর্ত্তি-ধ্বংসে মামুদ গজনভী। লাহোরী কেবল মন্দির ধূলিসাৎ ইত্যাদি হিন্দুধর্ম্ম-নির্যাতনের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুদের কাছে "পাথুরে প্রমাণ"* রহিয়াছে—পশ্চিম ভারতে জৈন সম্প্রদায় শাহজাহানের রাজত্বকালেই একাধিক মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গোকুলস্থ বল্লভাচার্য্য গোঁসাইগণ আকবরের সময় হইতে শাহজাহানের রাজত্বের অবসান পর্য্যন্ত গোকুলে গোবর্দ্ধন এবং সাহার পরগণায় বিশেষ অধিকার পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের কাছে যে সমস্ত বাদশাহী ফরমান্ ও নিশান্ (সরকারী চিঠি) আছে সেগুলি হইতে জানা যায় তাঁহাদের ভূমির উপর রাজস্ব ও অতিরিক্ত কর, মাশুল ইত্যাদি মাপ ছিল, গোকুল গোবর্দ্ধনে অবাধ গোচারণের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, ময়ূর ও অন্যান্য প্রাণী শিকার মঠসমূহের সম্পত্তির এলাকায় নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল।*

১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেই বাদশাহী শীলমোহর-যুক্ত এইরূপ দুইখানা ফরমান্ বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়কে দেওয়া হইয়াছিল; অথচ তিন বৎসর পরে মুর্শিদকুলী খাঁকে মথুরার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া শাহজাহান হুকুম দিলেন ঐ অঞ্চলে বিদ্রোহ এবং মূর্ত্তিপূজা যেন কঠোর হস্তে দমন করা হয়। মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পরে দেখা যায় গোঁসাই-গণের অধিকার স্বীকার করিয়া শাহজাদা দারা ৪ খানা ও অন্য দুই জন স্থানীয় ফৌজদার সম্রাটের অনুমোদিত ২ খানা নিশান্ জারি করিয়াছিলেন।

এই পরস্পরবিরোধী অস্থির নীতির মূলসূত্র কোথায়? অজ্ঞাতসারে কোন দোটানা-স্রোতে না পড়িলে শাহ-জাহানের রাষ্ট্র ও ধর্ম্মনীতি পালন ও দমন, মত-সহিষ্ণুতা ও নির্যাতন-স্পৃহার মধ্যে ঘুরপাক খাইত না। মোগল সাম্রাজ্যে সম্রাটকে মধ্যবিন্দু করিয়া দারা এবং আওরঙ্গ-জেবের মধ্যে প্রথম হইতেই যেন একটা দড়িটানাটানি চলিয়াছিল; দারা মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ব্বস্মৃতি এবং আওরঙ্গজেব উহার ভাবী নিয়তির অঙ্গুলি-সঙ্কেত।

* Jaina Inscriptions, শ্রীপূরণচাঁদ নাহার কৃত।

* দাতার নাম	সংখ্যা
সম্রাট আকবর	৪
হামিদা বানু (আকবরের মাতা)	১
খান-খানান আবদুর রহিম (আকবরের সেনাপতি)	১
জাহাঙ্গীর	০
শাহজাহান (সম্রাট)	২
দারাশুকো	৪
মোয়াজ্জম খাঁ (শাহজাহানের কর্ম্মচারী)	১
ইস্‌হাক খাঁ ঐ	১
আওরঙ্গজেব	০
প্রথম শাহ আলম	১
মীর্জ্জা নজফ খাঁ (দ্বিতীয় শাহ আলমের সেনাপতি)	১

দ্রষ্টব্য—*Imperial Farmans* by K. M. Jhaveri Bombay.

ভূরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

হাওড়া ও হুগলী জেলার ঐতিহাসিক উপকরণ যাঁহারা সংগ্রহ করিতে সামান্য চেষ্টাও করিয়াছেন তাঁহারাই বিলুপ্ত ভূরশুট রাজ্যের "বামন রাজা"র দেওয়া দানপত্রাদির কথা জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত এই রাজবংশের নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। কেবল কতকগুলি প্রবাদমাত্র কল্পনার আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে (৺বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্যকৃত "রায়-বাঘিনী" দ্রষ্টব্য) এবং তাহাই জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। মুসলমান আমলের পূর্ব্বে "ভূরিসৃষ্টি" দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত একটি গ্রামমাত্র ছিল—এই গ্রামনিবাসী ভারতবিশ্রুত দার্শনিক কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য্যের প্রামাণিক বিবরণ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছি (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ. ১১৪-১৬: বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা, পৃ. ৬-৮)। শ্রীধরাচার্য্যের পৃষ্ঠপোষক কায়স্থ-রাজা পাণ্ডুদাস সমগ্র দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, তদন্তর্গত কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বরই ছিলেন। সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম কি ছিল জানিবার উপায় নাই—সম্ভবতঃ তাহার ভূরশুট নাম ছিল না। মুসলমান আমলে রাঢ় অঞ্চলে ভূরশুট একটি প্রসিদ্ধ এবং বৃহৎ "পরগণা" বা রাজ্যের নাম ছিল। আইন্-ই-আকবরীতে পাওয়া যায়, সরকার সোলেমানাবাদের অন্তর্গত ৩১টি মহালের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাজস্ব ছিল "বসন্ধরী" পরগণার। তৎপরই ভূরশুট—রাজস্ব ১৯৬৮৯৯০ (প্রায় বিশ লক্ষ) "দাম" (Ain-I-Akbari : II. p. 140—ব্লকম্যান সাহেব মহালের নাম লিখিয়াছেন Bhosat। পাদটীকায় উদ্ধৃত পাঠান্তর Bhorsat যে বিশুদ্ধ, স্থানীয় অনুসন্ধানের অভাবে সাহেব তাহা ধরিতে পারেন নাই)। লক্ষ্য করা আবশ্যক সরকার সাতগাঁও ও সরকার মাদারনে কোন পরগণার রাজস্ব এতদধিক ছিল না। প্রবাদ অনুসারে এই বৃহৎ পরগণার আদি জমিদার বাগ্‌দীরাজাকে পরাজিত করিয়া "চতুরানন মহানেউকী" (অর্থাৎ মহানিউগী) নামক একজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পরগণা দখল করিয়াছিলেন। এই নাম একটি কুলপঞ্জীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, বসন্তপুরের রাম চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে রক্ষিত কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়:—"শতানন্দ চতুরানন মহানেউকীর কন্যাগ্রহণে ভঙ্গ" (২৬২ পত্র)।[১] মহানিউগী উপাধি পাঠান আমলে রাষ্ট্রীয় উচ্চপদের জ্ঞাপক—চতুরানন সম্ভবতঃ হুসেন শাহের রাজত্বে ঐ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাষ্ট্রাধিপতির আনুকূল্যে বৃহৎ ভূ-ভাগ দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভূরশুটে এই ব্রাহ্মণ-রাজবংশের অধিকারকাল প্রায় ২০০ বৎসর। ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তির ফলে রাষ্ট্রাধিপতির আনুকূল্যে বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র বলপূর্ব্বক ভূরশুট রাজ্য দখল করিয়া ব্রাহ্মণ-রাজবংশের আধিপত্য ধ্বংস করেন। প্রামাণিক উপকরণ হইতে ইহার বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

বর্দ্ধমানাধিপতির হস্তে ভূরশুটরাজ্য ধ্বংসের একটি আনুষঙ্গিক ফল বঙ্গদেশের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছিল। অন্যথা মহাকবি ভারতচন্দ্রকে আমরা পাইতাম না—রাজ্যভ্রষ্ট বালকের প্রতিভা-স্ফূর্তি এই পারিবারিক বিপর্য্যয় দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। নতুবা হয়ত ক্ষুদ্র রাজত্ব ভোগ করিয়াই তিনি পিতৃ-পিতামহের মত প্রায় বিস্মৃত হইয়াই থাকিতেন।

রাজা কৃষ্ণ রায়

ভারতচন্দ্র তাঁহার কুলপরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন:

কুলের মুখটি নৃসিংহের অংশ তায় (পরিষৎ সং, পৃ. ৩১৬)।

নৃসিংহ প্রথম কুলীন উৎসাহ-পুত্র আহিতের প্রপৌত্র এবং চতুর্দ্দশ সমীকরণের বিখ্যাত কুলীন (মহাবংশ, পৃ. ১৩)। নৃসিংহ হইতে ভূরশুট রাজবংশের আদি রাজা পূর্ব্বোক্ত 'চতুরানন মহানিউগীর দৌহিত্র "কৃষ্ণ রায়" কয় পুরুষ অধস্তন তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ নানা মতের দ্বারা এতকাল সংশয়াকুল ছিল। সম্প্রতি কৃষ্ণ রায়ের কাল-নির্ণায়ক নবাবিষ্কৃত প্রমাণ ও কুলগ্রন্থের সাহায্যে তাহার নির্ণয় সম্ভব হইয়াছে। যে কয়টি কুলপঞ্জীতে ভূরশুট রাজবংশের নামমালা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের সর্ব্বত্র আদি-পুরুষের নাম লিখিত হইয়াছে "মদন ভট্টাচার্য্য"। ঢাকার একটি পুথিতে তাঁহাকে নৃসিংহের পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ মুরারি ওঝার অন্যতম পুত্র বলিয়া ধরা হইয়াছে (মহাবংশ, পৃ. ৩৭) এবং পূর্ব্বে আমরা এই মতটিকে প্রামাণিক মনে করিয়াছিলাম (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ১৯৩)। কিন্তু এই মদনের উপাধি ছিল ওঝা, ভট্টাচার্য্য নহে (কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণী দ্রষ্টব্য) এবং তদনুসারে কৃষ্ণ রায়ের জন্ম-তারিখ

১। সম্বন্ধনির্ণয়, ৪র্থ সং, ষষ্ঠ পরিশিষ্ট, পৃ. ২৩। শ্রীপঞ্চানন রায় মহাশয় বহু কষ্টে এই কুলগ্রন্থ হইতে তথ্য সঙ্কলন করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যক্ষের ধনের মত গ্রন্থটি রক্ষা করিতেন এবং কাহাকেও দেখিতে দিতেন না।

হয় প্রায় ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দ—তাহা এখন প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইতেছে। প্রমাণটি বিবৃত হইল। ভূরশুট পরগণার বহুতর তায়দাদ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি—রাজা প্রতাপ-নারায়ণের পূর্ব্বকালীন একটি মাত্র ভূমিদানের বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১২০৯ সনের ২০ ফাল্গুন (=১৮০৩ খ্রী.) সাদক মহামুদ দীগর "সাং বোড়হন" তাঁহাদের নিষ্কর সম্পত্তির বিবরণ দাখিল করেন (হুগলী কালেক্টরীর ৮৩৫৪ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে "খএরাত ভাঙ্গা বাস্তবাটী" মৌজে বোড়হন ৬৵০ বিঘা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ সেখ দৌলতকে দান করিয়াছিলেন "রাজা রায় কৃষ্ট"—দান-পত্রের তারিখ পরিষ্কার লিখিত আছে "৯৯০ সাল" (অর্থাৎ ১৫৮৩-৪ খ্রী.)। সুতরাং রাজা কৃষ্ণ রায়ই সম্রাট্ আকবরের সময়ে ভূরশুট রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। এই প্রমাণপত্রের আবিষ্কার-ফলে রায় বাঘিনী প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত চিরপ্রচলিত নানাবিধ মনোহর প্রবাদ-কাহিনী সমস্তই আকাশকুসুমে পরিণত হইয়া গেল। কৃষ্ণ রায়ের ভ্রাতার পৌত্র রাজীবই ছিলেন কালাপাহাড়। কৃষ্ণ রায়ের পুত্র দেবনারায়ণ ১৩০৬ শকাব্দে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, প্রতাপ-নারায়ণের মাতা রায় বাঘিনী পাঠান আমলে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি করিয়াছিলেন ইত্যাদি সমস্তই কবি-কল্পনা, বাস্তব ঘটনা নহে। আমরা একাধিকবার লিখিয়াছি পারিবারিক ইতি-হাসের উপকরণ কুলগ্রন্থ ও তায়দাদ প্রভৃতি প্রমাণপত্র ব্যতীত কেবল মৌখিক প্রবাদ এবং কল্পিত বস্তু হইতে উদ্ধার করা সম্ভব নহে।

কৃষ্ণ রায়ের ঊর্দ্ধতন পুরুষের নামমালা ভূরশুটের অন্তর্গত বসন্তপুরের পুথিতে স্থানে স্থানে ত্রুটিত। যথা, "গোপালের পুত্র—তৎপুত্র মদন ভট্টাচার্য্য তাঁহার পুত্র—তাঁহার পুত্রদ্বয় শতানন্দ বৈদ্যনাথ" ইত্যাদি।[২] ঢাকার পুথি অনুসারে, মদন—কাকুস্থ—শ্রীহরি রায়—সদানন্দ—কৃষ্ণ রায় রাজাখ্যাতি (৩১৫।২ পত্র, সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ১৯৩)। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথিতে দুই রকম লেখা আছে। মুরারি ওঝার পুত্র সৌরির এক বৃদ্ধপ্রপৌত্র চক্রপাণি—তৎপুত্র গোপাল তৎসুত মদন ভট্টাচার্য্য "ভূরশুট নিবাশিনঃ" (৪২৪।২ পত্র)। অন্যত্র আছে, সৌরি—গোপাল—যদুনন্দন ভট্টাচার্য্য (মদন নহে)—শ্রীধর—সদানন্দ—শ্রীমন্তশ্রীকৃষ্ণৌ ইত্যাদি (৪২৬।২ পত্র)। আমাদের নিকট রক্ষিত যশোহর জয়ন্তীপুরের পুথি অনুসারে, সৌরি—গোপাল (কিংবা গোপী) "ধর্ম্মাধিকারী" —মদন ভট্টাচার্য্য—শ্রীবরাচার্য্য—সতানন্দাচার্য্য—রাঘব (কেশবকৌ)—শ্রীমন্ত-জয়কৃষ্ণ-রায়কৌ (৮৩.২, পত্র)। রাজসাহীর একটি পুথিতেও সৌরিপ্রকরণে "গোপাল সুত মদন ভট্টাচার্য্য ভূরশুট নিবাসী" লিখিত আছে (৩১৪।২ পত্র)। সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক, এক ঢাকার পুথি ভিন্ন সর্ব্বত্র এই রাজবংশ ফুলিয়ার মুখবংশীয় সৌরিপ্রকরণের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং ধ্রুবানন্দের মতবিরুদ্ধ হইলেও তাহাই প্রামাণিক বলিয়া ধরিতে হইবে। মদনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাজা কৃষ্ণ রায় (এই অংশে ঢাকার পুথির নামমালা সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক) মহাকবি কৃত্তিবাসের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ হইতেছেন—কারণ সৌরি ছিলেন কৃত্তি-বাসের জ্যেষ্ঠতাত। কৃত্তিবাসের জন্ম আমাদের মতে ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে (প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৬ পৃ. ৩০৯) এবং সৌরির পুত্র গোপাল ধর্ম্মাধিকারীর জন্ম অনুমান ১৩৫০ খ্রী. ধরা যায়। তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া কৃষ্ণ রায়ের জন্ম হয় ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ গৌড়াধিপতি হুসেন শাহের রাজত্বকালে এবং তৎকালে কৃষ্ণ রায়ের মাতামহ চতুরানন ভূরশুট রাজ্যের নূতন অধিপতি। জয়ন্তীপুরের পুথি অনুসারে গোপাল হইতে শতানন্দ পর্য্যন্ত সকলেই শাস্ত্র-ব্যবসায়ী উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন এবং এরূপ স্থলে এক পুরুষের গড়পড়তা ৩৫-৪০ বৎসর ধরা উচিত। তাহা হইলে কৃষ্ণ রায়ের জন্ম হয় শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এবং চতুরাননের অভ্যুদয়কাল শের সাহের রাজত্বকালে পড়ে।

রাজা প্রতাপনারায়ণ

এই রাজবংশের সর্ব্বাপেক্ষা কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন "প্রতাপনারায়ণ"। ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীর আরম্ভে লিখিয়া-ছেন: ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যবাসী, নানাকাব্য অভিলাষী, যে বংশে প্রতাপনারায়ণ। (পরিষৎ সং, পৃ. ৩৯৯)। অথচ এই প্রতাপনারায়ণ ভারতচন্দ্রের সাক্ষাৎ পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন না। প্রতাপনারায়ণের বহু পারিবারিক বিবরণাদি আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ১৯৪-৯৮) এবং বহুতর নূতন তথ্য সম্প্রতিও আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। এই সকল সমৃদ্ধ উপকরণ বিশ্লেষণ করিয়া আমরা সারসিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লিখিতেছি। (১) অধুনা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় প্রতাপনারায়ণ রাজা কৃষ্ণ রায়ের প্রপৌত্র ছিলেন। কিন্তু নামমালা দ্বিবিধ পাওয়া যাইতেছে—কৃষ্ণ-রায়ের পুত্র দর্পনারায়ণ, তৎপুত্র উদয়নারায়ণ, তৎপুত্র প্রতাপ (বসন্তপুরের পুথি)। অন্য মতে কৃষ্ণ রায়ের পুত্র রাজা দক্ষিণ রায়, তৎপুত্র উদয়নারায়ণ (জয়ন্তীপুরের পুথি,

২। এই পুথি আমরা স্বয়ং পরীক্ষা করিতে পারি নাই। সুহৃদ্বর শ্রীপঞ্চানন রায়ের গবেষণালব্ধ বস্তু তাঁহার সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিলাম।

৮৩-৪ পত্র)। শেষোক্ত মতের সমর্থন একটি পারিবারিক ঘটনায় পাওয়া যায়—সাগরদিয়া বন্দ্যবংশীয় দামোদরের এক বৃদ্ধ-প্রপৌত্র (কাশীনাথ ন্যায়বল্লভের পুত্র) বিমলানাথ 'রাজা দক্ষিণ রায়ে'র পৌত্রের নিকট কন্যা বিবাহ দিয়াছিলেন (পরিষদের উক্ত পুথি ৭৭।২ পত্র)। বিক্রমপুর সিংপাড়ার একটি ঘটক-গ্রন্থে এই সম্বন্ধের স্পষ্ট বিবৃতি আছে "ভূরশুট দক্ষিণ রায় রাজার পৌত্রে উদয়নারায়ণসুত" (১৩৮।১ পত্র)। সম্ভবতঃ স্বয়ং প্রতাপনারায়ণই এই গৌরবজনক বিবাহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ রায় ও প্রতাপনারায়ণের মধ্যে কালব্যবধান ৭০ বৎসর হইতেও কম। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে ৮ পুরুষ কিংবা ৬ পুরুষ ব্যবধান হইতেই পারে না—রায় বাঘিনী ও ঢাকার পুথির লেখা ভ্রমাত্মক। (২) প্রতাপনারায়ণ বহু ভূমিদান করিয়াছিলেন—কয়েকটি দানপত্রের তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, ১০৫৯ সাল ৩ জ্যৈষ্ঠ (=১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ) রাজা প্রতাপনারায়ণ বুড়ননিবাসী সাহা জাহের আলীর পূর্ব্বপুরুষকে "লাখেরাজ নজর" দান করিয়াছিলেন (হুগলীর ৩৭২৪ নং তায়দাদ)। আর একটি লাখেরাজ ১০৭৫ সনে প্রদত্ত হয় (ঐ, ১৩২২৪ নং)। "শ্রীযুত মহারাজা প্রতাপনারায়ণ ১০৭৭ সালে ৺রেজা সখড্যাকে খয়রাত খানাবাটী দিয়াছিলেন (ঐ, ১৩৮৮৭ নং)। ১০৯১ সনে মোবা সৈদ মহিবুল্যাকে তিনি খএরাত দিয়াছিলেন (ঐ, ২৬৭৭৬ নং)।" সুতরাং রাজা প্রতাপনারায়ণের রাজত্বকাল ন্যূনপক্ষে ৩৩ বৎসর (১৬৫২-৮৪ খ্রীঃ) ছিল। তিনি সম্রাট সাজাহান ও আওরঙ্গজেবের অধীন জমীদার ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার অধিকার মধ্যে ভূরশুট পরগণায় নবাব আমিরল উমরা (অর্থাৎ শায়েস্তা খাঁ) ১০৯৪ হিজরী সনে (১৬৮৩ খ্রীঃ) মদদমাষ দান করিয়াছিলেন (ঐ, ২৯২৩ নং)।

(৩) প্রতাপনারায়ণ সে যুগের একজন বিখ্যাত বিদ্বৎসেবী ছিলেন। তাঁহার অন্যতম সভাসদ্ সুবিখ্যাত বৈদ্যগ্রন্থকার ভরত মল্লিক তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। "চন্দ্রপ্রভা" (১৫৯৭ শক) ও "রত্নপ্রভা" (প্রায় ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) গ্রন্থে ভরত মল্লিক আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

> "ভূরিশ্রেষ্ঠমহীপালসভাপণ্ডিতবিক্রতঃ"
> (চন্দ্রপ্রভা পৃঃ ৩২, রত্নপ্রভা পৃঃ ১৪)।

অন্যত্রও লিখিয়াছেন,

> ইতি প্রজাধীশ্বর-বীরবীর "প্রতাপনারায়ণ"সংসদন্তঃ।
> শ্রীকৃষ্ণকান্ত জগৎপ্রসিদ্ধাং বংশাবলীং শ্রীভরতো জগাদ।
> (ঐ, পৃঃ ২৭ ও ১১)

ভরত মল্লিকের গ্রন্থ রচনাকাল ঠিক প্রতাপনারায়ণের রাজত্বকালেই পড়িতেছে। (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃঃ ১৯৬: *I. H. Q.* XVIII pp 168-75)।

(৪) প্রতাপনারায়ণের একমাত্র পুত্রের নাম "শিবনারায়ণ" (বসন্তপুর ও ঢাকার পুথি)। তিনি বোধ হয় পিতার জীবদ্দশায় পরলোকগমন করেন। সাগরদিয়াবংশীয় বাণী শিকদারের এক প্রপৌত্র বিষ্ণুদেবের সম্বন্ধে লিখিত আছে, "ভূরস্থট নিবাসিনঃ রাজা শিবনারায়ণস্ত কংবিংভঙ্গঃ" (কুলকল্পদ্রুম, বন্দ্যবংশ পৃঃ ৯২)। "৺সিবনারায়ণ রায় মহাশয়ের দত্ত" একটি মাত্র দানপত্রের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি—শিবঠাকুর, ৺সিংহবাহিনী ও বিশালাক্ষীর দেবোত্তর (৩১৯৫ নং তায়দাদ)। গড়-ভবানীপুরের মণিনাথজীর সেবায়েৎ মণিরায় গিরি গোস্বামী ১০১।০ দেবোত্তর পাইয়াছিলেন। আমাদের পরীক্ষিত মূল সনদের তারিখ ৫ বৈশাখ ১০৯২ সন—কিন্তু দাতার নাম নাই। শিবনারায়ণ হইলেও হইতে পারে। শিবনারায়ণের একমাত্র পুত্র রাজা নরনারায়ণের প্রদত্ত শতাধিক দানপত্র এবং পারিবারিক নানা সম্বন্ধের কথা অবগত হওয়া গিয়াছে—তাঁহার রাজত্বকাল ঠিক ১০৯২-১১১৮ সন মধ্যে। তাঁহার জীবদ্দশায় কিংবা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ঠিক ১১১৯ সনে বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র বলপূর্ব্বক ভূরশুট পরগণা দখল করেন। তারিখটি আমরা গড়-ভবানীপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণমধ্যে আবিষ্কার করিয়াছি। ৪৮০৭৫ নং তায়দাদের "সনন্দর হকীকত" হইতে একটি পঙ্‌ক্তি অবিকল উদ্ধৃত হইল:

> "বর্দ্ধমানের জমিদারের সহিত সাবেক ব্রাহ্মণ জমিদারের সহিত লড়াই হয় ইহাতে গড়বাটি লুট হয় সনন্দ পত্র খোয়া গেছে সন ১১১৯ সাল।"

অন্যত্র লিখিত আছে,

> "...লড়াই হইয়া সাবেক জমিদারের জমিদারি বর্দ্ধমান চাকলা সামীল হয় তাহাতে শ্রীশ্রী৺দেগে বর্দ্ধমান লইয়া জাইয়া কথক দীন লেইখানে ৺সেবা করিয়া পুনরায় সন (১১২৫) পচিষ সালে ঐ জমি এবং গড় বাড়ি শ্রীশ্রীজিউদীগে দীয়া স্থাপিত করিলেন।"

গড়-ভবানীপুরে অদ্যাপি গোপীনাথজীর দ্বিতল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে এবং উক্ত তায়দাদের একটি ফর্দ্দে দেবালয়ের কৌতুকজনক একটি নক্‌সা অঙ্কিত আছে—তন্মধ্যে কোন দেবতা কোন্ কোঠায় প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা যথাযথ চিত্রাকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। দেবতাদের তালিকা এই—চতুর্ভুজ গণেশ, দ্বিভুজা ইন্দ্রাণী, দ্বিভুজা অভয়া, চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী, দশভুজা, দ্বিভুজ ভৈরবী, চতুর্ভুজা ভুবনেশ্বরী, চতুর্ভুজা গজলক্ষ্মী। দ্বিতলে—গদাধর শিব, গোপাল, গোপীনাথ, দামোদর (চক্র), রাধিকা ও কাশীনাথ শিব। সমস্তই "৺মহারাজা

প্রতাপনারায়ণ ও ৺মহারাজা (নর) নারায়ণ রায় প্রকাশ করিয়া দেন।" এই সকল বিগ্রহ এখন কোথায় আছে অনুসন্ধানযোগ্য।

রাজ্যহীন রাজবংশের পরবর্ত্তী বিবরণ শোচনীয়। নরনারায়ণের দুই পুত্র ছিল—"রাজা" লছমীনারায়ণ ও হীরারাম রায়। কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র রাজা চিত্রসেন বহু দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর লছমীনারায়ণকে দান করেন এবং বাঁশবাড়িয়ার রাজারা (গোবিন্দদেব, মনোহর ও মুকুন্দ) হীরারাম রায়কে বোরো পরগণায় মোট ৬১/০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর করিয়া দেন। হীরারাম সম্ভবতঃ ভূরশুট ত্যাগ করিয়া বাঁশবাড়িয়া রাজাদের আশ্রয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে লছমীনারায়ণের পুত্রেরা তাহা ভোগ করেন। লছমীনারায়ণের তিন পুত্র রামনারায়ণ, রূপনারায়ণ ও হরনারায়ণ গড় ভবানীপুর পরিত্যাগ করিয়া ভূরশুটের অন্তর্গত বসন্তপুর গ্রামে বাস স্থাপন করেন এবং ১২০৯ সনে জীবিত থাকিয়া পরস্পর 'কাজিয়াতে' কাল ক্ষেপণ করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ কেহ কেহ অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান আছেন। তাঁহাদের প্রদত্ত সম্পত্তির বিবরণে (৩৬৬১৩ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য) ভূরশুট রাজবংশের কীর্ত্তিকলাপের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর মোট ভূমির পরিমাণ ১১৪৬৷৪ কাঠা—তন্মধ্যে "ভবানীপুর ভদ্রাসন গড়বাটি আন্দাজী ২৫ তোষাখানার বাটি ৫ ছাওনাপুর আন্দাজী ৫১ রানিবাজার ভদ্রাসন বাটি আন্দাজী ১২···রাজবলহাট গড়বাটি ৭।" নানাস্থানে দীঘি পুষ্করিণীর মোট সংখ্যা ২৬। "দেবত্তর—শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী, মৌজে রানিবাজার আন্দাজি জমি ২০০ ৺রাজবল্লবী ঠাকুরাণী মৌজাহায়ে রাজবলহাট···৫০০ ৺গোপীনাথ জীউ ভবানীপুর দী, গর আন্দাজী ১০০"—৮০০।

সুপ্রাচীন রাঢ়দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিণতি সমগ্র বঙ্গদেশে আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং পাঠান মোগল আমলে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ পরগণা বা রাজ্যের অধিপতিগণই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া এই সামাজিক আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। মোগলরাষ্ট্রের পক্ষপুটে উপচিত বর্দ্ধমানরাজ একে একে এই সকল রাজ্য গ্রাস করিয়া হয়ত রাষ্ট্রীয়ভাবে রাঢ়দেশের সংহতি বিধান করিয়াছিল। কিন্তু রাঢ়দেশের ঐতিহাসিক উপকরণরাজি রাজবংশগুলির সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়াছে "রায়-বাঘিনী" জাতীয় উপন্যাস—নামটিও রাজপরিবারের সম্পর্কিত কি না সন্দেহ। বরদা পরগণার শ্যামসুন্দরপুর গ্রামে "শ্রীশ্রী৺রায়-বাগিনী" ধর্ম্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিল (৬১৪০৭ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)।

রাজবংশের অন্য শাখা

প্রতাপনারায়ণের সময়ে সমগ্র ভূরশুট রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ভবানীপুর শাখার দখলে ছিল, ।৵০ আনা অংশ পেঁড়ো-শাখার এবং ৵০ আনা অংশ দোগাছীয়া শাখার। শেষোক্ত শাখা রাজা কৃষ্ণ রায়ের এক পুত্র মুকুট রায় হইতে উৎপন্ন (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃঃ ২০০)। মুকুট রায়ের পৌত্র "পরগণা ভুরশট্ট কি দুই আনার সাবেক জমিদার ৺জগত বল্লভ রায়" ৭ কার্ত্তিক ১০৮৫ সনে (=১৬৭৮ খ্রীঃ) ভূমিদান করিয়াছিলেন (৬৭৯০ নং তায়দাদ)। অর্থাৎ তিনি প্রতাপনারায়ণের ভ্রাতৃসম্পর্কিত এবং সমকালীন ছিলেন। এই শাখার বহু বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। জগদ্বল্লভের পুত্র শিবচরণ রায়ের সময় রাজ্যের এই অংশও কীর্ত্তি-চন্দ্র গ্রাস করিয়াছিলেন—পরে কীর্ত্তিচন্দ্র স্বয়ংই শিবচরণের পুত্র ঘনশ্যাম ও বীরেশ্বর রায়কে ২৫৪/০ ভূমি দান করিয়াছিলেন (৪১৩৫০ নং তায়দাদ)।

"প' ভুরসীট্ট ।৵০ ছয় আনির সাবেক জমীদার ভগীরথ রায় চৌধুরী ব্রাহ্মণ জমীদার" ২০ কার্ত্তিক ১০৬০ সনে (১৬৫৩ খ্রীঃ) রহমত খাঁকে লাখেরাজ দিয়াছিলেন (৩৯৬৭ নং তায়দাদ) তাহার আংশিক অবস্থানস্থল "পার রাধানগর"ই পাণ্ডুয়া (বা পাঁড়ুয়ার) নামান্তর বটে। প্রতাপনারায়ণের সমকালীন এই চৌধুরীর নাম বংশাবলীতে নাই। সম্ভবতঃ রাজা কৃষ্ণ রায়ের ভ্রাতা শ্রীমন্ত রায়ের প্রপৌত্র "ভূপতি রায়ে"র নামই মুসলমান প্রজা ভুল করিয়া লিখিয়াছে। ভারতচন্দ্র ভূপতি রায়ের নাম সগৌরবে উল্লেখ করিয়াছেন:

> ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ,
> সদাভাবে হতকাংস ভুরস্থটে বসতি। (সত্যনারায়ণের ব্রতকথা)।

অনুমান হয় চতুরাননের দৌহিত্রদ্বয় শ্রীমন্ত রায় ও রাজা কৃষ্ণ রায়ের সময় হইতেই ভূরশুট রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত হইয়া শ্রীমন্ত ।৵০ ও কৃষ্ণ রায় ॥৵০ পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপনারায়ণ বোধ হয় এই ।৵০ আনা গ্রাস করিয়াছিলেন। কারণ ভূপতি রায়ের পুত্র সদাশিব প্রভৃতি কেহই ভূমি দান করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে তাঁহারা অনেকেই রাজা নরনারায়ণের নিকট ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়াছেন। যথা নরনারায়ণ পাড়ুয়ার সদাশীব, নরেন্দ্র, চতুর্ভুজ ও দয়ারাম রায়কে ১৪৮৬৩ দান করেন (৩৩৪৩ নং তায়দাদ)—১২০৯ সনে দখলকারদের মধ্যে (ভারতচন্দ্রের পুত্র) পরীক্ষিতের নাম আছে। পরীক্ষিত বোধ হয় মুলাযোড় ছাড়িয়া

পৈতৃক ভিটিতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সদাশিব-নরেন্দ্র-চতুর্ভুজ তিন পুরুষের একসঙ্গে উল্লেখ লক্ষণীয়। নর-নরনারায়ণ ভারতচন্দ্রের অপর ভ্রাতা অর্জুন রায়কেও ১১১৮ সালে ভূমি দান করেন (৩৩৪৪ নং তায়দাদ)। উক্ত রাজা নরেন্দ্র রায় ও চতুর্ভুজ রায়কে ১১০৯ ও ১১১২ সনে মোট ২৭৬।৹ দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন (৫১২৩৩ নং তায়দাদ)। তদ্ভিন্ন চিত্রসেন প্রদত্ত ২৫ অগ্রহায়ণ ১১৫১ সনের সনন্দে ইঁহাদের সম্পত্তির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়—মূল সনন্দ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। ইহাতেও সদাশীব রায়, নরেন্দ্র রায়, চতুর্ভুজ রায় প্রভৃতির নাম আছে—বুঝা যায় প্রায় শত বৎসর বয়সে সদাশিব তখনও জীবিত ছিলেন। এই সকল প্রমাণপত্র হইতে ভারতচন্দ্রের পিতৃবিবরণে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে।

জন্মান্তর সঙ্গতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পরিচয় পাই তার,
এই পৃথিবীতে এসেছি গিয়েছি,
আমি যে অনেকবার।
সে তারার আলো এখনো রয়েছে,
যে তারকা গেছে ডুবে,
মৃগ নাই, মৃগনাভির গন্ধ—
এখনো যায় নি উবে।
কত জনমের আঁখির পরশ,
রয়েছে রূপের গায়,
প্রণয়ের গাঢ় আলিঙ্গন যে
দাগ রাখিয়াছে তায়।
চেনা চেনা লাগে দেখে—
মাণিক্য-হারে রয়েছে আমার
বুকের কস্ যে লেগে।

সকল শব্দ ভাষা ও কাকলী
সব সুর, সব গীতি,
আমার জিহ্বা কণ্ঠ, তালুর
বহিতেছে পরিচিতি।
সুরের মীড় যে কোন্ নীড়ে ডাকে
ভাবিয়া পাই না সীমা,
বিস্মৃত প্রিয় কতই কণ্ঠ
দিল ওতে মধুরিমা।
ভাল-লাগা সব বর্ণে গন্ধে
ভাল-লাগা সব গানে,
জন্মান্তর সৌহৃদ্যের
অভিজ্ঞান যে আনে।
পাইনি অমর বর,
যুগের যুগের প্রেম শুধু মোরে,
করেছে জাতিস্মর।

স্পর্শে গন্ধে রসে কি আভাস,
কি যে ইঙ্গিত বয়,
প্রতি শৈলেতে রয়েছে আমার
শিলালিপি মনে হয়।
হেথাকার প্রেম-স্নেহ মমতায়
অক্রুরন্তের চিনে,
আগন্তুকেরা ধরাকে বেঁধেছে
অপরিশোধ্য ঋণে।
লয়ে যে বিপুল পণ্য এ মন
করে হেথা কারবার,
একটা জন্মে হিসাব-নিকাশ
চুকিতে পারে না তার।
তাই এই শতায়তি—
অপার্থিবের পরিবেশে করে
ধরাকে কান্তিমতী।

এসেছি গিয়েছি এটা ঠিক জানি
দিয়ে নিয়ে গেছি কি ?
নিয়ে গেছি এর বেদনা—দিয়েছি
বুকের সামগ্রী।
রূপে অপরূপ ওই লাবণ্য,
ওই যে আকর্ষণ—
ফিরিয়া আসিতে বার বার মোরে
করেছে নিমন্ত্রণ।
বিদায়ী নয়নে যেই রূপ ভাসে
যা ত্যজিতে ব্যথা বাজে,
ধরার কঠিন বন্ধন তাই
পুনরাগমন যাচে।
অমৃতের কণা বহি—
এসেছি গিয়েছি ধরার প্রেমকে
করিবারে কালজয়ী।

চিত্রচোর

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

৫

পরদিন প্রভাতে প্রাতরাশের সময় লক্ষ্য করিলাম দাম্পত্য কলহ কেবল বাড়ীর উপরতলায় আবদ্ধ নাই, নীচের তলায় নামিয়া আসিয়াছে। সত্যবতীর মুখ ভারী, ব্যোমকেশের অধরে বঙ্কিম কঠিনতা। দাম্পত্য কলহ বোধ করি সর্দ্দিকাশির মতই ছোঁয়াচে রোগ।

কি করিয়া দাম্পত্য কলহের উৎপত্তি হয়, কেমন করিয়া তাহার নিবৃত্তি হয়, এসব গূঢ় রহস্য কিছুই জানি না। কিন্তু জিনিষটা নূতন নয়, ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। ঋষি-শ্রাদ্ধের তার মহা ধুমধামের সহিত আরম্ভ হইয়া ইহা অচিরাৎ প্রভাতের মেঘডম্বরবৎ শূন্যে মিলাইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আহার শেষ হইলে ব্যোমকেশ বলিল, অজিত, চল আজ সকালবেলা একটু বেরুনো যাক।

বলিলাম, বেশ চল। সত্যবতী তৈরি হয়ে নিক।

সত্যবতী বিরসমুখে বলিল, আমার বাড়ীতে কাজ আছে। সকাল বিকেল টো টো করে বেড়ালে চলে না।

ব্যোমকেশ উঠিয়া শালটা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, 'আমরা দু'জনে যাব এই প্রস্তাবই আমি করেছিলাম। চল, মিছে বাড়ীতে বসে থেকে লাভ নেই।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের পায়ের দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, 'যার রোগা শরীর তার মোজা পায়ে দিয়ে বাইরে যাওয়া উচিত।' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি হাসি চাপিতে না পারিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলাম। কয়েক মিনিট পরে ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। তাহার ললাটে গভীর ভ্রূকুটি, কিন্তু পায়ে মোজা।

রাস্তায় বাহির হইলাম। ব্যোমকেশের যে কোনও বিশেষ গন্তব্য স্থান আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম হাওয়া বদলকারীর স্বাভাবিক পরিভ্রমণ-স্পৃহা তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু কিছু দূর যাইবার পর একটা খালি রিক্সা দেখিয়া সে তাহাতে উঠিয়া বসিল। আমিও উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'ডেপুটি উষানাথ বাবুকা মোকাম চলো।'

রিক্সা চলিতে আরম্ভ করিলে আমি বলিলাম, 'হঠাৎ উষানাথ বাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ রবিবার, তিনি বাড়ী থাকবেন। তাঁকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে।'

আধ মাইল পথ চলিবার পর আমি বলিলাম, ব্যোমকেশ, তুমি ছবি চুরির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ মনে হচ্ছে। সত্যিই কি ওতে গুরুতর কিছু আছে?

সে বলিল, সেইটেই আবিষ্কারের চেষ্টা করছি।

আরও আধ মাইল পথ উত্তীর্ণ হইয়া উষানাথ বাবুর বাড়ীতে পৌঁছান গেল। হাকিমপাড়ায় বাড়ী, পাঁচিল দিয়া ঘেরা। ফটকের কাছে রিক্সাওয়ালাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমেই চমক লাগিল, বাড়ীর সদরে কয়েকজন পুলিসের লোক দাঁড়াইয়া আছে। তার পর দেখিলাম ডি-এস-পি পুরন্দর পাণ্ডের মোটরবাইক রহিয়াছে।

উষানাথ ও পাণ্ডে সদর বারান্দায় ছিলেন। আমাদের দেখিয়া পাণ্ডে সবিস্ময়ে বলিলেন, 'একি, আপনারা।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ রবিবার, তাই বেড়াতে এসেছিলাম।'

উষানাথ হিমশীতল হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন। কাল রাত্রে বাড়ীতে চুরি হয়ে গেছে?'

'তাই নাকি? কি চুরি গেছে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সেটা এখনও জানা যায় নি। রাত্রে এঁরা দোতলায় শোন্, নীচে কেউ থাকে না। ঘর বন্ধ থাকে। কাল রাত্রে আপিস-ঘরে চোর ঢুকে আলমারি খোলবার চেষ্টা করেছিল। একটা পর-চাবি তালায় ঢুকিয়েছিল, কিন্তু সেটা বের করতে পারে নি।'

'বটে। আলমারিতে কি ছিল?

উষানাথ বাবু বলিলেন, 'সরকারী দলিলপত্র ছিল, আর আমার স্ত্রীর গয়নার বাক্স ছিল। ষ্টীলের আলমারি। লোহার সিন্দুক বলতে পারেন।

উষানাথ বাবুর চোখে কালো চশমা, চোখ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, তিনি ভয় পাইয়াছেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'তা হলে চোর কিছু নিয়ে যেতে পারে নি?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সেটা আলমারি না খোলা পর্য্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। একটা চাবিওয়ালা ডাকতে পাঠিয়েছি।'

'হু। চোর ঘরে ঢুকল কি করে?'

'কাঁচের জানালায় একটা কাঁচ ভেঙে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলেছে। আসুন না দেখবেন।'

উষানাথ বাবুর আপিস-ঘরে প্রবেশ করিলাম। মাঝারি আয়তনের ঘর, একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, ষ্টীলের আলমারি, দেওয়ালে ভারত-সম্রাটের ছবি—এ ছাড়া আর

কিছু নাই। ব্যোমকেশ কাঁচ-ভাঙা জানালা পরীক্ষা করিল; আলমারির চাবি ঘুরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চাবি ঘুরিল না। এই চাবিটি ছাড়া চোর নিজের আগমনের আর কোনও নিদর্শন রাখিয়া যায় নাই। আপিস-ঘরের পাশেই ড্রয়িং রুম, মাঝে দরজা। আমরা সেখানে গিয়া বসিলাম। আলমারিটা খোলা না হওয়া পর্যন্ত কিছু চুরি গিয়াছে কিনা জানা যাইবে না। উষানাথ বাবু চায়ের প্রস্তাব করিলেন, আমরা মাথা নাড়িয়া প্রত্যাখ্যান করিলাম।

ড্রয়িং-রুমটি মামুলি ভাবে সাজান গোছান। এখানেও দেওয়ালে ভারত-সম্রাটের ছবি। এক কোণে একটি রেডিও-যন্ত্র। চেয়ারগুলির পাশে ছোট ছোট নীচু টেবিল; তাহাদের কোনটার উপর পিতলের ফুলদানী, কোনটার উপর ছবির এল্‌বাম। দামী জিনিষ কিছু নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চোর বোধ হয় এ ঘরে ঢোকে নি।'

উষানাথ বাবু বলিলেন, 'এ ঘরে চুরি করবার মত কিছু নেই।' বলিয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। চোখের কাল চশমা ক্ষণেকের জন্য তুলিয়া কোণের রেডিও-যন্ত্রটার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তার পর চশমা নামাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমার পরী! পরী কোথায় গেল!'

আমরা সমস্বরে বলিলাম, 'পরী!'

উষানাথ বাবু রেডিওর কাছে গিয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে বলিলেন, 'একটা রূপোলী গিল্টি-করা ছোট্ট পরী—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী আমাকে উপহার দিয়েছিলেন—সেটা রেডিওর ওপর রাখা থাকত। নিশ্চয় চোরে নিয়ে গেছে।' আমরাও উঠিয়া গিয়া দেখিলাম। রেডিও-যন্ত্রের উপর আধুলির মত একটা স্থান সম্পূর্ণ ধূলিশূন্য। পরী ঐ স্থানে অবস্থান করিতেন সন্দেহ নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, চোরে হয়ত নেয় নি। আপনার ছেলে খেলা করবার জন্যে নিয়ে থাকতে পারে। একবার খোঁজ করে দেখুন না।

উষানাথ বাবু ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়া বলিলেন, 'খোকা শান্ত ছেলে, সে কখনও কোনও জিনিষে হাত দেয় না। যাহোক, আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। ব্যোমকেশ পাণ্ডেকে জিজ্ঞাসা করিল, কাউকে সন্দেহ করেন নাকি?

পাণ্ডে বলিলেন, 'সন্দেহ—না, সে রকম কিছু নয়। তবে একটা আরদালি বলছে, কাল রাত্রি আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় একটা পাগলাটে গোছের লোক ডেপুটি বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ডেপুটি বাবু দেখা করেন নি, আরদালি বাইরে থেকেই তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। আরদালি লোকটার যে-রকম বর্ণনা দিলে তাতে ত মনে হয়—'

'ফাল্গুনী পাল?'

'হাঁ। একজন সাব্-ইন্‌স্‌পেক্টরকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি।'

উষানাথ বাবু উপর হইতে নামিয়া আসিয়া জানাইলেন তাঁহার স্ত্রী-পুত্র পরীর কোনও খবরই রাখেন না। নিশ্চয় চোর আর কিছু না পাইয়া রৌপ্যভ্রমে পরীকে লইয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঁচকাইয়া বসিয়া ছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, 'ভাল কথা, সেই ছবিটা আছে কিনা দেখেছিলেন কি?'

'কোন্ ছবি?'

'সেই যে একটা গ্রুপ-ফটোর কথা মহীধরবাবুর বাড়ীতে হয়েছিল।'

'ও—না, দেখা হয় নি। ঐ যে আপনার পাশে এল্‌বাম রয়েছে, দেখুন না ওতেই আছে।'

ব্যোমকেশ এল্‌বাম লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহাতে উষানাথবাবুর পিতা-মাতা, ভাই ভাগিনী, স্ত্রীপুত্র সকলের ছবি আছে, এমন কি মহীধরবাবু ও রজনীর ছবিও আছে, কেবল উদ্দিষ্ট গ্রুপ-ফটোখানি নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'কৈ দেখছি না তো?'

'নেই!' উষানাথবাবু উঠিয়া আসিয়া নিজে এল্‌বাম দেখিলেন, কিন্তু ফটো পাওয়া গেল না। তিনি তখন বলিলেন, 'কি জানি কোথায় গেল। কিন্তু এটা এমন কিছু দামী জিনিষ নয়। আলমারি থেকে যদি দলিলপত্র কিংবা গয়নার বাক্স চুরি গিয়ে থাকে '

ব্যোমকেশ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, 'আপনি চিন্তা করবেন না, চোর কিছুই চুরি করতে পারে নি। গয়নার বাক্স নিরাপদে আছে, এমন কি আপনার পরীও একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে। আজ তা হলে আমরা উঠি। মিষ্টার পাণ্ডে, চোরের যদি সন্ধান পান আমাকে বঞ্চিত করবেন না।'

পাণ্ডে হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। আমরা বাহিরে আসিলাম; উষানাথবাবুও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ব্যোমকেশ উষানাথবাবুকে ইসারা করিয়া বারান্দার এক কোণে লইয়া গিয়া চুপিচুপি কিছুক্ষণ কথা বলিল। তার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'চল।'

রিক্সাওয়ালা অপেক্ষা করিতেছিল; আমরা ফিরিয়া চলিলাম। ব্যোমকেশ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তার পর এক সময় বলিল, 'অজিত, উষানাথবাবু এক সময় চোখের চশ্‌মা তুলেছিলেন, তখন কিছু লক্ষ্য করেছিলে?'

'কৈ না। কি লক্ষ্য করব?'

'উষানাথবাবুর বাঁ চোখটা পাথরের।'

'তাই নাকি? কালো চশমার এই অর্থ?'

'হ্যাঁ। বছর তিনেক আগে ওঁর চোখের ভেতরে ফোঁড়া হয়, অস্ত্র করে চোখটা বাদ দিতে হয়েছিল। ওঁর সর্ব্বদা ভয় সাহেবরা জানতে পারলেই ওঁর চাকরি যাবে।'

'আচ্ছা ভীতু লোক তো! এই কথাই বুঝি আড়ালে গিয়ে হচ্ছিল?'

'হ্যাঁ।'

এই তথ্যের গুরুত্ব কতখানি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। উষানাথবাবু যদি কানা-ই হন তাহাতে পৃথিবীর কি ক্ষতিবৃদ্ধি?

গিজা ক্রমে বাড়ীর নিকটবর্তী হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, যাবার সময় তুমি প্রশ্ন করেছিলে, ছবি চুরির ব্যাপার গুরুতর কিনা। সে প্রশ্নের উত্তর এখন দেওয়া যেতে পারে। ব্যাপার গুরুতর।'

'সত্যি? কি করে বুঝলে?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, একটু মুচকি হাসিল।

৬

অপরাহ্ণে আমরা মহীধরবাবুর বাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সত্যবতী বলিল, 'ঠাকুরপো, টর্চ নিয়ে যেও। ফিরতে রাত করবে নিশ্চয়।'

আমি টর্চ পকেটে লইয়া বলিলাম, 'তুমি এবেলাও তা হলে বেরুচ্ছ না?'

সত্যবতী বলিল, 'না। ওপরতলায় একটা মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, কথা কইবার লোক নেই। তার কাছে দু'দণ্ড বসে দুটো কথা কইলেও তার মনটা ভাল থাকবে।'

বলিলাম, 'মালতী দেবীর প্রতি তোমার সহানুভূতি যে ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে।'

'কেন বাড়বে না? নিশ্চয় বাড়বে।'

'আর রজনীর প্রতি সহানুভূতি বোধ করি সেই অনুপাতে কমে যাচ্ছে?'

'মোটেই না, একটুও কমে নি। রজনীর দোষ কি। যত নষ্টের গোড়া এই পুরুষ জাতটা।'

তর্জন করিয়া বলিলাম, 'দেখ, জাত তুলে কথা বললে ভাল হবে না বলছি!'

সত্যবতী নাক সিটকাইয়া রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

মহীধরবাবুর বাড়ীতে যখন পৌঁছিলাম তখনও সূর্যাস্ত হয় নাই বটে, কিন্তু বাগানের মধ্যে ঘোর ঘোর হইয়া আসিয়াছে। খোলা ফটকে লোক নাই। রাত্রেও বোধ হয় ফটক খোলা থাকে, কিংবা গরু-ছাগলের গতিরোধ করিবার জন্য আগড় লাগানো থাকে। মানুষের যাতায়াতে বাধা নাই।

বাড়ীর সদর দরজা খোলা; কিন্তু বাড়ীতে কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না। দুই-তিন বার হ্রেষা-ধ্বনিবৎ গলা খাঁকারি দিবার পর একটি বৃদ্ধগোছের চাকর বাহির হইয়া আসিল। বলিল, 'কর্তাবাবু ওপরে শুয়ে আছেন। দিদিমণি বাগানে বেড়াচ্ছেন। আপনারা বসুন, আমি ডেকে আনছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দরকার নেই। আমরাই দেখছি।' বাগানে নামিয়া ব্যোমকেশ বাগানের একটা কোণ লক্ষ্য করিয়া চলিল। গাছপালা ঝোপঝাড়ে বেশীদূর পর্যন্ত দেখা যায় না, কিন্তু ঘাসে ঢাকা সঙ্কীর্ণ পথগুলি মাকড়সার জালের মত চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম ব্যোমকেশ ফাল্গুনী পালের আস্তানার সন্ধানে চলিয়াছে।

বাগানের কোণে আসিয়া পৌঁছিলাম। একটা মাটির ঘর, মাথায় টালির ছাউনি; সম্ভবতঃ মালীদের যন্ত্রপাতি রাখিবার স্থান। পাশেই একটা প্রকাণ্ড ইঁদারা।

ঘরের দ্বার খোলা রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে অন্ধকার। আমি টর্চের আলো ভিতরে ফেলিলাম। অন্ধকারে খড়ের বিছানার উপর কেহ শুইয়া ছিল, আলো পড়িতেই উঠিয়া বাহিরে আসিল। দেখিলাম ফাল্গুনী পাল।

আজ ফাল্গুনীর মন ভাল নয়, কণ্ঠস্বরে ঔদাসীন্য-ভরা অভিমান। আমাদের দেখিয়া বলিল, 'আপনারাও কি পুলিসের লোক, আমার ঘর খানাতল্লাস করতে এসেছেন? আসুন—দেখুন, প্রাণ ভরে খানাতল্লাস করুন। কিছু পাবেন না। আমি গরীব বটে, কিন্তু চোর নই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা খানাতল্লাস করতে আসি নি। আপনাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কাল রাত্রে আপনি উষানাথবাবুর বাড়ীতে কেন গিয়েছিলেন?'

ফাল্গুনী তিক্তস্বরে বলিল, 'তাঁর একটা ছবি এঁকেছিলাম, তাই দেখাতে গিয়েছিলাম। দারোয়ান দেখা করতে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। বেশ কথা, ভাল কথা। কিন্তু সেজন্য পুলিস লেলিয়ে দেবার কি দরকার?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভারি অন্যায়। আমি পুলিসকে বলে দেব, তারা আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।'

'ধন্যবাদ' বলিয়া ফাল্গুনী আবার কোটরে প্রবেশ করিল। আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

দিনের আলো প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। আমরা বাগানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু রজনীকে দেখিতে পাইলাম না।

বাগানের অন্য প্রান্তে বড় বড় পাথরের চ্যাঙড় দিয়া একটা উচ্চ ক্রীড়াশৈল রচিত হইয়াছিল; তাহাকে ঘিরিয়া সবুজ শ্যাওলার বন্ধনী। ক্রীড়াশৈলটি আকারে চারকোণা, দেখিতে অনেকটা পিরামিডের মত। আমরা তাহার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। পিরামিডের অপর পার হইতে আবেগোদ্দত কণ্ঠস্বর কানে আসিল, 'ছবি ছবি ছবি! কি হবে ছবি! চাই না ছবি!'

'আস্তে! কে শুনতে পাবে।'

কণ্ঠস্বর দুইটি পরিচিত; প্রথমটি ডাক্তার ঘটকের, দ্বিতীয়টি রজনীর। ডাক্তার ঘটককে আমরা শান্ত সংযতবাক্ মানুষ

বলিয়াই জানি; তাহার কণ্ঠ হইতে যে এমন আর্ত উগ্রতা বাহির হইতে পারে তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। রজনীর কণ্ঠস্বরেও একটা শঙ্কিত শীৎকার আছে, কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক নয়।

ডাক্তার ঘটক আবার যখন কথা কহিল তখন তাহার স্বর অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু আবেগের উন্মাদনা কিছুমাত্র কমে নাই। সে বলিল, 'আমি তোমাকে চাই—তোমাকে: দুধের বদলে জল খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না।'

রজনী বলিল, 'আর আমি। আমি কি চাই না? কিন্তু উপায় যে নেই।'

ডাক্তার বলিল, 'উপায় আছে, তোমাকে বলেছি।'

রজনী বলিল, 'কিন্তু বাবা—'

ডাক্তার বলিল, 'তুমি নাবালিকা নও। তোমার বাবা তোমাকে আটকাতে পারেন না।'

রজনী বলিল, 'তা জানি। কিন্তু—। শোন, লক্ষ্মীটি শোন, বাবার শরীর খারাপ যাচ্ছে, তিনি সেরে উঠুন—তার পর—'

ডাক্তার বলিল, 'না। আজই আমি জানতে চাই তুমি রাজী আছ কিনা।'

একটু নীরবতা। তার পর রজনী বলিল, 'আচ্ছা, আজই বলব, কিন্তু এখন নয়। আমাকে একটু সময় দাও। আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় তুমি এস, আমি এখানে থাকবে; তখন কথা হবে। এখন হয়তো বাড়ীতে কেউ এসেছে, আমাকে না দেখলে—'

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল।

দু'জনে পা টিপিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, হঠাৎ চোখে পড়িল পিরামিডের অন্য পাশ হইতে আর একটা লোক আমাদেরই মত সন্তর্পণে দূরে চলিয়া যাইতেছে। এক বার মনে হইল বুঝি ডাক্তার ঘটক, কিন্তু ভাল করিয়া চিনিবার আগেই লোকটি অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পিরামিড হইতে অনেকখানি ঘুরিয়া দূরে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, বাড়ী ফেরা যাক। আজ আর দেখা করে কাজ নেই।'

রাস্তায় বাহির হইলাম। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; আকাশে চন্দ্র নাই, পথের পাশে কেরোসিনের আলোগুলি দূরে দূরে মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। আমি মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালিয়া পথ নির্ণয় করিতে করিতে চলিলাম।

ব্যোমকেশ চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছে। দুইটি বিদ্রোহোন্মুখ যুবক-যুবতীর নিয়তি কোন্ কুটিল পথে চলিয়াছে—বোধ করি তাহাই নির্ধারণের চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহার ধ্যানভঙ্গ করিলাম না।

বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'ওই লোকটিকে চিনতে পারলে?'

বলিলাম, 'না। কে তিনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনি হচ্ছেন আমাদের গৃহস্বামী অধ্যাপক আদিনাথ সোম।'

'তাই নাকি। ব্যোমকেশ, ব্যাপারটা আমার পক্ষে কিছু জটিল হয়ে উঠছে। ছবি চুরি, পশু চুরি, নেশাখোর চিত্রকর, কানা হাকিম, অবৈধ প্রণয়, অধ্যাপকের আড়িপাতা—কিছু বুঝতে পারছি না।'

'না পারবারই কথা। রবীন্দ্রনাথের গান মনে আছে—'জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটা তারে, জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে?'—আমিও সরু-মোটা তারের জট ছাড়াতে পারছি না।'

'আচ্ছা, এই যে ডাক্তার আর রজনীর ব্যাপার, এতে আমাদের কিছু করা উচিত নয় কি?'

ব্যোমকেশ দৃঢ়স্বরে বলিল, 'কিছু না। আমরা ক্রিকেট খেলার দর্শক, হাততালি দিতে পারি, দুয়ো দিতে পারি; কিন্তু খেলার মাঠে নেমে খেলায় বাগ্‌ড়া দেওয়া আমাদের পক্ষে ঘোর বেয়াদপি।'

বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম সত্যবতী একাকিনী বসিয়া পশমের সেলাই বুনিতেছে। বলিলাম, 'তোমার রুগীর খবর কি?'

সত্যবতী উত্তর দিল না, সেলাইয়ের উপর ঝুঁকিয়া দ্রুত কাঁটা চালাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি মুখে কথা নেই যে! মালতী দেবীকে দেখতে গিয়েছিলে তো?'

'গিয়েছিলাম'—সত্যবতী মুখ তুলিল না, কিন্তু তাহার মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ অদূরে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছিল, হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সত্যবতী সূচীবিদ্ধবৎ চমকিয়া উঠিল, শয়নকক্ষের দ্বারের দিকে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিল, তার পর আবার সম্মুখে ঝুঁকিয়া দ্রুত কাঁটা চালাইতে লাগিল।

আমি তাহার পাশে বসিয়া বলিলাম, 'কি ব্যাপার খুলে বল দেখি।'

'কিছু না। চা খাবে তো? জল চড়াতে বলে এসেছি। দেখি'—বলিয়া সে উঠিবার উপক্রম করিল।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'আহা কি হয়েছে আগে বল না। চা পরে হবে।'

সত্যবতী তখন আবেগভরে বলিয়া উঠিল, 'কি আবার হবে, ঐ লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষটার কাছে আমার যাওয়াই ভুল হয়েছিল। এমন পচা নোংরা মন—আমাকে বলে কিনা—কিন্তু সে আমি বলতে পারব না। যার অমন মন তার মুখে নুড়ো জেলে দিতে হয়।'

শয়নকক্ষ হইতে আর এক দমক হাসির আওয়াজ আসিল। সত্যবতী চলিয়া গেল। ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না। রাগে আমার মুখও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সন্দিগ্ধ-মনা স্ত্রীলোকের সন্দেহ পাত্রপাত্রী বিচার করে না জানি, কিন্তু সত্যবতীকে যে স্ত্রীলোক এরূপ পঙ্কিল দোষারোপ করিতে পারে, তাহাকে গুলি করিয়া মারা উচিত। ব্যোমকেশ হাসুক, আমার গা রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া ঘুম আসিল না; সারাদিনের নানা ঘটনায় মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে। ঘড়িতে দেখিলাম দশটা; ডিসেম্বর মাসে রাত্রি দশটা এখানে গভীর রাত্রি। ব্যোমকেশ ও সত্যবতী অনেকক্ষণ শুইয়া পড়িয়াছে।

বিছানায় শুইয়া ঘুম না আসিলে আমার সিগারেটের পিপাসা জাগিয়া ওঠে, সুতরাং শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল। গায়ে আলোয়ান দিয়া সিগারেট ধরাইলাম। কিন্তু বন্ধ ঘরে ধূমপান করিলে ঘরের বাতাস ধোঁয়ায় দূষিত হইয়া উঠিবে; আমি একটা জানালা ঈষৎ খুলিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম।

জানালাটা সদরের দিকে। সামনে ফটক, তাহার পরপারে রাস্তা, রাস্তার ধারে মিউনিসিপ্যালিটির আলোকস্তম্ভ; আলোকস্তম্ভ না বলিয়া ধূম্রস্তম্ভ বলিলেই ভাল হয়। প্রদীপের তৈল শেষ হইয়া আসিতেছে।

মিনিট দুই তিন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছি, বাহিরে একটা অস্পষ্ট খস্ খস্ শব্দে চকিত হইয়া উঠিলাম। কে যেন বারান্দা হইতে নামিতেছে। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম একটি ছায়ামূর্তি ফটক পার হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আলোকস্তম্ভের পাশ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে চিনিতে পারিলাম—কালো কোট-প্যান্ট-পরা অধ্যাপক সোম।

বিদ্যুৎ চমকের মত বুঝিতে পারিলাম এত রাত্রে তিনি কোথায় যাইতেছেন। আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় মহীধর বাবুর বাগানে ডাক্তার ঘটক এবং রজনীর মিলিত হইবার কথা; সঙ্কেত-স্থলে সোম অনাহূত উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু কেন? কি তাঁহার অভিপ্রায়?

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে এই কথা ভাবিতেছি, সহসা অধিক বিস্ময়ের কারণ ঘটিল। আবার খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। এবার বাহির হইয়া আসিলেন মালতী দেবী। তাঁহাকে চিনিতে কষ্ট হইল না। একটা চাপা কাশির শব্দ; তার পর সোম যে পথে গিয়াছিলেন তিনিও সেই পথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পরিস্থিতি স্পষ্টই বোঝা গেল। স্বামী অভিসারে যাইতেছেন, আর স্ত্রী অসুস্থ শরীর লইয়া এই শীতজর্জর রাত্রে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন। বোধ হয়, স্বামীকে হাতে হাতে ধরিতে চান। উঃ, কি দুর্বহ ইহাদের জীবন! প্রেমহীন স্বামী এবং বিশ্বাসহীন পত্নীর দাম্পত্য জীবন কি ভয়ঙ্কর। এর চেয়ে ডাইভোর্স ভাল।

বর্তমান ক্ষেত্রে আমার কিছু করা উচিত কিনা ভাবিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশকে জাগাইয়া সংবাদটা দিব? না, কাজ নাই, সে ঘুমাইতেছে ঘুমাক। বরং আমার ঘুম যেরূপ চটিয়া গিয়াছে, দু'ঘণ্টার মধ্যে আসিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং আমিই জানালার কাছে বসিয়া পাহারা দিব। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

আবার সিগারেট ধরাইলাম।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট। দীপস্তম্ভের আলো ধোঁয়ায় দম বন্ধ হইয়া মরিয়া গেল।

একটি মূর্তি ফটক দিয়া প্রবেশ করিল। নক্ষত্রের আলোয় মালতী দেবীর ভারী মোটা চেহারা চিনিতে পারিলাম। তিনি পদশব্দ গোপনের চেষ্টা করিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটা অবরুদ্ধ আওয়াজ বাহির হইল, তাহা চাপা কাশি কিংবা চাপা কান্না বুঝিতে পারিলাম না। তিনি উপরে চলিয়া গেলেন।

এত শীঘ্র শ্রীমতী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু শ্রীমানের দেখা নাই। অনুমান করিলাম, শ্রীমতী বেশী দূর স্বামীকে অনুসরণ করিতে পারেন নাই, অন্ধকারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তার পর এদিক ওদিক নিষ্ফল অন্বেষণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

সোম ফিরিলেন সাড়ে এগারটার সময়। বাদুড়ের মত নিঃশব্দ সঞ্চারে বাড়ীর মধ্যে মিলাইয়া গেলেন।

৭

সকালে ব্যোমকেশকে রাত্রির ঘটনা বলিলাম। সে চুপ করিয়া শুনিল, কোনও মন্তব্য করিল না।

একজন কনেষ্টবল একটা চিঠি দিয়া গেল। ডি-এস-পি পাণ্ডের চিঠি, আগের দিন সন্ধ্যা ছটার তারিখ। চিঠিতে মাত্র কয়েক ছত্র লেখা ছিল—

প্রিয় ব্যোমকেশ বাবু,

ডেপুটি সাহেবের আলমারি খুলিয়া দেখা গেল কিছু চুরি যায় নাই। আপনি বলিয়াছিলেন পরীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, কিন্তু পরী এখনও নিরুদ্দেশ। চোরেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আপনি জানিতে চাহিয়াছিলেন তাই লিখিলাম। ইতি

পুরন্দর পাণ্ডে

ব্যোমকেশ চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া বলিল, পাণ্ডে লোকটি সত্যিকার সজ্জন।

এই সময় যিনি সবেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি কটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার। মহীধর বাবুর পার্টির পর রাস্তায় নকুলেশ বাবুর সহিত দু'একবার দেখা হইয়াছিল।

তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম খবরটা দিয়ে যাই। শোনেন নি নিশ্চয়ই? ফাল্গুনী পাল—সেই যে ছবি আঁকত—সে মহীধর বাবুর বাগানে কুয়োয় ডুবে মরেছে।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তার পর ব্যোমকেশ বলিল, কখন এ ব্যাপার হ'ল?

নকুলেশ বলিলেন, বোধ হয় কাল রাত্তিরে, ঠিক জানি না। মাতাল-টাতাল লোক, অন্ধকারে তাল সামলাতে পারে নি, পড়েছে কুয়োয়। আজ সকালে আমি মহীধর বাবুর খবর নিতে গিয়েছিলাম, দেখি মালীরা কুয়ো থেকে লাস তুলছে।

আমরা নীরবে পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। কাল রাত্রে মহীধরবাবুর বাগানে বহু বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে।

আচ্ছা আজ তা হলে উঠি; আমাকে আবার ক্যামেরা নিয়ে ফিরে যেতে হবে—। বলিয়া নকুলেশ বাবু উঠিবার উপক্রম করিলেন।

বসুন বসুন, চা খেয়ে যান।

নকুলেশ চায়ের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, বসিলেন। অচিরাৎ চা আসিয়া পড়িল। দু'চার কথার পর ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, সেই গ্রুপ ফটোর নেগেটিভখানা খুঁজেছিলেন কি?

কোন্ নেগেটিভ। ও—হ্যাঁ, অনেক খুঁজেছি মশাই, পাওয়া গেল না।—আমার দোকানের বরাত; থাকলে আরও পাঁচখানা বিক্রী হ'ত।

আচ্ছা, সেই ফটোতে কে কে ছিল বলুন দেখি?

কে কে ছিল? পিকনিকে গিয়েছিলাম ধরুন—আমি, মহীধর বাবু, তাঁর মেয়ে রজনী, ডাক্তার ঘটক, সস্ত্রীক প্রফেসর সোম, সপরিবারে ডেপুটি উষানাথ বাবু আর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা। সকলেই ফটোতে ছিলেন। ফটোখানা ভারি উৎরে গিয়েছিল—গ্রুপ ফটো অত ভাল বড় একটা হয় না। আচ্ছা, চলি তা হলে। আর এক দিন আসব।'

নকুলেশবাবু প্রস্থান করিলেন। দু'জনে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। ফাল্গুনীর কথা ভাবিয়া মনটা ভারী হইয়া উঠিল। সে নেশাখোর লক্ষীছাড়া ছিল, কিন্তু ভগবান তাহাকে প্রতিভা দিয়াছিলেন। এমনভাবে অপঘাত মৃত্যুই যদি তার নিয়তি, তবে তাহাকে প্রতিভা দিবার কি প্রয়োজন ছিল?

ব্যোমকেশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'এ সম্ভাবনা আমার মনেই আসে নি। চল, বেরুনো যাক।'

'কোথায় যাবে?'

'ব্যাঙ্কে যাব। কিছু টাকা বের করতে হবে।'

এখানে আসিয়া স্থানীয় ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমা রাখা হইয়াছিল, সংসার-খরচের প্রয়োজন অনুসারে বাহির করা হইত।

আমরা সদর বারান্দায় বাহির হইয়াছি, দেখিলাম অধ্যাপক সোম ড্রেসিং গাউন পরিহিত অবস্থায় নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মুখে উদ্বিগ্ন গাম্ভীর্য। ব্যোমকেশ মামুলি সম্ভাষণ করিল, 'কি খবর?'

সোম বলিলেন, 'খবর ভাল নয়। স্ত্রীর অসুখ খুব বেড়েছে। বোধ হয় নিউমোনিয়া। জ্বর বেড়েছে; মাঝে মাঝে ভুল বকছেন মনে হ'ল।'

আশ্চর্য্য নয়। কাল রাত্রে সর্দ্দির উপর ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। কিন্তু সোম বোধ হয় তাহা জানেন না। ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার ঘটককে খবর দিয়েছেন?'

ডাক্তার ঘটকের নামে সোমের মুখ অন্ধকার হইল। তিনি বলিলেন, 'ঘটককে ডাকব না। আমি অন্য ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ চক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'কেন? ডাক্তার ঘটকের ওপর কি আপনার বিশ্বাস নেই? আমি যখন প্রথম এসেছিলাম তখন কিন্তু আপনি ঘটককেই সুপারিশ করেছিলেন।'

সোম ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন। ব্যোমকেশ তখন বলিল, 'সে যাক। এই মাত্র খবর পেলাম ফাল্গুনী পাল কাল রাত্রে মহীধরবাবুর কুয়োয় ডুবে মারা গেছে।'

সোম বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন, 'তাই নাকি। হয়তো আত্মহত্যা করেছে। আর্টিষ্টরা একটু অব্যবস্থিতচিত্ত হয়—'

ব্যোমকেশ বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন করিল, 'প্রফেসার সোম, কাল রাত্রি এগারোটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

সোম চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ পাংশু হইয়া গেল। তিনি স্খলিতস্বরে বলিলেন, 'আমি—আমি—। কে বললে আমি কোথায় গিয়েছিলাম? আমি তো—'

হাত তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'মিছে কথা বলে লাভ নেই। প্রফেসার সোম, আপনার স্ত্রীর যে আজ এত বাড়া-বাড়ি হয়েছে তার জন্যে আপনি দায়ী। তিনি কাল আপনার পেছনে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। এই রোগে যদি তাঁর মৃত্যু হয়—'

ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া সোম বলিলেন, 'আমার স্ত্রী—ব্যোমকেশবাবু, বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না—'

ব্যোমকেশ তর্জ্জনী তুলিয়া ভয়ঙ্কর গম্ভীর স্বরে বলিল, 'কিন্তু আমরা জানি। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই সতর্ক করে দিচ্ছি। আপনি সাবধানে থাকবেন। এস অজিত।'

লোক বজ্রের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় কিছু দূর গিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'লোককে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছি।' তার পর ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'ব্যাঙ্ক খুলতে এখনও দেরি আছে। চল, ডাক্তার ঘটকের ডিস্‌পেন্‌সারিতে একবার ঢুঁ মেরে যাই।'

বাজারের দিকে ডাক্তারের ঔষধালয়। সবে খুলিয়াছে। আমরা ডাক্তারের ঘরে প্রবেশ করিতে যাইব, শুনিলাম সে এক জনকে বলিতেছে, 'দেখুন, আপনার ছেলের টাইফয়েড হয়েছে; লম্বা কেস্, সারাতে সময় লাগবে। আমি এখন লম্বা কেস্ হাতে নিতে পারব না। আপনি বরং শ্রীধরবাবুর কাছে যান—তিনি প্রবীণ ডাক্তার—'

আমরা প্রবেশ করিলাম, অন্য লোকটি চলিয়া গেল। ডাক্তার সানন্দে আমাদের অভ্যর্থনা করিল। বলিল, 'আসুন আসুন। রোগী যখন সশরীরে ডাক্তারের বাড়ীতে আসে তখন বুঝতে হবে রোগ সেরেছে। মহীধরবাবু সেদিন আমাকে ঘোড়ার ডাক্তার বলেছিলেন। এখন আপনিই বলুন, আমি মানুষের ডাক্তার কিংবা আপনি ঘোড়া।'—বলিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিল। ডাক্তারের মন আজ ভারি প্রফুল্ল; চোখে আনন্দের জ্যোতি।

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'আপনি মানুষের ডাক্তার এই কথা স্বীকার করে নেওয়াই আমার পক্ষে সম্মানজনক। মহীধরবাবু কেমন আছেন?'

ডাক্তার বলিল, 'অনেকটা ভাল। প্রায় সেরে উঠেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ফাল্গুনী পাল মারা গেছে শুনেছেন কি?'

ডাক্তার চকিত হইয়া বলিল, 'সেই চিত্রকর! কি হয়েছিল তার?'

'কিছু হয় নি। কাল রাত্রে জলে ডুবে মারা গেছে'—ব্যোমকেশ যতটুকু জানিত সংক্ষেপে বলিল।

ডাক্তার কিছুক্ষণ বিমনা হইয়া রহিল, তার পর বলিল, 'আমার যাওয়া উচিত। মহীধরবাবুর দুর্ব্বল শরীর—। যাই, এক বার চট্ করে ঘুরে আসি।'—ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ সহসা জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কলকাতা যাচ্ছেন কবে?'

ডাক্তারের মুখের ভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হইল; সে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ব্যোমকেশের চোখের মধ্যে চাহিয়া বলিল, 'আমি কলকাতা যাচ্ছি কে বললে আপনাকে?'

ব্যোমকেশ কেবল মৃদু হাসিল। ডাক্তার তখন বলিল, 'হ্যাঁ, শিগগীরই একবার যাবার ইচ্ছে আছে। আচ্ছা চললাম। যদি সময় পাই ওবেলা আপনাদের বাড়ীতে যাব।'

ডাক্তার ক্ষুদ্র মোটরে চড়িয়া চলিয়া গেল। আমরা ব্যাঙ্কের দিকে চলিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, ডাক্তার কলকাতা যাচ্ছে জানলে কি করে? তুমি কি আজকাল অন্তর্যামী হয়েছ নাকি?

ব্যোমকেশ বলিল, না। কিন্তু একজন ডাক্তার যখন বলে লম্বা কেস্ হাতে নেব না, অন্য ডাক্তারের কাছে যাও, তখন আন্দাজ করা যেতে পারে যে সে বাইরে যাবে।

কিন্তু কলকাতায়ই যাবে তার নিশ্চয়তা কি?

ওটা ডাক্তারের প্রফুল্লতা থেকে অনুমান করলাম।

৮

ডাক্তারের ঔষধালয় হইতে অনতিদূরে ব্যাঙ্ক। আমরা গিয়া দেখিলাম ব্যাঙ্কের দ্বার খুলিয়াছে। দ্বারের দুই পাশে বন্দুক-কিরিচ-ধারী দুই জন সান্ত্রী পাহারা দিতেছে।

বড় একটি ঘর দুই ভাগে বিভক্ত, মাঝে কাঠ ও কাঁচের অনুচ্চ বেড়া। বেড়ার গায়ে সারি সারি জানালা। এই জানালা দিয়া জনসাধারণের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদের লেন-দেন হইয়া থাকে।

ব্যোমকেশ একটি জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া চেক্ লিখিতেছে, দেখিলাম বেড়ার ভিতর দিকে ম্যানেজার অমরেশ রাহা দাঁড়াইয়া একজন কেরাণীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। অমরেশ বাবুও আমাদের দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি স্মিত-মুখে বাহিরে আসিলেন। বলিলেন, 'নমস্কার। ভাগ্যে আপনাদের দেখে ফেললাম, নইলে ত টাকা নিয়েই চলে যেতেন।'

অমরেশ বাবুকে চায়ের পার্টির পর আর দেখি নাই। তিনি বেশ সজ্জিত; ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'রোজই মনে করি আপনাদের বাড়ীতে যাব, কিন্তু একটা না একটা কাজ পড়ে যায়। ব্যাঙ্কের চাকরি মানে আট প্রহরের গোলামি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এমন গোলামিতে সুখ আছে। হরদম টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।'

অমরেশ বাবু করুণ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'সুখ আর কৈ ব্যোমকেশ বাবু। চিনির বলদ চিনির বোঝা বয়ে মরে, কিন্তু দিনের শেষে খায় সেই ঘাস জল।'

ব্যোমকেশ চেকের বদলে টাকা পকেটস্থ করিলে অমরেশ বাবু বলিলেন, 'চলুন, আজ যখন পেয়েছি আপনাকে সহজে ছাড়ব না। আমার আপিস-ঘরে বসে খানিক গল্প-সল্প করা যাক। আপনার প্রতিভার যে পরিচয় অজিত বাবুর লেখা থেকে পাওয়া যায়, তাতে আপনাকে পেলে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আমাদের দেশে প্রতিভাবান মানুষের বড়ই অভাব।'

ভদ্রলোক শুধু যে ব্যোমকেশের প্রতি প্রত্যাশীল তাহাই নয়, সাহিত্য-রসিকও বটে। সেদিন তাঁহার সহিত অধিক আলাপ করি নাই বলিয়া অনুতপ্ত হইলাম।

তিনি আমাদের ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁহার একটি নিজস্ব আপিস-ঘর আছে, তাহার দ্বার পর্যন্ত গিয়া তিনি বলিলেন, 'না, এখানে নয়। চলুন, ওপরে যাই। এখানে গণ্ডগোল, ক্যাশের হুটোহুটি। ওপরে বেশ নিরিবিলি হবে।'

আপিস-ঘরের দরজা খোলা ছিল; ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, মামুলি টেবিল চেয়ার খাতাপত্র, কয়েকটা বড় বড় লোহার সিন্দুক ছাড়া আর কিছু নাই।

কাছেই সিঁড়ি। উপরে উঠিতে উঠিতে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওপরতলাটা বুঝি আপনার কোয়ার্টার?'

'হাঁ। ব্যাঙ্কেরও সুবিধে, আমারও সুবিধে।'

'স্ত্রী-পুত্র পরিবার সব এখানেই থাকেন?'

'স্ত্রীপুত্র পরিবার আমার নেই ব্যোমকেশ বাবু। ভগবান সুমতি দিয়েছিলেন, বিয়ে করি নি। একলা মানুষ, তাই অল্পভাবে চলে যায়। বিয়ে করলে হাঁড়ির হাল হ'ত।'

উপরতলাটি একজন লোকের পক্ষে বেশ সুপরিসর। তিন চারিটি ঘর, সামনে উন্মুক্ত ছাদ। অমরেশ বাবু আমাদের বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন ঘর; দেওয়ালে ছবি নাই, মেঝেয় গালিচা নাই। এক পাশে একটি জাজিম-ঢাকা চৌকি, দুই-তিনটি আরাম-কেদারা, একটি বইয়ের আলমারি। নিতান্তই মামুলি ব্যাপার, কিন্তু বেশ তৃপ্তিদায়ক। গৃহস্বামী যে গোছালো স্বভাবের লোক তাহা বোঝা যায়।

'বসুন, চা তৈরি করতে বলি।' বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

বইয়ের আলমারিটা আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, উঠিয়া গিয়া বইগুলি দেখিলাম। অধিকাংশ বই গল্প উপন্যাস; চলন্তিকা আছে, সঞ্চয়িতা আছে। আমার রচিত ব্যোমকেশের উপন্যাসগুলিও আছে দেখিয়া পুলকিত হইলাম।

ব্যোমকেশও আসিয়া জুটিল। সে একখানা বই টানিয়া লইয়া পাতা খুলিল; দেখিলাম বইখানা বাংলা-ভাষার নয়, ভারতবর্ষেরই অন্য কোনও প্রদেশের লিপি। অনেকটা হিন্দীর মতন, কিন্তু ঠিক হিন্দী নয়।

এই সময় অমরেশ বাবু ফিরিয়া আসিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি গুজরাটী ভাষাও জানেন?'

অমরেশ বাবু মুখে চট্‌কার শব্দ করিয়া বলিলেন, 'জানি আর কৈ? এক সময় শেখবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ও আমার দ্বারা হ'ল না। বাঙালীর ছেলে মাতৃভাষা শিখতেই গলদ্‌ঘর্ম হয়, তার ওপর ইংরেজী আছে। উপরন্তু যদি একটা তৃতীয় ভাষা শিখতে হয় তাহলে আর বাঙালীর শক্তিতে কুলোয় না। অথচ শিখতে পারলে আমার উপকার হ'ত। ব্যাঙ্কের কাজে গুজরাটী ভাষা জানা থাকলে অনেক সুবিধা হয়।'

আমরা আবার আসিয়া বসিলাম। দুই-চারিটা একথা সেকথার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'ফাল্গুনী পাল মারা গেছে শুনেছেন বোধ হয়?'

অমরেশ বাবু চেয়ার হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন। 'অ্যাঁ। ফাল্গুনী পাল মারা গেছে! সে কি! কবে—কোথায়—কি করে মারা গেল?'

ব্যোমকেশ ফাল্গুনীর মৃত্যু-বিবরণ বলিল। শুনিয়া অমরেশ বাবু দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আহা বেচারা! বড় দুঃখে পড়েছিল। কাল আমার কাছে এসেছিল।'

এবার আমাদের বিস্মিত হইবার পালা। ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'কাল এসেছিল? কখন?'

অমরেশ বাবু বলিলেন, 'সকালবেলা। কাল রবিবার ছিল, ব্যাঙ্ক বন্ধ; সবে চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে বসেছি, ফাল্গুনী এসে হাজির। আমার ছবি এঁকেছে তাই দেখাতে এসেছিল—'

'ও—'

চাকর তিন পেয়ালা চা দিয়া গেল। তক্‌মা-আঁটা চাকর, বুঝিলাম ব্যাঙ্কের পিওন; অবসরকালে বাড়ীর কাজও করে। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল অমরেশবাবু টাকা-পয়সার ব্যাপারে বিলক্ষণ হিসাবী।

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় চামচ ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, 'ছবিখানা কিনলেন নাকি?'

অমরেশবাবু বিমর্ষ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'কিনতে হ'ল। পাঁচ টাকা দিতে গেলাম কিছুতেই নিলে না, দশ টাকা আদায় করে ছাড়ল। এমন জানলে—'

ব্যোমকেশ চায়ে একটা চুমুক দিয়া বলিল, 'মৃত চিত্রকরের শেষ ছবি। দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।'

'দেখুন না। ভালই এঁকেছে বোধ হয়। আমি অবশ্য ছবির কিছু বুঝি না—'

বইয়ের আলমারির নীচের দেরাজ হইতে একখণ্ড পুরু চতুষ্কোণ কাগজ আনিয়া তিনি আমাদের সম্মুখে ধরিলেন।

ফাল্গুনী ভাল ছবি আঁকিয়াছে; অমরেশবাবুর বিশেষত্বহীন চেহারাও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যোমকেশ চিত্রবিদ্যায় একজন জহুরী, সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ছবিটি দেখিতে লাগিল।

অমরেশবাবু আগে বেশ প্রফুল্লমুখে কথাবার্তা বলিতেছিলেন, কিন্তু ফাল্গুনীর মৃত্যুসংবাদ শুনিবার পর কেমন যেন মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন। প্রায় নীরবেই চা-পান শেষ হইল। পেয়ালা রাখিয়া অমরেশবাবু স্তিমিত স্বরে বলিলেন, 'ফাল্গুনীর কথায় মনে পড়ল, সেদিন চায়ের পার্টিতে শুনেছিলাম পিক্‌নিকের ফটোখানা চুরি গেছে। মনে আছে? তার কোনও হদিস পাওয়া গেল কিনা কে জানে।'

ব্যোমকেশ মগ্ন হইয়া ছবি দেখিতেছিল, উত্তর দিল না। আমিও কিছু বলা উচিত কিনা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত অমরেশবাবুর পানে চাহিলাম। অমরেশবাবু তখন নিজেই বলিলেন, 'সামান্য ব্যাপার, তাই ও নিয়ে বোধ হয় কেউ মাথা ঘামায় নি।'

ব্যোমকেশ ছবি নামাইয়া রাখিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, 'চমৎকার ছবি। লোকটা যদি বেঁচে থাকত, আমিও ওকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিতাম। অমরেশবাবু, ছবিখানা যত্ন করে রাখবেন। আজ ফাল্গুনী পালের নাম কেউ জানে না, কিন্তু এক দিন আসবে যেদিন ওর আঁকা ছবি সোনার দরে বিক্রী হবে।'

অমরেশবাবু একটু প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি! তা হলে দশটা টাকা জলে পড়ে নি? ছবিটা বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙানো চলবে?'

'নিশ্চয়।'

অতঃপর আমরা গাত্রোত্থান করিলাম। অমরেশবাবু বলিলেন, 'আবার দেখা হবে। বছর শেষ হতে চলল, আমাকে আবার নববর্ষের ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে হেড আপিসের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে। এবার নববর্ষে দু'দিন ছুটি।'

'দু'দিন ছুটি কেন?'

'এবার একত্রিশে ডিসেম্বর রবিবার পড়েছে। শনিবার যদি অর্ধেক দিন ধরেন, তা হলে আড়াই দিন ছুটি পাওয়া যাবে। আপনারা এখনও কিছুদিন আছেন তো?'

'২রা জানুয়ারী পর্যন্ত আছি বোধ হয়।'

'আচ্ছা নমস্কার।'

আমরা বাহির হইলাম। ব্যাঙ্কের ভিতর দিয়া নামিতে হইল না, বাড়ীর পিছনদিকে একটা খিড়্কি-সিঁড়ি ছিল সেই পথে নামিয়া রাস্তায় আসিলাম। বাজারের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সিগারেট ফুরাইয়াছে। বলিলাম, 'এস, এক টিন সিগারেট কিনতে হবে।'

ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক ছিল, চমকিয়া উঠিল। বলিল, 'আরে তাই তো! আমাকেও একটা জিনিস কিনতে হবে।'

একটা বড় মণিহারীর দোকানে ঢুকিলাম। আমি এক দিকে সিগারেট কিনিতে গেলাম, ব্যোমকেশ অন্য দিকে গেল। আমি সিগারেট কিনিতে কিনিতে আড়চোখে দেখিলাম ব্যোমকেশ একটা দামী এসেন্সের শিশি কিনিয়া পকেটে পুরিল।

মনে মনে হাসিলাম। ইহারা কেন যে ঝগড়া করে, কেনই বা ভাব করে কিছু বুঝি না। দাম্পত্য-জীবন আমার কাছে একটা দুজ্ঞেয় প্রহেলিকা।

সেদিন দুপুরবেলা আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিবার জন্য বিছানায় লম্বা হইয়াছিলাম, ঘুম ভাঙিয়া দেখি বেলা সাড়ে তিনটা।

ব্যোমকেশের ঘর হইতে মৃদু জল্পনার শব্দ আসিতেছিল; উঁকি মারিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ চেয়ারে বসিয়া আছে এবং সত্যবতী তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে কি সব বলিতেছে। দু'জনের মুখেই হাসি।

সরিয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, 'ওহে কপোত-কপোতী, তোমাদের কূজন-গুঞ্জন শেষ হতে যদি দেরি থাকে তা হলে না হয় আমিই চায়ের ব্যবস্থা করি।'

সত্যবতী সলজ্জভাবে মুখের খানিকটা আঁচলের আড়াল দিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। খানিক পরে ব্যোমকেশ জলন্ত সিগারেট হাতে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বাহির হইল। অবাক্ হইয়া বলিলাম, 'ব্যাপার কি! ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়ছ যে!'

ব্যোমকেশ এক গাল হাসিয়া বলিল, 'পারমিশান পেয়ে গেছি। আজ থেকে যত ইচ্ছে!'

বুঝিলাম, দাম্পত্য-জীবনে কেবল প্রেম থাকিলেই চলে না, কূটবুদ্ধিরও প্রয়োজন।

৩

চা পান করিয়া উপরতলায় রোগিণীর সংবাদ লইতে গেলাম। সামাজিক কর্তব্য পালন না করিলে নয়।

অধ্যাপক সোমের মুখ চিন্তাক্রান্ত। মালতী দেবীর অবস্থা খুবই খারাপ, তবে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবার মত নয়। দুটা ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়াছে, অক্সিজেন দেওয়া হইতেছে। জ্বর খুব বেশী, রোগিণী মাঝে মাঝে ভুল বকিতেছেন। একজন নার্সকে সেবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে।

যথাভ সলিল। সহানুভূতি জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

নীচে নামিয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার ঘটক আসিল। এবেলা ডাক্তারের ভাবভঙ্গী অন্য প্রকার। একটু সতর্ক, একটু সন্দিগ্ধ, একটু অন্তঃপ্রবিষ্ট। ব্যোমকেশের পানে মাঝে মাঝে এমন ভাবে তাকাইতেছে যেন ব্যোমকেশ সম্বন্ধে তাহার মনে কোনও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

কথাবার্তা সাধারণ ভাবেই হইল। ডাক্তার সকালে মহীধর বাবুর বাড়ীতে গিয়া ফাল্গুনীর লাস দেখিয়াছিল সেই কথা বলিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দেখলেন? মৃত্যুর কারণ জানা গেল?'

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'অটপ্সি না হওয়া পর্যন্ত জোর করে কিছু বলা যায় না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তবু, আপনি ডাক্তার, আপনি কি কিছুই বুঝতে পারলেন না?'

ইতস্ততঃ করিয়া ডাক্তার বলিল, 'না।'

ব্যোমকেশ তখন বলিল, 'ও কথা যাক। মহীধর বাবু কেমন আছেন? কাল বিকেলে আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম; কিন্তু ডাকাডাকি করেও কারুর সাড়া পাওয়া গেল না, তাই ফিরে এলাম।'

ডাক্তার সতর্ক ভাবে প্রশ্ন করিল, 'ক'টার সময় গিয়েছিলেন?'

'আন্দাজ পাঁচটার সময়।'

ডাক্তার একটু ভাবিয়া বলিল, 'কি জানি। আমিও বিকেলবেলা গিয়েছিলাম, কিন্তু পাঁচটার আগে ফিরে এসেছিলাম। মহীধর বাবু ভালই আছেন। তবে আমকে বাড়ীতে এই ব্যাপার হ'ল—একটু শক্ পেয়েছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আর রজনী দেবী! তিনি কেমন আছেন?'

ডাক্তারের মুখের উপর দিয়া একটা রক্তাভা খেলিয়া গেল। কিন্তু সে ধীরে ধীরে বলিল, 'রজনী দেবী ভালই আছেন। তাঁর অসুখ করেছে এমন কথা ত শুনিনি। আচ্ছা, আজ উঠি।'

ডাক্তার উঠিল। আমরাও উঠিলাম। দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কলকাতা যাওয়া তা হলে স্থির?'

ডাক্তার ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দুটো সহসা জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, 'ব্যোমকেশ বাবু, আপনি এখানে শরীর সারাতে এসেছেন। গোয়েন্দাগিরি করতে নয়। যা আপনার এলাকার বাইরে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।' বলিয়া গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'ডাক্তার ঘটক এমনিতে বেশ ভালমানুষ, কিন্তু ল্যাজে পা পড়লে একেবারে কেউটে সাপ।'

বাহিরে মোটর বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ আসিয়া থামিল। ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'আরে, পাণ্ডে সাহেব এসেছেন। ভালই হ'ল।'

পাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। ক্লান্ত হাসিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশ বাবু, আপনার কথা ফলে গেল। পত্রী উদ্ধার করেছি।'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে চেয়ার দিয়া বলিল, 'বসুন। কোথা থেকে পত্রী উদ্ধার করলেন?'

'মহীধর বাবুর কুয়ো থেকে। ফাল্গুনীর লাস বেরুবার পর কুয়োয় ডুবুরি নামিয়েছিলাম। উষানাথ বাবুর পত্রী বেরিয়েছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আর কিছু?'

'আর কিছু না।'

'পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। ফাল্গুনী জলে ডুবে মরে নি, মৃত্যুর পর তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।'

'হুঁ। অর্থাৎ কাল রাত্রে তাকে কেউ খুন করেছে। তার পর মৃতদেহটা কুয়োয় ফেলে দিয়েছে। আত্মহত্যা নয়।'

'তাই ত মনে হচ্ছে। কিন্তু ফাল্গুনীর মতন একটা অপদার্থ লোককে খুন করে কার কি লাভ?'

'লাভ নিশ্চয় আছে, নইলে খুন করবে কেন? অপদার্থ লোক যদি কোনও সাংঘাতিক গুপ্তকথা জানতে পারে তা হলে তার বেঁচে থাকা কারুর কারুর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ফাল্গুনী অপদার্থ ছিল বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ ছিল না।

পাণ্ডে বিরস মুখে বলিলেন, 'তা বটে। কিন্তু আমি ভাবছি, পত্রীটা কুয়োর মধ্যে এল কি করে? তবে কি ফাল্গুনীই পত্রী চুরি করেছিল? খুনীর সঙ্গে ফাল্গুনীর কি পত্রী নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি হয়েছিল? তার পর খুনী ফাল্গুনীকে ঠেলে কুয়োয় ফেলে দিয়েছে?—কিন্তু পত্রীটা ত এমন কিছু দামী জিনিষ নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাল কথা, ফাল্গুনীর গায়ে কি কোনও আঘাত-চিহ্ন পাওয়া গেছে।'

'না। কিন্তু তার পেটে অনেকখানি আফিম পাওয়া গেছে। মদের সঙ্গে আফিম মেশান ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। দেখুন, কি করে ফাল্গুনীর মৃত্যু হ'ল সেটা বড় কথা নয়, কেন মৃত্যু হ'ল সেইটেই আসল কথা।'

পাণ্ডে উৎসুক চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'এ বিষয়ে আপনি কি কিছু বুঝেছেন ব্যোমকেশ বাবু?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'বোধ হয় কিছু কিছু বুঝেছি। আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু আপনার শোনবার সময় হবে কি?'

পাণ্ডে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। বলিলেন, 'সময় হবে কিনা দেখাচ্ছি। চলুন আমার বাড়ীতে, একেবারে রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরবেন।'

পাণ্ডে ব্যোমকেশকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

আমি আর সত্যবতী রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত তাস লইয়া গোলামচোর খেলিলাম।

ব্যোমকেশ ফিরিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হ'ল এতক্ষণ ধরে?'

ব্যোমকেশ গভীর হাস্য করিয়া বলিল, 'আঃ, মুর্গিটা যা রেঁধেছিল!'

ধমক দিয়া বলিলাম, 'কথা চাপা দিও না। পাঁচ ঘণ্টা ধরে কি কথা হ'ল?

ব্যোমকেশ জিভ কাটিল, 'পুলিসের গুপ্তকথা কি বলতে আছে? তবে এমন কোনও কথা হয় নি যা তুমি জান না।'

'হত্যাকারী কে?'

'পাঁচকড়ি দে।' বলিয়া ব্যোমকেশ দুষ্ট করিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পড়িল।

আগামীবারে সমাপ্য

ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আসল শিল্পীর লক্ষণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রঁম্যা রঁল্যা বলেছেন :

To live, to live too much ! A man who does not feel within himself this intoxication of strength, this jubilation in living—even in the depths of misery—is not an artist. This is the touch-stone.

—(*John Christopher*)

অর্থাৎ, বাঁচতে হবে—জোরের সঙ্গেই বাঁচতে হবে। যে মানুষ গভীর দুঃখের মধ্যেও নিজের ভিতরে অনুভব করে না শক্তির এই উন্মাদনা, বেঁচে থাকার এই উল্লাস—সে আর্টিষ্ট নয়। কে শিল্পী এবং কে শিল্পী নয় তা যাচাই করবার এই হ'ল কষ্টিপাথর।"

শিল্পীর এই যথার্থ পরিচয় পাই আমরা রবীন্দ্র রচনাবলীর সর্ব্বত্র। মায়াবাদকে কোথাও তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। মায়াবাদীকে কটাক্ষ করে 'সোনার তরী'তে একদা তিনি লিখেছিলেন :

যুগ যুগান্তর ধরে পশু পক্ষী প্রাণী
অচল নির্ভরে হেথা নিতেছে নিশ্বাস,
বিধাতার জগতেরে মাতৃক্রোড় মানি,
তুমি বুঝি কিছুরেই কর না বিশ্বাস।
লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা।

কবি চিরদিনই জীবনের পূজারী। জোরের সঙ্গে বাঁচার মন্ত্রই উচ্চারণ করেছেন তিনি। শুষ্ক বৈরাগ্য-সাধনের মধ্যে মুক্তিকে কখনো অন্বেষণ করেন নি। ভালবেসেছেন এই পৃথিবীকে, ভালবেসেছেন জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে। 'সোনার তরী'র অন্য একটি কবিতার শেষে আছে :

ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।
জন্মেছি যে মর্ত্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতার মধ্যেও একই সুর—মর্ত্ত্যভূমিকে তার সমস্ত আলো-ছায়ার বৈচিত্র্য নিয়ে ভালো-বাসার সুর। পৃথিবীকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন :

অয়ি দীনহীনা
অশ্রু-আঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্ত্ত্যভূমি। আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।
যেমনি বিদায়-দুঃখে শুষ্ক দুই চোখ
অশ্রুতে পূরিল—অমনি এ স্বর্গলোক
অলস কল্পনাপ্রায় কোথায় মিলাল
ছায়াচ্ছবি। তব নীলাকাশ, তব আলো,
তব জনপূর্ণ লোকালয়, সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরিশিরে
শুভ্র হিমরেখা, তরু-শ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্য নদীপারে
অবনতমুখী সন্ধ্যা—বিন্দু অশ্রুজলে
যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পণের তলে
পড়েছে আসিয়া।

জীবনের প্রতি এই অফুরন্ত অনুরাগ, মানুষের প্রতি এই অন্তহীন প্রীতি, প্রকৃতির প্রতি এই সুনিবিড় ভালোবাসা—এর পরিচয় 'ছিন্নপত্রে'র পাতায় পাতায়। ছিন্নপত্রের যুগ রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতবাসের যুগ। 'নোবেল প্রাইজ' তখনও তাঁকে খ্যাতির শিখরদেশে উত্তীর্ণ করে দেয় নি। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে নৌকায় নৌকায় তাঁর দিন কেটে যায় প্রকৃতির নিভৃত অন্তঃপুরে। সন্ধ্যা কাটে পদ্মার নিভৃত চরে। 'সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি মাঝে' কবির মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটে ঋতুতে ঋতুতে জন্মভূমিকে নব নব রূপে দেখে দেখে। ছিন্নপত্রের যে-কোন পাতা খুললেই দেখতে পাওয়া যাবে—কি অসীম কৌতূহল নিয়ে কবি দিনের পর দিন পর্য্যবেক্ষণ করে গেছেন বাংলাদেশের গ্রাম্য জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারকে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই সাজাদপুরের কুঠিবাড়ীতে বসে লিখছেন :

"খেয়া নৌকো পারাপার করছে, পান্থরা ছাতা হাতে করে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেছে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্ছে, চাষীরা আঁটি বাঁধা পাট মাথায় করে হাটে আসছে, দুটো লোক একটা গাছের গুঁড়ি মাটিতে ফেলে কুড়ুল দিয়ে ঠক ঠক শব্দে কাঠ চেলা করছে, একটা ছুতোর অশথ গাছের তলায় জেলে ডিঙি উলটে ফেলে বাটালি হাতে মেরামত করছে, গ্রামের কুকুরটা খালের ধারে ধারে উদ্দেশ-হীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুটিকতক গোরু বর্ষার ঘাস অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহারপূর্ব্বক অলস ভাবে রৌদ্রে মাটির উপর পড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে এবং কাক এসে তাদের মেরুদণ্ডের উপর বসে যখন বড়ো বেশি বিরক্ত করছে তখন একবার পিঠের দিকে মাথাটা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে। এখানকার এই দুই একটা একঘেয়ে ঠক ঠক ঠুক ঠাক শব্দ, উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের খেলার কল্লোল, রাখালের করুণ উচ্চস্বরে গান, দাঁড়ের ঝুপঝাপ ধ্বনি, কলুর ঘানির

ভীরুকাতর বিবাদস্বর, সমস্ত কর্মকোলাহল একত্র মিলে এই পাখীর ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য ঘটাচ্ছে না—সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময় মর্মর করুণামাখা একটা বড়ো সংগীতের অন্তর্গত— খুব বিস্তৃত অথচ সংযত মাত্রায় বাঁধা। আমার মাথার মধ্যে সূর্য্যের আলোক এবং এই সমস্ত শব্দ একেবারে যেন কানায় কানায় ভরে এসেছে অতএব চিঠিপত্র বন্ধ করে খানিকক্ষণ পড়ে থাকা যাক।"

যা অত্যন্ত পরিচিত, যা অত্যন্ত নিকটের তারই মধ্যে জীবনের এই গভীর আনন্দকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার ক্ষমতাই হ'ল শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় আমরা দেখতে পাই এই বেঁচে থাকার উল্লাস (This jubilation in living)। এই যে 'passionate curiosity and zest in life'—এ অনুরাগ, এ কৌতূহল যার মধ্যে নেই তাকে শিল্পীর পর্য্যায়ে কখনও ফেলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে ভালবেসেছিলেন। এমন করে সমস্ত সত্তা দিয়ে পৃথিবীকে ভালো না বাসলে তাঁর পক্ষে এত বড় কবি হওয়া কখনই সম্ভব ছিল না। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কালিগ্রামে বসে তিনি লিখেছিলেন:

"এই যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি। ওর এই গাছপালা নদীমাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা. প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটাসুদ্ধ দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম।" (ছিন্নপত্র)

১৩২১ সালের ২৯শে পৌষ সুরুলে লেখা একটি কবিতায় আছে:

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে;
প্রভাত-সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে;
অবশেষে
এক হ'য়ে গেছে আজ আমার জীবন, আর
আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

গদ্যে আর পদ্যে জগতের ও জীবনের প্রতি একই সুগভীর অনুরাগের সুর।

ছিন্নপত্রের একখানি পাতায় আছে:

"যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি এখানকার মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব। এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে, পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এই জন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে। বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অদ্ভুত। এরা যে ফুলের গাছে এক একটা ঘ্যারাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায় নি সেই আশ্চর্য্য।"

পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই চারিদিকের প্রকৃতি এবং মানুষগুলি সম্পর্কে উদাসীন। জীবনকে জানবার কোন উৎসাহ এবং কৌতূহল নেই তাদের অন্তরে। তাদের চোখ আছে কিন্তু দেখে না। দৃষ্টি যাদের নেই তারা সৃষ্টি করবে কেমন করে? পোষ্ট মাষ্টার, কাবুলিওয়ালা—এসব গল্প-রচনার মূলে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি। কাবুলিওয়ালা পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা লোকের কাছে একজন লগুড়ধারী জোব্বা-পরা মেওয়াওয়ালার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। তার অস্তিত্বের বহিরাবরণ ভেদ করে তাকে পরিপূর্ণ সহানুভূতির চোখ দিয়ে দেখবার লোক জগতে সত্য সত্যই দুর্লভ। কিন্তু এমন এক একজন মানুষ কালেভদ্রে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন জীবনকে জানবার কৌতূহল এবং উন্মাদনা যাঁদের দুর্দমনীয়। এঁদের দেখা আর দশ জনের মত ভাসা-ভাসা নয়। সেই দেখার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয় মানুষের সত্য পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছিল রহমত কাবুলিওয়ালার সত্য পরিচয়। সে তো কেবল মেওয়াওয়ালা নয়—সে স্নেহময় পিতা। পৃথিবীর সব দেশের পিতার হৃদয়ে সন্তানের জন্য যে সুগভীর স্নেহ—রহমতের হৃদয়েও তাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে একটি মৌলিক ঐক্য রয়েছে—সেই ঐক্যের উপলব্ধি থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে বেরিয়ে এসেছে:

"দেখিয়া আমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। তখন সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা, আর আমি যে একজন বাঙালী সম্ভ্রান্তবংশীয় তাহা ভুলিয়া গেলাম—তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে; সেও পিতা আমিও পিতা।"

আমরা শতকরা নিরানব্বই জন লোক যতখানি হৃদয়-হীন নই ততখানি আমরা উদাসীন। আমাদের অন্তরে চারিদিকের জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে কৌতূহলের মারাত্মক অভাব। আমরা যদি তেমন করে দেখতে পারতাম তবে আমরা নিশ্চয়ই ভালবাসতেও পারতাম আর সেই সমবেদনা থেকে আসত সৃষ্টির প্রতিভা। ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি সমবেদনার গভীরতা থেকেই ত উৎসারিত হ'ল আদিকবির প্রথম শ্লোক, জগতের প্রথম সঙ্গীত।

'ছিন্নপত্র' পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয় মনের মধ্যে কি অপরিমেয় কৌতূহল নিয়ে চারিদিকের জীবনকে কবি দেখেছিলেন। তাঁর সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে এই কৌতূ-হলেরই পরিচয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই শিলাইদহে লেখা একখানি পত্রে পাই:

"আমার বোটের সামনে দুটি রাখাল বালক একপাল গরু নিয়ে এসে চরাচ্ছে ; গরুগুলি কচর মচর শব্দ ক'রে এই বর্ষাসতেজ সরসশ্যামল সিক্ত ঘাসগুলির মধ্যে মুখ ভ'রে দিয়ে ল্যাজ নেড়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে স্নিগ্ধ শান্ত নেত্রে আহার ক'রে ক'রে বেড়াচ্ছে...এই গরুগুলির চোখের দৃষ্টি কেমন বিষণ্ণ শান্ত সুগম্ভীর স্নেহময়।"

গরু চরছে এ আমরা সবাই দেখি। কিন্তু এমন অনুরাগ-ভরা কৌতূহল নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা কবির পক্ষেই সম্ভব। 'বিদায় অভিশাপ' কবিতায় কচের মুখ থেকে হোমধেনুর যে বর্ণনা পাই তা ফটোগ্রাফের ছবির মতই নিখুঁত। দেবযানীকে কচ বলছে :

> সুধা হতে সুধাময়
> দুগ্ধ তার ; দেখে তারে পাপক্ষয় হয়,
> মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিণী, শুভ্রকান্তি
> পয়স্বিনী। না মানিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা শ্রান্তি
> তারে করিয়াছি সেবা, গহন কাননে
> শ্যামশষ্প স্রোতস্বিনীতীরে, তারি সনে
> ফিরিয়াছি দীর্ঘদিন ; পরিতৃপ্তি ভরে
> স্বেচ্ছামতে ভোগ করি' নিম্নতট 'পরে
> অপর্য্যাপ্ত তৃণরাশি সুস্নিগ্ধ কোমল—
> আলস্য-মন্থর তনু লভি তরুতল
> রোমন্থ ক'রেছে ধীরে শুয়ে তৃণাসনে
> সারা বেলা ; মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে
> সকৃতজ্ঞ শান্ত দৃষ্টি মেলি, গাঢ় স্নেহ-
> চক্ষু দিয়া লেহন করিত মোর দেহ।
> মনে র'বে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ অচঞ্চল,
> পরিপুষ্ট শুভ্রতনু চিক্কণ পিচ্ছল।

শিলাইদহে লেখা পত্রে গরুর চোখের দৃষ্টির যে বর্ণনা আছে, কচের হোমধেনুর দৃষ্টির বর্ণনার মধ্যে তারই প্রতিধ্বনি। দুই জায়গাতেই বিচরণশীল গরুর পটভূমি একই—নদীতীরের সরসশ্যামল অপর্য্যাপ্ত তৃণরাশি।

'চতুরঙ্গে'র মধ্যে অভুক্ত দামিনী হাঁটুজল ভেঙে খাবারের থালা নিয়ে যেখানে উপস্থিত হয়েছে শচীশের কাছে সেখানকার বালুচরের দৃশ্যটি যেমন ভীষণ তেমনি নিখুঁত। সেখানে আছে :

"চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে—জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোন ডাকের কোন সাড়া, কোন প্রশ্নের কোন জবাব নাই এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাসে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ায় সেই শুক্‌নো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে, একটা 'না'। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি, তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

কোন্ দিকে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল। সেই দাগ ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া সে পৌঁছিল সেখানে একটা জলা। তার ধারে ধারে ভিজা মাটির উপরে অসংখ্য পাখীর পদচিহ্ন। সেইখানে বালির পাড়ির ছায়ায় শচীশ বসিয়া।"

এইবার ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শিলাইদহে লেখা একখানি পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

"শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর ধূ ধূ করছে। কোথাও শেষ দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়—আবার সময়ে সময়ে বালিকে নদী ব'লে ভ্রম হয়। গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই—বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুকনো সাদা বালি। পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যায় উপরে অনন্ত নীলিমা আর নীচে অনন্ত পাণ্ডুরতা। আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য, নিচে দরিদ্র, শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা। এমনতর desolation কোথাও দেখা যায় না।"

শিলাইদহের অপর পারের জনহীন চরের এই যে বর্ণনা—এর সঙ্গে চতুরঙ্গের বালুচরের বর্ণনার মিল খুবই স্পষ্ট।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস ভাল করে উপলব্ধি করবার জন্য 'ছিন্নপত্র' গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করবার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। ছিন্নপত্রের মধ্যে 'ছায়াময় নদীস্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন' বাংলার পল্লী-প্রকৃতির যে বিচিত্র বর্ণনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, সেই বর্ণনাগুলিই রবীন্দ্রনাথের নানা উপন্যাসে, নানা কবিতায়, নানা সঙ্গীতে নব নব ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। তফাৎ কেবল ভাষায়, বর্ণনার বিষয়বস্তু একই।

ছিন্নপত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ছিন্নপত্র পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয় গোর্কির সেই স্মরণীয় কথাগুলি :

> And what a privilege it is to be human! How much that is wonderful leaps to the eye—how the presence of beauty causes the heart to throb with a voluptuous rapture that is almost pain.

আমাদের চারিদিকের প্রকৃতি নিমেষে নিমেষে যে সৌন্দর্য্য আমাদিগকে পরিবেষণ করছে তাকে অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করবার মত সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকলে তবেই হৃদয় স্বতঃই বলে ওঠে :

"ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুস্।
কত-যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধুলা-মাটির মানুষ।" (বলাকা)

বাঁচার আনন্দ উপভোগ করবার জন্য যা দুর্লভ, যা দুষ্প্রাপ্য, যা অনুপম তারই অনুসন্ধান করা আমাদের শিক্ষিত-সমাজের একটা মজ্জাগত সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সহজে আমরা চারিদিক থেকে যা পাচ্ছি তার মধ্যেই কি আমাদের আনন্দের প্রচুর খোরাক নেই? ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় কবির আনন্দের অভিব্যক্তি, আর এই আনন্দ তাঁকে দিয়েছিল এই বাংলাদেশেরই প্রকৃতির বিচিত্র ছবি। ঘটনা এবং অভিজ্ঞতা আমাদের যাই হোক না কেন—প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার মত আমাদের আত্মার যদি অনুভবের শক্তি থাকে ত মাটি-মায়ের কোলেই আমরা স্বর্গকে খুঁজে পাব, কবির সঙ্গে বলতে পারব :

'স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে।' (বলাকা)

এমন কথা বলতে পারেন তাঁরাই যাঁদের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক খুব নিবিড় এবং প্রকৃতির মধ্যে নিজেদের নিঃশেষে ঢেলে দেবার শক্তি বিপুল। সকলের এ ক্ষমতা থাকে না। যাদের থাকে না তারা গোরু-বাছুর, ক্ষেত-খামার, ঘর-গৃহস্থালির বাইরে আর কোন কথা ভাবতে পারে না। নদীর তীরে নৌকা লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন মুগ্ধনেত্রে দেখতেন ছবির পর ছবি আর তাঁর আনন্দের অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতেন কানভুলানো মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তখন পল্লীর যারা কলসী-কাঁখে জমিদারবাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করত—তারা কবির অন্তরের ইতিহাস বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারত না। অথচ সেই শিলাইদহের এবং সাজাদপুরের অজ্ঞাতবাসের যুগে কবি যে 'কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা'র মধ্যে ডুবেছিলেন তার গুরুত্ব ছিল বিরাট। সে যুগে যা-কিছু তিনি অনুভব করেছিলেন অন্তরের গভীরে, তা তিনি কবিতার পর কবিতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেই সব কবিতা পড়লে আজও আমাদের অন্তর আনন্দে ভরে ওঠে।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর শিলাইদহে লেখা একখানি পত্রে পাই :

"যখন সন্ধ্যাবেলা বোটের উপরে চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে এবং আকাশের প্রান্তে সূর্য্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কি একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি। কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ। এই লোক-নিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জ্জন নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি; কেবল মৌলবীটা পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম বক্ বক্ করে আমাকে ব্যথিত করে তোলে।" (ছিন্নপত্র)

চারিদিকের প্রকৃতির কাছ থেকে সহজে আমরা যা পাই তার মধ্যে নিজের প্রাণ-প্রবাহকে এই ভাবে মিশিয়ে দিতে পারলে যে অনির্ব্বচনীয় শান্তি অনুভব করতে পারি তারই কথা ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায়। জীবন তাদেরই কাছে একটা অর্থহীন বোঝা বলে মনে হয় যারা প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের যোগ হারিয়ে ফেলেছে।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের একখানি তারিখহীন পত্রে (শিলাইদহে লেখা) পাই :

"পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোট নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জ্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতিরাত্রে শতসহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ-সংসারে এযে কী একটা আশ্চর্য্য মহৎ ঘটনা—তা এখানে আসলে তবে বোঝা যায়।"

ছিন্নপত্র থেকে এবং আরও কোন কোনও লেখকের লেখা থেকে এত যে উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল সে কেবল একটি বিরাট সত্যকে পাঠক-পাঠিকাদের মনের কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সত্যটি হ'ল—আনন্দ রয়েছে অন্য কোথাও নয় এইখানেই, ভাবীকালের মধ্যে নয়—বর্ত্তমানের তরঙ্গচূড়ায়। কেন আমরা আনন্দকে দূরে দূরে অন্বেষণ করে বেড়াব?

উইলিয়াম জেমস্ বলতেন :

Even prisons and sick-rooms have their special revelations

দুঃখের গভীরতম অন্ধকারেও মানুষ আনন্দলোকের তারা দেখতে পারে যদি চারিদিকের প্রকৃতির মধ্যে যা যা ঘটে চলেছে তা দেখবার মত চোখ থাকে। এই চোখ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জোড়া-সাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে। ছিন্নপত্রের পটভূমি কাশ্মীরের ভূস্বর্গ নয়, সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদের তীর নয়, পাহাড়-ঘেরা মানস সরোবরও নয়। সে পটভূমি এই বাংলারই 'অতি দূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখা', পাণ্ডুবর্ণ বালির উপরে 'বাঁকা কৃশ চাঁদখানির আলো', তৃণগুল্মশূন্য পদ্মার চর, 'অন্ধকারজড়িত, বনবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম,' 'জল-ধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত,' 'পরিপূর্ণ দিগন্তপ্রসারিত নদীর মধ্যে সূর্য্যাস্ত,' 'নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না,' ধেনু-চরা মাঠ, গাছে বাঁধা খেয়াঘাট, পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পল্লীপথ। হাজার হাজার লাখো লাখো মানুষ রয়েছে এই বাংলাদেশে যাদের মনে এরা কোন সাড়া জাগায় না। অথচ

রবীন্দ্রনাথের কাছে শিলাইদহের এবং সাজাদপুরের এক একটি দিন মনে হয়েছে এক একটি সম্পত্তির মত। পদ্মা একটি দিনের জন্যও তাঁর কাছে মনে হ'ল না পুরনো। ছিন্নপত্রের একখানি পত্রে আছে :

"প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয় আমার পদ্মা বোধ হয় পুরনো হ'য়ে গেছে—কিন্তু যখনই বোট ভাসিয়ে দিই, চারিদিকে জল কুল কুল করে উঠে, চারিদিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদুকলধ্বনি একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামলরেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্য্যের একটি নিত্য উৎসব উদ্ঘাটিত হয়ে যায় তখন আবার নতুন ক'রে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়।"

কেন্ আমরা বড় বড় দুরাশার মোহে জীবনের ছোট ছোট আনন্দগুলিকে উপেক্ষা করে আমাদের জীবনকে উপবাসী করে রাখি? কেন প্রতিদিনের অযাচিত ছোট ছোট আনন্দগুলিকে প্রতিদিন উপভোগ করে নিই নি? ছিন্নপত্রের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"এই সমস্ত রং, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত শূন্য পরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য্য, এর জন্য কি কম আয়োজনটা চলছে। কত বড় উৎসবের ক্ষেত্রটা। আর আমাদের ভিতরে ভাল করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না। জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি।"

চারিদিকের এই আকাশ, জল, বাতাস আলোকে যদি ভালবাসতে পারতাম, সাড়া দিতে পারতাম প্রকৃতির আহ্বানে, চোখ মেলে দেখতে পারতাম যেমন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন বিশ্বপ্রকৃতিকে—কোন দুঃখ থাকত না, কোন গ্লানি থাকত না মনের মধ্যে। বেশীর ভাগ লোকই স্বেচ্ছা-অন্ধ। বন্ধ পাল্‌কির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে তারা চলে যায়। তাই অন্তরের প্রচ্ছন্ন অতৃপ্তি এবং আত্ম-গ্লানি থেকে কিছুতেই তারা মুক্তি পায় না। দরকার হচ্ছে চারিদিকের বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে পারা। পৃথিবীকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে জীবনের দিকে পিছন ফেরানো নয়; জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে, সুষমাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে পারাটাই হচ্ছে বড় কথা। রোঁমা রঁল্যার 'জাঁ ক্রিস্তোফার' উপন্যাসের নায়ক ক্রিস্তফ্ বাস্তবের রূঢ় আঘাতে বাঁচার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছে। জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে যাবে এমন সময়ে পাশের একটি গাছে ছোট একটা পাখী গান সুরু করে দিল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ক্রিস্তফ্ শুনতে লাগল সেই সঙ্গীত। কানে আসতে লাগল জলের কলধ্বনি। বাতাসের কোমল চুম্বনে ফসলক্ষেতের সোনালি শিষগুলো উঠল দুলে দুলে। পপ্‌লার গাছের পল্লবে পল্লবে জাগল পুলকের শিহরণ। রাস্তার ওপারের একটা বাগানে মৌচাক ভরে উঠেছে মৌমাছিদের মধুর গুঞ্জন-ধ্বনিতে। বাতাসে তাদের গন্ধ-ভরা গানের সুর। নদীর ওপারে একটা গরু রোমন্থন করছে। তার চোখের চাউনিতে কি করুণ কোমলতা! প্রাচীরের উপরে বসেছিল একটি ছোট মেয়ে। মাথায় তার একরাশ সোনালি চুল। নগ্ন পা দুখানি দুলিয়ে দুলিয়ে আপন মনে সে গুন্ গুন্ করে গান করছিল। অনেক দূরে একটা মাঠে সাদা একটা কুকুর ঘুরছিল আর মাঝে মাঝে লাফাচ্ছিল। ক্রিস্তফ্ একটা গাছে হেলান দিয়ে বসন্তের পৃথিবীর আনন্দ-কল্লোল শুনতে লাগল মুগ্ধ হয়ে। দু'চোখ ভরে দেখতে লাগল তার সৌন্দর্য্যরাশি। আনন্দে এবং শান্তিতে তার মন উঠল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে। আঘাতের সমস্ত স্মৃতি সে ভুলে গেল, ভুলে গেল মানুষের দেওয়া সমস্ত দুঃখ। সহসা সে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল গাছটাকে। তার পর মাটিতে উবুড় হয়ে ঘাসের মধ্যে ডুবিয়ে দিল তার মুখ। আনন্দে বিহ্বল হয়ে হাসতে লাগল সে। জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সুষমা এবং মায়া তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল; প্রবেশ করল তারা ক্রিস্তফের প্রাণের পরতে পরতে। পৃথিবীকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে বিহ্বল কণ্ঠে সে বলতে লাগল :

এত সুন্দরী তুমি পৃথিবী! কিন্তু হায়, মানুষ কেন এমন কুৎসিত? আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমারই। ওরা তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে। ওরা যা খুশী তাই করুক। আমাকে যত পারে ওরা দুঃখ দিক্। দুঃখও জীবন।

জীবনকে ভালবেসে ক্রিস্তফের আর মরা হ'ল না। প্রকৃতির রূপসাগরের মধ্যে মনকে ডুবিয়ে দিতে পারলে সব দুঃখকে আমরা জয় করতে পারি। ক্রিস্তফের মত যার responsive sensibility আছে, জীবনের সৌন্দর্য্যের এবং সুষমার আহ্বানে চিত্ত যার সাড়া দিতে পারে—অস্তিত্ব তার কাছে কোনকালেই দুর্ব্বহ বলে মনে হবে না। আর সৌন্দর্য্য এবং সুষমা নেই কোন্ খানে? চোখ মেলে দেখবার লোকেরই অভাব। রবীন্দ্রনাথ চোখ মেলে পৃথিবীকে দেখেছিলেন, সে দেখার মধ্যে ছিল অসীম কৌতূহল আর সেই দৃষ্টি ছিল বলেই এমন অপূর্ব্ব সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন :

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে;
নদীর এপারে ঢালুতটে
চাষী করিতেছে চাষ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।
চলে কি না চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী নিমেষ নিহত

আধজাগা নয়নের মত।
পথখানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন আঁকা
চলেছে মাঠের ধারে—ফসল-ক্ষেতের যেন মিতা—
নদীসাথে কুটিরের বহে কুটুম্বিতা।
ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম ওই শূন্য মাঠ
ওই খেয়াঘাট
ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচখি কাকলী-কল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা—এই সব ছবি
কত দিন দেখিয়াছে কবি! (বলাকা)

যারা এই রকম করে জীবনকে স্বীকার করতে পারলে, দেখতে পারলে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য, তারাই যুগে যুগে সৃষ্টি করেছে সাহিত্যের সেই রসলোক যেখানে মানুষ খুঁজে পেয়েছে তাদের প্রাণের আরাম, চিত্তের সান্ত্বনা, পিপাসার অমৃত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দুইখানি পত্র

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দুইখানি মূল্যবান পত্র এখানে প্রকাশিত হইল। জাতিভেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট অস্পৃশ্যতা তাঁহার মত মনীষী ও সমাজহিতৈষী মহাপ্রাণ পুরুষকে কিরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখ দিত, পত্র দুইটিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। যে প্রসঙ্গে তিনি পত্র দুখানি লেখেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

১৯৩২ সনে দৌলতপুর কলেজের নমঃশূদ্রাদি ছাত্রগণ কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আশানুরূপ সদ্ব্যবহার না পাইয়া বাংলার সর্ব্বজনমান্য বহু নেতার নিকট তাহাদের দুঃখের কথা জানাইয়া পত্র লেখে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাহাদের সেই পত্র পাইয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। পত্র দুইটির ছত্রে ছত্রে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

উক্ত পত্র যখন প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট পৌঁছে, তখন তাঁহার (ফরিদপুর জেলার) গোপালগঞ্জ যাইবার কথা চলিতেছিল। সেখানকার নীরব কর্ম্মী "গোপালগঞ্জের গান্ধী" শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে গোপালগঞ্জের সন্নিকটস্থ উলপুরের এক কৃষক সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

গোপালগঞ্জ অঞ্চলে কয়েক হাজার বিঘা জমি সর্ব্বদা জলে ডুবিয়া থাকিত। সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ জমি যে কখনও উদ্ধার করা সম্ভব হইবে, তাহা কেহ ভাবিতে পারিতেন না। ঐ জমির মালিক প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার-বর্গও হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ অসীম অধ্যবসায়বলে, তাঁহার ভক্ত বহু সহস্র নমঃশূদ্র ও মুসলমানের সাহায্যে ঐ সমস্ত জমি উদ্ধার করিয়া অসাধ্যসাধন করেন।

তিনি তাঁহার ঐ ভক্তদের সাহায্যে বাঁধ বন্ধন এবং ক্রোশ-ব্যাপী খাল খননের দ্বারা ঐ বিষয়ে সাফল্য লাভ করেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি যখন কলিকাতায় বসিয়া ঐ খবর পান, তখন তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাহার পর ঘটনাস্থলে গিয়া ঐ বিরাট কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হন এবং চন্দ্রনাথকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

দুইটি পত্রেই উপরোক্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে।

দৌলতপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃগণ মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানমতে ঐ কলেজ চালাইবার চেষ্টা করিতেন। মনুতে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের প্রতি যেরূপ আচরণের আদেশ আছে, তাহা তাঁহারা নিজেদের অন্ধবিশ্বাসমত মানিয়া চলিতেন। তাঁহাদের ধারণায় এ যুগে যাঁহারা অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারা কিন্তু ঐ বিধান মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাহা লইয়াই বিরোধ ঘটিয়াছিল। তখন কোনমতে সেই বিরোধের মীমাংসা করিয়া, জোড়াতালি দিয়া যে সনাতন বিধি রক্ষিত হইয়াছিল, আজ পাকিস্থানে পড়িয়া তাহা চুরমার হইয়া গিয়াছে।

University College of Science
and Technology
Department of Chemistry
92, Upper Circular Road
Calcutta...12.12...1932

কল্যাণবরেষু

তোমাদের ৯ই তারিখের পত্র পাইয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম। বাস্তবিক জাতিভেদ তৎসংশ্লিষ্ট অস্পৃশ্যতারূপ বিষ হিন্দু-সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আজ যে আমরা ৭০০ বৎসর পরাধীন হইয়া বিদেশীর জুতা, লাথি ইত্যাদি খাইতেছি, আর কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি ; তাহা তোমরা বিদিত আছ। এই পাপ দূরীভূত না হইলে কখনই জাতিগঠন হইতে পারে না। দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল হইল, মহামতি Æsop উপন্যাসছলে ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন : The belly and the other members—তাই আজ হিন্দু-সমাজ পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিবর্জ্জিত। আমি "বর্ণাশ্রম" বিশ্বাস করি না; হিন্দু-ভারত ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথায়ও এই অভিশাপ নাই। ৪৫ কোটি চীন। ইংরেজ ও আমেরিকার লেখকগণ একবাক্যে বলেন যে Untouchability has been unknown there for the last three thousand years and China is the least caste-ridden in the world ; ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যদিও জাতিভেদ নাই, কিন্তু dollar ও gold worship আছে। Chinaতে তাহাও নাই।

২৯শে ডিসেম্বর Barisal Express-এ রওনা হইয়া গোপালগঞ্জ সন্নিকট উলপুর আমার যাইবার কথা আছে, সেখানে নাকি ১০।১৫ হাজার নমঃশূদ্র প্রজা ও মুসলমান রায়তও সমবেত হইবে ; তাঁহারা নাকি সমবেত চেষ্টায় বাঁধবন্দি করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। সেখানে বিরাট জনসভা ও প্রদর্শনী হইবে। ফেরতাবেলা অর্থাৎ আন্দাজ ১লা জানুয়ারী খুলনায় halt করিতে পারি, তবে তখন তোমাদের কলেজ বন্ধ থাকিবে। সেই সময় এ বিষয় আলোচনা করিতে পারি। অবশ্য আমি Daulatpur college-এ Trustee বা Board of council-এ নহি, সুতরাং আমি সাক্ষাৎভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না, তবে খুলনায় গান্ধীপার্কে যদি প্রতিবাদসূচক meeting কর, আমি উপস্থিত থাকিয়া মত প্রকাশ করিতে পারি। ফলকথা জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এখন প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা দরকার এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর যাহাতে তোমাদের সহিত "জলচল" হয়, তাহার ব্যবস্থা অচিরে করা কর্ত্তব্য। আর "কথায় চিঁড়ে ভেজে না।"

পুঃ—তোমাদের পত্রে কাহারও নাম না থাকায় লোক মারফৎ এই পত্র পাঠাইলাম।

শুভার্থী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

Calcutta..... 24. 12...1932

কল্যাণবরেষু,

তোমাদের ৭ই তারিখের পত্র পড়িলাম। যাহা যাহা লিখিয়াছ তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমি সম্প্রতি এক পুস্তক রচনা করিয়াছি। তাহাতে এই "বর্ণাশ্রম" ও অস্পৃশ্যতা হিন্দু-সমাজের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা দেখাইয়াছি। অন্যূন বিশ বৎসর যাবৎ আমার যাহা কিছু দুর্ব্বল শক্তি-সামর্থ্য তাহা ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার জন্য প্রয়োগ করিয়াছি। বর্ণাশ্রম সম্বলিত অস্পৃশ্যতা কোন ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না। ইহাকে আমি উপধর্ম্ম, অপধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও পৈশাচিক ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করি। আজও পর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজ এই বিষ পোষণ করায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সাড়ে সাত শ' বছর যাবৎ পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিধান করিয়া বসিয়া আছে। কত কুলীন ব্রাহ্মণ তাহার নিজ-ভবনের সন্নিকটে হাড়িনী, ডোমনী, ইত্যাকার উপপত্নী প্রকাশ্যে রাখিয়া বাইরে টিকীধারী ও নামাবলী গায় দিয়া হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্যপ্রচার করিতেছেন! লেমনেড, সোডা, বরফ পান করিতে দ্বিধা নাই, অথচ তথাকথিত অস্পৃশ্য আমার রান্নাঘরের চৌকাটের ভেতরে পা দেয় তখনই আমার ভাতের হাঁড়ি ও জলের কলসী অপবিত্র হইয়া গেল!! অথচ কুকুর বেড়াল আস্তাকুড় বেড়াইয়া পচা ইন্দুর বা গোমাংস ভক্ষণের পর রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া ভাতের পাত হইতে মাছের মুড়াটি মুখে করিয়া চলিয়া যাইতেছে অথবা দুধের কড়ায় চপ্ চপ্ করিয়া দুধ পান করিতেছে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র মনে বিকার হয় না। হায়রে হিন্দুধর্ম্ম !!! ইহা এখন কেবল কতকগুলি দূষিত কদাচারের সমষ্টিমাত্র।

আমার ২৯শে তারিখ বরিশাল Express-য়ে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় ষ্টীমারে উঠিবার কথা এবং শুনিয়াছি সেই ষ্টীমার রাত্রিযোগে চলিয়া ৩০শে অতি প্রত্যুষে উলপুরে যায়, সেখানে ঐ তারিখে Exhibition খুলিতে হইবে এবং পরদিন নাকি mass meeting হইবে—ইহার উদ্যোক্তাগণ আমাকে বলিয়াছেন যে, অন্যূন ১০।১২ হাজার নমঃশূদ্র এবং কতক মুসলমান (ইহারা প্রায়ই কৃষক শ্রেণীর) সমবেত হইবেন। আমার ফিরিতে ১লা অথবা ২রা জানুয়ারী হইবে। তখন X'mas ছুটি। সুতরাং তোমরা mess-য়ে নাও থাকিতে পার। নচেৎ আমার সঙ্গে Ry. Stn. বা ষ্টীমারে দেখা করিতে পার। শুভার্থী—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

৮০নং টালীগঞ্জ রোডস্থ দ্বাদশ শিবালয়ের একাংশে। দ্বারপার্শ্বের অষ্টশাল দুইটির পরচালা লক্ষণীয়

[শ্রীঅনাথনাথ মণ্ডলের সৌজন্যে

কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

৩

আদি গঙ্গার উভয় তীরে পুণ্যার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে পরিচয় প্রচ্ছন্ন তাহার সাক্ষীরূপেই যেন দেবমন্দিরসমূহের অবস্থিতি। ৮০নং টালীগঞ্জ রোডে ক্ষীণস্রোতা সুরধুনীর সৈকত-সন্নিধানে একটি ঠাকুরবাড়ী দুই ভাগে বিদ্যমান। একাংশে একটিমাত্র অষ্টশাল। উহা সম্মুখে থামযুক্ত ত্রিচূড় —চূড়ায় দুই থাক আমলার উপর বিষ্ণুচক্র। মন্দিরের দেবতা শ্রীরাধা মদনমোহন। উহার গাত্রে এই রেখালিপিটি আছে :

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শুভমস্ত শকাব্দা: ১৭৫০ সন ১২৩৫। কীর্ত্তি শ্রীউদয়নারায়ণ দাস মণ্ডল সাকিম বাওয়ালি।

মন্দিরের সম্মুখে নাট্যমন্দির ও চত্বরের চারিদিকে প্রাচীরের গাত্রে কক্ষরাজি।

অপরাংশে চত্বরের চারিদিকে মোট তেরটি মন্দির। দক্ষিণ-পশ্চিমেরটি খাঁজযুক্ত চূড়াবিশিষ্ট পঞ্চরত্ন। বাকী মন্দিরগুলি অষ্টশাল। উত্তরদিকের দ্বারের উভয় পার্শ্বের দুইটি অষ্টশাল পরচালাযুক্ত। এরূপ পরচালা কলিকাতায় আর নাই। দ্বাদশটি অষ্টশালেই শিবলিঙ্গ আছে। পঞ্চরত্নে কোন দেবতা নাই। চত্বরের অগ্নিকোণে একটি চতুঃশাল রাসমঞ্চ। নৈঋত কোণের পঞ্চরত্নটির ঠিক উত্তরের অষ্টশালে একটি পোড়ামাটির ফলকে লিপি ছিল; এখন উহা নোনা ধরিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফলকটির উত্তর প্রান্তে উপর হইতে নীচে মাত্র এই অক্ষরগুলি অবশিষ্ট আছে। ৩১ (?) তটে, ৩১ বৈ, ভামাসি, শ্রীশ্রী—মোট পাঁচ সারি। লবণাক্ত-ভূমির মন্দিরে পোড়ামাটির লিপি কম। এইটি লুপ্তপ্রায়।

৮৬এ টালীগঞ্জ রোডে একটি ত্রিচূড় অষ্টশাল এখন দেবতাবর্জ্জিত হইয়া উদ্বাস্তর আশ্রয়-শিবিরে পরিণত। উহার চূড়ায় দুই থাক কলস ও ত্রিশূল। সম্মুখের অলিন্দে দুইটি অর্দ্ধ থামযুক্ত খিলান।

১৩নং টালীগঞ্জ রোডে দশটি অষ্টশাল শিবালয় ও একটি নবরত্ন—ইহার দুই পাশে দুইটি পঞ্চরত্ন। নবরত্নের দেবতা গোপাল ও গোবিন্দ। মন্দিরসমূহের অলিন্দ ও চত্বর মর্ম্মরমণ্ডিত। পঞ্চরত্ন ও নবরত্নের উপরিস্থ দেউলগুলি খাঁজবিশিষ্ট। ঠাকুরবাড়ীর বহির্দ্বারের উভয় পাশে মর্ম্মরফলকে রেখালিপি। উহাতে মন্দির-প্রবেশের শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের সহিত কৃতীর দিব্য বা শপথবাক্য খোদিত আছে। প্রবেশপথের বামভাগের লিপির ফলকটি দীর্ঘতর, ডাহিনেরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

বাম পাশের ফলকের লিপি :

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তা। যানৈর্ব্বা পাদুকৈর্ব্বাপি শিবিকা ছত্রধৃত্যথা। গঙ্গাস্নানেন গন্তব্য দেব দেবালয়েষু চ। ইতি পদ্মপুরাণ সংহিতায়াং। অস্যার্থ। ১।

সকলের চরণে আমার এই নিবেদন। দেবালয়ে যাইতে

না করি আরোহণ। নিষেধ বিধি কহি কিছু সভার অগ্র-ভাগে। গাড়ি পালকি ঘোড়া গজাদি নিষেধ আগে। পাদুকা পাদেতে আর শিরে ছত্র ধরে। না যাইবে গঙ্গাস্নানে দেবের মন্দিরে। মুনিবাক্য হেলন করে যাইতে যাহার মন। শপথ আছয়ে প্রবেশ করিতে বদন।

গোপালস্যৈক হর্ম্ম্যং প্রণতি মত শিরাস্তত মধ্যে করোতি।
দাসস্তৎ প্যারিলালোভুবি হরিহরধামেতি নাম্নাপ্রকাশং।
মুরারি মুরলিছিদ্রৈ কুমার বদনঃ রত্নাকর শুধাকর শাকের গগনঃ
কুম্ভে সপ্তবিংশতি দিবসে শুভক্ষণেঃ শুভারম্ভ সুরশৈবলিনী
সন্নিধানেঃ।

পরিত্যক্ত ত্রিচূড় অষ্টশাল, ৮৩এ টালীগঞ্জ রোড
[ফটো—লেখক

ত্রিচুড় অষ্টশাল, ৯৩নং টালীগঞ্জ রোড
[ফটো—লেখক

আরম্ভ সন ১২৫২ সাল তারিখ ২৭ ফাল্গুন পিভিষ্টা সন ১২৫৩ সাল তারিখ ৩১ চৈত্র। শ্রীপ্যারিলাল দাস। শ্রীমণি-মোহন দাস।

লিপির বাংলা অংশের অর্থ সরল। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণসহ প্রবেশের বিধিনিষেধ ও শপথযুক্ত সবিনয় অনুরোধ লিপিটিকে একটি অভিনব রূপ দিয়াছে। কৃতীর শ্রদ্ধালু বিনম্র মূর্ত্তি ও শাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাসের এরূপ নিদর্শন দুর্লভ। ডাহিনের মর্ম্মরফলকে রেখালিপি :

শকাব্দা ১৭৬৭। এই শ্রীশ্রী৺ বাটীতে কেহ পাদুকা পায়ে দিয়া জাইবেন নাই জে জাইবেন তাহাকে তালাক—সন ১২৫২ সাল।

বচনটির রূঢ়তাকে আবৃত করিয়া কৃতীর অন্তরের খানিকটা দরদ এই লিপিটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বারের ভিতরে অঙ্গনের ডাহিনে কাল পাথরে রেখা-লিপি :

শাকে শৈলাদ্রৈ নৈর প্রমিত ইহ ঘটে তেন সপ্তাদ্ধি মাসে।
গৌরী জানেশিশাস্তৎ সুরধুনিতটগং দ্বাদশং সংজ্ঞা চ।
বাণীসংখ্যা কাশীপতি সানন্দে বেষ্টিতঃ মধ্যে নবরত্নে শ্রীগোপাল
বিরাজিতঃ।
বাল্যবেশে নন্দী আসে ভঙ্গী মনোহরঃ তুলনা কি দিব রূপ জিনি
জলধরঃ।
অট্টালয় নাম হৈল হরিহরধামঃ প্যারিলাল দাসের আশা লইতে
হরিনামঃ।

সংস্কৃত লিপির ছন্দ স্রগ্ধরা। উহারই মর্ম্ম বাংলা কবিতা। ইহা শান্ত রসের দ্যোতক। দুইটি বিন্দু বিরামচিহ্নরূপে ব্যবহৃত। মুরারি মুরলি ছিদ্রে সাত, কুমার বদনে ছয়, রত্নাকরে সাত ও শুধাকরে এক বুঝাইতেছে। বাণীসংখ্যা কাশীপতি বলিতে দ্বাদশ শিব। বর্ণাশুদ্ধি লক্ষণীয়। কৃতী প্যারীলাল এই আদি গঙ্গাতীরস্থ ঠাকুরবাড়ীকে পৃথিবীতে হরিহরধামরূপে পরিচিত করিবার অভিলাষী। মনে হয়, ইহা খিদিরপুরের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পরিখাবেষ্টিত জলাশয় উপবনাদি-শোভিত প্রাসাদমধ্যস্থ ঠাকুরবাড়ীর ভূকৈলাস নামকরণের অনুকরণ। ভূকৈলাসের মন্দিরগুলি হরিহরধামের-মন্দির-

সমূহ অপেক্ষা প্রাচীন। চৈত্র মাসের শেষে রাসযাত্রা হরিহরধামের প্রধান উৎসব। ইহা বলরামের রাসযাত্রা নামে কথিত। এই সময় এখানে একটি মেলা বসে। ইহাতে স্থানটি কিছুদিনের জন্ম উৎসবমুখর হইয়া উঠে।

এই স্থানের অদূরে কেওড়াতলার মহাশ্মশান। উহার মধ্যে একটি বিরাট নবরত্ন সমাধি শিবালয়। উহার লিপি :

নম শিবায় Maimensing Memorial. জেলা ময়মন সিং আঠার বাড়ী নিবাসী ৺মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরীর শ্মশান মন্দির।

ইহার দেউলগুলি খাঁজযুক্ত। লিপিতে কোন সন তারিখ নাই।

নিকটে ৺নকুলেশ্বর শিবের আস্তানা ও ৺মহাকালীর বিরাট অষ্টশাল। ইহাতে কোন প্রাচীন লিপি নাই। অষ্টশালের সু-উচ্চ পীঠের গহ্বরে দক্ষিণা-কালীর প্রস্তরমূর্ত্তি, সম্মুখে নাট্যমন্দির। কালীঘাটের এই মহাকালীর আস্তা-নাই কলিকাতাকে তীর্থের মর্য্যাদা দিয়াছে। রুদ্রযামলতন্ত্রের মতে এই কালী সমগ্র বঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তন্ত্রচূড়ামণি বলেন, এখানে সতীর দক্ষিণ পদের অঙ্গুলিসকল পড়িয়াছিল, নকুলেশ এখানকার ভৈরব। কালীদেবতা সর্ব্বসিদ্ধিকারিণী। ইহা কালীপীঠ নামে আখ্যাত। বহুকাল ধরিয়া এই তীর্থ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শক্তিসাধক ভক্ত হিন্দুকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন। গঙ্গার আদিখাতের সান্নিধ্যে ইহার প্রভাবেই স্থানটি পবিত্রতম বিবেচিত হওয়ায় পুণ্যার্থী ধনবানগণ সুদূর অতীত কাল হইতেই এখানে মঠ, মন্দির, ধর্ম্মশালা, যাত্রীনিবাস, আরোগ্যশালা, তীর্থ-সোপান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপর।

ভূকৈলাস, হরিহরধাম প্রভৃতি ইহার প্রভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের প্রধান দেবতা কার্ত্তিকেয়ের সুবর্ণ-গঠিত মূর্ত্তিও বৎসরের কোন বিশেষ সময়ে এখানে অধিষ্ঠান করেন। স্থানটি তীর্থক্ষেত্র, কিন্তু স্বার্থপর পূজক, পাণ্ডা, ব্যবসায়ী ও ভিক্ষুকের সংখ্যাধিক্য ইহার মহিমাকে কতকটা খর্ব্ব করিয়াছে। কালীঘাটের এই মন্দিরটিও কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে খুব প্রাচীন নহে। উত্তর কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটায় নাকি দেবীর আদি অধিষ্ঠান ছিল—ইহা কোন কোন পুরাতাত্ত্বিকের মত। বৎসরের বিশেষ বিশেষ পর্ব্বে সমাগত জনতার চাপে এখানে ভক্তের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।

৮০নং টালীগঞ্জ রোডস্থিত শ্রীরাধামদনমোহনের অষ্টশাল

[শ্রীঅনাথনাথ মণ্ডলের সৌজন্যে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাটীর অষ্টশাল দুইটির বৈশিষ্ট্য আছে। যেন দুইটি কুটীর উপরি-উপরি স্থাপিত।

কলিকাতার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ইটালি পল্লীর দেব লেনের আনন্দ-কাননের দক্ষিণভাগে ছয়টি অষ্টশাল শিব-মন্দির আছে। উহাদের প্রত্যেকটির তিনটি চূড়ায় কলস-ত্রয়, ঘণ্টা ও কলক-উল্টানো ত্রিশূল শোভিত। পূর্ব্বদিক হইতে প্রতি মন্দিরের শিবলিঙ্গের নাম—লোকনাথ, বৈদ্য-নাথ, বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, পশুপতিনাথ ও অমরনাথ। কেদারনাথ মন্দিরে লিপি : "শ্রীদেবনারায়ণ দেবেন স্থাপিতং সন ১২৬১।৩১ চৈত্র।" স্থানটি পুষ্পোদ্যানে রমণীয়। শিব-লিঙ্গগুলির নাম দেখিয়া মনে হয় কৃতী প্রতিষ্ঠাতা পুরীধামের লোকনাথ ও অন্যান্য তীর্থের বিখ্যাত শিবলিঙ্গসকল দর্শনান্তে

৺গোপালের নবরত্ন, ১৩নং টালীগঞ্জ রোড
[ফটো—লেখক

কালীঘাটে শ্রীকালীমাতার অষ্টশাল ও নাটমন্দির।
চূড়ায় দুই সারি আমলা
[ফটো—লেখক

ফিরিয়া সেই সেই তীর্থের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্বীয় প্রতিষ্ঠিত শিবালয়গুলির অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের ঐরূপ নামকরণ করিয়াছেন। প্রবাদ—এই সকল মন্দির-প্রতিষ্ঠা সময়ে সমাগত অধ্যাপকগণকে বিদায় কে দিবেন ইহা লইয়া বিতর্ক হইলে, খ্যাতনামা শম্ভুনাথ পণ্ডিত দেবনারায়ণকেই দিতে বলেন। তিনি বলেন, "আমি কি দিব।" শম্ভুনাথ বলেন, "তোমার নামের আগে দে পরে দে, তুমি দিবে না ত দিবে কে ?"

মহানগরীর অন্যান্য অঞ্চলের মণ্ডপগুলির মধ্যে জান বাজারের রাণী রাসমণির জামাতৃগণের মণ্ডপপঞ্চকই উল্লেখযোগ্য—ইহাদের পূর্ব্বাংশেরটি চকমিলানের পূর্ব্বদিকে, বাকীগুলি উত্তরাংশে। ভবানীপুর অঞ্চলে বসু-পরিবারের মণ্ডপ প্রাচীনতম। ইটালীর দেবনারায়ণ দেবের মণ্ডপ দুইটি—একটি চকমিলান প্রাসাদ-মধ্যে উত্তরাংশে, অপরটি আনন্দ-কাননে পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। অট্টালিকারণ্যের নিবিড়তায় মণ্ডপরাজির সন্ধান ও প্রাচীনতা-নির্ণয় দুরূহ।

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বর্ত্তমান বিধান সভার অধিবেশনে অনেক সদস্যই পল্লী অঞ্চলের শোচনীয় অবস্থা এবং উহার উন্নতিসাধনের কথা বলিয়াছেন। পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু সদস্যগণের অধিবেশনের আলোচনা বাস্তবে কি রূপ পরিগ্রহ করিবে সে সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ আছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে কোন-না-কোন বিষয়ের উন্নতি-সাধনের চেষ্টায় যে কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। সুতরাং পল্লী অঞ্চলের উন্নতিসাধনের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। কয়েকটা হাসপাতাল ও শিক্ষালয় স্থাপন, স্থানে স্থানে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, জল সেচনের বা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, কৃষির উন্নতির জন্য এখানে সেখানে অল্প পরিমাণ সার, বীজ, কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহ, অধিকতর ফসল উৎপাদনের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে অধিকতর পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দান প্রভৃতির দ্বারা পল্লী অঞ্চলের স্থায়ী কোন উন্নতি সাধিত হইবে না। পল্লী অঞ্চলের উন্নতিসাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কৃষির এবং কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট কুটীর শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। এমন সব শিল্পের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে যাহাতে পল্লী অঞ্চলের বেকার যুবকগণ নিজেদের গ্রামে অবস্থান করিয়া সেই সকল শিল্পে নিজেদের নিযুক্ত করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে। যান্ত্রিক শিল্পের প্রতিযোগিতায় তাহারা যেন হটিয়া না যায় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা ছাড়া এমন ব্যবস্থাও করিতে হইবে যাহাতে কৃষিজাত এবং শিল্পজাত পণ্যসমূহ সহজে এবং উচিত মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। পল্লী অঞ্চলের প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের শিল্পের প্রবর্ত্তন করাই বাঞ্ছনীয় যাহাতে পল্লী অঞ্চলেই উহাদের কাটতি সহজসাধ্য হয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হইতেছে—স্বাস্থ্যের উন্নতি। পল্লী অঞ্চলের স্বাস্থ্যের যে কি পরিমাণ অবনতি ঘটিয়াছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের জন্যও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ ব্যাধির সুচিকিৎসারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয় বিষয়টি হইতেছে—রাস্তা, ঘাট প্রভৃতির উন্নতি সাধন। ইহাদের অভাবে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসিগণের দুর্গতির সীমা নাই।

চতুর্থ বিষয়টি হইতেছে—ভবিষ্যৎ নাগরিক প্রস্তুতের ব্যবস্থা। ইহার জন্য চাই বিভিন্ন রকমের উপযুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ছাত্রদের শিক্ষার জন্য সংগঠনমূলক নানাবিধ কার্য্যের প্রবর্ত্তন।

আরও অনেক বিষয় আছে তাহাদের আর উল্লেখ করিলাম না।

সমাজ-সংগঠনের (community project) নূতন পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম বাংলায় আটটি 'ব্লক' ছোট ছোট জনপদ বা টাউনসিপ গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পশ্চিম বাংলার আয়তন ও প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতি সামান্য প্রচেষ্টা; অথচ ইহার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হইবে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে নগর স্থাপিত না করিয়া পল্লী অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে কেবল মাত্র "পল্লী উন্নয়নে"র প্রচেষ্টার পথে কোন অন্তরায় থাকিতে পারে না; মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ অনুসারে কয়েকটি স্থানে কেবল গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি। অবশ্য জানি এই অনুরোধ "অরণ্যে রোদন" মাত্র হইবে।

সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম গিয়াছিলাম, শুনিলাম 'কমিউনিটি প্রোজেক্ট পরিকল্পনা' অনুসারে এই স্থানে একটি জনপদ বা টাউনশিপ গঠিত হইবে। স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা নাই, কোন উৎসাহও দেখিলাম না। যাহা হউক, দুই-একটা কথায় ঝাড়গ্রামের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার কথা কতকটা বুঝা যাইবে। সেখানকার কৃষি মহাবিদ্যালয় কৃষি-ক্ষেত্রের একজন শ্রমিকের মুখে শুনিলাম যে, সে মাসিক ৩৫৲ টাকা বেতন পায়। তাহার পরিবারে মোট আট জন লোক—প্রতিদিন এই আট জনের জন্য ৮ সের চাউল লাগে। তাহার জমি-জমা বিশেষ কিছু নাই। পরিবারে আর একজন উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি আছে, টাকায় দুই সের করিয়া চাল ক্রয় করিতে হয়। সে এই আয়ের দ্বারা কি ভাবে তাহার পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন চালায় এই প্রশ্ন করায় সে বলিল তাহার গরু, বাছুর, ঘটিবাটি, ঘরদোর প্রভৃতি সবই মহাজনের কাছে বন্ধক আছে। এই করুণ কাহিনী পল্লী

অঞ্চলের অসংখ্য লোকের নিকট হইতে শুনা যাইবে; কিন্তু ইহার প্রতিকার কে করিবে বা কিরূপে হইবে?

পল্লী অঞ্চলের উন্নতিকল্পে অনেক রকমের পরিকল্পনার কথা সংবাদপত্রে পাঠ করি, কিন্তু কোথায় কি ভাবে তাহাদের বাস্তব রূপ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের সাহায্যে পল্লী অঞ্চলের কোন্ স্থানে এবং কোন্ ক্ষেত্রে পল্লীবাসিগণ কি পরিমাণে উপকৃত হইয়াছেন তাহার বিশেষ পরিচয় পাই না। ভারত-সরকারের 'প্ল্যানিং কমিশনে'র সদস্য শ্রীগুলজারিলাল নন্দ বলিয়াছেন যে, absence of substantial signs of progress and achievement and a series of unexplained and inexplicable failures and mistakes অর্থাৎ এক কথায় ক্রমাগত সরকারী নীতির শোচনীয় ব্যর্থতা বর্ত্তমান পল্লীসমাজের মানসিক জড়তার অন্যতম প্রধান কারণ। কথাটা খুবই সত্য।

গত আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "পাড়াগাঁয়ের কথা"য় আমার একটি পুষ্করিণী সংস্কার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানাইয়াছিলাম। প্রায় দেড় বৎসর 'হয়রানির' পর আমার ঋণের আবেদন কি ভাবে বাতিল করা হইয়াছিল, তাহাও প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আবার এক পত্রে আমাকে জানান হইয়াছে যে, সেই পরিকল্পনা আবার মঞ্জুর করা হইয়াছে। হুগলী জেলার মৎস্য-কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন:

"Further to this office memo No. 92|TDS'P. dated 6. 2. 52, I am to inform you that the scheme in question has since been sanctioned.

"If you are still interested in taking the loan for improvement of 'Nai-Pukur' I am to request you to submit the detailed scheme as per *pro forma* already given to you . . ."

একটা প্রচলিত কথা আছে 'ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়'। এ ক্ষেত্রে সেই কথাই বার বার মনে হইতেছে।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে লিখিত "পাড়াগাঁয়ের কথা"য় কৃষি-বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। ঐ সম্পর্কে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত শ্রীফণীন্দ্রনাথ দত্ত (পোঃ হরিপাল, জেলা হুগলী) মহাশয়ের একখানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছিল। যুগান্তরে প্রকাশিত একখানি প্রতিবাদ-পত্রে দত্ত মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি পূর্ব্ব প্রকাশিত পত্রের লেখক নহেন। তাঁহার প্রতিবাদ-পত্রখানি এইরূপ:

"আমার নাম ফণীন্দ্রনাথ দত্ত; সন ১৩৫৯ সাল ১৩ই বৈশাখ তারিখের পত্রিকায় চিঠিপত্রের স্তম্ভে কৃষি বিভাগের অব্যবস্থা শীর্ষক আমার নামীয় চিঠিখানা পড়িয়া আমি বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলাম; অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানি না; উপরন্তু কৃষি বিভাগের সম্প্রসারণের পর আমরা বিশেষ ভাবে ইহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধায়ক সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পাইতেছি।"

দেখা যাইতেছে যে, যিনি প্রথম পত্রখানির প্রকৃত লেখক তিনি সৎসাহসের অভাবে নিজের নাম ও ঠিকানা দেন নাই; কিন্তু এমন কাঁচা কাজ করিয়াছেন যে তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল না, বরং কৃষি বিভাগ ভাল কাজের জন্য 'সার্টিফিকেট' পাইলেন। পত্র লেখকের এইরূপ আচরণ খুবই গর্হিত।

মিছিল

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

রাত্রি-দিবস ক্ষুব্ধ পান্থ চলে,
পৃথিবীর পথে চলে জনতার ভিড়।
আঁধারে আলোকে নিঃসীম নভোতলে,
খুঁজে খুঁজে ফিরে সে কোন্ স্বপ্ন-নীড়।

কত আকাঙ্ক্ষা, কত না উদ্দীপনা,
জেগে জেগে উঠে হ'য়ে যায় নিঃশেষ।

নিভে নিভে যায় প্রাণের বহ্নি-কণা
কত সঙ্গীত হারাইয়ে ফেলে রেশ।

অনন্ত পথ—অনন্ত দিবারাতি
শত দুঃখেও পান্থ শ্রান্তিহীন।
চলিয়ে মিছিল চলার নেশায় মাতি,
যুগ-যুগান্ত তা'র মাঝে হয় লীন।

শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-স্থান

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে গোকর্ণক্ষেত্র* হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ গিরি-শ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে। উক্ত শৈলমালা ভাষা ও দেশ ভেদে 'সহ্যাদ্রি', কোল পর্বত, মলয়গিরি প্রভৃতি নামে খ্যাত। গিরিশ্রেণী একটি সুপ্রাচীন পুণ্যময় ভূভাগের পূর্বদিকে মাল্যাকারে বেষ্টিত রহিয়াছে। বিশাল আরব সমুদ্র পশ্চিমে বিরাজিত থাকিয়া যেন সেই পুণ্য-তীর্থের পাদদেশ ধৌত করিয়া দিতেছে। এই পবিত্র ভূভাগ 'পরশুরামক্ষেত্র' নামে কথিত। শ্রীপরশুরাম স্বয়ং কর্মলেপরহিত হইয়াও লোকোপদেশার্থ মাতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য গোকর্ণক্ষেত্র হইতে কন্যাকুমারিকা-ক্ষেত্র পর্যন্ত বাণ প্রয়োগে সমুদ্রকে অপসারিত করিয়া তথায় এক নূতন ভূভাগ সৃষ্টি করেন এবং উহা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-গণকে দান করেন। এই পরশুরামক্ষেত্র উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত আদি কেরল, মধ্য কেরল, ও অন্ত্য কেরল—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। আদি কেরল উত্তর কর্ণাট ও দক্ষিণ কর্ণাট—এই দ্বিবিধ প্রদেশে পরি-গণিত। উত্তর কর্ণাটকে 'কানারিজ' ভাষা আর দক্ষিণ কর্ণাটকে 'তুলু' ভাষারই বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। এই দক্ষিণ কর্ণাটক প্রদেশই 'রজতপীঠপুর' বা 'রৌপ্যপীঠপুর' নামে প্রাচীনকালে পরিচিত ছিল।

ত্রিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে পরশুরামভক্ত রামভোজ নামক কোন ক্ষত্রিয় ভূপতি বিষ্ণুপ্রীতির জন্য একটি যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ করিয়া যজ্ঞবিদ্যানিপুণ কতিপয় ব্রাহ্মণের অনু-সন্ধানে তৎপর হইয়াছিলেন। কোথায়ও তাঁহার অভীষ্টা-নুযায়ী সুনিপুণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ দেখিতে না পাইয়া পরিশেষে পাঞ্চালদেশান্তর্বর্তী গঙ্গাতীরস্থ অহিচ্ছত্র দেশ হইতে কর্ম-কাণ্ডনিপুণ ও পরম পণ্ডিত এক শত বিশ জন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের কুটুম্বগণের সহিত স্বদেশে আনয়ন করেন। সেই সকল ব্রাহ্মণের বংশ অদ্যাপি পরশুরামক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। কাল-প্রভাবে তাঁহাদের কয়েকটি বংশ লুপ্ত হইলেও এখনও শতাধিক ব্রাহ্মণ-বংশ তথায় দৃষ্ট হয়। ইঁহারা সকলেই শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাবের পর মধ্বানুগত হইয়া 'মাধ্বব্রাহ্মণ' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। রামভোজ নৃপতি ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া যখন যজ্ঞস্থলীর শুদ্ধির নিমিত্ত স্বহস্তে লাঙ্গলাদি দ্বারা ভূমির শোধন করিতেছিলেন, তখন একটি বৃহৎ সর্প লাঙ্গলপরিসরে পতিত হইয়া আহতের ন্যায় দৃষ্ট হয়। রামভোজ নৃপতি তাঁহার সেই কার্যের প্রায়শ্চিত্তার্থ চতুঃ-সীমায় 'তাঙ্গোড়ু', 'মাঙ্গোড়ু', 'অরিতোড়ু' ও 'মুচ্চিলকোড়ু' নামক দেবালয় চতুষ্টয় নির্মাণ করাইয়া মধ্যস্থলে ক্রোশ-

শ্রীমধ্বাচার্য

ব্যাপী রজতময় পীঠ সংস্থাপন করেন এবং পীঠোপরি সুবর্ণ 'শেষ' মূর্তি প্রকট করিয়া তাঁহার পূজা বিধান করেন। কালে সেই পীঠ ভূগর্ভস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। যজ্ঞকালে ভগবান্ শ্রীপরশুরাম রজতপীঠস্থ সুবর্ণ-সর্প-ফণার অধোভাগে লিঙ্গাকারে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন। সেই শেষশায়ী 'অনন্তেশ্বর' নামক বিষ্ণুর পুরাতন দেবালয় অদ্যাপি উডুপীতে বর্তমান রহিয়াছে। রৌপ্যপীঠের (সিংহাসনের)

---

* উডুপী হইতে প্রায় ৫২ ক্রোশ দূরে সমুদ্রতটে উত্তর কানাড়া জেলায় অবস্থিত।

সংস্থান হেতু সেই স্থান (উড়ুপী) প্রাচীনকাল হইতে 'রজতপীঠপুর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

এই স্থানের 'উড়ুপী' নাম সম্বন্ধেও একটি পৌরাণিক উপাখ্যান আছে। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি সাতাশটি তারা চন্দ্রের পত্নী। ইহারা সকলেই দক্ষের কন্যা। চন্দ্র দক্ষের অপর কন্যাগণের প্রতি উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র রোহিণীতে আসক্ত ছিলেন। অপর কন্যাগণের প্রার্থনায় এইরূপ অসম ব্যবহারের জন্য দক্ষ চন্দ্রকে কলাহীন হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। চন্দ্র শাপগ্রস্ত হইয়া স্বীয় কলাক্ষয় পরিহারার্থ সেই পরশু-

রামক্ষেত্রে 'অজারণ্য'* নামক স্থানে তপস্যা দ্বারা রুদ্রকে তুষ্ট করেন। তখন রুদ্রদেব রজতপীঠক্ষেত্রস্থ বৃহৎ সরোবরটিতে আবির্ভূত হন এবং চন্দ্রের সম্পূর্ণ কলাক্ষয় নিবারণার্থ তাঁহাকে বিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, তাঁহার এক পক্ষে ক্রমে কলাক্ষয় এবং অপর পক্ষে ক্রমে কলাবৃদ্ধি হইবে। সেই সময় হইতেই কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের উদ্ভব হয়। উড়ুপ শব্দের অর্থ চন্দ্র। 'উড়ু' পদে নক্ষত্র এবং 'প'-পতি। চন্দ্রের তপঃপ্রসন্ন রুদ্রদেবতার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র বলিয়া এ স্থানের নাম 'উড়ুপী' হইয়াছে। যে সরোবরের মধ্যে রুদ্রদেব প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহার তট-প্রদেশে অধুনা শ্রীরুদ্র 'চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব' নামে খ্যাত হইয়া সুবৃহৎ দেবালয়াভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত আছেন।

উড়ুপী এই সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ 'উদিপি' শব্দটি ক্রমশঃ অধিক প্রচলিত হয়। তদনুসারে এই স্থান সাধারণতঃ 'উদিপি' নামেই আখ্যাত। বস্তুতঃ ইহার শুদ্ধ নাম 'উড়ুপী'। এই উড়ুপীরই নামান্তর রজতপীঠপুর, রৌপ্য-পীঠপুর, শিবাল্লী ইত্যাদি। কানারিজ ভাষায় 'শিবাল্লী বা শিববেল্লী' শব্দে শিবের রৌপ্য বুঝায়। উড়ুপীর অনন্তেশ্বরের রৌপ্য সিংহাসনের সহিত এই সকল নামের সংস্রব আছে।

পথের পরিচয়

উড়ুপী দক্ষিণ কানাড়া জেলার একটি ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যাল শহর এবং উড়ুপী তালুকের সদর। ইহা মাঙ্গালোর শহর হইতে ৩৭ মাইল উত্তরে এবং আরব সাগরের তট হইতে ৩ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত।

দ্বৈতবাদাচার্য শ্রীমধ্বের প্রধান গাদি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ মঠ এবং শ্রীঅনন্তেশ্বর ও শ্রীচন্দ্রমৌলীশ্বরের দুইটি প্রাচীন মন্দিরের অবস্থানহেতু উড়ুপীতে নানা দেশ হইতে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়।

দক্ষিণ দেশীয় অভ্যস্ত যাত্রীগণের নিকট উড়ুপী যাইবার পথ সেরূপ দুর্গম মনে না হইলেও বঙ্গদেশীয় যাত্রীদের পক্ষে বিশেষ দুর্গম। তথায় সমগ্র বৎসরে একজনও বাঙালী যাত্রীর সমাগম হয় কিনা সন্দেহ। বোম্বাই হইতে ষ্টীমার-যোগে সমুদ্রপথে উড়ুপী যাইবার একটি পথ আছে। তাহা অপেক্ষাকৃত সুগম ও সুলভ।

উড়ুপী যাইবার প্রধান পথসমূহের কথা নিম্নে উল্লিখিত হইল :

১। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ব্রড-গেজের শেষ ষ্টেশন মাঙ্গালোর হইতে উড়ুপীতে প্রত্যহ অনেকগুলি মোটর,-বাস যাতায়াত করে। তন্মধ্যে যে সকল বাস সমুদ্রতীরবর্তী পথ দিয়া চলাচল করে, সেই সকল বাসে আরোহণ করিলে মাঙ্গালোর হইতে উড়ুপী মাত্র ৩৭ মাইল পথ; কিন্তু তাহাতে চারি বার বাস বদল করিয়া নৌকায় নদী পার হইতে হয়। ইহাতে বাসভাড়া অপেক্ষাকৃত কম হইলেও শারীরিক ক্লেশ হয়, সময়ও বেশী লাগে। এই পথে গমনকালে মাঝে মাঝে সমুদ্র দেখা যায়।

২। মাঙ্গালোর হইতে মোটর বাসের আর একটি পথ আছে। পর্বত কাটিয়া মোটর চলাচলের জন্য রাস্তা

* উড়ুপীর শ্রীকৃষ্ণ মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরস্থ এই স্থানটিতে বর্তমান পুষ্পোদ্যান রচিত হইয়াছে। এই স্থানের পুষ্প দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয়।

নির্মিত হইয়াছে, ইহাতে চড়াই-উৎড়াইয়ের মধ্য দিয়া ৫৭ মাইল পথ যাইতে হয়। চতুর্দিকেই শ্যামল বিটপীশ্রেণী-শোভিত পর্বতমালার সুন্দর দৃশ্য। সেই প্রদেশের পার্বত্য পথে যাইতে যাইতে বহু কৃষ্ণবর্ণা গাভী দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা মাঙ্গালোর হইতে উডুপী পর্যন্ত এবং উডুপী হইতে পাজকাক্ষেত্র পর্যন্ত শত শত কৃষ্ণা গাভী দেখিয়াছি। "গোষু কৃষ্ণা বহু ক্ষীরা" এইরূপ কথা আছে; কিন্তু সেই প্রদেশের কৃষ্ণা গাভীগুলি অধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে না; তবে উহাদের দুগ্ধ সুমিষ্ট ও উহারা খর্বাকৃতি।

৩। মাঙ্গালোর হইতে কারকল* নামক স্থান ৩৩ মাইল। কারকল হইতে উডুপী ২৪ মাইল। মাঙ্গালোর হইতে কারকল দিয়া উডুপী পর্যন্ত ৫৭ মাইল পথ সরাসরি বাসে যাওয়া যায়। কোথাও নৌকায় নদী অতিক্রম বা 'বাস' পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। মাঙ্গালোর হইতে অপরাহ্ন ৫টার বাসে যাত্রা করিলে রাত্রি প্রায় ৮৷টায় সেই বাস উডুপী পৌঁছায়। বাস কারকলে কিছুকাল অপেক্ষা করে।

৪। সমুদ্রতীরবর্তী পথে বাসের ভাড়া মাঙ্গালোর হইতে উডুপী জনপ্রতি এক টাকা দুই আনা এবং কারকল হইয়া যে বাস যায়, তাহার ভাড়া দুই টাকা এক আনা এবং এক্সপ্রেস বাসের ভাড়া দুই টাকা এগার আনা। এক্সপ্রেস বাসে নির্দিষ্টসংখ্যক আসন থাকে। আমরা যে সময় (২৯শে কার্ত্তিক ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) মাঙ্গালোর হইতে উডুপী যাই, সেই সময় উডুপী হইতে অনেকগুলি বাস ঘন ঘন যাতায়াত করিত।

মাঙ্গালোর একটি বৃহৎ বাণিজ্য-নগর। মাঙ্গালোর ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে প্রায় দুই ফার্লঙের মধ্যে অনেকগুলি হোটেল ও সুরম্য বাসভবন আছে। মাঙ্গালোরে কাদ্রী ও মঙ্গলাদেবীর দুইটি প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান; এখানে তিনটি কলেজ ও অনেকগুলি স্কুল আছে—খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রচুর।

৫। বোম্বে ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর কতকগুলি ষ্টীমার অক্টোবর মাস হইতে মে মাস পর্যন্ত অর্থাৎ বর্ষার চারি মাস ব্যতীত অন্য সময়ে বোম্বাই হইতে মাঙ্গালোরে গমনাগমন করে। আরোহিগণ উক্ত কোম্পানীর ষ্টীমারে মাল্‌পী বন্দরে অবতরণ করিতে পারেন। মাল্‌পী বন্দর হইতে উডুপী মাত্র চারি মাইল; তথা হইতে পদব্রজে, মোটর-বাসে বা গো-যানে উডুপীতে যাওয়া যায়।

মোটর বাসের টিকিট এক দিন পূর্বে ক্রয় না করিলে যথাসময়ে বাসে স্থান পাওয়া যায় না। মাঙ্গালোর কম্বাইণ্ড বুক এজেন্সির সহিত পূর্ব হইতে বন্দোবস্ত করিলে দক্ষিণ-ভারতের তীর্থস্থান ও প্রধান প্রধান স্থানে ট্রেনের সময়ানুযায়ী গমনাগমনের মোটর-বাস পাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। মোটর-বাস এ প্রদেশে সর্বত্র চলাচল করায় প্রত্যেক বড় বাস-ষ্টেশনেই বিশ্রামগৃহ, ভোজনাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। উডুপী-মোটর-বাস ষ্টেশন হইতে উডুপীর শ্রীকৃষ্ণ মন্দির মাত্র তিন ফার্লং পথ।

শ্রীবাদিরাজ স্বামী (দ্বিতীয় মধ্বাচার্য)

উডুপী হইতে প্রায় আট মাইল পূর্ব-দক্ষিণ কোণে পাপনাশিনী নদীর তটে 'বিমানগিরি' নামক একটি উচ্চ পর্বত বিরাজিত। পুরাকালে পরশুরাম শিলাখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া সেই পর্বতের চতুষ্পার্শ্বে পরশুতীর্থ, ধনুস্তীর্থ, বাণ-তীর্থ ও গদাতীর্থ নামক কুণ্ডচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিমানগিরির শিখর-প্রদেশে পরশুরাম-স্থাপিত যোগমায়া একটি বৃহৎ মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজমানা থাকিয়া অধুনা অদমারমঠীয় মাধ্ব ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নিত্য পূজিতা হইতেছেন। বিমানগিরি হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে বাসুদেবতীর্থ বিরাজিত। ইহার সন্নিহিত প্রদেশেই

* কারকল উডুপীর ২৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত। এই প্রদেশ এক সময় জৈনরাজগণের অধিকারে ছিল—ইহার অনেক নিদর্শন অদ্যাপি এখানে দেখা যায়। একটি অখণ্ড প্রস্তরের ৪২ ফুট উচ্চ স্তম্ভ (জৈন-গোমাতার স্তম্ভ) একটি উচ্চ পর্বতের উপরে বাস-যাত্রিগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এখানে একটি সংস্কৃত কলেজ আছে।

'পাজকাক্ষেত্র'। পাতি ইতি 'প', ন জায়তে ইতি 'অজ', পশ্চাসৌ অজশ্চেতি পাজঃ, পাজাৎ কং (জলং) যস্মিন্ তৎ পাজকম্ অর্থাৎ উৎপত্তি-রহিত পরশুরাম-বিষ্ণু দ্বারা যে ক্ষেত্রে জল অর্থাৎ ধনুস্তীর্থাদির প্রকাশ হইয়াছে, তাহারই নাম পাজকাক্ষেত্র।

শ্রীমধ্বসরোবর (শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের পূর্বভাগে অবস্থিত)

এই পাজকাক্ষেত্রে মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন বেদবেদান্তকুশল সদাচাররত জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পুরাকালে রামভোজ নৃপতি অহিচ্ছত্র প্রদেশ হইতে যে এক শত বিশ জন ব্রাহ্মণকে পরশুরামক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের গৃহাদি নির্মাণ করেন। সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি গ্রামের মধ্যভাগে গৃহাদি নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন, তিনিই 'মধ্যগেহ' নামে পরিচিত হন। 'মধ্যগেহ' শব্দটিকে কন্নড় ভাষায় 'নড্ডন্তিল্লায়' বলা হয়। নড্ (মধ্য)+অন্ত (স্থ) ইল্লায় (গৃহবান্)। মধ্যগেহ-বংশোৎপন্ন পাজকাক্ষেত্রবাসী সেই সদাচাররত ব্রাহ্মণের নাম ছিল 'নারায়ণ ভট্ট'। তিনি তাঁহার সহধর্মিণী বেদবতী বা (বা বেদবিদ্যা) দেবীর সহিত পাজকাক্ষেত্রে বাস করিয়া পরশুরামপীঠস্থ স্বকুলদেবতা শেষশায়ী ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছিলেন। বেদবতীর গর্ভে একে একে দুইটি পুত্র জাত হইয়া অচিরকালমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মধ্যগেহ ভট্ট পুত্রসুখে বঞ্চিত হইয়া একজন দীর্ঘায়ু বৈষ্ণবপুত্র লাভ করিবার আশায় রজতপীঠপুরাধিপতি শেষশায়ীর (অনন্তেশ্বরের) ভজনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীশেষশায়ী ভগবান ভক্তিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-দম্পতির তপস্যার সমুচিত পুরস্কার দিয়াছিলেন।

এই পাজকাক্ষেত্রেই শ্রীবাসুদেব (মধ্বাচার্যের পূর্বাশ্রমের বা বাল্যকালের নাম) আবির্ভূত হন। এই ক্ষেত্রে বাসুদেবের (শ্রীমধ্বাচার্যের) আবির্ভাব-পীঠস্থান অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। উড়ুপী হইতে দক্ষিণ দিকে তিন মাইল অতিক্রম করিবার পর 'উদীয়াবর' নদী। যাঁহারা উড়ুপী হইতে ট্যাক্সি-যোগে সরাসরি পাজকাক্ষেত্রে গমন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ট্যাক্সিসহ চাপের নৌকায় উক্ত নদী পার হইতে হয়। দুইটি নৌকা পাশাপাশি একত্রিত করিয়া উহার উপর কাঠের বিস্তৃত পাটাতন ও দুই দিকে লোহার বেষ্টনী দিয়া উক্ত চাপের নৌকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ট্যাক্সি পারাপারের মাশুল পাঁচ টাকা। মাঙ্গালোর হইতে যাঁহারা সমুদ্রতীর-পথে চারিবার নদী পার হইয়া উড়ুপীতে মোটর-বাসে গমন করেন তাঁহাদিগকে শেষবার উক্ত নদী পার হইতে হয়। মোটর-বাস-যোগে যাঁহারা পাজকাক্ষেত্রে যান, তাঁহাদিগকে উদীয়াবার নদীর উত্তর তীরে বাস হইতে অবতরণ করিয়া খেয়ায় উক্ত নদী পার হইয়া দক্ষিণ পার হইতে অন্য বাসে চড়িয়া পাজকাক্ষেত্রে যাইতে হয়। উক্ত নদীর দুই পার্শ্বে শ্যামলসুন্দর নারিকেলকুঞ্জ শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় নারিকেলকুঞ্জ-শোভিত ভূখণ্ড আছে। নদীটি প্রায় ১॥ ফার্লং প্রশস্ত হইবে—খুব গভীর নহে। এ প্রদেশের মহিলাগণও উদীয়াবার নদীপথে ছোট ছোট ডোঙ্গায় নানাস্থানে গমনাগমন করেন। উদীয়াবার নদীর সহিত পাপনাশিনী মিলিত হইয়াছে। নদীতে চড়া পড়ায় সোজাসুজি নৌকায় পার হওয়া যায় না। কতকটা অন্য দিকে গিয়া নদী পার হইতে হয়। নদী পার হইবার পর আরও পাঁচ মাইল অতিক্রম করিলে পাজকাক্ষেত্র পাওয়া যায়। পাজকাক্ষেত্রের প্রায় অর্ধ মাইল পূর্বদিকে পরশুতীর্থ; পাজকাক্ষেত্রের পশ্চিমে ও বিমানগিরিস্থ যোগমায়া-মন্দিরের দক্ষিণ দিকে বাণতীর্থ। এই তীর্থের জলের দ্বারা শ্রীযোগমায়ার অভিষেকাদি হয়। যোগমায়া মন্দিরের উত্তরে এবং পরশুমন্দিরের নিম্নে গদাতীর্থ। পাজকাক্ষেত্রস্থ মঠের পূর্বদিকে প্রায় তিন মাইল দূরে পর্বতের উপরে ধনুস্তীর্থ অবস্থিত। পাজকাক্ষেত্রে শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-পীঠের উত্তর-পূর্ব কোণে 'বাসুদেবতীর্থ' নামক একটি সুপ্রাচীন সরোবর (কুণ্ড) আছে। মধ্যগেহ ভট্ট ও বেদবতী পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত বিমানগিরির চতুষ্পার্শ্বস্থ চারিটি তীর্থে (পরশুতীর্থ, ধনুস্তীর্থ, বাণতীর্থ ও গদাতীর্থে) প্রত্যহ স্নান করিতেন। বিমানগিরি কেন্দ্রস্থলে ছিল। একাদশীর উপ-

বাসের পরদিবস কোন এক বিশেষ দ্বাদশীতে অত্যল্পকালমাত্র পারণকাল অবশিষ্ট ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে চারিটি তীর্থে স্নান সমাপন করিয়া তিথির সম্মানরক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। এই কারণে বাসুদেবের মাতাপিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের সন্তোষবিধানার্থ বালক বাসুদেব পাজকাক্ষেত্রে তাঁহার গৃহের সন্নিকটে সমস্ত তীর্থের সমাবেশ করিয়া একটি তীর্থ প্রকট করেন। বাসুদেবের নাম হইতেই সেই সরোবরের নাম হইল 'বাসুদেব তীর্থ'। মাতাপিতা বালক-পুত্রের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করায় বাসুদেব তাঁহাদের প্রত্যয়ের জন্য একটি আল (বট) বৃক্ষ আনয়ন করিয়া উর্ধ্বদিকে উহার মূল ও নিম্নদিকে পত্রাদি রাখিয়া একাদশী দিবসে উক্ত সরোবরের তটে রোপণ করিয়া বলিলেন, "যদি দ্বাদশীতে উর্ধ্বভাগস্থ বৃক্ষমূলে অঙ্কুরোদগম হয়, তবেই আমার কথায় তোমরা আস্থা স্থাপন করিও।" মাতাপিতা বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং দ্বাদশী দিবস প্রত্যুষে সত্য সত্যই উক্ত বটবৃক্ষের উর্ধ্বভাগে অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। তখন বাসুদেবের কথায় নারায়ণ ভট্ট ও বেদবতীর বিশ্বাস জন্মিল এবং তথায় সমস্ত তীর্থের আগমন হইয়াছে জানিয়া তাঁহারা উক্ত সরোবরে স্নানান্তে দ্বাদশীর পারণ করিলেন। তদবধি ঐ সরোবরটি 'বাসুদেবতীর্থ' নামে খ্যাত হইল। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বেও সেই স্থানে উক্ত বৃক্ষটি প্রকট ছিল। যাঁহারা স্বচক্ষে উহা দর্শন করিয়াছেন, এরূপ কয়েক জন আমাদের নিকট বিষয়টি বর্ণনা করিলেন। শ্রীমধ্বাচার্যের জন্মপীঠের পূর্বদিকে কিছুদূরে সেই লুপ্ত বটবৃক্ষের স্থানটি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই বাসুদেব-তীর্থ-সরোবরের তীরে কানুর-মঠের একটি ক্ষুদ্র শাখামঠ বা দেবালয় আছে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে উক্ত মঠের তদানীন্তন মঠাধীশ বাসুদেবের প্রকটকালীন পর্ণকুটিরাধিষ্ঠিত স্থানে দেবালয়টি নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

উডুপী শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের সম্মুখস্থ গোপুরম (পশ্চিমমুখী) এবং দক্ষিণে অবস্থিত শ্রীরথ

বাসুদেব-তীর্থের উত্তর দিকে বালক বাসুদেব যে স্থানে এক উত্তমর্ণ বণিককে অর্থের পরিবর্তে এক মুষ্টি বীজ প্রদান করিয়া মাতাপিতার ঋণ শোধ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটি অদ্যাপি দেখা যায়। জন্মপীঠের উত্তরভাগে একটি শিলাখণ্ড রহিয়াছে। ইহার উপর বসিয়া বাসুদেব মধ্যগেহ ভট্টের নিকট বর্ণমালা শিক্ষা করিতেন। মধ্য-গেহ পূর্বদিবসের লিখিত অক্ষরগুলি বালকের স্মরণার্থ পুনরায় লিখিয়া দিলে বালক বলিয়াছিলেন, "লিখিতমেব পুনর্লিখিতং কুতঃ?" অর্থাৎ, গত দিবসের লিখিত অক্ষর-গুলি অদ্য পুনরায় কেন লিখিয়াছেন? একবার দেখিয়াই সমস্ত বর্ণমালা বাসুদেবের আয়ত্ত হইয়া গিয়াছিল। বাসুদেব কর্তৃক বিষধর সর্পাকৃতি মণিমান রাক্ষসের বধস্থান বিমান-গিরির উপত্যকার পূর্বভাগে এখনও রহিয়াছে। বাসুদেব-তীর্থের চতুর্দিকে শ্রীমধ্বাচার্যের অলৌকিক বাল্যলীলার স্মৃতিজড়িত আরও কতিপয় স্থান অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-পীঠে অনন্তপদ্মনাভ শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীবিগ্রহ উপবিষ্ট চতুর্ভুজ মূর্তি। মূর্তিটি ধাতুময়ী। কানুর মঠের স্থানীয় অর্চক বামনাচারিজী

বলিলেন, উক্ত শ্রীবিগ্রহ মধ্যগেহ ভট্ট ও বেদবতী স্বহস্তে পূজা করিতেন। শ্রীবিগ্রহের নিকট লক্ষ্মী-নৃসিংহ, উগ্র-নৃসিংহ ও একটি উৎসব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। যখন মধ্যগেহ ভট্ট চিরায়ুঃ পুত্রলাভের জন্য রজতপীঠপুরস্থ শ্রীঅনন্তেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীঅনন্তেশ্বর মধ্যগেহ ও বেদবতীকে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া তাঁহার উৎসব-বিগ্রহকে পাজকাক্ষেত্রে লইয়া গিয়া নিষ্ঠার সহিত পূজা করিবার আদেশ করেন। তদবধি তাঁহারা রজতপীঠপুর হইতে শ্রীঅনন্তেশ্বরের উৎসব-বিগ্রহ পাজকাক্ষেত্রে স্থাপন-পূর্বক নিত্য পূজা করিতেন।

এই স্থানের সেবার জন্য কানূক মঠ হইতে ধান্যক্ষেত্রের বন্দোবস্ত আছে। শ্রীমধ্বাচার্যের তিরোভাব-তিথিতে এখানে উৎসব হয়। ইহা তাঁহার আবির্ভাব-স্থান হইলেও আশ্রয়বিগ্রহগণের (আচার্যগণের) আবির্ভাব-উৎসব তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুষ্ঠেয় নহে বলিয়া আবির্ভাব-তিথিতে কোনও উৎসব হয় না।

'বিমানগিরি' নামক পর্বতে এক দিন বালক বাসুদেব বাল্যক্রীড়ায় রত ছিলেন, তখন মাতা বেদবতী পুত্রকে আহ্বান করেন। বাসুদেব উক্ত পর্বত হইতে এক লম্ফে পাজকাক্ষেত্রে মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। গিরি-সানুদেশস্থ পাজকাক্ষেত্রের শিলাময় স্থানে বায়ু, হনুমান ও ভীমের অবতার শ্রীমধ্বাচার্যের পদভার পতিত হওয়ায় ঐ স্থান তৎপদাঙ্কে চিহ্নিত হয়। পরে যখন বাদিরাজস্বামী এই স্থানে তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে আগমন করেন তখন শ্রীমধ্বাচার্যের একটি প্রস্তর-মূর্তি এখানে স্থাপন করিয়া যান। পূর্বোক্ত আবির্ভাব-ক্ষেত্রের কানূক মঠের শাখামঠের অনতিদূরে পশ্চিমভাগে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে সেই পদচিহ্ন ও বাদিরাজ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীমধ্বমূর্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীমধ্বাচার্যের মূর্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বরদ-মুদ্রা ও বাম হস্তে পুঁথি।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-পীঠ হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে বিমানগিরি-শিখরে পরশুরাম-প্রতিষ্ঠিত দুর্গাদেবী আছেন। এই মন্দির অদমার মঠের অধিকারভুক্ত। দুর্গা-মন্দিরের সম্মুখে পরশুরামের একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি খুব প্রাচীন। ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি সুদীর্ঘ গুহা আছে। প্রায় এক শত বর্ষ পূর্বে পলমার মঠের তদানীন্তন মঠাধীশ একটি মশালের সাহায্যে উক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় প্রবেশ করিয়া যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও নিকট তাঁহার আর ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য হয় নাই। তিনি তথায় বিষ্ণুর এক অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত হন। তিনি তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত যোগমায়ার মন্দিরের নিম্নভাগে একটি গভীর কূপ আছে। তথায় পরশুরামের গাভীর পশ্চাদনুসরণকারী জনৈক ব্রাহ্মণের বহু ধনরত্ন নিহিত এইরূপ প্রবাদ আছে। দস্যুর ভয়ে নাকি উক্ত কূপে ঐ ধনরত্ন রক্ষিত হইয়াছিল।

ফের আগুন

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

রক্ত-যুদ্ধের আগুন কি ফের জ্বলবে ?
মদের নেশায় মাতাল পৃথিবী টলবে ?
হানাহানি—এই ভয়
মুছে দিতে কেউ কল্যাণকামী নয় ?
নর্মা ও মাছির মতই জীবন
মৃত্যুতে পাবে লয় ?
তবু ছাই-চাপা হঠাৎ আগুন
নড়ে-চড়ে' ওঠে ক্রত বহুগুণ,
স্ফুলিঙ্গশিখা আকাশে ছড়ায়—
বর্মা, মালয়, চীন, কোরিয়ায়,
শত আশ্রয়-নীড়
ঠুনকো কাঁচের মতই কখন
ভেঙে হয় চৌচির।
বারুদের বারুদ—
লালা অধরে কুলফি আগুন-স্তর
ছড়াতে চায় কি—সড়ক পৃথ্বী 'পর ?
—তাই বিদ্যুৎ কাঁপে ?
পৃথিবী হবে কি পুড়ে' ছারখার
বারবার অভিশাপে ?

—

ঈশ্বর তুমি নেই ?
এ মাটির ঢেলা নির্মম আঘাতেই
অবিরাম চিড় খাবে ?
মৈত্রী কি দাবে
এ হনন-স্পৃহা ঢাকো,
বারুদ তফাৎ রাখো
আছে যা পৃথিবী জুড়ে'।
রাম দিলতে উজ্জ্বল রোদ্দুরে
আর যার যদি থাকো
ঈশ্বর কাছে থাকো।

দর্পণ-বিসর্জ্জন

শ্রীকমল সরকার

একটি মেয়ে। মেয়েটি আঠারো বছরে পা দিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। সতেরো বছর দিনে দিনে যা সঞ্চয় করেছে সেদিকে হঠাৎ ওর নজর পড়েছে। নজর পড়তে ও যেন নিজেকে আবিষ্কার করলে। আর সেই আবিষ্কারের আনন্দ বেজে উঠল বাঁশির মত। বাঁশি বাজতে লাগল ওর মনের কোণে, ওর দেহের অঙ্গে অঙ্গে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলে না, উপচে পড়তে লাগল থেকে থেকে। কখনও ছলছলিয়ে বয়ে যায়, কখনও নূপুরের মত ঝম্‌ঝম্‌ করে বাজে। ঘরের মধ্যে চলতে ফিরতে হঠাৎ ওর পায়ে জাগে নাচের ছন্দ, বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে গলায় গান ওঠে গুন্‌গুনিয়ে; গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমে অসাড়, ও তখন জেগে উঠে চুপে চুপে ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসে, ঝিরঝিরে বাতাসে আবেশ-মগ্ন হয়ে বসে থাকে কতক্ষণ। সন্ধ্যেবেলা গা ধুয়ে এসে কোন কোনও দিন আয়নার সঙ্গে কথা কইতে বসে। নিজেই নিজের গালে হাত রেখে বলে, কি গো, আজ মুখখানা অমন ভার ভার কেন?—বলেই খিলখিল করে হেসে ওঠে।

বনানী রূপসী নয়। রঙ কালো, কিন্তু মুখখানা লাবণ্যমাখা। একহারা গড়ন, মাথায় একরাশ চুল। চেহারার চেয়ে তার ভঙ্গিমার বেশি আকর্ষণ। বনানীর হাসিটি মিষ্ট, গলার স্বরে বাঁশি না বাজলেও শুনতে ভাল লাগে। তার চলার মধ্যে ছন্দ আছে, আর একটু ঘাড় বেঁকিয়ে যখন কথা বলে, সে ভঙ্গীটিও মধুর। সব মিলিয়ে সে পুরোপুরি একটি মেয়ে, নিজের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যময়ী। তার নিজের অনেক আছে বলেই রঙের মুখোস পরতে হয় নি, কখনো মনেও ওঠে নি কৃত্রিম যৌবন ফোটাবার কোনও উপায়ের কথা।

যখনকার কথা বলছি, তখন বনানী সবে ইন্টারমীডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে। কলেজে যাবার তাড়া নেই, বই খাতা নোটবুক পড়ার টেবিল থেকে তাকের ওপর তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফলের কথা যে মনে আসে না তা নয়, কিন্তু তার অনেক দেরি। তা ছাড়া বনানীর মনে মনে বিশ্বাস—যেমন করে হোক, পাস করা তার আটকাবে না।

এক দিন সে নিজের ঘরে বসে ব্লাউসের হাতায় একটা রঙীন ফুল ফোটাবার চেষ্টা করছে, এমন সময় ওর ছোট বোন কল্যাণী লাফাতে লাফাতে এল।

—জানিস দিদিভাই, তোর এবার বিয়ে হবে—

—যাঃ, তোকে বলেছে!

—হ্যাঁ রে, আমি যে এক্ষুণি শুনে এলুম। মা বাবাকে বলছিলেন, বিনির তো এগজামিন হয়ে গেল, এই বার ওর বিয়ের চেষ্টা দেখ।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তোকে আর জ্যাঠামি করতে হবে না।

বললে বটে, কিন্তু বনানীর কথায় রাগের লক্ষণ তেমন প্রকাশ পেল না, বরং গলাটা যেন কেঁপে গেল। কল্যাণী বুঝতে পারে নি তো? ছিঃ ছিঃ ছোট বোনের কাছে তা হলে আর লজ্জার শেষ থাকবে না। লজ্জার কথা মনে হতে লজ্জা আরও ওকে পেয়ে বসল। ওর কান লাল হয়ে উঠল, বুকের মধ্যে শুনতে পেল ঢিপঢিপ আওয়াজ। নিজেকে ঢাকবার জন্যে ও তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লে।

—এদিকে আয় তো দেখি, চুলের একি ছিরি হয়েছে?

এই তো বিকেলবেলা চুল আঁচড়েছে, এর মধ্যে চুল কি করে খারাপ হতে পারে ভেবে পেলে না কণি। কিন্তু উত্তর দেবার অবসর পেলে না। দিদি বললে, চিরুণী আর আমার মাথার তেলের শিশিটা নিয়ে আয়—মাথায় জট আর ময়লা বোঝাই করে রেখেছে!

দিদি চুল বেঁধে দেবে এত বড় সৌভাগ্য কণি কল্পনা করে নি। সে এক দৌড়ে সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসে চুল বাঁধাতে বসল। আর তার দিদি বোনের মাথায় চিরুণী টানতে টানতে নিজের কল্পনার জট ছাড়াতে লাগল।

বনানীর বিয়ে! সেই আশ্চর্য্য ঘটনা এবার ঘটতে চলেছে। যে অস্পষ্ট ভাবনা তার নির্জ্জন অবসরে, তার তন্দ্রার ঘোরে হঠাৎ ঝলকানি দিয়ে মিলিয়ে যেত, সেই ভাবনা আজ বনানীর কাছে ধরা দিয়েছে—ওর চোখে এক দীপ্তি ফুটে উঠল। কি আশ্চর্য্য, ওরও বিয়ের সময় হয়েছে, এগিয়ে আসছে সেই দিন, যেদিন কপালে চন্দনতিলক এঁকে, রক্তাম্বরে দেহ ঢেকে সে বধূবেশে সাজবে, যেদিন তাকে নিয়ে উৎসব হবে, তার কল্যাণে বাজবে শাঁখ, তারই সম্মানে একটি রাত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সেই আলোতে, সেই আনন্দ-গুঞ্জনের মধ্যে বনানী লজ্জানত মুখে বসে থাকবে রাজপুত্রের প্রতীক্ষায়।

বনানীর বিয়ের কথাবার্ত্তা চলতে লাগল, এবং কিছু দিন যেতে-না-যেতে বাড়ীতে লোকজন আসতে লাগল মেয়ে দেখতে। একটা বিষয়ে বনানী নিশ্চিন্ত ছিল যে, তার বাবা তার মত না নিয়ে কিছু ঠিক করবেন না। বাবার উপর তার অগাধ বিশ্বাস। ভাই-বোনেদের মধ্যে বনানী সবচেয়ে বড়

বলে, বাবা তাকে অনেকটা ছেলের মত দেখেন। নানা বিষয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করেন, পরামর্শ করেন, মতামত নেন। বিয়ে-থার কথা উঠলে অনেক বার তিনি বলেছেন যে, বিয়েতে ছেলের মত যেমন দরকার, তেমনি মেয়ের মতটাও অগ্রাহ্য করবার নয়। ওঁর এক ভাইঝির বিয়ে তিনি এক বার ভেঙে দিয়েছিলেন, কারণ সে বিয়ের নামে মেয়ে নাকি কান্না-কাটি করেছিল। তাই থেকে বনানীর বিশ্বাস যে, তার সম্পূর্ণ মত না থাকলে বাবা কোথাও তার বিয়ে ঠিক করবেন না।

বাবার উপর নির্ভর করলেও বনানী কৌতূহল চাপতে পারত না। যখন বাড়ীতে কোনও সম্বন্ধের কথা আলোচনা হ'ত তখন লুকিয়ে লুকিয়ে অতি সন্তর্পণে কান পাতত, বা হঠাৎ আলোচনার জায়গায় এসে এমন ভাব দেখাত যেন সংসারের কি একটা জরুরি কাজ সারতে এসেছে। সম-বয়সীদের কাছে কখনও কখনও ইচ্ছা করে ধরা পড়ত।

এমন করে আশা-আনন্দ-উত্তেজনার মধ্য দিয়ে বনানীর দিন কাটতে লাগল। ইতিমধ্যে ওর পরীক্ষার ফল বের হ'ল। যা আশা করেছিল তার চেয়ে ভাল। ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাস করলে, সঙ্গিকে একটা লেটারও পেলে। বনানী তখন নির্ভাবনায় কল্পনার রাশ ছেড়ে দিলে, কিংবা বলা যেতে পারে কল্পনা ওকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল—চলল নতুন এক দিকে। এত দিন বেশি করে ওর চোখে ভাসছিল একখানি উৎসবের ছবি। তাতে মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে, উলু দিচ্ছে, বাড়ীর ভেতরে বাইরে আলোর মালা, আনন্দের কলগুঞ্জন, শাড়ী-গয়না, জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি, বেল যুঁই, রজনীগন্ধার গন্ধে বাতাস মদির। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, তত এই উৎসবের চিত্রটা ম্লান হয়ে আসতে লাগল। তখন কল্পনা রঙ দিতে লাগল সেই মানুষটির গায়ে যে এসে গ্রহণ করবে বনানীকে, ভরে তুলবে তার জীবন। তাকে নিয়ে সে ঘর বাঁধবে, তাকে বাঁধবে ভালবাসা দিয়ে। যত ভালবাসা বুকে আছে সব সে উজাড় করে ঢেলে দেবে। শুধু ভালবাসা কেন, সে নিজেকেই দিয়ে দেবে। কিছু বাকী রাখবে না। সে কি অসহ্য আনন্দ, কি অপরিসীম তৃপ্তি!

এমন সময় এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল। বনানীর বাবা অবিনাশবাবু একদিন সন্ধ্যেবেলা আদালত থেকে ফিরে হঠাৎ বললেন, শরীর বড় খারাপ লাগছে, আমার বিছানাটা করে দাও।—তক্ষণি ডাক্তারকে ডেকে আনা হ'ল, কিন্তু চিকিৎসার সময় হ'ল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। ডাক্তার বললেন, এপোপ্লেক্সি।

আঘাত এত তীব্র ও আকস্মিক যে বাড়ীর লোকে চেঁচিয়ে কাঁদলে না, কিছুদিন শূন্যদৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইল। এই আচ্ছন্ন ভাবটা বনানী যখন কাটিয়ে উঠল, তখন ওর কল্পরাজ্য তো ভেঙে চুরমার হয়েছেই, এমন কি অতি বাস্তব যে মাটির উপর ভর করে দাঁড়িয়েছিল, চলছিল ফিরছিল, সেই মাটিও যেন পায়ের তলা থেকে সরে সরে যেতে লাগল। অবিনাশবাবুর কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলে উনি মাত্র সাত হাজার টাকার ইনসিওর করে গিয়েছেন। জমানো নগদ টাকা কয়েক শ' মাত্র। এর মধ্যে হাজার পাঁচেক দুই মেয়ের নামে, তাদের বিয়ের খরচ হিসেবে। বসে খেলে ও টাকায় আর কতদিন? এদিকে শুধু সংসার-খরচ নয়, কণিকে অন্ততঃ ম্যাট্রিকটা পাস না করালে বিয়ে দেওয়া শক্ত হবে। কণির পর ছোটভাই অবনী। সে সবে ক্লাস সেভেনে পড়ছে। সুতরাং বেশ কয়েক বছর ধরে তার পড়ার খরচ টানতে হবে। কি করে এই খরচ সামলানো যাবে ভেবে কূলকিনারা পেলে না মা ও মেয়ে। বাড়ীতে দ্বিতীয় পুরুষ-অভিভাবক নেই। অবনীর লেখাপড়া শিখে রোজগার করতে ঢের দেরি। অত আত্মীয় যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে আত্মীয়তা চলে, হাত পাতা চলে না।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে এক দিন বনানীর মা ওকে ডেকে বললেন, হ্যাঁরে, এবার কি উপায় হবে বল দেখি।

বনানীর মনে পড়ল বাবাকে। তিনি বলতেন, তুই আমার বড়ছেলের মতন।—বড়ছেলের কাজই এখন তাকে করতে হবে।

বললে, দেখি কি করতে পারি।

—কি করবি তুই?

—তা এখন বলতে পারি না।

কিন্তু মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল বনানী, সে কি করবে। ভেতরে ভেতরে ও চেষ্টা করতে লাগল যদি কোন মেয়ে-স্কুলে মাষ্টারি পায়। কলেজের প্রোফেসারদের কাছ থেকে টেষ্টি-মোনিয়াল জোগাড় করে, এখানে-ওখানে এর ওর কাছে ঘুরে শেষ পর্য্যন্ত সত্যি সত্যি মিউনিসিপ্যাল গার্ল স্কুলে ও একটা কাজ পেলে। সেই সঙ্গে জোটালে সকালে বিকেলে ট্যুইশান। কোনও গতিকে সংসার চলতে লাগল।

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। বনানীর সবচেয়ে বড় আশ্রয় চক্ষের নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কোথায় রইল তার ঘর বাঁধবার কল্পনা, কোথায় মিলিয়ে গেল তার হাসি, কোথায় কত দূরে মিলিয়ে গেল সেই সব নানা রঙে রঙীন দিনগুলি, যা তার মুখে আনত স্বর্য্যোদয়ের আভা, চোখে ফোটাত তারা, কণ্ঠে দিত গান। যে বাসনা নিয়ে বনানীর বিলাস, যাকে খেলাধোলাতে ছিল ওর খেলা, তাকে সে মনের ঝাঁপিতে বন্ধ করে রাখলে। ও দেখলে ঘরেই বাঁধা পড়েছে ওর ঘর বাঁধবার কল্পনা। মনে মনে বললে, না, নিজের কথা ভাববার এখন সময় নেই। এখন সংসার

রয়েছে আমার মুখ চেয়ে, আমি না দেখলে এদের দেখবার কেউ নেই। এই সংসারকে যদি কোনও দিন দাঁড় করাতে পারি, যদি তেমন দিন আসে, তখন ভাবব নিজের কথা।

টাকা রোজগারের একটা মোহ আছে। কাজ করতে করতে বনানীকেও কাজের নেশা পেয়ে বসল। প্রথম থেকেই সে প্রচুর পরিশ্রম করতে লাগল—স্কুলের কোনও টিচার না এলে সে নিজে যেচে ক্লাস নিতে লাগল। ফলে কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়তে ওর দেরি হ'ল না। বছর ঘুরতে না ঘুরতে মাইনে বাড়ল। ট্যুইশানও আসতে লাগল বেশি বেশি টাকার।

প্রথম দিকে বনানী ভেবে রেখেছিল যে, কল্যাণী ম্যাট্রিক পাস করলে তাকেও কোনও একটা কাজে ঢুকিয়ে দেবে। বিশ-পঁচিশ যাই রোজগার করুক সেটা সংসারের সাশ্রয়। দু'জনে কাজ করলে সে নিজে সংসারের দায়িত্ব থেকে খানিকটা মুক্তি পাবে এই ভেবেছিল। কিন্তু কণি সত্যি সত্যি যখন ম্যাট্রিক পাস করলে তখন ও ভাবল, ছোট বোনটাকে এই বয়স থেকে চাকরিতে ঢুকিয়ে লাভ কি? এমন নয় যে শুধু কণির রোজগারে সংসার চলবে। বনানীকে চাকরি করতেই হবে এবং এতদিন যখন সে-ই চালিয়ে এল, তখন আর ছোট বোনের রোজগারের পয়সা কেন হাত পেতে নেবে।

কণিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, এখন কি করবি? তোর কি আরও পড়বার ইচ্ছে আছে?

—পড়তে পারলে ত ভালই হয়। অন্ততঃ আই-এটা পাস না করলে কাজকর্ম্ম পাওয়া শক্ত হবে।

বনানীও ভেবে দেখলে কথাটা ঠিক। তা ছাড়া কর্ত্তব্য করে যাওয়ার মধ্যেও একটা মোহ এবং মর্য্যাদাবোধ আছে—সেটা ক্ষুণ্ণ করতে বনানীর মন উঠল না। বললে, তা হলে তোকে কলেজে ভর্ত্তি করবার ব্যবস্থা করি।...

আরও দু'বছর। দু'বছর বাদে কণি যখন আই-এ পাস করলে তখন বনানী আবার মত পরিবর্ত্তন করলে। এত দিন যদি সংসারের সকল ভার সে একলা বয়ে থাকতে পারে, তা হলে আজ কেন সে বোনের কাছে ছোট হবে। চাকরিতে ঢোকানো মানে কণির জীবনটাও নষ্ট। দুটো জীবন নষ্ট করে লাভ কি? প্রয়োজনের চাপে বাধ্য হয়ে ওকে যে-জীবন বেছে নিতে হয়েছে, সে জীবনের স্বাদ কণি নাই বা পেলে। বরং এখন ওর বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে এক গুরু দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বাবা যা টাকা রেখে গিয়েছেন তাতে ওর বিয়ের খরচ চলে যাবে।

এক দিন মাকে ডেকে বনানী বললে, আমার ইচ্ছে কণির এবার বিয়ে দিই। তোমার কি মত?

—সে দিতে পারলে ত মাথা থেকে মস্ত ভার নামে। কিন্তু তুই? সংসারী হবি না?

—আমি?

একটা বিষণ্ণ হাসির রেখা বনানীর মুখে ফুটে উঠল। বললে, এই তো আমি তোমাদের নিয়ে সংসার করছি। তারপর কিছুক্ষণ থেমে সহজ গলায় বললে, আমার কথা এখন ভাবতে হবে না।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন। বলবার, জোর করবার কিছু ছিল না। আজ যদি নিনি বিয়ে করে সংসারী হয় ত কাল থেকে সংসার অচল। মা-মেয়ে তাই খোঁজখবর করে কণির বিয়ের চেষ্টা দেখতে লাগল। বড় বোন থাকতে ছোট বোনের আগে বিয়ে হবে এই কথাটা কখনও-সখনও বনানীর মনে উঠত, কিন্তু সে ভাবনাটাকে ও জোর করে দূরে ঠেলে দিত। মনে মনে বলত, ছি, ছি, কণি আমার ছোট বোন, ও কেন আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে, আমার জন্যে ওর সাধ-আহ্লাদ মিটবে না কেন? বিয়ের কথা শুনে ও নিজে থেকে যখন আপত্তি করে নি, তখন নিশ্চয় ওর ইচ্ছে আছে। এ বয়সের কোন্ মেয়েরই বা না থাকে?

অনেক চেষ্টার ফলে কণির বিয়ে হয়ে গেল। খরচপত্র যা হবে ঠিক ছিল, তার চেয়ে বেশিই হ'ল। তাতে বনানীর মনে কোনও দ্বিধা হ'ল না। সে স্পষ্টই বললে, আমার জন্যে টাকা রাখবার দরকার নেই, বিয়ের খরচ বাদে যা থাকবে সেটা সংসারের নামে থাক। যদি কখনও দরকার হয় দেখ।

কণির বিয়ে হ'তে বনানী ভারি নিশ্চিন্ত বোধ করলে। মস্ত বড় এক দায়িত্ব মাথা থেকে নামল। এখন ওর বাকী রইল একটিমাত্র কাজ—অবনীকে বি-এ পাস করানো। সে রোজগার করতে আরম্ভ করলেই ওর ছুটি। ছুটি হলে কি করবে সেই ভাবনাটা আবার একটু একটু করে ভাবতে সুরু করলে। পুরোনো দিনের সেই সব ভাবনা মাঝে মাঝে ফিরে আসতে লাগল। কিন্তু পুরনো দিনের মত এখন আর সে ভাবনায় তেমন চমক ছিল না, শিহরণ ছিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলতা কমে আসছিল। উদ্দাম কল্পনা নয়, স্নিগ্ধ অন্তরঙ্গ ভাবনা। এমন কেউ আসবে কি ওর জীবনে যাকে ওর দুঃখের কাহিনী নিঃসঙ্কোচে বলা যাবে, যে নেবে ওর ব্যথার অংশ, যে পৌরুষের নিঃসংশয় দৃঢ়তায় ওকে বলবে,—ভয় কি, আমি ত আছি।

অবনী পর পর দু'বছর ফেল করাতে দু'বছর নষ্ট হ'ল। তৃতীয় বারে পাস করল। কিন্তু পাস করলেই কি আর চাকরি মেলে—বিশেষতঃ যার সুপারিশের জোর নেই। এখানে ওখানে ঘুরে, আড্ডা দিয়ে আরও প্রায় বছর দেড়েক কাটিয়ে

দিলে। দু'একটা ছেলে পড়াত, কিন্তু যা রোজগার হ'ত তার থেকে সিগারেট খরচ, ট্রাম বাস ভাড়া আর নিজের কাপড় জামার খরচ বাদ দিয়ে বেশি কিছু উদ্বৃত্ত থাকত না। এই দীর্ঘকাল বনানী সংসারের ভার টেনে চলল।

একদিন সন্ধ্যেবেলা স্কুল থেকে ফিরে বনানী ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে, এমন সময় অবনী এসে ডাকল, দিদি—

—উঁ ?

—একবার মাথাটা তোল ত—

তাড়াতাড়ি উঠে বসে বনানী জিজ্ঞাসা করলে, কেন রে ?

অবনী ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। বললে, সিভিল সাপ্লাই আপিসে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, আজ চিঠি পাঠিয়েছে।

—সত্যি ?

আনন্দে, উত্তেজনায় বনানীর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। নীরবে ভাইয়ের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলে। তারপর কিছু যেন সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, মাইনে কি রকম ?

—একশ' কুড়ি। তা ছাড়া ডিয়ারনেস এলাউন্স আছে।

—মাকে প্রণাম করেছিস ?

—হ্যাঁ।

—চল, মার কাছে যাই।

মা এদিকেই আসছিলেন, কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে বনানী অবনীর হাত ধরে এগিয়ে গেল। হঠাৎ যেন ও জীবন্ত হয়ে উঠল। সেদিন সন্ধ্যাবেলাটা সে অবনীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে, মা'র সঙ্গে কথাবার্তা করে জমিয়ে রাখলে। রান্নাঘরে গিয়ে নিজে দু' একখানা তরকারি রাঁধলে, অবনী মালপো খেতে ভালবাসে বলে মালপো তৈরি করলে। তারপর যখন রাত গভীর হ'ল, যখন পথের কলরব নীরব হয়ে এল, আর দক্ষিণ দিক থেকে বইতে লাগল ঝিরঝিরে বাতাস, তখন বনানী শুধু নিজের ঘরে এসে বিছানায় এলিয়ে পড়ল। এত-দিনে, এতকাল পরে মিলেছে ওর ছুটি! বাবা মারা গেছেন প্রায় বার বছর। বার বছর পরে আজ ও পেলে নিষ্কৃতি। অবনী এবার নেবে সংসারের ভার। এখন আর বনানীর উপার্জ্জনের উপর ভরসা করে থাকবে না মা-ভাই। আর তার নিজের প্রয়োজন কতটুকু? ইচ্ছে করলে কালই সে চাকরিতে ইস্তফা দিতে পারে। মুক্তি, এতদিন পরে বনানীর মুক্তি।

কিন্তু মুক্তির পর ?

হঠাৎ বনানীর দেহের মধ্য দিয়ে যেন এক বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। একই প্রশ্ন যেন চারিদিক থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল—'মুক্তির পর ?' উত্তর মনে এল না। অবনী না হয় মায়ের দায়িত্ব নিলে, বনানীর ভার সে নেবে কেন? সে নিলেও বনানী কেন চিরকাল ভাইয়ের ও সংসারের ভার হয়ে থাকবে ?

একটা সম্ভাবনার কথা মনে এল—বহুদিন ভুলে থাকা, বহু পশ্চাতে ফেলে আসা সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনা যেন আকার নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। রূপবতী সম্ভাবনা, অষ্টাদশী রূপমাধুরী। কি সুন্দর চেহারা মেয়েটির, কি মিষ্টি ওর মুখের হাসি!…কিন্তু অন্ধকারে যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বেড-সুইচটা বনানীর হাতের মধ্যে নড়ে উঠল—ঐ যে, ঐ ত দেয়ালে লাগানো ফ্রেমের মধ্যে মেয়েটি বসে রয়েছে।… কিন্তু, কিন্তু ওর কপাল এত চওড়া দেখাচ্ছে কেন? টান করে চুল বেঁধেছে বলে? একটানে কবরীমূল শিথিল করে দিলে, সীমন্তের প্রশস্ত মোহানা ঢাকল না। মেয়েটি তখন হাত রাখল নিজের গালের উপরে। কিন্তু হেসে উঠল না পুরোনো দিনের মত। হঠাৎ নজরে পড়ল মুখের দু'ধারে দুই গভীর রেখার উপর। আঙুলের চাপে চাপে রেখা দুটোকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা ঘাম হয়ে ঝরে পড়ল। আস্তে চোখ নামিয়ে নিলে, কিন্তু সেখানেও নিরাশা। দেহ লালিত্য-হীন, দেহরেখা লুপ্তপ্রায়।

শিউরে উঠে বনানী মুখ ঢাকলে। বার বছর আগে দর্পণে যার ছবি পড়ত, এ ত সে নয়। আঠার বছরের সে মাধুরীকে বার বছরের জমা শিক্ষয়িত্রীর শুষ্ক কাঠিন্য গ্রাস করেছে। আঠার বছরের আকর্ষণ কবে বিকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বার বছরে ঘুইয়েছে আঠার বছরের সঞ্চয়, লাভ করেছে কিছু অর্থ, কিছু-বা সম্মান, আর অসমবয়সীর ভক্তি। তাই সম্বল করে জীবন কাটাতে হবে। মহান্ আদর্শের নামে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, প্রতিদিন পাঁচ-সাত ঘণ্টা অনর্গল বকে অর্ব্বাচীন মেয়ের দলকে পড়িয়ে যেতে হবে ভূগোল ব্যাকরণ, পাটীগণিত।

'সাব্‌সিডি' কাদের জন্য ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

খাদ্য-সাব্‌সিডি উঠিয়ে দেওয়ার কথা ভারত গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করার পর থেকে সারা ভারতে সাব্‌সিডি পুনঃপ্রবর্তনের সপক্ষে তুমুল আন্দোলন সুরু হয়েছে। বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী, শিল্পপতি-শ্রমিক, সাংবাদিক প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী—সকলেই এক সুরে এই সরকারী নীতির প্রতিবাদ করেছেন। কোনও কোনও দল আবার সত্যাগ্রহ, হরতাল প্রভৃতি উপায় প্রয়োগ করতেও ছাড়েন নি। ব্রিটিশ কোনও নীতি অবলম্বন করলে আমরা পরাধীন থাকার সময় সেই নীতিকে সন্দেহের চোখে দেখেছি এবং বিরুদ্ধ আন্দোলন চালিয়েছি; স্বাধীন হয়েও আমরা সে অভ্যাস ছাড়তে পারি নি। তাই অধিকাংশ সময়েই নির্বিচারে সরকারী নীতির বিরুদ্ধাচরণ করি। সাব্‌সিডি সম্বন্ধেও সেই অদূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিষয়টির কিঞ্চিৎ আলোচনা করে দেখা যাক্।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, যখন গবর্ণমেন্টের নির্দ্দেশ বা অনুমোদনে কোন পণ্য ক্রীত দর (বা উৎপাদন-খরচার) অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করবার ব্যবস্থা থাকে এবং বিক্রেতার যা লোকসান হয় তা অর্থ-সাহায্য দিয়ে পূরণ করে দিতে গবর্ণমেন্ট প্রস্তুত থাকেন, তখন বলা হয় যে পণ্যটির জন্য সাব্‌সিডি দেওয়া হচ্ছে। যুদ্ধের সময় সাধারণের নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন ও আমদানী সাধারণতঃ কমে যায়। চাহিদার তুলনায় পণ্যের যোগান কম থাকে বলে পণ্যের দর চড়তে থাকে। সমাজদ্রোহী কালোবাজারীর দল তখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এরূপ অবস্থায় জনসাধারণের মুখ চেয়ে গবর্ণমেন্টকে ঐ সব পণ্যের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নিতে হয়। সাধারণের ক্রয়-শক্তির দিকে দৃষ্টি রেখে গবর্ণমেন্ট তখন একটা দর বেঁধে দেন—এটাই হ'ল কণ্ট্রোল দর। খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ আসে গবর্ণমেন্টের হাতে এই ধরণের পরিস্থিতির মধ্যে। খাদ্যশস্যের দর বেঁধে দিয়েই গবর্ণমেন্ট নিশ্চিন্ত হন নি, শিল্পাঞ্চলে খাদ্য সরবরাহও করেছেন। খাদ্যশস্যের যে দর গবর্ণমেন্ট বেঁধে দিয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশী দর দিয়েও খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে হয়েছে সরকারকে। সুতরাং গবর্ণমেন্টকে বেচতে হয়েছে কেনা দামের চেয়ে কম দরে; তাই কণ্ট্রোলের নির্দ্ধারিত দরে বেচতে গিয়ে সরকারকে লোকসান দিতে হয়েছে। এই লোকসানটাই হ'ল 'সাব্‌সিডি'। কিন্তু সাব্‌সিডির (অর্থাৎ লোকসানের) টাকাটা এসেছে কোথা থেকে? এসেছে সাধারণ করদাতার গাঁট থেকে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।

কণ্ট্রোল-দরের সূত্রপাত হয় বিগত মহাযুদ্ধের সময়। যুদ্ধে সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতির উৎপাদন যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে তার জন্য প্রয়োজন হয় কারখানার মজুরদের সন্তুষ্ট রাখা। তাই, মজুররা যাতে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলি সস্তায় ও যথেষ্ট পরিমাণে পায় সেজন্য কণ্ট্রোল-দরে পণ্য-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কণ্ট্রোল-দরের সুযোগ-সুবিধা তাই পেয়েছে শিল্পাঞ্চল; শিল্পাঞ্চলের বাইরের লোক সে সুবিধা পায় নি। মজুরদের কল্যাণার্থে কণ্ট্রোলের ব্যবস্থা হলেও, একমাত্র কারখানার মজুররাই সব সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে; তার ছিটে-ফোঁটাও পায় নি কৃষি-মজুর। অথচ কৃষি-মজুরের সংখ্যা কারখানা-মজুরের তুলনায় কম নয়। এক পশ্চিম বাংলাতেই আছে বিশ লক্ষের অধিক কৃষি-মজুর। কারখানার মজুরের আয় কৃষি-মজুরের চেয়ে অনেক বেশী। অধিকন্তু, কারখানার কর্মচারীদের জন্য আছে বিনা-ভাড়ার থাকার ঘর, কলের জল, বিজলী-বাতি, কয়লা, বাজারদরের চেয়ে কম দরে নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান, বার্দ্ধক্য-বীমা, দুর্ঘটনা-বীমা প্রভৃতির ব্যবস্থা। কৃষি-মজুর বা সাধারণ পল্লীবাসীর কাছে এ সব গল্পকথা। কারখানার মজুর হ'ল সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় একটা নগণ্য অংশ—১০ ভাগের অধিক নয়; তবু এরাই পাচ্ছে এই সব সুবিধা। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, গবর্ণমেন্ট পক্ষপাত দেখিয়েছেন শিল্পের প্রতি। শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে এই পক্ষপাতের আওতায়। আর এই একচক্ষু-নীতির ফলে পল্লী-অঞ্চল হয়ে উঠছে মরুভূমি।

ব্রিটিশ ঐতিহ্যই আমাদের দিয়েছে অনুপ্রেরণা। ব্রিটেনে শিল্পকেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা হয়েছে এই ধরণের নানাবিধ সাহায্য দিয়ে। ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলিও আমরা গড়ে তুলছি ব্রিটিশ-আদর্শে। তাই পল্লীকে বঞ্চিত করে সব সুযোগ-সুবিধা শিল্পকেন্দ্রগুলিকে দিতে আমাদের বাধছে না। কিন্তু ভারত যে ব্রিটেন নয় সেকথা আমরা ভুলতে বসেছি। ব্রিটেন হ'ল শিল্পনির্ভর দেশ। সেদেশের অধিকাংশ লোকের মরণ-বাঁচন নির্ভর করে শিল্পের উপর; শিল্পই তাদের প্রাণ। তাই কারখানার মজুরের উপরই থাকে সকলের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত। ভারতের কথা আলাদা। ভারত হ'ল কৃষি-প্রধান দেশ; কৃষিই হ'ল ভারতের প্রাণ; জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ আসে কৃষি থেকে। কৃষিই হ'ল ভারতের আর্থিক কাঠামোর বুনিয়াদ। সুতরাং কৃষি-সংশ্লিষ্ট লোকের জীবনধারার উন্নতি-বিধানই হওয়া দরকার ভারতের 'ন্যাশনাল পলিসি' বা জাতীয় নীতি। তাই সব প্রয়াসের পিছনে থাকা উচিত কৃষকের

উন্নতি। ভারতের কৃষকশ্রেণী সাধারণতঃ অসহায়; নিজেদের দাবি জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতে জানে না; অভাব-অভিযোগ জানাবার জন্য তাদের নির্ভর করতে হয় সহরের তৃতীয় ব্যক্তির উপর। পক্ষান্তরে কারখানার মজুর সঙ্ঘবদ্ধ; পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে তারাও করেছে ট্রেড ইউনিয়ন; রাজনীতির কল্যাণে তাদের পৃষ্ঠপোষকেরও অভাব হয় না। কৃষক-সমাজের তুলনায় তাদের সংখ্যা নগণ্য হলেও তাদের গলার জোর বেশী—সরকারের কর্ণে প্রবেশ না করেই পারে না। সাব্‌সিডি পুনঃপ্রবর্তনের জন্য বোম্বাই শহরে যে আন্দোলন সুরু হয়েছে সেটা কি এই কথারই সমর্থন করে না? শিল্পাঞ্চলের মুষ্টিমেয় লোকের সুবিধার জন্য সাব্‌সিডির পুনঃপ্রবর্তন যাচ্ঞা করার অর্থ বাকি শতকরা ৯০ জন করদাতার উপর চাপ বৃদ্ধি। এতে বঞ্চিতদের অধিকতর বঞ্চিত করে, এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোকের সুবিধা করে দেওয়াই হয় নাকি? আন্দোলনকারীরা একথা কি একবারও ভেবে দেখেছেন?

সাধারণ করদাতার 'কষ্ট অফ্ লিভিং' (ভরণপোষণ খরচ) কমিয়ে আনাই হ'ল 'সাব্‌সিডি'র উদ্দেশ্য। কিন্তু এ উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে? এক বৎসরের অভিজ্ঞতা কি? যে সব এলাকায় রেশনিং চালু ছিল সেই সব এলাকায় খাদ্যশস্য বিক্রীত হয়েছে একটা নির্দিষ্ট দরে—বাড়ে নি। কালোবাজারের কথা এখানে ধরা হচ্ছে না, কেননা কালোবাজারকে বাদ দিয়েও লোকের পক্ষে চাল-আটা সংগ্রহ করে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল। কিন্তু রেশনিং-বহির্ভূত এলাকায় যেখানে চাল জন্মায় সেখানে চালের দর বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে—

বৎসর	চালের দাম
১৯৪৭	১৫৸৶০ আনা মণ
১৯৪৮	১৯৷০ " "
১৯৪৯	১৯৸৶০ " "
১৯৫০	২২৶০ " "
১৯৫১	২৭৸৶০ " "

সুতরাং 'রেশনিং' এলাকার বহির্ভূত অঞ্চলের লোকেদের তুলনায়, রেশনিং এলাকার লোকেরা খাদ্য সম্বন্ধে কিছু সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু অন্যান্য পণ্যের দর ক্রমশঃ বেড়েই গেছে—

১৯৩৯ আগষ্ট ১০০

	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১
খাদ্যশস্য	৩১২	৪৪৩	৪৬৫	৪৭১	৪৮৩
ডাল	৪৭১	৪২৪	৪৩৮	৪৪৯	৫০৬
চামড়া	৩৫২	৩০৪	৩১২	৩৫৪	৪৫৩
উদ্ভিজ্জ তৈল	৫২৫	৫২২	৬১১	৬৮৬	৬৭৯
সূতা	২৯৫	৪৪৮	৪৩০	৪১১	৪৮৩
ধাতু	১৩১	১৭০	১৭৩	১৭৭	১৯৭
খৈইল	১৯২	৪০১	৪০৩	৪৭০	৫০০
টেক্সটাইল	৩১৪	৪০৪	৩৯৮	৪০২	৪৬৮
কারখানাজাত পণ্য	২৭৬	৩৪১	৩৪৪	৩৪৩	৩৯৬

মজুরশ্রেণীর কষ্ট অফ্ লিভিং-এর ইন্‌ডেক্স দেখলেও এই কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়—

১৯৩৯ আগষ্ট ১০০

	বোম্বাই	আমেদাবাদ	শোলাপুর	কানপুর	মাদ্রাজ	কলিকাতা
১৯৪৭	২৬৫	৩০০	৩৪০	৩৭৮	২৭৭	৩০৯
১৯৪৮	২৮৮	৩৩৩	৪০০	৪৭১	৩১৫	৩৩৯
১৯৪৯	২৯২	৩৩৯	৪১০	৪৭৮	৩৩০	৩৪৮
১৯৫০	২৯৮	৩৫১	৩৯৮	৪৩৪	৩৩২	৩৪৯

অতএব বলা যায় যে, কষ্ট অফ্ লিভিং নামিয়ে আনার প্রয়াস সফল হয় নি; শুধু পল্লীর জনসাধারণের তুলনায় শিল্পাঞ্চলের লোক কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ করেছে। শিল্পাঞ্চলের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখানোর ফলে যদি ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন বেড়ে যেত তা হলেও কথা ছিল, কিন্তু তাও হয় নি। কন্ট্রোল-আমলে কৃষিজ পণ্যের দর বেড়েছে সত্য, কিন্তু কৃষিজ পণ্যের তুলনায় অন্যান্য পণ্যের দর বেড়েছে অনেক বেশী। তাই চাষীর চাষের খরচা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। ফসল বিক্রি করে চাষী যা পায়, অর্থাৎ তার যা মার্জিন বা উদ্বৃত্ত থাকে, তার মাত্রা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। চাষীর বাড়তির মাত্রা যেমন একদিকে কমে এসেছে, তেমনি অন্যদিকে তার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দরের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। চাষীর কাছে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা তাই হয়ে উঠেছে অ-লাভের ব্যাপার। চাষের জমি তাই হয়েছে বাস্তের বিলে পরিণত, ধান জমি হয়েছে পাটের জমিতে রূপান্তরিত। ধান চাষ করার যে অনুপ্রেরণা তার হয়েছে অভাব। এর উপর আছে প্রকৃতির খেয়াল, তাই খাদ্যশস্যের উৎপাদন ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে কমে আসছে শিল্পের উৎপাদন। এরূপ আত্মঘাতী নীতি কোন 'ওয়েল্‌ফেয়ার' ষ্টেটেরই (কল্যাণকামী রাষ্ট্র) বাঞ্ছনীয় নয়।

দেশজ পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পেয়ে যদি ঘাটতি দেখা দেয়, তা হলে বিদেশ থেকে সেই পণ্যটি আমদানী করাই হ'ল প্রকৃষ্ট উপায়। যুদ্ধাবসানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে খাদ্যশস্যের দর দুনিয়ার বাজারে যথেষ্ট চড়ে যায়। যে সব দেশ বাড়তি উৎপাদন করেছে তারা পেল অপূর্ব্ব সুযোগ। বুভুক্ষু ভারতের অসহায় অবস্থায় সুযোগ নিয়ে তারা হাঁকল অসম্ভব রকম চড়া দর। এই চড়া দরে খাদ্যদ্রব্য খরিদ করা ছাড়া ভারতের গত্যন্তর ছিল না। মুখর (articulate) শিল্পাঞ্চলের দাবি যত বাড়তে লাগল, ভারতের আমদানির পরিমাণও সেই অনুপাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল। প্রদেশগুলির দাবি যে অনুপাতে বেড়ে চলল, সেই অনুপাতে চাষীর কাছ থেকে

প্রদেশগুলির সংগ্রহের পরিমাণ কমতে লাগল। প্রদেশগুলির দাবি সে সব সময়ে ন্যায়সঙ্গত ছিল না, তা বুঝা যায় এই দেখে যে সাব্‌সিডি উঠিয়ে দেওয়ার পর তাদের চাহিদা গেল কমে। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে সাব্‌সিডি পুরামাত্রায় বজায় রাখলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বাজেট ব্যালান্স করা ক্রমশঃ অধিকতর কষ্টসাধ্য হয়ে উঠত। এই হিসাবে বলা যায় যে সাব্‌সিডি উঠিয়ে দেওয়াই হয়েছে যুক্তিসঙ্গত।

সাব্‌সিডি-প্রাপ্ত পণ্য যে দরে বিক্রয় হয় সেটা তার যথার্থ দর নয়। পণ্যটির যথার্থ দর হ'ল—যে দরে পণ্যটি বিক্রয় হচ্ছে + সাব্‌সিডি যা দেওয়া হচ্ছে। সমাজের লোকসংখ্যা যদি হয় "ক", এবং মাথা-পিছু "খ" পরিমাণ খাদ্যশস্য যোগান দিতে হয়, তা হলে গবর্ণমেণ্টকে মোট যোগান দিতে হয় "কখ" পরিমাণ খাদ্যশস্য। এখন যারা কণ্ট্রোলদরে খাদ্যশস্য পায় তাদের সংখ্যা যদি হয় "ক১" ও মাথা-পিছু পায় "খ১" তা হলে মোট "ক১ খ১" পরিমাণ খাদ্যশস্যের দাম পাওয়া যাবে "রেশনড্" এলাকা থেকে এবং বাকী শস্যের (কখ – ক১খ১) দায়িত্ব পড়ে গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে—অর্থাৎ, তার মূল্যের জন্য দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হয় (ক – ক১) লোককে।

কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বোঝার চেষ্টা করা যাক। চালের কথাই ধরি। গবর্ণমেণ্ট চাষীদের কাছ থেকে চাল সংগ্রহ করেন সাধারণতঃ ১৬৲ দরে। যে পরিমাণ চাল পূর্ব্বে সংগৃহীত হত এখন তা হচ্ছে না; চাল-সংগ্রহের পরিমাণ শতকরা ২৫ থেকে ৫০ ভাগ কমে গেছে। দেশের চাষীদের কাছ থেকে চাল সংগ্রহের পরিমাণ যে অনুপাতে হ্রাস পায়, যোগান অব্যাহত রাখার জন্য সেই পরিমাণ চালের আমদানী বাড়াতে হয়। আমদানী করা চালের জন্য দাম দিতে হয় ২২৲ টাকা থেকে ২৭৲ টাকা পর্য্যন্ত; গড়ে ধরতে পারি ২৪।০ আনা। ধরা যাক, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সংগ্রহ করে মজুত রাখা দরকার "ক" পরিমাণ চাল। দেশের চাষীদের কাছ থেকে সমস্তটা সংগ্রহ করতে পারলে খরচ পড়ত (১৬ × কক) = .৬৲ টাকা। কিন্তু দেশের মধ্য থেকে সংগ্রহের পরিমাণ ২৫ থেকে ৫০ ভাগ কমে গেছে বলে এখন খরচ পড়বে—(১৬ × ·৭৫ক + ২৪·৫ × ·২৫ক) = ১৮ক টাকা থেকে (১৬ × ·৫ক + ২৪·৫ × ·৫ক) = ২০·২ক টাকা। তার মানে এই হ'ল যে, দেশের মধ্যে থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ করতে না পারার দরুন সংগ্রহ-ব্যয়ই বেড়ে গেল শতকরা ২৫৲ টাকা; এবং গবর্ণমেণ্টের খরচ বাড়ার অর্থই হ'ল সাধারণ করদাতার চাপ বাড়া। রেশনিং এলাকার অন্তর্ভুক্ত লোকদের কণ্ট্রোল-দরে চাল সরবরাহ করতে গিয়েই এই অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে। অথচ অতিরিক্ত খরচার চাপটা বহন করতে হবে কেবলমাত্র রেশন এলাকার বহির্ভূত লোকেদের। অধিকন্ত জনসমষ্টির মাত্র ১০ ভাগকে এই বোঝা বইতে হবে বলে তাদের উপরের চাপ আরও ১১ ভাগ বেড়ে যাবে। সাধারণ করদাতাকে এই চাপের হাত থেকে মুক্তি দিতে হলে রেশন এলাকার বহর বাড়ালে চলবে না; কেননা রেশন এলাকার বহর বাড়ানোর অর্থ হ'ল গবর্ণমেণ্টের সংগ্রহ-ব্যয় বাড়ানো এবং তার অর্থ পরোক্ষভাবে করদাতার উপর চাপ বৃদ্ধি করা —যেন এক হাতে মুষ্টি-ভিক্ষা দিয়ে অপর হাতে মোটামুটি অপহরণ করা হ'ল। সুতরাং একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে সাব্‌সিডি তুলে দেওয়া।

উপরের আলোচনায় দেখাতে চেয়েছি সাব্‌সিডির পুনঃপ্রবর্ত্তন অর্থনীতির দিক থেকে কল্যাণকর নয়। তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায় বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় কি? বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার নীতি কি হওয়া বাঞ্ছনীয়?

'ফসল বাড়াও' আন্দোলন চালিয়ে এবং এই আন্দোলনের সমর্থনে জমির উদ্ধারসাধন করেও বিশেষ সুফল পাওয়া যায় নি। এ বছরে চাষের বহর দেখে অনুমান করা যাচ্ছে যে, এবার শস্যের ঘাটতি হবে আনুমানিক শতকরা ২৬ ভাগ। সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষ্য করে বলা যায় যে, মোটামুটি ভাবে ১০ থেকে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত খাদ্যের ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা—

বৎসর	শতকরা কত ভাগ ঘাটতি হয়েছে
১৯৪৭	৬
১৯৪৮	১০·৫
১৯৪৯	২০
১৯৫০	১৬
১৯৫১	৬·৫
১৯৫২	২৬ (আনুমানিক)

শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ ঘাটতি এমন কিছু মারাত্মক নয়। চাষী উদ্দীপনা পেলে সহজেই এই ঘাটতির অনেকটা পুষিয়ে দিতে পারে। সুতরাং দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার কারণ থাকা উচিত নয়। অথচ সে অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় বোঝা যায় যে, গবর্ণমেণ্টের খাদ্যনীতির মধ্যে কোথাও গলদ রয়েছে। সাব্‌সিডিই পরোক্ষ ভাবে চাপ দিয়ে চাষীর উৎপাদনের প্রেরণাকে করেছে ব্যাহত। মজার কথা এই যে, দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের জন্য দরদ যাঁরা দেখাচ্ছেন তাঁরাই আবার সাব্‌সিডির সপক্ষে অভিযান চালিয়েছেন।

রেশনিং এলাকায় খাদ্যশস্য সরবরাহ করবার জন্য চাষীর কাছ থেকে গবর্ণমেণ্ট যে চাল সংগ্রহ করেন তার পরিমাণ মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগের বেশী নয়—

বৎসর	সংগ্রহের পরিমাণ টন	মোট উৎপাদনের শতকরা
১৯৪৭	৪,৪৭,০০০	১৩'৮
১৯৪৮	৪,৬৭,০০০	১৪'৭
১৯৪৯	৪,৩৭,০০০	১৪'৫
১৯৫০	৪,৭৩,০০০	১৪'২
১৯৫১	৪,৩২,০০০	১১.৯

কোন একটি বক্তৃতায় খাদ্যসচিব বলেছিলেন যে, শিল্পাঞ্চলের লোকের যা প্রয়োজন তার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র অবৈধ উপায়ে (স্মাগলড্) গ্রাম থেকে শিল্পাঞ্চলে আসে, অর্থাৎ ঊর্দ্ধপক্ষে ২ লক্ষ টন চাল গ্রাম থেকে কলিকাতা অঞ্চলে আসার কথা। সুতরাং শতকরা ৮০ ভাগ ফসল (১০০ − [১৫ + ৫]) পল্লী অঞ্চলেই থাকার কথা এবং তা যদি থাকে তা হলে সেখানে হাহাকার উঠে কেন? তা হলে এই চাল গেল কোথায়? অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষীর ঘরে লুকান আছে—অনুমান করলে কি ভুল হয়? পল্লীর লোকের মুখে শোনা যায় যে, এই ভাবে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে প্রতি বৎসরই বহু ধান ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। অধিকন্তু ক্যানিং প্রভৃতি সীমান্ত অঞ্চলের লোকেরা সুপারি ও নানা পণ্যের বিনিময়ে বহু পরিমাণ ধান অবৈধ উপায়ে পূর্ব্ব-পাকিস্থানে চালান করে দেয় বলেও শোনা যাচ্ছে। গবর্ণমেণ্টের ভুল নীতিই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

পশ্চিম বাংলার চাষী-পরিবারের সংখ্যা হ'ল ২১,৮০,০০০—এদের মধ্যে ৫ একরের অধিক পরিমাণ জমির মালিক শতকরা ১৫টি পরিবারের বেশী নয় (ইশাক কমিটির রিপোর্ট)। অন্ততঃ ৫ একর জমি থাকলে একটা পরিবারের স্বচ্ছন্দে চলে। অতএব বলা যায় যে শতকরা ৮৫টি চাষী পরিবারের যা আয় তা 'সাবসিস্টেন্স লেভেলে'র উপরে নয়। অর্থাৎ—উদ্বৃত্ত ফসলের মালিক প্রধানতঃ মাত্র কয়েক শত পরিবার। বিত্ত ও প্রতিপত্তির জোরে এরা গবর্ণমেণ্টের সংগ্রহনীতি বানচাল করে দিতে সক্ষম। তাই সরকারকে চাল সংগ্রহের জন্য নির্ভর করতে হয়েছে প্রধানতঃ ছোট ছোট চাষী-পরিবারের উপর। এই সংগ্রহনীতির ফলে চাষীর হাতে কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। গ্রামের চাষী-মজুর বা ভাগচাষীর অভাব পড়লে এরাই তাদের দাদন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই চাষী-মজুরের অবস্থা কোনকালে সচ্ছল না থাকলেও, খাদ্যাভাবে তাদের অনাহারে থাকার সম্ভাবনা ছিল না। যে চাষী অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করতে সদাই প্রস্তুত থাকত, সেই চাষী আজ বর্ত্তমান সংগ্রহনীতির ফলে অতিথি দেখলে আতঙ্কিত হয়। বড় চাষী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হ'ল বিদেশী, মহাজন বা প্রবাসী। গ্রামবাসীর সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ নেই। তাই দরদের অভাব। ছোটখাটো চাষী এরূপ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাই পল্লীতে জাগে হাহাকার। এই হাহাকারের সম্মুখীন হয়ে অনেকেই বলছেন রেশনিং এলাকা বিস্তৃত করতে। কিন্তু রেশনিং বাড়ানোর অর্থ হ'ল সংগ্রহ বাড়ানো। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সেটা কতটা সম্ভব ও যুক্তিসঙ্গত ভেবে দেখা দরকার। সংগ্রহের পথে বাধা সৃষ্টি করে রেশনিং ব্যাপকতর করতে বলার অর্থ তাই আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।

দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পাঞ্চলকে খাওয়াতে গিয়ে পশ্চিম বাংলা গবর্ণমেণ্টকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সুতরাং শিল্পাঞ্চলকে খাওয়ানোর দায় থেকে যদি অব্যাহতি পাওয়া যায় তা হলে পশ্চিম বাংলার খাদ্যসমস্যার অনেকটা সুরাহা হয়। অধিকন্তু কারখানার কর্ম্মচারীদের মধ্যে বাংলার বাইরের লোকই শতকরা ৮০ জন। ১৯৪৯ সনে কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে এক অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল; সেই কমিটির রিপোর্টে দেখা যায়:

কোন্ দেশের অধিবাসী	শতকরা কয়জন কাজ করে
পশ্চিম বাংলা	২৪'৫
বিহার	২৯'৯
উড়িষ্যা	১০'৯
উত্তর প্রদেশ (ইউ. পি.)	২০'৫
মধ্যপ্রদেশ	২'৮
পূর্ব্ব-পাকিস্থান	৬'৩
অন্যান্য প্রদেশ	৫'১
	১০০'০

কারখানায় কর্ম্মীদের সন্তোষবিধানের জন্যই প্রধানতঃ যখন 'সাবসিডাইজড' হারে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা তখন এই অঞ্চলের খাদ্য সম্বন্ধে দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারেরই নেওয়া উচিত। আশার কথা যে, খাদ্যমন্ত্রী কিদওয়াই সে দায়িত্ব-ভার বহন করতে স্বীকৃত হয়েছেন।

অতএব শিল্পাঞ্চলকে বাদ দিয়ে যে অংশ, তার ভার রইল পশ্চিম-বাংলা গবর্ণমেণ্টের উপর। শিল্পাঞ্চলের ৫০ লক্ষ লোককে বাদ দিলে বাকী রইল ২ কোটি লোক এবং এদের জন্য প্রয়োজন ৩১,৫৯,০০০ টন চাল। বিগত কয়েক বৎসরের হিসাব দেখলে বোঝা যায় যে, কলিকাতা অঞ্চলকে খাদ্য যোগাতে না হলে খাদ্যের বিশেষ অভাব হয় না—

বৎসর	খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ (শতকরা ১০ ভাগ বীজ, নষ্ট হওয়া প্রভৃতির জন্য বাদ দিয়ে)
১৯৪৭	৩২,৩৬,০০০ টন
১৯৪৮	৩১,৬৯,০০০ "
১৯৪৯	৩০,১৫,০০০ "
১৯৫০	৩০,২৬,০০০ "
১৯৫১	৩৬,৩৫,০০০ "
১৯৫২	৩০,৩৪,০০০ (আনুমানিক)

গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেছেন—আমদানী খাদ্যশস্যের শতকরা যা পড়বে সেই দরে "কেয়ার প্রাইস্" দোকানে চাল বিক্রি হবে—কলিকাতায় "কেয়ার প্রাইস্" দোকানে চাল ৩০ টাকা দরে বিক্রী হয়। সুতরাং দুনিয়ার বাজারে চালের দর ২৭ টাকা থেকে ৩০ টাকা ধরতে পারি। অথচ চাষীর কাছ থেকে আমরা চাল সংগ্রহ করছি ১৬ টাকা দরে। খোলা বাজারে চাষীর পক্ষে ২০।২৫ টাকা দর পাওয়া অসম্ভব ছিল না। চাল সংগ্রহের দর, দুনিয়ার বাজারের দরের তুলনায় যদি অস্বাভাবিক রকম কম রাখা যায়, তা হলে চাষীর উৎপাদন করার প্রবৃত্তি নষ্ট হয়। বেশী ফসল পেতে হলে চাষীকে দিতে হবে "ইন্‌সেন্‌টিভ" বা অনুপ্রেরণা। তাই অধিকতর উৎপাদনে চাষীকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে গবর্ণমেণ্টকে সংগ্রহ-দর (প্রকিওরমেণ্ট প্রাইস্) বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় বেচবার সুযোগও দিতে হবে। পূর্ব্বেই দেখেছি চাষী-পরিবারের সংখ্যাই অধিক। সামান্য যা তারা উৎপাদন করে তা থেকে পরিবারের সম্বৎসরের খরচ ও বীজধানের জন্য ধান ঘরে তুলে রেখে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবেই তারা বাজারে বিক্রী করতে আসে। সুতরাং খোলাবাজার পেলে পল্লী অঞ্চল খাদ্যহীন হয়ে যাবে এ ধারণা অমূলক। পক্ষান্তরে মহাজন, জমিদার প্রভৃতি বড় বড় চাষী, 'কর্ডন' থাকলেও লাভের সম্ভাবনায় 'স্মাগল' করতে পশ্চাৎপদ হবে না। কিন্তু খোলাবাজার থাকলে এই কালোবাজারীদের বেচতে হবে টক্কর দিয়ে; অধিকন্তু লুকানো ফসলও এসে উঠবে বাজারে। আর প্রথম বাজার পাবার জন্য লুকানো চাল যদি প্রতিযোগিতার বাজারে আসতে থাকে তা হলে বাজার নেমে যাওয়াই সম্ভব। সুতরাং সংগ্রহ-দর কিছু বাড়িয়ে দিয়ে চাল সংগ্রহ করে প্রত্যেক থানায় যদি "কেয়ার প্রাইস শপ" খোলা যায় এবং কেনাবেচার সর্ব্ববিধ বাধা অপসারিত করে স্বাভাবিক ভাবে কারবার করতে দেওয়া হয়, তা হলেই খাদ্যসমস্যা আয়ত্তের মধ্যে আসার সম্ভাবনা। সংগ্রহ-দর বাড়িয়ে দিলে গবর্ণমেণ্টের খরচ কিছু বাড়বে সত্য, কিন্তু সাবসিডি দিতে হলে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হ'ত তা হবে না, অথচ গবর্ণমেণ্টকে পক্ষপাত-দোষেও দোষী হতে হবে না। চাষীও তখন পাবে অধিকতর উৎপাদনের প্রেরণা।

কলিকাতাই হ'ল কালোবাজারের কেন্দ্র। কলিকাতার বাজারে চাহিদা প্রবল থাকলে কালোবাজারীরা 'স্মাগল' করতে প্রলুব্ধ হয়। সুতরাং প্রধানতঃ কলিকাতার চাহিদাই হ'ল কালোবাজারী-দরের নিয়ামক। কলিকাতার এই চাহিদার প্রকৃতিটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। সপ্তাহে একজন লোকের গড়ে ৩।০ সের চাল লাগে, খাদ্য-গবেষকেরা বলেছেন। কণ্ট্রোলের বরাদ্দ সপ্তাহে ১ সের চাল ও ১ সের দশ ছটাক আটা ময়দা বা গম; অর্থাৎ মোট ২ সের ১০ ছটাক। সুতরাং ঘাটতি হয় ১৪ ছটাক খাদ্যশস্য। আমাদের পারিবারিক অভিজ্ঞতাও তাই। সাধারণতঃ লোকের কালোবাজার থেকে সপ্তাহে এক সের করে চাল খরিদ করতে হয়। কালোবাজারের দর এই এক সের চাহিদার উপর নিয়ন্ত্রিত হয়। কর্ডনিং-এর ফলে স্মাগল করা যত অসুবিধাজনক হয় কালোবাজারের দর তত চড়তে থাকে। অধিকন্তু খোলাবাজারে কেনার উপায় নেই বলে যাদের সামর্থ্য আছে তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরিদ করে ভবিষ্যতের জন্য মজুত রাখতে উদ্বুদ্ধ হয়। কালোবাজারের দর এতেও কিছু চড়ে, লোকে তাই সেরপ্রতি এক টাকা থেকে দেড় টাকা পর্য্যন্ত দিয়ে চালের অভাব পূরণ করতে বাধ্য হয়।

কলকাতা অঞ্চলে খাদ্য বণ্টনের যে নূতন ব্যবস্থা হ'ল তাতে আমরা কণ্ট্রোলের দরে ২ সের ১০ ছটাক খাদ্যশস্য ত পাবই, অধিকন্তু কেয়ার প্রাইস শপ থেকে ৩০ টাকা দরে অতিরিক্ত ৬ ছটাক চালও পাব। সুতরাং আমাদের অভাব থাকবে মাত্র ৮ ছটাকের। অতএব এখন খোলাবাজার বা কালোবাজারের দর নির্ভর করবে এই ৮ ছটাক চাহিদার উপর। পুলিসের রুলের গুঁতোর ভয় না করে খোলাবাজার থেকে প্রয়োজন বোধ করলেই যখন যতটা ইচ্ছা চাল বা আটা যে-কোন সময়েই কেনা যাবে তখন পূর্ব্ব থেকে কিনে সঞ্চয় করে রাখার প্রবৃত্তি না জাগাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে এই অতিরিক্ত ৬ ছটাক দিয়েই দুই এক সপ্তাহ চালিয়ে নেওয়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং চাহিদা হ্রাস পাওয়ার এবং তীব্রতা কমে যাওয়ায় কালোবাজারের দর পড়াই স্বাভাবিক। আশপাশের গ্রাম থেকে যে সব মেয়েপুরুষ লুকিয়ে চুরিয়ে দু-দশ সের চাল মাথায় করে এনে আমাদের অভাব মিটিয়েছে এখন তারা বেচতে চাইলে তাদের বেচতে হবে সের প্রতি ১২ আনার কমে; তাই খুব বেশী চাল 'স্মাগল' হয়ে কলকাতার দিকে আসার সম্ভাবনা কম। বর্ত্তমান নীতির ফলে তাই সাধারণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প দরে চাল কিনে অভাব মেটানো সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

বর্ত্তমান খাদ্যনীতির ফলে কালোবাজারীরা যাতে গ্রামকে নিঃস্ব করে সমস্ত চাল কলকাতা এলাকায় এনে ফেলতে না পারে তার জন্য গবর্ণমেণ্ট চেয়েছেন কলকাতা অঞ্চলকে কর্ডনের বেড়াজালে ঘিরতে। ব্যবস্থাটা খুব যুক্তিসঙ্গত বলে আমরা মনে করি না। পূর্ব্বেই বলেছি যে, খোলাবাজার বা কালোবাজারের দর কলকাতা অঞ্চলে নির্ভর করবে ৮ ছটাক ঘাটতি চাহিদার উপর। 'স্মাগল' করার প্রবৃত্তি তখনই প্রকট হয় যখন ঝুঁকির অনুপাতে মুনাফা পাওয়া যায় অনেক। বাজার খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "কেয়ার প্রাইস শপ" প্রবর্ত্তন করায় খোলাবাজারে চালের দর থাকবে ৩০ টাকার কাছাকাছি; অতিরিক্ত চালের মাত্রা

অদূর ভবিষ্যতে কিঞ্চিন্মাত্রও বাড়ানো গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যদি সম্ভব হয় তা হলে বাজার না নেমেই পারে না। এরূপ অবস্থায় কর্ডনের বেড়া তুলে কৃত্রিম উপায়ে যোগান ব্যাহত করে কালোবাজারীদের সুবিধা করে দেওয়ার কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না। তুলনায় বাজার-দরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেচায় কিছু সুযোগ চাষীরা যদি পায় তা হলে লাভের মুখ দেখে তারা স্বতঃই অধিকতর উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ হবে। গ্রাম থেকে কলকাতার দিকে চালের অভিযান নিয়ন্ত্রণ করার বাসনা যদি থাকে তাহলে কর্ডনিঙের বদলে 'ল্যাণ্ড কাষ্টমসের' ব্যবস্থা করলে সুফল পাওয়া যাবে আশা করা যায়। স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে অযথা বাধার সৃষ্টি করলে কৃষি বা বাণিজ্য কোনটাই প্রসারলাভ করতে পারে না। মাত্র একটা ডিক্লেয়ারেশন বিবৃতি দিয়ে যে-কোন বণিক বা চাষী যদি চাল কলকাতা অঞ্চলে চালান দিতে সমর্থ হয় তা হলে ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটা স্বাভাবিক পথে চলতে পারে। কলকাতার বাইরের দরের সঙ্গে, কলকাতার দরের সমতা রাখার মত একটা সমতামূলক শুল্ক যদি ধার্য্য করা যায়, তা হলে আর আশঙ্কার কারণ থাকে না; অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টও একটা নূতন আয়ের পথ খুঁজে পান।

বর্ত্তমানে যে ভাবে চাল সংগ্রহ করা হয় তাতে চাষীর মনে 'জোর-জবরদস্তি'র একটা ধারণা জন্মে; তাই অনেক ক্ষেত্রেই বাধাদানের কথা শোনা যায়। কিন্তু স্বাধীন ভাবে বেচবার ও যে-কোন স্থানে (পশ্চিম বাংলার ভিতর) বেচবার অধিকার যদি থাকে, তা হলে ন্যায্য দরে গবর্ণমেণ্টকে না বিক্রী করবার কোন কারণ নেই, বরং তারা খুশীমনেই এগিয়ে আসবে। সরকারের মত খরিদ্দারকে যখন পাবে তখন চাষীর না বেচবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাই না। মহাজন-চাষীর কাছেই বিশেষতঃ কলকাতায় বাজার লোভের বস্তু। যে সব ঘাঁটি দিয়ে কলকাতায় চাল প্রবেশ করা সম্ভব, সেই সব ঘাঁটিতে যদি "কাষ্টম্‌স পোষ্ট" বসান যায় এবং ঘোষণা করা হয় যে, শুল্ক দিয়ে কলকাতায় যে কেউ চাল আমদানী করতে পারে এবং চাল আমদানী করতে গেলে কাষ্টম্‌স পোষ্টে একটা ফিরিস্তি দিতে হবে যে কে, কার কাছ থেকে, কত চাল আমদানী করছে ইত্যাদি এবং ঐ কাষ্টম্‌স ঘাঁটিতে নির্দ্দিষ্ট হারে শুল্ক আদায় করে ছাড়পত্র সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয় তা হলে যারা প্রকৃত বণিক তারা সুযোগ পাবে এবং তার ফলে কলকাতার বাজারদর নামার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে এই নীতি অনুসরণ করলে গ্রামকে রিক্ত করে সব চাল কলকাতা অভিমুখে আসার সম্ভাবনাও কমে যায়। মুনাফার সম্ভাবনা থাকলে কালোবাজারীদের কর্ডনের বেড়াজাল দিয়ে দূরে রাখা যাবে না, 'স্মাগল' তারা করবেই। অথচ শুল্ক দিয়ে চাল আমদানী করার সুবিধা যদি থাকে, তা হলে কালোবাজারীদের সঙ্গে সত্যকারের বণিকদের চলবে প্রতিযোগিতা এবং এই উভয়ের প্রতিযোগিতায় চাষী পাবে ভাল দর, তথা অধিকতর উৎপাদনের প্রেরণা। অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টও লাভবান হবেন, শুল্ক বাবদ কিছু আয় হবে এবং তাই দিয়ে চাষীর কাছ থেকে বর্দ্ধিত দরে সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। তা ছাড়া, কোন্ আড়তদারের ঘরে কত চাল উঠল তারও একটা হিসাব হাতে হাতে পাওয়া যাবে। সুতরাং আড়তদারদের ফাঁকি, জুয়াচুরি ধরাও অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। বাজার কোণঠাসা করে বাজার চড়াবার প্রবৃত্তি যদি আড়তদারদের মনে জাগে, তা হলে মজুত মাল বাজেয়াপ্ত করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। অবশ্য জনসাধারণের সহযোগিতা পেলেই যে-কোন নীতি সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। যাঁরা জনসাধারণের প্রকৃতই হিতকামী—তা তিনি যে দলেরই হউন না কেন, আশা করা যায়, তাঁরা এই নীতি অনুসৃত হলে সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করবেন, কেননা এখন খাদ্যসমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

সুরেন্দ্রনাথ

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্র-গুরু,
মাতৃ-মন্ত্র শুরু
হ'ল তব তূর্য্য-রবে হে সুরেন্দ্রনাথ!
বঙ্গ-বক্ষে এল নব-চেতনার প্রসন্ন প্রভাত।
প্রাণ-স্পন্দ স্ফূর্ত হ'ল কঙ্কালের: জাতীয়তা জয়-দৃপ্ত-চিত্তে
নাচিল সৈনিক-বেশে লৌহকারা বিচূর্ণ করিতে।
স্তব্ধ হ'ল রাজ-শক্তি: হ'ল নত শির
মত্ত বিদেশীর।
মহারণ!
আসে পর্ব্বত
ভেদিয়া তোমার রথ অব্যাহতগতি:
বুক্তভর আত্মবোধ অত্যাচারে করে নাই নতি।
জাতিরে দেখালে পথ; পৌরুষের বীরমন্ত্র ক'রে গেলে দান
বাঙালীর হাতে তুমি তুলে দিলে বিজয়-কৃপাণ।
স্বদেশের মুক্তি লাগি' ক'রেছ সংগ্রাম:
তোমার প্রণাম।

পৌরাণিক গ্রন্থে ভারতের আদিম মানব-প্রসঙ্গ

শ্রীকালিদাস দত্ত

ভারতবর্ষের হিন্দু-সভ্যতা কেবলমাত্র আর্য্যজাতির অবদান নহে। সুদূর অতীত যুগ হইতে বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির সমন্বয়ে উহা গঠিত হইয়াছে। ঐ সকল বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে ভারতের বর্ত্তমান বিরাট হিন্দুজাতিরও উদ্ভব হইয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক আদিম অনার্য্য জাতিও আছে। আর্য্যজাতির আগমনের বহু পূর্ব্বকালে উহারা ভারতভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তন্মধ্যে দুই-একটি জাতি অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে উচ্চাঙ্গের সভ্যতা গঠনেও সক্ষম হয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অভাবে ঐ সমস্ত আদিম মানবের প্রকৃত ইতিবৃত্ত পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বহুদিনের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে উহা ক্রমশঃ জ্ঞানগোচর হইতেছে। পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে ঐ শ্রেণীর মানবগণের কথাই দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষস, বানর ও পক্ষীরূপে বহু অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত কাহিনীর সহিত বিজড়িত আছে। তজ্জন্যই ঐ সকল গ্রন্থে উহারা অতি-প্রাকৃতরূপে বর্ণিত হইলেও, দেখা যায় যে মনুষ্যের অনুরূপ উহাদের মন, বুদ্ধি ও কথাবার্ত্তা ছিল। উহারা গ্রাম নগরাদিতে গৃহাদি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বসবাস করিত। উহাদের মধ্যে বহু যোদ্ধা, রাজা, ও শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছিল। সময় সময় আর্য্যেরাও ঐরূপ দানব বা অসুরের সুন্দরীকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন। আর্য্যবংশীয় ঋষিপুত্রগণও আবার পতিত হইয়া উক্ত রাক্ষস-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতেন।

ঐ সমস্ত বিষয়ের উদাহরণ-স্বরূপ বাল্মীকি রামায়ণ হইতে রাবণের লঙ্কাপুরীর বিবরণ১, বানররাজ বালির স্বর্ণখচিত রত্নপূর্ণ ও ধ্বজাশোভিত রাজধানীর বৃত্তান্ত২, জটায়ু পক্ষীর পৈতৃক রাজ্যশাসন ও রাজা দশরথের সহিত সখ্যের কথা৩, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পিঙ্গলাক্ষ, বিরোধ, সুপুত্র ও সুমুখ নামক পক্ষীদের বিন্ধ্যাচলে জৈমিনীকে মার্কণ্ডেয়-ক্রৌষ্টুকি সংবাদ উপক্রম দ্বারা ব্যাখ্যার কাহিনী৪, এবং পুরাণসমূহ হইতে আর্য্যপুত্র যযাতি কর্ত্তৃক দানবরাজ বৃষপর্ব্বের দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ৫ ও আর্য্যধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিবার জন্য সূর্য্যবংশীয় রাজা কল্মাষপাদ৬ এবং ঐলবিল বিশ্রবা ঋষির পুত্র রাবণ ও বিভীষণ প্রভৃতির রাক্ষস বলিয়া পরিগণিত হইবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাইতে পারে।৭

এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সকল অসুর, রাক্ষস, বানর ও পক্ষী মনুষ্য ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না। বৈদিক গ্রন্থে যে পঞ্চকৃষ্টি বা পঞ্চ মনুষ্য-জাতির উল্লেখ আছে যাস্ক প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিত উহা গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ ও রাক্ষসগণকে বুঝাইত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।৮

পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে অনার্য্যদের ঐরূপ বর্ণনার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতীয় আর্য্যেরা চতুর্দ্দিকে ঐ সকল আদিম জাতির দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত ভারতীয় আর্য্যদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির গুরুতর পার্থক্য ছিল। আর্য্যেরা তাহা তীব্রভাবে অনুভব করিতেন। সে কারণ তাঁহারা ঐ সকল অনার্য্যকে মানব অপেক্ষা হীন বিবেচনায় নিন্দাত্মক দৈত্য, দানব, রাক্ষস, বানর, অসুর ও পক্ষী সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, বগধ ও চের এই ত্রিবিধ প্রজা বা মানবের বিহঙ্গ নামে যে উল্লেখ আছে উহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।৯ কালক্রমে ঐ প্রকার উক্তিসমূহ জনপ্রবাদের সাহায্যে সাধারণ লোকের মনে বিকৃতরূপে বদ্ধমূল হইলে, অবাস্তবে বিশ্বাসী, সনাতন সংস্কারসম্পন্ন কবি ও লেখকগণ যে কাল্পনিক বর্ণনার দ্বারা উহা ঐরূপ অতি-প্রাকৃত ও ভয়াবহ করিয়া তুলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কল্পনাপ্রসূত ঐ প্রকার বহু অবাস্তব বিবরণের সহিত জড়িত হওয়ায় পৌরাণিক বৃত্তান্তগুলিতে কোন ঐতিহাসিক সত্য থাকা সম্ভব নহে এই ধারণা পূর্ব্বে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বারা সুদূর অতীতের অন্ধকার হইতে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস ক্রমশঃ আবিষ্কারের ফলে ঐ সমস্ত পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে স্থানে স্থানে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে সেগুলির উপরও কিছু কিছু আলোকপাত হইতেছে।

---

১ বাল্মীকি রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৩য় সর্গ।
২ ঐ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৪শ সর্গ।
৩ ঐ অরণ্যকাণ্ড, ৫০ ও ৫৩ সর্গ।
৪ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, অবতরণিকা।
৫ মৎস্যপুরাণ, ৩০।৩২,৩৩ অধ্যায়।
৬ বিষ্ণুপুরাণ, ৪র অধ্যায়।
৭ কূর্ম্মপুরাণ, ৪৯ অধ্যায়।
৮ নিরুক্ত (৩।৮)
৯ মৎস্যপুরাণ, ১০২ অধ্যায়, (১৭।২১)

পুরাণকারগণ ভারতের প্রাচীন মানব-সভ্যতার বয়স দিব্যমানের হিসাবে দশ হাজার আট শত বৎসর ধরিয়াছেন এবং উহা কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপর নামে তিনটি যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের উক্ত হিসাবমতে কৃতযুগ চারি সহস্র বৎসর ও উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ চারি শত হিসাবে আট শত বৎসর, ত্রেতাযুগ তিন সহস্র বৎসর ও উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ তিন শত হিসাবে ছয় শত বৎসর এবং দ্বাপরযুগ দুই সহস্র বৎসর—উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত হিসাবে চারি শত বৎসর।

পুরাণে উল্লিখিত এই কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপর তিনটি কালই প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তর্গত। তন্মধ্যে প্রথমটি উহার আদি, দ্বিতীয়টি মধ্য ও তৃতীয়টি অন্তকাল। উক্ত আদিকালের মানবগণের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পৌরাণিক গ্রন্থে আছে এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করা হইতেছে।

বহু কাল্পনিক অবাস্তব বিবরণের সহিত জড়িত থাকিলেও ইহার কিয়দংশের সহিত অনুসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা লব্ধ আদিম মানবগণের বিবরণের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। বায়ু-পুরাণে উক্ত অংশ এইরূপ :

"সরিৎসরঃ সমুদ্রাংশ্চ সেবন্তে পর্ব্বতানপি।
তদা নাত্যম্বু শীতোষ্ণ যুগে তস্মিংশ্চরন্তি বৈ।
পৃথ্বি্রসোদ্ভবং নাম আহারং হ্যাহরন্তি বৈ।
তাঃ প্রজাঃ কামচারিণ্যো মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তাবাস্তাং নির্ব্বিশেষাঃ প্রজাস্ততাঃ।
তুল্যমায়ুঃ সুখং রূপং তাসাং তস্মিন্ কৃতে যুগে।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তাবাস্তাং কল্পদৌতু কৃতে যুগে।
স্বেন স্বেনাধিকারেণ জজ্ঞিরে তে কৃতে যুগে।
... ...
নির্ব্বিশেষাস্ত তাঃ সর্ব্বা রূপায়ু শীলচেষ্টিতৈঃ।
অবুদ্ধি পূর্ব্বকং বৃত্তং প্রজানাম্ জায়তে স্বয়ম্
অপ্রবৃত্তিঃ কৃত যুগে কর্ম্মণোঃ শুভপাপয়োঃ।
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ন সঙ্করঃ।১০

অর্থাৎ—সেই আদিম যুগে শীত, বৃষ্টি ও আতপাদি কম ছিল, প্রজাগণ সরিৎ সরোবর ও পর্ব্বতাদিতে তখন বাস করিত। সেই সমস্ত কামচারী মনঃসিদ্ধিসম্পন্ন প্রজাগণ পৃথিবীর স্বভাবজাত আহারসমুদয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম ছিল না, সকলেই নির্ব্বিশেষ ছিল। সুখাদি সকল বিষয়ে তাহারা তুল্য ছিল। সকলেই নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়া জীবন যাপন করিত।...রূপ, স্বভাব ও ক্রিয়া প্রভৃতি সকলেরই সমান ছিল। কাহারও কিছুমাত্র বিশেষ দেখা যাইত না। কেহ ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া কোন কাজ করিত না, পরন্তু স্বভাববশেই কাজ করিত। কৃতযুগে শুভ অশুভ কোন রকম কর্ম্মেরই প্রবৃত্তি ছিল না, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাও ছিল না।

ঐ সময় মানবেরা যে যাযাবর ছিল তাহারও পরিচয় পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, "কৃতং সম্পদ্যতে চরণ" (কৃত-যুগে মানবেরা বিচরণশীল ছিল) এই উল্লেখ হইতে।১১

মহাভারতে তৎকালীন নারীদেরও বিবরণ এইরূপ, "মহিলারা তখন অনাবৃত থাকিত। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিত। কৌমারাবধি এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধর্ম হইত না। তখন ঐরূপ ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত ছিল।"১২

মৎস্যপুরাণে উল্লিখিত আছে যে ঐ প্রকার আদিম সভ্যতার অবসানে ত্রেতাযুগের আরম্ভ হয় এবং সেই সময় হইতেই ঐরূপ মানবগণের মধ্যে গৃহ ও গ্রাম নির্ম্মাণ এবং বার্ত্তাবিনিময়ের প্রবর্ত্তন হইতে থাকে। যথা :

"অন্তর্হিতায়াং সন্ধ্যায়াং সার্দ্ধং কৃত যুগেন হি।
কালাখ্যায়াং প্রবৃত্তায়াং প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে তদা।
ওষধীষু চ জাতাসু প্রবৃত্তে বৃষ্টি সর্জ্জনে।
প্রতিষ্ঠিতায়াং বার্ত্তায়াং গ্রামেষু চ পুরেষু চ।"১৩

অর্থাৎ—কৃতযুগ সন্ধ্যা সহ অন্তর্হিত হইলে ত্রেতাযুগের আরম্ভ হয়। পরে সুবৃষ্টির ফলে সর্ব্বত্র ঔষধিসমূহের উদ্ভব হয় এবং গ্রাম পুরাদি প্রতিষ্ঠা ও বার্ত্তাবিনিময় প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে।

বায়ু-পুরাণকার ঐ সময়ের অবস্থা আরও বিশদভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই :

"কৃত্বা দ্বন্দ্ব প্রতীকারং নিকেতানি হি ভেজিরে।
পূর্ব্বং নিকামচারাস্তে অনিকেতাশ্রয়া ভৃশম।
যথাযোগ্যং যথা প্রীতি নিকেতষ্ববসন্ পুনঃ।
মরুধন্বসু নিম্নেষু পর্ব্বতেষু নদীষু চ।
সংশ্রয়ন্তি চ দুর্গাণি ধন্বানং শাশ্বতোদকম।
যথাযোগ্যং যথাকামং সমেষু বিষমেষু চ।
আরব্ধাস্তে নিকেতান বৈ কর্ত্তুং শীতোষ্ণবারণম্।
ততঃ সংস্থাপয়া মাস খেটানি চ পুরাণি চ।
গ্রামাংশ্চৈব যথাভাগং তথৈবান্তঃ পুরাণি চ।
তাসামায়ামবিষ্কম্ভান সন্নিবেশান্তরাণি চ।

১০ বায়ুপুরাণ, ৮ অধ্যায় ৪৭,৫০,৬০,৬১

১১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,
১২ মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১২২ অধ্যায়
১৩ মৎস্যপুরাণ, ১৪৩ অধ্যায়, ২,৩

চক্ষুস্তদা যথা প্রাজং নিম্না নিম্নায়ণোঽম্বুদৈঃ।
মনোহর্ষাণি প্রমাণানি তদা প্রভৃতি চক্রিরে।"১৪

অর্থাৎ—সেই যথেচ্ছবিহারী গৃহহীন প্রজাগণ গাত্রাবরণ দ্বারা শীতবাততাপ-ক্লেশ নিবারণ করিয়া বাসগৃহসমূহ আশ্রয় করিতে আরম্ভ করে। তাহারা যথাযোগ্য স্ব-স্ব প্রীতি অনুসারে গৃহনির্ম্মাণপূর্ব্বক সুখে বাস করিতে থাকে। মরু, উন্নত, নিম্ন, পর্ব্বত, নদী, জলপ্রায়, সম, বিষম, দুর্গম, ইত্যাদি নানাস্থানে আপন আপন রুচিমত শীততাপ-ক্লেশ নিবারণ-উদ্দেশ্যে গৃহাদি নির্ম্মাণ আরম্ভ করে। তাহাতেই খেট (ক্ষুদ্র পল্লী) গ্রাম ও পুর ইত্যাদি স্থাপিত হয় এবং সেই সকলের দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদি পরিমাপ করণার্থ তখন অঙ্গুলিদ্বারা বিবিধ পরিমাণ সংজ্ঞাও বিহিত হয়।

১৪ বায়ু পুরাণ, ৮ অধ্যায় ৯৩-১০১

বর্ত্তমান কালের অনুসন্ধানলব্ধ সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায় যে, পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত কৃতযুগের বহু পূর্ব্বকাল হইতে পৃথিবীর নানাস্থানে আদিম মানবগণের অস্তিত্ব ছিল এবং তাহারা তখন সম্পূর্ণ বন্য অবস্থায় কালাতিপাত করিত। কতকাল পূর্ব্বে পৃথিবীতে ঐরূপ বন্য মানবের সৃষ্টি হয় তাহা এখনও সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। প্রাচীনতম বন্য মানব-প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত ওলন্দাজ নৃতত্ত্ববিদ্ Dr. Gustav von Koeningswald বলিয়াছেন :

"Man in the original form lived in the trees and was a powerful creature. When the forests vanished, the creature moved to the ground and began to especialize in the various avenues of intelligence, such as making of implements."

ফরাসী রসায়নবিদ্ গে লুসাক

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের যে-কোন এক দিন ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিস নগরীর একটি নামকরা রাসায়নিক গবেষণাগার দেখতে যে পর্যটকই গিয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, চোখে চশমা-পরা গম্ভীর প্রকৃতির এক ফরাসী ভদ্রলোক পরীক্ষাগারের চারদিক তদারক করছেন, সঙ্গে তাঁর অল্পবয়সী সুশ্রী এক জার্ম্মাণ যুবক। ঐ চশমা-পরা ভদ্রলোক হচ্ছেন তাঁদেরই অন্যতম যাঁদের ঐকান্তিক সাধনা, অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং সত্যানুসন্ধিৎসার গুণে রসায়নশাস্ত্র তার পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করে ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর নাম জোসেফ লুই গে লুসাক—সংক্ষেপে গে লুসাক; আর জার্ম্মান যুবকটি হলেন জাস্টাস ভন্ লিবিগ্—ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মান রসায়নবিদ্‌দের মধ্যে একজন নামকরা ব্যক্তি, রসায়নে প্রথম পাঠ গ্রহণ করবার সময়ই শিক্ষার্থী যাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত হয় 'লিবিগ্ কন্‌ডেন্সার' এই কথাটির মারফতে। এ সময় লিবিগ্ গে লুসাকের সহকারী হিসাবে কাজ করছিলেন প্যারিসের গবেষণাগারে।

গে লুসাক জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ফরাসীর অন্তর্গত লিমোজ নামক স্থানে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আইনব্যবসায়ী, তা ছাড়া তাঁর ছোটখাটো জোতদারীও ছিল। ফরাসী দেশের অবস্থা তখন অর্থবিপ্লব এবং আরও নানা কারণে মোটেই শান্তিপূর্ণ ছিল না; তাই গে লুসাক বাড়ীতেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে বাধ্য হন। ১৭৯৪ সালে তিনি প্যারিসে এলেন সেখানকার একল পলিটেকনিক নামক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার জন্যে। শহরতলীর কোন এক ভদ্রমহিলার বাড়ীতে তিনি থাকতেন। মহিলাটি প্রতি রাত্রে গাড়ীভর্ত্তি দুধ বিক্রী করবার জন্যে প্যারিসে আসতেন। সঙ্গে থাকতেন গে লুসাক। সকালবেলা বাড়ী ফেরবার সময় দেখা যেত, গে লুসাক গাড়ীর মেঝের শুয়ে শুয়ে বীজগণিত বা জ্যামিতির পড়া তৈরি করছেন।

১৭৯৭ সালে গে লুসাক বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পলিটেকনিক্ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার পরীক্ষা পাস করলেন। তিন বছর পর তিনি এখানকার পড়া শেষ করে ফুরক্রোয়া এবং বারথোলের সহকারী রূপে কাজ করতে আরম্ভ করেন। বারথোলে তাঁর কর্ম্মতৎপরতা এবং প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁর নিজস্ব গবেষণাগারে লুসাককে কর্ম্মে নিযুক্ত করলেন। বারথোলে এ সময় নানাবিধ গ্যাস নিয়ে উত্তাপ-প্রয়োগে তাদের আয়তনবৃদ্ধি সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন। এখান থেকেই গে লুসাক সর্ব্বপ্রথম তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ সময় তিনি গ্যাসের চাপ, জলীয় বাষ্পের চাপ, ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন।

১৮০৪ সালে গে লুসাক বায়টের সঙ্গে বেলুনে চড়ে ঊর্দ্ধাকাশে চুম্বকের আকর্ষণ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষণ-কার্য্য করেন। তিনি দেখতে পান যে, পৃথিবী থেকে সাত হাজার মিটার উঁচু

পর্য্যন্ত চুম্বক-আকর্ষণের কোনরূপ তারতম্য হয় না। এক বছর পর তিনি জার্মাণী এবং ইটালীতে ভ্রমণের জন্যে বেরিয়ে পড়লেন, উদ্দেশ্য—দেশ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভ। তখনকার দিনের বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের অনেকের সঙ্গেই তিনি এ ভ্রমণকালে সাক্ষাৎলাভ করেন। বোলোনায় গবেষণাকার্য্য করতেন এ সময় জগদ্বিখ্যাত বিদ্যুৎ-গবেষক ভোল্টা। তিনি সহজ, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। কাজেই তাঁকে খুঁজে পেতে গে লুসাকের একটু অসুবিধা হয়েছিল।

দু'বছর এমনি ভাবে কাটিয়ে গে লুসাক প্যারিসে ফিরে এলেন। এখানে আসার পরই তাঁকে ইনষ্টিটিউট দ ফ্রান্স-এর সদস্য করা হ'ল। এর দু'বছর পর অর্থাৎ ১৮০৮ সালে তিনি তাঁর 'বায়বীয় পদার্থের মিলনসূত্র' (Law of gaseous volume) আবিষ্কার করেন। এর পর থেকে তিনি লুই জ্যাক থেনার্ডের সঙ্গে একত্রে গবেষণা-কার্য্য আরম্ভ করেন। বিয়েও করেন তিনি এই বছরেই। জোসেফাইন রোজো কাজ করতেন এক কাপড়ের দোকানে। এক দিন গে লুসাক সে দোকানে পোশাক কিনতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে, মেয়েটি অবসর-সময়ে রসায়নের বই পড়ছেন। গে লুসাক তখনই তাঁকে তাঁর চাকরি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দিলেন। পড়াশুনা শেষ হলে গে লুসাক জোসেফাইনকে বিয়ে করেন। তাঁরা ছিলেন আদর্শ দম্পতি—বিয়ের সময় অবশ্য গে লুসাকের তখন ভাল চাকরি ছিল না, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই (১৮০৯ সালে) তিনি একল পলিটেকনিকে অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন।

গে লুসাক এবং থেনার্ড অনেক দিন একই সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৮০৭ সালে তৎকালীন সুবিখ্যাত রাসায়নিক ডেভি এলকালি মেটাল আবিষ্কার করে বিশেষ নাম করেছিলেন। তাঁর আবিষ্কারের চেয়ে উঁচু স্তরের আবিষ্কার যাতে গে লুসাক এবং থেনার্ড করতে পারেন সেজন্যে তৎকালীন ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন এদের বহু প্রকারে সাহায্য করেছিলেন। কিছুদিন পর তাঁরা 'বোরোন' আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। তা ছাড়া এলকালি মেটাল, ক্যালসিয়াম, বেরিয়াম ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ গবেষণা-কার্য্য তাঁরা করেছেন। এ সব কাজ করতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় গে লুসাক একবার আহত হয়েছিলেন। চোখে এমন আঘাত লেগেছিল যে, তিনি দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারাতে বসেছিলেন।

ক্লোরিন গ্যাস সম্বন্ধে তখনকার দিনের রাসায়নিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। লেভয়সিয়রের মত ছিল যে, ক্লোরিন গ্যাস কোন যৌগিক পদার্থ নয়, এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে অক্সিজেন। কিন্তু ডেভি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ক্লোরিন একটি মৌলিক পদার্থ। গে লুসাক এবং থেনার্ড লেভয়সিয়রের সিদ্ধান্তই সমর্থন করতেন বলে ডেভি এবং এদের মধ্যে সামান্য বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। ১৮১৪ সালে গে লুসাক 'আইডিন' সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা করে বহু মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেন। ক্লোরিন গ্যাস নিয়েও তিনি অনেক কাজ করেছেন।

১৮১৫ সালে গে লুসাক 'সাইনোজেন' আবিষ্কার করেন। পর বৎসর নাইট্রোজেন অক্সাইড সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা প্রকাশিত হয়। এর তিন বছর পর তিনি আবিষ্কার করেন ডাইথাওনিক এসিড। এর পরে থেকে কি করে রসায়নবিদ্যা নানা কাজে লাগান যায় সে দিকে তিনি বিশেষ মনোযোগ দেন। তিনি দেখতে পান যে, বোরাক্স বা এমোনিয়াম ফসফেটের দ্রাবণে কাঠ ডুবিয়ে নিলে তার দহনশীলতা অনেক কমে যায়। সালফিউরিক এসিড তৈরি করতে গিয়ে গে লুসাক দেখেন টাওয়ারের একান্ত প্রয়োজন। এই টাওয়ারটির ধারণা নিতান্ত আকস্মিক ভাবে তাঁর মনে আসে এবং তার পরের দিন সকালেই একজন সহকারীর সাহায্যে তিনি তা কাজে পরিণত করে ফেলেন। আরও অনেক রকম রাসায়নিক বিষয় নিয়েও তিনি বহু মূল্যবান গবেষণা করেছেন—কাঠ থেকে অক্জালিক এসিড তৈরি তার মধ্যে অন্যতম।

গে লুসাক যদিও একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যবহার ছিল চমৎকার। তিনি ছিলেন সাহসী এবং ধৈর্য্যশীল। বন্ধুপ্রীতি ছিল তাঁর অসাধারণ তাঁর সমসাময়িক রসায়নবিদ ডেভি, বারথোলে প্রভৃতি মুক্ত কণ্ঠে তাঁর উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন।

বৃদ্ধাবস্থায় গে লুসাক তাঁর স্বগ্রামে গিয়ে বাস করতে সুরু করেন। ১৮৫০ সালে তিনি এখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। দু'মাস পর তাঁকে প্যারিসে নিয়ে আসা হ'ল। এখানে তিনি ঐ বছরেই মে মাসে দেহত্যাগ করেন।

গে লুসাক আজ ইহলোকে নাই। কিন্তু যতদিন রসায়ন-শাস্ত্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত তার নাম লোকে ভুলবে না। যে সব বিজ্ঞান-সাধকের অক্লান্ত চেষ্টায় রসায়ন-শাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই লেভয়সিয়র, ডলটন, বার্জেলিয়াস, প্রভৃতির সঙ্গে গে লুসাক রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

মুঘল অন্তঃপুরে অসমীয়া রাজকুমারী

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগে যুদ্ধজয়ের শর্ত হিসাবে বিজিত দেশের সুন্দরী রমণী আহরণ বীরপুরুষদের মধ্যে প্রায়ই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার মত নারীও ছিল বীরভোগ্যা। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে দিল্লীর পাদশাহী আমলেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ত ছিলই না, বরং মুঘল অন্তঃপুরে ভারতবর্ষ ও ভারতের বাহিরের বহু রমণী (এমন কি অল্পবয়স্কা বালিকা পর্য্যন্ত) যুদ্ধজয়ের ফলে বা ক্রয়-বিক্রয়ের দরুন অথবা আনুগত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সংগৃহীত হইয়া রংমহল শীষমহলের শোভা বৃদ্ধি করিত। পুরসুন্দরীদের নূপুর-নিক্বণে বন্দীরা গান সাহিত্য কিম্বা ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয় না, কিন্তু নওরোজের উৎসবের দিনে নহবতে তান যে মিলাইয়া যাইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইরাণ, তুরান, বাহ্লীক, কাশ্মীর, জর্জ্জিয়া, আজার-বাইজান, তুর্কীস্থান প্রভৃতি বহু দেশ হইতে মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী মহিলা ছাড়াও মুঘল-হারেমে মাঝে মাঝে হিন্দু-রমণীরও সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত। কোন কোন রাজপুত অধিপতিরা এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন একথাও ঐতিহাসিক সত্য। অবশ্য রাজপুত-রমণীরা দিল্লী-আগ্রার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেও নিজেদের হিন্দু দাসী-বাঁদী রাখিতেন এবং পূজা-পদ্ধতি পালন করিতেন।

সমসাময়িক ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, মীরজুমলা কর্ত্তৃক পরিচালিত মুঘল-আহোম সংঘর্ষের ফলে ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের ঘিলাঝারি ঘাটের সন্ধির সর্ত্তস্বরূপ একটি অসমীয়া রাজকুমারীকে দিল্লীর পাদশাহী অন্তঃপুরে পাঠানো হয়। শ্রদ্ধেয় ডঃ যদুনাথ সরকার তাঁহার *History of Bengal* (vol. III, p. 350, Ch. XVIII)-এ এই সর্ত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আসাম বুরঞ্জীতে ইহার উল্লেখ আছে এবং এই বিষয়টি আসামের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ শ্রীসূর্য্যকুমার ভূঞা সবিস্তারে নানাস্থানে আলোচনা করিয়াছেন। অসমীয়া বুরঞ্জীগুলির ঐতিহাসিকত্ব পণ্ডিতসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি ইতিহাসের এক মূল্যবান ভাণ্ডারের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বুরঞ্জীতে সন্ধির সর্ত্ত এইরূপ—

"শ্রীশ্রীভিল্লিশ্বর পাৎসাহর দসখত মোহর। শ্রীশ্রীরাজা জয়ধ্বজসিংহ। সকলম বকারতে, ৯ মাঘ সন ১০৭২, বঙ্গাব্দ—শক ১৫৮৪ সাল। লিখিতং শ্রীশ্রীরাজা জয়ধ্বজ সিংহ ও শ্রীবড়গোহাঞি ও শ্রীবুঢ়াগোহাঞি ও শ্রীবড়পাত্র ও শ্রীরাজমন্ত্র বিলায়ত আসামকত···

তাহাত আমার জীউ ও মলুক রাখিবার কারণ শ্রীযুত নবাবখানের খাঁত জামিন দরবিয়ান দিয়া ২০০০০ বিস হাজার তোলা সোনা ও ১২০০০০ একলাখ আরু বিস হাজার রূপা ও নবৈ হাতি সমেত দিয়া আমার রাজা জয়ধ্বজসিংহর বেটি আরু তিপাম রাজার বেটি ৺খেজামতেও দিবার কবুল করিলোঁ···

এহি করারে আমরা আপনা দসখত ও মোহর করিয়া তমসুক লিখিয়া দিলুঁ···দসখত মোহর···"

অর্থাৎ—দিল্লীশ্বর পাদশাহের কাছে একরারনামা লিখিয়া দেওয়া হইল যে, প্রাণ ও মুলুক (রাজ্য) রাখিবার জন্য বিশ হাজার তোলা স্বর্ণ ও এক লাখ কুড়ি হাজার তোলা রৌপ্য, নব্বইটি হাতি ও রাজা জয়ধ্বজসিংহের কন্যা এবং তিপাম রাজার কন্যা পাদশাহ দরবারে প্রেরিত হইবে। ঐ সন্ধিতে আরও দেখা যায় যে, পাদশাহী থানা গৌহাটি লওয়া ও পাদশাহী গ্রাম হইতে রায়ত প্রজা উঠাইয়া নিজের রাজ্যে বসানো —রাজা জয়ধ্বজসিংহের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ ছিল। সেই জন্য "শ্রীযুত নবাব খানখানা (মীরজুমলা) ৺লস্কর লৈয়া আমার মলুক মারিলেক, আমি পলাই আসিয়া নামরূপের পাহারত চড়িলো"

এই সন্ধি অনুসারে যে কুমারীকে মুঘল সেনাপতি মীরজুমলার হাতে সমর্পণ করা হয় সেই কুমারীর নাম হইতেছে রমণী গাভরু এবং তিনি আহোমরাজ জয়ধ্বজসিংহের একমাত্র কন্যা। তিপাম রাজার কন্যার কথা ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সিহাবুদ্দীন তালিশ্ নামে এক গ্রন্থকার মীরজুমলার আসাম ও কুচবিহার আক্রমণের এক কাহিনী লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, মীরজুমলার আদেশে ঐ যুদ্ধে মুঘল সৈন্যের ক্ষয় ও ক্ষতির কথা গোপন রাখা হয়।*

এই পুস্তকটি উর্দ্দুতে মীরবাহাদুর আলিহোসেন কর্ত্তৃক ১৮০৫ সনে অনূদিত হয় ও তাহার পরে ১৮৪৫ সনে টি. পেভি কর্ত্তৃক ফরাসী ভাষারও তর্জমা হয়। ব্লকম্যানও 'জার্নাল অফ্ দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এ ইহার উল্লেখ করেন।

যদিও মীরজুমলা ঐ অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার ধন-সম্পত্তি ও যুদ্ধসম্ভার বহুল পরিমাণে পরহস্তগত হয়, তথাপি আহোমরাজ-প্রদত্ত সম্রাটের প্রাপ্য পেশ্কশ্ ও কুমারী গাভরু যে যথাসময়েই দিল্লীশ্বরের নিকট পৌঁছিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দিল্লীতে পৌঁছি-

*"The author states in the preface that the sufferings and losses of the Imperial Army had been kept secret by the wish of the Khan Khanan . . *Catalogue of Persian Manuscripts in the British Museum*, Vol I."

বার পর অসমীয়া রাজকুমারী মুঘল অন্তঃপুরে কিভাবে গৃহীত হইয়াছিলেন তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা কিভাবে পরিচালিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। হয়ত আর পাঁচ [illegible] আশ্রিতা রমণীর মত গাভরুও পাদশাহী হারেমের রীতিনীতি ও আদব-কায়দায় সুশিক্ষিতা এবং মুসলমান ধর্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার নূতন নামকরণ হয় রহমত বানু বেগম। "মাসির-ই-আলমগিরি" গ্রন্থে এই রাজকুমারীর সহিত পাদশাহ আলমগীরের তৃতীয় পুত্র সুলতান আজমশাহের বিবাহের বর্ণনা আছে এবং এই বিবাহে এক লক্ষ আশী হাজার টাকা মোহর ধার্য হয়। যদি মাসির-ই-আলমগিরির তথ্য সত্য হয় তাহা হইলে বিবাহ-কালে (১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দ ২রা বা ৩রা মে) রাজকুমারীর বয়স বার ও সুলতান আজমশাহের বয়স ছিল ১৬ এবং এই অসমীয়া কুমারীই আজমশাহের প্রথমা বিবাহিতা স্ত্রী। পরে অবশ্য তিনি দারাশিকোর কন্যা জানি বেগমকে ও বিজাপুরের সুলতান-কন্যাকেও বিবাহ করেন। জানি বেগমের সঙ্গে বিবাহ উপলক্ষেই আওরঙ্গজেব তাঁহাকে "আজমতারা" উপাধি দেন। মানুচ্চির মতে* এই কুমার ছিলেন ইন্দ্রিয়াসক্ত, মদ্যপায়ী ও রুক্ষ প্রকৃতির। তিনি সকলের প্রতি অশোভন আচরণ করিতেন এবং লোভীও ছিলেন। দিল্লী পাদশাহীর অসমীয়া বিবরণীতেও† এই শাহজাদা সম্বন্ধে বিশেষ গুণ-কীর্তন নাই। তিনি নাকি বাংলার সুবেদার থাকাকালে শিকারে গিয়া লক্ষ টাকা মূল্যের একটি জহরৎ হারাইয়া আসেন। যে জমিদারের এলাকায় ঐটি হারায় তাঁহার এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড হয়। পরে ঐ জহরৎটি পাওয়া গেলে তিনি জহরৎটিও রাখিয়া দেন, দণ্ডস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থও ফেরত দেওয়া হয় না।

রমণী গাভরুর বিবাহের সময় আজমতারা রোহিলখণ্ডের ফৌজদার ছিলেন, পরে তিনি মুলতান ও বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন ও নবাব শায়েস্তা খাঁর প্রথম সুবেদারীর পর কিছুদিনের জন্য সুবে বাংলারও সুবেদার হইয়াছিলেন। মীরজুমলার সহিত সন্ধির পরও আহোম-মুঘল সংঘর্ষ বন্ধ হয় নাই এবং গৌহাটি শহর মুঘলদের হাত হইতে অসমীয়ারা কাড়িয়া লয়। আওরঙ্গজেব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বরাধিপতি জয়সিংহের পুত্র রাজা রামসিংহকে আসামে পাঠান। অনেকে মনে করেন যে, রাজা রামসিংহ শিবাজীর দিল্লী হইতে পলায়নে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া আওরঙ্গজেবের সন্দেহ হয় এবং সভ্যাগ্রন্ত শিবরাও তাঁহার প্রতি বন্ধুত্বভাবাপন্ন দেখিয়া সম্রাট তাঁহাকে সাম্রাজ্যের সুদূরপ্রান্তে পাঠাইয়া দেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি কামরূপীর কতাদের যাদুমন্ত্রের প্রভাব হইতে তাঁহার সৈন্যদলকে রক্ষা করিবার জন্য গুরু তেগ্‌বাহাদুরকে আসাম অভিযানে সঙ্গী করিয়া লন। অসমীয়া সেনাপতি লাচিত্‌ বড়ফুকন রামসিংহকে পরাজিত করিয়া হঠাইয়া দেন। লাচিতের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা লালুক্‌ বড়ফুকন্‌ গৌহাটির শাসনকর্তা হন। তিনি মৃত রাজা জয়ধ্বজ সিংহের শ্যালক ও সম্পর্কে গাভরুর মাতুল।

রামসিংহের প্রত্যাবর্তনের পরও সম্রাট আহোমদের পুনরায় পরাজিত করার এবং গৌহাটি পুনরাক্রমণের আশা ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি বিহারের তৎকালীন সুবেদার সুলতান আজমতারাকে আসাম আক্রমণের নির্দেশ দেন।

অসমীয়া বুরঞ্জীতে উদ্ধৃত পত্রালাপের নকল হইতে ডঃ ভূঞা দেখাইয়াছেন যে, রাঙামাটির মুঘল ফৌজদার আবু নছর বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁ, গৌহাটির শাসনকর্তা লালুক্‌ বড়ফুকন, বাহুলি ফুকন, সম্রাটপুত্র আজমতারা ও সম্রাটপুত্রের অসমীয়া মহিষী রহমতবানু বেগমের মধ্যে আসাম আক্রমণ সম্বন্ধে পরামর্শ ও পত্রালাপ হয়। মূল পত্রগুলি পাওয়া যায় নাই, বুরঞ্জীতে উদ্ধৃত সারাংশ পরিপোষক অন্য প্রমাণ ব্যতিরেকে কতটা নির্ভরযোগ্য তাহা ইতিহাসবিদ্‌রাই বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবেন।

আবু নছর খাঁর পত্রের মর্ম হইতেছে "পাদশাহজাদা চুলতান আজমতারাই এক লাখ ঘোরা আরু তিনশ' হাতী সহিতে রাজমহল গোমাইছে। ধুলি যৌলে বার্তা দিছে, আরু তেঁও মোবাশহর বরফুকনলৈ এ ঘোর চিরপার চিরপার আরু…তার ফলত যদি গোব্রাহ্মণ হানি হয় সেই পরিণামর ভার বড়ফুকনে পাব"

এই পত্রের মধ্যে মুসলমান সেনাপতির গোব্রাহ্মণের জন্য যে কাতরতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা খুব স্বাভাবিক নয়। অবশ্য এই চিঠিকে ভয় প্রদর্শনের স্বল্প রীতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। লালুক বড়ফুকন মুঘলকে গৌহাটি প্রত্যর্পণ করিয়া আজমতারার সাহায্যে আতন্‌ বুঢ়াগোহাঁইকে সরাইয়া নিজেই আসামরাজ্যের সর্বেসর্বা হইতে চাহিতেছিলেন। সেই সময় মাধবচরণ ও মধুসূদন নামে দুই জন দূত সুবেদার-দরবারে আহোম রাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিল। তাহারা যে চিঠি আনিয়াছিল তাহা বিদ্রূপাত্মক মনে হওয়ায় তাহাদিগকে প্রথমে বন্দী করা হয়। তাহার পর গাভরু বেগমের অনুরোধ সুলতান্‌ আজম্‌শাহ তাহাদিগকে মুক্তি দেন। অসমীয়া বুরঞ্জীর মতে তাহারা নানা উপহার লইয়া আসে।

আর একটি পত্রের উপর ডঃ ভূঞা ও শ্রীযুক্ত বেণুধর শর্মা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সেইটি হইতেছে অসমীয়া কটকী বা দূতের সঙ্গে প্রেরিত স্বদেশ ও স্বজাতি বিরোধী কোন কার্য্য না করিতে অনুরোধ করিয়া মাতুল লালুকের প্রতি মুঘলমহিষী গাভরুর পত্র। এই পত্রটি কার্সী ভাষায়

* Niccolao Manucci : *Storia Do Magor*, p. 462.

† *Annals of the Delhi Badshahate* : Edited by Dr. S. K. Bhuyan.

প্যারিসে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রী কুমারী টকা পল পন্থ কর্তৃক মিসেস্ এলিনোর রুজভেল্টকে প্যারিসের আন্তর্জ্জাতিক শিশুকেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ

ওয়াশিংটনস্থ আন্তর্জ্জাতিক 'ষ্টুডেন্টস্ হাউসে'র ভারতীয় ছাত্রীগণ কর্তৃক ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত খাদ্য পরিবেশন

পুরীতে অনুষ্ঠিত খাদি ও গ্রামীণ শিল্প প্রদর্শনীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ
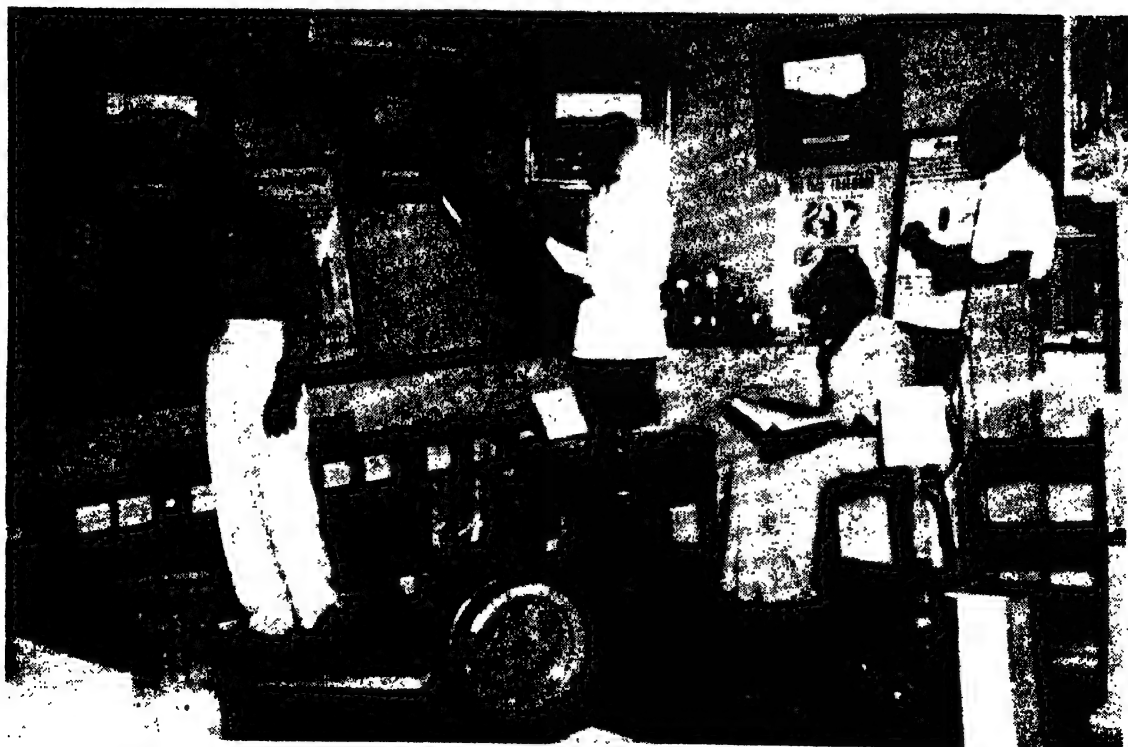
দেরাদুন 'ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটে' ভারতের কাষ্ঠ সম্পদ প্রদর্শন

লিখিত বলিয়া মুরব্বীতে উল্লিখিত এবং ইহার সারাংশ মুরব্বীতে সংরক্ষিত। ইহার পরিপোষক অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মাসির-ই-আলমগির ও অসমীয়া মুরব্বী ছাড়া বেগম রহমত্ বান্থর অন্য কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এই পত্রের যেখানে গাভরু তাঁহার মাতুলকে লিখিতেছেন যে, ছয় বৎসর বয়সে তোমরা আমাকে মুঘলদের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলে আর আজ আমার ঊনিশ বৎসর বয়স—এই তের বৎসর এই দুঃখিনীর কোন বার্তাই তোমরা লও নাই, তখন স্বজন-বিরহ-বিধুর এই রাজকন্যার দুঃখে সত্যই পাঠকের মন কোমল হইয়া উঠে।

লাচুক ফুকনের সঙ্গে গোপন আয়োজন অনুসারে নবাব মনসুর খাঁ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিনা বাধায় পুনরায় গৌহাটি অধিকার করেন। ফুকনের বিনা রক্তপাতে, মুঘল কর্তৃক গৌহাটি দখলের সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিলে রাজকন্যার আজমতারার সুতে সংবর্ধিত হন এবং তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয়। তন্মধ্যে ছিল ঊনিশটি পি‍্‌ ...তার একটি মালা।

আজমতারা সম্রাটের প্রিয় পুত্র ছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষের নানা স্থানে সুবেদারী করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আসাম অভিযানের পর তাঁহার প্রথমা মহিষী রহমত বান্থ ওরফে গাভরু বেগমের কি হইল তাহা জানা যায় না। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আজমতারা নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৭০০, জুন মাসে আজমশাহ বাহাদুর শাহের সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

ভারতের বহির্বাণিজ্য—১৯৫১-৫২

শ্রীশিবব্রত ঘোষ

ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫১-৫২ সালের আমদানী ও রপ্তানীর মোট পরিমাণ যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, ভারতের বাণিজ্যের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে কখনও এরূপ হয় নাই। এ বৎসরে আমদানী-রপ্তানি মিলিয়া মোট ১৬২১ কোটি টাকার লেনদেন হইয়াছে। বাণিজ্যের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতের বাণিজ্যিক গতি এ বৎসরও তাহার প্রতিকূলে; অর্থাৎ—মোট আমদানী অপেক্ষা মোট রপ্তানির মূল্য কম হওয়ায় বৎসরান্তে প্রচুর ঘাটতি হইয়াছে। এ বৎসরের দেনার পরিমাণ ১৮৭'৪৩ কোটি টাকা। এই বিরাট ঘাটতির কতক অংশ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট সঞ্চিত ষ্টার্লিঙের সাহায্যে আমাদের পূরণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার পরিমাণ যেরূপ দ্রুত কম পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ইহার অভাবে ভারতীয় বাণিজ্যে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতে পারে।

এ বৎসর যে পরিমাণ ঘাটতি হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে বৈদেশিক বাণিজ্যে সম্ভবতঃ এত অধিক ঘাটতি আর হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে আমদানীর পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই এরূপ প্রচুর ঘাটতির উদ্ভব হইয়াছে। মোট আমদানীর পরিমাণ ৯০৪'৩৯ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ এবং '৪৯-৫০ সালের আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৮৯ ও ৬১৭ কোটি টাকা। আমদানী-বাণিজ্যের পরিমাণ স্ফীত হইবার প্রথম ও প্রধান কারণ দেশে অন্নাভাব। জীবনধারণের পক্ষে অন্ন ও বস্ত্র অপরিহার্য্য। এগুলির অভাব মানুষের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, অন্নবিষয়ে ভারত এখনও একান্ত ভাবে পরমুখাপেক্ষী। প্রতি বৎসরই কোটি কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী করিয়া আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও অভাব মিটাইতে হয়। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা ১৯৫১-৫২ সালে আমাদের দেশে খাদ্য-সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করায় এ বৎসর বিদেশী খাদ্য-শস্যের আমদানী পূর্ব্বের সকল বৎসরের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। একমাত্র খাদ্য-শস্য আমদানী করিতে এবৎসর ব্যয় হইয়াছে ২২৮ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত বোতলে ভরা খাদ্য, ফল, শাকসব্জী, মশলা, পানীয় ইত্যাদি লইয়া আরও ৩৪ কোটি টাকার খাদ্যসম্ভার এ বৎসর আমদানী হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে এই হিসাবে ব্যয় হইয়াছিল ১০৬ কোটির কিছু অধিক।

বস্ত্রাদি—বিশেষতঃ বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য কাঁচা মাল আমদানী বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, এ বৎসর কার্পাস-তুলা ১৩৬'৪৬ কোটি টাকা এবং কার্পাসবস্ত্র ও সূতা ৬ কোটি টাকা—অর্থাৎ, মোট ১৪২ কোটি টাকার আমদানী হইয়াছে। ইহা ছাড়া, পশম ও পশমী দ্রব্য, রেশম, রেশমী বস্ত্র, কৃত্রিম রেশম, সূতা ও সূত্রজাত বস্ত্র একত্রে ধরিলে আরও ৪২ কোটি টাকা দাঁড়ায়। অর্থাৎ বস্ত্রাদির জন্য এক বৎসরে মোট ব্যয় হইয়াছে ১৮৪ কোটি টাকা। সুতরাং খাদ্যের জন্য ২৬২

এবং বস্ত্রের জন্য ১৮৪ কোটি, অর্থাৎ ৯০৪ কোটি টাকার আমদানীর মধ্যে একমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই আমাদের লাগিয়াছে ৬৯৯ কোটি টাকা। গত বৎসর উহার জন্য ২৩২ কোটি টাকার মত ব্যয় হইয়াছিল।

অন্ন ও বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানী করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়াছে যন্ত্রপাতি-খাতে। সকল প্রকার যন্ত্রপাতির মোট আমদানীর পরিমাণ ১০৪ কোটি টাকা। এ বৎসরের অন্যান্য প্রধান প্রধান আমদানী-দ্রব্যের নাম ও মোট আমদানীর পরিমাণ নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

দ্রব্যের নাম	আমদানীর পরিমাণ কোটি টাকা
খনিজ তৈল	৭৯
মণিমুক্তা	৪৪
রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৩৫
যানবাহন	৩৩
লৌহ-দ্রব্য	২১
বিভিন্ন ধাতব পদার্থ	২০
রং	১৯
কাগজ	১৪

১৯৫১-৫২ সালের রপ্তানি-বাণিজ্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যায় যে, এ বৎসরে বাণিজ্য বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে। রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ অন্যান্য বৎসরের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭১৬·৭৫ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে বৈদেশিক দ্রব্যের পুনরায় অন্যত্র রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ১৪ কোটি টাকা। গত বৎসর ও তৎপূর্ব্ব বৎসরে মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬০৭·৮৯ ও ৪৮৬ কোটি টাকা। যাহা হউক, ভারতের রপ্তানি সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা এবং কার্পাস ও কার্পাসজাত দ্রব্য ধরিলেই রপ্তানির অর্দ্ধেকের বেশী হইয়া যায়। ১৯৫১-৫২ সালে ইহাদের রপ্তানি যথাক্রমে ২৭০ কোটি টাকা, ৯৩ কোটি টাকা এবং ৭৯ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট রপ্তানির ৭১৭ কোটি টাকার মধ্যে ৪৪২ কোটি টাকা গত বৎসরের অঙ্কের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, কার্পাসদ্রব্যের রপ্তানি যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে, উহা অপেক্ষা তুলনায় পাট ও চায়ের রপ্তানি বহুলাংশে বাড়িয়াছে। গত বৎসর পাটজাত দ্রব্য, চা ও কার্পাসদ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে, ১১৪, ৮০ ও ১৫৩ কোটি টাকা।

অপরাপর রপ্তানিদ্রব্যের মধ্যে মশলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লঙ্কা, মরিচ, আদা, এলাচ ইত্যাদি মিলিয়া ২৭ কোটি টাকা হইয়াছে। ইহার পরই কাঁচা চামড়ার স্থান। ইহা রপ্তানির পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতি, আকরিক ধাতব পদার্থ এবং তামাকের নাম করিতে হয়। এ বৎসর ইহাদের পরিমাণ হইয়াছে যথাক্রমে ২৩, ১৯ ও ১৬ কোটি টাকা।

১৯৫১-৫২ সালের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিরাট ঘাটতি এক বিপর্যায় সৃষ্টি করিলেও রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু আশার সঞ্চার হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের বাণিজ্য এক অস্বাভাবিক অর্থ নৈতিক চাপে পড়ায় আমদানীর পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্য ও বস্ত্রের আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাইলে শীঘ্রই এদেশের বাণিজ্যিক অবস্থার উন্নতি ঘটিবে বলিয়া আশা হয়। আমদানীর পরিমাণ হ্রাস এবং রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া বহির্ব্বাণিজ্যের দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টার প্রয়োজন। বর্ত্তমানে আমদানী কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলেও বহু টাকার অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার প্রতি বৎসরই আমরা আমদানী করিতেছি; তন্মধ্যে মণিমুক্তা, মাদকদ্রব্য, প্রসাধন-সামগ্রী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলির আমদানী আরও নিয়ন্ত্রিত হওয়া বিধেয়। আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। কার্পাস-শিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতির দ্বারা অনায়াসেই ইহার পরিমাণ বর্ত্তমানে বৃদ্ধি করা সম্ভব। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় প্রায় সকল প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিতে যথেষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং দেশে শিল্প-প্রসারের সহিত রপ্তানি-বাণিজ্যের ক্রমে ক্রমে আরও উন্নতি ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায়।

নজরুল ইসলাম

শ্রীসুধাংশু চৌধুরী

নজরুল ইসলাম বেঁচে আছেন। বোধ হয় এই বেঁচে থাকা তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। ব্যাধি তাঁকে প্রাণে মারল না: কিন্তু ভুলিয়ে দিল তাঁর আত্ম-পরিচয়। তিনি আছেন, কিন্তু তাঁর গীতরচনা নেই এবং কাব্যরচনার শক্তি তাঁকে বহু আগেই ছেড়ে গিয়েছিল।

গীতরচনার ক্ষমতাও তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছিল নাকি? কোন কোন শক্তির ভর যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সব ঠিক থাকে। যখন সে শক্তি ছেড়ে চলে যায়, তখন হয়তো ঘটে অঙ্গহানি বা মনোবৈকল্য।

নজরুলের কবিত্ব-শক্তিতে ভর করবার মত কতকগুলি লক্ষণ আছে। তাঁর উত্তরাধিকার ভাল করে জানা নেই। বাল্যে যে শিক্ষা অনুশীলন তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল, যে মন বা প্রবণতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, তাও লেখকের অজ্ঞাত। কেন যেন মনে হতে চায়, নজরুলের কবিত্ব তাঁর শিক্ষা, চিত্তবৃত্তি এবং উত্তরাধিকারের যোগাযোগে লব্ধ জিনিষ নয়। কোন হঠযোগের দ্বারা সহসা কবিত্বের সিদ্ধাই তিনি লাভ করেছিলেন, তারপর সে সিদ্ধাই যখন তাঁকে ছেড়ে গেল তখন মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি আয়ুর দেনা শোধ দিতে বেঁচে রয়ে গেলেন।

'বল বীর, চির উন্নত মম শির' পড়ে এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়। দেবতারা ভয়ে সন্ত্রস্ত! নূতন এক দৈত্য তপস্যা দ্বারা আদিত্য বসু দিক্‌পালগণকে জয় করেছে, জয় করেছে অগ্নি-তপন-ইন্দ্র-পবনকে। পুরাণে এ ঘটনা বারবার ঘটেছে। কেটে গেছে কল্পকল্পান্ত; সপ্তর্ষিমণ্ডলের অগস্ত্য মুনি শুষে নিয়েছেন কালের অতলান্ত সমুদ্র। তারপর স্বর্গের নিত্য অধিকার আবার ফিরে পেয়েছেন দেবতারা। বিধাতৃবিদ্রোহের পৌরাণিক কল্পনা মিলিয়ে গেছে মহা-শূন্যে।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' 'কবিতা'য় এক দেবতাজয়ী দনুজবীর্য্য প্রকট হয়েছে। কাব্যের তপস্যা—

> ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া
> খোদার আসন আরশ ছেদিয়া'

—তথাপি উঠছে পতনের পৌরাণিক তুঙ্গ স্থানে, এবং পুরাণের পরিণামের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেরি হয় নি।

নজরুল যুদ্ধে গিয়েছিলেন। ফিরে কোন্ সাধনা তিনি করেছিলেন, তা লোকালয় এবং দিবালোক জানে না। তারপর তাঁর কবিত্ব সিদ্ধাই ব্যক্ত হ'ল 'বিদ্রোহী' কবিতায়। তিনি নাম পেলেন 'সৈনিক কবি'।

আমাদের বয়স তখন ষোল-সতের। গুজরাটের সমুদ্রোপকূল থেকে জাতীয় আন্দোলনের বন্যা তখন সমস্ত ভারতবর্ষকে ছেয়ে ফেলেছে, আসমুদ্র হিমাচল টলমল করছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক কুরুক্ষেত্র দিনে-রাত্রে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে। দিবাভাগের নেতৃত্ব গান্ধীজী, আর রাত্রিভাগের নেতৃত্ব সন্ত্রাসবাদীদের হাতে।

আকাশে তারা জ্বলছে। জাতির জীবনের হাজার হাজার বছর পিছনে জ্বলছে ভগবদ্গীতার বাণী। ক্লৈব্য পরিহরণের সেই দূরশ্রুত বাণী কানে ভেসে আসছে,

> ময়া হতাংস্ত্বং জহি, মা ব্যথিষ্ঠা
> যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।

একজন কবির দরকার ছিল সেই তিমিরঘন রণক্ষেত্রের জন্য। মনে হয় নজরুল সেই কবি। কে যোগাবে রাত্রীর মশাল—যা নিয়ে রাত্রির তিমির ভেদ করে রুধিরাক্ত রণক্ষেত্রে এগুতে হবে। বেদ নয়, বীণা নয়, বাণী নয়—অগ্নিবীণা এবং বিষের বাঁশীর কবি—তাই কাজি নজরুল।

নজরুলের ষাট বছর আগে মাইকেলে এমনিতর কবিত্বের বিকাশ হয়েছিল। শক্তির সে আর এক 'পুরোৎ-পীড় পরিবাহঃ'। দাম দিতে কেউ রাজী নয়, কিন্তু মাইকেল অকুতোভয়। বাঙালীর জাতিসত্তা নিয়ে পরীক্ষা চলছিল তখন। রাষ্ট্র, অর্থনীতির বহির্বেষ্টন ইংরেজের। হিন্দু কলেজ ইংরেজী শিক্ষার মারফত ইউরোপীয় সভ্যতার মাদকতা কলিকাতার নব্য যুবসম্প্রদায়ের মনের গভীরতর সত্তায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া কি হবে মাইকেলে তার চরম পরীক্ষা এবং সে পরীক্ষার উত্তর 'মেঘনাদবধ কাব্য'।

অত্যল্প সময়ে আত্মরূপান্তরের চরমে পৌঁছবার চরম পন্থা তাঁর। ক্রমবিকাশ নয়; প্রবল ব্যতিক্রম দ্বারা বিকাশ। অত্যধিক আত্মপ্রত্যয়ের হঠকারিতা তাঁকে ক্রমবিকাশের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তীরে আছাড় মেরে ফেলে রেখে গিয়েছিল। সুদীর্ঘ কালের ঐতিহ্যপুষ্ট রামরাবণের প্রস্তর মূর্তিকে মাইকেল এক রাত্রে নূতন করে গড়তে গিয়েছিলেন। পয়ারছন্দের শৃঙ্খল তিনি ভেঙে ফেলেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে।

বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় শক্তিসাধক কবি কাজি নজরুল। তখনও সে আর এক আত্মরূপান্তরের পালা চলছে জাতি-

সত্তার মশাল চাই রাত্রির অন্ধকারে। অতিদূরপ্রস্ত ভগবদ্গীতার দেবভাবা স্বাধীনতার রণক্ষেত্র কাঁপিয়ে তুলতে পারছে না। তখন ধ্বনিত হ'ল নজরুলের,

বল বীর চির উন্নত মম শির।

কিন্তু গোড়া থেকেই নজরুলের কাব্যে কাব্যবিরোধী ত্রুটি ছিল, সে হচ্ছে তাঁর অদম্য ধ্বনিপিপাসা। সে পিপাসা অগস্ত্যের মত। ধ্বনির সমুদ্র শুষে ফেলেও তাঁর পিপাসা মেটে না।

শোঁও শন্ নন নন, শন্ নন নন
শাঁই শাঁই
ঘুরপাক খাই, ধাই পাঁই পাঁই

ইহা তান্ত্রিক সাধনার মন্ত্র হতে পারে, কবিত্ব নয়।

অমাবস্যার অন্ধকারে নৃমুণ্ডমালিনীর অক্ষিতারকা দুটো জল্জল্ করে তাকিয়ে আছে শবাসীন তান্ত্রিক সাধকের দিকে। নৈয়ায়িকের আদিকারণ তান্ত্রিকের তরল পানীয় হয়ে নরকপালে রক্ষিত—প্রবেশ করেছে সে কারণ দেহে, রক্তে শিরাধমনীতে—অস্তিত্বের ত্রিপুটি ওঁ হ্রীং ক্লীং ধ্বনির কুণ্ডলী পাকিয়ে সহস্রারে এসে সংহত হয়েছে —তখন ধ্বনির ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত সৃষ্টি করতেই হবে। ধ্বনি, আরও আরও ধ্বনি; সে ধ্বনি থেকে বস্তু ও অর্থ অন্তর্হিত হয়েছে, সে ধ্বনির সঙ্গে জীবন-জগতের মথুরা-বৃন্দাবন সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে। তবুও আদিকারণের উন্মাদনাবিহ্বল সাধক সেই ধ্বনিসাহায্যেই ত কারণাতীত অবস্থায় পৌঁছে যাবে! সুতরাং—

শোঁও শন্ নন নন, শন্ নন নন
শাঁই শাঁই,
ঘুরপাক খাই, ধাই পাঁই পাঁই

এর ধ্বনি মুখব্যাদান করে বলতে হবে,

আমি একটি বিশ্ব গ্রাসিয়াছি
পারি গ্রাসিতে এখনও ত্রিশটি।

মানুষের ভাষাসৃষ্টির একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। মানবেতর জীবের বাগ্‌যন্ত্র অপটু। তার জড়তায় মেঘরন্ধ্রচ্যুত চেতনা একটি বা দুটি ধ্বনিতে মাত্র ব্যক্ত। পাখীর বা পশুর কণ্ঠে একটিমাত্র ধ্বনি উচ্চারিত হয়। সেই ধ্বনি সেই পাখী বা পশুর সুখদুঃখ ভাবনা-বেদনার বাহন। জীব-পর্য্যায়ে মানুষ যখন প্রথম দেখা দিয়েছিল তখন ভাষার উপরে জন্মগত অধিকার তার ছিল না। আদিম সমাজ-সংগঠনের মধ্য দিয়ে অন্নসংগ্রহ ও আত্মরক্ষার সংগ্রাম মানুষকে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত করেছে। সে পরিচয়ের স্বাক্ষর পড়েছে দুই প্রান্তে। এক, বাইরের বস্তু পরিচয়; দ্বিতীয়, ভিতরের ভাবপরিচয় এবং একই পরিচয়ের দুই প্রান্তে, বাইরে ও ভিতরে, মানুষ তার চেতনার ছাপ দিয়ে দিয়েছে বাগ্‌যন্ত্র থেকে উৎপন্ন ভাষার সাহায্যে।

সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী হয়েছে ভাষারও ক্রমবিকাশ এবং সে ধারা ধীর অথচ অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে ভাবীকালের অভিমুখে।

কিন্তু তবুও অপরিচয়ের সীমাহীন বস্তু ও ভাববিশ্ব ঘিরে রয়েছে মনুষ্যসমাজকে এবং সে অপরিচয়ের সীমানায় দাঁড়িয়ে মানুষ তার ভাষা ও ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার হারিয়ে ফেলে। প্রকাশক্ষমতার অকিঞ্চিৎকরতায় অভিভূত হয়ে মানুষ বিরাট অব্যক্ত ও নৈঃশব্দ্যের কাছে করে সুরের আত্মনিবেদন। মনুষ্যেতর জীবশ্রেণীর কণ্ঠের সুর এবং মানুষের কণ্ঠের সুরে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। প্রথমটা নিশ্চেতনতার বাহন, দ্বিতীয়টা অতিচেতনতার। প্রথমটায় রয়েছে অক্ষমতার অসীম দৈন্য, দ্বিতীয়টায় আছে নিজের ক্ষমতাকে পুনরায় ছাড়িয়ে উঠবার শ্লাঘনীয় পরাভব।

কবির কাব্যমাত্রেই সুরের এই উভয়মুখী টান থাকে। শুধু কাব্য কেন, প্রতিটি শব্দ ব্যবহার দ্বারা যে চেতনাকে মানুষ প্রকাশ করছে, সে চেতনার দূর অতীতে রয়েছে অচেতনতার সুরের হাতছানি, এবং দূর ভবিষ্যতেও রয়েছে বিস্তৃততর চেতনতার সুরমোহানা।

নজরুলের কাব্যের শব্দ-প্রয়োগ লক্ষ্য করলেই মনে হয় শব্দের চেতনা বহন করার ক্ষমতার প্রতি তাঁর ততটা খেয়াল নেই, যতটা রয়েছে তার যান্ত্রিক ধ্বনিবৈভবের দিকে।

আনোয়ার ঝিঞ্জির পরা খোয়া খিঞ্জির
শৃঙ্খলে বাজে শোন রোদা রিম ঝিন্‌ঝির,
ঝিঁঝি ঝিঁঝি কোয়ারা বহির ঝিনঝির,
গর্দানে জিঞ্জির।

ইহা ছেলেভুলানো শব্দের আগড়ুম-বাগড়ুম, কবিতা নয়।

নিজের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের বিপুল বিস্তার বর্ণনা করতে রবীন্দ্রনাথ মাত্র বলেন,

"ঠেকেছে মাথা মোর
মেঘের মাঝখানে—

আর নজরুল বলতে থাকেন,

আমি যজ্ঞ আমি ঈশান, বিষাণে ওঙ্কার
আমি ইস্রাফিলের শিঙার মহা হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল ধর্ম্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র মহাশঙ্খ, আমি প্রণবনাদ প্রচণ্ড
আমি ক্ষ্যাপা দুর্ব্বাসা বিশ্বামিত্র শিষ্য
আমি দাবানল দাহ, দাহন করিব বিশ্ব।

এর শেষ হবে তখন—

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।

এই উদ্দণ্ড নৃত্যঘূর্ণির পাকে পাকে শব্দগুলির পৃথক অর্থ-অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। কেবল ধ্বনির একটা বোঁও বোঁও শব্দ চারদিকে ঘুরতে থাকে। ভাষানিহিত ভাবারই অন্তর্বিরোধ সুর এসে চেতনামঞ্চ অধিকার করে।

নজরুলের সমগ্র কাব্যে এই ঘটনা ঘটেছে। কবি তিনি, শব্দের উপরে তাঁর সারস্বত অধিকার। তথাপি শব্দগুলোকে মুঠো করে ধরে তিনি সুরের বানভাসিতে ছেড়ে দেন, ঘটান তাদের পৃথক অর্থব্যক্তিত্বচ্যুতি।

উপরের মন্তব্যের সপক্ষে হয়তো অনেকেই সায় দেবেন না। শিল্পের স্কুলপাঠ্য জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ এটা নয় যে, বিনা প্রমাণেই প্রতীতি জন্মাবে।

কিন্তু প্রমাণ স্বয়ং নজরুলই হাজির করে দিয়েছেন শিল্পী হিসাবে তাঁর আত্মরূপান্তরের মধ্য দিয়ে।

নজরুল কাব্য-রচনা ছেড়ে গীতকথা-রচনার ক্ষেত্রে চলে আসেন। কথার মাধ্যম ছেড়ে নামেন সুরের মাধ্যমে। সমাজেরই চেতনার ধাক্কায় নজরুলের এই অবতরণ! সে চেতনা ভাল ব্যবহার পায় নি নজরুলের হাতে। কোথায় বুদ্ধি আবেগের উচ্চ থেকে উচ্চতর সংস্থিতির ধাপে ধাপে কবির বাক্যপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমাজের চেতনা এগিয়ে চলবে বিস্তৃততর ভবিষ্যতের দিকে—তা না হয়ে সে চেতনার বাঙ্ময় প্রতিনিধিরা নজরুলের হাতে পড়ে বাধ্য হয়েছে ধ্বনির ভৈরবীচক্রে যোগদান করতে, এবং শেলশূলঝঙ্কৃত শ্মশানান্ধকারে এই কবির সিদ্ধাই রূপে রয়েছে তাঁর আজ্ঞাবহ হয়ে।

এর প্রতিক্রিয়া অনিবার্য্য। 'বিদ্রোহী' বা 'ধূমকেতু'র মত কবিতা যাঁর রচিত তিনি নিঃসন্দেহে বড় কবি। কিন্তু শক্তিচ্যুতির অব্যবহিত পূর্ব্বে, শক্তির চরমপ্রকাশ গ্রীক্‌-ট্র্যাজেডিতে দেখা যায়, এবং যত সূক্ষ্মভাবেই হোক, সে চ্যুতি বা পতনের কারণ অব্যবহিত পূর্ব্ব-দৃশ্যের বিস্ময়কর শক্তিমত্তার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে।

নজরুলে তাই হয়েছে। সমসাময়িক সমাজের সমৃদ্ধ চেতনাপীঠ থেকে অপেক্ষাকৃত অবিকশিত চেতনার নিম্ন ধাপে তিনি অবরোহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কথার বদলে বাহন পেয়েছেন সুরকে তাঁর শিল্পীজীবনে, আর গীতিকাররূপে নজরুলের তুলনা নেই। কে যেন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে গান গেয়েছিল। গান গেয়েছিল তাঁর চক্ষু দিয়ে শ্রোত্র দিয়ে ত্বক্‌ দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের গান—তার সঙ্গে নজরুলের গান। দেহ-মমতার প্রতিকূল এবং অনুকূল বেদনা। সুরের মন্দাকিনী আর ভোগবতী। বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহ্যকে উপনিষদ দিয়ে শোধন করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, আর তান্ত্রিকতা দিয়ে ভয়াল করে নিয়েছেন নজরুল। শিল্প-মহিমায় নজরুলের গান তাঁর কবিতার চেয়ে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ এবং তা 'বিদ্রোহী' বা 'ধূমকেতু'কে বাদ দিয়ে নয়।

বাঙালীর কাব্যভূমির যথেষ্ট প্রসার হলেও তার গোড়ার দিকের জমিটা এখনও বেশ ঢালু এবং পিচ্ছিল আছে, নজরুলে তৃতীয় বারের জন্য তা সপ্রমাণ হ'ল। প্রথম প্রমাণ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিলোত্তমাসম্ভব এবং মেঘনাদবধ কাব্য দিয়ে সুরু করে তিনি ব্রজাঙ্গনা পর্য্যন্ত পৌঁছেছিলেন। সুর-কালিন্দীর কূলে এসে অকালে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

মিল্টনকে দিয়ে গীতিকথা রচনা কেউ আশা করতে পারেন?

দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গীতিকার এবং কবির দ্বন্দ্ব-সমন্বয় চলেছে। গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্যের তৃতীয় অঙ্কে এসে গীতিকার রূপে রবীন্দ্রনাথের জয়-জয়কার ঘোষিত হয়েছিল। বার্গসঁয়ের Creative Evolution বিধৃত জীবনদর্শন যথাসময়ে মঞ্চে এসে হাজির হয়েছিল—তাই 'বলাকা'য় কবির পুনর্জন্ম।

তৃতীয় নজরুল। কবিত্বের দিগ্বিজয় সত্ত্বেও কবিত্বেরই অন্তর্নিহিত বিরোধ সুর হয়ে তাঁর রূপান্তর ঘটাল—বদলে গেল শিল্পের মাধ্যম, কবি পরিণত হলেন গীতিকারে।

কিন্তু জীব-বিজ্ঞানের পৃথক পৃথক জীবশ্রেণীর ন্যায়, শিল্প-বিজ্ঞানে গীতিকথা এবং কবিতা যে পৃথক শিল্পশ্রেণী বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে এ নিয়ে বাংলা-সাহিত্যে ভাল করে আলোচনা হয় নি। তা হলে কবি থেকে গীতিকারে নজরুলের রূপান্তর আরও ভাল করে বোঝা যাবে।

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

১২

ভবেশ চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরের কথা।

দেবানন্দ চাঁপাতলার কানাই ধরের লেনে যুগান্তর আপিসে গিয়া শুনিল সেই দিনই তাহাকে দীক্ষা দেওয়া হইবে এবং শীঘ্রই তাহার উপর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পড়িবে। শুনিয়া সে আনন্দিত হইল।

দীক্ষা হইয়া গেল। দীক্ষার পরে তাহার মনের ভাব জানিবার জন্ত দেবানন্দের ডায়েরী হইতে এখানে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইতেছে :

ব্রিটিশ রাজত্ব ধ্বংস ও ব্রিটিশ রাজত্বের রক্ষক ইংরেজ রাজকর্মচারীদের ধ্বংস করবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে আমি দলে দীক্ষিত হয়েছি। গীতা ও তরবারি স্পর্শ করে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে আমার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছি। আমাকে কে দীক্ষা দিলেন জানি না। ধূপের ধোঁয়ায় অন্ধকার ছোট একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বেদীর সামনে বসিয়ে দিলেন। গম্ভীর স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করে আমাকে আদেশ দিলেন মায়ের খড়্গ ও পবিত্র গীতা স্পর্শ করে মন্ত্র বল। কলে'র মত আমি মন্ত্র বলে গেলাম। তার পর কঠিন শপথ, সর্বস্ব ত্যাগের শপথ করে ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ করে দেশে ধর্মরাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প ঘোষণা করলাম। অন্ধকারের মধ্যে কঠিন স্বরে কে বললেন, মন্ত্রগুপ্তির শপথ ভঙ্গ করলে তার শাস্তি কি জান?

আমি বললাম, মৃত্যু।

—বিশ্বাসঘাতকতার কি শাস্তি জান?

আমি বললাম, মৃত্যু।

গীতা ও মায়ের খড়্গকে প্রণাম করে উঠবার আদেশ হ'ল। ছোট ঘর হতে বেরিয়ে আর একটা ঘরে এসে বসলাম। আমার বুকের মধ্যে তখনও দপ্ দপ্ করে শব্দ হচ্ছে উত্তেজনায়। চোখে যেন ভাল দেখতে পাচ্ছি না। মনে কেবল একটা চিন্তার আলোড়ন অনুভব করছি, আজ থেকে আমার মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নী, সংসারের সকলের সঙ্গে স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে গেল, আমি আর তাদের কেউ নই। কথাটা ভাবি আর চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসে। আমি যে এত দুর্বল আগে জানতাম না।

হে আমার দেশ, হে আমার বহু শতাব্দীর পরাধীন মাতৃভূমি, আমার সকল জ্ঞান, বুদ্ধি, উদ্যম, সাহস আজ হতে তোমার শৃঙ্খলমোচনের চেষ্টায় নিয়োজিত করব, আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত তোমার সেবায় পাত করব।

দীক্ষার মাসখানেক পরের কথা।

মানিকতলা বাগানে কি কাজের জন্ত দেবানন্দের ডাক পড়িয়াছিল। কাজ সারিয়া সে দিনতিনেক পরে হষ্টেলে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল ভবেশের সিটে বরিশাল কলেজ হষ্টেলের নির্ম্মল বসিয়া আছে, ঘরে আর কেহ নাই।

দেবানন্দকে দেখিয়া নির্ম্মল তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, উঃ, কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা দেবুদা!

দেবানন্দ নির্ম্মলকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইল। বলিল, তুই কি করে এখানে এলি? মহেন্দ্র কোথায়?

নির্ম্মল—মহেনদা বিডন ষ্ট্রীটে এক আত্মীয়ের বাড়ী গিয়েছে, সেখানে কার অসুখ। আমি এখানে পড়তে এসেছি। কলেজে সিট পেলে ভর্তি হব। টাকা-পয়সার অভাবে এত দিন পড়া বন্ধ ছিল। একজনরা খরচ দেবে, তাই আবার পড়ব। অতুলদার কাছে মহেনদার ঠিকানা জেনে নিয়ে এখানে উঠেছি।

দেবানন্দ—অতুল কোথায় এখন? তার এক চিঠি পেয়েছিলাম, এ পর্য্যন্ত উত্তর দেওয়া হয় নি।

নির্ম্মল—এখন সে কোথায় বলতে পারি না, কলকাতায় আসবে বলেছিল।

তার পর সে বলিল, কাল সকালে দু'জন ছেলে এসেছিল তোমার কাছে। একটা কাগজের বাণ্ডিল দিয়ে গেল তোমাকে দেবার জন্ত।

মহেন্দ্রের টেবিলের উপর হইতে সে বাণ্ডিলটি লইয়া দেবানন্দকে দিল। বাণ্ডিল খুলিয়া বাহির হইল দশ কপি যুগান্তর।

যুগান্তর দেখিয়া নির্ম্মল উহার একখানা টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। মিনিট দুই পড়িয়া নির্ম্মল বলিল, দেবুদা, শোন যুগান্তর কি লিখেছে। কি সাহস কাগজখানার।

“ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব!”

দেবানন্দ উঠিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিল। নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, পয়সা দিয়ে কিনে রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে লোকে পড়ছে আর তুমি দোর বন্ধ করলে।

সে পড়িতে লাগিল—“স্বাধীনতালাভের জন্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার প্রয়োজন নাই—দেশের এক দল লোক এই কথা বলিতে চাহেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, দেশের লোক যদি ইংরেজের অধীনে চাকুরী করিতে অস্বীকার করে, ইংরেজকে কোনভাবে সাহায্য করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে এত বড় দেশকে অল্পকয়েক বিদেশীর পক্ষে

অধীনে রাখা অসম্ভব হইবে এবং তাহাদের রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

—"আইন বাঁচাইয়া চলিবার আগ্রহ হইতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা বলা হয়। অস্ত্রের সাহায্য না লইয়া প্রতিকার করিবার চেষ্টা ইংরেজের আইনে অপরাধ নহে, এইজন্য উহা যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত উপায়—এই ধারণার মধ্যে গলদ রহিয়াছে। ইংরেজ আইন বানাইয়াছে তাহার সুবিধার জন্য ও দেশের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য। ইংরেজের তৈয়ারি এই আইন মানিবার জন্য আমাদের কিসের বাধ্যবাধকতা?

—"ইংরেজের তৈয়ারি আইনের মূলে রহিয়াছে তাহাদের গায়ের জোর। এই আইনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে আমাদিগকেও গায়ের জোরের চর্চা শ[illegible] হইবে। এই পথ হইতেছে আমাদের পক্ষে সঠিক পথ।

—"কি ভাবে আমরা প্রবলপ্রতাপশালী ইংরেজের সঙ্গে গায়ের জোরের পাল্লা দিতে পারি?

—"যুবক ম্যাটসিনির কথায় প্রথমে তাঁহার দেশের বেশী লোক কর্ণপাত করিত না। আজ ইটালী তাহার কলঙ্ক-কালিমা রক্তের ধারায় ধুইয়া ফেলিয়াছে।

—"এদেশে ইংরেজের সংখ্যা এক লাখের বেশী নহে। প্রতি জেলায় কত জন ইংরেজ কর্ম্মচারী আছে? এক দিনে তোমরা ইংরেজের শাসন খতম করিয়া দিতে পার।

"আজ সময় আসিয়াছে ইংরেজকে বুঝাইয়া দিবার যে পরের দেশ অন্যায় করিয়া দখল করিয়া রাজ্যভোগ করিবার আনন্দ চিরকাল চলিতে পারে না।

"একটি জীবন শেষ করিয়া একটি জীবন দিবার জন্য প্রস্তুত হও। স্বাধীনতার মন্দিরে তোমার জীবন উৎসর্গ কর। বিনা রক্তপাতে দেবীর পূজা সম্পন্ন হইবে না।"

নির্ম্মল থামিল। কাগজখানার আর এক অংশে দৃষ্টিপাত করিয়া পড়িতে লাগিল—"অর্থসংগ্রহের উপায়। ধনী ব্যক্তিদের অর্থ লুণ্ঠন, সরকারী অর্থ লুণ্ঠন, জনসাধারণের নিকট ট্যাক্স আদায়,—এই কয়েকটি উপায়ে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে।"

দুই জন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। প্রথমে কথা বলিল নির্ম্মল। হাসিয়া সে বলিল, দেবুদা, একটা মজার কথা মনে হ'ল যুগান্তর পড়ে। যুগান্তরের মত শুনলে। অন্যদিকে আবার বঙ্গবাসী দলের কাগজগুলো কি বলে জান? তাদের মতে "ইংরেজের সাহায্য ছাড়া আমরা কোন দিন স্বরাজ পাব না। ইংরেজকে গুরুর মত শ্রদ্ধা কর, সেবা কর, বিপ্লবের কথা মন থেকে দূর করে দাও। বয়কট বড় খারাপ জিনিস, কারণ এতে মনে বিদ্বেষ আসে।"

দেবানন্দ কোন উত্তর দিল না। সে ভাবিতেছিল ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়া যুগান্তর দল কি এবার ভগবানের ইঙ্গিত দেখিতে পাইল? তাহাদের নিজেদের সত্য কতখানি হইয়াছে যে দেশের লোককে প্রকাশ্যভাবে তাহাদের পথের সন্ধান দিতে সাহস করিতেছে?

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া নির্ম্মল কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় দরজায় আঘাতের শব্দ হইল। দেবানন্দ নির্ম্মলকে বলিল, কাগজপত্র বালিশের নীচে রাখ। সে দরজা খুলিয়া দিতে মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল। দেবানন্দকে দেখিয়া সে বলিল, তুই কখন এলি দেবু? বিকেলে দোর বন্ধ করে দুটোতে ঘুমুচ্ছিলি নাকি?

নির্ম্মল বলিল, রুগ্ন আত্মীয়ের সেবা করে আর কতদিন কলেজ কামাই করবে মহেনদা? কিন্তু তোমার চেহারা-খানা ত রাত জেগে সেবা করবার মত শুকনো লাগছে না?

মহেন্দ্র হাসিতে লাগিল। বলিল, সে এক আজব কাণ্ড। গিরিধারীকে ডেকে কিছু খাবার আনতে দে আগে। অনেক দূর, সেই আলমবাজার থেকে আসছি, খিদে পেয়ে গেছে।

দেবানন্দ বারান্দায় গিয়া গিরিধারী, গিরিধারী বলিয়া ডাকিল। "যাউচি এজ্ঞে" বলিয়া গিরিধারী সাড়া দিল।

নির্ম্মল—আলমবাজার থেকে আসছ মানে? তোমার আত্মীয়ের বাড়ী বিডন ষ্ট্রীটে শুনেছিলাম না?

গিরিধারীর হাতে খাবার আনিবার পয়সা দিয়া দেবানন্দ ঘরে আসিল।

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, আত্মীয়ের বাড়ী বিডন ষ্ট্রীটে, কিন্তু আমি থাকি আলমবাজারে। কাণ্ডটা কি এবার বলি শোন। আত্মীয়ের অসুখ বটে, কিন্তু আমাকে তলব করবার কারণ অন্যরকম। আমার এক মাসী এসেছেন তাঁর বিধবা ননদের মেয়ে নিয়ে। মেয়েটি আইবুড়ো এবং মাসীর পোষ্য। প্রথম দিন খবর পেয়ে যেতেই মাসীমা কেঁদে-কেটে অস্থির। তাঁর পেটে ব্যথা হয়েছে, আর বাঁচবেন না। কিন্তু পিতৃমাতৃহীনা এই যে অনাথা মেয়েটিকে মানুষ করেছেন তার কি গতি হবে ভেবে মরতে পারছেন না। তুই যদি একটু দয়া করিস বাবা—বলে আমার দুই হাত জড়িয়ে ধরলেন। মেয়েটি সেই ঘরের এক কোণে বসে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগল। বোধ হয় তাকে আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা হয়েছিল। আমাকে হটেলে আসতে দেবেন না। ডাঃ কেদার দাসকে দিয়ে দেখাবেন, আমাকে সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমি ছাড়া আর কে তাঁকে দেখবে?

নির্ম্মল—কিন্তু তোমার বিডন ষ্ট্রীটের সেই আত্মীয় ত নিজেই ডাক্তার।

মহেন্দ্র—হাঁ, বেশ নামকরা ডাক্তার। তা হলে ব্যাপারটা ত বুঝতে পারছিস? অসুখ হয়েছে, ডাক্তার-আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠেছেন। আর বড় ডাক্তার দেখাবার, চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার ভার নিতে হবে আমাকে। সেদিন কোন

পড়িকে পালিয়ে এলে আর শুধুখো হই নে। লোক আসে ডাকতে। তোকে বললাম ওঁদের ওখানে যাচ্ছি কিন্তু একেবারে আলমবাজারে আমার পিসতুতো ভাই মনীশদার বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। আলমবাজার থেকে কলেজ করি আর বিকেলে দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে থাকি। এবার আমাকে ডাকতে লোক এলে বলবি আমাকে পুলিস ধরে নিয়ে জেলে রেখেছে।

তাহার কথা শুনিয়া দেবানন্দ ও নির্ম্মল হাসিতে লাগিল। গিরিধারী শালপাতায় দুই ঠোঙা ভর্ত্তি খাবার আনিল। তিন জনে ভাগাভাগি করিয়া খাইতে সুরু করিল। মহেন্দ্র বলিল, গিরিধারীমণি, তিন গেলাস জল ঐ কুঁজো থেকে গড়িয়ে দিতে আজ্ঞা করুন।

আদরের সম্ভাষণ শুনিয়া গিরিধারী আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসিল। তিন গেলাস জল টেবিলের উপর রাখিয়া সে প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্র বলিল, দক্ষিণেশ্বরে এক দিন আমাদের অতুলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। বড় বড় চুল রেখে সে বাবাজী-গোছের চেহারা করেছে। 'মাসেল' সেই রকম আছে। দেখে মনে হয় একটা ষণ্ডামার্কা বাবাজী বটেন। বলল, বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, তোদের সকলের খবর খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করল। বলল, দেবানন্দকে একখানা চিঠি লিখেছি, উত্তর পাই নি। এক দিন আসবে এখানে বলল। কাল আবার দেখা হয়েছিল। ভারি উত্তেজিত মনে হ'ল ওকে দেখে। বলল, ও কুমিল্লা যাবার আদেশ পেয়েছে, রাত্রে চলে যাবে। আরও অনেক কথা বলল। কুমিল্লা, ঢাকা, মৈমনসিংহে নাকি ভয়ানক গোলমালের আশঙ্কা হয়েছে। বরিশাল ও রাজশাহীতে নাকি অবস্থা ভাল নয়। ঢাকার ন্যাশনাল স্কুলের মাষ্টার ও অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন দাসকে কয়েক জন মুসলমান গুণ্ডা মিলে মারধোর করেছে। খবর পেয়ে ছেলেরা ক্ষেপে গেছে। নানা জায়গা থেকে ছেলেরা কুমিল্লা, মৈমনসিংহ ঢাকার দিকে যাচ্ছে।

কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মহেন্দ্র বলিল, আজ উঠি ভাই। বলে আসি নি, নইলে আজ এখানেই থেকে যেতাম। আমার ভয় আছে খবর না পেয়ে মাসীমা নিজেই হয়ত হষ্টেল পর্য্যন্ত ধাওয়া করবেন। বলবেন, ডাঃ কেদার দাস বলেছেন, তুই সঙ্গে না নিয়ে গেলে রোগী দেখবেন না, আয় বাবা, গাড়ীতে উঠে আয়।

তাহার কথা শুনিয়া নির্ম্মল হাসিতে লাগিল। মহেন্দ্র বলিল, ভুলিস না, এবার কেউ খোঁজ নিতে এলে বলবি তাকে ধরে নিয়ে জেলে রেখেছে। তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে হষ্টেলে আসতে পারি।

নির্ম্মল—তুমি কাল চলে এসো। দারোয়ানকে শিখিয়ে রাখব। কেউ তোমার খোঁজ নিতে এলে নীচে বসিয়ে রেখে আমাদের খবর দেবে। আমরা নীচে গিয়ে তাকে ধাপ্পা দিয়ে বিদেয় করব।

মহেন্দ্র—ভাল বুদ্ধি করেছিস। আমি কাল কলেজ থেকে হষ্টেলে ফিরব।

মহেন্দ্র চলিয়া গেল। নির্ম্মল বলিল, দেবুদা একটু বেড়িয়ে আসবে? আমাকে দুই-একটা জিনিস কিনতে হবে। চল না একসঙ্গে বেরুই।

দেবানন্দ—তুই যা। আমার দু'একখানা চিঠি লেখবার আছে, সেরে রাখি।

নির্ম্মল জামা গায়ে দিয়া বাহিরে গেল।

১৩

ভবেশ প্রায় মাস দুইয়ের মত অনুপস্থিত। দেবানন্দ তাহাকে দেশের ঠিকানায় চিঠি লিখিয়াছিল, কোন উত্তর আসে নাই। ইহাতে কিছু বিস্মিত হইলেও দেবানন্দ এ সব দিকে বেশী মন দিবার সময় পায় না। এক দিকে পরীক্ষার পড়া, অন্য দিকে দলের নানা রকম কাজ লইয়া সে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে।

ভবেশ চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ রায়ের পরিবার ও ডাঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হইয়াছে। হঠাৎ এক একবার হয়ত চকিতে কিটির কথা মনে পড়ে, ডাঃ চক্রবর্ত্তীর কথা, তাঁহার লাইব্রেরী ঘরের জানালার দিকে নীল রঙের 'ভাসে' রজনীগন্ধার গুচ্ছ, মৃণালের স্নিগ্ধ, সুন্দর হাসির কথা মনে উদয় হয়, কিন্তু এ সব চিন্তাকে সে প্রশ্রয় দেয় না যেমন সে প্রশ্রয় দেয় না আত্মীয়-স্বজনের চিন্তাকে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নবজন্ম হইয়াছে, পুরাতন জগতের সঙ্গে তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে; হৃদয়ের সকল আন্তরিকতা ও প্রত্যয় দিয়া এই কথাই সে আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে।

সেদিন সকালবেলা মহেন্দ্র তাহার হঠযৌগিক প্রক্রিয়াদি সমাপ্তির পর স্নান করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে, দেবানন্দ ও নির্ম্মল পড়াশুনা করিতেছে, দারোয়ান আসিয়া জানাইল এক বাবুজী ও দুই খোঁকীলোগ আসিয়াছে, তাহারা ভবেশ বাবুজীর খবর পুছ করলেন।

খবর শুনিয়া মহেন্দ্র, দেবানন্দ ও নির্ম্মল এ-ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু ভাবে চাহিল। মহেন্দ্র বলিল—বলে দাও ভবেশ বাবু মুলুক গিয়া। দারোয়ান চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, উলোগ দেবানন্দ বাবুকা বাত পুছতা।

মহেন্দ্র—তোমার খোঁজ করছে দেবু, গিয়ে দেখে এস।

নির্ম্মল বলিল—আমিও যাই।

মহেন্দ্র তাহাকে ধমকাইয়া বলিল—তুই যাবি কি রে? তোকে ডেকেছে নাকি? যেই শুনেছে খোঁকী এসেছে অমনি আমি যাই? বোস্‌ চুপ করে।

ধমক খাইয়া নির্ম্মল অপ্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল। দেবানন্দ নীচে নামিয়া গেল।

হষ্টেলের সামনে রাস্তায় এক ল্যাণ্ডো গাড়ীতে একজন অপরিচিত যুবক, কিটি ও তাহার বয়সী একটি মেয়ে বসিয়াছিল। দেবানন্দকে দেখিয়া যুবকটি বলিল—আপনার নাম দেবানন্দ বাবু? আমি ডাঃ রায়ের বাড়ী থেকে আসছি। ভবেশদা আমার পিসতুতো ভাই। তাঁর কোন খবর পাচ্ছি না আমরা। তিনি দেশে যান নি, কলকাতায় কোন আত্মীয়বাড়ীতেও নেই। কোথায় গেলেন আপনি কিছু জানেন? ক'দিন বাদে আমার এক বোনের বিয়ে—

দেবানন্দ দেখিল কিটি অন্ত দিকে চাহিয়া আছে। তাহাকে কোন সম্ভাষণ করিল না। সে একটু বিস্মিত ও দুঃখিত হইল। যুবকটির কথার উত্তরে সে বলিল—

হষ্টেলে সকলে জানে তিনি দেশে গেছেন। আমি দেশের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলাম, উত্তর পাই নি।

যুবকটি চিন্তিত ভাবে বলিল—কিন্তু দেশে ত তিনি যান নি? কোথায় গেলেন তবে? কিটি চল বাড়ী ফিরি। আচ্ছা, নমস্কার।

দেবানন্দ হষ্টেলের দিকে ফিরিল। রাস্তা পার হইয়া ফটকে ঢুকিতে গিয়া পিছনে ডাক শুনিয়া সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত হইয়া সে দেখিল কিটি রাস্তা পার হইয়া তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেবানন্দের মুখের দিকে একবার চাহিয়া কিটি তাহাকে প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমার বিয়ে হবে শীগগির। তোমাকে নিমন্ত্রণ করব না। আশীর্ব্বাদ কর।

তাহার কথা শুনিয়া দেবানন্দ মৃদু হাসিল। বলিল—আমার আশীর্ব্বাদ? বেশ, আশীর্ব্বাদ করি, দেশের প্রতি তোমার ভক্তি ও ভালবাসা অক্ষয় হোক্।

আশীর্ব্বাদ শুনিয়া কিটি মাথা হেঁট করিল। রাস্তার লোক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিতেছিল। কিটি গাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল।

গাড়ীর উপর মেয়েটি তাহার জ্যেঠতুত বোন সরমা। সরমা গাড়ীর একপাশে হেলিয়া সন্ধানী দৃষ্টিতে দেবানন্দ ও কিটিকে দেখিতেছিল। কিটি গাড়ীতে ফিরিলে গাড়ী চলিতে লাগিল। সরমা জিজ্ঞাসা করিল—এই ছেলেটির সঙ্গে তোর কত দিনের আলাপ রে?

কিটি অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল। সরমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

দেবানন্দ ঘরে ফিরিলে মহেন্দ্র ও নির্ম্মল একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল—কারা এসেছিল?

দেবানন্দ—একজন মিঃ রায়ের মেয়ে, একজন ভবেশদার বড় মামা ডাঃ রায়ের ছেলে, আর একজন কে চিনি না।

মহেন্দ্র—ভবেশের খোঁজে হষ্টেল পর্য্যন্ত এসেছিল কেন?

দেবানন্দ সংক্ষেপে বলিল—তা ত জানিনে। তিনি দেশে যান নি, তাই খোঁজ নিতে এসেছিল হষ্টেলে।

মহেন্দ্র মন্তব্য করিল—তবে ভবেশ গেল কোথায়?

দারোয়ান আসিয়া দেবানন্দের সীটের উপর একখানা খবরের কাগজ রাখিয়া গেল। নির্ম্মল কাগজ খুলিয়া প্রথম পাতায় চোখ বুলাইয়া বলিল—শোন, শোন, "কুমিল্লায় মুসলমানদের গুণ্ডামি! হিন্দু দোকান-পাট লুঠ! পথচারী হিন্দুদের বেপরোয়া আক্রমণ! সলিমুল্লার নূতন কীর্ত্তি!"

তিন জন একসঙ্গে কুমিল্লার দাঙ্গার বিবরণ পড়িতে লাগিল।

দুই-চারি দিনের মধ্যে কুমিল্লার দাঙ্গা সম্বন্ধে নানা রকম খবর চারদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কেহ বলিল কুমিল্লার এই দাঙ্গা নবাব সলিমুল্লার আগমনের ফল। সলিমুল্লা মুসলমান দাঙ্গাকারীদিগকে হিন্দুর দোকানপাট লুঠ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। দাঙ্গাকারীদের তাণ্ডব চোখে দেখিয়াও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেব নিষ্ক্রিয় ভাবে বসিয়াছিল। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ও আহত হিন্দুরা থানায় গেলে পুলিস তাহাদের এজাহার লইতে অস্বীকার করিয়াছে। আহত ও দুর্গতদের কোন প্রকার সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। একখানি কাগজের সংবাদদাতা লিখিল—হিন্দুরা যতক্ষণ মার খাইতেছিল, দাঙ্গা থামাইবার কোন চেষ্টাই কর্ত্তৃপক্ষরা করিলেন না। একজন মুসলমান গুলিতে নিহত ও পুলিসসাহেব জখম হইলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট চোখ খুলিলেন।

সন্ধ্যা লিখিল—"কুমিল্লার দাঙ্গা হইতে বুঝা যাইতেছে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া ভ্রাতৃভাবে কাঁধে কাঁধ দিয়া দাঁড়াইবার দিন বহু দূরে। ফিরিঙ্গীর শয়তানি কত দূর যাইতে পারে এই দাঙ্গা হইতে আমরা জানিতে পারিলাম।" অন্ত একখানি কাগজ লিখিল, "সলিমুল্লা পার্টিশানের সমর্থনে সভা করিবার চেষ্টা করাতে দাঙ্গা বাঁধিয়া গেল। সরকারী বিবরণ হইতে জানা যায়, মুসলমানরা কর্ত্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করিয়া বেআইনী শোভাযাত্রা করিয়া আল্লা হো আকবর ধ্বনি দিতে দিতে শহরের রাস্তা চষিয়া বেড়াইতে লাগিল, হিন্দুদের বেপরোয়া মারপিট করিতে লাগিল।" একখানা কাগজের সংবাদদাতা লিখিল—"কুমিল্লায় নগরায় যে গুর্খা মিলিটারী পুলিস বসান হইয়াছে তাহার কম্যাণ্ডান্ট বলিয়া বেড়াইতেছে বন্দেমাতরম বন্ধ করিবার জন্ত প্রত্যেক জেলায় কতকগুলি ছেলেকে গুলি করিয়া মারিতে হইবে।"

কুমিল্লার দাঙ্গার ব্যাপারে দেশের কিছু লোক বিস্মিত হইয়া দেখিল এদেশীয় ইংরেজ রাজপুরুষগণ স্বদেশী আন্দোলন দমন করিবার জন্য নিজেদের পদোচিত কর্তব্য ভুলিয়া কতদূর বিপথে যাইতে পারে। লোকের স্মৃতিশক্তি দুর্বল, ফুলারী আমলের কথা অনেকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল।

একখানি কাগজ লিখিল—"কুমিল্লা কি মগের মুলুক? সেখানে যাহা ঘটিল, এক বৎসর আগে কোন ভারতবাসী কি কল্পনা করিতে পারিত সভ্য ইংরেজশাসিত দেশে, বিংশ শতাব্দীতে তাহা কখনও ঘটিতে পারে? দেশবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস—বিভেদসৃষ্টির নীতি দেশে এই সর্ব্বনাশা আগুন জ্বালিবার জন্য দায়ী।" সমগ্র অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া সঞ্জীবনী লিখিল—"যখন লাঠির সাহায্যে স্বদেশী আন্দোলন দমন করা গেল না তখন বিভেদের বীজ বুনিবার জন্য ফুলার সাহেব মুসলিম প্রেমে আকুল হইলেন। হেয়ার সাহেবের আমলে পুলিশের লাঠি আড়ালে রাখা হইয়াছে, মুসলমানরা লাঠি হাতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দাঙ্গা বাধিতে দেখিয়া কোন কোন ইংরেজ পুরুষ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন। কুমিল্লার দাঙ্গা ও লুঠ-তরাজের প্রথম দিন ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস দাঁড়াইয়া মজা দেখিল। দ্বিতীয় দিন একজন হিন্দুর মাথা কাটিয়াছে দেখিয়া তাহারা হাত পরিহাস করিল। তৃতীয় দিন যখন দোকানপাট লুঠ করা আরম্ভ হইল—লুঠ বন্ধ করিবার জন্য তাহারা কোনই চেষ্টা করিল না।"

কুমিল্লার দাঙ্গার বিস্তারিত সংবাদ পৌঁছিলে যুগান্তর লিখিল, "কুমিল্লার ঘটনাগুলির মধ্য দিয়া ভগবানের ইঙ্গিত আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। দেশের সর্ব্বত্র এই ধ্বনি উঠুক, আজ কাত্রশক্তির উদ্বোধন চাই।"

বন্দেমাতরম্ ঘোষণা করিল, "বাংলার সর্ব্বত্র আজ 'লীগ অব মিউচুয়েল ডিফেন্স' গঠন করা আবশ্যক হইয়াছে।" কুমিল্লার যে সকল ছাত্র মুসলমান গুণ্ডাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের প্রশংসা করিয়া লিখিল—The boys are to be regarded as the chosen instruments of God" (ছেলেরা ভগবানের নির্ব্বাচিত যন্ত্র)।

কুমিল্লার দাঙ্গা সম্পর্কে স্বদেশী ভলাণ্টিয়ারদের নাম সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। কুমিল্লা শহরের শ্বেতাঙ্গ স্ত্রী পুরুষ সারকিট হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং সারকিট হাউস ঘিরিয়া রহিল রাইফেলধারী গুর্খা। লোকে রটাইল বন্দুকের শব্দ শুনিয়া জজসাহেবের পত্নী মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন। লাঠি ও বল্লমে সজ্জিত হইয়া ভলান্টিয়ারগণ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শহরে পাহারা দিতে লাগিল।

নবাব আলি চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত মিহির ও সুধাকর কাগজ কুমিল্লার দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে লিখিল:

"হিন্দু রেলকর্ম্মচারীরা নবাব সলিমুল্লা যে ট্রেনে কুমিল্লা আসিয়াছিলেন সেই ট্রেন ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। নবাবকে যখন শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয় তখন এক হিন্দুবাড়ী হইতে তাঁহাকে ঝাঁটা দেখান হয়। হিন্দুরা রাত্রে কেন্দ পরিয়া পথেঘাটে মুসলমানদের মারপিট করে। হিন্দুদের ভয়ে মুসলমানরা দল বাঁধিয়া রাস্তায় চলাফেরা করে, এক জন দুই জন রাস্তায় চলিতে সাহস পায় না।

"বাঙালীদের আর ভীরু বলিয়া উপহাস করা চলিবে না। তাহারা এখন লাঠি ধরিতে শিখিয়াছে, পুলিশ সাহেবের গায়ে হাত তুলিতে ভয় পায় না, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঢিল মারিতে ইতস্ততঃ করে না, গুলি চালাইয়া মুসলমানকে মারিতে সাহস করে—আন্দোলন চালাইয়া তাহারা এক জন ছোটলাটের চাকুরি খাইয়াছে। রাত্রে কুমিল্লা শহরের নানা জায়গায় বিভিন্ন রকমের আওয়াজ শোনা যায়। এই আওয়াজের অর্থ কি আমরা জানি না। এই সব ব্যাপারে মেসিডোনের বিদ্রোহের কথা মনে পড়ে। হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠা বিচিত্র নহে।"

*   *   *

দিনকয়েক পরে দেবানন্দ কেন্দ্র হইতে আদেশ পাইল তাহাকে প্রচারের জন্য ও অভিজ্ঞতা লাভের নিমিত্ত মফস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে কিছুদিনের জন্য। ডায়মণ্ডহারবার, হুগলী, চন্দননগর হইয়া কটকে ও ছোটনাগপুরে যাইতে হইবে। আরও আদেশ হইল গেরুয়া লইয়া সন্ন্যাসীবেশে বেড়াইতে হইবে। সেদিন কেন্দ্রে একটু উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করিল সে। একটা ঘরে নগেনদা এবং আরও কয়েক জনের মধ্যে তর্ক হইতেছিল। ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তার খানিকটা শুনিয়া সে বুঝিল পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা ও দলের কর্ত্তব্য তর্কের বিষয়।

এক জন বলিল—ঢাকার দল যা পারে করুক। এখান থেকে সাহায্য পাঠাতে হয় অনুশীলন সমিতির কেন্দ্র পাঠাবে। আমাদের অন্যদিকে মন দিলে চলবে কেন?

নগেনদা বলিলেন—দলাদলির কথা তুলো না। যুগান্তর যখন টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে যায় যায় তখন টাকা এসেছিল কোথা থেকে? রংপুরের কেন্দ্র থেকে টাকা আসে, তাই দিয়ে যুগান্তর চালু করা হয়। নিশ্চয় আমরা লোক পাঠাব যদি অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়।

প্রথম ব্যক্তি বলিল—লোক ত পাঠাবে। মালমশলার—তাহার চোখ দেবানন্দের দিকে পড়াতে সে থামিয়া গেল।

কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পরে স্থির হইল আর কয়েক দিন পরে দেবানন্দের পরীক্ষা, পরীক্ষা শেষ হইলে সে হষ্টেল ছাড়িয়া চাঁপাতলার কেন্দ্রে চলিয়া আসিবে, তারপর বাহিরে যাইবে।

পরীক্ষা শেষ হইল। দেশে যাইতেছে বলিয়া সে জিনিস-পত্র গুছাইতে লাগিল। যাবে সে দুইখানি চিঠি লিখিতে বসিল। একখানি লিখিল তাহার বাবাকে, সংক্ষেপে জানাইল সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছে, ইহাই তাহার শেষ পত্র। দ্বিতীয় পত্র লিখিল ইন্দ্রের কাছে। লিখিল—ভাই ইন্দ্র, এই চিঠিতে কয়েকটা দরকারী কথা লিখছি। তোকে আমি নিজের ভাইয়ের মত দেখি তাই লিখছি। তোকে একথা লেখা বাহুল্য হলেও লিখছি। বাবার অভাবে আমার মা, ভাইবোনদের একটু দেখিস। আমি এক অজানা পথে পা দিয়েছি। আমার গতিবিধির আর ঠিকানা কেউ পাবে না এর পর। ব্রত নিয়েছি মন্ত্রের সাধন কিংবা জীবনপাত। সংশয় ও মায়া হয়ত মনে সাময়িক দুর্ব্বলতা আনবে, কিন্তু আমার সঙ্কল্প যেন একটু মাত্র দুর্ব্বল না হয় এই প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে।

—অজানা পথের কথা বলেছি। ইন্দ্র, শুধু তোকে বলছি ভাই, পথ শুধু অজানা নয়, অন্ধকারময়। কিন্তু আমি এক জন সামান্য সৈনিক মাত্র হতে চাই, বিচারের চেষ্টা আমি করব না। চোখের সামনে দেখছি, সঙ্কল্পে অবিচলিত, সাহসে দুর্জ্জয় শত শত তরুণ সৈনিক এই অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কোন দিন ফিরতে পারবে কিনা তারা জানে না, লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে কিনা তারা জানে না, তবু তারা পা বাড়িয়েছে।

—আমি তাদের পিছনে যাবার জন্য অধীর হয়েছি। হিসাব, বিচার-বিশ্লেষণ অনেক হয়েছে, অনেক দিন ধরে, অনেকের দ্বারা হয়েছে। আবেদন-নিবেদনের চূড়ান্ত করা হয়েছে। দস্যুকবলিত রত্ন যে শুধু রক্তের মূল্যে উদ্ধার করা সম্ভব এই চরম ও পরম সত্য আমরা বুঝতে চাই নি এতদিন। সেদিন দেখি একখানা কাগজ—বন্দেমাতরম কাগজের নাম তুই নিশ্চয় শুনেছিস, ঠিক আমার মনের কথা লিখেছে :

"To avoid violent and bloody methods, the gentle, spiritual, law-abiding people are trying to invent new ways of regeneration which are, however, delusive. The petitionary delusion has been played out, and the medium of religion or industrialism though helpful are in themselves insufficient to effect the desired result. Politics is the work of the Kshatriya whose first virtue is 'not to bow his neck to the unjust yoke'."

(উগ্র ও রক্তসিক্ত পথে যাহাতে না যাইতে হয় এজন্য ভদ্র, ধার্ম্মিক, আইন-ভক্ত লোকেরা মুক্তিলাভের নূতন নূতন উপায়ের সন্ধান করিতেছেন, কিন্তু এই সকল উপায় ভ্রান্তি-জনক। আবেদন-নিবেদনের মোহ দূর হইয়াছে। ধর্ম্ম বা শিল্পোন্নতির পথে খানিকটা কাজ হইতে পারে, কিন্তু এই পথে অভীষ্টলাভ হইতে পারে না। রাজনীতির চর্চা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের প্রধান গুণ অন্যায় বিধানের নিকট মস্তক নত করিতে অস্বীকার করা)।

কিন্তু এখন আর বিচারের কথা নয়, এখনকার কথা :

We are not to reason why
We are but to do or die.

হাঁ, টু ডু অর ডাই, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন—আমার পক্ষে এই একমাত্র পথ।

ভাই ইন্দ্র, আজ তোদের কাছ থেকে বিদায় নেবার কথায় তোর কথা, লক্ষ্মীর কথা আর মার কথা মনে পড়ছে বার বার। চেষ্টা করেও মন থেকে সরাতে পারছি না। জানি না আর কোন দিন তোদের সঙ্গে দেখা হবে কিনা।

ভাই, এই চিঠিতে যা লিখলাম গোপন রাখবি। এক সময় না এক সময় বাড়ীতে সবাই জানতে পারবে। তুই কিছু জানাস না। আমার ভালবাসা নিস। লক্ষ্মীকে আমার ভালবাসা দিস।

* * *

ইন্দ্র কয়েক দিন খুব ব্যস্ত। শহরতোবা কাছারী লুঠ হইবার সম্ভাবনার কথা শুনিয়া সে সেখানে কয়েক জন বিশ্বস্ত লোক পাঠাইল।

এদিকে উলিপুরের উত্তরে বিলের মধ্যে কোন কোন গ্রামে মারধোর, লুঠপাটের সংবাদ আসিতে লাগিল। জেলে, নমশূদ্র চাষী, দুই-চার ঘর কৈবর্ত্ত, কুমার, কামার, তেলি মুদিখানার দোকানী মুসলমান গ্রামগুলিতে বাস করিত। তাহাদের কেহ কেহ স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাজনগরে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। ইন্দ্র ও তাহার গ্রামরক্ষী দল ইহাদের জন্য ব্যবস্থা করিবার ভার লইল।

দিনকয়েক পরে সন্ধ্যার দিকে গ্রামরক্ষীদলের এক ভলাণ্টিয়ার আসিয়া খবর দিল যতীন মাষ্টার মহাশয় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইন্দ্র হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া তাড়া-তাড়ি স্কুলের কাছে যতীন মাষ্টারের বাড়ীর দিকে চলিল।

তখন আবছা অন্ধকার হইয়াছে চারদিকে। ইন্দ্র অন্ধ-কারে দেখিল বাহিরের ঘরের বারান্দায় কে একজন বসিয়া আছে। সে ডাকিল—মাষ্টার মশায়, বাড়ী আছেন ?

বারান্দায় উপবিষ্ট সেই লোকটি অতিশয় স্নেহবিগলিত স্বরে বলিল, আও বেটা আও, তুমহারে লিয়ে ম্যঁয় বহুঁৎ দিনভর বৈঠ রহতা হুঁ। অ আও মেরা বেটা।

বিস্মিত ইন্দ্র বলিল, আপনি কে? মাষ্টার মশায় কোথায়?

ইন্দ্রের সাড়া পাইয়া যতীন মাষ্টার ঘর হইতে বারান্দায় আসিল। বলিল, কে? ইন্দ্র নাকি? এসো এসো।

উপবিষ্ট লোকটি প্রতিবাদের স্বরে বলিয়া উঠিল—আরে

ইন্দির কৌন হায় ? বহুত বেয়া বেটা হায়। আও বেটা আও।

তার পর সে অট্টহাস্ত করিল। বলিল, বাবু মশা, আসুন। ঘাবড়াবেন না। আমি জিংবাহাদুর নেপালী আছি।

ইন্দ্র কোন উত্তর না দিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘরে হেরিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। দুইটি ছেলে ঘরে বসিয়া ছিল, ইন্দ্র ঘরে ঢুকিতে তাহারা তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল। ইন্দ্র লণ্ঠনটি উঠাইয়া লইয়া বারান্দায় আসিয়া উঁচু করিয়া ধরিল। দেখিল বিরাটদেহ গেরুয়াধারী এক সন্ন্যাসী মাটিতে কম্বল পাতিয়া বসিয়া আছেন। মাথায় প্রকাণ্ড গেরুয়া কাপড়ের পাগ্‌ড়ি।

তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র বলিল—আপনি কোন নেপালের নেপালী ? দেখে ত মনে হচ্ছে গ্যালিভারের ব্রবডিংনাগ থেকে এসেছেন।

সন্ন্যাসী ও যতীন মাষ্টার তাহার কথা শুনিয়া হাসিল। লণ্ঠন নামাইয়া রাখিয়া ইন্দ্র বলিল—মাষ্টার মশায়, কুমিল্লার খবর বলুন। কাগজ পড়ে আমরা চিন্তিত আছি।

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—

চিন্তা কর দূর বাছা চিন্তা কর দূর
মাণিকপীর স্মরণ করে চালাও লগুড়।

এই মাষ্টার। ঘরে চল বাপু। মুড়ি টুড়ি থাকে ত খানা-খানেক আন। ঘরে কুটুম এয়েছে, তার ওপর জমিদার অতিথি।

সকলে ঘরে ঢুকিল। যতীন মাষ্টার দরজা বন্ধ করিল। সন্ন্যাসী পাগড়ী খুলিয়া তক্তপোষের উপর বসিল। ডাকিল—ওগো খুকীরা, এদিকে এস ত দু'বোন।

ইন্দ্র দেখিল যে ছেলে দুইটি তাহাকে দেখিয়া ঘর হইতে পালাইয়াছিল তাহারা হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল। ছেলে দুইটির পনের ষোল বছরের বেশী বয়স নয়। একটির চেহারা শ্যামবর্ণ, একটু বেঁটে, অন্যটি ফর্সা, মেয়েলী, কোমল চেহারা। তাহারা হাসিতেছিল। সন্ন্যাসী বলিল—বস ইন্দির বাবু, এদের পরিচয় দিই। এই যে আমার মত কেলে কিন্তু বেঁটে বক্কেশ্বর ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী গণেশ। আর উই রাধা-রাধা চেহারা যাঁর তাঁর নাম শ্রীমতী দেবেশ। এঁরা দুটি যতীন মাষ্টারের বিবাহিতা ভগ্নী। দাদার সঙ্গে পিত্রালয় কুমিল্লা থেকে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করেছেন। এখানে জারণি ব্রেক করেছেন। যে স্বভাবের মানুষ তোমরা দুই ঠাকরুণ, এক দিন সরকারী শ্বশুরালয়ে গিয়ে শ্রীজগদম্বা বলে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে নিশ্চিন্ত থাক।

ছেলে দুইটি এই বক্তৃতা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। ইন্দ্র এই বক্তৃতার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারিল না। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে যতীন মাষ্টারের দিকে চাহিল।

সকলে কম্বল পাতিয়া মেঝেতে বসিল। যতীন মাষ্টার সন্ন্যাসীর পরিচয় দিয়া বলিল—ঐ সন্ন্যাসী প্রভু হচ্ছেন মি—। এক সাহেব কোম্পানীর ট্রাভেলিং সেল্‌সম্যান। বহুরূপী মানুষ, কখন সাহেব, কখন সন্ন্যাসী, কখন ভোজপুরী দারোয়ান। নানা বেশে নানা কাজে বিহার থেকে চাটগাঁ, বর্মা পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়ান। আমরা এঁকে জানি দিভুদা বলে। আর এই ছেলে দুটি কুমিল্লা স্কুলের ছাত্র। খুনের চার্জ্জে পুলিশ এদের পিছনে লেগেছে, এদের মেয়ে সাজিয়ে নিয়ে সরে পড়তে হয়েছে। কুমিল্লায় থাকলে নির্ঘাত ধরা পড়ত। পুলিশ নিবারণ নামে একজনকে ধরেছে—গুলি করে একজন মুসলমানকে খুন করার জন্য।

ইন্দ্র—কুমিল্লার অবস্থা কি দেখলেন বলুন।

দিভুদা—বেশ কথা বললে হে ছোকরা ? আমরা কি অবস্থা দেখতে গিয়েছিলাম সেখানে ? চাটগাঁ, ফেণী আর বরিশালের কয়েকজন মাত্র ছেলে ছিল বটে, কিন্তু যা করবার কুমিল্লার ছেলেরা নিজেরাই করেছে।

যতীন—কুমিল্লা ঠিক আছে। নাবালক মিঞা অবশ্য এখনও গোলমাল বাধাবার চেষ্টায় আছে পুলিশের সাহায্য নিয়ে। কুমিল্লা শহরে সুবিধে করতে না পেরে এখন নগরা-হাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৈমনসিংহে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা চলছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রটাচ্ছে রাজা সুরেন্দ্রনাথ হুকুম দিয়েছেন হিন্দুদের মুসলমান দেখলেই মারবে—গোলমাল বাধিয়ে তোল তা হলেই পার্টিশন রদ হবে। জামালপুরে মুসলমানরা বাকি শোধ নেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। টাঙ্গাইলে, ফরিদপুরে, এণ্টি-স্বদেশী মিটিং হচ্ছে খবর পাওয়া গেল। নবাব সলিমুল্লা চুপি চুপি কুমিল্লা থেকে সরে পড়েছেন। কেউ কেউ বলছে মেয়ে সেজে পাল্কী চড়ে পালিয়েছেন। ঢাকায় ফিরে এক ইস্তাহার বের করেছেন—কুমিল্লায় হিন্দুরা ভীষণ অত্যাচার করেছে মুসলমানদের ওপর ; একজন শহীদ, অনেকে জখম হয়েছে, ভাই সব, তৈয়ের হও। ইস্তাহারখানা বের হয়েছে সলিমুল্লার শালার নামে। ঢাকায় খিটিমিটি লেগেই আছে।

ইন্দ্র কুমিল্লার ছেলে দুইটির পরিচয় পাইয়া তাহাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হইল। অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা কথাবার্ত্তায় কাটাইয়া সে বাড়ী ফিরিল। যতীন মাষ্টার লণ্ঠন হাতে লইয়া তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। পথে আসিতে আসিতে ইন্দ্র বলিল—মাষ্টার মশাই আমাকে দলে নিন, বাইরে পড়ে থাকতে আমার আর ভাল লাগছে না।

যতীন মাষ্টার—বাইরে থেকে তুমি অনেক কাজ করবে ইন্দ্র। বাইরে থেকে কাজ করবার ভাল লোকের খুব প্রয়োজন। আমার মনে হয় কি জান, কুমিল্লায় হিন্দুরা এই ভাবে রুখে দাঁড়ানোতে সরকার পক্ষের চমক লেগেছে। তারা বুঝতে পেরেছে একটা দল গড়ে উঠেছে হিন্দুদের মধ্যে, তারা আর চুপ করে দুই পক্ষের মার খাবে না। তাজেই তোড়-

যোগ হবে এদের চিঠি করবার জন্ত। ক্ষুদিরাম বহু অপোগণ্ড স্কুলের ছেলেকে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ চালান দিচ্ছে। আমার অনুরোধ তুমি কোন দলের ভিতরে ঢুকো না, বাইরে থেকে কাজ কর।

ইন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু আর কিছু বলিল না।

পরের দিন দুপুরে ইন্দ্র দেবানন্দের চিঠি পাইল। অনেক বার সে চিঠিখানি পড়িল, চিঠির পরিষ্কার অর্থ যেন তাহার বোধগম্য হইল না। শুধু একটা কথা তাহার সমস্ত চেতনাকে আলোড়িত করিতে লাগিল—সেজুদা, তাহাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলেন এখন হইতে।

দেবানন্দের বাবাকে লিখিত পত্রের কথা গ্রামে প্রচারিত হইল, সকলে জানিল দেবানন্দ সন্ন্যাসী হইয়াছে।

ইহার কয়েকদিন পরে দেবানন্দের প্রথম বিভাগে পাশ করিবার সংবাদ প্রকাশিত হইল।

কবি মোহিতলাল

শ্রীসুনীলকুমার বসু

মোহিতলাল আর ইহলোকে নাই। যে বয়সে তিনি মর্ত্যের মায়া কাটাইয়াছেন, সাধারণ বাঙালী-জীবনের পরিমাপ অনুসারে তাহা বার্দ্ধক্য। সে বয়সে বাঙালীর মনন-প্রতিভায় গোধূলির প্রায়ান্ধকার ঘনাইয়া আসে। মোহিতলালের বেলায় কিন্তু ইহা ঘটে নাই। মোহিতলাল মনন-শক্তির ভাস্বর জ্যোতির মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বাণী অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবন-দর্শন পরিণত বয়সের গাঢ় বুদ্ধিচ্ছটায় ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সব ফলটুকু তিনি আমাদের দিয়া যাইতে পারেন নাই।

মোহিতলালের সাহিত্যানুরাগের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য তাঁহার নিষ্ঠা। সাহিত্য আমরা অনেকেই ভালবাসি, সাহিত্যচর্চ্চাও করি বটে, কিন্তু এমন করিয়া সাহিত্যের মধ্যে একাত্মীভূত হইয়া যাইতে পারি না। মোহিতলালের সাহিত্যানুরাগ অত্যন্ত নিবিড় ও একাগ্র ছিল। তাঁহার নিষ্ঠা তাঁহাকে তাঁহার বাঞ্ছিত বস্তুর মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াছিল—তাহার বাহিরে তাঁহার কোন অস্তিত্ব ছিল না। শ্রদ্ধাহীন, উদ্দেশ্যহীন বর্ত্তমান যুগে মোহিতলালের একাগ্রতা তাহাকে প্রচলিত অর্থে একেবারে অচল করিয়া দিয়াছিল। যুগের সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই। যুগ-বিশেষের অন্তর্নিহিত বাণীর ছন্দে তিনি কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বটে, তাঁহার তারুণ্য তরুণজনের ভালবাসায় অভিষিক্ত হইয়াছিল, ইহাও সত্য। কিন্তু ধীরে ধীরে বাহিরের জাঁকজমক ও চটুলতা অতিক্রম করিয়া বস্তুর অন্তরে যে সত্য আছে, যাহা যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যায় না, তাঁহার কাব্য সেই সত্যের সন্ধানে ব্রতী হইয়াছিল। যদি সাহিত্যে শাশ্বতের কোন মূল্য থাকে, পরিবর্ত্তনশীল জগতের ছায়াচিত্রের ইন্দ্রজাল অতিক্রম করিয়া চিরন্তন আনন্দলোক সন্ধানের কোন সার্থকতা থাকে, তবে মোহিতলালের সাহিত্য-সাধনা চঞ্চল জীবন-স্রোতের মধ্যে এক দিন স্থায়িত্বের সার্থক আশ্বাস দিবে। মোহিতলাল জানিতেন যে প্লাবন আসে, ভাসাইয়া নেয়, আবার চলিয়া যায়, কিন্তু চিরন্তন জীবনধাত্রী মাটী অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়া যায়।

মোহিতলাল জানিতেন সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সুলভ নহে, তাহার জন্য রীতিমত মূল্য দিতে হয়। সে মূল্য তিনি পুরামাত্রায় দিয়াছিলেন। সাম্প্রতিক কালে যখন তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থান করিতেন তখন লেখক অনেকবার সেই সুন্দর গ্রাম্য-পরিবেশের মধ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, জাগতিক ও বাস্তব পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁহার বৈরাগীর মত ঔদাসীন্য, দেখিয়াছেন সাহিত্য ব্যতীত অন্য কোন কিছুর কথা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিত না। হয়ত পার্থিব জীবনের দিক দিয়া ইহা অন্যায়। কিন্তু সাহিত্য-প্রীতির এমন প্রগাঢ় ও নৈষ্ঠিক নিদর্শন, এমন খাঁটি পরিপূর্ণ সাহিত্যানুরাগ, এ যুগে বিরল। তাঁহার সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করিতে করিতে লেখকের মনে হইত চতুর্দ্দিকের সমস্ত পরিবেশ বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গিয়াছে—শুধু বাঁচিয়া আছে এক স্পন্দমান অনুরাগ। লেখকের আরও মনে পড়ে মোহিতলালের কবিতা আবৃত্তি। মোহিতলালের মুখে কাব্যের যে আবৃত্তি শুনিবার সৌভাগ্য লেখকের বহুবার হইয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব। আবৃত্তির সময় মোহিতলালের চক্ষু দুটি ভাবাবেগে অর্দ্ধনিমীলিত হইয়া পড়িত, সে দৃশ্য আজও তাঁহার চোখের সামনে ভাসিতেছে।

মোহিতলালের রক্তে সাহিত্য-প্রেরণা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রবহমাণ। মাতুলগোষ্ঠীর দিক দিয়া তিনি যুগ-সন্ধির কবি ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে সম্পর্কিত। কাঁচড়া-পাড়ায় তাঁহার মাতুলালয়। সেখানে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১১ই কার্তিক তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। পিতৃকুলের দিক হইতে ললিতভাষী ভাবুক কবি দেবেন্দ্রনাথের সহিত তিনি আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ। দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবও কিছু কিছু তাঁহার উপর পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। হুগলী জেলার জিরাট-বলাগড় গ্রামে তাঁহার পৈতৃক নিবাস। মোহিতলালের পিতাও সাহিত্যরসিক ছিলেন। সংসারের প্রতি তিনি ছিলেন উদাসীন। এই ঔদাসীন্য মোহিত-লালের চরিত্রেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মাতুলালয় ও স্বীয় গ্রামে বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতায় কলেজ জীবনে প্রবেশ করেন ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাস করেন। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তিনি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিতে বাধ্য হন।

অল্প বয়সেই মোহিতলালকে জীবিকার সন্ধানে ছুটিতে হয়। অস্থায়ী সরকারী চাকুরি উপলক্ষে কলিকাতার বাহিরে নগ্ন প্রকৃতির বুকে তাঁহাকে কিছুদিন বাস করিতে হয়। তাহার পর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। শিক্ষকতা কাজে তিনি অনেক দিন ব্রতী ছিলেন। কলিকাতার তালতলা স্কুল ও ক্যালকাটা হাই স্কুলে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৩৩৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং সেখানে প্রায় বার-তের বৎসর অধ্যাপনা করেন। অবসর গ্রহণের পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নগরীর উপকণ্ঠে নিভৃত পল্লীভবনে সাহিত্য-সাধনায় নিরত থাকিয়া দিন যাপন করিতেছিলেন।

'মানসী' পত্রিকায় মোহিতলাল সত্যিকারের সাহিত্য-সাধনা সুরু করেন এবং ১৩১৬ সাল হইতে ঐ পত্রিকায় তাঁহার গদ্য রচনা ও কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে। কিন্তু ভারতীগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিয়াই বোধ হয় তাঁহার প্রতিভা ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে সুরু করিল। যে সব বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সান্নিধ্যলাভে তিনি অনু-প্রাণিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ১৩২৮ সালে তাঁহার 'স্বপন-পসারী' প্রকাশিত হয় এবং তাহার ৫ বৎসর পরে 'বিস্মরণী' প্রকাশের ফলে তাঁহার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁহার অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও মূল্যবান কবিতা প্রকাশিত হয়। 'শনিবারের চিঠি'কে কেন্দ্র করিয়া তিনি শনিচক্রের একজন উৎসাহী সভ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এই পত্রিকায় তাঁহার অনেক সুচিন্তিত সাহিত্যিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩৪৩ সালে তাঁহার বিশিষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ 'আধুনিক বাংলা-সাহিত্য' এবং তাহার দুই বৎসর পরে তাঁহার দ্বিতীয় সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ-পুস্তক 'সাহিত্যকথা' বাহির হয়। মোহিত-লালের সাহিত্যিক জীবন দীর্ঘ হইলেও বহু রচনায় ভারে ভারাক্রান্ত নহে। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের তুলনায় তাঁহার কাব্যের সংখ্যা কম। তাঁহার সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলীও সংখ্যায় অধিক নহে। মোহিতলালের রচনায় নিবিড়তা বেশী, বিস্তৃতি বেশী নয়। তাই প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে গাঢ়তা এবং ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গিকে যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ ও উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিবার মত অনুভূতির স্পর্শ আছে। তাহার ভাব যেমন গভীর ও বিচিত্র, রচনা-শৈলীও সেইরূপ অনবদ্য—কি কবিতায়, কি গদ্য-প্রবন্ধে। গদ্য-রচনায় তিনি যে ষ্টাইল সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা যে শুধু তাহার স্বকীয়তা ও মৌলিকত্বের জন্যই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাহা নহে—সে ষ্টাইল বিশুদ্ধতা, প্রাঞ্জলতা এবং ওজোগুণেও অনবদ্য।

১৩২৮ বঙ্গাব্দে মোহিতলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপন-পসারী' প্রকাশিত হয় বলিয়াছি। ইহার পর হইতে তাঁহার দীর্ঘ কবি-জীবনের মধ্যে বাংলা কাব্যধারায় অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। ১৩২৮ সালে বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে নূতন ও পুরাতনের কোলাহলময় দ্বন্দ্বে বাংলা-সাহিত্য মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় 'স্বপনপসারী'র আবির্ভাবে পাঠকশ্রেণী চকিত ও পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল একটা নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখিয়া। সে যুগের পক্ষে 'স্বপনপসারী'র কবিতা নূতন, সংস্কারবিরোধী ও বিদ্রোহাত্মক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। সেই কারণে সে যুগে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নিকট তাঁহাকে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছিল।[১] ইহার পাঁচ বৎসর পর 'বিস্মরণী' প্রকাশিত হইলে তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে তিনি বিশেষভাবে সম্বৰ্দ্ধিত হন।[২] সংস্কারবিরোধী তরুণ লেখক-গোষ্ঠী তাঁহাকে সংস্কার-মুক্তির অন্যতম পথ-প্রদর্শক হিসাবে গণ্য করেন। কিন্তু যখন 'স্মরগরল' প্রকাশিত

১। মাসিকপত্র সমালোচনা ('ভারতী'তে প্রকাশিত মোহিতবাবুর 'স্বপনপসারী' কবিতা সম্পর্কে), সাহিত্য, মাঘ, ১৩২৬।

২। 'বিস্মরণী'র সমালোচনা, 'কালিকলম,' বৈশাখ, ১৩৩৪; 'প্রগতি' মাঘ, ১৩৩৪।

হইল, তখন যেন মোহিতলাল অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়াছেন এবং বাংলা কবিতার অগ্রগতির কথা ভাবিয়া নিজেই নিজের অসাময়িকতা ও সংস্কারপ্রীতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন।

কোন কাব্যই স্বয়ম্ভূ নয়। সমস্ত কাব্যরীতি বা কাব্য-ধারার পিছনে একটা ইতিহাস থাকে। মোহিতলালের কাব্যেরও আছে। মোহিতলালের কাব্যও বহু দেশী ও বিদেশী কবির প্রভাবের চিহ্ন ও স্বাক্ষর বহন করে। তাহাতে অবশ্য তাঁহার মৌলিকতা ও স্বকীয়তা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার পিতার আরবী ও ফারসী-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছে। সমসাময়িক বিভিন্ন কবির প্রভাবও তাঁহার কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার গুরুস্থানীয়। এ বিষয়ে তাঁহার 'সাহিত্য-বিচার' দ্রষ্টব্য। বাঙালী পারিবারিক জীবনের রমণীয় মাধুর্য্য দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে ফুটিয়াছিল। মোহিতলালের কোনও কোনও কবিতায় ইহার প্রভাব আছে। সনেট-রচয়িতা হিসাবেও মোহিতলাল দেবেন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। কিন্তু মোহিতলালের মানসিক গঠন দেবেন্দ্রনাথ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাই তাঁহাদের কাব্যরীতিও পৃথক হইতে বাধ্য। গোবিন্দদাসের দেহসচেতন কবিতার ছাপ মোহিতলালের উপর রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি রবীন্দ্র-প্রভাব মোহিতলাল এড়াইতে পারেন নাই। তরুণ লেখকগণ অবশ্য সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "'বিস্মরণী' প্রকাশিত হবার পর এ কথা বলা বাহুল্য যে বাংলার কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নেই।"

তরুণদের এই অতিশয়োক্তির মধ্যে সত্য এইটুকু যে, রবীন্দ্র-প্রভাবের ভিতর দিয়া মোহিতলাল একটা নূতন রচনা-শৈলী সৃষ্টিতে সফল হইয়াছেন, কিন্তু সে প্রভাব হইতে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে পারেন নাই। সংস্কৃত-কাব্যের ভাব-গভীর বাচন-রীতি তাঁহার কবিতায় মহা-কাব্য-সুলভ গাম্ভীর্য্য আরোপ করিয়াছে। ইংরেজ কবিদের মধ্যে কীট্স ও টেনিসনের কাব্যরীতির সঙ্গে তাঁহার সামঞ্জস্য দেখা যায়, অবশ্য প্রধানতঃ তাঁহার প্রথম বয়সের কবিতায়। কীট্সের প্রথম জীবনের অসংযত রোমান্টিকিজম্-এর মত 'স্বপনপসারী'তে মোহিতলালের রোমান্টিকিজম্ও স্থানে স্থানে ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে; বিশেষ করিয়া তাঁহার আরবী-ফারসী প্রভাবিত কবিতা-গুলিতে (ইহাদের উপর সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবও সুস্পষ্ট)।

'স্বপনপসারী' অপরিণত কাব্যরীতির প্রকাশ—একটা পরখ বা experiment, ভাব অপেক্ষা ভাবালুতাই ইহাতে বেশী—তাঁহার স্বাতন্ত্র্য এখানে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। কীট্সের মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা আছে, কিন্তু concreteness বা বস্তুরূপ নাই। এই হিসাবে তিনি কীট্স অপেক্ষা টেনিসনের সমগোত্রীয় অনেক বেশী। শেষোক্ত কবির দুইটি কবিতার অনুবাদ তিনি 'হেমন্ত-গোধূলি'তে স্থান দিয়াছেন। 'বিস্মরণী' তাঁহার শ্রেষ্ঠতম কাব্যগ্রন্থ। অন্যত্র 'উচ্চৈঃশ্রবা' নামক তাঁহার একটি কবিতা আছে। ইহাতে উচ্চৈঃশ্রবা গ্রীক পুরাণের 'পেগাসিস'-এর মত মহাকাব্যের প্রতীক। এই "অতি-দুর্ম্মদ-উন্মাদবেগ" উচ্চৈঃশ্রবাকে কবি আয়ত্তাধীনে আনিয়া দিয়াছেন—

> মাঠের মাঝারে সুরভি তৃণের পাশে
> সেথায় মধুর প্রভাতে পুলকভরা
> ফুটিছে টুটিছে রাখালিয়া গীতি চুম্বনে কলহাসে
> অধরার শোভা পলকে ধরিছে ধরা।

অর্থাৎ তিনি এই মহাকাব্যোচিত বীররসের প্রতীক পৌরাণিক হয়রাজকে বাংলার স্নিগ্ধ, শ্যামল, ললিতকান্ত গীতিগুঞ্জনের ঐতিহ্যের সঙ্গে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছেন। ক্লাসিক ও রোমান্টিক কাব্যরীতির এই সমন্বয়ই তাঁহার কাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই হিসাবে 'বিস্মরণী' তাঁহার পূর্ণতম ও সার্থকতম সৃষ্টি। এই কাব্যে দেখা যায় শব্দচয়নে অসাধারণ নৈপুণ্য, নব-পুরাণ সৃষ্টি, ভারতীয় পুরাণকে নবরূপ প্রদান। ভাবের দিক দিয়া ইহাতে দেখা যায় মানবতা, দেহ-বাদ ও তজ্জনিত দুঃখবাদ ও তান্ত্রিক সাধনার অনুসরণে দেহ ও দেহাতীতের সমন্বয় বিধানের চেষ্টা। জগৎকে অস্বীকার করিয়া তিনি নিরালম্ব শূন্যে মুক্তি খোঁজেন নাই। তাঁহার এই কাব্যে একদিকে দেহময় অনুভূতি ও বাসনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া দেহাতীত নির্ব্বাণের সম্ভাবনা ও প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, অথচ কামনার অন্তর্নিহিত অসমাপ্তি, ভোগের অপ্রশমনীয় তৃষ্ণা তাঁহাকে সুরাভিখারী করিয়া তুলিয়াছে। মৃত্যুর অনন্ত প্রহেলিকা, জীবনের অপরিসীম সুগভীর রহস্য কবির পিপাসু অন্তঃকরণকে বৈরাগীর রঙীন বসনে সাজাইতে চাহিয়াছে। পৃথিবীর বাসনা-কামনার সুরভি ও পুলকে ভরপুর কবি বলিতেছেন:

> "জীবন মধুর! মরণ নিঠুর—তাহারে দলিব পায়,
> যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়।"
> (অঘোরপন্থী। স্বপনপসারী)

তিনি বলিতেছেন:

> "সত্য শুধু কামনাই, মিথ্যা চির-মরণ-পিপাসা।"

পুনরায়:

> "দেহ ভরি কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা,
> ধুলা মাটি খুঁড়ি লও কামনার কাঁচ যদি হীরা।

"অবধুঁটি সব মোমা কাঙালের মত,
রমণীর তনযুগ করি দিব ক্ষত,
নিঃশেষ শোষণে…।" ('মোহমুদ্গর')

বহুভাবে, বহুরূপে তিনি তাঁহার এই আকণ্ঠ কামনার কথা বলিতে চাহিয়াছেন। যেমন, "জীবনের দুঃখসুখ বার বার ভুঞ্জিতে বাসনা", "ব্যথায় বিবশ তনু তবু হোম করি আলি কামানল, এ দেহ ইন্ধন তায়।" কিন্তু এই কামনার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে ক্লান্তি, অবসাদ, হতাশা ও দুঃখের করুণ কাহিনী লেখা রহিয়াছে। 'বিস্মরণী'র পান্থ কবিতায় দার্শনিক সোপেনহাওয়ারকে লক্ষ্য করিয়া তিনি আবার সেই কামনার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন—কিন্তু দেহ-বাদী কবিতাগুলির মদির ছন্দ এখানে নাই, অসমাপ্তি ও অবসাদের ক্লান্তিময় মূর্চ্ছনা এখানে বাজিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতেছেন :

"যে মধু হরণ তুমি করিবারে চাও, মধুহর!
তারি মায়ামুগ্ধ আমি, মেহে মোর আকণ্ঠ পিপাসা।
মৃত্যুর মোহন মন্ত্রে জীবনের প্রতিটি প্রহর
জপিছে আমার কানে সকরুণ মিনতির ভাষা"
('পান্থ,' 'বিস্মরণী')।

মৃত্যুই যেন জীবনের হাজার কামনা-বাসনাকে কবির কাছে প্রিয়তর করিয়া তুলিয়াছে। মনে হয় প্রথম যৌবনের উগ্র ভোগলালসা মৃত্যুর দূরাগত কটাক্ষে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—জীবনের খণ্ডিত আনন্দ সেই মৃত্যুর আলোতে শুভ্র, স্নিগ্ধ, করুণ হইয়া দেখা দিয়াছে। 'মৃত্যু ও নচিকেতা' কবিতায় এই মৃত্যু একটা বিরাট অপরিমেয় বিস্ময়রূপে দেখা দিয়াছে। ঔদ্দালক-আরুণির পুত্র বালক নচিকেতার চোখে যে মৃত্যু-জিজ্ঞাসা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কবির নিজের চোখেও তাই। যতবার তিনি পৃথিবীর প্রত্যক্ষ সম্পদ দুই বাহু দ্বারা আঁকড়াইয়া ধরিতেছেন, ততবারই মৃত্যুর রহস্য প্রাবৃট্‌ সন্ধ্যার মত ঘন ছায়া মেলিয়া তাঁহার চোখের সামনে বিভ্রমের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই বালক নচিকেতার কণ্ঠে বাজিয়া উঠে পৃথিবীর প্রথম বিস্ময়, প্রাগৈতিহাসিক অপরাজেয় কৌতূহল—

"ওগো মৃত্যু! কহিয়াছি কামনা আমার
হেরিব স্বরূপ তব! স্নিগ্ধ কি নির্মম,
করুণ কোমল, কিবা ভীষণ ভয়াল
হেরিতে বাসনা চিতে।"

'স্মরগরল' প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালে। ইহা বিস্মরণীর পরিণতি—প্রবীণতা ইহার অঙ্গে অঙ্গে। এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'প্রেম ও ফুল' একটা নূতন ধরণের সার্থক সৃষ্টি। ভাবের দিক দিয়া এই কাব্য বিস্মরণীর ক্রমানুবর্ত্তী। ইহাতে পরিণত বয়সের মননশীলতা ও পরিপক্বতা পরিস্ফুট। কবি যেন এখানে স্বেচ্ছায় দার্শনিক সাজিয়াছেন। কবিতার শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত্ত হইতেছে সেই শুভ গোধূলিলগ্ন যখন মননের সঙ্গে প্রাণের মধুর মিলন ঘটে। 'বিস্মরণী' সেই গোধূলি আলোয় অবগুণ্ঠিত মিলনের রহস্যময় অঙ্গীকার। কিন্তু এখানে মননই যেন সর্ব্বময় হইয়া উঠিয়াছে। কবিতার কাঠামোটা ঠিক ক্লাসিক্যাল. কিন্তু অতিভাষণ দোষ স্পষ্ট। 'বিস্মরণীর, 'পান্থ' ও এই কাব্যের 'বৃদ্ধ' তুলনীয়। শেষোক্ত কবিতাতেও জীবনের চরম সমস্যা দুঃখ ও চরম সত্য মৃত্যু কবিকে পীড়িত করিতেছে। 'হেমন্ত-গোধূলি'তে কুহেলি-মলিন শান্ত, শীতল সন্ধ্যায় কবি হৈমবতীরূপে সুন্দরীকে দেখিয়াছেন। যৌবনের প্রাখর্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। স্নিগ্ধ, বিধুর জীবন-সায়াহ্নে হেমন্ত-গোধূলিই কবির স্তিমিত-তেজ সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে। এখানে তাঁহার লেখনী "নীরব নিথর রঙের পাথার" হইতে স্নিগ্ধ ম্লান মধুরিমা চয়ন করিতে ব্যস্ত। গীতিকবিতার পক্ষে ইহা বিশেষ ভাবে উপযোগী। 'স্বপ্নসঙ্গিনী,' 'ফুল ও পাখী' প্রভৃতি কবিতা এই হিসাবে বিশেষ ভাবে উপভোগ্য। গীতিকাব্য হিসাবেই 'হেমন্ত-গোধূলি'র মূল্য অবিসংবাদিত থাকিবে।

মোহিতলালের কাব্যসম্বন্ধে এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাঁহার দুই-একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখানে সামান্য কিছু আলোচনা করা হইল। তাঁহার কাব্য শেষ পর্য্যন্ত বিবর্ত্তনের ছন্দে যে রূপই গ্রহণ করুক না কেন, 'স্বপনপসারী' ও 'বিস্মরণী' স্মরণীয় সৃষ্টি সন্দেহ নাই। ইহার আর একটি কারণও আছে। সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখি মোহিতলালের কাব্যদ্বয় সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কালের অনেক কবির কাব্যপ্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম প্রথম কাজী নজরুল। রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তির নেশা যখন তরুণ সাহিত্যিকদের পাইয়া বসিয়াছিল তখন মোহিতলালের কাব্য যে তাঁহাদের চোখের সামনে একটা নূতন জগতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে শেষ কথা এই যে, মোহিতলালের কাব্যের সার রসবস্তুটুকু চিরন্তন, তাহা সমসাময়িক বা যুগ-বিশেষের বস্তু নহে। সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই চিরকালের, শুধু বর্ত্তমান কালের নহে।

সমালোচক মোহিতলালের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যালোচনার মান বা standard নির্দ্দিষ্ট করা। এই বস্তুটির অভাবে বাংলা-সাহিত্যে সমালোচনা বলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুঝাইত হয় স্তুতিগান না হয় তিরস্কার। মোহিতলাল বুঝিয়াছিলেন, ইহার কারণ

সাহিত্য-সমালোচনায় মানের অভাব। তাই তিনি বাংলা সাহিত্যে 'aesthetics' বা রসশাস্ত্র গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক মতামত যাহাই হউক না কেন, একথা সত্য যে শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দেখিবার তাঁহার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তাঁহার সমালোচনা বলিষ্ঠ তেজোগর্ভ ও গঠনমূলক। ভাষার দিক দিয়া তিনি রীতি-বিশুদ্ধির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজ ও রাজনীতির দিক দিয়া তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। বাংলার সংস্কৃতি ছিল তাঁহার প্রাণের একান্ত প্রিয়। বাঙালীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বে তিনি আস্থাবান ছিলেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে, বাঙালী আবার ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিবে। তাই বর্ত্তমানের উন্মার্গগামী, অবনত, সঙ্কটাপন্ন বাঙালী-সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার জন্য তিনি অশ্রান্ত ভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন। আজ বাংলা-সাহিত্যে রীতিসম্মত সাহিত্যালোচনা চালু হইয়াছে। ইহার পশ্চাতে মোহিতলালের দান অসামান্য। বাংলা গদ্য-প্রবন্ধ তাঁহার কাছে অশেষ ভাবে ঋণী। বাংলার সাহিত্য-রসিকেরা চিরদিন তাঁহাকে স্মরণ রাখিবেন। কারণ তিনি তাঁহাদের দৃষ্টির মোড় ফিরাইয়া দিয়াছেন।

হাফিজ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

স্তব্ধ করে মৃত্যু সব, জীবনের কলরব, যৌবনের আনন্দ-সঙ্গীত ;
স্তিমিত কটাক্ষ থাকি, স্পন্দহীন দেহমন,
বদ্ধ তার বক্ষের সম্বিৎ,
অধরে চুণীর আভা লুপ্ত হয় মরণের হিমশীর্ণ বিবর্ণতা মাখি।
তাতয়া মৃত্তিকা মাতা সন্তানে সস্নেহে রাখে
নিজ ক্রোড়ে সঙ্গোপনে ঢাকি।

এই তো চলেছে বন্ধু, মানবের ইতিবৃত্ত,
যুগে যুগে ধরিত্রীর কোলে,
কে কাহারে মনে রাখে ? স্মৃতি হেথা সীমাবদ্ধ ;
কালক্রমে লোকে সবই ভোলে।
তুমি কিন্তু করিয়াছ সে অনন্ত কালচক্র
আপনার মহিমায় জয়,
তোমার সঙ্গীত-সুধা উচ্ছ্বসি উঠিছে
আজও দিল্‌রুবায় সারা বিশ্বময়।

যে হাসি মিলিয়া গেছে তারে তুমি করিয়াছ
ম্লান ওষ্ঠে পুন উজ্জীবিত,
যে প্রেম শুকায়ে গেছে, তুলেছে সঞ্জীবি তারে
নব রসে তব প্রেমামৃত।
জীবনের শূন্য পাত্রে ভরিয়া দিয়াছ তুমি অনন্তের
তীব্র দ্রাক্ষা-সুরা,
রূপহীনা নার্গিসের মুকুল মুঞ্জরি ওঠে
অরূপের সৌরভে বিধুরা।

বুলবুলের কণ্ঠে তুমি উজ্জীবিত করিয়াছ স্বর্গ-ছোঁয়া অভিনব সুর,
গজল্ গুঞ্জরি ফিরে অন্তরের তীরে তীরে স্বতঃস্ফূর্ত বিচিত্র মধুর,
মৃত্যুর অনন্ত বাণী মৃত্তিকার বক্ষে আনি নিরন্তর শুনাও হৃদয়ে,
সীরাজ মনের মরু মরুধা সরস হ'ল প্রেমস্নিগ্ধ তোমার পরশে।

ইরাণের নীলাকাশ উঠেছিল ভরি তব মিঠি নব সুরের প্রলাপে
জেগেছিল ব্যাকুলতা মোস্তাদের বাগিচায়
আরক্তিম গোলাপে গোলাপে।
তরঙ্গিয়া তুলেছিল রুকনাবাদ
স্রোতস্বিনী সুরামত্ত দেওয়ানা বাতাস,
হুকিত কুন্তলপুঞ্জে কাঁদে কত প্রেমোন্মাদ তরুণের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।

জানি জানি, এনেছিলে খোরাসানি ইস্পাহানি
খুশ্‌রোজের বেহেস্ত ভূলোকে,
সাম্রাজ্য চেয়েছ দিতে আনন্দ-বিহ্বল প্রাণ
প্রেয়সীর প্রেমের পুলকে
প্রিয়ার কপোল-লগ্ন এক বিন্দু কৃষ্ণ তিল
সৌন্দর্য্যের বিনিময়ে তার,
বুখারা সামারখান্দ্ হেলায় বিলায়ে দিলে
হে চরম প্রেমিক উদার!

আজও যারা হাসে গায় প্রণয় মজলিসে করে পরস্পরে আশ্লেষ চুম্বন,
তৃষার্ত্ত তাদের কণ্ঠ তব প্রেমামৃত সুরা ক্ষণে ক্ষণে করে অন্বেষণ।
জলে না যাদের ঘরে প্রদোষে সন্ধ্যায় তোরে
হাসি কান্না স্নেহ-রাঙা দীপ,
সেথাও দীওয়ান্ তব সৃষ্টি করে অভিনব কল্পলোক
হে প্রেম-প্রদীপ!

জীবনের পান্থশালে ক্লান্ত মুসাফির যারা পথশ্রমে অবসন্ন আজ,
যাদের দুয়ারে আসে দু'দিনের হাসি খেলা
দুনিয়ার ভাল মন্দ কাজ ;
উদাসী তাদের হিয়া তোমারে খুঁজিয়া ফেরে
মরমিয়া হে বন্ধু হাফিজ,
আছে তব পানপাত্রে সুরাপাত্রে সঙ্গোপিত
মৃত্যুঞ্জয়ী মহামন্ত্র বীজ!

বাতি-দান

শ্রীসাধনা কর

মুর্শিদাবাদ—লালবাগ, জাফরাগঞ্জ, খোশবাগ মণিপুর—ভারতের ইতিহাসের এক অধ্যায়ের স্মৃতি তাদের বুকে। তাদের ধূলায় ধূলায় হতভাগ্য সিরাজের উত্থান-পতন অণুর রেণুকণার মত বিজড়িত। তাদের বন-জঙ্গলের মর্ম্মরে বাংলার অতীত কাহিনী দিনে রাতে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। ভাগীরথীর স্বচ্ছ জলধারা নিরন্তর বয়ে চলেছে, তারই কূলে ক'খানা স্তূপীকৃত ইট—জগৎশেঠের ঐশ্বর্য্য-গরিমা বাদ-বিসম্বাদ মান-সম্মান হৃদয়ের উত্তাপ-সন্তাপ এরই মধ্যে বিলীন হয়ে আছে। সারাটা দিন হেঁটে হেঁটে ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম—সিরাজদৌল্লার প্রাসাদ হাজার-দুয়ারী, মসজিদ ইমামবাড়া, সিরাজের কবর, তাঁর মতিঝিল; জগৎশেঠের কষ্টি-পাথরের মন্দির, তার ভাঙা অট্টালিকা; লালগোলার বাগান—আরও কত কি। মন এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বেলা তখন তিনটে-চারটে। অরণ্য-পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছলাম এক কবরস্থানে। নবাব আর বেগমদের কবর। লালবাগ, জাফরাগঞ্জ, খোশবাগ জায়গাগুলি বন বনে ঢাকা। দু'শ' বছর আগে তার যে সৌন্দর্য্য, যে সাজসজ্জা, যে কলরবপূর্ণ জীবন-স্রোত ছিল, তা যেন এখনও স্তব্ধ হয়ে রয়েছে এই অরণ্যে। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুদ্ধ-বিগ্রহ হানাহানি কোন কিছুতেই সে স্তব্ধতা ভাঙতে পারে নি। তার বুকে সাইকেল রিক্সা চলছে, মটর ছুটছে, ঘোড়ার গাড়ীর ঘর ঘর রবও শোনা যাচ্ছে, এক এক জায়গায় নগর এবং জনপদের আভাসও মিলল, কিন্তু রাস্তার দু'ধারের গহনতা দুর্ভেদ্য; তার নীরবতা একটুকু নষ্ট হয় নি। সেই অরণ্যের বুক চিরে চিরে রক্তরেখার মত সরু জীর্ণ রাজপথ—আলোছায়ায়, ধুলোবালিতে পাখীর কলরবে আর গাছপালার সন্‌সন্‌ শব্দে দিগন্তকে জাগিয়ে রেখেছে। চলতে চলতে নবাবদের প্রিয় আম আতা নোনা এ সকল ফলের গাছ আর চাঁপা বকুল প্রভৃতি ফুলের গাছের সঙ্গে আরও অজস্র গাছের ভিড় পেরিয়ে হঠাৎ দেখা দেয় এক-একটি জায়গা, নবাব আমলের স্মৃতি। তারা যেন সত্য নয়, এ পৃথিবীর বুকের নয়, যেন দেখতে চাইছি বলেই সেই বনানীর স্তূপের আবরণ সরিয়ে কে তুলে ধরছে অতীতের ছায়া, যেন ছবি ফুটে উঠল।

কবর-স্থানটির দুই মাইলের মধ্যেও বোধ হয় একটি জনপদ নেই। চারপাশের বন তাকে অতি গোপন মণির মত লুকিয়ে রেখেছে। নিরালা দুপুর। পাখ-পাখালির ডাক নেই, মানুষের চিহ্নও নেই। শুধু আষাঢ়ের মেঘ-ভাঙা খাঁ খাঁ রোদ, আর চোখের সামনে নবাব আমলের খিলান-দেওয়া দেয়াল-ঘেরা কবরস্থান। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। বিরাট খিলানের দোর, তার দু'ধারের স্তম্ভে দুটো কাচের বাতি, আর খোপে খোপে পায়রার থাকবার চিহ্ন। দরজায় সুন্দর কারু-কার্য্য। ক্ষয়ে এসেছে, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তার পাশে অর্দ্ধচন্দ্রাকার বারান্দা, দু'একটা টুল-বেঞ্চ রয়েছে—আগন্তুকদের বিশ্রামের জন্য কিংবা শব নিয়ে যারা আসে তাদের বসবার জন্য। আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট শিবু—বয়স তার বছর দশ-বারো, সে বললে—বাবাঃ, মাথাটা চনচন করছে।—রোদে ঘুরে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

প্রায় বিঘা দুই-আড়াই স্থান পুরু দেয়াল-ঘেরা। মাঝে সবটাই প্রায় পাষাণ-বাঁধানো—ছোট-বড় কবর-খণ্ড। তার মাথায় মাথায় পাষাণ-ফলকে নাম ধাম ইতিহাস লেখা। মাঝখানটা আবার ছোট দেয়াল দিয়ে অবরুদ্ধ, বিশ্রাম করে আমরা উঠলাম। কবরগুলি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, সযত্নরক্ষিত। বাইরের কবরগুলি দেখে ছোট দেয়াল-ঘেরা অবরোধের কবাট খুলে ভিতরে গেলাম। বেগমদের কবরস্থান—আব্রু-ঘেরা। সেখানেও এতটুকু অযত্নের চিহ্ন নেই। এদিক-ওদিক ঘুরে দেখলাম। খিলানের খোপে খোপে দু'চারটে পায়রা বসে আছে। তারাও এমন নিদ্রালস বিহ্বল সুরে ডাকছে, দুপুরের নিঝুম সুরে তাদের স্বর মিলে যাচ্ছে। কড়া রোদ, কবরের পাশের সিমেণ্টে দাঁড়ানো যায় না। ঘাম ঝরতে লাগল, মুখ মাথা তেতে উঠল, আবার এসে বারান্দায় বসলাম। অত্যধিক শ্রান্তির জন্যেই হোক কিংবা রোদের জন্যেই হোক অথবা সমস্ত জায়গাটার একটা অতীত মোহ আমাদের অভিভূত করে ফেলার জন্যেই হোক, বারান্দায় বসে আর সহসা উঠতে ইচ্ছে করল না। শিবু ত একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে দিলে বেঞ্চে। বললে—মাথাটা ভয়ঙ্কর ব্যথা করছে। সেই জনহীন দীপ্ত রশ্মিভরা প্রখরতা, বারান্দায় বসে কপোতের গুঞ্জনধ্বনি শুনতে লাগলাম।

খানিকক্ষণ কেটেছে, এক সময় মনে হতে লাগল কপোতের অলস কূজনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। সে যে মানুষের স্বর, বোঝা যাচ্ছে না। কখনও মনে হয় হাওয়ারই মর্ম্মরধ্বনি, কিংবা দুপুরের ঝিম-ধরা সুর, কখনও বা পরিষ্কার মানুষের কথা—যেন অতীতের বিদেহী আত্মারা তাদের কতদিনের জমানো কথা বলতে উৎসুক হয়ে উঠেছে, কত কি বলে চলেছে—আমাদের এমন কান

নেই, এমন অনুভূতি নেই যে তা শুনতে পারি, বুঝতে পারি। ভাবলাম এ বুঝি আমার একার অনুভূতি। দেখলাম তা নয়। চারজনেই বিস্মিতভাবে মুখের দিকে তাকিয়েছি। শিবু ত রীতিমত ভয় পেয়েছে। মানুষের কথা কোথা থেকে আসছে। ভুল নয়, অন্য কোন জীবজন্তুর আওয়াজ নয়। দিনদুপুর, পরিষ্কার মানুষের কথা শুনছি। একটি শব্দও বুঝতে পারছি না। অতি কোমল ললিত সুরের কথা। জামাইবাবু বেতারে কাজ করেন। বলে উঠলেন—বাঃ, আশ্চর্য্য। রিসিভার কানে দিলে এমন অনেক অদ্ভুত কথা ভেসে যেতে শোনা যায়। খালি কানেও যে তেমনি শুনছি।

আমরা বলে উঠলাম—আমরাও শুনতে পাচ্ছি যে।

জামাইবাবু হেসে রহস্য করে বললেন—কবর-স্থানে বসে আছি, বিদেহীরা খবর পাঠাচ্ছে বোধ হয়।

আমরা অবশ্য হাসলাম। কিন্তু সেই পরিবেশে বসে কথাটা মোটেই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল না, বরং কথাটাকে স্বীকার করতেই সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে উঠল। এদিক-ওদিক তাকালাম। নির্জ্জন স্থান, পুবালি বাতাস বইছে এলোমেলো। কথাগুলি মনে হচ্ছে কবরের ভিতরে কাছে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্রমে ক্রমে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। যেন ফিরে গেল কে, কোন্ অজানা অদৃশ্য রাজ্যে। সবাই বিমূঢ়। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। দিনের এই খর আলো, অতীন্দ্রিয় কিছু কি সত্যি ঘটতে পারে! চারদিকে তাকাচ্ছি, হঠাৎ সামনে তাকিয়ে চমকে উঠলাম—জীর্ণ শীর্ণ এক বৃদ্ধ—শুভ্রকেশ, শুভ্র মুসলমানের সাজ, বকের পালকের মত সাদা কোমল শ্মশ্রুগুচ্ছ, চোখের ভ্রূ অবধি শরতের মেঘের মত ধবধবে, শুধু তার ভিতরের স্থির কালো দীপ্ত দৃষ্টি অতলস্পর্শী। সে রূপ যে কোন মানুষের, সহসা বিশ্বাস হয় না। কবর থেকে যেন ভেসে উঠল এক অশরীরী আত্মা। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এল, সেলাম জানালে, স্নিগ্ধ হাসি হাসল। বড় সুন্দর সে হাসি। জামাইবাবু বলে উঠলেন—কে তুমি? কোথেকে এলে?

বৃদ্ধ হেসে বললে, আমি এখানেই থাকি, নাম জালালুদ্দিন। এ সব কবর দেখাশুনো করা আর রোজ সন্ধ্যাবেলা এখানে বাতি দেওয়া আমার কাজ।

—তুমিই কথা বলছিলে?

বৃদ্ধ বললে, কে এখানে আছে, কার সঙ্গে কথা বলব? ওই যে দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট খোপ দেখছেন, ওরই ওপাশে দুখানা ঘর আছে। আমি সেখানে বসে কোরাণ-শরীফ আওড়াচ্ছিলাম। জানালা দিয়ে যেন মানুষের মত দেখলাম এখানে, উঠে এলাম দেখতে।

এতক্ষণে রহস্য বোঝা গেল। দেয়ালের ডান-পাশের গবাক্ষপথও চোখে পড়ল। সে সময় আমাদের গবাক্ষই বটে। জালিকাদের ভিসটে কোকরমার। ভিতর থেকে ভেজানো ছিল, ওপাশে ঘর আছে বোঝা কঠিন। জামাই-বাবু বললেন—বলো বলো, কতদিন আছ এখানে?

বৃদ্ধ বসল। জামাইবাবু আলাপী মানুষ, অল্পক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধের সঙ্গে গল্প জমিয়ে দিলেন—কে কে তার আছে, কিভাবে চলে, বয়স কত, ইত্যাদি।

বৃদ্ধ অতি ধীর নম্র গলায় উত্তর দিতে লাগল। প্রত্যেক কথায় তার হাসিটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার ঠাকুর্দার বাবা নাকি অল্প বয়সে শেষ নবাবের হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিল। সেই থেকে তারা বংশানুক্রমে নবাববাড়ীতেই কাজ করে আসছে। তার বয়স অনুমান হ'ল নব্বইয়ের কাছা-কাছি। প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই সে এখানে কাজ নিয়েছে। তখনই বয়স দু'কুড়ি দশ পেরিয়ে গেছে। তার পর থেকে এখানেই পঁচিশ ত্রিশ বছর আছে। স্ত্রী মারা গেছে, তিন ছেলেমেয়ে ছিল, ছেলের বউ ছিল, কেউ বেঁচে নেই। নবাব-বাড়ী থেকে তার অন্ন দিয়ে আর কবরস্থানে বাতি দেবার তেল বরাদ্দ আছে। সপ্তাহে দু'দিন কি এক দিন এক জন লোক এসে সে সব দিয়ে যায়। লোকের সঙ্গে সংস্রব তার নেই বললেই চলে। যারা কবরখানা দেখতে আসে তাদের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা হয়, আর বছর পাঁচ সাত কিংবা আরও পরে হয় ত নবাববাড়ী থেকে আসে শব। সেদিন সারাদিন বা সারারাত এখানে লোকজন থাকে। বৃদ্ধ এসে দেখে, ওদের সঙ্গে নমাজ পড়ে, তার পর থেকে নতুন কবরে দেয় বাতি।

দুটো পায়রা ঝটপট্ করতে করতে একটা জায়গা একটু অপরিষ্কার করলে, তাদের পালক খসে পড়ল দুটো। আমা-দের অত খেয়াল হ'ল না। কিন্তু বৃদ্ধ উঠে ঝাড় খুঁজে জায়গাটা সাফ করে এল। চোখ বুলিয়ে দেখে নিলে চারদিকটা। বললে—পায়রাদের ফিরবার সময় হয়ে এল, জল আর দানা দিয়ে রাখতে হবে।

চেয়ে চেয়ে দেখছি সেই বৃদ্ধকে। জরায় তার পা কাঁপছে, অসুস্থতায় ঠিকমত চলতে পারছে না, কিন্তু অতি যত্নে সে আপন কাজ করে এল। তার চোখের দৃষ্টিতে কি প্রীতি! কাজ করতে গভীর আনন্দ। এখানকার পাষাণও তার কাছে যেন জীবন্ত। এমনি দরদ হাঁটা চলায়। আমার একটা কেমন আকর্ষণ জন্মে গেল বৃদ্ধের উপর। জামাইবাবু এবং ছোড়দারও ভাল লাগছে। তাদের আগ্রহভরা কথাতেই তা বুঝতে পারলাম। এখান থেকে যাবার কথাই তারা যেন ভুলে গেছেন। বৃদ্ধ এসে বসতেই আবার তার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

আমার গভীর অন্তরে অতি সূক্ষ্মভাবে বাজতে লাগল—এ কি সত্যি মানুষ! মানুষ তার কথায় হাসিতে চোখের

চাউনিতে মানুষকে অভিভূত করে ফেলতে পারে এত অল্প সময়ের মধ্যে? ভিতরে ভিতরে একটু অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। এই জনশূন্য কবর-স্থান তার মধ্যে ওই রহস্যে ভরা অদ্ভুত মানুষ। তাকে দেখে ভয় হয় না, কিন্তু একটা অপূর্ব বিস্ময়ে মন ভরে ওঠে।

জামাইবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন—কি করে তুমি এখানে থাক? এই প্রেতপুরীর কবরের মধ্যে?

বৃদ্ধ তেমনি মধুর করে হাসল। কিন্তু তার চোখের কালো গভীর দুটি বেদনায় ভরে উঠল। তাকে বোঝা যায় না, কিন্তু প্রাণ ব্যথায় কেঁপে ওঠে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল, তার পরে বললে—প্রথমে তাই মনে হ'ত বটে। ক'বছর ত পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হ'ত পালিয়ে যাই। এখন নিজেদের জন্যে আমি এখান ছেড়ে এক পা যেতে পারি নে। নবাববাড়ী থেকে কতবার খবর এসেছে—এবার কাজ থেকে ছুটি। আমি অনুনয় করে বলে রেখেছি আমাকে যেন এখান থেকে সরানো না হয়।

বৃদ্ধ মাথা নাড়তে লাগল। তার সেই স্থির দুটি রুদ্ধ আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠল, তার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল—না, না, আমি কোথাও যাব না, যেতে চাই নে।

আমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কি ব্যাপার! এই কবরের মধ্যে কি সে এমন পেয়েছে যে, এখান থেকে চলে যেতে হবে শুনেই বৃদ্ধ এত অধীর! জামাইবাবু বললেন—তোমার ছেলে মেয়ে স্ত্রীর কবরও কি এখানে আছে?

বৃদ্ধ জিভ কেটে বললে—না, এখানে শুধু নবাব আর বেগমদের কবর দেবার নিয়ম। আমরা ত সাধারণ লোক। তারা এখানে কেউ মারাও যায় নি। আমার স্ত্রীর কবর আমার মণিপুরের বাড়ীতে আছে। ছেলেমেয়েরা বিদেশে মারা গেছে।

—তবে কেন তুমি এখান থেকে যাবে না বলছ? কি পেয়েছ এখানে?...

বৃদ্ধ অপরূপ প্রীতিমাখা হাসি হাসল। মানুষের মুখে এমন হাসি কখনও দেখিনি। আমাদের মন প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিলে। বৃদ্ধ একটু চুপ করে থেকে মৃদু কোমল স্বরে বললে—সে আসবে, আমি জানি সে আসবেই, এক দিন তাকে আসতেই হবে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না।

তার চোখে পিঙ্গলাভ তীব্র জ্যোতি ফুটে বেরুল, তার মুখের পেশীতে পেশীতে দৃঢ় আশার ছাপ। সে কবরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল্ আমাদের অস্তিত্ব ভুলে। আমাদের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। বৃদ্ধ কি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, না পাগল? এ কবরখানায় কে আসবে? বৃদ্ধ বললে—তবে শুনুন।

সে নীরব হয়ে রইল খানিকক্ষণ, তার পরে ধীরে ধীরে বলতে লাগল—এখানে এসেছি তার দু'চার বছর পরের কথা—আমার স্ত্রী এবং ছেলেরা তখন সবে মারা গেছে। মেয়ের ছেলেবেলা বিয়ে হয়ে গেছে, শ্বশুরঘর করছে। বন্ধন বলতে আমার কিছু ছিল না। শোক পেয়ে পেয়ে আমার মন কেমন হয়ে গেছে। লোকজন ভাল লাগে না। এখানে কাজ নিয়ে এলাম, এই নির্জনতা আরও ভার হয়ে চেপে বসল। নিজেকেই প্রেতলোকের অপচ্ছায়ার মত মনে হতে লাগল। সে কি অশান্তি! দিন রাত ছটফট করছি। ক্রমে ক্রমে এই কবরের পাষাণের মতই সমস্ত হৃদয় যেন পাষাণ হয়ে এল। সুখদুঃখের অনুভূতিও ভুলে যেতে লাগলাম। কাজে আনন্দ নেই, খাওয়া নেই, চোখে ঘুম নেই—সে এক কেমন ভাব নিজেই জানি নে। এমনি ভাবে দিন কাটছে, এই সময় এক দিন নবাব-বাড়ী থেকে এল এক শব—নবাবের এক বেগমের। অল্প দিন ভুগে হঠাৎ মারা গেছেন। সন্ধ্যার কিছু আগে শব এল—ফকিরে ভরা। মারা যাবার পরেও বেগমদের শব-দেহ কেউ দেখতে পায় না। ইনি নবাবের এক বিশেষ প্রিয় বেগম ছিলেন। তাঁর রূপ নাকি ছিল রূপকথার পরীদের মত। ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়সেই তিনি মারা গেলেন। নবাব খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন তাঁকে হারিয়ে। সমারোহের সহিত বেগমকে কবর দেওয়া হচ্ছে। আর এখানে এই বারান্দার কুর্শীতে নবাব স্থির গম্ভীর হয়ে বসে। তাঁর সঙ্গে এসেছে ন'দশ বছরের নবাবপুত্রী—সেই বেগমের একমাত্র সন্তান। সে যে কি রূপ বলতে পারব না। নবাব-পরিবারের রূপের খ্যাতি দেশজোড়া। বেগম যাঁরা আসেন তাঁরা বাছাই-করা শ্রেষ্ঠ রূপসী। এই বেগম ছিলেন আবার তাঁদের মধ্যেও সেরা। রূপবান নবাবের কোল আলো করে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। আমি কাছে এসে বসলাম, নবাব তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে নীরবে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, সে তার সজল কালো দু'চোখ তুলে তাকিয়ে দেখছে শবযাত্রার সমারোহ। আয়োজন ক্রিয়াকাণ্ড শেষ হ'ল। ফকির কবরে নামানো হ'ল। এবার মাটি চাপা দেওয়া হবে। নমাজ পড়া হবে। নবাব উঠলেন। মেয়েকেও তুলে নিয়ে তিনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালেন কবরের সামনে। অস্ফুট স্বরে কোরাণের বয়েৎ আওড়াতে লাগলেন। সবাই স্তিত করে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে। নবাবপুত্রী এই বারান্দা থেকে মর্মরমূর্তির মত তাকিয়ে আছে। আমি কাছে বসে। সে হঠাৎ নড়ে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললে—মা কি আর আসবে না?

অত্যন্ত সহজ সরল শিশুর প্রশ্ন। নবাবপুত্রী—নবাব আর বেগমের আদরের ধন, জন্ম থেকে উৎসবে আনন্দে প্রতিপালিত। কোন দিন কোন দুঃখ-আঘাত পায় নি, সংসারের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, তখনও সে সতকোটা ফুলের

মত নির্মল পবিত্র। এখন আমাতে মিশে গেছে। সেই সরল হৃদয়ের আকুল প্রশ্ন আমার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেজে উঠল —আসবে না? যে গেল সে কেন আর আসবে না? তাকে ফিরে পাবার কি কোনও উপায় নেই? হঠাৎ বলে ফেললাম —নিশ্চয় আসবে।

নবাবপুত্রী চঞ্চল হয়ে উঠল। আগ্রহভরে চোখ তুলে আমাকে বীণার ঝঙ্কারের মত কম্পিত সুরে বললে—কবে আসবে? কি করে আসবে?

মিথ্যা স্তোকবাক্যই বেরিয়ে গিয়েছিল বালিকার কাছে। কিন্তু বালিকার চোখে-মুখে প্রগাঢ় প্রত্যয়ের ছাপ ফুটে উঠল। সে ব্যাকুল ভাবে বললে—সবাই বলছে আসবে না, মা বেহেস্তে চলে গেছেন। তুমি বলছ আসবে, কি করে আসবে?

আমি সহসা কথা বলতে পারলাম না। মিথ্যা বলে ফেলে তীব্র গ্লানিতে মন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে আবার বললে— বল না, মা আসবেন? কেমন করে আসবেন? বল।

বলে ফেললাম—তুমি যে তাকে ভালবাস। বেহেস্ত যে বড় সুন্দর আর ভাল, সেখানে ভালবাসাই মাত্র পৌঁছায়।

নবাবপুত্রী আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে বললে—হাঁ্যা, বাবা বলেছেন সে জায়গা সুন্দর আর ভাল। এই পৃথিবী কেন তেমন নয়? তবে ত মা এখান থেকে যেতেন না।

একটু অন্যমনস্ক থেকে আবার সে সুরু করলে—কবরের কাজ শেষ হয়ে গেল। সবাই ফিরে এল। নবাব এসে মেয়েকে বুকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। আমি তাকে বললাম —রোজ সন্ধ্যেবেলা আমি আলো জেলে রাখব এখানে।

নবাবপুত্রী বললে—আমি দেখতে আসব।

সেদিন থেকে কবরখানা আমার কাছে বেহেস্ত। ক'দিন নবাবপুত্রী গাড়ি করে সন্ধ্যার সময় বাতি দেওয়া দেখতে আসত। আমার সঙ্গে সে নমাজ পড়ত, আমার সঙ্গে কত গল্প করত। সেই আনন্দ আমি কোনদিন ভুলব না। কুড়ি-পঁচিশ বছর হয়ে গেছে এখনও সে সন্ধ্যাগুলির মোহ আমি স্পষ্ট অনুভব করি। তারপর সে বড় হয়ে গেল। আর এল না। আমাকে বলে গেল—তুমি কবরখানাকে বেহেস্ত করে রেখো। মা তবে নিশ্চয় এখানে থাকবেন।

এমনি ভাবে কাটল বহুদিন। ক্রমে সে বড় হ'ল, শুনলাম তার বিয়েও হয়ে গেছে। তার সঙ্গে আর আমার দেখা হ'ল না। আমার চোখের দৃষ্টি কমে এসেছে, আমার শরীর ভেঙে এসেছে, আমার আর কাজ করবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু সে আমাকে জাগিয়ে রেখে গেছে, কবরের মধ্যে আনন্দ দিয়ে গেছে, এই পাষাণ, এই কবর এখন আমার কাছে বড় দরদের। আপনারা বিশ্বাস করবেন না, দিনে দিনে আমার মন বলছে মৃতও জেগে উঠবে, এই কবরও জীবন্ত। আমি মিথ্যা বলি নি। আমি তাকে দেখতে পাব। আমি তাই কোথাও যেতে পারব না, তাকে দেখতে চাই আমি।

বৃদ্ধ সেই সন্ধ্যার আবছায়ার অরণ্যের মাথায় দিনের শেষ-শিখার মত কাঁপতে লাগল। তাকে দেখে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বৃদ্ধ উঠে কাজে চলে গেল। এদিকে তাকিয়ে দেখি শিবু কাতরাচ্ছে। তার চোখ লাল, মুখ লাল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মেঝের উপরই শুয়ে পড়েছে। এমনিতেই সে স্বাস্থ্যবান নয়। অনেকক্ষণ থেকেই অসুস্থ বোধ করছিল। এতক্ষণ এ সব দেখবার কৌতূহলে কিছু বলে নি। এখন আর চেপে রাখতে পারলে না। তার অবস্থা দেখে আমরা রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লাম। লোক-জনহীন নিভৃত জায়গা। এই পরিবেশ। এই বৃদ্ধও কেমন রহস্যভরা। এখন উপায়! নৌকা করে বহরমপুর থেকে এসেছি এ সব দেখতে। সিরাজের প্রাসাদ সেই হাজার দুয়ারীর ঘাটে রয়েছে নৌকা। মাইল দুই-আড়াইয়ের পথ। কি করে ওঁকে নিয়ে যাব। বৃদ্ধ এলে তাকে সব বললাম। সে অত্যন্ত দরদভরা সুরে বললে—রোদে ঘুরে অমন হয়েছে। বাচ্চা ছেলে। কিছু ভয় নেই। চল আমার ঘরে, এখানে ত পাঁচটার পরে থাকবার নিয়ম নেই। একটু শুয়ে থাক, আমি ওষুধ দিচ্ছি, সেরে যাবে। খোকা, খুব কষ্ট হচ্ছে?

বৃদ্ধ এসে শিবুকে পরম স্নেহে তার ঘরে নিয়ে গেল। পাটি বিছিয়ে দিলে, বদ্‌না করে ঠাণ্ডা জল দিলে। কি একটা গাছের পাতা এনে ঘসে শিবুর কপালে আর মাথার তালুতে লাগিয়ে দিলে। এমন একান্তভাবে কয়েক মিনিট সেবা-শুশ্রূষা করলে যে, অল্প সময়ের মধ্যেই শিবু সুস্থ হয়ে উঠল। এদিকে ঘন-ঘটার দিয়ে জোর এক পশলা বৃষ্টি এসে গেল। বৃদ্ধ কিছুতে আমাদের ছাড়বে না। গাড়ি নিয়ে আসতে বললে। শিবুকে ঠাণ্ডার জলে যেতে দেবে না। জামাইবাবু গাড়ির খোঁজে গেলেন। আমরা বৃদ্ধের ঘরে বসে রইলাম। বৃষ্টি থামলে বৃদ্ধ আবার সমস্ত কবরখানা ঝাড়পোঁছ করে এল, দিলাম মুছলে, বাতি সাফ করলে। বাগানের আশেপাশে অবধি ঘুরে দেখে এল।

জিজ্ঞেস করতে বললে, বৃষ্টিতে বাতাসে অনেক সময় গাছের ডালা ভাঙা ভেঙে পড়ে যায়। ভাল হ'ল বৃষ্টি হয়ে। অনেক দিন জল হয়নি, গাছগুলি তৃষ্ণায় যেন ঊর্দ্ধমুখ হয়েছিল। দেখলাম কি দরদ দিয়ে সে অরণ্য আর পাষাণ-ঢাকা মৃতের কবরকে প্রাণময় করে রেখেছে, সুন্দর করে রেখেছে। এক মিনিট তার বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই, জড়তা বা অসুস্থতাবোধ নেই। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আছি, তার প্রত্যেকটি কাজ দেখছি, আর বিস্ময় সীমা অতিক্রম করছে। বৃদ্ধ সেদিন যেন বড় বেশী অধীর, নিজেই বললে—আমি যে আজ কি

হয়েছে, কেন সমস্ত মন এমনভাবে ব্যথার আনন্দে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, আমার কি দিন শেষ হয়ে এল।

তার পরে বিড়বিড় করে বললে—তাকে কি তবে দেখতে পাব না? না, না, নিশ্চয় দেখতে পাব, হয় তো আজই; কেন এমন মনে হচ্ছে! এমন তো কোনদিন হয় না।

সে কোরাণের বয়েৎ আওড়াতে আওড়াতে কেবল ক্রত-কম্পবান পদক্ষেপে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমাদের মনে হতে লাগল বৃদ্ধ যে-কোন মুহূর্তে ছুটে চলে যাবে; সত্যিই যেহ মন দিয়ে সে কি বুঝতে পারছে, জানতে পারছে। এই বাদল সন্ধ্যায়, ওই সন্‌সন্ পাগল হাওয়ায় সমস্ত কবরখানা অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। যে-কোন মুহূর্তে অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য কিছু ঘটা অসম্ভব নয়। বৃদ্ধ যেন সেই অদ্ভুতেরই প্রতিচ্ছায়া। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বৃদ্ধ কবরখানায় বাতি দিতে চলে গেল। আমরা ঘুলঘুলি দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। সে দিলানে বাতি জ্বাললে। প্রত্যেকটি কবরে বাতি দেখালে। তন্ময় হয়ে কি আওড়ালে। সেই গাঢ় অন্ধকার আর অস্পষ্ট আবছা আলোয় বৃদ্ধের চেহারা ছায়ার মত দেখাতে লাগল। সমস্ত কবরে বাতি দেখানো হয়ে গেলে সে যখন তার সেই মৃদু কোমল সুরে কোরাণ-শরীফ আওড়াতে আওড়াতে আসছে, হঠাৎ ঝাপটা বাতাসে তার হাতের আলো নিভে গেল, দূরাগত গুরুগুরু শব্দ শোনা গেল, হু হু করে হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল। বৃদ্ধ চকিত হয়ে আবিষ্টের মত সামনের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, আর এক পুঞ্জীভূত কালোছায়ার স্তূপের মধ্যে থেকে অপরূপ এক নারী-মূর্ত্তি ভেসে উঠল। শিবু ভয়েছিল, আমি আর ছোড়দা ঘুলঘুলির গায়ে ঝুঁকে পড়লাম। চোখের দৃষ্টি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা নিয়ে ঐ দিকে নিবিষ্ট হ'ল। ভ্রম নয়, অস্পষ্ট নয়, কালো সূক্ষ্ম মসৃণ বোরখায় ঢাকনা, তারই ভিতর থেকে প্রস্ফুটিত চন্দ্রমার মত স্নিগ্ধকান্তি অলোকসুন্দরী নারী-মূর্ত্তি, বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর, পরিপূর্ণ যৌবনের স্থির কমলের মত অন্ধকারের বুকে সে অনিন্দিত রূপ ফুটে আছে। কবরের দিলানে দুইটি বাতি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে, তারই আলো পড়েছে, বৃদ্ধ আর নারী-মূর্ত্তি স্পষ্ট চোখে দেখছি। কেবল মনে হচ্ছে—মানুষের প্রেম কি এমন হতে পারে, মৃতকে জাগিয়ে তুলতে পারে এমন সত্য করে? নারী-মূর্ত্তি হাসল, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধও কেঁপে উঠল। আমাদের মতই বিমূঢ় হয়ে বৃদ্ধ এতক্ষণ তাকিয়েছিল—দু'হাত বাড়িয়ে বসে পড়ে বলল, এসেছ, তুমি এসেছ?

তার সমস্ত শরীর থর থর করে বাতাসে-কাঁপা শিখার মত কাঁপছে। তার চোখে-মুখে সে কি আনন্দের জ্যোতি! কি প্রীতির স্নিগ্ধতা উপচে পড়ছে! নারী অকস্মাৎ পিছন ফিরে তাকাল, চকিতে কালো ছায়া মিলিয়ে গেল। আমরা একদি অভিভূত হয়ে পড়েছি, মনে হচ্ছে জেগে নেই, স্বপ্ন দেখছি। চেয়ে আছি কি নেই তাও বুঝতে পারছি না। কারণ এই মাত্র যেখানে নারী-মূর্ত্তি দেখলাম সেখানে দিলানের বাতির আলো পড়েছে, বৃদ্ধ ভক্তিতের মত বসে আছে, আর ত কেউ নেই! চোখ রগ্‌ড়ে নিয়ে তাকালাম। বৃদ্ধ তীব্র দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে অমন করে তাকিয়ে আছে কেন? ছোড়দার দিকে তাকালাম। সে দেখলাম ভিতরের কবরের দিকে তাকিয়ে নেই, কান পেতে ওদিকে কি শুনছে। বলে উঠল—জামাইবাবু বোধ হয় এসেছেন।

চকিত হয়ে শুনলাম বাইরে লোকের কথার মতই শোনা যাচ্ছে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই জামাই-বাবু এসে ঢুকলেন। তার পিছনে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের সুন্দর বলিষ্ঠ এক পুরুষ। মুসলমানী মসৃণ শেরওয়ানী, পাঞ্জাবী আর ফেজ পরা। অভিজাত-বংশের সৌষ্ঠব তার হাঁটা-চলায়।

জামাইবাবু বললেন, গাড়ী এসে গেছে চল। সেই কোন্ লালবাগের পথ থেকে আসতে হ'ল। গাড়ী কি আর পাই। কতদূর পথ। রাত হয়ে গেল। ইনি হলেন বৃদ্ধের সেই নবাব-পুত্রীর স্বামী।

ভদ্রলোক চমৎকারভাবে অভিবাদন করলেন। পথে পেয়ে জামাইবাবু তাঁকে আমাদের বিপদের কথা বলেছেন। ভদ্রলোকের কাছ থেকে জানা গেল—নবাবপুত্রীকে এই বৃদ্ধ অত্যন্ত ভালবাসে সেই তার মায়ের মৃত্যুদিন থেকে। নবাবপুত্রীও তাকে কি চোখেই যে দেখেছে সে-ই জানে। প্রায়ই তার কথা বলে। বৃদ্ধকে দেখতে চায়, কিন্তু তাঁরা গোঁড়া মুসলমান, অভিজাত বংশ। সে বাড়ীতে একবার মেয়েরা ঢুকলে বাপের বাড়ীতেই সহজে আসতে পারে না, এখানে আসা ত অসম্ভব। বৃদ্ধ ক'দিন থেকে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যে লোক সিধে আনে তাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে, কিন্তু বাড়ীর লোক রাজী হয় নি। বার বার খবর পাঠিয়েছে বৃদ্ধ। নবাবপুত্রীও অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আসা অসম্ভব। সামাজিক রীতি, বংশের সম্মান, আর সংস্কার সব অটল হয়ে অবরোধ করেছিল পথ। দৈবক্রমে সে দিনই অশীতিপর বৃদ্ধ নবাব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দেখতে চেয়েছেন মেয়েকে। এক দিনের জন্য তাই স্বামীর সঙ্গে মেয়েটি এসেছে তাঁকে দেখতে। নবাব একটু ভাল আছেন। কিন্তু এখানে এসে অসুস্থ বাপকে দেখার পর নবাবপুত্রী এমন কাতর হয়ে পড়েছেন, এমন কাতরভাবে স্বামীর কাছে বৃদ্ধকে দেখবার জন্য অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন যে, স্বামী উপেক্ষা করতে পারলেন না। কবরস্থানে সাধারণ বাতি দেওয়ার লোক এই বৃদ্ধকে তাঁরা দেখতে এসেছেন, এসেছেন গাড়ী করে এই সন্ধ্যায় অন্ধ-কারে। এখুনি চলে যাবেন। বুঝলাম সেই নারী-মূর্ত্তি নবাব-

পুত্রী। জামাইবাবুর গাড়ীর শব্দ শুনে ঘোমটা ঢাকা দিয়ে সরে গেছে বারান্দার কোণে।

আমরা ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে যুবকে আমাদের কথা বলতে বলে গাড়ীতে এসে উঠলাম। ঘোড়ার গাড়ী ঘর ঘর শব্দ তুলে সেই অরণ্য-পথ ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। চোখে পড়ল—দূরে অন্ধকারের মধ্যে কবরের বিজনে বাতি দুটি জলছে—মৃতের কবরে মানুষের অমর প্রেমের অনির্বাণ বাতি। এবার মনে হ'ল কবরখানা নয়, সত্যি সে প্রেমের বেহেস্ত্।

কখন এসে হাজারদুয়ারী পৌঁছলাম খেয়াল রইল না। গাড়ী থামায় খাঁহুঁশিতে দেখলাম লোকালয়ে এসে পৌঁছি, গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম।

বর্ত্তমানের চাষ-বাস

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমার অঞ্চলের (আঁটপুর পোঃ, জাঙ্গীপাড়া থানা, জেলা হুগলী) বর্ত্তমান সময়ের চাষ-বাসের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

রোয়া আমন ধানের চাষই এখন প্রধান ; কৃষকের ও বলদের এখন পরিশ্রমের অন্ত নাই, কিন্তু দুই-ই দুর্ব্বল, দুইয়েরই খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব, রোগের সুচিকিৎসার অভাব। এবারকার জলবায়ু রোয়া আমন ধানের চাষের পক্ষে মোটামুটি অনুকূল ; প্রায় চৌদ্দ আনা পরিমাণ জমিতে চারা রোপণের কাজ শেষ হইয়াছে ; উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টির অভাবে উঁচু বা ডাঙ্গা জমিতে এখনও চারা রোপণ সম্ভব হয় নাই ; এইরূপ জমির কৃষকগণ আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। পুকুর, ডোবা, খাল ইত্যাদি এখনও জলে ভরিয়া যায় নাই।

আমেরিকান "কেয়ার মিশন" কর্তৃক প্রদত্ত 'কেয়ার' লাঙ্গলে চাষ হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ পল্লী-মঙ্গল সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত আঁটপুর (হুগলী) পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীতে এই লাঙ্গল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল

লাঙ্গলের আর একটি চিত্র

শ্রমিকের পারিশ্রমিক দৈনিক জলখাবার সমেত দুই টাকা চারি আনা। শ্রমিকের যথেষ্ট অভাবও আছে। সাঁওতাল পরগণা, রাঁচি প্রভৃতি স্থান হইতে বহু শ্রমিক আসিয়াছে। স্থানীয় শ্রমিক অপেক্ষা, ইহাদের কাজের

পরিমাণ বেশী, সেইজন্ত ইহাদের চাহিদাও বেশী। চাহিদার অনুপাতে যোগান কম।

এই অঞ্চলে আউশ ধানের চাষ বর্ত্তমান বৎসরে খুবই কম; তবে ইহার অবস্থা মোটামুটি ভাল। কৃষিবিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত শ্রেণীর আমন ও আউশ ধানের চাষের পরিমাণ খুবই অল্প। প্রধানতঃ তিনটি কারণে আউশ ধানের চাষের পরিমাণ কম হইয়াছে। গত বৎসর পাটের দাম অতি উচ্চ স্তরে ছিল, বর্ত্তমান বৎসরে সেইরূপ উচ্চ দরের আশায় কৃষকেরা পাটের চাষ খুবই বাড়াইয়াছে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় প্রতিকূল আবহাওয়া এবং পরবর্ত্তী অবস্থায় ব্যাপকভাবে পোকার আক্রমণ পাটের খুবই ক্ষতি করিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই ফলন খুবই কম হইবে। আউশ ধানের জমির পরিমাণ কম হওয়ার অপর একটি কারণ প্রতিকূল আবহাওয়া। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের অনাবৃষ্টি আউশ ধানের চারা প্রস্তুতের পক্ষে আদৌ অনুকূল ছিল না। অনেক স্থলে বীজতলা প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই,

আউশ ধানের ক্ষেতের একটি দৃশ্য

আবার অনেক স্থলে অনাবৃষ্টির জন্য চারা বাঁচাইয়া রাখা খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তৃতীয় কারণ, বীজের অভাব। ৪০।৪২৲ টাকা দরে এক মণ বীজ বিক্রয় হইয়াছে; কোথাও কোথাও ৬০৲ টাকা দরও দিতে হইয়াছে।

স্থানে স্থানে পাট কাটা আরম্ভ হইয়াছে। কোন কোন স্থানে পাট কাটার পর পাটের জমিতে আমন ধানের চারা রোপণের রীতি প্রচলিত আছে—ইহা ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত চলিবে। পাট কাটিয়া লইবার পর পাটের জমিতে রোয়া আমন ধানের চাষের প্রবর্ত্তন যত বেশী বাড়িবে ততই দেশের মঙ্গল হইবে। এই দিকে কৃষি-বিভাগ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন জানি না।

এবার প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বেগুন, ঝিঙে, করলা, চিচিঙ্গা প্রভৃতির ফলনও কম হইয়াছে এবং স্থানীয় বাজারে উহাদের আমদানী খুবই কম।

গরু কিনিবার জন্য স্থানে স্থানে সরকারী ঋণ প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু উহার পরিমাণ খুবই সামান্য—যে ক্ষেত্রে ২৫০০৲ টাকার ঋণের আবেদন ছিল, সে ক্ষেত্রে হয়ত ২০০০৲ টাকার ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

কোন স্থানেই উন্নত প্রণালীর কৃষি প্রবর্ত্তিত হয় নাই, অন্ততঃ চোখে পড়ে না। পুরাতন প্রথা ও পদ্ধতিতেই কৃষি চলিতেছে। তবে স্থানে স্থানে উন্নত শ্রেণীর বীজ প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও স্থানে স্থানে কৃষকদের মনে কৃষি-বিভাগের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিতেছে। এই অঞ্চলের জাজীপাড়া থানার নিকটবর্ত্তী একজন অভিজ্ঞ কৃষক গত বৎসর কৃষি-বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রায় সাত বিঘা জমিতে কৃষি-বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রংবুল আলুর বীজ বপন করিয়াছিলেন। এই সাত বিঘা জমির জন্য তাঁহাকে নয় মণ বীজ সরবরাহ করা হইয়াছিল। জমি প্রস্তুত, বীজ বপন, পরবর্ত্তী পরিচর্য্যা কৃষি-বিভাগের উপদেশ অনুসারেই করা হইয়াছিল। বীজ খুব সন্তোষজনকভাবেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল, চারা গাছগুলিও খুব তেজী ও জোরালো হইয়াছিল। প্রথমে বীজের প্রশংসা সারা অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল, কৃষকের মন আনন্দে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু হায়, কিছু দিন পরেই দেখা গেল যে কতক কতক গাছ অকালে শুকাইয়া যাইতেছে। এইরূপ ভাবে শতকরা প্রায় ৫০টি গাছ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস্ হইতে বিশেষজ্ঞ আসিলেন, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, মাটিতে কোন দোষ নাই, চাষের পদ্ধতিতে এবং ফসলের পরিচর্য্যাতেও কোন ত্রুটি নাই, বীজের দোষেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। বীজের মধ্যেই এই রোগের বীজাণু বর্ত্তমান থাকে এবং যে সকল বীজে এইরূপ বীজাণু বিদ্যমান থাকে সেই সকল বীজ হইতেই অঙ্কুরিত গাছ এইরূপ রোগে আক্রান্ত হয় এবং অকালে মরিয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে এই রোগ সংক্রামক নহে। ইহার ফলে কৃষি-বিভাগের উপর স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায়ের যে অবিশ্বাস জন্মিয়াছে তাহা দূর করিতে দীর্ঘ-

কাল লাগিবে। কৃষকের যে ক্ষতি হইল তাহা কি ভাবে পূরণ করা হইয়াছে জানি না।

উন্নত শ্রেণীর বীজ উৎপাদনের জন্য কৃষি-বিভাগ স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র আয়তনের কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতেছেন। কৃষকের জমি—কৃষি-বিভাগের তত্ত্বাবধানে ঐ জমিতে কৃষিকাজ এবং বীজ উৎপাদন হইবে। পূর্ব্বে এই জমির আয়তন ৪০।৪২ বিঘা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল, যতদূর সম্ভব এক লপ্তে জমির অবস্থান হওয়া চাই। এই পরিমাণ জমির চাষের জন্য কৃষি-বিভাগ বীজ, সার, কৃষি-যন্ত্রাদি সরবরাহ বাবদ ১২০০৲ টাকা সাহায্য দিতেন; বর্ত্তমান বৎসরে এইরূপ কৃষি-ক্ষেত্রের আয়তন বার বিঘা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং এই আয়তনের জমির চাষবাসের জন্য কৃষি-বিভাগ ১০০০৲ টাকা সাহায্য করিবেন। যিনি এই পরিমাণ সাহায্য গ্রহণ করিয়া এইরূপ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিবেন তাঁহাকে ইহার পরিবর্ত্তে উক্ত কৃষি-ক্ষেত্রে উৎপাদিত উন্নত

কৃষিক্ষেতে আটক আউশ ধান

শ্রেণীর ধানের বীজ ৩০ মণ এবং গমের বীজ ১০ মণ দিতে হইবে। সংগৃহীত বীজ স্থানীয় কৃষকগণের মধ্যে আগামী ঋতুতে বিতরণ করা হইবে।

আঁটপুর গো-প্রদর্শনীতে আনীত একটি গাভী

উন্নত কৃষি-যন্ত্রাদির প্রচলন নাই বলিলেই চলে। গত মার্চ্চ মাসে আঁটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীতে সর্ব্বোত্তম পুরস্কার হিসাবে আমেরিকার 'কেয়ার মিশন' কর্ত্তৃক প্রদত্ত একটি 'কেয়ার' লাঙল জাঙ্গীপাড়া নিবাসী শ্রীগোকুলচন্দ্র সিংহ রায়কে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি একজন অতি অভিজ্ঞ কৃষক, মহিষের সাহায্যে তিনি এই লাঙল ব্যবহার করিতেছেন—দেশী বলদ এই লাঙল টানিতে পারে না। গোকুলবাবু বলেন দেশী লাঙলের অপেক্ষা এই লাঙলের কার্য্যকারিতা বেশী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ-পরিকল্পনা কৃষি বিভাগের একটি প্রধান কাজ। এই সকল পরিকল্পনার প্রত্যেকটির মোট ব্যয় ১০,০০০ টাকার বেশী হইবে না। স্থানীয় কৃষকগণকে খরচের এক-তৃতীয়াংশ দিতে হইবে; অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে। এই পরিকল্পনার একটি বিশেষত্ব এই যে, খরচের এক-তৃতীয়াংশ ভাগ কৃষকগণ নগদ অর্থে দিতে না পারিলে গায়ে-গতরে খাটিয়া পরিশোধ করিতে পারেন। জাঙ্গীপাড়া থানার কৃষি-কর্ম্মচারী মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, তাঁহার এলাকায় গত ২।৩ বৎসরে ৫।৬টি এইরূপ পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা হইয়াছে এবং উহাদের জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ৫।৬ হাজার টাকা।

১০ হাজার টাকার ঊর্দ্ধের পরিকল্পনা সেচ বিভাগ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। এই এলাকায় আমার গ্রামের এই রূপ একটি পরিকল্পনার কথা জানি; পরিকল্পনার নাম "Re-excavation of Khurigachi Khal and Construc-

আঁটপুর গো-প্রদর্শনীতে আনীত গরু, বাছুর

চালাইতেছেন, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফত ইহা বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রীত হইতেছে, মূল্য প্রতি মণ ॥• টাকা। এই সারের উপর কৃষকের সম্পূর্ণ আস্থা এখনও জন্মে নাই।

অতি সাধারণ উন্নত প্রণালীসমূহও অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হয় নাই। উদাহরণ-স্বরূপ কম্পোষ্ট প্রস্তুত, গোবর সংরক্ষণ প্রভৃতির কথা বলিতে পারি। কৃষির উন্নতির জন্য অতি ছোট ছোট কাজও কৃষকের সমবেতভাবে সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হয় না, একটা 'জাওনার' অল্প অংশ কাটিয়া দিলে জল সরবরাহের সুবিধা হয়, ২।১০ জন মিলিয়া এই অল্প কাজ অনায়াসে করা যায়, কিন্তু কেহ করে না—সরকার বা জমিদারের উপর দোষারোপ করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য করে। সরকারী বা বেসরকারী নেতৃত্বের একান্ত অভাব।

tion of a sluice gate at Tarajol in P. S. Jangipara"। এই পরিকল্পনার সূচনা হয় ১৯৫০ সালের ১৬ই জুন। গত ১৯৫২ সালের ১১ই জুলাইয়ের ২৯৫০--১ নম্বর পত্রে কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই। দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল, অনুসন্ধানের পর্য্যায়েই পরিকল্পনাটি এখনও আছে। ইহা "লাল ফিতা"র একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কর্ত্তৃপক্ষ বুঝেন না যে, এইরূপ "লাল ফিতা"র ফলে স্থানীয় জনসাধারণের মনে হতাশার সঞ্চার হয়; আগ্রহ ও উৎসাহ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

আর একটি পরিকল্পনার নাম "রণের খাল", এই খালের সংস্কার হইলে ২.৩ হাজার বিঘা "পতিত জমি" চাষে আনা যাইবে, ৭.৮ হাজার বিঘা জমিতে দুইটি ফসল উৎপাদন করা যাইবে এবং বর্ত্তমান আবাদী জমির ফলন বাড়িবে। কিন্তু ইহাও দুই বৎসরের উপর "লাল ফিতা"র কবলে পড়িয়া আছে।

সারের সরবরাহও চাহিদার অনুপাতে খুব কম; ধানের জমির জন্য কৃষি-বিভাগ একরকম সারের প্রচারকার্য্য

জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র খুবই নিম্নে নামিয়া যাইতেছে। জুয়া খেলার সাহায্যে 'বারোয়ারী' অনুষ্ঠিত হইতেছে, চোরাকারবারীদের আর্থিক সাহায্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ম্মিত বা পুষ্ট হইতেছে। জেলা মৎস্য-কর্ম্মচারীর মুখে শুনিলাম জেলেদের মধ্যে জুয়া খেলার নেশা অতি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। ফল, মূল, মাছ প্রভৃতির চুরিও খুব বাড়িয়াছে। আমার পিতার আমলের পুরাতন ভৃত্য এককড়ি বলিল, লোকে স্বভাব এবং অভাবের জন্যই চুরি করে, বর্ত্তমানে লোকের স্বভাব খুব বেশী নষ্ট হইয়াছে এবং অভাবও খুব বাড়িয়াছে; সুতরাং চুরিও বাড়িয়াছে। স্থানীয় বাজারে টাকায় এক সের এক ছটাক চাউল বিক্রীত হইতেছে, অর্থাৎ এক মণ ৩৭।• টাকা, ইহা ১১ই আগষ্টের দর।

কি ছিল, কি হ'ল ?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

১০

তিন মাস পরে হাজত থেকে ফিরে এসে নরোত্তম শুনল— জমিদার কালীবাড়ী দখল করেছেন। বিনা প্রতিবাদে সেবায়েত ঠাকুরও নাকি করেছেন তার কাছে বশ্যতা স্বীকার।

জমিদারের পূর্ব্বপুরুষের দত্ত একখানা দলিলের বলে সেবায়েতের উপরেই ন্যস্ত ছিল দেবসেবার ভার। আর সেবায়েতকে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ও বৈষয়িক কার্য্য-পরিচালনার দায়িত্ব সম্বন্ধে মোড়লদের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল একটা চুক্তি। বংশপরম্পরায় মোড়লরা সে চুক্তির সর্ত্ত পালন করে আসছে, জমিদারের প্রদত্ত কিছু নিষ্কর জমিজমাও ভোগদখল করছে।

দলিলখানার মুসাবিদার মধ্যে এমন একটা আইনগত ফাঁক ছিল, যার ব্যাখ্যা হয়েছিল—'জোর যার—কালীবাড়ী তার।' জমিদার ইচ্ছা করলেই মোড়লদের বেদখল করতে পারেন।

মোড়লদের সঙ্গে কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ করা পূর্ব্ববর্ত্তী জমিদারেরা সম্মানজনক মনে করেন নি। কিন্তু বর্ত্তমান মনুপ কুমারবাহাদুরের চক্ষুলজ্জার বালাই ছিল না। নরোত্তমের কাছে বারবার অপদস্থ হয়েও তিনি নিরুৎসাহ হন নি। নরোত্তমের হাজতবাসের সুযোগ নিয়ে কালীবাড়ী দখল করা খুব সহজসাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটানো কোনপ্রকারেই সম্ভবপর হয় নি। কুমারবাহাদুরের ইচ্ছা ছিল— কালীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়ে, কালীবাড়ীকে জমিদারের বাগানবাড়ী বা কাছারিবাড়ী ঘোষণা করা। কিন্তু কর্ম্মচারীরা কেউই সে বিষয়ে জমিদারকে সহায়তা করতে রাজী হ'ল না। জনমত উগ্র হয়ে উঠার আশঙ্কা কুমারবাহাদুর একেবারে উপেক্ষা করতে পারলেন না।

বিশেষভাবে কুমারবাহাদুরের পৌত্তলিকতাবিরোধী মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন রমাদেবী। তিনি বললেন— মা-কালীর বিভীষিকার মধ্যে বাস্তবতার কোন প্রশ্নই উঠে না। আসুরিক অত্যাচার বা অবিচারের বিরুদ্ধে ঐশী শক্তির ঐরূপ একটি প্রতিবাদমূর্ত্তির পরিকল্পনা—দুর্ব্বল মানব-মনের স্বাভাবিক সান্ত্বনা। মানবতার বিরুদ্ধে তোমার আসুরী দানবতাকে দমন করবার জন্যে খাঁড়া নিয়ে মাকালীর আবির্ভাব, আমিও আশঙ্কা করি…

কুমারবাহাদুর হো হো করে হেসে উঠলেন। তুমি কি বলতে চাও—কালী আমার মুণ্ডু কেটে রক্ত পান করবেন ?

—ছিন্নমস্তা রূপে নিজের মুণ্ডু কেটেও রক্তপান করেন তিনি। তাঁর রক্ত-পিপাসা আর বাড়িয়ে তুলো না। দোহাই তোমার।

কুমারবাহাদুর গম্ভীরভাবে বললেন—ছি ছি ছি রমা! তুমি শিক্ষা ও সংস্কৃতির দাবি একেবারেই ত্যাগ করেছ দেখছি…

—কারণ তোমার মত বিভ্রান্ত হই নি…

—শোনো রমা! আমি অকৃতজ্ঞ নই। বাবা আমাকে নিশ্চয়ই ত্যাজ্যপুত্র করতেন। তোমার জন্যেই এ জমিদারী আমি পেয়েছি। তাই তোমাকে অনেকখানি সহ্য করি। কিন্তু তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ…

—তার মানে ?

—আমি জানতে পেরেছি—আমার বিরুদ্ধে নরোত্তমকে তুমি অর্থসাহায্য করেছ…

—হ্যাঁ, করেছি। বাবা আমাকে যে টাকা দিয়ে গেছেন, তা আমি কিভাবে ব্যয় করছি—জানবার প্রয়োজন তোমার নেই। জমিদারীর টাকা উড়িয়ে তুমি যে বাগানবাড়ীতে ফুর্ত্তি আমোদ চালাচ্ছ—তার প্রতিবাদ ত আমি করি না ?

—সে অধিকার তোমার নেই…

রমাদেবীর চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠল। উত্তেজিতভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি বললে ? সে অধিকার আমার নেই ? আমি তোমার কেউ নই ?

—না।

—বেশ, আমার খোকার পক্ষে দাঁড়িয়ে জমিদারীর ইষ্টানিষ্ট চিন্তা করবার অধিকার আমার আছে কি না তা তুমি শীগগিরই জানতে পারবে…

এই ঘটনার পর কুমারবাহাদুরের সঙ্গে রমাদেবীর বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেল। দেখাসাক্ষাতের সম্ভাবনাও বেশী রইল না।…

ঠিক এই সময়ে একজন তান্ত্রিক সাধু এসে চাপলেন জমিদারের স্কন্ধে। মাকে নিবেদন করে, মন্দিরে বসেই তিনি মদ্যপান আরম্ভ করলেন। কুমারবাহাদুরকে দীক্ষা দিলেন কারণ-মন্ত্রে। তাঁর মতে বিশ্বপ্রসবিনী মহাশক্তির কাছে কোন উচ্ছৃঙ্খলতাই অমার্জ্জনীয় অপরাধ নয়। পঞ্চ-মকারের নির্লিপ্ত সাধকই পারে মা ব্রহ্মময়ীর কৃপালাভ করতে।

সেবায়েত প্রথমে এই তান্ত্রিক গুরুর বিরোধিতা আরম্ভ করেছিলেন। মন্দিরের পবিত্রতারক্ষা বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু গুরুজী একদিন তাঁকে অন্তরালে ডেকে

দিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। কর্তৃত্বের সুরে বললেন—মূর্খ তুমি। তুমি কি জান না—'বিষস্য বিষমৌষধম'? মদের সাহায্যেই মাতালকে মদ ছাড়াতে হয়। এই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের মনে মাতৃমন্দির ধ্বংস করার যে দুষ্প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে, তাকে ধ্বংস করার জন্যেই ত এসেছি আমি। এ ছাড়া পাষণ্ড-দলনের আর কি পন্থা আছে? শুধুই দেবার্চ্চনা নয়, মানব প্রকৃতির রহস্য যে কত জটিল তা ত জান না? শীগ্‌গিরই আমি ওকে এক মহাশ্মশানে নিয়ে যাব। তার পর দেখো—ওই দুর্দান্ত মাতাল হয়ে উঠেছে কত বড় মাতৃভক্ত। কত সংযতচিত্ত সাধুপুরুষ।

সেবায়েত লক্ষ্য করতে লাগলেন—ধীরে ধীরে অহিংস মতবাদী জমিদার-নন্দনের রুচি ও প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটছে। মাংসাশী হলেও মাকে নিবেদন না করে এখন তিনি আর মাংস খেতে চান না।

গুরুজী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে! কি দেখছ?

সেবায়েতও হেসে বললেন—বেশ, ভালই...

গুরুজী বলতে লাগলেন—তোমরা অতি অগভীর জলের শফরী। ধর্মের তত্ত্ব যে কোন্ গুহাতে নিহিত আছে, তা জানা খুব সহজ নয়। দস্যু রত্নাকরের মধ্যে বাল্মীকি ঘুমিয়েছিলেন। তাকে জাগাতে হলে, মহাকাব্যের উৎসমুখ খুলতে হলে, উচ্ছৃঙ্খল দস্যুকে কি উপেক্ষা করা চলে? তাই তো ওই বরাভয়দাত্রী মা-ব্রহ্মময়ী সবাইকেই কাছে ডাকছেন। তাঁর কাছে হিন্দু বা অহিন্দু নেই। খাদ্য বা অখাদ্য নেই। তাঁর তৃতীয় নয়নের আগুনে পুড়ে সমস্ত পাপ-প্রবৃত্তি ছাই হয়ে যায়। যা থাকে তা খাঁটি সোনা।

নরোত্তমও শুনল জমিদার মন্দিরে বসেই মদ্যপান করছেন। সেবায়েত তার কোন প্রতিবাদ করছেন না। কি অনাচার! ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় নরোত্তমের মন বিষাক্ত হয়ে উঠল।

দীনবন্ধু ঠাকুর এসে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কি করবে মোড়ল?

—কি আর করব ঠাকুরখুড়ো! কালীবাড়ীমুখো আর যাব না। এখান থেকেই গড় করব। বলেই মাটিতে মাথা রেখে নরোত্তম কাঁদতে লাগল। দীনবন্ধু ঠাকুর তাকে সান্ত্বনা দিলেন।

নিবারণ পরামাণিকের বাড়ী ছিল মোড়লদের পাশের গাঁয়ে। সপ্তাহে দু'দিন সে আসত নরোত্তমের বাড়ীতে। নরোত্তমকে সে মনে করত মা-কালীর বরপুত্র। মা-কালীকে সে অত্যন্ত ভয় করত। বদমেজাজী কর্ত্তার কাছে পৌঁছানোর সাহস যার নেই, সে তার পেয়াদাকেই খুশী রাখবার চেষ্টা করে। নিবারণের অতিরঞ্জিত বিবৃতি শুনতে নরোত্তমেরও খুব ভাল লাগত।

হাজতবাসের পর নরোত্তমের পরিষ্কার মুখখানা অত্যন্ত নোংরা হয়ে আছে। খবর পেয়েই নিবারণ ছুটে এল—ক্ষুর-নরুন আর কাঁচি শানিয়ে নিয়ে। নরোত্তম একটু হেসে বলল—না নিবারণ! গোঁফদাড়ি আর কামাব না। শ্রীবৃন্দাবন যাব।

—কেন মোড়ল? বিস্মিতভাবে নিবারণ চেয়ে রইল তার মুখের দিকে।

—বিবাগী হব। গেরুয়া পরে গলায় একটা তুলসীর মালা বাঁধব। লাঠিবাজী আর কখনও করব না।

সে কি? নিবারণ চমকে উঠল। জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নরোত্তমের লাঠিই যে জনসাধারণের একমাত্র ভরসা, তা কে না জানে? নরোত্তমের বৈরাগ্য যে দেশের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে, তা ভাবলেও নিবারণের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। দেশে-বিদেশে নরোত্তমের লাঠি-সড়কির অতিরঞ্জিত গল্প প্রচার করে নিবারণ সবাইকে ভরসা দিয়ে থাকে। কোন ভয় নেই। আমাদের নরোত্তম মোড়ল আছে! জমিদারের সাধ্য কি যে টু-শব্দটি করে? সেই নরোত্তমের লাঠি আজ কদমতলার বাঁশী হয়ে যাবে—একথা নিবারণ ভাবতেই পারছে না।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নরোত্তম বলল—তবু তুমি এসো নিবারণ! লাঠি-সড়কি ছাড়লেও তোমার ফেনিয়ে-তোলা গল্প-শোনার লোভ ছাড়ব না...

নিবারণের প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সে যাকে পছন্দ করে, তাকে আকাশে তোলে। যাকে পছন্দ করে না তাকে নিতান্ত আবর্জনার মতই আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়। নরোত্তম তা জানে।

নিবারণ বলে উঠল—কাল একটা অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছে মোড়ল!

—কি ঘটনা?

—আমাদের গাঁয়ের মেজবাবু আমাকে কত ভালবাসেন তা তো জান? রাত তখন সাড়ে বারোটা। মেজবাবু এসে বললেন—নিবারণ! জামাই এসেছেন। ঘরে মাছ নেই। জাত যে যায়। কি সর্ব্বনাশ! মেজবাবুর জাত যাবে? কিন্তু উপায় কি? এত রাত্রে কোথায় পাওয়া যাবে মাছ? দাওয়ায় বসে খুঁটিটা হেলান দিয়ে ভাবছি। এমন সময় খড়্ খড়্ শব্দ! নতুন বাঁশের খুঁটি। এই সেদিন জল থেকে তুলে ঘরে লাগিয়েছি। আবার খড়্ খড়্ শব্দ! ছেলেকে ডেকে বললাম—কুড়ুলটা নিয়ে আয় তো রে! চাল থেকে খুলে নিয়ে, কেঁড়ে ফেললাম খুঁটিটা। তোমাকে কি আর বলব মোড়ল! সোনা এক কুড়ি কইমাছ উঠানে ছড়িয়ে পড়ল। একটা বেশীও নয়, একটা কমও নয়। সে কি

আমল আমার। মেজবাবুর আতরকে হ'ল। কি ভাগ্যবান লোক আমাদের মেজবাবু…

—মেজবাবুর খবর কি? একটু হেসে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল।

—তার কথা আর বলো না। মেজবাবুর বাড়-বাড়ন্ত দেখে হিংসের জলেপুড়ে মরছেন।

—শুনলাম দুশো টাকা দিয়ে একটা গরু কিনেছেন? দু'বেলা দশ সের দুধ দিচ্ছে সে?

—মিছে কথা, মিছে কথা। মুখটা বিকৃত করে নিবারণ বলল। ছটাকখানেক দুধ হয়। মরা গরু, ঘাস পায় না। সেদিন আমাকে গায়ের জ্বালায় বলেছেন—'নিবারণ তোকে আমি দেখে নেব।' হেসে আর বাঁচি নে। নরোত্তম মোড়ল যার সহায়—সে তো জমিদারকেই ভয় করে না। তুমি কোথাকার মেজবাবু হে?

গম্ভীরভাবে নরোত্তম বলল—তা তো বটেই। আজকাল বুঝি আর জমিদার-বাড়ীতে যাও না?

—কেন যাব? মাতাল-জমিদার বলে—তার নাকের নীচের খুব ছোট্ট একটু গোঁফ রাখতে হবে। কি অন্যায় কথা বল তো? কামাবি তো সব কামা। আর না হয় কার্ত্তিক-ছাঁটাই করে দি—গোঁফে তা' দে। তা নয়, নাকের নীচের ছোট্ট গোঁফ!

একটু থেমে নিবারণ আবার বলতে লাগল—আহা হা হা! কামাতাম ওঁর বাবা সেই বুড়ো জমিদারকে। এক দিন গিয়ে দেখি—বৈঠকখানা ঘরের ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। সেই ঘুমন্ত মুখেই ক্ষুর চালিয়ে কামিয়ে ফেললাম। ঘুম ভেঙে, আমাকে দেখেই বললেন—নিবারণ এসেছিস্? দে, দে, কামিয়ে দে…আমি একটু হেসে বললাম—আজ্ঞে হুজুর! কামানো হয়ে গেছে। অ্যাঁ, বলিস কি? মুখে হাত দিয়েই জমিদার অবাক্! তখুনি গায়ের শাল-খানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—আমার কাঁধের উপর। এখনও সে শাল আমার ঘরে আছে।

হঠাৎ নরোত্তমের চোখে পড়ল—দূর থেকে কে যেন আসছে তাদের বাড়ীর দিকে। পরিধানে রক্তের মত রাঙা কাপড়। উপবীতের মত গলায় ঝুলানো রাঙা চাদর। কপালে জল্ জল্ করছে তৈলাক্ত মোটা সিঁদুরের কোঁটা। তার সঙ্গে লম্বা লাঠি-হাতে দুই জন জমিদারের পাইক।

—কে? কে আপনি? নরোত্তম বিস্মিতভাবে চেয়ে রইল আগন্তুকের মুখের দিকে।

—চিনতে পারলে না নরোত্তম? একটু হাসলেন তিনি।

চিনতে পেরেছে বলেই নরোত্তমের বিস্ময়ের অবধি নেই। এও কি সম্ভব? শার্ট গায়ে, চিলে পা-জামা পরা, চুল উল্টানো, আর নাকের নীচে ছোট্ট গোঁফ-ওয়ালা যে কুমার-বাহাদুরের চেহারা ছিল নরোত্তমের চক্ষুশূল, তাঁর এ কি রূপসজ্জা? কপালের উজ্জ্বল সিঁদুরের কোঁটার দিকে চেয়ে চেয়ে নরোত্তমের সর্ব্বাঙ্গ যেন শিথিল হয়ে আসছিল। ইঙ্গিতে সে নিবারণকে বলল, চৌকিটা এগিয়ে দিতে।

জমিদার বললেন, না, না, বসব না। একটা বিশেষ অনুরোধ জানাতে এসেছি তোমাকে। আজই সন্ধ্যার পর মন্দিরে গিয়ে আমার সঙ্গে একবারটি দেখা করবে…

—কেন বলুন ত? সন্দিগ্ধভাবে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল।

কুমারবাহাদুর বললেন, সিদ্ধিলাভের জন্যে কালই আমি মহাশ্মশানে যাচ্ছি গুরুদেবের সঙ্গে। মা আদেশ করেছেন—তোমার উপরেই মন্দিরের ভার রেখে যেতে হবে…

নিজের কান দুটোকে নরোত্তম যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। কথাগুলি আর একবার যাচাই করে শুনে হঠাৎ বলে উঠল—সত্যিই আপনাকে আমি চিনতে পারছি না, বুঝতে পারছি না। একটু থেমে নরোত্তম বলতে লাগল, দু' মাস আগে আমাকে একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেল খাটাতে চেষ্টা করেছেন। কালীবাড়ী দখল নিয়েছেন। শুনতে পাই মন্দিরে বসেই অখাদ্য খাচ্ছেন—মদ চালাচ্ছেন। এখন হঠাৎ আপনার এ কি চেহারা? আপনি সন্ন্যাসী? এ কি আপনার কোন জমিদারী চাল? আমাকে আরও বেশী বিপদে ফেলবার চেষ্টা? সত্যি বলুন ত আপনার মতলব কি?

কুমারবাহাদুর একটু হাসলেন। অকপট সে হাসি নরোত্তমের অন্তর স্পর্শ করল। সে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ল।

অতি শান্ত ও সংযতভাবে কুমারবাহাদুর বলতে লাগলেন, শোন নরোত্তম, অতীতের কোনও কাজের অনুশোচনা আজ আর করব না। শুধু একটি কথা তোমাকে বলব। যে জমিদারকে তুমি চিনতে, সে জমিদার আমি নই।

নরোত্তমের চোখে দারুণ বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টি। এত অল্প দিনের মধ্যে কোন্ যাদু-মন্ত্রে এরূপ রুচি-পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে? সেই জমিদারই বলছেন, আমি সে জমিদার নই? কি আশ্চর্য্য!

তেমনি শান্তভাবে ও স্মিতমুখে কুমারবাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভাবছ নরোত্তম? যা ভাবছ তা বুঝতে পারছি। এ সংসারে যা-কিছু ঘটছে সবই সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায়। সম্ভব আর অসম্ভবের প্রশ্ন মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে। তাঁর ইচ্ছাশক্তির ত কোনও নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী নেই। মুহূর্ত্তের ভূমিকম্পে যদি একটা পাহাড় ধ্বসে যেতে পারে, কোনও মানুষের অহঙ্কারই বা চূর্ণ হতে পারবে না কেন?

নরোত্তমের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি। সে যেন সংজ্ঞাহীন অচঞ্চল পাথরের মূর্ত্তি। কুমারবাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, মাতাল-জমিদারের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে দেখা করতে

ভয় পাচ্ছ ? তোমার দুঃসাহসের যে সব গল্প শুনেছি তাতে মনে হয়েছিল, ভয় কাকে বলে তা তুমি জান না…

হঠাৎ নরোত্তম আকুল হয়ে বলে উঠল—শুধু আমার মাকে ছাড়া এই দুনিয়ায় আর কাউকে ভয় করি না আমি…

—তবে সেই মন্দিরে যাবার সাহস নেই কেন ?

—মনে হচ্ছে—মার কাছে আমি বোধ হয় কোনও অপরাধ করেছি…

—হ্যাঁ, করেছ। কুমারবাহাদুর আবার একটু হাসলেন। সে অপরাধ হচ্ছে—তোমার লাঠি-সড়কির আর বাহুবলের অহঙ্কার! মনে মনে ভেবেছিলে—বাহুবলে বেঁকেই তুমি আমাকে মন্দিরে ঢুকতে দেবে না। তা কি পার নরোত্তম ? মা যাকে টানেন, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। এত দিন মায়ের কাছে আমাকে আসতে না দিয়ে তুমি যে অপরাধ করেছ—তার শাস্তি মা তোমাকে নিশ্চয়ই দেবেন…

অতি ধীর স্থিরভাবে কথাগুলি বলেই কুমারবাহাদুর চলে গেলেন। নির্ব্বাক, নিস্পন্দভাবে বহুক্ষণ বসে রইল নরোত্তম।

ভয়ে ও বিস্ময়ে নিবারণ এতক্ষণ নির্ব্বাক বসে ছিল। জমিদার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করল—ব্যাপার কি নোত্তম ?

—কিছু না। হঠাৎ যেন নরোত্তম একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। নিবারণের কাছে এগিয়ে বসে বলল, এ গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে দাও নিবারণ! এখুনি কামিয়ে দাও…

—কেন ? শ্রীবৃন্দাবন যাবে না ?

—না। মা ডেকেছেন। আমার বোধ হয় লাঠি ধরতে হবে…

—তাই নাকি ? বেশ, বেশ, মা-কালী তোমাকে সুবুদ্ধি দিন—নিবারণ সোৎসাহে নরোত্তমের ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করল।

১৪

সন্ধ্যার পর গোপীযন্ত্র বাজিয়ে সখিচরণ গান ধরল—

ও আমার প্রাণের ঠাকুর!
প্রাণ কাঁদে আজ তোমার লাগি'
বাইরে দেখি রং-তামাশা—
আমার মন হ'ল সংসার-বিরাগী।
আমি পাই যা-কিছু হারাই অনেক বেশী,
হায় না-বেনে চালাই বেষারেষি—
এই পাওনা-দেনা বেচা-কেনার হাটে
হই সুখের দেনায়, দুখের ভাগী।

হঠাৎ গানে বাধা পড়ে গেল। সখিচরণের স্ত্রী সুহাসিনী এসে ঝঙ্কার দিয়ে বলল—বলি, তুমি ভেবেছ কি ?

—যা ভেবেছি—তা কি গানের ভিতর দিয়ে পরিষ্কার শুন্‌ছ না ? সত্যিই আমি ভেবেছি—এ সংসার অসার!

—কেন মেজদি আমাকে বাঁদী বলে গালাগালি দেবে ?

—তা হলে সংসার যে অসার, সেই কথাই ত মান্‌তে হ'ল ? এস এখন, বাঁদা-বাঁদী দু'জনই গলাধরাধরি করে কাঁদি আর বলি—

"অসার সংসারে আসা যারে বারে,
ভাবিলাম অন্তরে—কেহ কার নয় আপন!"

—বাজে বকো না। শোন বলছি—এ অন্যায়ের যদি কোনও বিচার না হয়, তা হলে কাল ভোরেই আমি বাপের বাড়ী চলে যাব।

—খোকাকে রেখে যাবে ত ?

—কেন ? সে আমার ছেলে। আমিই তাকে বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছি।

—সে কথা কে অস্বীকার করছে ? তবে, তোমার বাপের বাড়ীতে গিয়ে, খোকার কি হাল হবে, সে কথাটা আমাকে বলে যাওয়া উচিত।

একটি রোরুদ্যমান ছেলেকে বুকে নিয়ে তারাচরণ এসে দাঁড়াল সেখানে। মেজবৌ সৌরভিনীর পক্ষ-সমর্থন করে বলল—দেখ সেজবৌমা! মেজবৌ বড়, তুমি ছোট। ছোটকে বাঁদী বলার অধিকার বড়র নিশ্চয়ই আছে…

—হারামজাদী বাঁদী বলে, চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে বাড়ী থেকে যে তাড়িয়ে দেন নি—সেই তোমার ভাগ্যি—খুব গম্ভীর ভাবে সখিচরণ বলল।

বাধা দিয়ে তারাচরণ বলল—না না, অত দূর কেন করবে ? আসল কথা কি জানিস্ স'খে! উনুনের তাপে মেজবৌয়ের সোনার অঙ্গ কালি হয়ে যাচ্ছে। সংসারের জন্যে সারাদিন খেটে খেটে হাড় গুঁড়ো করে ফেলছে। তার একটা চড়া কথা শুন্‌লে তোমাদের গায়ে ফোস্‌কা পড়ে কেন বৌমা ?

—সেজবৌয়ের চামড়া বেজায় পাতলা মেজদা! কি করা যায় বল ত ?

ঘোমটা টেনে, ভাসুরের সম্মান রেখে সুহাসিনী এতক্ষণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। আর সহ্য করতে পারল না। কেঁদে বলল—কেন ? আমরা কি রাঁধতে জানি না ? নিজের আর নিজের ছেলেমেয়েদের ভালমন্দ খাবার ব্যবস্থার জন্যে দিন রাত দিদি হেঁসেল আগলে পড়ে থাকেন, তার খাটুনির জন্যে দায়ী কে ?

—শুন্‌লি স'খে সেজবৌমার কথা ?

—হ্যাঁ শুন্‌লাম মেজদা! একটু সোজা হয়ে বসে সখিচরণ বলল—আমি একটা কথা ভাবছি…

—কি ?

—বড়দা বেজায় ভাগ্যবান্…

খুব দৃঢ়তার সঙ্গে সুহাসিনী বলে উঠল—সে ভাগ্যি তোমারও হবে খুব শীগগির। আমিও বড়দির মত আবগাছে ঝুলব।

—না না, সেজবৌ! দোহাই তোমার—করজোড়ে সখিচরণ বলতে লাগল—তেমন কাজ কখখনো করো না। রাত দুপুরে কেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে পারব না আমি। তার পর শ্যামাচরণের দিকে ঘুরে বসে বলল—তোমার পায় পড়ি মেজদা! বৌদিকে হেঁসেল থেকে বেরিয়ে আসতে বল। তার শুঁতো হাত খেয়ে খেয়ে আমাদেরও অজীর্ণের ব্যারাম ধরবে। বৌরাও দড়ি নিয়ে ছুটোছুটি করবে আম-বাগানে। দরকার কি? দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকুন তিনি! তুমিও তাঁ'র পদসেবা করে শান্তি পাও, আমিও নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে বাঁচি…

সখিচরণের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ চিরদিনই শ্যামাচরণের অসহ্য। হঠাৎ একটা চড় মেরে কোলের ছেলেটাকে আরও বেশী কাঁদিয়ে দিয়ে হন্ হন্ করে সে চলে গেল মেজবৌ সৌরভিণীর ঘরে।

সখিচরণ তার গোপীযন্ত্রটা হাতে তুলে নিয়ে বেশ শান্তভাবে বলল, তা হলে দয়াময়ী! কাল ভোরেই ত তুমি যাচ্ছ? বাপের বাড়ীতে পৌঁছেই একখানা চিঠি লিখো।

—আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও কেন? আর একটা বৌ ঘরে আনবে বুঝি? অভিমানভরে সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করল।

গোপীযন্ত্রটা রেখে, নিজের নাক আর কান অতি নির্দয়ভাবে মর্দন করে সখিচরণ বলল, আবার? সর্ব্বনাশ! যে ভুল একবার করেছি, তার ঝাল সামলাতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে—আবার সেই ভুল করব? হেঁ:!

গোপীযন্ত্রটা তুলে নিয়ে সখিচরণ গাইতে লাগল—

কেন, ভুল ক'রে তুই বাইরে এলি—
নিজের ঘরের দোর খুলে?
ওরে, পর কি কখন হয়রে আপন?
মিছেই টাক্-ঢাকা তোর পর-চুলে।
নিজের ঘরে নিজের আলো জ্বলতে যে না-জানে,
চোখ-ধাঁধানো পরের আলো, বাইরে তাকেই টানে।
আপনারে, সে চিন্‌তে নারে—ও মন!
ভুল থেকে যায় যার মূলে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে শুনতে সুহাসিনীর চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। রাগের জালায় হাজার বার মুখে বললেও, সখিচরণকে ছেড়ে যাওয়ার কথা সে মনে ভাবতে পারে না। আপনভোলা সখিচরণকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে সে। তার বাহ্যিক উপেক্ষা ও অনাদরের মধ্য দিয়েও সুহাসিনী অনুভব করে সখিচরণের আন্তরিক সহৃদয়তা ও স্নেহার্দ্র প্রাণের পরিচয়।

চোখ মুছে ধীরে ধীরে সুহাসিনী গিয়ে বসল সখিচরণের পায়ের কাছে। উপস্থিত প্রসঙ্গটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যে কাতরভাবে বলল, একটা কথা বলব, শুনবে?

—একটা কেন? কথার জাহাজ তুমি। তোমার পেট ভর্ত্তি কত রামায়ণ আর মহাভারত আছে, তা কি আর জানি নে? উগরাতে না পারলে পেট ফুলে মরে যাবে যে! বল, বল, শুনি…

—তোমাদের বোন কাদু যে মরেছে…

সখিচরণ চমকে উঠল। বিস্মিতভাবে মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—মরেছে মানে? কখন মরল? এই যে এই মাত্তর আমাকে এক ঘটি জল দিয়ে গেল…

—সে মরা নয়…

—তবে আবার কোন্ মরা? মেয়েদের রকমারি মরণ আছে নাকি?

—হ্যাঁ আছে। ও পাড়ার কানাইকে ত চেন? যে যাত্রার দলে কেষ্ঠঠাকুর সাজে। নেচে নেচে গান গায় আর আড়-বাঁশী বাজায়?

—চিনলাম। সে কি করেছে?

—রোজই আসে তোমাদের বাড়ীতে।

—কারণ?

—ছোট বৌয়ের কি রকম ভাই হয় যে…

—তাই বল। সেই কারণেই ছোট বৌমার ঘরে মাঝে মাঝে গাঁজার গন্ধ টের পাই…২সেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সখিচরণ ডাকল—মনোহর! মনোহর ঘরে আছিস?

মনোহর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—ডাকছ কেন সেজদা?

—কানাই ছোট বৌমার কি রকম ভাই রে?

—মামাতো বা পিসতুতো—এই রকম কি একটা হবে।

—কি আশ্চর্য্য! আমি ভেবেছি- তুই বুঝি একটু গাঁজা খেতে শিখছিস। যাকগে—ছোকরাকে বারণ করে দিস—সে যেন আমাদের বাড়ীতে আর আসে না। বড়দার চোখে পড়লে এমন থাপ্পড় খাবে যে ঘুরে পড়েই মরে যাবে…

—তা ত মরবে! সুহাসিনী চোখমুখ ঘুরিয়ে বলল, এদিকে তোমাদের বোন কাদু যে মরে ভূত হয়ে আছে। কাল তারা অন্ধকারে ঐ কামিনী ফুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ফিসফিস করেছে। নিজের চোখে দেখেছি—কানাইকে দেখবার জন্যে কাদু যেন ছটফট করে। গোপনে দেখাশুনাও আরম্ভ হয়েছে।

—যাও, যাও, বাজে বকো না। সখিচরণ উত্তেজিত ভাবে বলল—মনোত্তম ঘোষালের বোন্ কাদু! সে মান-মর্য্যাদাবোধ তার নিশ্চয়ই আছে। দু'দিন বাদে চান-

সত্যি হাতে নিয়ে যাবে গোস্বামীর ঘর করতে। জেঠ-ঠাকুরের বাণী শুনে পাগল হওয়ার মত মেয়ে সে নয়।

মনোহরের দিকে ফিরে সখিচরণ বলল—শোন্ মনোহর! ছোক্‌রাকে বলে দিস্—বাবের বাচ্চা নিয়ে খেলা করবার দুর্ব্বুদ্ধি যেন তার না হয়…

বাইরের ঘর থেকে নরোত্তম ডাকল—স'খে!

—যাই বড়দা…বলেই সখিচরণ গিয়ে হাজির হ'ল—নরোত্তমের সামনে।

নরোত্তম বলল—আমি একটু কালীবাড়ির দিকে যাচ্ছি—ফিরতে দেরি হতে পারে…

বিস্মিতভাবে সখিচরণ জিজ্ঞাসা করল—কেন?

—জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে…

—কি সর্ব্বনাশ! একলা এই রাত্তিরকালে! তুমি কি বলছ?

সে জমিদার আর নেই…

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে সখিচরণ বলল—হ্যাঁ, শুনেছি—খোলসটা বদলেছেন, মদ তো ছাড়েন নি? জমিদারী ঠাট সবই বজায় আছে।

—তা থাক্। আমার জন্তে ভাবতে হবে না। তোরা সাবধানে থাকিস…বলেই নরোত্তম রওনা হ'ল। বিকেল-বেলা। তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে নি। পিছনে-পিছনে কিছুদূর গিয়ে নীচু স্বরে সখিচরণ জিজ্ঞাসা করল—ভজিখানাও কি নিয়ে যাবে না?

—না। শুধু হাতেই যাব…

নরোত্তম চলে গেল। সখিচরণ একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। নিজের ঘরের বারান্দায় ফিরে এসে গোপী-যন্ত্রটা বাগিয়ে নিয়ে আবার গান ধরল:

> মন! তোরে আর কেমন ক'রে—
> বোঝাই আমি বল্?
> তুই, ছয়দিকে ছয় রিপুর টানে
> সদাই থাকিস্ যে চঞ্চল।
> তোর, অঙ্গে লাগে পাগলা-হওয়া
> সুখ-বসন্ত কালে—
> তোর, রক্ত নাচে পলাশবনের
> ফুল-ফোটানো তালে।
> ও মন! মন্‌রে আমার—
> যখন আসবে বর্ষা—শ্রাবণ কর্ম্ম—
> ঝরবে চোখে জল।

গান থামবার সঙ্গে সঙ্গেই সখিচরণের নাকডাকা শুরু হ'ল। এমন সময় ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। টিনের চালে বর্ষণের ঝঙ্কারের সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল সখিচরণের নাসিকা-গর্জ্জন। বাইরে এসে সুহাসিনী তার হাতখানা ধরে টেনে তুলল। বিরক্তভাবে বলল—নেশা করেছ নাকি? গায়ে যে জলের ঝাপ্‌টা লাগছে, সে হুঁস্ নেই?

নিদ্রাতুর সখিচরণ টলতে টলতে ঘরে ঢুকল।

১৫

কালীবাড়ির সিং-দরজায় পৌঁছেই নরোত্তম দেখল—তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্তে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেবায়েত ও ম্যানেজার।

মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে সাষ্টাঙ্গে মা-কালীকে একটা প্রণাম করে নরোত্তম গেল জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে।

সাধু-সন্ন্যাসী বা বিশিষ্ট অতিথিদের আশ্রয়দানের জন্তে কালীবাড়ীর প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যেই আছে একটি সুদৃশ্য ছোট বাড়ী মন্দির থেকে কিছু দূরে একটা নির্জ্জন পঞ্চবটী-বনে। বাড়ীটার সামনেই পদ্মপুকুর। তার কালো জল, পদ্মপাতা আর পদ্মফুলে ঢাকা। চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। সংস্কারের অভাবে বহুদিন বাড়ীটা পড়ে ছিল—জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে অব্যবহার্য্য অবস্থায়। নরোত্তম দেখল—জমিদার দখল নেওয়ার পরে সেখানে যেন গড়ে উঠেছে একটি ছোট নন্দন-কানন। মালী নিযুক্ত হয়েছে। সুবিন্যস্ত ফুলগাছের কেয়ারীতে ফুটে উঠেছে নানাবিধ সুদৃশ্য ও সুগন্ধি ফুল। তাদের বর্ণ-সুষমায় সত্ত রং-করানো বাড়ীটাকে আলোকিত করেছে। পদ্মপুকুরের মাঝখানে এক ঝাঁক রক্তপদ্মের দিকে চেয়ে চেয়ে নরোত্তমের মনে শৈশব-স্মৃতি জেগে উঠল। মায়ের পূজার জন্তে কত দিন সে সাঁতার কেটে রক্তপদ্ম তুলে এনেছে। সেদিনকার মত আজও এক জোড়া রাজহাঁস পদ্মফুলের ফাঁকে ফাঁকে ঘাড় দুলিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। পুকুর-পাড়ে রক্তজবা আর স্থলপদ্ম যেন ফুটে উঠার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। সত্যিই ত জমিদারকে কালীবাড়ীতে ঢুকতে না দিয়ে নরোত্তম গুরুতর অপরাধ করেছে। তার জন্তেই এত দিন কালীবাড়ীর এই দিকটা তেমন অন্ধকার হয়ে ছিল।

বাড়ীটার দোতলায় একটা ঘরে ঢুকে নরোত্তম দেখল—বিস্তৃত ব্যাঘ্র-চর্ম্মের আসনে বসে আছেন জমিদারের তান্ত্রিক গুরু। রক্তবস্ত্র পরিহিত ও জটাজুটধারী। একটু কাত হয়ে একটা ব্যাঘ্র-মুণ্ডের উপর তিনি দেহভার রেখেছেন। ব্যাঘ্রের কৃত্রিম কাঁচের চোখ দুটোর চেয়েও তাঁর চোখ দুটি যেন বেশী জ্বলছে।

নরোত্তমকে দেখেই সোজা হয়ে উঠে বসলেন তিনি। গম্ভীর স্বরে বললেন—এস, এস, তোমার জন্তেই অপেক্ষা করছি।

জমিদার বসে আছেন তাঁর গুরুদেবের পায়ের কাছে। নরোত্তম দূর থেকেই দু'জনকে দণ্ডবৎ করল। গুরুজী হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন। পূর্ব্বে কখনও এই তান্ত্রিক সাধুকে

নরোত্তম দেখে নি। কিন্তু সাধুজী এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে নরোত্তমের পারিবারিক কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, তাতে মনে হ'ল যেন যোড়শরা তাঁর পূর্ব্বপরিচিত।

গুরুজী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—তুমি একটু বস নরোত্তম, আমরা আসছি···বলেই কুমারবাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুই দেয়ালের কাঁচের দীপদানিতে দুটো মোমবাতি জ্বলছিল। হঠাৎ সে দেখল—বাতি দুটো নিঃশেষে পুড়ে নিবে আসছে। এখনি ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে। কিন্তু কই, গুরুজী ত ফিরে এলেন না?

ঘরের সামনে একটা ঝুল-বারান্দা। বারান্দার দিকে আছে একটা জানালা ও একটা দরজা। সেই দরজাই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার একমাত্র পথ। দরজাটার কাছে গিয়ে নরোত্তম দেখল—বাইরের দিক থেকে তালা বন্ধ। তা হলে কি সে এই ঘরে বন্দী? কি আশ্চর্য্য!

বাতি নিবে গেল। ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিকটে বা দূরে জন-মানবের সাড়াশব্দ নেই। এ ভাবে তাকে একটা নির্জ্জন ঘরে বন্দী রাখবার তাৎপর্য্য নরোত্তম ঠিক বুঝতে পারল না। তান্ত্রিক সাধুর উদ্দেশ্য কি?

হঠাৎ নরোত্তম দেখল, বাইরের বারান্দার জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন সাধুজী। অন্ধকারে অতি অস্পষ্ট তাঁর চোখ মুখ। গম্ভীর সুরে বললেন তিনি—নরোত্তম! আজ অমাবস্যার রাত তা বোধ হয় জান?

নরোত্তম কোন জবাব দিল না। একটু এগিয়ে এসে দেখল—গুরুজীর পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে কাঁপছে নন্দরাণী।

সাধুজী বললেন—মহাপূজা অন্তে আজই শেষরাত্রে, তোমাকে আর এই নন্দরাণীকে বলি দেওয়া হবে। মা তোমাদের রক্ত চেয়েছেন।

উত্তেজিত ভাবে নরোত্তম বলল—মা যদি আমার রক্ত চেয়ে থাকেন, আমি নিজেই দেব। আপনারা কেন হত্যা করবেন আমাকে? এ ষড়যন্ত্র কেন?

—তুমি নিজেই রক্ত দেবে?

—হ্যাঁ দেব···

—প্রাণের মমতা নেই তোমার?

—না।

—শুনেছ নন্দরাণী? নরোত্তম নিজেই মরতে পারে। তুমি ত পার না?

—না না, আমাকে বলি দেবেন না—। আমার বড্ড ভয় করে। নন্দরাণী ডুকরে কেঁদে উঠল।

—বেশ, তা হলে আমাদের সঙ্গে মহাশ্মশানে চল···

নন্দরাণীকে টেনে নিয়ে সাধুজী অদৃশ্য হলেন। নরোত্তম বহুক্ষণ জানালার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল।

অমাবস্যার রাত্রি। সূচিভেদ্য অন্ধকার। দূরে বা নিকটে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নরোত্তম নিজের শরীরটাকে পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না। সত্যিই কি তাকে মরতে হবে? এই অন্ধকারেই কি সে নিজেকে চিরতরে হারিয়ে ফেলবে? অন্ধকারের ভিতর দিয়েই ত আসে বিস্মৃতি ও বিলুপ্তি। মৃত্যুর অন্ধকারেই নিবে যায় জীবনের আলো।

মা, মা, মা! নরোত্তম ডেকে উঠল—সত্যিই কি তুমি আমার রক্ত চাও? যে মা বুকের রক্ত দিয়ে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখে—সে কি তার রক্ত চাইতে পারে? মিছে কথা। ও কে? ও কে? নরোত্তমের মনে হ'ল, চন্দ্রকলা এসে দাঁড়িয়েছে জানালার ধারে। সে যেন হাতছানি দিয়ে নরোত্তমকে ডাকছে আর কেঁদে কেঁদে বলছে—ওগো! চলে এসো, চলে এসো আমার কাছে। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারছি নে। কত ভালবাসতাম তোমাকে—তা কি জান না? আমি মরেছি, কিন্তু আমার ভালবাসা তো মরে নি? তাই তো আমার অন্ধ ভালবাসা এই অমাবস্যার অন্ধকারে তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে···

অন্ধকারে চন্দ্রকলার ওই অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি কি নরোত্তমের দুর্ব্বল-মানসের কল্পনামাত্র? নরোত্তমের মাথার ভিতর সবই যেন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে—কিছুই ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে।

—না না, চন্দ্রকলা! এভাবে মরতে পারব না আমি। এ যে জমিদারের হীন ষড়যন্ত্র! মা আমার রক্ত চাইতে পারেন না। আমাকে বাঁচতেই হবে। নরোত্তম জানালা-দরজাগুলি পরীক্ষা করতে লাগল।

বহুকালের পুরানো বাড়ী। নরোত্তমের মনে হ'ল, রং লাগিয়ে নূতন করলেও কাঠের সঙ্গে চুণ-সুরকির বাঁধ নিশ্চয়ই তত শক্ত নেই। বারান্দার দিককার জানালাটাকে সে অনেক টানাটানি করল। সেটা একটুও নড়ল না। রৌদ্র-বৃষ্টির আড়ালে ছিল বলেই তার শক্তি এখনও হ্রাস পায় নি। বাইরের দিক্‌কার একটা ছোট জানালাকে একটু ঝাঁকানি দিতেই নড়ে উঠল। নরোত্তমের দেহে অসুরের শক্তি। দেয়ালে পা বাধিয়ে শিক ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে জানালাটাকে সে খুলেই ফেলল। কিন্তু নীচে তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। লাফিয়ে পড়লে কোথায় গিয়ে পড়বে তাও ঠিক ঠাওর করতে পারছে না।

খোলা ফাঁক দিয়ে গলাটা বের করে নরোত্তম চারদিক দেখছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা লম্বা লগির আগা এসে লাগল তার মাথায়। চমকে উঠে খপ্ করে আগাটা ধরে টেনে তুলল লগিটাকে। খুব লম্বা লগি। কে তাকে এ লগিটা পৌঁছে দিচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারল না।

নরোত্তম বলল—নীচে যে থাক সরে যাও, আমি এই

লগি দিয়ে লাফিয়ে পড়ছি। কোথায় পড়ছি জানি না…

লগির গোড়াটা মাটিতে গিয়ে ঠেকল। আগায় নরোত্তম। তার দেহভার অনেকখানি লঘু হয়ে গেল। যেখানে গিয়ে সে পড়ল—সেখানে ছিল কতকগুলো রজনীগন্ধা গাছ। তারা দলিত ও মথিত হয়ে গেল। এদিক-ওদিক চেয়ে নরোত্তম দেখল—দূরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখল—কালীবাড়ীতে যে পাগলাটা পড়ে থাকে—সে। লগি ছুঁড়ে ধরবার খেয়ালটা তার মনে কে জাগিয়ে দিয়েছে? কি আশ্চর্য্য ঘটনা!

নরোত্তম কাছে যেতেই সে খিলখিল করে হাসতে লাগল। নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল—কে তোকে বলেছে এই লগিটা আমার কাছে পৌঁছে দিতে?

—তোর মা বলেছে। তোর বাবা বলেছে। অশ্রাব্য গালিগালাজ দিতে দিতে পাগলাটা চলে গেল।

কালীবাড়ীর পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজল। যে লোক ঘড়ি পেটাচ্ছিল, সে একটা পশ্চিমা দারোয়ান। নরোত্তম তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—জমিদার-সাধু কোথায়?

—সাধুলোক তো সব্ চোলে গেল…

—কোথায় গেল তাই ত জিজ্ঞেস করছি…

—সে হামি জানে না।

—সেবায়েত কোথায়? তাঁকে একটু ডেকে আন। বলবে—নরোত্তম ঘোড়ল ডাকছে—

খবর পেয়েই সেবায়েত মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি করে বেরিয়ে এলে নরোত্তম?

নরোত্তম বলল, সেকথা পরে বলছি। আগে জানতে চাই—আমাকে এ ভাবে বন্দী রাখার মানে কি? সাধু-জমিদার আর তাঁর গুরুজী কোথায়?

—এই একটু আগে নৌকো ভাসিয়েছেন। রাতারাতি কোথায় কোন এক মহাশ্মশানে গিয়ে পৌঁছবেন। একটু থেমে সেবায়েত বললেন, তোমার সম্বন্ধে আমাকে বলে গেছেন—কাল সকালে তালা খুলতে…

কেন বলুন ত?

—তা আমি জানি না। আমি খুব প্রতিবাদ করেছিলাম। বলেছিলাম ওভাবে নরোত্তমকে বন্দী রাখতে পারবেন না। সে বেরিয়ে পড়বেই। গুরুজী বললেন—যদি বেরিয়েই পড়ে তাকে বলো—আজ রাতে সে যেন উপবাসী থাকে। আর, মায়ের প্রসাদ মুখে না দিয়ে কালও যেন অন্নজল স্পর্শ না করে।

—এ আদেশের মানে?

—তা জানি না। তবে বলেছেন—এ আদেশ অমান্য করলে তোমার মুখ দিয়ে নাকি রক্ত উঠবে…

নরোত্তম বিস্মিতভাবে চেয়ে রইল সেবায়েতের মুখের দিকে। অস্ফুট স্বরে বলল—বুঝতেই পারছি না ঐ অদ্ভুত সাধুটির উদ্দেশ্য কি?

—'উদ্দেশ্য যাই হোক', সেবায়েত বললেন, 'তিনি যে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উচ্ছৃঙ্খল কুমারবাহাদুরকে যে ভাবে পোষা প্রাণীটির মত সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন, তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।

—কোথায় গেলেন? কেন গেলেন? কবে ফিরবেন? তা ত আপনি বলতে পারেন না?

—না।

—আশ্চর্য্য!

মাথাটা চেপে ধরে নরোত্তম বহুক্ষণ বসে রইল মন্দিরের সিঁড়ির উপর।

ক্রমশঃ

দুপুর বিকেল হয়

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

দুপুর বিকেল হয়: পাখীর পালক কাঁপে অরণ্যের মনে,
নির্জন হৃদয়ের স্মরণের দীপ নিয়ে প্রাণের প্রাঙ্গণে
অনেক প্রেমের মতো ক্লান্তিহীন কামনার তারাভরা মুখ
যত খুশি সব এসে আমার দেহের ঘুমে নীরবে নিস্তব্ধ।
নীরবে নিস্তব্ধ সব ঘন কালো অন্ধকার: চোখের তিমির
ঘন হোক্ কালো কালো আকাশের কোল জুড়ে এই পৃথিবীর।
সেই সব কালো রাত ব্যাকুলিত কামনার সকরুণ সুরে
বলবে কত-না কথা স্মরণের ছলোছলো মনের দুপুরে।

তাই তো তোমার এই দুপুরের বিকেলের দীঘি-কাঁপা মেঘ
নিঃশেষে শেষ করে আমার প্রাণের থেকে বুকের আবেগ।
ঝিরঝিরে বাতাসের থরে থরে ঝরে কত রাতের সুবাস,
যে সুবাস নিয়ে সব চ'লে গেছে সন্ধ্যার হৃদয়ের হাঁস।
রঙ্ মেখে স্বর্ণের সে রঙীন আকাশের ঝিক্-মিক্ মেঘ
তাই তো কেঁবলি আসে মনে মনে কামনার নিবিড় আবেশ।

গান

(ভীমপলশ্রী—তেতালা)

গলার এ হার রাখিব না,
আজো প্রভু মোর ভবনে এল না।
যার লাগিয়ে মন বিচলিত হয়েছে,
কোন্ দেশে গিয়ে বিসরিয়া রয়েছে,
যাও যাও অনুসন্ধান কর তার
যদি পাও জানাবে বেদনা ॥*

রচনা—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরলিপি—শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩ 0 ১ ২ ৩
র্সা র্রর্সা র্সা ণা ণা র্সণণা পা | া মজ্ঞা মজ্ঞা মা | ণা পা র্সা -া র্সা -া র্রর্সা র্সা
গ র০ ০ এ হা র০ ০ - রা ০ খি ব ০ না - আ - জো০ ০

0 ১ ২´
ণা পা -া পা মা জ্ঞা মা পা | মা জ্ঞা রা সা II
প্র ভু - মো র ভ ব নে এ ল না ০

0 ১ ২´ ৩
ণা পা পা পা মা জ্ঞা মা | পা না না না | র্সা র্সা র্সা র্না র্সা -া র্সা
যা র লা গি য়ে ম ন বি চ লি ত হ য়ে ছে কো ০ ন্ দে

* এই গানটি সদারঙ্গকৃত "গরবা হররা জরোজী মৈ" এই গজল গানটির অনুকরণে রচিত।

১ ২´ ৩ 0 ১
র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা র্সা | না র্সা র্রা র্সা | না র্সা পণা পা | পা র্সা র্সা ণা | ধা পা মা পা |
০ শে গি য়ে বি স রি য়া র য়ে ছে০ ০ যা ০ ও যা ০ ও অ ন্থ

২´ ৩ 0 ১ ২´
জ্ঞা -া মা পা | মা জ্ঞা র সা | ণ্া ণ্া সা সা | র্সা র্রা র্সা -া | না না র্সা -া II
স - ন্ধা ন ক র তা র য দি পা ও জা না বে - বে দ না -

আলাপী তান :—

৩ 0 ১ ২´
১। ণ্সা জ্ঞমা পা -া | -া -া -া -া | ণা পা মা -া | জ্ঞপা মপা মজ্ঞা রসা II
আ০ ০০ ০ - - - - - ০ ০ ০ - ০০ ০০ ০০ ০০

১ ২´ ৩ 0
২। জ্ঞমা পা র্সা -া | -া -া -া -া | ণা -া ধা পা | ণা পা মা পা | জ্ঞা মা -া -া |
আ০ ০ ০ - - - - - ০ - ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ - -

১ ২´
ণ্া -া সা মা | জ্ঞা -া রা সা II
০ - ০ ০ ০ - ০ ০

বালতান :—

৩ 0 ১ ২´
১। ণ্সা জ্ঞমা পধা পমা | জ্ঞমা পপা মজ্ঞা রসা | জ্ঞমা পণা পণা র্সর্রা | সণা ধপা মজ্ঞা রসা II
গ০ ০০ লা০ ০০ য়০ ০০ ০০ ০০ এ০ ০০ ০০ ০০ হা০ ০০ য়০ ০০

৩ 0 ১ ২´
৩। জ্ঞমা পণা পণা র্সর্রা | র্সণা ধপা মজ্ঞা মা | জ্ঞমা পর্সা ণধা পমা | জ্ঞপা মপা মজ্ঞা রসা II
গ০ ০০ লা০ য়০ এ০ হা০ য়০ ০ রা০ ০০ ০০ ০০ খি০ ০০ ব০ না০

তান :—

১ ২´
৫। ণ্সা জ্ঞমা পণা র্সর্রা | র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা II
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

১ ২´
৬। র্রর্রা র্সণা ধপা মপা | ণণা পমা জ্ঞরা সা II
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

৩ 0 ১ ২´
৭। ণ্সা জ্ঞমা পজ্ঞা মপা | জ্ঞমা পপা মজ্ঞা রসা | জ্ঞমা পণা র্সর্মা র্জ্ঞর্রা | র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা II
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

অন্তরার তান :

0 ১ ২ ৩
৮। মপা জ্ঞমা পা র্সা | -া -া -া -া | ণর্সা র্মা র্জ্ঞা র্রর্সা | ণর্সা র্রর্রা র্সণা ধপা II
আ০ ০০ ০ ০ - - - - ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

বাট :—

১ ২´ ৩ 0
৯। ণ্সা জ্ঞমা পপা ণা | পঃমজ্ঞা মঃ পণা র্সর্রা | র্সণা ধপা মজ্ঞা মপা | মজ্ঞা রসা র্সণা র্সা |
গলা র এ হার রা খি ব না আ০ জো০ প্রভু মোর ভব নে এ ল০ না০ গলা র

১ ২´ ৩ 0
ণধাণঃ পা জ্ঞা মঃ | ণপা র্সা র্সণা র্সা | ণধাণঃ পা জ্ঞা মঃ | ণপা র্সা র্সণা র্সা |
এ০ হা র রা খি ব০ না গলা র এ০ হা র রা খি ব০ না গলা র

১ ২´
ণধাণঃ পা জ্ঞা মঃ | ণা পা র্সা -া II
এ০ হা র রা খি ব ০ না -

নন্দ প্রব্রাজন

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

কপিলবাস্তু। রাজপ্রাসাদের ইন্দ্রপুরীসদৃশ সজ্জিত কক্ষে যৌবন-উৎসবে মত্ত রাজপুত্র নন্দ ও তদীয় পত্নী সুন্দরী ভদ্রা। পত্নীগত-প্রাণ রাজকুমার নন্দের রমণীগণমুকুটমণি ভদ্রা। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমাবেশে বুঝি ওঁকে গড়েছিলেন বিধাতাপুরুষ। নন্দপ্রিয়ার তিনটি নাম ছিল। রূপ ও সৌন্দর্য্যের জন্যে তাঁকে সবাই সুন্দরী বলে ডাকত। ঔদ্ধত্য ও গর্ব্ব ছিল বলে পৌরজন তাঁর নাম রেখেছিল মানিনী। আর দীপ্তি ও মানের জন্যে তাঁর নাম ছিল ভামিনী। ভদ্রার ক্ষণিক অদর্শনে শাক্যপুত্র নন্দ জগৎ-সংসার অন্ধকার বলে মনে করেন। মোহময় প্রমোদমদিরা পানে মদান্ধ প্রণয়ীযুগল। ভাবানুরক্ত কিন্নর-কিন্নরীর ন্যায় উভয়ে সৌন্দর্য্যে যেন পরস্পরকে তিরস্কৃত করে রাজপ্রাসাদের শোভা বর্দ্ধন করছেন। প্রতিদিন নন্দ প্রিয়তমা দয়িতাকে নানা বসন-ভূষণে সাজাতেন। সাজিয়ে তাঁর আশা মিটত না। অপলক দৃষ্টিতে তিনি পুষ্পিত-যৌবনা প্রিয়ার অরবিন্দসম মুখের পানে চেয়ে থাকতেন।

চৈত্র মাসের প্রভাতবেলা। দূরে শৈলরাজির তুষারমুকুট সূর্য্যদেবের তরুণ রশ্মিপাতে ঝলমল করছে। বলভীপৃষ্ঠে পারাবতের দল সানন্দে ডেকে চলেছে। জাতিপুষ্প-সুগন্ধি ভেসে আসছে চৈত্তালী পবনে।

প্রমোদ-কক্ষ। সপ্রেম কটাক্ষ দয়িতের মুখের উপর নিক্ষেপ করে সুভগা ভদ্রা বললেন, দেখ, চন্দনাদি দিয়ে আমার বদন চিত্রিত করব। চিত্রকর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই আরশিখানা আমার সামনে ধরে থাক।

যথা আজ্ঞা, দেবি! বলে নন্দ আদেশ পালনে রত হলেন।

সভ্রূ ভদ্রার আয়তলোচন দুটি কৌতুকে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠে। তাঁর বিম্বসদৃশ অধরে চাপল্যের আভাস খেলে গেল। তর্জ্জনী হেলিয়ে শাসনের সুরে নন্দকে বলে, উঁহু, ঠিক হচ্ছে না। এই এমনি ভাবে ধরে থাক।

অপাঙ্গে দয়িতের শ্মশ্রু নিরীক্ষণ করতে করতে সুন্দরী নিজের মুখে অনুরূপ শ্মশ্রু চিত্রিত করছেন। মুচকি হেসে নন্দ নিশ্বাসবায়ু দ্বারা দর্পণখানি দোষযুক্ত করলেন।

'বটে! দেখাচ্ছি তোমায়'—বলে যৌবনমদে মত্তা সুন্দরী ভদ্রা নন্দের বৃষস্কন্ধসদৃশ অংসে কর্ণোৎপল নিক্ষেপ করলেন। পরক্ষণেই হাস্যে বিগলিত হয়ে সুন্দরী স্বীয় মৃণালোপম ভুজ-বল্লরী দ্বারা নন্দকে জড়িয়ে ধরে নিজেকে এলিয়ে দিলেন স্বামীর উন্নত বক্ষপুটে।

অতঃপর মদঘূর্ণিতাক্ষী ভদ্রা হস্ত দ্বারা আপনার রক্ত-কমল গণ্ডস্থলে বিশেষক রচনা করলেন। চঞ্চল কুণ্ডলের সংস্পর্শে বিশেষকের প্রান্তদেশ লুপ্ত হতে লাগল। কারণ্ডব-ক্লিষ্ট অরবিন্দের ন্যায় তাঁর মুখশ্রী দর্শনে নন্দের চিত্ত-চাঞ্চল্য অধিকতর বর্দ্ধিত হ'ল।

প্রাসাদের চারিদিকে কর্ম্মব্যস্ততা। গৃহস্বামীর প্রসাধন ও ক্রীড়ানুরূপ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহের জন্যে যুবতী দাসীরা ব্যতি-ব্যস্ত। কেউ শ্বেত ও রক্তচন্দন ঘর্ষণ করছে; কেউ বস্ত্রাদি গন্ধযুক্ত করছে; কেউ জাতিপুষ্পের সুগন্ধি মাল্য রচনা করছে; কেউ বা স্নানের আয়োজন করছে।

এদিকে ভিক্ষাকাল সমাগত। আত্মাধীশ্বর ভগবান তথাগত কপিলবাস্তুর অধিবাসীদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরছেন। অবশেষে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দের গৃহে ভিক্ষার জন্যে উপনীত হলেন।

ভগবান সুগতের উপস্থিতি কারও দৃষ্টিগোচর হ'ল না। ভিক্ষা বাক্য কিংবা আসন না পেয়ে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। নন্দের এক দাসী প্রাসাদের বাতায়ন-পথে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। সে মেঘমুক্ত উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট সুগতকে নন্দের মহল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল। গৃহ-স্বামীর অমঙ্গলাশঙ্কায় তার অন্তর কেঁপে উঠল। অর্হতের অর্চ্চনা করতে পেলে না বলে সে নিজেকে শতবার ধিক্কার দিলে। কম্পিত পদে নন্দের প্রমোদকক্ষে উপনীত হয়ে ভগবান তথাগতের আগমন এবং ভিক্ষা ও পাদ্য-অর্ঘ্য না পেয়ে চলে যাবার কথা নিবেদন করল।

আজ কত কথা মনে পড়ল নন্দের। কত যুগ পরে ভগবান সুগত কপিলবাস্তুতে ফিরে এসেছেন। সমস্ত নগরী তাঁর আগমনে আনন্দসাগরে নিমগ্ন। ন্যগ্রোধারাম বিহারে অবস্থান করছেন তিনি। মহাপ্রজাপতি গোতমীর বড় স্নেহের পাত্র ছিলেন সর্ব্বার্থসিদ্ধ। মহামায়ার মৃত্যুর পর তিনিই কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন সিদ্ধার্থকে। প্রৌঢ় বয়সে তিনি নন্দকে অঙ্কে পেয়েছিলেন। সর্ব্বার্থসিদ্ধ যেদিন প্রিয়তমা পত্নী ও শিশু-সন্তানের মায়া কাটিয়ে রাজধানী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, সেদিন কপিলবাস্তুর অধিবাসিগণের সঙ্গে বালক নন্দও কেঁদেছিলেন।

সর্ব্বার্থসিদ্ধের গৃহত্যাগের পর অনেক কাল গত হয়েছে। ইতিমধ্যে নন্দ যৌবনে পদার্পণ করেছেন। পাছে কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই ভয়ে রাজা শুদ্ধোদন রমণী-কুলপ্রধানা জনপদকল্যাণী সুন্দরীর সঙ্গে নন্দের বিবাহ দিলেন। নন্দ নবপরিণীতা বধূর সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদে মত্ত হলেন। এদিকে সর্ব্বার্থসিদ্ধ নির্ব্বাণ অর্হত্ব লাভ করে জগতের কল্যাণে

ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন। ক্রমশ: ধর্মচক্র এগিয়ে চলল। দেখতে দেখতে কাশী গয়া গিরিব্রজ পাটলিপুত্র প্রভৃতি জনপদের অধিবাসীদের মস্তক আনমিত হ'ল বুদ্ধের চরণতলে। জনগণের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

ভগবান তথাগতের ধর্ম্মবিজয়ের কথা কপিলবাস্তুতে এসে পৌঁছল। জ্যেষ্ঠের গৌরবে গৌরবান্বিত নন্দ। অবশেষে সশিষ্য ভগবান জিন মহাবাণী প্রচার করবার জন্যে জন্মনগরীতে আগমন করেছেন। কপিলবাস্তুর জনগণ তাঁর চিরমধুনিস্যন্দী মোক্ষোপদেশ গ্রহণ করে ধন্য হচ্ছে। কিন্তু হায়, মোহের বশীভূত নন্দ প্রিয়ার সঙ্গে প্রাসাদেই বিহার করতে লাগলেন।

মহাপ্রাণ ভগবান সুগত নন্দের আলয়ে এসে ভিক্ষা না পেয়ে ফিরে গেলেন, একথা স্মরণ করে নন্দের সুপ্ত ভ্রাতৃপ্রেম জেগে উঠল। তিনি ম্লানমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে ভার্য্যাকে বললেন, দেবি, আমি ভগবান জিনকে প্রণাম করতে যাব। আমায় ক্ষণিকের জন্যে বিদায় দাও।

কোন এক ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় সুন্দরী তন্বীর বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল। আর্দ্রবিলেপনযুক্ত বাহুলতা দ্বারা প্রিয়তমকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে বললেন, আর্য্যপুত্র, তুমি ভগবান সুগতকে দেখতে অভিলাষ করেছ। আমি তোমার ধর্ম্মপীড়ার কারণ হতে চাই নে। তুমি যাও; কিন্তু বিশেষক শুষ্ক হবার পূর্ব্বেই ফিরে এস।

একথা শুনে নন্দ বিনীতভাবে বললেন, তাই হবে প্রিয়তমে, তাই হবে। ভগবান তথাগতের বেশী দূর গমনের পূর্ব্বে আমায় ছেড়ে দাও।

তন্বী নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দয়িতকে বাহুপাশ থেকে মুক্ত করলেন। তাঁর আয়তলোচন অশ্রুতে টলমল করছে। বেচারী নন্দ! তাঁর মন চাইছে না প্রিয়তমাকে ছেড়ে যেতে। তবু যেতে হবে। তিনি বিলাস-বেশ ত্যাগ করে তৎকালযোগ্য বেশে সজ্জিত হলেন। অশ্রুমুখী তন্বীর দিকে পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করতে করতে নন্দ বিলাসকক্ষ ত্যাগ করলেন। কামানুরাগে মন্দগতি ও ধর্ম্মরাগে আকৃষ্ট হয়ে অতিকষ্টে চলতে লাগলেন।

মধ্যেয় তায় দীপ্তিমান্ ভগবান জিন রাজপথ আলোকিত করে ন্যগ্রোধারাম বিহার পানে মন্থর গতিতে চলেছেন। বলবলযুক্ত শ্রীবুদ্ধ রাজপথে অগণিত নরনারী কর্ত্তৃক স্তুত হয়ে অতিকষ্টে জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। আয়ুষ্মান্ নন্দ জনতার ভিড় ঠেলে মহামুনি বুদ্ধদেবের নিকট যেতে না পেয়ে দূর থেকে সেই মহান্ মূর্ত্ত দেখতে লাগলেন। আত্মগর্ব্বে তাঁর সমস্ত অন্তর ভরে উঠল। 'হে শাক্যবংশাবতংস, কনিষ্ঠের প্রণাম গ্রহণ করুন'—মনে মনে জ্যেষ্ঠের উদ্দেশে ভক্তি-নৈবেদ্য নিবেদন করেন তিনি। অন্তর্যামী ভগবান সুগত গৃহাসক্ত নন্দকে আকর্ষণ করবার জন্যে জনাকীর্ণ রাজপথ পরিত্যাগ করে নির্জ্জন পথে চললেন।

মধ্যাহ্নকাল। সূর্য্যদেব মধ্যগগনে প্রখর কিরণ বর্ষণ করছেন। নন্দ অগ্রসর হয়ে গললগ্নীকৃতবাসে ভগবান তথাগতকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, ভন্তে, দয়া করে আপনি আমার আলয়ে অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: অর্হতের অর্চনা করবার সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি। আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন, দেব। হে মহাভিক্ষু, দয়া করে আমার আলয়ে চলুন।

ভগবান সুগত নন্দের মধ্যে মোক্ষের বীজ নিহিত দেখলেন। তাই স্নেহবশত: তাঁকে উদ্ধারে যত্নবান্ হলেন।

পদ্মপলাশলোচন ভগবান বুদ্ধ তাঁর হস্তে স্বীয় করঙ্কটি তুলে দিলেন; ইঙ্গিতে তাঁকে অনুসরণ করতে বলে ন্যগ্রোধারাম বিহারের দিকে অগ্রসর হলেন। নন্দ দুঃখিতচিত্তে মহামুনি বুদ্ধের অনুগমন করলেন। ভার্য্যার চঞ্চলনয়নশোভিত বিশেষকমণ্ডিত আনন পুনঃ পুনঃ তাঁর মনে পড়তে লাগল। বুদ্ধের অলক্ষ্যে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করলেন। বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে অবশেষে উভয়ে জ্ঞানের আলয় বুদ্ধবিহারে উপনীত হলেন।

সর্ব্বভূতে দয়াবান্ ভগবান তথাগত স্বীয় চক্রচিহ্নিত করতল নন্দের মস্তকোপরি স্থাপন করে সস্নেহে বললেন, হে সৌম্য, জন্ম হলেই মরণ আছে। একথা জেনেও অসার কামসুখে মগ্ন হয়ে শাশ্বত আনন্দ ও মুক্তিলাভে বঞ্চিত হওয়া কি বাঞ্ছনীয়? জগতে জরার তুল্য অশিব বস্তু আর নেই; ব্যাধিই একমাত্র অনর্থের মূল। একমাত্র মৃত্যুভয়েই জীবকুল ভীত সন্ত্রস্ত। ইন্দ্রিয়পরবশ অসংযমী ব্যক্তি অবিতারতিতে আসক্ত হয়ে একে পরম সুখ বলে মনে করে। কিন্তু মোহগ্রস্ত সে জানে না যে, এটা দুঃখদায়ক। একমাত্র অধ্যাত্ম-সুখই সত্য। ঠিক কিনা বল।

হ্যাঁ ভন্তে, সত্যই তাই।

জগৎ বলে কিছু নেই। তা অলীক এবং দুঃখময়। অতএব ক্লীবত্ব পরিহার করে জন্ম-মৃত্যু নিরোধের জন্যে যোগ অবলম্বন কর। যোগবলে অন্তরে আত্মতেজ উদ্দীপ্ত হলে তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ হবে। যে আদিরসে আজ তুমি হাবুডুবু খাচ্ছ তা প্রজ্ঞার আলোকে অতি তুচ্ছ বলে মনে হবে। অতএব আলেয়ার পিছনে ছুটে নিজেকে নষ্ট করো না। আজ তুমি নিজেকে বপুষ্মান্ বলে গর্ব্ব করছ। দু'দিন বাদে দেখবে তোমার এই সুন্দর সুঠাম দেহখানি জরাজীর্ণ হয়ে গেছে।

যাতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে জঠরনরক-যন্ত্রণা এবং রোগ-শোক আদি ভোগ করতে না হয় সেরূপ ব্যবস্থা করা কি সমীচীন নয় ?

ভন্তে, উচিত।

বুদ্ধদেব নন্দের সম্মতিসূচক উত্তরে সুখী হলেন। তিনি ভিক্ষু আনন্দকে বললেন, আনন্দ, একে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাও।

মহাভিক্ষু যাতে অন্তরে কিছুমাত্র ক্লেশ না পান সেজন্তে নন্দ সুগতের উপদেশে এতক্ষণ মৌখিক উৎসাহ দেখিয়েছেন। একণে জ্যেষ্ঠের নির্মম আদেশ শুনে তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। প্রিয়ার অশ্রুসজল মুখখানি তাঁর অন্তরাকাশে বিদ্যুৎচমকের ন্যায় খেলে গেল। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়। বিনা বিচারে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা পালন করাই ক্ষাত্রধর্ম। তাই তিনি কোন উচ্চবাচ্য না করে অধোবদন হয়ে চুপ করে রইলেন।

ভগবান তথাগত সস্নেহে ডাকলেন, নন্দ, আমার কথার উত্তর দাও। প্রব্রজ্যা গ্রহণে কি তোমার মত নেই ?

ম্লান হাসি হেসে নন্দ বললেন, প্রভো, আপনি যা আদেশ করেন।—মুখে তাঁর হতাশার ছাপ।

তবে আজই মুণ্ডিত মস্তকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। শুভস্য শীঘ্রম্। অনর্থক কালক্ষেপে এ মাহেন্দ্রযোগ নষ্ট করো না। সুযোগ জীবনে একবারই আসে। অতএব, বৎস, প্রস্তুত হও।

আসুন।

আনন্দ অগ্রসর হলেন। পশ্চাতে নন্দ। কিয়দ্দূর গমন করে আনন্দকে বললেন, আমি গৃহে যাব, প্রব্রজ্যা গ্রহণ আমাদ্বারা হবে না। এ মহান্ ব্রত গ্রহণের আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমায় মার্জনা করবেন।

স্থবির আনন্দ বুদ্ধের শ্রীপাদপদ্মে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। স্থিতপ্রজ্ঞ ভগবান জিনের ললাট কুঞ্চিত হ'ল। বললেন, আনন্দ, তুমি নন্দকে গিয়ে বল, আমি তাকে ডাকছি।

ভগবন্, আপনার যেরূপ আদেশ।

আয়ুষ্মান নন্দ অগ্রজের আদেশ শুনে মহা মুশকিলে পড়লেন। আজ্ঞানুবর্তিতা শাক্যবংশের প্রধান ধর্ম। কিন্তু—

রাজকুমার নন্দ অবনত মস্তকে অগ্রজের সম্মুখে এসে উপনীত হলেন।

করুণার মূর্তপ্রতীক ভগবান তথাগত কনিষ্ঠের মুখের দিকে চেয়ে সস্নেহে বললেন, নন্দ, যা শুনেছি তা কি সত্য।

হ্যাঁ ভন্তে।

পরমকারুণিক বিনায়ক অনুজের সত্যবাদিতায় সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু কনিষ্ঠের মধ্যে কামনা-রাগের প্রাবল্য দেখতে পেয়ে ব্যথা অনুভব করলেন।

শোন নন্দ, আমি তোমার অগ্রজ। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েও সবকিছু পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। আমার উপদেশে আত্মীয়গণের মধ্যে অনেকেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছে। গৃহিগণ সংযমী হয়েছে। অথচ এ সব দেখেও তোমার জ্ঞানের উদ্রেক হচ্ছে না। এটা বড়ই পরিতাপের বিষয়। জগৎ নশ্বর। এখানে অনুরাগের কিছুই নাই। দারাপুত্র-পরিজন সবকিছুই ঐন্দ্রজালিক মায়া। অনিত্য প্রিয় বস্তুর প্রতি অনুরাগ ত্যাগ কর। শ্রেয়লাভে যত্নবান্ হও।

অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান নন্দ। জ্যেষ্ঠের উপদেশ শ্রবণ করে বিনীত বচনে বললেন, ভন্তে, আপনি যেরূপ বলেন আমি তাই করব।

স্থবির আনন্দ নন্দের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদ্রেক দেখে তাঁকে পরম স্নেহভরে আলিঙ্গন করলেন।

আনন্দ তাঁর চাঁচর চিকুর মুণ্ডন করলেন। অতঃপর প্রব্রজ্যার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল। কাষায় বস্ত্র পরিহিত নন্দ কৃষ্ণপক্ষের অবসানে নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন।

"বিশেষক শুষ্ক হবার পূর্ব্বেই আসব" বলে সেই যে প্রিয় চলে গেছে এখনও এল না। করতলে আনন রস্ত করে সুন্দরী ভদ্রা ভাবছেন। তাঁর মুখখানি বর্ষাজলক্লিষ্ট পদ্মের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। প্রিয়বিপ্রযুক্তা সুন্দরী বৈদূর্য্য ও হীরকখচিত বিচিত্র কোমল আবরণযুক্ত পালঙ্কে স্বীয় দেহতার এলিয়ে দিলেন। কিন্তু মোটেই স্বস্তি পেলেন না। দুগ্ধফেননিভ শয্যা কণ্টকের ন্যায় মনে হ'ল। শয্যাত্যাগ করে ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন। ক্ষকতল আগুনের ন্যায় তপ্ত বলে মনে হ'ল। ভূমিশয্যা পরিত্যাগ করে কক্ষের বহির্দেশে গমন করলেন। কবরী এলিয়ে পড়েছে ; পরিধান-বস্ত্র বিপর্য্যস্ত। চক্ষুদ্বয় আরক্ত। মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করছেন। প্রাসাদ-অলিন্দে দেহভার ন্যস্ত করে নত হয়ে রাজপথের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কিন্তু হায়, দয়িতের আগমনের কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কিছুকাল তদবস্থায় থেকে নন্দ-হৃদয়রঙ্গিণী ভদ্রা শ্রান্ত দেহভার আর বইতে পারলেন না। দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে অশ্রুসিক্ত বিবর্ণ মুখে পুনরায় প্রমোদকক্ষে প্রবেশ করলেন। স্বামীর আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত তিনি নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত অলঙ্কার পরিধান করেছিলেন। স্বীয় গাত্র থেকে অলঙ্কাররাশি একে একে উন্মোচন করে কক্ষের চারদিকে ছড়িয়ে ফেললেন। সেগুলোর আর প্রয়োজন কি ?

আমার দয়িত স্বহস্তে ধারণ করেছিলেন—একথা স্মরণ করে সুন্দরী ভদ্রা দর্পণখানি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করে তাতে গণ্ডস্থল সজোরে ঘর্ষণ করতে লাগলেন। স্বামীর ব্যবহৃত বিলাস-দ্রব্যাদি দর্শনে তার শোকাবেগ আরও বর্দ্ধিত হ'ল।

'দয়িতপ্রতিজ্ঞ আজ কেন মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হলে ? আর্য্যপুত্র, তুমি এত পাষাণ হলে কিরূপে ? ওগো পাষাণ দেবতা, ফিরে এস।

স্বামীর সম্ভাব্য নানা বিপদের আশঙ্কা করে সুন্দরী জনপদকল্যাণী কাঁদতে লাগলেন। পারাবতের কূজন ক্রন্দন-শব্দে কোথায় ডুবে গেল।

প্রাসাদের প্রহরিণী ও দাসীগণ গৃহস্বামিনীর ক্রন্দন-শব্দে সংকিত এবং ভীত হয়ে পড়ল। তারা দ্রুতপদে ভয়ে ভয়ে দ্বারদেশে উপনীত হ'ল।

শাক্যানী জনপদকল্যাণী কখন রোদন করছেন, কখন-বা দু'হাতে চুল ছিঁড়ছেন, আবার কখনও বা দু'হাতে বুকে আঘাত হানছেন। অঙ্গে পদ্মরাগ বসনখানি বিস্রস্ত। রজনী-বিহারের জন্যে রচিত জাতিপুষ্পের সুগন্ধি মাল্য রোষে বিকৃত করে দূরে নিক্ষেপ করলেন। শেষ পর্যন্ত জনপদকল্যাণী পাগল হয়ে গেল নাকি!

দাসীগণের মধ্যে একজন সুন্দরী জনপদকল্যাণীর অশ্রুমোচন করে সান্ত্বনার সুরে নানারূপ উপদেশ দিতে লাগল। দেবি, শোক করা তোমার শোভা পায় না। ধৈর্য ধারণ কর।

আচ্ছা, তিনি নাকি প্রব্রজিত হয়েছেন? এ সংবাদ কি সত্যি?

হাঁ দেবি, সত্যি। তবে এর জন্যে শোক প্রকাশ করা সঙ্গত নয়; কারণ তপোবলই ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দের একমাত্র কাম্য। তুমি রাজর্ষি-বধূ। স্বামী সঙ্ঘের শরণ নিয়েছেন, এতে তোমার আনন্দ করা উচিত। যদি অপর কোন রমণীর প্রেমে তিনি আসক্ত হতেন তবে সে ছিল আলাদা কথা।

প্রিয়সুখভাগিনী সুন্দরী কোনক্রমেই ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। তাঁর শোক আরও বর্ধিত হ'ল। তিনি অবিরলধারায় অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। দাসীগণ গৃহস্বামিনীর শুশ্রূষায় রত হ'ল। কেউ ব্যজন করতে লাগল, কেউ বা ভৃঙ্গার থেকে সুশীতল জল চোখে মুখে দিতে লাগল। এমনিধারা বিবিধ প্রকারে জনপদকল্যাণীর পরিচর্যা চলল।

প্রাগুক্ত ঘটনার পর একটি বছর অতীত হয়েছে। পুনরায় মধুমাসের আগমনে বনশ্রী ফুটে উঠেছে। নাগকেশর কিংশুক বকুল চম্পক ও শিরীষ ফুলের অপরূপ সমাবেশ! ময়ূরের কেকাধ্বনি, কোকিলের কুহুস্বর ও মধুপানমত্ত ভ্রমরের গুঞ্জন-শব্দে কাননভূমি মুখরিত। আম্র-মুকুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র।

জেতবনবিহারের এক নিভৃত প্রদেশে রাজকুমার নন্দ ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করে অবস্থান করছেন। কিন্তু অষ্টাঙ্গ-মার্গের অনুশীলন যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে না। আজও নন্দের বিরহী মন কপিলবাস্তুর প্রতিটি বস্তুর স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত। ভিক্ষুচিহ্ন ধারণ করেও নন্দ তার কিছুমাত্র মর্যাদা দিতে পারেন নি। বসন্তকালীন পুষ্পশোভা তাঁকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। কোনও একটি চূতবৃক্ষকে কুসুমিত মাধবীলতা জড়িয়ে আছে। নন্দের মনে পড়ে—এমনি করে প্রিয়া তাঁকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করত। নন্দ কিছুতেই সুন্দরী জনপদকল্যাণীর চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারছেন না। প্রিয়ার অতিপ্রিয় প্রিয়ঙ্গুলতা দেখে তাঁর সমস্ত হৃদয় মথিত করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

নাঃ—জনপদকল্যাণীকে ছেড়ে আর থাকা চলে না। প্রিয়াকে ছেড়ে কিছুতেই তিনি বাঁচবেন না। বিনয় প্রতিপালন অষ্টাঙ্গ-মার্গের অনুশীলন সব কিছুই অর্থহীন। আকাশে বাতাসে সর্বত্র যেন তিনি প্রিয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে পান—ওগো দয়িত, ফিরে এস। বিশেষক শুষ্ক হবার পূর্বেই ফিরে এস।

নন্দ চিত্রকলায় পারদর্শী ছিলেন। প্রিয়ার বিরহ সহ্য করতে না পেরে অবশেষে তিনি জনপদকল্যাণীর একটি প্রতিমূর্তি পাষাণফলকে চিত্রিত করলেন। প্রিয়াস্বরূপ মূর্তিখানি ফুলের রেণু দিয়ে অনুলেপন করেন; বিবিধ পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করে আবেগভরে আলিঙ্গন করেন। মূর্তির প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন; কখনও বা প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়ে চিত্রখানি চুম্বন করেন।

এমনি ভাবে কত বিনিদ্র রজনী কাটে। কোথায় রইল বিনয় প্রতিপালন, আর কোথায় গেল অষ্টাঙ্গমার্গের অনুশীলন!

ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে তপশ্চর্যায় রত ভিক্ষুগণ জানতে পারলেন।

বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে অনেকে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত নন্দকে অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। স্ত্রীবিষয়ক মদাপবাদ প্রভৃতির দোষ বর্ণনা করলেন। কিন্তু করলে কি হবে। প্রিয়ার চিন্তায় নন্দের চিত্ত ভরপুর। বিহ্বলতা হেতু তিনি সকল উপদেশ শুনতে পেলেন না।

দিন যায়। দেখতে দেখতে তিন-চার মাস হয়ে গেল। নন্দের উন্মত্ততা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাধন-তপস্যার পরিবর্তে প্রিয়াকে স্মরণ-মনন করে নন্দের দিন কাটে।

সেদিন ভগবান জিন ভিক্ষায় গমন করেছেন। বিরহী নন্দ পাষাণফলকে অঙ্কিত প্রিয়ার প্রতিমূর্তি আলিঙ্গন করে স্বগতোক্তি করছেন—কল্যাণী, আমি যাব। তোমাকে ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও আমার কিছুমাত্র শান্তি নেই। অর্হতের পরিচ্ছদ ধারণ করে এরূপ আচরণ আমার শোভা পায় না। মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ বলে আমায় ভাবছ। কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার বিবেচনা করে দেখ, তা হলে বুঝতে পারবে কতটা অবস্থাবৈগুণ্যে এত নিষ্ঠুর হতে হয়েছে আমাকে। ক্ষমা কর দেবি, তুমিই আমার ইহকাল-পরকালের যথাসর্বস্ব। প্রভু ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে বিহার ত্যাগ করাই ভাল।

কিন্তু নন্দের আর যাওয়া হ'ল না। ভিক্ষু আয়ুস এসে জানালেন—প্রভু বুদ্ধ আপনাকে স্মরণ করেছেন।

ইতিমধ্যে নন্দের কীর্তি-কাহিনী ভগবান তথাগতের নিকট

পৌঁছেছে। স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী নন্দ। রূপমুগ্ধ সে। শুধু আদেশ-উপদেশে হবে না। নন্দের ভালবাসা কল্যাণী ভদ্রার দেহ-মাধুর্য্য কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। প্রেমাস্পদার প্রতি তার সকাম প্রেমকে নিষ্কাম প্রেমে পরিণত করতে পারলেই নন্দ মুক্তির পথ—অমৃতের আস্বাদন লাভে সমর্থ হবে। তাই অনুরাগ দ্বারা অনুরাগ নষ্ট করতে ইচ্ছা করে ভগবান সুগত নন্দকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

শাখাপ্রশাখা-বিলম্বিত এক প্রকাণ্ড নাগকেশর বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ভগবান জিন। ধ্যানগম্ভীর তাঁর মূর্তি। পরম বিনায়কের দেহনিঃসৃত জ্যোতিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত। তাঁকে ঘিরে রয়েছে শিষ্য-প্রশিষ্যেরা। প্রাভাতিক অনুষ্ঠানাদি সবে-মাত্র শেষ হয়েছে। এমন সময় নত মস্তকে সলজ্জভাবে নন্দ সেখানে এসে উপনীত হলেন। ভগবান তথাগতকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কনিষ্ঠের মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুদ্ধদেব সস্নেহে ডাক-লেন, নন্দ।

ভন্তে, আদেশ করুন।

তোমার চিত্তবিকারের কারণ কি? তুমি যা করছ তা ভিক্ষুর পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। তোমার এরূপ আচরণে সত্যিই আমি মর্মাহত।

ভন্তে, চিত্তচলনের জন্তে বাস্তবিকই আমি লজ্জিত, কিন্তু আমি উপায়হীন। আজও আপনার ভ্রাতৃবধূ শাক্য-কুললক্ষ্মী ভদ্রার কথা ভুলতে পারছি না। আমার সমস্ত অন্তর্লোক জুড়ে তিনি রয়েছেন। সাধন-তপস্তায় আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পূজ্য-চিহ্ন ধারণ করে আজ আমি ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ সম্পদ হারাতে বসেছি। আপনি অনুমতি দিন, আমি গৃহে যাব।

ভগবান জিন অভিনিবেশ সহকারে কনিষ্ঠের চিত্ত-বিভ্রমের কাহিনী শুনলেন। তিনি আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। পরম স্নেহভরে অনুজের হস্ত ধারণ করে বললেন, চল নন্দ, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে নন্দ দেখলেন, তাঁরা উভয়ে আকাশ-পথে উল্কাগতিতে কোথায় ছুটে চলেছেন। দেখতে দেখতে পায়ের নীচে সমস্ত পৃথিবী মিলিয়ে গেল। উভয়ে ভদ্রাধাধা বনস্থলভ ছায়াচ্ছন্ন সিদ্ধ-চারণ-সেবিত হিমবানের কোনও এক প্রদেশে উপনীত হলেন। কোথাও ময়ূরগণ পুচ্ছ গুটিয়ে বিশ্রামসুখ উপভোগ করছে; কোথাও বা কিন্নরীগণ ইতস্তত: বিচরণ করছে। নন্দ মুগ্ধনেত্রে এসব দেখছেন। পরমবিস্ময়ে তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না। এই সময় রক্তমুখী একচক্ষুহীন একটি বানরী দৃষ্টিপথে পতিত হ'ল। ভগবান সুগত কনিষ্ঠকে বললেন, আচ্ছা নন্দ, বল দেখি শাক্যকুলবধূ এবং এই বানরীর মধ্যে কে অধিক সুন্দর।

নন্দ ঈষৎ হেসে বললেন, ভগবন্, আপনি কি যে বলেন। আপনার ভ্রাতৃবধূ সুন্দরী ভদ্রার সঙ্গে কোনক্রমেই এর তুলনা সম্ভবে না।

মনে মনে হেসে ভগবান শ্রীবুদ্ধ নন্দকে সঙ্গে করে ইন্দ্রের নন্দনকাননে উপস্থিত হলেন।

অপূর্ব্ব দেশ! অপূর্ব্ব তার পরিবেশ! অপূর্ব্ব সঙ্গীতলহরী বাতাসে ভর করে ভেসে আসছে। সে স্বর্গীয় সঙ্গীত কর্ণে যেন সুধা ঢেলে দিচ্ছে। সমস্ত নন্দনকানন স্বপ্নময়।

এমন সময়ে চির-যৌবনা অপরূপ শ্রীবিশোভিতা লাস্যময়ী দেবাঙ্গনাগণ অদূরে আবির্ভূতা হলেন। নন্দ বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে সেদিকে চেয়ে রইলেন। কি অপূর্ব্ব দেহশ্রী! অপাঙ্গে সুতীক্ষ্ণ সায়ক।

অপ সরাগণের ভুবনমনোমোহিনী সৌন্দর্য্য দর্শনে নন্দের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। অনুরাগে নন্দের দেহ রোমাঞ্চিত হচ্ছে। একান্ত প্রেমাস্পদা সুন্দরী ভদ্রাকে তিনি বিস্মৃত হলেন। বিস্মৃত হলেন মহাপ্রজাপতি গোতমীকে। কোথায় রইল আবাল্যের ক্রীড়াভূমি কপিলবাস্তু! সবকিছু বিস্মৃতির অতল সাগরে তলিয়ে গেল। তাঁর সমস্ত দেহমন একান্ত উন্মুখ হয়ে উঠল স্বর্গবিলাসিনীদের ভোগ করবার জন্তে। তাঁকে বড়ই ম্রিয়মাণ দেখাতে লাগল।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান জিন। মধুর স্বরে নন্দকে বললেন, ভাল নন্দ, এবার সত্য করে বল দেখি শাক্যকুলগর্ব্ব ভদ্রাদেবী অথবা এই সব দেবাঙ্গনা—এদের মধ্যে রূপে ও গুণে কে তোমার নিকট শ্রেষ্ঠ?

অনন্তযৌবনা অপ্সরাগণের প্রতি জাতানুরাগ নন্দের হৃদয় তখন অনুরাগে জর্জ্জরিত। তিনি উত্তর দিলেন, ভন্তে, এঁরা দিব্যাঙ্গনা, আর আপনার ভ্রাতৃবধূ মানবী। এঁরা চিরজীবী, কিন্তু শাক্যানী ভদ্রা জরামৃত্যুর অধীন। কোন বিষয়েই এঁদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য নেই, তুলনা কিরূপে সম্ভবে!

তবু বল, শুনি।

ভগবন্, এঁদের তুলনায় জনপদকল্যাণী ভদ্রা ওই এক-চক্ষুহীন বানরীর ন্যায়। পূর্ব্বে একমাত্র ভদ্রাদেবীকেই রমণীকুলপ্রধানা মনে করে গর্ব্ব অনুভব করতাম। আজ আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। দেখছি, এঁদের তুলনায় শাক্যানী কত তুচ্ছ!

শোন নন্দ, একমাত্র তপোবল দ্বারা এঁদের লাভ করা যায়, অন্য কিছুতেই নয়।

যদি অপ্সরাগণকে পেতে চাও, তবে অপ্রমত্ত হয়ে বিনয় পালন করে স্থিরব্রহ্মচারী হও; দেখবে সমস্ত অপ্সরা তোমার চিত্তবিনোদন করছে। এ বিষয়ে আমি অঙ্গীকার করছি। কেমন রাজী আছ?

নন্দ সলজ্জভাবে বললেন, ভন্তে, তাই যদি হয়, আপনার

শ্রীপাদপদ্ম ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করছি, আজ থেকেই আমি নিবিষ্টচিত্তে বিনয় প্রভৃতি পালন করব।

আবার জেতবন-বিহার। এবার সাধন-তপস্যা মোক্ষলাভের জন্যে নয়, স্বর্গবিভাধরীগণের নিমিত্ত। অপ্সরাগণের চিন্তা এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনে তাঁর দেহশ্রী বহুলাংশে ম্লান পেয়ে শরীর ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হ'ল।

প্রিয়ভার্য্য নন্দ। আজ কিনা ভার্য্যাবিষয়ে তিনি বিগত-স্পৃহ। আশ্চর্য্য মানুষের মন! সমবয়সী ভিক্ষুদের মধ্যে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা হয়।

নন্দ যেখানে যোগাসনে নিমীলিত নয়নে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন, সেখানে স্থবির আনন্দ ধীর পদক্ষেপে উপনীত হলেন। ক্ষণকাল নন্দের তপক্লিষ্ট মুখের পানে চেয়ে রইলেন। আহা বেচারী নন্দ! স্থবির আনন্দ পরম স্নেহভরে ডাকলেন, আয়ুষ্মান্, একবার কৃপাদৃষ্টি করুন।

নন্দ ধীরে ধীরে স্থবির আনন্দের প্রতি তাকালেন। দৃষ্টিতে পরম বিস্ময়। ম্লান পদ্মসদৃশ বিরস বদন নন্দের।

আনন্দ বললেন, আয়ুষ্মান্, শুনতে পাচ্ছি আপনি অপ্সরা লাভের জন্যে ধর্ম্ম আচরণ করছেন। এ কথা কি সত্যি কিংবা পরিহাস?

আনন্দের কথায় নন্দ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে অধো-বদনে নীরব রইলেন। নন্দের মৌনভাব দেখে আনন্দ বুঝতে পারলেন, তাঁর অনুমান মিথ্যা নয়। তখন তিনি ধীরে ধীরে বললেন, ভদ্র, আপনার এই ব্রতপালন বাহ্যিক, আন্তরিক নয়। আপনার হৃদয় কামাগ্নিতে প্রদীপ্ত। কিন্তু বিস্মৃত হবেন না, কামের প্রার্থনা দুঃখময়; সুকর্ম্মের অবসানে মানুষ আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। যদি প্রকৃত আনন্দ পেতে চান, তা হলে অধ্যাত্মবিষয়ে মন দিন।

আনন্দের প্রমুখাৎ স্বর্গও পরিণামে দুঃখাবহ অতৃপ্তিদায়ক এবং ক্ষয়শীল জেনে প্রব্রজিত নন্দ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি স্বর্গকে ধ্রুব মনে করে অপ্সরালাভের জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন। এবার তিনি স্বর্গসুখের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন, স্থবির আনন্দকে অশেষ ধন্যবাদ জানালেন। অপ্সরাদর্শনে তিনি প্রিয়তমা ভার্য্যা সুন্দরী ভদ্রাকে বিস্মৃত হয়েছিলেন; এবার অপবর্গপ্রাপ্তির জন্যে ব্যাকুল হলেন।

স্থবির আনন্দকে বিদায় দিয়ে নন্দ ভগবান জিনের সকাশে উপনীত হলেন। তথাগতকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করে অনুতপ্ত হৃদয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভগবান তথাগত প্রশান্ত চিত্তে তাঁর দিকে তাকালেন। দেখলেন, লজ্জারুণ মুখ নন্দের; নয়নদ্বয় বাষ্পাকুল।

ব্যাপার কি, নন্দ?

ভন্তে, বড়ই অস্বস্তি বোধ করছি। আত্মনিয়ম পালন ও ধ্যানাদি দ্বারা স্বর্গলাভ হলেও কালে কর্ম্মক্ষয় হলে নাকি পৃথিবীতে আবার ফিরে আসতে হয়। এরূপ স্বর্গে আমার প্রয়োজন নেই। অপ্সরালাভের জন্যে ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর আপনার প্রতিভূ থাকবার দরকার নেই।

সাধু চক্ষুষ্মান্ নন্দ, সাধু। বুঝলাম এতদিনে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। তোমার হৃদয়ে শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মেছে। তমোগুণ আর তোমায় আকর্ষণ করতে পারবে না। সদ্ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন শ্রদ্ধার প্রতি নিষ্ঠাবান্ হও। দেখবে মার ও তার বিকটাকার অনুচরগণ তোমার ত্রিসীমায় আসতে পারবে না। জরা-ভীতি এবং পার্থিব প্রলোভনাদি আর তোমার কিছুই করতে পারবে না।

ভন্তে, আপনার অনুশাসন যথাযথ পালন করতে চেষ্টা করব। আমি আজ ধন্য।

ভগবান জিন অমৃতপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ আর্য্যসত্য সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যা করে অনুজকে শোনালেন। শ্রীবুদ্ধের উপদেশে নন্দ অমৃত-স্নাত হয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। অনন্তর তিনি গুরুদেবকে ভক্তিভাবে প্রণাম করে বললেন, ভন্তে, আশীর্ব্বাদ করুন অভিলাষে যেন সমর্থ হই।

বৎস, তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হোক।

আবার তপশ্চর্য্যা। এবার সাধনা পূর্ব্বের চেয়ে কঠিন। বীরাসনে উপবিষ্ট নন্দ। কায়গত স্মৃতি এবং আত্মাতে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করে যোগাভ্যাস করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে পাঁচ পাঁচটি বসন্ত তাঁর অত্যুগ্র সাধনাকে প্রণতি জানিয়ে গেল।

এক দিন রাত্রিশেষে চারদিক যেন এক স্বর্গীয় মূর্চ্ছনায় জেগে উঠেছে। দিব্য গন্ধ ও পুণ্যবায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। অশেষ কৃচ্ছ্রসাধনের পর নন্দ অর্হত্ব লাভ করেছেন। তাই কি দেবদুন্দুভি-নিনাদ শোনা যাচ্ছে! দেখতে দেখতে নবারুণচ্ছটায় পূর্ব্বদিক সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পুণ্যভূমি জেতবন বিহারে সুরু হয় প্রাভাতিক অনুষ্ঠান। কাকলি-মুখরিত বনভূমি।

নবজীবনের প্রথম প্রভাত। অর্হত্বলাভের সংবাদ দিতে হবে ভগবান জিনকে। পুষ্প-প্রকীর্ণ বনপথ অতিক্রম করে নন্দ জ্যেষ্ঠের সকাশে উপনীত হলেন। ভগবান তথাগত দেখলেন, প্রজ্ঞার আলোকে ঝলমল করছে কনিষ্ঠের আনন-খানি। পদপ্রান্তে আনমিত প্রিয় ভ্রাতার মস্তকে স্বীয় চক্র-লাঞ্ছিত করপল্লব স্থাপন করে আশীর্ব্বাদ করলেন।

বৎস নন্দ, সাধনায় তোমার সিদ্ধিলাভে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। বহু দিনের আশা; তোমাকে সন্ন্যাশ্রমে জয়ধ্বজাবাহী দেখব। তুমি আমার সে ইচ্ছা পূরণ করেছ।

গদ্গদচিত্তে স্থিরবুদ্ধি নন্দ কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, ভন্তে, প্রাতিভাসিক জগতের বন্ধন থেকে আপনি আমায় মুক্ত করেছেন। আর আমার ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষা নেই;

আপনার করুণায় ত্রিবিধ সংসারের মোহ থেকে মুক্ত হয়েছি। পুনরায় আপনি অনুজের প্রণাম গ্রহণ করুন।

সৌম্য নন্দ, আজ তুমি যে বোধি লাভ করেছ তা জগতের কল্যাণে প্রচার কর। অমৃতের পুত্রেরা ভোগাসক্ত হয়ে অশিবের পূজায় রত, তাদের তুমি অমর জীবনের পথে পরিচালিত কর।

প্রভো, আপনার আদেশ শিরোধার্য।

আর একটি কথা। প্রজাবতী সুন্দরী ভদ্রাকে সদ্ধর্মে দীক্ষিত করবে। তাঁর প্রতিও তোমার কর্তব্য রয়েছে।

যথা আজ্ঞা দেব।

কপিলবাস্তুর রাজপথ। সৌম্যদর্শন প্রশান্তচিত্ত নিয়তকর্মা কাষায়বস্ত্রপরিহিত মুণ্ডিতমস্তক নন্দ ভগবান বুদ্ধের মহাবাণী প্রচার করে চলেছেন। অগণন জনতা। সবাই বিস্মিতচিত্তে বলাবলি করছে, কি আশ্চর্য! মোহাসক্ত প্রিয়ভার্য্য রাজপুত্র নন্দ কিনা আজ মোক্ষের কথা বলছেন।

এমন সময়ে সমবেত নর-নারী সবিস্ময়ে দেখতে পেল, আলুলায়িতকুন্তলা স্রস্তবসনা নিরাভরণা ক্ষীণাঙ্গী প্রিয়দুঃখকাতরা শাক্যকুলবধূ সুন্দরী ভদ্রা পাগলিনীর ন্যায় ছুটে আসছেন। সবাই সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে। ভদ্রা প্রব্রজিতের সম্মুখে এসেই তাঁর চরণপ্রান্তে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন।

বহুকাল পরে ধর্মসহচরীর দর্শনে অর্হতের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল কি! নন্দ শান্ত অথচ গাঢ়স্বরে ডাকলেন, কল্যাণী ভদ্রা, ওঠ।

দয়িতের আহ্বানে ভদ্রা ধীরে ধীরে মুদিত নয়নপল্লব উন্মীলন করলেন। অস্ফুট স্বরে ডাকলেন, আর্য্যপুত্র।

দেবি!

অভাগিনী ভদ্রার কথা কি এতদিনে মনে পড়ল! ওগো পাষাণ-দেবতা, আর আমায় পরিত্যাগ করে যেও না। প্রাসাদে ফিরে চল।

দেবি, নশ্বর ভোগবিলাসের প্রতি অযথা আমায় আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করো না। ত্রিরত্নের শরণ লও। দেখবে অধ্যাত্মের তুল্য প্রশান্ত ও অনবদ্য রতি আর নেই। শরীর অপবিত্র, দুঃখজনক, অনিত্য এবং নিরাত্মক। যৌবন দ্রুত চলে যায়, ফিরে আসে না।

মানব-জীবনের ভয়াবহ পরিণতির কথা শুনে সুন্দরী ভদ্রা ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বললেন, স্বামিন্, আমায় বলে দাও, এখন আমার কর্তব্য কি।

কল্যাণী, ভগবান নিজ কৃপা করে তোমার পথনির্দেশ করে দিয়েছেন। আমার পথই তোমার পথ। সদ্ধর্মে দীক্ষিতা হও। ভগবান তথাগত-প্রবর্তিত ধর্মচক্রের সাহায্যে স্ত্রীলোকদের মোক্ষসাধনায় অনুপ্রাণিত কর।

প্রভো, তোমার ধর্মই আমার ধর্ম। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

ভগবান তথাগত তোমার মঙ্গল করুন। প্রভু বুদ্ধকে প্রণাম করবে চল।

মূর্তিমতী ভক্তির ন্যায় ভদ্রা চক্ষুষ্মান্ নন্দের অনুগমন করলেন। সমবেত নর-নারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।*

---

* মহাকবি অশ্বঘোষ প্রণীত 'সৌন্দরনন্দ' কাব্য অবলম্বনে।

কবি-প্রশস্তি

শ্রীগোপাললাল দে

'তোমারে যে জানি' একথা বলিব কেমন করে',
'জানি না তোমারে' হেন কথা বলা বিষম দায়;
'তোমারে জানায় সাধনা লয়েছি জীবন ভরে';
স্পর্দ্ধা-সুলভ এত গৌরব সাজে না হায়।

জীবনে জেগেই হেরেছি রবিরে জ্যোতির্ময়,
কবির ভাষাই বাঙালীর তথা ভারতী-ভাষা,
কায়মনোবাক্ সাধনা তোমার রূপ নিল জাতি-অভ্যুদয়,
গান্ধী সুভাষ জওহরে পূরে তোমার আশা।

বলিষ্ঠ দেহে প্রবল কর্মে প্রচুর জ্ঞানে,
অবারিত জ্ঞানে অ-বঙ্গ দেশে মানব-প্রীতি;
আমরা দেশের তথা মানবের, ভারতের গেহ সকল স্থানে
অসীমে সীমার মিলায় দুয়ার তোমার গীতি।

মহাভারতের ঋষি-কবি-বাণী দেশে কালে চলে নির্বিশেষ,
'আমার জীবনে লভিয়া জীবন, জাগোরে সকল দেশ।'

এশিয়ার পুনর্গঠন ঃ নূতন জাপানের বিস্ময়কর উন্নতি

শ্রীঅন্নাসাহেব সহস্রবুদ্ধে

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

সজীব শিক্ষা-ব্যবস্থা

সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের দৃষ্টি : জাপানের এই যে প্রগতি—স্বতঃই যাহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহার কৃতিত্ব বহুলাংশে তথাকার শিক্ষা-পদ্ধতির প্রাপ্য। জাপানী পিতা মাতা সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য তাহারা অশেষ যত্নও করে। এইজন্য তাহারা ত্যাগস্বীকারও করিয়া থাকে। বালক-বালিকা উভয়ের পক্ষেই শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। নয় বছর তাহাদের স্কুলে যাইতেই হয়। এই নয় বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসরের শিক্ষাকে প্রাথমিক বলা হয়, পরের তিন বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষা বলিয়া গণ্য। সাধারণতঃ ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বালক-বালিকারা পাঠশালায় ভর্ত্তি হয় এবং বয়স পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পড়িতেই হয়। প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ব্বে শিশুদের শিশুশিক্ষায়তনে দুই বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু তাহা বাধ্যতামূলক নহে। আর সকলের পক্ষে তাহা সুলভও নহে। যে গ্রামেই যাইবেন, দেখিতে পাইবেন যে প্রাথমিক পাঠশালার গৃহ অতি চমৎকার। গ্রামের লোকেরা তাহাদের শিক্ষা-নিকেতনকে গ্রামের ভূষণ ও গৌরব মনে করিয়া থাকে। প্রাথমিক পাঠশালা—অর্থাৎ প্রথম ছয় বৎসর বালক-বালিকারা যে পাঠশালায় যায় তাহা গ্রামের সংলগ্ন হওয়া চাই। পাঠশালায় পৌঁছিতে বালক-বালিকাদের এক মাইলের অধিক যাইতে না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠশালা-গৃহ নির্ম্মাণ করা হয়। মাধ্যমিক স্কুল-গৃহ দুই-তিনটি গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুল-গৃহ কোন গ্রাম হইতে দুই-আড়াই মাইলের অধিক দূরে নহে। স্কুল-গৃহগুলি দেখিতে যেমন সুদৃশ্য, তেমনি তাহাতে হাওয়াও খেলে পর্য্যাপ্ত। প্রত্যেক স্কুলে এক-একটি প্রশস্ত ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ আছে। অনেক ক্ষেত্রে স্কুলের ছোটখাটো বাগানও থাকে। পাঠশালায় দ্বিপ্রহরের আহারের জন্য প্রশস্ত ভোজনাগারের ব্যবস্থা আছে। পাঠশালার অপর সমবেত কাজেও ঐ গৃহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রামবাসীদের দায়িত্ব : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের গৃহ গ্রামবাসীদের তৈরি করিয়া দিতে হয়। ইহা জাপানের প্রথা। শিক্ষা-বিভাগ হইতে প্রতি বৎসর গ্রামবাসীদের নূতন স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণের, অথবা পুরাতন গৃহের আয়তনবৃদ্ধির নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের বিবেচনার নিমিত্ত শিক্ষা-বিভাগ পরিকল্পনাও পাঠাইয়া থাকে। পাঠশালা নিজ গ্রামের সম্পদস্বরূপ—এই ধারণাবশতঃ অনেক স্থলে গ্রামবাসীরা সরকারী নির্দ্দেশ অপেক্ষা অধিক ব্যয়ে সুবৃহৎ মনোরম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। তার জন্য তাহারা নিজেরা মজুরি করে, চাঁদা দেয়। গাঁয়ের কাহারও নিজের বন থাকিলে স্কুল-গৃহের জন্য কাঠ ইত্যাদিও দিয়া থাকে। এক গাঁয়ে দেখিলাম সোয়া লাখ টাকা ব্যয়ে পাঠশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে একটি পল্লীর সকল লোকে পাঠশালা পর্য্যন্ত এক মাইল লম্বা রাস্তার দুই দিকে মাটি ফেলার কাজ করিয়া সবটা মজুরি—সাড়ে চারি হাজার টাকা স্কুল-তহবিলে দিয়া দিয়াছে। অপর এক পাড়ার লোকেরা দুই রাত্রি জাল ফেলিয়া সমস্ত রোজগার—প্রায় কুড়ি হাজার টাকা স্কুলকে দিয়াছে। কাঠ-মিস্ত্রী, কামার ও অপর কারিগরেরা অতিরিক্ত কাজ করিয়া যে বাড়তি রোজগার করিয়াছে তাহা স্কুল-ফণ্ডে চাঁদা দিয়াছে। এই সব সত্ত্বেও যে টাকা ঘাটতি পড়িয়াছিল, প্রত্যেক গৃহস্থের কাছ হইতে তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা তুলিয়া তাহা পূরণ করা হয়। স্কুল-গৃহ এতই সুন্দর যে, গ্রামের লোকেরা গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারে, এমন সুন্দর স্কুল দশ মাইলের মধ্যে আর একটি নাই। স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়াতেই গ্রামবাসীদের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। বেঞ্চি, ব্ল্যাক-বোর্ড ইত্যাদি শিক্ষার যাবতীয় উপকরণ তাহাদেরই যোগাইতে হয়। বছরের পর বছর এই সব উপকরণ বাড়িয়া চলে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ জাপানী ভাষা, সমাজবিদ্যা, গণিত, গান-বাজনা, নৃত্য, চিত্রকলা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, হস্তশিল্প, শারীরশ্রম, ব্যায়ামাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। শিল্পের প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হয়—ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক দুই-ই। কৃষি, বৃক্ষ সংবর্দ্ধন, স্থানীয় শিল্প ব্যবসাদি, বাগ-বাগিচা ইত্যাদির সহিত বালক-বালিকাদের যাহাতে অনায়াসে পরিচয় ঘটে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম নির্দ্ধারণ করা হয়।

মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম : তিন বর্ষব্যাপী মাধ্যমিক (লোয়ার সেকেণ্ডারি) পাঠ্যক্রম কতকগুলি বিষয় অবশ্যপাঠ্য, আর কতকগুলি স্বেচ্ছা-গ্রাহ্য। জাপানী ভাষা, সমাজবিদ্যা, গণিত, সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য, চিত্রকলা, শারীরশ্রম, ব্যায়াম, হস্তশিল্প, ইত্যাদি অবশ্যপঠনীয়। বিদেশী ভাষা (ইংরেজীই ছাত্রছাত্রীরা

সাধারণতঃ লইয়া থাকে) ও শিল্প-কারিগরি-শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয়। এই মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম এমন ভাবে রচনা করা হয় যে, যে ছাত্র উত্তরজীবনে কৃষক হইতে ইচ্ছা করে সে যেন কৃষি ও মিস্ত্রীর কাজ ঐচ্ছিক বিষয় রূপে লইতে পারে। প্রাদেশিক অবস্থাভেদে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনমত হেরফের করা চলে। কৃষি, বৃক্ষ-সংবর্দ্ধন, পল্লীর অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ক পাঠ্য পুস্তকে অনেকগুলি পাঠ থাকে। এই কারণে বালক-বালিকাদের মনে কৃষি ও শিল্প-কারিগরি ইত্যাদির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল : উক্ত নয় বছরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাতে বিশেষ বিশেষ বিষয় ও শিল্প ব্যবসায়াদিবিদ্যা বিশেষ ভাবে অধ্যয়নের নিমিত্ত বালকেরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (অপার সেকেণ্ডারি) প্রবেশ করে। সাধারণতঃ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের নিমিত্ত জাপানে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে :—কৃষি ও বৃক্ষ-সংবর্দ্ধন, (২) যন্ত্রতন্ত্রবিষয়ক (টেকনিক্যাল), (৩) ব্যবসা-বাণিজ্য, (৪) মৎস্যপালন, (৫) মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (ডোমেষ্টিক সায়েন্স), (৬) সাহিত্য, কলা, শিল্প ইত্যাদি সাধারণ বিষয়।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার স্কুল : মেয়েদের গার্হস্থ্য-ব্যবস্থা বিষয়ক শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল আছে। তবে তাহারা ইচ্ছা করিলে অপরাপর বিষয়ের অধ্যাপনা যে স্কুলে হয়, সে স্কুলেও পড়িতে পারে। যে সব বিদ্যার্থী পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে এই সব স্কুলে উচ্চ ধরণের উপপত্তিক (theoretical) শিক্ষা দেওয়া হয়। আর যাহারা মাধ্যমিক শিক্ষাতে চাকরি বা উপার্জ্জনের জন্য অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহে তাহাদের সেই সেই বিষয়ে উচ্চাঙ্গের ব্যবহারিক শিক্ষাদান করা হয়। যে সব ছাত্রের পক্ষে দিনের বেলা স্কুলে যাওয়া অসুবিধাজনক তাহাদের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় রহিয়াছে। কোন বিদ্যার্থী যদি কেবলমাত্র একটি বিষয় পড়িতে চাহে ত সে সুযোগও আছে। তবে নৈশ স্কুলে যাহারা যায়, তাহাদের দুই বৎসরের স্থলে তিন বৎসর পড়িতে হয়।

স্কুলের সময় : সাধারণতঃ এই সকল স্কুল সকাল সাড়ে আটটায় বসে ও দ্বিপ্রহরে আড়াইটায় সময় ছুটি হয়। দুপুর বারোটা হইতে একটা পর্য্যন্ত খাওয়ার জন্য ক্লাস বন্ধ থাকে। প্রত্যেক ছাত্র সঙ্গে খাবার লইয়া আসে এবং বড় 'হল'ঘরে সকলে একসঙ্গে বসিয়া আহার করে। প্রত্যেক ঘণ্টার পরে দশ মিনিটের ছুটি তাহারা পায়। ঐ সময় তাহারা ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে গিয়া খেলে, এবং তাজা হইয়া অন্য পাঠ গ্রহণের জন্য ক্লাসে আসে। বিদ্যালয়ে শতকরা উপস্থিতি শতকরা নিরানব্বুই।

সহ-শিক্ষা : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বালকদের মাথা নেড়া করিতে হয়। মেয়েদেরও এক বিশেষ ঢঙে চুল কাটাইতে হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রেরা লম্বা চুল রাখিতে পায়। বিদ্যার্থিনীদের লিপষ্টিক ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ।

বিদ্যালয়ে শিক্ষোপকরণের সুলভতা : বিদ্যালয়মাত্রেই শিক্ষার যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও সুযোগ সুবিধার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছোট বালক-বালিকাদের জন্য মাইক্রোফোনের বন্দোবস্ত আছে। পালাক্রমে বালকেরা উহাতে কথা বলার শিক্ষা পাইয়া থাকে। গান, বাজনা ও নৃত্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা বিদ্যালয় মাত্রেই থাকে, আর তার জন্য একটি আলাদা হল-ঘরও থাকে। প্রথম শ্রেণী হইতেই চিত্রকলা শেখানো হয়। বালক-বালিকারা কাগজ, পেন্সিল, রং ইত্যাদি বাড়ী হইতে আনে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম ও প্রশস্ত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ থাকে। বেসবল জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় খেলা। প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সেলাই-কল, রন্ধনের হাঁড়ি-কুঁড়ি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য হাতিয়ার, কাঠ-মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি ও বাগ-বাগিচার সামগ্রী থাকে। মেয়েরা পালাক্রমে নিজেদের বাড়ী হইতে রান্নার বাসন-কোসন, তরি-তরকারি ইত্যাদি লইয়া আসে, রান্না করিয়া তাহারা পরিবেশন করিয়া থাকে। প্রত্যেক পাঁচটি মেয়ের জন্য একটি সেলাই-কল থাকা চাই—ইহা নিয়ম।

শিক্ষক-অভিভাবক সঙ্ঘ : প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার সহিত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের খুব নিকট সম্বন্ধ। প্রত্যেক পাঠশালার এক-একটি শিক্ষক-অভিভাবক সঙ্ঘ আছে। গাঁয়ের যে-কোন অভিভাবক এই সঙ্ঘের সদস্য হইতে পারেন। কখনও কখনও অন্য লোককেও সদস্য করিয়া লওয়া হয়। এই সকল সদস্য নিজেদের মধ্য হইতে এক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন করিয়া লন। প্রতি মাসে ঐ সমিতির ও শিক্ষকদের সংযুক্ত বৈঠক বসে। প্রত্যেক সদস্যকে এই সঙ্ঘে মাসিক চাঁদা দিতে হয়। ঐ টাকা পাঠশালার উপকরণবৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। প্রতি মাসে একবার সকল অভিভাবক পাঠশালায় আসেন এবং তাঁহাদের বালক-বালিকাদের শিক্ষা কিরূপ হইতেছে তাহা নিরীক্ষণ করেন। তার পর শিক্ষক ও অভিভাবকদের সংযুক্ত বৈঠকে ছাত্রদের ও পাঠশালা সম্বন্ধে আলোচনা চলে। কোন্ ছাত্রের কোন্ বিষয় লওয়া উচিত এবং কেন লওয়া উচিত এ সম্বন্ধে ঐ বৈঠকে আলোচনা হইয়া থাকে। অভিভাবকদের মধ্যে সকলেই শিক্ষিত ও বিজ্ঞ।

তাঁহারা মধ্যে মধ্যে পাঠশালায় আসেন বলিয়া শিক্ষকেরা তাঁহাদের সমীহ করিয়া চলেন।

ছুটির সদ্ব্যবহার : জাপানের বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মের ছুটি ২১শে জুলাই হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত। বন্ধের সময়ে স্কুল হইতে ছাত্রদের ভ্রমণে লইয়া যাওয়া হয়। আট-দশ দিনের জন্য তখন তাহারা শিবিরে থাকে। সমুদ্রের ধারে উপযুক্ত স্থানে এই সব শিবির সংস্থাপিত হয়। ছাত্রদের সহিত শিক্ষকেরাও থাকেন। তখনকার প্রধান কার্য্যক্রম হইতেছে সাঁতারকাটা ও খেলা। এই কার্য্যে অভিভাবকদেরও সহযোগিতা পাওয়া যায়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা পালাক্রমে অভিভাবকেরাই করেন। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছুটির সময়ে নিজ নিজ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের নিমিত্ত কৃষিক্ষেত্রে বা কারখানায় গিয়া কাজ করে। কতক ছাত্র ঐ কর্ম্মের বিনিময়ে বেতনও পায়। ছুটি ভিন্ন অন্য সময়ে পাঠশালায় ও পড়াশুনার কাজের অবকাশে বালক-বালিকারা মা-বাপের কাজকর্ম্মের সহায়তা করিয়া থাকে। ধান রোপণের সময়ে ঐ সকল বিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র এবং কারখানার বহু শ্রমিক এখানে-সেখানে ঐ কাজে লাগিয়া যায়। ছুটির সময়ে কখন কখন শিক্ষক ও ছাত্রেরা মিলিয়া রাস্তাঘাট তৈরি করে, সাফাই বা অন্য কোন সার্ব্বজনিক কাজও করিয়া থাকে।

শিক্ষক : ১৯৫০ সালে জাপানে ছয় লক্ষ পনর হাজার দুই শত পঁচাত্তর জন প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। তন্মধ্যে তিন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাত শত পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ এবং দুই লক্ষ বিশ হাজার পাঁচ শত চৌদ্দ অর্থাৎ শতকরা ৩৮ জন ছিলেন স্ত্রীলোক—অবশিষ্টেরা ছিলেন অর্দ্ধ সময়ের শিক্ষক। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া যাহারা শিক্ষকতা করিতে চাহেন, তাঁহাদের চারি বৎসর শিক্ষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে হয়—ইহা সাধারণ নিয়ম। ইহাদের ফার্ষ্ট গ্রেড শিক্ষক বলা হয়। কোন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদেরও শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁহাদিগকে পাঁচ বছর পরে একবার ও দশ বছর পরে আর একবার পরীক্ষা দিতে হয়। এইরূপ শিক্ষকদের দশ বছর পরে সেকেণ্ড গ্রেড পদে উন্নীত করা হয়। সাধারণতঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকদের বেতন মাসিক সত্তর টাকা, সেকেণ্ড গ্রেড শিক্ষকদের মাহিনা আশি টাকা ও ফার্ষ্ট গ্রেড শিক্ষকদের নব্বই টাকায় আরম্ভ হয়। তা ছাড়া বিবাহিত শিক্ষকেরা পত্নীর জন্য দশ, প্রথম সন্তানের জন্য দশ ও পরবর্ত্তী প্রত্যেক সন্তানের জন্য মাথাপিছু আট টাকা করিয়া মাসিক ভাতা পাইয়া থাকেন। শিক্ষকদের মাহিনা বাড়িতে বাড়িতে ঊর্দ্ধকল্পে দুই শত পর্য্যন্ত হইতে পারে। মাহিনাবৃদ্ধি নির্দ্ধারিত নিয়ম অনুসারে ত হয়ই, উপরন্ত শিক্ষকের যোগ্যতানুষ্ঠেও হইয়া থাকে।

প্রত্যেক শিক্ষককে সপ্তাহে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাকে সাড়ে আটটা হইতে আড়াইটা পর্য্যন্ত, এবং কখনও কখনও তাহার পরেও পাঠশালার কাজ করিতে হয়। ছেলেদের সঙ্গে তাঁহাদের খেলিতেও হয়। দীর্ঘ ছুটিতে তাঁহাদের ভ্রমণে বাহির হইতে, শিবিরে বাস করিতে, রিফ্রেশার কোর্স ইত্যাদি গ্রহণ করিতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় : উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে স্বল্পসংখ্যক বিদ্যার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মত বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপনার নিমিত্ত পৃথক পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। মেয়েদের আলাদা তেত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয় জাপানে রহিয়াছে। মেয়েদের জন্য চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিত্রকলা, গান-বাজনা, নৃত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সেখানে বহুসংখ্যক মেয়ে পড়ে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষার মাধ্যম জাপানী ভাষা। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, লেকচারার ইত্যাদি মিলিয়া উনচল্লিশ হাজার, কুড়ি জন লোক কাজ করেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই হাজার সাত শত মহিলা আছেন। পঞ্চাশ হইতে সত্তর বৎসর বয়সের অধ্যাপকের সংখ্যা দুই হাজার সাত শত পঁয়ষট্টি। একাত্তর বৎসরের অধিকবয়স্ক অধ্যাপক আছেন এক শত ছাব্বিশ জন। তাঁহাদের অনেকে গবেষণা-কার্য্যে লিপ্ত।

—

নাথ পন্থ—শ্রীকল্যাণী মল্লিক। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৮৮। বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধ নাথ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইতিবৃত্ত আলোচ্য পুস্তিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী' নামক বৃহৎ গ্রন্থে লেখিকা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। লেখিকার মতে 'নাথ ধর্ম্মকে তন্ত্র ও যোগের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। নাথ যোগীরা প্রধানত শৈব, তাই তাঁহারা শৈব তান্ত্রিক নামে পরিচিত।... অবধূত আদর্শবাদী নাথ গুরুরা কৌল...নাথপন্থে বৌদ্ধ সহজিয়াদের রহস্যবাদও কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে' (পৃঃ ৩৩, ৩১, ৩৬)। এই সম্প্রদায়ের আচারগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখিকা বলিয়াছেন—'যোগীদের মধ্যে জাতিভেদ নাই।...মাংস আহার নিষিদ্ধ না হইলেও মৎস্য হইতে মৎস্যেন্দ্রনাথ জাত বলিয়া মৎস্য আহার নিষিদ্ধ। এখন এই সকল যোগীর উপাস্য দেবতা ধর্ম্মঠাকুর' (পৃঃ ২০, ১৫)। এগুলি কোন্ স্থানের যোগীদের বৈশিষ্ট্য তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। তবে বাংলার যোগীদের সম্বন্ধে এসব উক্তি ঠিক খাটে বলিয়া মনে হয় না। একদা 'যে যোগীজাতি বঙ্গদেশে ও পূর্ব্ব-ভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন'—যাঁহারা 'রাজাদের গুরু ছিলেন, সন্ন্যাসী হইলেও ধর্ম্মযুদ্ধাদিতে যোগ দিতেন, আবার দর্শনের গ্রন্থ ও পদ্যাদি রচনা করিতেন' (পৃঃ ১৪) তাঁহাদের সে গৌরব কখন কি ভাবে ক্ষুণ্ণ হইল সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা লেখিকা করেন নাই। আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি এসম্পর্কে পাঠকের ঔৎসুক্য নিবারণে যত্নবতী হইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বিদায় বর্ম্মা—শ্রীমানসী মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

১৯৪২ সালে জাপানী আক্রমণের সময় ব্রহ্মদেশ হইতে বহু ভারতীয় হাঁটাপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই পথ ছিল দীর্ঘ, দুর্গম এবং বিপৎসঙ্কুল। লেখিকা তাঁহার স্বামী ও কন্যা সমভিব্যাহারে এই পর্ব্বত-অরণ্যময় দুর্গম পথ কখনও পদব্রজে, কখনও বা নানাবিধ যানে অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। সখের ভ্রমণ ও প্রাণের দায়ে পথ অতিবাহন এই দুইয়ে আকাশপাতাল প্রভেদ। একটিতে দেশ ও মানুষ, দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মানুষের রীতিনীতি প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া উপভোগ করিয়া খোশ মেজাজে বর্ণনা দেওয়া স্বাভাবিক। অন্যটিতে কায়িক ক্লেশ, প্রতিদিন আশ্রয় ও আহার্য্য সংগ্রহের চেষ্টা, পরিজনসহ সুস্থ দেহে নির্বিঘ্নে দেশে পৌঁছানোর দুশ্চিন্তা প্রভৃতি লইয়া মানসিক প্রফুল্লতা বজায় রাখা দুষ্কর। অথচ লেখিকা এই সব বিপত্তিকে গ্রাহ্য না করিয়া দু'চোখ ভরিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসুধা পান করিয়াছেন এবং তাহারই মধ্যে ছবি আঁকিয়াছেন অজস্র। তাঁহার প্রকৃতি-দর্শনের সমারোহে পথের ক্লেশ তো মুছিয়া গিয়াছেই—পথের দুর্গমতাও ঘুচিয়া গিয়াছে। পাঠকও বহুবিস্ময় এই পথযাত্রাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিবেন।

রাম রহিম—শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য আড়াই টাকা।

বিগত মহাযুদ্ধের আঘাতে পৃথিবীর মানচিত্রই শুধু বদলায় নাই, মানুষের সমাজ-ব্যবস্থাও রীতিমত উল্টাইয়া দিয়াছে। পুরাতন নীতি-আদর্শবাদের সঙ্গে সৎ বৃত্তিগুলিও বুঝি নিঃশেষিত হইয়াছে। জগৎময় আজ অস্থিরতা অশান্তির প্রসার। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এইগুলি মোটামুটিভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া মানুষের অশান্তি বাড়িতেছে, সত্য-শিব ও সুন্দর তাহাকে আশ্বাস দিতে পারিতেছে না। এই অস্বাস্থ্যকর সামাজিক প্রতিবেশে কেন্দ্রচ্যুত জীবনের ভাব ও ভাবনা ইদানীন্তন বাংলা কথা-সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইতেছে। এই জগতে অন্ধকার যেমন গাঢ়—পশুদের কোলাহলও তেমনি প্রচণ্ড। আলোচ্য গল্প-সংগ্রহে পাশবিক জীবনের লোভ-লালসা বঞ্চনা ও পীড়নের ছবিই পাওয়া যায়। গল্পগুলি সময়ের স্রোত ঠেলিয়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই—তিক্তস্বাদযুক্ত জীবনের গ্লানি-বেদনা ব্যর্থতার মধ্যেই পাক খাইয়া ঘুরিতেছে। আজিকার সর্ব্বাত্মক দুর্বিপাকের ঊর্দ্ধে তুলিয়া ব্যক্তি ও বস্তুকে চিনিয়া লইবার অবকাশ সকলের ঘটে না—রূঢ় বাস্তবই মানুষকে সে অবকাশ দেয় না। লেখকও সে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার দুঃখবেদনাবোধ তীব্র এবং সেই কারণেই চিত্রগুলির বাস্তব স্পর্শ যেমন নিবিড়, চিন্তার ক্ষেত্রও তেমনি প্রসারিত। ছোট গল্পের বুনন-রীতিতেও লেখকের নৈপুণ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রোবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম—স্বর্ণকমল। সি. সি. বসাক এণ্ড সন্স, ১২৭, মসজিদবাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪।০ টাকা।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান ভাষাতেই ওমর-খৈয়ামের সুমধুর রুবাই-গুলির অনুবাদ বর্তমান। বাংলাতেও একাধিক অনুবাদ-গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া ভাষা লালিত্যের জন্য কান্তিচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকার জন্য ডক্টর শহীদুল্লাহের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। তথাপি আর অনুবাদের প্রয়োজন নাই একথা বলিতে পারি না। নানা জনের প্রয়াসের ফলে হয়তো কবির আরও বিভিন্ন পদের অনুবাদ পাইতে পারি, অনুবাদের ভাষাও ক্রমশঃ অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে।

আলোচ্য অনুবাদ-গ্রন্থের ভাষা সুখপাঠ্য ও সাবলীল।

> "যখন তুমি ও আমি চলি' যাব যবনিকা-পারে
> তারও পরে কতকাল র'বে বিশ্ব, তার সিংহদ্বারে
> কতদিন তারও পর তুমি আমি এসে যাব ফিরে
> কেহ কারে চিনিবে না বালুকণা সম সিন্ধুতীরে।"

বিষয়ের গভীরতা এই অনুবাদে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তবে কোনটির গম্ভীর ভঙ্গী, কোনটির চটুল চপল ছন্দ পাশাপাশি থাকিয়া যেন সামঞ্জস্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

বলাকা-কাব্যপরিক্রমা—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। এ. মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪।০ টাকা।

মনস্বিতার সঙ্গে কল্পনার মিলনে অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি হইয়াছে 'বলাকা' কাব্যে। ইহার ভাব সুগভীর বলিয়া পাঠক অনেক সময়ে ব্যাখ্যা বা আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন। এই গ্রন্থ সে প্রয়োজন মিটাইবে। রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী'তে সাহিত্যের ক্লাসে এই কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই সব আলোচনা 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা হইতে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া আচার্য্য ক্ষিতিমোহন এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল কবির সান্নিধ্যে ছিলেন, সেজন্য নানা স্থান হইতে এই কাব্য সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য সঙ্কলন করিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নিজস্ব পাণ্ডিত্য ও রসানুভূতিগুণে তিনি অনেক জানিবার ও ভাবিবার কথা সুন্দর করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারিয়াছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মর্ম্ম-মরাল—শ্রীরবি গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। ২৩, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

গীতি-কবিতার বই। ...উনষাটটি কবিতার সমষ্টি। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। জীবনপথের যাত্রাপ্রারম্ভে তরুণ মনে একটি আবেগ আসিয়াছে। সে আবেগের স্বরূপ সম্পূর্ণ নির্ণীত হয় নাই।

'কে' কবিতায় পাই,

মরণের সুরের সাথে কোন্ নিবিড়ের
পাপড়ি খোলে গন্ধ মেখে।
আমার এই গহন-মনের অচিন বনে
না-জানা-ফুল ফোটায় সে কে?

'উন্মুক্তি'তে আছে,

মর্ম্মের মন্দির খুলিল দুয়ার,
এল কোন্ স্বপ্নের জ্যোতির-জোয়ার!

'বসন্তে' পাই,

স্বর্ণলতা দীপন-ব্রতা কোন্ সে আলো সন্ধানে
ছন্দে দিয়ে তোমায় ধরা সুবর্ণে সে জাগল কি?
দিনের সূচনায় আলো-ছায়া মিশাইয়া আছে,
ভোরবেলাকার স্বপ্নমাখা আবছা-আলোর কোলে
রাতের আশা দোলে।

তার পর মধ্যদিনে,

মনের মাঠে রাখাল-রাজা বাজায় যে তার রূপান্তরের বাঁশি,
কালো দীঘির দর্পণ উদ্ভাসি'।

আর নিশীথে,

তুমি শিখায়েছ শিখাটিরে মোর জ্বলিতে তোমারি পানে।

তাই,

আজ মৃত্যুর পথ বন্ধনহীন সংশয়-লেশ নাই,
আজ মর্ম্মের শোণ-বহ্নির সুর সত্যের ডাক চাই।

'চন্দ্রালোকে',

মোর মানসের নিসীম নীলে চিরকালের শুক্লা শশী,
সব আবরণ দীর্ণ করি' ভুবন আমার যাও বিলসি'।

'আহ্বান'—শ্রীঅরবিন্দের 'ইন্‌ভিটেশন্‌' নামক বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ। অনুবাদে মূলের গাম্ভীর্য্য ও প্রেরণার পরিচয় পাই,

অধীপ আমি তুঙ্গতমের—প্রলয়-অধীশ্বর,
গর্ব্ব আমার অতল উৎস—সত্তা প্রমুক্তির
অটুট শক্তি যে-বীর ধরে, বিপদ স্বজন যার
অংশী সে মোর রাজ্যমণির—সঙ্গী সরণীর।

'রূপান্তর' চমৎকার। কবিতাগুলি উপভোগ্য। বিচিত্র ছন্দ এবং আবেগ-ঝঙ্কারের মধ্য দিয়া "মর্ম্ম মরালে" মরমী কাব্যের সুরের আভাস ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

স্মৃতি-কথা—শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিন খণ্ডে প্রকাশিত এই বিরাট পুস্তকখানি লেখকের আত্মচরিত। ইহাতে বহুকগুলি নীতিমূলক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে এবং সমসাময়িক ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা ও বাংলার কয়েক জন বনামধন্য পুরুষের জীবনের উপর নূতন আলোকপাত করা হইয়াছে।

জীবনী লেখা কঠিন ব্যাপার; আত্মচরিত লেখা আরও কঠিন। লেখকের অন্তর্দৃষ্টির অভাব ও আত্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা এই দুইটিই সার্থক আত্মজীবনী লেখার পরিপন্থী। যে কঠোর সত্যনিষ্ঠা ও আত্ম-সমীক্ষা আত্মজীবনীর প্রাণ তাহা সত্যই দুর্লভ। অতএব আত্মচরিত লিখিতে হইলে 'অহং'-কে নির্মমভাবে নিষ্পিষ্ট করিয়া সত্যকে অকুণ্ঠ প্রকাশের অবসর দিতে হয়। লেখক পুস্তকে যে বিচিত্র ও মনোজ্ঞ বর্ণালীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার প্রায় প্রতিটি রেখায় আমরা সেই সত্যনিষ্ঠা ও অকপটতার অনুসন্ধান করিয়াছি। চকিত হইয়াছি, শঙ্কা জাগিয়াছে, কিন্তু হতাশ হই নাই। লেখকের প্রতিজ্ঞাবাণী মনে পড়িয়াছে, "স্মৃতি-কথায় যাহা লিখিয়াছি তাহা আমার অভিজ্ঞতায় সত্য—কোন কথা জ্ঞাতসারে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত লিখি নাই।"

স্মৃতির দূরদৃষ্টি-চক্রবাল হইতে সুরু করিয়া বার্দ্ধক্যের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত 'স্মৃতি-কথার' বিষয়বস্তু। বাল্যের তুচ্ছ ঘটনাগুলিও মধুর; বাল্য-লীলার বিলাস হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; প্রাণোচ্ছল যৌবনের আবেদন প্রাণে সাড়া জাগায়। লেখকের পিতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম কন্যাবাৎসল্য, ছাত্র-প্রীতির প্রশংসা করিতে হয়।

পুস্তকের প্রায় সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ তৃতীয় খণ্ডে লেখকের গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাস, নির্ভরতা ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের চিত্ত যেন ক্রমশঃই ঐহিক ছাড়িয়া পারত্রিকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সে ভক্তি-বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ—স্বতোৎসারিত ভক্তির মন্দাকিনীধারা পুস্তকের বহু স্থান স্পর্শ করিয়াছে, মার্জ্জনা করিয়াছে, সিক্ত করিয়াছে।

লেখকের মানবপ্রীতি ঈশ্বর-প্রীতিতে পরিণত হইয়াছে, আবার ঈশ্বরপ্রীতি মানবপ্রীতির বাহুবন্ধনে ধরা দিয়া সার্থকতার পথে ছুটিয়াছে।

পুস্তকখানি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইলেও, অতি দীর্ঘ বর্ণনা ও একই 'ছাঁচের চরিত্রসৃষ্টির বাহুল্যে, স্থানে স্থানে একঘেয়ে মনে হয়। শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি, ভিক্টোরিয়া কলেজের মেয়েদের সম্বন্ধে 'পরস্মৈপদী' জ্ঞানের উপর গবেষণা চাপল্যের কান ঘেঁসিয়া গিয়াছে। পুস্তকের গাম্ভীর্য্য ও নৈতিক মানের সহিত উহার সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। আর একটা অসঙ্গতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। অধ্যাপক মহাশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন—তাঁর ছাত্রবৃন্দ অগণিত। তাহারা ভালবাসিয়া তাঁহাকে সন্দেশ, মাছ, ধুতি-শাড়ীর "ভেট" পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি আত্মহারা হইয়া যে বর্ণনার স্রোত বহাইয়াছেন, তাহা অত্যুক্তিতে পূর্ণ। এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও পুস্তকখানি যে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

১। শিশু ও শৈশব—অধ্যাপক শ্রীরমেশ দাস। পৃঃ ৩৫।

২। 'শিশু পালনে কোনটি চাই—বংশগতি না পারিপার্শ্বিক : অধ্যাপিকা শ্রীসুবিনীতা ঘোষ।

৩। আপনার শিশু কি লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে ?—শ্রীমীরা গুহ। 'মণিমেলা' মহাকেন্দ্রের সহযোগিতায় প্রকাশিত। সম্পাদনা—নির্মল চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান ১৩,২, কাটাপুকুর থার্ড বাই লেন, হাওড়া। পৃঃ ৩২। মূল্য চারি আনা।

আলোচ্য পুস্তিকা তিনখানি শিশু লালনী গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত এবং মনোবিদ্যায় বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক লিখিত। শিশুরা মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কারণ এরাই মানুষের বংশধারা অব্যাহত রাখে, জাতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হয়ে দেশকে মহত্তর সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে শিশুকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব এবং সমস্যা সম্বন্ধে বেশীর ভাগ শিক্ষিত পিতামাতাই অনবহিত; অশিক্ষিতদের তো কথাই নাই। সন্তানের প্রতি স্নেহ আছে সকল পিতামাতারই, কিন্তু কিসে তার মঙ্গল হবে, তার জীবনগঠন সুষ্ঠু হবে, তার সুপ্ত শক্তিগুলির বিকাশ ঘটবে সে বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই। রুশো বলেছিলেন, 'সন্তানকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব যে নিতে পারে না তার পক্ষে সন্তানের জন্মদাতা হওয়া অপরাধ।' এ অপরাধে আমাদের সমাজের অনেকেই অপরাধী।

শিশু লালনী-গ্রন্থমালার পরিকল্পনা এবং প্রকাশের ব্যবস্থা করে এর উদ্যোক্তারা বাঙালী অভিভাবকদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও পুস্তিকাগুলিতে শিশুর মন, প্রকৃতি, বুদ্ধির ধারা, জড়বুদ্ধির কারণ, তা দূর করার উপায় প্রভৃতি অতি সহজবোধ্য ভাষায় মনোজ্ঞভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ পুস্তিকাগুলি পিতামাতার কৌতূহল জাগ্রত করে তাঁদের সন্তানের প্রতি দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে সহায়তা করবে। সমাজের কল্যাণকামী সকলেরই পুস্তিকাগুলি যত্নের সঙ্গে পাঠ করা উচিত। বহুল প্রচারের দিকে লক্ষ্য রেখে পুস্তিকার নামমাত্র মূল্য ধার্য্য করা হয়েছে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

দেহলক্ষণা—ডাঃ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম চার টাকা।

গ্রন্থকার সাধারণের উপযোগী চিকিৎসাবিষয়ক প্রবন্ধাদির লেখক হিসাবে সুপরিচিত। আলোচ্য পুস্তকখানি শারীরবৃত্তের বিস্তৃত বিবরণে পূর্ণ। এরূপ ক্ষেত্রে পারিভাষিক শব্দের বহুল প্রয়োগ অপরিহার্য্য এবং যদিও লেখক সেগুলির সরল ব্যাখ্যা সঙ্গে সঙ্গেই দিয়াছেন তথাপি তাহাতে শারীর-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক জটিলতা বিশেষ কমে নাই। এজন্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিষয়ের মর্ম্মগ্রহণে কিছু অসুবিধা হইবে। শারীরবৃত্তের ন্যায় জটিল বিষয় লেখক অতি সংক্ষিপ্ত আকারেই বিবৃত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে বর্ণনা বেশ সরস এবং কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। বইখানির সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় অংশ শারীরবৃত্তের জ্ঞান চিকিৎসাক্ষেত্রে কি উপায়ে প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলি।

শ্রীবিজয়কেতু বসু

পরিচয়—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরঙ্গম। ২-এ, রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

তিন অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকে লেখক সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানবচরিত্রের 'পরিচয়' দিতে চাহিয়াছেন। সংলাপ-রচনায় লেখকের পটুতা আছে, চমকপ্রদ ঘটনাসৃষ্টি করারও ক্ষমতা আছে।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় ইহার নামকরণ করিয়াছেন। জায়গায় জায়গায় কলম ধরিয়াছেন, তাঁহার রঙ্গমঞ্চে অনেক দিন ধরিয়া অভিনয় করাইয়াছেন। নাটকখানি পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিবে সন্দেহ নাই।

মুদ্রাকর-প্রমাদ হইতে বইখানি মুক্ত হইতে পারিলে ভাল হইত।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

পদাতিক—শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু। মিত্র প্রকাশনী। ৩, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩। মূল্য তিন টাকা।

উপন্যাসখানি রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত। নায়ক পার্থকে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায় এক ধনী-পরিবারের গৃহ-শিক্ষক-রূপে। নন্দিতা এবং আশাপূর্ণা এই দুটি মেয়ে তার ছাত্রী। কিন্তু বেশী দিন পার্থ এ কাজে ব্রতী থাকিতে পারে নাই। আশাপূর্ণা ও নন্দিতার মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতের মুখে পড়িয়া সে এই পরিবার হইতে বিদায় লইল, কিন্তু নন্দিতা তাহাকে মন হইতে বিদায় দিতে পারিল না—খোঁজ করিয়া তাহাকে এক পার্টির আপিসে আবিষ্কার করিল এবং নানাভাবে তাহাকে আর্থিক সাহায্য করিতে লাগিল। কিন্তু নন্দিতার বিবাহে ইহাতে ছেদ পড়িল। এদিকে পার্টির কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিল। শেষ পর্য্যন্ত পার্টির উপর পুলিসের নজর পড়ায় কর্মীরা দলবদ্ধভাবে কাজ করা বন্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। নায়িকা শুক্লা পার্টির এক জন অক্লান্ত কর্ম্মী। পার্থকে সে ভালবাসে, তাই তার পাশে থাকিয়া কাজ করায় তার আনন্দ। পার্টি ছত্রভঙ্গ হইবার সময়ে সে নিজেকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিল এবং পার্থকে বন্ধনের মধ্যে আটকাইবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু পার্থ সহজেই নিজেকে মুক্ত করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। শুক্লা পুলিসের কাছে ধরা দিয়া কারাবরণ করিল। এমনি নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া উপন্যাসখানি সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং নানা চরিত্র ভিড় করিয়া আসিয়াছে। নন্দিতার সঙ্গেও আবার পাঠকের সাক্ষাৎ হয়।

লেখকের সাবলীল ভাষা এবং চরিত্রসৃষ্টি প্রশংসনীয়, কিন্তু স্থানে স্থানে রচনার মধ্যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক ভাব প্রকাশ পাওয়ায় রসগ্রহণে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

গ্রামসেবা-সঙ্ঘ

গত ১৯৪৯ সনের ১লা ডিসেম্বর হাটথুবা গ্রামে গ্রামসেবা-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সঙ্ঘ গোড়ায় গ্রামের কয়েকটি মৌলিক অভাব সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সচেতন করিবার জন্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তন করিয়াছে—

(১) দুই জন অভিজ্ঞ এল.এম.এফ. চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে গত এক বৎসরে ৫২২৮ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মাতৃ এবং শিশু-মঙ্গল সমিতির অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকার পরিচালনায় ১২ জন মহিলাকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২) গ্রাম্য মহিলাদের উপার্জ্জনের সুযোগ দিবার জন্য তাহাদের সীবনশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সীবন বিভাগের মহিলা কর্ম্মিগণ আয় করিয়াছেন ১৫১২।৶৩ পাই। এই বিভাগ থেকে প্রায় ৩০ হইতে ৪০ জন মহিলা-কর্ম্মী শিক্ষা পাইয়াছেন।

(৩) তাঁতশিল্পের প্রসারকল্পে একটি আদর্শ বয়নাগারের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই বিভাগে ৪ খানি তাঁত ও কয়েকটি চরকা এবং তকলির সাহায্যে গ্রামীণ মহিলাদের বয়ন এবং সুতাকাটা শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৪) সরকারী রিলিফ ডিপার্টমেন্টের সাহায্যে যৌথ কারবারের আদর্শে আশ্রয়হীনা বাস্তুচ্যুত মহিলাদের বোতাম-তৈরি শিক্ষার জন্য একটি মহিলা সমবায় শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

(৫) এতদ্ব্যতীত সঙ্গীত বিদ্যালয়, লোকশিক্ষা সংসদের শাখা, ব্যায়ামাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার ইত্যাদিও উক্ত সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং দুঃস্থ মহিলাদের উপার্জ্জনের জন্য একটি 'ধান ভানা বিভাগ' খোলা হইয়াছে। ইউ. সি. আর. ডব্লিউ. কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১৬০০৲ টাকা দ্বারা দুঃস্থ মহিলাদের ধান ক্রয় করিয়া দেওয়া হয়, এবং আবশ্যকবোধে ঢেঁকির ব্যবস্থাও করা হয়।

(৬) ইউ. সি. আর. ডব্লিউ. হইতে ধুতি-শাড়ী, সার্ট বিভিন্ন কলোনীর দরিদ্র বাস্তুত্যাগীদের মধ্যে বিলি করা হয়।

এই জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সরকার, সমাজ-কল্যাণকামী সংস্থাসমূহ এবং জনসাধারণ সকলেরই এই প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যমত অর্থসাহায্য করা কর্ত্তব্য।

কার্সিয়ং যক্ষ্মা-হাসপাতালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দান

কার্সিয়ংস্থ এস. বি. দে স্যানাটোরিয়ামের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানকে এক লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। এই দানের একটি বিশেষ সর্ত্ত এই যে, স্যানাটোরিয়মের 'ফ্রি বেডে'র' মধ্যে পঁচিশটি দার্জ্জিলিং জেলার যক্ষ্মা-পীড়িত পার্ব্বত্য অধিবাসীদের জন্ত সংরক্ষিত থাকিবে। ইহার কার্য্যসম্প্রসারণের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিপূর্ব্বে চার লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

রাধারমণ কীর্ত্তন-সমাজ

গত ১৪ই জুন, শনিবার রাইটার্স বিল্ডিংস-এ এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে রাধারমণ কীর্ত্তন-সমাজ কর্ত্তৃক 'নৌকাবিলাস' গীত হয়। সুললিত বৈষ্ণব পদাবলী শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়

উপস্থিত ছিলেন। স্বর্গত সরোজসুন্দরী দেবীর উদ্যমে উক্ত কীর্ত্তন-সমাজ ১৯৪১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য্যের শিক্ষকতায় ইহার বিশেষ উন্নতি বিধান হয়। তদবধি দীর্ঘ এগার বৎসর ধরিয়া এই কীর্ত্তন-সমাজ বিনা পারিশ্রমিকে কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে কীর্ত্তনগান প্রচার করিয়া আসিতেছে।

জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

যে সকল বাঙালী বাংলার বাহিরে একনিষ্ঠ সেবাব্রত এবং চরিত্রবলে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন, খাণ্ডোয়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন সেক্রেটারী জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। গত ২৮শে জুন এই কৃতী প্রবাসী বাঙালী পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৮৯০ সালে ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের বৈরাক গ্রামে জানকীনাথের জন্ম হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কলেজ টেকনিক্যাল বোর্ডের পরীক্ষা পাস করেন। তার পর মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিলাসপুরে পি-ডব্লিউ-ডি'র সার্ভে ওভারসিয়ার নিযুক্ত হন। সে কর্ম ত্যাগ করিয়া ১৯১৩ সালে তিনি খাণ্ডোয়া মিউনিসিপ্যালিটির ওভারসিয়ার হইয়া আসেন এবং ১৯২৭ সালে সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি অবসরগ্রহণ করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতিক্রমে তাঁহাকে আবার বৎসরাধিক কালের জন্য 'ওয়াটার ওয়ার্কস্ সুপারভাইজার' নিযুক্ত করা হয়। তিনি সবসুদ্ধ ৩৭ বৎসর মিউনিসিপালিটির সেবা করেন, এবং খাণ্ডোয়াতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে সহায়ক হন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০৷২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

নাইরোবিতে "এয়ার ইণ্ডিয়া" কর্তৃক ভারত-চিত্র প্রদর্শন

বাস্তুহারাদের শহর, নীলোখেরির কাঠের কারখানায় 'কম্যুনিটি প্রজেক্ট অফিসারগণ'
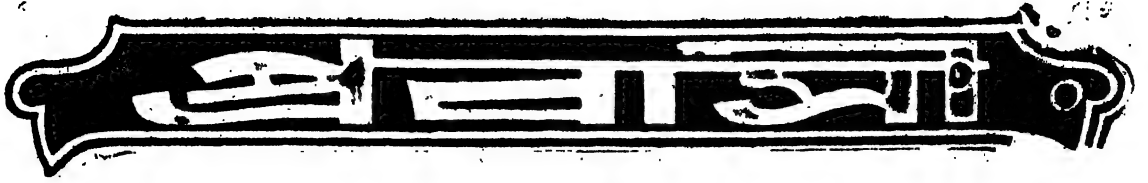
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫২শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৫৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শারদীয়া

শারদীয়া পূজা আগত। বাঙালী ও বাংলার এইটি মহত্তম আনন্দোৎসব। কিন্তু আজ সে আনন্দ কোথায়? দুই চারি জন ভাগ্যবানের গৃহে হয়ত সদুপায়ে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সমাগম হইয়াছে, দুই-চারি শত কালোবাজারী বা চোরাকারবারী হয়ত অসদুপায়ে বিলাস ও ভোগের উপকরণ একত্র করিয়াছে, কিন্তু সমগ্র দেশ ও দেশবাসীর দিকে দেখিলে পূর্ব্বেকার সে আনন্দোচ্ছ্বাসের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

ইহার কারণ কি বলিতে গেলে তর্কের অবতারণা করা হয়। বাংলায় আর যে কোন প্রকার অভাব থাকুক বা না থাকুক, কুট-তার্কিক ও মিথ্যাবাগীশের কোনই অভাব নাই। সুতরাং বাংলা ও বাঙালীর এত দুঃখ, এত অভাব কেন সে বিচার করিতে গেলে মিথ্যা ও ভুয়া বাক্যজাল কাটিতেই সময় শেষ হইয়া যায়। ছল, ছুতা ও মিথ্যাই আজকাল বাজারচলতি জিনিষ, কেননা উহা সহজেই মুখরোচক করা চলে। অপ্রিয় সত্যের সে গুণ নাই, সে চটক নাই।

এক দিন বাঙালী চিন্তাশীল ছিল এবং তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ প্রখর ছিল। তাহার সমস্ত মেধাশক্তি ও ক্ষমতা সে কর্ত্তব্য বিচারে ও পালনে প্রয়োগ করিত। সেদিন ছিল বাঙালীর উজ্জ্বল গৌরবের দিন, এবং বাঙালীর উদ্যোগ, বাঙালীর প্রয়াস তখন শত বাধা সত্ত্বেও চতুর্দ্দিকে জয়যুক্ত হইত। বাংলার সন্তান সেদিন নিজের পুরুষকারের বলে আসমুদ্রহিমাচলে বাংলার খ্যাতি-প্রতিপত্তি ব্যাপ্ত করিয়াছিল। বাঙালী কর্ম্মঠ বলিয়া, বাঙালী বুদ্ধিমান বলিয়া সমগ্র ভারতে সম্মান পাইয়াছিল।

আজিকার "গতগৌরব হৃতআসন" বাঙালীর ও সেদিনকার বাংলার সুসন্তানের মধ্যে প্রধান প্রভেদ ঐ কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ব-বোধের। সহজে প্রাপ্ত স্বাধীনতার ফলে আজ আমাদের স্বত্ব ও অধিকার জ্ঞান অতিশয় প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ঐ স্বত্ব ও অধিকার যে কর্ত্তব্য রক্ষা ও দায়িত্বপালনের উপর নির্ভর করে, সে জ্ঞানটুকু আমাদের হয় নাই, স্বাধীনতার বিষয়ে আমরা এতই অজ্ঞ ও এতই অর্ব্বাচীন। সে জ্ঞান যদি আমাদের থাকিত তবে আজ আমাদের এইরূপ অবহেলিত ও উপেক্ষিতের ঘৃণ্য অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটিত না।

কলিকাতা নগরী শুধু পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী নহে। ইহা ভারতের বৃহত্তম পুরী, সমস্ত এশিয়া মহাদেশে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ নগর আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আজ এই পুরীর যানবাহন চলাচল হইতে পৌরজনের নাগরিক ও সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার কঠোর প্রকাশ দেখা যায়। ট্যাক্সি ও বাস-চালক যেখানে খুসী থামে, যেভাবে খুসী অন্যের অসুবিধা ও বিপদের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া চলে, কেহ তাহাদের কিছু বলে না। নিয়ম অনেক প্রকার আছে কিন্তু সে নিয়মভঙ্গই এখন দস্তুর। প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে শৌচাদি ক্রিয়া এ তো কলিকাতার সাধারণ ব্যাপার, গলিতে বা ছোট পথে আবর্জ্জনার স্তূপ ঢালা সেও সাধারণ ব্যাপার। জল দূষিত, বায়ুও অত্যধিক ধোঁয়া ও দুর্গন্ধে কলুষিত। "প্রাসাদপুরী" কলিকাতা এখন রোগের খনি, এবং রোগের প্রতিকার দুরূহ হইতে দুরূহতর হইতেছে। হাসপাতালে স্থান নাই, ঔষধ অগ্নিমূল্য—উপরন্তু ভেজালে ভরা—এবং চিকিৎসকের দক্ষিণা ক্রমেই উচ্চে উঠিতেছে। নাগরিক জীবনের বাহিরেও যে দৈনন্দিন জীবন তাহাতেও বাধা-বিপত্তি অভাব-অনটন বাড়িয়াই চলিতেছে।

কলিকাতাতেই অবস্থা এইরূপ, কলিকাতার বাহিরে, মফস্বলে, লোকে যে অবস্থায় আছে তাহা বর্ণনার অতীত। অনাচার ও অব্যবস্থার প্লাবনে তো সারা দেশ—কি নগর, কি গ্রাম—ডুবিতে চলিয়াছে। কে কাহাকে উদ্ধার করিবে, সবাই হয় নিজের গণ্ডা বুঝিতেই ব্যস্ত—নয় হতাশ ভাবে শুধু দিনগত পাপক্ষয়ের কার্য্যে নিবিষ্ট। এই অভিশপ্ত দেশে লোকের সত্য মিথ্যা বিচারের ক্ষমতা, দায়িত্ববোধ, কর্ত্তব্যজ্ঞান সবই যেন লোপ পাইয়াছে।

দায়িত্বজ্ঞানের অভাবে দেশের যে কত প্রকার ক্ষতি হইতেছে তাহার নিদর্শন নিম্নোক্ত সংবাদে পাওয়া যায়:

"দার্জ্জিলিং, ১৫ই সেপ্টেম্বর—দার্জ্জিলিঙের খাদ্য দপ্তরের গুদাম হইতে খাদ্যদপ্তরের প্রায় ১৮ শত মণ চাউল উধাও হইয়াছে বলিয়া

খবর পাওয়া গিয়াছে। দার্জিলিঙের খাদ্যদপ্তরের মহকুমা কন্ট্রোলার কর্তৃক অনুসন্ধানকালে এই ব্যাপারটি ধরা পড়ে। এই সম্পর্কে গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয় বটে, কিন্তু পরে তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। পুলিস ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন।"

১৮ শত মণ চাউল দুই এক জন লোকের পক্ষে লওয়া সম্ভব নয়। কতজন লোক এই ব্যাপারে জড়িত তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ দপ্তরে কি কোনও দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত সং লোক ছিল না যে ঐরূপ বিরাট অনুপাতে অনাচারের প্রতিরোধ হইল না?

সমস্ত পৃথিবীতে যুদ্ধের মধ্যে কণ্ট্রোল ব্যবস্থা কোন না কোন রূপে ছিল। কিন্তু এ দেশে তাহার যে বিষময় ফল দেখা দিয়াছে, অন্য কোনও সভ্য দেশে ততটা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। দেশে যে অনাচার ও দুর্নীতিপরায়ণতার স্রোত বহিতেছে তাহার মূলে এই কণ্ট্রোল বিভাগের শৈথিল্য, বিশৃঙ্খলা, কর্তব্যজ্ঞানের অভাব ও দুর্নীতি। কিন্তু কেবলমাত্র সরকারী উচ্চ অধিকারী বা সরকারী বিভাগকে দোষ দিলেই চলে না। ঐরূপ দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসী যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আন্দোলন করিত তবে তাহা বহু পূর্বেই লোপ পাইত।

দেশে আন্দোলন বা অভিযোগ অনুযোগের চীৎকারের অভাব নাই। কিন্তু মূলতঃ সং উদ্দেশ্যে—সত্যাগ্রহের ন্যায়—কয়টি চালিত বা ঘোষিত হয়? অধিকাংশই ত রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্য ফাঁকির অভিযান।

শারদীয়ার প্রকৃত পূজারী যে, সে দেবতার কাছে বর চাহিবে ঐ দিব্যজ্ঞানের, যাহার বলে দেশ জাগ্রত হইয়া বুঝিবে কর্তব্য কি, দায়িত্ব কি। নহিলে এদেশের উদ্ধার নাই।

মানভূম

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন-বৃদ্ধির জন্য এক প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে সর্বদলের সমর্থনে গৃহীত হয়। প্রস্তাবের ভাষা এবং প্রস্তাবনায় যুক্তি দুই-ই বহু দোষযুক্ত। উহার মধ্যে আমাদের চরম আপত্তি ভিক্ষার ইঙ্গিতে। যুক্তির মধ্যে অধিকাংশই অসার এবং অলীক। তবে ঐরূপ অদ্ভুতভাবে প্রস্তাব করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী দল "প্রাদেশিকতা" দোষ বাঁচাইয়াছেন। মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া "জাতধর্ম" রক্ষা যেমন নিম্নগামী সমাজের লক্ষণ তেমনই এইরূপ কপটতাও কংগ্রেসের অধঃপতনের প্রধান নিদর্শন। এ বিষয়ে ১২ই ভাদ্র সংখ্যা 'সৈনিক' পত্রিকায় যে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যথার্থ:

"ইংরেজ রাজনীতির প্রয়োজনে বাংলার খানিকটা অংশ বিহারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেদিন সারা ভারতবর্ষ ইংরেজের এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল, বার বার আমরা চীৎকার করেছি বাংলার অংশ বাংলাকে ফিরিয়ে দাও···ইংরেজ শোনে নি।

ইংরেজ চলে গেল, বাংলা আবার ভাগ হ'ল। এবারের ভাগ মারাত্মক ভাগ। দেশকে স্বাধীন করতে বাংলা সে ক্ষতিও স্বীকার করে নিলে। বাংলার মাটি ভাগ হ'য়ে গেল, কিন্তু বাংলার মানুষ ভাগ হ'ল না। তারা চলে আসতে বাধ্য হ'ল। দলে দলে উদ্বাস্তুর দল ভীড় করে এসে জমতে লাগল পশ্চিম বাংলার মাটিতে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার অবশিষ্ট মাটিতে তাদের স্থান সংকুলান হ'ল না। দুই বাংলার লোক এক বাংলায় এসে আজ ভীড় করেছে। আজ জমির আয়তন না বাড়ালে তাদের জায়গা দেওয়া যাবে না।

দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে যে বাংলাকে একদিন ভাগ করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই বাংলাকে সমৃদ্ধ করাও রাষ্ট্রের প্রথম কর্তব্য ছিল তার ভৌগোলিক আয়তন বৃদ্ধি করা। কিন্তু রাষ্ট্র তা করে নাই।

একদিন গান্ধীজী বলেছিলেন ভাষা হিসেবে রাজ্যগঠন হবে। আজ সে প্রস্তাবকে এঁরা প্রাদেশিক বলে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ভাষা নয়, ভূমি—ভূমির প্রয়োজনে বাংলার নিজস্ব অংশ তার সিংভূম মানভূমকে আজ তাদের প্রত্যর্পণ করতেই হবে।

বাংলার আজ উদ্বাস্তু সমস্যা একটা বড় সমস্যা। আজ তাকে জায়গা দিতে হলে কাউকে না কাউকে জমি ছাড়তেই হবে। কিন্তু বাংলার নিজস্ব জমি পড়ে রয়েছে বিহারে—আজ বাংলা সেই জমিটুকুই ফিরে পেতে চায়। কিন্তু বিহার তার সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি ছাড়বে না বলেছে। বিহারের এ মনোবৃত্তি প্রাদেশিকতা হ'ল না, কিন্তু বাংলা তার নিজস্ব জমি ফিরিয়ে নেবার দাবী করতেই প্রকাশ পেলে তার উৎকট প্রাদেশিকতা!

বাংলা কোনদিনই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার কথা বলে নি। যেখানেই সে বাংলার কথা বলতে চেয়েছে, সেখানেই বলেছে ভারত। স্বামিজী একথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। শুধু বাংলার কথা বাংলার কোন মনীষীই বলেন নি। তবু বাংলাকে আজ প্রাদেশিক অপবাদ সইতে হচ্ছে!

বাংলার এই আন্দোলনকে তাঁরা যে নামেই অভিহিত করুন, বাংলা তার দাবী ছাড়বে না। আজ তাকে বাঁচতে হবে, এবং মানচিত্রের ক্ষীণ পরিসর তাকে বাড়াতেই হবে। এ প্রাদেশিকতার কথা নয়, মানবতার কথা।"

বস্তুতপক্ষে প্রাদেশিকতা দোষ কেবল বাঙালীর বেলায়। অন্য সমস্ত প্রদেশে আজ "ডোমিশিল", অর্থাৎ প্রদেশে স্থায়ী বসবাস, একটা প্রধান অধিকার সূত্র, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়। বিহারে, উড়িষ্যায় ও আসামে ত ভিন্ন প্রদেশীয়ের সকল অধিকার লোপের প্রচেষ্টা সবেগে চলিতেছে। প্রত্যেক প্রদেশই অন্য প্রদেশীয়ের লাভ লোক-সান ধর্তব্যেরও মধ্যে আনে না, শুধু পশ্চিমবঙ্গের সে সকল বিচার করিতে হয়। চাকুরীর ক্ষেত্রে মাদ্রাজী, পঞ্জাবী, বিহারী, গুজরাটি যে ভাবে নিজ জাতি ও জ্ঞাতি পোষণ করেন তাহা তাঁহাদের ক্ষেত্রে স্বজাতিপ্রেম, বাঙালীর পক্ষে তাহা প্রাদেশিকতা।

যাহা হউক, প্রস্তাবের ফল একই হইল। বিহারী দল গর্জন

করিয়া উঠিলেন। তখন আমাদের কংগ্রেস-কুলতিলক শ্রীঅতুল্য ঘোষ এক অপরূপ ভাষণ দিলেন। তাঁহার বক্তব্যের সারাংশ এইরূপ:

"বিহারে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধির দাবি সম্পর্কে বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রজাপতি মিশ্র যে বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন এবং বিহার কণামাত্র ভূমি ছাড়িয়া দিবে না বলিয়া যে উক্তি ও বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বেদনাদায়ক। বাংলার তথা ভারতের প্রতি তাঁহার সামান্যতমও দরদ নাই। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে যে বাংলা স্বাধীনতার জন্য চরম মূল্য দিয়াছে, নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে, বাংলার সংস্কৃতি বাংলার প্রাণকে নিষ্ঠুরভাবে বলি দিয়াছে, আজ তাহার বাঁচিবার সামান্যতম নম্র দাবিকে এইভাবে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না।

"বাংলার আয়তন বৃদ্ধির দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং বৃহত্তর মানবতা-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলার জনসংখ্যার অনুপাতে তাহার স্থান অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সেই ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ স্থানের উপর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ত্রিশ লক্ষাধিক উদ্বাস্তু আসিয়াছেন। তাঁহাদের স্থান দানের জন্য বাংলার এই যে দাবি তাহা যুক্তিপূর্ণ, সময়োপযোগী এবং সঙ্গত। সেইজন্য বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি যদি আজ বাংলা দাবী করে—তবে সে দাবী কখনো অন্যায় নহে। বাংলার কল্যাণে বিহারের কল্যাণ তথা সমগ্র ভারতের কল্যাণ হইবে।

"আজ বিহারের নিকট সম্পূর্ণ মৈত্রী ও প্রীতির ভাব লইয়া নতজানু হইয়া করযোড়ে জানাইতেছি ঐ সকল অঞ্চল আমাদের দিতে হইবে।

"তাই আজ বিহারের নিকট আমাদের আবেদন, আমাদের প্রার্থনা, মানবতার নামে আমাদের দাবি, তাঁহারা যেন আমাদের বাঁচিবার মত স্থান দান করেন।

"যদি বিহার সেই দাবিকে উপেক্ষা করে, যদি বাংলার এই নম্র দাবি, এই বাঁচিবার মত দাবি উপেক্ষিত বা পদদলিত হয়, তাহা হইলে বিহার যেন জানিয়া রাখে বাংলা সংগ্রামের পথই বাছিয়া লইবে।

"আমরা দমিব না, বা ভয় পাইব না। বাংলা কাহাকেও ভয় করে না। বিহারের কোন হুমকি তাঁহাকে তাহার লক্ষ্যস্থল হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিবে না। আমরা দলে দলে পায়ে হাঁটিয়া বিহারের ঐ সমস্ত অঞ্চলে গিয়া বসতি স্থাপন করিব। অশেষ দুঃখ, অশেষ নির্যাতন বুক পাতিয়া লইব।"

"নতজানু" ও "করজোড়" হওয়া অবশ্য আজ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস অধিকারীবর্গের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু এক্ষেত্রে ঐরূপ ব্যায়ামের ফলে নেতৃবর্গের উদরের পরিধি হ্রাস ভিন্ন অন্য কোনও লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা ইন্দোরের নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে দেশের উচ্চতম অধিকারী শ্রীনেহেরুর ভাষণেও বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তিনি বিহার-বাংলা সমস্যা সম্পর্কে বলিয়াছেন:

বাংলা-বিহার সমস্যা লইয়া যে তিক্ততা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া পণ্ডিতজী বলেন, "দেশ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ অত্যধিক ক্লেশ ভোগ করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে ভীড় করিয়াছে; বাংলার সমস্যা আমি বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু যে ব্যাপারে আমি অতিশয় অভিভূত হইয়াছি, তাহা হইল এই যে, ভারতীয় ইউনিয়নের দুইটি রাজ্য এমন মতবিরোধ ও তীব্র পারস্পরিক সমালোচনায় লিপ্ত হইয়াছে যেন তাহারা দুই পরস্পর-বিরোধী দেশ। দুইটি রাজ্যের মধ্যে যদি কোনও বিষয় লইয়া মত-বিরোধ থাকে, তাহা হইলে উহার মীমাংসা করিতে হইবে শান্তিপূর্ণ ভাবে। কিন্তু উপযুক্ত বুঝাপড়ার জন্য চাই আন্তরিকতাপূর্ণ আবহাওয়া।"

পার্লামেণ্টে বিহারের (মানভূম) সদস্য শ্রীভজহরি মাহাতের বিবৃতি কি পণ্ডিতজী শুনেন নাই? যদি না শুনিয়া থাকেন তবে কি "হরিজন" পাঠও তিনি বন্ধ করিয়াছেন? যদি তিনি শুনিয়া থাকেন বা পড়িয়া থাকেন—এবং আমাদের বিশ্বাস তিনি তাহা শুনিয়াছেন ও পড়িয়াছেন—তবে ঐ "আন্তরিকতাপূর্ণ আবহাওয়া" ইত্যাদি ভুয়া কথার অবতারণা তাঁহার পক্ষে ছলনা মাত্র। শ্রীভজহরি মাহাতের বিবৃতি এইরূপ:—

[শ্রীভজহরি মাহাত ১৯৫২ সালের ১২ই জুলাই বিহারের মানভূম কেন্দ্র হইতে লোকসেবক সংঘের পক্ষে ভারত লোকসভায় নির্বাচিত হন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি লোকসভায় হিন্দীতে নিম্নলিখিত ভাষণ দিয়াছেন:

—অতুলচন্দ্র ঘোষ]

"সমস্যা বিষয়ে নিজেদের মনোভাব ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া লোকসেবক সংঘের পার্লামেণ্ট সদস্য শ্রীভজিহরি মাহাত বিগত ১২ই জুন লোকসভায় নিম্নলিখিত মত বক্তৃতা করেন। বক্তাদের নাম-তালিকায় পূর্ব্ব হইতে তাঁহার নাম না থাকা সত্ত্বেও এই প্রস্তাবের সহিত মানভূমের সমস্যা জড়িত থাকায় স্পীকার শ্রীমভলঙ্কর শ্রীভজহরি মাহাতকে বক্তৃতার বিশেষ অনুমতি প্রদান করেন। বক্তৃতার বিশদ বিবরণ এই:

আমি মানভূমের অধিবাসী। আমার ভাষা বাংলা। আমি ইংরেজী একেবারেই জানি না। হিন্দীও প্রায় জানি না। ইংরেজী আমলে জেলের সুযোগলাভে হিন্দী লেখাপড়া সামান্য করিয়াছিলাম। বাহিরেও ইদানীং হিন্দী শেখার চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু হিন্দীপ্রেমীর দল মানভূমে জবরদস্তী হিন্দী চালাইবার জন্য যে অবস্থা করিয়াছেন তাহাতে আমরা সেই সব অত্যাচার লইয়াই অস্থির আছি—হিন্দী শেখার অবস্থা আর নাই। আমি হিন্দী বিশেষ কিছু না জানিলেও রাষ্ট্রভাষা বলিয়া আমি ভাষা হিন্দীতেই কোন রকমে বলিতে চেষ্টা করিতেছি। ভুল হইলে মাফ করিবেন।

ভাষার ভিত্তিতে দেশগঠনের প্রশ্ন মানভূমের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানভূমে এই ভাষাভিত্তিক প্রদেশের প্রশ্ন লইয়া যে অত্যাচার চলিতেছে তাঁহার জন্যই ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে।

"আমরা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্নকে কখনো প্রাদেশিকতার দৃষ্টিতে দেখি নাই। মানভূমে আমরা বরাবরই সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত ভাবে কাজ করিয়াছি। আমরা কংগ্রেসেই ছিলাম। কংগ্রেসকে আমরা গড়িয়াছি। শ্রীঅতুল বাবুর নেতৃত্বে আমরা বরাবরই ঐ ভাবেই কাজ করিতেছিলাম। কিন্তু কংগ্রেস ছাড়িতে বাধ্য হইলাম। সুতরাং আমরা ভাষার ভিত্তিতে দেশগঠনের প্রশ্নকে প্রাদেশিকতার দৃষ্টিতে না দেখিয়া বরাবরই গান্ধীজীর বিচার ও শিক্ষায় শাসন ব্যবস্থায় সুবিধার দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলাম। তথাপি আমরা নিজেরা এ বিষয় কখনো উত্থাপন করি নাই। কারণ আমরা ভাবিতেছিলাম—ভারতের নেতৃবৃন্দ নিজেরাই এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন। নেতৃবৃন্দকে জানাইতেছি—এ বিষয়ে আর বিলম্ব করা উচিত নয়—শীঘ্র এ বিষয় চুকাইয়া ফেলা উচিত। কারণ এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকার জন্য মানভূমের উপর যে অবস্থা করা হইতেছে—তাহাতে এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে—মানভূমের জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লব দেখা দিবে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের কথা উত্থাপন করিলে তাহাকে প্রাদেশিকতা বলা হইতেছে। কিন্তু যাহারা ঐ কথা বলিতেছেন এবং যাঁহাদের হাতে আজ শাসন তাঁহাদেরই আজ প্রাদেশিকতা করিবার সুযোগ হইয়াছে এবং তাঁহারাই প্রাদেশিকতা করিতেছেন। নিজ রাজ্যের সীমা হইতে অন্য ভাষাভাষী অঞ্চল যাহাতে ভাষার প্রশ্নে বাহির হইয়া যাইতে না পারে তজ্জন্য প্রাদেশিক সরকার অন্যভাষাভাষীদের উপর জবরদস্তি হিন্দী চালাইয়া তাহাদের মাতৃভাষা নষ্ট করিতেছেন। ইঁহারাই প্রাদেশিকতা করিতেছেন।

"বলা হইতেছে—মানভূম প্রভৃতি স্থানের এই ভাষার প্রশ্ন বিহার ও বাংলা প্রদেশ মিলিয়া স্থির করিয়া লও। কিন্তু আমি বুঝি না যে আসামী ও বাদীর নিজেদের মধ্যে মীমাংসা কি করিয়া হইবে? কাশ্মীর ব্যাপারে বিশ্বজাতি সংঘ বলিতেছেন পাকিস্থানে ও হিন্দুস্থানে মিলিত ভাবে মীমাংসা করিয়া লও। কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রী বলিতেছেন—তাহা হইতে পারে না। কাশ্মীরের জনগণই নিজেদের বিষয় নিজেরা স্থির করিবে। অথচ ভারত-সরকার জাতি সংঘের মত বলিতেছেন যে, এই সমস্যা বাংলা বিহারে মিলিয়া করিয়া লও। প্রধান মন্ত্রীর দাবির মত আমরাও বলিতেছি যে, ইহা মানভূমবাসীরাই স্থির করিবে; মানভূমের জনসাধারণকে নিজের ভবিষ্যৎ স্থির করিতে অধিকার দেওয়া হউক। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি বিষয়ে আমাদের লোকসেবক সংঘের নিজ সিদ্ধান্ত থাকিলেও, এ বিষয়ে নিজ ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থির করিবার অধিকার মানভূমের জনগণের উপর আমরা রাখিয়াছি।

"মানভূমের অবস্থা আজ পাকিস্থানের মত। পাকিস্থানে হিন্দুদের উপর যেমন অত্যাচার চলিতেছে—ভাষার প্রশ্নে বিহার সরকার মানভূমের বাংলাভাষাভাষীদের উপর পাকিস্থানের ন্যায় বৈষম্যমূলক ব্যবহার ও অত্যাচার করিতেছেন। এই প্রশ্নের শীঘ্র সমাধান করা প্রয়োজন। শীঘ্র তদন্ত করিয়া দেখা হউক—বিহার সরকার ঠিকমত শাসনের দায়িত্ব পালন করিতেছেন কি না। সরকার যখন ভাষার প্রশ্নে প্রাদেশিকতা ও উৎপীড়ন করিতেছেন—তখন ভাষার প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত, মানভূমের শাসনভার বিহার-সরকারের হাত হইতে লইয়া লওয়া হউক। বিহার সরকার মানভূমের জনগণের উপর যেভাবে উৎপীড়ন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা মানভূমবাসী ভারতীয় শাসনের অধীনে যে কোন স্থানে থাকিতে পারি, কিন্তু আমরা আর বিহার সরকারের শাসনাধীনে থাকিতে কখনই চাই না; আমরা মুক্তি চাই। (হিন্দীতে প্রদত্ত বক্তৃতার বাংলা তর্জ্জমা)

"দ্রষ্টব্য: নির্বাচনে যে সকল বিভিন্ন দল অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমি যতটা সংবাদ পাইয়াছি, শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ পরিচালিত মানভূমের লোকসেবক সংঘের কার্যপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত নির্দোষ বলিয়া মনে হয়। বিহার আইন সভার ১১ কিংবা ১২টি আসনের মধ্যে এই দল ৭টি এবং বিহার হইতে লোকসভার নির্বাচনে ২টি আসন লাভ করিয়াছে। ইহারা কেবলমাত্র লোকপ্রিয়তার শক্তিতেই এই আসন লাভ করিয়াছে, ইহাদের অর্থবল তেমন ছিল না। বহুদিন ধরিয়াই অতুলবাবুর সহিত আমার পরিচয়, তাঁহার মধ্যে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা নাই। মানভূমের গণ্ডগোলের জন্য বহুলাংশে দায়ী বিহার গবর্ণমেন্টের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও জবরদস্তীপূর্ণ ব্যবহার। যদি বিহার নিজের চৌহদ্দীর মধ্যে মানভূমকে রাখিতে চায় তবে তাহাকে নত হইয়া এবং প্রেম ও ন্যায়পূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা জেলার বাংলাভাষাভাষীদের মন জয় করিতে হইবে। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, প্রান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তর্জনগর্জনকারীদের সমীহ করিয়া চলিতেছে অথবা যতকাল সম্ভব সমস্যাকে ধামাচাপা দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এই দুর্বলতার জন্য তাঁহাদের সুনাম নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে।"—("হরিজন" সম্পাদক কিশোরীলাল মশরুওয়ালার মন্তব্য)

"নতজানু কৃতাঞ্জলিপুট" মহাশয়কে আমাদের নিবেদন এইমাত্র যে, মানভূমের বাঙালীর উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলিতেছে তাহার প্রতিকার চেষ্টা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? বিহারের মহৎ ব্যক্তিগণের বাঙালী-প্রেম কিরূপ সে বিষয়ে শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালার মন্তব্য সাক্ষ্য দিতেছে।

বর্ত্তমান বিহারী নেতৃবর্গের বাঙালী-বিদ্বেষ অস্থিমজ্জাগত। তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি বিহারের ভূমিকম্পের সময়, যখন রাজেন্দ্রবাবুর স্বেচ্ছাসেবক দল একদিকে বাঙালীর "মেয়র্স ফণ্ড" হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিতেছিলেন, অন্যদিকে বিহারের ভূমিকম্পক্লিষ্ট ও আহত "বঙালী লোগ" যাহাতে কোনও সাহায্য না পায় তাহার চেষ্টাও চালাইতেছিলেন। এ বিষয়ে কলিকাতার সংবাদপত্রে অভিযোগ প্রকাশিত হইলে রাজেন্দ্রবাবু প্রথমে সজোরে বলেন, উহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। পরে অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছেন, বলেন।

গত যুদ্ধের মধ্যে, '৪২ সনে পূর্ব্ববঙ্গে দাঙ্গা ও হিন্দু নির্যাতন চলে। যুদ্ধের ওজুহাতে ব্রিটিশ সরকার সে সকল সংবাদ চাপিয়া দেয়। তখন একমাত্র পথ ছিল ঐ বিষয় উল্লেখ করিয়া ব্যবস্থা-পরিষদ স্থগিত করার প্রস্তাব আনয়ন করা। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঢাকায় স্বচক্ষে সমস্ত অবস্থা দেখিয়া ঐরূপ প্রস্তাব আনয়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার নিজের দল ছোট বলিয়া ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী দলের সমর্থন প্রার্থনা করেন, এবং সে দলের তখনকার অধিনায়ক শ্রীকিরণশঙ্কর রায় তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু তখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং তাঁহার অনুমতি বিনা কংগ্রেস দল উহা সমর্থন করিতে পারিত না। শ্যামাপ্রসাদবাবু অনেক কষ্টে, কিরণ বাবুর মারফৎ, রাজেন্দ্রবাবুর সহিত এ বিষয়ে টেলিফোনে আলোচনা করেন। রাজেন্দ্রবাবু অতি রূঢ় ভাবে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। এমন কি স্বচক্ষে দর্শনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি বলেন তাঁহার নানা স্থলের নিমন্ত্রণ রক্ষা হইলে পরে তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিবেন। অর্থাৎ বাঙালী মরে কি বাঁচে সেটা তিনি কর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিতে চাহেন নাই।

শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাদের এ সকল কথা জানাইলে আমরা উত্তর প্রদেশের এক বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মীর মারফৎ এই সকল কথা ও শ্যামাপ্রসাদ বাবু-প্রদত্ত দাঙ্গার বিবরণী মহাত্মা গান্ধীর নিকট ওয়ার্দ্ধায় পাঠাই। সে সকল দেখিয়া, তিনি রাজেন্দ্রবাবুকে কঠোর তিরস্কার করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা বুঝাইয়া দেওয়ায় উহা স্থগিত করার প্রস্তাবে শ্যামাপ্রসাদবাবু কংগ্রেস-দলের সমর্থন লাভ করেন।

রাজেন্দ্রবাবু বিহারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বর্ত্তমানে তাঁহার মনোভাব অনেক উন্নত, অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার মশানজোড়স্থিত প্রধান বাঁধের নির্ম্মাণে বিহারীরা দুই বৎসর নানা মিথ্যা ওজুহাতে বাধা দেয়। রাজেন্দ্রবাবু সেখানে হস্তক্ষেপ করাতেই তাহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বিহারের নেতৃবর্গের মনোভাব কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মনে হয় না।

এই তো অবস্থা। এখানে করজোড় ইত্যাদি নাটকীয় প্রক্রিয়ায় কোন বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। এখানে প্রয়োজন স্পষ্ট ভাষায় অপহৃত অঞ্চলের প্রত্যর্পণ দাবি এবং তাহার সমস্তটা। অন্যথায় প্রয়োজন দেশব্যাপী সবল, সুদৃঢ় সত্যাগ্রহ অভিযান। তাহার পথ আছে, সে বিষয়ে দেশবাসী নিশ্চিন্ত থাকুন।

শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালা

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর "হরিজন" সম্পাদক শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালা ৬২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্যদলের মধ্যে শ্রীকিশোরলালের স্থান অন্যতম ছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য, শ্রান্ত মন লইয়া তিনি কিছুদিন যাবৎ অবসর লইবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্তু সে অবসর তাঁহার জুটিল অন্তিমরূপে।

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর হইতেই তিনি গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 'হরিজন' সম্পাদনা করিতেছিলেন। একাগ্রতায়, সত্যনিষ্ঠায় ও নিরপেক্ষতায় গান্ধীজী সাংবাদিক জগতে "হরিজন"কে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন শ্রীকিশোরলাল সেই উচ্চ আদর্শ তাঁহার সাধ্যমত উজ্জ্বল রাখিতে সদাই চেষ্টিত ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের সম্পাদকমণ্ডলীর এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

পণ্ডিত নেহরু তাঁহার মৃত্যুসংবাদে শোক প্রকাশ করিয়া যে টেলিগ্রাম করেন তাহাতে তিনি বলেন,

"তিনি সেই মহৎ দলের একজন যাঁহারা আজকার ঘটনা স্রোতে বিচলিত না হইয়া স্থিরভাবে গান্ধীজীর মহান আদর্শের পথে চলিয়াছেন।"

সাংবাদিক জগতে আজ সুবিধাবাদই প্রশস্ত পথ। ঐ পথে সত্যাসত্যের কোনও বালাই নাই, ন্যায়ধর্ম্মের কোনও কথাই নাই। আছে শুধু আয়ের চেষ্টা ও পরোক্ষভাবে খ্যাতির চেষ্টা। সেই হিসাবে এই সত্যকাম, মিতভাষী ও ন্যায়নিষ্ঠ সাংবাদিকের মৃত্যুতে কোনও বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু চিরন্তন যদি কিছুমাত্র ঐ ক্ষেত্রে থাকে, যাহা সাংবাদিকের উচ্চতম আদর্শের পর্য্যায়ে পড়ে, তবে সেই হিসাবে আমরা বলিব আমাদের একজন অন্যতম পথপ্রদর্শকের তিরোধান হইয়াছে।

সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় বৃত্তি

"বিগত ২৬শে জুলাই সেনেটের অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে সুধীরকুমার বৃত্তি ফাণ্ডে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। এই ফাণ্ডের টাকায় বাঙালী যুবকদের সামরিক বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইবে। এক বৎসর পর পর এই ফাণ্ড দেরাদুন বা অনুরূপ কোন সরকারী কলেজে সামরিক শিক্ষালাভের জন্য একটি ছেলেকে বাৎসরিক ১০০০্ টাকার বৃত্তি দিবে।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় এই লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা অর্পণ করিলেন। বিভিন্ন খাতে এই অর্থ হইতে উপযুক্ত ছাত্রদিগকে সাহায্য করা হইবে। একমাত্র সন্তানের স্মৃতিতে অর্পিত এই অর্থ উপযুক্ত পাত্রের শিক্ষায় ব্যয়িত হইলে বাঙালী ছেলের কৃতিত্বের মধ্যেই তাঁহার পুত্র ভবিষ্যতের বাংলাদেশে চিরজীবী হইয়া থাকিবে।

রাজ্যপালের দৃষ্টান্তে আরও অনেকে এইরূপ ত্যাগের ও মহানুভবতার পরিচয় দিলে দেশের কল্যাণ হইবে।"

'শিক্ষা' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় উপরোক্ত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন শিক্ষাব্রতী। তাঁহার কৃচ্ছ সাধনের ফলেই এরূপ মহা-দান-ব্রতের উদ্‌যাপন সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার আদর্শে দেশের লোক অনুপ্রাণিত হউক।

রাজনীতিতে শব্দের মায়াজাল

কলিকাতা হইতে নব-প্রকাশিত "এশিয়া" পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় জার্ম্মান কমিউনিষ্ট পার্টির ভূতপূর্ব্ব সদস্য আর্থার কোয়েসলার

লিখিতেছেন, "...আমরা এক শব্দার্থ স্ফীতির মধ্যে বাস করছি যার ফলে ভাষা এবং তার অর্থের একটা কালোবাজার জন্মেছে; যেখানে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের ব্যবসা তার 'অর্থ' মালের উপর চলছে; যার সঙ্গে তার সরকারী গৃহীত অর্থের বহুত পার্থক্য রয়ে গেছে।..." "...'ধনতন্ত্রবাদ' ও 'সমাজতন্ত্রবাদ', 'দক্ষিণপন্থী' এবং 'বামপন্থী' ইত্যাদি বিপরীত অর্থবোধক শব্দগুলো আজ প্রকৃত পক্ষে অর্থহীন হয়ে পড়েছে।..." উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে 'রাজনৈতিক বামপন্থী' শব্দের উৎপত্তি হয়—১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে। পরিষদ কক্ষে গণতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী সভাবৃন্দ রাষ্ট্রপতির বাম দিকে আসন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করায় ক্রমে ইউরোপে এই প্রথা গৃহীত হয়। কালক্রমে "সর্ব্বপ্রকার গণতান্ত্রিক, উদারনৈতিক চরমপন্থী, প্রগতিশীল অথবা বৈপ্লবিক ভাবধারাকে বুঝাইবার জন্য 'বামপন্থী' শব্দ দিয়া আলঙ্কারিক প্রয়োগ করিবার দস্তুর চালু হইল, এবং যতই এই শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্রের সীমা তাহার নিজস্ব অর্থবোধকে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল, তাহার আবেগময় আবেদন করিবার শক্তিও ততই জোরদার হইতে লাগিল। এই ভাবে, এই শব্দটি তাহার নিজ জন্মস্থানে অর্থাৎ ফরাসী চেম্বারে গত যুদ্ধের প্রারম্ভকালে প্রায় আধ ডজন রাজনৈতিক দলের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহাদের কার্য্যকলাপ এবং সাধারণ বিচারের মান অনুযায়ী কিন্তু এই দলগুলির প্রত্যেকটিই রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল এবং বাস্তবিক পক্ষে বামপন্থীবিরোধী।

মানব মনের উপর ভাষা তথা শব্দের প্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি আমাদের শব্দের বর্ণনামূলক এবং আবেগমূলক ব্যবহারের মধ্যের মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে বলেন। "যদি কয়েকটি শব্দ, যথা বাম, শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি সাধারণ মনে কি ভাবে রেখাপাত করে সে সম্বন্ধে কেউ চিন্তা করেন তবে দেখবেন যে, বর্ত্তমানে এই শব্দগুলোর স্বকীয় কোন মানে নেই। অথচ এই শব্দগুলোর সঙ্গে কি প্রচণ্ড আবেগের বারুদ জড়ান রয়েছে। এই থেকে এই সন্দেহ খুব স্বাভাবিকভাবেই আসবে যে, রাজনৈতিক জগতে এমন কোন নিয়ামক সূত্র আছে যাহার প্রভাবে শব্দের সাধারণ অর্থ আর তার আবেগময় প্রভাবের মধ্যে এক বিপরীত সম্পর্কের আনুপাতিক নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।"

"'বাম' শব্দটি আজকের দিনে প্রয়োজনহীন এক ক্ষতিকারক স্বার্থে ব্যবহৃত হইতেছে। উদারনৈতিক হইতে সুরু করিয়া চরম বামপন্থী পর্য্যন্ত সকলের উপরই অবিরামভাবে ইহার বর্ণসমারোহের প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে এবং এই ভাবে উদারনৈতিক প্রগতিপন্থী এবং অত্যাচারী ত্রাসপূজারীদের মধ্যে এক মূলগত ঐক্যবোধের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। এই এলোমেলো পরিভাবকে উদাসীনভাবে মেনে নেওয়ার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ এই শব্দটির অন্তর্নিহিত প্রগতিমূলক চিন্তাধারাকে কম্যুনিষ্ট অরাজকতাবাদের সহিত এক করে দেখিয়ে থাকে। তা ছাড়াও মানব মনের উপর শব্দের এমনই যাদুকরী ক্ষমতা আছে যার ফলে যিনি নিজেকে বামপন্থী বলে অভিহিত করতে থাকেন তাঁর অবচেতন মনে 'বামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির' সঙ্গে যে ঐক্যবোধের সূচনা হয় তা ক্রমশঃ মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও এক বাস্তব একতাবোধের পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।"

এরই বাস্তবরূপ আমরা দেখিতে পাই "শান্তির সংগ্রাম" "জনগণের গণতন্ত্র" ইত্যাদি বুলির কম্যুনিষ্ট কূটনৈতিক কালোবাজারের ফাঁদে অনেক বিখ্যাত এবং মহৎ ব্যক্তির মানসিক দাসত্ব।

স্বাধীনতা সংগ্রামে কম্যুনিষ্টদের ভূমিকা

গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সহযোগিতা করিয়াছিল তাহা সর্ব্বজনবিদিত। টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা তায়েব স্লীম সম্প্রতি ভারতবর্ষে এক সংবাদপত্র সম্মেলনে কম্যুনিষ্টদিগের কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর বিশেষ ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। ২১শে ভাদ্র তারিখের এশিয়া পত্রিকা হইতে তাঁহার ভাষণের অংশবিশেষ পাঠকদিগের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করা হইল:

"তিনি বলেন, যতক্ষণ তাঁহারা (কম্যুনিষ্ট) ক্ষমতায় থাকেন না ততক্ষণই নিজদলগত স্বার্থে, জনমত পাইবার জন্য, উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার কথা আওড়াইয়া থাকেন মাত্র। ১৯৪৫-৪৬ সালে ফরাসী কম্যুনিষ্টদের হাতে ক্ষমতা আসিলে তখন কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীরা স্বয়ং দমনের অস্ত্রস্বরূপ হইয়া টিউনিসিয়ার সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছিল। তিনি বলেন যে টিউনিসিয়ার কম্যুনিষ্টরা ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টির শাখা মাত্র (এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পর্ক স্মরণীয়)।"

টিউনিসিয়ার এই বীরনেতার মাথার উপর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদিগের প্রাণদণ্ডাদেশ ঝুলিতেছে।

ভারতের জনগণনা

১৯৫১ সালের লোকগণনায় ভারতের মোট জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ। জম্মু ও কাশ্মীরের লোকসংখ্যা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। জম্মু ও কাশ্মীরের মোট জনসংখ্যা বর্ত্তমানে ৪৪ লক্ষ। ভারতে পুরুষের সংখ্যা ১৮ কোটি ৩৩ লক্ষ, আর নারীর সংখ্যা ১৭ কোটি ৩৫ লক্ষ, অর্থাৎ প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৯৪৭। ১৯০১ সালে বর্ত্তমান বিভক্ত ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ২৩ কোটি ৮৪ লক্ষ, ১৯১১ সালে ২৫ কোটি ২৩ লক্ষ; ১৯২১ সালে ২৫ কোটি ১৫ লক্ষ; ১৯৩১ সালে ২৭ কোটি ৯২ লক্ষ; এবং ১৯৪১ সালে ৩১ কোটি ৮৯ লক্ষ। গত দশ বৎসরে ভারতে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে ৪ কোটি ২০ লক্ষ। মোট শতকরা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১২.৫; আর বৎসরে গড়পড়তা বৃদ্ধির হার শতকরা ১.২।

বর্ত্তমানে জাতীয় অর্থনীতি পরিকল্পনার দ্বারা নির্বাহিত হয়, সেই জন্য জনগণনার সঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামোর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

১৯৫০ সালে আমেরিকায় জনগণনায় মাথাপিছু ২,৮৫০ টাকা খরচ হইয়াছিল, ভারতে মাথাপিছু খরচ হইয়াছে প্রায় ২০।২১ টাকা।

ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭০ জন প্রায় চাষী। চাষীদের শতকরা ৩৩ জনের জমি নাই। এদেশের শহরবাসীর সংখ্যা ৬ কোটি ২০ লক্ষ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ জন শহরে বাস করে। বাংলাদেশে শহরবাসীর সংখ্যা কিছু বেশী, এখানে শতকরা প্রায় ২৫ জন শহরে বাস করে। ১৯৪১ সালে ভারতে শতকরা ১৪ জন শহরে বাস করিত। এক লক্ষ বা ততোধিক লোক বাস করে এরকম শহরের সংখ্যা বর্ত্তমানে ৭৫টি, ১৯৪১ সালে ছিল ৪৮টি এই রকম শহর। এদেশে গ্রামীণ সভ্যতার পরিবাহক হিসাবে দেখা যায় উড়িষ্যা, আসাম এবং বিহারকে। এই তিনটি প্রদেশে শতকরা ৪ হইতে ৬ জন শহরে বাস করে।

ভারতে প্রতি বর্গ মাইলে গড়পড়তায় ২৮১ জন বাস করে। বাংলাদেশে বসতিঘনতা অনেক বেশী, এখানে প্রতি বর্গ মাইলে গড়পড়তায় ৮৩৯ জন বাস করে। কলিকাতায় প্রতি বর্গ মাইলে গড়পড়তায় ৭৭,২৬৩ জন বাস করে; হাওড়ায় প্রতি বর্গ মাইলে ২,৮৮৫ জন বাস করে, হুগলীতে—১,২৯১ জন; ২৪ পরগণায়—১,১৪৪; বর্দ্ধমানে—৮০৯; মুর্শিদাবাদে—৮৩১; নদীয়ায়—৭৬০; মালদায়—৬৮০; মেদিনীপুরে—৬৩৫; বীরভূমে—৬১৩; পশ্চিম দিনাজপুরে—৫০৯; কুচবিহারে—৫০৭; দার্জ্জিলিঙে—৩৭৩ এবং জলপাইগুড়িতে—৩৬৩ জন। ভারতে ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে বসতিঘনত্ব সবচেয়ে বেশী; সেখানে গড়পড়তায় প্রতি বর্গমাইলে ৯২৯ জন বাস করে।

কর্ম্মচারীদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড

কর্ম্মচারীদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এক্ট অনুসারে কর্ম্মীদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড প্রথা বর্ত্তমানে চালু করা হইয়াছে। কর্ম্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যাপারে বর্ত্তমান ব্যবস্থাটি সারা এশিয়ার মধ্যে অতুলনীয়। কারণ এত অধিক সংখ্যক কর্ম্মীদের জন্য নাকি এইরূপ ব্যবস্থা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার আর কোথাও নাই। এতদ্দ্বারা প্রায় ১৬ লক্ষ লোক উপকৃত হইবে। বর্ত্তমানে ছয়টি শ্রমশিল্পে এই আইনটি প্রচলিত করা হইবে, যথা, বস্ত্রশিল্প; লৌহশিল্প, সিমেণ্ট কারখানা, যন্ত্রশিল্প, কাগজ এবং সিগারেট।

সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যে স্বাস্থ্যবীমাকে অগ্রণী করা হইয়াছে। বর্ত্তমান রাষ্ট্র মাঙ্গলিক রাষ্ট্র এবং সামাজিক নিরাপত্তাবিধান মাঙ্গলিক রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গ। এই সকল শিল্পে যে সব কারখানায় পঞ্চাশ বা ততোধিক কর্ম্মী আছে তাহাদের পক্ষেই এই আইনটি প্রযোজ্য। অবশ্য সরকারী এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠানগুলি এই আইনের আওতায় পড়িবে না। যে সকল কর্ম্মীর এক বৎসর চাকরী হইয়াছে এবং যাদের মূল মাহিনা তিন শত টাকার অধিক নহে কেবলমাত্র তাহারাই ইহার দ্বারা উপকৃত হইবে। তবে চুক্তিবদ্ধ কর্ম্মী সকল বাদ থাকিবে।

কর্ম্মীদিগকে মোট মাহিনায় প্রতি টাকায় এক আনা করিয়া দিতে হইবে, এই এক আনা মূল মাহিনা তথা মাগ্‌গী ভাতার উপর দিতে হইবে। মালিক সমপরিমাণ অর্থ, অর্থাৎ টাকায় এক আনা হিসাবে দিবে।

কেন্দ্রে এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া ট্রাষ্টি বোর্ড থাকিবে এবং ইহারাই প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিবে। সরকারী প্রতিনিধি, কর্ম্মীদের প্রতিনিধি এবং মালিকদের প্রতিনিধি লইয়া ট্রাষ্টি বোর্ডগুলি গঠিত হইবে। পঞ্চান্ন বৎসর বয়স হইলে কর্ম্মী তাহার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড হইতে সকল টাকা পাইবে—নিজের এবং তাহার মালিকের প্রদত্ত অংশ। তবে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর তার ফাণ্ডের সভ্য হওয়া প্রয়োজন। যে কোন সময়ে যদি সে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হয় তাহা হইলেও সে সকল টাকা পাইবে। আর জীবনবীমার পলিসির জন্য টাকা দিবার প্রয়োজন হইলে ফাণ্ড হইতে মাঝে মাঝে ধার লইতে পারে।

ভারতে আয়কর

ভারতের আয়করের ১৯৫১-৫২ সালের হিসাব সম্প্রতি ভারত-সরকার প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৫১-৫২ সালে ১৮৫ কোটি টাকা আয়কর হিসাবে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব বৎসর মোট আয়কর ছিল ১৭৫ কোটি টাকা। বর্ত্তমান বৎসরে আয়কর অধিক-সংখ্যক লোকের উপর ধার্য্য করা হইয়াছে। ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ৮,৮৫,৩৯৯ জনকে আয়কর প্রদানকারী হিসাবে ধরা হয়। ১৯৪৮ সালে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা ছিল ৫,৪০,০০২। অর্থাৎ, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার বেশী লোক আয়কর দিতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা এই কয়েক বৎসরে প্রায় শতকরা ৬৩ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহাদের বাৎসরিক আয় ২৫,০০০ টাকা বা তদূর্দ্ধ তাহাদের ধরা হয় প্রথম শ্রেণীতে এবং যাহাদের বাৎসরিক আয় ১০,০০০ টাকা হইতে ২৫,০০০ টাকার মধ্যে তাহাদের ধরা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে। তাহা হইলে দেখা যায় যে, উচ্চ শ্রেণীর আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গত বৎসর প্রায় ১৩৮ কোটি টাকার আয়কর বাকী পড়িয়াছিল। ইহার মধ্যে শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ আদায় করা হইয়াছে। এখনও ১১৩ কোটি টাকা বাকী পড়িয়া আছে। শুধু বোম্বাই শহর ও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০ কোটি টাকার মত আয়কর অনাদায়ী পড়িয়া আছে। আয়কর বিভাগের খরচ হইতেছে শতকরা ১'৪৪ টাকা হিসাবে। মোট খরচ হইয়াছে গত বৎসর দুই কোটি ছেষট্টি লক্ষ টাকা।

স্বেচ্ছায় যাহারা গুপ্ত আয়ের সন্ধান দিয়াছে তাহাতে আজ পর্য্যন্ত ৩০ কোটি টাকা আয়কর হিসাবে ধরা হইয়াছে। মোট ১০৩ কোটি টাকা গুপ্ত আয় প্রকাশিত হইয়াছে।

আয়কর নির্ণয়ের একটি প্রধান দোষ এই যে, যাহারা প্রকাশ্য-

ভাবে আয়করের হিসাব রাখে তাহাদের উপরই ইহার চাপ অধিক। দোকানপাট আপিস না করিয়া খুচরা কেনাবেচা যাহারা করে তাহাদের সংখ্যা এখন বিপুল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে শতকরা দুই জনও আয়কর দেয় কি না সন্দেহ। কলিকাতায় বা অন্য প্রধান শহরে বসিয়া কাজ-কারবারে বাৎসরিক ১০।১২ হাজার টাকা উপায় করে, এরূপ অসংখ্য লোক আছে। তাহাদের আয়ের হিসাব ধরা অতি দুরূহ ব্যাপার। তাহারা বাড়ীঘর করে বা জমিজমা কেনে সুদূর গ্রামে বা ছোট শহরে যেখান হইতে আয়কর বিভাগের খোঁজ পাওয়াও অসম্ভব। এই শ্রেণীর লোক আজকাল বিশেষভাবে চোরাকারবারে নামিয়াছে। ইহারা জাতির আয়ের কোঠায় প্রত্যক্ষভাবে কিছুই দেয় না, পরোক্ষভাবেও অতি অল্পই দেয়। অথচ জাতীয় অর্থব্যয়ের ফলে যে সকল সংস্থা সাধারণের হিতার্থে স্থাপিত হয় তাহার সকল সুযোগই উহারা পায়।

পল্লী-শিল্পই একমাত্র উপায়

উপরোক্ত শিরোনামায় ৬ই সেপ্টেম্বরের "হরিজন পত্রিকা"র ভূদান-যজ্ঞের ঋত্বিক শ্রীবিনোবা ভাবের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় ১০ই আগষ্ট তারিখে বারাণসীতে প্রদত্ত প্রার্থনার ভাষণ। তিনি গোরক্ষপুর এবং দেওরিয়ার দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "...সঙ্কটের একটি উদ্বেগজনক দিক আমি আপনাদের ভাবিয়া দেখিতে বলি। তাহা এই: সকলের কুলাইবার উপযোগী যথেষ্ট খাদ্য ঐ অঞ্চলে রহিয়াছে, কিন্তু লোকে কিনিয়া খাইতে পারে না। কারণ তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতার অভাব রহিয়াছে।

"ইহার অর্থ কি? আমাদের কাছে এই কথা নতুন নয়। গঠন-কর্ম্মিগণ আরম্ভ হইতেই এই কথার উপর জোর দিয়া আসিতেছেন যে, পল্লী-শিল্পের প্রসার ব্যতিরেকে ভারতের সঙ্কটমোচনের অন্য কোন উপায় নাই। ইহা সরল সত্য, যিনিই বুঝিয়া দেখিতে চান তিনিই ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সরল সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি জাগিতেছে না এবং অর্থনৈতিক কূটতর্কের কুজ্ঝটিকার আড়ালে আলো ঢাকিয়া দেওয়া হইতেছে। এই সকল তর্কে আমার কোন আগ্রহ নাই। আমি শুধু বলি গ্রামবাসীকে কাজ দাও, পল্লী-শিল্পের মাধ্যমে না দাও অন্যপ্রকারে দাও, যন্ত্রসাহায্যে কাজ দিতে চাও তাহাই দাও। কিন্তু যন্ত্র তো উপস্থিত নাই, এদিকে লোক কর্ম্মের অভাবে দুঃখভোগ করিতেছে। আমার দাবী এই যে, পল্লীবাসীদিগকে পল্লী-শিল্পের মাধ্যমে ছাড়া কাজ দেওয়া যাইবে না...।"

তিনি আরও বলেন, "যন্ত্রচালিত শিল্পকে পল্লী-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া উচিত নহে।" দেশের দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের স্থায়ী সমাধানের নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, যেহেতু "পল্লীবাসী জনসাধারণের ভরণপোষণ কেবলমাত্র কৃষিকর্ম্ম দ্বারা সম্ভব নহে, অতএব পল্লী-শিল্প রক্ষণ ও প্রসারের জন্য আমাদিগকে জোর করিতে হইবে।"

ধুতি-শাড়ী বুনিবার কাজে তাঁতিদিগের রক্ষা করিবার জন্য রাজাজী সম্প্রতি যে আবেদন জানাইয়াছেন বিনোবা তাহা সমর্থন করিয়া বলেন, "ন্যায্য কর্ত্তব্যের পক্ষেই রাজাজীর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছে।" কারণ মাদ্রাজে জনসাধারণের প্রতি বার জনের মধ্যে এক জন তাঁতি। মিলের প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য নানাবিধ অসুবিধা সহ্য করিয়াও তাহারা যেভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেছে তাহাতে বিনোবার মতে "আমাদের জাতীয় অধ্যবসায় ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।"

তিনি বলেন যে, "বলা হয় মিলের কাপড় তাঁতের কাপড়ের চেয়ে সস্তা কিন্তু ইহা যন্ত্রনির্ভর অর্থনীতি হইতে সঞ্জাত একটি মরীচিকা মাত্র।...মিল আসিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে আশ্রয়চ্যুত করিয়া বেকার থাকিতে বাধ্য করে। মিলের দ্বারা বেকার করা এই সকল সহস্র, লক্ষ লোকের ভরণপোষণের খরচ অগ্রে মিলের স্কন্ধে চাপাইয়া তৎপর হিসাব করিয়া দেখা হউক, মিলের কাপড়ের দর সত্যই সস্তা পড়ে কিনা।—মিল বস্ত্রের দর সস্তা শুধু আপাতদৃষ্টিতে...কারণ খাদির মূল্য সমপরিমাণ মিল-বস্ত্রের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলেও এই অতিরিক্ত মূল্য আমাদের গ্রামের ভাই-বোনদের ভরণপোষণে যায়। পক্ষান্তরে মিল-বস্ত্র কিনিতে যে টাকা দেওয়া যায়, তাহার সবটাই মিলমালিকের থলি ভারী করিতে চলিয়া যায়।" বিনোবা বলেন, সুতরাং মিলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিতে হইবে। না হইলে "লোক বলিবে এবং বলা অযৌক্তিক হইবে না যে, মিলমালিকরা গবর্ণমেণ্টকে নিজের পক্ষে টানিতে পারে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের মুঠার মধ্যে।"

তিনি বলেন, "পল্লী-শিল্প সম্পর্কে আমার অন্ধ আসক্তি কিছু নাই, একটি মাত্র আসক্তি আমার আছে স্বীকার করি। বুভুক্ষা ও অভাব হইতে মুক্তির প্রতি আমার আসক্তি আছে।" রাজসরকার বৃহৎ যান্ত্রিকশিল্পের চর্চ্চা করিয়াও কোন ফল দেখাইতে পারেন নাই। বিনোবা তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, "রাজসরকারকে আমার বলা উচিত, তাহারা সময় থাকিতে জাগ্রত হউক, পল্লী-শিল্পকে অবলম্বন করুক। পল্লী-শিল্পই রাজসরকারকে আমাদের দেশের দরিদ্র অবস্থা হইতে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবে সন্দেহ নাই।"

মিলের ও হাতে কাটা ও হাতের তাঁতে বোনা কাপড়ের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহা পূরণ করার দুইটি মাত্র উপায়। প্রথম এই যে, মিলের কাপড়ের উপর শুল্ক চাপাইয়া সেই শুল্কের অংশ খাদিতে দেওয়া। দ্বিতীয় এই যে হাতে কাটা সুতার সর্ব্ববিধভাবে উন্নতি করা, যাহাতে তাঁতির কাজ সহজ হয় এবং ঐ সুতায় প্রস্তুত কাপড় টেকসই ও উৎকৃষ্ট ধরণের হয়। পূর্ব্বেকার দিনে তাহাই ছিল এবং রাধানগর, শান্তিপুর, ঢাকা ইত্যাদির বিখ্যাত কাপড় হাতে কাটা সুতাতেই নাম করিয়াছিল। পুনর্বার সেরকম হয় কিনা তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ খদ্দরের কাপড় টেকসই করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। ইহার জন্য উৎকৃষ্ট কার্পাসের চাষও ঘরে ঘরে হওয়া উচিত।

দেশের লোকের মন যাহা সহজে গ্রহণ করে সেদিকে লক্ষ্য না রাখিলে কোনও চেষ্টাই সফল হইবে না। খদ্দর তখনই লোকে সহজে লইবে যখন তাহা টেঁকসই এবং কিছু উন্নততর বস্ত্রগুণযুক্ত হইবে। দরিদ্রের ভরণপোষণে সকলেরই কিছু কৃচ্ছ্রসাধন করা উচিত। কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধন সঙ্গের সীমার মধ্যে থাকা প্রয়োজন। সমস্ত দেশের লোককে আদর্শের পথে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা অতি মহান্ উহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু সেই চালনা তখনই সফল হইবে যখন চালক বাস্তবের রূপও সম্যকভাবে বিচার করিয়া পথনির্দেশ করিবেন।

"নবমহাভারতের রচনা"

বালিখানা অঞ্চলের মাসিকপত্র "সাধারণী" ভাদ্র সংখ্যায় লিখিয়াছেন, "মানুষের লোভে পৃথিবীতে আজ পাপের সঞ্চয় হয়েছে বিপুল। সকল হিংসার মূলেই মানুষের এই লোভ, এই শোষণ। তাই অন্যায়ের দ্বারা যাঁরা সঞ্চয় করেছেন, সেই সঞ্চয় আজ তাঁদের ফিরে দিতে হবে সেই বঞ্চিতদের, পৃথিবীময় অভাবের তাড়নায় যারা তাড়িত হয়ে বেড়াচ্ছে। 'সবৈ ভূমি গোপালকী' গান্ধীজীর এই বাণীই আজ বিনোবার বাণী। যাঁদের ভূমির সঞ্চয় রয়েছে আজ তাঁরা ভূ-দান যজ্ঞে সেই সঞ্চয় অর্পণ করুন। রাজসূয় নহে, আজ বিনোবার আহ্বান এই 'প্রজাসূয় যজ্ঞে'। আজ প্রজার অভিষেকের পর্ব্ব আরম্ভ হবে আমাদের এই নবমহাভারত রচনায়। 'ভূমিওয়ালা বাবা' বিনোবা···ছয় বৎসরে ভারতের নগর জনপদে অন্ততঃ ২৫ হাজার মাইল ভ্রমণ করে বঞ্চিতদের জন্য···ভূদান সংগ্রহ করবেন। প্রজাসূয় যজ্ঞে ভূ-দান উৎসর্গ করে সকলের কণ্ঠে স্বাহা! স্বাহা উচ্চারিত হউক। পুণ্যময় হউক এই ভারত।···"

এই "নবমহাভারত রচনা"র ইঙ্গিত আমরা পাই বিনোবাজীর ভ্রমণ-পঞ্জী হইতে। উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত হামিরপুর জেলার একটি গ্রাম মানগ্রোথ। এই গ্রামের অধিবাসিগণ তাহাদের সমস্ত জমি ভূ-দান যজ্ঞে দান করিয়া দিয়া 'সবৈ ভূমি গোপালকী' এই মহান্ আদর্শ অনুসরণ করিবার অতুলনীয় গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। এই চমকপ্রদ ঘটনার বর্ণনা করিয়া শ্রীদামোদর দাস মুন্দড়া ৬ই সেপ্টেম্বরের "হরিজন" পত্রিকায় লিখিয়াছেন: "বিনোবা নিজে এই গ্রামে যান নাই।···বিনোবার একটি মাত্র ভাষণ হইতে তাঁহারা এই বিষয়ে অনুপ্রাণিত হন···এই গ্রামের ৬৬ জন ভূস্বামী সকলেই তাঁহাদের সমগ্র ১৩০০ একর ভূমি বিনোবাকে দান করিলেন।···

"এখন মানগ্রোথে একজনও ভূমিহীন ব্যক্তি রহিল না। সমস্ত যাচক অযাচকে পরিণত হইল। জমি সাধারণভাবে একত্রে চাষ করিতে সকলে সম্মত হইল। গ্রামকে আদর্শরূপে গড়িতে বিনোবার পরামর্শক্রমে কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। সেই দিন হইতে বিনোবা প্রত্যেক গ্রামে তাঁহার প্রত্যেক ভাষণে মানগ্রোথের কথা উল্লেখ করিয়া উহার সুখ্যাতি করেন।···"

এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি ১৮৫৭ সনে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিয়া এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইতিমধ্যেই এক গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়াছে।

শ্রীমুন্দড়া হরিজন পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "মানগ্রোথ সকল সমস্যা ও সন্দেহের সমাধান করিয়াছে। জোতজমির খণ্ডীকরণ, একটি দান অথবা দুইটি দান, সমবায় কৃষি বনাম ব্যক্তিগত কৃষি, পতিত জমির উদ্ধারের সমস্যা প্রভৃতি সকল প্রশ্নের সমাধান জমিতে একমাত্র ব্যক্তিগত মালিকনা স্বত্ব ত্যাগের দ্বারাই সম্পন্ন করিয়াছে। ভূ-দান যজ্ঞের আরম্ভেই এইরূপ একটি আদর্শের কথা বিনোবার মনে জাগরূক ছিল। কিন্তু তিনি যদি গোড়াতেই ইহার জন্য চাপ দিতেন তাহা হইলে আমরা ভূ-দানের এই মহান্ রূপ দেখিতে পাইতাম না।···"

মানগ্রোথের এই সাফল্যের পর বুন্দেলখণ্ডে বিনোবার দাবি সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিল। "প্রারম্ভে তেলেঙ্গানায় তিনি দিনে প্রায় ১০০ একর ভূ-দান পাইতেন। ওয়ার্ধায় ফিরিবার কালে ইহা ২০০ একরে দাঁড়ায়। ওয়ার্ধা হইতে দিল্লীর পথে তিনি গড়ে দিনে ২৫০ একর করিয়া পান। উত্তর প্রদেশের পূর্ব্ব জেলাগুলি হইতে ৩০০ একর করিয়া পাওয়া যায়। সেবাপুরী সম্মেলনের পর দিনে ১০০০ একর করিয়া সংগ্রহ হইতে থাকে। প্রথমে প্রত্যেক জেলা হইতে বিনোবার দাবি ছিল মাত্র ১০,০০০ একর। এখন দাবির পরিমাণ বাড়িতে লাগিল এবং জালাউল হইতে তিনি ২০,০০০ একর পাইলেন। কিন্তু দাবির ঊর্দ্ধগতি বাড়িয়াই চলিল এবং হামিরপুরকে ৩৪,০০০ একর সংগ্রহ করিয়া দিতে বলা হইল। পরিশেষে বান্দা এক লক্ষ একর সংগ্রহ করিয়া দিতে সম্মত হইল। এক্ষণে বিনোবা তাঁহার দাবি এক লক্ষ একরের নীচে নামাইতে রাজি নন্। তিনি বলেন, "অবশেষে প্রতি জেলা দুই লক্ষ একর জমি অবশ্যই সংগ্রহ করিয়া দিবে। তাহা হইলে ভারতবর্ষের মোট ২৫০টি জেলা পাঁচ কোটি একর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। এবং ইহাই আমার শেষ লক্ষ্য।···"

"সবৈ ভূমি গোপালকী" যে আদর্শের মূলকথা, তাহার সঙ্গে কম্যুনিষ্ট ভূমিনীতির সাদৃশ্য যথেষ্ট। কিন্তু বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে মূলনীতিগত। আদর্শবাদের মতে বিনামূল্যে ভূমি উৎসর্গ করা হয় ভগবানের কাছে, দরিদ্রের সেবায়। কম্যুনিষ্ট মতে দানের মাহাত্ম্য নাই, সবলে ভূমির অধিকারী হইতে ছিনাইয়া লওয়ারই গুরুত্ব আছে। অর্থাৎ অপরের ক্ষতি ও অপমান ভিন্ন কম্যুনিষ্ট মত সফল হয় না।

অল্প কথায় পার্থক্য হিংসা ও অহিংসায় নীতির এবং দুর্নীতিমূলক অত্যাচারের ও প্রতিহিংসার। কোনটা ভারতীয় প্রাচীন নীতি সম্মত তাহার বিচার করা দুরূহ নয়।

জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ

গত ১৭ই ভাদ্র কটিতে প্রার্থনা সভায় আচার্য্য বিনোবা ভাবে বলেন, "যদি কংগ্রেসের মত এক অসাধারণ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠনমূলক কার্য্যে নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠান উহার আদর্শ হারাইয়া ফেলিবে এবং শয়তানের আড্ডাখানায় পরিণত হইবে।

"যদি কংগ্রেস আইনসভার কাজ ত্যাগ নাও করিতে পারে, তাহা হইলেও কংগ্রেসের জনগণ এবং সরকারের মধ্যে যোগ সূত্ররূপে কাজ করা উচিত হইবে।"

আইনসভায় যে সকল কংগ্রেসপন্থী আছেন এবং আইনসভার বাহিরে যে সকল কংগ্রেসসেবী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কি প্রকার সম্পর্ক থাকিবে এবং কংগ্রেসসেবীদের সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকিবে কিনা সে প্রশ্ন আবার উঠিয়াছে।

"মহাত্মাজী এই সমস্যার সমাধানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর 'কংগ্রেস লোক-সেবক সঙ্ঘে পরিণত হইবে।'

"সরকার এবং জনগণের মধ্যে একটা যোগসূত্র রাখিতেই হইবে। আমি এই সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছি। আমি মনে করি যে, কংগ্রেস যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তাহা হইলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে। কংগ্রেস সরকার ভারত সেবক সমাজ গঠনের কথা ভাবিতেছেন কিন্তু কংগ্রেস যদি দূরে দাঁড়াইয়া থাকে তবে এই ভারত সেবক সমাজ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে না। একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান যাহার শাখা-প্রশাখা সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া আছে, সেই প্রতিষ্ঠান চুপ করিয়া থাকিতেও পারে না, উহা শয়তানের আড্ডাখানায় পরিণত হইতে পারে না।"

আচার্য্য ভাবে বলেন, "কংগ্রেসের নিজের স্বার্থেই উহাকে আইনসভার কাজের সহিত গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই গঠনমূলক কার্য ব্যতীত অপর কোন ব্যবস্থার দ্বারাই কিংবা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধন করিলেও অবস্থার প্রতিকার হইবে না। কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি হইলে স্বেচ্ছাচারের বিপদ থাকিবে। যদি এই দুই পদ পৃথক ব্যক্তির হাতে থাকে, তাহা হইলে সংঘর্ষেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং যদি কংগ্রেস সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর লোক হন, তাহা হইলে তিনি তাহার আজ্ঞাবহ ব্যতীত আর কিছুই হইবেন না। এই অবস্থায় উহা কাহার পক্ষেই কল্যাণকর নহে।"

উপসংহারে আচার্য্যজী বলেন, "আমি মনে করি যে, কংগ্রেস যখনই গঠনমূলক কাজ হাতে লইবেন, তখনই সকল দলীয় বিরোধের অবসান হইবে এবং অন্যান্য দলগুলিও জাতি গঠনমূলক কার্য্যে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিবেন।"

আমরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশী মাথা ঘামাই না। প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্ম্মী যদি আদর্শে অটুট থাকেন, তবে কংগ্রেস ঠিক থাকিবে বা তাঁহারা অন্য প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া দেশের সেবা করিবেন।

কৃষিমন্ত্রীর আবেদন

গত ১৬ই ভাদ্র তারিখের "খাদ্যোৎপাদন" পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগীয় মন্ত্রী ডাঃ আর. আহমেদের এক আবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গবাসীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, চাউলই আমাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চাউলের অভাব দেখা দিয়াছে। বিদেশ হইতে চাউল আমদানী করিয়া আমাদের দেশের খাদ্যাভাব দূর করা অসম্ভব। সুতরাং দেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

তিনি বলিয়াছেন, "এ বছর বৃষ্টি ভালই হয়েছে এবং আমনের রোয়াও সুরু হয়েছে। কিন্তু ধানের ফলন বাড়াতে হলে ক্ষেতে স্বাভাবিক ও রসায়নিক সার প্রয়োগের ওপরই বেশি নজর দিতে হবে। আমাদের চাষীরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে নিজ নিজ ক্ষেতে যথাসাধ্য সার প্রয়োগ করেছেন কিন্তু যাঁরা নাইট্রোজেন বা ফসফেটযুক্ত সার ব্যবহার করেন নি তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন অবিলম্বে এগুলো জমিতে দেন। সর্ব্বাধিক ফলনের জন্য বিঘাপ্রতি যে পরিমাণ ঐ জাতীয় সার প্রয়োজন তার একটি তালিকা প্রয়োগের সময় নির্দ্দেশসহ নিয়ে দেওয়া হ'ল চাষীদের অবগতির জন্য। এ্যামোনিয়াম সালফেট—১৫-২০ সের বা খৈল ১-২ মণ কাদানোর সময় কিংবা রোয়া লাগানর ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে কিংবা উভয়তঃ। হাড়ের গুঁড়া বা সুপার-ফসফেট ১০।১৫ সের কিংবা আরও বেশি জমি তৈরির সময় অথবা কাদানোর সময় এবং ধানের মুসন মিশ্রসার ১ মণ ২৭ সের কাদানোর সময় অথবা পরে টপড্রেসিং হিসাবে অথবা দুই ভাবেই। সার বণ্টন ব্যবস্থা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১,৬৩,০০০ মণ খৈল, ৮১,৬০০ মণ সুপার ফসফেট কম দামে সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন সরকারী এজেন্টের মারফত। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজের সাবডিপো মারফত বিতরণ করা হবে ৩,০০,০০০ মণ এ্যামোনিয়াম সালফেট। আমাদের এজেন্ট মেসার্স তালুকদার এণ্ড কোম্পানীর মারফত ৬।০ আনা মণ দ.র বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে ৮১,০০০ মণ বিশেষ ভাবে তৈরি ধানের মিশ্র সার। খৈল, এ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার-ফসফেট, হাড়ের গুঁড়া ও তলানি সার মিলিয়ে এই মিশ্র সার তৈরি। একর প্রতি ৫ মণ এই মিশ্র সার দিলে ধানের ফলন শতকরা অন্ততঃ ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ বাড়বে বলে আশা করা যায়।"

তিনি অনুরোধ করিয়াছেন, "চাষী বন্ধুরা যেন আমাদের এজেন্টের ডিপোতে সরাসরি গিয়ে দরকারমত এই মিশ্র সার সংগ্রহ করেন। যাঁরা এই ডিপোগুলির খবর রাখেন না তাঁরা নিকটবর্ত্তী ইউনিয়নে কৃষিকর্ম্মচারী অথবা কৃষিপরিদর্শকের থানা অফিসে দেখা করে চাহিদা অনুযায়ী মিশ্রসার সংগ্রহ করবেন। কৃষিকর্ম্মচারীদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা চাষীদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করেন এই সার সংগ্রহ ব্যাপারে। যে পরিমাণ সার সরবরাহের ব্যবস্থা এ বছর করা হয়েছে তার প্রতিটি কণা যাতে ধানের ফসলে ব্যবহার হয় তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ উদগ্রীব।"

চাষীদিগের নিকট এই সার ব্যবহারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া এবং পল্লীগ্রামের শিক্ষিত সমাজ যাতে এই সার সংগ্রহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিস্তারে সাহায্য করেন তার আবেদন জানাইয়া কৃষিমন্ত্রীর ভাষণের সমাপ্তি।

কৃষিমন্ত্রীর • আবেদন সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের "সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ ও অভিমত" পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রয়ালাসীমার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনসাধারণকে সাহায্যের আবেদন জানাইয়া অন্ধ্র প্রাদেশিক সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটির সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণরাও সোভিয়েৎ ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় শ্রমিক সঙ্ঘের নিকট যে বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে ভি. কুজনেৎসফ লিখিয়াছেন :

"অন্ধ্র প্রদেশের মেহনতী জনগণ ও মাদ্রাজ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের এই মহা দুর্বিপাকে সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতী জনসাধারণের পক্ষ থেকে সোবিয়েৎ ট্রেড ইউনিয়ন তাহাদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং দুর্ভিক্ষত্রাণ সংযুক্ত কমিটির নিকট নিম্নলিখিত সাহায্য পাঠাচ্ছে, ১০ হাজার টন গম, ৫ হাজার টন চাউল, ৫ লক্ষ টন গুঁড়া দুগ্ধ এবং ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ভারতীয় মুদ্রা।"

দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্যের কাজে অন্ধ্র কমিটির সাফল্য কামনা করিয়া তাঁহার পত্র সমাপ্ত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত-সরকার চীন এবং সোবিয়েৎ সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, উক্ত দেশগুলি হইতে প্রেরিত সাহায্য হয় সরকারী প্রতিষ্ঠান মারফত না হয় ভারতীয় রেড ক্রস মারফত বণ্টন করা হইবে। অন্য কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা অন্ধ্র কমিটির মারফত এই সাহায্য বণ্টনে ভারত-সরকার সম্মত নহেন। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েৎ ট্রেড ইউনিয়ন ভারতীয় রেড ক্রসের মারফত প্রেরিত খাদ্যদ্রব্য বণ্টন করিতে সম্মত আছেন।

রাজনীতি ও দলাদলি

"স্বাধীন ভারতে"র শ্রাবণ ১৩৫৯ সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সময়োপযোগী :

"সমষ্টিগতভাবে তথাকথিত বামপন্থী দলসমূহের সহিত কংগ্রেসের এবং ব্যষ্টিগতভাবে একটি বামপন্থী দলের সহিত অপরটির যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান, যে সঙ্গতি ও অসঙ্গতি প্রত্যক্ষগোচর, পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় যদিও আমরা তাহার বিস্তৃত পর্য্যালোচনা করিয়াছি, তথাপি নব উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার পুনরালোচনা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। দেশের সাধারণ নির্ব্বাচনকে সম্মুখে রাখিয়া রাজনৈতিক দাবার ছক যেভাবে সজ্জিত হইয়াছিল, নির্ব্বাচন পর্ব্ব সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ছকের শক্তি সংস্থাপন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধনের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে এবং তদনুযায়ী ছকের গুটি-সমূহের অঙ্গে সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে চাঞ্চল্যের সঞ্চার। নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করিবার সর্ব্ববাদিসম্মত সঙ্কল্প সম্বল করিয়া পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী ও বিপরীত কর্ম্মীদলসমূহের মধ্যে আপাততঃ মিলনের যে সাধারণ সূত্র রচিত হইয়াছিল, নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইবার পর হইতেই তাহার বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করে এবং আজ অবস্থাগতিকে সে মিলনগ্রন্থি বহুধা-বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম।"

উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ

গত ৯ই ভাদ্র তারিখের "বাঁশরী" পত্রিকা এই বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আরও কঠিন ভাষা প্রয়োগ করা যায় :

"পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি নদীয়া জেলার কয়েক স্থানে সফর করিয়া ও সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে যাহা মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রাজ্যপাল বলিয়াছেন—পাকিস্থানের চাপ পড়িলে উদ্বাস্তুগণ ভারতে চলিয়া আসেন, ভারতের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং তারপর আবার পাকিস্থানে চলিয়া যান। ইহাতে সরকারী অর্থের অপচয় হয়।" কয়েকদিন পূর্ব্বে আমরা পশ্চিম বাংলা সরকারের সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন ডেপুটি মন্ত্রীদ্বয়ের সহিত হাঁসখালি থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর উদ্বাস্তু কলোনী দেখিতে গিয়াছিলাম। এই কলোনীতে প্রায় সাড়ে পাঁচ শত উদ্বাস্তু পরিবার ছিলেন এবং সকলেই প্রায় সরকারী সাহায্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে অর্দ্ধেক পরিবার উক্ত কলোনীতে নাই। হয় তাঁহারা পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছেন, আর না হয় অন্যত্র সরিয়া পড়িয়াছেন।

"রাজ্যপাল বলিয়াছেন—পাকিস্থানের মোহ ত্যাগ করিয়া উদ্বাস্তুগণকে সম্পূর্ণ ভারতীয় নাগরিকরূপে বসবাস করিতে হইবে।" রাজ্যপালের বক্তব্যের সহিত সুর মিলাইয়া আমরা ঐ একই কথা বলি যে, পাকিস্থান ছাড়িয়া যখন চলিয়াই আসিতে হইয়াছে তখন আবার পাকিস্থানের মোহ বা জমি জমার লোভ কেন? পাকিস্থানের হিসাবনিকাশ শেষ করিয়া ভারতের নাগরিকরূপে বাস করিবার জন্য মনোনিবেশ করাই ভাল।

"এমন অভিযোগও পাওয়া গিয়াছে যে, অনেক উদ্বাস্তু ভারত হইতে অর্থ, লাঙল, বলদ প্রভৃতি সাহায্য লইয়া পাকিস্থানে পলাইয়া গিয়াছেন। ভারতের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া পাকিস্থানে পলাইয়া যাওয়া অথবা ঋণ প্রভৃতি ফাঁকি দিবার জন্য অন্যত্র সরিয়া পড়া বা নাম বদলাইয়া ফেলা—এ সকলই গভীরভাবে নিন্দনীয়।"

পাকিস্থানে সংবাদপত্রের মিথ্যা প্রচার

"ত্রিপুরার জনৈক উদ্বাস্তুর হত্যাকাণ্ডের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের উপর অত্যাচার ও অগ্নি সংযোগের যে অভিযোগ পাকিস্থান হইতে ক্রমাগত করা হইতেছে, তৎসম্পর্কে তদন্তের জন্য কলিকাতা-স্থিত পাকিস্থানী ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী গত ২৯শে জুলাই আগরতলা আসিয়াছিলেন।

"ত্রিপুরার ডি. এম. ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সংখ্যালঘু বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী এস. আর. গুপ্ত এবং লিয়াজঁ অফিসার মিঃ শরিফের সহিত তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ বিষয়ে তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট মতামত প্রকাশ

করিতে অসম্মত হন। কেননা বিষয়টি বর্ত্তমানে বিচারাধীন রহিয়াছে এবং ইহার সহিত জড়িত ব্যক্তিগণ গ্রেপ্তার হইয়াছে। এ সম্পর্কে পাকিস্থানের কোন কোন সংবাদপত্রে যে সকল খবর বাহির হইয়াছে তদ্বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, এগুলি অতিরঞ্জিত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সকল লোক বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে। ত্রিপুরা সরকার নগদ টাকা ও জিনিষপত্র দিয়া তাহাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেছেন। গবর্মেণ্ট এতদঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, পাকিস্থান বেতারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে দাবি করা হইয়াছে, উহা অপ্রাসঙ্গিক। কেননা গবর্মেণ্ট এই ব্যাপারের সহিত জড়িত নহেন।"

গত ২৩শে শ্রাবণের "যুগশক্তি" (করিমগঞ্জ) পত্রিকায় উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। আশা করি হামিদ সাহেবের স্বীকৃতিতে পাকিস্থানী নাগরিকের চৈতন্যোদয় হইবে।

মিশর

মিশরের পরিস্থিতি আজ সারা দুনিয়া আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছে। যখন ২৬শে জুলাই সেনাপতি নেগুইবের আদেশে রাজা ফারুককে সিংহাসনচ্যুত করা হইল, সেদিন মিশরবাসীরা আশার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। রক্তবিহীন সামরিক বিপ্লব জনগণের বিপ্লবে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনায় প্রতীয়মান ছিল। মিশরের দ্রুত পট-পরিবর্ত্তনে প্রধান মন্ত্রী আলি মেহের পিছাইয়া পড়িলেন। ফারুকের সিংহাসনচ্যুতির পিছনে ছিল মেহের এবং নেগুইবের যুক্ত প্রচেষ্টা। আলি মেহেরের দূরদৃষ্টির অভাব ছিল, কারণ তাঁহার বুঝা উচিত ছিল তাঁহাকেও রাজা ফারুকের পথ অনুসরণ করিতে হইবে।

রাজা ফারুকের সিংহাসনচ্যুতির খবর আজ পুরানো হইয়া গিয়াছে। রাজার জন্ম নাকি কেহ চোখের জল ফেলে নাই—খুবই স্বাভাবিক। ফারুকের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ মিশরের জনসাধারণের মঙ্গল তাঁহার চিন্তায় কখনই উদিত হয় নাই। আত্মসুখেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন এবং রাষ্ট্রের টাকার অপ-ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। আরও অভিযোগ ছিল যে, বিগত প্যালে-ষ্টাইন যুদ্ধে অস্ত্র-সরবরাহের কেলেঙ্কারী ব্যাপারে রাজা ফারুকের খানিকটা যোগ ছিল; অন্ততঃ যাহারা অস্ত্র সরবরাহের প্রহসনে টাকা করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে প্যালেষ্টাইন রণক্ষেত্রে মিশরের সৈন্যদের প্রতারিত করিয়াছে তাহাদের রাজা ফারুক কোন শাস্তি দেন নাই। প্যালেষ্টাইন যুদ্ধে পরাজয় মিশরের সামরিক মনে প্রচণ্ড দাগ রাখিয়া গিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহারই আলোড়নের ফলে ফারুককে সিংহাসন হারাইতে হয়।

মিশরে বহু দল আছে, তাহার মধ্যে ওয়াফ্‌দ দলই প্রধান এবং ইহাদের সভ্যসংখ্যা অনেক বেশী। নাহাশ পাশা ইহার নেতা এবং সেরাগ-এল্-দিন্ প্রধান সচিব ছিলেন। আলি মেহের এই দলেরই সভ্য। গত জানুয়ারী মাসে কায়রোতে যে দাঙ্গা হয় তাহার জন্ম রাজা ফারুক নাহাশ পাশাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে চ্যুত করেন। জানুয়ারী মাসের দাঙ্গার পর হইতেই মিশরে রাজকীয় বিপ্লবের বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। সামরিক বিপ্লব আকস্মিক হইতে পারে, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ছিল না।

ফারুকের পর মিশরের প্রকৃত শাসক হইলেন সেনাপতি নেগুইব, যদিও আইনতঃ তিনি ছিলেন কেবল প্রধান সেনাপতি মাত্র। আলি মেহের হইলেন প্রধান মন্ত্রী। নেগুইব জানিতেন যে, ওয়াফ্‌দ দলের সমর্থন ব্যতীত রাজা ফারুককে বিতাড়ন করা সম্ভবপর নয়; তাই আলি মেহের হইয়াছিলেন ফারুক বিতাড়নে শিখণ্ডী। ওয়াফ্‌দ দল গঙ্গাজলে ধোয়া ছিল না সে কথা নেগুইবের জানা ছিল।

নেগুইব দাবি করিলেন যে, মিশরের রাজনৈতিক দলগুলি যেন অবিলম্বে নিজেদের পুনর্গঠন করিয়া অর্থ নৈতিক বিপ্লবের আয়োজন করে। নেগুইব আরও দাবি করিলেন, কোন জমির মালিকের ২০০ একরের বেশী জমি থাকিতে পারিবে না। আলি মেহের দ্বিধাগ্রস্ত হইলেন। জমির পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থায় হাত দেওয়া তিনি বিপজ্জনক মনে করিলেন, কারণ তাহাতে ওয়াফ্‌দ দলের বহু সভ্যের স্বার্থে ঘা পড়িবে। ওয়াফ্‌দ দলের সচিব সেরাগ-এল দিন কোটিপতি এবং ক্ষমতাশালী—তাঁহার স্বার্থে হাত দেওয়া আলি মেহেরের ক্ষমতার বাহিরে ছিল। তাই যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই ঘটিল—আলি মেহের পদত্যাগ করিলেন। সেনাপতি নেগুইব হইলেন মিশরের প্রধান মন্ত্রী, যুদ্ধমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি—মিশরের ভাগ্যবিধাতা।

৭ই সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে সেনাপতি নেগুইব মিশরের প্রধান মন্ত্রী হইলেন। সেদিনই মিশরের ৫১ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকে বন্দী করা হয়। ওয়াফ্‌দ দলের প্রায় সকল নেতাকেই বন্দী করা হইয়াছে—কেবলমাত্র আলি মেহের ও নাহাশ পাশা মুক্ত আছেন। নেগুইব প্রধান মন্ত্রী হইয়া প্রথমেই দুইটি আদেশ জারী করিয়াছেন—দুই শত একরের বেশী কাহারও ধানজমি থাকিবে না এবং দ্বিতীয়তঃ মিশরের সমস্ত রাজনৈতিক দলের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে।

নেগুইবের শুভ প্রচেষ্টা সফল হউক। নেগুইব তথা মিশরের ভবিষ্যৎ সকলেই সাগ্রহে লক্ষ্য করিবে। শুভ আদর্শ সর্ব্বদা ভাল, কিন্তু তার প্রচেষ্টা সর্ব্বদা শুভফল নাও দিতে পারে। ওয়াফ্‌দ দল মিশরের প্রধান রাজনৈতিক দল এবং ইহার জনসমর্থন যথেষ্ট। আজ ওয়াফ্‌দ দল নেগুইবের বিরুদ্ধে—তাই সঠিক কিছু বলা যায় না নেগুইবের ভবিষ্যৎ কর্ম্মধারা কি রূপ লইবে। তবে একথা ঠিক যে সুদানের উপর মিশরের দাবি অনিশ্চিত কালের জন্ম ধামাচাপা পড়ল। মিশর আজ অন্তর্বিপ্লবে দ্বিধা-বিচ্ছিন্ন, সামরিক শক্তি আজ তার ভাগ্যবিধাতা—এ অবস্থায় সুদান মিশরের সহিত মিলিত হওয়ার কল্পনাও করিতে পারে না। সম্প্রতি সুদানের উপর মিশরের দাবি নিস্তব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মিশরের পট-পরিবর্ত্তনে নেগুইব কি

করিয়া সে দাবি মিটাইবেন তাহা লক্ষ্যের বিষয়। পরের বছর সাধারণ নির্ব্বাচনের পর যখন রাষ্ট্রতান্ত্রিক গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন মিশর নেগুইবকে কি ভাবে লইবে তাহা আলোচনার বিষয়।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও স্বর্ণপরিস্থিতি

যুদ্ধোত্তর স্বর্ণপরিস্থিতি বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এক আউন্স সোনার মূল্য ৩৫ ডলার হিসাবে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে। যে সকল দেশ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সভ্য তাহারা এই মূল্যে অর্থাৎ এক আউন্স ৩৫ ডলারে বেচা-কেনা করিতে বাধ্য। এক আউন্সে প্রায় আড়াই ভরি হয়। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পূর্ব্বে সোনার আন্তর্জাতিক মূল্য ছিল ১১৬৲ টাকায় আড়াই ভরি। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর বর্ত্তমানে আড়াই ভরি সোনার মূল্য হইয়াছে ১৬৬৲ টাকা। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতে যে সোনার মূল্য তাহা হইতেছে কালোবাজারের মূল্য, যদিও এদেশে আইনসঙ্গত ভাবে ৯০।৯২৲ টাকায় সোনার ভরি বিক্রি হইতেছে। আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের মান হিসাবে সোনার মূল্য বর্ত্তমানে ৬৬৲ টাকায় এক ভরি হওয়া উচিত ছিল, এবং মুদ্রামান হ্রাসের পূর্ব্বে এক ভরি সোনার মূল্য ৪০৲ টাকা হওয়া উচিত ছিল। ভারতে যুদ্ধ-পরবর্ত্তী যুগে কোন সময়েই এ মূল্যে সোনা পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষকে তাই বলা হয় সোনার চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য। ভারতের বাজারে সোনার দাম আন্তর্জাতিক মূল্য হইতে অনেক বেশী, স্বভাবতঃই তাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে এদেশে সোনার গুপ্ত আমদানী হয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় যথেষ্ট পরিমাণে সোনা উৎপন্ন হয়। তার দাবি হইতেছে যে, সোনার ডলার-মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহা না হইলে স্বর্ণ-উৎপাদক দেশগুলির কোনই লাভ থাকে না। ৩৫ ডলারে এক আউন্স সোনা ১৯৩৫ সাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় স্বর্ণ উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই সোনার বাজারদরও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কয়েক বৎসর আলোচনার পর আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার দক্ষিণ-আফ্রিকাকে ৩৫ ডলারের অধিক মূল্যে সোনা বিক্রি করিবার অনুমতি দিয়াছিল। প্রায় বৎসর দুই দক্ষিণ-আফ্রিকা পৃথিবীর বাজারে ৩৮।৪০ ডলারে এক আউন্স করিয়া সোনা বিক্রি করিয়াছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক সোনার বাজার আজ মন্দা, তাই অধিক মূল্যে সোনা আজ আর তেমন বিক্রি হইতেছে না।

সোনার চাহিদা প্রধানতঃ গহনা ও অন্যান্য সৌখীন জিনিষের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ নোটের বিরুদ্ধে জমা রাখা। দ্বিতীয় কারণে সোনার চাহিদা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অর্থাৎ, বর্ত্তমানে রাষ্ট্র কাগজের নোট বাহির করে হুণ্ডি কিংবা বিলের বিরুদ্ধে। তাই সোনার ব্যবহার এই ব্যাপারে প্রায় অচল। আর গহনা প্রভৃতির জন্য সোনার চাহিদা এক ভারতবর্ষেই বেশী। ইউরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গহনার জন্য সোনার চাহিদা অতি নগণ্য। সোনার চাহিদার অন্য একটি কারণ ছিল যে, সোনা জমানো। কোরিয়ার যুদ্ধ তথা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনিশ্চিত হওয়ায় সোনা জমানোর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধ অনিশ্চিতের গর্ভে চলিয়া যাওয়ায় সোনা জমানোর চাহিদাও হ্রাস পাইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চড়া মূল্যে দক্ষিণ-আফ্রিকা সোনা বিক্রি করিতে পারিল না। তাই সোনার কালোবাজার প্রায় অচল, অবশ্য ভারতবর্ষ ব্যতীত।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অধিবেশন হইয়া গেল। বাৎসরিক রিপোর্টে সোনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার মন্তব্য করিয়াছে যে সোনার গুপ্ত আমদানী বন্ধ করিতে হইলে শুধু আইন দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইবে না। সত্যিকারের প্রয়োজন হইতেছে স্বচ্ছল বাজেট এবং ব্যাঙ্কের ঋণদানের বিনিয়ন্ত্রণ। ঘাট্‌তি বাজেট মুদ্রাস্ফীতির সহায়ক এবং সেইজন্য সোনা জমানোর চাহিদা বাড়িয়া যায়, কারণ ঘাট্‌তি বাজেটে মুদ্রামূল্য হ্রাস পায় তাই লোকে সোনা জমাইতে চায়। ১৯৫১ সালে সোনা জমানোর চাহিদা খুব বৃদ্ধি পায়, প্রধানতঃ ভারতবর্ষে। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ সোনা আজ ভারতমুখী, অবশ্য অধিকাংশই চোরাকারবার হিসাবে। কারণ ভারতে সোনার দর বেশী। কিন্তু চাহিদার তুলনায় সোনার অধিক আমদানী হওয়ায় সোনার দাম পূর্ব্বাপেক্ষা খানিকটা কমিয়াছে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রায় দুই শত কোটি টাকার ঘাট্‌তি বাজেট হইবে। অর্থাৎ, এই ঘাট্‌তি টাকার কিছু জনসাধারণের নিকট হইতে সরকার ঋণ হিসাবে লইবেন এবং বাকিটা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাগজের নোট ছাপাইবেন। যেখানে মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেখানে সোনার মূল্য যে কমিবে সে ভরসা কম। তবে যদি ভারতবাসীর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ যদি সোনা জমানোর প্রবৃত্তি হ্রাস পায় তবেই সোনার মূল্য কিছু কমিতে পারে। তবে গহনার চাহিদা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে ও গহনার দোকানের সংখ্যা যে ভাবে বাড়িতেছে তাহাতে এদেশে সোনার মূল্য হ্রাসের পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইবে।

ইউরোপীয় কয়লা এবং লৌহ-শিল্প সমন্বয়

সার প্রদেশ জার্ম্মানীর প্রধান কয়লা উৎপাদনের উৎস। সার শুধু জার্ম্মানীকে কয়লা দেয় না, দেয় সম্পদ এবং সামরিক বল। সার প্রদেশবিহীন জার্ম্মানীর সামরিক সম্পদ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে—একথা ফ্রান্স জানে। জার্ম্মানীর পুনর্গঠনে আবার যদি সে সার প্রদেশ ফিরিয়া পায় তাহা হইলে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই জার্ম্মানী পুনরায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। সেই চিন্তায় এতদিন ফ্রান্সের চোখে ঘুম ছিল না। অথচ জার্ম্মানীকে আবার সামরিক শক্তিতে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। তাহা না হইলে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে রাশিয়াকে রুখিবে কে? তাহা হয়ত পারিবে একমাত্র জার্ম্মানী। জার্ম্মানী আজ বিচ্ছিন্ন, সেইজন্য ইউরোপের

শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ আজ জার্ম্মানীকে বাঁচাইবার জন্ত ব্যগ্র। কিন্তু শক্তিশালী জার্ম্মানী যে ফ্রান্সের ভয়ের কারণ। অন্ততঃ 'সার' বিহীন জার্ম্মানীর বিষ-দাঁত কয়েকটা ভাঙা থাকিবে—ইহাই হইতেছে ফ্রান্সের কথা। জার্ম্মানীকে বাঁচাও, কিন্তু সার প্রদেশ দিও না। জার্ম্মানী উত্তর দিল সার প্রদেশ ব্যতীত জার্ম্মানী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। মীমাংসা হইল এই বলিয়া যে, মিত্রশক্তি পক্ষের ইউরোপীয় দেশগুলি লৌহ-শিল্প ও কয়লা-শিল্প একত্রীকরণ করা হউক, যাহাতে নিজস্ব কোন দেশ এইগুলিকে যুদ্ধে না লাগাইতে পারে। এই শিল্প একত্রীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ রেষারেষি দুর করা। ফ্রান্সের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী সুমান এইরূপ শিল্প একত্রীকরণের প্রধান উদ্যোক্তা। সুমানের কথা হইতেছে লৌহ ও কয়লা শিল্প একত্র করিলে ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে যুদ্ধ যে শুধু অচিন্তনীয় হইয়া উঠিবে তাহা নহে, পরন্তু যুদ্ধ করা অসম্ভব হইবে। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক সমন্বয় দ্বারা ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমন্বয় সম্ভবপর হইবে এবং ফলে ঐখানে শান্তিরক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রিটেন প্রথম থেকেই এই প্রস্তাবে আপত্তি জানাইয়া আসিতেছে; কারণ সে মনে করে যে অর্থনৈতিক সমন্বয় দ্বারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার হানি হইবে।

নয় জন সভ্য লইয়া একটি পরিচালক সভা থাকিবে। ছয়টি সভ্য দেশ আট জন পরিচালক নিযুক্ত করিবে এবং এই আট জন সভ্য নবম সভ্য নিযুক্ত করিবে। পরিচালকগণ ছয় বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবে। এই পরিচালকবর্গের একটি উপদেষ্টামণ্ডলী থাকিবে, যাহারা উপদেশ দিবে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যাপারে পরিচালকবর্গের আদেশ বাধ্যতামূলক হইবে এবং অন্যান্য ব্যাপারে শুধু উপদেশ দিবে। জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গ এই শিল্প-সমন্বয়ের সভ্য। পরিচালকবর্গের অধীনে একটি মন্ত্রী-পরিষদ থাকিবে। মন্ত্রী-পরিষদ হইবে কার্য্যকরী সমিতি।

ইউরোপীয় শিল্প সমন্বয় চুক্তিকে আর্থিক যুক্তরাষ্ট্র বলা যাইতে পারে। সভ্যদেশগুলির মধ্যে যদি বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহার সমাধানের জন্য একটি উচ্চ আদালত স্থাপিত হইয়াছে। সাত জন বিচারক লইয়া এই আদালত গঠিত হইয়াছে। যদি কোন দেশ মনে করে যে পরিচালকবর্গের কোন আদেশ সেই দেশের আর্থিক ব্যবস্থার পক্ষে অনিষ্টকর, তাহা হইলে সে দেশ আদালতের কাছে আবেদন করিতে পারে।

ইউরোপীয় কয়লা ও লৌহ-শিল্প সমন্বয় একটি নূতন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। জাতিসঙ্ঘ কিংবা বর্ত্তমান ইউ-এন-ও'র প্রধান অসুবিধা হইতেছে যে, সভ্যদেশগুলি তাহাদের রাজনৈতিক সার্ব্বভৌমত্ব ছাড়িতে রাজী নহে। সেইজন্য ইউরোপীয় শিল্প-সমন্বয়ের ভবিষ্যৎ কি হইবে, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। কারণ আজ পরাজিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন জার্ম্মানীর হাত হইতে তাহার সার প্রদেশ ছাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এবং তাহার উপর প্রায় জোর করিয়াই শিল্প-সমন্বয় চাপানো হইয়াছে। দ্বিধাবিভক্ত জার্ম্মানী যখন যুক্ত হইবে তখন সংযুক্ত জার্ম্মানী কি ভাবে ফ্রান্সের সর্দ্দারী গ্রহণ করিবে তাহা দেখিবার বিষয়।

রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি

গত ১৬ই ভাদ্রের "বাঁকুড়া-দর্পণ" সাপ্তাহিক পত্রিকায় দুর্গত নর-নারীর দুঃখ লাঘবের জন্ত যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে :

"জেলার বিভিন্ন স্থানে অন্নাভাব প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে। মধ্যবিত্ত ও কুলি-মজুরদের খাদ্যাভাবই অধিক। সেদিন খাতড়া থানার এক সভায় নাকি জেলাশাসক জানিয়াছেন অন্নাভাবে মৃত্যুর সংবাদ। কাজেই তৎকালীন মনোভাবাপন্ন সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের জনসেবা মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের একটি সভা গঠন করতঃ জেলার প্রতি গ্রামের অবস্থা সম্যক্ অবগত হইয়া কার্য্য করিলে তথাকথিত খাদ্যাভাবে মৃত্যুর সংবাদ আর আমাদিগকে শুনিতে হইবে না বলিয়া বিশ্বাস করি। ১৩৪২ সনের দুর্ভিক্ষের সময় হইতে এইরূপ একটি সমিতি কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। আমাদের মনে হয় আবার সেইরূপ একটি জেলা রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি অচিরাৎ গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

জেলার দুঃস্থ অঞ্চলে সাহায্যের জন্ত প্রয়োজন—

(ক) যথেষ্ট ল্যাণ্ড ইমপ্রুভমেণ্ট লোন ;

(খ) ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেণ্টের কাজ আরও বেশীভাবে চালান।

(গ) ধান নিড়াইতে ও উল্টাইতে যথেষ্ট পরিমাণ কৃষিঋণ।

(ঘ) সমস্ত দুঃস্থ ইউনিয়নের রিলিফ টেষ্টওয়ার্ক খোলা প্রয়োজন।

ইহাতে অনেক কুলি-মজুর কাজ পাইবে এবং সেই সকল স্থানে ৭।০ টাকা মণ দরে সরকার হইতে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের এখানে একজন অভিজ্ঞ সদর মহকুমা-শাসক আসিয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি অচিরাৎ উক্ত কমিটি গঠন করতঃ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। তিনি অবশ্য একথা বুঝেন যে, এক একজন সার্কেল অফিসারের এরিয়া অনেক বড়—সকল স্থানের সকল খবর রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নহে।"

হাওড়া জেলায় কৃষি-ঋণ

"নব্য-ভারত" পত্রিকার ১৪ই ভাদ্র সংখ্যায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল :

"কৃষিকার্য্যে ঋণ সম্বন্ধে হাওড়া জেলায় অত্যন্ত অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। সমবায় সমিতির আপিস হইতে বহু ইউনিয়নে সমবায় সমিতি গঠনের জন্ত উৎসাহ দেওয়া হয় এবং যথারীতি সমবায় সমিতিও গঠিত হইয়াছে। ঐ সমিতির প্রয়োজনীয় সরকারী ব্যবস্থামত সব কিছু করার পর কৃষকেরা ঋণ পায় নাই। এ সকল দরখাস্ত সময় মত মঞ্জুর হইয়াছিল বলিয়া শোনা গিয়াছে। হাওড়া জেলা

সমবায় কর্তৃপক্ষের নিকট এ সকল জানান হইয়াছিল। তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না বলিয়াছেন। ইহা খুবই আশ্চর্য্য ব্যাপার। অর্থ বন্টনের ভার তাঁহারই উপর অথচ সদর ও উলুবেড়িয়া মহকুমার অর্থ নির্দ্ধারিত করিয়া বন্টনের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। সরকারী কর্ম্মচারীদের অমনোযোগিতায় বা স্বেচ্ছাচারিতায় জনসাধারণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাহার নিরসন হইতে বহু অসুবিধা হয়। আমরা এ সম্বন্ধে সমবায় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মন্ত্রী মহাশয় বঞ্চিতদের এখনও সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিলে করিতে পারেন। শুনিতেছি সরকার কৃষিঋণের অর্থ ও সময় বাড়াইয়া দিতেছেন।

এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎপর হওয়া উচিত। কৃষি-বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব আছে। কারণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না হইলে তাঁহার নিজের বিফলতা প্রমাণিত হইবে।

বর্দ্ধমান শহরের হাসপাতাল

আনন্দবাজার পত্রিকার ১৯শে ভাদ্র সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতি আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি শহরের ডাক্তারী স্কুল লইয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যাহা করিতেছেন। তাহা বুঝা সহজ নয়। কেন এ-সব স্কুলকে দুর্দ্দশায় ফেলিতেছেন তৎ-সম্বন্ধে নানাবিধ বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে। তার ফলে বিষয়টি আরও ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমানের সংবাদ, "তথাকার হাসপাতালের প্রসুতি বিভাগের সন্তানসম্ভবা রোগিণীদের দৈনন্দিন আহার লইয়া মহাসমস্যা দেখা দিয়াছে। সমস্যাটা অবশ্য খাদ্য প্রস্তুত এবং পরিবেষণ লইয়া নয়। রোগিণীদের জন্য নিয়মিত খাদ্য পরিবেষণের পর ইতস্ততঃ বিচরণশীল গরু, ছাগল ও কুকুর আসিয়া প্রায়ই তাহা গলাধঃকরণ করিতেছে। একটিমাত্র পরিচারিকা রহিয়াছে। তাহার দ্বারা উপরোক্ত বেপরোয়া জীবগুলিকে আগলাইয়া থাকা কিংবা বিতাড়ন করা সম্ভব হইতেছে না। সে বিধিমতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিবরণ জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছে। কিন্তু প্রতিকার যাঁহারা করিবেন, তাঁহারা নাকি এক প্রকার অসহায়তা জ্ঞাপন করিয়াছেন। হাসপাতালের প্রসুতি বিভাগে কোলাপসিবল গেট বসাইলে ইতস্ততঃ বিচরণশীল গরু, ছাগল ও কুকুরের উপদ্রব বন্ধ হইতে পারে, ইহা কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সরকারের নিকট টাকা চাহিয়া কোন জবাব মিলে নাই বলিয়া হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ সমস্যায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। সংবাদটি পাঠ করিলে মনে হয়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রতিকারের ভার আপাততঃ ইতস্ততঃ বিচরণ-শীল গরু, ছাগল ও কুকুরের উপর ছাড়িয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। প্রকৃতপক্ষে এই আচরণ কুখ্যাত রেডটেপিজ্‌ম বা আমলাতন্ত্রী গতানুগতিকতারই চূড়ান্ত নিদর্শন।"

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী-সমাজ

"এই হতভাগ্য দেশে হতভাগ্য জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার পক্ষে একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন কেহ নোয়াইতে পারে নাই ; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্নবিপত্তি ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে ; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই ; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা যাহা সর্ব্ববিধ মিথ্যাচার ও কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত ও স্বাধীন রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে বাঙালীর মধ্যে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইতে পারে, সন্দেহ নাই।"—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

"বিদ্যাসাগরের কথা চিন্তা করলে এই কথাই মনে হয়। বাঙালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ও একমাত্র সিংহ যিনি, সেই ঈশ্বরচন্দ্র মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে জন্মেছিলেন ১৮২০ সালে। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই, আজ থেকে ঠিক ৬১ বছর আগে। খুব বেশী দিন আগেকার কথা নয়। বিদ্যাসাগরকে স্বচক্ষে দেখেছেন এমন অনেক লোক আজও বাংলাদেশে জীবিত আছেন। তাঁদের মুখে আজও শোনা যায় বিদ্যাসাগরের অমিত-বিক্রমের কথা। মনে হয় যেন রূপকথার কাহিনী শুনছি। চারি-দিকের এই কলরবের মধ্যে আজ আরও বিশেষভাবে বিদ্যাসাগরের অভাববোধ করতে হয়। মনে হয়, আজ যখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সমগ্র বাঙালী জাতির চরম জীবনসঙ্কটের দিনে, তখন কোথায় বিদ্যাসাগর, কোথায় সেই পুরুষসিংহের পঞ্জরভেদী গর্জ্জন! বাংলাদেশে বাঙালীর জন্যে আজ যেমন বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন, বোধ হয় বিদ্যাসাগরের আমলেও তেমন প্রয়োজন ছিল না। ভারত-বর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি—একথা বিদ্যাসাগর একদিন শিব-নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলেন। এতবড় কথা বলবার সাহস আজ পর্য্যন্ত আর কোন বাঙালীর হয় নি, অন্ততঃ কোন চটিজুতাপরা বাঙালীর। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন :

দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব। বিদ্যা-সাগরের এই পৌরুষ, এই মনুষ্যত্ববোধই মৃতপ্রায় বাঙালী সমাজে প্রাণসঞ্চার করেছিল বিগত শতাব্দীতে। আজও সেই প্রাণ-স্পন্দনটুকুই আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম উত্তরাধিকার। তার অনেকটাই বিদ্যাসাগরের দান, এবং বাঙালীর নব-জীবনমন্ত্রের প্রধান দীক্ষাগুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর—বাঙালী জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথে দুটি মাইলস্টোন, অর্থাৎ দুটি প্রধান বাঁকের নিশানা। রামমোহন ছিলেন চিন্তানায়ক, বিদ্যাসাগর ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। প্রাচীন ও নবীনের যুগসন্ধিক্ষণে রামমোহনের

আবির্ভাব, তাই দুয়ের সমন্বয়সাধন করাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব নবীনের শুভযাত্রাক্ষণে, তাই অবিরাম চলার পথে গতিসঞ্চার করা এবং সেই পথ কেটে তৈরি করাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। রামমোহনকে যদি 'আর্কিটেক্ট' বলা যায়, তাহলে বিদ্যাসাগরকে বলতে হয় 'ইঞ্জিনীয়ার' ও 'বিল্ডার'। আধুনিক শিক্ষার জন্যে রামমোহন চিঠি লিখেছিলেন আমহার্স্টকে, হেদুয়ার ধারে এংলো-হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নারীর শিক্ষা ও সমানাধিকারের দাবীও সমর্থন করতেন এবং সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের জন্যে আন্দোলনও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র থেকে একেশ্বরবাদ প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করতে কেটে গেছে। ধর্ম্মসমন্বয়ই রামমোহনের জীবনের অন্যতম কীর্ত্তি। বিদ্যাসাগর জীবনে কোনদিন 'ঈশ্বর' নিয়ে বা 'ধর্ম্ম' নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাঁর অন্যতম কর্ম্মক্ষেত্র ছিল 'সমাজ' এবং 'সাধারণ বাঙালী সমাজ'। বিদ্যাসাগরের জীবনের জপ-তপ-ধ্যান ছিল শিক্ষার মাধ্যমে, মানবিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে, প্রত্যেক মানুষের শুভবুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তোলা।..."

শ্রীবিনয় ঘোষ কাশীর 'উত্তরা' মাসিক পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ধৃতাংশ দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যাসাগর যুগস্রষ্টা; শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় সাহিত্য ও সমাজে সর্ব্বাধিনায়ক। তাঁহার সময়েই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত পণ্ডিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত ধর্ম্ম-বিদ্, রাজনারায়ণ বসুর মত স্বদেশ-প্রেমিক এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের মত গদ্য ও পদ্য-সাহিত্যের নূতন পথিকৃৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ৫০ বৎসরের বিশেষত্ব।

শ্রীহট্ট সম্মিলনী

শ্রীহট্ট সম্মিলনীর ১৯৫১-৫২ সনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরে ভারতের নব-জাগরণের যে ইতিহাস সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি লোকনায়কবৃন্দ লিখিয়া গিয়াছেন, তার মধ্যে শ্রীহট্ট সম্মিলনীর, ত্রিপুরা সম্মিলনীর, বিক্রমপুর সম্মিলনীর, ময়মনসিংহ সম্মিলনীর, ফরিদপুর সম্মিলনীর, বরিশাল সম্মিলনীর নাম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। আজ এই সব প্রতিষ্ঠান পূর্ব্বের কোন কাজই করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের সাহায্য ব্যতীত তাহা সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত সমাজের এই সব প্রতিষ্ঠান নিজেদের জন্মভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা নগরীর জনারণ্যের মধ্যে যে তাহাদের অগণিত দেশবাসী লুকাইয়া আছে নানা কাজ-কারবারের মধ্যে, তাহাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত করিতে পারে নাই। খিদিরপুর, টেরেটিবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট বাজার, বেলেঘাটা অঞ্চলে অগণিত শ্রীহট্টবাসী বাস করিতেছেন। তাঁহাদের আদমসুমারি লইবার চেষ্টা করিলে এইরূপ জন-সেবার গোড়া পত্তন হইবে।

আমরা মনে করি যে, এই সব প্রতিষ্ঠান এখনও নূতন যুগে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পরে নিজেদের জেলাবাসীর সেবা করিয়া পূর্ব্ব-গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারেন।

বেণীমাধব দাস

গত ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শিক্ষক-সমাজের অন্যতম প্রধান শিক্ষাব্রতী, ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন ধর্ম্মপ্রাণ বেণীমাধব দাস তাঁহার বালীগঞ্জস্থিত বাসভবনে ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত সারোয়াতলী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ উপাধি লাভ করিয়াই চট্টগ্রাম হাই স্কুলে তাঁহার শিক্ষকতা আরম্ভ হয়। তার পর কটক র‍্যাভেনশ কলিজিয়েট স্কুলে অধ্যাপনার কার্য্য করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। নেতাজী তাঁহার জীবনীতে এই মধুর সম্পর্কের ও তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ ও উদ্দীপনালাভের উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহার পর তিনি কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে ও তার পর সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। কেবলমাত্র কঠিন শাসনযন্ত্রের দ্বারাই যে ছাত্রমণ্ডলীকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়, একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু মধুর কোমল আদরেও যে ছাত্র-সম্প্রদায়কে সমানভাবেই সুপরিচালিত করা যায়, স্বর্গত বেণীমাধব বাবুই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শিক্ষক-সমাজে দেখাইয়া গিয়াছেন। ছাত্রমনে উচ্চ আশা জাগ্রত করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার চরিত্রে একাধারে বজ্রসমান কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল-ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় যে দেখিয়াছে সেই বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছে। তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের সম্মুখে সকলকেই মস্তক অবনমিত করিতে হইয়াছে।

তিনি ব্রাহ্মসমাজের এক জন প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। তাঁহার দৃঢ় নৈতিক চরিত্রবল সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিত। তাঁহার মধুর অমায়িক ব্যবহার, শেষজীবন পর্য্যন্ত অন্যের মঙ্গল চিন্তা করা, সকলের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করা যে দেখিয়াছে তাহারই অন্তরে তাঁহার এই পবিত্র স্মৃতি অমর হইয়া থাকিবে।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ৯ই আশ্বিন (২৫শে সেপ্টেম্বর) হইতে ২২শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকা-কড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা খুলিবার পর করা হইবে।

এই সূত্রে জানানো যাইতেছে যে, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, ঠিকানা-পরিবর্ত্তন, প্রবাসী-অপ্রাপ্তি—এতদ্‌বিষয়ক চিঠিপত্র "ম্যানেজার, প্রবাসী" এই নামে প্রেরিতব্য। কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

শাহজাদা দারাশুকো

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

ষষ্ঠ অধ্যায়—গৃহযুদ্ধের কারণ ও দায়িত্ব

১

মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে দারার দুর্ভাগ্য, শাহজাহানের বন্দীদশা, শুজা ও মোরাদের শোচনীয় পরিণাম—ইহার জন্য দায়ী কে? এই প্রশ্ন নিতান্ত সহজ নহে। ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে একতরফা রায় দেওয়া সেকালের কাজীর বিচার, একালে ঐ জাতীয় ঐতিহাসিক বিচার গবেষণার নামে ওকালতী। বোধ হয়, আওরঙ্গজেবের মনে সন্দেহ হইয়াছিল খোদাতালা ছাড়া পাপিষ্ঠ মানুষও হয়ত কোন দিন তাঁহার কাজের বিচার করিবে। এইজন্য প্রাথমিক সাবধানতাস্বরূপ তিনি দরবারী ইতিহাস-রচনা এক রকম বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ, গৃহযুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পিতার সহিত শাসনসংক্রান্ত ও পারিবারিক ব্যাপারে যে সমস্ত চিঠি লেখালেখি হইয়াছিল এবং শাহী দরবারে দারার চক্রান্তে বিপন্ন ইস্‌লামের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত নিজে কিরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় দলিল দস্তাবেজে প্রস্তুত রাখিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের ছয় মাস পূর্ব্ব পর্যন্ত দারা তাঁহার দিল্লীস্থ "নিগম-বোধ-মঞ্জিল" প্রাসাদে উপনিষদের ফার্সী অনুবাদকার্য্যে মহাব্যস্ত ছিলেন; ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রস্তুতি কিংবা মোকদ্দমা সাজাইবার তাঁহার সময় কোথায়? দারা মানুষকে বড় বিশ্বাস করিতেন; বিশ্বাস করিয়া ঠকিয়াছিলেন, বিচারের ভার মানুষের উপরই ছাড়িয়া গিয়াছেন। নিরপেক্ষ সত্য অনুসন্ধিৎসায় যাহা সম্ভব, এই প্রশ্ন মীমাংসায় আচার্য্য যদুনাথ চূড়ান্ত রায় দিয়াছেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহের উপর গৃহযুদ্ধে দায়িত্বের অংশ ন্যায্যমত বণ্টন করিয়াছেন।* সম্প্রতি আমরা সংক্ষেপে শাহজাহান এবং তাঁহার পুত্র চতুষ্টয়ের অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ আলোচনা করিব।

২

পুত্রের পিতা এবং সম্রাট্ হিসাবে শাহজাহানের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের প্রধান অভিযোগ—

(ক) স্নেহ ও অনুগ্রহ বণ্টনে দারার প্রতি অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্ব।

(খ) দারার ষড়যন্ত্রে আওরঙ্গজেবের কার্য্যে বাধাদান ও তাঁহাকে অপমান।

(গ) আওরঙ্গজেবের প্রতি বিদ্বেষ ও অযথা সন্দেহ।

ইহার সহিত ইতিহাসের দুইটি অতিরিক্ত ধারা—

(ঘ) সম্রাটের দোষ-ত্রুটি পুত্রগণের বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ কি না।

(ঙ) আসন্ন গৃহযুদ্ধ নিবারণের জন্য সম্রাট্ সমস্ত সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না।

শাহজাহান পুত্র চতুষ্টয়ের প্রতি বিশেষ স্নেহাসক্ত ছিলেন, কিন্তু অনুগ্রহ সমান ভাবে বণ্টিত হয় নাই—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তিনি আওরঙ্গজেবকে শাসনকার্য্যে দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য যথোচিত প্রশংসা করিতেন এবং কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য সুযোগ দানে কার্পণ্য করেন নাই। "প্রশংসা" শত্রুমিত্র সকলের নিকট হইতে জবরদস্তী করিয়া আদায় করা যায়, কিন্তু "ভালবাসা"র উপর আবদার চলিতে পারে, জবরদস্তী চলে না। আওরঙ্গজেবকে ভালবাসার পাত্র হইবার মত, কিংবা দুনিয়ায় স্ত্রীপুত্র মিত্রকে বিশ্বাস ও ভালবাসিবার ক্ষমতা খোদাতালা দেন নাই। নিজের পুত্রগণের প্রতি আওরঙ্গজেবের নির্ম্মম কঠোরতা এবং সতর্ক দৃষ্টি যদি শাহজাহানের থাকিত তাহা হইলে পুত্রের মত তিনিও গৃহযুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিতেন, বন্দী-দশায় তাঁহার মৃত্যু হইত না। গুণ ও কার্য্যের অনুপাতে দারা অপেক্ষা আওরঙ্গজেব কম জায়গীর ও মনসব পাইয়াছিলেন; কিন্তু বিচার্য্য বিষয়, দারা অপেক্ষা বেশী পাইলে তিনি কি করিতেন? জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রিয়তম এবং যোগ্যতম তৃতীয় পুত্র শাহজাদা খুর্‌রমকে (পরে সম্রাট্ শাহজাহান) ত্রিশ হাজারী মনসবদারী প্রদান করেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রকে বাদ দিয়া তাঁহাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন—এইরূপ সুবিচারে খুর্‌রমের পিতৃদ্রোহ নিবারিত হইল না কেন? আসল কথা, শাহজাহান পুত্রকে চিনিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব যে "সুবিচার" দাবি করিতেন, দিল্লীসাম্রাজ্য এবং অন্যান্য পুত্রের জীবন বিপন্ন করিয়া উহা পূর্ণ করিলে শাহজাহান রাজধর্ম্মচ্যুত হইতেন, মাতা মমতাজ বাঁচিয়া থাকিলেও আওরঙ্গজেব ময়দান সাফ্ করিয়া ফেলিতেন। অন্যান্য পক্ষপাতিত্বের নমুনা :—

১। সুবা মুলতান এবং সুবা লাহোরের সীমামুখে ইসমাইল হুত নামক এক বেলুচ জমিদার মুলতান-সুবাদার আওরঙ্গজেবের আদেশ অমান্য করিয়া লিখিয়াছিল, সে লাহোরের সুবাদার শাহজাদা দারার প্রজা এবং অজুহাত

---

* বর্ত্তমানে কয়েকজন লেখক ইতিহাসের নামে "অজুহাত নামা" [Apologia] লিখিয়াছেন, যথা—মৌলানা শিব্‌লী নুমানী (উর্দ্দু); ফোরেশী—*History of Aurangzib.*

স্বরূপ দারার চিঠিও দাখিল করে। আওরঙ্গজেব দারার বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। সম্রাট্ স্বয়ং দুই সুবার সীমানির্দ্দেশ করিয়া আওরঙ্গজেবের সপক্ষে রায় দিয়াছিলেন।

২। ইহার দুই বৎসর পরে আওরঙ্গজেব যখন দ্বিতীয়-বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হইয়া বদলি হইলেন তখন মুলতান সুবা দারাকে দেওয়া হইয়াছিল। সুবাদার বদলি হওয়া সুবার প্রজাগণের পক্ষে এক মহা উৎপাত। যিনি বদলি হইতেন তাঁহার কর্ম্মচারিগণ জবরদস্তী করিয়া কিস্তীর খাজানা আগাম উশুল করিত; তখন সুবার অবস্থা যেন পররাজ্যে দখলকারী ফৌজের পশ্চাদপসরণের আনুষঙ্গিক অরাজকতা। অপর পক্ষে, নূতন সুবাদারের পাইক বরকন্দাজ দেওয়ান ফৌজদার দখল কায়েম করিবার জন্য সুবার অবস্থা নববিজিত দেশের ন্যায় করিয়া তুলিত। মুলতানে দারার কর্ম্মচারিগণ অভিযোগ করিল, পূর্ব্ববর্ত্তী সুবাদারের আমলারা মুলতান শহরে সরকারী ইমারতগুলি ভাঙ্গিয়া কড়ি-বরগা ও চৌকাঠ পর্য্যন্ত বিক্রী করিয়া গিয়াছে। দারা কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া সরাসরি ঐ অভিযোগ দরবারে পেশ করিলেন। আওরঙ্গজেবের কাছে কৈফিয়ৎ তলব হইল। আওরঙ্গজেব এইরূপ কাঁচা কাজ করিবার লোক ছিলেন না; বিচারে দারার কর্ম্মচারিগণও দোষী সাব্যস্ত হইল।

৩

আওরঙ্গজেবের প্রতি শাহজাহানের সন্দেহ ও অবিশ্বাস অধিকাংশ স্থলেই অমূলক ছিল না। তবে একটি ব্যাপারে আওরঙ্গজেবের প্রতি তিনি নিঃসন্দেহ অবিচার এবং অশোভন সন্দেহ করিয়াছিলেন যাহা "ঘাটি বুদ্ধি নাটি" ছাড়া কিছুই নহে।

বুরহানপুরের শাহীবাগে একটা আমগাছ ছিল—নাম বাদশাপছন্দ্। ঐ আমগাছের জন্য দাক্ষিণাত্যের সুবাদারকে শাহী খেদমতের ব্যবস্থা করিতে হইত এবং আম পাকিলে কিস্তী করিয়া জরুরি ডাকচৌকি মারফত দিল্লী আগ্রা পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিতে হইত, আমের ঝুড়ি কোথায়ও মাটিতে রাখিবার হুকুম ছিল না। দ্বিতীয় বার আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যে বদলি করিবার সময় শাহজাহান পুত্রকে এই আমগাছের কথা বিশেষ ভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন। ঐ গাছের তদারক করিবার জন্য নূতন সুবাদার এক অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে বুরহানপুরে রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমের প্রথম ঝুড়ি দরবারে পৌঁছিবার পর আম খাইয়া আলা হজরত বলিলেন, এইবার আম ঠিক সময়ে তোলা হয় নাই। দ্বিতীয় ঝুড়ির উপর মন্তব্য হইল, আম বোধ হয় আসিবার সময় মাটিতে রাখা হইয়াছিল। তৃতীয় ঝুড়ি দেখিয়া সম্রাট্ বলিলেন, আম এই বৎসর যেন সংখ্যায় কম; জাহানারা ভাইকে এই কথা জানাইয়া দিলেন। আওরঙ্গজেব প্রমাণাদিসহ কৈফিয়ৎ দিলেন ঝড়ে একটা বড় ডাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং আমও কম ফলিয়াছে। ইহাতেও নিস্তার নাই। পরের কিস্তি পৌঁছিবার পর আলা হজরত বলিলেন, আমের ঝুড়ি বোধ হয় বুরহানপুর হইতে দৌলতাবাদ ঘুরিয়া আসে!

এইরূপ উক্তি সম্রাটের সমাগত দ্বিতীয় শৈশবের ছায়া। আওরঙ্গজেবের চিঠিপত্র হইতে দেখা যায়, দ্বিতীয় বার দাক্ষিণাত্যে আগমনের পর হইতেই শাহজাহান এবং দারার বিরুদ্ধে তাঁহার বেশীর ভাগ অভিযোগ। এই সমস্ত অভিযোগ সত্য হইলেও ঐগুলিকে গৃহযুদ্ধের কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই শুজার সহিত দিল্লীতে এবং মোরাদের সহিত মালবে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আওরঙ্গজেব দারার বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ করিবার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং ইহার পর হইতে এই গুপ্ত "ত্রিবর্গ" মিত্রশক্তির তিনিই সেক্রেটারী এবং পোস্ট-আপিস স্বরূপ কাজ করিতেছিলেন; সুতরাং দাক্ষিণাত্যের ব্যাপার আওরঙ্গজেবের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি—উহাকে "কার্য্য" বলা যাইতে পারে, "কারণ" নহে। দাক্ষিণাত্যের ব্যাপার সংক্ষেপে এইরূপ:

ইরাণ দেশের ইস্পাহান শহর হইতে এক তেলীর ছেলে (তবুও সৈয়দ!) গোলকুণ্ডায় আসিয়া ক্রমে হীরা-জহরত-ব্যবসায়ী এবং পরে সুলতান আবদুল্লা কুতব শাহের উজীর-আজম হইয়াছিলেন—ইঁহার ইতিহাসবিখ্যাত নাম মীরজুমলা। অতঃপর তেলী-নন্দনের কোথায়ও একজন স্বাধীন সুলতান হইবার বাসনা হইল। তিনি পুত্র মহম্মদ আমিনকে গোলকুণ্ডায় নায়েব-উজীর রাখিয়া গোলকুণ্ডার সৈন্য ও অর্থ-বলের সাহায্যে কুতবশাহের নামে পূর্ব্বকর্ণাটক অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন এবং ঐখানেই স্বাধীনভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এই দিকে মহম্মদ আমিন কুতবশাহের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। কুতবশাহ দিলদরিয়া লোক; সঙ্গীত ও সূফীতত্ত্ব লইয়াই থাকিতেন। এক দিন নায়েব-উজীর মহম্মদ আমিন পানোন্মত্ত অবস্থায় মসনদের উপর শাহী গালিচায় শুইয়া কুতবশাহের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে গালিচার উপর শরাব বমি করিয়া ফেলিলেন। ভাল মানুষ কুতবশাহ হঠাৎ রাগিয়া নায়েব-উজীরকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং কর্ণাটক হইতে মীরজুমলাকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে আসিয়াই মীরজুমলার সহিত কুতবশাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং গোলকুণ্ডা আক্রমণের অছিলা খুঁজিতেছিলেন। আমিনকে মুক্তি দিবার জন্য শাহজাহান যে ফরমান আওরঙ্গ-

জেবের সঙ্গে লিখিত চিঠির সহিত পাঠাইয়াছিলেন, তিনি উহা জঘন্য ভাবে চাপা দিয়া সম্রাটের আদেশ অমান্যের অজুহাতে গোলকুণ্ডারাজ্য আক্রমণ করিলেন, আসল ব্যাপার কুতবশাহ বা সম্রাট্ কাহাকেও জানিতে দিলেন না (১০ই জানুয়ারি ১৬৫৬)। কুতবশাহের দূত অনন্যোপায় হইয়া প্রভুকে এই অন্যায় আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য দারার শরণাপন্ন হইলেন। দারার নিকট হইতে প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়া কুতবশাহকে ক্ষমা করিয়া সম্রাট্ এক ফরমান পাঠাইয়াছিলেন (৮ই ফেব্রুয়ারী ১৬৫৬)। আওরঙ্গজেব উহাও চাপা দিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। দারা ও জাহানারা উভয়েই এইবার কুতবশাহকে রক্ষা করিবার জন্য আবেদন জানাইলেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কড়া আদেশ পাঠাইলেন, যুদ্ধ তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া বাদশাহী ফৌজকে গোলকুণ্ডা রাজ্য হইতে সরিয়া আসিতে হইবে (৩০শে মার্চ্চ, ১৬৫৬)।

আওরঙ্গজেব মনে করিলেন ইহা দারার ষড়যন্ত্র, পিতার অবিচার।

বাঘের মুখ হইতে শিকার কাড়িয়া লওয়া বিপজ্জনক হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ কার্য্যকে কেহ বাঘের প্রতি অবিচার বলিবেন কি? দুই দুই খানা শাহী ফরমান্ বেমালুম গায়েব করিয়া ফেলিবার অপরাধের জন্য আওরঙ্গজেবকে বদলি করিলেই সুবিচার হইত।

৪

সম্রাট্ শাহজাহানের লোভে পাপ এবং পাপে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছিল। এই লোভের বশেই তিনি পুনরায় আওরঙ্গজেবের ফাঁদে পড়িলেন। পুত্রের চিঠিতে গোলকুণ্ডার প্রতি বিশ্বাসঘাতক মীরজুমলার গুণরাশি শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিলেন এবং মৃত উজীর সাদুল্লার স্থলে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন (জুলাই ১৬৫৬ ইং)। সম্রাট্ কিছুদিন তাঁহার পরামর্শ অনুসারে চলিতে লাগিলেন; দারার কথায়ও আমল দিতেন না। ঐ বৎসর (৪ঠা নবেম্বর, ১৬৫৬) বিজাপুরের পরাক্রান্ত এবং শাহজাহানের বন্ধুস্থানীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহের মৃত্যু হওয়ার পর ঐ রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিয়াছিল। আওরঙ্গজেব এই সুযোগে বিজাপুর জয় করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং সম্রাটের কাছে লিখিলেন, আদিল শাহের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় আদিল শাহ্ তাঁহার আসল পুত্র নহে। মীরজুমলা সম্রাট্কে বুঝাইলেন বিজাপুর অতি সহজে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার ইহাই সুবর্ণ-সুযোগ। শাহজাহান এই লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না; বিজাপুরের বিরুদ্ধে এই "অধর্ম্ম"-যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের কাছে একেবারে সাদা চেক্ পাঠাইয়া দিলেন। মালব এবং অন্যান্য সুবার বাদশাহী ফৌজ লইয়া মীরজুমলা আওরঙ্গজেবের সাহায্যার্থ ১৬৫৭ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে শাহজাদার সহিত মিলিত হইলেন। আওরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য সফল হইল।

আলা হজরত জহরত ভাল চিনিতেন; কিন্তু এই ইরাণী শিয়া জহুরী তাঁহাকে ঠকাইয়া গেল। আট মাস পরে বিজাপুরের রাজদূত শাহজাদা দারার মারফত সন্ধিপ্রার্থী হইলেন। ইতিমধ্যে মোহগ্রস্ত সম্রাট্ চৈতন্যলাভ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের কুমতলব আশঙ্কা করিয়া তিনি হুকুম পাঠাইলেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে সন্ধি করিয়া ফরমান পাওয়া মাত্র যেন যুদ্ধ বন্ধ করা হয়; অধিকন্তু হিন্দুস্থানের বাদশাহী মনসবদারগণের কাছে সোজাসুজি ফরমান প্রেরিত হইল তাঁহারা যেন অবিলম্বে ফৌজসহ দরবারে ফিরিয়া আসেন (সেপ্টেম্বর, ১৬৫৭)। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ জীয়াইয়া রাখিয়া হিন্দুস্থানের বাদশাহী ফৌজ তাঁহার অধীনে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলে দারা আত্মরক্ষার উপায় হইতে বঞ্চিত হইবে—এই মতলবেই আওরঙ্গজেব বিজাপুর-গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অন্যায় যুদ্ধপক্ষে সম্রাট্কে প্রলোভিত করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ এই অন্যায় কার্য্যে অসঙ্গত দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া আওরঙ্গজেবের হাতে ক্রীড়নক হইলেও অনিবার্য্য গৃহযুদ্ধ তিনি নিবারণ করিতে পারিতেন না।

৫

গৃহযুদ্ধের জন্য কোন কোন ঐতিহাসিক শাহজাহানের উপর প্রধান দায়িত্ব চাপাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রথম অভিযোগ, পুত্রগণের ধর্ম্ম-শিক্ষায় সম্রাট্ উদাসীন ছিলেন, দারাকে পাকা সুন্নী বানাইলেই মুসলমানেরা ধর্ম্মের নামে আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক প্রতারিত হইত না। ইহা অতি স্থূল যুক্তি। ইস্লামের ইতিহাসে দেখা যায়, পুণ্যাত্মা খলিফা হজরত আলীর পক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ মুসলমান অভিজাতবর্গ কপটী মুনাফেক মাবিয়ার সহিত যোগ দিয়াছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে আলীর চাচা আব্বাসও ছিলেন। দারা সুন্নী হইলে তাঁহার পথ কিঞ্চিৎ সুগম হইত, কিন্তু দারা ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে সদ্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। শাহজাহান পুত্রগণের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগির পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন; কিন্তু উহাতেও শান্তির আশা ছিল না। ভাগের কম্বলে সাত জন ফকির নাক ডাকিয়া ঘুমাইতে পারে; কিন্তু সসাগরা সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর আধিপত্য একজন বাদশাহের মাটির ক্ষুধা মিটাইতে

পারে না। শাহান্‌শাহ দিল্লীর বাদশাহী নিক্তির ওজনে চারি পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেও গৃহযুদ্ধ বন্ধ হইত না। শাহজাহানের মত অবস্থায় পড়িয়া খলিফা হারুণ-অল্‌-রসিদ পর্য্যন্ত ঐরূপ ভাগাভাগি করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন—“অন্যে পরে কা কথা”।

একমাত্র রুমী কায়দা ব্যতীত বংশানুক্রমিক সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তুর্কী সুলতানগণ তাঁহাদের জীবদ্দশায় পুত্রগণের মধ্য হইতে একজনকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া বাদবাকীর জন্য আজীবন কারাগারেই আরামের ব্যবস্থা করিতেন। আওরঙ্গজেবকে প্রথম বয়সে পদচ্যুতির পর সরাসরি মক্কাশরীফে পাঠাইয়া দিলে গৃহযুদ্ধের বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। মমতাজের মৃত্যুর পর পিতার শাসন অপেক্ষা মাতার স্নেহ সন্তানগণ শাহজাহানের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। অন্তর হইতে মমতাজের স্মৃতিকে বিসর্জ্জন দিয়া, পার্শ্বে তাঁহারই ছায়া জননীর প্রতিচ্ছবি কন্যা জাহানারার মর্ম্মে আঘাত করিয়া এইরূপ কার্য্য শাহজাহান করিলে তাঁহারই হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইত। পুত্রগণ বিদ্রোহী হওয়ার পরেও এই স্নেহ তাঁহার করধৃত রাজদণ্ডের শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়াছিল।

৬

গৃহযুদ্ধের জন্য দায়ী না হইলেও দারার দুর্ভাগ্যের জন্য পিতা ভ্রাতা কিংবা জগৎপিতা কেহই দায়ী নহেন। তিনি পিতৃদত্ত সুযোগের যথোচিত ব্যবহার করেন নাই, যুবরাজের বিপদ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না—অতি বিলম্বে তাঁহার “যোগনিদ্রা” ভঙ্গ হইয়াছিল। ছয় সুবার বিপুল অর্থ এবং সেনাবাহিনী তিন ভ্রাতার সম্ভাব্য বিরোধিতা ব্যাহত করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিলে অবস্থা অন্য রকম হইত; অবহেলা করিয়া তিনি নিজে ডুবিলেন বৃদ্ধ পিতাকেও ডুবাইলেন। দলগঠনে আওরঙ্গজেবের মত দক্ষতা শাহজাদা দারার ছিল না; অথচ তিনি দলের ঊর্দ্ধে থাকিতে পারেন নাই—যাঁহারা প্রকৃত কাজের লোক তাঁহাদিগকে চটাইয়াছেন। এই হিসাবে প্রতিপক্ষকে সুযোগ দেওয়ার দোষ এবং গৃহযুদ্ধের জন্য পরোক্ষ দায়িত্ব হইতে দারা সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইতে পারেন না।

আকবরের উদার-নীতি অনুসরণ করিয়া শাহজাদা দারা রাজনীতিক্ষেত্রে দৃষ্টির প্রসার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান-সমাজে ক্রমবর্দ্ধমান ধর্ম্মান্ধতার জোয়ারে ভাঁটি সাঁতরাইবার মত প্রপিতামহের অনন্যসাধারণ শক্তি তাঁহার ছিল না—আওরঙ্গজেব এই জোয়ারে গা ভাসাইয়া তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া অভীষ্ট লক্ষ্যে অনায়াসে পৌঁছিয়াছিলেন।

৭

“রাজতন্ত্র” মতে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিপরীত সাধনায় নিমগ্ন কুমার আওরঙ্গজেবের মধ্যে ঐতিহাসিক “মহা”-পুরুষের সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজধর্ম্মের প্রথম সূত্র, “মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যৎ—” তাঁহার চরিত্রে সুপরিস্ফুট। তিনি চিরকাল মনে এক, কথায় অন্য এবং কাজে আর কিছু। তৎকালীন সমাজে কিংবা মোগলদরবারে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে এই নীতি দোষাবহ কিংবা নিন্দনীয় ছিল না। বর্ত্তমান যুগেও বিশ্বের দরবারে কার্য্যোদ্ধারের জন্য এই নীতি কেহ কেহ অপরিহার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন।

আওরঙ্গজেব স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন তিনি কাহারও হাতে “কোরবানে”র উট হইবেন না; তাঁহার ভাগ্যে হয় দরবেশী, না হয় বাদ্‌শাহী। তিনি জানিতেন আল্লা তাঁহার একমাত্র প্রকৃত সহায়, শুজা মোরাদ ভগ্নী রোশনারা, মাতুল শায়েস্তা খাঁ কিংবা মেসো জাফর-খলিল্ উল্লা নহে; জীবনে যদি ঈদ্ কখনও আসে উহাতে আল্লার নামে উৎসর্গীকৃত তাঁহার ঈদের উট-ছাগল হইবে দারা শুজা ও মোরাদ। সরল জীবনযাত্রা, সরলতা-বর্জ্জিত সৌজন্য ও প্রিয়ভাষিতা এবং শরিয়তে সুবিধাবাদী নিষ্ঠায় কুমার আওরঙ্গজেব প্রথম হইতেই উদীয়মান “জিন্দাপীর”;—মুখে ফকিরী ছাপ ও দরবেশী বুলি, ইস্‌লামের জন্য প্রচারমূলক আশঙ্কা, পিতার প্রতি ভক্তির বাণী এবং শুজা ও মোরাদের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম ও হিতচিন্তার ফোয়ারা। কার্য্যে তাঁহার অতি প্রশংসনীয় শাস্ত্রোক্ত “আফল-কর্ম্মোদয়” নীতি ফলপ্রসূ না হইলে তিনি কি করিবেন কাহারও সন্দেহ কিংবা অনুমান করিবার সাধ্য ছিল না—ফলপ্রসূ হইবার পূর্ব্বে কেহ জানিতে পারিত না। শাহজাহানের রাজত্বে অভিনীত বীভৎস-বিয়োগান্ত গৃহযুদ্ধ নাটিকার নটগুরু কিন্তু স্বয়ং আওরঙ্গজেব। তিনিই প্রযোজক, তিনিই প্রথম অঙ্কে শুজা ও মোরাদের উপদেষ্টা সাজিয়া তাঁহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা-বহ্নিতে ইন্ধন জোগাইয়াছিলেন—এই অভিযোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পিতার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম বিদ্রোহী হইলেও শুজা ও মোরাদের দায়িত্ব আওরঙ্গজেব অপেক্ষা অনেক কম।

শাহজাহানের পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজেকে অপর অপেক্ষা বেশী “লায়েক” মনে করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ মোরাদ ছিলেন চরিত্রে আওরঙ্গজেবের ঠিক বিপরীত। চিন্তা-ভাবনা ভয়-কপটতা সংযম-ধর্ম্মনিষ্ঠা মোরাদের

ছিল না। "বলং বলং বাহুবলম্" বলিয়া সর্ব্বদা বাহ্বাস্ফোটন—শাহীপরিবারে তিনি যেন "বলভদ্রে"র তুর্কী অবতার—বুদ্ধিতে হলধর, পান-ভূমিতে মদিরালোলাক্ষ স্খলিতপ্রয়াত কাদম্বরী-পানোদ্ধত-পৃথুশ্রী রেবতীরমণ, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বিক্রমে সঙ্কর্ষণ। তিনি প্রায় প্রকৃতিস্থ থাকিতেন না, হয় রক্তপাত না হয় শরাব ও সুন্দরী তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া রাখিত। দাদা আওরঙ্গজেব বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে দিল্লীর তক্তে বসাইয়া মক্কাযাত্রা করিবেন। তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া এবং ষড়যন্ত্র-জালে আবদ্ধ হইয়া মোরাদ প্রথমেই যুদ্ধে নামিয়া পড়িয়াছিলেন। মোরাদের অসুর-বিক্রম আওরঙ্গজেবের ইঙ্গিতে চালিত হইয়া দারার শক্তি ধূলিসাৎ করিয়াছিল, দিল্লীশ্বর ও দিল্লীসাম্রাজ্যকে আওরঙ্গজেবের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। দাদাকে তিনি সরল মনে নিজের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিতে দিয়া মাথাটাও হারাইয়াছিলেন। গৃহযুদ্ধে আওরঙ্গজেব মুখ্য, এবং মোরাদ গৌণ অপরাধী; শুজা ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে প্রায় সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

সুলতান শাহশুজা শাহজাদা দারার তের মাস পরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতামহ জাহাঙ্গীরের আদরে লালিত-পালিত হইয়া তাঁহার দোষ-গুণ অনেক-কিছু তিনি পাইয়াছিলেন; কোন নূরজাহানের হাতে পড়িলে বোধ হয় নাতি-ঠাকুরদার মধ্যে ইতিহাসে কোন তফাৎ থাকিত না। নির্ব্বিবাদে দিল্লীর সিংহাসনে বসিতে পারিলে সম্রাটের পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে শুজাই যোগ্যতম উত্তরাধিকারী হইতেন। দারার দাক্ষিণ্য, উদারতা ও চরিত্রমাধুর্য্য, এবং আওরঙ্গজেবের বাস্তব দৃষ্টি, মাত্রাজ্ঞান, ব্যবহারিক বুদ্ধি, নীতি-প্রয়োগ, শৌর্য্য ও শাসনক্ষমতার একত্র সমাবেশ তাঁহার মধ্যেই ছিল; অথচ কোন প্রকার ভাবের পাগলামি, ছেলে-মানুষি, গোঁড়ামি, ভণ্ডামি কিংবা সহজাত দুষ্ট বুদ্ধি ছিল না। বয়সে ছোট হইলেও তিনি দারার পূর্ব্বেই প্রথম মনসবদার ও সুবাদার হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের মত একটানা কঠোর পরিশ্রমে উৎসাহ ও দৃঢ়তা, প্রারব্ধ কার্য্যে একাগ্রতা ও ধৈর্য্য কিংবা ব্যসন-সংযম তাঁহার ছিল না। বাল্যাবধি কূটনীতি চর্চ্চা, শাসনকার্য্য ও যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের প্রশংসনীয় গুণসমূহ পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল; কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার না হওয়ায় শুজার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিভা বাংলাদেশে পঙ্গু ও মলিন হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার কোষবদ্ধ তরবারি শাণ ও পান দুইটাই হারাইল।

প্রায় একটানা সতর বৎসর সুবা বাংলার নিরুপদ্রব সুবাদারী শুজার পক্ষে শুভ হয় নাই। বাংলার দোজখে ভাল ভাল ভোগের জিনিষের অভাব ছিল না; আকাশে-বাতাসে আরাম-আয়েস ভাসিয়া বেড়াইত। আওরঙ্গজেবের মত পদে পদে খোদাকে ভয় কিংবা শরিয়তের পা-বন্দী হইয়া তিনি চলিতেন না। তিনি অতিমার্জ্জিতরুচি, সঙ্গীতপ্রিয় এবং কাব্যরসিক ছিলেন; শিয়া-সুন্নীর সঙ্কীর্ণতা তাঁহার ছিল না। তাঁহার শাসনকালে দিল্লী-আগ্রা হইতে অনেক বিশিষ্ট শিয়া-পরিবার ঢাকায় স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার দরবারী বিশ্বস্ত অনুচরগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ইরাণী শিয়া। লোকে আওরঙ্গজেবকে একটা "ভয়স্থান" মনে করিত; শুজাকে রাজোচিত গাম্ভীর্য্যের জন্য সমীহ করিত, মানুষ হিসাবে বিশ্বাস করিত এবং ভালবাসিত। শুজা দারাকে ঈর্ষা করিতেন, হিংসা কিংবা অসৌজন্য তাঁহার প্রতি কখনও প্রকাশ করেন নাই। ছোট ভাই আওরঙ্গজেবকে পিতা তাঁহার সমান মনসব দিয়াছিলেন এই জন্য তিনি কখনও অভিযোগ করেন নাই, জাহানারা এবং পিতার উপর অভিমান তাঁহার থাকিলেও আক্রোশ ছিল না। দারার বিরুদ্ধে এক পথের যাত্রী হইয়াও শাহ-শুজা "শুভচিন্তক" আওরঙ্গজেবকে বিশ্বাস করিতেন না, মোরাদের লম্ফ-ঝম্ফ দেখিয়া হাসিতেন।

শাহশুজার চরিত্রে "একোহি দোষো গুণরাশিনাশী" হইয়াছিল। এই দোষ তাঁহার মজ্জাগত আলস্য এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যসন। সেকালে বাংলাদেশে যদি কোন কালিদাস থাকিতেন তাহা হইলে রঘুরাজ অগ্নিবর্ণের ভোগ-বিলাসের ছায়া ঢাকা-রাজমহলে শাহশুজার অন্তঃপুরে দেখিতে পাইতেন। মহারাজ অগ্নিবর্ণের মত এই মোগল রাজকুমার ছিলেন, "রাত্রিজাগরো দিবাশয়ঃ", অর্থাৎ:

> "বামাস্পর্শ সুখে যাপিয়া যামিনী
> হতেন নিদ্রিত দিনে নরমণি।" [নবীনচন্দ্র দাস]

শাহশুজার হারেমে ছিল একটি নিত্যনূতন ভ্রাম্যমাণ বেহেশত; অন্দরমহলে পালে পালে হুর-পরীর নাচগান, শরাবের নহর। ঢাকা ও রাজমহলের অলস অপরাহ্ণ তিনি বুড়ীগঙ্গা কিংবা জাহ্নবীর ঢেউ গণিয়া কাটাইয়াছেন, হয়ত দেখিয়াছেন অদূরে নর্ত্তকীর বিলসিতানুকারিণী তন্বী তরঙ্গ-নীবিবন্ধা সঞ্চারিণী বলাহকমালাবিলম্বী বেলাভূমির নিতম্বভঙ্গী। নাচওয়ালীর রূপের হাটে তিনি রাত্রি প্রভাত করিয়া দিনকে রাত করিতেন; ভোগের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করিবার জন্য কয়েকদিন শাসনসংক্রান্ত বকেয়া ও হালের যাবতীয় কার্য্য ঊর্দ্ধশ্বাসে অথচ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করিয়া আবার কিছুদিন আরাম-আয়েসে ডুবিয়া থাকিতেন। ইহার ফলে তিনি অকালে জরাগ্রস্ত হইয়া চল্লিশের এপারেও চামেলি ফুল অপেক্ষা কোন ছোট জিনিষ চোখে দেখিতেন না। সুশাসন ও দানশীলতার গুণে বাংলার লোক তাঁহাকে

প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত, পূর্ব্ববঙ্গ "নকল শুজার" জন্য আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। শুজার শোচনীয় পরিণামের জন্য দায়ী তাঁহার ব্যসনপ্রবণস্বভাব—বাংলার মাটি নহে। সুযোগের অভাব প্রায় ক্ষেত্রে অলস ব্যক্তির অজুহাত। শুজার পরিবর্ত্তে সম্রাট যদি আওরঙ্গজেবকে বাংলাদেশে রাখিতেন তবুও তাঁহার অদম্য ইচ্ছাশক্তি, আক্রমণাত্মক স্বভাব এবং ময়ূরসিংহাসনের স্বপ্ন নিশ্চয়ই অনুকূল কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিত। গোলকুণ্ডা-বিজাপুরের মত সমৃদ্ধিশালী রাজ্য বাংলার সীমান্তে না থাকিলেও অবিজিত আসাম, ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম, মগ-পর্ত্তুগীজ ছিল; সুতরাং বাংলার সুবাদারের তলোয়ারে মরিচা ধরার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না।

৮

পিতৃসিংহাসনের আশা আলস্যপরায়ণ শাহশুজার ধ্যানে বহু বৎসর "আচ্ছন্ন" অবস্থার স্তরে ছিল। তিনি চাহিয়াছিলেন সম্রাটের জীবদ্দশায় তিক্ততার সৃষ্টি না করিয়া সুবা উড়িষ্যা এবং বিহার যেন বাংলার সহিত তাঁহার অংশস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করা হয়; পরে কাড়াকাড়িতে গোটা বাদশাহী পাওয়া না গেলে অন্ততঃ তিনি "উড়িষ্যামগধবঙ্গ ত্রিদেশ-ঈশ্বর" থাকিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবেন। কয়েক বৎসর পরে উড়িষ্যা তিনি পাইয়াছিলেন; কিন্তু সুবা বিহার এবং তাঁহার মধ্যে ব্যবধানস্বরূপ হইয়া রহিলেন দারা। মনের এই অবস্থা লইয়া ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে শুজা লাহোর গিয়াছিলেন, পণ্ডশ্রম ও কান্দাহার অভিযানে সেনাপতিত্বলাভের আশাভঙ্গজনিত অপমান ব্যতীত তাঁহার কোন লাভ হইল না। ফিরিবার পথে সম্রাট্ আদেশ দিয়াছিলেন তিনি ও আওরঙ্গজেব যেন এক মঞ্জিল আগে পিছে লাহোর হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত পথ অতিক্রম করেন, অর্থাৎ কেহ কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ না করেন। এই দুই পুত্রের প্রতি সমান আচরণ এবং সমান অবিশ্বাস তাঁহাদিগকে দারার বিরুদ্ধে একজোট হইবার প্রেরণাই যোগাইয়াছিল। ইহার পূর্ণ সুযোগ লইলেন আওরঙ্গজেব। রাস্তায় না হইলেও দিল্লীতে পিতার আদেশ উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা কয়েকদিন পরস্পরকে ভোজে আপ্যায়িত করিয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা স্থির করিয়া ফেলিলেন। পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই শুজার কন্যা গুলরুখবানুর সহিত আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ সুলতানের "সগাই" [বাগ দান] পাকাপাকিভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল। পরে এই ব্যাপার লইয়া আওরঙ্গজেব এবং সম্রাটের মধ্যে কড়া চিঠিপত্র লেখালেখি হয়। শাহজাহান শুজাকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য তাঁহার কাছে আওরঙ্গজেবের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া চিঠি লিখিলেন, এবং জানাইলেন আওরঙ্গজেবকে সরাইয়া তিনি দক্ষিণের পাঁচ সুবা বাংলা ও উড়িষ্যার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে দিতে প্রস্তুত আছেন। আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং গুপ্ত সন্ধি হওয়ার পূর্ব্বে হয়ত সম্রাটের এই অনুগ্রহ তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না; কিন্তু পরে শাহশুজা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিলেন।

শুজার দিল্লীর সিংহাসনের আশা "আচ্ছন্ন অবস্থা" হইতে ভাই আওরঙ্গজেব একেবারে "কূটস্থচৈতন্য" অবস্থায় উঠাইয়া দিয়াছিলেন; কোহিনূরখচিত মুকুট তাঁহার কাছে তখন হস্তামলকবৎ। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন রাজ্যে তাঁহার স্পৃহা নাই, পুত্রের ভবিষ্যৎ দাদার হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত; তবে বেয়াড়া মোরাদকে বাগ মানাইতে হইবে এবং সেই ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করিয়া তিনি নর্ম্মদা অতিক্রম করিবেন। মালবের পথে দো-রাহা নামক স্থানে কয়েকদিন পরে (২৩শে ডিসেম্বর ১৬৫৭ ইং) গুজরাট হইতে আসিয়া মোরাদ আওরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—ইহা কাকতালীয়বৎ ঘটনা নহে। শুজা, আওরঙ্গজেব এবং মোরাদের মধ্যে পিতার অজ্ঞাতসারে একযোগে দারাকে আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল; আওরঙ্গজেবের মারফত কিংবা তাঁহার সুবার মধ্য দিয়া তেলেঙ্গানার পথে শুজা ও মোরাদের মধ্যে গুপ্ত ডাকের ব্যবস্থা, সংকেতলিপির কোড্ আওরঙ্গজেবের মাথা হইতে বাহির হইয়াছিল। শুজা আওরঙ্গজেবকে বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু উপায় কি? দারার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা এবং স্বার্থসাধনের জন্য আওরঙ্গজেবের সাহায্য আপাততঃ তাঁহার প্রয়োজন; তিনি শাহীতক্তে বসিতে পারিলে হয় নিজ নিজ সুবা লইয়া আওরঙ্গজেব ও মোরাদকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, না হয় তাহাদের বরাতে যাহা আছে তাহাই হইবে।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে, গৃহযুদ্ধের দায়িত্ব আওরঙ্গজেব হইতে শুজার কিছু কম। তিনি নিরপেক্ষ থাকিলে আওরঙ্গজেব ও মোরাদ এত সহসা হয়ত যুদ্ধ বাধাইতেন না, বাধাইলে পরাজিত হইতেন—দারার নিকট হইতে তিনি স্বাধীনতা না পাইলেও সুবিধাজনক সর্ত্ত পাইতেন, নির্ব্বাসনে শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতেন না।

হাসির অশ্রু

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গাড়ীতে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল বিকেলটা যেন সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে। একটা ঝাপসা নীল মেঘের স্তর দক্ষিণ দিকে উঠে সমস্ত আকাশটা ছেয়ে ফেললে, তারপর ক্রমাগতই হাল্‌কা হাল্‌কা মেঘের স্তূপে সেটা পুরু হয়ে উঠেছে। রেন-কোটটা বাসায় ফেলে এসে ভুল করেছে গিরীন। মেঘ দেখে আজ বড় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, তবুও কথাটা এক একবার মনে পড়ছিল ; এ যা বৃষ্টি নামবে, শুধু ছাতায় তার কিছুই আটকানো যাবে না।

গাড়ী থেকে নেমে যখন রিক্‌সতে উঠেছে, একেবারে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। তখন মনে পড়ল ছাতাটাও গাড়ীতে এসেছে ভুলে। তখন কিন্তু আর উপায় নেই, গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, প্ল্যাটফর্মের শেষে গার্ডের গাড়ীর লালটুকু যাচ্ছে দেখা।

পাড়াগাঁয়ের সাইকেল-রিক্‌স, ছইয়ের কাপড়টা শতছিন্ন। চেনা রিক্‌সওলা দুলাল সেই লজ্জাতেই বললে, "না হয় ফিরে যাবেন দাদাবাবু ইষ্টিশেনে?...কাপড়টা আজ কাল করে পাল্‌টানো হয় নি..."

"তোর কষ্ট হবে?...ফিরে গেলে কিন্তু আজ আর বেরুতে পারা যাবে না ষ্টেশন থেকে।"

"কি যে ক'ন দাদাবাবু! আমার কথাই যেন ভাবছি!"

জোরে পা চালিয়ে দিলে দুলাল।

গিরীনই কি নিজের কথা ভাবছে? নিজের কথা যে ভাবে, সে কি ভরা শ্রাবণে নিজের রেন-কোট বাসায় ফেলে আসে? তার পরেও কি চৈতন্যোদয় না হয়ে, অমন ঘনঘটা দেখেও ছাতাটা দাতব্য করে আসে রেলগাড়ীকে?...অথচ এই বর্ষার চিত্রই অনুক্ষণ তার চোখের সামনে ভাসছিল।

অবশ্য তার কোলে আছে আরও একটি চিত্র, মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতই। প্রভেদ এই যে বিদ্যুৎটি স্থির, নিরবচ্ছিন্নতার দীপ্তি মনের আকাশে।

বাড়ীতে সুরবালা এসেছে আজ দিন সাত হ'ল। মাঝের এই ক'টা দিন যে কি করে কেটেছে, তা যার কেটেছে সে-ই জানে। কিন্তু বৃষ্টির জলের সঙ্গে সে আপশোসটা ধুয়ে যাচ্ছে গিরীনের, ও-যেন আদর করে গা পেতে নিচ্ছে বর্ষার ধারাকে। আজকের এই মেঘ-মেদুর অম্বর, সব লুপ্ত করা অবিরাম ধারাপাত—এ যে একান্তই ওদের দু'জনের জন্যে। এই যে সন্ধ্যাকে এগিয়ে আনা, এ ত ওদের মিলন-রজনীকে দীর্ঘ করবার জন্যেই দিনের খানিকটা অংশ ছিন্ন করে নিয়ে তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে।...কার উপর অসীম কৃতজ্ঞতায় মনটা আসছে ভরে।

দুলাল বলছে, "জর-জ্বালা যে হচ্ছে বড় গাঁয়ে, সেই ভয় —নইলে বর্ষায় কি আর ভিজে না লোকে?—ভিজে...তবে, ঐ জর-জ্বালা যে হচ্ছে বড়..."

—তা হোক জর, সে ত আশীর্ব্বাদ, ছুটি নেবার পথ খুলবে, সেবার হাতে সুরবালা থাকবে বসে পাশটিতে। কিছু একটা বলতে হয়, সেইজন্যেই বললে, "তা হোক, তুই একটু জোরে পা চালা দিকিন..."

—আজ সব চিন্তার মাঝেই যে সুরবালা এসে পড়ছে। রাস্তার সামনেই যে দোতলার ঘরটা, ফুলশয্যা দিয়ে যেটা ওদের দু'জনের ঘর করে দেওয়া হয়েছে, তার জানলার গরাদ ধরে সুরবালা আছে পথের পানে চেয়ে...ভাগ্যিস বৃষ্টিটা সামনা-সামনি নয়...কিন্তু তবুও ত পাশ ঘেঁষে আসছেই খানিকটা ছাট...সুরবালার কি সাড় আছে কতটা ভিজল, কতটা শুক্‌নো রইল?...চারিদিকে এই জর-জ্বালা!..."আর একটু পা চালাতে পারিস না দুলাল? তোর জন্যেই বলছি, যতটা কম ভিজিস..."

"ছাটটা যে উল্‌ট আসছে, নইলে...এই ত সিদিন লতুন বৌদিদিরা এল—তেনার কাকা, ছোট বোন—বৌদিদি দু' বোনেরা আমারই রিসকায় ছেলো ত—বলোদ-গাড়ীতে মাল-পত্তর...সিদিনও ত বিষ্টি ছেলো গো, তবে এই রকম উল্‌টো ছাট কি?...শুদিও না লতুন বৌদিকে—ড্যাংডেঙ্গিয়ে নে' গিয়ে দরজায় দাখিল করলুম..."

—গিরীন হাতটা সীটের গদির ওপর আস্তে আস্তে বুলাতে লাগল—সুরবালার বসে থাকাটুকুকে যে শত বৃষ্টিতেও ধুয়ে ফেলতে পারে না ; বললে, "না হয় আস্তেই চালা, তাড়া কিসের এমন? ট্রেন ধরতে ত যাচ্ছে না লোকে।...হ্যাঁরে, ওরাও তোর এই ছেঁড়া রিক্‌সয় বিষ্টি মাথায় করে...!"

"কি যে বলে দাদাবাবু!...তিনখানা রিসকা ; ম'তে ভাবছে আমার রিসকায় চাপুক লতুন বৌদি, ব'দে ভাবছে আমার রিসকায় চাপুক, আমিও কোন্ না সেই কথাই ভাবছি মনে মনে, কর্ত্তা বললেন, দুলালের খানাতেই উঠুন বৌমা ওঁর বোনকে নিয়ে, ওর ছুডের কাপড়টা ভালো। ভালোই ছেলো কিনা, এই পরশুকার ঝড়ে রিসকাসুদ্ধ্যু উল্‌টে দিয়ে দিলে যে ফাৎরাফাঁই করে..."

গিরীন সীটটাতে সেই রকম আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে, ঝড়ে উল্‌টেছিল বলে আরও যেন মায়া পড়ে গেছে রিক্‌সাটার উপর ; বললে, "তা মেরামত করিয়ে নে কাপড়টা।"

"আমার নাম দুলাল হাজরা দাদাবাবু ; ওদের মত সেলাই তালি দেওয়া রিসকা ঠেলতে আমার পা ওঠে না।...তা পয় আছে লতুন বৌদির, সমস্ত হপ্তাটা কামালুম কি রকম ! এবার যা ছুডের কাপড় কিনব ভেবে রেখেছি..."

গিরীন একটু হেসে বললে, "কিন্তু পয় যে বলছিস, রিক্‌সা ত তোর গেল উল্‌টে..."

"আর ব'দের যে চাকাই দিলে তেউড়ে, য'তে এখনও পায়ে চুণ-হলুদ নাগাচ্ছে—হিসেব করে দেখুন নোকসানটা। দাদাবাবু বলে পয় নেই !"

একটু চুপ করে রইল গিরীন, তারপর প্রশ্ন করলে, "তা কত জমল তোর—নতুন কাপড় যে কিনবি ?"

"ন'টা টাকা লাগবে, সাতটা জম্যে ফেলেছি—মাল হাটের মোয়াড়াটা একাই সামলালুম ত..."

বাইরেটা যে পরিমাণ ভিজল, ভিতরটা ভিজেছে তার চেয়ে ঢের বেশী ; সেখানে ত সাতটা দিনের মেঘ জমে গুমরাচ্ছিল। রিক্‌সা থেকে নেমে, ভাড়ার উপর দুটো টাকা বেশী দিলে দুলালকে। ছেলেটা ভাল, একটু লজ্জিতভাবে বললে, "তা আপনি কেন গুনোগাৎ দেবে দাদাবাবু; বড়ে লোকসান করেছে—সবারই করেছে..."

গিরীন হেসে বললে, "এ ত গুনোগাৎ নয়...আর তা যদি বললি, আমি নিজের পকেট থেকে দিচ্ছি নাকি ? আদায় করব না তোর বৌদির কাছ থেকে !"

...বেশ লাগছিল—গরীব, বিত্তর প্রভেদ, গ্রাম-সম্পর্কে বৌদিদি পাতিয়ে বসেছে, হয়তো নিজের অন্তরের প্রেরণাতেই ; এনে যে পৌঁছে দিয়েছে তার গুমর রাখবার জায়গা নেই। আজকের সে সুর তার সঙ্গে চমৎকার মিলে যাচ্ছে।

দুলালও কি ভেবে হাসলে, বললে, "তা যদি বলছ ত ছাও। তা হলে ভিতরকার কথাটাও বলি দাদাবাবু, আনলুম নতুন বৌদিকে—রিস্‌কার এক হিসাবে জন্ম পালটে যাওয়াই ত, তা কর্ত্তাবাবু বক্‌শিশ করলেন মোটে চারটি গণ্ডা পয়সা। ভাগ্যিস একটু আড়ালে ছিলুম বলে কারুর নজরে পড়ে নি—সেটাকে আট গণ্ডা বলে চালিয়ে দিলুম।...তা ছাও—সোয়ামী হ'ল গিয়ে ইস্তিরীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, মনে করব লতুন বৌদিদির পয়মন্ত হাত থেকেই নিলুম।"

এ পর্য্যন্ত গৌরচন্দ্রিকা ত বেশ হ'ল, কিন্তু মূল গান এসে পড়া পর্য্যন্ত যে ক্রমাগতই বেসুরা চলেছে, তার কি করা যায় ?

রিক্‌সাটাকে রাস্তা থেকেই বিদায় করে দিয়েছিল। তারপর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে পুকুরের পাশ দিয়ে খানিকটা গিয়ে বাড়ীটা। জল-কাদার মধ্যে দিয়ে মাইল দেড়েকের পথ, সন্ধ্যা প্রায় হয়েই এসেছে ; গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেলে সুরবালা যে জানলা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, অনেকখানি দেখা যাবে ; নইলে রিক্‌সা আসছে দেখে সে আগে-ভাগেই সরে দাঁড়াবে না ?

গোটাতিনেক গাছের আড়াল কাটিয়েই একটা বাঁকের মুখ থেকে উপরের জানলাটা দেখা যায়। জানলাটা নিতান্ত নির্ব্বিকার ভাবেই রয়েছে বন্ধ।

একটা আঘাত লাগল, তবে খুব বেশী নয়। দাঁড়িয়ে যে থাকবেই একথা ত লেখা ছিল না চিঠিতে ; একটা আন্দাজ করে নেওয়া। নানা কারণেই সে আন্দাজ না ফলতে পারে ; কিংবা হয়ত ছিল দাঁড়িয়ে, বিলম্ব দেখে সরে গেছে। আর এও ত ভাববার কথা—এক-বাড়ী লোক, নূতন বউ সে স্বামীর পথ চেয়ে কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ?... আন্দাজটাই কি ভুল হয় নি ?

তবুও হ'ল নিরাশ। নব-বিবাহিতের মন, কোথা দিয়ে কি হয়, সে যেন কোন যুক্তিই মানতে চায় না। একটু যেন অভিমান নিয়েই বাড়ীতে প্রবেশ করলে গিরীন।

তারপর এই অভিমানই যাচ্ছে যেন ক্রমশঃ বেড়ে, চেষ্টা করছে ঠেকিয়ে রাখতে যুক্তি দিয়ে, কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে যেন।

প্রথমতঃ তার এই ধারাস্নান—এই ভিজে চুপসে যাওয়া নিয়ে বাড়ীতে যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল—"তোয়ালে আন্—কাপড় দে শুকনো—চা কর শীগ্‌গির—একি কাণ্ড !—না হয় না-ই আসতে আজ !..."

—আশঙ্কা অনুযোগ ভৎসনা ; এর মধ্যে সুরবালা কোথায় ? মন বোঝায়—মা, বোন, ভাজ, ওঘর থেকে বাবাও যোগ দিচ্ছেন, এর মধ্যে সুরবালার স্থান হয় কি করে ? কিন্তু বোঝালে শোনে কে ?—

মনে হয়—তবুও...

তবুও কি ?...তবুও একজনের ডুরে শাড়ীর একটুখানি আঁচল কি এই বাদুলে হাওয়ায় কাছের কোন দোরের আড়াল থেকে একটু উড়ে আসতে পারত না ? গুরুজনদের সামনে একজনের সংযম কি দুটো চুড়ির শিঞ্জনেও একটু শিথিল হয়ে যেতে পারত না ?

নিচেই অনেকক্ষণ দেরি করলে গিরীন। জামা-কাপড় নিচেই ছাড়লে, তারপর গল্প-গুজব। কিন্তু সুরবালা বলে যে

কোনও জীব বাড়ীতে আছে তার ত কোন লক্ষণই নেই। তারপর মনে হ'ল, উপরেও ত থাকতে পারে তারই প্রতীক্ষায়। যেমন বলা উচিত, উপরেই সবাইকে আসতে বলে সিঁড়ির দিকে এগুল। কেউ আসছে না দেখে একটু আশাও হ'ল, তারপর গিয়ে দেখে উপরের ঘরও শূন্য।

নূতন করে এই অভিমানটুকু বেশ ভাল হয়ে জমে উঠবার আগেই কিন্তু সুরবালা এসে উপস্থিত হ'ল। হাতে খাবারের রেকাবি আর চায়ের পেয়ালা।

গিরীন প্রথম সম্ভাষণ করলে—"তুমি এখানেই আছ নাকি ?"

সুরবালা একটু চোখ তুলে চেয়ে হাসলে, রেকাবি আর ডিস-সুদ্ধ চায়ের পেয়ালা একটা ছোট টেবিলের উপর রেখে টেবিলটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, "না থাকলে কি একজন এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে···"

"আসত ? ঠিক কথা। কিন্তু এল যে, সেকথা কি একজনের মনে ছিল ?"

"এই দেখ, এসেই কবিত্ব, আমার ঘর বিছানাপত্তর ভিজে যাবে যে !"—

তাড়াতাড়ি গিয়ে সুরবালা সামনের জানলাটা বন্ধ করে দিলে, তারপর বিছানার একটা কোণে, গিরীনের চেয়ারের সামনা-সামনি হয়ে বসে বললে, "চাটুকু আগে খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।···মনে থাকবার কথা বলছ, নিজের পায়ের তদারক করেই ফুরসত নেই ত পরের কথা মনে থাকবে কি ?"

চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে গিরীন থমকে গেল, জিজ্ঞাসা করলে, "কি হ'ল পায়ে ?"

"মচকে গিয়ে যা ব্যথা ! রান্নাঘরে বসে ফোমেণ্ট দিচ্ছিলাম···খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছি বিকেল থেকে···কে জিজ্ঞেস করে বল সেকথা ?"

"কই, এখন ত খোঁড়াচ্ছিলে না···মানে, তাইতে জিজ্ঞেস করি নি আমি···কই, দেখি কোনখানটা···"

উঠে এগিয়ে যাবার আগেই সুরবালা চাপা গলায় খিল খিল করে হেসে উঠল, বললে, "বস, কি জ্বালা ! ফোমেণ্টের ব্যবস্থা না হলে তোমার চায়ের জল তৈয়ের থাকত কি করে ? কাপড় ছেড়েই যে এক কাপ পেলে !···হ্যাঁ, এইবার গিয়ে বলে দাও যে, ওঁদের বউ উপরে এসে আর খোঁড়াচ্ছে না···"

মুখে কাপড় চেপে হাসতে লাগল।

মুখে অল্প হাসি নিয়ে ছোট ছোট চুমুকে চা খেতে লাগল গিরীন, দুষ্টুমির কথাটুকু ভেবে মাঝে মাঝে চাইছে সুরবালার দিকে। বৃষ্টিটা একটু যেন নরম হয়েছিল, জানলার উপর ঝাপটায় মনে হচ্ছে আবার জোর হ'ল।

বললে, "খুলে দেবে না জানলাটা ?"

"কি গেরো ! জানলা না খুললে···আমার কিন্তু মচকানো পা, বারবার ওঠা-নামা করতে পারব না, জানলা খুলে ঐদিক দিয়ে নেমে যাব। আমার কাজ রয়েছে বিস্তর "

"মচকানো পা নিয়ে শুয়ে থাকাই ভাল···"

"মচকানো পা নিয়ে খেটে বেড়ানো আরও ভাল। সবাই ভাববে—দেখেছ, কি কাজের বউ ! এ বউ কি কে এল বাড়ীতে, কে গেল, তার খোঁজ রাখতে পারে ?"

গিরীন নিজেই গিয়ে জানলাটা খুলে দিলে। ফিরে দেখলে কিন্তু সুরবালা একেবারে সিঁড়ির কাছে। দু'পা এগিয়ে এসে বললে, "খেয়ে নাও ওগুলো, দিব্যি রইল ; আমার ফুরসত নেই এখন বসবার।···বিকেলে মাছ পায় নি, পুকুরে জাল ফেলতে বলেছেন বাবা···"

"তুমি ফেলবে ?"

সিঁড়ির একটা ধাপে পা দিয়েছে সুরবালা, আঙুলটা উঁচিয়ে ঠোঁট নেড়ে জানালে—"পাবে উত্তর।"

এই রকম করে ক্রমাগতই যতিভঙ্গ করে চলেছে সুরবালা—ক্রমাগতই। বাইরের দুর্যোগ অন্তরের ব্যাকুলতাকে যত দিচ্ছে জাগিয়ে, যত মনে হচ্ছে সার্থক করে তুলি আজকে এই দুর্লভ রাত্রিটিকে, ততই সে ওর এই ছোট ছোট আঘাত দিয়ে, ওর এই অকরুণ হাসি দিয়ে যেন সেটাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। বিশেষ করে এই হাসি—এতটুকু ভাবালুতাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও দাঁড়াতে দিচ্ছে না ; এ কি রোগ দাঁড়িয়েছে নূতন !

ভাল হয়তো লাগছে, তার কারণ সুরবালার সবকিছুই ভালো। কিন্তু তবুও আজকের রাত্রিটি যদি এই করে হয় বিফল—ওর মনের সুরের সঙ্গে সুরবালার মনের মিল না থাকে—তা হলে সে আপশোস রাখবার জায়গা কোথায় ওর ? বিয়ের পর এই প্রথম এই রকম একটি বর্ষারজনী···

কোন রকমে ওর মনের ঠিক তন্ত্রীটিতে দেওয়া যায় না একটু আঘাত ?

সেই উদ্দেশ্যে গল্পটা বলছে গিরীন। মনে করেছিল কখনও বলবে না।···তোমায় পেতে আমার যে কি আত্মত্যাগ—তোমার মহিমায় মুগ্ধ হয়ে এক দিন আমার মনও যে কি মহিমময় হয়ে উঠেছিল, একথা কি যায় মুখ ফুটে বলা ? তবু হচ্ছে বলতে—আজ ওর জন্যে যতই দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই আলেয়ার মত ও যাচ্ছে পেছিয়ে ; অথচ এক দিন কত আশা নিয়েই না এই সুরবালার দ্বারে উপস্থিত হয়েছিল যে ওর মত নিঃশেষ করে কেউই বোধ হয়, নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে না—

সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে এতক্ষণ পরে পেয়েছে সুরবালাকে। সমস্ত সংসারের চঞ্চলতা সব শব্দ থেমে গিয়ে বর্ষার সঙ্গীতটুকু আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—শুধু ঝরঝর শব্দের সঙ্গে ভেকের অবিরাম কলরব। রাত্রিটুকু দুটি প্রাণীর হাতে তুলে দিয়ে সমস্ত পল্লী গভীর সুপ্তিতে মগ্ন।

জানলাটা খোলা, সামনে একটা কৌচের একটি ধারে গিরীন বসে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। সুরবালা আসে নি, পাশেই বিছানা, তাইতেই আছে শুয়ে। অবশ্য জেগেই আছে, গল্পও করছে।

আহ্বানের উত্তরে হেসে বললে—"কি করব, আমি কবি নই, খেটেখুটে এসে বিছানাটাই লাগছে ভাল।"

গল্পই হচ্ছিল—একথা-সেকথা নিয়ে। গিরীন বললে, "যখন এসে পড়ে কবিত্বের লগ্ন তখন কবি হওয়াতেই লাভ —এই রকম একটি লগ্নে সাড়া দিয়ে আমি এক দিন আমার জীবনের যা সবচেয়ে পরম সম্পদ তাই পেয়েছি···"

সুরবালা মাথাটা ঘুরিয়ে দুষ্টুমি করে ভ্রূ কুঁচকে বললে, "তোমার পরম সম্পদ তো শ্রীমতী সুরবালা দেবী—এই তো এত দিন জানতাম···"

উপরে ওর দু'জনেই, ছাতের দরজাও বন্ধ; তার উপর বর্ষণের শব্দ—বেশ মুক্তভাবেই হেসে উঠল একটু।

গিরীন বললে, "শ্রীলশ্রীযুক্তেশ্বরী সুরবালা দেবীরই কথা হচ্ছে।"

"মহারাণী'টা জুড়ে দাও···পরম সম্পদই তো।"

"শ্রীলশ্রীযুক্তেশ্বরী মহারাণী সুরবালা দেবীর কথা।"

"শুনতে হয় তো তা হলে।"

"তা হলে আসতে হয় এখানে।"

সুরবালা খিলখিল করে হেসে ঘুরে শুল।

"কি হ'ল আবার?"—বিস্মিত ভাবেই প্রশ্ন করলে গিরীন।

"মহারাণীর হুকুম—এইখানে এসে কবিকে তার কাব্য-কাহিনী শোনাতে হবে।"

এই পথেই চালিয়ে নিয়ে আসছিল, বিজয়িনীর মত আরও মুক্ত কণ্ঠে হেসে উঠল।

গিরীন উঠে গেল, একটা হাত চেপে ধরে বললে, "দোহাই তোমার সুরো, এই রকম হাসি দিয়ে আজকের এমন রাতটা আর দিও না ছিন্নভিন্ন করে। ওঠ, লক্ষ্মীটি।"

খানিকটা জোর করেই টেনে নিয়ে এসে কৌচটাতে দিলে বসিয়ে। সামনের অন্ধকারের গায়ে স্মৃতির বাতিটা যেন উজ্জ্বল করে দিয়ে বলতে লাগল—

"তোমায় আমি যেচে বিয়ে করতে গেলাম কেন—এ নিয়ে সবাই আশ্চর্য্য হয়েছে···"

আবার পাশে চোখ তুলে হাসলে সুরবালা।

"কেন, তুমি জানতে ব্যাপারটা? কৈ, বল নি তো!··· তা হলে আর নতুন কি শোনাচ্ছি!"

"কি ব্যাপার তা জানি না, তবে আমি যে সুন্দরী এটা তো জানতাম।"

"ও, আবার সেই দুষ্টুমি!"

আবার বলতে আরম্ভ করলে—

"প্রথম হয়ে পাস করেছি। শ্বশুর হবার জন্যে চারিদিকে রেষারেষি পড়ে গেছে—বিলেত পাঠিয়ে কেষ্ট-বিষ্টু করে আনবে, মেয়েদের ফটো যা আসতে লাগল মাথা ঘুরিয়ে দেয়, এমনও নয় যে বিলেত যাবার অসাধ বা সুন্দরী চেনবার চোখ নেই—এমন অবস্থায় হঠাৎ একি মতিগতি হ'ল!—হ্যাঁ, মেয়েও যে খুব সুন্দরী তাও তো নয়···"

"ইস্!···নয়!"

"সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। আসল কথাটা কাউকে বললাম না; শুধু জিদ ধরে রইলাম—ঐ মেয়ে না হলে করবই না বিয়ে। একটু মোলায়েম করে বললাম অবশ্য—এখন থাক, নিজের পায়ে দাঁড়াই···মিথ্যে কথা সব···"

"এখন তার ফল ভুগছি···" একটু খুক্ খুক্ হাসি উঠল কথাগুলোর সঙ্গে।

"বিয়ের চিন্তাতেই কিন্তু মনটা আমার পূর্ণ হয়ে রয়েছে, তবে আমার রোমান্স একটু অন্য ধরণের। তাই নিয়ে তোমাদের বাড়ীটা আমায় বড় টানত। আমি তখন ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নিয়ে কাজ করছি। অজ পাড়াগাঁ, তার মধ্যে এক-প্রান্তে ঐ রকম একটা প্রকাণ্ড বাড়ী জীর্ণ হয়ে আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে, লোক নেই; বড় নাড়া দিত মনটাকে। বড় রাস্তা থেকে একটু ঘুরে বাড়ীটা, কাজে থাকতাম ব্যস্ত, মনও শ্রান্ত থাকত, কাছ দিয়ে কখনও যাই নি। পুরনো ঝাউ আর বটল-পামের ফাঁকে ফাঁকে উপরের যেটুকু দেখা যেত সেটুকু নিয়েই রোমান্স সৃষ্টি করতে করতে বেরিয়ে যেতাম আমাদের ক্যাম্পের দিকে। বলা বাহুল্য, সেই রোমান্সের কল্পলোকে একটি মেয়েও ছিল, বিয়ে না করায় সম্ভব-অসম্ভব জায়গায় বিয়েরই স্বপ্ন দেখছি তখন। তার পর এক দিন সন্ধ্যেয় কি মনে হ'ল—বড় রাস্তা ছেড়ে ঐদিক ঘুরেই আসব, টের পেলাম বাড়ীটার নিচের একটা অংশে রয়েছে লোক, যেতে যেতেই দরজার মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ল রকে একটা লালঠেম জলছে আর তারই আলোয় রকের উপর দেয়ালে ঠেস দেওয়া এক গোছা বাসন ঝক ঝক করছে। রোমান্স খানিকটা খোরাক পেলে। দু'দিন বেশ অন্যমনস্ক রইলাম, তৃতীয় দিনে আবার ঐ পথে আসতে হওয়ায় ঐদিক হয়েই ঘুরে আসতে আসতে দেখি মেয়েটিও কল্পলোক থেকে নেমে এসেছে, তার কণ্ঠস্বর

শুনলাম—ছোট্ট একটি কথায়।···তুমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ যে সুরো ?"

"কল্পলোক থেকে নামতে পারছি না।" এবারের হাসিটা যেন জোর করেই হাসলে সুরবালা।

"কিছুদিন আমায় অন্য গ্রামে গিয়ে কাজ করতে হ'ল। তাতে রোমান্স শুকিয়ে নিশ্চিন্দি হবারই কথা, কিন্তু দিন-দিনই যেন আরও শাখা-পল্লবে সজীব হয়ে উঠতে লাগল, আনন্দটা ক্রমে যেন যন্ত্রণায় দাঁড়াচ্ছে। এই সময় মনের অবস্থা অন্যদিক দিয়েও ভাল নয়, ছুভিক্ষের অনেক দিন হয়ে গেছে, লোকের দেবার ক্ষমতা বা স্পৃহা এসেছে কমে। প্রথমটা যেমন পাবার বা দেবার উন্মাদনায় মানুষের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠছিল, তেমনটি আর নেই। কেউ দিতে জানে না নিজেকে···একেবারে নিজেকে ভুলে যদি বিলিয়ে দিতেই না পারলে তো কেমন করে মেটাবে ক্ষুধা ? ঐটেই তখন মূল চিন্তা মনের, তার পর এক সময় চিন্তাটা কি করে স্থান আর পাত্র পরিবর্ত্তন করলে, দেখলাম বভুক্ষুদের জায়গায় এসে পড়েছি আমি আর দাতার জায়গায়···"

"সেই মেয়েটি।···কি রোমান্স বাবা !" এবারেও হেসে উঠল সুরবালা। কিন্তু সে অকৃত্রিম সুর ফোটাতে পারলে না।

বর্ষার বিরাম নেই। ঘোরটা এবার কাটল না গিরীনের ; আবিষ্টভাবেই বললে—"এ সময় সেই ঘটনাটুকু চোখে পড়ল।"

একটু চুপ করলে, মনটা যেন সিক্ত অন্ধকারের মধ্যে কোথায় গেছে তলিয়ে। সুরবালাকে তাগাদা দিতে হ'ল— "ঘুমে এদিকে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে···"

"সেদিন কিন্তু মেয়েটি নিজের কথা একেবারেই ভাবে নি। কাজ খুব কম, জোগানের অভাবেই প্রায় গুটিয়ে এসেছে। তাইতে নিজের কথাই বড় হয়ে পড়েছে বলে ঐ বাড়ীটার ওদিক দিয়েই ক্যাম্পে ফিরে আসছি—বর্ষার সন্ধ্যাই, তবে বৃষ্টি নেই, আকাশে মেঘ থমথমে হয়ে রয়েছে। দেখি একজন ভিখিরী ঐ বাড়ীর দরজায় বসে রয়েছে। হয়তো আসলে ভিখিরী নয়, ছুভিক্ষ যাদের ভিখিরী করে তুলছে তাদেরই এক জন, আর তো আমাদের কাছেও বড় একটা পাচ্ছে না কিছু।

যারা এই সব কাজ নিয়ে থাকে তাদের মনটা যে সর্ব্বদাই করুণায় ছল ছল করতে থাকে এমন নয়, বরং দেখে শুনে ঘেঁটেঘুঁটে খানিকটা নির্ব্বিকারই হয়ে যায়। এগিয়েই যেতাম, কতবার গেছি এই রকম, সেদিন কিন্তু কি হ'ল, হঠাৎ মনটা বড় টনটনিয়ে উঠল, মনে হ'ল ঐ মানুষটা শুধু ঐ মানুষই নয়, জগৎ জুড়ে যারা দীন-নয়নে রয়েছে হাত পেতে তাদের যেন প্রতীক। একটু এগিয়েই গিয়েছিলাম, ঘুরে দাঁড়ালাম।

দোরের দিকে একটু তেরছা হয়ে বসেছিল, ঘুরে দাঁড়াতে ভাল করে নজর পড়ল। পুরুষ নয়, মেয়েছেলে। শীর্ণ, কালো, মাথার চুলগুলি এলোমেলো হয়ে ঘাড়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে ; পরনে একটা শতছিন্ন ময়লা কাপড়, গুটিয়ে-সুটিয়ে উবু হয়ে বসে রয়েছে বলেই যেন কোনরকমে লজ্জা নিবারণ হয়েছে ; ঐ কাপড়েরই খানিকটা পিঠের উপর টানা।

মুখে কথা নেই। যেন ডেকেছে, সাড়া পায় নি, আর ডাকবার শক্তি নেই, উঠবারও শক্তি নেই, তাই হাত পেতে আছে বসে। চারিদিকের ঘন গাছপালার ছায়ার উপর মেঘলা সন্ধ্যার ছায়া এসে পড়ায় সমস্ত দৃশ্যটি অস্পষ্ট, সেই জন্যই যেন আরও করুণ।

বলতে বাধা নেই, আমায় একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল। কি রকম গৃহস্থ জানি না, তবে ইচ্ছে থাকলেও ত এই ভর-সন্ধ্যের সময় কিছু দেবে না ; হাত দুটো আপনিই কখন পকেটে গিয়ে সেঁদিয়েছে, এক পকেটে একটা দোয়ানি আর এক পকেটে আধখানা পাঁউরুটি ঠেকল।···দিয়ে আসি, তার পর এক পাশে বসিয়ে ক্যাম্প থেকে আরও কিছু না হয় নিয়ে আসা যাবে।

পা বাড়িয়েছি, বাধা পড়ল। দরজার ভেতর দিয়ে উঠোনটার খানিকটা নজরে পড়ে, দেখছি একটি মেয়ে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে যেন বাড়ীর সবাইকে লুকিয়ে এগিয়ে আসছে। ···বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠল—দুটি ভিখিরীকে একসঙ্গে দয়া—এ যে কল্পনাতীত, একজনকে না হয় শুধু দেখা দিয়েই···

একটু আড়াল হয়ে দাঁড়ালাম। আড়াল থেকে আরও একটু অস্পষ্ট, তবু যা দেখবার তা পাচ্ছি দেখতে।···দরজায় এসে একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভেতরে দেখে নিলে, তার পর গলা বাড়িয়ে বাইরেটাও চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রথমে একটা সাড়ি দিলে কোলের উপর ফেলে, তার পর চাপা-গলায় তার-ই একটু আঁচল মেলে ধরতে বলে কোঁচড় থেকে কতক-গুলো মুড়ি বের করে দিলে, খান দুই রুটি, আর একটু লঙ্কা-গোছের গোটা দু'তিন কি তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভিখারিণী বোধ হয় হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করতে যাচ্ছিল, হাত তুলে চাপা গলায় বললে—"চুপ।" দাঁড়িয়ে পড়ে একটু যেন কি ভাবলে, তার পর আর একবার ভেতর-বার দেখে নিয়ে পিঠের আঁচলটা আস্তে আস্তে নামিয়ে দিলে। আবার সতর্ক চাউনি, তার পর নিজের গায়ের ব্লাউজটা তাড়াতাড়ি খুলে নিয়ে ওর কোলে ছুঁড়ে ফেলে আঁচলটা আবার জড়িয়ে উঠোনে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

গিরীন চুপ করে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল—অনেকক্ষণ। তারপর বললে, "মনে হ'ল পেয়েছি।

যে এই রকম ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলে তার কাছে হাত না পেতে অন্য কার কাছে দিতে যাব ধরুন। ? তার পর দিনই চিঠিটা লিখি—অভিভাবক দাদা—লিখলাম বাবাকে বোনের বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি দিন।”

মনে আছে সুরবালার। যদিও ঐ সূত্রেই যে বিবাহ এটা জানলে এই প্রথম। ওরা দু'শো টাকা পেয়েছিল সেদিন। কোনও সিনেমার একটা অংশ, পুরনো জীর্ণ জমিদারের বাড়ী দরকার, একটি পতিত অভিজাত বংশের মেয়ের চরিত্র নাকি দেখান হচ্ছে। তারই শুটিং হচ্ছিল সেদিন—আরও এক দিন হয়েছিল।...মেয়েটির সঙ্গে ওর একটু আলাপও হয়েছিল —তবে মা দিদি কিন্তু পরিচয়টা বাড়তে দেয় নি।

এত বড় হাসির কথা—নির্জ্জলা কবিত্বের এতবড় হাস্যকর পরাজয় আর হয় না। মুখে আঁচল চেপে উঠলই যেন একটু খিলখিল করে সুরবালা; তার পরেই একটু চুপ, তার পরেই স্পষ্ট মনে হ'ল যে আঁচলের মধ্যে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে এগিয়ে বসল গিরীন—সত্যিই ফোঁপাচ্ছে সুরবালা! বুকে চেপে ধরে বললে—“কি! কি হ'ল সুরো ?—হঠাৎ...”

সুরবালা মুখটা বুকে চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গেই পারলে না কিছু উত্তর দিতে। তার পর ভাঙা ভাঙা কথায় কান্নার মধ্যে দিয়ে বলে চলল—“একদিন শুনবে—যেদিন হাসির মধ্যে দিয়েই বলবার ক্ষমতা পাব ফিরে...তার আগে একটা কথার উত্তর দাও—পোড়া হাসির রোগ রয়েছে বলে তোমার কি একটুও এমন সন্দেহ আছে যে, আমি সেদিনকার চেয়ে আরও নিঃশেষ করে তোমার পায়ে লুটিয়ে দিই নি নিজেকে ?...বল না—এই রকম একটা রাতেই যে বলবার কথা সেটা...”

মানবশিশুর রহস্য

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

জীবসৃষ্টির আদিপর্ব্বে যার মধ্যে প্রথম প্রাণের অস্তিত্ব দেখা দিয়েছিল সে ছিল নিতান্ত সরল এক-কোষবিশিষ্ট প্রাণী। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। এই জেলি-জাতীয় প্রাণী থেকেই পৃথিবীর যাবতীয় জীবের উৎপত্তি হয়েছে। শুধু জীবজগৎ নয়, তরুলতা-তৃণগুল্মাদি যাবতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তিও এই ক্ষুদ্র প্রাণবিন্দু থেকে। একথা চিন্তা করে নানা জাতীয় বৃক্ষলতাশোভিত অরণ্য, বিবিধ পুষ্পসমৃদ্ধ তরু, নানা জীবজন্তু—এক কথায় এই বৈচিত্র্যময় পরিবেশের দিকে তাকালে মনে হয়, কোন মহা-যাদুকর একেবারে ‘কিছুই না’ থেকে এই রূপরসগন্ধভরা অপূর্ব্ব সুন্দর বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কোন যাদু-দণ্ড-স্পর্শে এক নিমেষের মধ্যেই এই বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নি, বহু লক্ষ বৎসরের নীরব অথচ সুশৃঙ্খল ক্রমবিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে জীবকুল বর্ত্তমান অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে। কিরূপে এ পরিবর্ত্তন ঘটেছে এইটেই হ'ল বড় প্রশ্ন। ব্যাঙ বা টিকটিকি কিরূপে বাঘ, ভালুক, গণ্ডার কিংবা জিরাফে পরিণত হ'ল, কেমন করেই বা এদের কোন শাখা বানর, বন-মানুষ এবং অবশেষে মানুষের স্তরে এসে পৌঁছেছে এই অসীম কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেবে কে ? লামার্ক এবং ডারুইন প্রাণিজগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেছেন তাই জীবতত্ত্ব আলোচনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি।

ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ লামার্ক বলেন, প্রাণিজগতের নিয়ম এই যে, পিতার গুণ, ধর্ম্ম, বৈশিষ্ট্য সন্তানে বর্ত্তে; সন্তান পিতার অনুরূপ হয়ে গড়ে উঠে, তবে সম্পূর্ণ তাঁর অনুরূপ হয় না—কতকটা গুণ সে নিজেও অর্জ্জন করে। এই অর্জ্জিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য সে আবার তার নিজের সন্তানে সঞ্চারিত করে যায়। এইরূপে পুরুষপরম্পরায় অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ হেতু জীবের মধ্যে পিতৃগুণেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটতে থাকে। শেষে সে জীব এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছে যখন অনেককাল আগেকার আদিপুরুষের সঙ্গে তার বিশেষ কোন মিল থাকে না; তাকে তখন আদিপুরুষ থেকে স্বতন্ত্র জীব বলে মনে হয়।

লামার্ক-তত্ত্বের মূল কথা হ'ল দুটি: প্রথম, সন্তান পিতার স্বভাবধর্ম্মের অধিকারী হয়; জীব যেন সন্তানের ভিতর দিয়ে নিজেকেই নূতন করে প্রচার ও প্রসার করছে। দ্বিতীয়, একপুরুষের অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য সন্তানে সংক্রামিত হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় সূত্রটি স্বীকার করলে একথা মানতে

হয় যে, প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে জীব যে অঙ্গের বেশী ব্যবহার করে ক্রমে তা পুষ্টিলাভ করে এবং সেই অর্জ্জিত শক্তি এবং বৈশিষ্ট্য সন্তানেও প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, ব্যবহারের অভাবহেতু কোন অঙ্গ ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে একেবারে লোপ পাওয়াও অসম্ভব নয়। এই যুক্তির বলে লামার্ক জীবের ক্রমপরিণতির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, রূপান্তরিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে যাওয়ার ফলে জীবকে নানারূপ চেষ্টা করতে হয়েছে। এই চেষ্টার ফলে তার দৈহিক যা-কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তা সন্তানে প্রতিফলিত হয়েছে। এইভাবে জীবের ক্রমাভিব্যক্তিতে বানর যে নরে পরিণত হবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কিন্তু লামার্কের এই মত সর্ব্বজনস্বীকৃত হয় নি।

লামার্কের পরে ডারুইন। ডারুইন লামার্ক-তত্ত্বের প্রথম সূত্রটি স্বীকার করেন। তিনিও বলেন, সন্তান পিতার স্বভাব এবং গুণগুলি পায়। বৃক্ষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ যেমন বীজের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় লুক্কায়িত থাকে, জীবের বিশেষ লক্ষণ ও গুণগুলিও তেমনি সন্তান উৎপাদনকারী বীজের মধ্যে অবস্থান করে। কালক্রমে এগুলি বিকাশলাভ করতে থাকে। এ পর্য্যন্ত লামার্ক ও ডারুইন উভয়েই একমত। কিন্তু সন্তান যদি হুবহু পিতার অনুরূপই হতে থাকে, সন্তানকে যদি পিতার অপরিবর্ত্তনীয় নূতন সংস্করণ বলা চলে, তবে জীবের ক্রমপরিণতি প্রমাণ করার উপায় কি? টিকটিকি তবে চিরদিন টিকটিকি হয়েই রইল না কেন? এর উত্তরে ডারুইন বলেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই জীবের অভিব্যক্তির বা ক্রমোন্নতির কারণ। কথাটি একটু স্পষ্ট করে বলা যাক্‌।

এই পৃথিবীতে জলে স্থলে যত জীবজন্তু বৃক্ষ তৃণলতা রয়েছে এদের সকলের উপযোগী খাদ্য পৃথিবীতে নাই। বাঁচতে হলে এক জনের পক্ষে অপরকে হত্যা করে উদর পূরণ করা ছাড়া উপায় নাই। যে সবল সে দুর্ব্বলকে ভক্ষণ করে বেঁচে আছে; শুধু তাই নয়, সবলতরের আক্রমণ থেকে তাকে আত্মরক্ষাও করতে হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বিশ্বসংসার একটি বিরাট 'রণরঙ্গভূমি'। এখানে প্রতিমুহূর্ত্তে চলেছে তীব্র জীবনমরণ-সংগ্রাম। প্রাণীমাত্রেরই প্রধান কামনা বেঁচে থাকা। সেই প্রেরণার বশে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকবার উপযোগী শক্তি তারা অর্জ্জন করেছে। এ শক্তি সকলের এক রকম নয়। বাঘের ধারালো দাঁত নখ, হরিণের দ্রুত পলায়নক্ষমতা, বরাহের দাঁত, মহিষের শিং, গিরগিটির দেহের রঙ পরিবর্ত্তন করে অপরকে ফাঁকি দিবার কৌশল—এ সবই জীবন-সংগ্রামের যোদ্ধাদের আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ। কেহ গায়ের জোরে অপরকে মেরে নিজে বেঁচে আছে, কেহ পালিয়ে আত্মরক্ষা করার উপায় গ্রহণ করেছে, কেহ বা দৈহিক শক্তির অভাব বুদ্ধি দ্বারা পূরণ করেছে। এই টিকে থাকবার প্রতিযোগিতায় যে অপারগ, তার বাঁচবার কোন অধিকার নাই, সে বিনাশপ্রাপ্ত হবেই। যে শক্তিমান কেবল তাকেই প্রকৃতিদেবী বাঁচবার যোগ্য বলে নির্ব্বাচন করে নিচ্ছেন। এই হ'ল প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জীবনযুদ্ধের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত করার ফলে জীব আত্মরক্ষার তাগিদে দেহের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করতে করতে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। এ সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নি; যত দিন ধরাপৃষ্ঠে জীব আছে, তত দিন চলবে। লামার্ক ও ডারুইনের প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণার বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা মানবশিশুর ক্রমবিকাশ পর্য্যালোচনা করার পূর্ব্বে শুধু এইটুকু উল্লেখ করতে চাই যে, সন্তান পিতার গুণ ও স্বভাবধর্ম্ম উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে পূর্ব্বপুরুষের ধারাকে বহন করে চলেছে। এই গুণ বা স্বভাবধর্ম্মের যেগুলি জীবের একান্ত মজ্জাগত সেগুলিই সন্তানে সংক্রামিত হয়; আকস্মিকভাবে অর্জ্জিত কোন বৈশিষ্ট্য পিতার নিকট থেকে সন্তান পায় না; যেমন ইঁদুরের লেজ কেটে দিলে তার বাচ্চাদের লেজ কাটা থাকে না; আকস্মিক কারণে কোন ব্যক্তির কোন অঙ্গহানি হলে তার সন্তানে সে অঙ্গের বিকলতা দেখা যায় না। জীবের স্বভাবধর্ম্ম যে বীজকণিকার মধ্যে নিহিত থাকে তা এমন সূক্ষ্ম এবং বাহিরের প্রভাব থেকে এমন যত্নসহকারে রক্ষিত যে, অকস্মাৎ এতে কোন পরিবর্ত্তনসাধন সম্ভবপর নয়। প্রকৃতিদেবী এ বিষয়ে অত্যন্ত গোঁড়া। জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি যেন গোপনপুরে মণিকোঠায় শ্বেত স্তম্ভের অভ্যন্তরে হীরা-বাঁধানো কৌটার মধ্যে বন্ধ করে রেখেছেন। এর ফল হয়েছে এই যে, এক দিকে যেমন মানুষের অর্জ্জিত কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ—যথা বিদ্যা, শিল্পে নিপুণতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি সন্তানে আপনাআপনি সঞ্চারিত হয় না, অন্য দিকে তেমনি গুণহীনতা বা ব্যবহারগত দোষও সন্তানকে স্পর্শ করে না। সন্তানের ভিতর দিয়ে প্রকৃতি জীবের মৌলিক ধারাটিই প্রবাহিত রাখতে চান।

ইতর প্রাণিজগতে এই পৈতৃক ধারাবহন সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। এখানে পিতা এবং সন্তানে বিশেষ কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না; সন্তান যেন পিতারই নব রূপায়ণ; জনকই যেন সন্তানদের ভিতর নূতন করে দেহ ধারণ করেছে। কিন্তু মানুষের বেলায় এরূপ হুবহু মিল দেখা যায় না। পিতা এবং সন্তানে দৈহিক পার্থক্য ত কিছু-না-কিছু থাকেই, বুদ্ধি এবং অন্যান্য মানসিক শক্তিতেও তারতম্য

দেখা যায়। কেন এরূপ হয় তা জানার কৌতূহল হওয়া সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক।

মানবশিশুর স্বভাবে বৈচিত্র্য

মানুষের স্বভাবে বৈচিত্র্য দেখা যায় কেন তা বুঝতে হলে শিশুর জন্মের মূল রহস্যটি জানা দরকার। প্রাণিজগতে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত জীব। অন্যান্য জীবের মত মানুষেরও রয়েছে কতকগুলি স্বাভাবিক জীবধর্ম্ম—যেমন বাঁচবার বাসনা, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈহিক প্রয়োজন, কামক্রোধ, প্রজনন, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষের মধ্যে সাধারণ জীবধর্ম্ম যেমন ক্রিয়াশীল রয়েছে, তেমনি মন বুদ্ধি ও বিবেক মনুষ্যত্বর কল্যাণময় প্রভাব বিস্তার করে এগুলি নিয়ন্ত্রিত করছে। মানুষের মাঝে তাই জীব ও শিবের মিলন ঘটেছে। জীবধর্ম্ম ত সকলের মধ্যেই বিদ্যমান; তবে ব্যক্তিগতভাবে যার মধ্যে শিবধর্ম্ম যত বেশী প্রবল তিনি তত উন্নত স্তরের মানুষ।

কাজেই দেখা যায়, জীবধর্ম্ম অনুসারে সকল মানুষ একই প্রকার হলেও ধী-শক্তি, বুদ্ধি, অনুভূতি, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতির তারতম্য হেতু তাদের পরস্পরের মধ্যে অন্তর্নিহিত পার্থক্য থাকে। সন্তান তার পিতা ও মাতা উভয়ের নিকট থেকেই এই শক্তিগুলি লাভ করে। তার মধ্যে যেন দুইটি স্রোতের ধারা এসে মিশেছে। এই এক একটি স্রোতে আবার অন্য কত স্রোত এসে পড়েছে। এই ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মানুষ তার দেহমনের উপাদান কত বিভিন্ন সূত্র থেকে লাভ করে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে ব্যাপারটি কি ভাবে ধরা পড়ে দেখা যাক।

পিতা ও মাতার দেহনিঃসৃত জার্ম্ম-সেল বা জীবকোষের মিলন থেকেই শিশুর জন্ম। যে মুহূর্ত্তে দুইটি বীজকণিকা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'ল তখন থেকেই সুরু হ'ল শিশুর জীবন-লীলা। এই মুহূর্ত্তেই শিশুর ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হয়ে গেল: তার দেহের গড়ন কেমন হবে, হাত-পা, চোখ-মুখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন হবে, কি পরিমাণ মেধা, কল্পনা-শক্তি প্রভৃতি মানসিক সম্পদের মূলধন নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করবে তাও ঐ সময়েই নির্দ্ধারিত হয়ে গেল। তখন হতে নিষিক্ত বীজকোষটি ধীরে ধীরে পুষ্ট হতে থাকে। পুষ্টির জন্য জরায়ুসংলগ্ন ফুলের (placent) ভিতর দিয়ে মাতৃদেহ থেকে রসগ্রহণ করলেও শিশু-ভ্রূণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্য অন্য কারও উপর আর নির্ভরশীল নয়। বৃক্ষের একটি পরিপক্ব বীজকে কোমল, আর্দ্র এবং অঙ্কুর উদগমের পক্ষে অনুকূল মাটিতে বপন করলে বীজের অভ্যন্তরস্থ ঘুমন্ত বৃক্ষশিশুটি জেগে উঠে এবং মাটি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বেড়ে উঠতে থাকে। মাতৃজঠরে অবস্থিত শিশুও বৃক্ষশিশুর মতই। বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জলমৃত্তিকা আলোবাতাসের দাক্ষিণ্য ও শিশুর প্রয়োজন মাতৃদেহ হতে আহৃত পুষ্টিকর রসধারা। খাদ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ শিশু-দেহের বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল কিংবা প্রতিকূল হতে পারে, কিন্তু এতে তার দেহমন গঠনের মূল উপাদানে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না।

এখন প্রশ্ন হ'ল: এই মূল উপাদানের স্বরূপ কি? এর ভিতরই যদি শিশুর ভবিষ্যতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে তবে একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে হয়ত এক দিন ইচ্ছা-মত গুণসম্পন্ন মানবসৃষ্টি সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রকৃতির উপর নির্ভর করা ছাড়া মানুষের অন্য উপায় নাই।

পিতা এবং মাতার দেহজাত যে দুইটি জীবকোষের মিলনে শিশুর উৎপত্তি, তা গঠিত হয়েছে চব্বিশ জোড়া অতি মিহি সূতার মত ক্রোমোসোম দ্বারা। দুইটি জীবকোষের মিশ্রণের ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা দাঁড়াল আটচল্লিশ জোড়া। প্রকৃতির অতি নিভৃত কারখানায়—জরায়ুর অভ্যন্তরে কোন দুর্জ্ঞেয় নিয়মে কে জানে, এই আটচল্লিশ জোড়া ক্রোমোসোমের ভিতর থেকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বাছাই কাজ সমাধা হয়। প্রতি জোড়া থেকে একটি করে ক্রোমোসোম সূত্র খসে বাতিল হয়ে বাদ পড়ে যায়। তার ফলে সংমিশ্রিত জীবকোষের ভিতরও শেষ পর্য্যন্ত চব্বিশ জোড়া ক্রোমোসোমই ঠিক থাকে। এই সংমিশ্রিত জীবকোষ-টিই শিশুর দেহমন, প্রকৃতি, স্বভাব সবকিছুর মূল উপাদান। এই উপাদানের অর্দ্ধেক পিতার নিকট থেকে এবং আর অর্দ্ধেক মায়ের নিকট থেকে পাওয়া। পিতা ও মাতার বংশের দুইটি পৃথক ধারা এসে একত্র মিলিত হয়েছে। দুই দিক থেকে আগত চব্বিশ জোড়া করে আটচল্লিশ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের বংশগতি একত্রিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে থেকে কতক বাদ দিয়ে কতক গ্রহণ করা হ'ল। আটচল্লিশ জোড়া ক্রোমোসোম সূত্র হতে চব্বিশ জোড়া বাছাই করে নিতে গেলে লক্ষ লক্ষ রূপ ভিন্ন প্রকারে সংমিশ্রণ করা সম্ভবপর। এই সংমিশ্রণ ইচ্ছামত সম্পাদন করা মানুষের সাধ্যের অতীত।

জীবকোষের উপাদান ক্রোমোসোমগুলির মধ্যেই মানুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অতি সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পিতার কিছু বৈশিষ্ট্য এবং মাতার কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়েই শিশুর জীবন সুরু হয়। পিতা এবং মাতার দিক থেকে কোন্ বৈশিষ্ট্য সে পাবে বা কোন্টি পাবে না—তা কেউ নির্দ্ধারণ করে দিতে পারে না। এখানে দৈবই একমাত্র ভাগ্যবিধাতা।

মাতৃদেহের অভ্যন্তরে নীরবে ধীরে ধীরে সংমিশ্রিত জীব-কোষটি পুষ্টিলাভ করতে থাকে। মাতৃজঠরস্থিত শিশুর বৃদ্ধি ও জন্মের সঙ্গে বৃক্ষজাতি ফলের ক্রমপুষ্টিলাভের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। গাছে ফুল ফুটলে মৌমাছি, প্রজাপতি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ এসে জোটে মধুপান করতে। এরা এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে বহন করে নিয়ে যায়। এইভাবে পুষ্পের পুংকেশর থেকে রেণু বা পরাগ স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভকেশরে নীত হয়। পরাগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয় ফল। ফল বোঁটাতে লেগে থাকে এবং বৃক্ষের রস থেকে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করতে থাকে। অবশেষে সম্পূর্ণ পরিপক্ক হলে আপনা থেকেই ফলটি বৃন্তচ্যুত হয়। বৃক্ষের সকল বৈশিষ্ট্য বীজের মধ্যে সযত্নে রেখে দিয়ে, বীজের খাদ্যস্বরূপ কিছু মূলধন ফলের মধ্যে স্থাপন করে বৃক্ষ যেন নিজের সন্তানকে নূতন করে বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্য পাঠিয়ে দিলে। ফলের মধ্যে বৃক্ষের সন্তান ঘুমিয়ে রয়েছে।

মানবশিশুরূপ ফলটিও মাতার জরায়ুর মধ্যে অবস্থান করে, মাতৃদেহ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে যথাকালে পরিপক্ক বৃন্তচ্যুত ফলের মত ভূমিষ্ঠ হয়। বৃক্ষ একাধারে ফলের পিতা ও মাতা। কারণ একই বৃক্ষে স্ত্রী-পুষ্প ও পুং-পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়; কখনও বা একই ফুলে পুংকেশর ও গর্ভ-কেশর থাকে। কাজেই ফলের মধ্যে কেবল একটি বৃক্ষের বৈশিষ্ট্যই নিহিত থাকে। কিন্তু মানব-শিশুর মধ্যে এসে মিলেছে পিতৃবৃক্ষ ও মাতৃবৃক্ষের দুইটি পৃথক ধারা। তাই শিশুর জীবনে এত বৈচিত্র্য।

একই পিতামাতার সব ক'টি সন্তান সব বিষয়ে একই রূপ হয় না। দেখা যায়, সন্তান হয়ত মায়ের গায়ের রং, পিতার মত চুল, চোখ, নাক, ঠাকুরদাদার মত দেহের গড়ন পেয়েছে। কণ্ঠস্বরে কেউ সম্পূর্ণ একপ্রকার নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তান পিতামাতার দৈহিক অবয়ব ও মানসিক গুণগুলির অধিকারী হয়। গুণের পরিমাণে অবশ্য তারতম্য থাকতে পারে এবং থাকাই স্বাভাবিক। তাই দেখি সাহিত্য, সঙ্গীত, গণিত বা চিত্রকলা প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ সকল ভাই-বোনের একরকম হয় না; এ সকল আয়ত্ত করার মত মানসিক শক্তি এবং প্রবণতাও সকলের থাকে না। অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় কবির ছেলে সাহিত্যরসে বঞ্চিত, চিত্রশিল্পীর ছেলে রংকানা, গণিতজ্ঞের ছেলে অঙ্কশাস্ত্রে নিরেট মূর্খ। আবার ঠিক এর বিপরীত অবস্থাও বিরল নয়।

এর কারণ নির্দ্দেশ করতে গেলে বলতে হয়, শিশুর জীবন সুরু হওয়ার মুহূর্ত্তে পিতা ও মাতার জীবকোষের ক্রোমোসোমগুলির মধ্য থেকে যে বাছাই সম্পন্ন হয় তার উপরই সবকিছু নির্ভর করে। শিশু মায়ের নিকট থেকে অর্দ্ধেক এবং বাবার নিকট থেকে অর্দ্ধেক মূলধন নিয়ে জীবন আরম্ভ করে। তার পিতামাতা উভয়েই আবার তাঁদের বাবা ও মায়ের নিকট থেকে অর্দ্ধেক পরিমাণ করে উপাদান নিয়ে নিজেদের জীবন গঠন করেছিলেন। কাজেই শিশু তার পিতামাতার কাছ থেকে পাওয়া উপাদানের ভিতর দিয়ে পিতামহ ও মাতামহের এক-চতুর্থাংশ করে দেহমনের উপাদান লাভ করে। এইভাবে পিতা ও মাতার দিক থেকে আগত দুইটি ধারা অবলম্বন করে পূর্ব্বপুরুষের কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষের নিকট থেকে আমরা দেহমনের উপাদান পেয়ে থাকি। এই উত্তরাধিকারকে বলা হয় বংশগতি (heredily)। এখানে একটি প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গুণ বা মানসিক শক্তি ও প্রবণতার অভাব থাকতে পারে কিংবা কোন কোন গুণ এবং মানসিক শক্তি একেবারেই নাও থাকতে পারে, কিন্তু কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা সকল দেশের সকল জাতির মানুষের মধ্যেই বিরাজমান। এগুলিকে বলি স্বাভাবিক বা সহজাত প্রবৃত্তি। এগুলি মানুষের জীবধর্ম্ম। কোন ইমারতের গঠনাকৃতি পৃথক হতে পারে। এর দেয়ালের কারুকার্য্যে এবং বর্ণে নূতনত্ব থাকতে পারে-কিন্তু মূল উপাদান সকলেরই এক—ইট-কাঠ-লোহা-পাথর। তেমনি বিভিন্ন মানুষের গায়ের রঙে পার্থক্য আছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্যে ও সৌষ্ঠবে ইতরবিশেষ আছে, মানসিক শক্তির কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচুর্য্য আছে, অভিনবত্ব আছে—এ সকল বিষয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে তা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু মানুষের জীবধর্ম্মে একের সঙ্গে অন্যের কোন পার্থক্য নাই। সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ অর্থাৎ ভাবাবেগ সকল মানুষের মধ্যেই সক্রিয় রয়েছে। শিশুর ক্রমবিকাশের গতিপথ জানতে হলে, কিভাবে ক্ষুদ্র অসহায় মানবশিশু বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় তা বুঝতে হলে সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের স্বরূপ কি তা জানা প্রয়োজন। এগুলিই মানুষের জীবন-প্রেরণার উৎস।*

---

* লেখকের প্রকাশিতব্য পুস্তকের একটি অধ্যায়।

স্থপাত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দীপ নাম তার, ভাস্কর তারা, বহুদিন হেথা বাস,
গৌরবময় বংশের ইতিহাস।
পাঠশালে মোর সহপাঠী ছিল, মেধাবীও ছিল বটে,
আজ ভিক্ষুক কপালে যা থাকে ঘটে।
ভাবিনু এবার তীর্থভ্রমণে যাইব একটু দূর—
সমুদ্রতটে পুরী জগবন্ধুর।
দীপ আসি, মোরে আগ্রহে বলে' সঙ্গে যাইব আমি
টেনেছেন মোরে প্রভু অন্তর্যামী।
পুরীধামে গিয়া মাসেক কাটানু, তৃপ্তি দেহে ও মনে
জগন্নাথ আর জলনিধি দর্শনে।
দীপ খায় দায়, ঝিমোয় ঘুমায়, জাগায় তাহারে কে ?
বেড়াতে গেলাম উভয়ে কোণার্কে।
বিশাল সূর্য্যমন্দির যেই চক্ষে পড়িল তার
নূতন মানুষ, সে দীপ নহে সে আর।
উল্লাসে তুলি' অঙ্গুলি তার দেখালো দেউল মোরে,
সুন্দর এক সূর্য্যোদয়ের ভোরে।
হেরি সুগঠিত পাষাণ-প্রতিমা আগে চোখে পড়ে যেটি,
দীপ বলে 'আজও দাঁড়ায়ে আছিস বেটি ?'
সব যেন চেনা—চলেছে ক্ষিপ্র দৃপ্ত পদক্ষেপে—
জাগে যৌবন সর্ব্বশরীর ব্যেপে।
প্রতি প্রস্তর প্রতি মূর্ত্তিটি নেহারে বারম্বার,
ওরা জীবনের শিলালিপি যেন তার।
পাষাণ পুষ্প গন্ধ বিতরে, ছবি যেন হাসি নয়ে,
যুগান্তরের সুহৃদের সমাগমে।
কি ঔজ্জ্বল্য, কি ঔৎসুক্য, ওকি ছন্দিত গতি ?
ভিখারী তো নয়—রাজ্যের অধিপতি !
শীর্ণ শরীরে ও কি লাবণ্য ! ঐশ্বর্য্যের ছাপ,
দেখিনি তো হেন পুনর্জ্জন্ম লাভ !

সম্ভ্রমে তারে ডাকিয়া বলিনু 'ফিরিতে হবে যে ত্বরা',
দীপের চক্ষু এখনো স্বপ্নভরা।
কহিল 'বন্ধু, অপেক্ষা কর, দেখ হয়ে সুস্থির,
আমার হস্তে গড়া এই মন্দির।
আমি করিয়াছি পাষাণের এই সূর্য্য অর্ঘ্য দান,
কালের পরশ করিতে নারিবে ম্লান।
গড়িয়া দেউল, লভেছিনু আমি সবিতার কাছে বর
—এখানে এলেই হইব জাতিস্মর।
হেরিয়া দেউল, ফিরিয়া পেলাম সেই যে মমতা প্রীতি,
মানসে জাগিছে জন্মান্তর স্মৃতি।
অর্কপুষ্প, বনঝাউ যেথা দুলিতেছে সমীরণে,
প্রথম দাঁড়ানু ওখানে, রয়েছে মনে।
প্রধান স্থপতি, প্রথম পাথর স্থাপিনু যখন আসি,
খণ্ড চন্দ্রে হেরিনু পৌর্ণমাসী।
সে কি আনন্দ, সে কি উচ্ছ্বাস, আমোদিত ভূভুব
চৌদিকে ধ্বনি 'আরম্ভ হোক শুভ'
বিপুল জনতা, ধ্বজা ও পতাকা, বাদ্য শঙ্খ রব,
মনে পড়ে সেই যজ্ঞ মহোৎসব।
গায়ত্রীকে যে আমি দেখিয়াছি হইতে মূর্ত্তিমতী।
সৃষ্টি আমার হইয়াছে শাশ্বতী।
এই বিটঙ্কে, কপোত কপোতী দু'জনে থাকিত বেশ,
মন্দির-গড়া তখনো হয় নি শেষ।
কণিক দিয়া পাষাণে পাষাণে এইখানে দিনু জোড়
দেখিনি, নৃপতি পার্শ্বে দাঁড়ায়ে মোর।
বিদায়ের দিনে এই দেহলীতে বাঁধিনু যন্ত্রপাতি
উত্তরায়ণে শেষ প্রস্তর গাঁথি।"

আমি নির্ব্বাক, বিমুগ্ধ মোরে করিয়াছে যাদুকর
যা দেখায় দেখি—অনিন্দ্য সুন্দর।
দীপ তেজোময়, সর্ব্ব অঙ্গে জ্যোতি, কি অপার্থিব,
কথায় আমি কি বর্ণনা তার দিব ?
হেরিনু তাহার সত্য মূর্ত্তি, শুনিনু সত্য ভাষ,
জন্মান্তর করি আমি বিশ্বাস।
আমার সঙ্গে দীপ গিয়াছিল বলিয়া ফেলিছি ভ্রমে
দীন গিয়াছিনু রাজেন্দ্রসঙ্গমে!

কবিতীর্থে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

স্কচেদের প্রিয় শহর এডিনবরা। ওঁরা বলেন, এ ত শহর নয়, এ আমাদের সুসজ্জিত নাট্যশালা! নিউইয়র্ক শহরের নাম রেখেছেন ওঁরা সিনেমা। উত্তর সাগরতীরের এই সুন্দর শহরটিকে প্রকৃতি আর মানুষ উভয়ে মিলে গড়ে তুলেছে। একদা এইখানে একটি পাহাড় ছিল। মানুষ তাকে 'কিল্লাদার শহর' বানিয়ে বসেছে। এডিনবরা শহর ও দুর্গ এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে সহজে বুঝা যায় না এটি পাহাড়ের উপর তৈরি হয়েছে, না পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে! পাহাড়ের ঢালু পিঠ, যা চূড়ার উপর থেকে গড়াতে গড়াতে সাগরের দিকে নেমেছে, কবে কোন্ যুগে স্কচেরা করেছিল সেখানে বসতি। গড়ে উঠেছে জনপদ। তৈরি হয়েছে সেখানে ফুলের বাগান—তাতে সুদৃশ্য চতুষ্কোণ, অষ্টকোণ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার কত রকমের কেয়ারি। এরই সামনে দিয়ে চলে গেছে দীর্ঘ সুবিস্তৃত রাজপথ। এডিনবরার গর্ব্বের ধন প্রিন্সেস ষ্ট্রীট!

অসম এই মানব-জীবনের যে ছন্দ, সে ছন্দের প্রধান মাত্রাই হ'ল বৈষম্য। বৈপরীত্যের মধ্যেই বেজে ওঠে আমাদের আনন্দের সবচেয়ে মধুর সুরগুলি। সরু মোটা তারের অসঙ্গতির মধ্যেই ঝঙ্কৃত হয় সঙ্গীতের ঝর্ণা। সুরের সপ্তগ্রাম এইখানেই। এডিনবরার নানাস্থানে নগরের রূপে এই বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে একটু বেশী। কোথাও বা সে রুক্ষ ধূসর, কোথাও বা স্নিগ্ধ শ্যামল। এই বৈচিত্র্যই এডিনবরার প্রধান আকর্ষণ। স্কচ মানুষগুলির প্রকৃতিও অবিকল তাদের দেশের মত। অর্থাৎ, কতকগুলি মানুষ অসহ্য গোঁয়ার, আবার কতকগুলি লোক একান্ত বিনীত ও ভদ্র। পুরাতন প্রচলিত রীতি-নীতির প্রতি এদের গতানুগতিক আনুগত্য যেমন, তেমনি আবার সৃষ্টিছাড়া পাগলা ক্ষ্যাপার দেশও এটা। এরা যেমন শান্ত স্থির, তেমনি আবার রূঢ় চপল! অনেক সময় একই লোকের মধ্যে এই দুই বিপরীত প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায়! সে আরও বিপদ! কাজেই এদের সঙ্গে বেশীদিন বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলা একটু কঠিন। এদের রুচি ও রসবোধ একাধারে রোমান্টিক আবার ক্লাসিক্যাল! বস্তুতান্ত্রিক অথচ ভাবধর্ম্মী! কোমলে কঠোরে গড়া সৃষ্টিছাড়া মানুষ এরা। কখনো এদের হৃদয়ে দেখা দেয় আমীরের মত উদারতা, কখনো কৃপণের মত সঙ্কীর্ণতা। আমরা দীর্ঘ এক পক্ষকাল অন্তরঙ্গের মত এদের সঙ্গে একত্র বসবাস করে এসেছি। অতিথিদের সম্পর্কে, বিশেষতঃ বিদেশী যারা, তাদের বেলায় এরা একেবারে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের অবতার। এদের মধ্যে কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীর অভাব নেই। ইংরেজরা যতই বলুক না স্কচেরা বেনিয়ার
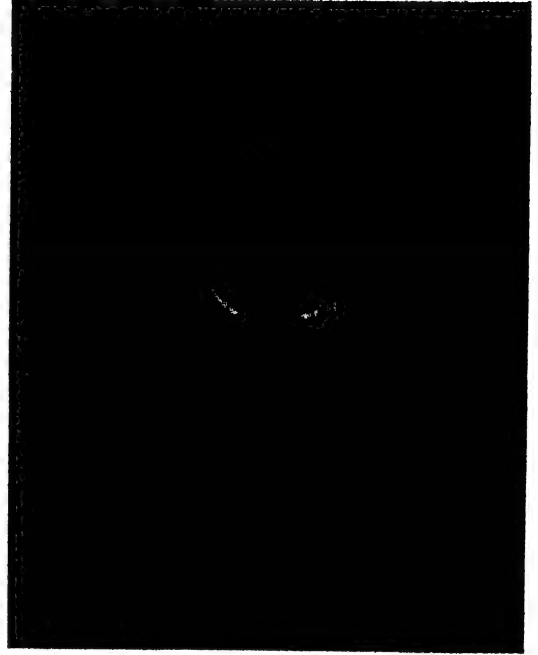
সার্ ওয়াল্টার স্কট

জাত; পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আমরা কিন্তু তা বলব না। কারণ আমরা ওদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কিছু বলবার মত কোনও ত্রুটি খুঁজে পাই নি, কেবল ওদের ঐ হাইল্যাণ্ডার স্কার্ট, কোমরে চামর দোলানো, মাথায় পালকের টুপী ইত্যাদি পোশাক মনে হয়েছে এ যুগে অচল! সেকালের জাতীয় পোশাকের প্রতি ইংরেজ-বিদ্বেষবশতঃ আজকাল ওদের মনে যে অহেতুক প্রীতির বান ডেকেছে তার একটুও প্রশংসা করতে পারছি না। এই বিংশ শতাব্দীতে এগুলোকে এখন ওদের শরীরের চেয়ে এডিনবরা মিউজিয়মের শো-কেসেই মানায় ভাল।

থাক্ ওদের পাহাড়িয়া জংলি পোশাক। যে কথা বলছিলাম। মানুষ তখনই পশুর পর্য্যায়ে গিয়ে পড়ে যখন তার সংস্কৃতি বলে কিছু থাকে না, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ থাকে না, রসসৃষ্টি ও রসোপভোগ থেকে যখন সে বঞ্চিত থাকে।

সুখের বিষয় স্কচেরা এর কোনটাই হারায় নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাচীন কবি ডান্‌বার থেকে সুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর সুরসিক কবি রবার্ট বার্নস এবং উনবিংশ শতাব্দীর কবি ও কথাশিল্পী রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন ও সার জেমস বারী

সার্ ওয়াল্টার স্কটের স্মৃতি-মন্দির
[এডিনবরা শহরে প্রিন্সেস গার্ডেনের মধ্যে]

পর্য্যন্ত সাহিত্যের আবহাওয়ায় স্কটলণ্ড ভরপুর ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর স্কচ সাহিত্য-আকাশের প্রদীপ্ত সূর্য্য—'সার ওয়াল্টার স্কট'। এঁর সম্বন্ধে লর্ড রোজবেরী একবার বলেছিলেন—"উভয় প্রদেশের শাসন-পরিষদের সংযোগের ফলে ইংলণ্ড এক দিন স্কটলণ্ডকে পেয়েছিল বটে, কিন্তু 'স্কটে'র অনুগ্রহে সমগ্র পৃথিবী আজ 'স্কটলণ্ড'কে পেয়েছে!"

এডিনবরার সবচেয়ে বড় ও সুদৃশ্য রাস্তা হ'ল প্রিন্সেস ষ্ট্রীট। লণ্ডনের পিকাডিলি বা কলকাতার চৌরঙ্গীর সঙ্গে এর তুলনা করলেও করা যেতে পারে। তবে কিনা লণ্ডন বা কলকাতা পার্ব্বত্য শহর নয়; এডিনবরা পার্ব্বত্য-নগরী। এর একধারে প্রাসাদোপম সব ঘরবাড়ী, বড় বড় দোকান, প্রসিদ্ধ সব হোটেল, আর একধারে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর একটি ফুলের বাগান,—প্রিন্সেস গার্ডেন্‌স—সেখানে অজস্র রঙীন ফুল ফুটে রাজপথটিকে যেন আলো করে রেখেছে। এই প্রিন্সেস ষ্ট্রীট বাগানের পূর্ব্বদিকে আর একটি ঘেরা পুষ্পোদ্যানের মধ্যে স্কচেরা তাদের সাহিত্য-সম্রাট্ সার ওয়াল্টার স্কটের একটি সুন্দর 'স্মৃতি-মন্দির' নির্ম্মাণ করে রেখেছে। এই স্মৃতি-মন্দিরটি দেখে মনটা খুশী হয়ে উঠল। হ্যাঁ, এরা স্কটলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবির প্রাপ্য মর্য্যাদার যথাযোগ্য স্মৃতি-মন্দিরই নির্ম্মাণ করেছে! দেখে মনে হয় যেন লোকান্তরিত কবির যশের চূড়াগুলি একে একে ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধতর লোকে উঠে চলেছে। দূর থেকে এটিকে যেন উপাসনা-মন্দিরের চূড়া বলেই মনে হয়। কারণ সেই রকম মন্দিরের ধরণেই এটি তৈরি হয়েছে। তিন পেনি মাত্র দক্ষিণা দিয়ে এটি দর্শন করতে হয়। দেখতে দেখতে ভাবছিলাম—কলকাতার লোয়ার সারকুলার রোড সিমেট্রিতে মহাকবি মাইকেলের যে দুঃখীর ন্যায় এতটুকু একটি 'স্মৃতিমঠ' করা হয়েছে সে কি প্রচণ্ড প্রতিভাধর মধুসূদনের যোগ্য স্মরণিকা? "দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম তব যদি বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল"—এত বড় অনুরোধ করবার অধিকার কি সেই অতি ক্ষুদ্র স্মৃতিস্তম্ভটির আছে? ওকে ভেঙে গড়তে হবে—মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের যোগ্য স্মৃতি-মন্দির করে। রবীন্দ্রনাথের নিমতলা শ্মশানঘাটের ভস্মাবশেষ চিতার মাটি লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা আছে বটে, কিন্তু শরৎ চন্দ্রের কেওড়াতলা শ্মশানের চিতা হারিয়ে গিয়েছে। এর কোনটিতেই আজ পর্য্যন্ত একখানি ইটও গাঁথা হয় নি। কোনও স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টাও দেখা যাচ্ছে না।

আজ থেকে একশ' আশী বছর আগে এক দিন এই সুন্দর এডিনবরা শহরেই স্কটের জন্ম হয়েছিল। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট তিনি পৃথিবীতে এসে প্রথম আলোর দিকে চোখ মেলেছিলেন। পিতা ওয়াল্টার স্কট ছিলেন সরকারী রেজেষ্ট্রী আপিসের আইন-কর্ম্মচারী। মাতা এনী রাদারফোর্ড ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ জন রাদারফোর্ডের কন্যা। সুতরাং তিনি যে পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই ছিলেন সদ্বংশ-সম্ভূত ও অভিজাত একথা বলাই বাহুল্য।

আঠারো মাসের শিশু। দাঁত উঠছে না। বাপ-মা কাতর। ছেলে কেবলই জ্বরে ভুগছে। শেষে দেখা গেল, শিশু ওয়াল্টারের ডান পা-টি অবশ হয়ে গেছে। তিন বছর বয়সে তাঁকে পাঠানো হ'ল স্যাণ্ডিনোয় তাঁর ঠাকুরদাদার কাছে। এইখানেই প্রথম শিশু ওয়াল্টার আবৃত্তি করতে শিখলেন স্কটলণ্ডের গ্রাম্য ছড়া, লোকসঙ্গীত ও গাথা।

আট বছর বয়সে বালক ওয়াল্টারকে নিয়ে যাওয়া হ'ল প্রেস্টনপ্যান্সে। এইখানে তাঁর পরিচয় হয় লোকগাথা বিষয়ে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ডালগেটি এবং জর্জ্জ কন্স্টেবলের সঙ্গে। এঁদের কাছে তিনি অনেক কিছু নতুন ছড়া শেখেন এবং সেই কিশোর বয়সেই নিজেও কিছু কিছু গাথা রচনা করতে সুরু করেন।

এডিনবরা হাইস্কুলে পড়বার জন্য তিনি যখন আবার এডিনবরায় ফিরে এলেন তখন তাঁর বয়স সবে ন'বছর পূর্ণ হয়েছে। এই অল্প বয়সেই তিনি স্কুলের রেক্টর অধ্যাপক এডামের কাছে কিছু কিছু লাটিন ভাষা শিখেছিলেন। বালকের মধ্যে যে কাব্যপ্রতিভা ছিল, অন্ধকবি ও শিক্ষক ডঃ ব্ল্যাকলক্ তা আবিষ্কার করে তাঁকে কবিতা-রচনার প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই সময় স্কটলণ্ডের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ কবি বার্নসের সঙ্গে বালক স্কটের যে স্মরণীয় সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, তা আজ এক ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

সার ওয়াল্টার স্কটের এবট্‌সফোর্ড প্রাসাদ
[টুইড নদীর তীর থেকে ছবির মত দেখায়]

এডিনবরা হাইস্কুলে স্কট তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ করে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়েই উচ্চশিক্ষার জন্য প্রবেশ করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভাষা বা সাহিত্য কোনটাতেই তেমন মনোযোগ দিতে পারেন নি। লাটিন শেখা তাঁর অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধান থাকা সত্ত্বেও তিনি গ্রীক-ভাষা শিখতে কিছুতেই রাজী হলেন না। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে পনেরো বছর বয়সে স্কট এসে ঢুকলেন তাঁর বাবার আপিসে। অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রমের সঙ্গে তিনি স্কটলণ্ডের আইন-বিদ্যা অধিগত করে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে আদালতে ব্যবহারজীবীরূপে প্রবেশ করলেন।

আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারেই তাঁকে এই সময় একবার উত্তর স্কটলণ্ড অর্থাৎ হাইল্যাণ্ড অঞ্চলে যেতে হয়। ইনভার্ণেহাইল তাঁর অপরিচিত ছিল না। এইবার তরুণ স্কটের জীবনে হ'ল রোমান্সের আবির্ভাব। শুষ্ক আইনের বিধান তাঁর কবিমানসকে নীরস করে তুলতে পারে নি। তিনি লেডি লুইসা মার্গারেট ষ্টুয়ার্টকে হৃদয় উজাড় করে ভালবেসে ফেললেন। যদিও এই বিদুষী রসিকা রূপসীকে তিনি পত্নী রূপে গৃহে আনতে পারেন নি, কিন্তু মানসলোকের রস-সঙ্গিনী রূপে পেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই নারীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অটুট ছিল। স্কটের সাহিত্য-জীবনের প্রকৃত প্রাণরসায়ণ ছিল এই সুন্দরী মার্গারিটার লেখা সুন্দরতম সরস লিপিগুলি।
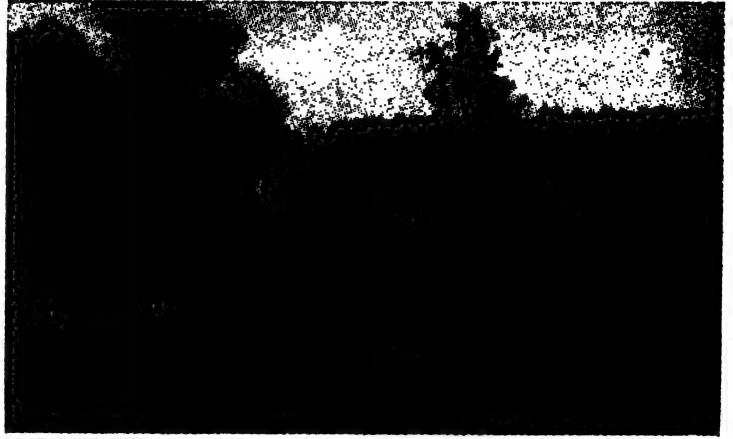
১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কটের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রচনাগুলি ছিল লোকগাথারই ছন্দোবদ্ধ মার্জ্জিত রূপ। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কবির বয়স যখন ছাব্বিশ বছর, হঠাৎ তাঁর সখ হ'ল স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক হবার। সারা বসন্তকালটা তিনি অশ্বারোহী সৈনিকের কুচকাওয়াজ নিয়েই কাটিয়ে দিলেন। এই সময় তাঁর *Black Dwarf* নামে খ্যাত ডেভিড রিটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। তার পর টুইডেল থেকে কবি ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হন গিল্‌সল্যাণ্ডে। এইখানেই তরুণ কবি প্রথম দর্শনেই দেখে মুগ্ধ হলেন কুমারী শার্লোটি মার্গারেট কার্পেনটার বা শাপেতিয়াঁকে। ইনি একটি রূপসী বিদুষী ফরাসী মেয়ে। এর পিতা ছিলেন ইংলণ্ড-প্রবাসী একজন ফরাসী। এই বছরেই অর্থাৎ ঐ ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের অধিবাস রাত্রে কার্লাইলের এক গীর্জ্জায় সেই ফরাসী মেয়েটিকে তিনি বিবাহ করে ফেললেন।

মধুচন্দ্র যাপন করতে নববধূকে নিয়ে কবি গেলেন লিণ্ডস্‌-ডেলে। এখানে তাঁর পৈতৃক জমিদারী। পিতার দেওয়া ছোট্ট টাট্টু ঘোড়াটি চড়ে প্রায়ই তিনি এখানে বেড়াতে আসতেন। প্রাচীন গ্রাম্যগাথা বা ব্যালাড সংগ্রহের জন্যও ইতিপূর্ব্বে একবার এখানে এসে কিছুদিন ছিলেন। এবার ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিবাহের পর থেকে স্কট এই সময় প্রতি বৎসর এখানে সস্ত্রীক আসতে সুরু করেন। এই অবকাশে বহু গ্রাম্যগাথা, লোক-সঙ্গীত, পল্লীকাহিনী ও কিংবদন্তী ইত্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন

এবট্‌সফোর্ড প্রাসাদ [উদ্যানের দিক থেকে]

কোনদিনই স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারেন নি। এই দুর্ঘটনার পর তিনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরা ত্যাগ করে এশেষ্টিলে গিয়ে বাস করেন। এশেষ্টিল টুইড নদীকূলের একটি ছোট্ট গ্রাম। এই টুইড নদীটি কিন্তু নেহাৎ ছোট নয়। প্রায় একানব্বুই মাইল লম্বা। স্কটলণ্ডকে ইংলণ্ডের সীমান্ত থেকে পৃথক করে রেখেছে এই টুইড নদী।

এখান থেকে কবি 'এডিনবরা রিভিয়ু' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি পাঠাতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ 'ওয়েভার্লি নভেল্‌স' এই সময় তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাধীন ব্যবহার-জীবীর পেশা ত্যাগ করে দায়রা আদালতের বেতনভোগী আইনজ্ঞের কাজে যোগ দেন। কারণ ওকালতী কাজটা তাঁর সাহিত্য-সাধনার পক্ষে বাধা হয়ে উঠেছিল। এরই ঠিক দু'বছর পরে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁর 'মর্ম্মিয়ন' বইখানি প্রকাশিত হ'ল তখন স্কটের খ্যাতি বেড়ে গেল। কিন্তু লর্ড ফ্রান্সিস জেফরি, তদানীন্তন একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক তাঁর 'এডিনবরা রিভিয়ু' পত্রিকায় বেশ একটু বক্রোক্তি করায় এবং 'এডিনবরা রিভিয়ু' পত্রিকা এই সময় আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ও গণতন্ত্রের সমর্থক হয়ে ওঠায়, তিনি ঐ পত্রিকার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেই 'এডিনবরা কোয়ার্টার্লি' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করতে সুরু করেন। এই সময় তাঁর সম্পাদনায় 'ড্রাইডেন', 'সুইফট' প্রভৃতি ক্লাসিক রচনাবলী প্রকাশিত হতে থাকে।

তিনি। নানা চরিত্রও অধ্যয়ন করেছিলেন জানা যায়। এম্‌. জি. লুইস্‌ এই সময় একখানি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর অনুরোধে স্কট এই গ্রন্থের জন্য 'গ্লেন্‌ফিন্‌লাস' এবং 'ঈভ অফ সেণ্ট জন' এই রচনা দুটি লিখেছেন এবং জার্ম্মান মহাকবি গ্যেটেরও একটি রচনা অনুবাদ করে দিয়েছিলেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে স্কটিশ কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা সার্‌ ওয়াল্টার মেলকার্কশায়ারের শেরিফ নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন 'কেলসো'য় ছিলেন তখন পুস্তক-ব্যবসায়ী জেম্‌স ব্যালাণ্টাইন তাঁর কাছে এসে তাঁর রচিত একখানি বই প্রকাশ করবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তারই ফলে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আর একখানি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—*The Border Minstrelsy*। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিযশ ছড়িয়ে পড়ে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে; যখন তাঁর *The Lay of the Last Minstrel* বইখানি প্রকাশিত হ'ল। এই গ্রন্থ স্কটকে সেদিন সর্ব্বজনপ্রিয় লেখক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিলে। স্কটের বয়স তখন মাত্র ৩৪ বৎসর। যৌবনের জয়পতাকা পূর্ণ তেজে উড়ছে।

কিন্তু নিদারুণ এক আর্থিক বিপর্যয় এসে কবিকে এই সময় একেবারে নিঃস্ব করে ছেড়ে দিলে। তাঁর দুই প্রকাশক—ব্যালাণ্টাইন ও কন্‌স্টেবল যাঁদের উপর বিশ্বাস করে তিনি ঘর থেকে টাকা বার করে দিয়ে এঁদের ব্যবসায়ের অংশীদার হয়েছিলেন, তাঁরা দু'জনেই নিজেদের অব্যবসায়ীর ন্যায় আচরণের ফলে কারবারে ফেল হলেন। স্কট ছিলেন কবি। ব্যবসাবুদ্ধি তাঁর একেবারেই ছিল না। বিষয়বুদ্ধিও ততোধিক শোচনীয়। কাজেই আর্থিক ব্যাপারে তিনি

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে স্কটের *Lady of the Lake* (সরঃসুন্দরী) গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বখ্যাতি অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্কট এই সময় গ্রেট ব্রিটেনের পশ্চিমাঞ্চলের দ্বীপাবলী পরিভ্রমণে যান। এখানে এসে তাঁর খেয়াল হয় 'লর্ড অফ দি আইলস্‌' নামে 'লেডি অফ দি লেক'-এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর একখানি গ্রন্থ রচনা করবেন। কল্পনানুযায়ী একটি খসড়াও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সে বই আর তখন লেখা হয় নি। কারণ ওখান থেকে ফিরেই তিনি এবটস্‌ফোর্ডে খানিকটা আবাদী জমি কেনেন কৃষিক্ষেত্র করবার জন্য। এই জমির উপর একখানি ছোট কুটির ছিল। কবি সর্ব্বপ্রথম এই কুটিরখানির সংস্কারে মন দিলেন। এই হ'ল তাঁর কাল। কবির খেয়ালে সেই কুটির হয়ে উঠল 'এবটস্‌ফোর্ড প্রাসাদ' যা বহু রাজপ্রাসাদকেও লজ্জা দিতে পারে! এই প্রাসাদ নির্ম্মাণে তাঁর

যথাসর্বস্ব ব্যয় হয়ে গিয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে স্কটের *Rokeby* প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটি তাঁর ব্যর্থ রচনা বলেই গণ্য হয়েছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজদরবার থেকে তাঁকে 'Poet Laureate' বা রাজকবির সম্মানে ভূষিত করবার প্রস্তাব আসে। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক কবিবন্ধু রবার্ট সাদে এ পদের একজন প্রার্থী জেনে তিনি সাদের অনুকূলে 'লরিয়েট' হবার রাজ-আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেন। স্কট ছিলেন প্রকৃত শিল্পী। রাজসম্মান তাঁর কাছে বন্ধুপ্রীতির চেয়ে বড় বলে মনে হয় নি।

সার্ ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থাগার

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্কটের "লাইফ অফ সুইফ্‌ট" রচনাটি সমাপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয় তাঁর বেনামী রচনা 'ওয়েভার্লি'। স্কটের এই 'ওয়েভার্লি' উপন্যাস প্রকাশ হবামাত্র বিশ্বে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু যশ-নির্লোভ কবি নিজেকে এ গ্রন্থের রচয়িতা বলে কিছুতেই প্রকাশ করেন নি। এর কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি বলেছিলেন, "ওয়েভার্লি" লেখবার সময় আমি যে প্রেরণা পেয়েছিলাম, পরবর্তী রচনায় যদি সে শক্তি না থাকে তা হলে ভাল বই লেখা আর আমার দ্বারা সম্ভব হবে না যে! হয়ত লেখাই ছেড়ে দিতে হবে। আমি অভাবের তাড়নায় উপন্যাস লিখি, নিজের আগ্রহে নয়। আমি 'ঔপন্যাসিক' নামে পরিচিত হতে চাই না!" কবির বয়স এ সময় চুয়াল্লিশ হয়েছিল। যৌবন-সীমান্ত উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রৌঢ়ত্বের রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু ওয়েভার্লির এই অপ্রত্যাশিত বিশ্বজয় সহসা যেন তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছিল যৌবনের অমিত উদ্যম ও উৎসাহ! ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে পর পর প্রকাশিত হয় তাঁর সেই *Lord of the Isles* (দ্বীপেশ) *Guy Mannering* উপন্যাস এবং *Antiquary* শীর্ষক গ্রন্থখানি।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর নিজের এই ভীষণ অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর রচনার যে এতটুকু স্বাস্থ্যহানি ঘটে নি তার প্রমাণ পাই আমরা কবির এই সময়ে প্রকাশিত *Rob Roy* এবং *The Heart of Midlothian* গ্রন্থ দুটি থেকে। এর পর মাত্র দুটি বছর যেতে না যেতেই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কবি পুনরায় সাংঘাতিক পীড়িত হয়ে পড়েন। এবার তাঁর জীবনসঙ্কট বলেই মনে হয়েছিল। এই অসুস্থতার মধ্যেও রোগযন্ত্রণায় কাতর কবি শয্যাশায়ী অবস্থাতেই মুখে মুখে বলে লিখিয়েছিলেন তাঁর অমর গ্রন্থ *The Bride of Lammer Moor*।
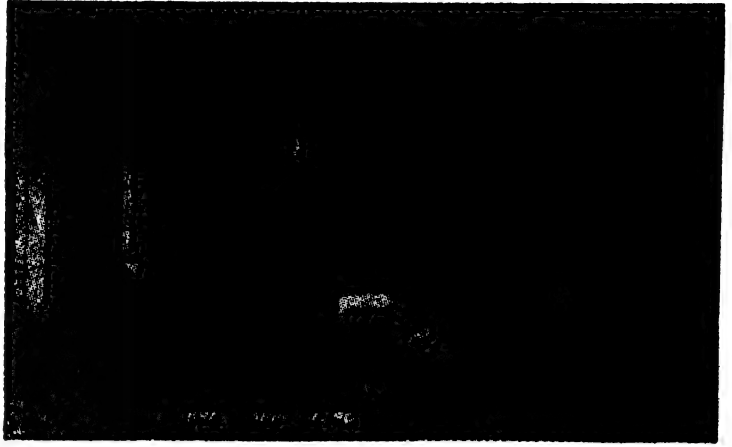
এরপর ভগবানের দয়ায় তিনি কতকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। শরীর যদিও সম্পূর্ণ সারে নি, কিন্তু রচনাশক্তি তাঁর একটুও ক্ষুন্ন হয় নি। এই সময় যখন প্রকাশিত হ'ল 'আইভান হো' তখন আবার রসবেত্তা পাঠক-সমাজের এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্মম সমালোচকদের মুখেও স্কটের জয়ধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *The Monastary* কাউকে তেমন খুশী করতে পারে নি। এই বছরই রাজদরবার থেকে তাঁকে ব্যারনেটের সম্মানে ও উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এখন থেকে তিনি সার্ ওয়াল্টার স্কট নামে অভিহিত হতে থাকেন। কবির উপর এই রাজ-উপাধি বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কবির লেখনীতেও যেন বর্ষণের বন্যা দেখা দেয়। এর পর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর *The Abbot*, *Kenilworth*, *The Pirate*, *The Fortune of Nigel*, *Peveril of the Peak*, *Quentin Durward*, *Red Gauntlet* প্রভৃতি গ্রন্থরাজি। ১৮২০ থেকে ১৮২৪ মাত্র এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি আটখানি বেশ বড় বড় উপন্যাস লিখে ফেলেন। তিনি স্বীকার করে গেছেন তাঁর এবটস্‌ফোর্ড প্রাসাদ রক্ষা করবার জন্য এবং ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ফলে স্কন্ধে চাপা ঋণের বোঝা পরিশোধ করবার জন্য তাঁকে দিবারাত্র কলম চালাতে হয়েছে। সখ করে নয়।

খ্যাতির বিপত্তির সঙ্গে উপাধির মর্য্যাদা সংযুক্ত হওয়ার পর থেকে সমাজের উচ্চ স্তরের ভক্তসম্প্রদায় দেশ-বিদেশ থেকে দলে দলে ছুটে আসতে সুরু করেছিলেন কবির 'এবটস্‌ফোর্ড প্রাসাদে' তাঁকে দর্শন করতে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে,

সার্ ওয়াল্টার স্কটের লেখাপড়ার ঘর

তাঁর হাতের লেখা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে। এঁরা কিন্তু কবির একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধনার কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মাতে পারেন নি। এমন কি নানা সামাজিক কর্ত্তব্য পালনেও তাঁকে কোনও দিন অবহেলা প্রদর্শন করতে দেখা যায় নি। নৃপতি চতুর্থ জর্জ্জ যখন স্কটলণ্ডে পদার্পণ করেন তখন এডিনবরায় উপস্থিত থেকে তিনি রাজ-অভ্যর্থনার বিপুল সমারোহ নিপুণভাবেই সম্পন্ন করেন। তিনি সেল্‌কার্কের আদালতে নিয়মিত এসে মামলার বিচার করতেন। 'স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যবাহিনী' গঠনের কাজে তাঁকে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে দেখা গেছে। প্রতিদিন তিনি অগণিত চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন। সার্ ওয়াল্টার স্কটকে পত্র লিখে উত্তর পায় নি এ অভিযোগ করবার সুযোগ তিনি কাউকে দেন নি। এ গুণটি আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও তাঁকে পত্র লিখলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেত। সার্ ওয়াল্টারের হৃদয় ছিল অতি কোমল। দরিদ্রের প্রতি তাঁর করুণা ছিল অসীম। হাতে টাকা থাকলে তিনি প্রার্থীকে কখনও বিমুখ করতেন না।

উপন্যাস-রচনা তাঁর কোনদিনই বন্ধ ছিল না, উপরন্তু তিনি মহাবীর নেপোলিয়নের জীবনী রচনা করতেও সুরু করেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর *Journal* প্রকাশ হতে আরম্ভ হয়। *Woodstock* রচনা করবার সময় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার ব্যবসার বাজার ভেঙে পড়ে এবং আর পাঁচ জনের মত স্কটও এ ব্যাপারে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু নীলকণ্ঠ শিবের মত ঋণভারের জটা শিরে নিয়ে তিনি অবিকৃত চিত্তে সে ক্ষতির বিষ পরিপাক করেন। এখন থেকে তিনি পদাধিকার সংক্রান্ত জনসেবার কাজ ছাড়া তাঁর অবশিষ্ট সমস্ত সময়টুকু সাহিত্যরচনার কাজেই নিয়োগ করেন। এই দীর্ঘকালীন কঠিন পরিশ্রমের ফলে শেষ পর্য্যন্ত কবি তাঁর ঋণদায় থেকে মুক্তিলাভ করতে পেরেছিলেন, তবে সে মুক্তি তাঁর জীবদ্দশায় অবশ্য সম্পূর্ণরূপে ঘটে নি। তাঁর আত্মাও সেই সঙ্গে দেহমুক্ত হয়েছিল।

শেষজীবনে কবি খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পত্নীবিয়োগের বেদনায় কবি যখন একান্ত কাতর সেই সময় প্রকাশকের কাছ থেকে *Count Robert of Paris* বইখানির পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনায় অমনোনীত হয়ে ফেরত এল। এ আঘাত কবিকে একেবারে বিকল করে দিলে। এর উপর আবার এই সময় জেডবরার র‍্যাডিক্যাল মতাবলম্বী উচ্ছৃঙ্খল দল কবিকে এত বেশী অবমাননা বর্ষণ করতে সুরু করে যে দুঃসহবোধে কবি দেশ ছেড়ে ভূমধ্যসাগরে সমুদ্রবিহারে চলে যান। কিন্তু এত দুর্যোগের মধ্যেও সাহিত্যসেবা তিনি ছাড়তে পারেন নি। *The Siege of Malta* গ্রন্থখানি তিনি এই সময় রচনা করতে সুরু করেন।

কবি গৃহে ফিরে এলেন যেন মৃত্যুকে বরণ করবার জন্যই। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর স্কটলণ্ডের এই বিরাট প্রতিভাধর কবি, এবটসফোর্ডের সাহিত্য-সূর্য্য অস্তমিত হন। ড্রাইবার্গ এবি উপাসনা-মন্দিরের সমাধিক্ষেত্রে অমর কবির নশ্বরদেহ সমাহিত করা হয়।

কবির দেহান্তের অষ্টাদশাধিক শত বৎসর পরে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তের এক নগণ্য কবি-দম্পতি গিয়েছিল সেই সুদূর স্কটলণ্ডের এবটস্‌ফোর্ড কবিতীর্থে সার্ ওয়াল্টার স্কটের চরণধূলিপূত গৃহ-প্রাঙ্গণে তাদের শ্রদ্ধার প্রণাম-অর্ঘ্যখানি রেখে আসতে। ১৯৫০ সন। আগষ্ট মাসের শেষের সপ্তাহ। এডিনবরায় বসেছে সাহিত্যের রাজসূয় যজ্ঞ—'ইণ্টারন্যাশনাল পেন-কংগ্রেস'। পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সাহিত্যিকেরাই সমবেত হয়েছিলেন এখানে। ভারতের প্রতিনিধিরূপে আমরাও উপস্থিত ছিলাম এই বিশ্ব-লেখক-মহাসম্মেলনে। স্কটিশ পি-ই-এন সেণ্টারের কর্ত্তৃপক্ষ যাঁরা এডিনবরায় এই সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন, তাঁরা এক দিন আমাদের সকলকে নিয়ে গেলেন এবটস্‌ফোর্ডে এই কবিতীর্থ দেখিয়ে আনতে।

যথার্থ ই দেখলাম সে এক বিরাট প্রাসাদ। নদী হ্রদ ও পর্ব্বত পরিবেষ্টিত নিবিড় কাননভূমির মধ্যে ছবির মত এই

ঈলডন শৈলমালা [সার্ ওয়াল্টার এবট্‌স্‌ফোর্ড প্রাসাদের অলিন্দ থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধনেত্রে এই দৃশ্য দেখতেন]

কবির বাড়ী। প্রাসাদের মধ্যস্থলের স্থাপত্যকৌশল 'গথিক হলে'র অনুকরণে প্রস্তুত। তা ছাড়া, কবি তাঁর দেশ-ভ্রমণকালে যেখানে যেটি ভাল দেখেছিলেন তাঁর সাধের এবটস্‌ফোর্ড প্রাসাদে সেগুলি সবই প্রায় নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন : যেমন, প্রবেশদ্বার তৈরি হয়েছিল প্রাচীন এডিনবরা নগরের তোরণদ্বারের অনুকরণে। লক লেভেন ক্যাসেলের অনুকরণেও অনেককিছু করেছিলেন। কত লক্ষ টাকা যে কবি এর পিছনে ব্যয় করেন তা বলা যায় না। তবে এটা ঠিক যে, কবির পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকাই এই বাড়ীখানি গ্রাস করেছিল। শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁর সমস্ত গ্রন্থের স্বত্ব উত্তমর্ণদের নামে লিখে দিয়ে এবং মাসে মাসে কিস্তিবন্দী হিসাবে তাঁদের বাকী পাওনাটুকু পরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তবে এবটস্‌ফোর্ড প্রাসাদ রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

মানুষের বিপদ কখনও একা আসে না। স্কটের এই বিপন্ন অবস্থার মধ্যেই প্রচণ্ড শক্তিশালী সাহিত্য-সমালোচক কার্লাইল স্কটের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা-প্রসঙ্গে অত্যন্ত কঠোর ও নির্ম্মম ভাবে লিখে চলেছিলেন—"স্কটের রচনায় কোনও সঙ্গতি নেই, কোনও ধারাবাহিক পারম্পর্য্য রক্ষিত হয় নি। তাঁর রচনার মধ্যে কোনও সজীব বা প্রাণবন্ত জীবনের স্পন্দন নেই। তাঁকে কোনও কারণে প্রথম শ্রেণীর একজন অসাধারণ লেখকের সম্মান দেওয়া চলে না। তাঁর যা কিছু কল্পনা তা এই মাটির পৃথিবীর বাস্তব সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। জগতে যা কিছু স্থূল ও প্রত্যক্ষগোচর তারই সৌন্দর্য্যটুকু তিনি প্রকাশ করতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁর রসানুভূতি কোথাও সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়লোকে পৌঁছতে পারে নি। প্রতিভা, মেধা, মনীষা যাই বলুন না কেন, স্কটের সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই অধ্যাত্মলোকে কোনদিনই পৌঁছতে পারেন নি, যেখানে পরমানন্দ-সাগরে আত্মার বিহার ঘটে। স্কটের কাছে সে তত্ত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।"

কার্লাইলের সমালোচনা সেইদিন সাহিত্য-জগতে একটা আলোড়ন তুলেছিল বটে, কিন্তু বিরাট প্রতিভাধর স্কটের কোনও ক্ষতি করতে পারে নি। তিনি ছিলেন গভীর দেশপ্রেমিক। জন্মভূমি স্কটলণ্ডকে ভালবাসতেন প্রাণের অধিক। তাঁর রচনা স্কটলণ্ডকে সেদিন জগতের চক্ষে মহনীয় করে তুলেছিল। এইখানেই কবির জীবনের সার্থকতা।

আমরা গভীর শ্রদ্ধানত চিত্তে এই কবিতীর্থে প্রবেশ করলাম। সার্ ওয়াল্টার স্কটের পৌত্র দ্বিতলের সিঁড়ির মুখে তাঁর কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ইনি বিপত্নীক। একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ। এঁর নাম মেজর জেনারেল সার্ ওয়াল্টার ম্যাক্সওয়েল স্কট সি-বি-ডি-এস-ও, ডি-এস্-সি। ইনি আমাদের আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর মহান্ পিতামহের তীর্থতুল্য আলয়ে। আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে তাঁর বিদুষী ও রূপসী কন্যা ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলেন—সার্ ওয়াল্টার স্কটের ড্রয়িংরুম ও লাইব্রেরী। দুটিই বেশ প্রশস্ত বড় ঘর। সার্ ওয়াল্টার যে ঘরে বসে লেখাপড়া করতেন, তাঁর টেবিল চেয়ার, দোয়াত কলম, বুক-কেস, তাঁর ডায়েরী, হিসাবের খাতা, চিঠিপত্র সমস্ত সযত্নে মিউজিয়মের মত রাখা হয়েছে। তাঁর শয়নঘর, ভোজনাগার, কবির ব্যবহৃত কত দ্রব্যাদি সমস্তই এখানে পবিত্র দেবোত্তর সম্পত্তির মত সুব্যবস্থায় সংরক্ষিত।

সার্ ওয়াল্টার স্কটের লেখাপড়ার ঘরখানি দেখাতে দেখাতে তাঁর পৌত্র ম্যাক্সওয়েল স্কট প্রসঙ্গতঃ আমাদের বলেছিলেন, "আমার পিতামহ তাঁর এই পড়ার ঘরের এক কোণে টেবিলে বসে লেখনী চালনা করে পৃথিবীতে অমর হয়ে গেছেন। আর, আমি, তাঁর অযোগ্য বংশধর, এতকাল মৃত্যুকে তুচ্ছ করে কত দেশ-বিদেশে ছুটে গিয়ে অসিচালনা করেছি, কিন্তু অমরত্ব অর্জন করা দূরে থাক্—আমার নামও কেউ জানে না। 'Pen is mightier than sword' একথা আর কেউ
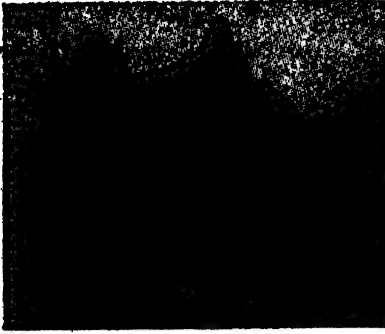
ড্রাইবার্গ এবের মধ্যে সার্ ওয়াল্টার স্কটের সমাধি

স্বীকার করুক বা নাই করুক, আমি তা করতে বাধ্য।"

তার পর তিনি আমাদের একটি ছোট বারান্দায় নিয়ে গিয়ে দেখালেন, এইখানে কবি নিত্য বসে দেখতেন ঐ এবটস্‌ফোর্ডের দিগন্তে ঈলডন পাহাড় চূড়ার অন্তরালে সূর্য্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য। কবির স্বহস্তে রচিত উদ্যানে এলম্ ও পাইনের যে চারাগুলি শৈশব থেকে যৌবনের তেজে বেড়ে উঠেছিল, তারই শাখাপল্লবকিশলয়ের ফাঁকে ফাঁকে নৃত্যতরঙ্গিণী টুইড নদীর স্নিগ্ধ শুভ্রোজ্জ্বল প্রবাহ চোখে পড়ে। নেপল্‌স থেকে ফিরে এসে পর্য্যন্ত অসুস্থ কবি এইখানে দীর্ঘক্ষণ বসে প্রকৃতির শান্ত সুন্দর রূপের মধ্যে আত্মসমাহিত হয়ে পড়তেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে কি জানি কি প্রেরণার কি রচনা করে যাবার তাগিদে তিনি একবার তাঁর কলমটি হাতে নিয়ে টেবিলে বসেছিলেন। কিন্তু কিছুই লেখা হ'ল না। এবটসফোর্ডের পার্ব্বত্য বনভূমির দিকে নির্নিমেষ নয়নে নিশ্চল হয়ে চেয়ে রইলেন। বোধ করি তাঁর স্বর্গগতা প্রিয়তমার কথা ভাবছিলেন। কখন যে তাঁর অজ্ঞাতসারে হাত থেকে কলমটি খসে পড়ে গিয়েছিল কবি তা টের পান নি। তাঁর দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণা সেবিকা কবিকে সযত্নে তুলে এনে শয্যায় শুইয়ে দিলেন। কবির শেষ কথা—"বড় ঘুম পাচ্ছে।"

কবির সে ঘুম আর ভাঙে নি। এবটস্‌ফোর্ড থেকে মাত্র এক মাইল দূরে তাঁর মাতামহবংশের দান 'ড্রাইবার্গ এবে'তে কবির সমাধি দেখে এলাম। বীমারসাইড পাহাড়ের আড়ালে তখন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল। কবির সমাধিশিয়রে দাঁড়িয়ে মনে পড়ছিল তাঁর হৃদয়ের মহত্ত্ব, তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেম, তাঁর বাৎসল্যরসাভিষিক্ত স্নেহপ্রবণ হৃদয়, তার মধুর স্বভাব যা তাঁর আশ্চর্য্য প্রতিভাকে জ্যোতির্ম্ময় করে তুলেছিল। এই মহাপ্রাণ কবির উদ্দেশে আমাদের প্রণাম জানিয়ে আমরা সান্ধ্যভোজের আগেই এডিনবরায় ফিরে এলাম।

ভাদরে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রজনীগন্ধার গন্ধ আর্দ্র সমীরণে
ভেসে আসে। একটানা ঝিঁঝির আওয়াজ
আঁধারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ভাদ্রের গগনে
মেঘেদের গুরু গুরু বাজে পাখোয়াজ।
নাহি তারা, নাহি চন্দ্র, নাহিকো তপন;
অন্ধকার-সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার
দিকে দিকে। মুখোমুখি আমি আর মন
চুপ ক'রে বসে আছি,—কেহ নাহি আর।

ভালো লাগে এ আঁধার, এই সুমধুর
পুষ্পের সৌরভে পূর্ণ সুস্নিগ্ধ বাতাস;
ভালো লাগে ঝিঁঝির এ একটানা সুর;
ভালো লাগে মেঘালো এ রাতের আকাশ।
দিবসের কর্ম্ম আনে চিত্তের বিক্ষেপ;
রাত্রি আনে মর্ম্মে স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপ।

চিত্রচোর

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১০

বড়দিন আসিয়া চলিয়া গিয়াছে; নববর্ষ সমাগতপ্রায়। এখানে বড়দিন ও নববর্ষের উৎসবে বিশেষ হৈ চৈ হয় না, সাহেব-মেমেরা হুইস্কি খাইয়া একটু বেশী নাচানাচি করে এই পর্য্যন্ত।

এ কয়দিনে নূতন কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। মালতী দেবীর রোগ ভালর দিকেই আসিতেছিল; কিন্তু তিনি একটু সংবিৎ পাইয়া দেখিলেন ঘরে যুবতী নার্স রহিয়াছে। অমনি তাঁহার ষষ্ঠ রিপু প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি গালাগালি দিয়া নার্সকে তাড়াইয়া দিলেন। ফলে অবস্থা আবার যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে, অধ্যাপক সোম একা হিম্‌সিম্ খাইতেছেন।

শনিবার ৩০শে ডিসেম্বর সকালবেলা ব্যোমকেশ বলিল, 'চল আজ একটু রোঁদে বেরুনো যাক।'

রিক্সা চড়িয়া বাহির হইলাম।

প্রথমে উপস্থিত হইলাম নকুলেশ বাবুর ফটোগ্রাফির দোকানে। নীচে দোকান, উপর তলায় নকুলেশ বাবুর বাসস্থান। তিনি উপরে ছিলেন, আমাদের দেখিয়া যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল তিনি বাঁধা-ছাঁদা করিতেছিলেন; কাষ্ঠ হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন—ছবি তোলাবেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন নয়। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম আপনার দোকানটা দেখে যাই।'

নকুলেশ বাবু বলিলেন, 'বেশ বেশ। আমি কিন্তু ভাল ছবি তুলি। এখানকার কেষ্ট-বিষ্টু সকলেই আমাকে দিয়ে ছবি তুলিয়েছেন। এই দেখুন না।'

ঘরের দেয়ালে অনেকগুলি ছবি টাঙানো রহিয়াছে; তন্মধ্যে চেনা লোক মহীধর বাবু এবং অধ্যাপক সোম। ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, 'বাঃ, বেশ ছবি। আপনি দেখছি একজন সত্যিকারের শিল্পী।'

নকুলেশ বাবু খুশী হইয়া বলিলেন, 'হেঁ হেঁ। ওরে লালু, পাশের দোকান থেকে দু' পেয়ালা চা নিয়ে আয়।'

'চায়ের দরকার নেই, আমরা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছি। আপনি কোথাও যাবেন মনে হচ্ছে।'

নকুলেশ বাবু বলিলেন, 'হাঁ, দু' দিনের জন্যে একবার কলকাতা যাব। বৌ-ছেলে কলকাতায় আছে, তাদের আনতে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা, আপনি গোছগাছ করুন।'

রিক্সাতে চড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ষ্টেশন চল।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপার কি? সবাই জোট বেঁধে কলকাতা যাচ্ছে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এই সময় কলকাতার একটা নিদারুণ আকর্ষণ আছে।'

রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ব্রাঞ্চ লাইনের প্রান্তীয় ষ্টেশন, বেশী বড় নয়। এখান হইতে বড় জংসন প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে, সেখানে নামিয়া মেন লাইনের গাড়ী ধরিতে হয়। রেল ছাড়া জংসনে যাইবার মোটর-রাস্তাও আছে; সাহেব-সুবা এবং যাহাদের মোটর আছে তাহারা সেই পথে যায়।

ব্যোমকেশ কিন্তু ষ্টেশনে নামিল না, রিক্সাওয়ালাকে ইসারা করিতেই সে গাড়ী ঘুরাইয়া বাহিরে লইয়া চলিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হ'ল, নামলে না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি বোধ হয় লক্ষ্য কর নি, টিকিট-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার ঘটক টিকিট কিনছিল।'

'তাই নাকি?' আমি ব্যোমকেশকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে যেন শুনিতে পায় নাই এমনি ভান করিয়া উত্তর দিল না।

বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে বড় মণিহারীর দোকানটার সামনে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম। ব্যোমকেশ রিক্সা থামাইয়া নামিল, আমিও নামিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আবার কি মৎলব? আরও এসেন্স চাই নাকি?'

সে হাসিয়া বলিল, 'আরে না না—'

'তবে কি কেশতৈল? তরল আলতা?'

'এসই না।'

দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ডেপুটি উষানাথ বাবু রহিয়াছেন; তিনি একটা চামড়ার সুটকেস কিনিতেছেন। আমার মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া গেল, 'আপনিও কি কলকাতা যাচ্ছেন নাকি?'

উষানাথ বাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, 'আমি! নাঃ! আমি ট্রেজারি অফিসার, আমার কি ষ্টেশন ছাড়বার জো আছে? কে বললে আমি কলকাতা যাচ্ছি?' তাঁহার স্বর কড়া হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সান্ত্বনার সুরে বলিল, 'কেউ বলে নি। আপনি সুটকেশ কিনছেন দেখে অজিত ভেবেছিল—। যাক, আপনার পরী পেয়েছেন ত?'

'হাঁ, পেয়েছি।' উষানাথ বাবু অসন্তুষ্ট ভাবে মুখ ফিরাইয়া লইয়া দোকানদারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

আমরা ফিরিয়া গিয়া রিক্সাতে চড়িলাম। বলিলাম, 'কি হ'ল হুজুর হঠাৎ চটলেন কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি জানি। ওঁর হয়ত মনে মনে কলকাতা যাবার ইচ্ছে, কিন্তু কর্ত্তব্যের দায়ে ষ্টেশন ছাড়তে পারছেন না তাই মেজাজ গরম। কিংবা—'

রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, 'আভি কিধর্ যানা হ্যায়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডি-এস্-পি পাণ্ডে সাহেব।'

পাণ্ডে সাহেবের বাড়ীতেই অ'পিস। আমাদের স্বাগত করিলেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সব ঠিক?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সব ঠিক।'

'ট্রেন কখন?'

'রাত্রি সাড়ে দশটায়। সওয়া এগারটায় জংসন পৌঁছবে।'

'কলকাতার ট্রেন কখন?'

'পৌনে বারটায়।'

'আর পশ্চিমের মেল?'

'এগারটা পঁয়ত্রিশ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ। তা হলে ওবেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় আমি মহীধর বাবুর বাড়ীতে যাব। আপনি সাড়ে পাঁচটার সময় যাবেন। মহীধর বাবু যদি আমার অনুরোধ না রাখেন, পুলিশের অনুরোধ নিশ্চয় অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।'

গম্ভীর হাসিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'আমারও তাই বিশ্বাস।'

ইহাদের টেলিগ্রাফে কথাবার্ত্তা হৃদয়ঙ্গম হইল না। কিন্তু প্রশ্ন করিয়া লাভ নাই; জানি প্রশ্ন করিলেই ব্যোমকেশ জিভ্ কাটিয়া বলিবে—পুলিশের গুপ্তকথা।

পাণ্ডের আপিস হইতে ব্যাঙ্কে গেলাম। কিছু টাকা বাহির করিবার ছিল।

ব্যাঙ্কে খুব ভিড়; আগামী দুই দিন বন্ধ থাকিবে। তবু ক্ষণেকের জন্ম অমরেশ বাবুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি বলিলেন, 'এই বেলা যা দরকার টাকা বার করে নিন। কাল পরশু ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি ফিরছেন কবে?'

'পরশু রাত্রেই ফিরব।'

কাজের সময়, একজন কেরাণী তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। আমরা টাকা বাহির করিয়া ফিরিতেছি দেখিলাম ডাক্তার ঘটক ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিল। সে আমাদের দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু যেন দেখিতে পায় নাই এমনি ভাবে গিয়া একটা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ আমার দিকে চাহিয়া সহাস্য চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিল। তারপর রিক্সতে চড়িয়া বসিয়া বলিল, 'ঘর চলো।'

১১

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আমি আর ব্যোমকেশ মহীধর বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি বসিবার ঘরে ছিলেন। দেখিলাম তাঁহার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে। মুখের ফুটি-ফাটা হাসিটি ম্রিয়মাণ, চালতার মতন গাল দুইটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

বলিলেন, 'আসুন আসুন। অনেক দিন বাঁচবেন, ব্যোমকেশ বাবু, এইমাত্র আপনার কথা ভাবছিলাম। শরীর বেশ সেরে উঠেছে দেখছি। বাঃ বেশ বেশ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আপনার শরীর তো ভাল দেখছি না।'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'হয়েছিল একটু শরীর খারাপ—এখন ভালই। কিন্তু একটা বড় ভাবনার কারণ হয়েছে ব্যোমকেশবাবু।'

'কি হয়েছে?'

'রজনী কাল রাত্রে কলকাতা চলে গেছে।'

'সে কি? একলা গেছেন? আপনাকে না বলে?'

'না না, সে সব কিছু নয়। বাড়ীর পুরোনো চাকর রামদীনকে তার সঙ্গে দিয়েছি।'

'তবে ভাবনাটা কিসের?'

মহীধরবাবুর মনে ছলচাতুরী নাই। তিনি সোজাসুজি বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'শুনুন বলি তা হলে। কলকাতায় রজনীর এক মাসী থাকেন, তিনিই ওকে মানুষ করেছেন। কাল বিকেলে ওর মেসোর এক 'তার' এল। তিনি রজনীকে ডেকে পাঠিয়েছেন—মাসীর ভারি অসুখ। রজনীকে রাত্তিরের গাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। ও এমন প্রায়ই যাতায়াত করে, পাঁচ ছয় ঘণ্টার রাস্তা বৈ তো নয়। রজনী আজ সকালে কলকাতায় পৌঁছে গেছে, 'তার' পেয়েছি।

'এ পর্য্যন্ত কোনও গোলমাল নেই। তারপর শুনুন। আজ সকালে দুখানা চিঠি পেলাম; তার মধ্যে একখানা রজনীর মাসীর হাতের লেখা—কালকের তারিখ। তিনি নিতান্ত মামুলি চিঠি লিখেছেন, অসুখ-বিসুখের কোনও কথাই নেই।'

মহীধরবাবু শঙ্কিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন। ব্যোমকেশ বলিলেন, 'এমনও তো হতে পারে চিঠি লেখবার পর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'তা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু অন্য চিঠিখানার কথা এখনও বলি নি। বেনামী চিঠি। এই পড়ে দেখুন।'

তিনি একটি খাম ব্যোমকেশকে দিলেন। খামের উপর ডাকঘরের ছাপ দেখিয়া বোঝা যায় এই শহরেই ডাকে দেওয়া হইয়াছে। ব্যোমকেশ চিঠি বাহির করিয়া পড়িল। সাদা এক তক্তা কাগজের উপর মাত্র কয়েকটি কথা লেখা ছিল—

আপনার চোখের আড়ালে একজন ভদ্রবেশী দুষ্ট লোক আপনার কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়াছে। ইহারা যদি ইলোপ করে, কেলেঙ্কারীর একশেষ হইবে। সাবধান। ডাক্তার ঘটককে বিশ্বাস করিবেন না।

ব্যোমকেশ চিঠি পড়িয়া ফেরত দিল। মহীধরবাবু কম্পিত স্বরে বলিলেন, 'কে লিখেছে জানি না। কিন্তু এ যদি সত্যি হয়—'

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল, 'ডাক্তার ঘটককে আপনি জানেন। সে এমন কাজ করবে বলে আপনার মনে হয়?'

মহীধরবাবু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'ডাক্তারকে তো ভাল ছেলে বলেই জানি; যখন তখন আসে আমার বাড়ীতে। তবে পরচিত্ত অন্ধকার। আচ্ছা, সে কি আছে এখানে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আছে। আজ সকালেই তাকে দেখেছি।'

মহীধরবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আছে? যাক তা হলে বোধ হয় কেউ মিথ্যে বেনামী চিঠি দিয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার কিন্তু আজ রাত্রে কলকাতা যাচ্ছে।'

মহীধরবাবু আবার ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ—যাচ্ছে! তবে—?'

ব্যোমকেশ দৃঢ় স্বরে বলিল, 'মহীধরবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনও কেলেঙ্কারী হবে না। আপনি মিথ্যে ভয় করছেন।'

মহীধরবাবু ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'সত্যি বলছেন? কিন্তু আপনি কি ক'রে জানলেন—আপনি তো—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি অনেক কথা জানি যা আপনি জানেন না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছি না। রজনী দেবী দু'দিন পরেই ফিরে আসবেন। তিনি এমন কোনও কাজ করবেন না যাতে আপনার মাথা হেঁট হয়।'

মহীধরবাবু গদগদ স্বরে বলিলেন, 'ব্যস, তা হলেই হ'ল। ধন্যবাদ ব্যোমকেশবাবু। আপনার কথায় যে কত দূর নিশ্চিন্ত হলাম তা বলতে পারি না। বুড়ো হয়েছি—ভগবান একবার দাগা দিয়েছেন—তাই একটুতেই ভয় হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওকথা ভুলে যান। আমি এসেছি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে।'

মহীধরবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'বলুন বলুন।'

'আপনার মোটরখানা আজ রাত্রে একবার দিতে হবে। জংসনে যাব। একটু জরুরি কাজ আছে।'

'এ আর বেশী কথা কি? কখন চাই বলুন?'

'রাত্রি ন'টার সময়।'

'বেশ, ঠিক ন'টার সময় আমার গাড়ী আপনার বাড়ীর সামনে হাজির থাকবে। আর কিছু?'

'আর কিছু না।'

এই সময় পাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে মিলিয়া চা ও প্রচুর জলখাবার ধ্বংস করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

ঠিক ন'টার সময় মহীধরবাবুর আট সিলিণ্ডার গাড়ী আমাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া থামিল। আমি ব্যোমকেশ ও পাণ্ডে সাহেব তাহাতে চাপিয়া বসিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। একটি কালো রঙের পুলিস ভ্যান্ আগে হইতেই দাঁড়াইয়া ছিল, সেটি আমাদের পিছু লইল।

শহরের সীমানা অতিক্রম করিয়া আমাদের মোটর জংসনের দীর্ঘ গৃহহীন পথ ধরিল। দুই পাশে কেবল বড় বড় গাছ; আমাদের গাড়ী তাহার ভিতর আলোর সুড়ঙ্গ রচনা করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

পথে বেশী কথা হইল না। তিন জনে পাশাপাশি বসিয়া একটার পর একটা সিগারেট টানিয়া চলিয়াছি। একবার ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার আসামী ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনবে।'

'হাঁ। আমারও তাই মনে হয়। যে ক্লাসেই উঠুক, ইন্সপেক্টর ছুবে পাশের কামরায় থাকবে।'

'পুলিস মহলে আসল কথা কে কে জানে?'

'আমি আর ছুবে। পাছে আগে থাকতে বেশী হৈ চৈ হয় তাই চুপিসারে মহীধরবাবুর গাড়ী নিতে হ'ল। পিছনের ভ্যানে যারা আছে তারাও জানে না কি জন্যে কোথায় যাচ্ছি। পুলিসের থানা থেকে যত কথা বেরোয় এত আর কোথাও থেকে নয়। ঘুষখোর পুলিস তো আছেই। তা ছাড়া পুলিসের পেটে কথা থাকে না।'

পুরন্দর পাণ্ডে নির্ম্মলচরিত্র পুরুষ, তাই স্বজাতি সম্বন্ধেও তিনি সত্যবাদী।

দশটার সময় জংসনে পৌঁছিলাম। লাল সবুজ অসংখ্য আকাশ-প্রদীপে ষ্টেশন ঝলমল করিতেছে।

পুলিস ভ্যানে দুই জন সব্-ইন্সপেক্টার ও কয়েকটি কনেষ্টবল ছিল। পাণ্ডে তাহাদের ষ্টেশনের ভিতরে বাহিরে নানা স্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন; তারপর ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিলেন। বলিলেন, 'আমার একটা 'লগ' আসবার কথা আছে। এলেই খবর দেবেন। আমরা ওয়েটিং রুমে আছি।'

আমরা তিন জনে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে গিয়া বসিলাম। পাণ্ডে ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখিতে লাগিলেন।

ঠিক সাড়ে দশটার সময় ষ্টেশন মাষ্টার খবর দিলেন, 'লগ এসেছে। সব ভাল। ফার্স্ট ক্লাস।'…

এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় যত দীর্ঘই হোক, প্রাকৃতিক নিয়মে শেষ হইতে বাধ্য। গাড়ী আসার ঘণ্টা বাজিল। আমরা প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের সকলের গায়ে ওভারকোট এবং মাথায় পশমের টুপি, সুতরাং সহসা দেখিয়া কেহ যে চিনিয়া ফেলিবে সে সম্ভাবনা নাই।

তারপর বহুপ্রতীক্ষিত গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

পাণ্ডে সাহেব নাটকের রঙ্গমঞ্চ ভালই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, আয়োজনেরও কিছু ত্রুটি রাখেন নাই; কিন্তু তবু নাটক জমিতে পাইল না, পটোত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পড়িয়া গেল।

গাড়ীর প্রথম শ্রেণীর কামরা যেখানে থামে আমরা সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলাম। ঠিক আমাদের সামনে প্রথম শ্রেণীর কামরা দেখা গেল। জানালাগুলির কাঠের কবাট বন্ধ, তাই অভ্যন্তর-ভাগ দেখা গেল না। অল্পকাল-মধ্যে দরজা খুলিয়া গেল। একজন কুলি ছুটিয়া গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দুইটি বড় বড় চামড়ার সুটকেস নামাইয়া রাখিল।

কামরায় একটি মাত্র যাত্রী ছিলেন, তিনি এবার বাহির হইয়া আসিলেন। কোটপ্যান্ট-পরা অপরিচিত ভদ্রলোক, গোঁফদাড়ি কামানো, চোখে ফিকা নীল চশমা। তিনি সুটকেস দুটি কুলির মাথায় তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, পাণ্ডে এবং ব্যোমকেশ তাঁহার

দুই পাশে গিয়া দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ একটু দুঃখিত স্বরে বলিল, 'অমরেশবাবু, আপনার যাওয়া হ'ল না। ফিরে যেতে হবে।'

অমরেশবাবু! ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা! গোঁফদাড়ি কামানো মুখ দেখিয়া একেবারে চিনিতে পারি নাই।

অমরেশ রাহা একবার দক্ষিণে একবার বামে ঘাড় ফিরাইলেন, তারপর ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া নিজের কপালে ঠেকাইয়া ঘোড়া টানিলেন। চড়াৎ করিয়া শব্দ হইল।

মুহূর্ত-মধ্যে অমরেশ রাহার ভূপতিত দেহ ঘিরিয়া লোক জমিয়া গেল। পাণ্ডে হুইসল বাজাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের বহু লোক আসিয়া স্থানটা ঘিরিয়া ফেলিল। পাণ্ডে কড়া সুরে বলিলেন, 'ইন্সপেক্টর দুবে, সুটকেস দুটো আপনার জিম্মায়।'

একজন লোক ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। চিনিলাম, ডাক্তার ঘটক। সে বলিল, 'কি হয়েছে? এ কে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'অমরেশ রাহা। দেখুন তো বেঁচে আছে কি না।'

ডাক্তার ঘটক নত হইয়া দেহ পরীক্ষা করিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'মারা গেছে।'

ভিড়ের ভিতর হইতে দন্তবাদ্যসহযোগে একটা বিস্ময় কুতূহলী স্বর শোনা গেল, 'অমরেশ রাহা মারা গেছে—অ্যা! কি হয়েছিল তার দাড়ি কোথায়—অ্যাঁ—!'

ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার।

ডাক্তার ঘটক ও নকুলেশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাদের গাড়ীও এসে পড়েছে। এখন বলবার সময় নেই, ফিরে এসে শুনবেন।'

১২

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা সাংঘাতিক ভুল করেছিলাম। অমরেশ রাহা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তার যে পিস্তলের লাইসেন্স থাকতে পারে একথা মনেই আসে নি।'

সত্যবতী বলিল, 'না, গোড়া থেকে বল।'

২রা জানুয়ারী। কলিকাতায় ফিরিয়া চলিয়াছি। ডি-এস-পি পাণ্ডে, মহীধরবাবু ও রজনী ষ্টেশনে আসিয়া আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এতক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত মনে একত্র হইতে পারিয়াছি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুটো জিনিষ জট পাকিয়ে গিয়েছিল—এক, ছবি চুরি; দ্বিতীয়, ডাক্তার আর রজনীর গুপ্ত প্রণয়। ওদের প্রণয় গুপ্ত হলেও তাতে নিন্দের কিছু ছিল না। ওরা কলকাতায় গিয়ে রেজিষ্ট্রী করে বিয়ে করেছে। সম্ভবতঃ রজনীর মাসী আর মেসো জানেন, আর কেউ জানে না; মহীধরবাবুও না। তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন কেউ জানবে না। মহীধরবাবু সেকেলে লোক নয়, তবু বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে সাবেক সংস্কার ত্যাগ করতে পারেন নি। তাই ওরা লুকিয়ে বিয়ে করে সব দিক রক্ষে করেছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খবরটা কি ডাক্তারের কাছে পেলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উঁহু। ডাক্তারকে ঘাঁটাই নি; ও যে রকম রুখে ছিল, কিছু বলতে গেলেই কামড়ে দিত। আমি রজনীকে আড়ালে বলেছিলাম, সব জানি। সে জিজ্ঞেস করেছিল, ব্যোমকেশ বাবু, আমরা কি অন্যায় করেছি? আমি বলেছিলাম—না। তোমরা যে বিদ্রোহের ঝোঁকে মহীধরবাবুকে দুঃখ দাও নি এতেই তোমাদের গৌরব। উগ্র বিদ্রোহে বেশী কাজ হয় না, কেবল বিরুদ্ধ শক্তিকে জাগিয়ে তোলা হয়। বিদ্রোহের সঙ্গে সহিষ্ণুতা চাই। তোমরা সুখী হবে।'

সত্যবতী বলিল, 'তারপর বল।'

ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল, 'ছবিচুরির ব্যাপারটাকে যদি হাল্কা ভাবে নাও তা হলে তার অনেক রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু যদি গুরুতর ব্যাপার মনে কর, তা হলে তার একটিমাত্র ব্যাখ্যা হয়—ঐ গ্রুপের মধ্যে এমন একজন আছে যে নিজের চেহারা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চায়।

'কিন্তু কি উদ্দেশ্যে?—একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে ওই দলে একজন দাগী আসামী আছে যে নিজের ছবির প্রচার চায় না। প্রস্তাবটা কিন্তু টেক্‌সই নয়। ঐ গ্রুপে যারা আছে তারা কেউ লুকিয়ে বেড়ায় না, তাদের সকলেই চেনে। সুতরাং ছবি চুরি করার কোনও মানে হয় না।

'দাগী আসামীর সম্ভাবনা ত্যাগ করতে হচ্ছে। কিন্তু যদি ঐ দলে এমন কেউ থাকে যে ভবিষ্যতে দাগী আসামী হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, অর্থাৎ একটা গুরুতর অপরাধ করে কেটে পড়বার চেষ্টায় আছে, তা হলে সে নিজের ছবি লোপাট করবার চেষ্টা করবে। অজিত, তুমি ত লেখক, শুধু ভাষার দ্বারা একটা লোকের এমন হুবহু বর্ণনা দিতে পার যাতে তাকে দেখলেই চেনা যায়?—পারবে না; বিশেষতঃ তার চেহারা যদি মামুলি হয় তা হলে একেবারেই পারবে না। কিন্তু একটা ফটোগ্রাফ মুহূর্তমধ্যে তার চেহারাখানা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে। তাই দাগী আসামীদের ফটো পুলিসের ফাইলে রাখা থাকে।

'তা হলে পাওয়া গেল, ঐ দলের একজন একটা গুরুতর অপরাধ করে ডুব মারবার ফন্দি আঁটছে। এখন প্রশ্ন এই—সংকল্পিত অপরাধটা কি এবং লোকটা কে?

'গ্রুপের লোকগুলিকে একে একে ধরা যাক।—মহীধর বাবু ডুব মারবেন না; তাঁর বিপুল সম্পত্তি আছে, চেহারাখানাও ডুব মারবার অনুকূল নয়। ডাক্তার ঘটক রজনীকে নিয়ে উধাও হতে পারে; কিন্তু রজনী সাবালিকা, তাকে নিয়ে পালানো আইন-বর্হিত অপরাধ নয়। তবে ছবি চুরি করতে যাবে কেন? অধ্যাপক সোমকেও বাদ দিতে পার। সোম যদি শিকল কেটে উড়বার সঙ্কল্প করতেন তা হলেও গ্রুপ ঐ ছবিটা চুরি করার কোনও মানে হ'ত না। লোকের আরও ছবি আছে; নকুলেশ বাবুর ঘরে তাঁর ফটো টাঙানো আছে আমরা দেখেছি। তারপর ধর নকুলেশ বাবু; তিনি নিরু-

পিকনিকের দলে ছিলেন। তিনি মহীধর বাবুর কাছে মোটা টাকা ধার করেছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে গা-ঢাকা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তিনি ফটো তুলেছিলেন, ফটোতে তাঁর চেহারা ছিল না। অতএব তাঁর পক্ষে ফটো চুরি করতে যাওয়া নিরর্থক।

'বাকি রয়ে গেলেন ডেপুটি উষানাথ বাবু এবং ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার অমরেশ রাহা। একজন সরকারী মালখানার মালিক, অন্যজন ব্যাঙ্কের কর্তা। দেখা যাচ্ছে, ফেরার হয়ে যদি কারুর লাভ থাকে ত এঁদের দু'জনের। দু'জনের হাতেই বিস্তর পরের টাকা; দু'জনেই চিনির বলদ।

'প্রথমে উষানাথ বাবুকে ধর। তাঁর স্ত্রী-পুত্র আছে; চেহারা-খানাও এমন যে ফটো না থাকলেও তাঁকে সনাক্ত করা চলে। তিনি চোখে কালো-চশমা পরেন, চশমা খুললে দেখা যায় তাঁর একটা চোখ কানা। বেশী দিন পুলিসের সন্ধানী চক্ষু এড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া তাঁর চরিত্রও এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করার প্রতিকূল।

'বাকি রইলেন অমরেশ রাহা। এটা অবশ্য নেতি প্রমাণ। কিন্তু তারপর তাঁকে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবে তিনি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। তাঁর চেহারা নিতান্ত সাধারণ, তাঁর মত লক্ষ লক্ষ বৈশিষ্ট্যহীন লোক পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছেন। এ রকম দাড়ি রাখার সুবিধা, দাড়ি কামিয়ে ফেললেই চেহারা বদলে যায়, তখন চেনা লোকেও আর চিনতে পারে না। নকল দাড়ি পরার চেয়ে তাই আসল দাড়ি কামিয়ে ফেলা ছদ্মবেশ হিসাবে ঢের বেশী নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য।

'অমরেশ বাবু অবিবাহিত ছিলেন। তিনি মাইনে ভালই পেতেন, তবু তাঁর মনে দারিদ্র্যের ক্ষোভ ছিল; টাকার প্রতি দুর্দম আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল। আমার মনে হয় তিনি অনেকদিন ধরে এই কু-মতলব আঁটছিলেন। তাঁর আলমারিতে গুজরাটী বই দেখেছিলে মনে আছে? তিনি চেষ্টা করে গুজরাটী ভাষা শিখেছিলেন; হয়ত সঙ্কল্প ছিল টাকা নিয়ে বোম্বাই অঞ্চলে গিয়ে বসবেন। বাঙালী-দের সঙ্গে গুজরাটীদের চেহারার একটা ধাতুগত ঐক্য আছে, ভাষাটাও রপ্ত থাকলে কেউ তাঁকে সন্দেহ করতে পারবে না।

'সব দিক ভেবে আঁটঘাট বেঁধে তিনি তৈরি হয়েছিলেন। তারপর যখন সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করবার সময় হ'ল তখন হঠাৎ কতকগুলো অপ্রত্যাশিত বাধা উপস্থিত হ'ল। পিক্‌নিকের দলে গিয়ে তাঁকে ছবি তোলাতে হ'ল। তিনি অনিচ্ছাভরে ছবি তুলিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু না তোলালে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। ভাবলেন, ছবি চুরি করে সামলে নেবেন।

'যা হোক, তিনি মহীধর বাবুর বাড়ী থেকে ছবি চুরি করলেন। পরদিন চায়ের পার্টিতে আমরা উপস্থিত ছিলাম; সেখানে যেসব আলোচনা হ'ল তাতে অমরেশ বাবু বুঝলেন তিনি একটা ভুল করেছেন। শুধু ছবিখানা চুরি করা ঠিক হয় নি। তাই পরের বার যখন তিনি উষানাথ বাবুর বাড়ীতে চুরি করতে গেলেন তখন আর কিছু না পেয়ে পরী চুরি করে আনলেন। আলমারিতে চাবি ঢুকিয়ে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন যাতে মনে হয় ছবি চুরি করাটা চোরের মূল উদ্দেশ্য নয়। অধ্যাপক সোমের ছবিটা চুরি করার দরকার হয় নি। আমার বিশ্বাস তিনি কোনও উপায়ে জানতে পেরেছিলেন যে, মালতী দেবী ছবিটা আগেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। কিংবা এমনও হতে পারে যে, তিনি ছবি চুরি করতে গিয়েছিলেন কিন্তু ছবি তার আগেই নষ্ট করা হয়েছিল। হয়ত তিনি ছেঁড়া ছবির টুকরোগুলো পেয়েছিলেন।

'আমার আবির্ভাবে অমরেশ বাবু শঙ্কিত হন নি। তাঁর মূল অপরাধ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে; তিনি টাকা নিয়ে উধাও হবার পর সবাই জানতে পারবে, তখন আমি জানলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ফাল্গুনী পালের প্রেতমূর্তি যখন এসে দাঁড়াল, তখন অমরেশ বাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তাঁর সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যাবার উপক্রম হ'ল। ফাল্গুনী থাকতে ফটো চুরি করে কি লাভ? সে স্মৃতি থেকে ছবি এঁকে ফটোর অভাব পূরণ করে দেবে।

'কিন্তু পরকীয়া-প্রীতির মত বেআইনী কাজ করার একটা তীব্র উত্তেজনা আছে। অমরেশ বাবু তার স্বাদ পেয়েছিলেন। তিনি এতদূর এগিয়ে আর পেছুতে পারছিলেন না। তাই ফাল্গুনী যে দিন তাঁর ছবি এঁকে দেখাতে এল সেদিন তিনি ঠিক করলেন ফাল্গুনীর বেঁচে থাকা চলবে না। সেই রাত্রে তিনি মদের বোতলে বেশ খানিকটা আফিম মিশিয়ে নিয়ে ফাল্গুনীর কুঁড়ে ঘরে গেলেন। ফাল্গুনীকে নেশার জিনিষ খাওয়ানো শক্ত হ'ল না। তারপর সে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ল তখন তাকে তুলে কুয়োয় ফেলে দিলেন। আগের রাত্রে চুরি করা পরীটা তিনি সঙ্গে এনেছিলেন, সেটাও কুয়োর মধ্যে গেল; যাতে পুলিস ফাল্গুনীকেই চোর বলে মনে করে। এই ব্যাপার ঘটেছিল সম্ভবতঃ রাত্রি এগারোটার পর, যখন বাগানের অন্য কোণে আর একটি মন্ত্রণাসভা শেষ হয়ে গেছে।

'পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকে মনে হয় ফাল্গুনী জলে পড়বার আগেই মরে গিয়েছিল। কিন্তু অমরেশ বাবুর বোধ হয় ইচ্ছে ছিল সে বেঁচে থাকতে থাকতেই তাঁকে জলে ফেলে দেন, যাতে প্রমাণ হয় সে নেশার ঝোঁকে অপঘাত জলে ডুবে মরেছে।

'যাহোক অমরেশ বাবু নিষ্কণ্টক হলেন। যে ছবিটা তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন, রওনা দেবার আগে সেটা পুড়িয়ে ফেললেই নিশ্চিন্ত, আর তাঁকে সনাক্ত করবার কোনও চিহ্ন থাকবে না।

'আমি যখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলাম, এ অমরেশ বাবুর কাজ তখন পাণ্ডে সাহেবকে সব কথা বললাম। ভারি বুদ্ধিমান লোক, চট করে ব্যাপার বুঝে নিলেন। সেই থেকে এক মিনিটের জন্যেও অমরেশ বাবু পুলিসের চোখের আড়াল হতে পারেন নি।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল।

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, অমরেশ রাহা যে ঠিক ঐ দিনই পালাবে, এটা বুঝলে কি করে? অন্য যে-কোনও দিন পালাতে পারত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা কোনও ছুটির আগে পালানোর সুবিধে আছে, দু'দিন সময় পাওয়া যায়। দু'দিন পরে ব্যাঙ্ক খুললে যখন চুরি ধরা পড়বে, চোর তখন অনেক দূরে। অবশ্য বড়দিনের ছুটিতেও পালাতে পারত; কিন্তু তার দিক থেকে নববর্ষের ছুটিতেই পালানোর দরকার ছিল। অমরেশ রাহা যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল সেটা কলকাতার একটা বড় ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অফিস। প্রত্যেক মাসের শেষে এখানে হেড আপিস থেকে মোটা টাকা আসত; কারণ পরের মাসের আরম্ভেই ব্যাঙ্কের টাকায় টান পড়বে। সাধারণ লোক ছাড়াও এখানে কয়েকটা খনি আছে, তাতে অনেক কর্ম্মী কাজ করে, মাসের পয়লা তাদের মাইনে দিতে হয়। এবার সেই মোটা টাকাটা ব্যাঙ্কে এসেছিল বড়দিনের ছুটির পর। বড়দিনের ছুটির আগে পালালে অমরেশ রাহা বেশী টাকা নিয়ে যেতে পারত না। তার দুটি সুটকেস থেকে এক লাখ আশী হাজার টাকার নোট পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ লম্বা হইয়া শুইল, বলিল, 'আর কোনও প্রশ্ন আছে?'

'দাড়ি কামালে কখন? ট্রেনে?'

'হ্যাঁ। সেইজন্যেই ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট কিনেছিল। ফার্ষ্ট ক্লাসে সহযাত্রীর সম্ভাবনা কম।'

সত্যবতী বলিল, 'মহীধর বাবুকে বেনামী চিঠি কে দিয়েছিল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রফেসার সোম। কিন্তু বেচারার প্রতি অবিচার কোরো না। লোকটি শিক্ষিত এবং সজ্জন, এক ভয়ঙ্করী স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে তাঁর জীবনটা নষ্ট হতে বসেছে। সোম সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিকেও কিছু হ'ল না, ডাক্তার ঘটকের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি হেরে গেলেন। তাই ঈর্ষার জ্বালায়—। ঈর্ষার মতন এমন নীচ প্রবৃত্তি আর নেই। কাম ক্রোধ লোভ—ষড়রিপুর মধ্যে সব চেয়ে অধম হচ্ছে মাৎসর্য্য।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'মালতী দেবীর অসুখের খুবই বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। কারুর মৃত্যু-কামনা করতে নেই, কিন্তু মালতী দেবী যদি সিঁথের সিঁদুর নিয়ে এই বেলা স্বর্গারোহণ করেন তা হলে অন্ততঃ আমি অসুখী হব না।'

আমিও মনে মনে সায় দিলাম।

সমাপ্ত

গানের জাগরণ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আকাশ নীল, শ্যামল ধরা, আলোকে ঝরে সোনা,
সে গান আমি গাহিব না-কি স্বপ্নে যাহা বোনা?
সে-সব কথা থাকুক আজি, শারদ দিবা কয়,
শ্যামল গীতি, সুনীল গীতি, সোনালী গান নয়।

উতল চাঁদ বুকের সুধা রাখিতে নারে ধরি,
আত্মহারা—উৎসারিয়া জ্যোৎস্না পড়ে ঝরি।
ধরিব কি-সে সুরের ধারা? শারদ রাতি কয়,
অপরূপের রূপ-জাগানো রূপালী গান নয়।

শুভ্র মেঘ, খণ্ড মেঘ—বাঁধন-ছেঁড়া তরী,
লক্ষ্যহারা ভাসিয়া চলে দূরের পথ ধরি'।
ঊর্দ্ধ হ'তে অসীম নীল ইসারা করি' কয়,
দূরের গান, সুরের গান, ভাসার গান নয়।

স্রোতস্বিনী বহিয়া চলে কলধ্বনি তুলি,
ও-কথা শুধু কহিতে গিয়ে এ-কথা যায় ভুলি।
কি-কথা যেন বলিবে বলি' উতল সুরে কয়,
যে-সব কথা হয়েছে বলা সে-সব কথা নয়।

ব্যাকুল বায়ু বনের পথে কেবলি মরে ঘুরি,
ঝরায়ে পাতা, দোলায়ে শাখা, ফুটায়ে যায় কুঁড়ি।
বহিয়া যেতে সহসা থামি চপল সুরে কয়,
বনের গান, ফুলের গান, ভুলের গান নয়।

আবেশ-ভরা নয়নে কেন চাহিছ অকারণ,
মধুর সেই স্মরণ 'পরে পড়ুক আবরণ।
সবার সুখ-দুঃখ মাঝে প্রাণের পরিচয়,
তোমার গীতি, আমার গীতি—একার গীতি নয়।

মানব করে যেথায় চির বেদন-নিবেদন,
সেথায় জানি জীবন-মাঝে গানের জাগরণ।
অপূর্ব্ব সে সুরের ধ্বনি হৃদয় ভরি রয়,
করুণ গীতি, কোমল গীতি, বিলোল গীতি নয়।

তুমি ও আমি ছিলাম একা,—সেদিন অবসান,
বিশ্বপ্রাণে বাজিছে আজি রক্তরাঙা গান।
স্বপ্নভাঙা সুরের ভাষা কবিরে ডেকে কয়,
সবুজ গীতি, সুনীল গীতি, সোনালী গান নয়।

শারদীয়া

শ্রীরঘুমণি ভট্টাচার্য্য, এম-এ

ষড়্ঋতুর বৈচিত্র্য যুগে যুগে নব নব কবির চিত্রণে নূতন নূতন সৌন্দর্য্যে রূপায়িত হয়েছে। আদিকবি বাল্মীকি থেকে সুরু করে ব্যাসদেব ও পরবর্ত্তীকালে কালিদাস, ভারবি, ভর্তৃহরি, মাঘ প্রভৃতি কবিরা কেউ বা অংশতঃ কেউবা পূর্ণাঙ্গভাবে এই ঋতুচক্রের বর্ণনায় স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের বর্ণনাই প্রকাশভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। অনুপম শোভা-সৌন্দর্য্যের আকর শরৎ সুদূর অতীতকাল থেকেই এই সব কবির চোখে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ধরা দিয়েছে।

কবিকুলের মধ্যে বাল্মীকি ও ভর্তৃহরি শরদাগমে 'স্থলে, জলে আর গগনে গগনে' প্রকৃতির সর্ব্বত্র—প্রকীর্ণ সৌন্দর্য্যকেই বড় করে দেখেছেন। তাই আদিকবির বর্ণনায় দেখতে পাই—পুষ্পভারাবনত সপ্তপর্ণে, নির্মেঘ আকাশে, সূর্য্য-চন্দ্র-তারকার দীপ্তিতে ও মদমত্ত মাতঙ্গের লীলায়িত গতিতে শরৎ এক অভূতপূর্ব্ব শ্রীর সঞ্চার করেছে—

শাখাসু সপ্তচ্ছদপাদপানাং প্রভাসু তারার্কনিশাকরাণাম্।
লীলাসু চৈবোত্তমবারণানাং শ্রিয়ং বিভজ্যাদ্য শরৎ প্রবৃত্তা।

রামা-কিষ্কি ৩০।২৮

অরুণ কিরণে রঞ্জিত কমল যেন উন্মীলিত নয়নে শরৎকে দেখছে, তাতে শরতের শ্রী হয়েছে আরও বর্দ্ধিত—

সূর্য্যাগ্রহস্তপ্রতিবোধিতেষু পদ্মাকরেষ্বভ্যধিকং বিভাতি।

রামা-কিষ্কি ৩০।২৯

শরৎ গো-কূলে এনে দিয়েছে মত্ততা ও নদীসমূহে স্বচ্ছতা। শরতের শোভাবর্দ্ধনে এরাও যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে কবিগুরু বাল্মীকি সেকথাও যেন প্রকারান্তরে প্রকাশ করেছেন:

গবাং সমূহেষু চ দর্পিতেষু
প্রসন্নতোয়াসু চ নিম্নগাসু
বিভাতি লক্ষ্মীর্বহুধা বিভক্তা। রামা-কিষ্কি ৩০।৩২

রামায়ণে শরতের এই বহুধাপ্রকট সৌন্দর্য্য সীতাবিরহী রামচন্দ্রের বিরহযাতনাকে যেন তীব্রতর করে তুলেছে। তিনি অনুজ লক্ষ্মণকে সম্বোধন করে বলছেন:

"প্রিয়া বিহীনে দুঃখার্ত্তে হৃতরাজ্যে বিবাসিতে।
কৃপাং ন কুরুতে রাজা সুগ্রীবো ময়ি লক্ষ্মণ।"

রামা-কিষ্কি ৩০।৬৬

"হে লক্ষ্মণ! আমি সীতার বিরহে বিধুর—বিমাতা কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বনে নির্ব্বাসিত। আমার এ অবস্থা দেখেও সুখী বানররাজের চিত্তে দয়ার উদ্রেক হচ্ছে না।"

রামচন্দ্রের অনুগ্রহে রাজ্যলাভ করে সুগ্রীব ভোগৈশ্বর্য্যে মগ্ন। বিরহ-সন্তাপ যে কি তা তার অজ্ঞাত। কাজেই অন্যের ব্যথায় সে ব্যথিত হবে কেন? সুগ্রীবের সহানুভূতি-হীনতা রামচন্দ্রের এই উক্তিতে করুণ সুরে ধ্বনিত হয়েছে।

ভট্টিকাব্যে দেখতে পাই শরতের সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত হয়েছে একাধারে বনস্পতিতে, সরোবরে, নদীতে, জ্যোতিষ্ক-সমূহে, প্রাণিনিচয়ে ও দিগ্বিভাগে:

বনস্পতীনাং সরসাং নদীনাং তেজস্বিনাং কান্তিভৃতাং দিশাঞ্চ।
নির্যায় তস্যাঃ স পুরঃ সমন্তাচ্ছ্রিয়ং দধানাং শরদং দদর্শ। ভট্টি ২।১

তপোবিঘ্নকারী রক্ষঃকুলের বধার্থে রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ-সহ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করছেন। শারদাগমে প্রকৃতির এই নিরুপম শ্রী অযোধ্যা থেকে সদ্যোনিষ্ক্রান্ত রামচন্দ্রকে বিমুগ্ধ করেছে।

কালিদাস, ভারবি ও মাঘ কিন্তু এই প্রবিভক্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরালে এক অখণ্ড সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিলেন—সে সত্তা হচ্ছে শারদলক্ষ্মীর। কালিদাস শরতের আগমনে শুনতে পেয়েছেন নববধূর সলজ্জ অভিসারের নূপুর-নিক্কণ। কাশকুসুম পেয়েছে তার শুভ্র বসনের রূপ, ফুল্লকমল পেয়েছে তার মুখ-পঙ্কজের শ্রী, আর কেলিমত্ত মরালকুলের কণ্ঠধ্বনি যেন তার নূপুরের ধ্বনি অনুকরণ করেই হয়েছে মধুর। পক্কপ্রায় শালিধান্যের রূপে কল্পিত হয়েছে তার মনোহর দেহ-যষ্টির রূপ:

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্বশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা।

ঋতুসংহার।১

আবার, এই লজ্জামুকুলিতাক্ষী মুগ্ধা নববধূ ক্রমে পেয়েছে যৌবনরসে উচ্ছল কামিনীর রূপ। নীলোৎপল যেন তার দৃষ্টি চুরি করেই হয়েছে সুন্দরতর, আর তার শুচিহাস্যে মণ্ডিত কুমুদ হয়েছে শুভ্রতর।

বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা।
কুমুদরুচিরহাসা কামিনীবোন্মদেয়ং প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ

প্রীতিমগ্র্যাম্। ঋতু ২৭

রঘুবংশে চতুর্থ সর্গে দেখি মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয় যাত্রা-কালে শরৎ কল্যাণবিধায়িনী রাজলক্ষ্মীরূপে ব্যগ্র হয়ে এসেছে তার উপচারসম্ভার নিয়ে যাত্রারম্ভের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্যে—

পার্থিবশ্রীর্দ্বিতীয়েব শরৎপঙ্কজলক্ষণা। রঘু ৪।১৪

কবি মাঘের বর্ণনায় শরৎ পেয়েছে নৃপতির অভ্যর্থনা করিনী

মহিষীর রূপ। বিহারেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন রৈবতক পর্ব্বতের অভিমুখে। ছয় ঋতু এসেছে পুষ্পের পসরা সাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করার জন্তে। পর্য্যায়ক্রমে শরৎও এসেছে। বায়ু-চালিত শুভ্র মেঘপুঞ্জ আকাশের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সে দৃশ্য দেখে শ্রীকৃষ্ণের মনে হ'ল যেন শরৎ-রাণীর শুভ্রবসন অনুরাগে স্খলিত হচ্ছে।

স বিকচোৎপলচক্ষুষমৈক্ষত ক্ষিতিভৃতোঽঙ্কগতাং দয়িতামিব।
শরদমচ্ছগলদ্বসনোপমাক্ষমঘনামজনাশনকীর্ত্তনঃ॥ শিশু-৬।৪২

কিরাতার্জ্জুনীয়তে দেখতে পাই শরদাগমে স্থলভূমি পেয়েছে প্রিয়ার যৌবনলাবণ্য। অর্জ্জুন পাশুপত অস্ত্রলাভের জন্তে তপস্তা করতে চলেছেন হিমশৈলে। পাণ্ডুতাগুণ বিশিষ্টা প্রাপ্তযৌবনা, হাস্তমুখরা, কলভাষিণী প্রিয়া যেমন মেখলাকিঙ্কিণীতে সচকিত করে সখীগণের সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাদের আনন্দবর্দ্ধন করে, শরতের আবির্ভাব তেমনি লোকালয়ে করেছে অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সঞ্চার। শ্রেণীবদ্ধ কলনাদী মরালকুল হয়েছে স্থলভূমির মেখলাস্বরূপ, পক্ব শস্য রচনা করেছে তার পাণ্ডুতাগুণ। শরতের এই অনুপম রূপ অর্জ্জুনের নয়ন-মন হরণ করেছে।

ততঃ স কূজৎকলহংসমেখলাং সপাকশস্যাহিতপাণ্ডুতাগুণাম্।
উপাসসাদোপজনঞ্জনপ্রিয়ঃ প্রিয়ামিবাসাদিতযৌবনশ্রীঃ॥

কিরাত ৪।১

এও সেই 'অঙ্গে অঙ্গে' যৌবনতরঙ্গোচ্ছলা শরতের পরিপূর্ণ লাবণ্যের রূপ। শরতের আবির্ভাবে প্রকৃতির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্য্যও পূর্ব্বোক্ত কবিদের বর্ণনায় সুন্দর রূপেই ফুটে উঠেছে। সে বর্ণনাগুলিতে কবিকুলের ভাবসাম্য অপেক্ষা ভাবের বৈচিত্র্যই সুপরিস্ফুট। কোন কোন বিষয়ে উত্তরকালের কবিদের উপর পূর্ব্ববর্ত্তীদের কিছু কিছু প্রভাব পড়লেও তাঁদের নিজস্ব নিপুণ তুলিকাপাতে বর্ণিত বিষয়গুলি এরূপ অভিনব রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, চিত্রগুলি স্বপ্রকাশেই ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

শরতের এই অনুপম শ্রীর বর্ণনাক্রমে দেখতে পাই আদি কবি সুনীল আকাশকে স্বচ্ছতোয় সরোবরের উপমান রূপে কল্পনা করেছেন। হ্রদের বক্ষে একটি হংস অচঞ্চল— মনে হয় যেন সুপ্ত। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কুমুদ প্রস্ফুটিত। নির্মেঘ আকাশে অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে চন্দ্রের সৌন্দর্য্যও যেন তোয়াধারের সৌন্দর্য্যের কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

সুপ্তৈকহংসং কুমুদৈরুপেতং মহাহ্রদস্থং সলিলং বিভাতি।
ঘনৈর্বিমুক্তং নিশি পূর্ণচন্দ্রং তারাগণাকীর্ণমিবান্তরীক্ষম্॥

রামা-কিষ্কি ৩০।৪৮

'সুপ্তৈকহংস' মহাহ্রদের এ রূপ অনবদ্য সৃষ্টি হিসাবে কাকে না মুগ্ধ করে? মহাকবি কালিদাসের চোখেও আকাশ ও সরোবরের ঠিক এই চিত্রই ধরা পড়েছে, তবে তাঁর বর্ণনায় আকাশই হয়েছে উপমেয় আর সরোবর হয়েছে উপমান।

স্ফুটকুমুদচিতানাং রাজহংসস্থিতানাং মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্।
শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোম তোয়াশয়ানাং বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্॥ ঋতু ২১

চন্দ্রতারকাশোভিত মেঘমুক্ত আকাশ প্রস্ফুটিত কুমুদে পরিব্যাপ্ত, রাজহংসশোভিত 'মরকতমণির ন্যায় সুনির্ম্মল জলরাশিবিভূষিত জলাশয়সমূহের শোভা ধারণ করেছে।

শরতে আকাশের গাঢ় নীলিমা দেখে কবি কল্পনা করেছেন যেন সমস্ত আকাশে কে কজ্জল লেপন করে দিয়েছে।

ভিন্নাঞ্জনপ্রচয়কান্তি নভো মনোজ্ঞম্। ঋতু ৫

যে সহজাত সৌন্দর্য্যের অধিকারী তার রূপ বাহ্যিক উপকরণের অপেক্ষা না করেই মানুষকে মুগ্ধ করে। তাই পতিগৃহেগমনোদ্যতা ক্ষৌমবস্ত্রপরিহিতা সালঙ্কারা শকুন্তলার রূপও একবেণীধরা মলিনবসনা নিরাভরণা শকুন্তলার রূপের কাছে হার মেনেছে। শরতের নিরাভরণ আকাশের সৌন্দর্য্যও কবি ভারবির চিত্তকে করেছে বিমুগ্ধ। বর্ষাকালে উড্ডীয়মান বলাকাশ্রেণী ও ইন্দ্রধনু আকাশকে শোভমান করে রেখেছিল। কিন্তু আজ তারা কোথায় যে বিলীন হয়ে গেছে তার কোনও নিদর্শন নেই। তবু আকাশের সৌন্দর্য্য যেন অধিকতর প্রতিভাত হচ্ছে।

পতন্তি নাস্মিন্ বিশদাঃ পতত্রিণো ধৃতেন্দ্রচাপা ন পয়োদপংক্তয়ঃ।
তথাপি পুষ্ণাতি নভঃ শ্রিয়ম্পরাং ন রম্যমাহার্য্যমপেক্ষতে গুণম্॥

কি ৪।২৩

শরতে দিকসমূহের প্রসন্নতা বর্ণনা করতে গিয়ে বাল্মীকি একটি সুন্দর রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। অন্ধকার আছে বলেই তো আলোর মহিমা ফুটে উঠেছে। বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন দিগ্বিভাগ ছিল যেন অন্ধকারের মসীতে লিপ্ত। বর্ষাপগমে মেঘজাল অপসৃত হওয়ায় সূর্য্যের কিরণে দিগ্বধূদের রূপ যেন ঝলমল করে উঠেছে। আদিকবির বর্ণনায় অন্ধকার ও মেঘ অভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

তমোবিমুক্তাশ্চ দিশঃ প্রকাশাঃ। রামা-কিষ্কি ৩০।৩৬

কালিদাস দিকসমূহের প্রসন্নতা আরও মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন যে প্রাবৃট্ কালের অন্তর্দ্ধানে জলদজাল হয়েছে তিরোহিত। তাই দিগ্বিভাগসমূহ হয়েছে মনোহর:

বিগতজলদবৃন্দা দিগ্বিভাগা মনোজ্ঞাঃ। ঋতু ২২

ভারবির দৃষ্টিতে শরতে দিগ্বধূরা পেয়েছে এক অপরূপ

ওয়াশিংটনে বিশ্ববাণিজ্য প্রদর্শনীতে ভারতীয় প্যাভিলিয়নে ইউ. এস্.
এড্মিনিষ্ট্রেশনের ডাইরেক্টর মিঃ হ্যারিম্যান

সান ফ্রানসিস্কোতে বিশ্ববাণিজ্য মেলায় বোম্বাইয়ের কুমারী ডেরিকা ডিজ কর্ত্তৃক
ভারতীয় ধাতুকলা প্রদর্শন

পিকিঙের 'সামার প্যালেস' পরিদর্শনরত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন

পিকিঙের 'লেবার প্যালেসে' ভারতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনীতে চীনা বালক-বালিকা

রূপ। বর্ষার কদম্ব রেণু সম্পৃক্ত অনিল কল্পিত হয়েছে তাদের পতিরূপে। বর্ষাপগমে কদম্বানিল হয়েছে অন্তর্হিত। প্রোষিতভর্তৃকা দিগ্‌বধূদের মেঘরূপ পয়োধরে বিদ্যুৎ-রূপ হার শোভা পাচ্ছে না। বিরহবিধুরা হয়ে তারা আজ ক্ষীণকায়া; তবুও তাদের সৌন্দর্য্য অনবদ্য।

বিপাণ্ডুভির্ম্লানতয়া পয়োধরৈশ্চ্যুতাচিরাভাগুণহেমদামভিঃ।
ইয়ং কদম্বানিলভর্তুরত্যয়ে ন দিগ্বধূনাং কৃশতা ন রাজতে॥

কিরাত ৪।২৪

শরতে জল ভাগের বর্ণনায় আদিকবি বলেছেন—কি নদী কি প্রস্রবণ সকলেরই গতি হয়েছে মন্থর, তাদের ধ্বনি হয়েছে নীরব—

নদীঘনপ্রস্রবণোদকানামতিপ্রবৃদ্ধানিলবর্হিণানাম্।
প্লবঙ্গমানাঞ্চ গতোৎসবানাং ধ্রুবং রবাঃ সম্প্রতি সম্প্রনষ্টাঃ॥

রামা-কিষ্কি ৩১।৪৩

বাল্মীকি ও কালিদাস উভয়েই নদীর সঙ্গে কামিনীর অপরূপ রূপের তুলনা করেছেন। চঞ্চল মীনকুল যেন তাদের মেখলা—

মীনোপসন্দর্শিতমেখলানাং নদীবধূনাং গতয়োঽদ্য মন্দাঃ।

রামা-কিষ্কি ৩০।৩৪

মদমত্তা কামিনী শ্রোণিভারে হয় অলসগামিনী। তেমনি বিশাল পুলিনা যে তটিনী-বধূদের নিতম্ব গুরুভার আজ তারা ঐ গুরুভারেই হয়েছে মন্থরগামিনী। প্রান্তস্থিত শ্বেত হংস শ্রেণী হয়েছে নদীবধূদের হার।

চঞ্চমনোজ্ঞশফরীরসনাকলাপাঃ পর্যন্তসংস্থিতসিতাণ্ডজপংক্তিহারাঃ
নদ্যো বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিম্বাঃ মন্দং প্রযাতি সমদাঃ প্রমদা
ইবাদ্য॥ ঋতু-৩

যেমন সুবিন্যস্তা ভরণা বরাঙ্গনা নায়কের মনকে মুগ্ধ করে তেমনি শরতে পদ্মিনীমণ্ডিত, কলহংসাকীর্ণ বাপীসমূহের সৌন্দর্য্য আদিকবিকে মুগ্ধ করেছে। হংসশ্রেণী হয়েছে যেন তাদের মেখলা, বিকসিত কমল ও কুমুদরাজি তাদের কণ্ঠহার।

প্রকীর্ণহংসাকুলমেখলানাং প্রবুদ্ধপদ্মোৎপলমালিনীনাম্।
বাপ্যুত্তমানামধিকাদ্য লক্ষ্মীর্বরাঙ্গনানামিব ভূষিতানাম্॥

রামা-কিষ্কি ৩০।৪৯

কালিদাসের কবি দৃষ্টির নিকটে প্রতিভাত হ'ল, শরদাগমে সঞ্চারিত এক অভিনব শ্রী। মত্ত হংসমিথুন, প্রস্ফুটিত কমল ও ইন্দীবর এবং প্রভাত সমীর হিল্লোলে চঞ্চল তরঙ্গমালা কবিচিত্তকে উদ্দীপিত করেছে।

সোন্মাদহংসমিথুনৈরুপশোভিতানি স্বচ্ছানি ফুল্লকমলোৎপলভূষিতানি।
মন্দপ্রভাতপবনোদ্‌গত বীচিমালান্যুৎকণ্ঠয়ন্তি সহসা হৃদয়ং সরাংসি॥

কিরাতার্জুনীয়ে দেখি সরসী প্রিয়ার দৃষ্টি শোভা হরণ করেছে। সরসী আজ কমল-নয়ন উন্মীলিত করে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি দান করছে। চঞ্চল শফরীকুলের বিবর্তন তার লোল অপাঙ্গের রূপ পেয়েছে। তাই তার দর্শনে প্রিয়ার মুখচ্ছবি কবির স্মৃতিপথে উদিত হচ্ছে।

নিরীক্ষ্যমাণা ইব বিস্ময়াকুলৈঃ সরোভিরুন্মীলিতপদ্মলোচনৈঃ।
হৃত-প্রিয়াদৃষ্টি-বিলাস-বিভ্রমা মনোঽস্য জহ্রুঃ শফরীবিবৃত্তয়ঃ॥

কিরাত ৪।৩

শরতের পুষ্পোদ্গমে স্থল ও জলভাগের সৌন্দর্য্য একটি সুন্দর উৎপ্রেক্ষামূলে বর্ণনা করেছেন কবি ভর্তৃহরি। কুসুম-নিকরে বনভূমি হয়েছে সমৃদ্ধ; প্রস্ফুটিত কমলবন সমস্ত জল-ভাগকে যেন আলো করে রেখেছে। তাতে চঞ্চল ভ্রমরকুল মধুপানে মত্ত। তাই দেখে কবির প্রতীতি হচ্ছে যেন বন-লক্ষ্মী ও জললক্ষ্মী পরম প্রীতিতে বিমুগ্ধ হয়ে পরস্পরের সৌন্দর্য্য অবলোকন করছেন।

বনানি তোয়ানি চ নেত্রকল্পৈঃ পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ।
পরস্পরাং বিস্ময়বন্তি লক্ষ্মীমালোকয়াঞ্চক্রুরিবাদরেণ॥ ভট্টি ২।৫

এখানে স্থল ভাগে ও জল ভাগে শরৎ সৌন্দর্য্যের দুইটি পূর্ণাঙ্গ রূপ অনবদ্য ভাবে চিত্রিত হয়েছে।

শরতে পুষ্প সমৃদ্ধির বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিরা সকলেই কমল কুমুদকে শরৎ শোভার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে স্বীকার করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন কবি ভিন্ন ভিন্ন রূপকের সাহায্যে এদের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন। আদিকবির বর্ণনায়, প্রভাতের সূর্য্যকরে প্রস্ফুটিত কমলের অপরূপ শ্রীতে শরৎ শোভা সার্থক রূপে ফুটে উঠেছে। রাত্রিকালে চন্দ্র-করস্নাত কুমুদরাজি নক্ষত্রনিচয়ের সৌন্দর্য্যকেও পরাস্ত করেছে।

প্রিয়সমাগমে নায়িকার মুখকমলে এক অভূতপূর্ব আনন্দ ফুটে উঠে। আর প্রিয়ের প্রবাস গমনে তাদের মুখ-চ্ছবি হয় করুণ, বিষাদপাণ্ডুর।

দিবসকরময়ূখৈর্বোধ্যমানং প্রভাতে বরযুবতি-মুখাভং পঙ্কজং
জৃম্ভতেঽদ্য।
কুমুদমপি গতেঽস্তং লীয়তে চন্দ্রবিম্বে হসিতমিব বধূনাং
প্রোষিতেষু প্রিয়েষু॥ ঋতু-২৩

প্রভাতে কমলিনী-নাথের উদয়ে প্রস্ফুটিত পদ্ম-নিকরে কবি কালিদাস দেখতে পেয়েছেন শুচিস্মিতা প্রিয়ার মুখচ্ছবি আর কুমুদিনীনায়ক চন্দ্রের অস্তগমনে ম্লানায়মানা কুমুদিনীর পাণ্ডুর দৃশ্য দেখে, প্রোষিতভর্তৃকা প্রিয়ার মলিন মুখচ্ছবি কবিচিত্তে উদিত হয়ে তাকে ব্যথাতুর করেছে। প্রভাতের তরঙ্গহিল্লোলে চঞ্চল আরক্ত কমলে ভ্রমরকুল মধুপানে মত্ত। উৎপলের এই শোভা কবি ভর্তৃহরির দৃষ্টিতে প্রদীপ্ত বহ্নির

সৌন্দর্য্যকে পরাহত করে প্রতিভাত হয়েছে। ঘনকৃষ্ণ ভৃঙ্গকুল তার শিখারূপে কল্পিত হয়েছে।

তরঙ্গসঙ্গাচ্চপলৈঃ পলাশৈঃ জ্বালাশ্রিয়ং সাতিশয়াং দধন্তি।
সধূমদীপ্তাগ্নিরুচীনি রেজুঃ তাম্রোৎপলাক্রান্তকুলবট্‌পদানি।

ভট্টি ২।২

কবি মাঘের তুলিকায় নবারুণ-রাগে আরক্ত কমলের সৌন্দর্য্য কি অপূর্ব্ব কুশলতা সহকারেই না চিত্রিত হয়েছে :— কমল কুমুদ ছাড়াও সপ্তচ্ছদ, কাশ, স্থলপদ্ম, কোবিদার বন্ধুজীব প্রভৃতি পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন কবির বর্ণনায় শরৎ শোভার অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারবি ও মাঘের দৃষ্টিতে পুষ্পিত বনশ্রেণী পেয়েছে নববধূর যৌবন-সুষমা। অলঙ্কার-বিন্যাসে জবা পেয়েছে তার বিম্বাধরের রক্তিম আভা আর বি-ষ্টিকা পেয়েছে তার ভাবাবেশে মুগ্ধ নয়নের শোভা।

অনুবনং বনরাজি-বধূমুখে বহলরাগজবাধরচারুণি।
বিকচবাণদলাবলয়োঽধিকং রুরুচিরে রুচিরেক্ষণবিভ্রমাঃ।

শিশু ৬।৪৬

কবি ভারবি দেখলেন সপ্তপর্ণপরাগে সমগ্র বনরাজি হয়েছে আচ্ছন্ন। এ যেন অভিসারোৎকণ্ঠিতা নববধূর আর এক রূপ। সপ্তপর্ণরজ ও বাণপুষ্প যথাক্রমে হয়েছে তার শুভ্র উত্তরীয় ও শুচিহাস্য—

বিপাণ্ডুসংব্যানমিবানিলোদ্ধতং নিরুন্ধতীঃ সপ্তপলাশজংরজঃ।
অনাবিলোন্মীলিতবাণচক্ষুষঃ সপুষ্পহাসাঃ বনরাজিযোষিতঃ।

কিরা ৪।২৮

বর্ষাবসানে পুষ্পোদ্গম শোভারহিত কদম্ব, কুটজ, সর্জ্জ, অর্জুন ও নীপ বৃক্ষের ম্লানিমা কবিদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে— আবার কুসুমভূষণে সজ্জিত সপ্তচ্ছদের অপূর্ব্ব শোভা শরতের শ্রীকে সার্থক করে তুলেছে।

মুক্তা কদম্বকুটজার্জুনসর্জনীপান্ সপ্তচ্ছদানুপগতা কুসুমোদ্গমশ্রীঃ।

ঋ-১৩

কাশকুসুমের শুভ্রতা কোথাও বা রূপায়িত হয়েছে শারদলক্ষ্মীর হাস্যদীপ্তিতে কোথাও বা শরৎকে ব্যজন করবার ভার তার উপর ন্যস্ত হয়েছে—

অকলয়ন্মুদিতামিব সর্বতঃ স শারদং শরদন্তরদিঙ্মুখম্।

শিশু ৬।৫৪

পুণ্ডরীকাতপত্রস্তং বিকসংকাসচামরঃ ঋতুর্বিড়ম্বয়ামাস ন পুনঃ প্রাপ তচ্ছ্রিয়ম্। রঘু ৪।১৭

সিত শতদল অবিরাজ শরতের ছত্র আর কাশ তার চামর। তা দিয়ে সে বৃথাই চামরের দ্বারা বীজমান ছত্র-শোভিত নৃপতি রঘুর অনুকরণ করেছে।

শরতে ধীর সমীরণ-স্পর্শে কোবিদারের শাখা-প্রশাখা কম্পমান। তাম্রাভ কোমল কিসলয় ও পুষ্পের সমৃদ্ধিতে সে সমৃদ্ধ। আবার তার কুসুমে কুসুমে মধুপানমত্ত মধুপকুলকে দেখে কবির চিত্ত হচ্ছে বিদীর্ণ।

মন্দানিলাকুলিতচারুতরাগ্রশাখঃ পুষ্পোদ্গমপ্রচয়কোমল পল্লবাগ্রঃ।
মত্তদ্বিরেফপরিপীতমধুপ্রসেকশ্চিত্তং বিদারয়তি কস্য ন কোবিদারঃ।

ঋ-৬

কোথাও বা সরোবরতীরের অরণ্যবীথিকা ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। তাদের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়েছে জলে। তাতে তীরভূমি মনে করছে যেন জল তার পুষ্পসমৃদ্ধি হরণ করে নিয়েছে। এই দুঃসহ পরাভব সে সহ্য করবে কেন? এর শোধ তুলবার জন্য সেও উদ্যোগ করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে স্তবকে স্তবকে স্থলপদ্ম হ'ল বিকসিত। তাদের সৌন্দর্য্য যেন জলপদ্মের শোভাকেও হার মানাল। স্থলপদ্মশোভিত স্থলভূমির এই অপরূপ শ্রী কবি ভর্তৃহরির চিত্তকে বিমুগ্ধ করেছে।

বিম্বাগতৈস্তীরবনৈঃ সমৃদ্ধিং নিজাং বিলোক্যাপহৃতাং পয়োভিঃ।
কুলানি সামর্ষয়তেব তেহুঃ সরোজলক্ষ্মীং স্থলপদ্মহাসৈঃ।

ভট্টি ২।৩

শরতে দিগন্তে বিলীয়মান সন্ধ্যার মধ্যে আদিকবি বাল্মীকি দেখেছেন অনুরাগিণী আদেশবিহ্বলা নায়িকার অপরূপ রূপ। নায়কের কোমল করস্পর্শে নায়িকার আঁখি হয় ধীরে ধীরে লজ্জা মুকুলিত, তার অঙ্গাবরণ হয় স্খলিত। তেমনি চন্দ্রকরস্পর্শে অনুরাগ ভরে সন্ধ্যা অম্বর পরিত্যাগ করছে। আকাশ তার বসন আর তারকারাজি তার হর্ষে উন্মীলিত নয়ন—

চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা। অহো রাগবতী সন্ধ্যা-
জহাতি স্বয়মম্বরম্। রামা-কিষ্কি ৩০।৪৫

আদিকবি শারদীয়া নিশীথিনীর রূপকে শুক্লবসনা নারীর অনুপম সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চন্দ্র যেন হরণ করেছে তার আননের মধুরিমা, তারকানিচয় পেয়েছে তার অপলক দৃষ্টির মনোহর শোভা আর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার শুভ্রতাও তার শুভ্র বসনের অন্তরালে হয়েছে বিলীন।

রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিতসৌম্যবক্ত্রা তারাগণোন্মীলিতচারুনেত্রা।
জ্যোৎস্নাংশুকপ্রাবরণা বিভাতি নারীব শুক্লাংশুকসংবৃতাঙ্গী।

রামা-কিষ্কি ৩০।৪৬

মহাকবি কালিদাসের দৃষ্টিতেও রাত্রির এই অনবদ্য সৌন্দর্য্য ধরা পড়েছে কতকটা ভিন্ন রূপে। তাঁর বর্ণনায় তারকারাজি রজনীর অলঙ্কারসম্ভার। মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র তার সৌম্য মুখশ্রী, সিত জ্যোৎস্না তার শুক্ল পট্টবস্ত্র।

শুধু শূন্যে, জলে, স্থলে প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করেই যে শরৎ ক্ষান্ত হ'চ্ছে তা নয় প্রাণিজগতের উপরও তার প্রভাব

সুপরিস্ফুট। বর্ষা প্রাণীদের মধ্যে এনে দিয়েছিল জড়তা, শরৎ তাদের জড়ভাব দূর করে তাদের মধ্যে এনে দিলে অপূর্ব্ব শ্রী আর প্রাণচাঞ্চল্য, তাই আদিকবি মদমত্ত বৃষভ-কুলের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

শরদগুণাপ্যায়িতরূপশোভাঃ প্রহর্ষিতা পাংশুসমুক্ষিতাঙ্গাঃ।
মদোৎকটাঃ সম্প্রতি যুদ্ধলুব্ধাঃ বৃষা গবাং মধ্যগতা নদন্তি॥

রামা-কিষ্কি ৩০।৩৮

নদীর কূল খননকারী বৃষভকুলকে দেখে কালিদাসের মনে হ'ল যেন তারা রঘুর বিক্রমের অনুকরণ করছে।

মহোদগ্রাঃ ককুদ্মন্তঃ সরিতাং কূলমুদ্রুজা।
লীলাখেলমনুপ্রাপুঃ মহোক্ষাস্তস্য বিক্রমম্॥ রঘু ৪।২২

কিরাতার্জ্জুনীয়তে শরৎ শোভান্বিত মদমত্ত বৃষের এই উৎখাত কেলিই কবিদৃষ্টিতে মূর্ত্তিমান্ দর্পরূপে কল্পিত হয়েছে।

দদর্শ পুষ্টিন্দধতীং স শারদীং স বিগ্রহং দর্পমিবাধিপংগবাম্॥

কিরাত ৪।১১

বর্ষাপগমে মৃগকুল বনপ্রান্তে বিচরণশীল। প্রস্ফুটিত উৎপলের শোভা হরণকারী তাদের নয়ন দেখে সবার চিত্ত হয়েছে উৎকণ্ঠিত।

পর্যন্তসংস্থিতমৃগীনয়নোৎপলানি প্রোৎকণ্ঠয়ন্ত্যপবনানি মনাংসি পুংসাম্

ঋতু—১৪

ভারবির বর্ণনায় পাই, মৃগীরা মধুকণ্ঠী গোপীদের গীতে মুগ্ধ হয়ে শস্য ভক্ষণে বীতস্পৃহ হয়েছে—

কৃতাবধানাঞ্চিতবর্হিণধ্বনৌ সুরক্তগোপীজনগীতনিঃস্বনে।
ইদঞ্জিঘৎসামপহায় ভূয়সীং ন শস্যমভ্যেতি মৃগীকদম্বকম্॥

কিরা ৪।৩৩

শিশুপালবধকাব্যেও কৃষক বধূদের গীতে প্রসক্ত মৃগ-যূথের অনুরূপ একটি চিত্র ফুটে উঠেছে—

বিগত শস্যজিঘৎসমঘট্টয়ৎ কলমগোপবধূর্ন মৃগব্রজম্।
শ্রুততদীরিতকোমলগীতকধ্বনিমিষেঽনিমেষবক্ষমগ্রতঃ॥

শিশু ৬।৪৯

ভর্ত্তৃহরি দেখছেন মৃগকুল একমনে ভ্রমরগুঞ্জন শ্রবণ করছে। তাদের নিকটেই যে ব্যাধ উপস্থিত সে বিষয়ে তারা আদৌ অবহিত নয়। পক্ষান্তরে ব্যাধেরাও হংসের মধুর কাকলীতে আকৃষ্ট হয়ে মৃগবধের জন্যে শরসন্ধান করতেই ভুলে গেছে।

দত্তাবধানং মধুলেহিগীতৌ প্রশান্তচেষ্টং হরিণং জিঘাংসুঃ।
আকর্ণয়ন্নুৎসুকহংসনাদান্ লক্ষ্যে সমাধিং ন দধে মৃগাবিৎ॥

ভট্টি ২।৭

পক্ষিকুলের মধ্যে মরালকে কবিরা সকলেই শরৎশোভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে স্বীকার করেছেন। আদিকবির বর্ণনায় চক্রবাক ও সারসকে দেখি মরালকুলের ক্রীড়াসহচর রূপে। মহানদীর তীরে চক্রবাকের সঙ্গে ক্রীড়ারত হংসদের শোভা কবির নয়ন মুগ্ধ করেছে।

মহানদীনাং পুলিনোপযাতৈঃ ক্রীড়ন্তি হংসাঃ সহ চক্রবাকৈঃ।

রামা-কিষ্কি ৩০।৩১

কোথাও বা সারসের কূজনে নদীবক্ষ হয়েছে মুখর। শরদাগমে মানস-প্রত্যাবৃত্ত হংসেরা হৃষ্টচিত্তে তাদের এই আনন্দোৎসবে যোগ দিতে নদীগর্ভে নিপতিত হচ্ছে।

সসারসারাবনিনাদিতাসু নদীষু হংসাঃ নিপতন্তি হৃষ্টাঃ।

রামা-কিষ্কি ৩০।৪২

শরতে কেলিমত্ত হংসের গতি কালিদাসকে মুগ্ধ করেছে। অঙ্গনাদের সুললিত গতিও তাদের গমনভঙ্গীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে—

হংসৈর্জিতা সুললিতা গতিরঙ্গনানাম্। ঋতু-১৭

ভট্টিকাব্যে দেখতে পাই হংসশ্রেণী কোথাও বা শ্বেতপদ্মের, আবার কোথাও বা শুভ্র ফেনপুঞ্জের অন্তরালে লীন। তারা দৃষ্টিগোচর না হলেও তাদের মধুরকাকলী শ্রবণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করছে আর তা থেকেই তাদের অস্তিত্ব সহজে অনুমিত হচ্ছে।

সিতারবিন্দপ্রচয়েষু লীনাঃ সংসক্তফেনেষু চ সৈকতেষু।
কুন্দাবদাতাঃ কলহংসমালাঃ প্রতীয়িরে শ্রোত্রসুখৈর্নিনাদৈঃ॥

ভট্টি ২।১৮

বর্ষাত্যয়ে ময়ূরেরা বিষণ্ণচিত্তে নৃত্য পরিত্যাগ করেছে, তাদের সৌন্দর্য্য হয়ে গেছে ম্লান, পক্ষান্তরে হংসদের কলকাকলী সকলেরই চিত্ত জয় করছে। মীনকেতনও বুঝি তাই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

নৃত্যপ্রয়োগরহিতাঞ্ছিখিনো বিহায় হংসানুপৈতি মদনো মধুরপ্রগীতান্।

ঋতু-১৩

সদ্‌গুণই মানুষের চিত্তজয়ে সমর্থ হয়। বর্ষাত্যয়ে কেকা-রবকারী শিখিকুলের স্বর হয়েছে কর্কশ, পরন্তু কামমত্ত হংসের কলস্বর সকলকেই করছে আকৃষ্ট। ক্ষণিকের পরি-চয়েও হংসেরা কলকাকলী ধ্বনিতে সবার চিত্ত এক নিবিড় মাধুর্য্যে ভরে দিয়েছে। ভারবির বর্ণনায় দেখি দীর্ঘকালের পরিচিত ময়ূরদের অশ্রদ্ধা করেও সকলে হংসদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে—

বিহায় বাঞ্ছামুদিতে মদাত্যয়াদরক্তকণ্ঠস্য রুতে শিখণ্ডিনঃ।
শ্রুতিঃ শ্রয়ত্যুন্মদহংসনিঃস্বনং গুণাঃ প্রিয়ত্বেঽধিকৃতাঃ ন সংস্তবঃ॥

কিরাত ৪।২৫

কবি মাঘ বলেছেন, সময়ই প্রাণিগণের মধ্যে সবলতা ও দুর্ব্বলতা সঞ্চার করে এই শাশ্বত বাণীর সার্থকতা সম্পাদন

করে যেন শরতে হংসের স্বর হয়েছে মধুর আর নিস্তেজ ময়ূরের স্বর হয়েছে কর্কশ।

সময় এব করোতি বলাবলং প্রণিগদন্ত ইতীব শরীরিণাম্।
শরদি হংসরবাঃ পরুষীকৃত স্বরময়ূরময়ূররমণীয়তাম। শিশু ৬।৪৪

জলে স্থলে আকাশে শরৎ সুষমার এই বৈচিত্র্য ভাগবতকারের বর্ণনায় গৌণ স্থান লাভ করেছে। তাঁর দৃষ্টিতে শরতের সৌন্দর্য্য বিষ্ণুভক্তের মনে পরম আনন্দের সঞ্চার করেছে আর তাতেই তার সার্থকতা প্রতিপাদিত। ভক্তের মনোমুকুরে হ্লাদৈকময়ী ভগবন্মূর্ত্তি প্রতিফলিত। সেই চিত্তের মাধুর্য্য বর্ণনাই ব্যাসদেবের শরৎ-বর্ণনায় মুখ্য।

শরদাগমে আকাশ থেকে মেঘ দূরীভূত হয়েছে। কৃষ্ণভক্তিতে যেমন সমস্ত অশুভ দূর হয়ে যায় তেমনি শরৎ কৃষ্ণমেঘজালকে অপসারিত করে সর্ব্বকল্যাণের নিধানরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছে।

ব্যোমোহব্দ্রং ভূতশাবল্যং ভুবঃ পঙ্কমপাংমলম্
শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাশুভম্। ভাগবত ১০ম।২০শ।৩৪

কোথাও বা জলহারা নবনীত শুভ্র মেঘখণ্ড আকাশের কোলে ভেসে বেড়াচ্ছে। কবির দৃষ্টিতে তারা সংসারত্যাগী নিরাসক্ত নিষ্পাপ মুনির মত পবিত্র।

সর্ব্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চসঃ।
যথা ত্যক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিল্বিষঃ। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম।২০শ।৩৫

এই ভাবে দেখা যায় বাল্মীকি থেকে সুরু করে কবিপঞ্চক মূলতঃ জলে, স্থলে, আকাশে ও প্রাণিজগতে শরতের বহুধাবিভক্ত সৌন্দর্য্যকেই উপলব্ধি করেছেন। এই বিচিত্র সৌন্দর্য্যরহস্যে তাঁরা এতই অভিভূত হয়েছেন যে, তাতেই তাঁরা পেয়েছেন ব্রহ্ম লীলারসের তুল্য আস্বাদ। তাই এই সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যেই তাঁরা অসীমের পরিপূর্ণ প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এ বিষয়ে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের সঙ্গে তাঁদের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বাল্মীকি, কালিদাস, ভারবি, ভর্তৃহরি ও মাঘ শরতে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়-আশ্রয়ী শ্রীতে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করেছেন। প্রকৃতির এই মনোজ্ঞ বেশ ভাগবতকারের দৃষ্টিবহির্ভূত ছিল না বটে, তবে ভক্তের দৃষ্টিতে ভক্তি-উদ্বেল চিত্তের মাধুর্য্যের কাছে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হয়েছে উপমেয়।

শারদোৎসব

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

কোথা উৎসব কোথা আনন্দ উল্লাস কলরব,
দ্বারে সমাগত, চির প্রার্থিত মধু শারদোৎসব।
পূজা-উপাচার, অর্ঘ্য পুষ্প, ধূপ দীপ, চন্দন;
পূর্ণ রয়েছে মঙ্গল ঘট—প্রস্তুত শুভ অভিষেক;
হাসিগান-ভরা আলোকোজ্জ্বল শত দিঠি অনিমেষ;
রয়েছে জনতা, নেই জীবনের জাগ্রত স্পন্দন।
নীল নির্মেঘ উদার শান্ত গগন-সরণী বাহি—
কাশ-কুসুমিত ব্রহ্মপুত্র জাহ্নবী অবগাহি,
হলুদ ধান্য-মঞ্জরী ভরা সবুজ শস্যক্ষেতে
শিউলী অতসী সুরভি-উতল শ্যামল কুঞ্জপথে,
হিমানী তুহিন শৈলশিখর অক্লেশে অবতরি।
শারদলক্ষ্মী এসেছে বঙ্গে আনন্দ সঞ্চারি।
বাজিছে বাদ্য উদ্দীপনায়, উতরোল উৎসব;
মৃন্ময়পটে চিন্ময়ী রূপ হয় না তো উদ্ভব?

শশী মাষ্টার

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দূরসম্পর্কীয় ভাই যতীশ এসে ধরল, দাদা, শশী মাষ্টারের কাছে একবার যাবেন আমার সঙ্গে? চলুন না, এখন ত আপনার হাতে তেমন কাজ নেই।

ব্যাপারটা কি—হঠাৎ এমন জরুরি তাড়া?

আর বলেন কেন, ছেলেটা টেষ্টে সুবিধে করতে পারে নি—হেড মাষ্টার কিছুতেই ওকে এলাউ করবেন না। দেখা যাক যদি বলে-কয়ে—

কিন্তু বলে-কয়ে পাঠালেই কি ছেলে পাস হয়ে যাবে?

যায় বৈকি দাদা—এমন ত হামেশাই হচ্ছে। টেষ্ট পরীক্ষাটা শক্তই হয় ত। তা ছাড়া ছেলে ধনুকভাঙা পণ করেছে—এলাউ না হলে একদিক পানে চলে যাবে।

ছেলের ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞার কথা শুনে অবশ্য বিস্মিত হলাম না। এমন অনেক ছেলেই এ হেন অবস্থায় পড়ে এই রকম শক্ত শক্ত প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ করে অভিভাবকদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। ওদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে কতখানি আগুন জ্বলে সে জানি না—তবে তাপটা যেন মাত্রা ছাড়িয়েই যায়। একবার যেন বলেছিলামও প্রকাশ্যে, এই আগুনটা যদি সারা বছর জ্বালিয়ে রাখতে পারতে ত…

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের তাপকে ওরা এমনই তীব্র করে তুলতে পারে যার সঙ্গে সারা বছরের তাপটা পাল্লা দিতে পারে না। বুঝলাম—ভ্রাতুষ্পুত্রটিও নাটকীয় মুহূর্তটি ভাল ভাবেই তৈরি করেছেন, শশী মাষ্টারের শরণাগত না হয়ে উপায় নাই।

কিন্তু আমাকে আর কেন?

আপনি গেলে অনুরোধের গুরুত্ব বাড়বে। হাজার হোক, কলেজে প্রফেসারি করেন।

হাঁ—মাষ্টারের সম্মতি যদি আদায় করতে হয় ত অনুরোধের আঁকশিটাকে শক্ত করতেই হবে। গাছের মোটা ডাল নোয়াতে হলে ঢিলে বাঁধনের আঁকশি নিলে চলবে না।

জানি—শশী মাষ্টার লোকটি নিতান্ত অসামাজিক। সংসারী মানুষ, কোনদিন ওঁর ছায়া মাড়ায় না—সংসার-বোধ মাষ্টারের বেশ খানিকটা কম বলেই। দোতলার লম্বা একটি ঘরে আকণ্ঠ বই বোঝাই রয়েছে—তাক আলমারি টেবিল চেয়ার দুয়ারের মাথা ছাপিয়ে বই উপচে পড়েছে মেঝেতে। একটি তক্তাপোশ—তার একাংশে স্বল্পপরিসর শয্যা ঘিরে বইয়ের রাশি।—কথায় বলে হরির লুঠ; এ ঘরে এলে মানুষের মনে হবে শুধু বাতাসা-পাটালিতে নয়—হরির লুঠ বইয়েতেও দেওয়া সম্ভব। যে সব জ্ঞানের তরঙ্গ অসংখ্য পুস্তক-পত্রাঙ্কে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে—তাদের মুক্তিদাতা যেন একমাত্র শশী মাষ্টার। তিনি ছাড়া লোকই-বা কে আছে গ্রামে? সবাই সংসার নিয়ে ব্যস্ত। সংসারের বাইরে যে একটা রাজত্ব চলছে তার হিসাব রাখার দায় যে মহা দায়ই সে বোধ কয়জনেরই বা আছে আর তা বহন করার ক্লেশ কেন ভোগ করবে সংসারী মানুষ! গ্রামের ব্যতিক্রম এই সংসার-বিচ্ছিন্ন মানুষটি নিজেকে নির্ব্বাসিত করেছেন দ্বিতলের এই ঘরখানিতে। কর্ম্মব্যস্ত দিনের সকাল সন্ধ্যার অবসর এবং ছুটির দিনের সমস্তটাই এই ঘরে কাটে শশী মাষ্টারের। শুধু বই পড়া নয়—শুনি খানিকটা সময় জপধ্যান পূজাতেও যায়। বাড়ীতে একটিমাত্র দোতলা ঘর—পূব-দক্ষিণ খোলা। অবারিত আলো-হাওয়ার পিপাসায় জন্য না হোক—বাড়ীর কুচো-কাঁচা ছেলেমেয়ে ও কর্ত্তা-গিন্নীদের কোলাহল কোন্দল থেকে নিষ্কৃতিলাভের ইচ্ছা শশী মাষ্টারের প্রবলই ছিল—তাই কোলাহলের অপর পারে তাঁর বাসা। রাশভারি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ—উনি ঘরে থাকলে ছেলেমেয়েরা সামনের ছাদে কদাচিৎ আসে। যদি আসে ত ভয়ে ভয়ে বলে, আপনার ভাত বাড়া হয়েছে জ্যেঠামশাই। কিংবা, একজন লোক আপনাকে ডাকছে বাইরে। কিংবা…

ওঁর ছোট ভাইপোটিকে ধরলাম সদর দরজায়। বললাম, খোকা তোমার জ্যেঠাকে গিয়ে বল ত—দু'জন লোক দেখা করতে এসেছেন।

দশ বছরের ছেলে জ্যেঠতাতের আচার-আচরণ সম্বন্ধে ওয়াকিব-হাল। বললে, জ্যেঠা পড়ছেন যে।

তা হোক—খবর দাও গে।

অনেক সাধ্যসাধনা করতে ছেলেটি ভিতরে গেল এবং খানিক পরে ফিরে এসে বললে, আসুন।

মস্ত উঠানের পর অনেকগুলি একতলা ঘর রয়েছে সারি সারি। সেকালের পাতলা ইটে তৈরি ঘর—পলস্তারা নেই। ইটে নোনা ধরেছে এমন সাংঘাতিক ভাবে যে আধখানা ভিৎই কে যেন কুরে কুরে ফোঁপরা করে দিয়েছে। সেকালের চওড়া ভিৎ বলে ঘরগুলি ভূমিসাৎ হয় নি। লম্বা টানা একতলার পাশ দিয়ে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। অপ্রশস্ত—ইট-খসা। সাবধানে উঠতে হয়। দোতলার সামনে রয়েছে একতলার বিস্তীর্ণ ছাদ—তার সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে আকাশ আর আলো। একতলার বহু পুরাতন জরাজীর্ণ জগৎ পেরিয়ে এক নিমেষে এসে পড়লাম যেন চির নূতন কোন দেশে!

আমাদের পায়ের শব্দে শশী মাষ্টার দোরগোড়ায় এসে অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন, আসুন।

চেয়ারের উপর থেকে বইগুলি তুলে বললেন, বসুন।

বসব কি—ঘরের শোভা দেখেই চক্ষুর পলক আর পড়ছে না।

কি অগোছালো বইয়ের স্তূপ। মলাট-ছেঁড়া, পাতা-খসা—হাজার হাজার বই এধার-ওধার চারধারে ছড়ানো। একটা আলনা রয়েছে—তাতেই কেবল জামা-কাপড়—সেখানে বই রাখবার সুবিধা হলে বোধ করি পরিধেয় থাকত না। আর সর্ব্বত্র বই—বই। পুরাতন বইয়ের গন্ধে ঘরখানি ভরপুর।

আমাদের বিস্ময় দেখে শশী মাষ্টার বললেন, ওই একটা সখ ছিল—পড়া। ছেলেবেলা থেকে যা পেয়েছি কুড়িয়েছি—কাউকে ফেলতে পারি নি।

আপনার সময় নষ্ট করলাম। ক্ষমা-প্রার্থনার সুরে বললাম।

সময়! হাসলেন শশী মাষ্টার। হাঁ, ছেলেবেলায় যেন পড়েছিলাম—সময় আর স্রোত অপেক্ষা করে না কারও জন্যে।

বললাম, কিন্তু অনর্থক নষ্ট হওয়ার সার্থকতা কি?

আপনি ত কলেজে পড়ান, বলতে পারেন ওকথা। আমাদের সময় আর সার্থক হতে পারে কই! তিন বার এম এ দিলাম—প্রাইভেট—তিন বারই পারলাম না। সময় নষ্ট হয় নি বলব কোন্ মুখে?

কিন্তু আপনার মত বয়সে—

বিদ্যাশিক্ষার আবার বয়স কি—সারাজীবনই ত শিক্ষা নেওয়া যায়। তবে আমরা কিনা সারা বছরই পরীক্ষা করছি ছেলেদের—নিজেদের বোধশক্তি ওরই চাপে কখন ভোঁতা মেরে যাচ্ছে।

একথা সেকথায় অনেকক্ষণ কাটল। যতীশ ইতিমধ্যে বারকয়েক পা টিপেছে। সময় নষ্ট হলে শশী মাষ্টার আক্ষেপ না করুন, আমাদের বাজার-হাট কেনাকাটা ইত্যাদি টুকিটাকি কাজ রয়েছে, বহুক্ষণ বসে বসে কারও জীবন কাহিনী শুনে সময়ের অপব্যবহার করতে পারি না।

অবশেষে আমাকে সচেতন করতে না পেরে যতীশ গলা ঝেড়ে বললে, আজ্ঞে আপনার কাছে এসেছি—

হাঁ, হাঁ। কি জন্য এসেছেন বলুন? অপ্রতিভ শশী মাষ্টার মাথা চুলকাতে লাগলেন।

'আমার মেজ ছেলে সুশীল', যতীশ গলাটা ঝেড়ে বক্তব্য শেষ করলে, 'আপনাদের ইস্কুলেই পড়ে কিনা'।

শশী মাষ্টার সবিস্ময়ে বললেন, তাই নাকি? তা কোন ক্লাসে—?

আজ্ঞে এইবারই ত ম্যাট্রিক দেবে। তা—

ওহো সুশীল! তাই বলুন।—আলো দেখতে পেয়ে উৎসাহিত হলেন শশী মাষ্টার। একটু থেমে বললেন, তা সত্যি বলতে কি ছেলেটা পড়াশোনায় একটু মাটো। এবার ভাল মার্ক রাখতে পারে নি বলে এলাউ করি নি। একটু নজর রাখবেন ওর উপর—আসছে বার যাতে ভাল ভাবে পাস করে যায়।

আজ্ঞে এইবারই একটা চান্স দিন না দয়া করে।

শশী মাষ্টার অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন মিনিটখানেক। বললেন, বলেন কি, ভাল ভাবে তৈরি না হয়েই···না না, এমন অনুরোধ করবেন না। ছেলের আখের নষ্ট করবেন না। টায়েটোয়ে যদি পাসই করে—থার্ড ডিভিসনে—তাতে লাভটা কি। শুনি ত অনেক আপিসে আজকাল থার্ড ডিভিসন নিচ্ছে না।

যতীশ বললে, আপনি ওকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন—আমরা কেয়ার নেব'খন—যাতে সেকেণ্ড ডিভিসনটা হয়।

বলেন কি—সারা বছরে যে রেজাল্ট ভাল করতে পারলে না সে দু'তিন মাসে মেক-আপ করবে? না যতীশবাবু, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আপনারা ছেলের সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন—

যতীশ তাড়াতাড়ি বললে, না না, উচ্চ ধারণা আমি পোষণ করি না, তবু একটা চান্স দিলেই বা ক্ষতি কি?

'ক্ষতি আছে'। শশী মাষ্টারের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল। 'ইস্কুলের সুনাম—এটিও দেখতে হয় আমাদের। সরকারের সাহায্য যাতে বজায় থাকে—সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। সেণ্ট পারসেণ্ট ছেলে পাঠালে পাস করে যদি টোয়েন্টি কি টোয়েন্টি-ফাইভ—সেটা ইস্কুলের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা?'

প্রশ্নটা আমার পানে চেয়েই করলেন। আত্মীয়ের মুখ চেয়েও প্রতিবাদ করতে পারলাম না।

তার চেয়ে ওকে ভাল করে পড়ান—আর একটি বছর। এবার কেয়ার নিন, দেখবেন, ওই ছেলেই ফার্ষ্ট ডিভিসন মেরে আসছে বার।

মনঃক্ষুণ্ণ যতীশ বললে, ছেলে বলছে এবার না হলে আর পড়বে না।

এই কথায় উচ্চ হাস্য করে উঠলেন শশী মাষ্টার।—বলেন কি! ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনিন হ'ল একমাত্র ওষুধ। রোগী যদি বলে ওষুধটা বড্ড তেতো—খাব না, তা হলে রোগ সারবে? যেমন রোগ—তেমনি চিকিৎসা। আপনি ত কলেজে পড়ান, আপনি কি বলেন?

কলেজের ছেলেরা ইস্কুলের ছাত্রদের চেয়ে স্বাধীন, তাদের ওপর খুব কড়া আইন চাপানো যায় না।

তার ফলও হচ্ছে চমৎকার! দিন দিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেমে আসছে দেখছেন ত?

কিন্তু দোষ শুধু ছাত্রদেরই? মৃদু প্রতিবাদ করলাম।

দোষ যারই হোক, নিজের দোষটুকু অন্ততঃ বুঝতে চেষ্টা করা আর বুঝে শুধরে নেওয়া উচিত কিনা?

যতীশ বললে, সে আর ক'টা মানুষ পারে! বয়স্ক মানুষরাই পারে না—তা কচি ছেলেরা!

ঠিক বলেছেন। বড়রা দুর্ব্বল বলেই ছেলেরা আব্দেরে হয়। সে আব্দার রাখতে গেলে ক্ষতি করা হয় তাদেরই।

প্রকারান্তরে শশী মাষ্টার অমত করলেন ছেলেটিকে পাঠাতে। অগত্যা আমরাও উঠলাম।

দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে এলেন শশী মাষ্টার। বললেন, আবার আসবেন সময় পেলে।

কিন্তু আপনার সময় ত কম।

হাঁ, ছেলেদের ভার নিয়েছি—বড্ডই জড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু কি করি বলুন, একটা কাজ না নিয়ে থাকলে সংসার চলে না—মনও ভরে না। বিকেলে আমার যথেষ্ট সময় আছে। তখন ছেলে পড়াই না, নিজে পড়ি। কেউ গল্প করলে শুনি, ভাল জিনিস আদায় করে নিই লোকের কাছে। আসুন না বিকেলে?

আমাকে আর আপনি আপনি কেন, আমি বয়সে আপনার চেয়ে অনেক ছোট।

আপনি ব্রাহ্মণ, বয়সে ছোট হলেও নমস্য আমার। শশী মাষ্টার হাত তুলে নমস্কার জানালেন।

বাইরে এসে যতীশ বললে, লোকটা ওই এক রকম! সংসারের অনেক ব্যাপার ওঁর মাথায় ঢোকে না। একটা বছর পড়ানোর খরচ আমাদের মত নিত্য-আনা নিত্য-খাওয়া লোকের পক্ষে টেনে যাওয়া যে কি মর্ম্মান্তিক তা উনি বোঝেন না।

কিন্তু কথাটা ওঁর মিথ্যা নয়।

আরে ভাই—সত্য নিয়ে যদি সংসারে বাস করতে হয়, তা হলে পেটে ভাত আর পরণে কাপড় জোটে না। যতীশ উষ্ণ স্বরে বললে, —আমাদের মত লোকের স্কুল-কলেজে ছেলেদের পড়ানো ত বিদ্যে-শিক্ষার জন্যে নয়—কোনমতে একটা ছাপ জোগাড় করে চাকরিতে বহাল করে দেওয়া এই হ'ল উদ্দেশ্য। এমনিতেই ত সংসারে ধারকর্জ্জ—আরও একটা বছর…

সারাটা পথ যতীশ গজ গজ করতে লাগল। বাড়ীর কাছে এসে হঠাৎ সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বললে, একটা উপায় আছে—অগত্যা তাই করতে হবে।

উপায়?

উপায়টা শুনলে সকলে হাসবে—কিন্তু এ ছাড়া গতিই বা কি! কি জানেন—দেবদ্বিজে ওঁর অসীম ভক্তি—পরম বৈষ্ণব উনি। তার সুযোগ কে না নিচ্ছে! আমিও নেব।

আমি হাঁ করে চেয়ে আছি দেখে যতীশ হেসে ফেললে। বললে, দেশে থাকেন না ত—জানবেন কি করে। ব্রাহ্মণের ছেলে যদি ওঁর পা চেপে ধরে তো কেমন উনি এলাউ না করেন দেখি!

আশ্চর্য্য হবারই কথা। শিক্ষা সম্বন্ধে শশী মাষ্টারের অভিমতটা নিতান্ত ফেলো নয়। শিক্ষালয়ের প্রতি ওঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা—সেখানকার অণুমাত্র মর্য্যাদাহানি সইতে পারেন না অথচ তিনি যে এমন একটা ছেলেমানুষির প্রশ্রয় দেবেন—এটা কল্পনাতীত।

দু'দিন পরে সত্যই আশ্চর্য হলাম যখন যতীশ এসে বললে, দাদা কেল্লা ফতে—খোকা এলাউ হয়েছে।

বল কি?

হাঁ। তবে সোজা আঙুলে ঘি ওঠে নি—একটু বাঁকাতে হয়েছে আঙুলটাকে। খোকা গিয়ে বাঁটাতক পা চেপে ধরে বলেছে যদি স্যার না পাঠান আমাকে—এইখানেই আত্মহত্যা করব। ব্যস, মন্ত্রের মত কাজ হয়ে গেল। ওকে সঙ্গে করে ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে খাতার নাম বসিয়ে দিয়েছেন।

বললাম, উনি যে এতটা দুর্ব্বল প্রকৃতির জানতাম না।

যতীশ হাসলে। দেশে থাক না জানবে কি করে! চিরকালই উনি দুর্ব্বল। বয়স হয়ে আরও বেড়েছে দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বল না হলে স্ত্রীবিয়োগের তিন মাস পেরুতে-না-পেরুতে দ্বিতীয়পক্ষ করেন? দুর্ব্বল না হলে কুলগুরুকে ত্যাগ করে দু' দু'বার গুরু বদল করেন। দুর্ব্বল না হলে সমাজে সেবার যে গোলমাল হ'ল—তাতে একবার এ পক্ষ আর বার অন্য পক্ষে যোগ দেন? লোকটি মাষ্টার হিসেবে ভাল, কিন্তু মেরুদণ্ড নেই।

সে বিস্তৃত কাহিনী যতীশের মুখেই শুনলাম।

শশী মাষ্টারেরা ছিলেন চার ভাই। পূর্ব্বকালের একান্নবর্ত্তী পরিবারের বাঁধন ওঁদের কালে শিথিল হয়ে এসেছে একাধিক কারণে। একটা বাঁধা আয়—জমির কিংবা গচ্ছিত অর্থের সুদ অথবা পরিজনের কারও মোটা মাইনের চাকরি না থাকায় সংসারের কর্ত্তৃত্ব বার-কয়েক হাতবদল হয়ে চার ভাগ হয়ে গেল।

বড় বললেন, দিনকাল যা পড়েছে তাতে সবাই সমান টাকা না দিলে সংসার চলবে না।

মেজ শশী বললেন, সকলের আয় ত সমান নয়, সমান টাকা দিতে পারবে কেন?

সেজ বিনোদ বললে, দিতে পারলেই বা দেবে কেন? যার সংসারে পুষ্যি বেশী তারই ত বেশী দেওয়া উচিত।

এই কথায় বড় কাশীনাথ উষ্ণ হয়ে বললেন, তোদের ছোট সংসার এক দিন বড় হবে সেটা মনে রাখিস।

তখন হিস্তেমাফিক টাকা নিও আদায় করে। সেজও চড়া গলায় জবাব দিলে।

বাড়ীর মেয়েদের মধ্যেও কলহ সুরু হ'ল। কাপড়, গহনা, খাওয়া-পরা, ছেলেদের পোশাক-পরিচ্ছদ, নিজেদের খাটা-খাটুনি ইত্যাদি সব ব্যাপার নিয়ে কোলাহল বাড়তে লাগল।

বড় বললেন, আর নয়, কাল থেকে আমার রান্নাঘর আলাদা—তোদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না।

অনুজেরাও অগ্রজের পথ অবলম্বন করলে।

বৃদ্ধা মা বললেন, আমার গতি কি হবে?

কেন চার ভাই মিলে তোমার খাওয়া-পরার খরচা দেব।

কোথায় থাকব আমি? কার ঘরে?

পালা করে থাকবে এর ঘরে দু'মাস, ওর ঘরে দু'মাস।

শশী বললেন, বাড়ী বিষয় ভাগ হবার হোক, গর্ভধারিণীকে ভাগ করার দুর্ম্মতি যেন আমাদের না হয়। উনি আমার কাছেই থাকবেন।

শশীর অন্ন খেয়েই মা শেষ পর্য্যন্ত দেহ রাখলেন। মাতৃশ্রাদ্ধের

ব্যয় তাও সম্পূর্ণ বহন করতেন শশী। কারণ পৃথগন্ন হয়ে অবধি সংসার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সে বিচ্ছেদের প্রাচীর কাদা দিয়ে তৈরি নয় —সিমেণ্ট আর ইটে গাঁথা। এই প্রাচীর-ঘেরা সংসারে কিছুদিন পরে অপুত্রক শশীর স্ত্রী-বিয়োগ হ'ল। আত্মীয়েরা তখন প্রতিবেশীর ভূমিকায় সমাসীন। প্রতিবেশী-সুলভ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই অশৌচান্ত পর্য্যন্ত তারা সংসার চালিয়ে দিলে, তারপর আর কোন সম্পর্ক রাখলে না। তখন জ্ঞানের সাধক শশী পড়লেন বিপাকে। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী তিনি নন; দু'কূল রক্ষার কোন উপায় না দেখে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করলেন। আত্মীয়েরা ধিক্কার দিলে প্রচণ্ড ভাবে। নিঃসন্তান শশীর বিষয়-সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব যাদের অর্শাবে তাদের ধিক্কার দিবার হেতুটিও বোঝা যায়। ওঁদের মতে স্ত্রীবিয়োগে শশী নাকি হায় হায় করে কাঁদেন নি। স্ত্রীর স্মৃতি আজীবন বয়ে বেড়াতে পারেন তেমন প্রমাণই বা দিলেন কই। যাঁরা বিষয়-সম্পত্তির আশা রাখেন না—তেমন আত্মীয়দল বললেন, বিয়ে না করে ওঁর গতিই বা কি! সংসার-ছাড়া মানুষগুলিকে সংসারে বগাল-তবিয়তে সুস্থ রূপে জীইয়ে রাখা নিতান্ত অন্তরঙ্গজন ছাড়া কারই বা সাধ্য। যদি বল-উনি আত্মসুখপরায়ণ তাই সেবার জন্যে অস্তমিত যৌবনেও একজন সঙ্গিনী বেছে নিলেন, তাতেই বা ক্ষতি কি।

শশীও মাঝে মাঝে আক্ষেপ করেছেন, আমি দুর্ব্বল, আমি অধম তাই এমন মতি হ'ল আমার।

কথাপ্রসঙ্গে এক দিন বলেছিলেন, তোমরা ছেলেমানুষ—বুঝবে না মানুষের প্রাক্তন কর্ম্মের ব্যাপার। ফল ভোগ না করে তার উপায় কি?

কেন, যা বুঝছি অন্যায় তাকে প্রাক্তন কর্ম্মের দোহাই দিয়ে মেনে নেব কেন?

একটু হাসলেন এই কথায়। বললেন, পরমহংসদেবের একটি গল্প মনে পড়ল। শোন। এক ব্রাহ্মণ এক দিন মনস্থ করলেন সন্ন্যাস নেবেন—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খাবেন। তাঁর সঙ্কল্পের কথা শুনে ব্রাহ্মণী বললেন, সন্ন্যাস নিয়েও পেটের জন্যে যদি পাঁচ দোরে ভিক্ষে করতে হয়—তার চেয়ে এক দোরে ভিক্ষে করাই কি ভাল নয়? তাতে মেহনত কম—সময় নষ্ট হবে কম—ভগবানকে ডাকতে পারবে অনেকক্ষণ ধরে। আমাদেরও জ্ঞানচর্চ্চা ওই রকম। গৃহিণী চলে যেতেই দেখলাম—পেটের চিন্তাই সব চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠছে, রান্না, খাওয়া আর ইস্কুল। ইস্কুলে পড়াই, পুরো মন দিতে পারি না। কর্ত্তব্য-অবহেলার অনুতাপ দিনরাত পুড়িয়ে মারতে লাগল। এ ছাড়া আর উপায়ই-বা ছিল কি।

পরে অবশ্য বুঝেছি নিঃসন্তান মানুষের সবচেয়ে বড় সহায় তার সহধর্ম্মিণী। ওঁরা সংসারের হাল ধরে থাকেন বলেই ঝড়-তুফানে নৌকো চলে নির্ব্বিঘ্নে। কত ছোটখাটো তুচ্ছ ব্যাপার যা জীবনের পক্ষে শ্রেয় বলে মেনে নিতে বাধে অথচ, সেগুলির সহযোগিতা না পেলে শ্রেয়ঃলাভের তপস্যাটা নিষ্ফল হয়ে যায়। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'র মধ্যে রূঢ় বাস্তব আমাদের প্রতিনিয়তই শাসন করছে।

কিন্তু এই কুৎসা-রটনা মিলাতে-না-মিলাতে আর একটি বিপত্তি ঘটল। সেটা সামাজিক দলাদলির তাণ্ডব। সেকালের রক্ষণশীল সমাজ জাহাজে কালাপানি পার হওয়া সহ্য করতে পারত না। স্বজাতীয় কোন যুবকের এই দুঃসাহস হওয়াতে তাঁরা কঠিন হয়ে উঠলেন।

অপর পক্ষে তরুণদের নিয়ে দল গড়ে উঠল। সুরু হ'ল কর্দ্দম-নিক্ষেপ।

সমাজের মধ্যে বিদ্যায় প্রতিষ্ঠায় শশী ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তি—প্রায় পুরোভাগে ছিল তাঁর আসন। কিন্তু শশী সমাজ-সংস্কারক নন—সমাজ পরিচালনার স্বপ্নও দেখেন নি কোনদিন। বিদ্যা ওঁকে অহঙ্কৃত করে নি এ প্রমাণ বহুবার দিয়েছেন—এই উপলক্ষ্যে আর একবার দিলেন।

সমাজপতি বললেন, এই স্লেচ্ছাচার সমর্থন কর তুমি? সমাজ ধ্বংস হোক এই চাও?

শশী বললেন, সে কি—তা কখনও হয়!

তা হলে কাগজে লেখ—আন্দোলন চালিয়ে যাও।

সেই লেখা নিয়েই বাধল গোল।

বিপক্ষ দলের শিশির বললে, কাকাবাবু, এটা আপনার কাছে আশা করি নি। আপনি ত ওঁদের মত কূপমণ্ডূক নন। নানা জ্ঞানলাভ করে উদার হয়েছেন—আপনি কি করে লিখলেন, বিদেশ-যাত্রার কুফল সমাজে অনুভূত হবেই। নানান্ জাতির সঙ্গে মিশলেই কি জাত যায়? ছুঁৎমার্গকে আপনি পরম কল্যাণজনক মনে করেন?

শশী বিব্রত হয়ে বললেন, না না, তা কেন! তবে এতটা উচ্ছৃঙ্খল হওয়া—

বেশ ত—শাসন করুন আমাদের। শিক্ষা দিন—দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। আমরা নতুন,—বাঁধন ছিঁড়ে বেশি লাফালাফি করে থাকি যদি, নতুন বাঁধন দিয়ে বুঝিয়ে দিন—কিসে হিত কিসে অহিত।

শশী মাষ্টার দ্বিতীয় প্রবন্ধ কিন্তু লিখলেন না।

সমাজপতি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, শশী, তুমিও ওদের সমর্থন করছ?

না। আমি ওদের বুঝিয়ে দেব কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ। বাড়ীর ছেলে যদি দুষ্টুমি করে তাকে বাড়ীর বার করে দিয়ে সমস্যা মিটানো যায় না। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—

সমাজপতি রুষ্ট হয়ে বললেন, বুঝেছি তোমার ভীমরতি হয়েছে।

এদিকে ছেলেরাও তাঁর কথা পুরোপুরি মেনে নিলে না। বললে, ওদের গোঁড়ামি ভাঙব আমরা। সমাজের মাথায় চড়ে ওরা মনে করেছে যা খুশী তাই করবে? হাড়বজ্জাতের দল! এই সমাজ আমরা ভাঙব।

ভাঙবে কেন—ওর দোষ-ত্রুটি শুধরে নূতন করে তৈরি কর। শশী মীমাংসার ভঙ্গিতে বললেন।

তা হয় না। পুরনো পচা বাড়ীর ভিৎ সুদ্ধ উপড়ে না ফেললে নূতন ইমারত গড়া যায় না।

অনেক বুঝালেন শশী। শেষ অবধি এই মন্তব্য শুনলেন, যান যান মশাই, আপনিও ত কুয়োর ব্যাঙ। লেখাপড়াই শিখুন আর মাষ্টারিই করুন বাইরের জগতের ধারণা করবেন কেমন করে!

শশী মাষ্টার ফিরে এলেন নিজের ঘরে। নিজের সঙ্কীর্ণ ঘর ছাড়া তাঁর জায়গা কোথায়? সংসারে প্রাচীর উঠেছে বহুকাল, আজ সমাজের সংযোগ-সেতুটি ভেঙে পড়ল। দু'পক্ষ থেকে অবিরাম চলছে হাসি শ্লেষের কষাঘাত···ঘরের মধ্যে আসন পাতলেন শশী মাষ্টার।

জ্ঞান-জগতের আর একটি প্রকোষ্ঠে এসে পৌঁছলেন। তিক্ত মন অবসন্ন দেহ আর নিঃশেষিত শক্তি নিয়ে সেই ঘরের ধূলিময় মেঝের উপর বসলেন। রিক্ত ঘর—আকাশের বিস্তার নিয়েই তার চারটি দেয়াল—আকাশের নীল রঙ ভেসে বেরোচ্ছে রিক্ততা। মন হু হু করে, তবু মনে হয় এই শূন্যতার পারেও কি বস্তুর প্রকাশ চোখে পড়বে না? নীলের মাঝেও ত পাটল মেঘের আবির্ভাব হয়; একদা নিবিড়-জলদ-জালে আবৃত প্রকৃতি শ্যাম স্নিগ্ধ রূপে হৃদয় মন ভুলিয়ে দেয়। এই শূন্যতা মন্থন করে সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে। চেয়ে থাকেন উঠানের শিউলি গাছের দিকে। অন্তরের দৃষ্টি খুলে যায়। দেখেন, আকাশের আলো আর মাটির রস নিয়ে শিউলি তার পাতায় ঘন সবুজের সমারোহ ছড়িয়ে দেয়—শাখা ভরে ফুটিয়ে তোলে গৈরিক-বৃন্ত সাদা ফুলের রাশি। সে ফুল শাখার উচ্চাসনে বসে সৌন্দর্য্যের ঔদ্ধত্যে মানুষকে আকর্ষণ করে না, মাটিতে বিছিয়ে পড়ে সৌরভে ভরিয়ে তোলে দিক। যার দানে সমৃদ্ধ তারই পায়ে প্রণাম জানিয়ে অলঙ্কৃত করে তার আসনখানি।

বইয়ের আলমারির পাশে একখানি ছবি টাঙিয়ে দিলেন। সকাল সন্ধ্যায় ধূপধুনা জ্বেলে আসন পেতে বসতে লাগলেন সেই ছবির নিচে। শূন্যতার মাঝে লঘু মেঘ-খণ্ডের মত কিসের আভাস যেন মাঝে মাঝে ভেসে আসে আর ভেসে যায়। ধরি ধরি করে সে আলেয়াকে ধরা যায় না। অথচ সে আলেয়া নয়—রহস্য নয়—অশান্তি ত নয়ই।

কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিলেন।

গুরুদেব, কেন এ আকুতি? সত্যিই কি ঈশ্বর আছেন? তাঁকে দেখা যায়?

যায় বৈকি। ভক্তেরা সব দেখেছেন। প্রহ্লাদ, ধ্রুব—

আপনি দেখেছেন?

আমি? গুরু আমতা আমতা করেন। আমার সে সাধনা কই—কেমন করে দেখব! তবে সাধনা করলে অবশ্যই তাঁকে পাওয়া যায়।

সাধনা করেন না কেন?

সংসারী গুরু বিপদে পড়েন—কি যে উত্তর দেবেন ভেবে পান না। অবশেষে বলেন, সে ত একজন্মের সাধনায় হয় না।

তা হলে এ জন্ম নিয়ে কি লাভ আমার!

লাভ? এই সংসারও ত কর্ম্মক্ষেত্র—এখানে জনক রাজার মত থাকতে হয়। সংসারে থেকেও নির্লিপ্ত।

শশী বুঝলেন, এই পথের বেশী দূর পর্য্যন্ত জানা নেই গুরুর।···

এর পর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গেলেন পুরীধামে। রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। পুনর্জন্ম না হোক—পথের আরও খানিকটা নজরে পড়ল।

নরসমুদ্রের মাথায় ভাসছে তিনটি মাত্র ফুল। জ্ঞান আর সিদ্ধির ঐশ্বর্য্যে ভরা বস্তু। চৈতন্যের রূপটি জড়বস্তুর অনুকৃতিতে মিলবে না তাই কর্ম্মেন্দ্রিয় অবয়বহীন। এ যেন—

অচক্ষু দেখিতে পান—অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।

পদহীন অথচ গতির এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়ে নি ইতি-পূর্ব্বে। চঞ্চল হয়ে উঠেছে জনতা—সমুদ্র ঢেউয়ে ঢেউয়ে বিক্ষুব্ধ। বিরাট স্রোতে ভেসে চলেছে জীবজগৎ—যাঁর চৈতন্যে বিশ্বের চেতনা —তাঁরই পরম রূপটি রথযাত্রার গতিপথে চোখে পড়ল।

এক বৈষ্ণব সাধুর আশ্রমে উঠেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজ, জীবজগৎ কি এমন ভাবেই চলছে?

হাঁ। সমুদ্রের ঢেউ দেখলে ত? ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লীলা-নিকেতন। তিনি একরূপে সৃষ্টি করে অন্যরূপে আস্বাদ করছেন। একটি আগুনের অনন্ত কোটি স্ফুলিঙ্গ।

এই স্ফুলিঙ্গ সবই কি সেই আগুনে মিশতে পারে?

যতক্ষণ মিশতে না পারে ততক্ষণই চলে তার মেশার সাধনা।···

গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ফিরে এলেন দেশে। ঘরের মধ্যে আর একখানি ছবি টাঙালেন। লোকে বললে, গুরুত্যাগী—দুর্ব্বল চিত্ত।

বছর দুই পরে এই দুর্ব্বলতাকে প্রমাণ করলেন এক কালী-সাধকের কাছে পুনর্ব্বার দীক্ষা নিয়ে।

সাধক বললেন, এই কালীই সৃষ্টিরূপা পরমাপ্রকৃতি শক্তি। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে শক্তি সঞ্চার না হলে লীলা প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না। লীলাই ত শোভা—জলের যেমন ঢেউ। প্রত্যেক জীবেই আছেন ভগবান। যত্র জীব তত্র শিব—এই উপলব্ধি যতক্ষণ না হবে তোমার মুক্তি নেই। এই বিদ্যাই যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; পরা বিদ্যা। অপরা জ্ঞান জাগতিক নাম রূপের আবর্ত্তে খালি পাক খাইয়ে মারে। সংশয়, তর্ক, অহঙ্কার, প্রচার—এ সবের মধ্যে পড়েই জীবের শান্তি নেই।

ছবির সংখ্যা বাড়ল ঘরে। জপ, স্তোত্রপাঠ, পূজা এ সবে বহু সময় ব্যয় হয়। বৈকালে নিয়মিতভাবে পড়েন চৈতন্যচরিতামৃত, তন্ত্র, পুরাণ, উপনিষদ আর পাশ্চাত্য দর্শনের বই। কেউ ঘরে এলে আলাপ চলে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত। আলাপ শেষে বলেন, গরীবের ক্ষুদ-কুঁড়ো যদি অনুগ্রহ করে—

ঘরের মানুষ একটু বিপদে পড়েন। শশী মাষ্টার হাসিমুখে ত্রাণ করেন সেই বিপদ থেকে। বলেন, আজ আমার খিদের জোর নেই কম করে খাবার দেবে। যা আছে সকলে ভাগ করে খাই এস।

এত করেও কিন্তু সর্ব্বজীবে ভগবৎসত্তা অনুভূত হয় না।

আপন-পর ভেদাভেদ মুছে যায় না। কর্ত্তব্যের অহঙ্কার দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠে। চরম পরীক্ষা হয়ে গেল এক দিন।

সেদিন স্ত্রী বললেন, একজন বামুনের মেয়ে এসেছিল বাড়ীতে। তোমার কাছে তার নালিশ আছে।

নালিশ? আমার কাছে!

হাঁ। তার ছেলেকে নাকি তুমি স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ?

ছেলেটির নাম কি ভূপেন? প্রতিপ্রশ্ন করেন শশী।

হাঁ—তারই মা এসেছিল। বেচারী ভারি কান্নাকাটি করছে। ছেলেটিকে কোন রকমে ইস্কুলে রাখা যায় না?

না। ওপর থেকে হুকুম এসে গেছে। ছেলেটি ভারি বদ। যা করেছে—ইস্কুলের আইনে তার উচিত শাস্তিই হয়েছে।

তাকে শাস্তি দেবার সময় তার মায়ের কথা ভেবেছিলে?

ইস্কুলের আইন ছেলেদের নিয়ে—অভিভাবকদের নিয়ে নয়।

তবু তাঁরা কেন ইস্কুলে ছেলে দেন—সেটাও ভেবে দেখা উচিত নয় কি? ছেলে উপায় করে সংসার চালাবে, পেটে দু'মুঠো ভাত, পরণে একখানি দশি জুটবে—এই না আশা! আর বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে—তাঁর আশা কতখানি জান?

একজনের জন্যে সব ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারি না।

তুমিই বা শাস্তি দেবার কে? অন্যের ভবিষ্যৎ দেখবার ক্ষমতাই বা কে দিলে তোমায়? বিধবার চোখের জল মোছাতে না পারলে যদি—কিসের তোমার জপ ধ্যান পূজো পাঠ? তুমিই তো বল ভগবান আছেন সর্ব্বভূতে—ওই ছেলেটি কি দুনিয়া ছাড়া?

এসব প্রশ্ন স্ত্রী করে নি—আপন মনেই করেছিলেন শশী। কর্ত্তব্যের আত্মপ্রসাদে যে প্রদীপ জ্বেলে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন—তার তলায় ছিল খানিকটা ছায়া। ছায়া দীপের তলাতেই থাকে। সেটি বৃহৎ হয়ে সবকিছুকে ঢেকে ফেলছে। কেন তিনি অসম্মান করলেন ব্রাহ্মণের? কেন নিরুপায় করলেন বিধবাকে? এই কর্ত্তব্যজ্ঞান কি অহঙ্কারের নামান্তর নয়?

পরের দিন হৈ হৈ উঠল গ্রামে—একটি ছেলে পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যার কারণ—প্রশ্নপত্র চুরির অপরাধে ছেলেটির রাষ্টিকেশন হয়েছিল ইস্কুল থেকে। ছেলেটি অপমান সইতে পারলে না।

সারাদিন ঘর থেকে বার হলেন না শশী। জলস্পর্শ করলেন না। জানু পেতে বসে প্রার্থনা করলেন; চোখের জলে ভাসতে লাগলেন।

বললেন, হে দেবতা, ক্ষমা কর আমায়। কর্ত্তব্যের ছদ্মবেশে অহঙ্কার আমায় গ্রাস করেছিল—মানুষের সত্যকার রূপ দেখতে ভুল করেছি আমি। তুমি যে সর্ব্বভূতে আছ—সকলকে শাসন করছ—পালন করছ—এই জ্ঞান হারিয়েছিলাম। তাই এত বড় শাস্তি দিলে আমায়।

পরের দিন কর্ম্মত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দিলেন ইস্কুলে।

সেক্রেটারি ছুটে এলেন বাড়ীতে। বললেন, ইস্কুলের এই টালমাটাল অবস্থা—এখন আপনি রিজাইন দিলে সব ডুববে।

না, না, আমাকে আর জড়াবেন না। করজোড়ে অনুনয় করলেন শশী মাষ্টার। বয়স হয়েছে—কত দিন আর কাজ নিয়ে জড়িয়ে থাকব!

অন্ততঃ একটি বছর দয়া করুন। আমরা সামলে নিই একটু, এতগুলি ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শশী মাষ্টার বললেন, তারা—তারা!...

তারপর আরও অনেক বছর কেটেছে—শশী মাষ্টার চাকরিতে ইস্তফা দিতে পারেন নি। যুদ্ধোত্তর যুগে জীবনযাত্রার মান এমন পর্য্যায়ে উঠেছে যে ঘরে বসে কর্ম্মহীন হয়ে কেউ পরম নির্ভরতার সঙ্গে বলতে পারে না, হে ঈশ্বর যা কর তুমি।

তিনি যে দুর্ব্বল—এ কথা শশী মাষ্টার প্রতিদিন প্রার্থনার সঙ্গে স্বীকার করেন। প্রার্থনা শেষে তাঁর দু'চোখে জলধারা নামে।

এক দিন বললাম, আমি দুর্ব্বল—আমি পাপী এই চিন্তা মনের মধ্যে থাকলে মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারে কি?

শশী মাষ্টার হেসে বললেন, তাঁর কাছে পৌঁছব এত কি সাহস আমার! চোখের জলে মনের ময়লা ধুয়ে গিয়ে মনটা যদি সাফ হয়—সেই তো পরম লাভ ভাই। আমার আমার জ্ঞানটা এই করতে করতে যদি একদম মুছে যায়—

শশী মাষ্টারের কথায় বেশ বুঝলাম ওঁর সংসারত্যাগের দিন আসন্ন হয়ে উঠছে।...

তার পর দীর্ঘকাল কেটে গেছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বৃদ্ধ শশী মাষ্টার আজও সংসার ত্যাগ করেন নি। ইস্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন—কিন্তু সকালে বিকালে ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা দেন। সংসারের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

সংসারী আর বিবাগী দু'পক্ষই বলে, ও রকম দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষ এ গ্রামে কেন—ভূভারতে আর দুটি নেই।

কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

ভূকৈলাস দক্ষিণ-কলিকাতার একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। পরিখা-বেষ্টিত রাজবাটীর জলাশয়, উপবন ও প্রাসাদরাজির মধ্যস্থিত এখানকার বিচিত্র রীতির মন্দির-সমূহের স্বাভাবিক বিশিষ্টতা আছে। গঠনবৈচিত্র্য, অলঙ্কার-বিন্যাস ও লিপি-প্রাচুর্য্যে এখানকার মন্দিররাজি সমৃদ্ধ। কলিকাতার প্রাচীন বংশসম্ভূত ঘোষাল-পরিবারের একাংশ

মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের মন্দির, ভূকৈলাস।
রোমীয় স্থাপত্যের অনুকরণ

ঐশ্বর্য্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ও বারাণসীধামে যুগপৎ খ্যাতিমান হইয়া উঠেন। সম্ভবতঃ এই পরিবারের লোকেরাই বঙ্গের বাহিরে খ্যাতিমান বাঙালীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বারাণসীধামের নানাস্থানে এই ঘোষাল-পরিবারের নাম ও কীর্ত্তির বিবরণ প্রস্তরে ক্ষোদিত দেখা যায়। কাশী-ধামের রেউড়িতলায় একটি বিদ্যালয়ে লিখিত আছে :

"This school was formerly established by Maharaja Joynarain Ghosal in MDCCCXVIII,"

অভিজাত ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন হইলেও এই পরিবারের উপর একই সঙ্গে পুরোহিত ও পাদরী-সম্প্রদায়ের আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল। ব্রিটিশ সরকারের সহিত পত্রালাপে এই বংশ বাংলা ভাষার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সাহিত্য এই পরিবারের উৎসাহে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল। মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এখানকার মন্দির ও মণ্ডপে নিজস্ব ও বৈদেশিক উভয় রীতিই পরিস্ফুট। মন্দিরে দেবতাগণের মত মনুষ্যমূর্ত্তিও
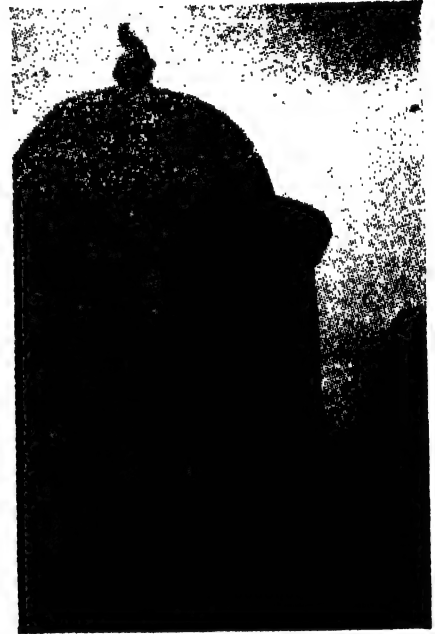
শ্রীকার্ত্তিকেয় মন্দির, ভূকৈলাস। উপরে গম্বুজ

পূজিত। এই রাজবাটীর জলাশয়ের উত্তরাংশে সোপানরাজির সন্নিকটে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইটি বিরাট অষ্টশাল দণ্ডায়মান। পশ্চিমেরটির অধিষ্ঠাতা বিশাল কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ—এই মন্দিরে কোন লিপি নাই। পূর্ব্বদিকের মন্দিরে অনুরূপ রক্ত-কমলেশ্বর নামক মহালিঙ্গ। মন্দিরদ্বয় দুই সারি থামযুক্ত, উর্দ্ধে চারি-পাঁচটি কলস-শোভিত ত্রিশূল-শীর্ষক তিনটি চূড়া। রক্তকমলেশ্বর মন্দিরে একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার কৃষ্ণ-প্রস্তরে নিম্নোক্ত লিপি আছে :

"চৈত্রেক পক্ষ গণিতেহনি পূর্ণিমায়াং
শাকেক্ষিশূন্য জলধীন্দুমিতে গৃহেস্মিন্
শ্রীযুক্ত রক্তকমলেশ্বর নামলিঙ্গং
বারে রবেঃ পশুপতেঃ কৃপয়া বিরাসীত
শকাব্দা ১৭০২

লিপিতে বিরামচিহ্ন ও লুপ্ত অকার বর্জ্জিত হইয়াছে। ১৭০২ শকাব্দার ২৯শে চৈত্র রবিবার পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরক্তকমলেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মন্দিরের উপরিতম চতুঃশালে বারটি বৃত্তের মধ্যে যোগাসনে উপবিষ্ট সাধকগণের মূর্ত্তি। দ্বারের সম্মুখস্থ প্রাচীরে কিছু কিছু অলঙ্করণ আছে।

পঞ্চানন মন্দির, ভূকৈলাস। বিলাতী রীতি
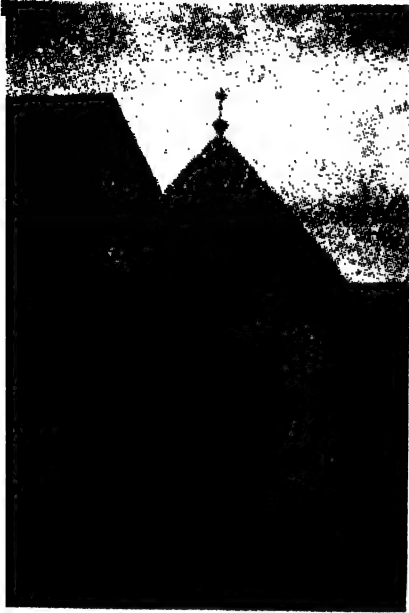
রাজবাটীর পশ্চাতে পৃথক মহলের উত্তরাংশে অষ্ট-ধাতুর দশভুজা মহিষ-নির্গত অসুরঘাতিনী ঘোটকাকৃতি সিংহে আরূঢ়া সিংহবাহিনীর স্তম্ভশোভিত মর্ম্মরমণ্ডিত মণ্ডপ, তিনটি বৃহৎ লিপি ফলকে সমাকীর্ণ। মণ্ডপের সোপানরাজির উপরিস্থিত মধ্যবর্ত্তী দুইটি স্তম্ভের পশ্চিমেরটির গাত্রে ভূকৈলাস নামকরণের ইতিহাস শক তারিখাদিযুক্ত কৃষ্ণ-প্রস্তরের উৎকীর্ণ লিপিতে প্রকাশিত :

"শিবেক্ষণ বিয়ন্মুনীন্দুমিত শাক বর্ষে বিধোর্দিনেদিনকরে ভিসংক্রমিত মীন রাশৌ ঘটীতইদং কলিভবার্ণবে পতিতমেবং সংরক্ষিতুং জগতপতিত পাবনীবিরাদ সীদিয়াং ভৃঙ্গাদ গীত সুমোদদায়ী সুমনোরাজী বিরাজিতুরম্যার্ণা বল্লিচরাম্বিতাটবি সদানন্দুল্লস তাণ্ডবং কৈলাসেশশবান্বিতং পুরমিদং কৈলাসতুল্যং ভুবি তস্মাদর্থ বিদাকৃতাং জগতিভূকৈলাস সংজ্ঞাং বধৌ।

শিবেক্ষণ=৩, বিয়ং=০, মুনি=৭, ইন্দু=১ একুনে ১৭০৩। উক্ত শকাব্দার ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিন রবিবারে কলিযুগে ভবসাগরে পতিত মনুষ্যগণের রক্ষার নিমিত্ত জগতের পতিত পাবনির অবস্থানে ভৃঙ্গসঙ্গীত সমন্বিত সৌরভ সঞ্চারী কুসুমরাজির শোভামণ্ডিত নানা তরুলতার সুন্দর উপবনে সর্ব্বদানন্দীয় তাণ্ডব নৃত্য সংঘ কৈলাসসেশ শিবযুক্ত এই পুরীপৃথিবীতে কৈলাসতুল্য হওয়ায় অর্থজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহার ভূকৈলাস নামকরণ করিলেন।"

লিপিটি গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত কিংবা ভাস্কর অশুদ্ধভাবে উৎকীর্ণ করায় ঐরূপ হইয়াছে। ইহাতেও লুপ্ত অকার নাই। এই ভূকৈলাস নাম জনসাধারণের বহুল ব্যবহারে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া সুবিদিত তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। সম্মুখের রাজপথটিও ভূকৈলাস নাম পাইয়াছে। ইহার অনুকরণে নির্ম্মিত টালিগঞ্জের হরিহরধাম এরূপ সার্থকতা লাভ করে নাই। যে দিব্যসুষমায় মণ্ডিত এই স্থান ভূকৈলাস নাম পাইয়াছিল, আজ তাহার সেই সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত; জনসাধারণের অবিবেচনা ও কর্ত্তৃপক্ষের অক্ষমতা ইহাকে পার্থিব প্রবাসে পরিণত করিয়াছে। আজ ইহার পরিখা কচুরিপানায় সমাচ্ছন্ন দূষিত জলে পরিপূর্ণ। উদ্যান অন্তর্হিত, জলাশয় ও প্রান্তর রূপভ্রষ্ট হইয়া বিকৃতাকার।

দ্বারের পূর্ব্বাংশের প্রস্তর-ফলকে রেখালিপিতে ঘোষালবংশের কুলপঞ্জী দেওয়া আছে। ইহা নয়টি সারিতে সম্পূর্ণ :

শ্রীমন্নারায়ণোজ্জ্যতি। সুধানিধির্বাংস্য গোত্রে ছান্দড়স্তংসুতো মহান্। আদিশূরস্য যজ্ঞার্থ মাগতো রাঢ়দেশভাক্। তংসুতঃ শ্রীধরস্তস্য ঘোষালঃ সুরভিঃ স্মৃতঃ। তংসুতঃ সাগরস্তস্যুত্তমোপহ উদাহৃতঃ। বিশ্বামিত্র স্তুতোজজ্ঞে জিতামিত্রশ্চ তংসুতঃ। সরণিস্তনয়স্তস্যুততঃ পিঙ্গল নামকঃ। ততো জাতঃ শিরোধীমান্ বল্লাল রাজপূজিতঃ। ততোজাত উধতস্য কোচ স্তংসুত আভকঃ। তস্য পুত্রঃপশোর্ণাম তংপুত্র উদয়স্মৃতঃ। ততো বাণেশ্বরো জজ্ঞে বিশ্বনাথশ্চ তংসুতঃ। কংসারিস্তনয়স্তস্য সর্ব্বানন্দীতি মেলকঃ। শ্রীধরশ্চততস্মাদ যদুনাথশ্চ পাঠকঃ। নানা শাস্ত্রাধ্যাপকশ্চ কুলবিচ্ছেদকারকঃ। গোপীকান্তস্ততোজাতো রামকৃষ্ণশ্চ তংসুতঃ। তস্যপুত্রোহি রাজেন্দ্রোবিষ্ণুদেবোহপি তংসুতঃ। অনুজো বিষ্ণুদেবস্য কৃষ্ণ দেবোহপুত্রক বিষ্ণুদেবস্য কন্দর্পো রামদুলাল এবচ। তংপুত্রো রামনিধিস্তংসুতো রামলোচনঃ। তস্যপুত্রাস্ত্রপুত্রশ্চ রামজীবন নামকঃ। কন্দর্পস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কৃষ্ণচন্দ্রোগ্রজোমহান্। তথা গোকুলচন্দ্র রামচন্দ্রানুজঃস্মৃতঃ। পঞ্চ গোকুলচন্দ্রস্য পুত্রাবৃন্দাবনাগ্রজঃ। রামনারায়ণশ্চৈব হরিনারায়ণস্তথা। লক্ষ্মীনারায়ণশ্চৈব গঙ্গা নারায়ণোপিচ। এতে সুতাস্য পুত্রাশ্চ স্বল্পকালেন স্বর্গতাঃ। কৃষ্ণচন্দ্রাগ্রজোধীমান্ জয়নারায়ণঃ সুধীঃ। কালীশঙ্কর ঘোষাল স্তংসুতোধীর সম্মতঃ। তস্যষটতনয়াঃ খ্যাতাঃ কাশীকান্তোগ্রজো মহান্। সত্যপ্রসাদস্তদনু তৃতীয়ঃ সত্যকিঙ্করঃ। চতুর্থঃ সত্যচরণ ঘোষালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। পঞ্চমঃ সত্যশরণঃ ষষ্ঠঃ সত্যপ্রসন্নকঃ। ইতিষণ্ণাং কুমারাণাং সত্যভক্তস্ত সপ্তমঃ। শকাব্দা ১৭৩৮ সন ১২২৩।

মহারাজ মন্দিরের থামেও এই পর্য্যন্ত লিপি আছে।

তস্যাত্মজৌ মৃতৌ বাল্যে কাশীকান্তাদ্ভুতৌততঃ। জ্যায়ান্ সত্যদয়ালাখ্যঃ কনিষ্ঠঃ সত্যবল্লভঃ। পিতুঃ পশ্চাম্মৃতা বেতৌ সুতঃ সত্যপ্রসাদতঃ। সত্যজীবন নামৈক স্তৎপুত্রঃ সত্যকিঙ্করঃ। শ্রীসত্যচরণাৎ খ্যাতঃ সত্যানন্দোগ্রজো পরঃ। সত্যসত্যাভিধঃ সত্যশরণাৎ সত্যদুর্লভঃ। জনকাগ্রে মৃতে তস্মিন্ জাতঃ সত্যপ্রসন্নতঃ। সত্যরঞ্জন নামাদ্যসত্যকৃষ্ণচাপ্তিমনা শ্রীযাদবচন্দ্রভাস্করেণ খোদিতং

শ্রীরাধানাথেন সম্পাদিতম

শকাব্দাঃ ১৭৬৭ সন ১২৫২

বাৎস্যগোত্রীয় সুধানিধির পুত্র ছান্দড় আদিশূরের যজ্ঞসম্পাদনের নিমিত্ত রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীধর সুত সুরভি ঘোষাল সুত সাগর সুত তমোপহ সুত বিশ্বামিত্র সুত জিতামিত্র সুত সরণি সুত পিঙ্গল সুত শির। ইনি রাজা বল্লাল সেন পূজিত কুলীন। সুত উধ সুত কোচ সুত আভক সুত পশো সুত উদয় সুত বাণেশ্বর সুত বিশ্বনাথ সুত কংসারি। ইনি সর্ব্বানন্দী মেলভুক্ত হন। সুত শ্রীধর সুত যদুনাথ পাঠক। ইনি নানা শাস্ত্রজ্ঞ ও কুলভঙ্গকারী। সুত গোপীকান্ত সুত রামকৃষ্ণ সুতত্রয় রাজেন্দ্র, বিষ্ণুদেব ও কৃষ্ণদেব। ইনি অপুত্রক। বিষ্ণুদেবের পুত্রদ্বয় কন্দর্প ও রামদুলাল। রামদুলাল সুত রামনিধি সুত রামলোচন সুত রামজীবন অপুত্রক। কন্দর্পের পুত্রত্রয় কৃষ্ণচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র ও রামচন্দ্র। গোকুলচন্দ্রের পঞ্চ পুত্র বৃন্দাবন, রামনারায়ণ, হরিনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও গঙ্গানারায়ণ। ইঁহারা অপুত্রক ও বাল্যে স্বর্গত। কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র পণ্ডিত জয়নারায়ণ। সুত কালীশঙ্কর ঘোষাল। ইঁহার সাত পুত্র কাশীকান্ত, সত্যপ্রসাদ, সত্যকিঙ্কর, সত্যচরণ, সত্যশরণ, সত্যপ্রসন্ন, সত্যভক্ত। শকাব্দা ১৭৩৮ সন ১২২৩।

অগ্রজদ্বয় বাল্যে স্বর্গত হন। কাশীকান্তের পুত্রদ্বয় সত্যদয়াল ও সত্যবল্লভ। পিতার পরে ইঁহারা লোকান্তরিত হন। সত্যপ্রসাদের পুত্র সত্যজীবন সুত সত্যকিঙ্কর। সত্যচরণের দুই পুত্র সত্যানন্দ ও সত্যসত্য। সত্যশরণের পুত্র সত্যদুর্লভ। ইনি পিতার জীবদ্দশায় গত। সত্যপ্রসন্নের পুত্রদ্বয় সত্যরঞ্জন ও সত্যকৃষ্ণ। শকাব্দা ১৭৬৭ সন ১২৫২ শ্রীযাদবচন্দ্র ভাস্কর খোদাই করেন ও শ্রীরাধানাথ লিপি সম্পাদন করেন। সম্ভবতঃ প্রথমাংশ ১২২৩ ও দ্বিতীয়াংশ ১২৫২ সালে ক্ষোদিত।

রক্তকমলেশ্বরের আটশাল, ভূকৈলাস। এই মন্দিরটীর লিঙ্গ মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের মাতার নাম বহন করিতেছে।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কালো ফলকটিতে লিপি আছে

কলিকাতার ঘোষাল বংশের কুলপঞ্জীর ফলক। ভূকৈলাসের রাজবাটী

এই মণ্ডপের অলিন্দের পূর্ব্বদিকের গাত্রে ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় *"Life of Maharaj Joynarain Ghosal"* পিত্তল-ফলকে ক্ষোদিত আছে। ইংরেজী অক্ষরগুলি হস্তলিখিত বর্ণে খচিত।

মণ্ডপের প্রাঙ্গণের চারি কোণের চারিটী খ্রীষ্টীয় বা বিলাতী রীতির মন্দিরের চূড়া—সূক্ষ্মাগ্র অষ্টকোণসমন্বিত। বায়ুকোণে মকরবাহিনী গঙ্গা। নৈর্ঋত কোণে কৃষ্ণ-]

বৃষারোহী পঞ্চমুখ (একটী মুখ মস্তকের উপর শায়িত) চতুর্ভুজ কৃষ্ণবর্ণ পঞ্চানন্দ। বাম হস্তদ্বয়ের নিম্নে মুষ্টি ও উর্দ্ধে টাঙ্গী। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে অভয় মুদ্রা। অগ্নিকোণে রাজরাজেশ্বর মহালিঙ্গ। ঈশাণ কোণে কালভৈরব—ইহার গলে মুণ্ডমালা, ইনি ত্রিনয়ন—বামহস্তে খট্টাঙ্গ, ডাহিনে খেট, বাহন কুকুরযুগল। সকল মূর্ত্তিই প্রস্তরনির্ম্মিত।
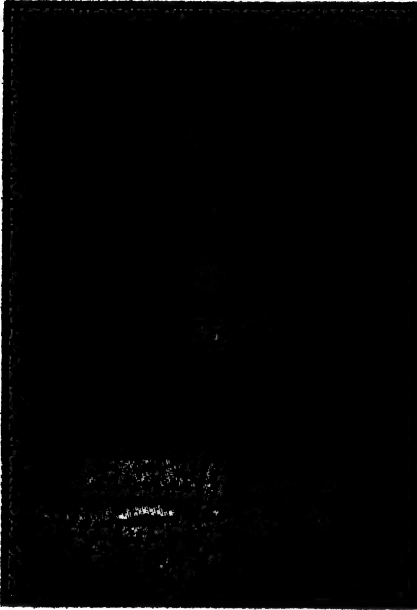
ভূকৈলাসের সিংহবাহিনীর মণ্ডপ।
ভূকৈলাস নামকরণের কারণনির্দ্দেশক ফলকটি দেখা যাইতেছে

পূর্ব্বকথিত অষ্টশাল দুইটীর সম্মুখের জলাশয়ের পশ্চিম ও পূর্ব্ব পারে ছয়টি মন্দিরের প্রত্যেকটির শিরে গম্বুজ থাকায়, ইহাদের রীতিতে ইসলামীয় প্রভাব পরিস্ফুট। মন্দিরবিন্যাস—প্রতি কোণে চারিটী মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইটি। দক্ষিণের মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। বায়ুকোণের দেবতা, বাম হস্তদ্বয়ে উর্দ্ধ ও নিম্নক্রমে খেট, মালা, ডাহিনে ধনু ও কমণ্ডলুধারী ময়ূরবাহন ষণ্মুখ কার্ত্তিক—তিনটী মুখ সম্মুখে অপর তিনটী পশ্চাতে। পশ্চিমের মন্দিরে শ্বেতবর্ণ চতুর্ভুজ—উর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে পদ্ম, নিম্নের ডাহিনে মালা, বামে চক্রাকার বস্তুধারী ঘোটকবাহী, রথারোহী সম্ভবতঃ সূর্য্যদেবতা। নৈর্ঋতে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। অগ্নিকোণে রাম, সীতা ও মহাবীর। পূর্ব্বে গণপতি। ঈশানে গৌর ও নিতাইয়ের যুগল প্রতিমূর্ত্তি।

জলাশয়ের দক্ষিণাংশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গম্বুজধারী মন্দিরটীর চারিকোণে যুগ্ম স্তম্ভ। ইহাতে রোমীয় রীতি সুপ্রকট। মধ্যে স্তম্ভোপরি যোগাসনে জপরত মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি। স্তম্ভগাত্রে ক্ষুদ্রাক্ষরে একটী লিপি। সম্মুখ বা উত্তর দ্বারের বামে মর্ম্মরে লোহিত বঙ্গাক্ষরে একটী রেখালিপি।

"ভূকৈলাসস্য শোভায়ৈ নিয়তঃ সুপ্রযত্নবান্। রাজশ্রীসত্যচরণ ঘোষালঃ শরণাগ্রজঃ। তদাজ্ঞয়া প্রিয়া রামকমলঃ কর্ম্মপেশলঃ। মুখোপাধ্যায়কঃ স্বৈরং কৃতবান্ খেয়মুত্তমং। শঙ্খের কারুণাতস্য রচিতঃ সংক্রমোত্তমঃ। বেদর্ত্ত্ব ব্ধি নিশিনাথ সম্মিতে শক বৎসরে। জ্যৈষ্ঠেমাসি সিতে পক্ষে সম্পূর্ণস্থ মিতাবুভৌ। লিণ্ডলিন কোং।"

একটী ইউরোপীয় কোম্পানী মর্ম্মরফলকে বঙ্গাক্ষরে এই সংস্কৃত লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছেন। চতুর্ভুজের মধ্যের অংশটী জুড়িয়া দেওয়া। মর্ম্ম ঃ—ভূকৈলাসের শোভার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান রাজা শ্রীসত্যচরণ ঘোষালের (সত্যশরণের অগ্রজ) আজ্ঞায় কর্ম্মপটু রামকমল মুখোপাধ্যায় ১৭৬৪ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিখা ও জলাশয় খনন সম্পন্ন করেন। খেয় শব্দের অর্থ পরিখা। দেবতাগণের মতই মন্দিরে পিতৃপুরুষকে স্থান দিয়া তাঁহার পূজা-ব্যবস্থায় একটা অভিনবত্ব থাকিলেও বঙ্গদেশে ইহা নূতন নহে। বর্দ্ধমানে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণ দিকে এই মন্দির-নির্ম্মাণেও "পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণাদিক তথৈবচ" (পিতৃগণের স্থান আকাশ ও দক্ষিণ দিক্) এই শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ রক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার মূলে পাশ্চাত্যের অনুকরণও আছে।

হিন্দু, মুসলিম ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রতি সমভাব, বিদ্যার সাধনা ও বিদ্যোৎসাহিতা, শিল্পে বিভিন্ন রীতির প্রয়োগ, ইতিহাস-রক্ষণে যত্নশীলতা, জাতীয়তা ও জাতীয় ভাষার মর্য্যাদারক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ভূকৈলাস রাজকুলের বিশিষ্টতা আছে। প্রাচীন যুগের রাজা প্রতাপনারায়ণ রায় ও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র অলঙ্কৃত ভূরশিট রাজবংশ এবং পরবর্ত্তী যুগের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবংশ এইরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রতি ঘণ্টায় ঘড়ি ও নিত্যনিয়মিত নহবত বাজাইয়া ভূকৈলাসে প্রাচীন রীতি রক্ষিত হইয়া থাকে।

হাওড়া জেলার বাকসারা গ্রামে এই ঘোষাল-বংশের আদিনিবাস ছিল। ঐ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী ইঁহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কন্দর্প ঘোষাল ব্যবসায়সূত্রে আসিয়া গড়-গোবিন্দপুরে বাস করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ বাং সন ১১৫৯ সালের ৩রা আশ্বিন শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্ম্মাণকালে কন্দর্প ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া কিছুদিন বেহালায় থাকেন; পরে সন ১১৬১ সালে তিনি খিদিরপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। জয়নারায়ণ সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, ফারসী, দেবনাগরী ও হিন্দী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। পনর বৎসর বয়স হইতেই তিনি

মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে দেশের কল্যাণমূলক প্রচেষ্টায় অসীম কার্য্যকুশলতা দেখাইয়া নবাব ও ইংরেজ রাজপুরুষগণকে মুগ্ধ করেন। ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন, সুতরাং ঐ সকল কার্য্যের বিনিময়ে তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেন না।

তৎকালীন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব মোবারক উদ্দৌলা, টম্যাস প্যাটাল, জন সেক্সপিয়ার, ক্যামাক, ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রমুখ ইংরেজ রাজপুরুষগণ জয়নারায়ণের কার্য্যকুশলতায় এরূপ মুগ্ধ হন যে, বাং ১১৮৬ সালের শ্রাবণ মাসে অসুস্থতা হেতু তিনি অবসর লইলে, হেষ্টিংসের সুপারিশে দিল্লীর তৎকালীন বাদশাহ মহম্মদ জাহন্দর শাহ শাহজাদা মির্জ্জা জওয়ান বখতের সীল ও সহির মারফত জয়নারায়ণকে ১১৯৮ হিজরির ২৯শে রবিয়াল আউলে তিন হাজারী মনসবদারীসহ মহারাজবাহাদুর উপাধি দান করেন। জয়নারায়ণ বন-বিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহের জমিদারী পরিচালনা বিষয়েও প্রচুর সাহায্য করেন। বাংলার বহু জেলা ও খিদিরপুরে জয়নারায়ণ বিস্তর জমিদারী ক্রয় করেন। খিদিরপুরের বিস্তৃত জলাভূমি ভরাট করিয়া তিনি গড়বেষ্টিত ভূকৈলাস রাজবাটি প্রতিষ্ঠা করেন। উহার মধ্যস্থিত শিবগঙ্গা নামক পুষ্করিণী ও পূর্ব্বোক্ত দেবতাসকল তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ পিতৃনামে, রক্তকমলেশ্বর মাতৃনামে ও রাজরাজেশ্বর লিঙ্গ পত্নীর নামে প্রতিষ্ঠিত। সিংহবাহিনী বা পতিতপাবনী প্রধানা কুলদেবী। ইনি ঝুলন ও জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণরূপ ও কার্ত্তিকী অমাবস্যায় কালীরূপ ধারণ করেন—ইহা এখানকার এমন এক অভিনব ব্যাপার যাহা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কাশীধামে তিনি করুণানিধান নামক কৃষ্ণবিগ্রহ ও দুর্গাকুণ্ডের নিকট গুরুধামে গুরুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐখানে গুরুকুণ্ড খনন করেন। এখানে ১৮১৭ সালে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত চারিতল বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি দুই শত ছাত্রের সংস্কৃত, বাংলা, ফারসী, হিন্দী ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সংস্কৃত পদ্যে শঙ্করী সঙ্গীত, ব্রাহ্মণার্চ্চন-চন্দ্রিকা ও জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম তাঁহারই রচিত। কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ ও করুণানিধান বিলাস নামক বাংলা গ্রন্থও তাঁহার কৃতি। কালীঘাটের কালীমাতার চারিটি রজত-হস্ত তিনিই করাইয়াছেন। উহা এখনও বর্ত্তমান আছে। (কিছুদিন আগে 'মাসিক বসুমতীতে' উহা গোকুলচন্দ্রের দান বলিয়া উল্লিখিত হয়—তাহা ভুল।) বাং ১২২৮ (ইং ১৮২১) সালের ২৫শে কার্ত্তিক শুক্রবার ৬৯ বৎসর বয়সে জয়নারায়ণের কাশীপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল। কুমার সত্যমোহন ঘোষাল এই বংশের শেষ সরকার-স্বীকৃত কুমার। ইনি করোনেশন মেডাল প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র সত্যবিজয় ঘোষাল দরবারে নিমন্ত্রিত হন। বর্ত্তমানে শ্রীসত্যতাপস ঘোষাল ও শ্রীসত্যতমোজ ঘোষাল ভ্রাতৃদ্বয় বংশের গৌরবরক্ষায় যত্নশীল।

৺কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর মন্দির, ভূকৈলাস

খিদিরপুর পুলের নিকট দুই পটি কালীবাজারের মধ্যে ৺ধবলেশ্বর মহাদেবের একটি খাঁজযুক্ত সুঠাম পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। লিঙ্গটি শ্বেত পাথরের, উঁহার মহান্ত তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা পাইয়া সন ১৩০২ সালের ৫ই মাঘ সদয় পাণ্ডাকে দান করেন। পরে তাঁহার চেলা গোবিন্দ পাণ্ডা ইহার মালিক হন। উমাকান্ত পাণ্ডা ইহার বর্ত্তমান মালিক। মন্দিরে একটি পুরাতন লিপির ফলক ছিল—বৈষয়িক স্বার্থে ইহা এখন অপসারিত।

এই স্থানে পথের উত্তর পার্শ্বের পঞ্চাননতলায় মহাদেবের একটি অষ্টশাল আছে। ইহার উপরের চতুঃশালের গাত্রে নাগর অক্ষরে একটি সুদীর্ঘ লিপি আছে। ইহা আধুনিক বলিয়া মনে হয়। কোন সংস্কারক ইহা যোজনা করিয়া দিয়া থাকিবেন।

ঋষি

[বৈদিক, ঔপনিষদিক ও পৌরাণিক]

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

পৌরাণিক কাহিনী হইতে দধীচি, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি কয়েক জন প্রসিদ্ধ ঋষির পরিচয় পাই। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক এক জন স্বনামধন্য ঋষি। ইঁহাদিগকে লইয়া যে সকল উপাখ্যান রচিত হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই ঋষিরা প্রভূত তপোবলের অধিকারী ছিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়া ঐ তপোবল তাঁহারা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহার প্রভাবে তাঁহারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন—অঘটন ঘটাইতে পারিতেন। ঋষি-মুনিরা বর প্রদান করিয়া কাহাকেও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিতে পারিতেন; আবার অভিসম্পাত দিয়া প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকেও দুর্গতিভোগ করাইতে পারিতেন। মুনিঋষির ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে শত শত মানুষ ভস্মীভূত হইয়া যাইত। দেবতারাও তাঁহাদের অভিসম্পাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।

দুর্ব্বাসা, দধীচি, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা গৃহী ছিলেন না। আবার বশিষ্ঠ প্রভৃতি অনেক ঋষি গৃহস্থ ছিলেন। আশ্রম স্থাপন করিয়া শিষ্যদিগকে বিদ্যাদান করিতেন; কখনও কখনও তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন। কিন্তু তাঁহারা যে তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ ও আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী ছিলেন, কাহিনীগুলি হইতে তাহা সুস্পষ্ট নহে। ইঁহারা যেন উপাখ্যানের চরিত্র। প্রত্যেকে এক একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। সেই ভূমিকায় তাঁহারা লৌকিক মানুষ হইয়াও অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং এই অলৌকিকত্বই যেন তাঁহাদের ঋষিত্বের পরিচায়ক। পৌরাণিক কাহিনীগুলি নীতি, উপদেশ ও কবিত্বের সম্ভার হইলেও ঘটনাবলীর অনেক কিছুই উদ্ভট—একালে ঐ প্রকারের কার্য্যকলাপ বাস্তবে সম্ভব বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না।

এ যুগের লেখকেরা যেমন নিজস্ব কল্পনার সাহায্যে উপন্যাস রচনা করেন, পুরাণকারেরা ঠিক সেইভাবে পৌরাণিক কাহিনী লেখেন নাই। যে সকল কাহিনী সুদূর অতীত, এমন কি প্রাগ্‌বৈদিককাল হইতে লোকের মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত ছিল তাহাই তাঁহারা কল্পনায়, কবিত্বে প্রসারিত করিয়া পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকার রূপায়িত করিলেন এবং উহা পুরাণমধ্যে গ্রথিত করিয়া রাখিলেন। মূল কাহিনী, যাহা এক সময় সংক্ষিপ্ত বা বীজরূপে ছিল, কালে তাহা শাখা-প্রশাখা ও পত্রপুষ্পসমন্বিত বিস্তৃত আকারের বৃক্ষে পরিণত হইল। ঋষি-চরিত্রও এইরূপে বৈদিক সময়ে বাস্তবে যাহা ছিল, কালস্রোতে তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধারণ করিল। বৈদিক ঋষিরা যেরূপ ছিলেন, পরবর্তী সময়ে উপনিষদের ঋষিরা তাহা হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ। পুরাণের ঋষিরা মানুষ হইয়াও দৈবশক্তিসম্পন্ন অর্দ্ধদেবতা অতিমানব কল্পিত হইয়াছেন।

উপনিষদ্‌ তত্ত্বালোচনা-প্রধান। একারণ উপনিষদে বর্ণিত যে ঋষিদিগকে পাই তাঁহারা তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ গৃহস্থ। ইঁহারা পৌরাণিক ঋষিদের ন্যায় কেহ সুদীর্ঘকাল তপস্যায় অতিবাহিত করিলেন অথবা তপোবলের দ্বারা অদ্ভুত কিছু করিলেন এরূপ পাওয়া যায় না। জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েই ঔপনিষদিক ঋষি। বিদেহরাজ জনক রাজ্য পরিচালনা করিতেন, কিন্তু পরম নির্লিপ্তভাবে। জনকের উক্তি "মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে লাভো ন মে ক্ষতিঃ"—মিথিলা রাজ্য অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেলেও জনকের তাহাতে লাভ বা ক্ষতির কিছু নাই। রাজর্ষি জনক গীতা-কথিত অনাসক্ত মুক্তসঙ্গের বাস্তব মূর্ত্তি। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে লইয়া সংসার করেন। তাঁহার বহু শিষ্য সমন্বিত আশ্রম আছে। আশ্রমের ও নিজের প্রয়োজনে গো-ধন সংগ্রহে উৎসাহী।

জনক যজ্ঞ করিয়াছেন। যজ্ঞ উপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করিবার আয়োজন করিয়াছেন। উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠজ্ঞানী জানিবার জন্য এক সহস্র গরু বাঁধিয়া রাখিলেন এবং প্রত্যেক গরুর দুই শৃঙ্গে দশ দশ পাদ সুবর্ণ বাঁধিয়া দিয়া ঘোষণা করিলেন, "ভগবান্‌ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি এই সকল গাভী লইয়া যাউন।"

কেহই গাভী লইয়া যাইতে অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য উঠিয়া তাঁহার এক শিষ্যকে ঐ গাভীসমূহ লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া জানিতে চাহিলেন যাজ্ঞবল্ক্য যে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ তাহা তিনি কি প্রকারে বলিতেছেন? ইহাতে যাজ্ঞবল্ক্য যে উত্তর দিলেন তাহা অতীব সরল। বলিলেন, "নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্মো, গোকামা এব বয়ং স্ম।"—ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার করি, আমরা গো-লাভ করিতেই ইচ্ছা করি।

অনন্তর অশ্বলপ্রমুখ আট জন ঋষি, নারী-ঋষি গার্গী বাচক্নবী (গর্গ গোত্রের বচক্নু কন্যা) প্রভৃতির সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের যে-প্রশ্নোত্তর বা আলোচনা হইল তাহা হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইল।

এক দিন জনক রাজসভায় বসিয়া আছেন এমন সময় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন? পশুলাভের ইচ্ছায়, না আমার সহিত সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করিবার জন্য?" এখানেও ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সরল উত্তর। বলিলেন, "হে সম্রাট্, উভয় উদ্দেশ্যেই।" অর্থাৎ সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনাও হইবে, গাভী সংগ্রহও করিব।

উভয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ তত্ত্বালোচনা হইল। জনক তাঁহাকে তাঁহার উপদেশের জন্য হস্তিতুল্য বৃষভসহ সহস্র গাভী দান করিতে চাহিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তৎক্ষণাৎ সেই দান গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, "আমার পিতা বলিতেন, সম্যক্ উপদেশ না দিয়া দান গ্রহণ করিবে না।" অর্থাৎ উপদেশ অসমাপ্ত রাখিয়া দক্ষিণা তিনি গ্রহণ করিবেন না। ঋষি নির্লোভ, তিনি গাভী চান, কিন্তু তাহা শাস্ত্রসম্মত উপায়ে—ব্রহ্মবিদ্যা দানের দক্ষিণা স্বরূপ।

যাজ্ঞবল্ক্যের উভয় স্ত্রীর মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ মৈত্রেয়ীর উক্তি হইতে এই নারী-ঋষির আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাই। গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার সময় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বলিলেন—"আমি অন্য আশ্রমে যাইবার জন্য ইচ্ছুক, এ কারণ আমার যে বিত্ত আছে তাহা তোমার ও অপর পত্নী কাত্যায়নীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে চাই।"

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বিত্ত প্রাপ্তির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল না হইয়া জানিতে চাহিলেন, "বিত্তসমূহের দ্বারা আমি কি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব?" তাঁহার প্রয়োজন অমৃতত্বের, বিত্ত দ্বারা যদি তাহা লাভ হয় তবেই তিনি বিত্ত লইবেন, নচেৎ উহাতে তাঁহার প্রয়োজন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "অমৃতস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন"—বিত্তদ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই। মৈত্রেয়ী জানাইলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?" যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারিব না তাহা দ্বারা কি করিব?

বলাকি-অজাতশত্রু-সংবাদে, গার্গ্য বলাকি নামে একজন বিদ্বান্ ঋষির পরিচয় পাই। ইনি নিজেকে অতিশয় বিদ্বান্ মনে করিতেন। এজন্য গর্বিতস্বভাব ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল রাজর্ষি জনক অপেক্ষাও তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। একদা কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিব।" অজাতশত্রু বলিলেন, "আপনি যে আমাকে এই কথা বলিলেন ইহার জন্যই আপনাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি।"

বলাকি ও অজাতশত্রুর মধ্যে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল। উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা হইলে, বলাকি বুঝিতে পারিলেন অজাতশত্রু তাঁহা অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ। নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কাশীরাজকে বলিলেন, "আমি আপনার শিষ্যরূপে উপস্থিত হইতেছি, আমাকে উপদেশ করুন।" এখানেও ঋষিস্বভাবে অপূর্ব্ব সরলতা। ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাহা স্বীকার করিলেন ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য ব্রাহ্মণঋষি ক্ষত্রিয় রাজর্ষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। উপনিষদে ক্ষত্রিয় ও নারী ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু পুরাণে কেহ নারী-ঋষি নাই এবং এক বিশ্বামিত্র ভিন্ন অপর কেহ ক্ষত্রিয় ঋষিও নাই। বিশ্বামিত্রও ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। উপনিষদের জনক যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞ রূপে চিত্রিত হইয়াছেন, পৌরাণিক জনক সেরূপ ব্রহ্মজ্ঞরূপে অঙ্কিত হন নাই—তিনি বিদেহরাজ মাত্র।

উপনিষদের ঋষিরা সহজ সরল গৃহস্থ এবং তত্ত্বজ্ঞ বা তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু। পৌরাণিক ঋষির ন্যায় অতিমানুষ তাঁহারা আদৌ নহেন। পুরাণসমূহ কাহিনী-প্রধান। পুরাণোক্ত কাহিনীর সহায়তায় জনসাধারণের মধ্যে নীতি উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে। অপর পক্ষে উপনিষদগুলি তত্ত্বালোচনা-প্রধান। একারণ উপনিষদের ঋষিদিগকে গভীর তত্ত্বালোচনা-পরায়ণ রূপেই দেখিতে পাই। ছোটখাট যে কয়েকটি কাহিনী পাওয়া যায় তাহার কাহিনী-অংশ তত্ত্বালোচনার ভূমিকা মাত্র।

ঋগ্বেদের মধ্যে বৈদিক্ যুগের যে সকল ঋষির নাম পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে মনু, ভৃগু, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ, কণ্ব, অঙ্গিরা, কক্ষীবান, শুনঃশেপ, দধীচি, দীর্ঘতমা, গৌতম, চ্যবন, অগস্ত্য ইঁহাদের নাম পুরাণমধ্যেও পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ঐ সকল বৈদিক ঋষি পুরাণকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্র হন নাই। কাহিনী রচনায় ঐ সকল প্রসিদ্ধ ঋষির নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। পুরাণে যে সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবার কথা আছে তাহা অতিরঞ্জন। ঋগ্বেদে মানুষের জীবনকাল এক শত বৎসর নির্দ্দিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে।

আদিতে, অর্থাৎ ঋগ্বেদের সময়ে ঋষি বলিতে কিরূপ মানুষকে বুঝাইত তাহা তাঁহাদের রচিত মন্ত্রগুলি হইতে জানিতে পারা যায়। তাঁহারা সকলেই গৃহস্থ ছিলেন। অনার্য্যদিগের সহিত প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হইত। একারণ তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইত। আর্য্যদিগের বিভিন্ন

গোষ্ঠীর মধ্যেও যুদ্ধ হইত। সুদাস রাজার সহিত ভরতবংশীয় দশ জাতির একটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ যুদ্ধে ভরতদিগের পুরোহিত ছিলেন বিশ্বামিত্র এবং সুদাস রাজার পুরোহিত ছিলেন বশিষ্ঠ। সুদাস জয়ী হন। বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ—ঋষি হইয়াও যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। জীবিকার জন্য কৃষি ও গো-পালন সকল ঋষিই করিতেন। জাতিভেদ তৎকালে প্রবর্তিত হয় নাই, কাজেই ব্রাহ্মণ-ঋষি, ক্ষত্রিয়-ঋষি, এরূপ কোন পার্থক্যও তাঁহাদের মধ্যে ছিল না।

বিদ্যা ও বুদ্ধির পার্থক্যে মানুষ চিরকালই একজন আর একজন হইতে অধিক সম্মান পাইয়া থাকে। আর্য্যদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ এবং চিন্তাশীল ছিলেন ও ঋক্ (অর্থাৎ মন্ত্র) রচনা করিতেন তাঁহারাই ঋষি আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। ঋক্‌সমূহ প্রধানতঃ দেবতার নিকট প্রার্থনা। এই প্রার্থনা অত্যন্ত স্পষ্ট। জাগতিক ধনসম্পদের অধিকারী হইয়া নিরুপদ্রবে সুস্থশরীরে পুত্রপৌত্রাদি সহ শত বৎসর জীবিত থাকিবার কামনা। শত্রুর বিনাশ চাহিয়াও তাঁহারা দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই জাগতিক মানুষ এবং বাস্তববাদী ছিলেন। তত্ত্বচিন্তা মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। চিন্তাশীল ঋষিরা পাপের অনুশোচনা করিয়াছেন, গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তা সমন্বিত উক্তিও করিয়াছেন। এই সকল দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক উক্তি বিস্তৃত হইয়া উপনিষদ্ রচিত হইল। উপনিষদ্ সমূহে ঋষিদের ধারণারও পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহারা সাংসারিক মানুষ হইলেও জাগতিক বিষয়ে নির্লোভ, অনাসক্ত, তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ ও ব্রহ্মিষ্ঠ রূপে চিত্রিত হইলেন। বৈদিক ঋষিরা ছিলেন রক্তমাংসের বাস্তব মানুষ—জাগতিক ও আধ্যাত্মিকের সংমিশ্রণ। উপনিষদের ঋষিরা হইলেন আদর্শ আধ্যাত্মিক মানুষ।

বৈদিক উক্তি ও বৈদিক কাহিনী কালস্রোতে লোকমুখে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, অপর দিকে বেদ ও উপনিষদের চর্চা সাধারণের মধ্যে ক্রমে অপ্রচলিত হইল, এই সময়ে ঐ সকল কাহিনী বহুলপরিমাণে পল্লবিত হইয়া সম্পূর্ণ এক অলৌকিক কাহিনীতে পরিণতি লাভ করিয়া পুরাণমধ্যে স্থান পাইল। তখন মূল, (অর্থাৎ ঋগ্বেদোক্ত) ঋষি চরিত্রের মধ্যে অনেকখানি কল্পনার সমাবেশ হইল। পৌরাণিক বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, গৌতম, কপিল, দধীচি, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা ঐ সকল নামের বৈদিক ঋষি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন মানুষরূপে আখ্যায়িত হইলেন। বৈদিক ঋষিরা ছিলেন বাস্তব মানুষ, উপনিষদের ঋষিরা হইলেন আদর্শ মানুষ। পৌরাণিক ঋষিরা সম্পূর্ণরূপে কল্পনাপ্রসূত অলৌকিক মানুষ।

নীড়ভ্রষ্ট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

নীড়হারা পাখী, নূতন কুলায়
ভালো কি লাগে না তোর ?
বাঁধিয়াছে তোরে পুরাতন তরু
আজো দিয়ে মায়াডোর!
সেই কূলহারা পদ্মার জল
ঢেউ লেগে শুধু করে কল কল—
তারি কল্লোল-সঙ্গীতে তোর
এখনো পরাণ ভোর!

ধেনু-চরা আর বেণু-বাজা সেই
পদ্মার চর আর
ওরে উন্মাদ, ফিরে পেতে চাস্
বৃথা তুই বার বার!

ফিরে ফিরে পাবি সেই মেঠো হাওয়া,
পল্লীর বীথি ফুলে ফুলে ছাওয়া ?
সাধের কুলায় ছিল যে শাখায়
সে আজি ভস্মসার!

কত তরুশাখে জনমে জনমে
বাঁধিতে যে হবে নীড়,
কত অরণ্য ডাকিবে রে তোরে
নিয়ে ছায়া সুনিবিড়!
ভাঙিবে গড়িবে কত শত বাসা,
করিবি কেবল যাওয়া আর আসা ;—
কিসের দুঃখ ? ওরে পাখী তুই
পাবি কত নদীতীর!

একটি পুরানো প্রেমের কাহিনী

চারুচন্দ্র দত্ত

[এইরূপ শুনা যায়, বিলাতের বহু অভিজাত পরিবারে ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া এদেশে কার্য্যে নিযুক্ত শ্বেতকায়গণ কেহ কেহ ইংলণ্ডে যান। তাঁহাদের ঔরসজাত সন্তান-সন্ততিরা ইংরেজ-সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ জনশ্রুতির মূলে যে সত্য অনেকখানি নিহিত রহিয়াছে, বর্ত্তমান কাহিনীর বিষয়বস্তু হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আর একটি কারণে এই কাহিনী সময়োপযোগী বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। সেযুগে যখন মোগল আমল একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই এবং ইংরেজ-প্রভুত্বও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন ইংরেজগণ ভারতবাসীর ভাষা শিখিতেন, ভারতবাসীর আচার-আচরণ গ্রহণ করিতেন, এক কথায় তাঁহাদের পুরাপুরি ভারতীয় বনিয়া যাওয়াও আশ্চর্য্য ছিল না। কিন্তু তাঁহাদেরই হাতে যখন শাসনভার ন্যস্ত হইল তখন তাঁহারা অন্য রূপ ধরিলেন। জাতিগত পার্থক্য ক্রমে জাতি-বৈরিতায় পরিণত হইল। এই দৃষ্টান্ত হইতে বর্ত্তমানেও আমাদের কিছু শিখিবার আছে এবং সাবধান হইয়া চলা প্রয়োজন। কেননা আজ পুনরায় কোন কোন শ্বেত-জাতি নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি সাহিত্য ও সমাজের প্রতি সহানুভূতিতে আকুল হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান যুগপরিবর্ত্তনকালে ইতিহাসের শিক্ষা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।—প্রবাসীর সম্পাদক]

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ। মোগল বাদশাহীতে ভাঙন ধরেছে। দিল্লীতে বড় বড় আমীর-ওমরাও নিজের নিজের দল পাকাচ্ছেন। বাংলার গদীতে অধিরূঢ় অলস অকর্ম্মণ্য বিলাসী সরফরাজ খান। তাঁহার শান্তিরক্ষার ক্ষমতাও নেই, ফুরসতও নেই। উড়িষ্যার পথে নাগপুরের বর্গীরা বার বার হানা দিয়ে মেদিনীপুর বর্দ্ধমান অঞ্চল বিধ্বস্ত করছে। বড় বড় বাঙালী জমিদারবর্গ একটা বিপ্লব আসন্ন জেনে আপন আপন সৈন্যবল বাড়াচ্ছেন, ভাবছেন কি করে আবার বারো-ভুঁঞার যুগ ফিরিয়ে আনবেন। নানাজাতীয় সাহেব কোম্পানী নানাস্থানে কুঠি ফেঁদে বসেছেন। তাঁরাও সেনাবৃদ্ধি করছেন, গণ্ডগোলের মাঝে যদি কিছু সুবিধা করতে পারেন এই আশায়। ইংরেজ কলকাতায়, ফরাসী ফরাসডাঙ্গাতে, ওলন্দাজ চুঁচুড়াতে, গঙ্গাতীরে নিজ নিজ কেল্লা বেঁধেছেন। এখনও ইংরেজ-ফরাসীর, ইংরেজ-ওলন্দাজের, ইংরেজ-মোগলের মধ্যে চরম বল পরীক্ষা হয় নাই। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী শেষ পর্য্যন্ত কাকে বরণ করবেন, তা জানা নাই। এই পরিবেশে একটি বড় মধুর প্রেমের ব্যাপার ঘটেছিল, সেই গল্প পাঠককে আজ শোনাব।

কলকাতা ও ফরাসডাঙ্গার মাঝামাঝি ভাগীরথী-তীরে ভৈরবপুর গ্রাম, প্রধানতঃ চাষাভুষোর বাস। সেই গ্রামের উপকণ্ঠে, ঠিক নদীর উপরেই, একখানি সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট-খাটো বাড়ী। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, বেশ উঁচু দাওয়া। সামনে ক্ষুদ্র একটি বাগান, তাতে নানা-রকম ফুল ফোটে, প্রধানতঃ বড় বড় গাঁদা ও চামেলি। পিছনে উঁচু বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা উঠান। সেই উঠানের এক পাশে ছোট্ট একখানি রান্নাঘর, অন্যপাশে গোয়াল। কোণে লাউ-কুমড়োর মাচা। সবটা পরিষ্কার, তকতক করছে। খিড়কির দরজা হতে একটি সঙ্কীর্ণ পথ চলে গেছে নিকটস্থ গঙ্গার ঘাট অবধি।

বাড়ীর কর্ত্তা পঞ্চানন কাব্যতীর্থ ঠাকুর এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত। এককালে অন্যত্র তাঁর এক বড় টোল ছিল, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেই দিন কাটাতেন। খুব নামডাক ছিল, দেশ-বিদেশ থেকে সব ছাত্র আসত তাঁর কাছে কাব্য-সাহিত্য পড়তে। বছর দুই হ'ল সে সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ এইখানে গঙ্গা-তীরে এসে বসবাস শুরু করছেন। তাঁর এক বাল্যবন্ধু ও ভক্তশিষ্য থাকবার জন্য বাড়ীটা করে দিয়েছেন, পণ্ডিতমশায় পূজা-অর্চ্চনা করে কাল কাটান। কখন কখন বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেন। পরিবারে তিনটি মানুষ —ঠাকুর নিজে, তাঁর ব্রাহ্মণী ও একটি মেয়ে দুর্গা। মেয়েটি পরমা সুন্দরী, বয়স সতের বছর, বাল-বিধবা। অসাধারণ বুদ্ধিমতী, সাত বছর বাপের কাছে ব্যাকরণ ও কাব্য-সাহিত্য পড়ে সে বুদ্ধি আরও মার্জ্জিত হয়েছে। তার সখী-সাথী কেউ নেই, সর্ব্বদা বাপের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাঁর পূজা-আরাধনার আয়োজন করে দেয়। তাঁর সঙ্গে স্তব পাঠ করে, পদাবলী গায়। একেবারে পিতৃগতপ্রাণা। ব্রাহ্মণী ঘর-সংসার নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু সকল কাজের মাঝে তাঁর চোখ দুটি যেন সদাই খুঁজে বেড়ায় বৃদ্ধ স্বামী ও আদরের কন্যাটিকে। সন্ধ্যাবেলায় তাঁদের পূজা বা পাঠের কাছে বৃদ্ধা চুপটি করে বসে থাকেন পরিপূর্ণ আনন্দে। তখন সস্তা-গণ্ডার দিন, ভক্ত শিষ্যেরা যা দিত-থুত তাতেই এঁদের সংসার বেশ চলে যেত, কোন অভাব ছিল না, ভাবনা-চিন্তাও ছিল না।

দুর্গার কথাটা আর একটু খুলে বলি। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা মেয়ে, নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণী সে নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তার অন্তর একটুও নীরস ছিল না। থাকতেও পারে না, যখন সে সংস্কৃত-বাংলা কাব্য-সাহিত্যের রসগ্রহণ

করতে শিখেছে। সরল হৃদয় নইলে কি কেউ শকুন্তলা মেঘদূত উপভোগ করতে পারে, না জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী অমন মধুর স্বরে গাইতে পারে! পদাবলী গাইতে গাইতে যখন মেয়ের দু'চোখ বেয়ে জল পড়ত, তখন বাপ-মা মুগ্ধনয়নে চেয়ে দেখতেন সেই প্রেমমূর্ত্তি। তবে দুর্গার কাঠামোর মধ্যে এতটুকু স্বার্থপরতা কোথাও ছিল না। তাই তার হৃদয়ের প্রেম ছিল স্বচ্ছ নির্ম্মল, সে প্রেমে কামনা-কালিমার স্পর্শমাত্রও ছিল না।

কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে একটা দুর্বিনীত অধীর সত্তা আছে। সে কখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে 'যুদ্ধং দেহি' বলে হাঁক ছাড়বে তার কোন ঠিকানা নেই। যখন সে এই রকম কোমর বেঁধে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় তার একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। নইলে মানুষ স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে যায়। দুর্গার আমাদের শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনে এইরকম একটা সঙ্কট এসে পড়ল। ভেসে যাওয়ার মেয়ে ত সে নয়! কিন্তু তার কি কিনারা হ'ল, পাঠক শুনুন।

কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানীর কুঠীতে এক তরুণ কর্ম্মচারী ছিল। তার নাম জন স্পেন্সার। সে বিলাতের এক পুরানো জমিদার ঘরানার ছোট ছেলে। সেদেশের আইন অনুসারে তার দাদাই সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছিলেন। জন এক হাজার পাউণ্ড বকশিশ পেয়েছিল মাত্র। তাই সে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে এদেশে এসেছিল। তখনকার দিনে বিলেতে একটা বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষে অতি সহজেই লক্ষপতি হওয়া যায়। জন বেচারা কিন্তু তিন বছরেও সেই কুবের-ভাণ্ডারের কোন সন্ধান পায় নাই। তবে সাবধানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সে তার হাজার পাউণ্ড পুঁজিকে প্রায় দেড় হাজারে তুলেছিল। জনকে কার্য্যসূত্রে রোজ জলপথে চন্দননগর যাওয়া-আসা করতে হ'ত। গঙ্গার দু'পারের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে যেত। ছেলেটি ভাবপ্রবণ; যা দেখত সবই তার কাছে নূতন, খুব ভাল লাগত। এদেশের লোককে সে অবজ্ঞা করতে শেখে নাই নেটিব বলে। বরং বাঙালী ছেলে-মেয়ের সঙ্গে পথে-ঘাটে যেচে আলাপ করত, তাদিকে আদর করত, খেলনা, পুতুল, বাতাসা কিনে দিত। পাল-পার্ব্বণে বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ পেলে আনন্দে নিমন্ত্রণ রক্ষা করত। যত্ন করে বাংলা বলতে শিখেছে—সত্যিকার বাংলা, "টুমি কে আছে"-গোছ অদ্ভুত ভাষা নয়। অন্য সাহেবেরা পিছনে যতই তাকে ঠাট্টা-তামাশা করুক না কেন, সম্মুখে কিছু বলতে সাহস করত না, কারণ জন বনেদী ঘরের ছেলে এবং খুব রাশভারী। ভাবগতিকে সে দেখাত যেন খুব অল্পদিনের জন্যই সে ভারতবর্ষে এসেছে, এখানকার সাহেবদের নিন্দা বা প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না।

আগে জন ভোরের অন্ধকারেই আহিরীটোলা ঘাট থেকে পান্সী করে ফরাসডাঙ্গা রওনা হ'ত। এখন সূর্য্যোদয়ের পরে বেরোচ্ছে। এক দিন যখন ভৈরবপুরের ঘাটের কাছ দিয়ে নৌকা যাচ্ছে তখন সাহেব দেখলে যে এক অপরূপ সুন্দরী, সদ্যস্নাতা, কলসী কাঁখে ধীরে ধীরে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে। প্রাতঃকালের সূর্য্যের আলো তার উপর পড়ে তার সমস্ত দেহখানি উদ্ভাসিত করে তুলেছে। সেই সোনালী আলোতে, গঙ্গাবক্ষের সেই শীতল হাওয়াতে জনের অন্তরটা বলে উঠল, "কি সুন্দর, কি সুন্দর, এমন রূপ ত কখনও দেখি নি!" হাঁ করে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগল। কে এই তরুণী, একি তার চেনা কেউ? তা কি করে হবে? সে ইংরেজ, মেয়েটি বাঙালী, দু'জনের পূর্ব্বপরিচয় অসম্ভব। সঙ্গে যে বাঙালী কেরাণীটি ছিল তাকে জন অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "কাদের মেয়ে?" বাবুটি ধূর্ত্ত, ভাবলে যে এই শিকার সাহেবের হাতে তুলে দিতে পারলে বেশ দু-পয়সা বকশিশ পাবে। খুব অমায়িক হাসি হেসে উত্তর দিলে, "বামুন পণ্ডিতের বিধবা মেয়ে, খুব গরীব ওরা, সস্তায় পাওয়া যাবে। চেষ্টা দেখব সাহেব?" কথাটা কানে যেতেই জনের গোলাপী নেশা ছুটে গেল, গর্জ্জন করে উঠল, "চুপ কর, বেয়াদব। ফের ওরকম কথা মুখে আনলে মুখ ভেঙে দেব।" বাবু চেপে গেলেন, "বেশ, বেশ, সবুরে মেওয়া ফলে।" নৌকা এগিয়ে চলল। যতক্ষণ দেখা যায় জন চেয়ে রইল দুর্গার পানে। তার পর আস্তে আস্তে পান্সীর ভিতরে উঠে গিয়ে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

এদিকে দুর্গা যখন প্রথম দেখলে যে একটা সাহেব তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে তখন ভারি বিরক্ত হ'ল। মনে মনে "পোড়ারমুখো!" বলে মাথার কাপড় টেনে ধীরে ধীরে বাড়ী চলে গেল। পোড়ারমুখো সাহেবটা বেয়াদব ত বটেই, কিন্তু দুর্গার বুকের ভিতরটা অমন ঢিপ ঢিপ করছে কেন? ভয়ে? কে জানে! মুখখানি লাল টুকটুকে করে যখন উঠানে ঢুকল, মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে দুর্গা, মুখটা অমন রাঙা হ'ল কেন? রোদ লেগে গেছে বুঝি? কাল থেকে আর একটু সকাল সকাল ঘাটে যাস্।" মেয়ে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে বটে, কিন্তু বুক তার তখনও দুরু দুরু করছে। ছি, ছি কি হ'ল তার! মালবিকার কথা, দময়ন্তীর কথা, শকুন্তলার কথা সে পড়েছে। কিন্তু বই পড়ে আর প্রেমের ধর্ম্ম কে কবে বুঝেছে! অতনুর শরের ঘা এক বার খেলে তবে না বোঝা যায় তার শক্তি কেমন দুর্জ্জয়! সে রাতটা দুর্গার ভাল করে ঘুম হ'ল না। একটা অজানা কিসের

উত্তেজনা তার অন্তরে তোলপাড় করতে লাগল। ভয়ও হচ্ছিল, আবার ভালও লাগছিল।

পর দিন সকালবেলা ঘাটে যেতেই দুর্গা দেখলে যে সেই সাহেবটির পান্সী সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সাহেব আগের দিনের মতই তার পানে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। আজ সেও চোখ তুলে সাহেবকে এক বার দেখলে। চার চোখ মিলল। চোখে চোখে কিছু কথা হ'ল কি? বোধ হয় হ'ল। নৌকা চলে গেলে দুর্গা একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। আজ মনটা তার কেমন হাল্কা বোধ হচ্ছে। পান্সী একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেইদিকে সে চেয়ে রইল। তার পর স্নানাদি সেরে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে গেল। মনে একটা খটকা লেগেছে, "আমি কিছু অন্যায় করলাম কি?"

সারাদিন সারারাত কত কি ভাবছে দুর্গা। সাহেব দেখতে বড় সুন্দর! ছিঃ, ও-কথা কি মনে করতে আছে। দেখলে কিন্তু ভাল লোকই মনে হয়। তা হলে কি চায় সে দুর্গার কাছে? দুর্গাকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে তার বাপ-মার কাছ থেকে? না, কখখনো নয়, সে রকম সাহেব এ নয়! তবে তার মতলব কি, ও রকম করে তাকিয়ে থাকে কেন? তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা হয়েছে? লোকটা নিশ্চয় পাগল। নইলে সাহেব হয়ে বামুনের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়! চায় তাই বা কে বললে? কি সব ছাই কথা মনে আসছে! না, কাল থেকে আর সকালবেলা ঘাটে যাবে না দুর্গা। এক বার ভাবলে, বাবাকে বলি সব কথা। সব কথা আবার কি! কে এক জন সাহেব তার দিকে চেয়ে চেয়ে গেছে, সেও তার পানে এক বার তাকিয়েছে। এতে হয়েছে কি? নিশ্চয় দুর্গার নিজের মাথা খারাপ হয়েছে: নইলে এমন করে তিলকে তাল করে তুলছে কেন? না, বাপকে এসব কথা বলতে বড় লজ্জা করবে। দিনকয়েক দেরি করে ঘাটে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তা হলেই সাহেব তার খেয়াল ছেড়ে দেবে।

পর দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ঘাটে বেরুল না, জোর করে ঘরের খুঁটিনাটি কাজ নিয়ে বসল। মা খুব বকুনি দিলেন, "এখনও ঘাটে গেলি না, দুর্গা, সেদিনকার মত আবার রোদ লাগাবি!" দুর্গার মন একটা ছুতো খুঁজছিল মাত্র। "এই যাচ্ছি মা" বলেই কলসী নিয়ে ছুটল নদীর পানে। ঘাটের কাছবরাবর গিয়ে দেখলে যে সাহেবের পানসী ধীরে ধীরে ঘাট পার হয়ে যাচ্ছে। সাহেব হাঁ করে ঘাটের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, দুর্গা ছুটে আসছে দেখে একটু হাসলেন। দুর্গার ঠোঁটের কোণেও কি একটু হাসি ফুটে উঠল? ঠিক বলা যায় না, তবে তার মনে যে একটা আনন্দের ছোট্ট লহরী খেলে গেল, সেটা নিশ্চিত। এই রকম চলল মাসখানেক। ক্রমশঃ দুর্গা যেন স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে। বড় মধুর লাগে তার এই প্রতিদিনের দেখা। এক একবার মনে করে, "এ আমি কোথায় ভেসে চলেছি?" আবার সব ভাবনা-চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে, "পারি না ভাবতে। যা হবার তাই হবে। শেষ পর্য্যন্ত মা গঙ্গা আছেন।" বাপ-মাকে কিন্তু কিছু বলতে পারলে না লজ্জায়।

জন স্পেন্সারও গা ভাসিয়ে দিয়েছে। রোজ সকাল-বেলায় দুর্গাকে দেখে দিনটা বেশ গোলাপী নেশায় কেটে যায়। সেই কেরাণী বাবুটি ত রোজ সাহেবের সঙ্গে পানসীতে থাকে, সাহেবের রকম-সকম নজর করে দেখে। দুই একবার বলেওছে, "কেন কষ্ট পাচ্ছেন, স্যার! হুকুম পেলে অতি সহজেই আমি ওঁকে এনে দিতে পারি। এ রকম ত রোজই হয় হুজুর!" খুব তাড়াও খেয়েছে প্রভুর কাছে, "দূর হয়ে যা, শয়তানের বাচ্চা। খবরদার, এসব নীচ কথা মুখে আনবে না।" দুর্গাকে জন ছাড়তেও পারছে না, আবার তাকে অপমান করা, তার ক্ষতি করাও জনের পক্ষে অসম্ভব। খুব জোর করে নিজেকে বলে, "না, ইংরেজ-ভদ্রলোকের ছেলে স্ত্রীলোককে অপমান করে না। যাকে ভালবাসি, তার মানসম্ভ্রম রক্ষা করতে না পারি ত কিসের ভদ্রলোক আমি!" অনেক ভেবে-চিন্তে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করলে, সে দুর্গার বাপের কাছে যাবে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। সে বিলেতী সাহেব, অত কি জানে যে হিন্দুর সঙ্গে খ্রীষ্টানের বিয়ে হয় না। যদি সে রকম কোন কথা শুনেও থাকে ত সেটা অন্ধ কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে সে প্রস্তুত। কেরাণীবাবুকে এক দিন বললে বিবাহ-প্রস্তাবের কথা। বাবু হো হো করে হেসে উঠল, "বলেন কি, হুজুর, বামুনের ঘরের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করবেন! আমি বলতে গেলে আমাকে জুতো-পেটা করবে।" জন উত্তর দিলে, "তোমাকে কিছু বলতে যেতে হবে না, বাবু। তুমি নৌকোয় বসে থাকবে, যা বলবার আমি নিজে গিয়ে বলব। যদি আমার বাংলা বিদ্যাতে না কুলোয়, তা হলে তোমাকে ডাকব।" বাবু মনে মনে হেসে বললে, "বিয়ে না নিকে! যা হোক আমার ঘটকবিদায়টা না মারা যায়, দেখতে হবে।"

বিয়ের কথা যে দুর্গার মনে একেবারে আসে নি, তাও নয়। এই এক মাস ধরে সে কত কথাই না ভেবেছে! কাব্য-সাহিত্যে সে গান্ধর্ব্ব বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত পেয়েছে। গান্ধর্ব্ব বিবাহ যে জাতকুলের বাধা মানে না, তাও সে জানে ত। এসব কথা ভাবতে ভাবতে দুর্গার ছোট্ট কান দুটি লাল হয়ে উঠত। বড় ভাল লাগত তার এই সব দিবাস্বপ্ন। তবে এই স্বভাব-পবিত্র ব্রাহ্মণ কন্যার স্নিগ্ধ মধুর প্রেমের মধ্যে লালসার কোন ছোঁয়াচ ছিল না। তার একবারও মনে

হ'ত না যে সাহেবকে ভালবেসে সে নিজেকে কোন রকমে খাটো করছে। তবু বাবা মা মত না দিলে সে বিয়ে করবে না, এটা নিশ্চিত। পূজায় বসে ঠাকুরের চরণে কত প্রার্থনাই না সে জানাত! দেখা যাক, ঠাকুর শেষ অবধি কি ভাবে নিষ্পত্তি করলেন দুর্গার সমস্যা।

এক দিন সূর্য্য উঠতে না উঠতে সাহেবের পানসী এসে লাগল ভৈরবপুরের ঘাটে। সাহেব লাফিয়ে নেমে পড়লেন। ঠিক সেই সময়ে দুর্গা কলসী নিয়ে আসছিল নদীর পানে; জনকে নামতে দেখে সে কেমন যেন ভয় পেয়ে একছুটে বাড়ী পালাল। মা উঠানে বসে তরকারি কুটছিলেন। দুর্গা তাঁকে জড়িয়ে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "মাগো, কে একজন সাহেব এসেছে বাবার কাছে।" বলতে বলতে একবার তার মুখখানি পাঙ্গাশ হয়ে গেল, আবার তখনই শিরায় শিরায় একটা রক্তের ঝলক উঠে মুখে যেন সিঁদুর লেপে দিলে। দু'হাতে চোখ ঢেকে দুর্গা ছোট্ট মেয়েটির মত মায়ের কোলে শুয়ে পড়ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চুপি চুপি মাকে কত কথাই বললে। আজ আর তার কোন লজ্জা-সঙ্কোচ নেই। জীবন-মরণের সমস্যা এসে পড়েছে। ওদিকে, জন যখন নৌকা থেকে নেমে দেখলে যে দুর্গা দৌড়ে পালাচ্ছে তখন একটু থমকে দাঁড়াল। তার পর বার দুই গা ঝাড়া দিয়ে বললে, "না, কর্ত্তব্য যখন স্থির করেছি আর ইতস্ততঃ করব না।" বলে মাথা উঁচু করে দৃঢ় ভাবে দুর্গাদের বাগানের দিকে এগোল। পণ্ডিত মশায় তখন খুরপি নিয়ে বাগানে কাজ করছিলেন। একজন শ্বেতকায় ভদ্রলোককে ঢুকতে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে চান আপনি সাহেব?" জন সসম্ভ্রমে টুপী তুলে উত্তর দিলে, "আপনার কাছেই এসেছি, মশায়। আমার একটা বিনীত প্রার্থনা আছে।" ঠাকুর মশায় হেসে উঠলেন, "উপহাস করছেন, সাহেব? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত, আপনি সম্ভ্রান্ত বণিক, আমি আপনাকে কি দিতে পারি বলুন?" জন একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললে, "না, উপহাস করি নেই, মশায়। এ উপহাসের কথা নয়। আপনার এক অমূল্য রত্ন আছে, সেই রত্ন আমি ভিক্ষা করতে এসেছি। আপনার মেয়েকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি। তাকে আপনি দয়া করে আমার হাতে দিন। আমি পুরানো সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, আপনার মেয়েকে যথাসাধ্য যত্নে আদরে রাখব। বিবাহ করে তাকে আমি আমার দেশে নিয়ে যাব।" ব্রাহ্মণ অট্টহাসি হেসে উঠলেন, "সাহেব, তুমি পাগল। বামুনের মেয়ের সঙ্গে কি খ্রীষ্টান সাহেবের বিয়ে হয়!" জন আজ সাহসে বুক বেঁধে এসেছে; বিনীতস্বরে বললে, "বিবাহ হিন্দুমতে না হতে পারলেও খ্রীষ্টানমতে হতে পারে। আপনি সদয় হয়ে অনুমতি দিলেই আমি সব ব্যবস্থা করব।" ব্রাহ্মণ প্রসন্ন বদনে জনের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "সাহেব, তুমি সত্যই বড় ভাল লোক। আমি বুড়ো মানুষ, দীন দরিদ্র, এ দেশের রাজা অক্ষম অকর্ম্মণ্য, তুমি ইচ্ছা করলেই দুর্গাকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারতে। তা না করে তাকে তোমার ধর্ম্ম অনুসারে বিবাহ করতে চাইছ। জান, সাহেব, এক দিন আমাদের দেশে গান্ধর্ব্ব বিবাহ হ'ত? সে বিবাহে জাতকুলের কোন কথাই উঠত না। আজকের সমাজে কিন্তু তা চলে না। আচ্ছা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। বর-কনে পরস্পরের প্রতি একান্ত অনুরাগী না হলে গান্ধর্ব্ব বিবাহের কথাই ওঠে না। তুমি ত আমার দুর্গাকে চেনই না!" জনের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সলজ্জ হাসি হেসে উত্তর দিলে, "তার সঙ্গে আমার কোন দিন বাক্যালাপ হয় নেই বটে। কিন্তু আজ এক মাস দু'জনে দু'জনকে দেখছি। আমার মনে হয় না যে তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। তবে তিনি যদি আমাকে না চান, তা হলে আমি চিরদিনের জন্য বিদায় নেব, আর আপনাদের কাছে দেখা দেব না।"

এই রকম দু'জনে কথাবার্ত্তা হচ্ছে এমন সময় ব্রাহ্মণী বেরিয়ে এলেন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি দোরের আড়াল থেকে তোমাদের সব কথা শুনেছি। মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে সাহেবকে কোন জবাব দিও না। মেয়ে আমাকে আজ অনেক কিছু বলেছে।" ভিতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, "মা, একবার এখানে আয় ত!"

দুর্গা মাথা হেঁট করে এসে দাঁড়াল। বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, "খুকী, তুই এই সাহেবকে চিনিস্?" দুর্গা একবার সাহেবের দিকে চেয়ে দেখে মাথা নেড়ে জানালে যে সে তাঁকে চেনে। বাপ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "সাহেব তোকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মমতে বিয়ে করতে চান। তোর কি তাতে মত আছে?"

মেয়ে কোন উত্তর দিলে না; লজ্জায় তার মাথা বুকের উপর নুয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণ কাছে গিয়ে আদর করে মুখখানি তুলে ধরতেই তার দু'চোখ বেয়ে জল ঝর ঝর করে পড়তে লাগল। ব্রাহ্মণী একটু হেসে বললেন, "কি আর জিজ্ঞাসা করছ, ঠাকুর? দেখছ না যে মেয়ে তোমার স্বয়ম্বরা হয়েছে! ওকে আর আটকে রেখে কি হবে? আটকে রাখলে ও বাঁচবে না। এখন বুঝতে পারছি যে, কেন আজ একমাস থেকে মেয়ে ভাল করে খায় না, ঘুমোয় না, সদাই যেন আনমনা। তুমি সমাজের ভয় ছেড়ে দিয়ে ওকে সাহেবের হাতে তুলে দাও, দু'জনকে আশীর্ব্বাদ কর,

সুখী হোক। এতে আমরা ভগবানের চোখে দোষী হব না, সমাজ যাই বলুক না কেন।"

ব্রাহ্মণ একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার পর জনকে কাছে ডেকে বললেন, "বৎস, তুমি আমার খুকীকে নাও। আমি ওকে খুশী হয়ে তোমার হাতে সমর্পণ করছি।" দুর্গার হাত জনের হাতে রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন, "ভগবান তোমাদিকে সুখী করুন। সমাজের সঙ্গে একটু ছলনা করতে হবে, তা আমি করব।" জন সাহেব হলেও একেবারে কাঠখোট্টা ছিল না। চোখ মুছতে মুছতে করুণ স্বরে বললে, "ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। আমি দুর্গাকে সকল রকমে সুখী করতে চেষ্টা করব।"

উপসংহার দীর্ঘ নয়। কয়েকদিন পরে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী মেয়েকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরুলেন। তিন মাস পরে যখন দেশে ফিরলেন, তখন দুর্গা তাঁদের সঙ্গে নেই। সবাইকে বললেন, "মেয়েটা তিন দিনের ব্যারামে কাশীতে মারা গেল, সবই অদৃষ্ট!"

এদিকে জন দুর্গাকে যথারীতি কলকাতার বড় গীর্জ্জায় বিয়ে করে তাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বিলেত চলে গেল। কেননা খবর এসেছিল যে কয়েক সপ্তাহ আগে তার দাদা হঠাৎ মারা গেছেন। জন এখন আইন অনুসারে বিশাল পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হয়েছে; এখন তার বিলেতে জমিদারীতে বাস করা একান্ত আবশ্যক। কয়েক মাস পরে সার্ জন ও লেডী স্পেন্সার তাঁদের পুরানো ভদ্রাসন স্পেন্সার হল-এ বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। ইংরেজী ভাষা ও আদব-কায়দা আয়ত্ত করতে দুর্গার মত বুদ্ধিমতীর বেশী দেরী হ'ল না। অল্পকালের মধ্যেই সে নিজগুণে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল।

ভৈরবপুরে বুড়োবুড়ী বড় দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন। একে ত মেয়ের জন্য অহরহ মন কেমন করছে, তার উপর দারুণ অর্থকষ্ট। যে শিষ্য বন্ধুটী বসতবাড়ী করে দিয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে অর্থসাহায্য করতেন, তিনি একেবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন। কেননা লোকের মুখে মুখে একটা কথা রটেছিল যে, দুর্গা একজন ফিরিঙ্গীর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, আর সেই ফিরিঙ্গীটার কাছে বামুন টাকা পেয়েছে। ক্রমশঃ সবাই ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করলে। মনের দুঃখে পয়সার অভাবে বুড়ো বয়সে তিনি যজমানবৃত্তি আরম্ভ করলেন, তাও বহু দূরদূরান্তের গ্রামে।

প্রায় তিন বছর পরে একদিন বুড়োবুড়ী জীর্ণ বাড়ীখানির দাওয়াতে বসে সুখ-দুঃখের কথা কইছেন। বুড়ী ম্লান মুখে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাগা, তোমার কি মনে হয় ওরা ভাল আছে? কতদিন কোন খবর আসে নি!" ব্রাহ্মণ বললেন, "চিঠি ত সেই একখানা মাত্র এসেছিল আর বছরে খোকার জন্মের খবর দিয়ে। কিন্তু দেখ, আমার দেবতা বলছেন, সবাই ভাল আছে, সুখে আছে। তুমি ভেব না।" বলতে বলতে হঠাৎ ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে উঠলেন, "ওগো দেখ, দেখ, ঘাটে একখানা মস্ত বড় পানসী লেগেছে, কারা সব নামছে। ওঠ, গিন্নী ওঠ, মেয়ে জামাই এসেছে দেখছ না! ওগো, আর কে এসেছে, জান? ঐ দেখ, দেখ, দুর্গার কোলে খোকা।" এই না বলে দৌড়লেন দু'জনে ঘাটের পানে। জন দুর্গা ছুটে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। খোকা ঝাঁপিয়ে পড়ল দিদিমার কোলে। তার পর সবাই মিলে দাওয়াতে বসে কত সুখ-দুঃখের গল্প করলেন। যাওয়ার আগে জন শ্বশুরকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে এই অনুরোধ করলে, "বাবা, যদি আপনার অনুমতি পাই ত আমার বড় সাধ যে এইখানে আপনার আর মায়ের জন্য একটা কোঠাবাড়ী তুলে দিই, আর বন্দোবস্ত করে যাই যে কলকাতার কুঠী থেকে মাসে মাসে কিছু টাকা আসবে আপনাদের নিত্য খরচের জন্য। আমাদের জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছেন দু'জনে। এইটুকু ব্যবস্থা আপনাদের জন্য করতে দিন। টাকা আমি দিচ্ছি না, আপনার মেয়ে নিজে দিচ্ছেন।" একটু ইতস্ততঃ করে বৃদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত রাজী হলেন। জন দুর্গা যে ক'দিন কলকাতায় ছিল, রোজ একবার খোকাকে নিয়ে ভৈরবপুর আসত। তার পর সময় হলে তারা বিলেতে ফিরে গেল।

যথাসময় কোঠাবাড়ী উঠল, বুড়োবুড়ী সেখানে থাকতে গেলেন। কলকাতা হতে নিয়মিত টাকাও আসতে লাগল। যজমানদের বাড়ী বাড়ী ঘোরার দায় হতে বৃদ্ধ মুক্ত হলেন। কিন্তু অদৃষ্টে না থাকলে কি আর সুখ পাওয়া যায়!

বিলেতে ফিরে যাবার বৎসরখানেক পরেই প্রথমে খোকা, তার পর দুর্গা মারা গেল। কলকাতার কুঠীর বড়সাহেব সেই দুঃসংবাদ ভৈরবপুরে দিলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সে নিদারুণ শোক সহ্য হ'ল না। কয়েক মাস মাত্র রোগ-ভোগ করে তাঁরা পর পর মেয়ের কাছে চলে গেলেন।

বছরখানেক বাদে জন যখন ভারতবর্ষে এল তাঁদিকে দেখতে, তখন তাঁরা দুজনেই পরলোকে, বাড়ী জ্ঞাতিদের দখলে। সেই বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আজও আছে, অন্ততঃ কিছু দিন আগে অবধি ছিল—দুটি বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন দেশের তরুণ-তরুণীর বিমল প্রেমের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ।

কবিগুরুর 'চিত্রা' কাব্যে রূপলোক ও ভাবলোক

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের জীবনে সত্যের সহিত পরিচয় দুই প্রকারে হইয়া থাকে। এক হইল রূপের মধ্যে যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করি তাহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বস্তুজগতের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা নিয়ত স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে তৎপ্রতি সচেতন করিয়া রাখে। সে সত্যকে ভুলিয়া থাকিবার জো নাই, তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য, আমাদের ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত প্রত্যক্ষগোচর। এই যে রূপ-সত্য, তাহার সহিত আমাদের পরিচয় সহজ ও ঘনিষ্ঠ। জীবনের প্রারম্ভেই তাহার সহিত আমাদের পরিচয় সুরু এবং তাহার সহিত সুষ্ঠু ব্যবহারে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত।

আর একটি সত্য আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত করে; তাহা হইল ভাব-সত্য। এই সত্যের স্থান আমাদের মনে, তাহার স্বীকৃতি আমাদের উপলব্ধিতে। রূপ-সত্যকে যেমন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূলভাবে স্পর্শ করি, এই ভাব-সত্যকেও তেমনি আমাদের বিভিন্ন, বিচিত্র অনুভূতিগুলির দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করিয়া যাই। তাহাকে আমরা আমাদের মনের মধ্যে আমাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া অনুভব করি, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া কোনমতে উড়াইয়া দিতে পারি না। অথচ তাহা রূপ নয়, তাহা ভাব মাত্র, তাহাকে হাতে ধরিয়া রূপজগতে হাজির করিবার উপায় নাই, তাহা মনের দ্বারাই উপলভ্য। রূপ-সত্য যেমন বৈজ্ঞানিক, ভাব-সত্য তেমনি আধ্যাত্মিক।

আমাদের ভাব-সত্য রূপজগতের সহিত আমাদের ব্যবহারকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। এই ভাবলোকের সত্যকে আশ্রয় করিয়া ঘিরিয়া থাকে আমাদের আদর্শ, আমাদের আশা-ভরসা, আমাদের সাধনা। রূপ-সত্য আমাদের জীবনকে সীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে, ভাব-সত্য আমাদের জীবনকে একটা অসীমতার দিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়। রূপলোক ও ভাবলোক লইয়া আমাদের জীবন সংহত ও বিস্তৃত। ইহাদের কোন একটিকে অস্বীকার করিলে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়। যদি ভাবলোককে আমরা রূপলোক হইতে বিবিক্ত করিয়া দেখি তবে জীবনের সহিত তাহার যোগ দুর্ব্বল হইয়া যায়, তবে সেখানকার সত্যকে আমরা সন্দেহ করিতে থাকি, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি না। 'আমার ধর্ম্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "বাইরের জগতে মানুষের যে পরিচয় সেইটেতেই তার প্রতিষ্ঠা। বাইরের এই পরিচয়টি যদি ভিতরের সত্যের সঙ্গে কোন অংশে না মেলে তা হলে তার অস্তিত্বের মধ্যে একটা আত্মবিচ্ছেদ ঘটে।" অর্থাৎ, বাহির এবং ভিতর এই উভয়ের পরস্পরের যোগ না থাকলে কোন একটি সত্য পরিপূর্ণ মর্য্যাদা পায় না। বাহিরের দিকটিকে অস্বীকার করিয়া আত্মগত ভাবসাধনার মধ্যে সত্যকে ধরিতে চাহেন এরূপ escapist-এর (পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন) সংখ্যা আমাদের দেশে বিরল নয়। বস্তুতঃ ভাবকে রূপের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া দেখা একটি শিল্পী-দৃষ্টি। সে শিল্প-প্রতিভা সকলের থাকে না। শিল্পী তাঁহার ভাবকে রূপায়িত করেন, আমরা সেই রূপ হইতে ভাবকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সত্যকে অনুধাবন করি।

এই শিল্প-কর্ম্মটি খুব সহজ নয়। কত বিচিত্রতা সম্পাদন করিয়া আমাদের জীবন এই রূপজগতে বিস্তৃত; আমাদের ভাব সত্যটি এই বৈচিত্র্যের সংস্পর্শে আসিয়া নানা বিরোধের সম্মুখীন হয়। এমন সাধক খুব কমই আছেন যাঁহারা তাঁহাদের জীবন-সত্যটিকে শত বিরোধের মধ্যেও অবিকৃত অবস্থায় ধরিয়া রাখিতে পারেন। তাঁহাদেরই জীবন-শিল্পী বলা যাইতে পারে, শত দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্যেও যাঁহাদের জীবনের প্রকাশটি তাঁহাদের জীবন-সত্যকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রূপায়িত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এমনই এক জীবন-শিল্পী। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-জীবনদর্শন সামগ্রিকভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা এই জীবন-শিল্পীর শিল্প-প্রকাশ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব। ইহা গভীর ও বিশদ আলোচনাসাপেক্ষ, একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সুযোগ নাই। চিত্রা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার তাঁহার ভাবলোক ও রূপলোক স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহারই আলোচনা করিয়া কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কবিচিত্তের ক্রিয়াটি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

'মানসী'র কবি রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার বাসনা-কামনাময় ভালবাসা লইয়া রূপজগতের মধ্যে আপনার মানসিক ভোগের সন্ধান করিতেছিলেন তখন সেখানে রূপলোকের সহিত ব্যবহারে তাঁহার চিত্ত কেবলই অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। কবিপ্রকৃতি এই অশান্তি ও বিক্ষুব্ধতাকে একটা কাব্যস্ফূর্ত্তি দিয়া নির্দ্দ্বন্দ্ব হইতে চাহিয়াছে সত্য, কিন্তু রূপলোকের সহিত কবির ব্যবহারটি সহজ হইয়া উঠে নাই। কবি আপনার মধ্যে যে তৃষ্ণা অনুভব করিতেছিলেন, রূপলোকে সে তৃষ্ণা মিটিতেছিল না। রূপলোক যেন কবিচিত্তকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, কবিচিত্ত তাহাকে ছাপাইয়া উঠিতেছিল। ইহাতে রূপলোকের অপূর্ণতা ও দীনতা কবির কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং কবি ইহারই পূর্ত্তির জন্য আপনার মানসলোকে রূপকে একটি ভাবের সাধনায় গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। এইরূপে ধীরে ধীরে মানসীতে কবির মানসিকতায় একটি ভাবলোক গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেখানে কবি তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জড়ো করিয়াছেন। এই ভাবলোকের পিছনে রূপলোকের একটা আবেদন থাকিলেও সেখানে বাস্তব-সত্যকে ছাড়াইয়া কবিসুলভ ভাবকল্পনাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।

কবির এই মানসবিহারটি গগনবিহারী বিহঙ্গের পক্ষ-বিস্তারের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দেখি, কবির মন-বিহঙ্গটি পৃথিবীর বৃক্ষে যে নীড় বাঁধিয়াছিল, বৃক্ষের আন্দোলনে সেই নীড়টিকে ছাড়িয়া কেবলই তাহার চারিপাশের আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। যে বৃক্ষে তাহার বাস, সেই বৃক্ষটিকেও যেমন সে ভাল করিয়া চেনে নাই, বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া যে অসীম শূন্যে সে তাহার পক্ষ বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, সেই আকাশকেও সে তেমনি চেনে নাই। রূপলোক ও ভাবলোক উভয়ের সঙ্গেই তাহার পরিচয় অসম্পূর্ণ; তাই ভয়-ভাবনা, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখের কাকলিতে এই কণ্ঠটি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর জীবনের সহিত পরিচয় ক্রমশঃ যত গভীর হইতে লাগিল, ততই রূপলোক কবির কাছে আপনার অর্থ লইয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ভাবলোকে কবির পক্ষবিলাসও গভীরতর তাৎপর্যলাভ করিল। মানসীর পরে 'সোনার তরী'তে কবির মনে একটি দার্শনিক বোধ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল এবং তাহাতে কবির ভাবলোক একটি নূতন উপাদানে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। এই দার্শনিক বোধটি কোন এক জ্ঞানসাপেক্ষ তত্ত্ব হিসাবে কবির চিত্তকে সমৃদ্ধ করে নাই, পরন্তু তাহা জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে একটি বেদনাময় উপলব্ধির মধ্য দিয়া কবিচিত্তে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। 'দুই পাখী' কবিতাটিতে এই অভিজ্ঞতার কথাটি বলা হইয়াছে। খাঁচার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে জীবনের যে প্রকাশ, একটা বৃহত্তর জীবন কেবলই তাহার উপর স্পর্শ রাখিতে চাহিতেছে এবং খাঁচার বাধা দূর করিয়া ক্ষুদ্রকে বৃহত্তের মধ্যে লীন করিতে চাহিতেছে। এই বৃহত্তর জীবনবোধে কবির ভাবলোকটি এখানে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবি 'দীপ্তি-ভরা নয়নমাঝে তৃপ্তিহীন তৃষা' লইয়া এই নূতন জগতে উপস্থিত হইয়াছেন। এখনও ইহার সম্যক্ পরিচয় পান নাই; আপনার 'ছোট ক্ষেত' হইতে ইহাকে একখানি 'তরু-ছায়া-মসী-মাখা' মেঘে ঢাকা গ্রামের মত প্রতীয়মান হইতেছে। কবি শুধু কল্পনার সেই ঘুমের দেশে নিদ্রিতা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর গলায় মালা পরাইয়া দিয়া আসিতে পারেন, তাহার শুভ-দৃষ্টিলাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার এখনও হয় নাই। একদা জীবনের নবীন প্রভাতে কবি সেই বিদেশিনীর আহ্বান শুনিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইলেন। সেখানে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পার হইয়া গভীর তিমিরময়ী রাত্রির মধ্যে পথ কোথায় চলিয়া গিয়াছে! সোনার ফসল ফলাইতে ফলাইতে কবি এই পথে চলিতে লাগিলেন। এই যাত্রার মূলে যে সত্যটি রহিয়াছে, 'সোনার তরী' কবিতাটিতে তাহা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

'সোনার তরী'তে এই যে একটি বৃহত্তর জীবনবোধ কবির ভাবলোককে পুষ্ট করিয়াছে চিত্রা কাব্যে তাহাই রূপজগতে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং কবির রূপলোক ও ভাবলোক নূতন অর্থ লইয়া স্ব স্ব বিশিষ্টতায় কবির মনোজগতে ধরা পড়িয়াছে।

চিত্রার 'সুখ' কবিতাটিতে কবির রূপলোকের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে রূপলোকের নূতন অর্থটি কবির কাছে অভিব্যক্ত হইয়াছে। মেঘমুক্ত প্রসন্ন আকাশের তলায় কবি দৈনন্দিন পৃথিবীর ছবিটি দেখিতেছেন এবং অন্তরের মধ্যে একটি অনাবিল শান্তি অনুভব করিতেছেন। এখানে রূপবস্তু সাধারণ ও সামান্য; অর্দ্ধমগ্ন বালুচর, ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু, প্রচ্ছন্ন কুটির, বক্রশীর্ণ গ্রামাপথ, কৌতুকালাপে মগ্ন স্নানরত গ্রামবধূগণ, নৌকার উপরে কর্ম্মনিরত জেলে ও তাহার উলঙ্গ বালক, আতপ্ত পবনে সঞ্চারিত আম্রমুকুলের গন্ধ ও বিহঙ্গের মধুর স্বর,—এ সকলি একটি শান্ত ছন্দ রক্ষা করিয়া কবি-চিত্তে গভীর ও সহজ ভাবের আবেদন জানাইতেছে। ইহা যেন বিশ্ববীণা হইতে গানের মতন উঠিয়া সমস্ত গগন নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহাকে প্রকাশ করিতে কবি উৎসুক হইয়াছেন। কিন্তু ইহাকে ধরা তো সহজসাধ্য নয়। এই রূপকে যখনই আঁকড়িয়া ধরিতে যাইতেছেন, বাসনার মধ্যে, ভোগের মধ্যে যখনই তাহাকে আবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন, তখনই তাহার মধ্যে সুন্দরের ব্যঞ্জনা অন্তর্হিত হইতেছে। তাই কবি এখানে মানসীর যুগের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়াছেন:

> কঠিন আগ্রহভরে
> ধরি তারে প্রাণপণে মুঠির ভিতরে
> টুটি যায়, হেরি তারে তীব্রগতি ধাই
> অন্ধবেগে বহুদূরে লঙ্ঘি চলি যাই,
> আর তার না পাই উদ্দেশ।

ইহারই জন্য মহাবিশ্ব-সঙ্গীতটিকে কবি সহজে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। এই অপ্রকাশের বেদনা কবির কাব্যজীবনে বরাবর রহিয়া গিয়াছে। বলাকাতেও কবি বলিতেছেন:

> যে কথা বলিতে চাই,
> বলা হয় নাই,
> সে কেবল এই
> চির দিবসের বিশ্ব আঁখি সম্মুখেই
> দেখিনু সহস্রবার
> দুয়ারে আমার।
> অপরিচিতের এই চির পরিচয়
> এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়,
> সে-কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
> আমি নাহি জানি।

মানসীর যুগে রূপলোকের মধ্যে এই বিশ্ব-সঙ্গীতটির পরিচয় কবি পান নাই (অবশ্য 'অহল্যা' কবিতাটিতে ইহার একটি অনুকরণ লক্ষিত হয়); চিত্রায় রূপলোকের মধ্যে এই বিশ্ব-সঙ্গীতটিকে, এই শান্ত সরল ছন্দটিকে তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন এবং তাহার উদ্দেশে প্রণতি জানাইয়াছেন। 'বিজয়িনী' কবিতাটিতেও সমগ্র বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রীভূত সত্তার কাছে অনঙ্গদেবতার অনুরূপ একটি প্রণাম দেখি। সৌন্দর্য্য-সত্তাকে অনঙ্গদেবতা ভোগের মধ্যে বাঁধিতে পারেন নাই, তাহাকে প্রণাম জানাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

চিত্রার রূপলোকের মধ্যে এই সহজ সরল ছন্দের আবিষ্কারটি অভিনব। ইহাতে কবি রূপলোকের মধ্যে একটি মহিমা দেখিতেছেন, একটি গভীরতাও ব্যাপ্ত দেখিতেছেন। এখন তিনি পূর্ণিমার আলোতে একটি লোক-লোকান্তরপূর্ণ মৌন বাণীর ব্যঞ্জনা দেখিতেছেন, ধূলির মধ্যে ব্রতচারিণী মাতৃমূর্তি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ধূলিকে উদ্দেশ করিয়া কবি বলিতেছেন :

> অয়ি ধূলি, অয়ি তুচ্ছ, অয়ি দীনহীনা,
> সকলের নিম্নে থাক নীচতম জনে
> বক্ষে বাঁধিবার তরে ; সহি সর্ব ঘৃণা
> কারে নাহি কর ঘৃণা। গৈরিকবসনে,
> হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি উদাসীনা
> বিশ্বজনে পালিতেছ আপন ভবনে।
> নূতনেরে নির্বিচারে কোলে লহ তুলি,
> পুরাতনে বক্ষে ধর, হে জননী ধূলি।

এইরূপে যাহা আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ কবি-দৃষ্টিতে তাহা মহিমা লাভ করিতেছে। রূপলোকে যাহা অসম্পূর্ণ সহস্র আঘাতে চূর্ণ, বিদীর্ণ, বিকৃত, মৃত্যুর দ্বারা নানা ভাবে খণ্ডিত, কবি মৃত্যুর পরপারে তাহারও একটি সম্পূর্ণতা, সফলতার সম্ভাবনা আশা করিতেছেন :

> হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময়
> অনিত্য চঞ্চল
> সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব নূতন রূপে
> হয় সে সফল।
> চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব
> রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,—
> জন্মান্তের নবপ্রাতে সে হয়তো আপনাতে
> পেয়েছে উত্তর।

এই রূপলোক অনিত্য, চঞ্চল, বিফলতাময় ; কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন জলস্থল, নভঃস্থল মৌন, স্তম্ভিত, বিষাদে নিমগ্ন তখন সেই ধূসর সন্ধ্যায় এই পৃথিবীর দিকে চাহিয়া কবি তাঁহার জীবন-যাত্রাটির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন। কবির মনে হইতেছে, ধরিত্রী যেন আপনার মধ্যে একটি পরিস্ফুটনোন্মুখ জীবনকে ধারণ করিয়া আছে ; নীহারিকা হইতে তাহার সুরু এবং লক্ষ কোটি জীব বক্ষে ধারণ ও লালন করিয়া বহু দুঃখ-ক্ষতির মধ্য দিয়া আজ তাহার বর্তমান পরিণতি। এই জীবধাত্রী জননীর কাজ এখনও শেষ হইয়া যায় নাই, সে ভবিষ্যতের ঘোর তমসার দিকে চাহিয়া আপনার শেষ সার্থকতা খুঁজিতেছে :

> ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার
> গাঢ়তর নীরবতা—বিশ্বপরিবার
> সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
> বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগভীর
> একটি ব্যথিত প্রশ্ন, ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
> শূন্যপানে—"আরো কোথা। আরো কতদূর।"

এইরূপে রূপলোককে কবি সামগ্রিক ভাবে দেখিতেছেন এবং ইহাতে এক দিকে যেমন সেখানে একটা সহজ শ্রী ও সার্থকতা দেখিতে পাইতেছেন, অপর দিকে তেমনি একটি বৃহত্তর পটভূমিকায় জীবনকে অবলোকন করিয়া জীবনের মহত্তর ধর্মগুলি এবং জীবনের দীনতা উভয়ই অনুভব করিতেছেন। 'ব্রাহ্মণ' এবং 'পুরাতন ভৃত্য' কাহিনী দুইটিতে জীবনের সত্যধর্ম ও প্রেমধর্মের মহান্ রূপ দেখাইয়াছেন, আবার 'দুই বিঘা জমি'তে উৎপীড়কের হীন অত্যাচারের ছবি স্পষ্ট করিয়া আঁকিয়াছেন। 'নগর-সংগীত' এবং 'শীতে ও বসন্তে' কবিতায় আমাদের প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ জীবনকে কবি বিদ্রূপ করিয়াছেন। রূপলোকের মধ্যে কবি যে ব্যাপ্তি, যে শ্রীটুকু দেখিতেছেন আমাদের নাগরিক জীবনের তুচ্ছতা ও সঙ্কীর্ণতা তাহার অনেকখানি ব্যাহত করিতেছে। ইহাতে কবিচিত্তে বিরোধ জাগিয়াছে এবং তাহা কবিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যঙ্গাত্মক করিয়াছে। কিন্তু চিত্রা কাব্যে রূপজগতের সহিত ব্যবহারে শ্লেষের সুর মুখ্য হইয়া উঠে নাই, কারণ কবির অন্তর্লোকে একটি বৃহত্তের, পূর্ণতার ও মহিমার ভূমিকা রহিয়াছে এবং তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে কবি যাহা তুচ্ছ, যাহা দীন তাহাকে শোধন করিয়া লইতে চাহিতেছেন, তাহার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য, একটা সার্থকতা দেখিতে চাহিতেছেন।

এই ভাবলোকে কবি একটি অভিনব উচ্চতর মানসিক ভোগের সন্ধান করিতেছেন, সেখানে এক সম্পূর্ণতাকে ধরিতে চাহিতেছেন। তাহা এই রূপলোকের পরপারে রহিয়াছে। রূপলোকে কবি তাহাকে ধরিতে পারিতেছেন না, কিন্তু রূপ হইতেই সেই অরূপের তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিতেছে। পূর্ণিমা রাত্রে যখন চতুর্দিক শুভ্র জ্যোৎস্নায় আবেশবিহ্বল, তখন সেই রূপলোকের মধ্যে থাকিয়া কবির চিত্ত অরূপ-সৌন্দর্য্যের তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছে :

> আমি যে কাতর
> অনন্ত তৃষায় আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
> সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চির রাত্রিদিন,
> আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তর মন্দিরে
> অজ্ঞাত দেবতা লাগি—বাসনার তীরে
> একা বসে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
> আপন হৃদয় ভেঙে নাহি তার সীমা ?

অনন্ত আকাশ হইতে চন্দ্রালোক আসিয়া কবিকে স্পর্শ করিতেছে, তাঁহাকে তৃষ্ণায় ব্যাকুল করিতেছে, কবি সেই রূপের পর্দা সরাইয়া তাহারই পরপারে রূপাতীতকে ধরিতে চাহিতেছেন :

> কোনো মর্ত দেখে নাই
> যে দিব্যমূরতি আমায়ে দেখাও তাই
> এ স্তিমিত রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।

কবি অনুভব করিতেছেন, রূপের পরপারে রহস্যময়ী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী রহিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে এই রূপস্রোত ভাসিয়া আসিতেছে এবং কবির চেতনাকে স্পর্শ করিয়া কবিকে সেই অরূপের জন্য চঞ্চল

করিয়া তুলিতেছে, কবির অন্তরে অপূর্ব্ব বিরহ জাগাইয়া তুলিতেছে। কবি ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন:

খোলো দ্বার, খোলো দ্বার।
তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার
সৌন্দর্যসভায়। নন্দনবনের মাঝে
নির্জন মন্দিরখানি, সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা—রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ীবালা;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা।

'সোনার তরী'তে ভাবলোকে এই অরূপ-ধ্যান অস্পষ্ট ছিল। সেখানে কবি স্বপ্নের মধ্য দিয়া ঘুমের দেশে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর গলায় মালা পরাইয়াছিলেন। এখানে রূপপ্রবাহ বাহিয়া রূপের পরপারে অরূপমূর্ত্তির গলায় মালা দিতে চলিয়াছেন। এখানে কবি সচেতন, কবির ভাবলোক শুধুমাত্র স্বপ্ন দিয়া তৈয়ারি নয়, একটা নিদারুণ তৃষ্ণা, একটা গভীর বিরহ-বেদনা কবিকে ভাবলোকে উন্নীত করিয়াছে। সৌন্দর্যসত্তার জন্য এই যে অনন্ত বাসনা ও বিরহানুভূতি, 'উর্ব্বশী' কবিতায় ইহার তত্ত্বটি প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মানসস্বর্গে এই সৌন্দর্যসত্তা মূর্ত্তিমতী, তাহার জন্য আমাদের বাসনা সর্ব্বদা জাগ্রত।

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী।
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ শোণিমা;
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনী।

এই যে গভীর তৃষ্ণা কবিকে অরূপের ধ্যানে সমাহিত করিতেছে, 'মরীচিকা' কবিতাটিতে সেই তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থার রূপটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে:

কেন আসিতেছ মুগ্ধ মোর পানে ধেয়ে
ওগো দিক্‌ভ্রান্ত পান্থ, তৃষ্ণার্ত্ত নয়নে
লুব্ধ বেগে। আমি যে তৃষিত তোমা চেয়ে।
আমি চিরদিন থাকি এ মরুশয়নে
সঙ্গীহারা। এ তো নহে পিপাসার জল,
এ তো নহে নিকুঞ্জের ছায়া, পক্বফল
মধুরসে ভরা,...

শুধু জেনো, একখানি বহ্নিসম শিখা
তপ্ত বাসনায় তুলি আমার সম্বল
অনন্ত পিপাসাপটে এ কেবল লিখা
চিরতৃষার্তের স্বপ্ন মায়ামরীচিকা।

এই ভাবলোকে কবি যাহা অনুভব করিতেছেন তাহা অর্থহীন শূন্যতা নহে, কবির কাছে তাহা একান্ত সত্য। এ সত্য বস্তুগত নহে, ইহা আত্মিক; তাই ইহাকে কবি বাহিরের রূপলোকের মধ্যে উপস্থিত করিয়া প্রমাণ করিতে পারেন না, শুধু আপনার মধ্যে ইহার সত্যতা অনুভব করেন। 'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় এমনই এক ভাবসত্যের উপলব্ধির কথা কবি বলিয়াছেন। তিনি আপনার অন্তরে প্রেমের মহিমা অনুভব করিতেছেন এবং ইহাতেই প্রেমের সত্যতায় আস্থাবান হইয়াছেন। রূপলোকে কবি যে দৈন্য অনুভব করিতেছিলেন, এখন প্রেমের উপলব্ধিতে সে দৈন্য দূর হইয়া গিয়াছে। কবি বলিতেছেন:

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরবমুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর; তব রাজটিকা
দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ
আমার ক্ষুদ্রতা যত ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে।...
...সেথা আমি জ্যোতিষ্মান্
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী; সেথা মোর সভাসদ
রবিচন্দ্রতারা, পরি নবপরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব অর্থভরা; চির-সুহৃদ সমান
সর্বচরাচর।

এই যে নূতন রসসম্পদে কবির ভাবলোক ভরিয়া উঠিয়াছে যাহার মহিমা কবি আপনার মধ্যে নিয়ত অনুভব করিতেছেন, তাহাতেই কবির আত্মোপলব্ধি সুরু হইয়াছে, আপনার মধ্যে কবি একটি ভাবসত্তার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছেন এবং তাহার প্রকাশটি বুঝিতে পারিতেছেন। এই প্রকাশকে কবি আপনার মধ্যে একটা উৎসব বলিয়া মনে করিয়াছেন। 'উৎসব' কবিতায় সেই কথাটি ব্যক্ত হইয়াছে:

ওগো যে তুমি আমার মাঝে নূতন নবীন
সদা আছ নিশিদিন
তুমি কি বসেছ আজি নববরবেশে সাজি
কুন্তলে কুসুমরাজি অঙ্কে লয়ে বীণ।
ভরিয়া আরতি থালা জ্বালায়েছ দীপমালা
নূতন নবীন,
আজি বসন্তের দিন।

কিন্তু এই উপলব্ধির সময় কবিকে রূপলোক ছাড়িয়া ভাবলোকের মধ্যে আসিতে হইতেছে। তখন :

সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে।

ইহাতে এই দুই বিভিন্ন জগৎ তাহাদের বিশিষ্টতা লইয়া কবির কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যকার বিরোধটি সম্বন্ধে কবি সচেতন হইয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন :

আজি এ উৎসব কলরব কেহ নাহি জানে,
শুধু আছে তাহা প্রাণে।

এই ভাবলোক কবির আত্মবোধের ভূমি। অহং-এর ক্ষুদ্র, খণ্ড, সীমাবদ্ধ প্রকাশ হইতে দূরে এখানে একটি অখণ্ড ভাবসত্তার উপলব্ধি। 'অন্তর্যামী' কবিতাটিতে কবি এই ভাবসত্তার রহস্য খুঁজিয়া জীবনের সহিত তাহার সংযোগটি দেখাইতে চাহিয়াছেন এবং তাহার তত্ত্ব ও তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এখানে কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার একটি সংশয়ময় জীবন-দর্শন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। চিত্রা কাব্যে এই জীবন-দর্শনটি শুধুমাত্র রস-চেতনার আস্বাদিত হইয়াছিল, পরবর্তী যুগে 'মানুষের ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতনের' বাণীগুলিতে ইহা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কবি বলেন, রূপলোকের সহিত তাঁহার যে কারবার, সেখানে তাঁহার জীবনের যে প্রকাশ সে সকলই ভাবলোকের রহস্যময় সত্তার অভিপ্রায়ে হইতেছে। তাই সে সকলকে খণ্ড, বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হইলেও তাহারা পরস্পরের সহিত একটি গভীর অর্থে সংযুক্ত হইয়া একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে কবি স্বয়ং এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই এ একটা ব্যাপার যাহার উপরে আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না, যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ সেই খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি; তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।…আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষমাত্র—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।…শুধু কি কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন। তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একটি অখণ্ড তাৎপর্য্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়—আমার স্বার্থ আমার প্রবৃত্তি আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন; তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন।…এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্য দান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন; সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।"

এই ভাবটি অন্তর্যামী কবিতায় একটি অপূর্ব্ব কাব্যস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। আপনার ভাবলোকে কবি এই রহস্যময়ী সত্তার আবির্ভাব অনুভব করিতেছেন এবং তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া ধরিতে ছুঁইতে চাহিতেছেন, কিন্তু চিত্রা কাব্যে ইঁহাকে কবি একটা আবেগের মধ্যে লাভ করিয়াছেন মাত্র, এখানে ইহা একটি রসসম্ভোগের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, এখনও কবির ইহা পরিপূর্ণ উপলব্ধির বিষয় হইয়া উঠে নাই। তাই এখানে অপরিচয়ের বেদনাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং অরূপসত্তার ধ্যানটি কবি-মানসের অপূর্ব্ব রসবিলাসে পরিণত হইয়াছে—

ছাড়ি কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী
জীবনের শেষে কী নূতন বেশে
দেখা দিবে মোরে অয়ি!
চির দিবসের মর্মের ব্যথা,
শত জনমের চির সফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী,
মরণ নিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্তজনের শিয়রে আসিয়া
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি।
ললাট আমার চুম্বন করি
নবচেতনায় দিবে প্রাণ ভরি

নয়ন মেলিয়া উঠিব শিহরি
জানি না চিনিব কি না।
শূন্য গগন নীল নির্মল
নাহি রবি শশী গ্রহমণ্ডল
না বহে পবন, নাহি কোলাহল
বাজিছে নীরব বীণা।

এইরূপে দেখি চিত্রা কাব্যে কবির ভাবালোকে কবির জীবন-দেবতার আসনটি পাতা হইয়াছে। তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে একটি গভীর বিশ্বাস এবং একটি অস্পষ্ট বোধ। জীবনদেবতাকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বাস ও বোধ হইতে ক্রমশঃ কবির জীবন-ধর্মটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।—"আমার ধর্ম আমার উপচেতন লোকের অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে চেতন লোকের আলোতে যে উঠে আসছে এই লেখাগুলি তারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন। সে চিহ্ন দেখলে বোঝা যায় যে, সে পথ চেনে না এবং সে জানে না ঠিক কোন্ দিকে সে যাচ্ছে। পথটা সংসারের কি অতিসংসারের তাও সে বোঝে নি। যাকে দেখতে পাচ্ছে তাকে নাম দিতে পারছে না, তাকে নানা নামে ডাকছে।" এই প্রসঙ্গে কবি আরও বলেন, "ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তারপরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।" এই ভাবলোকে কবির জীবনদেবতার প্রতিষ্ঠা, কবির ধর্মের উদ্বোধন।

কিন্তু ভাবলোকে কবি যে পূর্ণতাকে দেখিতেছেন, রূপলোকে খণ্ডের মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই পূর্ণতাকে এখনও উপলব্ধি করেন নাই। 'চিত্রা' কবিতাটিতে কবি রূপলোকে বৈচিত্র্যের মধ্যে এবং আপনার ভাবলোকে একাকিত্বের মধ্যে যে একই সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন তাহা চিত্রা কাব্যের শেষকথা; ইহা একটি তত্ত্ব রূপে এখানে স্বীকৃত হইয়াছে, জীবনে ইহার পরিচয় এখনও কবি পান নাই। ইহারই জন্য রূপলোকের সহিত ভাবলোকের বিরোধ মিটে নাই, যদিও উভয়ের মধ্যে একটি সমন্বয়ের বিশ্বাস কবি অন্তরের মধ্যে পোষণ করিয়া চলিয়াছেন। পরবর্তীকালে তিনি এইরূপ সমন্বয় করিয়াছেন যে, এই অখণ্ড, এই পূর্ণ অরূপসত্তা, খণ্ডের মধ্য দিয়া রূপের মধ্য দিয়া বিচিত্রভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। ইহা তো রূপবিচ্ছিন্ন একটা নিছক আইডিয়া মাত্র নয়, ইহা রূপের মধ্য দিয়াই বিকাশমান একটা ভাবসত্তা। রূপ যেখানে ইহাকে প্রকাশ করে সেখানে রূপের মহিমা; রূপ যেখানে ইহাকে আচ্ছন্ন করে, সেখানে রূপের দীনতা, রূপের ব্যর্থতা। (এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, আপনার অন্তর্যামীকে কবি যখন বিভিন্ন বিচিত্র রূপের মধ্যে বিকশিত দেখিলেন, তখন কবির জীবনদেবতা বিশ্বদেবতায় পরিণত হইয়া গেলেন।)

কবির এই ভাবলোক—যেখানে পূর্ণের প্রতিষ্ঠা, সেখানে সমস্ত বিক্ষোভ প্রশমিত, গভীর শান্তি ও স্তব্ধতা সেখানে বিরাজ করিতেছে। এই ভাবলোকে আসিতে হইলে কবিকে রূপলোক ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। কবি এই বিচ্ছিন্নতাকে যখন অনুভব করিলেন তখন এই ভাব-সাধনাকে কবির গীতবিলাস বলিয়া মনে হইল।—

যেদিন জগতে চলে আসি
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ-দিন দীর্ঘ-রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।

রূপলোক হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মগত ভাবসাধনার মধ্যে সমাহিত হওয়া একটা 'এস্কেপিজম'। যিনি পৃথিবীর কবি, তাঁহার পক্ষে এই এস্কেপিজম কবি-ধর্মের বিরোধী। কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই বিরোধ দেখা দিয়াছে। 'স্বর্গ হইতে বিদায়' এবং 'এবার ফিরাও মোরে', এই দুইটি কবিতায় ইহার পরিচয় পাই।

'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটিতে কবি আপনার ভাবস্বর্গ হইতে বিদায় লইবার কথা বলিয়াছেন। স্বর্গে সকলই পূর্ণ; সেখানে চিরন্তন সুখ বিরাজমান। সেখানে সবকিছু আপনার সার্থকতায় ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ত্রুটির ক্ষমা নাই, ক্ষতির স্বীকৃতি নাই। অপূর্ণতা সেখানে লাঞ্ছিত, মহিমা ক্ষীণ হইলে সেখান হইতে চলিয়া আসিতে হয়। এহেন স্বর্গলোকে আত্মমহিমায় কবি স্থান-লাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু কবির সঙ্গীতের উৎস সেখানে অনেকখানি রুদ্ধ হইয়া যায়, তাঁহার কবি-ধর্ম ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। বেদনাই সঙ্গীতের প্রধান উৎস, কিন্তু পূর্ণতার মধ্যে বেদনা নাই। পূর্ণতা হইতে স্তবগান বা বন্দনা জাগিতে পারে, কিন্তু বেদনা হইতে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, পূর্ণতা সে সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে পারে না। স্বর্গের যে মন্দার-মালিকা, যে পারিজাত পুষ্প কখনও ম্লান হইয়া যায় না, তাহার দিকে চাহিয়া মুগ্ধ কবি স্তবগান রচনা করিতে পারেন, কিন্তু পৃথিবীর যে ফুল না ফুটিতে ঝরিয়া যায়, তাহাই কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপকরণ। বেদনাবোধ কাব্যসৃষ্টির প্রধান উপকরণ বলিয়া পাওয়া অপেক্ষা না পাওয়া, সুখ অপেক্ষা দুঃখ, জীবনের ছন্দ-রক্ষণ অপেক্ষা ছন্দপতনই অধিক প্রেরণা জোগায়। স্বর্গে পূর্ণতার রাজ্যে এই বেদনার স্বীকৃতি নাই। তাই ছন্দপতন সেখানে প্রশ্রয় পায় না, অশ্রু সেখানে প্রকাশ পায় না, বিরহের ছায়া মিলনের আনন্দকে ম্লান করে না। কাব্যসৃষ্টির এবং মূল্যবান উপকরণগুলির অভাবে স্বর্গে কবি-ধর্ম ক্ষুণ্ণ ও পীড়িত।

পৃথিবীর কবি তাই এই পূর্ণতার রাজ্য হইতে অপূর্ণ রূপজগতে ফিরিয়া আসিতে আগ্রহ বোধ করিয়াছেন। এই দীন পৃথিবীতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, হাসি-অশ্রু, চাওয়া-পাওয়ার দ্বারা তরঙ্গিত জীবনলীলাকে কবি আনন্দের সহিত মানিয়া লইবেন। তাই স্বর্গের অপ্সরীর অম্লান নয়নজ্যোতি অপেক্ষা কবির কাছে পৃথিবীর প্রেয়সীর শঙ্কিত কম্পিত হৃদয়ের অস্ফুট প্রেমাভিব্যক্তি আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। একটিতে রহিয়াছে বৈচিত্র্যহীন সুখের নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি, আর একটিতে রহিয়াছে প্রেমবেদনার তরঙ্গ-বিক্ষোভ; একটিতে সঙ্গীত

সমাপ্তির নীরবতা, আর একটিতে গীতহারীর ব্যাকুলতা। কবি এই তরঙ্গে দোলায়িত হইয়া গীত-মুখর হইতে চাহিয়াছেন। কবি জানেন ইহার মধ্যেই তিনি তাঁহার স্বর্গকে অনুভব করিবেন, এই অপূর্ণতাই পূর্ণতায় বিকশিত হইয়া উঠিবে।—

মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূরস্বপ্ন-সম—যবে কোন অর্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি, নির্মলশয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি
গ্রন্থি সরমের, মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর ; দক্ষিণ-অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।

যখন কবি বেদনার মধ্য দিয়া এই রূপলোকের সহিত প্রেমের সংযোগ অনুভব করিলেন তখন, 'অমনি এ স্বর্গলোক অলস কল্পনা প্রায় কোথায় মিলালো ছায়াচ্ছবি।' তখন কবিচিত্ত ইহাকেই সাগ্রহে অবলম্বন করিল।

কিন্তু 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় দেখি, কবি তাঁহার ভাবলোক হইতে পৃথিবীর যে পরিবেশের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে চাহিয়াছেন, সেখানে যে-কোন প্রকার সৌন্দর্যের উৎসারণই রুদ্ধ, সেখানে চরম দৈন্য তাহার সকল প্রকার বীভৎসতা লইয়া মুখব্যাদান করিয়া আছে। পৃথিবীর পরিচয় যে সুখের নয়, সেখানে যে প্রেয়সীর বাহুবন্ধন সর্বত্র আনন্দলোক রচনা করিয়া রাখে না, নানা অত্যাচার অবিচার নিপীড়নে আর্তজনের হাহাকার আকাশ-বাতাস ভরিয়া রাখিয়াছে—পৃথিবীর এই পরিচয়টিও কবিকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিল। কবির ভাবলোকের সহিত এই পৃথিবীর কোথাও মিল নাই। অথচ এখান হইতে পলায়ন করিয়া কবি যে আত্মগত ভাবসাধনায় মধ্যে নিমগ্ন থাকিবেন, তাহা কোনক্রমেই সম্ভব হইতেছে না ; মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত এই দীন বাস্তব পৃথিবী কবিকে তাঁহার কল্পলোক হইতে নামাইয়া আনিতেছে।

এখানে আসিয়া কবি চারিদিকে শত অভাব দেখিলেন এবং সেই অভাবের মধ্যে আপনার কবি-কর্মটিকে যুক্ত করিতে চাহিলেন। সেই কবি-কর্মটি এইরূপ :

সে বাঁশীতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্মহীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা
সুপ্তি হ'তে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।

কবি তাঁহার বাঁশীতে কি সুর শিখিয়াছেন, জীবনের মধ্যে তাহার প্রয়োগই বা কিরূপ ?

কবির সুর আত্মবোধের বাণী। আপনার একক ভাবসাধনায় কবি যে আদর্শের ধ্যান করিয়াছেন, যে মহিমার প্রতি সচেতন হইয়াছেন, তাহারই প্রভাবে কবি বুঝিয়াছেন যে, পৃথিবীতে কেহই দীন নয়। আমরা যদি আমাদের আত্মবোধ জাগাইয়া তুলি, যদি শ্রেয় শ্রেয়ের দিকে, পূর্ণতার দিকে দৃঢ়পদক্ষেপে আগাইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমরা তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিতে পারিব।

মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

মানব-মহিমার প্রতি এই যে বিশ্বাস, কবি তাঁহার আদর্শলোক হইতে সেটিকে ধূলির পৃথিবীতে লইয়া আসিবেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শবাদ, তাঁহার জীবনের এই ভাবসত্যকে অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন না—তাহাকে রূপ-নিরপেক্ষ একটি তত্ত্ব হিসাবে একটা 'ecstacy of art or **contemplation**—'রস-সাধনা বা ধ্যান কল্পনার আত্যন্তিক সুখ-সম্ভোগ' হিসাবে দেখিয়া জীবনের সহিত তাহার যোগটির গুরুত্ব অনুভব করেন না বা জীবনসাধনায় তাহার উপর নির্ভর করেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে ভাবসত্যকে রূপসত্যের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন, এবং রূপসত্যকে যাহার অনুগামী করিয়া উভয়ের মধ্যে একটা গভীর ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন, সেই ভাবসত্যের সাধনাকে অনেকেই জীবনের একটা সার্থক সিদ্ধির পন্থা বলিয়া গণ্য করেন না। সাধারণ মানুষের পক্ষে 'এক রূপ ক্ষণিক চিত্তবিলাস মাত্র' মনে করিয়া তাহাকে জীবনসাধনা হইতে বিযুক্ত করিয়া রাখেন। জীবনের মধ্যে সেই ভাবসত্যকে রূপায়িত না দেখিয়া তাঁহারা ইহাকে শুধুমাত্র কাব্যের সত্য বলিয়া বিচার করেন এবং এই জন্যই জীবন হইতে তাহাকে বিবিক্ত করিয়া দেখিয়া জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য কবি-মানসের কল্পনা-বিলাস বলিয়া ইহার চড়া মূল্য নির্দ্ধারণ করেন।

কিন্তু এই **attitude** বা দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিতে বসিলে রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এমন সত্যকে কখনও স্বীকার করিতে চাহেন নাই, জীবনের সহিত যাহার যোগ নাই বা জীবনের মধ্য দিয়া যাহা উপলভ্য নয়। এই অভিজ্ঞতার জন্য তিনি আপনার ব্যক্তিজীবনের উপর নির্ভর করেন নাই, পরন্তু আপনার মধ্যে এক বিশ্বমানবিক সত্তাকে উপলব্ধি করিয়া সেই জীবনের দর্পণে যাবতীয় সত্যের আলোককে প্রতিফলিত করিয়াছেন। ইহাতে কবি-জীবনের সত্য বিশ্ব-জীবনের সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বিশ্ব-জীবনের সত্যকে কবি-কল্পনা বলিয়া মানব-সাধারণ হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার কারণ নাই। 'মানব-সাধারণ' একটি রূপসত্য এবং 'বিশ্বমানবতা' ইহা হইতেই উদ্ভূত একটি ভাব-সত্য। একটি অপরটিকে ধারণ করিয়া আছে, একটি অপরটির মধ্য

দিয়া প্রকাশমান। কবিচিত্ত এই ভাবসত্তাটিকে উপলব্ধি করিয়া রূপ-সত্যের মধ্যে তাহার প্রকাশ দেখাইতে চাহিয়াছে। ইহাতে হয়ত যাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না তাহার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু জীবনে যাহা সম্ভব নয়, জীবন যাহাকে রূপায়িত করিতে পারে না, তাহার কথা কোথাও বলা হয় নাই। ইহা একটি বৃহত্তর জীবন-সত্য যাহার দিকে সাধারণ-জীবন অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। উদাহরণ-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'কথা' হইতে একটি কবিতার উল্লেখ করিব :

> বিপ্র কহে, "রমণী মোর
> আছিল যেই ঘরে
> নিশীথে সেথা পশিল চোর
> ধর্ম্মনাশ তরে।
> বেঁধেছি তারে, এখন কহ
> চোরে কি দিব সাজা ?"
> "মৃত্যু" শুধু কহিল তারে
> রতনরাও-রাজা।
> ছুটিয়া আসি কহিল দূত
> "চোর সে যুবরাজ।
> বিপ্র তাঁরে ধরেছে রাতে
> কাটিল প্রাতে আজ।
> ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে
> কী তারে দিবে সাজা ?"
> "মুক্তি দাও" কহিলা শুধু
> রতনরাও-রাজা।

কবিতাটির নাম "রাজ-বিচার"। ইহার মধ্য দিয়া যে-জীবনের পরিচয়টি দেওয়া হইয়াছে, তাহা সাধারণের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, তাহা একটি বৃহত্তর জীবনের পরিচয় আমাদের কাছে আনিয়া দেয়। ইহার সত্য এমন একটি আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যে আদর্শ জীবন-বিচ্ছিন্ন একটা নিছক শূন্য কল্পনার মধ্যেই তাহার চরম পরিচয় লাভ করে নাই, যাহা জীবনের মধ্য দিয়াই উপলভ্য একটি ভাব-সত্য। এই ভাবসত্য যেখানে রূপের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়াছে সেখানে রূপ সাধারণ হইতে একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, সেখানে সে একটি বিভূতি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কখনই এমন ভাব-সত্যকে লইয়া আঁকড়াইয়া থাকেন নাই রূপের মধ্য দিয়া যাহার প্রকাশ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। ইহারই জন্য রবীন্দ্রনাথ বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদকে মানবিক ব্রহ্মবাদের দ্বারা শোধন করিয়া লইয়াছেন এবং তাহারই দিকে বিশ্বমানব-জীবনের অভিব্যক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন, "যে-প্রেম মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই প্রেমকে আশ্রয় করেই প্রেয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে।" আদর্শবাদী ব্যক্তিমাত্রেই মানুষের জীবনে এই শ্রেয়ঃ-সাধনার গুরুত্বকে স্বীকার করিবেন। বঙ্কিম-চন্দ্রও আদর্শবাদকে জীবন-সাধনার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস যে, এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্ম্মিক হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক।...যে যাহা হইতে চায় তাহার সম্মুখে তাহার সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকট-বর্ত্তী হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ কৃষ্ণ-চরিত্র। 'অনুশীলনে' তিনি সেই আদর্শ ও তাহা লাভের উপায়ের কথা বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এক মানবিক ব্রহ্ম, 'মানুষের ধর্ম্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শের পথে জীবনের যাত্রাটি দেখাইয়াছেন।

আদর্শকে লাভ করিবার জন্য যে জীবন-সাধনা, সেই জীবন-সাধনাকে, সেই কর্ম্মকে রবীন্দ্রনাথ কোন দিন অস্বীকার করেন নাই। কর্ম্মহীন ভাব-সাধনার মধ্যে আদর্শকে শুধুমাত্র ধ্যানে একটি ভাব-মূর্ত্তিতে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার প্রকাশটি কখনই কর্ম্ম-নিরপেক্ষ নয়। মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাটিকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা যে জীবন-সাধনাকে স্বীকার করিয়াছে তাহাতে "বাস্তবের সহিত প্রকৃত বোঝাপড়া নাই, রূঢ়-কঠিন-কুৎসিতের সহিত সংগ্রাম নাই—সে সকলকে একরকম অস্বীকার করিয়া, সকল অসম্পূর্ণতা সেই ভাবকল্পনা দ্বারা পূর্ণ করিয়া আত্মার মহিমা উপলব্ধি করিতে হয়! ইহা জীবনে শক্তির সঞ্চার করিতে পারে না।...বস্তু ও আদর্শের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা দূর করিবার জন্য ভাব-সাধনাই যদি যথেষ্ট হয়, বস্তুর অসম্পূর্ণতা যদি ভাবের দ্বারাই পূরণ করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে কোন দুঃখ, কোন অভাবই আর থাকে না, জীবনের সহিত যুঝিবার প্রয়োজন হয় না। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি Idealist। বঙ্কিম-চন্দ্র এবং বিবেকানন্দও Idealist বটেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হয় জীবনের বাস্তব সাধনা দ্বারা; এজন্য সে ক্ষেত্রে, ভাব-সাধনা নয়—শক্তি-সাধনাই প্রকৃত সাধনা।"

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবি বলিয়া তাঁহার কর্ম্ম আসলে কবিকর্ম্ম; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ত কোথাও মানবের কর্ম্মকে, তার জীবন-সাধনাকে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে ভাবসাধনা গ্রহণ করিতে বলেন নাই। বস্তু ও আদর্শের মধ্যে ব্যবধান দূর করিবার পথ তিনি তো কবিতা লেখার মধ্যে নিহিত দেখেন নাই। তাঁহার আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে গেলে জীবনের বাস্তব সাধনার প্রয়োজন হয় না এ অসম্ভব ধারণার সৃষ্টি কিরূপে হইল? রবীন্দ্রনাথের সাধনাকে 'খাঁটি বৈষ্ণব সাধনা' আখ্যা দিয়া শক্তি-সাধনা হইতে তাহাকে পৃথক করিলেই সত্য মিথ্যা হইয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ কোনকালে 'খাঁটি বৈষ্ণব' নহেন এবং তাঁহার আদর্শকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করিতে হইলে কর্ম্মনিরপেক্ষ ভাবসাধনাকে অনুসরণ করিলে চলে না। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ এই দু'জনের জীবনের সত্য যদিও এক হয়, তাহার রূপায়ণ বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের কর্ম্ম শিল্প-কর্ম্ম, কিন্তু আদর্শকে বাস্তবে

রূপ দিবার জন্ত বিবেকানন্দ যে ভাবে যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে যেমন একথা বুঝি না যে, আমাদের সকলকেই বেদান্তের ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইবে, রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতেও তেমনি এ ধারণা করা চলে না যে আমাদের সকলকে ভাবুক ও কবি হইয়া উঠিতে হইবে। আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করিতে গেলে তাহা কদাচ নিছক ভাবুকতার দ্বারা হয় না, তাহার জন্ত কর্ম্মসাধনার প্রয়োজন। জীবনের রূপায়ণে এই বাস্তব জীবন-সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও অস্বীকার করেন নাই। পরন্তু যেখানে এই অস্বীকৃতি দেখিয়াছেন, সেখানে কবি ধিক্কার দিয়াছেন। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে কবি এক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছেন,—"আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকেদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগলো, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলি নে কেন?' তারা বললে 'কপাল'। আমি বললেম, 'কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিসনে কেন? তারা তখনি বললে, 'আজ্ঞে, কর্ত্তার ইচ্ছে হলেই হয়।' যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব, তাদেরই জলদান করবার ভার কোন একটি কর্ত্তার। সুতরাং যে করে হোক এরা একটি কর্ত্তা পেলে বেঁচে যায়।" এখানে দেখি রবীন্দ্রনাথ জীবন-সমস্যার সমাধানে 'অমৃত পায়স' বিতরণ করেন নাই, তাহার বাস্তব মীমাংসাই করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে জীবন-সাধনার কথা বলিয়াছেন, তাহাকে যাঁহারা ভাববিলাস বলিয়া দেখেন রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদকে যথাযথ ব্যাখ্যা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

ইহারই জন্ত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির দ্বিতীয় অংশটির যেখানে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর জীবন-সাধনার কথা বলিয়াছেন— অনেকেই তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা করেন। মোহিতলাল বলেন,— "রবীন্দ্রনাথ বাস্তব দুঃখকে একরূপ অস্বীকার করিয়া এই দুর্গত মনুষ্যসমাজের আর্ত্তিনাশের জন্ত অতি উচ্চ ভাবসাধনার পন্থাই নির্দ্দেশ করিলেন; ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির জন্ত যে অন্নজল তাহার পরিবর্ত্তে পরম সত্যের অমৃত পায়স, মনুষ্যজীবনের পরিবর্ত্তে বিশ্ব-জীবন, এবং নিষ্ঠুর নিয়তিরূপিণীর পরিবর্ত্তে নিরুপমা সৌন্দর্য্য-প্রতিমার আধ্যাত্মিক আরাধনাকেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় বলিয়া ঘোষণা করিলেন।...যাহারা "শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া'—তাহাদের সেই সাক্ষাৎ দুঃখের প্রতিকার চিন্তা না করিয়া, কবি উপদেশ দিলেন—

> মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
> নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।

কিন্তু মোহিতলালের এই ব্যাখ্যাটিকে আমরা মানিয়া লইতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে বাস্তব দুঃখকে এড়াইয়া যাইতে চাহেন নাই। একজন রাজনীতিক বা সমাজসংস্কারক জীবনের সমস্যা-সমাধানে যে যুগোপযোগী পন্থা নির্দ্দেশ করিবেন, রবীন্দ্রনাথ সেই সাময়িক আরোগ্যের কথা এখানে বলেন নাই, একথা সত্য— কারণ কবি হইয়া তিনি মানুষের অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করিলেও তাহা মিটাইবার পন্থা নির্দ্দেশ করিবার দায়িত্ব তাঁহার নিজের বলিয়া অনুভব করেন নাই। ইহার জন্ত সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির দায়িত্ব রহিয়াছে। আদর্শের পথে মানবের অভি-ব্যক্তিকে যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই আদর্শের সাধনাই মানুষের মনুষ্যত্ব, ইহা জীবনবহির্ভূত কোন উচ্চাঙ্গের ভাবসাধনা নয়। ইহা কোন প্রকার পলায়নী মনোবৃত্তি নয়। মহাপুরুষেরা মানুষের এই সাধনাকেই নিজ নিজ জীবনে দেখাইয়া যান। জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্ত কবি এই জীবনসাধনার কথা বলিয়াছেন। এই যে বৃহত্তর জীবন, ইহা আমাদের দৈনন্দিন তুচ্ছ জীবন হইতে পলায়ন নয়, ইহা সার্থকতার মধ্যে মহিমার মধ্যে আমাদেরই দীন জীবনের অভিব্যক্তি। ইহা বাস্তব জীবনেরই মধ্য দিয়া—তাহাকে এড়াইয়া আসিয়া কোন নিভৃত একক ভাবরাজ্যের মধ্যে নয়। কবি এখানে আমাদের সকলকে এই বৃহত্তর জীবনের দিকে যাইতে বলিতেছেন। ইহা শুধু তাঁহার নিজের সাধনাই নয়, এই বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিয়া কবি আমাদিগকে বৃহত্তর জগতের মধ্যে ফিরাইতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কদাচ জীবনকে বিস্মৃত হইবার কথা বলেন নাই, তিনি বৃহত্তর জীবন-সাধনার দ্বারা ক্ষুদ্র জীবনকে জয় করিবার কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার অমোঘ বাণী:

> কি গাহিবে, কি শুনাবে। বলো মিথ্যা আপনার সুখ,
> মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
> বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

ইহাতে জীবন হইতে পলায়নের কথাও নাই, জীবনকে বিস্মৃত হইবার কথাও নাই। বিকৃত দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত অর্থ অন্ত প্রকার। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেই তো আমরা দেখি যে বহু বাসনা-কামনা চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বকে আমরা প্রায়ই তুচ্ছ বলিয়া অস্বীকার করিতে চাই, নতুবা জীবন কেবলই বড় বেশী করিয়া সীমাবদ্ধ হইয়া যায়, সকল চাওয়াগুলি মিটাইতে গেলে জীবন অগ্রসর হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মতত্ত্বে' বাচস্পতি মশায়ের সকল জাগতিক দুঃখকেই তুচ্ছ বলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-সাধনাকে অস্বীকার করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-সাধনার যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বাচস্পতি মহাশয়ের মিহিধুতি ও সরু চালের ভাত কোন দিনই জুটিবে না, কিন্তু বাচস্পতির জীবন আর একদিকে পরিপূর্ণতা লাভ করিবে, বাচস্পতি প্রকৃত 'মানুষ' হইয়া উঠিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাচস্পতিকে ধর্ম্মাচরণ করিতে বলিয়াছেন, আদর্শের অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন, বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের দ্বারা। বস্তুতঃ মানবধর্ম্ম হইতে বিচ্যুতিই সকল দুঃখদুর্দ্দশার মূল ইহাই বঙ্কিমচন্দ্র মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, 'মানুষের যে সকল সুখ-দুঃখ আছে, মানুষের স্বকৃত কর্ম্ম ভিন্ন তাহার অন্ত কারণও আছে'; কিন্তু দুঃখ দূর করিবার জন্ত বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মাচরণের কথাই বলিয়াছেন। আদর্শকে ঠিক রাখিয়া বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের জন্ত ইহাও এক বাস্তব জীবন-সাধনা।

রবীন্দ্রনাথও মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর করিবার নিমিত্ত ধর্মাচরণের কথাই বলিয়াছেন এবং তাহাও বাস্তব জীবন-সাধনা সাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথও আদর্শের পথে জীবনের যাত্রাটি দেখাইয়াছেন। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া দুর্গতদের কথা ভুলিয়া আপনার জীবনদেবতার ধ্যানের কথা বলেন নাই, তিনি জীবনের আদর্শকে রূপ দিবার জন্য বিশ্বের সাধকদের জীবন-সাধনার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং দুর্গতদিগকে সেই জীবন-সাধনা সম্বন্ধে সচেতন হইতে বলিয়াছেন।

'জীবনদেবতা' এই নামে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আপনার কবিয়া তাঁহার আদর্শকে উপলব্ধি করিয়াছেন একথা সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপ্রিয়া' 'মহিমালক্ষ্মী' 'সৌন্দর্যপ্রতিমা' বলিয়া যাহার উল্লেখ করিতে চাহিয়াছেন তাহার মধ্যে কবির জীবনদেবতা-বোধ মিশিয়া থাকিলেও তাঁহার সহিত অন্যান্য সাধকের আদর্শবোধের বিরোধ নাই। 'বিশ্বপ্রিয়া' এই নামেই রবীন্দ্রনাথ তাই তাহার পরিচয় দিয়াছেন। উপরন্তু পৃথিবীর কঙ্করকণ্টকময় পথ 'কোনরূপে অতিক্রম' করিবার কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেন নাই। কবি যে জীবন-সাধনার কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা এই :

> -তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
> চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
> ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
> অন্তর-প্রদীপখানি। শুধু জানি যে শুনেছে কানে
> তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
> সঙ্কট আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জন
> নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি ; মৃত্যুর গর্জন
> শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
> বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে
> সর্বপ্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
> চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন --
> হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য উপহারে
> ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষপূজা পূজিয়াছে তারে
> মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি তারি লাগি
> রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
> পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
> সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন : বিঁধিয়াছে পদতলে
> প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
> মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
> অতি পরিচিত অবজ্ঞায় ; গেছে সে করিয়া ক্ষমা
> নীরবে করুণ নেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
> সৌন্দর্য্য প্রতিমা।

এই পংক্তিগুলি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথ যে-জীবন-সাধনার কথা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবতাবর্জ্জিত নিছক ভাববিলাস নহে। ইহাতে জীবনকে কোথাও অস্বীকার করা হয় নাই। এখানে সাধকদের যে জীবন-সাধনার কথা কবি বলিয়াছেন, তাহা শুধুমাত্র ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতে আপনার প্রকৃতিটিকে জানাইয়াছে।

এই কবিতাটির আলোচনা-প্রসঙ্গে এত কথা বলিতে হইল এই জন্য যে, অনেক সুধী ব্যক্তিও এই কবিতাটির শেষাংশের অপব্যাখ্যা করেন। ইহাতে চিত্রার যুগে রবীন্দ্র-মানসে রূপলোক ও ভাবলোকের বিভিন্ন প্রকৃতিটি ও তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধটি সঠিক নির্ণয় করা যায় না। কবিমানসে রূপলোক ও ভাবলোক উভয়ই ক্রমশঃ একটি পরিস্ফুট সত্যমূর্তি ধারণ করিতেছিল। মানসীর যুগে এই অস্পষ্টতা ও অপরিচয়ই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেখানে রূপজগতে কবি যেমন একটা স্বাভাবিক শ্রী ও ছন্দের অভাব অনুভব করিতেছিলেন, বিভিন্ন বিরোধমূলক চিত্র কবির মনে সংশয় ও প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিতেছিল, কবির ভাবলোকও তেমনি নিছক জীবনসাধনাবহির্ভূত মানসবিলাসের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। জীবনের সহিত তাহার সত্য যোগ ছিল না। যদি ইহার মধ্যেই কবির মানসিকতা চরম পরিণতিলাভ করিত তাহা হইলে কবিকে এস্‌কেপিষ্ট বলিতাম। কিন্তু কবি আপনার ভাবনার মধ্যে বিশ্বের ভাবনার যোগ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার ধ্যান একটি বিশ্বজনীন সত্যের ভূমিকালাভ করিয়াছে। 'মেঘদূত' কবিতায় ইহার প্রথম পরিচয় পাই। ইহাতে পরবর্তীকালে কবি রূপলোককে যেমন স্পষ্ট করিয়া চিনিতে চাহিলেন, তাঁহার ভাবলোকে তাঁহার আদর্শ এবং গভীর বিশ্বাসও স্পষ্ট-অস্পষ্ট বোধের দ্বারা মণ্ডিত হইয়া উঠিল। এখন তিনি রূপসত্তাকে দেখিলেন, ভাবসত্তাকেও বুঝিলেন, ইহাদের বৈপরীত্য সম্বন্ধে কবি সচেতন হইলেন—কবিচিত্তে আর পূর্ব্বের মত অপরিচয়ের নিমিত্ত প্রবল দ্বন্দ্ব রহিল না। কিন্তু এই দুই সত্যের মধ্যে বিরোধ রহিয়া গেল। এক সত্যকে ছাড়িয়া আর এক সত্যকে একান্তভাবে আশ্রয় করিতে চাহেন নাই বলিয়া এই বিরোধই কবির জীবনে বরাবর রহিয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বৈষ্ণব নহেন। খাঁটি বৈষ্ণবের সাধনা যে স্তরে পৌঁছিয়াছে রবীন্দ্রনাথ সে স্তরে যাইতে চাহেন নাই। তবে তাঁহার জীবন-সাধনাটি বৈষ্ণবীয় বলিয়া মনে হয়, কারণ খাঁটি বৈষ্ণবের ন্যায় তিনিও অরূপ ও অরূপের লীলা বা রূপপ্রকাশকে ধরিতে চাহিয়াছেন—তবে তাহা তাঁহার এই মানব-বুদ্ধি দিয়াই, এবং এই জীবনের মধ্যেই, এই জীবনকে ত্যাগ করিয়া কোন অতিমানবিক বুদ্ধিতে নয়।

চিত্রা-কাব্যের 'চিত্রা' কবিতাটিতে দেখি জীবনদেবতাকে কবি সম্পূর্ণ দুই বিপরীত সত্য-মূর্তিতে উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু তাহারা তাহাদের বৈপরীত্য লইয়া কবিকে আঘাত দিতেছে না বা বিক্ষুব্ধ করিতেছে না। কবি বৈপরীত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াই উভয়কে গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটা মানসিক শান্তি রক্ষা করিয়াছেন। চিত্রা-কাব্যের সর্ব্বত্রই কি রূপানুভূতিতে, কি অরূপানুভূতিতে, কবির মানসলোকে এই শান্তিরক্ষার প্রয়াসটি দেখিতে পাই। ভাবসত্য ও রূপসত্যের বৈপরীত্য কবি দূর করিতে পারেন নাই, কিন্তু উভয়ের

দ্বন্দ্বটি মিটাইতে চাহিয়াছেন। অথচ চিত্রা-কাব্যে স্থির বিশ্বাসের সহিত উভয়ের সম্বন্ধ-সূত্রটিকে উপস্থিত করিতে পারেন নাই বলিয়া একটি 'যদি', 'হয়তো' ইত্যাদির স্পর্শ তাঁহার মনে রহিয়া গিয়াছে। তাহাতে রোমান্টিকতার সুরটি আরও স্পষ্ট হইয়া কাব্য-মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে রূপ ও অরূপের মধ্যে যে একটা সম্বন্ধের ও সামঞ্জস্যের বিশ্বাসের উপর কবির জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারই দিকে চিত্রা-কাব্যটি কবিকে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। চিত্রার যুগে ভাবসত্তাকে রূপায়িত করিবার সাধনায় প্রার্থিত ও কাম্য সিদ্ধির প্রতি যে ক্ষীণ সংশয়ের সুর লক্ষ্য করি, বলাকার যুগে গভীর বিশ্বাসের মধ্যে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাই না।

অটল বিশ্বাসের মধ্যে ভাবসত্যকে এ জীবনে রূপায়িত করিবার যে প্রচেষ্টা, চিত্রাকাব্যে জীবনের সেই অভিযান শুরু হইয়াছে। চিত্রাকাব্যের মধ্য দিয়া দৃষ্টিপাত করিলে আমরা তাই এই মহান্ জীবনশিল্পীর শিল্পক্রিয়ার প্রকৃতিটি অনুভব করিতে পারি এবং তাঁহার বহুদূরবিস্তৃত জীবন-সাধনার মূল সূত্রগুলির সন্ধান পাই। চিত্রাকাব্যটি রবীন্দ্রনাথের ভাব-জীবনের এমন একটি পরিচয় বহন যাহার মধ্যে কবির জীবন তাহার ভবিষ্যতের প্রতিকৃতি লইয়া একটি সামগ্রিক মূর্ত্তিতে আপনাকে আভাসিত করিয়াছে। নবীন জীবনের মাধুর্য্যে ও রোমান্টিকতায় সমগ্র কাব্যটি তাই অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত।

বজ্র-সুন্দরী

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বজ্রের মত তুমি রুদ্রাণী সুন্দরি,
পদ্মের মত তুমি কমনীয়া ধন্যা,
দুর্নীত-নাশে এলে অগ্নির চোখ নিয়ে
শিল্পীরে দিলে তুমি আনন্দ-বন্যা :
সৃষ্টির সুষমার লক্ষ্মীর ধ্যান থেকে
মর্ত্তেতে রূপ নিল তব দেহ ছন্দে,
দুর্গার তেজ ধরো গীর্ব্বাণী-বেদগানে
অনন্যা এলে নামি রূপে, রসে গন্ধে।
প্রেমিকা তপস্বিনি, প্রিয়তম লাগি' তব
যমের সঙ্গে তুমি করি বাক্‌যুদ্ধ
মৃত্যুর সংগ্রামে মৃত্যুঞ্জয় করি
বাঞ্ছিতে কেড়ে নিয়ে হয়েছ মা শুদ্ধ।

তিনলোক শিল্পীর শিল্পের কল্পনা—
গন্ধের ফুল ফোটে তব দেহতীর্থে,
মদন ভস্ম করি শিবের চিত্ত কাঁদে
সুন্দরী গৌরী মা পদে তব ফিরতে।
শৃঙ্খলা ভেঙে যবে হও বিশৃঙ্খল
লক্ লক্ করে জিভ হাতে দোলে খড়্গ,
পা'র তলে মঙ্গল-মহাদেব শঙ্কার
খাবি খায়, গর্জ্জায় প্রলয়ের ঝড় গো।

বঙ্কিম চাহনিতে বিদ্যুৎ চমকায়
শঙ্কার ঝড় বয় ক্রোধভরা চক্ষে,
তব অভিসম্পাত বজ্রের বজ্রন্
সৃষ্টির ঝঙ্কারে বহ তুমি বক্ষে।

তব দেহ সৃষ্টির উৎসব-ধ্যান শেষে
ব্রহ্মার কল্পনা হয়ে গেছে নিঃস্ব,
শ্যামচাঁদ বংশীতে বাজায়েছে তোরি গান
বন্দনা দিল তব এ নিখিল বিশ্ব।
সৃষ্টির সুষমার পূর্ণ বিকাশ অয়ি,
রুদ্রের রুদ্রাণী কামজয়ী অঙ্গ,
দুর্নীত অসুরেরা মাগি তোমা ক্রোধে তব
হুঙ্কার শুনি ওগো রণে দিল ভঙ্গ।
যারা শিবসুন্দর তাহাদের লাগি তুমি
বক্ষে রেখেছ দেবী ভরি প্রেমকুম্ভ,
পশু-মানবের লাগি ধরো তুমি খড়্গ মা
ধ্বংসিল তব হাতে শুম্ভ নিশুম্ভ।
সুন্দরি, ধরা আজ ঘৃণ্য যে কামায়নে
লালসায় পশুসম দুর্নীত নর গো,
কটাক্ষে আজ তব জেলে রেখো বজ্র মা
রুদ্রাণী বেশে সদা হাতে রেখো খড়্গ

সেণ্ট মরিৎস্

শ্রীশেফালি নন্দী, এম-এ

ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়া "ভূস্বর্গ-সুইজারল্যাণ্ড" ভেসে উঠল চোখের সামনে যখন শোনা গেল টুরিষ্ট কোম্পানী সব ব্যবস্থাই ঠিক করে ফেলেছে। ঈষ্টারের তুষারপাত উপেক্ষা করে রওনা হলাম দূর ভ্রমণের উদ্দেশ্যে—টুরিষ্টদের পক্ষে সময়টা অসুবিধাজনক

লুগানো

হলেও ইংলণ্ড-প্রবাসীর পক্ষে এ মুক্তির আস্বাদ। তাই ফ্রান্স পেরিয়ে যখন সুইজারল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে লুগানো শহরে এসে পৌঁছলাম—বিদেশিনীর শাড়ীর প্রতি বিন্দুমাত্র অনুকম্পা না দেখিয়ে সুইস প্রকৃতিদেবী-সুরু করলেন প্রচণ্ড বর্ষণ।

ইউরোপের তুষারপাত দেখার উদ্দেশে রওনা হলাম লুগানো থেকে সেণ্ট মরিৎস্-এর পথে। আল্পসের এই পাহাড়চূড়াটি যদিও সর্ব্বোচ্চ নয় তথাপি তার সৌন্দর্য্য আর স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশের জন্য প্রতি গ্রীষ্মের সুরুতে এখানে স্বাস্থ্যকামী সৌন্দর্য্যপিয়াসীদের সমাগম হয়। সুইজারল্যাণ্ড পথিকদের হাত হতে বার্ষিক যে দশ লক্ষ পাউণ্ড আদায় হয় তার প্রায় এক-চতুর্থাংশই আসে এই সেণ্ট মরিৎস-এর কল্যাণে। স্বর্গধামের এই-ই হ'ল ইন্দ্রলোক—এর নামে একবার অন্ততঃ যাবার লোভ হয় না—ইউরোপখণ্ডে এমন লোকের সংখ্যা বিরল।

পথের শেষ আছে, কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই—তাই সুইস সীমান্ত পার হয়ে আমরা চাইলাম ইটালীর সীমানায় প্রবেশ করতে; বাধা দিলেন ইটালীর সরকার—কারণ উপযুক্ত ছাড়পত্রের অভাব। [illegible] সীমান্ত পার হতে গেলে আমার ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, সেণ্ট মরিৎস অবধি পৌঁছান আর হবে না। উচ্চ ইটালীয় [illegible] মুদ্রাব্যবহারকারীর কাছে সুইস মুদ্রার কৌলীন্যের অসীম প্রভাব। গোটা পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকান ডলারের পরই সুইস মুদ্রার প্রাধান্য। ভারতের ব্রাহ্মণ্যযুগের পুরোহিতের ন্যায় আমেরিকান ডলার-বাহকের অসীম প্রভাব এই
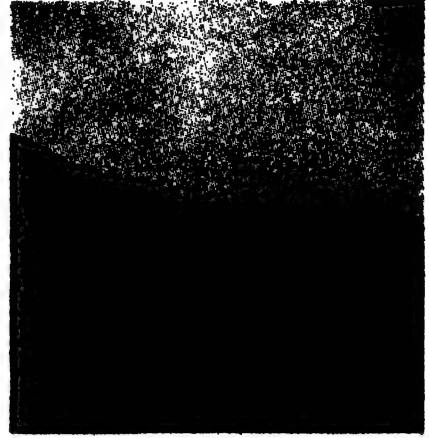
সুইস-ইটালীয় সীমান্তের ঘরবাড়ী

পশ্চিম ভূখণ্ডে, আমেরিকাবাসীর প্রতাপে পাউণ্ড-এল'কার অধিবাসীরা ত ইউরোপের চোখে কৃপার পাত্র। বারকয়েক কথাকাটাকাটির পর প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র সংগ্রহ করে নিলাম। প্রকৃতির অঙ্গে অস্ত্রোপচার করে তৈরি হয়েছে যে সুড়ঙ্গ সেটা

কোমো হ্রদ

পেরিয়ে কোমো লেকের পাশে এসে পড়লাম—প্রকৃতি যেন হেসে উঠলেন তীর্থযাত্রীর পানে চেয়ে। এতক্ষণ আমরা আকাশের চেহারা দেখে ভাবছিলাম ইংলণ্ডেই এলাম বুঝি আবার।

চোখ মেলে তাকালাম—
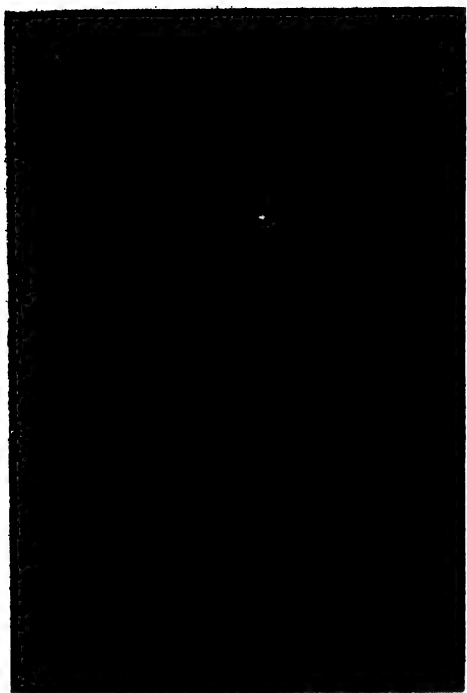
সেণ্ট মরিৎস্—পাহাড়ের উপর গ্রাম

সেণ্ট মরিৎস্-এর চূড়ায় নাইলন টকিজের দোকান

তুষারাবৃত সেণ্ট মরিৎস্-এর পথে বিশ্রামাগার ও হোটেল

সেণ্ট মরিৎস্-এর পথে
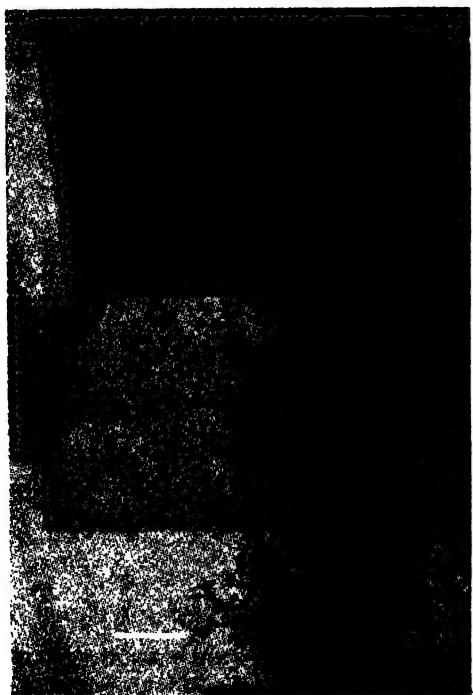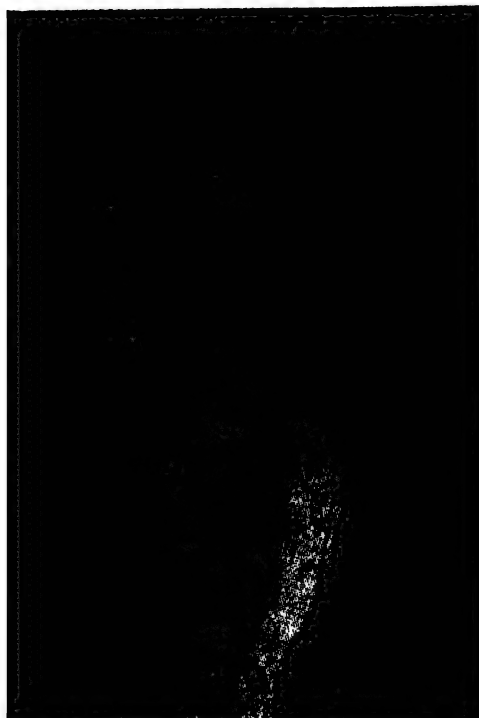
"নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?" এ প্রশ্নের জবাব আজ পেলাম—পাহাড় আর পাহাড়—পাহাড়ের কোলে নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ হ্রদে ইতস্ততঃ ভাসমান ছোট্ট নৌকা—পাহাড়ের মাথায় বরফ পড়ে ঝকমক করছে প্রকৃতি—তারই গা বেয়ে নেমে আসছে সংকীর্ণ ঝরণাধারা, গড়িয়ে পড়ছে ছোট বরফগলা স্রোতস্বিনীর বুকে—সে আবার ছুটে চলেছে মাটিমায়ের আকর্ষণে, ছোট ছোট উপলখণ্ডের বাধাকে অতিক্রম করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঐ হ্রদরূপী প্রিয়ের অঙ্কে। এই খেলা চলেছে পৃথিবী জুড়ে—পর্ব্বতশীর্ষে হিমকণা, ভূগর্ভে সাগরবারি—জাতি এদের একই ; একে অন্যের পরিপূরক—কিন্তু কি বৈচিত্র্য !

লুগানো হ্রদের পাশ দিয়ে আমাদের কোচ চলেছে—ধীরে ধীরে আমরা নীচে নামছি। পাহাড় আর তার পাশের বাঁকা রাস্তা দিয়ে সুন্দর তার গতি। এসে নামলাম দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী প্রশস্ত উপত্যকায়, দু'ধারে সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো—এখানে সেখানে ছিল আঙুরক্ষেত—তার চিহ্ন বিদ্যমান। বসন্তের শেষে গাছে গাছে সুরু হয়েছে মুকুল ধরার পালা—কোনটার রঙ নীলাভ—কোনটা হাল্কা বেগুনী, কোনটা সাদা। আর তাদের শাসন করছে উদ্ধত সিটান, সাইপ্রেস, ওলিভ আর পপলারের দল।
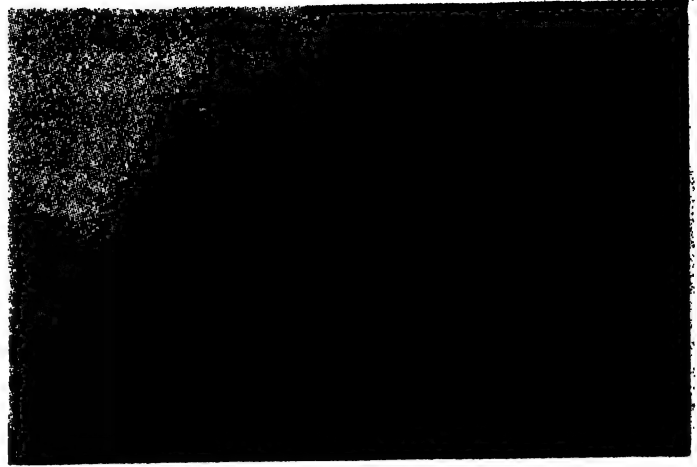
আবার ইটালীর সীমানা। কোমো হ্রদের বুকে পড়েছে তার প্রিয় শৈলের ছায়া ওরা মুখ দেখছে কোমোর কাকচক্ষুর মত নির্ম্মল নীরে। ভাসছে একটা-দুটো ছোট নৌকা—সেই বণিকসুলভ চেঁচামেচি—পরিবেশের রূপ ওদেরও দিয়েছে নিস্তব্ধ করে।

একটি বিপণির দৃশ্য

সেণ্ট মরিৎস্-এর শিশুগণ

এবার আমরা উঠছি তুষাররাজ্যে। রাস্তার আশেপাশে ছড়ানো হিমকণা—ক্রমশঃ তুষারে ছেয়ে গেল চারিধার। চার দিকে শুধুই সাদা। রোদের আলো পড়ে তার থেকে প্রতিবিম্ব ঠিকরে পড়ছে—তাকানো ক্রমশঃ দুষ্কর হয়ে উঠছে। ঐ উঁচু পাহাড়-চূড়া, পাশের ঐ প্রাসাদগুলো, আমাদের ডানদিক ও বাঁদিক ৮০০০ ফুট নীচে ঐ যে গ্রামের রেখা দেখা যায় সবই যেন মাখন দিয়ে তৈরি। হাত দিলেই গলে যাবে যে ! ঐ চূড়ায় শুভ্র হিমানী ধারণ করেছে ভাস্করের সাতটি রঙ—তারই অদূরে ছোট একখণ্ড মেঘ সোনালী আর গৈরিক বর্ণে সেজে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের চক্ষু। ঐ সাইপ্রেস গাছগুলো ধরে রেখেছে রাশি রাশি পেঁজা তুলো। এক বার একটু হাল্কা হাওয়া এসে মজা দেখবার জন্য ওদের চুল ধরে একটু নাড়া দিয়ে যাচ্ছে আর গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে হীরার কণা, মাথা দুলিয়ে এরা করছে আমাদের অভিবাদন, যতই উপরে উঠছি জমানো বরফের চোখ ঝলসানো রূপ ততই তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছে। পাশে পেলাম ছোট একটি জলধারা—যা অতি কষ্টে নিজের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। আমাদের সুইস পথপ্রদর্শক গর্ব্বভরে বলল—জান, এই আমাদের নদী। দেখতে মনে হচ্ছে খুব ছোট, আসলে এই-ই কিন্তু অস্ট্রিয়ার দানিয়ুব আর জার্ম্মানীর 'রাইন'কে জল যোগায়।

শ্রমপ্রিয় সুইস জাতি পথিকের সুখসুবিধায় প্রতি লক্ষ্য রেখে পথের আশেপাশে তৈরি করেছে হোটেল রেস্তোরাঁ—চা-খানা আর

সেণ্ট মরিৎস্-এর শীর্ষস্থানে

কফিখানা। তারই ফলে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট গ্রাম, স্বাস্থ্যনিবাস আর বসতবাড়ী কিছুরই অভাব নেই। ক্লান্ত পথিক চা, কফি, সুরা, খাদ্য—যার যাতে রুচি তার সদ্ব্যবহার করে আবার যাত্রা করে সুরু—এখানে-সেখানে কর্ম্মরত সুইস ছেলেমেয়ের দল হাত তুলে জানায় সহাস্য অভিনন্দন। ব্যবহার এদের অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। অতিক্রম করে যাই পাহাড়ের আর এক ধাপ। আর ১০০০ ফুট বাকী হঠাৎ গাড়ীর গতিবেগ কমে কমে ক্রমশঃ একেবারেই ক্ষান্ত হয়ে গেল। প্রকৃতি সহ্য করবে না যান্ত্রিক সভ্যতার অত্যাচার তাই পাঠিয়েছে তুষার স্তূপ আমাদের পথ অবরুদ্ধ করতে। কিন্তু আমরা বিংশ শতাব্দীর নর-নারী তাই হার মানব না—গাড়ীর চাকায় বেঁধে নিলাম লোহার শিকল আষ্টেপৃষ্ঠে, আর সুইস পথরক্ষকেরা যন্ত্রেরই সাহায্যে বরফ পরিষ্কার করে অতিথিদের যাত্রাপথ করে দিলে সুগম। এই অবসরে আমরা ছবি তুললাম, মধুচন্দ্রিকাযাপনকারী প্রেমিক-প্রেমিকারা উপভোগ করে নিলে নীরব প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্য্য—পরস্পরের দেহে তুষারকীলক ছুঁড়ে তারা অভিবাদন করল সেণ্টমরিৎস্ উপত্যকাকে। ওদের পাশ হতে সরে গিয়ে চেষ্টা করলাম বরফের উপর গড়িয়ে ঢালু রাস্তা দিয়ে নীচে নেমে যাবার—বরফের ঘায়ে একটু রক্তপাত হ'ল মাত্র।

পাঁচ মিনিট চলার পরই হোটেলে এসে পৌঁছলাম। সেখানে লাঞ্চ খাওয়ার পর আবার উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। ৩০৫৮ মিটার (১০,০০০ ফুট) উঁচু এই গিরি-শৃঙ্গের অন্তরালবর্ত্তী উপত্যকা প্রকৃতির মায়াপুরী। কল্পনা এখানে মূক—ভাষা এখানে নীরব। ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে গিয়েছে যে হিম-অচল তারও দেহে অস্ত্রোপচার করেছে আধুনিক সভ্যতা। বাড়ীগুলো উঠেছে তার অঙ্গ ঘিরে। কিন্তু আজ তারা তুষারে আবৃত। গৃহবাসীর দল আশ্রয় নিয়েছে পাহাড়ের নীচে—সমতলভূমিতে। ধার্ম্মিক খ্রীষ্টানরা এখানে তৈরি করেছে গীর্জ্জা। যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য সেণ্ট মরিৎস্-এর নামে উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির। দোকান, বাজার, হোটেল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার যত কিছু অত্যাবশ্যক উপকরণ সবই এই দশ হাজার ফুট উপরে পাওয়া যায়। হেয়ার ড্রেসিং এমন কি 'নাইলনের মোজা সারাবার' দোকান পর্য্যন্ত। যাঁরা এখানে বাস করতে আসেন তাঁরা কোনরকম অসুবিধা সহ্য করতে অভ্যস্ত নন্। কি করে অতিথিকে স্বাচ্ছন্দ্য আর তৃপ্তি দিতে হয় তা এরা জানে। তাই যে একবার এখানে আসে, আবার সে আসতে চায়। আর্থিক লেনদেনের ভিতর দিয়েও এরা যে আন্তরিকতা দেখায় তার তুলনা ইংলণ্ডে ত নয়ই, আজকাল আমাদের দেশেও মেলে না। ইদানীং ইংলণ্ডের মুদ্রানিয়ন্ত্রণ-নীতির ফলে সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষতিই বোধ হয় হয়েছে সবচেয়ে বেশী—ওখানে গিয়ে বসবাস করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। ফলে সুইস আতিথেয়তার সঙ্গে অর্থনীতি জড়িত হয়ে ওদের ব্যবহারকে করেছে আরও ভদ্র, আরও আন্তরিকতাপূর্ণ।

সেণ্ট মরিৎসের উপর হতে নেমে আসার আয়োজন করছি হঠাৎ পিঠে আঘাত পেয়ে চমকে তাকালাম উপর দিকে—বরফে ঢাকা একটি বাড়ীর বারান্দা হতে সহাস্য এক দল শিশু আমাদের বরফের গোলা ছুঁড়ে অভিবাদন করছে। আমরাও চেষ্টা করলাম প্রত্যুত্তর দিতে। কিন্তু সমতলভূমির লোক আমরা পারব কেন ওদের সঙ্গে—রণে ভঙ্গ দিয়ে সহাস্যে আশ্রয় নিলাম "বাসস্বর্গে"। চারিপাশের তুষাররাজ্যের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, "নবনীত শুভ্র" কথাটার মানে বোধ হয় এর আগে এমন করে আর বুঝি নি। মনে হয় হাত দিলে গলে যাবে—কিন্তু এরা বজ্রের মত কঠোর। বেশী চাপ দিলে গুড়ো হয়ে যায়—জল হয় না—এরা ভাঙে তবু মচকায় না। যে কোন মালিন্য এদের কাছে হার মানে। নীল আকাশের কোলে অপূর্ব্ব শুভ্র পর্ব্বতশ্রেণী একের কাঁধের উপর দিয়ে অপরে উঁকি মারছে, পায়ের কাছে পড়ে আছে ভেলায়, জমে যাওয়া হ্রদের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। উত্তপ্ত তপন এর কাছে মাথা নীচু করে আপনার কিরণ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এই ত ভূস্বর্গ।

নেমে এলাম এই সুরলোক থেকে। পড়ন্ত সূর্য্যের আলোয় আশী মাইল পথ অতিক্রম করলাম তিন ঘণ্টায়। ঢালু পথে বিশেষ সাবধানে চলতে হয়—না হলে পদে পদে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। ফেরবার পথে গাইড আমায় জিজ্ঞাসা করল—কেমন দেখলে আমাদের দেশ। আমি বললাম, 'চমৎকার'! সে অত্যন্ত গর্ব্বের সঙ্গে আবার বলল, জানো, আমাদের এই দেশে থাকার জন্য লোকের আগ্রহের আর সীমা নেই—কি সুন্দর আমাদের দেশ, মজা দেখার জন্য বললাম, "আমার কিন্তু মনে হয় না কেউ এখানে চিরকাল বাস করতে চাইবে, শুধু থাকা আর খাওয়াটাই কি জীবনের সব?" সে

নিতান্ত বিস্ময়ভরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—এমন কথা সে বোধ হয় আর কখনও শোনে নি। তার পর তাচ্ছিল্যভরে বলল—কি জানো, ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। আমি হেসে বললাম—তা ত বটেই। তর্ক প্রায় জমে উঠছিল হঠাৎ এক ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, 'সুইস্ জাতির দেশের প্রশংসা করলে এরা তোমার বন্ধু—আর ওদের বিরুদ্ধে কিছু বললে বা সমালোচনা করলে এরা তোমায় কৃপার চোখে দেখবে।' বিদেশে বন্ধুত্বটা বড়ই মূল্যবান্, তাই প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্ত বললাম, দেখেছ ঐ কোমো গ্রামটি কি সুন্দর দেখাচ্ছে—সূর্য্যাস্তের রঙ পড়ে আল্পসের বুকে রক্তিম কোমোগ্রাম আমাদের জানাল বিদায়-অভিনন্দন, আমার সঙ্গীর মুখ হয়ে উঠল উজ্জ্বল, আমরাও নেমে এলাম আমাদের আবাসে।

কি ছিল, কি হ'ল ?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

১৬

আবার আগুন নাড়াচাড়া পড়ল। কয়লা-ঝরা কাঠের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

দীনেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—রমাদেবী এখন কি করছেন? তাঁর কথা ত আর বলছেন না কিছু?

ঔপন্যাসিক একটু হেসে বললেন, তিনিই ত করছেন সবকিছু। আড়ালে বসে ভাগ্যদেবীর মত উপন্যাসের নায়ক নরোত্তমের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনিই। একটা কথা এখন বলব?

—কি কথা?

—না, থাক। এখন বললে রসভঙ্গ হবে। পরে বলব। কি বলেন?

—বলব বলে না বললে উৎকণ্ঠা বেড়ে উঠে। বলুন, বলুন···

—উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে নিতে পারলেই ত উপন্যাস জমে। যাক্ গে বলেই ফেলি। তান্ত্রিক সাধুটি কে—বুঝতে পেরেছেন?

—আজ্ঞে না।

ঔপন্যাসিক হাসতে হাসতে বললেন, এই তান্ত্রিক সাধুটি হচ্ছেন রমাদেবীর পিতা···

অনেকেই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল—তাই নাকি? রমাদেবীর পিতা!

—হ্যাঁ। রমাদেবী তাঁকে চেনেন না। কিন্তু তিনি রমাদেবীকে চেনেন। ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রমাদেবী মাতৃহীন হয়েছিলেন। পিতাও সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। সন্ন্যাসী অনেক দেশ ঘুরেছেন। তারপর তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বহুদিন পরে আজ মেয়েকে দেখতে এসেছেন।

সাধুজী আত্মগোপন করে জমিদারের অন্দরমহলে গিয়ে রমাদেবীকে দেখলেন। শুনলেন তাঁর অদৃষ্টের বিড়ম্বনার কথা, বিবাহিত জীবনের লাঞ্ছনার কথা। রমাদেবী কেঁদে কেঁদে সন্ন্যাসীর পায়ে নিবেদন করলেন—তাঁর সকল মর্ম্মবেদনা।

সাধুজী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কেঁদ না মা। মা ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছায় আমি যখন এসে পড়েছি তখন তোমার আর কোন ভয় নেই। তোমার স্বর্গীয় শ্বশুর ছিলেন আমার পরম বন্ধু। তার ছেলের মতিগতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা আমি নিশ্চয়ই করব।' সাধু কিন্তু রমাদেবীকে জানতে বা বুঝতে দিলে না যে, তিনিই তাঁর পিতা। রমাদেবীও চিনলেন না পিতাকে।

মন্দিরে বসেই গুরু-শিষ্যের মদ্যপান লক্ষ্য করে, রমাদেবী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কুমারবাহাদুরের বেশভূষার পরিবর্ত্তন দেখে বিস্মিত হলেন। তারপর কোন এক মহাশ্মশানের অভিমুখে দু'জনাই যাত্রা করছেন শুনে রমাদেবীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। শুনলেন—নন্দরাণীও নাকি যাচ্ছে তাঁদের সঙ্গে। কি আশ্চর্য্য।

একটি বছর গুরু-শিষ্যের আর কোন খবর পাওয়া গেল না। কুমারবাহাদুরের অভাবে জমিদারীতেও নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটতে লাগল। রমাদেবী নরোত্তমকে ডেকে পাঠালেন।

—এখন উপায় কি নরোত্তম?

দৃঢ়তার সঙ্গে নরোত্তম বলল, কোন ভয় নেই মা! তোমার এই বড় ছেলে যত দিন বেঁচে আছে, তত দিন তার নাবালক ছোট ভাইটির অনিষ্ট করতে কেউ পারবে না।

নন্দরাণীর অনুপস্থিতির জন্তে আসামী নরোত্তমের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ আর টিকল না। মামলা ডিসমিস হয়ে গেল। নরোত্তম এখন দু'বেলাই জমিদার-বাড়ীতে আসা-যাওয়া করছে। রমাদেবী লক্ষ্য করছেন—অশিক্ষিত হলেও নরোত্তম তীক্ষ্নবুদ্ধি ও কৌশলী। অল্পদিনের মধ্যেই উচ্চশিক্ষিত ম্যানেজারকে সে টেনে আনল মুঠোর মধ্যে। জমিদারীতে আর কোন বিশৃঙ্খলা ঘটবার আশঙ্কা রইল না।

এদিকে সখিচরণের চেষ্টায় কাদম্বিনীর বিয়ের বাজনা বেজে উঠল। নরোত্তম কোন আপত্তি করল না। শ্যামাচরণ আর মনোহরের ইচ্ছা ছিল—এবারই তাদের বাড়ীটা পাকা হয়ে যাক। ইট তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু সেজবৌয়ের হুঁসিয়ারীর ফলে কানাই সম্বন্ধে সাধচরণ অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কাদম্বিনী যদি কুলে

কালি দেয়, ইমারতের চুণ-বালি দিয়েও সে কালি ঢেকে রাখা যাবে না।

কাদম্বিনীর বিয়ের জন্তেই ইমারতের ভিৎ গাঁথা বন্ধ রইল। মেঝে খুঁড়ে নোটভর্ত্তি ঘটিগুলো সবই তোলা হ'ল। বরাভরণ, বরশয্যা ও বরপণ নগদ চাই। পাত্রটি কোন অবস্থাপন্ন মণ্ডল-পরিবারের ম্যাট্রিক পাস ছেলে। স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন।

চাষী মোড়লরা সবাই নগদ টাকা দিয়ে মেয়ে কেনে। কিন্তু আজ এ কি ব্যাপার? কালো অক্ষরের মান, এত দাবি-দাওয়া? ছেলের চাহিদা দেখে সবাই বিস্ময় বোধ করতে লাগল।

হাসতে হাসতে সখিচরণ বলল—বড়দা! কি ভুলই করেছ। ছোটবেলায় আমাদের কেন পাঠশালাটা ঘুরিয়ে আন নি? শ্বশুর ব্যাটার কান মুচড়ে কিছু টাকা আদায় করতে আমরাও ত পারতাম?

নরোত্তম গম্ভীরভাবে বলল, টাকা নেওয়ার চেয়ে দেওয়ার সুখ বেশী···

সখিচরণ নীচু স্বরে টিপ্পনী কাটল—অবিশ্যি, যদি থাকে···

নরোত্তম মন্তব্য করল—ধানের দাম বেড়ে গেছে। আমাদের লাঙলের ফালে যত টাকা উঠছে—কোন কলমপেষা কেরাণী তা কামাতে পারছে না।

শ্যামাচরণ বলল, তবে ও পোশাকী বাবু ছেলেটিকে পছন্দ করলে কেন? আমাদের মত টিপসই লাঙলা-ছেলে তো দেশে ঢের আছে।

মনোহর বলল, কানাই ছেলেটাই বা মন্দ কি? তার সঙ্গে ত···

কানাইয়ের নাম শুনেই সখিচরণ রেগে উঠল। চিৎকার করে বলল, গেঁজেল কানাইকে যদি এ বাড়ীতে আর কোন দিন দেখি—তাহলে তার মুণ্ডু উড়িয়ে দেব···

ঠিক এই সময়ে অন্য ঘরে সেজবৌ সুহাসিনী ননদিনী কাদম্বিনীর চোখ মুছিয়ে বলছিল—কাঁদিস নে। কি সুন্দর লেখাপড়াজানা ছেলেটি। মুখ্যু কানাই তার বাঁ-পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারে না। অবুঝ বালিকার প্রেমে বিধাতার যে কি ভয়ানক অভিশাপ আছে—কাদম্বিনী তা জানে না।

শুভদিনের তিন চার দিন আগে দীনবন্ধুঠাকুর এসে বিয়ে বাড়ীর কর্ত্তা সেজে বসলেন। মোড়লরা টিপসই মাত্র করতে পারে। নরোত্তমের অনুরোধে—ফর্দ ফিরিস্তি ও হিসাবপত্র লেখবার ভার তিনিই নিতে বাধ্য হলেন। নরোত্তম পরগণা নিমন্ত্রণ করল। ব্রাহ্মণপাড়াতে গিয়েও সকলের পায়ের ধুলো প্রার্থনা করে এল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণবাড়ীতে চাল ডাল, নুন তেল, মাছ দুধ ও তরিতরকারী পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। চার ভাই পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে অর্থব্যয়ের এমন একটা বিরাট পরিকল্পনা ফেঁদে বসল যে দীনবন্ধুঠাকুর শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। পোঁতা টাকায় ঘটি নিংড়ে সে ব্যয় নির্ব্বাহ সম্ভব হবে, মনে করলেন না।

বিয়ের আগের দিন করজোড়ে গলায় বস্ত্র নিয়ে নরোত্তম গিয়ে দাঁড়াল জমিদার-গৃহিণী রমাদেবীর সামনে। বলল, মা! একটা কথা বলব? অপরাধ নেবে না?

—ছিঃ নরোত্তম! মায়ের সঙ্গে কি ওভাবে কথা বলতে আছে? এযে বড্ড পরের ভ'ব। মা ভালবাসে ছেলের আব্দার। বল, কি বলবে?

অতি বিনীতভাবে নরোত্তম বলল—মা! তোমারই মেয়ের বিয়ে। আমার ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে তুমি কি একবার পায়ের ধুলো দেবে না সেখানে?

রমাদেবী একটু হেসে বললেন, আমি ত ভেবেছিলাম—তুমি একবার মুখের কথাটাও বলবে না আমাকে। যাক্‌গে। এখুনি বেহারাদের খবর পাঠাও। কাল ভোরেই আমি যাব তোমাদের বাড়ীতে। সারাদিন সেখানে থাকব। নিজেই দেখে শুনে মেয়ের বিয়ে দিয়ে রাত্রে ফিরে আসব।

—বল কি মা! নরোত্তম অভিভূত হয়ে পড়ল। সে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, না, না, তা হতে পারে না। তোমাকে একটু বসতে দেব, এমন আসনও ত নেই আমার বাড়ীতে। সারাদিন কোথায় থাকবে তুমি?

—সে ভাবনা তোমার নয়—আমার। একটু ভেবে রমাদেবী বললেন, ম্যানেজারকে খবর পাঠাও—এখুনি আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে···

নরোত্তমের দু'চোখ থেকে তখনও আনন্দাশ্রু ঝরছিল। ম্যানেজারকে কথাটা জানিয়েই ছুটে গেল নিজের বাড়ীতে।

নরোত্তমের প্রতীক্ষায় দীনবন্ধুঠাকুর রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাকে দেখেই বললেন—কোথায় গিয়েছিলে?

কেন?

—তোমাদের পোঁতা টাকা ত ফুরিয়ে গেছে। এখন উপায় কি? এদিকে, নারদের নেমন্তন্ন করে বসে আছ। হালুইকর এসে গাঁজা টিপছে। মালমশলার ব্যবস্থা কি? টাকা কোথায়?

—সে ভাবনা আমার নয় ঠাকুরখুড়ো, আমার মায়ের। মা নিজেই আসছেন।

মাতৃভক্ত নরোত্তমের মা যে কে, তা দীনবন্ধুঠাকুর জানেন। সেই প্রস্তরময়ী মা ত যুগযুগান্ত জিভ্‌ বের করেই দাঁড়িয়ে থাকেন। ভক্তের ফুল জল ও প্রেমাশ্রু গ্রহণ করেন। তাঁর কোন কর্ম্ম নেই, কর্ম্মফলপ্রাপ্তির আনন্দ বা অনুশোচনাও নেই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা অভুক্ত ফিরে গেলেও, তিনি ভাঁড়ারে গিয়ে মিষ্টান্ন পরিবেশনের ভার গ্রহণ করবেন না। একটু বিরক্ত ভাবে বললেন, পাগলামো কর না নরোত্তম, কারও দুঃখ নিবারণের জন্যে মা কোনদিন মন্দিরের বাইরে আসে নি, আসবেও না।

—তাই নাকি? নরোত্তম হো হো করে হেসে উঠল। ঠাকুরখুড়ো, তোমরা শুধু মন্তর আওড়াতেই জান। তাব বুঝি মা আমার দিনরাত ওই মন্দিরেই বন্দী থাকে? তা নয়—তা নয়। দরকার হলে মাঝে মাঝে মা বেরিয়েও পড়ে, নরোত্তমের ডাকে

সাড়া না দিয়ে পারে না। দাঙ্গার মাঠে যাকে দেখতে পাই—কাত্তর বিয়ের দিনে সেই মা আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো না দিয়ে কি পারে? আসবে, আসবে—আমার মুখ রক্ষা করবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক···

নরোত্তমের নিশ্চেষ্টতা ও মায়ের উপর নির্ভরপরায়ণতা দেখে দীনবন্ধুঠাকুর বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। হালুইকররা বসে আছে। ছানা আছে, চিনি নেই। সন্দেশের পাক উঠছে না। হাটের বেলা হয়ে গেছে, তরিতরকারি আনবার কোনও বন্দোবস্ত হচ্ছে না। টাকা নেই। উপায় কি?

দীনবন্ধুঠাকুর বিরক্ত ভাবে বললেন, শোন নরোত্তম, প্রায় পাঁচ হাজার লোক নেমন্তন্ন করেছ। তোমার আত্মীয়-কুটুম্বরা এসে বাড়ী ভর্ত্তি করে ফেলছে। এ কাজের কর্ত্তৃত্বের ভার দিয়ে আমাকে একটা লজ্জার ভিতর ফেলবে নাকি?

দীনবন্ধুঠাকুরের বসবার আসন ছিল—বাইরের ঘরের বারান্দায় পাতা একটা নূতন মাদুর। একটি নূতন মেটে হাঁড়ির ভিতর ছিল—দোয়াত, কলম ও হিসাবের কাগজপত্র। এক খণ্ড কাগজ টেনে নিয়ে দীনবন্ধুঠাকুর চিঠি লিখতে বসলেন। নরোত্তমকে বললেন, শীগ্‌গির একবার মনোহরকে ডাক তো···

—কেন?

—এই চিঠিখানা নিয়ে এখুনি যাবে···

—কোথায়?

—আমার গিন্নীর কাছে।

—কি লিখছ তাঁকে?

—তার গলার হার দু'গাছা, আর হাতের আটগাছা চুড়ি—এখুনি পাঠিয়ে দিতে।

—না, না, সে কথা লিখ না। লিখে দাও, কাল সকালে হার আর চুড়ি পরে সেজে-গুজে বসে থাকতে। নরোত্তম গিয়ে তার খুড়িমাকে নিয়ে আসবে।

—না, না, তিনি এখানে আসবেন না।

—কেন আসবেন না? মা এলে, খুড়িমাকেও আসতে হবে···

এমন সময় একটা সাইকেল চেপে ম্যানেজার এসে বললেন, নরোত্তম, কাল তোমার মা এসে কোন্ ঘরে থাকবেন? কি, কি আসবাবপত্র সেখানে দরকার হবে? একটা ফর্দ্দ করে দাও···

দীনবন্ধুঠাকুরের হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল। তিনি অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ম্যানেজারের মুখের দিকে। অস্ফুট স্বরে বললেন, কি বলছেন আপনি? জমিদার-গৃহিণী আসবেন নরোত্তমের বাড়ীতে?

ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ, কাল ভোরেই আসবেন তিনি। সারাদিন থাকবেন এখানে। রাত্রে বিয়ে দেখে, ফিরবেন।

দীনবন্ধুঠাকুর ভাবতে লাগলেন—তাঁদের শাস্ত্র-জ্ঞান, আর ফুল-পাতা দিয়ে দেব-দেবীর অর্চ্চনা একেবারেই পণ্ডশ্রম। মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ নরোত্তমের সর্ব্বত্র মাতৃ-দর্শন—সাধনায় সিদ্ধিলাভের একমাত্র পন্থা। তাই তো মা এসে ভক্ত-রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন। আজ মাতৃভক্ত নরোত্তমের মানরক্ষার জন্যে কোন্ মা আসছেন? ধনীর দুলালী জমিদার-গৃহিণীর অন্তরে নরোত্তম আজ কোন্ মাকে জাগিয়ে তুলেছে? মন্দিরের পাষাণী মা-ই কি মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে এলেন? মাতৃসাধক নরোত্তম! তুমিই ধন্য।

পল্লীগ্রামের জমিদারের আভিজাত্যের অহঙ্কার যে-কোন সম্রাটের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। জমিদাররা কখনও কোন প্রজা-বাড়ীতে পদধূলি দিতেন না। জমিদার-গৃহিণীর প্রজার গৃহে আগমনের কথা ত কেউ ভাবতেই পারে না। জমিদারীর ইতিহাসে যে ঘটনার কোনও নজির নেই, উদার-হৃদয়া তেজস্বিনী রমাদেবী আজ তাই করছেন। জমিদার-পরিবারে বিক্ষোভ আরম্ভ হ'ল। কর্ম্মচারীরাও বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু সামনে এসে কেউ কোনও প্রতিবাদ করতে সাহসী হ'ল না।

একজন অতি বৃদ্ধ কর্ম্মচারী, যিনি এই জমিদারীর তিন-পুরুষ দেখে আসছেন, তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। কাঁপতে কাঁপতে এসে বললেন, মা! কাজটা কি ভাল হচ্ছে? জমিদারের সম্মান···

—'থামুন!' ধমক দিয়ে রমাদেবী বললেন, 'জমিদারের সম্মান কিসে বাড়ে—তা আমি জানি। স্বার্থ-বুদ্ধি নিয়ে আপনারাই ত চিরদিন জমিদারকে আড়ালে রেখেছেন, প্রজা-মনিব সম্বন্ধকে বিষাক্ত করে তুলেছেন। নরোত্তম আমার ছেলে!'

নরোত্তমের বাড়ীতে জমিদার-গৃহিণী আসছেন। পরগণায় একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। মোড়লরা চার ভাই আজ আনন্দে আত্মহারা। পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনেরাও সে আনন্দোৎসবে যোগদান করেছে। কাদম্বিনীর বিয়ের চেয়েও, মোড়লদের বাড়ীতে রমাদেবীর অবস্থান—বেশী আকর্ষণীয় ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। বাড়ীর প্রবেশ-পথে, ফুলপাতা দিয়ে তোরণ তৈরি হচ্ছে। শেষ-রাত্রেই বাদ্যকররা নহবতে উঠবে। এলাহি ব্যাপার!

সবচেয়ে বেশী ছুটোছুটি করতে হচ্ছে—দীনবন্ধুঠাকুরকে। তাঁর কাছাটা বার বার খুলে যাচ্ছে! কাঁধের নামাবলীখানাও পড়ে যাচ্ছে। সখিচরণ এসে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে করজোড়ে নিবেদন করল—ঠাকুরখুড়ো! অনুমতি করুন—আপনার কাপড়খানা ভুঁড়ির উপর গেরো দিয়ে বেঁধে দি। একটু সাবধান হওয়া ভাল···

সৌরভিণী, সুহাসিনী আর নীহারিকা তটস্থ হয়ে আছে। নরোত্তমের আদেশ—তাদেরই করতে হবে জমিদার-গৃহিণীকে সেবা ও যত্ন।

সখিচরণ হাসতে হাসতে সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করল—ওকি! তোমার চোখ দুটো ছল্ ছল্ করছে কেন?

—আমাকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও। এ বিয়ে আমি দেখব না···

—কেন?

—আমার বড্ড ভয় করছে···

—ভয় কি ? তিনি সাপও নন্—বাঘও নন্। তোমাদের মতই একটি মেয়ে। এই যে মেজ-বৌদি, দোহাই তোমায়—ছেলেমেয়েদের যত শাসন করতে চাও, আজ রাত্রেই করে ফেল। কাল কিন্তু কারও গায়ে একটি চড়-চাপড় মারতে পারবে না। শুনলাম—তিনি নাকি তোমাদের ঝগড়া-ঝাটি শুনতেও রাজী আছেন, কিন্তু কোনও বাচ্চাকে ঠেঙানো সইবেন না! এই যে ছোটবৌমা, তোমার চোখ-মুখ শুকিয়ে গেছে কেন? তুমি ত একটু লেখাপড়া জান? গুড্ মর্ণিং বলে সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। ভয় কি?

১৭

আষাঢ় মাস। তখনও পল্লীর মাঠে ঘাটে বর্ষার বান ডাকে নি। হাসি-কান্নার মত আকাশের কোলে ঊষার উজ্জ্বল আলো, আর জলভরা স্নিগ্ধ মেঘের গাঢ় অন্ধকার, শুভ দিনেও অনিশ্চিত আবহাওয়ার সূচনা করছে।

মাঠের বর্ণ বিন্যাস এক ঢালা সবুজ। বর্ষাস্নাত সতেজ ধানের চারাগুলি বাতাসে হেলে-দুলে চাষীর মনে আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলছে। গাছে গাছে সবুজের আনন্দ। জীবনীশক্তির পূর্ণ বিকাশ। ফুল-ফসলের পূর্ব্বাভাস।

আট-বেহারার পাল্কীতে চড়ে রমাদেবী আসছেন নরোত্তমের বাড়ীতে। পল্লীপথ আনন্দ-কলরবে মুখরিত। ছেলে-বুড়ো সবাই এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের বাইরে। মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে, উলু দিচ্ছে। পল্লীবধূরা ঘোমটার ভিতর থেকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে রমাদেবীকে একবার দেখবার জন্যে।

রমাদেবী তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমেরিকার রাজপথে ঘুরেছেন। পাশ্চাত্ত্য যান্ত্রিক সভ্যতার বিলাস-বৈভব ও জীবন-যাপনের স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে এসেছেন। কিন্তু, দরিদ্র ও অনুন্নত বাংলার পল্লীপথে আজ তিনি একি দেখছেন? চারিদিকে প্রাণমাতানো সবুজের লীলা, সহজ ও সরল পল্লী-জীবনের আনন্দ মেলা ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণশক্তির স্বভাব-সুন্দর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ!

ভোর পাঁচটা থেকেই নহবত বাজছে। বেলা সাতটায় রমাদেবীর পাল্কী এসে থামল মোড়লদের বাড়ীর সামনে, ফুল-পাতায় সাজানো তোরণ-দ্বারে। মোড়লরা চার ভাই গলবস্ত্রে ও করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। নরোত্তমের দু'চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছে। পথঘাট লোকারণ্য। মানুষের গায়ে মানুষের চাপ। চাষীরা কেউ আজ লাঙল নিয়ে মাঠে যায় নি। সবাই এসেছে রাণীমাকে দেখতে।

রমাদেবীকে ঘরে নিয়ে তুলবার পথটায় মেয়েদের রঙীন শাড়ী পাতা। রাণীমার পায়ে যেন একটুও জলকাদা বা ধুলোবালি না লাগে। খোকাকে বুকে নিয়ে রমাদেবী পাল্কী থেকে নামলেন। নরোত্তমকে বললেন, এ কি করেছ? শাড়ীগুলো তুলে ফেল···

—তা কি হয় মা? তুমি তো কখনও মাটিতে পা রাখ না। বৌদের শাড়ী তারাই পেতে দিয়েছে। ওতে তোমার পা লাগলে, তারা যে ধন্য হয়ে যাবে মা!

রমাদেবী সেই শাড়ী মাড়িয়েই ঘরে উঠতে বাধ্য হলেন। বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ারে উঠে বসলেন। চারদিক থেকে আরম্ভ হ'ল মেয়ে-পুরুষের প্রণামের পালা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রমাদেবীর পা-দুখানা ঢাকা পড়ল প্রণামীর টাকায়।

রমাদেবী অতি নিখুঁতগঠন ও অপূর্ব্ব সুন্দরী। দুধে-আলতা রং আর ভ্রমর-কালো চুল। সবচেয়ে সুন্দর তাঁর চোখ দুটি। কত স্বচ্ছ, কত করুণ আর কত মধুর আবেশভরা তাঁর দৃষ্টি! এ কোন্ ভাস্করের সৌন্দর্য্য-পরিকল্পনার চরম সৃষ্টি? চাষী ছেলে-মেয়েরা অবাক হয়ে ভাবছে আর দেখছে কোলে তাঁর কি সুন্দর গোলাপফুলের মত কচি ছেলেটি!

চাষী-মেয়েদের অলঙ্কার-প্রিয়তা খুব বেশী। সোনারূপো না জুটলেও একগোছা কাঁচের চুড়ি তারা পরবেই। কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখতে লাগল—রাণীমার হাতে খুব সরু দু'গাছা সোনার চুড়ি ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নেই। গলায় আছে এক ছড়া দামী মুক্তার মালা।

বৌদের সবার সঙ্গেই রমাদেবীর আলাপ-পরিচয় হ'ল। হেঁসেলেও না ঢুকে ছাড়লেন না তিনি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, তত্ত্ব ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন সবাইকে। ছোট বৌয়ের ঘরে ঢুকে দেখলেন—বিয়ের কনে' কাদম্বিনী এক কোণে চুপটি করে বসে কাঁদছে। তার হলুদমাখা অঙ্গ আর পরিধানের লালপেড়ে নূতন শাড়ীখানা দেখেই চিনলেন তাকে। আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, আজকের এই শুভ দিনে তুমি চোখের জল ফেলছ কেন?

কাদম্বিনী মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর কথার কোন জবাব দিল না।

নরোত্তম এসে জিজ্ঞাসা করল, মা! কাছের কল্যাণে কালীবাড়ীতে আজ একশ' আটটি পাঁঠা বলি হবে। তুমি কি দেখতে যাবে?

—একশ' আটটা? রমাদেবী শিউরে উঠলেন।

—এই পরগণার প্রায় পাঁচ হাজার লোক মায়ের প্রসাদ পাবে। একশ' আটটা তো খুব বেশী নয় মা?

—না, না, অত বড় একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখব না আমি।

—আমি নিজেই তো খাঁড়া ধরব···

—একশ' আটটা জীব হত্যা করতে তোমার হাত কাঁপবে না? তুমি কি বলছ নরোত্তম?

—কেন কাঁপবে! আমার মা যে রক্ত পেতে চান। একশ' আটটা কইমাছ কাটতে দেখলে তো তোমরা শিউরে উঠ না মা! কুটনো কুটতে তাজা কইগুলোকে ভাজতেও মেয়েদের হাত কাঁপে না। পাঁঠাগুলোর উপর এত দরদ কেন?

—আমি মাছও খাই না, মাংসও খাই না। বিশেষতঃ কথা হচ্ছে

মেয়ের বিয়ের রাত্রে মাকে উপবাসী থাকতে হয়। বিয়ের পর একটু দই-মিষ্টি খাব। কালীবাড়ীতেই হোক, আর এখানেই হোক, আমার কোন খাবারের ব্যবস্থা করো না কিন্তু···

নরোত্তমের সঙ্গে বাইরে গিয়ে রমাদেবী দেখলেন, একটা খোলা জায়গায় সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। তার নীচের তক্তপোশের মঞ্চে ভেলভেট দিয়ে ঢাকা চেয়ার। সামনে ছোট টেবিলের উপর দুটো ফুলদানি। তার চারিধারে বহুলোক সমবেত হয়েছে। দীনবন্ধুঠাকুরের অনুরোধে রমাদেবী গিয়ে বসলেন সেই চেয়ারে।

কুমারবাহাদুরের অত্যাচারে বহু প্রজা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। খাজনা-আদায় বন্ধ করেছিল। আজ তারা সবাই এসেছে নরোত্তমের বাড়িতে রাণীমাকে দেখতে ও প্রণামী দিতে।

এক জন বৃদ্ধ চাষী চীৎকার করে উঠল—'জয় আমাদের রাণীমার জয়!'

রমাদেবী বলতে লাগলেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—তোমাদের প্রত্যেকটি গাঁয়ে আমি যাব মায়ের দাবী নিয়ে। তোমরা আমাকে যত টাকা প্রণামী দেবে তার পাঁচ গুণ আশীর্ব্বাদী আমি দেব—সেই গাঁয়ের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে। মনে রাখবে—জমিদার তোমাদের প্রভু নন, সেবক।

সমবেত জনগণ রমাদেবীর উচ্চ প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল।

ছোটবৌ নীহারিকার ঘরে তখনও কাদম্বিনী কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিল। নীহারিকা তর্জ্জনী তুলে মনোহরকে বলল, আমি এখনও বলছি—তোমার দাদাদের বল—আমার ভাই কানাইয়ের সঙ্গেই ওকে বিয়ে দিক। নইলে অনর্থ ঘটবে···

মনোহর বলল, এখন আর সেকথা আমি বলতে পারব না। তাতে যদি ও বিষ খেয়ে মরতে চায়, মরুক। আমি এনে দিচ্ছি···

কাদম্বিনী শুধুই কাঁদে, কোন কথা বলে না। তার পক্ষে ওকালতি করে নীহারিকা। নীহারিকা বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের পাঠ সমাপন করেই দু'চারখানা আধুনিক গল্পের বই পড়ে ফেলেছে। নিজেও আধুনিকা হতে চেষ্টা করছে। 'আমি তোমার সেবাদাসী নই!' দিনের মধ্যে দশ বার একথাটা সে মনোহরকে শুনিয়ে দিচ্ছে। সরলা পল্লী-বালিকা কাদম্বিনীর মনের উপরেও অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। কাদম্বিনীকে বুঝিয়ে দিয়েছে—প্রেমের জন্যে আত্মোৎসর্গ করলে মেয়েরা স্মরণীয়া হয়। কানাইয়ের সঙ্গে কাদম্বিনীর পূর্ব্বরাগের প্রেমপালা নীহারিকার তত্ত্বাবধানেই ধীরে ধীরে উদ্যাপিত হয়ে উঠেছে। এখন তার নাটকীয় পরিণতির জন্যে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া কাদম্বিনীর আর কি উপায় আছে?

আর এক বার চোখ রাঙিয়ে নীহারিকা মনোহরকে বলল, এখনও সাবধান হও। লেখাপড়া তো জান না? এই বইখানা যদি পড়তে পারতে, তা হলে বুঝতে—'ব্যর্থ-প্রেমে'র পরিণতি কি ভয়ানক!—বলেই সে একখানা বই ছুঁড়ে ফেলল মনোহরের গায়ের উপর। বইখানা কুড়িয়ে নিয়ে মনোহর দেখল, তার রঙীন মলাটে একটি রোরুদ্যমানা সুন্দরীর ছবি। এই ছবি দেখিয়েই নীহারিকা কাদম্বিনীকে তৈরি করছে। তার ব্যর্থ প্রেমের তাজমহল গড়ে তুলেছে।

মনোহর নিপুণ মৎস্য-শিকারী। হোঁচ-কোঁচ বড়শী-পোলো দোয়াড়-ঘুনসী প্রভৃতি মৎস্য-শিকারের বহুবিধ যন্ত্র তার ঘরে আছে। রমাদেবীর আদেশে জমিদার-বাড়ীর দীঘি থেকেই বড় বড় রুই-কাতলা ধরে আনবার ব্যবস্থা হয়েছে। এখুনি জেলেরা এসে বেড়-জাল নিয়ে নামবে। মনোহরের উপর পড়েছে তত্ত্বাবধানের ভার। প্রেমতত্ত্ব আলোচনার সময় এখন তার নেই। সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

—তোমরা যা জান কর। আমি চললাম···বলেই একগাছা খেপলা-জাল কাঁধে ফেলে মনোহর রওনা হ'ল।

নীহারিকা চোখমুখ ঘুরিয়ে কাদম্বিনীকে বলল, এসব আয়োজন তো তোর জন্যে নয়, জমিদার-গিন্নীর জন্যে। তোর খবর কে রাখছে? তুই কে?

কাদম্বিনী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে নীহারিকার মুখের দিকে। মনে মনে ভাবে, সত্যিই তো সে কে? তার চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে।

সন্ধ্যা-লগ্নেই বিয়ে। বর এসেছে। নহবতখানায় সানাই বেজে উঠেছে। প্রাণমাতানো মধুর রাগিণী সে শুভসংবাদ চারিদিকে ঘোষণা করছে। পাড়াময় হৈ চৈ। উদ্বেলিত জনসমুদ্র যেন মোড়লদের বাড়িটাকে ভাসিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। কোন দিকেই শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব হচ্ছে না। নিরম্বু উপবাসী দীনবন্ধুঠাকুর গলদ-ঘর্ম্ম হয়ে ছুটোছুটি করছেন। বর এসে রমাদেবীর পায়ের উপর প্রণাম করল।

শুভলগ্ন উপস্থিত। বরকে সভাস্থ করা হ'ল, কিন্তু কাদম্বিনী কোথায়? তাকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? কেউ বুঝতে পারছে না—ব্যাপার কি? পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে—কাদু কোথায়?

মনোহর ছুটতে ছুটতে এসে নীহারিকাকে জিজ্ঞাসা করল—কাদু কোথায়?

নীহারিকা সোজা জবাব দিল—জানি না।

কাউকে কিছু না বলে মনোহর ছুটে গেল কানাইয়ের বাড়ীর দিকে। একটা মাঠের ওপারে তার বাড়ী। জংলা-বাড়ীতে মাত্র একখানা ভাঙা খড়ের ঘর। এক বুড়ী-ঠাকুরমা ছাড়া কানাইয়ের আর কেউ নেই।

মনোহর তাকেই জিজ্ঞাসা করল—কানাই কোথায়?

বুড়ী বলল, সে তো এই সন্ধ্যের ইষ্টিমারে কলকাতায় রওনা হয়ে গেছে···

মনোহর মাথায় হাত রেখে বসে পড়ল। সে বুঝল সর্ব্বনাশ হয়েছে। এখন আর প্রতিকারের কোন উপায় নেই। ফিরে এসে সখিচরণকে সব কথা বুঝিয়ে বলল। সখিচরণ বলল নরোত্তমকে।

কানাই সম্বন্ধে কাদম্বিনীর দুর্ব্বলতার কথাটা ভায়েরা সবাই জানে, জানে না শুধু নরোত্তম। চন্দ্রকলা তো বেঁচে নেই? কে তাকে জানাবে? বুদ্ধিমান ভায়েরা কথাটা এক বার নরোত্তমের কানে তোলাও আবশ্যক বোধ করে নি।

সখিচরণের কাছে আনুপূর্ব্বিক শুনে নরোত্তম কেঁদে উঠল—ওরে বোকারা, এতদিন কথাটা আমার কাছে গোপন রেখেছিলি কেন? না হয় কানাইয়ের সঙ্গেই তাকে বিয়ে দিতাম। এমন জাতনাশা কেলেঙ্কারী তো ঘট্‌ত না? নরোত্তম বুক চাপড়ে আর্ত্তনাদ করতে লাগল।

রমাদেবীও অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়ে পড়েছেন। নরোত্তমকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—কিন্তু সে কি আর সান্ত্বনা মানে? কাঁদতে কাঁদতে বলল, মা! নরোত্তমের উঁচু মাথাটি আজ মাটিতে মিশল। মায়ের পেটের বোন আজ আমাকে যে শাস্তি দিলে, তা আর কেউ কখনও পারে নি। কত দাঙ্গায় লাঠি-সড়কি নিয়ে লাফিয়ে পড়েছি। দু'চারটি মাথা না নিয়ে ফিরি নি। কিন্তু কানু আমার সে লাঠি-সড়কির অহঙ্কার একেবারে চূর্ণ করে দিয়ে গেছে। নরোত্তম আর নেই।

রমাদেবী তাঁর ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, কাল সকালেই একখানা 'তার' করে দিন শিয়ালদার ষ্টেশান-মাষ্টারের নামে।

—তার করে আর কি হবে মা?

—তুমি কি বলছ নরোত্তম? একটা চরিত্রহীন বদ ছেলের কুপরামর্শে একটি অবুঝ মেয়ে তার সর্ব্বনাশ করবে, আর আমরা নিশ্চেষ্ট থাকব?

—তাকে কি আর ফিরিয়ে আনা যাবে?

—কেন যাবে না? এক্‌স্‌প্রেসটা পৌঁছবে কাল এগারটায়। তার আগেই আমাদের তার পৌঁছে যাবে। নিশ্চয়ই তারা ধরা পড়বে···

রমাদেবীর পায়ের উপর মাথা রেখে নরোত্তম কেঁদে কেঁদে বলল, মা! আমার কানুকে ফিরিয়ে আন। নইলে আমি বাঁচব না।

রমাদেবী মনে মনে ভাবছিলেন—যার কল্যাণকামনা করে একশ' আটটা জীবহত্যা করেছ—তার জীবনের এই পরিণতির জন্যে বোধ হয় তুমিই দায়ী নরোত্তম! একের অনিষ্টসাধন করে অন্যের ইষ্ট কামনা শুধু নির্ব্বুদ্ধিতা নয়, পাপ—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম!

ক্রমশঃ

এবার পূজা অশ্রু-গঙ্গাজলে

শ্রীনীলরতন দাশ

আজি বাংলার ভাঙা ঘরে কেন এলে মা শরৎ-রাণী?
কে গাহিবে তব আগমনী; কে বা পূজিবে চরণখানি?
কে সাজাবে তব বরণের ডালা,
মঙ্গল ঘট, কুসুমের মালা?
কাঁদে নিরন্ন, কাঁদে বিপন্ন দহি' সদা দুখানলে,
এবার তোমার বোধন হবে মা ব্যথার বিল্বদলে

বাহিরে শরৎ এসেছে বঙ্গে, ঝরিছে শেফালিদল
অন্তরে তার দুখ-বরষার ধারা ঝরে অবিরল
রুদ্ধ দেবীর মন্দিরদ্বার,
চারি ধারে ক্রন্দন হাহাকার
গৃহহারা আর পথের ভিখারী ঘুরিতেছে দলে দলে,
এবার তোমার পূজা হবে মা গো অশ্রু-গঙ্গাজলে!

কণ্ঠ সবার বাষ্পরুদ্ধ, নাহি হাসি কলরব;
পূজারী ভুলেছে পূজার মন্ত্র, ভক্ত মাতৃস্তব।
উপবাসী কোটি সন্তান যা'র
কোথা পা'বে তারা ষোড়শোপচার?
দুর্গতি মাঝে কি অর্ঘ্য তারা দিবে তব পদতলে?
এবার তোমার অর্চ্চনা শুধু বেদনার শতদলে!

হিন্দু কোড বিল

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

৬ই মে, ১৯৫২ ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় এ. ডি. গোড়ওয়ালার হিন্দু কোড বিল নামে যে লেখাটি বেরিয়েছে, অনেকেই হয় ত তা দেখেছেন এবং তা পাঠ করে বহু জন আশ্বস্তও হয়েছেন আশা করতে পারি। আমরা মেয়েরা—যারা আশ্বস্ত হই নি, পণ্ডিতজীর বহুপ্রতিশ্রুত বাক্যের পর, তারা আশ্চর্য্য হয়েছি—এই আমাদের মেয়েদের দিকের কথা—আর কি বা বলা যায়?

এর পর প্রায় এক মাস কুড়ি দিন পরে ২৫শে জুনের ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদকীয়তেও শ্রীযুক্ত গোড়ওয়ালার কথারই আভাস দেওয়া হয়েছে বা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ষ্টেট্‌স-ম্যান যা বলেছেন তার মূল বক্তব্য এই—'দেশের বহুসংখ্যক শিল্পপতি, ধনীসমাজ এবং বহু রক্ষণশীল দল এই বিলটি পছন্দ করেন না, সমর্থনও করবেন না। অথচ দেশের এখন-কার নানাবিধ পরিকল্পনা ও উন্নতির ব্যাপারে আর্থিক সাহায্যের জন্ম দেশকে এখন তাঁদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে, কাজেই পণ্ডিতজী তাঁদের বিরুদ্ধে গিয়ে এই বিলটির জন্তে মাথা ঘামাতে ইচ্ছা করেন না। সুতরাং পণ্ডিতজী বলছেন—আগে দেশের উন্নতি হোক।'

আমরাও বলি—'তোমারই বা তোমাদেরই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' অর্থাৎ—ধনীরা আরও ধনবান্ হোন, (দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হোক), শক্তিশালীরা আরও শক্তিশালী হোক, (অশক্ত নারী ও দাসেরা আরও অশক্ত হোক)। দেশের সব উন্নতি সারা হলে তখন হিন্দু কোড বিলের কথা, ভাষাভিত্তিক প্রদেশের গঠনের কথা, মুটে-মজুর চাষাভুষোদের অন্নবস্ত্র শিক্ষার কথা ভাবা যাবে। কেননা 'কাল ত নিরবধি'—কর্ত্তাদেরই হাতে আছে। মানুষ না হয় মরণশীল।

শ্রীযুক্ত আম্বেদকরের পদত্যাগের পর অনেকেরই মনে হয়েছিল যে, স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন শাসনতন্ত্রের অনেক পরিকল্পনার দশাই কবির ভাষায় 'অর্দ্ধেক পরিকল্পনা তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা' না হয়।

হিন্দু কোড বিলের খণ্ডিত রূপে আমরা সেই কল্পনারই আভাস পাচ্ছি। জনমতকে উপেক্ষা করবার প্রথম সূচনা এতেই হ'ল বলা যায়। প্রগতিশীল বিলকে এই ভাবে চাপা দেওয়ার চেষ্টা মেয়েদের মধ্যে যে কি পরিমাণ তিক্ততার সৃষ্টি করেছে, তা বোধ হয় কর্ত্তারা বোঝবার চেষ্টা করেন নি। যাক্ সে কথা।

শুধু একটু আলোচনা করে দেখা যাক্, স্বাধীন ভারতের পার্লামেণ্টে এই বিলের শুধুমাত্র আলোচনাতেই রক্ষণশীল বিত্তশালী সমাজের পুরুষদের কেন এত ভয়-ভাবনা।

এটা ভুল নয় যে সত্যি করেই এই ভয় ও ভাবনার কারণ আছে। কেননা এই বিলটি যদি পাস হ'ত, তা হলে প্রতিক্রিয়াশীল পুরুষসমাজ যে বড় বড় তিনটি অধিকার চির-কাল ধরে ভোগ করছিলেন, তা থেকে বঞ্চিত হতেন ঠিকই।

প্রথমতঃ, হিন্দু কোড পাস হলে পুরুষের বহুবিবাহ করার অধিকার থাকবে না। সকলেই বহুবিবাহ করুন বা না করুন, অধিকার বলে যে একটা জিনিষ আছে, তা ত আছে, তাতে ত সন্দেহের অবকাশ নেই এবং রাজা, মহারাজা, বহু জমিদার ও ধনশালী ব্যক্তি যে একাধিক বিবাহ করে থাকেন এবং সাধারণ লোকেরাও যে ইচ্ছে করলে ও উপায় থাকলে একাধিক বিয়ে করেন, সেকথা কে না জানে? এখন যদি রাজা মহারাজাদের উপরও এই বিলটি প্রযুক্ত হয়, তা হলে ভেবে দেখুন, কত অসুবিধা হবে তাঁদের! অগাধ টাকা, অখণ্ড অবসর থাকতে যদি অবাধ বিবাহ না করতে পারেন তা হলে জীবনের যে একটা পরম বিলাস থেকেই তারা বঞ্চিত হবেন! বিল পাস হলে—একটি মাত্র স্ত্রী, তাকেও ত্যাগ করলে তবে আবার একটি বিবাহ হতে পারবে। সেও আবার কিছু ওজর অছিলা দেখাতে হবে—বন্ধ্যা, অসতী, রুগ্না ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধিকার, বিবাহ-বিচ্ছেদ। বিবাহ-বিচ্ছেদ হিন্দু সমাজে নেই বলে লোকের ধারণা—সেটা ভুল। বিবাহ-বিচ্ছেদ বাস্তবিকই আছে। স্ত্রী ত্যাগ করা যায় অনায়াসে। তাড়িয়ে দেওয়া যায় স্ত্রীকে পুত্রকন্যাসহ, ছেলেমেয়ে কেড়ে নিয়ে বিতাড়িত করা যায়, ঘরে রেখে ত্যাগ করে আবার বিয়ে করা যায়, অপমান করা যায়। সব চলে স্বামীর। এই ব্যবহার-গুলিকে কেউ বিবাহ-বিচ্ছেদ বলুন বা না বলুন, এগুলি বিচ্ছেদই বটে তবে একতরফা। এই অধিকারগুলি স্ত্রীদের নেই। তার ইচ্ছামত চলে যাবার অধিকার নেই—অপমানিত হলেও; আবার ইচ্ছামত বাড়ীতে থাকবার অধিকারও নেই, যদি স্বামী তাড়িয়ে দেন। কোনও কালে—কোনও অবস্থাতেই আমৃত্যু তাঁর স্ত্রীত্বটুকু যাবে না—তিনি সেই স্বামীটির স্ত্রী থেকেই যাবেন চিরদিন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই বিলটি পাস হলে স্ত্রীদের নিজেদের দেহের উপর বা অস্তিত্বের উপর একটা অধিকার জন্মাত। পরিত্যক্ত হয়েও স্বামীর সম্পত্তি

হয়ে থাকতে হ'ত না। আইনানুমোদিত যে-কোনও প্রতিকূল অবস্থাতেই স্ত্রী চলে যেতে পারত, পৃথক হতে পারত এবং ইচ্ছে হলে আবার বিয়েও করতে পারত।

তৃতীয়তঃ, যে একচ্ছত্র অধিকারে পুরুষেরা অংশীদারিত্বের আশঙ্কা করে বিরোধিতা করছেন সেটা হ'ল সম্পত্তিতে অধিকার। হিন্দু কোড পাস হলে মেয়েরা সম্পত্তিতে অধিকার পেতেন। দেশে অধিকাংশই ত দরিদ্র। তবু এই বিলে যাঁর সম্পত্তি আছে, তাঁর কন্যাসন্তান কিছু পেতে পারতেন।

কিন্তু বহু পিতারই (এবং মাতারও) অবাধে কন্যার জনকজননী হয়েও সেটা অপছন্দ। তাঁদের মনে হয় ধনসম্পদ 'পুরুষ পরম্পরায়ই থাকা উচিত—সন্তান পরম্পরাক্রমে করলে কন্যা বংশে চলে যাবে আর বহু জটিল সমস্যার উদ্ভব হবে—ভাই-বোনে, জামাতা-সম্বন্ধী সম্পর্কে। তাঁরা আরও বলেন, মেয়ের বিবাহ হলে পৈতৃক ধনসম্পত্তির খানিকটা পরিবারের বাইরে চলে যাবে—ছেলের ভাগে কম হবে। (যদিও সে পরের মেয়েটি ঘরে আসবে, সেও ত তার পিতার সন্তান হিসাবে কিছু সম্পত্তি আনবে।) তাঁরা আরও বলেন, এখন ভাইয়ে ভাইয়েই অমিল হয়, তখন ব্যাপার আরও জটিল হবে। সম্পত্তি টুকরা টুকরা হবে ইত্যাদি।

আমাদের বক্তব্য এই, ব্যাপার জটিল হবে বা কোনও অসুবিধা হবে বলে মানুষের অধিকার মানুষকে না দেওয়া, সন্তানের অধিকার তার মা পাওয়া বঞ্চনারই সামিল। পূর্ব্বে এক সময় বলেছিলাম—মানুষের জন্যই সম্পত্তি, সম্পত্তির জন্য মানুষ নয়। এখনও সেই কথাই বলব। কন্যাসন্তানকে পরিপূর্ণ সন্তান মনে করতে হবে এযুগে। তাদের শিক্ষাহীন, মানুষের অধিকারহীন করে রাখা চলবে না। এখনি দারুণ বিতৃষ্ণার উদয় হয়েছে তাদের মনে, এর পরে সমাজ আপনি ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাবে। সম্পত্তিতে অধিকার থাকলে তার পরের গলগ্রহ হয়ে হীন জীবন যাপন করতে হয় না—সেকথা মেয়েরা আজ বুঝতে পেরেছে।

এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হিসাবে বলা যায়, মাতৃতন্ত্র সমাজের কথা এবং মুসলমান সমাজের কথা। মাতৃতন্ত্র সমাজে মালাবারে (দাক্ষিণাত্যে) আজ অবধি যে প্রথা চলে আসছে সেটাতে নারী ধনাধিকারশালিনী। সে সমাজে নারীদের অবস্থা পিতৃতন্ত্র সমাজের চেয়ে ঢের উন্নত। পরের গলগ্রহ জননী ভগিনী কন্যা হয়ে তাঁরা বেঁচে থাকেন না। সেই সমাজে নারী সম্পত্তি পাওয়াতে পুরুষের অর্থের অভাব হয় নি। আর মেয়েরা দাসীর ন্যায় জীবন যাপন করেন না, কেননা গলগ্রহ নন্।

মুসলমান সমাজে নারীদের অনেক অধিকারই নেই আমাদেরই মত। কিন্তু দুটি বড় অধিকার আছে, যা আমাদের নেই। প্রথম পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার আছে—ভাইয়ের সঙ্গে বোনের। মেয়ে পিতার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পান। দ্বিতীয় বিবাহ-বিচ্ছেদ তাঁদের সমাজে আছে। যদিও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার সর্ত্তাধীন। যেমন—বহু বিবাহ পর্দাপ্রথা প্রভৃতি কতকগুলি কুপ্রথা মেয়েদের স্বাধীনতা অনেকটা হরণ করে নিয়েছে, তেমনি এই দুটি মৌলিক অধিকার থাকায় তাঁরা ততটা দীনহীন অসহায় জীবনযাপন করেন না। পিতৃগৃহে স্থান আছে—পতিগৃহে না থাকলে আবার পরিত্যক্তা হলে ইচ্ছা থাকলে আবার নতুন জীবন আরম্ভ করতেও পারেন।

এখন পুরানো কথায় ফেরা যাক। এই হিন্দু কোড বিল পাকা হলে মেয়েরা যে অধিকার পেতেন—সেই অধিকার হারাবার জন্যে পুরুষের এত ভয়। অবশ্য আমাদের মতে সত্য সত্য পুরুষমানুষদের এই অধিকারগুলিতে বঞ্চিত হবার ভয়ে 'গেল রাজ্য গেল মান' বলে হৈ চৈ করতে লজ্জাই হবার কথা।

যাই হোক, 'মানুষের দশ দশা' বলে একটা কথা আছে। হিন্দু কোড বিলটিরও 'দশ দশা'র ভাগ্য যদি ধরে নিই তা হলে তার মাত্র তিনটি দশা এখন পর্য্যন্ত হয়েছে। প্রথমে দেশমুখ বিল, তার পর রাও বিল, এখন হিন্দু কোড বিল। সে হিসাবে আমরা তার আর বাকি সাত দশার স্বপ্ন দেখতে পারি। খণ্ডিত রূপে ম্যারেজ বিলও কি সেই দশ দশার এক দশা?

অতএব, আপাততঃ এখন 'কত কাল পরে বদি ভারত রে' স্বাধীন হ'ল—'দীপমালা নগরে নগরে পরে'—মেয়েরা 'যে তিমিরে সে তিমিরে'ই থাকুন। ধনিক বণিক ভীতচকিত পণ্ডিতজী, মাননীয় সস্ত্রীক রাষ্ট্রপতিজী ও রক্ষণশীল দলেরই জয়জয়কার হোক।

ঝিনুক ও শঙ্খ

(সাগরকূলে গোপালপুর)

শ্রীজীবনময় রায়

ঝিনুক

শিশু-সূর্যের পাল

উদয় উষার কোলে ভোরের বেলা,
আকাশে চলেছে যবে আবীর খেলা,
আঁধারের কোলে কোলে সাগরতীরে
রাঙিয়া উঠিছে ঢেউ আকাশ ঘিরে।
দিকে দিকে বালুচরে দেখি যে চেয়ে,
তারা ফুটে আছে যেন আকাশ ছেয়ে।
রাঙা রাঙা কাঁকড়ায় ভ'রে আছে চর
লক্ষ হাজার ছোট গর্ত্তের পর :
কট্‌কটে সাদা চোখ টকটকে গায়,
সূর্য্যের ছটা হানে রাঙা রাঙা পায়,
উদয়-রবির পানে চায় আছে চেয়ে ;
অরুণ বরণ হ'ল আলোকেতে নেয়ে।
গুটি গুটি সাগরের গহন ঠেলে,
ওঠে রাঙারবি, ছটা-কিরণ মেলে।
বিপুল কাঁকড়া যেন আকাশ 'পরে
বুলায় সোহাগ-কর সাগর চরে।
খুশীতে ফুলায়ে বুক লক্ষ মুখে—
শুষিছে কিরণ-সুধা-প্রসাদ সুখে—
রাঙা রাঙা ফুলে শিশু-সূর্য্যের পাল,
পান করি রাঙা আলো হয়েছে মাতাল।

বাঁশী

রেলের বাঁশীটা আচম্‌কা দিল পিলে চম্‌কানো ডাক,
যমদূতটার গলা যেন ঠিক পাঁচ শত চেরা বাঁশ ;
সে বরং ভাল—জাহাজের সেই পেত্নী-তাড়ান হাঁক—
ঢেউয়ের উপরে কুয়াশা নয়, ও রাক্ষুসে রাজহাঁস।

ঢেউয়ের সোহাগ

ঝিঁঝিঁ ঝিম্‌ধরা নিঝুম দুপুর রাত—
বিনা মেঘে এ কি ? হঠাৎ বজ্রপাত ?
না-না—সাগরের ঢেউ জোয়ারের মুখে—
বিপুল সোহাগে ঝাপটি পড়িছে তৃষিতা বেলার বুকে।

ঝিনুকের কদর

নুলিয়ানী বুড়ি কাঁকালেতে ঝুড়ি ঝিনুক কুড়িয়ে ফেরে,
শামুক শঙ্খ ঝিনুকের রাশ জমা করে এক ঢেরে।
ঝুড়ি-ভরা কত রং-বেরঙের কত না ঢঙেতে গড়...
খোকাখুকী দেখে চোখ করে ছানাবড়া।—
"ও দাদা ! দেখ্‌ না।" "দে না গো মা দুটো !
খোকা ছুটে গিয়ে ধরে তার ঝুড়ি ;
খ্যাক খ্যাক করে বুড়ি ওঠে তেড়ে
"পয়সাটি দে"—পকেটটা ঝেড়ে
মুখভার করে বলে খোকা, "বুড়ি, পয়সা যে নেই।"
মনের দুঃখ চাপ্‌ল মনেই।
খুকী ত বোঝে না, খুকী বলে "ওগো দেব পুতুলের বিয়ে
গয়না গড়াব ; কি হবে তোমার ঝুড়ি ঝুড়ি এত নিয়ে !"
বুড়ি বলে "যা যা, পুড়িয়ে করব চুণ।"
শুনে ছল্‌ ছল্‌ খোকার দু'চোখ, খুকী কেঁদে হয় খুন।

কাঁকড়ার কদর

উদাম দুলিয়া ছেলে—পিছনে কুকুর—ঘুরে ফিরে,
সাগরের তীরে বালুচরে ;
পুচ্‌কে পুচ্‌কে জালে কত যে গর্ত্ত ফেলে ঘিরে,
ফাঁদ পাতে কাঁকড়ার ঘরে।
কাঁকড়াও প্রাণ নিয়ে বালি খুঁড়ে সেঁদোয় বিবরে—
চলে যেন লুকোচুরি খেলা ;
বালি খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁড়ে, ঝুলির ভিতরে জমা করে ;
এমনি চলেছে সারা বেলা।
জালের ঝুলির পেটে কাঁকড়ার ঝাঁক ওঠে কেঁপে—
কী খুসীতে দেখছে ছেলেটা।
কাকেরা উড়ছে লোভে—কুকুরটা তেড়ে যায় ক্ষেপে—
কী ফ্যাসাদে পড়েছে জেলেটা !
উঁচু পাড়িটায় বসে স্যামুয়েল করছে বিচার—
(কাঁকড়ার নামে—মুখে জল ;)
ঘেউ ঘেউ ডাকে কেলো—চায় না সে আর ভাগীদার—
যত হাড়হাভাতের দল !
ছোঁড়াটা কি বেয়াড়া হে ! কাঁকড়া সে বেচবে না ! খাবে !
স্যামুয়েল কত যে বোঝায় !
মানুষগুলো কি ছোঁচা ! ঘেন্নায় কুকুরটা ভাবে।
কাঁকড়ার প্রাণ যায় যায়।
মনিব, কুকুর, কাক, সাহেব করিছে হানাহানি,
কাঁকড়ার বেড়ে ওঠে দর—
জীবন সকল তত প্রাণ নিয়ে যত টানাটানি,
তবু বুঝল না খোকা কাঁকড়ায় আপন কদর।

শঙ্খ

কাব্য-লক্ষ্মী

তুমি আর আমি এ বিজন রাতে
সাগর তীরে,
চলেছি ধীরে।
রাঙা পায়ে তব ভেঙে পড়ে ঢেউ,
কী পরশ রসে জানে কি তা কেউ!
ও চরণ চুমি সৈকত ভূমি
মরিছে কি রে!
দক্ষিণা বায় কৌতুকে ধায়
নাচিয়া ফিরে
তনুটি ঘিরে।
আঁধারে আঁধারে দোলে পারাবারে
আলোক-মালা
বিজলী-জ্বালা।
অঙ্গে অঙ্গে নাচে তারি ছায়া,
নব যৌবন বিছুরিছে মায়া;
গিরি বনভূমি উঠিছে কুসুমি'
ভরিছে ডালা;
গগন সোহাগে দেয় অনুরাগে
অর্ঘ্য থালা—
দীপালি জ্বালা।
সকল ভুবন জাগে অনুরাগে
তোমারি তরে,
সোহাগ ভরে।
আকাশ বাতাস সাগর ধরণী,
ঘুচায়ে দিয়েছে মায়া-আবরণী;
তোমার দেহের দেহলী দুয়ারে
লুটায়ে পড়ে
না মানে বারণ দেয় আভরণ
অঙ্গ ভরে,
যতন করে।

শুনি দিকে দিকে বন্দনা স্তব
বিশ্বব্যাপী—
নীরবগ্রাহী।
দেখি চেয়ে চেয়ে আরতি তোমার,
তারায় তারায় চলে অনিবার;
এ রাজসভায় মোর গান হায়
কেমনে গাহি।
সঙ্কোচে লাজে সুর নাহি বাজে—
কণ্ঠ বাহি;
করি নিবেদন হৃদয় বেদন—
চিত্ত-দাহী—
বচন নাহি।

শ্রাবণ পূর্ণিমায়—ব্যাক ওয়াটার লেক

ধীর গম্ভীর নীরব তন্বী কালো সে কিশোরী মেয়ে,
স্বচ্ছ সলিলে সজল কাজল আঁখি;
এ মোর দু'চোখ, রূপের ভিখারী, দেখেনি তো ফিরে চেয়ে
সাগরের রূপে মুগ্ধ নয়ন পাখী।
নীল অম্বরে সরমে আবরি' দেহ
সঙ্কোচে ত্রাসে সরে থাকে পাশে, হেলা করে পাছে কেহ।
নিত্য তাহারি পথে আসি যাই সাগরের টানে ধেয়ে;
সজল নয়নে শুধু চেয়ে থাকে অভিমানী কালো মেয়ে।
সহসা একদা কোথা হতে নামে ক্ষ্যাপা শ্রাবণের ঢল,
উছলি উঠিল কানায় কানায় যৌবন ছলোছল;
শান্ত সায়র টলোমলো করে ঢলোঢল রূপে ছেয়ে—
কল কল হাসে জাগে উল্লাসে তন্বী কিশোরী মেয়ে।
নয়ন ফিরানো নাহি যায়,
নীরদ বরণ নবীন রূপের গরিমায়।
ঘেরিয়া শোভন গিরি ঝাউ বন—শিহরে সজল গগনে,
কূলে কূলে ছাপি মৃদু কল ভাষে, ডাকে মোরে ডাকে সঘনে
আজি শ্রাবণের ভরা-পূর্ণিমা-চন্দন লেপি অঙ্গে
কালো মেয়ে তোর এ কী রূপ খরসান!
আপনা পাশরি ঝাঁপ দিয়া পড়ি ডুবিব অতলে রঙ্গে
রূপের সায়রে লভি বাঞ্ছিত অবসান।

সঞ্চয়ী

সাগরের তীরে তীরে পাগল কুড়ায়ে ফিরে
রঙীন ঝিনুক;
গুন্ গুন্ গান গায় চলে গুটি গুটি পায়
হয়ে অধোমুখ।
ছোট বড় নানা রং কত না বিচিত্র ঢং
কত শত রূপ;
কুড়ায়ে কুড়ায়ে তার কামনা মিটে না আর
জমে ওঠে স্তূপ।
অবিরাম কল কলে সাগর উছলি চলে
ওঠে পড়ে ঢেউ,
দুরন্ত প্রাণের আশা অশান্ত বুকের ভাষা
বোঝে না ত কেউ।

পাগল আপন মনে কুড়াইছে অকারণে
ঝিনুকের ঝাঁক ;
বোবা হয়ে ওঠে জেগে পশেনাক' কানে তার
সাগরের ডাক ।
দিন আসে দিন যায় পাগল নাহিক চায়
কোনো দিকে ফিরে ;
জমে ওঠে স্তূপাকার নিত্য সঞ্চয়ের ভার
সিক্ত বালুতীরে ।
শ্যামল ধরণী 'পরে নামে ঋতু স্তরে স্তরে
প্রাণের হিল্লোল,
আনন্দে আলোকে গানে ওঠে দশ দিক পানে
উৎসবের রোল ।
কত নব নব আশা প্রাণভরা ভালবাসা
জীবনের গান,
আনন্দের অশ্রুনীর স্নেহমুগ্ধা ধরণীর
প্রাণের আহ্বান ।
এ আহ্বান কেবা শোনে ! পাগল আপন মনে
করিছে সঞ্চয় ।
শুধু মনে জাগে ভয় পাছে হয় অপচয়,
পাছে হয় ক্ষয় ।
জানে নাকি হবে তার এই সঞ্চয়ের ভার
তবু অনুরাগী—
কুড়াইছে একমনে ; সঞ্চয়িছে নিরজনে
নিত্য কার লাগি !

গগনে গরজে মেঘ বেড়ে ওঠে বায়ুবেগ—
চমকে বিদ্যুৎ
হানিছে তরঙ্গফণা ফেনিল জহর কণা—
মরণের দূত ।
উচ্ছলি তরঙ্গ-ভার ডাকে তারে বার বার
মৃত্যুনীল নীর ;
তবু সে পাতে না কান শুনিবারে সে আহ্বান
অমোঘ—গভীর ।
শ্যামা ধরণীর 'পরে তুলিতেছে থরে থরে
প্রাণের পসরা,
তরঙ্গে তরঙ্গে তার বহিছে অমৃতধার—
স্নেহসুধা ভরা ।
উচ্ছ সিত গন্ধভারে ধরণী পাঠায় তারে
প্রাণের আহ্বান—
পাগল ফিরিয়া খুঁজি' স্তূপাকার করে পুঁজি,
নাহি দেয় কান ।

একদিন দেখি শেষে সাগরের কূলে এসে
ঝিনুকের স্তূপ—
জড়ায়ে দু'বাহু ডোরে পাগল রয়েছে পড়ে
নিশ্চল, নিশ্চুপ ।
সাগরের ঢেউ তারে লেহিতেছে বারে বারে
টানিছে অকূলে
উতলা পূরবী বায় কৌতুকে খেলিয়া যায়
আলুথালু চুলে ।

জাগর-রাতি

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

বাসনা আমার লয় হয়ে গেল তোমার আলিঙ্গনে,
সুপ্তিমগন মুগ্ধ চেতন, অধর আলিম্পনে ;
বাহিরে বিশ্ব রয়েছে দাঁড়ায়ে—নীরব নিশার প্রায়,
মগ্ন পরাণে প্রেমের দেউলে জাগি মোরা দু'জনায় ।

নিথর আকাশ কান পেতে আছে মিলন বাসরদ্বারে,
দীপ নিভে গেছে মধু-নিশ্বাসে নীরবে প্রদীপাধারে ;
কাঁপিছে রজনী, কাঁপিছে সজনী, কাঁপিছে হিয়ার তার,
দেহতন্ত্রীর লহরী তুলিয়া ওঠে সুর-ঝঙ্কার ।

দেহের মিলনে, প্রাণের মিলনে হয়ে গিয়ে একাকার,
ফুটায়ে তুলিল রূপ-মঞ্জরী মঞ্জুল সুষমার ;
ফুটায়ে তুলিল সিন্ধু-কিনারে শুকতারকার বাতি,
সার্থক করে এপারে ওপারে মোদের জাগর-রাতি ।

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

১৪

কর্তৃপক্ষের আদেশে দেবানন্দ হোটেল ছাড়িয়া চাঁপাতলা আপিসে আসিয়া উঠিল। চাঁপাতলা আপিসে জিনিসপত্র রাখিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেবানন্দ ডায়মণ্ড হারবারের দিকে রওনা হইল, উদ্দেশ্য বিপ্লববাদ সম্বন্ধে দেশের লোকের মনোভাবের পরিচয় লওয়া, অর্থ-সংগ্রহ ও লোকসংগ্রহ। দেবানন্দের প্রথম প্রব্রজ্যার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাহার ডায়েরীতে লিখিত বিবরণ হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করা হইতেছে :

সমাজের মধ্যে নিজের নির্দিষ্ট ও পরিচিত পরিবেষ্টন ছেড়ে বাইরে এসে দেখতে পাচ্ছি দেশের সাধারণ লোক দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কত উদাসীন। নানা রকম লোকের সঙ্গে আলাপ করছি। কেউ ভাবে আমি জুয়াচোর, কেউ ভাবে কোন মামলার পলাতক আসামী, আবার কেউ ভাবে আমি বাড়ী থেকে ঝগড়া করে পালিয়েছি। দুই-একজন ভাবে আমি তুকতাক জানা সন্ন্যাসী। কেউ হাত দেখতে বলে, কেউ অম্বলের ঔষধ চায়। সেদিন লক্ষ্মীকান্তপুরের পথে এক বুড়ো চাষীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। নিজের নানা দুঃখের কথা বলল সে। আমি জিজ্ঞেস করলাম,—তোমার এই দুর্দশার কারণ কি জান? সে বলল—খুব জানি ঠাকুরমশাই। জমিদার আমাদের যত কষ্টের গোড়া। আমি বললাম—এটা তোমার ভুল। সব দোষ সরকারের। এই সরকার কে জান? একটা বিদেশী জাত সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে এসে আমাদের শুষে খাচ্ছে। বুড়ো চাষী বড় বড় ঘোলাটে চোখ তুলে আমার দিকে চাইল। বলল—আপুনি কি কইলেন ঠাকুর বোঝলাম না। আমার সঙ্গে আর কোন কথা না বলে সে পা চালিয়ে চলে গেল। বোধ হয়, সে আমাকে কোন মতলববাজ লোক বা পাগল বলে ভাবল।

সন্ধ্যার আগে জয়নগরে পৌঁছে একটা থাকবার জায়গার সন্ধান করছি, পাঁচ-ছয় জন যুবক এসে আমাকে ঘিরে ধরল রাস্তায়। একজন এগিয়ে এসে বলল,—ওহে সন্ন্যাসী বাবা, চণ্ডী থেকে দু'চারটে শ্লোক মুখস্থ বলতে পারবে? গাঁজা চাও গাঁজা দেব, বিলেতী মাল চাও তাও দেব। তোমাকে প্লে করতে হবে প্রতাপাদিত্য নাটকে। সংস্কৃত পার্টটা নিয়েছিল, কিন্তু জ্বর করে বসেছে, আর লোক পাচ্ছি না।

আমাকে টেনে নিয়ে চলল তারা। আমি ঝোলা থেকে একখান "সোনার বাংলা" বের করে একজনের হাতে দিয়ে বললাম—আপনারা একজন চেঁচিয়ে এইটে পড়ুন। পড়া শেষ হলে আপনাদের কার কি মত শুনে আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।

যার হাতে ওটা দিয়েছিলাম সে চেঁচিয়ে কয়েক ছত্র পড়ে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাইল। সঙ্গীদের সে বলল—ওটাকে ছেড়ে দে।

আমাকে বলল—সন্ন্যাসীঠাকুর, খসে পড়ো ত বাবা।

আমি হেসে বললাম—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করব বলে এসেছি। আপনারা প্রতাপাদিত্য নাটক করছেন আর আমার দুটো ভাল কথা শুনবেন না।

একজন মন্তব্য করিল—স্বদেশী যাত্রা, স্বদেশী বোয়েসীর কথা শুনেছি, এ যে দেখছি স্বদেশী সন্ন্যাসী।

অন্য একজন বলল—আমরা বাবা গিল্যাণ্ডার, এনড্রু ইয়ুল, রেলী ব্রাদার্সের চাকুরি করে খাই। একবার স্বদেশী করে বাঁকশুদ্ধ চাকুরি যাবার যোগাড় হয়েছিল, আবার স্বদেশী? তুমি পথ দেখ ত ঠাকুর!

আমাকে পথ দেখতে হ'ল না, তারাই পথ দেখল। দলের মধ্যে যেটি ছোট সে বলল—হরেন দা, ও কাগজটা দাও ওঁকে ফিরিয়ে দি।

হরেন কাগজখানা মাটিতে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলল। ছেলেটি সেটা কুড়িয়ে নিজের পকেটে রাখল, দলের কেউ লক্ষ্য করল না। আমার কাছে এসে সে বলল,—ঐ বটগাছতলায় আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি ফিরে এসে আপনাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব।

সে দলের সঙ্গে চলে গেল।

সত্যি ছেলেটি ফিরে এল। তার নাম সোমেন। সে রাত্রে তাদের বাড়ীতে আশ্রয় পেলাম। তার বাবার সঙ্গে আলাপ হ'ল। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক, কলিকাতায় কোন কলেজে প্রোফেসারি করেন। ভদ্রলোক প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করলেন—আপনার সন্ন্যাসীর বেশ, পরিচয় জিজ্ঞাসা করব না, কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে দিলেন কেন? আপনার ত এখন পড়াশুনা করবার বয়স, সেটাও একটা তপস্যা।

আমি—এ তপস্যা আমরা পুরুষানুক্রমে করে আসছি। এ তপস্যায় দেশের কি লাভ হয়েছে?

তিনি—লাভ কিছু হয় নি কি? দেশে শিক্ষার প্রসার হয়েছে বলে স্বদেশী আন্দোলন করছি আমরা। গবর্ণমেণ্টের কাছে অধিকার দাবি করছি, হোমরুলের কথা বলছি স্বরাজের কথা বলছি, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে আমরা সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্বের কথা বলতে শিখেছি, রুশিয়ার নিহিলিস্টদের আন্দোলনের কথা পড়ে গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাবার কথা ভাবছি। ইটালীয়ানদের স্বাধীনতা আন্দোলন, আইরিশদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা পড়ে প্রেরণা পাচ্ছি। সেদিন একজন ভদ্রলোককে বেলজিয়ামের

স্বাধীনতা লাভে আনন্দ প্রকাশ করতে শুনলাম। দেশে শিক্ষার প্রসার না হলে এটা কি সম্ভব হ'ত?

আমি—আপনার কথা মানছি; কিন্তু কি পেয়েছি আমরা?

তিনি—কিছু পেয়েছি বই কি? আরও পাব। আমেরিকা ফিলিপিনোদের সেল্ফ গবর্ণমেণ্ট দিলে সেদিন। আমরাও সেল্ফ-গবর্ণমেণ্ট পাব।

আমি—আমরা কিছুই পাব না। ইংরেজ কাউকে নিজে থেকে একফোঁটা অধিকার দিয়েছে কোন দিন? আপনি আমেরিকার কথা বললেন। আমেরিকানরা ইংরেজের জ্ঞাতভাই। যতক্ষণ না তারা লড়াই করে নিজেদের দাবি আদায় করে নিল ততক্ষণ ইংরেজ তাদের কিছু দিয়েছিল?

তিনি—আপনারাও লড়াই করে আদায় করবেন না কি? চোখ রাঙানিতে ভয় পাবার ছেলে ইংরেজ নয়। সুরেন ব্যানার্জি ও বিপিন পালের বক্তৃতায় ভয় পেয়ে ইংরেজ কিছু দেবে না।

আমি—আমিও সেই কথাই বলছি। কাঁদাকাটি করলেও দেবে না, গরম গরম বক্তৃতা করলেও দেবে না। তবে দেবে আর কিসে?

তিনি—সেই পরামর্শ দিয়েছেন জাপানের প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট ওকুমা। বলেছেন কনষ্টিটুশানাল এজিটেশন কর।

আমি—কাউণ্ট ওকুমা ইংরেজের ওকালতি করে আমাদের বিনি খরচার উপদেশ দিয়েছেন।

তিনি—আপনার কথা ত খুব ডেয়ারিং, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি করতে পারেন?

আমি—আমেরিকা যা করেছিল, ইটালীয়ানরা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যা করেছিল আমরাই বা তা করতে পারব না কেন।

ভদ্রলোক জোরে হেসে উঠলেন। বললেন—আনআর্মড, টিমিড বেঙ্গালীজ টু থিঙ্ক অব আর্মড রিবেলিয়ন! (নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালী সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা ভাবে!)

আমি গম্ভীরভাবে বললাম—নয় কেন? আপনার মত শিক্ষিত, জ্ঞানী লোক এর মধ্যে অসম্ভব দেখলেন কি।

তিনি—আপনি ছেলেমানুষ, কি করে বোঝাই বলুন? প্রথমতঃ আর্মড রিবেলিয়ন বা আর্মড রেজিষ্টান্স ইজ রেপাগনাণ্ট টু দি ইণ্ডিয়ান স্পিরিট (সশস্ত্র বিপ্লব বা সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা ভারতবর্ষের প্রাচীন চিন্তা ও ভাবধারার বিরোধী)। একথা আমি বলছি না, আমাদের দেশের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা যাঁরা লীডরস অব থট তাঁরাই বলেছেন ও বলছেন। ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবাদের দেশ, তাই দেখুন সুদীর্ঘকাল পরাধীন থেকেও শি হ্যাজ নট লষ্ট হার সোল (ভারতবর্ষের আত্মা গ্লানিমুক্ত থাকতে পেরেছে), জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড ঠিক আছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণ করা ইণ্ডিয়ার ট্রাডিশন (ভারতের ঐতিহ্য) নয়। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ আজ পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শক্তিশালী জাত। আমাদের মত নিরস্ত্র জাতির পক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে আর্মড রিবেলিয়নের কল্পনা করাই পাগলামি। অন্য কথা ছেড়ে দিলেও অস্ত্রশস্ত্র পাবেন কোথায়?

আমি—অস্ত্রশস্ত্রের অভাব তা হলে আপনার মতে আর্মড রিবেলিয়নের বিপক্ষে বড় যুক্তি?

ভদ্রলোক কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ পরে বললেন—আপনি কে? কি বলতে চান।

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম—আই এম দি রিবেলিয়াস স্পিরিট অব ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ (আমি পরাধীন ভারতের বিদ্রোহী আত্মা)। বলতে চাই আপনারা এগিয়ে আসুন। নিজে না পারেন টাকা পয়সা দিয়ে লোক দিয়ে তাদের সাহায্য করুন যারা মায়ের শৃঙ্খল যে-কোন উপায়ে ভেঙ্গে ফেলে দেবার ব্রত নিয়ে কাজে নেমেছে।

ভদ্রলোক হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দু'হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, এ রকম লোক কি আছে এদেশে? তারা কাজে নেমেছে? তুমি সত্যি বলছ?—দেখলাম নিজের অজ্ঞাতসারে ভদ্রলোকের ধার-করা আধ্যাত্মিকতার যুক্তি উড়ে গেছে। তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। আমি বললাম, আপনি বসুন।

তিনি একটু লজ্জিতভাবে বসলেন। আমার চোখে পড়ল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে যে ছেলেটি আমাকে এ বাড়ীতে এনেছিল, সে ও একটি মেয়ে আমাদের আলাপ শুনছে। ছেলেটি এগিয়ে এসে তক্তপোশের এক পাশে বসল। আমি বললাম, আপনি যে রকম লোকের কথা বললেন, সে রকম লোক এদেশে আছে। নিজেদের সামান্য সম্বল নিয়ে তারা কাজ করছে। টাকা ও লোক দরকার তাদের।

তিনি—দুঃসাহসিক চিন্তা ও দুঃসাহসিক কাজ করবার লোক তা হলে আমাদের মধ্যে আছে। কাজ আরম্ভ করা শক্ত কথা। আরম্ভ হলে,

> **Freedom's battle once begun**
> **Bequeath'd by bleeding sire to son**
> **Though baffled oft is over won.**

হাঁ, টাকা ও লোকের কথা বলছিলেন না? লোক আর কোথায় পাব আমি? আমি দরিদ্র ছা-পোষা মানুষ, দেখতেই ত পাচ্ছেন! বাট আই স্যাল কণ্ট্রিবিউট মাই মাইট (আমার সামান্য শক্তিমত দেব)। আজ রাত হয়েছে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করুন। কাল সকালে যাবেন।

এই কৃতকার্য্যতায় মনে একটু আত্মপ্রসাদের ভাব এল। সেটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলাম। বোধ হয় ভদ্রলোকের মেয়ে, সোমেনের বোন পরিবেশন করছিল। কয়েক বার মেয়েটি উৎসুক ভাবে আমার দিকে চাইল লক্ষ্য করলাম। বোধ হয়, কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইছিল।

পরদিন সকালে উঠে বিদায় নিলাম। ভদ্রলোক পঁচিশটি টাকা আমার হাতে দিলেন। বললেন, কোথায় টাকা পাঠাতে হবে ঠিকানা দেন। আমি সাধ্যমত মাঝে মাঝে কিছু পাঠাব। আমি চাঁপাতলা কেন্দ্রের ঠিকানায় মনি-অর্ডার লিখে তাঁর হাতে টাকাটা

ফিরিয়ে দিলাম। বললাম, আপনি পাঠিয়ে দেবেন। আমি আরও অনেক জায়গায় যাব, টাকা সঙ্গে রাখতে চাই নে।

সোমেনের খবর জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, সে খুব সকালের গাড়ীতে মগরাহাট গিয়েছে, সেখানে চাকুরি করে।

মগরাহাট পৌঁছে ষ্টেশনের গায়ে বড় বড় টিনের গুদাম-ঘর দেখে আশ্চর্য্য হলাম। অসংখ্য গরু, মহিষের গাড়ী বোঝাই চাল আসছে আর ওজন হয়ে গুদামে বোঝাই হচ্ছে। ঘুরে ফিরে দেখলাম বোম্বে কোম্পানীর গুদাম, রেলী ব্রাদার্সের গুদাম, স্মোভার স্মিডের গুদাম, সোয়ালীর গুদাম রয়েছে। রেলীব্রাদার্সের গুদাম বিরাট আয়তনের। সোয়ালীর গুদাম বাঙালীর। কোম্পানীগুলির নীচের দিকের কর্ম্মচারীরা বাঙালী। তারা চাল কিনছে বেপারীর কাছে। এই চাল বস্তাবন্দী ও ওয়াগন ভর্ত্তি হয়ে রেলে চলে যাচ্ছে বাইরে রপ্তানির জন্য। বাংলায় আকাল লেগেছে। যশোর ও ফরিদপুরে লোক না খেতে পেয়ে মরছে। নদীয়ায় চালের মণ ৬৸০ উঠেছে। লোকে এক বেলা খাচ্ছে। বিহারে আকাল লেগেছে। গবর্ণমেন্ট পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছে সাহায্যের জন্য। বাংলার গবর্ণমেণ্ট রিলিফ ওয়ার্ক সুরু করেছে কয়েকটা জেলায়। এদিকে বিলিতী ব্যবসায়ীরা লাখ লাখ মণ চাল বিদেশে পাচার করছে। গবর্ণমেণ্ট দেশের অবস্থা দেখেও এই রপ্তানি বন্ধ করে নাই। এক মগরাহাট থেকে বছরে ২০ লক্ষ মণ ধান-চাল রপ্তানি হয় বিদেশে। কলকাতায় বঙ্গবাসীর বরদা বোস অন্নরক্ষিণী সভা ডেকেছেন, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা তার সভাপতি। অন্নরক্ষিণী সভায় বক্তৃতার ছড়াছড়ি হচ্ছে আর শত শত ওয়াগন বোঝাই অন্ন সকলের চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে বিদেশে। হায় রে দেশ?

ঘুরতে ঘুরতে নজরে পড়ল স্মোভার স্মিড কোম্পানীর গুদামের পাশে একটা তেঁতুলগাছের নীচে চেয়ার টেবিল পেতে জয়নগরের সেই ছেলেটি খাতায় হিসাব লিখছে, তাকে ঘিরে বহু লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আমি মনে মনে একটু হাসলাম। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ধান-চাল লোপাট করে দেশে আকাল এনেছে, আর ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রিলিফ ওয়ার্ক খুলেছে। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরছে, আবার সেই দেশের লোক নিজেদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে সাহায্য করছে ইংরেজ ব্যবসায়ীকে। কাগজে হা-হুতাশ করে দু'চার ছত্র লিখছে মাঝে মাঝে, এ পর্য্যন্ত। কি চমৎকার বন্দোবস্ত ইংরেজের আর কি নির্ব্বোধ লয়াল গোলাম আমরা! ভাবলাম ছেলেটিকে ডেকে দু' একটা কথা বলি, কিন্তু আমার কথা শোনবার অবকাশ কই তার?

অনেক জায়গা ঘুরে বেড়ালাম কিন্তু জয়নগরের মত সাড়া পেলাম না কোথাও। এবার চুঁচুড়া, চন্দননগর হয়ে সাঁওতাল পরগণায় যেতে হবে।

বিশ্রাম করবার জন্য যখন শ্রীরামপুর ষ্টেশনের প্লাটফর্মের একটা বেঞ্চে বসে ছিলাম তখনকার একটা ঘটনার কথা মনে আছে। ঘটনা বিশেষ কিছু নয়, আমার পাশে উপবিষ্ট তিনটি ভদ্রলোকের মধ্যে আলাপ হচ্ছিল তার খানিকটা কানে এল।

প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, ফিনান্স মেম্বার এডামসন আমাদের দাবির উত্তরে বলে দিয়েছে—Self-Government is an absurd plea and is thoroughly impractical (স্বায়ত্ত শাসনের দাবি বাজে ও অসম্ভব দাবি)। কথাটা মন্দ বলে নাই। আমাদের আবার সেল্‌ফ-গবর্ণমেণ্ট! দলাদলি, খেয়োখেয়ি লেগেই রয়েছে। আগে নিজেরা যোগ্য হ'—দু'পাতা ইংরেজী পড়েই দাবি করছে সেল্‌ফ-গবর্ণমেণ্ট চাই, স্বরাজ চাই। যত সব ইয়ে—

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিবাদের সুরে বললেন, তাদের চোখে যোগ্য আমরা কোন দিন হতে পারব মনে কর? এই দেখ ঈষ্ট বেঙ্গলে কি কাণ্ড তারা বাধিয়ে দিয়েছে। মারামারি বাধিয়ে দিয়ে বলছে, তোমরা অযোগ্য, আমরা চলে গেলে তোমরা যে মারামারি করেই শেষ হবে।

প্রথম ব্যক্তি—ঈষ্ট বেঙ্গল আসামের সঙ্গে গেছে ভালই হয়েছে। ওটা বাংলার গ্যাংগ্রিনাস লিম্ব (ক্ষতদুষ্ট অঙ্গ) এম্পুটেট (কেটে বাদ দিয়ে) করে ভাল করেছে। নইলে পশ্চিম বাংলাতেও ঐ গ্যাংগ্রিন হ'ত।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা স্বদেশী করে, দোতরফা মার খাচ্ছে আর তুমি ভাবছ আমরা ত বেঁচে গেছি। সে দিন একজন বললেন, সম্বলপুরের একখানা উড়িয়া কাগজ পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের গালাগালি করেছে আর মুসলমানদের উপর দরদে গলে গিয়েছে। তোমারও দেখছি প্রায় সেই অবস্থা। তা বহরমপুর কন্‌ফারেন্সে দীপনারায়ণ সিংহকে সভাপতি কর আর যাই কর, বিহারীরা তোমাদের সঙ্গে হাত মেলাবে না। পশ্চিম বাংলা থেকে আলাদা হবার জন্য তারা আন্দোলন করছে। উড়িশা উইল ফলো (উড়িষ্যা তার অনুসরণ করবে)। ইউ আর নট লাইক্‌ড্ বাই এনিবডি (তোমাদের কেউ পছন্দ করে না)।

প্রথম ব্যক্তি একটু চটে গেলেন। বললেন, পছন্দ না করল ত বয়ে গেছে। যত সব ইয়ে—

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। একখানা ডাউন গাড়ী আসছে। আমি দ্বিতীয় ব্যক্তির কোলের উপর একখানা "সোনার বাংলা" ফেলে দিয়ে প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকলাম।

দু'দিন পরে দুপুরবেলা চন্দননগরে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর এক বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। বাড়ীর মালিক খালি গায়ে রকের উপর এক মোড়ায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। উজ্জ্বল রং, খাড়া নাক, দীর্ঘ দাড়ি, কপালে, বাহুতে চন্দনের ছাপ। মুখের ভাব প্রশান্ত ও গম্ভীর। আলাপ করবার জন্য কাছে গিয়ে বললাম, আজকের কাগজ কি? একটু দেখতে পারি?

খবরের কাগজ পড়তে চায়—এই রকম সন্ন্যাসীর দিকে তিনি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন। তারপর গৈরিক বসনকে সম্মান দেখিয়ে মোড়া ছেড়ে দিয়ে বললেন, বসুন। কাগজখানা আমার হাতে দিলেন।

আমি বললাম, আপনি বসুন। আপনি বয়োবৃদ্ধ। আমি মাটিতে বসছি।

তিনি আপত্তি করলেন, আপনি সন্ন্যাসী, গৃহস্থের সম্মানের পাত্র, আপনি বসুন।

তারপর ভদ্রলোক আমাকে জেরা করতে লাগলেন। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী—না অন্যনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন। এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস নেবার কারণ জানতে চাইলেন।

আমি দেশসেবক সন্ন্যাসী শুনে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমি একখানা "সোনার বাংলা" পুস্তিকা তাঁকে দিলাম। তিনি সেখানা পড়তে লাগলেন।

পড়া শেষ করে বললেন—আমি জানি চন্দননগরেও আপনাদের দলের কয়েক জন আছেন। দু'একজনের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে—ইংরেজ দেশের রাজা। রাজা নরদেহে সাক্ষাৎ ভগবান। রাজদ্রোহ কি ধর্মসঙ্গত না শাস্ত্রসঙ্গত? রাজদ্রোহ মহাপাপ। ভগবানের বিধানে আমাদের মঙ্গলের জন্য অত্যাচারী, বিধর্মী মুসলমানের হাত থেকে দেশের শাসনভার ইংরেজের হাতে গিয়েছে। ইংরেজ রাজধর্মচ্যুত হলে ভগবান স্বয়ং তার প্রতিবিধান করবেন। আপনারা অহংজ্ঞানে মত্ত হয়ে তাঁর বিধান লঙ্ঘন করতে গেলে দেশের অমঙ্গল হবে। আমি গৃহস্থ, আপনি সন্ন্যাসী, আপনাকে উপদেশ দিতে চাই না, কিন্তু আমাদের ধর্ম ও শাস্ত্রে যা বলে সেই কথা আপনাকে বলছি।

ভদ্রলোকের এই বক্তৃতা শোনবার পর আমি বুঝলাম এখানে কিছু সুবিধে হবে না। বললাম—আপনি জ্ঞানী লোক, যা বললেন চিন্তা করে দেখব। আচ্ছা, নমস্কার।

ভদ্রলোক হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন—বসুন, বসুন। আপনি সন্ন্যাসী, দুপুরে গৃহস্থের বাড়ী এসেছেন। দুটি অন্ন গ্রহণ না করে আপনি যেতে পাবেন না।

আমি উঠছিলাম, ফের বসলাম। ভদ্রলোক বহুক্ষণ আমাদের ধর্ম, শাস্ত্র, সমাজ, বেদবেদান্ত, ষড়্দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে বলে গেলেন। তারপর স্নানাহারের ব্যবস্থা হ'ল। আহার সেরে ভদ্রলোককে নমস্কার করে বিদায় নিয়ে গঙ্গার ঘাটে চলে এলাম। মনে মনে ভাবছিলাম ভদ্রলোক শাস্ত্রের দোহাই দিলেন, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার ট্রাডিশনের দোহাই দিলেন। বোধ হয়, ইংরেজী শিক্ষায় তেমন অগ্রসর নন, অগ্রসর হলে নিশ্চয় আধ্যাত্মিকতার বুক্তি উঠাতেন।

ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে গঙ্গার বাঁধানো ঘাটে এসে বসলাম। বিকেল হয়ে এল। কত রকমের লোক বেড়াতে এল গঙ্গার ঘাটে। দৃষ্টি রাখছি আলাপ করবার মত কোন লোক দেখতে পাই কি না।

ক্রমে সূর্য্যাস্ত হ'ল। ঘাট ছেড়ে রাস্তায় নেমে, ঘুরতে ঘুরতে গোন্দলপাড়ার পথ ধরলাম। নজরে পড়ল সাহেবী পোশাক-পরা সাড়ে ছয় ফুটের মত চেহারার এক দেশী সাহেব টলতে টলতে চলেছেন আমার আগে আগে আর ইংরেজীতে মাঝে মাঝে কি বুকনি দিচ্ছেন। আমার কেমন যেন মনে হ'ল ভদ্রলোক নকল মাতাল। দেখলাম রাস্তায় এক ফরাসী পুলিস তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে তিনি পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে ছুঁড়ে দিলেন রাস্তায়।

একটু তফাৎ থেকে আমি ভদ্রলোককে অনুসরণ করলাম। তাঁর চলবার ভঙ্গী বেশ স্বাভাবিক হয়েছে দেখতে। অন্ধকার হয়ে এল। চলতে চলতে পুকুরের পাশে একটা দোতলা বাড়ীর ফটকে এসে ফটক বন্ধ দেখে তিনি দোরে হাঁক দিলেন। একটু বাদে লণ্ঠন হাতে একজন লোক বাতী হাতে বেড়িয়ে এসে ফটকের তালা খুলে দিল। লণ্ঠনের আলোতে লোকটির মুখ দেখতে পেয়ে ডাকলাম—জ্ঞান-দা।

আমার ভুল হয়নি। হাতিবাগান কেন্দ্রের জ্ঞান-দা বটে। আমার গলা শুনে সেই ভদ্রলোকটি আমার দিকে ফিরে বললেন—আরে, কোথাকার একটা নেংটি ইঁদুর সঙ্গ নিয়েছে দেখি।

আমাকে বললেন—কৌন হ্যায় তু বাত্তা জলদি। আমি তাঁর পাশ দিয়ে ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। জ্ঞান-দাকে পেয়ে—আমার খুব আনন্দ হ'ল।

জ্ঞান-দা ফটকে আবার তালা দিলেন, আমরা সকলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম।

পরদিন চন্দননগরে থেকে কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ হ'ল, চন্দননগর, মেদিনীপুর প্রভৃতি কয়েকটা জায়গা সম্বন্ধে কিছু খবর পেলাম।

প্রথমেই রাস্তার সেই নকল মাতাল লোকটির কথা বলতে হয়। আমি কথায় কথায় আবিষ্কার করলাম বরিশালের অতুল এক চিঠিতে যে জিতুদার কথা লিখেছিল ইনি সেই জিতু-দা, কোন বিলিতী কোম্পানীর ট্রাভেলিং সেলস্ম্যান।

জিতু-দা এখানে এসেছেন মালমসলা সংগ্রহের জন্য কিছু কিছু এর মধ্যে যোগাড় করেছেন শুনলাম। দ্বিতীয় দিন দেখা হ'ল একজন ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি ডুপ্লে কলেজের গণিত অধ্যাপক সেন মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র। শুনলাম এফ-এ পাস করে কিছুদিন ই-আই-আরে চাকরি করেছিল। এখন বি-এ পড়ছে। রোগা, অত্যন্ত সাধারণ চেহারা, চোখে পুরু চশমা, কথাবার্তা কম বলে। কোন কারণে উত্তেজিত হলে তার সব চেহারাটা বদলে যায় দেখলাম। আমি রওনা হবার দিন মেদিনীপুর কেন্দ্রের একটি ছেলে এল। সে ক্ষুদিরাম নামে একটি ছেলের কথা বলল। এক মেলায় "সোনার বাংলা" বিলি করতে গিয়ে সে ধরা পড়েছিল

পুলিসের হাতে। অনেক দিন তাকে হাজতে রেখে পুলিস ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দেবার সময় পুলিস নাকি বলেছে,—"রুই কাতলার সন্ধান নেবার জন্য এই পুঁটি মাছকে ছাড়ছি।"

চন্দননগরে আর একটা ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তার নাম বলাই। বলাই ইতিহাস পড়েছে তার গুরু অধ্যাপক রায় মশায়ের কাছে। আইরিশ আন্দোলন ও নিহিলিষ্ট আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর খুব ভাল পড়া আছে দেখলাম। আর একটা জিনিস তার মধ্যে দেখে ভাল লাগল, সেটা হ'ল ধ্যানধারণার ওপর অনাসক্তি। চেহারা তার রোগাপানা হলে কি হয়, বক্সিং ও স্যুটিংএ হাত খুব ভাল।

বলাই হাসতে হাসতে একটা গল্প বলল। ঘটনাটা দেখে তখনকার লোকের মনের ভাব কি রকম দাঁড়িয়েছে বোঝা যায়।

চন্দননগরের হাটখোলায় একটা বড় স্বদেশী সভা করা হবে স্থির হ'ল। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতি, হাজার হাজার লোক সভায় উপস্থিত, চন্দননগরের মেয়র মঁসিয়ে তার দিভিয়েল বন্দুক কাঁধে জন পঁচিশেক মাদ্রাজী সেপাহী নিয়ে এসে হুকুম করলেন—সভা বন্ধ কর। ছেলেদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। কাছে একটা খালি বাড়ীতে সভা বসল। সভায় স্থির হ'ল মেয়রকে আক্রমণ করা হবে। শ'খানেক ছেলে লাঠি, বন্দুক, বল্লম, খাঁড়া কুড়ুল নিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হ'ল। বলাই হাসতে হাসতে বলল লড়াই বেধে যায় আর কি। অনেক কষ্টে তাদের থামিয়ে বাড়ী পাঠানো হ'ল। অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল মঁসিয়ে তার দিভিয়েলকে শায়েস্তা করবার ব্যবস্থা করা হবে।

এই পর্য্যন্ত বলে হাসি থামিয়ে বলাই গম্ভীর ভাবে বলল,—শায়েস্তা আরও অনেককে করতে হবে। তার দিভিয়েল, এনড্রু ফ্রেজার, কিংসফোর্ড—

তার দু'চোখ জলে উঠল। একটু পরে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল তার মুখে। বলাইয়ের কথা আমি ভুলব না। কথা বলে বুঝলাম এগোবার পথ তার কাছেও অস্পষ্ট, কিন্তু তার বিশ্বাসের জোর!

জিতু-দা চলে গেলেন। বড় একটা চামড়ার স্যুটকেস কুলির মাথায় চাপিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠে বসলেন। পুলিস যদি জানত ঐ স্যুটকেসে কি সব মাল আছে।

জিতু-দার কথা বলবার একটা নিজস্ব ধরণ আছে। অনেক কথা বলেন তাঁহার স্বরচিত অভিধানের শব্দসম্পদ ব্যবহার করে। লোকে শুনে ভাবে লোকটা কি রসিক। গাড়ী ছেড়ে দেবার সময় আমাকে বললেন, শোন নেংটি ইন্দুর, একটা ছড়া শোন—

অবসব গিরিলুপ্ত বসে নাক টেপো পুত
নাক টিপলে দুধ ভাত নইলে খাবে বুটের গুঁতো।

ছড়া বলে নিজেই খানিকটা হাসলে।

গাড়ী ছেড়ে দিল। জিতু-দা জানালা দিয়ে গলা বের করে রুমাল নাড়তে লাগলেন।

চন্দননগর ছেড়ে যাবার দিন গায়ে একটা র‍্যাপার জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলাই এল ষ্টেশনে। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি খুব জ্বর। বলাই হেসে বলল, দেখ দেখি জ্বরের আক্কেল। ভেবেছিলুম তোমার সঙ্গে গাড়ীতে উঠে একটু ঘুরে আসব। মনের কথা জানতে পেরে বেটা বাগড়া দিলে।

১৫

দেশের প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলা হইতেছে।

বাংলার দুই বৎসরের স্বদেশী আন্দোলন, সরকার পক্ষের অত্যাচার-উৎপীড়নের কাহিনী। বন্দেমাতরম, নিউ ইণ্ডিয়া, যুগান্তর ও সন্ধ্যার নূতন জাতীয়তার বাণী প্রচার এবং মহারাষ্ট্রের এক্‌ষ্ট্রিমিষ্ট আন্দোলন অন্য প্রদেশগুলিতে কোন চাঞ্চল্য আনিতে পারে নাই এ পর্য্যন্ত। বাঙালী ও মারাঠি চরমপন্থী নেতাদের চেষ্টায় ফিরোজ শা মেটা প্রভৃতি মডারেট ধুরন্ধরগণের মুষ্টিধৃত কংগ্রেসের মতের পরিবর্ত্তন হইল না।

বাংলায় তখনকার মডারেট দলের মধ্যেও তিন শ্রেণীর রাজনৈতিক মত দেখা যাইত। এক শ্রেণীর মডারেট দলের কাগজ ছিল হিন্দু পেট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি। এই দল বলিতে লাগিল, ইংরেজ আমাদের ব্যবহারে রাগ করিয়া এদেশ হইতে চলিয়া গেলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। সুতরাং বয়কট চালাইয়া তাহাকে চটাইও না, বয়কট ইজ সিলি ও রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে একেবারে অচল। হে দেশবাসী, তোমরা কথায় ও কাজে মডারেশন অভ্যাস কর। দ্বিতীয় শ্রেণীর মডারেটরা বলিতে লাগিলেন ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ মনে রাখিও না। ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে আজ আমরা পথে ঘাটে হাটে ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডীর নাম শুনিতে পাই, দেশবাসীর মনে নূতন ভাব জাগিয়াছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করা কি পাগলামি নহে? ইহাদের কেহ কেহ আবার যুক্তির রকমফের করিয়া বলিতে লাগিলেন: পাশ্চাত্য রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও জলবায়ুর উপযোগী নহে, ও পথ ছাড়িয়া দাও। তৃতীয় শ্রেণীর মতকে বলা হইত মর্লেইজম, স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারের যুগের নেতারা এই মত অনুসরণ করিতেন। বন্দেমাতরম পার্টির এক্‌স্‌ট্রিমিষ্টরা ইহাদের আবেদন-নিবেদন পন্থা ও একান্ত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা বিদ্রূপ করিয়া ইহাদের বলিতেন—ব্লিটিং লিডারস, গ্রীক কোরাস। এক্‌স্‌ট্রিমিষ্ট আন্দোলনের বন্যা রোধ করিবার জন্য ইহাদের চেষ্টাকে ঝাঁটা হাতে মিসিস পার্টিংটনের আটলাণ্টিক মহাসাগরের জলোচ্ছ্বাস রোধ করিবার প্রয়াসের সঙ্গে তুলনা করিতেন।

"মর্লে মিয়ান দলের উৎপত্তির কথা বলা হইতেছে। জন মর্লে ইণ্ডিয়া আপিসের ভার লইবার পরে কিছুদিন যাইতে বিলাতী কাগজ ও এদেশের ইংরেজ পরিচালিত কাগজগুলির সুরের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কংগ্রেস এক্‌স্‌ট্রিমিষ্টদের হাতে না গিয়া পড়ে এজন্য মডারেট দলকে সমর্থন করা আবশ্যক মনে হইল। এই প্রয়োজনবোধ হইতে জন্ম নিল "র‍্যালি দি মডারেটস" নীতি। এক্‌স্‌ট্রিমিষ্টদের

ভাবভঙ্গীর উপর দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হইল। মাঝে মাঝে এই এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিতে লাগিল—বাংলায় "সোশিয়ালিষ্টিক সোসাইটি" গড়া হইতেছে। উপদেশ দিল, জাপান গবর্ণমেণ্ট যেমন শক্ত হাতে এই সব সোসাইটি দখল করিয়াছে তোমরাও তাহাই কর। এদিকে বয়কট আন্দোলন ব্যর্থ করিবার জন্য ইংরেজ বণিকেরা ভারতবর্ষের কলকারখানা খুলিবার প্রস্তাব করিল।

একষ্ট্রিমিষ্ট মতের লোকেরা একদিকে কংগ্রেস দখল করিবার আশায় আপনাদের শক্তিবৃদ্ধি করিবার দিকে মন দিলেন প্রকাশ্য ভাবে গুপ্ত সংগঠনে সাহায্য করিয়া। 'সন্ধ্যা' ঘোষণা করিল—"স্বরাজ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে চারিটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—স্বদেশী, বয়কট, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও শক্তির প্রয়োগ।" যুগান্তর বলিল, "দেশবাসীর মন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিতে সংবাদপত্র গান, সাহিত্য, যাত্রা ও থিয়েটারের সাহায্যে বিপ্লবের বাণী প্রচার করিতে হইবে। সকলের উপরে প্রয়োজন গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গঠনের।"

বাংলা মহারাষ্ট্র বাদে অন্য প্রদেশগুলি এ পর্য্যন্ত রাজভক্তির আদর্শস্থল হইয়াছিল। রাজভক্ত প্রদেশগুলির মধ্যে প্রথমে গোল-যোগের সূত্রপাত হইল পঞ্জাবে, লাহোরের সংবাদপত্র "পাঞ্জাবী"কে লইয়া। একটি প্রবন্ধে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করিবার অভিযোগে সম্পাদক ও মুদ্রাকরের জেল হইল। পুলিস তাঁহাদের উপর যে পীড়ন করিয়াছিল তাহার বিবরণ প্রকাশ হইয়া পড়ায় পঞ্জাবে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। এই বিক্ষোভের সংবাদে দুই বৎসর একক আন্দোলন চালাইবার পরে আর একটি প্রদেশকে দোসর পাওয়া গেল ভাবিয়া বাংলার একষ্ট্রিমিষ্ট দল উল্লসিত হইল। ব্রহ্মবান্ধব সন্ধ্যায় লিখিলেন—"সুদূর কলিকাতায় বসিয়া, লাহোরের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া ঊর্দ্ধে ভগবানের কাছে যুক্তপাণি হইয়া আমরা প্রার্থনা করি দেশের সকল সেবক, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, আর্য্য, মাদ্রাজী, মারাঠী, যিনি হউন, পাঞ্জাবীর সম্পাদকের মত তাঁহার অভিষেক যেন সম্পন্ন হয়। তাঁহার উপর পীড়ন নয়, দেবতার আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্যের মত যেন আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি।"

পঞ্জাবে স্যার চার্লস রিভাজের প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন এবং ক্যানেল অঞ্চলে সরকারী খাস জমি পত্তনের পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন নূতন অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। জাঠরা ইহার ফলে উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং তাহাদের মধ্যে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। বিহারের চম্পারণ জেলার জাওতোলিয়া গ্রামে অত্যাচারী নীলকর ব্লুমফিল্ডকে হত্যা করিবার সন্দেহে পুলিস ও ফ্যাক্টরির সাহেবেরা মিলিয়া সমস্ত গ্রাম চষিয়া ফেলিল। দোষী-নির্দ্দোষ নির্বিচারে সকল প্রজার উপর উৎপীড়নের সংবাদ প্রকাশিত হইল। এই উৎপীড়নের সংবাদ পাটনার এক বাঙালী-পরিচালিত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার জন্য বিহারী কাগজ সহযোগীর উপর রুষ্ট হইয়া উৎপীড়িত চাষীদের উপদেশ দিল কুলোকের পরামর্শে ছোট লাট, বড়লাটের কাছে দরখাস্ত না পাঠাইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরবার কর। বিপিনচন্দ্র পাল তখন মাদ্রাজে; স্বদেশী, বয়কট ও স্বরাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন। রাজমুহেন্দ্রীতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট কলেজের ছেলেরা ধর্ম্মঘট করিল। তাঁহার বক্তৃতার ফলে মাদ্রাজের শহরে ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হইল।

এই ভাবে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের পরে পঞ্জাব ও মাদ্রাজে একস্‌ট্রিমিষ্ট মতের প্রসার হইল।

ক্রমশঃ

আর এক জীবন

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

অনেক স্বপ্নের নীল কামনায় উচ্ছ্বসিত রঙীন পালক
উড়ে উড়ে ফিরেছিল এ মনের প্রান্ত ছুঁয়ে স্বর্ণ-সীমানায়,
মনে হ'ত কি ফেনিল যৌবনের সুধাপানে বুনো হাঁস-বক
সন্ধ্যায় সুস্নিগ্ধ ক্ষণে চলে' যেত ক্লান্ত চোখে বিশ্রান্ত ডানায়:
কতো মুগ্ধ রজনীর চাঁদ-জাগা নৈঃশব্দ্যের নির্জ্জন প্রহরে
দিগন্তে সবুজ বনরেখা হতে হাতছানি দিয়ে কে ডেকেছে—
'এখানে অঢেল শান্তি সুখ, শুধু মিছে পড়ে থেক নাক' ঘরে'
বিহ্বল মুহূর্ত্তে জানি অনেক তারকা-মেয়ে সলাজ হেসেছে!

আকাশে আকাশে ঘুরে কল্পনার জাল বুনে কেটে গেছে দিন
কি এক কুহক যেন! মনে হ'ত এ-কুহকে জীবন বিলীন!
এখানে মাটির বুকে কান্না জমে; থর থর কান্নার আবেগ
বাথার ফসল বুকে প্রাণপণ আঁকড়ে থাকা বিবর্ণ শঙ্কার
কখন দস্যুরা আসে, ভেঙে পড়ে বজ্র নিয়ে দুর্যোগের মেঘ;
এখানে গুমোট কান্না জীবনের জায়মান ক্ষতের জ্বালায়!
আরেক জীবন তবু: স্পর্শে গন্ধে অনুভবে হাসিতে অশ্রুতে
মিশে আছে একাকার এ আমার শোণিতের অণুতে অণুতে!

মুক্তি-সাধনার পথে অন্ধ্রদেশ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

১

বহু দিনের সাধনায়, বহু দেশপ্রেমিকের ত্যাগ, তিতিক্ষা, দুঃখবরণ ও আত্মোৎসর্গের দরুন আমাদের মাতৃভূমি স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের দান কতখানি সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এমন কি বাংলার জাতীয়তার ভাবধারা একদা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের মনে কতটা ভাবোন্মাদনা এবং কর্ম্মপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল তৎসম্বন্ধেও বহু তথ্য আজও অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে সকল মুক্তিসাধক জাতীয়তার পাদপীঠে সমিধ সংগ্রহ করে গেছেন তন্মধ্যে কত জনের কীর্ত্তিকথা যে আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে অবলুপ্ত তার আর অন্ত নেই।
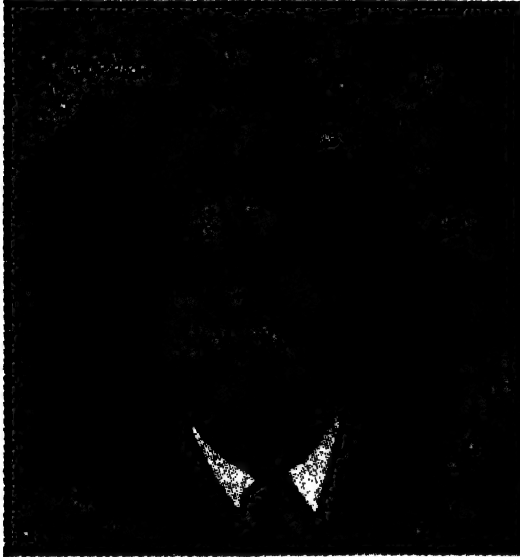
পি. আনন্দ চার্লু

ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের কতকগুলি অজ্ঞাত অধ্যায় আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয় অন্ধ্রদেশের কব্বুরের বীরমন্দির নামক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে। অন্ধ্রদেশের যে সকল সুসন্তান মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁদের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয় অন্ধ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকনায়ক 'দেশভক্ত' ভেঙ্কটাপ্পাইয়া কর্ত্তৃক ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল তারিখে। এই স্মৃতিমন্দিরে প্রবেশ করলে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাচীরগাত্রে বিলম্বিত অন্ধ্রদেশের দেশপ্রেমিক বীর সন্তানদের অনেকগুলি তৈলচিত্র। স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত দেশভক্ত কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া পান্তুলু, চিরল সত্যাগ্রহের নেতা অন্ধ্ররত্ন গোপাল কৃষ্ণাইয়া, গুদেম এজেন্সির সশস্ত্র বিদ্রোহের অধিনায়ক সীতারাম রাজু (আল্লুড়ি শ্রীরামরাজা) প্রভৃতির ছবি দর্শককে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে অন্ধ্রদেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বীরমন্দিরের কর্ম্মীরা শুধু দেশের বীর সন্তানদের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করেই তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, অন্ধ্রদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করে তাঁরা তাঁদের মাতৃভূমির দুই শত মুক্তিসাধকের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করেছেন—তেলিঙ্গানার শহীদদের সম্বন্ধেও বহু অপ্রকাশিত তথ্য আহরণ করতে তাঁরা সমর্থ হয়েছেন। বীরমন্দিরে সযত্নে সংরক্ষিত এই সমস্ত উপকরণের সাহায্যে এক বিরাট গ্রন্থ-রচনার পরিকল্পনাও কর্ত্তৃপক্ষের আছে।

মুক্তি-আন্দোলনের স্রোত অন্ধ্রদেশের বুকের উপর দিয়ে বারংবার, বিচিত্র ভাবে আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। জাতীয়তার প্রবল ভাববন্যায় যখনই এই সমুদ্রমেখলা, শৈলকিরীটিনী ভূমি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে তখনই দেশহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এক এক জন শক্তিধর পুরুষ এই বাঁধভাঙা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে পরম মুক্তিতীর্থের অভিমুখে পরিচালিত করেছেন—বহু সাধকের ত্যাগ, তপস্যা ও আত্মদান অন্ধ্রদেশকে পরিণত করেছে মুক্তিসাধনার পাদপীঠে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সমস্ত মুক্তিসাধকের জীবন ও কর্ম্মের নিরিখে আমরা অন্ধ্র-দেশের মুক্তি-আন্দোলনের ধারাটি অনুসরণ করবার চেষ্টা করব।*

কংগ্রেসের আদিযুগ—আনন্দ চার্লু: যে কয়জন মুক্তি-সাধকের অক্লান্ত চেষ্টায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভিত্তি গোড়ার দিকে দৃঢ়তর হয়েছিল, আনন্দ চার্লু তাঁদের অন্যতম। মাদ্রাজ তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র হলেও তিনি ছিলেন অন্ধ্রদেশের লোক, জাতিতে তেলুগু। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তিনি যোগ দেন। সেই প্রথম অধিবেশনেই উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শাহ মেটা, দাদাভাই নৌরোজী প্রভৃতির মত আনন্দ চার্লুও তাঁর বক্তৃতায় ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যে নূতন আদর্শ ভিতরে ভিতরে শক্তিসঞ্চয় করছিল তার ইঙ্গিত প্রদান করেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দ চার্লু নাগপুর কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে।

---

* এই প্রবন্ধের বহু উপকরণ বীরমন্দিরে সঞ্চিত কাগজপত্র থেকে সংগৃহীত। কব্বুর সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ শ্রী কে. ভি. এস. আপ্পারাও তেলুগু ভাষায় লিপিবদ্ধ এই সমস্ত তথ্য ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আনন্দ চালু ছিলেন তেজস্বী পুরুষসিংহ, তাঁর অন্তরে দেশ-প্রেমের হোমশিখা ছিল আমৃত্যু অনির্বাণ। তাঁর অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে এক অপূর্ব অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করত। প্রায় দু'দশক ধরে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-স্বরূপ। যদিও তাঁর অনুগামী কেউ ছিল না, বা তিনি কোন নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তকও নন, তথাপি তিনি খ্যাতির শীর্ষদেশে আরোহণ করেছিলেন—বাগ্মী হিসাবেও তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল অসাধারণ।

এন. সুব্বারাও পান্তুলু: আনন্দ চালুর মত ন্যায়পতি সুব্বারাও পান্তুলুও কংগ্রেসের জন্মকাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কংগ্রেসের চতুর্থ (এলাহাবাদ, ১৮৮৮) অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর থেকেই তিনি লবণ আইন, বিচার এবং শাসন বিভাগ, ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয়দের প্রবেশ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন, অনুমোদন এবং সমর্থনাদি দ্বারা কংগ্রেসে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করতে সমর্থ হন। 'ইম্পীরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে'র সভ্যরূপে তিনি একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিয়োগের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সুব্বারাও পান্তুলু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে বৃত হন।* স্যর উইলিয়াম হাণ্টারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বলেন, কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসনের ও ইংরেজী শিক্ষার ফল। তখনও যে শাসক-দল সকল কার্য্যে ষড়যন্ত্র দেখিতেছিলেন, তিনি তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করেন।

"১৯১৪,১৫,১৬,১৭ এই চারি বৎসর তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু মিসেস বেসান্ত যখন সি পি রামস্বামী আয়ারকে প্রকৃত 'ওয়ার্কিং সেক্রেটারী' রূপে গ্রহণ করেন সুব্বারাও তখন (১৯১৭) ধন্যবাদের সঙ্গে সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেন।"

অন্ধ্রদেশের শিক্ষিত মহলে সুব্বারাওয়ের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। ইনি অন্ধ্রদেশের ভীষ্ম বলে পরিচিত ছিলেন।†

অন্ধ্রের জাতীয়জীবনে বাংলার স্বদেশী ভাবধারার প্রভাব: অন্ধ্রদেশে নেতাজীসুভাষচন্দ্রের প্রভাব যে কি গভীর তা তাঁর কংগ্রেস-সভাপতি-নির্বাচন ব্যাপারেই পরিস্ফুট হয়েছিল। অন্ধ্র দেশের জনমনে আজও সে প্রভাব রয়েছে অক্ষুন্ন। বাংলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক আদর্শ ও ভাবধারার প্রতি অন্ধ্রবাসীদের এই যে অনুরাগ তা আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয়—এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘকালের একটা ঐতিহ্য। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলায় যে নব জাতীয়তার উদ্বোধন হয় তা একদা অন্ধ্রদেশে অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এন. সুব্বারাও পান্তুলু

১৯০৩-৪ সালে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর সাপ্তাহিক নিউ ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তার ভাবধারা এবং জাতীয় শিক্ষা ইত্যাদির যে অভিনব ব্যাখ্যা করেন তা অন্ধ্র দেশে ক্ষেত্র তৈরি করে রাখে, এবং ১৯০৭ সালের গ্রীষ্মকালে বিপিনচন্দ্রের অন্ধ্রদেশ ভ্রমণ সেখানে জাতীয়তার নব ভাবধারা ও আদর্শপ্রচারের দিক দিয়ে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বিপিনচন্দ্র রাজমহেন্দ্রীতে (রাজামহেন্দ্রবরম্) গেলে পর উক্ত

---

* কংগ্রেস—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পৃ, ৭৮

† ১৩৪৩ সনে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অন্ধ্র দেশে যান। সেই সময় রাজমহেন্দ্রীর যে সভায় তিনি বক্তৃতা করেন তার সভাপতি হয়েছিলেন সুব্বারাও পান্তুলু। তখন তাঁর বয়স আশী বৎসর। ১৩৪৩, আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে 'অন্ধ্র দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ' নামক প্রবন্ধে রামানন্দবাবু প্রসঙ্গক্রমে এই বর্ষীয়ান দেশসেবকের কথা বলেছেন।

শহরের অধিবাসীরা সেখানে একটি জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে কৃতসঙ্কল্প হয়। গবর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজের ছাত্রেরা তাঁকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করার অপরাধে (?) কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়—বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত এই সকল ছাত্রেরাই শেষ

দেশভক্ত কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া পান্তলু
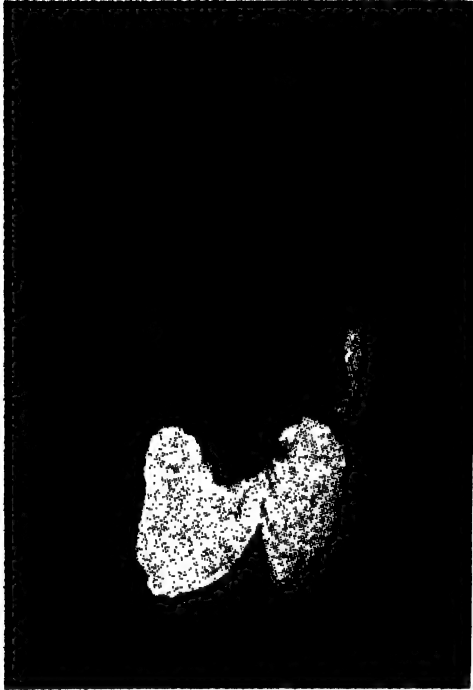
পর্য্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় জাতীয় সংগ্রামের সৈনিক। ১৯০৭ সালে বিপিনচন্দ্র কর্ত্তৃক মসলিপট্টমে (মছলিপট্টনম) উপ্ত জাতীয় শিক্ষার বীজ অচিরে অঙ্কুরিত হয়ে উঠে। সেই উদ্ভিন্ন অঙ্কুর ১৯১৭ এবং ১৯২১-এর জাতীয় আন্দোলনের সলিলসিঞ্চনে এবং সার-প্রয়োগের ফলে পরিণত হয় বিরাট মহীরুহে এবং সরকারী বিরাগের প্রচণ্ড উত্তাপ ও বিশীর্ণকারী বাত্যার মধ্যেও ফলে পুষ্পে সুশোভিত হয়ে আজও সেই বৃক্ষ সগর্ব্বে দণ্ডায়মান।*

১৯০৭ সনে স্বদেশী-বয়কট এবং জাতীয় শিক্ষার অভিনব স্লোগানে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত হয়ে উঠল মুখরিত। বাংলা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং পঞ্জাবের এখানে-ওখানে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল জাতীয় বিদ্যালয়, কোথাও কোথাও বা গড়ে উঠল এক একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—এমনিভাবে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন প্রসারলাভ করল দূরদূরান্তরে।

১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখে বাঙালী বীর-বালক ক্ষুদিরামের ফাঁসি এবং তার কিছুকাল পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুগান্তর-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জেল হ'ল। দেশের জন্য বাঙালীর কৃচ্ছ্র সাধন এবং আত্মদানের কাহিনী সুদূর অন্ধ্রদেশে প্রচারিত হয়ে সেখানকার অনেক দেশপ্রেমিককে দীক্ষিত করল অগ্নি-মন্ত্রে। রাজদ্রোহের জন্য প্রদত্ত সরকারী শাস্তি লোকের মনে ভীতি উদ্রেক করতে আর সক্ষম হ'ল না। দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হতে লাগল রাজদ্রোহের বাণী। "বন্দেমাতরম্"-এ রাজদ্রোহ-প্রচারের অভিযোগে অরবিন্দ অভিযুক্ত হলে, তাঁর পক্ষসমর্থন করে প্রবন্ধ লেখার অপরাধে ১৯০৮ সনের ১৩ই জুলাই মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তার করা হ'ল এবং ঠিক উক্ত দিবসেই অন্ধ্রদেশে হরিসর্ব্বোত্তম রাও ও অপর দুই ব্যক্তিকে অরবিন্দের পক্ষসমর্থনের অপরাধেই গ্রেপ্তার করা হ'ল। তিলক সবসুদ্ধ সাড়ে ছয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। অন্ধ্রের হরিসর্ব্বোত্তম রাওকে প্রথমে নয় মাসের জন্য শাস্তিপ্রদান করা সাব্যস্ত হ'ল। কিন্তু সরকার তাঁর অপরাধের পুনর্বিচার করা স্থির করলেন এবং হাইকোর্ট মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে তিন বৎসরের দণ্ডাদেশ প্রদান করলেন।

৩

অন্ধ্রের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন—কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া পান্তলু: অন্ধ্রপ্রদেশ মাদ্রাজের অন্তর্গত। কিন্তু মাদ্রাজীদের ভাষা তামিল আর অন্ধ্রদের ভাষা তেলুগু—তামিল এবং তেলুগু সংস্কৃতির মধ্যেও বিরাট পার্থক্য রয়ে গেছে। অন্ধ্রকে মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত করে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের খেয়ালমাফিক প্রদেশগঠন তেলুগুদের জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে যে কতদূর পরিপন্থী সে সম্বন্ধে অন্ধ্রবাসীদের সর্ব্বপ্রথম যাঁরা সচেতন করে তোলেন, দেশভক্ত কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া পান্তলু তাঁদের অন্যতম। ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্রপ্রদেশের পুনর্গঠন আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত তিনি।

১৮৬৬ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী গুণ্টুরে ভেঙ্কটাপ্পাইয়া পান্তলুর জন্ম হয়। ম্যাট্রিক পাস করবার পর তিনি মাদ্রাজের একটি কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হন এবং বি-এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমে তিনি আইন-ব্যবসায় সুরু করেন মসলিপট্টমে। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ থেকেই জনকল্যাণমূলক কর্ম্মের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগের সৃষ্টি হয়। তিনি কৃষ্ণা ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন এবং এই সংস্থার মুখপত্র "কৃষ্ণা" পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই পত্রিকাখানি অন্ধ্রবাসীদের কতভাবে যে সেবা করেছে তা বলে শেষ করা যায় না। মসলি-পট্টমে কয়েক বৎসর আইন ব্যবসায় এবং বিবিধ জনহিতকর কর্ম্মে লিপ্ত থাকবার পর পান্তলু গুণ্টুরে চলে আসেন এবং গুণ্টুরকেই তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র বলে বরণ করে নেন। তামিল ভাষা এবং সংস্কৃতি-

"The seed of National education sown by Pal in the year 1907 at Muslipatam (Muchhlipatnam) sprouted forthwith was since watered and manured by the National movements of 1917 and 1921 and has grown into a tree and remains there to this day, bearing flower and fruit, such as we can expect under the withering winds and the scorching heat of State displeasure."

History of the Indian National Congress by B. Pattabhi Sitaramayya—p. 69.

পেছনে তেলুগুদের জাতীয় সত্তা কি ভাবে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে তিনি ১৯১১ সনে অপর কয়েক জনের সহযোগিতায় অন্ধ্রের স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠা-আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করেন। ভেঙ্কটাপ্লাইয়া এবং তাঁর সহকর্মীদের উদ্যোগে ১৯১৩ সনে বেপাতলায় প্রথম অন্ধ্র কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। তেলুগুদের জন্মগত অধিকার অর্জ্জনের জন্য পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবার উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালে দেশভক্ত বিপুল লাভজনক আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করেন। এমনি ভাবে গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত বয়কট আন্দোলনের পূর্ব্বেই ব্রিটিশের আদালত বর্জ্জন করে তিনি দেশবাসীর সমক্ষে ত্যাগের এক জলন্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠনের দাবি ১৯১৫ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রথম উত্থাপিত হয়।* কিন্তু তখন কংগ্রেস এর উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন নি। ১৯১৬ সালে অন্ধ্র মহাসভার ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির জেনারেল সেক্রেটারীরূপে দেশভক্ত পৃথক্ অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশের দাবি করে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। ১৯১৭ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহিত যথোচিতভাবে আলোচনান্তে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই প্রস্তাবের মূলনীতি গ্রহণ করেন এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তেলুগুভাষী জেলাসমূহ নিয়ে স্বতন্ত্র কংগ্রেস প্রদেশ গঠিত হোক্ এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯১৭ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে বিষয়টি নিয়ে তুমুল বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এমন কি স্বয়ং গান্ধীজী পর্যন্ত এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি মুলতুবি রাখা উচিত। কিন্তু প্রকৃত প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্বের পক্ষে ভাষাভিত্তিক প্রদেশগঠন যে অপরিহার্য্য, অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতাবলে লোকমান্য তিলক তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। কলিকাতা কংগ্রেসের (১৯১৭) সভাপতিত্ব করেন মিসেস বেসাণ্ট। তিনি এবং জনকয়েক নেতৃস্থানীয় দক্ষিণী তামিল প্রতিনিধি তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। প্রস্তাবটি নিয়ে দু'ঘণ্টারও অধিককাল বাদপ্রতিবাদের তুমুল ঝড় বয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু রাত্রি সোয়া দশটার সময় ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ফলে ১৯১৮ সালে স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হ'ল—দেশভক্ত হলেন এর প্রথম সেক্রেটারী এবং ১৯২০ সালে তিনিই অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। ঐ বৎসরেই নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র পরিবর্ত্তিত হওয়ায় যে নূতন কর্ম্মতালিকা প্রণয়ন করা হয়, কংগ্রেস-প্রদেশগুলিকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা হ'ল তার অন্তর্ভুক্ত। নয় বৎসর পূর্ব্বে অন্ধ্রের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেশভক্ত দেখেছিলেন, বহু আলাপ-আলোচনা ও আন্দোলনের ফলে এবার তার আংশিক সাফল্যের সূচনা দেখা দিল।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের বিপুল ভাববন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষ যখন পরিপ্লাবিত হয়ে গেল, দেশভক্ত তখন বিপুল উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্ম্মসমুদ্রে। গুণ্টুর জেলার পেডানাণ্ডিপেড়ুতে করবন্ধ আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে তিনি যে কর্ম্মক্ষমতা ও সংগঠনশক্তির পরিচয় দেন তা মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে এবং তার পর থেকেই মহাত্মাজী অন্ধ্রের এই লোকনায়ককে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতে সুরু করেন।

১৯২৩ সালে অন্ধ্রদেশের কোকনদাতে মৌলানা মহম্মদ আলির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে (৩৮তম) অধিবেশন হয় তাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন দেশভক্ত কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া পান্তলু। তাঁর অভিভাষণের গোড়ার দিকে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অবিবেচনাপ্রসূত নীতির ফলে ভিন্নভাষাভাষী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অন্ধ্রবাসীদের ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে যে কতদূর পরিপন্থী হয়েছে তা উল্লেখ করেন, এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কিভাবে অন্ধ্রবাসীদের রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধনপূর্ব্বক তাদের অন্ধ্র-আন্দোলন তথা ভারতের প্রদেশসমূহকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্বণ্টন আন্দোলন প্রবর্ত্তনে প্রণোদিত করে, জোরালো যুক্তিতর্ক সহকারে তিনি বিশদভাবে সেকথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

"After this part of the country came under the British the individuality of the Andhras became obscured by being indiscriminately mixed up with communities speaking other languages by a Government unmindful of the progress of the people under its rule. But during the days of agitation against the partition of Bengal, the consciousness of the Andhras was roused under the influence of the great national movement and they endeavoured to reassert their individuality by starting the "Andhra movement." They advocated the redistribution of provinces in India on linguistic basis as essential for the development the races living in different provinces and also for the solidarity of the Indian Nation."*

দেশভক্তকে প্রতিকূল রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে বহু শক্তিক্ষয় করতে হয়েছে, সংগ্রামের আহ্বান যখনই এসে পৌঁছেছে তখনই তিনি সাড়া দিয়েছেন। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে এক বার এবং ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে আর এক বার তিনি কারাবরণ করেন। তাঁর আসল অনুরাগ কিন্তু ছিল জাতিগঠনমূলক কর্ম্মের প্রতি এবং জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য গঠনমূলক কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

---

* "which travelled on to the Congress of 1915"—*History of the Indian National Congress*, p. 147.

* *Report of the 38th Indian National Congress, Cocanada*, 1923, p. 10.

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই রিপোর্ট ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

করতেন। কোকনদা কংগ্রেসের ভাষণেও তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের চেষ্টা, খদ্দরপ্রচার, অস্পৃশ্যতাবিদূরণ, সমগ্র ভারতের জন্ম সাধারণ ভাষা প্রচার ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন।

অন্ধ্রের আদিবাসীদের শোচনীয় অবস্থা এই দরদী দেশসেবকের মনকে গভীরভাবে বিচলিত করে তুলেছিল। তাদের উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকেও তিনি জীবনের অন্যতম ব্রত বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। ঠক্কর বাপা প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় আদিম-জাতি সেবক সঙ্ঘে'র সহিত সংশ্লিষ্ট 'অন্ধ্ররাষ্ট্র আদিমজাতি সেবক-সঙ্ঘে'র তিনি ছিলেন সভাপতি : অন্ধ্রের এজেন্সী অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে অন্ধ্র শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য-সভার কর্ম্মীদের গঠনমূলক কার্য্যের কথা শুনে তিনি উক্ত সংস্থার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং ১৯৪২ সালে শ্রীমণেশ্বর শর্ম্মা সহ মন্থুগোলার দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সেখানকার দুর্গত আদিবাসীদের ভগ্ন হৃদয়ে নবীন আশার সঞ্চার করেন। আদিবাসীদের প্রতি এই জরাজীর্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য সপ্ততিপর বৃদ্ধের অপরিসীম দরদ ও প্রীতির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্যসভার কর্ম্মীরা নবপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। এই বৎসরেই বীর-মন্দিরের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবার জন্তে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হ'ল। গোদাবরী নদীর পূর্ব্বতীরস্থ সেই পবিত্র স্মৃতি-মন্দির-সংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে দেশভক্ত সেদিন যে অপূর্ব্ব ভাষণ দিলেন, শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার সভ্যদের তা গঠনমূলক কর্ম্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলল।

১৯৪৯ সনের ১৫ই আগষ্ট, আমাদের স্বাধীনতালাভের দ্বিতীয় বার্ষিকী দিবসে অন্ধ্রদেশের এই সর্ব্বজনবরেণ্য নেতা মরলোক পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর অপূর্ব্ব জীবনাদর্শ যে বিরাট আলোক-স্তম্ভের ন্যায় দীর্ঘকাল জাতিকে পথনির্দেশ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

৪

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারা যেমন ১৯০৭ সনে অন্ধ্র-দেশে বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছিল তেমনি ১৯২১ সনে মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের আদর্শও অন্ধ্রবাসীদের অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল এক অপূর্ব্ব কর্ম্মপ্রেরণায়। অসহযোগ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে তখন অন্ধ্রদেশের চিরলে যে গণ-অভ্যুত্থান হয় তার অধিনায়করূপে অন্ধ্ররত্ন গোপালকৃষ্ণাইয়ার নাম ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

কিন্তু অন্ধ্রের মুক্তি আন্দোলন শুধু অহিংস সংগ্রামের পথেই অগ্রসর হয় নাই। ক্ষেত্রবিশেষে তা সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারেও আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯২২ সনে অন্ধ্রের গুদেম এজেন্সীতে ভিজাগাপট্টম (বিশাখাপত্তন) এবং গোদাবরী জেলার সীতারাম রাজুর (শ্রীরামরাজা) নেতৃত্বে আদিবাসীদের অভ্যুত্থান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। সমগ্র ভারতের মুক্তির পরিকল্পনা নিয়েই যে শ্রীরামরাজা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, বীরমন্দিরে তাঁর তৈলচিত্র উন্মোচন উপলক্ষে অন্ধ্র সোশ্যালিষ্ট পার্টির নেতা এম. শ্রীঅন্নপূর্ণিয়া সেকথার উল্লেখ করেন।*

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে অন্ধ্রদেশ কখনও পিছিয়ে থাকে নি। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনেও বহু অন্ধ্রবাসী দেশের জন্ম দুঃখবরণের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, ১৯৩১-এ 'গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট' স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও অন্ধ্রবাসীরা সরকারের লাঞ্ছনা এবং নির্যাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। পূর্ব্বগোদাবরী

অন্ধ্রবীর আল্লুড়ি শ্রীরামরাজা (সীতারাম রাজু)

জেলার ভাদাপল্লীতে তখনও বহু লোক পুলিসের গুলিবর্ষণে আহত, এমন কি কয়েকজন নিহত পর্য্যন্ত হয়েছে। ১৯৪০-১৯৪১এ গান্ধীজী যখন সমগ্র ভারতে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করলেন তখন ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক সারা ভারতের মধ্যে অন্ধ্রবাসীদের উপরেই সব চেয়ে বেশী জরিমানা ধার্য্য করা হয়েছিল। ৪২-এর আগষ্ট বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনা করে অন্ধ্রের ছাত্র ও তরুণ-সম্প্রদায় এক অভিনব রেকর্ড স্থাপন করেছে—জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন বীর মোগলাইয়া। এমনি ভাবে, বহু বীরসন্তান-প্রসবিণী অন্ধ্রদেশ শত অত্যাচারে অবিচলিত থেকে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছে মুক্তিসাধনার পথে। কিন্তু তার বিশদ বর্ণনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়।

*Raja started his revolution in the Andhra Agency, as a part of a premeditated and preplanned, All-India one for the liberation of the country—*Juga-dharma* a bilingual fortnightly, edited by R. M. Sarma.

শিল্পবিদ্যালয়ের পরিণতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের জল্পনা-কল্পনা ও প্রতিষ্ঠাবধি প্রথম চারি বৎসরের বিবরণ আমরা এ পর্য্যন্ত মোটামুটি জানিতে পারিয়াছি। এ বিষয়ে ১৮৫৪-৫৭ সনের সংবাদপত্রাদির উপরই আমাকে একান্তভাবে নির্ভর করিতে হইয়াছে। ১৮৫৬ সনের প্রথম হইতে শিল্পবিদ্যালয় সরকারী সাহায্য-লাভে সমর্থ হয়। এই সাহায্য অল্পকালের মধ্যেই বাড়িয়া মাসিক ছয় শত টাকা দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৫৭ সনের মে মাসে সিপাহী যুদ্ধ সুরু হয়। তখন কর্ত্তৃপক্ষ স্বভাবতঃই অন্যান্য বিভাগে ব্যয়সঙ্কোচ করেন। ১২৬৪, ১লা আষাঢ় সংখ্যা 'সংবাদ প্রভাকরে' পূর্ব্ববর্ত্তী 'জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণে' প্রকাশ, "কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স সাহেবরা কলিকাতায় শিল্পবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ মাসিক ৩৫০ টাকা প্রদান করণের অনুমতি প্রেরণ করেন।" যুদ্ধের অবসান হইলে এই সাহায্য বাড়িয়া পূর্ব্ব পরিমাণ ছয় শত টাকাই করা হইয়াছিল—এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

যাহা হউক, এই সময় হইতেই শিল্পবিদ্যালয় সরকারী আওতায় আসিয়া পড়িয়াছিল। ১৮৫৮ সনের ৭ই মে শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার অধ্যক্ষ-সমিতির একটি অধিবেশনের বিবরণ 'বেঙ্গল হরকরা'য় (১৭ মে, ১৮৫৮) পাইতেছি। সিবিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ লেফ্‌টেন্যাণ্ট সি. ই. এস্. উইলিয়াম্‌সের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় উইলিয়াম্‌সের প্রস্তাবে মেজর ষ্ট্রাসি এবং কিশোরীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ অধ্যক্ষ বা পরিচালক সমিতির সদস্য হইলেন। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ছাত্রদের চিত্র ও শিল্পদ্রব্যাদির একটি প্রদর্শনী হইবে এইরূপ কথা ছিল। এই বিবরণ হইতে আরও জানা যায়, মিঃ হুইলি তখন তক্ষণশিল্পের অধ্যাপক। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যোৎকর্ষের জন্য সভা আনন্দ প্রকাশ করেন। তক্ষণ শিল্পবিভাগে কাজের চাপ বেশী; কারণ বাহির হইতেও বেশ অর্ডার পাওয়া যাইতেছিল। এ সময় শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদকের নাম পাইতেছি এইচ্. স্কট স্মিথ, আর সিবিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজই ছিল সভাস্থল।

২

ছাত্রদের শিল্পদ্রব্যাদির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইল কিন্তু কয়েক মাস পরে—৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে। প্রদর্শনী-ক্ষেত্র ছিল মেসার্স চার্লস নেফিউ এণ্ড কোং-এর ভবনে। ঐ দিন বৈকাল ৫টার সময় উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত একটি সাধারণ সভাও হইয়াছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিম কোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি সার আর্থার ডবলিউ. বুলার। শিল্পরসিক সরকারী বেসরকারী দেশীয় বিদেশীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পাদ্‌রী লঙ, সি. এইচ. এ. ডাল, ডাঃ মৌএট, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরস্কার বিতরণ, সভাপতির বক্তৃতা প্রভৃতি হইতে শিল্প-বিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইতেছে। তখন বিদ্যালয়ে ছয়টি শ্রেণী ছিল—(১) মৃৎপুত্তলি নির্ম্মাণ ও ছাঁচে ঢালাই, (২) আকৃতি অঙ্কন—প্রথম শ্রেণী, (৩) ঐ—দ্বিতীয় শ্রেণী, (৪) দৃশ্যচিত্র অঙ্কন, (৫) তক্ষণশিল্প ও (৬) ফটোগ্রাফি। বিভিন্ন শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে নগদ টাকা, পুস্তক ও মাসিক 'পীল'-বৃত্তি দেওয়া হয়। পীল-বৃত্তির অধিকারী হইলেন পাঁচ জন। ইঁহারা যথাক্রমে: প্রথম শ্রেণীতে প্রমথনাথ মিত্র—মাসিক আট টাকা পীল-বৃত্তি; দ্বিতীয় শ্রেণীতে জে. এস্. পাইন—পাঁচ টাকা; তৃতীয় শ্রেণীতে হরিশঙ্কর খাঁ—পাঁচ টাকা, চতুর্থ শ্রেণীতে প্রসন্নকুমার রায়—চারি টাকা এবং পঞ্চম শ্রেণীতে কালিদাস পাল—চারি টাকা। ষষ্ঠ শ্রেণী, অর্থাৎ ফোটোগ্রাফিতে কাহাকেও পীল-বৃত্তি দেওয়া হয় নাই।

সভাপতি বুলারের বক্তৃতা ছিল একাধারে পাণ্ডিত্য ও তথ্যপূর্ণ। ইহা হইতে জানা যায়, বেসরকারী চাঁদা হইতে তখন বিদ্যালয়ের আয় দাঁড়াইয়াছিল মাসিক মাত্র নব্বুই টাকা। সরকারী মাসিক সাহায্য ছয় শত টাকা হইতেই প্রায় সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। সরকার তখনও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। বুলার বলেন, সরকারী সাহায্য রদ হইলে যে-কোন মুহূর্ত্তে বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। কাজেই এরূপ একটি হিতকারী প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধানকল্পে তিনি সভাস্থগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান এবং নিজেও মাসিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সম্পর্কে তিনি বলেন যে, অর্থাভাবে সমুদয় বিভাগের কার্য্য সুষ্ঠুরূপে আরম্ভ না হইলেও তখন পর্য্যন্ত যে-যে কাজ হইয়াছে তাহাতে নিরাশ হইবার

কানই কারণ নাই। ভারতবাসীর স্বাভাবিক শিল্পপ্রীতি হিয়াছে। নানা কারণে এতদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকিলেও তুতবমিনার, তাজমহল ও মসজিদের দেশে সামান্যমাত্র যোগ-সুবিধা পাইলেই যে তাহা আবার উজ্জীবিত হইতে ারে, শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের দ্বারাই তাহা মাণিত হইয়াছে ও হইবে। পূর্ব্বে বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক স্তক চিত্রিত করিবার উপায় ছিল না। বিলাত হইতে ড্রাইন ও ব্লক করাইয়া আনিতে বিস্তর অর্থব্যয় ও সময়-ক্ষেপ হইত। বুলার বলেন, শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষাগুণে অভাব ও অসুবিধা নিরাকৃত হইয়াছে। সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান পুস্তক চিত্রিত করিতে এখন আর বিপদগ্রস্ত হইতে য় না। তিনি আশা করেন, চিত্রবিদ্যা শীঘ্রই এতটা উৎকর্ষ-লাভ করিবে যে, ইংলণ্ডের শিশু-সাহিত্যের মত এখানকার শিশু-সাহিত্যও চিত্র সহযোগে প্রকাশিত হইয়া অচিরে শিশু-চিত্ত হরণ করিতে সমর্থ হইবে। তক্ষণশিল্পে ভারতবর্ষ চিরদিনই উন্নত। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, অস্থি, শঙ্খ দ্বারা অলঙ্করণশিল্প খোদাই ও গড়ন কাহার না জানা? বিদ্যালয়ে নব-প্রবর্ত্তিত ফটোগ্রাফি শিক্ষার প্রয়োজনীতার প্রতিও সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রায় শতাব্দীকাল পূর্ব্বে প্রদত্ত বুলারের এই বক্তৃতা পাঠ করিলে আজিও আমাদের প্রাণে নূতন আশা ও নব বলের সঞ্চার হয়।*

৩

বড়লাট লর্ড ক্যানিং সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছয় শত টাকার বাড়াইবার নির্দ্দেশ দিয়া বাংলা-সরকারকে যে পত্র লেখেন তাহাতে বলা হয় যে, শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্ত্তা (D. P. I.) এই বিদ্যালয় তিন মাস অন্তর পরিদর্শন করিবেন, আর এই বিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপের বিষয় সরকারী শিক্ষা বিবরণে উল্লিখিত হওয়া উচিত। ১৮৫৯-৬০ সনের সরকারী শিক্ষা-বিবরণেই সর্ব্বপ্রথম আমরা শিল্পবিদ্যালয়ের উল্লেখ পাই। এই বিবরণ হইতে জানিতে পারি যে, সরকারী সিবিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ঐ সময়কার অধ্যক্ষ মেজর জর্জ্জ চেস্‌নী শিল্পবিদ্যালয়ের 'একস্-অফিসিও ভিজিটর' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের কথা তখনই কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিতেছিলেন। তক্ষণশিল্প—বিশেষতঃ কাঠ-খোদাই বিভাগটি তখন বেশ চলিতেছিল। অধ্যাপক রিগ'র (Rigaud) নেতৃত্বে মৃৎপুত্তলি নির্ম্মাণ ও ছাঁচে-ঢালাইয়ের কাজ বেশ উৎকর্ষলাভ করে। পূর্ব্বোক্ত পুরস্কার-বিতরণী সভার সভাপতি বুলার অধ্যাপক রিগ'র কর্ম্মকুশলতার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার মনকষাকষি লাগিয়াই ছিল। উক্ত সরকারী বিবরণে প্রকাশ—১৮৫৯ সনের আগষ্ট মাসে শিল্প-বিদ্যালয়ের সঙ্গে রিগ' সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাঁহার স্থলে কোন অধ্যাপক নিযুক্ত না হওয়ায় ঐরূপ সুপরিচালিত বিভাগটির কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে হয়। এই সম্পর্কে শিক্ষা-বিবরণে বলা হয়:

"This interruption is unfortunate, but it affords no ground for doubting the ultimate success of the school."*

কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যালয়টির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। সরকার মাসিক ছয় শত টাকা হিসাবে পুনরায় দুই বৎসর সাহায্যদানে সম্মত হন। শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা নিজস্ব বিদ্যালয়টি পুনর্গঠনের জন্য মাদ্রাজের শিল্প-বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ ডঃ হাণ্টারের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন বলিয়াও উক্ত সরকারী বিবরণে লিখিত আছে।

পর বৎসরের (১৮৬০-৬১) শিক্ষা-বিবরণে শিল্প-বিদ্যালয়ের কার্য্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাই। এই সনে বিদ্যালয় এক আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। বিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষ একটি 'পটারি' বা মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণ বিভাগ খুলিবার মনস্থ করেন। মাদ্রাজ হইতে ডঃ হাণ্টারের সুপারিশে এই কার্য্যে পটু এক জন ইউরোপীয় ও এক জন দেশীয় শিক্ষক আনীত হন। এগার শত টাকা ব্যয়ে একটি চুল্লীও নির্ম্মিত হইল। কিন্তু কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই ইউরোপীয় শিক্ষকটি মারা যান। ইহাতে দেশীয় মাদ্রাজী শিক্ষকটিও বিশেষ ভয় পাইলেন এবং স্বদেশে চলিয়া গেলেন। তক্ষণশিল্প (কাঠ-খোদাই প্রভৃতি) বিভাগে গড়ে ছাত্র ছিল আঠার জন। এ বিভাগটি লাভজনক, কাজও হইত বেশ। কিন্তু সম্পাদকের বিবৃতি হইতে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরের মধ্যে সকল ছাত্রই বিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কৈফিয়ত-স্বরূপ তাহারা বলে যে, বিদ্যালয়ে থাকিয়া তক্ষণকার্য্যে তাহাদের যাহা আয় হয়, স্বাধীনভাবে কাজ করিলে তাহারা তাহার অধিক আয় করিতে পারিবে। তক্ষণ-বিভাগের সিনিয়র ছাত্রগণ প্রত্যেকে মাসে বার টাকা পর্য্যন্ত আয় করিত। অঙ্কন ও তৈলচিত্র বিভাগেও ভাল কাজ হয়। এই বৎসরের ছাত্র-সংখ্যা চুয়াল্লিশ, পূর্ব্ব বৎসরে ছিল মাত্র চব্বিশ জন।

---

* *The Bengal Hurkaru and India Gazette*, Sep. 13, 1858.

* *General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1859-60.*, pp. 40-1.

১৮৬১-৬২ সনের সরকারী শিক্ষা-বিবরণে শিল্প-বিদ্যালয়ের কোন উল্লেখ পাই নাই। তবে এই সময় হইতে যে ইহার উন্নতি ও পুনর্গঠনের জন্য বিশেষ চেষ্টা সুরু হয়, পরবর্ত্তী বৎসরের (১৮৬২-৬৩) সরকারী শিক্ষা-বিবরণ হইতে তাহা বুঝা যায়। শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভা এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়া সরকারকে পেশ করেন। এই সময় শিল্পবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিঃ গ্যারিক। ১৮৬২-৬৩ সনের প্রথম আট মাস পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন মিঃ মেড্‌লিকট। তাঁহার পর সম্পাদক হন মিঃ এইচ. এফ. ব্লান্‌ফোর্ড। সুতরাং ব্লান্‌ফোর্ডই পূর্ব্ব-সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে সব কথা জানিয়া ইঁহাদের সাহায্যে বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই বিবরণ হইতে জানিতে পারি, তখন শিল্পবিদ্যালয় সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শ্রেণীগুলি এইরূপ: (১) মণ্ডনশিল্প ও আকৃতি চিত্রণ, (২) তক্ষণশিল্প (কাঠ খোদাই প্রভৃতি), (৩) লিথোগ্রাফি, (৪) তৈলচিত্র, (৫) মৃৎপুত্তলি নির্ম্মাণ ও ছাঁচে ঢালাইয়ের কাজ, (৬) মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ এবং (৭) ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্র।

সম্পাদক ব্লান্‌ফোর্ড দফাওয়ারি ভাবে প্রতিটি শ্রেণীর কার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। মৃৎপুত্তলি নির্ম্মাণ ও ছাঁচে-ঢালাই শিল্পের শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত দেখিতেছি মিঃ ওয়েব নামক জনৈক শিক্ষাব্রতীকে। এ বিদ্যায় তাঁহার দক্ষতা ছিল সুবিদিত। তথাপি সংস্কারবশে ভদ্রশ্রেণীর খুব কম যুবকই তাঁহার নিকট কাদা লইয়া কাজ করিতে রাজী হইত। এ কারণ এ বিভাগের কাজ তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই। বাহির হইতে অর্ডার আসিলে, বা বিক্রয়ের জন্য কিছু কিছু কাজ এখানে করা হইত। মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণ শ্রেণীরও ঐ একই অবস্থা। তবে কুম্ভকার জাতীয় কয়েকটি ছাত্র এ বিভাগে মাঝে মাঝে আসিয়া কাজ শিখিত। দারিদ্র্য-হেতু নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকিতে না পারিলেও তাহারা অল্প সময়ে কাজে বেশ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। তাহাদিগকে ছাত্র বলিয়াও গণ্য করা যাইতে পারে।

আকৃতি অঙ্কন ও মণ্ডনশিল্পের শ্রেণীতে প্রত্যেক ছাত্রকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পর প্রথম পাঠ লইতে হইত। ইহাতে কতকটা দক্ষতা না জন্মিলে কেহই তক্ষণ-শিল্প, লিথোগ্রাফি প্রভৃতি বিভাগে প্রবেশ করিতে পাইত না। এ কারণ এ শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যাও হইত বেশী, ঐ সনে ছিল আঠার জন। প্রাথমিক পাঠ লইবার পর অন্যান্য বিভাগে চলিয়া যাওয়ায় এ বিভাগে বেশী ছেলে রাখা যাইত না। চিত্রকলায় নৈপুণ্য অর্জ্জনের পক্ষে এ শ্রেণীতে ছাত্রদের দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ একান্ত প্রয়োজন। এই বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে, যাহাতে এ শ্রেণীতে অন্ততঃ কয়েকজন ছেলে অধিক দিন চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে সেজন্য প্রধান শিক্ষক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অধ্যক্ষ-সভা সরকারের নিকট কয়েকটি বিশেষ বৃত্তি স্থাপনের প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন।

তক্ষণশিল্পের শ্রেণী কাজের দিক্ দিয়া উৎকর্ষ লাভ করে। এখানকার ছাত্রসংখ্যা ছিল চৌদ্দ। বাহির হইতে যে সব অর্ডার পাওয়া যাইত তাহাতে দক্ষ ছাত্রেরা সম্বৎসর ধরিয়া যথেষ্ট কাজের সুযোগ পাইত। বিদ্যালয়ের নিজস্ব লিথোগ্রাফির যন্ত্র থাকিলেও এ বিভাগে তেমন কাজ হয় নাই। ছাত্রসংখ্যাও কম ছিল। তাহাদের আয়ের পন্থা যাহাতে বাড়ে এ বৎসর তাহার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তৈল-চিত্র শ্রেণীতে মাত্র তিন জন ছাত্র ছিল। এই বিভাগের উন্নতি হওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বর্ণিত হয়। ফটোগ্রাফি শ্রেণীতে ছিল পাঁচ জন ছাত্র।*

৫

অধ্যক্ষ-সভার পূর্ব্বোক্ত পরিকল্পনা ভারত-সরকার সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করিলেন। শিল্পবিদ্যালয়ের জন্য মাসিক সাত শত টাকা বেতনে একজন প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব মঞ্জুর করা হইল। তবে সরকার ইহার সঙ্গে একটি সর্ত্ত জুড়িয়া দেন যে, যে পর্য্যন্ত না ইংলণ্ড হইতে উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত করিয়া আনা হয় এবং তিনি এখানকার অবস্থার সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত না হন তত দিন এই খাতে কোনরূপ অর্থব্যয় করা হইবে না। অধ্যক্ষ-সভা এই সর্ত্তে সম্মত হইয়া বিলাতে লণ্ডন স্কুল অফ্ ডিজাইন-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ রেডগ্রেভ, আর-এ'র নিকটে একজন উপযুক্ত শিল্পীকে মনোনয়ন করিয়া পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিলেন।† রেডগ্রেভ মহোদয় মিঃ এইচ. এইচ. লককে উক্ত পদের জন্য নির্ব্বাচন করেন।

লক ১৮৬৪ সনের ২৯শে জুন কলিকাতায় পৌঁছেন এবং পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই দিন হইতে সরকার শিল্পবিদ্যালয়ের ভার পুরাপুরি গ্রহণ করিলেন। সরকারের পক্ষে লক সাহেব অধ্যক্ষ-সভার হস্ত হইতে আনুষ্ঠানিক ভাবে শিল্পবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব ভার লইলেন, তাঁহার উপরওয়ালা হইলেন সরকারী শিক্ষা বিভাগের অধিকর্ত্তা। অধ্যক্ষ-সভা অতঃপর মাত্র একটি পরামর্শদাতা কমিটিতে

* *Ibid*, for 1862-63, pp. 23-25.

† *Ibid*, for 1863-64, pp. 62-3.

পর্য্যবসিত হইল। কমিটির অনুমোদনক্রমে অধ্যক্ষ লক শিল্পবিদ্যালয়ের পুনর্গঠন উদ্দেশ্যে প্রস্তাব তৈরি করিয়া সরকারের নিকট পাঠাইয়া দেন। সরকারের অনুমোদন-লাভের পর ইহা পুনর্গঠিত হয়। এ বিষয় পরে আলোচ্য। এই সময় হইতে শিল্পবিদ্যালয়ের নাম হইল 'গবর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্ট'।*

১৮৬৪-৬৫ সনে বিদ্যালয়টির জন্য ভারত-সরকার ১৫,৩৫৩৲ এবং বাংলা-সরকার ১,৬৭১৲, মোট ১৭,০২৪৲ টাকা ব্যয় করেন।† শিল্পবিদ্যালয় এই বৎসরে ১৬৬ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে স্থানান্তরিত হইল।

* *Ibid*, for 1864 65 pp. 23-4.

† *Ibid*, **Appendix, p. 94.**

গ্রামের নাম

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণকান্তের উইলের 'হরিদ্রাগ্রাম কোথায়?' শীর্ষক আলোচনায় লিখিয়াছিলাম: 'হরিদ্রাগ্রাম' এই নাম হইতে উহা কোন্ জেলায়, তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারি। কোন জেলায় "—গ্রাম' এইরূপ নামের গ্রামের প্রাদুর্ভাব। কোনও জেলার সমুদয় গ্রামের নামের তালিকা পাইলে তাহা হইতে সেই জেলায় কয়টি—"গ্রাম" আছে বাহির করা সহজসাধ্য, কিন্তু এইরূপ নামের তালিকা সরকারী দপ্তরে থাকিলেও সাধারণের পক্ষে তাহা পাওয়া সহজসাধ্য ত নহেই, উপরন্তু বহু ব্যয়সাপেক্ষ। আজকাল প্রায় প্রত্যেক গণ্ড-গ্রামে, বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে ডাকঘর আছে। কোনও জেলায় যদি গ্রামের নামের মধ্যে—"পুর" শতকরা দশটা, "—গ্রাম" শতকরা সাতটা, —'গড়' শতকরা পাঁচটা "—পাড়া" শতকরা তিনটা করিয়া থাকে তবে ডাকঘরের নামের তালিকায় মধ্যেও আমরা শতকরা দশটা "—পুর', সাতটা "—গ্রাম" পাঁচটা "—গড়" ও তিনটা "—পাড়া" দেখিতে পাইব আশা করিতে পারি। সুতরাং ডাকঘরের তালিকা হইতে কোন্ জেলায় "—গ্রাম" এই নামের প্রাদুর্ভাব তাহা আমরা কতকটা আন্দাজ করিতে পারি। 'হরিদ্রাগ্রামে' একটা ডাকঘর ছিল, সুতরাং ডাকঘরের তালিকা দেখিয়া যদি আমরা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হই তাহা হইলে সেটি অসঙ্গত হইবে না। ২৪ পরগণা জেলায় মোট ১৭৪টি ডাকঘরের মধ্যে "—'গ্রাম' এই নামের ডাকঘর একটি আছে, যথা: শিকড়া কুলীন গ্রাম। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম শুধু শিকড়া ছিল। পরে বারাসত বসিরহাট লাইট রেলওয়ে হইবার পর, রেল-ষ্টেশনের নাম লইয়া অন্য স্থানের রেল-ষ্টেশনের নামের সহিত গোলযোগ হওয়ায় ইহার নামপরিবর্ত্তন করিয়া "শিকড়া কুলীনগ্রাম" রাখা হয়। ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মস্থান। হুগলী জেলায় ১২৬টি ডাকঘরের মধ্যে এইরূপ "—গ্রাম আছে তিনটি যথা: বৈচি গ্রাম (এটিকে আমরা বাদ দিতে পারি, কারণ বৈচি ডাকঘর হইতে এটি যে পৃথক তাহা দেখাইবার জন্য এই নামকরণ)।

নদীয়া জেলায় ১৭৬টি ডাকঘরের মধ্যে চারটি '—গ্রাম' আছে, যথা: দেবগ্রাম, মাঝেরগ্রাম ও বিধ গ্রাম। হাবড়া জেলায় ১০৯টি ডাকঘরের মধ্যে "—গ্রাম' একটি মাত্র—দেউলগ্রাম—আছে। মেদিনীপুর জেলায় ১৯৬টি ডাকঘরের মধ্যে পাঁচটি "—গ্রাম" আছে, যথা: কালাগ্রাম, দাসগ্রাম, নয়া-গ্রাম, ঝাড়গ্রাম, ও নন্দীগ্রাম। মুর্শিদাবাদ জেলায় ৯২টি ডাকঘরের মধ্যে আটটি "—গ্রাম" আছে, যথা: মতিগ্রাম, খড়গ্রাম, মাড়গ্রাম, নবগ্রাম, পাঁচগ্রাম, সিজগ্রাম, তালগ্রাম ও কাগ্রাম। যশোহর জেলায় ১৬০টি ডাকঘরের মধ্যে চারটি '—গ্রাম' আছে। যথা: রাধানগরগ্রাম, রায়গ্রাম, জয়গ্রাম ও শুক্তগ্রাম। আর বর্দ্ধমান জেলায় ২২৭টি ডাকঘরের মধ্যে ২২টি গ্রাম আছে, যথা: জয়াগ্রাম, কেতুগ্রাম, নসীগ্রাম, গোবগ্রাম, মন-নবগ্রাম, আউসগ্রাম, শ্রীগ্রাম, মৌগ্রাম, চণ্ডীপুর, কোগ্রাম, মাঝিগ্রাম, বেড়ুগ্রাম, জোগ্রাম, কুলীন-গ্রাম, মধ্যমগ্রাম, কসুমগ্রাম, মসাগ্রাম, নবগ্রাম ও নাতুগ্রাম। এতৎ-সম্পর্কিত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

জেলার নাম	মোট ডাকঘরের সংখ্যা	গ্রাম এই নামের ডাকঘরের সংখ্যা	শতকরা
২৪ পরগণা	১৭৪	১	০.৮
হুগলী	১২৬	৩	২ ৪
নদীয়া	১৭৬	৪	২'৩
হাবড়া	১০৯	১	০'৯
মেদিনীপুর	১৯৬	৫	২'৫
মুর্শিদাবাদ	৯২	৮	৮'৭
যশোহর	১৬০	৪	২ ৫
বর্দ্ধমান	২২৭	২২	৯'৭

সুতরাং 'হরিদ্রাগ্রাম' হয় বর্দ্ধমানে না হয় মুর্শিদাবাদে রাঢ় অঞ্চলে—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অসঙ্গত হইবে না। অন্যান্য যুক্তি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এখানে উল্লেখ করিলাম না।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র আই-সি-এস কর্তৃক সঙ্কলিত হুগলী জেলা সম্বন্ধীয় ডিষ্ট্রীক্ট হ্যাণ্ডবুক দেখিবার সুযোগ বর্ত্তমান লেখকের হইয়াছে। স্যর উইলিয়াম উইলসন হাণ্টার কর্তৃক প্রকাশিত Statistical Account of Bengal-এর পরে এ বিষয়ে এরূপ তথ্যবহুল পুস্তক আমরা দেখি নাই। এই নূতন ডিষ্ট্রীক্ট হ্যাণ্ডবুকে হুগলী জেলার ১৯০৬টি গ্রামের নাম, কালি, লোক-সংখ্যা, বাড়ীর-সংখ্যা, লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ও গ্রামবাসীদের পেশা ইত্যাদি দেওয়া আছে। এই তথ্যগুলি অনুধাবন করিতে করিতে মনের মধ্যে কতকগুলি জিনিষ পরিস্ফুট হইল। দেখিলাম যে, শেষাংশে "পুর" শব্দযুক্ত নামবিশিষ্ট গ্রামের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব।

একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, মৌজাকেই এই পুস্তকে গ্রাম বলিয়া ধরা হইয়াছে। আমরাও যখন গ্রামের নাম লইয়া আলোচনা করি তখন প্রকৃতপক্ষে মৌজার নাম লইয়াই আলোচনা করি। এককালে মৌজা ও গ্রাম—সমাজবিশিষ্ট গ্রাম অভিন্ন ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এক্ষণে মৌজা ও সমাজবিশিষ্ট গ্রামের মধ্যে পার্থক্য হইয়াছে। এ বিষয়ে ইংরেজী ১৯১১ সালের আদমশুমারির সুপারিন্টেন্ডেণ্ট এল. এস. এস. ওমালি সাহেব লিখিয়াছেন :

"The marginal statement (*here given below*) shows the number of inhabited mauzas and residential villages or hamlets in the districts" of West Bengal. [West Bengal then meant the Burdwan and the old Presidency Divisions.]

Divisions	Inhabited mauzas	Inhabited villages
Burdwan	24,132	29,451
Presidency	13,389	21,233

দেখা যায়, কোন কোনও স্থানে মৌজা বাসগ্রামের চেয়ে ছোট; আবার কোনও কোনও স্থানে বাসগ্রাম অপেক্ষা বড়। বর্দ্ধমান বিভাগে মৌজার কালি গড়ে ৩৭২ একর; আর তখনকার প্রেসিডেন্সী বিভাগে মৌজার কালি গড়ে ৭৮১ একর—পার্থক্য দ্বিগুণের উপর। বাসগ্রামের কালির পার্থক্য কিন্তু তত বেশী নহে। যেমন, বর্দ্ধমান বিভাগে গড় কালি ৯৩০ বিঘা; আর প্রেসিডেন্সী বিভাগে ১৪৯০ বিঘা—পার্থক্য দেড়গুণের কাছাকাছি।

হুগলী জেলায় ১৮টি থানা ও ১৯০৬টি গ্রাম আছে। ৩টি মহকুমায় এই ১৮টি থানা। সমস্ত জেলায় কয়েকটি "—পুর", কয়েকটি "—ডাঙ্গা", কয়েকটি "—পাড়", কয়েকটি "—বাটী", কয়েকটি "—নগর", কয়েকটি "—গ্রাম" ইত্যাদি আছে, তাহার আলোচনা মহকুমা-ওয়ারি ও থানা-ওয়ারিভাবে করিলাম। তালিকাটি এইরূপ। যথা :

সদর মহকুমা

থানার নাম

	চুঁচুড়া	ধনেখালি	পোলবা	মগরা	বলাগড়	পাণ্ডুয়া
মোট মৌজার সংখ্যা	২২	২১৪	১৯৪	৫৬	১৩৬	১৫৮
"—পুর"	৫	৩৯	৪৮	২০	৪০	২২
"—ডাঙ্গা"	৩	২	১	—	৩	১
"—গড়, গড়া, গড়িয়া"	২	৫	১	—	৩	৫
"—পাড়া"	১	৭	১২	১	১৩	১১
"—ঘাটা"	—	১	—	১	—	—
"—বাটী"	—	৫	৫	১	৪	২
"—ঘরা"	—	২	—	১	—	—
"—নগর"	১	১	৪	১	১	২
"—গ্রাম"	—	১	২	১	—	৮

শ্রীরামপুর মহকুমা

থানার নাম

	শ্রীরামপুর	উত্তরপাড়া	ভদ্রেশ্বর	চণ্ডীপাল	তারকেশ্বর	সিঙ্গুর	চণ্ডীতলা	জাঙ্গীপাড়া
মোট মৌজার সংখ্যা	২৭	১২	২১	১৫৪	৯০	১০৩	১৬২	১২৯
"—পুর"	৮	২	৪	৭১	৪০	৩২	৩৯	৫০
"—ডাঙ্গা"	—	—	—	—	—	২	৩	—
"—গড় ইত্যাদি"	—	—	—	২	৫	২	১	২
"—পাড়া"	—	২	২	৫	২	২	২	৩
"—ঘাটা"	—	—	—	—	—	৩	—	—
"—বাটী"	১	—	—	১১	৮	৭	২	৬
"—ঘরা"	—	—	—	—	—	—	৪	১
"—নগর"	—	১	—	৫	৪	৭	২	৮
"—গ্রাম"	১	—	১	—	১	—	—	১

আরামবাগ মহকুমা

থানার নাম

	আরামবাগ	পুরশুড়া	গোঘাট	খানাকুল
মোট মৌজার সংখ্যা	১৭৫	৫০	২১১	১৪৭
"—পুর"	৬০	১৭	৫০	৫০
"—ডাঙ্গা"		—	১	১
"—গড়, গড়া" ইত্যাদি	২	—	৫	২
"—পাড়া"	৪	৫	৫	২
"—ঘাটা"	—	—	—	—
"—বাটী"	৪	২	১০	৩
"—ঘরা"	১	—	১	—
"—নগর"	৩	—	২	৮
"—গ্রাম"	৪	—	৬	—

বিভিন্ন থানায় বিভিন্ন কারণে মৌজার সংখ্যার বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। সেজন্য উপরি-উক্ত সংখ্যাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার পক্ষে শতকরা হিসাবটি অধিকতর সহায়ক হইবে বলিয়া মনে করি। নিম্নে আমরা মহকুমাওয়ারী কোন মহকুমার "—পুরে"র শতকরা অনুপাত কত, "—ডাঙ্গা"রই বা কত, "—পাড়া"র বা "—নগরে"র কত তাহা দেখাইলাম। থানাওয়ারী হিসাবে দিলে যে তথ্যগুলি অনুধাবন করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত তাহা মনে হয় না। কারণ থানাগুলির মধ্যে আয়তনগত যথেষ্ট তারতম্য আছে। যেমন চুঁচুড়া থানা ১৪'৫ বর্গমাইল, উত্তরপাড়া থানা ১১'২ বর্গমাইল; পক্ষান্তরে ধনিয়াখালি থানা ১০৬'২ বর্গমাইল; গোঘাট থানা ১৪৫'৩ বর্গমাইল। ৩টি মহকুমাই যে সমান আয়তনের তাহা নহে; তবে থানার ন্যায় অত বেশী বৈষম্য নাই। মহকুমাগুলির আয়তন নিম্নে দেওয়া গেল। যথা:

সদর মহকুমা	—	৪৪৬'১ বর্গমাইল
শ্রীরামপুর "	—	৩৪৯'৮ "
আরামবাগ "	—	৪১২'৫ "

মহকুমাগুলি এরূপ ভাবে গঠিত যে, এক আরামবাগ মহকুমা ব্যতীত অন্য দুইটি মহকুমার সহিত তুলনা করিয়া কোনও .eg onal peculi..ity বা স্থানীয় বিশেষত্ব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

শতকরা হিসাব দিবার পূর্ব্বে মহকুমাওয়ারি পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হইল:

	সদর	শ্রীরামপুর	আরামবাগ	জেলা হুগলীতে সর্ব্বমোট
মোট মৌজার সংখ্যা	৭৭৭	৬৩৮	৪৮৩	১৯০৬
"পুর"	২৩৪	২৪৬	১৭৭	৬৫৭
"ডাঙ্গা"	১২	৫	২	১৯
"গড়, গড়া" ইত্যাদি	১৬	১২	৯	৩৭
"পাড়া"	৪৫	১৮	১৬	৭৯
"ঘাটা"	২	৩	—	৫
"বাটী"	১৭	৩৫	১৯	৭১
"ঘরা"	৩	৬	২	১১
"নগর"	১০	২৭	১৩	৫০
"গ্রাম"	১২	৪	১০	২৪

একটা জিনিষ লক্ষণীয় যে, সব মহকুমাতেই "পুরের" সংখ্যা খুব বেশী। সদর মহকুমা তার নীচেই "পাড়া"র সংখ্যা; কিন্তু শ্রীরামপুর ও আরামবাগ মহকুমার "বাটী"র সংখ্যা তার পরেই। "বাটী" সদর মহকুমার তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে; "নগর" শ্রীরামপুর মহকুমার তৃতীয়; "পাড়া" আরামবাগ মহকুমার তৃতীয়। "গ্রাম" সর্ব্বত্রই "নগর" অপেক্ষা সংখ্যায় কম। থানা হিসাবে ধরিলেও একমাত্র পাণ্ডুয়া ছাড়া অন্যত্র "গ্রাম" নগর অপেক্ষা সংখ্যায় কম। "পাড়া"র সংখ্যা "গ্রামে"র সংখ্যার চেয়েও বেশী। কোনও থানায় (যেমন সিঙ্গুরে) "ভেড়ী", কোনও কোনও থানায় (যেমন গোঘাটে) "গঞ্জ" ইত্যাদি আছে। সমগ্র জেলায় এই গ্রাম নগরাদির হিসাব ধরা হয় নাই।

এইবার আমরা মহকুমাওয়ারি শতকরা হিসাব নিম্নে দিলাম:

শতকরা হিসাবে—

	সদর মহকুমায়	শ্রীরামপুর মহকুমায়	আরামবাগ মহকুমায়	সমগ্র জেলা হুগলী
"পুর"	৩০'০	৩৭'০	৩'০৩	৩৪'৬
"ডাঙ্গা"	১'৫	০'৮	০'৩	১'০
"গড়, গড়া গড়িয়া" ইত্যাদি	২'০	১'৯	১'৬	২'০
"পাড়া"	৫'৯	২'৮	২'৭	৪'১
"ঘাটা"	০'৩	০'৫	০	০'৩
"বাটী"	২'২	৫'৫	৩'৩	৩'৭
"ঘরা"	০'৪	০'৯	০'৩	০'৮
"নগর"	১'৩	৪'২	২'২	২'৮
"গ্রাম"	১'৫	০'৫	১'৭	১'৩

হুগলী জেলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মৌজা হইতেছে খানাকুল থানার অন্তর্গত ঘোষপুর। ইহার কালি ৩২৮২ একর। লোকসংখ্যা ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ১২৮১। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মৌজা হইতেছে বলাগড় থানা অন্তর্গত রাজবল্লভপুর। ইহার কালি মাত্র ৩'৪ একর বা ১০।১১ বিঘা। এই মৌজার কিয়দংশ গঙ্গাগর্ভগত হওয়ার দরুনই ইহার আয়তন এরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহাতে লোকবসতি নাই। এই জেলায় ৪৫টি মৌজা লোক-বসতি শূন্য। যখন মৌজা গঠিত হইয়াছিল তখন নিশ্চয়ই লোকের বসতি ছিল।

কয়েকটি থানার, প্রথম কয়েকটি "পুরে"র, "পাড়া"র, "নগরে"র, "বাটী" প্রভৃতির কালির গড় নিম্নে দেওয়া হইল। যে কয়টি "পুর" বা "পাড়া" বা "নগর" প্রভৃতি লইয়া গড় ধরা হইয়াছে তাহার সংখ্যা গড়ের পাশে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।

কালির গড় :—

থানার নাম

	পোষা	গোঘাট	ধনিয়াখালি
"—পুর"	২৩৭ (১০)	৩৮১ (১০)	২৯৩ (১০)
"—পাড়া"	৪৪৩ (১০)	৪৪৬ (৫)	২০৪ (৭)
"—নগর"	২২৭ (৪)	১৬৫ (২)	৫৮৯ (৪)
"—বাটী"	৩৭৫ (২)	৩৭২ (১০)	২৭৪ (৬)
"—গ্রাম"	২১০ (২)	৪০০ (৫)	৯৭৮ (১)
"—ঘাটা"	—	—	২৪৭ (১)
"—ডাঙ্গা"	২৬৫ (৩)	৩২৬ (১)	৩০৯ (২)
"—গঞ্জ"		৪০০ (৩)	

পোষা থানা ও ধনিয়াখালি পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি থানা। গোঘাট থানা হুগলী জেলার সর্ব্বপশ্চিম প্রান্তস্থ থানা। ১৮টি থানার মধ্যে লটারি করিয়া বাছিয়া এই ৩টি থানা লওয়া হইয়াছিল। উপরি-উক্ত পরিসংখ্যান অনুধাবন করিলে কালির মধ্যে বড় একটা regional peculiarity (আঞ্চলিক বিশেষত্ব) পরিলক্ষিত হয় না। পোষা ও ধনিয়াখালিতে—পুরের "কালি কতকটা সমান সমান হইলেও, "—নগর" বা "—গ্রামে"র বেলায় এই সমতা আদৌ দৃষ্ট হয় না।

পোষা থানায় "—পুর" ও "—নগরে"র কালি প্রায় একইরূপ; ধনিয়াখালিতে "—পুর" অপেক্ষা "—নগর" ঢের বড়—প্রায় দ্বিগুণ। পক্ষান্তরে গোঘাটে "—পুর" "—নগর" অপেক্ষা দ্বিগুণের চেয়ে বড়। "—বাটীর" আয়তন পোষা ও গোঘাটে প্রকই রূপ; কিন্তু ধনিয়াখালিতে অনেক ছোট। "গ্রামে"র আয়তনের পার্থক্য খুব বেশী দেখিলে বুঝিতে হইবে ইহা নিতান্ত accidental বা আকস্মিক।

সাধারণতঃ আমাদের ধারণা এই যে, "গ্রাম" অপেক্ষা "নগর" বড়; আর "পাড়া"র চেয়ে "গ্রাম" বড়। এই প্রচলিত ধারণার কোনও সমর্থন উপরে যে সমস্ত পরিসংখ্যান ও তথ্যাদি প্রদত্ত হইল তৎসমুদয় হইতে পাওয়া যায় না।

এইবার গ্রামের নাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া যে সকল প্রশ্ন মনে জাগিয়াছে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেছি। তারকেশ্বর থানার ভরবল্লভপুর নামে একটি গ্রাম আছে (J. L. no ৩৮)—ইহার আয়তন ১০৩ একর।° হরিপাল থানায় ভরবল্লভপুর (J. L. no ৩০ নামে আর একটি গ্রাম আছে—ইহার আয়তন ১৫৬ একর। এই দুইটি স্থানের সহিত ৺তারকেশ্বর মন্দিরের দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা রাজা ভরমল্লের কি কোন সংস্রব আছে? মগরা থানায় "গজঘণ্টা" নামে একটি গ্রাম আছে—ইহা সরস্বতী নদীর উত্তর তীরে। যদি হাতীশালার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকে ত ইহা নদীর তীরে হওয়াই স্বাভাবিক। সিঙ্গুর থানায় "সিংহল পাটন" নামে একটি গ্রাম আছে—ইহার সহিত মঙ্গলকাব্যের "সিংহল পাটনের" সংস্রব থাকা অসম্ভব নয়। ঐরূপ খানাকুল থানায় "গুজরাট" নামে একটি গ্রাম আছে—ইহার আয়তন ৩৯৪ একর। ইহার সহিত মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বর্ণিত, কালকেতু-প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরীর কি কোনও সম্বন্ধ আছে?

এই সব বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। হুগলীতে একটি "টিটাগড়" আছে—ইহার সহিত ২৪ পরগণার বিখ্যাত টিটাগড় শহরের নাম-সাদৃশ্য আছে। অন্যান্য জেলারও কি টিটাগড় নামে কোনও গ্রাম বর্ত্তমান? এই নাম-সাদৃশ্যের হেতু কি? এই সমস্ত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হইলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-সম্পর্কে বহু অপ্রকাশিত তথ্য উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।
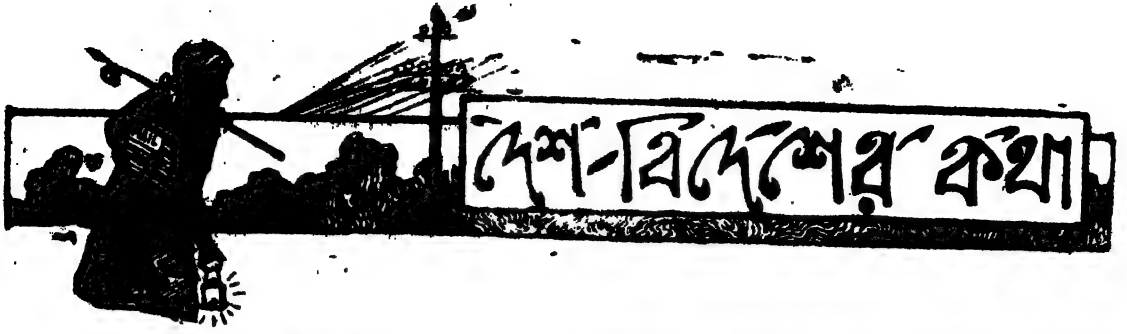
বাঁকুড়ায় কুষ্ঠরোগ

বাংলা, তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। বাঁকুড়া জেলার তের লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার লোক অর্থাৎ শতকরা পাঁচ জন এই রোগে আক্রান্ত। এই রোগ সংক্রমণের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সমগ্র বাঁকুড়া জেলার মধ্যে আবার সদর মহকুমায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। প্রায় প্রতিটি পল্লীতে আট-দশ জন কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন পল্লীতে এমনও দেখা যায় যে, একটি পরিবারের প্রায় সকলেই এই রোগে আক্রান্ত। সম্প্রতি এ বিষয়ে সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ করিয়া বাঁকুড়া জন কল্যাণ সমিতি আন্দোলন চালাইতেছে। বাঁকুড়ার হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট নেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য শ্রীরামহরি চট্টোপাধ্যায় এই ব্যাধির প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে বিশেষভাবে তৎপর হইবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কতকটা আগ্রহ দেখাইয়াছেন এবং সরকারী প্রচেষ্টায় বাঁকুড়া শহর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে গৌরীপুরে একটি কুষ্ঠ হাসপাতাল নির্ম্মিত হইতেছে। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বাঁকুড়া শহরের সন্নিকটে বদড়া গ্রামে খ্রীষ্টান মিশনরী-দের দ্বারা যে ক্ষুদ্র হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে মাত্র দুই শত রোগী ঔষধ পাইয়া থাকে এবং সেখানে সকল রোগীর থাকিবার স্থানের অভাব। বাঁকুড়াতে একটি বৃহৎ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া ১৯৪৭ সালে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাঁকুড়া শহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে সেই জঙ্গলাকীর্ণ স্থান সরকার কর্তৃক অধিকার করা হয়। এই হাসপাতালের আয়তন প্রায় তিন শত একর। প্রথম দফায় হাসপাতালের গৃহনির্মাণে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, দ্বিতীয় দফার কার্য্য আরম্ভ হয় ১৯৪৯ সালে। এই দফায়

কুষ্ঠ হাসপাতালের ফটক

কুষ্ঠ হাসপাতালের একাংশ

প্রায় চার লক্ষ টাকা খরচ হয়। ১৯৫২ সালে তৃতীয় দফার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুই শত চল্লিশ জন রোগীর থাকিবার উপযোগী হাসপাতাল ভবনটি নির্ম্মিত হইয়াছে। হাসপাতালে ১৬০টি রোগী চিকিৎসাধীনে

বাঁকুড়া কুষ্ঠ হাসপাতালের সাধারণ দৃশ্য

আছে, তাহারা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজকর্ম করিতেছে। তাহাদের জন্য একটি 'রিক্রিয়েশন ক্লাব' ও পাঠাগার আছে। সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী এই হাসপাতালের 'বেডে'র সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, ইহাতে বাঁকুড়ার কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে শতকরা ষাট জনের অবস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হইতে পারে। এক হাজার বেডের মধ্যে বাঁকুড়ার অধিবাসীরা পাইবেন ছয় শত বেড। বাঁকুড়ার রোগীর সংখ্যা সাড়ে ছয় হাজার, এই স্বল্পসংখ্যক বেডের সাহায্যে সরকার কি ভাবে রোগ প্রতিরোধ করিতে পারিবেন তাহা ভাবিবার বিষয়। গৌরীপুরের ন্যায় রাণীবাধ প্রভৃতি জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে সরকার যদি এইরূপ আরও কয়েকটি হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া রোগী ভর্ত্তি করেন, তবে বাঁকুড়া জেলার অধিবাসীদের কুষ্ঠরোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার ব্যবস্থা হইবে।

বাঁকুড়া জনকল্যাণ সমিতির কার্য্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। টাকাকড়ি উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীশক্তিপদ বরাটের নিকট প্রেরিতব্য।

'সন্ধ্যা'র বার্ষিক সম্মেলন

গত ২৪শে আগষ্ট এলাহাবাদে সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা-সেবক শিবিরে 'সন্ধ্যা'র বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন উত্তর প্রদেশের সূচনা (Information) বিভাগের মন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী। এই সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহের জন্য 'সন্ধ্যা' নিখিল-ভারত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে।

১। ভারতের জাতীয় চেতনার অনুকূল পদ্ধতিতে ও সময়োপযোগী সমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্য তথা শিল্পকে উজ্জীবিত করা।

২। সাম্প্রদায়িক এবং শ্রেণীসংঘর্ষের হিংসাত্মক বিশৃঙ্খলা হইতে সাহিত্য ও শিল্পকে বাঁচানো।

৩। যে সকল লেখক এবং শিল্পীর মৌলিকত্ব আছে তাহাদের প্রচেষ্টাকে দেশ ও সর্ব্বসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরা।

৪। সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের সমষ্টিগত চরিত্রের বিকাশ।

৫। রাষ্ট্র ও মানবতার জন্য এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক পটভূমিকার সৃষ্টি।

৬। লেখক এবং শিল্পীদের মধ্যে জাতি ও সমাজগঠনমূলক কর্ম্মের প্রেরণা সঞ্চার।

৭। জনসাধারণের মধ্যে সৎ সাহিত্যের প্রচার।

৮। তরুণ লেখক ও শিল্পীদের সম্ভবপর উপায়ে সাহায্য প্রদান করিয়া তাদের প্রতিভা-বিকাশের পথকে সুগম করিয়া দেওয়া।

৯। লেখক ও শিল্পীদের স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠা এবং তাঁহাদের আর্থিক জীবনের মান উন্নত করা।

ভারতের সকল প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী লেখক ও শিল্পীদের পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের সাহায্যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য গত এক বৎসর যাবৎ 'সন্ধ্যা' কাজ করিয়া আসিতেছে।

সম্মেলনে ভারতীয় কপিরাইট এক্টের সংশোধনের জন্য দাবি উত্থাপন করা হয়। অশ্লীল সাহিত্য ও ফিল্মের উপর হস্তক্ষেপ এবং বিকৃত সিনেমা-সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করার জন্যও সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

'সন্ধ্যা'র কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীরাজেশ্বরপ্রসাদ সিংহ, শ্রীসমর সোম ইহার কর্ম্ম-সচিব। আগামী ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে এক নিখিল-ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্তও 'সন্ধ্যা'র বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে।

ধর্ম্ম এবং বিশ্বমৈত্রী

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং 'ফ্রেটারনিটি অব ফেথ্‌স অরগেনাইজেশনে'র উদ্যোগে গত ২৫শে আগষ্ট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনাগৃহে এক আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

আলোচনীর উদ্বোধন করিতে গিয়া ডক্টর জে. কেলাস বলেন, ধর্ম্মকে মূল্য দিতে হইবে তাহার নিজের জন্যই—অন্য কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য নহে। বিশ্বমৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা আজিকার দিনে যত বেশী অনুভূত হইতেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন কালে ততটা হয় নাই। কিন্তু এই ঐক্য মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক কূটনীতি ইত্যাদি দ্বারা অর্জ্জিত হইতে পারে না, কেবলমাত্র ভগবদ্-বিশ্বাসের বলেই ইহার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমরা, যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাহারা দুইটি উপায়ে নাস্তিকতা ও সর্ব্বগ্রাসিতার প্রতিরোধ করিতে পারি। একটি হইতেছে, মানুষকে সদ্‌ভাবে জীবনযাপনের পন্থার নির্দ্দেশ প্রদান এবং অপরটি তাহাকে এমন কিছু দেওয়া যাহা সে জীবন অপেক্ষাও শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে। সার সত্যের প্রতি বিশ্বাসের জন্য আমরা যদি আমাদের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হই, কেবলমাত্র তাহা হইলেই যে সর্ব্বনাশের মুখোমুখি আমরা দাঁড়াইয়া আছি তাহাকে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইতে পারে।

কাজী আবদুল ওদুদ বলেন, ধর্ম্মের সার কথা ভগবানে আত্ম-সমর্পণ। অন্যান্য ঐহিক ব্যাপারাদির জন্য ইহার সঙ্গে কোন আপোষরফা হইতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীর প্রতি মৈত্রীভাব যেন
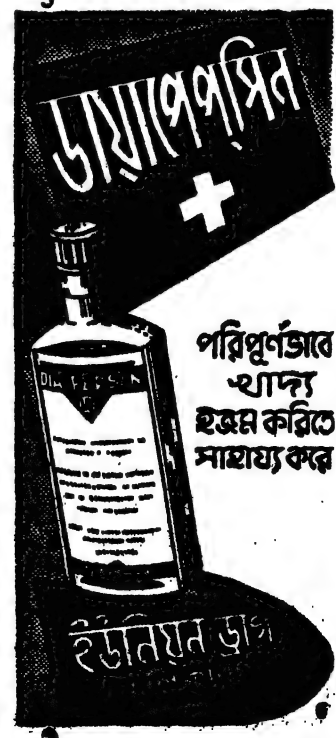
এম.বি.সরকার
এণ্ড সন্স

আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে। যাবতীয় প্রাণীর এই শুভকামনা সকল ধর্মেই অনুস্যূত হয়। উপনিষদের ঋষিরা বলিয়াছিলেন—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" কিন্তু আমাদের ধর্মবিশ্বাস সত্ত্বেও আমরা লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অনশনে রাখিয়া মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভোগ-সুখের ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার প্রতিকার করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য। অন্যথা মানবজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

রেভারেণ্ড শীলভদ্র বৌদ্ধধর্মের বিশ্বমৈত্রীর উপর জোর দিয়া বলেন যে, বৌদ্ধধর্মে স্বার্থপরতার স্থান নাই। বুদ্ধদেব সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেম ও করুণার বাণী প্রচার করেন। বর্ত্তমান জগতে বৌদ্ধধর্মের সত্য যদি সক্রিয় হইয়া উঠে তাহা হইলে জাতিতে জাতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হইয়া বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মিঃ এ. দিনশা বলেন, জরথুষ্ট্র এবং রামমোহন রায় এই দুই জনের প্রচারিত ধর্মের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। স্রষ্টা যখন একজন তখন সকল মানুষই পরস্পরের ভ্রাতা। আমাদের জীবনে এবং আচরণে এই সত্যের উপলব্ধি দ্বারাই কেবলমাত্র বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ডক্টর সরোজ দাস বলেন, এখন এমন সময় আসিয়াছে যখন আমাদিগকে বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হইতে হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন, আমাদের ভগবদ্গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাতে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমাদের এই পৃথিবীতে অনেক ধর্ম্ম বিদ্যমান, সত্য কিন্তু এক। সত্যের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিয়া আমরা যদি ইহা উপলব্ধি করিতে পারি তাহা হইলে আর সবকিছুই ইহার অনুগামী হইবে এবং বিশ্বমৈত্রীর প্রতিষ্ঠাও বিলম্বিত হইবে না। শাস্ত্রীয় অনুশাসন, ধর্ম্মমত, "ইজ্ম" ইত্যাদি পৃথিবীতে বিভেদ সৃষ্টি করে। কিন্তু সত্য ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করে।

ডঃ মুখোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে বলেন—গত মহাযুদ্ধ মানব সভ্যতার উপর যে প্রচণ্ড আঘাত হানে তাহার ফলে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের ঐক্যপ্রতিষ্ঠার আদর্শের জন্ম হয়। পারস্পরিক বুঝাপড়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ অথবা দৈবদুর্বিপাক এবং বৃথা যুদ্ধ এই সকলের মধ্যে কোনটির প্রতিক্রিয়ায় এই ঐক্যবদ্ধ পৃথিবীর সৃষ্টি হইবে, ভবিষ্যৎই তাহার বিচার করিবে, কিন্তু ইহার জন্ম অবশ্যম্ভাবী বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। যুগে যুগে ধর্ম্ম মানবজাতির জন্য আধ্যাত্মিকতার যে দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ব্যক্তির জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কেবলমাত্র তাহারই আছে। ধর্ম্ম যেমন মানুষকে তাহার ব্যক্তিগত 'অহং' জয় করিতে সাহায্য করিয়াছে, তেমনি ধর্ম্মই মানুষের জাতিগত অহমিকা জয় করিবার পক্ষে সহায়ক হইবে।

বি. এম. বসু

ভারত সরকারের উত্তর প্রদেশের শ্রমমন্ত্রী-পরিষদের 'ইন্সপেক্টর অব ট্রেনিং' বি. এম. বসু গত ২৬শে আগষ্ট বিমানযোগে দিল্লী হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হইয়াছেন। কারিগরি (ভোকেশন্যাল) শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভার্থ তিনি ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তথায় প্রেরিত হইয়াছেন।

বি. এম. বসু ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী অবসরপ্রাপ্ত পুলিস অফিসার খগেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-ই (মেক্যানিক্যাল) উপাধি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একজন কৃতী ছাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন।

বর্ত্তমান কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে বসু মহাশয় বাংলাদেশে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কাজ করিতেন। সেখানে কারিগর এবং শিল্পীদের তত্ত্বাবধায়কদের শিক্ষাদানে তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁহার প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই আজ সারা ভারতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে (আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের কারখানা) দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কারিগরদের (টেক্নিসিয়ান) শিক্ষাদান বিষয়ে বসু মহাশয়ের বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি এ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান অর্জ্জন করিবার সুযোগ লাভ করিবেন।

কেশরঞ্জের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
চুল উঠা বন্ধ করে
মাথা ঠাণ্ডা রাখে
এই মার্কা দেখে কিনুন•নকল থেকে সাবধান

পূর্ণকুম্ভ—শ্রীরাণী চন্দ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

শ্রেষ্ঠ কলাবৎ তানপুরার তারে সুর বাঁধিয়া রাগের আলাপ আরম্ভ করিবামাত্র যেমন রসজ্ঞ শ্রোতার মনে খুশীর আমেজ লাগে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেও তেমনি সুরুতেই 'সাধা' হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। "পূর্ণকুম্ভ" ঠিক সেই ধরণের একখানি বই যা একেবারে সুরু হইতেই পাঠকের মনে চমক লাগাইয়া দেয়। প্রথম পৃষ্ঠা হইতেই 'শিমুল ফুলের ভিতরে বাটি-ভরা মধুর' ন্যায় ইহার প্রতিটি ছত্র যেন রসে একেবারে টসটস করিতেছে এবং আশ্চর্য্য এই যে, এই অনাবিল রস পুস্তকখানির একেবারে শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—কোথাও রসাভাস ঘটে নাই।

আত্মীয়দের সঙ্গে লেখিকা চলিয়াছেন হরিদ্বারে অমৃতকুম্ভে—তীর্থের প্রতি দুর্নিবার সে আকর্ষণ, কিন্তু পিছন হইতে ঘরের মায়া তাঁহার মনকে শতপাকে জড়াইয়া ধরিতেছে। তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে দেখিয়া আসিয়াছেন—বসন্তের হোঁয়ায় আঙিনায় সবে সুরু হইয়াছে শিমুল পলাশ কোটার পালা—অন্তরের অন্তঃপুরে চলিতেছে স্মৃতির রোমন্থন। আর তাঁর নিপুণ তুলিকায় বসন্তের, পুষ্পসম্ভারসমৃদ্ধ গৃহ-প্রাঙ্গণের কি অপরূপ স্মৃতি-চিত্রই না ফুটিয়া উঠিয়াছে!

রূপসৃষ্টির আনন্দে কথার সাহায্যে ছবির পর ছবি আঁকিয়া চলিয়াছেন লেখিকা এই ভ্রমণ-কাহিনীতে। আশ্চর্য্য তাঁহার দেখিবার চোখ। কোনো দৃশ্যই, পারিপার্শ্বিক কোনো ঘটনাই—আপাতদৃষ্টিতে তা যতই তুচ্ছ ও সাধারণ বলিয়া প্রতীয়মান হোক না কেন—তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় না। আর অপূর্ব্ব তাঁহার মাত্রাজ্ঞান। এক-একটি নৈসর্গিক খণ্ডদৃশ্যের বর্ণনা যেন হালকা তুলির নিপুণ টানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে ফুটিয়া-উঠা এক-একটি নিরুপম সৌন্দর্য্য-ছবি। কোথাও রেখার বাহুল্য নাই, রঙের জলুসে চোখে ধাঁধা লাগাইবার প্রয়াস নাই—রঙে রেখায় যতটুকু প্রকাশিত, ব্যঞ্জনা তাহার চেয়ে ঢের বেশী।

কি সে যাদু লেখিকার ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে যাহা আমাদের চোখে মাখাইয়া দেয় মায়া-অঞ্জন। তাহার প্রভাবে তাঁহার চোখ দিয়া যাহা দেখি তাহাই ভালো লাগে, কোথা হইতে অনুভূতির একটা অজানা আলো আসিয়া পড়িয়া সবকিছুকে যেন এক দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। বর্ণনাগুণে আমাদের মনে শুধু আবেগই নয়, গতিবেগও সঞ্চারিত হয়। আমরাও যেন এই পুণ্যার্থিনীদের সঙ্গে সঙ্গে উপনীত হই হরিদ্বারে—পূতসলিলা গঙ্গাতীরে। তাঁদের সঙ্গে কি এক অপার্থিব দুর্লভ সম্পদের আশায় বিচরণ করি তপোভূমির মন্দিরে মন্দিরে, সপ্ত সরোবরের

ঘোষ ব্রাদার্স
জুয়েলার্স
১১৪ নং কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা
বি, বি, ২২৫৯
শাখা
১৬ নং গড়িয়াহাট রোড
বালীগঞ্জ
ও
জলপাইগুড়ি,
ফোন ৬২

অশীতিপরবর্তী হংসদেবের আশ্রমে বসিয়া এই মহাপুরুষের শ্রীমুখাৎ শ্রবণ করি সরল বিশ্বাসের মাহাত্ম্য-কথা, অগণিত তীর্থযাত্রীর ভিড়ে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে বসিয়া স্নানার্থী সাধুদের শোভাযাত্রার সমারোহ অবলোকন করিয়া অভিভূত হই নির্ব্বাক বিস্ময়ে। তারপর বৃন্দাবনে গিয়া হোলি উৎসবে লালে লাল 'ব্রজ রজঃ' সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া হই পুলকিত। অবশেষে মথুরা, বৃন্দাবন, বারাণসী, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রের তীর্থবারি'তে হৃদয়ের পাত্র পূর্ণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হই।

এই ভ্রমণ-কাহিনী আমাদিগকে যে রহস্যময় জগতের দ্বারদেশে লইয়া যায় তাহার পরিবেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেখানে পৌঁছিয়া মনে হয়, ভারতের তীর্থ-মন্দিরে, পুণ্যসলিলা গঙ্গা-অলকানন্দার তীরে তীরে অগণিত সাধু-সন্ন্যাসীর তপস্যাক্ষেত্রে হিন্দুজাতির অধ্যাত্মসত্তার যে বহুধাবিচিত্র বিকাশ, কেবলমাত্র ভক্ত বিশ্বাসী হিন্দুর দৃষ্টিতেই তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধ হইতে পারে। কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বার এবং বৃন্দাবনে সমাগত লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসীর কঠোর তপশ্চর্য্যা দেখিয়া লেখিকার মত আমাদের মনেও এই কৃচ্ছ্রসাধনের সার্থকতা কি সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু লেখিকার সহযাত্রিণী ভক্তিমতী 'বড়দি'র সেই সরল বিশ্বাস—যার প্রসাদে ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ, তাহা আমাদের অন্তরেও সঞ্চারিত হইয়া সকল সংশয়ের নিরসন করে।

লেখিকা প্রসঙ্গক্রমে পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, ভোলানন্দ-গিরি, ভাস্করানন্দ, ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রমুখ মহাপুরুষদের সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন সেগুলিও মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থপাঠে একদিকে যেমন পাঠকের রসপিপাসা চরিতার্থ হয়, অন্যদিকে তেমনি ইহা তাহার মনকে লইয়া যায় এক উন্নততর স্তরে, অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য তাহার মনে এক অনির্দ্দেশ্য ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়। অনুভূতির গভীরতা, দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব, প্রকাশের স্বচ্ছতা—এই সমস্ত গুণের সমন্বয়ে পুস্তকখানি বাংলা-সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে।

মুক্তিপথের গান—শ্রীঅমরকুমার দত্ত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত কবিতাসমষ্টি। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন—"ভারতের এই বিরাট জাতীয় জীবন সময়ে সময়ে যে আলোড়ন এনেছে ভারতবাসীর মনে তারই একটি অকিঞ্চিৎকর ছবি আমার এই "মুক্তি-পথের গান।" এই বইয়ের কবিতা-গুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত:—মুক্তিপথের গান, অভিযান, অগ্রগামী। ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের যাঁরা ঋত্বিক সেই বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের উদ্দেশে রচিত কবিতাগুলি আছে প্রথম ভাগে। "অভিযান" অংশে, সন্ন্যাসীবিদ্রোহ হইতে আরম্ভ করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তিসংগ্রাম পর্য্যন্ত যে সকল মুক্তি-আন্দোলন দেশের বুকে সাড়া জাগাইয়াছে তৎসম্বন্ধে রচিত কবিতাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় অংশে ক্ষুদিরাম, যতীন দাস, নেতাজী সুভাষ প্রমুখ দেশের অগ্রগামী বীর সন্তানদের স্মরণে লিখিত কবিতাবলী স্থান পাইয়াছে।

একটা তেজোদৃপ্ত পৌরুষের সুর এই বইয়ের কবিতাগুলির মধ্যে অনুরণিত। ভাবের গাম্ভীর্য্য, সুনির্ব্বাচিত শব্দচয়ন এবং ছন্দোবৈচিত্র্যে অনবদ্য কবিতাগুলি পাঠ করিলে মনে একটা অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। বর্ত্তমানের খণ্ডিত আশাহত বাংলার ঘরে ঘরে সঞ্জীবনী মন্ত্রবিধায়ক এই সকল কবিতা পঠিত হওয়া আবশ্যক। কবিতাগুলি গীতিধর্মী, সুর-তান-লয়ে গীত হইলে এগুলির প্রভাব অধিকতর কার্য্যকরী হইবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ভাগ্যহীনের বিধিলিপি—শ্রীপ্রমদারঞ্জন সেনগুপ্ত। কল্যাণী স্মৃতিমন্দির। ৩৮নং যোগীনগর, ঢাকা। মূল্য ১৲ মাত্র।

গ্রন্থকারের নিজের কথায় গ্রন্থখানি "ব্যথিতের প্রলাপ ও আর্ত্তের উচ্ছ্বাসমাত্র।" পরলোকগত পুত্রের স্মৃতি এবং শোকসন্তপ্ত মনের নানা চিন্তা কয়েকটি প্রবন্ধ-আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বিপ্রতীপ—শ্রীঅবিনাশ রায় ও আর এক জন। এ. সি. দাশগুপ্ত কোম্পানি, ৩২-৪ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য ১।০।

আধুনিক কবিতার বই। সম্পূর্ণ খেয়ালের খেলা। ভূমিকায় লেখকেরা বলিয়াছেন: "আমরা কবি নই, তবে কবিতা প'ড়ে থাকি।" প্রথম কবিতা—'এ যুগের চাঁদ', আরম্ভ:

> "বলি কানে কানে আস্তে
> এ যুগের চাঁদ কাস্তে।"

ষষ্ঠ কবিতার নাম '?'।

আশা করি, ইহা হইতেই লেখকদ্বয়ের [সত্যই কি দুই জন?] খেয়ালীপনার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। অন্ততঃ ছাপার ভুলগুলি তাঁহাদের সংশোধন করিয়া দেওয়া উচিত ছিল।

নবদীপন—নিশিকান্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য ২॥০।

কাব্যরসিক বাঙালী-মাত্রেরই নিকট নিশিকান্তের কবিতা সুপরি-চিত। ভাবের গভীরতা এবং ভাষার পূর্ণতা তাঁহার পরিণত কবিপ্রতিভার নিদর্শন। শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে রচিত এই ত্রিশটি কবিতায় যে পবিত্র ভাবদীপ্ত প্রকাশ পাইয়াছে তাহা পাঠকগণের হৃদয়ে শান্তির

আলোক বিকীর্ণ করিবে। প্রতি কবিতায় শেষাংশে বাজিয়াছে একটি মন্ত্রের সুর : "শ্রী অরবিন্দ বিবস্বান্

নবকল্পের জগদ্গুরু

আরক্তে তব বিভা আবরিত

আবরণে নব দীপন সুরু।"

ভজনমালা (স্বরলিপিসংগ্রহ)—কুমারী শ্রীবিজন ঘোষ দস্তিদার, সঙ্গীত বিদ্যালঙ্কার। ৬১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ১২। মূল্য ২৷০।

স্বরলিপিসহ ১৬টি ভজনগানের সঙ্কলন। যিনি সঙ্কলন করিয়াছেন, সুগায়িকা এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞা বলিয়া কেবল বাঙ্গালাদেশে নহে, বাংলার বাহিরেও তাঁহার খ্যাতি আছে। এই স্বরলিপি-পুস্তকখানি সঙ্গীত-চর্চাকারী এবং ভজন-অনুরাগীদের সমাদর লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। মহাত্মাজীর প্রিয় বিখ্যাত 'রামধুন'ও এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাত্যহিক—শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। কমলা বুক ডিপো, ১৫ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

নূতনত্বের মোহে বিভ্রান্ত না হইয়া এই নবীন কবি কাব্যের সুপ্রশস্ত সনাতন পথেই যাত্রা করিয়াছেন। পরিচ্ছন্ন ভাষায় ও মনোরম ছন্দে অনায়াসে ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে, এই কাব্যগ্রন্থখানিতে তাহার পরিচয় পাইয়া তৃপ্তিবোধ করিলাম।

মেঘে ঢাকা চাঁদ—শ্রীমতী মিনতি নাথ। দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড। ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।০।

বালিকার লেখা কবিতার বই—সে দিক দিয়া আশাপ্রদ। ভাষা ও ছন্দের উপর লেখিকার দখল আছে। তাঁহার রচনা যে উত্তরোত্তর রূপে-রসে পূর্ণতর হইয়া উঠিবে, তাহার প্রতিশ্রুতি এই কবিতাগুলির মধ্যে আছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাধা-মদনমোহন—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র। আর, কে, পাবলিশিং কোম্পানী, ১১এ, গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা। মূল্য—২৲ টাকা।

মানুষের মনোভূমিতে দেবতার বাস ; সুতরাং মানুষের দৈনন্দিন কর্মের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অস্বীকার করার উপায় নাই। পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির কাহিনীগুলিতে মানুষ এবং দেবতা এক হইয়া রহিয়াছেন—স্বর্গ ও মর্ত্যের ব্যবধান—তাঁহাদের প্রীতি প্রেম সখ্য বাৎসল্যের প্রবাহধারায় মুছিয়া গিয়াছে। পুত্র, পিতা, সখা, প্রভু কিংবা প্রেমাস্পদ প্রভৃতি ভিন্নতর রূপে এই দেবতা আমাদের জীবনের বৃত্তিগুলিকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন—অতি আপন জনের মত তাঁহাকে লইয়া হাসি অশ্রু আনন্দ বেদনা মিশাইয়া আমরা গল্প রচনা করিয়াছি অনেক। বাগবাজারের মদনমোহনকে লইয়া বাংলায় তেমনই এক সুমধুর প্রেমভক্তিমূলক কাহিনী প্রচলিত আছে। বিষ্ণুপুরের রাজবংশ আর বাগবাজারের গোকুল মিত্র এই কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই মদনমোহন দীনের কুটীর হইতে আসিয়াছেন রাজার প্রাসাদে, আবার রাজহর্ম্য হইতে গিয়াছেন ভক্তের আলয়ে। কাহার 'কিছু' হারাইলেই যে মদনমোহন পলাইয়া যান—বহুপ্রচলিত এই প্রবাদটি ছেলেদের মুখে মুখে বহুকাল হইতেই ফিরিতেছে। সে 'কিছু' ভক্তি ছাড়া যে অন্য বস্তু নহে—মদনমোহনের লীলা-কাহিনীতে তাহাই সুব্যক্ত হইয়াছে। লেখক ঠাকুরের সেবায়েত বংশের অন্যতম। এই কাহিনী লিখিবার অধিকার তাঁহার আছে এবং লেখনীমুখে সেই যোগ্যতার প্রমাণও তিনি রাখিয়া দিয়াছেন। তথাপি এই ভক্তি-উপচারে যে সামান্য ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে তাহা ভক্ত-মনকে পীড়িত করে—এবং এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্নও মনে জাগে। পুস্তকের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল কাগজ সংগ্রহ করা কঠিন ছিল কি ? মদনমোহন বিগ্রহের আলোকচিত্র তোলা বা অন্য কোন চিত্র অঙ্কন করা নিষিদ্ধ কিনা ? তৎপরিবর্তে আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত নাচঘরের কয়েকখানি ছবি দিবার সার্থকতা কি ? ইহাতে বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া উপকরণকে প্রচার করার অশোভন ব্যগ্রতাই দেখা যায়।

নদী ও নারী—হুমায়ুন কবীর। ওরিয়েণ্ট লংম্যান্‌স লিমিটেড, ১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩। মূল্য ৪৷৷০ টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানির নাম হইতেই বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায়। পদ্মার তীরে নূতন চরে নূতন মানুষেরা আসিয়া ঘর বাঁধে। চাষের জমি বাড়ে, সংসারও সেই সঙ্গে গড়িয়া উঠে। আসে নারী—সমাজ গড়িয়া উঠে। এক কূল ভাঙিয়া অন্য কূল ভরিয়া নদী যেমন বহিয়া যায়, নারী তেমনি সংসারের এক কূল মুছিয়া দেয়—অন্য কূলকে করিয়া তুলে সমৃদ্ধ। নূতন চরের বন কাটিয়া, মাটি তৈয়ার করিয়া তাহাতে সোনা ফলাইয়া যে দু'জন মানুষ একদিন পরম দোস্তির সঙ্গে শান্তিতে দিন যাপন করিয়াছে, পরে তাহারাই পরস্পরের পরম শত্রুতে রূপান্তরিত হইয়াছে। নদীর রহস্যে যেমন সর্বনাশ ও সমৃদ্ধির কাহিনী লেখা থাকে, এই দুটি মানুষের বিদ্বেষের মধ্যে তেমনি আছে এক নারীর ভালবাসা। এই ভালবাসা একটি জীবনকে জ্বালাইয়া আর একটি জীবনে জীয় শস্য-সমারোহে সার্থক হইয়াছে।

মূলতঃ এই কাহিনী সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষদের—যাহাদের জীবিকা চাষ-আবাদ—যাহাদের পৃথিবী একটি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহারা পূর্ববঙ্গের বিত্তহীন মুসলমান চাষী। ইহাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচয় থাকায় যে আংশিক ছবি লেখক আঁকিয়াছেন তাহা জীবন্ত হইয়াছে। সেই সঙ্গে জীবন্ত হইয়াছে সর্বনাশী পদ্মা। নিম্নবিত্ত মুসলমান-সমাজের রীতিনীতি গল্পটিকে বাস্তব রূপ দিয়াছে। ঘটনাপরম্পরা কৌতূহলের সূত্র ধরিয়া যে চরম পরিণতিতে পৌঁছিয়াছে তাহা অত্যন্ত করুণ। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্য ও রচনাকৌশলে চমৎকারিত্ব আছে। যাহা একটি বিষয়ের অনবধানতা গল্পটিকে সম্পূর্ণ বাস্তব-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। গল্পের চরিত্রগুলি যে স্তরের, সংলাপে সে স্তরের সীমা লঙ্ঘিত হইয়াছে। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের মুখে কেতা-দুরস্ত বুলি কেমন যেন বেমানান লাগে। এই ত্রুটিটুকু না থাকিলে 'নদী ও নারী' নিম্নবিত্ত সমাজের নিখুঁত আলেখ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। প্রচ্ছদপট চমৎকার।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ধীমতির অর্থনীতি বা সামাজিক ঋদ্ধিকথা—শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯। পৃষ্ঠা ১১৪, মূল্য ২৲।

এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য—'সনাতনী মূল্যতত্ত্বের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে নূতন সামগ্রিক অর্থনীতির মূল কাঠামোকে বিবৃত (ব্যাখ্যা) করা।' নিম্নলিখিত আটটি অধ্যায়ে বা প্রস্তাবে এই জটিল বিষয়টি ব্যাখ্যাত হইয়াছে: সমাজের বাস্তব (আর্থিক) রূপ; আয়ের ত্রিবেণীধারা (খাজনা, মজুরী এবং সুদ); সমাজের ব্যয় বা আয়ের ব্যবহার; সরকার ও সামাজিক আয়-ব্যয়; বাজার ও মূল্যক্রম; অর্থ, আয় ও মূল্যক্রম; বহির্বাণিজ্য ও সামগ্রিক আয় এবং ধনিকতন্ত্র ও রাষ্ট্রশাসন।

ধনোৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার দরুন সমাজের ঐহিক বা আর্থিক কল্যাণ বর্তমানকালে নানা জটিলতায় আচ্ছন্ন, অথচ ক্রমেই জনসাধারণকে—শিক্ষিতের ত কথাই নাই—নিতান্ত জীবনধারণের প্রয়োজনে এই সকল তত্ত্বে ওয়াকিবহাল হইতে হইতেছে। বর্তমান গ্রন্থে লেখক ইংরেজী শব্দের ব্যবহার প্রায় না করিয়াই অর্থতত্ত্বের জটিল বিষয়টি যেরূপ সরল ভাষায় পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা দাবি করিতে পারেন। অর্থনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে লেখকের এই গ্রন্থ যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।